

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

ঊনবিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ,—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮—১৩৩৯

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক—লেখসূচি

চিত্রসূচি

পৌষ—১৩৩৮

বহুবর্ণ চিত্র

মাঘ—১৩৩৮

বহুবর্ণ চিত্র

ফাল্গুন—১৩৩৮

বহুবর্ণ চিত্র

চৈত্র—১৩৩৮

বহুবর্ণ চিত্র

বৈশাখ—১৩৩৯

বহুবর্ণ চিত্র

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৯

বহুবর্ণ চিত্র



পৌষ—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ

গীতার মান্ত্রবর্ণিক

অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ

কর্ম্মযোগ

মান্ত্রবর্ণিক, অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিতেছেন। কুরুক্ষেত্র হইতে অর্জ্জুন পিছাইয়া আসিতে চান, কি মুস্কিল! তাঁহার মনে ভাবান্তর আসিয়াছে—স্বজনবধে সিংহাসনের কি প্রয়োজন, এমন সাধে বাজ পড়ুক—কাষ নাই রাজত্বে, রাজ্যে,—বনের পথ ঢের ভাল! বাসুদেব আত্মবিস্মৃত অর্জ্জুনকে কর্ম্মক্ষেত্রে ধরিয়া রাখিতে চান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য শুনাইয়া দেন। অমৃত ভাষণ শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে ঔষধ ধরিয়া আসিয়াছে। আরও শুনিতে চান, আরও স্পষ্ট করিয়া কথাগুলিকে ধরিতে চান। যে কথা বলা হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি চান। বাসুদেব অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের গণ্ডীতে গাণ্ডীব করে, কর্ম্মময় পুরুষ রূপে, দেখিতে চান। তাই ২য় অধ্যায়ে, ৪০ হইতে ৫৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে কর্ম্মযোগ শুনাইয়াছেন। ৫৩ হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞভাষণ শুনাইয়াছেন,—কর্ম্মযোগীর পক্ষেই একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া সম্ভব। তাই ইহাকে কর্ম্মযোগের শেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' গোছের পরিসমাপক করিয়াছেন। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানযোগেরই একরূপ নামান্তর। জ্ঞানের মাত্রা এতটা চড়িয়া উঠিল যে কর্ম্মযোগ চাপা পড়ার উপক্রম হইল। অর্জ্জুনের কাণে কর্ম্মের ক্ষীণ মূর্চ্ছনা বাজিতেছে; আর এ-দিকে শ্রীকৃষ্ণ 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ'

শুনাইতেছেন। অর্জ্জুনের নিকট যেন কেমন বিরোধ-বিরোধ ঠেকিতে লাগিল—কর্ম্মের আসন যেন অনেক নীচু হইয়া গেল, জ্ঞান যেন অনেক উঁচু হইয়া উঠিল। তবে কোন্ পথে যাই? এই দ্বিধার মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্ভব।

'হে জনার্দ্দন, হে কেশব—যদি কর্ম্ম হইতে বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হয় তবে কর্ম্মে কি প্রয়োজন? কখনও কর্ম্মের কখনও জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ, মিছামিছি কেন মিশ্র বাক্-চাতুর্য্যে আমার মনকে দিশাহারা করিতেছ? কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সেইটি বল। ১, ২।

এমনি করিয়া অর্জ্জুন, জ্ঞান ও কর্ম্মের সন্ধিস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এদিকে ওদিকে উদ্বেগাকুল মন ফিরাইতেছেন;—প্রশ্ন উঠিতেছে কোন্‌টি ভাল? শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে কর্ম্মযোগের পাঠ সুরু করিলেন। পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি যে, গীতার ঐতিহাসিক ভিত্তি স্বধর্ম্ম,—স্বধর্ম্মের কাঠামই কর্ম্মযোগ। কুরুক্ষেত্রে রণবিমুখ অর্জ্জুনকে দাঁড় করাইতে কর্ম্মযোগের দীপক রাগের যত প্রয়োজন, এমন আর কিছুরই নহে। তাই কর্ম্মযোগাধ্যায়টি গীতার একরূপ প্রাথমিক সোপান।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে কহিলেন,—'হে অর্জ্জুন, দুই প্রকার যোগ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সাংখ্যমতে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মিদের মতে কর্ম্মযোগ। ৩।

প্রারম্ভ শ্লোকোক্ত 'বুদ্ধি' ও 'কর্ম্ম' শব্দের ব্যাপকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। 'বুদ্ধি' শব্দের উল্লেখ ২য় অধ্যায়ে এইরূপ—'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি' (৩৯)। ইহার সহিত বর্ত্তমান শ্লোক 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্' মিশাইলে, বুদ্ধি অর্থে যে জ্ঞানযোগ বুঝিতে হইবে, তৎসম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কি গভীর সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে 'বুদ্ধি' শব্দের ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধি যখন আত্মসমাহিত তখন ইহা জ্ঞানযোগ; যখন সেই আত্মস্থ বুদ্ধি কর্ম্মে অভি-নিবিষ্ট তখন ইহা কর্ম্মযোগে দাঁড়ায়। যে-কর্ম্মের পশ্চাতে আত্মানুমোদিত বুদ্ধির চালনা নাই, সে কর্ম্ম ফলযুক্ত, যোগযুক্ত নহে। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠান সহজ নহে, গুরুতর। স্ববিৎ না হইলে কর্ম্মে অধিকারী হওয়া যায় না; স্ববিৎ না হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য পালনেও কোন উপকার দর্শে না। অতএব সর্ব্বাদৌ স্ববিৎ হওয়া বিধেয়। তাই ২য় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ সর্ব্বপ্রথম বিবৃত করিয়াছেন।

'হে অর্জ্জুন, কর্ম্মের একদা অনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিলেই যে কর্ম্মাতীত হইবার সুবিধা হইবে এমন নয়, আর সন্ন্যাস লইলেই যে মোক্ষ সহজলভ্য হইবে এমনও নয়। ৪।

ইহার কারণস্বরূপ বলিতেছেন—

'কেহ কখনো কর্ম্মহীন হইয়া ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না, প্রকৃতিজ ত্রিগুণ সকলকেই অলক্ষ্যে থাকিয়া কর্ম্ম করাইবেই করাইবে। মানুষের কর্ম্ম না করিয়া উপায়ান্তর নাই। ৫।

ইহার অর্থ কি? গৃহী যেমন গৃহকে ভুলিয়া গৃহে বাস করিতে পারে না, অনুক্ষণ গৃহকে উঠিতে বসিতে শুইতে, এমন কি স্বপ্নেও এড়াইয়া চলিতে পারে না—গৃহের প্রভাব নিদ্রা ও জাগরণে মানিয়া চলে, তেমনি প্রকৃতি মানবের জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মগৃহ—প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-সংস্কারো বর্ত্তমান জন্মাদৌ অভিব্যক্তঃ (শঙ্কর)। ইহাকে এড়াইয়া চলা পূর্ব্ববৎ অসম্ভব। জলে সাঁতার কাটিতে কাটিতে জলকে অস্বীকার করা কি সম্ভব? এখন এই ৪র্থ শ্লোকটিকে একটু বিচার করা চলে। যে-ব্যক্তির মধ্যে কর্ম্মগৃহ মজুত রহিয়াছে তাহার পক্ষে 'নৈষ্কর্ম্ম্য' কিরূপে সম্ভব, আর এমতাবস্থায় সন্ন্যাসমাত্রই বা সিদ্ধি-লাভের কি ভরসা? 'জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ,' 'পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ'—যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুণ্যপাপের সমষ্টিভূতা প্রকৃতি একেবারে না বিলোপ পাইয়াছে, ততক্ষণ জীব নির্ম্মল হইয়া নিরঞ্জনকে পায় না। সুতরাং কামাত্মক প্রকৃতি-রূপ কর্ম্মগৃহে বাস করিয়া জীব যখন নৈষ্কর্ম্ম্যব্রত অথবা সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া 'বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বাসনাসুখ হইতে বিরত রাখিয়া মনে মনে সেই সব ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের অনুশীলন করে—সে নিতান্তই কপটাচারী ও ভণ্ড।' ৬।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কর্ম্ম করার কি বিধি থাকিতে পারে? কর্ম্মগৃহরূপা প্রকৃতির মধ্যে যখন বাস করিতেই হইবে, তখন 'বিধূয় নিরঞ্জনঃ' হইবার কি পন্থা থাকিতে পারে? তাই শ্রীকৃষ্ণ নিরঞ্জন হইবার জন্য কর্ম্মযোগ আদেশ করিতেছেন,—

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের আসক্তি নিরোধ করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়

অর্থাৎ হস্তাদি করণ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠাতা হইবে, তাহার কর্ত্তব্য-পদ্ধতি কর্ম্মযোগসংজ্ঞা লাভ করিবে। ৭।

কর্ম্মযোগের আসন হইল মনে—মন হইতে তন্মাত্রযুক্ত আসক্তি একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, মনের রাজা বুদ্ধি; সেই বুদ্ধি যখন মনের লাগাম ধরিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ হইতে ইহাকে টানিয়া লয়, তখনই ফলবিযুক্ত কর্ম্ম করা সম্ভব হয় এবং তদবস্থায় 'বুদ্ধিযুক্তো জাহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে' এমন যে কর্ম্মানুষ্ঠান, ইহাকেই কর্ম্মযোগ কহে। বুদ্ধি যখন স্ব-যুক্ত হয় তখনই জ্ঞানযোগ—কারণ 'জ্ঞ এবাত্মা'। সেই স্ব-যুক্ত বুদ্ধি যখন কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয় তখনই ইহা কর্ম্মযোগ, কেন না সেই বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকিতে পারে না। এতদনুযায়ী শ্লোক ২য় অধ্যায়ের কর্ম্মযোগাংশে আমরা পাইয়াছি—যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি ২।৪৮; 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ' ২।৪৯—এইরূপে কর্ম্মযোগের প্রথম সূত্র পাওয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিতেছেন—ঈদৃশ বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম নিয়ত করিবে, নৈষ্কর্ম্ম্যের চেয়ে ইহা ঢের ঢের ভাল। যদি হাত পা করণাদি গুটাইয়া বসিয়া থাক তবে প্রাণ রক্ষাই ত দুষ্কর! ৮।

এই পর্য্যন্ত আমরা কর্ম্মযোগের প্রথম চ্ছেদ পাইতেছি। দ্বিতীয় চ্ছেদ ৯ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত। ১ হইতে ৮ পর্য্যন্ত প্রকৃতি-প্রভাবান্বিত কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় চ্ছেদে প্রাণের যজ্ঞরূপ ও অন্নের দেবভাব আলোচিত হইবে।

(২)

প্রাণের যজ্ঞরূপ

যজ্ঞ বাহিরের অনুষ্ঠান—অগ্নি ইহার প্রাণ, ইহাকে ঘেরিয়া ঋত্বিকমণ্ডলী হবন করেন। বহির্যজ্ঞটিকে অন্তর্লোকে লইয়া আসা অথচ হুবহু মিল রাখা যে-সে কার্য্য নহে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেই অলক্ষিত বিষয়টিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছেন। প্রাণের যজ্ঞরূপ যাহার নয়নে সমুদ্ভাসিত হইবে, তাহার জীবনের সুর ফিরিয়া যাইবে, চেতনায় জীবনের সত্যমূর্ত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন,—

যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অপর কর্ম্ম স্বার্থজ—তাহাতে জীবের কর্ম্মবন্ধনই ঘটে, কর্ম্মমোচন হয় না। সুতরাং হে অর্জ্জুন, ইন্দ্রিয়াসক্তি নিরোধ করিয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্মে ব্রতী হও। ৯।

যজ্ঞার্থ শব্দটি 'অর্থেন চ,' সূত্রানুসারে যজ্ঞায় ইদম্ এইরূপ হইবে। এখন যজ্ঞ অর্থ কি? 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' ইতি শ্রুতি। যজ্ঞ বিষ্ণুরই নামান্তর; অভিধানেও যজ্ঞ নারায়ণের নাম—'যজ্ঞঃ স্যাদাত্মনি মখে নারায়ণ-হুতাশয়োঃ' ইতি হৈমঃ। সুতরাং এই যজ্ঞ 'স্ব'-এর সহিত অভিন্ন, দ্বিতীয় অধ্যায় একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। স্ব-এর দিকে চাহিয়া কর্ম্ম করাই স্ব-ধর্ম্ম—ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখিয়াছি। এ ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ উহারই দ্বিরুক্তি করিতেছেন। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করাই স্বানুমোদিত কর্ম্ম করা এবং উহাই কর্ম্মযোগ।

সেই স্ব-রূপ যজ্ঞাগ্নির স্ফুলিঙ্গকেই প্রাণরূপে প্রাণীতে অধিষ্ঠিত করিয়া প্রজাপতি আদেশ করিয়াছেন—'তোমরা ইহার অর্থাৎ প্রাণাগ্নি সাহায্যে উন্নতিশীল হও, ইহা তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ করুক! ১০।

প্রাণ আত্মার একটি শিখা বিশেষ—ইহাই জীবন-যজ্ঞের হোমানল। আগুন নিভিলে যেমন যজ্ঞ থামিয়া যায়, প্রাণ নিভিলেও তেমনি জীবন-যজ্ঞ অঙ্গারে পরিণত হয়। সুতরাং এ উপমা অতি সুষ্ঠু। ছান্দোগ্য উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য ইহার পার্শ্বে বসাইতেছি, তাহা হইলে সূক্ষ্ম বিষয়টি সহজদৃষ্টিগ্রাহ্য হইতে পারে। ন চ প্রাণৈর্ব্বিযুক্তস্য গতিরূপপদ্যতে, জীবত্বং বা। সর্ব্বগতত্বাৎ সদাত্মনো নিরবয়বত্বাৎ প্রাণসম্বন্ধমাত্রমেব হি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জীবত্ব-ভেদকারণমিতি, অতস্তদ্বিয়োগে জীবত্বং গতির্ব্বা ন শক্যা পরিকল্পয়িতুম্ শ্রুতয়শ্চেৎ প্রমাণম্। ৫।১০।১ প্রাণই জীব—কেন না যিনি প্রাণন্-প্রাণবান তিনিই জীবন্ জীবন্ত। যতক্ষণ জীবন্ ক্রিয়ায় বাধা না ঘটে ততক্ষণই জীব, যখন ইহা থামিয়া গেল তখনই নির্জীবণ এই প্রাণন্ ক্রিয়াটিকে ফোয়ারার ন্যায় খুলিয়া দেওয়ায় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা আত্মনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। দেহে যুক্ত হওয়ায় ইহা যেমন দেহকে জীবন্ত করিয়াছে, তেমনি ইহা আত্মনরূপ মূল-অগ্নি হইতে পৃথক হইয়া জীবভেদ ঘটাইয়াছে। তাই জীব বলিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকেই বুঝায়, কিন্তু অগ্নিকে নহে। আত্মন্ শাশ্বত অগ্নি, ইহা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকে না, কিন্তু প্রাণরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি শরীরাশ্রয়ী, সুতরাং

নিত্য চঞ্চল। যখনই শরীর-বিযুক্ত হইয়া গেল তখনই দৃশ্যতঃ ইহা যেন নিভিয়া গেল, আর জীব নির্জীব হইয়া পড়িল।

দশম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাণকে যজ্ঞাগ্নিরূপে ধরিয়া লইয়া উহাতে হোম করিতে বলিতেছেন। এ যজ্ঞ অবশ্য অন্তর্যজ্ঞ। ইহার কি রূপ? বহির্যজ্ঞের অনুযায়ী অন্তর্যজ্ঞও হুবহু আকারপ্রকারভূষিত। যজ্ঞাগ্নিতে যে হবি আহুত হয়; তাহাকে যেমন সেই উদ্দিষ্ট দেবতার নিকট অগ্নি বহন করিয়া লইয়া যায়, কেন না 'বহ্নিমুখা বৈ দেবাঃ'—ঠিক তদ্রূপ প্রাণাগ্নিতেও যে অন্তর্যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার আহুতি স্বরূপী আত্মনের নিকটে যায়। বহির্যজ্ঞের হবি গব্য, প্রাণাগ্নির হবি ব্রাহ্ম। উর্দ্ধরেতস্সু চ শব্দে হি—বেদান্তদর্শন ৩।৪।১৭। তাই ইন্দ্রিয়-নিরোধ প্রয়োজন, নতুবা ব্রহ্মহবি ক্ষরিত হইয়া যাইবে।

এই প্রাণশক্তিতে প্রাণবন্ত হইয়া দেবতাদিগকে অর্চ্চনা কর, দেবতারাও তোমাদের অনুরাগী হউন—পরস্পরের প্রীতিবদ্ধ হইয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হও। ১১।

এইখানেই আমরা দ্বিতীয়াংশের অনুচ্ছেদ অন্নের দেবভাবে পৌঁছিতেছি। অন্নের কাহিনীর সহিত পঞ্চাগ্নিতত্ত্ব ওতপ্রোত সম্পৃক্ত। আশানুরূপ ভোগ আহুত দেবতারা তোমাকে দিবেন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দত্ত অন্ন যে উৎসর্গ না করিয়া খায় সে চোর। ১২।

দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ভোজন যে সাধুরা খান তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, আর যাহারা শুধু নিজের পেটের উদ্দেশেই রন্ধন করে তাহারা পাপই যেন খায়। ১৩।

অন্নের এই দেবভাব কি জন্য বিহিত হইল তৎসম্পর্কে অন্নোৎপত্তি কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন—

অন্ন হইতে প্রাণী জন্মায়, মেঘ হইতে সেই অন্নের উৎপত্তি, মেঘ আসিতেছে যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্মীর কর্ম্ম দ্বারা অনুষ্ঠিত, কর্ম্মের বিধান দিলেন বেদ, বেদ উদ্ভূত হইয়াছে অক্ষরপুরুষ হইতে। এইরূপে দেখা গেল সর্ব্বত্র স্থিতিশীল ব্রহ্মই যজ্ঞের জনক এবং পালক। ১৪, ১৫।

এইরূপ চক্র যে অনুসরণ না করে, ভোজনের দেবভাব বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহার আয়ু পাপপূর্ণ; ইন্দ্রিয়সেবার দাসানুদাস হইয়া তাহার জীবন সর্ব্বথা নিষ্ফল। ১৬।

ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্নি-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে দেখা যায় যজমান 'অগ্নিহোত্র' নামক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রাতঃসন্ধ্যায় যে অগ্নি জ্বালেন উহাতেই হোম করেন। এই মর্ত্তলোকের অগ্নি স্বরূপ হইতেছে দ্যুলোকের আদিত্য—এ অগ্নিতে হবন হইলে, ইহার বিস্তৃতি দ্যুলোকের অগ্নিতে পৌঁছে। অগ্নিহোত্রের আহুতি হইতে ক্রমে বৃষ্টিপতনে মাটি সিক্ত হইয়া শস্যের উদ্গম ঘটায়; সেই অন্ন প্রাণাগ্নিতে আহুতি দিলে তবে জীবনরক্ষা হয়।

গীতায় এই তত্ত্বটিকে কিরূপ নিপুণতার সহিত ফোটান হইয়াছে, দশম শ্লোকেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যের অগ্নিহোত্র নামধেয় বহির্যজ্ঞটিকে গীতায় প্রথমেই অন্তর্যজ্ঞরূপে দেওয়া হইয়াছে। আমরা ইহার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। জীবনই হইতেছে যজ্ঞ, প্রাণ যজ্ঞানল। সেই প্রাণাগ্নির হবি হইতেছে অন্ন। মন্ত্রপূত হবি যেমন যজ্ঞে আহুত হয়, প্রাণাগ্নিকেও তেমনি মন্ত্রোৎসৃষ্ট অন্ন আহুতি দিতে হয়। আহুতিকালে যে যে দেবতা ইহার অনুগ্রাহক, তাঁহাদের উদ্দেশে প্রথমে অন্নকে নিবেদিত করিতে হয়। সেইজন্য অন্নারম্ভকালে ভূঃপতয়ে স্বঃপতয়েভুবঃ পতয়ে এইরূপে পঞ্চাগ্নির তিন অগ্নিকে নিবেদন করিতে হয়। তাঁহাদের কৃপায় যখন অন্নলাভ ঘটে, তখন তাঁহাদিগকে অস্বীকার করিয়া উদরম্ভরি হওয়া যে কতবড় অকৃতজ্ঞতা তাহা ত সহজেই অনুমেয়। সর্ব্বশেষ সেই অন্ন নিবেদন করিতে হয় প্রাণাগ্নিকে, যথা, প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা ইত্যাদি। প্রাণাগ্নিতে সমর্পিত অন্ন দেহাভ্যন্তরে অক্ষরপুরুষে সর্ব্বশেষে আহুত হয়—কারণ প্রাণ হইল তাঁহারই শিখা স্বরূপ। সেই যজ্ঞরূপী অক্ষর-পুরুষে যখন আহুতি ঠেকিল, তখন যিনি এ সকল অনুগ্রাহকেরও জনক তাঁহাকে নিবেদন করিয়া অন্নাহুতি সার্থক হইল। এইরূপে নিবেদিত অন্নভোজন যেন দেবতার প্রসাদ খাওয়া।

এহেন সুপ্রতিষ্ঠিত অন্নচক্রের ক্রম যাহার জীবনে অস্বীকৃত হইয়া আছে তাহার বৃথাই জীবন। প্রাণাগ্নিতে অন্নের হবন ক্রিয়া দেখানই এখানে উদ্দেশ্য। ছান্দোগ্যের পঞ্চাগ্নিতে ইহার ফল দর্শান অভিপ্রেত—অন্নাহুতির ফলে রেতঃসঞ্চয় ঘটে। ছান্দোগ্যে ইহাকে যোষায় আহুতি দিয়া সৃষ্টি-চক্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কর্ম্মযোগী এই রেতোরূপ

হবিকে প্রাণাগ্নিতে হবন করিবেন ; তবেই প্রকৃতির ক্রমিক তিরোধানে অক্ষরপুরুষ তাঁহার পক্ষে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবেন। নৈষ্কর্ম্য বা সন্ন্যাসে যে প্রকৃতিবশ্যতা দূর করা সম্ভবপর হয় না, সেই প্রকৃতির প্রভাব এড়াইবার এই একমাত্র পন্থা।

(৩)

কর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণ

সম্প্রতি আমরা তৃতীয় ছেদে পৌঁছিতেছি। ইহার বিস্তৃতি ১৭ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত, বিষয় কর্ম্মযোগশিক্ষায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও স্বধর্ম্ম পালন। পূর্ব্বোক্ত বিভাগ হইতে ইহা সহজ।

'হে অর্জ্জুন, যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট, তাঁহার করণীয় কিছুই নাই। ১৭।

'এ হেন যোগযুক্তের কৃত কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ও হয় না, কোন কর্ম্ম করিতে না পারায় পাপও স্পর্শে না। এমন সিদ্ধ ব্যক্তির ইহকাল ও পরকালে আশ্রয়দাতার কোনই প্রয়োজন হয় না। ১৮।

'সেই জন্য হে অর্জ্জুন, ইন্দ্রিয়নিরোধ করিয়া কর্ম্মাচরণ কর। যাঁহার অভ্যাস এইরূপ তাঁহার পরমার্থ লাভ ঘটিয়া থাকে। ১৯।

'জনকাদি পুণ্যশ্লোক রাজর্ষিরা কর্ম্মবলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব সকলকে স্বধর্ম্মে অবহিত রাখিবার জন্যও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। ২০।

শ্রেষ্ঠজন যে যে ভাবে চলেন, অন্যান্য লোকেরাও তাঁহাকেই অনুসরণ করে, তাঁহার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যই অপরের অনুকরণীয়। ২১।

'হে পার্থ, এই ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছুই নাই, কেন না—না-পাওয়ার বালাই আমার থাকিবার নয়। ২২ ॥

'পূর্ণ বলিয়া যদি আমি কর্ম্মপথ ত্যাগ করি, তবে মানুষ আমার দেখাদেখি অলস হইয়া উঠিবে। ২৩।

'আমি কর্ম্মপথ ত্যাগ করিলে লোক সকল স্বধর্ম্মবিহীন হইয়া উৎসন্ন হইয়া যাইবে। স্বধর্ম্মত্যাগহেতু সমাজে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হইবে এবং এই বিপ্লবের জন্য আমি দায়ী হইব। ২৪।

স্বধর্ম্মপালনে অর্জ্জুনকে নিয়োগ করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এমনিভাবে নিজকে স্বধর্ম্মপালনশীল কর্ম্মযোগী রূপে ফুটাইতেছেন, যাহাতে অর্জ্জুনের মনে স্বতঃই লজ্জার উদয় হয়। গীতার অধ্যায়গুলিতে নিরবচ্ছিন্ন দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্ববিচার নাই, ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে গীতার ঐতিহাসিক ভিত্তি 'স্ব-ধর্ম্ম' বিষয়ক উদ্দীপনা আছে। কুরুক্ষেত্রের অভিমুখী হইয়া গীতা চলিতেছে, সুতরাং গীতা পাঠে কুরুক্ষেত্রকে ভুলিলে ত চলিবে না। এখানে 'বর্ণসঙ্কর' কথাটি অর্জ্জুনের ক্ষণিকবৈরাগ্যের মোহে ক্ষাত্রধর্ম্মবিস্মৃতি সম্পর্কে প্রযুক্ত ; বর্ণসঙ্কর অর্থ বর্ণধর্ম্মবিভ্রাট—যাহার যে ধর্ম্ম, বর্ণগত নহে সে ধর্ম্মে আকৃষ্ট হওয়া। অর্জ্জুনের ধর্ম্ম বর্ণগত ক্ষাত্র, অথচ অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ্য তপোধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। এইরূপে সকলেই যদি স্ব স্ব বর্ণ-ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া পর বর্ণ-ধর্ম্ম আলিঙ্গন করে তবে বর্ণপ্রাণ সমাজ টিকিবে কেন ? বর্ণগত ধর্ম্ম যেখানে উপেক্ষিত হয়, সেখানে বর্ণভেদ কি বর্ণসঙ্করে ঠেকিয়া নিজস্বরূপ হারাইবে না ?

'আসক্তচিত্তে অজ্ঞানীরা যেমন কর্ম্মতৎপর হয়, অনাসক্তচিত্তে কর্ম্মযোগীরাও তেমনি স্বধর্ম্মবিষয়ে লোকশিক্ষা হেতু কর্ম্মপরায়ণ হয়েন। ২৫।

'আসক্তকর্ম্মীদের নিকট বুদ্ধিতত্ত্ববিচার নিষ্প্রয়োজন, কেন না তাহা গ্রহণযোগ্য হইবার নয়। কর্ম্মযোগী স্বয়ং যোগযুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে অজ্ঞানকে আকর্ষণ করিয়া ঐ পথে টানিয়া লইবেন। ২৬।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন যে তিনি কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিয়া নিষ্কামকর্ম্মে জনসাধারণকে টানিয়া আনিতে চাহেন না ; পরন্তু এ ক্ষেত্রে স্বকর্ম্মবলে পরকে রাস্তা দেখানই সমীচীন মনে করেন।

কর্ম্মযোগ-শিক্ষার ধারা শেষ হইল, চতুর্থ ছেদ সুরু হইতেছে। ২৭ হইতে ৩৫ শ্লোক পর্য্যন্ত দার্শনিক তত্ত্ব—প্রকৃতির প্রভুত্বে পরতন্ত্র জীবও স্বরাট মাল্লবর্ণিক বাসুদেব।

কর্ম্মতত্ত্ব বড়ই কঠিন। কর্ম্মগৃহ প্রকৃতির প্রভাব এড়াইয়া কিরূপে ইহার পরিহার সম্ভব এবং নূতন কর্ম্মের উপচয়ও নিরস্ত হয় সেই প্রসঙ্গ তুলিতেছেন। ৫ম শ্লোকের প্রতিধ্বনি ইহাতে লাগিয়া আছে।

'প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারাই সকাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় ; অথচ জীব ত্রিগুণের কর্ত্তৃত্ব না বুঝিয়া আপনাকেই কর্ত্তারূপে মনে করিয়া থাকে। ২৭।

সাংখ্যদর্শনের 'অহঙ্কারঃ কর্ত্তা পুরুষঃ' সূত্রটির ৬।৫৪ কি সুন্দর পুনরুক্তি পাওয়া যাইতেছে। ছান্দোগ্যের শঙ্করভাষ্যে উক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিজকে অগ্নি মনে করিয়া প্রভু সাজিয়া বসিল। জীবরূপী স্ফুলিঙ্গ আত্মাভিমানে এত ফুলিয়া উঠিল যে অগ্নিরূপী আত্মন্ ইহার নিকটে ক্রমে অস্বীকৃত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

'যে কর্ম্মগৃহ প্রকৃতির সগুণতত্ত্ব জানে, সে তাহার সত্তাকে প্রকৃতি ও ত্রিগুণের প্রভাব বিমুক্ত করিবার পন্থা জানে। ২৮।

ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া কর্ম্মযোগে প্রবেশ কিরূপে সম্ভব? যখনি বিষয়ের দিকে ইন্দ্রিয়ের লিপ্সা তপ্ত হইতে থাকে তখনি সে মনকে পরখ করিয়া জানে ইহার কতখানি তাহার 'স্ব' হইতে আসিতেছে। পরখ করিবার যন্ত্র বুদ্ধি। বুদ্ধি তাহাকে বলিয়া দিবে—'ওগো তোমার জীবন-যজ্ঞের প্রাণাগ্নিশিখায় এ লিপ্সাকে পুড়াইয়া ফেল,—ইহা ইন্দ্রিয়াসক্তি।' এইরূপে ত্রিগুণের কাণমন্ত্রণা উপেক্ষিত হইলে যজ্ঞের হোমানল দীপ্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু যাহাদের মন, অজ্ঞতাহেতু অত গভীরভাবে বুদ্ধির দীপশিখা জ্বলিয়া সজাগ থাকিতে পারে না, তাহারাই প্রকৃতির চাতুরীতে আত্মহারা হইয়া যায়—গুণ সম্মোহনে একেবারে জীবনযজ্ঞের অনলকে যেন ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। এ হেন জনকে প্রাজ্ঞ কখনো প্রাণাগ্নির স্বরূপ শুনাইবেন না। ২৯।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন যে কর্ম্মযোগের স্বরূপ পাঠ শুনিবার অধিকারী সকলে নয়—সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপরও নহে। অর্জ্জুন এ সম্বন্ধে উত্তম শিষ্য, তাই কহিতেছেন—

হে অর্জ্জুন, আমাকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তারূপে মূলে রাখিয়া তুমি স্বাধিকার বুদ্ধিতে আত্ম-প্রবুদ্ধ হইয়া স্ব-ধর্ম্ম পালনে ব্রতী হও—কামনা, মমতা ও অনুশোচনা যেন তোমার কর্ম্মযোগকে তিলমাত্রও দুর্ব্বল করিতে না পারে। ৩০।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ যে তৎসৎ অক্ষরের সহিত একাত্মক তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি ৬১ সংখ্যক শ্লোকে বাসুদেব 'মৎপর' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা দর্শনের অচিন পুরুষকে আপন সত্তায় বিলীন করিয়া দিতেছেন। এখানে বাসুদেবকে পুনরায় গীতার মান্ত্রবর্ণিকরূপে পাইতেছি।

মান্ত্রবর্ণিকস্বরে শ্রীকৃষ্ণ আরও কহিতেছেন—

হে অর্জ্জুন, আমার এই মতই যাহাদের জীবনের একমাত্র পথ, যাহারা শ্রদ্ধাবান এবং অসূয়াশূন্য—তাহারা নির্লেপ কর্ম্মযোগাশ্রয়ে সঞ্চিত কর্ম্মের উচ্ছেদ ঘটাইতে পারে। আর যাহারা নিজের নিকট অতি পণ্ডিত—আমার মতের পরিবর্ত্তে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া চলে তাহাদিগকে নিম্নতমপথযাত্রী বলিয়া জানিয়ো। ৩১, ৩২।

যাহারা শাস্ত্রপাঠে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছে, তেমন যে জ্ঞানবান তাহাদের পক্ষেও পাণ্ডিত্যবলে কর্ম্মযোগী হইয়া প্রকৃতির প্রভাব এড়ান যে সম্ভব তাহাও নয়। পূর্ব্বোক্ত সাধারণের ন্যায় তাহারাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ প্রকৃতির গুপ্ত গুণ-সঙ্কেতে চালিত। যদিও কর্ম্মগৃহ প্রকৃতির পরিচয় সকলেই জানে এবং এটুকুও জানে যে ঐ প্রকৃতির পরতন্ত্রতায় পরিণামে সমূহ দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। ৩৩।

এই শ্লোকে ৫ম শ্লোকেরই ভাবার্থ পুনরুক্ত হইয়াছে। কর্ম্মসমস্যায় প্রকৃতির প্রভাব অপরিলক্ষিত হইলেও ইহার গোপন ইঙ্গিতেই জীবজগতে কর্ম্মপ্রবাহ চলিতেছে। সুতরাং কর্ম্মযোগের একমাত্র দুর্লঙ্ঘ্য বাধাই প্রকৃতি। ইহা যে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মেরই পরিণাম তাহা পূর্ব্বে শঙ্করবাক্যে আলোচিত হইয়াছে।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপর প্রকৃতির অনুশাসন অলক্ষ্যে আসিয়া পড়িতেছে—ইহার পরশ লাগিয়া নেত্র নয়নাভিরাম, শ্রোত্র শ্রবণমনোহর বিষয়ের জন্য উন্মুখ হইতেছে; আর যখনি ইহাদের পাওয়ার অসুবিধা ঘটিতেছে তখনি দ্বেষ-বিষ উদ্গার করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে জাগ্রত হইতেছে। সুতরাং রাগ ও দ্বেষ, সুখ দুঃখ বিরচক প্রকৃতির দুই শর স্বরূপ। ইহাদের প্রভাবে কর্ম্মযোগী কখনই আত্মবিস্মৃত হইবেন না। শরবিদ্ধ হইলেও জীবনযজ্ঞের হোমানলে তৎক্ষণাৎ ইহাকে পুড়াইয়া ফেলিবেন। ইহার শক্তি মনের উপর ফলিতে থাকিলে হোমানল ধুঁয়াচ্ছন্ন হইয়া মলিন হইয়া যাইবে। ৩৪।

কর্ম্মযোগী এইরূপে রাগদ্বেষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া স্বাভিনিবিষ্ট বুদ্ধিতে স্বধর্ম্মপালনে তৎপর হইবেন। তবেই কর্ম্মফলের বালাই থাকিবে না। এইরূপে যোগযুক্ত হইয়া

ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অসিচালনা করে তবে তপোবনে তপোমগ্ন ব্রাহ্মণ হইতে ইহাকে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। উভয়ই উভয়ের স্বধর্ম্মপালনে রত, ইহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় তাহার স্বধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণবর্ত্মে যুদ্ধকালে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিলে ইহা পাপাচার রূপে গণ্য হইবে। সুতরাং হে অর্জ্জুন, স্বধর্ম্মপালনে প্রত্যবায় নাই, ইহার উল্লঙ্ঘনে জীবন পাপভাক্ হইবে। ৩৫।

(৪)

প্রকৃতির স্বরূপবোধ

কর্ম্মযোগাধ্যায়ের শেষ ছেদে পৌঁছিতেছি। ৩৬ হইতে ৪৩ পর্য্যন্ত প্রকৃতির স্বরূপবোধ আলোচিত হইয়াছে। আমরা থাকিয়া থাকিয়া প্রকৃতির নাম ফাঁকে ফাঁকে পাইতেছি। দর্শনশাস্ত্রের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, 'প্রকৃতি' যে তাঁহাদের পাঠে বাধা জন্মাইবে ইহা নিশ্চয়। প্রকৃতি দর্শনশাস্ত্রে এক গোলকধাঁধা বিশেষ, এক কথায় অত বড় জিনিসের ধারণা করা কঠিন। তবে সহজ ভাষায় এইটুকু বলা চলে যে, সংখ্যাহীন পূর্ব্ব জন্মের রাশিকৃত কর্ম্মের ফলগুলি, ল্যাম্পের চিম্‌নিতে ঠাণ্ডা ধুঁয়ার ন্যায় আমাদের হৃদয়াকাশে জমাট বাঁধিয়া আছে। সেই জন্য সূর্য্য হইতে অধিক উজ্জ্বল আত্মনকে চক্ষু মুদিলে দেখা যায় না। এই কর্ম্মজাল ঠেলিয়া আত্মনের দর্শন লাভ ঘটে না, যেমন মেঘজাল ঠেলিয়া সূর্য্যের দর্শন অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। জন্মান্তরীণ এই কর্ম্মজালই প্রকৃতি। কর্ম্মের উৎপত্তিই কাম হইতে; তাই প্রকৃতির স্বরূপ কাম। অতীত অতীত জন্মের কর্ম্মফলগুলি ভিতরে জমাট থাকিয়া মানুষের চরিত্রে অনায়াসে কামের সাড়া জাগায়। আমরা জানি মানুষ অভ্যাসের দাস, অভ্যাসকে এড়ান সহজ নহে। অতীত জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মগুলি কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। যাহার মদ খাওয়া অভ্যাস হইয়াছে তাহার থাকিয়া থাকিয়া মদের পিপাসা হয়। ঠিক তেমনি ভোগ-বিলাসের যে-অভ্যাস মানুষ শত শত জন্মে উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছে, সেই অভ্যাসগুলি থাকিয়া থাকিয়া মদ্যপায়ীর ন্যায় নূতন জন্মেও দেখা দেয়। ইহাকেই বলে প্রকৃতির প্রভাব। আমরা চলিত কথায় বলিয়া থাকি, মদ খাওয়া তাহার স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে—সে কি ইহা ছাড়িতে পারে? এ জন্মের অভ্যাস যদি স্বভাবে পরিণত হইতে পারে, বহু-জন্মের সঞ্চিত অভ্যাস তবে 'প্রকৃতিতে' পরিণত হইতে কি বাধা থাকিতে পারে?

কর্ম্মযোগের বিস্তৃত পাঠ শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে ইচ্ছা হইল প্রকৃতির শাসন সম্বন্ধে আরও পরিষ্কাররূপে শুনা। তাই প্রশ্ন করিলেন—

'হে বার্ষ্ণেয়, মানুষ যদি চ পাপাচরণে স্বয়ম অভিলাষী নহে, তবু কাহার পরতন্ত্র হইয়াই যেন পাপকৃৎ হয়, জীবের মধ্যে ঐ পাপ প্ররোচক কে বাস করিতেছে? ৩৬।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

'হে অর্জ্জুন, জীবনযজ্ঞকে পণ্ড করিয়া ব্যর্থতায় মানুষকে ভাসাইতেছে এমন যে মহাশত্রু তাহাকে কাম বলিয়াই জানিবে। ইহার ক্ষুধা চির-অতৃপ্ত, আকাঙ্ক্ষা অফুরন্ত। ইহাকে মহাপাপ বলিয়া জানিও। প্রকৃতির রজোগুণ হইতে এ বৃত্তিটি উদ্ভূত হইয়া মানুষের মনকে অলক্ষ্যে এমনি রাঙাইতে থাকে যে মানুষ ইহাকে আপন স্বভাব বলিয়া ভ্রমবশতঃ ধরিয়া লয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও উৎপন্ন হয়। ৩৭।

শ্রীকৃষ্ণ এমনিভাবে সহজ, সরল ভাষায় কর্ম্মযোগের প্রধান অন্তরায়কে চিনাইতেছেন। এত খোলাখুলি ভাবে আর কখনো বলেন নাই। সকলেই জানেন রিপু ছয়টি—ষড়রিপু। কিন্তু ইহারা ছয়ে এক—গোড়া সেই কাম,—একেরই ষড়ঙ্গ মাত্র।

আমরা জানি কামই সৃষ্টিবাহী;—কাম হইতে মানুষ জন্মে, মানুষে আবার ক্রোধ লোভ ইত্যাদি উপসর্গ বয়সের সঙ্গে জুটিতে থাকে—প্রত্যুত ইহারা কামেরই ভিন্ন ভিন্ন স্তর মাত্র,—কামের সহিত ইহাদের রক্তসম্বন্ধ আছে, যেন কামের পেটেই ইহাদের জন্ম। আচার্য্য শঙ্কর ক্রোধ সম্বন্ধে ভাষ্যে লিখিতেছেন—কাম এহি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধত্বেন পরিণমতে।'

এখানে একটু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে 'মহাপাপ্মা' শব্দটি কামেরই বিশেষণ। কামের অভ্যুদয় রজোগুণ হইতে, গুণত্রয়ের অভ্যুদয় হইতেছে প্রকৃতি হইতে— 'প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ' (৩।৫) সুতরাং কামের উৎপত্তিস্থান প্রকৃতি। প্রকৃতিং কামকর্ম্মবীজভূতাং (শঙ্কর)। এইরূপে প্রমাণিত হয় প্রকৃতিই অনৃতবৃত্তির জনয়িত্রী হইয়া জীবের অন্তঃপুরে নিভৃতে বাস করিতেছে—সেই কর্ম্মগৃহে জীবের

মোহকরী মন্ত্রণাসভা অগণিত কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ 'মহাপাপ্মা' বিশেষণে ইহাকেই বিশেষিত করিয়াছেন। কর্ম্মযোগের প্রারম্ভ মাত্রই ইহার বিপক্ষতা প্রবল হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিয়া আপন যোগ-মার্গে চলিতে হইবে।

কামের চাঞ্চল্য মনের উপর খেলিয়া যাইতেই এক রাশ ধুঁয়া উঠিয়া যেন জীবনের হোমানলকে মলিন করিয়া দেয়, স্বচ্ছ দর্পণকে যেন অস্বচ্ছ করিয়া ফেলে, উল্ব যেমন করিয়া গর্ভকে ঢাকিয়া রাখে, ইহাও তেমনি জীবের স্ব-রূপকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। ৩৮।

আবার ঐ কথাকেই জোর দিয়া কহিতেছেন—

ঐ কামরূপ চিরবুভুক্ষু নিত্যশত্রুর মধ্যবর্ত্তিতাহেতু জ্ঞানীর জ্ঞান আবৃত হইয়া আছে। ৩৯। 'জ্ঞ এবাত্মা' বেদান্তের এই সূত্র হইতে আত্মাই যে জ্ঞানগর্ভ ইহা বুঝা যায়। সেই জ্ঞানালোক আচ্ছন্ন করিয়া কামের গতিবিধি ঘটিয়া থাকে।

কেমন করিয়া কাম মানুষের সত্তার অলক্ষ্যে মিশিয়া যায় এবং স্ব-ভাবে পরিণত হয়, শ্রীকৃষ্ণ তৎসম্পর্কে ইঙ্গিত করিতেছেন—

'ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধিতে মৃদু পদবিক্ষেপে কাম অতি সঙ্গোপনে বিচরণ করে, মন ও বুদ্ধি যজ্ঞরূপী আত্মনের আলোকে সচেতন না থাকিলে ইহার একান্ত লঘুগতি টের পায় না এবং কিছুকালের মধ্যে ঔষধ ধরিয়া যায়। তখন মন কামায়মান হয়, বুদ্ধি কামসঙ্কল্পে ঘোলা হইয়া যায়। তখন যে-বুদ্ধি স্বাভিনিবিষ্ট থাকিয়া জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের ভিত্তিস্বরূপ ছিল তাহা কামাচ্ছাদনে ঢাকা পড়িয়া যায়। জীবের স্বরূপ ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। যজ্ঞের হোমানল নিভু নিভু করিতে থাকে। ৪০।

ইন্দ্রিয়গণের মহারাজ মন—মন যেদিকে হেলাইবে সেদিকে ইহারা নুইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ মনকে সংযত করিয়া ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ বিধান করিয়াছেন। 'ইন্দ্রিয়রোধ করিয়া কামরূপ মহাপাপকে নিরস্ত করিবে যেন কোন ছিদ্রপথে কামের প্রবেশ না ঘটে। ৪১। 'ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে যেমন দ্বিধাবোধ করিবার নাই—ইন্দ্রিয়ের সেনানী রূপে মনকে গ্রহণ করিতেও কোন আপত্তির কারণ নাই। মনের স্বামী বুদ্ধি, বুদ্ধির ভর্ত্তা সেই স্ব-রূপী আত্মন্। ৪২।

৪২ শ্লোকে জীব বলিতে কতখানি বুঝায়—কত গভীরভা[বে] জীবনের উৎস লুকাইয়া আছে তাহার একটা অতি সংক্ষে[প] আবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য কতক[টা] এখানে তুলিতেছি—

অথ য সর্ব্বংশ্বেভ্যো, বুদ্ধ্যন্তেভ্যো আভ্যন্তরঃ যং দেহিন্ ইন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্যুক্ত ক্যমো জ্ঞানাবরণ দ্বারে[ণ] মোহয়তীত্যুক্তম্ বুদ্ধেঃ পরতস্ত স বুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা।

দৃশ্য শব্দের প্রয়োগ দ্বারা পাতঞ্জল যোগসূত্র ম[নে] পড়িতেছে—………। যে ইন্দ্রিয়াবলীর মূলে বুদ্ধির স্থি[তি] তাহাদের হইতে আরও নিভৃত প্রদেশে আরও অভ্যন্তরে অক্ষর আত্মন্ বিরাজমান। কামকরণাদির বিকার সাধ[ন] করিয়া এক জ্ঞানাবরক মোহময় দ্বারের সৃষ্টি করে। যি[নি] এইরূপে জীব হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়েন—তিনি বুদ্ধিভূৎ তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা। আর সকলই দৃশ্য মাত্র।

মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইয়া জীব নিজকে স্বয়ম্ সমাপ্ত জ্ঞানে দ্রষ্টা মনে করে—কিন্তু এ সকলি যে দ্রষ্ট অক্ষর পুরুষের নিকট দৃশ্যরূপে প্রতিভাত তাহা জানে না কাম যে কর্ম্মগৃহ প্রকৃতির মন্ত্রণাসভার একটি প্রতিনিধিমাত্র তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? কামের দ্বারা যে আচ্ছাদন রচনা পাইতেছি, উহা প্রভুত প্রকৃতির প্রতিই সবিশেষে প্রযোজ্য। কারণ অনাদিকাল ধরিয়া দৃশ্য দ্রষ্টাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই হেতু পাতঞ্জল বাণী ইহার অত্যন্ত উচ্ছেদ আদেশ করিয়াছেন—দ্রষ্টাদৃশ্যয়ো সংযোগো হেয়হেতুঃ ২।১৭। যখন দৃশ্যের মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমান চুকিয়া গিয়া দ্রষ্টার কর্ত্তৃত্বে জীবনযজ্ঞের হোমানল জ্বলিবে তখনি কর্ম্মযোগের সূত্রপাত।

তাই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশেষ কহিতেছেন—বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ সেই দ্রষ্টা অক্ষরকে জানিয়া, বুদ্ধির সারথিপণার মনকে প্রগ্রহের ন্যায় কামভাব হইতে সর্ব্বদা টানিয়া লইবে। ৪৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের রূপ যেমন 'স্ব-ধর্ম্ম' শব্দে অভিব্যক্ত, তৃতীয় অধ্যায়ের সাঁরসংক্ষেপও তেমনি একটি শব্দে অন্তর্নিহিত—সেইটি সহযজ্ঞ। প্রাণের যজ্ঞরূপ কর্ম্মযোগীর জীবনে সত্য জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য। প্রাণযজ্ঞের হোমানল যত জ্বলজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, প্রকৃতির পরতন্ত্রতা বিমুক্ত হইয়া জীব তত স্বতন্ত্র হইবে।



তার পর

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(১৬)

সমস্ত রাস্তা মায়ার মগজ যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। বাড়ীতে ফিরিয়া সে সুস্থির হইতে পারে না; চঞ্চল ভাবে, জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে তার বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিল।

অভয়কে সে ডাকিয়া পাঠাইল। অভয় ল্যাবরেটারীতে ছিল,—চাকর আসিয়া খবর দিল তিনি এখন আসিতে পারিবেন না।

মায়া ভয়ানক চটিয়া উঠিল। চাকরের কাছেই বলিল, "আসতে পারবেন না কি? এ কি তামাসা? ব'লেছিসি ভয়ানক দরকার?"

"আজ্ঞে, ব'লেছিলাম, তিনি আমাকে হাঁকিয়ে দিলেন।"

ক্রুদ্ধ পদবিক্ষেপে মায়া হন হন করিয়া ল্যাবরেটারীতে নামিয়া গেল।

অভয় তখন একটা পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত ছিল। মায়া বলিল, "দেখ, তুমি যদি ও ছাই ফেলে আমার কথা এখন না শোন তবে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেবো তোমার সব যন্তর!"

অভয় তার দিকে না চাহিয়াই বলিল, "একটু—একটু সবুর!"

মায়া বলিল, "এদিকে সর্ব্বনাশ হ'যে যাচ্ছে—একটু সবুর! সবুর ক'রবো না আমি—এসো।"

অভয় বলিল, "চুপ—গোল ক'রো না।"

মায়া গর্জ্জিয়া বলিল, "বটে!" কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে রাগে ফুলিতে লাগিল। তার পর সে অনুভব করিল, রাগ করা মিথ্যা—অভয়কে তার এই সাধনক্ষেত্রে সে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিবে না। সে দম্ দম করিয়া ল্যাবরেটারী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ একলা বসিয়া সে ভাবিল। তার পর নিরুপমকে ডাকিয়া পাঠাইল।

নিরুপম আসিলে মায়া বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি কাপুরুষ!"

নিরুপম বলিল, "কিসে বউদিদি?"

"তুমি নিজেই না ব'লেছিলে যে তুমি যদি কাউকে ভালবাস তবে অন্যের খাতিরে তাকে ছেড়ে দেবে না। ছেড়ে দেওয়া ধর্ম্ম নয়—কাপুরুষতা। তুমি কিন্তু নিজে ঠিক তাই ক'রছো।"

নিরুপম কথাটার ঠিক তাৎপর্য্য বোধ করিতে পারিল না। সে দেখিল মায়ার মুখ চোখ ভয়ানক উত্তেজনায় ভরা—সে যেন আত্মস্থ নয়। তার সন্দেহ হইল মায়া বুঝি-বা—হাঁ, বুঝি-বা স্থির করিয়াছে যে নিরুপম মায়াকে মনে মনে ভালবাসে এবং সেই কথা উপলক্ষ করিয়াই এ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। তার বুকের ভিতরটা এ কল্পনায় ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিল। সে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

মায়া তার পর বলিল, "তুমি যতই যা' বল, এ কথা অস্বীকার ক'রতে পারবে না যে সরমাকে ভালবাস।"

চট করিয়া খাড়া হইয়া নিরুপম বলিল, "না—ও-প্রসঙ্গ আর তুলো না বউদি।"

"কেন তুলবো না? তুমি যে তুলতে চাও না তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে তুমি তাকে ভালবাস—সে আর কাউকে ভালবাসে ভেবে তুমি সরে' দাঁড়িয়েছ। তুমি নিজেই তো ব'লেছ এ কাপুরুষের কাজ।"

"না বউদি, তা নয়, সে আমার ভালবাসার যোগ্য নয়।"

"কেন না, তোমার বিশ্বাস সে অজয়কে ভালবাসে। যা' থেকে তুমি এই সিদ্ধান্ত ক'রেছ সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি সে কথা খুব ভাল ক'রে অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি। সরমা অজয়কে যে সেদিন ডেকেছিল, সে সম্পূর্ণ অন্য কাজে। আসল কথাটা এই যে সরমার দোষ নেই—কিন্তু ঐ অজয় যে আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'য়ে তাকে ফুসলিয়ে বিয়ে ক'রবার চেষ্টা ক'রছে সে কথা সম্পূর্ণ ঠিক। এই যদি সত্যি কথা হয়, আর তুমি যদি সরমাকে সত্যি ভালবাস, তবে কি একদম সরে দাঁড়িয়ে তাকে এই অসাধু উদ্দেশ্য সফল ক'রবার সুযোগ দেওয়া তোমার উচিত? তোমার কি উচিত নয়, পুরুষের মত অগ্রসর হয়ে সরমাকে অজয়ের এই চক্রান্ত থেকে রক্ষা করা? তাকে অজয়ের কবল থেকে কেড়ে নেওয়া?"

নিরুপম বলিল, "কিন্তু তুমি কেন মনে ক'রছো যে তোমার দিদি এত উদাসীন?"

তার কথা কাড়িয়া লইয়া মায়া বলিল, "মনে ক'রছি আমি সব কথা জানি ব'লে। কিন্তু নাই যদি হয় তা'—যদি সেও ভালই বাসে ওই অপদার্থ অজয়কে, তবুও কি তোমার উচিত নয় তাকে তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া? তুমি না ব'লেছিলে একদিন, যাকে তুমি ভালবাসবে তাকে তুমি কেড়ে ছিঁড়ে নেবে, সে আর কাউকে ভালবাসে ব'লে পথ ছেড়ে দাঁড়াবে না?"

"কিন্তু তোমার কি ঠিক বিশ্বাস যে সেদিন—যে তোমার দিদি সত্যি সত্যি অজয়ের সঙ্গে—মানে তার কোনও গোলযোগ নেই?"

"পাগল! এ কথা তোমার নিছক কল্পনা। কিন্তু এ কথা আমি বিশ্বাস করি যে, তাকে যদি তুমি মাঝে পড়ে উদ্ধার না কর তবে অজয় তাকে একদিন ফাঁসাবে। সে সরমার মন অনেকটা নরম ক'রে ফেলেছে।"

নিরুপম কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখি, তোমার দিদিকে রক্ষা ক'রতে পারি কি না?"

ভাবিতে ভাবিতে নিরুপম বাড়ী চলিয়া গেল।

অভয় যখন উপরে আসিল তখন মায়া ভয়ানক রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। মায়া যে রাগ করিয়াছে সে কথা অভয় প্রথমে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে তখন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া মায়ার অভিমান ভাঙ্গাইল।

পরিশেষে মায়া বলিল, "এদিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"

"সে কি? কি হ'য়েছে?"

"সরি যে ম'রতে ব'সেছে!"

"অ্যাঁ, তাঁর অসুখ ক'রেছে না কি?"

"না, অসুখ করে নি—তার চেয়ে ঢের ভয়ানক।" বলিয়া সে সরমার সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছিল এবং যাহা অনুমান করিয়াছিল সব কথা খোলাসা করিয়া অভয়কে বলিয়া বলিল, "এখন উপায়? তুমি তো হাবার মত সেদিন তার কথা শুনে এসেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সেছ—তার পেটে পেটে যে কত বুদ্ধি তার তুমি বুঝবে কি?"

অভয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "এখন আর উপায় কি? এতদূর যখন গড়িয়েছে তখন তার অজয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া ছাড়া তো অন্য কোনও উপায় দেখ্‌ছি নে।"

মায়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "পাগল হ'য়েছ? ঐ হতভাগা পাষণ্ডের সঙ্গে সরমার বিয়ে? শেষে যে গলায় দড়ি দিতে হবে।"

অভয় বলিল, "তুমি তাকে যা ভাবছ সে এখন তেমন নয়। সে একেবারে শুধরে গেছে। আমি তাকে—"

"শুধরে থাকতে পারে বিপদে প'ড়ে। তাও শুধরেছে কি অ্যাক্টিং ক'রছে ভগবান জানেন। আবার সুদিন এলে ও যে-কে-সেই হবে।—তা' ছাড়া শোধরাক বা না শোধরাক—এই ক'লকাতা সহরে কে না জানে যে ও চোর—জোচ্চোর, বদমায়েস! ওর সঙ্গে যদি আমার বোনের বিয়ে হয় তবে সমাজে আমার মুখ দেখান দায় হবে।"

অভয় বলিল, "কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের হাত দেবার কি অধিকার আছে মায়া? দিদির বয়স হ'য়েছে, বুদ্ধিও আছে। তিনি যদি ভেবে-চিন্তে একজনকে ভালবেসে বয়ে

ক'রতে চান, তবে তোমার আমার তাতে কথা ব'লবার কি অধিকার আছে ?"

"দুশো বার অধিকার আছে। যাও—তুমি ঐ কথা বিনিয়ে বিনিয়ে আমাকে বার বার শুনিও না।"

"কিন্তু এ তো আমার কথা বলছি না মায়া, তুমিও তো সেদিন নিরুপমকে এই কথা ব'লেছিলে।"

"বেশ ক'রেছিলাম, ব'লেছিলাম। আমি অতটা তখন বুঝতে পারি নি। কিন্তু এ হ'তেই পারে না। যে ক'রেই হোক ওদের তফাৎ ক'রতে হবে। নইলে আমার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। লোকের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে ?"

অভয় মায়ার এই তীব্র মন্তব্যের পর তাকে বুঝাইবার কোনও চেষ্টা করিল না। সে আপনার মনে চিন্তা করিতে লাগিল। মায়ার মত সে অজয়ের চরিত্র সম্বন্ধে অবিশ্বাসী নয়, কেন না, সে দেখিয়াছে অজয় আর সে অজয় নাই। তবু অজয়কে বিবাহ করা সরমার পক্ষে ভয়ানক অবিবেচনার কার্য্য হইবে বলিয়া তার মনে হইল। অজয় যে কোনও অংশেই সরমার যোগ্য নয় এ কথা সে ভুলিতে পারিল না।

কিন্তু, সেজন্য তাদের প্রেমে বাহির হইতে তাহারা বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, এমন ইচ্ছা অভয়ের হইল না। বিশেষতঃ মায়ার কথা হইতে অভয় যাহা বুঝিয়াছিল, তাতে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াইয়া গিয়াছে—সরমা গোপনে অজয়ের সঙ্গে সারা সকালটা কাটাইয়া আসিয়াছে। সে নিজ মুখে বলিয়াছে—সে মরিতে গিয়াছিল। ইহার কেবল এক অর্থ সম্ভব—সেই অর্থ মায়া করিয়াছিল,—অভয়ও তার সেই অর্থ করিল। এমন অবস্থায় তাদের বিবাহ করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

তাই অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অভয় স্থির করিল যে, সরমার সঙ্গে অজয়ের বিবাহে বাধা দিবার কল্পনা বাতুলতা। বরং এখন যত শীঘ্র বিবাহটা হইয়া যায় তাই মঙ্গল।

মায়া স্থির করিল ঠিক উল্টা। সে প্রতিজ্ঞা করিল, এ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারিবে না। তাই সে নিরুপমকে মাঝখানে দাঁড় করাইবার জন্য তাকে উৎসাহিত করিল। তার পর সে মনে মনে ভাবিল অজয়কে সে শাসাইয়া বারণ করিবে। একবার তার খুব রাগের সময় মনে হইয়াছিল যে সে নিজে যাইয়া অজয়কে ধমকাইয়া শাসাইয়া আসিবে। কিন্তু একটু ঠাণ্ডাভাবে বিষয়টা চিন্তা করিয়া সে সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করিল। অজয়ের সঙ্গে সামনা-সামনি কথা কহিতে গেলে তাদের ভিতর অনেক কথা উঠিতে পারে, অজয় হয় তো অনেক কথা শুনাইতে পারে -সে সব কথা শুনিবার সাহস তার ছিল না; অজয়ের সামনাসামনি হইয়া তার সঙ্গে তর্ক করিতে সে সাহস করিল না।

তাই সে কৌশলে অভয়ের কাছে অজয়ের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তার কাছে চিঠি লিখিল। মায়া লিখিল,

"অজয়বাবু, সরমার মুখে যাহা শুনিলাম তাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আপনি তাঁকে ফাঁদে ফেলিয়া সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। আমি বাঁচিয়া থাকিতে যে আপনি তাকে হস্তগত করিয়া তাকে শেষে বিবাহ করিয়া বসিবেন ইহা স্বপ্নেও মনে করিবেন না। আমি আপনাকে সাবধান করিতেছি—এখনও যদি আপনি তাকে ত্যাগ না করেন তবে বিপদে পড়িবেন।

"যদি আপনি নিজের মঙ্গল চান, অবিলম্বে আপনি সরমাকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। যদি না যান, যদি সরমার সঙ্গে আপনার আবার সাক্ষাৎ হইয়াছে শুনিতে পাই, তবে আপনাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য কিছুই করিতে কুণ্ঠিত হইব না। ইতি

মায়া।"

(১৭)

সরমা অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে আপনাকে শান্ত করিল।

এই কথাটা তাকে নিদারুণ আঘাত করিল যে উপযাচিকা হইয়া অজয়কে প্রেম নিবেদন করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যে কোনও মেয়ের পক্ষে এটা একটা নিদারুণ অপমান ও মর্ম্ম-পীড়ার কথা। সরমার বুকেও কথাটা শেলের মত গিয়া বিঁধিল।

অজয় তাকে কোনও অপমানজনক কথা বলে নাই সত্য, অত্যন্ত দীনতা স্বীকার করিয়া সে যথাসম্ভব ভদ্রভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এবং পাছে তার সেখা যাওয়া লইয়া কোনও কথা উঠিয়া সে অপমানিত হয়

যত্ন করিয়া গোপনে তাকে বাহির করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অপরিসীম ভদ্রতা ও যত্ন সে দেখাইয়াছে। তবু,—সে যদি ভালবাসিত সরমাকে, তবে কি সে পারিত প্রত্যাখ্যান করিতে? এই কথাটাই তাকে ভয়ানক পীড়া দিতে লাগিল যে সে তার সম্মান তুচ্ছ করিয়া অজয়কে প্রেম নিবেদন করিয়াছিল, অজয় তার সে প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই, এতখানি ভালবাসা তার অন্তরে একটা ভালবাসার তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারে নাই!

অনেকক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল।

বসিয়া সে ভাবিল, এ পাঠ তার শেষ হইয়া গিয়াছে। অভয়কে সে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু হাতে পাইয়া তাকে সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছিল। তাতে দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু সে দুঃখের ভিতর এইটুকু তৃপ্তি তার ছিল যে সে স্বেচ্ছায় অভয়কে ছাড়িয়া দিয়াছে, মায়ার সুখের জন্য। ত্যাগের একটা আনন্দ সে পাইয়াছিল। তার পর তার হৃদয় হইতে অভয়ের ছাপ মুছিয়া দিয়া এই কয়দিনের মধ্যে অজয় তার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। উন্মত্ত হইয়া সে অজয়কে ভালবাসিয়াছিল—সে পাঠও তার মিটিয়া গেল। অজয় তাকে চায় না।

সে মনে করিল তার ভালবাসার উপর বিধাতার অভিশাপ আছে। ভালবাসিয়া, ভালবাসা পাইয়া যে তৃপ্তি সে সুখ ভগবান তার অদৃষ্টে লেখেন নাই। বৃথাই সে ভালবাসিতে গিয়া প্রাণের ভিতর দারুণ দাবানল জ্বালিয়া মরিতেছে। ইহার চেয়ে সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সেই তার ভাল। বিজ্ঞান চর্চ্চায় সে আত্মনিবেদন করিবে, পুরুষের কথা চিত্তে স্থান দিবে না। আজও সে নূতন করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিল, ভাঙ্গা প্রাণে, উৎসাহহীন অন্তরে।

একদিন সে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় আত্মোৎসর্গের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বিদ্যার উৎসাহে, জ্ঞানের আনন্দে। কি আনন্দ কি উৎসাহ ছিল তার সে প্রতিজ্ঞায়! কিন্তু তার আজকের প্রতিজ্ঞায় না ছিল আনন্দ, না ছিল উৎসাহ। প্রেমে হতাশ হইয়া, অন্য পথ নাই জানিয়া, সে বিজ্ঞানকে আজ আশ্রয় করিল—আনন্দে নয়, দুঃখে। সেদিনকার প্রতিজ্ঞায় আর আজকের প্রতিজ্ঞায় আকাশ পাতাল তফাৎ!

প্রথম যখন সে বিজ্ঞান-সেবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তখন সে গিয়াছিল উল্লসিত অন্তরে উৎসাহদীপ্ত পদক্ষেপে। আজ হৃদয় তার উদাস, তার পদক্ষেপ ক্লান্ত। সে আপনাকে টানিয়া তুলিল, টানিয়া আপনাকে লইয়া গেল তার পাঠ-গৃহে। শুধু কঠোর প্রতিজ্ঞার বলে হৃদয়ের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে মন বসাইল তার পাঠ্য গ্রন্থে।

কিছুক্ষণ পড়াশুনা করিয়া সে স্নানাহার করিয়া ল্যাবরেটারীতে যাইতে প্রস্তুত হইল।

আহারের সময় সুনীতি তাকে বলিলেন "তোর চেহারা এ কি হ'য়ে গেছে? অসুখ ক'রেছে না কি?"

সরমা বলিল, "না মা অসুখ করে নি; কই আমার তো কিছু মনে হ'চ্ছে না!"

"তবে অমনি এই চেহারা হ'য়েছে? নাই-বা হবে কেন? প'ড়ে প'ড়ে একেবারে শরীরখানাকে তো কালি ক'রলি। এত পড়ার কি দরকার তোর? তোর তো চাকরী ক'রে খেতে হবে না।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "মাগো, লেখাপড়া লোকে শুধু চাকরী করবার জন্যই শেখে না। লেখাপড়া করাটাই একটা মস্ত বড় কাজ! এই পৃথিবীর এত রহস্য আছে, জানতে ইচ্ছা হয়, তাই পড়ি। প'ড়ে আশ মেটে না। মনে হয় আরও প'ড়ে বিশ্বের বুক চিরে তার সব রহস্য চট্ ক'রে জেনে ফেলি।"

"তা যাই হোক বাপু, তোর এত পড়া চলবে না। পড়ার এত তাড়াটা কি তোর? র'য়ে স'য়ে প'ড়লে ক্ষতি কি তোর? দিনরাত সমানে পড়া, এত তোর সইবে না। শরীর থাকলে তবে না পড়া!"

"কোনও ভাবনা ক'রো না মা, এ শরীর কিছু হবে না। আচ্ছা এইবার থেকে কি করি দেখ। খেয়ে খেয়ে তোমার এ শরীরখানা এমন ফুলিয়ে দেবো যে তুমি চিনতে পারবে না আমায়।"

"তা' আজ বাড়ীতে থাক মা, নাই গেলি আজ অভয়ের কাছে প'ড়তে।"

"না মা, আজ না গেলে চ'লবে না।"

সরমা অন্যদিনের চেয়ে একটু দেরীতে ল্যাবরেটারীতে গেল। সেখানে গিয়া সে রোজ যেমন যায় তেমনি তার জায়গায় গিয়া কাজ আরম্ভ করিল। তার সেদিনকার

নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া সে লাইব্রেরীতে গিয়া পড়িতে বসিল।

অভয় তাকে সমস্তক্ষণ একটু কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখিল। অনেকবার তার মনে হইল তার সঙ্গে অজয়ের বিষয়ে কথা কয়, কিন্তু সে সরমার কাছে অগ্রসর হইল না। প্রথমতঃ সরমা এত একাগ্রতার সহিত কাজ করিতেছিল যে তার কাজে সে বাধা দিতে ইচ্ছা করিল না। দ্বিতীয়তঃ সে যে কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবে, কি কথা বলিবে, সে কথা সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

সরমা যখন লাইব্রেরীতে আসিয়া বসিল তখন অভয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল।

সরমা তার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তার পর সে পড়িয়া গেল।

অভয় কিছুক্ষণ কাগজ-পত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া শেষে বলিল, "দেখুন দিদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি ?"

সরমার বুক দুড় দুড় করিয়া উঠিল। কি কথা যে অভয় বলিবে সে তাহা অনায়াসে অনুমান করিল। মায়ার সঙ্গে আজ সকালে সাক্ষাতে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে সে সমস্তই মায়া অভয়কে জানাইয়াছে সে বিষয়ে সরমার সন্দেহমাত্রও ছিল না। সুতরাং অভয় তাকে অজয় সংক্রান্ত কথাই জিজ্ঞাসা করিবে নিশ্চয়। আজ ল্যাবরেটারীতে আসিবার সময় অবধি সরমার মনে মনে এই বিষয়ে একটা প্রকাণ্ড ভয় ছিল। অভয় যদি তাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে তবে কি উত্তর সে দিবে, তাই ভাবিয়া সে অস্থির হইয়াছিল। সারাদিন. তাই সে অভয়ের সঙ্গে বিশেষ কোনও কথাই বলিতে পারে নাই। আর এ বিষয়ে তার সঙ্কোচ ঢাকিবার জন্যই বিশেষ করিয়া সে তার মন নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিল তার পরীক্ষা কার্য্যে। অভয়ের কথায় তাই তার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

অভয় মৃদুস্বরে বলিল, "দেখুন আপনি সেদিন আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আপনার বিয়ের কোনও কথা হ'লে আমাকে জানাবেন। কিন্তু—এই—আজ মায়ার কাছে যা শুনলাম, তাতে সে কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি ?"

সরমার মুখ লাল টকটকে হইয়া উঠিল। সে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মিথ্যা বলি নি।"

অভয় সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "কিন্তু, দেখুন, কিছু মনে ক'রবেন না এ সব কথা জিজ্ঞেস ক'রছি ব'লে,—কোনও অধিকার নেই আমার কিছু জিগ্‌গেস ক'রবার"—

সরমা ধীরভাবে বলিল, "আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—আপনি আমার গুরু, আমার আদর্শ—দেবতা ! আমার জীবন গড়ে তোলবার ভার আপনার। আপনি আমাকে স্বচ্ছন্দে জিগ্‌গেস ক'রতে পারেন—যদি অন্যায় ক'রে থাকি তার জন্য শাসন ক'রতে পারেন। আপনার শাসন আমি মাথা পেতে নেব।"

অভয় একটু বিব্রতভাবে বলিল, "না, সে কথা কেন ব'লছেন ? আমি বলছি না যে আপনি অন্যায় কিছু ক'রেছেন। আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে আপনার নিজের জীবন নিয়মিত ক'রবার, সে স্বাধীনতায় আমার হাত দেবার কোনও অধিকার নেই। আমি সুধু এই ব'লছিলাম যে অজয় বাবুর সঙ্গে আপনার ওর নাম কি—বিয়ের কথা চ'লছে—কিন্তু সে সম্বন্ধে তো আপনি আমাকে কিছু বলেন নি।"

সরমার বুকটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল। সে চট্ করিয়া কথাটার জবাব দিতে পারিল না। এই কথার সঙ্গে তার অন্তরের এমন একটা নিবিড় বেদনার সংযোগ ছিল যে এই প্রসঙ্গ উঠাতে সে একটু অস্থির হইয়া উঠিল। একটু পরে সে বলিল, "বলি নি, বলবার দরকার হয় নি ব'লে, আর সময় পাই নি ব'লে। কথাটা হঠাৎ উঠেছিল—আর খুব শীগ্‌গির তার নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে, তাই ব'লতে পারি নি।"

অভয় বলিল, "যাক, নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে তা' হ'লে। বেশ। শীগ্‌গিরই বিয়ে হবে কি ?"

সরমা মাথা নত করিয়া বলিল, "না, বিয়ে হবে না। হবার হ'লে আমি নিজেই আপনাকে ব'লতাম।"

অভয় চমকাইয়া উঠিয়া বলিল "অ্যাঁ ! বিয়ে হবে না ? —তার মানে"—আর কি বলিবে অভয় ভাবিয়া পাইল না।

সরমা টেবিলের উপর আরও নুইয়া পড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মানে এই যে অজয়বাবু আমাকে বিয়ে ক'রতে অস্বীকার ক'রেছেন।"

কথা কয়টা বলিতে সরমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে অশ্রু সংবরণ করিতে প্যারিল না। টেবিলের উপর মাথা দিয়া মুখ লুকাইল।

অভয় লাফাইয়া উঠিল। অভয়ের রাগ কেউ কোনও দিন দেখে নাই, কিন্তু আজ সে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বটে! এত বড় আস্পর্দ্ধা!" সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রবেগে পায়চারী করিতে লাগিল।

একটু পরে সে সরমাকে বলিল, "দেখুন—"

সরমা উঠিয়া বাধা দিয়া বলিল, "দয়া ক'রে এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা জিগ্‌গেস ক'রবেন না। আমি—আমি আর কিছু ব'লতে পারবো না। আমি যাই।" বলিয়া সে বেগে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া সে নিজের মোটরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

অভয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল! ক্রোধে তার ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কোনও কথা না বলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

সরমা যে কথা বলিতে পারিবে না বলিল, অভয় তাহা কল্পনায় পূরণ করিয়া লইল। মায়ার কাছে সে যাহা শুনিয়াছিল তাহাতে তার অনুক্ত কাহিনীটি মনে মনে রচনা করিয়া লইতে কোনও কষ্ট হইল না।

অভয় স্থির করিল অজয় সরমাকে বিবাহ করিবার ভরসা দিয়া তাকে বিপথগামিনী করিয়াছে। এখন নিতান্ত বিপন্ন হইয়া সরমা অজয়কে বিবাহ করিতে বলিয়াছিল, কিন্তু অজয় তাহা করিতে অস্বীকার করিয়াছে। সরমার আর মুখ দেখাইবার পথ সে রাখে নাই।

এ কথা মনে হইতেই অভয় মহা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সরমা চলিয়া গেলে সে অস্থিরভাবে তার লাইব্রেরী ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে লাগিল। তার রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল।

তার মনে হইল মায়া বলিয়াছিল ঠিক! অজয়ের মত পাপিষ্ঠের চরিত্রে পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। অবস্থান্তরের সহিত তার দুষ্প্রবৃত্তি ভিন্নগতি হয় মাত্র!

সরমার উপর তার মোটে ক্রোধ হইল না, তাকে প্রবঞ্চিতা বলিয়া তার উপর অভয়ের করুণা উথলিয়া উঠিল। তার ক্রোধ দগ্ধ করিতে লাগিল সুধু অজয়কে।

এখন উপায়? একমাত্র উপায় অজয়ের সহিত সরমার বিবাহ—অন্য কোনও কথাই অভয়ের মনে হইল না। সে সুধু ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া অজয়কে বিবাহ করিতে বাধ্য করা যায়?

সে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ভাবিতে লাগিল। একটা পেন্সিল সে তার সম্মুখের ব্লটারের উপর অন্যমনস্কভাবে চালাইতে লাগিল—তাতে সে বড় বড় অক্ষরে, নানারূপ অলঙ্কার যোগ করিয়া অন্যমনস্কভাবেই লিখিল 'সরমা'—আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল অজয়কে বাধ্য করিবার উপায়।

মায়া আসিয়া দাঁড়াইল। অভয় তাহা লক্ষ্য করিল না। ল্যাবরেটারীর বাহিরে মায়া অভয়কে কখনও এমন অন্যমনস্ক হইতে দেখে নাই। সে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল ব্লটারের উপর বড় বড় অক্ষরে অভয় লিখিয়াছে "সরমা" আর সেই লেখার উপরই পেন্সিল বুলাইয়া সে অলঙ্কার যোগ করিতেছে।

তেলে বেগুনে মায়া জ্বলিয়া উঠিল! এই জন্য অভয় এতক্ষণ উপরে যায় নাই। এই ঘরে নিভৃতে বসিয়া সে ধ্যান করিতেছে সরমার কথা! তার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল।

মায়া তীব্র শ্লেষের সহিত বলিল, "কি হ'চ্ছে এখানে ব'সে ব'সে? বিরলে ব'সে প্রিয়তমা সরমার ধ্যান হ'চ্ছে?"

অভয় পেন্সিল ফেলিয়া অবাক্ হইয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ছিঃ, কি যে বল তুমি তার ঠিকানা নেই। দেখ, অমন কথা মুখেও এনো না।"

তীব্রকণ্ঠে মায়া বলিল, "কেন বলবো না? সারাদিন ব'সে তার সঙ্গে ল্যাবরেটারীতে কাটালে, আর এখন সে চ'লে গেছে, তার কথা ব'সে ব'সে ধ্যান ক'রছ। দেখ আমি নেহাৎ কাণা নই। এতদিন যদি বা কাণা ছিলাম, আজ সকালে চোখ খুলে দিয়েছে সরি। সে যে সব ক'রতে পারে সে কথা এখন বুঝেছি। আর এও বুঝেছি যে কিসের টানে সে এখানে ছুটে আসে, আর কেনই বা হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তুমি ফস্ ক'রে Bio-chemistryর ল্যাবরেটারী ক'রতে গেলে। সমস্ত আজ আমার চ'খের সামনে জলজলে হ'য়ে ফুটে উঠেছে। তা' এত যদি ভাল লেগেছিল ওকে—ওকে বিয়ে ক'রলে না কেন? আমাকে

দমাবার জন্ত বিয়ে করবার কি দরকার ছিল? জেঠা মশায়ের কথা না হয় নাই রাখতে!"

অভয় মায়ার কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। তার এই বাক্যস্রোতে বাধা দিবার পর্য্যন্ত শক্তি তার ছিল না। কথঞ্চিৎ সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়া সে বলিল, "থাম, থাম, অমন কথা মুখেও এনো না। ছি! কি ভাব তুমি আমায়। আর দিদিকেও তুমি যা' ভাবছ তা' তিনি নন তা' তুমি জান। একটা ভুল ক'রে ফেলেছে ব'লে সে দুশ্চরিত্রা নয়।"

"না সে কেন হ'তে যাবে দুশ্চরিত্রা? খারাপ যা' কিছু আমি। তার কথা আমায় শোনাতে হবে না। আর তুমি —তোমাকে কি দোষ দেব? দোষ আমার অদৃষ্টের!" মায়া ধপ্ করিয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

অভয় কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। মায়া একটু পরে আবার বলিল, "অত যে সাধু সাজছো, ভাব আমি কিছু খবর পাইনা? ল্যাবরেটারীর কাজ শেষ ক'রে উপরে না গিয়ে এতক্ষণ দু'জনে একলা ব'সে গুজু গুজু হ'চ্ছিল তা' জানি না? না সরি যে কেমন ক'রে ছুটে গিয়ে মোটরে উঠলো তা' দেখি নি!"

অভয়ের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। হঠাৎ মায়ার এই ভাবান্তরে সে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। মায়া ও সরমার পরস্পর প্রীতির সীমা ছিল না; আর সরমার সহিত অভয়ের মেলামেশা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা সঙ্কোচ তার ভিতর কোনও দিন প্রকাশ পায় নাই। অভয় সরমাকে যতখানি শ্রদ্ধা করে, যে প্রশংসা করে, তার চেয়ে মায়া তার প্রশংসা বা তাকে শ্রদ্ধা কম করে নি কোনও দিন। সরমার বুদ্ধি, তার চরিত্রগৌরব লইয়া তারা কত দিন কত আলোচনা করিয়াছে। সরমার চরিত্রের কথা বলিতে গিয়া মায়া অনেক দিন এমন গদ্গদকণ্ঠে তার অশেষ প্রশংসা করিয়াছে যে সে কথা শুনিয়া অভয় অবাক হইয়াছে।

অভয়ের মনে পড়িল, একদিন নয়, অনেক দিন মায়া বলিয়াছে, "সরি মানুষ নয়, দেবতা! ও যা ক'রেছে তা বুঝি দেবতাও পারে না। এত মনের বল, এত ত্যাগ, এতখানি ভালবাসা মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।" অনেক দিন মায়া বলিয়াছে, "রোজ যদি আমি সরির পাদোক খাই তবে আমি ধন্ত হ'য়ে যেতে পারি।"

আজ কি সরমা একটি মাত্র ভুলে, একবার মাত্র এক বঞ্চকের প্রলোভনে আত্মহারা হইয়া মায়ার চক্ষে এতখানি নামিয়া গিয়াছে যে মায়া এ কথাও বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছে যে সরমা অভয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী!

অভয় স্তব্ধ হইল, দুঃখিত হইল, ক্রুদ্ধও হইল। অনেকক্ষণ পর সে একটু রূঢ়কণ্ঠে বলিল, "মায়া, তোমার কাছে এ ব্যবহার আমি আশা করি নি। আমি কোনও দিন এমন কিছু করি নি যাতে তোমার এমন সন্দেহের কোনও কারণ হ'তে পারে। তোমার দিদিও এ তিন বৎসরের মধ্যে একটি দিনের তরে কোনও রকমে কোনও সন্দেহের কারণ দেন নি।"

"সন্দেহের কারণ দেন নি? বটে? কারণ যথেষ্টই ছিল, কিন্তু আমি ওকে চিনতে পারি নি এত দিন, তাই সাদা মনে ওকে কোনও দিন সন্দেহ করি নি। আমি যা জানি তা জেনে অন্য কোনও মেয়ে এমন স্বচ্ছন্দে ওকে তোমার সঙ্গে মিশতে দিত না। আমি দিয়েছিলাম, ওকে দেবতার মত জানতাম ব'লে, জানতাম না যে ও এতবড় পাপিষ্ঠা!"

অভয় আরও অবাক্ হইল। সে হাঁ করিয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মায়া একটু পরে বলিল, "কি জানি শুনবে? শোন— —তোমার উপর ওর লোভ বরাবর। যেদিন প্রথম ও তোমাকে দেখেছে, সেই থেকে ও তোমাকে ভালবেসেছে। —একদিন সে নিজমুখে সে কথা স্বীকার ক'রেছিল আমার কাছে।"

বলিয়া মায়া অভয়কে সেদিনকার বিবরণ বলিল। শুনিয়া অভয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার বুকটা যেন বসিয়া গেল—হাত-পা অসাড় হইয়া গেল। শেষে মায়া বলিল, "আমি তখন ভেবেছিলাম বুঝি আমাকে ভালবেসে সে এতবড় ত্যাগ ক'রেছে। ভেবেছিলাম ও বুঝি দেবতা! এখন দেখছি—বুঝছি অন্য রকম। ওকে তুমি বিয়ে ক'রবে না জেনে ও আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে ঘটিয়েছিল, শুধু তোমাকে হাতে রাখবার জন্তে।"

অভয়ের মনটা যেন বিস্ময়ের আঘাতের পর আঘাত খাইয়া একেবারে চুরমার হইয়া গেল। তার চিন্তার ধারা উদ্দামভাবে একেবারে চারিদিকে সমান বেগে ছুটিয়া চলিল, গুছাইয়া সমস্ত কথা সে ভাবিতে পারিল না।

মায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া শেষে বলিল, "ও পোড়ার মুখী যদি আর এ বাড়ীমুখো হয় তবে আমি হয় ওকে ঝাঁটাপেটা ক'রে তাড়াব, না হয় তো নিজে গলায় দড়ি দেব। তুমি ওকে ফের যদি এ ল্যাবরেটারীতে কাজ ক'রতে আসতে দেবে তো, তারই একদিন কি আমারই একদিন।"

অভয় বলিল, "কি যে বল তার ঠিকানা নেই। কি ব'লে তাকে মানা ক'রবে ল্যাবরেটারীতে আসতে তাই শুনি?"

মায়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কি ব'লে, স্পষ্ট ক'রে তাকে ব'লবো সে দুশ্চরিত্রা—ব'লবো আমার স্বামীকে সে নষ্ট ক'রবে, সে আমি দাঁড়িয়ে দেখবো না।"

অভয় ত্রস্তভাবে বলিল, "চুপ, চুপ! দেখ পাগলামী ক'রো না। তুমি একেবারে স্বপ্ন দেখছো। যা ভাবছো তার চেয়ে মিথ্যা জগতে কিছুই নেই।—তুমি শান্ত হও, সুস্থির হয়ে ভেবে-চিন্তে দেখ—নিজেই ভুল বুঝতে পারবে।"

মায়া বলিল, "ভুল? তুমি সরমাকে ভালবাস না? আচ্ছা বেশ, তবে তুমি তাকে এক্ষুণি চিঠি লিখে দাও যে সে যেন কাল থেকে এ বাড়ীতে না আসে, ল্যাবরেটারীতে না আসে।"

অভয় উত্তপ্তভাবে বলিল, "এমন অন্যায় কথা আমি কিছুতেই লিখবো না—কেন না আমি জানি তাঁর কোনও দোষ নেই, তাঁকে এমন ক'রে অপমান ক'রবার কোনও অধিকার নেই আমার!"

মায়া বলিল, "তার চেয়ে বল না কেন, লিখতে বুক ফেটে যাবে আমার! তাকে না দেখে থাকতে পারবো না আমি! কিন্তু—আমি ব'লে রাখছি যে আমি বেঁচে থাকতে এ ল্যাবরেটারী উপলক্ষ ক'রে রাসলীলা হ'তে দেবো না।"

অভয় চুপ করিয়া গেল। তার এত রাগ হইল যে সে কোনও কথা বলিতে পারিল না।

মায়াও অনেকক্ষণ বকাবকি করিয়া তড়্‌বড়্‌ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

মায়া চলিয়া গেলে অভয় তার ছিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারাগুলি সংহত করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিল। তার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সে অজয়কে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল।

অজয়কে সে লিখিল,

"অজয় বাবু,—

"সরমা দেবীর সঙ্গে আপনার ব্যবহার পশুর অধম হইয়াছে। আপনার ভিতর যদি এক ফোঁটা মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে তবে আপনি অবিলম্বে সরমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন।

"একজন ভদ্রকন্যাকে ভুলাইয়া কলঙ্কিত করা খুব একটা পৌরুষের কথা নয়। আর তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া আপনি যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন এ কথা মনেও ভাবিবেন না। একদিন আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা অম্লানবদনে ব্যয় করিয়াছিলাম, সরমা দেবীর প্রতি যদি আপনি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন না করেন তবে আমি আমার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করিয়াও আপনাকে শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইব না। স্মরণ রাখিবেন যে শাস্তি দিবার শক্তি আমার আছে।

"আপনি পত্রপাঠ মাত্র সরমা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিবেন। তিন দিন মধ্যে যদি শুনিতে না পাই যে আপনাদের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, তবে আমি আপনার শাস্তির জন্য যাহা করিতে হয় করিব। ইতি—

অভয়।"

চিঠি ডাকে পাঠাইয়া দিয়া অভয় উপরে গেল।

মায়া বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল। অভয় তাহাকে স্নিগ্ধ বাক্যে শান্ত করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইল।

(ক্রমশঃ)

বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'চৈত্য'

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি

বৌদ্ধ-সাহিত্যে চৈত্য শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চৈত্য বলিতে সাধারণ অর্থে আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কিত যে কোন পবিত্র স্থানকেই বুঝিয়া থাকি ; কিন্তু মূলতঃ চৈত্য অর্থে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কিত ঐরূপ স্থানকেই বুঝাইত না, কারণ জৈন এবং ব্রাহ্মণগণেরও চৈত্য ছিল, প্রাচীন গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] ইহা হইতেই অনুমান করা যায় অতি প্রাচীন কালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে "চৈত্য" বলিতে যে কোন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-মন্দির, পূজাস্থান বা তীর্থভূমিকেই বুঝাইত। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে "চৈত্য" শব্দটী কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কিত পবিত্র স্থানকেই বুঝাইতে আরম্ভ করে।

দীঘ-নিকায় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে ভগবান বুদ্ধ এক সময় ভোজনগরের আনন্দ-চৈত্যে বাস করিতেন ; সেইখানে বাসকালে তিনি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা[২] এবং চারিটী মহোপদেশ[৩] সম্বন্ধে ভিক্ষুদের শিক্ষা ও উপদেশ দান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে আনন্দ-চৈত্যে ভিক্ষুরা বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও উপদেশ শ্রবণ করিতে সমবেত হইতেন ; সুতরাং আনন্দ-চৈত্য কোন ভিক্ষুবিহারের নাম ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই দীঘ-নিকায়েরই অন্যস্থানে চাপাল চৈত্যের উল্লেখ আছে। শিষ্য আনন্দকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধ এই স্থানে একটী দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "হে আনন্দ, বৈশালী নগরী সুন্দর, এবং উদেন, গোতমক, সত্তম্বক, বহুপুত্ত, সারনদদ এবং চাপাল চৈত্যও সুন্দর।[৪] এইগুলি ছাড়া দিব্যাবদানে গোতম-ন্যগ্রোধ এবং মকুটবন্ধন নামক অতিরিক্ত দুইটি চৈত্যের উল্লেখ আছে।[৫] এই চৈত্যগুলি ঠিক কি রকমের পূজাস্থানকে বুঝাইত তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; কিন্তু নাম দেখিয়া মনে হয় উল্লিখিত চৈত্যের অনেকগুলিই কাহারও নাম অথবা স্মৃতিচিহ্নের স্মরণ ও পূজার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। গোতমন্যগ্রোধ-চৈত্য বলিতে খুব সম্ভব একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষকেই বুঝাইত, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধভিক্ষুরা হয় ত এই বৃক্ষের পূজাও করিতেন। বৃক্ষ পূজার অনেক প্রমাণ ও নিদর্শন প্রাচীন বৌদ্ধশিল্প ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। বরহুত ও সাঞ্চী স্তূপের প্রাচীর-গাত্রে বৃক্ষপূজার অনেক প্রস্তর-চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যগ্রোধবৃক্ষের তলদেশেই গোতম সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। মকুটবন্ধন চৈত্য বলিতেও বোধ হয় কোন একটি পবিত্র স্থানকেই বুঝাইত। বুদ্ধদেব গৃহত্যাগের পরই তরবারী দিয়া নিজেই নিজ দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ভক্ত ও শিষ্যেরা বুদ্ধদেবের এই কেশগুচ্ছের পূজা করিতেন। মকুট-বন্ধন চৈত্য এইরূপ কর্ত্তিত কোন কেশগুচ্ছের অথবা তাঁহার মস্তকের পরিচ্ছদের বন্ধনী রক্ষিত পূজাস্থানের নাম ছিল বলিয়াই মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিপূজার কোন স্থান ছিল না, ভক্ত ও শিষ্যেরা তখন বুদ্ধস্মৃতির পূজা করিতেন—বোধিদ্রুম, বুদ্ধদেবের পরিত্যক্ত কেশগুচ্ছ, তাঁহার পদচিহ্ন, ধর্ম্মচক্র, ভিক্ষাপাত্র অথবা এই প্রকার কোন স্মৃতিচিহ্ন যাহা সর্ব্বদা তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিত, তাঁহারা তাহাই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য দানে পূজা করিতেন।

১। পিটকগুলিতে 'চেতিয়' বলিতে জনসাধারণের যে কোন স্থানকেই বুঝায় এবং সে পূজাস্থানের সঙ্গে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পূজার্চ্চনার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। এই পবিত্র স্থান বলিতে কোন কোন ক্ষেত্রে হয় ত বর্ণ সমাবেশে বা পুষ্পসুসজ্জিত একটী বৃক্ষ বা একখণ্ড প্রস্তরকেও বুঝাইত (Eliot, Hinduism and Buddh'sm, II, 171-172)। জৈন চৈত্যগুলি বৌদ্ধ চৈত্যের ন্যায় বৃহৎ নহে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে প্রায় একই রূপ (Stevenosu, Heart of Ja'inism, p. 280)। সংস্কৃত ভাষায় 'চৈত্য' বলিতে কোন স্তূপ পূজাবেদী বা সমাধিকে বুঝায়। চৈত্য অর্থে "দাগোবা" শব্দটী ব্যবহার হয় ; 'দাগোবা' সংস্কৃত 'দেহগোপা' শব্দ হইতে উদ্ভূত (Mitra, Bodh-Gaya, p. 119)।

২। দীর্ঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ১২৬ পৃঃ।

৩। দীর্ঘ নিকায় ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ।

৪। দীঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ১০২ পৃঃ।

৫। দিব্যাবদান (Cowler & Neil) ২০১ পৃঃ।

বাস্তবিক বরহুত স্তূপের প্রস্তর-বেষ্টনীতে এইরূপ পূজার নিদর্শন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মকুটবন্ধন চৈত্য মল্লদের পূজাস্থান ছিল, দীঘনিকায় গ্রন্থে এই প্রকার উল্লেখ আছে।[৬] প্রত্যেক গণ ও প্রত্যেক জনপদের পৃথক পৃথক পূজাস্থান ছিল; সেই সব পূজাস্থানের পূজা ও সংরক্ষণের ভার তাহাদের লইতে হইত। দীঘনিকায় গ্রন্থের মহাপরি-নিব্বাণসুত্তে আছে, "যতদিন বজ্জিরা (অর্থাৎ বজ্জিগণের লোকেরা) তাহাদের পূজাস্থানের পূজা ও সংরক্ষণ করিবে, ততদিন বজ্জিদের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।[৭] সারনদদ চৈত্যে অবস্থানকালে বুদ্ধ বজ্জিদিগকে কল্যাণের সাতটি হেতু সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছিলেন।[৮] মনে হয় সারনদদ চৈত্য বজ্জিদের কোন বিহার ছিল। তাহা না হইলে ভিক্ষুদের সম্মিলন সেখানে সম্ভব হইত না। মকুটবন্ধন চৈত্যে বোধ হয় ভগবান বুদ্ধদেবের মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল; কারণ, দীঘনিকায় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান বুদ্ধদেবের মৃতদেহ মল্লদের মকুটবন্ধন চৈত্যে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, ইহাই দেবতাদের কাজ, কারণ সেইখানেই মৃতদেহ দাহ করা হইবে।[৯] এই গ্রন্থেই চাপাল চৈত্যের কথার বিশেষভাবে উল্লেখ আছে; এইখানেই তিনি মারের দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া তাহাকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন।[১০] দিব্যাবদান গ্রন্থে চাপাল চৈত্যের উল্লেখ আছে। ভগবান বুদ্ধদেব একদিন আনন্দকে বলিলেন, "যে চাপাল চৈত্যে ভিক্ষুরা বাস করে, তুমি সেইখানে গিয়া সকলকে উপাসনা-গৃহে সমবেত হইতে বল।[১১] ইহা হইতে অনুমান করা সহজ যে চাপাল চৈত্য কোন বিহার বিশেষেরই নাম ছিল। সারনদদ চৈত্যকে বিহার বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে; কারণ অঙ্গুত্তর নিকায়ে উল্লেখ আছে যে এক সময় পাঁচ শত ভিক্ষু এইখানে সমবেত হইয়া পঞ্চরত্নপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বিতর্ক ও আলোচনা করিয়াছিলেন।[১২]

সংযুত্ত নিকায়[১৩] হইতে জানিতে পারা যায় যে বৈশালীর বহুপুত্ত চৈত্যও এই প্রকার সংঘ-বিহারই ছিল। রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্ত্তী কোন এক স্থানে এই চৈত্য অবস্থিত ছিল। এক সময়ে বুদ্ধদেবকে এই স্থানে বসিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই স্থানের গোতমক চৈত্যে বুদ্ধ কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছিলেন, "সবিশেষ জ্ঞাত থাকিয়াই আমি ধর্ম্ম উপদেশ দিব, কারণ ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার সাহায্যে ইহা শিক্ষা দিব।[১৪]" বিনয়পিটকেও এই গোতমক চৈত্যের উল্লেখ আছে; কিন্তু গোতমক চৈত্য বোধ হয় কোন উন্মুক্ত পূজাস্থানের নাম ছিল।[১৫] বস্তুতঃ ধম্মপদ গ্রন্থের টীকাকার উদেনও গোতমক চৈত্যকে বৃক্ষ চৈত্য (রুক্ষ চেতিয়ানি) বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন; সন্তান কামনা করিয়া কিংবা ভয় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য লোকে এই জাতীয় চৈত্যে আশ্রয় লইত।[১৬] দীঘনিকায় গ্রন্থে এই দুটী চৈত্যের উল্লেখ আছে।[১৭] জনৈক অচেলক জীবন যাপনের জন্য সাতটী নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে একটী এই ছিল যে তিনি উদেন, গোতমক, সত্তম্বক ও বহুপুত্ত চৈত্যের সীমান্তের বাহিরে যাইবেন না। ইহা হইতে জানা যায় যে বৈশালীর পূর্ব্বদিকে ছিল উদেন চৈত্য, দক্ষিণে গোতমক চৈত্য, পশ্চিমে সত্তম্ব (অথবা সত্তম্বক), এবং উত্তরে বহুপুত্ত। মগধের মণিমালক চৈত্য বিহার-গৃহ ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে; এই চৈত্য মণিভদ্দ যক্ষের আবাসস্থল ছিল এবং তথাগতও কিছু দিন এখানে বাস করিয়াছিলেন।[১৮] অগ্গাড়ব চৈত্যও ঐ রকম একটী বিহার ছিল।[১৯] এক

৬। দীঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ১৬০ পৃঃ।

৭। দীঘ নিকায়; ২য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ; অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ১৬-১৭ পৃঃ।

৮। দীর্ঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ;

৯। দীর্ঘ নিকায়, ২য় খণ্ড ১৬০ পৃঃ।

১০। দীর্ঘ নিকায়, ৩য় ১১৩-১৪ পৃঃ।

১১। দিব্যাবদান, ২০৭ পৃঃ।

১২। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, ১৬৭ পৃঃ।

১৩। সংযুত্ত নিকায়, ২য় খণ্ড, ২২০ পৃঃ।

১৪। অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃঃ।

১৫। বিনয় গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, ২১০ পৃঃ।

১৬। ধম্মপদ ভাষ্য, ৩য় খণ্ড, ২৪৬ পৃঃ।

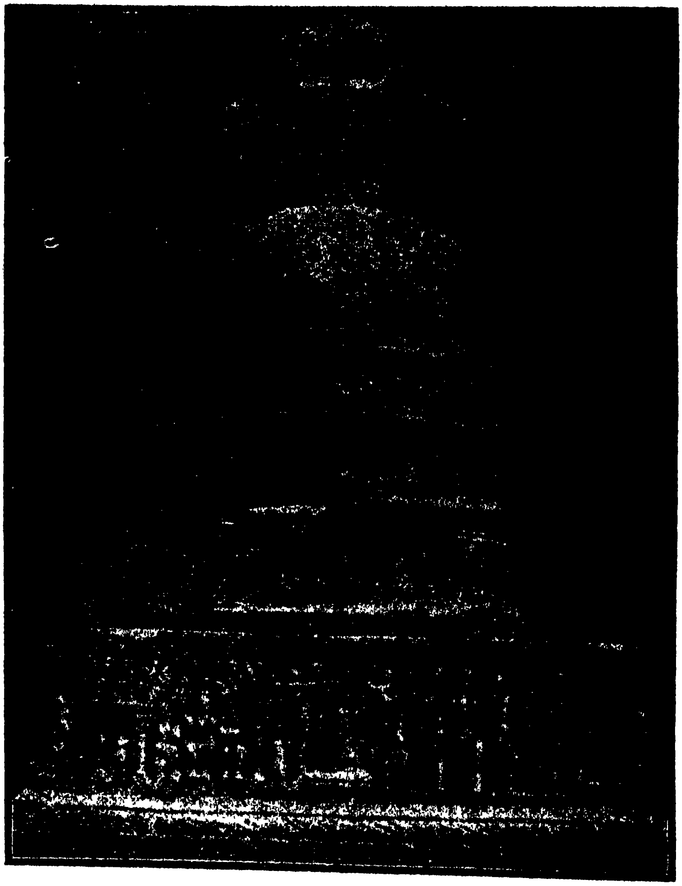
১৭। দীঘ নিকায়, ৩য় খণ্ড, ৯-১০ পৃঃ।

১৮। সংযুত্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, ২০৮ পৃঃ।

১৯। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ২১৬-১৭ পৃঃ; ধম্মপদ ভাষ্য, ৩য় খণ্ড, ১৭০ পৃঃ।

সময় ভগবান তথাগত রাজগৃহের নিকট লট্‌ঠিবন প্রমোদোদ্যানে সুপতিট্‌ঠ চৈত্যে কিছু দিন বাসকালে নৃপতি বিম্বিসার তাঁহাকে ও ভিক্ষুসংঘকে একদিন আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন।[২০] এই চৈত্যটীও একটী বিহার ছিল বলিয়াই মনে হয়।

জাতকে অনেক চৈত্যের উল্লেখ আছে। মণিকণ্ঠ-জাতকের ভূমিকায় অগ্‌গাড়ব চৈত্যের কথা আছে; বুদ্ধ এখানে কিছু দিন বাসকালে ভিক্ষুদের নিকট মণিকণ্ঠ, ব্রহ্মদত্ত ও অট্‌ঠিসেন জাতক-কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। মনে হয় অগ্‌গাড়ব চৈত্য কোন গুহা বা বিহারের নাম ছিল।[২১] কালিঙ্গবো ধি-জাতকের ভূমিকায় বিভিন্ন প্রকার চৈত্যের বিবরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব সেখানে আনন্দকে বলিতেছেন, চৈত্য তিন প্রকার:—(১) শরীর চৈত্য, অর্থাৎ যে চৈত্য কোন দেহাবশেষের উপর নির্ম্মিত (সম্ভবতঃ ইহা স্তূপ বা দাগোব জাতীয় চৈত্যের নাম); (২) ভোগীক চৈত্য, অর্থাৎ কোন ভোগ্য পার্থক্যে উপলক্ষ করিয়া যে চৈত্য নির্ম্মিত (সম্ভবতঃ কোন ভিক্ষা-পাত্র, চীবরখণ্ড, অথবা এই জাতীয় কোন জিনিস পূজার জন্য যে চৈত্য নির্ম্মিত হইত তাহারই নাম); এবং (৩) উদ্দেশিক চৈত্য, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা ঘটনা বা কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার উদ্দেশে ও স্মরণার্থে যে চৈত্য নির্ম্মিত হইত। এই জাতকের ভূমিকাতে আনন্দ তথাগতকে প্রশ্ন করিতেছেন কোন বুদ্ধের জীবিতকালেই তাঁহার উদ্দেশে চৈত্য নির্ম্মিত হইতে পারে কি না। তথাগত উত্তরে বলিলেন, উদ্দেশিক চৈত্য কোন বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে হইতে পারে না; কিন্তু যে বোধিবৃক্ষের নীচে তাঁহারা সম্বোধি লাভ করেন, সেই বৃক্ষচৈত্যের পূজা জীবিতাবস্থায়ও হইতে পারে, মৃত্যুর পরেও হইতে পারে।[২২] উদ্দেশিক চৈত্য সম্বন্ধে ভগবান তথাগতের এই নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ঐ জাতীয় চৈত্য নির্ম্মিত ও পূজাস্থানরূপে যে ব্যবহৃত হইত না এ কথা বলা চলে না। পূর্ব্বে যে তিন প্রকার চৈত্যের কথা বলা হইয়াছে, ইহা ছাড়া অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়াও অনেক সময় অনেক চৈত্য নির্ম্মিত হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ



বৌদ্ধ চৈত্য

করা যায়, একবার ভগবান তথাগত সুজাতা কর্ত্তৃক আহারে নিমন্ত্রিত হইয়া স্নান সারিয়া নদীগর্ভ হইতে উঠিবার পরই শত শত দেবগণ আকাশ হইতে নামিয়া আসিলেন তথাগতের স্নানাবশিষ্ট ফুল কুড়াইতে; উদ্দেশ্য ছিল ঐ ফুলের উপর চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা তাহার পূজা করিবেন।[২৩]

২০। বিনয় গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, S. B. E. ১৬৩ পৃঃ।

২১। জাতক গ্রন্থ (Fausboll), ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃঃ, ঐ, ৩য় খণ্ড, ৭৮, ৩৫১ পৃঃ।

২২। জাতক (Fansboll), ৪র্থ খণ্ড, ২২৮ পৃঃ।

২৩। মিত্র, বোধগয়া, ৩০ পৃঃ।

এই শ্রেণীর চৈত্যগুলি যে স্তূপকে নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মহাবস্তু গ্রন্থে বহুদেব চৈত্যের উল্লেখ আছে। বহুদেব চৈত্য বোধ হয় কোন গুহা গৃহ বা বিহার গৃহের নাম ছিল।[২৪] অপদান গ্রন্থে বুদ্ধচৈত্য ও শিখিচৈত্য নামক দুইটী চৈত্যের উল্লেখ আছে।[২৫] ধম্মপদ ভাষ্যে অগ্গাড়ব চৈত্যের যে উল্লেখ আছে, সে সম্পর্কে জানা যায় যে একবার তিনি একটি তন্তুবায়-কন্যাকে যে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহার ফলে ধর্ম্মলাভের প্রথম সোপান সে অতিক্রম করিয়াছিল।[২৬] এই গ্রন্থেই দশবল সম্বন্ধে কসসপ বুদ্ধের জন্য একটী স্বর্ণ চৈত্যের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। বারানসীর ভক্ত পরিবারের লোকেরা গাড়ী বোঝাই খাবার সঙ্গে লইয়া এই চৈত্য নির্ম্মাণ কার্য্যে মজুরের কাজ করিতে আসিয়াছিল।[২৭] এই স্বর্ণ চৈত্যটী বোধ হয় কোন স্তূপকেই বুঝাইতেছে।

বিনয়পিটকের টীকা সমন্তপাসাদিকা, শাসনাংশ মহাবোধিবংশ, দাঠাবংশ, চূড়বংশ, সম্মোহবিনোদনী (বিভঙ্গের টীকা) এবং মনোরথপূরনী (অঙ্গুত্তর নিকায়ের টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থে সিংহলের অসংখ্য চৈত্যের উল্লেখ আছে। সমন্তপাসাদিকা গ্রন্থে আছে, সিংহলের যে স্থানে প্রথম বৌদ্ধথেরগণ পদার্পণ করেন, সেখানে একটী পূজাস্থান নির্ম্মিত হয়; তাহার নাম ছিল পঠম চৈত্য। ইহা বোধ হয় কোন স্তূপ বা দাগোবার নাম ছিল।[২৮] এই গ্রন্থেই উল্লেখ আছে যে একবার এক ধার্ম্মিক সমণের আকাশ চৈত্যের আঙ্গিনার কয়েকটী সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।[২৯] একবার বুদ্ধদেব ৫০০ ভিক্ষু সহ মহাচৈত্য, দীঘবাপীচৈত্য এবং কল্যাণী চৈত্য [৩০] পরিদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া সমন্তপাসাদিকায় উল্লেখ আছে। এগুলি সম্ভবতঃ স্তূপ বা বিহার ছিল। থূপারাম চৈত্য একটী বিহারাবাসের নাম ছিল; তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। অনুরাধপুরের নিকটে একটি চৈত্যের উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে; কয়েকজন বৌদ্ধ থের আকাশ হইতে সেখানে নামিয়াছিলেন।[৩১] কুমার উত্তর কর্ত্তৃক স্বর্ণ নির্ম্মিত অপর একটী চৈত্যের কথাও ইহাতে পাওয়া যায়। ইহাও একটী স্তূপ বলিয়া মনে হয়। সিংহলে এ শ্রেণীর স্তূপকে 'দাগোবা' বলে।[৩২] অনুরাধপুর সহরে প্রবেশের পূর্ব্বে অশোক কণ্টক-চৈত্য পরিদর্শন করিয়া তাহা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।[৩৩] কণ্টক-চৈত্য খুব সম্ভব কোন স্তূপ বা বৃক্ষচৈত্যের নাম, এবং এই জাতীয় চৈত্যের চারিদিকেই প্রদক্ষিণ-পথ থাকিত। সম্মোহবিনোদনী গ্রন্থের মতে প্রত্যেক ভক্তেরই চৈত্য পরিদর্শনকালে তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিয়া পূজা করা উচিত।[৩৪] ইহা হইতেই অনুমান করা যায় প্রত্যেক চৈত্যের চতুর্দ্দিকেই পরিক্রম-পথ ছিল। শাসনবংশে অনেকগুলি চৈত্যের উল্লেখ আছে, যথা, পাদ চৈত্য,[৩৫] রতনচৈত্য,[৩৬] ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা কঠিন। মহাবোধিবংশে দীঘবাজী চৈত্য ও শীলাচৈত্যের উল্লেখ আছে; বুদ্ধদেব সমস্ত ভারতবর্ষ পরিদর্শনের পূর্ব্বে এই দুই চৈত্য দেখিতে গিয়াছিলেন।[৩৭] অশোক একবার মহাচৈত্য দর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া সমন্তপাসাদিকায় উল্লেখ আছে; তখন জনৈক থের ফুল লইয়া সেই চৈত্য পূজায় নিযুক্ত ছিল।[৩৮] প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে এই চৈত্যে পূজার জন্য বহু লোক সমবেত হইত। এইরূপ পূজা বৌদ্ধদের নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। সম্মোহবিনোদনী (২৯২ পৃঃ) হইতে জানিতে পারা যায় যে পাপমুক্ত থের মহাচৈত্যকে অভিবাদন করে। চৈত্য দর্শনে যে পুণ্য হয় এই বিশ্বাস

২৪। Law, A Study of the Mahavastu, p. 153; cf. Mahavastu (Senarts' Ed), Vol. III, p. 300.

২৫। অপদান, ১ম খণ্ড. ১২, ২৫৫ পৃঃ।

২৬। ধম্মপদ ভাষ্য, ৩য় খণ্ড, ১৭০ পৃঃ।

২৭। ধম্মপদ ভাষ্য, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪ পৃঃ।

২৮। মহাবংশ, ১৪ পরিচ্ছেদ, ৪১-৪৫ শ্লোক; সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃঃ।

২৯। মহাবংশ, ২২ পরিচ্ছেদ, ২৩ শ্লোক।

৩০। সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ।

৩১। সমন্তপাসাদিকা ১ম খণ্ড, ৭৯ পৃঃ।

৩২। সমন্তপাসাদিকা, ৩য় খণ্ড, ৫৪৪ পৃঃ।

৩৩। সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ৮২ পৃঃ।

৩৪। সম্মোহবিনোদনী, ৩৬৯ পৃঃ।

৩৫। শাসন বংশ, ১১৫ পৃঃ।

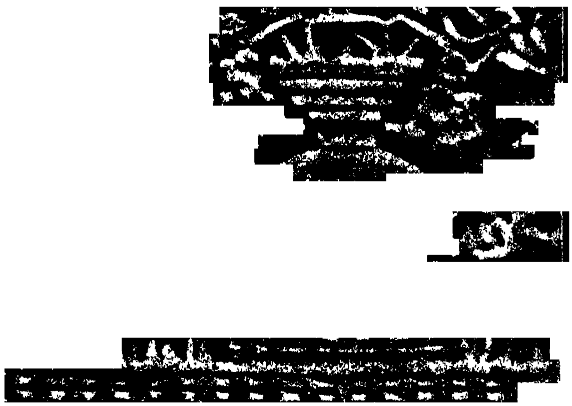
৩৬। শাসন বংশ, ৯১ পৃঃ।

৩৭। মহাবোধি বংশ, ১৩২ পৃঃ।

৩৮। সমন্ত পাসাদিকা, ২য় খণ্ড, ১৮১ পৃঃ।

লোকদের মনে দৃঢ় ছিল (চেতিয়দস্‌সনম্‌ সাখম)।[৩৯] দাঠাবংশ গ্রন্থে চূড়ামণি চৈত্যের উল্লেখ আছে; ইহা যে একটী স্তূপ বা দাগোবাকে বুঝাইত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কারণ উল্লেখ আছে যে ইহার গর্ভে স্থাপিত স্বর্ণপাত্রের ভিতর ভগবান তথাগতের কর্ত্তিত কেশগুচ্ছ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রক্ষিত আছে।[৪০] দাঠাবংশেই সিংহলের কল্যাণী, থূপ ও থূপারাম চৈত্যের উল্লেখ আছে।[৪১] থূপ চৈত্য যে একটী স্তূপেরই নাম, তাহা তাহার নামেই প্রমাণ; কিন্তু থূপারাম চৈত্য যে বিহার ছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, ইহার নামকরণ হইতেই তাহা বুঝা যায় এবং ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। মনোরথপূরণী গ্রন্থে [৪২] আকাশচৈত্য এবং মহাচৈত্যের উল্লেখ আছে; দুইটী চৈত্যই সম্ভবতঃ স্তূপ ছিল। চূড়বংশেও সিংহলের অনেক চৈত্যের নাম পাওয়া যায়। সিংহলে অশ্বথলা চৈত্য [৪৩] পর্য্যন্ত অনেকগুলি সুসজ্জিত চৈত্য ছিল। অন্যত্র মঙ্গলচৈত্যের কথাও ইহাতে বিবৃত আছে। ইহার উত্তরে রাজা উপতিষ্য একটী স্তূপ, একটী মূর্ত্তি এবং উহার সংরক্ষণের জন্য একটী গৃহও নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।[৪৪] বহুমঙ্গল চৈত্য,[৪৫] অমলচৈত্য,[৪৬] হেমবালুক চৈত্য,[৪৭] রতনবালুক চৈত্য [৪] এবং রতনাবলী [৪৯] চৈত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দমিড়জাতির লোকেরা যে একটী চৈত্য ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল, তাহারও উল্লেখ চূড়াবংশে আছে।[৫০]

স্তূপ ও বিহার ছাড়া চৈত্য বলিতে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সভাগৃহকেও বুঝাইত, তাহার প্রমাণ নাসিক, ভাজা, কার্লে প্রভৃতি স্থানের পর্ব্বত-গাত্র-খোদিত অদ্যাপি বর্ত্তমান চৈত্য গৃহগুলি হইতেও জানা যায়। এখনও এই সকল সভাগৃহ-গুলিকে চৈত্য বলা হয়। এই সভাগৃহগুলির ভূমিচিত্র একটু লম্বাকৃতি এবং শেষ প্রান্তটি কতকটা অর্দ্ধমণ্ডলাকার।



চৈত্য পূজা

এই শেষ প্রান্তে একটী ছোট স্তূপ বা দাগোবা থাকে, এবং তাহারই সম্মুখে স্তম্ভসজ্জিত প্রশস্ত সভাগৃহ,—সেইখানে ভক্ত ও শিষ্যেরা সমবেত হইয়া স্তূপের পূজা করিতেন, আচার্য্যের উপদেশ ইত্যাদি শুনিতেন। বিহারগুলি ছিল ভিক্ষুদের বাসগৃহ; এক একটী বিহারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি কক্ষ থাকিত, প্রত্যেক কক্ষে এক একজন ভিক্ষু বাস করিতেন। স্তূপগুলি পূর্ব্বে ছিল ছোট বড়, অর্দ্ধমণ্ডলাকৃতি ও পরে হইয়াছিল নলাকৃতি গম্বুজের মতন।

উপরে বিভিন্ন প্রকারের চৈত্যের যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, বৌদ্ধ-সাহিত্যে চৈত্য বলিতে বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কিত স্তূপ, বিহার, সভাগৃহ, বিশেষ বৃক্ষ, স্মৃতিস্তম্ভ, পূজাস্থান, অথবা মূর্ত্তিকে বুঝাইত। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কে পূজা ও ভক্তি নিবেদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ও নির্ম্মিত যে কোন পূজার বস্তুকেই চৈত্য বলা যাইতে পারে।

৩৯। সম্মোহবিনোদনী, ৩৪৮ পৃঃ।

৪০। দাঠাবংশ (B. C. Law), ৬ পৃঃ।

৪১। দাঠাবংশ ১২-১৩ পৃঃ।

৪২। মনোরথ পূরণী (সিংহলী সং) ২০৭ পৃঃ; প্রথমটী অনোমা নদীতীরে বোধিসত্ত্ব কর্ত্তিত কেশগুচ্ছের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চৈত্য ইন্দ্র আকাশমার্গে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মহাচৈত্য অনেক অমাত্য কর্ত্তৃক পূজিত হইত।

৪৩ চূড় বংশ, ১ম খণ্ড, ৫ পৃঃ।

৪৪ চূড় বংশ, ১ম খণ্ড, ১৪ পৃঃ।

৪৫ চূড় বংশ, ১ম খণ্ড, ২৭ পৃঃ।

৪৬ চূড় বংশ, ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃঃ।

চূড় বংশ, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃঃ।

৪৮ চূড় বংশ, ২য় খণ্ড, ৩৭৮ পৃঃ।

৪৯ চূড় বংশ, ৪৪৯ পৃঃ।

৫০। চূড় বংশ, ৩৭৮ পৃঃ।

অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ

(১)

"তা কি কোনো রকমেই হ'তে পারে না মিস্ ?"

"না" বলিয়াই প্রসঙ্গটা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে তরুণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"ঐ দেখুন ; দীর্ঘকাল বিলেতে থেকে, সেখানকার চাল্‌চলন্ আপনার এতই মজ্জাগত হ'য়ে গেছে যে, বাঙালীকে—নিজের জাত ভাইকেও আর দেশী কায়দায় বনিয়ে নিয়ে চ'ল্‌তে পারেন না। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এগুলো কি বিলেৎ-ফেরৎ মাত্রেরই রোগ? আমি কিন্তু ঐ সব সাহেবিয়ানাগুলো খুব অপছন্দ করি। ওতে তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিই আসে বেশী। যাক্, আপনি আমায় মিস্ না বোলে, নাম ধ'রেই ডাক্‌বেন্। আমার সঙ্গে ওগুলো ঠিক্ খাপ্ খায় না।"

"আচ্ছা, তাই ক'র্‌বো এবার হ'তে। বিলিতি কায়দা যে মজ্জাগত হ'য়ে গেছে ব'লেই সেই ধাঁচে সব সময় চ'ল্‌তে চাই, তা ঠিক্ নয়। ওতে অনেক অসুবিধার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। নাম না জানার ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না ; কোন আদবেরও বালাই নাই। আপনার নামটা তো আমার আজও ভাল ভাবে জেনে নেওয়া হয় নি। অনেকবার ভেবেছি—জিজ্ঞেস ক'র্‌বো ; হ'য়ে ওঠে না।"

"নামটা ছাড়া যার অন্য কোনো পরিচয় নাই, তার সে নামটারও কোনো মূল্য নাই। যা হয় একটা কিছু ব'লে ডাক্‌লেই চল্‌'বে ; কিন্তু—'আপনি', 'আজ্ঞা' ইত্যাদির ভারটা আর ঘাড়ে চাপাবেন না।"

ললাটটা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণেক ভাবিয়া লইয়া মেজর বলিলেন——"ঠাকুরদা তো আপনাকে 'অনি' কিম্বা ঐ রকম কি একটা ব'লে ডাক্‌তেন, শুনেছি। পুরো নামটা বোধ হয় শুনি নি কোনো দিন।"

"দাদা মশায়ের সঙ্গে সঙ্গেই যার বাঁধনের শেষ সুতোটি পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গেছে, তার আর অতীতের জীর্ণ সম্বল শুধু নামটাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি বলুন? ছেলেবেলা থেকে যা কিছু আমার ব'ল্‌তে ছিল, আজ আর তার কোনো চিহ্নও নাই। তাই ব'ল্‌ছিলুম—ঐ নামটাকে কেবল আঁক্‌ড়ে ধ'রে আর লাভ নাই। দাদা মশায় ডাকতেন, ইচ্ছে হ'লে আপনিও সেই 'অনি' ব'লেই ডাক্‌বেন। তবে বর্ত্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে ব'ল্‌তে হ'লে, এখন আমার পুরো নামটা হওয়া উচিত—হয় 'অনামিকা' কিম্বা 'অনাথা'। যা'ক্, কিন্তু দয়া ক'রে আমায় 'আপনি' না ব'লে, 'তুমি' ব'লে সম্বোধন ক'র্‌লেই সুখী হব। নামের মূল্য বিশেষ কিছু নাই ; ওটা শুধু 'বহুর' ভিতর থেকে একজনকে বেছে নেবার একটা সঙ্কেত মাত্র। সুতরাং ডাক্‌বার বেলায় যা ব'লেই ডাকুন্, তাতে কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তাই ব'লে অবশ্য 'তুমি'র যোগ্যকে 'আপনি' না বলাই ভালো ; কারণ, পদমর্য্যাদার কথা এসে পড়ে। নয় কি?" বলিয়াই অনি তাহার স্বাভাবিক মাধুর্য্যের সহিত অল্প হাসিল।

"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু হঠাৎ 'তুমি' ব'ল্‌তে যেন কেমন একটু বাধো বাধো লাগে।"

মেজরের কথা শেষ না হইতেই, তাড়াতাড়ি ঘরের আলোটি ক্ষীণ করিয়া দিয়া, স্মেলিং সল্টের শিশিটা তাঁহার হাতে দিয়া অনি বলিল—"আপনার শরীর অসুস্থ। ব'ল্‌ছিলেন—মাথা ধরে'ছে। বেশী কথা ব'ল্‌বেন না। যে পরিচয়টুকু না জেনে এই দেড় মাস সময়ও বেশ কেটে গেছে, সেটার অভাবে আরো দু'একদিন কাটানোর কোনো অসুবিধাই হবে না। পরে একদিন সব জেনে নিলেই চ'ল্‌বে। আপনি একটু বিশ্রাম করুন ; আমি ইউডিকোল্‌নের শিশিটা নিয়ে আসি।" পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া অনি পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে তাহার ধীর মন্থর গতির পানে চাহিয়া রহিলেন। স্বদেশের ও বিদেশের যে সকল সম্ভ্রান্ত ও সুসভ্য সমাজের মহিলাদের সঙ্গে তিনি মিশিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে এই নারীটির যেন একটা অস্বাভাবিক রকমের পার্থক্য আছে। নারী—এত ধীর ও অচঞ্চল—তাঁহার চোখে খুব কমই পড়িয়াছে। অথচ ইহার চাল্-

চলন, কথাবার্ত্তা—সব কিছুর মধ্যেই যথেষ্ট সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। চরণের ধীর তাল যেন সুরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় পরশ দিয়া চলে। আয়ত নীল চোখ দুটি লাবণ্যময় যৌবন-শ্রীকে আরও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

ইউডিকোলনের জলে খিন্ লিনেনের পটীটা ভিজাইয়া মেজরের কপালে দিয়া, অনি পাশের ইজিচেয়ারে বসিয়া হাতপাখায় বাতাস দিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু নিমীলিত নেত্রে শয্যায় পড়িয়া কি ভাবিতেছিলেন। অনিও অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া বাতাস দিতেছিল। সহসা শিথিল পাখাখানি ডাক্তার বাবুর কপালের উপর পড়িতেই উভয়ের চমক্ ভাঙিয়া গেল। অনি অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতেই, তিনি বলিলেন—

"এতে লজ্জিত হবার কিছুই নাই। আপনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন; কিন্তু আমার মনে হয়—ওটা অনাত্মীয়তার সঙ্কোচ। ঐটাই আমি বরদাস্ত ক'র্‌তে পারি না। কাছে থেকেও মানুষের সঙ্গে যদি মানুষের অনাসক্ত ভাবটাই প্রবল থেকে যায়, তবে দূরেরটা যে চিরদিন নাগালের বাইরেই পড়ে' থাক্‌বে তাতে আর সন্দেহ কি? আপনি —তুমিও তো কোনো অংশেই তার চেয়ে বেশী কাছে আস্‌তে চাও ব'লে মনে হয় না। আমার এখানে মাত্র কয়েক দিন থেকেই তুমি হাঁফিয়ে পড়ে'ছ। গুরুগিরি, না হয় নার্সিং —যা হোক্ কিছু না হ'লেই যে তোমার জীবিকা চল্‌তে পারে না, সেটা আমি কোনো মতেই স্বীকার ক'রবো না। যদি দোষ না নাও, তবে বল্‌তে চাই—সাহায্য নেওয়া নয়, বন্ধুত্বের দাবীতেও তো আমার এই যৎসামান্য আয়ের অংশ নিয়ে তোমার চ'ল্‌তে পারে! অনি, সত্যই কি তোমায় বন্ধু হিসাবেও কাছে রাখ্‌বার অধিকারটুকু পেতে পারি না?"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই যেন সহসা লজ্জিত হইয়া ডাক্তার প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"না—না, আমি অন্য কোনো ভাবে বলি নি। আপনার দাদা মশায়ের মৃত্যুর পর যখন আপনি আমার আশ্রয়ে আস্‌তে আপত্তি ক'রেছিলেন, তখন আপনাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলুম, এখনো স্পর্দ্ধার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে ঠিক্ তাই বল্‌ছি, যে আপনি আমার মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস ক'র্‌বেন না; আমার দ্বারা আপনার সম্মান কখনই ক্ষুণ্ণ হবে না। আপনি যদি মনে করেন এখানে কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে, আমি আপনার জন্যে আলাদা বাসা ঠিক্ ক'রে দিতেও প্রস্তুত আছি।"

মেজরের সৌজন্যে নিজের তরফ হইতে একটু লজ্জিতা হইয়াই অনি বলিল—

"ও কথা বল্‌বেন না। আমি তো আর কোন দিনের জন্যেই সে কথা ভাবি নি। আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা' আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও পাওয়া যায় না। বন্ধু কেন! আপনি আমার পরম আত্মীয় ও আশ্রয়-দাতা। আপনি ও কথা বল্‌ছেন কেন? আমি তো আপনার এইখানে—আপনার কাছেই আছি।"

"না অনি, এ কাছে থাকার মধ্যে যেন কোথায় একটা মস্ত ফাঁক আছে। জীবন আর মৃত্যু অনবরত পাশাপাশি থাক্‌লেও, একটা সূক্ষ্ম পর্দ্দা যেমন তা'দিগে চিরদিনই তফাৎ ক'রে রেখেছে, কোনো মতেই কেও কারো রহস্য ভেদ ক'র্‌তে পার্‌ছে না; তোমার আমার মধ্যেও যেন কতকটা তেমনি ভাবই র'য়ে গেছে। আমার মনে হয়, কোথায় যেন তোমার একটু শান্তির, একটু তৃপ্তির অভাব—"

মেজরের কথা শেষ না হইতেই অনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"আমার কোনও তৃপ্তি, কোনও শান্তিরই অভাব তো নেই। আপনি নিজে কষ্ট ক'রে আমার জন্যে যা ব্যবস্থা ক'রেছেন, তাতে আমার কোন অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্যই থাক্‌তে পারে না। এতখানি কোনো আত্মীয় বন্ধুর কাছ থেকেও আশা ক'রতে পারি নি। দেশে যে দুই একজন আত্মীয় আছেন, বিপদে পড়ে' তাঁদের অনেকের কাছেই সাহায্য চেয়েছিলুম; তাঁরা পত্রের উত্তর দিয়েও আমার এই বিপদের সময় একটু সহানুভূতি দেখাবার অবসর পান নি, বা দরকার বলে' মনে করেন নি। মা তাঁদের আগে থেকেই চিন্‌তেন। তাই তিনি কারও আশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে দেশের ভিটেটুকু আঁকড়ে থাক্‌তে পারেন নি। আপনি যে দয়া করে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন—বিদেশে বিপন্ন অবস্থায় রক্ষা করেছেন, তার চেয়ে বেশী আর কি আশা করতে পারি! আপনার অনুগ্রহ পেয়েছিলুম ব'লেই জীবন-জোড়া একটা মস্ত অনুশোচনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। দাদুর সেই দারুণ রোগের সময় কি বিপন্নই যে হ'য়েছিলুম, তা একমাত্র ভগবান জানেন। আপনি দয়া ক'রেছিলেন ব'লেই, তবুও

দাদামশায়ের শেষ অবস্থায়—যা হোক্, একটু কিছুও ক'রতে পেরেছি। আপনি দয়া ক'রে আমার ভার হাতে তুলে নিয়েছিলেন; তাই অন্ততঃ মর'বার সময়ও তিনি তাঁর শোক-সন্তপ্ত, জীর্ণ হৃদয়ের শেষ নিঃশ্বাসটা একটু সোয়াস্তির সঙ্গে ফেলে যেতে পেরেছেন। এই নিরাশ্রয়া—অনাথার জন্যে—"

অনিকে নিরস্ত করিয়া মেজর একটু আক্ষেপের সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—"নাঃ, অনি, শুধু কৃতজ্ঞতার বোঝা চাপিয়ে নিজেকে হাল্‌কা ক'র্‌তে চাও; কিন্তু আমি তো তার দাবী করি না।"

"প্রত্যুপকার ক'র্‌বার ক্ষমতা সকলের না থাক্‌তে পারে, কিন্তু উপকারীর কৃত উপকারকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'র্‌বার কৃতজ্ঞতাটুকু সবারই থাকা উচিত। সেটা না থাকাকে আমি সত্যি খুব ঘৃণা করি ডাক্তার বাবু। যাক্ গে সে সব কথা! আপনি আর বেশী ব'কে ব'কে জ্বরটা তুলে ফেল্‌বেন না। কাছে না পাওয়ার অভিযোগ সর্ব্বদাই করেন; কিন্তু আমি কাছে আস্‌তে চাই না শুধু ঐ জন্যেই—যে আপনি কোনো লোককে কাছে পেলেই কেবল আবল তাবল বক্‌তে সুরু করেন। আমি বাতাস দিচ্ছি, আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন; নইলে উঠে যেতে বাধ্য হব।"

মেজর পাশ ফিরিয়া চোখ বন্ধ করিলেন। ইচ্ছা হইলেও বলিতে পারিলেন না—কেন তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে বকিয়া যাইতে চান। 'পুরুষেরও হারানোর ব্যথা আছে—সে ব্যথা নারীর চেয়ে কম নয়।'

তিনি নিঃশব্দে পড়িয়া ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্যর্থতা জ্ঞাপনের ভান করিতেও তাঁহার সাহস হইল না। এই নারীর দৃঢ় আদেশগুলির প্রতিবাদ করিবার, বা তাহা লঙ্ঘন করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। সেই দৃঢ়তার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল, যাহা তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে আদৌ মিল খাইত না; অথচ কেন যে তিনি তাহা না মানিয়া পারিতেন না, তাহার কৈফিয়তও হয়তো নিজের কাছেই দিতে পারেন না। তিনি বুঝিতেন, অনি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ বলিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিলেও, তাঁহাকে ভয় করে না।

স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া অনি ধীরে ধীরে হাতপাখাখানি সঞ্চালিত করিতে লাগিল। সে ইচ্ছা করিয়াই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, যাহাতে ডাক্তার পুনরায় কথা বলিবার সুযোগ ও অবসর না পান। এই নিস্তব্ধতা ডাক্তারের ভাল না লাগিলেও ভাঙিবার ইচ্ছা হইল না। স্নেহের আবেশে পোষমানা দুরন্ত শিশুর মত, তাঁহার বাঁধনহারা চঞ্চল চিত্ত-প্রকৃতি অনির এই দৃঢ় অথচ শান্ত ও স্নিগ্ধ শাসনের তলে যেন আপনা আপনি অবশ হইয়া আসিল।

অনি যখন নিঃশব্দে আসন ছাড়িয়া উঠিল তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। ডাক্তার অনেক-ক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। অনি মেজরের ঘুমন্ত মুখখানাকে অতি সন্তর্পণে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। সুগৌর মুখখানার উপর আলোর ছটা পড়িয়া যেন একটা স্বপ্নময় মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মনকে জোর করিয়া শাসন করিলেও দেখার লোভটুকুকে অনি কোনোমতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। মেজরকে দেখা অবধিই অনির মনের নিভৃত কোণে থাকিয়া থাকিয়া যেন কিসের একটা ক্ষীণ আকর্ষণ জাগিয়া উঠিত; কিন্তু সংযত-স্বভাবা অনি তাহার কোনো কারণই খুঁজিয়া পাইত না। নিজের সেই দুর্ব্বলতাটুকুকে দমন করিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া চলিত।

টেবিলের উপর হইতে সেজ্‌টাকে সরাইয়া আড়ালে রাখিয়া অনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(২)

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতেই, অনি যখন পথের পাশের জানালা খুলিয়া দাঁড়াইল, তখন বেলা প্রায় সাতটা। রৌদ্রের সোণালী আঁচল তখন ঘন পল্লবিত তরুর ছায়ান্তরাল ভেদ করিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। সহসা মেজরের কথা মনে হইতেই অনি একটু লজ্জাবোধ করিল। এত বেলায় সে কখনই শয্যাত্যাগ করে না। ডাক্তার বাবু খুব সকালে উঠিয়া চা ও জলখাবার খাইয়া বাহির হইয়া যান্। এখানে আসিবার পর হইতে অনি তাঁহার সকাল-বিকালের চা ও জলখাবার-টুকু ঠিক্ করিয়া দিবার ভার স্বেচ্ছায় নিজেই গ্রহণ করিয়াছিল। অনি ডাক্তারবাবুর সহিত অবাধভাবে মেলামেশা করিতে পারিত না। একটা অকারণ-সঙ্কোচে সে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু তাহার সেবাপরায়ণা নারী-প্রকৃতি সেই উপকারী

বন্ধুর সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে একবারে উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিত না।

বাবুর্চি ও বেয়ারার অনুগ্রহের উপর ডাক্তারের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সুবিধা অসুবিধা নির্ভর করিত। অনি প্রথম প্রথম তাহাদের কাজকর্ম্মের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। এইরূপে, দেখিতে দেখিতে, আপনার অজ্ঞাতসারে সেই বাঁধনহারা, উদাস কর্ম্মশ্রান্ত পথিকের সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের ভার সে ক্রমে ক্রমে আপন হাতে তুলিয়া লইয়াছিল।

মেজরের গত সন্ধ্যার অসুস্থতার কথা মনে হইতেই নিমেষে অনির কর্ত্তব্যজ্ঞান যেন তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে চাবুক মারিয়া সচেতন করিয়া তুলিল। যিনি তাহার আত্মীয় অপেক্ষাও মঙ্গলার্থী, বন্ধু অপেক্ষাও হিতৈষী; বিদেশে নিঃসহায় ও বিপন্ন অবস্থায় একমাত্র যাঁহার অনুগ্রহ ও সহানুভূতি তাহাকে আজিও নারীত্বের সকল গৌরব লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার সম্বল দিয়াছে, তাঁহার অসুস্থতায় সে নিজের এই উদাসীনতাকে কোন মতেই ক্ষমা করিতে পারিল না। ত্রস্তপদে ডাক্তারের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিল দ্বার তখনও রুদ্ধ; রাত্রে সে যেরূপভাবে দরজাটা টানিয়া বাহির হইতে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল, এখনও ঠিক সেই ভাবেই আছে। গৃহকোণে ক্ষীণ সেজ্‌টা তখনও মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল।

অনি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মেজর তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই—লাল-ইম্‌-লির মোটা র‍্যাগখানিতে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন। হঠাৎ এ অবস্থা দেখিয়া তাহার মনটা আঁৎকাইয়া উঠিল। নিঃশব্দে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া গায়ে হাত দিতেই, ডাক্তার একটা ক্ষীণ কাতর শব্দ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। অনি কপালে হাত দিয়া দেখিল—প্রবল জ্বরে তাহা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া আছে।

নিমেষে অনির সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। অতি নিবিড়ভাবে ডাক্তারের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, কপালে জলপটী দিয়া, সে আস্তে আস্তে তাঁহার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে লাগিল। অনির মনে হইতেছিল তাহারই সর্ব্বস্বান্তকারী গ্রহদেবতার নিষ্ঠুর প্রকোপেই বোধ হয় এই উদার, মুক্তহস্ত আশ্রয়দাতার মহৎ জীবনকে নির্য্যাতিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার চোখ মেলিয়া একবার অনির মুখের দিকে চাহিলেন। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুক ঠেলিয়া উঠিতেছিল। অনি উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি খুব কষ্ট হ'চ্ছে?"

ডাক্তার বলিলেন—"বিশেষ কষ্ট হয় নি; তবে জ্বরটা বোধ হয় একটু বেশী হ'য়েছে। বনবিহারীকে একবার খবর দিলে ভাল হ'ত। আপনি একা—"

অনি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"তাতে কি হ'য়েছে! সে জন্যে আপনি মোটেই ব্যস্ত হবেন না। আর বনবিহারী বাবুকেও আমি এখনি খবর পাঠাচ্ছি।" বনবিহারীর নামে যেন সেও মনে মনে একটু ভরসা পাইল।

বনবিহারীবাবু মেজর রায়ের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি মোগলসরাইএর রেলওয়ে ডাক্তার। ইতঃপূর্ব্বে দুই একবার নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বনবিহারীবাবু এখানে আসিয়াছিলেন। অনির সহিতও তাঁহার অল্প-বিস্তর আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। বনবিহারীবাবুর সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও, তাঁহার স্বভাবের ভিতর এমন একটা মিশুক্‌ ও মোলায়েম ভাব ছিল, যাহাতে তিনি অতি অল্পক্ষণের আলাপেই অনির নিকট অনেকখানি আত্মীয়তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

টেবিলের উপর হইতে একখানি চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া, অনি ডাক্তার রায়ের প্রবল জ্বরের কথা লিখিয়া বনবিহারীবাবুকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিল। সে বনবিহারীবাবুর পুরা নাম ও ঠিকানা জানিত না। অনি বনবিহারীবাবুর নিকট যাহা শুনিয়াছিল, ডাক্তার রায়ের নিকট হইতেও সেই উপাধিহীন নাম ও রেল কোম্পানী-সংশ্লিষ্ট পদমর্য্যাদাটুক্‌র বেশী আর কিছুই জানিতে পারে নাই। নাম জিজ্ঞাসা করিলেই বনবিহারীবাবু একটা কাব্যের দোলা দিয়া কেবলমাত্র বলিতেন—"বন্‌ বে-হা-রী," এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিতেন যে সেইটুকুর বেশী আর কোনো পরিচয়েরই দরকার হবে না। সুতরাং ডাক্তারকে সে বিষয়ে পুনরায় কোন প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া, অনি বেয়ারাকে ডাকিয়া পত্রখানি সত্বর মোগলসরাই-এর রেল-ডাক্তার সাহেবের কুঠীতে পৌঁছাইয়া দিবার আদেশ দিল। বেয়ারা চিঠিখানি

বনবিহারীবাবুকে বিশেষরূপে চিনিত ; এবং পূর্ব্বেও সে বহুবার বনবিহারীবাবুর নিকট পত্রাদি পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

স্নেহের বন্ধন ও রক্তের কোন যোগসূত্র না থাকিলেও অনি ডাঃ রায়ের অসুখে বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। অদৃষ্ট ও ঘটনায় গতিচক্রে তাহার কেন্দ্রচ্যুত জীবন যে বিরাট শূন্য-পথে ছুটিয়া চলিয়াছিল, সেখানে ডাঃ রায়ের আকর্ষণ ও সহানুভূতি না পাইলে, তাহা তো চিরদিনের মতই লুপ্ত হইয়া যাইত। ডাক্তারের সেই কৃত উপকার ও মহত্ত্বকে অনি শ্রদ্ধা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই দারুণ আকর্ষণের প্রতিক্রিয়া যেন পূর্ব্বে আর কখনো এমন করিয়া উপলব্ধি করে নাই।

* * * *

বিকালের গাড়ীতে বেয়ারার সঙ্গে সঙ্গেই বনবিহারীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

রোগীকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া ও বিশেষ মনোযোগের সহিত অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বনবিহারীবাবু ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। ডাক্তারেরা নিজের চিকিৎসা নিজে কখনই করেন না—সেটা সংস্কার বা অক্ষমতা যে কোন কারণেই হউক! সুতরাং বনবিহারীবাবুকেই মেজরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে হইল।

(৩)

অনির আগ্রহ ও অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বনবিহারীবাবু সে রাত্রে মেজরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই আতিথ্য স্বীকারে বনবিহারীবাবুরও যে বিশেষ ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না—তাহা বলা যায় না। বনবিহারীবাবু স্বভাবতঃ মিশুক ও সঙ্গীপ্রিয় ছিলেন। নিত্য নূতন বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপনের বেশ একটু নেশা তাঁহার বরাবরই ছিল।

তখন সন্ধ্যা। অনি তখনও মেজরের মাথার কাছে বসিয়া তাঁহার কপালে জলপটী ও বাতাস দিতেছিল। বেয়ারা অনেকক্ষণ আলো জালিয়া দিয়া গিয়াছে। বনবিহারী বাবু বাহিরের খোলা বারান্দায় পাইচারি করিতেছিলেন। মেজরের তখন একটু তন্দ্রাভাব হইয়াছে দেখিয়া অনি বনবিহারী বাবুর চা ও জলখাবারের ব্যবস্থা করিবার জন্য আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

খাবার ও চায়ের বাটী বয়ের হাতে দিয়া অনি ঘরে ফিরিয়া আসিল। বনবিহারী বাবু তখন কোট খুলিয়া ইজি চেয়ারখানার উপর বসিয়া ডাক্তারের রেসপিরেশান্ দেখিতেছিলেন। অনি ও তাহার পিছনে চা-সহ বয়কে দেখিয়া তিনি টেবিলের পাশে উঠিয়া আসিলেন।

বয়ের হাতে এক পেয়ালা চা ও একজনের মত খাবার দেখিয়া বনবিহারী বাবু ঈষৎ উষ্ণতা মিশ্রিত দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"নাঃ—অনিমা দেবী, এ তো হ'তে পারে না। এ যে কোন্ দেশী ভদ্রতা তা তো বুঝি না। আমি একা খাবো, আর আপনি বসে' থাকবেন!—সে হ'তেই পারে না। এই বয়! মায়ী-জী-কো চা ঔর খানা কাঁহা? যাও—আভি হিঁয়া লেয়াও—তুরন্ত্..."

বেচারা বয় বিব্রত হইয়া অনির দিকে চাহিতেই অনি হাসিয়া বলিল—"বেচারা বয়কে ধমক দেওয়া মিছে। সে ওর বেশী কেক্ বিস্কুটও পাবে না—চা'ও আর নেই। আর থাকলেও যে বিশেষ সুবিধে হ'ত—তা নয়। আমি মোটেই ও-সবের ভক্ত নই! ছেলেবেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত চা বিস্কুটের সঙ্গে চাক্ষুষ ভিন্ন ব্যবহারিক সম্বন্ধ কখনই হয় নি। যাক্, আপনি আগে খেয়ে ফেলুন। দেরী ক'রবেন না—চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।"

"তা না হয় খেলুম, কিন্তু সেটা কি ভালো দেখায়। আপনি যখন খান্ই না, তখন অবশ্য আমার ব'ল্বার কিছুই নেই। কিন্তু ছেলে বেলা থেকে খান্ না ব'লেই যে কখনো ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও খাওয়া যায় না—তা আমি মানতে পারি না।" বলিয়াই বনবিহারী বাবু চায়ের বাটীতে একটা চুমক দিলেন।

অনি সে অভিযোগের কোন প্রতিবাদ করিল না দেখিয়া বনবিহারী বাবু একটু জয়ের প্রফুল্লতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"অত্যন্ত না হ'লেই যে সে কাজটা কখনো ক'রতে হবে না—সেটা লেম্ এক্সকিউজ্ বা বাজে ওজর ভিন্ন কিছুই নয়; বুঝলেন মিস্!"

অনি বনবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া নির্ব্বিচিত্তে তাঁহার অকারণ-জয়োল্লাসের ভাবটা লক্ষ্য করিয়া মনে

মনে হাসিতেছিল। বনবিহারী পুনরায় তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কেমন—মিস্! ওটা মানেন তো?"

"কোন্‌টা?" বলিয়াই অনি অল্প হাসিল।

বনবিহারীবাবু এই হাসির অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় কহিলেন—"এই যেমন বল্‌ছিলেন যে, অভ্যস্ত নন্ ব'লেই চা বিস্কুট ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও খেতে পারেন না।"

"অন্যায় অভিযোগ! আমি তো তা বলিনি ক্যাপ্টেন! অভ্যস্ত নই ব'লেই যে ভদ্রতা রক্ষার জন্যেও খাবো না—তা ঠিক্ নয়। কেক্ বিস্কুট ইত্যাদি জিনিষগুলো কোন কালেই আমার বাপ পিতামহ খান্ নি। রোষ্ট-ফাউল-কেক্ যাকে আপনারা হয় তো সুখাদ্য ব'লে মনে করেন, সেটা অন্যের কাছে ঠিক্ তা না হতেও পারে তো! খাওয়ার ব্যাপারটা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চেয়ে রুচির উপরেই বেশী নির্ভর করে। আমি মাছ মাংস ডিম্ চা ইত্যাদি খাই না। নিজে খাই না ব'লেই যে আমি সেগুলোকে ঘৃণার চোখে দেখি, তা ভাব্‌বেন না। খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে একটু নিয়ম নিষ্ঠা থাকার দরকার। পুরুষেরা না মান্‌লেও, মেয়েদের অন্ততঃ কতকগুলো মেনে চলা উচিত। তা ছাড়া চা একটা নেশার সামিল ব'লে আমি আরো বেশী এড়িয়ে চলি।"

বনবিহারীবাবু সহাস্যে উত্তর করিলেন—"চমৎকার। এ যুক্তি খণ্ডন করা যায় না। তবে বাপ পিতামহ খান্ নি, সুতরাং খাবেন না—এটা নিছক্ সংস্কার। আপনাদের মত শিক্ষিতা আধুনিক মহিলাদের ভিতরেও যে কুসংস্কারের বালাই এখনো এত দৃঢ়মূল, তা জানতুম না।" শেষের কথাটুকু বনবিহারীবাবু বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই বলিলেন।

অনি তাঁহার শ্লেষটুকু লক্ষ্য করিয়া দৃঢ় অথচ মোলায়েম-ভাবে বলিল—"আমাকে শিক্ষিতা শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করাটাই যে আপনার ভুল হ'য়েছে বনবিহারীবাবু! শিক্ষিতা হ'তে পারি নি বলেই তো কুসংস্কারের মোহগুলো এখনো কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি। আপনাদের পক্ষে ওগুলো উড়িয়ে দেওয়া যত সহজ হ'য়েছে, মূর্খের পক্ষে তত সহজ কখনই হ'তে পারে না। তা' ছাড়া এগুলোকে কুসংস্কার ব'লে যে আপনারা নিতান্ত ঘৃণা ও অবহেলার চোখে দেখেন—সেটাকেও আমি ঠিক্ ভালো ব'লে মেনে নিতে পারি না। সামাজিক যে সব বাঁধাবাঁধি আছে—সেগুলোকে আমি সংস্কারের বাঁধন বলি না; সেগুলো হ'চ্ছে সামাজিক বা জাতীয় বিশিষ্টতা। অর্থাৎ আপনি যাকে বলেন—কুসংস্কার, আমি তাকে বলি 'স্বাতন্ত্র্য'। এই স্বাতন্ত্র্য হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সবারই আছে। যার নাই—সে দুর্ব্বল—সে কাপুরুষ।"

কথাগুলির মধ্যে যে বেশ একটু উত্তাপ ছিল, তাহা বনবিহারীবাবুর উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া তিনি অনির দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহু পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; বিশেষতঃ হিন্দুয়ানির বিষয় লইয়া কোনো তর্ক বা আলোচনা সুরু হইলে অনি অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিত। নিয়ম-নিষ্ঠা সম্বন্ধে অনির গোঁড়ামির কথা তিনি মেজরের নিকট শুনিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে তর্ক বাধাইবার চেষ্টাও বনবিহারী দুই একবার করিয়াছিলেন। কিন্তু সংযত-স্বভাবা অনি সংক্ষেপে দুই একটা উত্তর দিয়াই তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। অনির মধ্যে এতখানি তেজস্বিতার ভাব তিনি কখনই লক্ষ্য করেন নাই।

বনবিহারীবাবুর স্বভাবের মধ্যে একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি উদ্গত ক্রোধ ও ঘৃণাকেও সহসা হজম করিয়া সরল হাসিতে প্রতিপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিতে পারিতেন। তাঁহার অস্বাভাবিকরূপে সরল ও বিস্ফারিত চক্ষু দুইটাই ছিল সেই আত্মগোপনের একটা মহৎ প্রচ্ছদপট।

বনবিহারীবাবু সহাস্যে, তাঁহার বিশাল চক্ষু দুইটাতে রাশীকৃত সরলতার হাসি মাখাইয়া, অনির দিকে চাহিতেই অনি যেন বিশেষ বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল। বনবিহারীর এই স্বভাবসিদ্ধ কৃত্রিম সরলতার অন্তরালে কিছু ছিল কি না তাহা সে লক্ষ্য করিবার চেষ্টাও করে নাই। বরং সে যে এত সরল ও অপ্রাকৃতিক লোকের নিকট অনর্থক কতকগুলো আবল তাবল বকিয়া ফেলিয়াছে কেন, এই কথা ভাবিয়াই মনে মনে না হাসিয়া পারিল না।

মেজরকে ঔষধ দিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া অনি তাড়াতাড়ি রোগীর পার্শ্বে গেল। মেজরের তন্দ্রাভাবটা তখন চলিয়া গিয়াছিল; তিনি এতক্ষণ শুইয়া শুইয়া অনির নিঃসঙ্কোচ যুক্তির আনন্দটুকু উপভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার দিকে চোখ পড়িতেই অনি একটু

বনবিহারীবাবু ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়াই প্রসঙ্গটাকে হঠাৎ উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প একটু উত্তেজনাতেই অনির যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মুখ চোখের ভিতর যে নিঃসঙ্কোচ ভাবটি ফুটিয়া উঠিতেছিল, সে টুকুকে আরও অবাধভাবে দেখিবার লোভ তাঁহার যথেষ্টই থাকিয়া গেল।

মেজরকে ঔষধ খাওয়াইয়া অনি তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তখন জ্বরের বেগ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগ হয় নাই। ইহাতে সে মনে একটু ভরসা পাইল, জ্বরটা রাত্রের মধ্যেই ছাড়িয়া যাইতে পারে।

আলোটা একটু আড়াল করিয়া দিয়া, অনি জানালার পর্দ্দাগুলি ভালরূপে টানিয়া আটকাইয়া দিল; এবং মেজরকে দেখিবার জন্য বনবিহারীবাবুকে আর একবার অনুরোধ করিয়া তাঁহার রাত্রের আহারের আয়োজন করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল।

মেজর ও বনবিহারী উভয়েই বোধ হয় তখন অনির কথা ভাবিতেছিলেন। অনির তৎপরতা ও চলাফেরা প্রভৃতি প্রত্যেকটী গতিবিধিতেই একটা মাদকতা ছিল। সে মাদকতা মনকে চঞ্চল করার চেয়ে আকর্ষণই করে বেশী।

(ক্রমশঃ)

দীনের দাবী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

মহা ভিড় আজ মন্দির-দ্বারে
বাধিয়াছে বড় কোন্দল
দেবালয়-মাঝ ঢুকিতে যে আজ,
হয়নাক রাজি মণ্ডল।
স্বজাতিরা তার বলে বারবার
সবাই নিয়েছি পৈতে,
লজ্জা ঘৃণায় মাথা হবে হেঁট
বাহিরে দাঁড়ায়ে রইতে।
দেবতার দেহ পরশনে হায়
অধিকারী আজ সর্ব্বে,
সব হিন্দুর হৃদয় ভরেছে
অপূর্ব্ব এক গর্ব্বে।
এত প্রাণপণ সত্যাগ্রহ,
এত যে বিপুল চেষ্টা।
হে অনুরক্ত প্রবীণ ভক্ত,
বিফল হবে কি শেষটা?
মণ্ডল রয় দ্বারে দাঁড়াইয়া
ভীত দুরু দুরু বক্ষে,
গলে নামাবলী বিশাল উরস্,
অশ্রু ঝরিছে চক্ষে।
বলে, দীন মোরা ভিতরে যাইতে
মোটেই মোদের নাইরে,
মোরা সেথা গেলে দীনবন্ধু যে
আসিবে না আর বাইরে।
দেবতা এসেছে যুগ যুগ ধরে
আমাদের মাঝে নিত্য,
কে করেছে দান এত সম্মান,
ভেবে হও স্থির-চিত্ত।
হুজুগ করিয়া মন্দিরে যাব
তাহাতে বাড়িবে মান কি?
দেবতা পরশ করিতে চাইনে
দেবের পরশাকাঙ্ক্ষী।
যাব না ভিতরে, যাব না যাব না
রাজি নই দাবী ছাড়তে,
বলি দিয়া হায় যুগের যুগের
বনিয়াদী আভিজাত্যে।
আমাদের টানে আমাদের দ্বারে
নিজে এসেছেন গঙ্গা,
কেন ছুটে যাব পরশ করিতে
জহ্নু মুনির জঙ্ঘা?
মন্দিরে গেলে মোটেই মোদের
বাড়িবে না জেনো দাম গো;
শ্রীরামের কাছে গুহক যায়নি,
গুহকের কাছে রাম গো।
মোরা রহি যেন চিরদিন ধরে'
মানবের অস্পৃশ্য,
দেবের পরশ-আস্পদ হয়ে
দীন শবরীর শিষ্য।
ভাল আমাদের চল কি অচল
ব্যাকুল নহি তা জানতে,
থাক্ অধিকার আঁখি-জল দিতে
হরির চরণ-প্রান্তে।

সিংহভূমের তাম্রখনি

শ্রীপিনাকীলাল রায়

ছেলেবেলায় ঠাকু'মার কাছে শুনতাম—

"খুকুমণির বিয়ে দোব
হপ্তমালার দেশে,
তারা গাই বলদে চষে,
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে,
রুই মাছ আর নাল্‌তের শাক
ভারে ভারে আসে—"

ঠাকু'মা তাঁহার প্রতিশ্রুতি রাখিতে পারেন নি; কারণ, সে দেশে আমার বিয়ে হয় নি। তবে, যাহা না হইলে আজকাল লোকে মেয়ে দিতে চায় না, সেই গোলামীর যোগাড়টা কেমন করিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে, সেই হপ্তমালার দেশেই সংঘটিত হইয়াছিল, এবং গোলামী করিতে আসিয়া, ঠাকু'মার ঐ ছেলেভোলানো ছড়াটি মনে পড়িয়া গিয়াছিল সেই দিন, যে দিন প্রথম গাই ও বলদের লাঙ্গল-টানা দেখিয়াছিলাম। আর সে দেশের লোক হীরেয় দাঁত ঘষে কি না তাহা যদিও কোন দিন দৃষ্টিগোচর হয় নি, তথাপি উক্ত বাক্যের সার্থকতা সম্ভবতঃ এই যে, সে দেশের পাহাড়গুলি নানা রকম মূল্যবান খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। আর, সে দেশের সুবর্ণরেখা নদীর রোহিত মৎস্যের উপাদেয় ঝোল্ অদৃষ্টে যখন প্রায়ই জুটিয়া যায়, তখন রোহিত মৎস্যের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনই কারণ নাই। তবে ঠাকু'মা বর্ণিত নাল্‌তে শাকের উপর আমার যে উচ্চ ধারণা ছিল, তাহাতে ঐ শাক গলাধঃকরণ করার পর হইতে ও-জিনিষটার উপর যদিও আমার কোন লোভ নাই, তত্রাচ কবিরাজের ব্যবস্থাপত্রে দেখিতে পাই যে, নাল্‌তে শাক যকৃতের ব্যারামে মহৌষধের কার্য্য করে এবং সে-দেশে বিনায়াসে যথেষ্ট পাওয়াও যায়।

বলা বাহুল্য, সে-দেশের ঐ সব পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলির সাহচর্য্যে, ঠাকু'মার ছড়াটি ও তাঁহার মধুর স্মৃতি সচরাচর মনে পড়িয়া যাওয়া যে স্বাভাবিক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; এবং যাঁহার কথায়, ছড়ায় ও উপদেশে আমার শৈশব-চরিত্রের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এই প্রবন্ধটি, আমার সেই স্নেহময়ী ঠাকু'মার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে, নগণ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র।

"ইণ্ডিয়ান্ কপার করপোরেশন্ লিমিটেড্—" (Indian Copper Corporation Ld) নামে একটি বিলাতী কোম্পানী সিংহভূমস্থ "মোষাবনি তাম্রখনির" আধুনিক স্বত্বাধিকারী ও "এ্যাংলো ওরিয়েণ্ট্যাল্ মাইনিং করপোরেশন্ লিমিটেড্" (Anglo Oriental Mining Corporation Ld) নামক আর একটি বিলাতী কোম্পানী ইহার "ম্যানেজিং এজেণ্ট" (Managing Agent)। মূলধন, স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক সমস্তই খাঁটি বিলাতের হইলেও ইহার অধিকাংশ কার্য্যই ভারতীয় শ্রমিকদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

"মোষাবনি তাম্রখনি" সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে, এই স্থানটি, সিংহভূম জেলার কোথায় অবস্থিত, সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ, সে স্থানটি জঙ্গলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নগণ্য মৌজা বিশেষ; কিন্তু অধুনা কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র মৌজাটি বৃহৎ জনপদে পরিণত হইয়াছে; এবং কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় নগরের ব্যবসায়ী-মহলে এই স্থানটির নাম আজ বেশ সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ছোটনাগপুর বিভাগের সামিল এই সিংহভূম জেলা। ধলভূম এই জেলার মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ পরগণা। এই পরগণার মধ্যে ঘাটশীলা একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং বি, এন্, আর, কোম্পানীর মধ্যবিৎ ষ্টেশন। ঘাটশীলা রাজষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত মোষাবনি একখানি ক্ষুদ্র মৌজা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মোষাবনি মৌজায় একটি তাম্রখনির আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে ঠিক আধুনিক আবিষ্কার বলা চলে না। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ইং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঘাটশীলার রাজা দ্বিতীয় চিত্রেশ্বর দেউ

ধবলদেবের সময়ে, জোসেফ্ মার্শাল্ হেথ্ সাহেব কর্ত্তৃক "রাখা মাইন্‌স্" (Rakha mines) ও তাহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি মাইন্‌স্ আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; এবং ঐ রাখা মাইন্‌সের মালপত্র (Ores) গালাই করিবার জন্য রাজদহা নামক গ্রামে একটি কারখানাও স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত কারখানার চিম্‌নিটি এখনো দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ও "কালের কুটিল ভ্রূকুটি নিরীক্ষণ করিতেছে।"

আবার মিঃ হেথ্ সাহেবই যে প্রকৃত পক্ষে এই সকল মাইন্‌সের (mines) আবিষ্কারক, তাহাও ঠিক বলা চলে না। কারণ, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, মহারাজা অশোকের রাজত্ব-কালে, ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মহারাজা অশোকের নামাঙ্কিত তাম্রফলক ও তাম্রমুদ্রা এখনও পাহাড়ে ও জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্র-নিষ্কাশন নিদর্শনগুলি (Ore workings and slags) এখনও পার্ব্বত্য অঞ্চলের স্থানে স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৌদ্ধদের আমলে ভারতের হিন্দুরাজত্বের মধ্যাহ্নসূর্য্য যখন অপ্রতিহত প্রভাবে চতুর্দ্দিকে তাহার নম্র কিরণজাল, সুদূর চীন, জাপান, সিংহল, সুমাত্রা, বলি, যাভা প্রভৃতি স্থানে বিকীরণ করিতেছিল, অর্থাৎ যে সময়ে ভারত সর্ব্বপ্রকার উচ্চ আদর্শের আশ্রয়ভূমিরূপে, সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই সময়ে খনিজ সম্পদের উৎকর্ষতায় ভারত যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। রাখা-পাহাড়, সিদ্ধেশ্বর-পাহাড়, চাপুরী, কেন্দাডি, মোষাবনি, ধবনি, পুটুর, ডমরু প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল নিদর্শন প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। কেন্দাডি তাম্রখনিতে একটি অতি পুরাকালের "তাম্র-প্রস্তর" (copper-ore) উত্তোলনের গহ্বর (Shaft) আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যদিও সে গহ্বর (Shaft) আজকাল জঙ্গলে ও প্রস্তরে মজিয়া গিয়া দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি আমরা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, সেই ব্যাঘ্র-ভল্লুক-ব্যাল-নিষেবিত ভীষণ জঙ্গল ভেদ করিয়া, গহ্বর-মুখে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। দেখিলাম গহ্বরের মুখ হইতে ৪।৫ গজ দূরে একটি সুবৃহৎ প্রায় ৩৬ ইঞ্চি মোটা কাষ্ঠদণ্ড (Wooden pillar) ঈষৎ বক্রভাবে পাহাড়ের ভিতরকার ঊর্দ্ধদেশে সংযোজিত (Support) রহিয়াছে। এই কাষ্ঠদণ্ডটি অতিক্রম করিয়া, পাহাড়ের অভ্যন্তরে আর অগ্রসর হওয়া চলে না ; কারণ, আলোকবর্ত্তিকা ভিন্ন সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

সেই স্থানের বাসিন্দা জনৈক মাতব্বর রকমের বৃদ্ধ সাঁওতাল আমাদের পথি-প্রদর্শক ছিল। সে বলিল :—

"সে বহুৎ দিনের কথা বাবু,—মেম্বেনীর যখন পহিলে ছানাটা হুলেন্, আমার মনটা লাচি উঠলো। কাঁড় বাঁশ ধুরি, শীকার কুরতে গেলি। আগুবাটে, একটা হুরিণ দেখি, সেটার পেছু পেছু গুড়দালীন্।—তার পিছু, হুরিণটা দু'ড়ি দু'ড়ি আসি, এই রাখাটায় সামালো। হুরিণটা দু'ড়িবার ক্ষণে, কাঁড় অস্ করি, বিঁধি দিলি। লুসিব খারাব বাবু, কাঁড়টা লাগলো নাই, এই কাঠটায় আসি বাজলো। দ্যাখ্‌না বাবু, কাঁড়টার চিন্‌হৎটা এখনো দেখাছে। এখন আমার উমের হুছে, তিনকুড়ি বছর—তা হো দাগটার তেমনি চেহারা দেখাছে।"

সাঁওতাল মিথ্যা বলে না। দেখিলাম বাস্তবিকই একটা লৌহফলক যেন বহু কাল হইতে কাঠের গায়ে অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় প্রথিষ্ট রহিয়াছে। আর দেখিলাম, সেই কাষ্ঠদণ্ডটিতে কাঠের কোনই চিহ্ন নাই, সমস্তটাই যেন কৃষ্ণবর্ণ শক্ত অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। কয়লা খনির মধ্যে যে পাথুরে কয়লার পিলার (Pillar) থাকে, এটা যেন কতকটা তাহারই মত দেখিতে।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কোন্ পুরাকালে এখানে এই তাম্রখনির আবিষ্কার হইয়াছিল এবং তখনও এই আধুনিক কালের মত খনির মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠদণ্ড, পিলারের কাজ করিত (Timbering works as Pillar)। তার পর হিন্দু রাজত্বের ক্রমিক অধো-গতির সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের খনিজ সম্পদেরও অধোগতি আরম্ভ হইয়া, শেষে একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছিল।

জাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, জাতির কত বড় বড় সম্পদ যে কত রকমে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর জাতি তখন পায় না। এই সমস্ত খনিজ সম্পদ, যাহা জাতির একদিন খনিজ শিল্পের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল, সেই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে,

তথাপি এই আত্মবিস্মৃত পরাধীন জাতি, সেই তীব্র আঘাত-জনিত যন্ত্রণাকে ক্রমশঃ সহনশীল করিয়া লইয়া, পিপীলিকা-দংশনের ন্যায়, সেটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে নি। যে জাতি এক দিন অসাধ্য সাধন করিয়াছে, সেই জাতি যদি কোন রকমে একবার পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়, তখনই সে ক্রমে ক্রমে আত্মবিস্মৃত ও জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। রামচন্দ্র আত্মবিস্মৃত ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে সীতা উদ্ধারে অতটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যে কী, তাহা যদি তিনি জানিতেন, তাহা হইলে সীতা উদ্ধার তো একটি লহমার ওয়াস্তা! ভেবে দেখ সেই রামচন্দ্রের দেশের আত্মবিস্মৃত জাতি, তুমিও আজ সেই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রামচন্দ্রের মতই সমভাবাপন্ন নও কি? দেবতারাও আত্মবিস্মৃত হইলে শক্তিহারা হইয়া পড়েন।

অধুনা বহু শতাব্দী পরে বৃটিশ বণিকদের স্বাভাবিক অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতায় ভারতের সেই প্রনষ্ট গৌরব পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের রাজার জাতি, এই যে এত বড় লুপ্ত প্রতিষ্ঠানটিকে খাড়া করিয়া তুলিতে, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা নিজের দেশের দশের নিকট হইতে আনিয়া, অকাতরে জলের মত খরচ করিয়া, প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করতঃ হাজার হাজার বেকারের অন্নসমস্যার সমাধান করিয়া দিতেছেন, ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। এই এত বড় প্রতিষ্ঠানটিকে খাড়া করিয়া তুলিতে শুধু যে তাঁহারা অজস্র অর্থ ব্যয়ই করিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু সেই সঙ্গে বৃটিশ জাতি আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে, যে অসাধ্য সাধন হাতে-কলমে করিয়া দেখাইয়া দিয়া, জগতের সম্মুখে আমাদিগকে মানুষের কাঠামো লইয়া খাড়া হইতে শিক্ষা দিয়াছে, ও যাহার অনুপ্রেরণায় আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতের মধ্যে, যে স্বাধীনতার স্পৃহা আজ, আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহার মূলীভূত কারণই হইতেছে,—কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শতাব্দী কাল যাবৎ, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান জাতি বৃটিশের সহিত সহযোগিতা ও তাহাদের কর্ম্মানুরক্তি, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন প্রভৃতি গুণ নিচয়ের পক্ষপাতিতা।

এই যে পঞ্চমুখ হইয়া লেখক বৃটিশ জাতির গুণ-কীর্ত্তন করিতেছে, ইহাতে হয় তো রাজনীতিবিদেরা লেখকের উপর খড়্গহস্ত হইতে পারেন; কিন্তু এই প্রবন্ধটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয়, এটা যেন তাঁহারা স্মরণ রাখেন। হইতে পারে, তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ ষোল আনা বজায় করিয়া, এই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভাবা প্রয়োজন যে, তাঁহাদের স্বার্থের সঙ্গে আমাদের স্বার্থও অনেকটা আপনা আপনি প্রায় তুল্যমূল্য ভাবেই জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের যে দিকটা প্রকৃতপক্ষে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে দিকটাকে কোন রকমেই দাবিয়ে রাখা চলে না। দেশের নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা একটা মহৎ গুণের পরিচায়ক। হোক না সে বিদেশী, আর হোক না সে "কামস্কট্কা" কিম্বা "হোনোলুলুর" অধিবাসী, কিম্বা থাক না তাহাদের মধ্যে স্বার্থের প্রলুব্ধতা, তাহাতে কি আসে যায়? আমরা যে কাজ পারি না, তাহারা যদি তাহাই সম্পাদন করিয়া আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেয়, তাহাতে যে আমরা কম লাভবান নহি, তাহা গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ অকপটে স্বীকার করিতে বাধ্য।

"বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী"র ঘাটশীলা ষ্টেশন হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল দক্ষিণে "মোষাবনির তাম্রখনি"। মধ্যে বিশালকায়া পবিত্র-সলিলা পার্ব্বত্য নদী সুবর্ণরেখা। ঘাটশীলা ষ্টেশন হইতে খনির অভিমুখে যাইতে হইলে, প্রথমে প্রায় এক মাইলের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই নদীটি গমনপথ রোধ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তার পর ওপারে (দক্ষিণ পারে) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমাই নগর। যেখানে একদা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, ময়ূরভঞ্জের রাজা, ধলভূম রাজ্য আক্রমণার্থ যুদ্ধঘোষণা করিয়া, উক্ত স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। আমাইনগরের ঠিক অপর পারে ধলভূমরাজের বিশালকায় রাজপ্রাসাদ। ময়ূরভঞ্জাধিপতি শিবির হইতে বাহির হইয়া প্রত্যুষেই নদীতে স্নান করিতে নামিয়াছেন, এই বার্ত্তা, দিগ্বিজয়ী তীরন্দাজ ধলভূমের অন্ধ নৃপতি নরসিংহ ধবল দেউ চরমুখে জানিতে পারিয়া, প্রাসাদোপরি হইতে একটি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শব্দভেদী বাণ ময়ূরভঞ্জেশ্বরের [illegible] পড়িয়া, স্নানার্থ ব্যবহার্য্য জলপাত্র মধ্যে সশব্দে নিপতিত হইল। নরপতি তীরখানি লইয়া দেখিলেন, তীরফলকে খোদা রহিয়াছে—"[illegible]

তার স্ত্রী হইবে রাঁড়।" ময়ূরভঞ্জরাজ এই অদ্ভুত কৃতিত্ব দর্শনে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাইনগরের শিবির ভগ্ন করিয়া, স্বরাজ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।"

যে আমাইনগর একদা ধলভূম রাজ্যের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, কালের অপ্রতিহত গতিতে, সেই সমৃদ্ধিশালী নগর এক্ষণে কয়েকঘর মৎস্যজীবী জেলের বাস-স্থানে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই আমাইনগর হইতে "মোষাবনির তাম্রখনি" প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে যাইবারও কোন অসুবিধা নাই। আজকাল ট্যাক্সি ও মোটর বাসের কল্যাণে, দুর্গম পাহাড় জঙ্গলেও মানুষ পায়ে হাঁটার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে।

সুবর্ণ-রেখার উত্তর তীরে মৌভাণ্ডার নামক স্থানে, এই কোম্পানীর কারখানা (work-shop) ও জেনারেল অফিস (General office) স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানটি বি, এন্, আর, কোম্পানীর ষ্টেশন ঘাটশীলা ও গালুডির মধ্যস্থলে অবস্থিত। যে স্থান একদিন শ্বাপদ-সঙ্কুল ও দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ ছিল—দিন দুপুরেও যেখানে যাইতে লোকে সাহসী হইত না, সেই স্থানের আজ হঠাৎ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যেন কোন্ যাদুকরের যাদুদণ্ডের স্পর্শে, সেই নিবিড় অরণ্যাণী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া, তথায় জনকোলাহল মুখরিত বৃহৎ এক জনপদে পরিণত হইয়াছে। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে যে পান্থ এই স্থানের নিকট দিয়া যাইবার সময় ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া গিয়াছে, সে যদি আজ পুনরায় এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় মনে করিবে যে, হয় তো সে পথ হারাইয়া এক বৈদ্যুতিক আলোকমালা-ভূষিত দৈত্য-পুরীতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে; কিম্বা হয় তো সে ভাবিবে যে, এটা নিশ্চয়ই সেই "আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপেরই" কাণ্ড! কিন্তু যখন সে জানিতে পারিবে, প্রকৃত পক্ষে এই পুরীর রচয়িতা কে, তখন কি এই বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় কর্ম্মকুশল জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় তাহার শির অবনমিত হইবে না?

এই স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য এত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক যে, দেখিলে মনে হয়, ভগবান তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্ভারে, চক্রবাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকটা, খালি প্রকৃতিরাণীর সবুজ অঞ্চল দিয়া ঢাকা, আর তাহার মধ্য দিয়া পার্ব্বত্যনদী সুবর্ণরেখা যেন প্রকৃতিরাণীর সিঁথীর ন্যায় লীলায়িতা। অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণবর্ণ লোহিত রশ্মি, পাহাড়ের শীর্ষদেশ চুম্বন করিয়া যখন নদীবক্ষে প্রতিফলিত হয়, তখনকার সেই ঢল ঢল সৌন্দর্য্য, বিবাহবেশে সজ্জিতা নববধূর চেলাঞ্চলের মাধুরিমা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই স্বর্গীয় সুষমা বর্ণনার অতীত—বরং উপভোগের সামগ্রী!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মৌভাণ্ডার কারখানাটি নদীর উত্তর তীরে স্থাপিত। খনি হইতে উত্তোলিত "তাম্রপ্রস্তর" (Copper ore) "বৈমানিক রজ্জুমার্গ" দ্বারা (Aerial Rope-Way) ৬ মাইল দূরবর্ত্তী মোষাবনি হইতে এই কারখানায় আনীত হয়। এই নূতন ধরণের প্ল্যাণ্ট্‌টি (Plant) স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বুদ্ধিতে পরিপক্ক বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারগণ তাহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। এই "বৈমানিক রজ্জুমার্গ" দ্বারা খনি হইতে যে কেবল "তাম্র-প্রস্তরই" (Copper ore) আসিতেছে তাহা নহে; পরন্তু খনি-পরিচালনার্থ যে কোন সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহা সমস্তই, ইহার দ্বারা তথায় প্রেরিত হইতেছে। মোটের উপর এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে, মালবাহী কোন যানই, ইহার ন্যায় কার্যকরী হইতে পারিত না এবং কেবলমাত্র এই মালপত্র যাতায়াতের অসুবিধাতেই, এখানে কারখানা স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। আমার মনে হয়, "কেপ্ কপার কোম্পানীর রাখা মাইনস" (Rakha mines) বহু চেষ্টা করিয়াও যে এ দেশে সফলকাম হইতে পারে নাই, তাহার একটি মুখ্য কারণই হইতেছে মালপত্র যাতায়াতের (Transporting) অসুবিধা।

যাহা হউক "কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে" এই নীতি অবলম্বন করিয়া, কোম্পানী আজ যে আদর্শ প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা কয়েকটি বিষয়ের নূতনত্বে, অত বড় টাটা কোম্পানীর চেয়েও আধুনিকতায় (up to date) অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যে সমস্ত "তাম্র-প্রস্তর" (Copper-ore) খনি হইতে উত্তোলিত হয়, সেই সমস্ত প্রস্তর সর্ব্বাগ্রে, "প্রাইমারি

সাহায্যে চূর্ণীকৃত হইয়া থাকে। তার পর লৌহ-নির্ম্মিত এক প্রকার "হ্যাংইং বাকেটে" (Hanging Bucket) সেই সমস্ত চূর্ণ প্রস্তর মেসিনের সাহায্যে বোঝাই হইবামাত্র বাকেট-সংলগ্ন হুক্‌গুলি (Hooks) আপনা আপনি (automatically) বৈমানিক রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে অগ্রসর হইতে থাকে। এক একটি মালবাহী বাকেট্ প্রায় তিন কি চারি হন্দর পরিমাণ মাল বহন করিয়া আনিয়া প্রতি এক মিনিট কিম্বা দেড় মিনিট অন্তর মৌভাণ্ডারের কারখানাস্থ "ওর বিনে" (Ore-Bin) ঢালিয়া দিতেছে। এই "ওর বিন্" (Ore-Bin) এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, মালবাহী বাকেট্‌টি ঝুলিতে ঝুলিতে যেই "ওর বিনের" (Ore-Bin) উপরে আসিয়া পৌঁছিবে, অমনি সেই মুহূর্ত্তেই বাকেট্-টি উল্টাইয়া যাইবে, ও সঙ্গে সঙ্গেই বাকেটস্থ মালগুলিও "ওর বিনের" মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে যেন মালগুলি বাকেট হইতে আপনা আপনিই "বিনের" মধ্যে পড়িয়া গেল।

এই সমস্ত "তাম্র-প্রস্তর" (Copper-ore) "ওর বিন্" (Ore-Bin) হইতেই সর্ব্বপ্রথম "হার্ডিন্ বল মিলে" (Hardinge Ball Mill) প্রেরিত হয়। এই বিভাগটি (plant) চারি ভাগে বিভক্ত—গ্রাইণ্ডিং (Grinding) ফ্লোটেশন (Flotation) ফিল্‌টারিং (Filtering) ও ড্রাইং (Drying)। প্রথমতঃ তাম্র-প্রস্তরগুলি গ্রাইণ্ডিং মেসিনে গুঁড়া হইয়া আপনাআপনি (automatically) ফ্লোটেশনে (Flotation) উপনীত হয়। এই ফ্লোটেশনের কার্য্য হইতেছে, প্রস্তর-সংশ্লিষ্ট তাম্রকণাগুলি নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তর হইতে পৃথক করা। এই তাম্র ও প্রস্তর কণিকাগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তরল কাদার আকারে এক সঙ্গেই মিশিয়া থাকে। তার পর এই তরল অবস্থায় সেগুলি "ফিল্‌টারিংএ" গিয়া উপনীত হয়। "ফিলটারিংএর" কার্য্য হইতেছে প্রস্তর হইতে তাম্রকণাগুলি ছাঁকিয়া লওয়া। ছাঁকিয়া লইলেই যে খাঁটি তাম্রকণা পাওয়া যাইবে তাহা নহে, পরন্ত বহুল প্রস্তর কণিকাও তাহার সঙ্গে মিশিয়া থাকিবে। এই রকম অবস্থাতেই সেগুলি "ড্রাইং সেক্‌শনে" (Drying Section) চলিয়া যায়। ড্রাইংএর কাজ হইতেছে, সেগুলিকে শুষ্ক করিয়া বালুকাকারে পরিণত করা।

এইখানেই মিলের কাজ শেষ। এখন এই মিল হইতে যে "ওরগুলি" বাহির হইল, তাহার নাম হইতেছে "কন্‌সেন্‌ট্রেটেড্ ওর" (Concentrated ore) পরে, এই "ওরগুলি" "কনসেনট্রেট্ কারে" (Concentrate Car) বোঝাই হইয়া, ইলেকট্রিক লিফটের (Electric Lift) সাহায্যে "বেডিং বিনে" গিয়া উপনীত হয়। এইবার গালাই হওয়ার (Smelting) পালা :—

মিলের ন্যায় "স্মেলটিং" বিভাগও পর পর তিনটি ভাগে বিভক্ত :—রিভারবারেটোরি ফারনেস (Reverberatory furnace) কন্‌ভারটার (Converter) এবং রিফাইনারি ফারনেস (Refinery furnace)।

ওরগুলি কন্‌সেন্‌ট্রেট্ কারে বোঝাই হইয়া বেডিং বিনে



মৌভাণ্ডারের কারখানা
এখানে "কপার-ওর" চূর্ণ করা হয়। এটি কারখানার সাধারণ দৃশ্য। সামনেই শূন্যে রোপ-ওয়ে। এই তারের উপর দিয়া "ওর"-বোঝাই ঝোড়া হইতে "ওর" নামাইয়া দেওয়া হইতেছে

(Bedding Bin) উপনীত হইবামাত্র "রিভারবারেটোরি ফারনেসে" ঢালিয়া দেওয়া হয়। ওরগুলি এই "ফারনেসে" গালাই হইয়া তামার অংশ নীচে থিতাইয়া যায় এবং কতক ময়লা (Slags) যাহা উপরে থাকে, তাহা তরলাকারে বাহির হইয়া যায়। অবশিষ্ট অংশ যাহা তরলাকারে ফারনেসে থাকিয়া যায় সেগুলি বড় বড় ষ্টীলের বালতিতে (Ladle) ভর্ত্তি হইয়া, ওভারহেড ক্রেনের (Overhead crane) সাহায্যে কন্‌ভারটারে (Converter) ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই কন্‌ভারটারেও সমস্ত ময়লা বাহির হইয়া

তার স্ত্রী হইবে রাঁড়।" ময়ূরভঞ্জরাজ এই অদ্ভুত কৃতিত্ব দর্শনে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাইনগরের শিবির ভগ্ন করিয়া, স্বরাজ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।"

যে আমাইনগর একদা ধলভূম রাজ্যের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, কালের অপ্রতিহত গতিতে, সেই সমৃদ্ধিশালী নগর এক্ষণে কয়েকঘর মৎস্যজীবী জেলের বাসস্থানে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই আমাইনগর হইতে "মোষাবনির তাম্রখনি" প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে যাইবারও কোন অসুবিধা নাই। আজকাল ট্যাক্সি ও মোটর বাসের কল্যাণে, দুর্গম পাহাড় জঙ্গলেও মানুষ পায়ে হাঁটার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে।

সুবর্ণ-রেখার উত্তর তীরে মৌভাণ্ডার নামক স্থানে, এই কোম্পানীর কারখানা (work-shop) ও জেনারেল অফিস (General office) স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানটি বি, এন্, আর, কোম্পানীর ষ্টেশন ঘাটশীলা ও গালুডির মধ্যস্থলে অবস্থিত। যে স্থান একদিন শ্বাপদ-সঙ্কুল ও দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ ছিল—দিন দুপুরেও যেখানে যাইতে লোকে সাহসী হইত না, সেই স্থানের আজ হঠাৎ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যেন কোন্ যাদুকরের যাদুদণ্ডের স্পর্শে, সেই নিবিড় অরণ্যাণী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া, তথায় জনকোলাহল-মুখরিত বৃহৎ এক জনপদে পরিণত হইয়াছে। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে যে পান্থ এই স্থানের নিকট দিয়া যাইবার সময় ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া গিয়াছে, সে যদি আজ পুনরায় এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় মনে করিবে যে, হয় তো সে পথ হারাইয়া এক বৈদ্যুতিক আলোকমালা-ভূষিত দৈত্য-পুরীতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে; কিম্বা হয় তো সে ভাবিবে যে, এটা নিশ্চয়ই সেই "আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপেরই" কাণ্ড! কিন্তু যখন সে জানিতে পারিবে, প্রকৃত পক্ষে এই পুরীর রচয়িতা কে, তখন কি এই বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় কর্ম্মকুশল জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় তাহার শির অবনমিত হইবে না?

এই স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য এত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক যে, দেখিলে মনে হয়, ভগবান তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্ভার, মরি মরি, কি সুনিপুণ হস্তেই সাজাইয়া রাখিয়াছেন! চক্রবাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকটা, খালি প্রকৃতিরাণীর সবুজ অঞ্চল দিয়া ঢাকা, আর তাহার মধ্য দিয়া পার্ব্বত্যনদী সুবর্ণরেখা যেন প্রকৃতিরাণীর সিঁথীর ন্যায় লীলায়িতা। অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণবর্ণ লোহিত রশ্মি, পাহাড়ের শীর্ষদেশ চুম্বন করিয়া যখন নদীবক্ষে প্রতিফলিত হয়, তখনকার সেই ঢল ঢল সৌন্দর্য্য, বিবাহবেশে সজ্জিতা নববধূর চেলাঞ্চলের মাধুরিমা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই স্বর্গীয় সুষমা বর্ণনার অতীত—বরং উপভোগের সামগ্রী!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মৌভাণ্ডার কারখানাটি নদীর উত্তর তীরে স্থাপিত। খনি হইতে উত্তোলিত "তাম্রপ্রস্তর" (Copper ore) "বৈমানিক রজ্জুমার্গ" দ্বারা (Aerial Rope-Way) ৬ মাইল দূরবর্ত্তী মোষাবনি হইতে এই কারখানায় আনীত হয়। এই নূতন ধরণের প্ল্যাণ্ট্টি (Plant) স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বুদ্ধিতে পরিপক্ক বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারগণ তাহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। এই "বৈমানিক রজ্জুমার্গ" দ্বারা খনি হইতে যে কেবল "তাম্র-প্রস্তরই" (Copper ore) আসিতেছে তাহা নহে; পরন্তু খনি-পরিচালনার্থ যে কোন সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহা সমস্তই, ইহার দ্বারা তথায় প্রেরিত হইতেছে। মোটের উপর এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে, মালবাহী কোন যানই, ইহার ন্যায় কার্যকরী হইতে পারিত না এবং কেবলমাত্র এই মালপত্র যাতায়াতের অসুবিধাতেই, এখানে কারখানা স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। আমার মনে হয়, "কেপ্ কপার কোম্পানীর রাখা মাইনস" (Rakha mines) বহু চেষ্টা করিয়াও যে এ দেশে সফলকাম হইতে পারে নাই, তাহার একটি মুখ্য কারণই হইতেছে মালপত্র যাতায়াতের (Transporting) অসুবিধা।

যাহা হউক "কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে" এই নীতি অবলম্বন করিয়া, কোম্পানী আজ যে আদর্শ প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা কয়েকটি বিষয়ের নূতনত্বে, অত বড় টাটা কোম্পানীর চেয়েও আধুনিকতায় (up to date) অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যে সমস্ত "তাম্র-প্রস্তর" (Copper-ore) খনি হইতে উত্তোলিত হয়, সেই সমস্ত প্রস্তর সর্ব্বাগ্রে, "প্রাইমারি ক্রাশার মেসিনের" (Primary Crusher machine)

সাহায্যে চূর্ণীকৃত হইয়া থাকে। তার পর লৌহ-নির্ম্মিত এক প্রকার "হ্যাংইং বাকেটে" (Hanging Bucket) সেই সমস্ত চূর্ণ প্রস্তর মেসিনের সাহায্যে বোঝাই হইবামাত্র বাকেট-সংলগ্ন হুক্‌গুলি (Hooks) আপনা আপনি (automatically) বৈমানিক রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে অগ্রসর হইতে থাকে। এক একটি মালবাহী বাকেট্ প্রায় তিন কি চারি হন্দর পরিমাণ মাল বহন করিয়া আনিয়া প্রতি এক মিনিট কিম্বা দেড় মিনিট অন্তর মৌভাণ্ডাড়ের কারখানাস্থ "ওর বিনে" (Ore-Bin) ঢালিয়া দিতেছে। এই "ওর বিন্" (Ore-Bin) এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, মালবাহী বাকেট্‌টি ঝুলিতে ঝুলিতে যেই "ওর বিনের" (Ore-Bin) উপরে আসিয়া পৌঁছিবে, অমনি সেই মুহূর্ত্তেই বাকেট্-টি উল্টাইয়া যাইবে, ও সঙ্গে সঙ্গেই বাকেটস্থ মালগুলিও "ওর বিনের" মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে যেন মালগুলি বাকেট হইতে আপনা আপনিই "বিনের" মধ্যে পড়িয়া গেল।

এই সমস্ত "তাম্র-প্রস্তর" (Copper-ore) "ওর বিন্" (Ore-Bin) হইতেই সর্ব্বপ্রথম "হার্ডিন্ বল মিলে" (Hardinge Ball Mill) প্রেরিত হয়। এই বিভাগটি (plant) চারি ভাগে বিভক্ত—গ্রাইণ্ডিং (Grinding) ফ্লোটেশন (Flotation) ফিল্‌টারিং (Filtering) ও ড্রাইং (Drying)। প্রথমতঃ তাম্র-প্রস্তরগুলি গ্রাইণ্ডিং মেসিনে গুঁড়া হইয়া আপনাআপনি (automatically) ফ্লোটেশনে (Flotation) উপনীত হয়। এই ফ্লোটেশনের কার্য্য হইতেছে, প্রস্তর-সংশ্লিষ্ট তাম্রকণাগুলি নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তর হইতে পৃথক করা। এই তাম্র ও প্রস্তর কণিকাগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তরল কাদার আকারে এক সঙ্গেই মিশিয়া থাকে। তার পর এই তরল অবস্থায় সেগুলি "ফিল্‌টারিংএ" গিয়া উপনীত হয়। "ফিলটারিংএর" কার্য্য হইতেছে প্রস্তর হইতে তাম্রকণাগুলি ছাঁকিয়া লওয়া। ছাঁকিয়া লইলেই যে খাঁটি তাম্রকণা পাওয়া যাইবে তাহা নহে, পরন্তু বহুল প্রস্তর কণিকাও তাহার সঙ্গে মিশিয়া থাকিবে। এই রকম অবস্থাতেই সেগুলি "ড্রাইং সেক্‌শনে" (Drying Section) চলিয়া যায়। ড্রাইংএর কাজ হইতেছে, সেগুলিকে শুষ্ক করিয়া বালুকাকারে পরিণত করা।

এইখানেই মিলের কাজ শেষ। এখন এই মিল হইতে যে "ওরগুলি" বাহির হইল, তাহার নাম হইতেছে "কন্‌সেন্‌ট্রেটেড্ ওর" (Concentrated ore) পরে, এই "ওরগুলি" "কনসেনট্রেট্ কারে" (Concentrate Car) বোঝাই হইয়া, ইলেকট্রিক লিফটের (Electric Lift) সাহায্যে "বেডিং বিনে" গিয়া উপনীত হয়। এইবার গালাই হওয়ার (Smelting) পালা :—

মিলের ন্যায় "স্মেলটিং" বিভাগও পর পর তিনটি ভাগে বিভক্ত :—রিভারবারেটোরি ফারনেস (Reverberatory furnace) কন্‌ভারটার (Converter) এবং রিফাইনারি ফারনেস (Refinery furnace)।

ওরগুলি কন্‌সেন্‌ট্রেট্ কারে বোঝাই হইয়া বেডিং বিনে



মৌভাণ্ডারের কারখানা
এখানে "কপার-ওর" চূর্ণ করা হয়। এটি কারখানার সাধারণ দৃশ্য। সামনেই শূন্যে রোপ-ওয়ে। এই তারের উপর দিয়া "ওর"-বোঝাই ঝোড়া হইতে "ওর" নামাইয়া দেওয়া হইতেছে

(Bedding Bin) উপনীত হইবামাত্র "রিভারবারেটোরি ফারনেসে" ঢালিয়া দেওয়া হয়। ওরগুলি এই "ফারনেসে" গালাই হইয়া তামার অংশ নীচে থিতাইয়া যায় এবং কতক ময়লা (Slags) যাহা উপরে থাকে, তাহা তরলাকারে বাহির হইয়া যায়। অবশিষ্ট অংশ যাহা তরলাকারে ফারনেসে থাকিয়া যায় সেগুলি বড় বড় ষ্টীলের বালতিতে (Ladle) ভর্ত্তি হইয়া, ওভারহেড ক্রেনের (Overhead crane) সাহায্যে কন্‌ভারটারে (Converter) ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই কন্‌ভারটারেও সমস্ত ময়লা বাহির হইয়া

যায় না, কতকটা থাকিয়া যায়। সুতরাং কনভারটার হইতে যে তামা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করণার্থ আর একটি "ফারনেসে" চার্জ্জ (Charge) করিতে হয়। এই ফারনেসের নাম "রিফাইনারি ফারনেস" (Refinery furnace)। এই ফারনেসে সমস্ত ময়লা (Slags) তামা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া যায় এবং এই তামাই "বিশুদ্ধ তামা" বলিয়া পরিগণিত (Refined Copper)। এই বিশুদ্ধ তামা যখন বাহির হয়, তখন তরলাকারে থাকে। তার পর তাহা ছাচে (Mould) ঢালিয়া ইষ্টকাকারে (Ingot) পরিণত করা হয়।

অধুনা প্রত্যেক দিন এই রিফাইনারি ফারনেস্ (Refinery furnace) হইতে প্রায় ১২।১৩ টন বিশুদ্ধ



মোষাবনির সাধারণ দৃশ্য—এইখানে খনির মুখ অবস্থিত

তামা উৎপন্ন (Production) হইতেছে। এই সমস্ত তামা বিক্রয় করিবার জন্য কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী "মেসার্স গিল্যাণ্ডার আরবুথনট্ এণ্ড কোম্পানী (Messrs Gillanders Arbuthnot & Co.) ইহার "সোল্ সেলিং এজেন্ট" (Sole selling-agent) নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতার বাজারে আজকাল যে তামার ইনগট্ (Ingot) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায় সমস্ত এই কোম্পানীরই তামা।

আর একটি নূতন "প্ল্যাণ্ট" (Plant) এই কোম্পানী স্থাপন করিয়াছে,—তাহার নাম "রোলিং মিল প্ল্যাণ্ট" (Rolling Mill Plant)। এখানে যে কোন প্রকারের পিতলের শিট্ ও প্লেট্ (Sheet & Plate) তৈয়ার হইতেছে। তামার সহিত দস্তা (Zinc) মিশাইলেই পিতলের (Yellow Metal) উৎপত্তি হয় ইহা সকলেই জানেন। কোম্পানীর নিজস্ব তামায়, এই যে পিতলের উৎপত্তি, ইহাতে কোম্পানী যেরূপ লাভবান হইতেছে, তামা অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া পিতল তৈয়ার করিতে গেলে, আজকালকার বাজারে, কোম্পানীর লাভ হওয়া দূরে থাক্, বরং লোকসান হইবারই বেশী সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কোম্পানীর নিজের প্ল্যাণ্ট (Plant) হইতে তামার উৎপত্তি হইতেছে বলিয়া, সে আজ বাজারে অন্যের চেয়ে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে ও সস্তায় কিস্তি মারিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহারা যে কোন আকারের পাতলা শিট্ (Sheet) হইতে মোটা প্লেট (Plate) পর্য্যন্ত অর্ডার অনুযায়ী তৈয়ার করিয়া দিতে পারে। পিতলের এই শিট্ ও প্লেট (Sheet & Plate) ভারতে ও ভারতের বাহিরে দিন দিন যে রকম সমাদর লাভ করিতেছে ও চাহিদার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ভারতের বাহির হইতে পিতলের শিট্ ও প্লেটের আমদানী, ভবিষ্যতে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা বেশী।

আজকাল প্রত্যেক মাসে কোম্পানীর ৩৫০ টন বিশুদ্ধ তামা উৎপন্ন হইতেছে। এবং কোম্পানী বিশেষ রকম চেষ্টা করিলে মাসে ৫০০ টন পর্য্যন্ত তামা উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী তামা কোম্পানীর এই বর্ত্তমান Plant হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তাহা হইলে প্ল্যাণ্টটি আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন।

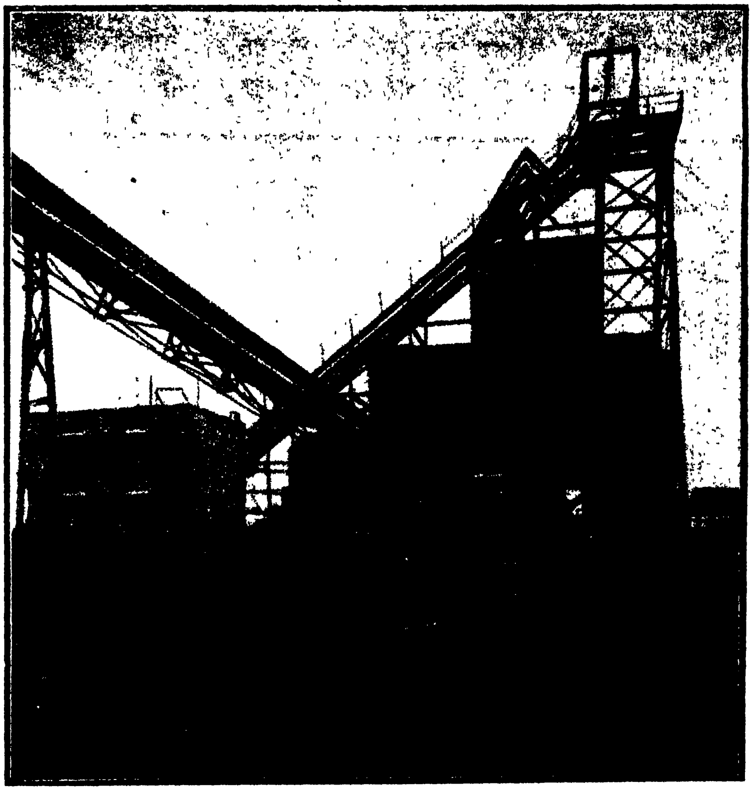
এ দেশে পূর্ব্বে যে প্রকারে তামা উৎপাদন হইত তাহার কতকটা বিবরণ, যাহা আমি দীর্ঘকাল এ দেশে অবস্থান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকপাঠিকাদের গোচর করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, ইহাতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাম্র উৎপাদন করার পুরাকালের পদ্ধতির সহিত আধুনিক প্রণালী তুলনা করিলে, আকাশ-পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হইবে।

জগৎ স্বভাবতঃই পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু জড়বিজ্ঞান এই

জগৎকে এত দ্রুত পরিবর্তনশীল করিয়া, তাহাকে উন্নতির এত ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়াছে যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সে স্থানের কোন নামগন্ধই জানা ছিল না। এইজন্য বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সময়ে সময়ে বলিতেন যে, পূর্ব্বের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, পশ্চিমের জড়বিজ্ঞানের সহিত যদি কখনো সংমিলিত হয়, তাহা হইলে, এমন এক ভাবসম্পদপূর্ণ শক্তিশালী অভিনব বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতে পারে, যাহার ফলে, সমগ্র জগৎ হয় তো একদিন, মন্ত্র শিষ্য হইবার জন্য, ইহাদের পাদ-পীঠতলে সমবেত হইতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। সেই মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে কি না জানি না, কিন্তু কখনো কখনো মনে হয়, কোন্ দূরাগত সঙ্গীতের ক্ষীণতম স্বরের রেশ বায়ুহিল্লোলে ভাসিয়া আসিয়া, যেন কর্ণ-পটাহ তাহার মধুর 'পরশ' দিয়া যাইতেছে!

বৌদ্ধযুগে জড়বিজ্ঞানের একবার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ভাস্করাচার্য্য, অম্বুজাক্ষ শিরোমণি, প্রভৃতি মনীষিগণ তাহার প্রমাণ; এবং সেকালে এতদ্দেশে যে প্রচুর তাম্র উৎপন্ন হইত তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। কিন্তু তখন এই তাম্র উৎপাদন-প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে, তাহার পরবর্ত্তী যুগে, কুটীর শিল্পের মত, কিরূপে অতি ক্ষুদ্র প্রণালীতে, এই কার্য্য পরিচালিত হইত, তাহারই একটা মোটামুটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথমতঃ তাম্র-প্রস্তরগুলি (Copper-ores) ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত গোবর (Cow-dung) মিশানো হইত। যেমন করিয়া হিন্দুস্থানীরা হাতে টিপিয়া রুটি প্রস্তুত করে সেই রকমভাবে সেগুলি এক একখানি ৫ ইঞ্চি লম্বা ও সওয়া ইঞ্চি চওড়া করিয়া লইয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া হইত। পরে চারি ফুট চওড়া ও দেড় ফুট উচ্চ একটি গোলাকার স্তূপের আকারে সেগুলি সাজাইয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইত। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা যাইত, সেগুলি সারারাত্রি পুড়িয়া রক্তবর্ণ অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। পরে সেই "কপার ওর" গুলি (Copper-ores) একটি ক্ষুদ্র ভাটায় (Blast furnace) কাঠ কয়লা (Charcoal) ও হস্ত-হাফরের (Hand Bellows) সাহায্যে, গালাই (Smelting) করা হইত।

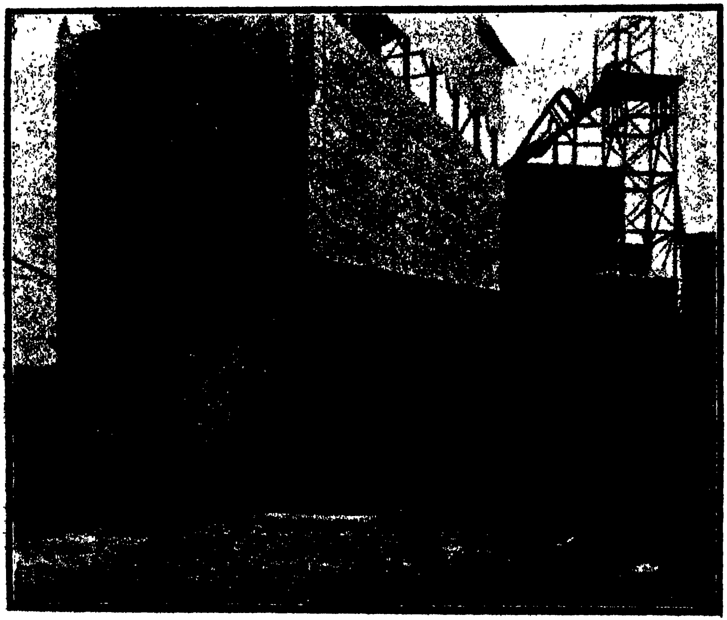


মোসাবনির খনি

এই ভাটাটি গোলাকারে তৈয়ার করিয়া তাহার তলদেশে কিয়ৎ পরিমাণ খাঁটি বালি বিছাইয়া দেওয়া হইত, আর ভাটার ঠিক মধ্যস্থলে একটি গোলাকার গর্ত্ত ১২ ইঞ্চি হইতে ১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া (Diameter) এবং দুই ইঞ্চি হইতে তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীর (Deep) করিয়া লইয়া তাহারও তলদেশে ঐ বালি পূর্ব্বোক্ত রূপে ছড়াইয়া দিয়া, তাহার উপর আর এক স্তর গুঁড়া ছাইএর প্রলেপ দেওয়া হইত। কাঠকয়লার উত্তাপ স্বভাবতঃই খুব বেশী;

এবং স্থায়ীভাবে সমপরিমাণ উত্তাপ অনেকক্ষণ ধরিয়া দিতে পারে। তার পর, ছাইয়ে আল্‌কালি (Alkali) থাকায় সেও উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে কম সাহায্য করে না; তার উপর বালির সংযোগে উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাফরের কাজও (Blasting) চলিতে থাকে; সুতরাং এই সমবেত উত্তাপে, কঠিন যে প্রস্তর, সেও ভাটার মধ্যে গলিয়া গিয়া, সম্পূর্ণ তরলাকারে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করে।

ভাটার চারি ধারে চারিটি গোলাকার গর্ত্ত (Nozzles) এমন বক্রভাবে খনন করিতে হয় যেন ভাটার সহিত সেগুলির সংযোগ থাকে। এই গর্ত্তগুলির তিনটিতে



শূন্যে তারের পথ

মোষাবনির খনি হইতে উত্তোলিত "ওর" এখানে গাড়ীতে বোঝাই দেওয়া হয়

তিনটি হাফর (Hand Bellows) ভাটায় বাতাস দিয়া (Bla·ting) উত্তাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয় এবং চতুর্থ গর্ত্তটি একেবারে খোলা থাকে। সেই মুখ দিয়া গলিত ময়লা (Slags) বাহির হইয়া যায়, আবার দরকার হইলে এই মুখটি সময়ে সময়ে কাদা দিয়া বন্ধ করিয়াও রাখিতে পারা যায়।

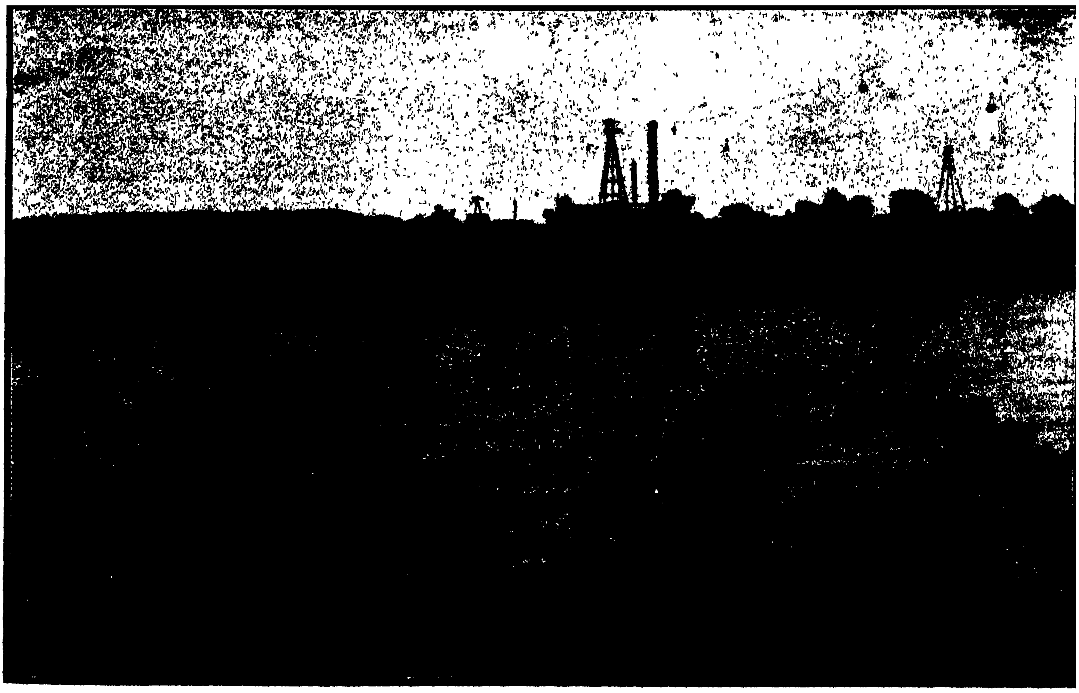
একটি ভাটায় এক দিনে ৯।১০ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণতঃ আড়াই মণ গোবর মিশ্রিত "পোড়ানো ওর" (Burnt Ore) গালাই করিবার জন্য, তিন মণ কাঠকয়লা অর্দ্ধমণ ঘুঁটে ও দুইমণ "লৌহপ্রস্তর" (Iron-Ore) দরকার হইত প্রত্যেক ভাটায় চারিজন হিসাবে শ্রমিকের দরকার হইত এবং এই কাজ এতদ্দেশে তখন কুটীরশিল্পের মত এক একটি পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একজন গৃহস্বামী, তাহার স্ত্রী ও দুইটি পুত্র থাকিলেই একটি ভাটার কাজ তাহারা নিরাপত্তিতে চালাইয়া লইত এবং এই সম্মিলিত পরিশ্রমে, একটি পরিবারের মাসে প্রায় ১৫।২০ টাকা উপার্জ্জন হইত। "শরাক্‌" নামে এক জাতি পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া তাহাদের অস্থায়ী বাসভবন নির্ম্মাণ করতঃ এ দেশের বনজঙ্গলে বসবাস করিত এবং তাহাদের মধ্যেই এই ব্যবসাটি তখন বেশীর ভাগ প্রচলিত ছিল। তার পর কি কারণে এই ব্যবসা সম্বন্ধে ধলভূম-রাজের সহিত মনোমালিন্য ঘটায়, তাহারা চিরদিনের জন্য এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং কুটীরশিল্পের আকারেও যাহার অস্তিত্বটুকু কোন রকমে বজায় ছিল, তাহাদের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুও, নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এই ভাটা (Blast furnace) হইতে যে তামা বাহির হইত তাহা বিশুদ্ধ তামা নহে। তাহাতে অনেকটা ময়লা (Slags) থাকিয়া যাইত। পরদিন প্রাতঃকালে এই ভাটা হইতে সেই ময়লা তাম্র বাহির করিয়া লইয়া আর একটি ক্ষুদ্র ভাটায় (Refineny furnace) সাজানো হইত। এই ভাটায় দুইটি মুখ থাকিত (Nozzles)- একটি মুখ দিয়া ময়লা বাহির হইত ও অপরটিতে একটি হাফর (Bellows) দ্বারা ভাটায় বাতাস দেওয়া হইত। এই ভাটা হইতে বিশুদ্ধ তামা বাহির করিবার পূর্ব্বে একপ্রকার গাছের রস ভাটার মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইত। সেই গলিত ও ফুটন্ত তামার সহিত এই রসের সংমিশ্রনে এমন একটা রাসায়নিক ক্রিয়ার উদ্ভব হইত যাহার ফলে

সমস্ত ময়লা উপরে ভাসিয়া উঠিয়া উপরের খোলা মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইত এবং খাঁটী তামাটুকু (যাহা ময়লা অপেক্ষা স্বভাবতঃই ভারী) নীচে সঞ্চিত হইত। যেমন, অনেকেই দেখিয়াছেন, চিনি ভিয়ানের সময়, তাহা হইতে ময়লা বাহির করিবার জন্ত দুধে জল মিশাইয়া, সেই জলমিশ্রিত দুধের প্রক্ষেপ দেওয়া হয়; যাহাকে চলিত কথায় ময়রারা বলে "চিনির গাদকাটা।" এই রসের দ্বারা তামার ময়লা বাহির করার প্রক্রিয়াও ঠিক একই রকমের বলিয়াই মনে হয়।

ভাটা হইতে সমস্ত ময়লা বাহির হইয়া গেলে, অবশিষ্ট যুগেও যে এতদ্দেশে প্রচুর তাম্র উৎপাদনের কাজ চলি তাহার নিদর্শন—পর্ব্বতাকারে পুঞ্জীভূত তামার ময়লাগুা (Slags)।

বৈদিক যুগেও তামার প্রচলন ও প্রজনন যে এ দেশে পার্ব্বত্য-অঞ্চলে ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণী ভারতের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকিয় ভারতের পশ্চিম প্রান্তে তাহার অভ্রংলিহ শির উত্তোল করতঃ ক্রমে ক্রমে সেই শির সঙ্কোচন করিতে করিতে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়া, সিংহভূ জেলার শেষপ্রান্তে সমতলে বিলীন হইয়া গিয়াছে



মোভাণ্ডারের কারখানা—সাধারণ দৃশ্য—(সুবর্ণরেখা নদীর অপর পার হইতে গৃহীত চিত্র)

যে তরলাকার বিশুদ্ধ তামা পাওয়া যায়, তাহা কাদায় নির্ম্মিত ছোট ছোট ছাঁচে (moulds) ঢালিয়া, তামার ইনগট্ (Ingot) তৈয়ার করা হইত। ইনগটগুলি ওজনে হইত প্রায় দুই সের ও সেগুলির রঙ হইত—উজ্জ্বল লালিমাভ (Brittce & Lilac coloured).

এই কুটীর শিল্পের পূর্ব্বযুগ হইতেছে বৌদ্ধযুগ। তখন কি প্রণালীতে তামার প্রজনন চলিত সে সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ আজকাল আর পাওয়া যায় না; তবে, সেই বৌদ্ধ

প্রকৃতির এই যে লুকোচুরী, এটা ভাবুক হৃদয়কে স্বভাবতই ভাববিহ্বল করিয়া, অজানা দেশের কত "অজন্তার" যে সন্ধান আনিয়া দেয়, তাহা শুধু কবি-কল্পনার খোরাকী নয়, প্রত্যুত বাস্তব রাজ্যেও তাহার দর্শন মিলে।

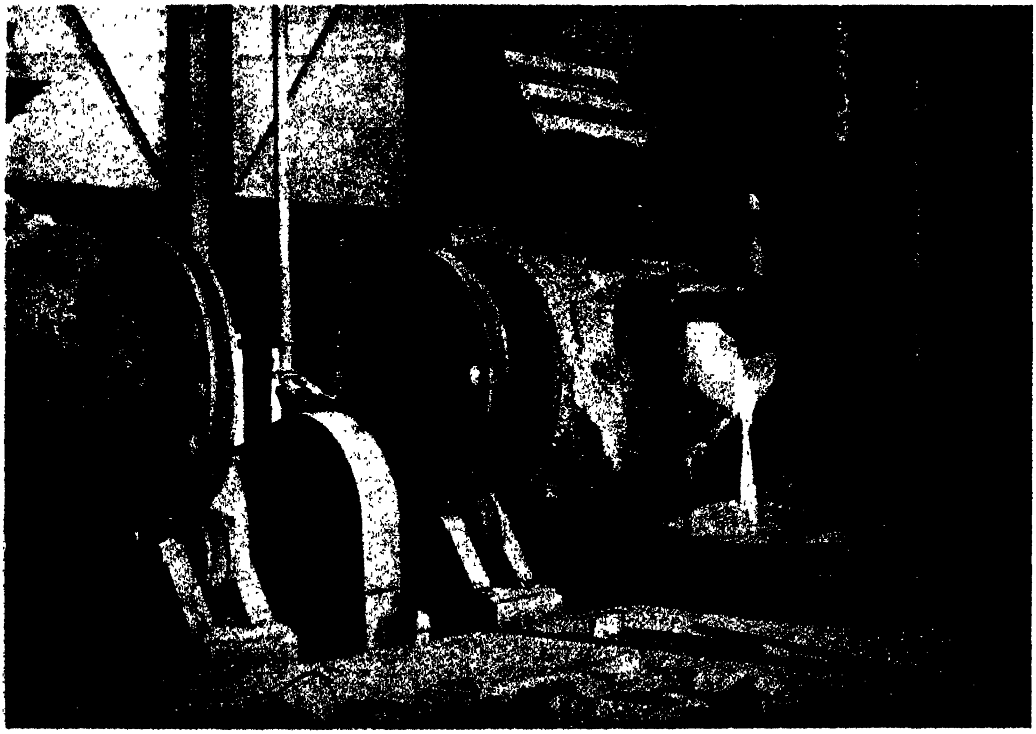
এই বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণী হইতে একটি তাম্রপ্রস্তরের স্তর পশ্চিম দিক হইতে বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে সিংহভূম পর্য্যন্ত আসিয়া, পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, এই স্তরটিরও অস্তিত্ব লোপ পাইয়া গিয়াছে। ইয়োরোপের খনি-

তত্ত্ববিদেরা সিংহভূমের তাম্রপ্রস্তর স্তরের এই অংশের নাম দিয়াছে "সিংভূম কপার বেল্ট" (Singbhum copper Belt)।

এই তাম্রপ্রস্তরের স্তর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোথায় আরম্ভ হইয়াছে ও কোথায় ইহার শেষ, তাহার সঠিক খবর বসুন্ধরার ভিতর হইতে কে দিতে পারে? তবে বৈদেশিক খনিতত্ত্ববিদেরা যন্ত্রপাতির সাহায্যে, এই সকল পর্ব্বতশ্রেণীর নানা স্থান খনন (Boring) করিয়া, কোনো কোনো স্থানে এই "কপার বেল্টের" অনুসন্ধান পাইয়াছে এবং এখনও তাহার সন্ধানে নিযুক্ত আছে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর" "বিলাসপুর—কাটনী" ব্রাঞ্চ যখন খোলা হয়, তখনকার একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনায় * প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কত যুগযুগান্তর পূর্ব্ব হইতে এ দেশে তামার প্রচলন ও প্রজনন হইয়া আসিতেছে। এই লাইনটির কনষ্ট্রাক্সনের (construction) পূর্ব্বে, এই সমস্ত স্থানের দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী ও ভীষণ জঙ্গলে মনুষ্য সমাগম অসম্ভব ছিল। ব্যাঘ্র ভল্লুক হস্তী প্রভৃতি নানা জাতীয় হিংস্র জন্তু ও নানা রকমের বিষাক্ত সরীসৃপ ও বড় বড় অজগরের প্রিয় বাসভূমি এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া যখন কনষ্ট্রাক্সনের কার্য্য চলিতে সুরু হয়, তখন এই রেল কোম্পানীর কত লোক যে এই সকল হিংস্র জন্তুদের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তাহা এতদঞ্চলের লোক বিশেষ ভাবে অবগত আছে। জনৈক ইয়োরোপীয়ান অফিসারের উপর এই কনষ্ট্রাকসনের কার্য্য ভার অর্পিত হয়।

সাহেব সম্প্রতি বিলাত গিয়া বিবাহ করিয়া মেমসাহেবকে সঙ্গে করিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন এবং এই কনষ্ট্রাক্সনের কার্য্যে আসিবার কালে মেমসাহেবকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ প্রায় দুই শতাধিক লোকলস্কর লইয়া এই জঙ্গলে প্রবেশ করেন।



মৌভাণ্ডার কারখানার কলকব্জা

* এই ঘটনাটি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "জন্মভূমি" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সর্ব্বাগ্রে দুইটি হস্তী থাকিত। তাহারা পথ পরিষ্করণ ও সম্মুখের বাধা বিঘ্ন অপসারণার্থ ব্যবহৃত হইত। তৃতীয় হস্তীতে সাহেব নিজে ও মেমসাহেব উভয়ে আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া, বিশেষ সতর্কতার সহিত উপবিষ্ট থাকিতেন। তৎপশ্চাৎ প্রায় দুইশতাধিক লোক রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে করিতে অগ্রসর হইত। এই সমস্ত লোকের কোলাহলে ও সর্ব্বাগ্রে চালিত দন্তীদ্বয়ের পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত দামামার মেঘগম্ভীর ভীষণ নির্ঘোষে, সম্মুখস্থ হিংস্র জন্তুগণ ভয়চকিত ভাবে ছুটিয়া পলায়ন করিত। কখন কখনও হস্তিযূথ সদলবলে আসিয়া সম্মুখে এমন হানা দিত যে, তাহাদিগকে তাড়াইতে প্রায় সমস্ত দিনটাই কাটিয়া যাইত।

বলিয়া সেইস্থানেই তাম্বু খাটানো হইত। সাহেবের নিজের ও তাঁহার অধীনস্থ এঞ্জিনীয়ার, ওভারশিয়ার, সাব্-ওভারশিয়ার, প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের পৃথক পৃথক তাম্বুর বন্দোবস্ত ছিল।

এইরূপভাবে অগ্রসর হইতে হইতে একদিন তাহারা এক কদলীবৃক্ষের জঙ্গলে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভীষণ জঙ্গলে কদলীবৃক্ষ ও তাহাতে নানা জাতীয় কদলী বিশেষতঃ সুপক্ক মর্ত্তমান কলার কাঁদিগুলি দেখিয়া, সাহেব ও মেম-সাহেবের আনন্দ ধরে না। এক স্থানে কয়েকটি বৃহদাকার গুহার সম্মুখে তাহারা দেখিতে পাইল, প্রায় শতাধিক তাম্রনির্ম্মিত তৈজসপত্র, যেমন—কোশাকুশী, পারাত্, টাট্,



মৌভাণ্ডার কারখানা—এখানে তামা ঢালাই ও শোধন করা হয়

এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, বন্ধুর পার্ব্বত্য অঞ্চলের কত উচ্চ স্থান নিম্ন করিতে হইয়াছে, কত পাহাড় কাটিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে হইয়াছে, কত পাহাড়ের বুক চিরিয়া সুড়ঙ্গ খনন করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপর কাহারও ধারণাতেই আসে না। এক স্থানে এক সপ্তাহব্যাপী তাম্বু খাটানো থাকিত। এবং সে স্থানের কার্য্য শেষ হইলে আর এক স্থানে তাম্বু খাটানোর ব্যবস্থা হইত। সাধারণতঃ উচ্চ স্থান অনেকটা নিরাপদ

পঞ্চপ্রদীপ, পুষ্পপাত্র, প্রদীপ, কমণ্ডলু প্রভৃতি পূজাকালে ব্যবহারোপযোগী জিনিষপত্র, কে বা কাহারা যেন এইমাত্র সাজাইয়া রাখিয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেগুলি আকারে এত বড় যে, দেখিলে মনে হয়, এই পাত্রগুলি সাড়ে তিন হস্ত দীর্ঘ মানবের ব্যবহারোপযোগী নহে। পরন্তু এই পাত্রগুলি যে যুগের, সে যুগের মানুষ নিশ্চয়ই এই আধুনিক যুগের মনুষ্য অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ দীর্ঘ ছিল।

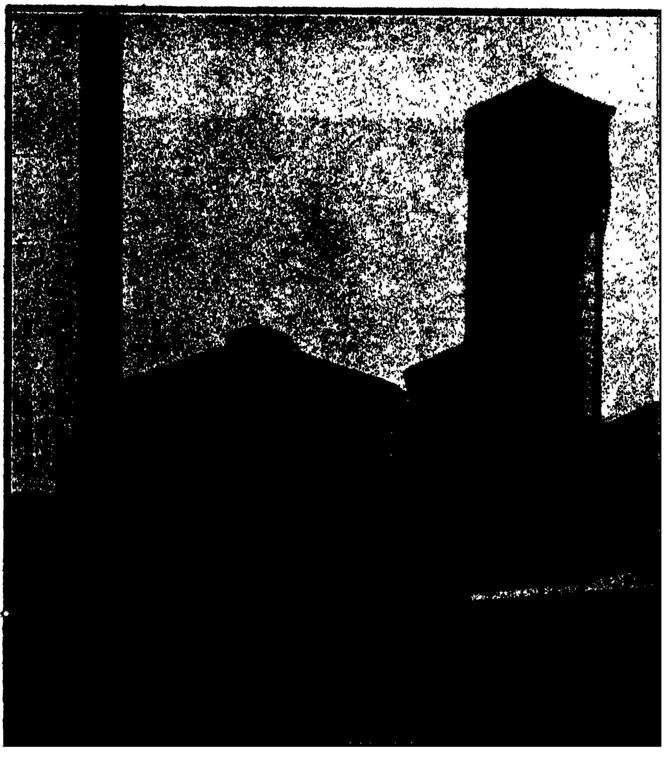
সাহেব মেমসাহেব এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি সকলে সেই

জিনিষগুলি দেখিয়া স্থির করিলেন যে, এগুলি একত্রে ওজন করিলে প্রায় দেড়শত মণেরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। আর গুহার অভ্যন্তরে প্রায় অর্দ্ধমণ ওজনের কয়েকটি তামার চ্যাঙ্গড় পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলির ওজনও প্রায় দেড়শত মণ হইবে। পাহাড়ের সমতল স্থানে তাম্র-নিষ্কাশনের ময়লা (Slags) পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

এখানে এত তামা কিরূপে আসিল, ইহাই চিন্তা করিতে করিতে সাহেব সেই চ্যাঙ্গড়গুলি তাম্বুতে বহিয়া লইয়া যাইতে, তাঁহার লোকজনদের আদেশ করিলেন। আর সেই তাম্র-পাত্রগুলির সম্বন্ধে বলিলেন, এগুলি এই স্থানেই এখন থাক, যাহাদের জিনিষ তাহারা নিশ্চয় আসিয়া এগুলি লইয়া যাইবে। কিন্তু খুব সাবধান, যাহারা লইতে আসিবে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ আমাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

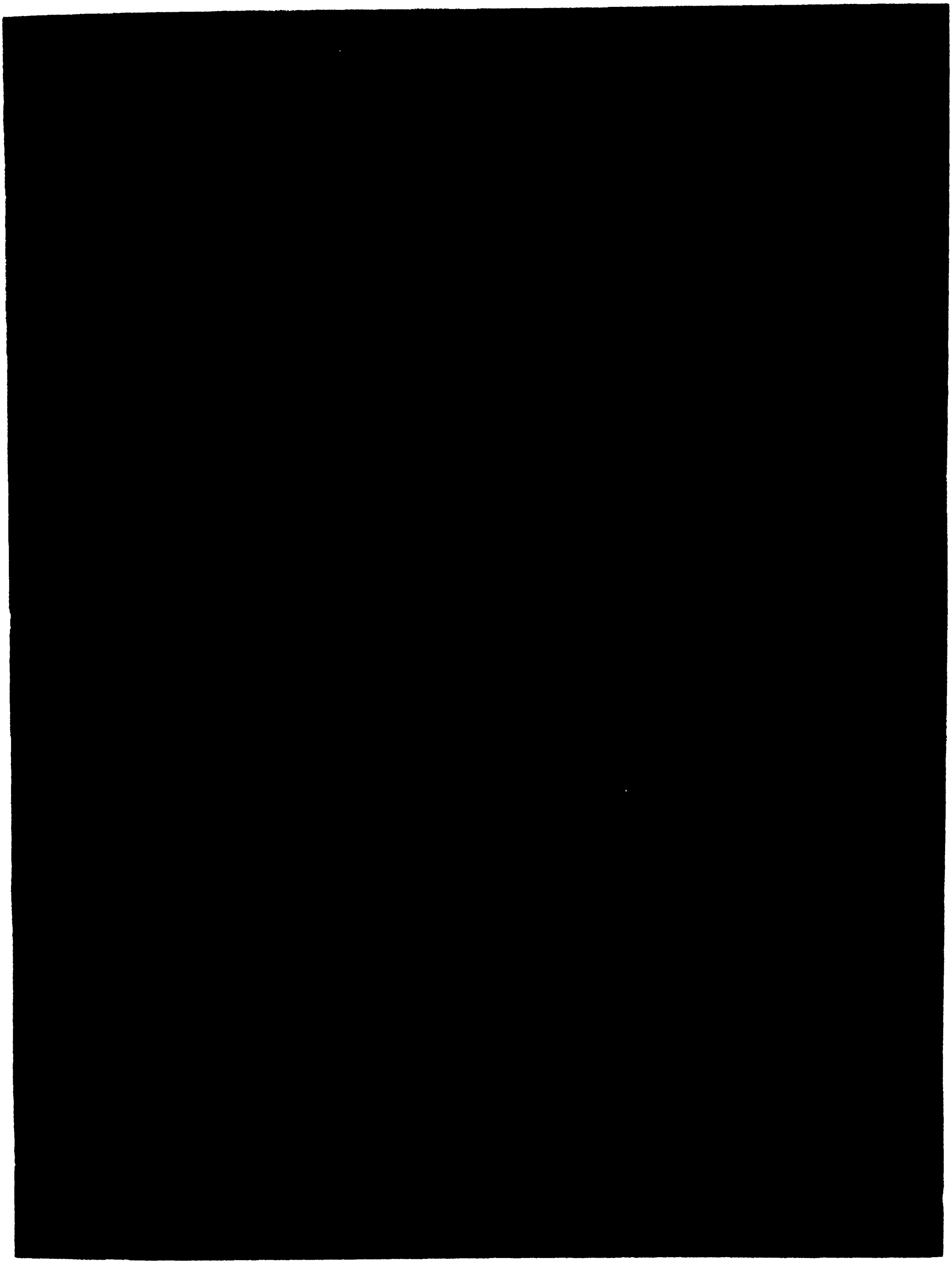
সাহেবের তাম্বু খাটানো হইয়াছিল একটি পাহাড়ের ঊর্দ্ধদেশস্থ খানিকটা সমতল স্থানে। সেই স্থান হইতে চতুর্দ্দিক অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেদিন উপরিউক্ত তাম্রপাত্র ও তামার চ্যাঙ্গড়গুলি দৃষ্টিগোচর হয়, সেইদিনই অপরাহ্ণে সাহেব তাম্বুতে গিয়া মেম সাহেবের ভীতিবিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সাহেবের আগমনে মেমসাহেব প্রকৃতিস্থ হইয়া সাহেবকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

মেম সাহেব তাম্বু হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতে করিতে পাহাড়ে সূর্য্যাস্ত দেখিতে-ছিলেন। পাহাড় অঞ্চলে সূর্য্যাস্ত, ঠিক সময়ের পূর্ব্বেই, ঘটিয়া থাকে। সেই স্থানের পরম রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্ভার সেই ইংরাজ মহিলাকে এতটা আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি তাম্বুর বাহিরে কাটাইতে ভালবাসিতেন। তার উপর সূর্য্যাস্ত-কালীন সৌন্দর্য্য যে কত মনোরম তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপর লোকের লেখনী মুখে বর্ণনা করা বাতুলের প্রলাপের ন্যায়ই নিষ্ফল। এ হেন সময়ে সেই ইংরাজ মহিলার সৌন্দর্য্য-পিপাসু লোচন দুটির পিপাসা যখন মিটিয়াও মিটিতেছিলেন না, সেই সময়ে হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটি পার্ব্বত্য নদীর তটে, প্রায় সাত আট হাত দীর্ঘ পাঁচটি গৌরবর্ণ মনুষ্য-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। তাঁহাদের মুখাবয়ব দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফে সমাচ্ছন্ন, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাজাল, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি বিলিপ্ত, হস্তে কমণ্ডলু, কটিদেশ মোটা রজ্জু-সংবদ্ধ। এই অভূতপূর্ব্ব মনুষ্য-মূর্ত্তি দর্শনে মেম-সাহেব ভয়ে স্থাণুবৎ "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন দেখিয়া, তাঁহারা তাড়াতাড়ি সেই ভীষণ বেগে প্রবাহিতা পার্ব্বত্য নদীটি বিনায়াসে এক এক লম্ফে পার হইয়া, জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।



"ওর" গালাইবার চিমনী, বয়লার ও চূর্ণ কয়লার "প্ল্যাণ্ট"

এতক্ষণে সাহেব বুঝিতে পারিলেন—ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত তাম্র-নির্ম্মিত পাত্রগুলি এক স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল ও যে সব তামার চ্যাঙ্গড়গুলি তাম্বুতে আনা হইয়াছে, সেগুলির প্রকৃত অধিকারী কে? এই রকম বৃহদাকৃতন



বুদ্ধের বৈরাগ্য

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

তৈজসপত্রগুলি, এই রকম দীর্ঘাবয়ব বিশিষ্ট মনুষ্যগণের ব্যবহারোপযোগী করিয়াই যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

সাহেব ইঁহাদের সন্ধানে বহু লোক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দুই তিন দিন ধরিয়া বহু অনুসন্ধানেও তাহাদের কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না, কিম্বা সেই তাম্রপাত্রগুলিও কেহই লইয়া গেল না। ইহার চার পাঁচ দিন পরে, সাহেব স্বয়ং আবার সেই রকমের মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সাহেবের হস্তে সকল সময়েই একটি দূরবীণ যন্ত্র থাকিত। তিনি এই দূরবীণের সাহায্যে পাহাড়ের শ্রেণীবিন্যাস দেখিতেছিলেন; এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, সেই রকম অবয়ব বিশিষ্ট দুইটি মনুষ্য, পাহাড়ের একটি শৃঙ্গ হইতে আর একটি শৃঙ্গে পর পর লাফাইয়া পড়িল; তার পর আর কিছুই দেখা গেল না। সাহেব স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া পুনরায় সন্ধান আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোন রকমেই তাহাদের আর সন্ধান মিলিল না। সাহেব অগত্যা হাল ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই স্থানের অনতিদূরে, "অমরনাথ" নামে একটি পাহাড় বিন্ধ্যাচলের শাখা পাহাড় বলিয়া খ্যাত। সেই পাহাড়ের শীর্ষদেশে "অমরকণ্ঠ" নামে মহাদেব মন্দির মধ্যে বিরাজমান আছেন। মন্দির মধ্যে "গৌরীপট্টের" পার্শ্বে একটি উৎস হইতে অনবরতঃ একটি জলধারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া গৌরীপট্টের পশ্চাদ্দেশ বিধৌত করতঃ মন্দিরের বাহিরে একটি সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তার পর এই স্থান হইতে কিয়দ্দূরে পাহাড়ের অনেকটা নীচে এই সুড়ঙ্গের মুখ খুলিয়া গিয়া, প্রবল একটি ঝরণার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রবাদ,—এই ঝরণাটিই পবিত্র-সলিলা নর্ম্মদা নদীর সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তিস্থল। যে দীর্ঘকায় পঞ্চ মানব উল্লম্ফনে নদী পার হইয়া গিয়াছিলেন, সেইটিই এই নর্ম্মদা নদী।

এই পরম রমণীয় স্থানটি হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর "বিলাসপুর-কাটনী" শাখাস্থ "পেণ্ড্রারোড" ষ্টেশনে নামিয়া, কিয়দ্দূর পদব্রজে যাইলে, এই স্থানে উপনীত হওয়া যায়। নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তিস্থল এই "অমরনাথ" পাহাড়ে, কোন্ বৈদিকযুগ হইতে কত মুনিঋষি তপশ্চরণ করিয়া যে, ভগবচ্চরণে লীন হইয়া গিয়াছেন, এবং সেই দীর্ঘকাল হইতে কঠোরতপা কত না তপস্বী মুক্তিলাভের কামনায় এখনও পর্য্যন্ত যে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত আছেন, তাহা কে বলিতে পারে? এই যে ঋষিপ্রতিম দীর্ঘকায় পঞ্চ মানব—ইঁহারা যে সেই বৈদিক যুগ হইতে তপঃপ্রভাবে নিজেদের পরমায়ু সুদীর্ঘ করিয়া লইয়া, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সচ্চিদানন্দের "সামীপ্য" লাভ করতঃ পরমানন্দে তাঁহাদের অমর জীবনযাপন না করিতেছেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

অনেক তপস্বী ও তপস্বিনী ভগবচ্চরণে একেবারে লীন হইয়া যাইবার জন্য নির্ব্বাণ মুক্তি চান না;—সখারূপে, দাসরূপে, পিতারূপে, পুত্ররূপে, মাতারূপে, কন্যারূপে থাকিতে চান;—লীলাময়ের লীলা দেখিবার জন্য অমর হইয়া থাকিতে চান,—তাহাতে মিশিয়া যাইতে চান না। এই যে দীর্ঘাঙ্গ পঞ্চ মানব ইঁহারা যে কোন্ যুগের মানব, তাহা সঠিক জানিতে না পারিলেও, ইঁহারা যে এই শেষোক্ত শ্রেণীর সাধক নহেন, তাহাও কি কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন?

আমরা এই প্রবন্ধে, বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত, এতদ্দেশের তাম্রখনির অস্তিত্ব, প্রচলন ও প্রজনন সংক্ষেপে দেখাইয়াছি; আর এক্ষণে, উপরিউক্ত ঘটনায় সপ্রমাণ হইল যে, তাহারও ঊর্দ্ধতন বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত ইহার সমাদর এ দেশে সমভাবে বিদ্যমান ছিল। ইহার আর একটি প্রধান কারণ এই যে, বসুন্ধরায় যত প্রকারের ধাতু আছে, তাহার মধ্যে তামা হিন্দুদের পরম পবিত্র জিনিষ এবং মানবের দৈহিক উৎকর্ষতার জন্য তামার প্রয়োজনীয়তা কত, সে সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে বিশেষ গবেষণার পর যখন আমাদের মুণি ঋষিরা ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে চরম অনুকূল বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখনই এই ধাতুকে ধর্ম্মের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধিয়া দিলেন যে, দেবপূজার জন্য নির্ম্মাল্য, ভোগরাগ, গঙ্গোদক প্রভৃতি যাহা কিছু পূজোপকরণ সমস্তই এই তাম্রপাত্র ভিন্ন অন্য কোন ধাতুপাত্রে ব্যবহৃত হইবে না। স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মের এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাব আর কোন দেশের কোথাও পরিলক্ষিত হয় কি?

একটি জ্ঞাতব্য বিষয় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সিংহভূমের তামা যে অতি প্রাচীন কালে দেশ বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত, তাহার প্রমাণ মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত বন্দর বা তমলুক। বৌদ্ধদের আমলে যখন সিংহভূমে প্রচুর তাম্র উৎপন্ন হইত, সেই যুগে এই বন্দরটি স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই স্থান হইতে তামাই বেশীর ভাগ রপ্তানি হইত বলিয়াই এই বন্দরটির নামকরণ হইয়াছিল "তাম্র-লিপ্ত"।

প্রিয়তমা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

তব মর্ম্ম-সুর মোর মর্ম্মে মর্ম্মে রণিতেছে আজি
মুখরি' উঠেছে প্রাণবাঁশী
ওগো প্রিয়তমা !
মিলন-রাগিণী যেন সকল অন্তরে উঠে বাজি
নিরন্তর আনন্দে উচ্ছ্বাসি'
নিত্য মনোরমা !
কর্ম্মের কঠিন বর্ম্মে শৃঙ্খলিত ছিল যার প্রাণ
বেদনায় বন্দী নিশিদিন,
তব ছন্দ-বন্দনায় শুনেছে সে মুক্তির আহ্বান,
লভিয়াছে জীবন নবীন
ওগো প্রিয়তমা !
অঞ্জলি ভরিয়া তুমি আনিয়াছ' সর্ব্ব সার্থকতা
মরু-বক্ষ সিক্ত করি বহায়েছো অশ্রু-বিহ্বলতা
নির্ঝরিণী সমা !
তোমারে পেয়েছি আজি যাত্রা-শেষে জীবনের পথে,
দুখ-সাথী—চির-আকাঙ্ক্ষিতা
ওগো প্রিয়তমা !
আমারে লয়েছ' বরি' আপনার প্রাণ-জয়-রথে
বিজয়িনী প্রণয়-গর্ব্বিতা
প্রেম-সুরঙ্গমা !
তোমার চরণ-পাতে গেহে মোর উঠিয়াছে ফুটি'
সৌন্দর্য্যের অরবিন্দরজি,
ইন্দিরার ইন্দুলেখা—ইন্দ্রাণীর গর্ব্ব পড়ে টুটি'
তোমার ঐশ্বর্য্যতলে আজি
ওগো প্রিয়তমা !
দলিয়া দুস্তর বাধা বধূ হ'য়ে এসেছো কল্যাণী
অন্তরের সত্য তব দৃপ্ত তেজে লইয়াছো মানি
লো' বধূ উত্তমা !
তব মৃদু গুঞ্জরণ হৃদয়ের কুঞ্জবন ঘিরে
রচে কোন্ অপূর্ব্ব কাহিনী
ওগো প্রিয়তমা !
রোমাঞ্চ শিহরি' উঠে কলস্বনা তোমার মঞ্জীরে
কাণে কয় কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
তুমি নিরুপমা !
তোমারে চাহিয়াছিনু জন্মে জন্মে আমার জীবনে
মরমের পরম প্রেয়সী,
আজি তাই মূর্ত্তি ধরি' এসেছো এ প্রদোষ-লগনে
অন্তরের সঙ্গিনী শ্রেয়সী
ওগো প্রিয়তমা !
তোমার হাসিতে বাজে উর্ব্বশীর নূপুর ঝঙ্কার
তনুর অণুতে শুনি অতনুর ধনুর টঙ্কার !
তুমি অনুপমা !
জড়ায়ে ধ'রেছে মোরে যেন ওই কালো কেশপাশ
রহস্যের নিগূঢ় বন্ধনে
ওগো প্রিয়তমা !
তোমার আঁখির তারা তোলে কোন্ উতলা নিঃশ্বাস
অকস্মাৎ পরিতৃপ্ত মনে
বিদ্যুৎ-সঙ্গমা !
তোমার গতির লীলা দোলা দেয় সর্ব্ব অঙ্গে মোর
যৌবনের তরঙ্গ আবেগে ;
স্পর্শ তব অভিনব পুলকের আনে স্বপ্ন ঘোর
কল্পনায় স্বর্গ ওঠে জেগে
ওগো প্রিয়তমা !
তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে সৃজনের আনন্দ হিল্লোল
চির-বসন্তের হাসি-অফুরন্ত কূজন কল্লোল
আছে যেন জমা !
আজন্ম-সাধন-লব্ধ তুমি মোর অন্তরের ধন
চিরন্তনী পরাণ-আত্মীয়া
ওগো প্রিয়তমা !
যুগে যুগে কালে কালে চিত্ত মোর করেছো হরণ
অনুরাগে ভরিয়াছে হিয়া
তোমার সুষমা !
আমার যা কিছু শূন্য পূর্ণ করিয়াছো বারে বারে
প্রাণের প্রাচুর্য্য দেছ' আনি,
সকল রিক্ততা মোর ভরিয়াছো তব উপহারে
তোমার দুর্লভ প্রেম দানি
ওগো প্রিয়তমা !
তুমি আসিয়াছো আজি মিলন-অমৃত-দীপ ল'য়ে
ঘুচায়ে দিয়েছো দেবী আমার নিকটতম হ'য়ে
বিরহের অমা !

চিরন্তনীর জয়

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"ওগো, শুন্‌ছ ?"

স্বামী তখন আরাম-কেদারায় শ্রান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন। পত্নীর আহ্বানে তিনি একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "শুন্‌তে ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত। রাণীর কি আদেশ—"

পত্নী তরলিকার সুগৌর আনন ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কৃত্রিম রোষভরে বলিল, "তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। যাও, অমন করলে আমি কিছুই বল্‌ব না।"

প্রতুলচন্দ্র পাকা মুন্সেফী পদ পাইয়া মাস কয়েক হইল এই সহরে আসিয়াছেন। তাঁহার যৌবনের কল্পনা, তারুণ্যের স্বপ্ন এখনও নথিপত্রের নীরস ভাষা এবং আইনের জটাজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। শান্ত, স্নিগ্ধ অপরাহ্নে বাগানের ফুলগাছগুলি দোলাইয়া বাতাস মদির স্বপ্নের আভাস প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

গড়গড়ার নলটা ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া প্রতুলচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তরুণী পত্নীর পেলব দক্ষিণ করতল চাপিয়া ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই, তরলিকা বলিয়া উঠিল, "তোমার যদি লজ্জা-সরম কিছু থাকে। বেয়ারা, চাকর ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?"

প্রতুলচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তিহীনতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ কোন অভিযোগ করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া জয়মাল্য লাভের ফলে অনেকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, কিন্তু সুস্থ, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ যুবকের দেহ, নয়ন বা মনে কোনরূপ পীড়া দেখা দিতে পারে নাই। সুতরাং তিনি সবই দেখিতে পাইতেছিলেন।

তবে যৌবনের ধর্ম্মকে তিনি অবহেলা করিবার চেষ্টা কোন দিন করেন নাই, করিবার কোন প্রয়োজনও তিনি এ যাবৎ অনুভব করেন নাই। পাণিপীড়ন করিয়া, অগ্নি সাক্ষী করিয়া যাহাকে গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিয়া আনিয়াছেন, নিরালায় তাহার কর গ্রহণে কোনও অপরাধ হয়, ইহা তাঁহার আইন-শাস্ত্রে লেখা ছিল না। সুতরাং পত্নীকে পাশের আসনে বসাইয়া প্রতুলচন্দ্র হাসিমুখে, বলিলেন, "এখন দাস প্রস্তুত, কি আজ্ঞা বলুন ?"

তরলিকা স্বামীর এরূপ পরিহাসে অভ্যস্ত ছিল। সে জানিত, এ বিষয় লইয়া পীড়াপীড়ি করিলে, অভিনয় ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিবে। সুতরাং সে স্বামীকে আর প্রশ্রয় না দিয়াই বক্তব্য বিষয়ে অবহিত হইল।

পাণের ডিবা খুলিয়া স্বামীর মুখে সযত্নরচিত পাণের খিলি দিয়া বলিল, "বলছিলুম কি, দাদা আস্‌বেন বলে' পত্র লিখেছেন।"

বিস্ময়ের অভিনয় সহকারে প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বটে !"

"না, তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই। সব তাতেই তোমার ঠাট্টা।"

সহসা গম্ভীর হইয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "না, এবার আদৌ ঠাট্টা-তামাসা নয়। হঠাৎ এদিকে তাঁর আসবার হেতু ?"

তরলিকা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা জানি নে। খুলে কিছু লেখেন নি। স্পষ্ট করে কোন কালেই ত দাদা কাকেও কিছু বলেন না।"

প্রতুলচন্দ্র গড়গড়ার নল মুখে আবার তুলিয়া লইয়াছিলেন। নিবিষ্ট মনে কয়েকবার টান দিয়া তিনি বলিলেন, "পরীক্ষা দেওয়ার এমন বাতিক বড়-একটা দেখা যায় না। এবার নিয়ে তিনটে বিষয়ে তিনি এম্‌-এ পরীক্ষা পাশ করলেন না ?"

তরলিকা বলিল, "ইংরাজী, ইতিহাস, আর সংস্কৃত— তিনটেই ত হল। দেখ না, আবার হয় ত আর একটা বিষয় নিয়ে পড়্‌তে থাকবেন।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "দেখ, তোমার বাবার ঐ একটি মাত্র ত ছেলে। পয়সাকড়িও শ্বশুরমশাই যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু অনিলবাবু বিয়ে করতে এত নারাজ কেন ?"

একটি ছোট নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তরলিকা বলিল,

"কি জানি, দাদার যে কি মতলব কিছুই বোঝা যায় না। ওঁর আরও ক'জন বন্ধু আছে, তাঁরাও চিরকুমার সভার সভ্য হয়ে আছেন। আমার কিন্তু ভারী বিশ্রী লাগে।"

সন্ধ্যার ছায়া তখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। ভৃত্য আলোক লইয়া আসিতেই তরলিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতুলচন্দ্রও নিবিষ্ট মনে কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। তিনিও আরাম-কেদারার উপর সোজা হইয়া বসিলেন।

বাগানের ফটকের কাছে পদশব্দ শ্রুত হইতেই তরলিকা স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

পরিচিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "মুন্‌সেফবাবু আছেন না কি?"

প্রতুলচন্দ্র কেদারা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আসুন, বীরেশবাবু।"

বীরেশবাবু স্থানীয় কলেজের বিচক্ষণ অধ্যাপক। বয়সে প্রবীণ এবং জ্ঞানে বিজ্ঞ। এই তরুণ-বয়স্ক মুন্‌সেফটির বিনয়-নম্র ব্যবহার, পাণ্ডিত্য এবং শিষ্টাচারে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই বয়সের পার্থক্য উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ বীরেশবাবুও কায়স্থ বলিয়া উভয়ের মধ্যে অল্পদিনের পরিচয়েও আন্তরিক আত্মীয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

অধ্যাপককে সমাদরে বসাইয়া প্রতুলচন্দ্র ভৃত্যকে তামাক সাজিবার আদেশ দিলেন।

বয়সের মাপকাঠিতে তারুণ্য বা বার্দ্ধক্যের পরিমাণ করা অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত হইয়া থাকে। মানব-মনের সুস্পষ্ট পরিচয় যাঁহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই সকল তত্ত্বদর্শী মনীষী বলিয়া থাকেন, তারুণ্য বা বার্দ্ধক্য মানুষের দেহে নহে, মনে। সুতরাং ২৮ বৎসরের যুবা প্রতুলচন্দ্রের সহিত পঞ্চাশৎ বর্ষীয় প্রৌঢ় বীরেশবাবুর মনের একতানতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট কোন কারণ ছিল না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সঙ্গে উভয়েরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। দর্শনশাস্ত্রে উভয়েই পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কলেজে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিলেও, দর্শনে বীরেশবাবুর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বীরেশবাবুর প্রথম যৌবনে যে সকল সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত অধিকাংশ বাঙ্গালীর নিকট তাহাই সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। কেহ বা সে সমস্যার সমাধান করিয়া একটা পথ বাছিয়া লয়, অনেকে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়াই চলে।

বীরেশবাবু সমস্যার সমাধান পাইয়া আত্মস্থ হইয়াছিলেন। প্রতুলচন্দ্রের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার মতের ও চিন্তাধারার বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল। বীরেশবাবু প্রগতি বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু যে দেশে তাঁহার জন্ম, যে ভাবধারায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছেন, দেশের যে অবদান, মাটীর রস, বায়ুর স্নিগ্ধতা, শ্যামা মায়ের বুকের অফুরন্ত স্নেহ-নির্ঝরের শীকরকণায় মিশিয়া মানুষকে সঞ্জীবিত রাখে, তাহার মহিমা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন—বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং প্রতীচ্য শিক্ষার মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিতে পারে নাই।

প্রতুলচন্দ্র তরুণ হইয়াও এই মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তিনি সকল সময়েই মনে করিতেন, তিনি হিন্দু, তিনি বাঙ্গালী। য়ুরোপীয় সভ্যতার সমুজ্জ্বল দীপ্তি মানুষের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত, সচকিত করিয়া তুলে; কিন্তু তাহার অন্তরাল হইতে বস্তুতান্ত্রিকতার যে ক্ষুধিত, লুব্ধ রূপ দেখা যায়, তাহা প্রতীচ্য মনোবৃত্তির স্পৃহনীয় নহে।

গড়গড়ার নল তুলিয়া লইয়া বীরেশবাবু বলিলেন, "আমাদের কলেজে একজন নূতন অধ্যাপক আস্‌ছেন, তাঁর জন্য একটা বাসা ঠিক করা হয়েছে। আপনার বাংলো থেকে বেশী দূরে নয়।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "এখানে এসে অবধি একদিনও কলেজটা দেখ্‌তে যাওয়া হয় নি। যে কাজের ভিড়। আপনি ছাড়া অন্য কোন অধ্যাপকের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হয় নি। একদিন যাব কলেজে।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "আপনি পণ্ডিত মানুষ। পল্লী সহরের কলেজ কেমন চলছে, আপনাদের জানা দরকার।"

প্রতুলচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "না, সত্যি, আমি এজন্য লজ্জিত। সোমবার কোর্টে যাবার আগে একবার দেখে আস্‌ব। ভাল কথা, আপনি যে নূতন অধ্যাপককে আমার প্রতিবেশী করে দিচ্ছেন, তাঁর নামটা কি বলুন ত?"

জোরে গড়গড়ায় একটা টান দিয়া বীরেশবাবু বলিলেন, "অনিলচন্দ্র বসু। তিনি বিলেতে এম্‌-এ।"

প্রতুলচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব দৃষ্টিতে বীরেশবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার শ্যালক অনিলচন্দ্র এখানে অধ্যাপক হইয়া আসিতেছেন, এ সংবাদ তাঁহাকে বা স্বীয় সহোদরাকেও তিনি জানাইলেন না কেন? এ মন্ত্রগুপ্তির সার্থকতা কি?

তিনি জানিতেন, পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অনিলচন্দ্র ভারতীয় সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য দুই বৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদে গিয়াছিলেন। পরীক্ষায় সাফল্য লাভও করিয়াছিলেন। প্রথম স্থান অধিকার করিয়া অনিলচন্দ্র চাকুরীতে যোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও অনুরোধ-উপরোধে কর্ণপাত না করিয়া তিনি সে আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। পরের কাছে দাসত্ব করাকে তিনি উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোথাও কোন প্রকার কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন নাই। তবে আজ এতদূরে—পল্লী সহরে অধ্যাপনা কার্য্য গ্রহণের মনস্তত্ত্ব কি? দাসত্ব হইলেও অধ্যাপনা মহৎকার্য্য, লোকশিক্ষার পীঠস্থান। সহরের কলেজটি সাধারণের অর্থে স্থাপিত—বেসরকারী। সেই জন্যই কি এতদিন পরে অনিলচন্দ্র এ কার্য্য গ্রহণ করিলেন?

প্রতুলচন্দ্রের মুখে চিন্তার রেখা দেখিয়া বীরেশবাবু বলিলেন, "কি ভাব্ছেন আপনি?"

নবীন মুন্সেফ অকারণ মিথ্যাভাষণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "অনিলবাবুর এই মনোবৃত্তির মূলতত্ত্ব খুঁজে পাচ্ছি না। সিবিল সার্ব্বিসের লোভনীয় এবং প্রার্থনীয় পদ পেয়েও যিনি তা অনায়াসে ত্যাগ করতে পারলেন, তিনি কলেজের অধ্যাপনার ভার সামান্য অর্থের বিনিময়ে কেন গ্রহণ করলেন, বুঝতে পাচ্ছি না।"

বীরেশবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি তাঁকে চেনেন না কি?"

মৃদু হাসিয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনি আমার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়,—আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদর।"

অধ্যাপক বীরেশবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিবার পর বলিলেন, "সিবিল সার্ব্বিসের পদ অনিলবাবু পেয়েছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ, ভারতে যে পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু কাজ পেয়েও অনায়াসে তা তিনি উপেক্ষা করেছেন।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আরও বিস্ময়ের বিষয় এখানে তিনি আসছেন, তাও আপনাদের জানান নি।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আসবার সংবাদ অবশ্য জানিয়েছেন; কিন্তু কি জন্য আসছেন, তা লেখেন নি।"

বড় অদ্ভুত লোক ত!—

বীরেশবাবু নীরবে ধূম পান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"দাদা, এ তোমার ভারী অন্যায়"—

"কেন, কি হয়েছে, বোন্?"

তরলিকা অভিমানস্ফুরিতাধরে বলিল, "তুমি এখানে চাকরী নিয়ে এসেছ, অথচ অন্য বাড়ী ভাড়া নিলে—একবার আমাদের জানাবার প্রয়োজনও মনে করলে না। আমরা কি এতই পর?"

অনিলচন্দ্র সহোদরার এই অভিমান দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোর ছেলে বেলার স্বভাবটি এখনও ঠিক এক রকমই আছে। অল্পেই অভিমান।"

"তা যাই বল দাদা, তুমি যদি আমাদের পর মনে না করতে, তা হলে নিশ্চয় আমাদের কাছে সব খুলে লিখ্তে, আমাদের বাড়ীতেই আস্তে, আলাদা বাসা করতে না।"

প্রতুলচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া ভ্রাতা ও ভগিনীর আলোচনা শুনিতেছিলেন। এবার তিনি বলিলেন, "আপনার বোনের এ অভিযোগ কি সত্য নয়, অনিলবাবু?"

তেমনই প্রশান্তভাবে হাসিতে হাসিতে অনিলচন্দ্র বলিল, "না, প্রতুলবাবু। যদি দু'দিনের জন্য বেড়াতে আমি আস্তাম, তা হলে আমার বোনের বাড়ীতে ছাড়া আমি আর কোথাও নিশ্চয় যেতাম না। কিন্তু আমাকে স্থায়িভাবে কলেজে পড়াতে হবে। এ অবস্থায় আপনাদের বাসার কাছাকাছি আলাদা থাকা কি সঙ্গত নয়? বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর যে একান্তরূপে ভক্ত, তার কি একজন সরকারী চাকুরীয়ার বাড়ীতে স্থায়িভাবে থাকা সঙ্গত, না শোভন? আপনিই বিচার করে বলুন, প্রতুলবাবু?"

পতি ও পত্নীর দৃষ্টি একযোগে, অনিলচন্দ্রের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। এতক্ষণ কেহই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে

নাই। প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার শ্যালকের অঙ্গে আগাগোড়া মোটা খদ্দরের সাধারণ বেশভূষা, পায়ে সামান্য মূল্যের জুতা। তরলিকা লক্ষ্য করিল, দাদার মস্তকে ঈষদ্দীর্ঘ, কুঞ্চিত কেশরাজির শোভা আর নাই। সমগ্র দেহে ও ব্যবহারে বিলাসিতার পূর্ব্বচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া, একটা সংযমপূত অপূর্ব্ব দীপ্তি অনিলচন্দ্রের আননে নয়নে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার জ্যেষ্ঠের—একমাত্র সহোদরের এই পরিবর্ত্তনে তরলিকার মনে কোন্ ভাবের উদ্ভব হইল, তাহার দৃষ্টিতে বা কথায় তাহার স্বরূপ ব্যক্ত হইল না। সে মৃদুস্বরে বলিল, "এ সব খদ্দর কিনেছ?"

অনিলচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না বোন্। রোজ আমি চার ঘণ্টা করে চরকা চালাই। তাতেই আমার জামা, কাপড়, চাদর, বালিসের ওয়াড়, বিছানার চাদর সব হয়ে যায়।"

"এখানেও চরকা চালাবে, দাদা?"

"নিশ্চয়। ওটা যে নিত্য কর্ম্মের মধ্যে বোন্।"

তার পর ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি হাকিম মানুষ। আমার চরকা, তাঁত, মাকু—এ সব হাঙ্গামা নিয়ে কি এখানে থাকা উচিত? আপনিই বলুন, প্রতুলবাবু?"

প্রতুলচন্দ্র নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তার পর বলিলেন, "তোমার দাদার জন্যে চা নিয়ে এস, আর পার ত আমার জন্যও আর এক কাপ—"

অনিলচন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "আমি চা ত খাই না—তরি, আমার জন্য দরকার নেই।"

তরলিকা সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি চা আবার কবে ছাড়্লে? দিনের মধ্যে চার-পাঁচ বার চা নইলে যে চল্‌ত না তোমার!"

জ্যেষ্ঠ হাসিয়া বলিল, "তুই ত অনেক দিন আমাদের ওদিকে যাস্ নি, তা জান্‌বি কি করে? এখন চা আর ভাল লাগে না। তবে সর্দ্দি কাশি হলে মাঝে মাঝে এক আধ কাপ্ চলে।"

তরলিকা বলিল, "বেশ, চা না খাও, সরবতে ত আপত্তি হবে না। তুমি বস, আমি এখনি আস্‌ছি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে লঘুগতিতে চলিয়া গেল।

প্রতুলচন্দ্র নিবিষ্ট মনে কি ভাবিতেছিলেন। পত্নী চলিয়া গেলে তিনি শ্যালকের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি, অনিলবাবু? এখানে সামান্য বেতনের অধ্যাপকের কাজ নিয়ে এলেন, আপনার বাবা তাতে মত দিয়েছেন?"

অনিলচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বাবার মতের বিরুদ্ধে এ জীবনে কোন কাজ করি নি। প্রথমতঃ তিনি আমার উদ্দেশ্যের ধারা বুঝতে পারেন নি, তাই হয় ত একটু দুঃখিত হয়েছিলেন; কিন্তু এখন তিনি আমার কোন কাজে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বিশেষভাবে উৎসাহই দিয়ে থাকেন। বাবা বছরখানেক হ'ল ওকালতীর কাজও ছেড়ে দিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, বয়স হচ্ছে, উৎসাহ নেই।"

বাহিরে ফটকের কাছে বীরেশবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "মুন্‌সেফবাবু, বাড়ী আছেন ত?"

সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের পদধ্বনি নিকটতর হইয়া আসিল।

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "অনিলবাবু, আপনি যে কলেজের কাজে যোগ দিয়েছেন, বীরেশবাবু সেখানে বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। এখনও বোধ হয় পরস্পরের মধ্যে আলাপ হয় নি?"

অনিল বলিল, "না, আমি ত সবে এসে পৌঁছেছি। কাল কলেজ খুললে দেখা হবে। তবে প্রিন্সিপ্যালের ভাই আমাকে ষ্টীমার-ঘাট থেকে নিয়ে এসেছেন।"

বীরেশবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই প্রতুলচন্দ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। শ্যালককে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনিই অনিলবাবু, আজ ভোরেই এসেছেন। আর ইনি কলেজের মেরুদণ্ড বীরেশবাবু।"

বীরেশবাবু এই প্রিয়দর্শন তরুণ অধ্যাপকের দিকে চাহিয়া অভিবাদন করিতেই অনিলচন্দ্র প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি। আমাকে কোন রকমে চালিয়ে নেবেন। অভিজ্ঞতা কিছুই নেই।"

বীরেশবাবু মুগ্ধ হইলেন। তরুণ-বয়স্ক উচ্চশিক্ষিত-দিগের মধ্যে এমন বিনয় ইদানীং বড়-একটা তিনি দেখিতে পান না।

তরুণ বৈশাখের প্রভাতে অরুণের দীপ্তি তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই। বাংলোর সম্মুখে বৃক্ষবীথির মধ্য দিয়া কঙ্কররচিত মনোরম পথটি চলিয়া গিয়াছে। সে দিকে চাহিয়া অনিলচন্দ্র বলিয়া উঠিল, "পল্লীর এমন মধুর শ্রী পল্লী সহরেও কদাচিৎ দেখা যায়, প্রতুলবাবু। আপনারা এখানে বেশ আছেন।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "সে কথাটা মিথ্যা নয়, অনিল-বাবু। বড় বড় সহরের অনেক কদর্য্যতা, নানা রকমের বিশ্রী আবহাওয়া এখানে দেখ্‌তে পাবেন না। পল্লীর শান্ত শ্রীর অনবদ্য মাধুর্য্য এখানে অপর্য্যাপ্ত পাবেন।"

ভৃত্য ও পাচক তিনখানা পাত্র লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখের টেবলের উপর উহা রক্ষা করিয়া তাহারা নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তার পর তিন গ্লাস সরবৎ ও তিন গ্লাস পানীয় জল একে একে উপস্থিত হইল।

বীরেশবাবু বলিলেন, "সকালবেলা এসব কি, মুন্‌সেফ্‌ বাবু?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "হিন্দু গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বাঙ্গালার মেয়েরা এখনও ভোলে নি। এ-সব আমার অধিকার-সীমার বাইরের ব্যাপার, বীরেশবাবু।"

প্রবীণ অধ্যাপক অনিলচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনার কি মত, তা জানি না; কিন্তু লেখাপড়া শিখে—পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে, বাঙ্গালার সনাতন ভাবধারা কলকাতার অনেক হিন্দু পরিবার ভুলে গেছেন। এটা কি খুব লোকসান বলে মনে করেন না?"

অনিলচন্দ্র একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে অনেক দৃশ্যের স্মৃতি যেন ছায়াচিত্রের মত চলিয়া গেল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আমাদের লোকসান কতখানি হয়েছে, তার হিসাব নিকাশ করে দেখ্‌বার প্রবৃত্তি অনেকের মধ্যেই এখনও জেগে ওঠে নি, এ কথাটা আমি জোর করেই বল্‌তে পারি।"

রবিবারের অবকাশ। কাহারও তাড়া ছিল না। সুতরাং জলযোগের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলিতে লাগিল।

বীরেশবাবু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, এই উচ্চশিক্ষিত তরুণ যুবক বর্ত্তমান যুগের আবহাওয়ার মধ্যেও একটা সুস্থ, সবল, বিচারসঙ্গত মনোবৃত্তির অধিকারী। শুধু তাহাই নহে, হিন্দুর ভাবরাজ্য ও কর্ম্ম-জগতের অনেক সংবাদ ইহার নখদর্পণে বিদ্যমান। প্রতীচ্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব ইহাকে অভিভূত ও বিচলিত করিতে পারে নাই।

এই তত্ত্বটুকু অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই নব-পরিচিত অধ্যাপকের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বিজ্ঞানের বিচিত্র রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগ দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। প্রাচীন হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানের সমগ্রসীভূত সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলির সন্ধান পাইয়া যৌবনের অর্ব্বাচীন মনোভাবগুলিকে তিনি নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাই অনুরূপ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন যুবকের প্রতি তাঁহার প্রৌঢ় মন প্রধাবিত হইল।

অনিলচন্দ্র অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলে, বীরেশবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনার সম্বন্ধী বড় চমৎকার ছেলে। এমন একটি রত্ন সহসা পাওয়া যায় না। ওঁর বিবাহ হয়েছে?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "ঐখানেই গোল। উনি কিছুতেই বিবাহে রাজী নন। অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল; কিন্তু এই তরুণ যোগী এ বিষয়ে স্বামী বিবেকা-নন্দের মন্ত্রশিষ্য।"

সবিস্ময়ে বীরেশবাবু বলিলেন, "কেন বলুন ত?"

"কারণ কিছুই প্রকাশ নেই। তবে পূর্ব্বরাগ বা অনুরাগের কোন বালাই এতে নেই। শুধু খেয়াল। ওঁর দলের সব ক'টিই এই মন্ত্রের উপাসক শুনেছি।"

বীরেশবাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নদীর জলে উষাস্নান সমাপ্ত করিয়া ভজন গাহিতে গাহিতে অধ্যাপক বীরেশচন্দ্র যখন ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখনও দিকচক্রবালে অরুণ-লেখার দিব্য প্রকাশ দেখা দেয় নাই। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর যখন তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রভাত-কিরণে প্রকৃতির শ্যামল শ্রী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বীরেশবাবু গুণ গুণ রবে তখনও একটা ভজন গাহিতে-ছিলেন। অন্তঃপুরের সংলগ্ন উদ্যান মুখে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, প্রতিদিনের ন্যায় তাঁহার তরুণী

কন্যা পুষ্প চয়নে সমাহিত-চিত্ত। প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চ গোময়লিপ্ত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

পিতার নয়নের স্নেহদৃষ্টি কন্যার নিষ্ঠাভরা পুষ্পচয়ন দেখিতে লাগিল।

প্রাতঃস্নান সারিয়া গৃহিণী হৈমবতী রন্ধনাগারের দিকে যাইতেছিলেন। স্বামীর নিস্পন্দ মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কন্যার প্রতি এমনভাবে চাহিয়া থাকিতে তিনি স্বামীকে কোন দিন দেখেন নাই। তাঁহার সদাপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে আজ যেন একটা গম্ভীর ছায়া—চিন্তার রেখাবলী ললাট-দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্বামীর মন ও চিন্তাধারার সহিত হৈমবতী এতই সুপরিচিত ছিলেন যে, আজিকার এই ভাব-বৈচিত্র্য তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিল।

গতিবেগ হ্রাস করিয়া তিনি স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীরেশচন্দ্র এমনই আত্ম-সমাহিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন যে, পত্নীর আগমন পর্য্যন্ত তাঁহার অগোচরই রহিয়া গেল।

হৈমবতী ধীরে ধীরে স্বামীর স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিতেই বীরেশচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল।

হৈমবতী বলিলেন, "অমন করে কি ভাব্ছিলে, এই সকাল বেলা ?"

পত্নীর প্রশ্নবোধক উজ্জ্বল স্নেহদৃষ্টির আঘাতে বীরেশচন্দ্রের বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "মা আমার সত্যি বড় হয়ে উঠেছে। এ গৌরীর যোগ্য বর কোথায় পাব তাই ভাবছি।"

হৈমবতীর মাতৃহৃদয় এই একমাত্র সন্তানের জন্য কতখানি উদ্বেগাকুল থাকিত, ক্রমবর্দ্ধমানাঁ, যৌবন-পুষ্পিতা কন্যাকে শীঘ্র পাত্রস্থ করিবার দুর্ভাবনায় অধীর হইয়া উঠিত, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু স্বামীকে এতদিন তিনি এ বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিতে পারেন নাই। প্রশ্ন তুলিলেই বীরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিতেন "ব্যস্ত কি ? মেয়ে ত আমার এখনও তেমন বড় হয় নি।"

কন্যার নাম গৌরী হইলেও তাহার গাত্রবর্ণ নাম-মাহাত্ম্যের অনুরূপ ছিল না। কিন্তু কবিবর্ণিত "ম্লান ছল ছল" দেহকান্তিতে একটা বিচিত্র মাধুর্য্য ছিল; গৌরীর মুখশ্রীতে একটা পবিত্র স্নিগ্ধ দীপ্তি, নয়ন যুগলে করুণার প্রস্রবণ যেন নিয়তই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

বীরেশচন্দ্র কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিতেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।" কিন্তু দেশের আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তাঁহার কোন অনুরাগ বা বিশ্বাস ছিল না। সারাজীবন ধরিয়া শিক্ষাবিভাগের সেবা করিলেও, তিনি উত্তমরূপে জানিতেন, এ শিক্ষার ফল বাঙ্গালীর পক্ষে অমৃত-তুল্য হইয়া উঠিতে পারে না। তাই তিনি কোনও দিন কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠান নাই। কলেজে অধ্যাপনার অবকাশে প্রত্যহ দুই বেলা তিনি স্বয়ং গৌরীর লেখা পড়ার তত্ত্বাবধান ও সহায়তা করিতেন। ইংরাজী ভাষা, ভাষা হিসাবে জানার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া কন্যাকে তিনি অবশ্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতেন, কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই দুইটি ভাষার প্রতিই তিনি সমধিক জোর দিয়া কন্যার চরিত্র ও মনকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

প্রতীচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, প্রাচ্য মনোভাব এবং শিক্ষাদীক্ষাকে প্রগতির পথে পরিচালিত করিতে হইলে প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে হইবে। বাঙ্গালীকে স্বতন্ত্রতা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইলে অবাঙ্গালী শিক্ষা ও মনোবৃত্তির গতিরোধ অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

তাই রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি, বঙ্কিম, মাইকেল, নবীন, হেম, রবি, বড়াল প্রভৃতির পাশে পাশে, শেলী, কীট্স্, টেনিসন, সেক্সপীয়র, ডিকেন্স, টলষ্টয়, হুগোর মোটামুটী পরিচয় ঘটিবার ব্যবস্থা কন্যার সম্বন্ধে করিয়াছিলেন। এই অষ্টাদশ বর্ষীয়া তরুণীর মনোরাজ্যে জ্ঞানের প্রবাহধারায় ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার ব্যঞ্জনার তরঙ্গ-মালা যাহাতে নিয়ত সমুচ্ছ্বসিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থায় পিতার অখণ্ড মনোযোগ ছিল।

আজ মধুর প্রভাতে, রবির প্রথম কিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল উদ্যান মধ্যে "সঞ্চারিণী পল্লবিনী" লতার ন্যায় কন্যার লীলায়িত গতিভঙ্গী দেখিয়া পিতৃহৃদয়ে যে অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর কয়টি কথায় মাতার অন্তরেও তাহা সুস্পষ্ট জাগিয়া উঠিল।

হৈমবতী একটি মৃদু নিশ্বাস্ ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"তুমি এতদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছ—তোমরা পুরুষ মানুষ সব কথা বুঝতে চাও না; কিন্তু রাত্রিতে আমার সত্যি ঘুম হয় না। বয়স চলে গেলে তখন বিয়ে দিয়ে কি লাভ তা বুঝতে পারি নে।"

কথাটা বীরেশবাবুর অন্তরে সত্যই আজ প্রচণ্ড আন্দোলন তুলিল। মানুষের মন একটা অবলম্বনকে আশ্রয় করিতে না পারিলে অবিচলিত থাকিতে পারে না। তবু বহুমুখী পুরুষের চিত্তে নানা বৈচিত্র্য, আশ্রয়ের রূপান্তর হিসাবে দেখা দেওয়া সম্ভবপর; কিন্তু নারীর মন বহু বিষয়ে একনিষ্ঠতা অবলম্বন করে না, ইহা দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। যৌবন যখন দেহ ও মনে তাহার আগমন-বার্ত্তা বিঘোষিত করে, তখন নারীর পক্ষে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। আশ্রয়-তরুকে বেষ্টন করিয়া লতা আপন গৌরব ও বৈভবে যখন পুষ্ট ও মুকুলিত হইতে থাকে, তখনই লতার জীবনের সার্থকতা ঘটে। এ সত্যকে কোনও বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

না,—পিতা হইয়া, প্রতীচ্য মোহের প্রাবল্যে তিনি কন্যার বিবাহে অধিক বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। নিজ জীবনের যৌবনের অভিজ্ঞতা পুরুষ হইয়াও যদি তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে এত বিলম্ব করিতেন না।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চেষ্টা কি তিনি করেন নাই? কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ উপলক্ষে তিনি ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যে পাত্রগুলি তাঁহার কাছে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাদের তরফ হইতে একে একে অনেকেই গৌরীকে দেখিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কাহারও মনে ধরে নাই। সকলেই সুগৌরী পাত্রীর সন্ধানে ব্যস্ত। শ্যামা বঙ্গভূমির ক্রোড়ে গৌরীর আবির্ভাব যে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে, এ যুগের নকল সভ্যতার আলোক-মুগ্ধ বিমূঢ়গণ তাহা বুঝিতে চাহে না। নিজেদের শরীরের দিকে চাহিয়াও তাহারা আপনাদের ভ্রম নিরাকরণ করিবার চেষ্টাও করে না।

বীরেশ বাবু পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "না, এবার আর মোটেই সময় নষ্ট করবো না। যেমন করে হোক আমার মা জননীকে সুপাত্রে দেবার ব্যবস্থা করছি। এখন তাঁরই ইচ্ছা!"

যুক্ত কর ললাটে লগ্ন করিয়া প্রৌঢ় অধ্যাপক কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হৈমবতী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "চল, এ-ভাবে দাঁড়ায়ে থেকো না। গৌরীমা এদিকেই আস্‌ছে। আমাদের এ অবস্থায় দেখে সে হয় ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে। ওর যা বুদ্ধি, আমাদের মনের দুঃখ ঠিক অনুমান করে নেবে।"

বীরেশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানের মধ্য-বিসর্পিত পথে চলিতে চলিতে তরলিকা বিস্ময়ানন্দে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার! চমৎকার!"

অধ্যাপক-পত্নী হৈমবতী পথ দেখাইয়া অগ্রে চলিতেছিলেন। নবপরিচিতা অপূর্ব্ব সুন্দরী, তরুণী মুন্‌সেফ্‌-গৃহিণীর এই মন্তব্যে তাঁহার অন্তর প্রসন্ন হইল। তিনিও বিস্ময়মুগ্ধা তরুণীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

সযত্ন-রচিত রজনীগন্ধা, বেলা, যূথিকা, চামেলি, শেফালী প্রভৃতি বাঙ্গালার পুষ্পবৃক্ষগুলির শোভা তরলিকার চিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল। কোনও বাঙ্গালীর গৃহপ্রাঙ্গণে পুষ্পবৃক্ষের এমন বিচিত্র সমাবেশ ও সযত্ন পালন-নৈপুণ্য সে পূর্ব্বে দেখে নাই। নদী-তীরবর্ত্তী এই সাধারণ ভবনটি কুঞ্জবনের স্নেহালিঙ্গনের স্পর্শে দর্শকের চিত্ত অভিনব মাধুর্য্যরসে মুগ্ধ করিয়া দেয়!

তরলিকা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এমনটি আমি কোথাও দেখি নি,—আপনারা সত্যি খুব সুখী।"

হৈমবতী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ফুল আমরা খুব ভালবাসি, গাছপালারও আমরা খুব ভক্ত; কিন্তু এ সবই আমার মেয়ে গৌরীর সাধনার ফল। আপনার ভাল লেগেছে জেনে বড় তৃপ্তি পেলাম।"

তরলিকা সহসা বলিয়া উঠিল, "আমাকে 'আপনি' 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না। আমি আপনার মেয়ের বয়সী। আমাকে গৌরীর মত তুমি বলেই ডাক্‌বেন। মাসীমা! গৌরী কোথায়?"

হৈমবতী এই তরুণী, সুশিক্ষিতা, মুন্‌সেফ্‌-গৃহিণীর

সৌজন্য ও সরলতায় মুগ্ধ হইলেন। তিনি চলিতে চলিতে ডাকিলেন, "গৌরী!—"

গৌরী জানিত মুন্সেফ বাবুর পত্নী তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিবেন। সে পরম্পরায় শুনিয়াছিল, পিতৃবন্ধু প্রতুল বাবুর স্ত্রী অপূর্ব্ব সুন্দরী এবং শিক্ষিতা—ধনী পিতার কন্যা। তাই সে কুণ্ঠাভরে এতক্ষণ নিজের ঘর হইতে বাহির হইতে পারে নাই। মাতার আহ্বান শুনিবামাত্র সলজ্জ চরণে সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

তরলিকা তাড়াতাড়ি গৌরীর কাছে গিয়া বলিল, "এই গৌরী? চমৎকার মেয়ে ত!"

হৈমবতী হাসিয়া বলিলেন, "গৌরীর মত ওর রূপ নেই। তবু উনি কেন যে ওর নাম গৌরী রেখেছেন।"

তরলিকা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার দীর্ঘায়ত, কৃষ্ণতার নয়ন যুগলের স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আগুল্‌ফলম্বিত তরঙ্গায়িত কৃষ্ণ কেশরাজির চিক্কণ শোভা, সুস্থ সবল, সুডৌল দেহের লাবণ্য, তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের অভাবেও হিমালয়-নন্দিনী গৌরীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সন্তান-বাৎসল্যে অভিভূত হইয়া যে পিতা কন্যার এই নামকরণ করিয়াছেন, তাঁহার রুচি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

তরলিকা গৌরীর কোমল করযুগল নিজের অনিন্দিত পীবর কর-প্রকোষ্ঠে ধারণ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আজ থেকে তুমি আমার বোন্ এবং সই। আমরা প্রায় সমবয়সীই হব বোধ হয়। তুমি আমার নাম ধরে ডাক্‌বে, আমিও ডাক্‌ব। কেমন ভাই?"

গৌরী এই সদ্যঃ পরিচিতা তরুণীর অমায়িকতায় প্রকৃতই মুগ্ধ হইল। সাধারণতঃ সে বড় একটা কাহারও সহিত মেলামেশা করিতে চাহিত না। নিজের মধ্যে অনেক প্রকার দীনতা আছে মনে করিয়া সকল সময়েই সে অনাবশ্যক কুণ্ঠা অনুভব করিত। কিন্তু মুন্সেফ্-পত্নীর অমায়িক ও অন্তরঙ্গ ব্যবহারে তাহার অন্তরের সকল সঙ্কোচ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সদ্যঃ-গোময়-লিপ্ত তুলসীমঞ্চ দেখিয়া তরলিকার মন আরও মুগ্ধ হইল। নিজের বাসাবাড়ীতে আসিবার পর হিন্দু নারীর প্রাত্যহিক নিত্যক্রিয়ার এই বেদ-পীঠ সে প্রাঙ্গণ-ভূমিতে নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যায় সে ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ে তুলসীতলে প্রদীপ দিয়া বাল্যের অভ্যাসকে সে সঞ্জীবিত রাখিত। গৌরীরও এই অভ্যাস আছে জানিয়া সে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিল। সমধর্ম্মী, সমমতাবলম্বী নরনারীর মধ্যে বন্ধুত্বের বীজ যত শীঘ্র উপ্ত হয়, এমন অন্যত্র সম্ভবপর নহে।

গৌরী তরলিকাকে সঙ্গে লইয়া বসিবার ঘরে গেল। পরিচ্ছন্ন গৃহমধ্যে গৃহবাসীদিগের রুচি ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অপর্য্যাপ্ত নিদর্শন দেখিয়া তরলিকার মন একদিনেই এই পরিবারের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইল। স্বামীর নিকট সে বীরেশবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়েই তাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবে, ইহা সে পূর্ব্বে প্রত্যাশা করিতে পারে নাই।

সায়াহ্নের সূর্য্য নদীর ওপারে বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিতেছিল। ঘরের বাতায়ন-পথে নদীর জলস্রোত দেখিতে পাওয়া যায়। তরলিকা মুগ্ধ হৃদয়ে বাতায়ন সন্নিধানে একখানি আসনের উপর বসিয়া পড়িল। পল্লীর শান্ত শ্রী, নদীর বিচিত্র শোভা তাহার চিত্তকে অভিভূত করিল। গৌরীর শান্ত মুখশ্রী অপরাহ্ণের মৃদু আলোক-রেখায় বড় মধুর দেখাইতেছিল।

তরলিকা বলিল, "ভাই, শুনেছি তুমি না কি বেশ গাইতে পার। গান আমার বড় ভাল লাগে। একটা গাও না, ভাই। যা তোমার ইচ্ছে।"

গৌরীর মুখ লজ্জার অরুণরাগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমার গান শুন্‌তে কি আপনার ভাল লাগবে?"

তরলিকা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমাকে তুমি আপ্‌নি বলছ! না ভাই, ও সব লৌকিক শিষ্টাচার বোনের কাছে, সইএর কাছে আমি পেতে চাই নে। তোমার বাবা খুব চমৎকার গাইতে পারেন শুনেছি। তুমি তাঁর কাছেই গান শিখ্‌ছ, জানি। তোমার ও রকম বিনয়ে আমি ভুলছি না।"

গৌরী বলিল, "বাবা খুব ভাল গান জানেন, সে কথা সত্যি; কিন্তু ভাই আমি ত কিছুই এখনও শিখ্‌তে পারি নি।"

তরলিকা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে বুঝব'খন। এখন তুমি একটা গাও ত, ভাই।"

লঘুচরণে গৌরী গৃহপ্রান্তে রক্ষিত এস্রাজটা তুলিয়া আনিয়া বলিল, "আমি এস্রাজের সঙ্গেই গেয়ে থাকি। অর্গান আমার ভাল লাগে না।"

তরলিকা বলিল, "সেই ভাল।"

এস্রাজটা লইয়া গৌরী তারগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তার পর সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া সে গান ধরিল—

"আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ!"

ছায়া ও আলোক পৃথিবীর বুকে তখন নৃত্য করিতেছিল। অগ্রগামিনী নারীর লঘু, মন্থর চরণ-ক্ষেপের তালে তালে ম্লান মুখে বিরহ ব্যথিত আলোক শ্রান্ত চরণে বিদায় লইতেছিল। গানের সুরে সুরে ভক্ত হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা ও আশার বাণী যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

গায়িকা কণ্ঠস্বর উচ্চ সপ্তকে তুলিয়া গাহিল—

"চির আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির অবহেলা পেয়েছ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি,
ধরে টেনে কোলে নিয়েছ;
'ও পথে যেও না, ফিরে এস'—বলে
কাণে কাণে কত কয়েছ!
(আমি) তবু চলে গেছি; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ!"

তরলিকা স্পন্দনহীন নেত্রে সুকুমারী তরুণীর ভাব-সমৃদ্ধ আননের প্রতি চাহিয়া এই অপূর্ব্ব সুর-তরঙ্গের খেলা সমস্ত প্রাণ দিয়া শুনিতেছিল। ইহা ত শুধু সুর-তান-জ্ঞান-প্রবীণা গায়িকার গীতির ঝঙ্কার নহে। ইহা যে একান্ত সাধকের অন্তর্নিহিত ভক্তি নিবেদন!

না, সত্যই কোনও নারীকণ্ঠে এমন অভিব্যক্তিপূর্ণ মধুর সঙ্গীত সে পূর্ব্বে কখনও শুনে নাই। বিমুগ্ধ চিত্তে সে শুনিতে লাগিল—

"(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি মুখে তুমি বয়েছ;
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে করে নিয়ে রয়েছ!"

ঘুরিয়া ফিরিয়া সঙ্গীত-ধ্বনি কক্ষমধ্যস্থ বায়ুরাশিকে পুলকিত করিয়া বাহিরের সন্ধ্যার বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল।

এস্রাজের তারে শেষ ঝঙ্কার তুলিয়া গৌরী যন্ত্রটি এক পাশে রাখিয়া দিল।

তরলিকা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে গৌরীকে আবদ্ধ করিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিল, "সার্থক তোমার গান শিক্ষা, সই! সত্যি তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হচ্ছে!"

গৌরী কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, "ছিঃ! দিদি! আমাকে আর লজ্জা দিও না।"

তরলিকা গাঢ়কণ্ঠে বলিল, "একটুও অত্যুক্তি নেই, খাঁটি সত্য কথা, প্রাণের কথা বলছি। তোমার এ গান শুন্‌লে অতিবড় পাষাণের চোখেও জল আস্‌তে বাধ্য।"

দাসী ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল।

তরলিকা মুহূর্ত্ত পরে বলিল, "ভাই, দুঃখের গান শুন্‌লে চোখে জল আসে। হাসির গান কি তোমার ভাল লাগে না?"

"না, ভাই, এই রকম গানই আমার প্রিয়। আমি বাবার কাছ থেকে বেছে বেছে রজনী সেন, রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গানই শিখেছি। অন্য গানও গেয়ে থাকি, কিন্তু আমার মন তাতে যেন ঠিক সাড়া দিতে চায় না।"

তরলিকা বাহিরে চাহিয়া দেখিল, নদীর জলে অন্ধকারের তরল ছায়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পর পারের শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজির যবনিকার অন্তরালে যেন কত রহস্য আত্মগোপন করিয়া আছে। সে নিবদ্ধদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিল। এই তরুণীর দেহান্তরালস্থিত অন্তরের ভাবধারার সন্ধান কি সে পাইয়াছে?

তাহার মনে হইল, গৌরীকে যদি সে ভ্রাতৃজায়ারূপে পাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার দাদা নিশ্চয়ই সুখী হইতেন। কিন্তু অনিলচন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্যের গভীরতা ও নিষ্ঠার কথা মনে পড়িতেই তাহার অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া গৌরী তরলিকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হল, দিদি ?"

কিন্তু তরলিকা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হৈমবতী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা লক্ষী, একটু মুখ হাত ধোবে চল।"

গৌরী বলিল, "আমিও ততক্ষণ তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে, লক্ষ্মীর আসনটা দিয়ে আসি।"

তরলিকা বলিল, "তুমি রোজ লক্ষ্মীর আসন দেও না কি, বোন্ ?"

গৌরী মৃদু হাসিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

তরলিকার মনে হইল, পিতৃগৃহে সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় মা লক্ষ্মীর পূজা করিয়া লক্ষ্মী ব্রতের কাহিনী সুরে সুরে গান করিত। কিন্তু বিবাহের পর আর সে কার্য্যের অবকাশ পায় নাই। স্বামীর সহিত কর্ম্মস্থলে আসিবার পর লক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠা করিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু নারীর পক্ষে এ অবহেলা সঙ্গত নহে। সে মনে মনে সংকল্প করিল, আগামী কল্য হইতেই সে আবার স্বামী-গৃহে দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া ধন্য হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

বীরেশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তোমার পছন্দ আছে ; কিন্তু উপায় নেই। অনিলচন্দ্রের ধনুকভাঙ্গা পণ, বিয়ে সে কোন দিনই করবে না।"

হৈমবতী বলিলেন, "তুমি একটু যত্ন করে দেখ না। তরলিকাকে বলেছিলাম, তার খুব আগ্রহ আছে। প্রতুল বাবুরও মত আছে বলে শুনেছি।"

বীরেশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ত আমিও জানি। প্রতুলবাবুর ভারী ইচ্ছে গৌরীর সঙ্গে তাঁর শ্যালকের বিয়ে হয়। কিন্তু যে বিয়ে করবে, তারই যে শুকদেব গোস্বামীর মত প্রতিজ্ঞা।"

হৈমবতী কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ?"

অধ্যাপক পত্নীর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাহিলেন।

হৈমবতী মৃদুস্বরে বলিলেন, "একদিন কৌশল করে গৌরীকে দেখিয়ে দাও,—তার গান শুনিয়ে দাও। মানুষের মন ত !—"

বাকী যে কথাগুলি হৈমবতী বলিতে চাহিতেছিলেন, তাহা বাক্যে পরিস্ফুট হইল না।

বীরেশচন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি ছেলেটির পরিচয় ভাল করে পাও নি ; তাই বলছ। আজ ক'মাস ধরে আমি ওর সকল বিষয় লক্ষ্য করে আস্‌ছি—ওর সকল মন্তব্য মন দিয়ে শুনে আস্‌ছি। নারীজাতিকে অনিল মায়ের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করে। শক্তিরূপিণী নারীর প্রতি তার গভীর সম্ভ্রমবোধ ; কিন্তু কোন নারীকে অঙ্ক-লক্ষ্মী করে তোলবার ও ঘোর বিরোধী। কেন এমন মত, তার কোন সঙ্গত কারণ তার মুখ থেকে এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি।"

বিরস বদনে হৈমবতী বলিলেন, "তবু একবার ভাল মতে চেষ্টা করে দেখ না! সেদিন ডেপুটীবাবুর বাড়ী ছেলেটির কি প্রশংসা শুনে এলুম !"

অধ্যাপক অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "সারা সহর শুদ্ধ লোকই অনিলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জেলার হাকিম, জজ, ডাক্তার সাহেব—একবাক্যে সকলেই এই শান্ত স্বভাব, ক্রীড়াবিদ্, পণ্ডিত ছেলেটির প্রশংসা করে থাকেন। আমাদের প্রিন্‌সিপাল বলছিলেন, দশ হাজারে এমন এক-জনও পাওয়া যায় না।"

আনমনে হৈমবতী বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর, মিষ্টি চেহারা!—"

উত্তেজিত ভাবে বীরেশ বাবু বলিলেন, "শুধু তাই ? গুণের কথা শোন। কাল ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী নৌকোয় বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দাঁড় ভেঙ্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জলে পড়ে যান। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সঙ্গে ছিলেন, তিনিও জুতাজামা সমেত তাড়াতাড়ি জলে লাফিয়ে পড়েন। কিন্তু মেম সাহেবকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, সেই বোঝা সমেত তিনি নিজেই হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করেন। অনিল তখন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিকে লোকজন মোটেই ছিল না। অনিল দেখ্‌তে পেয়েই তাড়াতাড়ি জুতা জামা খুলে ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছোকরার গায়ে যেমন অসীম ক্ষমতা, সাঁতারেও তেমনি ওস্তাদ! সাহেব মেমকে সে কৌশলে দুই হাতে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে তীরে নিয়ে আসে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এজন্য তার ওপর এমন খুসী হয়েছেন যে, কাল সন্ধ্যায়

পরই সহরের যে সকল সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁদের কাছেই মুক্তকণ্ঠে অনিলের প্রশংসা করেছেন। আজ এজলাসে এসে উকীল মোক্তারদের কাছেও সে সব কথা বলেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী নিজে আজ তাকে বাংলোয় ডেকে নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।"

বলিতে বলিতে বীরেশচন্দ্র সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার আননে একটা প্রসন্ন দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনিলচন্দ্রের প্রশংসা শুনিয়া হৈমবতীর নারীহৃদয় এই যুবকের জন্য আরও আকুল হইয়া উঠিল। এমন পাত্রে যদি তাঁহার গৌরীমাকে অর্পণ করিতে পারিতেন!

অধ্যাপক কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সহরের ছেলের দল অনিলের এমন ভক্ত হয়ে পড়েছে যে, তার মুখের সামান্য কথায় তারা যেন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। মহাত্মাজীর আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের এই সহরেও তার প্রবল ঢেউ এসেছে। কিন্তু অনিলের আদর্শে ছেলেরা এমন মুগ্ধ যে, তারা নিঃশব্দে চরকায় সূতো কেটে চলেছে। কোথাও কোন উত্তেজনা নেই। নীরবে কেমন করে মাতৃভূমির সেবা করা যায়, এই ক' মাসে অনিল তা দেখিয়ে দিয়েছে। এজন্য জেলার কর্ত্তারাও তার উপর রাগ করা দূরে থাকুক ভারী সন্তুষ্ট।"

হৈমবতীর হৃদয় যেন গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তুমি অনিলকে একদিন এখানে নিয়ে এস। গৌরীর গান শুনিয়ে দাও। তাকে দেখ্‌লে অনিলের মন হয় ত ফিরে যেতেও পারে।"

বীরেশ বাবুর পিতৃহৃদয়, পত্নীর এই আশ্বাস বাক্যে হয় ত বা একটু আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু অনিলের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে ওঁ ভরসা হয় না।"

হৈমবতী দ্বার-পথে প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া ছিলেন। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে তুলসীমঞ্চের তলে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বস্ত্রাঞ্চল গলদেশে রাখিয়া গৌরী নত হইয়া প্রণাম করিল। প্রদীপের আলোক শিখা গৌরীর স্নিগ্ধ মুখে নৃত্য করিয়া উঠিল।

মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যাকে আর এমন ভাবে রাখা কোন মতেই চলে না। জীবনের সুন্দরতম মুহূর্ত্তগুলি স্বামিগৃহে, স্বামি-সংবাসে যদি সার্থকতা লাভ করিতে না পায়, তাহা হইলে জীবন কি দুর্ব্বহ হইয়া উঠে না—ব্যর্থ হইয়া যায় না?

বীরেশ বাবু ডাকিলেন, "গৌরী মা, তোমার হয়েছে?"

"যাই বাবা," বলিয়া গৌরী ধীর পদে সোপান পথ অতিক্রম করিয়া পিতার দিকে অগ্রসর হইল।

তাহার প্রসন্ন মুখে পূর্ণ শান্তির মধুর শ্রী।

কন্যা পিতার পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্টা হইলে বীরেশচন্দ্র তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "তোমার সব কাজ হয়ে গেছে ত, মা?"

গৌরী উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, বাবা।"

"তবে এইবার বই নিয়ে এস। আজ বাল্মীকির রামায়ণের বনবাসের অধ্যায়টা তোমাকে শেষ করতে হবে।"

গৌরী ধীরপদে মূল রামায়ণখানি আনিয়া উজ্জ্বল প্রদীপালোকে পড়িতে বসিল।

শ্রীরামচন্দ্র সহধর্ম্মিণী সীতাদেবীকে বনগমনে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানাবিধ বিপদ ও আশঙ্কার কথার উল্লেখ করিবার পর জনকনন্দিনী তেজোগর্ভ বাক্যে যখন পতিকে বলিলেন যে, তাঁহার পিতা কি একজন কাপুরুষের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ? তখন গৌরীর হৃদয় যেন আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা, হাজার হাজার বছর আগের হিন্দু স্ত্রীর এই কথা বাল্মীকির লেখায় অমর হয়ে নেই কি?"

কন্যার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বীরেশচন্দ্র বলিলেন, "তুই ঠিক ধরেছিস্ মা। সীতা বীরের কন্যা, বীরের পুত্রবধূ, মহাবীরের সহধর্ম্মিণী। তাঁর মুখে এই রকম উক্তিই শোভন। কিন্তু হিঁদুর মেয়েরা এ যুগে সে মহা আদর্শের কথা ভুলে গেছে।"

তখন পিতা ও পুত্রী আবার রামায়ণের মধুর কাব্য মাধুর্য্য ও চরিত্র সৃষ্টির অনবদ্য মহিমার মধ্যে আপনাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিল।

হৈমবতী নিজের কাজ সারিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। (ক্রমশঃ)

নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু-সমাজে

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট-ল

প্রথম প্রবন্ধ

আজকাল সর্ব্বত্রই নারী-জাগরণের কথা শুনা যাইতেছে। তাঁহারা চিরকালই অত্যাচারিত হইয়া আসিয়াছেন—এখন তাঁহারা শিক্ষিতা হইয়া তাঁহাদিগের ন্যায্য স্বত্বাধিকার চাহিতেছেন। পুরুষদিগের মতন সকল কর্ম্ম করিবার—বিশেষতঃ অর্থকরী কর্ম্ম করিবার তাঁহাদিগের অধিকার থাকা উচিত—তাঁহারা সকল অর্থকরী কর্ম্ম করিতে না পাওয়ার নিমিত্ত পুরুষদিগের দাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুরুষরা যথেচ্ছা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে—নারীরা সেরূপ করিলেই যত দোষ—তাহা করিলে তাঁহাদিগকে ইহলৌকিক অনেক নির্য্যাতন সহিতে হয়—পারলৌকিক অনেক ভয় দেখান হয়। নিজেরা পচ্ছন্দ করিয়া বিবাহ করা উচিত—বিবাহ অসুখকর বোধ হইলেই বিচ্ছেদ করিতে দেওয়া উচিত—পারিবারিক জীবনে স্বামীর কোনরূপ আধিপত্য তাঁহাদের উপর থাকা উচিত নয়—রাজনৈতিকক্ষেত্রে তাঁহাদিগের ভোট থাকা উচিত—ব্যবস্থাপক সভার সভ্যা হইতে পাওয়া উচিত ইত্যাদি নানাপ্রকার স্বত্বাধিকার প্রসারের দাবী শুনা যাইতেছে। হিন্দু-সমাজ চিরকালই নারীদের উপর ঘোর অত্যাচারী—তাহাদিগকে অবজ্ঞা করে—এই সকল স্বত্বাধিকার দিতে অসম্মত—বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত মনে করে না—বালিকাদিগকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বিকাশের পথ রুদ্ধ করে। সুতরাং হিন্দু-সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক—তাহা না করিলে আমাদের উন্নতির কোন প্রত্যাশাই নাই, ইহা অনেক তরুণ তরুণীরা প্রমাণিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়েন; বোধ হয় পাশ্চাত্যের নারীদিগের উক্তপ্রকার স্বত্বাধিকার প্রসার দেখাইয়া আমাদিগের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যাঁহারা প্রথম হইতেই ধরিয়া লয়েন যে হিন্দু-সমাজ সকল পুরাতন 'অসভ্য সমাজের মতন নারী-নিগ্রহী, তাঁহাদিগকে দেখিতে বলি যে হিন্দু ভিন্ন কোন সভ্য সমাজ এ পর্য্যন্ত ভগবানকে নারী আকারে দেখে না—কল্পনাও করে না। যদি সত্য সত্যই আমরা নারীকে হেয় বা নীচ মনে করিতাম—অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতাম, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে নারী আকারে দেখিতাম না—কল্পনা করিতাম না—দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা বার বার নারী-দেবতার শরণাপন্ন হইয়া অসুরদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার কথা আমাদের ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত হইত না—আপদকাল উপস্থিত হইলেই গৃহে গৃহে চণ্ডীপাঠ হইত না—জীবনের প্রধান কাম্যবস্তুর—শক্তি, অর্থ ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমরা নারীভাবে কল্পনা করিতাম না—এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত হয়। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিবারস্থ সকল নারীদিগের প্রতি—(ভগিনী, দুহিতা, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, জ্ঞাতি, বন্ধুপত্নী, শিষ্যা প্রভৃতি) কেবল নিজের নিজের পত্নীটির প্রতি নয়—সসম্মান ব্যবহার করিবার যেরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ আছে—সেরূপ ব্যবহার না করিলে যে সে কুলের ইহকালও নাই পরকালও নাই বলা আছে—সেরূপ অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় না। * আমরা

---

* যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলা ক্রিয়াঃ। মনু ৩ অধ্যায় ৫৬
শোচন্তি জাময়ো ‡ যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা। ৫৭
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যা হতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ। ৫৮
তস্মাদেতা সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতি কামৈনরৈ নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ। ৫৯

‡ জাময়ঃ—ভগিনী, পত্নী, দুহিতা, পুত্রবধূ, ইত্যাদি। কৃত্যাহতা—অভিচারহতা

সকল স্ত্রীলোককেই মাতৃসম্বোধন করিয়া থাকি—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—আমাদের চলিত প্রবাদ মধ্যে গণ্য।

ইহা হইতে প্রমাণ হয় কোন সমাজই হিন্দুদের মতন নারীদের এত সম্মান করে নাই—এত উচ্চ স্থান দেয় নাই। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে নারীদিগের পুরুষদিগের মতন সমান অধিকার না থাকার নিমিত্ত হিন্দু-সমাজকে নারীনিগ্রহকারী ধরিয়া না লইয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখা যাউক সমাজে নারীর স্থান ও কর্ম্ম কি হওয়া উচিত—হিন্দু আদর্শ ই বা কি, ও তাহা নারীদের পক্ষে, সমাজের পক্ষে, সচরাচর সাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না—পাশ্চাত্য আদর্শ অধিকতর মঙ্গলজনক কি না। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক বিধি নিষেধ, নিয়মাবলি সাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না দেখিতে হয়—ব্যক্তিগতভাবে তাহাতে অনেকের পক্ষে অন্যায় হইতে পারে—কিন্তু সমষ্টির সুবিধা ও মঙ্গলের জন্য সকল সমাজকেই ব্যষ্টির সুবিধা উপেক্ষা করিতে হয় তাহা অপরিহার্য্য—তাহা যেন মনে থাকে।

আর একটি কথা আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিলে তাহাদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হয় না—তাহাদিগের মঙ্গলজনক হয় না। বাঘকে ও গরুকে একই আহার দিলে তাহাদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হয় না—সকল লোককে একই রকম আহার দিলে তাহাদের উপযোগী হয় না। একই রকম কার্য্য করিতে দিলে তাহাদিগের অনেকের প্রতি অত্যাচার হইতে পারে। হৃদ্‌রোগগ্রস্ত লোকদিগকে যানবাহকের কার্য্য করিতে দেওয়ায় তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়। যাহার যে কার্য্য করিতে উপযুক্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প আছে, তাহাদিগকে সেই কার্য্য করিতে না দেওয়া,—ও যাহাদের যে কার্য্য করিবার সহজ পটুতা আছে তাহাদিগকে সেই কার্য্য করিতে দেওয়া, সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইজন্য যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নয় তাহাদিগকে * সৈনিক হইতে দেওয়া হয় না। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষমতা ও গুণাগুণ বিচার করিয়া তবে লোকেদের কার্য্য নির্দ্দেশ করাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর—ইহা সকল সভ্য সমাজে একবাক্যে স্বীকৃত।

পুরুষ ও নারীর শরীর গঠনের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সাধারণতঃ নারীর শরীরের আয়তন, দেহের ও পেশীর শক্তি, পুরুষের অপেক্ষা কম, অস্থিও দুর্ব্বলতর, দেহও কোমলতর। তাহাদের মস্তিষ্কের ওজন ও জটিলতা (convolutions) মস্তিষ্কের অগ্রভাগের (cerebrum) ও পশ্চাদ্ভাগের (cerebellum) ও স্নায়ুগ্রন্থির (nerve ganglia) ওজনও পুরুষের অপেক্ষা কম। কিন্তু থ্যেলেমাস, (Thalemus) যাহা সম্প্রতি ভাবপ্রবণতার (emotions) উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পুরুষদিগের অপেক্ষা বড়। শুধু এই শরীর ও মস্তিষ্কের পার্থক্য হইতে দেখা যায়, যে পুরুষ ও নারীর একই প্রকার কর্ম্ম হওয়া বিধেয় নহে। একই প্রকার কর্ম্ম করিতে হইলে নারীদিগেরই দুর্গতি হইতে বাধ্য, কারণ, তাহারা দুর্ব্বলতর। আবার নারীদিগের মাতৃত্ব উপযোগী অঙ্গ সকল আছে (fallopian tube, uterus, ovary, breast) এবং সেই সকল অঙ্গ, কাম উপভোগ উপযোগী অঙ্গ অপেক্ষা বৃহত্তর—শেষোক্ত অঙ্গ পূর্ব্বোক্ত অঙ্গের কতক অংশের সহিত জড়িত। নারীর শরীর গঠন এরূপ যে মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশের নিমিত্ত—পূর্ণ গর্ভাবস্থায় মাতৃত্বের অঙ্গের নিকটস্থ সকল অঙ্গকে অবকাশ দিতে হয়। মাতৃত্বের অঙ্গ সকলে বহু স্নায়ু ও স্নায়ুগ্রন্থি আছে তাহা শরীরের অন্য অংশের সহিত জড়িত। তাঁহাদের স্নায়ু সকল তাহাদের মাতৃত্বের উপযোগী—অধিকতর সূক্ষ্মানুভূতিশীল—সহজেই উত্তেজিত হয়। তাহারা বহুকাল অল্প পরিশ্রম করিতে পারে—পুরুষরা সময়ে সময়ে অধিক পরিশ্রম করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের তজ্জন্য অধিক বিশ্রাম আবশ্যক। মাতৃত্বের অঙ্গ সকল আছে বলিয়াই তাহাদের মাতৃত্বের প্রকৃতিজ প্রেরণা আছে। শিশুদিগকে স্তন্যপান করাইয়া, পালন ও আদর করিয়া তাহারা যে পরিমাণে সুখী হয়—পুরুষরা সেরূপ হয় না। মতৃত্বের উপরই সৃষ্টি নির্ভর করে—সুতরাং মাতৃত্বের অঙ্গগুলি তাহাদের প্রধান অঙ্গের মধ্যে গণ্য। পুরুষ ও স্ত্রীর পার্থক্য

* ইহা 'নারী নিগ্রহ?' মনুরই আদেশ। নারী ব্যবহার সম্বন্ধে "পূজ্যন্তে" শব্দের ব্যবহারটির দিকে তরুণদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মিতাক্ষরা আইন প্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

ভর্তৃ, ভ্রাতৃ, পিতৃ, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর দেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥

এই মাতৃত্বেই--সুতরাং মাতৃত্বই স্ত্রীত্ব। জীবজগতের ভিতর মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত (evolved) ; সুতরাং নারীদিগের মাতৃত্বও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত। তজ্জন্য মাতা ও অপত্যদের সম্বন্ধ জীবনব্যাপী ও মাতৃত্বের অঙ্গীভূত সেবাপরায়ণতা, ত্যাগশীলতা, পরার্থপরতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত—ক্রমে মানবজাতিতেই বহুবিস্তৃত। সেইজন্য লোকেরা যত পরস্পর সহায় ও নির্ভরশীল তত কোন জন্তু নয় ও পরস্পর সহায়শীলতার জন্যই মানবজাতি এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে। Benjamin Kidd on Science of Power বা ১৩৩২ সালের মাঘ সংখ্যার "বিবাহ ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। জন্তুদের ভিতর দেখা যায় যে স্ত্রী জন্তুরা কাম উপভোগের পরেই গর্ভবতী হয়—যাহাদের গর্ভবতী হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারা কাম উপভোগ করে না। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে প্রকৃতির নির্দ্দেশে স্ত্রীলোকের কাম তাহাদের মাতৃত্ব বিকাশের সহায়ক মাত্র—তাহাদের কাম ও মাতৃত্বের অঙ্গ জড়িত বলিয়া অনেক সময়ে মাতৃত্বের প্রকৃতিজ প্রেরণা কাম বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই সকল কারণে নারীদিগের কর্ম্ম এরূপ হওয়া উচিত যে তাহাতে মাতৃত্বের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়—মাতৃত্বের অঙ্গগুলির সম্যক ব্যবহার হইতে পায়। অঙ্গ থাকিলেই তাহার ব্যবহার করিবার প্রেরণা প্রকৃতি হইতেই আসে—অধিকদিন ব্যবহার না করিতে পাইলে সেই অঙ্গের স্নায়ু সকল শুষ্ক (atrophied) হইয়া যায়—সেই অঙ্গ ক্রমেই অব্যবহার্য্য হয়—অনেক সময়ে তজ্জন্য অনেক ব্যাধি হয়। মাতৃত্বের অঙ্গগুলি বহুকাল ব্যবহার করিতে না পাইলেও সেইরূপই হয়—মাতৃত্বের প্রকৃতিজ আকাঙ্ক্ষাও ক্রমে লুপ্ত হয়। হস্তপদাদি প্রধান অঙ্গ কোন লোককে ব্যবহার করিতে না দিলে তাহার উপর যেরূপ অত্যাচার করা হয়, স্ত্রীলোকদিগের মাতৃত্বের অঙ্গগুলি বহুকাল বা চিরকাল ব্যবহার করিতে না দিলে তাহাদের উপর সেইরূপই ঘোর অত্যাচার হয়। যাবৎ স্ত্রীলোকদিগের রজোনিঃসরণ হয় তাবৎ, তাহারা মাতা হইতে পারে—তাহার পূর্ব্বেও পারে না—তাহার পরেও পারে না। সুতরাং রজোনিঃসরণের আরম্ভ হইতেই নারীরা মাতা হইবার উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সকল স্ত্রী জন্তুরাই তৎকাল হইতেই কাম উপভোগ করে ও গর্ভবতী হয়—তাহার পর সামান্য দিনও অপেক্ষা করে না সুতরাং প্রকৃতির নির্দ্দেশ এই যে তৎকাল হইতেই স্ত্রীলোকদিগকে কামের ও মাতৃত্বের অঙ্গ সকল ব্যবহার করিতে দেওয়া বিধেয়। এই সকল বিষয়ে সর্ব্ববাদী সম্মত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—Havelock Ellis লিখিয়াছেন যে রজো নিঃসরণের প্রারম্ভই নারীদিগের যৌন পরিপক্কতা নির্দ্দেশ করিতেছে—("Sexual maturity is determin d in women by a precise biological event the completion of puberty on the onset of menstruation." See Psychology of Sex, Vol. VI, Page 524.) রজোনিঃসরণের পর স্ত্রীলোকদিগকে বহুকাল কামের ও মাতৃত্বের অঙ্গ সকল ব্যবহার না করিতে দেওয়ায় তাহাদের উপর অত্যাচার করা হয় এবং এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে অবিবাহিতা কন্যাদের তৎকালে হিষ্টিরিয়া, রজোসংক্রান্ত নানান ব্যাধি, অজীর্ণ, মাথাধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি নানা ব্যাধি ও অনেক সময়ে অতি দুষ্ট রক্তহীনতা, (Chloro is, Persistent Anæmia) হৃৎপিণ্ডের ব্যাধি হয়—ইহা সকল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত স্বীকার করেন। সুতরাং আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহ দিবার প্রথা তাহারা রজোদর্শনের প্রারম্ভ হইতেই যাহাতে কাম ও মাতৃত্বের অঙ্গ ব্যবহার করিতে পারে ও তাহা করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত না হইতে হয়, তজ্জন্যই হইয়াছে। এইরূপ ব্যবহার না করিতে পাইলে তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইত—তাহা নিবারণ করা অল্পবয়সে বিবাহ দিবার এক প্রধান উদ্দেশ্য। সংস্কারকেরা এই প্রথাকে যে দোষনীয় বলেন তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহারা যে বলেন বাল্যে বিবাহ হওয়ায় বালিকাদিগের শিক্ষা হইতে পায় না—সে কথাটিও ভ্রমাত্মক। কারণ বধূরা তাহাদের স্বামীর বংশের পোষ্যকন্যা—তজ্জন্য তাহাদের বিবাহের সময় গোত্রান্তর হয়—সুতরাং তাহাদের শিক্ষার ভার তাহাদের পোষক পিতা—অর্থাৎ শ্বশুর ও স্বামীর উপর সমর্পিত হয়—তাহাদের সংসারের উপযোগী ভাবে শিক্ষা দেওয়া তাহাদেরই কর্ত্তব্য,—দিয়াও থাকেন। পিতৃগৃহে প্রাপ্ত শিক্ষা স্বামীর বংশের অনুপযোগী হইতে পারে—অনুপযোগী শিক্ষাতে বিরোধের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই তাহা নিরাকরণ করিবার

উদ্দেশ্যেই—দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ণ-বিকাশের উদ্দেশ্যেই—বধূদের শিক্ষার ভার স্বামীর বংশের উপর সমর্পিত। যদি তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা না পান, তাহা আমাদের সমাজ-গঠনের দোষ নয়—শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামীরই দোষ।

স্ত্রীলোকদিগের রজোনিঃসরণ-কালীন তাহাদের শারীরিক নানা বিপর্য্যয় হয়—স্নায়ু সকল এত উত্তেজিত হয়, এত বিকৃত ভাবাপন্ন হয় যে তৎকালে তাহাদের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক—সকল ডাক্তারেরাই স্বীকার করেন। এই বিশ্রাম না পাইলে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয়—নানা ব্যাধি হয়—অনেক সময়ে তাহা দুরূহ আকার ধারণ করে। গর্ভকালীন ও অপত্যেরা যতদিন ছোট থাকে, ততদিন তাহাদের সেবা ও তত্ত্বাবধারণের জন্য, সে সময়ে অন্য কর্ম্ম করিতে হইলে নারীদের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হয়—শিশুদেরও কষ্ট ও অনেক সময়ে দুর্গতি হয়। ধনী স্ত্রীলোকেরা হয় তো শিশুর পরিচর্য্যা অন্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারায় করাইতে পারেন—কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকরা তাহা পারে না। সুতরাং তাহাদেরও শিশুদের দুর্গতি হয়। সুতরাং নারীর শরীর গঠন ও তাহার ক্রিয়া হইতে প্রতীয়মান হয় যে তাহাদের কর্ম্ম এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে (১) তাহাদের মাতৃত্বের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়—অর্থাৎ (ক) রজোনিঃসরণের প্রারম্ভ হইতেই মাতা হইবার স্বাধীনতা থাকে (খ) গর্ভকালীন ও যাবৎ অপত্য ছোট থাকে তাবৎ তাহাদের তত্ত্বাবধারণ, যত্ন ও সেবা করিবার পূর্ণ অবকাশ থাকে, ও তাহাদের তজ্জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা-ভারগ্রস্তা না হইতে হয় বা বিশেষ কষ্ট না সহ্য করিতে হয়। (২) মাসিক রজোনিঃসরণ কালীন বিশ্রাম পায় (৩) শরীরের আপেক্ষিক দুর্ব্বলতা ও স্নায়ুর ক্রিয়া পার্থক্যের অনুপযোগী না হয়। যদি তাহাদের কর্ম্মে উপরিউক্ত কোনটির ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে সেরূপ কর্ম্ম করায় বা করিতে পাওয়ায়, বা বাধ্য হওয়ায় তাহাদিগের স্বত্বাধিকার প্রসার না হইয়া তাহাদের উপর অত্যাচারই করা হয়।

পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকরা সম্প্রতি বহু অর্থকরী কর্ম্ম করিতেছে—তাহাদিগকে ভোট-অধিকার দেওয়া হইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনেক কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া আমাদের তরুণ-তরুণীরা অনেক বৃদ্ধরাও মনে করেন যে এইরূপ কর্ম্ম করিতে পাওয়ায়, নারীদের স্বত্বাধিকার প্রসার করা হইতেছে এবং আমাদেরও সেইরূপ করা উচিত। পাশ্চাত্যে কেন এরূপ হইয়াছে তাহা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব। এখন দেখা যাউক এরূপ করিতে পাওয়া সাধারণতঃ নারীদিগের মঙ্গলজনক, কি, না।

অতি অল্প অর্থকরী বা রাজনৈতিক কর্ম্ম আছে যাহাতে নারীরা প্রথমতঃ মাসিক তিন চারি দিন বিশ্রাম পাইতে পারেন ও গর্ভাবস্থায় ও অপত্য হইবার পর কিছুকাল বিশ্রাম পাইতে পারেন। সুতরাং এই সকল কর্ম্ম, যাহাতে তাহারা সেইরূপ বিশ্রাম পায় না তাহা করিতে দেওয়া বা পাওয়া তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—সমাজের পক্ষেও মঙ্গলজনক নয়। কেবল লুপ্ত-গর্ভধারণশক্তি নারীদের জন্য ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পাওয়া হয় তো দোষাবহ না হইতে পারিত, কিন্তু ঐরূপ স্বত্বাধিকার সাধারণভাবে সকল নারীদের জন্য চাওয়া হইতেছে—পাশ্চাত্যে তাহাই হইয়াছে এবং তাহার ফলে কি কুমারী, কি বিবাহিতা, কি বৃদ্ধারা সকলেই অর্থকরী কর্ম্মে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। কিন্তু সকল স্ত্রীলোকরা এইরূপ কর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা আবশ্যক বা অনুপযোগী নয়, তাহাদের সেইরূপ কর্ম্ম পাইবার পথই সঙ্কুচিত হইতেছে; কারণ তাহাতে ঐরূপ কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। এই সকল কর্ম্ম পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় করিতে হইলে যে মাসিক বিশ্রাম তাহাদের একান্ত আবশ্যক তাহা পাইতে পারে না, তজ্জন্য তাহাদের শারীরিক কষ্ট অবশ্যম্ভাবী—স্বাস্থ্যহানিও হয়—সুতরাং নারীদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—এরূপ কর্ম্ম করিতে পাওয়ায় তাহাদিগের স্বত্বাধিকার প্রসার বলা সঙ্গত নয়, বরং এইরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হওয়াই তাহাদের উপর অত্যাচার; সুতরাং এইরূপ কর্ম্ম যত কম করিতে বাধ্য হয় ততই তাহাদের পক্ষে ভাল এবং সেইরূপে সমাজ-গঠন হওয়াই বিধেয়। একে তো গরীবদের অর্থকরী কর্ম্ম করিতে গেলেই তাহাদিগকে অশেষ কৈফিয়তী ভোগ করিতে হয়, তাহা কি পুরুষদিগের কি নারীদিগের। এখনও পাশ্চাত্য-সমাজে সদুপায়ে জীবিকা উপার্জন করা যুবতী-শিক্ষিতা নারীদিগেরও বিশেষ অপমানজনক অনেকের সে জ্ঞানই নাই। জগদ্বিখ্যাত লেখক Hall Caineএর

'The Woman thou gavest me', H. G. Wellsএর 'Ann Veronica', Victor Hugoর Les Miserablesএতে Fantineএর উপাখ্যান পড়িলে তাহা দেখিতে পাইবেন। অনেক সময়ে চরিত্রহীনতা আর্থিক উন্নতির সহায়ক হয়—সেইজন্য অনেকেরই পদস্খলন হয়। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে পাশ্চাত্যের বারবনিতাদের ভিতর অধিকাংশকেই অর্থকরী কর্ম্ম করিতে গিয়া ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। Havelock Ellis (See Psychology, of sex Vol. VI. 557 to 558) লিখিয়াছেন যে কলকারখানায় কর্ম্মকারিণী (Factory girls) বাড়ীর পরিচারিকা, দোকানে বিক্রয়কারিণী (Shopgirls) হোটেলাদিতে পরিচারিকা (waitresses) হইতে অধিকাংশ বারবনিতা আসে। যাহারা দরজীর কাজ করে তাহাদের অনেকেই যখন ব্যবসা ভাল না চলে তখন বেশ্যাবৃত্তি করে, অনেকে দুই কার্য্য একত্রেই করে। মুক্তি ফৌজের (Salvation army) খাতা হইতে প্রকাশ হইয়াছে যে লণ্ডন্ সহরের পশ্চিমাংশে যেখানে অধিকাংশ গরীবরা বাস করে সেখানে শতকরা ৮৮টি বেশ্যা চাকরাণী শ্রেণী হইতে আসিয়াছে। লণ্ডন সহরে ১৬০২২টি বেশ্যাদের ভিতর তদন্ত করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে যে ৫০৬১টি বেশ্যা আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, ৩৩৬৩টি দৈন্যের নিমিত্ত, ৩১৫৪টি প্রতারিত হইয়া, ১৬৩৬টি পুরুষরা বিবাহের প্রতিজ্ঞা করায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। The Great social Evil নামক পুস্তকে Logan সাহেব লিখিয়াছেন যে বেশ্যাদের ভিতর এক-চতুর্থাংশ পূর্ব্বে হোটেলাদিতে কর্ম্ম করিত—এক-চতুর্থাংশ কলকারখানায় কর্ম্ম করিত, এক-চতুর্থাংশ কুট্টনী দ্বারায় প্রতারিত, এক-চতুর্থাংশ কর্ম্মাভাবে, (তাহা কতক নিজেদের দোষে) আর বিবাহের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় বেশ্যাবৃত্তি করে। বার্লিন ও ভিয়ানা সহরের শতকরা ৫১টি ও ৫৮টি বেশ্যা চাকরাণী শ্রেণী হইতে আসিয়াছে। Havelock Ellis আরও লিখিয়াছেন যে অনেক শ্রমিক ও গরীব মধ্যবিত্তদের কন্যারা যে গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করে তাহা নিশ্চয়। Acton সাহেব On prostitution নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে অসংখ্য বৃটিশ নারী মধ্যে মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে। বেশ্যা হওয়ার প্রধান কারণ তাঁহার মতে কর্ম্মের অভাব ও পারিশ্রমিকের অল্পতা। আবার অনেকে মনে করেন যে চাকরী করিতে গিয়া ধনীদিগের ভোগাতিশয্য দেখিয়া প্রলোভিত হইয়াই অধিকাংশ এইরূপ বেশ্যাবৃত্তি করে। লালা লজপত রায় তাঁহার Unhappy India নামক পুস্তকে ১৮ অধ্যায়ে James marchant এর The master problem ও Dr. Blochএর Sexual life of our time, Glass of fashion ও অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য সমাজতত্ত্ববিৎদিগের লেখা হইতে দেখাইয়াছেন যে অধিকাংশ দোকানের বিক্রয়কারিণীদের গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়। অনেক সেবাসদন (nursing homes) স্নানাগার (baths) গা, হাত, পা টেপাইবার স্থান (massage establishment) নাচ ও গানের স্থান, থিয়েটার, মদের দোকান, হোটেল, গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তির স্থানের মধ্যেই গণ্য—সেখানে যে সকল তরুণীরা কার্য্য করে তাহাদের প্রকৃত কার্য্যই বেশ্যাবৃত্তি। * অনেক কর্ম্মপ্রার্থিণীদিগকে নানাপ্রকারে প্রলোভিত করিয়া,—ভয় দেখাইয়া,—বিপদগ্রস্তা করিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য করে বলিয়া ইংরাজ সরকার হইতে ইস্তাহার জারি করিয়া সাবধান করা হইয়াছিল যে যেন তরুণীরা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরী সন্ধান আপিস হইতে খবর পাইয়া,—বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া—চাকরী করিতে না যায়—অপরিচিত লোকের সহিত কথা না কহে—রবিবারের স্কুলে ও বাইবেল ক্লাসে অপরিচিতের আহ্বানে যোগ না দেয়—নিজের গন্তব্য পথ জিজ্ঞাসা না করে—কাহারও হঠাৎ বিপদের কথা শুনিয়া সাহায্য করিতে তাহার সহিত না যায়—ইত্যাদি † (যাঁহারা অবরোধ

* The Master Problem P. 186.

† The notification is quoted in extenso (see Ibid P. 188.)

Warning to Girls, Forewarned is Forearmed.

"Girls should never speak to strangers, either men or women, in the Street, in shops, in stations, in trains, in lonely country roads, or in places of amusement.

Girls should never ask the way of any but officials on duty, such as policemen, railway officials, or postmen,

Girls should never loiter or stand about alone in the Street and if accosted by a stranger (whether man

প্রথা দোষাবহ মনে করেন, তাঁহারা যেন তরুণীদিগের এই সকল বিপদের কথা মনে রাখেন)। তরুণীদিগের অর্থকরী কর্ম্ম করিতে যাওয়ায় পাশ্চাত্যেই ফল কিরূপ বিষময় হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিলাম। গরীবদেরই অর্থকরী কর্ম্ম করিবার আবশ্যক—পেটের দায়ে যখন যে কর্ম্ম করিবার সুবিধা পায়, তাহাই লইতে বাধ্য হয়—তাহার ভালমন্দ বিবেচনা করিবার অবসরই থাকে না—প্রতারকদিগের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিবার ক্ষমতাও তরুণীদিগের নাই—আমাদের দেশের অনেক বয়োবৃদ্ধদিগেরও নাই—আড়কাঠিদের দ্বারায় কুলি সংগ্রহের কাহিনী যেন স্মরণ থাকে—সুতরাং গরীব তরুণীদিগকে অর্থকরী কর্ম্ম করার প্রলোভন অধিকাংশ স্থলে কুট্টনিদিগের দ্বারায় প্রলোভন দেখাইয়া গৃহ হইতে বাহির করার প্রথম সোপান মাত্র হইয়া পড়ে। ইহাকেই 'নারীস্বত্বাধিকার' প্রসার বলিয়া সংস্কারকেরা আমাদের গৃহলক্ষ্মীদিগকে বোঝাইতেছেন!

পাশ্চাত্যের ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দোষে সকলকে নিজের নিজের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া অধিকাংশ লোকেরা বহুকাল—অনেকে চিরকাল বিবাহ করিতে পায় না—অধিকাংশেরই যৌবন উত্তীর্ণ হইয়া যায়; সুতরাং বহু নারীরা বহু কাল—অনেকে চিরকাল—অবিবাহিতা থাকে; সুতরাং পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থকরী কর্ম্ম করার নিগ্রহ ভুগিতে হয়—তজ্জন্যই তাহারা সকল অর্থকরী ও অন্যান্য কর্ম্ম পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় করিতে চাহিতেছেন—এবং ইহাই উন্নতির চিহ্ন—নারী স্বত্বাধিকার প্রসার বলিয়া ধরিয়া লইতেছি এখানে সেইরূপ করিতে অনেকে চাহিতেছেন। ইহার ফল কি হইতেছে ও হইয়াছে তাহা স্থির চিত্তে দেখিতে বলি। বহু অবিবাহিতা নারী এইরূপ অর্থকরী কর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে—Law of supply and demandএর নিমিত্ত—সকল কর্ম্মের পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায়। যত নারীরা এইরূপ কর্ম্ম করে তত পুরুষরা সেই সেই কর্ম্ম করিতে পায় না—তাহারা কর্ম্ম পাইলে হয় তো অনেকে বিবাহ করিয়া অন্ত কতকগুলি স্ত্রীলোককে অর্থকরী কর্ম্ম করিবার ফৈজয়তী হইতে অব্যাহতি দিতে পারিত—তাহা তাহারা পারে না—সুতরাং সেই সকল নারীরাও অর্থকরী কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং যত অধিক নারীরা অর্থকরী কর্ম্মে নামিতেছে তত বিবাহের সংখ্যা কমিতেছে—পাশ্চাত্যেই তাহাই হইতেছে—তাহা নারীদিগের পক্ষে ভাল কি মন্দ পরে আলোচনা করিব। এইরূপ বহু নারীরা বহুকাল অবিবাহিত থাকায় ও প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত অর্থকরী কর্ম্ম করায়—পুরুষ ও নারীদিগের ভিতর একটা রেশারিশি—একটা বিদ্বেষভাব উপস্থিত হয়—(যাহার অন্য গৌণ কারণও আছে)—যাহা পাশ্চাত্যে আসিয়াছে ও ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ইহা সকল নারীস্বত্বাধিকার প্রসারের নেতারাই স্বীকার করেন। এইরূপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত বহুকাল কর্ম্ম করায় তাহাদের স্ত্রীস্বভাবসুলভ কোমলতার পরিবর্ত্তে পুরুষসুলভ কাঠিন্য আসে—সহানু-

---

or woman) should walk as quickly as possible to the nearest policeman,

Girls should never stay to help a woman who apparently faints at their feet in the street, but should immediately call a policeman to her aid.

Girls should never accept an invitation to join Sunday School or Bible Class given them by strangers, even if they are wearing the dress of a sister or nun, or are in clerical dress.

Girls should never accept a lift offered by a stranger in a motor, or taxi-cab, or vehicle of any description,

Girls should never go to an address given them by a stranger, or enter any house, restaurant, or place of amusement on the invitation of a stranger,

Girls should never go with a stranger (even if dressed as a hospital nurse) or believe stories of their relatives' having suffered from an accident or being suddenly taken ill, as this is a common device to kidnap girls.

Girls should never accept sweets, food a glass of water, or smell flowers offered them by a stranger; neither should they buy scents or other articles at their door as so many things may contain drugs.

Girls should never take a situation through an advertisement or a stranger, or registry office either in England or abroad, without first making enquiries from the Society to which they belong.

Girls should never go to London or any large town for even one night without knowing of some safe lodging"

'The Woman thou gavest me', H. G. Wellsএর 'Ann Veronica', Victor Hugoর Les Miserablesএতে Fantineএর উপাখ্যান পড়িলে তাহা দেখিতে পাইবেন। অনেক সময়ে চরিত্রহীনতা আর্থিক উন্নতির সহায়ক হয়—সেইজন্য অনেকেরই পদস্খলন হয়। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে পাশ্চাত্যের বারবনিতাদের ভিতর অধিকাংশকেই অর্থকরী কর্ম্ম করিতে গিয়া ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। Havelock Ellis (See Psychology, of sex Vol. VI. 557 to 558) লিখিয়াছেন যে কলকারখানায় কর্ম্মকারিণী (Factory girls) বাড়ীর পরিচারিকা, দোকানে বিক্রয়কারিণী (Shopgirls) হোটেলাদিতে পরিচারিকা (waitresses) হইতে অধিকাংশ বারবনিতা আসে। যাহারা দরজীর কাজ করে তাহাদের অনেকেই যখন ব্যবসা ভাল না চলে তখন বেশ্যাবৃত্তি করে, অনেকে দুই কার্য্য একত্রেই করে। মুক্তি ফৌজের (Salvation army) খাতা হইতে প্রকাশ হইয়াছে যে লণ্ডন্ সহরের পশ্চিমাংশে যেখানে অধিকাংশ গরীবরা বাস করে সেখানে শতকরা ৮৮টি বেশ্যা চাকরাণী শ্রেণী হইতে আসিয়াছে। লণ্ডন সহরে ১৬০২২টি বেশ্যাদের ভিতর তদন্ত করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে যে ৫০৬১টি বেশ্যা আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, ৩৩৬৩টি দৈন্যের নিমিত্ত, ৩১৫৪টি প্রতারিত হইয়া, ১৬৩৬টি পুরুষরা বিবাহের প্রতিজ্ঞা করায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। The Great social Evil নামক পুস্তকে Logan সাহেব লিখিয়াছেন যে বেশ্যাদের ভিতর এক-চতুর্থাংশ পূর্ব্বে হোটেলাদিতে কর্ম্ম করিত—এক-চতুর্থাংশ কলকারখানায় কর্ম্ম করিত, এক-চতুর্থাংশ কুট্টনী দ্বারায় প্রতারিত, এক-চতুর্থাংশ কর্ম্মাভাবে, (তাহা কতক নিজেদের দোষে) আর বিবাহের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় বেশ্যাবৃত্তি করে। বার্লিন ও ভিয়ানা সহরের শতকরা ৫১টি ও ৫৮টি বেশ্যা চাকরাণী শ্রেণী হইতে আসিয়াছে। Havelock Ellis আরও লিখিয়াছেন যে অনেক শ্রমিক ও গরীব মধ্যবিত্তদের কন্যারা যে গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করে তাহা নিশ্চয়। Acton সাহেব On prostitution নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে অসংখ্য বৃটিশ নারী মধ্যে মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে। বেশ্যা হওয়ার প্রধান কারণ তাঁহার মতে কর্ম্মের অভাব ও পারিশ্রমিকের অল্পতা। আবার অনেকে মনে করেন যে চাকরী করিতে গিয়া ধনীদিগের ভোগাতিশয্য দেখিয়া প্রলোভিত হইয়াই অধিকাংশ এইরূপ বেশ্যাবৃত্তি করে। লালা লজপত রায় তাঁহার Unhappy India নামক পুস্তকে ১৮ অধ্যায়ে James marchant এর The master problem ও Dr. Blochএর Sexual life of our time, Glass of fashion ও অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য সমাজতত্ত্ববিৎদিগের লেখা হইতে দেখাইয়াছেন যে অধিকাংশ দোকানের বিক্রয়কারিণীদের গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়। অনেক সেবাসদন (nursing homes) স্নানাগার (baths) গা, হাত, পা টেপাইবার স্থান (massage establishment) নাচ ও গানের স্থান, থিয়েটার, মদের দোকান, হোটেল, গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তির স্থানের মধ্যেই গণ্য—সেখানে যে সকল তরুণীরা কার্য্য করে তাহাদের প্রকৃত কার্য্যই বেশ্যাবৃত্তি। * অনেক কর্ম্মপ্রার্থিণীদিগকে নানাপ্রকারে প্রলোভিত করিয়া,—ভয় দেখাইয়া,—বিপদগ্রস্তা করিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য করে বলিয়া ইংরাজ সরকার হইতে ইস্তাহার জারি করিয়া সাবধান করা হইয়াছিল যে যেন তরুণীরা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরী সন্ধান আপিস হইতে খবর পাইয়া,—বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া—চাকরী করিতে না যায়—অপরিচিত লোকের সহিত কথা না কহে—রবিবারের স্কুলে ও বাইবেল ক্লাসে অপরিচিতের আহ্বানে যোগ না দেয়—নিজের গন্তব্য পথ জিজ্ঞাসা না করে—কাহারও হঠাৎ বিপদের কথা শুনিয়া সাহায্য করিতে তাহার সহিত না যায়—ইত্যাদি † (যাঁহারা অবরোধ

* The Master Problem P. 186.

† The notification is quoted in extenso (see Ibid P. 188.)

Warning to Girls, Forewarned is Forearmed.

"Girls should never speak to strangers, either men or women, in the Street, in shops, in stations, in trains, in lonely country roads, or in places of amusement.

Girls should never ask the way of any but officials on duty, such as policemen, railway officials, or postmen,

Girls should never loiter or stand about alone in the Street and if accosted by a stranger (whether man

প্রথা দোষাবহ মনে করেন, তাঁহারা যেন তরুণীদিগের এই সকল বিপদের কথা মনে রাখেন)। তরুণীদিগের অর্থকরী কর্ম্ম করিতে যাওয়ায় পাশ্চাত্যেই ফল কিরূপ বিষময় হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিলাম। গরীবদেরই অর্থকরী কর্ম্ম করিবার আবশ্যক—পেটের দায়ে যখন যে কর্ম্ম করিবার সুবিধা পায়, তাহাই লইতে বাধ্য হয়—তাহার ভালমন্দ বিবেচনা করিবার অবসরই থাকে না—প্রতারকদিগের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিবার ক্ষমতাও তরুণীদিগের নাই—আমাদের দেশের অনেক বয়োবৃদ্ধদিগেরও নাই—আড়কাঠিদের দ্বারায় কুলি সংগ্রহের কাহিনী যেন স্মরণ থাকে—সুতরাং গরীব তরুণীদিগকে অর্থকরী কর্ম্ম করার প্রলোভন অধিকাংশ স্থলে কুট্টনিদিগের দ্বারায় প্রলোভন দেখাইয়া গৃহ হইতে বাহির করার প্রথম সোপান মাত্র হইয়া পড়ে। ইহাকেই 'নারীস্বত্বাধিকার' প্রসার বলিয়া সংস্কারকেরা আমাদের গৃহলক্ষ্মীদিগকে বোঝাইতেছেন!

পাশ্চাত্যের ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ গঠনের দোষে সকলকে নিজের নিজের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া অধিকাংশ লোকেরা বহুকাল—অনেকে চিরকাল বিবাহ করিতে পায় না—অধিকাংশেরই যৌবন উত্তীর্ণ হইয়া যায়; সুতরাং বহু নারীরা বহু কাল—অনেকে চিরকাল—অবিবাহিতা থাকে; সুতরাং পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থকরী কর্ম্ম করার নিগ্রহ ভুগিতে হয়—তজ্জন্যই তাহারা সকল অর্থকরী ও অন্যান্য কর্ম্ম পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় করিতে চাহিতেছেন—এবং ইহাই উন্নতির চিহ্ন—নারী স্বত্বাধিকার প্রসার বলিয়া ধরিয়া লইতেছি এখানে সেইরূপ করিতে অনেকে চাহিতেছেন। ইহার ফল কি হইতেছে ও হইয়াছে তাহা স্থির চিত্তে দেখিতে বলি। বহু অবিবাহিতা নারী এইরূপ অর্থকরী কর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে—Law of supply and demandএর নিমিত্ত—সকল কর্ম্মের পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায়। যত নারীরা এইরূপ কর্ম্ম করে তত পুরুষরা সেই সেই কর্ম্ম করিতে পায় না—তাহারা কর্ম্ম পাইলে হয় তো অনেকে বিবাহ করিয়া অন্ত কতকগুলি স্ত্রীলোককে অর্থকরী কর্ম্ম করিবার কৈফিয়তী হইতে অব্যাহতি দিতে পারিত—তাহা তাহারা পারে না—সুতরাং সেই সকল নারীরাও অর্থকরী কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং যত অধিক নারীরা অর্থকরী কর্ম্মে নামিতেছে তত বিবাহের সংখ্যা কমিতেছে—পাশ্চাত্যেই তাহাই হইতেছে—তাহা নারীদিগের পক্ষে ভাল কি মন্দ পরে আলোচনা করিব। এইরূপ বহু নারীরা বহুকাল অবিবাহিত থাকায় ও প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত অর্থকরী কর্ম্ম করায়—পুরুষ ও নারীদিগের ভিতর একটা রেশারিশি—একটা বিদ্বেষভাব উপস্থিত হয়—(যাহার অন্য গৌণ কারণও আছে)—যাহা পাশ্চাত্যে আসিয়াছে ও ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ইহা সকল নারীস্বত্বাধিকার প্রসারের নেতারাই স্বীকার করেন। এইরূপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদিগের সহিত বহুকাল কর্ম্ম করায় তাহাদের স্ত্রীস্বভাবসুলভ কোমলতার পরিবর্ত্তে পুরুষসুলভ কাঠিন্য আসে—সহানু-

---

or woman) should walk as quickly as possible to the nearest policeman,

Girls should never stay to help a woman who apparently faints at their feet in the street, but should immediately call a policeman to her aid.

Girls should never accept an invitation to join Sunday School or Bible Class given them by strangers, even if they are wearing the dress of a sister or nun, or are in clerical dress.

Girls should never accept a lift offered by a stranger in a motor, or taxi-cab, or vehicle of any description,

Girls should never go to an address given them by a stranger, or enter any house, restaurant, or place of amusement on the invitation of a stranger,

Girls should never go with a stranger (even if dressed as a hospital nurse) or believe stories of their relatives' having suffered from an accident or being suddenly taken ill, as this is a common device to kidnap girls.

Girls should never accept sweets, food a glass of water, or smell flowers offered them by a stranger; neither should they buy scents or other articles at their door as so many things may contain drugs.

Girls should never take a situation through an advertisement or a stranger, or registry office either in England or abroad, without first making enquiries from the Society to which they belong.

Girls should never go to London or any large town for even one night without knowing of some safe lodging".

ও বিবাহিত জীবনের ও গৃহস্থালী কর্ম্ম করিবার বহুকাল অভ্যাস অভাবে অনুপযুক্ত করিয়া তোলে—মাতৃত্বের ও গৃহস্থালী কর্ম্মে আর তাহারা সেরূপ সুখ পায় না—বরং কষ্ট হয়—অপরের সুখ সুবিধার নিমিত্ত নিজের সুখ সুবিধা বলি দিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা—যাহার উপর বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে—তাহাই কমিয়া যায়—সুতরাং বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা আনিতে অপারগ হইয়া পড়ে—তাহাদের বিবাহিত জীবন অশান্তিময় হয়—এইরূপ সাধারণতঃ হওয়া অপরিহার্য্য—পাশ্চাত্যে তাহাই হইতেছে। সেইজন্য বিবাহ বিচ্ছেদ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে এবং তাহাই নারীস্বত্বাধিকার প্রসার ও উন্নতির চিহ্ন তরুণ তরুণীরা ধরিয়া লইতেছেন। যদি অপত্য থাকে বিবাহ বিচ্ছেদে তাহাদের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় তাহা দেখিয়া মাতাদের কিরূপ কষ্ট হয় তাহা ভাবিতে বলি। নিজেরাই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন—প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন—কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; সেই সকল চূর্ণ হইয়া গেল—প্রেমাস্পদের কুব্যবহার অসহ্য হইল—গৃহ ভগ্ন হইল—আবার নূতন করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে—আবার হয় তো মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে—কত মনোমত স্থানে প্রত্যাখ্যানের অবমান নীরবে সহ্য করিতে হইবে। ইহা ভালবাসাপ্রবণ নারী হৃদয়ের কিরূপ মর্ম্মাঘাতী তাহা ঈষৎ কল্পনা সাহায্যে তরুণ তরুণীদিগকে ভাবিতে বলি এবং ইহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি তাহাদিগের স্বত্বাধিকার প্রসার বলা কত অসঙ্গত তাহাও ভাবিতে বলি। ইহা কেবল পাশ্চাত্য বিবাহ প্রণালীর দোষ ও বিফলতা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে। যাহারা কিছুদিন অর্থকরী কর্ম্ম করিয়া তাহাতে অভ্যস্তা হইয়াছে, একে তো তাহাদের গৃহস্থালী কর্ম্ম ভাল লাগে না, তাহাতে অর্থ সচ্ছলতার মোহে তাহারা বিবাহিতা হইয়াও অনেকে অর্থকরী কর্ম্ম করিতে থাকে। বিবাহিতারা অর্থকরী কর্ম্ম করায় প্রথমতঃ অবিবাহিতা নারীদিগেরও পুরুষদিগের যাহাদের অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়—পারিশ্রমিকের হার কম হয়—সুতরাং তাহাদের দুর্দ্দশা হয়—তাহাতে নারী সমষ্টির কোনরূপ মঙ্গল হয় না—ধনী [illegible]

বিবাহিতা নারীরা অর্থকরী কর্ম্ম করায় তাহাদের বিবাহিত জীবনও শান্তি ও প্রীতিদায়ী হয় না—অপত্য থাকিলে তাহাদেরও দুর্দ্দশা হয়। যখন দুই জনেই অর্থকরী কর্ম্মান্তে পরিশ্রান্ত, নানা ঝঞ্ঝাটগ্রস্ত ও বিরক্তি ভাবাপন্ন হইয়া গৃহে ফিরিবেন তখন কে কাহাকে, কখন, যত্ন, সেবা, ও সহানুভূতির শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া স্নিগ্ধ করিবেন? আর যদি আবশ্যক মত পরস্পরের যত্ন সেবা ও সহানুভূতি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিবাহের সাফল্য কোথায়? তখন তাহাদের গৃহ, আর গৃহ রহিল না—মেশে পরিণত হইল। এরূপ হওয়ায় সামান্য কলহও ভীষণ আকার ধারণ করে—অনেক সময়ে তাহার ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। অপত্যদেরও যত্ন সেবা ও আদর করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়—সুতরাং অপত্যরা পিতামাতার যত্ন, আদর, ভালবাসা ও শিক্ষা অতি অল্পই পায়—তাহাদের পিতামাতার প্রতিও ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা বিকশিত হইতে পায় না—সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে যখন পরের সেবা ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক হয়, তখন তাহারা অপত্যদের নিকট তাহা পাইতে পারে না—পাশ্চাত্যে পিতামাতারা এখনই পায় না—সুতরাং ভাড়াটিয়া সেবার উপর নির্ভর করিতে হয়—গরীবদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হয়—অধিকাংশ বৃদ্ধদিগকে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ করিতে হয়—সেই জন্য পাশ্চাত্যে বার্দ্ধক্য এত আতঙ্কজনক। ভালবাসার পাত্র যত নিকটে থাকে ও যত তাহাদিগকে সেবা ও যত্ন করিতে পাওয়া যায় ততই অধিক বিকশিত হয়। এইজন্য দেখা যায় মাতৃহীন শিশুকে যখন পিতা অধিক যত্ন ও সেবা করিতে বাধ্য হন, তখন পিতাও মাতার মতন অধিক স্নেহশীল হইয়া পড়েন। পিতামাতার অপত্য সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই তাহাদের প্রতি ভালবাসা বিকশিত হইতে পায় না—ভালবাসিয়া, তাহাদের যত্ন ও সেবা করিয়া যে সুখ আছে—তাহাতে জীবন যে সরস থাকে—তাহা হইতে বঞ্চিত হয়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপভোগ জিনিস—ভালবাসা—তাহারই প্রসারের পথ সঙ্কুচিত হয়। অপত্যদের জন্ম ও প্রতিপালন হইতেই পরার্থপরতা, সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি সকল সৎগুণেরই প্রকাশ ও বিকাশ হইয়াছে (১৩৩২ সালের মাঘমাসের [illegible]

এইরূপে পরার্থপরতা ভালবাসা ও সহানুভূতির বিকাশের পথ সঙ্কুচিত হওয়ার ফলেই স্বার্থপরতা নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা প্রকটভাব ধারণ করে—অর্থ ই জীবনের কাম্য হয় এবং তাহা পাইবার জন্য সকল সদ্বৃত্তি বলি দিতে লোকে বাধ্য হয়। Ellen Key যিনি নারী স্বত্বাধিকার প্রসারের একজন প্রধান ও চিন্তাশীলা নেতা বলিয়া স্বীকৃত—যাহার Love & marriage নামক পুস্তক সাত আটটি পাশ্চাত্য ভাষায় অনুদিত হইয়াছে তিনি লিখিয়াছেন যে বিবাহিতা নারীদের কর্ম্ম করার ফলে অবিবাহিতা নারীদের পারিশ্রমিকের হ্রাস হইয়াছে—তাহাদের সংসারের স্বচ্ছন্দতা দেখিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা লোপ হইয়াছে—তাহারা তাহাদের অসাবধানতাবশতঃ যাহা উপার্জ্জন করে তাহার অপেক্ষা অধিক লোকসান করে—অনেকের বন্ধ্যাত্ব হয়—তাহাদের শিশুমৃত্যু অধিক হয়—শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি হয়—বিবাহিত জীবনও ঘৃণ্য হয়—তাহাদের গৃহ আরাম ও শান্তিহীন হয়—মদ্য সেবন ও পাপের বৃদ্ধি হয়। ("These married women who are partly maintained by their husbands, have by their supplementary earning reduced the wages of self-supporting unmarried ones and when these in their turn are married, they lack the desire and the capacity to look after the home and waste through negligence more than they earn. The consequence of the outside employment of wives has further more been sterility, high infantile mortality and the degeneration of the surviving children both physically and psychically—a debased domestic life, with its consequences discomfort drunkenness and crime. (See Love & Marriage, ch. V, P. 169). বহু ধনী পাশ্চাত্যেই নারীদিগের অর্থকরী কর্ম্ম করার ফল এইরূপ বিষময় হইয়াছে—আমাদের এই গরীব দেশে নারীদিগকে অর্থকর কর্ম্ম করিতে দিলে—আমাদের সমাজ গঠন পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভাঙ্গিলে, নারীদিগের দুর্দ্দশা আরও কত ভীষণ হইতে বাধ্য তাহা পরে দেখাইবার চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্যেই যাহার ফল এত বিষময় হইয়াছে তাহাকে কিরূপ নারী স্বত্বাধিকার প্রসার বলা হয়—কোন আশায় সেইরূপ করিতে [illegible]

তো আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধিতে আসে না। নারীদিগের এইরূপ স্বত্বাধিকার গাভীদিগের ঘাড়ে জোয়াল তুলিয়া দিয়া খোলা মাঠে লাঙ্গল টানিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করার বা গাড়ী টানিয়া পৃথিবীর নানাস্থান বেড়াইবার ও দেখিবার স্বত্বাধিকার দেওয়ারই—ও তজ্জন্য অলঙ্কার স্বরূপ হয় তো গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে পাওয়ারই—অনুরূপ তাহাও কি আমরা দেখিব না? আমরা যৌথ পরিবার প্রথার দ্বারায় লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সকল নারীদিগকে তাহাদের পিতৃমাতৃকুল ও স্বামীর পিতৃমাতৃকুলের দ্বারায় আজীবন অবশ্য প্রতিপাল্য করিয়া—সকল পুরুষদিগকে বিবাহ করিবার আদেশ থাকায় প্রায় সকল অবলাদিগকে পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থকরী কর্ম্মের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলাম—সকল নারীদিগকে প্রথম যৌবন হইতে-ই—যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল থাকে—কাম উপভোগ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলাম—তজ্জন্য যাহাতে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে না হয়—তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলাম—নারীর নারীত্ব যাহাতে—নারীজীবনের প্রধান কার্য্য (function.) ও সার্থকতা যাহাতে—জীবন সরস রাখিবার প্রধান উৎস যাহাতে—সেই মাতৃত্ব, যাহাতে সকলে উপভোগ করিতে পায়—অপত্য প্রতিপালনে যৌথ পরিবারস্থ অন্যান্য স্ত্রী পুরুষের সাহায্য পাওয়াতে বিপদগ্রস্তা বা অধিক দুশ্চিন্তা-ভারগ্রস্তা না হইতে হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলাম—আমাদের গৃহে মাতার স্থান সকলের উচ্চে—অথচ পাশ্চাত্য পদাঙ্কানুসারী সংস্কারকরা আমাদিগকে নারী-নিগ্রহী বলেন—আর পাশ্চাত্যেরা যাহারা নারীদিগের প্রথম যৌবনের প্রকৃতিজ প্রেরণা ও উচ্ছ্বাস রুদ্ধ করিতে বাধ্য করে—বা উপভোগ করিতে গিয়া সংসারানভিজ্ঞা তরুণীদিগকে বিপদ সাগরে নিমজ্জিত করে—মনোমত তরুণদিগকে পাইবার নিমিত্ত অশেষ চেষ্টা করিতে বাধ্য করে—বহু অভীপ্সিত স্থলে বার বার প্রত্যাখ্যানের অবমাননার গুরুভার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গোপন করিতে বাধ্য করে—তজ্জন্য হৃদয় বিষময় করে—পুরুষদিগের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্যহানিকর শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুপযোগী অর্থকরী কর্ম্ম করার ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়িতে [illegible]

সহৃদয়তা, সেবাপরায়ণতা, পরার্থপরতা ক্রমে লীন করিয়া দেয় ও গৃহস্থালী কর্ম্ম করিবার অনুপযুক্ত করিয়া তোলে—মাতৃত্বের অঙ্গ সকল ও তৎযুক্ত স্নায়ু ও স্নায়ুগ্রন্থি সকল বহু-কাল ব্যবহারাভাবে শুষ্ক করিয়া জগজ্জননীরূপিণী জগদ্ধাত্রীরূপিণী নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে—তাহাই তাহাদের "উন্নত" সমাজ যন্ত্রে পিষিয়া নিষ্কাশিত করে ও মাতৃত্ব নিরোধকারী উপায় অবলম্বন করিয়া পুরুষদিগের কাম-সহচরী ও চিত্তবিনোদিনী সখী হইয়া নারী-জীবন সার্থক করিতে বলে ও বাধ্য করে—নারীর নারীত্ব বর্জ্জন করাইয়া নকল পুরুষ সাজায়—যাহারা বিবাহ করিতে পায়, তাহাদেরও অধিকাংশকেই অমনঃপূত স্থানে বিবাহ করিতে বাধ্য করে—(পরে দেখিবেন যে পাশ্চাত্যে শতকরা ৭৫টির উপর বিবাহ অর্থের বা অন্য সংসারিক সুবিধার জন্যই হইয়া থাকে—তরুণীদিগের কাম্য প্রেম-পরিণয় নহে); ও যাহাদের অধিকাংশের বিবাহিত জীবন অশান্তিগ্রস্ত—বিবাহ-বিচ্ছেদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত—যাহাদের অনেক নারীদিগকে গুপ্ত বেশ্যাবৃত্তি করিতে হয়—যাহাদের গৃহে কাম-সহচরী নারী (ও অপ্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যা) ভিন্ন কেহ—এমন কি মাতাও গৃহে স্থান পায় না—বৃদ্ধ বয়সে প্রায় সকল নারীদিগকে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ করাইয়া প্রিয়জন বিরহিত বৈতনিক বা অবৈতনিক সেবাসদনে পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় লইতে বাধ্য করায়—তাহারাই "অবলা বান্ধব" "নারী স্বত্বাধিকার প্রসারক" পাশ্চাত্যেরা বোঝাইতেছেন—আর আমাদের "শিক্ষিত" সম্প্রদায় তাহাদের চিরাভ্যস্ত প্রথামত তাহাই নতশিরে মানিয়া লইতেছেন—আমাদের সমাজ গঠন ভাঙ্গিয়া পাশ্চাত্যদের অবিকল নকল করিয়া তাহাদের মতন "উন্নত" "নারীপূজক" সমাজ গঠন করিতে বদ্ধপরিকর; আর আমাদের "শিক্ষিতা" নারীরা পাশ্চাত্যের দৃষ্টি-মনোহর সমাজ গঠনের প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া মরিবার স্বাধীনতা পাইতে উদ্‌গ্রীব! হা, সর্ব্বদর্শী ভগবান! আমাদের এ সখের গোলামীর শেষ পরিণতি কোথায় !!

ত্রিযামার দিগ্বিজয়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(ALLEGORY)

বাজিল দামামা—"যাবে কে গো নিরুদ্দেশ-পথে ?— অজানার দিগ্বিজয় তরে ?"
সাড়া দিল কত রথী দেশ দেশান্তর হ'তে কম্পিত অনামা আশা ভরে!
বাহিরিল রাজবর্ত্মে মর্ম্মতলে স্বপ্ন রচি',— নমি' সেনানীরে পুরোভাগে—
নিস্তল নয়ন যাঁর নক্ষত্রের নিমন্ত্রণ! প্রাণে তার দীপ্তি এসে লাগে!

চলে···চলে···তুরঙ্গমী··· ঢাকে দিক্‌-চক্রবাল লক্ষ-ক্ষুরোৎকীর্ণ-ধূলিধূমে···
"অজানার আবাহন!!"— উল্লাস-গরবে তারা ধূলিকারে পূর্ব্বরাগে চুমে।···

ক্রমে স্বপ্নসভা ছাড়ি পথ ব্যাপ্তি হেরে আঁখি··· কেহ কহে: "আর কত দূর ?"
"যাত্রা কেন মন্দাক্রান্তা ?"— পুছে কেহ, কেহ কহে: "শুনি কই পথান্তের সুর ?"

বাহিনীপতির মৌন সান্দ্র বৈজয়ন্তী ভাতি শ্রান্তি গ্লানি স্পর্শিতে না পারে,

বহু লুব্ধ এসেছিল··· কেহ প্রার্থি' মুক্তা মণি কেহ যাচি' কীর্ত্তি উগ্রতপা,
কেহ পূর্ণ রাজ্য, কেহ— অর্দ্ধেক রাজত্ব সাথে রাজকন্যা অলোকসম্ভবা।
রহে তারা পিছে পড়ি'··· নায়ক চাহে না ফিরে··· দৃষ্টি তার দূর অনাগতে···
বিশ্রব্ধ স্বপনী সঙ্গী সাথে ল'য়ে কতিপয় চলে···চলে···নিরুদ্দেশ-রথে।

অগণন গুপ্ত অরি ত্যজে লক্ষ গুপ্ত বাণ; বিষদিগ্ধ শিলীমুখ ঘুরে
অন্তরীক্ষে···জলে···স্থলে; বাধা অনীকিনী চাহে লক্ষ্যেরে ঠেলিতে শুধু—দূরে।

সে-অদৃশ্য-শরাহত দুর্ব্বল পদাতি এক নিরুৎসাহ লয় যেন মানি';
ধূসরিমা সাথে তার হৃদয়ে বিক্ষুব লুটে··· ভুলে সূর্য্য-দুন্দুভির বাণী।
"অজানার অভিসার? কেন?"—বুঝে না সে—তবু কণ্ঠভরা জাগে তারি তৃষা,
প্রান্তের বৈদূর্য্য-তূর্য্য সায়াহ্নে অনচ্ছ কেন?— ভাবিয়া না পায় তার দিশা!
কার পানে ধায় তারা? দিশারীর আঁখি শুধু কহে: "ত্রিযামার দিগ্বিজয়ে।"
ত্রিযামা?—পরাণ কাঁপে! অরূপ সার্থক তবে নহে কি রূপেরি পরিচয়ে?

দ্বন্দ্বের শ্রীহীন জ্বরে বসে এক বৃক্ষতলে; সহসা কে মর্ম্মরিয়া উঠে?
—"চিন্তাকুল কেন পান্থ?" কহে তরু স্নেহানত। —"সংশয়ে"—সৈনিক মুখে ফুটে।
—"চিনি সে প্রচ্ছন্ন দৈত্যে, আমারেও একদিন দহিত সে তুষের দাহনে।"
—"কোন্ শান্তিজলে তারে নিভাইলে বল বল— বড় তৃষ্ণা বহি আরাধনে!"
—"রহি' শুধু ঊর্দ্ধপাণি নীলিমায় মাল্য দানি' পথান্ত ভরসা বুকে ধরি'।"
—"সে ভরসা যদি হায়! দিনান্তে ডুবিয়া যায়?"— "রহি প্রাণ-দেবতারে স্মরি',
"জপি'—যাহা অন্তর্লীন মগ্নছন্দে বাজে আজি মুঞ্জিবে চেতনে একদিন।"
—"হায় কোথা সে-চেতন? কোথায় দেবতা বন্ধু? কোথা বাজে তব মগ্ন বীণ?"
—"অণু হ'তে অণু হৃদে কুহেলি-মঞ্জীরে বাজে কবি-হৃদে বাজে স্বপ্ন-দলে;
"ঋষি হৃদে শ্রুতি ছন্দে বাজে জাগরণে—যাহে কল্পলোক নামে চলাচলে।"
—"কেমনে শুনিলে তারে কহ সেই ইতিহাস।" —"পাতি' কান দীপ্র ত্রিযামায়।"
—"হায়! তুমিও কি বন্ধু, প্রহেলিকা বাসো ভালো?— নহে দীপ্র কহ তমসায়?
—"ত্রিযামা তামসী!!—তার দেখেছ স্বরূপ কভু?" —"স্বরূপ?—না, তবে—" ক্রম কহে:
—"তবে পান্থ তার কাছে শুন—যে দেখেছে তারে— তার মাধ্বীধারা বুকে বহে।"

"উষালোকে ফুটে যাহা বীজ রস উপ্ত তার ত্রিযামারই মর্ম্মকোষ-মাঝে।
"সাঙ্গহীন ফেনপুঞ্জ বুদ্বুদের আস্ফালন ত্রিযামারই বিস্ফারণে নাচে।
"অসহ্য অনল-অব্ধি ব্রহ্মাণ্ডে তরঙ্গায়িত ত্রিযামারই বিচ্ছুরণে শুধু।
"ত্রিযামারই বহ্নি বাণী শুনি' ব্যোম তারাঙ্কিত পুষ্পাঙ্কিত পৃথ্বীপীঠ ধূ ধূ!
"রূপায়ন-পারাবারে সংক্ষুব্ধ বাসনা ঝড়ে ঊর্দ্মিবুকে জাগে আচম্বিতে
"লক্ষ শান্তি-মণিহারা লিপ্সাফণী—হয় তারা মন্ত্রশান্ত—ত্রিযামা-ইঙ্গিতে।

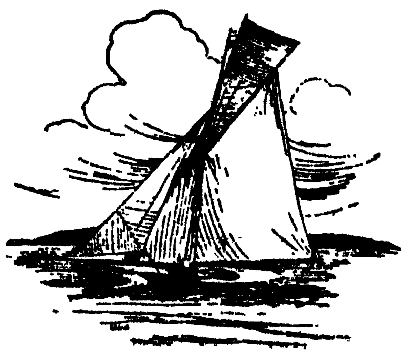
"করাল দানবী চমূ প্রেমের সঙ্গীত-সন্ম উৎসাদিত করে হাহাকারে,
"সে-ক্ষণে ত্রিযামা সেই শ্মশানে নন্দন রচে মৃত সঞ্জীবনী সুধাসারে।

"যে-স্তোম বাহিরে মন্দ্রে স্বরিত উদাত্ত ছন্দে পল্লবিয়া সুষমা অতুল,
"উৎস তার নাহি রাজে উর্দ্ধায়িত স্বরগামে,— পাতাল-সাম্রাজ্যে তার মূল।
"ত্রিযামা-সম্রাজ্ঞী একা শাসে সে অলখ-রাজ্য ধরি নিত্য নব ছদ্ম বেশ ;
"শব্দহারা রাজ্যদণ্ডে নিয়ন্ত্রে স্তনিত সৃষ্টি নামরূপ ঝঙ্কারি অশেষ।

"প্রবাহে সে জ্যোতিষ্পথে কোটি জ্যোতি-উর্ণাজাল প্রতি উর্ণা কোটি স্পন্দ বহে,
"প্রতি স্পন্দ বেড়ি' কোটি রূপের নিগড়ে—একা ত্রিযামা-উর্ণায়ু মুক্ত রহে।
"সংখ্যাহারা লূতাতন্তু কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে বিদ্যুত্বান্ জলদ্-গর্জ্জনে ;
"ত্রিযামা সে-বজ্রদোল করে উপশান্ত হাসি' মুহূর্ত্তের তর্জ্জনী-হেলনে।

স্ফুরদ্-বিলীয়মান সীমাহীন সমারোহে ধায় কোটি ভঙ্গিমা মুখরা
"নটরঙ্গে ;—কেন্দ্রে তার বিরাজে ত্রিযামা একা নটেশ্বরী নিসন্দী নির্জ্জরা।
"আসঙ্গে যে আত্মহারা, বহিরঙ্গ বিশ্বোৎসবে অপ্রমত্ত রহিতে না চায়
"তারে না ত্রিযামা চাহে যে না বরে লীলোৎসবে অন্তরের অন্তঃপুরিকায়।
"অনাসক্ত দিগ্বিজয়ে পাঠায় সে যাহাদের— পড়ে তারা বাঁধা নিজ জালে—
"কল্লোলে সমাধি রচি', সিংহনাদে নাহি শুনি' ছায়াশঙ্খ আলো-অন্তরালে।
"সে-আহ্বান শুনে যে-ই শব্দ-ভ্রান্ত নাহি হয় ত্রিযামা-শঙ্কায় নাহি কাঁপে ;
"শুনে না যে—হয় সে-ই হৃতধ্বজ মন্ত্রহারা, প্রাণ-মধ্যমণি মুখ ঝাঁপে।

প্রোল্লোল মর্ম্মরে তাই গণি না চরম বন্ধ, প্রার্থি বর্ণ-রলরোল-পারে
"হেরিতে সে নিরঞ্জনা নিখিল-বিজয়-মন্ত্রা দিবা-উৎসারিণী ত্রিযামারে।"



ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"উতার"

যখন পরস্পরে বাঁ হাত ঘাড়ে রাখিয়া দাঁড়ায়, তখন যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে নিজের ডান হাতের পুরবাহু দিয়া তাহার বাঁ কনুইয়ের কাছে ধাক্কা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া তাহার ঘাড়টী নিজের বাঁ দিকে টানিয়া, ঘুরিয়া পিছনে যাওয়া বা নিচে আনাকে "উতার" বা "লোকান" বলে। পিছনে যাইয়া বাঁ পা-টী সঙ্গে সঙ্গে পিছাইয়া লইতে হয় (চিত্র "উতার বা লোকান")।

"টাং"

(ক) যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটী তাহার ডান গুলির উপর দিয়া লইয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া, বাঁ পা-টী তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া উরতের উপরে নিজের উরতের পিছনটী লাগাইয়া জোরে পিছনে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্‌নে শরীরের ঝোঁক দিতে দিতে একটু ডান দিকে ঘুরিয়া নিচু হইয়া চিৎ করাকে "টাং" বলে। তাহার বাঁ কনুইটী ডান হাত দিয়া ধরিয়া টানিলে প্যাঁচটী আরো সহজ হয়। (চিত্র "ক-টাং")

(খ) বাঁ পা টী তাহার পায়ের মধ্য দিয়া না লইয়া গিয়া, দুই পায়ের বাহির দিক দিয়া লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে শরীরের ও হাতের কাজ করিয়া জোর দিয়া চিৎ করাকেও "টাং" বলে। (চিত্র "খ-টাং")

(গ) যখন পরস্পরে বাঁ হাত ঘাড়ে রাখিয়া দাঁড়ায়,





তখন যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ কব্জীটা ধরিয়া ও বাঁ পা-টী তাহার ছই পায়ের মধ্য দিয়া

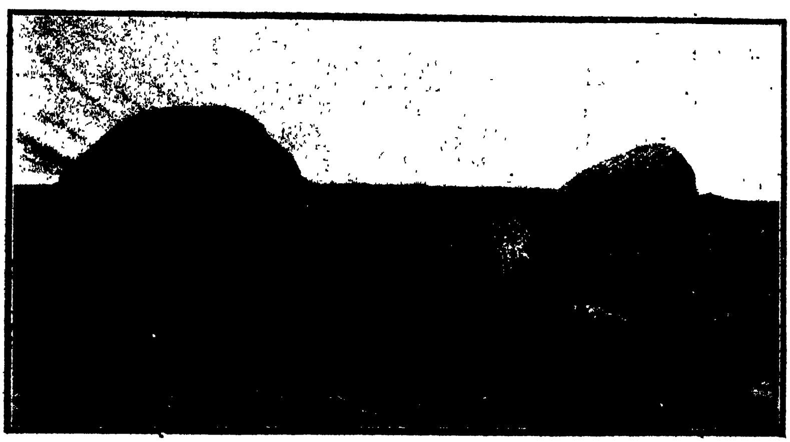


ধবি পট ১ম

লইয়া গিয়া, উরতের উপরে নিজের উরতের পিছনটী লাগাইয়া জোরে পিছনে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্‌নে শরীরের ঝোঁক দিতে দিতে একটু ডান দিকে ঘুরিয়া তাহার ঘাড়টী টানিয়া নিচু করিয়া চিৎ করাকেও "টাং" বলে।



"উতার বা লোকান"



ধবি পট ২য়

"ঢাক"

(ক) যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটি তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া, অপর কাঁধটী জোরে ধরিবার (কিংবা বাঁ হাত দিয়া তাহার গলাটী জড়াইয়া ধরিবার) সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটি তাহার কোমরে লাগাইয়া জোরে সাম্‌নে ঝোঁক দিয়া কোমরটা নিচু করিতে হয়। তবে ফেলিবার সময় তাহার শরীরটী যেন নিজের কোমরের উপর দিয়া যাইয়া পড়ে। এইরূপ প্যাচে চিৎ করাকে "ঢাক" বলে। তাহার বাঁ কব্জীটী ডান হাত দিয়া ধরিয়া টানিলে প্যাচটী আরো সহজ হয়। (চিত্র "ঢাক")

(খ) দুই হাত তাহার দুই বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে কোমরের কাজ করিয়া চিৎ করাকেও "ঢাক" বলে। কোন কোন দেশে এই প্যাচটিকে "দো-দস্তি ঢাক" বলে (চিত্র—"দো-দস্তি-ঢাক")।

"ঢাক-বাহাল্লী"

ঠিক "ঢাক" প্যাচের ন্যায় যদি অপরের বা পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটা তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া অপর কাঁধটী জোরে ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া কোমরের পিছনটী তাহার কোমরে লাগাইয়া জোরে সাম্‌নে ঝোঁক দিয়া কোমরটা নিচু করিবার সময় ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ কনুইয়ের কাছে ধরিয়া টানিয়া চিৎ করাকে "ঢাক বাহাল্লী" বলে।



"ঢাক"



ঢাক "বাহাল্লী"

হাতটী তাহার বগলের মধ্য দিয়া না লইয়া গিয়া গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে কোমরের কাজ করিয়া চিৎ করাকেও "ঢাক—বাহাল্লী" বলে (চিত্র-"ঢাক-বাহাল্লী")।

"কুল্লা"

যদি অপরের বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটী তাহার কোমরের ডান ধার দিয়া লইয়া গিয়া লেঙ্গটের পিছনের বাঁ দিকটা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া

ঠিক "ঢাক-বাহাল্লী" প্যাঁচের ন্যায় কোমরের পিছনটা তাহার কোমরে লাগাইয়া তাহার শরীরটা জোরের সহিত একটু তুলিয়া লইয়া জোরে সাম্‌নে ঝোঁক দিয়া কোমরটা নিচু করিবার সময় ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ কনুইয়ের কাছে কিংবা মাথাটা ধরিয়া টানিয়া চিৎ করাকে "কুল্লা" বলে (চিত্র—"কুল্লা")।



"কুল্লা"

"ধবিপট"

অপরের পাঁয়তারা দেখিয়া, যদি তাহার ডান পাঁয়তারা থাকে, তবে তাহার বাঁ কনুইটা ডান হাত দিয়া ধরিয়া লইয়া বাঁ পা-টা তাহার বাঁ দিকে আগাইয়া দিয়া, নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া আসিয়া বাঁ কাৎটা তাহার বাঁ বগলের নিচে ও কোমরটা তাহার কোমরে লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ মোড়াটা চাপিয়া ধরিয়া জোরে সাম্‌নে ঝোঁক দিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চিৎ করাকে "ধবিপট" বলে (চিত্র— "ধবিপট ১ম," "ধবিপট ২য়")।*



"দো-দস্তি ঢাক"

* ভ্রম সংশোধন।

বিগত কার্ত্তিক মাসে এই প্রবন্ধের কিছু অংশ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে ছাপার কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। আশা করি পাঠকগণ সংশোধন করিয়া পড়িবেন।

" ক-বাহাল্লী-১ম" হইবে পৃ ৭২৬ চিত্রের নিম্নে "বাহাল্লী-১ম" স্থানে

পৃঃ	৭২৩	চিত্রের নিম্নে	"দস্তি-১ম"	স্থানে	"খ দস্তি-১ম" হইবে
ঐ	৭২৫	ঐ	"দস্তি-১ম"	ঐ	"চাপরাস" হইবে
ঐ	ঐ	ঐ	"বাহাল্লী-২য়"	ঐ	"ক-বাহাল্লী-২য়" হইবে
ঐ	ঐ	ঐ	"ক-১ম লোকান"	ঐ	"নিকাল-১ম" হইবে
ঐ	৭২৬	ঐ	"দস্তি-১ম"	ঐ	"ক-দস্তি-১ম" হইবে
ঐ	ঐ	ঐ	"পট"	ঐ	"পট-১ম" হইবে
ঐ	৭২৭	ঐ	"দস্তি-২য়"	ঐ	"ক-দস্তি-২য়" হইবে
ঐ	৭২৮	ঐ	"বাহাল্লী-১ম"	ঐ	"খ-বাহাল্লী-১ম" হইবে
ঐ	ঐ	ঐ	"ক- ২য়-লোকান"	ঐ	"নিকাল-২য়" হইবে
ঐ	৭৩০	লেখায়	"এক-পট-টা"	ঐ	"এক-পট-টাং" হইবে
ঐ	৭৩১	ঐ	"লোকান"	ঐ	"নিকাল" হইবে
ঐ	৭১৮	চিত্রের নিম্নে	"দস্তি-২য়"	ঐ	"খ-দস্তি-২য়" হইবে

বদ্‌লি মঞ্জুর

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছোট একটি ব্র্যাঞ্চ্-লাইন। এক জংসন্-ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া আর-এক জংসন-ষ্টেশনে গিয়া মিশিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কয়েকটি ষ্টেশন।

তা লাইনের সব-কয়টি ষ্টেশনই দেখিতে প্রায় একরকম। পয়েণ্টিং-করা লাল ইঁটের তৈরি ছোট্ট একখানি ঘর, সুমুখে একটুখানি ঢাকা বারান্দা, বারান্দার এক পাশে কাঠের বেঞ্চি পাতা, তাহার পাশেই ওজন করিবার লোহার যন্ত্র, জানালার গায়ে টিকিট কিনিবার ঘুল্‌ঘুলি।

ভিতরে একটি টেবিলের উপর টেলিগ্রাফের যন্ত্র সাজানো। যিনি টেলিগ্রাফ্ করেন, তাঁহাকেই টিকিট দিতে হয়, তিনিই ষ্টেশন-মাষ্টার,—তিনিই সব। এ্যাসিষ্টেণ্টের বালাই এ-লাইনে নাই। এ্যাসিষ্টেণ্ট্ বলিতে একজন খালাসী। ষ্টেশনেও কাজ করে, আবার মাষ্টারের বাড়ীর কাজও করিয়া দেয়। মাষ্টারের চাকর রাখার খরচটা অন্তত বাঁচে।

মন্দ নয়।

ষ্টেশন-মাষ্টার এইচ্, পি, ব্যানার্জ্জি। আসল নাম—হরিপদ। মাহিনা বাহাত্তোর টাকা। সুখে-স্বচ্ছন্দেই সংসার চলে। ষ্টেশনের কাছেই ঠিক তেমনি পয়েণ্টিং-করা ইঁটের তৈরি দু'খানি ঘরের একটি কোয়াটারে—হরিপদ-মাষ্টারের সংসার। সংসার বলিতে একমাত্র তাহার স্ত্রী—বীণাপাণি। ছেলেপুলে নাই, একা মানুষ,—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট্।

বীণার কাজকর্ম্ম একরকম নাই বলিলেই হয়। ইন্দারা হইতে রামধনিয়া-খালাসী জল আনিয়া দেয়, তাহার স্ত্রী লছ্‌মীর কল্যাণে ঘর ঝাঁট দিতে হয় না, বাসন মাজিতে হয় না,—শুধু দু'বেলা দু'টি রান্না।

আছে একরকম ভালই, কষ্টের মধ্যে শুধু সে নিঃসঙ্গ, একাকিনী। এখানে আসিবার পূর্ব্বে বীণা ছিল এক পল্লীগ্রামে—তাহার মামার বাড়ীতে। সেখান হইতে আসিয়া অবধি কোথাও যাওয়া তাহার আর একটিবারের জন্যও ঘটিয়া ওঠে নাই। মনে হয়, এই আট বৎসর ধরিয়া সে যেন এই ছোট্ট খাঁচাটির মধ্যে বন্দিনী হইয়া আছে। আশে-পাশে এমন কেহ নাই যে, ডাকিয়া দুটা কথা কয়; উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে শুধু ওই খাঁচার মত ছোট ঘরখানি,—এত অপরিসর যে, দুদণ্ড নড়িয়া-চড়িয়া ছুটিয়া-খেলিয়া বেড়াইবারও উপায় নাই,—এক লছ্‌মীর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কথা কহিতে তাহার ভালও লাগে না।

হরিপদ খাইবার সময় বাসায় আসে। স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া খাইতে বসিলে, পাখা হাতে লইয়া বীণা তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলে, 'হ্যাঁগা, আর কতদিন? এখান থেকে তোমার বদ্‌লি কি আর হবে না ছাই?'

হরিপদর সেই এক জবাব।

বলে, 'কই আর হয়!'

বলে, 'কেন, জায়গাটা তেমন মন্দ ত' নয়! সব জিনিসই সস্তা। তরি-তরকারি ত' একরকম কিনতেই হয় না, তা ছাড়া কাল থেকে আধসের করে' দুধের বন্দোবস্ত করেছি, খাঁটি দুধ,—একবারে বিনি-পয়সায়।'

বলিয়া একটুখানি গর্ব্বের হাসি হাসিয়া হরিপদ তাহার মুখের পানে তাকায়। ভাবে হয় ত বীণা তাহার এই বুদ্ধিমত্তার তারিফ্ করিবে। কিন্তু তারিফ্ করা দূরে থাক্, হাতের পাখা তখন তাহার অত্যন্ত মৃদু গতিতে চলিতে থাকে, হেঁট্‌মুখে বুকের আঁচলের পা'ড়টা সে বাঁ হাত দিয়া টানিয়া টানিয়া সোজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, মনে হয়, কথাটায় যেন সে কানই দেয় নাই।

হরিপদ কিন্তু না শুনাইয়া তৃপ্তি পায় না, বলে, 'ওইখানে ওই জান্‌লায় দাঁড়ালে বাইরে দক্ষিণ দিকে উ-ই যে ওই গাছপালায়-ঢাকা গাঁ'টা দেখা যায়, ওই গাঁ থেকে চাষাদের আর গয়লাদের ছেলেগুলো সব লাইনের ধারে গরু চরাতে আসে। কচি-কচি অমন ঘাস ত' আর কোথাও পাবে না। রামধনিয়াকে দিয়ে গরুগুলো কাল আটক্ করেছিলাম। বললাম, খবরদার বেটারা, ওই একটা গরু কি বাছুর কোনোদিন যদি লাইনের ওপর কাটা পড়ে ত' হাজার টাকা জরিমানা—একেবারে ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারা ত' কেঁদেই অস্থির! বলে, গাঁয়ে

আর কারও বাড়ী এক আঁটি খড় নাই হুজুর, গরু চরাবার 'বাথান্' নাই, ছেড়ে দিলেই পেটের জ্বালায় হাঁ-হাঁ করে' লোকের ফসলে গিয়ে মুখ দেয়, এই লাইনের ধার ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই হুজুর। বললাম, আমি যে চরাবার হুকুম তোদের দেবো, তাতে আমার লাভ? রামধনিয়া একসের বলেছিল, কিন্তু একসের আর হলো না, শেষে আধসের করে' খাঁটি দুধ, ঠিক হলো যে, ওরা নিজেরাই এসে' কাল থেকে পৌঁছে দেবে।'

বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার বলে, 'কেমন, ভাল হয়নি?'

হাসিয়া একবার ঘাড় নাড়িয়া বীণা নীরবে সে কথার জবাব দেয়।

কিন্তু অমন বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া করিয়া খাইতে গেলে ত' হরিপদর চলে না।

রামধনিয়া ছুটিয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া বলে, 'বাবু, টেলিগিরাপ্...'

বাস্! সেদিনের মত হরিপদর খাওয়া ওই খানেই শেষ।

হাতে জল ঢালিয়া দিয়া পান আনিয়া যে বীণা তাহার হাতে দিবে তাহারও অবসর নাই।

'পান ওই রামধনির হাতে দিও।' বলিয়া হন্তদন্ত হইয়া হরিপদ ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

আবার কখন্ ফিরিবে কে জানে।

বীণা তাহার জানালার কাছটিতে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। প্যাসেঞ্জার ট্রেণ হুস্ হুস্ করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়ায়। কোনোটা বা এই দিক্ দিয়া, কোনোটা বা ওই দিক দিয়া। কিন্তু যেদিক দিয়াই হোক, তাহার এই জানালাটির পাশ দিয়া সকলকেই পার হইতে হয়। এই ট্রেণে চড়িয়াই সেই যে আট বৎসর আগে সে এইখানে আসিয়া নামিয়াছে, তাহার পর আর কোনোদিনই তাহাকে ট্রেণে চড়িতে হয় নাই। ট্রেণ দেখিতে তাহার বড় ভাল লাগে। জানালার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া ট্রেণের যাত্রীরা তাহারই দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া চোখের সুমুখ দিয়া পার হইয়া যায়। বীণার দুটি ব্যথিত ম্লান ব্যগ্র ব্যাকুল চক্ষু পরম ঔৎসুক্য-ভরে তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। কোনোদিন হয় ত বা একটি মুখের চেহারা সে সারাদিন মনে করিয়া রাখে, আবার কোনোদিন-বা সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, মনে করিয়া রাখিবার মত একখানি মুখও তাহার নজরে পড়ে না।

ট্রেণ চলিয়া যায়। বীণা দেখে, দিগন্তবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর, এদিকে ধানের মাঠ, ওদিকে ওই মাঠের মাঝখানে গাছপালায়-ঢাকা ছোট্ট একখানি গ্রাম,—দূরে—বহুদূরে, মাঠ প্রান্তর পার হইয়া গিয়া অস্পষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর মাথার উপরে নীল আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দিনের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে, বীণার চোখের সুমুখে তাহার ওই সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত খণ্ড-পৃথিবীটির রং বদ্‌লায়।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রতাপে দেখে, চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, মাঠের মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেছে, দূরে শুধু শুষ্ক প্রান্তরের মাঝখানে পত্রহীন কয়েকটি পলাশের গাছে রক্ত-রাঙা পুষ্পের সমারোহ! বৈকালের দিকে পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার করিয়া কাল বৈশাখীর কালো মেঘ দেখা যায়, মাঠের ধূলা উড়াইয়া ঘূর্ণীবায়ু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহার পর কোনোদিন-বা বৃষ্টি নামে, কোনোদিন-বা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু করে।

দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসে। দিবারাত্রি ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে। নিদাঘ-তপ্ত তৃষিত ধরিত্রী যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচে। বীণা তাহার সেই ছোট্ট জানালার পাশে তখনও বসিয়া থাকে,—দেখে, বহুদূর হইতে বৃষ্টির ধারা ঝম্ ঝম্ করিয়া তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে, চোখে-মুখে তাহার বৃষ্টির ঝাপটা আসিয়া লাগে, তবু সে কোথাও উঠিয়া যায় না। তাহারও তৃষিত আত্মা যেন অজ্ঞাতে বর্ষণ কামনা করে। এদিকের দরজার ফাঁকে ঘন-ঘন ষ্টেশনের দিকে তাকায়, স্বামী তাহার কাজ করিতেছে, কখন্ যে আসিবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। মাঠ-ঘাট সব জলে ভরিয়া যায়, দুপুরে দূরের গ্রাম হইতে জালি কাঁধে লইয়া লাইনের ধারের ডোবায় বাগ্‌দীর মেয়েরা মাছ ধরিতে আসে, ধানের মাঠে চাষীদের নিড়ান্ চলে, সূর্য্যাস্ত হইতে না হইতেই কড়্ কড়্ করিয়া ব্যাঙের ডাক সুরু হয়।

তাহার পর শরতের নির্ম্মল আকাশে চাঁদ ওঠে। জ্যোৎস্নার আলোয় সবুজ ধানের মাঠের উপর দিয়া

বাতাস বহিয়া যায়। রোমাঞ্চিত শস্যক্ষেত্রের শিহরণ যেন বীণার দেহে আসিয়া লাগে।

দেখিতে দেখিতে সবুজ ধানের মাঠ হলুদ হইয়া ওঠে। উত্তর দিক হইতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বয়। বীণা তখনও তাহার সেই ক্ষুদ্র বাতায়নপার্শ্বের নির্দ্দিষ্ট স্থানটি পরিত্যাগ করে না, গায়ে কাপড় জড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে, চাষীরা ধান কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া কাটা ধানের আঁটি লইয়া তাহারা গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের দিকে চলিয়াছে।

তাহার পরেই বসন্ত। সৃষ্টিছাড়া এই প্রান্তরের মাঝখানে তাহাদের ওই ছোট্ট ঘরখানির ততোঽধিক ছোট জানালার পথেও বসন্তের হাওয়া অনধিকার প্রবেশ করে। অপরিসর উঠানের এক পাশে বীণা তাহার নিজের হাতে বেল্ ফুলের যে গাছটি পুঁতিয়াছে, তাহারও শুষ্ক শাখায় শাদা শাদা কয়েকটি কুঁড়ি ধরে।

এম্‌নি করিয়া বছর কাটিয়া যায়।

জানালার বাহিরে প্রতি দিন সেই একই দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া বীণার জীবন যেন এইবার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

সকালের ট্রেণটা পার করিয়া দিয়া হরিপদ যখন বাসায় আসে, বীণা তখন রান্না করে। তাও সে রান্না করিতে করিতে উঠিয়া একবার স্বামীর কাছে আসিয়া বসে। হাসিয়া বলে, 'হ্যাগা, তুমি বদ্‌লির দরখাস্ত করেছ না আমায় মিছে কথা বলে' ভুলিয়ে রাখ্‌ছ?'

হরিপদ তাহার জুতায় কালি ঘষিতে ঘষিতে মুখ তুলিয়া বলে, 'কেন গো, বদ্‌লি বদ্‌লি করে' যে আমায় ক্ষেপিয়ে তুললে দেখছি।'

বীণা রাগ করিতে জানে না। মৃদু হাসিয়া আবার তাহার উনানের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ—আর সে তাহাকে ক্ষেপাইবে না। খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া এটা সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে ভাবে, রেল-কোম্পানীর মত নিষ্ঠুর কোম্পানী আর পৃথিবীতে কেহ নাই, স্বামী তাহার খাটিয়া খাটিয়া হায়রাণ হইয়া উঠিতেছে, ছুটি না থাক, অন্যত্রে বদ্‌লি না করুক—স্ত্রীর সঙ্গে দু'দণ্ড বসিয়া কথা বলিবার অবসরও ত' দেওয়া উচিত!

উনানে ভাত চড়াইয়া দিয়া হাত ধুইয়া বীণা আবার ঘরে আসিয়া ঢোকে। বলে, 'কেন, আমি কি তোমার জুতো ঘষে দিতে পারি না?'

হরিপদ বলে, 'না, পারবে না কেন? আমিই ঘষ্‌ছি, তাতে আর হয়েছে কি!'

তাহার পর বেচারা বীণা আর কোনও কথা খুঁজিয়া পায় না, হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে স্বামীর জুতা-ঘষা দেখিতে থাকে।

সেইদিনই দুপুরে বীণা হঠাৎ এক-সময় বলিয়া বসে, 'বিকেলের দুটো ট্রেণই নাকি উঠে যাবে শুনছিলাম, কই গেল না ত?'

হরিপদ বলে, 'ট্রেণ উঠে গেলে তোমার ভারি দুঃখু হয়, না?'

বীণা জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

হরিপদ বলে, 'জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা'হ'লে আর লোক দেখা হয় না।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'না, পারলে না বলতে। বিকেলের ট্রেণ দুটো উঠে যাওয়াই আমি চাইছি। উঠে গেলে বাঁচি।'

এবার হরিপদ বলে, 'কেন?'

এ 'কেন'র জবাব দিতে গিয়া বীণার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসে। লজ্জায় সে তাহার গালদুটি রাঙা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'বা-রে! ও-সময় একা থাকতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি! তোমার কি! তুমি ত' লোকজনের সঙ্গে......'

বলিয়াই বীণা জানালার কাছে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়। বাহিরে চাহিয়া দেখে, ইঁদারাটার কাছে রামধনিয়ার পাঁঠি ছাগলটাকে একটা খুঁটির সঙ্গে 'দিক্‌দড়ি' দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাছে লাইনে কাটা যায় বলিয়া লছমী তাহাকে এম্‌নি করিয়াই গলায় তাহার একটা লম্বা দড়ি দিয়া রোজ বাঁধিয়া রাখে।

সুদীর্ঘ আট বৎসর পরে তাহাদের একঘেয়ে জীবনে হঠাৎ একদিন এক বৈচিত্র্য দেখা দিল।

সন্ধ্যার ট্রেণখানা ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হরিপদ তাহার কালো আল্‌পাকার কোট ও মাথায় গোল টুপিটি পরিয়া ট্রেণের যাত্রীদের টিকিট লইবার জন্য একটা আলোর

খুঁটির নীচে দাঁড়াইয়া। ট্রেণ হইতে লোক নামিল মাত্র দু'জন, উঠিল একজন। হঠাৎ কে যেন ট্রেণের হাতল্ ধরিয়া ডাকিল, 'হরিপদ দাদা!'

পরিচিত কণ্ঠস্বর!

হরিপদ দেখিল, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের আলোটা তাহার মুখে গিয়া পড়িয়াছে। চিনিতে দেরি হইল না।—'সুকুমার যে রে? নাম্, নাম্!—নেবে পড়্!'

সুকুমার-ছোক্‌রাটি কি যেন বলিতে যাইতেছিল, হরিপদ তত্‌ক্ষণে তাহার কাছে আগাইয়া আসিয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইল, সঙ্গে মাত্র একটি সুট্‌কেশ্। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সুকুমার বলিল, 'তুমি যে এ ষ্টেশনে আছ তা আমি জানতাম না দাদা, তবে এই লাইনে যে আছ তা জানি। সেইজন্যেই ত' প্রত্যেকটি ষ্টেশনে উঁকি মেরে মেরে দেখছিলাম—যদি দেখা হয়ে যায়। ভালই হলো, অনেকদিন পরে দেখা হ'য়ে গেল। তুমি ভাল আছ? বৌদি ভাল আছে?'

ঘাড় নাড়িয়া হরিপদ বলিল, 'হ্যাঁ, ভালই আছে। আচ্ছা, চল্ তোকে বাসাতেই রেখে আসি।'

বলিয়া সেই জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় দু'জনে তাহাদের সেই ছোট্ট বাসার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। হরিপদ ডাকিল, 'ওগো, খোলো, খোলো, দ্যাখো কে এসেছে দ্যাখো।'

বীণা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতে আসিয়া দেখে, স্বামীর সঙ্গে এক অপরিচিত যুবক। তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টানিয়া সে সরিয়া যাইতেছিল, হরিপদ বলিল, 'বিয়ের সময় মাত্র একবার দেখেছিল, চিনতে পারবে না। আমাদের যোগেশ-মামার ছেলে গো—সুকুমার। এবার চিনলে ত?'

বীণা এইবার তাহার ঘোম্‌টাটি ঈষৎ তুলিয়া দিয়া সুকুমারের মুখের পানে চকিতে একবার তাকাইয়াই চোখ নামাইল।

সুকুমার তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'প্রণাম বৌদি, ও-রকম লজ্জা যদি করেন ত' এই আমি চললাম।'

বীণাকে বাধ্য হইয়া তাহার মুখের পানে আর-একবার তাকাইতে হইল।

সুট্‌কেশ্‌টা ঘরের ভিতর রাখিয়া হরিপদর সঙ্গে সুকুমার কথা কহিতেছিল; বীণা তাহার জন্য চা তৈরি করিতে গেল।

সুকুমার বলিল, 'কয়লার কারবার করছি কিনা, তাই একবার মাণিকগঞ্জে যাচ্ছিলাম। কাল সকালেই কিন্তু আমায় চলে' যেতে হবে হরিপদদাদা!'

'আচ্ছা সে এখন দেখা যাবে। তুই বোস্, তোর বৌদির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বস্ ততক্ষণ, আমি আমার কাজটা সেরে আসি।' বলিয়া হরিপদ ষ্টেশনে চলিয়া গেল।

বৌদিদির চা তখনও হয় নাই।

একটা ঘরের মধ্যে একাই বা সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কেমন করিয়া!

উঠানের পাশেই ছোট্ট রান্নাঘর। সুকুমার উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর চাপিয়া বসিল।

'বৌদির ঘরকন্না দেখতে এলাম। বাঃ, এখনও লজ্জা করছেন বৌদি? না বৌদি, তা'হলে আমি চললাম।'

বীণা এইবার তাহার মাথার ঘোমটা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া তাহার সেই সুন্দর মুখখানি অনাবৃত করিয়া হাসিয়া বলিল, 'কেন, যাবে কেন ঠাকুরপো, বিয়ে করেছ নাকি?'

সুকুমার হাসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না বৌদি, বিয়ে আর হলো না। হ'লে আপনাকে নেমন্তন্ন করব। যাবেন ত?'

বীণা বলিল, 'কেন যাব না?'

চা তৈরি করিয়া চায়ের বাটিটি বীণা সুকুমারের হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া বলিল, 'ভাল চা হয় ত হলো না ঠাকুরপো, তা কি আর করবে বল, ও-ই খেতে হবে।'

চায়ে চুমুক দিয়া সুকুমার বলিল, 'বৌদিদির হাতের তৈরি চা, এ-ই আমার অমৃত। এর চেয়ে ভাল চা আমার জোটে না বৌদি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আলাপ জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না। বীণা আজ বহুদিন পরে কথা কহিয়া বাঁচিয়াছে। কথা যেন তাহাদের আর ফুরাইতে চায় না।

'রাত্রে তুমি কি খাও ঠাকুরপো? লুচি করে' দিই খানকতক, কি বল?'

'দোহাই বৌদি, রাত্রে লুচি আমি কোনোদিনই খাই না, আমি ভাত খাব।'

বীণা বলে, 'ভাল তরি-তরকারির ব্যবস্থা কিছু নেই ঠাকুপো, ভাত খেতে তোমার কষ্ট হবে। এমন হতচ্ছাড়া জায়গা,—কিচ্ছু মিলে না।'

সুকুমার বলে, 'এবার আমি রাগ করব বৌদি, এ কী আরম্ভ করলেন আপনি? অত লৌকিকতা আমার ভাল লাগে না।'

বৌদিদি বলে, 'লৌকিকতা নয় ভাই, তুমি কি আর রোজ আসছ? পথ ভুলে হঠাৎ এসে পড়েছ, আর হয় ত' এ বৌদিদিটির কথা তোমার মনেই থাকবে না—'

সুকুমার বলে, 'থাক্। ভুলে যাবার মত বৌদি আপনি ন'ন্। আপনাকে একবার যে দেখে সে বোধ হয় জীবনে আর ভোলে না।'

এ-কথার জবাব সে আর খুঁজিয়া পায় না, চোখ তুলিয়া সুকুমারের মুখের পানে একবার তাকাইয়াই মুখ নামাইয়া সেও ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'থাক্।'

তাহার পর দু'জনেই চুপ!

সুকুমারের চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল। বাটিটি হাত হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আপনি এবার বোধ হয় রান্না করবেন? আমি এইখানে বসে' থাকলে আপনার লজ্জা করবে না ত?'

বীণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বলিয়া সে চৌকাঠের কাছেই একটি আসন পাতিয়া দিয়া বলিল, 'ভাল করে' চেপে এইখানে বোসো ঠাকুরপো, তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

সুকুমার ভাল করিয়াই চাপিয়া বসিল।

পরদিন সকালেই সুকুমারের চলিয়া যাইবার কথা, বীণা বলিল, 'পাগল হয়েছ ঠাকুরপো, আজ কি তোমায় ভাল করে' না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি কখনও? যেতে হয়, কাল যেয়ো।'

এ অনুরোধ এড়ানো শক্ত। বাধ্য হইয়া সেদিন তাহাকে থাকিতে হইল।

বীণা তাহার স্বামীকে রাত্রেই বলিয়া রাখিয়াছিল, সকালে হরিপদ কোথা হইতে একটা মাছ সংগ্রহ করিয়া বধনিয়াকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

সুকুমার বলিল, 'দাদাকে দেখছি ষ্টেশনের সব কাজই করতে হয়, বাড়ী এসে' দুদণ্ড যে বিশ্রাম করবে, তারও ফুরসুৎ মিলে না,—না বৌদি? একা-একা দিন আপনার কাটে কেমন করে' বলুন ত?'

বাহিরে মাছটা পড়িয়া আছে, তাড়াতাড়ি সেটাকে কুটিবার ব্যবস্থা না করিলে এখনই হয় ত' কাকে মুখ দিবে, তাই সে সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া একরকম ছুটিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল। মুখে কিছুই বলিতে পারিল না।

ব্যাপারটা যে সুকুমার বুঝিল না তাহা নয়, কথাটা বলা হয় ত তাহার উচিত হয় নাই, তাই সে কিয়ৎক্ষণ জানালার বাহিরে একদৃষ্টে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু তাহার এই নীরবতাও বীণার ভাল লাগিল না। মাছ কোটা শেষ করিয়া হঠাৎ একসময় ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'অমন চুপ করে বসে রইলে যে ঠাকুরপো?'

হাসিয়া সুকুমার বলিল, 'ঝগড়া করব আপনার সঙ্গে?'

বীণাও হাসিল। বলিল, 'কর না। পারবে?'

বলিয়াই সে আর জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

আহারাদির পর খানিকটা বিশ্রাম করিয়া সুকুমার বলিল, 'যাই একটু ষ্টেশনে বেড়িয়ে আসি।'

বীণা বলিল, 'এসো। খাঁচার ভেতর কাল থেকে বাস করে' জীবন বোধ হয় তোমার হাঁপিয়ে উঠেছে।'

সুকুমার তাহার বৌদির দিকে তাকাইয়া মৃদু একটুখানি হাসিল মাত্র।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'হাস্‌লে যে?'

সুকুমার বলিল, 'আমার যদি এই একদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে, আপনার তা'হ'লে আট বছরে কি হওয়া উচিত?'

তাচ্ছিল্য ভরে বীণা বলিল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও ভাই, আমি মেয়ে মানুষ, আমাদের উপায় কি!'

বলিয়াই ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'বেশি দেরি কোরো না, আমি চা তৈরি করে' রাখব।'

দেরি অবশ্য বেশি সে করে নাই, ফিরিয়া যখন আসিল

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দরজার কড়া নাড়িবামাত্র হ্যারিকেন্ লণ্ঠন হাতে লইয়া বীণা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

দেখা গেল, বীণা বেশ করিয়া গা ধুইয়া ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, ভাল একখানি শাড়ি পরিয়াছে, জামা গায়ে দিয়াছে, পায়ে লাল টক্‌টকে আলতা, হাতে কয়েক-গাছা সোনার চুড়ি, জামা কাপড় হইতে তাহার ভুর্ ভুর্ করিয়া সস্তা একটা এসেন্সের উগ্র গন্ধ বাহির হইতেছে।

কিন্তু মানাইয়াছে চমৎকার! হঠাৎ দেখিলে দু'দণ্ড তাকাইয়া থাকিতে হয়।

সুকুমার বলিয়া উঠিল, 'বাঃ! এ যে তোমায় দেখছি আর চিনতে পারা যাচ্ছে না বৌদি!'

সলজ্জ একটু হাসিয়া বীণা বলিল, 'কেন? অপরাধ?'

সুকুমার বলিল, 'অপরাধ নয় বৌদি, ছাই-চাপা আগুনের যেমন ছাই উড়ে গেলে আগুন বেরিয়ে পড়ে, তোমারও দেখছি আজ তাই হয়েছে। কাল থেকে দেখছিলাম, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, ময়লা একখানা কাপড়, পায়ে আলতা ছিল না—সত্যি বৌদি, আজ আপনাকে একেবারে নূতন মানুষ বলে' বোধ হচ্ছে।'

বীণা বলিল, 'তোমারও যে দেখছি মাথা খারাপ হলো ঠাকুরপো, আমার রূপ নিয়ে কবিত্ব করতে গিয়ে 'আপনি' 'তুমি'তে যে গুলিয়ে ফেললে।'

সুকুমার বলিল, 'তা হোক্ বৌদি, আপনাকে 'আপনি' না হয় নাই বললাম, কিন্তু সত্যি বলছি বৌদি, তোমায় আজ ভারি ভালো দেখাচ্ছে। দেখ তো, পায়ে আলতা না পরলে মেয়েদের কখনও মানায়! আজ তোমার ও পায়ের ওপর প্রণাম করতেও সুখ!'

বীণা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

'বাঃ, হাসছো যে বৌদি? আমি কি মিছে বললাম?'

'না সেজন্যে হাসিনি, তুমি আলতার কথা বললে, তাই হঠাৎ হেসে ফেল্‌লাম। বাক্স খুলে দেখি—আলতা নেই। সে যে আজ ক'বচ্ছর ধরে' নেই কে জানে। তখন কি করলাম জানো?—ওই ছাখো!'

বলিয়া বীণা আঙুল বাড়াইয়া মেঝের উপর যে জিনিস-গুলি দেখাইয়া দিল সুকুমার সেগুলি চিনিতে পারিল না। বলিল, 'কি ওগুলো?'

বীণা বুঝাইয়া বলিল, 'আমাদের ওই ইঁদারার পাশে কতকগুলো ফণী-মনসার গাছ আছে দেখেছ? ওই গাছের ওগুলো ফুল কি ফল জানিনে ভাই, ছোটবেলায় ওই দিয়ে আমরা আলতা পরতাম; আজও হঠাৎ আলতা পরবার সখ হতেই লছমীকে ডেকে ছুরি দিয়ে ওইগুলো কেটে আনালাম। ভারি বিশ্রী কাঁটা, হাতে একবার ফুটলে আর সহজে বেরোতে চায় না, তাই খুব সাবধানে বেছে-বেছে ওইগুলো টিপে-টিপে লাল লাল রস নিঙড়ে আলতা যখন আমি পরছিলাম, তখন তুমি দরজায় কড়া নাড়লে, অতি কষ্টে হাসি চেপে তোমায় আমি দরজা খুলে দিলাম।—দাঁড়াও, ওগুলো ফেলে' দিই।'

বলিয়া সেই ফণী-মনসার ফলগুলা মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া বীণা হাসিতে হাসিতে জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সুকুমার বলিল, 'এতেই এম্‌নি, তা না জানি সত্যি-কারের আলতা পরলে,...'

হাত নাড়িয়া বীণা বলিল, 'হয়েছে।' বলিয়াই একবার হাসিল।

বলিল, 'নাঃ, এত প্রশংসা যখন করলে, তখন তোমায় এক পেয়ালা চা আমায় দেখছি এনে দিতেই হলো। উনোন আমার ধরে' গেছে, বেশি দেরি হবে না, বোসো।'

বলিয়া বীণা চা তৈরি করিতে গেল।

রান্নাঘর কাছেই, সুকুমার সেইখানে বসিয়া বসিয়াই বলিল, 'প্রশংসা নয় বৌদি, সাজ্‌লে তোমায় সত্যি বড় সুন্দর দেখায়।'

রান্নাঘর হইতে জবাব আসিল, 'কিন্তু তাতে ত' কিছু লাভ হবে না ঠাকুরপো, তুমি এবার খুব সুন্দরী একটি মেয়ে দেখে বিয়ে কর। মেয়ে দেখবার ভারটা না-হয় আমার হাতেই দিও।'

লজ্জায় সুকুমার চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

সেইদিন রাত্রেই সুকুমারকে মাণিকগঞ্জে যাইতে হইবে। না গেলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

সুকুমার বলিল, 'তোমায় ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে হয় না বৌদি। সেকথা তো বললেও বুঝতে নিশ্চয় পেরেছ।

আচ্ছা,—ফেরবার পথে যদি পারি ত' না-হয় আর একবার…'

'এসো' কথাটা বীণার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না। সুকুমার যে এত শীঘ্র হঠাৎ আবার চলিয়া যাইবে তাহা সে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল।

হরিপদ ইহারই মধ্যে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাঁকিয়া বলিল, 'তুই তবে আয় সুকুমার, আমার আর দাঁড়াবার অবসর নেই।'

'যাই।' বলিয়া সুটকেশ্‌টা তুলিয়া লইয়া হরিপদর পিছু-পিছু সুকুমারও বাহির হইয়া গেল।

বীণার বাড়ীর পাশ দিয়া যে গাড়ী পার হইয়া যায় এ-দু'দিন বীণা সেকথা ভুলিয়াই ছিল, আজ এই অতিথিটি চলিয়া যাইবামাত্র দৃষ্টি তাহার আবার সেইদিকে নিবদ্ধ হইয়াই রহিল।

মাণিকগঞ্জ যাইবার গাড়ী পার হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে। গাড়ীর আরোহীদের মধ্যে ছিল সুকুমার জানালার পথে তাকাইয়া, আর সেই ক্ষুদ্র গৃহের বাতায়ন-পার্শ্বে বীণা ছিল তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, আকাশে ছিল অজস্র জ্যোৎস্না, গাড়ীতে ছিল আলো, অথচ কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না, বীণার অস্থির চঞ্চল দু'টি চক্ষুতারকার সুমুখ দিয়া সশব্দে ট্রেণখানা পার হইয়া গেল।

শূন্য গৃহ আবার তেম্‌নি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

আবার সেই একঘেয়ে একটানা জীবন!

দু'তিন দিন পরে আবার সুকুমারের ফিরিবার কথা।

বীণা জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া ট্রেণ দেখে, আর ভাবে, আর দিন গুণে।

জানালার বাহিরে ধরিত্রীর যে ভগ্নাংশটুকু তাহার চোখের সুমুখে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিভাত হইয়া আছে, চোখ বুজিলেই যে-দৃশ্য তাহার মনশ্চক্ষে হুবহু ছবির মত ভাসিয়া ওঠে, সেটুকু দেখিয়া দেখিয়া এখন তাহার এমন হইয়াছে যে, সে না দেখিয়াও বলিয়া দিতে পারে—লাইনের ধারে একটি হেলানো পলাশগাছের নীচে একটি উইএর ঢিপি, পাশেই ছোট্ট একটি ডোবায় বারোমাস জল জমিয়া থাকে, তাহারই এককোণে একটি রক্ত-সাপ্‌লার ঝাড়, লাল রঙের দুইটি শালুক সে সেখানে রোজই ফুটিয়া থাকিতে দেখে, ঝোঁপের ভিতর একটি ডাহুক-দম্পতি বোধ করি তাহাদের বাসা বাঁধিয়াছে। দিনের বেলা তাহারা কোথায় থাকে কে জানে, সন্ধ্যা হইলেই ডাহুক দুইটি তাহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া ওই সাপ্‌লা-ঝোঁপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বীণা জানে, সুমুখে ধানের মাঠের তিনটা মাঠ বাদ দিয়া চতুর্থ মাঠের আ'ল্‌টা বাঁকা। দূরে একটা পুকুরের পা'ড়ে পঁচিশটি তালের গাছ, দক্ষিণ দিক হইতে পাঁচটা গাছের পর যে ফাঁকটুকু আছে দিনের সূর্য্য সেইখানে গিয়া পৌঁছিলেই তাহার রং হয় লাল,—বীণা তখন বুঝিতে পারে—সূর্য্যাস্ত হইতে আর দেরি নাই।

কিন্তু আজকাল আর ও-সবের দিকে তাহার নজর যেন কম, আজকাল সে দেখে শুধু মাণিকগঞ্জ হইতে আসিবার ট্রেণ। ট্রেণের জানালার পথে আরোহীদের মধ্যে সুকুমারের অনুসন্ধান করে; নিরাশ হইয়া শেষে চুপ করিয়া বসে। বহুদূর হইতে শব্দ শুনিয়া সে ঠিক বলিয়া দিতে পারে—মাল-গাড়ী কি প্যাসেঞ্জার।

দু'দিন যায়, তিন দিন যায়, চার দিনের দিন—তখনও সে আশা ছাড়ে না, মনে হয়, সুকুমার আসিবে।

কিন্তু দিনের পর দিন পার হইয়া শেষে সপ্তাহ পার হইয়া গেল। সুকুমার আসিল না।

বীণা ভাবে, বিবাহ না করুক্, ছেলেটি বেশ ভাল ছেলে, কয়লার কারবার করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করে, যে-মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে সে হয় ত তপস্যা করিতেছে। নিজের রোজগার ছাড়িয়া দিয়া এখানে তাহার এমনই বা কি আকর্ষণ যে, বসিয়া বসিয়া দুদিন গল্প করিয়া যাইবে। আসিতে সে পারে না, আর কেনই বা আসিবে, আর সে-ই বা নিতান্ত স্বার্থপরের মত তাহার আসিবার কথাই-বা ভাবে কেন?

হরিপদর জামাটা বড় ময়লা হইয়াছিল, বীণাকে সেদিন সে ডাকিয়া বলিল, 'জামাটায় আজ একটু সাবান দিয়ে দিয়ো ত'।'

সাবান দিবার জন্য জামাটা সে উঠানে লইয়া যাইতেছিল, পকেটে কিছু আছে কি না দেখিবার জন্য একটা পকেটে হাত ঢুকাইতেই ভারি-মত কি একটা বস্তু তাহার হাতে ঠেকিল।—'এটা কি গো ?'

জিনিসটা বাহির করিয়া বীণা দেখিল—লাল কাগজের বাক্সোয়-মোড়া তরল আলতার একটি শিশি। জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, এটা তুমি পেলে কোথায় ?'

আহারাদির পর হরিপদ একবার গড়াইয়া লইতেছিল, বলিল, 'দেখ্‌লে, কি-রকম মনের ভুল! আজ চার দিন ধরে' তোমায় বলব বলব করেও ভুলে গেছি। সুকুমার সেদিন রাত্রের ট্রেণে মাণিকগঞ্জ থেকে বাড়ী ফিরছিল, গাড়ী থেকে আমায় ডেকে সেদিন তোমার জন্যে ওই আল্‌তার শিশিটে দিয়ে গেছে। এত করে' বললাম তা কিছুতেই নামলো না, বললে, বড় জরুরী কাজ আছে দাদা, আজ আসি।'

অনেকক্ষণ ধরিয়া আলতার শিশিটি বীণা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল। খুলিয়া দেখিল, চমৎকার আলতা! রক্তের মত লাল!

* *
*

তাহার পর দেড় বৎসর পার হইয়াছে। সুকুমার আর আসে নাই। হরিপদর আরও চার টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

তখন বসন্ত কাল। পলাশের ঝোপে, লাইনের ধারে, যেখানে-সেখানে যখন তখন কোকিল ডাকিতে সুরু করিয়াছে। এম্‌নি দিনে হরিপদর বদলির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া আসিল।

বদলি হইয়াছে প্রকাণ্ড এক জংসন ষ্টেশনে। সেখান হইতে বেশি দূরে নয়। বীণার মামার বাড়ীর কাছেই।

কিন্তু হইলে কি হয়, বীণার যেন এখন আর সে উৎসাহ নাই। গত তিন চার মাস তাহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে। অত রূপ তাহার এই অল্প দিনের মধ্যেই কেমন যেন ম্লান হইয়া গেছে।

বাসার জিনিসপত্র রামধনিয়া বাঁধা-ছাঁদা করিয়া দিল। লছমী আসিয়া চোখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। যে-স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য বীণা একদিন পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এই সুদীর্ঘ নয় বৎসরের পর সে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বীণার চোখেও জল আসিল।

জংসন-ষ্টেশনের চমৎকার কোয়ার্টার। বাড়ীগুলাও বড়, উঠানে জলের কল, স্নান করিবার ঘর, চৌবাচ্চা, ইলেক্‌ট্রিকের আলো। চারিদিকে লোকজন, গাড়ীঘোড়া, সাহেব-মেম,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট খাটো শহরের মত জায়গা। লাল ফুলে-ভরা প্রকাণ্ড একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ দরজার সুমুখে একেবারে তাহাদের উঠানের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

হরিপদ হাসিয়া বলে, 'কেমন ? হয়েছে ত' এবার ?'

বীণাও ম্লান একটুখানি হাসে। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাঁ।'

হরিপদ বলে, 'ভালই হলো। এখানে এসে' শরীরটা তোমার সারবে এবার। রেলের একজন খুব বড় ডাক্তার আছে, কালই একবার ডেকে দেখাব ভাবছি।'

বীণা বলে, 'না গো না আর ডাক্তার দেখাতে হবে না। এম্‌নিই সেরে যাবে।'

কিন্তু সারে না। স্নান করিতে গেলেই গায়ে জল ঠেকিবামাত্র শরীরটা তাহার কেমন যেন শির্‌ শির্‌ করিয়া ওঠে, স্পষ্ট জ্বরও হয় না, অথচ ভিতরে ভিতরে দিন-দিন বড় দুর্ব্বল হইয়া যায়, তাহাতেই কোনোরকমে নিজের হাতেই সংসারের কাজকর্ম্ম করে, স্নানও করে, ভাতও খায়,—অথচ মুখ ফুটিয়া স্বামীকে কোনোদিন কোনও কথাই বলে না।

বলে না ত' বলে না, হরিপদও নিজের কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকে, ডাক্তার আনিবার কথা সে ভুলিয়া গেছে।

এখানে আসিয়া অবধি হরিপদর প্রায়ই রাত্রে 'ডিউটি' পড়ে, দিনের বেলা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

সেদিন সে অমনি ঘুমাইতেছে, রান্না সারিয়া হরিপদকে স্নান করিবার জন্য উঠাইতে গিয়া বীণা থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বলিল, 'ওগো, আমার জ্বর এসেছে।'

লেপের পর লেপ চাপা দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াও হরিপদ বীণার কাঁপুনি আর থামাইতে পারে না।

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে লেপের তলা হইতে বীণা বলিল, 'ওগো তুমি রাত জেগেছ, যাও স্নান করগে, করে' নিজেই চারটি হেঁসেল্ থেকে—কি আর করবে লক্ষ্মীটি···'

বলিয়া লেপের তলায় হাত্ড়াইয়া হাত্ড়াইয়া হরিপদর হাতখানা বীণা তাহার আগুনের মত গরম হাত দিয়া ধরিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সে কান্না হরিপদ দেখিতে পাইল না।

'দাঁড়াও, আজই ডাক্তার আনছি।' বলিয়া সে স্নান করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

নিজেই ভাত বাড়িয়া খাইয়া হরিপদ ফিরিয়া আসিতেই বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'খেলে? ভাল করে' খেয়েছ ত? কাঁসার সেই বড় বাটিতে মাছের ঝোল ছিল, আর কলাই-করা সেই সাদারঙের···'

কথাটা হরিপদ তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না, বলিল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবই খেয়েছি। তুমি একটুখানি চুপ করে' ঘুমোও দেখি। আমি ডাক্তার ডেকে আনি।'

বীণা তাহার মুখের ঢাকা খুলিয়া বলিল, 'না, তুমি যেয়ো না। ডাক্তার ডাকতে হয়—এর পর ডেকো।'

এই বলিয়া সে একদৃষ্টে তাহার স্বামীর মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'আমায় এক গ্লাস জল দিয়ে তুমি ঘুমোও। তোমায় আবার রাত জাগতে হবে।'

বীণাকে জল খাওয়াইয়া হরিপদ সত্যই ঘুমাইল।

বৈকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখে, বীণা বসিয়া বসিয়া একটা ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁট দিতেছে। হরিপদ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'ও কি! ও কি হচ্ছে?'

বীণা হাসিয়া বলিল, 'জ্বর আমার অনেকক্ষণ সেরে' গেছে।'

হরিপদ বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'পাগল হ'লে না কি?'

বীণা তাহার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিল, 'বিশ্বাস না হয়, ছাখো গায়ে হাত দিয়ে।'

হরিপদ তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, সত্যই তাই। জ্বর তাহার ছাড়িয়া গেছে।

। বলিল, 'বড় খিদে পেয়েছে। কি খাই বল দেখি?'

হরিপদ উঠিয়া দাঁড়াইল। জামা গায়ে দিয়া বলিল, 'দাঁড়াও, আগে ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকি।' বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, 'ম্যালেরিয়া, পুরনো জ্বর, ও অমনি আসে আর যায়। খেতে দিন, কিন্তু একবার চেঞ্জে পাঠাতে পারলে ভাল হয়।'

হরিপদ খানিক ভাবিয়া বলিল, 'চেঞ্জে? পাড়াগাঁয়ে পাঠালে চলে?'

ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চলে।'

বলিয়া তিনি ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান্ লিখিয়া দিলেন।

ঔষধ চলিতে লাগিল।

জ্বর অম্‌নি আসে আর যায়। হরিপদ বুঝাইয়া বলে, 'ছাখো, আমি কিছুদিন না হয় হোটেলেই খাই, আমার কোনও কষ্ট হবে না। তুমি যাও দিনকতক মামীমার কাছেই থেকে এসোগে, কেমন?'

বীণা বলে, 'না গো না, আমার কিচ্ছু হবে না, আমি বেশ আছি।'

হরিপদ রাগ করিয়া বলে, 'তোমার সঙ্গে কে পারবে বল! বেশ থাকো, এমনি করে' জ্বর আসুক আর অনাচার অত্যাচার কর, তার পর একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকবে, এখন হোটেলে খেতে দিচ্ছ না, তখন আমায় নিজে রেঁধে খেতে হবে।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'মরি মরি, নিজে রেঁধে খাবার লোকটি কেমন! তখন তুমি আর-একটা বিয়ে করবে।'

হরিপদ আর জবাব দেয় না। রাগ করিয়া নীরবে বসিয়া থাকে।

বীণা তাহার রাগ ভাঙ্গাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। বলে, 'না গো না, রাগ করলে? না না, বিয়ে তুমি করবে না তা আমি জানি। তোমার বিয়ে করবার সময় কোথায়?'

এমনি করিয়া রাগ-অভিমানের পালা চলিতে চলিতে বীণাকে একদিন রাজি হইতে হইল। বলিল, 'আচ্ছা

তবে তাই আমায় দিয়েই এসো বাপু, শরীরটা না-হয় সেরেই আসি। কিন্তু—'

'কিন্তু কি ?'

বীণা বলিল, 'আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করে' বল··· ওগো না না, ছি! হোটেলে আবার মানুষে খায়! তার চেয়ে এক কাজ কর। এখানে একটা রাঁধুনী বামুন পাওয়া যায় না ?'

হরিপদ বলিল, 'আচ্ছা তাই না-হয় একটা বামুন-টামুন দেখে বাড়ীতে রান্না করিয়েই খাব।'

বীণা বলিল, 'খাব নয়। তোমায় আমি খুব ভাল করে' চিনি। পকেটে আলতার শিশি রেখে যে চার দিন ভুলে যায়···বামুন তুমি একটা নিয়ে এসো ডেকে। তাকে আমি দেখিয়ে-শুনিয়ে দিই, দুদিন রান্না করুক্, আমি দেখি,—তার পর···'

ব্রাহ্মণ এক ছোকরাকে পাওয়া গেল। নাম যতীন। সেখান হইতে ক্রোশখানেক্ দূরের একটা গ্রামে তাহার বাড়ী। রাঁধে ভাল। কাজকর্ম্মও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বীণা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিল। তাহার পর স্বামীকে তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া ঠিক সময়ে স্নানাহার করিবার শপথ করাইয়া জানাইল যে, সে যাইতেছে বটে, কিন্তু মোটেই সে সেখানে বেশি দিন থাকিতে পারিবে না, চিঠি লিখিবামাত্র সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসে।

বলিল, 'বাক্স আমি নিয়ে যাব না। দু'চারখানা কাপড়-জামা তোমার ওই টিনের হাত-বাক্সটাতে যা ধরে তাই নিয়েই আমি চললাম। তার পর দরকার হয়—মামীমা দেবেন, সেজন্যে ভেবো না।'

দিন কয়েক পরে একটি দিনের মাত্র ছুটি লইয়া হরিপদ তাহাকে তাহার মামীমার কাছে রাখিয়া আসিল।

বাপের বাড়ী কাছেই, কিন্তু সেখানে তাহার মাও নাই বাবাও নাই, মামার বাড়ীতেই ছেলেবেলা হইতে মানুষ, তাই তাহাকে তাহার মামীমার কাছে রাখিয়া আসা ছাড়া আর উপায় কি!

বীণার চিঠি আসে—সে বেশ ভালই আছে। জ্বর এক-আধটু মাঝে-মাঝে আসে বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়, আসে আর যায়।

চিঠি পড়িয়া হরিপদ খুসী হয়। আহা, এত দিনের সাধ তাহার—বদলি হইয়া যদিই-বা সে জংসন-ষ্টেশনে আসিল, আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে সুখে বাস করিতে পায় নাই, এইবার সে সারিয়া আসিয়া আবার সেই আগের মতই হাসিয়া খেলিয়া কাজ করিয়া বেড়াইবে।

কিন্তু দুনিয়ার বিধাতা বুঝি হরিপদর চেয়েও নিষ্ঠুর। তাহারই মত অন্ধ!

এক মাস পার হইতে না হইতেই বীণার মামীমার কাছ হইতে এক চিঠি আসিল।—বীণার যেমন জ্বর হয় তেম্‌নি জ্বর আসিতেছিল, দিন চার-পাঁচ আগে জ্বরটা একটু বেশি করিয়াই আসিয়াছে, এখনও মগ্ন হয় নাই, কাল রাত্রে একটু বিকারের মত হইয়াছিল, ভুল বকিতে বকিতে হঠাৎ বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেছে, জ্ঞান রহিয়াছে কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। তুমি বাবা একবার আমার এই চিঠিখানি পাইবামাত্র আসিও।

চিঠিখানি পাইবামাত্র হরিপদর মাথা ঘুরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে গিয়া, ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া একশিশি ঔষধ লইয়া হরিপদ ট্রেণে চড়িয়া বসিল।

গ্রামে ঢুকিতে বুকখানা তাহার অজানা আতঙ্কে দুম্ দুম্ করিতেছিল, তবু সে গ্রামে ঢুকিল। লোকজনের মুখের পানে তাকাইতে তাহার ভরসা হইল না। কোনো-রকমে মুখ নীচু করিয়া মামীমার ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল, মামীমা নিজেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। হরিপদকে দেখিবামাত্র তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিপদ তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে মামীমা বলিলেন, 'হয়ে গেছে বাবা, বীণি চলে' গেছে।' আর-কিছু তিনি বলিতে পারিলেন না। বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। হরিপদ

তখন মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে, ঠোঁট দুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

এমন অকস্মাৎ সে যে চলিয়া যাইবে কে জানে!

মামীমা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। বীণার ওষুধের শিশিটা সেইখানেই কাৎ হইয়া পড়িয়া রহিল।

দেখা গেল, শবদাহের জন্য গ্রামের লোকজন আসিয়া উঠানে জড়ো হইয়াছে। সুমুখে ঘরের মেঝের উপর বীণার মৃতদেহ আপাদ-মস্তক সাদা চাদর দিয়া ঢাকা।

চাদরখানা সরাইয়া দিয়া উন্মাদের মত হরিপদ তাহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মামীমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'যাবার সময় কিছু বলে' গেল না বাবা, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে রইলো।'

কথাটা শুনিয়া হরিপদর কান্না যেন আরও বাড়িয়া গেল। বীণার সেই অর্দ্ধ-মুদ্রিত ঘোলাটে দুইটি চক্ষুর পানে তাকাইতে গিয়াও সে আর তাকাইতে পারিল না। বুকের ভিতরটা তাহার মোচড়্ খাইয়া হু হু করিয়া উঠিতেই সে মামীমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, 'আসতে সে চায়নি মামীমা, আমি ওকে জোর করে' পাঠিয়েছিলাম।'

নদীতীরের শ্মশানে বীণার মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে চোখের সুমুখে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

হরিপদকে মামীমা বার-বার করিয়া শ্মশান হইতে বাড়ী ফিরিতে বলিয়াছিলেন, শবযাত্রীরাও বারে-বারে তাহাকে গ্রামে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু হরিপদ কাহারও কথা শুনিল না। অবস্থা তখন তাহার ঠিক পাগলের মত। বীণার হাতের আটগাছি সোনার চুড়ি ও কানের দুলটি লইয়া ভিজা কাপড় পরিয়া ভিজা জামাটা কাঁধে ফেলিয়া নদীতীরের পথের উপর দিয়া হরিপদ চলিয়া গেল। পুরোহিত তাহার পিছনে-পিছনে কিছুদূর ছুটিয়া আসিয়া কাঁচা মাটির একটা ঢেলার মধ্যে খানিকটা চিতাভস্ম ও বীণার অস্থি কয়টি তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'পার ত' এইটি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ো; বুঝলে? দিতে হয়।'

মাটির ঢেলাটিও হরিপদ হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল।

ট্রেণে চড়িয়া হরিপদ যখন তাহার নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে নামিয়া বাসার দিকে চলিতে লাগিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রেল লাইনের উপর দিয়া প্রকাণ্ড একটা সেতু পার হইতে হয়। তাহারই উপর দিয়া হরিপদ ধীরে-ধীরে চলিতেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ষ্টেশনে কয়েকবার মাল-গাড়ী হইতে প্রচুর জিনিসপত্র চুরি যায়, তাই এখন এখানে বহুদূর পর্য্যন্ত ইলেক্‌ট্রিক আলোর ব্যবস্থা। আলোগুলা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে লোহার লাইন, আর তার, আর গাড়ী! অদূরে 'লোকোশেড্।' কালো কালো প্রকাণ্ড দানবের মত ইঞ্জিনগুলা হুম্ হুম্ করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। ওদিকে ইলেক্‌ট্রিকের ইঞ্জিন-ঘর, ওদিকে কারখানা, এদিকে যন্ত্র, ওদিকে কল। শুধু লোহা আর ইস্পাত্, শুধু ষ্টীম্ আর আগুন্! হরিপদর আপিসটা দেখা যাইতেছিল। কলের মত লোকগুলা সেখানে কাজ করিতেছে। মনে হইল, সে নিজেও ওই কল-কারখানার সামিল। যন্ত্রের মত পরের ইঙ্গিতে সেও তাহার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের যাত্রাপথে অন্ধের মত হাঁটিয়া চলিয়াছে। ছুটি নাই, অবসর নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই—মৃত্যুপথযাত্রী বীণাকে একটুখানি দেখিবার অবসর পর্য্যন্ত নাই! বীণার কথা মনে হইতেই তাহার চোখের সুমুখে যেন হুহু করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—নদীতীরের সেই শ্মশান আর সেই চিতা; আর সেই ধুম, সেই আগুন, আর সেই নিসাড় নিস্পন্দ বীণার মৃতদেহ!···হাতে তাহারই অস্থি!

ধীরে-ধীরে এক পা এক পা করিয়া হরিপদ সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলা দিয়া তাহার কোয়ার্টারের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেই কোয়ার্টার! এইখান হইতেই বীণাকে সে জোর করিয়া মামীমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছিল। ঘরের বাহিরে একটা আলো জ্বলিতেছে। দেখিল,—যতীন-ছোক্‌রাটি বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া

গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হরিপদ তাহাকে আর জাগাইল না। ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিল। ভিজা কাপড় প্রায় শুকাইয়া গেছে। জামাটা কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখিতে গিয়া ঠক্ করিয়া কিসের যেন শব্দ হইল। হাত দিয়া দেখিল, বীণার চুড়ি! বীণার চুড়ি ও দুল সে বীণার বাক্সেই রাখিয়া দিবে ভাবিয়া খাটের নীচে বালিসের তলা হইতে তাহার চাবির তোড়াটি বাহির করিয়া সে বাক্স খুলিল। বীণার সেই বাক্স। তাহারই নিজের হাতের সাজানো জিনিস! কিন্তু এ কি! থাকে-থাকে সাজানো কাপড় জামা সব যেন লাল! মনে হইল—সব যেন রক্তে-ছোপানো। হরিপদ তাহার চোখ দুইটা ভাল করিয়া রগ্ড়াইয়া লইল,—দেখিল, না, চোখের ভুল নয়, সত্যই তাই। কম্পিত হস্তে ধীরে-ধীরে একটি একটি করিয়া কাপড়-জামাগুলি হরিপদ নামাইতে লাগিল। দেখিল, বাক্সের এককোণে সযত্ন-রক্ষিত সুকুমারের দেওয়া সেই আল্তার শিশিটি। ভাঙিয়া কোন্ সময় সমস্ত আল্তা গড়াইয়া পড়িয়াছে!

কয়েকটি কাপড়ের তলায় দেখিল, তাহারই দেওয়া রেল-কোম্পানীর একটি সাদা খাতা। খাতার কয়েকটি পাতা ছিঁড়িয়া চিঠির মত কি যেন লেখা হইয়াছে। কাগজগুলি হরিপদ তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। বীণার হাতের লেখা কয়েকখানি চিঠি! কিন্তু চিঠির অধিকাংশ অক্ষর লাল আল্তার দাগে অস্পষ্ট। এক-খানি চিঠির কিয়দংশ সে পড়িতে পারিল। লেখা আছে—

'ভাই ঠাকুরপো—' তাহার পর অনেকগুলি অক্ষর কাটা। তাহার পর লিখিয়াছে, 'তোমাকে যে চিঠি দিব কিন্তু ঠিকানা জানি না যে!'

সে চিঠিখানির আর-কিছু পড়িবার উপায় নাই।

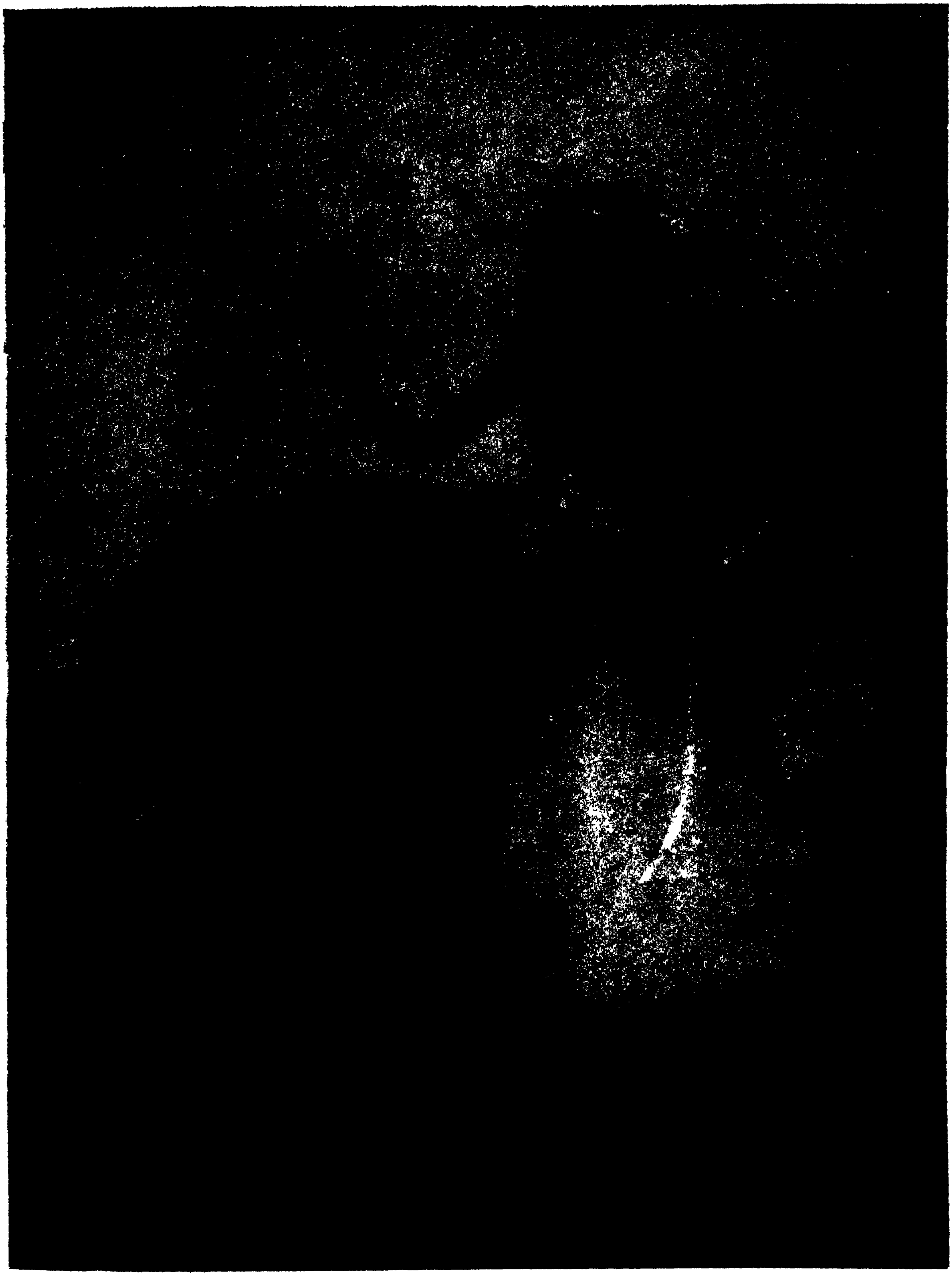
আর-একখানি চিঠি! আগাগোড়া সবই লাল, মাঝখানে মাত্র কয়েকটি লাইন—

'সাজিলে আমাকে ভাল দেখায়। তুমি যে আমায় আল্তা পরিয়া ভাল করিয়া সাজিতে বলিলে, কিন্তু কাহার জন্য সাজিব ভাই? কে দেখিবে? তোমার দাদা কাজের লোক। চব্বিশ ঘণ্টা সে তাহার কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে। তাহার কি আর দেখিবার অবসর আছে ছাই!……'

হরিপদর হাত হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাগজগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথার ভিতরটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। এবং তাহার দুই মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে মনে হইল যেন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লাল রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।…চারিদিকে অজস্র ইঞ্জিন আর ধোঁয়া, কল আর কারখানা, টেলিগ্রাফের তার, আর যন্ত্রের শব্দ!… ওদিকে হুইস্‌ল্ বাজিল, এদিকে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, রামধনিয়ার চীৎকার, লছমীর ঝগড়া,…টেলিগ্রাফ আসিয়াছে…বীণার অসুখ, বীণা রাগ করিয়াছে, বীণা চলিয়া যাইবে! সত্যই ত! তাহার অবসর কোথায়! তাহার অবসর কোথায়!…

কোয়ার্টারের মাঠে যাত্রা শুনিয়া যতীন এমন ঘুম ঘুমাইয়াছে যে, উঠিল যখন, তখন প্রভাত হইয়া গেছে। ধড়্মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, দরজা খোলা, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, বাবু কোন্ সময় আসিয়াছেন তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিতেই দেখে, বাবুর খালি গা, খালি পা, বাক্স খোলা, বাক্সর জিনিসপত্র ঘরময় ইতস্ততঃ ছড়ানো, আর তাহারই মাঝখানে বাবু তাহার বাক্সের ডালির উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

আর…পাশের বাড়ীর সাদা রঙের একটা পোষা বিড়াল বীণার সেই অস্থি-পিণ্ডটা লইয়া ঘরের মেঝের উপর পা দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া খেলা করিতেছে!



সোনালি সূতা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বড়লাট ও ছোটলাটের বাসভবন

প্রথম গভর্ণমেন্ট হাউস, বর্ত্তমান কাষ্টম্ হাউসের উত্তরে অবস্থিত ছিল। ইহা ইষ্টক-নির্ম্মিত মাটির গাঁথনির একখানি সামান্য বাড়ী ছিল। এই স্থানেই জব চার্ণকের জামাতা চার্লস্ আয়ারের (Charles Eyre) বাসভবন ছিল। ঝটিকাবর্ত্তে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার পর ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

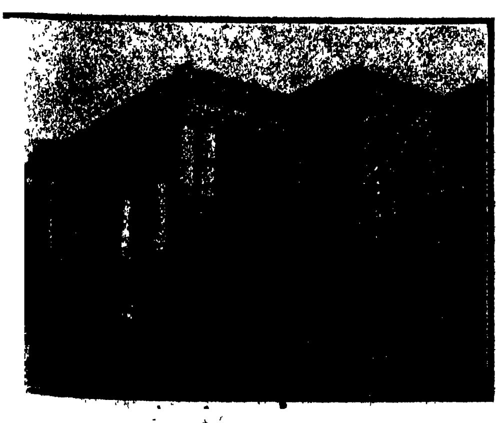
* * * *

দ্বিতীয় গভর্ণমেন্ট হাউস্ পুরাতন দুর্গের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ছিল। ইহা একটি মনোরম অট্টালিকা—গঙ্গার দিকে ২৪৫ ফিট লম্বা ছিল এবং প্রধান প্রবেশ-পথ হইতে গঙ্গার ধারের প্রধান ফটক পর্য্যন্ত স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত ছিল। উত্তর-পশ্চিম বুরুজের নিকট একটি ছোট ঘাট ছিল। এই ঘাট দিয়াই সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডার বাহিরে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের উপর অন্ধকূপের নির্য্যাতিত হলওয়েল্ ও তাঁহার অন্যান্য জীবিত সহকর্ম্মীদের সহিত অন্ধকূপ-হত্যার পরদিন প্রাতে নবাবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং ধন-রত্নাদির সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রশ্ন করা হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।



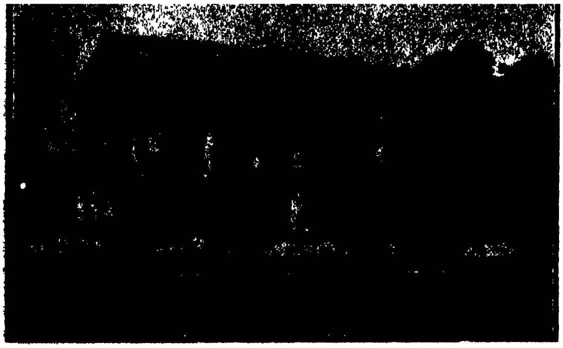
হেষ্টিংসের সুখসাগরের বাটীর ধ্বংসাবশেষ

ইহার পরের লাট ভবন দুর্গের বহির্ভাগে দক্ষিণ দিকে ছিল। উহা কোম্পানীর বাড়ী বলিয়া খ্যাত ছিল। উহা একটী ত্রিতল বাটী—১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, কারণ ঐ বৎসরে কলিকাতার যে নক্সা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে উহা স্পষ্ট চিহ্নিত আছে। কলিকাতা আক্রমণের সময় উহা থানার কাজ করিয়াছিল।



বারাকপুর লাটভবন

জানা যায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে এই বাটী ধ্বংসপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শীঘ্রই উহাকে ভাঙ্গিয়া উহার জমি বাঁকশাল্



মেমোরিয়াল হল—বারাকপুর

অর্থাৎ জাহাজের মালপত্র রাখিবার স্থানে পরিণত করা হয়। তাহা হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তার নাম হয় বাঁকশাল্ ষ্ট্রীট্।



লেডি ক্যানিংয়ের সমাধি

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কারভালহো (Ca valho) নামক এক ব্যক্তির একটি বাটী আয়ার কুটের জন্য ক্রীত হয় এবং ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের (Heiiry Vana t·ar·) অধিকারে আইসে। উহা সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ভ্যান্সিটার্ট রোডে অবস্থিত ছিল। ভ্যান্সিটার্ট কাউন্সিলের সদস্য ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড (William Frankland) সাহেবের সম্পত্তি একটী বাগানবাড়ী দশ হাজার আর্কট মুদ্রায় খরিদ করেন। মিড্লটন্ রোডে লোরেটো কন্ভেণ্ট যে স্থানে আছে উহা তথায় ছিল।

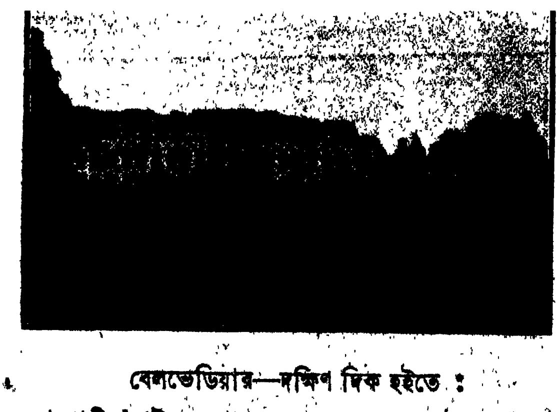
* * * *

ক্লাইভ্ দুইবার ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর হন। প্রথমবার তিনি হুজুরিমলের একটী বাটীতে বাস করিয়া-



জন জোফানি

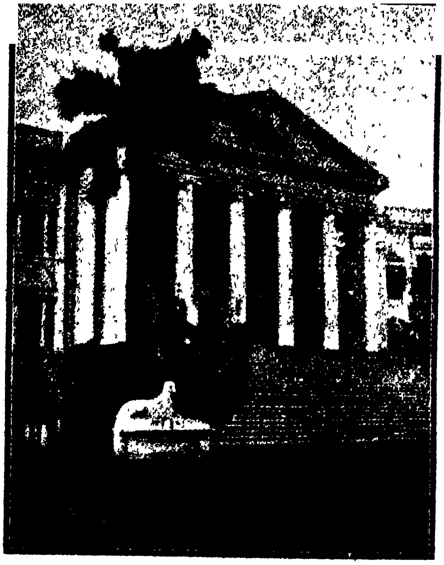
ছিলেন। দ্বিতীয়বার আসিয়া তিনি এস্প্লানেডের একটী বাটী, যাহা নূতন কাউন্সিল হাউস্ বলিয়া পরিচিত ছিল, তথায় থাকিতেন। ক্লাইভষ্ট্রীটে বর্ত্তমান রয়েল্ এক্সচেঞ্জ বা গ্রেহাম্



বেলভেডিয়ার—দক্ষিণ দিক হইতে

কোম্পানীর বাটী যে স্থানে আছে তথায় ক্লাইবের একটি বাটী ছিল। উহাতে পরে ফ্রান্সিস্ ফিলিপ্ ও বাস করিয়াছিলেন। দমদমাতে ক্লাইবের একটী বাড়ী ছিল. উহাকে

দমদম হাউস বলিত। খুব সম্ভব উহা ওলন্দাজ বা পোর্ত্তুগীজ কুঠি ছিল। দেশীয়রা ইহাকে কেল্লা বলিত। ইহা বাঙ্গালার মধ্যে একটা পুরাতন বাটী।



লাটভবনের সোপান-শ্রেণী

* * * *

চতুর্থ লাটভবন—ইহা ১৭৬৪ অথবা ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল্ হাউস রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান লাট-



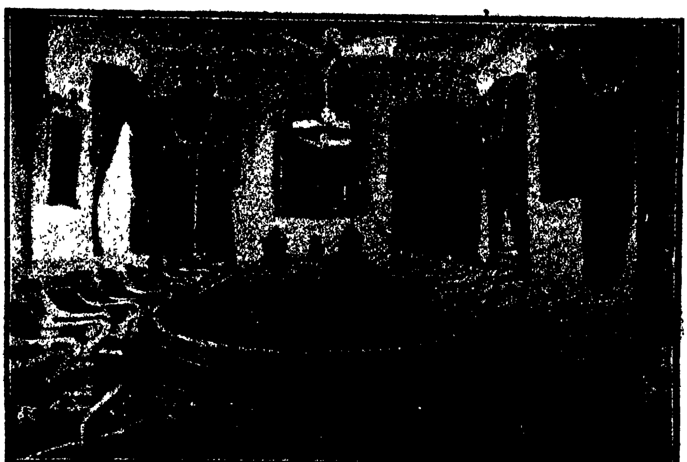
ডোভড ব্রাউন

প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইহা অবস্থিত ছিল। ইহা হইতে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট নাম হইয়াছে। ড্যানিয়েল্ এবং বেলির অঙ্কিত চিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিম দিকের বাড়ীটি সেই বাড়ী। ১৭৮৫ ও ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের প্রস্তুত নক্সাতেও ইহা দেখান আছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭২ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি পূর্ব্বোক্ত ভবন-সংলগ্ন উত্তর দিকের বৃহৎ



লাট-ভবনের তোরণ

অট্টালিকায় বাস করিয়াছিলেন। উহা মহম্মদ রেজাখাঁর সম্পত্তি—কোম্পানী ভাড়া লইয়াছিলেন। ইহার নিকটে



কাউন্সিল চেম্বার—লাটভবন

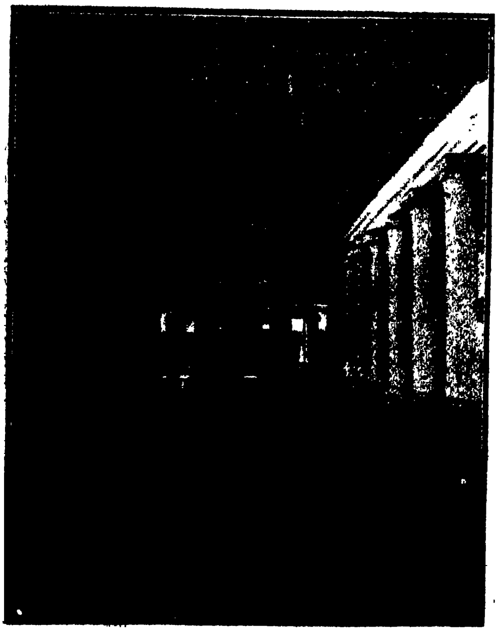
বাকিংহাম্ হাউস নামে আর একটি বাটীর কথা জানা যায়। হেষ্টিংস এ বাটীতেও বাস করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের মতে ইহাই পঞ্চম গভর্ণমেণ্ট ভবন।

*   *   *   *

হেষ্টিংসের বাড়ী—সরকারি বা ব্যক্তিগত যে ভাবেই হোক হেষ্টিংস আরও অনেকগুলি বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেকগুলিই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল।



সিংহাসন-কক্ষ—লাট-ভবন



মারবেল দরবার-কক্ষ—লাট ভবন

৭নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে যেখানে বার্ণ কোম্পানীর অফিস ছিল, সে বাটী তাঁহার ছিল। তাঁহার পত্নী ব্যারনেস ইন্‌হফ্‌ প্রায়ই এই বাটীতে বাস করিতেন। আলিপুর জজ আদালতের নিকট "হেষ্টিংস হাউস" নামক বাড়ীটিও তাঁহার ছিল। ইহা নবাব মিরজাফরের নিকট হইতে উপহার স্বরূপ পাইয়াছিলেন। হেষ্টিংস তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে লইয়া এই বাটীতে বাস করিতেন। ১৭৭৫ হইতে ৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটের পশ্চিম দিকের একটি ভাড়াটীয়া বাটীতে তিনি বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ইম্‌হফের (Baroness Inhoff) সহিত বিবাহের পূর্ব্বে তিনি বাস করিয়াছিলেন। চিৎপুরের নিকট কাশীপুরের বাগান নামে ২১৬ বিঘা জমি সমেৎ তাঁহার একটি বাগানবাড়ী ছিল। এ বাটীতে তিনি কখন বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কাডবার্ট থর্ণহিল (Cudberat Thornhill) নামক এক ব্যক্তিকে



বেঙ্গল আর্ম্মির সৈনিক

তিনি সম্ভবতঃ বিলাত যাইবার সময় ইহা বিক্রয় করিয়া যান।

রিষড়ায় বর্ত্তমানে যে স্থানে পাটকল আছে উহা হেষ্টিংসের পল্লীভবন ছিল। উহা ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হেষ্টিংস বিক্রয় করেন। এই বাটীতে তিনি কখনও বাস



ড্রইং রুম—লাট-ভবন



টিপু সুলতানের সিংহাসন—লাটভবন

করিয়াছেন এ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুখসাগরেও হেষ্টিংসের একটী পল্লীবাস ছিল। ফরবেশের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায়, উহা তৎকালে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন ছিল। এই বাটী হেষ্টিংস তৈয়ারি করান এবং তথায় একটি ইংরাজি ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরে উহা সুবিখ্যাত ধনী বোরেটো খরিদ করেন এবং তথায় একটি রোম্যান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী লওরালেটা (Laur. letta) ব্যবসাদার-দের বাসভবন ও মোরগের লড়াইয়ের আড্ডায় পরিণত করেন। উহা বহু দিন হইল গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জনের মতে হেষ্টিংস্ অন্ততঃ তেরটি বাটীতে বাস করিয়াছিলেন।

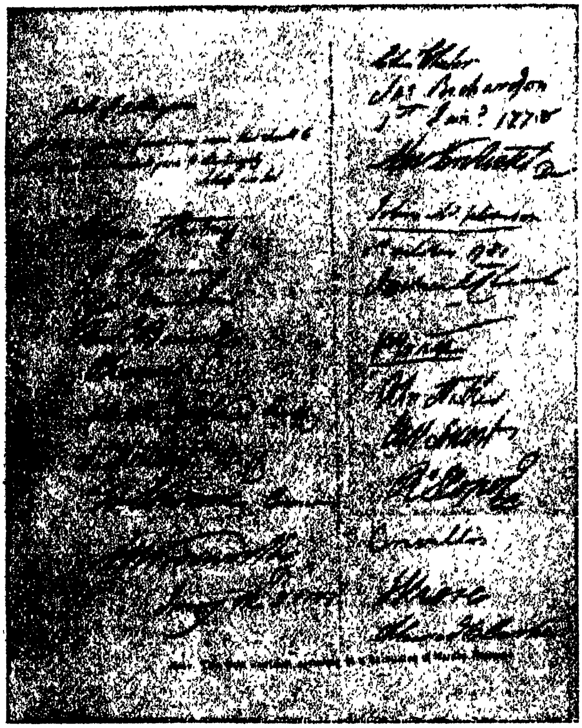
* * * *

ষষ্ঠ লাটভবন—ইহা বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের যে অংশ এক্ষণে সৈন্যদের ইন্‌ষ্টিটিউটরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে অবস্থিত ছিল। এই বাটীতেই কর্ণওয়ালিস বাস করিতেন এবং যতদিন না বর্ত্তমান লাট্‌ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল ততদিন.

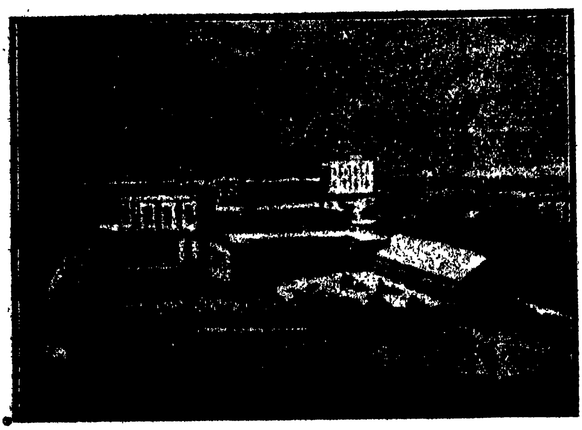


জয়-স্মৃতি—লাটভবন (১ম চিত্র

ওয়েলেস্‌লিও এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ট্রেজারি বিল্ডিং সংলগ্ন একটী বাটীতেও তিনি বাস করিতেন।



হেষ্টিংস্‌, ক্লেভারিং, মনসন, বারওয়েল্‌, কর্ণওয়ালিস্‌, শোর প্রভৃতির স্বাক্ষরের প্রতিলিপি

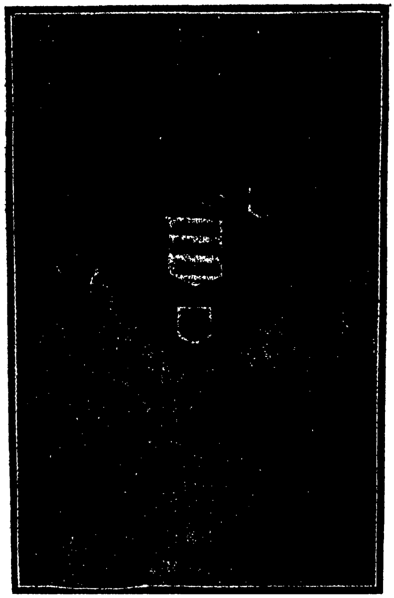


শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতার একটি দৃশ্য

কিন্তু বাটী নির্ম্মাণ-কালে ব্যারাকপুরেই তাঁহার ঠিক বাসস্থান ছিল।

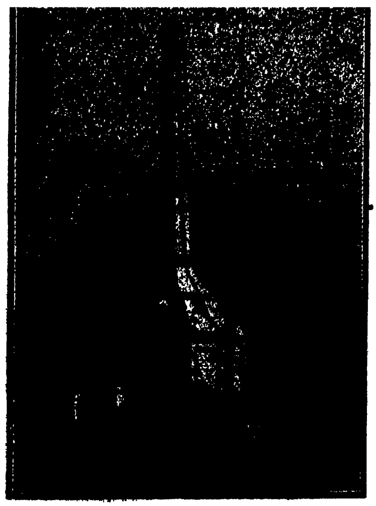
* * * *

ব্যারাকপুর পার্ক—গভর্ণর জেনারেলের পল্লী-ভবন রূপে ইহা বহু কাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহারও বহু পূর্ব্ব



ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার দর্শনের জন্য প্রবেশপত্র

হইতে এই ব্যারাকপুরের সহিত ইংরাজদের সম্পর্ক ছিল। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক এই স্থানে একটি



প্রাচীনকালের অন্ধকূপ স্মৃতি-স্তম্ভ

বাংলো নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও একটী বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদবধি দেশীয় লোকেরা স্থানটাকে চানক নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে

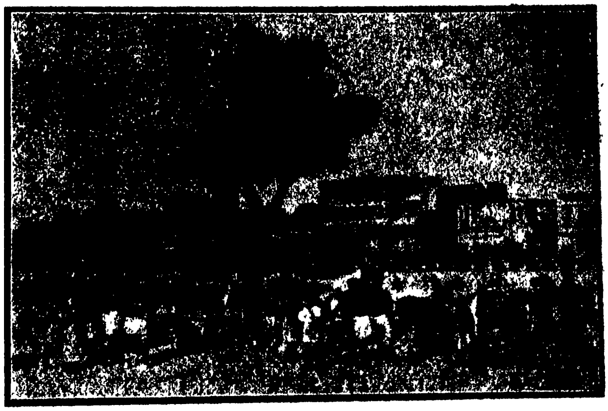
প্রথম সৈন্যাবাস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহা হইতে ব্যারাকপুর নাম হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাপটেন্ ম্যাকিন্টায়ার (Captain John Macintyre) ব্যারাকের পরিসর বৃদ্ধি বা সেনাপতির



জয়স্মৃতি—লাট ভবন। (২য় চিত্র)



ব্যারাকপুরের সৈন্যাবাস



প্রাচীন এস্প্ল্যানেডের এক অংশ

সুবিধার জন্য তাঁহার দুইখানি বাংলো ও ২২০ বিঘা জমি গভর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। উহা ২৫০০০৲ টাকায় ক্রীত হইয়া তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল্ ম্যাক্‌ফার্শনের সম্মতিক্রমে সেনাপতির হস্তে অর্পিত হয়। কর্ণওয়ালিশ এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে; যদি তাহা সত্য হয় তবে তিনি গভর্ণর জেনারেলের সহিত সেনাপতিও ছিলেন এই জন্যই বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে লর্ড ওয়েলেস্‌লি দ্বারা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেলের সম্পত্তি করিয়া লওয়া হয়। তিনি অবিলম্বে এই স্থানটির উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় পুরাতন বাংলো ভাঙ্গিয়া নূতন বাটী যাহাকে "নূতন বাংলো" বলে তাহা নির্ম্মিত ও সুবিস্তৃত উদ্যান রচিত হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তথায় একটি চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই কার্য্যের জন্য বুকাননকে (Dr Francis Buchanon) নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে যে প্রাসাদ তথায় বিরাজমান আছে উহা আর্ল অব মিণ্টোর দ্বারা আরম্ভ হইয়া তাঁহার পরবর্ত্তী গভর্ণর মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস দ্বারা সমাপ্ত হয়। সাহসী



সেনেট হাউস

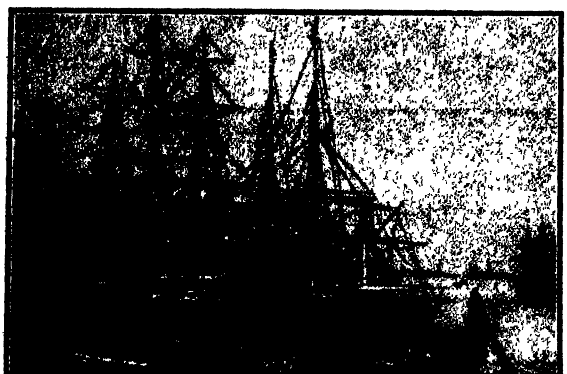
সৈনিকদিগের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে মিণ্টোর দ্বারা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে "মেমোরিয়েল হল" নামক অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হয়। অপরাপর গভর্ণরদিগের মধ্যে প্রথম ভাইসরয় লর্ড

ক্যানিং ও তাঁহার পত্নীর এই স্থানটি বড়ই প্রিয় ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লেডি ক্যানিংয়ের কলিকাতায় মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দেহ এই স্থানে সমাধিস্থ করা হয়।



টালির খালের উপর সেতু

বেলভেডিয়ার—ব্যারাকপুরে যেমন গভর্ণরের পল্লীবাস, সহরের উপকণ্ঠে আলিপুরে ছোটলাটের সরকারি বাসভবন বেলভেডিয়ারও তেমনই। ইহার প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। জনপ্রবাদ, ইহা ১৭০০



কলিকাতা বন্দরের দৃশ্য—১৮৪৮

খৃষ্টাব্দে প্রিন্স্ আজিম উস্‌শান্ দ্বারা প্রথম আরম্ভ হয়। উহা মিঃ ফ্র্যাংক্ল্যাণ্ডের (Mr. Frankland) বাগান-বাড়ী ছিল এরূপও জানা যায়। রেভারেণ্ড্ লংয়ের বর্ণনায় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বাটীর প্রসঙ্গে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেল্‌ভেডিয়ার নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। হেষ্টিংসের এই উদ্যানভবনে যাইবার জন্য কালিঘাটের খালের উপর



চার্লস সিলি



এলিজা ফে

পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ষ্টাভোরিনাস্ (Stavorinus) এই স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

হাণ্টার সাহেব (Sir W. W. Hunter) বেল-

ভেডিয়ার হেষ্টিংসের প্রিয় বাসভবন ছিল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কি সূত্রে ইহা তিনি পাইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। "হেষ্টিংস হাউস্" নামে তাঁহার অপর একটি বাড়ী যাহা আজিও সরকারি অতিথিভবন রূপে আছে তাহা উহার দক্ষিণে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ মেজর টলিকে (Major Tolly) বেলভেডিয়ার ভবন বিক্রয় করেন। তৎপরে নিকোলাস নিউজেন্ট (Nicholas Nugent) টমাস্ স্কটের (Thomas Scott) জন্য ইহা নীলামে খরিদ করেন। ইহার পর ব্রেরেটন্ বার্চ (John Brireton Birch) শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি ও জেমস্ ম্যাকিলপ্ (James Mackillop)এর হাত ফিরিয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইহা সুপ্রসিদ্ধ প্রিন্সেপ্-বংশের সম্পত্তি হয় এবং অবশেষে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট প্রিন্সেপ্ (Charles Robert Princep) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইহা বিক্রয় করেন। তাহার পর হইতে ইহা ছোটলাটের বাসভবন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে (James Halliday) এখানে বাস করিয়াছিলেন। পর পর ছোটলাট স্যার এ্যাসলে ইডেন, স্যার চার্লস ইলিয়ট্ প্রভৃতির দ্বারা এই অট্টালিকার অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

এই সুপ্রসিদ্ধ ভবনে ডিউক অব্ এডিনবারা, প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্ রূপে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড, ডিউক্ অব্ ক্লারেন্স, প্রভৃতির সময় সময় শুভাগমন হইয়াছে। এখানকার উদ্যান ও অট্টালিকা প্রভৃতি কলিকাতার লাটপ্রাসাদ অপেক্ষা মনোরম।

* * * *

ছোটলাটের গ্রীষ্মাবাস—স্যার এ্যাস্‌লে ইডেন্ যখন বাঙ্গালার ছোটলাট, সেই সময় দার্জ্জিলিংয়ের গ্রীষ্মাবাসটি খরিদ করা হয়। ইহার নাম "শ্রবারি"। ইহা বার্চহিলের উপর অবস্থিত। পূর্ব্ববর্ত্তী ছোটলাটেরা মধ্যে মধ্যে দার্জ্জিলিং যাইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত বর্ত্তমান "শ্রবারি" যেস্থানে অবস্থিত, তথায় একটি পুরাতন বাটীতে বাস করিতেন। ইহা পূর্ব্বে বার্ণেস্ (Mr. Barnes) নামক এক সাহেবের সম্পত্তি ছিল, তৎপরে কুচবিহারের মহারাজা খরিদ করেন। শেষোক্ত মহারাজার নাবালক অবস্থায় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর গভর্ণমেণ্ট ইহা খরিদ করেন। তৎপরে ইহার বহুল পরিবর্ত্তন করিয়া সম্পূর্ণ নূতনভাবে গঠিত করা হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্য শেষ হয়। পর বৎসর গ্রীষ্মকালে এখানে প্রথম ছোটলাট আসিয়া বাস করেন। কিং (Sir G. King) দ্বারা এখানকার উদ্যান রচিত হয়।

* * * *

বর্ত্তমান লাটভবন—ইহা নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে গভর্ণরের বাসের জন্য যে সব বাটী ছিল, তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আদৌ শোভন ছিল না, ইহা প্রথম লর্ড ওয়েলেস্‌লির মনে হয়। তিনি বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষ প্রাসাদ হইতে রাজার ভাব লইয়া শাসিত হওয়াই উচিত, ব্যবসা ক্ষেত্রে বসিয়া সামান্য মসলিন্ বা নীলের ব্যবসায়ীর সংস্কার লইয়া নহে।" ইহা তিনি যথার্থ কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছা এবং চেষ্টায় বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। উক্ত ৫ই ফেব্রুয়ারি হিকি (Mr. Timothy Hickey) সাহেবের দ্বারা ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যের জন্য স্থপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন ক্যাপ্টেন ওয়াট্ (Captain Wyatt, R. E.) ইংলণ্ডের ডার্ব্বিশায়ার-স্থিত লর্ড স্কার্স্‌ডেলের (Lord Scarsdale) কেড্‌লেস্টন্ হল্ নামক পল্লী-ভবনের পরিকল্পনায় নির্ম্মিত হয়। লং সাহেবের লেখা হইতে জানা যায়, ইহার জন্য জমি খরিদে ৮০০০০৲ টাকা, বাটীর জন্য ১৩ লক্ষ টাকা এবং আসবাব-পত্রের জন্য অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার জমির পরিমাণ মোট ছয় একার। উপস্থিত এই প্রাসাদ-সংলগ্ন যে সুন্দর উদ্যান পরিদৃষ্ট হয় ইহা লর্ড লিটনের চেষ্টায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণের পর সর্ব্বপ্রথম এখানে যে উৎসব হয়, তাহা সিরিঙ্গাপাটাম পতনের বাৎসরিক উৎসব, ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে সাধিত হয়। এই উপলক্ষে সাতশ তের অধিক সম্ভ্রান্ত নরনারী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর ১২ই আগষ্ট গভর্ণর জেনারেল মিশর প্রত্যাগত জেনারেল বেয়ার্ড্ (Major-General Baird) ও সৈনিক কর্ম্মচারীদের বহুসংখ্যক প্রধান নরনারীদের লইয়া ভোজ দ্বারা অভিনন্দিত করেন। তৎপরে এমিন্সএর সন্ধি উপলক্ষ্যে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি লাটভবনে

এক মহাউৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উৎসবে প্রায় আট শত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বিলাতের লর্ড্ ভেলেন্শিয়া (Lord Valentia) এই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে দুর্গ, নদীবক্ষে জাহাজ, লাটভবন প্রভৃতি আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। এরূপ সমারোহের সহিত পূর্ব্বোক্ত উৎসব দুইটি সম্পন্ন হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক এইটিকেই নবনির্ম্মিত লাটভবনের প্রথম উৎসব বলিয়াছেন।

* * * *

লাটভবনে বিবিধ বিজয়-স্মৃতি—এখানকার প্রাসাদ মধ্যে ও সংলগ্ন জমিতে বহুবিধ উল্লেখযোগ্য দ্রব্যাদির মধ্যে নানা যুদ্ধের বিজয়-স্মৃতি সকল সযত্নে রক্ষিত আছে। ব্রহ্ম, সেরিঙ্গাপাটাম, আলিওয়াল প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধজয়ে লব্ধ কতিপয় সুবৃহৎ কামান উদ্যান মধ্যস্থ পথগুলিতে সজ্জিত আছে। সিংহাসন-কক্ষে যে সিংহাসনখানি রক্ষিত আছে এবং যাহা রাজপ্রতিনিধি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা টিপু সুলতানকে পরাস্ত করিয়া আনা হয়। চন্দননগর বিজয়ের পর ফ্রান্সের রাজা-রাণীর যে জীবন-প্রমাণ প্রতিকৃতি তথা হইতে আনা হয় উহাও এই স্থানে ছিল। এই সকল ভিন্ন এখানে বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ শিল্পী অঙ্কিত ঐতিহাসিক চিত্র আছে। এই সকল চিত্রের মধ্যে লর্ড ক্লাইব, মারকুইস্ হেষ্টিংস্, মারকুইস্ কর্ণওয়ালিস্, মারকুইস্ ওয়েলেস্লি, আর্ল ক্যানিং, লর্ড লরেন্স, আর্ল মেয়ো, লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক, মারকুইস্ ল্যান্সডাউন্, আর্ল অক্ল্যাণ্ড, মারকুইস্ রিপণ্, লর্ড এলগিন্, আর্ল মিণ্টো ভাইকাউণ্ট্ হার্ডিং, আর্ল এলগিন্, স্যার আর্থার ওয়েলেসলি, ডিউক্ অব্ ক্লারেন্স, শের আলি খাঁ পাতিয়ালার মহারাজা, ফতে আলি, আর্ল বেকন্সফিল্ড প্রভৃতির প্রতিকৃতি আছে। এতদ্ভিন্ন রাণী ভিক্টোরিয়া যে বৎসর সিংহাসন প্রাপ্ত হন সেই বৎসরের অঙ্কিত তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি আছে। *

* নূতন ও পুরাতন লাট-ভবনের ছবি অনেকগুলি পূর্ব্ব পূর্ব প্রবন্ধের সহিত বাহির হইয়াছে; সেই জন্য আর সেগুলি এখানে দিলাম না। সময়ে পাওয়া না যাওয়ায় কয়েকখানি ছবি যথাস্থানে পূর্ব্বে দিতে পারি নাই, তাহা এই সঙ্গে দিলাম।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাংলা ভাষা

শ্রীবীরেশ্বর সেন

শ্রাবণ এবং ভাদ্রের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত বাংলা ভাষা বিষয়ক দুইটী অতি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাংলার উচ্চারণ ও বানান সম্বন্ধে নানা কথা মনে উদিত হইল। তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বাংলা ভাষার বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে অভিন্ন। এই দুই বর্ণমালায় আকারগত প্রভেদ থাকিলেও বর্ণের নাম উভয়েই এক। কিন্তু কোন কোন বর্ণের ধ্বনি সংস্কৃতে একরূপ, বাংলায় কিছু বিভিন্ন। ভারতবর্ষে প্রচলিত আরও কয়েকটী বর্ণের ধ্বনি সংস্কৃতের মত নহে। তাহা ক্রমে প্রদর্শন করিব। অনুস্বার হইতেই আরম্ভ করা যাউক। বিদ্যানিধি মহাশয়ও ইহার বিচার করিয়াছেন।

আমরা সর্ব্বত্র অনুস্বারকে ঙ রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি। মিথিলা-বাসীরাও তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু পশ্চিমের লোক ন্ রূপে ইহার উচ্চারণ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কখন ম্ রূপে কখন ন্ রূপে উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ৺হরিভট্ট শাস্ত্রী স্পষ্টভাবে সম্স্কার এবং পুন্স্কোকিন বলিতেন। কিন্তু তিনি পুঁল্লিঙ্গও বলিতেন। বোম্বাইএর মুদ্রিত দুই একখানা পুস্তকেও রোমান অক্ষরে samskar বা তদনুরূপ অক্ষ বানান দেখিয়াছি ইহা মনে আছে। এ বিষয়ে প্রায় ১৫ বৎসর হইল বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাড়ীতে আমার মৌখিক আলাপও হইয়াছিল। আমি কিন্তু তাঁহাকে তখন প্রমাণ দেখাইতে পারি নাই।

এক শত বৎসর হইল বাঙ্গালীদের সহিত হিন্দুস্থানীদিগের যে বেশ মেলামেশা ছিল ইহা সুপরিজ্ঞাত। তাহারই ফলে আমরা বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে

সন্মান, সন্মত ইত্যাদি উচ্চারণ করিতে শুনিতাম। কিন্তু এখন সেইরূপ উচ্চারণ বঙ্গদেশে অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। যেহেতু আমরা কখনই অনুস্বারকে ন্ রূপে উচ্চারণ করি না।

অনুস্বার যে স্বরের পরে থাকে সেই স্বর অত্যন্ত বা বিকৃত হইয়া চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলেই অনুস্বারের প্রায় ঠিক উচ্চারণ পাই; যথা অংশ—অওঁশ, মাংস—মাওঁস, হিংসা—হিইঁসা।

স্পর্শবর্ণের পূর্ব্বে অনুস্বার থাকিলে সেই বর্ণ যে বর্গের সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণই বিকল্পে অনুস্বারের উচ্চারণ; যথা কিং করোমি—কিঙ্করোমি; কিংচ—কিঞ্চ, কিং তু—কিন্তু। এইরূপ উচ্চারণের রীতি বঙ্গদেশের বাহিরের। আমাদের দেশে কেবল ক বর্গের যে কোন বর্ণের পূর্ব্বে অনুস্বার থাকিলেই তাহার উচ্চারণ ঙ হয়। অন্য বর্গের হইলে দুই চারিটা শব্দ ভিন্ন অন্য কোন স্থলে অনুস্বারের উচ্চারণ বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয় না। আমরা এবঞ্চ কিন্তু পরন্তু লিখি এবং বলি, কিন্তু কিংতেন, সত্যংব্রয়াৎকে কিঙতেন, সত্যঙ ব্রয়াৎ রূপেই উচ্চারণ করি।

অনুস্বারকে ঙ রূপে উচ্চারণ করা যখন ভুল তখন বাংলা' লেখাও ভুল। কিন্তু লিপি-সৌকর্য্যের জন্য আমরা এরূপ ভুল সংদাই করিয়া থাকি। খাওয়া, যাওয়া, গোয়াল, ওয়াটার (water) কে য়াটার, শুয়াপোকা, কুয়া, গেরুয়া প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের য়া টা ভুল—আ হওয়াই উচিত। কিন্তু য়া লেখা অপেক্ষা আ লেখা অধিক অনায়াসসাধ্য বলিয়া আমরা এই সকল শব্দে য়া লিখি, কিন্তু উচ্চারণ কখনই আ ভিন্ন য়া করি না। এই সকল শব্দকে রোমান অক্ষরে রূপান্তরিত করিবার সময়েও ya না লিখিয়া a ই লিখিয়া থাকি। সুতরাং কেবল লিপি-সৌকর্য্যের জন্যই বাংলা, শিলং, দারজিলিং, ইংরেজ লেখার সমর্থন করা যাইতে পারে। কেন না এই সকল শব্দ ঙ অথবা ঙ্গ দিয়া লেখা সুসাধ্য নহে। বিশেষতঃ এই সকল শব্দে ং ব্যবহার করায় যত দোষ, তাহা অপেক্ষ যাওয়া প্রভৃতি শব্দে য়া লেখায় দোষ অধিক, যেহেতু আমরা সর্ব্বদাই অনুস্বারকে ঙ রূপে উচ্চারণ করি।

লিখিবার সুবিধার জন্য অশুদ্ধ বানানের আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আসামীরা চ অক্ষরটাকে ইংরেজী saw শব্দের মত উচ্চারণ করেন এবং সাহাব লিখিতে হইলে চাহাব লেখেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে স অপেক্ষা চ লেখা সুসাধ্য।

'বাংলা' বানানের প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ। ইহা তিনি আমার লিখিত একটা প্রবন্ধের উত্তরে লিখিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি বঙ্গভাষায় প্রধান authority বিদ্যানিধি মহাশয়ও 'বাঙ্গালা' ছাড়িয়া 'বাংলা' ধরিয়াছেন। সুতরাং এখন হইতে আমিও এ বিষয়ে তাঁহাদের অনুগামী হইব। বাঙালী সাহিত্যিক মাত্রেই এই বানান গ্রহণ করিবেন কি না বলিতে পারি না।

বিদ্যানিধি মহাশয় ঙ এবং ঞ র উচ্চারণের বিষয়েও বিচার করিয়াছেন। ঙ র উচ্চারণটা বোধ হয় কিছু কঠিন বলিয়াই বর্ণ শিক্ষার সময়ে ইহাকে উঁঅ এবং উঁ-আ বলে। পূর্ব্বকালে এই অক্ষরটা স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইত না। কেবল মাহেশ্বর সূত্রে ঞ ম ঙ ণ ন ম্ এ এবং বিভক্ত প্রকরণে ইহা দেখিতে পাই। বাংলায় ইহার উচ্চারণ বহু শব্দে থাকিলেও উহাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাইত না। বর্ত্তমান কালের প্রভাবে ঙ প্রকাশ্যভাবে নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার বহু উদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় যে বলিয়াছেন যে 'ভাঙা' শব্দের ঙ র প্রকৃত উচ্চারণ উঁআঁ, আমি ভয়ে ভয়ে বলিতেছি যে তাঁহার এই মতের সহিত আমি একমত নহি। "উঁ আ" অক্ষরের নাম মাত্র ধ্বনি নহে; যেমন পারসী আলেফ, জিম্, দাল প্রভৃতি; গ্রীক আলফা বিটা, ডিগম্ম (আমাদের অন্তঃস্থ ব) প্রভৃতি, বাংলা ইঁর আন (ণ) আঙ্ক, আর সংস্কৃত অনুস্বার বিসর্গ প্রভৃতি। তবে যে পূর্ব্বকালের বাঙালী লেখকেরা সেই নামকেই ধ্বনি বলিয়া মনে করিতেন, তাহার কারণ ভারতচন্দ্র ভিন্ন তাঁহারা সুশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহাদের বানান আদর্শ হইতে পারে না। কাশীরাম দাসের মহাভারতে ভুরি ভুরি অশুদ্ধ প্রয়োগ ছিল। ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সে সমস্ত সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করেন। ইহা তাঁহার ভূমিকা হইতেই জানা যায়; যথা—

শ্রীগৌরীশঙ্কর কহে শুন কাশীরাম।
শোধন করিতে বড় কষ্ট পাইলাম॥

'ঙ্গ' র গ অনেক স্থানে অস্পষ্ট; যেমন কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত। অনেক স্থানে ইহা মোটেই উচ্চারিত হয় না; যেমন ভাঙা, আঙুল। অনেক স্থলে ইহার উচ্চারণ ঙ, যেমন পূর্ব্ব বঙ্গে গঙ্ঙ, মঙ্ঙল। গকারের ক্ষীণ ধ্বনি সঙ্গ, সঙ্গী প্রভৃতি শব্দে। রাঢ়ে 'ঙ্গ' র 'গ' উচ্চারণ স্পষ্ট।

বাংলায় কথা কহিবার সময়ে সকলেই বলে 'বাঙালী'। অথচ ইংরেজীতে কথা কহিবার সময়ে উচ্চারণ হয় বেঙ্গলী'। ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয়। পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত যুবকেরা কখন কখন ইংরেজী বলিবার সময়েও বেঙালী বলিয়া থাকেন। তাহা কিন্তু শ্রুতি মধুর বলিয়া বোধ হয় না।

ঙ্গ এবং ঙ উভয় ধ্বনিই ইংরেজী ng দিয়া প্রকাশিত হয়। কোন্ ধ্বনি কোথায় হইবে তাহা শিখিতে হয়। Sing, singer, long, longer (personal noun), bring, hang, hunger প্রভৃতি শব্দের ng = ঙ। Finger, hunger, longer (adjective), longest প্রভৃতি ng = ঙ্গ।

এ বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমার একদিন আলাপ হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে একটু মতভেদ হইয়াছিল মনে আছে।

গঙ্গাকে অনেক বাঙ্গালী গঙ্ঙা বলেন এই প্রসঙ্গে একটা অবান্তর কথা মনে হইল। তাহাতে অনেক পাঠক কৌতুক অনুভব করিবেন ভাবিয়া লিখিতেছি। গ্রীকে গঙ্গা প্রকাশ করিতে হইলে গগ্গা লিখিতে হয়। গঙ্গানদীর গ্রীক নাম গাগ্গেস অথবা গাগ্গীস্—উচ্চারণ গাঙ্গীস। ইহা ইংরেজীতে Ganges রূপে লিখিত হয়। কিন্তু ইংরেজীতে g র পরে e থাকিলে সাধারণতঃ g র উচ্চারণ গ না হইয়া জ হয়। এই জন্যই গঙ্গাকে ইংরেজীতে গেঞ্জেস বলে।

ঙ অপেক্ষাও কঠিন উচ্চারণ ঞ র। ইহাও স্বতন্ত্রভাবে কেবল মাহেশ্বর

সূত্রে এবং ব্যাকরণের অন্যান্য স্থানে আছে। অন্যত্র বোধ হয় না। যখন ইহার সহিত চ বর্গের কোন বর্ণ যুক্ত হয় তখন ইহার উচ্চারণ কিছু-মাত্র আয়াসসাধ্য নহে, যেমন চঞ্চল, বাঞ্ছা ; কিন্তু যখন চ ও জ র সহিত ঞ যুক্ত হয় তখনই বোধ হয় অনেকেই তাহার উচ্চারণ দুঃসাধ্য মনে করেন। যাচ্ঞা শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ যাচ্চাঁ এবং যজ্ঞ শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ যজ্জঁ। বাঙালীরা এই দুইটা যথাক্রমে যাচ্ঙা এবং যগ্গঁ এবং মহা-রাষ্ট্রীয়েরা যাচ্না এবং যজ্ন রূপে উচ্চারণ করেন। প্রাচীন কালে যে এরূপ উচ্চারণ ছিল না তাহা সন্ধির সূত্র দেখিলেই বুঝা যায়। সন্ধির নিয়মানুসারে তৎ+জ্ঞান—তজ্জ্ঞান। ইহাতেই বুঝা যায় জ্ঞ অক্ষরের জ উচ্চারিত হইত।

বাংলায় কতকগুলি এমন ধ্বনি আছে যাহা প্রকাশ করিবার অক্ষর নাই। ইহার প্রথম এবং প্রধান সংস্কৃত অ যাহা ইংরেজী but শব্দে আছে। বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই এই বিশ্বাস যে এই ধ্বনির ব্যবহার আমাদের মোটেই নাই। আমার বিবেচনায় ইহা ভুল বিশ্বাস। আম, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের এবং অন্যান্য বহু শব্দে আমরা এই ধ্বনি পাই। বাস্তবিক বলিতে গেলে আমরা প্রায়ই সংস্কৃত আ উচ্চারণ করি না। ইহার উদাহরণ না দিলে অনেকের বিশ্বাস হইবে না। 'আসানানাং সুরভিত শিরঃ নাভিগন্ধৈর্মৃগানাং' মেঘদূতের এই পংক্তিতে ছয়টা আ আছে। বাংলায় কয়টা শব্দে এইরূপ দীর্ঘ আ উচ্চারিত হয়? ৺বলদেব পালিত সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় কবিতা লিখিতেন। তাঁহার কোন কাবতায় এক চরণ পরীক্ষা করিলেই আমার উক্ত আরও স্পষ্ট হইবে। যেমন "মধুর অমৃত মাখা এই সে সৌম্যমূর্ত্তি" মালিনী-ছন্দের এই চরণটার মাখা শব্দটা যেমন টানিয়া উচ্চারণ করিতে হয় আমরা কথা কহিবার সময়ে বা গদ্য পাড়বার সময়ে তেমন কখনই করি না।

বাংলায় যেভাবে আমরা অকারের উচ্চারণ করি তাহা আমাদের এবং আসামীদের বিশেষত্ব। এই অ ইংরেজী call শব্দের aর মত।

আমাদের যে কেবল আকারের উচ্চারণ নাই এমন নহে। আমাদের এ এবং ও প্রায়ই হ্রস্ব অথচ তাহা লিখবার অক্ষর নাই। সংস্কৃতে হ্রস্ব-এ এবং হ্রস্ব-ও যথাক্রমে ই এবং উ রূপে লিখিত হয় ; কেন না সংস্কৃতে হ্রস্ব-এ এবং হ্রস্ব-ও নাই। তেলেগু ভাষা ভিন্ন বোধ হয় আর কোন ভাষা-তেই হ্রস্ব-এ এবং হ্রস্ব-ও স্বীকৃত হয় নাই। বঙ্গের বাহিরে উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্র দেখিয়াছি যে লোকের হ্রস্ব-এ এবং হ্রস্ব-ও উচ্চারণ করিবার ক্ষমতাই নাই। আমাদেরও হয় ত সেইরূপ অক্ষমতা ছিল। আমরা ইংরেজী ticket শব্দে যে হ্রস্ব এ আছে সেস্থানে ই দিয়া টিকিট বলি। এখন কিন্তু আমরা বাংলা পড়িবার সময়ে অথবা বলিবার সময়ে সংস্কৃত এ এবং ও কেও হ্রস্ব রূপে উচ্চারণ করি। প্রত্যেকে নিজেই ইহার পরীক্ষা করিতে পারেন।

স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বিস্মিত বা চমকিত হইলে তাঁহাদের মুখ হইতে যে একটা interjection বাহির হয়, তাহা আমরা ওমা রূপ লিখিয়া থাকি। কিন্তু সংস্কৃতে তাহা উমা রূপে লিখিতে হয় ; কেন না এই শব্দের ওকারটা হ্রস্ব। কালিদাস কুমারসম্ভবে লিখিয়াছেন যে মেনকার কন্যা গিয়া মেনকাকে বলিলেন মা আমি তপস্যা করিব। ইহা শুনিয়া মেনকার মুখ দিয়া উমা এই বিস্ময়সূচক শব্দটা বাহির হইল। সেই জন্যই মেনকার কন্যার নাম হইল উমা।

(এই উমা intergcrionটা যদি কেবল বঙ্গদেশেরই শব্দ হয়, তাহা হইলে এই অভিনব ব্যুৎপত্তি করাতে কালিদাসকে বাঙ্গালী বলিয়াই বোধ হয়। কালিদাসকে বাঙ্গালী ভাবিবার আরও কারণ আছে। কিন্তু সে কথা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত।)

এত দূর য হা বলিলাম তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, আমাদের ভাষায় যত ধ্বনি আছে, আমাদের বর্ণমালায় তাহা প্রকাশ করিবার মত অক্ষর নাই। সংস্কৃত এবং হিন্দী ভিন্ন বোধ হয় কোন ভাষাতেই ধ্বনির সমসংখ্যক অক্ষর নাই। প্রত্যেক ধ্বনির জন্য এক এক অক্ষর করিতে হইলে আমাদের বর্ণমালা চীনের বর্ণমালার সমান না হউক, উহাতে আরও শতাবধি অক্ষর বাড়াইতে হয়। কিন্তু সেরূপ করা বোধ হয় কাহারই ইচ্ছা নহে। ইংরেজীতে যখন ২৬টা অক্ষর দিয়াই কাজ চলে, তখন তাহার দ্বিগুণ অক্ষর দিয়া আমাদের কাজ চলিবে না কেন? আমাদেরও এক একটা অক্ষর দিয়া একাধিক ধ্বনি প্রকাশ করাইতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের যে সকল অক্ষর আছে তাহা অকারণে বর্জ্জন করা উচিত নহে। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন "প্রাণ ঝোল্‌তে হোলেই বোল্‌তে হয় পোড়া দেশের লোকের আচার দেখে চোল্‌তে পথে করি ভয়।" এখনকার লেখকেরা লিখিবেন ঝলতে, বল্‌তে, হলে, চল্‌তে। "বলে, কয়ে চলে গেল" এই কয়েকটা কথা বিদ্যানিধি মহাশয়ই উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল শব্দে ও-কার দিয়া লেখাই উচিত। কিন্তু নব্য লেখকেরা তাহা করিবেন না ; অথচ তাঁহারা ভালো, বোলো, বারো, তেরো প্রভৃতিতে ওকার দিবেনই দিবেন ; যদিও ওকার বর্জ্জন করিলে কোনরূপ গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই।

অকারের পর ই বর্ণ অথবা উ বর্ণ থাকিলে, এমন কি ইহাদের মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও, বাংলা ভাষায় প্রকৃতি অনুসারে অ কার ও রূপে উচ্চারিত হয়। হই, হউক, কবি, ছবি, কচু, রঘু প্রভৃতি শব্দের অকার স্থানে ওকার লিখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বলিয়া কহিয়া চলিয়া স্থলে বলে কয়ে চলে লিখিলে যে বোলে, কোয়ে, চোলে উচ্চারণ করিতে হইবে বাংলার প্রকৃতি সেরূপ নহে। পূর্ব্বকালে এইরূপ স্থলে শব্দের শেষে য-ফলা যোগ করা হইত। কিন্তু এরূপ করার প্রধান আপত্তি এই যে তাহা হইলে পূর্ব্ব স্বর গুরু হইয়া যায়। অন্য আপত্তিও হইতে পারে। আমরা ব-ফলা ও য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনকে অভ্যস্তরূপে উচ্চারণ করি যেমন সখ্য, বক্র। হিন্দুস্থানের কোন কোন স্থলে কিন্তু এরূপ উচ্চারণ হয় ; যেমন মহারাজ গাইকোআড়ের এক পুত্রের নাম ধারিয়া শীল অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল।

নবীন লেখকদের বানানের আর একটা উদাহরণ দিব। তাঁহারা হইতেছে স্থলে হচ্ছে লেখেন। তাঁহারা হয় ত ভাবেন যে ইহা কলিকাতা অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। হইতেছের

রাঢ়ী উচ্চারণ হোচ্ছে কলিকাতার প্রাচীন এবং পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান উচ্চারণ হোচ্ছে, নদীয়া জেলার উত্তরভাগের উচ্চারণ হচ্চে (উচ্চারণ haus say)। সুতরাং হচ্ছে কোন স্থলে উচ্চারণই নহে, যদিও নদীয়ার উচ্চারণের কাছাকাছি বটে।

আর একটা অক্ষরের উচ্চারণ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া উচ্চারণ এবং বানানের পালা শেষ করিব। ঋকারে যে রকারের ধ্বনি আছে তাহা অতি ক্ষীণ। তাহার সহিত যে স্বর আছে আমরা তাহা ই রূপে উচ্চারণ করি। কিন্তু উড়িষ্যায় তাহার উচ্চারণ প্রায় উ। উড়িয়ারা কৃষ্ণকে প্রায় ক্রুষ্ণ বলেন। এই উচ্চারণ গ্রীক, জর্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ ভাষায় আছে ; কিন্তু ইংরেজী, সংস্কৃত, বাংলা এবং লাটিনে নাই। ঋষি, পৈতৃক, কৃমি শব্দ যথাক্রমে রিষি, পৈত্রিক, ক্রিমি রূপে লিখিলেও শুদ্ধ হয়। ইহাতে বোধ হয় যে ই যুক্ত রকার যে ঋকারের উচ্চারণ তাহা প্রাচীন কাল হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, কি মহারাষ্ট্রে, কি মিথিলায়, কি বঙ্গদেশে ঋকার ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইলে কোন স্থানেই তাহা শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হয় না, ইহা দেখিয়াছি। সদৃশ, তাদৃশ, জতুগৃহ, সরীসৃপ, মসৃণ প্রভৃতি শব্দ সদ্রিশ, তাদ্রিশ, জতুগ্রিহ, সরিস্রিপ, মস্রিণরূপে উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছি। এই উচ্চারণ যে অশুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না ইহাতে পূর্ব্বস্বর গুরু হয়। মসৃণ শব্দের তিনটা স্বরই লঘু ; সুতরাং ইহা মালিনী ছন্দে শ্লোকের প্রথমে বসিতে পারে। কিন্তু ইহা মস্রিণরূপে উচ্চারণ করিলে, ইহার প্রথম স্বর গুরু হইয়া যায়। তাহা হইলে ছন্দঃপতন হইবে।

এখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের আরও দুই চারিটা মন্তব্যকে কেন্দ্র করিয়া আমি আরও কয়েকটি কথা বলিব। ঠাকুর্দ্দা বানান সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন দ যখন দ্বিরুক্ত হইয়াছে তখন রেফ হইবে না। এই মন্তব্যের সূত্রটা বুঝিলাম না। ঠাকুদ্দা অথবা ঠাকুর দা লিখিলে যে ভাল হইত সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু দ অভ্যস্ত হইলে উপরে রেফ হইতে পারে না কেন ? রেফের নিম্ন বর্ণ বিকল্পে অভ্যস্ত বা দ্বিরুক্ত হয় ইহাই সূত্র। প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীই তর্ক মূর্খ গর্গ দুর্ঘট, কর্ত্তা, সমর্থ, দুর্দ্দিন, নির্দ্ধন, অর্পণ, বর্ব্বর শব্দে রেফের নিম্নবর্ণ দ্বিরুক্ত করিয়া উচ্চারণ করেন। কিন্তু কতকগুলিকে অভ্যস্তভাবে লেখেন ; যেহেতু সেগুলি অভ্যস্তভাবে লেখা অনায়াসসাধ্য। ত্ত, দ্দ, ব্ব, লিখিতে আয়াস মাত্র নাই। কিন্তু ক্ক, কখ, গগ, ইত্যাদি লেখা মোটেই সুকর নহে।

গ্রাভারী বোধ হয় পৃথক্ করিয়া গ্রাম ভারী লিখিলেই ভাল হইত। গ্রামের মধ্যে ভারী গ্রামবৃদ্ধ। আজ্ঞে বাক্যের 'আজ্ঞে', শব্দের ছায়া মাত্র। এঁজি পেঁজির তুল্য। বিশেষণের ছায়া এবং ব্যক্ষর ও স্বরাদি বলিয়া বোধ হয় ছায়াটা পূর্ব্বগামী হইয়াছে। বিশেষ্যের ছায়া সর্ব্বদাই পশ্চিমগামী। ছায়া দিয়া কথা উত্তর ভারতের সকল ভাষারই বিশেষত্ব। বাংলা, কাপড় টাপড়, হিন্দী কাপড়া উপড়া।

বিদ্যানিধি মহাশয় নারী ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। এখন নারীরা যখন পুরুষের মত চুল কাটিয়া পুরুষোচিত সমস্ত কার্য্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেছেন তখন, তাঁহাদের ভাষাটাই বা কেন অন্তঃপুরগত হইয়া থাকিবে ? এই জন্যই আমরা নারীভাষার সাত্তিককের শব্দটাকে ঈষৎ রূপান্তরিত 'সত্যকার' ভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে কুড়ি বৎসর হইতে দেখিতে পাইতেছি। নতুবা 'প্রকৃত' এবং 'বাস্তবিক' এই দুইটা শব্দ থাকিতে কিম্ভুত কিমাকার সত্যকার শব্দের কি প্রয়োজন ছিল ? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বহু সাবধান লেখকও এই সত্যকারের হাত হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন। কালে হয় ত পুরুষেরা পরস্পরের প্রতি ওলো, হাঁলা প্রভৃতিও প্রয়োগ করিবেন। আবার আজকাল নাট্যশালা যখন আমাদের একটা তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছে, তখন হয় ত অচিরে আমাদের চলিত ভাষায় নাটকীয় আযুত্ত, মারীষ, ভাব প্রভৃতি শব্দও প্রবেশ করিবে।

বিদ্যানিধি মহাশয় একটা সুন্দর সূত্রের আভাষ দিয়াছেন। সূত্রটি এই যে জানা শব্দের উচ্চারণ বশে নূতন শব্দের উচ্চারণ নিয়মিত হয়। এই জন্য যে আমরা হস্পিটালকে হাঁসপাতাল বলি তাহাতে সন্দেহ নাই। হাঁস ও পাতাল উভয়ই আমাদের সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু তাহা বলিয়া যে হায় হায় শব্দের উচ্চারণ বশে হায়রান হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। হায় হায় সর্ব্বত্রই আছে কিন্তু অতি অল্প স্থানের লোকেই হায়রান বলে।

ভিতর হিন্দী ভীতর শব্দেরই বাংলা রূপ। ভেতর আবার ভিতরের অপভ্রংশ। ন্যূনাধিক শত বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত পুস্তকে ইহার বানান ভীতর দেখিয়াছি। ইহার রূপ যাহাই হউক না কেন ইহা ব্যবহার না করিয়া মধ্য শব্দ ব্যবহার করাই ভাল নহে কি ? কেবল একটী মাত্র প্রয়োগ দেখিয়াছি যেখানে ভিতরের পরিবর্ত্তে মধ্য বসিতে পারেনা। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ভিতরে আসুন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের আর দুইটা সূত্র এই। (১) ইকারের পর আ থাকিলে মৌখিক ভাষায় আ স্থানে এ হয়। যেমন ফিতা, ফিতে। (২) উকারের পর আ থাকিলে মৌখিক ভাষায় আ স্থানে ও হয়। যেমন খুড়া খুড়ো। প্রথমটী সার্ব্বভৌম কিন্তু দ্বিতীয়টী নহে। সেটী এইরূপ হইবে—উকারের পর আ থাকিলে আ স্থানে পশ্চিম বঙ্গে ও হয় ; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর প্রভৃতি প্রদেশে এ হয়। যেমন বুড়া, বুড়ো, বুড়ে ; জুতা, জুতো, জুতে, খুড়া, খুড়ো, খুড়ে ; গুলা, গুলো, গুলে, খুলনা, খুলনো খুলনে।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন প্রদীপ দপ করিয়া নিভিয়া যায় বলা ভুল। আমি কিন্তু দপ্ করিয়া নিভিয়া যাওয়ার কথা বহু শুনিয়াছি এবং নিজেও বলিয়াছি। বাতাস লাগিলে প্রদীপ দপ্ দপ্ করে।

এখানে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। নির্ব্বাণ শব্দ হইতেই নিভিয়া হইয়াছে। সকলে ভ দিয়া বানান করেন দেখিতে পাই। আমি কিন্তু স্পষ্ট ভ উচ্চারণ শুনি নাই। অন্যের অভিজ্ঞতা কি তাহা জানি না।

নৌকা, বোঝাই হউক না হউক, বাতাসে টলমল করে ; আর জল খুব স্বচ্ছ হইলেই টল টল করে। ইহাই আমার জানা ছিল। ইহাদের মূলে বাহির করিবার চেষ্টা বৃথা বলিয়া বোধ হয়।

চন্দ্রবিন্দু বহুল প্রচার আছে ফ্রান্সে, চীনে, আসামের শিবসাগর জেলায় এবং রাঢ়ে। অন্ত পক্ষে ইংরেজদের এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের পক্ষে ইহা

উচ্চারণ আয়ত্ত করা এক প্রকার অসাধ্য বলিলেই হয়। হিন্দুস্থানীদের অক্ষমতা নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহারা পঁচিশকে পচীস বলেন। অথচ পাঁচ পয়তীস বলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ঘোঁড়া, শঁশা বলে কিন্তু পঁচিশ বলে না। আমরা শাঁপ কাঁচ বলি কেন? যাঁহারা চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ করিতে পারেন না অথচ উচ্চারণটা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা দুই তিন দিন নিম্নলিখিত exerciseটা অভ্যাস করিলেই সফলকাম হইবেন। চাচা, পঁছা চটা পঁছিন না আচাঁছা চটা পঁছিস।

বিসর্গের উচ্চারণটা কেবল সংস্কৃতের বিশেষত্ব, আর কোন ভাষায় এই দুরুচ্চার্য্য ধ্বনি নাই। ইহা কিছু পরিবর্ত্তিত ভাবে ক খ প ফ শ ষ স এই সাতবর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে উচ্চারিত হয়। বাংলায় অন্য কোন স্থলে বিসর্গ লেখার ব্যবহার ভুল। স্রোত মন প্রভৃতি শব্দে এখন আমরা বিসর্গ যোগ করে না। ক্রমশঃ, বস্তুতঃ স্বভাবতঃ প্রভৃতিতে বিসর্গ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাঙ্গালীরা যে সংস্কৃত পড়িবার সময়েও বিসর্গের উচ্চারণ করিতে শেখেন না ইহা বড়ই শোচনীয়।

লেখাটা দীর্ঘ হইয়া গেল। আজ এই পর্য্যন্ত।

নক্ষত্রের বর্ণ-বৈচিত্র্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল,

নির্ম্মল অন্ধকার রজনীতে আকাশের দিকে তাকাইলে বহু সংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। নক্ষত্র সকল আকাশের সুনীল চন্দ্রাতপে উজ্জ্বল হীরার ফুলের ন্যায় শোভা পায়। আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্র আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ এবং সূর্য্যের ন্যায় উহাদের নিজের আলোক আছে। নক্ষত্র সকল দেখিতে সাধারণতঃ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ। বাস্তবিক আকাশে বহু বর্ণের নক্ষত্র বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য খালি চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় না।

কতকগুলি নক্ষত্রের আলোকের রঙ্‌ আমরা খালি চক্ষেই দেখিতে পাই। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর আর্দ্রা (Betelgeuse) বৃষ রাশির রোহিণী (Aldeberan), এবং তুলারাশির স্বাতি (Arcturetes) এই কয়টি নক্ষত্র দেখিতে লাল। এণ্টারিস্ (Anteres) নক্ষত্রটিও লাল এবং দেখিতে অতিশয় রমণীয়।

নীল পীত লোহিত হরিৎ প্রভৃতি শতাধিক রঙের নক্ষত্র আকাশে দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার নক্ষত্রের রঙ্‌ও পরিবর্ত্তনশীল। টলেমী (Ptolemy) তাঁহার নক্ষত্রের তালিকায় অত্যুজ্জ্বল লাল রঙের কয়েকটি নক্ষত্রের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তালিকায় পোলাক্স্ (Pollux) এবং লুব্ধক (Sirius) নামক দুইটি নক্ষত্র স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমানে 'পোলাক্স্' নক্ষত্রের রঙ্‌ হরিদ্রাভ এবং 'সিরিয়াস' নীলের আভাযুক্ত শুভ্র। টলেমীর ন্যায় আরও কয়েক জন বিখ্যাত প্রাচীন লেখক এই কয়টী নক্ষত্রকে "লাল তারা" বলিয়াছেন। 'হোমার' 'সেনেকা'ও সিসিরো 'সিরিয়াস' নক্ষত্রটীকে লাল বলিয়াছেন। ইহা হইতে ধারণা হয় যে পূর্ব্বে সিরিয়াসের রঙ্‌ লাল ছিল। আরও কয়েকটী নক্ষত্রেরও এইরূপ বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এল্‌গল্ (Algol) নামক একটি নক্ষত্রকে পারস্য দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ আল্‌সুফী (Al Sufi) লাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উহা দেখিতে এখন শ্বেত বর্ণ।

আকাশে নানা বর্ণের বহু সংখ্যক নক্ষত্র আছে। কিন্তু উহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য দূরবীক্ষণ ব্যতীত প্রত্যক্ষ করা যায় না। বড় নক্ষত্রদিগের মধ্যে অভিজিৎ (Vega) এবং চিত্রা নীলের আভাযুক্ত শুভ্র। ব্রহ্মহৃদয় (Capella), প্রশ্বা (Procyon) ও স্বাতি আমাদের সূর্য্যের ন্যায় একটু পীতবর্ণ। উহাদিগকে খালি চক্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়। নীল, পীত, হরিৎ, লাল, বেগুনে প্রভৃতি শতাধিক বর্ণের বহু সহস্র নক্ষত্র আকাশে শোভা পাইতেছে। কিন্তু আমরা সেই সকল নক্ষত্রের নানা বর্ণের আলোক দেখিতে পাই না। প্রতি রাত্রে যদি ঐ সকল নানা বর্ণের নক্ষত্রের রঙ্গীণ আলোক আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত, তবে আকাশে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমরা প্রত্যক্ষ করিতাম।

আকাশে কতকগুলি যুগল (double star) নক্ষত্র আছে। এই সকল যুগল নক্ষত্রের দুইটী তারকা পরস্পর হইতে কোটি কোটি মাইল ব্যবধানে থাকিয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটী নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। আকাশে এইরূপ প্রায় বার হাজার যুগল নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক একটী নক্ষত্র সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ। কিন্তু নক্ষত্র সকল অচিন্তনীয় দূরে অবস্থিত বলিয়া উহাদিগকে দূরবীক্ষণ ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় না। যুগল নক্ষত্রের সূর্য্যগুলি মাধ্যাকর্ষণের অধীন হইয়া বৃত্তাভাস-কক্ষে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

যুগল নক্ষত্রের আলোক-বৈচিত্র্য অতিশয় মনোরম। উহাদের বর্ণ মাধুর্য্য অতীব চিত্তাকর্ষক। কতকগুলি যুগল নক্ষত্রের দুইটী তারকার রঙ্‌ এক প্রকার। যেমন দুইটাই সাদা, দুইটাই নীল, অথবা দুইটাই সবুজ। কতগুলি যুগল নক্ষত্র আছে, উহাদের দুইটী তারকার আলোক দুই বিভিন্ন রঙের। যেমন একটী সবুজ, অপরটী লাল, একটী নীল, অপরটী হল্‌দে ইত্যাদি। আর কতকগুলি যুগল নক্ষত্রের তারা দুইটীর বর্ণের পার্থক্য তত বেশী নয়, যেমন একটী সোনালী, আর একটী হল্‌দে ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণের নক্ষত্র ব্যতীত ধূসর, পাটল, বাদামী প্রভৃতি বহু বর্ণের বহু সংখ্যক নক্ষত্র আকাশে শোভা পাইতেছে। শেষোক্ত নক্ষত্রগুলির আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও উহারা নগণ্য নহে। এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলির সমবেত আয়তন সৌরজগতের সকল গ্রহের আয়তনের সমষ্টি অপেক্ষা হাজার গুণ বৃহৎ।

কতকগুলি নক্ষত্র আছে উহাদিগকে ঠিক যুগল নক্ষত্র বলা যায় না। উহাদের তিন, চার অথবা ততোধিক তারকা মাধ্যাকর্ষণে ধৃত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রের চারিদিকে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই শ্রেণীর তারকাগুলির প্রত্যেকের আলোকের রঙ্‌ বিভিন্ন। 15 Monocerotis নামক একটী নক্ষত্রপুঞ্জের তিনটী তারকার একটীর আলোক সবুজ, একটী বর্ণ নীল এবং একটী আলোক কমলা রঙ্‌এর। 12 Lyncis নামক নক্ষত্রমণ্ডলীর

তিনটী তারকার একটীর সবুজ একটীর সাদা ও তৃতীয়টীর নীল আলোক। এইরূপ অনেক নক্ষত্র আকাশে অবস্থিত। কতকগুলি যুগল নক্ষত্রের দুইটা তারকা আবার যুগল। ইহাদিগকে 'যুগলে-যুগল' (double double star) কহে। এই শ্রেণীর নক্ষত্রের চারিটী তারকারই আলোক বিভিন্ন রকম। এই প্রকার নক্ষত্রের রাজ্য আকাশে কি মনোহর দৃশ্য বিকাশ পায়।

আকাশে বিভিন্ন বর্ণের সহস্র সহস্র নক্ষত্র বিরাজিত থাকিয়া নানা বর্ণের আলোক বিতরণ করিতেছে। দূরবীক্ষণ ব্যতীত আমরা সেই সকল নক্ষত্রের অত্যাশ্চর্য্য বৈচিত্র্যপূর্ণ আলোকমালা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। আমাদের সূর্য্য শুভ্র আলোক প্রদান করে। প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে যখন সূর্য্য লোহিত কিরণমালায় গগনমণ্ডল ও পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে তখন প্রকৃতি অতি রমণীয় মাধুর্য্য ধারণ করে। প্রভাত ও সন্ধ্যাকালীন নৈসর্গিক শোভা বর্ণনা করিয়া কত কবি ধন্য হইয়াছেন; কত চিত্রকর সেই বর্ণ মাধুর্য্য অঙ্কিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু সুদূর নক্ষত্র রাজ্যের বর্ণ-বৈচিত্র্যের তুলনায় পার্থিব শোভা অতি অকিঞ্চিৎকর।

কোন যুগল তারার রাজ্যে একদিন একটী সূর্য্য লাল কিরণ দেয়, পরদিন হয় ত আর একটী সূর্য্য নীল কিরণ দেয়। কোন রাজ্যে একদিন আকাশে সবুজ সূর্য্য দেখা দেয়; তার পর আবার পীত সূর্য্য উদিত হয়। কখনও এক সময়েই আকাশে দুই বা ততোধিক সূর্য্য উদিত হইয়া দুই বা বহু প্রকার বিভিন্ন অথবা অদ্ভুত মিশ্র আলোক প্রদান করে।

যদি এই সকল বিচিত্র বর্ণের সূর্য্যজগতে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জনপ্রাণী-পূর্ণ গ্রহ অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল গ্রহের অধিবাসীরা প্রতি দিন নয়নের তৃপ্তিকর কত আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করে। ঐ সকল গ্রহের বৃক্ষলতাদি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সেই সকল রাজ্যের অত্যাশ্চর্য্য মাধুর্য্য কল্পনা করিতেও আমরা অসমর্থ। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত সার উইলিয়ম হার্শেল নক্ষত্র রাজ্যের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দূরবীক্ষণ সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"Imagination fails to conceive the charming contrast and graceful vicissitudes of red and green day alternating with white light or with darkness in the planatory system belonging to these suns."

প্রাচীন মগধের ভাবসমৃদ্ধি

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন এম-এ, বি-এল

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে বিশেষতঃ মগধরাজ্যে ধর্ম্ম ও দর্শন-জগতে এক অভিনব যুগ উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রে এই যুগের নানা দার্শনিক মতবাদ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আচার্য্যাদির বিশদ বিবরণ জানা যায়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন কালের ইতিহাসে ভারতের এই যুগের চিন্তাসমৃদ্ধির অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। মহাবীর ও বুদ্ধ এই যুগের লোক ছিলেন।

বুদ্ধ তাঁহার সমসাময়িক দার্শনিক মতবাদকে বাষট্টি শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। পালি দীঘ নিকায়ের "ব্রহ্মজাল সুত্তে" বুদ্ধের এ বিষয়ে যে বর্ণনা আছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

(১) "সস্সতবাদ"—চার প্রকার ভেদে ইঁহাদের মত ছিল যে আত্মা ও জগৎ উভয়ই শাশ্বত;

(২) "একচ্চ—সস্সতিকবাদ"—চার প্রকার ভেদে ইঁহারা বলিতেন যে ব্রহ্মা শাশ্বত কিন্তু আত্মা নহে, বা কোন আত্মা শাশ্বত কোন আত্মা নহে, বা আত্মা শাশ্বত কিন্তু শরীর নহে;

(৩) "অন্তানন্তিকবাদ"—চার প্রকার ভেদে ইঁহারা বলিতেন জগৎ সান্ত কি অনন্ত;

(৪) "অমরাবিক্খেপিকবাদ"—চার প্রকার ভেদে ইঁহারা সব প্রশ্নের দ্ব্যর্থবোধক ও বাঁকা উত্তর দিতেন। "অমর" মাগুর মাছের মত এক রকম পিছল মাছের নাম। বুদ্ধঘোষ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন যে ইহাদের কথায় ইহাদের অর্থ বুঝা যাইত না, অর্থাৎ ইহাদের ধরা যাইত না বলিয়া বুদ্ধ ইহাদের এই নাম দিয়াছিলেন।

(৫) "অধিচ্চসমুপ্পন্নিকবাদ"—দুই প্রকারভেদে ইঁহারা বলিতেন আত্মা ও জগৎ অকারণ উদ্ভূত;

(৬) "উদ্ধমাঘাতনিকবাদ"—বত্রিশ প্রকারভেদে ইঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার সচেতনতা বা অচেতনতা, নশ্বরতা বা অনশ্বরতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেন;

(৭) "উচ্ছেদবাদ"—সাত প্রকারভেদে ইঁহারা বলিতেন মৃত্যুর পর আত্মারও বিনাশ হয়, এবং আত্মার স্বরূপ দেহ বা মন বা আকাশ ইত্যাদি।

(৮) "দিট্‌ঠধম্মনিব্বানবাদ"—পাঁচ প্রকারভেদে ইঁহারা বলিতেন এই জীবনেই পূর্ণমোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব।

এই আটটি প্রধান শাখার বিভিন্ন প্রকারভেদগুলির মোট সংখ্যা বাষট্টি।

মহাবীর তাঁহার সমসাময়িক মতবাদগুলিকে প্রধানতঃ চারটি শাখায় বিভক্ত করেন ও ইহার উপশাখাগুলির মোট সংখ্যা তিন শত তেষট্টি। জৈনশাস্ত্রের বহু স্থানে এই চারটি প্রধান শাখার উল্লেখ আছে। হরিভদ্র রচিত "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়" গ্রন্থের গুণরত্নপ্রণীত "তর্করহস্যদীপিকা" নামক টীকায় ইহার যে বিশদ ব্যাখ্যা আছে তাহার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ—

(১) "ক্রিয়াবাদ"—একশত আশি উপশাখায় বিভক্ত। ক্রিয়া অর্থ সকল কার্য্যের মূল কারণ; কেহ বলিত এই কারণ ঈশ্বর, কেহ বলিত আত্মা, কেহ কাল, কেহ নিয়তি, কেহ স্বভাব। কালবাদীরা বলিতেন বৃক্ষলতার ফলফুল, ষড়্‌ঋতুর বিবর্তন, মানুষের বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বার্দ্ধক্য, সকলই যথাসময় ব্যতীত হয় না। অগ্নির উপর স্থালী বসাইলেই মুদ্গপক্তি হয় না, এই সামান্য ব্যাপারটিও যথাকালসাপেক্ষ। "কালঃ পচতি ভূতানি, কালঃ সংহরতে প্রজাঃ, কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি"; অতএব কালই সকল কার্য্যের কারণ।

নিয়তিবাদীরা বলিতেন যে যে কার্য্যের যাহা কারণ, তাহা সব সময়েই সেই কার্য্যের কারণ ; যে কারণের যাহা কার্য্য তাহা সব সময়েই সেই কারণের কার্য্য ; ইহাই কার্য্যকারণের নিয়তরূপ। অতএব নিয়তিই মূল কারণ "অন্যথা কার্য্যকারণব্যবস্থা (Law of Cause and Effec·) প্রতিনিয়তরূপ ব্যবস্থা (Law of Uni'ormity of Nature) চ ন ভবেৎ নিয়ামকাভাবাৎ", তাহা না হইলে জগতে কোন নিয়মতন্ত্র থাকিত না।

স্বভাববাদীরা বলিতেন যে সকলই স্বাভাবিকভাবে হয় ; মৃত্তিকা হইতে ঘটই হয়, পট হয় না ; সূত্র হইতে পটই হয়, ঘট হয় না। কণ্টকের তৈক্ষ্ণ্য, মৃগপক্ষীর বিচিত্রভাব কে করে ? বদরীর কণ্টক তীক্ষ্ণ, কোনটি বা ঋজু কোনটি বা কুঞ্চিত, তাহার ফলগুলি বর্ত্তুল, এসব কে করিল ? "স্বভাবতঃ সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তং।" "ন কামচারোঽস্তি", যথেচ্ছ খেয়ালমত কিছুই হয় না, সবেরই ধরাবাঁধা স্বাভাবিক নিয়ম আছে। স্থালী, ইন্ধন প্রভৃতির সহযোগে মুদগপক্তি হয় বটে, কিন্তু কঙ্কদুক মুদগ তো হাজার জ্বাল দিলেও কোনও কালে সিদ্ধ হয় না ; কারণ স্বভাবতঃই ইহা অপচ্য। অতএব স্বভাবই মূল কারণ।

(২) "অক্রিয়াবাদ"—চুরাশি উপশাখায় বিভক্ত। ইঁহারা বলিতেন ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি কিছুই নাই। ফল ও লক্ষণ দেখিয়া কার্য্যের কারণ অনুমান করা যায়। এমন কোনও ফল বা লক্ষণ দেখা যায় না যাহা হইতে ঈশ্বর বা আত্মা প্রভৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। কার্য্যকারণের প্রতিনিয়তরূপব্যবস্থাও কিছু নাই, কারণ শালূকের (এক প্রকার কুমুদ) জন্ম শালূক হইতেও হয় গোময় হইতেও হয়, অগ্নির জন্ম অগ্নি হইতেও হয় অরণি হইতেও হয়, ধূমের জন্ম ধূম হইতেও হয় অগ্নি-ইন্ধনের সংযোগ হইতেও হয়, কদলীর (একপ্রকার বর্ষাকালের সাদা ফুল) জন্ম কন্দ হইতেও হয় বীজ হইতেও হয়, বটবৃক্ষের জন্ম বীজ হইতেও হয় বট-শাখা হইতেও হয়, ইত্যাদি। অতএব কার্য্যকারণের বহু রূপ, "অতর্কো-পস্থিতমেব সর্ব্বম্‌" সকলই পূর্ব্বে স্থিরীকৃত না হইয়া দৈবাৎ (যদৃচ্ছাতঃ) জন্মে, কাকের গায়ে তালের আঘাত লাগার মত সকলই "ন বুদ্ধি-পূর্ব্বোঽস্তি" বিনা বিচারে হঠাৎ (accidentally) হয়। অতএব মূল-কারণ কিছুই নাই।

(৩) "অজ্ঞানবাদ"—সাতষট্টি উপশাখায় বিভক্ত। ইঁহারা বলিতেন যে জ্ঞানের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। যেথানেই জ্ঞান সেখানেই পরস্পর-বিরোধী মতের দ্বন্দ্ব—ইহাতে চিত্তকলুষ ও ভববন্ধন বাড়িয়াই চলে। অ-জ্ঞানে অহঙ্কার বৃদ্ধি হয় না, অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধভাব হয় না, অতএব ভববন্ধনের সম্ভাবনা কমে। জ্ঞান হইতে চেষ্টা হয়, প্রচেষ্টা হইতে কর্ম্ম হয়, এবং কর্ম্ম হইতে বন্ধন হয়। কিন্তু প্রচেষ্টাবিহীন যে কেবলমাত্র শারীর কর্ম্ম তাহাতে ঘোরতর ও দুঃখময় ফলোদয় হয় না। অতি শুষ্ক ও ধবল গৃহগাত্র হইতে বায়ুচালিত ধূলির ন্যায় শারীর-কর্ম্ম-ফল সহজেই বিদূরিত হয়। এই প্রচেষ্টাবিহীনতা অজ্ঞান হইতে জন্মে। ধরিয়া লইলাম জ্ঞানের প্রয়োজন আছে ; কিন্তু যথার্থ জ্ঞান কি কেমন করিয়া জানিব ? ইহা জানা অসম্ভব ; কারণ জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে সব পণ্ডিতদের ভিন্ন মত। ইহাদের মধ্যে কে ঠিক বলা যায় না। বুদ্ধ বা জিন-বুদ্ধদের শিষ্যেরা বলিতে পারেন তাঁহাদের গুরু সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাই যে করিয়াছিলেন অন্যে করে নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি ? ইঁহাদের শাস্ত্র যে ঠিক তাহারই বা প্রমাণ কি ? শাস্ত্রে যে ঋষি-জিন-বুদ্ধের বচন ঠিক ঠিক লেখা হইয়াছে, শঠেরা তাহা প্রচার করে নাই, তাহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অতএব জ্ঞান কি জানা যায় না, জানিবার প্রয়োজনও নাই ; কারণ জ্ঞানেতে প্রচেষ্টা, প্রচেষ্টায় বন্ধন আসিবে, "জ্ঞাতস্তু অভিনিবেশ হেতুত্বয়া পরলোকপ্রতিপন্থিত্বাৎ"। কাজেই অ-জ্ঞানই মোক্ষের পথ।

(৪) "বিনয়বাদ"—বত্রিশ উপশাখায় বিভক্ত। ইঁহারা বলিতেন যে কায়মনোবাক্যে দেবতা, গুরুজন, মাতাপিতা, সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতির সেবাই মোক্ষলাভের পথ। শাস্ত্র বা আচার ইঁহারা মানিতেন না।

এই শ্রেণীবিভাগের অন্তর্গত কয়েকটি মতবাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব।

আজীবিকবাদ। আজীবিকরা বলিতেন সুখ, দুঃখ, ভোগ, মুক্তি প্রভৃতি মানুষের নিজের উপর নির্ভর করে না, ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বল, বীর্য্য, পুরুষকার, কর্ম্ম, পরাক্রম প্রভৃতি কিছুই নাই ; শত-শত জন্মের পর জীব স্ব স্ব ভাগ্যানুযায়ী মুক্তিলাভ করে। জৈনদের "উপাসক-দশা" নামক শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মহাবীর একবার সদ্দালপুত্র নামক আজীবিকবাদী একজন কুম্ভকারের বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন সে তাহার মাটির ঘট প্রভৃতি রৌদ্রে শুকাইতে দিতেছে। মহাবীর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মাটির ঘট প্রভৃতি কিরূপে তৈয়ারী হয়। সদ্দালপুত্র বলিল প্রথমে মাটি লইতে হয়, পরে জল দিয়া ছানিতে হয়, তার পর তাহাতে গোবর ও ছাই ভালরূপে মিশাইতে হয় ও শেষে চাকার উপর বসাইয়া উহা হইতে অনেক ঘটিবাটি বানান হয়। মহাবীর জিজ্ঞাসা করিলেন এইসব কাজ করিতে বল, পরিশ্রম, পরাক্রম প্রভৃতি লাগে কি লাগে না। সদ্দালপুত্র বলিল লাগে না, কারণ সবই ভাগ্যের দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে। মহাবীর জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কোন ভৃত্য যদি ঘটিবাটিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে বা চুরি করে বা ফেলিয়া রাখে বা তোমার স্ত্রী অগ্নিমিত্রার সঙ্গে অবৈধ আচরণ করে তবে তুমি সেই ভৃত্যকে কি শাস্তি দিবে ?" সদ্দালপুত্র বলিল "আমি তাহাকে অভিশাপ দিব, তর্জ্জন করিব, বা প্রহার করিব, বাঁধিয়া রাখিব, বা তাহার প্রাণবধ করিব।" মহাবীর তখন বলিলেন যে সবই যদি ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে ভৃত্যকে কিছুই বলা বা করা উচিত নয় ; কারণ সে তাহার কাজের জন্য দায়ী নয়। ইহাতে সদ্দালপুত্র বুঝিল যে আজীবিকবাদ ভ্রান্ত। আজীবিকরা নগ্ন হইয়া থাকিত ও কেহ প্রতি গৃহে, কেহ প্রতি দ্বিতীয়, কেহ প্রতি তৃতীয় গৃহে ও এই ক্রমানুসারে কেহ প্রতি চতুর্থ হইতে সপ্তম গৃহমাত্রে ভিক্ষা লইত ; কেহ বা শুধু পদ্মের মৃণাল ভিক্ষা লইত, কেহ বিদ্যুৎ চমকাইলে ভিক্ষা করিত না, কেহ উডুম্বর বট, বদরী প্রভৃতি ফল খাইত না, কেহ বা বৃহৎ মৃৎভাণ্ডে প্রবেশ করিয়া তপস্যা করিত।

আত্মষষ্ঠবাদ। আত্মষষ্ঠবাদীরা বলিতেন পঞ্চ ভূতের ন্যায় আত্মাও একটি ষষ্ঠ ভূত। এই ছয় ভূত অনাদি ও অবিনাশী।

তজ্জীব তচ্ছরীর বাদ। এই মতে যাহাই শরীর তাহাই জীব বা আত্মা। পঞ্চ ভূতই জগতের মূল কারণ ও এই পঞ্চ ভূতের শরীর হইতে আত্মা জাত হয় এবং শরীরের নাশের সঙ্গে আত্মারও নাশ হয়। কাজেই, পাপপুণ্য, জন্মান্তর, কর্ম্মফল প্রভৃতি কিছুই নাই। কেশাগ্র হইতে পদতল ব্যাপিয়া আত্মা থাকে; যতক্ষণ শরীর ততক্ষণ আত্মা, মৃত্যুর পর কিছুই থাকে না। যদি বল শরীর ছাড়া আত্মা আছে, তবে তাহা হ্রস্ব না দীর্ঘ, ত্রিভুজ না চতুর্ভুজ, কাল না সাদা, নীল না লোহিত, গুরু না লঘু, মিষ্ট না তিক্ত, দ্রব না কঠিন, উষ্ণ না শীতল? কোষ হইতে তরবারি, মাংস হইতে অস্থি, দুগ্ধ হইতে নবনী, তিল হইতে তৈল, ইক্ষু হইতে রস, ও অরণি হইতে অগ্নি যেমন পৃথক করিয়া দেখান যায়, সেরূপ শরীর হইতে আত্মা পৃথক করিয়া দেখাইতে পার? পার না, অতএব আত্মা বলিয়া কোনও পৃথক বস্তু নাই।

জৈনদের "রাজপ্রশ্নীয় সূত্র" নামক শাস্ত্রগ্রন্থে প্রদেশী নামক একজন রাজার সঙ্গে কেশী নামক একজন জৈনশ্রমণের আত্মা বিষয়ক তর্ক-বিতর্কের সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। রাজা প্রদেশী তজ্জীব তচ্ছরীরবাদী ছিলেন। এই বিবরণ হইতে এই মতবাদ ও প্রাচীন কালে সেই মতের খণ্ডন কিরূপে হইত বুঝা যাইবে। বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ—

প্রদেশী বলিলেন "শরীর ছাড়া পৃথক আত্মা যদি থাকে তবে আমার পিতামহ, যিনি অত্যাচারী রাজা ছিলেন ও নিজ পাপের ফলে নিশ্চয় নরকে গিয়াছেন, তিনি কেন আসিয়া তাঁহার প্রিয় পৌত্র আমাকে পাপবিষয়ে সাবধান করিয়া দেন না? তিনি যদি আসিতেন তবে বুঝিতাম তাঁহার আত্মা এখনও জীবিত আছে এবং শরীর হইতে পৃথক আত্মা আছে।"

কেশী বলিলেন, "আপনার মহিষীর কেহ যদি ধর্ম্মনাশ করে ও উহার শাস্তির জন্য যদি আপনি তাহাকে ধরেন এবং সে যদি বলে 'আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি গিয়া আমার আত্মীয়বর্গকে সাবধান করিয়া দিই যে তাহারা যেন এরূপ পাপ না করে, করিলে আমার মত দণ্ড পাইবে' তবে কি আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন? নরকভোগী আত্মার সেই অবস্থা, প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও নরক হইতে আসিতে পারে না।"

প্রদেশী বলিলেন "আমার পিতামহী ধর্ম্মশীলা ছিলেন; তিনি নিশ্চয় স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি কেন আসিয়া আমাকে ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহিত করেন না?"

কেশী বলিলেন "আপনি যখন শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া দেবমন্দিরে যান, তখন কেহ ডাকিলে অপবিত্র হইবার ভয়ে আপনি যেমন তাহার কাছে যান না, সেইরূপ স্বর্গবাসীরাও সংসারে আসেন না।"

প্রদেশী বলিলেন "আমি যখন একদিন সভায় বসিয়া ছিলাম, তখন নগরপাল একজন চোরকে বাঁধিয়া আনিল। আমি চোরকে একটি দৃঢ়বদ্ধ লৌহপাত্রে জীবন্ত বদ্ধ করিয়া সেখানে প্রহরী রাখিয়া দিলাম। কয়েক দিন [illegible] চোরের আত্মা খুঁজিলাম। পাত্রে কোন ছিদ্র ছিল না, কিন্তু তথাপি আত্মা দেখিতে পাইলাম না।"

কেশী বলিলেন "গৃহের সকল দ্বার, গবাক্ষ বদ্ধ করিয়া ভিতরে ভেরী-নিনাদ করিলে যেমন বাহির হইতে শুনা যায়, সেইরূপ আত্মাও লৌহাদি ভেদ করিতে পারে।"

প্রদেশী বলিলেন, "একবার আমি একটি চোরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া সুদৃঢ় লৌহপাত্রে বদ্ধ করিয়া প্রহরী রাখিয়াছিলাম। কয়েক দিন পরে সেই পাত্র খুলিয়া দেখিলাম অসংখ্য কীট কিলবিল করিতেছে। পাত্রে কোথাও ছিদ্র ছিল না জীবন্ত কীটগুলি নিশ্চয় চোরের মৃত শরীর হইতে জন্মিয়াছিল, অতএব আত্মা শরীর হইতেই জন্মে।"

কেশী বলিলেন "অগ্নিতে লৌহ উত্তপ্ত করিলে লৌহে ছিদ্র না থাকিলেও অগ্নি তাহাতে প্রবেশ করিয়া লৌহকে অগ্নিময় করে; সেইরূপ কীটের আত্মাও পাত্রে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করিয়াছিল।"

প্রদেশী বলিলেন "আমি একটি চোরকে কাটিয়া ফেলিয়া তাহার শরীরে তন্ন তন্ন করিয়া আত্মা খুঁজিয়াছিলাম, পাই নাই। কাটিয়া ফেলিবার ঠিক পূর্ব্বে ও পরে চোরকে ওজন করিয়াছিলাম, কোনও পার্থক্য হয় নাই। আত্মা যদি থাকিত তবে বার্দ্ধক্যে শরীরের জীর্ণতাই বা কেন হয়?"

কেশী বলিলেন "আত্মা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়; জরাতে শরীরই জীর্ণ হয়, আত্মা অপরিবর্ত্তিত থাকে।"

সাতবাদ। সাতবাদীরা বলিতেন যে সুখ (সাত) হইতে সুখ হয়, সকল জীবই সুখার্থী, দুঃখে সকলেই কষ্ট পায়, মোক্ষ সুখেরই অবস্থা, অতএব সুখভোগের দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। ইন্দ্রিয়জ সুখভোগে কাহারও অনিষ্ট করা হয় না উপরন্তু ভোক্তার কষ্টদূর ও হর্ষ হয়। "সুভাষিত সংগ্রহে" ও আর্য্যদেব প্রণীত "চিত্তবিশুদ্ধ প্রকরণে" লিখিত আছে যে তান্ত্রিকরাও এই মত পোষণ করিতেন। *

শূন্যবাদ। শূন্যবাদীরা বলিতেন শুধু যে আত্মা নাই তা নয়, কিছুই নাই। সবই মায়া, ভ্রম, মরীচিকা। সূর্য্যের উদয়াস্ত, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, নদী ও বায়ুর প্রবাহ, সবই মিথ্যা। বৌদ্ধধর্ম্মের "মাধ্যমিক"-মত ও বেদান্তের মায়াবাদের উৎপত্তির সঙ্গে এই প্রাচীন শূন্যবাদের সম্বন্ধ আছে।

দীঘ নিকায়ের "সামঞ্ঞফল সুত্তে" বুদ্ধ তাঁহার সমসাময়িক ধর্ম্ম-শিক্ষকদের মধ্যে মহাবীর ছাড়া আর পাঁচজনের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা গোশাল মস্খলিপুত্র, অজিত কেশকম্বল, পুরাণ কাশ্যপ, পকুধ কাত্যায়ন, ও সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্র। গোশাল আজীবিকদের গুরু ছিলেন। ইনিও মহাবীর কিছুদিন একত্র ছিলেন; পরে মতদ্বৈধ হওয়ায় বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়াছিলেন। গোশালের গোশালায় জন্ম হইয়াছিল। শ্রাবস্তিতে হালাহলা নাম্নী কুম্ভকার-পত্নীর বাড়ীতে আজীবিকদের ঘাঁটি ছিল। মৃত্যুর সময় বিকারের ঘোরে গোশাল অনেক রকম পাগলামি করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয় শাস্ত্রেই গোশালের বড় নিন্দা আছে। অজিত নাস্তিকবাদী

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লেখককে তন্ত্রশাস্ত্রে

ছিলেন। পুরাণের আত্মা সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের পুরুষের মত ছিল। পুরাণ বলিতেন পাপপুণ্য ইত্যাদিতে আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, আত্মা নিষ্ক্রিয়। পকুধের মত অনেকটা আত্মষষ্ঠবাদীদের মত ছিল। ইনি বলিতেন জগৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, সুখ, দুঃখ, ও আত্মা এই সপ্ত ভূতের সমষ্টি। মানুষকে কাটিয়া ফেলিলে পাপ হয় না, সপ্ত ভূতের মধ্য দিয়া তরবারি চলিয়া যায়, এইমাত্র। সঞ্জয় সংশয়বাদী—মহাবীরের মতে "অজ্ঞানবাদী" ও বুদ্ধের মতে "অমরাবিক্খেপিকবাদী"—ছিলেন ও বলিতেন যে মাত্র একভাবে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না,—একদিন হইতে যাহা একরূপ অন্যদিক হইতে তাহা ভিন্নরূপ।

উপরে উল্লিখিত দার্শনিক মতবাদগুলি ছাড়া বহু সংখ্যক সম্প্রদায়ের কথাও জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। †

কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কথা সংক্ষেপে বলিব।

"হত্তীতাপস"রা বহু প্রাণীহত্যার পাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য বৎসরে একটি হাতী মারিয়া সারা বৎসর তাহার শুষ্ক মাংস খাইয়া থাকিত। "বালতাপস"রা গাছের ঝরাপাতা ছাড়া আর কিছু খাইত না। "গো-ব্রতিক"রা গরুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিত ও গরু যাহা করিত তাহা করিত, গরু ঘাস খাইলে নিজেরা ঘাস খাইত গরু শুইলে নিজেরা শুইত, ইত্যাদি। কোন সম্প্রদায় আহারের সময় একটি জিনিষ খাইয়া, কেহ দুইটি, কেহ তিনটি, এইরূপে কেহ সাতটি জিনিষ খাইয়া জল খাইত। কেহ শুধু জল, কেহ বায়ু, কেহ শৈবাল, কেহ মূল, কেহ কন্দ, কেহ পাতা, কেহ ফুল, কেহ ফল, কেহ বীজ, কেহ গাছের ছাল খাইয়া থাকিত। কেহ শুধু পচা কন্দ, কেহ পচা মূল, কেহ পচা ফুল, কেহ পচা ফল, কেহ পচা পাতা খাইয়া থাকিত। কেহ শরীর উর্দ্ধাঙ্গ চুল্‌কাইত না, কেহ নিম্নাঙ্গ চুল্‌কাইত না। কেহ গঙ্গার দক্ষিণকূলে যাইত না, কেহ উত্তরকূলে যাইত না। কেহ জলে বাস করিত, কেহ মুক্ত স্থানে, কেহ গুহায়, কেহ সমুদ্র কূলে, কেহ বৃক্ষমূলে বাস করিত, কেহ জলে ডুবিয়া থাকিত। কেহ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিত ও লোক আসিতে দেখিলে শাঁক বাজাইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিত, কোন সম্প্রদায়ে খাইবার সময় শাঁখ বাজাইয়া লোক সরাইয়া দিত। কেহ স্নানের সময় একবার মাত্র ডুব দিত, কেহ ডুব না দিয়া স্নান করিত, কেহ অতি অল্পক্ষণ জলে থাকিত। কেহ যেখানে অশ্বগবাদি পশু থাকিত সেখানে যাইত না।

বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি ছিল। প্র:ত্য-কই নিজের দল পুষ্ট করিতে খুব চেষ্টা করিত ও অন্য দলের লোককে নিজদলে আনিতে পারিলে পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত নিজের দল ভারি করিতে বা নিজ দলের লোকের অন্য দলে যোগ দেওয়া নিবারণ করিবার জন্য অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করা হইত, তাহারও অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। জোর জবরদস্তি প্রয়োগ বা অবৈধ উপায় অবলম্বনের দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না।

† লেখক প্রণীত Schools and Sects in Jaina Canonical Literature নামক পুস্তকে ইহাদের বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

যাত্রা-পথ

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বহুপথ প'ড়ে আছ বসুধার মাঝে
কোন তার সংখ্যা নাই,—নাহিক' নির্দ্দেশ ;

বন্ধুর অজানা পথে অনাগত কাযে
হোক্ মোর যাত্রা সুরু,—জড়তার শেষ!

উর্দ্ধমুখী লক্ষ্য মহা আছে দিবাযামী
গিরি পথ লঙ্ঘিবারে প্রশান্ত স্বপন—

মনে হয়, পথাশ্রয়ী বীর্য্যবল'য়ে আমি
সার্থক করিয়া লব' ক্ষণিক স্খলন।

পথিকের সাথী সম বন্ধু অযাচিত
অগণিত বৈরী যদি জোটে মোর পাশে,

আমি মোর লক্ষ্য ল'য়ে,—উচ্চ করি' শির
বিজয়ীর মত কব',—'এস' অজানিত।'

বিশ্ব-পথে বাহিরিনু যেই রত্ন আশে
যাত্রাশেষে আজি তাহা খুঁজে লব' স্থির।

গল্প

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

হুগলীতে, ভাগীরথীর তীরে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকার ভিতরে এক সুবিস্তৃত কক্ষে একটি মহতী সভা বসিয়াছে। সভা মহতী বটে, কিন্তু তাহাতে রাজনীতি, অর্থনীতি, এমন কি সমাজনীতি আলোচিত হইতেছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। রবিবার, আফিস-আদালত স্কুল-কলেজ বন্ধ; অট্টালিকাস্বামী চা পান করিতেছেন; স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, কন্যা, দৌহিত্র সকলেই লম্বা টেবিলের দুইটি দিক অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। দুইজন পাচক-ব্রাহ্মণ লুচি কচুরি সিঙ্গাড়া সরবরাহ করিয়া যাইতেছে; জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ সামনে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বসিয়া আছেন; গৃহিণী টেবিল হইতে চেয়ারখানা একটু তফাৎ করিয়া বসিয়া হরিনাম করিতেছেন।

ভাদ্রমাসের শেষ; গঙ্গা কূলে কূলে পরিপূর্ণা—বারিবক্ষ গৈরিক-রঞ্জিত; ও-পারে পাটকলগুলির চিমনী হইতে অল্প অল্প ধূম বিনির্গত হইতেছে।

এবার আশ্বিনের প্রারম্ভেই মহাপূজা। আর তিন চারদিন পরেই স্কুল কলেজ বন্ধ হইবে, আদালত বন্ধেরও বিশেষ দেরী নাই। পাঠক বোধ হয় ভাবিতেছেন সভায় দেশভ্রমণের বিষয় আলোচিত হইতেছে! হওয়াই স্বাভাবিক বটে, এখানে কিন্তু তা' মোটেই নয়।

কর্ত্তা চা পান শেষ করিয়া তোয়ালেতে মুখ মুছিয়া, দ্বার-সন্নিধানে দণ্ডায়মান ভৃত্যকে কহিলেন, "কানাইকে ডাক্ ত রে!" তার পর জ্যেষ্ঠপুত্র রমেশকে বলিলেন—"রমেশ, তুমি এবার পূজোর বাজার করবে। ফর্দ্দ তৈরী; যবে বেরুতে চাও, ঠিক ক'রে ফেলো বাপু।" মধ্যমপুত্র নরেশকে বলিলেন, "তুমি তোমার বড়দি ও মেজদিকে আনতে যাবে নরেশ! পুরুতমশাইকে বলে আজই দিন ঠিক ক'রে তাদের চিঠি লিখে দাও গে।" কনিষ্ঠপুত্র পরেশ ভাবগতিক সুবিধা নয় বুঝিয়া পলায়নোদ্যোগ করিতেছিল, কর্ত্তা তাহা বুঝিয়া, সহাস্যে কহিলেন, "পালালে চল্‌ছে না পরেশ, তোমার ওপরেও কিছু কিছু কাজের ভার আছে। বস, বলছি।"

কানাইলাল সরকার আসিয়া কর্ত্তা গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে, কর্ত্তা বলিলেন—কানাই, ফর্দ্দগুলো এনে বাবুদের যার যা, তা বুঝিয়ে দাও।

পৌত্র সুরেশকে বলিলেন, তুই কি করবি বল্ ত রে শালা?

সুরেশ দশ বৎসরে পড়িয়াছে, হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ সুন্দর ছেলেটি। তাহার মাতার বামদিকে বসিয়াছিল, মাতার নির্দ্দেশমত কহিল—তুমি যা করতে বলবে দাদু, আমি তাই করবো।

পারবি ত রে?

পারব দাদু।

বেশ, তুই আমার বডিগার্ড থাকবি। কেমন পারবি ত?

সুরেশ সোল্লাসে কহিল, খুব পারব, দাদু।—বলিয়াই মা'কে কাণে কাণে বলিল—বডিগার্ড কি মা?

মা বুঝাইলেন, দাদুর সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, আর কিছু না।

ছেলে বলিল—কিছু করতে হ'বে না? তা'হলে আমি বডিগার্ড হবো না।

মা যখন ছেলের অভিলাষ সভার গোচর করিলেন, তখন সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। শ্রীমান সুরেশ ইহাতে অতিমাত্রায় অপমান বোধ করিয়া মাতার পিঠের কাপড় টানিয়া মুখ ঢাকিয়া রাগতস্বরে সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল—আমি কিচ্ছু করবো না ত!—ঠাকুরও দেখবো না, নেমন্তন্নও খাব না, নতুন কাপড়ও পরবো না, কিচ্ছু না।

পিতামহ উঠিয়া, নাতিকে ধরিয়া আনিয়া কোলের কাছে বসাইয়া বলিলেন—সবচেয়ে বড় কাজ দিলাম শালা, তা তোর মনে ধরলো না। ভাইসরয়ের বডিগার্ড, এ কি কম সম্মান রে দাদা! যাক্, ও কাজ যখন তোর পছন্দ নয়, অন্য কাজ দিচ্ছি/নে। ভিখিরীদের কাপড় দিতে পারবি ত?

একগাল হাসিয়া নাতি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বড়কে বড়, পুরুষকে ধুতি, মেয়েলোককে সাড়ী, ছোটদের ছোট কাপড়—পারবি গুছিয়ে দিতে?

হুঁ। যদি ভুল হয়, তুমি দেখিয়ে দিও দাদু।

ওরে শালা, উল্টে আমাকে তোমার এডিকং করবার মতলবে আছ তুমি! দুষ্টু কোথাকার!

আবার হাসির ধুম পড়িয়া গেল।

সুরেশের মা বলিলেন, কিন্তু কি অন্যায় বলেছে বাবা?

কর্ত্তা বলিলেন, কেমন বেটীর বেটা ও, অন্যায় কেন বল্‌বে?

কানাই আসিয়া রমেশের নাম-লেখা ফর্দ্দ রমেশকে, নরেশ ও পরেশের ফর্দ্দ তাহাদের হাতে দিল। সকলেই ফর্দ্দ খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বাড়ীর যিনি গৃহিণী, এতক্ষণ তিনি হাস্য-পরিহাসে যোগ দিতেছিলেন বটে, কথাবার্ত্তা বড় বলেন নাই; এক্ষণে পুত্রত্রয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—তোরা এক এক করে ফর্দ্দগুলো পড়, শুনি।

রমেশ পড়িল। প্রায় হাজার জোড়া কাপড়, ছোট ছেলেদের জামা পোষাক, বৌমা ও মেয়েদের বারাণসী, জামাইদের ও তিন ভাইয়ের শান্তিপুরী, কর্ত্তার মুর্সিদাবাদী গরদের ধুতি চাদর, গৃহিণীর লাল কস্তাপাড় ভাগলপুরী, যোগেনের ও তাহার কন্যার জন্য দুইজোড়া করিয়া থান ও সরুপাড় মিল ধুতি।

নরেশ পড়িল, তাহার ফর্দ্দে লেখা আছে, বড়দি ও মেজদিকে আনিতে যাইবার সময় তাঁহাদের, তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণের ও ভগ্নীপতিদ্বয়ের পূজার কাপড় ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। দুইজন ভৃত্য মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবে।

পরেশের পড়িবার পালা। পরেশ চক্ষু পাকাইয়া বলিয়া উঠিল, নেমন্তন্নর ফর্দ্দয় গোড়াতেই যোগেন ঘোষ! বর্দ্ধমানের মহারাজকুমার গেল, উত্তরপাড়ার মুখুজ্জেরা গেল, চকদীঘির সিংহীরা গেল, সকলের আগে কার নাম, না যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং হুগলী!

ব্যাপারটা প্রায় সকলের কাছেই বিসদৃশ ঠেকিলেও কেহই কিছু কহিলেন না। কর্ত্তা বলিলেন, কানাই, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন বাপ্? এক দাগ, দু'দাগ, তিন দাগগুলো বুঝিয়ে দাও না পরেশকে; ও ছেলেমানুষ, কখনও ত করে নি, নইলে জানবে কি ক'রে?

নামের পাশে তিনরকম দাগ আছে। কতকগুলির পার্শ্বে বাঁকা-ভাবে একটি, কতকগুলির পার্শ্বে দুইটি এবং বাকীগুলির পার্শ্বে তিনটি করিয়া দাগ টানা আছে। কানাই বুঝাইয়া দিল যে, এক-দাগযুক্ত নামগুলিতে ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র যাইবে; দুই-দাগসংযুক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে ছোট বাবুকে স্বয়ং যাইতে হইবে; এবং যাঁহাদের নামে তিন-দাগ আছে, তাঁহাদের নিকট তিনি ত যাইবেনই, উপরন্তু পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং অথবা তাঁহার পুত্র সঙ্গে থাকিবেন। কারণ শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ; শূদ্রগৃহে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ দিবার তাহাই প্রাচীন রীতি।

পরেশ, পরেশের দুই দাদা রমেশ ও নরেশ—সকলেই এক সঙ্গে প্রথম নামটার দাগের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—দাগ দুইটি! অর্থাৎ পরেশকে স্বয়ং যাইতে হইবে।

পরেশ জিজ্ঞাসিল, যোগেন ঘোষের বাড়ীতেও আমাকে যেতে হ'বে?—তাহার স্বর অত্যন্ত বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ।

কর্ত্তা বলিলেন, উনিশ বচ্ছর মা এ বাড়ীতে আসছেন; এই উনিশ বচ্ছর তোমার বাবা ঐ যোগীনের বাড়ীতে সব প্রথম গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছে।

ইহার পরে আর কথা চলে না।

কর্ত্তা একটু পরে আবার বলিলেন—গিন্নীকে বলেছি, তোমাদের বলা হয় নি, এখন বলি শোন। গবর্ণমেণ্টের চাকরীর আইন আছে, পঞ্চান্ন বচ্ছর বয়সের পর আর চাকরী করতে দেয় না, রিটায়ার করিয়ে দেয়। আইনটা ভাল। যদিও চাকরী করি নি, খেটেছি তার চেয়েও বেশী। পঞ্চান্ন হ'তে একটি বছর দেরী, আসছে বছর রিটায়ার করব—কোর্ট থেকে ত বটেই, সংসার থেকেও কতকটা বটে। তাই এক বছর আগে থাক্‌তে হাতে-কলমে তোমাদের দ্বারা সব কাজ করিয়ে, আসছে বছর থেকে একেবারে বিশ্রাম নোব। রমেশ আদালতের মক্কেল রাখবে; নরেশ বিষয়-আসয়গুলো দেখবে; পরেশকে, ঠিক করেছি, বিলেত পাঠাব, ব্যারিষ্টার করিয়ে আনবো। অবিশ্যি—

বাধা দিয়া নাতি সুরেশ বলিল—দাদু, আমি ব্যারিষ্টার হ'বো।

না দাদা, তুমি ডাক্তার হ'বে।

ব্যারিষ্টার-পিসেমহাশয়ের গাউন চশমা টাইয়ের প্রতি

সুরেশ বাবাজীবনের যতখানি লোভ ছিল, ততখানি অথবা আরও কিছু বেশী লোভ ছিল, ফ্যামিলি ডক্টর মৃগেনবাবুর ষ্টেথিস্‌কোপ ও সার্জ্জারি বাক্সের উপর। ভাবী-ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বাবু অতঃপর সন্তুষ্ট হইয়া বসিলেন।

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন—বিলেত যাওয়ার আগে পরেশের বিয়ে দেবার ইচ্ছেটাও আছে। বৌমারা কি বল গা?

বড় ও মেজ বৌমা সমস্বরে কহিলেন—নিশ্চয় বাবা! —বলিয়াই তাঁহারা দুইজনে প্রখর দৃষ্টি দ্বারা বেচারা পরেশকে বিদ্ধ করিলেন। ভাবটা, কেমন, হইল! তাহার কারণ ছিল। পরেশ একটু ইয়ং-বেঙ্গল টাইপ; বলে, বিবাহ করিবে না, কিছুতেই না! এই বিবাহ-দ্রোহী দেবরটিকে শীঘ্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিবেন ভাবিয়া বধূঠাকুরাণীদের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, পরেশ যতখানি সম্ভব পিতার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে আড়াল করিয়া চক্ষুর ইঙ্গিতে ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিল যে, কাঁঠাল এখনও গাছের মগডালে, এখন হইতে সরিষার তৈলের মালিস করা সুবুদ্ধির কার্য্য নয়।

কর্ত্তা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, কানাই, সাজকরকে বলে দিয়েছ ত, মা, ভাই, বোনেরা এবার সবাই খদ্দর পরবেন?

কানাই সবিনয় বিজ্ঞাপিত করিল, ব্যবস্থা সেইরূপই হইয়াছে।

মেজ বধূমাতা বলিলেন, বাবা, আমরা সব বেনারসী পরবো, আর মা'র বেলা খদ্দর?

কর্ত্তা বলিলেন, ওরে বেটী বোকা বেয়ানের মেয়ে, খদ্দর যে বেনারসীর চেয়েও পবিত্র। কাগজে পড়ছিস্ নে, খৃষ্টানের দেশ বিলেত, সেখানেও খদ্দরের নেংটী কি পূজো পাচ্ছে!

মেজ বধূমাতা কহিলেন, তা দেখছি ত! তাহ'লে বাবা, আমাদেরও আপনি খদ্দর দিন।

বেশ ত, রমেশ, বৌমাদের ও তোমার বোনেদের সব খদ্দর এনো, ফর্দ্দে কেটে লিখে নাও।

কর্ত্তা বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন, ছেলেরা ও মেয়েরা সকলে 'গুলতুনি' করিতে করিতে অন্দরমহলে প্রস্থান

দুই

কর্ত্তার নাম, রায় বাহাদুর ভবেশচন্দ্র মিত্র, সি-আই-ই। হুগলী জেলায়, তাই বা কেন, সারা বাঙ্গালায় ঐ নামটি জানে না, শুনে নাই, এমন লোক কয়জন আছে? আমার পাঠক-পাঠিকাগণ এতক্ষণে এটুকু নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, রায় বাহাদুরটী একেলে হইলেও সম্পূর্ণ সেকেলে লোক। সত্য সত্যই লোকটি নিতান্ত সেকেলে। এই পূজার সময়ে রাজা মহারাজা হইতে চাকরাণী-গৃহস্থ পর্য্যন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কত আনন্দ করে, আর এ লোকটি মৃন্ময়ীমূর্ত্তির কোন্ যায়গাটায় গরজন তেল কম হইল, সিংহের কেশরগুলা আরও স্ফীত দেখান হইল না কেন (যেহেতু পশুরাজ তখন অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত), বীণাপাণির বীণার তারগুলিতে কেন রজন দেওয়া হইল না, এই সকল তর্ক আলোচনাতেই দিনাতিবাহিত করিতেছেন! যাক্, সে দুঃখ করিয়া, গল্প-লেখক আমি, আমার লাভ কি! আমার যাহা বলিবার, তাহাই বলিয়া যাই।

চকমিলান বর্হিবাটীর বারান্দায় বসিয়া রায় বাহাদুর প্রতিমার সাজ পরান দেখিতেছেন, কানাই আসিয়া খবর দিল, জেলেরা বড় মাছ লইয়া যাইতেছে। হুকুম হইল, ডাক্, ডাক্।

সর্ব্বাপেক্ষা বড়টি ওজন করিয়া দেখা গেল, বাইশ সের। কর্ত্তা মৎসটি ভৃত্যের হস্তে দিয়া, স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া গৃহিণীর উদ্দেশে কহিলেন—কোথা গেলে গো? কি এনিছি দেখ সে!

গৃহিণী বাহিরে আসিয়া মাছ দেখিয়া, হাসিমুখে পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, ও মাছটা এখানে আন্ ত রে!

কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসিলেন—তোমার মাছটার ওজন কত? বাইশ সের।

আমার উনত্রিশ সের। তোমার মৃগেল, আমার রুই। —আমার লিখিতে লজ্জা হইতেছে, গৃহিণীর চক্ষু দু'টি স্পষ্ট ভাষায় কহিয়া দিল, তাহা হইলে আমারই জিত। আরও লজ্জার কথা এই, একবছর পরে রিটায়ার করিলে

দুইটা মাছ পাশাপাশি রাখিয়া, দেখিয়া, মিলাইয়া উভয়েই উভয়কে মনে মনে সাধুবাদ করিয়া লইলেন; পরে রায় বাহাদুর কহিলেন, এক কাজ কর, রমেশকে বলো, দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে রাত্রে খেতে বলে আসুক; আর যোগীনের বাড়ীতেও—

গৃহিণী বলিলেন, সে আর আমায় বলতে হ'বে না গো, আমি ক্ষেন্তিকে বলেই রেখেছি, চারটি আলু, একটু তেল, আর খানকতক মাছ দিয়ে আসতে।

কর্ত্তা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ধীবরগণ তখনও দাঁড়াইয়া আছে। নিশ্চয় কানাই দাম দেয় নাই, উহাদের কাজের ক্ষতি করাইয়াছে। কানাইকে ডাকিতেই, ধীবর সবিনয়ে কহিল—দাম পেইছি কর্ত্তা। নতুন খয়রা মাছ উঠেছে, নেওয়া হবে কি না জিজ্ঞেস করছি।

নতুন খয়রা মাছের কথা শুনিয়া কর্ত্তা পরম পুলকিত হইয়া উঠিলেন। দশসের মাছ লওয়া হইল; পাঁচ সের বাড়ীর ভিতরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, বাকী পাঁচ সের লইয়া কানাই সরকার তখনই কলিকাতা যাত্রা করিল। কলিকাতায় রমেন্দ্রনাথ নামে রায় বাহাদুরের এক বন্ধুপুত্র অবস্থান করেন, তিনি খয়রা মাছ ভালবাসেন বলিয়া প্রতি বৎসর দু' একবার ঐ মাছ প্রেরিত হইয়া থাকে।

বেলা দশটা বাজিল, ভৃত্য তেল মাখাইতে বসিল, স্নানাহার সারিয়া এখনই আদালতে বাহির হইতে হইবে। একজন গোমস্তা আসিয়া বলিল—ছোট বাবু আজ কলেজ যাবেন না।

কেন? পরেশের কলেজের ছুটি হয়ে গেছে নাকি?

আজ্ঞে না। ঘোড়া-জোড়ার অসুখ করেছে, গাড়ী জোতা হ'বে না, তাই।

একখানা ভাড়া-গাড়ী করে দাও না।

আজ্ঞে, তা আমি দিতে চেয়েছিলুম, তিনি ছ্যাকড়া গাড়ীতে চড়বেন না বল্লেন।

ডাক দেখি পরেশকে।

পরেশ কলেজের বেশে পিতৃ-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে পরেশের দুই দাদা, তাহাদের মা সকলেই এধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। তুচ্ছ কারণে পরেশের কলেজে না যাওয়া লইয়া অন্দর-মহলে আলোচনা সুরু

কর্ত্তা আর কাহাকেও দেখিতে পান নাই, সামনে কেবলমাত্র পরেশকে দেখিলেন, বলিলেন—ভাড়া-গাড়ীতে যেতে দোষ কি রে পরেশ?

পরেশ উত্তর দিল না; পিতা পুনশ্চ কহিলেন—তোরা সব হলি কি রে পরেশ? বোশেখ মাসের কাঠফাটা রোদে, শ্রাবণ ভাদ্দরের হাঁটুভোর কাদা ঠেলে দু'ক্রোশ দূরে ইস্কুলে রোজ আমরা গেছি, এইছি। এইখেনে থেকে এইখেনে তোদের কলেজ, হেঁটে যাওয়ারই ত কথা, না-হয় গেলি গাড়ীতেই গেলি! কিন্তু একদিন বাড়ীর গাড়ী না হলে যাওয়া যায় না? হ্যাঁ রে পরেশ, আমি যে···

পরেশ হস্তস্থিত বহিগুলিতে মুখের কতকাংশ আচ্ছাদিত করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আপনাতে আমাতে তফাত অনেক। আপনি ছিলেন টেক্স-দারোগা অবিনাশ মিত্রের ছেলে, আমি অনারেবল রায় ভবেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর সি-আই-ইর ছেলে—আপনাতে আমাতে অনেক তফাত।

পরেশের উত্তর শুনিয়া যে যেখানে ছিল, সকলেই হাসিয়া উঠিল; কর্ত্তাও সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। ওদিকে ফিরিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শুনলে তোমরা, ছেলের কথা শুনলে একবার! আমার বাবাকে গালাগাল!—তারপর ভৃত্যকে বলিলেন, ওরে বড় বাবুকে ডাক্।

বড় বাবু নিকটেই ছিলেন, হাসি চাপিতে চাপিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়াই কর্ত্তা বুঝিলেন, রমেশও সব শুনিয়াছে। বলিলেন, ওহে রমেশ, পরেশ বাবুর ত মোটর নইলে আর চলছে না দেখছি। ঘোড়ার যদি একদিন অসুখ বিসুখ হয়, তাহ'লেই ত কলেজ কামাই করবেন; শেষকালে কি বি-এ ফেল ক'রে বংশের নাম ডোবাবেন! কাজ নেই বাপু, ছোটখাট দেখে একখানা মোটর তুমি ওঁকে কিনে দাও।

পরেশের তথা রমেশের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইল। এই সময়ে রঙ্গক্ষেত্রে গৃহিণীর আবির্ভাব! গৃহিণী লাল কস্তাপাড় শাড়ী পরিতেন, মানুষটি ছোটখাট, অথচ পাঁড় দুইটি এতই প্রশস্ত যে মনে হইত তিনি বুঝি রক্তবর্ণের বস্ত্রই পরিধান করিয়া আছেন। গৃহিণীকে দেখিয়া কর্ত্তা রসিকতার ছলে কি বলিতে যাইতেছিলেন, তৎপূর্ব্বেই গৃহিণী

বাবা কি সেই পক্ষীরাজের জুড়ীই হাঁকাবেন? ছিঃ, লোকে বলবে কি গো?

বৌমাদের প্রবেশ!

—না বাবা, সে কিছুতেই হ'বে না। ছোট ঠাকুরপো বরং হেঁটেই কলেজে যাবে, আপনি মোটরে আদালত করবেন।

রমেশ বলিলেন—সে কথা সত্যি বাবা, সেটা ভাল দেখায় না।

পরেশ দুষ্টামি হাসিতে মুখ ভরাইয়া মিটমিট করিয়া বলিল—বাবার জন্যেই মোটর আসুক, আমি ঐ পক্ষীরাজেই যাব।

কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তোমরা যে কথামালার সেই বুড়ো আর তার ছেলের গল্প ক'রে তুললে দেখছি। ছেলে ঘোড়ায় চড়লে লোকে নিন্দা করে—বুড়ো বাপ হেঁটে যাচ্ছে আর ছেলে আরাম করছে; আবার বুড়ো ঘোড়ায় উঠলে বলে, বুড়োর আক্কেল দেখেছ, কচি ছেলেটাকে হাঁটিয়ে মারছে। নাঃ, কাজ নেই বাপু লোকনিন্দা সহ্য করে! রমেশ, দু'খানা মোটরই কেনবার ব্যবস্থা কর। একখানায় পরেশ চড়বে, আর একখানায় আমরা আদালতে যাব।

নাতি সুরেশ ঝটিতি বলিয়া উঠিল—দাদু, আমি?

কর্ত্তা হাসিয়া সস্নেহে কহিলেন, তাই ত রে শালা, সোনা বাইরে, আঁচলে গেরো! রমেশ, সেই যে বেবী-কার না-কি বলে, তাই একখানা ঐ শালার জন্যেও বলে দিয়ো।

ছোট মেয়ে পঙ্কজিনী হাসিয়া বলিল—একসঙ্গে তিন পুরুষের ব্যবস্থা হয়ে গেল! ভারি খুসী।

পঙ্কজিনীর বছরখানেক হইল বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী বিলাতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িতে (অবশ্য শ্বশুরের খরচেই) গিয়াছে। কর্ত্তা বলিলেন, রমেশ, বিলাতে টমাস কুকের কেয়ারে একখানা কারের দাম 'কেবল' করে দাও, সজনীকে তারা যেন একখানা গাড়ী কিনে দেয়।—সজনী ছোট জামাতার নাম।

কর্ত্তা স্নানকক্ষে প্রবেশ করিলেন। পরেশ সমস্ত বাহাদুরিটা নিজস্ব করিয়া লইয়া, ভাড়া-গাড়ী আনাইয়া কলেজে চলিয়া গেল।

তিন

গাড়ী আসিতে বিলম্ব হইল না, পরদিন প্রভাতেই তিনখানা গাড়ীই আসিয়া পৌঁছিল।

কর্ত্তা, কানাইকে পাঠাইয়া যোগীন ঘোষকে ডাকাইয়া আনিয়া, বলিলেন, তিনখানা গাড়ী কিনে ফেললুম যোগেন, ছেলে-বাবুরা সব বাবু হ'য়ে পড়েছেন, মোটর ছাড়া ওঁদের আর চলে না। চল একটু বেড়িয়ে আসি।

মেয়েরা পরেশের গাড়ীতে উঠিয়াছেন, সুরেশের গাড়ীতেও কেহ কেহ উঠিয়াছেন, বড় গাড়ীখানা খালিই ছিল—কর্ত্তা যোগীনকে উঠাইয়া, নিজে সেই গাড়ীতে উঠিলেন। তিনখানা গাড়ী এক-সঙ্গে ষ্টার্ট করিল—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া গাড়ীগুলি ছুটিল। কিয়দ্দূর গিয়াই অন্য দুইখানা গাড়ী কর্ত্তার গাড়ীকে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল—কারণ সেই গাড়ীখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও অধিক শক্তিসম্পন্ন। কর্ত্তা পাশ কাটাইবার সময় ইহাদিগকে দুয়ো দিয়া গেলেন এবং সত্য কথা বলিতে কি, বাড়ীসুদ্ধ লোকের রাগটা গিয়া পড়িল, সেই যোগীন ঘোষের উপর।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফেরা হইল। এবার কর্ত্তা স্বয়ং যোগেনের বাড়ীর দ্বারে গাড়ী থামাইয়া, নিজে নামিয়া, তাহাকে নামাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

অপরাহ্ণে পিতাপুত্র আদালত হইতে ফিরিতেছেন, বাড়ী হইতে একটু দূরে যোগেন ঘোষের সঙ্গে দেখা; সে তাঁহার গৃহপানেই আসিতেছিল;—কর্ত্তা মোটর থামাইতে বলিলেন এবং নিজে নামিয়া পড়িলেন। যোগেন রাস্তার একেবারে শেষে, অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; কর্ত্তাকে নামিতে দেখিয়া সে আরও হতভম্ব হইয়া পড়িল। অপরাধীর মত কাঁচুমাচুমুখে, জোড় হস্তে বলিল, আমি ভেবেছিলুম, আদালত বন্ধ হয়ে গেছে, আপনি বাড়ীতেই আছেন, তাই একটু কাজের জন্যে আসছিলুম—তা থাক্‌, আমি সন্ধ্যের পর আবার আস্‌বো।

সে কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া, কর্ত্তা রমেশকে বলিলেন, তুমি বাড়ী যাও রমেশ, আমি কথা কইতে কইতে

যোগেন বলিল, না, না, আপনি গাড়ীতে উঠুন, আমি পরে আসবো অখন।

তুমি যাও রমেশ, আমি আসছি।

রমেশের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এত বাড়াবাড়ি কাহার বা সহ্য হয়। বাড়ী ফিরিয়া, তিন ভ্রাতা, এক ভগ্নী, দুই বধূ একটা মস্ত সভা জমাইয়া ফেলিল; এবং আজ প্রকাশ্যে ও কঠোরভাবে প্রতিবাদ করিবে সভায় এই প্রস্তাব ভোটের জোরে পাস করাইয়া লইল। গৃহিণী হাঁ না কিছুই বলিলেন না। উপযুক্ত পুত্রগণের মত-বিরুদ্ধতা করাও যেমন অনভিপ্রেত, স্বামীর বাড়াবাড়িটাও তেমনই অশোভনীয় যে না ঠেকিত, তাহা নহে।

সন্ধ্যার পর কর্ত্তা বাড়ী ফিরিলেন, সঙ্গে যোগেন। বৈঠকখানায় বসিয়া কানাইকে পাঁচশ' টাকা আনিতে বলিলেন। টাকা তহবিলে নাই, কানাই সে কথা জানাইতে, কর্ত্তা হুকুম দিলেন, বাড়ীর ভেতর থেকে আনো।

টাকা আসিলে, যোগেনের হাতে তাহা দেওয়া হইল। কানাই আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসিল, কাগজ কলম আনতে হ'বে কি?

কর্ত্তা গম্ভীরভাবে কহিলেন, না। তুমি যাও।

যোগেন চাদরের খুঁটে টাকা বাঁধিতে বাঁধিতে মুখ খুলিতে সুরু করিবামাত্র, "আমি কাপড়-চোপড় ছাড়ি গে যোগেন, সেই সকাল থেকে সঙ সেজে আছি" বলিয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বিদ্রোহী-দল স্থির করিয়াছিল, রাত্রে খাইতে বসিয়া কথাটা তোলা যাইবে এবং পরেশচন্দ্রই সভার মুখপাত্রের কার্য্য করিবেন, ইহাও নির্দ্ধারিত ছিল। ভোজন-টেবিলে সকলেই উপস্থিত, কর্ত্তা তখনও আসেন নাই। তিনি তখনও স্নান কামরায়, রোজই এইরূপ হয়। কর্ত্তা স্নানকক্ষ হইতে বাহির হইয়াই খাইতে বসেন। রাত্রের ভোজন আসর, এক উৎসব বিশেষ। নাতি নাতনীদেরও হাজির থাকিতে হয়; ঘরের সকলগুলি আলো জ্বলিয়া উঠে, দুইখানা বড় বড় টানা পাখা দুলিতে থাকে; বৌমারা ছুটাছুটি করিয়া তদারক করিতে থাকেন, মাঝে মাঝে পরিবেশন করিতেও হয়—কারণ বৌমারা দুই চারিটি [illegible]

নাতনীদের পার্শ্বে চেয়ার লইয়া বসেন, তিনি কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তাঁহার বিশ্বাস, তাহাদের কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়ে।

স্নান-কামরার ছিটকিনি খোলার শব্দ হইতেই, বড় বৌমা ছুটিয়া নীচে চলিয়া গেলেন, রমেশ ও নরেশ চক্ষুর ইঙ্গিতে পরেশকে উৎসাহিত করিয়া রাখিলেন; নাতি নাতনী যাহাদের মাথার সঙ্গে টেবিলের ঘন ঘন সঙ্ঘর্ষ ঘটিতেছিল, তাহারা অকস্মাৎ মাথাগুলিকে বাধ্য করিয়া ফেলিল। কর্ত্তা আসিলেন। আসিয়া চেয়ারে বসিলেন; মধ্যম বধূমাতা মাটীতে বসিয়া শ্বশুরমহাশয়ের পা দু'খানি ভাল করিয়া মুছাইয়া, দু'পাটী সিল্কের পাতলা মোজা পরাইয়া, চেয়ারের হাতায় রক্ষিত সিল্কের পাতলা শালখানি গায়ে দিয়া দিলেন। আহার্য্য আসিল, এবং সকলে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভবেশবাবুর মত আধুনিকতাবর্জ্জিত লোক কেন টেবিলে বসিয়া আহারাদি করেন, লেখকের মনে হইতেছে পাঠক পাঠিকারা লেখকের নিকট এ সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দাবী করিতেছেন। কৈফিয়ৎ এই: তিনি মনে করেন, টেবিলের মাথায় বসিলে নিজের খাওয়ার সঙ্গে সকলের খাওয়া তদারক করা যায়, কেহ ফাঁকী দিতে পারে না; আসনে পা মুড়িয়া বসিতে, তাঁহার মত স্থূলাঙ্গ ব্যক্তির আড়ষ্টতা-জনিত কষ্ট অনুভূত হয়, ইহাতে তাহার সম্ভাবনা নাই; আর মাথা মুখ না ফিরাইয়া বেশ সহজভাবে গল্প করা চলে। টেবিল-চেয়ারে বসিয়া খান্ সত্য, কিন্তু ছুরী-কাঁটা-চামচ দরকার হয় না এবং আহার-শেষে ফিঙ্গার-বৌলে হস্তমুখ প্রক্ষালনের সমর্থন তিনি আদৌ করেন না।

কর্ত্তা বলিলেন, রমেশ বোধ হয় তখন খুব বিরক্ত হয়েছিল—রাস্তায় নেমে পড়ার জন্যে!

রমেশ কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি আবার বলিলেন, লোকটা বড়ই বিপন্ন হে!

লোকটা যে কে, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন; কেহই কোন কথা বলিলেন না।

কর্ত্তা কহিলেন, আমার বরাবর সন্দেহ ছিল, যোগীন ত একেবারে অশক্ত, অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। বিধবা মেয়ে আর তার অতগুলি কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে সংসার চালায় কি [illegible]

করিছি তা নয়; পষ্ট জবাব কোনদিনই দিত না; বলত, 'ভগবান চালিয়ে দেন,' 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেন তিনি,' এই সবই ছিল তার জবাব। অথচ আমি বরাবর বলিছি, যোগীন, দরকার হ'লে কোন কথাই আমার কাছে লুকিয়ো না। কিন্তু এমনই বুদ্ধিহীন লোকটা যে, আমার কাছে কোন কথা না বলে এক সাইলক-বেনের কাছে শ' দেড়েক টাকা ধার ক'রে আজ ভিটে মাটী সব হারাতে বসেছিল। দেড়শ' টাকা নাকি সুদে আসলে পাঁচ বছরে পাঁচশ' টাকা হয়েছে; চুপি চুপি নালিশ ক'রে,ডিক্রী ক'রে একেবারে বাড়ী বাঁশগাড়ী করতে এসেছিল; অনেক কষ্টে হাতে পায়ে ধ'রে একটি দিনের সময় পেয়েছে; কাল সকালেই টাকা দিতে হ'বে। না পারলে গাছতলায় ঘর বাড়ী! তা'ও হতভাগা আমার কাছে আসতো না, ওর মেয়েটাই ধরে-বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাই এসেছিল। ওর বিশ্বাস, আমি যে ওকে একটু আধটু 'দয়া' করি, টাকার কথা তুললেই নাকি advantage নেওয়া হ'তো।—advantage এর বাঙ্গালাটা বেশ বলেছিল হে!—অত্যাচার না অসম্মান, ঠিক মনে পড়ছে না। হাজার হোক্, গয়লা ত জাতে! কথাতেই বলে, আশী বছর না হ'লে ওরা সাবালক হয় না।—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পরেশ অবসর খুঁজিতেছিল; হাসি থামিলে, বলিল—তাই বুঝি পাঁচশ' টাকা দিলেন তা'কে?

হুঁ; কানাইটে আবার এমনই বুদ্ধিমান, কাগজ, কালী-কলম, ইষ্টাম্প নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খত লিখিয়ে নেবে।. বুদ্ধিমান রামধন আর কি! আরে ও-বেচারা গরীব, বিপন্ন, দেবে কোথা থেকে যে খত লিখিয়ে নোব!

তা'হলে টাকাটা জলে গেল, বলুন?

হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন, তার মানে কি পরেশ?

পরেশ কাঁত হাত মাটীর নীচে বসিয়া গেল; পিতার এ মূর্ত্তি কেহ কখনও দেখে নাই! কিন্তু তখন পিছু হঠাও চলে না, দাদারা বৌদিরা সকলে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। পরেশ শুষ্কস্বরে ভয়ে ভয়ে কহিল, টাকাটা আর পাওয়া যাবে না, তাই বলছি।

কর্ত্তা অন্য দুই পুত্রের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরাও কি তাই বল না কি হে?

তাঁহারা নীরব। এই নীরবতার স্পষ্ট অর্থ বুঝিয়া কর্ত্তা একবার গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার মনোভাব জানিবার চেষ্টা করিলেন। সুখের বিষয় সে মুখে চিরদিন যে নির্লিপ্ত ভাব বিরাজ করিতে দেখা গিয়াছে, আজও তাহাই সুস্পষ্ট। কর্ত্তা প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন—এই কটা টাকা গেছে এই হয়েছে তোমাদের ভাবনা, না? গরীবের ছেলে, বই কিনতে যা'র পয়সা জুট্‌তো না, পরের বাড়ীর দেউড়ীর আলোয় বসে যা'কে স্কুলের কলেজের পড়া তৈরী ক'রে আসতে হোত, অসুখে-বিসুখে মিশনরীদের হাসপাতালের জানালায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ণা দিয়ে যা'কে ওষুধ এনে খেয়ে অসুখ সারাতে হো'ত, তার পাওয়ার পরিমাণটা তোমাদের চোখে পড়ল না; আর একটি গরীব, বিপন্ন প্রতিবাসীর কাজে ঐ ক'টা টাকা গেছে ভেবে একেবারে মর্ম্মাহত হোয়ে পড়েছ দেখছি। যে লোক দশ হাতে রোজগার করেছে, অতি দীন অবস্থা থেকে মানুষ যে অবস্থা সাগ্রহে কামনা করে সেই অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, সে যদি দু'হাতে কিছু খরচ ক'রে, তা'তে দুঃখিত হওয়া কি কারো উচিত?

এক মিনিট থামিয়া কর্ত্তা পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, আগেও তোমাদের বলিছি, এখনও বলছি, নিজের ভোগ, ইচ্ছা, বাঞ্ছা, বাসনা, কোনটা অপূর্ণ রেখে অর্থ সঞ্চয় করে যাবার সদিচ্ছা আমার কোনদিনই নেই।

কথাগুলি বলিয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবে তিনি পুনরায় খাইতে আরম্ভ করিলেন। পাতের খাবার সবই প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, বধূমাতারা ছুটাছুটি করিয়া আবার সব গরম আহার্য্য আনিয়া দিলেন।

পরেশ ভাল করিয়া খাইতেছে না দেখিয়া, হাসিয়া কহিলেন, ভাবতে হবে না রে পরেশ, তোদের তিন ভাইয়ের ভাগ থেকে একটি কপর্দ্দকও কমবে না, এই বুড়োবুড়ীর একটা দু'টো ভাগ আছে ত, ও-টাকাটা তারই থেকেই যাবে। হ্যাঁ হে রমেশ, আজকের কনসাল্‌টেশানফীজ কত পাওয়া গেল হে?

রমেশ বলিল—হাজার এক টাকার চেক্ দিয়ে গেছে।

যাক্, বাঁচা গেল! পাঁচ-শ টাকা বাজে খরচ হয়ে গেছে, বাকী পাঁচ-শ' পরেশ বাবুকে কাল দিও দিত হে! বুঝলে!

রমেশ কহিল—যে আজ্ঞে।

নাতি সুরেশ একখানা শক্ত মোগলাই পরোটা লইয়া ধস্তাধস্তি করিতেছিল, ছোট্‌-কা হঠাৎ অনেকগুলি টাকা পাইয়া গিয়াছেন শুনিয়া বলিয়া উঠিল, দাদু, আমায় টাকা দেবে না?

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, যা শালা, ব্যালেন্স এক টাকা তোর!

নাতি বলিলেন—ছোট্‌-কার বেলা অ—তো টাকা, আর আমার বেলা এক টাকা!

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন—ওরে শালা, তুই বড় হ, তোর ছোট্‌-কার মত দুষ্টু হ, তখন তোর বাবাও তোকে অমনি গাদা গাদা টাকা দেবে। শুধু কি হাত পাতলেই হয় রে ভাই? প্যাঁচ দিতে জানা চাই। বুঝলি?

নাতি কি বুঝিল, কে জানে; কিন্তু সকলেই হাসিয়া উঠিল এবং সত্য কথা বলিতে কি, এতক্ষণ ধরিয়া যে ঘরের বাতাস অত্যন্ত ভারী বোধ হইতেছিল, তাহা আবার হাল্কা হইয়া সহজ ভাব ধারণ করিল।

চার

মহাষষ্ঠী! আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। অপরাহ্নে অনাথ আতুরদিগকে অর্থ বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে; নাতি সুরেশ স্বহস্তে দান করিয়াছে; কর্ত্তা তাঁহার বাল্যবন্ধুর পুত্র রমেন্দ্রকে লইয়া পার্শ্বে বসিয়া দেখাশুনা করিয়াছেন। সুরেশ পিতামহকে বিশেষভাবে আনন্দ দিয়াছে। অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ সম্পর্কে একবারের বেশী তাহাকে নির্দ্দেশ দিতে হয় নাই। পিতামহ বলিয়াছেন, সুরেশ আমার মুখ রাখবে।

রাত্রি তখন আট-টা। সদর-বাড়ীর উঠানে পাল টাঙ্গাইয়া, সাঁওতালী নাচ দেওয়া হইয়াছে। কাতারে কাতারে নরনারী আসিয়া জমিয়াছে; বাড়ীর মেয়েরা উপরের বারান্দার চিকান্তরালে বসিয়া; কর্ত্তা বৈঠকখানার রোয়াকে ফরাসের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছেন, পার্শ্বে রমেন্দ্র। এক সময়ে ফরাসের কাছে একটি মলিন-বসনা নারীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রমেন্দ্র সেইদিকে কর্ত্তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। কর্ত্তা সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—কে মা গৌরী? কি খবর?

গৌরী বলিল—কাল থেকে বাবার খুব জ্বর হয়েছিল, এখন ছাড়ছে বোধ হয়, কিন্তু বড্ড ঘামছেন, মাদুর বালিশ সব ভেসে যাচ্ছে। আর জ্ঞানগম্যি কিচ্ছু নেই, কাউকে চিন্তেও পাচ্ছেন না।

তাই না কি! তুমি চল মা, আমি আসছি এখনি। ওরে ভুতো, একটা আলো নে। কানাই কোথা গেলে হে, মৃগেন ডাক্তারকে একবার চট্‌ ক'রে খবর দাও।—বলিয়া তিনি গৌরীর সঙ্গে সঙ্গেই সিংহদ্বার পার হইলেন। যাহারা নাচিতেছিল, তাহারা জানিল না, যাহারা দেখিতেছিল, তাহারাও জানিল না; কিন্তু যাহারা জানিবার মত, বুঝিবার মত, দূরে থাকিয়াও তাহারা সবই দেখিল; কি বুঝিল, জানি না, কিন্তু তাহাদের মুখে যে চিহ্নগুলি ফুটিল, তাহাতে প্রীতি অথবা সন্তোষ যে বিকশিত হইল না, তাহা জানি। এই মেয়েটিকে তাহারা কোন দিন দেখে নাই; তথাপি সে যে যোগেন ঘোষের বিধবা কন্যা তাহা বুঝিতেও তাহাদের যেমন বিলম্ব হইল না, মলিন বসনাভ্যন্তর হইতে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত নারীদেহের অপরূপ রূপ-লাবণ্যের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া দারুণ দুশ্চিন্তার বৃশ্চিক-দংশনজ্বালা হইতেও তাহারা অব্যাহতি পাইল না।

ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়িবার কালে, অনেক সময় ঐরূপ হয়, বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই, তবুও আমি ঘণ্টা-খানেক পরে আবার আসিয়া দেখিয়া যাইব—ডাক্তারের মুখে এই অভয়বাণী শুনিয়া কর্ত্তা যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন নাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আসর প্রায় খালি; কেবল প্রতিমার রূপমুগ্ধ পাড়ার বালক বালিকারা আসরের মাঝখানে বসিয়া শুইয়া সিংহীমামার কেশর, অসুর ভায়ার রক্তচক্ষু ও কার্ত্তিকঠাকুরের ময়ূরের রূপগুণ আলোচনায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

আহারের সময় উপস্থিত। পূর্ব্ব-পরিচিত সকলে ত আছেনই, উপরন্তু দুই জামাতা, কন্যা, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি, বন্ধুপুত্র রমেন্দ্র আছেন।

ষষ্ঠীর রাত্রের আয়োজন যেমন বিচিত্র, তেমনই বিরাট। আজ আর পাচক ব্রাহ্মণ নহে, আজ বাড়ীর মেয়ে-বৌয়েরা সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। আজ নিরামিষের ব্যাপার, কাজেই বহুবিধ ও সকলগুলিতেই বিচক্ষণতা অত্যাবশ্যক। রমেন্দ্রকে কর্ত্তা বাম পার্শ্বে লইয়া বসিয়াছেন, রমেন্দ্র খাইতে পারে বলিয়া তিনি তাহাকে বড় ভালবাসেন।

নানা কথা হাসিগল্পের মধ্যে ভোজন-আসর খুবই জমিয়া উঠিয়াছে; কানাই আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল।

কর্ত্তা মুখ তুলিয়া চাহিতেই, কানাই বলিল, ডাক্তার বাবু এসেছেন।

কর্ত্তা বলিলেন—যোগীনের বাড়ীতে নিয়ে যাও-না! বলে দিও, ফেরবার সময় যেন দেখা ক'রে খবর দিয়ে যান।

কানাই বলিল, তিনি সেখান থেকেই আসছেন।

ডাক, এইখানেই ডাক।

মৃগেনডাক্তার নিঃশব্দে এবং খুব সহজভাবেই ঘাড়টা নাড়িয়া দিলেন। কর্ত্তা আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—কতক্ষণ?

ডাক্তার বলিলেন, এই মাত্র!

বড় বৌমা, আঁচাবার জল দাও মা!

সকলেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন; কিছুই খাওয়া হয় নাই, মাত্র দুই গ্রাস পলান্ন মুখে দিয়াছেন!

আর হয় না মা! জল দাও।

পরেশ বলিয়া উঠিল—এটা কিন্তু আপনার বড্ড বাড়াবাড়ি বাবা! কে সে যোগীন ঘোষ, আমাদের না-জাত, না-জ্ঞাত, না-কুটুম্ব, না-বন্ধু যে, খাওয়া ছেড়ে উঠ্‌তে হ'বে! কে-সে যে—

কর্ত্তা বসিয়া পড়িলেন; বলিলেন, সে কে, তা এই রমেন্দ্র জানে! তোমাদের জানাবো না ভেবেছিলুম, বড় লোক হ'লে গরীবের উপকারটুকু কেউ মনে রাখতে ইচ্ছা করে না; মনে করলেও নাকি তাদের কষ্ট হয়। তাই ভেবেছিলুম, আমার সঙ্গেই যার শেষ, তা আর কাউকে জানিয়ে যাবার দরকার হ'বে না। কিন্তু আজ যখন যোগীন পৃথিবীর ক্রোধ বিরক্তির অতীত হয়ে গেছে, তখন কথাটা জানালেও ক্ষতি নেই।—যে ঘরে আজ তোমরা রূপোর থালায়, সোনার বাটীতে, রূপোর গেলাসে টেবিল সাজিয়ে বসে আছ, ঠিক এই জায়গায় গোলপাতার ঘরে এক দুঃখিনী বিধবা তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাস করতো। ভিক্ষে সিক্ষে-ক'রে নানাভাবে গতর খাটিয়ে মা যা রোজগার করতো, তাতে মা ছেলের পেটের ভাত, কায়ক্লেশে কোনদিন হোত, কোনদিন হোত না। যেদিন একেবারে হোত না, সেদিন ঐ ও-পাশের গলির আর এক গরীব আর তার মা চাট্টি ক'রে চাল দিয়ে যেতো। এমন একদিন নয়, এক সপ্তাহ নয়, এক মাস নয়, এক বছর নয়, এই জায়গার কুঁড়ে ঘরের ছেলেটি যতদিন এণ্ট্রেন্স পাস্ ক'রে বৃত্তি না পেয়েছিল, ততদিন ও-পাশের গলির গরীব গোয়ালার ছেলে আর তা'র মা এদের অন্ন জুটিয়েছিল। আজ এই ঘর, এই ঐশ্বর্য্য, এই সোনারূপা যে করেছে, সে একদিন প্রাণধারণ করেছিল যার অন্নে, তার প্রাণ-বিয়োগে অন্ন যদি তার মুখে একদিন না-ই রোচে পরেশ, তাকে কি তুমি বাড়াবাড়ি বল্‌তে পারো?

সমস্ত ঘরখানা যেন ভূমিকম্পে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। টানাপাখা যেন থামিয়া গিয়াছে, ঘরে অসহ্য গুমোট্, আলোগুলি যেন সহসা নিবিয়া গিয়াছে, ঘর অন্ধকার!

কর্ত্তা আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন, গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওঁরা বড়-লোকের রায় বাহাদুরের ছেলে-বৌ, ওঁদের কথা স্বতন্ত্র, তুমি কি আমার সঙ্গে যোগীনের বাড়ী যাবে?

গৃহিণী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—যাব বৈ কি! চল।

বৌ-মারা শ্বশুরের পায়ের উপর বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন, বাবা, আমাদের আপনি পর ভাবছেন কেন? আমরাও যাব আপনার সঙ্গে।

নাতি সুরেশ বলিল—দাদু, আমিও যাব।

"আয় ভাই" বলিয়া কর্ত্তা সুরেশের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন; বলা বাহুল্য, পাঁচমিনিটের মধ্যে ও-পাশের গলির সেই বাড়ীখানি, এ-পাশের অট্টালিকার জনগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গৌরী মৃত পিতার শব জড়াইয়া ধরিয়া আছাড় বিছাড় করিয়া কাঁদিতেছিল—অত্যধিক বিস্ময় তাহার পিতৃ-শোকেরও গলা টিপিয়া স্তব্ধ করিয়া দিল।

অনামি ও গোধূলি-লগ্ন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীঅরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবীর দৌহিত্র শ্রীমান অরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার "অনামি" শীর্ষক সনেটটী তাঁর দাদামশাই রবীন্দ্রনাথকে সংশোধনের জন্ত দেখান। সংশোধন-ফলে ভাবটী যদিও এক রহিল— ভাষার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটীর একটী নূতন নাম দিয়া দেন। মূল কবিতাসহ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। আলোকচিত্র দুইখানি শ্রীমান অরুণরঞ্জন দিয়াছেন।—সম্পাদক]



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমান্ অরুণরঞ্জন



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

অনামি

ওই দেখ সন্ধ্যা আসে গগনের কোনে,
ধূসর তিমির-ছায়া মিলাইয়া দেহে।
প্রভাতের দীপ্ত রবি গেছে অবসান,
কী পুলকে কেঁপে উঠে বল্লরী বিতান।
এইরূপ একদিন জেগেছিলে তুমি
আমার মানস-পটে, হাতে লয়ে তুলি।
তোমার অজানা ছিল হৃদয় আমার,
তবু কিন্তু লয়েছিলে আরতি পূজার।
তারপর একদিন সাথে তব দেখা,
দেখাইলে সেই দিন অসীমের সীমা।
দিলে মোরে সেই দিন তোমার বারতা,
গহন কানন-পথে জ্বালি দীপ-শিখা।
তোমারে বরিব কোথা ভাবিয়া আকুল
হৃদেতে মানসে—কিবা পরাণ ব্যাকুল।

শ্রীঅরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গোধূলি-লগ্ন

ওই সন্ধ্যা আসে, যেন কি শঙ্কা সন্দেহে,
ধূসর উত্তরীখানি আবরিয়া দেহে।

*　　*　　*　　*

এই মত একদিন আলোয় আঁধারে,
এসেছিলে তুমি মোর স্বপনের পারে।
তার আগে মোরে তুমি চিনিতে না কভু,
আমার পূজার মালা নিয়েছিলে তবু।
তারপরে—আজ পথে চলেছিনু একা,
গোধূলিতে তোমা সাথে পুন হ'ল দেখা।
তোমার দখিন হাতে ওই দীপখানি,
নীরবে আমার প্রাণে কি কহিল বাণী।
তারপর হ'তে খুঁজি বন-বীথিকায়,
তোমার আসনখানি পাতিব কোথায়।

২০ মার্চ্চ, ১৯৩১ }
জোড়াসাঁকো }

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সারনাথ—মূলগন্ধকুঠী-বিহার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

হিন্দু-ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশীধামের অদূরবর্ত্তী সারনাথে সে দিন নব-নির্ম্মিত বিহারের স্থাপনার মহোৎসব। সেই উৎসবের প্রতি ক্ষুদ্র অঙ্গটি পর্য্যন্ত যেন এক অপূর্ব্ব আশা ও আনন্দের প্লাবনে পরিপ্লুত। উৎসবের বহিরঙ্গ যে সুন্দর ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না; কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটি ছিল আরও সুন্দর, আরও উদার, আরও মহান্।



মূলগন্ধকুটী-বিহার—সারনাথ

সকলেই সমবেত—ভারতবর্ষ, সিংহল, শ্যাম, বর্ম্মা, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি বহু দেশের বহু প্রতিনিধি সেই পবিত্র ক্ষেত্রে পবিত্র হৃদয়ের মঙ্গলেচ্ছা লইয়া সম্মিলিত। ভারত-শাসক-সম্প্রদায়ের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের প্রধান পরিচালক রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনী মহোদয় তক্ষশীলা হইতে আনীত ভূগর্ভে প্রাপ্ত রৌপ্যাধার-নিহিত ভগবান-বুদ্ধের পবিত্র দেহাস্থি যখন মহাবোধি সঙ্ঘের (Mahabodhi Society) সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে উক্ত পবিত্র স্থানে স্থাপনের নিমিত্ত সমর্পণ করিলেন, তখন ভারতের অতীত নাট্যের এক গৌরবময় পুরাতন দৃশ্য যেন সহসা মানস-নেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত ও পুনরভিনীত হইল; মনে হইল সেই কথা, যখন সম্রাট্ অশোক মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রকে ভগবান্ বুদ্ধের দেহাস্থি এবং যে পবিত্র মহাবোধিতলে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের একটি শাখা প্রদান করিয়া শাক্যসিংহের শান্তি ও মৈত্রীর বাণী দেশ-দেশান্তরে প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।



মূলগন্ধকুঠী বিহারের সম্মুখে হস্তীপৃষ্ঠে পবিত্র অস্থি (একটী দৃশ্য)

* * * * * *

সারনাথ মিউজিয়মের শস্য-শ্যামল সুন্দর প্রান্তরে সমবেত নরনারীর সম্মুখে, রায় বাহাদুর মহাশয় কিরূপে বুদ্ধের পবিত্র অস্থি তক্ষশীলায় ভূগর্ভ খননকালে Sir John Marshall পাইয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিলেন ও ভাইসরয়ের শুভেচ্ছাও সেই সঙ্গে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি আরও

বলিলেন যে মহাবোধি সঙ্ঘ (Mahadodhi Society) যদি তক্ষশীলায় আর একটি বিহার নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে শাসক-সম্প্রদায়ের (Government)



মূলগন্ধকুঠী বিহারের সম্মুখে হস্তীপৃষ্ঠে পবিত্র অস্থি (দ্বিতীয় দৃশ্য)

হস্তে বুদ্ধের যে আর এক অংশ অস্থি আছে, তাহা সেই স্থানে সমাহিত করিবার জন্য উক্ত সঙ্ঘের হস্তে সমর্পণ করা হইবে। অতঃপর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়



হিমালয়ের বৌদ্ধ বাদকদল

মহাবোধি সঙ্ঘের তরফ হইতে রায় বাহাদুর, ভাইসরয় ও প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগকে ধন্যবাদ দিয়া রৌপ্যাধারনিহিত অস্থি শ্রীযুত অনাগরিক ধর্ম্মপালের ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে প্রদান করিলেন।

তার পর এক অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা বাহির হইল। মিউজিয়ম হইতে বিহারে লইয়া যাইবার জন্য উক্ত নিহিত বুদ্ধাস্থি রৌপ্যাধার সুসজ্জিত হস্তী-পৃষ্ঠে সযত্নে সংরক্ষিত হইল। সেই শোভাযাত্রার সর্ব্বপুরোভাগে তিব্বতীয় বাদ্যকরগণ অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র সহকারে অপূর্ব্ব বাদ্যোদ্যম করিয়া চলিল। তার পর সিংহল, বর্ম্মা, শ্যাম, চীন, জাপান ও নেপাল হইতে আগত বৌদ্ধাচার্য্যগণ, আর ঐ সব দেশের বৌদ্ধ নরনারী তিনবার মন্দির পরিক্রমণ করিবার পর শোভাযাত্রা দণ্ডায়মান হইল ও সেই পবিত্র বুদ্ধাস্থি হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে নীত ও রৌপ্যাধারসহ বিহার মধ্যস্থ বুদ্ধ-মূর্ত্তির সম্মুখে রক্ষিত হইল। তখন সেই সম্মিলিত ভারতীয় ও অভারতীয় নরনারীর ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে ও ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে একতানে একই আত্ম-নিবেদনের পাবন-মন্ত্র ধ্বনিত হইল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

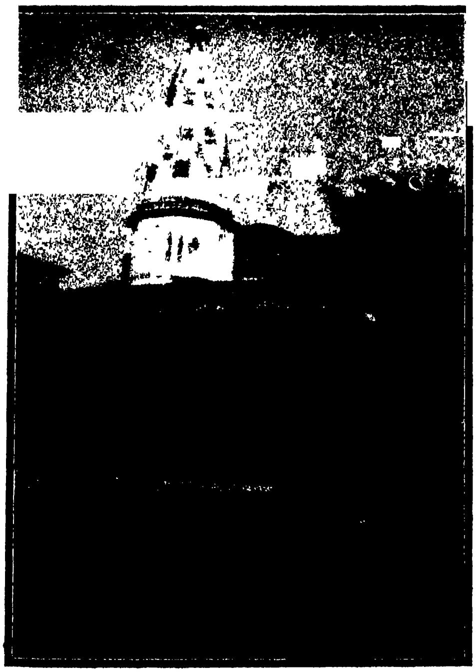
অস্থি সংরক্ষণের পর বিহার-প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ তলে সিংহলের প্রধান বৌদ্ধাচার্য্যের নেতৃত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। মন্ত্র উচ্চারণের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়,—প্রথমেই শ্রীযুত ধর্ম্মপালের অভিভাষণ পঠিত হয়; তৎপরেই রাজা স্যার মতিচাঁদ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে সম্বর্দ্ধনা জানান। সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধগণ পবিত্র ভারতবর্ষের উদ্দেশে তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ও সারনাথে যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হয়, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের সহযোগ দানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সময় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাণী ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রেরিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ বার্ত্তা সভায় পঠিত হয়।

ভারতের সমগ্র হিন্দু-সমাজের মুখপাত্র-স্বরূপ নিখিল হিন্দুমহাসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রতিনিধিগণ এই উৎসবে প্রীতি ও আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। অতীত

ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধাচার্য্যগণ বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী ও শান্তির নিমিত্ত যে দুষ্কর সাধনা করিয়াছিলেন তাহা যে ফলপ্রসূ হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল উক্ত উৎসব-সভায় আপামর-হিন্দু-জন সাধারণের উপস্থিতিতে।

জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জহরলাল বলিলেন যে উক্ত কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বিহারের নিমিত্ত একটি কারুকার্য্যখচিত জাতীয় পতাকা প্রদান করিবেন।

সন্ধ্যায় মন্দিরে ত্রিপিঠক পাঠ হইল ও বাজী পোড়ান হইল।

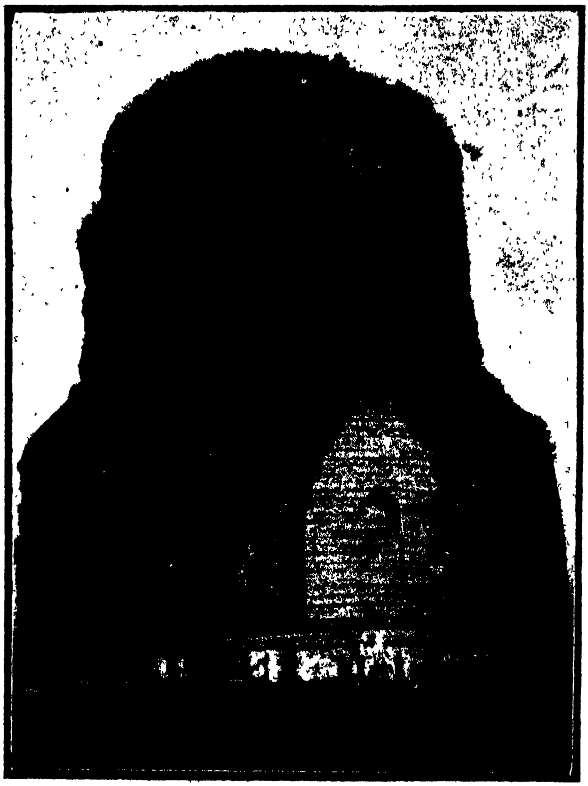


জৈন মন্দির—সারনাথ

পরদিন প্রভাতে শ্রীযুত ধর্ম্মপাল ও রায়বাহাদুর সাহনী সিংহল অনুরাধাপুর হইতে আনীত মহাবোধিবৃক্ষের ২টী ছোট গাছ বিহারে রোপণ করিলেন। এই দিবস অপরাহ্নে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের সভানায়কত্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এক সভা আহূত হয় ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে অনেকে অনেক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শেষের দিন বৌদ্ধ শিল্প ও চিত্রকলার একটী প্রদর্শনী খোলা হয় ও দেশবিদেশ হইতে আনীত বৌদ্ধকলার নিদর্শন সমূহ তথায় উপস্থিত করা হয়। জগতে অতুলনীয়, মানবের মনোরাজ্যের চরমোৎকর্ষের পরম-প্রকাশ-স্বরূপ এই বৌদ্ধ-কলার প্রতীকগুলিকে যেন চোখে দেখিয়া ঠিক ধারণা করা যায় না—এগুলি যেন অতিমানুষের সৃষ্টি। এগুলি ধ্যানের বস্তু; স্থূল বুদ্ধির আবেষ্টনীর মধ্যে ইহাদের বাঁধিতে গেলে যেন ইহাদের সৌন্দর্য্য ও রস-প্রকাশের মহিমা একেবারেই খর্ব্ব হইয়া পড়ে।

বাঙালী সেই অতীত-গৌরবময় ভারতবর্ষের প্রতি যে কত শ্রদ্ধাবান্, সারনাথের অতীত কীর্ত্তিমালা জানিবার জন্য কত আগ্রহ তাহাদের, তাহা সেদিন কাশীস্থিত আপামর



ধামেক স্তূপ—সারনাথ

বাঙালী নরনারীর সারনাথে উপস্থিতিতে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইল। উৎসবের বাহ্য অনুষ্ঠান, মেলা প্রভৃতি বাঙালীকে ততদূর আগ্রহান্বিত করিতে পারে নাই, সারনাথের ঐ ভগ্ন স্তূপ যতদূর করিয়াছে। ভবিষ্যতে কাশীর ন্যায় সারনাথও বাঙালীর নিকট পবিত্র তীর্থস্থান হইবে এরূপ আশা করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অশোভনীয় হইবে না ইহা একপ্রকার নিশ্চয়তার সহিতই বলা যাইতে পারে। এই ঐতিহাসিক ও আন্তর্জ্জাতিক বুদ্ধ-উৎসবকে যে বাঙালী কোন প্রকারেই অবজ্ঞা করে নাই, ইহা তাহার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।

ভাস্কর

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

বৈদিক ঋষি পূজিল তোমারে তোমার নয়নে নয়ন রাখি
অর্য্যমা, পূষা, উষাপতি ভাস্কর,
তবু তেজোমাঝে ভর্গেরে বুঝি হেরিল তাদের মনের আঁখি,
শ্রুতির স্থক্তে সেই ধ্যান ভাস্বর।
ত্রেতা যুগে এলো নৃপতির ধারা, তব নাম তারা করিল পুঁজি,
য়ারী করিয়া গড়িয়া তোমায় ভাবিল পিতৃপুরুষ বুঝি,
থধ্বজায় তোমার প্রতীক বর্ণছটায় আঁকিল তারা ;
জয় হুঙ্কারে কম্পিল অম্বর,
ত তারকার বংশগণেরে শাসিল গর্ব্বে আত্মহারা।
তুমি শুধু তায় হেসেছিলে দিবাকর।

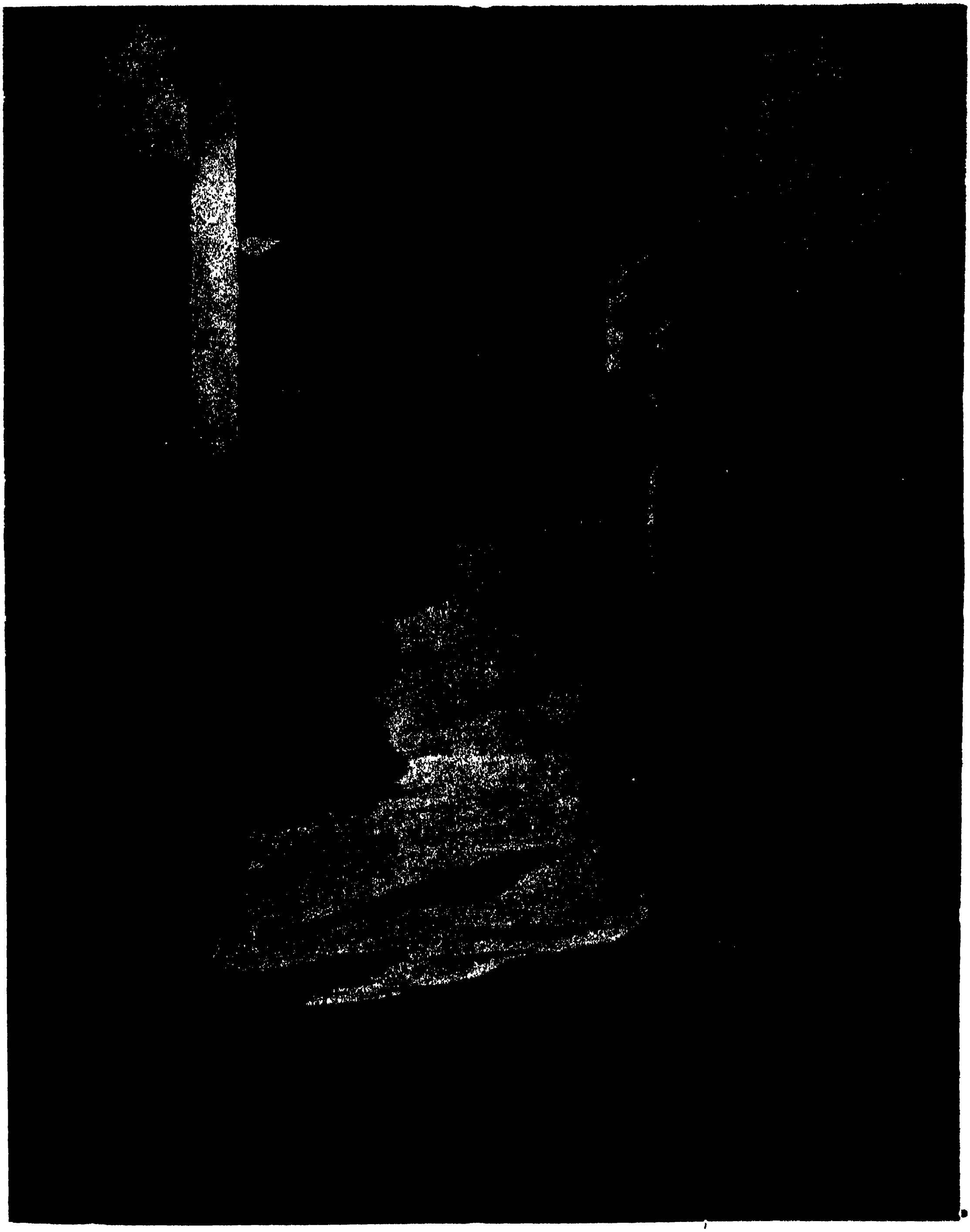
ার পর এলো সৌরপন্থী তোমারে ভাবিল ব্রহ্মময়,
তোমার পূজাই সকল পূজার সার,
াব শাক্ত বৈষ্ণব সাথে যুঝিয়া তাহারা লভিল জয়,
কভু পরাজয়ে বহিল লজ্জা-ভার।
জয়-মত্ত সৌর ভূপতি রাজকোষ তার শূন্য করি'
ন্ধুর তীরে তব মন্দির গড়িল দ্বাদশ বর্ষ ধরি'
ত ভাস্কর দুষ্কর ব্রতে কলা-চাতুর্য্যে বিমণ্ডিত
করিল যতনে শোভামণ্ডল তার,
াটি ভক্তের জয়ধ্বনিতে হ'লো ব্যোমলোক আন্দোলিত।
ভাস্কর তুমি হেসেছিলে একবার।

্যাতির্ব্বিদেরা, জ্যোতির্ব্রহ্ম আরাধিল তোমা আরেক রূপে
বহাইল দেশে নবতন্ত্রের ধারা,
গ্রহের তুমি নিয়ন্তা, ভয়ে সম্ভ্রমে গ্রহের ভূপে
স্বস্তি বচনে কত না পূজিল তারা।

সব শেষে এলো জড়বিজ্ঞান ধ্রুবস্বরূপ জেনেছে বলে,
একচোখে চায় তোমা পানে রবি, তুমি হাস তায় কৌতূহলে।
কেহ আর তব দেউল গড়ে না, সৌরতন্ত্র লুপ্ত ক্রমে,
পূজার ঘটার পর্ব্ব হয়েছে সারা।
স্নানশেষে শুধু পল্লীবাসীরা একবার শুধু তোমারে নমে,
পাঁজির পাতায় হইয়াছ তুমি হারা।

আজি নাই সেই বেদের ঋষিরা, নাই কোণার্ক সৌররাজ ;
কোথা শিল্পীরা—তাঁহার আজ্ঞাবহ ?
রণপতাকায় চিত্রিল তোমা যারা, তারা হায় কোথায় আজ ?
আজি তুমি নও কারো দূর পিতামহ।
মানুষের এই পূজা-পূজা খেলা হেরি বিচিত্র, প্রদোষে প্রাতে
যুগ যুগ হ'তে সমান হাসিই হাসিয়া চলেছ উপেক্ষাতে।
মধ্যদিনের ভ্রূকুটি তোমার কেন তাহা হায় কেই বা বোঝে!
কৃপায় কৃপণ তুমি যে কখন নহ,
রবির রবিরে যাহারা নিত্য বিশ্বের প্রতিবিম্বে খোঁজে,
তাদের মূঢ়তা তাও তুমি রবি সহ।

মানবোদয়ের আগে হ'তে তব নিত্য সেবার যে আয়োজন
হয়নি বিতথ তার তিল-পরিমাণ,
গিরিচূড়া তোমা বরিছে নিত্য, তোমার আপন চারণগণ
সাঁঝে ভোরে গায় নীড়ে-নীড়ে জয়গান।
যুগ যুগ হ'তে মেঘেরা অরুণ কেতন ওড়ায় তোমার রথে,
সমানই নিত্য উষসী সন্ধ্যা সিঁদুর ছড়ায় তোমার পথে,
চিরদিনই সেই সূর্য্যমুখীরা তোমা পানে চেয়ে ব্রতটি পালে
কাল-পারাবার করায় তোমায় স্নান,
বসুধার শিরে হৈম আশিস্ পাণি সহস্র সমানই ঢালে
যুগ যুগ হ'তে হে রবি, বিবস্বান্।



বন্ধুর পথে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

আগন্তুক

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

ড্রেসিং-আয়নার সাম্‌নে বসে' প্রসিদ্ধ নাট্যকার সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী চুল আঁচ্‌ড়াতে আঁচ্‌ড়াতে গুন্‌গুন্‌ করে' গান কর্‌ছিলো। এমন নয় যে সে গান কর্‌তে পারে; তবে মনটা অতিরিক্ত রকম প্রফুল্ল থাক্‌লে কে-ই বা গুন্‌গুন্‌ না করে। সূর্য্যকুমারো কর্‌ছিলো।

কারণ, আজ্‌কে তা'র চতুর্থ নাটকের প্রথম অভিনয়-রাত্রি। রিহার্সেল থেকে বিচার কর্‌তে গেলে, এ নাটকটি দর্শকদের খুব শক্ত ক'রেই ধর্‌বে। আর এম্‌নিও—বিজ্ঞাপনের জোরে কাল্‌কের মধ্যেই বেশির ভাগ টিকিট বিক্রি হ'য়ে গেছে। তা'র নামের জোরেও যে খানিকটা না হয়েছে, তা নয়। তা'র বয়েস এখনো তিরিশ হয় নি, কিন্তু ইতিমধ্যে সে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অর্জ্জন করেছে। অলক্ষিত রাস্তায় বেরুনো তা'র পক্ষে মুস্কিল। শেষ যবনিকা-পাতের পর প্রথম রাত্রির দর্শকরা তা'কে দেখ্‌বার জন্য চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—রঙ্গমঞ্চে তা'কে এসে দাঁড়াতে হয়, কিছু বল্‌তেও হয়। আজ্‌কেও হ'বে। আর এক ঘণ্টার মধ্যে অভিনয়ের সুরু—তায় তা'র আবার একটু আগেই পৌঁছতে হ'বে; কতগুলো জিনিষ বহুবার রিহার্সেল-দে'য়া থাকা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্ত্তে একবার বলে' দে'য়া দরকার। তাই, হাতে একটু সময় রেখেই বেরুবার জন্য সে তৈরি হচ্ছে; সজ্জা সমাপন করে' চুল আঁচ্‌ড়াতে আঁচ্‌ড়াতে গুন্‌গুন্‌ কর্‌ছে। যেমন, মন অতিরিক্ত রকম প্রফুল্ল থাক্‌লে, সবাই করে।

চুলের ব্রাশটা আবার গেলো কোথায়? টেবিলটা একবার হাৎড়ে সে ড্রয়ার টান্‌লে -কে যে কোথায় সব জিনিষ ফেলে রাখে! কে আবার রাখ্‌বে?—যাক্—পাওয়া গেছে ব্রাশ। এক ধাক্কায় ড্রয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে মুখ তুলে' আয়নায় তাকালো; কিন্তু ব্রাশ-সুদ্ধ তা'র হাত ঠিক মাথার কাছে এসে আট্‌কে রইলো—চুলের ওপর আর নাব্‌তে পার্‌লো না।

আয়নার মধ্যে এক নারী-মূর্ত্তির ছায়া। ঠিক তা'র পেছনে।

পরে সে মনে ক'রে দেখেছিলো, চুলের ব্রাশটাকে হাত থেকে টেবিলের ওপর নাবিয়ে রাখ্‌তে তা'র রীতিমত সচেতন চেষ্টা কর্‌তে হয়েছিলো। যেমন, জ্বরের ঘোরে বিকার যখন আস্‌তে থাকে, সবল মন তা'কে প্রাণপণ চেষ্টায় ঠেকিয়ে রাখে। শুধু তা-ই নয়, চেয়ার ছেড়ে সে উঠ্‌লো, এবং ফিরে' আগন্তুকের মুখোমুখি দাঁড়ালো। প্রত্যেকটি কাজ করতে যেন তা'র এক-এক বছর আয়ুক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে।

শেষটায় সে কথাও বল্‌লে। মনে হ'ল, মাঝখানে যেন অনেকখানি সময় কেটে গেছে।

বল্‌লে, 'তুমি?'

নিজের কণ্ঠস্বর শোন্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে সে যেন তা'র নিজত্বে ফিরে' এলো। বিস্ময়ের স্তব্ধ নিস্তরঙ্গতার বুকে লাগ্‌লো শব্দের ঢিল; মূঢ়তা গেলো কেটে।

অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিকভাবে সে আবার বললে, 'তুমি? হঠাৎ?'

'এলাম।' শুধু এ-ই হ'ল উত্তর। অত্যন্ত চাপা গলা—যেন কথা বল্‌তে কষ্ট হচ্ছে, যেন মেয়েটি ভালো করে' নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পার্‌ছে না।

সূর্য্যকুমারো তা লক্ষ্য কর্‌লে। ভালো করে' তা'র অতিথির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে—অত্যন্ত ম্লান মুখ। যেন দীর্ঘ অসুখ থেকে উঠেছে।

শোবার ঘরে আর কোনো আস্‌বাব ছিলো না; সূর্য্যকুমার তা'র বিছানার দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে, 'বোসো।'

'না, বস্‌বো না; এবার আমি যাই।'

'এসেই চলে' যাবে? এতদিন পর কি এরি জন্যে এসেছিলে?"

'তোমাকে একবার দেখ্‌তে এসেছিলাম।'

'দেখ্‌তে এসেছিলে? তা হ'লে একটু বোসো—আরো-একটু ছাখো। একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই কি দেখা শেষ হ'য়ে যায়?'

'তুমি হয় তো কোনো কাজে বেরুচ্ছিলে—আমি থাক্‌লে তা'র ব্যাঘাত হ'বে না তো?'

'হ'লই বা। এ-পর্য্যন্ত অনেক কাজ করেছি; কাজের কখনো ব্যাঘাত ঘটতে দিই নি। আজ্‌কে—এতদিন পর—তুমি এসে না হয় একটু ব্যাঘাতই করলে।'

'তোমার কোনো ক্ষতি হ'বে না তো?'

'কেন ও-সব কথা বল্‌ছো, কঙ্কা?'

'আবার।'

'কী আবার?'

'আবার ডাকো—আমার নাম নিয়ে।'

'কী যে পাগ্‌লামি করো।—বোসো।'

'না—ডাকো না তুমি। তার পর বস্‌ছি।'

'কঙ্কা, তোমার নাম নিয়ে আমি কবিতা তৈরি কর্‌বো।'

'না—না; কবিতা নয়, কবিতা নয়; তুমি বলো—মুখে বলো।'

'কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কা।'

গভীর তৃপ্তি মেয়েটির ম্লান মুখে পলকের জন্য একটু আলো ছিটিয়ে দিয়ে গেলো। ধীরে-ধীরে সে বিছানার একপ্রান্তে আল্‌গোছে বস্‌লো। সূর্য্যকুমারও তা'র চেয়ারটি একটু এগিয়ে এনে বস্‌লো। খানিকক্ষণ কাট্‌লো চুপচাপ।

এবার কঙ্কাই আগে কথা বললে, 'অমন করে' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকো না তুমি।'

সূর্য্যকুমার চোখ সরিয়ে নিলে। একটু পরে আলাপ আরম্ভ কর্‌লে, 'কোথায় উঠেছো তুমি?'

কঙ্কা যেন কিছু বুঝ্‌তে না পেরে বললে, 'উঠেছি? কোথায় আবার উঠ্‌বো?'

সূর্য্যকুমার একটু অপ্রস্তুতই হ'য়ে গেলো। জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'তুমি—তুমি কি এই আসছো?'

'কোথায়?'

'এখানে—কল্‌কাতায়।'

'তা নয় তো কী? এইমাত্র এলাম।'

'তোমার জিনিষপত্তর কোথায়?'

'জিনিষপত্তর কিছু আনি নি।'

'আনো নি? কিচ্ছু নয়?'

'না, কিছুই নয়।'

মনে-মনে সূর্য্যকুমার একটু চিন্তিতই হ'য়ে পড়্‌লো। বলা নেই, কওয়া নেই, দীর্ঘ চার বছর—না, পাঁচ বছর?—পাঁচ বছর পর—এই মেয়ে, যা'র জন্য কোনো-এক সময়ে রাতের পর রাত সে ঘুমোতে পারে নি—এই মেয়ে হঠাৎ আজ সন্ধ্যেবেলায় তা'র কাছে এসে উপস্থিত—সঙ্গে ওর দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। এর মানে কী? কী? কী? সূর্য্যকুমার যতই ভাব্‌তে লাগ্‌লো, ততই তা'র মন শুধু একটা জিনিষের প্রতিই ইঙ্গিত কর্‌তে লাগ্‌লো। এ ছাড়া এর অন্য মানে হ'তে পারে না।

সে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'সঙ্গে কে এসেছে?'

'কেউ নয়।'

'এত দূরের পথ একা এসেছো?'

'হ্যাঁ, একাই এসেছি।'

একটু চুপচাপ।

'তুমি—তুমি যে চলে' এসেছো, তা—তা ওখানে সবাই জানে?'

'হ্যাঁ, সবাই জানে।'

'জানে?'

'জানে।'

'তোমার ছেলে—আর তোমার মেয়ে—ওরা?'

'তা'দেরও রেখে এসেছি।'

একটু সময় সূর্য্যকুমার বল্‌বার মত কোনো কথা খুঁজে' পেলো না। তার পর: 'ওরা তো বেশ বড় হয়েছে এতদিনে?'

'তবু—আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে প্রথমটায় ওদের একটু কষ্ট হ'বে বই কি। অবিশ্যি দু'দিনেই সয়ে' যাবে।'

এ-কথা শুনে' মাথা নীচু করে' দু' হাতে মুখ ঢেকে সূর্য্যকুমার ভাব্‌তে লাগ্‌লো। প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌লো, খুব দ্রুতবেগে, খুব পরিষ্কার করে' চিন্তা কর্‌তে। তার পর মুখ তুলে' কঙ্কার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে পারি?'

'বলো।'

'তুমি কি এখানে থাক্‌তে এসেছো?'

প্রশ্ন শুনে' কঙ্কা একটু হাস্‌লো। ঘরে ঢুকে' অবধি এই তা'র প্রথম হাসি। বল্‌লে, 'আমি শুধু তোমাকে একবার দেখ্‌তে এসেছিলাম, এখনি চলে' যাবো মনে করে'। তবে, থেকেও অবিশ্যি যেতে পারি—যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে।'

সূর্য্যকুমার কোনো কথা বল্‌লে না; বল্‌তে পার্‌লে না। তা'র বুকের ভেতর তুমুল তোলপাড় চল্‌ছিলো।

কঙ্কাই আবার কথা বল্‌লে: 'একদিন—মানে, এক রাত্রে—মনে আছে তোমার?—তুমি আমাকে ধরে' রাখ্‌তে চেয়েছিলে—আমি নিজকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে' গেলাম—'

সূর্য্যকুমার রুদ্ধস্বরে বলে' উঠ্‌লো: 'থাক্—বোলো না, ও-সব কথা বোলো না।'

—'শোনোই না। যাবার সময় আমি বলে' গিয়েছিলাম, "আবার আস্‌বো।" তুমি হয় তো সারা রাত জেগে আমার অপেক্ষা করেছিলে।—'

কঙ্কার কথা সূর্য্যকুমার স্পষ্ট করে' শুনতে পাচ্ছিলো না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তা'র বুকের ওপর হাতুড়ির বাড়ি পড়্‌ছে।

'—তখন আমি আমার কথা রাখ্‌তে পারি নি। আজ —এতদিন পর পার্‌লাম, আমার সেই কথা রাখ্‌তে পার্‌লাম। আজ আমি আবার এলাম, সূর্য্য।'

সূর্য্যকুমার টের পেলো, তা'র চোখ জলে ভরে' উঠেছে। সে তা লুকোবার চেষ্টা না করে' দু' হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে খানিকটা কেঁদে' নিলে। তা'র মন একটু যেন হাল্‌কা বোধ হ'ল।

আলাপটাকে একটু সাংসারিক স্তরে নাবিয়ে আন্‌বার আশায় সে বল্‌লে, 'এত লম্বা জার্নির পর তুমি খুব ক্লান্ত নিশ্চয়ই?'

'না, ক্লান্ত নই, মোটেও ক্লান্ত নই।'

'পথে তোমার কোনোরকম কষ্ট হয় নি তো?'

'তা কষ্ট একটু হয়েছিলো বই কি।'

'তা হ'লে তুমি এখন কিছু খেয়ে নিয়ে বরং একটু বিশ্রাম করো—ঘুমিয়ে নাও। স্নানের জন্য গরম জল দরকার? তুমি পর্‌বেই বা কী? আমার বাড়িতে তো শাড়ি টাড়ি—'

'ব্যস্ত হোয়ো না তুমি;—স্নান কি খাওয়া কি ঘুম কিছুরি আমার দরকার নেই।'

'না—না, সে কী হয়? কিছু না খেলে অন্তত চল্‌বে কেন? চা? বরং এক পেয়ালা গরম দুধ খাও—ঘরে ফল-টল বোধ হয় কিছু আছে।'

'আমি তোমাকে বল্‌ছি, এখন আমার কিছুরি দরকার নেই—সত্যি নেই। তুমি শান্ত হ'য়ে বোসো—গল্প করো।'

'গল্প তুমি যত চাও কর্‌বো—কিন্তু একটু দুধ অন্তত তুমি খেয়ে নাও। তোমাকে ভারি শুকনো দেখাচ্ছে।'

সূর্য্যকুমার উঠ্‌তে যাচ্ছিলো; কঙ্কা অল্প একটু হাত তুলে' তা'কে বাধা দিলে।—'আচ্ছা, সে পরে হ'বে'খন—এখন তুমি বোসো। এই তো সবে এলাম—এত তাড়া কিসের?'

ঘর অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছিলো। 'আলোটা জ্বালিয়ে দেবো?' সূর্য্যকুমার জিজ্ঞেস কর্‌লে।

'না-ই বা দিলে। বেশ আছে।'

'তোমাকে অত্যন্ত ম্লান দেখ্‌ছি, কঙ্কা। তোমার কি শাগ্‌গির কোনো অসুখ করেছিলো?'

'হ্যাঁ, অসুখ করেছিলো।'

'খুব কঠিন অসুখ?'

'লোকে তা'কে কঠিনই বলে।'

'এখন ভালো আছ তো?'

হ্যাঁ, ভালো আছি, খুবই ভালো আছি। এখন আর কোনো অসুখ নেই।'

'তুমি অমন চুপচাপ ঘরে এসে ঢুকেছিলে—'

'খুব চমকে উঠেছিলে—না? নীচে কাউকে দেখলাম না, তাই সোজা ওপরে উঠে' এলাম।'

'কা'কেই বা আর দেখ্‌বে।'

'একেবারে একা আছো। কখনো-কখনো খারাপ লাগে না?'

'অভ্যেস হ'য়ে গেছে।'—হঠাৎ সূর্য্যকুমারের একটা কথা মনে পড়্‌লো: 'তুমি আমার ঠিকানা পেলে কোথায়?'

'তোমার মত একজন প্রসিদ্ধ লোকের ঠিকানা জোগাড় করা আর মুস্কিল কী।'

'তোমার মুখে ও-কথা ঠাট্টার মত শোনালো, কঙ্কা।'

'না-হয় করলামই একটু ঠাট্টা।'

'করতেই পারো।'

'তোমাকে এ-ক' বছরে আমি একখানাও চিঠি লিখ্‌তে পারি নি। এত কম সময়—'

'বুঝি, আমি সবি বুঝি। তোমাকে বল্‌তে হ'বে না।'

'তোমার সেই শেষ চিঠি আমি পেয়েছিলাম। যা'তে তুমি লিখেছিলে—'তোমার হাতের লেখা দেখ্‌তেও আমার ভালো লাগ।' সত্যি কথা?'

'কোন্‌টা?'

'আমার হাতের লেখা দেখ্‌তেও তোমার ভালো লাগে? সত্যি?—বলো না!'

'হ্যাঁ, লাগে।'

'তুমি কি সত্যি আমার চিঠি পেতে আশা করতে?'

'সত্যি বল্‌তে, আমি কখনো আশা করি নি যে তুমি আমাকে চিঠি লিখ্‌বে।'

'তোমাকে একখানা চিঠি কিন্তু লিখেছিলাম।'

'কবে?'

'এই তো—চলে' আস্‌বার ঠিক আগে। পাও নি?'

'না তো।'

'বোধ হয় কোনো কারণে ডাকে দেরি হচ্ছে।'

'চিঠি দিয়ে আর কী হ'বে? তুমিই তো এলে।'

''হ্যাঁ, আমি এলাম। আমার কথা আমি রাখ্‌লাম, সূর্য্য।'

'কিন্তু বলো—বলো এবার আর তুমি চলে' যাবে না?

'চলে' কখনোই যাবো না—এ কথা কি জোর করে' বলা যায়?'

'না—না, এবার আর তোমাকে চলে' যেতে দেবো না—কিছুতেই নয়। কতবার যে তুমি কাছে এসেই চলে' গিয়েছো—ফিরে' এসেছো শুধু আবার চলে' যাবার জন্য; সে-কষ্ট—সে-কষ্ট মৃত্যু-যন্ত্রণার মত।'

'না—না; তাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা বলে না। মৃত্যু-যন্ত্রণা কাকে বলে, শুন্‌বে?'

'আমি জানি; তা ভালো করে'ই জানি।'

'তা নয়, তা নয়। শোনো—আবার যে খুব কঠিন অসুখ করে না?—'

'হ্যাঁ, বলো।'

'ভয়ানক অসুখ। একটানা চার মাস বিছানায় শুয়ে' ছিলাম। পেটের নাড়ি-ভুঁড়িতে কী-সব গোলমাল—ডাক্তাররা কেটে-কুটে আর কিছু রাখে নি।'

'যাক্—ভালো যে হ'য়ে উঠেছো—'

'শোনোই। একদিন হ'ল কী—এই তো সেদিন—চারজন ডাক্তার মিলে' কী যেন একটা অপারেশন করলে—সে নাকি ভয়ানক একটা শক্ত ব্যাপার। কী করলে ওরা ছুরি-কাঁচি নিয়ে ওরাই জানে—ক্লোরোফর্ম থেকে জেগে উঠে' মনে হ'ল, এইবার ভালো হ'য়ে উঠ্‌বো। ভেতর থেকে কেউ যেন বল্‌তে লাগ্‌লো, "তুমি ভালো হ'য়ে উঠ্‌বে, ভালো হ'য়ে উঠ্‌বে।" কাকে যেন বল্‌লামও সে-কথা।

'একটু পরে এক মজার ব্যাপার আরম্ভ হ'ল। আমার পা দুটোয় কী-রকম যেন শীত করতে লাগ্‌লো। একটু জড়োসড়ো হ'তে গিয়ে দেখি, পা আর নড়ে না। এ আবার কী? শীত এদিকে বেড়েই চলেছে—আস্তে-আস্তে হাঁটু অবধি, তার পর কোমর। আমার শরীরের আদ্ধেক যেন পাথর হ'য়ে গেছে। সে-কথা কতবার চীৎকার করে' বল্‌লাম—ঘর-ভরা লোক—কেউ শুন্‌লে না, কেউ শুন্‌লে না। ইসারা করতে গেলাম—হাত আর তুল্‌তে পারি নে। তার পর সেই শীত যখন গলার কাছে এলো—কী-রকম লাগ্‌লো, জানো? জানো? মৃত্যু-যন্ত্রণা কাকে বলে তা আমি জানি, সূর্য্য, তুমি জানো না।'

সূর্য্যকুমার নিঃশব্দে আগাগোড়া শুন্‌লে। তার পর অত্যন্ত শান্তভাবে স্থিরদৃষ্টিতে কঙ্কার দিকে তাকিয়ে রইলো। ঘরের আলো আরো কমে' এসেছিলো; তবু একটা জিনিষ—এতক্ষণ সে যা লক্ষ্য করে নি—তার নজরে পড়্‌লো। তার স্প্রিঙ্-এর খাটে স্প্রিঙ্-এর ম্যাট্রেস্ পাতা—তার ওপর কঙ্কা বসেছে; কিন্তু সে যেখানটায় বসেছে, তা একটুও নীচু হ'য়ে যায় নি, চাদরটার ভাঁজ একটুও নষ্ট হয় নি—বিছানাটা আগাগোড়া সমান, নিভাঁজ। কঙ্কার শরীরের একেবারেই কোনো ওজন নেই।

কঙ্কার কথা শোনা গেলো: 'আজ্‌কে আর তোমার সময় নষ্ট করবো না। আর-একদিন না-হয় আস্‌বো।' বলে' কঙ্কা উঠে' দাঁড়ালো।

দৃঢ়পদে সূর্য্যকুমারো উঠে' দাঁড়ালো। কঙ্কার মুখ থেকে পলকের জন্যও সে চোখ সরাবে না—দেখি, সে কেমন করে' মিলিয়ে যায়।

আবার কঙ্কার স্বর শোনা গেলো: 'আমাকে যেতে দাও, সূর্য্য, যেতে দাও। আমাকে নিয়ে তুমি কী করবে? কী করবে?'

পেছন দিকে হেঁটে কঙ্কা দরজার দিকে যেতে লাগ্‌লো। সঙ্গে-সঙ্গে সূর্য্যকুমারও এগোচ্ছে।

কঙ্কা আবার কথা বল্‌লে: 'কেন তুমি আমাকে ধরে' রাখ্‌তে চাও? তোমাকে শুধু একবার দেখে গেলাম।'

সূর্য্যকুমার ঝাঁ করে' হাত বাড়িয়ে কঙ্কাকে ধরতে গেলো। তার গলা দিয়ে চীৎকার বেরিয়ে এলো: 'কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কা—।'…

'কী হয়েছে, দাদাবাবু?'

সূর্য্যকুমার ভালো করে' একবার চারদিকে তাকালো। ঘরে আলো জ্বলেছে। দরজার সাম্‌নে সে দাঁড়িয়ে, আর তার সাম্‌নে ভোলা—তার চাকর।

'কী হয়েছে, দাদাবাবু?'

'কিছু হয় নি—তুই যা।' ইস্‌—সে ঘামে ভিজে' গেছে একেবারে। 'পাখাটা খুলে' দে তো, ভোলা।'

পাখা খুলে' দিয়ে ভোলা বল্‌লে, 'এইমাত্র একখানা চিঠি এসেছে।'

'রাখ্‌ ওখানে।'

ড্রেসিং-টেবিলের ওপর চিঠিখানা রেখে ভোলা চলে' গেলো। সূর্য্যকুমার আবার সেই চেয়ারটিতেই এসে বস্‌লো।

কী চিঠি, তা সে জানে। যার হাতের লেখা দেখ্‌তেও তার ভালো লাগে, তারি হাতের লেখা। ও চিঠি এখন আর না খুল্‌লেও চলে।

তবু সে টেবিল থেকে চিঠিখানা তুলে' নিলে। পেন্সিল দিয়ে অত্যন্ত হিজিবিজি করে' ঠিকানা লেখা; না জানা থাকলে চট্‌ করে' সে হয়-তো হাতের লেখা চিন্‌তেই পার্‌তো না। টিকিটের ওপর ডাকঘরের ছাপে কাল্‌কের তারিখ।

খাম খুলে' সে চিঠিখানা বা'র কর্‌লে। ওপরে জায়গার নাম বা তারিখ কিছু নেই। মাঝখানে পেন্সিলে দু'লাইন হিজিবিজি লেখা:

'আমার খুব অসুখ। তোমাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করছে। একবার আসা কি সম্ভব?

কঙ্কা।'

আমি আর যেতে পার্‌লাম কই, কঙ্কা—তা'র আগে তুমিই এলে, তুমিই তো এলে।…

ভোলা এসে বল্‌লে, 'থিয়েটার থেকে টেলিফোনে ডাকছে।'

বাঃ, থিয়েটারের কথা সে একেবারে ভুলে'ই গিয়েছিলো। পাশের ঘরে গিয়ে সূর্য্যকুমার টেলিফোন তুলে' নিলে।

'কে? ললিতবাবু নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনার এত দেরি যে?'

'এই—দেরি একটু হ'য়ে গেলো। আরম্ভ হ'য়ে গেছে নাকি?'

'হ'ল বলে'। আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো?'

'যদি দয়া করে' করেন—দশ মিনিট। গোড়ার দিকটা আমার দেখা খুব দরকার।'

'আচ্ছা—পনেরো মিনিটই অপেক্ষা করছি।'

'অনেক ধন্যবাদ। তা'র আগেই আমি পৌঁছে যাবো। —ও-ঘর থেকে আমার চাদর আর মনিব্যাগ নিয়ে আয় তো, ভোলা। আর শোন্‌—আজকে রাত্তিরে আমি আর বাড়ি ফিরবো না।'



লিথুয়েনিয়া

শ্রীভারতকুমার বসু

লিথুয়েনিয়ান্‌দের ইতিহাসখানি ল্যাট্‌ভিয়াবাসীদের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। উভয়েরই দেশীয় ভাষার মিল আছে অসাধারণ। এমন কি, তাদের বাক্যের মূল এবং ব্যাকরণ-গত শব্দও অভিন্ন। লেটো-লিথুয়েনিয়ান্‌ ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অনেকটা ঐক্য আছে। মিস্‌ ফ্লোরেন্স্‌ ফার্‌নবারো বলেন, "The Letto-Lithuanion languages are more closely allied to the Sanskrit of ancient India than any living tongue."—অর্থাৎ, "লেটো-লিথুয়েনিয়ান্‌ ভাষাগুলি যে-কোনো ভাষার চেয়ে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেই বেশী সম্বন্ধযুক্ত।"



কৃষকের গৃহ



ঘরের ভিতরে আগুনের ঘর। আগুনের ঘরের উপরে ব'সে একটা ছেলে শীত দূর করছে

ফরাসী কলেজের অধ্যাপক মিলেট্‌ বলেন, "কোনো লোকের মুখ থেকে যদি ইণ্ডো-ইয়োরোপীয় ভাষার প্রতিধ্বনি শুনতে চান, তা হ'লে লিথুয়েনিয়ান্‌ চাষারা যেখানে গল্প ক'রছে, সেখানে যান।" অনেকে বলেন, ল্যাটিন এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষার চেয়েও লেটো-লিথুয়েনিয়ান্‌ ভাষা হচ্ছে ইয়োরোপের প্রাচীনতর ভাষা।

বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্ট্‌ ১৮শ শতাব্দীতে প্রুশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেহে লিথুয়েনিয়ান্‌ পিতৃপুরুষের রক্ত ছিল। রুহিগ্‌ সাহেবের "লিথুয়েনিয়ান্‌ অভিধানের" পরিচয়-পত্রে ক্যাণ্ট লিখেছেন যে, ঐ অভিধানখানিকে যত্নের সঙ্গে রাখা উচিত; কারণ তার দ্বারা লিথুয়েনিয়ানরা শিক্ষায় ও জ্ঞানে উন্নতি লাভ ক'রতে পারবে এবং ভাষা শিক্ষার দ্বারা পৃথিবীর প্রাচীন জাতি-গুলির সঙ্গে পত্র ব্যবহারের সুবিধা পাবে।

আগে লিথুয়েনিয়ানরা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল না। কিন্তু এই ধর্ম্মের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটা ভীষণ ওলট-পালট হ'য়ে গেল। দ্বাদশ শতাব্দীতে পোলাণ্ড ও রাশিয়া তরবারীর মুখে তাদের খৃষ্টান্‌ করবার জন্য প্রস্তুত হ'লো। ধর্ম্মের নামে এ-রকম হিংস্র জুলুম লিথুয়েনিয়ান্‌রা সহ্য ক'রতে পারলে না—বিরুদ্ধ-শক্তিকে প্রাণপণে প্রতিরোধ ক'রতে লাগলো।

১২৫২ খৃষ্টাব্দে লিথুয়েনিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক মিন্‌ডাইগাস্‌ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে রাজী হ'লেন। কিন্তু তার পরই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাতে দেশে অশান্তি হবে, দাঙ্গা-

হাঙ্গামা হবে এবং লোক ক্ষেপে যাবে। তখন তিনি দেশকে রক্ষা করবার জন্য খৃষ্টান্ শক্তিগুলোকে বাধা দিতে যুদ্ধের আয়োজন ক'রলেন। সে যুদ্ধে তাঁর জয় হ'লো। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে লিথুয়েনিয়া আশ্চর্য্য ভাবে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি ঝোঁক দিলে, এবং অনেকেই রোম্যান্ ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলে।

১৩৮৬ সালে লিথুয়েনিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক জোগেলার সঙ্গে পোল্যাণ্ডের রাণী হেডভিগের বিবাহ হয়। এই বিবাহই উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর সম্বন্ধ এনে দিলে। উক্ত বিবাহের পর জোগেলা পোল্যাণ্ডের রাজা হ'লেন। এইভাবে লিথুয়েনিয়া কার্য্যতঃ পোল্যাণ্ডেরই শাসনাধীন হ'য়ে গেল। তার ফলে, ১৫৬৯ সালের পরই পোল্যাণ্ড



কুমড়োর ক্ষেত। কুমড়োগুলো এত বড় হয় যে, কোনো কোনোটীর ওজন ৪০ থেকে ৮০ পাউণ্ড পর্য্যন্তও হয়।

লিথুয়েনিয়ার প্রতি আর মৈত্রী-ভাব দেখাবার প্রয়োজন বোধ ক'রলে না। পোল্যাণ্ড নিজের প্রভাব জাহির ক'রতে লাগলো। প্রথমেই লিথুয়েনিয়ান্ ভাষার প্রচলন বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। দেশে অপ্রীতির একটা ঘোর আন্দোলন উঠলো। বিখ্যাত লিথুয়েনিয়ান্ পণ্ডিত নিকোলাস্ ডাইজা ব'ললেন, "To take away from a nation its own language is equivalent to taking away the sun out of the heavens, to destroying the world-order, to imprisoning the very life and soul of the people."—অর্থাৎ, "জাতির কাছ থেকে জাতির ভাষা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে—আকাশ থেকে সূর্য্যকে তুলে নেওয়া, পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট



"ইষ্টার"—শোভাযাত্রার আগে আগে পুরোহিত যাচ্ছেন

করা, এবং লোকের জীবন ও আত্মাকে বন্দী করার সমান।"

আপত্তিমূলক আন্দোলন হ'য়ে উঠলো। সকলের চেয়ে ক্ষেপে উঠলো চাষারা। তারা ত বিদ্রোহই সুরু ক'রে দিলে! কিন্তু চাষাদের অবস্থা তখন ক্রীত-



ঘোড়া বিক্রীর জায়গায় ঘোড়ার পরীক্ষা হচ্ছে

দাসের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে বললেই হয়। তাদের সে বিদ্রোহ বেশী দিন টিক্‌লো না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে

এই যে, দেশের অভিজাত-সম্প্রদায় তখন রীতিমত পোল্যাণ্ড-ঘেঁষা হ'য়ে উঠেছিলেন। তার উপর ঘুস, পক্ষপাতিত্ব-দোষ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ত ছিলই। কিন্তু পোল্যাণ্ড-পন্থী অভিজাতদের 'স্বজাতিদ্রোহ' মাঠে মারা গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অন্তর্বিপ্লবের দ্বারা পোল্যাণ্ড ধ্বংস হ'য়ে গেল। কাজেই, পোল্যাণ্ড-সংশ্লিষ্ট লিথুয়েনিয়াও পতনোন্মুখ হ'লো। এর সুযোগে প্রায় অধিকাংশ লিথুয়েনিয়াকেই রাশিয়ান্‌রা হস্তগত ক'রলে।



লিথুয়েনিয়ান্ তরুণী

লিথুয়েনিয়ার বাকী অল্পাংশ অনেক দিন আগে থেকেই অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই জার্ম্মাণী অধিকার ক'রেছিল। যাই হোক, রাশিয়ার শাসনাধীনে এসেই সেখানকার লোকদের দুর্দ্দশা বাড়লো চরম ভাবে। দেশে রুষ নীতির প্রচলন হ'লো এবং উঁচু-নীচু সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর পদ-ই রাশিয়ানদের দ্বারা অধিকৃত হ'লো। জমি বাজেয়াপ্ত করা হ'লো, এবং কৃষি-সঙ্ঘগুলিকেও আর মাথা তুলতে দেওয়া হ'লো না। লিথুয়েনিয়ান্ ভাষার প্রচলন ত আগে থাকতেই বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল, এখন দেশীয় ভাষায় গোপনে শিক্ষা দেওয়াও দণ্ডনীয় হ'য়ে গেল। লোকদের দেব ভক্তি ছাড়াবার জন্য ধর্ম্ম-সংক্রান্ত স্কুল ও সমিতিগুলির দুয়ার বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। কিন্তু লিথুয়েনিয়ান্‌দের বুকে সকলের চেয়ে বেশী আঘাত বাজ্‌লো—মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ ক'রে দেওয়ায় এবং মুদ্রণ ব্যাপারে ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহার ক'রতে না দেওয়ায়। এই রকম দমন-নীতি চ'লেছিল—পুরো চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত। কিন্তু লিথুয়েনিয়ান্‌রা নিজেদের ভাষায় নিজেদের দেশে বই ছাপাতে না পারলেও, দ'মলো না। তারা জার্ম্মাণী ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বই



ইহুদীর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ। লিথুয়েনিয়ার ইহুদীরা মুশার (Moses-এর) নীতির পক্ষপাতী

ছাপাতে আরম্ভ ক'রলে। ওই সব বই সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে আনা হ'তো। কিন্তু যথেষ্ট সাবধানে আনা হ'লেও, হাজার-হাজার লোক ধরা প'ড়তে লাগলো। সামান্য উপাসনার বই ছাপানোর অপরাধেও তাদের নির্ব্বাসিত করা হ'তে লাগলো সাইবিরিয়ায়।

এক শতাব্দীরও বেশী দিন পর্য্যন্ত লিথুয়েনিয়ান্‌রা রাশিয়ান্‌দের নির্দ্দয় শাসনে নিস্তেজ হ'য়ে ছিল। কিন্তু হাজার নিস্তেজ হ'লেও, পরাধীন জাতি মনে-মনে স্বাধীনতার তেজ সূর্য্যের বন্দনা ক'রতে ভোলে নি। তাদের শুভ দিন ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল।

রুষো-জাপানের যুদ্ধ সুরু হ'তেই ১৯০৫ সালে লিথুয়ে-য়ানুর নব তেজে স্বদেশ-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রলে,—"জাগৃহি!" ই সময় থেকেই প্রকৃত পক্ষে তাদের কর্ম্মারম্ভ হয়। তার র জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয়, এবং শেভিক্ বিদ্রোহে "জারে"র বিপদ! লিথুয়ে-য়ানুরা এই সব সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিলে।। তাদের প্রচেষ্টা, অর্থাৎ গঠনমূলক কার্য্য তগুণ উৎসাহে আত্মপ্রকাশ ক'রলে। শেষে, ৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিথুয়েনিয়ার াধীনতা ঘোষিত হ'লো।

সেখানকার লোকেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ষকদের ছোট ছোট বাড়ীগুলি বাগান ও লগাছের বেড়ায় ঘেরা। দেখলেই মনে হবে, ঃ শতাব্দীর পর পাওয়া স্বাধীনতার নবীন ানন্দ সেগুলোতে ঝল্‌মল্ ক'রছে। কৃষকের ড়ীর সম্পত্তির মধ্যে গাভী, মেষ ও শূকর ধান। পশু-পালন তাদের অন্যতম ব্যবসা। ক্ষেতের স্যের মধ্যে বার্লি, যই, গম, শাক-সব্জী ও সরিষার ম করা যেতে পারে। সেখানকার সরিষাই হচ্ছে প্রধান স্য। শতকরা ৪১টী উর্ব্বরা জমিতে কেবল সরি-াই চাষ করা হয়। তিসিও সেখানে কম পাওয়া য় না।

সেখানকার গরীব লোকদের বাড়ীতে চর্‌কা এবং তাঁত হচ্ছে একটী মূল্যবান সম্পত্তি। গরীব লোকেরা বাড়ীতেই তাদের বসন তৈরী করে। এমন কি, পশমের জামাও



কৃষক রমণী

বাড়ীতে বুনে তৈরী করা হয়। অধিকাংশ কৃষকের-ই বাড়ীতে শোবার ঘর থাকে মাত্র একটী। ঐ ঘরখানিকে গরম ক'রে রাখবার জন্য মাঝখানে একটা বড় অগ্নিকুণ্ডের ঘর থাকে। সাধারণতঃ ঐ ঘরের এক কোণে থাকে একটা কাঠের খাটিয়া। শীতের দিনে ঐ খাটিয়ায় শুতে যাবার সময় চাষারা তাদের ভেড়ার চামড়ার জামাকে



অশ্বের বিশ্রাম।

চাদরের মতো গায়ে ঢাকা দিয়ে শীত দূর করে। ঘরের মধ্যে থাকে একটা টেবিল, একটা কি দুটো চেয়ার ও



ইহুদীর দোকানে

বেঞ্চি। কড়িকাঠ থেকে একটা দোল্‌না ঝোলানো থাকে। প্রত্যেক পনেরো মিনিট অন্তর এই দোল্‌নাটীকে



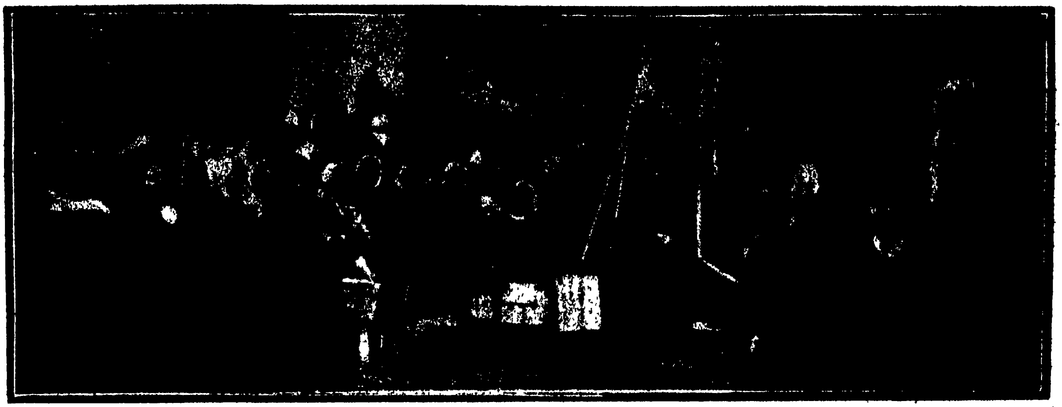
সৈন্যদের 'ড্রিল্‌'

দুলিয়ে দেওয়া হয়। এর কচ্‌কচ্‌ শব্দের দ্বারা প্রকারান্তরে ঘরের মেয়েদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা যেন না কাজের সময়ে কুঁড়ে কিম্বা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। সামান্য একটা মাটীর পাত্র এবং কতকগুলো কাঁসি সেখানকার ব্যবহার্য্য বাসন।

সেখানকার অতি-দরিদ্রের ঘর থেকেও অতিথি কখনো ফিরে যায় না। বাড়ীর চৌকাঠে পা দিলেই অতিথিকে আদর-অভ্যর্থনা করা হয়। অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আনা হয় 'রাই' মাখানো রুটি এবং ট'কে যাওয়া দুধ। দুধকে ইচ্ছে ক'রেই টকিয়ে ফেলা হয়। সেই টক দুধ না কি খেতে খুব সুস্বাদু এবং উপকারকও বটে! গ্রীষ্মের সময়ে অতিথিকে দেওয়া হয়—সুগন্ধী সরস ফল, কিম্বা, রান্না-করা উৎকৃষ্ট 'ব্যাঙের ছাতা' (mushrooms)। 'ব্যাঙের ছাতা'র সেখানে আদর খুব!

লিথুয়েনিয়ার প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্থান দখল ক'রে আছে—বহু শতাব্দীর পুরোনো জঙ্গল। আজ সেখানকার এক এক স্থানে জঙ্গল এত নিবিড় যে, ঠিক অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো এখনো তা দুর্ভেদ্য ও দুর্গম হ'য়ে আছে।

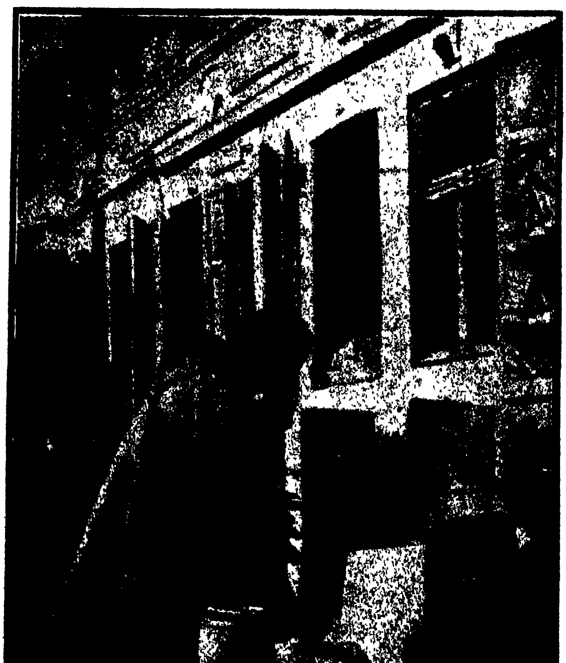
এর একমাত্র কারণ, স্বাধীনতা পাবার পর লিথুয়েনিয়া খুব অল্প সময়ই পেয়েছে, যে সময়ের মধ্যে ওই সব জঙ্গল তাদের মধ্যে অনেকেই অনাহারে ও রোগে মারা গেল।···প্রায় আড়াই লক্ষ লোক জন্মভূমির মাটী ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়।



লিথুয়েনিয়ান সৈন্যদের অভ্যর্থনার জন্য মিলিত জনতা

পরিষ্কার হ'তে পারে। লিথুয়েনিয়াকে সারা জীবনটাই ত কেবল দুঃখ কষ্ট, ঝড় ঝাপটা স'য়েই কাটাতে হ'লো!·· বেশী দিন আগেকার কথা নয়, বিগত মহাসমরের সময়ে উৎপীড়িত হতভাগ্য লিথুয়েনিয়ান্‌রা দুর্দ্দশার চরমে পৌঁছেছিল। সে কথা শুনলে বাস্তবিকই বুক ফেটে যায়। মহাসমরের সময়ে লিথুয়েনিয়ার দিকে আক্রমণকারী জার্ম্মানদের কামান প্রথম অগ্নিবর্ষণ ক'রলে। সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণীর সৈন্যদল সীমান্ত দিয়ে এসে, দুধারের নগর গ্রাম পোড়াতে পোড়াতে অগ্রসর হ'লো। এমন কি, শস্যক্ষেত্রগুলিকেও তারা বাদ দিলে না। কৃষি-প্রধান দেশে কৃষকদের অবস্থা হ'য়ে প'ড়লো অত্যন্ত শোচনীয়! প্রায় চার লক্ষ গোলাবাড়ী পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। হাজার-হাজার পরিবার গৃহহারা হ'লো। ধ্বংসের স্তূপে নগর গ্রাম যেন শ্মশানের দৃশ্যে পরিণত হ'লো। ১৯১৫ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে সমস্ত লিথুয়েনিয়াকে বিধ্বস্ত ক'রে, সেখানকার পূর্ব্ব সীমান্তে জার্ম্মাণ সৈন্যদল তাদের তাঁবু ফেললে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তারা সেখান থেকে এক পা-ও ন'ড়লো না। জার্ম্মাণ আক্রমণের সময়ে লিথুয়েনিয়ার অনেক লোক প্রাণ বাঁচাবার জন্য পেট্রোগ্রাড ও মস্কোর দিকে পালিয়ে যায়। অনেকে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়। কিন্তু কোনো স্থানেই তাদের দুঃখ অভাবের অর্দ্ধেকও দূর হ'লো না।

কিন্তু লিথুয়েনিয়ান্‌দের উৎসাহ অদম্য! তাদের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য অসাধারণ! দেশের স্বাভাবিক অবস্থা



দোকানদার ও ক্রেতা

ফিরে আসতেই, দেশত্যাগী অনেক সন্তান আবার দেশে ফিরে এল। এসেই, সংস্কারের কাজ আরম্ভ ক'রলে। তাদের বুদ্ধি ও একাগ্রতা সত্যই প্রশংসনীয়। এর দ্বারাই তারা, হাজার নির্জীব হ'য়ে প'ড়লেও, দ্বিগুণ তেজে দেশ সংস্কারের মহান দায়িত্ব নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ ক'রলে না। তারা এক-প্রাণ এক-আত্মা হ'য়ে এক-সঙ্গে যে-কোনো স্বাধীন জাতির মতো, আশায় উদ্দীপ্ত প্রেরণা ও দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজে লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফ্যাক্টরী, স্কুল, সঙ্কট-ত্রাণ-কমিটি ও অন্যান্য সমিতি খোলা হ'লো। শত বাধা সত্ত্বেও বিজ্ঞান, কলা, কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক জাতীয় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠলো। এক কথায়, লিথুয়েনিয়ান্‌রা আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা ক'রলে। শেষে, মৌখিকভাবে ১৯১৮ সালে তাদের স্বাধীনতা ঘোষিত হ'লো। পরে, ১৯২১ সালের সেপ্‌টেম্বর-মাসে লিথুয়েনিয়া "জাতি-সঙ্ঘের" (League of Nations এর) সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়।



সমাধি-ক্ষেত্রে প্রার্থনা

বিগত মহাসমরের আগে সেখানকার লোকদের সমস্ত অধিকারই যে কেড়ে নেওয়া হ'য়েছিল, সে কথা আগেই বলা হ'য়েছে। তখন কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক—সমস্ত ব্যাপারেই লিথুয়েনিয়ানদের ঠিক টুঁটি টিপেই রাখা হ'য়েছিল। কাজেই, তাদের মধ্যে অনেকে একান্ত বাধ্য হ'য়েই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যায়। ওই সব স্থানেই তারা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীন অধিকার উপভোগ ক'রতে থাকে। আজও গ্রেট্‌ব্রিটেনে, বিশেষভাবে গ্লাস্‌গো ও স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে প্রায় পনেরো হাজার লিথুয়েনিয়ান্ বাস করে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই তাদের সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। সেখানে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ লিথুয়েনিয়ান অধিবাসী আছে। এর মধ্যে চিকাগোর ভিতরে, কিম্বা, তার কাছাকাছি জায়গায় বাস করে ৮০ হাজার, এবং নিউইয়র্কে বাস করে ৪০ হাজার।



"এরোড্রোমের" একধারে খ-পোত-কর্ম্মচারীরা দূরবীক্ষণের সাহায্যে উড়ো জাহাজের গতি লক্ষ্য ক'রছেন

লিথুয়েনিয়া স্বাধীনতা পাবার পর অনেক প্রবাসী লিথুয়েনিয়ান্ তাদের স্বদেশে ফিরে আসতে আরম্ভ ক'রলে। তারা প্রবাসের আবহাওয়ায় থেকেও মাতৃ-ভাষাকে নির্ব্বাসিত করে নি। তাদের ছেলেমেয়েদের তারা স্বদেশের ভাষাই শিক্ষা দিয়েছিল। কাজেই, লিথুয়েনিয়ায় ফিরে আসবার পর জাত ভাইদের সঙ্গে আগেকার মতোই মিলেমিশে থাকবার বিষয়ে তাদের কোনোই অসুবিধা হ'লো

না। তারা বিদেশের অভিজ্ঞতায় জাতি-গঠন ও আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা-প্রণালীর জ্ঞান সঞ্চয় ক'রেছিল যথেষ্ট। দেশভাইদের তারা সেই জ্ঞানের পথ দেখিয়ে দিলে। গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকায় কর্ম্ম-জীবনের যে-সব নূতন নূতন দরকারী পন্থা তারা দেখেছে, তারই সন্ধান তারা স্বজাতির কাছে দিতে লাগলো। তারা বুঝেছিল যে, ইংরেজী শিক্ষাই উন্নতির প্রকৃষ্ট পথ। আজকাল লিথুয়েনিয়ায় তাই ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হ'য়েছে।

স্বাধীনতা পাবার পর থেকে লিথুয়েনিয়ার উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা চ'লে গেছে; কারণ, একটা বিপদ আসতে না আসতেই আর-একটা বিপদ এসে উপস্থিত হ'তো। কাজেই, দেশ-সংস্কারের গুরুতর কার্য্যটীকে আর কিছুতেই শেষ ক'রতে পারা যাচ্ছিল না। ক্রমে সমস্ত বাধা-বিপত্তির ইতি হয়। আজকাল লিথুয়েনিয়া অনেক বিষয়েই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

সেখানকার লোকেরা নীলচক্ষু, দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ এবং স্বভাবতই স্বাস্থ্যবান। তারা কঠোর পরিশ্রম ক'রতে পারে। মিতব্যয় এবং সঞ্চয়শীলতা গুণ তাদের আছে প্রচুর। সেখানকার সমবায়-পদ্ধতি খুবই উন্নতি ক'রেছে। ওই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে—পরস্পরকে অর্থ নৈতিক সাহায্য করা। চাষের ব্যাপারেও ওই সমবায়ের একটা কর্ত্তব আছে। তাকে বলা হয় "তাল্‌কা"। বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন পল্লী-প্রদেশে "তাল্‌কা"র দ্বারা অনেক শ্রমিককে কাজে লাগানো হয়। ওই সব শ্রমিক ক্ষেত চাষ করে, বীজ বপন করে এবং কাঠের গুঁড়ি চালান করে। কিন্তু সমবায়-সমিতি তাদের পারিশ্রমিক দেন না। গ্রামের প্রত্যেক লোককেই নৈতিক কৃতজ্ঞতায় চাঁদা তুলে ওই সব শ্রমিককে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়াই সেখানকার নিয়ম।



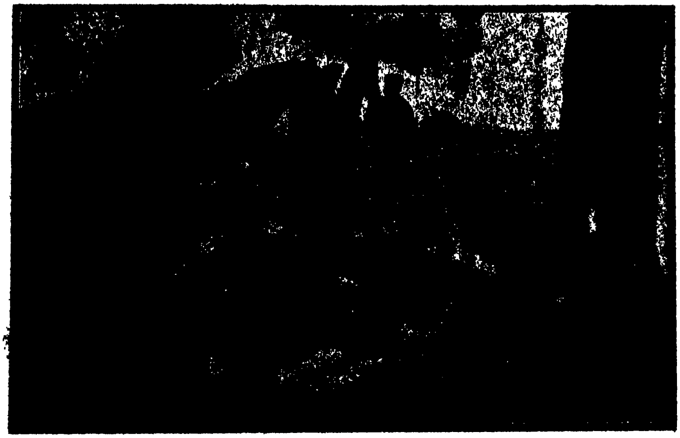
গরীবের ঘরে চরকার পূজা



লিথুয়েনিয়ার বীর সন্তান

সেখানকার যে-কোনো জন-সভায় গিয়ে দাঁড়ালেই, যে-জিনিষটী সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে, তা হচ্ছে—লোকদের বসনের বৈশিষ্ট্য। আজও কোনো কোনো জেলায় কোনো বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মেয়ের

তাদের পিতৃপুরুষের আমলের পোষাক ব্যবহার ক'রে থাকেন। মেমেল্‌দেশের চারিপার্শ্বস্থ স্থানে ওই ধরণের পোষাক-পরিহিতাদের বাস্তবিকই সুন্দরী দেখায়, সন্দেহ



অনেকক্ষণ অশ্বারোহণের পর বৃক্ষতলে বিশ্রাম

নেই। কিন্তু আমেরিকান্ প্রভাব ক্রমেই তাদের উপর ছড়িয়ে প'ড়ছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে প্রাচীন পোষাকের আর ইজ্জৎ থাকবে কি না বলা যায় না।



জাতীয় পোষাকে লিথুয়েনিয়ান নারী

সেখানকার পুরুষদের পোষাক কিন্তু আধুনিকতার দাবী রাখে যথেষ্ট।

লিথুয়েনিয়ার আছে সম্পদযুক্ত সাহিত্য। তবে সে সাহিত্যের দান বেশী নয়। প্রত্যেক ছেলে মেয়েকেই সেখানকার গ্রাম্য গল্প, কবিতা এবং গান প'ড়তে ও শিখতে দেওয়া হয়। এইভাবে তাদের মধ্যে কবিতা ও নাটক লেখবার প্রেরণা জাগে।

সেখানকার লোকেরা রোম্যান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের দিকেই বেশী আসক্ত। দেশের চারিদিকেই রাস্তার ধারে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্ত্তি দেখা যায়। প্রত্যেক রবিবারে গীর্জ্জার মধ্যে লোকদের প্রার্থনা ক'রতে আসা চাই-ই! প্রার্থনা শেষ হবার পর লোকেরা আমোদ-আহ্লাদ করে। বলা বাহুল্য, এ-সব তারা করে—শস্য-ক্ষেতের মঙ্গল-কামনায়। এইভাবে লোকদের সামাজিক ও ধার্ম্মিক মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সেখানকার ইহুদীদের হাতেই লিথুয়েনিয়ার সমস্ত কারবার র'য়েছে। তারা প্রধানতঃ দোকানদার। তাদের খুব বড় রকমের কোনো ব্যবসা নেই। কিন্তু তা হ'লেও, তারা ছাড়া দেশবাসীদের গত্যন্তর নেই। এই জন্যই লিথুয়েনিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ তাদের কিছু স্বাধীন অধিকার



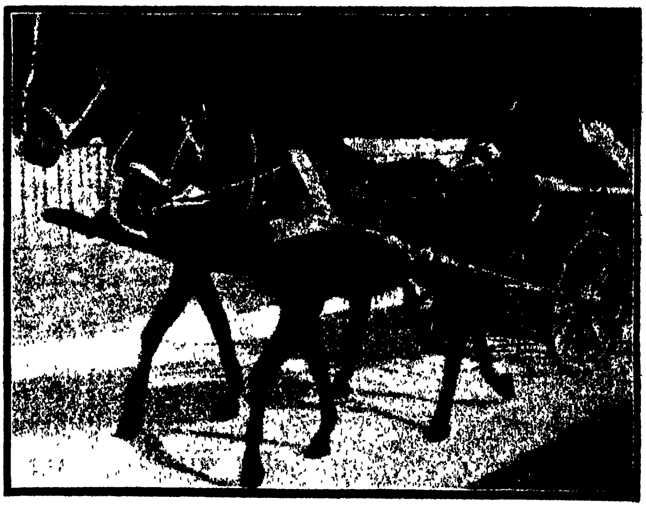
গৃহহারাদের প্রান্তর-জীবন

বিগত মহাসমরের সময় নির্ম্মম জার্ম্মাণ আক্রমণে বিব্রত হ'য়ে, অত্যন্ত অসহায়ভাবেই লিথুয়েনিয়ানরা তাদের বাড়ী ত্যাগ ক'রে, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সমেত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যায়। এই ছবিতে যাবার সময়কার অত্যন্ত করুণ দৃশ্যটী ফুটে উঠেছে।

দিয়েছেন। এই অধিকারেই তারা নিজেদের মধ্যে একটা স্বায়ত্ত-শাসিত ব্যবস্থা-পরিষদ ক'রেছে। এই পরিষদই তাদের ব্যবসার উপদেশ দেয়; তাদের শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত বিষয়ে কর বসাবার স্বাধীনতা পায়।

লিথুয়েনিয়ান্‌রা শান্তির প্রয়াসী। ধর্ম্মই তাদের প্রাণ। কর্ম্মে তারা পশ্চাৎপদ নয়। তাদের সম্বন্ধে ইংরেজ বিশেষজ্ঞের অভিমত হচ্ছে এই যে, "লিথুয়েনিয়ান্‌দের মতো ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে মানুষোচিত তেজস্বিতা, সমবায়ের কল্পনা, দৃঢ়তা এবং সঙ্ঘবদ্ধতার গুণ অতিরিক্তভাবে প্রশংসনীয়।"

সেখানকার লোকেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। শতকরা ৯০ জন লোকই ক্ষেতের পূজা করে। ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যগুলি ছাড়া, সেখানকার পশম, মাখন, পনির, ডিম, ইত্যাদি বিক্রী ক'রেও লোকেরা বেশ দু-পয়সা অর্জ্জন করে। চিনি, চামড়া এবং কাগজও সেখানকার বেশ লাভজনক ব্যবসা। শতকরা খুব অল্প লোকই শিল্প কাজের পক্ষপাতী। সেখানকার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪,৮০০,০০০।



মালগাড়ী

গতিক

শ্রীবিমল মিত্র

মতিচ্ছন্নই বলিতে হইবে!……

অতদিনকার পুরান ঝি; প্রায় চোদ্দ পনেরো বছর কাজ করিতেছে—কোনও রূপ খারাপ কিছু করে নাই—বেশ নিশ্চিন্তে কাজ করিয়াছে!—

শেষকালে যাবার সময় কি-না এই কাণ্ড বাধাইয়া গেল!

বয়স কত আর?—আসিয়াছিল দশ বছর বয়সে—এখন হইয়াছিল প্রায় চব্বিশ কি পঁচিশ।—তা' হোক্—কিন্তু এমন কুমতি হইল কেন?

ব্যাপারটা প্রকাশ করে ঝি নিজমুখেই ও-পাড়ার মুখুয্যে গিন্নির কাছে;—

হাত মুখ নাড়িয়া না-কি বলিয়াছে—আমি আর থাকি কোন্ মুখে বল মা?—বাবুর মেজ ছেলে—চারিদিকে চাহিয়া অ:পক্ষাকৃত আস্তে—বুঝ্‌লে মা—গিন্নীমারা যখন দার্জ্জিলিঙে গিয়েছিল—বাড়ীতে থাকবার মধ্যে ছিল মেজদাদা আমি আর ঠাকুর দারোয়ান—এরাই—ওমা লজ্জার কথা বলব কি—আর একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল—পরে বলিল—রাত্তির বেলা মেজদাদা আমারই ঘরে—

মুখুয্যে গিন্নী এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই গালে হাত দিলেন—ওমা তুই বলিস্ কি সিন্ধু—আমাদের রামকেষ্ট?—তুই যে অবাক করলি সিন্ধু—ওমা আমার কি হবে!

এমন সোজা ব্যাপারটা কে না বুঝিতে পারে?—

ঝি চলিয়া যাইতেই ক্রমে ক্রমে পাড়ায় কথাটা রটিয়া গেল—ক্রমে উঠিল মা'র কাণে—শেষে একদিন আমাকে ডাকিলেন—হ্যারে রামকেষ্ট—সিন্ধুর কাণ্ড শুনেছিস্!—

পূর্ব্ব-বর্ণিত ব্যাপারটাই শুনিলাম—শুনিয়া হাঁ-না কিছুই না করিয়া চলিয়া আসিলাম;—

মা বলিলেন—এত বড় পাজী ঝি—আমার সোনার ছেলের নামে—

কি করিয়া দাদার কাণে উঠিয়াছিল—দাদা বলিল—আসুক সে বেটী একবার—দেখে নেব তা'র ঘাড়ে ক'টা মাথা।……

মা'র 'সোনার ছেলে' ঘরে বসিয়া শুনিল।

বাড়ীর ভেতরকার ছোট ছোট কাজ ঝি'র দ্বারা হইলেই সুবিধা হয়।

আর একটা ঝি আসিল।—সঙ্গে আনিল একটা দেড় বছরের ছেলে!

এবারকার ঝি'র নাম—নন্দ'র মা।

মা বলিলেন—হ্যাঁ নন্দ'র মা,—খোকার বাপ কতদিন হ'ল নেই?

ঝি'র চোখে ধারা বহিল—আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ঝি বলিল—দুখের কথা বলব কি মা—সবই ছিল—জানতেও পারিনি কপাল ভাঙবে—সন্ধ্যেবেলা কাজ করে' এসে বললে শরীরটা কি রকম ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে—একটু চা কর ত—ওমা—

চোখের জল আবার ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া বলিল—ওমা চা' করে' এনে দেখি—গা হাত পা ঠাণ্ডা—সব শেষ—আমার কপাল ভাঙলো—

খানিকক্ষণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ—তার পর আবার সুরু হইল—তা' আমার কিসের অভাব মা—সব ছিল পা'য়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারতুম মা—বসে' খেতে পারতুম—দেওররা সব ফাঁকি দিয়ে নিলে—আমি মেয়েমানুষ কি বুঝি—

নন্দর মা'র বয়স বাইশ কি তেইশ···একটু রোগা—

ছেলেটি ভাল হাঁটিতে পারে না—নন্দর মা' দেখি দুপুর বেলা তাহাকে লইয়া—হাঁটি হাঁটি পা-পা—সুরু করিয়া দিয়াছে···

ছোট খুকীর খেলনা ঝুমঝুমীগুলা দেখি দিন দিন সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছে;—একদিন স্পষ্ট বলিলাম—

হ্যাঁগা নন্দর মা, এ রকম করলে তো তোমাকে আর রাখা যায় না—ছোট খুকীর খেলনাগুলো নন্দর ঘরে যে জমা হচ্ছে—সে তো আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই!

ওগুলো পয়সা দিয়ে কিনতে হয়—একান্তই নন্দ যদি বায়না ধরে···চাইলেই পারো···চুরী করো কেন?

মা ভাঁড়ার-ঘরে ছিলেন;—নন্দর মা' তাঁ'হাকে শুনাইয়া বলিল—ওমা এও কপালে ছিল মা—শেষকালে চোর বলে' অপবাদ হোল—ওগো কেন তুমি আমায় ফেলে গেলে? কেন আমার এই হাড়ির হাল হোল গো?—ওগো তুমি ওপর থেকে সব ত' দেখতে পাচ্ছ গো।—ওগো আমার আর কেউ নেই যে গো

পোঁ-কান্না সুরু হইল—দেখিয়াছি নন্দর মা'কে একটু বকিলেই এই রকম ছিঁচকাদুনী সুরু করিয়া দেয়;—

মা কান্না শুনিয়া বাহিরে আসিয়া আমাকেই ধমক দিলেন—তুই বা রামকেষ্ট বলতে যাস্ কেন? কতই বা দাম খেলনাগুলোর—নিলেই বা—ছোট ছেলে বই ত নয়—অবেলায় এই অমঙ্গুলে কান্না শুন্‌তে হোল তো?···

চুপ করিলাম;—

আর একদিন!···

খাইতে বসিয়াছি;···দুধ নয় ত চুনগোলা জল যেন!

মা'কে বলিলাম—বেশী দাম দিয়ে খাঁটি দুধ কেনা হয়—অথচ এত জল কেন? এর চাইতে এক গ্লাস খাঁটি জল খাওয়া ভাল।

মা সাদাসিধা মানুষ; বলিলেন—কি জানি বাপু—কে আর জল মিশোবে—নন্দ'র মা'ই তো নিজে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে দুইয়ে নিয়ে আসে—তা কি করে' গয়লারা জল মেশাবে!—

সে একটা কথা বটে!—কিন্তু—একটা সন্দেহ হইল!—

নন্দ'র মা দোকানে খাবার আনিতে গিয়াছিল;—মা'কে বলিলাম—নন্দ'র মা নিজে ছেলের জন্যে চুরী করে না ত?

—কি যে বলিস্,—মা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।—

বচন সিংকে ডাকিয়া নন্দ'র মা'র ঘরটা একবার দেখিয়া আসিতে পাঠাইলাম।—

মা' ত' হতভম্ব!···বচন সিং আসিল হাতে লইয়া এক বাটী ভর্ত্তি খাঁটি দুধ!—বলিল—তাকের উপর লুকান ছিল।

মা'কে বলিলাম—দেখলে তো!······

মা বলিলেন—থাক্ গে বাবা—নন্দ'র মা'কে আর কিছু বলিস্‌নে—আহা ছোট ছেলে—দুধ না হ'লে বাঁচ্‌বে কেন?···

সেইদিন হইতে ব্যবস্থা হইল নন্দ'র মা'র বদলে বচন সিং নিজে গিয়া দুধ লইয়া আসিবে।

এমন যে হইবে আশা করি নাই।

একদিন ভর্ সন্ধ্যাবেলা সিন্ধু আসিয়া হাজির—কোলে ছয়মাসের একটি সন্তান;······

সিন্ধুর চেহারা দেখিয়া ভয় পায়;···চোপছুটি ঢুকিয়া গিয়া একেবারে অস্তিত্ব লোপ পাইবার জোগাড়;···চুলগুলা খসখসে হইয়া জট্ বাধিয়া গিয়াছে—নাকটা যেন একটি চণ্ডালের লাঠির মত 'সব শেষ'—এই কথাটাই প্রকাশ করিতেছে!

তবু রাগ হইল—হইবারই কথা!

যাইবার সময় যে কাণ্ড করিয়া গিয়াছে;······কিন্তু উপায় ছিল না বলিয়া শেষকালে কি আমার নামেই বদনাম রটাইতে হয়?

দাদা খবর পাইয়া একটি লাঠি দিয়া মারিতে উদ্যত হইয়া বলিল—বেরো হারামজাদী—বেরো!—এখুনি বেরো!

মা বাহিরে চীৎকার শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন।

বকিলেন—ও কি কর্চ্ছিসরে নিধিরাম—বাড়ীতে এসে আশ্রয় চাইছে—তুই সন্ধ্যেবেলা তাড়িয়ে দিচ্ছিস্—ওতে যে অকল্যাণ হয়!—না না মারিস নি—আহা—কি চেহারা হয়েছে দেখছিস্ না—অমন একটু আধটু দোষ সকলেই করে—নে নে—যা এখান থেকে—বচন যা,' এর একটা ঘর দেখিয়ে দে—কোথাও জায়গা পায়নি—শেষকালে এখানেই আসতে হয়েছে—যা' সিন্ধু বচনের সঙ্গে যা'!······

মা'র কল্যাণে সব শান্ত হইল;···সিন্ধু আবার আমাদেরই বাড়ীতে আশ্রয় পাইল···মা'র বিরুদ্ধে এতটুকু উচ্চবাচ্য করিবার সাহস কাহারো নাই।

নন্দর মা' দেখি সিন্ধুকে দেখিয়া গজ গজ করিতেছে;—বলে—হাঁসপাতালে বিইয়েছে—হাঁসপাতালেই ফেলে দিয়ে আসতে পারেনি?—কোন্ মুখ নিয়ে আবার এখানে এনেছে—মরণ আর কি!···ঘেন্নার কথা···বিধবা হ'য়ে মুখে আগুন—অমন···

ঘরে বসিয়া সমস্ত শুনিতে পাই।

বাগানের পথে সিন্ধুর ঘর।

মাঝে মাঝে অকারণে চোক পড়িয়া যায়।

দেখি প্রায়ই ছোট ছেলেটিকে কোলের কাছে করিয়া শুইয়া আছে! বাহিরে কমই আসে—জীবনের পথে যেন ওইটুকুই সম্বল—হারাইয়া গেলেই বুঝি সব অন্ধকার!

মনে মনে ভাবি কলঙ্কের ওই প্রতিদানটিকে বহিয়া যে লজ্জা সঙ্কোচের সমস্ত আড়ালকে পার হইয়া আসিয়াছে—পাথেয় স্বরূপ তাহার কি মিলিল?

পৃথিবীর এই পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে কি যেন মণি কুড়াইয়া পাইয়াছে—আগলাইতেও ব্যস্ত—নিজের সমস্ত অপবাদ ও অপমানের বিনিময়েও!

ওর ওই ঘরের দিকে চাহিয়া অনেক কিছু চিন্তা করি।

মানুষ পঙ্কের গ্লানিতে কি কমল ফুটায়! অসুন্দরের পূজায় অজ্ঞাতে কি চমৎকার সুন্দরের সৃষ্টি করে।—কুৎসা ও লজ্জাকর কলহবিবাদের মাঝে কেমন লক্ষ্মীর চরণ-চিহ্ন পড়ে।

করযোড়ে একবার মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া লই!

শুনিলাম সিন্ধুর ছেলেটির অসুখ।

মা দু'বেলা গিয়া দেখিয়া আসেন—ঔষধপত্রাদির কোনও রকম অসুবিধা হয় না বুঝিতে পারিলাম।—ডাক্তারও না-কি একদিন আসিয়া দেখিয়া গেছে!

নন্দর মা গজ গজ করিয়া ওঠে—বলে—আবাগী মরতে আর জায়গা পেলে না—এখানে এল জ্বালাতন করতে।

হিংসা হবারই কথা—ওর ছেলেটি দুধ পায়না—আর সিন্ধুর ছেলের জন্য ডাক্তার!—সিন্ধু কখনও ডাক্তার দেখেছে!—

তিন দিন পরে মা বলিলেন—ছেলেটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

দেখিতে গেলাম।

ঘরটির ক্লিষ্ট আবহাওয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেয়। ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর ছায়া যেন চোকের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।—সুন্দরের প্রাণ কলঙ্কে হাঁকাইতে থাকে;

বাহিরে আসিতেই প্রাণ বাঁচিল;—ভাবিলাম কাল প্রভাতেই কিছু সুব্যবস্থা করিব।

হাজার হোক গরীব। আমরাও মানুষ!

ঘুম ভাঙিতেই নন্দর মা'র কান্না শুনিতে পাই।

ব্যাপার কি!—বাহিরে আসিয়া সব শুনিতেই ধারণা আরও সাদা হইয়া গেল।

নন্দর মা সকালে নন্দকে খুঁজিয়া পাইতেছে না—আর ওদিকে সিন্ধু মৃত ছেলেটি ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

সিন্ধুই যে নন্দকে লইয়া পলাইয়াছে—এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই!—

পৃথিবীর রহস্য যেন আরও স্পষ্ট হইল আমার কাছে।...

তিন দিন পরে নন্দ'র মা মা'র কাছে নিবেদন করিল—আর মা, যা'র জন্যে পরের বাড়ী খাটা সেই যখন নেই—তখন আমার আর কাজ করে' লাভ কী?...আমাকে বিদেয় দাও মা—নিজের পেটটা কোনও রকমে চালিয়ে নেবই!—

নন্দ'র মা' চলিয়া গেল।

পরদিন দেখা গেল বাড়ীর উড়ে চাকরটিও অন্তর্ধান হইয়াছে।

যায়—ক্ষতি নাই—পয়সা দিলে আকাশে ওড়া যায়—আর চাকর পাওয়া যাইবে না?

ভালই হইল—আপদ গেল।

মা বলিলেন—রামকেষ্ট, এবার বুড়ী ঝি রাখব—ও-সব ঝঞ্ঝাট ভাল নয়। ওদের গতিক খারাপ।

এক বুড়ী ঝি আসিল এবার;—

সিন্ধুও নয় নন্দ'র মাও নয়—এবার যমুনা!

তা' নামে কি আসে যায়!

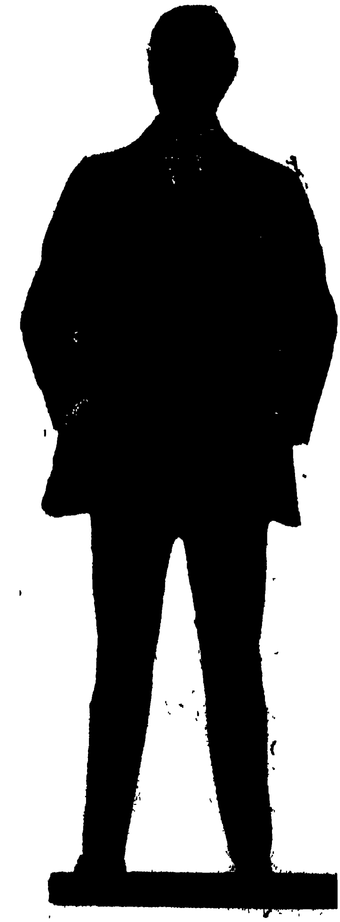
মা বলিলেন—বাঁচলুম!

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রের শিল্পকলার দিক)

পূর্ব্বেই বলেছি যে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বিভাগে চলচ্চিত্রের যে বিপুল উন্নতি সাধিত হ'য়েছে, শিল্প-কলার দিক দিয়ে এখনও তার সে পরিমাণ ঔৎকর্ষলাভ ঘটেনি। তার প্রধান কারণ প্রথমতঃ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা অনেকেই টাকা-আনা-পাই যতটা বোঝেন,—চারু কারু সম্বন্ধে তাঁরা ঠিক সেই পরিমাণেই অবোধ! দ্বিতীয় কারণ—ক্যামেরার চোখে অবিকল সত্য বস্তুই নির্ব্বিকারভাবে প্রতিফলিত হয়, এই ভুল ধারণাবশতঃ এতকাল পর্য্যন্ত রঙীন তুলি নিয়ে শিল্পীদের স্বপ্ন-কল্পনার মায়া তার পিছনে এসে দাঁড়ায়নি। কাজেই তখন গল্পের ছবিও উঠ্‌ছিল ঠিক এখনকার 'টপিক্যাল বাজেট্' বা চল্‌তি খবরের মতই! দেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনার, ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত নির্ভুল নথী-সংগ্রাহক হিসাবে, শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞান প্রচারের দিক দিয়ে—এমন কি, ক্যামেরার বিজ্ঞানের' নব নব উদ্ভাবন সম্ভাবনার উপায় নিহিত আছে বলে ধ'রে নিলেও ক্যামেরার শক্তি যদি আজ কেবল 'চল্‌তি খবরের' চলচ্ছবি শ্রেণীর-সজীব চিত্র তোলাতেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তা হ'লে আমাদের দেশের সনাতন গরুর গাড়ীর বৈদিক চাকার মতো ক্যামেরা আজও তার আদিম অবস্থাতেই পড়ে থাকতো। কিন্তু সে তার বহুবিধ শক্তির পরিচয় দিয়ে আজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।



জ্যাক্ ডেম্পসি (Jack Dempsey)
(বিখ্যাত বক্সিং খেলোয়াড়)

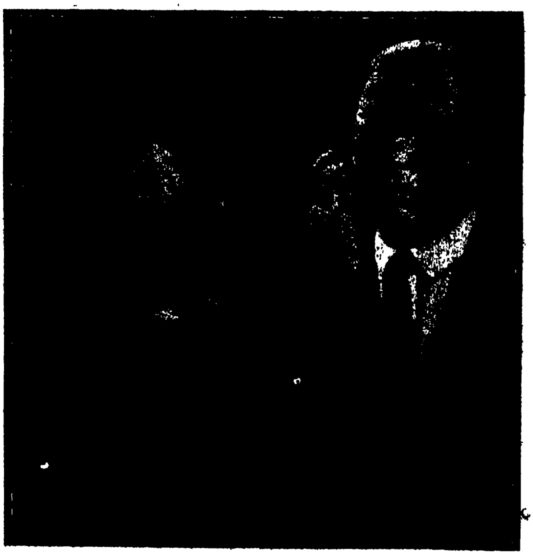


বিড়াল-তপস্বী (Tartuff)
(নায়িকা 'এলমায়ারে'র ভূমিকায় প্রসিদ্ধা জার্ম্মান্ অভিনেত্রী শ্রীমতী লিল্ ডাগোভার্ (Lil Dagover.)

সিনেমা দেখতে গিয়ে প্রধান ছবি সুরু হবার আগে এখনো "চলতি খবরে" দেশ-

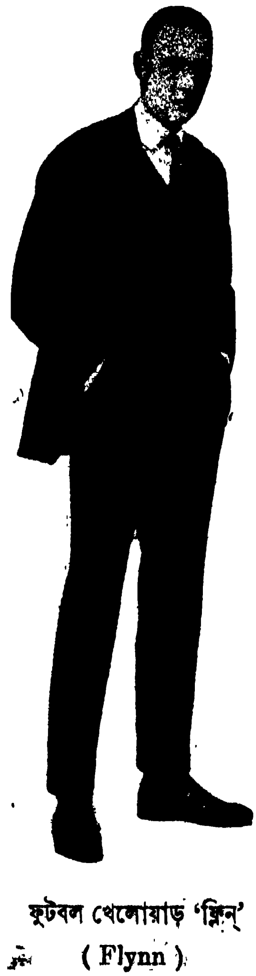


এলিনোর গ্লিন্ (Elinor Glyn)
(প্রসিদ্ধা উপন্যাস লেখিকা। উপস্থিত আমেরিকান চিত্র-নাট্যের গল্প রচয়িত্রী)



জ্যাক্ ডেম্প্সি
(চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য রূপসজ্জা ক'রছেন)

বিদেশের সচিত্র সমাচারটুকু অনেকেরই ভালো লাগে। কিন্তু, সে ভালো লাগা তাদের ছবির জন্য নয়, খবরেরই জন্য! ঠিক যে আগ্রহে লোকে সকালে উঠেই নিবিষ্ট মনে সংবাদপত্র পড়ে, এও তাই। কিন্তু, একটা কোনো গল্প বা রূপকথার যদি ঠিক ঐ ভাবে ছবি তুলে দেখানো হয় তাহ'লে —সেটা না হবে ছবি—না হবে রূপকথা! কারণ 'চলতি খবরের' ছবিতে যখন আমরা দেখি যে,—বড়লাট দিল্লীতে একটি নূতন হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন ক'রছেন, কিম্বা বিলাতে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ব্রাইটনে সমুদ্র স্নান ক'রছেন, তখন বড়লাট বা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের মনের ভাব কি রকম, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়না, আমাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে কেবল তাঁদের কাজটুকু! কিন্তু, ছবিতে রূপকথা দেখবার সময় পাতালপুরীর রাজকন্যাকে দেখে উদয়গড়ের যুবরাজের মনে কী ভাবের উদয় হ'চ্ছে, সেইটে জানবার আগ্রহই হ'য়ে ওঠে আমাদের প্রধান আকর্ষণ। রাজকুমারীর সঙ্গে কুমারের চোখের দেখাটুকুর ছবিই শুধু আমাদের নয়ন-মনকে তৃপ্ত ক'রতে পারেনা! কাজেই, চলচ্চিত্রের আদিম যুগে যখন ক্যামেরায় গল্পের ছবি নেওয়া হ'তো—মাত্র কতকগুলি ঘটনার পরের পর ছবি তুলে—অবিকল 'চলতি খবরের' ধরণে, তখন সে ছবি দর্শকদের প্রাণকে স্পর্শ ক'রতে পারতো না, কেবল তাদের—চোখের কৌতূহল কতকটা জাগিয়ে তুলতো মাত্র!

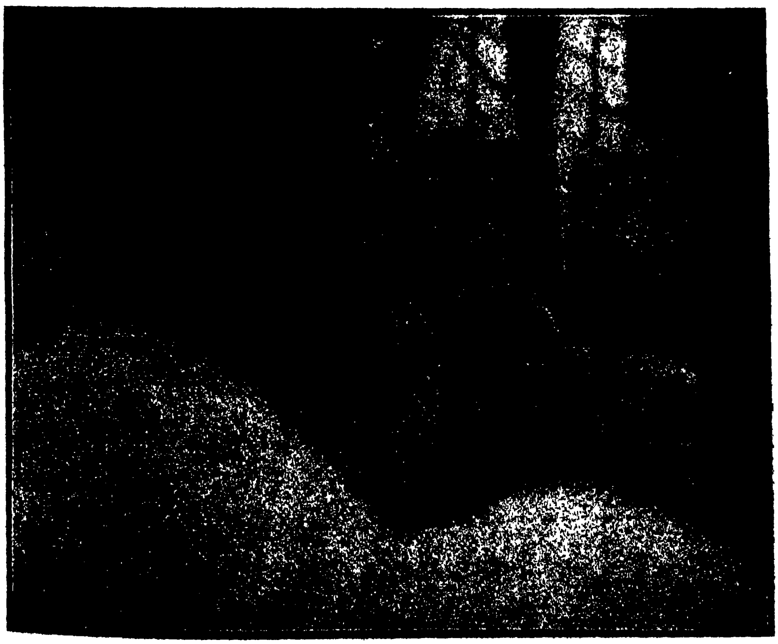


ফুটবল খেলোয়াড় 'ফ্লিন্'
(Flynn)

সেই যে প্রথম দিন থেকেই ভুলপথে এই চলচ্চিত্র-শিল্প তার পা' বাড়িয়েছিল, আজও সেই ভুল পথ ধ'রেই সে চলেছে। অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান্ পরিচালক ব্যতিত আর কেউ ক্যামেরাকে শিল্পীর হাতের ক্রীড়নক ক'রে তুলতে পারেননি। ক্যামেরাকে নিজের বশে না এনে ক্যামেরার বশে থেকে যাঁরা ছবি তোলেন, সে ছবিতে তাঁরা কোনো কাল্পনিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রে কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন না। চলচ্চিত্র যে কেবলমাত্র 'ফটোগ্রাফ্' নয়, সে যে ছবি—এবং, সে যে গল্পের ছবি নয়—ছবিতে গল্প—এই সহজ কথাটা যে ডাইরেক্‌টার্ মনে রাখতে পারেন না, তাঁর তত্ত্বাবধানে তোলা ছবিতে পরিচালকের কৃতিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্যামেরাকে যিনি ইচ্ছামত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দূরে নিকটে ও কোণাকোণি ক'রে রেখে, ছবি তোলার সময় ও গতির হ্রাস বৃদ্ধি ক'রে এবং পটচ্ছেদ প্রণালী (Ma·king) ও পটবিপর্য্যয় (Transposition) প্রথা প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে চলচ্চিত্রকে ছবির পর্য্যায়ে টেনে তুলতে পারেন এবং সেই ছবির দ্বারা গল্পটিকে সজীব ও প্রত্যক্ষ ক'রে তুলতে পারেন, তিনিই সুদক্ষ পরিচালক ব'লে খ্যাতি-লাভ ক'রতে পারেন।



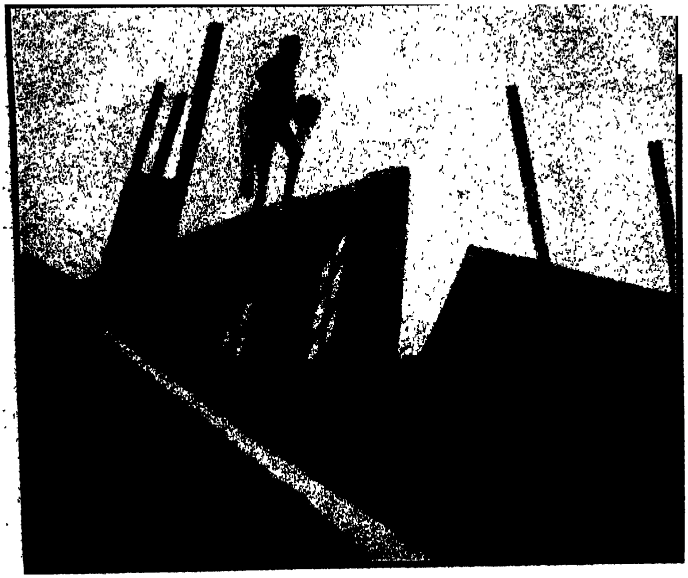
দি ক্যাবিনেট্ অফ্ ডক্টর্-ক্যালিগারি
(সিজারের ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা কন্‌রাদ্ ভীট্ (Conrad Veidt.)



দি ক্যাবিনেট্ অফ্ ডক্টর্ ক্যালিগারি
('জেনের' ভূমিকায় লিল্‌ডাগোভার। সীজার জেনের মৃতদেহ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে)

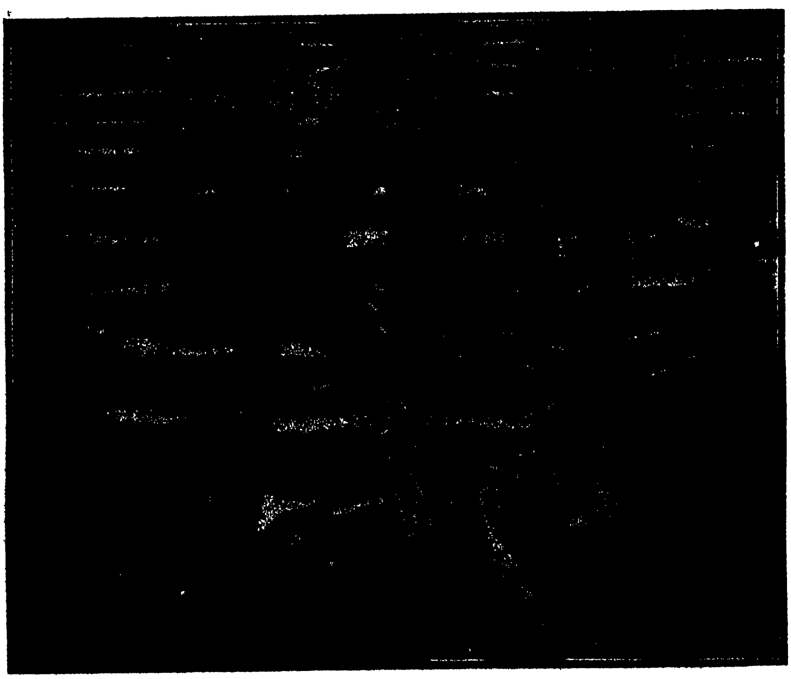
কোনো বস্তু বা ব্যক্তির অবিকল প্রতিকৃতি অর্থাৎ তার আকৃতির প্রত্যেক অংশ ও তার পরিমাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছবিতে দেখ্‌তে পেলেই আসল জিনিসটি বা ব্যক্তিটিকে দেখার অনুরূপ আনন্দ বা অনুভূতি জাগেনা। কোনো বস্তু বা ব্যক্তির পরিবর্ত্তে যদি আমরা কেবলমাত্র তার ছবিখানি পাই তাতে আমরা খুশী হ'তে পারিনি। টাকার

পরিবর্ত্তে যেমন টাকার ছবি পেলে কারুর মন ওঠেনা, এও অনেকটা সেই রকম। যে পরিচালকের শিল্প-প্রতিভা আপন কল্পনা-শক্তির সাহায্যে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির



দি ক্যাবিনেট্ অফ্ ডক্টর্ ক্যালিগারি
(জেনের মৃতদেহ নিয়ে সীজারের পলায়নের দৃশ্য)

প্রতিরূপ সৃষ্টি করে—যেটা তার নিজের অনুভূতির ছায়া বা তার অন্তর্দৃষ্টির অবলোকিত কিম্বা মানস-গোচর রূপের অভিব্যক্তি —সেইটাই যথার্থ 'আর্ট' বা কলা-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শিল্পের মর্য্যাদা লাভ ক'রতে পারে। "একজনের ছবি উঠেছে ঠিক যেন তার অবিকল জীবন্ত প্রতিকৃতি" এ কথা ব'ললে—সে ক্যামেরাটি যে খুব ভালো এবং নির্দ্দোষ এটা প্রমাণ হ'তে পারে বটে, কিন্তু, শিল্পীর বাহাদুরী বা গুণপনার পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না তার মধ্যে। শিল্পীর কৃতিত্ব সেইখানে—যেখানে শিল্পীর চোখে সে তাকে যেমনটি



ব্যাট্‌ল্ শিপ—'পোটেমকিন্'—(সোভিয়েট চলচ্চিত্র।)

বা তার যে রূপটি দেখেছে—তার যেটুকু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা প্রধান পরিচয় শিল্পীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—সেইটুকু বিশেষ ক'রে যে ছবিতে সে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে—সেইখানেই শিল্পীর যথার্থ নৈপুণ্য, এবং দর্শকের মনেও সেই ছবিই একটা আনন্দানুভূতির সাড়া জাগিয়ে তোলে! নইলে, তাদের প্রতিদিনের সহজ দেখা মানুষটিকে ছবিতে হুবহু তেমনি দেখলে তাদের দৃষ্টি বেশীক্ষণ সেদিকে আবদ্ধ থাকে না! অথচ,—দর্শকের দৃষ্টিকে ছবির উপর আবদ্ধ ক'রে রাখাই হ'চ্ছে এই শিল্পের ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভের একটা প্রধান উপায়!

শিল্পীর চোখের বিশেষ-দৃষ্টি আমাদের সহজ-দেখা কোনো মানুষের যে বিশেষ লক্ষ্য ক'রে রূপটি ছবির পটে তাকে ফুটিয়ে তোলে, আমরা সে আলেক্ষ দেখে যদি মুগ্ধ নাও হই, অন্তত, অবাক্ বিস্ময়ে সেদিক পানে চেয়ে দেখে ভাববো যে,—এ মানুষ-টার' এ [illegible] মূর্ত্তি .ববে. হেন [illegible] আমাদেরও

চোখে একটিবার পড়েছিল! সে কবে—কে জানে? ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু, দেখেছিলুম যে নিশ্চয়,—তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই, কেন না একে ত' একটুও আমার অপরিচিত ঠেকছেনা! আবার, অনেক সময় এমনও হয়—যে, শিল্পীর দেখা সেই মানুষের চা রি ত্রি ক বৈশিষ্ট্যটুকু সর্ব্বপ্রথম দর্শকের চোখে ধরা পড়ে শিল্পীর আঁকা সেই ছবি দেখেই! আবার, হয় ত' আগে অনেকবার আমরা সেই মানুষটিকে দেখেছি, দূর থেকে দেখলেই তাকে চিনতে পারি, তার চলার ভঙ্গী, তার আকৃতির গঠন আমাদের খুব চেনা, কিন্তু, তার মুখের দিকে স্থির হ'য়ে অনেকক্ষণ ভালো করে চেয়ে দেখবার সুযোগ আমাদের কখনো



ব্যাটল্‌শিপ—'পোটেমকিন্'
(নৌ সেনা নায়কদের জলমগ্ন হওয়ার দৃশ্য)

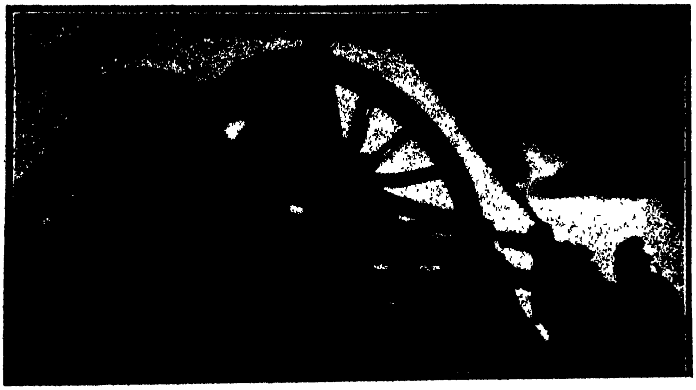
হয়নি, কাজেই তার মুখের ঠিক স্বরূপ চেহারাও আমরা ভালো চিনিনা,—এটা বেশ বুঝতে পারি যখন তাকে আমরা—হঠাৎ একদিন একেবারে খুব কাছে পেয়ে তার মুখের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখবার অবসর পাই!

এই সুযোগটা ফিল্মে খুব' বেশী রকম কাজে লাগে, যখন 'Close-up' ছবি নেওয়া হয়, অর্থাৎ ক্যামেরা খুব কাছে নিয়ে গিয়ে কোনো



ব্যাটল্‌শিপ—'পোটেমকিন্'
(ওডেসার (Odessa) সোপান শ্রেণীর উপর তোলা যুদ্ধের একটি বিরাট দৃশ্য)

বস্তু বা ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষত্বটুকু খুব বড়ো করে ছবিতে তুলে দেখানো হয়। এই উপায়ের দ্বারা ছবির নায়ক নায়িকার সঙ্গে দর্শকদের যেন খুব একটা নৈকট সাযুজ্য স্থাপিত হয়, এবং, এই নৈকট সাযুজ্যর ফলে যে বস্তু বা ব্যক্তি ছিল ইতিপূর্ব্বে আমাদের চোখে



"অক্টোবর"—(সোভিয়েট চলচ্চিত্র। "যে দশদিন পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল!" এই নামে ছবিখানি আমেরিকায় দেখানো হয়েছিল)

সাধারণ ও বৈচিত্র্যহীন—তারই মধ্যে আমরা দেখতে পাই—যেন কী একটা অনাবিষ্কৃত রহস্য—একটা নূতনতর রূপ! চলচ্চিত্র শিল্পীদের এ কথাও বরাবর মনে রাখা উচিত যে—ছবি—কোনো বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের হুবহু প্রতিকৃতি না হ'য়েও অবিকল তার প্রতিরূপ হ'তে পারে! ফটোগ্রাফ এবং আর্টে এইখানেই প্রভেদ!

কোনো ফিল্‌ম দেখে তার সমালোচনা করবার সময় যদি কেউ বলেন যে—'অমুক ছবিখানি আগাগোড়া অতি সুন্দর হ'য়েছে, নির্দ্দোষ হয়েছে বা নিখুঁত হয়েছে, তাহ'লে তিনি অত্যন্ত ভুল বলবেন, কারণ কোনো ফিল্‌মই সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত আগাগোড়া নিখুঁত বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আজ পর্য্যন্ত হয়নি—এবং কবে যে হবে তা'ও সঠিক বলা যায় না। তবে, অমুক ফিল্‌মখানি এ বৎসরের সব ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এ কথা বলা চলে, কারণ, যে ছবির মধ্যে পরিচালকের শিল্প-প্রতিভা যতো বেশী দিক দিয়ে আত্মপ্রাশ করে, সে ছবি তত বেশী উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে! কাজেই, ছবির প্রধান কর্ণধার হ'চ্ছেন—যিনি সুপটু পরিচালক (Director)। তিনি—ক্যামেরাম্যান আলোকশিল্পী এবং অভিনেতৃবর্গের ভিতর দিয়ে নাট্যকারের স্বপ্নকে আপন কল্পনার রংয়ে ফুটিয়ে তোলেন ছবির পর ছবি সাজিয়ে তোলার নৈপুণ্যে! কবি ও সাহিত্যিক যে কাহিনী রচনা করে সুললিত ভাষায়, চলচ্চিত্র-শিল্পী সজীব ক'রে তোলে সে কাহিনীকে রূপের অপরূপ ঐশ্বর্য্যে।

১৯০৩ সালে প্রথম যে গল্পের চলচ্চিত্র দেখানো হ'ল "The Great Train Robbery" (ভীষণ রেল-ডাকাতী) সেটা দর্শকদের এত বেশী ভালো লেগেছিল যে সেদিন থেকে চলচ্চিত্রে রূপকথা গল্প উপন্যাস নাটক এমন কি কাব্য ও গীতিকবিতা পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হ'তে সুরু হয়েছে। সেদিনের পরিচালকদের আদর্শ ছিল রঙ্গমঞ্চ। নাট্যশালার অভিনয়কে তাঁরা ছবির পর্দ্দার উপর টেনে নিয়ে এসে যে ভুল করেছিলেন সে ভুল আজও সম্পূর্ণরূপে ভাঙেনি। ১৯০৮ সালে Comedie



"অক্টোবর"—(সোভিয়েট চলচ্চিত্রে 'জারের' প্রাসাদ দৃশ্য)

Francaiseএর প্রসিদ্ধ অভিনেতৃবর্গকে 'Tartuff,' 'Phedre' প্রভৃতি কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলী ক্যামেরার সম্মুখে অভিনয় করবার জন্য নিযুক্ত করা হ'য়েছিল। কারণ সে যুগে চলচ্চিত্র

ব্যবসায়ীদের ধারণা ছিল যে,—প্রসিদ্ধ নাটক ও বিখ্যাত নট নটীর সমাবেশে রঙ্গালয়ের মতো চলচ্চিত্রেও দর্শকদের আকৃষ্ট হ'তেই হবে। যশস্বী পরিচালক এডলফ্ জুকর (Adolf Zukor) এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েই 'ফেমাস্ প্লেয়ার্স' নাম দিয়ে একটি চলচ্চিত্র-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। এই কোম্পানী সাফল্য-মণ্ডিত হ'য়ে উঠে এখন জগতের বৃহত্তম চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর নাম হয়েছে এখন "The Famous Players-Lasky film Corporotion."

Comedie Francaiseএর অভিনেতৃদের নিয়ে চলচ্চিত্রে নামানোর দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত য়ুরোপ ও আমেরিকায় এই প্রথাই চলে আসছে। যে নাটক যে প্রহসন যে গীতিনাট্য রঙ্গালয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন ক'রে সর্ব্বজন প্রিয় হ'য়ে উঠছে, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা অমনি তৎপর হ'য়ে বহু মূল্য দিয়ে তার 'ছায়াছবি' তোলবার অধিকার ক্রয় করে নিচ্ছেন। যে উপন্যাসখানি যখনি বিশ্বসাহিত্যে সমাদর লাভ ক'রছে, অমনি তৎক্ষণাৎ সেখানি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা হ'চ্ছে; তা' সে উপন্যাস বা গল্প ছবিতে তোলবার ও পর্দ্দায় ফেলে দেখাবার উপযোগী হোক্ বা নাই হোক্। রঙ্গমঞ্চে যে নটনটী একটু খ্যাতিলাভ ক'রছে, তা সে অভিনয়েই হোক্ বা নৃত্যেই হোক্ বা সঙ্গীতেই হোক্—অমনি তাকে চতুর্গুণ পারিশ্রমিক দিয়ে চলচ্চিত্রের 'চিত্র গড়ে' (Studio) টেনে নিয়ে আসা হ'চ্ছে। বিশেষ ক'রে আজকালকার সবাক্ ছবির 'চিত্র গড়ে,' তাদেরই একাধিপত্য চ'লেছে! এমন কি নাট্যশালার বাইরেও যারা অন্যান্য নানা বিভাগে সর্ব্বসাধারণে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বিখ্যাত হ'য়ে প'ড়ছেন, চলচ্চিত্রওয়ালারা তাদেরও ছবির মধ্যে টেনে নিয়ে আসবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারছে না। তাদের মধ্যে শ্রীমতী এলিনোর গ্লিন্ (Elinor Glyn) এমী ম্যাক্ফার্সন্ও (Aimee Macpherson) আছেন, আবার বক্সিংয়ের ওস্তাদ্ জ্যাক্ ডেম্প্সী (Jack Dempsey) ও জর্জ্জ কারপেন্টিয়ারও (George Carpentier) আছেন! এমন কি ফুটবল খেলোয়াড়্ 'ফ্লিন্' (Flynn) এবং ঘোড়-দৌড়ের শ্রেষ্ঠ সোওয়ার্ ষ্টীভ্ ডনোঘুও (Steve Donoghue) বাদ যাচ্ছেন না! সে যুগে রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলিই হ'য়ে উঠেছিল চলচ্চিত্রের' প্রধান সম্বল! অভিনয়-ভঙ্গীও ছিল হুবহু নাট্যশালার অনুকরণে, কারণ নাটামঞ্চ থেকেই চলচ্চিত্রের জন্য অভিনেতা অভিনেত্রী বেছে নেওয়া হ'ত তখন, ঠিক যেমন আমাদের এখানেও চলেছে এখনো! যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেনি চলচ্চিত্রে তেমন লোককে নেওয়া হ'ত না! Acting বা অভিনয় কৌশল ভালোরকম জানা থাকলে তবেই সে হতে পারতো তখন 'ম্যুভিং-ষ্টার্'!—অর্থাৎ, চলচ্চিত্রাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র!

আমেরিকা এই 'ষ্টার' গুলিকে আগে অনেক অর্থ দিয়ে নিয়ে যেতো নিজেদের চিত্র গড়ে। আজকাল তাদের সেখানে রীতিমত 'ষ্টারের' 'চাষ' চলেছে! নিত্য নূতন 'ষ্টার' গজিয়ে উঠ্ছে তাদের হোলিউড্ আর লস্ এঞ্জেল্সের বুকে। ক্যামেরার পছন্দসই যে কোনো সুপুরুষ ও সুন্দরী মেয়ে, অর্থাৎ যাদের নাক চোখ মুখ এবং দেহের গঠন ছবিতে বেশ সুন্দর দেখায়—একটু আধটু নাটকীয় হাবভাব—অর্থাৎ 'থিয়েটারী ঢঙ্'ও আছে যাদের চলাফেরার মধ্যে এবং বিশেষ ভাবে যারা তাদের হাসিতে চাহনিতে ও লীলায়িত অঙ্গভঙ্গীতে যৌন-লালসা উদ্দীপিত ক'রে তুলতে পারে—তারাই হ'য়ে উঠ্ছে চলচ্চিত্র-গগনের সুগণ্য গ্রহ-তারা!

সেদিন দর্শক আকর্ষণের জন্য ছবিতে এমন সব আজগুবী গল্প তাঁরা বেছে নিতেন, যাতে ক্যামেরার কারচুপিতে অসম্ভবও সম্ভব ক'রে তোলা যেতো! যেমন প্রকাণ্ড 'এক ষ্টীম রোলার' রাস্তার এক পুলিশ সার্জ্জেণ্ট্‌কে চাপা দিয়ে চলে গেলো, সেই প্রকাণ্ড ষ্টীম রোলারের প্রচণ্ড চাপে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট একেবারে জিবে-গজার মতো চ্যাপ্টা হ'য়ে গেলো—কিন্তু তবুও মোলোনা! চ্যাপ্টা সার্জ্জেণ্ট তার চ্যাপ্টা রুল নিয়ে তখনি ধুলো ঝেড়ে আবার উঠে দাঁড়ালো! কিম্বা, বীর রাজকুমার অসি-চালনার সুকৌশলে ভীষণ দৈত্যকে কেটে টুক্রো টুক্রো করে দিয়ে ঘুমন্ত রাজকুমারীকে দৈত্যপুরী থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেলো, কিন্তু, সেই মায়াবী দৈত্যের ছিন্ন-ভিন্ন দেহাংশ একে একে আবার পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে সেই ভীষণ দৈত্য আবার বেঁচে উঠ্লো এবং প্রতিহিংসা নেবার জন্য রাজপুত্রের পিছু নিলে—! ১৯০০ সালের আগে থেকেই

ক্যামেরার কারচুপির গোড়াপত্তন হ'য়েছিল এই সব ছবিতে, আজও তার বিরাম হয়নি। যেমন (Mickey Mouse Cartoon films) কৌতুকাঙ্কন হিসাবে আজও মুখর চলচ্চিত্রের দর্শকদের পর্য্যন্ত আকৃষ্ট ও মুগ্ধ ক'রছে। কিছুদিন আগে Eisensteinএর রুষগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ছবি October'এ ক্যামেরার এই কারচুপি কাজে লাগানো হয়েছিল। রুষসম্রাট Czarএর গভর্ণমেণ্ট ধ্বংশ হওয়ার প্রতীক্ স্বরূপ তাঁর বিরাট মর্ম্মর-মূর্ত্তি মাটিতে পড়ে গিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো, কিন্তু, তৎপরিবর্ত্তে রুষিয়ায় কার্ণেস্কীর Ka neske অস্থায়ী শাসন-পরিষদ গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভগ্ন মূর্ত্তির প্রত্যেক চূর্ণখণ্ড পরস্পর জোড়া লেগে আবার খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো, যেন কার্ণেস্কীর গভর্ণ-মেণ্টকে উপহাস করবার জন্য! ডগলস্ ফেয়ার ব্যাঙ্ক্‌সের ছবি "The Thief of Bogdad" (বোগ্দাদের চোর) ফিল্মখানিতে এই ক্যামেরার কারচুপি খুব বেশী মাত্রায় দেখানো হয়েছে।

এই ধরণের সব ক্যামেরা-কৌশল দর্শকের মনে একটা বিশেষ কৌতূহল জাগিয়ে তোলে এইজন্য যে, তারা নিশ্চিত জানে যে এটা অসম্ভব, এ রকমটা বস্তুতঃ কখনো হ'তেই পারে না, তবু—সেই ব্যাপারই তাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ ঘটছে দেখে তারা বেশ আমোদ অনুভব করে। মানুষের মনকে এই অবস্থায় নিয়ে এসে অর্থাৎ এমনি ভাবে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে ভোলানো চলচ্চিত্র সৃষ্টি হবার আগে অন্যবিধ প্রমোদ ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ছিল, যেমন ম্যাজিক্—ইন্দ্রজাল—ঈজীপ্সিয়ান ব্ল্যাক-আর্ট প্রভৃতি।

চলচ্চিত্রে দর্শকদের মনকে মাতিয়ে তোলবার আর একটা প্রধান উপায় হ'চ্ছে গতির প্রতিযোগিতা; অর্থাৎ পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবন, ছুটে গিয়ে পলাতককে বন্দী করা বা আততায়ীকে উদ্ধার করা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোথাও গিয়ে পৌছানো, ইত্যাদি! এ সব ব্যাপারে পায়ে হেঁটে ছোটা থেকে সুরু ক'রে ঘোড়ার পিঠে, সাইকেলে, মোটরকারে, মোটর বাইকে, ট্রেনে, ষ্টীমারে, উড়ো জাহাজে, সবরকম যানবাহনেই ছোটাছুটী দেখানো হয়! এই ছোটাছুটীর উত্তেজনা দর্শকদের মনকেও উত্তেজিত করে' তোলে; গল্পের কথা ভুলে গিয়ে দর্শকের মন এই গতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তন্ময় হয়ে ওঠে। কাজেই Scenario বা 'চিত্রনাট্য' লেখকেরা প্রায়ই তাঁদের গল্পে এই সুযোগটুকু নেবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারেন না। এ সব ছবিতে যত রকম সস্তার উত্তেজনা, খেলো বিস্ময় ও নিম্নশ্রেণীর হাস্যরসের অবতারণা করা হ'ত। এ সব ছবিতে না-ছিল 'টেম্পো', না ছিল নট-নটীর উচ্চ অঙ্গের অভিনয়! পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির দিকেও লক্ষ্য ছিলনা; বিশেষ, এমন কি ফিল্ম্ editing অর্থাৎ চিত্রের সম্পাদন কার্য্য, যা' যোগ্য লোকের হাতে ভার পড়লে ছবিখানিকে সকল দিক দিয়ে সুন্দর ক'রে ও নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রতে পারে—তারও বিশেষ কোনো সুব্যবস্থা ছিলনা।

১৯২০ সালে প্রথম একখানি ছবি ও-পারের পর্দ্দার উপর দেখতে পাওয়া গেছলো যা' চলচ্চিত্ররাজ্যের গতানুগতিক পথ ছেড়ে এক নূতন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হ'য়েছিল। সে ছবিতে ছিল কল্পনার ঐশ্বর্য্য, ভাবের মাধুর্য্য ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য! সে ছবি সঙ্গে এনেছিল শিল্প জগতের এক অভিনব সম্পদ, কলা-নৈপুণ্যের এক নবীন পরিচয়, যা গ্রিফিথ্ প্রভৃতি বড় বড় চলচ্চিত্র-পরিচালকেরা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারতোনা! ফিল্মের রাজ্যে গ্রিফিথের দান অবশ্য ছোট নয়; যদি শিল্পের দিক দিয়ে ফিল্ম আজ কিছুমাত্র উন্নতির পথে এগিয়ে থাকে তবে সেটুকুর জন্য তাকে চিরদিন গ্রিফিথের কাছেই ঋণ স্বীকার ক'রতেই হবে, কারণ গ্রিফিথই সেই প্রথম চলচ্চিত্র-পরিচালক যিনি তাঁর নিজের চোখের সঙ্গে ক্যামেরার দৃষ্টিকেও মেলাতে পেরেছিলেন এবং নিজের ধ্যানের ছবিকে রূপায়িত ক'রে তুলতে পেরেছিলেন। 'সাযুজ্য' 'বিলয়' 'ক্রমবিনাশ' ও 'ক্রমবিকাশ' প্রভৃতি কলা-কৌশল চিত্রজগতে তিনিই প্রথম আমদানী ক'রেছিলেন; কিন্তু এ সব সত্ত্বেও গ্রিফিথের কোনো ছবিই শিল্পের দিক দিয়ে সে আভিজাত্য দাবী ক'রতে পারেনা যা ডাঃ রবার্ট হ্বীয়েনের (Dr. Robert wiene) জার্ম্মাণ ফিল্ম্—"The Cabinet of Doctor Caligari" শীর্ষক ছবিখানি পেতে পারে। তারপর পাঁচবৎসর আর কোনো ছবি এর সমকক্ষ হ'তে পারেনি; পাঁচবৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে সোভিয়েট্ ফিল্ম "The Battleship Potemkin" এসে এই ছবিখানির সঙ্গে সমান আসন দাবী ক'রতে পেরেছিল।

বার্লিন থিয়েটারের Decla প্রোডিউসিং কোম্পানীর

পক্ষ থেকে ১৯১৯ সালে ডাঃ হবীয়েনে "The Cabinet of Doctor Caligari" ছবিখানির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় য়ুরোপের শিল্পরাজ্যে কিউবিজম্ (Cubism) 'ত্রিকোণাঙ্কন পদ্ধতি। (Impressionism) 'মুদ্রাঙ্কণ পদ্ধতি (Expressionism) 'ভাবাঙ্কণ পদ্ধতি' প্রভৃতি অতি আধুনিক কলাবিধির প্রচলন সুরু হ'য়েছিল। ১৯১০ সালের মার্চ্চমাসে "The Cabinet of Doc or Caligari) চিত্রখানি শেষ হ'য়ে পর্দ্দার উপর এসে পড়েছিল। Dr. Wiene নিজে তখন Expressionism-এর একান্ত অনুরাগী ছিলেন। চলচ্চিত্র পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলনা। এই ছবিখানি তোলবার সময় তাঁর যে তিনজন সহকারী ছিলেন—Walther Ronrig. Herman Warm ও Walther Reimann তাঁরা তিনজনেই 'কিউবিজ্‌মের' ভক্তশিল্পী। Abstract Art অর্থাৎ নিছক্ শিল্প বা খাঁটি 'কলা সৌন্দর্য্যের' অনুরাগী তাঁরা, কাজেই চলচ্চিত্র পরিচালনে নেমে তাঁরা যে গতানুগতিক পথে না গিয়ে নিজেদের শিল্প-প্রতিভার দ্বারা সচল ছবির একটা নূতন রূপ সৃষ্টি করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক।

ক্যামেরার চক্ষুতে যে কেবল হুবহু বাস্তবের ছায়াটুকুই ধরা পড়ে না, পরিচালকের ইচ্ছামত এই যন্ত্রের চোখও যে স্বপ্ন-ভাবাতুর হ'য়ে উঠতে পারে, চলচ্চিত্রও যে কঠিন বাস্তবের প্রতিরূপ না হ'য়ে শিল্পীর ধ্যানের মূর্ত্তিও পরিগ্রহ করতে পারে, সে যে কল্পনার বস্তু এবং শিল্পীর সৃষ্টি ব'লেও পরিগণিত হ'তে পারে,—আলোকচিত্র হ'লেও তার নাটকীয়তা যে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং জীবনের বাহ্যিক রূপ ছাড়া মানুষের মনস্তত্বের অভিব্যক্তিও যে চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা অসম্ভব নয়, এসব নূতন তত্বের সন্ধান The Cabinet of Doctor Caligari" ছবিখানিই চিত্রজগতে সর্ব্বপ্রথম এনে উপস্থিত ক'রেছিল।

আরও একটু বিশদভাবে এ ছবিখানির সম্বন্ধে আলোচনা ক'রলে বোধ হয় চলচ্চিত্রের শিল্পের দিক ব'লতে কী বোঝায় তা পাঠকদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। "The Cabinet of Dotor Caligari" ছবির চিত্রনাট্য রচনা ক'রেছিলেন—Karl Mayer ও Hans Janowitz দু'জনে মিলে। গল্পটি একটা পাগলা গারদের অধ্যাপককে নিয়ে। গল্পের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং তার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অনন্য সাধারণ। গল্প বলার ভঙ্গীটিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক! এ ফিলম্‌খানির বিশেষত্বই হ'চ্ছে যে, গল্পটি যেমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে থাকে, দর্শকদের আগ্রহও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে! অন্য কোনো বাজে ব্যাপার দিয়ে বা সস্তার উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে দর্শকদের ভোলাবার চেষ্টা করা হয়নি। পরিচালক Dr. Wein এ ছবির পট-ভূমিকায় বাস্তব দৃশ্যপটের আমদানি করেন নি। কেবলমাত্র প্লেন ক্যানভাস্ এবং সাধাসিধে স্ক্রীনের সাহায্য নিয়েছেন। সরঞ্জামের মধ্যে তিনি এমন সব জিনিসপত্র ব্যবহার ক'রেছেন যা পাগলের চোখেই ভালো লাগতে পারে! অর্থাৎ, তিনি তাঁর প্রত্যেক দৃশ্যে একজন পাগলের নিবাসের আব-হাওয়া সৃষ্টি করবার চেষ্টা ক'রেছেন এবং তাতে সম্পূর্ণ সফলকামও হ'য়েছেন। প্রকৃত শিল্পীর মত তিনি আর একটা কৌশলও এতে দেখিয়েছেন—বর্ণ-বৈচিত্র্যের লীলা! বিভিন্ন রংয়ের সমাবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিত্রের সৌন্দর্য্য যে কতখানি বাড়তে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যায় এ ছবিখানির প্রত্যেক দৃশ্যে! তিনি এমনভাবে নাটকীয় ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে দৃশ্যগুলিকে সাজিয়েছেন, যাতে নাটকের ও অভিনয়ের অর্থ সহজেই দর্শকদের হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ঘরের মেঝেয় তিনি মোটামোটা লম্বা লম্বা কালো সাদা লাইন আঁকিয়ে নিয়েছেন, এর ফলে ঘরের যেখানে যে বস্তু বা যে ব্যক্তি থাকবে দর্শকের পরিপূর্ণ দৃষ্টি সেই দিকেই আকৃষ্ট হ'তে বাধ্য হবে। পাগলা-গারদের ভিতরের দেয়াল কেবল কতকগুলি উঁচু লম্বা সরু ও বিবর্ণ প্রাচীর এমনভাবে সাজিয়ে দেখানো হ'য়েছে যাতে সহজেই মনের উপর একটা অসাড় ঔদাসীন্যের ভাব জেগে ওঠে! অফিসের টাউন-ক্লার্কের জন্য তিনি একেবারে ছ'ফুট উঁচু একখানি টুল ব্যবহার ক'রেছেন, এর ফলে সে দৃশ্য দেখলেই বোঝা যাবে যে এই টাউন ক্লার্ক প্রভুটি নিজেকে মস্ত একটা লোক ব'লে মনে করেন; সহজে কেউ তাঁর কাছে এগুতে পারেনা, —এবং তিনিও কারুর দিকে চট্ করে দৃক্‌পাত করেন না! এমনিতর নানান খুঁটিনাটির ভিতর দিয়েও Dr. Wiene ছবিখানির অর্থ ও পাত্রপাত্রীর চরিত্র পরিস্ফুট ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছেন। একেই বলে যথার্থ Artistic Direction! শিল্পের দিক দিয়ে চলচ্চিত্র সেই দিনই যথার্থ উন্নতি লাভ ক'রতে পারবে যেদিন Dr. Wiener মত কলাভিজ্ঞ পরিচালকেরা প্রত্যেক ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে তাঁদের শিল্প-প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার ক'রতে পারবেন।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শৈশবে আত্মীয়-পরিজনের মুখে রাণী ভবানীর নাম শ্রদ্ধা সহকারে উচ্চারিত হইতে শুনিতাম, শৈশবসহচরদিগের সহিত রাণী ভবানীর প্রসঙ্গের আলোচনা করিতাম। আলোচনার বিষয় কি তাহা মনে নাই; কিন্তু রাণী ভবানীর প্রসঙ্গ মাত্রেই শিশু-হৃদয় যে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া যাইত (এখনও যায়) তাহা বেশ মনে আছে।

তাহার পর বিদ্যালয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসে রাণী ভবানীর কীর্ত্তিকাহিনী পাঠ করিলাম। অবশেষে পলাশীর যুদ্ধ-কাব্যে "রাণীর কি মত, শুনি সুপ্তোত্থিত-প্রায়" পাঠ করিয়া সেই শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সেই হইতে রাণী ভবানী ও নাটোর নাম উচ্চারিত হইতে শুনিলেই শৈশব কালের ন্যায় এখনও হৃদয় শ্রদ্ধায় দ্রবীভূত হইয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে রাণী ভবানীর বংশধর মহারাজ রামকৃষ্ণের সাধনার কথা জানিতে পারিলাম। অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বর বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠতম জমিদারবংশীয়, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা মহারাজ রামকৃষ্ণ বিপুল সম্পত্তি তুচ্ছ করিয়া অপার্থিব ধন লাভের জন্য সাধনা করিয়াছিলেন; তাহা রাণী ভবানীরই বংশধরের উপযুক্ত বটে। সেই রাণী ভবানীর অন্যতম বংশধর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের—ইনিও অদ্বিতীয় সাধক—জীবন-কথার আলোচনার সুযোগ পাইয়া আজ "ভারতবর্ষ" (এবং সঙ্গে সঙ্গে এ অধমও) ধন্য হইল।

নাটোর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী করিয়া বিপুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন এই বংশের প্রথম রাজা। তাঁহার পুত্র কালিকাপ্রসাদ এবং রাজা রঘুনন্দনের পুত্র ভবানীপ্রসাদ। কালিকাপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ উভয়েরই মৃত্যু হইলে রামজীবন রামকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাণী ভবানী রামকান্তের পত্নী। তাঁহার পোষ্যপুত্র রাজা রামকৃষ্ণ। রাজ-সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণের দুই পুত্র রাজা বিশ্বনাথ (বড় তরফ) ও রাজা শিবনাথ। বিশ্বনাথের পোষ্যপুত্র গোবিন্দচন্দ্র গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাজা গোবিন্দনাথ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমন কালে পত্নী ব্রজসুন্দরীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সেই পোষ্যপুত্র।

নাটোরের নিকটবর্ত্তী হরিশপুরনিবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীনাথ রায়ের পুত্র ব্রজনাথ দত্তক গৃহীত হইয়া মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ হইয়াছিলেন। দেড় বৎসর বয়স্ক শিশু ব্রজনাথকে রাণী ব্রজসুন্দরী নিজ গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়াছিলেন। জগদিন্দ্রনাথও তাঁহাকে জননী বলিয়াই জানিতেন।

সন ১২৭৫ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার (২৬শে অক্টোবর, ১৮৬৮) নাটোরের এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী হরিশপুর —সংক্ষেপে হরিপুরে—দরিদ্র কিন্তু সৎকুলজাত শ্রীনাথ রায়ের ঔরসে ব্রজনাথের জন্ম হয়। আঠারো মাস বয়সে দত্তক গৃহীত হইয়া তিনি রাজধানী নাটোরে আনীত হইলেন। সেই দিন হইতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্রজনাথ হইলেন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। নাটোর রাজবংশের রাজোপাধি বাদশাহের প্রদত্ত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম দিল্লী দরবারে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের মহারাজা উপাধির অনুমোদন করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নাটোরের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলী নামক স্থানে ক্যাম্পে একটি দরবার করিয়া মহারাজকে উপাধির সনন্দ ও খেলাৎ প্রদান করা হয়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জগদিন্দ্রনাথ শিক্ষালাভার্থ রাজসাহীতে আগমন করিয়া রাজসাহী কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। ঐ স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গৃহশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ স্বীয় বংশ, আভিজাত্য ও পদমর্য্যাদার উপযোগী সুশিক্ষাও লাভ করেন। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী লিখিয়াছেন, তিনি যখন একবার তাঁহার জননীর সহিত মহারাজার কলিকাতার

বাড়ীতে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অনুরূপা দেবীর জননীকে প্রণাম করিতে আসেন। সেই সময়ে মহারাজ অনুরূপা দেবীর জননীকে বলিয়াছিলেন, "মা, আমি আপনার শ্বশুরের (স্বর্গীয় ভূদেব বাবুর) একজন মস্ত ভক্ত।" এই ভক্তির কারণ তিনি এইরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন যে, মহারাজের বয়স যখন আট বৎসর তখন ভূদেব বাবু একবার নাটোরে আসিয়াছিলেন। মহারাণী ব্রজসুন্দরী ভূদেব বাবুকে রাজবাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন। আহারাদির পর তিনি ভূদেব বাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে কুমারের পড়াশুনা ভাল হচ্ছে না। আপনি যদি দয়া করে একবার তাকে পরীক্ষা করে দেখেন ও কি ভাবে শিক্ষা দিলে মানুষ হতে পারে বলে দেন, তবে বড়ই উপকৃত হই। পরীক্ষান্তে ভূদেব বাবু কুমারকে কাছে নিয়ে খুব আদর করে বলেছিলেন, "মস্ত বড় বংশের সম্মানরক্ষা করতে হবে তোমায়। রাণী ভবানী, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যে রাজবংশকে চরিত্র-মাহাত্ম্যে, দান ও ত্যাগের দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয় করে গেছেন, তোমার দ্বারা সেই সংসারের পবিত্রতা যেন নষ্ট না হয়।" ভূদেব বাবু কুমারের শিক্ষককে এইরূপ উপদেশ দেন যে, কুমারের বংশমর্য্যাদা জ্ঞানটা যাতে বৃদ্ধি পায় তা করবেন। 'আমাদের বংশে এরূপ কাজ করা সম্ভবে না' এই লজ্জা মনে থাকলে অনেক নীচতা হতে লোক রক্ষা পায়; দয়া দাক্ষিণ্য, দেব-অতিথি-সেবা, আর্ত্তত্রাণ ও বিদ্যাদান প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়। ভূদেব-বাবুর উপদেশ ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই পালন করিয়াছিলেন—শৈশবের সেই উপদেশের ফলেই মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের 'অসাধারণ' চরিত্র গঠিত হইয়াছিল—আভিজাত্য ও democracy র অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জগদিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের দুই একদিন পূর্ব্বে ভূমিকম্পে উত্তরবঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং নাটোর রাজধানীর প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি ভূমিসাৎ হয়। মহারাজের বিবাহ উপলক্ষে রাজধানীতে বহু আত্মীয় কুটুম্বের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অল্পাধিক আহত হইয়াছিলেন। বিবাহের পর বৎসর জগদিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এই সময়ে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে নাটোরে একটি আন্দোলন-সভা হয়। সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে জগদিন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। নাটোর রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বক্তা। উত্তরকালে জগদিন্দ্রনাথ ধনী এবং জমিদার হইয়াও যে অকুতোভয়ে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, নাটোরের এই রাজনীতিক সভায় তাহার প্রথম সূত্রপাত হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জগদিন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতার জন্য এক বৎসর পড়াশুনা করিতে পারেন নাই। পর বৎসর এফ্-এ পড়িবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইলেন বটে, কিন্তু বেশী দিন পড়া চলিল না। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কলেজ ত্যাগ করিয়া তিনি রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই বৎসরই তিনি আইনানুযায়ী সাবালক বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ইহার পর সরিকী গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ নাটোর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। পরে সন ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে মহারাজকুমারী শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর জন্ম হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ময়মনসিংহস্থিত স্বীয় জমিদারী পরিদর্শনানন্তর ভারত ভ্রমণে বাহির হন; এবং এক বৎসরের অধিক কাল বিদেশে থাকিয়া পাটনা, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, বোম্বাই, পুণা, হায়দরাবাদ, বরোদা, জয়পুর ও দিল্লী পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বৎসর রাজসাহী বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের পক্ষ হইতে মহারাজ নাটোর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তৎকালে ব্যবস্থাপক সভায় দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ লালমোহন ঘোষ, মিঃ আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী ছিলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বসন্তরোগ সংক্রামকভাবে দেখা দেয়। সেইজন্য মহারাজ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নাটোরে গমন করিয়া কিছু দিন বাস করেন। এই বৎসরের

শেষভাগে মহারাজ পুনরায় দেশভ্রমণে বাহির হন এবং কাশ্মীর, জম্বু, অমৃতসর, লাহোর, পেশোয়ার, আলি মসজিদ, খাইবার পাশ, জামরুদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৬নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসর মার্চ্চ মাসে এই বাড়ীতে মহারাজকুমার (বর্ত্তমান মহারাজা) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে ৮০ হাজার টাকা মূল্যে এই বাটী ক্রয় করা হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী বিভাগের জেলাবোর্ডসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসর নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। দিঘাপতিয়ার স্বর্গীয় রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুরের সহযোগে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় সম্মিলনীকে নাটোরে আহবান করিয়াছিলেন। সম্মিলনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য উভয়ে যত্ন ও অর্থব্যয়ে ত্রুটি করেন নাই এবং তাঁহাদের ব্যয় সার্থক হইয়াছিল, যত্ন সফল হইয়াছিল, অধিবেশন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান, অবসরপ্রাপ্ত জজ স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্মিলনীর সভাপতি হইয়াছিলেন। নানা কারণে এই সম্মিলনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গলার ধনী জমিদার ও রাজারাজড়ার মধ্যে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। মহারাজ সম্মিলনীর সাফল্যের জন্য এতই পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বলিষ্ঠ শরীর ও সুন্দর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কল্পে তিনি এক বৎসর কাল সিমলা শৈলে বাস করিতে বাধ্য হন।

এ যাবৎ বাঙ্গলার রাজনীতিক আন্দোলন আলোচনা এবং কংগ্রেস কনফারেন্স, সভাসমিতির কার্য্য ইংরেজী ভাষায় নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল। বাঙ্গলার মনোভাব যে বাঙ্গলা ভাষাতেই ব্যক্ত হওয়া কর্ত্তব্য, সেকালের রাজনীতিকরা তখনও তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সময় হইতে নব্য রাজনীতিকরা বাঙ্গলা ভাষাতে রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। কংগ্রেস কনফারেন্সে দেশবাসীর মনোভাব প্রকাশের বাহন কি হইবে, তাহা লইয়া প্রবীণ ও নবীন রাজনীতিকদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। নাটোর কনফারেন্সে এই বিরোধ সর্ব্বপ্রথম মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ নবীন দলের সহিত সম্পূর্ণ একমত ছিলেন যে, ভাষার স্বাধীনতা না থাকিলে মনের স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নহে। যত দিন রাজনীতিক আন্দোলন ইংরেজী ভাষায় চলিবে, তত দিন আমাদিগের ইংরেজের শেখানো মুখস্থ কথার আবৃত্তি করা ছাড়া প্রকৃত কাজ বিশেষ কিছুই হইবে না। নাটোর কনফারেন্সে বাঙ্গলা ভাষা যাহাতে তাহার যথাযোগ্য আসন লাভ করে রবীন্দ্রনাথ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন; এবং সে প্রচেষ্টায় জগদিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় হন। মহারাজের সহায়তায় দুঃখিনী বঙ্গভাষা কংগ্রেসে রাজাসন লাভ করেন। রাজনীতির আসরে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজিও তাহা সম্ভব হইল না, ইহা যেমন দুঃখের কথা, তেমনি বাঙ্গলার পক্ষে লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। সেই রবীন্দ্রনাথ আছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তনে তাঁহার সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ কই?

বাঙ্গলা ভাষার প্রতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের কতখানি আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কনফারেন্সের এই ঘটনা হইতেই তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগই উত্তর কালে মহারাজকে "মানসী"র সম্পাদকের পদ গ্রহণে প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

নাটোরের প্রাদেশিক কনফারেন্স আরও একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। কনফারেন্সের শেষ দিনে বঙ্গব্যাপী ভীষণ ভূমিকম্প হয়। কনফারেন্সে তৎকালীন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনস্বীবর্গের সমাবেশ হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে প্রতিনিধিরা অস্থায়ী মণ্ডপে ছিলেন, তাই রক্ষা; নচেৎ বাঙ্গলা বোধ হয় এক দিনে বহু শ্রেষ্ঠ সন্তানে বঞ্চিতা হইতেন। এই ভূমিকম্পই মহারাজের স্বাস্থ্যভঙ্গের একটা কারণ; ইহার ফলে তাঁহার শিরোঘূর্ণন রোগ জন্মিয়াছিল। এক বৎসর সিমলায় বাস করিয়া তিনি পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করেন। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে কনফারেন্সের সাফল্যের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম-

জনিত ক্লান্তি বশতঃই যে স্বভাবতঃ সুস্থ ও সবল মহারাজ এই রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। সিমলায় সপরিবারে বাস করিবার সময়ে তিনি তিন মাস আগ্রায় অবস্থিতি করিয়া বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল, মথুরা, বৃন্দাবন, সেকন্দরা প্রভৃতি প্রাচীন বাদশাহী কীর্ত্তি সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও দিঘাপতিয়ার রাজা স্বর্গীয় প্রমদানাথ রায়ের সহযোগে "বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এসোসিয়েশন" স্থাপন করেন। বাঙ্গলার অভিজাত রাজনীতিক কর্ম্মক্ষেত্রে এই সভা পূর্ব্ববর্ত্তী "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের"র প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই বৎসর কলিকাতার বিডন উদ্যানে জাতীয় মহা-সমিতির ষোড়শ অধিবেশন ও তৎসহ একটি শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। এই কংগ্রেস উপলক্ষে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার অনন্যসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতার নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

ইহার দুই বৎসর পরে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বহরম-পুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে (এবারেও যেখানে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন হইয়া গেল) সভাপতির কার্য্য করেন। সেবারকার অভিভাষণও মহারাজেরই উপযুক্ত হইয়াছিল। সম্মেলন অন্তে, প্রত্যাবর্ত্তন কালে, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ নাটোর রাজবংশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী বড়নগরে থাকিয়া রাণী ভবানীর কীর্ত্তিরাশির ভগ্নাবশেষ প্রাচীন শিবমন্দির, রাজরাজেশ্বরীর মন্দির প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পাবনা জামিরতানিবাসী শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ীর সহিত মহারাজকুমারী শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর শুভ বিবাহ হয়। এই বৎসর কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ কল্পে একটি বিরাট সভা আহূত হয়। টাউন হলের উপর তলায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একটি overflow meeting হয়। উপরের সভায় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং overflow meetingএ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সভাপতি হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অনুকূল সকল যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিয়াছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে মণ্টফোর্ড স্কীম অনুসারে ব্যবস্থাপিত নূতন কাউন্সিলে মহারাজ সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তৎপর-বৎসর নাটোর প্রাসাদে নূতন শাসন ব্যবস্থানুযায়ী বাঙ্গলার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলের অভ্যর্থনা করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ পাবনা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির কার্য্য করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ নাটোর রাজ-প্রাসাদে বঙ্গের তৎকালীন গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশের মহা-সমারোহে অভ্যর্থনা করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই নাটোরবাসীরা স্বয়ং মহারাজের অভ্যর্থনা করেন। ১৯২৫ সালের ইষ্টার পর্ব্বের অবকাশে মহারাজ বিক্রমপুর—মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সম্মেলনে মূল সভাপতির কার্য্য করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে ইহাই তাঁহার শেষ সাধারণ কার্য্য। তাঁহার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী দেশবন্ধু সি, আর, দাস মহাশয় এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

মহারাজের জীবনের দুইটি রূপ অতি স্পষ্ট—একটি তাঁহার মহারাজ রূপ ; অপরটি তাঁহার সাধারণ ভদ্রলোকের রূপ। জমিদারীর কার্য্য পরিচালনে, প্রজাবর্গের সহিত ব্যবহারে, রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত আলাপ-সম্ভাষণে, রাজদরবারে, মহালে তাঁহার জমিদার বা রাজমূর্ত্তি দেখা যাইত। আর সাহিত্যের আসরে, বন্ধু বান্ধবের বৈঠকে তিনি সাধারণ ভদ্রলোক রূপে প্রতিভাত হইতেন। তাঁহার সকল বন্ধু, সকল পরিচিত ভদ্রলোক একবাক্যে এই কথা বলিয়াছেন যে, আলাপের পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাতবংশীয়, অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর বংশধর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথকে তাঁহারা ভয় ও কুণ্ঠার সহিত নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে সাহস করেন নাই। কিন্তু মহারাজ নিজের ব্যবহারে সে আতঙ্ক, কুণ্ঠা জয় করিয়া তাঁহাদিগকে সমাদরে নিজের কোলের কাছে টানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত একাসনে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া গল্পগুজব, হাসিতামাসা, রঙ্গরস করিয়াছেন। তিনি যে মহারাজ, তিনি যে এতবড় বংশের বংশধর,

তিনি যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের সমাজপতি, তাহা কেহই তাঁহার ব্যবহারে লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই।

আবার যখন তিনি প্রজাদের লইয়া দরবার করিয়াছেন, মহাল পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন, তখন রাজোচিত আড়ম্বরের সীমা-পরিসীমা থাকিত না—হাতী ঘোড়া, লোক-লস্কর, পাইক-বরকন্দাজ প্রভৃতির বিশাল সমারোহ হইত। এই দুই রূপেই তিনি, যে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কখনই আত্মবিস্মৃত হন নাই,—স্বর্গীয় ভূদেব বাবুর উপদেশ লঙ্ঘন করেন নাই,—বংশগৌরবের অমর্য্যাদা করেন নাই; অথচ, অহঙ্কার, অভিমান, গর্ব্ব, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া কখনও কাহাকেও মনঃপীড়া দেন নাই,—তিনি যে সাধারণ লোকদের হইতে বহু—বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত, এরূপ মনে করিবার সুযোগ বা অবসর কখনও কাহাকেও দেন নাই। ইহাই মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের চরিত্রের বিশেষত্ব। বাঙ্গলার আর কোন জমিদারবংশীয় ধনী সন্তানের মধ্যে এই বিচিত্র রূপ বা দৃষ্টান্ত কখনও দেখা গিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। বস্তুতঃ মহারাজ—ব্রজনাথ ও জগদিন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সম্মিলন। মহারাজের পরলোকান্তে স্বর্গীয় অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় সি-আই ই মহোদয় মহারাজের স্মৃতি-লিপিতে এই রূপটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় মহারাজের প্রায় সকল বন্ধুই তাঁহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মহারাজ সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ ছিল। তাঁহার ন্যায় অতিথিবৎসল লোক খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার আতিথেয়তা সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—সেবারে (নাটোরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী উপলক্ষ্যে সব চেয়ে যাহা আমরা উপভোগ করিয়াছিলাম, সে তাঁহার আতিথ্যের আয়োজন নহে, আতিথ্যের রস। এই আতিথ্যের রসটি কিরূপ উপভোগ্য হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহারও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানে সকল দলের সম্মিলিত দায়িত্ব যেখানে, সেখানে নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিরা নিজেদের দায়িত্ব ভুলিয়া বরযাত্র-সুলভ মেজাজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না—নাটোর সম্মিলনীতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। মহারাজ কিন্তু প্রসন্ন চিত্তে সকলের সকল আবদার শুনিয়া তাহা পূরণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তাহার পর ভূমিকম্পে যখন সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল তখন, রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়—"যিনি গৃহস্বামী এই দুর্ব্বিপাকে নিঃসন্দেহই নিজের সংসারের জন্য তাঁহার উদ্বেগের সীমা ছিল না। কিন্তু নিজের ক্ষতি ও বিপত্তির চিন্তা তাঁহার মনের মধ্যে যে আলোড়িত হইতেছিল বাহির হইতে তাহা কে বুঝিবে? বিধাতা তাঁহার আতিথেয়তার যে কি কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি, আর সেই পরীক্ষায় তিনি যে কিরূপ সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাও আমাদের মনে পড়ে।" এত বড় বিপদে মহারাজ কিরূপ ধীরভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা, এই সম্মিলনের প্রসঙ্গে দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—প্রবল ভূমিকম্পে উত্তরবঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া গেল, নাটোর ও দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ী চূর্ণ হইয়া গেল—আমার দাদা (রাজা প্রমদানাথ রায়) এই আকস্মিক বিপদে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। মহারাজেরও প্রায় তুল্য বিপদ উপস্থিত হইলেও, তিনি দিঘাপতিয়া আসিয়া আমার দাদাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

মহারাজের জ্ঞানস্পৃহা অদম্য ছিল। তিনি ছিলেন চিরদিন—ছাত্র। সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। যে-কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হউক না কেন, সেই বিষয়েই তিনি এমন নূতন তথ্য সকল প্রকাশ করিতে পারিতেন যে, সেই সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণও চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে "cultured gentleman" বলিয়া স্বীকার করিতেন। মহারাজের একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরী ছিল। লাইব্রেরীর বইগুলি কেবল গৃহের শোভা সম্পাদনার্থ সংগৃহীত হয় নাই—মহারাজ তাহার প্রত্যেকখানি তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সংস্কৃত সাহিত্য তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একবার এক বন্ধু-বৈঠকে কথা প্রসঙ্গে মা দুর্গার কোন্ দিকে লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং কার্ত্তিক-গণেশের মূর্ত্তি অবস্থিত এই তর্ক উঠিলে তিনি মধুর কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে নির্ভুলভাবে দশ-পনেরো মিনিট ধরিয়া সমগ্র দুর্গার ধ্যানটি আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া

দিয়াছিলেন। যিনি নিজে জ্ঞানলাভের জন্য এত আগ্রহশীল তিনি যে অপরকে জ্ঞান দান করিবার জন্য সমান আগ্রহান্বিত হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; বহু ছাত্রকে নিয়মিত ভাবে অর্থ-সাহায্য করিতেন, এবং একটি বিদ্যার্থীকে এককালীন পনেরো হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়া শিক্ষালাভার্থ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেবল কি ইহাই? পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর স্মৃতির উদ্দেশে কলিকাতায় স্থাপিত রাণী ভবানী স্কুলে দুই বৎসর ধরিয়া সপ্তাহে দুই দিন তিনি উপর ক্লাশের ছাত্রদিগকে ইতিহাস পড়াইয়াছিলেন।

জাতীয়তা, দেশাত্মবোধ তাঁহার আর একটি গুণ। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। সেটা ভাষা ও সাহিত্যের দিক। তদ্ব্যতীত অন্য দিকেও জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য তিনি অনেক কিছুই করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটা—এবং এইটাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান—তাঁহার Natore Eleven। এই জিনিসটি কি তাহা বোধ হয় প্রবীণ পাঠকরা এখনও ভুলিয়া যান নাই; কিন্তু তরুণ সম্প্রদায়ের সকলের বোধ হয় এইটি জানা নাই। শরীর-চর্চ্চা যে আমাদের বিশেষ আবশ্যক, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি কুস্তি, ডন, মুগুরভাঁজা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, লাঠি, মুষ্টিযুদ্ধ, ক্রিকেট (ফুটবল তখনও প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি বলব্যঞ্জক ক্রীড়া-কৌতুকে নিজেও যেমন অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, সমবয়স্ক বয়স্য ও অন্যান্য লোকদিগকেও সেইরূপ অভ্যস্ত করাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার লাঠিখেলার অদ্ভুত নৈপুণ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, একদিন রাজসাহী সহরে রাত্রি দশ ঘটিকার সময় শশধর বাবু ও তিন চারিজন বন্ধু মহারাজের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। কথায় কথায় মহারাজ বলিলেন, আমি ছড়ি হাতে করিয়া দাঁড়াই, আপনারা সকলে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কাপড়ের বল ছুঁড়ুন। আমার গায়ে বল লাগাইতে পারিলে আমি বাজি হারিব। তৎক্ষণাৎ একগাছি ছড়ি ও পাঁচ-সাতটি কাপড়ের বল একজন ভৃত্য আসিয়া দিয়া গেল। মহারাজ ছড়ি-হস্তে এক দিকে দাঁড়াইলেন, বন্ধুরা অপর দিকে দাঁড়াইয়া বল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারাজ এমন দক্ষতার সহিত ছড়ি ঘুরাইতে লাগিলেন যে একটি বলও তাঁহার গাত্রে লাগিল না। লাঠি ঘুরাইয়া বল ঠেকাইতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা, বিচারবুদ্ধির ক্ষিপ্রতা, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও দ্রুত সঞ্চালনশক্তি প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের দরকার হয়। তা ছাড়া অতি লঘু হস্তে অতি দ্রুত দেহের সর্ব্বদিকে হস্ত সঞ্চালন করিতে ত হয়ই। অপর একদিন কথা-প্রসঙ্গে মহারাজ শশধর বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, রেলে কিম্বা পথে-ঘাটে যাতায়াতের সময় সাহেবপুঙ্গবদিগের সহিত ঝগড়া হইবার সম্ভাবনা। সে সময় সাহেবদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে এই সকল শিখিতে হইয়াছে। একবার, (১৩০১) দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের বিবাহোৎসবের সময়, বিবাহ-বাটীতে বাজে লোকের ভীড় নিবারণের জন্য রাজা প্রমদানাথ বিবাহবাটীর ফটকে দুইজন নূতন ভোজপুরী দ্বারবান নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। তাহারা কিন্তু তাহাদের মুনিবকে চিনিত না—মফস্বলের এক কাছারী হইতে তাহারা আমদানী হইয়াছিল। বরের তাঞ্জামের পশ্চাতে পদব্রজে বরযাত্রীরা—সর্ব্বাগ্রে মহারাজ, রাজা প্রমদানাথ প্রভৃতি বরযাত্রীদের পরিচালন করিতেছিলেন। বরের তাঞ্জাম বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিবার পর দ্বারবানরা পূর্ব্ব আদেশানুযায়ী, বাজে লোক মনে করিয়া মহারাজ, রাজা প্রমদানাথ প্রভৃতিকে আটক করিল। রাজা প্রমদানাথ ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দ্বারবানদের তিরস্কার করিতে এবং তাঁহারাই যে তাহাদের মুনিব এই কথা তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কোঁচার খুঁট গুঁজিয়া, কোমরে চাদর জড়াইয়া ও জামার আস্তিন গুটাইয়া ভোজপুরী দ্বারবানদিগের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পালোয়ান জগদিন্দ্রনাথ ভোজপুরী-দিগের সম্মুখে পিছু হটিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে দ্বারবানদিগের নিয়োগকারী ও উপদেষ্টা কাছারীর কর্ম্ম-চারীরা আসিয়া দ্বারবানদিগকে নিরস্ত করেন। রাজা প্রমদানাথ তাহাদিগকে বরখাস্ত করিতে উদ্যত হইলে জগদিন্দ্রের আর এক মূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি তখন

দ্বারবানদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, দ্বারবানরা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া, প্রমদানাথের ক্রোধশান্তি করিলেন।

শরীরচর্চ্চামূলক অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে Natore Eleven বা নাটোর মহারাজার ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দলই সর্ব্বপ্রধান। তৎকালে ভারতবর্ষে যতগুলি দেশীয় ক্রিকেটের দল হইয়াছিল, সাহেবদের সঙ্গে খেলায় তাহারা কিছুতেই পারিয়া উঠিত না। কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, পাতিয়ালার মহারাজা, প্রিন্স রণজিৎ সিংজী প্রভৃতি ক্রিকেটবীরগণের পরিচালিত দুই চারিটি ভাল ক্রিকেটের দল ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের কোনটাই কেবলমাত্র ভারতীয়দিগের দ্বারা গঠিত ছিল না—সব কয়টি দলেই কয়েকজন করিয়া বিদেশী ক্রিকেট খেলোয়াড় থাকিত। মহারাজ জগদিন্দ্রের চক্ষে ইহা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু বলিয়া ঠেকিল। তখন তিনি কেবলমাত্র ভারতীয়দিগের দ্বারা একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় ক্রিকেট দল গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। বালীগঞ্জে নাটোর পার্ক নামে তাঁহার যে উদ্যানবাটিকা ছিল, বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে তাহাকে ক্রিকেট ফীল্ডে পরিণত করিলেন, এবং প্রতি বৎসর আরও সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বাছা বাছা ক্রিকেট খেলোয়াড়দিগকে একত্র করিয়া Natore Eleven নামে একটি ক্রিকেট টীম গঠন করিলেন। এই দলটি একরূপ অপরাজেয়ই হইয়াছিল। বহু ইয়োরোপীয়ান ক্লাবকে খেলায় পরাজিত করিয়া নাটোরের ক্রিকেট খেলোয়াড় দল ভারতবর্ষের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। যেরূপ মনোভাবের ফলে, যেরূপ জাতীয়তার প্রণোদনে ইহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা একমাত্র নাটোর ব্যতীত, ভারতীয় অন্য কোন ধনী, জমিদার, রাজা বা মহারাজার দেখা যায় নাই।

মহারাজের দেশাত্মবুদ্ধি, মহারাজের স্বাজাত্য এতই বেশী ছিল যে, তাহার খাতিরে তিনি অতি দুর্গম স্থানে গমন করিতে বা অতি দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশের আহ্বানে, জাতির আহ্বানে, কর্ত্তব্যের আহ্বানে তিনি অনেক অসাধ্যসাধনও করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং যেমন সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন, গুণীর আদর করিতেও তেমনি জানিতেন। তিনি স্বয়ং চিত্রকর ছিলেন না বটে, কিন্তু চিত্রকলা বুঝিতেন ও চিত্রশিল্পীর আদরও করিতেন। তিনি স্বয়ং কবি ছিলেন, তাঁহার কাব্য "সন্ধ্যাতারা" কবিত্বের ঝঙ্কারে সমুজ্জ্বল। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতবহুল শব্দসম্পদ ও বঙ্কিমের লালিত্য তাঁহার গদ্য রচনায় একত্র হইয়া যে লীলায়িত তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহার "শ্রুতিস্মৃতি"তে তাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। তিনি অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক,—"দারার দুরদৃষ্ট" ও "নূরজাহান" তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তিনি নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক—বহুবর্ষব্যাপী "মানসী" এবং "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সুসম্পাদনই তাহার নিদর্শন। সঙ্গীতালোচনায় তিনি ভারতের বড় বড় ওস্তাদগণের সমকক্ষতা করিতেন এবং সকলের কাছেই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে "মৃদঙ্গ" "কথা কহিত"; "পাখোয়াজ" বাজনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ধনী নির্দ্ধন নির্ব্বিশেষে তাঁহার ন্যায় মজলিসি লোক বঙ্গদেশে বড় বেশী ছিলেন না। সরস কথাবার্ত্তায়, গালগল্পে, রঙ্গ-ব্যঙ্গে, সাহিত্যালোচনায় তিনি সকলকে এমন মাতাইয়া তুলিতে পারিতেন যে সময় কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত, তাহা কেহ জানিতে, বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য, তাঁহার আশ্রিত-বাৎসল্য, তাঁহার বিনয়, তাঁহার অহমিকাশূন্যতা, তাঁহার অভিমান-রাহিত্য যে-কোন ভদ্রলোকেরই পক্ষে অলঙ্কার স্বরূপ—রাজা মহারাজার ত কথাই নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ভিখারী না হইয়াও স্বয়ং অনুশীলন করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বহু রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কনফারেন্সে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈঠকী আলাপের সময় তাঁহার রসিকতা রসজ্ঞ সুধিগণের উপভোগ্য বস্তু ছিল। সামাজিকতায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁহার অমায়িকতা এবং উদারতা এতই ছিল যে, তিনি নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর বলিয়া, কোন বন্ধু কিম্বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহার পাছে অমর্য্যাদা হয় এই ভয়ে, সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে তিনি নিমন্ত্রণের অপেক্ষামাত্র না রাখিয়া স্বতঃ

প্রণোদিত হইয়া বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কত বড় বিশাল উদার হৃদয় হইলে এইটি সম্ভব হয়, তাহা অনুমান করা কঠিন।

ক্ষমা তাঁহার আর একটি গুণ। তিনি অন্তরে অন্তরে ক্ষমাশীল। মুখে কখনও কখনও তিনি রাগ দেখাইতেন বটে, কিন্তু সে রাগ কখনও তাঁহার আন্তরিক ছিল না। অপরাধীকে দণ্ডবিধানের পদ্ধতিও তাঁহার অতি চমৎকার ছিল। একবার তিনি স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায় প্রমুখ তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে নাটোরে মাছ ধরিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মাছ ধরিতেছেন, এমন সময় বরকন্দাজরা এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার কাছে অভিযোগ করিল যে, এই ব্যক্তি চুরি করিয়া লালদীঘিতে মাছ ধরিতেছিল। লালদীঘিতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ছিল। রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া মাছ ধরার অপরাধে মহারাজ লোকটির কি শাস্তি বিধান করিলেন, শুনিবেন? মহারাজ তাহার অতি সাধারণ রকমের সরঞ্জাম দেখিয়া তাঁহার নিজের একটি পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড হুইল তাহাকে বকসিস দিয়া বলিলেন, "নিষেধ করলেও তুই চুরি করে মাছ ধরবি, তবে না হয় প্রকাশ্যে ভাল হুইল দিয়াই ধর, আমাকেও ভাগ দিস।" ব্যস! চূড়ান্ত বিচার ও চূড়ান্ত দণ্ড!

তিনি কত যে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধারে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহার একজন বন্ধু বলিয়াছেন, অন্যান্য দানের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল কন্যাদায়গ্রস্তদিগকে দানের পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা।

মহারাজ হাসিখুসি করিতেন, আমোদপ্রমোদ করিতেন, সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, কবিতা, প্রবন্ধ লিখিতেন, গানবাজনা করিতেন, দেশভ্রমণ করিতেন, ঘরকন্না করিতেন, 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সম্পাদন করিতেন, এক কথায় ধনী ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা সচরাচর যাহা করিয়া থাকেন, তিনিও প্রায় তাহাই করিতেন; কিন্তু তাঁহার মনের গোপন কোণের প্রকৃত "মর্ম্মবাণী"টি কি, তাহা বড় একটা কেহ জানিতে পারিত না। একদিন রাত্রিতে কেবল একজন মাত্র লোকের কাছে তিনি তাঁহার মরমের গোপন কথাটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই একজন আমাদের দাদা—তখনকার শ্রীজলধর সেন—এখনকার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন। সেই একটি দিন মাত্র মহারাজ জগদিন্দ্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। চৌরঙ্গীর 'মানসী' কার্য্যালয় হইতে রাত্রি দশটার সময় একখানি মোটরে দাদা ও মহারাজ ব্যারাকপুরে বাগানবাড়ীতে যাইতেছিলেন। অন্ধকার নির্জ্জন পথ, উভয়েই চুপচাপ। পথের মাঝখানে সহসা মহারাজ দাদার সাড়া লইয়া বলিলেন, "দেখ দাদা, আমি ভাবি কি জান? আমার মনে হয়, এই রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করে আমার সেই দীনদরিদ্র জনকজননীর কুটীরে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকলে হয় ত সুখী হতে পারতাম। সেই দরিদ্র পল্লীজীবনের জন্য আমার প্রাণ এক এক সময় হাহাকার করে ওঠে। সেই বুঝি ভাল ছিল!" এই কথা বলিয়া মহারাজ একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৩৩২ সালের ২১এ পৌষ (১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী) মহারাজ লোকান্তরে প্রস্থান করেন। একখানি মোটরের ধাক্কা লাগিয়া তিনি পড়িয়া যান; তাহারই ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। যে ট্যাক্সি-চালকের অসাবধানতার জন্য তিনি এরূপ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অনেকেই তাহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বভাবতঃ ক্ষমাশীল মহারাজ তাঁহার মৃত্যুকালীন শেষ বাণীতে সেই ট্যাক্সি-চালকের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়া যান!

মৌন-প্রশস্তি

শ্রীরাধারাণী দেবী

বন্ধু গো! এসেছি মোরা 'জয়ন্তী-উৎসবে' আজি তব
এনেছি অঞ্জলি অর্ঘ্যে ভরি'
প্রকৃতির মর্ম্মযামি হে কবি! মোদের মৌন স্তব
জানি তুমি লবে পাঠ করি।
এ আনন্দ-যজ্ঞতলে আমাদের ডাকে নাই কেহ,
বাতাসে পেয়েছি বার্ত্তা; শুনি কাঁপে প্রাণ মন দেহ
পুলকের শিহরণে; জাগে মনে তব মুগ্ধ-স্নেহ;
আমরা নহি ত' অচেতন—
তুমি ইহা জানো, তাই—আনিয়াছি প্রীতি-অবলেহ—
মূকের নীরব নিবেদন!

তন্দ্রামগ্ন ছিনু কবি, অন্ধকার গিরি-গুহা-তলে
কত যুগ-যুগান্তর ধরি'
তোমার কিরণ-স্পর্শে জাগিয়া উঠেছি কুতূহলে
বিশ্বেরে বিস্ময়-স্তব্ধ করি!
আমার কল্লোল-গীতি তব দিব্য বীণার ঝঙ্কারে
অপূর্ব্ব যৌবনাবেগে উচ্ছ্বসি' উঠেছে শতধারে!
ভাঙিয়াছে স্বপ্ন মোর তোমারি' আহ্বানে বারে-বারে—
খুঁজিয়া পেয়েছি যেন গতি!
নব-ভগীরথ ওগো! লহ এই আনিয়াছি দ্বারে
'নির্ঝরের' নীরব প্রণতি।

বলো বলো ওগো বন্ধু! পেরেছো কি চিনিতে আমারে?—
দেখ তো চাহিয়া মোর পানে,
সপ্ত-সিন্ধু বক্ষে তুলি' তবু তুমি প্রেয়সী 'পদ্মারে'
ভোলোনি—এ কথা সে যে জানে।
উন্মাদ পূর্ণিমা আজো অঙ্গে অঙ্গে মূর্চ্ছি' পড়ে মোর—
বেলাহীন বালুচরে চখা-চখী কাঁদিছে অঝোর,
তেমনি ঘনায় সন্ধ্যা—আসে নেমে স্বপ্ন-শুভ্র ভোর;
আমি শুধু দিন গুনি' দুখে—
হে পদ্মা-বিহারী কবি! জীবনের প্রিয়-সঙ্গী মোর!
ফিরে কি পাবোনা আর বুকে?

ধান্যের মঞ্জরী ভরি' নৈবেদ্য এনেছি পদে প্রিয়!
আমি তব শ্যাম-শস্য ক্ষেত;
বন্দিয়াছো ছন্দে গানে যে আনন্দে অনির্ব্বচনীয়,
ভুলি নাই আজো সে সঙ্কেত!
নিদাঘ দহনে মম শূন্য-বক্ষ যবে ধু ধু জ্বলে
উত্তীর্ণ হয়েছো হেথা রুদ্র অগ্নি-তপস্যার ছলে,—
সজল শ্রাবণ দিনে নীল নব মেঘচ্ছায়া তলে
মাতিয়াছো যেন মত্ত কেকা,—
হেমন্তে শরতে শীতে রেখে গেছো আমার অঞ্চলে
রূপ-মুগ্ধ কতো গীত-লেখা!

আমরা এসেছি সখা তোমারে অঞ্জলি দিতে আজ,
নাহি সাজ—নাহি জয়-রোল—।
কম্পিত চরণে এসে দাঁড়ায়েছি কুণ্ঠিত সলাজ,
তব প্রেম বক্ষে দিলো দোল!
'মোরা গ্রাম্য বেণু-কুঞ্জ'—'বরষার আমি নদীতট'
'প্রান্তর-নিবাসী আমি ছায়াঘন সেই বৃদ্ধ বট!'
'আমি স্বচ্ছ পল্লী-দীঘি'—হে কবি, যাদের চিত্রপট
এঁকেছো এমন রমণীয়,
যতনে এনেছি মোরা মরমের প্রীতিপূর্ণ ঘট
সমাদরে নিয়ো বন্ধু,—নিয়ো।

আমারে চিনিতে কবি, বিলম্ব হবেনা তব, জানি,—
বড়ো ভালোবাসো মোর হাসি,

ফেন-শুভ্র ক'রে দিই শরতের উত্তরীয়খানি
যেদিন বাজাও তুমি বাঁশী।
তোমার মুরলী-রবে বাহিরিয়া আসি আমি 'কাশ'
—'আমি দীন দূর্ব্বা তবু আমারেও করেছো প্রকাশ!'
তোমার সম্মানে সখা, বক্ষে আজ উথলে উল্লাস
'—এসেছি গো, মোরা ঝরাপাতা!'
অখ্যাত আছিনু কাব্যে কতো দীর্ঘ যুগ বর্ষ মাস
মরমি! মোদের তুমি ত্রাতা!

'হে বন-বিলাসী কবি! এনেছি মুকুলগুচ্ছ মোর
ফাল্গুনের আম্রবন আমি!
মত্ত মৌমাছির মতো গন্ধে যার হ'য়েছো বিভোর
লহো তার সুরভি প্রণামী।'
'—এসেছে খর্জ্জুর শাল, পল্লব-ব্যজনী-করে তাল,
মহুয়া মদির-মত্ত, দেওদার সুদীর্ঘ বিশাল,
হরিতকী, আমলকী, নারিকেল, এসেছে তমাল—
নিবেদিতে আনন্দ-বারতা;
সমুদ্র সন্তরি' এলো পুষ্পে রচি রংয়ের মশাল
তুষার দেশের তরুলতা!'

দরদী গো! দীনা আমি, রূপহীনা—কারো যোগ্য নয়,
চাহে নাই কেহ মোর পানে!
একদা নির্জ্জন সাঁঝে—পথমাঝে নিলে পরিচয়
কী গান গাহিলে কাণে কাণে!
অনাদৃতা আকন্দের ছন্দে কভু ছিল না প্রবেশ,
তুমি বন্ধু, বুঝেছিলে দুখিনীর মূক মর্ম্ম-ক্লেশ,
পূর্ণ করি দিলে তাই বঞ্চিতার অন্তর প্রদেশ,
সার্থক করিলে তার প্রাণ;—
অবজ্ঞাতা আকন্দের সকৃতজ্ঞ আনন্দ-আবেশ
এনেছি চরণে দিতে দান!

জয়ন্তী-উৎসবে তব বন্দনায় এলো সবে মাতি'
—শেফালি বকুল, গন্ধরাজ,
কদম্ব কেতকী কুন্দ করবী কাঞ্চন যূথী জাতি
পুলক ধরেনা বুকে আজ!
মালতী মল্লিকা এলো, চামেলি পারুল সন্ধ্যামণি
আসিলো রজনীগন্ধা সুগন্ধের নূপুর নিক্বণি'
নলিনী মেলিলো আঁখি, এলো ছুটে সৌরভের খনি—
কামিনী গোলাপ চম্পা হেনা;
অনামা অরণ্য-পুষ্প,—অনাঘ্রাতা ইন্দু-নিভাননী
বিদেশিনী এসেছে অচেনা!

সসাগরা বসুন্ধরা চরাচর এ বিশ্ব-প্রকৃতি
অর্চ্চনার সাজাইয়া ডালা
এনেছে কবির দ্বারে প্রাণের নীরব স্তুতি-গীতি
তোমার অমর বর-মালা!
'উর্ব্বশী' অলক্ষ্যে দিলো প্রণামী পাঠায়ে পারিজাতে,
শুভ্র মেঘে মহাশ্বেতা উপহার ভেটিল সভাতে,
আপনি জননী বাণী তোমার ললাটে নিজ হাতে
জয়-টীকা পরালো গৌরবে,
অমূর্ত্ত আনন্দ অর্ঘ্য অজস্র এসেছে আজি প্রাতে
অপরূপ অমৃত-সৌরভে!

আমি মনে ভাবি তাই তব যোগ্য পূজা উপচার
কী দিয়া রচিব নাহি জানি!
আকাশ বাতাস আলো শ্যাম ধরা যাঁর অর্ঘ্য-ভার
পদ-প্রান্তে বহি দিলো আনি!
মুগ্ধ মূক প্রকৃতির কণ্ঠে শুনি মৌন-জয়গান
অন্তর-নিতলে মোর অনুরণি' ওঠে তারি তান
হে কুহকি কবি! বলো কী অঞ্জলি দিব আজি দান
ধরাপূজ্য তোমার চরণে,
আমার প্রণতি-অর্ঘ্য—তোমার প্রতিভা-মুগ্ধ প্রাণ
নিবেদিনু উৎসবের ক্ষণে। *

* 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের' জন্য রচিত।

শোক-সংবাদ

পরলোকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরলোক-গমনে ভারতবর্ষ তাহার গৌরবপতাকাবাহী একজন সন্তানকে হারাইল, জগতে একজন প্রকৃত পণ্ডিতের ও জ্ঞানীর আসন শূন্য হইল। মৃত্যু আসিয়া আজ যে শুধু একজন ব্যক্তিকে এই মর্ত্ত্য-জগৎ হইতে সরাইয়া লইয়া গেল তাহা নয়, এই তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, বহু বিলুপ্ত দিনের, বহু বিলুপ্ত যুগের, বহু বিলুপ্ত মানবের নব-জীবন-প্রাপ্তির সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত হইয়া গেল। যে গৌরবের জগৎ শুধু স্মৃতিকথা মাত্র হইয়া এই বিস্মরণশীল জাতির প্রাণ-মহিমার নিদর্শন স্বরূপ কালের তিমিরান্তরালে বিরাজ করিতেছিল—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আপনার অসামান্য সৃজনময়ী প্রতিভা ও ব্রাহ্মণ্য সাধনার বলে সেই স্মৃতিময়ী ভারতকে বিস্মরণের সমুদ্র-তল হইতে সমুদ্র-মন্থনোত্থিতা কমলাসনা লক্ষ্মীর মত তুলিয়া ধরেন। অন্যান্য বহু পণ্ডিতের সহিত তাঁহার একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল যে, যে বিপুল জ্ঞান তিনি আহরণ করিয়াছিলেন, তা একান্ত সহজ হইয়া তাঁহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত এবং নানা খণ্ড তত্ত্বের ও কালের ব্যবধানের মধ্য হইতে তাঁহার সৃজনময়ী প্রতিভা বিলুপ্ত তত্ত্বের বা বিস্মৃত মূর্ত্তির সত্য প্রকাশ অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারিত। পুরাতত্ত্ব বা ঐতিহাসিক আলোচনা এবং অনুসন্ধানের যে নব বৈজ্ঞানিক প্রণালী এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সেই আন্দোলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে দুই একটী মণি-রত্ন লইয়া বহু ব্যক্তি আজ কৃতী ও পণ্ডিত হইয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনায় তিনি একটীর পর একটী যে-সব পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া বহু অনাগত কাল ব্যাপিয়া সুধিজনদিগকে চলিতে হইবে। নেপাল হইতে তিনি যে-সমস্ত অমূল্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন—তাহা তিনি না থাকিলে অন্যত্র চলিয়া যাইত। এসিয়াটিক সোসাইটীতে তিনি সংস্কৃত পুস্তকের যে কয়েক খণ্ড তালিকা করিয়া গিয়াছেন, ভারতের অতীত ইতিহাস পুনরুদ্ধারের অন্ধকার দুরূহ পথে, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। যে অতীতকে আমরা দেখি নাই, যে অতীতকে আমরা কল্পনা করিতে পারি না, সেই অতীতের অলি-গলিতে, রাজপথে-পথে তিনি অতি পুরাতন নাগরিকের মত বিচরণ করিতেন; সেখানকার পথের প্রত্যেক বাঁকটী, সেখানকার নাগরিকদের প্রত্যেকটীকে যেন তিনি বন্ধুভাবে জানিতেন ও চিনিতেন। তাই পুরাতত্ত্ব বা ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার রচনা বা বক্তৃতায় এমন একটা সহজ প্রকাশ মহিমা ফুটিয়া উঠিত, যেন তিনি তাঁহার গত জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতার ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসবের প্রস্তাব করিয়া যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতিরূপে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—"আমি ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন-সভায় সমস্ত লোকের মধ্য হইতে আমাকেই কেন সভাপতি পদে নির্ব্বাচন করা হইল! সম্ভবতঃ সভার উদ্যোক্তৃগণ মনে করিয়াছেন যে, আমি বয়সে কবির অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় এবং একই সময়ে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম ও আমরা উভয়েই বঙ্কিমের প্রতিভার অনতিক্রমনীয় প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং আমাদের উভয়কেই বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের উদীয়মান শক্তিরূপে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছিলেন।"

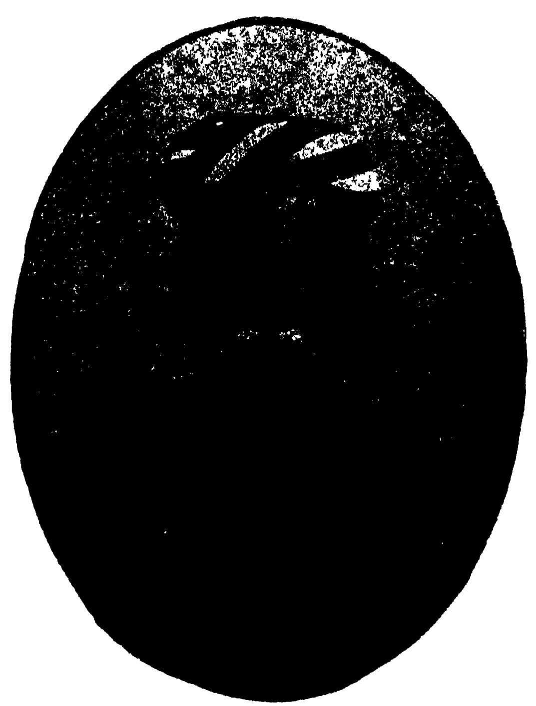
সমগ্র দেশ যখন তাহার কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন জ্যেষ্ঠ হিসাবে আশীর্ব্বাদ করিবার যাঁহার অধিকার ছিল, তিনি পরলোক-গমন করিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্মৃতি-সভায় রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বাঙ্গলা রেনাসাঁসের অপূর্ব্ব কাহিনীর সহিত এই শ্রদ্ধাঞ্জলির যে

গভীর নীরব সম্পর্ক আছে, তাও স্থায়ী কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হওয়া উচিত।

"আমাদের বাল্যকালে আমরা একটা নূতন যুগের অবতারণ দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচার-পদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়-কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল। তার পরে তার পরিণতি দেখেছি রাজেন্দ্রলাল মিত্রে। সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির প্রযত্নে প্রাচীন কাল থেকে আহরিত সাহিত্য এবং পুরাবৃত্তের উপকরণ অনেক জমে উঠেছিল। সেই সকল অসংশ্লিষ্ট উপাদানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সত্যকে উদ্ধার করার কাজে রাজেন্দ্রলাল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষায় ও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাঁর মন মানুষ হয়েছিল; পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর রচনা ইংরেজি ভাষাতেই প্রকাশ হোত। কিন্তু আধুনিক কালের বিদ্যাধারার জন্যে বাংলা ভাষার মধ্যে খাত খনন করার কাজে তিনি প্রধান অগ্রণী ছিলেন, তাঁর দ্বারা প্রকাশিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ তার প্রমাণ। তাঁর লিখিত বাংলা ছিল স্বচ্ছ প্রাঞ্জল নিরলঙ্কার।

সে অনেক দিনের কথা।—সেদিন একদা পূজনীয় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের মাণিকতলার বাড়ীতে কী উপলক্ষ্যে গিয়েছিলুম সেটা উল্লেখযোগ্য। বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বেঁধে দেবার উদ্দেশ্যে তখনকার দিনের প্রধান লেখকদের নিয়ে একটি সমিতি স্থাপনের সঙ্কল্প মনে ছিল। তাতে বঙ্কিমচন্দ্রকেও টেনেছিলুম। বিদ্যাসাগরের কাছেও সাহস করে যাওয়া গেল। তিনি বল্লেন, "তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো সন্দেহ নেই; কিন্তু যদি সাধন করতে চাও তা' হ'লে আমাদের মতো "হোম্‌রা চোম্‌রা"দের কখনই নিয়োনা, আমরা কিছুতে মিলতে পারিনে।" তাঁর কথা কতক অংশে খাট্‌ল, হোম্‌রা-চোম্‌রার দল কেউ কিছুই করেন নি। যত্নের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিলেন একমাত্র রাজেন্দ্রলাল। সমিতির প্রত্যেকের কাছে ফেরি করিয়ে নেবার জন্যে তিনি ভৌগলিক পরিভাষার একটি খসড়া লিখে দিলেন। অনেক চেষ্টা করলুম সকলকে জোট করতে, মিলিয়ে কাজ করতে তখনকার দিনের লোকদের নিয়ে সাহিত্য-পরিষদ খাড়া করে তুল্‌তে;—পারিনি, হয়ত নিজেরই অক্ষমতাবশতঃ। তখন বয়স এত অল্প ছিল যে অনেক চেষ্টায় যাঁদের টেনেওছিলুম তাঁদের কাজে লাগাতে পারলুম না।

আজ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোক-সভায় রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দু'জনের চরিতচিত্র মিলিত হয়ে আছে। তিনি রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন। আমি তাঁদের উভয়েরই মধ্যে একটা গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোনো



স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচার-শক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে বলেননি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন।

হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধির প্রভাবে সংস্কার-মুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনদিন সম্ভবপর ছিলনা। ভূয়োদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সেই স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশের শক্তি আজো আমাদের দেশে বিরল। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই,—অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ ছিলেন সাধকের দলে এবং তাঁর ছিল দর্শন শক্তি।

"আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য-পরিষদে হরপ্রসাদ অনেক দিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এসিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য পরিষদকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ করে রেখেছিলেন। এমন সর্ব্বাঙ্গীন সুযোগ পরিষৎ আর কী কখনো পাবে? যাঁদের কাছ থেকে দুর্লভ দান আমরা পেয়ে থাকি কোনোমতে মনে করতে পারিনে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেই জন্য যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক, দেশ অকালমৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক নির্ব্বাচনের মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখতে হবে যে, আজ যাঁর স্থান শূন্য, একদা যে আসন তিনি অধিকার করেছিলেন, সেই আসনেরই মধ্যে তিনি শক্তি সঞ্চার করে গেছেন এবং অতীতকালকে যিনি ধন্য করেছেন ভাবীকালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ করবেন।"

৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর

আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে পাঠকগণকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের প্রিয় সুহৃৎ রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, আই-এস-ও বাহাদুর ১৯৩১ সালের ২৫এ নবেম্বর তাঁহার ৩০নং হ্যারিসন রোডস্থ বাটীতে অবস্থিতি কালে অপস্মার রোগে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারী ২৪ পরগণার রোহোরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি সেই কলেজে প্রথমে শিক্ষক, পরে অধ্যাপক হন। অধ্যাপকতা করিতে করিতে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। ইহার পর কিছুদিন প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের পার্সনাল এসিষ্ট্যাণ্ট, কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী প্রভৃতি পদে কার্য্য করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেসন পদে উন্নীত হন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিছু কাল তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যও হইয়াছিলেন। এবং আরও কিছুদিন অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জষ্টিস অব দি পীসের কার্য্যও করেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।





সাময়িকী

বিশ্বকবির সপ্ততিতম জন্মদিন উৎসবে—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিন-স্মরণ-উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজাইতে, এই কথা শুধু মনে জাগে, আদি-স্রষ্টার মত মহাকালকে যে ব্যাপ্ত করিয়া রহিল, খণ্ডকালের সীমান্ত-রেখাকে চিহ্নিত করিয়া তাহাকে কি সম্মান দিব ?

বহুযুগ আগে একদিন এই ভারতের এক পুণ্যক্ষেত্রে এক ভুবন-বিজয়ী বীর আপনার রথের সারথির বিশ্বরূপ দেখিয়া যেমন চরম বিস্ময়ে বলিয়াছিল, কোন্ দিকে তোমায় বন্দনা করিব ?—তেমনি আজ অনুভূতির সমুদ্র-তলে অবগাহন করিয়া দেখি, হে কবি, মানসক্ষীরোদসিন্ধুশায়ী, কোন্ অনুভূতি দিয়া তোমার অর্ঘ্য রচনা করিব ?

তাই আজ বিস্ময় দিয়া তোমার বন্দনা রচনা করিলাম —যে-বিস্ময় ছিল সৃষ্টির প্রথম দিনে প্রথম রবির উদয়ে এই কুমারী ধরণীর বুকে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন—

জাতির এই সঙ্কটময় অবস্থায় পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বহরমপুরে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে মৌলভী আবদুস্ সমদ সাহেব যে সুচিন্তিত ও প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছেন—তাহা সত্যই দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ এই জাতির পক্ষে একান্ত কল্যাণকর। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-সমস্যাই ছিল তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিষয় এবং উহা যে বর্ত্তমান সময়ে রাজনীতির অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে উদার ও সহজ মনোবৃত্তি লইয়া মৌলভী সাহেব এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন—আশা করি, বাঙ্গলার অন্যান্য মুসলমান নেতা ও জনসাধারণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। গোলটেবিল বৈঠকে স্বজাতীয় নেতাদের অপকীর্ত্তি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া তিনি স্বার্থান্ধ পৃথক-নীতির মারাত্মক ফলাফলের কথা অভিভাষণে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। অভিভাষণে তিনি বলেন, "আমি আমার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে আমাদের অস্তিমের কাণ্ডারী পয়গম্বর শ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদের সেই অমৃতবাণী—"হুব্বল্ ওতন মেনাল ঈমান" (অর্থাৎ স্বদেশ-প্রেম ঈমানের অন্তর্গত) স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন দলে দলে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। ভারতের সকল জাতির একমাত্র প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস,—কংগ্রেস একমাত্র সভা, যাহার দ্বার সকল জাতির জন্য, সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য সদাই উন্মুক্ত। দেশকে, জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের কবল হইতে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি আছে কংগ্রেসের। মুসলমান হাজারে হাজারে আসিয়া এই জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করুন—ইহার শক্তি বৃদ্ধি করুন—ইহাই আমার অনুরোধ। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আপনাদের যদি কোন অভিযোগ থাকে, তবে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিলে তাহার প্রতিকার হইবে না। বরং কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া সেই সকল অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে।"

সভাপতির অভিভাষণ—

বাঙ্গলার চির-তরুণ বৃদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে যে রুদ্র-সতর্ক বাণীর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হয়ত সরকার না শুনিতে পারেন; কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তরবারি দিয়া শাসনের দিন অনেকদিন হইল অতীত হইয়া গিয়াছে। নাগ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন,

"পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানব-প্রকৃতি বীরদর্পে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আর ভারতের মানব-প্রকৃতিকে তোমরা স্বার্থান্ধ হইয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছ। এই বিশাল দেশের বিরাট মনুষ্য-প্রকৃতিকে তোমরা তরবারি শাসন দ্বারা চাপিয়া রাখিতেছ। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় নিরপরাধের

উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত কোন ইতিহাসে নাই। হিজলীর বন্দীদের উপর গুলী চালান হইয়াছে। সভ্য-জগতে ঐরূপ লজ্জাকর ঘটনা আর কোথায় ঘটিয়াছে বলিতে পার কি? তোমাদের প্ররোচনায় গবর্ণমেণ্ট নূতন নূতন অনুশাসন, সরাসরি বিচারপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতেছেন, আর তোমরা কাল্পনিক শত্রু দমন হইতেছে বলিয়া উল্লসিত হইতেছ। মস্তিষ্ক হারাইয়া দেশে আগুন জ্বালাইও না। দেশময় আগুন জ্বলিলে দেশ পুড়িয়া মরিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তোমাদের কোনই লাভ হইবে না। চট্টগ্রাম, হিজলী ও ঢাকার ঘটনার দ্বারা তোমাদের দমননীতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে যদি মনে কর, তাহা হইলে তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা আছে বলিয়া মনে করা কঠিন হইবে। কালস্রোত তরবারির শাসনের দিন অনেক পিছে লইয়া গিয়াছে। তরবারির সাহায্যে বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয়ের দিন আর ফিরিয়া আসিবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া সময়স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে না চলিলে সকলকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।"

প্রাদেশিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী—

প্রাদেশিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত মূল প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়,

(১) বৃটিশ পণ্য-বর্জ্জন,

(২) যে সমস্ত ব্যাঙ্ক, বীমা-কোম্পানী, ষ্টীমার-কোম্পানী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বৃটিশ দ্বারা পরিচালিত সেইগুলি এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্র বর্জ্জন,

(৩) বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন,

(৪) মাদক-দ্রব্য বর্জ্জন।

প্রস্তাবগুলি কোনটাই নূতন নয়। বহুদিন ধরিয়া জাতি এই পথে অগ্রসর হইতেছে। একান্ত স্বাভাবিক নিয়মে এমন দিন সহজেই আসা উচিত যখন এই সমস্ত বিষয়ের জন্য সভা করিয়া আর প্রস্তাব করিতে হইবে না। যে-জাতির আত্ম-সম্মান-বোধ জাগ্রত হয়, তাহাকে প্রস্তাব করিয়া আর তখন তাহা বলিয়া দিতে হয় না। এখনও যে সভা করিয়া এই সব প্রস্তাব করিতে হইতেছে, ইহাতে জাতির অন্তরের দৈন্য ও জড়তা যে আজও বিদূরিত হয় নাই, তাহাই বুঝায়।

পোষ্টকার্ড ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি—

জনসাধারণের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নূতন সরকারী আইন অনুসারে ১৯৩১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর হইতে খাম ও পোষ্টকার্ডের দাম চড়িবে এবং টেলিগ্রাফ মণি-অর্ডারের উপর অতিরিক্ত ফী ধার্য্য হইবে। ২॥০ তোলার অনধিক ওজনের চিঠির জন্য ৫ পয়সার টিকিট দিতে হইবে, তদতিরিক্ত প্রতি আড়াই তোলা অথবা ঐ ওজনের কোন অংশের জন্যও ৫ পয়সা করিয়া দিতে হইবে। পোষ্টকার্ডের মূল্য তিন পয়সা এবং জোড়া পোষ্টকার্ডের মূল্য ছয় পয়সা হইবে। কোন কার্ডে যদি টিকিট না দিয়া ডাকে দেওয়া হয়, তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে।

প্রত্যেক টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারের জন্য যথারীতি যে মণিঅর্ডার কমিশন এবং টেলিগ্রাফের ফী দিতে হইবে, তদতিরিক্তও দুই আনা করিয়া দিতে হইবে। বিদেশী টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারের উপরও ফী ধার্য্য হইবে। টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার যে ধরণের যত টাকার জন্যই হউক না কেন, প্রত্যেক থানার জন্য ঐ দুই আনা অতিরিক্ত ফী লওয়া হইবে।

যেখানে সরকারী আয়ের শতকরা ৬৬৲ টাকা সেনা বিভাগের জন্য ব্যয় হয়, (অন্যান্য দেশে হয় ৩৲ হইতে ৬৲ টাকা) সে-দেশে এইভাবে দরিদ্র কর-দাতাকে পীড়ন করিয়া অর্থনৈতিক সাম্য কতদিন বজায় রাখা চলে?

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অবসান—

হাস্য, পরিহাস ও রসিকতার মধ্যে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের বিদায়-পালা উপলক্ষে প্রধান-মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড গুরুগম্ভীর রাজনৈতিক আব-হাওয়ার মধ্যে একটু রসিকতার অবতারণা করেন। বক্তৃতা দিতে উঠিয়াই প্রধান মন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীর আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্দ্যের প্রশংসা করিয়া বলেন—"তবে একটি বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমার ঝগড়া করিবার আছে,—তিনি কেন আমার তুলনায় নিজেকে বৃদ্ধ বলিলেন? (হাস্য) মহাত্মার অনেক বৎসর এখনও হাতে আছে। গত কল্য রাত্রি ১২টার সময় যিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন তিনি যুবক

(হাস্য)। সভাপতির আসনে যিনি ছিলেন তিনিই বৃদ্ধ। আমি জানি না আমাদের মধ্যে কাহাকে বেশী বৃদ্ধ দেখায়, কিন্তু হিসাবপত্র হইতে বুঝা যায় যে গান্ধীর অপেক্ষা স্বাভাবিক নিয়মে আমার শেষ সময় অনেক নিকটবর্ত্তী এবং দীর্ঘ বৈঠক সম্বন্ধে যদি কাহারও অভিযোগ করার থাকে তাহা হইলে যে যুবক বক্তৃতা দিতাছেন তাঁহার উহা নাই, যে বৃদ্ধ সভাপতিত্ব করিয়াছে অভিযোগ তাহারই আছে—তাহাকে আপনারা রাত্রি ২॥টা পর্য্যন্ত জাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং বিবৃতি লইয়া প্রস্তুত হইয়া এখানে আসিবার জন্য আবার সকাল ৬টার সময়ই শয্যাত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। এইখানেই ত' অভিযোগের কথা, কিন্তু আমার একবিন্দুও অভিযোগ নাই, কারণ ভারতের স্বার্থের জন্যই এই ব্যাপার হইয়াছে।

আমার পুরাতন বন্ধু স্যার আবদুল কায়াম প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া আমি খুব আনন্দিত, গান্ধী এবং তিনি একমত হইয়াছেন, ইহাই ত একটা মস্ত লাভ। ইহা হইতেই ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে—ভবিষ্যতে মুসলমান এবং হিন্দু···(মহাত্মা এই সময় বাধা দিয়া বলেন "হিন্দু নহে") সভাপতি বলেন, "গান্ধী মানুষের সহজ কথার ফাঁক বুঝিয়া ফেলেন। মহাত্মা গান্ধী—"আমি উহা ক্ষমা করিলাম।" সভাপতি—গান্ধী আমার মতন লোকের সহজ কথার ফাঁক বুঝিয়া ফেলেন। মুসলমান ও অন্যান্য সকলে (হাস্য এবং আনন্দধ্বনি) ভবিষ্যতে এক হইবেন। আমি গান্ধীর চিন্তাগুলি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, কারণ তিনি বরাবরই আমাদের বলিয়াছেন যে, তোমরা বিভিন্ন দলমাত্র এবং আমি তোমাদের সকলকে ধারণ করিয়া আছি। মহাত্মা—"অবশ্যই"। সভাপতি—সহযোগিতার জন্য আপনাদের মিলনে যে ফল হইয়াছে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখুন এবং স্কচম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করুন। প্রিয় মহাত্মা, আসুন আমরা এইরূপেই অগ্রসর হই। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। হয়ত আপনি দেখিতে পাইবেন যে, ইহাই একমাত্র উপায়। এই পথে অগ্রসর হইলেই আমরা উভয়ে নিশ্চয়ই আমাদের কার্য্যের জন্য মহৎ গৌরব বোধ করিতে সমর্থ হইব এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উৎসে যে মহৎ আধ্যাত্মিক প্রেরণা আছে তাহার সহিত আমাদের রাজনীতিক কার্য্যাবলীর সংযোগ সাধনে সমর্থ হইব।

গোলটেবিল বৈঠকে হইল কি ?—

দুই মাস ধরিয়া নানাবিধ তর্ক-আলোচনার পর গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন আপাততঃ শেষ হইয়া গেল। অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে ইহা মাঝপথে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অপূর্ব্ব ধৈর্য্য তাহা ঘটিতে দেয় নাই। এই বৈঠকের ফলে স্পষ্টতঃ কোনও নূতন অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—মূলতঃ ইহার সিদ্ধান্ত প্রথম বৈঠকের পুনরাবৃত্তি মাত্র। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্রের স্বরূপ এই বৈঠক বসিবার পূর্ব্বে যেরূপ ধোঁয়াটে ছিল, অধিবেশন শেষ হইবার পরও সেইরূপ রহিয়া গেল। বহুদিনের দেওয়া প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি ব্যতীত এই দুই মাসের আলোচনার কোনও বিশেষ সাক্ষাৎ ফল দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তবে একটা বিষয় যে, আলোচনা বা মীমাংসার পথ বন্ধ হইয়া যায় নাই। লণ্ডনের অধিবেশন শেষ হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও এই সম্বন্ধে মীমাংসার সম্ভাবনা রহিল। প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যায়,—

(১) বর্ত্তমান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিগত ১৯শে জানুয়ারী তারিখের ঘোষণার পুনরুক্তি করিতেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষ লইয়া সংযুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস আছে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই পথই অনুসরণ করিবেন।

(২) প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার মধ্যে যে নীতির কথা আছে, তাহা অনুমোদন করিবার জন্য শীঘ্রই পার্লামেণ্টের কমন্স সভাকে অনুরোধ করা হইবে।

(৩) অল্পদিনের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারেন, তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং একটা মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(৪) সকলের সম্মতিকে ভিত্তি করিয়া নির্দ্ধারিত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সমূহের স্বাভাবিক দাবী ও অধিকার রক্ষা করা হইবে—এই মর্ম্মে শাসনতন্ত্রের মধ্যে একটি বিধান সংযুক্ত করা হইবে।

(৫) গোলটেবিল বৈঠকের একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হইবে। ভারতের বড়লাটের মারফতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সময় সময় এই কমিটির সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৬) শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুতের জন্য যে কমিটি গঠিত হইবে, সেই কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করিবার জন্য তৃতীয়বার গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা হইবে।

(৭) সীমান্তের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এবং বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইনের গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া অগৌনে সীমান্ত প্রদেশকে গবর্ণর-শাসিত প্রদেশের সমান করা হইবে।

(৮) অর্থ-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইলে সিন্ধুদেশকে পৃথক্ প্রদেশ করা হইবে এবং অর্থ-সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা হইবে।

(৯) তিনটি নূতন কমিটি গঠন করা হইবে :—(ক) বাজেটের ভিত্তিতে সংযুক্ত রাষ্ট্রের রাজস্ব সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি হইবে (খ) ভোটাধিকার ও নির্ব্বাচন কেন্দ্র সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য একটি কমিটি করা হইবে (গ) দেশী রাজ্যের সহিত বর্ত্তমানে যে-সমস্ত সন্ধি আছে, তাহার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য আর একটি কমিটি হইবে।

(১০) কেন্দ্রীয় আইন সভায় কোন দেশীয় রাজ্য হইতে কতজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে সাহায্য করিবেন।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শেষ কথা—

প্রধান মন্ত্রী একান্ত অমায়িক ভাষায় মহাত্মা গান্ধীকে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যদি শুধু মিষ্ট ভাষা ব্যবহারের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া যাইত, তাহা হইল ভাবনার কিছুই ছিল না। তাই গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাঁহার শেষ বক্তব্য তাঁহার স্বাভাবিক নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে বলেন, "সম্মানজনক সর্ত্তে আমরা সখ্যতার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কংগ্রেস শুধু কথার চালে ভুলিবে না। গান্ধীজী —আমাকে কিছু না বলিতে হইলেই ভাল ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শেষ কথা আমি যদি না বলি, তাহা হইলে আপনাদের প্রতি এবং আমার নিজের নীতির প্রতিও সুবিচার করা হইবে না। আমি কোনরূপ কুহকের রাজ্যে বাস করি না। প্রস্তাবিত রক্ষা-কবচ সমূহ ভারতের স্বার্থের অনুকূল নহে এবং মোটেই সন্তোষজনক নহে। আমরা আপোষ করিতে পারি, তবে সেটা করিতে প্রকৃত স্বাধীনতা ও সম্মান বজায় রাখিতে হইবে। বলিতে গেলে একটা সমগ্র মহাদেশের স্বাধীনতা যে শুধু যুক্তিতর্কের কাটাকাটি বা কসরতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আলোচনাও যদি কতকগুলি সর্ত্তের মধ্যে হয়, সে আলোচনায় কোন ফল হয় না। বৈঠকের নিকট যে সব রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশের সহিতই আমি মতদ্বৈধ প্রকাশ করিয়াছি, কারণ তাহা না করিলে আমার পক্ষে প্রকৃতরূপে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করা হয় না। নিজের হাতে কোনরূপ সামরিক বল না থাকা সত্ত্বেও—প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও যে প্রতিষ্ঠান প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট চালাইতে সক্ষম, আমাদিগকে স্বাধীনতা দানের ইচ্ছাই যদি আপনাদের থাকিত, তাহা হইলে আপনারা সেই প্রতিষ্ঠানকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেন। কংগ্রেসকে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার কংগ্রেসের যে দাবী, তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। আমি জানি, সে দাবী প্রতিপন্ন করা এখানে আমার পক্ষে সম্ভব নহে, তবু জোরের সঙ্গেই আমি সে দাবী করিব; কারণ আমার উপর গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে।

ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে আইন-অমান্যের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় না ফেলিয়া তিনি সম্মানজনক মীমাংসা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু যদি ব্যর্থ হন তবে তিনি সানন্দে ঐ অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইবেন।

মহাত্মাজী বলেন, লর্ড আরুইন আমাদিগকে যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অর্ডিন্যান্স কিংবা লাঠি কিছুই স্বাধীনতার স্রোতবেগে বাধা দিতে পারিবে না। আমার জীবন আপনাদের হাতে, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সকলের জীবন, নিখিলভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সকলের জীবন আপনাদের হাতে; কিন্তু লক্ষ লক্ষ

মুক জনসাধারণের জীবনরক্ষা করিবার শক্তি যদি আমার থাকে আমি তাহা উৎসর্গ করিতে চাহি না।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, আপোষ মীমাংসায় তাঁহার কোন আপত্তি নেই, তবে সেটা সম্মানজনক হওয়া চাই এবং তাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা চাই, এখন তাহার যে নামই দেওয়া হউক। তিনি প্রকৃত স্বাধীনতা চান। তিনি বন্ধুত্ব স্থাপনই করিতে চান এবং ভারত ও ইংলণ্ডের যোগসূত্র ছিন্ন করিতে চান না—এই বন্ধুতার যোগসূত্র স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। প্রস্তাবিত রক্ষাকবচ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কিত রক্ষাকবচগুলি ভারতের স্বার্থকে সঙ্কুচিতই করিবে। রক্ষাকবচ দেওয়া হইবে বলিয়া কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সেগুলি ভারতের স্বার্থের অনুকূলেই হওয়া উচিত এবং ইংলণ্ডের স্বার্থের প্রতিকূলজনক না হওয়াই উচিত। ভারতের ও ইংলণ্ডের খেয়ালমাফিক এবং অবৈধ স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে দূরীভূত করিতে হইবে। আমি আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে চাই না। আমি চাই সাময়িক যুদ্ধবিরতিকে স্থায়ী শান্তিতে পরিণত করিতে। যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন, তবে ইহা কিছুই নহে—কিন্তু কংগ্রেসকে বিশ্বাস করুন—কারণ কংগ্রেস আমার চেয়েও বড়।

আপনারা আপনাদের নিজের সুগঠিত বিভীষিকাপূর্ণ নীতি দ্বারা বিপ্লবীদের বিভীষিকার সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন। কিন্তু ভারতকে যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা স্বাধীনতা না দিতেছেন, এমন সহস্র সহস্র লোক আজ প্রস্তুত আছে, যাহারা ততদিন নিজেরাও শান্তি কাহাকে বলে জানিবে না, আপনাদিগকেও জানিতে দিবে না।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধান না করিয়া ভারতে স্বরাজ হইতে পারে না; কিন্তু ইহার সমাধানে আমি নিরাশ হই নাই। যে পর্য্যন্ত বিদেশী শাসন থাকিবে সে পর্য্যন্ত পারিবে না।

ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে এই সমস্যা ছিল না এবং এখনও হিন্দু ও মুসলমানেরা গ্রামে শান্তিতেই বাস করে!

আইন অমান্য আন্দোলন ঠেকাইয়া রাখার চেষ্টা করার সময় চলিয়া গিয়াছে। আমি অন্য পথ ধরিবার মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তথাপি এখনো একটা আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য আমি কোন ত্যাগকেই অত্যধিক বলিয়া মনে করিব না। কংগ্রেস আন্দোলনের যাহা প্রাণ—অর্থাৎ "ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা" এই আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণায় যদি আমি আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে দেখিবেন আমি সর্ব্বদাই আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য উদগ্রীব। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা আমার স্বাধীনতার দাবী মানিয়া না লইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপোষ-নিষ্পত্তি অসম্ভব।

আমি বিবেচনা করিতে প্রস্তুত। ধর্ম্মের দোহাই, আপনারা এই বৃদ্ধকে, যাহার মাথার উপর দিয়া ৬২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে, একটিবার সুযোগ দিন। তাহার প্রতি এবং সে যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটু সুবিচার করুন;—বাহ্যতঃ আমাকে আপনারা বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, আমি যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। উক্ত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমার ব্যক্তিত্ব নগণ্য—কংগ্রেসের নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন কিছু করিবার অধিকার আমার নাই।

বৈঠকের শেষে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা—

বৈঠকের অধিবেশন শেষ হইবার পরও মহাত্মা গান্ধী প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী সাক্ষাৎভাবে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা সম্বন্ধে ভারত-সচিবকে জেরা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে ঐ ঘোষণায় যে সব রক্ষাকবচের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে কি না।

প্রকাশ স্যার সেমুয়েল হোর গান্ধীজীকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে যুক্তরাষ্ট্র কমিটীর কোন সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত নহে—কেন না পার্লামেণ্টে যে সব প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতেই রহিয়াছে। বর্ত্তমানে গোলটেবিল বৈঠকের যে কার্য্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে এবং যাহার বিষয় প্রধান মন্ত্রী ঘোষণ করিয়াছেন, সেই কমিটি ইচ্ছা করিলে গবর্ণ-

মেণ্টের কাছে কতকগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের রক্ষাকবচের প্রস্তাব করিতে পারেন। তবে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং রক্ষাকবচগুলির আকৃতি দেখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐগুলি সমর্থন করিবেন কি না তাহা স্থির করিবেন।

এই সব আলোচনার ফলে গান্ধীজীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ যে, কতকগুলি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পাইলে তিনি জাতীয় হিসাবে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার জন্য এবং গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্যকরী সমিতিতে সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুমতি দিতে তিনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ করিবেন।

ইংলণ্ড হইতে বিদায়-কালে মহাত্মার বাণী—

মহাত্মা গান্ধী ইংলণ্ডের উপকূল ত্যাগ করিয়া জাহাজে উঠিবার সময় রয়টারের বিশেষ প্রতিনিধির নিকট ইংলণ্ড-বাসীদের প্রতি নিম্নলিখিত শেষ বিদায়বাণী প্রদান করেন:—

"ভারতে ফিরিতেছি, এজন্য আমি আনন্দিত, কিন্তু ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। এখানে আমি খুব সুখে ছিলাম।"

অতঃপর মহাত্মাজী বলেন—"ভগবানের যদি ইচ্ছা থাকে, আমাকে ইংরাজদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, এ কথা আমি যখন বলি, তখন ইংরেজেরা যেন আমাকে বিশ্বাস করেন। আমি নিশ্চয়ই বিদ্বেষপরবশ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না। যাঁহারা আমার অত্যন্ত প্রিয়তম আত্মীয়, তাঁহাদের কাহার কাহারও সঙ্গে আমাকে যেরূপ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, সেইরূপ প্রেমপ্রবৃত্ত হইয়াই আমি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইব। সুতরাং ভারতের আত্মমর্য্যাদা অব্যাহত রাখিয়া যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করাই আমার সঙ্কল্প।"

য়ুরোপ ও এশিয়ার ঋষির মিলন—

ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধী য়ুরোপের ঋষি রোমাঁ রল্যাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ফ্রান্সের মধ্য দিয়া সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। দুইজনেই জীবনের প্রথম জাগরণ-ক্ষণে একই গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করেন, সে গুরু রুষিয়ার ঋষি টলষ্টয়। আন্তর্জাতিক কৃষ্টির ইতিহাসে এই মিলন একটী অতি সুন্দর রূপকের মত লাগে। জ্ঞানের পাবক-শিখা ভৌগোলিক সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করিয়া দেশে দেশান্তরে জ্বলিতেছে। একদিন সেই পাবক-শিখার আলোকে বিশ্ব-রাষ্ট্র-মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান বসিবে—রাজনৈতিক মিথ্যা কথার চাতুরী সে অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যাইবে—রণ-বিলাসীর রক্ত-বুভুক্ষা স্তিমিত হইয়া আসিবে—ইহা যেন তাহারই প্রতীক্।

বাঙ্গলার নূতন আধা-জঙ্গী আইন—

বিলাতে যখন প্রধান-মন্ত্রী একান্ত অমায়িক ভাষায় সহযোগিতার জন্য জাতীয় নেতাদের আহ্বান করিতেছেন, বাঙ্গলায় তখন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে দমন করিবার উপলক্ষে সরকার ব্যাপকভাবে এমন সব দমন-নীতির সৃষ্টি করিতে-ছেন, যাহাতে মনে হয় যে সমগ্র দেশ যেন সশস্ত্রভাবে বিপ্লবী হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার আর একটী নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। ইহার নাম বেঙ্গল ইমার্জ্জেন্সী পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স। এই অর্ডিন্যান্সের প্রধান সূত্রগুলি হইতেছে,

(১) কোন লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ফেরারী আসামীর সহিত যোগাযোগ রাখিতে অথবা তাহাকে খাদ্য, পানীয়, অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ বা অন্য কোন দ্রব্য সরবরাহ করিতে বা অন্য কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারিবে না।

(২) যে কোন সামরিক কর্ম্মচারী এবং এ্যাসিষ্টাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টার পর্য্যন্ত যে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী বা ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফলস্ ও আসাম রাইফেলসের স্থলে জমাদার পর্য্যন্ত যে কোন কর্ম্মচারী যখনই কোন ফেরারী আসামীর সহিত যোগাযোগ বন্ধ করা বা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর নিরাপত্তা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তখনই তাহার তারের সংবাদ, টেলিফোন সংবাদ, খামের চিঠি, পোষ্টকার্ড এবং পার্শেল আটক করার ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি সামরিক বা পুলিশ কর্ম্মচারীর নিরাপত্তার বিঘ্নকর কোন সংবাদ পাইলে তাহাকে তৎ-

ক্ষণাৎ উহা নিকটতম ম্যাজিষ্ট্রেট, সামরিক কর্ম্মচারী বা পুলিশ কর্ম্মচারীকে জানাইতে হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইতেছে বা ফেরারী আসামী অথবা বিপ্লবীর জন্য কোন সংবাদ লইয়া যাইতেছে বা বে-আইনী অথবা অবৈধভাবে প্রয়োগ করার জন্য কোন দ্রব্য লইয়া যাইতেছে সন্দেহ হইলে, সামরিক বা পুলিশ বাহিনীর যে কোন লোকই তাহাকে থামাইয়া তাহার শরীর তল্লাস করিতে পারিবেন।

(৫) কোন লোকই সামরিক বা পুলিশ বাহিনীর কোন লোকের গতিরোধ বা গতিরোধের চেষ্টা বা গতিরোধের জন্য কাহাকেও উত্তেজিত করিতে পারিবে না।

(৬) কোন লোক সামরিক, পুলিশ বা জনসাধারণের সম্পত্তি অনিষ্ট করার উদ্দেশ্য বা প্রচেষ্টার কথা জানিতে পারিলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটতম সামরিক বা পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট উহা রিপোর্ট করিতে হইবে।

(৭) কোনও ব্যক্তি সামরিক বা পুলিশবাহিনী সম্পর্কিত কোনরূপ সংবাদ সামরিক বা পুলিশবাহিনীর কোনও লোকের নিকট হইতে অথবা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোনও কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জানিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না।

(৮) কোনও ব্যক্তি সামরিক বা পুলিশবাহিনী সম্পর্কিত কোনও সংবাদ কোনও সংবাদপত্রে আদান-প্রদান করিতে পারিবে না।

(৯) সামরিক বা পুলিশবাহিনী সম্পর্কিত কোনও সংবাদ কোনও সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন না। সামরিক বা পুলিশবাহিনী সম্পর্কিত কোনও সংবাদ যদি কোনও সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, তবে উক্ত সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, সম্পাদক এবং প্রিণ্টারকে ঐরূপ সংবাদ প্রকাশের জন্য দায়ী করা হইবে।

(১০) কোনও ব্যক্তি বেতার যন্ত্রের গ্রাহক বা প্রেরক কোনরূপ যন্ত্রই ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(১১) কাহারও চালচলনে সন্দেহের উদ্ভব হইলে তাহার নিকট হইতে তাহার বিবৃতি আদায় করিয়া লইবার জন্য বা উহার সত্যতা সপ্রমাণ জন্য তাহাকে ২৪ ঘণ্টাকাল আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিবে।

(১২) আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে কোন জমিদার ও যে কোন স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারী বা যে কোন স্কুল কলেজ ও শিক্ষালয়ের যে কোন শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১৩) স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, কোন অঞ্চল বিশেষের লোকেরা নির্দ্দিষ্ট অপরাধে লিপ্ত আছে বা উক্তরূপ অপরাধে সহায়তা করিতেছে, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর উক্ত স্থানীয় সরকার জরিমানা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

(১৪) বৈপ্লবিক অপরাধ সংশ্লিষ্ট হত্যার প্রচেষ্টাকে ট্রাইব্যুনাল সর্ব্বোচ্চ অপরাধ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিবেন।

(১৫) স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

নূতন অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী—

ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জাহাজে আরোহণ করিবার সময় মহাত্মা গান্ধী বলেন,—

"আমি এ কথা না বলিয়া পারিতেছি না যে, নূতন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ধারাগুলি আমি যতই পাঠ করিতেছি, ততই আমার মনে আশঙ্কার কারণ প্রবলতর হইতেছে। নরহত্যার উদ্যমকারীকে পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধান হইয়াছে। এরূপ কঠোর বিধান আরও অনেকগুলি আছে। আমার মতে সেগুলি অধিকতর মারাত্মক। প্রয়োজন হইলে আমরা কয়েকজন নিরপরাধ লোকের মস্তক দান করিতে পারি; কিন্তু সমস্ত জাতির মনুষ্যত্ব নাশ করিবার যে ব্যবস্থা, তাহার কথা ভাবিয়া স্থির থাকিতে পারি না। আমি তাই আশা করিতেছি, নূতন বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বিধানগুলি খুব ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়া বৃটিশ জাতি ইহা প্রত্যাহারের জন্য জিদ করিবেন। আমার মতে, এরূপ হুকুমনামা জারী করা রাজনৈতিক ক্ষমতার অমানুষিক প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নহে।"

লয়েড জর্জ্জ ও মহাত্মা গান্ধী

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও জগতের রাজনৈতিক ইতিহাসে "ওয়েলস্ দেশের মায়াবী" বলিয়া খ্যাত, ধুরন্ধর রাজনীতিক মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ কলম্বো যাইবার পথে

বোম্বেতে আগমন করেন। বোম্বে কর্পোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে এই কূটবুদ্ধি রাজনীতিক যেভাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে এদেশবাসী কোন কোন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ কাগজ এতই মর্ম্মাহত হইয়াছেন যে, সে সংবাদটুকুও ছাপিতে পারেন নাই। লয়েড্ জর্জ্জের সহিত ভারতের তথা প্রাচ্যের নানা দিক দিয়া নানা যোগ আছে এবং এ কথা স্থির যে আমরা কোন দিনই এই মায়াবীর কোনও কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু আজ যেভাবে লয়েড্ জর্জ্জ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি শ্রদ্ধার নিবেদন করিয়াছেন, তাহাতে তিনিই মহৎ হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ইংলণ্ড ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব্বে আপনাদের মহান্ নেতা মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ পাইবার আমি শেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ব্যক্তিগত কষ্ট স্বীকার করিয়া এক কুজ্ঝটিকাময় নিশীথে তিনি আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিন ঘণ্টারও অধিক কাল, আমার সহিত আলোচনা করেন এবং অভিব্যক্তির অতুলনীয় ক্ষমতাবলে তিনি আমার নিকট তাঁহার দেশের প্রশ্নগুলি উত্থাপিত করেন। আমি একজন রাজনীতিক এবং আমার বলিতে কোন সঙ্কোচ নাই যে, মহাত্মা গান্ধীকেও আমি একজন রাজনীতিক বলিয়া বুঝিয়া লইলাম। আমার রাজনীতিক হৃদয়ে তিনি একটা সুন্দর ছাপ আঁকিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় বিচক্ষণ, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। আমিও তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপী তাঁহার অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য বাক্‌শক্তির পরিচয় পাইয়া সত্যসত্যই বুঝিলাম, তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক। গ্রেটবৃটেনের অধিবাসীগণ এখনও সম্মিলিতভাবে মিলনের পথ খুঁজিয়া পাইতে ব্যগ্র এবং আমি বিশ্বাস করি তাহা হইবেও। পুরাকাল হইতে পুরুষানুক্রমে আপনাদের সভ্যতার দান, উৎকর্ষের পরিমাণ এবং আপনাদের দেশের মহামনীষিগণের জীবনের আদর্শ ও দর্শনের জ্ঞান শুদ্ধ মাত্র বৃটেনে নহে সমগ্র জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং আমি ভবিষ্যতের আশাপথ লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত "সনাতন হিন্দু"—১৷৹

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত "স্বদেশী যুগের স্মৃতি"—১৷৹

শ্রীঅখিলচন্দ্র ঘোষ এম-এ প্রণীত "রাজর্ষি রামমোহন"—৸৹

সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য কৃত "কর্ম্মতত্ত্ব"; শ্রীমৎ সাংখ্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এসসি কৃত টীকা সমেত—১৲

শ্রীঅঘোরনাথ কাব্যতীর্থ প্রণীত পৌরাণিক নাটক "রণচণ্ডী"—১৷৹ ও "যাজ্ঞসেনী"—১৷৹

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী বিদ্যাবিনোদ প্রণীত পৌরাণিক নাটক "ধূম্রমায়"—১৷৹

শ্রীশৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত উপন্যাস "সেথকাটির নীলকুঠি"—১৷৹

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভাবকুসুমাঞ্জলি"—৷৹

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "রহস্য-লহরী" সিরিজ "বোম্বেটে-পল্টন" ও "দস্যুরাজ্যের লাট"; প্রত্যেকখানি—৸৹

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ প্রণীত "বড়-মা"—১৷৹

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব"—৸৹

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম-এ প্রণীত "বাংলার মনীষী"—১৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA,
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR,
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.



ঝরা ফুলের কাহিনী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত খগেন রায়



ভারতবর্ষ

মাঘ—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড } উনবিংশ বর্ষ { দ্বিতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালা সাহিত্যে Romanticism

এ, হাকিম এম-এ, বি-এল্

যে দিন Wordsworth ও Coleridge তাঁদের "Lyrical Ballads" প্রকাশ করিলেন, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। অষ্টাদশ শতাব্দী "রহস্য" বলিয়া কোন জিনিসকে স্বীকার করিতে চায় নাই,—যা কিছু "অলৌকিক" আখ্যা পাইতে অধিকারী, তাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতর নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট করান হইয়াছে। রামধনুর রহস্যের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, আমরা তার জাতি-কুলের পরিচয় পাইয়াছি। পৃথিবীতে আর পরীর মেলা বসে না। বিশ্ব-বিজয়ী বিজ্ঞান সমস্ত রহস্যের কুঞ্জিকাঠির সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণ-উষায় যে দিন "Lyrical Ballads" প্রকাশিত হইল, সেই দিন হইতে আবার স্বর্গীয় পরীবালাগণ একে একে ভূতলে অবতীর্ণা হইতে লাগিলেন। পল্লীর মাঠ, পল্লীর নদী, পল্লীর আকাশ, পল্লীর বাতাস এক রহস্যের আবরণে ঘিরিয়া গেল; পল্লীর দোয়েল, পল্লীর পাপিয়া, পল্লীর বুলবুল রহস্যের গান গাহিয়া উঠিল। পল্লীবালার কণ্ঠে "Old, unhappy, far-off thing" ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। জানার দেশে না-জানার বহর বাড়িয়া গেল। যা কিছু Familiar ছিল সব আবার Unfamiliar হইয়া উঠিল। Coleridge-এর Ancient Mariner রহস্যের বাণিজ্য হইতে পণ্যসম্ভার লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। Wordsworth অস্তগামী সূর্য্যের সোণালি কিরণে, বিশাল

জলধি-বক্ষে, বিরাট আকাশ-গাত্রে ও মানবের হৃদি-পদ্মাসনে কার রাঙা চরণের সন্ধান পাইয়া আসিলেন। Shelley নিশীথ রাত্রে চিররহস্যের আগার প্রণয়-বিধুরা রাজকুমারীর বিরহের গান শুনিয়া আসিলেন। Keats কোন্ অচিন 'পরীরাজার' দেশে গমন করিয়া মায়া-অট্টালিকার গবাক্ষপথে অপহৃতা রাজকুমারীর ব্যথামলিন মুখখানি দেখিয়া আসিলেন।

ইংরাজী সাহিত্যের সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্য এই অপূর্ব্ব স্পন্দন লাভ করিতে পারে নাই। গতানুগতিকের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া যে সাহিত্যসৃষ্টি, সে আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রে। একটা অসাড়, পরাধীন, মৃতকল্প জাতিকে আত্মমর্য্যাদায় জাগাইয়া তুলিতে হইলে যে সাধনা আবশ্যক, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। সেই সাধনা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে Sir Walter Scott যেমন তাঁর জন্মভূমির অতীত গৌরব কাহিনী লইয়া অমর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইতিহাসের নীরস উষর পথ পরিত্যাগ করিয়া কল্পনার বিচিত্র লীলা-লাবণ্যে সৃষ্টিকে অপূর্ব্ব ও অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপ ভস্মস্তূপ কল্প প্রাণহীন জাতির ভিতর দিয়া তাঁর Romantic প্রতিভার কল্পনা মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, বাস্তবের সহিত স্বপ্নের মণিকাঞ্চন যোগ সংঘটিত হইয়াছিল।

ইংরাজী সাহিত্যে Romanticism বলিয়া যে জিনিস সাহিত্য-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, তাহার ইতিকথা ও আত্মকথা অতি সহজ ও সরল। এমন দিন ছিল যখন কাব্যের ভাষা ও অলঙ্কারই ছিল রাজাধিরাজ। কাব্যের বা সাহিত্যের লীলা-অংশই যে প্রধান বস্তু এ কথা বুঝিবার সমজদার ছিল না। তাই কতকগুলি মামুলী ধরাবাঁধা আইনের মাপকাঠি দিয়াই তাহার বিচার হইত। নাগরিক জীবন, রাজা-মহারাজার কাহিনী, এই সমস্ত হইবে সাহিত্যের আখ্যানবস্তু। গরীবের ভগ্নকুটীরে, ধানের ক্ষেতে, 'বনরাজি-নীলা' গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে যে কোন কিছু আছে, সে ছিল ধারণার অতীত।* এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাই "Romantic Movement" নামে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত। জটিলের বিরুদ্ধে সরলের অভিযান, দাসত্বের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম, নাগরিক আবহাওয়ার বিরুদ্ধে পল্লীর শান্তি-শ্রীর বিদ্রোহ, কৃত্রিম সভ্যতার বিরুদ্ধে মানবাত্মার চির-বিরোধই এই Romanticismএর ভিতরকার বস্তু। ভিন্ন ভিন্ন সমজদার একে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ এর নাম দিয়াছেন "Return of Nature," কেহ বলিয়াছেন "Renaissance of Wonder"। যিনি যে অভিজ্ঞান একে দিয়া থাকুন, তাহার দ্বারা ঐ একই জিনিসকেই বুঝিতে পারা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের আসরে এই Romanticism কে পরিপূর্ণ রূপ দান করিতে পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর রমন্যাস বা রহস্যবাদের প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গালা ভাষায় একে কায়েমী মৌরশী স্বত্ব দান করিতে পারেন নাই। কিন্তু উচ্ছেদযোগ্য কোর্ফা প্রজা হইয়াও পরবর্ত্তী কালে এ নিজের পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখলের যোগ্য স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, "কপাল-কুণ্ডলার" Romanticismএর অতি বড় একটা element বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে। সুদূর সাগর-পারে মনুষ্যসমাগমহীন নির্জ্জন বনে স্বভাবের শিশু কপাল-কুণ্ডলা স্বভাবের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছেন। প্রকৃতি তাঁর কাছে "Both Law and Impulse"। কৃত্রিম সভ্যতা হইতে দূরে প্রতি পদে সমাজের নিষেধের গণ্ডীর পরপারে একটি নারীপ্রকৃতি কী ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, ইহাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিতত্ত্ব। কপাল-কুণ্ডলাকে মনে পড়িতে Wordsworthএর Lucyকে মনে পড়ে। একের সহিত অন্যের পার্থক্যও অনেক, মিলও প্রচুর। কোন্ স্বর্ণ-উষায় মূর্ত্তিমান রহস্যের মত বনানি উজ্জ্বল করিয়া নবকুমার প্রকৃতিবালার সম্মুখীন হইয়াছিল, যার তড়িৎস্পর্শে মায়াবী যাদুকরের মায়াদণ্ড-স্পর্শের ন্যায় সৃষ্টির সেরা রমণী-কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইল, "পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ!" অয়ি, রহস্যময়ি! তোমার রহস্যের পরপারে পাড়ি দিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই! তুমি তোমার রহস্যের পাথারে আমাদের চির-কালের জন্য ডুবাইয়া রাখ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী কালে বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের

কাব্যে এই Romantic element অপূর্ব্বভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বস্তুতঃ, বাঙ্গালা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথই এই মহাগৌরব দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও অলঙ্কারের কারাগার হইতে ভাবকে স্বাধীনতা দান করিয়া মুক্ত বাতাসে আনয়ন করিয়াছেন। সমাস-সন্ধি গুরুগম্ভীর কাব্যাবলীকে পেন্‌সন দিয়া সহজ, সরল সাদাসিদা, গ্রাম্য, চলিত কথাকে উচ্চপদে বহাল করিয়াছেন। সাহিত্যের প্রাণ যে গভীর অনুভূতি, স্বাধীন-উদার চিন্তা, সমৃদ্ধ কল্পনা, এ সত্য রবীন্দ্রনাথ পূর্ণমাত্রায় দেখাইয়াছেন। পল্লীর জীবনে যে সহজ সৌন্দর্য্য আছে, পল্লীবালার হৃদয়ে যে মধু আছে, মহাপ্রাণতা আছে, পল্লীর স্তরে স্তরে যে কবিতা গাথা আছে, তাহা তিনি একে একে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। Material Civilization যে মানুষকে অ-মানুষ ক'রে দেয়, সুন্দরকে সিংহাসনচ্যুত করে, শিবকে বিদায় করে দেয়, সত্যকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না, এ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্তঃস্থল। এই যে সহজ সৃষ্টি, সহজ Expression, ইহাই কেবল রবীন্দ্রনাথের Romanticism নয়। রবীন্দ্রনাথের উপর প্রাচ্যের বৈষ্ণব কবির যে প্রভাব, তাহাতে প্রতীচ্যের Romanticism অনুপ্রাণিত হইয়া এক অভিনব কাব্য সৃষ্টি হইয়াছে। Wordsworth রামধনুর অন্তঃপুরে যে রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন, সেখানে প্রেমময় পরমপুরুষকে টানিয়া আনেন নাই। কিংবা Highland Girlএর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে

"এসেছিলো নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে"

এরূপ কোন ভাবের অবতারণা করেন নাই। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী ভাবধারা ছুটিয়াছে শুধু সকল রহস্যের যে শেষ রহস্য তার সন্ধানে!

"সেথা কে পারিত
ল'য়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে!
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণ সরোজফুল্ল সরোবর কূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম-সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা।"

এই যে একটা mystic element, একটা রহস্যের ইঙ্গিত, এ রবীন্দ্র-কাব্যের বিশেষত্ব। পারসীক মহাকবি হাফেজ যেমন Human Soul ও Godএর সম্পর্ককে আশেক-মাশুকের হিসাবে তাঁর অমর কবিতার ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন, Mystic রবীন্দ্রনাথও Sufeeismএর সে প্রভাবে অনুপ্রাণিত; তাঁর প্রেমাস্পদ কখন নিশীথযোগে তাঁর শিয়রে আসিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁর মালার পরশ বুকে লাগিয়াছিল, এবং তাঁর আগমনের শত চিহ্ন তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন। কখন তিনি রহস্যময়ী নারী, চির-বিরহ বিধুরা, "জগতের নদী গিরি সকলের শেষে" তাঁর প্রেম-অমরাবতী, সেখান হইতে চিরকালের জন্য আমরা নির্ব্বাসিত হইয়াছি। কার শাপে আমাদের এই ব্যবধান? তার সেই দূর বাতায়নে "কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে" শুধু কল্পনাকেই পাঠান যায়!

কবি বা শিল্পীর লীলাভূমি হইতেছে 'মানুষ' ও 'প্রকৃতি'। কোন কবি এই 'মানুষ' ও 'প্রকৃতি'র যা দেখে, তাই লিখে যায় বা নিপুণ তুলিকায় আঁকে। একটা ফুল, সে ত সুন্দর, সুতরাং তার যে ছবি তোলা হয় সেও সুন্দর, তাতে হয় তো বাহাদুরীও কম নয়। কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর কাজ ঐখানেই শেষ হয় না। Romantic কবিদের মতে ঐ ছবিতে তাকে যোগ করতে হবে

"The Light that never was on land or Sea.
The Consecration and the poet's dream."

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক কবিতা, প্রত্যেক লেখার ভিতরে এইটিরই উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি লইয়াই তিনি কাব্য-সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু এ সংসারের প্রত্যেক প্রাণীটি যেন স্বপ্নের দেশ হইতে কার আশীর্ব্বাদের বরমাল্য ধারণ করিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'এই সূর্য্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে' তাঁর ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছেন। 'জীবন্ত হৃদয় মাঝে' তিনি স্থান কামনা করেন। পৃথিবীতে যে চির-তরঙ্গিত প্রাণের খেলা, কত বিরহ, মিলন, কত হাসি-অশ্রু,

মানবের এই সুখে দুঃখে সঙ্গীত গাঁথিয়া তিনি অমর-আলয় রচনা করিতে চাহেন। তাই 'ধনীর দুয়ারে' কাঙ্গালিনী মেয়েকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন 'তবে আজ কিসের উৎসব!'

"দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা,
তবে মিছে মঙ্গল কলস।"

এর Suggestiveness কত গভীর; অথচ প্রকাশের ক্ষমতা কত সহজ ও সুন্দর। অন্য কেহ হইলে হয় তো কাঁদিয়াই ভাসাইত; আর কান্নার পরে থাকে কী, ঐখানেই এর সমাধি হইত।

দিনের আলো যখন নিবে এলো, সূর্য্য যখন ডোবে ডোবে, চাঁদের লোভে আকাশ ঘিরে মেঘ সব জুটেছে, এমন সময় ও-পারেতে বিষ্টি এলো, গাছপালা সব ঝাপ্‌সা, যা মনে ক'রে দেয়—ছেলেবেলার গান, সেই "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ন'দী এলো বান।" এই যে একটা বৃষ্টিভরা বাদ্‌লা হাওয়ার আসন্ন সন্ধ্যার একটি ছবি, এ যেন একটা কুহকের রাজ্য সৃষ্টি করে দেয় যেখানে প্রবেশ করিলে শিশু হইয়া প্রবেশ করিতে হয়। নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে পল্লীর সহজ, সুন্দর শান্তি-শ্রীর যে বিদ্রোহ, তা রবীন্দ্রনাথের "বধূ" কবিতায় এক মনোরম বেশে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। পল্লীর বালিকা আজ সহরের বধূ হইয়াছে।

"হায়রে রাজধানী পাষাণকায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ ঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!"

আজ সবার মাঝে বালিকা একেলা ফিরিতেছে, কেমন ক'রে তার সারাটা বেলা কাটে! ইঁটের 'পরে ইঁট রহিয়াছে, তার মাঝে মানুষ কীট; এখানে না আছে ভালোবাসা, না আছে খেলা। "বেলা যে প'ড়ে এলো, জলকে চল্।" 'সে মায়া-কণ্ঠের আহ্বান কোথায়?

আবার গরীবের ভিতরে যে মহাপ্রাণতা আছে, তার জীবনের ছোট কাহিনীও যে কাব্যের গৌরবান্বিত আসরে একটু জায়গা পেতে পারে, সে যে উপেক্ষার বস্তু নয়, তা রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" প্রভৃতি কবিতায় বেশ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তীদের কেহ অনুপ্রাসের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন, কেহ চিতোরের মহীয়সী পদ্মিনীর সমর-অভিযান দেখিতেছেন। কেহ বা "মধুকরী কল্পনার" সাহায্যে প্রাচ্যের ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি এবং প্রতীচ্যের হোমার, ভার্জ্জিল, দান্তে, মিল্‌টন প্রভৃতি কবির "চিত্ত ফুলবন" হইতে মধু হইয়া অপূর্ব্ব "মধুচক্র" রচনা করিয়াছেন "গৌড় জন যাহে আনন্দে করিবে পান' সুধা নিরবধি"। কেহ ভগ্নোদ্যম দেবগণের সহিত বৃত্রাসুর-বধের মন্ত্রণা করিতেছেন, আবার কেহ "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের" আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছেন। এ ত সব বড় লোকের বড় কথা। গরীবের আসন চিরদিনই ধূলায়। সেই ধূলা হইতে তাহাকে তুলিয়া মহামহিমান্বিত মঞ্চে যিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সে এই রবীন্দ্রনাথ। অত্যাচারী জমিদার গরীবের 'দুই বিঘা জমি' কেড়ে নিয়ে গেল, তার অস্থিমজ্জার 'পর আরাম-বাগ তৈয়ার করিল, এ যে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারের মতই, তথাপি কাব্যসংসারে এ কথা কেউ মুখ ফুটিয়া বলিবেন না। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের এই কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। তাঁর দুর্ভাগা দেশ কতজনকে অপমান করিয়াছে, কত ভাইকে মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে ঘৃণা করিয়াছে, সেই অজ্ঞান-আঁধারে আচ্ছন্ন দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বাণী কী অপূর্ব্ব!

"তবু নত করি' আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান্!
সবারে না যদি ডাকো,
এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান।
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥"

Romanticismএর আর একটা লক্ষণ হইতেছে 'স্বাধীনতা'। "Liberty, Equality and Fraternity"

এই ত্রিবিধ মন্ত্রে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সারা জগৎ অতীতের বিবিধ সংস্কারের চাপে নিপীড়িত হইতেছিল। একটা মুক্তি, একটা খোলা হাওয়া, একটা পক্ষের বিস্তার, একটা হৃদয়-স্পন্দন, এর জন্য বিশ্বমানব ব্যাকুল হইয়াছিল। এক স্বর্ণ উষায় France তার মুক্তি-সংগ্রামের জয়-পতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল। ফ্রান্সে যাহা রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিল, জারমানীতে তাহা Transcendentalism নামে দার্শনিক চিন্তা রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করিল, এবং একই ভাবধারা ইংলণ্ডের সাহিত্য-জগৎকে নূতন করিয়া গড়িয়া দিল। এই যে স্বাধীনতা, এই আলো-বাতাসের কামনা রবীন্দ্র কাব্যে সংযম ও উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া মহামহিম মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দেশ গৃহে পরাধীন, বাহিরে পরাধীন। তিনি গৃহের পরাধীনতাকেই প্রকৃত পরাধীনতা বলিয়াছেন। এ'কে দূর করিতে পারিলে বাহিরের পরাধীনতা আপনা হইতেই আত্ম-নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিবে। তাই তাঁর কবি-প্রতিভার পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া দেশবাসীর কাছে সেই স্বাধীন প্রভাতের অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ মূর্ত্তি ঘোষিত করিয়াছেন—

"সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন, আসিবে।"

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে মানুষ বলিয়াই জানিয়াছেন। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, কিংবা ভৌগোলিক কোন প্রকার সীমার মধ্যে তার সসীম-অসীমত্বকে বেড়ী দিয়া আটকাইয়া রাখেন নাই। তিনি ভারতের মহা-মানবের সাগর তীরে দাঁড়াইয়া আর্য্য, অনার্য্য, দ্রাবিড়, চীন, মোগল, পাঠান সকলেরই মহা-সমন্বয় দেখিতে পাইয়াছেন। পশ্চিমে আজি দ্বার খুলিয়াছে, সেখান হইতেও বহু উপহার আনিতে হইবে, তবে ত সবার স্পর্শে পবিত্র-করা তীর্থনীরে মঙ্গলঘট পূর্ণ হইবে।

রমন্যাসে সৌন্দর্য্যের স্থান অতি উচ্চে। ইংরাজী সাহিত্যে romantic poetগণ, বিশেষ করে Shelley ও Keats এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অনবদ্য ও অতুলনীয়। তাঁহার "উর্ব্বশী" সৌন্দর্য্যের 'পীরামিড'। চাঁদের হাসি, তারকার চাহনি, আকাশের নীলিমা, মলয়ার হিল্লোল, কোকিলের কণ্ঠ, বুলবুলের গান, পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি, ফুলের মধুরিমা, ঝরণার কলকল গীতি, প্রেমিকার হৃদয়-মধু, জগতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মধুর, সকলেরই উৎস-মুখ—আদিম বাসস্থান এই উর্ব্বশী! সৃষ্টির উষায় মন্থিত সাগরে অনন্ত-যৌবনা উর্ব্বশী সেই যে সর্ব্বপ্রথম আমাদের সম্মুখে উপনীত হইলেন, তার পর তাঁকে আর একদিনের জন্যও বিদায় করিয়া দিই নাই। উর্ব্বশী কোনো কালে মুকুলিকা বালিকা বয়সী ছিলেন কি না জানি না! তিনি আঁধার-পাথার-তলে কার ঘরে একেলা বসিয়া মাণিক মুকুতা লইয়া শৈশবের খেলা করিয়াছেন? আমরা যখন তাঁর পরিচয় পাই, তখন তিনি 'যৌবনে গঠিতা' 'পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।' এই বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী দেবরাজের সভায় যখন নৃত্য করেন, তখন সেই ছন্দে ছন্দে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল নাচিয়া উঠে। জগতের অশ্রুধারে তাঁর তনুর তনিমা ধৌত হয়। তাঁর পায়ের আলতা ত্রিলোকের হৃদিরক্তে তৈরী। তিনি মুক্তবেণী ও বিবসনে বিকশিত বিশ্ব বাসনার অরবিন্দ-মাঝখানে আপনার অতি লঘুভার পাদপদ্ম রাখিয়াছেন। নিখিল মানবের হৃদয় তাঁর রঙ্গভূমি; তিনি স্বপ্নসঙ্গিনী। উর্ব্বশী যুগযুগান্তর হইতে বিশ্বের প্রেয়সী, কিন্তু বিশ্ব রহস্যজাল ভেদ করিয়া কখনও তাঁকে পায় নাই, তিনি স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী রহস্যরূপেই চিরবিরাজমানা আছেন। কবি প্রাণ তার জন্য সদা ব্যাকুল

"মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
তোমার মদিরগন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
উদ্দাম সঙ্গীতে।"

কিন্তু হায়, সেই আকুল-অঞ্চলা, বিদ্যুৎ-চঞ্চলা, নিষ্ঠুরা, বধিরা উর্ব্বশী নূপুর বাজাইয়া কোথায় চলিয়া যায়।

যে-কোন সৃষ্টির পশ্চাতে যে শিল্পীর সাধনাটাই বড়, শিল্পীর স্বপ্ন যোগ না হলে তার সৃষ্টি যে রাঙা হ'য়ে ফুটতে পারে না, রহস্যবাদের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানসী" নামক চতুর্দ্দশপদী কবিতায় নারীসৃষ্টি প্রসঙ্গে তার ইঙ্গিত করিয়াছেন

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গ'ড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হ'তে। বসি' কবিগণ
সোণার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
স'পিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কতো বর্ণ কতো গন্ধ ভূষণ কতো না,
সিন্ধু হ'তে মুক্তা আসে খনি হ'তে সোণা,
বসন্তের বন হ'তে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তা'র।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি' ক'রেছে গোপন।
প'ড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা ;
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।"

কবি যে বিশ্ব রহস্যের বাণিজ্য করে, তা রবীন্দ্রনাথের "প্রকাশ" কবিতায় বেশ ক'রে প্রকাশ পায়। হাজার হাজার বছর কাটিয়া গিয়াছে, কেহ তো কোন কথা কহে নাই। ভ্রমর মাধবী-মঞ্জরীর আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, লতা শত আলিঙ্গনে তরুকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, চাঁদ উঠিতেই চকোরী আনন্দিত হইয়াছে, মেঘের মধ্যে তড়িৎ খেলিয়াছে, সাগরকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী হয়রাণ হইয়াছে, সূর্য্য উঠিতেই কমল চক্ষু মেলিয়াছে,—নবীন আষাঢ়কে চাতক আগমনী গাহিয়া আহ্বান করিয়াছে, এতো যে সব গোপন মিলন তা কবি-ই সর্ব্বপ্রথম জগৎকে বলিয়া দিয়াছেন। সে কবি লতা-পাতা-চাঁদ-মেঘ এদের সহিত এক হ'য়ে মিশে ছিল। সে মনের আড়ালে ঢাকা ও ফুলের মতন মৌন ছিল। সে চাঁদের মতন স্বপন-মাখা নয়নে চাহিতে জানিত, এবং বায়ুর মতন অলক্ষ্য মনোরথে ফিরিতে পারিত। সে মেঘের মতন আপনার মাঝে আপন ছায়া ঘনাইয়া একাকী কোণে বসিয়া—"ঘনগম্ভীর মায়া" রচনা করিতে জানিত। বিশ্ব প্রকৃতি কবির কাছে সাবধানে ছিল না ; ভাবে, ইঙ্গিতে, গানে ঘনঘন তা'র ঘোম্‌টা খসিত। বাসরঘরের বাতায়ন যদি কখন খুলিয়া যাইত কবিকে দ্বার-পাশে দেখিয়া দম্পতী দুয়ার বন্ধ করিত না। যদি কবি সে নিভৃত শয়নের পানে নয়ন তুলিয়া চাহিত, তাহা হইলে শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ফুল-ধূলি ছুঁড়িত না!

জগতের যা কিছু প্রেয়,—জীবন, যৌবন, ধন, মান, সবই কালস্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই সম্রাট শা-জাহান কালের কপোলতলে এক বিন্দু নয়নের জল রাখিয়া গিয়াছেন—সে তাঁর 'তাজমহল।' রবীন্দ্রনাথ তার "শা-জাহান" কবিতায় এই নশ্বরতার যে মনোজ্ঞ ছবি দিয়াছেন, তাহা তাঁহার রহস্যবাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে আপনাদিকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না

"হায় ওরে মানব-হৃদয়
... ...
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
যেইক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায় গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই,
আবার শিশির রাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ-প্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই—যে সময়।

এই ক্ষণভঙ্গুরতা চিন্তা করিয়াই সম্রাট তাঁর সৃষ্টির বিস্ময় 'তাজমহল' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা, সৌন্দর্য্যে ভুলাইয়া সময়ের হৃদয় হরণ করিবেন। সম্রাট প্রণয়িনী আজ যে দেশে আছেন, সে এক "Undiscover'd Country, from whose bourne no traveller ever returns." কিন্তু সেখানে কবির অবাধ গতি, তাই সম্রাটের দূত অমলিন, শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন একস্বরে চিরবিরহীর বাণী লইয়া সে দেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে—কবি তাহা আমাদিগকে জানাইতেছেন

"হে সম্রাট্ কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত

ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
র'য়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে
ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

রবীন্দ্রনাথের সম-সাময়িক কোন কবি কিংবা তাঁহার পদাঙ্কানুবর্ত্তীদের মধ্যে কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যে এই অপূর্ব্ব romanticism সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কাজেই প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁদের আলোচনায় বিরত রহিলাম। রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রের অমর নাম এ স্থলে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। গুরুর প্রতিভার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শরৎচন্দ্রের প্রতিভা একটা নির্দ্দিষ্ট বিরাট-বিশাল ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই সাধনায় তিনি তাঁর বিশ্ব-বিজয়ী গুরুকেও ছাড়াইয়া চলিয়াছেন। মানুষের মন যদি জগতের সব চাইতে বড় রহস্য হয়, তাহা হইলে সেই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্র যে নিপুণতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে অপূর্ব্ব romantic seer বলিতে হইবে। আদিম বসন্ত-প্রভাত হইতে যে-ভাব বিশ্বমানবের মধ্যে যুগে যুগে রূপে রসে পুষ্পে ফলে সুশোভিত হইয়া আসিয়াছে, চির-পুরাতন, অথচ চির-নূতন সেই ভাবরাজির রহস্যময় লীলা-মাধুর্য্য সহজ, সরল ভাবে যে শিল্পী আমাদের সামনে উপস্থিত করিযাছেন সে শরৎচন্দ্র। সারা পৃথিবীর লোকের যে উৎসবে নিমন্ত্রণ, তার ভাঁড়ারের চাবি গোলমাল হইতে পারে; নিমন্ত্রিতদের ভোজের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সে প্রকারের দায়িত্ব নিয়ে ভোজের নিমন্ত্রণ করেন নাই। যে কুটীরের যে চাবি তাই দিয়াই তিনি তাকে খুলিয়াছেন, তার অন্তরের সম্পদকে বাহির করিয়া দিয়াছেন। তাঁর এক একখানি উপন্যাস এক একটি জীবন-রহস্য।

আজ প্রবন্ধের অস্তগিরিতে নামিয়া শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে চাই না। আলোচ্য প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে আমার কৌতূহল হইতেছে যে, আপনাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এত কথার পরেও কি Romanticism অথবা Mysticism কী বস্তু, তার মীমাংসা হ'য়েছে? আমার উত্তর হইবে এই—কবি যা সৃষ্টি করেন সে একটা atmosphere মাত্র, তাকে ধরা যায় না, সে কেবল অনুভবের বস্তু। রামধনুকে খুলিয়া দেখাইতে হইলে তাহাকে ঐ "dull catalogue of common things" এর মধ্যে নিয়ে ফেল্‌তে হয়, তাতে তার রামধনুত্ব ঘুচে যায়। ফুলকে দেখেই আনন্দ, তার পাপড়ীগুলি চিরে একটি একটি করিয়া দেখাইলে, তার ফুলজীবন ব্যর্থ হয়, দেখার গৌরবও মাঠে মারা যায়।

স্রষ্টার সৃষ্টির মধ্যে একটা কুহকের রাজ্য, একটা মায়া-মরীচিকা, একটা ইন্দ্রজাল, একটা যাকে-ধর্‌তে-চাওয়া যায়-অথচ-ধরা যায়-না অপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্বভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। রসজ্ঞ সমজদার কতক পেয়ে—কতক না পেয়ে কেমন একটা বিপুল পরিতৃপ্তিতে এই সৃষ্টির লীলামাধুর্য্য সন্দর্শন করেন। 'সুন্দর কিছু দেখ্‌লে, মধুর কিছু শুন্‌লে, মনে যে কেমন এক ভাবের উদয় হয়, তাকে analyse করা যায় না, তাকে উপলব্ধি কর্‌তে হয়। কাব্যের সৌন্দর্য্য চুলচেরা analysisএ ফুটে উঠে না, তার হৃদয়-ঐশ্বর্য্য আপন গৌরবে দেখা দেয় যখন সে সৃষ্টির সুমেরু-শিখরে নিরুপদ্রবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই Romantic element যেন মুক্তফলের উপর 'ছায়া', একে আপনারা সহজেই উপভোগ কর্‌তে পারেন, কিন্তু রূঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে এ নিজেকে ধরা দেয় না। এ যেন রবীন্দ্রনাথের প্রাণপ্রিয়া, তাঁর মানসী, তাঁর সাধনার উর্ব্বশী—এ কারু মাতা নয়, কারু কন্যা নয়, কারু বধূ নয়; কোন বন্ধনের মধ্যে একে পাওয়া যায় না। অথচ এ আছে, একে প্রাণ চায়।

'পূর্ণিমা নিশিতে যবে দশ দিক পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি।'

এই এর স্বরূপ! এই এর পরিচয়!



তার পর

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(১৮)

সেদিন রাত্রে সরমা বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। সকাল বেলায় সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিবে। সারা দিন সে একান্ত ভাবে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছে। বই-খাতা লইয়া সে যতক্ষণ ছিল, তখন মনের ভিতর দিয়া যদিও একটা তপ্ত উদাস বাতাস বহিতেছিল, তবু সে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ নিশীথে শয্যায় পড়িয়া তার মনে হইল অজয়ের কথা। কিছুতেই সে তার মনশ্চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিল না অজয়ের সেই শীত ক্লিষ্ট দেহে দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের চিত্র, তার রোগতপ্ত পীড়িত মুখের ছবি!

সকালবেলায় সে দেখিয়া আসিয়াছে অজয়ের দেহে খুব বেশী উত্তাপ। সারা দিন সে কোনও সংবাদ পায় নাই। না জানি কত জ্বর হইয়াছে তার! সেই এক ছোকরা ছাড়া আর তার শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই। সেই অপরিচ্ছন্ন দোকানঘরে ভাঙ্গা খাটিয়ায় শুইয়া অজয় না জানি রোগে কত কষ্ট পাইতেছে!

ভাবিতে তার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল। অজয়ের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় একবার তার মনে হইয়াছিল যে অজয়ের একটা খবর লইয়া যায়; কিন্তু প্রবল শক্তির সহিত সে আকাঙ্ক্ষা সে দমন করিয়াছিল। এখন তার মনে হইল যে দেখিয়া আসিলে ভাল হইত।

কিছুতেই সে স্বস্তি লাভ করিতে পারিল না। কোনও মতেই চোখে ঘুম টানিয়া আনিতে পারিল না।

ছট্‌ফট্‌ করিয়া সে শেষে উঠিয়া পড়িল। সে তার মাকে ডাকিয়া তুলিল। সুনীতি উঠিয়া বলিলেন, "কি মা? কি হ'য়েছে?"

সরমা বলিল, "কিছু নয় মা, কিছুতে ঘুম পাচ্ছে না, ছট্‌ফট্‌ ক'রছি। এসো মা, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।"

সুনীতি বলিলেন, "ঘুম হবে কি? দিনরাত এত পড়া—এতে মাথা গরম হবে না! আয় তুই আমার কাছে এসে শো', আমি তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। মোদ্দা কাল আর আমি তোকে বই ছুঁতে দিচ্ছি নে।"

সরমা মায়ের বিছানায় শুইয়া পড়িল। সুনীতি তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সরমা শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া সরমা বলিল, "মা, আজ তো পড়া মানা, চল আজ বেড়িয়ে আসি।"

সুনীতি সম্মত হইয়া বলিলেন, "বেশ তো, চল না। কোথায় যাবি?"

"বিশেষ কোথাও নয়—একটু লম্বা রাস্তায় ঘুরে আসবো।"

মোটরে করিয়া তারা বালিগঞ্জ হইতে ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, বসা প্রভৃতি ঘুরিয়া টালিগঞ্জের পথে ফিরিতে লাগিল।

অজয়ের দোকানের কাছাকাছি আসিয়া সরমা বলিল, "মা গো, অজয়বাবুর শুনেছি বড় অসুখ, একবার দেখে যাবো?"

সুনীতি বলিলেন, "তাই না কি? কি অসুখ?"

"বড্ড না কি জ্বর হ'য়েছে।"

সুনীতি বলিলেন, "চল্ দেখে যাই।"

অজয়ের দোকানের সামনে গাড়ী থামিলে সরমা দেখিল আজও দোকানের দুয়ার বন্ধ, সুধু সেই ছোকরা পাম্পের কাছে বসিয়া আছে। সরমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—অজয় তবে আজও অসুস্থ আছে!

সেই ছোকরাকে সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কেমন আছে?"

ছোকরা মুখ ভার করিয়া বলিল, "ভারী বেমার আছে। কাল সারা দিন জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে ছিল।"

সরমার প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। সে মাকে নামাইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেল দোকানের দুয়ারে। দুয়ার ভেজান ছিল, ধাক্কা দিতে খুলিয়া গেল।

সরমা ছুটিয়া অজয়ের বিছানার কাছে গেল। সুনীতি ব্যস্ত হইয়া পিছু পিছু আসিলেন।

সরমা দেখিল, অজয় ঘুমাইতেছে। সে নিঃশব্দে পা ফেলিয়া বিছানার কাছে গেল। অতি সন্তর্পণে সে অজয়ের কপালে হাত দিয়া তাপ পরীক্ষা করিল। দেখিল উত্তাপ খুব বেশী।

সরমা কপালে হাত দিতেই অজয় চক্ষু মেলিয়া চাহিল। চক্ষু দুটি লাল টক্ টক্ করিতেছে।

সুনীতি স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে জ্বর হ'ল বাবা? কেমন আছ?"

অজয় বলিল, "এখন অনেকটা ভাল আছি—কিন্তু, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে! আপনাকে কে খবর দিলে?"

সরমা অজয়ের মাথার দিকে ছিল, অজয় তাকে তখনও দেখিতে পায় নাই।

সুনীতি সরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সরির কাছে এই শুনলাম। এত জ্বর তোমার, তোমায় দেখছে শুনছে কে?"

অজয় চোখ ফিরাইয়া সরমাকে দেখিয়া একবার চক্ষু বুজিল।

সরমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তার মুখে কথা ছিল না।

অজয় স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "দেখবার লোক আছে পিসিমা। কাল একটা ডাক্তারও এসেছিল। কিন্তু আজ হাঁসপাতালে যাব ভাবছি।"

বলিয়া অজয় হাত দিয়া মাথা চাপিয়া ধরিল।

সরমা ত্রস্তেব্যস্তে অজয়ের মাথাটা দুই হাতে টিপিয়া ধরিল। শুষ্কমুখে সে বলিল, "আপনার মাথাটা ধুইয়ে দেব?"

অজয় মাথাটা নাড়া দিয়া বলিল, "দেও!—দিন।"

সরমা ছুটিয়া গিয়া সেই ছোকরাকে ডাকিল। সরমার আদেশে সে বালক এক বালতী জল ও একটা ঘটি লইয়া আসিল।

সরমা বলিল, "আপনার এ লম্বা চুলগুলো কেটে দি?

অজয় বলিল, "যা ইচ্ছা কর—আর পারি নে সহ্য ক'রতে।—মাপ ক'রবেন কথার ঠিক নেই আমার।"

সেই ছোকরা একখানা কাঁচি আনিয়া দিল। সরমা কচ কচ করিয়া অজয়ের লম্বা চুলগুলি ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলিল। তার পর সে দু'হাতে তার মাথা তুলিয়া ধরিল, সুনীতি অনেকক্ষণ ধরিয়া জল ঢালিলেন।

সরমা এদিক ওদিক চাহিয়া হাতের গোড়ায় কিছু না পাইয়া তার আঁচল দিয়া অজয়ের মাথা মুছাইয়া দিল।

অজয় বলিল, "ওঃ বাঁচলাম। মাথার কি যন্ত্রণা! আপনি বাঁচালেন আমাকে। আপনার কাপড়টা মিথ্যে ভিজালেন।"

সরমা বলিল, "তার জন্য ভাববেন না আপনি।"

সুনীতি বলিলেন, "ডাক্তার এখন আসবে কি বাবা?"

অজয় বলিল, "না, আর ডাক্তারকে খবর দিই নি। ঠিক ক'রেছি হাঁসপাতালে যাব। আমার ট্যাক্সি ড্রাইভার এলেই যাবো।"

সরমা বলিল, "মা, ওঁকে আমাদের ওখানে নিলে হয় না?"

সুনীতি বলিলেন, "বেশ তো, সেই ভাল। চল আমরা তোমাকে নিয়ে যাই।"

অজয় বলিল, "না—না, আপনারা কেন কষ্ট ক'রবেন—আমি হাঁসপাতালে যাচ্ছি।"

সরমা বলিল, "হাঁসপাতালে গেতে ডাক্তার দেখতে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে; চলুন না এখনকার মত—তার পর দু' একদিনে না সারে যাবেন হাঁসপাতালে। কি বল মা?"

সুনীতি বলিলেন, "হাঁ তাই ভাল। তাই চল বাবা।"

অজয় বলিল, "মাপ ক'রবেন, আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি—আর কষ্ট দেব না।"

সুনীতির তখন ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছে, তিনি বলিলেন, "সে কিছুতেই হবে না, আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না।"

অজয় বলিল, "মাপ করুন আমায়—"

সুনীতি বলিলেন, "সেও কি একটা কথা হ'ল? তুমি চল। আমাদের ড্রাইভারকে ডাক না সরি, ওকে ধ'রে নিয়ে যাক।"

অজয় কাতরভাবে সরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি, আপনি আমায় মাপ করুন—মাকে বলুন।"

সুনীতি নিজেই উঠিয়া দরজার কাছে গেলেন ড্রাইভারকে ডাকিতে। সেই অবসরে সরমা বলিল, "আপনি যা ভাবছেন সে ভয় নেই। আমি আপনাকে আর সে কথা তুলে বিরক্ত ক'রবো না। আপনার কাছেও যাব না। আপনি চলুন।"

অজয়ের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "ভুল বুঝলে দেবি,—কিন্তু কি ব'লবো আমি? উপায় নেই।"

সরমা। সে সব কথা আপনি মোটে ভাববেন না। আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে মুক্তি দিয়েছি—কোনও ভয় নেই।

অজয় বলিল, "ভয়!—হাঁ ভয় বই কি?—আচ্ছা ছাড়বে না যখন—চল।"

ড্রাইভার আসিলে সে অজয়ের একপাশে দাঁড়াইল, অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল সরমা। দু'জনে ধরাধরি করিয়া অজয়কে লইয়া গাড়ীতে উঠাইল। অজয়ের মাথা কোলে করিয়া গাড়ীর ভিতর বসিলেন সুনীতি, ড্রাইভারের পাশে বসিল সরমা।

দোকান ঘরে চাবী বন্ধ করিয়া সেই ছোকরা আসিয়া চাবী সরমার কাছে দিয়া গেল। কারখানা খোলাই রহিল।

সরমা তার পড়িবার ঘর পরিষ্কার করিয়া অজয়ের জন্য একটা খাট পাতিয়া বিছানা করিয়া দিল। টেলিফোনে ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল, অল্পক্ষণ বাদেই ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়েছে—বুকে দোষ হবার আশঙ্কা আছে, সাবধানে শুশ্রূষা করা দরকার।"

সরমা ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া টেলিফোন করিয়া দিল দুইজন নার্সের জন্য। নার্স দুইজন পালা করিয়া অজয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

সারা সকালটা সরমা অজয়ের ঘরে গেল না। দ্বিপ্রহরে যখন সে সংবাদ পাইল জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং অজয় একেবারে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে, তখন সে আর বাহিরে থাকিতে পারিল না, বিছানার পাশে গিয়া বসিল। জ্বরের মোহে অজয় অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইতেছে, নার্স মাঝে মাঝে আসিয়া আইস্-ব্যাগ বদলাইয়া দিতেছে, সময়মত ঔষধ খাওয়াইতেছে। সরমা কেবল বসিয়া অজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, আর ব্যাকুলচিত্তে ভগবানের কাছে অজয়ের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। সুনীতিও ঘুরিয়া ফিরিয়া তাকে দেখিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময় জ্বরের বেগ কিছু কমিল, অজয় একবার চক্ষু মেলিল। সরমার দিকে চাহিয়া সে তার হাতখানা তার দিকে বাড়াইয়া দিল। সরমা হাতখানা দুই হাতের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া রহিল। অজয় তৃপ্তির সহিত চক্ষু বুজিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। পাছে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় সেই ভয়ে সরমা নড়িল না, হাতও ছাড়িল না।

রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত সরমা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংবাদ লইতে লাগিল। বারটার সময় নার্স বলিল, জ্বর বেশ কমিয়া গিয়াছে, রোগী বেশ শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে। তখন সরমা গিয়া নিজের ঘরে শুইয়া পড়িল। ভোর হইবার পূর্ব্বেই সরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি গায় একখানা শাল জড়াইয়া অজয়ের ঘরে চলিয়া গেল। নার্স বলিল, জ্বর আর কমে নাই, কিন্তু রোগী বেশ শান্তভাবে ঘুমাইতেছে।

সরমা আবার অজয়ের শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর অজয় চক্ষু মেলিয়া চাহিল। সরমা মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন?"

অজয় করুণ নয়নে তার দিকে চাহিয়া রহিল। তার চোখের কোণ চক্ চক্ করিয়া উঠিল। শেষে সে বলিল, "বেশ আছি, আজ মাথার যন্ত্রণা নেই। আপনি কি সারা রাত এখানে ব'সে আছেন?"

সরমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, আমি ঘুমিয়েছি সারারাত, এই এখনি এসেছি।"

অজয় চুপ করিয়া রহিল। তার পর সে বলিল, "আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে সারা রাত আপনি আমার কাছে আমার হাত ধ'রে ব'সে আছেন।"

তার পর সে আবার বলিল, "কত কষ্ট যে দিলাম আপনাকে!"

হাসিয়া সরমা বলিল, "আমার আর কি কষ্ট বলুন, খাচ্ছি দাচ্ছি কাজকর্ম্ম ক'রছি। শুশ্রূষা তো ক'রছে নার্সেরা।"

অজয় বলিল, "সে কথা বলছি না।" আর কিছু বলিল না।

সরমা উঠিয়া মুখ হাত ধুইল। তার পর চা খাইয়া সে নিজ হস্তে অজয়ের পথ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া গেল।

ডাক্তার বলিয়াছিলেন দুই ঘণ্টা অন্তর পথ্য দিতে। অজয় পথ্য খাইতে বড় আপত্তি করিতেছিল। নার্সেরা অনেক বলিয়া কহিয়া একরকম জোর করিয়া তাহাকে খাওয়াইতেছিল।

এখন সরমা মুখের কাছে বাটী ধরিল, অজয় নির্ব্বিবাদে পান করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, "অনেকটা ভাল; কিন্তু আজকের দিনটা না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোন্ ভাব ধ'রবে।"

সরমা বাহিরে গিয়া তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করিল, "কোনও চিন্তার কারণ দেখলেন কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "এবার ইনফ্লুয়েঞ্জায় ফুসফুসের দোষ প্রায় হ'চ্ছে, আর হ'লে বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়। এঁর ফুসফুসে এখনও কোনও দোষ হয় নি, কিন্তু bronchial catarrh আছে। তা ছাড়া হৃৎপিণ্ডও খুব সবল নয়—কালকে পর্য্যন্ত দেখলে বোঝা যাবে।"

সারা দিন জ্বর খুব বেশী থাকিল। সরমা ব্যস্ত হইয়া সারা দিন কাটাইল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে জ্বর কমিয়া আসিল। আজ আর সরমা শুইতে গেল না। কাল অজয় বলিয়াছিল সে স্বপ্ন দেখিয়াছে সরমা তার কাছে বসিয়া আছে। তাই সে আজ বসিয়া রহিল।

সারারাত্রি অজয় পরম শান্তভাবে নিদ্রা গেল। শেষরাত্রে সরমা সন্তর্পণে গায় হাত দিয়া দেখিল, না, বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। একটা শান্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সরমা খাটের চালির উপর মাথা রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিল। সেই অবস্থায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া অজয় দেখিল সরমা সেই অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তার একখানা হাতে সে অজয়ের হাত ধরিয়া ছিল। তার শিথিল হস্তের উপর অজয়ের হাত পড়িয়া আছে।

তার দিকে চাহিয়া অজয় দীর্ঘ্যনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাত টানিয়া লইল, এবং পাশ ফিরিয়া সরিয়া শুইল। তাতে সরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

অজয় বলিল, "আজও কি আপনি এই এসেছেন?"

সরমা লজ্জিতভাবে বলিল, "না, ব'সে থাকতে থাকতে এখানেই ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম।"

অজয় করুণ-নয়নে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সরমা তার গায় হাত দিয়া দেখিল জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। নার্স আসিয়া থারমোমিটার লাগাইয়া দেখিল, জ্বর আর নাই। সরমা তখন উঠিয়া বলিল, "এইবার যাচ্ছি আমি। আর আসবো না।"

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, আমার ভয় হ'য়েছিল বুঝি broncho-pneumonia দাঁড়াবে। সৌভাগ্যক্রমে তা হয় নি। এখন আর চিন্তা নেই, কিন্তু চার পাঁচ দিন অন্ততঃ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার, বিছানা থেকে নড়া নিষেধ!"

ডাক্তারের মুখে এ কথা শুনিয়া সরমা নিশ্চিন্ত মনে তার পড়ার বই লইয়া বসিল। অজয়ের ঘরে আর সে গেল না। মাকে পাঠাইয়া দিল।

অজয় তাঁকে বলিল, "পিসীমা, এবারে আমার জ্বর তো ছেড়েছে, এখন আমাকে যেতে দিন।"

সুনীতি বলিলেন, "না, বাবা, ডাক্তার যে চার পাঁচ দিন শুয়ে থাকতে ব'ল্লে।"

অজয় বলিল, "ডাক্তারেরা অমন ব'লে থাকে, আর কিছু হবে না।"

সুনীতি কিছুতেই সে কথা শুনিলেন না, অজয়কে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল।

সেদিন সমস্ত দিন রাত্রির ভিতর সরমা একবারও

অজয়ের কাছে গেল না। পরের দিন সকালে গিয়া অজয়কে কুশল প্রশ্ন করিল।

অজয় বলিল, "আমি তো সেরে গেছি, কিন্তু আপনারা সারতে দিচ্ছেন কই?"

সরমা বলিল, "ডাক্তার বারণ ক'রেছেন, কি করি বলুন?"

অজয় বলিল, "ভারী অন্যায় ক'রছেন কিন্তু। ভারী অনিষ্ট হ'চ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন না, কি ব'লব?"

"কেন? আমি তো আর আপনার কাছে এসে বিরক্ত করি নি? আর, এক্ষুনি আমি চ'লে যাচ্ছি।"

উত্তেজিত ভাবে অজয় বলিল, "কেবল ইচ্ছে ক'রে আমাকে কষ্ট দেবার জন্য আপনি ঐ কথা বার বার ব'লছেন। নইলে, আপনি এলে আমি বিরক্ত হব, এ কথা আপনি কিছুতে ভাবতে পারেন না। আমি এত বড় পাপিষ্ঠ নই।"

অজয় মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

সরমা বলিল, "সত্যি বলছি আপনাকে কষ্ট দেবার জন্য আমি কোনও কথা বলি নি"—

বাধা দিয়া অজয় বলিল, "আপনি বুঝবেন না জানি, বোঝাতে পারবো না আপনাকে—যে কত দুঃখে আমি আপনাকে দুঃখ দিয়েছি—যদি বুঝতেন তবে ক্ষমা ক'রতেন।" অজয়ের চক্ষে জল আসিল।

অজয়ের চোখের জল মুছাইয়া সরমা স্নিগ্ধভাবে বলিল, "সে সব কথা আর কেন অজয়বাবু। সে কথা তো আমি ভুলি নি, তা নিয়ে আপনার উপর আমার কোনও অভিযোগ তো নেই। তবে কেন সে কথা ভাবছেন?"

"অভিযোগ আপনি ক'রছেন না, কিন্তু আমার অন্তর দিন-রাত অভিযোগ ক'রছে। কিন্তু ভগবান জানেন, আমি যা ক'রেছি ভাল বুঝেই ক'রেছি।"

সরমা। থাক—সে কথা থাক। এখন সে সব কথায় কাজ নেই—কোনও দিনই সে কথা তুলে আর কাজ নেই। যা' হবার হ'য়ে গেছে, ভগবানের যা' ইচ্ছা ছিল তাই হ'য়েছে। আমি সত্যি বলছি আমার তা নিয়ে কোনও অনুযোগ কি অভিযোগ নেই।"

অজয় চুপ করিল। সরমা কিছুক্ষণ তার মাথায় হাত বুলাইয়া, আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

সে আবার রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ করিল, কেবল ল্যাবরেটারীতে এ কয়দিন গেল না।

(১৯)

নিরুপম যখন মায়ার কাছে শুনিল যে অজয়ের সঙ্গে সরমার বাস্তবিক কোনও ভালবাসা নাই, তখন সে সহজেই সে কথা বিশ্বাস করিল। বিশেষতঃ সে ভাবিয়া দেখিল যে অজয়ের সঙ্গে সরমার যদি কোনও দোষের সম্পর্ক থাকিত তবে সরমা অজয়কে বাড়ীতে আনিত না। কেন না বাড়ীতে সুনীতি আছেন। সুনীতির চক্ষের সম্মুখে সরমা যে এতবড় অপকার্য্য করিতে সাহস করিবে এমন তার মনে হইল না। তার মন এইরূপ চিন্তার অনুকূল হওয়ায় ক্রমে আরও এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সহস্র যুক্তি তার মনে সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু অজয় যে নিরুপমের প্রণয়ের পথে বিঘ্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে কথা মায়া নিজেই বলিয়াছে। মায়া বলিয়াছে অজয় সরমার মন অনেকটা নরম করিয়া ফেলিয়াছে।

এ কথায় নিরুপমের ভয়ানক রাগ হইল সরমার উপর এবং অজয়ের উপর। সরমার উপর রাগের কারণ এই যে নিরুপমের মত যোগ্য পাত্র সম্মুখে থাকিতে সরমার মন অজয়ের উপর পড়ে কেন? অজয়ের সঙ্গে নিরুপমের তুলনা? এ কল্পনাই যে নিরুপমের পক্ষে অসম্মানজনক! নিরুপম ভাবিল সরমাকে ভালরকমে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

সে গত কয়েক দিন হইতেই সরমাকে শিক্ষা দিবার উপায় চিন্তা করিতেছিল। আজ মায়ার কাছে কথাটা শুনিয়া সে আরও গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। মায়া তার নিজের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়াই বলিয়াছে যে, যদি তার চোখের সামনে অজয় তাকে পরাজিত করিয়া সরমাকে লইয়া যায়, সে তার পক্ষে একটা ভয়ানক লজ্জার কথা, আর সে যদি হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া এমন একটা কাণ্ড হইতে দেয় তবে সে কাপুরুষ। কিছুতেই সে ইহা হইতে দিতে পারে না।

মায়ার মনের ইচ্ছা এই ছিল যে নিরুপম সরমাকে জয় করিবার জন্য সরমার মন কাড়িবার চেষ্টা করুক। নিরুপমের চিন্তা সে ধারায় গেল না। সে ভাবিতে লাগিল অজয়কে

কোনও রকমে নির্য্যাতন করিয়া—অপমান করিয়া তার পথ হইতে তাড়াইতে হইবে। এবং তার সহজেই মনে হইল যে অজয়ের নামে একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা করিয়া তাকে জেলে দিতে পারিলেই এ কার্য্যটি সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইবে। তাতে এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে—অজয়ের উপর বৈর-নির্য্যাতন করা হইবে, সরযূকে জব্দ করা হইবে।

এ কথা তার আগেও মনে হইয়াছিল, কিন্তু ভাবিয়া সে কোনও উপায় করিতে পারে নাই। অজয়ের পূর্ব্ব-জীবনের কথা তার কিছু জানা ছিল না। কার সঙ্গে তার কি কারবার আছে তাহা সে জানিত না। তার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না যে, সেই সময় অজয় যাদের সঙ্গে কারবার করিত তাদের কাছে অনুসন্ধান করিলে হীরালাল আগরওয়ালার মামলার মত আর দুই চারটি মামলার খোঁজ সে অনায়াসে পাইতে পারিবে। কিন্তু সে খোঁজের সূত্র সে ধরিতে পারে নাই। আজ মায়ার কাছে কথাটা শুনিয়া অবধি সে গভীর ভাবে বিষয়টা লইয়া চিন্তা করিল। তার বুদ্ধি আরও তীব্র অনুসন্ধিৎসার সহিত এই খাতে প্রবাহিত হইল।

কাছারীতে গিয়া তার মনে হইল হীরালাল আগর-ওয়ালার কাছে অনুসন্ধান করিলে তার কাছে হয় তো কোনও সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। অজয়ের সঙ্গে যেকালে তার খুব হৃদ্যতা ছিল, সে তার গতিবিধির সন্ধান রাখিবার কথা।

এই স্থির করিয়া সে হীরালালের কাছে যাইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিবার সঙ্কল্প করিল। হীরালালের যিনি উকীল ছিলেন তাকে লইয়া সে হীরালালের কাছে গেল। কিন্তু শুনিতে পাইল হীরালাল কলিকাতায় নাই—চার পাঁচ দিন বাদে আসিবে।

উপায় নাই—এ পাঁচ দিন অপেক্ষা করিতেই হইবে।

হীরালালের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় তার সঙ্গী উকীলটি কথা-প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন যে, অজয় আর একটা বড় অপরাধ করিয়াছিল, তাতে তার পাঁচটি বচ্ছর জেল অবধারিত ছিল; সে একটা হুণ্ডীতে কান্তিবাবুর নামে acceptance জাল করিয়া এই উকীলের এক মক্কেলের কাছে টাকা ধার করিয়াছিল।

নিরুপম বলিল, "তার পর? সে অজয়কে ফৌজদারীতে দিলে না?"

"না, সে আর হ'ল কই। সে ফৌজদারী ক'রবেই ঠিক ক'রেছিল, কিন্তু অভয়বাবু তার সব টাকা শোধ ক'রে দিলে তাই আর ফৌজদারী হ'ল না।"

উত্তেজিত ভাবে নিরুপম বলিল, "ভয়ানক অন্যায়। অভয়দা প্রশ্রয় দিয়েই তো ওই কুকুরটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এখন পস্তাচ্ছে।"

বন্ধু উকীলটি তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "পস্তাচ্ছে মানে? অভয়বাবু কি অজয়ের উপর চ'টেছেন না কি?"

"চটেছেন? আমার বোধ হয় এখন যদি অজয় জেলে যায় তবে তিনি আনন্দে একটা উৎসব ক'রবেন।"

"তা সে তো তাঁর হাত। রামসুখের হুণ্ডীর টাকা শোধ দিয়ে তো সে হুণ্ডী তিনিই নিয়েছেন—তাঁর কাছেই আছে। তিনি ইচ্ছা ক'রলেই এখন অজয়ের নামে forgery র চার্জ্জ ক'রতে পারেন। তাঁকে ব'লে দেখুন না একবার।"

"Capital!" বলিয়া নিরুপম খুব জোরে তার হাঁটুর উপর করাঘাত করিল।

পরদিন সে অভয়ের কাছে গেল।

অভয়কে সে বলিল, "অভয়দা, রামসুখ মাড়োয়ারীর একখানা হুণ্ডী তোমার কাছে আছে?"

অভয় বলিল, "সে তো আমি জানি না, এটর্ণী জানেন। কিন্তু হুণ্ডী—হুণ্ডী কিসের থাকবে আমার কাছে?"

"অজয় বাবু সেই হুণ্ডী দিয়ে রামসুখের কাছে টাকা নিয়েছিল; তুমি রামসুখকে টাকা দিয়ে হুণ্ডী তোমার নামে endorse করিয়ে নিয়েছিলে?"

অভয় বলিল, "হাঁ তা' হ'তে পারে—আমি তো এ সব খবর রাখি না, এটর্ণী সব জানেন। কিন্তু কেন বল তো?"

"সে হুণ্ডীখানা জাল—অজয় তাতে কান্তিবাবুর নাম জাল ক'রেছিল।"

অভয় বলিল, "তাই না কি? তা কিন্তু অজয়বাবু সে সব শোধ ক'রে দিয়েছেন।"

"শোধ ক'রেছেন! তবে কি সে সব তুমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছ না কি?"

"হাঁ—এটর্ণী সব দলিলপত্র তাকে ফেরত দিয়েছিলেন।

কিন্তু অজয় সেগুলো না নিয়েই চ'লে গেছে। সে বোধ হয় এখনও এটর্ণীর কাছেই আছে।"

নিরুপম বলিল, "বাঁচালে। যা' হ'ক এখন এটর্ণীর কাছ থেকে তুমি সেই হুণ্ডীখানা আনিয়ে নাও—আর একটা নালিশ লাগিয়ে দাও—ওইটেই হবে অজয়ের মৃত্যুবাণ।"

অভয় হাঁ করিয়া নিরুপমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "নালিস ক'রবো কি হে? সে সব দলিলের টাকা নিয়ে ক্যান্সেল ক'রে দিয়েছি যে—আবার নালিস কিসের?"

নিরুপম বলিল, "তাতে forgery'র দায় থেকে তার মুক্তি নেই। তুমি তাকে forgery'র জন্য ফৌজদারীতে দাও—তার পর দেখি বাছাধন কোথায় যান।"

অভয় বলিল, "তাই না কি?—না, এ কি হ'তে পারে? টাকা শোধ ক'রে দিয়ে দিলে সে, তার পর আবার ফৌজদারী কি?"

"আরে হাঁ, অভয়দা, হাঁ—আমি বলছি তুমি শুনে রাখ। কাগজখানা এনে তুমি আমাকে দাও, তার পর দেখে নিচ্ছি আমি।"

অভয় বলিল, "আচ্ছা আমি জিগ্‌গেস ক'রে দেখবো এটর্ণাকে। আর ক'টা দিন যাক।"

"আবার ক'টা দিন যাক কেন? আজই নিয়ে এসো, কাল নালিস রুজু ক'রে দি। বাছাধনের ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই সব মিটে যাক।"

অভয় বলিল, "বেশী নয়, আর পাঁচ সাত দিন যাক না।"

অভয় ভাবিতেছিল যে অজয় যদি তার চিঠি পাইয়াও তিন চার দিনের মধ্যে সরমাকে বিবাহ করিতে সম্মত না হয়, তবে এই হুণ্ডী দেখাইয়া সে অজয়কে ভয় দেখাইবে। নিরুপম যাহা বলিল তাহা যদি সত্য হয়, তবে এই হুণ্ডী দেখাইয়াই অজয়কে কাবু করা যাইবে। কিন্তু এখন সে কথা তুলিবার দরকার নাই—চার পাঁচ দিন দেখিয়া এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য অভয় তাহা করিবে। তার মনের এ কথাটা সে নিরুপমের কাছে খোলসা করিয়া বলিল না, তাই নিরুপম কিছুতেই এই প্রস্তাবিত বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারিল না। অনেক ঝকাঝকি করিয়া সে শেষে অপ্রসন্ন চিত্তে উঠিয়া গেল।

পাঁচ দিন পর সে হীরালাল আগরওয়ালার সাক্ষাৎ পাইল। তার উকীল বন্ধুটি তাকে হীরালালের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে নিরুপম জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অজয় বাবুর নামে অত বড় সঙ্গীন মোকদ্দমাটা অমনি তুলে নিলেন, ব্যাটাকে শাস্তি দিলেন না?"

হীরালাল বলিল, "কি করবো বাবু, তার স্ত্রী আমার পা ধ'রে কান্নাকাটি ক'রলে, কিছুতে পা ছাড়ে না। তার পর টাকাটা সব দিয়ে দিলে—আমি ব'ল্লাম যা'ক।"

নিরুপম বলিল, "তার স্ত্রী! সে তো বিয়ে করে নি! আমি তো জানতাম একটা বাজে মেয়েলোককে নিয়ে সে আপনাকে ঠকিয়েছিল।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সে তার স্ত্রীই। মোকদ্দমার আগের দিন আমাকে সে ডাকিয়ে নিয়ে ভয়ানক কান্নাকাটি ক'রলে। আর সে বড়লোকের মেয়ে—মস্ত বড় বাড়ীতে থাকে! আমার বোধ হয় সে মেয়ে বিয়ে ক'রেছে ওকে, কিন্তু এই সব মামলা ফ্যাসাদে প'ড়ে ও এমন খাটো হ'য়ে গেছে ব'লে ওর স্ত্রী লজ্জায় সে কথা চেপে রেখেছে। সে মস্ত বড়লোকের মেয়ে বোধ হয়।"

নিরুপম উগ্র কৌতূহলের সহিত এ কথা শুনিল। তার মনে হইল ইহা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটা সহজ পথ। অজয়ের যদি সত্য সত্যই বিবাহ হইয়া থাকে এবং তার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকেন, তবে সেই কথাটা প্রকাশ করিয়া দিলেই সরমা তাকে বিষবৎ বর্জ্জন করিবে—আর মামলা ফ্যাসাদের মধ্যে যাইতে হইবে না।

তাই সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বটে?—তার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার তবে আলাপ আছে—পর্দ্দানশিন কি তিনি?"

"না, না, পর্দ্দা-ফর্দ্দা নেই। আজকাল আপনাদের বাঙ্গালীর ঘরে যেমন হ'য়েছে। আমার সঙ্গে দিব্যি কথাবার্ত্তা কইলে।"

নিরুপম আগ্রহের সহিত হীরালালকে অনুরোধ করিল, "আপনি একবার তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে পারেন?—আমার বিশেষ দরকার আছে।"

হীরালাল একটু সঙ্কোচ অনুভব করিল, কিন্তু শেষে সে সম্মত হইল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় হীরালাল নিরুপমকে লইয়া যাইবে স্থির হইয়া গেল।

বৈকাল বেলায় নিরুপম মায়ার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "বউদি, সব আস্কারা হ'য়ে গেছে। আমি একটা মস্ত বড় আবিষ্কার ক'রেছি—অজয় বাবু বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী বর্ত্তমান!"

মায়া ও অভয় তুজনেই বিস্মিত হইয়া বলিল, "অ্যাঁ!"

হাসিয়া নিরুপম বলিল, "হাঁ—যতই আশ্চর্য্য হোক কথাটা সত্যি। এবং আজ এখনি আমি যাব তাঁর সেই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রতে। যদি সম্ভব হয় তাঁকে নিয়ে তোমার দিদির কাছে হাজির ক'রলেই অজয়ের দফা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।"

মায়া কথাটা বেশী তলাইয়া দেখিল না, সে খুসী হইল। অভয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। সে ভাবিল ইহাই যদি সত্য হয় তবে তো অজয়ের পক্ষে সরমাকে বিবাহ করা অসম্ভব! তবে তো সরমার মান রক্ষার কোনও উপায়ই থাকিবে না! সে মনে মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিল, কিন্তু কোনও কথা প্রকাশ করিল না। মায়ার কাছে এখন সরমার নাম করিতেও সে মহা সঙ্কোচ অনুভব করে।

নিরুপম বলিল, "বিয়ে সে আজ করেনি, তিন চার বছর আগে তার বিয়ে হ'য়েছে। যখন তোমাদের বাড়ীতে তার আনাগোনা খুব বেশী ছিল, সেই সময়েই তার বিয়ে হ'য়ে গেছে। সেই স্ত্রীকে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন হীরালাল আগরওয়ালার দোকানে—কি শয়তান দেখেছ!"

এই কথায় মায়ার মুখ শুকাইয়া গেল। তার প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল! কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া এ আবার কি সাপ বাহির হইতে চলিল। তার অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

সে তখন বলিল, "তুমি ভুল শুনেছ ঠাকুরপো! তখন অজয় বাবুর নিশ্চয় বিয়ে হয় নি! আমি জানি।"

হাসিয়া নিরুপম বলিল, "তুমি তো তখন তা' জানবেই। কিন্তু বিয়ে যে তার হ'য়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমি যার কাছে শুনেছি সে নিজের চক্ষে তাকে দেখে এসেছে—তার সঙ্গে কথা ক'য়েছে। আর এ তো হাতে পাঁজী মঙ্গলবার—এখনি তো যাচ্ছি আমি, সেখানে গেলেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।"

মায়া শুষ্কমুখে বলিল "কে সে?—কে দেখেছে তাকে?"

নিরুপম বলিল, "হীরালাল আগরওয়ালা—সেই আমাকে নিয়ে যাবে তার কাছে।"

মায়া এক মুহূর্ত্তে যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। কথা কওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হইল। ভাল করিয়া সব কথা ভাবিতেও সে পারিল না। হীরালালকে লইয়া কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি করিলে শেষে পাছে আসল কথাটা বাহির হইয়া পড়ে, পাছে অজয় সরমার সম্মান রক্ষার জন্য সত্য কথাটা বলিয়া দেয়—সেই ভয়ানক সম্ভাবনার কথা কল্পনা করিয়া সে একেবারে বজ্রাহতের মত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে মায়া সসঙ্কোচে অভয়ের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "এ কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা কি ভাল হবে? তুমি কি বল?"

অভয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কিছু ভেবে উঠতে পারছিনে। আমার মনে হয়—তাই যদি হয়, তবে ওটা আর কিছুদিন চাপাই থাক।"

মায়া আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "হাঁ সেই ভাল—আমিও তাই বলি। কথাটা প্রকাশ হ'য়ে প'ড়লে—কে জানে সরি হয় তো ভয়ানক একটা কিছু ক'রে ব'সতে পারে!"

নিরুপম বলিল, "সে ভয় মিছে ক'রছেন। আমার ঠিক বিশ্বাস যে কথাটা প্রকাশ হ'লে আপনার দিদি অজয়কে সুধু লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবেন। তার চেয়ে ভয়ানক কিছু ক'রবেন না।"

ব্যস্ত হইয়া মায়া বলিল, "থাক ঠাকুরপো, ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে কাজ নেই।"

নিরুপম তাদের সঙ্গে তর্ক করিল। অভয় ও মায়া তুজনেই তাদের গোপন হেতুটা প্রকাশ করিতে না পারায় তর্কে তাদের সপক্ষে কোনও যুক্তিই উপস্থিত করিতে পারিল না।

পরিশেষে নিরুপম বলিল, "আচ্ছা দেখাই যাক না একবার কথাটা কতদূর সত্য। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, তার পর ঘাঁটা কি না ঘাঁটার কথা তোমাদের সঙ্গে বিচার করা যাবে।"

নিরুপম তার পর হীরালালের কাছে গেল। হীরালাল তাকে মোটরে চড়াইয়া চলিল বালিগঞ্জে।

বালীগঞ্জে আসিয়া যখন হীরালাল ড্রাইভারকে সরমার বাড়ীর রাস্তার কাছে মোড় লইতে বলিল তখন নিরুপম

চমকাইয়া উঠিল। ভাবিল কি দুঃসাহস এই অজয়ের। এই রাস্তার উপর, সরমার এত কাছে তার স্ত্রী থাকে, আর এইখানে সরমার সঙ্গে সে প্রেম করিতে আসে! এসব লোকদের দুঃসাধ্য কর্ম্ম নাই।

তার চমকটা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই গাড়ী দাঁড়াইল— সরমারই বাড়ীর সামনে! নিরুপম স্তব্ধ হইয়া গেল— এই বাড়ীতে?—তবে কি—সরমাই অজয়ের বিবাহিত পত্নী?

এই কথা মনের ভিতর ঝলক দিয়া যাইতেই নিরুপমের হাত পা অসাড় হইয়া গেল, তার উৎসাহ দপ করিয়া নিভিয়া গেল।

হীরালাল নামিতে যাইতেছিল, নিরুপম তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আপনার ভুল হয় নি তো বাবুজী? এই বাড়ীই ঠিক?"

হীরালাল বিস্মিত হইয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "নিশ্চয়! আমার ভুল হবে কেন?"

শুষ্কমুখে নিরুপম বলিল, "এ যে—এ যে আমার এক বন্ধুর বাড়ী!"

হীরালাল বিস্মিত হইয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। সে একবার নিরুপমের মুখের দিকে চাহিল, আর একবার চাহিল সেই বাড়ীর দিকে। বাড়ীতে উজ্জ্বল বিজলী বাতি জ্বলিতেছে, সরমা তার পড়িবার ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে, জানালা দিয়া তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

হীরালাল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সরমাকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ অজয় বাবুর স্ত্রী!"

নিরুপম মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল যে সরমার সঙ্গে অজয়ের বিবাহ হইলে মায়ার সে কথা কিছুতেই অজানা থাকিত না। সুতরাং বিবাহ হয় নাই নিশ্চয়। সে হীরালালকে বলিল, "উনিই কি অজয়ের সঙ্গে আপনার দোকানে গিয়েছিলেন সেই গয়না চুরীর দিন?"

"হাঁ।"

নিরুপম ভাবিতে লাগিল। বিবাহ হয় নাই নিশ্চয়, কিন্তু তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে সরমা অজয়ের সঙ্গে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়াছে এবং অপরের কাছে অজয়ের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই? কি পাপিষ্ঠা! নিদারুণ ঘৃণায় ও জিঘাংসায় তার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। তার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল।

শেষে সে বলিল, "বাবুজী, এখন আমার দেখা করবার দরকার নেই। আপনি আর একটু দয়া ক'রবেন। অনুগ্রহ ক'রে আধঘণ্টা এখানে একটু অপেক্ষা ক'রতে হবে। আমার বিশেষ অনুরোধ—আমি এক্ষুণি আসছি।"

হীরালাল বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপারটা কি বুঝিবার জন্য তার কৌতূহল হইল। সে অপেক্ষা করিতে সম্মত হইল।

নিরুপম ছুটিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী এক বাড়ী হইতে অভয়কে টেলিফোন করিয়া বলিল, "তুমি শীগ্‌গির বউদিকে নিয়ে বালিগঞ্জের সরমার বাড়ীতে এসো!"

অভয় বলিল, "কেন, কি হ'য়েছে?"

"ভয়ানক তামাসার কথা, শীগ্‌গির এসো—এক মুহূর্ত্ত দেরী ক'রো না—বউদি যেন আসে।"

"কেন অজয়ের স্ত্রীকে পেয়েছ না কি?"

"হাঁ—তুমি এসোই না।" বলিয়া সে টেলিফোন ছাড়িয়া দিল।

অভয় ও মায়া দুজনেই স্বতন্ত্রভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল ঠিক এই কথাই।

অভয় ভাবিতেছিল, নিরুপম যাহা বলিল তাহা যদি সত্য হয় তবে ভয়ানক সর্ব্বনাশের কথা! তাহা হইলে কি উপায় হইবে সরমার?

একবার মনে হইল, সরমাকে জগতের অবজ্ঞা হইতে রক্ষা করিবে অভয় নিজে। তার সকল শক্তি দিয়া সে সরমাকে পৃথিবীর সমস্ত আঘাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে, আর তার গৃহে সম্মান দিয়া তাকে সে বেষ্টিত করিয়া রাখিবে। কলিকাতায় তার থাকা সম্ভব না হয়, স্থানান্তরে যাইবে—চাই কি ভারতের বাহিরে ইয়োরোপ কি আমেরিকায় যাইবে, কিন্তু অজয়ের বঞ্চনার জন্য সরমার পায় সে কুশাঙ্কুরও বিঁধিতে দিবে না। সরমার সন্তান হইলে তাকে মানুষ করিবে অভয়।

তখনই তার মনে পড়িল ভয়ানক কথা! সরমাকে রক্ষা করিবার তার যে শক্তি তাহা একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে মায়া। মায়া সরমাকে সন্দেহ করে, অভয়কে সন্দেহ করে! আর তার চেয়ে আরও ভয়ানক কথা,

সরমা অভয়কে মনে মনে ভালবাসে! এইটাই অভয়ের মনে হইল সব চেয়ে বিপদের কথা। অভয় যদি সরমাকে অধিক সমাদর করে, কে জানে তার ভিতরকার এই প্রচ্ছন্ন প্রেম বাড়িয়া উঠিয়া সকল বাধা চূরমার করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে না? তবেই তো বিষম বিপদ!

চারিদিক দিয়াই বিপদ। কোনও দিক দিয়া কূল সে খুঁজিয়া পাইল না।

মায়ার ভাবনার আর কোনও কূল-কিনারা ছিল না। সে ভাবিতেছিল, এতক্ষণ নিরুপম হয় তো হীরালাল আগরওয়ালাকে লইয়া সরমার কাছে গিয়াছে, হয় তো এতক্ষণ এ কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে, অজয় বিবাহিত নয়, সরমাই আপনাকে তার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, এবং হয় তো সরমা আসল কথাটা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে! যদি তাই হইয়া থাকে তবে তো তার আর মরণ ছাড়া গতি নাই। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এই কথাটাই সে বার বার ভাবিতে লাগিল—কোনও মতেই ভাবিয়া শেষ করিতে পারিল না। ভয়ে ভয়ে তার কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

নিরুপমের টেলিফোনবার্ত্তা পাইয়া অভয় শুষ্কমুখে মায়াকে নিরুপমের কথা জানাইল। মায়া তার হৃৎকম্পন কোনও মতে দমন করিয়া শুনিল—তার পর অনেকক্ষণ দুইজনে নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দু'জনেরই মুখ শুষ্ক, হৃদয় ভারাক্রান্ত।

শেষে অভয় বলিল, "চল যাওয়াই যা'ক। নিরুপমটা যে গোঁয়ার, কি ক'রতে কি ক'রে ব'সবে তার ঠিকানা নেই। চল যাই।"

মায়া বলিল, "তুমিই যাও, আমি গিয়ে কি ক'রবো?"

অভয় বলিল, "তুমি না গেলে কিছুতেই হবে না—নইলে দিদিকে এ বিপদের সময় সামলাবে কে?"

মায়া খুব জোর করিয়া অস্বীকার করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। মনের গুপ্ত আশঙ্কায় সে ভীরু হইয়া পড়িয়াছিল; তার মনের ভিতর যে ভয় পাছে জোরে অস্বীকার করিলে সেটা অভয়ের কাছে প্রকাশ হইয়া যায়, সেই আশঙ্কায় সে খুব তীব্র প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সে পাশ কাটাইবার চেষ্টায় বলিল, "না থাক, এখন খোকাকে খাওয়াতে হবে আবার।"

অভয় বলিল, "সে মা ক'রবেন, চল।"

অত্যন্ত ক্ষীণভাবে মায়া বলিল, "মার হাতে সে খেতে চায় না—গোলমাল করে।"

"তা হোক—তোমাকে রেখে আমি যাব না। তুমি চল।"

আর প্রতিবাদ করা চলিল না। মায়া নীরবে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীর ভিতর অভয়ের অঙ্গস্পর্শ করিতেও তার সঙ্কোচ হইল। অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে গাড়ীর এক কোণায় সে এতটুকু হইয়া পড়িয়া রহিল।

তার মনে হইল সে চলিয়াছে আজ তার মৃত্যুর পথে।

(২০)

সেই দিন সকালে অজয় উঠিয়া ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে লাগিল। তার মুখখানা চিন্তায় অন্ধকার।

পূর্ব্বদিনে সরমা সকালে সুধু একবার তার কাছে আসিয়াছিল। আর সারা দিনের মধ্যে সে একবারও আসে নাই। অজয় সমস্ত দিন ব্যগ্রভাবে তার আগমনের প্রতীক্ষা করিয়াছিল—বার বার দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল, প্রতিবারই হতাশ হইয়া চক্ষু ফিরাইয়াছিল।

অথচ অন্তরালে থাকিয়া সরমা যে তার সেবা-যত্ন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া করিতেছে, বার-বার দাস দাসী পাঠাইয়া তার খবরা-খবর করিতেছে, অজয়ের নিঃসঙ্গতার গ্লানি দূর করিবার জন্য মাকে পাঠাইয়া দিয়াছে, বই পাঠাইয়াছে, কাগজ পাঠাইয়াছে, এসব কোনও খবরই অজয়ের জানিতে বাকী নাই।

এই সেবায় প্লাবিত হইয়া অজয় আকুল ভাবে কামনা করিতেছিল এই করুণা, সেবা ও স্নেহের উৎসের। তাকে চোখে দেখিয়া, তার কথা শুনিয়া, তার সঙ্গে কথা কহিয়া যে আনন্দ, তার জন্য সে লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল।

এ কামনা তার মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়, কিন্তু এ বেদনা সে সহিতেও পারে না।

সারা দিবারাত্রের অদর্শনে তার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল সরমার দর্শনের জন্য! কাল অনেকবার সে ভাবিয়াছে সরমাকে ডাকিয়া পাঠায়, কিন্তু সাহস পায় নাই। আজ আর সে তার দর্শন-তৃষ্ণাকে কোনও ক্রমেই দমন করিতে পারিতেছে না।

চাকর আসিয়া তার চা ও খাবার দিয়া গেল। অজয় বলিল, "দেখ—"

চাকর ফিরিয়া দাঁড়াইল আদেশের প্রতীক্ষায়। কিন্তু অজয় থামিয়া গেল।

তার পর সে বলিল, "তোমার দিদিমণি কি ব্যস্ত আছেন খুব ?"

তখনই হাসিতে হাসিতে সরমা ঘরে প্রবেশ করিল। অজয়ের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চাকর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরমা হাসিয়া বলিল, "আমাকে ডাকছিলেন আপনি ?"

অজয় চট্ করিয়া কোনও উত্তর দিতে পারিল না। একটু থামিয়া সে বলিল, "হাঁ একবার—এই আপনাকে বলছিলাম কি ? আজ আমাকে ছুটী দিন। আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ ক'রছি—আর আটকে রাখ্‌বেন না।"

সরমা মুখ ভার করিয়া বলিল, "কষ্ট যদি হয় আপনার এখানে থাকতে, তবে কাজ নেই।"

উত্তেজিত ভাবে অজয় বলিল, "কষ্ট হয়! আপনি কি ব'লছেন ? কিছুই কি বুঝতে পারেন না আপনি ? আমার উপর আপনি এমনি অবিচার কি চিরদিন ক'রবেন ?"

সরমা বলিল, "অবিচার কিছু করিনি অজয় বাবু। আজ তিন দিন থেকে যাবার জন্য আপনি ছট্‌ফট্ ক'রছেন, তাই আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাই না ব'লেছি।"

অজয় গম্ভীর হইয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সরমা বলিল, "রাগ ক'রলেন অজয় বাবু ?"

দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া অজয় বলিল, "না। রাগ করিনি, কিন্তু দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে এই জন্যে, যে বুকের ভিতর যা হ'চ্ছে তা আপনাকে খুলে দেখাতে পারছি না। তাই অবিচার আমার মাথা পেতে নিতে হ'চ্ছে। সে দুঃখ সইবে—কিন্তু আপনি যে না বুঝে দুঃখ পাচ্ছেন এই দুঃখ সইতে পারছি না।"

সরমা তার বড় বড় চক্ষু দুটি অসীম স্নেহের সহিত অজয়ের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "আমার কোনও দুঃখ নেই অজয় বাবু। বরং এ কয় দিন আপনার যে একটু সেবা ক'রতে পেরেছি সেই আমার আনন্দ!"

অজয় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে হাসিমুখে আজ আমায় বিদায় দিচ্ছেন ?"

সরমাও ছোট্ট একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, "হাসিমুখেই বিদায় দেব, কিন্তু এ বেলায় নয়। খাওয়া দাওয়া ক'রে একটু ঘুমিয়ে বিকেলে যাবেন। কেমন ?"

অজয় বলিল "আচ্ছা।"

তার পর কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে অজয় হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "দেখুন, আপনাকে না ব'লে আমি পারছি নে। না ব'ল্লে চিরদিন আপনি আমার উপর অবিচার ক'রবেন, সে আমি সইতে পারবো না। সেদিন আপনি আমাকে যে মহার্ঘ রত্ন দিতে গিয়েছিলেন, নিতে পারি নি আমি তা। কিন্তু অশ্রদ্ধা ক'রে আমি প্রত্যাখ্যান ক'রেছি—গর্ব্ব ক'রে বা রাগ করে প্রত্যাখ্যান ক'রেছি, এমন কথা যদি আপনি মনে ভাবেন তবে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি না—আপনাকে ভালবাসি না—এর চেয়ে নিদারুণ মিথ্যা নেই। কিন্তু আপনাকে বড় ভালবাসি ব'লেই প্রত্যাখ্যান ক'রেছি—আপনাকে অসম্মানিত ক'রবো না ব'লে। এ কথা বিশ্বাস ক'রবেন কি ?"

একটা আনন্দের লহর খেলিয়া গেল সরমার অন্তরে। কিন্তু সে আনন্দ সে প্রকাশ করিল না। সে শুধু বলিল

"সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রছি। কিন্তু আর সে কথা কেন ? সে সব তো চুকে গেছে। সে কথা তুলে' তো কোনও লাভ নেই।"

"লাভ আছে। দরকার আছে তাই ব'লছি। যদি না বলি, তবে আপনি আমাকে একটা পশুর অধম ভাবলে আপনাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। তাই এই কথাটা আমি আপনাকে বিশ্বাস করাতে চাই যে আমার অন্তরে যে ভালবাসা আছে আপনার উপর—সে সমুদ্রের মত গভীর। কিন্তু সে ভালবাসায় আপনাকে রক্ষা ক'রতে চাই—বাঁচিয়ে রাখতে চাই আপনার পরিপূর্ণ সম্মান—আপনাকে গ্রাস ক'রে ডোবাতে চাই নে। তাই, আমার অত বড় স্পর্দ্ধা হ'য়েছিল।"

সরমা শান্তভাবে বলিল, "থাক, ও-কথা আর তুলে কাজ নেই। আমি ব'লেইছি তো, সে কথা নিয়ে আমার আপনার উপর কোনও অভিযোগ নেই, অনুযোগ নেই। আমার আপনার দুজনেরই এখন উচিত সে দিনকের

কথাগুলো ভুলে যাওয়া। নয় কি? আমার কোনও দুঃখ নেই, কোনও গ্লানি নেই। আপনিও তা' নিয়ে মনে কিছু ক'রবেন না। আপনি আপনার কাজ ক'রে যান, আমি আমার কাজ করি। সংসারে আমরা তো শুধু ভালবাসতে আসি নি, এসেছি কাজ ক'রতে। একটা ব্যর্থ ভালবাসার আপশোষ নিয়ে কাজ মাটি করা, জীবনকে ব্যর্থ হ'তে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

অজয় আবার কি বলিতে যাইতেছিল। সরমা বাধা দিয়া বলিল, "আপনার কাছে আমার শুধু একটা ভিক্ষা, আপনি শরীরটাকে মিছেমিছি অত কষ্ট দেবেন না। শরীরের প্রতি যদি আপনি একটু দৃষ্টি না দেন তবে আমার দুঃখ কিছুতেই যাবে না।"

অজয় বলিল, "আপনার এ অনুরোধ যদি রক্ষা না করি তবে আপনার করুণার—ভালবাসার অপমান করা হবে। আমি কথা দিচ্ছি, শরীরের যত্ন ক'রবো এর পর।"

সরমা তার পর আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

তার মনের ভিতর যে উল্লাস হইল, নির্জ্জনে বসিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিল। অজয় তাকে ভালবাসে। সে নিজমুখে তাহা বলিয়াছে, তার মুখ চোখ তাহা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছে। ভালবাসিয়াই সে তাকে ছাড়িয়াছে। তার এ প্রতিজ্ঞায় যেমন প্রকাশ পাইয়াছে তার ভালবাসা, তেমনি ফুটিয়া উঠিয়াছে তার মহত্ব, তার চরিত্র-গৌরব। এই কথায় অজয়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা বহুগুণে বাড়িয়া গেল। তার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া সে গৌরব সরমা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অজয় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তখন সরমা আসিয়া অজয়ের হাতে তার দোকানের চাবিটা দিল।

অজয় বলিল, "যাবার সময় একটা ভিক্ষা পাব কি?"

ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া সরমা বলিল, "কি চান?"

অজয় কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "চাইতে ভরসা হয় না, চাইবার অধিকার আমি অর্জ্জন করি নি, তবু চাইতে সাহস ক'রছি—শুধু আপনার করুণার সীমা নেই ব'লে।"

সরমা বলিল, "কি চান বলুন না?"

কম্পিত হস্তে সরমার একখানি হাত ধরিয়া অজয় বলিল, "আপনার এই হাতখানির উপর, জন্মের শোধ, একটি চুম্বন"—

সরমার শরীরের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। অত্যন্ত ধীরে ধীরে হাতখানা টানিয়া লইয়া সে আত্মস্থ হইয়া বলিল, "থাক। ও সব কথা ভুলে যান।"

অজয় ত্রস্তে ব্যস্তে তার হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "অপরাধ ক'রেছি, বেয়াদবী মাপ ক'রবেন।"

সে যখন গিয়া গাড়ীতে উঠিল, তখন সরমা তাকে বলিল, "আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

অজয় বলিল, "আদেশ করুন।"

"মাঝে মাঝে আপনি এক-আধবার এসে আমাকে দেখা দিয়ে যাবেন।"

অজয়ের বুকটা কাঁদিয়া উঠিল। ইহার উত্তরে অনেক কথা তার ঠোঁটের গোড়ায় আসিল। সে কথা ফিরাইয়া দিয়া সে বলিল, "আচ্ছা আসবো।"

দোকানে গিয়া অজয় দুয়ার খুলিয়া দেখিল ঘরটা অত্যন্ত নোংরা হইয়া রহিয়াছে। এই ঘরের দীনতা ও অপরিচ্ছন্ন শ্রীহীনতা আজ যেন তার চোখের ভিতর কাঁটার মত ফুটিল। সরমার বাড়ীতে সে আরামে ছিল, সম্পদে বেষ্টিত ছিল। কিন্তু সে সম্পদের চেয়ে বড় ছিল সরমার কল্যাণ-হস্তের রচিত এতটি অপূর্ব্ব শ্রী, আর গৃহের বায়ু ও আকাশের ভিতর পরিব্যাপ্ত তার অনর্ঘ প্রেম। সেই শ্রী ও সেই প্রীতির স্পর্শলেশশূন্য এই গৃহটী তার চোখে আজ অত্যন্ত কুৎসিত মনে হইল।

দুয়ার খুলিয়া সে ঝাঁটা হাতে করিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে প্রস্তুত হইল। একটুতেই সে ক্লান্তি বোধ করিল। তার স্মরণ হইল সরমাকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে যে শরীরের যত্ন করিবে। তাই সে অতিশ্রম হইতে বিরত হইল। তার ছোকরাকে ডাকিয়া ঘর ঝাঁট দিতে বলিয়া সে জিনিষ-পত্র একটু গুছাইতে চেষ্টা করিল।

সে দেখিতে পাইল একটা জানালার কাছে মেঝের উপর কয়েকখানা চিঠি ছড়াইয়া রহিয়াছে। তার অনুপস্থিতিতে ডাকপিয়ন জানালা দিয়া চিঠিগুলি গলাইয়া দিয়াছিল, সেগুলি অমনি পড়িয়া ছিল।

চিঠি কয়খানা কুড়াইয়া লইয়া সে একে একে পড়িতে

লাগিল। দুই একখানা চিঠির পর সে পড়িল মায়ার চিঠি। পড়িয়া সে স্তম্ভিত হইল।

চিঠিখানার তারিখ পরীক্ষা করিয়া সে দেখিল যে, যেদিন সরমা তার কাছে আসিয়াছিল সেই দিনকার লেখা এ চিঠি, আসিয়াছে তার পরদিন।

মায়ার পত্রের কঠোরতা তার বুকে বিষম আঘাত করিল। অজয় যে সরমাকে ভুলাইয়া বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে এই তার অভিযোগ। এ অভিযোগের ভিত্তি বোধ হয় এই যে মায়া জানিয়াছে যে সরমা তার কাছে আসিয়াছিল। কি নিষ্ঠুর অবিচার!

তার পর সে মনে করিল, সরমা যে অজয়ের কাছে সেদিন আসিয়াছিল সে কথাটা তবে মায়ার কাছে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে; আর সরমা যে প্রণয় সম্ভাষণে আসিয়াছিল এ অনুমান মায়া করিয়াছে। কি ভয়ানক কথা! সরমার তবে মায়ার কাছে লজ্জার আর অবধি নাই। সরমার মানরক্ষার জন্য অজয়ের যত্ন ব্যর্থ হইয়াছে।

মায়ার অভিযোগ ও তিরস্কারের ভিতর যে নির্ম্মম অবিচার ছিল তাহা তাকে যতই আঘাত করুক, কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে স্থির করিল যে মায়ার উপদেশটা অশ্রদ্ধেয় নয়। সে এখানে থাকিলে সরমার সঙ্গে দেখা হইবে। কে জানে তাহা হইতে কোন দিন কোন বিপদ উপস্থিত হইবে! কয় দিন সরমার কাছে থাকিয়াই তো তার প্রতিজ্ঞা টলমল হইয়া উঠিয়াছিল—সে পারে নাই সম্পূর্ণ আত্মসংবরণ করিতে। সুধু সরমার দৃঢ়তায় তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। কে জানে আবার দেখা হইলে কি হইবে? সুতরাং এখানকার কারবার গুটাইয়া স্থানান্তরে—দূরদেশে যাওয়ার পরামর্শ মন্দ নয়!

গভীরভাবে এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অজয় বাকী চিঠিগুলি খুলিয়া পড়িল। সর্ব্বশেষে সে খুলিল অভয়ের চিঠি।

এই চিঠি পড়িয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

অভয় অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি, উদার ও স্থিরবুদ্ধি লোক। তার হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এমন একখানা চিঠি লেখা সম্ভব নয়। নিশ্চয় সে এমন কথা শুনিয়াছে যাহাতে তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে সরমা তাহার দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে।

অজয় চিন্তিতভাবে চিঠির তারিখ পরীক্ষা করিল। দেখিল যে, সরমা যেদিন তার কাছে আসিয়াছিল তার পর দিন অভয় লিখিয়াছে। সুতরাং মায়া ও অভয়ের অভিযোগের ভিত্তি এক—সরমার অজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অজয় অনুমান করিল যে মায়া যখন লিখিয়াছিল তখন কথাটা ছিল এই যে, অজয় সুধু সরমাকে ভুলাইয়া বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। পরের দিনই কথাটা এইভাবে প্রকাশ হইয়াছে যে অজয় সরমাকে কলঙ্কিত করিয়াছে, কিন্তু তাকে বিবাহ করিতে চায় না!

কথাটা নিশ্চয়ই সরমার আত্মীয়-সমাজে বেশ ভাল করিয়াই রটিয়াছে। এমনভাবে বিকৃত হইয়া তাহা রটিয়াছে যে সরমার এখন আত্মীয় সমাজে মুখ দেখান অসম্ভব!

মায়া ও অভয় দুইজনেই তাকে শাসাইয়াছে। মায়া বলিয়াছে সরমাকে ত্যাগ করিতে, অভয় বলিয়াছে তাকে বিবাহ করিতে! এই প্রভেদের হেতু অজয় ইহাই অনুমান করিল যে মায়া যখন লিখিয়াছে তখন সরমার কলঙ্কিত হইবার কথা রটে নাই, অভয় যখন লিখিয়াছে তখন তাহা রটিয়াছে। মায়া ও অভয় উভয়ের শাসন ও ভয় প্রদর্শন সে অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু তারা যাহা লিখিয়াছে সেই কথা গভীর ভাবে ভাবিতে লাগিল।

এখন তার কর্ত্তব্য কি? মায়ার উপদেশ অনুসারে পলায়ন, না অভয়ের আদেশ অনুসারে বিবাহ? যদি সরমার নামে অত বড় কলঙ্ক রটিয়া থাকে, তবে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় সরমার কোনও হিত হইবে না, সে কলঙ্ক তার ঘুচিবে না। বিবাহ করিলে ঘুচিবে কি? সে সরমাকে বিবাহ করিয়া তার মান বাড়াইতে পারিবে না—সুধু কলঙ্ক মোচনের জন্য তাকে খাটো করা সঙ্গত হইবে কি?

অজয় ভাবিল সরমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই সুধু সরমার তাতে সম্মানহানি হইবে বলিয়া। এখন তার হইয়াছে এত বড় কলঙ্ক যার কাছে সে সম্মানহানি তুচ্ছ। সে কলঙ্ক হইতে মুক্তির এক উপায় সরমাকে বিবাহ করা! এ কল্পনায় সে তৃপ্তি অনুভব করিল না। কেন না সরমাকে অজয় যতই ভালবাসুক, এ বিশ্বাস তাহার বদ্ধমূল ছিল যে সে সরমার যোগ্য স্বামী কিছুতেই নয়। সে সরমাকে বিবাহ করিলে সরমাকে খাটো হইতে হইবে, হয় তো সরমা জীবনে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, তার তৃপ্তি সে পাইবে না।

সুতরাং এ কল্পনায় তার হৃদয় যত উল্লসিত হইল, তার অন্তরে সে সেই পরিমাণে সঙ্কোচ অনুভব করিল।

হউক, কিন্তু পরস্পরকে ভালবাসিয়া তারা জীবন চরিতার্থ করিতে পারে। অজয় সরমাকে ভালবাসে, সরমা অজয়কে ভালবাসে—তাদের দুজনের কারও জানিতে বাকী নাই যে অপরে তাকে ভালবাসে। এতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিল সুধু একটা সম্মানের ব্যবধান। সে ব্যবধান হঠাৎ এমনি করিয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতে সঙ্কোচ যতই হউক, অজয়ের উল্লাস হইল। একটা ক্লেশকর কর্ত্তব্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রাণের পিপাসার পরিতৃপ্তির স্বাধীনতা পাইয়া তার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কিন্তু সরমা? এত বড় কলঙ্কের পর সে কি করিবে? ভাবিতে অজয়ের হৃদয় ব্যথায় পীড়িত হইল। দেবীর মত মেয়ে সরমা, তার অদৃষ্টে এই নিদারুণ কলঙ্ক! ভগবানের রাজ্যে কি বিচার নাই? না জানি সরমা ইহাতে কি নিদারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতেছে!

অজয় স্মরণ করিল, এ কয় দিনের মধ্যে সে সরমার ভিতর কোনও বৈলক্ষণ লক্ষ্য করে নাই। সে অজয়ের প্রত্যাখ্যানের অসম্মান যেমন উপেক্ষা করিয়াছে, তেমনি উপেক্ষা করিয়াছে তার এ কলঙ্ক! মায়া ও অভয় অজয়কে যে কথা লিখিয়াছে সে কথা যে সরমার কাছে পৌঁছায় নাই এমন সম্ভাবনা তার মনে হইল না। সে মনে করিল যে তাদের চিঠি লিখিবার পূর্ব্বেই সরমা এজন্য তিরস্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা জানিয়াও সরমা অনায়াসে অজয়কে তার গৃহে লইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে তার সেবা করিয়াছে, অসামান্য স্নেহ দেখাইয়া তার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে—প্রশান্ত বিকারহীন চিত্তে।

কিন্তু—হাঁ একটু বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছে বই কি অজয়? প্রেম সম্বন্ধে সে একটু ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে, সে কথা অজয়কে তুলিতে বারণ করিয়াছে—ভুলিবার কথাও বলিয়াছে! সরমার এই ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য অজয় তখন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু এখন তার মনে হইল যে তার নামে এই কলঙ্ক রটিয়াছে বলিয়াই সরমা তার উদ্দাম প্রেমকে সহসা সংযত করিয়া ফেলিয়াছে। সুধু এইটুকু,—জগতের অসম্মান, অশ্রদ্ধা বা কলঙ্ককে সে ইহার বেশী আমল দেয় নাই! কি মহীয়সী এই নারী—কি অপূর্ব্ব তার চরিত্র! শ্রদ্ধায় ভক্তিতে অজয়ের অন্তর সরমার কাছে নত হইয়া পড়িল।

এই কথা ভাবিয়া অজয়ের মনে একটু সংশয় হইল। কলঙ্কের কথা শুনিয়া যদি সরমা ইহাই স্থির করিয়া থাকে যে সে অজয়ের প্রতি প্রেম ভুলিয়া যাইবে, তবে কি সে আজ অজয়ের মুখে বিবাহের প্রস্তাব খুসী হইয়া গ্রহণ করিবে? অজয়ের ভয় হইল, বুঝি বা সরমা তাকে প্রত্যাখ্যান করিবে—স্নিগ্ধভাবে সে প্রত্যাখ্যান করিবে, কিন্তু দৃঢ়তার সহিত।

আজই আসিবার সময় সে অজয়ের মত্ত ভিক্ষা যে স্নিগ্ধ দৃঢ়তা ও প্রশান্ততার সহিত বিমুখ করিয়াছিল সে কথা অজয়ের স্মরণ হইল। এখন তার ভয় হইল যে অজয় যদি এখন বিবাহের প্রস্তাব করে তবেও সে এমনি ভাবে প্রত্যাখ্যান করিবে।

তাই অজয় সঙ্কুচিত হইল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া, কি করিবে সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। শেষে সন্ধ্যাবেলায় সে মন স্থির করিয়া সরমার সঙ্গে দেখা করিতে চলিল।

(২১)

অভয় মায়াকে লইয়া উপস্থিত হইলে নিরুপম তাহাদের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, হীরালাল একটু পশ্চাতে রহিল।

অভয়কে সে বলিল, "অভয়দা, দেখবে আজ অজয়বাবুর স্ত্রীকে—আজকের স্ত্রী নয়, হয়তো চার বছরের পুরোনো স্ত্রী—সুধু বিয়েটা হয় নি—দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে।"

সরমা তার পড়িবার ঘর গুছাইতেছিল। অজয়ের বিছানাটা তখনও সেখানে পাতা ছিল। ঘর গুছাইতে গুছাইতে সে বার বার সেই বিছানার দিকে চাহিতেছিল। এক একবার হঠাৎ তার ভুল হইতেছিল—বুঝি অজয় এখনও সেখানে শুইয়া আছে!

হঠাৎ সে দেখিতে পাইল অভয়, মায়া ও নিরুপম বাগানের ভিতর দিয়া আসিতেছে। দেখিয়া সে বাহির হইয়া সিঁড়ির তলায় দাঁড়াইল।

সরমা হাসিয়া বলিল, "কি সৌভাগ্য!—এ ক' দিন খবরই নেই—আজ যে বড় মনে প'ড়লো?"—তার পর তার

চোখ পড়িল পশ্চাতে হীরালালের উপর। সরমার মুখ চুণ হইয়া গেল—সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

সরমার মনে হইল তার মাথায় যেন খড়্গাঘাত হইল। আজ অভয় ও নিরুপমের সম্মুখে তার সেই লজ্জার কথাটা প্রকাশ হইয়া যাইবে, এই কথা ভাবিয়া সে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে তার পর বলিল "আসুন।" বলিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া ঘরে লইয়া বসাইল।

ঘরে বসিয়াই নিরুপম বলিল, "অভয়দা', বউদি, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। ইনি হ'চ্ছেন অজয়বাবুর স্ত্রী—তিন বছর আগে অজয়বাবু এঁকে নিয়ে হীরালালবাবুর দোকানে গিয়েছিলেন। তার পর অজয়বাবুর নামে যখন মোকদ্দমা হয়, তখন ইনি সব স্বীকার ক'রে হীরালালবাবুর পায় ধ'রে তার মুক্তি ভিক্ষা ক'রে নিয়েছিলেন।—হীরালালবাবু, আমার কথা ঠিক তো?"

হীরালাল বড় সঙ্কোচ অনুভব করিল—তার মনে হইল এ-সব কথার তাৎপর্য্য ভাল নয়,—ইহার ভিতর তার আসা উচিত হয় নাই। কিন্তু নিরুপায় হইয়া সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

নিরুপমের কথার আরম্ভ হইতেই সরমা একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে শক্ত হইয়া তার আসনে বসিয়া রহিল—কিন্তু হাত-পা তার ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মায়া তার পাশে বসিয়া ছিল। তার বুক আগেই শুকাইয়া গিয়াছিল, এখন সে মরণ কামনা করিতে লাগিল। শঙ্কা-বিস্ফারিত চক্ষু দুটি দিয়া সে কাতর ভাবে সরমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—সরমার মুখের ভাব দেখিয়া তার ভয় হইল—সরমার দুঃখে সে দুঃখ পাইল—কিন্তু সব চেয়ে বেশী হইল তার নিজের জন্য ভয়।

অভয় একেবারে হতভম্ব হইয়া প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ বিস্ফারিত নয়নে নিরুপমের দিকে চাহিয়া রহিল। নিরুপম তার বক্তব্য সমাপন করিলে সে চাহিল সরমার মুখের দিকে—সরমার মুখ দেখিয়া তার দয়া হইল। কিন্তু সে কোনও কথা বলিতে পারিল না। তার বাক্‌শক্তি এই অপ্রত্যাশিত সংবাদের আঘাতে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে নিরুপম শ্লেষের সুরে বলিল, "কি বলেন সরমা দেবী—এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

এই শ্লেষে প্রস্তর-মূর্ত্তিতে যেন প্রাণ-সঞ্চার হইল। সরমা যেন মূর্চ্ছাভঙ্গে জাগিয়া উঠিল।

সে তার অন্তরের সকল শক্তি সংহত করিয়া অনৈসর্গিক প্রশান্ততার সহিত বলিল, "হীরালালবাবু, আপনার বোধ হয় আর দরকার নেই, আপনি এখন যেতে পারেন।"

হীরালাল অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবে উঠিয়া নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। সে নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল—এমনি ভাবে বহিস্কৃত হইয়া যেন বাঁচিল।

সরমা তেমনি ধীরভাবে বলিল, "কি জিজ্ঞাসা ক'রছিলেন নিরুপমবাবু?"

নিরুপম তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

সরমা বলিল, "তার আগে, আপনার এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার কি অধিকার আছে জানতে পারি কি?"

নিরুপম এ প্রশ্নে যেমন অপ্রস্তুত হইল, তেমনি হইল রুষ্ট। সে বলিল, "আমি জিগ্‌গেস ক'রছি অভয়দা'র হ'য়ে, বউদির হ'য়ে।"

"ওঁরা তো নাবালক নন?"

এ কথার জবাব নাই। কিন্তু নিরুপম হটিবার পাত্র নয়। সে বলিল, "বেশ, আপনি যদি কিছু না বলেন, সে আপনার ইচ্ছে—আমরা এ থেকে যা সিদ্ধান্ত হয় ক'রবো।"

সরমা বলিল, "তা অবশ্যই ক'রবেন। কিন্তু আপনার এ প্রশ্ন জিগ্‌গেস করবার অধিকার নেই ব'লছি ব'লে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি কুণ্ঠিতা, তা মনে ক'রবেন না। আমার উত্তর এই যে আমি যে অজয়বাবুর স্ত্রী এ কথা হীরালালবাবুকে কেন, কারও কাছে ব'লতে আমার লজ্জা নেই।"

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে সরমা কথা কয়টি বলিল, কিন্তু অশনি-সম্পাতের পর যেমন তীব্র গভীর নিস্তব্ধতা জগৎকে আচ্ছন্ন করে, এ কথার পর তেমনি একটা স্তব্ধ নীরবতা যেন ঘরখানাকে আবৃত করিল।

এক মুহূর্ত্ত কেহ কথা বলিতে পারিল না—নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিতে পারিল না।

কথাটা এত বিস্ময়কর—এত অপ্রত্যাশিত যে ইহা যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের মত অভয়ের মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া

গেল ; সে কিছুক্ষণ ইহার তাৎপর্য্য সম্যক অনুভব করিতে পারিল না। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে সরমার প্রশান্ত পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার সেই মুখের দিকে চাহিয়া কোনও কথা তার মুখে আসিল না। নিরুপমের কথা শুনিয়া সে যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, তেমনি সে অভিভূত হইয়াছিল তার অনুচিত ও অকরুণ কঠোরতায়। আর সে বিস্মিত ও অভিভূত হইল সরমার এই অপ্রত্যাশিত উত্তরের গাম্ভীর্য্য ও অপূর্ব্বতায়। সরমার মুখের দিকে চাহিয়া সে বুঝিল কত বড় আঘাত নিরুপম তাকে দিয়াছে—তার ব্যথা যেন অভয়ের বুকের ভিতর গিয়া লাগিল। কিন্তু সব চেয়ে বেশী অভিভূত হইল সে সরমার মূর্ত্তি ও কণ্ঠের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে অপূর্ব্ব মহত্ব ও গৌরব তাহাতে!

মায়া নিরুপমের প্রশ্ন শুনিয়া যেন তার আসনের ভিতর মিশিয়া গিয়াছিল। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে তার মনে হইতেছিল যে সে যদি কোনও অলৌকিক উপায়ে হঠাৎ সে স্থান হইতে বিলুপ্ত হইতে পারিত তবে সে বাঁচিত। নিদারুণ আশঙ্কায় সে যেন মরিয়া গেল, তীব্র ঔৎসুক্যের সহিত সে তার ব্যথিত দৃষ্টি সরমার দিকে ফিরাইল। প্রতি মুহূর্ত্তে তার মনে হইল বুঝি বা সরমা এখনি সত্য কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া তার মাথায় বজ্র হানিয়া বসিবে। সরমার অগোচরে সে নিজে সরমার প্রতি নিদারুণ অবিচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই—সরমার অন্তরের সব চেয়ে গোপন কথা অভয়ের কাছে প্রকাশ করিয়া সরমার চরিত্রের উপর আক্ষেপ করিতে তার বাধে নাই—সরমা যে এত বড় বিপদের ভিতর পড়িয়া মায়ার মান রক্ষা করিয়া আপনাকে লাঞ্ছিত করিবে এ আশা তার হইল না। ঔৎসুক্য, আশঙ্কা, হতাশা তার দৃষ্টির ভিতর ফুটিয়া উঠিল। তার পর, সরমা যতক্ষণ নিরুপমের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিল, ততক্ষণ সে নিদারুণ উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিল। সরমার মুখের অস্বাভাবিক প্রশান্ততার ভিতর সে তার অন্তরের নিষ্পিষ্ট ক্রোধাগ্নির গর্জ্জন শুনিতে পাইল। মায়া প্রমাদ গণিল। তার হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।

তার পর সরমা যখন সমস্ত কথাটা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিল, তখন মায়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর আপ্লুত হইয়া গেল—ভুলিয়া গেল সে এ কয় দিন ধরিয়া সরমার উপর মনে মনে যত অবিচার করিয়াছিল। সরমার উপর তার সকল আক্রোশ বিলুপ্ত হইয়া গেল—সরমাকে তার কৃত কর্ম্মের জন্য ঘৃণা করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। সরমার এই কথায় তার অন্তরের যে অপরিসীম স্নেহ-বন্যা রুদ্ধ হইয়া ছিল ঘৃণায় ও ক্রোধে—তাহা মুক্ত হইয়া তাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল—তার ইচ্ছা হইল সরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে, তার পদতলে লুটাইয়া পড়িতে। সরমার প্রতি সহানুভূতিতে তার অন্তর ভরিয়া গেল, তার জন্য সরমার যে এত বড় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল তাহাতে তার বুকের ভিতর ভয়ানক খোঁচা লাগিল—নিদারুণ আত্মগ্লানিতে তার মন ভরিয়া গেল। নিরুপমের উপর তার ভয়ানক ক্রোধ হইল—কিন্তু সাহস হইল না তার মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে। তার মনে হইল সে ক্ষুরধার সূক্ষ্ম পথের উপর কোনও মতে টায়টোয় দাঁড়াইয়া আছে, সামান্য একটা ধাক্কায় সে হয় তো টলিয়া পড়িবে অতলস্পর্শ গহ্বরে। সত্য কথা যদি কোনও মতে প্রকাশ হয়, তবে যে কত বড় সর্ব্বনাশ হইবে তাহা ভাবিতে তার অন্তর শিহরিয়া উঠিল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল নিরুপম, নিদারুণ হিংসা ও ক্রোধ তার মুখের প্রতি রেখায় রেখায় বিকটভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—কিছুক্ষণ সে রাগে কথা বলিতে পারিল না। তার পর সে বলিল, "লজ্জা নেই আপনার তা' আমি জানি। নইলে যখন আপনার বোনের সঙ্গে অজয়ের বিয়ের কথা হ'চ্ছে অন্ততঃ তখন আপনি অজয়কে নিয়ে এমনি ঢলাঢলি ক'রতে পারতেন না। কিন্তু অজয় আপনার স্বামীটি কি রকম শুনি? একটা বিবাহ অনুষ্ঠানের বোধ হয় কোনও প্রয়োজন হয় নি আপনার, কেমন?"

কথাগুলি মায়ার বুকের ভিতর যেন শেলের মত বিঁধিল। সরমার এ অন্যায় নির্য্যাতন আর সে সহিতে পারিল না, তার অপরাধে তার সামনে যে সরমা এমন কঠিন শাস্তি পাইতেছে তাতে তার আপনাকে একেবারে ক্রিমিকীটের মত হীন ঘৃণ্য মনে হইল। সে তার সমস্ত সঙ্কোচ জয় করিয়া মাথা নাড়া দিয়া বসিয়া বলিল, "আসল কথা তুমি জান না ঠাকুরপো,"

মায়া মুখ খুলিতেই সরমা [illegible] ফেলিল সে কি কথা বলিতে যাইতেছে। ধপ করিয়া মায়ার হাত চাপিয়া ধরিয়া

সে বলিল, "থাম মায়া, আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছেন, আমাকে উত্তর দিতে দে।"

মায়া স্তব্ধ হইয়া, অবাক হইয়া সরমার দিকে চাহিল। সরমা বলিল, "ঠিক কথা নিরুপমবাবু—লজ্জা নেই আমার। কিন্তু কিই বা জানেন আপনি যে, ব'লছেন আমার লজ্জা নেই বা তা' ব'লে আমায় লজ্জা দেবেন। আমি বলছি শুনুন, আমি অজয়বাবুর সঙ্গে গোপনে নির্জ্জনে অনেক সময় কাটিয়ে এসেছি। তা ছাড়া, এ কয় দিন অজয়বাবু এখানেই ছিলেন, আমি তাঁর সেবা ক'রেছি—এক রাত্রি তাঁর বিছানায় কাটিয়েছি—এই কিছুক্ষণ হ'ল তিনি বেরিয়ে গেছেন—এখনও আমার পড়বার ঘরে তাঁর বিছানা পাতা আছে। শুনলেন? এতে আমার লজ্জা নেই—কেন না আমি তাঁর স্ত্রী—বিয়ে হ'য়েছে কি না হ'য়েছে সে কথা নিষ্প্রয়োজন, ভগবানের চক্ষে ধর্ম্মের চক্ষে আমি তাঁর স্ত্রী!"

তার পর সে এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিল, "শুনলেন তো? বুঝলেন তো যে আমার উপর লোভ ক'রে আমার বাড়ীতে ঘুর ঘুর ক'রে আসায় আপনার কোনও সার্থকতা নেই? এখন আপনি যেতে পারেন।"

সরমার এ বক্তৃতায় নিরুপম পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির স্পর্দ্ধায় সকলেই স্তম্ভিত হইল—তার ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি কারও রহিল না।

অভয় ও মায়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

নিরুপম আপনাকে প্রবঞ্চিত ও পরাজিত অনুভব করিয়া নত মস্তকে বসিয়া দন্তে অধর দংশন করিতে লাগিল।—সরমা যে তাহাকে বিদায় হইতে বলিল তাহা সে গ্রাহ্য করিল না, সরমার কথার একটা উপযুক্ত উত্তর কল্পনা করিতে থাকিল।

অজয় ঠিক সেই সময় আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল—কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

সে একটু পূর্ব্বে আসিয়াছিল। গেটে ঢুকিবার সময় সে দেখিল হীরালাল গাড়ীতে উঠিতেছে। ঘরে আসিয়া দেখিল সরমার কাছে মায়া, অভয় ও নিরুপম। এক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। প্রবেশ করিতে তার সঙ্কোচ হইল। ব্যাপারটা বুঝিতে তার বিলম্ব হইল না। হীরালালকে সরমার সম্মুখীন করিয়া ইহারা সরমাকে তার কল্পিত অপরাধের জন্য তিরস্কার করিতে আসিয়াছে এ কথা সে বুঝিল, কিন্তু এ অবস্থায় তার কর্ত্তব্য কি তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে অল্পক্ষণ দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইল।

সেইখানে দাঁড়াইয়া সে নিরুপমের শেষ কথা শুনিল, মায়ার কথা বলিবার চেষ্টা দেখিল, আর পরিশেষে শুনিল সরমার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। নিরুপমের কথা শুনিয়া সে রাগে ফুলিয়া উঠিল। মায়ার কথা শুনিয়া তার উপর তার শ্রদ্ধা হইল—সরমার কথা শুনিয়া গর্ব্বে আনন্দে তৃপ্তিতে তার হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে প্রবেশ করিয়া সরমার পাশে দাঁড়াইল। সরমা অগ্নিময় দৃষ্টিতে নিরুপমের দিকে চাহিয়া ছিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "ব'সে রইলেন যে? উঠুন, যান। এটা আমার বাড়ী, এখানে আসবার কোনও অধিকার নেই আপনার, জানেন? বেরিয়ে যান!"

নিরুপম উঠিল। একটা তীব্র কথা বলিয়া বিদায় হইবার জন্য উঠিল। মুখ তুলিয়াই সে দেখিল অজয়!

অজয় বাহুবেষ্টনে সরমাকে জড়াইয়া ধরিল। সরমা চমকিত হইয়া তার দিকে চাহিল, তার পর সে অজয়ের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন সকলেই অজয়ের দিকে চাহিল।

অজয় দৃঢ় বাহুবন্ধনে সরমাকে আশ্রয় দিয়া বলিল, "সরমা, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার সম্মানের দিকে চেয়েই তোমায় দুঃখ দিয়েছি, আপনি দুঃখ পেয়েছি।—তার ফলে আজ তোমার এই অপমান! আমাকে ক্ষমা কর—আমিও বলছি আজ তোমার সঙ্গে—ভগবানের কাছে, ধর্ম্মের কাছে আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী!"

সরমা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অজয়কে দেখিতে পাইয়াই নিরুপম দম্ দম্ করিয়া পা ফেলিয়া বেগে প্রস্থান করিয়াছিল। অভয়ও বিব্রত ভাবে, কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! মায়া তার কৌচের উপর এলাইয়া পড়িয়া চক্ষু ভরিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, তার মুখ চোখের জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল।

অজয় সরমাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া,—অভয়

ও মায়াকে বলিল, "আপনাদের দুজনেরই চিঠি আমি পেয়েছি—আপনারা এঁর সম্বন্ধে যা শুনেছেন সব ভুল। সরমা কি আমি এমন কোনও কাজ করি নি বা কোনও কথা বলি নি যা' সমস্ত জগতের কাছে মাথা খাড়া ক'রে বলা না যায়। কি ভগবানের বিধি, কি মানুষের বিধি, কোনওটাই আমরা উল্লঙ্ঘন করি নি।"

সরমার কান্নার বেগ যখন কমিয়া আসিল তখন তার খেয়াল হইল যে এমনি করিয়া সবার সামনে অজয়ের কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকাটা বড় অশোভন; সে তখন ধীরে ধীরে আপনাকে অজয়ের বাহুমুক্ত করিয়া আসনে বসিয়া পড়িল। অজয় অভয়কে সঙ্গে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—সরমার পড়িবার ঘরে বসিয়া সে অভয়কে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল। শুধু বলিল না মায়ার সঙ্গে হীরালালের ব্যাপারের সম্পর্কের কথা।

অশ্রুমুখী মায়া সরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি আমার, আমায় মাপ কর। আমার বুদ্ধির দোষে তোর এই লাঞ্ছনা হ'ল, তুই ক্ষমা কর। মিথ্যে তোর নামে আমি মন্দ কথা মনে ঠাঁই দিয়েছিলাম। আমার অপরাধের শেষ নেই ভাই। কিন্তু তুই আমার উপর রাগ করিস নে।"

সরমা মায়াকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া তাকে চুম্বন করিয়া বলিল, "পাগল? তোর উপর আমি কোনও দিন রাগ ক'রতে পারি? আর এখন—এখন যে পৃথিবীর কারও উপর আমার রাগ নেই ভাই—আনন্দে যে বুক ছাপিয়ে প'ড়ছে।"

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে মায়া হাসিয়া বলিল, "যা ব'লেছিলি শেষ তাই করলি তুই? অজয়কে নিয়ে elope করবি ব'লেছিলি—এ তো প্রায় তাই হ'ল।"

সরমা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "হাঁ ভাই, আমরা এক কথা ভেবে একটা কথা বলি, ভগবান সে কথা শুনে সেই মুখের কথাই সত্য ক'রে দেন অন্য ভাবে।"

হঠাৎ সরমার একটা কথা মনে পড়িল। সে বলিল, "ওঃ যা! আমার যে একটা ভুল হ'য়ে গেছে। চল অভয় বাবুকে খুঁজে বের করি।"

সরমা মায়াকে লইয়া অভয়ের কাছে গেল।

অভয় তখন অজয়ের কাছে সকল কথা শুনিয়া উৎফুল্ল অন্তরে অজয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছিল।

সরমা তার কাছে আসিয়া লজ্জারক্ত, স্মিত মুখে বলিল, "অভয়বাবু, আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, তাই বলছি, এঁকে বিয়ে ক'রবো। অনুমতি করুন।"

আনন্দে অভয় কথা কহিতে পারিল না, সে শুধু বলিল, "বেশ, বেশ, বেশ।"

শেষ

জীব-বধূ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

যৌবন-সুধা আহরি',
দেহের দুয়ারে দাঁড়াইল বধূ—
বক্ষে বহিয়া গাগরী।

রূপ-রহস্যে দিঠি বিব্রত,
দুটি আঁখি-পাতা শিহর-আনত,
অনব্যক্ত রসাভাসে উঠে
কপোল-কোরকে ভা ভরি'।

মায়াময় মন মৃদুহাসে দিল
মৌন ওষ্ঠ আবরি',
অনুপ্রবেশী প্রেমিক পরাণ
প্রণয়ে বাঁধিল আঁকড়ি'।
জীবনের জরা দূরমপগত,
মরণ—অমৃত-উৎসব-রত,
অন্তরশায়ী পরম আত্মা
চাহিল চমকি' জাগরি'।

হরপ্রসাদ-স্মৃতি-তর্পণ

অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী, এম-এ

তর্পণ

পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা স্মরণ করিলেই আমার মনে মহাকবি কালিদাসের দুষ্মন্তের একটি উক্তি উদিত হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের সপ্তম অঙ্কে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন হইবার পরে দুষ্মন্ত মহর্ষি মারীচের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

ভগবন্ প্রাগভিপ্রেতসিদ্ধিঃ পশ্চাদ্দর্শনম্ অতোঽপূর্ব্বঃ খলু বোঽনুগ্রহঃ, কুতঃ—

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রম-
স্তব প্রসাদস্য পুরস্তু সম্পদঃ॥

হে ভগবন্, প্রথমেই আমার অভিলষিত বস্তু লাভ হইয়াছে, পরে আপনার দর্শন পাইয়াছি, অতএব আপনার এই অনুগ্রহ অপূর্ব্ব; কেন না বৃক্ষাদিতে প্রথমে পুষ্প (কারণ) দেখা দেয়, পরে ফল (কার্য্য) হয়, আকাশে প্রথমে মেঘ (কারণ) দেখা যায়, পরে বৃষ্টি (কার্য্য) হয়; কার্য্যকারণের এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু আমার বিষয়ে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে, কেন না আপনার দর্শনরূপ অনুগ্রহ পাইবার পূর্ব্বেই তাহার ফল শকুন্তলা লাভ আমার ঘটিয়াছে।

দুষ্মন্তের এই উক্তির অনুরূপ উক্তি করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে (১) মনে মনে সম্বোধন করিয়া অনেকবার বলিয়াছি—হে গুরুদেব, আপনার দর্শন পাইবার পূর্ব্বেই আমি আপনার অনুগ্রহ পাইয়াছি। সেই অনুগ্রহের বিষয় বলিয়াই আমি আজিকার কথা আরম্ভ করি।

বাঙ্গালা ১৩১১ সাল, বৈশাখ মাস; বাঙ্গালদেশে বিবাহের ধূম লাগিয়াছে। প্রায় ১॥ মাস পূর্ব্বে (ইংরাজী ১৯০৪ সালের মার্চ্চ মাসে) প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষা দিয়াছি। হাতে কাজকর্ম্ম তেমন নাই, বিবাহের বরযাত্রিরূপে ২।১টা বিবাহের সাক্ষী হইয়াছি। আর একটা বিবাহ উপস্থিত ১৯শে বৈশাখ তারিখে। চন্দননগরের সরিষাপাড়ায় আমাদের এক সহপাঠীর বিবাহ। কন্যাদান আরম্ভ হইয়াছে, আমরা দেখিতেছি; হঠাৎ একজন লোক আমাকে বলিলেন "তোমাকে আশুবাবু ডাকিতেছেন।" আশুবাবু—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় —আমাদের আশু'দাদা'—আমাদের প্রতিবেশী; যখন বর যাত্রা করেন তখন তিনি আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই, কলিকাতায় গিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গণিতের অধ্যাপক—আমাদের সকলেরই পূজ্য, গুরুস্থানীয়। তাঁহার আহ্বান! বিলম্ব না করিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি সংস্কৃতে"—"নম্বর পাইয়াছ এবং অমুক স্থান অধিকার করিয়াছ। শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন—তোমাকে সংস্কৃত কলেজে পড়িতে হইবে।" শাস্ত্রীমহাশয় সংস্কৃতের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন এবং আশুদাদা আমার পরীক্ষা ফল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় আনন্দের সহিত উক্তরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল শুনিয়া তখন আমার আনন্দিত হইবার বয়স। কিন্তু আমার আনন্দের সঙ্গে জাগিয়া উঠিল বিষাদ। বলিলাম "আপনি ত জানেন আমার বাবা কত গরীব, আমি কলিকাতায় পড়িবার টাকা কোথায় পাইব! কলিকাতায় পড়িবার ভাগ্য আমার নাই; হুগলী কলেজেই পড়িব, 'হাঁড়ির ভাত' চারিটি খাইয়া কলেজে যাইব, যেমন করিয়াই হোক বাবা কলেজের মাহিনা ৬৲ টাকা দিবেন।" আশুদাদা উত্তর করিলেন "আচ্ছা, মামা (আমার বাবাকে আশুদাদা মামা বলিতেন) যেন তোমাকে ৬৲ টাকাই দেন। তুমি তাঁহাকে বলিবে, তোমাকে কলিকাতায় যাইতেই হইবে।"

১ বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলে যেমন কেহ ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বা ৺জীবানন্দ ভট্টাচার্য্যকে বুঝেন না, এক ঈশ্বরচন্দ্রকেই বুঝেন, তেমনই আমাদের পাঠদশায় এবং তাহার পরেও আমরা শাস্ত্রীমহাশয় বলিলে অন্য কাহাকেও না বুঝিয়া হরপ্রসাদকেই বুঝিতাম।

সে রাত্রিতে কথা ঐ পর্য্যন্ত। তখন জানিতাম না—আমার মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রীমহাশয় ও আশুদাদা কিরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। আমার মত লোকের পক্ষে কলিকাতায় পড়ার আশা অন্য অনেকেরই বিলাতে পড়িবার আশার ন্যায়।

উক্তরূপ কথাবার্ত্তার পর আমার মনে অপ্রাপ্য বস্তুর প্রতি অতিলোভের ন্যায় একরূপ লোভ জাগিল; কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সেই লোভকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিতে লাগিল আমার দারুণ দারিদ্র্য। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ায় বন্ধুর বিবাহের আমোদ আমার নিকট ফিকা বোধ হইতে লাগিল।

যথাসময়ে গৃহে ফিরিয়া বাবাকে সব কথা বলিলাম। বাবা আশুদাদার সহিত পরদিন দেখা করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া অশ্রুপ্লাবিত নয়নে আশুদাদাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আমাকে যাহা বলিলেন তাহা হইতে আমি সংগ্রহ করিলাম এই যে, শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে ২৲ মাহিনায় কলেজে পড়িতে দিবেন এবং আশুদাদা নিজ বাসায় আমাকে রাখিয়া আমার আহার্য্যের ব্যয় বহন করিবেন; বাবা আমাকে যে ৬৲ দিবেন তাহা হইতে আমি কলেজের মাহিনা দিব, কাগজ-কলম কালী ও পুরাতন পুস্তক কিনিব, প্রয়োজন মত একখানা ধুতি ও একটা টুইলসার্ট কিনিয়া লইব এবং কোনও কোনও শনিবারে বাড়ী যাইব। বাবার চোখে সেদিন জল দেখিয়াছিলাম, তখন ভাল বুঝি নাই আমি কলিকাতায় পড়িতে যাইব, ইহাতে চোখে জল কেন; আজ শাস্ত্রীমহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে এ কথা লিখিতে বসিয়া তাঁহার অযাচিত অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আমার চোখে জল আসিতেছে, এই জলের একবিন্দু শাস্ত্রীমহাশয় স্বর্গ হইতে গ্রহণ করুন।

১৯০৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। আমি পণ্ডিতের বংশোদ্ভূত বলিয়া কর্ত্তা (২) আমার কলেজের মাহিনা ২৲ স্থির করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহার জন্য আমাকে তাঁহার সম্মুখে হাজির হইতে হইয়াছিল। তিনি স্বাভাবিক মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমার নাম কি'? উত্তরে কৌলিক উপাধি 'চট্টোপাধ্যায়' শুনিয়া তিনি আশুদাদার মুখের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'ভট্টাচার্য্য নয়?' উত্তর আমিই দিলাম—'না; আমার বাবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কর্ম্ম এবং কথকতা করেন বলিয়া ভট্টাচার্য্য লেখেন; আমার পিতামহ লিখিতেন তর্কবাগীশ, আমার প্রপিতামহ লিখিতেন ন্যায়বাগীশ—তাঁহাদের ন্যায়ের টোল ছিল; আমরা—ভায়েরা—এখনও পণ্ডিত হই নাই বলিয়া এবং কুলীনের সন্তান বলিয়া কৌলিক উপাধিই ব্যবহার করি।' কর্ত্তা আমার মুখের দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন; তাঁহার মধুর স্বর আগেই শুনিয়াছি, ভয় পাইলাম না; তিনি কি বুঝিলেন জানি না, কিন্তু আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই।

কাব্যরসিক শাস্ত্রীমহাশয়।

কর্ত্তা ছিলেন বিবিধবিদ্যাহৃদয়গ্রাহী, বিশেষ করিয়া কাব্যরসিক। তাঁহার কাব্যসমালোচনার পরিচয় আমরা প্রথমে সাক্ষাৎ ভাবে পাই নাই। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত কোনও কোনও পুস্তক আমাদিগকে পড়িতে হইত, সিনিয়ার বৃত্তিপরীক্ষার জন্য। কথা ছিল কর্ত্তা আমাদিগকে কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র পড়াইবেন। আফিসের কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত সময়াভাব হওয়াতে তিনি আমাদিগকে ঐ পুস্তক পড়াইতে পারেন নাই, ইহা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। আমাদের মনে একটা ক্ষোভ থাকিয়া গিয়াছিল। এই ক্ষোভ পরে দূর হইল কর্ত্তার দ্বারা পরিচালিত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের অভিনয়ের মহলা (rehearsal) ও পরে অভিনয় দেখিয়া। এই অভিনয়াভ্যাস দেখিয়া যাহা শিখিয়াছি, তিনি আমাদিগকে পড়াইলে তদপেক্ষা বেশী শিখিতে পারিতাম বলিয়া মনে হয় না।

নাটক কাব্য বটে, কিন্তু দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণকে নাটক পড়াইবার সময়ে রাজা=নৃপতিঃ অথ—অনন্তরং ইত্যাদি প্রতিশব্দ দিবার বা সরলার্থ দিবার আবশ্যকতা ছিল না; এটুকু ছাত্রেরা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিত। ইহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল—নাটকের কাব্যত্ব, রস, সন্ধি এবং নাটকীয় পাত্রের চরিত্র-বিশ্লেষণের জন্য কোন্ উক্তির কতটুকু আবশ্যক। কর্ত্তা

(২) সংস্কৃত কলেজের ভিতরে শাস্ত্রীমহাশয়কে আমরা কর্ত্তা বলিতাম, তিনি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া।

এই কাজ করিয়াছিলেন মালবিকাগ্নিমিত্রের মহল্লায়। আহার ও বিশ্রাম ভুলিয়া তিনি কলেজের ছুটির পরে এই কার্য্যে রত হইতেন এবং নিজে বৃদ্ধ হইলেও যুবকের উদ্যমে rehearsal চালাইতেন। তিনি যে কলেজের অধ্যক্ষ, এ কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং সকল ছাত্রের সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া ভাব অনুভাব বিভাব ইত্যাদি তন্ন-তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন এবং আবৃত্তির ভঙ্গী (বাচনিক অভিনয়), অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়িবার ভঙ্গী (কায়িক অভিনয়) এবং ভাবপ্রকাশের (সাত্ত্বিক অভিনয়) প্রণালী শিখাইয়া দিতেন। এবং 'আহার্য্য' অভিনয়ও যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় এই উদ্দেশ্যে "পাথুরে প্রমাণ" (৩) সংগ্রহ করিবার জন্য মাঝে মাঝে ৺অমৃতলাল বসুকে (তখন ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার), একজন চিত্রকরকে ও একজন বেশকারককে সঙ্গে লইয়া যাদুঘরে (Indian Museum) গিয়া প্রাচীন কালের ঘরবাড়ীর আকৃতি ও সাজ-পোষাকের ধরণ বুঝাইয়া দিতেন এবং অমৃতবাবুর ইঙ্গিতমত চিত্রপট ইত্যাদি আঁকিতেন এবং বেশকারক সাজ-পোষাক তৈয়ারি করিতেন। (৪) সখ করিয়া অভিনয় করিতে গিয়া এত যত্ন লওয়া ও এত অর্থব্যয় করা এক বেলগাছিয়া নাট্যশালার পরিচালকগণ (রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি) ভিন্ন অন্য কেহ করিয়াছেন, ইহা বড় দেখা যায় না।

কলেজের ছুটির পরে অভিনয়ের মহল্লা চলিত এবং কর্ত্তা নিজ ব্যয়ে সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন। ছাত্রেরা অভিনয়ের মহল্লায় যোগ দেওয়া একটা তামাসা বা হুজুগ মনে করিত না; তাহারা মনে করিত যেন ক্লাশের পাঠ গ্রহণ করিতেছে; মহল্লার সময়ে সংযম বিনয় প্রভৃতি কোনটিরই অভাব থাকিত না, অথচ কর্ত্তা কোনও দিন নিজের প্রভুত্ব খাটান নাই, কাহাকেও শাসন করেন নাই; বরং সকল সময়েই বন্ধুর ন্যায় সরস ব্যবহার করিতেন। ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (এক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) অগ্নিমিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রথম-মহল্লা-দিন হইতেই—কর্ত্তা ডাকিতেন "রাজা" বলিয়া এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্তই 'রাজা' বলিয়া গিয়াছেন। রাজার সকল আবদার কর্ত্তা শুনিতেন, এ জন্য আমাদের কোনও কথা কর্ত্তাকে বলিতে হইলে আমরা রাজাকে ধরিতাম (৫)। আমরা অভিনয়ের মহল্লায় উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিতাম ও শুনিতাম, তাহা হইতে যে কেবল মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক আমাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে পড়া হইয়াছে তাহা নহে, সংস্কৃত নাটকসমূহ পড়িবার কৌশলও আমাদের অধিগত হইয়াছে। কর্ত্তার নিকট শিক্ষিত কৌশল আমাদের অনেকেরই কর্ম্মজীবনে আজ পর্য্যন্ত সহায়তা করিতেছে (৬)।

মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রথম অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন—অক্সফোর্ডের বোডেন (Boden) প্রফেসার ম্যাকডোনেল সাহেব। ১৯০৭ সালে এই নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়; বঙ্গের ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার ও তৎপত্নী এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয়ের পূর্ব্বে

(৩) প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি আদি এবং শিলালেখকে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন পাথুরে প্রমাণ।

(৪) মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয়ে যে দৃশ্যাবলী ও সাজপোষাক ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার ২।১টির চিত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'কালিদাস' গ্রন্থের মধ্যে আছে। আজকালকার বাঙ্গালা নাট্য-পরিচালকদের মধ্যে প্রথমে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় সময়োপযোগী সাজ পোষাক ও দৃশ্যাবলীর দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন।

(৫) কলেজের বৃদ্ধ দপ্তরীকে কর্ত্তা খাতির করিতেন; কর্ত্তা যখন কলেজের ছাত্র, তখন এই ব্যক্তিই দপ্তরী ছিল; এই দপ্তরী কর্ত্তার ছাত্রজীবনের ২।৪ কথা মাঝে মাঝে আমাদিগকে বলিত। আমাদের অর্দ্ধাবকাশের খেয়াল হইলে বা একদিন ছুটির ঝোঁক হইলে—আমরা ধরিতাম এই দপ্তরী মিঞাকে। দপ্তরী কর্ত্তাকে বুঝাইয়া দিত, অমুক লোক অমুক সময়ে কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন, সে ছুটিটা পাওনা আছে, ইত্যাদি, কর্ত্তা এমন ছুটি মঞ্জুর করিতেন। সেই বুড়োমিঞার পুত্র এখন সংস্কৃত কলেজের দপ্তরী হইয়াছে।

(৬) অভিনয় করিয়া ছেলে খারাপ হইয়া যায়—এরূপ উক্তির প্রতিবাদস্বরূপে আমি অভিনেতাদের ২।৪ জনের নাম করিব। একজনের নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি—রাজা গুরুপ্রসন্ন; নাটকের সঙ্গীতাচার্য্য-দ্বয়ের ভূমিকা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে সমাসীন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত; রাণী ইরাবতী কুমিল্লা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ৺তুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন; মালবিকা সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলকে রক্ষা করিয়াছেন এবং এক্ষণে ঐ মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও গৌহাটী শিলং মোটর কোম্পানীর সেক্রেটারি।

একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া রাখা মন্দ নহে। অমূল্যরতন অধিকারী (পরে কুমিল্লা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছিলেন) বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার অভিনয়কৌশল দেখিয়া অমৃতবাবু ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পেশাদারী থিয়েটারে ওরূপ বিদূষক এ পর্য্যন্ত হয় নাই এবং তিনি বিদূষকের ওরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় কল্পনা করিতে পারেন না। অমূল্যবাবু সেবার এম-এ পরীক্ষা দিয়াছেন; তাঁহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি—কারণ যাঁহারা এই নাটক পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে, বিদূষকই এই নাটকের প্রাণস্বরূপ। এহেন-যে বিদূষক অমূল্যবাবু—তিনি পরীক্ষার পাশ নম্বর হইতে ২।১ নম্বর কম পাইয়াছেন। চারিদিকে শিহরণ উঠিয়াছে। লাটসাহেব অভিনয় দেখিবেন, তার পূর্ব্বে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে নিশ্চয়ই অমূল্যবাবুর মন খারাপ হইয়া যাইবে এবং তিনি হয় অভিনয় করিবেন না, বা না হয় খারাপ অভিনয় করিবেন। এ এক সমস্যা! পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব করা হউক,—কেহ কেহ এরূপ ভাবিলেন; এক অমূল্যবাবুর জন্য সকলের ফল আটকাইয়া রাখা উচিত নহে, কেহ কেহ ইহাও বলিলেন। কথা কেমন করিয়া মুখুজ্জে মহাশয়ের (Sir Asutosh) কাণে উঠিল। তিনি ব্যাপারটা জানিয়া লইয়া না কি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বিদূষক কখনও ফেল হয়? পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল—গেজেটে অমূল্যবাবুর নাম আছে। অমূল্যবাবু এক্ষণে পরলোকে।

বিপত্নীক শাস্ত্রী মহাশয়

মালবিকার অভিনয়ের পরে উত্তরচরিতের অভিনয়ের কথা উঠিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের তখন পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। 'রাজা' গুরুপ্রসন্ন প্রস্তাব করিলেন, কালিদাসের একখানা নাটক অভিনয় করা গেল, ভবভূতির একখানা নাটক অভিনয় করা উচিত। উত্তররামচরিত অভিনয় হইবে এরূপ স্থির করিয়া রাজা শাস্ত্রী মহাশয়ের খাস-কামরায় একদিন দেখা করিতে গেলেন এবং বলিলেন, আপনি আমাদের উত্তরচরিতখানি অভিনয় করাইয়া দিন। শাস্ত্রী মহাশয় উত্তরচরিতের নাম শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুল হইয়া বলিলেন—"রাজা, উত্তরচরিতের আর অভিনয় কেন? আমার জীবনেই ত উত্তরচরিত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।" রাজা নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া এ কথা সকলকে বলিলেন; তখন ভবভূতির

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্ত ভেদাদ্
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।

করুণরসাত্মক নাটক অভিনয় করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে কষ্ট দিবার সংকল্প পরিত্যক্ত হইল।

মেঘদূত-ব্যাখ্যাতা

কাব্য-সমালোচনা-প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের মেঘদূত-ব্যাখ্যার উল্লেখ একান্ত আবশ্যক। অমর কবি কালিদাসের অপূর্ব্বসুন্দর মেঘদূত কাব্যের পূর্ব্বমেঘ 'কবিত্বের একটি ভাবময় লহর, উহাতে জড় প্রকৃতিকে চৈতন্যময় করিয়া তুলিয়াছে',—আর উত্তরমেঘ পার্থিব কলুষবিবর্জ্জিত অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময় চৈতন্যময় প্রকৃতির প্রেমে আঁটা মানবহৃদয়ের চিত্র। 'মেঘদূতে সব নূতন সৃষ্টি, পৃথিবী, গাছা, পালা, বন, জঙ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, সমাজ, সামাজিক সব ছাড়িয়া নূতন সৃষ্টি।—অলকা এক নূতন সৃষ্টি। এত বড় ভারতবর্ষটা ইহাতে কালিদাসের কুলাইল না। তিনি ভারতবর্ষ ছাড়া অনেক দেশ জানিতেন। পারস্য জানিতেন, যবনদেশ জানিতেন, যে সকল দ্বীপ হইতে লবঙ্গপুষ্প কলিঙ্গদেশে আনীত হইত তাহাও জানিতেন; এ সকল দেশে তাঁহার পছন্দমত জায়গা পাইলেন না।' তাই তিনি হিমালয়ের তুঙ্গতম শৃঙ্গে—মনুষ্যের অগম্য—কেবল তাঁহার কল্পনা-মাত্রের গম্য—স্থানে অলকানগর বসাইলেন'। এ এক নূতন সৃষ্টি—'কবির সৃষ্টির' এক 'প্রকাণ্ড খেলা।' শাস্ত্রী মহাশয়ের মেঘদূত-ব্যাখ্যা আর এক নূতন সৃষ্টি—এক অদ্ভুত সৃষ্টি, বাঙ্গালা সাহিত্যে এক প্রকাণ্ড দান। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের ভাষায়—'সংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা নূতন, ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাকরণ ছাড়িয়া, অলঙ্কার ছাড়িয়া, শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা নূতন। সৌন্দর্য্য বুঝাইতে গিয়া, ভূগোল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্বভাব, নরচরিত প্রভৃতির কথা নূতন।' কিন্তু এই নূতনের জন্য তিনি 'ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত' হইতেছিলেন। তাঁহার উক্তি—'প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; দৃষ্টির মণ্ডল যতই বাড়িতেছে, সৌন্দর্য্যের চমৎকারিতাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে।' মেঘদূত কাব্যখানি আকারে ছোট—ইহাতে মাত্র ১২০টি

শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না।" (৯)

বাল্মীকির জয়ের মূল-কথা এই—

বশিষ্ঠ জ্ঞানী ধার্ম্মিক, বিশ্বামিত্র কৌশলী রাজনীতিক রাজর্ষি, বাল্মীকি হৃদয়বান্ কবি। ইঁহারা "তিনজনে রাম-অবতারের ষাটি হাজার বৎসর পূর্ব্বে, রাম কি করিবেন তাহার যুক্তি করিতে বসিলেন।"

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম যেন ধার্ম্মিকচূড়ামণি হয়েন। তাঁহার শরীরে যেন পাপের লেশমাত্র থাকে না।

বিশ্বামিত্র বলিলেন—শুদ্ধ তাহা হইলেই হইবে না, রাম ক্ষত্রিয় হইবেন, রাম রাজা হইবেন, সুতরাং রামের বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতা বিশেষরূপে প্রকাশিত থাকা আবশ্যক।

বাল্মীকি বলিলেন, ব্রহ্মর্ষিগণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি রামকে ধার্ম্মিকও করিব না; বীরও করিব না; রাজনীতিজ্ঞও করিব না। স্বয়ং নারায়ণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। তাঁহার চরিত্র-বর্ণনাক্রমে আমি আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ দম্পতী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা, আদর্শ শাসনপ্রণালী, আদর্শ ভৃত্য ও আদর্শ শত্রু দেখাইব। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিলে আমি এই সুযোগে এমন একটি মনুষ্যচরিত্র চিত্রিত করিব, দর্শনে সর্ব্বদেশীয়, সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বকালীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র যুগপৎ কহিয়া উঠিলেন—তথাস্তু। তোমার রাম যেন চিরদিন নরজাতির আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকেন।"

রামচরিত্রের এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন শাস্ত্রীমহাশয়। এইখানেই বাল্মীকির সত্যকার জয়।

আমার নিজের সৌভাগ্য এই যে, কৈশোরেই বাল্মীকির জয়ের সন্ধান পাইয়াছিলাম। যে পরিমাণে তাহা বুঝিয়াছিলাম সেই পরিমাণে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। চুঁচুড়া হিন্দু-সমিতির বার্ষিক-প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কাররূপে বাল্মীকির জয় উপহার দিবার ব্যবস্থা ১৯০৪।৫ সালে করিয়াছিলাম। ১৯১৩ সালে গৌহাটীতে আসিবার পর সংস্কৃত অধ্যাপনার সঙ্গে বাঙ্গালা অধ্যাপনার ভারও আমার উপর পড়ে। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালায় অবশ্যপাঠ্য কোনও পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন না। ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও চরিত্র প্রদর্শনের জন্য কয়েকখানি পুস্তকের নাম গেজেটে প্রকাশিত হইত (Books recommended as presenting models of style and ideals of character)। দুঃখের বিষয় বাল্মীকির জয় সে তালিকায় কখনও স্থান পায় নাই। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকার ২১ খানি পুস্তক পড়াইতাম এবং বাল্মীকির জয় পড়াইতাম। শাস্ত্রীমহাশয় একদিন এ কথা আমার মুখে শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'তোমার চাকরি যাইবে।' এ তাঁহার অভিমানের উক্তি; অভিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা-প্রণেতাদের উপর। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বাঙ্গালা সঙ্কলন গ্রন্থের মধ্যে বাল্মীকির জয় হইতে খানিকটা অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। শাস্ত্রী-মহাশয় ইহা জানিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি—বাঙ্গালাদেশে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীতে এবং ভারতের একাধিক প্রদেশের ভাষায় ইহার অনুবাদ বাহির হইয়াছিল।

ভারতমহিলার উৎকর্ষ প্রকাশক

বাল্মীকির জয় রচনার পূর্ব্বে শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছিলেন—'ভারতমহিলা'। প্রাচীন কালে আমাদের দেশের স্ত্রীলোক-গণের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাঁহাদিগের চরিত্র বিষয়ে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কতদূর উৎকর্ষ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন—তাহা শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন

(৯) Calcutta Reviewএর সমালোচনা—1882 Mr. Sastri is really grand in his execution.

1891. The Valmikair Jaya is instinct with the profoundest criticism of life and society, and of schemes of regeneration of humanity, the myth being grouped round a central idea or regulative conception.

It is the most glorious phantasmagory in literature known to us.

Goethe's Helena......displays a fine critical insight; but it pales before the Valmikir Jaya, not only in moral profundity, but also in grandeur of design, a sense of primitive elemental freedom, and an intoxication of the creative imagination.

—ভারতমহিলায়। গ্রন্থের প্রথম ভাগে তাৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে বাল্মীকি বেদব্যাস কালিদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থ হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ নারী-চরিত্রের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে আলোচিত বিষয় হইতে জানা যায়—

১। স্ত্রীলোকদিগকে সাবধানে রক্ষা করা হইত।

২। স্ত্রীলোক অবরোধবর্ত্তী ছিলেন না।

৩। স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিতেন।

৪। অপাত্রে কন্যাদান নিষিদ্ধ ছিল। বরকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করা হইত—তিনি যেন যুবা ধীমান্ ও জনপ্রিয় হন।

৫। স্ত্রীলোকগণের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করা হইত। তাঁহাদিগকে পবিত্র বলিয়া গণনা করা হইত। "সোম তাঁহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাঁহাদিগকে মধুর বাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করিয়াছিলেন।"

৬। স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। "তাঁহার ব্রত, ধর্ম্ম, উপাসনা, উপবাস কিছুই নাই। শিল্পাদি কার্য্যে দক্ষ হউন, সে তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। গৃহকার্য্যে দক্ষ হওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য।" পুত্রের পালনভার স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত ছিল। কলাবিদ্যা তাঁহার অন্যতম শিক্ষনীয় বিষয় ছিল।

৭। স্ত্রীলোকের ধনাধিকার। তাঁহার পিতৃ-দত্ত ধনে স্বামীর অধিকার নাই। সে ধন স্বামী লইলে তাঁহাকে সুদ দিতে হইবে। "স্ত্রীলোকের ধনাধিকার বিষয়ে ভারতীয় ঋষিগণ যত সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এত অন্য কোন দেশে আজিও হইয়াছে কি না সন্দেহ।"

৮। বিধবার কর্ত্তব্য।

৯। দুষ্টচরিত্রাদিগের দণ্ড।

গ্রন্থের পরভাগে আলোচিত হইয়াছে নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকগণের চরিত্র—লোপামুদ্রা, শকুন্তলা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, সীতা, চিন্তা, গান্ধারী, মালবিকা, মালতী, শৈব্যা, পার্ব্বতী। ইঁহাদের বিশুদ্ধতা, মনোহারিত্ব, তেজস্বিতা, দৃঢ়তা—পতিপরায়ণতা, ঈর্ষাশূন্যতা প্রভৃতি গুণ ইঁহাদিগকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। "দক্ষ বলিয়াছেন, সাধ্বী রমণী পাইলেই স্বর্গ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।"

এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৮২ সালের Calcutta Review পত্রিকায়। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশের বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকায় স্থান পাইয়াছিল কি না জানি না।

প্রত্নতত্ত্ব গবেষণাকারক

শাস্ত্রীমহাশয় জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার জন্য। তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতির জন্য বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি বিশজন মাত্র বিশিষ্ট সভাবর্গের (Honorary Members) মধ্যে তাঁহাকে একজন বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন ১৯২১ সালে। তাঁহার গবেষণা বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকার আমার নাই। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ তাহা করিবেন, আমি দুই চারিটি কথামাত্র বলিব।

(১) আমরা যখন বি-এ শ্রেণীতে পড়ি—তখন দেখিতাম একটি সুদর্শন যুবক প্রায় প্রত্যহই সংস্কৃত কলেজে যাইতেন এবং কোনওরূপ সংবাদাদি না দিয়া শাস্ত্রীমহাশয়ের খাসকামরায় প্রবেশ করিতেন এবং কোনও দিন এক ঘণ্টা, কোনও দিন ততোধিক কাল থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। পরে জানিয়াছি—ইনি (পরে সুপ্রসিদ্ধ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; অনেক দিন হইতেই শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট হইতে প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের উপদেশ অনুসারেই 'চাপরাশ' সংগ্রহ করিবার জন্য ইনি বি-এ, ও পরে এম-এ পরীক্ষা দেন। মহেঞ্জো দাড়োর আবিষ্কার যে রাখালদাসের নাম ইতিহাসে অক্ষয় করিয়া রাখিল, সেই রাখালদাসের গবেষণা-শিক্ষার হাতে-খড়ি হইয়াছিল শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট।

(২) ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। ১৯০৮ সালে শাস্ত্রীমহাশয় সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই বৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র কলেজের ছাত্ররূপে সংস্কৃতে এম-এ পাশ করিলেন।* তার পর আর কেহ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিসাবে এম-এ পরীক্ষা দিতে

পারেন নাই, কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত কলেজকে এম এ পড়াইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না (affiliation দিলেন না)। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"ভাষাবিজ্ঞান (philology) পড়াইবার লোক নাই বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় affiliation দিতেছেন না; আমি ভাষা বিজ্ঞান পড়াইব; ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা প্রবন্ধ পরীক্ষা করিতে আমাকে উপযুক্ত মনে করা হয়, আর ভাষা বিজ্ঞান পড়াইতে আমি সমর্থ—এ কথা বিশ্ববিদ্যালয় কেন মনে করেন না! যাহাই হৌক, বিশ্ববিদ্যালয় এম-এ পড়াইবার অনুমনি দিলেন না। এই সময়ে আমরা এম-এ পড়িবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাইলাম। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পড়িব—এই আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা প্রায় নির্ম্মূল হইল। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে লেকচারার নিযুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজকে এম এ পড়াইবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই, বোধ হয় এই অভিমানে তিনি একটি দিনও আমাদিগকে লেকচার দিলেন না। আমরা তাঁহার বাড়ীতে (২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট) ধরণা দিতে আরম্ভ করিলাম। তিনি একদিন বলিলেন,—'তোমাদের তিন জনকে (আমরা পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলাম) পড়াইব, অন্য কাহাকেও নহে। পড়াইব কি জান? ম্যাকডোনেল সাহেবের বইখানা (History of Sanskrit Literature by A. A. Macdonell) কাটিয়া কুটিয়া ঠিক করিয়া দিব।' সুরেন (৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শাস্ত্রী—বিহারে অধ্যাপক হইয়াছিলেন) আই গ্রুপ (I Group) লইয়াছিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রিয় গ্রুপ; তিনি সুরেনকে কয়েকদিন বাড়ীতে পড়াইয়াছিলেন; পশুপতিকে (৺ ডক্টর পশুপতিনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী Ph D.—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন) ও আমাকে হদিশ্ বাৎলাইয়া দিয়াছিলেন—কেমন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পড়িতে হয়; আর তাঁহার নিজের লিখিত গবেষণা প্রবন্ধাদি পড়িতে বলিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি বিষয়ক তাঁহার প্রবন্ধ আমাকে পড়িবার জন্য দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া গবেষণা প্রণালীর ইঙ্গিত পাই। সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার যতটুকু অনুপ্রবেশ হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুগ্রহে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত একটি কথা বলার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এম-এ পরীক্ষা দিলাম ১৯১০ সালে; মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-পত্রের প্রথমার্দ্ধের পরীক্ষক। একদিন পূজনীয় রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় হঠাৎ আমাকে বলিলেন—'ওহে, কালীপ্রসন্ন বাবু তোমার উত্তরে ভারী খুসী হইয়াছেন; তুমি কত নম্বর পাইয়াছ মনে কর?' প্রথমার্দ্ধের প্রবন্ধের বিষয় ছিল দুইটি, আমি বাছিয়া লইয়াছিলাম 'সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি ও পরিণতি'; কারণ, শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃপায় প্রায় ১।১॥ বৎসর আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলাম এবং পরীক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যেখানে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পড়িয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিলাম '৫০এর মধ্যে ৫০ পাইব, আশা করি।' আজ পর্য্যন্ত জানি না কত পাইয়াছিলাম।

(৩) শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একদিন ট্রেণে এক কামরায় বসিয়া যাইতেছি; তিনি নৈহাটী যাইবেন, আমি তাহার পূর্ব্বের ষ্টেসনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া চুঁচুড়া যাইব। গাড়ীতে নানা বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। শ্যামনগরে গাড়ী উপস্থিত। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—'রিসার্চ্চ করিবে বলিতেছ, বল ত শ্যামনগর নাম কেন হইল?' শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশ্ন, হঠাৎ উত্তর দিয়া বেকুব বনিয়া যাইব! মন ছুটিল মূলাজোড়ের শ্যামাসুন্দরীর মন্দিরে ("করুণাময়ী"র মন্দির), সেখানে শ্যাম কই? আশে পাশে কোনও শ্যামের মন্দির আছে কি না খোঁজ করিতে লাগিলাম; শাস্ত্রী মহাশয় মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন, আমার কোনও উত্তর না পাইয়া বলিলেন—"এটা শ্যাম-নগর নহে, সাম্‌নে-গড়"। ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে কোথায় গড় আছে, কোন্ রাজার গড়, ভারতচন্দ্র কবে এখানে বাস করিয়াছিলেন ইত্যাদি সকল কথা তিনি বুঝাইলেন। মনে মনে লজ্জিত হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে মন তাঁহার পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কয়েক বৎসর পরে রেণেল সাহেবের (১০) মানচিত্রে দেখিয়াছি স্থানটার নাম লেখা

(১০) Map of Bengal * * by James Rennell F. R. S. published under the authority of the East India Company 1781, maps Nos. 1, 7, 19.

আছে—Samukgar—সমুখগড় এবং নামের পাশে কেল্লার চিহ্ন দেওয়া আছে। কথাটা ছিল বাঙ্গালা সাম্‌নে-গড়, রেণেল সাহেবের মানচিত্রে কিছু জাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে সমুখ-গড়, পরে আভিজাত্য লাভ করিয়া আমাদের নিকট রূপ পাইয়াছে শ্যামনগর। রূপ বদলাইয়াছে, অর্থ বদলাইয়াছে, এখন আসল বস্তুকে চেনা অসাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার কদর আমরা বাঙ্গালী হইয়াও করি না, হয়ত সংস্কৃত (অর্থাৎ বাঙ্গালার কাছে বিদেশী) হইলে কদর করিতাম। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কদর করিতে জানিতেন।

(৪) বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ প্রথম লিখিয়াছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়। বাঙ্গালীর পূজা পার্ব্বণ আচার ব্যবহারের ভিতর কত বৌদ্ধ আচার যে লুকাইয়া আছে, তাহা প্রথম দেখাইয়াছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িবার পর রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণ দেখিবার আগ্রহ জন্মে। পরে হুগলীজেলার কোনও এক গ্রামে ধর্ম্মপূজা দেখিয়া ও ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরামের) গান শুনিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের—বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম আছে—এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করি এবং এ বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে প্রদান করি; তিনি তৎসম্পাদিত "পূর্ণিমা" পত্রে (বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত) তাহা প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের মূলে শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তপ্রেরণা ছিল।

বঙ্কিম যুগে শাস্ত্রী মহাশয়

বঙ্কিম-যুগের প্রারম্ভে শাস্ত্রী মহাশয় বয়সে প্রবীণ না হইলেও সে যুগের পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমের লিখন-প্রণালীর (Style) পরিবর্ত্তনে প্রথম প্রেরণা দিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ করেন, তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের বয়স ছিল ১২ বৎসর মাত্র; কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইবার সময়ে তিনি ১৬ বৎসরের বালক; বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হইবার সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ২০ বৎসর। তিনি ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমবাবুর বাড়ী কাঁটালপাড়ায়, শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী নৈহাটীতে,—দুইগ্রামের মধ্যে দূরত্ব প্রায় এক মাইল মাত্র। বালক হরপ্রসাদ মাঝে মাঝে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন পূর্ণ-জ্যোতিতে বঙ্গের সাহিত্য-গগনে বিরাজমান, তাঁহার নিকট কোনও কথা বলিতে বিজ্ঞজনও ইতস্ততঃ করিতেন। তখন বঙ্কিমবাবু যে গ্রন্থাদি লিখিতেন, তাহা সংস্কৃত-বহুল শব্দে পূর্ণ থাকিত। শাস্ত্রীমহাশয় একদিন সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন যে, যদি সংস্কৃত-বহুল শব্দে বঙ্কিমবাবু তাঁহার গ্রন্থ লেখেন, তবে তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্পত্তি থাকিয়া যাইবে, তাঁহার ন্যায় গ্রন্থকারের গ্রন্থ বাঙ্গালীমাত্রেরই অধিগম্য যাহাতে হয় এমন ভাষায় তাঁহার লেখা উচিত; সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালার দিদিমা (প্রাকৃত, মা), নাতিনী কি চিরকালই দিদিমার হাত ধরিয়া চলিবে? কখনও কি সে নিজে চলিতে সমর্থ হইবে না? বালকের (বঙ্কিমের তুলনায় হরপ্রসাদ তখন বালক) এই কথা বঙ্কিম হাসিয়া উড়াইয়া দেন নাই। পরে তাঁহার লেখায় আমরা যে সহজ সরল বাঙ্গালা দেখিতে পাই, তাহার মূলে শাস্ত্রী-মহাশয়ের এই প্রস্তাব ছিল—এ কথা স্মরণ রাখিলে আমরা বুঝিতে পারিব—বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা কত দিক হইতে শাস্ত্রীমহাশয় করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে শাস্ত্রী মহাশয়

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সংশ্রবে শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল প্রবন্ধ (১১) ও অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন সেগুলি সাহিত্য সেবিগণকে এক নূতন পথ দেখাইয়াছে। দু একজন ভিন্ন কেহ সে পথে এখনও যাইতেছেন না, ইহাই দুঃখ। সায়ণাচার্য্যের পূর্ব্বে বাঙ্গালী বেদব্যাখ্যা করিয়াছে ইহা শাস্ত্রী মহাশয় শুনাইয়াছেন; বিদেশে গিয়া বাঙ্গালী সেই দেশকে শিক্ষা, সভ্যতা ও সাহিত্য দিয়াছে, এ কথা শাস্ত্রী মহাশয়ই শুনাইয়াছেন; বাঙ্গালী তন্ত্রের ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছে এ কথা তিনিই শুনাইয়াছেন; বাঙ্গালী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে এ কথাও

(১১) এ বৎসরের (১৩৩৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে "রত্নাকর শান্তি" (বিক্রমশিলার বৌদ্ধ ভিক্ষু)। আগামী ২৭শে অগ্রহায়ণের পরিষদের অধিবেশনে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ থাকিবে "বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার"। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের জন্য পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

তিনিই শুনাইয়াছেন; আবার 'বাঙ্গালা দেশে কিরূপে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গিলিয়া ফেলিয়াছে'—তাহাও তিনিই বলিয়াছেন; বুদ্ধ কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন তাহার সন্ধান করিতে গিয়া "পাথুরে প্রমাণ" বাহির করিয়া তিনিই দেখাইয়াছেন যে, সে ভাষা সংস্কৃত নহে, প্রাকৃতও নহে, সাধারণের পরিচিত পালিও নহে,—তাহাতে ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ নাই, যুক্তাক্ষর নাই—সে ভাষার নমুনাও দেখাইয়াছেন—

ইয়ং সলিলনিধনে বুধস ভগবতে সকিয়নং সুকিতিভতিনং সভগনিকনং সপুতদলনং—অর্থাৎ এই যে শরীর নিধান অথাৎ ছাই বা হাড়গোড় ভগবান্ বুদ্ধের, শাক্যদের, ভাই ভগিনী ও স্তুতদারার সহিত (১৩৩৩ পরিষৎ পত্রিকা পৃঃ ৯৪); যোগী জাতি, কৌলধর্ম্ম ও কৈবর্ত্তজাতি বাঙ্গালার তিনটি মহা সমস্যা তিনিই সমাধানের জন্য দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন (১৩৩৭ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা—শেষ অভিভাষণ); "আমাদের দেশের ইতিহাসটা ঢালিয়া সাজিতে হইবে।...শুধু ইংরাজী পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না।—এখনকার ইতিহাসবাগীশেরা সাহেবের বই ছাড়া পড়িতে পারেন না। সংস্কৃত তাঁহাদের একেবারেই বাঘ বলিয়া মনে হয়।".. কিন্তু "সংস্কৃত সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে অনেকের স্থান ও কাল ঠিক হইয়া যাইবে"—এ কথা তিনিই জোর করিয়া বলিয়াছেন (১৩৩২ পত্রিকা ১৯৫ পৃঃ);—"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হওয়া উচিত"—এ কথা তিনিই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন (১৩৩৫ পত্রিকা ৪ পৃঃ); বঙ্গের সহজিয়া সম্প্রদায়ের কথা, নাঢ়া-নাঢ়ীর কথা তিনিই শুনাইয়াছেন; প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' তিনিই নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; নেপালে বাঙ্গালা নাটকের সন্ধান তিনিই দিয়াছেন; বাঙ্গালা সমাজে বৌদ্ধভাবের প্রভাবের কথা তিনিই শুনাইয়াছেন। কত কথা তিনি শুনাইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ১৩ বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি থাকিয়া নিঃস্বার্থভাবে যথাসাধ্য সাহিত্যপরিষদের সেবা করিয়া তিনি গত বৎসর অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আশা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—"সাহিত্যপরিষৎ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার মিউজিয়াম পৃথিবীর অন্যান্য পরিষৎ ও মিউজিয়ামকে ছাড়াইয়া উঠিবে, কারণ বাঙ্গালা অতি প্রাচীন দেশ। এইরূপ নদীমাতৃক দেশেই সভ্যতার প্রথম উৎপত্তি—বাঙ্গালা সভ্যতা যে কত প্রাচীন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।"

জানি না শাস্ত্রী মহাশয়ের আশা কতদিনে পূর্ণ হইবে।

পরলোকে শাস্ত্রী মহাশয়

বাং ১২৬০ (ইং ১৮৫৩) সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩৩৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ (ইং ১৯৩১-১৭ই নবেম্বর) শাস্ত্রী মহাশয় পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন বাঙ্গালীকে, বাঙ্গালার শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহারকে, চেষ্টা করিয়াছিলেন বাঙ্গালীকে উন্নত করিতে, উদ্ধার করিয়াছেন বাঙ্গালীর ইতিহাসকে এবং স্বয়ং বঙ্গমাতার মুখ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। বয়সে, বিদ্যায়, জ্ঞানে, সম্মানে তিনি মহান্ হইয়াছিলেন। মহাকাল তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে, মহাকালের প্রভাব এড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। আরও কিছুদিন তিনি থাকিলে আমরা সুখী হইতাম, কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। অনিচ্ছাসত্ত্বে গভীর দুঃখে তাঁহাকে বিদায় দিতে হইয়াছে।

তাঁহার সাধনোচিত ধামে তিনি শান্তিতে বিরাজ করুন এবং বাঙ্গালীকে আশীর্ব্বাদ করুন—বাঙ্গালী যেন বাঙ্গালীকে তাঁহার মত চিনিতে শেখে।

চিরন্তনীর জয়

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

একাদশ পরিচ্ছেদ

"চলুন অনিলবাবু। বীরেশবাবু বিলম্ব দেখে ব্যস্ত হতে পারেন।"

অনিলচন্দ্র ভগিনীপতির তাড়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "এখনও সন্ধ্যার ঢের দেরী, প্রতুলবাবু।"

"তা না হ'ক। ওঁর বাড়ীটা নদীর ধারে। জায়গাটা ভারী সুন্দর। নদীর শোভা এমন চমৎকার সেখানে। অস্তগামী সূর্য্যের দৃশ্যটা উপভোগ করা যাবে, চলুন।"

"তরলিকাও যাবে ত। সে কি এর মধ্যে তৈরী হয়ে নিয়েছে?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আপনার বোন্ কি বাড়ী আছেন না কি? দুপুরবেলা বীরেশবাবুর ওখানে তিনি চলে গেছেন।"

অনিলচন্দ্র চরকার সূতা নাটাইয়ে গুটাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর প্রতুলচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "বীরেশবাবুর বাড়ী আজ কিসের উৎসব? অনেক লোকজন হবে না কি?"

"কিছু না; শুধু আমরা। আপনাকে তাঁর বড় ভাল লাগে। তাই আমাদের ক'জনকে নিয়ে ছুটির দিনের সন্ধ্যাটা আনন্দে কাটাবার ইচ্ছে হয়েছে।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে করিতে অনিলচন্দ্র বলিল, "বাস্তবিক বীরেশবাবু বড় চমৎকার লোক। যেমন পূত চরিত্র, তেমনই সদালাপী ও পণ্ডিত। সত্যি আমারও তাঁকে খুব ভাল লাগে।"

কি একটা কথা বলিতে গিয়া প্রতুলচন্দ্র থামিয়া গেলেন।

খদ্দরের চাদরখানা খুলিয়া গায় দিয়া অনিলচন্দ্র বলিল, "তবে চলুন।"

উভয়ে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বীরেশবাবুর বাড়ী অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। অপরাহ্ণের আলোকে উভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন। সূর্য্য তখনও পশ্চিম আকাশে আবীর ছড়াইতেছিলেন।

নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত হইল।

প্রতুলচন্দ্র নদীর তীরবর্ত্তী নাতিবৃহৎ প্রস্ফুটিত কুসুম-চিত্রিত, লতাবেষ্টিত প্রবেশ-পথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজপথের দক্ষিণ দিকে যে সাধারণ দ্বার বিদ্যমান, সে দিক দিয়া না প্রবেশ করিয়া এই পথটি তিনি বাছিয়া লইলেন। বীরেশবাবুর গৃহে নদীর দিকের এই মনোজ্ঞ পথে তিনি দুইবার অধ্যাপকের সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অন্তঃপুরের উদ্যানের একাংশ এই দিকে থাকা সত্ত্বেও বাহিরের লোকের পক্ষে এ দিক দিয়া প্রবেশের বিশেষ বাধা নাই।

অপরাহ্ণের স্তিমিত সূর্য্য তখন নদীর অপর পারের বৃক্ষরাজির অন্তরালে ঢলিয়া পড়ে নাই। সোণার কিরণে হেমন্তের সায়াহ্ন স্বপ্নলোকের মায়ায় মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

কঙ্করাকীর্ণ পথে একটু অগ্রসর হইতেই অনিলচন্দ্র সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রতুলচন্দ্র শ্যালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দাঁড়ালেন যে?"

অনিলচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল, "আমাদের এ পথে আসা উচিত হয় নি। ঐ দেখুন।"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, অদূরে রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে একটি তরুণী নিবিষ্টমনে সন্তর্পণে ফুল সংগ্রহ করিতেছে। তাহার এলাইত সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশরাজির একাংশ দেখা যাইতেছে। মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই। পরিহিত বাসন্তী বর্ণের বসনের উপর অস্তগামী সূর্য্যের আলোক-সম্পাতে তরুণীর দেহ-সুষমা যেন অপ্সরোলোকের দেবকন্যাগণের মাধুর্য্য-মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রতুলচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিলেন, "মেয়েটি বীরেশবাবুর। অনূঢ়াকে দেখে, চিরকুমারের সঙ্কোচ বড় বিস্ময়ের বিষয়।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "অন্য রাস্তা আছে ত; চলুন সেই দিক দিয়েই যাই।"

এমন সময় গৌরী ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তাহার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য চকিত হইয়া উঠিল। লজ্জার অরুণ রেখা আননে ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সংযত লঘু পদক্ষেপে অন্তঃপুরের প্রবেশ-পথের দিকে চলিয়া গেল। তাহার গতিভঙ্গীতে যে বিচিত্র মাধুর্য্য লীলায়িত হইয়া উঠিল, তরুণদিগের দৃষ্টি তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিল কি?

শ্যালকের মুখের দিকে একবার অপাঙ্গে চাহিয়া প্রতুলচন্দ্র সহজভাবে চলিতে লাগিলেন। অনিলের মুখ-ভঙ্গীতে গাম্ভীর্য্যের অটুট ছায়া দেখিয়া তাহার অন্তরের ভাব-বৈচিত্র্যের কোন আভাস তাঁহার তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আবিষ্কার করিতে পারিল না।

"মেয়েটি বড় ভাল বলে শুনেছি। বীরেশবাবু নিজে বাড়ীতে শিক্ষা দিয়ে ওঁকে বিশেষ গুণবতী করে তুলেছেন, কিন্তু ভাল পাত্র আজও জুটল না।"

অনিলচন্দ্র সংক্ষেপে বলিল, "বাঙ্গালার ঘরে ঘরেই এম্নি অবস্থা।"

প্রতুলচন্দ্র কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বীরেশ-বাবু বাহু প্রসারিত করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

"এই যে, আপনারা এসেছেন। আজ বড় আনন্দ পেলাম।"

উভয় বাহুর সাহায্যে উভয়কে আবেগভরে কাছে টানিয়া আনিয়া সরলপ্রাণ শিক্ষক মুহূর্ত্ত কাল উভয়ের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন। তার পর, পথ দেখাইয়া অতিথি যুগলকে বসিবার ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারি দিকের শোভা দেখিতে দেখিতে অনিলচন্দ্র বলিল, "আপনার এই বাগান, বাড়ী, এদের অবস্থান শিল্পীর কলাভবনের উপযোগী। আমার এক চিত্র-শিল্পী বন্ধু আছেন, তাঁকে এখানে আন্‌তে পারলে, এই রমণীয় দৃশ্যের মর্য্যাদা তিনি তুলিতে অমর করে তুলতে পারেন।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আপনার কোন্ বন্ধু অনিলবাবু? আমি কি তাঁকে দেখেছি?"

মৃদুশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল বলিল, "না, তাঁকে আপনি দেখেন নি, তবে নাম হয় ত শুনেছেন। বর্ত্তমান যুগের তরুণ চিত্রশিল্পীদিগের মধ্যে তাঁর তুল্য আমি আর কাউকে মনে করি না।"

চিত্রশিল্পের দিকে বীরেশ বাবুরও সমধিক অনুরাগ ছিল। কন্যা গৌরীকেও চিত্র-বিদ্যার অনুরাগিণী দেখিয়া তিনি তাহাকে নিজের সামর্থ্যানুসারে চিত্রাঙ্কনে সাহায্য করিতেন।

বীরেশবাবু বলিলেন, "কার কথা বল্‌ছেন, অনিলবাবু?"

সোপান পথে বারাণ্ডায় উঠিতে উঠিতে অনিল বলিল, "মনীশ গুহের নাম হয় ত আপনারা শুনে থাক্‌বেন। আজকাল—"

বাধা দিয়া বীরেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "মনীশ গুহ ত সত্যি একজন দক্ষ চিত্রকর। খুব নাম শুনেছি। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিকগুলিতে মনীশবাবুর ছবি প্রায়ই দেখ্‌তে পাই। তিনি আপনার বন্ধু?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "এ নাম আমারও অপরিচিত নয়। কাগজে দেখ্‌ছিলাম এবার কলকাতার চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর ছবির খুব প্রশংসা হয়েছে।"

অনিলচন্দ্র গাঢ়স্বরে বলিল, "তাঁর শিল্প সাধনার নিষ্ঠা ও একাগ্রতার কথা আপনারা জানেন না। আমি গোড়া থেকেই জানি। মনীশের প্রতিভা একদিন বাঙ্গালী জাতিকে শিল্পরসিক বলে সভ্যসমাজে পরিচিত করে দেবে, এই আমার বিশ্বাস।"

বীরেশবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতিথিযুগলকে বসাইয়া বলিলেন, "আমার মেয়ে গৌরীও মনীশবাবুর চিত্রের ভারী অনুরাগিনী।"

প্রতুলবাবু বলিলেন, "আপনার মেয়েকে চিত্র-বিদ্যাও শেখাচ্ছেন না কি?"

স্মিত-হাস্যে বীরেশচন্দ্র বলিলেন, "মা আমার সকল প্রকার ললিত কলারই অনুরাগিনী; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তার শক্তির অনুযায়ী শিক্ষা দিতে পাচ্ছিনে।"

প্রতুলচন্দ্র অনিলের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কি দেখিলেন। তার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কলকাতায় থাক্‌লে আপনি যোগ্য শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হয় ত পেতেন!"

বীরেশবাবু বলিলেন, "যোগ্য শিক্ষকের হয় ত অভাব

নেই; কিন্তু একটা কথা হয় ত আপনি লক্ষ্য করছেন না। শিক্ষা দিবার যোগ্য শক্তি থাকলেও যুবতী কন্যাদের কাছে শিক্ষকের পবিত্র দায়িত্ব রক্ষা করে চলবার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অতি সামান্য নয় কি?"

অনিলচন্দ্র এতক্ষণ নীরব ছিল। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "বীরেশবাবুর সহিত আমি এ বিষয়ে একমত। পৌরুষসম্পন্ন পুরুষের সংখ্যা বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস-হীন শিক্ষাপদ্ধতির ফলে বাঙ্গালা দেশে অত্যন্ত বিরল হয়ে পড়েছে।"

প্রতুলচন্দ্র কোন প্রতিবাদ করিলেন না। বোধ হয় অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান এই মতবাদের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার আকাশে সপ্তমীর চাঁদ, সন্নিহিত নদীর চঞ্চল বক্ষে লক্ষ চূর্ণ রেখা! অনিলচন্দ্র মুগ্ধভাবে সেই দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার এ জায়গাটি সত্যই লোভনীয়। বড় আনন্দে আছেন আপনি, বীরেশবাবু।"

প্রতুলচন্দ্র আলবোলার নলটি তুলিয়া বলিলেন, "সে কথা সহস্রবার।"

বীরেশবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঐশ্বর্য্যের সাধনা কোন দিন করিনি, তবে শান্তিতে দিন যাপনের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই। তিনি এইটুকু করেছেন বলে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাইনে, প্রতুলবাবু।"

কথাগুলির মধ্যে ভক্ত-হৃদয়ের যে অভিব্যক্তি বীণাগুঞ্জনের ধ্বনিতে ব্যক্ত হইল, তাহাতে অনিল মুগ্ধ হইল। সে বলিল, "যিনি সকল অবস্থাতেই মনকে শান্ত রাখবার সাধনা করেন, ভগবানের দয়া তাঁর উপর অজস্রধারেই বর্ষিত হয়।"

প্রতুলচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পার্শ্বের কক্ষ হইতে বীণাধ্বনিবৎ মধুর কণ্ঠের তরঙ্গ উত্থিত হইতেই তিনি থামিয়া গেলেন। সুস্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিল—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা!"

তরুণীর মধুস্রাবী কণ্ঠে এইরূপ ধরণের সঙ্গীত কি বিস্ময়কর নহে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রগতিপরায়ণ যুগে?

প্রতুলচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, অনিলচন্দ্র বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। তাঁহার অন্তরে যে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার শ্যালকের মনে বয়োধর্ম্মের সামঞ্জস্য হেতু কি অনুরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে?

"জনমের শোধ ডাকি মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা।"—

এ সঙ্গীত তাঁহার পত্নী তরলিকার কণ্ঠনিঃসৃত নহে নিশ্চয়ই। বীরেশবাবুর কন্যাই এমন কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী। কিন্তু এই তরুণ বয়সে গানের অভিব্যক্তিতে কুমারী কন্যার হৃদয়ব্যথা এমন ঔদাস্যব্যঞ্জক কেন? গান নির্ব্বাচনের সহিত অন্তরের কি কোন যোগাযোগ আছে?

প্রতুলচন্দ্র আইনজ্ঞ বিচারক। মনস্তত্ত্বের রাজ্যভূমিতে তিনি দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার চিত্ত অভিভূত হইল।

"পৃথিবীর কেউ ভাল ত বাসে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,—
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা!"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, অনিলচন্দ্র প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। তিনি একবার আসনের উপর নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

এস্রাজের সুরকে ছাপাইয়া—অতিক্রম করিয়া কণ্ঠধ্বনি উচ্চ সপ্তকে উঠিল—

"বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না,
(আমার) বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা!"

ক্রন্দনের সপ্তসমুদ্র যেন সত্যই সে কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ভাদ্রের কূলভরা জাহ্নবীর পবিত্র প্রবাহ-ধারার ন্যায় যেন সে সঙ্গীত-স্রোত শ্রোতৃবৃন্দকে ভাসাইয়া, অভিভূত করিয়া বহিয়া চলিল।

প্রতুলচন্দ্রের হৃদয় অশ্রুসিক্ত হইল। নয়নেও মুক্তা বিন্দু দুলিয়া উঠিল। অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার এ মানসিক দুর্ব্বলতা বীরেশবাবু অথবা অনিলচন্দ্রের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে কি না।

বীরেশবাবু মৃত্তিকা-নিক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন।

অনিলচন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে খদ্দরের রুমাল বাহির করিয়া মুখের উপর বুলাইয়া লইল।

গান থামিয়া গেলে কয়েক মুহূর্ত্ত কেহ কোন কথা কহিলেন না। সঙ্গীতের সুর তখনও যেন একটি ব্যথাদীর্ণ নারীর অন্তরের ক্রন্দন-গুঞ্জন বাতাসে এলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

প্রতুলচন্দ্র সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "বীরেশবাবু, এ গান নিশ্চয়ই আপনার মেয়ে গৌরী গেয়েছেন?"

অধ্যাপক মৃদুস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার মা লক্ষ্মী সেবার কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখে এসে এই গানটা শিখেছিল। সাহিত্যের দিকে মার আমার বিশেষ ঝোঁক। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি মার আমার অচলা ভক্তি।' কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি ওর কাছে নাকি বড় প্রিয়।"

অনিলচন্দ্র এবার ফিরিয়া বসিয়া ঔৎসুক্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "বলেন কি, স্যার! এ যুগে—এই বিচিত্র প্রগতির স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে নরনারী যখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে,—তখন আপনার মেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি অক্ষুন্ন রাখ্‌তে পেরেছেন? আশ্চর্য্য!"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তার মানে?"

মৃদু হাসিয়া অনিলচন্দ্র তীব্রকণ্ঠে বলিল, "মানে খুব সহজ। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরং' দেশবরেণ্য, পৃথিবীবরেণ্য হলেও, নব যুগের অনেকের ধারণা তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা যুগোপযোগী নয়। নিতান্ত সেকেলে তিনি—মনস্তত্ত্বের চিত্রকর হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীতেই তাঁকে রাখা না কি সঙ্গত!"

বীরেশচন্দ্র এবার উচ্চ হাস্যধ্বনিতে কক্ষতল মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তারপর বলিলেন, "আপনারও কি সেই মত নাকি, অনিলবাবু?"

অনিলচন্দ্র সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার সমস্ত জীবনটা ঐ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের আদর্শে গঠিত। উপন্যাস পাঠের ফলে তরুণ যুবকের চরিত্রনিষ্ঠা বজায় থাকে না বলে, আমাদের অভিভাবকদের মত ছিল; কিন্তু আমি গর্ব্ব করে বলতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র আমাকে মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে দিয়েছে।"

ভাবাতিশয্যে যুবকের আননে একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে গভীর আবেগভরে বলিয়া চলিল, "তাঁকে কখনও দেখি নি। আমার জন্মের বহু আগেই তিনি লোকান্তরে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ও রচনা আমার সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে রেখেছে। প্রতুলবাবু হয় ত এ কথা শুনে হাস্‌বেন; কিন্তু—"

অনিলচন্দ্র বক্তব্য শেষ করিল না। ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িল।

হাসিতে হাসিতে প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "ও বিষয়ে একচেটে অধিকার যে শুধু একলা আপনারই আছে অনিলবাবু, তা মনে কর্‌বেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার একনিষ্ঠ ভক্ত পাঠকের সংখ্যা আরও অনেক আছে।"

আকাশপটের চন্দ্রের স্নিগ্ধ দীপ্তির মাধুর্য্য সম্মুখের পুষ্পবনে ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছিল। অনিল বলিল, "বাইরে আস্‌লে কেমন হয়, প্রতুলবাবু?"

বীরেশবাবু বলিলেন, "তা খানিক বসা চল্‌তে পারে। তবে বেশীক্ষণ বাহিরের শিশির আপনাদের সহ্য হবে কি?"

প্রতুলচন্দ্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এখনো হিমের প্রতাপ তেমন প্রবল হয় নি, বীরেশবাবু। তা ছাড়া সাম্‌নে নদী। আপনি বৈজ্ঞানিক, সুতরাং এখানে শিশিরের উৎপাত তত বেশী হবে না, এ আপনি ভালই জানেন।"

এক পাশে যুঁই ঝাড়ের ধারে খানিকটা স্থান বাঁধান ছিল। সেখানে মাদুর পাতিয়া বীরেশবাবু অতিথি যুগলকে বসাইলেন।

কথায় কথায় গৌরীর প্রসঙ্গ প্রতুলচন্দ্র তুলিলেন। এমন গুণবতী কন্যার জন্য একটি গুণবান, সৎপাত্র বীরেশবাবু এখনও পান নাই, এজন্য প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

বীরেশবাবু স্নিগ্ধ প্রশান্তভাবে হাসিয়া বলিলেন, "বর্ত্তমান যুগে মানুষ রূপ এবং রুপেয়ার সম্মেলন চায়, মুন্সেফবাবু। আমার ঘরে এ দুয়েরই অভাব। সুতরাং গুণবান সৎপাত্র আমার কাছে দুর্লভ হয়েই আছে।"

অনিলচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল, "আপনার মেয়েকে বোধ হয় আমি দেখেছি। তিনি ত রূপহীনা নন, স্যার।"



প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমিও দেখেছি। ওঁর মেয়েকে দেখে যে কোন মানুষ মুগ্ধ হবে, এ আমার ধারণা। কিন্তু তবু আপনি কেন ভাল পাত্র পাচ্ছেন না বীরেশবাবু, আমি এখনও বুঝতে পাচ্ছি না।"

"আমার ভাগ্য।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় অধ্যাপক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্দরের দিকে গমন করিলেন।

ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছিল। গড়গড়ার নল তুলিয়া লইয়া টানিতে টানিতে প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আজকাল দেখছি, অনেকেরই ধারণা, প্রচুর উপার্জ্জন না করে বিয়ে করা উচিত নয় বলে, যৌবনের শ্রেষ্ঠভাগ যে ভাবে অবহেলা করে তাতে বাঙ্গালীর ন্যায় স্বল্পকাল-জীবী জাতির পক্ষে আদৌ শুভ নয়।"

অনিল বলিল, "আপনিও ত সেই যুগেরই মানুষ, প্রতুলবাবু। আপনি এখনও বুড়ো হন নি।"

"কিন্তু আমার মনোবৃত্তি স্বতন্ত্র। যথাসময়েই বিবাহের নাগপাশে নিজেকে ধরা দিয়েছি। আপনাদের মত কৌমার্য্যকে বরণ করে জীবনকে বিফল করে তুলি নি।"

উচ্চ হাস্যে প্রতুলচন্দ্র কাননতল মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

অনিলচন্দ্র সহসা গম্ভীরভাবে বলিল, "যাদের একদিন বিয়ে করতেই হবে, যৌবনকে কল্পনার স্বপ্নে ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের শেষকালে বিয়ে করার বিরুদ্ধে আমি চিরদিন লড়াই করে যাব। যারা ঐ রকম মত প্রকাশ করে, তারা বিদেশের অক্ষম অনুকরণ ক'রে সভ্য সাজতে চায়। ভারতবর্ষ যে ইয়োরোপ নয়, এ জ্ঞান তাদের নেই। কিন্তু যারাই কৌমার্য্যকে বরণ করে চলে, তাদের সকলের জীবনের বা মনের ইতিহাস ত আমরা জানি না। হয় ত বিয়ে না করবার অন্য কারণও থাকতে পারে!"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, অনিলচন্দ্রের আননে একটা বিষাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। শ্যালকের মনের মধ্যে কি তবে কোন গোপন ব্যথা আছে? ব্যর্থ প্রণয়?—না, সে রকম কোন আভাস ত এ পর্য্যন্ত তিনি পান নাই। তাঁহার পত্নীর নিকট হইতেও এমন কোন কথা তিনি জানিতে পারেন নাই, যাহাতে অনিলচন্দ্রের বিবাহে বিতৃষ্ণার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে।

ধীরে ধীরে তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিন্তা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না।

বীরেশবাবু তখনও বাহিরে আসিতেছেন না দেখিয়া অনিলচন্দ্রের দিকে একটু সরিয়া বসিয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বীরেশবাবুর মেয়েটি কি গুণবতী বলে মনে হচ্ছে না?"

ভগিনীপতির দিকে ফিরিয়া চাহিয়া অনিল বলিল, "বরং ঠিক তার বিপরীত। এমন চমৎকার চেহারার মেয়ে আমি কমই দেখেছি, এমন কণ্ঠস্বর শুনিই নি। ইনি যার গৃহলক্ষ্মী হবেন, সে ভাগ্যবান সন্দেহ নাই।"

প্রতুলচন্দ্র মনে মনে একটু আশান্বিত হইলেন। একদিনে বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয় মনে করিয়া তিনি ও প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

এমন সময় বীরেশবাবু আসিয়া বলিলেন, "এইবার ভিতরে চলুন, আপনারা—সব প্রস্তুত।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন ঘন ঘটা করিয়া মেঘমালা শূন্যে শূন্যে দৈত্যের ন্যায় বিরাট দেহ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। ছিদ্রশূন্য মেঘ—মৃদু বারিপাতের বিরাম নাই। ঝটিকার গর্জ্জন, বিদ্যুতের দীপ্তি প্রথম প্রহর রাত্রিতে বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। হেমন্ত ঋতুর প্রথম পাদে বাঙ্গালা দেশে প্রায় প্রতি বৎসরই ঝটিকার আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা আবহবিদ্যাবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন।

নির্জ্জন কক্ষে, অনিলচন্দ্র রাত্রির আহার শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। আজ কলেজ বন্ধ ছিল বলিয়া সমস্ত দিন, সে নিয়মিত সুতা কাটার পর, গ্রন্থপাঠেই অতিবাহিত করিয়াছে। এখন আর পাঠে তাহার স্পৃহা ছিল না। জানালা খুলিয়া দিয়া প্রকৃতির রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির দিকে সে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। প্রকৃতির অশান্ত রূপ তাহার কাছে কখনও প্রচণ্ড বলিয়া মনে হয় না। এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও সে বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র রূপ ও লীলা দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠে। সে শান্ত নিয়ম শৃঙ্খলার ভক্ত হইলেও মাঝে মাঝে প্রকৃতির উদ্দাম খেয়াল দেখিয়া তাহার

মধ্য হইতে সৌন্দর্য্য-লীলার ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলার তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

আজও তরুণ অধ্যাপক প্রকৃতির এই সংহারিণী মূর্ত্তি দেখিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্যলীলার ছন্দ অনুভব করিতে লাগিল। না, বিশৃঙ্খলতা বিশ্ব-সৃষ্টিতে নাই, থাকিতে পারে না। নিয়ম অমোঘ, অপ্রতিহত গতিতে জড় ও চেতন জগতে বিদ্যমান। উন্মদগতিতে মেঘমালা ছুটিতেছে,—আকাশের বক্ষ চিরিয়া সুন্দরীর নিষ্ঠুর হাস্যজ্বালার মত যে প্রদীপ্ত শিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহাতেও একটা শৃঙ্খলা আছে। মানুষের মনও কি প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে?

অনিলচন্দ্র চিন্তাজগতে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। মানব-মনের বিচিত্র ও বিশিষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও একের সহিত অপর মনের সূক্ষ্ম সাদৃশ্য কোথায়—সে সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণ কোথায় কি বলিয়াছেন, এই সকল বিষয়ের আলোচনায় সে তন্ময় হইয়া গেল। বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মতবাদ সত্ত্বেও যে চিরন্তন সত্য মানব-জীবনে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকে ভুল করিয়া বুঝিলে চলিবে কেন?

মানুষের মন সুখ চাহে, আনন্দ প্রার্থনা করে—শান্তি-পূর্ণ জীবনযাত্রা সংসারী মানব মাত্রেরই কি একান্ত প্রার্থনার বস্তু নহে? নিশ্চয়ই। কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? তবে?

অনিলচন্দ্র মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। এমন প্রশ্ন সহসা তাহার অন্তর মধ্যে জাগিয়া উঠিল কেন? চিন্তার কোন্ সূত্র ধরিয়া মন এমন প্রশ্ন উত্থাপিত করিল? ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কোঠায় আসিয়া মন এমন ভাবে বিচারের আলোচনায় ব্যগ্র হইয়া উঠিল, ইহার হেতু কি?

অন্তরের মধ্যে দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া সে দেখিল, বাহিরের এই দুর্য্যোগময়ী রজনীর মত সেখানেও প্রলয় ঝটিকার সূচনা হইয়াছে। মেঘ জমিয়া বিদ্যুৎদীপ্তি ও বজ্রগর্জ্জনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহা কি শুধুই খেয়াল, না নিয়মতান্ত্রিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল?

বিগত জীবনের কার্য্যধারা এবং মনোবৃত্তির হিসাব নিকাশ করিতে গিয়া সে দেখিল, অসঙ্গতভাবে, উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত সে কোন কাজই করে নাই। কোন কোন কার্য্যের দ্বারা সে পিতা মাতার মনে দুঃখ দিয়াছে; নিজেও সেজন্য হৃদয়ে বেদনা পাইয়াছে সত্য; কিন্তু সে সকল ব্যাপারে তাহার কোন হাতই ছিল না। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত কি অস্বীকার করিতে পারে?

ঝটিকার প্রচণ্ড গর্জ্জন চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে প্রবল ধারায় বারিপাতও হইতেছিল। অনিলচন্দ্রের দার্শনিক চিত্ত প্রকৃতির এই রণরঙ্গিণী নৃত্যলীলার মধ্যে যে বিচিত্র মাধুর্য্য অনুভব করিতেছিল, তাহাতে সহসা তাহার চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়িল।

কিন্তু আজ এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, একা একা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় না। কাহারও সহিত এই সৌন্দর্য্যানুভূতির রস ভাগ করিয়া লইতে পারিলে বোধ হয় একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

মনের মধ্যে এই চিন্তা সমুদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বীরেশ বাবুর কন্যার উদ্যানপথবর্ত্তিনী মূর্ত্তি তাহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তাহার পরিপূর্ণকণ্ঠের সঙ্গীতধারার স্মৃতি তাহার মনে আজিকার এই বাদলধারার ছন্দে যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিল!

অনিলচন্দ্রের মন কয়েক মুহূর্ত্ত সেই স্মৃতির তরঙ্গদোলায় দোল খাইয়া সহসা যেন প্রকৃতিস্থ হইল। তাহার দার্শনিক চিত্ত মনের গতিবেগ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখিল, তাহা ত স্বাভাবিক অবস্থায় নাই।

বাতায়ন সন্নিধান হইতে উঠিয়া অনিলচন্দ্র গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। এই গৌরী তন্বঙ্গী, সুদর্শনা, সুকেশা—এক কথায় সে সুন্দরী। জনশ্রুতি বলে শুধু সুন্দরী নহে, গুণবতী—শিক্ষিতা!

কক্ষমধ্যস্থলে সহসা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া অনিলচন্দ্র গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

কোনও নারী সম্বন্ধে সে এমনভাবে কখনও ত মনের মধ্যে আলোচনা করে নাই! সে নারী-বিদ্বেষী কোন দিনই নহে, নারীসঙ্গ পুরুষ জীবনকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলে, ইহা ত সে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে। কিন্তু জীবনের পঁচিশটি বসন্ত তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া বিষণ্ন মনে ফিরিয়া গিয়াছে, ইহাও ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই!

সে সৌন্দর্য্যের উপাসক, তত্ত্বরসের ভক্ত। তাহার সমগ্র জীবন, শিক্ষা সবই ত এই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অনুশীলনে নিযুক্ত। মহিমময়ী নারীকে বাদ দিয়া কি সৌন্দর্য্যানুশীলন সম্পন্ন হইতে পারে? তথাপি সে এখনও পর্য্যন্ত কোনও নারীকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করে নাই কেন?

আকাশ চিরিয়া বিদ্যুতের দীপ্তশিখা হাসিয়া উঠিল।

অনিলচন্দ্র মনে করিল, উহা নারীরই বিদ্রূপজ্বালা। তাহার চিন্তাধারাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন উহা আকাশপটে মুহূর্ত্তের জন্য দীর্ঘ রেখা আঁকিয়া দিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই ভীম গর্জ্জনে সমগ্র বাড়ীখানি কম্পিত হইয়া উঠিল।

দূর অতীতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হইল। কিশোর জীবনের অনাবিল বন্ধুত্ব—প্রাণের আশা ও আনন্দের রঙ্গীণ চিত্রগুলি স্মৃতির পটে ধীরে ধীরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। সরলহৃদয়ের রিপুকলঙ্কবর্জ্জিত নির্ম্মল মনোভাবগুলি কল্পনার ললিত তুলিকার সঞ্জীবনস্পর্শে বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রথম যৌবনে তাহার গতিবেগ স্বচ্ছন্দ ও প্রবল।

কিন্তু প্রবাহধারায় সহসা বাধা প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। অদৃষ্টের নির্ম্মম বাহু বিরাট লৌহপ্রাচীর তুলিয়া সে গতিবেগের প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দিল। তরুণ হৃদয়ের সে নৈরাশ্য সে জীবনে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। গভীর সহানুভূতিতে তাহার সমগ্র অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। অলক্ষ্য দেবতার চরণোদ্দেশে গভীর নতি জানাইয়া সে কি অঙ্গীকার করে নাই, যতদিন—যে পর্য্যন্ত ব্যথিত, নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে আশা ও আনন্দের আলোক জ্বলিয়া না উঠে ততদিন তাহার মুক্তি নাই? ততদিন সাংসারিক জীবের প্রার্থনীয় মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু হইতে সে আপনাকে দূরে নির্ব্বাসিত রাখিবে?

ঝটিকার তরঙ্গ কক্ষমধ্যে উন্মদ উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া আসিল। গৃহের আলোক আত্মরক্ষার ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া অন্ধকারে আত্মবিসর্জ্জন করিল।

অনিলচন্দ্র আলো জ্বালিবার কোন চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে আবার অন্য দিকের খোলা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

দ্রুততর বেগে, উন্মত্তভাবে মেঘের পর মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে, ঘনান্ধকারেও তাহা অনিলের দৃষ্টি এড়াইল না।

বুকের উপর বাম হস্ত স্থাপন করিয়া শূন্য নয়নে অনিলচন্দ্র মহাশূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার সে দিনের সে অঙ্গীকার, সে প্রতিজ্ঞার কথা কোন মানুষই শুনে নাই; কিন্তু সকলের অন্তর্যামী চিরসুন্দর কি সেদিন আশীর্ব্বাদ-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে বলিয়া উঠেন নাই—"তথাস্তু"?

না, তাহার ব্রত এখনও অনুদ্‌যাপিত রহিয়াছে, তাহার কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আত্মতৃপ্তি, আত্মসুখ ভোগ করিবার ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার এখনও তাহার হয় নাই।

কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিবার অধিকারও তাহার নাই। লৌকিক জীবনে তাহার এ মনোবৃত্তির কোনও মর্য্যাদা হয় ত নাই। তাহার এমন সঙ্কল্প সাধারণ মানুষের কাছে উদ্ভট, হাস্যোদ্দীপক বলিয়া উপেক্ষিত হইবে।

ঝটিকার তরঙ্গে সে কাণ পাতিয়া কি যেন শুনিতে লাগিল। তাহার মনে হইল দূর হইতে যেন গানের সুরে ধ্বনিত হইতেছে—

বড় দাগা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় জ্বালা সয়ে কামনা ভুলেছি,—"

সত্য, অতি সত্য। মানব জীবনের এই অনতিক্রমনীয় সত্যকে সেদিন তরুণীর কণ্ঠে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে সে দেখিয়াছে। তাহার অতীত ও বর্ত্তমান সেই সত্যকে বহন করিয়া অনুক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে না কি?

অনিলচন্দ্র স্তব্ধভাবে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রজনীতে তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ম্যাজিষ্ট্রেট গৃহিণী সমাদরে অনিলচন্দ্রকে কাছে বসাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তার পর, সকালবেলা কি মনে করে, মিঃ বোস্?"

অনিলচন্দ্র বলিল, "আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে আপনাকে।"

মিসেস্ টমসন্ সহাস্যে বলিলেন, "আপনাকে সাহায্য করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কারণ আমি জানি আপনি

নিজের জন্য কোন কিছু করেন না। আর যা কিছু করেন, তাতে কোন অন্যায়ের সংস্রব নেই।”

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লজ্জিত হইয়া অনিলচন্দ্র বলিল, “আমার সম্বন্ধে আপনার এমন উচ্চ ধারণার জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাক্‌ব। কিন্তু মিসেস্ টমসন্, আপনি এমন ভাবে আমায় লজ্জা দিলে কোন কথা বলাই আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে না।”

প্রৌঢ়া ইংরাজ মহিলা অনিলচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলি'লন, “অনিল, তোমার মত বয়সের একটি ছেলে আমি হারিয়েছি। সে যদি তোমার মত মনোবৃত্তি নিয়ে বেঁচে থাক্‌ত, আমার বুক্ মাতৃগর্ব্বে ভরে উঠ্‌ত। তোমার সম্বন্ধে সহরের পদস্থ ভদ্র লোকদের উচ্চ ধারণার কথা তুমি হয় ত জান না। তোমার গুণের প্রশংসায় মিঃ টমসন্ পঞ্চমুখ, সুতরাং লজ্জার কোন কারণই তোমার নেই।”

কথার মোড় ঘুরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে অনিলচন্দ্র বলিল, “যে জন্য আজ আপনার কাছে এসেছি, সে কথা নিবেদন কর্ত্তে পারি কি?”

“অনায়াসে, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই করতে প্রস্তুত।”

অনিলচন্দ্র তখন তাহার বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইয়া দিল। সহরে আগামী শীতঋতুতে একটি স্বদেশী শিল্পমেলা বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। দেশের কুটীর শিল্প, কৃষিজ পণ্য, দেশীয় ললিতকলার নিদর্শনসমূহ লইয়াই মেলার প্রতিষ্ঠা হইবে। কর্ম্মের দিক দিয়া, চিন্তার অনুশীলনে বাঙ্গালী কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এ অঞ্চলের নরনারীর সম্মুখে যদি তাহা ধরিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উৎসাহ পাইয়া অনেক বিষয়ে বাঙ্গালী আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। বস্তুতান্ত্রিকতার দিক দিয়া ইহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর। মিসেস্ টমসনের চিত্র-বিদ্যার বিশেষ খ্যাতি আছে। ইংলণ্ডের চিত্রশালায় তাঁহার অঙ্কিত একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যদি মেলার চিত্রকলা বিভাগের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মেলার অনুষ্ঠাতৃবর্গ কৃতার্থ হইবেন। মিঃ টমসন্ মেলার উদ্বোধন করিবেন এবং যাহাতে বাঙ্গালীর এই জাতীয় শিল্পপ্রচেষ্টা স্বদেশী মেলা সার্থক হয় সে বিষয়েও তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

মিসেস্ টমসন্ বলিলেন, “মিঃ টমসনের কাছে এ খবর আমি আগেই পেয়েছি। তোমাদের এ প্রচেষ্টা সাধু। কিন্তু অনিল, এ শিল্প মেলা প্রতিষ্ঠার মূল গায়েন কে? আমি শপথ করে বল্‌তে পারি, এ কল্পনা প্রথম তোমার মনেই উঠেছিল।”

সলজ্জকণ্ঠে অনিল বলিল, “না, মিসেস্ টমসন্, এর জন্য আমাকে প্রশংসা দিবেন না। এর প্রথম প্রেরণার জন্য একটি তরুণী—বাঙ্গালী মেয়েই সকল প্রশংসার অধিকারিণী। আমি ঘটনাক্রমে সেই কথাটা জান্‌তে পেরে সকলের কাছে প্রস্তাব করেছি। সহরের গণ্যমান্য সকলেই অবশ্য উৎসাহ ও অর্থ ব্যয় করতে রাজি হয়েছেন।”

মিসেস্ টমসন্ বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, “বটে! সে মেয়েটি কে?”

অনিল বলিল, “কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক বীরেশ বাবুকে বোধ হয় আপনি জানেন। তাঁরই মেয়ে গৌরী একদিন কথায় কথায় আমার বোনএর কাছে বলেন, সারা বাঙ্গালায় কত কি হচ্ছে, আমাদের এখানে এমন একটা শিল্প মেলা বসালে মন্দ হয় কি? দেশের মেয়েরাও নিশ্চিন্ত বসে নেই—তাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে পারলে অনেক কাজ বোধ হয় হতে পারে। সেই কথা শুনে—”

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী হাসিয়া বলিলেন, “বুঝেছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিছু মনে কর না। মেয়েটি কি বিবাহিতা?”

মিসেস্ টম্‌সনের প্রশ্নে, কৌতুকভরা স্নেহদৃষ্টির আঘাতে অনিল কি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল?

সে মুহূর্ত্তে দৃষ্টি নত করিল। তাহার আনন ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, “না, মিসেস্ টমসন্। তাঁর এখনও বিয়ে হয় নি। সুপাত্রের অভাবে বীরেশবাবু এখনও তাঁকে ঘরে রাখতে বাধ্য হয়েছেন।”

“তুমিও এখন কুমার অবস্থায় আছ? হ্যাঁ, আমি তাই শুনেছি। এ কথা ঠিক?”

অনিল পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে বলিল, “আপনার সংবাদ সত্য। কিন্তু—”

সহসা সে থামিয়া গেল। সে এ সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিল না।

মিসেস্ টম্‌সন্ তখনও তেমনই সহাস্য আননে, প্রসন্ন দৃষ্টিতে অনিলের দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বীরেশবাবুর কথা আমি শুনেছি, তিনি যেমন পণ্ডিত, তেম্‌নি ধর্ম্মপ্রাণ। তোমার ভগিনীপতি প্রতুলের কাছে শুনেছি, তাঁর মেয়েটি অতি চমৎকার। আমি কিন্তু খুব সুখী হব, অনিল, ভারী তৃপ্তি পাব।"

অনিলের অন্তর-দেশ এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিয়া ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। বোধ হয় ভিতরের কম্পনবেগ বাহিরেও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিবে। সে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বোধ হয় আত্মসংবরণের চেষ্টা করিতেছিল।

দৃঢ়বলে সে মুখ তুলিয়া চাহিল, সংযত কণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাদের প্রার্থনায় অনুমোদন করলেন ত, মিসেস্ টম্‌সন্?"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী গাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। শুধু তাই নয়, তোমাদের মেলা ভাণ্ডারে আমি যৎসামান্য—হাজার টাকা দিতে চাই।"

উৎসাহভরে অনিল বলিল, "এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনার মহত্ত্ব ও স্নেহকে বিচার করতে চাই না, মা! আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন!"

অনিলের নয়ন-যুগল ছল ছল করিয়া উঠিল। সে জানিত এই দয়াবতী মহিলা নানা সদ্‌গুণের অধিকারিণী, ধনী পিতার কন্যা। কিন্তু তাঁহার অন্তর এ দেশীয়দিগের কল্যাণ কল্পে এমন উন্মুক্ত তাহা সে পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই!

সে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেই শ্রীমতী টম্‌সন্ হাসিয়া বলিলেন, "এই স্বদেশী মেলায়, অনিল বসুর খদ্দরের স্তায়, তাঁতের কাপড় দেখ্‌তে পাব ত?"

অনিল মাথা নত করিয়া বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে এই পুণ্য-মন্দিরে আমার সামান্য অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হবার চেষ্টা করব।"

মিসেস্ টম্‌সন্ বলিলেন, "তোমায় এ জন্যও আমি ভালবাসি, অনিল।"

অনিল নতশিরে অভিবাদন করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পূজার ছুটীর দীর্ঘ অবকাশে বীরেশবাবু স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। হৈমবতীর বহুদিনের সাধ ছিল, তিনি বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ দেখিয়া আসিবেন। কন্যা গৌরীর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। বীরেশবাবুর কয়েকখানি গণিত পুস্তক শিক্ষাবিভাগের মনোনীত হওয়ায় তিনি উহা বিক্রয় করিয়া বিগত দুই বৎসরে কিছু মোটা টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কয়েক সহস্র টাকা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া, অতিরিক্ত অর্থ তিনি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবার পূজার অবকাশে গৃহিণীর চির সঞ্চিত বাসনার তৃপ্তিসাধন তাঁহার একান্ত লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

পল্লীভূমি হইতে বাহির হইবার তাঁহার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতাতে তাঁহার কোনও আত্মীয় থাকিতেন। কন্যার জন্য দুই একটি পাত্রের সন্ধান তিনি দিয়াছিলেন। তীর্থ ভ্রমণ সারিয়া ফিরিবার পথে সে বিষয়ে আলোচনা এবং প্রয়োজন হইলে মেয়ে দেখানর কাজ সারিয়াও যাইতে পারেন। অভীপ্সিত প্রার্থিত পাত্র অনিলচন্দ্রের তরফ হইতে আকার ইঙ্গিতেও কোনও অনুকূল ভাব এ পর্য্যন্ত দেখিতে না পাইয়া কন্যার বিবাহকে আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে ফেলিয়া রাখিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

তাহা ছাড়া আগামী স্বদেশী মেলা উপলক্ষে ছুটীর পর তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে, তাহাও তিনি জানিতেন। তিনিও উদ্যোক্তাদিগের অন্যতম। বিশেষতঃ অনিলচন্দ্র তাঁহার উপর এ বিষয়ে বিশেষরূপে নির্ভর করে বলিয়া অন্ততঃ মাসখানেক ধরিয়া দেশ ভ্রমণের দ্বারা মনের ও শরীরের গ্লানি দূর করিয়া আসিতে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন।

কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ দর্শন করিয়া বীরেশবাবু মথুরা ও বৃন্দাবনে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। সেখানকার দর্শনীয় যাবতীয় স্থান দর্শন করিয়া ভক্ত বীরেশবাবু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত, তাই ভক্তজন-পূজিত রাধামাধবের লীলাভূমিতে কয় দিন

যাপনের পর স্থির করিলেন, কিছু বেশী দিন আগ্রায় থাকিয়া মোগল-সম্রাটগণের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করিবেন।

সম্রাট সাজাহানের গৌরব-স্তম্ভ তাজ দেখিবার আগ্রহ গৌরীর চিত্তকে সমধিক অভিভূত করিয়াছিল। বীরেশ-বাবুও পূর্ব্বে কখনও পৃথিবীর এই অন্যতম আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়া ধন্য হন নাই— অথচ ইহার সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পর্য্যটকগণের কত বর্ণনাই না তিনি পাঠ করিয়াছেন।

ভদ্র বাঙ্গালীর বাসের উপযোগী হোটেলের অভাব আগ্রা সহরে নাই। বীরেশবাবু পরিবার সহ বাস করিবার উপযোগী এইরূপ একটি হোটেলের একাংশ ভাড়া করিলেন। পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যটিকে তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সহর ভ্রমণে বাহির হইলে ভৃত্যটি বাসায় প্রহরীর কার্য্য করিত।

আগ্রায় আসিবার পর প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি কয়দিন ধরিয়া তাঁহারা সম্রাট আকবর প্রভৃতির সমাধি-ভবন দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। স্থাপত্য-শিল্পের এমন চমৎকার নিদর্শন দেখিয়া সকলেরই চিত্ত অভিভূত হইল। আগ্রা সহরে কোনও উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর নিকট তিনি পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের চেষ্টায় আগ্রা দুর্গ দেখিবার ছাড়পত্রও তাঁহার পক্ষে সংগ্রহ করা দুর্লভ হইল না।

দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৌরী মন্ত্রমুগ্ধবৎ বলিল, "বাবা, এ যে একটা প্রকাণ্ড সহরের মতই বড়।"

পিতা বলিলেন, "তাই ত দেখ্‌ছি।"

মর্ম্মরপ্রস্তর রচিত দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস দেখিয়া গৌরী বলিল, "সম্রাটের দরবার এখানেই বস্‌ত, বাবা?"

"হ্যাঁ, মা।"

"কি চমৎকার শিল্পকাজ!"

বীরেশবাবু আনমনে বলিলেন, "তবু এখন ত কিছুই নেই। শুনেছি দামী পাথরগুলো সব খুলে নিয়ে গিয়েছে।"

ক্রমে তাঁহারা সম্রাট সাজাহান যেখানে বসিয়া প্রত্যহ তাজের শোভা দেখিতেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মোগল সম্রাটগণের আধিপত্যের যুগে দুর্গ-প্রাসাদে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বিভূতি ছিল, এখন তাহা অন্তর্হিত হইলেও, অতীত গৌরবের স্মৃতি দর্শকগণের মনকে বিস্ময়রসে পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

শিশমহলের কারুকার্য্য, সাজাহানের কারাকক্ষ প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহারা সেদিনের মত বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

পরদিবস দিবাভাগে তাজের সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গৌরী বলিল, "বাবা শুনেছি, রাত্রিতে তাজের সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত রূপ ধারণ করে। জ্যোৎস্না রাতে একদিন তাজ না দেখে আমি কিন্তু আগ্রা ছাড়তে রাজি নই।"

বীরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে। পূর্ণিমার রাত্রিতে আসা যাবে।"

গৌরী চলিতে চলিতে বলিল, "সে ত এখন দেরী আছে, বাবা। এর মধ্যে ফতেপুর সিক্রি দেখে এলে হয় না?"

গাইডকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, ফতেপুর সিক্রিতে আকবর সাহের লালপাথর নির্ম্মিত কেল্লা আছে। আগ্রার দুর্গ সেই আদর্শে নির্ম্মিত। তাঁহারা ইচ্ছা করলে যাইতে পারেন। দেখিয়া তৃপ্তিলাভ অসম্ভব নহে।

পর দিবস সকাল সকাল আহার সারিয়া বীরেশবাবু সপরিবারে রেলে চড়িয়া ফতেপুর সিক্রি ষ্টেশনে নামিলেন। ক্ষুদ্র ষ্টেশন, যাত্রীর সংখ্যাও অধিক নহে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যালোকে তাঁহারা প্রথমতঃ সেলিমচিস্তি দেখিতে গেলেন। যে ফকীরের দৌলতে আকবর পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত সেই সমাধিক্ষেত্রে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। এই ফকিরের নামানুসারেই জাহাঙ্গীরের ডাক-নাম সেলিম হইয়াছিল। বন্ধ্যারা এখনও জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে, ফকিরের সমাধিক্ষেত্রে নানাবিধ স্মারক দ্রব্য ঝুলাইয়া রাখে।

গৌরী ইতিহাসে এ সকল কথা পড়িয়াছিল। তাহার অন্তর যে কোনও পবিত্র স্থানে আসিলেই ভক্তিতে নত হইয়া পড়িত। সে পরলোকগত মহাপুরুষের উদ্দেশে নমস্কার জানাইল।

পল্লীর শ্যামাঞ্চলে প্রতিপালিতা গৌরী পূর্ব্বে কখনও দেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, বাধাবন্ধহীন উদার আকাশ-তলে এমন করিয়া বাহির হয় নাই। প্রথম প্রথম যে সহজাত কুণ্ঠা তাহাকে পশ্চাতে আকর্ষণ করিত, মুক্ত বাতাসে, নানা দেশের আবহাওয়ায় কয় দিনের মধ্যে সে জড়তা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। এখন সে সকল

ক্ষেত্রেই পুরোবর্ত্তিনী হইত। মাতা হৈমবতী সময়ে সময়ে তাহাকে বাধা দিতে গেলে বীরেশবাবু বলিয়া উঠিতেন "থাক না, ওতে দোষ নেই ত। একটু সাহস হোক্‌। বাঙ্গালার মেয়েরা কি চেলির পুঁটুলী হয়েই চিরদিন থাক্‌বে, না সেটা বাঞ্ছনীয় ?"

হৈমবতী আর আপত্তি করিতেন না।

আজও সে সর্ব্বাগ্রে উচ্চ ভূমি অতিক্রম করিয়া পরিত্যক্ত বিরাট দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। এক সময়ে সশস্ত্র দ্বারী প্রবেশ পথে দাঁড়াইয়া থাকিত,—সাধারণ ত দূরের কথা, পরিচিত ব্যক্তিকেও সন্তর্পণে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইত।

কথাটা গৌরীর মনে হইতেই সে দাঁড়াইয়া পড়িল। গাইড্‌ সহ পিতা ও মাতা অল্পক্ষণ মধ্যে তথায় আসিলেন।

গাইড্‌ দেখাইয়া দিল, এইখানে বীরবলের প্রাসাদ। অদূরে সম্রাট-মহিষীর মহল। এইরূপ নানা স্থান দেখিতে দেখিতে সোপান-শ্রেণী বাহিয়া সকলে দুর্গের সমুচ্চ স্থানে উপনীত হইলেন।

ভারত-সম্রাট যে সকল কক্ষে বাস করিতেন, তাহার সম্মুখে কৃত্রিম পুষ্করিণী। একদিন এইখানে সুগন্ধি শীতল জলে সম্রাট-মহিষী ও পুরকামিনীরা লীলাভরে জলক্রীড়া করিতেন। তাঁহার প্রহরিণীরা তখন ভীষণ আয়ুধে সজ্জিত হইয়া চারি দিকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তখন মণিমাণিক্য-খচিত আলোকিত কক্ষগুলির মধ্যে নৃত্য ও সঙ্গীতের যে তরঙ্গোচ্ছ্বাস উত্থিত হইত, এখনও কি তাহার রেশ গগনে-পবনে অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে না!

স্নিগ্ধ বাতাস শরীর জুড়াইয়া দিয়া বহিয়া গেল।

গৌরী মুগ্ধচিত্তে ষোড়শ খৃষ্টাব্দের সেই অদৃশ্য চিত্রের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে করিতে একটি প্রস্তরাসনের উপর বসিয়া পড়িল।

সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর। একদিন এই প্রান্তরে সংগ্রাম সিংহ ও বাবরের মধ্যে বল-পরীক্ষা হইয়াছিল। ফতেপুর সিক্রির রণক্ষেত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া নাই কি?

অস্তগামী সূর্য্য প্রান্তর-পারে অদৃশ্য হইতেছিল। গৌরী অনিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেকটি বিষয় পিতার নিকট সে যত্ন করিয়া শিখিয়াছিল। অধীত বিষয়গুলি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মানসিংহ, প্রতাপসিংহ, আকবর, বীরবল যোধাবাই, নৌরোজা—হিন্দুর ব্যক্তিগত বীরত্ব অথবা দুর্ব্বলতা, মোগল জাতির পরাক্রম, রাজনীতিক প্রতিভার বিকাশ ও অবসান।

অঙ্ক ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত পিতার কাছে ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং অধঃপতনের ক্রম-বিকাশের অতীত কাহিনী সে যত্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গশিরে বসিয়া, নির্জ্জন অপরাহ্নে তাহার নারীহৃদয় ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, অদূরে তাহার জননী বসিয়া পাণের কৌটা খুলিয়া পাণ চর্ব্বণ করিতেছেন, পিতা নির্ব্বাক ভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। গাইড্‌ আরও কিছুদূরে দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে।

কন্যার পদশব্দে পিতা ফিরিয়া চাহিলেন। ম্লান সন্ধ্যালোকে দেখিলেন, তাঁহার গৌরী-মার নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া কন্যার পার্শ্বে আসিলেন।

গৌরী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বাবা, চল নেমে যাই—ভাল লাগ্‌ছে না।"

বোধ হয় একই চিন্তা পিতা ও পুত্রীকে অভিভূত করিয়াছিল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "তাই চল, মা।"

গাইডের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনটি প্রাণী নির্ব্বাক ভাবে দুর্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। আকাশ-পথে তখন দ্বাদশীর চাঁদ দেখা যাইতেছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরিপূর্ণ চন্দ্রের কিরণ ধারায় রজনী অবগাহন করিতেছিল।

উদ্যান-তোরণের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া টঙ্গাওয়ালা বিনীত কণ্ঠে বলিল, "এখানে কতক্ষণ থাক্‌বেন, বাবু?"

ভাঙ্গা উর্দ্দুতে বীরেশ বাবু জানাইলেন, অন্ততঃ ঘণ্টা দুই তাঁহারা ত থাকিবেনই। কিছু বেশীও হইতে পারে। আগ্রায় আসিবার পর কয়দিন ধরিয়া এই টঙ্গাওয়ালা প্রত্যহ তাঁহাদিগকে বহন করিয়া দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাইয়া আসিতেছিল।

সেলাম করিয়া সে জানাইল, দুই ঘণ্টা পরে আসিয়া

সে তাঁহাদিগকে বাসায় লইয়া যাইবে। রাত্রির ভোজন ব্যাপারটা সে ইতিমধ্যে শেষ করিয়া আসিতে চাহে। যদি দুই দশ মিনিট বিলম্ব হয়, তাঁহাদের কোন চিন্তার কারণ নাই। বিপদের কোন প্রকার আশঙ্কা এখানে নাই। বাঙ্গালী বাবুরা, বিদেশী সাহেবরাও জ্যোৎস্নারাত্রিতে এখানে প্রায়ই বেড়াইতে আসেন। তবে এ বৎসর তেমন ভিড় নাই। যাহাই হউক, বাবুজী যেন চিন্তিত না হন, তাহার বাড়ী বেশী দূরে নহে। এই অঞ্চলেরই সে লোক। যথাসময়ে সে আসিবে।

অর্দ্ধচন্দ্রাকারে যমুনা তাজের পাদদেশ ধৌত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। জলতরঙ্গে জ্যোৎস্নাতরঙ্গ মিশিতেছিল। কালো জলে সে হিরণ্যদ্যুতি যেন শ্যাম-হৃদয়ে রাধার রূপ-জ্যোৎস্নার বিচিত্র বিকাশ!

মুগ্ধ হইয়া গৌরী কয়েক মুহূর্ত্ত সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিল। তার পর কৌমুদীস্নাত তাজের শুভ্র মূর্ত্তির দিকে চাহিতেই সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। এ কি বিচিত্র রূপ! শত শত কবি চন্দ্রালোকে তাজের যে বর্ণনা করিয়াছেন, এ সৌন্দর্য্য—এ বিচিত্র রূপ কি কাহারও লেখনীতে যথার্থ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

সাজাহানের জীবনব্যাপী প্রেমের স্বপ্নের এই মূর্ত্ত বিগ্রহটির তুলনা কোথায়?

অভিভূতভাবে তরুণী সেইখানে বসিয়া পড়িল। শিল্পী মানব ইহা গড়িয়াছে, সাম্রাজ্যের অতুল অর্থ বৈভব ইহার দেহের সৌন্দর্য্য-বিধানের উপকরণ অক্লান্ত ভাবে যোগাইয়াছে; কিন্তু মানবের শাশ্বত প্রেম ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না করিলে, অনন্তযৌবনা তাজ যুগে যুগে নর-নারীর মনে এমন ভাবে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরসের তরঙ্গ তুলিতে পারিত কি?

এমন অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে জীবন সার্থক করিবার জন্য আজ দর্শকের ভিড় না থাকায় নিস্তব্ধ রজনীর মৌন স্তুতি যেন অম্বরপথে বিনা বাধায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল।

হৈমবতী স্বামীর সহিত বিমুগ্ধ ভাবে উর্দ্ধনেত্রে তাজের উন্নত দেহের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। মনুষ্যের উচ্চারিত ভাষা পাছে এই গম্ভীর সৌন্দর্য্যের ধ্যান ভঙ্গ করে, এ জন্য কেহই কোন কথা কহিলেন না।

এমন সময় দূরে সুবৃহৎ চত্বরের কোনও অদৃশ্য প্রান্ত হইতে মৃদু বংশীধ্বনি বাজিয়া উঠিল। অতি ধীরে প্রকৃতির মৌন স্তুতির তালে তালে বাঁশী যেন লীলায়িত শব্দতরঙ্গে মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রকৃতির ভাষাহীন অশরীরী বন্দনার ছন্দে ছন্দে মানুষের ফুৎকারে প্রাণহীন বাঁশীর দেহরন্ধ্র হইতে যে বিচিত্র বন্দনাগীতি বাতাসে ভর করিয়া শূন্য পথে যাত্রা করিতেছিল, তাহার মাদকতা হৈমবতী, বীরেশচন্দ্র ও গৌরীর হৃদয়তন্ত্রীকে বিমূঢ় করিয়া ফেলিল।

দণ্ডের পর দণ্ড এমনই ভাবে যেন মুহূর্ত্তের ন্যায় সরিয়া গেল। বাঁশীর ঝঙ্কার যমুনার কলোচ্ছ্বাস, মৃদু বাতাসে বৃক্ষের সর্ সর্ শব্দ যে ঐক্যতান রচনা করিতেছিল, তাহার মাধুর্য্য শুধু উপভোগ্য,—বর্ণনীয় নহে।

কথাটা গৌরীর মনে সমুদিত হইবামাত্র সে একবার পিতামাতার দিকে চাহিয়া দেখিল। না, তাঁহারাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছেন,—শুধু একা সেই অভিভূত হয় নাই।

বাঁশীর ঝঙ্কার ক্রমশঃ থামিয়া গেল।

বীরেশ বাবু ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহারা প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছেন।

না, আর রাত্রি করা সঙ্গত নহে। টঙ্গাওয়ালা এতক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন বাসায় ফিরিয়া যাওয়াই উচিত।

"গৌরী মা, চল এখন ফিরি।"

অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৌরী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "যেতে ইচ্ছে করে না, বাবা। এ দৃশ্য দেখে তৃপ্তির শেষ নেই।"

হৈমবতী বলিলেন, "সে কথা সত্যি; কিন্তু আর রাত করা উচিত নয়। দশটা বেজে গেল প্রায়।"

তাজের চত্বর হইতে নামিয়া একটু অগ্রসর হইতেই বীরেশবাবু দেখিলেন, অদূরে দুইজন লোক মন্থর গতিতে তাঁহাদের অগ্রে চলিয়াছে। তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোনও দর্শকের অস্তিত্ব এতক্ষণ তাঁহাদের দৃষ্টির গোচর ছিল না। ইহারাও কি এতক্ষণ তাজের অনবদ্য মহিমায় অভিভূত হইয়া বসিয়া ছিল?

দীর্ঘাকার লোক দুইটি ক্রমশঃ দ্রুত চলিয়া তাদের প্রবেশ তোরণ উত্তীর্ণ হইল। তাহার পরেই বৃক্ষবীথির অন্ধকারে আর তাহাদিগকে দেখা গেল না।

বীরেশচন্দ্র কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "একটু তাড়াতাড়ি এস ; বড় রাত হয়ে গেছে।"

তোরণ পার হইয়া আর কিছুদূর গেলেই গাড়ী পাওয়া যাইবে। বীরেশবাবু দ্রুত চলিতে চলিতে একবার সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন—গাড়ী আসিয়াছে কি ?

ভাল বুঝা গেল না, নির্দ্দিষ্ট স্থান শূন্য বলিয়াই মনে হইল।

"বাবা !"—গৌরীর শঙ্কিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইতেই চন্দ্রালোকে তিনি দেখিলেন, ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষবীথীর অন্তরাল হইতে পূর্ব্বদৃষ্ট দুইটি মূর্ত্তি তাঁহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

দৃঢ়হস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া বীরেশবাবু ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলেন, "কে তোমরা ?"

সে কথার উত্তর না দিয়া একজন বলিয়া উঠিল, "তোফা ! বহুৎ বড়িয়া চিজ, দোস্ত !"

কন্যাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া বীরেশবাবু যষ্টি উদ্যত করিয়া বলিলেন, "হঠ্ যাও, বদমাস্ !"

অপর ব্যক্তি বাহু বিস্তৃত করিয়া ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে বলিল, "পাকড়ো, ছোড়ো মৎ !"

উভয়ের মুখ হইতেই সুরার উৎকট গন্ধ বাহির হইতেছিল।

হৈমবতীর কণ্ঠদেশ হইতে উত্থিত চীৎকার বাহির হইতে চাহিল না। গৌরীর আনন মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। বীরেশবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "পাজি, বদমাস্ !"

কিন্তু তাঁহার উদ্যত যষ্টি কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই—সম্মুখের জোয়ান লোকটা তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং প্রবল আকর্ষণে কাড়িয়া লইতেই টাল সামলাইতে না পারিয়া তিনি হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন।

শঙ্কিতা, বেপথুমতী নারীযুগল বীরেশ বাবুকে তুলিতে যাইবে, এমন সময় হৈমবতীকে সরাইয়া দিয়া জোয়ান লোকটা গৌরীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "মেরি —বাপ্—" সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া লোকটা তিন চারি হাত দূরে পড়িয়া গেল।

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিতেই গৌরী দেখিতে পাইল, খাকার এক যুবা দ্বিতীয় ব্যক্তির কণ্ঠদেশ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া নিপীড়িত করিতে করিতে বলিতেছে, "কুত্তাকা বাচ্ছা, নারীর প্রতি অত্যাচার !"

তার পর ভীম পদাঘাতে তাহার শিথিল-প্রায় দেহকে ভূতল শায়িত করিয়া যুবক স্নিগ্ধ কণ্ঠে হৈমবতীকে বলিল, "ভয় নেই মা, আপনারা আসুন।"

প্রথম জোয়ানটা ততক্ষণ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যষ্টি উদ্যত করিতেই যুবক ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইল। তার পর তাহার মুখমণ্ডলে উপর্য্যুপরি কয়েকটি প্রচণ্ড ঘুষি মারিতেই লোকটা নির্জ্জীবের মত মাটীতে পড়িয়া গেল।

বীরেশবাবু কম্পিত দেহে তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

যুবক বলিল, "আপনারা শীঘ্র এগিয়ে চলুন, আমি পেছনে আছি। আপনাদের কোন ভয় নেই।"

স্ত্রী ও কন্যার হাত ধরিয়া বীরেশবাবু বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবকও মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বীরেশচন্দ্র টঙ্গা দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিমূঢ়ভাবে ইতস্ততঃ দেখিতেছেন, এমন সময় যুবক বলিল, "আপনাদের সঙ্গে গাড়ী ছিল না ?"

তখনও বীরেশ বাবুর হৃদ্‌স্পন্দন থামে নাই। তিনি স্খলিতকণ্ঠে বলিলেন, "লোকটা গাড়ী নিয়ে আস্‌বে বলেছিল ; কিন্তু তাকে ত দেখ্‌ছি না।"

"আচ্ছা, আমার সঙ্গে মোটর আছে। চলুন আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে অগ্রসর হইল। অদূরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একখানি মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। সে উহার দ্বার খুলিয়া বিনম্র কণ্ঠে বলিল, "আপনারা উঠুন।"

হৈমবতী ও গৌরী অগ্রে উঠিলে, বীরেশবাবু ভিতরে গিয়া বসিলেন।

যুবক ক্ষিপ্রহস্তে সম্মুখের আসনের দ্বার খুলিয়া বাম পকেট হইতে চাবি লইয়া যন্ত্রে পাক্ দিল। কল টিপিতেই আলো জ্বলিয়া উঠিল। ষ্টিয়ারীং চাকায় হাত রাখিয়া সে দক্ষিণ হস্ত পাঞ্জাবীর পকেটে রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "যাঃ !"

বীরেশ বলিলেন, "কি হল ?"

স্মিতকণ্ঠে যুবক বলিল, "ও কিছু না—বাঁশীটা ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় পড়ে গেছে দেখ্‌ছি।"

গৌরী পিতার মুখের দিকে চাহিল। বীরেশ বাবু বুঝিলেন যে, এই যুবকই তাজের সন্নিধানে বসিয়া বাঁশীতে উহার বন্দনা গীতি ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল।

গাড়ীর মধ্য হইতে একটা মোটা বংশযষ্টি বাহির করিয়া যুবক বলিল, "আপনাদের একটু দেরী হবে—দু' মিনিট। আমি বাঁশীটা খুঁজে নিয়ে আসি। ওটা আমার বড় সখের জিনিষ।"

হৈমবতী লজ্জা ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, বাবা। তুমি আর যেও না।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "কোন ভয় নেই, মা। ও রকম দু' পাঁচ জনকে আমি গ্রাহ্য করি না। এ গাছা হাতে থাক্‌লে অমন দশ জন লোক আমার কাছে এগুতে সাহস্ করবে না, মা। আমি এলাম বলে।"

বীরেশ বলিলেন, "আপনার সখের জিনিষ! কিন্তু না গেলেই ভাল হত।"

দ্রুতপদে চলিতে চলিতে যুবক বলিল, "কোন চিন্তা করবেন না।"

দুই মিনিটের মধ্যেই যুবক বাঁশী হস্তে ফিরিয়া আসিল। তার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, "লোক দু'টোকে দেখ্‌লাম না। বোধ হয় ওদিকের পাঁচিল টপ্‌কে সরে পড়েছে। ভয় ত আছে। একটু আগেই পুলিস থানা।"

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া যুবক উঠিয়া বসিল। তার পর বলিল, "আপনাদের বাসার ঠিকানা?"

শুনিয়া লইয়া যুবক নক্ষত্র বেগে গাড়ী চালাইল।

গাড়ীর মধ্যে সকলেই নিস্তব্ধ। আজিকার এই অভিজ্ঞতা সামান্য নহে। সকলেই নীরবে বর্ত্তমানে অতিক্রান্ত ভীষণ বিপদের কথা স্মরণ করিয়া অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী নির্দ্দিষ্ট হোটেলের সম্মুখে আসিয়া থামিল। যুবক এতক্ষণ একবারও ফিরিয়া কোন দিকে তাকায় নাই।

প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া পুরাতন ভৃত্য হরিচরণ বাহিরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মোটর থামিতেই সে ছুটিয়া আসিল।

কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া বীরেশবাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। ইজ্জত ও প্রাণ রক্ষকের নাম এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিবার মত মনের অবস্থাও তাঁহার ছিল না। যুবক তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া মোটর ঘুরাইয়া লইতেই বীরেশবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমাদের ইজ্জৎ, সম্ভ্রম-রক্ষাকারীর নামটা—"

বাধা দিয়া যুবক বলিল, "কোন প্রয়োজন নেই। মানুষের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য করতে পেরেছি এই যথেষ্ট। নাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা আদায়ের পন্থাটা আমার ভাল লাগে না।"

যুবক চাকার হাতল ঘুরাইল।

বীরেশ বাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তবু আমাদের তরফ থেকে—"

যুবক গলা বাড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "জীবনে আর হয় ত আমাদের কখনও দেখাই হবে না। কাল ভোরেই দিল্লির পথে চল্‌ব। শুধু আমার নমস্কার নিয়ে আমায় মুক্তি দিন।"

গাড়ী দ্রুত রাজপথে চলিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পথের বাঁকে তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল।

বীরেশ বাবু স্তব্ধ ভাবে তখনও পথের উপর দাঁড়াইয়া। হোটেলের ফটকের ধারে হৈমবতী ও গৌরী স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া ছিল।

বীরেশবাবু বলিলেন "আশ্চর্য্য ছেলে।"

হৈমবতী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি বাছা আমার দীর্ঘজীবী হয়ে এম্‌নি করে দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে থাকুক।"

বীরেশবাবু বলিলেন, "ধন্য শক্তি! ধন্য সাহস!"

গৌরী নতমুখে মাতার অনুসরণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। (ক্রমশঃ)

পেশাওয়ার ও খাইবর পথ

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

মানুষের জীবন নাকি নদীর মত; সে উদ্দেশ্যহীন অথচ লক্ষ্যহীন নয়। নদীর মত জীবনও হয় ত আপনাকে সৃষ্টি করে' আপন পরিণতির দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছোটে। নদীতে যেমন আবর্ত্ত, জীবনে তেমনি ঘটনা। এই ঘটনাই মানুষের বিস্ময়, মানুষের বেদনা, মানুষের সুখস্মৃতি। এই আবর্ত্তগুলিই জীবনের নাটক ও গল্প। মানুষের মন চিরদিন ধরে' এই নাটক ও গল্পগুলির চারিপাশে ভ্রমরের মত গুঞ্জরণ করতে থাকে।

নদীর প্রবাহটি যেমন আপন প্রাণের মধ্যে একটি বিশেষ আবর্ত্তকে বারম্বার স্মরণ করে' চলে, আমিও তেমনি ১৯২৮ সালের ১৭ই নভেম্বরের রাতটিকে ভুলতে পারিনে। সে একটি কৃষ্ণকায়া জনবিরল যন্ত্রণাদায়ক শীতরাত্রি,—ভয়ার্ত্ত ও আড়ষ্ট। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পেশাওয়ারের পথে শেষ প্যাসেঞ্জার ট্রেণে চলেছি,—গাড়ীর গতি মৃদুমন্থর, তার কারণ ভোরের আগে কোনো ট্রেণের পেশাওয়ারে পৌঁছুবার হুকুম নেই,—অন্ধকারের আবরণে লুণ্ঠন ও হত্যার ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা।

মধ্যরাত্রি। কিছুক্ষণ আগে তক্ষশীলা পার হয়ে গেছে। আমার সঙ্গী কেউ নেই,—তার মানে এমন নয় যে, আমি সাহসী,—সঙ্গীর অভাবেই আমি একা। ট্রেণের দুই পাশে ঘনবৃক্ষসঙ্কুল অরণ্য, কিম্বা সুবিস্তৃত প্রান্তর অথবা সীমাহীন সাগর, সে সব কিছুই বোঝবার উপায় নেই, অন্ধকারে সমস্তই নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে অন্ধকারের পারে আকাশ নেই, সৃষ্টি নেই,—তার ওপর নেমেছে হিমকুহেলিকা! মনে হয় লক্ষ লক্ষ অন্ধ-দানবী আপন আপন পক্ষ বিস্তার করে' পৃথিবীর বুকের পরে বসে' নিশ্বাস রোধ করেছে।

গাড়ী থামে না, অথচ অতি ধীরে ধীরে এমন এক রাজ্যের দিকে চলে যা সম্পূর্ণ রহস্যময় ও ভয়সঙ্কুল, তবে সে অত্যন্ত যন্ত্রণাময়। সে কেবলই হাতুড়ে চল্‌ছে আবরণের পর আবরণ সরিয়ে অন্ধকারের অন্দর-মহলে। বেগ নেই, বিচ্ছেদ নেই—শুধু অনির্দ্দিষ্ট গতি। এদিকে কঠিন ঠাণ্ডায় হাতের ঘড়ি ও নিশ্বাস দুই বন্ধ হয়ে গেছে। আমার এ ভ্রমণ সৌখীন নয়, বিষয়কর্ম্মোপলক্ষ্যে নয়, দুঃসাহসের বদ্‌খেয়ালে নয়—এ শুধু দুর্গম পথের আকর্ষণ! আমি ভীরু, তাই আমার এই দুঃসাহসিক পত্রযাত্রার পরীক্ষা; আমি অলস, তাই আমার এই অশ্রান্ত গতিবেগের আকর্ষণ। যাই হোক, গাড়ীতে একা নই, পাশাপাশি বেঞ্চিতে আপাদমস্তক আবৃত দুটি বিরাট দেহ,—তারা নর কি নারী জান্‌বার উপায় নেই। পরম্পরায় অবগত আছি, এ-পথে গাড়ীর মধ্যে মারামারি হ'লে, খুন-জখম হ'লে অথবা চুরি-ডাকাতি হ'লে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ গ্রাহ্য করেন না। এ-দেশ নাকি আত্মরক্ষার দেশ, যথেচ্ছ আচার এবং অবাধ গতিবিধির স্বাধীন এলাকা। সিংহ-বিবরের মুখে শশকের মত ভীত দৃষ্টিতে তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়ল, গাড়ীর মধ্যে 'এলার্ম্ সিগ্‌নাল্' নেই। ভয়ার্ত্ত ভয়ে একবার আপন হৃদ্‌পিণ্ডকে অনুভব করলাম! দম আট্‌কাবে নাকি? গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়বো? এই দুটি নিদ্রিত ব্যক্তি হঠাৎ উঠে যদি টুঁটি টিপে ধরে? অসহায় বাঙালীটির গলার ভিতর থেকে সে রাত্রে হঠাৎ কান্না উঠে আসতে লাগ্‌ল।

সমস্ত রাত এমনি করে' কাট্‌ল। পেশাওয়ার ষ্টেশনে যখন নামলাম তখনো চারিদিকে অন্ধকার। জানা গেল সকাল ছ'টা বাজে। শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর চিম্‌নীর ধোঁয়ার মত হিম,—এক জায়গায় স্থির হয়ে সত্যিই দাঁড়াবার উপায় নেই। কিন্তু হঠাৎ এই অজানা অপরিচিত জায়গায় যে এতগুলি বন্ধু জুটবে তা আগে জানা ছিল না। গত রাত্রির ভয় তখনো সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল, গা-ঝাড়া দিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে একবার মাতব্বরের মত পায়চারি সুরু করলাম। দু' তিনটি হোমরা-চোমরা পাঠান্ এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি চা খাবো কি না, পথে হয় ত কষ্ট পেয়েছি, কোথায় যেতে চাই, কোন্ ঠিকানায়, গাড়ীর

বন্দোবস্ত করে' দেবে কি না,—সমস্তটাই যেন তোষামোদের সুর। একজন বলেই ফেল্লো, আমার অলক্ষ্যে এবং অজ্ঞাতে তারা তিন চার জন সমস্ত পথ গাড়ীর আশপাশে আমাকে পাহারা দিতে দিতে এসেছে। এই কাঁচা গোয়েন্দাগুলির সানুগ্রহ প্রস্তাবাবলী সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে' চা খেতে বসলাম। শেষকালে তারা একখানি ছাপা পুলিশ অফিসের 'ফর্ম্' বা'র করল, তা'তে নাম ধাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখে দিলাম। আমি যে রাওয়ালপিণ্ডির সৈন্যদলের লোক তাও জানাতে হ'ল। হেসে কবির কথায় তাদের বল্‌তে ইচ্ছে হ'ল—'অনুগ্রহ করে' এই ক'রো যেন অনুগ্রহ ক'রো না!'

সকাল হ'ল, রোদ উঠ্‌ল। ভয়ানক একটি দুঃস্বপ্নের পর রাজকন্যা যেমন ঘুম থেকে জেগে উঠে সুমুখেই দেখে রাজপুত্র, তেমনি করে' পেলাম সেদিনের সেই সকালটিকে। সুকঠিন দুশ্চর তপস্যা শেষে যেন বরলাভ হ'ল। অন্ধকারের পর এমন দিনের আলো—যেন এক ভীষণা রাক্ষসীর গর্ভ হতে একটি সুন্দর দেবশিশুর জন্ম হয়েছে; আকাশে আকাশে তার প্রভাতী উৎসব, নবসূর্য্যের রক্তরশ্মিতে তার জন্য আশীর্ব্বাদ। আনন্দে চারিদিকে একবার হেসে চাইলাম, নূতন করে' পৃথিবীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি ঘট্‌ল।

ছোট ষ্টেশন্, যতদুর মনে হয় একটি প্ল্যাট্‌ফরম্। এটি ছাউনী-ষ্টেশন, পেশাওয়ার সিটি-ষ্টেশনে নাম্‌লে নাকি কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্ভাবনা থাকে। গোরা-ছাউনীতে নামাই ভালো। ষ্টেশন পার হয়ে এসে দেখা যায় শহরটিও ছোট—গুটিকয়েক দোকান, একটি বাজার, কয়েকখানি টাঙা, দু'-একটি অফিস। মানুষের বসতি আছে কিন্তু সমাজ নেই; দেনা পাওনা আছে কিন্তু শৃঙ্খলা নেই। প্রথমেই মনে হবে সমস্ত শহরটি যেন আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একটি ভয়ের ছায়া--সন্ত্রস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত। মানুষ এখানে বসে' অহরহ যেন হিংস্র নখর শান্ দিচ্ছে। পথে নেমে একখানি টাঙা ভাড়া করে' বাবুমহল্লার দিকে চললাম। বাবুমহল্লায় জনকয়েক বাঙালী থাকেন।

দিকে দিকে সৈন্যদের কুচ্‌কাওয়াজ সুরু হয়েছে, পথের পাশে পাশে পাহারা দিচ্ছে ঘোড়সওয়ার, উট চল্‌ছে মাল-বোঝাই নিয়ে, কোথাও কোথাও বা কাফি-খানায় পাঠানরা বসে' জটলা করছে। ভাঙা-ফুটো কতকগুলি বিচিত্র বাড়ীঘর, জীবন যাত্রা ও গৃহস্থালী অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, স্ত্রী-পুরুষদের অঙ্গসজ্জা অতিরিক্ত অপরিষ্কার। মনে হয় তাদের দেশ আর্য্যভূমি ভারতের সীমান্তে না হয়ে আরব কি আফ্রিকায় হ'লে ভাল হ'ত। দু'ধারে দেখতে দেখতে চলেছি। এ-দেশের সবাই যেন অস্থায়ী বাসিন্দা, সবটাই যেন ধর্ম্মশালা, যে-কোনো মুহূর্ত্তে সকলেই যেন স্থানত্যাগ করে' যেতে পারে—মাটির সঙ্গে যেন কা'রো যোগাযোগ নেই, আত্মীয়তা নেই। কোনো একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝড়ের ফুৎকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতীক্ষা করে' রয়েছে।

বাবুমহল্লা পাওয়া গেল। গাড়ী থেকে নেমে সন্ধান করতে করতে দেখা গেল একখানি জীর্ণ একতালা বাড়ীর ন্যাড়া ছাদে একখানি লালপেড়ে শাড়ী ঝুল্‌ছে। শাড়ীটি যেন দুর বাঙলা দেশের শ্যামশোভা ও কমনীয় মমতার সংবাদ বহন করে' এনেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজায় উঠে কড়া নাড়লাম। একটু পরেই দরজা খুলে একটি ভদ্রলোক দেখা দিলেন। এই অপ্রত্যাশিত বাঙালীটিকে বহুদিন পরে দেখে হঠাৎ অত্যুগ্র আনন্দে মুখ দিয়ে কথা সরল না, শুধু হেসে নমস্কার করলাম। ভদ্রলোক নমস্কার নিলেন বটে, কিন্তু একবার চকিত চোখে আমার আপাদ-মস্তক তাকিয়ে বললেন, আপ্ কাঁহাসে আতে হেঁ?

বললাম, কি বলছেন, আমি যে বাঙালী!

অ্যাঁ? বাঙালী? আমি মনে করেছি বুঝি,—আসুন আসুন, কি আশ্চয্যি, আপনাকে চেনবারই উপায় নেই, ঠিক পাঞ্জাবীর মতন—

মাথার পাগ্‌ড়িটা খুলে রাখলাম। ভদ্রলোক চমৎকার আলাপ সুরু করলেন, যেন বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। খাইবার পাস্ যাবো শুনে তিনি খুসী হলেন। তিনি চাকরী করেন সি-এম্-এস্-এ। তাঁর বড় ভাই পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর, 'পিণ্ডিতেই তাঁর বাস। দেশ ছেড়ে পেটের দায়ে প্রবাসে পড়ে' থাকা অত্যন্ত ঝকমারি—ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পরে ভিতর থেকে চা প্রভৃতি এসে হাজির হ'ল।

আমার পায়জামার নীচে ধুতি পরণে ছিল, পায়জামাটি ছেড়ে এতক্ষণে 'বাঙালী' হলাম। ননীগোপাল বাবু জানালেন, এখনই যাত্রা করলে সন্ধ্যার সময়ে ফেরা সম্ভব

হবে, নৈলে সেখানে রাত্রিবাস করার জায়গাও নেই, নিরাপদও নয়। সুতরাং চা খেয়েই উঠতে হ'ল। তিনি মোটরে উঠিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে চললেন, বেশ জমিয়ে আলাপ করবার আর অবসর পাওয়া গেল না। আমার কম্বল ও পায়জামা তাঁর বাসাতেই রইল, ফেরবার মুখে তাঁর এখানে সান্ধ্যভোজ সেরে নিয়ে যাবো। এই গেল পেশাওয়ার পর্ব্ব।

দু'টাকা ভাড়ায় মোটর বাস-এ উঠলাম। ছোট গাড়ী, মালপত্র সমেত আন্দাজ জনদশেক যাত্রী। দু'জন দেশী গোরা, দুটি পাঠান স্ত্রীলোক, জন চারেক পাঠান ও একটি শীর্ণকায় চঞ্চল মাদ্রাজী যুবক। যুবকটি এসেছে নাকি 'সাইমন্ কমিশনের' সঙ্গে। আজ সাইমন্ সাহেব আসবেন খাইবর গিরিবর্ত্ম ভ্রমণে।

বেলা সাড়ে আটটা আন্দাজ গাড়ী ছাড়ল। পেশাওয়ার সহর পার হয়ে পড়ল বিখ্যাত খাজুড়ীর মাঠ। অসীম অনুর্ব্বর মরুভূমি। লম্বায় চওড়ায় নাকি প্রায় তিনশো মাইল। এ মাঠের সামান্য একটি সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়া আর কিছুই ভারত সরকারের অধীনে নয়। এই বিশাল প্রান্তরের দূর কিনারায় পর্ব্বতের সারি। সকালের সূর্য্যের আলোয় এতদূর থেকেও গলিত বিচিত্র বর্ণের সমারোহ দেখা যাচ্ছিল। আকাশ এবার পরিষ্কার হয়েছে। নীল আকাশের দিকে পর্ব্বতের তুষারকিরীটের আরক্ত শোভা একটি জাগ্রত কবিতার মত চেয়ে রয়েছে। প্রকৃতির নয়নাভিরাম রূপের প্রতি আমাদের দেহের সমস্ত তন্ত্রীগুলি একসঙ্গে পরম তৃপ্তিতে সাড়া দিয়ে ওঠে—প্রাকৃতিক শোভা উপভোগের গোড়ার কথাই এই।

গাড়ী ছুটছে। পাশেই একটি ক্ষুদ্র রেলপথ পেশাওয়ার থেকে এসে খাইবর গিরিপথের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পথের আশে পাশে বন্দুকধারী আফ্রীদীদের দেখা গেল। এই মাঠে তারা অবাধে বিচরণ করে বেড়ায়। এ তাদেরই রাজ্য। আফ্রীদীরা দরিদ্র, অশিক্ষিত ও সভ্যতালেশহীন। আশপাশের দুর্গম পর্ব্বতমালার কোটরে তাদের আবাস, সেখানে তাদের অন্নের সংস্থান নেই, অর্থ নেই, সমাজবিধি নেই। তারা নিষ্ঠুর কিন্তু অসাধু নয়। তারা হাসিমুখে লুণ্ঠন করে—লুণ্ঠন করে শুধু উদরান্ন সংগ্রহের জন্য—এবং অবলীলাক্রমে হত্যা করে ও হত হয়। নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি হ'লে অনায়াসে তারা গুলী ছোড়াছুড়ি করে। পথে-ঘাটে দিনমজুরী ক'রে তারা যা উপার্জ্জন করে তাই দিয়ে তারা কেনে গম ফল বাদাম ও বন্দুক। ভারত সরকার সম্ভবতঃ আপন অর্থব্যয়ে তাদের পঠন পাঠন এবং সভ্যতা বিস্তারের জন্য ও তাদের শান্ত রাখার অভিপ্রায়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিয়েছেন। সেটি খাজুড়ী মাঠের ওপরেই সুবিখ্যাত ইস্‌লামিয়া কলেজ।



স্বাধীন আফ্রীদী

ইংরেজি, উর্দ্দু, ফারসী, আরবী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। সশস্ত্র সৈন্য প্রহরী জামরুদ দুর্গের তত্ত্বাবধানে এই কলেজটির মধ্যে রীতি নীতি ও শাসন বজায় রাখে!

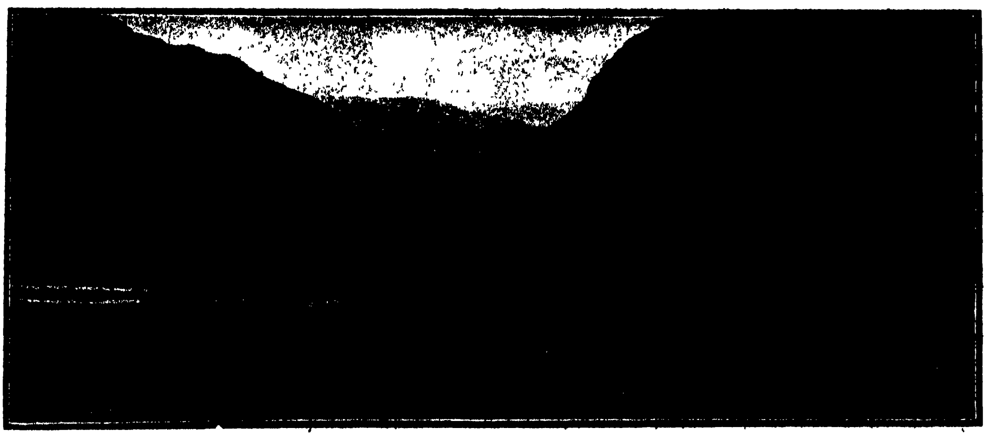
তার পর জামরুদ। পেশাওয়ার থেকে খাইবর-পথের মাঝখানে জামরুদই একটিমাত্র দুর্গ। কেল্লাটি ছোট, ওদেশের পাথর-মিশানো শক্ত মাটীর তৈরী। দুর্গম প্রান্তরের মধ্যে এক শীর্ণ জটাজুটধারী এবং জীর্ণ বল্কল-পরা

সন্ন্যাসী চোখ বুজে যেন ধ্যানে বসে রয়েছে। গাড়ী থাম্‌ল, পথের ওপর নেমে একটুখানি পায়চারি করে' নিলাম। আপেল্ নাশপাতি ও বাদাম এক জায়গায় অতি সস্তা দরে দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে চলেছে। তাদের ভঙ্গী দেখেই মনে হয় তারা স্বাধীন। পেশাওয়ার থেকে লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত খাইবর গিরিপথের ভিতর দিয়ে সম্প্রতি যে বিচিত্র রেলপথ



ইস্‌লামিয়া কলেজ—জামরুদের পথে

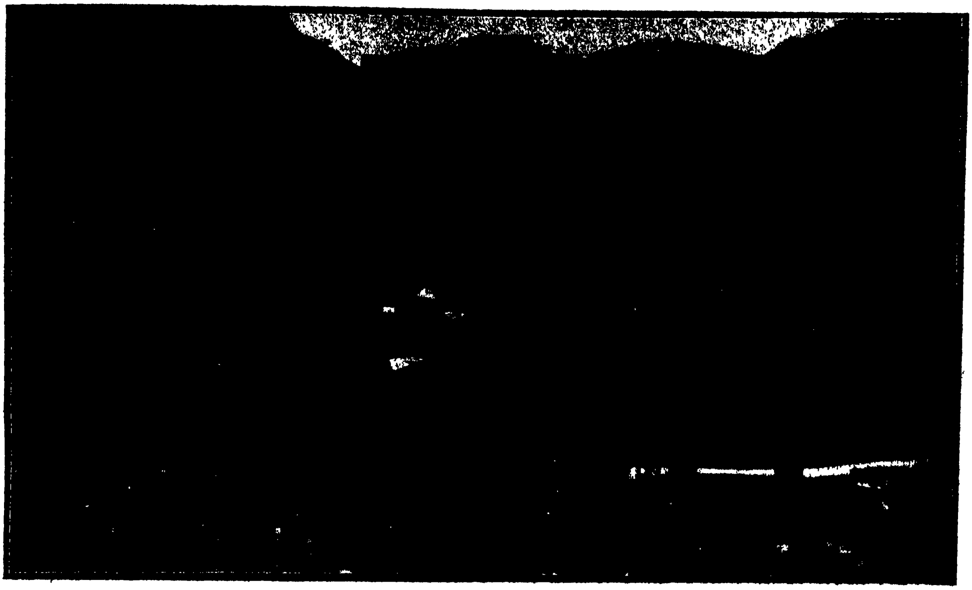
বিক্রি হচ্ছে। সবাই আমরা যেন আফ্রীদীর ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত; বেশ অনুভব করছিলাম পথের যাত্রীরা প্রতি নির্ম্মিত হয়েছে, সেই রেলপথে আফ্রীদীরা অবাধে ভ্রমণ করে' বেড়ায়। ট্রেনের টিকিট করার বদ্ অভ্যাস তাদের



খাইবর গিরিপথের প্রবেশ-দ্বার

মুহূর্ত্তেই লুণ্ঠন ও প্রহারের আশঙ্কা করে' থাকে। পথের প্রান্তে মাঠের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে দু'চারজন আফ্রীদী নিতান্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বৃটিশ-প্রজা আমাদের নেই, টিকিট কেউ তাদের কাছে জোরের সঙ্গে চাইতেও সাহস করে না। প্রতিক্ষণে তাদের হাতে টোটাভরা বন্দুক দেখে কোন্ দুঃসাহসী টিকিট-চেকার তাদের কাছে এগুবে?

ভারত সরকার এদের অত্যন্ত ভয় করে' চলেন—এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। গাড়ী আবার ছাড়ল। জামরুদ পার হয়ে কিছুদূর গিয়ে আমরা বাঁ-দিকে বাঁক নিলাম। গুলির কোলে অসংখ্য ছিদ্রপথ, এই ছিদ্রপথগুলিতে নাকি আফ্রীদীরা পাহাড়ের গোপন স্থানসমূহে যাতায়াত করে। শত্রুর আক্রমণকে এড়াবার নাকি এমন সুবিধা আর নেই।

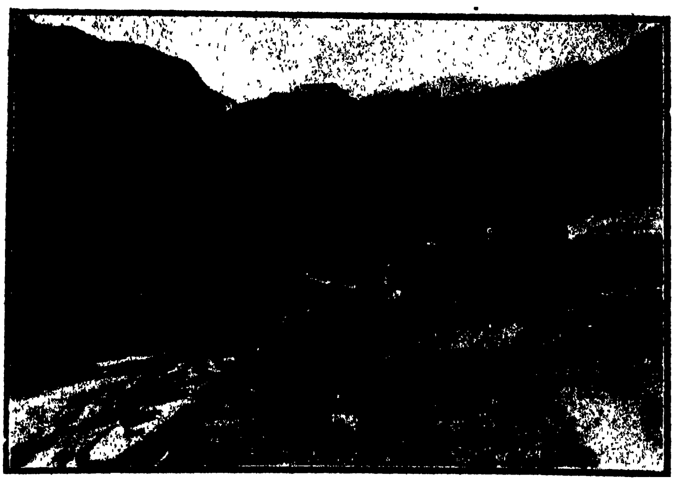


আলী মস্‌জিদ—খাইবর পথ

এই পথ বরাবর গিরিগর্ভের মধ্যে চলে গেছে। ইতিহাস বলে, ভারতের বিপুল ধনভাণ্ডার যুগে যুগে এই সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরে নিরুদ্দেশ হয়েছে! আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল।

কোটি কোটি টাকা খরচ করেও মানুষ যে কাজ করতে সক্ষম হ'ত না, প্রকৃতি সে-কাজ অতি সহজেই সম্পন্ন করে' রেখেছে। দুস্তর এবং দুরতিক্রম্য পর্ব্বত-মালার জটিলতার মধ্যে যে যাত্রীর দল এই সঙ্কীর্ণ সহজ পথটি আবিষ্কার করেছিল, যুগে যুগে তারা শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। দুই পাশের পাহাড়গুলির তাকালে চোখ জ্বালা করে' আসে,— বৃক্ষলেশহীন, গুল্মলতাশূন্য রুক্ষ, অগম্য দুরারোহ। কোথাও তার স্নেহ নেই, ছায়া সৌন্দর্য্যরূপ নেই। আপন দৈন্য ও রিক্ততা নিয়ে শকে সে প্রতিনিয়ত বিদ্রূপ করছে; প্রকৃতির মায়া-কে সে যেন নিঃশেষে লেহন করে' নিয়েছে। পাহাড়-

যে পথে আমরা চলেছি তার দুই পাশে হয় পাহাড়, নয় ত একধারে অনুর্ব্বর খানিকটা মাঠ—মাঠের পারে আবার

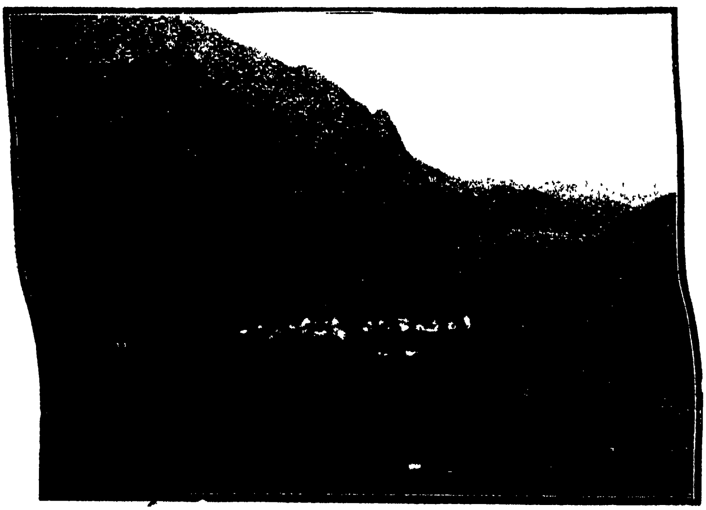


উটের পিঠে চড়ে' যাত্রী ও ব্যবসায়ী খাইবর-পথ অতিক্রম করছে

পাহাড়। এই মাঠ এবং পাহাড় সম্পূর্ণ আফ্রীদীগণের অধীনে। মাঠের মাঝে মাঝে তাদের গ্রাম। গ্রামগুলি প্রাচীর-বেষ্টিত। মাঝখানে একটি করে' গম্বুজ। এই

আর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এ কাজ নাকি আফ্রীদীর। ভয়ে ভয়ে তারের বেড়া পার হয়ে শহরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি বাঙালীর সন্ধান মিল্‌ল। এতদূরে 'দেশোয়ালীকে' পেয়ে পরম তৃপ্তি অনুভব করলাম। কাঙাল যেন পথের ধারে মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছে! মুহূর্ত্তেই গভীর পরিচয় হল। তিনি এখানে সুড়ঙ্গপথ নির্ম্মাণের কাজে এসেছেন। মিঃ ঘোষ বলে' তাঁর এদিকে পরিচয়। আর একটি লোকের সঙ্গেও আলাপ হল, তাঁর নাম মিশিরজি। তাঁর বাড়ী আগ্রা জেলায় সুতরাং বাঙলার প্রতিবেশী বলা চলে। তিনি পরমানন্দে যুদ্ধের গল্প সুরু করলেন।



লাণ্ডিখানা—খাইবর পথ

শীতের শুক্‌নো হাওয়ায় রোদ ভারি মধুর লাগছিল। পরিচয়হীন ও অজ্ঞাতকুলশীল বন্ধুগণের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত গভীরভাবে গল্প চলছিল। রাক্ষসপুরীর মধ্যে রাজকন্যার যেমন অবস্থা, চারিদিকে পর্ব্বতে-প্রান্তরে আফ্রীদীগণের মাঝখানে এই সুন্দর ও মনোরম লাণ্ডি-কোটাল শহরটিরও সেই অবস্থা। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা না থাকায় এ স্থান যেন অঙ্গহীন ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অন্তরে অন্তরে এ যেন শ্রীহীন ও অসহায়। সমাজের জীবন-ধারণের পক্ষে নারীর প্রয়োজন যে কতখানি, এর আগে এমন করে' আর কোথাও অনুভব করিনি। খাইবর পথ অতিক্রম করে' যে বস্তুটি সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করা যায় তা হচ্ছে প্রকৃতির বিদ্রূপ, অনাত্মীয়তা, অপরিমিত কর্কশতা,—যেন একখণ্ড তৃষ্ণার্ত্ত ভূমিখণ্ড সমগ্র পৃথিবীর কারুণ্য ও দাক্ষিণ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে নিরন্তর আকাশের দিকে তাকিয়ে হা হা করছে। দরিদ্র শুধু নয়,—দেউলিয়া!

পথের নীচেই একটি সরাইখানা। এ সরাইখানা জন-সাধারণের জন্য নয়। দূর আফগানিস্থান থেকে যে যাত্রীরা ভারত-অভিমুখে রওনা হয়, এখানে তারা বিশ্রাম করে। বিশ্রাম এবং বিশ্রান্তালাপ। ভিতরে একদল উট, অসংখ্য মুরগী, কোথাও বা আগুন জালিয়ে বাছুর এবং ভেড়া পোড়ানো হচ্ছে, কোথাও কোনো যুবক-যুবতী একান্তে হেসে হেসে গল্প করছে, কোথাও বা প্রকাণ্ড গড়গড়ায় তামাক ও গাঁজা সেজে একদল কাবুলী নরনারীর জটলা বসেছে। সরাইখানার দরজায় সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত। ভারতবাসীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। অন্য দিকে দলে দলে গোরাসৈন্যের কুচ্‌কাওয়াজ চল্‌ছে, কোথাও থেকে থেকে বাঁশী বেজে উঠ্‌ছে—কোনো কোনো তাঁবুর চারিদিকে ছুটো-ছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে' গেছে। সাজসজ্জা, আভাস-ইঙ্গিত, জরুরি আনাগোনা, চুপি চুপি কথা, বন্দুক রাখার ছপাছপ্ শব্দ,—মাথা যেন খারাপ হয়ে যায়। কথায় কথায় লাণ্ডিখানার কথা উঠ্‌ল, লাণ্ডিখানাই ভারতের শেষ সীমা। শোনা গেল কোনো 'বাঙালীর' সেখানে যাওয়া নিষেধ,—কেন, সে কথার উল্লেখের আর প্রয়োজন নেই, এবং বেলা দু'টো নাগাৎ কি উপায়ে লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত গোপনে গিয়েছিলাম, সে কথাও ছাপার হরপে প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। লাণ্ডিখানা এখান থেকে মাত্র চার মাইল দূর। সেখানেও দুর্গ নেই, গুটিকয়েক কেবল তাঁবুর সমষ্টি। রেলপথটি তার ধারে গিয়েই ফুরিয়ে গেছে। ট্রেণ সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করে না, শুধু প্রয়োজনের সময়ে। বৃটিশ সীমাটি আফগান সীমানা থেকে অতি ছেলেমানুষী উপায়ে চিহ্নিত করা। এ যেন মাত্র একটা মৌখিক বোঝাপড়া। আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারত সরকারের সদ্ভাব রাখা যেন একটি ভয়ানক সমস্যা।

আফগানিস্থানের কর্তৃত্ব এদিকে অত্যন্ত প্রবল ও প্রভাবশালী। আফ্রীদীগণ যদি আফগানের সঙ্গে মিতালি করে' ভারতের সীমানাকে আক্রমণ করে তবে ভীষণ বিপদ। সুতরাং আফগানদের সঙ্গে মিতালি করে' আফ্রীদীগণকে সকলের কু-নজরে রাখতেই হবে,—যাক্ সে কথা। ভারত থেকে মালপত্র আনাগোনার সময়ে এই লাণ্ডিখানায় পরীক্ষা করা হয়। একদিকের লোক নামায়, আর একদিকের লোক তুলে নেয়। এখান থেকে কাবুল পর্য্যন্ত যাবার মোটর-পথ আছে। বৃটিশ সীমানার ধারে একখণ্ড কাঠের ওপর লেখা,—'It is absolutely forbidden to cross this border into Afghan territory.'

এইবার শেষের পালা। শীতের সূর্য্য এরই মধ্যে পশ্চিম-পথে পাহাড়ের মাথায় নেমেছে। লাণ্ডিখানা থেকে ফিরে আমরা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই স্যর জন্ সাইমনের মোটর বিদ্যুদ্বেগে এসে ক্যাম্পের ধারে দাঁড়ালো। রাজা এলেন পিছনে পিছনে আরো ছ'খানি মোটর এল। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য তিনবার কামানের শব্দ করা হ'ল, পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটল সে শব্দ,—রাজকীয় অভ্যর্থনার কায়দায় তাঁকে গৌরব-গর্ব্বিত করা হ'ল। সবাই এল ছুটে, আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তারের বেড়ার বাইরে দু'একজন আফ্রীদী দেখে দেখে চলে' যাচ্ছিল। তাঁবুগুলি থেকে সৈন্য ও সিপাহীগণ সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এসে ব্যূহরচনা করে' দাঁড়ালো। সবাই পথে নেমে এসে যোগ দিল এই অভ্যর্থনায়, বাকী আর কেউ রইল না।

অদূরে একটি তাঁবুর দরজায় নজর পড়তেই দেখলাম, একটি তরুণবয়স্ক সুশ্রী ইংরাজ যুবক গলা বাড়িয়ে চুপি চুপি সাইমন্-সমারোহ লক্ষ্য করছে। আয়ত দু'টি চোখ—স্নিগ্ধ সে-চোখ চকিত চঞ্চল, কৌতূহলে ও মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত। অত্যন্ত দ্বিধাজড়িত ত্রস্ত মুখ, সর্ব্বশরীর লুকিয়ে আত্মগোপন করে' কোনো মতে উঁকি মেরে সে সমস্তটা দেখে নিতে চায়। তার এই সুমধুর চৌর্য্যবৃত্তি দেখে হাসতে হাসতে আমার বন্ধুর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলাম। বন্ধুরাও বিজ্ঞের মত হাসি হেসে বললেন, ও এক ভারি মজা, চলুন এবার এগোই।

চিন্তিত মুখে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। ফেরবার সময় ট্রেণে যাবার কথা, তাই ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হলাম। তারের 'পেরিমিটার' পার হলেই লাণ্ডিকোটাল ষ্টেশন্। তরুণ যুবকটির অকারণ কৌতূহল ও আত্মগোপনের অপূর্ব্ব প্রচেষ্টা দেখে আমার যেন তার সকল কথা জানবার ইচ্ছা হচ্ছিল। ধীরে ধীরে বললাম, মজাটা কি শুনি?

সবাই হাসল। হাসির কারণ কিছুই বুঝতে না পেরে তাঁদের মুখের দিকে তাকালাম। মিশিরজি উর্দ্দুতে বললেন, ও পুরুষ নয়!



শেষ সীমানা—খাইবর পথ

পুরুষ নয়? মুহূর্ত্তে চোখের চারিদিকে যেন সব ওলটপালট হয়ে গেল, সমস্ত মনশ্চক্ষের দৃষ্টি ছুটল সেই ছেলেটির শাদা কোটপ্যান্টের দিকে। সে কি তার ছদ্মবেশ? কেন?

মিশিরজি মাতৃভাষায় জানালেন, সে এক প্রেমের কাহিনী, সুন্দর ও করুণ! ও ভারি দুঃখী, তা জানেন? ও লুকিয়ে পুরুষ সেজে এসে একজনের খবর নিয়ে যায়।

আর কিছু জানবার প্রয়োজন ছিল না, শুধু দূর প্রান্তরের দিকে একবার তাকালাম। দিন অবসান হয়ে এসেছে! কি হবে সে কাহিনী শুনে? বাইরের ঘটনা কি অন্তরের গোপন ফল্গুধারার সন্ধান দেবে? থাক্—ও আমি নিভৃত কল্পনায় আবিষ্কার করে' নেবো।

বন্ধুজনের কাছে বিদায় নিলাম। বললাম, আবার দেখা হবে। কোথায়? কবে? গ্রহ-তারকার চক্রান্তে! এই জীবনই শেষ জীবন নয়।

সবাই বিদায়ের হাসি হাসলাম। সে হাসি আমাদের শ্রাবণের প্রভাতের মত। গাড়ী আস্তে আস্তে ছাড়ল। সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব নেই!

অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ,

(৪)

তিন দিনের মধ্যেও জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম হইল না দেখিয়া অণি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। বনবিহারী বাবু যথারীতি প্রত্যহই আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইতেন। তাঁহার চেষ্টার কোনই ত্রুটি ছিল না। এই দুই দিন জ্বরের বেগও একটু কমিয়াছিল, কিন্তু বিকাল হইতে বুকে ব্যথা, ও সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় জ্বর বাড়িয়া উঠিয়াছে। দুশ্চিন্তায় অণির বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এখন আর সহসা বনবিহারী বাবুকে সংবাদ দিবারও কোন উপায় নাই। মোগলসরাইয়ে যাইবার শেষ গাড়ী অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই ক্যান্টনমেণ্ট ছাড়িয়া গিয়াছে। সে স্ত্রীলোক এবং সম্পূর্ণ একাকী, এ অবস্থায় হঠাৎ যদি অসুখ বাড়িয়া উঠে, সে কি করিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছিল। স্থূল-বুদ্ধি শিউকিষণ্‌ ও বয় বিশেষ প্রভুভক্ত হইলেও রোগীর পরিচর্য্যা বিষয়ে অণি তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। বনবিহারীবাবু সকালে আসিয়া যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই প্রকার কোন অবস্থান্তর ঘটিলেও ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, সে কথাও সে তখন জিজ্ঞাসা করিয়া লয় নাই।

রোগীকে সারারাত্রি বিনা-ঔষধে রাখিলে হয় তো অসুখ আরো বাড়িয়া উঠিতে পারে; ইত্যাদি নানা কথা ভাবিয়া, অণি অগত্যা মাড়োয়ারী হাঁসপাতালের ডাক্তার বংশীধরবাবুকে আনিবার জন্য শিউকিষণ্‌ বেয়ারাকে গাড়ী লইয়া যাইতে বলিল।

কূলহীন সাগরের উত্তাল তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইলে মানুষ যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সন্তরণ-ক্লান্ত হাত দুটি দিয়া যে-কোনো আশ্রয়কে আঁকড়িয়া ধরে, অণিও যে সেইরূপ—তাহার জীবনের দুস্তর পাথারে সন্তরণ-অপটু হাত দুটী দিয়া এই উদার বন্ধুর আশ্রয়কেই অবলম্বন করিয়াছিল। সে তো জানিত না যে তাহারই দুর্ভাগ্যের দুঃসহ গুরুভারে এ আশ্রয়ও মজ্জমান হইয়া পড়িবে। হায়! সে যদি জানিত যে তাহার দুর্ভাগ্যের পাপগ্রহ এই আশ্রয়দাতা বন্ধুকেও পীড়ন করিয়া তাঁহার জীবন অমঙ্গলে ভরিয়া দিবে, তাহা হইলে সে তো অঙ্কুরেই এই অমঙ্গলের সংক্রামক বিষে-ভরা মূলকে আপন হাতেই ছিন্ন করিয়া ফেলিত। হিতৈষী বন্ধুর আনন্দময় জীবন-পথে সে তো অশান্তির কণ্টক হইতে চাহে না।

অণির ধারণা হইয়াছিল যে, তাহার সংস্পর্শে আসিয়াই বোধ হয় মেজর অশান্তি ভোগ করিতেছেন। অসুখ হইবার পূর্ব্বেও তো সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে, মেজর পূর্ব্বের মত আর সদাপ্রফুল্ল থাকিতে পারিতেন না। অণি এখানে আসার পর হইতেই যেন তিনি ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার মুখে একটা অশান্তির ম্লান ছায়াও অণি অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে। ইদানীং যেন প্রায় একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাঁহার বুকে জমিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু কেন? অণিকে তো তিনি কোন দিন কোন প্রসঙ্গেই তাঁহার বেদনার আভাস পাইতে দেন না।

নানা খণ্ড চিন্তায় অণির মনটা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। মেজরের সহিত বাস্তবিক কোন সম্বন্ধসূত্র না থাকিলেও, সে তো তাঁহাকে কোন সময়ের জন্যই পর ভাবিতে পারে না। রক্তের সম্পর্কে যাহাদের সহিত আত্মীয়তার দাবী লইয়া সে জন্মিয়াছিল, তাহার বিপন্ন জীবনের আর্ত্ত আহ্বানে সে তো তাহাদের কোন সাড়াই পায় নাই।

বেয়ারা আসিয়া জানাইল—ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন। অণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে উপরে আনিবার জন্য বলিয়া দিল। জ্বরের বেগ যথেষ্ট প্রবল হইলেও মেজর তখনো সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অণিকে অত্যন্ত ব্যস্ত হইতে দেখিয়া তিনি তাঁহার রোগক্লিষ্ট চোখ দুটী তুলিয়া অণির মুখের পানে চাহিলেন। অণি কাছে সরিয়া আসিতেই তাহার হাতখানি কপালের উপর টানিয়া

লইয়া বলিলেন—"বসুন, ব্যস্ত হবার কোনই দরকার নেই ; শিউকিষণ তাঁকে সঙ্গে ক'রে উপরেই নিয়ে আসচে। আমি নিষেধ করেছি কি না, তাই আর ও খবর না দিয়ে কাকেও উপরে নিয়ে আসে না।"

"হাঁ,—না—তার জন্যে তো আমি ব্যস্ত হই নি। তিনি দেখে গেলে অন্ততঃ এখনি একটা ওষুধের ব্যবস্থা হ'বে—তাই।" বলিয়া অণি নতমুখে মেজরের কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। মেজরের যাতনা-ক্লিষ্ট ম্লান মুখের উপরে তৃপ্তির যে শান্ত ভাবটা তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও, অণি যেন তাহাতে একটু সাহস পাইল।

শিউকিষণের সঙ্গে সঙ্গে বংশীধরবাবু ঘরের মধ্যে আসিতেই অণি বিছানা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। মেজরকে সম্মানসূচক অভিবাদন করিয়া বংশীধরবাবু পাশের চেয়ারখানার উপর বসিয়া সযত্নে তাঁহার উত্তাপ, বুক ও শ্বাসপ্রশ্বাস বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মেজর তাঁহার নিজের অসুস্থতা ও রোগ সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিতেছিলেন। ডাক্তারকে রোগ ও উপসর্গ সম্বন্ধে মেজর সংক্ষেপে কয়েকটী কথা জানাইয়া, বুক ও রেস্পিরেশনটা ভালরূপে দেখিবার জন্য বলিয়া দিলেন। বংশীধরবাবু মেজরের নির্দ্দেশ মতই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। রোগ সম্বন্ধে দুই একটা মতামত প্রকাশ করিলেও, মেজর যে বেশ একটা উদাসীনতার সহিত নিজের এই অসুখকে তাচ্ছিল্য করিতেছিলেন, তাহা অণি আগাগোড়াই লক্ষ্য করিতেছিল।

মেজর বামপার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়া নিউমোনিক অ্যাফেক্‌শানের আশঙ্কার কথা জানাইতেই বংশীধরবাবু গভীর মনোযোগের সহিত তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অণি উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করার পর মেজরের কথা সমর্থন করিয়াই বলিলেন—"হাঁ, নিউমোনিয়াই তো মালুম হোতা ; বোথ্ সাইডস্—।"

নিউমোনিয়া! অণির বুকের মধ্যে যেন সমস্ত রক্ত একসঙ্গে তোলপাড় করিয়া উঠিল। নিউমোনিয়াই যে তাহার জীবনের অনেক আসন শূন্য করিয়া দিয়াছে! বিহ্বল হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনে অণির গলা যেন শুকাইয়া আসিতেছিল। অগ্নিদগ্ধ যেরূপ রক্তসন্ধ্যা দেখিয়াই শিহরিয়া উঠে, অণিও সেইরূপ একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল।

বংশীধরবাবু ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বেয়ারার সঙ্গেই নামিয়া গেলেন। অণি তাঁহাকে পুনরায় সকালে আসিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল ; এবং বেয়ারার হাতে ঔষধের ফর্দ্দ ও টাকা দিয়া তাহাকে সত্বর ঔষধ লইয়া ফিরিবার জন্য বলিয়া দিল।

অণির সমস্ত মনটা যেন তখন অবশ হইয়া গিয়াছিল। অতীতের কান্নাভরা স্মৃতি, বর্ত্তমানের ম্লান ছায়া ও ভবিষ্যতের অন্ধকার কল্পনা-বিভীষিকায় তাহার বুকের মধ্যে যেন একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদিন যে সঙ্কোচ তাহাকে টানিয়া দূরে সরাইয়া রাখিত, আজ যেন সে সঙ্কোচের বাঁধন একটা অজ্ঞাত বিপ্লবের ঝড়ে নিঃশেষে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সযত্নে কম্বলখানি টানিয়া মেজরের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া, অণি পুনরায় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সস্নেহে কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। মেজর যে তাহার বন্ধু ও আশ্রয়দাতা। যাঁহার দয়া ও সহানুভূতিতে তাহার সব কিছু নিরাপদ হইয়াছে, তাঁহার প্রতি অনাবশ্যক সঙ্কোচে যে তাঁহার মহত্ত্বকে অশ্রদ্ধা করা হয়। নিজের অবিবেচনা-কৃত অপরাধের জন্য অণি নিজকে ধিক্কার দিল।...তিনি প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন না, কিন্তু তাহার তো কর্ত্তব্য আছে।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া মেজর অণিকে খাইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অণি উঠিল না। সে তাহার নিজের জন্য কোন আয়োজনই করে নাই ; কিছু খাইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। অণি বাবুর্চ্চি ও বয়ের রান্না খাইত না। মেজর অণিকে সে জন্য কোন দিন অনুরোধও করেন নাই। চাকরদিগকে বলিয়া তিনি তাহার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অণি স্বহস্তেই রন্ধন করিত।

অণি তখনও স্থিরভাবে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে দেখিয়া মেজর কর্ত্তব্যের অনুরোধেও একটু ক্ষীণ আপত্তি জানাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অণি তাহাতে বাধা দিয়া বলিল—"তার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না ; আপনি একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও ভদ্রতার খাতিরে মেজর বিশ্রাম করিবার জন্য অণিকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অণি কোনই উত্তর দিল না; নির্ব্বাক ও নিশ্চল ভাবে বসিয়া তাঁহার মাথায় বাতাস দিতে লাগিল।

মেজর চোখ বন্ধ করিয়া ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আর কোনরূপ বাধা দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। এই দাবীর সেবার এক অপরিমেয় তৃপ্তিতে তাঁহার সমস্ত মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সেবার অন্তরের এ তৃপ্তি তো তিনি জীবনে কখনই উপভোগ করেন নাই। হাঁসপাতালে নার্সদের নিকটে তিনি যে সেবা ও যত্ন বহুবার পাইয়াছিলেন, এ সেবা-যত্নের তুলনায় তাহা যেন আজ নিতান্ত প্রাণহীন ও শুষ্ক বলিয়া মনে হয়। ঘড়ির কাঁটা ও কর্ত্তব্যের মাপকাটিতে মাপা সেই সেবা-যত্নের মধ্যে তো তিনি এত প্রাণময় স্নিগ্ধ স্নেহের পরশ কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অণির হস্তস্পর্শে মেজরের বুকের মধ্যে যেন আজ থাকিয়া থাকিয়া একটা আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিতেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা সঙ্কোচের চোখ রাঙানিতে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অণির অসন্তুষ্টিকে তিনি ভিতরে ভিতরে বেশ একটু ভয় করিয়া চলিতেন।

(৫)

স্বভাবতঃ অণি অত্যন্ত ধীর, দৃঢ় ও অচঞ্চল হইলেও, রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাহার সে দৃঢ়তা যেন নিমেষের মধ্যে উপিয়া যাইত। শৈশবে জ্ঞান সঞ্চার হওয়ার পর হইতেই মৃত্যুযাত্রীর জীবন-পথে দাঁড়াইয়া যমের সহিত অবিশ্রান্ত হাত-কাড়াকাড়ির পরাজয়ের গ্লানিতে তাহার দৃঢ় চিত্তবৃত্তিগুলি যেন সব অসাড় ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিল। এ্যান্টিফ্লোজিষ্টিনের কৌটাটা গরম জলে বসাইয়া অণি তখন ধীরে ধীরে মেজরের বুকের উপর তাহার প্রলেপ দিতেছিল। জীর্ণ মনের এই অবসাদ-অবসরে আজ তাহার অতীতের ব্যথাভরা স্মৃতির জমাট অশ্রু যেন বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। এ্যান্টিফ্লোজিষ্টিনের প্রলেপ মাখানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল সেই স্নেহময় দাদুর কথা;—মায়ের সেই চিন্তাকুল ম্লান মুখ! ওঃ, মা যে শুধু তার কথা ভাবিয়াই মরণের শেষ নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত শান্তির সঙ্গে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই। আজও তাহার স্পষ্টই মনে পড়ে সেই বাবা, মা, দাদু—আত্মীয় বন্ধু—সবারই কথা। একটা প্রলয়ের বন্যা আসিয়া যেন পৃথিবীর বুক হইতে তাহার সব কিছুই মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। সৈদাবাদে গঙ্গার ধারে একখানা ভাড়াটিয়া ছোট্ট বাড়ীতে তাহারা থাকিত। চামেলী, প্রীতি, অমলা, মণিকা কত বন্ধুই না তাহার ছিল। বাবা তখন পক্ষাঘাতে শয্যাগত; তাঁহার চলাফেরা করিবার ক্ষমতা ছিল না, তবুও তিনি কত ভালবাসিতেন! বাবা যে তাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে পাগল হইয়া উঠিতেন। সে যেন এক যুগান্তরের পুরানো স্মৃতি; আজ আর তার কোন চিহ্নও নাই।

বাবা যখন মারা যান, তখন অণি সবেমাত্র বারো বৎসরে পড়িয়াছে। বাবার মৃত্যুর পর অনেকেই দেশের বাড়ীতে গিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। মা তাহাতে রাজী হন্ নাই। বাবার অসুখের পর হইতেই যেন মা পল্লীগ্রামের উপর অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের লোকের না কি তখন আর পূর্ব্বের মত সে সরল ও উদার ভাব ছিল না; সংকীর্ণতা, স্বার্থ ও হিংসায় তাহাদের অকর্ম্মণ্য মস্তিষ্ক পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল। এখনো হয় তো ঠিক্ তেমনি আছে।

সৈদাবাদের ছাত্ররা সকলে মিলিয়া একটী সেবাসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছিল। মা এই সেবাসঙ্ঘের ছেলেগুলিকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হরিৎ-দা—ডাক্তার, নিরঞ্জন-দা, পরিতোষ দা—আরও কত ছেলে মিলিয়া সেই সেবাসঙ্ঘের কাজ করিতেন। বাবার অসুখের প্রথম অবস্থা হইতে শ্মশানের শেষ সংকার পর্য্যন্ত সব কিছু কাজই ঐ ছেলেরা করিয়াছিল। নিরঞ্জন-দা কত উপকার—কত সাহায্য করিয়াছিলেন—তাহা বলা যায় না। মা যেদিন সৈদাবাদ ছাড়িয়া কাশীতে দাদুর কাছে আসিবার কথা বলিলেন, সেদিন রাত্রে সঙ্ঘের সকলে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—"কাকীমা, আমাদের ভুলবেন না। দরকার হ'লেই সংবাদ দিবেন; আমরাও আপনার ছেলে।"

তাঁহাদের কথা মনে হইলে আজিও শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে।

সৈদাবাদ ছাড়িয়া যেদিন আমরা দাদুর কাছে—কাশীতে আসিবার জন্য রওনা হইলাম, মা সেদিন আমাকে

বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কত কান্নাই কাঁদিয়াছিলেন। বাবা যে ঘরখানিতে সর্ব্বদাই থাকিতেন, রোগ-শয্যার সেই প্রথম দিন হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, সে ঘরখানি যেন মায়ের তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। চলিয়া আসিবার সময় বাবার সেই অন্তিম শয্যার স্থানটীকে মা কতই না চোখের জল ফেলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

আমাকে সঙ্গে করিয়াই মা নির্ভয়ে পথে বাহির হইতে পারিতেন। কিন্তু সেবার কাশী আসিবার সময় তিনি নিরঞ্জন-দাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তেজস্বিনী ও সাহসী মায়ের সব তেজ যেন বাবার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছিল। দাদুকে সংবাদ দিলে হয় তো তিনি আসিতেন, কিন্তু মা তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন; নিরঞ্জন-দার প্রতি মায়ের অপার স্নেহ ও বিশ্বাস ছিল।

দাদু, গাড়ী আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই, ষ্টেশনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের গাড়ী যখন কাশীতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দাদুর সে কি ব্যাকুলতা! ব্যস্ত হইয়া দাদু গাড়ীর জানালায় জানালায় মাকে ডাকিয়া বেড়াইতেছিলেন। মায়ের নাম ছিল যোগমায়া। নিরঞ্জন দা আমাদের হাত ধরিয়া নামাইতেই দাদু ছুটিয়া আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দাদুর তখনকার অবস্থা দেখিলে হয় তো কেহই বলিতে পারিত না যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। মাকে দেখিয়া দাদুর হঠাৎ যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে মনে হইল যে তিনি হয় তো পড়িয়া যাইবেন। নিরঞ্জন-দা দাদুর হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন। মা কাছে আসিতেই দাদু তাঁহাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। দাদু বা মা কাহারো মুখেই যেন তখন কথা সরিতেছিল না। মাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া দাদু তাঁহার শীর্ণ মুখখানি মায়ের মাথার উপর রাখিয়া কতক্ষণ যে নিশ্চল পাথর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিলেন তাহা বলা যায় না।

নিরঞ্জন-দা গাড়ী ভাড়া করিয়া সকলকে উঠাইলেন। মা গাড়ীতে উঠিয়া দুই হাত জোড় করিয়া বিশ্বনাথকে প্রণাম করিলেন। গাড়ী দাদুর বাসার দিকে রওনা হইল। ওঃ! সে যে কত কাল পূর্ব্বের কথা তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন আশ্বিন মাস, চারি দিকে শারদীয়া উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কাশীতে যাত্রীর কত ভিড়! চারি দিকে বোধনের ধূম্—কিন্তু আমাদের যেন তখন বিজয়া।

বাঙ্গালীটোলায় সেই দাদা মহাশয়ের ছোট্ট বাসাটী; দুইখানি মাত্র ঘর। তবুও কত শান্তিই ছিল সেই স্নেহ ও সমবেদনায় ভরা—বৃদ্ধের পক্ষপুটের তলে। দিদিমণি যে কতদিন পূর্ব্বে সকলকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন—তাহা মনে পড়ে না। দাদুর জীবনের একমাত্র সম্বল ছিলেন মা। মাকে যেন দাদু তাঁহার সমস্ত হৃদয় দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সবই তো নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। বাবার মৃত্যুর পর হইতে মা যেন প্রতি পলে পলে সম্পূর্ণরূপে বদ্‌লাইয়া গিয়াছিলেন। সেই একরাশি কালো চুল, মহাতাপের মত উজ্জ্বল রঙ্—কি অপূর্ব্ব রূপ ছিল মায়ের; কিন্তু একটা ঝড়ের দোলা তাহার সব কিছু এমন করিয়া ওলট্ পালট্ করিয়া দিয়াছিল যে, মাকে দেখিয়া আর চেনা যাইত না। মায়ের একমাত্র সন্তান আমি।—আমাকে বুকে করিয়া মা যে কত সোহাগ, কত আনন্দে ফুলিয়া উঠিতেন! কিন্তু ইদানীং আমাকে দেখিলেই আমার স্নেহময়ী মায়ের চোখ ফাটিয়া শুধুই জল গড়াইয়া পড়িত।

দাদামহাশয়ের প্রাণপণ যত্ন, চেষ্টা—সব কিছুই ব্যর্থ করিয়া সাধ্বী মা আমার বৈধব্যের সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লইলেন। বৃদ্ধ দাদু আমার পাগল হইয়া উঠিলেন। আমি তখন সবেমাত্র ষোল বৎসরে পড়িয়াছি। বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে—আজও মায়ের সেই শেষ;—ওঃ! মা! মা আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুখখানি নিজের কপোলের উপর চাপিয়া ধরিলেন; মায়ের চোখের জলে আমার মুখ ভিজিয়া গেল। ক্ষীণ একটা আর্ত্তনাদের মত মায়ের ওষ্ঠ দুইটী কাঁপাইয়া সুধু বাহির হইয়া আসিল—"ঠাকুর! অনাথার—উপায়—ক'রো—" তাহার পর সব শেষ হইয়া গেল। মা! এই অভাগী সন্তানের চিন্তায় তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত যে অশান্তির বিষে ভরিয়া উঠিয়াছিল মা।

অণির অজ্ঞাতসারে তাহার চোখ হইতে বড় বড় দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া মেজরের বুকের উপর পড়িল। অণি তাহা বুঝিতেও পারিল না।

মেজর চোখ মেলিয়া একবার অণির মুখের দিকে চাহিলেন। অণি তখনও অন্যমনস্ক হইয়া ছিল। তাহার বেদনাক্লিষ্ট

মুখ ও জলভরা চোখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই যেন মেজর সহসা চমকাইয়া উঠিলেন। কিসের এ অশ্রু! এ ব্যথা!! পরক্ষণেই একটা অপরিমেয় তৃপ্তিতে মেজরের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এ যেন তাঁহার জীবনের একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি।

অণি অন্যমনস্কভাবে বসিয়া তখনও ভাবিতেছিল—তাহার দাদুর কথা। মায়ের মৃত্যুর পর দাদু যেন সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকেই ঘিরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন। তখন আর দাদু বিশেষ একটা বাড়ীর বাহিরে যাইতেন না; সর্ব্বদাই পড়া-শুনার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চাহিতেন। একমাত্র অণিই ছিল তাঁহার সঙ্গী, ছাত্রী ও কর্ত্রী। সন্তানের মত দাদুকে চালাইতে হইত। দাদু নিজেও যেমন পড়িতেন, অণিকেও সেইরূপ পড়াইতেন। দাদুর নিকটে থাকিয়া অণি কতই না শিখিয়াছিল। শেষের পাঁচ ছয়টা বৎসর যেন দাদামহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত অণিকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাঙ্‌লা, ইংরাজী, সংস্কৃত—গীতা, উপনিষদ্‌, দর্শন—সমস্ত বিষয় দাদু নিখুঁতভাবে অণিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। দাদুর যে বড় ইচ্ছা ছিল, যেন তাঁহার আদরের অণিকে উদরান্নের জন্য পরের দ্বারস্থ না হইতে হয়।

বার্দ্ধক্যেও দাদামহাশয়ের মধ্যে যে অসাধারণ উৎসাহ ও যুবকের ন্যায় কর্ম্ম-পটুতা ফিরিয়া আসিয়াছিল, শীঘ্রই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। তাঁহার শরীর ও মন অতি দ্রুতবেগে আবার শিথিল হইয়া পড়িল। দাদু নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি প্রস্তত হইতেছিলেন। শেষের কয়েকটা দিন তিনি সর্ব্বদাই অণিকে উপদেশ দিতেন—তাহার জীবন-যাত্রার পাথেয়।

সেদিন বিকালে দাদামহাশয়কে লইয়া অণি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। দাদামহাশয়ের শরীরটা ভাল ছিল না। গঙ্গার জলো হাওয়ায় শীত করিতেছিল বলিয়া দাদামহাশয় সকাল সকাল বাসার দিকে ফিরিলেন। পথেই তাঁহার প্রবল জ্বর আসিল। চার দিন সমভাবেই জ্বর লাগিয়া থাকিল দেখিয়া অণি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রতিবেশী বল্লভ ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন। তাঁহার ঔষধে কোন ফল হইতেছিল না, এবং রোগীর অবস্থাও আশঙ্কাজনক বুঝিয়া, বল্লভবাবু ভাল ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য উপদেশ দিলেন। বৃদ্ধ হরিশঙ্কর তখন নিউমোনিয়াক্রান্ত হইয়াছেন।

তখন মাস-কাবার। দাদামহাশয়ের পেন্‌শনের অল্প যে কয়েকটা টাকার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের জীবন-যাত্রা চলিতেছিল, সেই নির্দ্দিষ্ট মাসিক সম্বলও এই কয়েক দিনের ঔষধ পথ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। ক্ষোভে, দুঃখে, গ্লানিতে অণির হৃদয় যেন নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। হায়! তাহার দাদু—দাদু আজ শেষ মুহূর্ত্তে,—বিনা চিকিৎসায়—বিনা পথ্যে অনাহার-ক্লিষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবেন! এই চিন্তা যেন উত্তপ্ত লৌহ-শলাকার ন্যায় অণির হৃৎপিণ্ডকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। মর্ম্মান্তিক মনস্তাপে সে যেন হঠাৎ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়া অণি পাশের ভাড়াটীয়াদের ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। দাদু তাহাকে কত নিষেধ করিয়াছিলেন; সে মানে নাই। বল্লভবাবু বলিয়াছেন—দাদুর রোগ কঠিন হইয়াছে; সে যেমন করিয়া পারে ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইবেই। অণি সিভিল সার্জ্জনের বাংলোর উদ্দেশে চলিল। সে জানিত। দাদুর কাছে সে বহুবার শুনিয়াছিল যে, খাঁটা সাহেব অপেক্ষা কৃত্রিম সাহেবরা সহস্রগুণ হীন। একজন ইংরাজকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু বাঙ্গালী বা ভারতীয় জাল-সাহেবকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তবুও অণি দমিল না।

মেজর—কত উদার, কত মহৎ! ভগবান তাহাকে পথ দেখাইয়াছিলেন। মেজরের সাহায্য না পাইলে সে সময় যে তাহাদের কি হইত তাহা অণি ভাবিতে পারে না। চোখে জল আসিল।

সহসা মেজরের কথা মনে হইতেই যেন আচম্বিতে অণি[র] সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি এ্যাণ্টিফ্লোজিষ্টিনের দিকে হাত বাড়াইতেই অণি দেখিল তাহা অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হই[য়া] গিয়াছে। লজ্জায় সঙ্কোচে অণি এতটুকু হইয়া জলের পা[ত্র] ও ঔষধের কৌটা লইয়া গরম করিবার জন্য নামিয়া গেল।

অকারণ তৃপ্তি ও আনন্দে বিহ্বল মেজর তখন অণি[র] দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। অপ্রত্যাশি[ত] মানসিক শান্তিতে তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা প্রায় অর্দ্ধেক কমি[য়া] গিয়াছিল। (ক্রমশঃ

সংবাদ প্রভাকরে সেকালের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর'-এর নাম অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি (১২৩৭, ১৬ই মাঘ) সাপ্তাহিক সমাচারপত্র রূপে ইহার প্রথম উদয় হয়। পর বৎসর—১৮৩২ সালের ২৫ মে (১২৩৯, ১৩ জ্যৈষ্ঠ) তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর চারি বৎসরের জন্য ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পুনরুদয় হইল ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্ট (১২৪৩, ২৭ শ্রাবণ) তারিখে; এবার আর সাপ্তাহিক রূপে নহে—বারত্রয়িক রূপে। এই ভাবে তিন বৎসর (১২৪৬, ৩০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত) চলিবার পর ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন (১২৪৬, ১ আষাঢ়) হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সমাচারপত্রে পরিণত হয়। এই ভাবে ইহা বহু বৎসর চলিয়াছিল।

সংবাদ প্রভাকরের পুরাতন ফাইল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে আমি এই সমাচারপত্রের কতকগুলি পুরাতন ফাইলের (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ) সন্ধান পাইয়াছি। অবিলম্বে সেগুলির সদ্ব্যবহার না-করিলে কিছুদিন পরে হয়ত তাহার চিহ্নও থাকিবে না। এই কারণে আমরা স্থির করিয়াছি, এই পুরাতন ফাইলগুলি হইতে জ্ঞাতব্য তথ্য সংকলন করিয়া 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিব।

১২৫৩ সাল ঃ—

হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

(৯ এপ্রিল ১৮৪৭। ২৮ চৈত্র ১২৫৩)

হুগলি কালেজের সমুদয় বিবরণ।—ইংরাজী ১৮৩৬ শকে ১ জুলাই দিবসে চুঁচুড়া নগরস্থিত মৃত হাজি মহম্মদ মহিসনের কালেজ সংস্থাপিত হয়, এই প্রধান বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হওনের পূর্ব্বে চুঁচুড়া, চন্দননগর, হুগলী প্রভৃতি নগরে রাজপুরুষদের ভাষা কিম্বা দেশভাষার সুচারুরূপে শিক্ষা হয় এমত কোন বিদ্যালয় বিরাজিত ছিল না, চুঁচুড়া নগরে লন্দন মিসনরিদের স্থাপিত যৎসামান্য এক অবৈতনিক পাঠালয় ছিল, তথায় ঈশু খ্রীষ্টের গুণ সঙ্কীর্ত্তন যে সকল গ্রন্থে বর্ণনা আছে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের প্রাচুর্য্য থাকাতে ভদ্রলোকের সন্তানেরা কেহ বিদ্যাভ্যাস করিত না, হুগলিতে এনামবাটীর অধীনস্থ মাদরসা সংক্রান্ত দাতব্য এক ইংরাজী পাঠশালা ছিল, ঐ পাঠশালার কার্য্য কেবল এক জন শিক্ষক দ্বারা নির্ব্বাহ হইত, এবং তত্ত্বাবধারণের অভাবে ও কোন বিশেষ নিয়মবদ্ধ না থাকাতে সুশৃঙ্খলারূপে পঠনা কার্য্য নিষ্পাদন হইত না, সুতরাং তৎকালে পূর্ব্বোক্ত নগরত্রয়ে ও তন্নিকটস্থ গ্রামের বালকবৃন্দের জ্ঞানার্জ্জনের উপায় ছিল না, উল্লেখিত মাদরসা ও তৎসংক্রান্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় পুণ্যাত্মা মহম্মদ মহিসনের ধন হইতে চলিত, ঐ মহল্লোকের উত্তরাধিকারি না থাকাতে উইলে অর্থাৎ মুমূর্ষু-কালীনের দানপত্রে অন্যান্য সৎ ও পুণ্যজনক কর্ম্মের মধ্যে স্বধন নির্দ্ধন ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের বালকগণের বিদ্যাভ্যাস জন্য এক উপযুক্ত পাঠশালা সংস্থাপনের অনুমতি লিখিত ছিল, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকেরা পূর্ব্বোক্ত ঐ সামান্য মাদরসা ও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ঐ পাঠশালাদ্বয়ের ব্যয় অত্যল্প ছিল, মহম্মদ মহিসনের বিষয়ের বার্ষিক আয় ষষ্টি সহস্র মুদ্রার অধিক, কিন্তু এ সমস্ত টাকা কেবল অপব্যয়ে শেষ হইত, কিয়ৎকাল পরে দেশহিতৈষী শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলিস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ দ্বারা এনামবাটীর সমস্ত ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করাইবাতে দয়ালু গবর্ণমেণ্ট হুগলির লোকেদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মহম্মদ মহিসনের দানপত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁহার বিষয়ের আয় হইতে উক্ত স্থানে এক উপযুক্ত কালেজ সংস্থাপিত করিতে বিদ্যাধ্যাপক সমাজের প্রতি অনুমতি করিলেন, উক্ত সভা উল্লেখিত শুভ সময়ে বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ করণার্থে ঐ প্রধান পাঠশালা স্থাপন করিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য

সম্পাদনের ভার ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল, পরে কথিত মহাশয়ের কায়িক পরিশ্রমে ও মানসিক যত্নে বিদ্যালয়ের দিন২ শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাঁহার অধ্যক্ষতাতে ও নিয়মাদিতে শিক্ষক প্রভৃতি কর্ম্মকারকেরা সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কখন কাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, বরং নিজাধীন শিক্ষাদাতাদের যাহাতে পদোন্নতি হয় এমত নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। অনন্তর তিনি বিদ্যাধাপনা সভার সম্পাদকত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলে শ্রীযুত জেম্‌স সদরলেণ্ড সাহেব মহাশয় তাঁহার পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তিনি পাঠশালার অধ্যক্ষতা কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পাঠশালাস্থ সমুদয় ব্যক্তিরা আনন্দে পুলকিত হইল, ঐ মহাশয়ের অধ্যাপনার সুশৃঙ্খলতা ও পারিপাট্য ও বাক্যের মিষ্টতা ও স্বভাবের সরলতা ও দয়া এবং পরহিতেচ্ছা প্রভৃতি যে গুণ তাহা বর্ণে বর্ণনা করা যায় না, তিনি অধীনস্থ ছাত্রগণকে স্বীয় প্রিয় সন্ততির ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের সুখে সুখী ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন,···গৌড়ীয় ভাষার উন্নতির নিমিত্ত তিনি পণ্ডিত ও ছাত্রবর্গকে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন,···। ইতিমধ্যে সদরলণ্ড সাহেব পীড়িত হইয়া যখন জন্মভূমিতে প্রস্থান করেন তখন সুবিজ্ঞ শ্রীযুত ডাক্তর ইস্‌ডেইল সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার অধ্যক্ষতা ও অধ্যাপনায় সকলে সন্তোষ চিত্ত ছিল, এবং তিনিও অনেক শিক্ষকের ও ছাত্রের উপকার করিয়াছিলেন, পরে সদরলণ্ড সাহেব স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ডাক্তর সাহেব অনেক প্রশংসাপত্র প্রাপণানন্তর অধ্যক্ষতা পদ হইতে অবসর হইলেন, তদনন্তর সদরলণ্ড সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ পূর্ব্বক কালেজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া অতি অল্প দিবস পরে মেরিণের সেক্রেটরী পদ প্রাপ্ত হইলে কালেজাধ্যক্ষতা ভার শ্রীযুত এল, ক্লিণ্ট সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল,···। ক্লিণ্ট সাহেব হুগলি কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া কিঞ্চিৎকাল শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, অনন্তর কালেজের অপূর্ব্ব অট্টালিকা ও মনোহর কুসুমোদ্যান ও পুস্তকালয় এবং তৎ সংক্রান্ত পাঠার্থি সন্দোহ ও শিক্ষকগণ ও অন্যান্য বেতনভুক্ত কর্ম্মকারক প্রভৃতি লোক তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন এবম্প্রকার বিবেচনা করত আপনাকে ধন্য মানিয়া • এককালে মদমত্ত হইলেন।···কথায়২ পাঠশালাস্থ ভৃত্যদিগের নাম ও বেতন কর্ত্তন এবং ছাত্রেরা অনুপস্থিত হইলে তাহাদিগকে অর্থ দণ্ড করিতেন, অপর শিক্ষকদিগের পদ ও মান বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বরঞ্চ যাহাতে তাঁহারা অপ্রতিভ ও অপমানিত হয়েন এমত পথানুসন্ধানে নিয়ত থাকিতেন,···। মহম্মদ মহীসনের কালেজ সংস্থাপনের মুখ্যোদ্দিশ্য এই যে দীন দরিদ্র সন্তানদিগকে বিনা বেতনে বিদ্যাদান করা কিন্তু এই পুণ্যাত্মা সাহেবের দ্বারা এই পাঠশালা সংপূর্ণ বৈতনিক হইয়াছে, অপিচ তিনি যে হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষি তাহার অন্য প্রমাণ দর্শাইবার আবশ্যক নাই, এতদ্দেশীয় পর্ব্বোপলক্ষে ঐ কালেজের ছুটি বিষয়ে কৌন্সেল অফ এডুকেসনে অনুরোধ করিয়া যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টেই বিশেষ জানা যাইতেছে, যাহা হউক অধুনা তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন···। শুনিতেছি যে বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব অল্প দিনের মধ্যে উক্ত কালেজের সর্ব্ব সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন,··।

এক জন উক্ত পাঠশালার
পূর্ব্বতন ছাত্রস্য।

১২৫৪ সাল ঃ—

ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভা

(৪ জুন ১৮৪৭। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪)

গত ১ জুন মঙ্গলবার রাত্রে মেডিকেল কালেজের থিয়েটরে মৃত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নামের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি বৃহের সাম্বৎসরিক নিয়মিত সভা হইয়াছিল, শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সভার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিলে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কারের ঘরের শিক্ষক শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মৃত মহাত্মা হেয়ার সাহেবের অসাধারণ বদান্যতা ও অন্যান্য মহদ্‌গুণ বিষয়ে বঙ্গভাষার এক অত্যুত্তম রচনা পাঠ করেন, তাহা শ্রবণ করত সভাস্থ সকল লোকেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ সভাপতি শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ অত্যন্ত সন্তোষ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন যে তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য

ব্যক্তিদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাধারণের হিতজনক ও অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, এবং তিনি সরলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলেন যে কালেজের অন্যান্য বিদ্বান্ পণ্ডিত মহাশয়েরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হউন।

তদনন্তর শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পঠিত পত্র কমিটিতে প্রদান করিবেন, এবং কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহা মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক সাধারণকে দিবেন।

পরে রেবরেণ্ড সভাপতি মহাশয় পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করত বলিলেন যে সকলে বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন যে হেয়ার সাহেবের প্রাইজ কমিটির মূলধন হইতে একশত টাকা উদ্বর্ত্ত হওয়াতে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার উন্নতি জন্য এরূপ ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা গিয়াছে যে, যেব্যক্তি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অল্পবয়সে বিবাহের ফল বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তম প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে ঐটাকা পারিতোষিকরূপে প্রদান করা যাইবেক, এবং ঐ কমিটির মূলধন ক্রমে বৃদ্ধি হইলে তাহার উৎপন্ন হইতে পারিতোষিক দান দ্বারা বঙ্গভাষা রচনা বিষয়ে বিদ্যার্থিগণকে উৎসাহি করিবেন, রেবরেণ্ড মহাশয়ের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাস্থ মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, তদনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

ডাঃ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮। ৪ ফাল্গুন ১২৫৪)

"গুণ হোয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়"

ডাক্তার গুডিব সাহেব গোপালচন্দ্র শীল এবং ভোলানাথ বসু নামক দুই জন মিডিকেল ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিলাত হইতে আগমন করিতেছেন, সূর্য্যকুমার নামক বিপ্র কুলোদ্ভব ছাত্র বিলাতে রহিলেন, হঠাৎ এখানে আসিবেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একটি বিলাতি বিবি বিবাহ করিবেন তবে আসিবেন, নচেৎ যে রহিলেন সেই রহিলেন, বিবির সহিত বিবাহের লোভে তিনি পাদ্রিদিগের শ্বেত পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ঈশুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, অজ্ পূর্ব্ব ব্রহ্মপুত্র নদের পারে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে ঐ সূর্য্যকুমার জন্মগ্রহণ করেন, ঢাকার কালেজে কিছুদিন ইংরাজী পড়িয়া কলিকাতায় আগমন করত চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত মিডিকেল কালেজে নিযুক্ত হয়েন, এখানে যতদিন ছিলেন ততদিন কিছুই মানিতেন না, সংপূর্ণ নাস্তিক ছিলেন, গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, কোন ধর্ম্মের প্রতিই বিশ্বাস করিতেন না, পরে মিডিকেল কালেজ হইতে গুডিব সাহেবের সঙ্গে বিলাত গমন করেন, সেখানে উত্তমরূপে বিদ্যা শিখিয়া দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অবশেষে এই অগাধ বিদ্যা প্রকাশ করিলেন,…।

ঘোষপাড়ার মেলা

(৩০ মার্চ্চ ১৮৪৮। শুক্রবার ১৮ চৈত্র ১২৫৪)

মান্যবর শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যদিও ঘোষপাড়ার মেলার বিষয় আপনার কোন বন্ধু কর্ত্তৃক অত্যুত্তম রূপ লিখিত হইয়া গত গুরুবাসরীয় প্রভাকরে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা২ সন্দর্শন করিয়াছি তাহা আপনার পাঠক মণ্ডলীর গোচরার্থে প্রকটন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না,…।

গত দোলযাত্রার পরদিবস সোমবার অপরাহ্নে কতিপয় বন্ধু সহিত আনন্দধাম ও পবিত্র স্থান ঘোষপাড়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে রাসযাত্রা দর্শন করিতে গমন করিয়া তথায় স্ত্রী পুরুষে অন্যুন দশ সহস্র ভাবের মনুষ্য অর্থাৎ কর্ত্তা উপাসককে উপস্থিত দেখিলাম, এতদ্ভিন্ন সে স্থলে ক্রেতা, বিক্রেতা, রঙ্গদর্শি ও নিমন্ত্রিত প্রভৃতি অনেক লোকের সমাগমন হইয়াছিল।

ঐ বহু সংখ্যক কর্ত্তামতাবলম্বিরা কেবল যে ইতরজাতি ও শাস্ত্র বিজ্ঞানবর্জ্জিত মনুষ্য তাহা নহে, তাহারদের মধ্যে সৎকুলোদ্ভব, মান্য, বিদ্বান্ এবং সূক্ষ্মদর্শি জন দৃষ্ট হইল, এই ভাবকেরা ভিন্ন২ দলবদ্ধ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে বা রম্যস্থলে বা পুষ্করিণীর ঘাটে বা মাঠে বা গৃহস্থের উঠানে অথবা রাজপথে স্ব স্ব মহাশয় অর্থাৎ উপগুরুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া একান্তঃকরণে কর্ত্তাগুণ সংকীর্ত্তন করিতেছে, কি আশ্চর্য্য, কি কুহক, যুবতী ও কুলের কুলবধূ প্রভৃতি কামিনীগণ যাহারা পিঞ্জরের পক্ষীর ন্যায় নিয়ত অন্তঃপুরে বদ্ধা থাকে তাহারা এককালীন লজ্জা ও কুল ভয় এবং মনের বিকারকে জলাঞ্জলি প্রদান পুরঃসর পরপুরুষের সহিত একাসনোপ-

বিষ্টা হইয়া আনন্দ লহরী ও গোপী যন্ত্রে গীত ও বাদ্য করিতেছে, ক্ষণেক২ ঠাকুর২ বলিয়া চীৎকার, ক্ষণেক বা গুরু নামে করতালি ও জয়ধ্বনি প্রদান এবং ক্ষণেক বা আউল নামোচ্চারণ করিতেছে, আরবার নিস্তব্ধ হইয়া ভক্তিতে মগ্নানন্তর অশ্রুপাত করিতেছে, এবম্প্রকার দর্শন ও শ্রবণানন্তর কর্ত্তার ভবনে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে বহু জনতা দেখিলাম, তিলার্দ্ধ স্থান শূন্য নাই যে কিঞ্চিৎ-কাল দণ্ডায়মান্ হইয়া কাহার সহিত কথোপকথন বা পুরীর শোভা সন্দর্শন করি, পরে বাটীস্থিত এক দাড়িম্ব তরুতলে অনেক লোককে পতিতাবস্থায় দৃষ্টি করিয়া তদ্‌বৃক্ষের নিকটস্থ হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবাতে অবগতি হইল যে এস্থলে কর্ত্তা পাতকী তরাইয়াছিলেন, বিধেয়ে ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, এজন্য সঙ্কটাপন্ন জীবেরা ইহার আশ্রয় লইয়াছে, অনন্তর তথায় অর্দ্ধ দণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া দেখিলাম, যে যাহারা ভূমিসাৎ করিয়াছে ইহারদের মধ্যে কেহ২ উৎকট পীড়াতে পীড়িত, কেহ বা সমূহ বিপদ্‌গ্রস্ত, কেহ বা মনের তাপে তাপিত ও কেহ বা সন্তান সন্ততি বিরহে দুঃখিত হইয়া স্ব স্ব দায় হইতে উদ্ধার হওনের ভরসায় ও মনোরথ সিদ্ধ করণের প্রত্যাশায় এরূপ হত্যে দিয়াছে, মধ্যে২ কর্ত্তার উদ্দেশে ঐ পবিত্র বৃক্ষকে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত দোহাই ঠাকুর, দোহাই সতী মা, আমরা নরাধম, অতি পাপি, আমারদের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

ইত্যাদি কাতরুক্তি প্রয়োগ করিতেছে, তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাটীর কিয়দ্দূরে হিমসাগর নামক পুষ্করিণীর নিকট চরণ চালন করিয়া দেখিলাম যে ইহার ঘাটের অধঃসোপানে পাপি লোক সকল এক পদ স্থলে দিয়া অন্য পদ জলে মগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কর্ত্তা প্রেরিত দূতগণের সমক্ষ্যে স্ব স্ব কৃত কলুষ রাশি অম্লান বদনে স্বীকার করত ত্রাণ পাইতেছে, কিন্তু যাহারা স্বীয়২ অপরাধ ব্যক্ত করিতে বিলম্ব বা সন্দেহ করিতেছে দুতেরা তাহারদের প্রতি প্রকৃত যমদুতের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দে তাহারদের কেশাকর্ষণ করত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা তাহারদের পাপপুঞ্জ স্বীকার করাইয়া লইতেছে, পরে ঐ পাতকিদিগকে কথিত পুষ্করিণীর সলিলে অবগাহন করাইয়া তাহারদের দেহ নিষ্পাপ করিয়া দিতেছে, পরিশেষে কর্ত্তার নিকেতনের উত্তরাংশে এক স্থান দৃষ্ট হইল যে একজন ফকির চামর লইয়া রোদন বদনে প্রভু আউলের আবির্ভাব ও তাহার সহিত বর্ত্তমান কর্ত্তা ঈশ্বরচন্দ্র পালের পিতা মহরামস্মরণ পালের মিলন বিষয়ের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছে, শ্রোতারা তচ্ছ্রবণে ভাবে গদ২ ও আর্দ্র হইতেছে। এদিগে কর্ত্তার অন্তঃপুরে রাশি২ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া সেবকবর্গের সেবায় লাগিতেছে, বাহির মহলে গান বাদ্য ও নৃত্যের ধুমধাম হইতেছে, অপর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় নাটমন্দিরে কবি আরম্ভ হইলে আমরা তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলাম, আমরা এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, যেহেতু ব্রাহ্মণ শূদ্র যবন প্রভৃতি জাতি নীচেদের অন্ন বিচার না করিয়া এরূপ একত্রে ভোজন ও পান করে ইহা কুত্রাপি কোন স্থানে দেখি নাই ও শুনি নাই, বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদবধি আমরা উক্ত পল্লীতে উপস্থিত ছিলাম তদবধি কাহাকে ক্ষণমাত্র অসুখি দেখি নাই, সকলেই হাস্যাস্যে সময় ক্ষেপ করিতেছিল, বোধ হয় রাসের তিন দিবস তথায় আনন্দ বিরাজমান থাকে,…।

কার ঠাকুর কোম্পানী

(৪ এপ্রিল ১৮৪৮। ২৩ চৈত্র ১২৫৪)

আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে মিস্তুয়ার্স কার ঠাকুর কোম্পানির অংশিগণ এক সরক্যুলর পত্র দ্বারা মহাজনদিগ্যে প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত জানুআরি মাসে তাঁহারা চলিত কার্য্য রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজনদিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া পাওনা সকল পরিশোধ করিয়া দিবেন, দেনা রাখিবেন না, কিন্তু গত ১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুরা হৌসের ঋণ প্রদানে অক্ষম হইয়া মহাজনদিগ্যে আহ্বান করণে বাধ্য হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকালীন আমারদিগের বিশেষ দুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাকুর কোম্পানিরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা অতি সুনিয়মে বাণিজ্য কার্য্য করিতেন, অধুনা ঋণ পরিশোধ করণে অক্ষম হইলেন, ইহার পর অন্যান্য হৌসের ভাগ্যে কি হয় তাহা কিছুই বলা যায় না।

বঙ্গভাষা-চর্চ্চায় ঔদাসীন্য

(৫ এপ্রিল ১৮৪৮। ২৪ চৈত্র ১২৫৪)

…জাতি মাত্রেই আপনাপন জাতীয় ভাষার প্রতি যত্ন

করেন, এবং বিশিষ্টরূপে তাহা শিক্ষা করিতে অনুরাগি হয়েন, কিন্তু কি চমৎকার, এই দেশের মনুষ্যেরা জাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, ইংরাজী ভাষানুশীলার্থ অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারদিগের অনুরাগ ও অযত্ন দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। বহুদিন হইল ব্রিটিস রাজপুরুষেরা এই রাজ্যের সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গ ভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু আমলারূপে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের মধ্যে প্রায় তাবতেই বঙ্গভাষা লিখন পঠনে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যে সকল দরখাস্ত অথবা কাগজ পত্র লিখিয়া থাকেন তাহাতে কতক বাঙ্গালা, কতক পারস্য, কতক ইংরাজী এবং কতক ওলন্দাজি শব্দ ব্যবহার করেন, একারণ তাঁহারা ব্যতীত বঙ্গভাষায় সুনিপুণ অপর কোন ব্যক্তি ঐ সকল কাগজপত্রের সমুদয় মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন না, গবর্ণমেণ্ট ঐ আমলাদিগের শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ না করাতেই রাজবিচারে অশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, এবং দেশীয় লোকেরাও বঙ্গভাষানুশীলনে অমনোযোগি হইয়াছেন, যেহেতু বিচারালয়ের কর্ম্মার্থিরা জানিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি রাজার দৃষ্টি নাই, যেরূপ হউক লিখিতে পারিলেই বিচারপতিরা সন্তুষ্ট হয়েন, এজন্য তাঁহারাও বঙ্গভাষার প্রতি অযত্ন করিয়া কেবল আইনের ধারা সকল কণ্ঠস্থ করত রাজকার্য্যে মনোনীত হইয়া থাকেন, অতএব আমারদিগ্যে অবশ্য বলিতে হইবেক যে রাজপুরুষেরা সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহারদিগের কিছুমাত্র যত্ন দেখিতে পাই না, তাঁহারা এই দেশে ইংরাজী বিদ্যা প্রচার নিমিত্ত বিবিধ প্রকার বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া রাজভাণ্ডার হইতে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাচুর্য্যার্থ অল্প ব্যয়ও করিতে পারেন না।

অপিচ এই বিষয়ে আমরা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে যদ্রূপ দোষি করিতে পারি গবর্ণমেণ্টকে তদ্রূপ দোষি করিতে পারি না, কারণ তাঁহারা ভিন্নদেশীয় মনুষ্য, অধুনা এতদ্দেশের মনুষ্যেরা যদি স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগি হয়েন তবে অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন প্রকার নিষেধ করেন না, বরং উৎসাহ প্রদান করেন,……কিন্তু এই পরিতাপ যে আমারদিগের দেশীয় মনুষ্যেরা জাতীয় ভাষা শিক্ষা করা একেবারে অকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে মুক্তকণ্ঠে দেশের ভাষার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন, তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না,……।

সাময়িক পত্র

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

সন ১২৫৪ সাল।—

বৈশাখ মাসের বিবরণ :—বাবু চৈতন্যচরণ অধিকারী মহাশয় ৩ বৈশাখ দিবসে ইংরাজী এবং বঙ্গভাষায় জ্ঞানাঞ্জন নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।···

বিষ্ণু সভা সম্পাদক ধার্ম্মিকবর হরিনারায়ণ গোস্বামি মহাশয় হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয় পত্র প্রকটন করেন।···

আষাঢ় মাসের বিবরণ।—৩ আষাঢ় বুধবার দিবসে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে সংবাদ কাব্যরত্নাকর পত্রের জন্ম হয়,···

ভাদ্র মাসের বিবরণ।—পুস্তকের আকারে জ্ঞান-সঞ্চারিণী নাম্নী এক পত্রিকা প্রকটিতা হয়।

হিন্দুবন্ধু নামে ধর্ম্ম বিষয়ক এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল।···

জিলা রঙ্গপুরে "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" নামক এক মহোপকারক সমাচার পত্র প্রকটিত হয়।

পৌষ মাসের বিবরণ।—এই হিড়িকে সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন পত্র মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন।······

৩ জানুআরি সোমবারাবধি হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রের কলেবর ও মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে।······

সংবাদ দিগ্বিজয় পত্র জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে প্রকাশ হয়। অপিচ সুজ্জনবন্ধু নামে অপর এক পত্র প্রকটিত হইয়াছে।···

জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রে সংবাদ মনোরঞ্জন নামে এক নূতন পত্র উদিত হইয়াছে।······

ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় "আক্কেল গুড়ুম্" নামে এক পত্র প্রকাশ হইয়া অনেককেই আক্কেলগুড়ুম্ মক্কেল চাক দেখাইতেছে।

মাঘ মাসের বিবরণ।—২ মাঘ দিবসাবধি সংবাদ ভাস্কর পত্র সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশ হইতেছে।·····

হিন্দুকালেজের প্রধান গৃহের ছাত্র জগদ্বন্ধু পত্রের সম্পাদক বাবু সীতানাথ ঘোষ অল্প বয়সে বিবাকের সজ্জা

বিষয়ে উত্তম এসে লেখাতে মৃত হেয়ার সাহেবের ফণ্ড হইতে এক শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।···

ডাক্তর এডলিন সাহেব ইণ্ডিয়া রেজিষ্টর অফ মিডিকেল সায়েন্স নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

১২৫৫ সাল:—

১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

সন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ।—

বৈশাখ:—এজুইকেসন্ কৌন্সেলের অধ্যক্ষেরা হিন্দুকালেজে সংগীত বিদ্যার অনুশীলন রহিত করেন।···ছাপাযন্ত্রের প্রধান উপকারি পরম কারুণিক দেশহিতৈষি বন্ধু ৺বাবু কানাইলাল ঠাকুর মহাশয় ১৯ বৈশাখ শনিবার দিবসে বিশুচিকা রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

জ্যৈষ্ঠ:—কুমারহট্টের খাসবাটী পল্লীতে এক বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে।·· হেয়ার সাহেবের নাম বিখ্যাত বিদ্যালয় নূতন বাটীতে স্থাপিত হয়।·· ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবিল সোসাইটির ষষ্ঠদশ গণিত রিপোর্ট পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহাতে মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুরের বদান্ততার তাবদ্ব্যাপার লিখিত হইয়াছে, যে বৎসর ঐ সোসাটি স্থাপিত হয় সেই বৎসর উক্ত বাবু চাঁদার পুস্তকে ১০০ টাকা স্বাক্ষর করেন, পরে বার্ষিক ১০০ টাকা দান করেন, পরন্তু আবার এককালীন ২০০০ তঙ্কা দেন, তৎপরে ৫০০ টাকা এবং ১৮৩৮ সালে একেবারে লক্ষ মুদ্রা বিতরণ বিতরণ করেন, তাহার বৃদ্ধি হইতে অনেক অক্ষম লোক প্রতিপালিত হইতেছে।

শ্রাবণ:—মিডিকেল কালেজের গত বৎসরের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে "মিস্‌মেরিক" বিদ্যা শিক্ষার্থে ডাক্তর ইজ্‌ডেল সাহেবের অধীনে মিস্‌মেরিক্ হাস্‌পিটালে নিযুক্ত হয়েন।···সিমুলিয়ার কাঁশারিপাড়া নিবাসী মান্যবর বাবু হরচন্দ্র বসু মহাশয় ৯ শ্রাবণ দিবসে পরলোক গমন করেন।···শ্রীরামপুরের পাদ্রি জান্ রাবিন্সন সাহেব বঙ্গভাষায় একখানী ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।

ভাদ্র:—২১ জুলাই তারিখে লাহোররাজ্যে সহগমনের রীতি নিবারিত হয়।···নারমেল স্কুল নামক এক অভিনব স্কুল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে।

আশ্বিন:—হিন্দু সমাজ নামে এক সভা স্থাপিতা হয়। ডাক্তর ডফ সাহেব হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন।

কার্ত্তিক:—বিচক্ষণবর বাবু রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুসাধু বঙ্গভাষায় পঞ্জাবেতিহাস নামক এক উত্তম নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

অগ্রহায়ণ:—হিন্দুকালেজের প্রধান গণিত ছাত্রীয় বৃত্তিধারী সুশিক্ষিত ছাত্র বাবু শ্যামাচরণ বসু নিদারুণ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া ২৯ কার্ত্তিক শনিবার দিবসে লোকান্তর গত হয়েন, শ্যামাচরণ বাবু সংবাদ পত্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন,···তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে ও রচনা দৃষ্টে তাবতেই তুষ্ট হইতেন,···উক্ত বাবু সত্য-সঞ্চারিণী পত্রিকা প্রচার দ্বারা জগন্ময় সুখ্যাতি বিস্তার করিয়াছিলেন।······

পৌষ:—সদর আদালতের জজেরা খাসআপীল ঘটিত মোকদ্দমায় উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সবদার এবং রমাপ্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করিয়াছেন। পরন্তু রাজনারায়ণ দত্ত [মাইকেল মধুসূদনের পিতা] প্রভৃতি কএকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত করিলেন।

মাঘ:—মেং সিডিন্স সাহেব যে নূতন আরক প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্দ্বারা অচৈতন্য করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিলে রোগি ব্যক্তি যন্ত্রণা মাত্র জানিতে পারে না।··· গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পূর্ব্বক হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বঙ্গভাষানুশীলন জন্য তিনজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন।

চৈত্র:—সিমুলিয়া নিবাসি ধনরাশি বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় বিনামূল্যে সাধারণকে ইংরাজী ঔষধ বিতরণ করিতেছেন।···হুগলী কালেজের প্রধান পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক দায়রত্নাবলী নামক এক পুস্তক প্রকাশ হয়।

"ইয়ং বেঙ্গাল"

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ, তাঁহারদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত তাবতেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না, "ইয়ং বেঙ্গাল" যুবক দলেরা স্বদেশের কল্যাণকারি বলিয়া সর্ব্বদাই অভিমান করেন, কিন্তু সে কল্যাণ কিসে হয়? তাঁহারদিগের ভাষার শিক্ষা গুরু মহাশয়ের নিকট "পরম কল্যাণীয়" পর্য্যন্ত হইয়াছে কি না? তাহা সন্দেহের বিষয়; অতএব যাঁহারা স্বদেশের বিদ্যা ও ভাষার প্রতি অনুরাগশূন্য তাঁহারদিগের মঙ্গল চেষ্টার আদি সূত্রেই দোষ পড়িতেছে, ঐ মহাশয়েরা বিলক্ষণ সুধীর ও সুসভ্য এবং অনেকাংশে প্রতিজ্ঞাপালক বটেন, কিন্তু এ পক্ষে কিঞ্চিৎ সুদৃষ্টি হইলে আমরা তাঁহারদিগের দ্বারা আশার অতীত কত অধিক ফল প্রাপ্ত হইতাম, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না, উক্ত যুবক মিত্রদিগের মধ্যে এই এক বিশেষ কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে কোন বিষয়েই বাঙ্গালা দেখিতে ইচ্ছা করেন না, সমুদয় বিষয় ইংরাজী হইলেই আহ্লাদিত হয়েন, কিন্তু কথায় সাহেব হইলে কি হইবেক? সাহেবদিগের মত কার্য্য কোথায়, সাহেবেরা স্বদেশীয় বিদ্যা এবং ভাষার উন্নতির প্রতি অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকেন, যাহাতে দেশীয় লোকেরা সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হয়েন তদর্থে সমূহ চেষ্টা আছে, শ্বেতকান্তি মহাশয়েরা অন্য দেশের নানা বিষয় ইংরাজী ভাষায় রচনা এবং অনুবাদ পূর্ব্বক আপন দেশের কত উপকার করিতেছেন, আমারদিগের বাবুসাহেবেরা ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে কেবল বাক্য দ্বারা বসিয়া২ মুখে২ রাজা উজির মারিতে পারেন, সেই আস্ফালনে পৃথিবী কাঁপিতে থাকেন, যাহা হউক, বাবুরা যদি ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির মর্ম্ম অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষায় পুস্তক প্রকাশ করেন, তবে তদ্দ্বারা এদেশের নানা প্রকার মহদুপকার সঞ্চার হইতে পারে, ভাষাও ক্রমে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং অপরিচিত বিষয় সকল আমারদিগের নিকট পরিচিত হয়? সকল প্রকার সৎকার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার প্রধান সৎকর্ম্ম, সেই উপকারের মূল সূত্র দেশীয় বিদ্যা ও ভাষার আলোচনা, অতএব যখন তদ্বিষয়ে তাঁহারদিগের গুরুতর উদাস্য তখন আমারদিগের এই আক্ষেপ ও উক্তি দূর্ব্বা গহনে মুক্তা নিক্ষেপবৎ মিথ্যা হইতেছে, যে সকল কীর্ত্তি সজ্জন সমাজে শ্রেয়ঃ ও প্রেয় নামে পরিগণ্য হয়, তাহার সাধনকল্পে যৌবনস্বরূপ জীবনের সারাংশের কিঞ্চিৎ কাল ব্যয় করিলে যদ্যপি মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয়, তবে তাহা না করিয়া কেন কলঙ্ককজ্জলে অভিষিক্ত হয়েন, যদ্যপি গ্রন্থ রচনা করিতে সময় প্রাপ্ত না হয়েন, তবে বাঙ্গালা ভাষার পত্রাদি লইয়া আমোদ প্রকাশ করুন, উত্তম২ রচনা দ্বারা সেই সকল পত্রের গৌরব বৃদ্ধি করুন, এবং বাঙ্গালা পত্র হইতে উত্তম২ প্রস্তাব সকল ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক ইংরাজী পত্রে প্রকটন করত রাজপুরুষদিগ্যে দেশের অবস্থা জ্ঞাপন করুন, ইহার কিছুই করিবেন না, অথচ স্বজাতির প্রতি উপহাস দ্বারা কেবল অনর্থক কাল ব্যয় করিবেন, ইয়ং বেঙ্গাল সাহেবেরা প্রায় কেহই বাঙ্গালা পত্রে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, এবং কোন অংশে তাহার আনুকূল্য করাও নাই, বাবুদিগের অর্থের অসঙ্গতি নাই, অনেকের পৈতৃক বিষয় আছে, তদ্ভিন্ন বড়২ চাকরি করেন, অপিচ সময়ের অভাব দেখিতে পাইনা, বন্ধু বান্ধব লইয়া টেবিলে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ ও কথোপকথন চলিয়া থাকে, মধ্যে২ বাগানে বনভোজনে অনর্থক দিনযাপন হয়, বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা শুনিতেও আমোদ আছে, শুদ্ধ বাঙ্গালা পত্র পড়িতে বিরক্তি জন্মে ও সময় হয়না, বাবুরা আহারাদির ব্যাপারে যে ব্যয় করেন, ইহাতে তাহার সহস্রাংশের একাংশ ব্যয় করিলে সমুদয় বাঙ্গালা পত্র লইয়া সম্পাদকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে পারেন, আমারদিগের ভাষা অতি সুশ্রাব্য, ও সুকোমল এবং মাধুর্য্যরসে পরিপূরিতা, এই ভাষার বাক্যদ্বারা ও লেখনী দ্বারা উত্তমরূপে নানা কৌশলে ও সহজে মনের অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করা যায়, অতএব ইহার প্রতি বাবুদিগের এত আন্তঃরিক্ দ্বেষ কেন হইল, কেবল আপনারা দ্বেষ করিলেও হানি ছিলনা, যাঁহারা মনের সহিত অনুরাগ করেন তাঁহারদিগ্যে মনুষ্য বলিয়াও জ্ঞান করেন না, হায় কি আক্ষেপ? ইয়ং বেঙ্গাল সাহেবেরা যে জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারা সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন, তাঁহারা এদেশের ভাষার প্রতি কিরূপ যত্ন করেন তাহা কি দেখিতে পান না; এইক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের সমুদয় প্রদেশের সুসভব্য মহাশয়েরা সংস্কৃত ভাষানুশীলনে এবং সংস্কৃত বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রাঙ্কিত

করণে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, যেমন তেড়েতের ফল আপন বৃক্ষকে বিনষ্ট করিয়া বনান্তরে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ সংস্কৃত শাস্ত্র অস্মদ্দেশে জন্মগ্রহণ করত জন্মভূমিকে উচ্ছিন্ন দিয়া ইউরোপ খণ্ডে বিরাজ করিতেছেন, হাতা যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া রন্ধন করিয়া মরে, রসনা তাহার আস্বাদন লয় এবং মস্তক যেরূপ মিথ্যা ক্লেশভোগ পূর্ব্বক পুষ্পকে বহন করে, নাসিকা তাহার আঘ্রাণ লয়, সেইরূপ ভারতভূমি সংস্কৃত ভাষার প্রসূতি হইয়া রোদন বদনে মনের অভিমানে ম্রিয়মানা আছেন, ভিন্ন দেশীয় লোকেরা তাহার রসাস্বাদনে কৃতার্থ হইতেছেন, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও কি বাবু সাহেবদিগের মনে২ লজ্জা বোধ হয় না ? এবং উপস্থিত বিষয়ে অনভিজ্ঞতা জন্য সাহেবেরা যে সঙ্কেতে তাঁহারদের নিয়ত নিন্দাবাদ করেন তাহা কি স্বপ্নেও বুঝিতে পারেন না, "ইয়ং ব্যাঙ্গাল" শব্দের অর্থ কি ? ইহা শুদ্ধ সদ্বিদ্বান্ সাহেবদিগের উপহাসসূচক বাক্য ? উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি এবৎসর টৌনহালে অতিশয় সদ্বক্তৃতা পূর্ব্বক বড়২ ইংরাজদিগকে হতগর্ব্ব করিয়াছেন, তাহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বাবু যদি দেশস্থ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিবর্গের দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নিমিত্ত বঙ্গভাষায় ঐরূপ সুবক্তৃতা করিতে পারিতেন, তবে অস্মৎ পক্ষে কি এক আশ্চর্য্য সুখের ব্যাপার হইত, ফলে তাহার চেষ্টাও নাই, বাঙ্গালা দুইটি কথা এক করিয়া কহিতে হইলে মাতায় অমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, অতি সম্ভ্রান্ত কোন আত্মীয় ব্যক্তি যিনি ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত নহেন, অথচ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত নিপুণ, তাঁহার সহিত কোন ইয়ং বাঙ্গালের সাক্ষাৎ হইলে কথোপকথন কালীন শুনিতে বড় কৌতুক হয়, যথা। কেমন ভাই বাড়ীর সকল মঙ্গলতো,—মশয়, আসুন, "ল্যাষ্ট নাইটে" বড় "ডেঞ্জরে" পড়েছি "আঙ্কেলের কালারা" হয়েছে, "পল্স" বড় "উইক্" হোয়েছিল, আজ্ "মার্ণিংয়ে" ডাক্তার এসে অনেক "রিকাবর" করেছে, এখন "লাইফের" "হোপ" হোয়েছে, সে ভালমানুষ বাবুজীর উত্তর শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না, ভ্যাভ্যা রামের ন্যায় অবাক্ হইয়া শুদ্ধ খাড়া থাকে, এইরূপ কত আছে, যাহা লিখিতে লেখনীর মুখে হাস্য আইসে, পরন্তু বাবুরা কথায়২ স্প্রিট্ জানান্, কিন্তু সেই স্প্রিটেই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ঐ স্প্রিটের রস পেটের ভিতর না ঢুকিলে এত অমঙ্গল কেন হইবেক।

ছাতুবাবুর পুত্র গিরিশচন্দ্র দেব

(১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

বাবু গিরিশচন্দ্র দেব।—আমরা গত ৩ কার্ত্তিক মঙ্গলবার যামিনী যামার্দ্ধ সময়ে এক অমূল্য তুল্যরহিত বন্ধুরত্ন বিহীন হইয়াছি। এই প্রভাকর পত্রের প্রধান আনুকূল্যকারি বহুগুণধারি সিমুলানিবাসি বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের প্রিয় পুত্র বাবু গিরিশচন্দ্র দেব উক্ত দিবস সাংঘাতিক জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইয়া এতন্নিখিল সংসার পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন।......তিনি আপন পিতৃব্য ও পিতার নিকটে প্রতিমাসে প্রচুরার্থ প্রাপ্ত হইতেন, তদ্ভিন্ন পরিয়র কোম্পানির হৌসে মুচ্ছুদ্দির কর্ম্মে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তথাচ...শুদ্ধ সৎকর্ম্মে তত্তাবৎ ব্যয় করত আবার ঋণী হইতেন।...

আমারদিগের মৃত বন্ধুর সহায়তায় ব্রাহ্ম সমাজের অধীনে কতিপয় বিপ্র নন্দন কাশীধামে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার দানে অনেক পাঠশালা ও সভা এবং প্রকাশ্য বিষয়ের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল, বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার যদ্রূপ যত্ন ছিল, তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণনা হইতে পারে না,...।

অন্তঃকরণে সততই বোধ হয়, গিরিশবাবু অবনী পরিত্যাগ করেন নাই, যেন বেলগেছিয়ার মনোহর বাগানে অথবা পাণিহাটির গঙ্গাতীরস্থ সুচারু নূতন উদ্যানে গমন করিয়াছেন এখনি আসিয়া আমারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।......

স্বর্গবাসি গুণরাশি ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের দুই পুত্র, প্রথম আশুতোষ তুল্য বাবু আশুতোষ দেব, দ্বিতীয় স্বধর্ম্মতৎপর বাবু প্রমথনাথ দেব, উক্ত উভয় ভ্রাতার মধ্যে গিরিশবাবু একাকী কেবল দেব বাবুদিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী এবং বংশধর ছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে এক কোটী ত্রিশ লক্ষ মুদ্রার স্বত্বাধিকারী হইতেন।...... বাবু ২৪ বৎসর বয়সে অদৃশ্য হইলেন, এতৎ সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে প্রবীণের ন্যায় অনেক মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন,...। সংগীত বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল, তাঁহার মরণে ঐ বিদ্যা সহগামিনী হইয়াছে, অর্থাৎ কলিকাতায় একেবারে তাহার পাঠ উঠিয়াছে, আমোদ উল্লাস অন্ধকারে

আচ্ছন্ন হইয়াছে। বাবু সেতার বাজনায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন,…। তাঁহার সকল স্বরূপ গুণ লিখিয়া শেষ হইতে পারে না। তিনি প্রতিদিবস প্রাতে অনেকগুলীন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্রলোককে চারি আনা, আট আনা ও এক টাকা করিয়া দান করিতেন, আপন ব্যয়ে বাটীতে এক ঔষধালয় স্থাপন করিয়া সাধারণকে ঔষধ বিতরণ করিতেন,…।

ধর্ম্মসভার ভগ্নদশা

(১৬ মে ১৮৪৮। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

ধর্ম্মসভা তথা চন্দ্রিকা সম্পাদক। অবগতি হইল, গত রবিবার বৈকালে কলুটোলার ধর্ম্মসভার গৃহে ধর্ম্মসভার এক অতিরেক সভা হইয়াছিল, ঐ সভাতে আমারদিগের প্রধান সহযোগি চন্দ্রিকার অভিনব সম্পাদক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, উক্ত বাবু পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হয়েন ইহা অস্মদাদির বিশেষ প্রার্থনা বটে, কিন্তু স্থির রূপে বিবেচনা করিলে প্রকাশ্য পত্রের সম্পাদক দিগ্যে ধর্ম্মঘটিত কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বদ্ধ হওয়া উচিত হয় না, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় অতি প্রকাশ্য তাহার সহিত গুরুতর সম্বন্ধ রাখা আরো অধিক দোষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষেরা সকল বিষয়েই স্বাধীন ও সকল বিষয়ের বিচারক স্বরূপ,…। আমারদিগের সহযোগী যখন ধর্ম্মসভার সম্পাদক হইলেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় এবং লেখনীকে যাবজ্জীবনের জন্য উক্ত সভার নিকট বিক্রীত করিতে হইল, তদ্বিষয়ে স্বাধীন-রূপে আর স্বাভিমত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, ধর্ম্মসভার কার্য্যঘটিত রাশিং দোষকে গোপন করিয়া বিপরীতার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক,…।

ধর্ম্মসভা, এই শব্দ শুনিতে অতি উত্তম, কারণ ধর্ম্ম শব্দ অতিশয় জাঁকজমকে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার ভিতরের মর্ম্ম অন্বেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না, কেন না এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট করিয়াছে, সতীরীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত যৎকালীন ঐ সভার সৃষ্টি হয়, তৎকালীন দেশের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, ধর্ম্ম বিষয়ের গোলযোগে অনেকের মনে নানা প্রকার ভাবের আন্দোলন হয়, হিন্দুগণ ভিন্নং দলাক্রান্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ কলহে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় সকলেরি আত্মপর ও হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়াছিল, সে সময়ে প্রতিযোগি পক্ষের উন্নতির উচ্ছেদ করণের মানসে অনেক ধনাঢ্য এবং দলপতি বর্গ পরস্পর স্থিরপ্রতিজ্ঞায় দলবদ্ধ করত একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা স্থাপিতা করেন, কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য ইচ্ছা, সত্যের কি নির্ম্মল প্রতিভা, দলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে অভিপ্রায়ে সভা করিয়া দ্বেষানলে দগ্ধ হইলেন, সে ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, "ধর্ম্ম" আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাঁহারদিগের মর্ম্মভেদ ও শর্ম্মচ্ছেদ করিলেন, অর্থাৎ মৃত মহাত্মা লার্ড উইলিএম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আপিল করেন, সেই আপিলের মোকদ্দমায় পরাজয় হইলেন, চাঁদার দ্বারা যে প্রচুরার্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা, ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়, জলে ফেলিলে বরং ভুড়্ভুড়ি কাটিত, তাহা না হইয়া কেবল ধর্ম্মসভার ব্যথার ব্যথী ব্যথী সাহেবের উদরায় স্বাহা হইল, মূল আশা ভঙ্গ হইলে স্থূলবুদ্ধি সভ্যেরা আর কি করেন, কিছুই ভাবিয়া পান্ না, সভার ফাঁদুনি করিয়া ছাঁদুনি ও বাঁধুনি মাত্র সার হইল, মনসার কাঁদুনি কত গাহিবেন, পরিশেষ বড়ং চাঁই মহাশয়েরা বুদ্ধির খেই হইতে এক দলাদলির সূত্র তুলিয়া বসিলেন, সেই দলাদলিতে কিছুদিন গলাগলি ভাব হইয়া পরিশেষ ঢলাঢলি আরম্ভ হইল, তাহাতেই একেবারে সৎকার্য্যের সৎকার্য্য হইল, আর পূর্ব্ববৎ প্রণয়ের সন্ধি রহিল না, দলপতিরা দলচক্রে পড়িয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া বসিলেন, মহামতি সভাপতি সভার গৃহে এক হাড়িকাষ্ঠ লগ্ন করিলেন, তাহাতে প্রতিদিন শতং ব্রহ্মবলি হইতে লাগিল "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" ধনিদিগের নিকট কোন কর্ম্ম উপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ বিদায় পাওয়া যাঁহারদিগের উপজীবিকা হইয়াছে, তাঁহারদিগের উপার্জ্জনের পথে কণ্টক পতিত হইল, যে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সেবক, সেই শূদ্রেরাই পরম পূজনীয় ভূদেবদিগের প্রায়শ্চিত্ত করাইতে লাগিলেন, তৎকালীন্ চন্দ্রিকা পত্রে একং দিন দলঘটিত যে যে বিষয় প্রকটিত হইত তাহা পাঠ করিয়া আমরা হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইতাম। যথা।

"মহামহিম শ্রীযুত—ঃঃ—দেব,
দত্ত, রাজা বাহাদুর, দলপতি মহাশয়.
ধার্ম্মিক বরেষু।

আমারদিগের এবাটীর সকলে শারীরিক ভাল আছেন, তাহাতে ভাবিত নহিবেন, যাতায়াতে তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক, গত পরশ্ব দিবসে আমারদিগের ওবাড়ীর বড় মহাশয়ের পিশের শালার মামার মেসোর দাদার খুড়ার জামায়ের ভেয়ের মামাশ্বশুর পদব্রজে গমন কালীন সিংহ বাবুদিগের বাটীর সংলগ্ন এক পুরাতন প্রাচীরের একখানা পতিত পাটকেল স্পর্শ করিয়াছেন, অতএব সভার রীতিমতে তাঁহাকে দল হইতে পরিত্যাগ করা উচিত হয় ইত্যাদি।"

এই প্রকার লোকের গ্লানিজনক গ্লানিসূচক বিষয় দ্বারা কিছুদিন ধর্ম্মসভার কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল, পরিশেষ এক নীলকমলি হেঙ্গামা উঠাতেই এক দিনে সমুদায় ধাই ফুট্ ফাট্ হইয়া গেল, রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত, বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, বাবু দেবনারায়ণ দেব, এবং বাবু জয়নারায়ণ মিত্র প্রভৃতি দলপতি মহাশয়েরা একত্র হইয়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরকে পরিত্যাগ করত সিমুলায় স্বতন্ত্ররূপে এক ধর্ম্মসভা করিলেন, ঐ সময়ে দেব বাহাদুর একাকী কেবল স্বদল সহিত কলুটোলার ধর্ম্মসভায় রহিলেন, অপর সকল দলপতি সংযোজিত রূপে নূতন সভার সভ্য হইলেন, কিন্তু চমৎকার দেখুন, তাঁহারদিগেরও সেই সংযোগ পরে মিথ্যা হইল, অর্থাৎ তাঁহারদিগের ঘরে২ এমত বিচ্ছেদ হইল যে পরস্পর বাক্যালাপ রহিল না, যজ্ঞসূত্র গ্রহণাভিলাষি গুণরাশি ক্ষত্রি অভিমানি আন্দুলেশ্বর রাজা বাহাদুর এক বিবাহ সূত্রে শিশুপালের ন্যায় সম্ভ্রান্ত হইয়া সিমুলিয়ার সভা ত্যাগ করত নিজ গ্রামে এক কলমের ধর্ম্মসভা স্থাপিতা করিলেন, সেই কলমের বৃক্ষে মধ্যে২ দুই একটী ফুল ফুটিয়া অমনি২ ঝরিয়া পড়ে, ফলের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় না, তদনন্তর এক "একজায়ের" ঢেউ উঠিয়া বিবাদের জলের স্রোতে প্রায় সকল সংহার করিয়া বসিল, রাজপরিবারের সহিত দেব বাবুদিগের বিচ্ছেদ হইল, সেই বিচ্ছেদেই সভার উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হইবেক, কারণ রাজদলের সহিত ঘোষ বাবু এবং মিত্র বাবু প্রভৃতি কতিপয় দলপতি একত্র হইয়া সিংহ বাবুদিগের দলের সহিত মিলিত হইলেন, এইক্ষণে ঘরে২ ধর্ম্মসভা, যেমন রাজপুর অঞ্চলে বাটোয়ারার গঙ্গা, অর্থাৎ করের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা, বসুর গঙ্গা ইত্যাদি, সেইরূপ অধুনা অমুকের ধর্ম্মসভা, কলনার ধর্ম্মসভা বলিয়া পরিচয় হইয়াছে।

সত্যযুগে ধর্ম্মের চারি পদ ছিল, ত্রেতাযুগে এক পদ ভগ্ন হইয়া তিন পদ হয়, পরে দ্বাপরে আর এক পদ ভগ্ন হইয়া দুই পদ থাকে, এই কলিযুগে কেবল এক পদ মাত্র আছে, তাহাতে তাঁহার চলিবার শক্তি নাই, অতএব এসময়ে সেই এক ঠ্যাং ধরিয়া টানাটানি করাতে কেবল তাঁহার প্রাণে ক্লেশ দেওয়া হয়। আমারদিগের রাজকৃষ্ণ বাবু চন্দ্রিকার সম্পাদকত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ সোপানে উত্থিত হইয়াছেন, সুতরাং এখন দলাদলি চক্রে প্রবৃষ্ট হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না, কেননা ইহাতে স্বাধীনতাকে একেবারে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করা হইবেক, সংপ্রতি চন্দ্রিকা পত্রে উত্তম২ বিষয় সকল লিখিত হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মসভার নিয়মে দলাদলি ঢুকিলে আর তদ্রূপ থাকিবেক না, পরে জাতিমারণ, হুঁকাবারণ, মানহরণ, বিষ্ণুস্মরণ, প্রতিজ্ঞা রক্ষণ, গোবর ভক্ষণ ইত্যাদি বিষয় দ্বারা এক২ দিনের চন্দ্রিকা পূর্ণ করিতে হইবে, অধুনা ঐ সভা একদোলে সভা হইয়াছে, মধ্যে দেশহিতার্থি বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ের বদান্যতায় কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সংপ্রতি তিনি সে শ্রী হরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ আপন হস্তে টাকা লইয়া উপায়হীন ভদ্র পরিবারকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছেন, ইহাতে সভার শোভা আর কি রহিল, কেবল এক নামের অভিমান মাত্র রহিয়াছে, অতএব জিজ্ঞাসা করি এমত মিথ্যা অভিমানের কার্য্যশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্মে কলঙ্ক প্রদান করা কি উত্তম বিবেচনা হইতেছে ?

জোড়াসাঁকোর সিংহ-পরিবার

(১৭ মে ১৮৪৮। বুধবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

৺বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ।—আমরা অসীম খেদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যোড়াসাকো নিবাসি ধনরাশি ধার্ম্মিকবর ৺বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় গত রবিবার বৈকালে শ্রীশ্রী৺ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীরে শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, নবকৃষ্ণ বাবু নবীন বাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন। জগদীশ্বর যে সকল মহদ্গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সমস্ত

গুণ তাঁহার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছিল।...নবকৃষ্ণ বাবু বৈষয়িক ব্যাপারে বিলিপ্ত হইয়াও সতত পণ্ডিত মণ্ডিত সভামধ্যে নানাবিধ শাস্ত্রালাপে সুখী হইতেন, সকল প্রকার বিদ্যায় ও ভাষায় তাঁহার বিশেষ সংস্কার ছিল,...। তিনি বিপক্ষদিগের বিপক্ষতা ও নিন্দাকে নিয়তই ক্ষমা করিতেন, তাঁহার আস্য ক্ষণকালের জন্য হাস্যহীন হয় নাই, এবং অঙ্গের কোনরূপ ভঙ্গিমাদ্বারা কেহই ক্রোধের চিহ্ন দেখিতে পান নাই, মৃত মহাত্মা বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয় যৎকালীন রামকৃষ্ণপুরের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে বিবাহ করেন, তৎকালীন ধর্ম্মসভা সংক্রান্ত কলিকাতাস্থ এবং অপরাপর স্থানের দলপতি ও বড়২ ধনশালি জনেরা সিংহ বাবুদিগের বিরুদ্ধে বিবিধমতে বিপক্ষতা করণে সাধ্যের ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু নবীন বাবুর কি অসাধারণ বুদ্ধি, তিনি ঐ শৈল সম বিপদকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া স্বীয় যুক্তি ও কৌশল শক্তিক্রমে উল্লেখিত বৃহৎ২ বিপক্ষদিগকে এককালীন্ হতগর্ব্ব করত সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হইয়াছিলেন।...

নবীন বাবু এতন্নগরের এক প্রাচীন ধনি পরিবারের অধ্যক্ষ ছিলেন,...অধুনা প্রার্থনা করি সদাত্মা বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় পরিবার সহিত দীর্ঘজীবি হইয়া বংশের নির্ম্মল সম্মান রক্ষা করুন।

রাজকবি মহারাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর

(২২ মে ১৮৪৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

রাজকবি মহারাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর বিদ্যা বিস্তার বিষয়ে যদ্রূপ যত্নশীল আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা তাহা বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন, তাঁহার বিরচিত বিবিধ প্রকার কবিতা পুস্তক পাঠ করিয়া সম্ভ্রান্ত সম্রাটগণ বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন, বিশেষতঃ দিল্লীশ্বর তাঁহাকে রাজকবি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, উক্ত মহারাজার সহযোগী মুন্সি তরিবুল্লা নামক ব্যক্তি সংপ্রতি পারস্য ভাষায় কবিতা ছন্দে এক অতি উত্তম পুস্তিকা লিখিয়াছেন, এবং তাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে তিনি ঐ রাজকবি মহারাজার ও তাঁহার পিতৃ পিতামহের জীবন বৃত্তান্ত অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ঐ পুস্তক পাঠ করিলে বিশেষ আহ্লাদিত হইবেন, যেহেতু তাহাতে তিন জন অতি সম্ভ্রান্ত এবং মান্যলোকের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, রাজকবি মহারাজার পিতামহ মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর যেরূপ মনুষ্য ছিলেন তাহা সকল রাজ্যের লোকেই জ্ঞাত আছেন, তাহার তুল্য কীর্ত্তিকুশল ব্যক্তি এই রাজ্য মধ্যে কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এবং রাজকবি বাহাদুরের পিতা মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের কীর্ত্তি বিস্তৃতা হইয়াছে, তাঁহার ন্যায় দাতা ও উদারচরিত্র ধার্ম্মিক মনুষ্য এইক্ষণে কে আছেন,...।

"মিস্‌মেরিক হাসপিটাল"

(৫ জুন ১৮৪৮। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫)

গত শুক্রবার বেলা পরাহ্নে শ্রীযুত হিউম সাহেবের বাটীতে মিস্‌মেরিক বিদ্যার বান্ধবদিগের এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় বহুলোকের সমাগম হইলে এই সকল বিষয় ধার্য্য হয়।

প্রথম কল্প।—গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক "প্রেসিডেন্সি সরজিয়ন" পদে ডাক্তর ইজ্‌ডেল সাহেব নিযুক্ত হয়েন, ইহা সভ্যদিগের বিশেষ অভিপ্রায় হইয়াছে।

দ্বিতীয় কল্প।—এজন্য যে সকল মহাশয়েরা উক্ত বিষয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন করা যাউক যে মিস্‌মেরিক হাসপিটাল যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, এতদর্থে উপযুক্ত মত ধন দান করেন।

তৃতীয় কল্প।—পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যে মিস্‌মেরিক চিকিৎসালয় স্থাপন করেন তাহার নিয়মানুসারে ভাবি হাসপিটালে সর্ব্বপ্রকার ব্যামহযুক্ত কি স্বদেশীয় কি ইউরোপীয় সকল মনুষ্যেরই চিকিৎসা হইবেক।

চতুর্থ কল্প।—এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা যদ্যাপি প্রচুররূপে আনুকূল্য হয় তবে সাধারণ সমাজ কর্তৃক এরূপ সকল নিয়ম নির্দ্ধার্য্য হইবেক, যাহাতে মনুষ্য জাতির বিশেষ উপকার সম্ভব, এজন্য ঔষধ, যন্ত্র, এবং দ্রব্যাদির কারণ গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করা যাইবেক, অর্থাৎ যদ্দ্বারা উক্ত হাসপিটালে একটা সাধারণ ঔষধালয় সংস্থাপন হইতে পারে।

যে সকল মহাশয়েরা মিস্‌মেরিক বিদ্যার সত্যতা অন্বেষণ করিতে চাহেন তাঁহারা অবাধে হাসপিটালে যাইতে পারিবেন।

পঞ্চম কল্প।—রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, অনরবিল মেং ইলিএট সাহেব, রেবরেণ্ড মেং ফিসর, মেং হিউম, রেবরেণ্ড মেং লাক্রা এবং ডাক্তর

মার্টিন সাহেব, ইঁহারা কমিটির অধ্যক্ষ, এবং বাবু রামগোপাল ঘোষ কোষাধ্যক্ষ এবং অতিরিক্ত মেম্বরী পদে মনোনীত হইলেন।

ষষ্ঠ কল্প।—এই সকল বিষয় কলিকাতার সমুদয় সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়, এজন্য তৎসম্পাদকগণকে বিজ্ঞাপন করা যাউক, অপর উল্লেখিত মিস্‌মেরিক হাসপিটালের উপকারার্থে উক্ত মহাশয়েরা ধন সংগ্রহ করেন, ইহাও জ্ঞাপনীয়।

কলিকাতা রসল ষ্ট্রীট, নং ১২ বাটীতে শ্রীযুত ডাক্তর ইঙ্‌ডেল সাহেব অথবা কমিটির অধ্যক্ষগণ দাতব্য ধন সংগ্রহ করিবেন।

বাংলা নাটক

(২৮ জুন ১৮৪৮। ১৬ আষাঢ় ১২৫৫)

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য গৃহের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক গৌড়ীয় গদ্য পদ্যে শ্রীমন্মহাকবি কালীদাস বিরচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সুবিখ্যাত নাটক গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তদীয় ভূমিকা ও মঙ্গলাচার প্রভৃতি কিয়দংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, অপর উক্ত পুস্তক উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, অতএব আমরা বিদ্যানুরাগি মহোদয়গণ সন্নিধানে প্রার্থনা করি তাঁহারা অভিজ্ঞান শকুন্তলঃ নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত হইলে উচিত মত আনুকূল্য প্রদান করেন।

গৌড়ীয় ভাষার পুনরুন্নতি হওন কালাবধি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক ব্যতীত আর কোন নটরসাশ্রিত গ্রন্থের গৌড়ীয় অনুবাদ হয় নাই, বিশেষতঃ এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পাদন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদ প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না, অতএব এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরস যাহাতে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে সন্দীপন হয়, তাহাতে সম্যগ্রূপ প্রযত্ন প্রকাশ করা বিধেয়, আমরা এই জন্যই শ্রীযুত রামতারক ভট্টাচার্য্যের সংকল্প সুসিদ্ধ যাহাতে হয় এমত অনুরোধ দেশহিতৈষি সমাজে জানাইলাম।

সাঁসুচি থিয়েটারে বাঙালী অভিনেতা

(২ আগষ্ট ১৮৪৮। ১৯ শ্রাবণ ১২৫৫)

থিয়েটর সান্সশশি।

মেং বেরি সাহেব বিনয় পূর্ব্বক তাঁহার এতদ্দেশীয় বন্ধুদিগ্যে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১০ জন বাঙ্গালি রাজা ও বাবুর সাহায্য অনুসারে বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের ১০ তারিখে তিনি সেক্সপিয়ার কৃত অথেলোর ট্রাজেডি ও অথেলো মুর অফ বিনিস একজন এতদ্দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা প্রসারিত করিবেন, সর্ব্ব শেষে সেক্সপিয়ারের জীবিত প্রতিমূর্ত্তি এবং তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত হইবেক, যে সকল বন্ধু মহাশয়েরা মেং বেরি সাহেবকে এতদ্ব্যাপারে সাহায্য করিবার মানস করেন তাঁহারা শীঘ্র২ আপনারদিগের বসিবার স্থানসকল গ্রহণ করিবেন যেহেতু তাহার অধিকাংশ বিলি হইয়া গিয়াছে, যাঁহারদিগের উক্ত স্থান গ্রহণের অবশ্যক হইবেক তাঁহারা পুরাতন থিয়েটরের নিকটে ওয়ালিংটন স্কোয়ারের ধারে মেং বেরি সাহেবকে পত্র লিখিবেন।

টিকিটের মূল্য।

বাক্‌স ৫ ষ্টাল ৩ এবং পিট দুই টাকা।

(২১ আগষ্ট ১৮৪৮। সোমবার ৭ ভাদ্র ১২৫৫)

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে সান্সশশি নামক থিয়েটরে যে রূপ সমারোহ হইয়াছিল বহুদিবস হইল ঐরূপ সমারোহ হয় নাই, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সাহেব ও বিবি এবং এতদ্দেশীয় বাবু ও রাজাদিগের সমাগম দ্বারা নৃত্যাগারের শোভা অতিমনোরম হইয়াছিল, মেং বেরি সাহেবের অনুষ্ঠানেরও কোন ত্রুটি হয় নাই, তিনি সকল বিষয় অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় নর্ত্তক বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, তিনি কোন রূপে ভীত অথবা কোন ভঙ্গি অবহেলন করেন নাই, তিনি চতুর্দ্দিগ হইতে ধন্য২ শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার উৎসাহ এবং সাহসও বদ্ধমূল হইয়াছে, যে বিবি ডেসডেমনা হইয়াছিলেন, তিনিও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন, বিশেষতঃ ভয়ানক রুমালের ব্যাপারে তিনি যে সকল ভঙ্গি দেখাইয়াছেন তাহাতে সেক্সপিয়ারের লেখার অনুরূপ যথার্থ মতেই প্রকাশ হইয়াছে।

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। মঙ্গলবার ২৯ ভাদ্র ১২৫৫)

অদ্য রজনীযোগে সান্সশশি থিয়েটরে সেক্সপিয়ার কৃত

ওথেলোর নাটক পুনর্ব্বার হইবেক, এবং বাবু বৈষ্ণবচরণ আঢ্য পুনর্ব্বার সাধারণ সমীপে প্রকাশমান হইবেন, গত নাটকের রজনীযোগে যাঁহারা থিয়েটরে গমন করিতে পারেন নাই অদ্য তাঁহারা গমন করণে কদাচ বিরত হইবেন না, বিশেষতঃ যে সকল মহাশয়েরা বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের বক্তৃতা ও অঙ্গ ভঙ্গিমায় দোষ দর্শন করিয়াছিলেন এবারে তাঁহারদিগের পক্ষেও নৃত্যাগারে উপস্থিত হওয়া উচিত, কারণ অদ্য তিনি সুচারুরূপে সমুদয় বিষয় সম্পন্ন করিবেন তাহার কোন সংশয় নাই, প্রথমতঃ সকল লোকেই কঠিনতর কার্য্য বিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, কিন্তু ক্রমে ব্যুৎপত্তি সহকারে তাঁহারদিগের বিলক্ষণ নিপুণতা হয়, যাহা হউক, বৈষ্ণবচরণ আঢ্য প্রথমোদ্যমে যে প্রকার সাহসের সহিত স্বীয় পারগতা দেখাইয়াছেন তাহাতে ভাবিকালে তিনি যে একজন বিখ্যাত আমিটর হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, অতএব আমরা বিনয় পূর্ব্বক সাধারণকে বিদিত করিতেছি যে তাঁহারা অদ্য সন্ধ্যার সময়ে সান্সশি নৃত্যাগারে গমন করণে আলস্য করিবেন না।

বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়

(১৫ জুলাই ১৮৪৮। . ১ শ্রাবণ ১২৫৫)

বিজ্ঞাপন।—জিলা মালদহের অন্তঃপাতি গৌড় নামক প্রসিদ্ধ রাজধানী যাহাতে বহু বহু বাদশাহগণ বাদশাহী করিয়া গিয়াছেন সেই গৌড়ে কদমরছুল অর্থাৎ রছুলের পদ চিহ্ন যাহাকে গৌড় বাদশাহ আদি পূজ্য করিয়া গিয়াছেন সেই পদাঙ্ক প্রস্তর বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ আষাঢ় তারিখ ডাকাইতেরা ডাকাইতি করিয়াছে, অতএব সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থ বিজ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত পরম বস্তু অথবা পদাঙ্কের তস্করদিগের অনুসন্ধান করিয়া যে কেহ জিলা দিনাজপুরের প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত মৌলবী গোলাম আশগর খাঁ বাহাদুরের নিকট তত্ত্ব জ্ঞাপন করাইবেন তিনি প্রশংসিত সাহেব মৌসুফের নিকট ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি সন ১২৫৫ সাল তাং ২৬ আষাঢ়।

শ্রীরাধামোহন শর্ম্মণঃ।

বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসভা

(২৫ জুলাই ১৮৪৮। ১১ শ্রাবণ ১২৫৫)

আমরা সংবাদপত্র দ্বারা অবগত হইয়া অতিশয় সন্তোষ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি মহারাজা মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর স্বীয় রাজধানী মধ্যে এক ব্রাহ্ম্য সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, প্রায় মাসাবধি হইল তাহার কার্য্য চলিতেছে, প্রতি রবিবারে অধীরাজ বাহাদুর আত্মীয় জনগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত সভারোহণ করিয়া থাকেন, এবং তথায় অন্যান্য বহুলোকেরও সমাগম হয়, তত্ত্ববোধিনী সভার বিজ্ঞবর পণ্ডিত শ্রীযুত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহাশয় ঐ সভায় বেদ পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, ব্রাহ্ম্য বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী, তাঁহার দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার বিস্তর উপকার হইয়াছে, বর্দ্ধমানের রাজসভায় তাঁহার সংযোগ হওয়াতে আমারদিগের নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে যে অধীরাজ বাহাদুরের মনোগত অভিলাষ অবশ্য সিদ্ধ হইবেক, যাহা হউক এই বঙ্গদেশের স্থানে২ বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা ও বেদের মর্ম্ম প্রচার নিমিত্ত সভা সকল অবাদে সংস্থাপিতা হওয়াতে আমরা যেরূপ আনন্দ রসে অভিষিক্ত হইতেছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না,…।

প্রাচীন দিনাজপুরবাসীদের আচার-ব্যবহার

(৩১ আগষ্ট ১৮৪৮। ১৭ ভাদ্র ১২৫৫)

ভ্রমণকারী বন্ধু কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করা গেল।

"দিনাজপুরের লোকেরদের আচার ব্যবহার রঙ্গপুরের লোকের ন্যায় প্রায় সকলাংশে সমান, এখানেও দুঃখিলোকের স্ত্রীজাতিরা চট্ পরিয়া থাকে, এবং ভদ্র পরিবারের রমণীরাও ঋতুবতী হইলে তিন দিবস চট্ বস্ত্র পরিধান করেন, স্ত্রীদিগের পরিধেয় বসন তিন প্রকার, ফোতা নামক বস্ত্র এণ্ডি নামক এক প্রকার পোকার গুটি নির্গত সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহাতে উত্তম বস্ত্র হইতে পারে, ধোকড়া অর্থাৎ কোষ্টা পাটের বস্ত্র, তাহার নাম ম্যাকৃলি, তাহাতে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র করা, বাঁদিপোতা নামক বস্ত্র অত্যন্ত মোটা রঙ্গিল সূতায় প্রস্তুত হয়, তাহাই স্ত্রীলোকদিগের পোসাগী সুট্ এবং বুকের ওড়্না হয়।

এখানকার হিন্দুর মধ্যে অনেক জাতির বিধবা স্ত্রীলোকেরা পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাকে, কিন্তু সেই বিবাহ পরের সঙ্গে প্রায় হয়না ঘরে২ সম্পন্ন হইয়া থাকে, ভাসুর অনায়াসেই ভ্রাতৃবধূকে এবং দেবর বড় ভ্রাতার

বনিতাকে উদ্বাহ করেন, তাহাতে কুলের হানি না হইয়া বরং গৌরব বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যে সকল সতী পতিবিয়োগে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন তাঁহারদিগের শোভা অতি মনোহর, কারণ বামহস্ত শূন্য দক্ষিণ হস্তে অলঙ্কার সতীত্বের বিষয় ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

এ জিলায় জলপথে দস্যুভয় নাই, এবং চুরি ডাকাইতি অতি অল্প হইয়া থাকে, দিনাজপুরের জলবাতাস অতি কদর্য্য, সর্ব্বদাই লোকের পীড়া হয়, বিশেষতঃ বর্ষাকালে রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, আমারদিগের নৌকা প্রায় এক প্রকার হসপিটাল হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে এপর্য্যন্ত কোনরূপ বিড়ম্বনা হয় নাই।

দিনাজপুর। ২৮ শ্রাবণ ১২৫৫।

হুগলীর হরচন্দ্র ঘোষ

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। ২৫ ভাদ্র ১২৫৫)

"সম্পাদক মহাশয়, মালদহের বর্ত্তমান আবকারি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এইক্ষণে অতি প্রশংসিতরূপে স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি ১৮৪৪ সালের নবেম্বর মাসে বোয়ালিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পরে ৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মালদহে আসিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়েন, এইস্থানে ইঁহার আগমনাবধি ক্রমশই আবকারির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বে বাইশ হাজার টাকার অধিক হইত না, হরচন্দ্র বাবু আসিয়া ১৮৪৬।৪৭ সালে অন্যূন পঞ্চান্ন হাজার টাকা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এতদ্রূপ অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের এবম্ভূত অধিক লাভ করাতে কার্য্য কল্পে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে, ঢাকা প্রদেশের পূর্ব্বতন আবকারি কমিস্যনর মহানুভব মৃত ডোনেলি সাহেব এবিষয়ে হরচন্দ্র বাবুর বিস্তর সুখ্যাতি লিখিয়াছেন, ফলতঃ তিনি যথার্থরূপ প্রশংশা প্রাপণের যোগ্য পাত্র তাহাতে সন্দেহাভাব।...

এমত সুযোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতি বিষয়ে রাজপুরুষেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না, যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য তাঁহারা অনায়াসেই অধিক বেতন প্রাপ্ত হয়েন, অথচ এ পর্য্যন্ত ইঁহার বেতন ২০০ টাকার অধিক হইল না,...। ১ ভাদ্র ১২৫৫।"

ডেবিড হেয়ার পুরস্কার

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। ৭ আশ্বিন ১২৫৫)

ডেবড হেয়ার সাহেবের স্মরণীয় মূলধনের উপস্বত্ব হইতে কমিটির মেম্বর মহাশয়েরা পুনর্ব্বার ৭৫ টাকা ব্যয় করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে কোন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তম এসে অর্থাৎ প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকেই উক্ত টাকা প্রদত্ত হইবেক, ঐ এসে ইংরাজী ১৮৪৯ সালের ১ মে তারিখে কমিটির সেক্রেটরী বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের নিকট পাঠাইতে হইবেক, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার পরীক্ষা করিবেন।

নূতন সাময়িক পত্র

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। মঙ্গলবার ৫ আশ্বিন ১২৫৫)

কোন বিশ্বাসি ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগতি হইল, এতন্নগরস্থ কতিপয় বিদ্যোৎসাহি যুবা হিন্দু চন্দ্রিকা যন্ত্র হইতে "হিন্দু ক্রোণিকেল" নামক এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকটন করিবেন, ঐ পত্র ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইবেক, বোধ হয় দুর্গা পূজার পরেই প্রকাশ হইতে পারে, কারণ তদর্থে প্রায় তাবদ্বিষয় প্রস্তুত হইয়াছে, আমরা তাহার অনুষ্ঠানপত্র দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইলাম, যেহেতু তাহা সদভিপ্রায় সম্বলিত ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় অতি উৎকৃষ্টরূপে প্ররচিত হইয়াছে, সম্পাদকদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, এইক্ষণে প্রকাশ করণে প্রয়োজন করে না, পত্র প্রকটিত হইলেই সকলে জানিতে পারিবেন, এতন্মাঙ্গলিক ব্যাপারের অনুষ্ঠানে সকলেই আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন, কারণ মেং মার্সম্যান সাহেব ভগবতীর খর্পরে সমাচার দর্পণ অর্পণ করিলে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তর্পণ পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছিল। বাঙ্গাল স্পেক্টেটর পত্র কিছুদিন সুনিয়মে নিষ্পাদিত হইয়া পরিশেষ উপযুক্ত রূপ সাহায্য বিরহে রহিত হইল, অপিচ জ্ঞানাঞ্জন সম্পাদক মহাশয় জ্ঞানাঞ্জন পত্রকে সজ্জনগণের মনোরঞ্জন ও নয়নাঞ্জন স্বরূপ করিতে না পারিয়া বাণিজ্য কার্য্যের বিপদ রূপ প্রভঞ্জনের প্রভাবেই পলায়ন করিলেন, সুতরাং অধুনা ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় একখানা পত্র

প্রচারিত থাকা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, এবং ইহাতে সাধারণের বিশেষ সাহায্য করা অতি কর্ত্তব্য।…

কতিপয় বন্ধুর দ্বারা অবগত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ভবানীপুরস্থ কয়েকজন দেশহিতৈষি যুবক বন্ধু "জ্যোতির্ম্ময়" নামক এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করণের কল্পনা করিতেছেন, ঐ পত্র কেবল সুসাধু বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়া উদিত হইবেক, সম্পাদকেরা নানাবিধ উত্তম২ রচনা রূপ জ্যোতির্দ্বারা "জ্যোতির্ম্ময়কে" প্রকৃত জ্যোতির্ম্ময় করণের মানস করিয়াছেন,…শুনিতেছি ভবানীপুরের "সুজন বন্ধু" যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইবেক, যে মহাশয়েরা এতৎ কল্পিত বিষয়ে সংযোজিত আছেন আমরা তন্মধ্যে অনেককেই বিশিষ্টরূপেই জ্ঞাত আছি, তাঁহারা তাবতেই উপযুক্ত এবং বিদ্যা বিষয়ে অতিশয় উৎসাহি,…। এইক্ষণে সমাচার পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে দেশমধ্যে কল্যাণের বীজ রোপিত হওনের বিলক্ষণ সুসময় দৃষ্টি করিতেছি, দেশস্থ লোকেরা ইহার সুফল দৃষ্টে রসাস্বাদন গ্রহণে যত যত্নশীল হইবেন ততই মঙ্গলের সম্ভাবনা, কিন্তু এতন্মধ্যে বক্তব্য এই যে ঐ সমস্ত পত্র উৎকৃষ্টতর প্রস্তাব দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেই সুখের বিষয় স্বীকার করিতে হইবেক, নচেৎ যদি অভিনব সহযোগিগণ ঘৃণিত সম্পাদকদিগের ন্যায় ঘৃণিত বিষয়ে আমোদি হইয়া নিয়ত কুৎসা ব্যাপার সকল বিন্যাস করিয়া প্রকাশ করেন তবেই একেবারে চিত্র করিয়া তুলিবেন, জ্যোতির্ম্ময় সম্পাদক মহাশয়েরা এই বিষয়ের লেখ্য নহেন, যাঁহারা নিন্দাবাদে অনুরাগি শুদ্ধ তাঁহারদিগের প্রতি এই উক্তি উক্ত হইতে পারে।

গত ৩ আশ্বিন রবিবার দিবসে শ্যামপুকুর নিবাসী বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক "সংবাদ অরুণোদয়" নামক এক নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকটিত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা পাঠানন্তর সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত হইলাম, যেহেতু তাহার গদ্য পদ্য উভয় রচনা সর্ব্বতোভাবে উত্তম হইয়াছে, বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে আমারদিগের নবীন সহযোগী প্রকাশ্যরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে আপন পত্রে নিন্দাবাদ প্রকাশ করিবেন না, সুতরাং ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে?

বনফুল

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বিজন বিপিনে ফুটেছে সে এক নামহীন বনফুল,
নাহিক তাহার গন্ধবিভব বিখ্যাত কোন কুল।
ঠাঁই পায় নাই প্রমোদকাননে কুলীন ফুলের পাশে,
হেথা আছে তাই অনাদরে পড়ে একাকিনী বনবাসে।
ভক্ত তাহারে চয়ন করিয়া দেবে না দেবতা পায়,
প্রেমিক আদরে উপহার বলে নাহি দেবে প্রেমিকায়।
বিলাসী তাহারে যতনে আনিয়া সাজাবে না ফুলদানী,
রূপের পূজারী কবিরও দৃষ্টি পড়িবে না হোথা জানি।

কেহ তারে নিয়ে গাঁথিবে না মালা মাল্যবদল তরে,
তুচ্ছ বলিয়া নাহি কেহ লবে ফুলশয্যার ঘরে।
তবু আছে তার রূপসম্পদ সুন্দর নিরমল,
উজল বরণ নিটোল গঠন স্নিগ্ধ পেলবদল।
হয় ত তাহারে কাঠুরের মেয়ে তুলিয়া ব্যাকুল করে,
ফুল্ল হৃদয়ে আদর করিয়া পরিবে খোঁপার 'পরে।
সার্থক হবে বিকশিত তার অপরূপ রূপরাশি,
বনবাস-ব্যথা যাবে সে ভুলিয়া পুলক পাথারে ভাসি।

অথবা যাবে সে অনাদরে ঝরে কানন-অন্ধকারে,
কুলমানহীন সে যে বনফুল কেহ না খুঁজিবে তারে।

সর্পিল

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রান্তরের প্রান্ত মিলিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল।

গ্রামে প্রবেশ করিবার আগে পাল্কী থামাইয়া অনন্ত একবার নামিয়া পড়িল, দাঁড়াইল প্রান্তরের দিকে মুখ করিয়া। অতিক্রান্ত পথটি বহুদূর অবধি নজরে পড়ে। যে নিঃসঙ্গ বটগাছটি অনেকক্ষণ আগে ছাড়াইয়া আসিয়াছিল, এতদূর হইতে তাহার অবস্থান আরও করুণ ও রহস্যময় মনে হয়। তার পর দিগন্তে মেশানো পৃথিবীর সীমা। বেলা দশটায় যে ক্ষুদ্র ষ্টেসনটিতে সে অবতরণ করিয়াছিল, তাহাকে অনুসরণ করিয়াই যেন ওই দিগন্ত সেই ষ্টেসনটি পার হইয়া আসিয়াছে। ডাহিনে বামে অর্দ্ধচক্রাকার তরুশ্রেণী ;—পাশাপাশি প্রান্তরটির বিস্তার তিন-চার মাইলের বেশী হইবে না। অদূরে প্রকাণ্ড একটা দীঘির জল চক্ চক্ করিতেছে। তাহারই তীরে কোন্ কৃষকের অস্থায়ী হোগলার ঘর। দিবারাত্রি ওই ঘরে থাকিয়া সে তাহার শস্যভরা কয়েক বিঘা পৃথিবীকে পাহারা দেয়।

করতলের ছায়ায় চক্ষুকে আশ্রয় দিয়া অনন্ত চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পত্র লিখিয়া কেতকী তাহাকে এত দূরে এমন দুর্গম গ্রামে টানিয়া আনিবে কে ভাবিয়াছিল!

কিন্তু দুর্গম গ্রামেও পাল্কী থামিল না। গ্রামবাসীর বিস্মিত দৃষ্টি ও কুকুর জাতীয় কতকগুলি জন্তুর সচীৎকার অভিনন্দন সংগ্রহ করিয়া গ্রাম ছাড়াইয়া পাল্কী জঙ্গলাকীর্ণ কাঁচা পথ ধরিল। থামিল আরও প্রায় আধ মাইল গিয়া।

কেতকীই পাল্কী বেহারা পাঠাইয়াছিল সুতরাং ভুল হইবার কথা নয়। সম্মুখেই কেতকীর আধুনিক বাসগৃহ।

কিন্তু গৃহ বলিয়া চেনা কঠিন। এ যেন রূপধরা পুরাতত্ত্ব।

সেকেলে তিনমহাল বাড়ী, একসারিতে খানচারেক ঘর ছাড়া বাকী সমস্তটাই প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এখানে দাঁড়াইয়া আছে খানিকটা ভাঙ্গা দেয়াল, ওখানে ঝুলিতেছে ছাদের একটু অংশ ও কড়িবর্গার কঙ্কাল,—যে প্রাচীর একদিন গৃহটিকে আড়াল করিয়া রাখিত তাহার চিহ্নমাত্র নাই। চারিদিকে শুধু ইঁটের স্তূপ ও আগাছার জঙ্গল। দেউড়িটা বিপজ্জনক অবস্থায় কোন মতে খাড়া আছে। দেউড়ির সামনে একটি বৃহৎ অশথ তরু বিস্তৃত ছায়া ফেলিয়া স্থানটির অস্বাভাবিক স্তব্ধতা দ্বিগুণ নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

অদূরে একটি মন্দির।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় মন্দিরটি বেশী পুরাতন নয়; কিন্তু ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে ভুল ভাঙ্গে। বুঝিতে পারা যায়, মানুষের যে গৃহ আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, দেবতার এই আবাসটির বয়স তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু আজও জীর্ণতা দেখা দেয় নাই, একটি ইটও খসিয়া পড়ে নাই। কাল যেন দেবতার ভয়ে মন্দিরকে শুধু স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, আঘাত করে নাই।

সিঁড়িটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কীর্ত্তি কালের নয়। কত কাল ধরিয়া কত মানুষের পায়ের আঘাত সিঁড়িটা সহিয়াছে তার ঠিকানা নাই। তাহা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত মানুষ যে দেবতার কাছে পৌঁছিবার কাজে তাহাকে লাগাইতে পারে এইটুকুই আশ্চর্য্য।

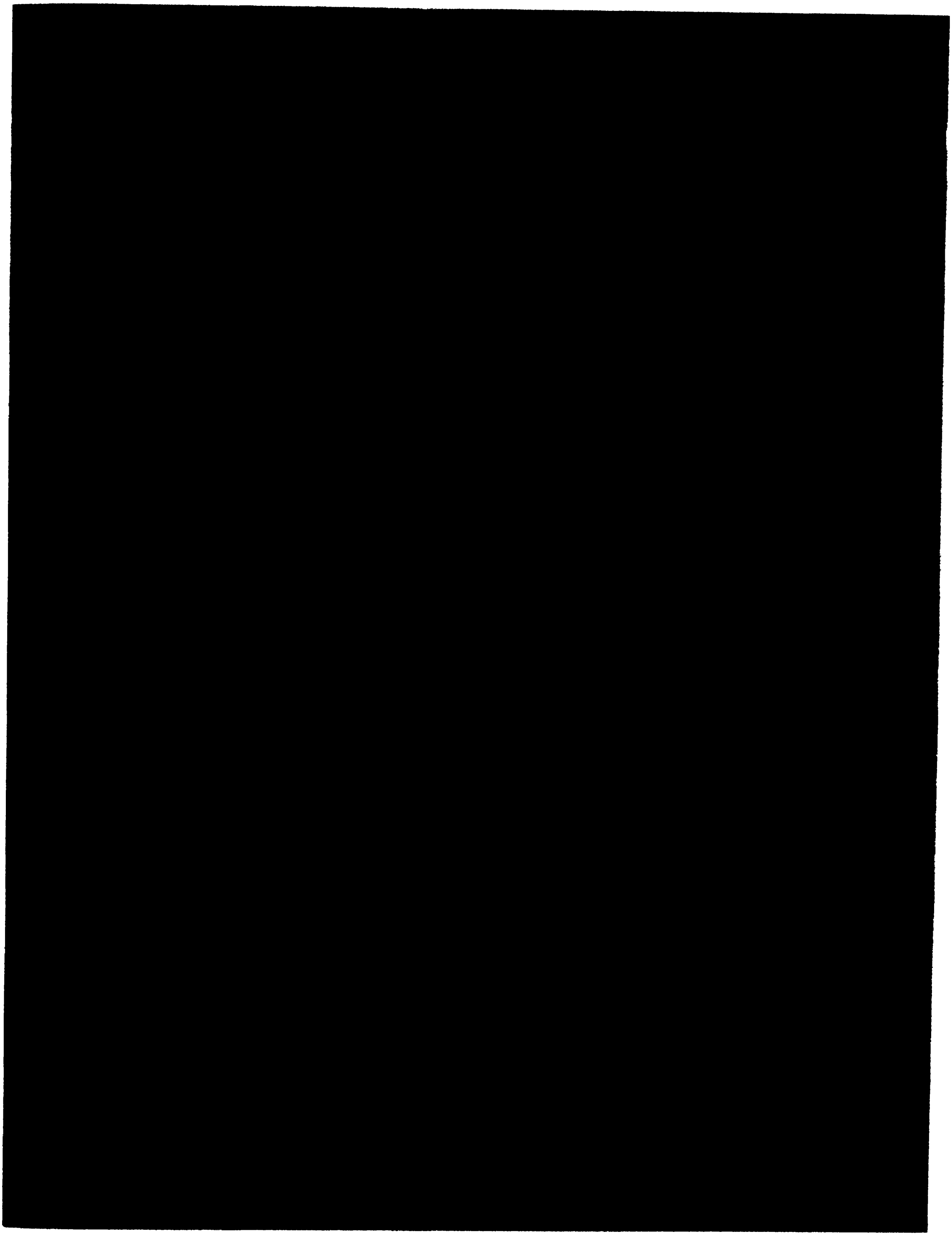
নিবিষ্ট চিত্তে মন্দির দেখিবার ফাঁকে কখন কেতকী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, অনন্ত টের পায় নাই। কেতকী কথা বলিতে সে একটু চমকিয়া উঠিল।

তিন বছর পরে তুমি এলে—

অনন্তের চমক লক্ষ্য করিয়া কেতকী হাসিয়া কথাটা শেষ করিল,—আর বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছ মন্দির!

অনন্তও হাসিল। বলিল, অভ্যর্থনা করার জন্য তুমি দেউড়িতে দাঁড়িয়ে নেই দেখে রাগ হয়েছিল। কেতকী বলিল, দাঁড়িয়ে থাকতাম; কিন্তু তুমি এত আগে এসে পড়বে ভাবিনি। এখানে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়।

ভাল ভাল খাবার ঘুষ পেয়ে বেহারারা উড়ে এসেছে।



ধাত্রী পান্না

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

কিন্তু অত খাবার পাঠিয়েছিলে কেন বল ত? বেড়িয়ে আসতে যদি পাঠিয়ে থাক, তবে ওদের বিলিয়ে দিয়ে বোধ হয় অন্যায় করেছি—

বলিয়া অনন্ত হাসিতে লাগিল। কেতকী বলিল, বিলিয়ে দিয়েছ বেশ করেছ, কিন্তু নিজে পেটভরে খেয়ে নিয়েছিলে তো?

নিয়েছিলাম। আর খেতে খেতে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, আমি কি খেতে ভালবাসতাম সব তোমার মনে রইল কি করে! লেবুর সরবৎটি পর্য্যন্ত তো ভোল নি?

কেতকীর মুখের পাশে রোদ পড়িয়াছিল, একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, যেন কত জন্ম কেটে গেছে, ভোলাই উচিত! তিন বছরেই মানুষের স্মৃতি লোপ হয় এই বুঝি তোমার ধারণা? কি করে চিনলাম ভেবে তো কই আশ্চর্য্য হলে না?

অবিকল এমনিভাবে কেতকী হাসিত, এমনি ভঙ্গীতে কথা কহিত,—প্রত্যেকটি বাক্য তাহার এমন রসাত্মক লাগিত যেন এক একটি সংক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র কাব্য।

অথচ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এত বেশী হইয়াছে যে ওই নিয়াই আর একটু হইলে সে প্রথম কথা আরম্ভ করিয়া দিত। ভারি ছেলেমানুষি শোনাইত তাহা হইলে। মনে হইত এ একটু নূতন ভাবে প্রথাম শারীরিক মানসিক কুশল প্রশ্নটিই সে করিয়াছে। তিন বছর পরে দেখা হওয়ার প্রথম দিকে অসংখ্য ছোটখাট প্রশ্নোত্তরের মধ্যে পরিবর্ত্তনের বিবরণ দাখিল করিতে কেতকীরই কি ভাল লাগিত?

কিন্তু গায়ের রঙ মলিন হইয়া দেহের গড়ন ভাঙ্গিয়া গিয়া কি চেহারাই আজ ইহার হইয়াছে? মুখে লাবণ্যের লেশ নাই, চোখ দুটি স্তিমিত।

অসময়ে গা ধুইতে গিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে, তবু!

এখন যে তুমি স্নান করেছ কেতকী? পূজো করবে না কি মন্দিরে?

আমি ওই মন্দিরে পূজো করব! কেতকী যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মন্দিরে পূজো হয় না?

হয়। ও করে।

এবার অনন্তের আশ্চর্য্যে হইবার পালা। শঙ্কর দেব-মন্দিরে পূজা করে! সেই দেবদ্রোহী বিলাসী শঙ্কর! হঠাৎ সে কোন্ দেবতার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছে?

এটা কোন্ দেবতার মন্দির কেতকী?

কেতকী মাথা নাড়িয়া বলিল, দেবমন্দির তো নয়। ওর মধ্যে দেবতা নেই।

অনন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, বিগ্রহ নেই তো শঙ্কর পূজো করে কার?

পাংশুমুখে কেতকী বলিল, কুগ্রহের পূজো করে। দুষ্টগ্রহের পূজো করে। ওর কথা বাদ দেও।

সেটা কঠিন কাজ। কেতকীর স্বামীর সম্বন্ধে এত বড় কথাটা বাদ দেওয়া যায় না। অনন্ত বলিল, কুগ্রহ দুষ্ট গ্রহের কথাটা আমায় বুঝিয়ে দাও তো, শুনি।

কেতকীর চোখ ছল ছল করিয়া আসিল, কি বোঝাব? সাতপুরুষের পাগলামি ওর কাঁধে ভর করেছে। এখানে এসে থেকে এমন ভয়ঙ্কর কালীভক্ত হয়েছে যে সে আর বলার নয়। ও মন্দিরে কালীমূর্ত্তি আছে, কিন্তু ও কালীমার পূজো করে না, নিজের পাগলামীর পূজো করে।

অনন্ত একটু ভাবিয়া বলিল, চল মা কালীকে দর্শন করে আসি।

কেতকী সভয়ে বলিল, না।

না কেন?

কেতকীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছিল, ঢোঁক গিলিয়া সে বলিল, ভয় পাবে। মা কালী বলে চেনা যায় না,—মনে হয় খাঁড়া হাতে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। দু'চোখ হীরার মত জল জল করছে। দিনের বেলাও মন্দিরে ভাল করে আলো যায় না—প্রদীপ জেলে দেখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার দু'চোখে দু'টো প্রদীপ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। প্রথম দিন একা গিয়ে ওই দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

কেতকী একবার শিহরিয়া উঠিল। এবং তাহাতেই তাহার শরীর ও মনের বর্ত্তমান অবস্থা অনন্তর কাছে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া গেল।

কিন্তু সে কিছুই বলিল না। কেতকীর আত্মসম্বরণের প্রক্রিয়াটা নীরবে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

চলো, ঘরে যাই,—কেতকী বলিল।

চলো।···কিন্তু চিঠিতে তুমি তো আমায় কোন খবরই দেও নি! পদে পদে অপ্রস্তুত হচ্ছি।

এ-সব কি চিঠিতে জানানোর মত খবর?

না, তা নয়। অনন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। এ-সব মানে *যে সব খবর তার অতি সামান্যই সে জানিয়াছে, সেটুকুও চিঠিতে লেখা কেতকীর পক্ষে সত্যই অসম্ভব। এ বাড়ীর ছবি কি চিঠিতে ওঠে! কেতকীর এই শীর্ণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবির বর্ণনা* কেতকীর ভাষাতে নাই—চিঠির ভাষাতে তো একেবারেই নাই।

দেউড়ির নীচে আসিয়া কেতকী হাসিয়া বলিল, অমন করে ওপোর দিকে তাকাচ্ছ যে? আমি যখন সঙ্গে আছি ভয় নেই।

তুমি সঙ্গে থাকলে বুঝি মাথায় ইট ভেঙ্গে পড়তে পারে না?

কই আর পারে? তিন বছর এর তলা দিয়ে যাতায়াত করছি, চূণবালিও তো কোন দিন মাথায় খসে পড়েনি। জান, এ বাড়ীর বিপদ আমায় এড়িয়ে চলে।

অনন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তবে এইখানে দাঁড়িয়ে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কেতকী। এ ভাঙ্গা দেউলে এসে নীড় বাঁধার প্রয়োজন হল কেন তোমাদের?

সাত পুরুষের ভাঙ্গা দেউল ছাড়া মানুষ আর কোথায় শান্তি পাবে বল?

অনন্ত বিচলিতভাবে বলিল, এমন ভয়ানক শান্তির দরকার পড়ল কার? তোমার না শঙ্করের?

ওঁর। স্বামীর শান্তিতেই স্ত্রীর শান্তি।

এ কথার সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন, অনন্ত নীরবে চলিতে আরম্ভ করিল। ইটের স্তূপ বেড়িয়া আঁকাবাঁকা সরু পথ ঘরগুলি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে—শঙ্কর ও কেতকীর পায়ে পায়েই পথটি গড়িয়া উঠিয়াছে বোধ হয়।

অনন্ত ভাবিতে লাগিল, শঙ্করের জীবনে যে শান্তির অভাব ঘটিয়াছিল সে তো তাহা টের পায় নাই? সহরের বাস তুলিয়া দিয়া জমিদারীতে গিয়া বাস করিবে অকস্মাৎ যে সময় শঙ্কর এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিল, তার কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই তাহার মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু তার কারণ যে অশান্তি এরূপ অনুমানের কোন সঙ্গত কারণই ছিল না। যে গাম্ভীর্য্য তাহার আসিয়াছিল তাহা ছিল প্রশান্ত, জীবনের সর্ব্বপ্রকার অগভীর আনন্দ উৎসবে যে ক্রমবর্দ্ধমান বিমুখতা দেখা দিয়াছিল তাহা ছিল প্রশান্ত। মনে হইয়াছিল, সে ভাবিতে শিখিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের যে একটি করিয়া নিজস্ব অন্তর্জ্জগৎ আছে ধীরে ধীরে তাহার সন্ধান পাইতেছে। অনেকের জীবনেই এ রকম ঘটে। শুধু বাঁচিয়া থাকার মধ্যেই এমন কতকগুলি চিরন্তন রহস্য আছে সচরাচর যাহার খবর সব মানুষ রাখে না; কিন্তু তুচ্ছ উপলক্ষ্যে হঠাৎ একদিন সেগুলি মানুষকে চিন্তিত করিয়া তোলে, বিচলিত করিয়া দেয়। শঙ্করের জীবনেও এমনি কিছু ঘটিয়াছে মনে হইয়াছিল। উপলক্ষ্যটাও কিছু কিছু সে অনুমান করিতে পারিয়াছিল বৈ কি!

সে যে শঙ্করের অশান্তির বহিঃপ্রকাশ এ কথা কিন্তু কল্পনা করাও চলে নাই।

অথচ নিদারুণ অশান্তিতেই যে তাহার দিন কাটিতেছিল, আজ আর তাহাতে সংশয় করা যায় না। এখানে কি মানুষ বাঁচিতে পারে যে, সাধ করিয়া অকারণে এখানে সে বাসা বাঁধিয়াছে! বেশী দিন হয় নাই, কত টাকা খরচ করিয়া বাগান-ঘেরা ছবির মত বাড়ী কিনিয়াছিল, বিলাসের আয়োজনের কোন অভাব রাখে নাই। সহরের সব রকম সুখ সুবিধা সে সেখানে লাভ করিত, শিক্ষিত মার্জ্জিত নরনারীর সঙ্গ পাইত, হাসি ও সঙ্গীতে সুমধুর সন্ধ্যা যাপন করিত। আর পাইত কেতকীর ভালবাসা। এখনকার এই শীর্ণা সন্ত্রস্তা কেতকীর ভালবাসা নয়, সে যখন ছিল হাস্যমুখী কল্যাণী বধূ।

সে জীবন পিছনে ফেলিয়া আসিয়া অকারণে শঙ্কর এখানে তাহার সমাধি খুঁজিয়া নেয় নাই। আগাছা কাটাইয়া ইটের স্তূপ সরাইয়া ঘর ক'খানার একটু সংস্কার করিবার ইচ্ছারও তার এখন অভাব! আধুনিকতম আবেষ্টনী হইতে ছুটিয়া আসিয়া ধূলিসাৎ শতাব্দীর গৌরবে সে মুখ গুঁজিয়া দিয়াছে।

শঙ্করের সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দিন সে যে কাণ্ড করিয়াছিল, তাহাতেই তাহাকে পাগল মনে হইয়াছিল; কিন্তু ইহার তুলনায় সে পাগলামী কত তুচ্ছ!

সে রাত্রির কথা তোমার মনে আছে কেতকী?

কোন্ রাত্রির কথা ?

শঙ্করের অসুখ হয়েছিল, বিছানার দুপাশে বসে আমরা রাত জেগেছিলাম ?

—পড়ে বৈ কি মনে। সে অসুখ তো আর ভাল হ'ল না। দু'মাস ছটফট করে পাগলের মত এখানে ছুটে এল।···পরদিন তোমার জাপান যাবার কথা ছিল।

অনন্ত চিন্তিতভাবে বলিল, হ্যাঁ। শঙ্কর ঘুমোলে বিদায় দিতে তুমি আমার সঙ্গে গেট পর্য্যন্ত এসেছিলে। কি সব অদ্ভুত কারণ দেখিয়ে চিঠি লিখতে বারণ করেছিলে এখনো স্পষ্ট মনে আছে কেতকী।···বাকী রাতটুকু শঙ্কর ঘুমিয়েছিল ?

এতদিন পরে কি প্রশ্ন !

মাথা নাড়িয়া কেতকী বলিল, না। ফিরে গিয়ে দেখি বিছানায় উঠে বসে নিজেই কপালে বরফ ঘষছে।

খুব ধীরে ধীরে হাঁটিলেও এতক্ষণে তাহারা ঘরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল।

অনন্ত গলা নামাইয়া বলিল, সেদিন হঠাৎ ওর কি হয়েছিল আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না কেতকী।

কেতকী বলিল, মাথার মধ্যে ভূমিকম্প হয়েছিল।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনন্ত যেন ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা চোখে সহাইয়া নিতে লাগিল। দারিদ্র্যকে ঘরের মধ্যে সযত্নে বরণ করিয়া নেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি জিনিষ যেন অভিনয় করিতেছে,—দারিদ্র্যের। তক্তপোষে কম্বলের শয্যা—কম্বলটা পুরু শালের মত দেখিতে এবং সম্ভবতঃ খুবই কোমল। ঘরের মাঝখানে বেতের একটি ক্ষুদ্র কৌচ। মেঝে জুড়িয়া ছেঁড়া বিবর্ণ গালিচা পাতা, শঙ্করই হয় ত একদিন যাহা তিন-চারশ' টাকায় কিনিয়াছিল। উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষিয়া কপাটভাঙ্গা এক আলমারি বই।

খদ্দরের মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া এক প্রান্তে কার্পেটের আসনে সিধা হইয়া বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছে স্বয়ং শঙ্কর। ছোট করিয়া চুল ছাঁটিয়া মাথার পিছনে সে স্থূল শিখা রাখিয়াছে, কপালে আঁকিয়াছে রক্তচন্দনের স্বস্তিক।

কে, অনন্ত ? বলিয়া সে ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বইটা সশব্দে বন্ধ করিয়া বলিল, তুমি আসবে আশা করি নি। তারা ! তারা ! কত অদ্ভুত ঘটনাই তোমার পৃথিবীতে ঘটে !

কি অভ্যর্থনা ! অনন্ত হতবাক্ হইয়া গেল।

কেতকী বলিল, আমি ওকে আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম।

বেশ করেছিলে, কিন্তু কথাটা সময় মত আমায় জানানো বুঝি তুমি উচিত বিবেচনা কর নি ?

স্বামীর অসম্ভব গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কেতকী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, না। সময় মত জানালে তুমি ওকে আসতে বারণ করতে।

শঙ্কর একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল ; তারা, তারা, তোমার সন্তানকে সবাই কি ভুলই বোঝে মা ! আসতে বারণ করতাম না কেতকী। অভ্যর্থনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আমিও সাদর আহ্বান জানাতাম। ও তোমার বাল্যবন্ধু হতে পারে ; কিন্তু বেশী বয়সে কি বন্ধুত্ব হয় না ? এসো অনন্ত, জুতো খুলে ঘরে এসে বোস'।

জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া অনন্ত বেতের কৌচটাতে বসিল। স্বামীর মন্তব্যের কোন জবাব না দিয়া কেতকী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি স্নান করবে ?

অনন্ত বলিল, না।

বারান্দায় জল আছে, মুখ হাত ধুয়ে নাও তবে। আমি চা করিগে'। coffee খাবে ?

অনন্ত বলিল, coffee !

কেতকী মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। হাই তুলিয়া শঙ্কর বলিল, তারা, তারা ! শুধু কফি নয় অনন্ত, কেক পাবে, পুডিং পাবে, স্যাণ্ডুইচেস্ পাবে। আর—আর একান্তই যদি খেতে চাও, কালটাল, veal, porterhouse steak সব ও তোমায় খাওয়াতে পারবে।—বলিয়া শঙ্কর মুখ বাঁকাইল।

অনন্ত হাসিয়া বলিল, কি যে তুমি বল শঙ্কর !

শঙ্কর বলিল, কি বলি ! ও কি হিন্দুর মেয়ে ? ও সব পারে। চা'টা খাইয়ে অর্গান বাজিয়ে ও ঠিক তোমায় গান শোনাবে, দেখো। ও না পারে কি ?

অনন্ত বিস্মিত হইল। মৃদুস্বরে বলিল, ওর গান তোমার আর ভাল লাগে না শঙ্কর ?

শঙ্কর তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভাল লাগে? অপমান বোধ হয়! পঁচিশ বছর আগে এ বাড়ীর বৌ অমন গান গাইলে তার কি করা হ'ত জান? গলা টিপে গান বন্ধ করে জন্মের মত বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। সোণাগাঁর চৌধুরী বাড়ীর বৌ, সে গাইবে প্রেমের গান!

অনন্ত সত্যই বিস্মিত হইয়া বলিল, প্রেমের গান গায়! এখানে!

শঙ্কর আনমনে আবার বইটা খুলিয়াছিল, কম্পিত হস্তে কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া বলিল, ও যখন গান ধরে অনন্ত, এ ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ক্রুদ্ধ মুখ দেখা দেয়। সব মুখ আমার চেনা। বাবার মুখ ওই ওখানে ফুটে ওঠে,—আঙ্গুল বাড়াইয়া দক্ষিণের দেয়ালের একটা অনির্দ্দিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, সে কি ভৎর্সনা তাদের চোখে অনন্ত, একটু তাকিয়ে থাকলে আপনা থেকে মাথা নীচু হয়ে যায়। সাদা ঠোঁট নেড়ে ফিস্ ফিস্ করে তারা আমাকে বলে, কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার!

অনন্ত প্রত্যেকটি দেয়ালে দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল। কিই-বা দেখিবার আছে দেয়ালে? শ্যাওলা-ধরা দেওয়ালের উপর চুণকাম করার ফলে যে আবছা অদ্ভুত চিত্রগুলি দেয়ালের গায়ে ফুটিয়া আছে, মানুষের মুখের সঙ্গে তাহাদের কোন সাদৃশ্যই আবিষ্কার করা যায় না।

তবু যেন শঙ্করের পাগলামীতে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। বলা কি যায়! শঙ্করের মুখেই তাহার পিতৃপুরুষের ইতিহাস সে শুনিয়াছে। আত্মার তৃপ্তি বলিতে যাহা বোঝায় তার সঙ্গে সেই মানুষগুলির সুদূরতম পরিচয়ও ছিল না! কেতকীর গানের অপমানে জাগিয়া উঠিয়া তাহারা যদি কোন ঘরের দেয়ালে ভ্রূকুটিভরা মুখে উঁকি দিতে পারে—এ ঘরের দেয়ালে দেওয়াই সম্ভব।

শঙ্কর একাগ্র দৃষ্টিতে অনন্তকে দেখিতেছিল, হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিল, এ' কথাটা ওকে বালো না ভাই, ভয় পাবে। ও ভারি ভীরু।

তা জানি।

করে কি জান? রাত্রে উঠে এসে জানালা দিয়ে আমায় দেখে যায়। আমি বেঁচে আছি এইটুকু জানলেই যেন ওর ভয় কমে!

অনন্ত শঙ্কিত হইয়া বলিল, রাত্রে ও একা থাকে না কি? থাকে বৈ কি, ওর মহাল যে ভিন্ন।

অনন্ত বুঝিতে না পারিয়া বলিল, মহাল কি?

শঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—মহাল জানো না!—আচ্ছা, বলি তোমায় বুঝিয়ে। এ চৌধুরী বংশের কেউ কোন দিন স্ত্রীর আঁচল পেতে ঘুমোয় নি ভাই। সে দীনতা এ বংশের রক্তে নেই। নিজের মহলে এ বাড়ীর বৌ প্রদীপ জ্বেলে রাত কাটিয়েছে চিরদিন,—স্বামীর খুসী হলে দর্শন দিয়েছে, খুসী না হলে দেয় নি।

অনন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, স্ত্রীকে ভালবাসা এ বংশের রীতি নয়, না?

নাঃ, বলিয়া শঙ্কর হাসিল।—মেয়ে-মানুষকে আমরা জয় করি, তার সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ের কারবার করি না। জানো, আমার এক পূর্ব্বপুরুষ রাজা ছিলেন। নিজের হৃদয়ে রাজত্ব করতে না পারলে আর রাজবংশে জন্মান কেন?

সাবান ও তোয়ালে দিতে কেতকী যে দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। নজর পড়িতে শঙ্কর একটু দমিয়া গেল।

কেতকী মৃদুস্বরে বলিল, নিজের হৃদয়-রাজ্য থেকে কি রাজস্ব তুমি বৎসরান্তে সংগ্রহ কর শুনতে পাই কি?

শঙ্কর নরম সুরে বলিল, শুনলে বুঝি আমার কথা সব?

না, সব শুনি নি। যেটুকু শুনেছি তাই ঢের। কিন্তু একটা কথা তুমি জেনে রেখো, যে রাজ্যে শুধু বালি ধু ধু করছে, তার অধিকার নিয়ে কোন মেয়েমানুষ আজ পর্য্যন্ত মারামারি করেনি। এই বলিয়া সে আপন মনে একটু হাসিল। শঙ্করকে কঠিন কথা বলিতে পারিলে সে যে তৃপ্তি পায়, অনন্তর কাছে তাহা আর গোপন রহিল না।

এ যেন তাহারি দুর্গতি এমনি ব্যথা বোধ হয়। শত্রুকেও আঘাত করা চিরদিন কেতকীর আয়ত্তাতীতই ছিল, নিজের স্বামীকে ঘা দিয়া সে আজ হাসিতে পারে!

অনন্ত একটা নিশ্বাস চাপিয়া গেল।

কেতকী অনন্তকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বাল্তির কাছে সাবান আর তোয়ালে রইল। মুখ হাত ধোবে এস। তোমার সুটকেশের চাবিটা দাও, কাপড়-জামা বার করে দি'।

চাবি নিয়া কেতকী চলিয়া গেলে শঙ্করের দুই হাতের

দশটা আঙুল সজোরে পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিল। হতাশ ভাবে সে বলিল, দেখলে অনন্ত! চোখ রাঙিয়ে চলে গেল, ধমক দিতে পারলাম না। দেখলে!

অনন্ত চুপ করিয়া রহিল।

চৌধুরী বংশের ছেলে আমি, স্ত্রীর কড়া কথা চুপচাপ সহ্য করলাম! তারা! তারা! কি লজ্জাই আমার কপালে লিখেছিলি মা?

একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্যে সন্ধ্যা নামিয়া আসে।

পূবের জানালার শিক ধরিয়া কেতকী বহুক্ষণ নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যে গ্রামের ভিতর দিয়া এখানে আসিতেছিল তার চেয়ে কাছে বোধ হয় অন্য গ্রাম আছে, অনেকগুলি কুকুরের ডাক অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বিকালে যে ঠাণ্ডা বাতাসটি বহিতেছিল হঠাৎ কখন তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে খেয়াল থাকে না। মনের মধ্যে শুধু পাক খায় শৃঙ্খলাহীন অবাস্তব চিন্তা।

তিন বছর ধরিয়া বান্ধবী ও বন্ধু যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহা যেন ঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারা যায় না।

কেতকীর চুলে যে মড়ক লাগিয়াছে খানিক আগে অনন্ত তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। কি আগুন জ্বলিতেছে ওর মাথায় কে জানে? তালু কতখানি তপ্ত হইয়া ওঠায় চুল ঝরিয়া পড়িতেছে, মাথায় হাত দিয়া তাহা অনুভব করিবার জন্য হঠাৎ একসময় অনন্তর মন কেমন করিয়া ওঠে। কিশোর বয়সে কেতকী একদিন তাহার পায়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়াছিল। অনেক দিনের কথা। কেন প্রণাম করিয়াছিল আজ মনে পড়ে না, বোধ হয় কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করিতে সেদিন যে খেয়াল থাকে নাই, সে কথাটা স্পষ্টই মনে পড়ে। বিদায় নেওয়ার সময় এবার যদি কেতকী প্রণাম করে—অকারণেই প্রণাম করে—প্রণাম করিতে হয় বলিয়া নয়,—মাথায় হাত রাখিয়া সে আশীর্ব্বাদ করিবে।

কিন্তু কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে?

ইহার কল্যাণের কোন্ পথটা আজ খোলা আছে? মনে মনেও কোন আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলে আজ ব্যঙ্গের মত শোনাইবে না?

কেতকী কথা কহিল।

সূর্য্য ডুবতে ডুবতে না ডুবতে পূব দিকে কি মেঘ করে এল ছাখো! রাত্রে বোধ হয় খুব ঝড় হবে। কি ধুমসো কালো মেঘ!

অনন্ত বলিল, ঝড় হবে বলছ কেন? শুধু বৃষ্টিও তো হতে পারে!

কেতকী মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, তা নিশ্চয় পারে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ঝড় হবে। তা ছাড়া কি গুমোট করেছে দেখেছ? আমি রীতিমত ঘামছি।

কাণ পাতিয়া শুনিয়া বলিল, বাইরে কারা কথা বলছে?

দেখি—

বাহিরে গিয়া অনন্ত দেখিল শঙ্কর বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে, বারান্দার নীচে যুক্তকরে দু'জন কৃষকশ্রেণীর লোক। একজন একটি হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠার গলরজ্জু ধরিয়া আছে।

শঙ্কর আপনা হইতে বলিল, রাত্রে মার কাছে বলি হবে অনন্ত। জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়াই নিয়ম, কিন্তু বলির কথা সারাদিন স্রেফ্ ভুলেছিলাম, অসময়ে লোক পাঠিয়ে একটার বেশী পাওয়া গেল না। সমস্ত রাত্রি আজ পূজো করব।

কালী পূজা?

শঙ্কর প্রশান্ত হাসি হাসিল,—তোমরা বেটিকে কালী বলেই জানো, আমরা বলি শক্তি। যার মহাপ্রলয়ের শক্তির সংযমে সৃষ্টির স্থিতি। এক স্তনে বিষ সঞ্চিত রেখে অন্য স্তনের অমৃতে যে জগৎকে পালন করছে।

ওই পাঁঠাটিকে ছাড়া।

মহাজ্ঞানীর মত মুখ করিয়া শঙ্কর বলিল, ধ্বংস তুমি চেনো না অনন্ত, মৃত্যুর স্বরূপ কিছুমাত্র বোঝ' না। মার ভাণ্ডার থেকে কি কিছু হারায়? যে পোকাটিকে তুমি না জেনে পায়ের নীচে পিষে দেও, সেও না। আজ পাঁঠাটির বলি হবে, কাল কি মা আমার ওকে পালন করবেন না?

বলিয়া বারান্দার নীচে নামিয়া শঙ্কর যেন সস্নেহেই পাঁঠাটির গলদেশ চুলকাইয়া দিতে লাগিল।

ক্ষণকাল নীরবে তাহার কাণ্ড দেখিয়া অনন্ত প্রশ্ন করিল, কিন্তু একাদশীর দিন কি কালীপূজো হয়?

মার পূজার আবার তিথি অতিথি কিছে সাহেব? মুখ না ফিরাইয়াই শঙ্কর এই জবাব দিল।

তা বটে!

অনন্ত কেতকীর ঘরে ফিরিয়া গেল।

শঙ্কর কি পাগল হয়ে গেছে কেতকী?

কেতকী জানালা ছাড়িয়া নড়ে নাই—এই সুস্পষ্ট প্রশ্নে বিচলিত ভাবে সে ঘুরিয়া দাড়াইল।

তা তো জানি নে। আমার মনে হয় ওঁর রক্তে এই বিকার ছিল, হঠাৎ একদিন প্রকাশ পেয়েছে। এখানে আসবার আগে আমি একটা পার্টি দিয়েছিলাম। একটা দরকারী কথা শুনতে আমায় তেতালার সেই ছোট ঘরে ডেকে নিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। সেই আমার প্রথম শাস্তি। পরে আর কাঁদি নি, সেদিন কেঁদেছিলাম, আর ভেবেছিলাম জাপান কতদূর?

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, বোস কেতকী। বসে বল।

কেতকী বসিয়া বলিল, তুমি তো ছিলে না, শেষ দু'মাসের ইতিহাস শোন। দু'দিন তিনদিন অন্তর রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে জেগে উঠত। কাঁপতে কাঁপতে বলত, কেতকী ওঠো, আলো জ্বালো শীগগির। রক্তে আমি নেয়ে উঠেছি। ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বালতাম। দেখতাম, ঘামে ওর সর্ব্বাঙ্গ ভেসে গেছে। স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে ও বার বার শিউরে উঠত। গগন-ছোঁয়া কালী-মূর্ত্তি, প্রকাণ্ড জিভ বুকে এলিয়ে পড়েছে, দুক'ষ বেয়ে স্রোতের মত রক্ত ঝরছে—এর পায়ের কাছে স্বপ্নে ও দিত নরবলি!

কেতকী জানালার কাছে সরিয়া গেল। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, সেই থেকে আমায় এখানে এনে ফেলেছে। একটা ঝিকে পর্য্যন্ত কাছে থাকতে দেয় না, এক-একদিন রাত্রে আমার এমন ভয় করে!—যে তাড়াতাড়ি মেঘ বাড়ছে রাত্রে না জানি কি ঝড় বৃষ্টিই হবে!

অনন্ত বলিল, ঝড় বৃষ্টি হওয়া আর আশ্চর্য্য কি।

আশ্বিনের ঝড় কালবৈশাখীর চেয়ে ভয়ানক হতে পারে, তা জানো?

সুরটি তাহার একটু melo-dramatic। আগামী ঝড়ের চিন্তা যে তাহাকে বিশেষ বিচলিত করিয়াছে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

অনন্ত সহজ ভাবে বলিল, তা নিশ্চয় পারে। কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে কি সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না? অন্ধকার হয়ে গেল যে!

কে জ্বালবে সন্ধ্যাদীপ? আমি? কাজ নেই সন্ধ্যাকে অমন লজ্জা দিয়ে! বলিয়া কেতকী হাসিল, চাকর লণ্ঠন জ্বেলে আনছে।

চাকর বোধ হয় ওই কাজেই ব্যাপৃত ছিল, অল্পক্ষণ পরেই ঘরে আলো দিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে কি পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়া গেল বলিবার নয়। ঘর আলো হওয়ামাত্র বাহিরের অন্ধকার গাঢ় হইয়া ধ্বংসপুরীকে নিজের মধ্যে যেন সম্পূর্ণ লুপ্ত করিয়া দিল। অনন্তর মনে হইল একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্নের শেষে কেতকীর তিন বৎসর পূর্ব্বেকার ঘরখানাতেই সে জাগিয়া উঠিয়াছে;—এ ঘরের চারিদিকে ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপ নাই, আগাছার জঙ্গল নাই, আছে ফুলের বাগান এবং বাগানের শেষে সহরের জনবহুল আলোকিত পথ।

পাশের ঘরে বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ও চাকর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমরা যাচ্ছি মা।

কেতকী বলিল, সব ভাল করে ঢেকে রেখেছ ঠাকুর? আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।

—অনন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, খেয়ে নিয়ে তুমিও এদের সঙ্গে চলে যাও। কাছারি-বাড়ীতে এরা তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দেবে।

অনন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন? এখানে শোবার ঘর নেই?

আছে। কিন্তু তুমি যাও। এই ভাঙ্গা বাড়ীতে রাত কাটাবে কোন্ দুঃখে?

কেতকীর পাংশু-মুখের দিকে চাহিয়া অনন্ত হাসিয়া বলিল, বেচারীরা ভয়ে ভয়ে চারি দিকে চাইছে, দরকার না থাকলে ওদের ছুটি দাও কেতকী।

তুমি যাবে না?

তুমি যদি যাও, যেতে পারি। যাবে?

কেতকী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা, তোমরা যাও ঠাকুর।

অনুমতি পাওয়ামাত্র তাহারা এমনভাবে প্রস্থান করিল যে অনন্ত হাসি চাপিতে পারিল না।

কেতকী ম্লান মুখে বলিল, তুমি হাসছো, আমার যা হচ্ছে ভগবান জানেন। কি থম্‌থম্‌ করছে চারিদিক!

অনন্ত হাসি বন্ধ করিল।

হাসা তাহার উচিত হয় নাই।

বাজনা নাই, ভক্তের কোলাহল নাই, একক পুরোহিতের নীরব পূজা। রাত্রির সঙ্গে গুমোট বাড়িয়াছে। তারার জগতে এখন মেঘের পরিপূর্ণ অমাবস্যা। কোথাও যেন শব্দ নাই, জীবনের স্পন্দন নাই, নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির সামনে ধ্যানস্থ ভক্তের মত সমস্ত জগৎ যেন একটা ভয়ঙ্কর অবরুদ্ধ শক্তির মুক্তি পাইবার প্রতীক্ষায় সমাধি পাইয়াছে।

মাঝে মাঝে এক একটা রাত্রিচর পাখী ডাকিয়া ওঠে, বটগাছে দু'টি তক্ষক পালা করিয়া বীভৎস আর্ত্তনাদ করে, মন্দিরের গায়ে ছোট ছোট চতুষ্কোণ ফাঁকগুলিতে যে বন্য কপোতেরা আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা পাখা ঝাপটায়, মন্দিরের পিছনে জঙ্গলাকীর্ণ শুষ্কপ্রায় দীঘিতে ছপ্‌ ছপ্‌ করিয়া কি যেন হাঁটে। একটা বড় গুবরে পোকা দেবীকে ঘিরিয়া বোঁ বোঁ করিয়া পাক্‌ খাইতে খাইতে বারকয়েক এক দিকের দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া মেঝেতে পড়িয়া যায়। কিন্তু এই সব বিচিত্র শব্দে ও অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর ডাকে স্তব্ধতা বাড়ে বই কমে না।

শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া অনন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল! দেবীকে দক্ষিণে রাখিয়া সে পাশাপাশি হইয়া বসিয়াছে, ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসির আভাস, অর্দ্ধনিমীলিত চোখে স্তিমিত চাহনি। প্রশস্ত কপালে যেন অনুর্ব্বর প্রান্তরের কঠোরতা। বলি হইয়া গিয়াছিল, প্রতিমার সামনে ছিন্ন ছাগমুণ্ডের নৈবেদ্য ও একপাত্র শোণিতের পানীয়। প্রতিমার চোখদুটি আগুনের মত জ্বলিতেছে, কিন্তু রক্ত তিনি একবিন্দুও পান করেন নাই। শঙ্করের কপালেই একটি রক্তের ফোঁটা জমাট বাঁধিয়া আছে।

জামার হাতায় টান পড়িতে অনন্ত সচেতন হইয়া উঠিল। চাহিয়া গ্যাখে, কেতকী কাঁপিতেছে।

চলে এসো। আমার ভয় করছে।

কথাটা শঙ্করের কাণে গেল।

ভয় করছে কেতকী? মার কাছে অভয় প্রার্থনা কর।

পুনরায় অনন্তকে টানিয়া কেতকী বলিল, এসো।

শঙ্কর বলিল, মাকে প্রণাম করে যাও কেতকী। এসো, মার মাথার সিঁদুর তোমায় পরিয়ে দিই। মার দয়ায় সব ভয় ভুলে যাবে। মা আমার সকলকে ক্ষমা করেন—সকলকে।

এ যেন ছাগশিশুর চেয়ে অসহায়ের উপর হত্যার চেয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার। কেতকী গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিল, অনন্ত তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, মনে মনে প্রণাম কোরো কেতকী। মা মনের প্রণামেই খুসী হন। চলো।

আলোটা তুলিয়া নিয়া কেতকীর হাত ধরিয়া অনন্ত সাবধানে ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল। দুজনে একসঙ্গে নামার মধ্যে যে বিপদ বেশী, এ খেয়াল তাহার ছিল না।

কিই বা এমন বিপদ? তিন হাত নীচে আছাড় খাইলে মানুষ মরে না।

সাপের কামড়ে বরং মরিলেও মরিতে পারে।

দেউড়ির নীচে তিন চার হাত লম্বা একটা কালো মোটা সাপ টান হইয়া শুইয়া ছিল, আলো চোখে পড়িতে আধ হাত উঁচু ফণা তুলিয়া স্থির হইয়া রহিল।

দুজনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কেতকী ফিস ফিস করিয়া বলিল, নড়ো না, আলো নেড়ো না। ছুটে এসে ছোবল দেবে।

অনন্ত নড়িল না, আলোও নাড়িল না, মৃদুস্বরে বলিল, এই ভদ্রলোকটির সন্ধানেই চারি দিকে চঞ্চলভাবে তাকাচ্ছিলে বুঝি? আমি ভাবছিলাম মন্দির থেকে নেমে এসেও তোমার ভয় কমে নি। কতক্ষণ পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে উনি পথ দেবেন?

দু'এক মিনিট।

অভিজ্ঞতা আছে দেখছি। কিন্তু কেতকী, এ বাড়ীর এইসব বিপদও কি তিন বছর ধরে তোমায় এড়িয়ে চলেছে?

কেতকী মৃদু হাসিল, সাপ আর বিপদ কি!

সাপ যে বিপদ নয় সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রমাণ পাওয়া গেল। কেতকীর দুই হাতের মধ্য দিয়া ওমনি মোটা আর একটি সাপ সঙ্গীর কাছে আগাইয়া গেল।

কেতকী বলিল, ওর বৌ। ভারি শান্ত।

তা দেখতেই পাচ্ছি। এখানকার যমরাজাও ভারি শান্ত। স্বামীর গায়ের উপর দিয়া পিছলাইয়া গিয়া শান্ত সর্পবধূ একটা ইঁটের স্তূপে ঢুকিয়া পড়িল। ফণা নামাইয়া স্বামীটিও তাহাকে অনুসরণ করিল।

কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলন বেচারীর অদৃষ্টে ছিল না। ইঁটের স্তূপের কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই একটা আস্ত ইঁট কুড়াইয়া নিয়া অনন্ত সামনে আগাইয়া গেল এবং সাপের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে ইঁটটা ছুঁড়িয়া মারিল।

শিহরিয়া কেতকী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, এ কি করলে?

অনন্তর তখন কথা কহিবার সময় ছিল না। ইঁটের আঘাতে ফণার খানিক নীচে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সাপটা ওলোট-পালোট খাইতেছিল, একটির পর একটি ইঁট তুলিয়া অনন্ত ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। সাপের ফণা ছেঁচিয়া গেল, রক্তাক্ত দেহটা একবার দড়ির মত পাকাইয়া গিয়া আর নড়িল না, লেজের দিকটা শুধু এদিক ওদিক আন্দোলিত হইতে লাগিল।

অনন্ত হাত ঝাড়িয়া বলিল, যাক্। এবার ওর শান্ত বৌটা বাকী রইল।

কেতকী ধরা গলায় বলিল, কেন মারলে?

—সাপ মারতে হয় কেতকী। বেঁচে থাকতে হলে ভাঙ্গা বাড়ীর সংস্কার করার মত এও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

—তাই বলে ইঁট দিয়ে কেউ অতবড় সাপ মারে! যদি না লাগত? চোখের পলকে তাহলে—কেতকী শিহরিয়া উঠিল।

অনন্ত হাসিয়া বলিল, সাপটা মরে গেছে, না লাগার কথা এখন আর ওঠে না। কিন্তু প্রথমবার তুমি যে 'এ কি করলে' বলে চেঁচিয়ে উঠলে সে তো আমার বিপদের কথা ভেবে নয়?

কেতকী বলিল, ওঁর নিষেধ ছিল। একজন চাকর একবার এতটুকু একটা বাচ্চা সাপ মেরেছিল, চাবকিয়ে উনি তার পিঠের কিছু রাখেন নি। আজও বোধ হয় বেচারীর পিঠে দাগ আছে। ওঁর মতে,—মা কালীর ডাকিনী যোগিনীরা এ বাড়ীতে সাপ হয়ে আছে—মারলে মহাপাপ হয়, অকল্যাণ হয়, সর্ব্বনাশ হয়।

অনন্ত শান্ত ভাবে বলিল, আমিও ওই রকম কিছু অনুমান করছিলাম কেতকী। সেই জন্যই তো মারলাম।

কেতকীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অস্ফুটস্বরে সে বলিল, সেই জন্য মারলে?

তবে যে বললে সাপ মারতে হয় বলেই—

সাপ মারতে হয়, কিন্তু ইঁট দিয়ে আমি সাপ মারি না কেতকী। বিপজ্জনক অভ্যাস। লাটি খুঁজি। সেই অবসরে সাপ যদি পালায় একটুও দুঃখিত হই না।

তবে? আজ কি জন্যে এমন করলে? কি বুঝেছ তুমি?

লণ্ঠনের আলোর ব্যাপ্তি আর কতটুকু, চারি দিকের গাঢ় অন্ধকারের হিংসায় এ যেন ক্ষুদ্র অক্ষম ভালবাসা। অনন্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, আমি কিছু বুঝি নি কেতকী। এই ভাঙ্গা বাড়ীর প্রেম শঙ্করকে কেন পাগল করল সে কি বোঝা যায়! সাপ আর ইঁটের স্তূপের জন্য ওর তো একবিন্দু মমতা থাকার কথা নয়!

কেতকী সহসা হাসিল, না, তা থাকার কথা নয়। ও আরও অনেকদিন বাঁচতে চায়।

অনন্ত বলিল, তা জানি। তাই ওর ঘরে কার্ব্বলিকের গন্ধ পেয়েছিলাম।

ঝড়ের সম্ভাবনা দেখলে ও তাই সারারাত মন্দিরে পূজো করে।

কেতকী প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিল।

খাবে চল। আলোটা দাও, আমি আগে যাই।

অনন্ত তাহার হাতে আলো দিল, কিন্তু চলিতে আরম্ভ করিল তাহাকে পিছনে রাখিয়া। বলিল, সাপের শান্ত বৌটি যদি স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় আমার ওপরে নেওয়াই উচিত কেতকী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

কেতকী বলিল, এসব অলুক্ষুণে কথা বলা কেন? কাল তুমি ভালয় ভালয় ফিরে যেও বাবু।

ঝড় ওঠে শেষরাত্রে।

কেতকী যে বলিয়াছিল আশ্বিনের ঝড় কালবৈশাখীর চেয়ে প্রবল হইতে পারে, ঝড়ের প্রথম ঝাপটার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যায়।

অনন্তকে শেষরাত্রে রওনা হইতে হইয়াছিল, সারাদিন গাড়ীতে পাল্কীতে কাটিয়াছে। শুইতেও প্রায় বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল। ঘুম যেন চোখ ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না। অথচ প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার মধ্যে ঘুমানোও অসম্ভব। নিদ্রামিশ্রিত নিস্তেজ জাগরণে কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, কেমন একটা গুরুভার আতঙ্ক বুকে চাপিয়া থাকে। চারি দিক হইতে যেন ভয়ানক একটা বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, অথচ এমনি অবশ অসহায় অবস্থা যে, প্রতিকারের জন্য আঙ্গুলটিও তুলিতে পারা যাইবে না।

কি যেন ঘটিবে,—ঘটিল বলিয়া! এক অজানা শত্রুর বিলম্বিত প্রতিশোধ কোন্ দিক দিয়া যেন আঘাত করিবে। ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধে যেন তাহার হিংসার আভাস মেলে, দেয়ালে দেয়ালে তাহারই সহস্র ক্রুদ্ধ করাঘাতের শব্দ শোনা যায়।

সহসা প্রবল আঘাতে অনন্ত পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া ওঠে। কতক্ষণের জন্য তাহায় মনে হয় কে যেন সত্যই তাহার বুকে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে—একটা পাঁজরও আর আস্ত নাই। নিশ্বাস টানিবার শক্তি খানিকক্ষণ তাহার থাকে না—হাঁ করিয়া আস্তে আস্তে সে হাঁপাইতে থাকে। সামান্য বাতাসটুকু ভিতরে নিতে গিয়াই বুকের পাঁজরগুলি তাহার টন টন করিয়া ওঠে। অস্ফুটস্বরে সে কাতরাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবে পড়িয়া থাকা যায় না। দেশলাইয়ের সন্ধানে বিছানা হাতড়াইয়া সে অনুভব করে ধুলা ও কাঁকরে বিছানা ভরিয়া গিয়াছে এবং পাশেই পড়িয়া আছে চুণ সুরকির চাপড়া লাগানো একটি আস্ত টালি। বুকের বেদনা বিস্মৃত হইয়া সে ত্বরিদ্বেগে উঠিয়া বসে। এবার আর তাহার বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, দেয়ালে দেয়ালে যে আর্ত্তবিলাপ আরম্ভ হইয়াছে, সে শুধু বাতাসের কান্না নয়, ওর মধ্যে মিশিয়া আছে প্রত্যেকটি ইঁটের মুক্তি পাইবার শঙ্কিত ব্যাকুলতা।

দিয়াশালাই খুঁজিয়া লইয়া কম্পিত হস্তে অনন্ত একটা কাঠি জ্বালিল। দুয়ারের অবস্থান দেখিয়া লইয়া কাঠিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে চৌকী হইতে নামিয়া পড়ে।

দরজার বাহিরে পাগলা হাওয়া বারিকণা লইয়া যে খেলা খেলিতেছিল তাহার বর্ণনা হয় না। সমস্ত অন্ধকার যেন সে উন্মত্ত খেলায় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। এমন ঝড়-বাদল অনন্ত জীবনে আর ছাখে নাই। পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানো অবধি বুকের ভিতর আবার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অনন্ত অতি কষ্টে আগাইয়া যায়। মাঝে একখানা ঘরের পরেই কেতকীর ঘর—এই সামান্য দূরত্বটুকু যেন আর অতিক্রম করা যায় না। অনন্ত সজোরে দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া ধরে।

অবশেষে কেতকীর দরজাটা হাতে ঠেকে। বিদ্যুৎ ক্রমাগতই চমকাইতেছিল, অনন্ত লক্ষ্য করে বাহির হইতে দরজায় শিকল তোলা রহিযাছে।

পতনোন্মুখ গৃহ ত্যাগ করিয়া কেতকী মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে—এ কথা ভাবিয়া প্রথমটা অনন্ত পরম স্বস্তি বোধ করে। কেতকী ঘুমাইয়া থাকিলে চারি দিকের এই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে তাহাকে ডাকিয়া তোলা সহজ হইত না। দরজায় ধাক্কা দিয়া লাভ ছিল না, বাতাস বহুক্ষণ ধরিয়া বীরবিক্রমে সে কাজ করিতেছে। নিজের কানে পৌঁছিবার মত শব্দও বোধ হয় তাহার ফুসফুসে এখন নাই। কিন্তু যেমন করিয়াই হোক কেতকীকে ডাকিয়া তুলিতে হইত;—এই ঝড়ে এখানে থাকা অসম্ভব। এ ভালই হইয়াছে যে সে আপনা হইতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া নিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে একবার না ডাকিয়াই কেতকী চলিয়া গেল? ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর চাকরের সঙ্গে তাহাকে গ্রামে পাঠাইয়া দিবার জন্য যে অমন ব্যাকুল হইয়াছিল?

অনন্ত শিকল খুলিয়া ফেলে। বাতাসের ধাক্কায় দুই পাট দরজা আছড়াইয়া খুলিয়া যায়।

ঘরের কোণে আলো জ্বলিতেছিল, বাতাসে নিভিয়া যায় নাই। অনন্ত দেখিতে পায় আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া কেতকী বোধ হয় নিরুদ্বেগে ঘুমাইয়াই আছে, আড়াআড়ি ভাবে তাহার বুকের উপর পড়িয়া একটা স্থূল কড়ি-কাঠ।

ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া রাখিয়া কেতকী যে এমন-ভাবে ঘুমাইয়া পড়ে নাই বুঝিতে অনন্তর কষ্ট হয় না। অনেক টানাটানি করিয়াও বাহির হইতে শিকল লাগানো দুয়ারটা যখন সে খুলিতে পারে নাই, তখনই এ ভাবে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছে।

কাছে গিয়া অনন্ত দুই হাতে কড়ি-কাঠটা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

—

সকালে ঝড় কমে কিন্তু থামে না।

রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া শঙ্কর বহুক্ষণ ইষ্টকস্তূপের নীচে অর্দ্ধাবৃত দেহাংশ দুটির দিকে চাহিয়া থাকে। তার পর একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি খুঁজিয়া নিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি ইঁট আনিয়া ইঁটের স্তূপে ফেলিতে থাকে।

দেহ দুটিকে সে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দিতে চায়। সমস্ত রাত্রি যে শয্যায় ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে অনন্ত-কাল সেই শয্যাতেই ইহারা ঘুমাইয়া থাক, শঙ্করের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কেহ যেন না জানে।

মানুষের মাটির দেহ মাটিতে পরিণত হইতে কত সময় নেয়? শেষ বেলায় ইটের শেষ ঝুড়িটা তুলিতে না পারিয়া মাটিতে বসিয়া শঙ্কর তাহাই ভাবে।

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সে ঠক ঠক করিয়া কাঁপে। তাহাকে ঘিরিয়া থাকিয়া থাকিয়া বাতাস গর্জ্জায়।

অনামা কবি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

সরযূ ও গঙ্গা রেবা সুবর্ণরেখা
সিপ্রা সিন্ধু, কৃষ্ণা, আদি নামের তালিকা;
হেরি যখন, ভাবি মনে এ নাম দেওয়া কার?
দেশের আদিম কবির পদে জানাই নমস্কার।

ব্রহ্মপুত্র, রূপনারায়ণ, অজয়, দামোদর,
রূপের ছবি আঁকলে ভাষায় এ কোন্ কারিকর?
ইচ্ছা করে আলিঙ্গিয়া প্রণতি দিতে,
এমন মধুর নামকরণের সেই পুরোহিতে।

অতসী, অপরাজিতা, রজনীগন্ধা,
চম্পা, পারুল, যূথি জাতি, অমৃতছন্দা,
বঙ্গভাষার সূতিকাগার করলে যা আলো,
দেখে শুনে আমার নয়ন পরাণ জুড়ালো।

বইছে দেশের নদ নদীতে আনন্দধারা,
ফুলে ফলে রাখলে তারা প্রীতির পসরা'
নগর ভূধর অরণ্যানী কেউ পড়েনি বাদ,
লুটলে তাঁদের স্নেহের পরমান্ন পরসাদ।

কাব্য তখন পায়নিকো পথ, খুঁজিছে ছন্দ,
গঙ্গা যেন শিবের জটিল জটাতে বদ্ধ;
আদিকবির অনুষ্টুভের আগের এ সব নাম
দিলেন যাঁরা, করছি তাঁদের শ্রীপদে প্রণাম।

ভাষার উষার সাধক কবির যাই বলিহারি,
নামে এমন রুচি যাঁদের নিত্য নেহারি;
ধন্য তাঁরা, ধন্য তাঁদের মোহিনী দৃষ্টি,
ওঁঙ্কারেতে করলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি।

তাঁরা জনগণের কবি দেশের কবি যে,
তাঁদের দেওয়া নামেই মোদের দেশ যে শোভিছে;
রচেন যাঁরা কাব্য নামের অমৃত-গন্ধী
আজকে আমি তাঁদের সবার চরণ বন্দি।

মধু দিয়ে ভরলে যাঁরা ভাষার মধুক্রম,
তাঁদের কথা যাই যে ভুলে, এমনি মোদের ভ্রম;
নাম দিয়েছে, নয়কো নিজে নামের প্রয়াসী,
কেমন করে বলবো তাঁদের কি ভালবাসি।

তাঁদের দেওয়া মুক্তা লয়ে অন্যে গাঁথে হার,
গোত্র গাঁই ও মেলের মালিক তাঁরাই সবাকার।
তাঁদের স্নেহেই মোদের ভাষা পুষ্ট গরবী
প্রণাম আজি পাঠায় তাঁদের অনামা কবি।

রাজগৃহ ও নালন্দর ধ্বংস-মাঝে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

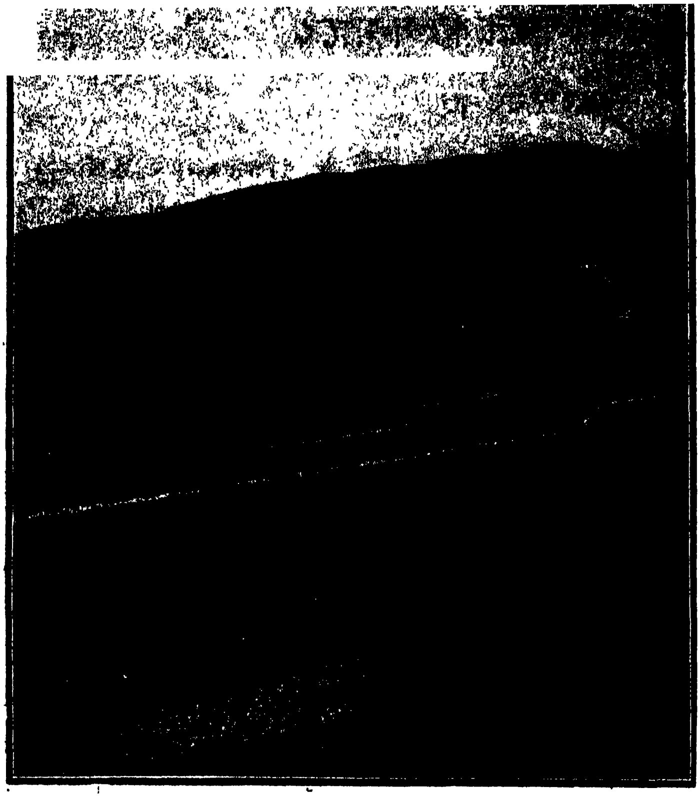
দারুণ অর্থ-সঙ্কটের সময়ে এ বৎসর পূজায় আর কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যাইব না স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে অন্ততঃ ৪।৫ দিনের জন্য একটু বাহিরে বেড়াইয়া আসিতেই হইবে। কোন্ জায়গায় যাওয়া হইবে বন্ধুরা কয় দিন ধরিয়া কেবল তাহারই জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। শেষে উকিল-বন্ধু প্রস্তাব করিলেন, রাজগির যাওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। রাজগির বা রাজগৃহ এবং সেই সঙ্গে তাহার অদূরবর্ত্তী নালন্দ, প্রাচীন ভারতের এই দুইটি অতি প্রসিদ্ধ স্থান দেখিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসা যাইবে। বহু দিন হইতে রাজগির যাওয়ার ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে ছিল। বন্ধুর প্রস্তাব শুনিয়া সকলের সঙ্গে আমিও তাহার সমর্থন করিলাম। তখনই ই, আই, রেলের 'টাইম টেবল' আনা হইল। দেখিলাম, হাওড়া হইতে পাটনার নিকটবর্ত্তী বক্তিয়ারপুর জংশন ৩১০ মাইল; এবং তথা হইতে বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের শেষ ষ্টেসন 'রাজগির কুণ্ড' ৩৩ মাইল। মোট ১৫ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌছান যায়।

আমরা ছয়জন বন্ধুতে মিলিয়া রাজগির যাইব, ইহাই স্থির হইয়াছিল। কিন্তু যাত্রার দিন সকালে প্রস্তাবকারী বন্ধুই বলিলেন, কোন বিশেষ কারণে তাঁহার যাওয়া ঘটিবে না। আর এক বন্ধু সমস্ত দিনের মধ্যে কোন খবর না পাঠাইয়া, নিরুদ্দেশ রহিলেন। বিজয়ার পর দ্বাদশীর দিন, ২৩শে অক্টোবর শুক্রবার রাত্রি ৮টার দানাপুর এক্সপ্রেস ট্রেণে, শিল্পী—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, সুলেখক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, স্থপতি—শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় ও নিজে, আমরা এই চার বন্ধুতে রাজগির যাত্রা করিলাম।

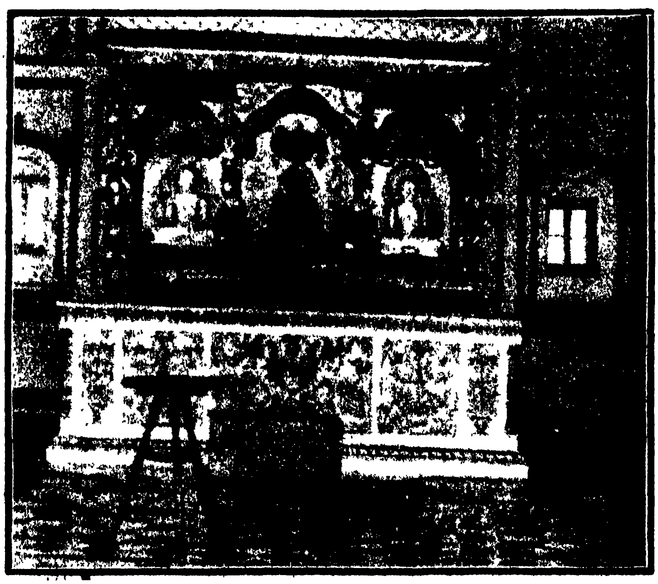
পরদিন ২৪শে অক্টোবর সকাল ৭টার পর আমাদিগকে বক্তিয়ারপুর জংসনে নামিয়া গাড়ী বদল করিতে হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে লাইট রেলওয়ের ট্রেণ ছাড়িল। কয়েকটী ছোট ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া, সাড়ে নয়টা আন্দাজ ট্রেণ বিহার-সরিফে পৌছিল। ইহা পাটনা জেলার বিহার মহকুমার সদর। বক্তিয়ারপুর হইতে দূরত্ব ১৯ মাইল। আরও ৭ মাইল অতিক্রম করিতে নালন্দ ষ্টেসন আসিল। অদূরবর্ত্তী স্তূপ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। ট্রেণ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজগৃহের গিরিশ্রেণী স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মধ্যে আর একটী ষ্টেসন মাত্র পার হইয়া বেলা ১১টার পর আমরা রাজগির আসিয়া পৌছিলাম।

রাজগির পাটনা জেলার বিহার মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার দক্ষিণে প্রাচীন রাজগৃহ অবস্থিত। বর্ত্তমানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং মুসলমানের নিকটও রাজগৃহ পুণ্য স্থান রূপে গণ্য। এখানকার জলবায়ু অতি মনোরম বলিয়া স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিরাও রাজগিরে আগমন করিয়া থাকেন। রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া অনেকে রোগমুক্ত হইয়াছেন, এরূপ শুনা যায়। রাজগিরে শ্বেতাম্বরী, দিগম্বরী, সনাতন ও শিখ এই চারিটি বড় ধর্ম্মশালা আছে। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্ম্মশালা ও মুসলমানদিগের জন্য মকদুম কুণ্ডের সঙ্গে মুশাফিরখানাও বর্ত্তমান। খালি থাকিলে সরকারী যে ইন্‌স্‌পেক্সন্ বাংলা আছে, তাহাতেও স্থান পাওয়া যাইতে পারে। ভাড়া লইয়া বাসের উপযোগী অন্য কোন বাড়ী পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া ব্যবস্থা না করিলে পূজা বা মেলা ইত্যাদির সময়ে স্থানলাভের জন্য বিশেষ অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। রাজগিরে কয়েকখানি মাত্র দোকান, একটী ছোট হাঁসপাতাল এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে।

পূর্ব্বে পত্র পাইয়া আমাদের অভ্যর্থনার জন্য কালীচরণ পাণ্ডা ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। তাহার সহিত অদূরবর্ত্তী সনাতন ধর্ম্মশালায় গিয়া উঠিলাম। ধর্ম্মশালার রক্ষক জানাইলেন, আপাততঃ কোন ভাল ঘর খালি নাই।



রাজগির—জৈন মন্দির অদূরে বৈভারগিরি ও দূরে রত্নগিরি



রাজগির—জৈন মন্দিরের ভিতর দৃশ্য

তবে, ঘণ্টা তিন চার পরে দ্বিতলে একটি ঘর খালি হইবে, তিনি সেইটা আমাদের দিবেন। কিছুক্ষণের জন্য তিনি তাঁহার নিজের ঘরই আমাদের ছাড়িয়া দিলেন। আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া, জিনিষ-পত্র লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে কাপড় গামছা ও কলিকাতা হইতে আনীত খাদ্য-সামগ্রী লওয়া হইল। মাঠের মধ্যের সরু পথ দিয়াই ব্রহ্মকুণ্ডের উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাচীন প্রাকারের ভগ্নাংশ অতিক্রম করিয়া আমরা গিরিবেষ্টিত রাজগৃহের সীমানার মধ্যে পৌঁছিলাম।

রাজগৃহ পূর্ব্বভারতের মগধরাজ্যের সুপ্রাচীন রাজধানী। বিহার প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ লইয়াই তখন মগধরাজ্য গঠিত ছিল। বর্ত্তমান বৈভারগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি ও স্বর্ণগিরি এই পঞ্চশৈলের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই রাজধানী বিস্তৃত ছিল। মহাভারতের সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ মগধের অধিপতি ছিলেন। রাজগৃহ তখন 'গিরিব্রজ' নামে অভিহিত হইত। গিরিব্রজের বর্ণনায় মহাভারতে লিখিত আছে—

"এষ পার্থ! মহানভাতি
পশুমান নিত্যমম্বুমান।
নিরাময়ঃ সুবেশ্মাঢ্যো
নিবেশো মাগধঃ শুভঃ॥
বৈহারো বিপুলঃ
শৈলো বরাহো বৃষভস্তথা।
তথৈব গিরয়শ্চৈব
শুভাশ্চৈত্যক পঞ্চমাঃ॥"

(সভাপর্ব্ব, বিংশোঽধ্যায়)

"অর্জ্জুন! এই সর্ব্বমঙ্গলময় বিশাল মগধ রাজধানী শোভা পাইতেছে; এখানে প্রচুর পশু আছে, সর্ব্বদা জল থাকে, এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা রহিয়াছে; কিন্তু কোন রোগ পীড়া নাই।

বৈহার, বিপুল, বরাহ, বৃষভ এবং চৈতক নামে পাঁচটী মঙ্গলময় পর্ব্বত ঐ দেখা যাইতেছে।"

ইতিহাসোক্ত শিশুনাগবংশীয় শ্রেণিক বিম্বিসার মগধের অধিপতি ছিলেন। রাজগৃহই তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বৈভার ও বিপুল গিরির উত্তরে রাজধানী আরও বিস্তৃত করিয়া নবরাজগৃহের পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাবীর বিপুলাচলে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বিম্বিসার মহাবীর স্বামীর একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। রাজগৃহ জৈনদিগের নিকট একটা মহাপুণ্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। জৈন ধনকুবেরগণের যত্নে পঞ্চশৈলের শিখরেই জৈন-মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

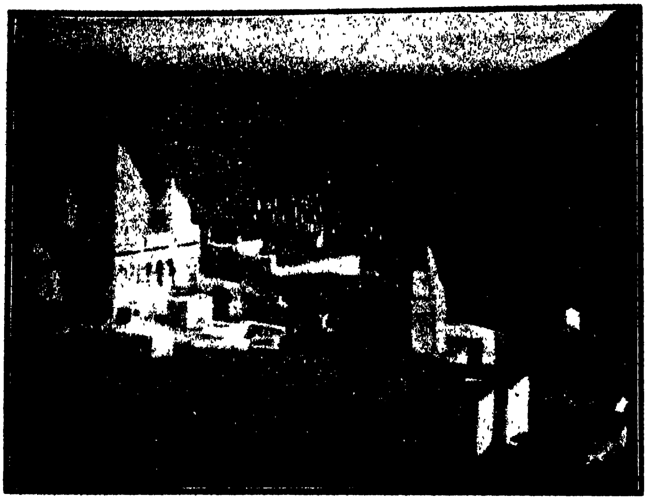
মহাবীরের অনতিকাল পরেই বুদ্ধ শাক্যসিংহ বৈভার-শৈলে আগমন করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য মগধপতি বিম্বিসার হইতে রাজগৃহবাসী জনসাধারণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব শৈলের শিখরদেশে থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিতে হইলে দুরারোহ পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে সাধারণের বড়ই কষ্ট হইত। এই কারণে রাজা বিম্বিসার পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সিঁড়ি এখনও বর্ত্তমান। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বেও এক ব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য রাজগৃহে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া, রাজগৃহে মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য ক্রমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি শেষে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব স্বীয় উপদেশাবলি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর তদীয় শিষ্যবর্গ মহারাজা অজাতশত্রুর অধিনায়কত্বে রাজগৃহেই এক সভা করিয়া গুরুর উপদেশ-সমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক তিনখণ্ডে বিভক্ত করেন। ইহাই 'ত্রিপিটক' নামে অভিহিত বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপুস্তক। অজাতশত্রুর সময়ে ও পরে রাজগৃহের গিরিশ্রেণীর উপরে এবং অন্যান্য নানা অংশে সঙ্ঘারাম, বিহার, স্তূপ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও সে সকলের বহু চিহ্ন বিদ্যমান।

অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোনের সঙ্গমের নিকটস্থ পাটলি গ্রামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র উদয়ের রাজত্ব কালে সেই স্থানে পাটলিপুত্র নগর স্থাপিত হয়, এবং রাজগৃহ হইতে রাজধানী তথায় স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রাচীন রাজগৃহের মধ্যে পদার্পণ করিয়া, একবার ভাল করিয়া চারি দিক দেখিয়া লইলাম। সম্মুখে বা আশে-পাশে, উপত্যকাভূমি কি নিকটস্থ গিরিগাত্রে অট্টালিকাদির কোন ধ্বংস চিহ্ন চক্ষে পড়িল না। তবে, দক্ষিণে নিকটেই পূর্ব্বেকার প্রস্তরমণ্ডিত তোরণের সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে, দেখিলাম। বামে অল্প দূরে প্রাকার আর এক স্থানে ভগ্ন করিয়া, ষ্টেসনের দিক হইতে আসিয়া প্রশস্ত পথ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের পথটি কিছু দূর গিয়াই তাহার সহিত মিলিত হইল। কুণ্ড হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছেন, পথে এমন কয়েকজন যাত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম। পথ সংক্ষেপ করার জন্য আবার একটী ক্ষুদ্র রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। রাস্তাটী ইন্‌স্পেক্সন্ বাংলার প্রাঙ্গণের ধার দিয়াই গিয়াছে। সেখানে অনেক লোকজন ও কয়েকখানি মোটরগাড়ি রহিয়াছে, দেখিলাম। শুনিলাম, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছুটিতে সদলবলে আসিয়া বাস করিতেছেন। অল্প দূর যাইয়া পথিপার্শ্বে বৃক্ষমূলে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। ক্রমে আমরা রাজগৃহ মধ্যস্থ একমাত্র ক্ষুদ্রকায়া পার্ব্বত্য নদী সরস্বতীর ধারে আসিয়া পড়িলাম। বামে বিপুল এবং দক্ষিণে বৈভারগিরি। এই স্থলে উভয়ের ব্যবধান অর্দ্ধ মাইলেরও কম বলিয়াই মনে হইল। এক স্থানে নদীতে অতি অল্প জল ছিল, কয়েকখণ্ড প্রস্তর দেওয়া থাকায় সহজেই পার হওয়া গেল। একবারে বৈভারগিরির পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বামে নিকটেই নদীর উপর একটী সুন্দর সেতু রহিয়াছে, দেখিলাম। গিরির নিম্নভাগে, অতি অল্প উচ্চেই ব্রহ্মকুণ্ডের স্থান। সেতুর সংলগ্ন একটি প্রশস্ত সিঁড়ি কুণ্ডে গিয়াছে। আমাদের সম্মুখেও একটী ভাল সিঁড়ি ছিল। তাহা দিয়া উপরে উঠিয়াই বর্ত্তমানে রাজগৃহে হিন্দু তীর্থযাত্রী-দের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ব্রহ্মকুণ্ড স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম।

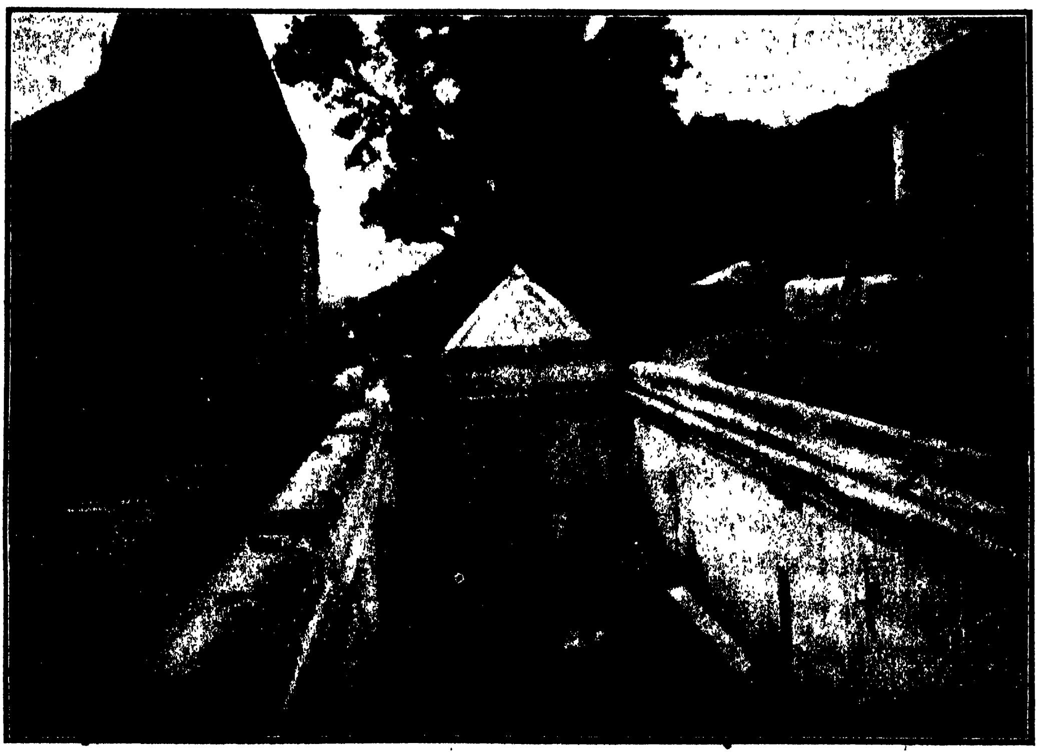
রাজগৃহ এক্ষণে হিন্দুর নিকট তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইলেও অতি প্রাচীন কালে এরূপভাবে গণ্য হইত কি না



রাজগৃহ—ব্রহ্মকুণ্ড স্নান (বিপুলগিরির অল্লাংশ দেখা যাইতেছে)

সন্দেহ। কালবশে মগধ হইতে বৌদ্ধ প্রভাব লুপ্ত হইলে এবং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইলে, বায়ুপুরাণীয় রাজগৃহ-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। যে সকল স্থান বৌদ্ধ ও জৈনগণের নিকট পুণ্য-স্থান বলিয়া গণ্য ছিল, সেই সকল স্থান হিন্দুতীর্থ বলিয়া কল্পিত হয়। হিন্দু দেব-দেবীরও প্রতিষ্ঠা করা হয়। নানা বৌদ্ধ কীর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ এইরূপে হিন্দুর বলিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে বহু তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে, তীর্থযাত্রীদিগকে পাণ্ডারা সেই সকল তীর্থ এখনও দেখাইয়া থাকেন।

ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে পঞ্চচূড়াসমন্বিত বিষ্ণু-মন্দির ও বামে শিব মন্দির দেখিলাম। ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে ফুলের মালা, মিষ্টান্ন ইত্যাদির দুই-তিনটি অস্থায়ী দোকান বসিয়াছিল। একটী দোকানদারের নিকট জামা, কাপড় ইত্যাদি রাখিয়া দিলাম প্রথমে পার্শ্বস্থিত সপ্তর্ষিকুণ্ডে গিয়া নামিলাম। চারি দিকে প্রাচীর দিয়া বাঁধান দীর্ঘাকৃতি স্থান। গিরিগাত্র হইতে পাথরের নল বাহিয়া তিনটি উষ্ণ



সপ্তর্ষিকুণ্ড—ধারা স্নানের স্থান

জলধারা পড়িতেছে। একটী খুব জোর, দ্বিতীয়টা তদপেক্ষা কিছু কম এবং তৃতীয়টা ক্ষীণ দেখিলাম। ধারার জলে প্রথমে কাপড় ও দেহ ভিজাইয়া লইয়া, তবে ব্রহ্মকুণ্ডের জলে নামিবার নিয়ম। জল অত্যন্ত গরম বোধ হইল। কোন রকমে দেহ ভিজাইয়া লইয়া, বিপরীত দিকের দেয়ালের মধ্যস্থিত দ্বার দিয়া আরও অবতরণ করিয়া, ব্রহ্মকুণ্ডের জলে নামিলাম। গরম প্রায় এক রূপই বোধ হইল। পরে সরকারী রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, ধারার জলের উত্তাপ ১০৫° হইতে ১০৮° এবং কুণ্ডের জলের ১০০° হইতে ১০৫°। কুণ্ডটী ৭।৮ হাত আন্দাজ সমচতুষ্কোণ বড় চৌবাচ্ছার মত। প্রস্তরমণ্ডিত পার্শ্বের দেওয়াল একতলারও অধিক উচ্চ। প্রাঙ্গণ এবং ধারাস্নানের স্থান হইতে দুইটী সিঁড়ি আসিয়া জলে পৌছিয়াছে। মধ্যে দাঁড়াইলে কুণ্ডের জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। কুণ্ডের এক কোণে তিনটী প্রস্তর-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মধ্যে বিষ্ণু, দক্ষিণে মহাদেব ও বামে গণেশ মূর্ত্তি। পাণ্ডার নির্দ্দেশ মত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাহাতে যাত্রীরা ফুল ও জল দিতেছে, দেখিলাম। রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে, যে, এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক নিবারিত হয় এবং ইহাতে পিণ্ড দান করিলে গয়ায় পিণ্ডদানের তুল্য ফললাভ হয়। কুণ্ডের তলদেশ হইতে অবিরত জল উঠিতেছে এবং অতিরিক্ত জল



ব্রহ্মকুণ্ড—ভিতর দৃশ্য

দেয়ালগাত্রস্থিত প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। এ জন্য বহু লোকে স্নান করিলেও, কোন বদ্ধ জলের মত কুণ্ডের জলের দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অনভ্যাস বশতঃ গরম জলে অধিকক্ষণ স্নান করা কষ্টকর বোধ হইতেছিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই উঠিয়া আসিলাম। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া যখন ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, তখন বিশেষ তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া



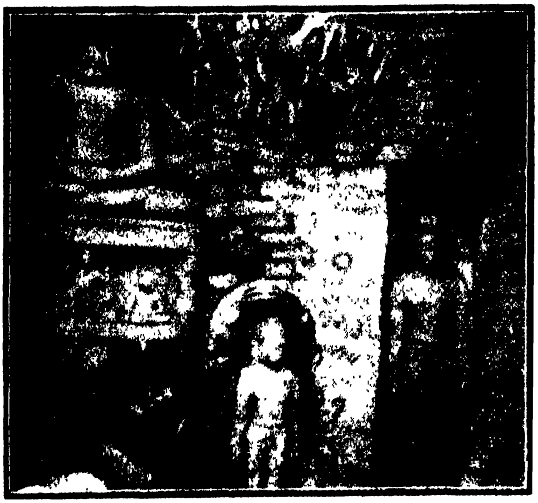
দুইটী ধারা

শরীর যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আরও দুইটী ছোট অব্যবহৃত কুণ্ড দেখিতে পাইলাম।

ব্রহ্মকুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিবার পথে একটী বাঁধান বটবৃক্ষতলে আসিয়া থামা গেল। সেখানে আসিয়া আমরা বেশ আনন্দের সহিত আহার সারিয়া লইলাম। পাত্র ভরিয়া উষ্ণ প্রস্রবণের জল আনিয়াছিলাম, তাহা পান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। জল একেবারে বর্ণ ও গন্ধহীন, কলের জলের মতই নির্ম্মল। সাধারণতঃ উষ্ণপ্রস্রবণের জল এত পরিষ্কার হয় না। ইহা রাজগৃহের জলের বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে। সরকারী পরীক্ষার রিপোর্ট দেখিয়াও, পরে আমরা জলের নির্ম্মলতার বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি।

রাজগিরে সনাতন ধর্ম্মশালার পশ্চাতেই দিগম্বরী ধর্ম্মশালা। কুণ্ড হইতে ফিরিয়া, জৈন মন্দির ঘুরিয়া,

ভগ্ন দালানে কয়েকটী অসমাপ্ত প্রস্তর স্তম্ভ পড়িয়া রহিয়াছে। ভিতরে শিবলিঙ্গের সম্মুখে অবস্থিত প্রস্তরের বৃষটী ভগ্ন। মন্দিরটী প্রাচীন হইলেও, পূর্ব্বদৃষ্ট বৌদ্ধ



বৈভার-শিখরে আবিষ্কৃত বৌদ্ধমূর্ত্তি

কীর্ত্তিগুলির পরবর্ত্তী কালের বলিয়া মনে হইল। এখানেও সরকারী নোটিশ দেখিলাম।



রাজগৃহ—গিরিবেষ্টিত প্রাচীন ভূমির এক অংশ

ফিরিবার সময় অন্য একটা পথ ধরিলাম। কিছু দূর যাইয়া মূল পথে আসিয়া পড়িলাম। নামিবার সময় কষ্ট কম হইলেও, অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইল। যাহা হউক, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম, উঠিবার সময় মধ্যপথে পরিত্যক্ত বন্ধুবর আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর কুণ্ডে স্নান করিয়া আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। যথাসময়ে আহারাদি শেষ করা হইল।

বেলা সাড়ে তিনটার পর একজন লোক সঙ্গে লইয়া রণভূমি দর্শনের ইচ্ছায় বাহির হইয়া পড়িলাম। এই প্রাচীন রণভূমিতেই না কি মহাবীর্য্যশালী ভীম, মগধরাজ প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধকে বাহু-যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকুণ্ডের নিম্নদেশ দিয়াই আমাদের যাইতে হইল। পুলের পরেই সরস্বতীর দুই ধারে দুইটী বাঁধান ঘাট রহিয়াছে, দেখিলাম। এই ঘাটে সরস্বতীর জলে স্নান, হিন্দু তীর্থযাত্রীদের একটী প্রধান করণীয়রূপে গণ্য। অল্পদূর আগাইয়া যাইতেই শ্মশান। নদীর দুই পার্শ্বস্থিত দুইটী পরিত্যক্ত চিতা হইতে তখনও ধূম উঠিতেছিল।

পায়ে-চলা সঙ্কীর্ণ পথ উপত্যকার উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। উচ্চ গিরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যে বিশেষ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। বনফুলের মৃদু গন্ধে তৃপ্তি বোধ হইতেছিল। নিজেদের ক্ষেতে বেড়া দিবার জন্য কৃষকেরা জঙ্গল হইতে কাটিয়া কুলকাটার বোঝা লইয়া যাইতেছে, দেখিলাম। পথে রণভূমি দেখিয়া ফেরত যাত্রী কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মাইলখানেক যাইয়া আমরা 'সোণভাণ্ডারে' আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহাই প্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণী গুহা। বুদ্ধের নির্ব্বাণের অনতিকাল-পরে এইখানেই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল। গিরিগাত্র কাটিয়া একটী প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ২০ হাত এবং প্রস্থ ১০ হাত আন্দাজ হইবে। ভিতর দিককার দেওয়ালের মধ্যে ঠিক খিলানের মত চিহ্ন ছিল। সঙ্গের লোকটী জানাইল, ঐখানে আরও ভিতরে যাওয়ার পথ ছিল, তাহা পাথর দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টর্চ্চ আলো দিয়া দেখিয়া, স্থপতিবন্ধু কিন্তু বলিলেন, ওটা ফাটার চিহ্ন। গৃহের সম্মুখভাগে, থামের উপর ছাদ দেওয়া বারাণ্ডা ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান দেখিলাম। সম্মুখে প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার সরকারী নোটিশ দেখিলাম।

বামে বিপুল এবং দক্ষিণে বৈভারগিরির মধ্যস্থল দিয়াই যাইতেছিলাম। এইবার রত্নগিরি, উদয়গিরি ও স্বর্ণগিরি সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। 'রণভূমি' পৌছানর পূর্ব্বে আমাদিগকে আবার একটী প্রাচীন প্রাকার ভেদ করিয়া যাইতে হইল। আমরা রণভূমিতে আসিয়া পৌছিলাম। চতুর্দ্দিকে প্রস্তরসমাকীর্ণ উপত্যকাভূমির মধ্যস্থলে প্রশস্ত স্থান। অন্যত্র হইতে আনীত মৃত্তিকা দিয়া, দুই তিন হাত উচ্চ ও সযত্নে সমতল করা হইয়াছে, মল্লযুদ্ধের উপযুক্ত করিয়াই নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। ভীম ও জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধের বর্ণনায় মহাভারতে লিখিত আছে—

"এবমাদীনি যুদ্ধানি প্রকুর্ব্বান্তৌ পরস্পরম।
তয়োর্যুদ্ধং ততোদ্রষ্টুং সমেতাঃ পুরবাসিনঃ॥
ব্রাহ্মণাবর্ণিজশ্চৈব ক্ষত্রিয়াশ্চ সহস্রশঃ।
শূদ্রাশ্চ নরশার্দ্দূল! স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ সর্ব্বশঃ॥"
(সভাপর্ব্ব—দ্বাবিংশোঽধ্যায়)

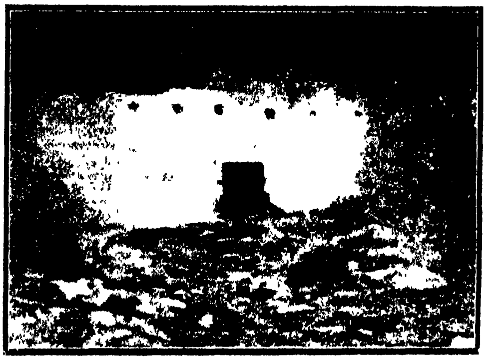
"ভীম ও জরাসন্ধ পরস্পর উক্তরূপ নানাবিধ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের যুদ্ধ দেখিবার জন্য পুরবাসীরা উপস্থিত হইল। এবং সমস্ত স্থান হইতে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জনসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া সে স্থানটা একেবারে রন্ধ্রশূন্য হইয়া গেল।"

আমরা জনমানবহীন রণভূমিই দর্শন করিলাম। রণভূমির পরের স্থান অধিক জঙ্গলাকীর্ণ মনে হইল। পুনরায় পূর্ব্বের সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া আমরা যখন ধর্ম্মশালায় পৌছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

ঘণ্টা তিনেক সময় রন্ধনের হাঙ্গামাতেই কাটিয়া গেল। লেখক, শিল্পী ও স্থপতি, তিন বন্ধুই রন্ধনে যোগ দিয়াছিলেন। আমার ও-বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকায়, আমি তাঁহাদের কৃত রন্ধনের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদানেই ব্যাপৃত ছিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া উঠিতে রাত্রি সাড়ে নয়টা হইয়া গেল।

লক্ষ্মীপূজা—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রি, জ্যোৎস্নার আলোকে চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর বোধ হইতেছিল। পরামর্শ করিয়া কয় বন্ধুতে ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। জনহীন পথে বেড়াইতে বেড়াইতে রেল ষ্টেসনে আসিয়া থামা গেল। ষ্টেসন মাষ্টার মহাশয় তখনও ঘরের মধ্যে বসিয়া হিসাব নিকাশ করিতেছিলেন। একখানি বেঞ্চ ছিল, তাহাই টানিয়া আনিয়া চাঁদের আলোতে লাইনের ধারে পাতিয়া বসিলাম। একটু পরে মাষ্টার মহাশয় বাসায় চলিয়া গেলেন, এবং জানাইয়া গেলেন যে, আমরা যতক্ষণ ইচ্ছা তাঁহার এলাকার মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারি। সেখানে বসিয়া গল্পে-গানে আমাদের অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া শয়ন করিতে প্রায় বারটা বাজিল।

পরদিন ২৬শে অক্টোবর সোমবার অতি প্রত্যূষেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ছয়টার সময়ই আমাদিগকে নালন্দ লইয়া যাইবার জন্য গোযান আসিবার কথা ছিল, সেজন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু গাড়ী পৌছিতে



রাজগৃহ—সোনভাণ্ডার

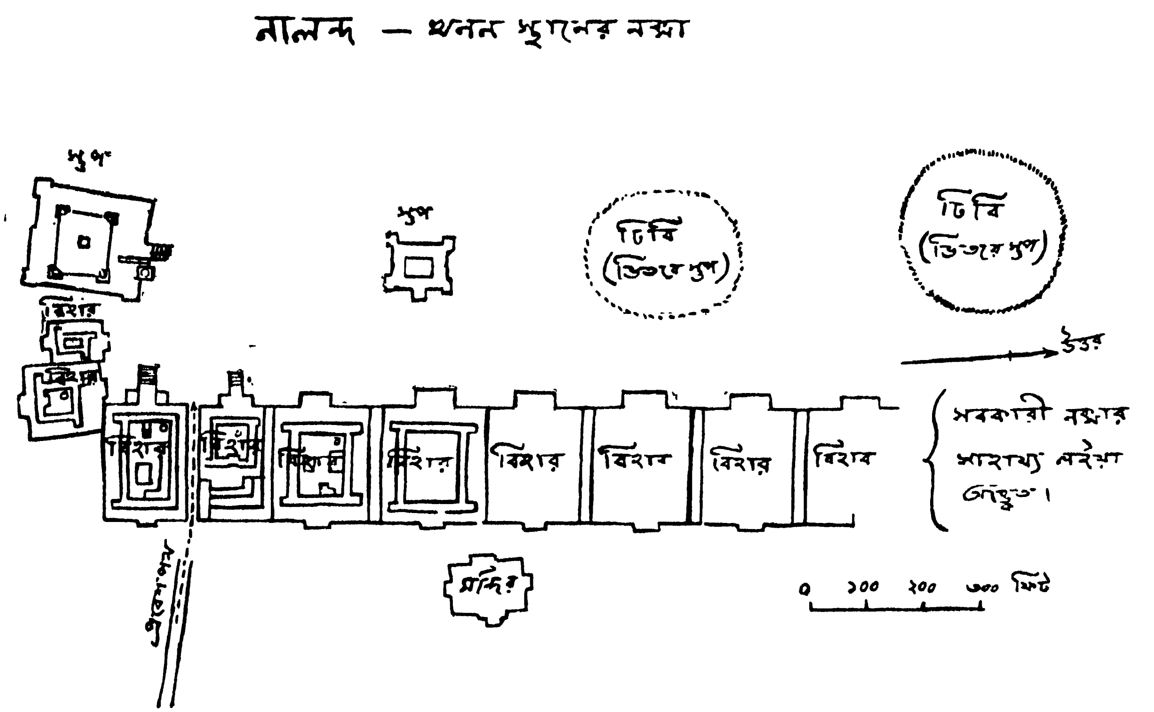
সাতটা বাজিয়া গেল। ছইএর উপর ছেঁড়া চট বাঁধা ছিল, ভিতরে দেওয়া খড়ের উপর আমরা একটা সতরঞ্চি বিছাইয়া লইলাম। সঙ্গে একবেলার আহারের উপযোগী রুটি, মাখন, মিষ্ট ইত্যাদি লইয়া, সাড়ে সাতটায় আমরা নালন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রাজগির হইতে নালন্দ মাত্র চার ক্রোশ পথ। আমাদের শকটচালক আশ্বাস দিল, বলদ দুইটী বিশেষ কর্ম্মঠ এবং তাহার নিজের অপেক্ষাও বুদ্ধিমান। তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দিবে। শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাজগির গ্রামের যে অংশ দিয়া আমাদের গাড়ি অগ্রসর হইল, তাহাতে তিন চারখানা পাকা বাড়ী ব্যতীত সবই খোলার বাড়ী দেখিলাম। গ্রাম ছাড়াইতেই রেলের লাইনের রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এই রাস্তাটি

বক্তিয়ারপুর হইতে আসিয়া রাজগিরে শেষ হইয়াছে। রাস্তার একধারে লাইট রেলওয়ের লাইন পাতা, বাকি-টুকুতে সকল স্থলে দুইখানি গাড়ীও পাশাপাশি একসঙ্গে যাইতে পারে না। রাস্তার অবস্থাও ভাল নয়। গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল অতি বিরল বলিয়া আমাদের গোযান একরূপ নির্ভাবনাতেই চলিতেছিল।

রাস্তার দুই পাশেই বিস্তৃত ধানের চাষ, মাঝে মাঝে আক, মূলা এবং অন্যান্য শাকসব্জির ক্ষেতও চক্ষে পড়িল। ছোট বড় জলাশয় মাত্রেই পানিফলের চাষ দেখিলাম। পূর্ব্বে শিলাও লাইট রেলওয়ের শেষ ষ্টেসন ছিল, রাজগির যাত্রীদের এইখানেই নামিতে হইত। রাজগির গ্রাম এখনও শিলাও থানারই অন্তর্গত।

শিলাও ছাড়িয়া যাইতে অল্পক্ষণ দেরী হইয়া গিয়াছিল। আরও দেড় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যখন নালন্দ ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, তখন সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ষ্টেসনের পাশ দিয়া আমরা বড়গাঁওএর রাস্তা ধরিলাম। দূরে স্তূপ দেখা যাইতেছিল, শীঘ্র পৌঁছানর জন্য মনের ব্যস্ততা আরও বাড়িয়া গেল। রৌদ্রের তীব্রতা বোধ



নালন্দ—খননস্থানের নক্সা

অনভ্যস্ত আরোহীদের গাড়ীতে অসোয়াস্তিই হইতেছিল। দেখিলাম, গাড়ী ছাড়িয়া হাঁটিয়া যাওয়াতেই অধিক আরাম। মধ্যে আর একটী ছোট গ্রাম অতিক্রম করিয়া দেড় ঘণ্টা আন্দাজ পরে, দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী শিলাও গিয়া পৌঁছিলাম। শিলাও বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে অনেক দোকান পসার দেখিতে পাইলাম। শিলাওএর খাজা বিশেষ বিখ্যাত। দশ-বারখানি দোকানে স্তরে স্তরে খাজা সাজান রহিয়াছে দেখিয়া, কিছু না কিনিয়া আর থাকিতে পারা গেল না। হইতেছিল, সেজন্য হাঁটিবার চেষ্টা না করিয়া শকট-চালককেই তাগাদা দিতেছিলাম! প্রথমে ফাঁকা রাস্তা, পরে একটী ছোট গ্রামের মধ্য দিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ আন্দাজ রাস্তা অর্দ্ধ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া, বেলা এগারটার পর আমাদের গোযান বড়গাঁও প্রান্তে নালন্দ বিহারের ধ্বংসা-বশেষের সম্মুখে আসিয়া থামিল। পূর্ব্বের বিহার-গ্রাম নামই বর্ত্তমানে বড়গাঁও নামে পরিণত হইয়াছে।

রাজগৃহের নিকটস্থ নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন কালে জগদ্বিখ্যাত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা

হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতের নানা স্থান এবং সুদূর চীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশ হইতে বৌদ্ধ ছাত্রেরা শিক্ষালাভার্থ এখানে সমবেত হইত। সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন সঙ্ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল ছাত্ররূপে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করেন। সে সময় বাঙ্গালী ভিক্ষু শীলভদ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির ছিলেন। এখানকার বিহারসমূহে ন্যূনাধিক দশ সহস্র ছাত্র বিনাব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা-বিদ্যার অধ্যাপনা হইত। রাজকোষ হইতে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। বহু সংখ্যক কৃতবিদ্য বৌদ্ধ পণ্ডিত জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ দানে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতেন। পালবংশের রাজত্ব সময়ে যখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রভাব ছিল, তখন নালন্দ একটী প্রধান বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল। রাজা দেবপাল দেব কনিষ্ক-বিহার হইতে সমাগত আচার্য্য বীরদেবকে নালন্দ-বিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নালন্দ-বিহার বিরাজমান ছিল। মুসলমান আক্রমণে ইহার ধ্বংসসাধন ঘটে।

নালন্দ-বিহারের ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে, রাস্তার বিপরীত দিকেই গভর্মেণ্টের আর্কিওলজিকেল বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বাংলার ফটক দেখিয়া, প্রথমে তাহাতেই প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থ একটী সুন্দর তাঁবুতে তখন সেণ্ট্রাল সারকেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও নালন্দ খননের ভারপ্রাপ্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারী উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে প্রথমে খননস্থান দেখিতে বলিলেন। বাংলা-সংলগ্ন ক্ষুদ্র মিউজিয়মটী বারটার সময় খোলা হইবে, ইহাও জানাইয়া দিলেন। তথা হইতে বাহির হইয়া আমরা খননস্থানের প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দ্বারে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের একজন চাপরাসী ছিল, সে আমাদিগকে লইয়া ইষ্টক নির্ম্মিত দুইটী উচ্চ দেওয়ালের মধ্যস্থিত প্রাচীন পথ দিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উপস্থিত করিল। প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব দিকে সারি সারি বিহার-সৌধ ও পশ্চিম দিকে স্তূপগুলি অবস্থিত। নালন্দর এই বিরাট ধ্বংসাবশেষ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই হাজার ফিট এবং প্রস্থে প্রায় সাত শত ফিট স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ফটো তুলিবার আশায় ক্যামেরা বাহির করিতেই, চাপরাসী নিষেধ জানাইল। নিকটেই একজন কর্ম্মচারী বসিয়া ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে চারজনের জন্য আট আনা দিয়া "দর্শনার্থীর পাশ" গ্রহণ করিতে হইল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রকাশিত, নালন্দ খননের একখানি ইংরাজী সচিত্র বিবরণ-পুস্তিকা সেই সময় ক্রয় করিয়া লইলাম। সঙ্গের চাপরাসী আমাদের সমস্ত স্থান দেখাইবার ভার লইল।

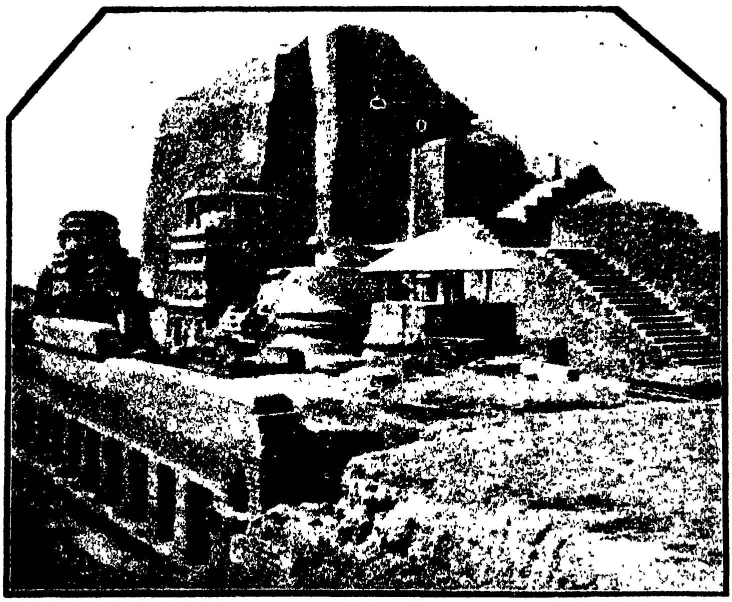
সর্ব্বাগ্রেই আমরা ধ্বংস-স্থানের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষক দক্ষিণধারে স্থিত প্রধান স্তূপে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিশালকায় চতুষ্কোণ স্তূপ একটী বাঁধান প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে



নালন্দ— খননস্থানের বাহিরের দৃশ্য

অবস্থিত। প্রাঙ্গণের চারি দিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্তূপও দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্ব দিকে, বামে অবলোকিতেশ্বরের একটী দণ্ডায়মান বৃহৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। ইহার উপরে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সিঁড়ি বহিয়া স্তূপের সর্ব্বোপরি উঠিতেই, সমগ্র খনন স্থানটী একসঙ্গে সুস্পষ্ট দেখা গেল। আশেপাশের অনেকদূর পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলাম। উপরে পূর্ব্বকালে যে একটী ছোট মন্দির ছিল, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। মন্দিরের অবশিষ্ট নিম্নাংশের দেওয়ালগাত্রের মূর্ত্তিগুলি অবিকৃতই রহিয়াছে, দেখিলাম। শিল্পীবন্ধু মূর্ত্তিগুলির, স্থপতিবন্ধু গাঁথনির প্রশংসায় ব্যস্ত ছিলেন। আমি নালন্দর ধ্বংসাবশেষের বিশালতা দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। জগতে নানা দেশে প্রাচীন দুর্গ, রাজ-

প্রাসাদ, সমাধি-মন্দির ও ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। কিন্তু এত বড় প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ কোথাও আছে কি না আমার জানা নাই। দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এইরূপ বিশাল প্রতিষ্ঠান, বর্ত্তমান যুগেও যে কোন শিক্ষাভিমানী সভ্য জাতির ও দেশের পক্ষে মহা গৌরবের বিষয়, বলিয়াই বোধ করিলাম। মানসচক্ষে যেন প্রাঙ্গণমধ্যে সহস্র সহস্র পীতবসন-পরিহিত সৌম্যমূর্ত্তি বৌদ্ধ ছাত্র ও আচার্য্যের গমনাগমন দেখিতে পাইতেছিলাম। হঠাৎ বন্ধুদের আহ্বানে চমক ভাঙ্গিল। দেখিলাম, তাঁহারা নামিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমিও নামিতে সুরু করিলাম।



নালন্দ—প্রধান স্তূপের সাধারণ দৃশ্য

খননের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে যে, প্রথমে এই স্থানে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে সর্ব্বপ্রাচীনটীর ধ্বংসাবশেষের উপরে ও চারি দিকে কয়েকটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া আকার বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বড় স্তূপটী অন্ততঃ সাতটী ছোট স্তূপের সমষ্টিতে গঠিত। তিনটি একবারে বড় স্তূপের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে এবং বাকি চারটী বাহিরে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে একটী স্তূপ অতি সুরক্ষিত ভাবেই আছে, বলা যাইতে পারে। এই স্তূপটীর গাত্রে সারি সারি সুন্দর বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি সজ্জিত দেখিলাম। পার্শ্বদেশ ঘুরিয়া স্তূপের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে নাগার্জ্জুনের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।

স্তূপের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া, তাহার পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত দুইটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিহার-সৌধের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বড় বিহার-সৌধে উপস্থিত হইলাম। প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া, পূর্ব্বেকার যে সকল প্রস্তর-স্তম্ভের উপর ছাদ রক্ষিত ছিল, তাহার অতি নিম্ন অংশ মাত্র এখন অবশিষ্ট রহিয়াছে, দেখিলাম। বারাণ্ডা অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ-পথের পার্শ্বস্থিত গৃহ হইতে খননের সময় একটী তাম্র-ফলক পাওয়া গিয়াছে। ইহা পাল রাজবংশের তৃতীয় রাজা দেবপালের সময়ের। তিনি নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ফলকে লিখিত আছে যে, "সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রার) অধিপতি শ্রীবলপুত্রদেব, নালন্দে একটী বিহার সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও আগত ভিক্ষুদের স্বাচ্ছন্দের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ, শ্রীনগর (পাটনা) বিভাগের রাজগৃহ ও গয়া জিলার কয়েকটী গ্রাম দান করিলেন। তিনি নিজ রাজ্যের কয়েকটী গ্রাম দেবপালদেবকে দিয়া, পরিবর্ত্তে ঐ সকল গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

প্রবেশ-পথের আশে পাশে, বালি ও চূণের জমাটে নির্ম্মিত বিশেষভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটী মূর্ত্তির অংশ দেখিতে পাওয়া গেল।

নালন্দ খননের ফলে একটা বিশেষ বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই একই স্থান কয়েকবার পরিত্যক্ত ও পুনর্গৃহীত হইয়াছিল। উপরিস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহার-সৌধের নিম্নে তৎপূর্ব্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহারের সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমরা নিম্নেকার বিহারটীতে ভিক্ষুদের বাসোপযোগী সারি সারি গৃহ দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বদিকের মধ্যভাগে যে পূজার স্থান ছিল, সেখানে একটা বৃহৎ আকারের ভগ্ন

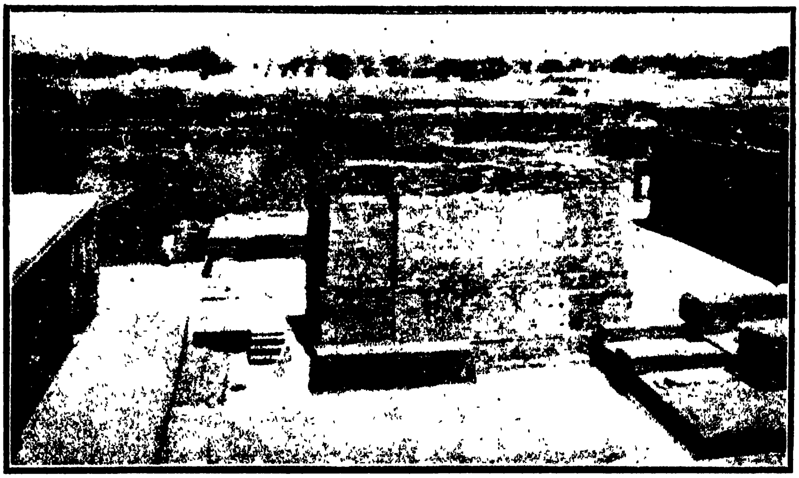
উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির পদদ্বয় ও বস্ত্রের অংশ মাত্র রহিয়াছে, দেখা গেল। বারাণ্ডায় অন্য অনেকগুলি ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তিও দেখিলাম। এক কোণে, শিব ও পার্ব্বতীকে পদতলে চাপিয়া দণ্ডায়মান, গলে নানা ভঙ্গীর ক্ষুদ্র বুদ্ধ মূর্ত্তি যুক্ত দীর্ঘ মাল্য পরিহিত ত্রৈলোক্য-বিজয়ের ভগ্ন মূর্ত্তির নিম্ন ভাগ মাত্র রহিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী উচ্চ চতুষ্কোণ চৈত্য ও এক কোণে বাঁধান কূপ রহিয়াছে দেখিলাম।

উপরে নির্ম্মিত বিহারে ভিক্ষুদের বাসগৃহের বিশেষত্ব দেখা গেল। তাহাতে প্রতি গৃহে, মেঝে হইতে হাতখানেক উচ্চ দুইটী করিয়া শয়নমঞ্চ গাঁথা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম।

পার্শ্ববর্ত্তী বিহারের উপরের অংশে উপস্থিত হইলাম। এই বিহার সৌধের অর্দ্ধাংশ খুব নীচে পর্য্যন্ত খনন করিয়া, তৎপূর্ব্বে নির্ম্মিত বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখান হইয়াছে। নীচেকার বিহারটী যে অগ্নিতে ধ্বংস পাইয়াছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ দগ্ধ দেওয়াল ও চৌকাট বর্ত্তমান রহিয়াছে, দেখিলাম। বিহারের প্রাঙ্গণের এক কোণেও একটী বাঁধান কূপ দেখিতে পাইলাম।

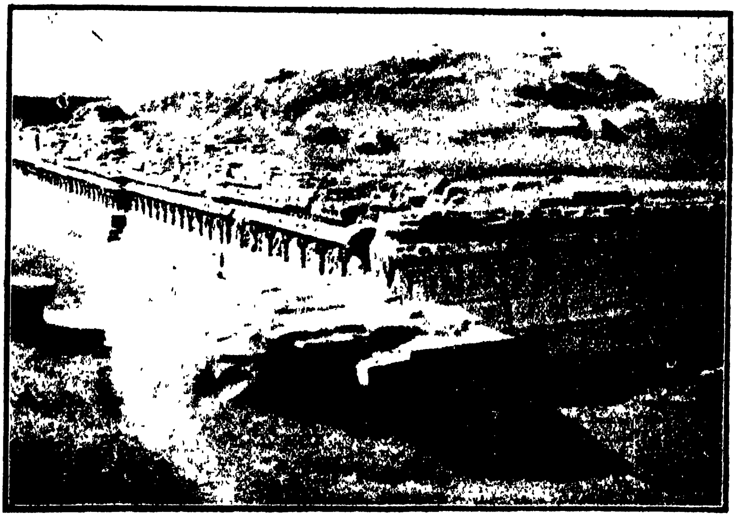
উক্ত বিহারের সংলগ্ন আর একটী বিহারে এক দিকের বাস-গৃহগুলি খনন মুক্ত করা হইয়াছে এখানে এক সারি গৃহের পশ্চাতে, মধ্যে প্রবেশদ্বার যুক্ত আর এক সারি গৃহ দেখা গেল।

পরের বিহারে ইষ্টক-মণ্ডিত দুইটী প্রাঙ্গণ দেখিলাম। নীচেরটী প্রথমকার বিহারের ও উপরেরটী তাহার ধ্বংসের পরে নির্ম্মিত অপর একটী বিহারের, বুঝিতে পারা গেল। উপরের প্রাঙ্গণে ভিক্ষুদিগের রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত দুই জোড়া লম্বা আকারের চুল্লী দেখিতে পাইলাম। এক ধারে একটী বাঁধান কূপ দেখিলাম। এই বিহার ও পরবর্ত্তী বিহারের মধ্য দিয়া একটা রাস্তা রহিয়াছে, দেখা গেল।



নালন্দ—বড় বিহারের প্রাঙ্গণমধ্যস্থ চৈত্য এবং পার্শ্বের গৃহাবলি

শেষে যে বিহারটাতে যাইলাম, তাহার প্রাঙ্গণ খনন করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এক স্থানে একই নক্সা অনুযায়ী পর পর তিনবার বিহার নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।



নানা মূর্ত্তিশোভিত প্রস্তর-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

এই বিহারের পশ্চাতেই একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। চারি দিকে নানারূপ খোদিত মূর্ত্তি—বিভিন্ন ভঙ্গীর মনুষ্য, বাদনরত কিন্নরী, শিব-পার্ব্বতী, কার্ত্তিকেয়, জাতকের গল্পের চিত্র, সাপুড়িয়া, ধনুর্দ্ধারী প্রভৃতি রহিয়াছে, দেখিলাম।

চাপরাসী জানাইল, দ্রষ্টব্য সকল বস্তুগুলিই আমাদের দেখান হইয়াছে। তাহাকে কিছু বকশিস দিয়া বিদায় করিলাম। খনন কার্য্য চলিতেছে, সেই অবস্থায় দেখিবার জন্য আমরা মুক্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া অপর দিকে দ্বিতীয় স্তূপের স্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, স্তূপটী প্রায় খনন মুক্ত হইয়াছে এবং হেলান অবস্থায় রহিয়াছে। অনেক অংশ বিকৃত হইলেও, স্থান বিশেষের কারুকার্য্য এখনও যেন নূতনের মত বোধ হইল। প্রথম স্তূপের অপেক্ষা আকারে ছোট হইলেও, সংস্কারের পর এটীও যে একটী বিশেষ দর্শনীয় বস্তু হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিকটে একটী চালার ভিতর মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অতি বৃহৎ ভগ্ন বুদ্ধ-মূর্ত্তি রহিয়াছে, দেখিলাম। পার্শ্বে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত ভগ্ন ছোট মন্দিরও দেখা গেল।

শুনিলাম, এখন প্রায় আড়াই শত শ্রমজীবী খনন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। পূর্ব্বে প্রায় সাত শত জন কাজ করিত। ছোট লাইন বসাইয়া ট্রলি করিয়া মৃত্তিকা দূরে ফেলা হইতেছে। খনন মুক্ত বিহার-সৌধ ও স্তূপের মেরামতের জন্য বিভিন্ন আকারের ইট ও টালি ইত্যাদি ঐখানেই প্রস্তুত করা হইতেছে। ইংরাজী ১৯১৫ সাল হইতে খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা শেষ হইতে আরও কত বৎসর লাগিবে, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না।

বিহার স্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বাংলার মধ্যস্থ ক্ষুদ্র মিউজিয়মে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহা দৈনিক মাত্র এক ঘণ্টার জন্য (১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত) খোলা থাকে। দুইটী নব-নির্ম্মিত সুন্দর গৃহে খনন কালে প্রাপ্ত নানা প্রকার মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও ধুনুচি, লৌহ-নির্ম্মিত তালা, কয়েকটী মুদ্রা ও তাম্রফলক এবং উৎকীর্ণ ইষ্টক প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত আছে, দেখিলাম।

দেখা শেষ হইলে, আবার গোযানে আরোহণ করা গেল। বেলা দেড়টা আন্দাজ নালন্দ ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ছোট ষ্টেসন, মাষ্টার মহাশয় তখন পার্শ্বের ঘরটীতে নিদ্রার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া, আমরা টিকিট ঘরের মধ্যে বসিয়াই আহার সারিয়া লইলাম।

দুইটার সময় আমাদের গোযান রাজগির যাত্রা করিল। মধ্যপথে শিলাওএ ফিরিয়া আমরা সকলেই কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য আবশ্যকমত খাজা ক্রয় করিয়া লইলাম। রাজগিরে ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌছাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

সুবিধা মত যাতায়াতের ট্রেণ না থাকায় আমরা রাজগির হইতে নালন্দ দেখিয়া আসিতে গো-যানের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে মনে হইয়াছিল, চার ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গিয়া, ট্রেণে ফিরিবার ব্যবস্থা করিলেই ভাল হইত। সময়ও কম লাগিত।

রন্ধনোৎসাহী বন্ধুরা সে রাত্রে আর উৎসাহ দেখাইলেন না। সেজন্য দোকান হইতে আনীত পুরী, তরকারী ও মিষ্টান্নের দ্বারা নৈশ ভোজ সমাধা করা গেল। আমরা সাড়ে নয়টার মধ্যেই শুইয়া পড়িলাম।

আমাদের রাজগির বাসের তৃতীয় রাত্রি প্রভাত হইলে, ২৭শে অক্টোবর মঙ্গলবার, সকলে ছয়টার মধ্যেই উঠিয়া পড়িলাম। প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া এবং ব্যবস্থাদির পর কুকারে রান্না চড়াইয়া বাহির হইতে আটটা বাজিয়া গেল। ষ্টেসনের পথ ঘুরিয়া আমরা প্রথমে ব্রহ্মদেশীয় ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। এটী অন্য ধর্ম্মশালা হইতে একটু দূরে বিপুলগিরির প্রায় পাদদেশে অবস্থিত। বাড়ীটি ছোট, সুন্দর ও সযত্নরক্ষিত। বাসের গৃহ অল্প বলিয়া, পার্শ্বেই আবার একটী নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, দেখিলাম। ধর্ম্মশালাস্থিত একটী গৃহে, কারুকার্য্য খচিত স্বর্ণাভ সিংহাসনের উপর সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিলাম।

সেখান হইতে বাহির হইয়া, প্রাচীন প্রাকার অতিক্রম করিয়া অল্প দূর যাইতেই বামে একটী ছোট রাস্তা পাইলাম। সেই রাস্তা ধরিয়া আমরা বিপুলগিরির পাদদেশে স্থিত মকদুমকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

মুসলমানগণের বিহার বিজয়ের পর, বহু মুসলমান সাধু সুখস্বাস্থ্যময় রাজগৃহে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে পীর মকদুমশাহের নাম বিহার অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। মকদুমশা বিপুলাচলের পাদদেশে স্থিত তীর্থ

ঋষ্যশৃঙ্গ-কুণ্ডে আসিয়া বাস করেন এবং নানা অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়া সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। ঋষ্যশৃঙ্গ-কুণ্ড তখন হইতে মকদুমকুণ্ড বলিয়া গণ্য হয়। অদ্যাবধি বহুদূর স্থান হইতেও ভক্ত মুসলমানগণ এই কুণ্ড দর্শনে আসিয়া থাকেন।

সদর দ্বার দিয়া কুণ্ডাবাসে প্রবেশ করিতে, বামে স্নানের কুণ্ড ও দক্ষিণে একটী মস্‌জিদ দেখিতে পাইলাম। মস্‌জিদের পরেও একটি ছোট কুণ্ড রহিয়াছে, দেখিলাম। ভিতরে প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বের সারি সারি গৃহে অনেক মুসাফির ছিলেন। তন্মধ্যে একজন পাবনাবাসী মুসলমান ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে আলাপ করিলেন। প্রাঙ্গণের শেষ দিকে কয়েক ধাপ উপরে উঠিয়া, পর্ব্বতগাত্র-স্থিত পীরের বাসের গুহাটীর সম্মুখভাগ গাঁথিয়া সুন্দর একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে, দেখিলাম। পার্শ্বের আর একটী সরু সিঁড়ি দিয়া পর্ব্বতগাত্রে অল্প দূর উঠিয়া, সমাধিস্থান দেখা গেল। সঙ্গে ক্যামেরাটী না থাকায়, কোন চিত্র সংগ্রহ করা হইল না।

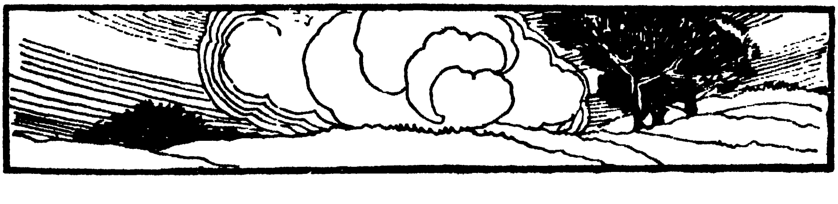
তথা হইতে বাহির হইয়া, আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শেষের দিনের স্নান সারিতে একটু অধিক সময়ই ব্যয় করা গেল। ফিরিবার সময় কেবল মনে হইতে লাগিল, আরও কয়েক দিন থাকিয়া রাজগৃহের সকল দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া যাইলে ভাল হইত। ধর্ম্মশালায় পৌছাইতে আমাদের দশটা বাজিয়া গেল।

যথাসময়ে আহারাদি শেষ করিয়া, একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম, কালীচরণ পাণ্ডা তাহার খাতা লইয়া উপস্থিত হইল। খাতা পরীক্ষা করিয়া তাহাতে অনেক জানিত বিশিষ্ট বাঙ্গালীর হস্তাক্ষর দেখিলাম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দেহত্যাগের বর্ষে (১৯২৫) গোড়ার দিকে রাজগৃহে কয়েক দিন সপরিবারে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরও দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ ও মাত্রানুযায়ী পারিশ্রমিক দিয়া, সকলে তাহার খাতায় নাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া দিলাম। জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া, ধর্ম্মশালার রক্ষককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া, আমরা তিনটার পর ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চারটার সময় আমাদের ট্রেণ ষ্টেসন ত্যাগ করিল। শেষবারের মত রাজগৃহের গিরিশ্রেণীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। কোলাহলময় কর্ম্মজীবনের মধ্যে কয়দিন মাত্র অবসর গ্রহণ করিয়া রাজগৃহে যে শান্তিলাভ করিয়াছি এবং ভারতের প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া একসঙ্গে যেরূপ দুঃখ ও আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহার স্মৃতি কখনও মুছিবার নয় বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

সন্ধ্যা সাতটা আন্দাজ আমরা বক্তিয়ারপুরে আসিয়া পৌছিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই কলিকাতাগামী দানাপুর এক্সপ্রেস্ আসিয়া পড়িল। আমরা তাহাতে উঠিয়া, পরদিন ২৮শে অক্টোবর বুধবার সকাল ছয়টায় যথাসময়েই হাওড়ায় উপস্থিত হইলাম।

নিবেদন—এই প্রবন্ধে লিখিত প্রাচীন বিবরণ সমূহ সংগ্রহের জন্য মহাভারত, বিশ্বকোষ, সরকারী বিবরণ, অভিধান ও ইতিহাস পুস্তকাদি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, সেজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এতৎসহ প্রকাশিত চিত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি আমার সহযাত্রী বন্ধুদের গৃহীত। নালন্দার ভিতরের চিত্র তিনখানি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের প্রকাশিত বিবরণ পুস্তিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছি। অন্য কতকগুলি চিত্র অগ্রজতুল্য শ্রীযুক্ত তারাদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। এ জন্যও সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম।



আর এক দিক

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

খোলা জানালার পথে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের এক টুক্‌রো চোখে পড়ে। বাতাস আস্‌চে কত দূর থেকে, কত মাঠ পার হয়ে, কত কুটীরের উপর দিয়ে। রাত বোধ হয় দুটো হবে। সহর আর বেঁচে নেই, এমনি রাত্রে জেগে থাকতে থাকতে তাই মনে হয়; মনে হয় পৃথিবীর প্রাণ-চাঞ্চল্য হঠাৎ থেমে গেচে। এমনি রাত্রে টেবিলের ধারে বসে থাকতে থাকতে অনেক কথাই মনে হয়। পৃথিবীর বিপুলতার তুলনায় নিজের সীমাবদ্ধ শক্তির কথা মনে করে দুর্ব্বলতা বোধ করতে হয় নিজের মধ্যে।

প্রকাশও ফিকে-নীল আলো-জ্বালা ঘরটীতে বসে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। তার হাতে একটা চুরুট, কিন্তু কতক্ষণ যে সেটাতে টান দেওয়া হয় নি তা ওর আর মনেই নেই। সেটাতে ছাই এতখানি জমা হয়েচে যে এখুনি তার গায়ে পড়্‌বে। কিন্তু প্রকাশ তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, তারার-ফুল-বিছানো আকাশের দিকে। ঠিক সে দিকে ও হয় ত চেয়ে নেই, বুঝি কোন দিকেই ও চাইচে না।

ওর টেবিলের ওপর খানকয়েক ইংরিজী বই, একটা পেন্, পেনের কালি, একটা ছাইদানি, গোটাকতক আলপিন্, খানকয়েক খাতা, একটা লেটার-প্যাড্। লেটার-প্যাড্‌টার ওপর একখানা খাম। খামের ওপর অপটু হস্তে লেখা তারই নাম—প্রকাশ রায়। চিঠিখানা ও পড়েচে, বেশ ভাল করেই পড়েচে। খুব কম হলেও বার পাঁচেক তাকে চিঠিখানা পড়তে হয়েচে। এইবার চিঠিখানার জবাব তাকে লিখতে হ'বে। কি লিখ্‌বে তা সে জানে, তবে কি করে লিখ্‌বে তাই নিয়ে ভাবনা। চিঠি সে জীবনে অনেককে লিখেচে, কিন্তু অনেককে যা লেখা যায় আজকের চিঠিখানি ঠিক সে রকম হবে না। আজ রাত্তিরেই চিঠিখানা তাকে শেষ করতে হবে, কারণ, সে চলে যাচ্চে বাইরে এবং সুমিতা তাকে লিখেচে চিঠি পেয়েই যদি না আসতে পারো ত তখুনি চিঠির জবাব দিও। সুমিতার প্রথম প্রস্তাব প্রকাশ রাখতে পারচে না, কাজেই ওর শেষ কথাটা ও রাখবে। এমন ভাবে রাখবে যে সুমিতা আর কখনও তাকে চিঠি দিতে বলবে না।

প্রথমে এল সম্বোধন-সমস্যা। ইতিপূর্ব্বে সে সুমিতাকে চিঠি লেখে নি; আজই প্রথম এবং শেষও। শুধু মিতা বলে ডাকলে সুমিতা হয় ত হাসবার সুযোগ পেতে পারে এবং তাতে বড় বেশী কবিতা হ'য়ে যায়। 'প্রিয়া' প্রমুখ সম্বোধনগুলো পুরানো হয়ে গেচে, যদিও সুমিতাই তার প্রিয়া, যে প্রিয়া অহেতুক ঘনিষ্ঠতা ও অকারণ দূরত্ব দিয়ে নিজেকে অপরূপ করে রাখে; যে কাছে টানে, কিন্তু কাছে আসে না। চিঠিতে সেই শব্দটা ও কিছুতেই প্রয়োগ করবে না।

অনেক ভেবে স্থির হল, শুধু সুমিতা ছাড়া আর কিছু সে সম্বোধনে ব্যবহার করবে না। নিরাভরণ সুমিতা,—নিরলঙ্কার।

প্রকাশ লিখ্‌ল—

সুমিতা,

তোমার চিঠি পেলাম একটু আগে। এতদিন তুমি চিঠি লেখো নি সেইটেই আশ্চর্য্যের। চিঠি লিখে তুমি ভালই করেচ; নইলে আমার যা বলবার তা বোধ হয় কোন দিন বলাই হত না। একটী একটী করে আমি তোমার সমস্ত কথার জবাব দেব; এমন অনেক কথাই বলব যা তুমি ভাবতে পারো না। কিন্তু বলা দরকার।

হঠাৎ আমি কেন গা-ঢাকা দিলাম তুমি তা জানতে চেয়েচো। এখনও গা-ঢাকা দিই নি এই চিঠিই তার প্রমাণ। তোমাকে আমার কথাগুলো না জানিয়ে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। এই চিঠির পর আমার আত্মগোপনের আর কোন বাধা রইল না। তুমি হয় ত ভাবচো যে এইবার আমি তোমার নিন্দা সুরু করব; কিম্বা লিখ্‌বো যে উত্তেজনাপূর্ণ একটা কবিতা লিখে আমি জেলে যেতে বসেচি, না হয় আমার টাকা-কড়ির এত অভাব যে মর্য্যাদা বজায় রাখবার মতো কাপড়-জামা জোগাড় করতে না

পেরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারচি না। তুমি জানো, তোমার নিন্দা আমি মুখের সামনেই করেচি, এবং তাতে তুমি রাগ কর নি কোন দিন। উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা ছেড়ে আমি এখন প্রেমের কবিতা লিখ্‌চি এবং সেগুলির মূলে আছো তুমি নিজে—এ কথাও বোধ হয় তোমার অজানা নয়। আর পোষাক? পোষাকের দিক দিয়ে কোন দিনই আমি আপটু-ডেট্‌ নই, দৃষ্টি থাকলেই তা বোঝা যায়। পাঞ্জাবীর মালিন্য ঢাকবার জন্যে আমি কোন দিন সেটাকে ফরসা চাদর দিয়ে আবৃত করতে চাই না।

তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে আমি তোমায় ভালবাসি কি না। ভালবাসি কি না, সেটা এত সহজে আমি বুঝতে পারি না যে তোমার সঙ্গে মাত্র ছ'টী মাসের আলাপের পরেই তার জবাব দিতে পারব। ছ'টী মাস তোমার-আমার জীবনের কতটুকু,—একটা সামান্য ভগ্নাংশ বই ত নয়। ছ'টী মাস আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করেচি, এতে তুমি লিখেচ যে আমায় অত্যন্ত কাছে না পেলে তোমার অস্বস্তির আর অন্ত থাকে না। চোখে ঘুম নেই, আহারে নেই রুচি, তৃতীয়ার চাঁদের মত তোমার তনু ক্ষীণ হয়ে গেছে, এ সব কথা যে লেখ নি এ জন্য তোমায় ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অস্বস্তি বোধ করাটা স্বাভাবিক বলে বুঝতে পারি। আর কিছু লিখলে আমি মনে মনে বোধ হয় হাসি চাপতে পারতাম না। কারণ, আমার মত এই যে ছ' মাস আমরা যে নৈকট্য অনুভবের সুযোগ পেয়েচি, আগামী ছ' মাস যদি তা আর না পাই তা হলে তোমার মনের বর্ত্তমান অবস্থা কেটে যাবে। আসল কথা এই যে আমি বিশ্বাস করি না তুমি আমায় ভালবাস। ভাল লাগাকেই আমরা অনেক সময় ভালবাসা বলে ভুল করে ফেলি এবং তার জন্যে পরে আর অনুতাপের অন্ত থাকে না। দুটোর মধ্যে তফাৎ অনেক। মনে করো না যে মানুষের ভালবাসায় আমার বিশ্বাস নেই। আমার বিশ্বাসের আদর্শ এত উঁচু যে সব ভালবাসাকে স্বীকার করতে আমার কুণ্ঠা বোধ হয়।

তোমাতে আমাতে কত জনকোলাহল-ক্লান্ত দুপুরে মুখোমুখী বসে গল্প করেচি, নিশ্চয়ই সে সব তোমার মনে আছে। কখনও দু'জনে পাশাপাশি দু'টী চেয়ারে, কখনও আমি চেয়ারে, তুমি নীচে—আমার হাঁটুর উপর মাথা রেখে। ঘরের কপাট ভেজানো থাক্‌ত, কিন্তু সেই আধ অন্ধকারেই দেখতাম তোমার স্বচ্ছ দু'টী চোখ একাগ্র বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে আছে; কখনও বা তোমার একটী হাত এসে আমার হাতের মুঠিতে আশ্রয় নিয়েচে। তোমার ছেলে-মানুষী প্রশ্নগুলির উত্তরে আমিও ছেলে-মানুষের মত জবাব দিয়েচি; তুমি যখন বড় বড় কথা জান্‌বার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেচো, আমি সাধ্যমত তার উত্তর দিয়েচি। আর্ট সম্বন্ধে আমার ধারণা কি শুন্‌তে শুন্‌তে তুমি তন্ময় হয়ে যেতে; কখনও বল্‌তে 'আমি কিছুতেই তেমন হ'তে পারি না! কি করে সে রকম হ'তে পারি, তুমিই তা বলে দাও!'

বলেচি আমি অনেক কথা এবং তুমি তা শুনেওচ। কিন্তু সুমিতা, তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের বিস্তৃতির তুলনায় সেই ভাব-ব্যাকুল মুহূর্ত্তগুলি কতটুকু? তার জন্যে এমনি করে উতলা হলে কি করে চলে—?

তুমি কলকাতা সমাজের নাম-করা মেয়ে। 'নাম-করা' কথাটার মধ্যে একটা খারাপ ইঙ্গিত আছে, আমি সেটুকু বাদ দিয়েই শব্দটা ব্যবহার করলাম। তোমায় নইলে সহরের সঙ্গীত-সভাগুলি অনেকখানি ঝিমিয়ে থাকে, সভা-সমিতিতে তোমার ঘন ঘন ডাক। কত ভ্যারাইটী-পারফরমান্সে তোমার নাম দেখেচি। তোমার জীবন তাই সীমাবদ্ধ নয়; তোমার ভক্ত অনেক, স্তাবক বহু। আমিও তাদের যে-কোন দলের একটী। তোমার কণ্ঠে সুরের যাদু, চোখে অতল রহস্য। তোমার বাবা কেবল ধনী নন,—ব্যারিষ্টার এবং ব্যারিষ্টার হলেই আমাদের দেশে যা হয় তাই—অর্থাৎ জন-নেতা। তবু তুমি আমার জন্যে অনেকখানি ভাবো এটা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু জীবনের দিক্‌-নির্ণয় তোমার আজও বোধ করি হয় নি। যদি তা করতে তা হলে আমায় চিঠি লেখবার আগে অন্ততঃ একশ বার তোমায় ইতস্ততঃ করতে হত। তা হ'ক্‌, তোমার পথের ইঙ্গিত আমিই দিলাম এই চিঠিতে।

অপূর্ব্ব চৌধুরীকে তুমি চেনো, আমি তাকে চিনি। অপূর্ব্ব আই-সি-এস হয়ে ফিরেচে এ কথাও তোমার জানতে বোধ হয় বাকি নেই। অপূর্ব্বর বাপ প্রচুর পয়সা রেখে গেছেন। আমার যদি একটী মেয়ে থাক্‌ত, তা হলে আমি তার জন্যে অপূর্ব্বর মতই একটী ছেলের খোঁজ

করতাম। অপূর্ব্বর চেহারা এত চমৎকার যে রূপের দিক্ দিয়েও সে একশ লোকের মাঝে বিশিষ্ট হয়ে থাকতে পারে। অপূর্ব্বর কথা আমি তোমার মুখে শুনেচি, আরও অনেকের মুখে শুনেচি। শুনেচি অপূর্ব্ব তোমার বাবার বিশিষ্ট কোন বন্ধুর ছেলে—উপযুক্ত ছেলে। অপূর্ব্বর সঙ্গে তোমার বিবাহ বাবা দেবেন এ কথাও যে তুমি জানো না, এই বা কি করে বলা যায়। অথচ আশ্চর্য্য এই যে তুমি অপূর্ব্ব সম্বন্ধে কখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে পারো না। আমার কাছেই তুমি তাকে নিয়ে কত তামাসা করেচ। অপূর্ব্ব যে ভাবে সমাজে চলা-ফেরা করে তা নাকি তোমার আদৌ মনে লাগে না। তুমি বলো যে অপূর্ব্ব ব্যবহার-শাস্ত্র খুব ভাল বোঝে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারটা ঠিক সুকোমল নয়।

তোমার মনের সঙ্গে একটী জায়গায় আমার মিল রয়েচে। আমাদের দুজনেরই শিল্পী মন; আমরা দুজনেই পৃথিবীর সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে যেতে পারি। আমি যদি কবিতা লিখে নিয়ে যাই, তা হলে তোমার তা শোনবার জন্য আগ্রহ থাকে খুব বেশী; তুমি যদি রবীন্দ্রনাথের নূতন কোন গান শেখো তা হলে আমিই অবশ্য তা সকলের আগে শুনব এবং এমন তন্ময় হয়ে শুনব যে আমার মনেই থাকবে না যে ঘণ্টা কয়েক পরে আমায় ফিরে যেতে হ'বে বাড়ী; বাড়ী গিয়ে দেখ্‌ব ছোট বোনটার জ্বর এখনও ছাড়ে নি, উপরন্তু বিনা-ভিজিটে ডাক্তার আর আসতে পারবেন না বলে হয় ত আশ্বস্ত করে গেছেন এবং বাবা একতলার অন্ধকার ঘরটীতে পড়ে পড়ে বাতের যন্ত্রণায় অসহ্য চীৎকার করচেন। ভেবে দেখো যে এই একটী মাত্র দিক ছাড়া আর কোন বিষয়ে তোমার-আমার মধ্যে মিল নেই।

আর অপূর্ব্ব?

তোমার গত জন্ম-তিথিতে হীরের যে আংটী দিয়েছিল তারই দাম হবে অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা; অপূর্ব্ব সপ্তাহের প্রত্যেক দিন এক একখানা মোটর চড়ে বেড়াতে পারে। তুমি বলো যে অপূর্ব্ব বড় 'রূঢ়'; ও সর্ব্বদাই নিজেকে জাহির করবার জন্য ব্যস্ত। তোমার কাছে এটা ভাল লাগে না, তুমি একটী স্বল্প ও সংযত-বাক্ মানুষ চাও, যে কোন দিন তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে আঘাত করবে না। সে তোমাকে কেবল ভালবাসাই দেবে না, তোমার ভাল লাগা বা 'হবি'গুলোকেও ভালবাসবে। এ-রকম রাজ-যোটক মিল হলে অবশ্য সুখেরই কথা, কিন্তু সে সুখের ব্যবহারিক মূল্য কতটুকু সে নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে।

তোমার জন্ম-দিনে আমি রেশমী কাপড়ের ওপর একটী কবিতা—আমারই লেখা একটী কবিতা ছাপিয়ে দিয়েছিলাম। জিনিষটা আমার পক্ষে শুধু ব্যয়-সাধ্য নয়, বড়-মানুষী। তবু দিয়েছিলাম, কারণ সে দেওয়ার মধ্যে আনন্দ ছিল এবং জানতাম যে তুমিও তাতে তৃপ্তি বোধ করবে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে আমার সেই উপহার এবং তোমার সেই তৃপ্তির দাম কতটুকু? সাদা চোখে আমার উপহারটা একটা কবিতা—যার কোন দাম নেই এবং তোমার সেই তৃপ্তিটুকু নিছক মনোবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

কবিতার এক জায়গায় আমি লিখেছিলাম—

কত লোক দেয় কত হাসির উৎসবে;
জানি মোর দান সেথা খুব ম্লান হ'বে!
তবু মর্ম্ম-মিতা,
তব নামে রচিলাম আমার কবিতা।

এই তবুর দাম আমার কাছে যত বেশীই হ'ক্, পৃথিবী—যেখানে স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের, মনুষ্যত্বের সঙ্গে লাভ-লোকসান আর লোভের প্রতিনিয়ত সংঘাত বাধ্‌চে—সেই পৃথিবী তার কোন দামই দেবে না।

ভালবাসা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের এবং তোমার যা আদর্শ, তার পরিণতি বিবাহ। আমাদের তথা-কথিত ভালবাসার পরিণতি বা পরিণাম যদি তাই হয়, তাহলে তোমার এবং আমার তার চেয়ে দুরদৃষ্ট আমি কল্পনাও করতে পারি না। মনে করো আমাদের বিবাহিত জীবনের কোন একদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে মেঘ জড়ো হ'তে লাগল এবং তার পর নামল বৃষ্টি। জানালার কাচ বেয়ে জল গড়াচ্চে, বাইরে বাজ পড়ার শব্দ—টেবিল-ল্যাম্পের সামনে বসে আমার লেখা একটা নতুন কবিতা তোমায় পড়ে শোনাচ্চি। হয় ত তাতে লিখেচি যে আলোক-চিহ্নহীন এমনি উতলা আকাশের নীচে, এমনি জল-ছন্দের মাঝখানে ঘরের কোণে বসে

থাকবার মত অভিশাপ আর নেই ; এমনি রাত্রে তুমি এসো, দু'জনে একটা টু-সীটার মোটরে চড়ে ছুটে যাই—লোকালয় ছাড়িয়ে, সহর ছাড়িয়ে, রেলের লাইন পার হয়ে—দিকরেখা-হারা মাঠের উপর দিয়ে। নিজেদের ইচ্ছামত আমরা ছুটব, নিজেদের খুসীমত আমরা যে দিকে হক্ যাব। ঝড়ো-হাওয়ায় তোমার খোঁপা যাবে ভেঙ্গে, জলেভেজা চুলগুলি পিঠের উপর, মুখের উপর লুটিয়ে পড়বে ; আমি ষ্টীয়ারিং বসে যা-খুসী তাই চীৎকার করব··· ইত্যাদি······

এই কবিতা শুনে তুমি যদি আকাশের মত উতলা হয়ে ওঠো, তাতে অবশ্য আমি পুলকিতই হ'ব, কিন্তু কবিতা শুনে, খানিক চুপচাপ বসে থাকবার পর, তুমি যদি হঠাৎ বলে ওঠো যে চলো অন্ততঃ রেড্-রোড পর্য্যন্ত দু'জনে মোটরে ঘুরে আসি, তাহলে সম্মতি দেবার আগে অন্ততঃ আমায় পাঁচ মিনিট্ ভাবতে হ'বে। কারণ, কবিতায় একটা ভাবকে প্রকাশ করতে পয়সা খরচ হয় না এবং ট্যাক্সিতে বসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলেও ড্রাইভার মিটারের প্রতি অমনোযোগী হ'বে না। পাঁচ মিনিট্ ভেবে আমি হয় ত সম্মতি দেব, কিন্তু সেই পাঁচ মিনিটই আমার এবং তোমার অন্তরের আনন্দকে শুকিয়ে মারবার পক্ষে যথেষ্ট।

টেম্পারামেণ্টের মিল আছে বলেই তোমার আমার জীবনে মিল হতে বাধ্য, এ কথা যদি মনে করো, তা হলে তোমার ধারণার প্রশংসা করা আমার পক্ষে কঠিন হবে। পক্ষান্তরে আমি জানি যে প্রথম জীবনে টেম্পারামেণ্টের মিল ছিল না, অথচ বিয়ে হয়েচে এবং তার কয়েক বৎসর পরে একজন নিজের বৈশিষ্ট্যকে এমন ভাবে হারিয়ে ফেলেচে যে কোন কালে তাদের জীবনে অসামঞ্জস্য ছিল তা আর বোঝবার উপায় নাই।

কিন্তু এ-সব তর্কের কথা ; এবার আমার প্রকৃত বক্তব্যটা বলি। প্রকৃত বক্তব্যটা এই যে, অপূর্ব্ব তোমাকে সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসে। টাকার জন্য তার মনে যদি কোন গর্ব্ব থাকে তা হলে সেটা সহজাত। তার জন্যে তাকে অপরাধী না করে, যারা তাকে সেই টাকার উত্তরাধিকার দিয়ে গেচেন তাঁদেরি দোষী করা বেশী যুক্তি-যুক্ত হ'ত। সত্যি টাকা জিনিষটার বৈশিষ্ট্যই এই যে মানুষের ওপর ওটা একটা ছাপ রেখে যাবেই—যে-কোন দিক্ দিয়েই হ'ক্। নিজেকে যদি কোন দিন বিশ্লেষণ করতে পারো তা হলে দেখবে যে তোমার ওপরেও তার একটা ছাপ রয়েচে। তোমার বাবার যদি প্রচুর পয়সা না থাক্‌ত, তা হলে প্রশংসার চেয়ে তোমাকে আজ নিন্দাই কুড়োতে হত বেশী এবং সকলের ভ্রূভঙ্গি উপেক্ষা করে তুমি প্রায় নিরাবরণ হয়ে মঞ্চের উপর দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পেতে না। তুমি জানো, আর্ট-এর জন্য তোমার এ-টুকু নির্লজ্জতা আমি মার্জ্জনা করতে পারি, কিন্তু সকলে আমার মত আর্ট-এর জন্য পাগল নয়। এ-কথাটা কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলাম।

আগেই বলেচি যে অপূর্ব্ব তোমায় ভালবাসে, এ কথা তুমিও যে জানো না, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। অপূর্ব্বর ভালবাসা এত গভীর তা আগে আমার জানা ছিল না, মাত্র চার পাঁচ দিন আগে হঠাৎ তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেচে।

রাত তখন এগারোটা হবে। একটা রেস্তরাঁয় ঢুকলাম চা খেতে। গিয়ে দেখি এক কোণে অপূর্ব্ব আর তার দু'জন বন্ধু। অপূর্ব্বর সামনে চায়ের পেয়ালা, তার হাতের দামী সিগারেট্টা থেকে কেবল ধোঁয়া বার হচ্চে, মুখের কাছে সেটাকে নিয়ে যাবার অবসর তার নেই। স্থান, কাল একেবারে ভুলে গিয়ে ও বন্ধুদের কাছে কেবল তোমার কথাই বল্‌চে। অপূর্ব্বর তখন মনেই নেই যে ও সদ্যঃ-পাশকরা আই-সি-এস, ওর বাপ কলকাতার এক-ডাকে-চেনা বড়-লোক!

অপূর্ব্ব বলছিল,···'কিন্তু আজও ওকে বুঝতে পারলাম না। মনটাকে এমনি সঙ্গোপনে রেখেচে যে সেখানে পৌঁছয় কার সাধ্য!···অথচ, ওর জন্যে আমি কি না পারি, আমাকে সিভিলিয়ানির মোহ ছেড়ে ও যদি কোন দিন অপরিচিত একটী গাঁয়ে গিয়ে বাসা বাঁধতে বলে, তাও বোধ হয় আমি পারি!'

রেস্তরাঁয় বসা আর তখন হয় নি। পথে নেমে কেবলই ভাবলাম, এত বড় নিষ্ঠার কোন দামই সুমিতা ওকে দিচ্চে না,···সত্যি, তোমার ওপর আমার সেদিন রাগ হয়েছিল। সেই তুমি আমাকে লিখেচো চিঠি ; এমন ভাষায় তুমি চিঠি লিখেচ যে অপূর্ব্বকে যদি তুমি তার একটী লাইনও

লিখতে তাহলে সে আনন্দে বোধ হয় উন্মাদ হয়ে যেত। কিন্তু আমি জানি অপূর্ব্বকে তুমি তা লিখবে না। কারণ, মেয়েদের একটা নিষ্ঠুর আনন্দ রয়েচে যার ভালবাসা নিশ্চিত ভাবে পাওয়া গেচে তার প্রতি ঔদাসীন্য দেখানর মধ্যে। অথচ, তোমাকে যদি বলা হয় যে অপূর্ব্বর প্রতি তুমি একেবারে বিমুখ হও, তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলো যে অপূর্ব্বর এখানে আর আসবার দরকার নেই; তা হলে তুমি বোধ হয় সে সাহসও করতে পারবে না। একসঙ্গে একাধিক পুরুষ-চিত্তকে নিয়ে খেলা করার মোহ তোমাদের মত মেয়ের ভয়ানক বেশী। কিন্তু খেলার সবচেয়ে বড় একটা মুস্কিল এই যে তার জন্যে অনেক সময় আসল কাজে ভুল হয়ে যায়। সে ভুল তুমিও করচো। যাতে সেটা বেশী দিন স্থায়ী না হয়, অনেক দূর এগোতে না পারে, তারি জন্যে এতগুলি অপ্রিয় কথা তোমায় লিখতে হ'ল। আশা করি তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

সকলের শেষে আর একটী প্রশ্নের উত্তর দেব। প্রশ্নটা উঠেচে আমার নিজেরই মনের মধ্যে। জানালা খুলে দিয়ে তোমায় চিঠি লিখ্‌তে বসেছিলাম; আকাশে ছিল এক-টুকরো চাঁদ এবং একরাশ তারা। চাঁদের সেই টুকরোটুকু নিভে গেছে—খালি অন্ধকার, তারাময় আকাশ। তোমার একটা ছবি রয়েচে আমার টেবলের সামনে, দেওয়ালে টাঙ্গানো। ছবিটার দিকে চেয়ে নিজের মনেই প্রশ্ন জাগলো, তোমায় পেলে আমি সুখী হব না কেন?

না, সত্যিই তা সম্ভব নয় সুমিতা।

আমাদের যুগে সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে আমরা নিজেদের বুঝতে পারলাম না; কি চাই তার সঠিক সংজ্ঞা দিতে পারি না। তুমিও না, আমিও না। আমরা যে সময়ে নিজেদের অনুভব করতে শিখ্‌লাম সেটা না নতুনের, না অতীতের। পুরানো বনিয়াদ আজ ভেঙ্গে পড়চে—কিন্তু এর পর কি হবে তা আমরা বুঝতে পারচি না। বুঝতে পারচি যে এতকাল পুরুষ আর নারী যে-পথে, যে-ভাবে চলে এসেচে, সে পথ আমাদের নয়। কিন্তু কোন্ পথ ধরলে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারব, তা এখনও জানা হল না। সেই জন্যে প্রতিবার পা ফেলতে গিয়ে আমাদের এত সন্দেহ, এত আশঙ্কা। এই অনিশ্চয়তার বিষ তোমাকে যতখানি গ্রাস করেচে, আমাকে তার চেয়ে কম করে নি। কিন্তু অপূর্ব্ব মুক্তি পেয়েচে এ' অভিশাপ থেকে; সে নিজেকে ভাল করে জানে। তাই তার কাছে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।

তোমাকে আর অপূর্ব্বকে যদি আমি ভুল বুঝে থাকি, তা হলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা বোধ করবার কোন কারণই থাকে না এবং আমার বিশ্বাস সে কারণ কোন দিন ঘটবে না।

আমার স্নেহ আর কুশল-কামনা।



বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাংলা বানান

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পৌষের "ভারতবর্ষে" ভাষা-প্রবীণ শ্রীযুত বীরেশ্বর সেন মহাশয় আমার লিখিত "বাংলা বানান" প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন। আমি সমালোচনাই চাই। কারণ বাংলা একার সম্পত্তি নয়, কে কি আকারে সে সম্পত্তি ভোগ করিতে চান, তাহা না জানিলে একদেশদর্শিতা হয়। আমার প্রবন্ধের অন্তর্গত দুই একটা বিষয়ে আবার কিছু লিখিতেছি।

ক খ গ ইত্যাদির ধ্বনিকে 'বর্ণ', এবং আকৃতিকে 'অক্ষর' বলি। সেন-মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমরা সর্ব্বত্র অনুস্বারকে ঙ রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি"। যদি তাই, তাহা হইলে তাঁহার "বাঙ্‌লা" ও আমার "বাংলা", উচ্চারণে একই। "বাংলা" বানানে তাঁহার আপত্তি থাকিতে পারে না।

কিন্তু আসল প্রশ্ন, ঙ অক্ষরের উচ্চারণ কিরূপ? সংস্কৃত কি ছিল তাহা উপস্থিত প্রবন্ধে না জানিলেও চলে। বাংলা সকল অক্ষরের উচ্চারণ সংস্কৃতের তুল্য নয়। ঙ অক্ষরেরও না হইতে পারে। পারম্পর্যক্রমে ঙ অক্ষরের কি উচ্চারণ চলিয়া আসিয়াছে? "ধান সা ধাঙ ধাঙ", কিম্বা "পাখীজাতি যদি হঙ; পিয়া পাশে উড়ি যাঙ" (কর্ত্তা মুঁ), এই দুই উদাহরণে ঙ অক্ষরের উচ্চারণ উঁ কিম্বা ওঁ নয় কি? "শাঙন মেঘ", এখানে ঙ স্পষ্ট উঁ। ইহাই পাঠশালায় রুঁঅ বা ওঁঅ পড়া হয়। ধ্বনি দ্বারাই অক্ষরের নাম হইয়াছে। যেমন, 'ক্ষ' বলা হয় 'খিঅ'। এই কারণে ক্ষ-মা বাংলায় খে-মা হইয়াছে। ধ্বনি দ্বারা অক্ষরের নাম না হইলে আর কি প্রকারে হইতে পারিত? ঙ অক্ষরের উচ্চারণ উঁ। ঞ অক্ষরের ইঁ অতএব ভা-ঙা = ভা-উঁআ বা ভা-ওঁআ। সেন মহাশয় পরে লিখিয়াছেন, "অনুস্বারকে ঙ রূপে উচ্চারণ করা ভুল।" ঙ-এর উচ্চারণ অঁ তুল্য। যদি তাই, তাহা হইলে ভা-ঙা = ভা-অঁা।

ব-ঙ্গ হইতে ব-ঙ্গা-ল, ব-ঙ্গা-লী, বা-ঙ্গা-লা। অতএব বা-ঙ্গা-ল, বা-ঙ্গা-লী বা-ঙ্গা-লা। কিন্তু চলিত ভাষায় বলি বা-ঙ্গ্‌-লা। অনুস্বার, বাঙ্গালা উচ্চারণে ঙ্গ্‌। ইহার উদাহরণ দিয়াছি। এই হেতু আমি বাং-লা বানানও করি। এই রূপ, জংলা, হেংলা, নোংরা, খেংরা, ইত্যাদি।

দেশভেদে অক্ষরের উচ্চারণ-ভেদ আছে। পূর্ব্ববঙ্গে ঙ অক্ষরের নাম উ-মা। অর্থাৎ এখানেও উঁআ। গঙ্গার পশ্চিম ও পূর্বপারে কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ-ভেদ আছে। সেন-মহাশয় পূর্বপারের অনুগামী হইয়াছেন। পশ্চিম পারে অর্থাৎ রাঢ়ে কেহ বা-ঙা লী বলে না, ছাপায় বা-ঙা-লী দেখিলেও সকলে পড়িবে বা-ঙ্গা-লী।

সেন-মহাশয় "বলে কয়ে চলে গেল" বানানের দোষ দেখাইয়া লিখিতে চান "বোলে কোয়ে চোলে গেল।" কিন্তু এই বানানে দুইটা দোষ ঘটে। ধাতু চিনিতে পারা যায় না। হয়, 'ব-ল, ক, চ-ল' ধাতু পরিত্যাগ করিতে হয়, নয় 'ব-ল বো-ল, ক কো, চ'ল চো-ল,' দুই দুই রূপ রাখিতে হয়। কিন্তু পরিত্যাগের জো নাই। কারণ, 'সে বলে, কয়, চলে,' আছে। দুই দুই রূপ স্বীকার করিলে ধাতুরূপ বাড়িয়া যায়, দুই রূপের পৃথক প্রয়োগ শিখিতে হয়। (২) বাংলা ভাষা মুখে যাহাই বলি, দেশভেদে কত রকমই বলি। কিন্তু লৈখিক রূপ এক। এই কারণে 'বো-লে, কো য়ে, চো-লে' রূপ প্রচলনের সময় হয় নাই।

যাঁহারা মৌখিক রূপ লেখেন, তাঁহাদের কেহ 'ব'লে, ক'য়ে, চ'লে', কেহ 'বলে' কয়ে' চলে' লেখেন। এই ঊর্ধ্ব 'কমা' কোন্ বর্ণের চিহ্ন? লেখককুল এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না, ইঙ্গিতে বলেন, বুঝিয়া লও। 'সে চলিল',—সে চ'লল, এখানে ঊর্ধ্ব কমা ঈষৎ ইকারের চিহ্ন। কিন্তু 'সে চলিয়া গেল'—'সে চলে' গেল,' এখানে ঊর্ধ্ব কমা কদাপি ইকার নয়, য় ফলা মনে করিতে হইতেছে। একটী চিহ্নের নানা অর্থ রাখিলে ভাষাশিক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে, এই কারণে আমি শৃঙ্গ চিহ্ন দ্বারা ঈষৎ ই জানাইতে চাই, এবং 'বল্যে কয়্যে চল্যে' লিখিয়া য়-ফলা দেখাইতে চাই।

'ব'লে ক'য়ে চ'লে' লিখিবার যুক্তি আছে। 'সে চলিল, তুমি বলিবে' —'সে চ'ল্‌ল তুমি ব'ল্‌বে'। সেইরূপ, 'বলিয়া চলিয়া',—'ব'লে, চ'লে'। অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রথম অক্ষরের পরে ঈষৎ ই চিহ্ন। এবং যেহেতু পরে ই থাকিলে পূর্ব অ-স্বর ঈষৎ ওকার হয়, সেহেতু, 'চ'লল, ব'লবে, ব'লে চ'লে' = উচ্চারণে 'চোল্‌ল বোল্‌বে বোলে চোলে'। কিন্তু হেতুটী হেত্বাভাস। কারণ, 'চ'লল ব'লবে' ইত্যাদিতে 'ইল ইবে' বিভক্তির 'ল, বে' থাকে, যদ্দ্বারা মূল রূপ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু 'চ'লে ব'লে' লিখিলে 'ইয়া' প্রত্যয়ের কোন চিহ্ন থাকে না, প্রকৃত উচ্চারণও পাই না। এই কারণে আমার মনে হয় 'বল্যে কয়ে চল্যে' লেখা ভাল। আমি জানি 'বোল্লে চোল্লে' পড়িবার আশঙ্কা আছে। আরও জানি নব্যেরা পুরাতন বর্জন করিতে উৎসুক। কিন্তু চাকর্যে বাবু, পুব্যে বাতাস, তিল্যে পাটালী, গুড়্যে সন্দেশ ইত্যাদি বহু বহু শব্দে য়-ফলা যোগ না করিলেও নয়, য়-ফলা না দিলে অধিকরণ কারক বুঝাইবে, বিশেষণ বুঝাইবে না।

এখানে দুই একটা শব্দ দেখি। 'ঠাকুর্দ্দা' বানানে দুই দোষ। (১) ঠাকুর-দাদা, সংক্ষেপে ঠাকুর্-দা। অতএব দুইটা দ লেখা ভুল। (২) ঠা-কু-র্দ্দা বানান দেখিলে পড়িতে হয় ঠাকুর্‌দ্-দা। মাঝে একটা

দ আসিয়া পড়ে। লেখিকা এত ভাবেন, নাই। কারণ অর্চ্চনা মূর্চ্ছনা, নির্জ্জন নর্ত্তন নর্দ্দন নির্ম্মাণ নির্য্যাস নির্ব্বাণ ইত্যাদি শব্দে রেফ আসিলেই ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। পূর্ব্বকালে, একশত বৎসর পূর্ব্বেও, তর্ক, দুর্গা অর্থাৎ তর্‌ক্ক, দুর্‌গ্‌গা বলা ও লেখা হইত। কেহ কেহ এখনও বলেন। কিন্তু কালক্রমে দ্বিত্ব উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে, গোটাকয়েকে ঠেকিয়াছে। মুদ্রাকর-মহাশয়েরা পুরাতন অক্ষর ধরিয়া আছেন, বানানের দুইটা বিধি শিখিতে হইতেছে। লেখকমহাশয়েরা মন করিলে অর্ধ উর্ধ্ব বানান চলিতে থাকিবে। আমি বিধি-সাম্যের প্রয়োজন দেখিয়া দ্বিত্ব বর্জন করিয়া থাকি। 'ঠাকুর-দাদা' হয় 'ঠাকুদা' নয় 'ঠাকুদ্দা'। এই দুয়ের 'ঠাকুদ্দা' ঠিক। মৌখিক নামে রেফ শোভা পায় না। এইরূপ, 'ঠাকুরমা'—ঠাকুমা, 'ঠাকুরঝি'—ঠাকুঝি, 'ঠাকুরজামাই'—ঠাকুজ্জামাই।

ভিতর শব্দ সং অভ্যন্তর। ভিতর বহুকাল হইতে আছে। 'ভিতরে এস' অভ্যন্তরে। 'ঘরের মধ্যে', ভিতরেও বটে, মাঝেও বটে। 'তোমাদের ভিতরে কে সাহসী'—'ভিতরে' অশুদ্ধ প্রয়োগ। 'আজে-বাজে' কাজের, আ-জেকে হঠাৎ বা-জের "ছায়া" বলিতে পারি না। বিশেষণে "ছায়া" পূর্ব্বগামী হইবার উদাহরণ পাই না। বরং মনে হয় 'বাজে বাজে' হইতে 'আজে বাজে'। এইরূপ, 'বিজি বিজি' (বীজ বীজ) হইতে 'ইজিবিজি' 'হিজিবিজি' জড় দ্রব্যের ছায়া পশ্চাৎগামী হয়, শব্দেরও হয়। যেমন, কাপড়-চোপড়। কিন্তু 'চোপড়' ছায়া নয়, একটা দ্রব্য। জামা-টামা'-র 'টামা'টি "ছায়া"। সেন-মহাশয়ের 'টল-টল', 'টল-মল' শব্দ দ্বয়ের অর্থ স্বীকার করিতে পারি না। অনেকে এইরূপ যুগল শব্দের ভুল প্রয়োগ করেন। প্রয়োগ দেখিয়া শব্দের অর্থচিন্তা বটে, কিন্তু প্রয়োগে প্রভেদ পাইলে মূল শব্দের অর্থদ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিতে হয়। ইতি

জেলালুদ্দিন রুমি

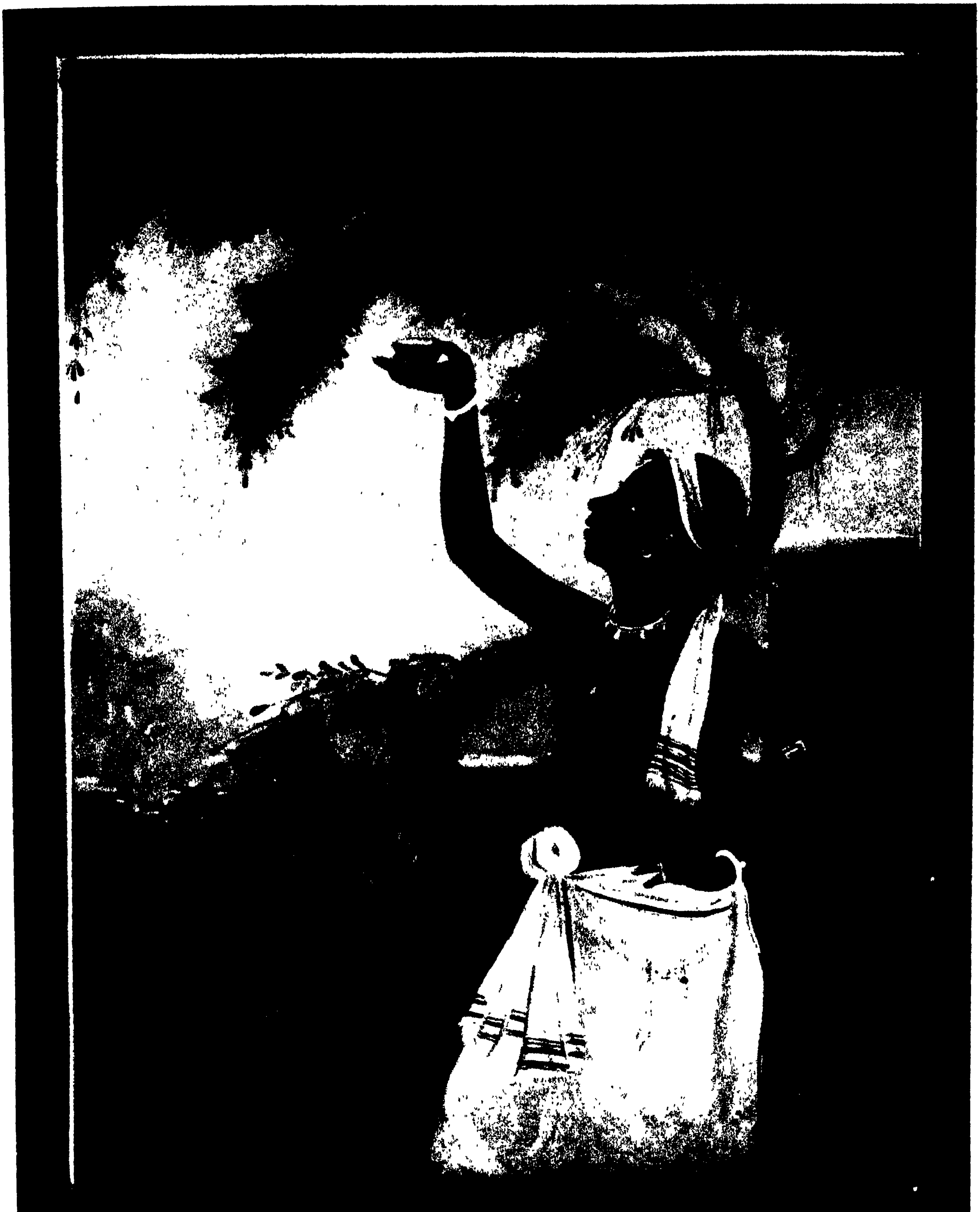
শ্রীবিষ্ণুপদ রায় এম-এ, বি-এল্

বৈষ্ণব কবিগণ একদিন বঙ্গসাহিত্যে যেমন যুগান্তর আনিয়াছিলেন, সুফীগণও তেমনই ভাষায়, ছন্দে, ভাবের গভীরতায় এবং আবেগের প্রবলতায় পারস্য সাহিত্যকে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য ও নূতন বৈচিত্র্য দান করিয়াছিলেন। সুফী কবিগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যায় জেলালুদ্দিন মহম্মদ তাঁহাদের শিরোমণি। সাধারণতঃ ইনি মৌলানা রুমি বলিয়াই পরিচিত।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী মহাশয় কবি সেখ-সাদি সম্বন্ধে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পারস্য সাহিত্যে সেখ সাদির স্থান অতুলনীয়, কিন্তু আমার মনে হয় সাদি অপেক্ষা রুমিই বাঙ্গালী হৃদয়ের নিকটতর প্রতিবেশী। রুমির জীবনে ও তদ্ রচিত কাব্যে সুফী-সাধনা তাহার সকল সৌন্দর্য্য লইয়া পূর্ণ বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সুফী সাধনার সহিত বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বাউল মতের অতি নিগূঢ় ও গভীর সম্বন্ধ আছে। রুমির গজল সাধারণ পারসি গজলের মত মানবীয় প্রেমের উচ্ছ্বাস মাত্র নহে। অনেক সময় তাহা বৈষ্ণব কবির পদের বা বাউলের গানের পারসি অনুবাদ বলিয়া ভ্রম হয়। রুমি স্বীয় জীবনে যে বৈরাগ্য ও ত্যাগের আচরণ দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি আমাদের হৃদয় জয় করিবেনই করিবেন। তিনি যে ভাবোল্লাসপূর্ণ ভক্তিময় জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা শুধু বৈষ্ণব মহাজনগণেই সম্ভব। কেবলমাত্র এই কারণেই নহে, রুমি দেশকাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে জগতের অন্যতম মহাকবি বলিয়া সম্মানিত হওয়ার যোগ্য। ইয়োরোপের একাধিক ভাষায় রুমির জীবনী আলোচিত ও রুমির কাব্য অনূদিত হইয়াছে। স্বনামধন্য অদ্বিতীয় জার্ম্মাণ পণ্ডিত হেগেল রুমির দার্শনিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ডি ভন রোজেনবার্গ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা নগরী হইতে রুমির দেওয়ানা কাব্যের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের সুধীসমাজেও রুমির যথেষ্ট আদর আছে। ড্যাভিস প্রমুখ কাব্য-সমালোচকগণ রুমির কাব্যালোচনা করিয়া বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রেড হাউস মসনবি কাব্যের এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৎপরে ইংরাজি ভাষায় আরও কয়েকখানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা শিব্‌লিও রুমির জীবনী ও কাব্য আলোচনা করিয়া উর্দ্দু ভাষায় একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

মহাপুরুষ মহম্মদের পবিত্র নামের সহিত আরও একজন মহাপুরুষের স্মৃতি ইসলামের ইতিহাসকে চিরদিন উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। ইনি হজরত মহম্মদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, সর্ব্বপ্রধান সহকর্ম্মী, সর্ব্বপ্রকার মহৎ কার্য্যে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ও উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আবুবকর সিদ্দিক। দুঃখ, বিপদ ও মৃত্যু-শঙ্কার মধ্যে আবুবকর সর্ব্বদা গুরুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। সহজ সরল আদর্শ জীবন লইয়া এই বর্ষীয়ান ধর্ম্মবীর মহম্মদের ত্যক্ত আসনের সম্মান যথাযোগ্য ভাবে রক্ষা করিয়াছেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ আবুবকরের বংশে কবি রুমির জন্ম। কবির পিতা এবং পিতামহও আদর্শ চরিত্র ও ধর্ম্মপ্রাণতায় জন্য তাঁহাদের জীবনে লক্ষ লক্ষ লোকের পূজা পাইয়াছেন। কবির পিতামহ হোসেন একজন সুবিখ্যাত সুফী ছিলেন। খোরাসানের রাজা মহম্মদ খোয়ারজম্ (১১৯৯—১২২০) নিজের একমাত্র কন্যা মালিক-ই-জাহানকে হোসেনের হস্তে সম্প্রদান করেন। এই নরপতি বিখ্যাত আক্রমণকারী চেঙ্গিস খাঁর সমসাময়িক। ১২১৯ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিসকে বাধা দিতে গিয়া ইনি পরাজিত হন।

হোসেনের পুত্র ও কবির পিতা বাহাউদ্দিন সুফী সাধনায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহার উপদেশ গ্রহণের জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে প্রতিদিন তাঁহার গৃহে সহস্র সহস্র লোক সমাগত হইত। প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; আহারান্তে দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে সমাগত লোকদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। জুম্মাদিনে বাহাউদ্দিনের



স্নেহের ডাক

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বক্তৃতা শুনিবার জন্ত পোয়ারজম সা স্বয়ং উপস্থিত হইতেন। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ ইমাম ফকরুদ্দিন রাজিও রাজার সহিত বাহাউদ্দিনের নিকট আসিতেন। বাহাউদ্দিন দার্শনিককে লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই বলিতেন—ভগবৎ-প্রেমই মুক্তির একমাত্র উপায়—শুষ্ক তর্কশাস্ত্র আলোচনায় কোনই লাভ নাই। ফকরুদ্দিন মনে মনে রুষ্ট হইতেন, কিন্তু রাজার ভয়ে বাহাউদ্দিনকে কিছু বলিতে পারিতেন না। মধ্যযুগের রাজারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন—জনসাধারণের মধ্যে কাহারও অসাধারণ ক্ষমতা বা প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিলে তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। বহু প্রভাবসম্পন্ন ধর্ম্মগুরু এই ভাবে প্রাচীন নরপতিগণের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। ফকরুদ্দিনের প্ররোচনায়, ও স্বদেশীয় সমাজে বাহাউদ্দিনের অসামান্য প্রভাব দর্শনে রাজার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। ফলে রাজা কবির পিতার সহিত নানা দুর্ব্যবহার আরম্ভ করেন ও বাহাউদ্দিন চির দিনের জন্য স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন (১২১২ খৃঃ অব্দ)। এই সময় জেলালুদ্দিন ছয় বৎসরের বালক। স্বদেশ ত্যাগের পর বাহাউদ্দিন প্রথমে নিশাপুরে উপস্থিত হন। সুবিখ্যাত সুফী লেখক ফরিদুদ্দিন আত্তর এই সময় নিশাপুরেই ছিলেন। কথিত আছে আত্তর বালক জেলালুদ্দিনকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—এই প্রচ্ছন্ন মণি একদিন জগৎ আলোকিত করিবে। আত্তরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। নিশাপুর হইতে পিতাপুত্রে বাগদাদ গমন করেন ও তথা হইতে মক্কা গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়া বাহাউদ্দিন লারেন্দা সহরে এক প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠে অধ্যক্ষরূপে সাত বৎসর অতিবাহিত করেন। পরিশেষে এসিয়া মাইনরের নৃপতি আলাউদ্দিন কায়কোবাদের আহ্বানে বাহাউদ্দিন এসিয়ামাইনরে গিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"—এই চাণক্য নীতি ইস্লামের গৌরবময় যুগে সকল উন্নতিশীল রাজ্যেই সযত্নে পালিত হইত। রাজা কায়কোবাদ বাহাউদ্দিনকে রাজোচিত সম্মান ও সমারোহ সহকারে সম্বর্দ্ধনা করেন। এসিয়ামাইনরকে লোকে তৎকালে রুম রাজ্য বলিত; ইহা হইতেই জেলালুদ্দিন 'রুমি' আখ্যা লাভ করেন।

১২০৭ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত বালাখ্ নগরে জেলালুদ্দিন রুমি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুমির পিতা বাহাউদ্দিন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। বাহাউদ্দিন নিজেই পুত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে বুরহানুদ্দিনও খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। কিছুকাল পরে বাহাউদ্দিন এই শিষ্যের হস্তে পুত্রের শিক্ষাভার ন্যস্ত করেন। বুরহানুদ্দিনই প্রকৃত পক্ষে কবির শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু উভয়ই। পিতাপুত্রে যখন কৌনিয়ায় আসেন তখন কবির বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে বাহাউদ্দিনের মৃত্যু হয়। রুমি শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য সামদেশে (বর্ত্তমান সিরিয়া) গমন করেন। তদ্দেশস্থ দামাস্কাস ও আলেপ্পো নগর তৎকালে জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রথমে আলেপ্পো নগরে গিয়া ছাত্রাবাসে থাকিয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কামালুদ্দিনের নিকট রুমি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কামালুদ্দিনের লিখিত আলেপ্পো নগরের ইতিহাস বহু ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কবি আলেপ্পো হইতে দামাস্কাস গমন করেন। এখানে কাহার নিকট তিনি জ্ঞানলাভ করেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কবির শিষ্য ও জীবনচরিত-লেখক সেপাশালার বলিয়াছেন যে, কবি দামাস্কাসে বুরহানিয়া নামক মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন; কিন্তু অন্য কোনও গ্রন্থে এই বুরহানিয়া মাদ্রাসার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন শাস্ত্রে রুমি এমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে কাহারও কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে নিরাকরণের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। ইসলামের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদ কবি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কবির রচিত মহাকাব্য 'মসনবি'ই তাহার প্রমাণ দিতেছে। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সকল শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে রুমি কৌনিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যে গম্ভীর জ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাপক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

এই পর্য্যন্ত কবির যে জীবন তাহা শুষ্ক জ্ঞানীর জীবন। এ সময়ে তিনি সাধারণ পণ্ডিতগণের ন্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন, ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, বক্তৃতা করিতেন, শাস্ত্রের বিধান (ফতোয়া) দিতেন এবং গীতবাদ্যাদি ধর্ম্মের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন। প্রেম, ভক্তি ও বৈরাগ্যের রাজ্য হইতে তখনও তাঁহার আহ্বান আসে নাই। সুবিখ্যাত সুফী সাধক সাম্স্ ই তাব্রেজের সহিত আলাপ ও বন্ধুত্বই কবির জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। ইঁহাদের প্রথম মিলন নদীয়ার অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিমাই এর সহিত ঈশ্বরপুরীর প্রথম সাক্ষাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সাক্ষাতের পর হইতেই বিদ্যার অহঙ্কার ও জ্ঞানের দম্ভ প্রেম-ভক্তির প্রবল স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল! জ্ঞানগর্ব্বী অধ্যাপক দীনহীন সন্ন্যাসীতে পরিণত হইলেন! সাম্স্-ই-তাব্রেজ ও জেলালুদ্দিন রুমির প্রথম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রুমির জীবন-চরিত-লেখকগণ কেহ কেহ এই সকল কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলি এত অলৌকিক যে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন মনে হয় না। কথিত আছে, মৌলানা একদিন অধ্যাপনা কার্য্যে রত ছিলেন, তাঁহার আশে পাশে রাশি রাশি বহুমূল্য গ্রন্থ। সহসা এক দরবেশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'এ সকল গ্রন্থে কি আছে?' মৌলানা বলিলেন,—'ইহাতে যে কি আছে তাহা আর তুমি কি বুঝিবে?' সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থগুলি অগ্নিদগ্ধ হইতে আরম্ভ করিল। মৌলানা জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহা কি?' দরবেশ বলিল, 'ইহাতে যে কি আছে তাহা আর তুমি কি বুঝিবে?' ইহার পর হইতেই রুমির জীবনে পরিবর্ত্তন আসে। বলা বাহুল্য এই কিংবদন্তীর দরবেশ সাম্স্-ই-তাব্রেজ।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইব্‌ন্-ই-বাতুতা কৌনিয়ায় গিয়া রুমির সমাধিস্থান দর্শন করেন। তিনি সেখানে লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন ও স্বয়ং যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাম্স্-ই-তাব্রেজ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা এইরূপ। একদিন এক ফেরিওয়ালা মোহনভোগ বিক্রয় করিতে করিতে রুমির নিকট উপস্থিত হয় ও তাঁহার নিকট এক গোটা মোহনভোগ বিক্রয় করে। রুমি

সেই মোহনভোগ খাওয়ার পর হইতে পাগলের মত হইয়া নিরুদ্দেশ হন। কয়েক বৎসর পরে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু তখন আর কাহারও সহিত কোনও কথাবার্ত্তা বলিতেন না, কেবল কবিতা আবৃত্তি করিতেন। এই সকল কবিতার সমষ্টি হইতেছে মস্নবি কাব্য। এই ফেরিওয়ালাই সুফীগুরু সাম্‌স্-ই-তাব্রেজ। ইব্‌ন্-ই-বাতুতা কৌনিয়া নগরে দেখেন যে সেখানকার লোকেরা রুমির মসনবি কোরআনের মত শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে রুমির শিষ্য সেপাসালার যাহা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে কোনও অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ নাই। তিনি লিখিয়াছেন, সাম্‌স্ সাধারণ সুফীদের মত ছিলেন না। তিনি যে ধর্ম্মজগতে কোনও উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছেন, বাহিরের আচরণ দেখিয়া কোনও দিন কেহ তাহা ভাবিতে পারিত না। ভগবৎ-প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি কৌনিয়ায় উপস্থিত হন। এক সরাইএ উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। দু একটী কথার পর রুমি তাঁহার অনুরক্ত হন এবং শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ৬৪২ হিজরিতে এই ঘটনা ঘটে। ইহার পর রুমি অধ্যাপনা-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সাম্‌স্এর সহিত নির্জ্জনে অবস্থান করিতেন এবং অন্নপান পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধ্যানধারণায় সময় অতিবাহিত করিতেন। সহরে সকলেই বলিতে লাগিল যে, এক পাগল আসিয়া রুমির মত একজন প্রবীণ পণ্ডিতের মাথা বিগড়াইয়া দিয়াছে। শিষ্যেরাও বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সাম্‌স্ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কৌনিয়া পরিত্যাগ করিলেন। সাম্‌স্এর বিচ্ছেদে মৌলানা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। বহু দিন পরে সাম্‌স্ দামাস্কাস হইতে এক পত্র দেন। রুমির পুত্র সুলতান ওয়ালাদ বহু শিষ্য লইয়া সাম্‌স্কে পুনরায় কৌনিয়ায় আনিবার জন্য যাত্রা করেন। ফিরিয়া আসিয়া সাম্‌স্ দুই বৎসর কৌনিয়ায় অবস্থান করেন। কথিত আছে মৌলানার শিষ্যদের হস্তেই তিনি নিহত হন। এ বিষয়ে এক সেপাসালার ভিন্ন আর সকল জীবনচরিত লেখকই একমত। সেপাসালার বলিয়াছেন যে সাম্‌স্ পুনরায় নিরুদ্দেশ হইয়া যান ও তাঁহার আর কোনও সন্ধান মিলে নাই।

সাম্‌স্-ই-তাব্রিজএর অন্তর্দ্ধানের পর হইতেই রুমির কবিত্বশক্তি যেন সহসা শতধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগুলির রচনা আরম্ভ হয়।

এই সময় সুবিখ্যাত পারস্যবিজয়ী হালাকুখাঁর সেনাপতি বেচুখাঁ কৌনিয়া আক্রমণ করেন। বহু দিন ধরিয়া নগর অবরুদ্ধ থাকায় নগর-বাসীরা বিব্রত হইয়া মৌলানার শরণাপন্ন হয়। মালেকিব্-উল-আরেফিন নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কবি আক্রমণকারী সৈন্যগণের সম্মুখস্থ এক টিলার উপর দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িতে আরম্ভ করেন। সৈনিকেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধনুতে শরযোজনা করে, কিন্তু জ্যা আকর্ষণে অসমর্থ হয়। সংবাদ পাইয়া সেনাপতি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন এবং নিজে মৌলানাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হন; কিন্তু এক পদ অগ্রসর হইতে অসমর্থ হন। এই গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, মৌলানা সাহসে নির্ভর করিয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপাসনা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার এই নির্ভীকতা দেখিয়া সেনাপতি মুগ্ধ হইয়া পড়েন। যাহা হউক, যে কারণেই হউক মৌলানার এই কার্য্যের জন্যই সেবারে নগরবাসীরা রক্ষা পায় এবং তাঁহার প্রভাবপ্রতিপত্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হয়।

সাম্‌স্-ই-তাব্রিজের অন্তর্দ্ধানে মৌলানা একেবারে মুষড়াইয়া পড়েন। সকল সময়ে তিনি দুঃখিত চিত্তে থাকিতেন। একদিন চঞ্চল চিত্তে ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিলেন, নিকটে তাঁহার প্রতিবেশী সালাহুদ্দিন আরকুব্ (স্বর্ণকার) দোকানে বসিয়া হাতুড়ি দিয়া রৌপ্যখণ্ডে আঘাত দিতে-ছিলেন। হাতুড়ির শব্দকে বাদ্যধ্বনি মনে করিয়া মৌলানা দোকানের সম্মুখে জ্ঞানশূন্য হইয়া নৃত্য আরম্ভ করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল—নৃত্য থামিল না। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া সালাহুদ্দিনের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি মৌলানার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। মৌলানা তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। দোকানে যাহা কিছু ছিল সালাহুদ্দিন সকলই বিলাইয়া দিলেন। এই দিন হইতে সালাহুদ্দিনই সাম্‌স্এর স্থান অধিকার করিলেন। সালাহুদ্দিন পূর্ব্ব হইতে সুফী-সাধনায় উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মৌলানার পিতা বাহাউদ্দিন ও তদীয় শিষ্য বুর্‌হানুদ্দিনের শিষ্য ছিলেন।

মৌলানা স্ব-রচিত কয়েকটী গজলেও এই সালাহুদ্দিনের উল্লেখ করিয়াছেন। নিরক্ষর স্বর্ণকারকে এই সর্ব্বজনমান্য মহাকবির অন্তরঙ্গ বন্ধু হইতে দেখিয়া কবির শিষ্য ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কবির পুত্র সুলতান ওয়ালাদ স্ব-রচিত মসনবি কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন

'তাব্রিজে মোরা দিলাম্ তাড়ায়ে তখন কি জানি হায়,
'সুর' হবে দুর তার ঠাঁই শেষে জুড়িয়া বসিবে ছাই!
শিষ্যেরা সদা করে কানাকানি গুরুরে আসিয়া বলে
'বিদ্যা-বিহীন এই হীনজন কেন রবে তব দলে?' -

গুরু ত তাহার বাহির দেখিয়া মুগ্ধ হন নাই। প্রেমের রাজ্যে শুষ্ক জ্ঞানের কি অধিকার আছে? তিনি শিষ্যগণের এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া তাহারাও নিরস্ত হইল। সুলতান ওয়ালাদ সালাহুদ্দিনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ৬৬৪ হিজরিতে সালাহুদ্দিনের মৃত্যু হয়। মৌলানা নিজের পিতার সমাধির পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করেন। শোকসন্তপ্ত কবি লিখিয়াছেন,—

তোমার বিরহে কাঁদিছে বন্ধু, দূরে ওই আসমান,
খুনের মাঝারে লুণ্ঠিত হিয়া, কাঁদিছে আমার জান।

সালাহুদ্দিনের মৃত্যুর পর কবির প্রিয়তম শিষ্য হেসামুদ্দিন অন্তরঙ্গ সাধক-সঙ্গীর স্থান অধিকার করেন। তান্ত্রিক সাধনায় উত্তর-সাধক যেমন অপরিহার্য্য সুফী-সাধনায় এই অন্তরঙ্গ বন্ধুরও সেইরূপ প্রয়োজন। তাই মৌলানা একজনের পর আর একজনকে এই ভাবে নিজের বিশিষ্ট বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হেসামুদ্দিনের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মৌলানা তাঁহার বিখ্যাত মহাকাব্য মসনবি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেন ও প্রিয়শিষ্য হেসামুদ্দিন তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। মসনবির প্রথম খণ্ড

সমাপ্ত হওয়ার পর হেসামুদ্দিনের স্ত্রীবিয়োগ হয় ও বহুদিন গ্রন্থরচনা বন্ধ থাকে।

১২৭৩ খৃষ্টাব্দে কৌনিয়া নগরে এক ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হয়। প্রতিদিন অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। বিপন্ন নগর-বাসীরা তাহাদের দুঃখবিপদের আশ্রয়ভূমি মৌলানা রুমির নিকট উপস্থিত হইলেন। মৌলানা তাহাদিগকে বলিলেন—ধরণী ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। উপযুক্ত খাদ্য মিলিলেই শান্ত হইবে। এই উপযুক্ত খাদ্য যে কি তাহা অচিরেই বুঝিতে পারা গেল।

কয়েক দিনের মধ্যে রুমি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সে যুগের ধন্বন্তরি-তুল্য চিকিৎসক আকমালুদ্দিন ও গজ্জোনকোর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। পীড়ার সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও নির্ধন সকলেই কবির রোগ-শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। খ্যাতনামা পণ্ডিত সদরুদ্দিন মৌলানার সেবার জন্য শিষ্যগণের সহিত কৌনিয়ায় আগমন করিলেন। তিনি কবির আরোগ্য কামনা করিয়া ভগবানের করুণা-ভিক্ষা করিলেন। তখন রুগ্ন কবি তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিলেন—বন্ধু, আর কেন? প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝখানে এই যে ক্ষুদ্র অন্তরাল, ইহা ছিন্ন হউক; জ্যোতিতে জ্যোতিঃ মিলিত হউক।' সকলেই বুঝিল কবির মৃত্যুর বিলম্ব নাই। সুফীগুরুরূপে কাহাকে মনোনীত করিয়া যাইতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি হেসামুদ্দিনের নাম করেন। পুত্র সুলতান ওয়ালাদ একজন বড় সুফী ছিলেন। কবি নিজেও তাহা জানিতেন। তথাপি তাঁহার নাম না করিয়া হেসামুদ্দিনকে নিজের স্থানে কার্য্য করিতে আদেশ দান করিলেন। কবির পঞ্চাশ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ ছিল। নিজের সম্পত্তি হইতে উক্ত ঋণ শোধ দিয়া বাকী সম্পত্তি বিলাইয়া দিবার জন্য শিষ্যগণকে অনুরোধ করিলেন। উত্তমর্ণেরা সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন "আপনি ঋণমুক্ত।" কবি তখন সদরুদ্দিনকে শেষ নমাজ পড়িবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদীপ্ত সুফী-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সমাধিভূমিতে লইয়া যাওয়ার জন্য শব উত্তোলিত হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা রোদন করিতে করিতে শবের অনুগমন করিল। খৃষ্টান ও ইহুদিরাও ইঞ্জিল ও তওরিত পাঠ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। বাদশাহ স্বয়ং এই শোভাযাত্রার সহিত ছিলেন। তিনি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইনি তোমাদের কে? তাহারা বলিল—ইনি যদি আপনাদের নিকট মহম্মদ হন তবে আমাদের নিকট ঈসা ও মুসা। জনতা ক্রমে এত বাড়িয়া চলিল যে শব সমাধিভূমিতে পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। কবির শেষ ইচ্ছানুসারে সৈয়দ সদরুদ্দিন নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু সহসা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাজি সেরাজুদ্দিন নমাজ পড়িলেন। কবিকে সমাহিত করিয়া সকলে বিষণ্ণ চিত্তে গৃহে ফিরিল।

রুমির সমাধিভূমি বহু কাল ধরিয়া সম্মানিত হইয়া আসিয়াছে। ইব্‌ন্‌-ই-বাতুতা যখন কৌনিয়ায় উপস্থিত হন, তখন এই সমাধির নিকট এক বৃহৎ লঙ্গরখানা (ভোজনাগার) দেখিতে পান। এই ভোজনাগারে যে কোনও অতিথি আগমন করিলেই আহার্য্য পাইত।

কবির পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিত-লেখকগণ বিশেষ বিবরণ দেন নাই। প্রায় ২০ বৎসর বয়সে কবি সমরকন্দবাসী লালা সারাফুদ্দিনের কন্যা গউহর খাতুনের পাণি-গ্রহণ করেন। তিনি এই স্ত্রীর গর্ভে আলাউদ্দিন ও বাহাউদ্দিন নামে দুই পুত্র লাভ করেন। বাহাউদ্দিন সুলতান ওয়ালাদ নামে পরিচিত। ইনি "দরবাবনামা" নামে একখানি মসনবি কাব্য লিখিয়াছেন। এই কাব্যে রুমির জীবনের অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। সুলতান ওয়ালাদ পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনি নিজেও এক সুফী ছিলেন। পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া দেখিলেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। ফলতঃ মৌলানার বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে পড়ায় সুলতান ওয়ালাদের প্রতিভা নিষ্প্রভ মনে হয়। অন্যথা অন্য স্থানে ও অন্য যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে ৯৬ বৎসর বয়সে সুলতান ওয়ালাদের মৃত্যু হয়।

রুমি সুফীমতাবলম্বিগণের মধ্যে এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইব্‌ন্‌-ই-বাতুতার ভ্রমণকালে এই সম্প্রদায় জালালিয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। মৌলানার নাম জালালুদ্দিন ছিল বলিয়াই বোধ হয় জালালিয়া নামের উৎপত্তি। এসিয়া মাইনর, মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে এই সম্প্রদায় মৌলবিয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। জীবিত লেখকগণের মধ্যে মৌলানা সিবলি লিখিয়াছেন যে তিনি এই সম্প্রদায়ের সভা ও চক্রাকারে নৃত্য স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুফী মত রুমির জীবনে অপূর্ব্ব রূপান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তিনি যে একজন অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী সর্ব্বশাস্ত্রে গভীর-জ্ঞানসম্পন্ন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। সমাজে এই পাণ্ডিত্যের সম্মান ও মর্য্যাদাও যথেষ্ট ছিল। প্রথম জীবনে সম্মান ও পদমর্য্যাদার দিকে তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি সর্ব্বদা বহু শিষ্য-সমন্বিত হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও তর্কবিতর্কাদি করিতে ভালবাসিতেন। যখন পথে বাহির হইতেন সঙ্গে অগ্রে ও পশ্চাতে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত গমন করিতেন। সামস্‌-ই-তাব্রিজের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে জীবন-নাট্যের পট-পরিবর্ত্তন হইল। জপ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদিই এখন জীবনের প্রধান অবলম্বন হইল। প্রেমের মায়াদণ্ড স্পর্শে পণ্ডিত কবি পাগল সুফীতে পরিণত হইলেন। বৈষ্ণব-পদাবলীতে কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগিনী রাধিকার অবস্থায় বা নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষ দশায় আমরা যে দিব্যোন্মাদ দেখিয়াছি, রুমির পরমধন্য জীবনেও তেমনই উন্মাদ আসিয়াছিল। অন্নে রুচি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, অহরহ শুধু প্রেমাস্পদের ধ্যানেই আনন্দ। নিদ্রা সম্বন্ধে রুমি নিজেই বলিয়াছেন,—

নিখিল ঘুমায় কেহ জেগে নাই
আমি যে আত্মহারা,—
বসিয়া বসিয়া সারা নিশি জাগি
গণি আকাশের তারা।

নয়নের নিদ লয়েছে বিদায়
আসিবে না কোনও ছলে,
তোমার বিরহ-গরল খাইয়া
ডুবেছে মরণ-জলে।

নমাজে দণ্ডায়মান হইবামাত্র তাঁহার চিত্ত প্রেমাস্পদের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যাইত। সেফাসালার বলিয়াছেন, "আমি কতবার দেখিয়াছি মৌলানা সন্ধ্যার সময় নমাজে দাঁড়াইয়া সমস্ত রাত্রিই কাটাইয়া দিয়াছেন।" উপাসনা আরম্ভ করা মাত্র অনর্গল অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত হইত। তাঁহার ব্যাকুল ভাব ও কাতরতা দেখিয়া দর্শকমাত্রেরই চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিত। সাংসারিক সম্পদে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ ভাব, সর্ব্বভূতে দয়া, সকলের নিকট দৈন্য ও বিনয়, তীব্র বৈরাগ্য রুমির শেষ জীবনকে ক্রমেই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিল।

এক শীতের রাত্রিতে প্রিয়শিষ্য হেসামুদ্দিন চিল্পির গৃহে যাইয়া দেখেন, —দ্বার রুদ্ধ, সকলে নিদ্রিত। কাহারও ঘুমের ব্যাঘাত না করিয়া—মৌলানা দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শীতের ক্লেশকর বাতাস বহিতেছে, বরফ পড়িতেছে; কিন্তু তিনি কাহাকেও আহ্বান করিলেন না, কোনও সাড়া দিলেন না বা দ্বারদেশে কোনরূপ শব্দ করিলেন না। গভীর রাত্রিতে দ্বারবান দুয়ার খুলিয়া দেখে মৌলানা একাকী সেই শীতের মধ্যে বসিয়া আছেন। সে তাড়াতাড়ি হেসামুদ্দিনকে সংবাদ দিল। হেসামুদ্দিন আসিয়া মৌলানার পদতলে পড়িলেন। মৌলানা তাঁহার গলা জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন। শুধু মানুষ বলিয়া নয় তিনি কোনও প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া অনুচিত মনে করিতেন। তিনি একদিন বহু শিষ্যসহ কোনও স্থানে যাইতেছিলেন; সঙ্কীর্ণ পথ, আর সেই পথরোধ করিয়া এক কুকুর শুইয়া ছিল। মৌলানা কুকুরের বিশ্রাম ভঙ্গ ভয়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একজন লোক তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কুকুরটাকে পথ হইতে তাড়াইয়া দেওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর একদিন মৈনুদ্দিনের গৃহে মৌলানা সশিষ্য সঙ্গীতের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কারজিখাতুন নামে এক মহিলা নানাবিধ মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সকলেই গানে মত্ত ছিল। ইত্যবসরে এক কুকুর আসিয়া সেই মিষ্টান্নগুলি খাইয়া ফেলে। ইহা দেখিয়া এক শিষ্য ক্রোধপরবশ হইয়া কুকুরটাকে প্রহার করিতে যান। মৌলানা তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—উহাকে মারিও না, তোমাদের অপেক্ষা উহার প্রয়োজনই অধিক ছিল। মহাপুরুষগণ নিজেরা এক দিকে যেমন শিশুর মত সরল-স্বভাব হন, অন্য দিকে তেমনই শিশুদিগকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। ঈশার নিকট একবার কতকগুলি শিশুকে আসিতে নিষেধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন,—

"Suffer the little children to come unto Me, and forbid them not; for of such is the Kingdom of Heaven"

Jesus Christ.

"শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দাও, বাধা দিও না; কারণ, স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।"

মৌলানার শিশুপ্রীতি সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। কথিত আছে, একদিন পথে মৌলানাকে দেখিয়া কতকগুলি বালক আসিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিল। তিনি একে একে প্রত্যেকের হস্তচুম্বন করিয়া নানারূপ আলাপ করিতে লাগিলেন। একটী বালক গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। মৌলানাকে এই অবস্থায় দেখিয়া সে দূর হইতে বলিল,—মৌলানা, ঐখানে দাঁড়াইয়া থাকুন, আমার কাজ হইলে আসিতেছি।' মৌলানা বহুক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন; বালকের হাতের কাজ শেষ হইলে সে নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্তচুম্বন করিল।

সংসারের কোনও বস্তুতেই তাঁহার স্পৃহা ছিল না। কৌনিয়ারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রান্ত সম্প্রদায় সকলেই মৌলানার নিকট বহুমূল্য উপহার পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু তিনি একটী দ্রব্যও স্পর্শ করিতেন না। হয় হেসামুদ্দিন, না হয় জারকুবের গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। রাজকোষ হইতে মাসিক ১৫ স্বর্ণমুদ্রা বৃত্তি পাইতেন, তাহাতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সাধারণের এ অর্থ বিনা পরিশ্রমে গ্রহণ করা রুমির ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট কখনই বিধেয় বোধ হইতে পারে না। তাই রুমি যে কোনও লোক যে কোনও অবস্থায় ব্যবস্থার জন্য তাঁহার নিকট আসিলেই বিনা অর্থে তাহাকে ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেন।

অধিকাংশ সময়ই ওয়াজদ্ বা ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। বাহ্যজ্ঞান তখন একেবারেই থাকিত না। বসিয়া থাকিতে থাকিতে নৃত্য আরম্ভ করিতেন, সহসা কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইতেন, সাত আট দিন কোনও সংবাদই পাওয়া যাইত না। তার পর হয় ত অনেক অনুসন্ধানের পর কোনও নির্জ্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পাওয়া যাইত। এইরূপ ভাবে-ভোলা একজন মানুষ এই বঙ্গদেশেও আসিয়াছিলেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর শেষ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রেমের ঠাকুরের মায়াদণ্ড-স্পর্শে এই পৃথিবীর মানুষের এইরূপ রূপান্তর যে অসম্ভব নহে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। সেই নিদারুণ বিরহযন্ত্রণা, সেই কৃষ্ণনাম শ্রবণমাত্রেই অচেতন অবস্থা, সেই নির্জন নিশীথে গম্ভীরা হইতে পলায়ন, সেই দয়িতদর্শনাকাঙ্ক্ষায় 'আকুলি ব্যাকুলি' বঙ্গদেশ কোনও দিন ভুলিতে পারিবে না।

মৃদঙ্গের ধ্বনি শুনিলেই যেমন নবদ্বীপচন্দ্র আত্মহারা হইতেন, রবাবের ঝঙ্কার শ্রবণ মাত্রেই মৌলানা রুমিরও তেমনই বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। কথিত আছে রুমের অধিপতি একবার এক প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক মুশলমানকে কাজির পদে নিযুক্ত করেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজাকে তিনটী সর্ত্ত দেন। তাহার মধ্যে একটী সর্ত্ত ছিল—কৌনিয়া হইতে সকল প্রকারের সঙ্গীতালোচনা বন্ধ রাখা। রাজা সকল সর্ত্তেই রাজি হইলেন কিন্তু মৌলানা সঙ্গীত ভালবাসিতেন বলিয়া এই বিষয়ে সম্মত হইতে পারিলেন না। এই সংবাদ শুনিয়া রুমি হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—রবাব অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে, তাহার প্রথম নমুনা দিয়াছে—এই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে বিচারকের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়া।

পণ্ডিত-শিরোমণি হইয়াও রুমি বিনয় ও দৈন্যের অবতার ছিলেন। তিনি উপাসনা-মন্দিরে কোনও দিন সকলের অগ্রে দাঁড়াইতেন না।

সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া সকলের নীচে সকলের পশ্চাৎভাগে আসন গ্রহণ করিতেন। নিজকে প্রচার করার ইচ্ছা তাঁহার উদার মনে কোনও দিন স্থান পায় নাই। তিনি মসনবির একস্থানে বলিয়াছেন :—

নিজেরে কর দীন, নিজেরে কর হীন,
তাঁহারি মাঝে শুধু হইয়া যাও লীন।
প্রচার করি নিজে বাড়াও মান মিছে
বিজ্ঞাপন-বেড়ি পরিলে রবে পিছে।

রাশিয়ায় নাট্য-বিপ্লব

শ্রীশরৎ ঘোষ এম-এ

মানুষ যখন সুস্থ থাকে সে হাসে, গান গায়—যখন পীড়িত, সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, হা-হুতাশ করে। জাতির সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথা। জাতি যত দিন জীবন্ত থাকে, সে সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করে, নব নব শিল্প রচনা করে—আবিষ্কার, অনুসন্ধান অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অভিনবকে অনাগতকে ক্রমাগত অধিকার করার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে মুমূর্ষু যে জাতি, সে তার গান হারিয়ে ফেলে, গতি ভুলে যায়—সে শুধু তখন অতীতের শয্যায় শুয়ে জগৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মিথ্যা মায়াময় দেখে, মহা সমাধির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ যুগে রাশিয়ার যদি কোনও বিশেষত্ব থাকে ত সে এই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় ঐ জাতটি আজ সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে একটা জাতির জাগরণ বিশেষ কোনও নূতন ব্যাপার নয়, কিন্তু রাশিয়ার এই অভ্যুত্থান এর তুলনা হয় না। জাতি অধীন থাকে, স্বাধীন হয়—দরিদ্র থাকে সমৃদ্ধ হয় ;—কিন্তু অতীতের সমস্ত প্রথাকে, সমস্ত সংস্কারকে সমস্ত বিধানকে এমন করে উপড়ে ফেলে একেবারে অজানা অপরিচিত এক পদ্ধতি দিয়ে একটা বিরাট জাতীয় জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা এ—যেমন দুঃসাহসের তেমনি নির্ম্মম। আমরা দূর থেকে বিস্মিত হয়ে ভাবি, প্রাণশক্তির কতখানি প্রাচুর্য্য থাকলে, এতবড় অস্ত্রোপচার সহ্য করে জাতি যে শুধু বেঁচে থাক্‌ছে তা নয়,—অন্য জাতির সঙ্গে সমান তালে সামনে এগিয়ে যেতে পারে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে তারা যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করে দিচ্ছে, সমস্ত যন্ত্র-শিল্প গণ-শাসিত করে তুলছে, পারিবারিক জীবনে বিবাহকে যেমন তারা স্বাধীন ও সন্তানপালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দিচ্ছে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আজ যেমন তারা অনাবশ্যক মনে করছে, তেমনি তাদের নাট্যজগতেও তারা বিপ্লবের আয়োজন বড় কম করে নি। শুধু অভিনয়ের উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে নয়,—অভিনয়ের রূপ, বিষয়-বস্তু, দৃশ্যপট এবং অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের সম্বন্ধ-বোধের দিক দিয়েও এরা এমন সব বিপ্লবের আয়োজন করেছে যে এত শীঘ্র ঠিক তার ফলাফল নির্দ্ধারণ করা শুধু কষ্টকর নয় অসম্ভব। সে সব কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয় যে সেই বিরাট নটরাজ আজ এই তুষার-শীর্ণ দেশের প্রাণবেদীতে এ কোন্ অপরূপ নৃত্য আরম্ভ করেছেন, যার ছন্দের অনুরণনে এমন সব অপূর্ব্ব পরিকল্পনা শিল্পে কলায় নিত্য নব রূপ পরিগ্রহ করতে থাক্‌ল।

নাটকে সারা ইয়োরোপ আজ বাস্তবতার (realism) ভক্ত হয়ে উঠেছে। Lear এর বিরাট দুঃখ, Faust এর সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা, কিম্বা Phœdra র দুর্জ্জয় লালসা, এদের কাহিনী ত্যাগ করে আজ ইয়োরোপ আঁকতে আরম্ভ করেছে, মানুষের ছোট ছোট অথচ মর্ম্মস্পর্শী সুখ দুঃখের —সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালী প্রবৃত্তি সমূহের চিত্র। এই ভাবের নাটক লেখায় ও অভিনয়েও রাশিয়া শক্তির পরিচয় বড় কম দেয় নি। Gorky র Lower depths, Turgenev এর A month in the Country, Tchekoff এর Cherry orchard কিম্বা Uncle Vanya প্রভৃতি নাটক এই পর্য্যায় ভুক্ত, এবং Moscow Art Theatre এর প্রযোজক Stanislavsky এর এমন চমৎকার বাস্তব রূপ দিয়েছেন যে সারা ইয়োরোপ মুগ্ধ হয়ে সে অভিনয় দেখেছে, আর রাসিয়ার প্রতিভাকে অকুণ্ঠিত ভাবে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়েছে। Moscow Art Theatre এর জন্ম ও প্রসিদ্ধিলাভ, দুইই ঘটে বিপ্লবের আগে। বিপ্লবের পরেও সে আজ বেঁচে আছে, কিন্তু রাশিয়ায় আর তার সে গৌরব নেই। বলশেভিজমের বিপ্লব জাতির জীবনে, চিন্তায়, লক্ষ্যে যে গভীর পরিবর্ত্তনের সংঘটন করেছে, তারি প্রখর আলোকে Stanislavsky র এই সাধের ও সাধনার প্রতিষ্ঠানটি হৃতগৌরব, অতীতের বস্তু, এবং প্রায় অনাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ কথা কেহই অস্বীকার করতে পারেন না যে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সাহিত্য যে সমাজকে চিত্রিত করে—সে বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাজ। দেশের শতকরা ৮০ভাগ যারা, সেই কৃষক ও মজুরদের আশা আকাঙ্ক্ষা ক্বচিৎ এই সাহিত্যে ভাষা পায়। অথচ সাহিত্যকে যদি সত্যকার জাতীয়ই হতে হয়, তাহলে এদের নিয়েই বেশীর ভাগ নাটক রচিত হওয়া উচিত। সোভিয়েট, আজ তাই জাতিকে প্রবুদ্ধ করার দিকে চায় না—যে এমন নাটক অভিনীত হো'ক যাতে এই শ্রমজীবীরা আনন্দ পায় না শিক্ষা পায় না, নিজেকে বড় করার উন্নত করার গভীর প্রেরণা পায় না। Art for art's sake—এ মত, রাশিয়া আজ মোটেই মান্‌তে চায় না। যে শিল্প ও যে কলাবিদ্যা জাতির জীবনকে উন্নত করতে পারে না, রাশিয়ার কাছে তার কোনও মূল্য নেই। আজ সেইজন্য সে দেশের নাটক হয়ে উঠেছে অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক। নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে আজ সোভিয়েট তাই চাইছে যে এই আনন্দোৎসব শ্রমিক ও কৃষককে শুধু আনন্দ দেওয়া বাদে তাদের কাছে মহাবিপ্লবের সেই বাণী পৌঁছে দিক, যা আজ তাদের জপমন্ত্র,—যা আজ তাদের স্বাভাবিক অথচ সুপ্ত আত্মমর্য্যাদাকে সচেতন করে তুলবে—যে বাণী আজ তাদের এই ভরসা দেবে যে পৃথিবীর ধন, সম্পদ, শিক্ষা, শিল্প—এতে নির্ধনদের দাবীও কম নয়। আজ তারা যে সব রকম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, তার কারণ আজ পর্য্যন্ত মানুষের সুখ-দুঃখ-স্বার্থের চিন্তা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও পরিবার-গত হয়ে রয়েছে, জাতিমূলক—সমাজগত—দেশগত হয়ে ওঠেনি। সোভিয়েট সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে যেদিন মানুষ মনে করবে যে শুধু তার পরিবার সুখী হলেই সুখ পাওয়া

যায় না—তার গ্রাম ও সমাজকে সুখী করা দরকার, শিক্ষার গৌরব, সম্পদের সচ্ছলতা যেদিন সে শুধু নিজের সন্তানকে দেওয়ার জন্য নয়—সকলের সন্তানকে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে—সেইদিন মানুষ হবে সত্যকার মানুষ এবং সেইদিন জাতি হবে সত্যকার জাতি। নৈলে আজ আমাদের যে সমাজ—এ ত সেই রোমের পুরোনো ধনী ও ক্রীতদাসের সমাজ। এক দলের লোক জগতের যত কিছু সুখ সম্ভোগ দু'হাতে ভোগ করে যাচ্ছে, আর—আর এক অনেক বড় দল জীবনপাত করে তাদের সেই ভোগের ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে।

উপদেশের দিক দিয়ে, লক্ষ্যর দিক দিয়ে, বাণীর দিক দিয়ে, এই ভাবে উদ্দেশ্যমূলক হয়ে রাশিয়ায় নাটকে এক মহা পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এই গেল প্রথম পরিবর্ত্তন। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন ঘটেছে, অভিনেতার সঙ্গে দর্শকের সম্বন্ধ-বোধে। আজ পর্য্যন্ত সব দেশে দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার সম্বন্ধ এই যে অভিনেতারা পাদপ্রদীপ ও যবনিকার ও-পাশে আলো দিয়ে, রঙ্গসজ্জা দিয়ে, অভিনয় দিয়ে এমন একটা জগতের সৃষ্টি করে—মানব জীবনের এমন একটা কাহিনীকে চিত্রিত করেন, যা দর্শকেরা বেশ ভোগবৃত্ত (passive) ভাবে উপভোগ করতে পারে। অভিনীত জগতের সঙ্গে দর্শকদের পৃথক করার জন্য এই কারণে অভিনয়ের সময় রঙ্গমঞ্চ আলোকিত ক'রে প্রেক্ষাগার থেকে আলোক অপসারিত করা হয়। Miejrhold রাসিয়ায় এই সম্বন্ধে একেবারে এক নব মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেন—এই যে দর্শক ও রঙ্গমঞ্চকে পৃথক করে দেওয়া, এতে নাটকের সম্পূর্ণ উপভোগে বাধা পড়ে। নাটকের কাজ শুধু ত যে কোনও একটা গল্পকে রূপ দেওয়া নয়—কিম্বা নায়ক নায়িকার সুখ দুঃখ দিয়ে দর্শকের সহানুভূতি উত্তেজিত ক'রে শুধু তাকে একটু ভোগবৃত্ত (passive) আনন্দ দেওয়া নয়;—নাটকের কাজ অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের সমস্ত চেতনা আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধিকে জাগ্রত করা; এমন ভাবে অভিনয়কে অগ্রসর হতে দেওয়া, যাতে কিছুক্ষণ পরে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে পাদপ্রদীপ ও যবনিকার যে কৃত্রিম ব্যবধান তা যেন যায় ঘুচে, সমস্ত দর্শক যেন নিজদিগকে এক বিরাট অভিনেতৃ-মণ্ডলী মনে করে এবং যে কাহিনী অভিনীত হচ্ছে, হেসে, কেঁদে, গান গেয়ে, জয়ধ্বনি করে তার সঙ্গে যোগ দেওয়া তাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। Mjeirholdএর মতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই একাত্মতার প্রতিষ্ঠা না হয়—ততক্ষণ পর্য্যন্ত অভিনয় সার্থক হয় না এবং যে শিক্ষা সঞ্চারিত করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তা একেবারে ব্যর্থ হয়।

এই জন্য রাশিয়া আজ সেই সব নাটকের বেশী অভিনয় করছে যাতে রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে বলশেভিজমের অভিযানের—ও জয়লাভের কাহিনী আছে। যখন রাশিয়ার সম্রাটের ও তার অনুগ্রহপুষ্ট জীবদের নির্ম্মম বিলাস ভোগ ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের সেই জগদ্দল পাষাণ সৌধ এই দুঃখযাত্রী কৃষক ও শ্রমিকদের ক্রুদ্ধ অধ্যবসায়ের ক্রমাগত আঘাতে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, এবং সেই ধ্বংস-স্তূপের আঁধার শ্মশানের ও পরে সোভিয়েটের রক্ত-পতাকা দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে তখন দর্শকেরা ভুলে যায় যে শুধু তারা দর্শক; বিজয়োল্লাসের সে গভীর ধ্বনি শুধু রঙ্গমঞ্চে আর আবদ্ধ থাকে না—সমস্ত প্রেক্ষাগারের আত্মহারা উল্লাস সে ধ্বনিকে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত করে তোলে—দর্শকেরা অভিনয়ের সমস্ত উত্তেজনাটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে শোষণ করে নিয়ে যায়।

ঠিক এই একই কারণে অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ আজ জাতির শিক্ষায়তনের এক বিশেষ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বলে সেখানকার প্রায় রঙ্গালয়গুলি জাতীয় সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। অর্থলাভের অথবা ব্যবসায়ের জন্য রঙ্গালয় আজ সেখানে চলতে চাইছে না। অপরপক্ষে এটাও ঠিক কথা যে এইভাবে Stateএর শাসনাধীনে না এলে রঙ্গালয়গুলিতে এমন ধারা যুগান্তকারী পরীক্ষা সব চালানোর সুযোগ জুটত না। পরীক্ষার সুযোগ যে কোনও কারণেই জুটুক্—নব্য ভাবের এই সব অভিনয় দেখতে যে জাতির আগ্রহের অবধি নেই এবং প্রশংসাধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করে দর্শকেরা যে অভিনয় থেকে ফিরে আসে, এই থেকে বোঝা যায়, রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক নাট্যজগতের এই বিপ্লবের সুরে সাড়া দিয়েছে।



প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেকালের খ্যাতনাম হিন্দু অধিবাসী

(১)

চন্দ্রনাথ পাল—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বা মধ্যভাগে ষ্ট্রাণ্ড রোডের চাঁদপাল ঘাট যথায় অবস্থিত তথায় চন্দ্রনাথ পাল নামে একজন মুদি দোকান করিতেন। তিনি সে সময়ে তথায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই চাঁদপাল ঘাটের নাম হইয়াছে।

* * *

লক্ষীকান্ত মজুমদার—ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে হইতেই মজুমদার বংশ বিশেষ বিখ্যাত ছিল। জব চার্ণক যে সময় কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমান লালদীঘির ধারে তাঁহার একটী পাকা কাছারী-বাড়ী ছিল। উহা কোম্পানীর সেরেস্তা রাখিবার জন্য প্রথম ভাড়া লওয়া ও পরে কিনিয়া লওয়া হয়। লালদীঘি পুষ্করিণীটিও তাঁহাদের ছিল। এখানে শ্যাম রায় বিগ্রহের ঠাকুরবাড়ী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেবের পিতামহ জন্ এণ্টনি তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। এই এণ্টনি সাহেবের নামেও এণ্টনী বাগান লেন নামে একটী পথ আছে।

* * *

রাজা উদমন্ত সিংহ—ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা দেবী সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র, মুরশিদাবাদ নশীপুরের মহারাজা রণজিৎ সিংহের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। ইনি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার অধীনে অনেক নগদী সেনা ছিল। রেওয়ার রাজার বিরুদ্ধে অভিযানকালে ইনি কোম্পানীকে সেনা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদের নবাব নাজিম আলিজার আমলে ১৮১০ হইতে ১৮২১ পর্য্যন্ত ইনি দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বড় বাজারের রাজা উদমন্ত ষ্ট্রীটের ইঁহার নামেই নামকরণ হইয়াছে।

* * *

মহারাজা রাজবল্লভ—ইনি মহারাজা দুর্ল্লভরামের পুত্র। নবাবী আমলে মহারাজা রাজবল্লভ ঢাকার ডেপুটী গভর্ণর ছিলেন। ইনি একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইঁহার সহিত সিরাজদ্দৌলার মনোমালিন্য ঘটে। ইঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস ইংরাজ গভর্ণর ড্রেকের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য কলিকাতায় আইসেন। এই ব্যাপার লইয়া নবাবের সহিত ইংরাজদের মনোমালিন্য ঘটে; নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রান্ত হওয়ার ইহাও কতকটা কারণ। রাজবল্লভ কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্য ছিলেন। তিনি বাগবাজারে একটি স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

* * *

নন্দরাম সেন—১৭০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রথম কলেক্টর রাল্‌ফ্ শেল্‌ডনের তিনি সহকারী ছিলেন, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী কলেক্টর তহবিল তছরূপ অপরাধে তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। ১৭০৭ সালে তিনি পুনরায় পূর্ব্বপদে নিয়োজিত হন, কিন্তু তাঁহার অপরাধের জন্য তাঁহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। "রথতলার-ঘাট" ইঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * *

কালীপ্রসাদ দত্ত—ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের সময়ের পূর্ব্বের বড়মানুষ চূড়ামণি দত্তের পুত্র। নবকৃষ্ণ ও চূড়ামণি উভয়েই স্ব-স্ব দলস্থ ব্যক্তিগণের অধিনায়ক ছিলেন। চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের সময় একটা গোলযোগ ঘটায় নবকৃষ্ণ তাঁহার দলস্থ কায়স্থগণকে সভাক্ষেত্রে যোগদান করিতে নিষেধ করায় কালীপ্রসাদ বড়িশা-বেহালার

সাবর্ণ চৌধুরী জমীদার সন্তোষ রায়ের শরণাপন্ন হন। ইনি স্বদলস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে লইয়া কালীপ্রসাদের বাটীতে উপস্থিত হওয়ায় তিনি পিতৃদায় হইতে উদ্ধার পান। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণদের পাথেয় ও বিদায় হিসাবে বহু অর্থ দান করেন। কথিত আছে এরূপ দানগ্রহণ সমীচীন নহে বিবেচনা করিয়া সন্তোষ রায় তাহা কালীঘাটের মন্দির নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করেন।

* * *

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—ইনি একজন বিখ্যাত প্রত্ন-তাত্ত্বিক ছিলেন। ইনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে শুঁড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র, প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র মোগল বাদসাহের একজন প্রিয়-পাত্র ছিলেন। তিনি বংশানুক্রমে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রলাল ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়িয়া ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে চিকিৎসা-বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শী করিবার জন্য বিলাতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু তাঁহার পিতা সম্মত হইলেন না এবং মেডিক্যাল কলেজ হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। তৎপরে তিনি আইন শিক্ষা করেন। ২২ বৎসর বয়সে তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটির সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন এবং দশ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এবং তৎপরে "রহস্য সন্দর্ভ" নামক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৫৫-৫৬ সালে তিনি ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের পরিচালক নিযুক্ত হন। কলিকাতা কর্পোরেশন্ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সরকার কর্ত্তৃক একজন কমিশনর নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটির সভাপতি হন। বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের ১৮০১ খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সভাপতি হইয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ফার্শি, হিন্দি, উর্দ্দু, উড়িয়া ভিন্ন গ্রীক্, ল্যাটিন্, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষাও জানিতেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার মত পণ্ডিত এবং বহুভাষাবিৎ বাঙ্গালী আর কেহ ছিলেন না। তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর অব্ ল, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর, পর বৎসর সি-আই-ই এবং পরে রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি মাসিক ৫০০৲ টাকা বিশেষ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ৬নং মাণিকতলা রোডে তাঁহার বাসভবন ছিল।

* * *

রতন সরকার—ইনি প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে "থ্যাকন্" নামক একখানি জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিলে তাহার কাপ্তেন ষ্টাফোর্ড সাহেব একজন দ্বিভাষী অন্বেষণ করায় তাঁহার কথা না বুঝিয়া একজন ধোপার আবশ্যক মনে করিয়া ধোপা রতন সরকারকে আনয়ন করা হয়। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, মাত্র দুই দশটা ইংরাজী কথা জানিতেন। যাহা হউক অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়ায় তিনি কাপ্তেনের প্রিয়পাত্র হন। তাঁহার নামে বড়বাজারে একটি পথ আছে।

* * *

জনার্দ্দন শেঠ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে ইনি তাঁহাদের দালালি করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া-ছিলেন। ইঁহার আদিপুরুষ মুকুন্দ রাম ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সপ্তগ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া সর্ব্বপ্রথমে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। তখন এই স্থান গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এজন্য শেঠেদের নাম "কলিকাতার জঙ্গলকাটা-বাসিন্দা"। তাঁহাদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীউর নাম হইতে গোবিন্দপুর নাম হইয়াছে এইরূপ জনপ্রবাদ। জনার্দ্দনের পুত্র বৈষ্ণবচরণ ব্যবসা দ্বারা প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

* * *

দুর্গাচরণ পিতুড়ী—ইনি সেকালের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। তেজারতি ও কণ্ট্রাকটারি কার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর ফোর্ট উইলিয়মের কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* * *

রামমোহন মল্লিক—বড়বাজারের মল্লিক বংশের নিমাই চরণ মল্লিক মহাশয়ের ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্র, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লবণের ব্যবসা দ্বারা তিনি অগাধ অর্থ

উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ দাতা ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃনামে বড়বাজারে একটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

* * *

কাশীপ্রসাদ মিত্র—ইনি স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। শবদাহের জন্য কাশী মিত্রের ঘাট নামে যে ঘাট আছে তাহা ইহাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত।

* * *

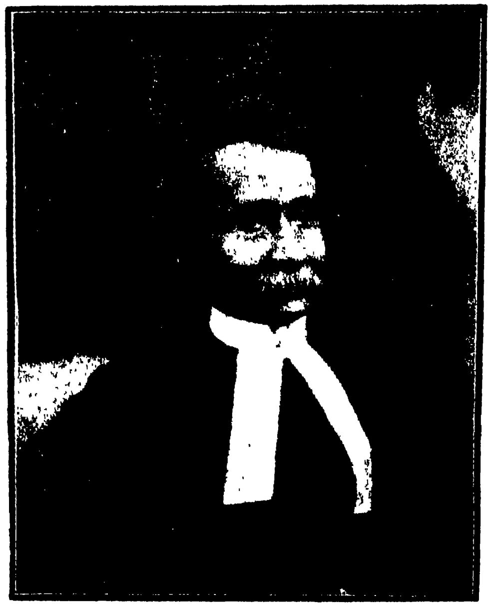


রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের সন্তান। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে মাতামহাশ্রমে ইঁহার জন্ম হয়। দরিদ্রতা নিবন্ধন ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। প্রথম টালক্ কোম্পানীর নীলাম-ঘরে দশ টাকা বেতনে কার্য্য গ্রহণ করেন, তৎপরে পঁচিশ টাকা বেতনে মিলিটারী অডিটার জেনারেল্ অফিসে প্রবেশ করিয়া শেষে চারিশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন হয়। হরিশ্চন্দ্রের ইংরাজি ভাষার উপর দখল যথেষ্ট ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট্ নামক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে কখন উহার ১৫০ জনের অধিক গ্রাহক হইত না। কিন্তু এই পত্রিকার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। তিনি দরিদ্রদের জন্য সর্ব্বদা লেখনী পরিচালন করিতেন। ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয় তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সাধারণের চাঁদায় ১০৫০০৲ টাকায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ ভবনে তাঁহার নামে একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * *

অক্রূরচন্দ্র দত্ত—ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের নিকট সুবি-



স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি

খ্যাত দত্ত পরিবার-সম্ভূত অক্রূর দত্ত মহাশয় কোম্পানীর আমলে কমিশেরিয়েট বিভাগে কার্য্য করিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করেন। বীরভূমের যুদ্ধ ব্যাপারে তিনি ইংরাজ সেনার সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই দত্ত বংশ নানাবিধ ক্রিয়াকলাপের জন্য কলিকাতা সমাজে বিশেষ পরিচিত। খ্যাতনামা মহিলা-কবি গিরীন্দ্রমোহিনী এই দত্ত পরিবারের বধূ।

* * *

স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়—ব্রাহ্মণ্যের উজ্জ্বল আদর্শ স্যার্ গুরুদাস ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি

প্রথমে হেয়ার স্কুল পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইনি শিক্ষালাভ করেন। সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। শিক্ষালয় ত্যাগ করিয়া তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন। হুগলী ব্রাঞ্চ ও বারাসত স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ইনি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। পরিশেষে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনিই এই কলেজের ইংরাজী ভাষার প্রথম অধ্যাপক। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন গেজেট পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার সম্পাদক হন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার উদ্দেশ্যে তিনি চোরবাগানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহারই চেষ্টায়

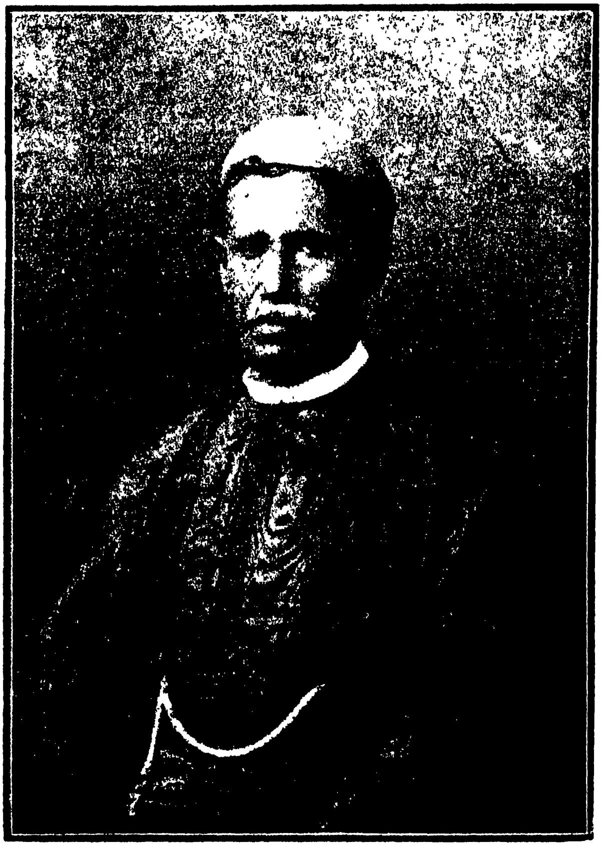


রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরাপাননিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইংরাজিতে Well-wisher এবং বাঙ্গালায় "হিতসাধক" বলিয়া দুইখানি পত্রিকা প্রচার করেন। তিনি তাঁহার সময়ের প্রায় সকল জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি একটি অন্নছত্র খুলিয়া বহু লোককে অন্নদান করেন। তাঁহার লিখিত ইংরাজি শিক্ষা বিষয়ক বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকগুলি আজিও সর্ব্বত্র সমাদৃত।

* * *

রামচন্দ্র ঘোষ—ইনি কুমারটুলীর মজুমদার বংশের আদিপুরুষ হুগলীর নিকটবর্ত্তী আকনা গ্রাম হইতে আসিয়া সুতানুটীর অন্তর্গত কুমারটুলীতে বাস স্থাপন করেন। নবাবের নিকট হইতে তাঁহার কৃত বহু সৎকর্ম্মের জন্য তিনি মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। এই মজুমদার পরিবার কাশীতে শিবস্থাপনা, মাহেশে দ্বাদশ মন্দির নির্ম্মাণ এবং কুমারটুলিতে একটী ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এই পরিবারের বলরাম মজুমদারও



রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়

একজন নামজাদা লোক ছিলেন। তাঁহার নামে একটি পথ আছে।

* * *

জয়নারায়ণ চন্দ্র—ইনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল বলরাম চন্দ্র। শ (M. D. Shaw) নামক একজন সেকালের ব্যারিষ্টারের সহকারীর কার্য্য করিতেন। ইংরাজি বাঙ্গলা ভিন্ন ফরাসী, পার্শী ও সংস্কৃত ভাষাও

ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। বর্দ্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমায় সহায়তা করায় তিনি ইঁহাকে একখানি তলোয়ার ও একটী বন্দুক উপহার দিয়াছিলেন। প্রতাপ চাঁদ কিছুকাল তাঁহার চাঁপাতলার বাটীতে লুকাইয়া ছিলেন। ইনি একজন দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি বৃন্দাবনের বর্ষাণ গ্রামে কতিপয় ইন্দারা এবং কালনায় ভগবানদাস বাবাজির ব্রহ্মদেবতার মন্দিব নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

* * * *



হরকুমার ঠাকুর

বিশ্বনাথ মতিলাল—মতিলাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ মতিলাল কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের অন্যতম ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনি বঙ্গীয় সমাজে একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণের গোলায় মাসিক আট টাকা বেতনে চাকুরীতে ঢুকিয়া শেষে তথাকার দেওয়ান হন। বৌবাজার নামক বাজারটী তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্রবধূ তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের এক অংশ প্রাপ্ত হন এবং তাহা হইতেই বৌবাজার নাম হয়। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এই বংশে বিবাহ করেন। ভাওয়াল ও নদীয়ার রাজবংশের সহিত এই বংশ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ।

* * * *

গিরীশচন্দ্র ঘোষ—১৮২৯ সালের ২৭শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ কাশীনাথ ঘোষ মহাশয় একজন দাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। গিরীশচন্দ্র প্রথম ১৫৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মিলিটারি অডিটার জেনারেল



মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা

অফিসে বদলি হন এবং বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৫০৲ টাকা হয়। এই স্থানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন এবং ইহা ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। গিরীশচন্দ্র তাঁহার কার্য্যকুশলতার জন্য শেষে ৩৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন। তখন তিনি রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাঁহার প্রসিদ্ধির কারণ ইহা নহে। সংবাদপত্রসেবক ও বক্তা রূপেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম তিনি কৈলাসচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত Literary Chronicleএ লিখিতে আরম্ভ

করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ চন্দ্রের সহিত একত্র The Bengal Recorder নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করেন। ইহা মাত্র দুই বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে The Hindoo Patriot প্রকাশ করিয়া ১৮৫৫ পর্য্যন্ত—হরিশ্চন্দ্র উহার ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা সম্পাদন করেন। পুনরায় তাঁহার মৃত্যুর পর বন্ধুর মাতা ও পত্নীর জন্য কিছু-দিন পেট্রীয়টের ভার লইয়াছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ১৮৬৯এ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অতি দক্ষতা ও স্বাধীনতার সহিত উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ডালহাউসি ইনষ্টিটিউট্, বেথুন সোসাইটী, বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ প্রভৃতি



তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

যে সকল সমিতির তিনি সভ্য ছিলেন, তথায় অনেক ভাল ভাল বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজ হলে রামদুলাল দে সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাই পরে বর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া রামদুলাল দের জীবনী রূপে প্রকাশ করেন। জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তিনি বেলুড়ে বাস করিয়াছিলেন। তথায় একটী সামান্য বাঙ্গলা পাঠশালাকে তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর রূপেও যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছিলেন।

* * * *

রামসুন্দর মিত্র—কোম্পানীর পাটনার আফিংএর কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্র মোহনলাল ও শ্যামলালের নামে বাগবাজারে দুইটী পথ আছে।

* * * *

যাদবিন্দু শেঠ—ইনি চৈতন্যচরণ ও নন্দলাল শেঠের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন বসাকের সহিত কোন ইংরাজ সওদাগরের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। শেঠেরা কলিকাতার অতি পুরাতন অধিবাসী। তাঁহারা দূরদেশে গঙ্গাজল পাঠাইয়া বহু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেকালে তাঁহাদের মোহরাঙ্কিত বোতলে গঙ্গাজল দূরদেশ সকলে বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত।

* * * *



ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু

রামতনু লাহিড়ী—সমাজ সংস্কারক রূপে যে সকল মহাত্মা এ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে হেয়ার সাহেব প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির স্কুল, যাহা পরে হেয়ার স্কুল নামে অভিহিত হয় তথায় অবৈতনিক ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন। পরে হিন্দু স্কুলে শিক্ষা-লাভ করেন। তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব ইঁহার চরিত্রে যথেষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এবং তাহারই ফলে তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করেন এবং বর্দ্ধমান, বারাসত, উত্তরপাড়া, বরিশাল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপরে কতিপয় বৎসর কৃষ্ণনগরে বাস করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। এই স্থানে বাসকালীন বহু জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।



রমানাথ ঘোষ

*　　*　　*　　*

দ্বারকানাথ মিত্র—হুগলী জেলার একটী সামান্য পল্লীতে এক সামান্য গৃহস্থের ঘরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। হুগলী কলেজে তাঁহার প্রথম শিক্ষা লাভ হয় এবং তিনি জুনিয়ার ও সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতে প্রবেশ করেন। তিনি শীঘ্রই তদানীন্তন আদালতের দুইজন নেতৃস্থানীয় উকিল রমাপ্রসাদ রায় এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রথমোক্ত ব্যক্তিই প্রথম বাঙ্গালী হাইকোর্টের বিচারপতি মনোনীত হন। দ্বারকানাথ প্রথমে ইঁহার জুনিয়ররূপে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস্ পিকক্ (Sir Barnes Peacock) তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তিনি ৪১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।



রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ

মহারাজা রমানাথ ঠাকুর—শেরবোর্ণ স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া তিনি বাটীতে সংস্কৃত, ফার্সি ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া প্রথম তিনি এলেকজাণ্ডার কোম্পানীর অফিসে কার্য্য গ্রহণ করেন। তৎপরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় তথায় কোষাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। পরে এই ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাইলে তিনি একজন লিকুইডেটারের কার্য্য করেন।

তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া The Reformer নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ

অধিকার প্রাপ্ত হন। যখন বেঙ্গল ব্যাঙ্ক প্রথম স্থাপিত হয়, তখন তিনিই প্রথম তথাকার বাঙ্গালী ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, শিবচন্দ্র ও নর্সিংচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র রাখিয়া ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন। রামচন্দ্রও মহারাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। খ্যাতনামা রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ইঁহারই প্রপৌত্র ছিলেন। রাজা বৈদ্যনাথও তাঁহার দাতব্যের দ্বারা বংশ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

* * * *

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সুপ্রসিদ্ধ গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র হরকুমারের পুত্র যতীন্দ্রমোহন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে



মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ

জন্ম গ্রহণ করেন। গোপীমোহন বাঙ্গলা, সংস্কৃত, উর্দ্দু, ফারসী, পোর্ত্তুগীজ্ এবং ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। হরকুমার সংস্কৃত ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন হিন্দু কলেজে পড়ার পর বাটীতে জোফ্রে (Herman Geoffery) ন্যাস্ (Dr. Nash) এবং পরে ক্যাপ্টেন্ রিচার্ডশনের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় সংস্কৃত শিক্ষাতেও তাহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং বাটীতে পণ্ডিতের নিকট উহা শিক্ষা করেন। বাঙ্গলা রচনাতেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি কতিপয় নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীতচর্চ্চা বিষয়েও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। এদেশে থিয়েটার সৃষ্টির প্রথম যুগে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এবং ইংরাজী রীতির অনুকরণে একতানবাদন এ দেশে তিনিই প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন।

যতীন্দ্রমোহন তাঁহার পিতার বিপুল সম্পত্তি এবং খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব নিজ চেষ্টায় অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, অনেক নূতন জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন। তাঁহার দানেরও সীমা ছিল না; তিনি হিন্দু বিধবাদের সুবিধার জন্য মাতৃনামে এক লক্ষ টাকা দান করেন; এবং মূলাজোড় মন্দিরের সেবাদির জন্য ৮০০০০, টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি, মেয়ো হাঁসপাতালে দান, প্রাসাদে দরিদ্রদের ভোজনের ব্যবস্থা, পিতা ও পিতৃব্যের নামে ছাত্রদিগের বৃত্তির ব্যবস্থা, সেনেট বারান্দায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপন প্রভৃতিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি এই সকল সৎকার্য্যের জন্য এবং সরকারের কার্য্যে সহযোগিতার জন্য মহারাজা, সি-এস-আই; কে-সি-এস-আই; ও মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। পরিশেষে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'মহারাজা' তাঁহার বংশানুক্রমিক উপাধি হয়। তিনি জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সিণ্ডিকেটের মেম্বর, যাদুঘরের ট্রাষ্টি ও সভাপতি, মেয়ো হাঁসপাতালের গভর্ণর, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সভাপতি এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তিনি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল ও বড়লাটের কাউন্সিলেরও সদস্য ছিলেন। তাঁহার 'প্রাসাদ' নামক সুন্দর অট্টালিকা ভিন্ন 'টেগোর কাস্‌ল্' ও দমদমাস্থিত 'এমারেল্ড্ বাওয়ার' নামক উদ্যান-ভবনটীও দেখিবার জিনিষ। এক কথায় যতীন্দ্রমোহন তাঁহার সময় কলিকাতার মধ্যে ধনে মানে ও বিবিধ গুণে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাবও অত্যন্ত প্রবল

ছিল। এবং অন্তরে বাহিরে একজন হিন্দু ছিলেন। তিনি কাশীতে একটি সুন্দর মন্দিরে শিব স্থাপনা করেন।

* * * *

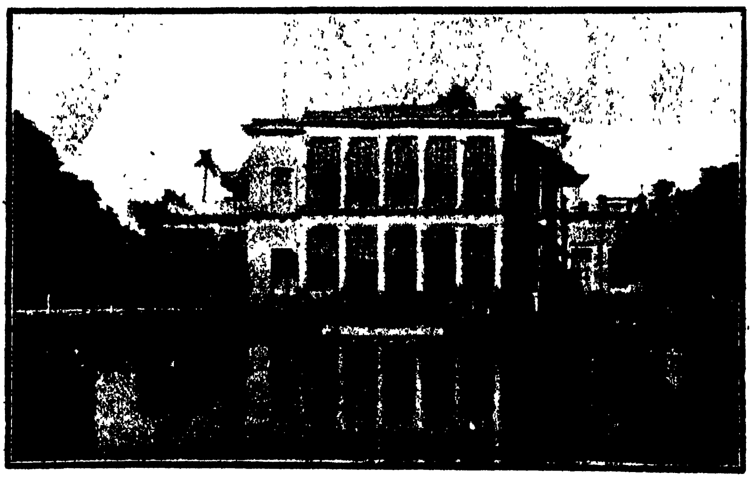
তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—ইনি হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি একখানি বাঙ্গলা-ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলা অনুবাদ ও টীকা সহ মনুসংহিতার কিয়দংশ প্রকাশ করেন, অর্থাভাবে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ প্রতিষ্ঠিত "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা"র তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি কিছুকাল কুইল্ নামক একখানি ইংরাজী পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বর্দ্ধমান-রাজের প্রধান সচিব হইয়াছিলেন।

* * * *

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রথম তাঁহাকে সেরবোর্ণের স্কুলে পাঠান হয়, তৎপরে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় প্রবিষ্ট হন। তাঁহার অংশের জমিদারীর আয় এক লক্ষ টাকার অধিক হইলেও তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এবং ইহাদ্বারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন। ব্যবসায়ের দিকেও তাঁহার ঝোঁক ছিল এবং নীলের চাষে ও তৈলের কলে তিনি বহু টাকা লোকশান করেন। হিন্দু কলেজ ও মেয়ো হাঁসপাতালের গভর্ণর, কাউন্সিল অব এডুকেশনের সদস্য এবং নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো রূপে কার্য্য করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। গ্রন্থ সংগ্রহেও তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং তাঁহার পুস্তকাগার বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থপূর্ণ ও তৎকালের পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থশালা ছিল। তিনি লেজিস্‌লিটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য সৎকার্য্যের মধ্যে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর ল প্রোফেসরশিপ সৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C. S. I. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেনেট



দরবার কক্ষ—প্রাসাদ



এমারেল্ড বাওয়ার

হাউসের প্রবেশ-পথে তাঁহার একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

* * *

খেলাতচন্দ্র ঘোষ—ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন ঘোষের পৌত্র খেলাতচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন রামলোচন লেডি হেষ্টিংসের সরকার ছিলেন। রামলোচনের শিবনারায়ণ, দেবনারায়ণ এবং আনন্দনারায়ণ নামে তিন পুত্র ছিলেন। খেলাতচন্দ্র দেবনারায়ণের পুত্র। ইনি দাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জাষ্টিস্ অব দি পিস্ ছিলেন।



শ্যামাচরণ লাহা

ধর্ম্মতলায় "আনন্দ বাজার" নামে যে বাজার ছিল, উহা পূর্ব্বোক্ত আনন্দনারায়ণের সম্পত্তি ছিল। খেলাৎচন্দ্র সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পুত্র রমানাথ ঘোষ মহাশয়ও একজন যশস্বী ব্যক্তি ছিলেন।

* * * *

জয়নারায়ণ মিত্র—সাধারণতঃ ইঁহাকে লোকে জয় মিত্র বলিত। ইঁহার পিতা রামচন্দ্র মিত্র জাহাজের কাপ্তেনদিগের মুচ্ছুদ্দির কাজ করিয়া বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ ক্রিয়াকলাপ ও পূজাপার্ব্বণে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন এবং সেজন্য তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বরাহনগরে গঙ্গাতীরে যে কালী মন্দির ও দ্বাদশ শিব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় উহা তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

* * * *

বনমালী সরকার—আত্মারাম সরকার হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর হইতে কুমারটুলিতে আসিয়া বাস করেন। বনমালী, রাধাকৃষ্ণ ও হরেকৃষ্ণ নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিলেন। বনমালী পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টের দেওয়ান্ এবং কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার ডেপুটি



প্যারীচাঁদ মিত্র

ট্রেডার ছিলেন। তিনি ব্যবসায়াদি কার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কুমারটুলির বা[টী] সেকালের কলিকাতার মধ্যে একটী দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। উ[হা] ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণের অনেক পূর্ব্বে প্র[স্তুত] হইয়াছিল।

* * * *

দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়—ইনি সরকা[রের] অধীনে কার্য্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলে[ন]।

তিনি প্রত্যহ বহু লোককে অন্ন দিতেন। বাগবাজারে গঙ্গাতীরে তিনি একটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

* * *

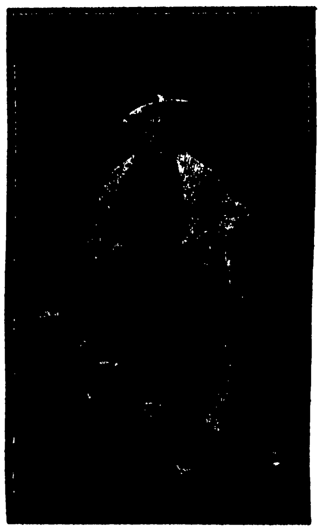
দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি জাষ্টিশ্ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ হিন্দু কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটায় তাহার নামে একটী পথ আছে। ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়া গোপীনাথপুর।

* * * *

মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা—মহারাজা ও তাঁহার ভ্রাতা শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ লাহা মহাশয়েদের নাম সমধিক খ্যাত হইলেও রাজীবলোচনের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ লাহা মহাশয় হইতেই তাঁহাদের বংশ-গৌরবের-আরম্ভ। ইঁহাদের পূর্ব্ববাস ছিল চুঁচুড়ায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে চুঁচুড়াতেই দুর্গাচরণ জন্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভের পর তিনি পিতার সহিত ব্যবসায়-কার্য্যে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানী নামক ফার্ম্মের সম্পূর্ণ ভার তিনি গ্রহণ করেন। তিনি একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্ হন। তৎপরে তিনি পোর্ট কমিশনের, বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মেয়ো হাঁসপাতালের গভর্ণর, ১৮৮২ ও ৮৮ খৃষ্টাব্দে দুইবার ইম্পিরিয়েল্ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং কলিকাতার সেরিফ হন। তিনি সি-আই-ই, রাজা এবং পরিশেষে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার বহু দানের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ, হিন্দু স্কুল ও হুগলী কলেজে কতিপয় অবৈতনিক ছাত্রের বৃত্তির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০০৲, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ও সুবর্ণবণিক দাতব্য সমিতিতে ২৪০০০৲ এবং মেয়ো হাঁসপাতালে ৫০০০৲ টাকা দান উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কুমার কৃষ্ণদাস ও হৃষীকেশ লাহা মহাশয়দিগকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

* * * *

শ্যামাচরণ লাহা—১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং তথায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায় কার্য্যে উন্নতির জন্য তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলের একজন ডিরেক্টর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানীর পরামর্শ সভার একজন সভ্য ছিলেন। তিনি অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং ২৪ পরগণার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনি কতিপয় বৎসর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য দানের মধ্যে চক্ষু-চিকিৎসা ভবনের জন্য ৬০০০০৲ টাকা দান



কিশোরীচাঁদ মিত্র

উল্লেখযোগ্য। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু চণ্ডীচরণ লাহা মহাশয়কে রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হন।

* * * *

জয়গোবিন্দ লাহা—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্যবসায়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যাইলেও, তিনি সাধারণের কার্য্যেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর তিনি কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল্

কমিশনর ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সেরিফ হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হন, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল্ লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সি-আই-ই উপাধি ভূষিত হন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, পোর্ট কমিশনার, জেল পরিদর্শক, মেয়ো হাঁসপাতালের গভর্ণর, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের পরামর্শ সভার সভ্য, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি, বেঙ্গল্ চেম্বার অব কমার্শের সভ্য, বেঙ্গল্ ন্যাশানেল্ চেম্বার অব কমার্শের সভাপতি, সুবর্ণ-



স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র

বণিক দাতব্য সমিতির সভাপতি প্রভৃতির কার্য্য করিয়াছিলেন। বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপ্রপীড়িতদের সাহায্যার্থ এক লক্ষ টাকার মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার দান করেন। জুলজিক্যাল গার্ডেনের একটী রসায়নাগার নির্ম্মাণার্থ ১৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ লাহা মহাশয়কে রাখিয়া তাঁহার পরলোক-প্রাপ্ত ঘটে।

*   *   *   *

ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু—১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার আদি বাসস্থান ২৪ পরগণার দক্ষিরহাট গ্রাম। তিনি তাঁহার সময়ের একজন উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসক ছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেডিক্যাল্ কলেজের সকল পরীক্ষাই তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং বহু পদক ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথম আকায়াব হাঁসপাতালের ভার গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ডিমনষ্ট্রেটার পরে য়্যানাটমির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের সভাপতি হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল্ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার সভাপতির কার্য্য করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মেডিক্যাল কংগ্রেসের তিনি সহঃ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ সকল লিখিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। তিনি তাঁহার জন্মস্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু নগেন্দ্রকুমার বসুকে রাখিয়া মারা যান।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে—বর্দ্ধমানের নিকট বাতাসি গ্রামে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। জেনারেল্ এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ডাক্তার ডফের অধীনে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার একটি গির্জ্জার ভার পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালনায় ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের নবধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে Antidote to Brahmoism নামে এবং ইহার পূর্ব্বে বেদান্ত সম্বন্ধে অন্য একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে "অরুণোদয়" নামে একখানি পত্র তিনি দুই বৎসরের জন্য প্রকাশ করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে Indian Reformer এবং পরে Friday Review নামে দুইখানি কাগজ দক্ষতার সহিত তিনি পরিচালন করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারকের কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন এবং ৬৩ বৎসর বয়সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার মাসিক বেতন ছিল এক সহস্র টাকা। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে "গোবিন্দ সামন্ত" নামক ইংরাজি গ্রন্থখানি সর্ব্বজনপ্রশংসিত।

* * * *

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ—ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর শ্রীনারায়ণ সিংহের পোষ্যপুত্র ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র প্রথম হইতেই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একজন সদস্য ও সহকারী সভাপতি ছিলেন। মেডিক্যাল্ কলেজে ও অন্যান্য স্থানে দানের জন্য তাঁহারা উভয়েই রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। হিন্দু বিধবা বিবাহ ভাণ্ডারে তাঁহারা ২৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাসস্থান কান্দিতে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহযোগিতায় তাঁহারা বেলগেছিয়াতে একটী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সকল জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহারা সংযুক্ত ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র পরে C. S. I. উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁহার সহোদর ছয় বৎসর পরে কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতাপচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র গিরীশচন্দ্র ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মৃত্যুকালে উইল দ্বারা কান্দিতে একটি হাঁসপাতাল স্থাপন জন্য ১১৫০০০৲ টাকা দান করিয়া যান।

প্যারীচাঁদ মিত্র—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের জন্ম হয়। তাঁহার সময়ে তিনি ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন এবং খ্যাতনামা অধ্যাপক ডিরোজিওর প্রভাব তাঁহার চরিত্রে বিশেষ ভাবে ফুটিয়াছিল। তিনি ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এবং বেথুন্ সোসাইটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন। স্কুল বুক্ সোসাইটি, এগ্রিহর্টিকালচার সোসাইটি, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি প্রভৃতি বহু সভা সমিতির সভ্য ছিলেন, এবং সে সকলের উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। কলিকাতায় থিয়জফিক্যাল্ সোসাইটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনিই বাঙ্গলার প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" লিখিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * * *

কিশোরীচাঁদ মিত্র—ইনি প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন; ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। হেয়ার



জাল প্রতাপচাঁদ

ও হিন্দু স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি কিছু দিন ডাফ্ স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে লিগ্যাল রিমেম-ব্রান্সারে অফিসে কার্য্য করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক্ সোসাইটির সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। বেঙ্গল স্পেক্টেটর, বেঙ্গল হরকারু এবং কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় তিনি বহু উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ সকল লিখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ভাষায় তাঁহার জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তিনি কয়েক বৎসর

ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড্ নামক সংবাদপত্রখানি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহিত সংযুক্ত হন এবং শীঘ্র তথাকার সদস্য হন। হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন, তাঁহারই চেষ্টায় তিনি প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরে জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* * * *

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে, ২৪ পরগণায় জন্ম গ্রহণ করেন, পিতার নাম রামচন্দ্র মিত্র। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে উকিল রূপে প্রবেশ করিয়া মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর হাইকোর্টের জজ হন এবং পরে স্যার রিচার্ড গার্থের অনুপস্থিতি কালে প্রধান বিচারপতি হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও লাটসাহেবের কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তৎপরে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্রাণের অর্ঘ্য

শ্রীকেশবনাথ রায় চৌধুরী

বন্ধুর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। ওর ভাগ্যে একটা ঘূর্ণি আছে, যা ওকে কখনো স্থির থাকতে দেয় না। বিয়ে হবামাত্র ছুটল মোটর করে ঘুরতে; বললে শেষে সিমলে কি দারজিলিং কি কাশ্মীর গিয়ে উঠব। এ আমি গত এপ্রিলের কথা বলছি—তখনো সেখানকার হাওয়া এ-রকম গরম হয় নি,—মানুষ ও প্রকৃতি দুই-ই ছিল সুস্থ ও সুন্দর।

ঠিক হলো কাশ্মীরই যাওয়া যাক্। বন্ধু আমার চেয়ে বড়, আর তিন-চার বছরের সিনিয়ার ছিলেন কলেজে। তাই তাঁর নামের সঙ্গে একটা 'দা' জুড়ে দিয়েছি—অমিয়দা। প্রাণে তার দেদার স্ফুর্ত্তি; সে যেন হাওয়ায় উড়ছে। আমার সঙ্গে তাই ভারী মিল হ'য়ে গেছে বয়সের বাধা ভেঙ্গে!

একটা মোটরে রইল অমিয়দা আর একটায় আমরা। অবশ্য অমিয়দার সঙ্গে যে তার নবীনা সুন্দরী বধূ রইল, সেটা না বললেও চলে।

আপনারা ভুলবেন না যে অমিয়দা বিংশ-শতাব্দীর টাটকা সভ্য। এ যাওয়াটা 'হনিমুন' উদ্দেশ্যে যাওয়া। অতএব এটা যথাসম্ভব সুমধুর করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে নিলে—রাম-সীতা যেমন লক্ষ্মণকে নিয়েছিলেন! আমরা চার পাঁচজন ছিলুম। হাসি ঠাট্টায় পথ সরগরম করতে করতে এগিয়ে চলি। বললুম 'অমিয়দা একটা example রেখেছে; বাঙ্গালীর কি বিয়ে হয়···'হনিমুন'ই নেই ত বিয়ে। অমিয়দা একটা কাজ করেছে বটে।' আপনারা নিশ্চয় চমকে উঠে বলবেন—বাঙ্গালী যে এতটা সভ্য হ'য়ে উঠেছে যে 'হনিমুন' করতে কাশ্মীরে ছুটল মোটর করে, তা' ত শুনি নি। শুনবেন কি করে মশাই, মেয়ের বাপের পয়সায় যেখানে বিবাহ-উৎসব কুলিয়ে নিতে আপনারা ব্যস্ত সেখানে এ-রকম কি করে ভাববেন। যাক্, জানুন যে বিশ-শতাব্দী তার সাত-রঙা ইন্দ্রধনু নিয়ে আমাদের মনে অহরহ বেড়িয়ে বেড়ায়। আমরা বাধা-বিঘ্ন আচার-ব্যবহার কিছুই মানি না। মেয়েরা শুনে বলবেন যে 'ওমা কি লজ্জা! কি লজ্জা! ছোঁড়াটা কি গো; নতুন বিয়ের বৌকে নিয়ে ছুটল কিনা বিদেশে···ছিঃ···!' আমি তাঁদের বলব, আপনারা আরো সুন্দরী হোন, আরো সভ্যা হোন!

আমি এখানে 'মোটরে কাশ্মীর যাত্রার' বিবরণ দিতে বসি নি। সে কাজ বহুৎ দিন আগে 'সৌরিনবাবু' শেষ করে দিয়েছেন। আমি শুধু একটী অনিন্দ্যসুন্দর কাহিনী বলব। তার কারণ আমার ভাগ্যে কাশ্মীর দেখা হোল না। ওরা সবাই চলে গেল, আমি মাঝ পথে আলাদা

হ'য়ে গেলুম। কিন্তু আমার কাশ্মীর দেখার চেয়ে বড় লাভ হ'য়েছে। কাশ্মীর দেখার সুযোগ অনেক পাব, না হয় আমার 'হনিমুন' করতে ঐখানেই যাব; কিন্তু এ যা মিলন, এ' ত সর্ব্বদা মেলে না। তাই আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দি, আমার খাম-খেয়ালী প্রকৃতিকে দিই ধন্যবাদ সমস্ত প্রাণ ঢেলে।

সে সময়টা ছিল অসহ্য গরম। আমরা আবার রাজপুতানা ঘুরে যাচ্ছিলুম; সেইজন্যে গরমটা একান্তই অসহ্য হ'য়ে উঠেছিলো।

উদয়পুরে এক বন্ধুর বাড়ী সেই দিনটা সবাই থামলুম। রাত্রিতে মোলায়েম জ্যোৎস্নায় সমস্ত সহর উপচে পড়েছিলো—মনে জেগে উঠল কত অতীত কালের কথা…সেই প্রতাপ-সিংহ…সেই পদ্মিনী কত…কি! আজ এ সহর দেখে… এর নিঝুম নিস্তব্ধ শান্তি দেখে মনে হোল যে হঠাৎ এই জায়গার তলায় একদিন বিসুভিয়স এসেছিল ভুল করে… মহা হুঙ্কারে জায়গাটা কেঁপে উঠেছিল তেজে বীর্য্যে শৌর্য্যে। তার পর কোথায় কি! যেন উদয়পুর একদিন স্বপ্ন দেখেছিল যে, সেও স্বাধীন ছিল। যেন সে দুর্ভাগ্যের মধ্যে এলিয়ে পড়ে সে সুস্বপ্নকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে করছে 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা' এরও তাই হ'য়েছে…ভুল—ভুল ও-সব কথা শুধুই কবির কল্পনা। আজকের অবস্থা দেখে মনেও হয় না এর অতীত ছিল গৌরবময়!

ছাদে শুয়ে এই রকমই ভাবছি আর দেখছি, এমন সময় পাশের বাড়ীতে নারী কণ্ঠে সুমধুর স্বর একটা ভেসে এল। চমকে উঠলুম—ও কে গায়? ও যে আমাদের প্রাণের ভাষা বাঙ্গালা…ও গান যে আমাদের বুকের রত্ন!

"নমেনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট, চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ
বুক-ভরা মধু বঙ্গের বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভ'রে।"

সমস্ত হৃদয় আমার আনন্দে থৈ থৈ করে উঠল। মনে হোল সমস্ত রাজপুতানায় যেন মরুভূমিই আছে; আর তার মধ্যে এইটা যেন শীতল কালো দীঘি! প্রাণ ছুটে গেল বাঙ্গলার সেই সবুজ লতা-পাতার মাঝখানে…গঙ্গার তীরে তীরে ঘন লতা পাতার কুঞ্জে-কুঞ্জে। মনে হোল, কে এই নিশীথে স্মরণ করলে তার দূরে ফেলে-আসা মাকে!

থাকতে পারলুম না; উঠে শুনতে লাগলুম সেই মধুর গানখানি! ভোরের আলোয় চোখ যখন বিশ্বের সৌন্দর্য্যের পরিচয় নিচ্ছিল, তখনও মনে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সেই সুর।

কিছু পরে সেই বাড়ীতে গিয়ে দাসীকে দিয়ে আমার কার্ডটা পাঠিয়ে দিতেই এক সুন্দরী তরুণী তাড়াতাড়ি এসে হাসতে হাসতে বললেন "আসুন, আসুন!"

যাক্, খুসী হলুম। ভয় হচ্ছিল ইনি যদি পর্দ্দানশীন হন ত ভারী আমায় অপ্রতিভ হ'তে হ'বে। কিন্তু তা নয়—ইনি বেশ সপ্রতিভ।

এখানকার কোন্ স্কুলে শিক্ষয়িত্রী তিনি; রঙটা, মুখখানি শিশির-ধোওয়া গোলাপের মতন!

দু'হাতে নমস্কার করে বললেন "আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এতে কি যে সুখী হয়েছি বলবার নয়!"

আমি বললুম "থাকতে পারলুম না; আমাদের বাংলা মায়ের সাড়া আপনার অন্তর থেকে এমন সুরে পেলুম যে, মনে হোল এঁকে আমার শ্রদ্ধা জানানো নিতান্তই দরকার!"

মধুর হেসে তিনি বললেন "বাঙ্গালী উদয়পুরে অনেকেই আসে; দূর থেকে তাদের দেখি আর মনে মনে বলি ওরা আমার ভাই। আপনার মতন তারা ত মানুষকে আপন করতে জানে না। আপনাকে আমার ভাই বলতে বড়ই ইচ্ছে করছে; ছোট ভাইটীর মতন আপনি সরল সুন্দর!"

তাঁকে প্রণাম করে বললুম "দিদি, এ দান যদি আপনি দেন সে ত মাথায় পেতে নোব!"

তিনি বললেন "আমার ভাই নেই; আপনি হোন ভাই আমার। কিছুদিন থেকে আমি এইখানেই রয়েছি—বাঙ্গলার আলো, গান, হাসি মনের মধ্যে গুপ্ত রত্নের মতন জ'মে গেছে। অবসর সময়ে তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করি, কত যে আনন্দ পাই কি বলব। মনে হয় যেন সেখানে আবার ফিরে গেছি; তাদের প্রতি উৎসবে

মেয়েরা যেন আমায় আমন্ত্রণ-লিপি পাঠায়; আমি যাই আবার ফিরে আসি। এমনি সব স্বপ্ন গাঁথি!”

আমি বললুম “আপনি একলা এখানে থাকেন কেন দিদি? বাংলায় যানই বা না কেন ছুটীতে ছুটীতে?”

তিনি হেসে বললেন “থাকতে হয় চাকরী করি বলে, আরো একটা কারণে—হ্যাঁ—আপনি কদিন থাকবেন এখানে?”

আমি বললুম “কালই বোধ হয় যাব।”

“কালই?—” বলেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বললেন “কাল আসবেন একবার সকালবেলা—আসবেন?”

রাজী হ'য়ে চলে এলুম। তাঁর ব্যবহার যেমনি ভাল লেগেছিল, তেমনি লেগেছিল আশ্চর্য্য! এত সুন্দর স্বাধীন চালচলন খুব কম দেখেছি! মনে মনে শ্রদ্ধা এল তাঁর প্রতি!

পরের দিন আসতেই তিনি হাসিয়া অভ্যর্থনা করলেন। বললেন “ভাইটী আমার এসেছে তবে; ভাবলুম বুঝি আসবে না!”

আমি কৃত্রিম রাগে বললুম “বেশ দিদি, আমার সম্বন্ধে এ রকম ভাবলেন—তবে আর আসব না।”

তিনি আমার হাত ধরে বললেন “না আসবে এসো না; কিন্তু যখন এসেছ তখন চল।”

আমি বললুম “না যাব না, যাই; ধরুন আমি আসি নি!”

তিনি হেসে বললেন, “ওমা, সে কি, আজ যে Special ভাই-দ্বিতীয়া আমার; নতুন-পাওয়া সবেমাত্র ভাইটীকে কি ছেড়ে দোব আজ বোনের অক্ষয় আশীর্ব্বাদ না দিয়ে!”

যেতে হোল! এই দূর প্রবাসে এক বোন তাঁর আশীর্ব্বাদ, ভালবাসা ঢেলে দিলেন আমার উপর। কি সুন্দর এই প্রথাটী! যে ভাই-বোন ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে বড় হ'য়ে বড়বেলায় ছাড়াছাড়ি হ'য়ে দূরে চলে যায়, বৎসরে এই একবার তাদের ভেতর স্নেহের স্নিগ্ধ রূপ জাগাবার কেমন চমৎকার প্রথা! এ আমার বরাবরই ভাল লাগে। বোন যেন তার ভাইকে অক্ষয় করে বাঁচিয়ে রাখে তার এই দিনটীর আশীর্ব্বাদে!

আমি বললুম “কিন্তু দিদি, বলতে হ'বে তোমায়, কেন তুমি এখানে থাক!”

তিনি বললেন “সবটা বলা যাবে না; একটুখানি শোন। কলেজে যখন পড়ি তখন একটী ছেলের সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়। সে পড়ত এম-এ—থাকত আমাদের বাড়ীর পাশেই। আমরা মা ও মেয়ে তাদের বাড়ীর কাছেই ভাড়া থাকতুম! প্রথম প্রথম দেখাশোনা হোত রোজ। তার পর পরিচয় হয়। তার পর তার সঙ্গে কলকাতায় কত জায়গা বেড়াতুম! কারণ আমি হোষ্টেলে থাকতুম। ছুটীতে বাড়ী গেলে তাকে যেন চিনি না এমনি ভাব দেখাতুম। সেও তাই দেখাত! কারণ ওর বাড়ীর লোকেরা বড় শক্ত লোক ছিলেন। আমার সঙ্গে বিয়ে কখনোই দিতেন না, কারণ আমরা ব্রাহ্ম। তাই মতলব করলুম যে আমরা কোথাও চলে যাব। দু'জনে রোজগার করব, আমাদের বেশ চলে যাবে। আমার এক আত্মীয় উদয়পুরে ছিলেন। তাঁর দ্বারা এই চাকরীটা ঠিক করে চলে এলুম। তার পর তার আসবার আশায় আশায় বসে আছি···ঠিকানা দিয়েছি···আজ দুই বছর হ'য়ে গেল। কোন ছুটীতেই এখান ছেড়ে যাই না, যদি সে এসে আমায় দেখতে না পেয়ে চলে যায়। এমনি করেই দিন কেটে যায়···সবুজ বাংলা থেকে ক্রমশঃই দূরে স'রে যাচ্ছি! বোধ হয় তার বাড়ীতে জানতে পেরেছে তাই······” তিনি ধীরে ধীরে থেমে গেলেন।

মনে হোল তাঁর অন্তর প্রিয়তমের সন্ধানে ভুবনে ভুবনে ছোটাছুটী করছে···মনে করছে বুঝি এই আসে···এই আসে? এ কি! এ কত বড় প্রেমের তপস্যা! কি মহিয়সী এই নারী?

বললুম “কোথা বাড়ী তার বলবেন কি? নাম কি? যদি আমার জানাশোনা থাকে!”

সুন্দর চোখ দুটীর কাণায় কাণায় যে জল জমিয়াছিল আঁচলে তা' মুছে তিনি বললেন “কি করবে ভাই সে সব শুনে? আমি আর চাই না···এখন তাকে চাওয়ার চেয়ে পাওয়ার চেয়ে বেশী করে পেয়েছি। তার অশরীরী সবটুকু এত বেশী করে ক্ষণে ক্ষণে আমার অন্তরের সঙ্গে মিশে গেছে যে তাকে পেলে এখন আর সইতে পারবো না। পাওয়া-হারানোর বাইরে যে পাওয়া সেইটেই পেয়ে গেছি যেমন সাধকরা অদেখা ভগবানকে অন্তরাত্মা ভ'রে পায় তাঁর দেহকে না পেয়েও!”

আমার মন আরো সম্ভ্রমে ভরে গেল ! প্রেম কাকে বলে তা বাইরে পড়েছি···মিরাণ্ডা ফার্দিনান্দের ভালবাসা মনে জ্বলজ্বল করছে, শকুন্তলার প্রেমও পড়েছি···আরো কত কি প্রেম দেখেছি। কিন্তু জীবনে তারা সত্য কি না সে ত টের পাই নি ; কিম্বা প্রিয়া-হীন বলে ল্যাম্বের মতন 'ব্যাচিলারের কমপ্লেণ্ট' লিখতেও সুরু করি নি। কারণ ল্যাম্বের আশা ছিল না—আমার যে অফুরন্ত জীবন পড়ে···মায়াবী প্রিয়া তার আঁচল উড়িয়ে হাতছানি কখনো না কখনো দেবেই। সেই জন্যে তত মাথা ঘামাই না।

কিন্তু আজ মনে হোল সব সত্য, সত্য ! সেকস্‌পিয়ার, কালিদাস মিথ্যে রাতের তারায় তারায় দীপ জ্বালে নি··· জাগিয়ে রেখেছে মানব-মনের নিরুপম চিরন্তন সত্য ! এ কথা মনে হয়ে হৃদয় ভরে উঠল !

বললুম "দিদি, তার নাম জানতে বড্ড ইচ্ছে করছে !"

তিনি বললেন। নাম শুনে চমকে গেলুম। কোন্ জায়গায় সে থাকে জানতে চাইলুম। বললেন।

নাঃ—আর ভুল ত নেই। ছিঃ ছিঃ ! মানুষের অন্তরের মধ্যে কি দানবের রাজত্ব !

উঠে পড়লুম। বলুম "যাই দিদি, ভুলবেন না আমায়, চললুম !"

তিনি বললেন "আমি ভুলব ? বরঞ্চ তুমি না ভুলে যাও ভাই।"

বাড়ীতে এসেই আমাদের দলবলকে বললুম "আজই তোমরা চলে যাও ; আমি যাব না—বাড়ী ফিরছি !"

তারা অবাক্ হোল ! বন্ধু বললে "যা—যা, আর ইয়ারকি করিস নি।"

আমি বললুম 'না—সত্যি যাব না, তোমরা যাও।"

তারা চলে গেল। আমি ফিরে এলুম। উদয়পুরে কখনো আর যাই নি।

কেমন করে তাঁকে বলব যে আজ তাঁর অন্তরের প্রিয়তম 'হনিমুন ট্রিপ' করতে সপ্রিয়া মোটরে বেরিয়েছেন। কেমন করে বলব তিনি তাঁর পাশের বাড়ীতেই রয়েছেন। কি করেই বা জানাই তাঁর এত বড় সাধনা সব ব্যর্থ···প্রিয় তাঁর কোনদিন আসবে না। নারী যখন তাঁর অন্তরের অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর পূজা সমাপন করছেন, পুরুষ তখন আনন্দে উৎসবে ব্যাকুল !

তিনি বারবার চিঠি লেখেন, যেতে বলেন, যাই না, কখনো যাব না তাঁর কাছে !

কিন্তু চিঠি ঠিক আসে ; বৎসরে কতবার কত উপহার আসে, অনুযোগ আসে, স্নেহ আসে, নিমন্ত্রণ আসে, তবু যাই না।

ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

একজন আই-সি-এস সিবিলিয়ান, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী কৃতজ্ঞতার নিদর্শন * স্বরূপ ইংরেজী ভাষায় যাঁহার প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠার একখানি সুবৃহৎ জীবন-চরিত রচনা করিয়াছিলেন, তিনি যে একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ ছিলেন তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যে বঙ্গদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মতন সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই বঙ্গদেশ নিশ্চয়ই গৌরবান্বিতা হইয়াছেন, এবং আজ তাঁহার স্মৃতি-তর্পণের সুযোগ পাইয়া আমরাও ধন্য বোধ করিতেছি।

রাজা আদিশূরের আমন্ত্রণে যে পঞ্চ বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন, ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম শ্রীহর্ষ হইতে ৩৪শ পুরুষ পরবর্ত্তী সন্তান। এই শ্রীহর্ষ "নৈষধ-চরিতে"র রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বংশানুক্রমের

* 'Gratitude was amongst the motives which led me to undertake the biography of my dis'inguished Bengali friend ; for he gave me sympathy and kindness at a time when I stood in need of both."
—Dedication to "AN INDIAN JOURNALIST." *by F. H. Skrine.*

প্রভাব যে কত, শম্ভুচন্দ্রে তাহা উজ্জ্বল ভাবে প্রকট হইয়াছিল।

শম্ভুচন্দ্রের পিতার নাম মথুরমোহন মুখোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতায় ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। শম্ভুচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিৎপুরে একখানি জ্বালানি কাষ্ঠ ও খোল-ভুষির দোকান ছিল। মথুরমোহন বরাহনগরে বাস করিতেন, এবং প্রত্যহ কলিকাতায় আসিয়া দোকান করিতেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বরাহনগরে শম্ভুচন্দ্রের জন্ম হয়।

বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির ন্যায় শম্ভুচন্দ্রও বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত এবং পাঠে অমনোযোগী ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে পাঠানো হয়, কিন্তু সেখানে কোন সুবিধা হয় নাই। সে সময়ে বরাহনগরে একটি মিশনারী স্কুল ছিল। সেই স্কুলের ছাত্রদের ক্রিকেট খেলিতে দেখিয়া শম্ভুচন্দ্র তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সেই স্কুলে পড়িতে চাহিলে তাঁহার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পিতা তাঁহার ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিক্ষায় ঘোর আপত্তি করেন; কিন্তু তাঁহার জননী তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। ফলে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বহু বাদানুবাদের পর শম্ভুচন্দ্র সেই মিশনারী স্কুলে পড়িবার অনুমতি পাইলেন (১৮৪৮)। কিন্তু মথুরমোহন শীঘ্রই সংবাদ পাইলেন যে, সেই স্কুলের চারিটি ব্রাহ্মণ ছাত্র খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া মথুরমোহন অবিলম্বে পুত্রকে সেই স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া কলিকাতা গরাণহাটার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে আনিয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেলেন। ইহাতে শম্ভুচন্দ্রের পড়াশুনার খুব সুবিধা হইল বটে, কিন্তু অন্য দিকে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মথুরমোহন তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক পূজা-আহ্নিক সারিয়া একমাত্র সন্তান শিশু পুত্রকে নিজে সঙ্গে করিয়া আনিয়া প্রত্যহ স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়া দোকানে চলিয়া যাইতেন; এবং স্কুলের ছুটি হইবার বহুক্ষণ পরে গৃহে ফিরিবার সময় তাঁহাকে লইতে আসিতেন। এই সময়টা শম্ভুচন্দ্র বাগবাজারের ঘোষ-পরিবারের বাড়ীতে পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেন। এই বাড়ীর ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেন, এবং উচ্চাঙ্গের ইংরেজী সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতেন। শম্ভুচন্দ্র প্রথমে ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাদের কাছে থাকিতেন, কিন্তু আলোচনায় যোগ দিতেন না। ক্রমে তাঁহার সাহস যেমন বাড়িতে লাগিল, জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহাও তদ্রূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বয়স্ক বালকদিগের উচ্চাঙ্গের সাহিত্যালোচনায় যোগ দিবার জন্য তিনি মহা উৎসাহে ইংরেজী পড়িতে লাগিলেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁহার পিতার পূর্ব্বের বিতৃষ্ণা এখন আর ছিল না। তাঁহার অনুমতি লইয়া শম্ভুচন্দ্র Calcutta Public Libraryতে যোগদান করিলেন। কিন্তু তখনও তিনি দুগ্ধপোষ্য বালক মাত্র - এই পাঠাগারের পরিণত-বয়স্ক পাঠকদিগের নিকটে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইত। এই সময়ে তাঁহার স্কুলে যাতায়াতের জন্য তাঁহার পিতা টাট্টু ঘোড়ায় বাহিত একখানি ছোট্ট গাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলেন, শম্ভুচন্দ্র লজ্জাবশতঃ বই লইয়া গিয়া গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া পড়িতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে শম্ভুচন্দ্র পূর্ব্বের স্কুল ত্যাগ করিয়া এই বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই সময়ে কৃষ্ণদাস পাল এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ার দত্ত-পরিবারের রমেশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের সহিত শম্ভুচন্দ্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িবার কালে শম্ভুচন্দ্র সংবাদপত্রের সেবায় নিযুক্ত হন এবং কৃষ্ণদাস পালের সহযোগে Calcutta Monthly Magazine প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পত্রখানি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর তিনি Morning Chronicle নামক একখানি দৈনিক পত্রের সম্পাদক হন। কিন্তু পত্রখানির ইংরেজ অধিকারী মিঃ লাভের রাজনীতিক মতের সহিত সম্পাদকের রাজনীতিক মতের সামঞ্জস্য না হওয়ায় শম্ভুচন্দ্র ইহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন, এবং Hindu Intelligencer পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই সময়ে শম্ভুচন্দ্র উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের অব্যবহিত পরে শম্ভুচন্দ্রের বন্ধু সুরেশচন্দ্র দত্ত Hindu Patriot সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় হরিশ্চন্দ্র মুগ্ধ হন, এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই বন্ধুত্ব তাঁহাদের আজীবনকাল অটুট ছিল। হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব শম্ভুচন্দ্রের উপর এমন কার্য্যকর হইয়াছিল যে, শম্ভুচন্দ্র

রাজনীতির চর্চায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন, এবং সিপাহী বিদ্রোহের গুপ্ত ইতিহাস অবলম্বন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহ উপলক্ষে লর্ড ক্যানিংএর আমলে মুদ্রাযন্ত্র-বিধান প্রণীত হইয়া সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়াছিল; তাহাতে রাজনীতির আলোচনা করিবার উপায় ছিল না। এই কারণে শম্ভুচন্দ্রের পুস্তিকাখানি এ দেশে প্রকাশিত হইতে পারিল না—"হোমে" (বিলাতে) প্রকাশিত হইল। প্রকাশক হইলেন মিঃ ম্যালকম লিউইন (১৮৫৭)। ইনি ছিলেন মান্দ্রাজ সদর কোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ। খৃষ্টানদিগের সহিত হিন্দুদিগের মামলায় হিন্দুদিগের প্রতি অবিচার হয়, এইরূপ আন্দোলন উত্থিত হওয়ায় মিঃ ম্যালকম লিউইন তথাকথিত অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জজিয়তি খসিয়া গিয়াছিল। তৎকর্ত্তৃক বিলাতে শম্ভুচন্দ্রের পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে সেখানে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। বইখানির রচনা এমন যুক্তিপূর্ণ, ভাষা এমন সুন্দর হইয়াছিল যে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে ইহা কোন ইংরেজের রচনা। ইহার পর শম্ভুচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের অনুরোধে হিন্দু পেট্রিয়টের লেখকের পদ গ্রহণ করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র তাঁহার বন্ধু রাজেন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত নব-প্রবর্ত্তিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতির চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বসিবার ঘরটি পরীক্ষাগারে পরিণত করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ঔষধ লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং পরীক্ষার ফল আমেরিকার চিকাগো ও ফিলাডেল-ফিয়া নগরের বড় বড় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণকে লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার গবেষণার পুরস্কার-স্বরূপ আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এম-ডি উপাধি প্রদান করিলেন। এই উপাধিলাভের প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্রের জীবনী-কার লিখিয়াছেন—"He (শম্ভুচন্দ্র) never sought a degree from his own *Alma Mater*; and it is not to the credit of that body that one of her greatest sons should never have been vouchsafed an honorary one." অর্থাৎ, শম্ভুচন্দ্র নিজ মাতৃভূমির বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কখনও কোন উপাধির প্রার্থী হন নাই। তাই বলিয়া, দেশের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের অন্যতমকে একটা অনারারী উপাধিও না দেওয়া দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

দুই বৎসর হিন্দু পেটরিয়টের সেবা করিবার পর শম্ভু-চন্দ্রের খেয়াল হইল তিনি এটর্ণী হইবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মেসার্স এলান, জজ এণ্ড লিজ্যাম নামক এটর্ণী কোম্পানীর আপিসে আর্টিকেল ক্লার্ক হইলেন। কিন্তু এটর্ণিশিপ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় তিনি পরীক্ষা দিলেন না। তখন হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে দ্বিতীয়বার আহ্বান করিয়া হিন্দু-পেটরিয়টের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলেন। পরবর্ত্তী তিন বৎসর শম্ভুচন্দ্রই হিন্দু পেটরিয়ট সম্পাদন করিয়াছিলেন বলা চলে; কারণ, হরিশ্চন্দ্র এই সময়ে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই রোগেই ৩৯ বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। উপকারী বন্ধুর মৃত্যুর পর শম্ভুচন্দ্র তাঁহার জীবনচরিত রচনা করেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় হিন্দু পেটরিয়ট ক্রয় করিয়া লন, এবং শম্ভুচন্দ্র হিন্দু পেটরিয়টের সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে অযোধ্যার তালুকদার সভার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া লক্ষ্ণৌ চলিয়া যান। এই সভা হইতে "সমাচার হিন্দুস্থানী" নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। শম্ভুচন্দ্রের হস্তে এই "সমাচার" সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়। হিন্দু পেটরিয়টের নূতন সম্পাদক হইয়াছিলেন রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর। শম্ভুচন্দ্র লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থিতি কালে হিন্দু পেটরিয়টে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন। লক্ষ্ণৌ বরাবরই গীত-বাদ্যের চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালে সেখানে সোরি মিয়ার পৌত্র মিয়া আলীর আলি সর্ব্বপ্রধান ওস্তাদ ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্রের পরম বন্ধু নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলার নবাব নাজিমের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। নবাব নাজিম শম্ভুচন্দ্রকে প্রথমে রাজনীতিক পরামর্শদাতা, পরে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এখানে তিনি নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পদচ্যুত দেওয়ান

এবং আমলাবর্গের ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়। এমন কি, এক সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে গুণ্ডা নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পিতার লোকান্তর হওয়ায় শম্ভুচন্দ্র পিতৃকৃত্য সমাপনের জন্য কলিকাতায় আসেন। তাহার পর আর তিনি মুর্শিদাবাদের কর্ম্মে ফিরিয়া যান নাই। ইহাতেও কিন্তু তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভূতপূর্ব্ব নায়েব-দেওয়ান কতকগুলি দলিলের দাবী দিয়া তাঁহার নামে ক্ষতিপূরণের অভিযোগ আনয়ন করেন। আদালতের বিচারে শম্ভুচন্দ্র এই অভিযোগে সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন; অধিকন্তু, কতকগুলি জিনিস ক্রয়ের কমিশন এবং বেতন বাবদ অনেক টাকার দাবী দিয়া পাণ্টা নালিশ করিয়া নায়েব দেওয়ানের নিকট হইতে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লন।

মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া তিনি হিন্দু পেটরিয়টে কিছু দিন সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। পরে কলিকাতা ট্রেনিং এ্যাকাডেমীর হেড্‌মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই কাজ তাঁহার বেশী দিন ভাল লাগে নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুরের চেষ্টায় শম্ভুচন্দ্র কাশীপুরের রাজা শিউরাজ সিংহের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। রাজা তাঁহার সেক্রেটারীকে লইয়া কাশীপুরে যাত্রা করেন। রাজার অভ্যর্থনার্থ তাঁহার ভৃত্যবর্গ একটা প্রকাণ্ড বন্য বরাহ শিকার করিয়া আনিয়াছিল। প্রাসাদে প্রবেশ করিবার সময় এই সুলক্ষণ দেখিয়া রাজা পরমাহ্লাদিত হইয়া বরাহের মাংস সকলকে বণ্টন করিয়া দেন এবং নব-নিযুক্ত সেক্রেটারীকেও বড় একখণ্ড মাংস পাঠাইয়া দেন। শম্ভুচন্দ্র নিরামিষাশী ছিলেন বলিয়া মাংস ফিরাইয়া দেন। রাজা সেক্রেটারীর মত পরিবর্ত্তনের অনেক চেষ্টা করেন এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাবেশ করিয়া শিকার করা বন্য বরাহের মাংস ভক্ষণের সপক্ষে পাঁতি সংগ্রহ করেন। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন যে বন্য বরাহ-মাংস ভক্ষণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। শম্ভুচন্দ্র তাহা স্বীকার করিয়াও মাংস ভক্ষণে অসম্মত হন। রাজা ইহা লইয়া আর পীড়াপীড়ি করেন নাই, রাগও করেন নাই। তবে রামপুরের নবাবের একজন Personal Assistantএর প্রয়োজন জানিয়া শম্ভুচন্দ্রকে প্রশংসাপত্র দিয়া রামপুরে পাঠাইয়া দেন। রামপুরে আসিয়া শম্ভুচন্দ্র অচিরে নবাবের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। কিন্তু এখানেও নবাবের অন্য কর্ম্মচারীদের ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়। অগত্যা তিনি রামপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া তিনি নিজ সম্পাদকতায় একখানি সাময়িক পত্র বাহির করেন, এবং হিন্দু পেটরিয়ট প্রভৃতি পত্রেও লিখিতে থাকেন। এই পত্রে তিনি ভূপালের বেগম সেকন্দ্রার একটি জীবনী লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক-পত্রখানির পাঁচ সংখ্যা বাহির হইবার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৭৬ সালে কিম্বা তাহার পর বৎসর শম্ভুচন্দ্র মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আগড়তলায় গিয়া তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানেও সেই ষড়যন্ত্র। রাজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য যে-কোন কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন, কোন্ অদৃশ্য হস্ত তাঁহাকে সেই কার্য্যে বাধা দিত। কাজেই তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজ তাঁহার গুণে একান্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন—সহজে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শম্ভুচন্দ্রকে আগড়তলায় যাইতে হইবে না—কলিকাতায় থাকিয়াই তিনি মহারাজার পরামর্শদাতা রূপে কার্য্য করুন। কিন্তু আর তিনি ত্রিপুরার কর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

কলিকাতায় ফিরিবার পর, রাণী রাসমণির সম্পত্তি বিভাগের জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহোদয় শম্ভুচন্দ্রকে এই কমিশনের অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র Reis and Rayyet নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই তাঁহার গৌরব স্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাই তাঁহার উপযুক্ত ও মনের মতন কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল। এই সংবাদপত্রের সম্পাদকের আসনে বসিয়া তিনি মনের সাধে নিজের বিশিষ্ট মত প্রকাশ করিতে পারিতেন—কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হইত না। এই পত্র উপলক্ষে বহু উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়; এবং তদানীন্তন

বড়লাট লর্ড ডাফরিন ও তাঁহার সমশ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত তাঁহার নিয়ত পত্র ব্যবহার চলিত।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Travels in E. Bengal নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বইখানি অতি চমৎকার শব্দচিত্র। ইহাতে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের যে প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, বইখানি পড়িলে পাঠকের হৃদয়ে তাহা স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়।

শম্ভুচন্দ্র যৌবনকালেই হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রোগ যখন প্রবল হইত, তখন তিনি অহিফেন সেবন করিতেন। তাহাতে রোগ-যন্ত্রণা হ্রাস পাইত। রোগ কমিলে তিনি অহিফেন সেবন বন্ধ করিতেন—কখনও উহাকে অভ্যাসে পরিণত হইতে দেন নাই। কিন্তু এই রোগ হইতে তিনি কখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, ক্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে থাকে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একবার নিউমোনিয়া রোগ হয়, তাহাতে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। ১৮৯৪ সালের ২৬এ জানুয়ারী হঠাৎ তাঁহার অত্যন্ত শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়। ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহার জ্বর হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখিতে পান। ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময় তাঁহার আত্মা মরলোক হইতে চির বিদায় গ্রহণ করে।

শম্ভুচন্দ্র চির-অস্থির, চির-অব্যবস্থিত চিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাহার সম্যক বিকাশে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। তাই তাঁহার গুণের সম্যক আদর হয় নাই, তাঁহার মাতৃ-ভাষায় তাঁহার কোন জীবনীগ্রন্থও রচিত হয় নাই। তাই গুণজ্ঞ ও গুণগ্রাহী বিদেশী বন্ধু তাঁহার জীবন-রচিত রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশবাসী গুণবান ব্যক্তির গুণের আদর করিবার পক্ষে আমাদের অনাস্থা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এই অপরাধ স্খালনে বাঙ্গালীর অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। *

---

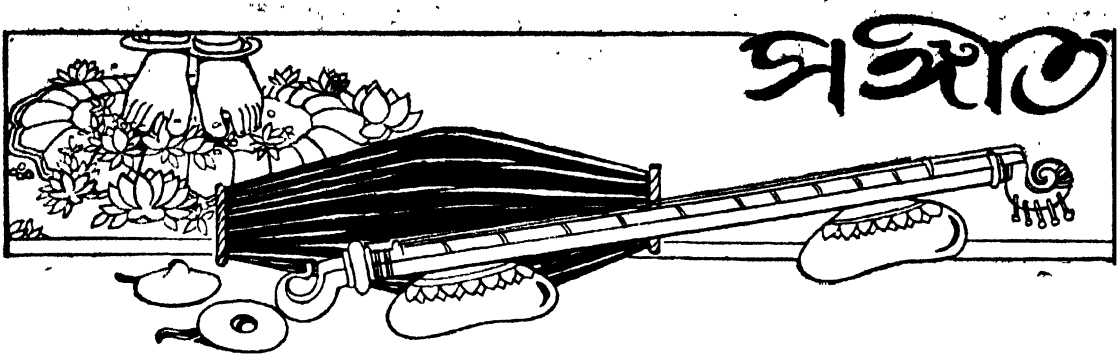
* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে, Mr. F. H. Skrine I. C. S. প্রণীত AN INDIAN JOURNALIST অবলম্বনে।

সনেট

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

তোমারে পেয়েছি আমি আজ নহে, আরো কত বর্ষ আগে আমারি অজ্ঞাতে
জ্যোতির্ম্ময়ী নিশিথিনী এক শুধু সাক্ষী তার—এইটুকু মনে পড়ে আজ ;
সেদিন আমার লুব্ধ আঁখি-তূণে কোন্ বাণ পূর্ণ ছিল,—ধ্যান ধারণাতে
তুমি জানো চুম্বন শায়কবিদ্ধা সোহাগী কপোতী মম মমতার তাজ।
কামনার কারাগারে যে দেহ পচিতেছিল একখানি রক্ত-ওষ্ঠ তরে,
তব রূপ-স্বর্গলোকে কবে সে ইন্দ্রত্ব পেল' সুকোমল কর-স্পর্শ পেয়ে—
কবে শিষ্ট দৃষ্টি পাখী লজ্জার পিঞ্জর ভেঙ্গে উড়ে গেল প্রেম-পক্ষ ভরে
তোমার নয়নাকাশে, তুমি জানো, তুমি জানো ধ্যানাতীতা ধরিত্রীর মেয়ে।

সুন্দরের সূচীপত্রে খুঁজিয়া পেয়েছি যারে,—স্মিতমুখী সন্ধ্যা-তারা মম
প্রাণ প্রিয়া সেই তুমি—কাব্যে-বলা চৈত্র-জ্যোৎস্না অনন্তের অব্যক্ত কাহিনী—
আজিও বিচিত্ররূপে উপেক্ষার পঙ্ক-সরে জ্যোৎস্নাস্নাত অরবিন্দ সম
ফুটিয়া র'য়েছ সুখে দেহের লাঞ্ছনা সহি' হে আমার উন্মাদ রাগিণী।
আজ নহে আমাদের প্রথম উৎসব এই, আজ নহ' নব পরিণীতা,
কল্প-প্রেম-রাখী যবে বেঁধে দিছি সেই হ'তে তুমি মোর স্মরণ-চুম্বিতা।



গান ও সুর ঃ—শ্রী অসিতকুমার হালদার

স্বরলিপি ঃ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও
শ্রীরবীন্দ্র রায়

আজি জাগো আনন্দে
সুখ-স্বপন অবসানে,
চাহ প্রভাত-কিরণ পানে !
আজি, বন-পল্লবে
কি মধুর মুর্চ্ছণা আনে !—
নব জাগরণ চেতন গানে ।

চঞ্চল কিশলয়-বীথি,
কলরব-মুখরিত গীতি,

আজি শোন আনন্দে,
দুখ-বেদনা-ভোলা প্রাণে—

- জ্ঞমা পা ণ | ণদ -া প ম | জ্ঞা ম প ম | জ্ঞা জ্ঞা ঋ সা
০ জা গো আ ন ন্ দে সু খ স্ব প ন অ ব সা ০
৩ + ২ ০

সা মা . পা ণ | ণদ -া প প | -া -া ম জ্ঞা | ম প ম জ্ঞা
নে জা গো আ ন ন্ দে ০ ০ ০ সু খ স্ব প ন অ
৩ + ২ ০

জ্ঞ ঋ সা -া | -া মা মা মা | পা পা ণ ণদ | দা -া -া প
ব সা ০ নে ০ চা হ প্র ভা ত কি র ণ পা ০ নে
৩ + ০

-া জ্ঞমা প ণ | ণদ -া -া -া
০ জা গো আ ন ন দে ০
৩ +

পদ দ ণ সা | র্সা র্সা র্জ্ঋ -র্সা | নর্সা -া -া -া | র্সা জ্ঞা ঋ সা
হে র ব ন প ল্ ল ০ বে ০ ০ ০ কি ম ধু র
০ ৩ + ২

সা ণ ণ ণ | দ -া পা -া | গা ঋ সা ণ | দ প ম প
মু র ছ না আ ০ নে ০ ন ব জা গ র ণ চে ০

মা জ্ঞা ঋ ঃ | সা মা প ণ | দ -া -া -া
ত ন গা ০ নে জা গো আ ন ন্দে ০ ০
০ ৩ +

সা সা ম ম | প প ণ দ | দ -া প -া | প র্জ্ঞা ঋ -া
চ ন চ ল কি শ ল য় বী ০ থি ০ ক ল র ব
২ ০ ৩ +

সা সা ণ -া | দ -া প -া | প ম প ণ | ণদ দ প ম
মু খ রি ত গী ০ তি ০ শো নো আ ০ ন ন দে দু
২ ০ ৩ +

জ্ঞা ম প ম | জ্ঞা জ্ঞা ঋ -া | সা ম প ণ | দ -া -া -া
খ বে দ না ভো লা প্রা ০ ণে জা গো আ ন ০ ০ ০

লক্ষ্ণৌ
খৃষ্ট জন্মদিন, ১৯৩১

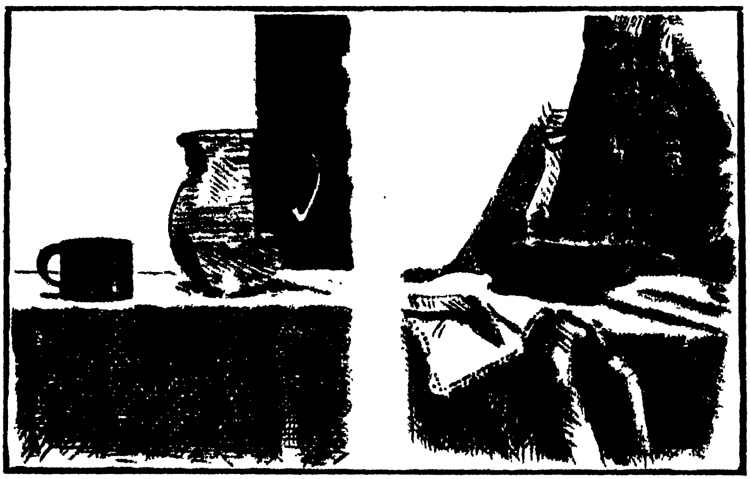


ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রের দৃশ্যরচন-রীতি)

ছবি দেখতে সুন্দর হয়, তার composition বা দৃশ্যরচন-কৌশলের গুণে ; অর্থাৎ, একখানি ছবিতে যা কিছু দ্রষ্টব্য থাকে সেগুলিকে এমন ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা দরকার, যাতে সমস্ত ছবিখানি দেখতে বেশ শোভন বা সুদৃশ্য হ'য়ে ওঠে। ছবিকে সুদৃশ্য ক'রে তোলা চলচ্চিত্র শিল্পের একটা প্রধান প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কারণ ছবির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর ক'রে এই সাজানোর কৌশলেরই উপর। পূর্ব্বেই বলেছি যে আলোকচিত্র কেবলমাত্র বাস্তবের অবিকল প্রতিকৃতি হ'লে চল্‌বেনা। নটনটীর অভিনয়াংশ



মানানসই সজ্জা (Harmony) বেমানান সজ্জা (Discord)

তোলার সঙ্গে সঙ্গে আলোকচিত্রে গল্প-লেখকের বক্তব্য এবং প্রয়োগ-শিল্পীর ও পরিচালকের স্বপ্ন ও কল্পনাকেও ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ কাজ সুসম্পন্ন করবার সহজ উপায় হ'চ্ছে composition বা দৃশ্যরচন পদ্ধতির প্রতি অবহিত হওয়া এবং সেদিকে আগাগোড়া সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

লেখক, পরিচালক ও নটনটীর কাজের সুসমন্বয় ঘটিয়ে তোলাই হ'চ্ছে আলোক-চিত্রকরের কৃতকার্য্য হবার সুনির্দ্দিষ্ট পথ। কারণ, এই তিনটির সহযোগেই চিত্রের গল্পটি গ'ড়ে ওঠে এবং সজীবও হয়। যেখানে এই ত্রিবিধ সম্মিলন ঘটেনা, সেখানে ছবিখানি আর যাই হোক সুন্দর ও সুদৃশ্য যে হয়না এ একেবারে সুনিশ্চিত। আমাদের বাংলা ছবিগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ! সুতরাং composition বা চিত্রের দৃশ্যরচন রীতিটা প্রত্যেক আলোক চিত্র-শিল্পীর সর্ব্বাগ্রে জেনে রাখা দরকার। জগতের একাধিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা অসংখ্য জড়-ছবিরও (S'ill Pictures) জন-প্রিয়তার একটা বিশেষ কারণ হ'চ্ছে তাঁদের চিত্রের এই composition বা দৃশ্যরচন কৌশলে তাঁরা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছেন। মনে রাখা দরকার যে চলচ্চিত্রও ছবি, অতএব এর সাফল্যও নির্ভর করে ঐ composition বা দৃশ্যরচন-কৌশলের উপর।

চলচ্চিত্রের সুদক্ষ শিল্পী হ'তে হ'লে এই composition বা দৃশ্যরচন-পদ্ধতি ছাড়া তাঁকে আলোক ও ছায়ার তারতম্যের উপযোগিতা ও বিভাগ কৌশল এবং তাঁর ক্যামেরা বা ছায়াধর যন্ত্রটির সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার-নৈপুণ্যও শিখতে হবে। দৃশ্যরচন-পদ্ধতির আবার নানা রকম প্রকার-ভেদ আছে, কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি এ জিনিসটা আজকের কোনো নূতন আবিষ্কার নয়, ছবি যেদিন থেকে উচ্চ অঙ্গের একটা শিল্প বলে স্বীকৃত হয়েছে সেদিন থেকেই চিত্রে এ দৃশ্যরচন-রীতির প্রচলন হয়েছে। বহু প্রাচীন চিত্রের মধ্যেও এই দৃশ্যরচন-দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। কে যে প্রথম এ তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রেছিলেন, তার সঠিক খবর জানা যায় না; তবে, তিনি যিনিই হোন্, তাঁর শিল্প প্রতিভার অনন্য সাধারণত্ব স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

বর্ত্তমান শিল্প-বিজ্ঞান সপ্রমাণ করেছে যে, কি পটে আঁকা ছবি, কি চলচ্চিত্র বা অন্য চিত্র, সব কিছুই দেখবার সময় সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম গিয়ে পড়ে ছবির নীচেকার বাঁ-দিকের কোণে, তারপর সেখান থেকে আমাদের দৃষ্টি ক্রমে সরে সরে উপর দিকে উঠ্‌তে থাকে, যে পর্য্যন্ত না একটা কিছু দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর গিয়ে আবদ্ধ হয় বা অন্য কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হয়। এই সব বস্তু বা দ্রষ্টব্য বিষয় গুলিকে ঠিক যথাযথ স্থানে সাজিয়ে রাখার কৌশলের মধ্যেই দৃশ্যরচন-নীতির গুহ্যতত্ত্ব নিহিত রয়েছে।

চলচ্চিত্রে এমন ভাবে একখানি ছবির দৃশ্য সাজানো যেতে পারে যাতে দর্শকের দৃষ্টিকে শিল্পী তাঁর ইচ্ছামত ছবির যে কোনোও একটি দিকের কোনো বিশেষ স্থানে আকৃষ্ট করতে পারেন এবং সেখানে আবদ্ধ রাখতেও পারে, অথচ সে সময় সেই ছবিরই অন্যদিকে হয়ত অনেক কিছু ব্যাপার ঘট্‌ছে, কিন্তু, দর্শক সেদিকে বেশী মনোযোগ দিতে চাইবেনা! এই যে দর্শকের দৃষ্টিকে নিজের ইচ্ছামত ছবির যে কোনো অংশে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং কেবলমাত্র নিজের অভীষ্ট যে কোনোও বস্তু বা বিষয়ের উপর তাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে পারার কৌশল ও নৈপুণ্য—এইটুকুই হ'চ্ছে নিপুণ আলোক-চিত্রকরের প্রধান বিশেষত্ব। এইখানেই যিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন, তিনিই হ'য়ে ওঠেন 'পাকা-খেলোয়াড়'! আর, যিনি এসব বোঝেনও না, পারেনও না, তিনি বরাবরই এ লাইনে আনাড়ী ও কাঁচা লোক ব'লেই বিবেচিত হবেন। ছবির ঘটনাবলী অনেক সময় এই দৃশ্যরচন-রীতির দোষেই জটিল ও দুর্ব্বোধ হ'য়ে ওঠে, কিন্তু, দৃশ্যরচন-কৌশল যে জানে, তার হাতে পড়লে যে কোনো ছবি যেন আপনি কথা কয়! খুবই সরল ও সহজবোধ্য হ'য়ে ওঠে।

পূর্ব্বেই বলেছি এই দৃশ্যরচন-কৌশল প্রয়োগ করবার অসংখ্য উপায় শক্তিশালী শিল্পীর হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকে। যে যত বেশী সেগুলিকে নিপুণভাবে কাজে লাগাতে পারে সেই তত বেশী দক্ষতার পরিচয় দেয়! একটা কোনো



"জ্ঞানদেবী" (দর্শকের দৃষ্টি দেবীর মুখের দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে)

আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে (Interior scene) যে Set বা পৃষ্ঠপট ব্যবহার হয় তা'তে—সেই পট-ভূমিকার পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ব্যবহারের



"জ্ঞানদেবী" (দর্শকের দৃষ্টি দেবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থখানির দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে)

ভিতর দিয়ে সে ছবিতে শুধু সুরুচি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর একমাত্র কাজ নয়—গল্পের প্রতিপাদ্য

ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ও প্রকৃতিগত বিশেষত্বের দিকটাও যাতে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে সেদিকেও তাঁর সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি রাখা দরকার।



'কাল ও দীপশিখা' (দর্শকের দৃষ্টি মূর্ত্তির দিকে আকৃষ্ট করা)

একজন রাসায়নিকের পরীক্ষাগার, একজন নৃ-তত্ত্ববিদের অনুসন্ধান-কক্ষ, বা একজন প্রত্ন-তাত্ত্বিকের গবেষণা গৃহ সাজানো হয়ত খুব সহজ ; কিন্তু, একজন দার্শনিকের ঘর

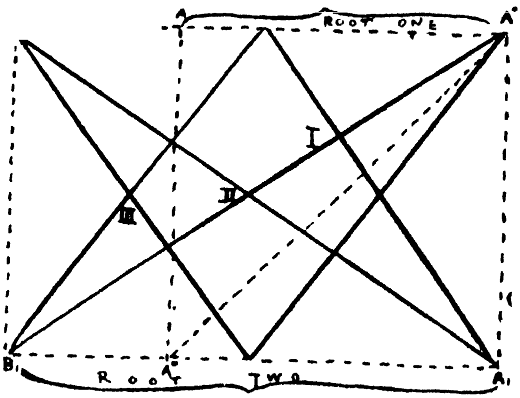


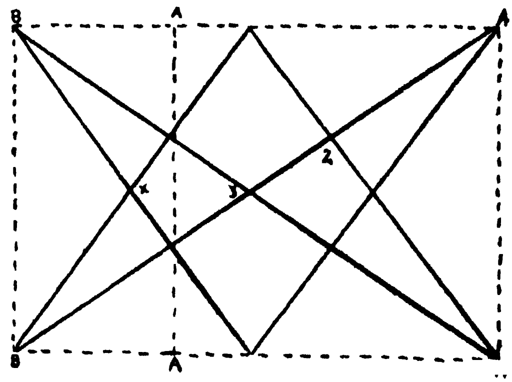
'কাল' ও দীপশিখা' (দর্শকের দৃষ্টি কালের পুঁথির দিকে আকৃষ্ট করা)

কিম্বা উন্মাদের কক্ষ কী ভাবে সাজানো উচিত, এ সম্বন্ধে আলোক-চিত্রকরকে অনেক ভাবতে হয়। রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ বা প্রত্ন-তাত্ত্বিকের সাজ-পোষাকের মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই—বিশেষত্ব শুধু তাদের পরস্পরের কার্য্যালয়ের। একজনের শিশি-বোতল ও 'টেষ্ট্-টিউব' নিয়ে কারবার, একজন কঙ্কালের পূজারী, আর একজন প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি ও স্থাপত্যের মধ্যে নিমগ্ন ; কিন্তু একজন দার্শনিক অথবা কোনো উন্মাদের বাসগৃহ দেখাতে গেলে আস্‌বাবপত্রের সাহায্য অতি সামান্যই পাওয়া যাবে ; এখানে চিত্রের সাফল্য নির্ভর করবে অভিনেতার রূপসজ্জা ও নাট-নৈপুণ্যের উপরই সব চেয়ে বেশী ! তাদের সেই রূপসজ্জা ও অভিনয়-কৌশলকে সুসম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোলাই—হওয়া উচিত তখন আলোক-চিত্রকরের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য। এটা নিপুণতার সঙ্গে নিষ্পন্ন হতে পারে প্রধানতঃ ছবিখানিতে প্রয়োজনমত আলো-ছায়ার পরিবেষণ পটুতায়। আসবাব-পত্রের সাহায্যও কিছু কিছু নেওয়া যেতে পারে, যদি সে আলোক-চিত্র-শিল্পী তার ব্যবহার সম্বন্ধে সুদক্ষ হ'ন। একখানি ইজিচেয়ার, একটি নস্যদান কিম্বা গড়গড়া, অত্যন্ত সাদাসিধা একটি শয্যা একধারে, খানকয়েক মোটা মোটা দর্শন-শাস্ত্রের বই, একটি উজ্জ্বল আলোকাধার, একটি এলার্ম ঘড়ী, একটি ছোট্ট ষ্ট্যাণ্ড্, চায়ের পেয়ালা পিরিচ, খাতা কলম কাগজ ও একটি 'লাল-নীল' পেন্সিল —এই আস্‌বাব-পত্রগুলি দার্শনিকের ঘরে হয়ত' রাখা যেতে পারে ; কিন্তু, শুধু ওগুলো রাখলেই তো হবে না, ওগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে যাতে দার্শনিকের ঘরখানি কেবল মানিয়ে যাওয়াই নয়, লোকটিকে দেখলেই বোঝা যাবে যে আমরা একজন দার্শনিকের সাক্ষাৎ পেলুম! ওই সব আসবাবপত্রের যথাযোগ্য সমাবেশে এমন একটা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন গড়ে উঠবে সেই ঘরের মধ্যে, যে, সে ছবি দেখ্‌বামাত্র

দর্শকদের মনে একটা দার্শনিকতার আবহ এসে ছোঁয়া দেবে! সেইখানেই দৃশ্য-রচন-কৌশলের সার্থকতা এবং আলোক-চিত্রকরের কৃতিত্ব।

বহির্দৃশ্যের (Exterior Scene) সংরচনে প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পীর প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করে। তরু, লতা,



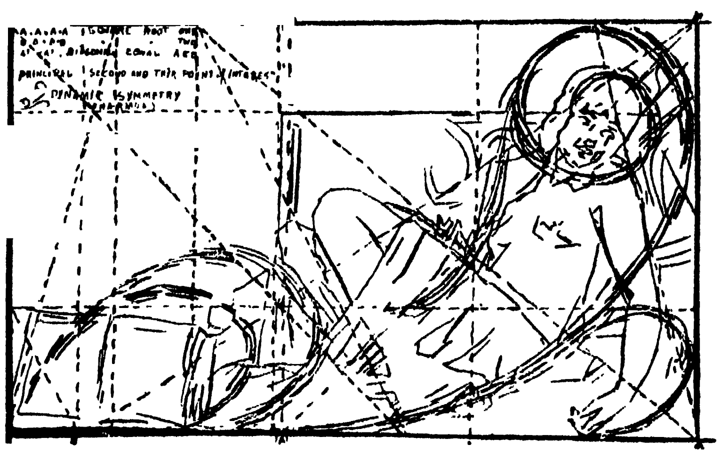


গতির অনুকূল রেখা ও সামঞ্জস্য ক্ষেত্রের নক্সা—গতির অনুকূল রেখা I or X. প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ স্থল II or Y. দ্বিতীয় আকর্ষণ স্থল III or Z. তৃতীয় আকর্ষণ স্থল

নদী, গিরি, মরু, প্রান্তর, ঘনবন, জীর্ণগৃহ, প্রাসাদ, তোরণ, কুটীর-প্রাঙ্গণ এসব ত' আছেই, তা' ছাড়া কৃত্রিম ফল-ফুলের গাছ, শিক্ষিত জীবজন্তু ও পশুপক্ষী, কৃত্রিম পাহাড় ও হ্রদ প্রভৃতি অনেক কিছুর সাহায্য নিতে পারা যায়। এর উপর আবার ক্যামেরার নানারকম কারচুপিও তিনি কাজে লাগাতে পারেন। কৃত্রিম আলোক-পাতের সুযোগও তাঁর থাকে।

পরিচালক নটনটীকে কোন্ দৃশ্যে কী করতে হবে এবং কী বলতে হবে যখন ব'লে দেন, তখন আলোক-চিত্রকর সেটি ভালো ক'রে শুনে নিয়ে সেই দৃশ্যটি সংরচনের ভার নেন, কারণ, এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে আলোক-চিত্রকরের উপরই নির্ভর করে। অভিনেতৃরা অভিনয় ক'রছেন, পরিচালক মহাশয় তাঁদের গতিবিধি ও ভাবাভিব্যক্তি দূর থেকে নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্ছেন, কিন্তু, তাঁদের সে গতিবিধির ও ভাবভঙ্গীর ছবি এঁকে নিচ্ছে কে? চলচ্চিত্রের প্রকৃত শিল্পী কে?—তুলি ও রংয়ের পরিবর্ত্তে ছায়াধর যন্ত্রের সাহায্যে আলোক-চিত্রকরই সে ছবি তুলে নেয়! সেই এ-কাজের একমাত্র 'সুপটু পটুয়া!' সুতরাং, শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ অঙ্গের চলচ্ছবি তোলবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যে প্রতিভাবান পরিচালক, তাঁকে সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করতে হবে এমন একজন আলোক-চিত্রকর যার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ শিল্প-জ্ঞান ও কলারস-বোধ আছে।

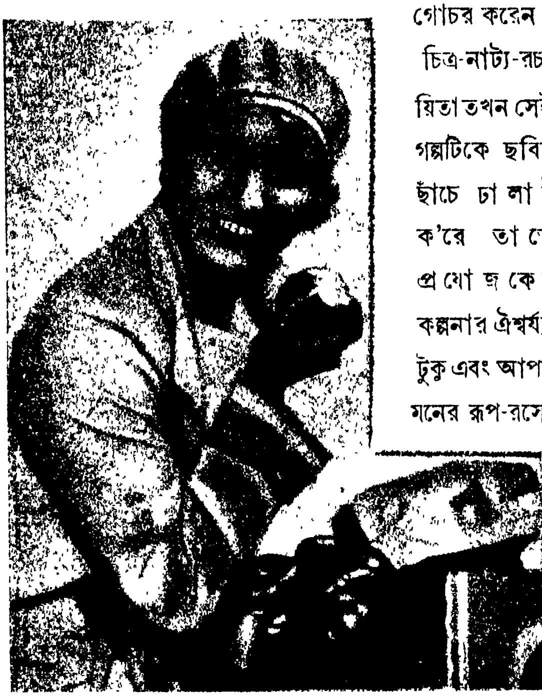
প্রথমে লেখক তার সাধ্যমত একটি উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করে আনেন, প্রযোজক সেই গল্পটি প'ড়ে দেখে যদি বোঝেন যে—হ্যাঁ, ছবিতে এ গল্পটি খুব ভালোই ফুটবে এবং এর মধ্যে দর্শক আকর্ষণের মালমশলাও যথেষ্ট পরিমাণে



নক্সায় তোলা 'জ্ঞানদেবীর' চিত্র

আছে, সুতরাং লাভবান হবার সম্ভাবনাও বর্ত্তমান, তখন তিনি সে গল্পটির সর্ব্বসত্ব কিনে নেন। তারপর, তিনি আবার সে গল্পটিকে নাট্যরূপ দেবার জন্য বেতনভোগী

চিত্রনাট্য রচয়িতার কাছে উপস্থিত করেন এবং সেই সঙ্গে ছবিখানির সম্বন্ধে তিনি যা যা ভেবেছেন এবং তাঁর মাথায় যে সব কল্পনা এসেছে তাও সেই চিত্র নাট্য-রচয়িতার গোচর করেন। চিত্র-নাট্য-রচয়িতা তখন সেই গল্পটিকে ছবির ছাঁচে ঢালাই ক'রে তাতে প্রযোজকের কল্পনার ঐশ্বর্য্যটুকু এবং আপন মনের রূপ-রসের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে দেন। তার পর সেটি গিয়ে পৌঁছয় পরিচালকের হাতে। পরিচালক আবার তার মধ্যে নিজের প্রতিভা-স্ফুরিত ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ বহু বৈচিত্র্য সন্নিবিষ্ট ক'রে সেখানিকে একটি সুসম্পূর্ণ চিত্র ক'রে তোলেন। অর্থাৎ, প্রকৃত পক্ষে সে গল্পটি হ'য়ে ওঠে তখন শুধু অসংখ্য ধারাবাহিক চিত্রের নক্সা—যা' সর্ব্বশেষে আলোক-চিত্রকর তাঁর ক্যামেরায় গেঁথে তোলেন। কিন্তু, তার আগে পরিচালক সেই চিত্র-নাট্যের ভূমিকা নির্ব্বাচন ক'রে তাঁর অধীনস্থ নটনটীদের মধ্যে যথাযোগ্য লোককে তা' বিতরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে গল্প লেখক, প্রযোজক, চিত্র-নাট্যকার ও তাঁর নিজের ঐক্যমতের উপযোগী দৃশ্যপটের পরিকল্পনা আঁকবার ভার দেন শিল্পীর উপর। নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত নটনটীরা ইতিমধ্যে তাদের অভিনেয় চরিত্রগুলির ধ্যান ধারণা এবং প্রত্যেক চরিত্রটি পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য অভিনয় ও রূপসজ্জার কি উৎকর্ষ সাধন করা যেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা ক'রতে থাকেন। তারপর ডাক পড়ে আলোক-চিত্রকরের!



আপেল খাওয়া (দর্শকের দৃষ্টি 'দন্তরুচি কৌমুদীর' প্রতি আকৃষ্ট)

অতএব দেখা যাচ্ছে যিনি ক্যামেরার পিছনে আছেন শেষরক্ষার ভার ও দায়িত্ব সবটাই তাঁর! তিনি গল্প পেলেন—গল্পের ভিতর গল্প লেখকের কল্পিত ছবি পেলেন, প্রযোজকের নিকট দর্শক আকর্ষণোপযোগী 'প্যাঁচের' সন্ধান পেলেন, চিত্র-নাট্যকারের রচিত ছায়ালিপিতে তিনি চিত্র বিবৃতি বা চিত্র-পরিচয় পেলেন, পরিচালকের পরিকল্পনায় সে ছবি যে "রূপ" নেবে তারও প্রতিচ্ছবি ও দৃশ্যপট প্রভৃতি পেলেন এবং অভিনেতৃবর্গের মানসপটে আঁকা চরিত্র-চিত্রগুলিও পেলেন। এখন, এই এতগুলি মনের কল্পিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা; তাদের ধ্যানের ছবিকে সজীব ও প্রত্যক্ষ ক'রে তোলার কঠিন কার্য্যভার গিয়ে পড়ে চলচ্চিত্রের আলোক-চিত্রকরের উপর। তিনি যদি যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর এই



বন-ভোজন (দৃশ্যরচন কৌশলের গুণে তৈজস্ পত্রগুলি রাখার মধ্যে একটি শোভন সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে)

কঠিন কার্য্যভার সুসম্পন্ন ক'রতে না পারেন তাহ'লে সেই গল্প-লেখক থেকে সুরু ক'রে প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, কারুশিল্পী (Art Director) ও নট-নটীগণ সকলেরই সমবেত চেষ্টা উদ্যম ও পরিশ্রম একেবারে পণ্ড হ'য়ে যাবে। সুতরাং চলচ্ছবিতে আলোক-চিত্রকরের দায়িত্ব সবচেয়ে গুরুতর। বিশেষ, আবার যে আধারে বা প্রচ্ছদের উপর তাঁর পটের ভিত্তি নির্ভর করে তার পরিমাপ মাত্র ¾″×১″ ইঞ্চি। এই ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেই তাঁকে শিশির বিন্দুতে আকাশ ধরার মতো চলচ্ছবির প্রত্যেক দৃশ্যটি তুলে নিতে হবে। কাজেই, তাঁর অসুবিধাও খুব; এবং সবচেয়ে মুস্কিল সেই ছবি যখন পৃথিবীর নানাদেশের ছবি-ঘরে অসংখ্য দর্শকদের চোখের সামনে ধরা হবে তখন সেই ক্ষুদ্র ছবিকে "প্রদর্শক যন্ত্রের" সাহায্যে প্রায় ষোলো হাজার গুণ বড়ো ক'রে দেখানো হবে! এই বিস্তৃতির সঙ্গে ছবির প্রত্যেক খুঁটিনাটির তাল মানের (Proportion) যে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটে, চলচ্চিত্র শিল্পীকে প্রতি পদে সে কথা স্মরণ রেখে সেই হিসাবের সঙ্গে অনুপাতে ছবি তুলতে হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি দৃশ্যরচন কৌশলের একাধিক রকম পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বজনপ্রিয় পদ্ধতি হ'চ্চে 'ডাইন্যামিক্ সিমেট্রী' অর্থাৎ গতির অনুকূল সামঞ্জস্য বিধান। (Dynamic Symmetry) জে হ্যাম্বিজ্ (Jay Hambidge) এই বিষয় নিয়ে একখানি বেশ সুচিন্তিত গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। চিত্র নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা এ বইখানি পড়লে ছবিকে এই দৃশ্য-রচন-কৌশল বা composition যে কতখানি সুন্দর ও সুদৃশ্য অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক ও নয়নাভিরাম করে তোলে—এক কথায় সুসম্পূর্ণ করে তোলে—তা' জেনে বিস্মিত এবং প্রভূত উপকৃত হবেন।

'ডাইন্যামিক সিমেট্রী' ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—একটা কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমিত ক্ষেত্রের উপর প্রথমত কয়েকটি গতির অনুকূল রেখা (ডাইন্যামিক্ লাইন) টেনে দৃশ্য রচনের একটা নক্সা ছ'কে নেওয়া এবং সেই ছকের মধ্যে চিত্রেয় বিষয় বস্তুকে ঠিক মানিয়ে সাজানো! তুলি ও রং নিয়ে যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁরা এই নক্সা আগে ছ'কে নিয়ে তবে সে কাগজে বা ক্যানভাসে হাত দেন, চলচ্চিত্র-শিল্পীর সে সুযোগ নেই; তাঁকে নিজের মানস পটে এই

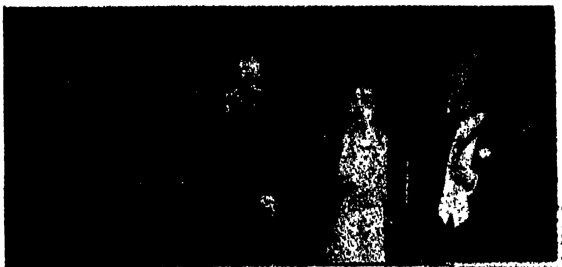


আরাম ও উদ্বেগ! (সরল ও ঋজু রেখার অনুসরণে দৃশ্য-রচন-কৌশলের গুণে কুকুরটির মধ্যে আরাম মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে, এবং উদ্ধত মানুষটি তা' থেকে বঞ্চিত!)

নক্সা ছ'কে রাখতে হয়। কেউ কেউ অবশ্য ক্যামেরার পিছনে যে ঘসা কাঁচের পর্দাখানি থাকে ছবির লক্ষ্য স্থির করবার জন্য, তারই উপর পেন্সিল দিয়ে ডাইন্যামিক্ লাইনের বা গতির অনুকূল রেখার ঘর দেগে রেখে দেন। তাতে

ছবির দৃশ্য-রচন কাজে আলোক-চিত্রকরের অনেকটা সুবিধা হয়।

'গতির অনুকূল রেখা' ব'ললে কী বোঝায় হয় ত' অনেকে তা ঠিক অনুধাবন ক'রতে পারবেন না! কিন্তু, শিল্পীরা এর রহস্য জানেন। যেমন,—ঋজু-রেখা (Vertical line) ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার এবং উচ্চ পদমর্য্যাদার গাম্ভীর্য্য দ্যোতক! শায়িত-রেখা (Horjzontal line) ঔদাস্য, বিনয় এবং অবসাদ ও আরাম-ব্যঞ্জক! কোণা-কোণি রেখা (Diagonal line) বিরক্তি, ক্রোধ, উৎসাহ ও কার্য্য-তৎপরতা প্রভৃতির পরিচায়ক!



কোণা-কোণি রেখায় চিত্রের ঘটনা সমাবেশ (বাম দিক থেকে দক্ষিণে উপর কোণ থেকে নিচের কোণ)



কোণা কোণি রেখায় চিত্রের ঘটনা সমাবেশ (দক্ষিণ দিক থেকে বামে—উপর কোণ থেকে নীচের কোণ)

একই ছবি কেবলমাত্র দৃশ্য-রচন কৌশলের গুণে কিরূপ বিভিন্ন অর্থ সূচিত ক'রে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে এই প্রবন্ধ সংলগ্ন চিত্রগুলি থেকে। হোলি উডের যশস্বী শিল্পী শ্রীযুক্ত হেনরী গুড (Henry Goode) এই ছবিগুলি "আমেরিক্যান সোসাইটী অফ্ সিনামেটে গ্রাফার্স্' সমিতিকে উপহার দিয়েছেন। এই ছবিগুলিতে তিনি 'গতির অনুকূল সামঞ্জস্য সাধন পদ্ধতি' (System of Dynamic Symmetry) অনুসারে চলচ্চিত্রের দৃশ্য-রচন-কৌশল প্রদর্শন করেছেন। প্রথম চিত্রে সজ্জিত তৈজসপত্রগুলির মধ্যে একটা বেশ সুরের ঐক্য লক্ষ্যগোচর হয় কিন্তু দ্বিতীয় ছবিতে সেই জিনিসগুলিই সাজাবার দোষে নেহাৎ, যেন বেসুরো বেতালা লাগে! দৃশ্য-রচন কৌশলের গুণে একইছবিতে কেমন সুন্দর ভাবে 'Harmony' এবং কিরূপ সুস্পষ্ট 'discord' ফুটিয়ে তোলা যায়; এর চেয়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কিছু হ'তে পারে না। এই দৃশ্য-রচন-কৌশলের গুণেই আবার একই ছবিতে দর্শকের দৃষ্টি শিল্পীর ইচ্ছা মতো বিশেষ কোনো একটি অংশের উপর কী ভাবে আকৃষ্ট ও নিবদ্ধ করা যায়, সে উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন তিনি 'জ্ঞানদেবীর দু'খানি পরের পর ছবিতে। তার পরের দুইখানি ছবিতে 'কাল ও দীপশিখার পরিকল্পনায় সেই গতির অনুকূল সামঞ্জস্য সাধন পদ্ধতি' অনুসারেই আঁকা একই চিত্রে তিনি দৃশ্য-রচন-কৌশলের গুণে দর্শকের দৃষ্টিতে একবার মানুষটীর উপর টেনে নিয়ে গেছেন, একবার তার 'বই'খানির উপর টেনে নিয়ে গেছেন। অথচ এই দুখানি ছবির মধ্যে আঁকার দিক দিয়ে পার্থক্য এত যৎসামান্য যে, অভিজ্ঞের প্রখর দৃষ্টি ভিন্ন তা' ধরা পড়ে না। কেবলমাত্র আলো ছায়ার ঈষৎ তারতম্য ঘটিয়ে একই ছবির মধ্যে মানুষটির বামহস্তের তর্জ্জনীটির অবস্থান একটু বদলে এই যে বিভেদ সৃষ্টি করা হ'য়েছে—দৃশ্য-রচন কৌশলের এও একটা প্রধান দিক। একটিমাত্র আঙুলের একটু এদিক ওদিক হ'য়ে গেলেই দর্শকের দৃষ্টির গতি যখন ফিরে যায়, তখন এ কথা আর বেশী ক'রে বলাই বাহুল্য যে, দৃশ্য-রচন কৌশলের উপর ছবির সাফল্য নির্ভর করে কতখানি। মোটের উপর চলচ্চিত্র-শিল্পীরও এ-কথা ভুলে গেলে চলবেনা যে শিল্প-সাধনায় composition বা দৃশ্য-রচন-কৌশল আয়ত্ত রাখা কলাজ্ঞানের সম্যক্ পরিচায়ক।



সাময়িকী

অবরোধ ও কারাদণ্ড—

মহাত্মা গান্ধী, প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক ভদ্রলোককে নূতন অর্ডিনান্স অনুসারে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। এলাহাবাদের এলাকা হইতে বাহিরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড এবং ঐ অপরাধে মিঃ শেরওয়ানীর ছয়মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের যথাক্রমে পাঁচশত ও দেড়শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে, অর্থ অনাদায়ে তাঁহাদের যথাক্রমে আরও ছয়মাস ও তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আরও চারিটী অর্ডিনান্স—

আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতীকারকল্পে বিগত ৪ঠা জানুয়ারী বড়লাট চারিটি অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অর্ডিন্যান্স চারিটির নাম :—(১) জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক (এমারজেন্সি পাওয়ার) অর্ডিন্যান্স, (২) বে-আইনী প্ররোচনা বিষয়ক (আন-ল-ফুল ইনষ্টিগেসন) অর্ডিন্যান্স, (৩) বে-আইনী সমিতি বিষয়ক (আন-ল-ফুল এসোসিয়েসন) অর্ডিন্যান্স এবং (৪) উৎপীড়ন ও বয়কট নিবারণ বিষয়ক (প্রিভেনসন অব মোলেষ্টেশন এণ্ড বয়কটিং) অর্ডিন্যান্স।

জরুরি ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স—

এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং তাহার কর্ম্মচারীদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া। তদনুসারে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শান্তি ক্ষুণ্ণকারী সকল রকম কার্য্য এই অর্ডিন্যান্সের মধ্যে পড়িয়াছে। তার পর এই অর্ডিন্যান্স-বলে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য পুরাতন প্রেস অর্ডিন্যান্সটি পুনরায় বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অবিলম্বে বোম্বাই ও বাঙ্গালাতে প্রবর্ত্তিত করা হইবে। এই অর্ডিন্যান্সে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে দমন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এই সন্দিগ্ধ ব্যক্তি বলিতে শুধু যে যাহারা জনসাধারণের নিরাপত্তা কিম্বা শান্তি নষ্ট করার কার্য্য করে তাহাদিগকেই বুঝায় তাহা নহে; পরন্তু যাহারা জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শান্তি নষ্টকারী কোন আন্দোলনের প্রসারকল্পে কাজ করে তাহারাও ইহার মধ্যে পড়ে।

বে-আইনী প্ররোচনা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স—

যুক্তপ্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে—এই অর্ডিন্যান্সও সেইরূপ। ইহা অবিলম্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে প্রবর্ত্তিত করা হইবে।

বে-আইনী সমিতি বিষয়ক অর্ডিন্যান্স—

উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে যে অর্ডিন্যান্সটি জারী করা হইয়াছে এই অর্ডিন্যান্সটিও সেইরূপ। ইহা অবিলম্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স বলে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে-কোন সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

উৎপীড়ন ও বয়কট বিষয়ক অর্ডিন্যান্স—

এই অর্ডিন্যান্স সমগ্র বৃটিশ ভারতে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে; তবে ইহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্মেণ্টকে তাহা সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। এই অর্ডিন্যান্সটি পুরাতন অর্ডিন্যান্সেরই অনুরূপ। তবে ইহাতে উৎপীড়নের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শান্তিপূর্ণ পিকেটিংও অপরাধ বলিয়া গণ্য।

প্রতিষ্ঠান বে-আইনী—

সপারিষদ গবর্ণর ১৯৩২ সালের ৪নং অর্ডিন্যান্স অর্থাৎ বে-আইনী সমিতি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কলিকাতার ৪৪টী প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নিম্নে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির নাম দেওয়া হইল।

রাজপুত নবযুবক দল, ১-১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট

হিন্দুস্থান তরুণ মণ্ডল „ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট
যতীন্দ্র স্মৃতি মন্দির ৪৮ চক্ররোড সাউথ
হিন্দুস্থানী সেবাদল ১২০ হ্যারিসন রোড
জমাদার্স ইউনিয়ন ৬ ওল্ড চায়না বাজার ষ্ট্রীট
লেগুর পিকেটিং বোর্ড পি ২৬৪ প্রতাপাদিত্য রোড
পিকেটিং বোর্ড ৮৩ লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা
বড়বাজার কংগ্রেস কমিটী ১নং
৮৩ লোয়ার চিৎপুর রোড
ঐ ২নং ১২৬ ১৬৪ হ্যারিসন রোড
পাঞ্জাব ইউথলীগ ৫।১ বেণ্ডারডাইন লেন
উত্তর কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতি ৯৬ রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীট
মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী ১নং
১৮নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
ঐ ২ ১৬২ শাখারীটোলা লেন
দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী
৭২এ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড
নারী সত্যাগ্রহ সমিতি ১নং এণ্টনিবাগান লেন
নিখিল বঙ্গ জাতীয় নারী সঙ্ঘ ২৪ বিডন ষ্ট্রীট
গুজরাটী মহিলা সঙ্ঘ ১৫০ লোয়ার চিৎপুর রোড
মহিলা উত্থান সঙ্ঘ ওরফে রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতি
২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
সিমলা ব্যায়াম সমিতি, কালিসিংহ পার্ক
বালিয়া ধাত্রী মণ্ডল ১০৮ কটন ষ্ট্রীট
২নং ঐ ১ জগন্নাথ ঘাট রোড
বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সঙ্ঘ ১০ আপার চিৎপুর রোড
বিদেশী বস্ত্র বহিস্কার সমিতি, ১৫৬ হ্যারিসন রোড
বেঙ্গল ইয়ুথ লীগ ১৪ শাখারীটোলা লেন
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ৪৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

জোড়াবাগান	„		৬৭।২৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড
১নং ওয়ার্ড	„		৪৪ বাগবাজার ষ্ট্রীট
৩নং	„	„	৯৬ রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীট
৫নং	„	„	১৭২ হ্যারিসন রোড
৬নং	„	„	২৬।১বি বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট
৭নং	„	„	১৬০ হ্যারিসন রোড
৮নং	„	„	১২ গোপালচন্দ্র লেন,
৯নং	„	„	২০ পটুয়াটোলা লেন
১০নং	„	„	২৭ মলোঙ্গা লেন
১১নং	„	„	১২ শাঁখারীটোলা লেন
১৯নং	„	„	৩৮৩ পাটারী রোড
২২নং	„	„	৩১ হালদারপাড়া রোড
২৩নং	„	„	৬৫ চেতলা রোড
২৪নং	„	„	৯২ ডায়মণ্ডহার্ব্বার রোড
২৫নং	„	„	মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট
২৭নং	„	„	১০৯।২ লেক রোড
২৯নং	„	„	১০বি মাণিকতলা মেন রোড।
৩০নং	„	„	২৫নং পাইকপাড়া রোড
৩১নং	„	„	১৯ উমাকান্ত সেন লেন

উত্তর কলিকাতা ইয়ুথ লীগ ১৫ রাজাবাগান জংসন রোড
দক্ষিণ কলিকাতা ইয়ুথ লীগ পি ২৬৪ প্রতাপাদিত্য রোড

কলিকাতায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী—

শুক্রবার (৯ই পৌষ)

৯ই পৌষ শুক্রবার টাউনহলে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়। কলিকাতার মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবে ত্রিপুরার মহারাজা প্রদর্শনী ও মেলা উদ্বোধন করেন। ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীযুক্ত বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর অভিভাষণে ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা রাজ-পরিবারের কলা-সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার প্রশংসা করিয়া বলেন—"আমি রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।"

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতা করিয়া বলেন—

"জয়ন্তী উৎসব হইতে আমি আজ পর্য্যন্ত নিজেকে ইচ্ছা করিয়াই দূরে রাখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ যখন শুনিলাম যে, উৎসবের উদ্যোক্তারা বর্ত্তমান ত্রিপুরাধিপতিকে দিয়া এই শিল্প মেলার দ্বারোদ্‌ঘাটনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যথাযোগ্য কাজই করিয়াছেন। আজিকার দিনে আমি আশীর্ব্বাদ ও কামনা করি যে আমার কল্যাণীয় বর্ত্তমান মহারাজার রাজ্য সাহিত্যে শিল্পে শক্তিতে সুন্দর ও মহান হইয়া উঠুক।"

বেলা ১টায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন।

আমরা নিম্নে প্রথম দিনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণের শেষ অংশ উদ্ধৃত রিয়া দিলাম।

"তার পরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ, বীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত চ্ছে। ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর একটা নূতন আলো সে যেন চোখে প'ড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ নন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবো না। কোনো চু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে জের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায় র পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল হিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। নেক প'ড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য । ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্যে দিয়ে যিনি বড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন তাঁকে জ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায় ?

"এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনো দিন খেচি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে ন্দ্র ক'রে যে নবীন বাঙ্‌লা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে র উঠলো, আমি তার কোনো খবরই জানিনে। কবির কোনোদিন ঘনিষ্ঠ হ'বারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর ছ ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, মি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন ; এইটা হলো বাইরের , কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে ার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই।—কাব্য ও ত্য ; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার ক'রে প'ড়েছি, ক তার ছন্দ, ক'টা তার অক্ষর, কা'কে বলে Art, তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনো ক্রটী ছ কিনা,—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি— ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের রে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর আর কিছু হ'তেই পারেনা। কি কাব্যে, কি কথা ত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

"একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ— শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু অকালে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হোলো না। আর কোথাও না হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।"

শনিবার (১০ই পৌষ)

বেলা ১১টায় টাউনহলে স্যর রাধাকৃষ্ণের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এদিন ইংরাজীতেই সভার কার্য্য হয়। অভিভাষণে স্যর রাধাকৃষ্ণ বলেন—

"অন্তর্জ্জীবনের তপস্যার আবশ্যকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যে বিশেষরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি সত্যিকারের শিল্পীর ন্যায় গভীর আত্মোপলব্ধির ভিতর হইতে এই সত্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে সেই অমৃতের স্পর্শ এবং তাঁহার সেই বিরাট মনের পরিচয় পাওয়া যায় যাহা পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে—যাহার মধ্য দিয়া গভীরতর সত্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। এই পৃথিবী একটা গোলকধাঁধা কিম্বা মায়ালোক নয় যে আমাদিগকে ইহা পরিহার করিয়া চলিতে হইবে ; ইহা পূর্ণতা লাভের যাত্রাপথ মাত্র। তাঁহার 'রাজর্ষি' নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন, একটি ক্ষুদ্র বালিকা রাজর্ষিকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছে যে, জাগতিক প্রেম ও ভালবাসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই পূর্ণতা লাভ করা যায় না—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।'

"রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, তাই সামাজিক বিধি-নিয়মের নামে মানুষের উপর মানুষ যে সব অন্যায় ও অবিচার করে তিনি তাহার ঘোর বিরোধী। তিনি মনে করেন, বিধি-নিয়ম অপেক্ষা জীবন উন্নততর ; সঙ্গতি অপেক্ষা সৌন্দর্য্য বৃহত্তর এবং সামঞ্জস্য অপেক্ষা সত্য শ্রেষ্ঠতর।

"আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরতা, শুধু শুধু ত্যাগের ব্যর্থতা এবং প্রেম ও সহমর্ম্মিতার বাস্তব উৎকর্ষ সাধন— এই তিনটি মূল কথা কবি তাঁহার সকল গ্রন্থের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সমগ্রতাই তাঁহার আদর্শ—জীবনকে তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া দেখেন নাই ; জীবন ও

হিন্দুস্থান তরুণ মণ্ডল „ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট
যতীন্দ্র স্মৃতি মন্দির ৪৮ চক্ররোড সাউথ
হিন্দুস্থানী সেবাদল ১২০ হ্যারিসন রোড
জমাদার্স ইউনিয়ন ৬ ওল্ড চায়না বাজার ষ্ট্রীট
লেগুর পিকেটিং বোর্ড পি ২৬৪ প্রতাপাদিত্য রোড
পিকেটিং বোর্ড ৮৩ লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা
বড়বাজার কংগ্রেস কমিটী ১নং
৮৩ লোয়ার চিৎপুর রোড
ঐ ২নং ১২৬ ১৬৪ হ্যারিসন রোড
পাঞ্জাব ইউথলীগ ৫।১ বেণ্ডারডাইন লেন
উত্তর কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতি ৯৬ রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীট
মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী ১নং
১৮নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
ঐ ২ ১৬ং শাখারীটোলা লেন
দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী
৭২এ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড
নারী সত্যাগ্রহ সমিতি ১নং এণ্টনিবাগান লেন
নিখিল বঙ্গ জাতীয় নারী সঙ্ঘ ২৪ বিডন ষ্ট্রীট
গুজরাটী মহিলা সঙ্ঘ ১৫০ লোয়ার চিৎপুর রোড
মহিলা উত্থান সঙ্ঘ ওরফে রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতি
২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
সিমলা ব্যায়াম সমিতি, কালিসিংহ পার্ক
বালিয়া ধাত্রী মণ্ডল ১০৮ কটন ষ্ট্রীট
২নং ঐ ১ জগন্নাথ ঘাট রোড
বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সঙ্ঘ ১০ আপার চিৎপুর রোড
বিদেশী বস্ত্র বহিস্কার সমিতি, ১৫৬ হ্যারিসন রোড
বেঙ্গল ইয়ুথ লীগ ১৪ শাখারীটোলা লেন
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ৪৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

জোড়াবাগান	„		৬৭।২৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড
১নং ওয়ার্ড	„		৪৪ বাগবাজার ষ্ট্রীট
৩নং	„	„	৯৬ রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীট
৫নং	„	„	১৭২ হ্যারিসন রোড
৬নং	„	„	২৬।১বি বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট
৭নং	„	„	১৬০ হ্যারিসন রোড
৮নং	„	„	১২ গোপালচন্দ্র লেন,
৯নং	„	„	২০ পটুয়াটোলা লেন
১০নং	„	„	২৭ মলোঙ্গা লেন
১১নং	„	„	১২ শাঁখারীটোলা লেন
১৯নং	„	„	৩৮৩ পাটারী রোড
২২নং	„	„	৩১ হালদারপাড়া রোড
২৩নং	„	„	৬৫ চেতলা রোড
২৪নং	„	„	৯২ ডায়মণ্ডহার্ব্বার রোড
২৫নং	„	„	মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট
২৭নং	„	„	১০৯।২ লেক রোড
২৯নং	„	„	১০বি মাণিকতলা মেন রোড।
৩০নং	„	„	২৫নং পাইকপাড়া রোড
৩১নং	„	„	১৯ উমাকান্ত সেন লেন

উত্তর কলিকাতা ইয়ুথ লীগ ১৫ রাজাবাগান জংসন রোড
দক্ষিণ কলিকাতা ইয়ুথ লীগ পি ২৬৪ প্রতাপাদিত্য রোড

কলিকাতায় রবীন্দ্র জয়ন্তী—

শুক্রবার (৯ই পৌষ)

৯ই পৌষ শুক্রবার টাউনহলে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়। কলিকাতার মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবে ত্রিপুরার মহারাজা প্রদর্শনী ও মেলা উদ্বোধন করেন। ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীযুক্ত বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুর অভিভাষণে ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা রাজ-পরিবারের কলা-সৌন্দর্য্য প্রিয়তার প্রশংসা করিয়া বলেন—"আমি রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।"

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতা করিয়া বলেন—

"জয়ন্তী উৎসব হইতে আমি আজ পর্য্যন্ত নিজেকে ইচ্ছা করিয়াই দূরে রাখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ যখন শুনিলাম যে, উৎসবের উদ্যোক্তারা বর্ত্তমান ত্রিপুরাধিপতিকে দিয়া এই শিল্প মেলার দ্বারোদ্‌ঘাটনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যথাযোগ্য কাজই করিয়াছেন। আজিকার দিনে আমি আশীর্ব্বাদ ও কামনা করি যে আমার কল্যাণীয় বর্ত্তমান মহারাজার রাজ্য সাহিত্যে শিল্পে শক্তিতে সুন্দর ও মহান হইয়া উঠুক।"

বেলা ১টায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন।

আমরা নিম্নে প্রথম দিনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণের শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তার পরে এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'চ্চে। ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে প'ড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলবো না। কোনো কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায় এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক প'ড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্যে দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

"এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনো দিন লিখেচি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে যে নবীন বাঙ্‌লা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো, আমি তার কোনো খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনোদিন ঘনিষ্ঠ হ'বারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই।—কাব্য ও সাহিত্য; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার ক'রে প'ড়েছি,—কি তার ছন্দ, ক'টা তার অক্ষর, কা'কে বলে Art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনো ত্রুটী ঘটেছে কিনা,—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হ'তেই পারেনা। কি কাব্যে, কি কথা সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

"একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবায় ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু অকালে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হোলো না। আর কোথাও না হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।"

শনিবার (১০ই পৌষ)

বেলা ১১টায় টাউনহলে স্যর রাধাকৃষ্ণের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এদিন ইংরাজীতেই সভার কার্য্য হয়। অভিভাষণে স্যর রাধাকৃষ্ণ বলেন—

"অন্তর্জ্জীবনের তপস্যার আবশ্যকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যে বিশেষরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি সত্যিকারের শিল্পীর ন্যায় গভীর আত্মোপলব্ধির ভিতর হইতে এই সত্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে সেই অমৃতের স্পর্শ এবং তাঁহার সেই বিরাট মনের পরিচয় পাওয়া যায় যাহা পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে—যাহার মধ্য দিয়া গভীরতর সত্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। এই পৃথিবী একটা গোলকধাঁধা কিম্বা মায়ালোক নয় যে আমাদিগকে ইহা পরিহার করিয়া চলিতে হইবে; ইহা পূর্ণতা লাভের যাত্রাপথ মাত্র। তাঁহার 'রাজর্ষি' নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন, একটি ক্ষুদ্র বালিকা রাজর্ষিকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছে যে, জাগতিক প্রেম ও ভালবাসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই পূর্ণতা লাভ করা যায় না—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।'

"রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, তাই সামাজিক বিধি-নিয়মের নামে মানুষের উপর মানুষ যে সব অন্যায় ও অবিচার করে তিনি তাহার ঘোর বিরোধী। তিনি মনে করেন, বিধি-নিয়ম অপেক্ষা জীবন উন্নততর; সঙ্গতি অপেক্ষা সৌন্দর্য্য বৃহত্তর এবং সামঞ্জস্য অপেক্ষা সত্য শ্রেষ্ঠতর।

"আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তরতা, শুধু শুধু ত্যাগের ব্যর্থতা এবং প্রেম ও সহধর্ম্মিতার বাস্তব উৎকর্ষ সাধন—এই তিনটি মূল কথা কবি তাঁহার সকল গ্রন্থের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সমগ্রতাই তাঁহার আদর্শ—জীবনকে তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া দেখেন নাই; জীবন ও

মনের সহজ স্বচ্ছন্দ গতিকে তিনি বিসর্জ্জন দেন নাই, উহা তাঁহার নিকট পূর্ণ সত্যলাভের সোপান স্বরূপ।"

স্যর সি, ভি, রমণ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডাঃ হাসান সারওয়ার্দ্দি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শাহীদুল্লা ও অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে রায় বাহাদুর এন, কে, সেন, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডাঃ রাধামুকুদ মুখোপাধ্যায়, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক অমরনাথ ঝাঁ কবিবরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ইহার পর রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ডাঃ আকুহার্ট, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির প্রবন্ধ পঠিত হয়।

রবিবার (১১ই পৌষ)—

এই দিন অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটায় টাউন হলের সম্মুখস্থ রাজপথের উপর প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সম্মুখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশ্বকবিকে অভিনন্দন ও অর্ঘ্য প্রদান করেন। সেদিনের দৃশ্য অনির্ব্বচনীয়। সর্ব্বপ্রথমে—

কলিকাতা পৌর-সভার অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের করকমলে—

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবি-প্রতিভা সমগ্র সভ্যজগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিতুল্য জনকের ধর্ম্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্ম্মক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে, শিষ্টাচার ও সদালাপে সমগ্র সজ্জনসমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন—তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জনসমাজের সমাদর লাভ করিয়া তুমি কলিকাতা-বাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গ-ভাষাকে অপূর্ব্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনাপ্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙ্গলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে, এবং তোমার লেখনীনিঃসৃত অমৃতধারা বাঙ্গালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞান-গুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। বন্দে মাতরম্।

তোমার গুণগর্ব্বিত

কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যবৃন্দের পক্ষে

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়—মেয়র

কবির উত্তর

একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজমহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্যই কবিকে সমাদর করিতেন—জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবি-কীর্ত্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণিজন অখ্যাত—রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবিসংবর্দ্ধনার ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত করিল না, অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে আরোগ্যে আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক, ইহার প্রবর্ত্তনীয় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্ব্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন করিয়া দিক,—পুরবাসীদের দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভ বুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক এই আমি কামনা করি।

তাহার পর বিশ্ব-ভারতীর পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অর্ঘ্য দান করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অভিনন্দন

রবীন্দ্র-প্রশস্তি

হে কবীন্দ্র, বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী-দিগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভবদীয় সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে, সাদরে ও সগৌরবে আপনাকে বরণ করিতেছে।

কিশোর বয়সেই আপনি বঙ্গবাণীর অর্চ্চনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তদবধি ব্রতধারী তপস্বীর ন্যায়, সুচিরকাল নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত-অকুণ্ঠ ভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন। হে তাপস, আপনার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে—দেবী আপনার শিরে অমর-বর বর্ষণ করিয়াছেন—আপনার ত্রিতন্ত্রীতে তাঁহার অমৃত বীণার অভয় মূর্চ্ছনা সঞ্চারিত করিয়াছেন। হে বরাভয়মণ্ডিত মনীষী, আপনি শতায়ুঃ হইয়া, এই মোহনিদ্রায় নিষুপ্ত জাতির প্রাণে বীর্য্য ও বলের প্রেরণা দ্বারা, তাহার সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করুন, এবং প্রতিভার কল্পলোকে বিরাজ করিয়া, মুক্তহস্তে প্রাচ্যকে ও প্রতীচ্যকে নব নব সুষমা ও সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও আনন্দ বিতরণ করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ঊনচত্বারিংশ বৎসর ব্যাপিয়া আপনার উপচীয়মান শুভ সাহিত্য-সম্পদে বিপুল গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আপনার বক্তৃতার মন্ত্রে ইহার আদ্য বার্ষিক উৎসব মন্দ্রিত হইয়াছিল। আপনার পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ হইলে পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। আবার আপনার স্মরণীয় ষষ্ঠীতম জন্মদিনে সংবর্দ্ধনার সম্ভার সজ্জিত করিয়া, পরিষৎ আপনাকে সম্ভ্রমের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিল। কবি-জীবনের সেই সেই সন্ধি-ক্ষণে উচ্চারিত পরিষদের উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনার কীর্ত্তি-ভাতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া আজ সফলতার তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে। সু ধন্য আপনি মানবের বিনশ্বর দুঃখ সুখের মধ্যে সত্যের শাশ্বত স্বরূপকে দর্শন করিয়াছেন, এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়া, যুগ-যুগান্ত-লব্ধ ভারতের সনাতন আদর্শকে ভাগীরথী-ধারার ন্যায় মর্ত্ত্যে আবার অবতীর্ণ করাইয়াছেন। হে সত্যদ্রষ্টা! আপনাকে শত শত নমস্কার।

হে বাণীর বরপুত্র, হে বিশ্ববরেণ্য কবি, 'বর্ণ-গন্ধ গীতময়' এই বিচিত্র বিশ্ব যাঁহার সুরভি শ্বাস, কবি কোবিদের 'ধী'র অভ্যন্তরে মুখরিত প্রেম প্রজ্ঞা-প্রতাপ যাঁহার সৎ চিৎ আনন্দের প্রচ্ছন্ন আভাস, সেই শঙ্কর বিশ্বম্ভর বিশ্বকবি আপনার চির স্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন; যদ্ ভদ্রং তদ্ ব আ সুবতু; আর, স বো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥

কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

১১ই পৌষ সভাপতি

কবির উত্তর

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম আরম্ভ কালেই এই প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল এ কথা তাঁহারা সকলেই জানেন যাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তক। আমার অকৃত্রিম প্রিয় সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই পরিষদকে স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশৎবার্ষিকী জয়ন্তীসভায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় তাঁহারই স্নিগ্ধ হস্ত হইতে আমার স্বদেশদত্ত দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্ত্তমান জয়ন্তী-উৎসবের সূচনা সভায় সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসা-বাদের দ্বারা আমাকে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া গিয়াছেন। আমি অনুভব করিতেছি এই মানপত্রে আমার পরলোকগত সেই সহৃদয় সুহৃদদের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে—যাঁহাদের হস্ত অদ্য স্তব্ধ, যাঁহাদের বাণী নীরব।

অদ্য পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি সর্ব্বজনবরেণ্য জন-নায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই যে মানপত্র সমর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিলেন এই পত্রে সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গ-ভারতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্তকালকে উজ্জ্বল করিলেন এই কথা বিনয়নম্র আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম।

তাহার পর হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন অভিভাষণ পাঠ করেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাহার যথাযোগ্য উত্তর দান করেন।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অভিনন্দন

জয়ন্তী-অর্ঘ্য

হে কবি! জয়ন্তী-অর্ঘ্য নিয়ে হাতে তোমার স্মরণে
সুদূর প্রবাস হ'তে এই পথে, কবিনিবেদনে,
এলো যারা, সেকি তারা বয়সের দাবী শুনে তব?
তা তো নয়, দেখি রূপ, অপরূপ, চির অভিনব;
বয়সের সীমা তব, নিত্য নব নর্ত্তনের কোলে,
সপ্ততি বৎসর বুকে, সাত বৎসরের শিশু দোলে
সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন; সময়ের হিসাব না রাখে,
বিস্মিত বিশ্বের মন তার পানে চেয়ে শুধু থাকে।
কার চোখে এত দীপ্তি? কার বাণী নিত্য বহমান?
কার প্রীতি নিতি নিতি, রচি চলে বিশ্বের কল্যাণ
অফুরন্ত প্রাণ-রসে;—সে যে এই শিশু চিরন্তনী,
যুগে যুগে হে প্রবীণ! গাহ নবীনের জয়ধ্বনি।
বাঙ্গালার বুকের দুলাল! সত্যদ্রষ্টা! হে অমর কবি!
কালক্ষয় করে তুমি জয় গেয়ে যেও সুরের পূরবী।
চির-সবুজের সমারোহ নিত্য হোক জীবনে তোমার,
প্রবাসের ভালবাসা ভরা, ধর এই অর্ঘ্য-উপচার।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

সপ্ততিতম-বর্ষ-অর্ঘ্যপত্র

দেশবাসীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম-বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি জীবনবিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সাহিত্যাচার্য্য-গণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি। ইতি—

রবীন্দ্র জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদপক্ষে

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

সভাপতি

সমস্ত অভিনন্দন প্রদান ও অর্ঘ্যদান শেষ হইয়া গেলে রবীন্দ্রনাথ সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—

"বিপুল জনসঙ্ঘের বাণীসঙ্গমে আজ আমি স্তব্ধ। এখানে নানা কণ্ঠের সম্ভাষণ, এ যে আমারই অভিবাদনের উদ্দেশে সম্মিলিত এ কথা আমার মন সহজে ও সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। সূর্য্যের আলোক বাষ্পসিক্ত ধূলি বিকীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়, কোথাও বা সে ছায়ায় ম্লান, কোথাও বা সে অন্ধকারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কোথাও বা সে বাধাহীন আকাশে সমুজ্জ্বল, কোথাও বা পুষ্প-কাননে বসন্তে তাহার অভ্যর্থনা, কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে শরতে তাহার উৎসব। দৈবকৃপায় আমি কবিরূপে পরিচিত হইয়াছি—কিন্তু সেই পরিচয়ের স্বীকার দেশবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে অনবচ্ছিন্ন নহে, তাহা স্বভাবতঃই বাধাবিরোধ ও সংশয়ের দ্বারা কিছু না কিছু অবগুণ্ঠিত। তাহাকে বিক্ষিপ্ততা হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া, আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই জয়ন্তী অনুষ্ঠান নিবিড় সংহতভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছিল—সেই সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম দেশের প্রীতি প্রসন্ন হৃদয়কে তাহার আপন অপ্রচ্ছন্ন বিরাটরূপে। সেই আশ্চর্য্যরূপ দেখিলাম পরম বিস্ময়ে, আনন্দে, সম্ভ্রমের সঙ্গে, মস্তক নত করিয়া।

অন্যকার এই প্রকাশ কেবল যে আমারই কাছে অপরূপ অপূর্ব্ব তাহা নহে, দেশের নিজের কাছেও। উৎসবের আয়োজন করিতে গিয়াই দেশশ্রী সহসা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার গভীর অন্তরের মধ্যে কতটা আনন্দ কতটা প্রীতি নানা ব্যবধানের অন্তরালে অজস্র সঞ্চিত হইতেছিল। আবাল্যকাল দেশমাতার প্রাঙ্গণে গাহিয়াই আমার কণ্ঠ সাধনা। মাঝে মাঝে যখন মনে হইত উদাসীন তিনি, তখনো বুঝিবা তাঁহার অগোচরেও সুর পৌঁছিয়াছিল

তাঁহার অন্তরে ; যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন তখনো হয়ত তাঁহার শ্রবণদ্বার রুদ্ধ হয় নাই। ভালো ও মন্দ, পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিসূত্রে গাঁথিয়া লইতেছিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর বয়সে যখন আমার আয়ু উত্তীর্ণ হইল, যখন তাঁহার সেই মালার শেষ গ্রন্থি দিবার সময় আসন্ন, তখনই আমার দীর্ঘজীবনের চেষ্টা তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণ প্রায়। সেইজন্যই তাঁহার এই সভায় আজ সকলের আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধস্বরে তাঁহার এই বাণী আজ উচ্চারিত—"আমি গ্রহণ করিলাম।" সংসার হইতে বিদায় লইবার দ্বারের কাছে সেই বাণী স্পষ্ট ধ্বনিত হইল আমার হৃদয়ে। ত্রুটী বিস্তর আছে, সাধনায় কোনো অপরাধ ঘটে নাই ইহা একেবারে অসম্ভব। সেইগুলি বুনিয়া বুনিয়া বিচার করিবার দিন আজ নহে। সে সমস্তকে অতিক্রম করিয়াও আমার কর্ম্মের যে সত্যরূপ, যে সম্পূর্ণতা প্রকাশমান তাহাকেই আমার দেশলক্ষ্মী তাঁহার আপন সামগ্রী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকারই এই উৎসবের মধ্য দিয়া আমাকে বরদান করিল। আমার জীবনের এই শেষ বর, এই শ্রেষ্ঠ বর।

অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতোই উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অদ্যকার এই দিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না তাহাই বিধাতার মহৎ দান—দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।

আপনাদের প্রদত্ত শ্রদ্ধা ও গৌরব আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতেছি। আপনাদের এই আয়োজন সময়োচিত হইয়াছে। জীবনের গতি যখন প্রবল থাকে, তখন সম্মান গ্রহণ ও বহন করিবার দিন নয়। জীবন যখন মৃত্যুর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছায় তখনই তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে লওয়া যায়। কর্ম্মের গতি বেগময় জীবনের মধ্যে সম্মান অনেক বিক্ষোভ ও বাদবিসম্বাদের সৃষ্টি করে। আজিকার দিনে আপনাদের হাত থেকে তাই সবিনয়ে দেশের শেষ সম্মান আমি গ্রহণ করিতেছি ও দেশবাসীকে আমার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের শেষ নমস্কার জানাইয়া যাইতেছি।

মঙ্গলবার (১৩ই পৌষ)—

এইদিন অপরাহ্ন সাড়ে তিনটার সময় শ্রীযুক্ত অমল হোম বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়, সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচন করেন। তাহার আধ ঘণ্টা পরেই রবীন্দ্রনাথ পরিষদ-ভবনে উপস্থিত হন। এ দিনে পরিষদে তাঁহার সংবর্দ্ধনার আয়োজন হয়। এই স্থানে মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতি শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী মহাশয় কবিবরকে রেশম-সূত্রে গ্রথিত একখানি সুন্দর মাদুর উপহার দেন। আলাপ-আলোচনা, আলোকচিত্র গ্রহণ ও জলযোগের পর সম্মেলন শেষ হয়।

বৃহস্পতিবার (১৫ই পৌষ)—

এই দিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় বাঙ্গালাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদিগের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করা হয়। বিস্তৃত সেনেট হলটী পত্রপুষ্প পতাকায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। ছাত্র-ছাত্রীদিগের পক্ষ হইতে কয়েকটী অভিনন্দনপত্র পঠিত ও অর্ঘ্য প্রদত্ত হইলে কবিবর একটী সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন।

মেলা, প্রদর্শনী ও আমোদপ্রমোদ—

৯ই পৌষ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকদিনব্যাপী একটী মেলা ও প্রদর্শনী টাউনহলের প্রাঙ্গণে ও হলের নিম্নতলে হইয়াছিল। মেলায় অনেক দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। টাউনহলের নিম্নতলে যে শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা বড়ই মনোরম হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত দুই শতাধিক চিত্র, তিনি কোথায় কি কি উপহার পাইয়াছিলেন সে সমস্ত, তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপিসমূহ এবং নানা স্থান হইতে আগত চিত্রাবলী এই প্রদর্শনীর অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিয়াছিল। কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে এবং কবিবরের জোড়াসাঁকোর ভবনে কয়েক

দিন গানবাজনা ও কবিরচিত 'নটীর পূজা' ও 'শাপ-মোচনের'র অভিনয় হইয়াছিল।

এই রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠাতৃবর্গকে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য ধন্যবাদ করিতেছি।

স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ বসু

সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বরদাপ্রসাদ বাবুই এতদিন 'বঙ্গবাসী' পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পিতার ন্যায় কার্য্যদক্ষতা ও সদাশয়তাগুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। বরদাবাবুর পরলোকগমনে আমরা একজন সহৃদয় বন্ধু হারাইলাম। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি বরদাবাবুর শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনগণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

৺যোগেশচন্দ্র সিংহ

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম যে গত ১০ই পৌষ মঙ্গলবার রাত্রি ১০টায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ উকিল, পাইকপাড়া রাজষ্টেটের একজিকিউটার, পরম ভাগবত এবং সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কায়স্থসমাজের কল্যাণসাধনে বিশেষভাবে ব্রতী ছিলেন। বাল্যাবধি তিনি জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকাবলীর মধ্যে "কালের স্রোত" নামক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকখানি বাঙ্গলার সুধিসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের আজীবন সভ্য এবং স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও স্বর্গীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় নিজ গ্রাম পাঁচথুপীর উন্নতিকর সমস্ত হিত কর্ম্মে তিনি প্রধান



স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র সিংহ

উদ্যোগী ছিলেন। এই শোকের সময় আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত 'নিশিপদ্ম"—১॥০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "অনাহূত"—১॥০

শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ কৃত শ্রীভাস্করাচার্য্যের "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" (গণিতাধ্যায়ের)—১৲

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ"—১॥০

শ্রীসুখময় দাসগুপ্ত এম-এ প্রণীত "বীরপূজা"—৷৴০

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটিকা "যক্ষপ্রিয়া"—৷০

শ্রীসুখময় দাসগুপ্ত এম-এ প্রণীত "মহাত্মা গান্ধীর ছাত্র-জীবন"—৷৴০

শ্রীমতী মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা প্রণীত খণ্ডকাব্য "পসারিণী"—২৲

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "আলাপে প্রলাপে"—১৲

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ প্রণীত খণ্ডকাব্য "অনুরাগ"—৷০

শ্রীতড়িৎকুমার বসু প্রণীত নাটক "শ্রী-হীন কৃষ্ণ"—১॥০

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত খণ্ডকাব্য "পদ্মা"—১৲

শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্তজায়া প্রণীত "পদ্মিনী"—৷০

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.



পার্থ-সারথী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

Bharatvarsha Halftone & Printing Works



ফাল্গুন—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ { তৃতীয় সংখ্যা

গীতার মর্ম্ম-বাণী

শ্রীঅনিলবরণ রায়

সাংখ্য ও যোগের মধ্যে তৎকালে যে প্রভেদ ছিল তাহারই উল্লেখ করিয়া গীতা তাহার অধ্যাত্ম-শিক্ষার অবতারণা করিয়াছে,—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যবুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যাযুক্তো যয়া পার্থ! কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥২।৩৯

সাংখ্য জ্ঞানের পন্থা, যোগ কর্ম্মের পন্থা; গীতা এই দুই প্রণালীরই সারতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছে, এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া নিজস্ব যোগপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছে। এই সমন্বয়ের রহস্যটি না বুঝিলে গীতোক্ত সাধনার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না। গীতা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে বিরোধ মিটাইয়া যে সমন্বয় সাধন করে, প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানে, পরে আচার্য্য শঙ্কর প্রচারিত মায়াবাদ ও সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রভাবে, সেই সমন্বয় ভারতবাসীর জীবনের উপর কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; গীতার এই নিগূঢ় শিক্ষা চাপা পড়িয়া যায়, তৎপরিবর্ত্তে জ্ঞানমার্গ এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম্মত্যাগ, সংসার-ত্যাগ, সন্ন্যাস, ইহাই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতা বলিয়া প্রচারিত হয়। এখনও লোকের মন হইতে এই ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। গীতার অধিকাংশ টীকাকার শঙ্করের অনুসরণ করিয়া জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মসন্ন্যাসকেই গীতার প্রকৃত শিক্ষা

বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। (১) কর্ম্মের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা কেবল প্রাথমিক অবস্থায়; শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে ত্যাগ না করিলে অধ্যাত্ম জীবনলাভ অসম্ভব। আবার গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাকর্ত্তাগণ গীতার অন্যান্য অংশের উপর ঝোঁক না দিয়া, প্রথমাংশে যে কর্ম্মযোগের শিক্ষা আছে, তাহাকেই গীতার পরম শিক্ষা বলিতেছেন। তাঁহাদের মতে গীতার পরম বাক্য হইতেছে,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্তকর্ম্মণি ॥২।৪৭

আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, গীতা দুইটি পন্থাই দেখাইয়াছে,—জ্ঞান ও কর্ম্ম, সাংখ্য ও যোগ। সন্ন্যাসীর পক্ষে জ্ঞানযোগ, আর সংসারীর পক্ষে কর্ম্মযোগ। কিন্তু, বস্তুতঃ গীতা এরূপ কোনও প্রভেদ স্বীকার করে নাই। সন্ন্যাস বলিতে গীতা বাহ্যিক কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগ বুঝে নাই। আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মত্যাগী, সংসারত্যাগী যত্র তত্র বিচরণশীল কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন। গীতায় কোথাও আমরা এইরূপ সন্ন্যাসীর বর্ণনা পাই না। গীতা যে ত্যাগের কথা বলিয়াছে, তাহা ভিতরে বাসনা কামনা ত্যাগ, প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্। সন্ন্যাসী বলিতে গীতা ইহাই বুঝিয়াছে,—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

তিনি অন্যান্য লোকের ন্যায় সংসারে বিচরণ করেন, কর্ম্ম করেন, কেবল তাঁহার কোনও বাসনা নাই, রাগ দ্বেষ নাই, তিনি সব "আমি" "আমার" ভাব হইতে মুক্ত—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি ॥২।৭১

গীতার যে নিজস্ব যোগ প্রণালী, সাধন-প্রণালী, তাহাতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়েই এই সমন্বয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত এইটিকেই পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছে, আবার জ্ঞানেরও প্রশংসা করিয়াছে। কর্ম্ম করিতে হইবে কিন্তু যেমন তেমন ভাবে নহে,—বুদ্ধিযোগের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা বাসনা-কামনার অহঙ্কারের উপর উঠিয়া যে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করা যায়, সেই অবস্থাতেই কর্ম্ম গ্রহণীয়, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্!—আমরা দেখিতে পাই, তৎকালের শিক্ষায় প্রভাবিত অর্জ্জুন প্রথমেই এই সমন্বয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই—ভিতরে ত্যাগ ও বাহিরে কর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই তিনি এ বিষয়ে তাঁহার সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। সেই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই সমন্বয় আরও পরিস্ফুট করিয়া কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জ্জুনের সকল সন্দেহ তাহাতেও দূর হয় নাই, পুনরায় পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমে তিনি সেই প্রশ্নই তুলিয়াছেন, আবার শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমেও আমরা দেখিতে পাই, অর্জ্জুন এই সমন্বয়-তত্ত্ব আরও পরিষ্কার ভাবে জানিবার ইচ্ছা গুরুর নিকটে নিবেদন করিয়াছেন। অতএব, গীতা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়কে স্তরে স্তরে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, এবং ইহাদের সহিত ভক্তির সমন্বয় করিয়া তাহার নিজস্ব সাধনাকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সেই সাধনায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন মিলিয়া এক হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা গীতার পরম তত্ত্ব ভক্তির কেবল একটু ইঙ্গিত মাত্র পাই, যুক্ত আসীত মৎপর, গীতোক্ত সাধনার বীজমন্ত্র স্বরূপ এই তিনটি কথাই পরে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ভাবে দেখিলে গীতা-শিক্ষার পদ্ধতিটি আমরা বেশ বুঝিতে পারি। গীতা তাহার সমস্ত বক্তব্য একেবারে স্পষ্ট করিয়া বলে নাই, শিষ্যের মানসিক অবস্থা ও গ্রহণ-শক্তি অনুসারে কোনটা বিস্তৃত করিয়া বলিয়া প্রাথমিক সাধনা নির্দ্দেশ করিয়াছে, কোনটার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছে, আবার কোনটা একেবারে চাপিয়া রাখিয়াছে। (*) পরে আবার সেই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা করিয়াছে, তাহাদিগকে প্রয়োজন মত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া সমস্ত শিক্ষাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। গীতার এই বিশিষ্ট পদ্ধতিটুকু মনে না রাখিলে, গীতার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে

(১) বাংলাদেশে শ্রীধর স্বামীর টীকাই সুপ্রচলিত, ইহা শাঙ্কর ভাষ্যের অনুযায়ী, কর্ম্মত্যাগ ও সন্ন্যাসমূলক।

(২) গীতার যাহা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব গীতা কোথাও তাহা পরিষ্কার করিয়া বলে নাই। গুহ্যতম রহস্যরূপেই রাখিয়া দিয়াছে, গীতোক্ত সাধনার অনুসরণ করিয়া সাধকগণকে নিজ নিজ জীবনেই তাহার বিকাশ করিতে হইবে।

মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়, অথবা নানা অদ্ভুত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

অর্জ্জুনের মুখে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন তুলিয়া গীতা জ্ঞান ও কর্ম্মের যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে, এবং ভক্তি ও ভগবানে আত্মসমর্পণের মধ্যে তাহাদের পূর্ণ সার্থকতা দেখাইয়াছে,—গীতার এই নিগূঢ় সমন্বয়ের মর্ম্ম বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও সাম্প্রদায়িক ভাষ্যের দ্বারা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কেহ জ্ঞানের উপরে, কেহ ভক্তির উপরেই বিশেষ ঝোঁক দিয়াছে, এবং সকলেই শেস পর্য্যন্ত কর্ম্ম-ত্যাগ, সংসার-ত্যাগকেই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে। এই সংসার দুঃখময়, এই জগৎ মিথ্যা মায়া, এই মায়াময়, দুঃখময় জগৎকে ছাড়িয়া আত্মার নিথর শান্তি, নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে লীন হইতে হইবে, অবিদ্যারূপিণী প্রকৃতির বন্ধন কাটাইয়া পুরুষ স্বীয় শুদ্ধ, শান্ত, স্বরূপে ফিরিয়া যাইবে, এইরূপে তাহার সংসার-লীলার অবসান হইবে, ইহাই সকলের প্রতিপাদ্য। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাই গীতার প্রকৃত শিক্ষা নহে। গীতা এই সকল মতবাদ ও সাধনপন্থার সার বস্তু গ্রহণ করিয়াছে, এবং এই সকলকেই ছাড়াইয়া উঠিয়া ইহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছে। প্রকৃতির যে ক্রিয়ার মধ্যে আমরা বদ্ধ রহিয়াছি, ইহা অজ্ঞান, অবিদ্যার ক্রিয়া; কিন্তু ইহা ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতি। ইহাই সব নহে, ইহারও উপরে আছে পরা-প্রকৃতি, ভাগবত প্রকৃতি, প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। তাহা দিব্য চেতনা, দিব্য জ্যোতি, শক্তি, আনন্দে পূর্ণ। তাহাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ, জীবভূতাম্। তাহার মধ্যে উঠিয়া, নিজের মধ্যে সেই পরা ভাগবত প্রকৃতির ক্রিয়ার বিকাশ করিয়াই মানুষ তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে। অতএব, এই জগৎ ও জীবনকে মিথ্যা মায়া বলিয়া, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া নহে, তাহা হইলে ত জীবের আবির্ভূত হইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না;—পরন্তু, ইহাকে পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত করিয়া, ইহার মধ্যে পরা ভাগবত প্রকৃতির দিব্য জ্ঞান, শক্তি, শান্তি, সৌন্দর্য্য, আনন্দ নামাইয়া আনা—ইহার জন্যই জীবের সংসার-লীলা, ইহার জন্যই মর্ত্তের মানব-জীবন।

গীতার এই অতীত রহস্যময় শিক্ষা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, এতদিনে শ্রীঅরবিন্দ অপূর্ব্ব সাধনালব্ধ দিব্য-দৃষ্টি সহায়ে ইহাকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া ভারতের, তথা জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার অনুসরণ করিয়াই মানবজাতি তাহার শ্রেষ্ঠ কল্যাণের পথে নিশ্চিত ভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে। পাশ্চাত্যের নীচ ইন্দ্রিয়-ভোগপরায়ণ জীবন নহে, ভারতেরও মায়াবাদ বা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে, মানব-জীবন এখন যেমন রহিয়াছে, নীচের প্রকৃতির অজ্ঞানের, ত্রিগুণের ক্রিয়া,—ইহাকে দিব্য ভাবে বিকশিত ও রূপান্তরিত করিয়াই মানুষ তাহার পরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবে,—মর্ত্ত্যের মানব-জীবনই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় জীবনে পরিণত হইবে,—ভগবানের নরলীলা সার্থক হইবে। শ্রীঅরবিন্দের কথায় গীতার বাণীর সার মর্ম্ম এই—

"মানুষ এখন তাহার প্রকৃতির যে নীচের ক্রিয়ার মধ্যে বাস করিতেছে ইহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, এই যে আলোক প্রকৃতপক্ষে অন্ধকারই, যা নিশা পশ্যতো মুনেঃ, ইহা হইতে উপরে উঠিয়া, অনন্ত, অক্ষর আত্ম-সত্তার জ্যোতির্ম্ময় সত্যের মধ্যে জাগ্রত হইতে পারে, বাস করিতে পারে। তখন আর মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, নিজেকে ক্ষুদ্র অহং বলিয়া দেখিয়াই চিন্তা করে না, কর্ম্ম করে না, অনুভব করে না, সামান্যের জন্য, স্বল্পের জন্য কষ্টকর প্রয়াসে প্রবৃত্ত থাকে না। শুদ্ধ আত্মার বিরাট ও মুক্ত নির্ব্যক্তিকতার (impersonality) মধ্যে সে ডুবিয়া যায়; সে ব্রহ্ম হয়; যে এক আত্মা সর্ব্ব-ভূতের মধ্যে বিরাজ করিতেছে,—তাহার সহিত নিজেকে এক বলিয়া জানিতে পারে। তখন আর তাহার অহং-বোধ থাকে না, তখন আর সে দ্বন্দ্বের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় না, দুঃখের জ্বালা বা সুখের চাঞ্চল্য অনুভব করে না, তখন আর সে পাপের দ্বারা ব্যথিত বা পুণ্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না। আর যদিই বা এই সকল জিনিষের আভাস বর্ত্তমান থাকে, সে দেখিতে পায় ও জানে যে, এ সব হইতেছে প্রকৃতিরই ত্রিগুণের খেলা, তাহার নিজের জীবনের সত্য বলিয়া সে সবকে সে উপলব্ধি করে না। কেবল মাত্র প্রকৃতিই কর্ম্ম করে এবং যন্ত্রবৎ নিজের নানা রূপ বিকাশ করে; কিন্তু শুদ্ধ আত্মা নীরব, নিষ্ক্রিয়, মুক্ত। শান্ত-প্রতিষ্ঠ, প্রকৃতির ক্রিয়া সকলের দ্বারা অস্পৃষ্ট,—সে সমুদয় ক্রিয়াকে সে দেখে সম্পূর্ণ সমতার সহিত, এবং নিজেকে সেই

সব হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানে। এই অধ্যাত্ম অবস্থা লইয়া আইসে নীরব শান্তি ও মুক্তি, কিন্তু ইহা শক্তিক্রিয়াত্মক দিব্যজীবন আনিয়া দেয় না, পূর্ণতম সিদ্ধি আনিয়া দেয় না; ইহা খুব উচ্চ-গতি সন্দেহ নাই, কিন্তু এইটিই সমগ্র ভগবদ্-জ্ঞান, আত্মজ্ঞান নহে, সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি, তাহা নহে।

"পূর্ণতম সিদ্ধিলাভ হয় কেবল পরম ও সমগ্র ভাগবতের মধ্যে বাস করিয়া।—তখন ভগবানের অংশ মানবাত্মা ভগবানের সহিতই যুক্ত হয়; তখন সে আত্মসত্তায় সর্ব্বভূতের সহিত এক হয়,—তাহাদের সহিত এক হয় ভগবানের মধ্যে, আবার প্রকৃতিরও মধ্যে; তখন সে শুধু মুক্ত নহে, সে পূর্ণ; তখন সে পরম আনন্দে নিমগ্ন, চরম সিদ্ধিলাভের জন্য প্রস্তুত। তখনও সে আত্মাকে দেখে—চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় সত্তা নীরবে সর্ব্বভূতকে ধরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সে প্রকৃতিকেও দেখে—আর কেবল যন্ত্রবৎ ত্রিগুণের ক্রিয়ায় রত অচেতন জড়াত্মিকা শক্তিমাত্র নহে, পরন্তু আত্মারই শক্তি, প্রকাশলীলায় রত ভগবানেরই শক্তি। সে দেখিতে পায় যে, নীচের প্রকৃতিই আত্মার জীবনের গূঢ়তম সত্য নহে, সে ভগবানের এক পরমা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সন্ধান পায়,—মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে এখন যাহা কিছু অপূর্ণরূপে দেখা যাইতেছে, সে সবেরই উচ্চতর সত্যের মূল ঐ প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে, তাহা এখনও প্রকট হয় নাই। নীচের এই মানসিক প্রকৃতি হইতে এই পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়া সে সমস্ত অহং হইতে মুক্ত হয়। সে নিজেকে একটি অধ্যাত্ম সত্তা বলিয়া জানিতে পারে;—মূলতঃ সে সর্ব্বভূতের সহিত এক, এবং তাহার ক্রিয়াশীল প্রকৃতিতে সে ভগবানেরই একটি শক্তি এবং বিশ্বাতীত অনন্তের একটি সনাতন আত্মসত্তা, জীবভূতঃ সনাতনঃ। সে সব কিছুকে ভগবানের মধ্যে দেখে, এবং সব-কিছুর মধ্যেই ভগবানকে দেখে, সে দেখে সবই বাসুদেব, বাসুদেব সর্ব্বম্। সুখ দুঃখ, প্রিয় অপ্রিয়, আশা নিরাশা, পাপ পুণ্য সকল দ্বন্দ্ব হইতেই সে মুক্ত হয়। এখন হইতে তাহার চৈতন্যময় দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয় সব কিছুকেই ভগবানের ইচ্ছা, ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করে। বিশ্ব-চৈতন্য ও শক্তির একটি আত্মা ও অংশরূপে সে জীবন যাপন করে, কর্ম্ম করে, পরম ভাগবত আনন্দে, অধ্যাত্ম আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে। তাহার কর্ম্ম হয় দিব্য কর্ম্ম এবং তাহার পদ (status) হয়, ঊর্দ্ধতম অধ্যাত্ম পদ"। (Essays on the Gita, Second serise)

বহুরূপী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বহুরূপী এক বহুদিন বহুদিন ধরি ভাবে,
গোবিন্দজীর কৃপা সে যা করেই হ'ক পাবে।
নানা বোল্ নানা বেশে হায় ভুলিয়াছে বহু জনে,
অতি কৃপণের কাছেও অর্থ এনেছে টেনে।
নিপুণতা তার অতুলন বিপুল পুলক চিতে,
ধারণা তাহার পারিবেই ভগবানে টলাইতে।

ভাবিতে ভাবিতে নিশিদিন হল সে পাগল মত,
মন্দির-দ্বারে প্রতিদিন করে হাবভাব কত,
কাবুলি সাজিয়া টাকা চায়, হাব'রে সাজিয়া নাচে,
সন্ন্যাসী সাজি গীত গায়, পাগলিনী সাজি যাচে।
নিরাশ হইয়া ফিরে যায় তবু বাধা নাহি মানে,
দেবতা তাহার রসময়, রসিক সে কথা জানে।

পাণ্ডা তাহারে সাঁজে এক ডাকি কন চুপি চুপি,
দেবতারও জেনো বহুরূপ, তিনিও যে বহুরূপী।'
খেলা দেখাইয়া ভুলাবার ও বড় কঠিন ঠাঁই
গলেনাক জল হাতে ওঁর, লাভের ভরসা নাই।
শুনি বহুরূপী খুশী খুব, ভাবে মনে মনে আজি,
হাব'রে এসেছি দেখাতে হাঘরের ঘরে বাজি।

একাকী পাইয়া দেবতায় বহুরূপী বলে জোরে,
দিতে হবে নাক কিছু আর, আছ কেন চুপ করে
প্রাণ ভরে আজ কথা কও চলে যাই ভালবাসি
সহসা ফুটিল দেবতার মুখে খিল্ খিল্ হাসি।

* * *

বহুরূপী আর আসে নাই, মোরা পথ চেয়ে থাকি
সম-ব্যবসায়ী দুজনায় এক হয়ে গেল নাকি?



অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ

(৬)

বনবিহারী বাবু প্রত্যহই আসিয়া মিঃ রায়কে দেখিয়া যাইতেন। মাড়োয়ারী হাসপাতালের ডাক্তার বংশীধর বাবুও যথাসাধ্য চেষ্টা ও তত্ত্বাবধান করিয়া মেজরের চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অসুখ সহজে কমিল না। জ্বর ও বুকের বেদনা সমান ভাবেই ছিল। অনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণে মেজরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। ডাক্তার যথেষ্ট সাহস ও আশা দিলেও, অনি ভরসা করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা হইতেছিল।

অনি যে নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই অধিক বিহ্বল হইয়াছিল, তাহা নহে, যদিও মেজরের বর্ত্তমান জীবনের উপর তাহার ভবিষ্য জীবনের অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছিল। মেজরের অসুস্থ অবস্থায় অনি যেদিন তাঁহার সাংসারিক ও পারিবারিক অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছিল, সেই দিন হইতেই যেন তাহার নারীত্বের স্বভাব-কোমলতা অধিকতর ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনি জানিত যে মেজর কর্ম্মস্থানে একাকী, কিন্তু তাঁহার পশ্চাতের ইতিহাসের পাতাগুলিও যে তাহারই ন্যায় শূন্য ও মরুময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে পূর্ব্বে কখনই ভাবিতে পারে নাই। অনি যেদিন মেজরের অসুস্থতার কথা বাড়ীতে জানাইবার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিতে গিয়াছিল, সেদিন মেজরের সেই বেদনা-ম্লান মুখ ও একটা বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস যেন অনিকে পলকে আত্মহারা করিয়া দিল। একসঙ্গে তাহার স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি কোমলতার যাবতীয় সম্পদ যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। হায়! পুরুষ! তোমার কর্ম্মশ্রান্ত জীবনকে তো তুমি স্বহস্তে সজীব করিয়া রাখিতে পার না। তুমি অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইয়া যাও; উৎসাহ তোমার কর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখে। কিন্তু তোমার সেই ক্লান্ত ও রুক্ষ উৎসাহকে সজীব করিয়া রাখে যে তোমার মাতা, পত্নী, ভগিনী ও কন্যা, তাঁহাদের সেই স্নিগ্ধতার শান্তিধারায় স্নান করাইয়া। সে যে প্রকৃতির নিয়ম,—দেবতার দান। সেই স্নেহ ও সেবাই যে তোমার যুদ্ধশ্রান্ত জীবনকে ঘুম পাড়াইয়া রাখে।

রাত্রিদিন মেজরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনি তাঁহার সেবা করিতেছিল; সে সেবার ক্লান্তি ছিল না, অবসাদ ছিল না। মেজরের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া অনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছিল; কিন্তু সেবার তৃপ্তিতে সে প্রীত হইতে পারিতেছিল না। মেজরের নিকট সে ঋণী ছিল সত্য। যিনি প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখিতেন না, যাঁহাকে প্রতিদান দিবার মত তাহারো কোন সম্বল ছিল না, সেই মহাজনের ঋণভার সাধ্যমত লাঘব করিতে চাহিয়াছিল অনি, তাঁহার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়া। কিন্তু রোগশয্যা-পার্শ্বে এই নির্ম্মম সেবার সুযোগ তো সে কখনই পাইতে চাহে নাই। ঠাকুর! সে আমরণ ঋণী হইয়া থাকিবে, তাহাতে তো তাহার কোন ক্ষতি নাই। তুমি মহৎকে প্রাণ দিয়াছ, হৃদয় দিয়াছ, শক্তি দিয়াছ,—বিপন্নকে সাহায্য করিবার জন্য। যে নিরুপায়, তাহাকে সে সাহায্য গ্রহণ করিবার অধিকারও দিয়াছ তুমি; প্রতিদানের অক্ষমতাও দিয়াছ তুমি। এ প্রতিদানের

সুযোগ দিয়া অক্ষমকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিও ; না প্রভু! যদি সে অধিকার পাই, জন্মান্তরে ফিরিয়া আসিব। আমার মূল্যহীন জীবনের সবটুকু পরমায়ু নিঃশেষে লইয়া, মেজরের জীবনকে সুদীর্ঘ করিয়া দাও; তাঁহাকে ভাল কর নারায়ণ!

অনি লক্ষ্য করিয়াছিল—মেজর যেন সে-দিন অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে কাহার নাম করিয়া কলিকাতায় একটা সংবাদ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনি ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু মেজর আর কোন উত্তর দেন নাই। সে বুঝিয়াছিল মেজর ইচ্ছা করিয়াই সেটা গোপন করিয়া গেলেন। অনিচ্ছা বশতঃ, মেজর যেটাকে গোপন করিতে চান্, অনি তাহা লইয়া আর কোনরূপ পীড়াপীড়ি করিল না।

* * *

অনাহার, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তায় অনির স্বভাব-কমনীয় মুখখানা যেন এই কয়েক দিনের মধ্যেই ছাইয়ের মত মলিন হইয়া গিয়াছিল। তাহার চোখে বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার সে দীপ্তি যেন আর ছিল না। এই দশ বারো দিনের মধ্যেই সব কিছু শুষ্ক ও নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন বনবিহারীবাবু অনির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"অণিমা দেবী, শরীরের প্রতি এতখানি অবহেলা করা কি আপনার উচিত হ'চ্ছে? এর 'পর আপনিও যদি বিছানা নেন, তখন কি উপায়টা হবে ভাবুন দেখি!"

অনি শুষ্ক একটু হাসিয়া উত্তর দিল "ক্যাপ্টেন্, মানুষের চিকিৎসা করা আপনাদের ব্যবসা; সুতরাং তাদের শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনাদের যথেষ্টই জ্ঞান থাকা উচিত—উচিত কেন! আছেই। কিন্তু তাই ব'লে যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আপনাদের বিশেষ পারদর্শিতা আছে—তা তো বোধ হয় না।"

বনবিহারী বাবু সহসা এরূপ একটা অসংলগ্ন উত্তরের কোন তাৎপর্য্যই বুঝিলেন না। তিনি যেন কতকটা আশ্চর্য্য হইয়াই অনির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার মানে?"

অনি পুনরায় হাসিয়া উত্তর দিল—"মানে অত্যন্ত সহজ ও সাদা। শরীরের সম্বন্ধে আপনাদের বিজ্ঞানে যা' সব লেখা আছে, তার একটাও হয় তো মিথ্যে নয়। কিন্তু যাদের উপর সেগুলোকে খাটাতে চান্, তাদের নিজের নিজের সাধারণ সূত্রগুলো খুব গোলমেলে হ'তে পারে তো! আমি মেনে নিচ্ছি যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানুষের শরীর রক্ষা সম্বন্ধে যে সব সূত্রগুলো লিখে গেছেন, সেগুলো সম্পূর্ণ সত্যি ও ঠিক; তবে সেই সব সূত্র অমানুষের পক্ষেও খাটবে কি না সেটা সন্দেহজনক। ব্যবহারিক জীবনে মানুষের মধ্যে এত রকমারি স্বভাব গড়ে' উঠেছে, যার জন্যে পুঁথির সূত্রগুলো ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে খাটে না; বুঝ্‌লেন? আপনি স্বীকার ক'রবেন নিশ্চয়ই, যে আগুনের তাপে মুখ ঝলসে যায়। কিন্তু অনবরত হাপরের পাশে থেকে থেকে আগুনের তাপ যার হজম্ হ'য়ে গেছে, তার মুখ কি আর আগুন তাপে ঝল্‌সাবে?"

বনবিহারী বাবু কথাটা বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে না পারিয়া, একটু বিরক্তির সঙ্গেই কহিলেন—"ও সব বাজে কথা ছেড়ে দিন্। সময়ে খাওয়া নাওয়া সব ছেড়ে দিয়ে, শরীরটাকে কি ক'রে ফেলেছেন, দেখছেন কি? এত কষ্ট করার আমি কোন দারকারই বুঝি না; একটা নার্স কয়েক দিনের জন্যে ঠিক্ ক'রলে, আপনারও কোন কষ্ট হ'ত না, মেজরেরও সেবা যত্ন যে ভালই হ'ত তা'তেও কোন সন্দেহ ছিল না। অবশ্য আপনি যে রকম রোগীর যত্ন করেন, তা' হয় তো নার্সরাও সব সময় পেরে ওঠে না; কিন্তু তাই ব'লে আপনার নিজের শরীরটাও দেখতে হবে তো!"

"নিজের শরীর তো সব সময়ই দেখছি বনবিহারী বাবু! ওতে আমার কোন কষ্টই হয় না, ওটা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্বাভাবিক ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটলে, অসুস্থতা ও অশান্তি এসে পড়'তে পারে। কিন্তু তার স্বাভাবিকত্ব একটু আধটু কম বেশী হ'লে কিছু ক্ষতি হ'তে পারে কি? সেবাই হচ্ছে নারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেবার জন্যে আমরা জন্মেছি, সেবাতেই আমাদের সার্থকতা। অন্ততঃ যে সমাজ ও জাতীয়তার আদর্শে আমাদের সব কিছু গড়ে' ওঠে, সেখানে সেবার বাইরে স্ত্রীলোকের অন্য কোন আদর্শই নাই। এবং আমরাও সেটাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মানি।"

বনবিহারী বাবু কিছুদিনের পরিচয়েই অনিকে বিশেষ

ভাবে চিনিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—অনি যেটাকে ধরিবে, তাহা হইতে সহজে তাহাকে সরানো যায় না। তথাপি তিনি অনির এই প্রকার যুক্তি সমর্থন করিতে পারিলেন না। বেশ একটু অসন্তুষ্টির সঙ্গেই বলিলেন—"আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাক্‌বার যুগ আর নেই অণিমা দেবী! নারীও মানুষ; তারও রক্ত মাংস, সুখ দুঃখ সবই আছে। সমাজের ভিতর নারীর যে আদর্শকে খাড়া ক'রে রাখা হ'য়েছে, সেটা কেবলমাত্র পুরুষদের চাল্ঃ—কেবল সর্ব্বতোভাবে নারীর উপর তাদের কর্তৃত্বটাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার মতলবে—বুঝলেন! সে চালিয়াতি যতদিন না ধরা পড়েছিল, ততদিন হয় তো তার কোন মূল্য ছিল; আজ আর সেটাকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। সভ্য দুনিয়ার দরবারে স্বার্থ-পিশাচরা তাদের সে দাবী এখন হারিয়েছে। আপনি শিক্ষিতা হ'য়েও যে সেই সব গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারেন নি, সেটা বড়ই দুঃখের কথা। নিজেকে অত ছোট ক'রে দেখবেন না।"

"নিজেকে ছোট ক'রে দেখাটাই বড়, না বড় ক'রে দেখাটাই বড়,—সেটা আমার চেয়ে হয় তো আপনিই ভালো জানেন। সেই চালিয়াতির তথ্য আবিষ্কার ক'রে, আপনার সভ্য জগৎ হয় তো নারীকে তার ছোট আসন থেকে টেনে তুলে বড় আসনের পাশে সমান অধিকারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তাই ব'লে তাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মকেও উল্টে দিয়ে তাতে সমান দাবী সাব্যস্ত ক'রতে পেরেছেন কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। প্রকৃতির কাছ থেকে যে যা পেয়েছে, সেটার উপর ছোট বড়'র সমস্যা এসে কোন পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে কি? নারী গর্ভধারণ ক'রবেই; স্নেহ, মায়া, মমতা, দুর্ব্বলতা—এগুলো তার থাকবেই। তবে আপনাদের সভ্য দুনিয়ার 'জন্ম শাসন' বা 'বার্থ্ কন্‌ট্রোল' তার কোন আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাবে কি না ব'লতে পারি না। যাক্, ওই নিয়ে তর্ক ক'র্‌বার সময় এখন নয়, আমার ইচ্ছাও নেই। আপনি যদি বোঝেন্ যে রোগীর শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হ'চ্ছে, নার্স নিযুক্ত করুন; তাতে আমার কোন দুঃখই নেই। তবে—সেবা কিন্‌তে মেলে না।"

অনি আর কোন কথা না বলিয়া গম্ভীর ভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে যেন নিজেই মনে মনে একটু লজ্জিতা হইল। মেজরের শুশ্রূষা করিবার কথা লইয়া তাহার এরূপ কোন তর্ক না করাই ভাল ছিল;—বনবিহারী বাবু কি ভাবিবেন! সত্যই তো! প্রয়োজন হইলে ডাক্তার নার্স নিযুক্ত করিবেন; তাহাতে বনবিহারী বাবুর প্রতি এরূপ অকারণ বিরক্তি ও নার্সদের সেবার উপর তাহার এরূপ অবজ্ঞার ভাব আসিবার তো কোন কারণ নাই! অনির মনে হইতেছিল—সে যেন নার্সদিগকে একটা বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেছে; কিন্তু এরূপ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবার কোন কারণ তো তাহার জীবনে ঘটে নাই। তবে মেজরের সেবার ভার বিন্দুমাত্র ছাড়িয়া দিতেও তাহার প্রাণে এ ঝাঁকানি লাগে কেন? কারণ খুঁজিতে গিয়া অনি অন্তরে একটা লজ্জার ধাক্কা খাইয়া রাঙিয়া উঠিল।

বনবিহারী বাবু বাহিরের খোলা বারান্দায় আসিয়া ইজি চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িলেন। তিনি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন এই নারীটার প্রকৃতির কথা। অনিকে যেন তিনি চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছিলেন না। অনির স্বাভাবিক প্রকৃতি, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী, চালচলন প্রভৃতি সব কিছুই যেন তাহার শান্ত ও স্নিগ্ধ রূপের কোমলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ফুটিয়া উঠে। গৌরাঙ্গী না হইলেও তাহার অত্যুজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মধ্যে এমন একটা দীপ্ত অথচ মৃদু ও কোমল সৌন্দর্য্য আছে, যাহাতে তাহাকে একটা তৃণশ্যামল ছায়াকুঞ্জ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সে স্নিগ্ধতার অন্তরের বিরাট তেজস্বিতা দেখিলে মনে হয় যে যেন একটা ভীষণ আগ্নেয়গিরি। বাহিরের প্রকৃতি শস্যশ্যামল, কিন্তু অন্তর তেজস্বিতার বহ্নিশিখায় প্রদীপ্ত।

নিজের কথাবার্ত্তার ত্রুটিটুকু ঢাকিয়া লইবার জন্য অনি তাড়াতাড়ি বনবিহারীর উদ্দেশে ফিরিয়া আসিতেছিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল—বোধ হয় বনবিহারী বাবু তাহার ঐরূপ বাচালতায় একটু অপ্রীত হইয়াছেন। কিন্তু বারান্দার সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিয়াই সেই নির্ব্বিকার কাব্য-মাতালের ভাবটুকু চোখে পড়িতে, অনির সে ধারণা কাটিয়া গেল; সে যেন মনে মনে একটু সোয়াস্তি অনুভব করিল। বনবিহারী তখন আপন

মনে মাথা দোলাইয়া তুড়ি দিতে দিতে আবৃত্তি করিতেছিলেন—

রে চপলা, হাস্য যে তোর
স্নিগ্ধ আলোয় মাখা!
গোপন বুকের অন্তরালে,
প্রলয় তেজের বহ্নি জ্বলে;
প্রাণ কাঁপানো সুরের আগুন
ঘুমের নেশায় ঢাকা॥

(৭)

অনির অক্লান্ত সেবা ও বনবিহারী বাবুর সযত্ন চিকিৎসায় মেজর উনিশ দিন রোগ ভোগের পর উঠিয়া বসিলেন। মেজরের রোগমুক্তিতে অনির মন একটা শান্তি ও তৃপ্তির গৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার চির-ব্যর্থ সেবা যে সার্থক হইবে অনি তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু সে শান্তিও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে নাই। মেজর সারিয়া উঠিলেন; নিজের কর্ত্তব্য ও শ্রদ্ধা সব কিছুর দিক্ দিয়াই অনি এতদিন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই; কিন্তু এখন তো আর নিশ্চেষ্ট ভাবে মেজরের স্কন্ধে ভর করিয়া বসিয়া থাকা চলে না। নিজের জীবন-সংগ্রামে তাহাকে নামিয়া পড়িতেই হইবে। যাঁহার নিকট সে সহস্ররূপে ঋণী হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার ঋণভার আর মানুষ কত বাড়াইতে পারে! অনি তাহার জীবিকা অর্জ্জনের একটা পথ খুঁজিয়া লইবার জন্য ভিতরে ভিতরে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। দাতার হস্ত চির মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট গ্রহীতার সে দান গ্রহণে অবাধ-হস্ত হওয়াকে অনি যেন অন্তরের সহিত সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। বন্ধুত্বের দাবীরও একটা সীমা আছে।

* * * *

সন্ধ্যার সময় মেজরকে ঔষধ খাওয়াইয়া অনি তাহার পড়ার ঘরে আসিয়া বসিল। মেজরের অসুখের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ প্রায় তিন সপ্তাহেরও অধিক অনি তাহার পড়ার ঘরে আসে নাই। টেবিল ও আলমারির চারিদিকে ধূলা জমিয়া উঠিয়াছে; এ মাসের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি যে অবস্থায় আসিয়াছিল, ঠিক্ সেই ভাবেই এখনো পড়িয়া আছে। লাইব্রেরী ঘরের অবস্থা দেখিয়া অনির মনে হইল ইহার পূর্ব্ব অবস্থার কথা! সে যেদিন প্রথম আসিয়া এই ঘরখানির সহিত পরিচিত হইয়াছিল, সে দিন যে অবস্থায় সে ইহাকে দেখিয়াছিল—আজকার অবস্থার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন পার্থক্যই নাই। তবে সাময়িক-পত্র ও বইএর সংখ্যা পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। অনির অবসর সময়ের খোরাক জোগাইবার জন্যই মেজর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইহার পুষ্টি সাধন করিতেছিলেন। সে কথা তিনি না স্বীকার করিলেও, অনির বুঝিতে কণামাত্র বাকী ছিল না। সরঞ্জাম বজায় রাখিলেও লাইব্রেরীর সহিত সম্পর্ক রাখিবার অবসর মেজরের খুব কমই ঘটিয়া উঠিত।

অনির শরীরটা অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তখন আর ঘরের সংস্কার করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। খবরের কাগজখানা হাতে করিয়া খোলা জানালার পাশে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া অনি বসিয়া পড়িল। দেশ বিদেশের সংবাদ দেখিবার প্রবৃত্তি তখন তাহার ছিল না; নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাহাকে যথেষ্ট রূপেই পাইয়া বসিয়াছিল। যে কোন একটা উপায় তাহাকে অবলম্বন করিতে হইবেই। মেজর হিতৈষী ও মহৎ বন্ধু হইলেও—তাঁহার সাহায্যে—তাঁহারই ভাগ্যোপজীবী হইয়া তো অনি বাস করিতে পারে না; তিনি নিঃসম্পর্কীয়। অনিরও সমাজ আছে, মেজরেরও সমাজ আছে; সে সমাজ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সমাজ; তাহার বিধি ব্যবস্থা মানুষকে মানিয়া চলিতেই হইবে। বন্ধুত্বের দাবী যতই পবিত্র হউক; সে নারী—মেজর পুরুষ! সমাজ এ দাবী কখনই সমর্থন করিবে না। লোকালয়ে বাস করিতে হইলে লোকমতকে অবহেলা করিয়া চলা যায় না।

অনি বসিয়া বসিয়া "কর্ম্মখালি"র ছত্রগুলির ভিতর তাহার কর্ম্মজীবনের নির্দ্দেশ খুঁজিতেছিল। কত দূর দেশের বিভিন্ন প্রকারের আহ্বান বহিয়া সংবাদপত্র কর্ম্মপ্রার্থীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অভাবের তাড়নায় মানুষ ছুটিয়া বাহির হইবে, এই আহ্বানে তাহার ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া সেই সুদূর

প্রবাসের পথে। এই অভাব স্নেহের ধার ধারে না; বন্ধুত্বের সহানুভূতিকে সে মুছিয়া ফেলে। অদৃষ্টের অন্বেষণে গৃহীকে উদাস করিয়া বাহির করে। তাহাকেও বাহির হইয়া পড়িতে হইবে—নিজের অদৃষ্টের অন্বেষণে—ঐ একই পথে। তবে তাহার আকর্ষণের বালাই নাই; সমস্ত বাঁধন আপনা আপনিই ছিঁড়িয়া তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

আবার নূতন করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইবার কথা ভাবিতে অনির চক্ষু দুইটী ভারি হইয়া আসিতেছিল। এই দুই তিন মাসের ঘনিষ্ঠতায় এখানকার সব কিছুই যেন আবার তাহাকে আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে; এই ঘর বাড়ী, মেজরের এই মহৎ ও সুদৃঢ় আশ্রয়। মেজরের সহানুভূতি ও স্নেহের কথা ভাবিতে সহসা অনি যেন একটা অকল্পিত আনন্দ ও ভীতিতে শিহরিয়া উঠিল। এ শিহরণ সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই। একটা অজ্ঞাত আনন্দের রঙিন্ তুলি অলক্ষ্যে তাহার সমস্ত বুকের ভিতর কে যেন টানিয়া দিল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটা বিভীষিকার কালো ছায়া সেই গোলাপী আভায় রঙানো চিত্তপটকে গাঢ় মসির প্রলেপে ভরিয়া দিল। অনি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল; তাহার বিবেক যেন নিমেষে তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তিগুলিকে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিল। খবরের কাগজখানিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া অনি দৃঢ়মুষ্টিতে জানালার গরাদে দুইটীকে ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অকারণ বিহ্বলতার উদ্গত অশ্রুকে রোধ করিবার জন্য অনি দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। কাল বৈশাখীর প্রচণ্ড মেঘ পাগল হাওয়ার সঙ্গে মাতামাতি করিয়া তখন সমস্ত প্রকৃতিকে কাঁপাইয়া ফিরিতেছিল। স্থির দৃষ্টিতে অনি আকাশের পানে চাহিয়া ছিল; এ যেন তাহারই বুকের একটা প্রতিচ্ছবি! দূরে অন্ধকারের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের যে উজ্জ্বল রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিমেষেই আবার সেই গাঢ় কালিমায় মিলাইয়া গিয়াছে।

অন্তরের সহিত কয়েক মুহূর্ত্ত যুদ্ধ করিয়াই অনির মনটা প্রকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন বয় আসিয়া জানাইল, সাহেবের দুধ ও রুটী গরম করা হইয়াছে, অনি মুখ না ফিরাইয়াই দৃঢ় অথচ নিম্নস্বরে তাহাকে বলিয়া দিল মেজরকে খাওয়াইবার জন্য। অনির এরূপ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বয় আর কোন কথা বলিবার সাহস পাইল না; সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অনি অবসন্নভাবে চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িল। আজ আর মেজরকে খাওয়াইবার জন্য সে উঠিল না। একটা কথা কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনির মনে হইতেছিল—'মেজর-সাহেব ক্রিশ্চান্! ব্রাহ্ম!'

শিক্ষিত হইয়াও যাহারা নিজের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া নূতন সম্প্রদায় গঠনে যোগদান করিত, নিজের জন্মগত জাতীয়তার গৌরবকে মাথায় লইয়া যাহারা পৃথিবীতে দাঁড়াইতে পারে না, অনি তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিত না। কিন্তু মেজরের বিষয়ে তাহার সে দৃঢ়তা যেন আপনা আপনি কতকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। তাহার দৃঢ়চিত্ত দাদামহাশয়ও মেজরের এই দুর্ব্বলতাকে উপেক্ষা করিয়া মেজরকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। অনিও সে শ্রদ্ধাকে অমান্য করিতে পারে নাই।

কোনো একটা সূত্র লইয়া অনি যখনই মেজরের কথা ভাবিত, তখনই যেন তাহার মনের মধ্যে একটা অচেনা দম্‌কা হাওয়া আসিয়া চিন্তার সমস্ত সূত্রগুলিকে ওলট্ পালট্ করিয়া জট পাকাইয়া তুলিত। অনি কোনোরূপেই সে অসোয়াস্তির সমাধান করিয়া উঠিতে পারিত না। আজও নিজের ভবিষ্য জীবনের ও মেজরের কথা ভাবিতে গিয়া অনি সেই জটিলতার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিষ্কৃতির পথ খুঁজিতে গিয়া আজ শুধু দাদামহাশয়ের শেষ কথাটাই তাহার বারে বারে মনে পড়িতেছিল। তাহার হাত দুইটী ধরিয়া নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া দাদু বলিয়াছিলেন—"দিদিমণি, সমাজ আর শাসনের দরকার মানুষের সম্পদকে নিরাপদ ক'রে রাখ্‌বার জন্যে। বিপন্ন যদি সম্পদের কোনো আশ্রয় পাবার জন্যে সেই সমাজের কোনো একটা গণ্ডীকে 'ভেঙে ফেলে, তাতে পাপ হয় না। নিয়মিত বিধি বা আইনের একটা সূত্র লঙ্ঘন করা হ'লেও, সেই বিধির উদ্দেশ্যকে তো তার দ্বারা ভাল ক'রেই সমর্থন করা হয় দিদি! সমাজ অনুমতি না দিলেও—তোমার দাদুর আদেশ থাক্‌লো।"

দাদুকে যথেষ্ট ভক্তি, এবং মেজরকে শ্রদ্ধা করিলেও অনি তাহার দাদুর শেষ উপদেশটা এতদিন কোনরূপেই মাথা পাতিয়া লইতে পারে নাই। আজ মেজরের আশ্রয়

ছাড়িয়া যাইবার কথা মনে হইতেই অনি সহসা নিজের বুকের ভিতর যে দুর্ব্বলতার ক্ষত দেখিতে পাইল—তাহাতে তাহার নিঃসম্বল চিত্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছিল। অনি সে দুর্ব্বলতাকে প্রাণপণ চেষ্টাতেও ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। দৃঢ়তার নিষ্ঠুর শাসনে তাহার ক্ষতমুখ হইতে যে রক্তস্রোত ছুটিতেছিল, তাহার একমাত্র প্রলেপ সে খুঁজিয়া পাইতেছিল দাদুর ঐ কয়েকটী কথার ভিতর। তবুও অনি স্থির হইয়া ভাবিতেছিল—সেটা দাদুর সত্যকার আদেশ, না—স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার! তাঁহার চিত্তে তো কখনই দুর্ব্বলতা ছিল না!

* * * *

অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকার পর, সহসা খেয়াল হইতেই অনি চাহিয়া দেখিল—খোলা জানালাপথে বৃষ্টির ছাট্ আসিয়া সব ভিজিয়া গিয়াছে। মেজরের ঘরের জানালা তখনও বন্ধ করা হয় নাই, সে কথা মনে হইতেই অনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেজরের ঘরে আসিল।

* * * *

মেজর সমস্ত জানালা দরজা আরও ভালরূপে খুলিয়া দিয়া সোফার উপর চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া ছিলেন। দুধ ও পাঁউরুটি টিপয়ের উপর ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়া আছে। অনি বুঝিল—মেজর সচেতন, কিন্তু ডাকিয়া কোন সাড়া পাইল না।

মেজরের এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমানের সহিত অনি পূর্ব্ব হইতেই পরিচিতা ছিল। মেজর তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তকে সেই সাময়িক বিশিষ্টতা মাত্র লইয়াই বিচার করিয়া দেখিতেন। জীবনের পশ্চাৎ ও সম্মুখের দিকে চাহিয়া চলিবার ধৈর্য্য তাঁহার কখনই ছিল না। এক একটা মুহূর্ত্তের তীব্র খেয়াল তাঁহার সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎকে ছাপাইয়া উঠিত। মেজরের এইরূপ সাময়িক উত্তেজনাগুলিকে অনি উত্তমরূপে চিনিয়াছিল বলিয়াই, দ্বিতীয় কোন চেষ্টা না করিয়া গ্রীন্-শেডে আলোটী ঢাকিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনি যেন ইচ্ছা করিয়াই তাহার সঙ্কোচের উন্মুক্ত রশ্মিকে আবার ধীরে ধীরে টানিয়া তাহার গতি ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

(৮)

বনবিহারীবাবুর একান্ত অনুরোধে সেদিন সন্ধ্যায় অনি ও মেজর তাঁহার প্রবাস-কুটীরে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য উপস্থিত না হইয়া পারিলেন না। এ নিমন্ত্রণে মেজর বিশেষ প্রীত না হইলেও, অনি আনন্দিত হইয়াছিল। সে তাহার দুশ্চিন্তা-পীড়িত অবসরে এইরূপ একটা অবলম্বনই কয়েকদিন হইতে খুঁজিতেছিল।

মেজরের অপ্রীতির কোন কারণই হয় তো ছিল না। কিন্তু তাঁহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য সর্ব্বদার জন্য এরূপ একটা হেঁয়ালি করিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিত, যাহাতে তাঁহার অন্তরের ক্ষুদ্র ভাবও বহির্জগতের চক্ষে একটা অকারণ গুরুত্ব লইয়া চলিত। যাহারা অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর তাহাদের ছদ্ম আবরণ সহজে ভেদ করা যায় না বলিয়াই মানুষ তাহাদের নিতান্ত মূল্যহীন উপাদানগুলিকেও সমীহ করিয়া চলে।

* * * *

ষ্টেশনের কিছুদূরে—প্রকাণ্ড খাল্‌টার পাশে, ছোটবড় নিমগাছের সারির আড়ালে ঢাকা বনবিহারী বাবুর মস্ত বাংলো ও রেলকর্ম্মচারিদের ছোট ছোট কয়েকটী একতলা বাসা। পুরানো লাইনের রেলগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া পাথর ও পোড়া কয়লা পিটাইয়া তাহাকেই রাস্তা করা হইয়াছে। বিশ বৎসরের সঞ্চিত পাথর কুচি ও রাশি রাশি ছাই সর্ব্বত্রই এরূপ কায়েমী স্বত্বে জমিয়া বসিয়াছে যে সমস্ত স্থানটাই যেন মরুভূমির মত শুষ্ক ও নীরস হইয়া গিয়াছে।

বহু যত্নে এই নীরস মাটির বুকে উর্ব্বরতা সঞ্চার করিয়া বনবিহারী বাবু তাঁহার বাংলোর সংলগ্ন ময়দানটীতে ছোট্ট একখানি সুন্দর বাগান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। চারি দিকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা; মাঝে মাঝে দেবদারু ও ইউক্যালিপ্‌টাস্ মাথা তুলিয়া আছে; তাহারি মাঝে অজস্র এপ্রিকট্ ও সিজ্‌নের ফোটা ফুলগুলি বাড়ীখানাকে যেন একটা সুন্দর কবিতার মত করিয়া রাখিয়াছে।

ছুরি আর আইডিনের ভিতর দিয়াও যে ক্যাপ্টেন্ তাঁহার কাব্যরুচিকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনি তাঁহাকে সহস্রবার ধন্যবাদ জানাইয়াছিল।

সন্ধ্যার পর মেজর, অনি, বনবিহারী ও তাঁহার পত্নী

সুলতা বাগানের মার্ব্বেল বেদীটির উপর বসিয়া গল্প জমাইয়া তুলিয়াছিল। সুদূর প্রবাসে অপরিচিতের ভিড়ের মাঝখানে সহসা স্বদেশীকে খুঁজিয়া পাইলে, মানুষ যেরূপ অপ্রত্যাশিত আনন্দে ভরিয়া উঠে, সুলতাকে পাইয়া অনিও সেইরূপ একটা অপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতার সহিত নানা গল্পে অনি এতই মাতিয়া গিয়াছিল যে, মেজর ও বনবিহারী বাবুর কথায় যোগ দিবার অবসর তাহার ছিল না।

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া বনবিহারীবাবু বয়কে ডাকিয়া সকলের খাবার ঠিক্ করিয়া দিতে বলিলেন। হঠাৎ সকলের খাবার কথা শুনিয়াই অনির চমক্ ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বনবিহারীর দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অনি বিশেষ লজ্জিতা হইয়া কহিল—"মাপ্ ক'রবেন, ক্যাপ্টেন্! আমি পূর্ব্বে বল্‌তে ভুলে গেছি। আমার তো—"

বনবিহারীবাবু জানিতেন—অনির কতকগুলি সংস্কার আছে। কিন্তু সে কুসংস্কারের দড়ি যে এখনো তাহার নাকে কাণে টান দিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাবিয়া তিনি যেন বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়াই কহিলেন—"সে কি কথা! সংস্কারের মোহ আপনার এখনো কাটে নি? তা হ'তেই পারে না; গরীবের কুটীরে যখন দয়া ক'রে পদার্পণ ক'রেছেন, তখন অন্ততঃ আজকার মত ও-সংস্কারটাকে ছাড়্‌তেই হবে। যা হোক্ একটু কিছু মুখে না দিলে তো চল্‌তে পারে না অনি দেবী।"

অনি হাতজোড় করিয়া বলিল—"ক্ষমা করুন ডাক্তার-বাবু, যা এতদিনেও মন থেকে দূর ক'রতে পারি নি, জোর ক'রে তাকে ঝেড়ে ফেল্‌বার ক্ষমতা আমার নাই। তবে এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করে' যাচ্ছি যে, আমার তরফ থেকে আপনার আতিথেয়তার কোন ক্রটিই পাই নি। আমি না খেয়েও যে তৃপ্তি ও আনন্দ পেয়েছি, খেয়ে তার চেয়ে বেশী কখনই পেতুম্ না।"

বনবিহারীবাবু বুঝিলেন—ইহা অনির একটা ছদ্ম আবরণ মাত্র। এইখানেই যে তাহার একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা আছে তাহা তিনি জানিতেন। মানুষকে জয় করিবার প্রশস্ত উপায় তাহার দুর্ব্বলতাকে আক্রমণ করা। সেদিন চেষ্টা করিয়াও বনবিহারী অনিকে হার মানাইতে পারেন নাই; কিন্তু সেই দুর্ব্বলতাকে পুনরাক্রমণ করিবার লোভ তাঁহার যথেষ্টই ছিল। যাহাকে সহজে আঁটিয়া উঠা যায় না, দুর্ব্বলতার অবসর লইয়া তাহাকে বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে তিনি ক্রটি করিতেন না। বনবিহারীবাবু বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—"দুনিয়ায় শুধু নিজের তরফের তৃপ্তিটা দেখ্‌লেই চলে না; পরের তরফ্ বলেও একটা জিনিষ আছে। মাপ্ কর্‌বেন; আপনাদের এই যে সংকীর্ণতা—যা শুধু নিজের তরফটাকেই দেখ্‌তে শিখিয়েছে—তার মূল কারণ ঐ কুসংস্কারের পচা আবর্জ্জনা। ওই আবর্জ্জনাই আমাদের সমাজ, দেশ, জাতীয়তা—সব কিছুকেই পঙ্কিল ক'রে তুলেছে। এইটাই সব চেয়ে দুঃখের বিষয় যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই সব আবর্জ্জনাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে, ভিতরটাকে পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌তে পারে নি। ঐ সব বাজে সংস্কার,—না আছে তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, না আছে কোন বাস্তব মূল্য—বেড়াজালের মত ঘিরে ঘিরে দেশটাকে উচ্ছন্নের পথে টেনে নিয়ে গেছে,—জাতিটাকে অধঃপতনের চরম সীমায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এ বাঁধন যতদিন না ছিঁড়্‌বে, ততদিন বিশ্বমানবের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। শিক্ষা পেয়েও যাদের সে জ্ঞান হয় না, তাদের শিক্ষার কোনই মূল্য নেই; তা'দিকে শিক্ষিত ব'লে ধারণা ক'রতেই আমি পারি না।"

বনবিহারীবাবুর কথার মধ্যে যে উষ্ণতা ছিল, তাহা উপলব্ধি করিলেও অনি বেশ ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে বলিল—"ওই নিয়ে তর্ক ক'র্‌বার ইচ্ছা আমার নেই, ক্যাপ্টেন্! জীবনের পথে যার যা ভাল লাগে সে তাই নিয়ে চল্‌বে; তাতে সমালোচনার কিছু নেই। তবে মূর্খ যে ভুলটা ক'রে চ'ল্‌ছে—আপনারাও যে সেই ভুলটাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বার চেষ্টায় নতুন ভুলে জড়িয়ে যাচ্ছেন কেন, সেইটা আমি বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না। একটা বিধিবদ্ধ সামাজিক রীতিকে অবিচারিতভাবে মেনে চলাই যদি সংস্কার হয়, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই সব সংস্কারকে অবিচারিত ভাবে শুধু 'সংস্কার' বলেই বাদ দিয়েও ঘৃণা ক'রে চ'ল্‌বার বিধিবদ্ধ রীতিটাও কি সংস্কার নয়? সংস্কার হ'লেই কি সেটাকে ঘৃণা ক'রতে হবে? বিশেষতঃ আপনি যাকে সংস্কার

বলেন– তা যে দুনিয়ায় নেই কোন্ জাতির, তা ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারি না।"

অনির কথায় বাধা দিয়া বনবিহারীবাবু বলিলেন—"তা ব'ল্‌বেন না অণিমা দেবী। দুনিয়ার সভ্য জাতিদের যদিও কোনো সংস্কার থাকে, তবে সে সংস্কারের নিশ্চয় কোনো একটা বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। নিছক্ গোঁড়ামি যাকে বলে, তা তাদের নেই।"

পূর্ব্ববৎ ধীরভাবেই অনি বলিয়া চলিল—"তা নয় ক্যাপ্টেন, সকল জাতিরই এমন অনেক সংস্কার আছে, যার বৈজ্ঞানিক মূল্য মিল্‌বে না। তবুও সেগুলোকে তারা মানে, কারণ সেগুলো তাদের সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় বৈশিষ্ট্য; এক কথায় যাকে 'স্বাতন্ত্র্য' বলা যেতে পারে। বুঝ্‌লেন?"—ঈষৎ হাসিয়া অনি বনবিহারীর পানে চাহিল।

বনবিহারী বোধ হয় তাহাতে আরও একটু জ্বলিয়া উঠিয়া বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু অনি তাড়াতাড়ি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"আর আপনি যে ব'ল্‌ছিলেন—'ভিত্তিহীন সংস্কারগুলোই জাতির উন্নতির পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে, বিশ্ব-প্রেম ক'র্‌বার মত আমাদের অন্তরকে প্রশস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে দিচ্ছে না।' সেটা মস্ত ভুল। ঐ আবর্জ্জনাই আমাদের পথ রোধ ক'রছে, না—তাকে না-জেনে না-চিনে, আবর্জ্জনা ব'লে ঘৃণা ক'র্‌বার সঙ্কীর্ণতা আমাদের পথ রোধ ক'রছে, তা ঠিক্ বলা যায় না। আমার মনে হয়, 'নিজস্ব'কে অবহেলা ক'রে, 'পরস্ব'কে পূজো ক'র্‌বার কাপুরুষতাই আমাদের পিছিয়ে রেখেছে। যে মা-ভাইকে ভালবাস্‌তে পারে না, তার পক্ষে বিশ্ব-সেবায় আত্মনিয়োগ ক'র্‌বার ইচ্ছাটা নিতান্ত বাতুলতা নয় কি? জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দিয়েও দশা কতকটা তাই ঘটে; সিঁড়ি ভেঙে ফেলে চারতলায় উঠ্‌বার পথ পরিষ্কার করার মত। কবি-কল্পনার বিশ্ব-প্রেম আর বাস্তব বিশ্ব-প্রেমে অনেক তফাৎ। নিজস্বকেই ব্যাপ্ত ক'রে নিয়ে পরস্বের সঙ্গে মিল করাতে হবে; ছেঁটে ফেলে নয়।"

"তা' কখনই হ'তে পারে না অনিদেবী। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিকে যদি মূল্যহীন ব'লে বুঝতে পারি, তবে সেটাকে ত্যাগ ক'রতেই হবে। যা মেনে চলে' এতকাল কোন লাভই হয় নি, সেটা যে কেবলমাত্র ভার হ'য়ে আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে, তা আপনাকে স্বীকার ক'রতেই হবে। ঐ ভার যত দিন ঘাড় থেকে না নাম্‌বে, ততদিন আমাদের কোন আশাই নাই। এতদিন হয়তো মূল্য যাচাই ক'রতে পারে নি ব'লে লোকে তাকে মেনে এসেছে।"

"তা হবে। তবে এ জাতি যেদিন স্বাধীনতা ও সভ্যতার শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রেছিল, সেদিনও তাদের ঐ বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজেদের গৌরবের জন্যে তারা বুক পেতে দিতে পেরেছিল ব'লেই তাদের আসন তারা বিশ্বগৌরবের মাঝখানে দাঁড় করাতে পেরেছিল। পরের মর্য্যাদাকে পূজো ক'রতে গিয়ে তারা নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দেয় নি। আপনি কি ব'ল্‌তে চান্ যে, তারা ঐ সব বৈশিষ্ট্যের মূল্য যাচাই ক'রতে পারে নি ব'লেই তাকে মেনে চলেছে!" বলিয়াই অনি একটু হাসিল।

বনবিহারীবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন—"আপনার যুক্তির কোন মাথামুণ্ডই নেই অণিমা দেবী। সভ্য জগৎ যাকে মূল্যহীন বলে' বুঝ্‌তে পেরেছে, তা যে মূল্যহীন তাতে কোন সন্দেহই নেই। বাস্তব জীবনে আমরা ওসবের কোন মূল্য বুঝ্‌তে পারি না; সুতরাং তাকে মাথায় তুলে নিয়ে, অকারণ নিজের মূর্খতাকে জাহির করা হয়। এতে কোন লাভই নেই, বুঝ্‌লেন!"

অনি পুনরায় বেশ দৃঢ় ও গম্ভীর হইয়াই বলিল—"লাভ আছে কি না আছে তা নিয়ে তর্ক চলে না। তবে এত দিন যাতে কোন লোকসান্ হয় নি, তাকে বাদ দিলেই যে লাভ হবে তার কোন মানে নাই। মূল্য যাচাইএর কথা বল্‌চেন; কিন্তু এটা মনে রাখ্‌বেন বনবিহারীবাবু, যে—ত্যাগের ভিতর দিয়ে যার প্রতিষ্ঠা গড়ে' উঠেছে, ভোগের ভিতরে বসে' তার ওজন যাচাই করা যায় না। তাতে সব কিছুই বিকৃত বলে' মনে হয়। যার বাস্তব মূল্য আমরা বুঝ্‌তে পারি না, তার সবগুলোকেই যদি বাদ্ দিয়ে চ'ল্‌তে হয়, তা হ'লে তো দেখ্‌ছি শেষ পর্য্যন্ত পুরোদস্তর নাস্তিক হ'য়ে উঠ্‌তে হবে।"

অনির কথা শেষ না হইতেই সুলতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"তা কি আর ব'ল্‌তে দিদি! ওঁর মত পুরো নাস্তিক আর দুটি নেই। ওঁর সঙ্গে তর্ক করা মিছে; উনি ভাঙ্‌বেন—তবুও নুইবেন না।"

সুলতা এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ইঁহাদের যুক্তিতর্ক শুনিতেছিল। অনির ভিতরে যে এত কথা বলিবার শক্তি আছে, তাহা সে ভাবিতেই পারে নাই। স্বামীর নাস্তিকতাকে সে সর্ব্বদা মানিয়া লইতে পারিত না বলিয়া, অনেক দিন অনেক কথা লইয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। অনির নিকট তাঁহাকে বিব্রত হইতে দেখিয়া সুলতা বেশ একটু আমোদ পাইতেছিল; যদিও তাহার অন্তরের গোপন ইচ্ছাশক্তি স্বামীকে জয়ী করিবার জন্য যথেষ্টই চেষ্টা করিয়াছিল।

সুলতার হাতখানাকে চাপিয়া ধরিয়া অনি হাসিয়া বলিল—"নাস্তিক তো আমরা সবাই বোন্! তবে তফাৎটা হ'চ্ছে এই যে—নাস্তিক হ'লেও আমরা মূর্খ। ওঁদের মত বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় তো নেই; কাজে কাজেই ওঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা চ'ল্‌তে পারি না। বিদ্বান্ যদি নাস্তিক হন্, তবে তাঁর নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের সীমা মূর্খ নাস্তিকের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি তাঁর জ্ঞান-গরিমায় যে সব মূল্যবান্ সংস্কারকেও তুচ্ছ ক'রে অবহেলার সঙ্গে পায়ে দ'লে যান্, মূর্খ তা' পারে না। নিজের অজ্ঞতায় মূর্খ যে সংস্কারের রুদ্ধদ্বারে প্রবেশ ক'র্‌তে পারে না, উর্ব্বর-মস্তিষ্ক পণ্ডিতের মত অনুমান ও কল্পনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের সাহায্যে সে বিষয়ের সমৃদ্ধি অস্বীকার ক'রতে তা'র একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচ আসে। মূর্খ যেটাকে ভক্তি করে না, সেটাকে ভয় করে, অন্ততঃ যত দিন শক্তির মল্ল পরীক্ষায় সে জয়লাভ ক'রতে না পারে।"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া, বনবিহারীবাবু সহসা তাঁহার অভ্যস্ত হাসিতে সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আর নয়; আজও না হয় আমিই হার মেনে নিচ্ছি। রাত্রি অনেক হ'য়ে গেছে। অন্ততঃ একটু জলযোগ ক'রেও আমাকে সুখী ক'র্‌বেন বলে' আশা করি অণিমা দেবী।"

মেজর এতক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া ইহাদের আলোচনা শুনিতেছিলেন হঠাৎ একটা ধাক্কা খাইয়াই যেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"ব্রেভো! ক্যাপ্টেন! আমার কাছে যেটা শুধু দীর্ঘনিশ্বাসের রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, আপনি যে তার স্বরূপটাকেই পেয়েছেন, তার জন্য আপনার সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না।"

এ কথার তাৎপর্য্য বনবিহারী বাবু কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু অনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"এ বিকৃত-স্বরূপ আবিষ্কারের কৃতিত্ব ওঁর সৌভাগ্যের, না উর্ব্বর কল্পনার—তা উনিই ভালো জানেন।"

মেজর রায়ের মুখে যেন একটা অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। স্বল্প-আলোকিত অন্ধকারের মধ্যে তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। বনবিহারীবাবু মেজরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাইনিং রুমে লইয়া চলিলেন; অনি বসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল।

সুলতা একখানি থালায় করিয়া কতকগুলি ফল আনিয়া অনির সম্মুখে উপস্থিত করিল। এ ব্যবস্থা বন-বিহারী বাবুই পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু অনি তাহা বুঝিতে পারে নাই। (ক্রমশঃ)



রবীন্দ্র-জয়ন্তী *

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

বাঙ্গালার আজ মহাসৌভাগ্য। যাঁহার গৌরবে আজ এ দেশ গৌরবান্বিত, আমরা সেই কবির সপ্ততি বৎসরের উৎসব করিতেছি। এ সৌভাগ্য এ অভাগ্য দেশের কদাচিৎ ঘটে। যে সব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এ দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁরা প্রায়ই অকালে বিদায় লইয়াছেন—সত্তর বৎসর প্রায় কেহই অতিক্রম করেন নাই। আজ এ দুর্নিয়মের দুইটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাঙ্গলার অশেষ সৌভাগ্য সূচনা করিতেছে। একটি রবীন্দ্রনাথ, আর অপরটি তাঁরই অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ জগদীশচন্দ্র।

আরও সৌভাগ্যের কথা এই যে সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমে রবীন্দ্রনাথ স্থবির বা নিষ্ক্রিয় নহেন; তাঁর প্রতিভা আজও পরিপূর্ণ গৌরবে দেদীপ্যমান। আজ আমরা যাঁর পূজায় সমবেত হইয়াছি, সে রবি অস্তাচলগত ক্ষীণদীপ্তি ভাস্কর নহেন, আজও তাঁর প্রতিভা মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের পরিপূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর। কালের নিয়মে তাঁর শরীরে আজ হয় তো বার্দ্ধক্যের চিহ্ন স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু অন্তর যে তাঁর আজও "যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল", তাঁর অনুভূতি ও প্রকাশের শক্তি যে আজও যৌবনের মতই প্রবল ও দ্যুতিমান, সে কথা তিনি না বলিয়া দিলেও আমরা অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম।

তাই আজ সমস্ত বঙ্গদেশ, সমস্ত ভারত, সমস্ত জগৎ বাঙ্গলার এই গৌরব-রবির আনন্দ-কল্লোলময় স্তবগানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে; দিকে দিকে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর মঙ্গলগাথা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। মিথিলার কেন্দ্রস্থলে আপনারা তাঁর যে জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে আমাকে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিয়া আমাকে মহাসম্মান ও আনন্দ দান করিয়াছেন। আপনাদিগকে আমি কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না।

বিহার আমার কাছে বিদেশ নয়। আমার শৈশবের অনেকগুলি বৎসর এই প্রদেশে কাটিয়াছে। মজঃফরপুরের অনতিদূরে মোতিহারীতে আমার শৈশবের যে কয়টি আনন্দময় বৎসর কাটিয়াছে তার স্মৃতি যে আমার অন্তরে বিলুপ্ত হয় নাই, যাঁরা আমার উপন্যাসগুলি পড়িয়াছেন তাঁহারা সে কথা স্মরণ করিতে পারিবেন। সাহিত্য-সাধনায় আমি কোনও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিয়াছি কি না জানি না, কিন্তু যদি সে সৌভাগ্য আমার হইয়া থাকে, তবে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব যে, আমার সে সফলতার প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছিল এই দেশে আমার শৈশবে। মোতিহারী স্কুলে পড়িবার সময়ই সাহিত্য-রচনার কল্পনা আমার মস্তিষ্কে প্রথম প্রবেশ করে—সেইখানেই আমি আমার প্রথম কবিতা রচনা করি। কি লিখিয়াছিলাম স্মরণ নাই, স্মরণ করিবার প্রয়োজনও নাই, কেন না স্মরণ করিয়া রাখিবার মত কিছু তখন লিখি নাই। কিন্তু বেশ স্মরণ আছে যে, লিখিবার কল্পনা ও ব্যর্থ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল এই দেশেই। সুতরাং বিহার প্রদেশের আহ্বান আমার কাছে পরম লোভনীয় হইয়াছিল এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এ তো শুধু বিহারের আহ্বান নয়—এ আহ্বান আপনাদের মুখপাত্র হইয়া পাঠাইয়াছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজন সেই মহীয়সী নারী যাঁর নাম বঙ্গভারতীর সভায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া গিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি-মালিকায় যিনি একটি পরম ভাস্বর রত্ন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কাছে এ আহ্বান আমার পক্ষে এতবড় সম্মান যে আমি ইহাতে যদি একটু অসঙ্গতরূপ গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি তবে হয় তো আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

আপনাদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসবে সভাপতিত্ব করিতে নিমন্ত্রিত হইয়া তাই আমি নানা কারণে সম্মানিত, গর্ব্বিত ও উল্লসিত হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া আমি আপনাদিগকে এমন কোনও কথা বলিতে পারিব না

* মজঃফরপুরে—সভাপতির অভিভাষণ

যাহাতে আপনাদের তাক্ লাগিয়া যাইবে। তবু রবীন্দ্রনাথকে আমি যেমন ভাবে বুঝিয়াছি, এবং তাঁর-গৌরব আমার চোখে যেমন করিয়া লাগিয়াছে, সে সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা আপনাদের কাছে আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমি যখন প্রথম পড়িয়াছিলাম—সে আজ অনেক দিনের কথা—তখন আমার সব চেয়ে বেশী বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল এই দেখিয়া যে, আমার মনের ভিতর যে সব অস্পষ্ট অনুভূতি উঁকি ঝুঁকি মারে, সেই সব কথা তিনি অপূর্ব্ব সুন্দর ভাষায় সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কৈশোরে ও যৌবনে যখন তাঁর "মানসী" ও "সোণার তরী" পড়িয়াছিলাম, তার পর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে যখন তাঁর 'চিত্রা' পড়িয়াছিলাম, তখন ঠিক এই কথা মনে হইয়াছিল অনেকগুলি কবিতা পড়িয়া। তার পর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রের বোঝা মাথায় লইয়া যখন বাহির হইলাম, তখন 'নৈবেদ্য' পড়িয়া দেখিতে পাইলাম যে, যে-সব তত্ত্ব লইয়া দর্শন এত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিয়াছে তার কি সরস সুন্দর সুস্পষ্ট প্রকাশ 'নৈবেদ্যে'র কবিতায়। তার পর, সে বিস্ময় কাটিয়া গেল, কিন্তু তৃপ্তি রহিয়া গেল। যখনি যাহা পড়িয়াছি তখনই অনুভব করিয়াছি কবি যেন আমার মনের কোন অস্পষ্ট অনুভূতি টানিয়া বাহির করিয়া তাকে অপরূপ ভাষায় এক লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দান করিয়াছেন তাঁর কবিতায়।

এইটিই কবির কাজ, এইখানেই কাব্যের সার্থকতা, ইহাতেই তার মাধুর্য্য। কবি এমনি করিয়া সবার মনের ভাষা ফুটাইয়া বলিতে পারেন বলিয়াই তাঁর লেখা তাঁর পাঠকের চিত্ত হরণ করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে, বিভিন্ন বয়সের অনুভূত নানা বিচিত্র বেদনা এমনি করিয়া সুপটু তুলিকার পেলব স্পর্শে সূক্ষ্ম রেখায় চিত্রিত করিয়া বিশ্বমানবের সর্ব্ববিধ বিচিত্র অনুভূতি এমন পরিপূর্ণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, সকল দেশের সকল মানুষ ইহার ভিতর কোথাও না কোথাও তার মনের সব কথারই প্রকাশ দেখিতে পায়। শিশু পায় শিশু-চিত্তের ভাব ও চিন্তার প্রকাশ, যৌবন পায় যৌবনের তীব্রতম ও সূক্ষ্মতম অনুভূতির পরিচয়, পরিণত-বয়স্ক পায় তাদের গভীরতর চিন্তা ও অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। প্রতি মানবের মনের গোপন কন্দরে যেখানে যে ক্ষীণ অশ্রুত শব্দটি আছে, তাহা যেন রবীন্দ্রনাথের লেখনী-মুখে মাইক্রো-ফোনের ভিতর নিঃশ্বসিত ক্ষীণ শব্দের মত পরিপুষ্ট হইয়া সারা বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জগতের কোনও কবিই মানব-চিত্তকে এরূপ ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। এতটা অন্তর্দ্দৃষ্টি, এতটা সহানুভূতি, এতখানি দরদ, এত পরিপূর্ণ রূপবোধ, এমন অপরূপ বিকাশপটুত্ব দিয়া খুব অল্প কবিই মানব-চিত্তের দলগুলি বিকশিত করিয়া তার অন্তরের সকল শোভা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। যাঁরা করিয়াছেন তাঁদের ভিতরেও অনুভূতির এতখানি ব্যাপকতা, এত অপরূপ বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব হয় নাই, কেন না রবীন্দ্রনাথের মত দীর্ঘ সাহিত্য-জীবন ভরিয়া মানব-চিত্তের সবগুলি স্তর এমন পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার সৌভাগ্য সকলের হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু—অনেক রকমে অনেক কর্ম্মে তিনি আপনাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সকল কর্ম্মে, জীবনের সকল প্রকাশে তিনি আদ্যোপান্ত কবি, রূপ রসের তিনি উপাসক।—যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন সকলই তিনি রূপরসে মণ্ডিত করিয়াছেন। তাই দর্শন ও পলিটিক্সের মত বিষয়কেও তিনি কাব্যরসে মণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁর দর্শন কঠোর তত্ত্বের সমষ্টি নয়, তাঁর অনুভূত সত্যের রসরূপ তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁর পলিটিক্স সমাজ-জীবনের একটি সৌষ্ঠবযুক্ত, শোভা ও মঙ্গলময় কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা মানবচিত্তের মূলগত শিবসুন্দরের রসমূর্ত্তির প্রকাশ!

এই কবির দৃষ্টি ও অনুভূতি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—চিরদিন কবির দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন প্রকৃতিকে, জগৎকে, জীবনকে। তাঁর সেই দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবন তার রূপরসময় মূর্ত্তিতে তাঁ'র জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে;—সেই বিভিন্ন রূপের একটা সামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

কৈশোরের কবি প্রকৃতির সুধু রূপরসে ভরপুর। রূপময়ী সে প্রকৃতি সুধু নয় তাহা প্রাণময়ী—তার রূপের ও প্রাণের খণ্ডখণ্ড প্রকাশ তাঁর মুগ্ধ চিত্তে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁর আবেগময় ভাষায়। ক্রমে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির সমগ্র রূপ, তার সমগ্র প্রাণ। সেই অনুভূতির গৌরবে মহিমান্বিত

হইয়া উঠিয়াছে পরিণত যৌবনের রচনা। তার প্রকাশ "সোণার তরী" ও "চিত্রার" বহু কবিতায় আছে। দু' একটি দৃষ্টান্ত দিব। 'যেতে নাহি দিব" কবিতায় কন্যার কণ্ঠে 'যেতে নাহি দিব' বলিয়া আবদার শুনিয়া কবি—

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খর বেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ড মেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগ যুগান্তর ক্লান্ত দিগন্ত বিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিঃশ্বাস।
কি গভীর দুঃখ মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়।" ধরণীর
প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরদিন অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।" সবে
কহে "যেতে নাহি দিব।" তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, "যেতে নাহি দিব।"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব' নিব'
আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব নারে।"
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।"—

"বিশ্বনৃত্য", "বসুন্ধরা" প্রভৃতির মধ্যে এমনি সমগ্র প্রাণময়ী প্রকৃতির রসমূর্ত্তি কবি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি কবিতামাত্র আমি উদ্ধার করিব। "সন্ধ্যা"য় কবি বলিয়াছেন—

গৃহকার্য্য হ'ল সমাপন,
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।
অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে;

* * * *

ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন নিমেষে
কত যুগ যুগান্তের অতীত আভাস
কত জীব জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা
তার পরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা
তার পরে স্নিগ্ধ শ্যাম অন্নপূর্ণা লয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটী জীব—কত দুঃখ কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু নাহি তার শেষ,
ক্রমে ঘনতর হ'য়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্বপরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হ'তে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—"আরো কোথা?" "আরো কতদূর?"

সমগ্র পৃথিবী সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে এখন কবি মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তার প্রাণের গভীরতম কথা যেন তাঁর হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহাই তাঁর প্রকৃতির পরিচয়ের শেষ স্তর নয়। 'নৈবেদ্য' ও "গীতাঞ্জলী"র কবিও প্রকৃতির রূপরসে ভরপুর, সমগ্র প্রকৃতি তাঁর অন্তরে রসের সঞ্চার করিতেছে। কিন্তু সে প্রকৃতি সুধু প্রকৃতি নয়, নিজস্ব একটি প্রাণের অনুভূতিতে তিনি বিভোর নন, এই স্তরে প্রকৃতি ভগবানের রূপ, তার অশেষ রূপলাবণ্যের ভিতর কবি দেখিতেছেন সেই রূপরসের অশেষ সৌন্দর্য্য। "শ্রাবণ ঘন গহন-মোহে" তিনি তাঁর "গোপন চরণ" দেখিতে পান। এখনও—

শালের বনে থেঁকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে

জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে

কিন্তু তাহা দেখিয়া কবি ভাবেন—

মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে!

গীতাঞ্জলির ছত্রে ছত্রে এই ভাব—প্রকৃতির অপরূপ শোভার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সে শোভার উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন কবি তাঁর জীবন দেবতার রসে রূপে। তার দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কবির হৃদয়ের এই অনুভূতির পর কবির ভিতর আবার নবজীবনের স্পর্শ দেখিতে পাই 'বলাকায়'। 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' গীতাঞ্জলীতে তাঁর যে জীবন তার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বুঝি কবি বলিয়াছেন,

"চ'লেছিলাম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারা দিনের পরে
কোথায় শান্তি স্বর্গ;
এবার আমার হৃদয় ক্ষত
ভেবেছিলাম হবে গত
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলার নত
তোমার মহাশঙ্খ!
আরতি দীপ এই কি জ্বালা?
এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথবো রক্তজবার মালা?
হায় রজনী-গন্ধা!
ভেবেছিলাম বোঝা বুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
ল'ব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকলো বুঝি
নীরব তোমার শঙ্খ।

কবি ফিরিলেন। যৌবনের পরশমণি আবার তাঁর প্রাণে স্পর্শ করিল, নূতন জীবনের বাঁণী, প্রাণের বিদ্রোহের বাণী তিনি শুনাইলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির অনুভূতির স্বরূপ বদলাইয়া গেল। এখনও প্রকৃতি তাঁহার চোখে ভগবানের প্রকাশ; কিন্তু শান্তির ভগবান সে নয়—সে কর্ম্মের ভগবান, যুদ্ধের ভগবান। প্রকৃতির ভিতর প্রাণের বিপুল প্রকাশ যে,—

ঝড়ের মাতন! বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাসে আকাশখানা ফেড়ে

প্রমত্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাই তাঁর দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিল। তিনি আকৃষ্ট হইয়া চাহিলেন হংসবলাকার পানে 'ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত' যাহাদের পাখা

রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

প্রকৃতির অনুভূতির দিক দিয়া কবির জীবনের এই ক্রম-বিকাশের স্তরের পরিচয় আমরা পাই চারিদিকে।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ প্রেমের কবি। প্রেমের অপূর্ব্ব মধুময় অনুভূতির সূক্ষ্ম পরদাগুলি তিনি এত সুপ্রচুর রসের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁর এই স্তরের কবিতাগুলি প্রতি যুবক-যুবতীর একান্ত প্রিয়তম হইয়া চিরদিন বাঁচিয়া রহিবে। কিন্তু প্রেমের খণ্ড খণ্ড সূক্ষ্ম অনুভূতিতেই তাঁর কবিতা পরিনিষ্ঠা লাভ করে নাই। তার একটা বিরাট সমগ্র মূর্ত্তি তিনি কল্পনা করিয়াছেন—সে কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর 'উর্ব্বশী'। সকল যুগের সকল প্রিয়া তাঁর দিব্য-দৃষ্টির সম্মুখে সম্মিলিত হইয়া উঠিয়াছে "উর্ব্বশীর" নব কলেবরে, আর সেই বিশ্বপ্রেয়সীর যে অপূর্ব্ব স্তব-গান তিনি গাহিয়াছেন প্রেমের সাহিত্যে তাহা চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

এই স্তরে তাঁর প্রেম যেমন গভীরতায় তেমনি গৌরবে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বে প্রেমের স্থান তাঁর কাছে পরম গৌরবময়—ভগবৎপ্রেমের কাছেও তাকে তিনি খাটো করিয়া দেখিতে পারেন না। তাই 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম গীতিহার

গাঁথা হয়ে নরনারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

এখনও তিনি বৈষ্ণব-কবির প্রেমের কবিতার গভীরতর সাধনার অধিকারী নহেন। যেখানে

এ গীত উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর তাঁর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে;

সেখানে তিনি "দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে।"

কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি আর বাহির দ্বারে দাঁড়াইয়া নন, অন্তরের মজলিসে তাঁর প্রবেশ ঘটিয়াছে। 'গীতাঞ্জলীর' গানে গানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে সেই বৈষ্ণব কবিতার অন্তরের সুর—তাঁর প্রেম পূর্ণতর গভীরতর পরিণতি লাভ করিয়াছে—দেবতাকে তিনি প্রিয়রূপে লাভ করিয়াছেন। তাঁর এই অপূর্ব্ব সরস নিবিড় ভগবৎ প্রেমানুভূতির একমাত্র তুলনা আছে বৈষ্ণব কবিতায়, আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না।

তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ, কবির mission সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ তাঁর জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রূপে তাঁর চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিণত যৌবনে "পুরস্কার" কবিতায় তাঁর প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন

ধরণীর তলে, গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।

সংসার মাঝে দু'য়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু'য়েকটি কাঁটা করি' দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।

সুখ হাসি আরও হবে উজ্জল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহ সুধামাথা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।

প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে'
আরেকটু স্নেহ শিশু মুখ পরে
শিশিরের মত রবে।

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
জাগিছে তেমনি সুর;

কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু'চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।

শুধু এইটুকু। জগৎ ও জীবনের সুন্দর ও মধুর রূপ ফুটাইয়া তোলা, ইহাই এ স্তরে কবির জীবনের আকাঙ্ক্ষা!

কিন্তু এইটুকুতে তাঁর তৃপ্তি শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া গেল। প্রাণের ভিতর একটা আকুল ক্রন্দন ক্রমে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, গভীর বেদনার সুরে সেই দিন কবি গাহিলেন, "এবার ফিরাও মোরে।"

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

* * * *

বলিলেন—

যে দিন জগতে চলে' আসি
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু খেলাবার বাঁশী।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হ'য়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে' গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার সীমা। সে বাঁশীতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে

শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি, তবে ধন্য হবে মোর গান
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

মানবের দুঃখ দৈন্য অবিচারের ব্যথায় জর্জ্জর দুঃখীর দুঃখানুভূতির অশ্রু ও তাহা নিবৃত্ত করিবার আকুল প্রতিজ্ঞাপূর্ণ এই অপূর্ব্ব মধুর কবিতা কবির জীবনের এক মহাসন্ধিস্থলে লিখিত। ইহা তাঁর কবি-জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার একটা প্রকাণ্ড বিপ্লবের সূচনা করিল। 'দু চারিটি কথা রেখে যাব সুমধুর' বলিয়া কবি আর সংসার হইতে ছুটি লইয়া পরিতৃপ্ত নন। মানবের সেবার একটা বৃহত্তর বিপুলতর আদর্শ তাঁর চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে আদর্শ তাঁর সাহিত্য-জীবন ও কর্ম্ম-জীবন অশেষ ফলপ্রসূ করিয়া দিয়াছে।

তাঁর জীবনের এমনি আর একটা বৃহৎ সন্ধিস্থল আসিয়াছিল অনেক দিন পরে। কবি তখন পঞ্চাশোর্দ্ধে আপনাকে জীবন-সন্ধ্যায় উপনীত ভাবিয়া আবার ছুটি লইয়াছেন। জীবনের শেষে দেবতার চরণে আপনাকে নিবেদিত করিয়া তিনি তখন দেবতাকে নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলী দিতেছেন, জীবন খেয়ার পারের কড়ি সংগ্রহ করিতেছেন। সেই সময়ে তাঁর কাছে আসিল একটা বৃহৎ আহ্বান—নূতন ভাবে সাড়া দিয়া তাঁহার বীণা আবার নূতন সুরে অভিনব মূর্চ্ছনায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এতদিন রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ছিলেন বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গালীর কবি। যাদের সুখ দুঃখের কথা অমর সঙ্গীতে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য তিনি সাধনা করিয়াছিলেন, নব নব প্রেরণা ও উদ্দীপনা দিয়া তিনি যাঁদের সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তারা সকলেই বাঙ্গালী। কিন্তু এক শুভ মুহূর্ত্তে কবি ইয়োরোপ যাত্রার অবসরে গীতাঞ্জলীর ইংরাজী অনুবাদ করিয়া বিশ্বের দরবারে তাঁর সঙ্গীত শুনাইলেন, চারিদিকে জয়ধ্বনি বাজিয়া উঠিল, বাঙ্গলার কবি বিশ্বের দরবারে জয়মাল্য লাভ করিয়া তাঁর জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিলেন। তখন তিনি অনুভব করিলেন যে তাঁর সেবার আকাঙ্ক্ষা রাখে শুধু বাঙ্গলার মাঠে ঘাটে বা প্রাসাদের বাঙ্গালী নরনারী নয়, বিশ্বের নরনারী। তাদেরও প্রাণের ভাষা, তাদেরও আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাব্যে ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্য তারা তাঁর মুখ চাহিয়া আছে।

ইহার পর হইতে রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে একটা প্রকাণ্ড রূপান্তর দেখিতে পাই, তার ভিতর তাঁর কবি-জীবনের আদর্শের একটা নূতন বিস্তার, বিশ্বের বিপুল প্রাণের একটা নূতন প্রেরণা ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁর উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে এই বিশ্বসেবার সুর নানা বিচিত্র রূপে ধরা দিয়াছে।

জীবনে তাঁর সন্ধ্যা আসিয়াছে ভাবিয়া কবি আরতির প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন। এখন দেখিলেন সন্ধ্যা কোথায়? ইয়োরোপের আকাশে সবদিন সূর্য্যাস্তেই তো সন্ধ্যা আসে না—তার পরেও থাকে দীর্ঘ দিবসের আলো, কর্ম্মের প্রচুর অবসর। সেখানে বসিয়া কবি অনুভব করিলেন, আরতির প্রদীপ জ্বালার সময় তাঁর এখনো আসে নাই, তাঁর সম্মুখে আছে অশেষ কাজ। 'ফাল্গুনী'তে তিনি জগৎকে শুনাইলেন যে জগতের যে বিরাট বুড়োর ভয় সেটা নিতান্তই ভুল—সে বুড়ো নেই। গাহিলেন

আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

তিনি সবুজকে, কাঁচাকে বরণ করিলেন, জীবনে যৌবনকে নূতন করিয়া উদ্বোধন করিয়া লইলেন।

গীতাঞ্জলীর যে সুর, তাহা তাঁর এখনকার জীবনেও লুপ্ত হয় নাই—সে যে লুপ্ত হইবার নহে, কিন্তু তাঁর সেই ভগবৎ প্রেমের ভিতর প্রাণের একটা বিপুল স্পন্দনের অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে। অন্ধ বাউলের গানের যে ভগবান তার সঙ্গে গীতাঞ্জলীর ভগবানের প্রভেদ আছে। গীতাঞ্জলীর ভগবান শান্তির দেবতা, ফাল্গুনীতে তিনি কর্ম্মের দেবতা—এগিয়ে চলার দেবতা। তিনি প্রলয় নাচনে উন্মত্ত নটরাজ।

এই নূতন অনুভূতি, নূতন প্রেরণার ফলে কবির কাব্য নূতন রসে নূতন অর্থে নূতন প্রাণে পরিপূর্ণ ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। এক দিকে তিনি ফাল্গুনী ও বলাকায় প্রাণের মাতনভরা আবেগভরা আনন্দের গান গাহিলেন, 'আধ-মরাদের ঘা দিয়ে' বাঁচাইবার জন্য কোমর বাঁধিলেন, সবুজ

পত্রে লেখা গল্প উপন্যাস ও পরবর্ত্তী বহু প্রবন্ধে আমাদের দেশব্যাপী নির্জ্জীব অসাড় প্রাণশূন্যতাকে কঠোর আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন, আবার অপর দিকে পাশ্চাত্য জগতের সমাজ-সমস্যার নিবিড় বেদনায় পীড়িত হইয়া, সেখানে যন্ত্রদানবের নিষ্পেষণে আনন্দময় প্রাণশক্তির ম্রিয়মাণ অবস্থায় চঞ্চল হইয়া জগৎকে আনন্দ ও মুক্তির বাণী শুনাইলেন 'মুক্ত ধারা'য় 'রক্ত করবী'তে।

তাঁর কবি জীবনের ভিতর যাহা কিছু শাশ্বত, যাহা কিছু সুন্দর তার কিছুই তাঁর এ অবস্থায় বিলুপ্ত হয় নাই। প্রকৃতির শোভায় তাঁর যে বিভোর আনন্দ তাহা এখনো ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁর সকল কবিতায়, সকল লেখায়। প্রেমের যে বিচিত্র অনুভূতি ও সরস ব্যাখ্যান তাহা এখনও তাঁর লেখনীতে তেমনি সতেজ ও জীবন্ত আছে—তার সব চেয়ে নূতন ও সুন্দর পরিচয় তাঁর 'শেষের কবিতা'।—ভগবৎ প্রেমে তাঁর যে তন্ময়তা নৈবেদ্যে, গীতাঞ্জলীতে প্রকাশ, তাহা এখনো পূর্ণ-গৌরবে দেদীপ্যমান—কিন্তু সমস্ত আজ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গৌরবান্বিত হইয়াছে একটা নূতনতর অর্থ ও গভীরতায়, সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে নবীন প্রাণের একটা অপূর্ব্ব স্পন্দনে।

Nothing of him that is lost
But is transformed into something
rich and grand.

সত্তর বৎসর বয়সে আজ তাঁর কবি জীবন, সাহিত্যিক জীবন, ভাবুক জীবন, ভক্ত জীবন সকলই সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে নূতন জীবনের প্রেরণায়। তিনি দীর্ঘ জীবন ভরিয়া আমাদের কাছে 'নিতুই নব'—নিত্য সুন্দর, নিত্য মহান। কালের গতি তাঁহার দেহের শক্তি হয় তো খর্ব্ব করিয়াছে, কিন্তু তাঁর চিত্তের শক্তি গৌরব ও সজীবতা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধই করিয়াছে। বার্দ্ধক্য তার দেহের সিংহদ্বারে আঘাত করিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিতে পারে; কিন্তু অন্তরের মণিকোঠায় তার জীবনশোষক বিষ এক ফোঁটাও প্রবেশ করাইতে পারে নাই।

বাঙ্গলার পক্ষে, ভারতের পক্ষে, জগতের পক্ষে এটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাই আমরা তাঁর সপ্ততিবর্ষোৎসবে অপরিমিত আনন্দের সহিত যোগদান করিয়া এই সৌভাগ্যের সুদীর্ঘ বিস্তার কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছি।

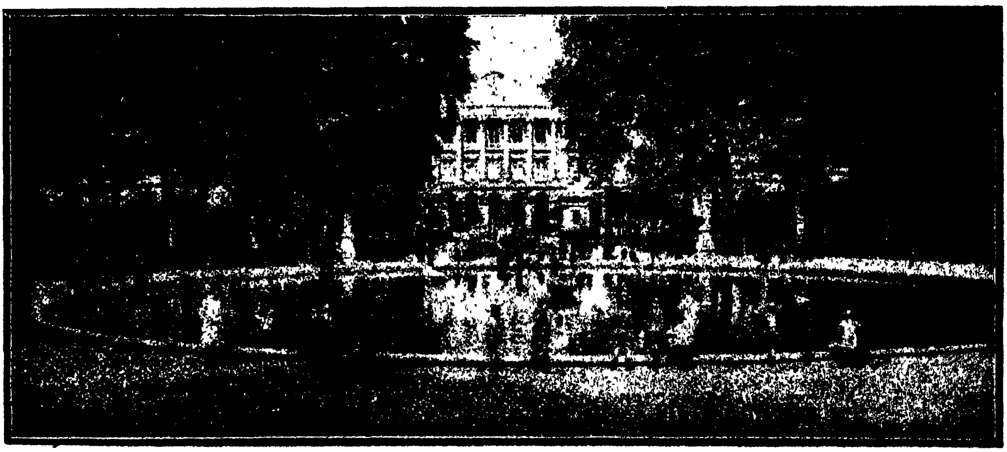
বেলজিয়ম ও তাহার চিত্র-সম্পদ

ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, ডি-এস সি, এম্-বি, এম্-আর-সি-পি

বিগত মহাসমরে ক্ষুদ্রায়তন বেলজিয়ম বাস্তবিকই শৌর্য্য-বীর্য্যের অদ্ভুত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। মাসাধিক কাল যে অমিত বিক্রমে বেলজিয়ানগণ বিরাট জার্ম্মাণ বাহিনীর গতিরোধ করে রেখেছিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তা' চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সেই অসম-সাহসিকতার কাহিনী এখনো বিস্মৃতির অতলতলে ডুবে যায় নি বলেই, অনেক দিন ধরে মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল, দেখতে হবে এই বেলজিয়ান জাতিটাকে, আর মহাযুদ্ধের লীলা-নিকেতন এই ছোট্ট দেশটাকে! বন্ধুবর মুখুয্যের ইচ্ছা ছিল, ফরাসী দেশ ছেড়ে সোজাসুজি জার্ম্মাণীতে যাওয়া, কিন্তু আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেই আমাদের যাওয়ার পথ ঠিক হলো বেলজিয়মের ভিতর দিয়ে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী ভোরে সাড়ে নটায় প্যারিস ছেড়ে, প্রায় সাড়ে তিনটায় এসে পৌছলুম বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেলস্ নগরীতে! নর্দ ষ্টেশনে নেমে, আড্ডা নেওয়া গেল কাছেই, হোটেল দি' নর্দে।

ফরাসী দেশের সীমানা ছাড়িয়েই, মনে হল হঠাৎ যেন চোখের সামনে একখানা দৃশ্যপট বদলে গেল! উত্তর ফরাসী দেশের একটা রুক্ষ নীরস দৃশ্যের পরিবর্ত্তে দেখতে পাওয়া গেল তৃণশ্যামল নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য।

অন্যান্য দেশের চেয়ে বেলজিয়ম ও হলাণ্ড অনেকটা নিম্নভূমিতে অবস্থিত, এমন কি স্থানে স্থানে সমুদ্রের চেয়েও নীচে বলে, এই দু'দেশকে একসঙ্গে "নেদারল্যাণ্ড" বলা হয়। সেই কারণেই এ দেশের ভূমি উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল। অবশ্য দক্ষিণ ফরাসী দেশ, (ডি রিভেরা, নীস্, মন্টিকার্লো), স্পেন অথবা, ইটালীও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে বেলজিয়ামের সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্য থেকে যেন একটু পৃথক্, আগাগোড়াই যেন একটু মসৃণ কোমলতায় ভরপুর! গাড়ী হতে যতদূর দৃষ্টি যায়, চোখে ঠেকছিল শুধু সবুজের ঢেউ, আর মাঝে মাঝে ঝক্ঝকে, তক্তকে নতুন করে গড়া দু একটি গ্রাম। অন্যান্য যাত্রীদের মুখে শুনলুম, এ সকল অঞ্চল যুদ্ধের দেশীয় কৃত্রিমতা কমে অসেছে, তার পরিবর্ত্তে একটা অতি সাধারণ স্বাভাবিকতা ফুটে উঠ্ছে! আমাদের গাড়ীতেই, পোটলা পুটলি, লট্বহর নিয়ে প্রায় আট-দশজন বেলজিয়ান্ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এসে উঠে বসলো! তাদের মধ্যে দু একজন অল্পস্বল্প ইংরেজী জানে! একজন মেয়ে আমরা কোত্থেকে আসছি, কোথায় যাব, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞেস কর্ত্তে লাগলো, আর একজন অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই আমাদের ইংরেজী খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে, গুরুমশাইর মত ভঙ্গীতে, নাকের আগায় চশমা ঠেলে দিয়ে, প্রায় এক হাত সামনে কাগজখানা ধরে চোখ, ভুরু ও কপাল কুঞ্চিত করে, অধ্যয়নে মনোনিবেশ কর্লে! লোকগুলি আর যাই



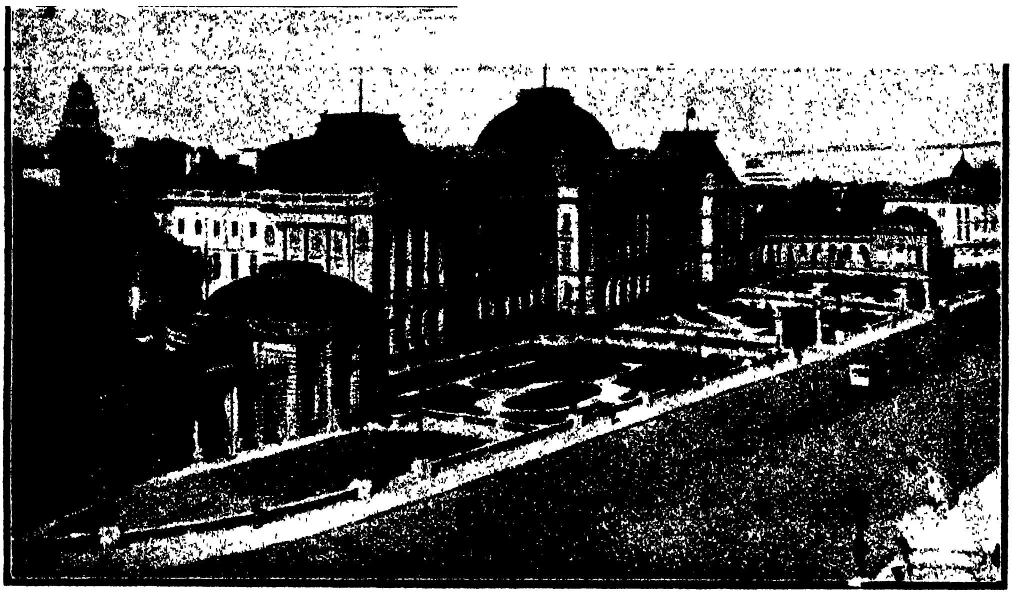
পার্লামেন্ট হাউস ও তৎ-সম্মুখস্থ পার্ক (ব্রুসেলস্)

সময় একেবারে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছিল! সে রকমই একটা কিছু প্রত্যাশা কচ্ছিলুম, কিন্তু তার চিহ্ন মাত্র দেখতে পাওয়া গেল না। ক্ষুণ্ন মনেই হিসেব করে দেখা গেল, যুদ্ধবিরতির পরও যে প্রায় বারোটি বছর চলে গেছে! এত বড় একটা যুদ্ধের, অমানুষিক বীভৎসতার ছবি, স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকে যুগ-যুগান্ত; কিন্তু, দেশের বুক হতে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ কর্ত্তে এক যুগই যথেষ্ট।

ফরাসী সীমান্ত পার হয়ে যেমন দেশের ছবি একেবারে বদলে গেল, তেম্নি আস্তে আস্তে লোকের ছবিও বদলাতে আরম্ভ কর্লে! চলতি গাড়ীতে যতগুলি লোক উঠা-নামা কর্ত্তে লাগলো, লক্ষ্য করে দেখলুম ক্রমশঃই ফরাসী হউক, আচারে ব্যবহারে যে ভদ্র, তা' বেশ টের পাওয়া গেল, কথায় কথায়, "পার্দ্ মুসে" অসংখ্যবার শুনে! পথে গাড়ীতে যা' গল্প হলো, তার বেশীর ভাগই বিগত মহাসমরের বিভীষিকার কথা! স্পষ্টই বুঝলুম, বেলজিয়ানদের দেশ হতে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা লোপ পেলেও, মনের মধ্যে তার ভীষণ স্মৃতি এখনো জাজ্জ্বল্যমান আছে!

যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলুম, অথবা নেমেও, যতই লোকগুলিকে দেখছিলুম, ততই যেন হতাশ হচ্ছিলুম, আর মনে একটু একটু করে অবিশ্বাস পুঞ্জীভূত হচ্ছিল,—সত্যিই কি, এই বেলজিয়ানরাই, বিরাট জার্ম্মাণ বাহিনীর গতিরোধ করে, মাসাধিক কাল বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল! আকারে কি চেহারায় ফরাসী কি

বেলজিয়ান্ কোন জাতিকেই তো খুব যোদ্ধা বলে মনে হয় না, তবু এক যুগ আগে এরাই বীরত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছিল! যতই ভাবছিলুম, ততই অবাক্ হয়ে যাচ্ছিলুম,—এরাই কি সেই সব আদর্শ বীরের বংশধরগণ! বিশ্বাস কর্ত্তে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, তবু ভাবলুম, হবেও বা, যখন লোকের জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, যখন ঘরের কোণে রাজ্যলোলুপ, দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্র ভীষণ রবে গর্জ্জে উঠে, তখন মৃতদেহেও যে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার কথা! বেল্‌জিয়ান্‌রা আর যাই হউক, কাপুরুষ হবার অবসর পায় নি! ইয়োরোপে যত বড় বড় যুদ্ধ



রাজপ্রাসাদ (ব্রুসেলস্)

হয়েছে তার বেশীর ভাগই হয়েছে এই বেলজিয়মের বুকে! কে উঠ্‌বে, কে পড়বে, বারবার তার পরীক্ষা হয়ে গেছে বেলজিয়ানদের এই ক্ষুদ্র শস্যশ্যামল দেশের বুকের উপর রক্তের স্রোত বয়ে। বেলজিয়ান্‌দের চিরদিনই তাতে অংশ নিতে হয়েছে। তারই পুরস্কার স্বরূপ ওয়াটার্লুতে নেপোলিয়নের পতনের প্রায় পনেরো বছর পরে, বেলজিয়ম স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষিত হয়। প্রায় একটি বছর আগে বেলজিয়ানরা সেই স্বাধীনতা লাভের শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন করেছে! বর্ত্তমান রাজা এলবার্টের পিতামহ প্রথম লিয়োপোল্ডই বেলজিয়মের প্রথম স্বাধীন নৃপতি! বর্ত্তমান রাজা এলবার্টের নেতৃত্বে, বেলজিয়ম বিগত মহাসমরে, স্বাধীনতা-যুদ্ধে, বুকের রক্ত দিয়ে প্রমাণ করেছে, পঁচাশি বছরের লব্ধ স্বাধীনতার মূল্য, হাজার বছরের স্বাধীনতার চেয়ে কম নয়।

উত্তেজনার পর অবসাদ, কর্ম্মের পর নিষ্ক্রিয়তা জগতের চিরন্তন নীতি; স্পষ্টই বুঝতে পেলুম, বেলজিয়মের ভাগ্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ফ্রান্স যেমন আপনাকে বিলাস ও ব্যসনের উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে, বেলজিয়ম স্বভাবতঃ গরীব দেশ, অনেক শতাব্দী ধরে ফরাসী দেশের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িত থাকলেও, তালে পেরে উঠে নি বিলাসিতায় ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্লা দিতে। অনেক স্থলে দেখতে পেলুম, মেয়েরা ফরাসী দেশের মেয়েদের অন্ধ অনুকরণ কর্ত্তে গিয়ে হঠাৎ যেন মাঝামাঝি পথে থমকে গেছে! লিপ, ষ্টিক্ আর রুজের আমদানী ঘরে ঘরে হয়েছে, তবে মাথার চুল এখনো বব্ ছেড়ে শিংলে পৌঁছেছে, খুব কম জায়গায়ই। আর পোষাক, পায়ের গোড়া পর্য্যন্ত নামে নি, হাঁটু ও গোড়ালির মাঝামাঝি এক স্থানে এসে ঠেকেছে! হাব-হাবটা, এবং হাসি কাশিটে, পর্য্যন্ত ফরাসী ধরণের হলেও, খুব সার্থক অনুকরণ নয়, তা' বেশ বুঝতে পারা গেল! পান ভোজন দেখতে

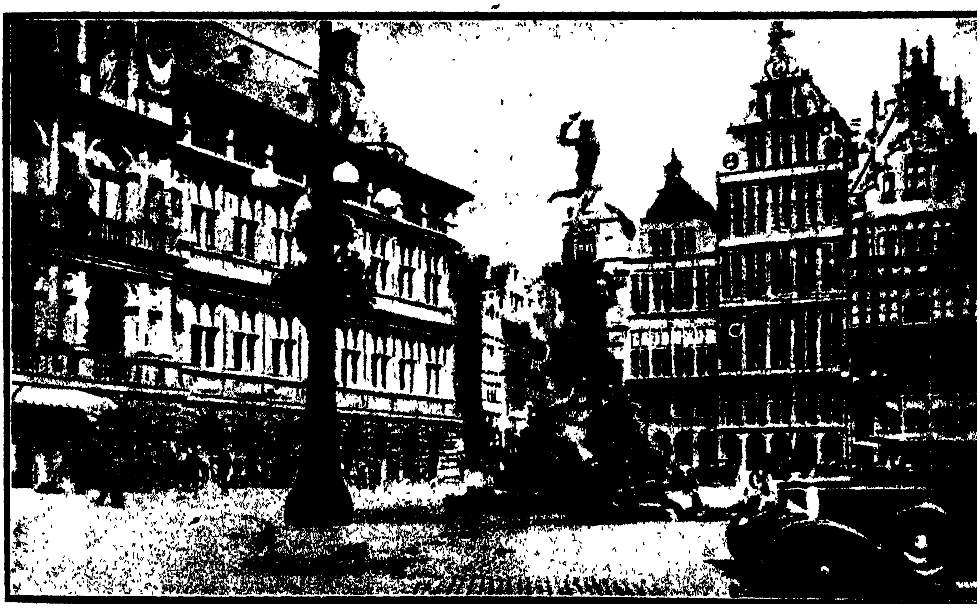
পেলুম ফরাসী দেশের মত সমান তালেই চলেছে, কিন্তু এক হিসাবে বেলজিয়ানরা ফ্রান্সকেও ছাড়িয়ে গেছে, তা' প্রত্যেক কাফে ও রেস্তারাঁতে, তাস হাতে লোকের জটলা, ও ঝন্‌ঝন্‌ করে মুদ্রাবিনিময়ের দ্বারাই প্রমাণিত হ'ল! দেখে দুঃখ হ'ল, মহাযুদ্ধের বীর বেলজিয়ানগণের বীরত্ব এসে পর্য্যবসিত হয়েছে, পানাহারে, জটলায় ও জুয়ার আড্ডায়।

ব্রুসেল্‌স্‌এ পৌছে, হোটেলের কাছে একটা কাফেতে মধ্যাহ্ন (?) ভোজন (বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা) সেরে নিতে হ'ল। তার পরই খোঁজ করে গেলুম অগতির গতি, গাইড হয়ে, ছুটি বন্ধু বেলজিয়মের রাজধানীর পথে বেরিয়ে পড়লুম! একটু এগিয়ে যেতেই প্রায় দু' মাইল দূরে, একটু উঁচু স্থানে, একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখে বন্ধুবর বল্লেন "ওহে, ঐ দেখ, হাইকোর্ট।"

একে ত বাঙ্গাল, তাতে আবার যশোরের নয়, ফরিদপুরের নয়, ঢাকার নয়, ত্রিপুরার নয়, একেবারে সিলেটের; সুতরাং পরিহাসের ভাবে নয়, গম্ভীর ভাবেই বল্লুম "বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছ?"

বন্ধুবর পরিহাসের সুরেই বল্লেন, "আরে, দেখেই রাখ!"

তখন অবশ্য দেখেই রাখা গেল, কিন্তু পরদিন অবাক্‌



ব্রাবো (এণ্টওয়ার্প)

বিদেশে পথিকের বন্ধু, কুক্‌ কোম্পানীর আড্ডায়! ভেবেছিলুম প্যারিসের মত, এখানেও কুক্‌ কোম্পানীর দ্বারাই সব বন্দোবস্ত ঠিক্‌ হবে, কিন্তু কার্য্যতঃ বিফল-মনোরথ হতে হলো! ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগ, বেলজিয়মে অত্যন্ত শীতের সময় (যদিও সেদিন আমাদের বেশ গরম বোধ হচ্ছিল, এবং ওভারকোটটি হোটেলেই রেখে গিয়েছিলুম) সুতরাং ঐ সময় পর্য্যটকেরা বড় একটা কেউ আসে না, তাই টুরিষ্ট-কার সব বন্ধ! অগত্যা কোম্পানীর লোকদের নিকট হতে, ব্রুসেল্‌স্‌এ দ্রষ্টব্য যা' কিছু তারই একটা লিষ্ট পাওয়া গেল! নিজেরাই নিজেদের হতে হয়েছিল জেনে, যে, "বাঙ্গালকে দেখানো হাইকোর্ট" ব্রুসেল্‌সের হাইকোর্টই বটে!

সেদিন বেলা চারটা হতে আরম্ভ করে, রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত, একের পর এক, ব্রুসেল্‌স্‌এর দ্রষ্টব্য অনেক কিছু দেখা গেল! বোটানিকেল গার্ডেন, পার্লামেণ্ট হাউস্‌ ও তারই সামনে প্রকাণ্ড পার্ক, তারি মধ্যে বেলজিয়ামের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির মর্ম্মর-মূর্ত্তি, পেটি সাব্লোঁ স্কোয়ার, ও তন্মধ্যস্থ কাউণ্ট এগ্‌মোঁ ও কাউণ্ট হর্ণের প্রতিমূর্ত্তি; জাঁম্পাক ও কংগ্রেস স্মৃতিস্তম্ভ, রাজা দ্বিতীয় লিয়োপোল্ডের সু-উচ্চ ঘোড়ার উপর আসীন বিরাটকায় মূর্ত্তি, এডিথ্‌

ক্বেভেলের সমাধি, মনুমেণ্টেল আর্কেড্ প্রভৃতি স্থানগুলি দেখে, আমরা এসে পৌছলুম, বেলজিয়মের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে! প্রাসাদটি খুব বড় নয়, তবু অতি চমৎকার ভাবে সাজানো, গোছানো! সম্মুখের সুপ্রশস্ত রাস্তা হতে প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরে অবস্থিত, মাঝে চমৎকার বাগান! রাস্তায়ই লোকজন অবারিত ভাবে চলাফেরা কর্চ্ছে, শুধু দুটি গেটে দুটি প্রহরী ছাড়া, রাজপ্রাসাদের মত আড়ম্বরের কিছুই দেখতে পেলুম না। অবাক্ হয়ে ভাবলুম, স্বাধীন দেশে, স্বাধীনতার আবহাওয়াই অন্যরকম! অথচ আমাদের দেশের যে কোন গবর্ণমেণ্ট হাউসের ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ চলাফেরা কর্ত্তে পারে না। কিছুদিন আগে, বুঝতে পারা গেল! কিন্তু অবাক্ হয়ে গেলুম, তার ভদ্র আচরণে ও কথায়! আমাদের দেশে হলে ঐ অবস্থায়, আমাদের যে কি হতো, তা আর ব'লে কাজ নেই। অগত্যা প্রহরীর নির্দ্দেশ মত আমরা চলতে আরম্ভ কর্লুম! ক্রমাগতঃ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা চলে আর চলার মত অবস্থা ছিল না পায়ের; তাই একজন কনেষ্টবলকে জিজ্ঞেস করে, নদ ষ্টেশনের পথে ট্রাম ধর্লুম!

ব্রুসেলস্ ছোট সহর হলেও দেখতে বেশ লাগলো! মনে হল, সমস্ত সহরটিই যেন প্যারিসের একটা ছোটখাটো সংস্করণ! বাড়ী, ঘর, পথঘাট, পার্ক, সমস্তই যেন প্যারিসীয় ভাবে গড়া! রাস্তায় লোকজন, যান-বাহনের উপরও



শেলড্ট্ নদী, ও তৎ-তীরবর্ত্তী ওয়ার মিউজিয়ম (এণ্টওয়ার্প)

দার্জ্জিলিংএ বেড়াতে গিয়ে দুটি ছেলে, না জেনে, গবর্ণমেণ্ট হাউসের বাইরে reserved areaতে ঢুকেছিল বলে, তিন দিন পর্য্যন্ত না কি হাজতে আট্‌ক থাকতে হয়েছিল। পথে দাঁড়িয়ে বন্ধুবর ও আমি, এ কথাটাই বোধ হয় আলোচনা কচ্ছিলুম, এম্নি সময় একজন প্রহরী এসে সসম্মানে নমস্কার করে, ফরাসী ভাষায় বল্লে "ক্ষমা করুন মহাশয়েরা, আপনারা বোধ হয় বিদেশী, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা আইনসঙ্গত নয়, কথা বলতে হলে, একটু আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করুন ও কথা বলুন!" বেলজিয়মের কথ্য ভাষা ফরাসী, তাই প্রহরীর কথা অনেকটা সেই প্যারিসের ছাপ। চলতে চলতে আমাদের মাঝে মাঝে ভুল হচ্ছিল, যেন প্যারিসেরই কোন সহরতলীতে হেঁটে বেড়াচ্ছি আমরা! তবু মনে হলো একটু তফাৎ আছে, হয় ত দারিদ্র্যের জন্য অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এক পানাসক্তি ছাড়া বিলাস ব্যসন কি সম্ভোগের স্রোতে ভাসলেও এরা এখনো ততটা বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল হয় নি।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম হতে উঠে দেখি ঝর ঝর করে বৃষ্টি হচ্চে; কিন্তু ছন্নছাড়া, লক্ষীছাড়া বন্ধু দুইটির অসাধারণ অধ্যবসায়! সেই দুর্য্যোগের মধ্যেই 'ডেশুনে' (প্রাতরাশ)

সেরে বেরিয়ে পড়া গেল, সহরের মাথার উপর উঁচু 'বাঙ্গালকে দেখানো হাইকোর্ট' লক্ষ্য করে! সেখানে পৌঁছতে লাগলো প্রায় এক ঘণ্টা; বন্ধুবর এগিয়ে একজন



বোটানিকেল গার্ডেন (ব্রুসেলস্)

পথিককে জিজ্ঞেস কর্লেন "পার্দ্ঁ মুঁসে, কি আলা মেইজো?" অর্থাৎ, ক্ষমা করুন, এই বাড়ীখানি কি?"

পথিক উত্তর কর্লে "প্যালে দি শাষ্টিস্"

আর যায় কোথায়, অমি বন্ধুবরের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ, অর্থাৎ কেমন, হাই-কোর্টই ত বটে! আর দেখাবে হাইকোর্ট!" অবশ্য বন্ধুবরও অবাক্। হাইকোর্টের সামনেই, এক দিকে পুরাতন রোমান্ এবং অন্য দিকে গ্রীক্ আইনজ্ঞ-দের প্রতিমূর্ত্তি! অতঃপর প্রহরীর অনুমতি নিয়ে, সমস্ত অট্টালিকাটি ঘুরে এসে, চারতালা গম্বুজের উপর চড়া গেল। তখনো বৃষ্টি হচ্চিল, তাই সমস্ত ব্রুসেল্‌স সহরের দৃশ্য একটু ঝাপ্সা দেখালেও বড় মন্দ লাগলো না। রাজকীয় গীর্জ্জাঘরের অভ্রভেদী চূড়াটি যেন



হাইকোর্ট (ব্রুসেলস্)

আকাশ ছুঁয়ে ফেলবার উপক্রম কচ্ছে, দেখতে পাওয়া গেল। তা ছাড়া কাছেই রাজপ্রাসাদটি ও স্মৃতিস্তম্ভগুলিও দেখতে পাওয়া গেল এবং বেশ বোঝা গেল কোন্‌টি কি? অবশ্য দিনটি যদি ভাল হতো, তাহলে, হাইকোর্টের উপর হতে সহরের সাধারণ দৃশ্য নিশ্চয়ই আরো অনেক ভাল লাগতো, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হাইকোর্ট হতে বেরিয়ে এসে গিয়ে ঢুক্‌লুম ব্রুসেলস্‌এর প্রসিদ্ধ তিনটি মিউজিয়মে। একটি শুধু মিউজিয়মই, বাকী দুটির একটি পুরাতন ও অপরটি নূতন আর্ট গ্যালারি! বাস্তবিক বেলজিয়মে গিয়ে যদি কিছুতে পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করে থাকি তবে, এই আর্ট গ্যালারিগুলি দেখেই! বাইরে তখনো সমান ভাবে বৃষ্টি হচ্চে, সুতরাং নিবিষ্টচিত্তে দেখতে মনোনিবেশ কর্লুম, বেলজিয়মের অনন্যসাধারণ চিত্র-সম্পদকে! অনন্যসাধারণই বলতে হবে, কারণ এ দুটি চিত্রশালায় যতটুকু সৌন্দর্য্য লুকিয়ে আছে, যে কোন চিত্ররসজ্ঞ শিল্পীর মনের খোরাক যোগাতে পারে অনেক দিন! অবশ্য প্যারিসের বিখ্যাত মিউজিয়ম লুভ, ও লণ্ডনের ব্রিটিশ আর্ট গ্যালারিও নানাবিধ বহুমূল্য

চিত্রসম্পদের অধিকারী! কিন্তু সবগুলি দেখে আমাদের মনে হল, ব্রুসেল্‌সের ছুটি ও এণ্টওয়ার্পের সুপ্রসিদ্ধ আর্ট



মরুভূমিতে আগর ও ইস্‌মাইল।
(ব্রুসেলস্‌ মিউজিয়ম)

গ্যালারি একত্র করে ধর্লে বোধ হয় বেলজিয়মের চিত্রসম্পদের স্থান হয় সকলের উপরে! পুরাতন ও নূতন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হলাণ্ড, সুইডিস্‌, স্পেন, ইতালীয়, জার্ম্মাণ, সকল দেশের, সকল সুবিখ্যাত চিত্রকরদের, তুলিকানৈপুণ্য দেখতে পাওয়া যায়, এসে এই বেলজিয়মে! শুধু আমাদের চোখে, একটা অভাব ঠেকলো, যদি এই আর্ট গ্যালারিগুলিতে, শুধু ভারতীয় চিত্রকলার একটু স্থান হতো, তাহলেই বোধ হয় ষোলকলা পূর্ণ হতো! শুধু চিত্র নয়, মর্ম্মরমূর্ত্তির সম্পদেও, এই মিউজিয়মগুলি পৃথিবীর মধ্যে একটা উচ্চ স্থানের দাবী রাখে! নিজে শিল্পী নই, তবু সুন্দর যা, মনোরম যা' মনের লুপ্ত শিল্পীভাবকে অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও একটু সাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেয়! হয় ত শিল্পীর দক্ষ তুলির প্রত্যেকটি রেখা ও বর্ণ-বিন্যাসের অর্থ বুঝি না, তবু সেগুলির সমন্বয়ে অঙ্কিত গোটা ছবিখানিকে ভাল লাগে; আমার শিল্পজ্ঞানের রসানুভব ঐ পর্য্যন্ত! কিন্তু এ হিসাবে বন্ধুবর সন্তোষ মুখুয্যে আমার চেয়ে সমজ্‌দার অনেক বেশী! ছবিখানাকে যখন আমি গোটা ছবিরূপেই দেখি, তিনি তার প্রত্যেকটি অংশ আলাদা করে চুল চিরে দেখেন, প্রকৃত সমালোচকের চোখে! সময় সময় তন্ময় হয়ে বন্ধুবর হয় ত আধ ঘণ্টা একখানা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে, অনেক সময়ই অরসিকের মত তাকে তাড়া দিতে হয়েছে! বন্ধুবর আবার আর একখানির সম্মুখে গিয়ে তন্ময় হয়ে গেলেন! বাস্তবিকই তন্ময় হবার মতই জিনিয বটে! আমারও যে সময় সময় দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা না হচ্ছিল এমন নয়, তবে আমাদের সময় অল্প আর দেখার সামগ্রী অনেক বেশী, এই অভিজ্ঞানটুকুই, শীগ্‌গির শীগ্‌গির, "পিবন্তীব চক্ষুভি" করে যতটুকু দেখা সম্ভব, তারই জন্য মনে তাড়া দিচ্ছিল! বেলা ন'টা হতে আরম্ভ করে সমস্ত দুপুর আমরা দুটি আর্ট গ্যালারি দেখলুম! বাস্তবিকই কেমন করে যে অতটা বেলা সেদিন কাটিয়েছিলুম শুধু ছবির পর ছবি দেখে, এখনো তা বুঝতে পারি



মেষপালের গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন। (ব্রুসেলস্‌ মিউজিয়ম)

না! অনেক কিছুই ভাল লাগলো। তার পর বন্ধুবর ও আমি দুজনে ভাল-লাগা ছবির তালিকা দুটি মিলিয়ে দেখি, গোটাকয় ব্যক্তিগত বৈষম্য ছাড়া—আমাদের ভাল-লাগার মধ্যে শতকরা নব্বইটি স্থলেই সাম্য ছিল! সুতরাং আর্টগ্যালারির দ্বারেই যে সব ছবি বিক্রী হয়—সে হতে, আমাদের দুজনের ভোটে যেগুলি লাগলো তারই অনেক-গুলি কিনে নেওয়া হ'ল। পাঠক পাঠিকা-দের জন্য, ভাল ভাল ক'খানি, এরই সঙ্গে সন্নিবেশিত কর্চ্ছি!

আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল নাভেজের অঙ্কিত, মরুভূমিতে "আগর ও ইস্মাইল" চিত্রখানি। এখানি আধুনিক চিত্র! চিত্রখানি শিল্পীর এক অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি! যতদুর দৃষ্টি যায়, মরুভূমি ধূ ধূ কচ্ছে; মরুভূমি পর্য্যটনের শ্রমে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় বালক ইস্মাইল, সুষুপ্তির কোলে ঢ'লে পড়েছে, এমন কি হাতের যষ্টি পর্য্যন্ত শ্লথ-ভাবে যেন হাত হতে খসে পড়ছে। পায়ের নীচে বোঝার গুরু-ভার ধরার বুকে ন্যস্ত! সুষুপ্ত বালকের মুখের ভাব বাস্তবিকই অতি চমৎকার। আর তার চেয়ে বেশী চমৎকার, আগরের বেদনাময়ী মুখশ্রী! প্রসুপ্ত বালককে ঘিরে, তার সেই উৎকণ্ঠাকাতর, ব্যাকুলতা-মাখা, সৌম্য, মৌন, আকুল দৃষ্টি, শিল্পীর অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচায়ক। নাভেজ যদি আর কোন ছবি না এঁকে শুধু এই একখানি ছবিই এঁকে যেতেন, তাতেই বোধ হয়, তাঁর নাম শতাব্দীর পর শতাব্দী শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে পরিচিত থাকতো জগতে!

সন্ধ্যায় "মেষপালের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন" ছবিখানিও চমৎকার। পাশেই একটি কবরের স্থান, তার উপর কাঠের ক্রুশ দেখা যাচ্ছে! বৃদ্ধ মেষপাল, গোধূলিতে শ্রান্ত কলেবরে মেষের দলকে নিয়ে গৃহে ফিরছে। চলতে চলতে একটি ছোট শাবক, চলতে পাচ্ছে না, তাই মেষপাল তাকে কোলে তুলে নিয়েছে; শাবকের মা টি ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টিতে শাবকের প্রতি চেয়ে আছে! সম্মুখে ক্ষুদ্র কাঠের সেতু; মেষের দল দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে, পার হবে কি না তাই ভাবছে! ছবিখানা শিল্পী ভারবিকোভেনের অঙ্কিত;—তুলিকার সাহায্যে, বাস্তব ও প্রকৃতির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে অতি নিপুণভাবে চিত্রিত।



গ্রাম্যপথ। (ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম)

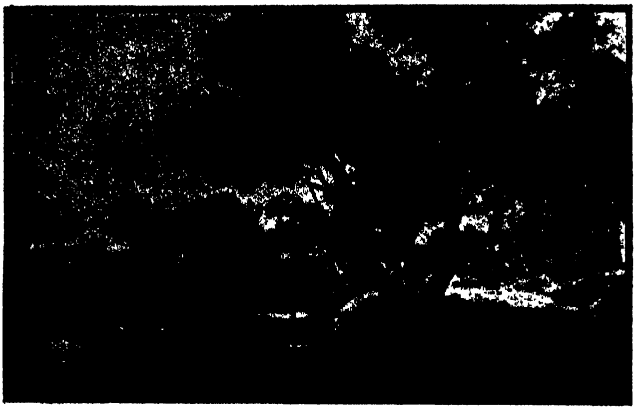
কখানি ল্যাণ্ডস্কেপ, টেনিয়ার্সের "গ্রাম্য পথ", ও "ছায়ায় বিশ্রাম" এবং হবেমার জলে "প্রতিবিম্ব," প্রত্যেক-খানি ছবি বাস্তবিকই অতি সুন্দর। দৃশ্যপট হিসাবে, এগুলির মূল্য খুবই বেশী নিঃসন্দেহ।



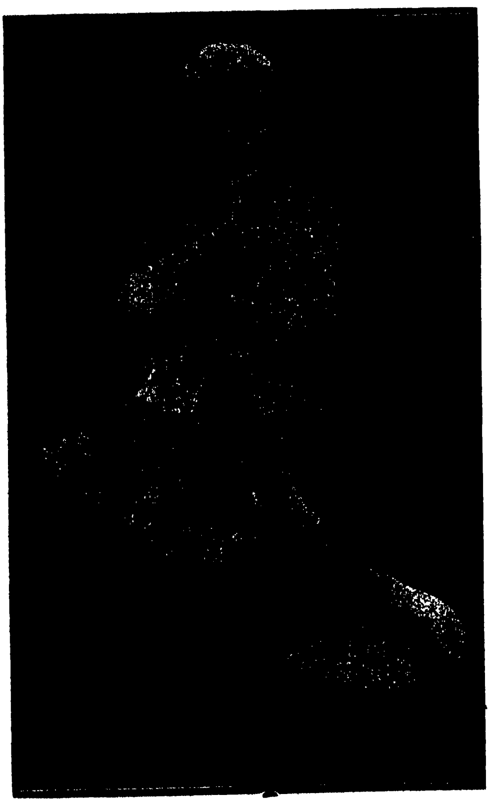
গ্রাম্যপথ। (ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম)

তা ছাড়া কতকগুলি মর্ম্মর-মূর্ত্তিও শিল্পীর ঔৎকর্ষের

পরিচায়ক। পাথর কেটে যে এম্নি জীবন্ত প্রাণময়ী মূর্ত্তি তৈরী করা যেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না! আমার অনেক দিন আগের কল্পনায় আঁকা, মাতৃমূর্ত্তির



:জলে প্রতিবিম্ব (ক্র:সেলস্ মিউজিয়ম)



মাতৃমূর্ত্তি (ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম)

জাজ্বল্যমানস্বরূপ মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখতে পেলুম, বেলজিয়মের মিউজিয়মে, শিল্পী ব্রেকিলিয়ারের হাতে গড়া!

"নীরব নিথর ঘুমাই যখন,
মোর পানে চেয়ে কর জাগরণ,
অপলক স্থির, নিস্পন্দ নয়ন;
স্নিগ্ধ কর দুটি, বুলাও আমার মাথে।"

সুষুপ্ত সন্তান বুকে, জননীর অপলক, নিদ্রা-হীন স্থিরদৃষ্টি, সে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! সারা দিন খেলাধূলার পর, অশান্ত শিশু খেলাধূলা ফেলে, শান্তিময় জননীর কোলে অঘোর ঘুমে অচেতন; কী সারল্যময় তার সেই নিদ্রাভার নত চক্ষু দুটি! কী স্নিগ্ধ পবিত্রতাময় তার সেই নির্ভরশীল কোমল আনন! আর তারই পাশে, কী স্বর্গীয় পবিত্রতামাখা, সন্তানের মঙ্গল-কামনারত, জননীর স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল, আর কী সুন্দর, "নিস্পন্দনয়ন, অপলক-স্থির" জননীর দৃষ্টি! দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলুম, কখনো সন্তানের পানে, কখনো জননীর মুখের পানে! কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখি? কোন্‌টার চেয়ে কোন্‌টা বেশী সুন্দর, তাও পর্য্যন্ত ঠিক কর্ব্বার ক্ষমতা নেই।

শিল্পী ডিলেন্সএর "উপাসনারতা একটি বালিকা"র প্রতিমূর্ত্তিও খুব চমৎকার লাগলো! সুগঠিতদেহা কিশোরী, একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে হাঁটুগেড়ে বসে, যুক্তকরে, নিমীলিত-নেত্রে প্রার্থনা কর্চ্ছে! সারল্যময়, প্রার্থনারত তদ্গত ভাবটি সত্যসত্যই অভূতপূর্ব্ব ও অবর্ণনীয়।

সেদিন মধ্যাহ্নভোজন সারতে হলো আর্টগ্যালারির নিকটেই একটি রেস্তরাঁয়। রেস্তরাঁয় এক কাপ চা যাহা অন্যান্য খাবারের সঙ্গে পাওয়া গেল, তাহা খুবই ভাল বলতে হবে। বন্ধুবর ও আমি দুজনেই একবাক্যে অভিমত প্রকাশ কলুম যে ভারতবর্ষ ছাড়ার পর, এ রকম এক কাপ চা বিলাতে কখনো ভাগ্যে জুটে নাই! সত্যসত্যই বিলাতে চা খেয়ে কখনো তৃপ্তি হয় নাই, ফরাসী দেশে ত নয়ই, কারণ ওখানে মদের পরিবর্ত্তে লোকে জলটুকু পর্য্যন্ত ছোঁয় না।

রাত্রিতে একটা সিনেমা-হলে ক ঘণ্টা কোন রকমে কাটানো গেল। কোনরকমে কাটানো গেল, কারণ ফরাসী-ভাষায় সবাক্‌চিত্র পরিহার কর্ত্তে মনস্থ করেও পারা গেল না, অনেক দূরে একটি 'নির্ব্বাক চিত্রশালা আছে জেনে সেখানে গিয়েও শুনতে পাওয়া গেল, নির্ব্বাকও সেদিন

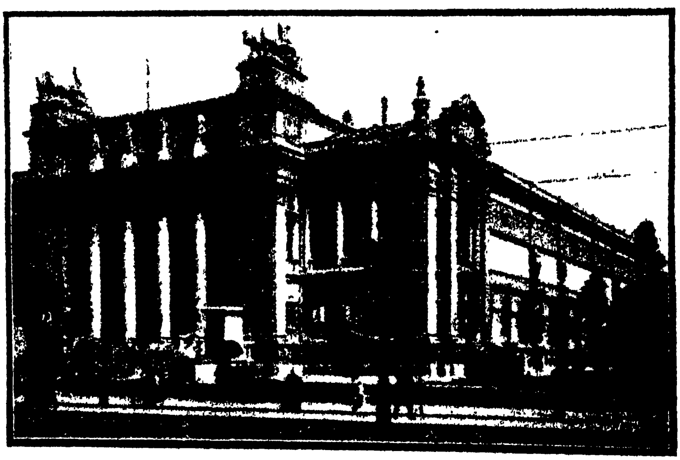
সবাক হয়ে গেছে! সুতরাং অতখানি গিয়ে আর ফিরতে প্রবৃত্তি হলো না, অথচ তা' হজম কর্ত্তে কষ্টও হলো বেশ কিছু! যতক্ষণ ছবি হচ্ছিল, দেখছিলুম বটে, তবে "হিউগো" সাহেবের দৌলতে, বুঝতে পাচ্ছিলুম একটু আধটু মাত্র!

পরদিন বেলা প্রায় দশটায়, নর্দ ষ্টেশন হতে রওয়ানা হওয়া গেল এণ্টওয়ার্পের পথে! পথে ভীড় এত বেশী ছিল যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট থাকা সত্ত্বেও একেবারে আগাগোড়া পথটা দাঁড়িয়েই কাটাতে হলো। তার উপর আবার উপদ্রব—T. T. C. এসে বল্লেন, কুক্ কোম্পানীর দেওয়া টিকেট অনুসারে আমাদের নর্দ ষ্টেশনে না উঠে মিডি ষ্টেশনে উঠা উচিত ছিল, তা না করার দরুণ দুজনকে তেরো ফ্রাঙ্ক করে অর্থাৎ নগদ ছাব্বিশ ফ্রাঙ্ক দিতে হবে। কি আর করা যায়, দিতে হলো আক্কেল সেলামি! গাড়ীতেই দুচার জন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের মস্তবড় একটা ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেল। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র ইয়োরোপে এণ্টওয়ার্পের মত সুদৃঢ় শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার মত দুর্গ আর একটিও ছিল না। নেপোলিয়ন তাই ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন, যাদের তোপের মুখে এণ্টওয়ার্পের পতন হবে, তারা দুনিয়াতে হবে অপরাজেয়। অবশ্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ীর সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি! অভেদ্য দুর্গ এণ্টওয়ার্পেরও পতন হয়েছিল বিরাট জার্ম্মাণ বাহিনীর সম্মুখে, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাদেরও পতন ঘটতে বেশী দিন দেরী হয় নি। মনে ধারণা ছিল, জার্ম্মাণ-বাহিনীর তোপের মুখে ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্ভেদ্য এণ্টওয়ার্প দেখতে হবে; কিন্তু সহযাত্রীদের মুখে শুনতে পেলুম, তার চিহ্নমাত্র নাই। শুধু শেলড্ট নদীতীরে, ওয়ার মিউজিয়ামে, যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি রক্ষিত আছে! তাদের নিকট হতেই এণ্টওয়ার্পে দ্রষ্টব্য অন্যান্য যা কিছু তার সংবাদ পাওয়া গেল।

সেদিনটাও ভাল ছিল না, অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল, আর তার উপর বরফ পড়ছিল। ইংলণ্ড ছেড়ে এসে প্রায় সাত দিন পরে এই প্রথম বরফ দেখতে পেলুম এণ্টওয়ার্পে এসে! গাড়ী হতে নেমে ভাবনা হলো, কোন্‌দিকে, অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে যাই? একটু এদিক্ ওদিক তাকিয়েই চোখের সম্মুখে



প্রার্থনারতা বালিকা (ব্রুসেলস্ মিউজিয়ম)।



আর্ট গ্যালারি। (এণ্টওয়ার্প)

পড়লো বেশ উঁচু একটি গীর্জ্জার চূড়া! বরাবর লক্ষ্য করে এসেছি, উঁচু যা' কিছু, বন্ধুবরের লক্ষ্য সর্ব্বদাই তার প্রতি।

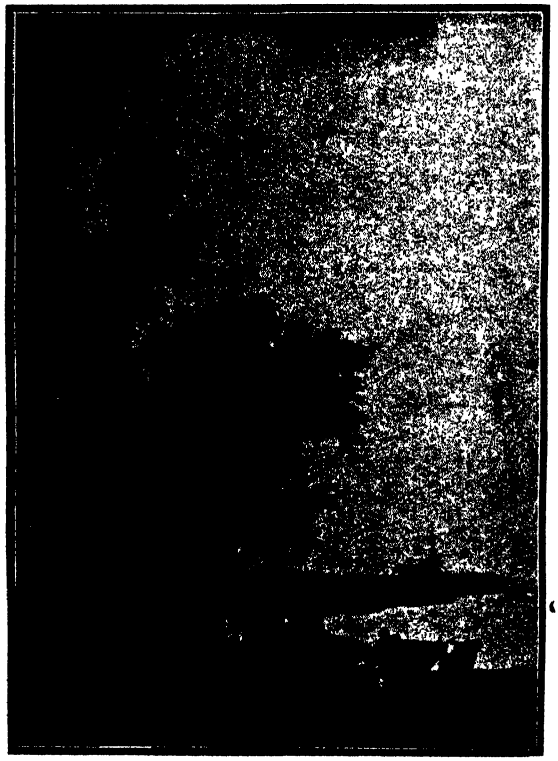
তাই যেই উঁচু চূড়া দেখা, অম্নি বল্লেন, ওটা দেখতে হবে। আমি বল্লুম, তা হবে পরে, এখুনি প্রথম আর্টগ্যালারিতে যাওয়া দরকার ; কারণ, সাড়ে তিনটায় বোধ হয় তা' বন্ধ হয়ে যাবে! এণ্টওয়ার্পে আর্টগ্যালারি বিশ্ববিখ্যাত। যেই তার নামোল্লেখ, অম্নি বন্ধুবর উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠ্‌লেন "ব-বেশ তাই।" ভাবাবেশের সময় বন্ধুবরের মুখে একটু কথা বাঁধে—বুঝতে পারলুম আমার কথায় তাহার ভাবের সঙ্গে বেশ একটু আবেশ এসে লেগেছে! পথেই একজন



ক্রুশ-বিদ্ধ খৃষ্ট। (এণ্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

কনেষ্টবলকে জিজ্ঞেস করে, ট্রামে উঠে, আর্টগ্যালারির দরজায় এসে পৌছলুম।

বাহির হতে দেখে, আর্টগ্যালারির বিশেষত্ব বিশেষ কিছুই মনে হলো না। প্যারিসের লুভ, অথবা লণ্ডনের ব্রিটিশ আর্টগ্যালারির মত বড় নয়। মাঝারি গোছের বাড়ীখানা, দেখতে অনেকটা বড়বড় থামওয়ালা, কলিকাতার সিনেট হাউসের মত! যাই হউক বাহিরের চেহারায় একটুও মনোনিবেশ না করে ঢুকে পড়লুম ভিতরে! দেখলুম, আর্টগ্যালারিটি চিত্র-সম্পদে বাস্তবিকই অতুলনীয়। ব্রুসেল্‌স্ এর দুটি আর্টগ্যালারি, আর এটির যদি একত্র সমন্বয় হয়, তবে পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ আর্টগ্যালারির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে বেলজিয়মে রক্ষিত শিল্পভাণ্ডার। শুধু চিত্র নয়—কতকগুলি মর্ম্মরমূর্ত্তিও আমাদের চোখে অতি চমৎকার লাগলো! এণ্টওয়ার্প আর্টগ্যালারির, আমাদের উভয়ের মতে ভাল লাগা, কখানা ছবির প্রতিকৃতি, পাঠক পাঠিকাদের জন্য এতৎসঙ্গে সন্নিবেশিত



[illegible]েয়া (এণ্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

কর্চ্ছি। এ হতেই তাঁরা এণ্টওয়ার্পের প্রসিদ্ধ চিত্রশালার একটা মোটামুটি ধারণা কর্ত্তে পার্ব্বেন।

সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ভ্যান্‌ডাইকের "ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্ট" ছবিখানি অত্যন্ত চমৎকার। হস্তপদ ক্রুশে বিদ্ধ, খৃষ্টের কী অপূর্ব্ব মহিমোজ্জল দৃষ্টি!

শিল্পী ভ্যান্ লিরিয়াসের, 'লেডী গডিভা'র ভীতচকিত, সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, যাহা তুলিকার মুখে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে ; দেখেই মনে হয় সার্থক শিল্পীর শ্রম ও সাধনা।

ভ্যান্ কুইকের "কাঠুরিয়া পরিবার" চিত্রখানিও বেশ! কাচ্চা, বাচ্চা, পুত্র, কন্যা, ও স্ত্রীর সঙ্গে—কাঠের বোঝা বয়ে কাঠুরের, শ্রান্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের দৃশ্য, অত্যন্ত সজীব বলে মনে হয়। মনে হয় তৎকালীন প্রত্যেকটি মুখভঙ্গিমার সহিত আমরা যেন পরিচিত!

বারেণ্ড ভান্ ওর্লির, "বিচারের দিন" ছবিখানিও রংএর খেলার জন্য অত্যন্ত মনোরম দেখায়! উপরে আকাশে দেবদূতদের মেলা বসেছে, নীচেই অসংখ্য উর্দ্ধদৃষ্টি নরনারী



বিচারের দিন। (এন্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

বিচারের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। নানাবিধ রংএর সংস্পর্শে, তুলিকার মুখে এতগুলি লোকের মুখচ্ছবি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা, বাস্তবিকই শিল্পীর কুশলতার পরিচায়ক। এক রংএর প্রতিকৃতি হতে, আসল চিত্রখানির ধারণা করা সম্ভব নয়, তবু একটু আভাষ পাওয়া যায়!

হলাণ্ডকুলের রুইস্‌ডেল অঙ্কিত "খেয়া" চিত্রখানিও আমাদের চোখে চমৎকার লেগেছিল! গাছের নীচে, নদীর বুকে, পার হবার জন্য একখানা খেয়া নৌকা, তার উপর ওপারের যাত্রী গাড়ী ঘোড়া লট্‌বহর নিয়ে অনেকগুলি লোক! দৃশ্যপট হিসাবে এখানার মূল্য খুবই বেশী বলেই মনে হ'ল।

ব্রুসেলস্ মিউজিয়মে দেখা মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত, এখানেও অনেকগুলি মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখে শিল্পীর ঔৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গেল! "খাদ্য বিতরণ" দৃশ্যটি বাস্তবিকই শিল্পীর এক অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি! জননীর সম্মুখে তিনটি শিশু। জননী একটিকে স্তনদান কচ্ছেন, আর বাকী দুটিকে একটি চামচে করে খাবার দিতে যাচ্ছেন। দুটি শিশুই একসঙ্গে হাঁ করে,—কে আগে খাবে, তারই



লেডী গডিভা (এন্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

প্রতিযোগিতা চলছে! জননীও কার মুখে আগে দিবেন ঠিক না কর্ত্তে পেরে, মাঝামাঝি এক স্থানে চামচ ধরে আছেন। ছেলেদের মুখে খাবার সেই তীব্র ইচ্ছা, এবং জননীর মুখে তৃপ্তিতে উজ্জ্বল স্মিতহাস্য যা' ফুটে উঠেছে, তা' বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! দেখে আরো দেখতে ইচ্ছা হয়; মনে হয় যেন সম্মুখে মর্ম্মরমূর্ত্তি না দেখে, সজীব মূর্ত্তিই দেখছি; এমন কি, ভ্রম হয় যেন হাস্যভরে জননীর ঠোঁট দুটি নড়ছে! সত্যসত্যই এমন জীবন্ত মূর্ত্তি জীবনে খুব কমই দেখেছি।

আর্টগ্যালারিতে ছবি কিনতে গিয়ে অনেকক্ষণ

আলাপ হলো ছবি-বিক্রেত্রীর সঙ্গে। বেলজিয়ানদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের বীভৎসতা—অনেক কিছু সম্বন্ধে। আমাদের বিদেশী জেনে মেয়েটিও মস্তবড় একটা বক্তৃতা দিলে আমাদের কাছে। তাতে লাভই হলো,—সে দেশ সম্বন্ধে বেশ একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা



কৃষক পরিবার (এন্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

গেল! কিন্তু আমাদের সময় কম, বেশীক্ষণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় চল্লো না। মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম আর্টগ্যালারি হতে, সেই উঁচু চূড়াওয়ালা গীর্জ্জাবরটির পথে!



"খাদ্য বিতরণ" (এন্টওয়ার্প আর্ট গ্যালারি)

ফরাসীদেশের মত বেলজিয়মও রোমান ক্যাথলিক। গীর্জ্জাটি অনেক শতাব্দীর পুরাতন। উঁচু চূড়াটি ১২৩ মিটার উঁচু, পাঁচতলা, তাতে একটি ঘড়ি আছে! ভিতরে ঢুকে খানিকক্ষণ মূর্ত্তিগুলি দেখে বেরিয়ে এলুম! একটু এগিয়ে গিয়েই সুপ্রসিদ্ধ স্কোয়ার ব্রাবোতে পৌঁছান গেল! এটি এন্টওয়ার্পের একটি জনবহুল প্রসিদ্ধ স্থান। চারদিকেই ছ'সাত তলা বাড়ী, বেশীর ভাগই বড়বড় দোকান! মাঝখানে উঁচু একটি ব্রোন্জ মূর্ত্তি, একটি দীর্ঘকায় লোক হাত হতে একটি অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলছে! শুনতে পেলুম এন্টওয়ার্প নামটি এই হতেই হয়েছে। (এন্ট—হাত, ওয়ার্প—অস্ত্র!) সেস্থানে বেশীক্ষণ কালবিলম্ব না করে আমরা চল্লুম নদীতীর লক্ষ্য করে!

এন্টওয়ার্পের নদী শেলড্‌ট্‌ মোটেই বড় নয়! তবু ছোট নদী দিয়েই ব্যবসার জাহাজগুলি সমুদ্র হতে আসে। নদী-তীর বাণিজ্যের স্থান বলে লোকাকীর্ণ; তবে সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, আর অবিরত তুষারপাত হচ্ছিল বলে লোকজন কম ছিল। আমরা খানিকক্ষণ নদীতীরে বেড়িয়ে গিয়ে ওয়ার মিউজিয়মে ঢুকলুম। ছোট্ট মিউজিয়মটি, বেশী কিছু নেই; শুধু জার্ম্মাণযুদ্ধে, এন্টওয়ার্প দুর্গের ভগ্নাবশেষ অনেকগুলি কামান ও গোলা প্রভৃতি রাখা আছে! বড় আশা করে এসেছিলুম, জার্ম্মাণযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ দুর্গপ্রাকার দেখতে পাব; কিন্তু দুধের আশা ঘোলেই মেটাতে হল মিউজিয়মে রক্ষিত ধ্বংসাবশেষগুলি দেখেই!

যখন বেরিয়ে এলুম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। অবিরত বরফ পড়ছে, এবং বেশ শীত লাগছিল। হাত পা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে অগত্যা ঢুকলুম গিয়ে একটা কাফেতে! চিমনীর পাশে বসে হাত পা গরম কর্ত্তে কর্ত্তে কিছু চা, বিস্কুট ও মিষ্টির সদ্ব্যবহার করা গেল! তখন আর ব্রুসেলস্‌ এর গাড়ীর বড় বিলম্ব নাই, সুতরাং আমাদের গন্তব্য স্থল হল ষ্টেশন!

ব্রুসেলস্‌এ পৌঁছে সেই রাত্রেই রাইনল্যাণ্ডের পথে গাড়ীতে উঠলুম ব্রুসেলস্‌ মিডি ষ্টেশনে! ব্রুসেলস্‌ ও এন্টওয়ার্পে আমরা যে তিনটি দিন ছিলুম, বেলজিয়মের চিত্রশালাগুলি আমাদের অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছিল। শিল্পী না হয়ে শিল্পের সমজদার হতে বাধ্য হয়েছিলুম বন্ধু দুটি! ভাল যা', সুন্দর যা', নয়নানন্দদায়ক যা', সকলের চোখেই তা' আনন্দ দেয়, আমাদের দিয়েছিল;—তেমনটি জীবনে খুব কম স্থানেই পেয়েছি! বন্ধুবর ও আমি ব্রুসেলস্‌ ছাড়বার মুহূর্ত্তে, দুজনেই একবাক্যে অভিমত প্রকাশ কর্লুম বেলজিয়মের চিত্রসম্পদ, সত্যসত্যই—অপূর্ব্ব!

চিরন্তনীর জয়

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"তুমি?—তুমি হঠাৎ কোথা থেকে ভাই?"

প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বিকাশ অনিলকে বাহিরের ঘরে একরকম টানিয়াই লইয়া গেল।

অনিলচন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, অনেক দিন তোমাদের কোন পত্র লিখিনি। তা, মনীশ এখন কোথায়?"

"সে এখন কলকাতায় নেই, ভাই। শুনেছ, চিত্র-জগতে সে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "তোমাদের সংবাদ আমি রাখি। যদিও মাস ছয়েকের মধ্যে তোমাদের চিঠি লিখিনি বটে। সে এখন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী, সে সংবাদ আমার ভালই জানা আছে। তার পর তুমি এখন কি করছ?"

বিকাশ সহাস্যে বলিল, "বাঙ্গালীর ত দু'টি পথ, হয় কেরাণীগিরি, নয় ত মাষ্টারী বা ওকালতি। আমি এখন—কলেজে একটা প্রফেসারি জুটিয়ে নিয়েছি। তার পর তুমি? সিভিলের সার্ব্বিসের পদ পেয়েছিলে জানি, নাও নি সে খবরও রাখি। এখন কোথায় আছিস্ বল ত ভাই?"

অনিলচন্দ্র সতীর্থ ও বাল্যবন্ধুর দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমারও ঐ গতি।—পুরের কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েই আছি। মনীশ কোথায় গেছে বল্লি?"

"—পুরের নবীন মহারাজ তার চিত্রশিল্প-প্রতিভায় মোহিত হয়ে গেছেন। তাকে দিয়ে কতকগুলো ছবি আঁকিয়ে নেবার জন্য, পুজোর সময় তিনি তাকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। আজ সকালেই তা'র ফিরবার কথা। লাহোর থেকে যে চিঠি পেয়েছি তাতে তাই লিখেছে।"

এমন সময় বিকাশের পিতা বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিলেন। পুত্রের অন্যতম অকৃত্রিম সুহৃদ অনিলচন্দ্রকে তিনি উত্তম-রূপেই জানিতেন। এক সময়ে মনীশ ও অনিল উভয়েই তাঁহারই প্রিয়পাত্র ছিল।

অনিলচন্দ্র বন্ধুর পিতা ও প্রথম-জীবনের আদর্শ শিক্ষা-গুরুকে দেখিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। বিকাশের পিতা সস্নেহে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার সাফল্যের সংবাদ আমি শুনেছি, বাবা। তিন বিষয়ে এম্-এ দিয়ে প্রত্যেক বারে প্রথম স্থান অধিকার করেছ, এ সংবাদ আমার অগোচর নেই। সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষাতেও তুমি জয়লাভ করে সে পদ নাও নি, তাও আমি জানি। এজন্য তোমার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা হয়েছে, বাবা।"

শিক্ষক মহাশয়ের প্রশংসা-বাক্যে অনিলচন্দ্র ঘামিয়া উঠিল। লজ্জার অরুণ রাগ তাহার সুগৌর মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন মানুষ হতে পারি।"

"হ্যাঁ বাবা, সে আশীর্ব্বাদ আমি সর্ব্বদাই তোমাদের তিন বন্ধুকেই করে থাকি। মনীশও খুব নাম করেছে।"

বিকাশ ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "অনিল, আয় ভাই, মা তোকে ডাক্‌ছেন।"

"যাও বাবা, যাও" বলিয়া বিকাশের পিতা জামা জুতো খুলিতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে বিকাশ বলিল, "তুই কোথায় উঠেছিস্?"

অনিল বলিল, "আমার মামা ভবানীপুরে নূতন বাড়ী তৈরী করেছেন। মা ও বাবা সেখানে এসেছেন। আমি কাল কলকাতায় দুপুরে এসে পৌঁছেছি। সেখানেই আছি।"

বিকাশের মাতা হাস্য মুখে পুত্র সম অনিলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কাছে বসাইলেন। নানা কুশল প্রশ্নাদির পর বিকাশের মাতা বলিলেন, "তা বাবা অনিল, তোরা তিন বন্ধু কি যে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছিস—বিয়ের নামই নেই।"

বিকাশ তখন ব্যস্ত ভাবে ঘরের এক কোণে একখানি ছবি খুলিয়া লইয়া মুছিতেছিল। অনিলচন্দ্র মাথা নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বিকাশের মাতা পুনরায় বলিলেন, "এমন সব সোনার চাঁদ ছেলে, লেখাপড়া শেষ করে সবাই টাকা রোজগারও

আরম্ভ করেছে, অথচ এরা সংসারীর কাজ কর্ত্তে ভয় পায়, কি যে দিন কাল পড়েছে !"

বিকাশ এবার সম্মুখে আসিয়া ছবিখানি একখণ্ড কাপড়ের সাহায্যে মুছিতে মুছিতে বলিল, "সকল মায়েরই ঐ এক কথা।"

মাতা দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এক কথা ত হবেই। তোরা সব অন্যায় করবি। আর মা বাপ সে অন্যায় কাজের কথা তোদের মনে করিয়ে দেবে না ?"

বিকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "বিয়ে না করা কি পাপ কাজ ?"

"পাপ নয় ? সংসারে থাক্‌বি অথচ সংসার-ধর্ম্ম পালন করবি না, এটা অন্যায় কাজ নয় ? পাপ নয় ? সন্ন্যেসী হয়ে যা না, কেউ তোদের দুষ্‌বে না।"

বিকাশ সেইরূপই হাসিতে লাগিল। তার পর বলিল, "মাসীমা—মনীশের মাও ঐ কথা বলেন।"

"সবাই তাই বল্‌বে, বাবা। তোরা আজকাল বক্তৃতা দিস, কাগজে লিখিস বিধবাদের বিয়ে দাও। তাতে ত খুব উৎসাহ দেখতে পাই। কিন্তু কুমারীগুলো যে বিয়ে না হয়ে দিন দিন কোন্ পথে ভেসে চলে যাবে, সে ভাবনা কারও নেই। কি যে তোরা স্বদেশী করিস্, বাবা !"

এবার পুত্রদিগের তরফ হইতে কোনও উত্তর আসিল না। অনিল মৃত্তিকা-নিক্ষিপ্ত দৃষ্টিতেই বসিয়া রহিল। বিকাশও মুখ ফিরাইয়া লইয়া মনোযোগ সহকারে ছবির গায়ের ময়লা তুলিতে লাগিল।

মাতা বলিয়া চলিলেন, "এই যে তোরা তিনটি ভাল ছেলে,—তিনটি মেয়েকে সংসারে সুখী করতে পারিস্; কিন্তু সত্যিকার দেশ-ভক্তি তোদের আছে বলে আমি ত মনে করি না। তা যদি থাকৃত, তবে তিনটি মেয়ের জীবনের দুর্ভাবনা—তিনটি পরিবারকে কন্যাদায়ের বিশ্রী ভাবনা থেকে উদ্ধার করে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারতিস্ না ?"

বিকাশ এবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু থামিয়া গেল। এ যুক্তির বিরুদ্ধ যুক্তির উল্লেখ করিয়া সে তাহার জননীর স্নেহাতুর প্রাণে বেদনা দিতে চাহিল না।

অনিলচন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার আননের ব্যথাতুর ভাব বিকাশকে আহত করিল। অনিল কেন এখনও বিবাহ করে নাই, তাহার সম্পূর্ণ হেতু সে জানিত না; কিন্তু তাহার মনে এ সম্বন্ধে একটা আভাস অনেক দিন হইতেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। মনীশকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা উভয়েই যে এখনও পর্য্যন্ত দাম্পত্য-জীবনে অগ্রসর হয় নাই, এ সত্য বিকাশ ত মনের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না !

ছেলেদের নীরব দেখিয়া বিকাশের মাতা আর কোন কথা বলিলেন না। অনিল বলিল, "মনীশের আজ পৌঁছুবার কথা আছে, একবার সেখানে গেলে হয়। তার সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে।"

বিকাশ বলিল, "চল্ সেখানে যাই। এতক্ষণ হয় ত সে পৌঁছে গেছে।"

মা বলিলেন, "অনিল, বিকাশ, তোরা কিছু খেয়ে যা।"

অনিল বলিল, "না মাসীমা, আমি ভোর বেলা ভবানীপুর থেকে জলখেয়ে বেরিয়েছি, এখন ক্ষিদে নেই।"

বিকাশ বলিল, "মনীশ বোধ হয় আজই আস্‌বে। আজ রাতে আমরা তিনবন্ধু একসঙ্গে এখানে খাব। তুমি তার যোগাড় করে রেখ। কেমন অনিল ?"

অনিল বলিল, "সেই ভাল।" তার পর, দুই বন্ধু বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

এমন ভাবে এই তিন বন্ধুর পরস্পর মিলন দীর্ঘকাল ঘটে নাই। বিকাশের দ্বিতলের এক পার্শ্বস্থ কক্ষে বসিয়া তিন বন্ধু সন্ধ্যার অবকাশ নানা আলোচনায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল।

বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবন-সঙ্গমের মধু-স্মৃতিভরা মুহূর্ত্তগুলি, অতীত যবনিকার অন্তরাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্ল যৌবন-মধ্যাহ্নের মিলন-ক্ষেত্রে যেন অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিতেছিল। ডিস্‌রেলীর ছাত্র-জীবন সংক্রান্ত অমোঘ বাণীটি আজ বিকাশের মনে বারবার উদিত হইতেছিল।

শিক্ষা-মন্দির—বিশ্ববিদ্যালয় জীবন-প্রভাতে বহু বন্ধু মিলাইয়া দেয়। কিন্তু সংসারের রথচক্রের পেষণে মানুষ যখন পিষ্ট হইতে থাকে—অর্থ, যশ, কীর্ত্তির পশ্চাতে ধাবিত হইয়া মানুষ যখন ব্যর্থতার হাহাকারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, অথবা

সার্থকতার উচ্চ চূড়ে উন্নীত হয়, তখন পূর্ব্বের বন্ধুত্ব কোথায় বিলীন হইয়া যায় তাহা অনুমান করাই কঠিন হয়। জীবনের চক্ররথ মধ্যপথে থামিয়া না গেলে—বন্ধুর সংসার-বর্ম্মের এখানে সেখানে মাঝে মাঝে হয় ত পুরাতন বন্ধুর সাক্ষাৎ মিলিয়া যায়; তখন হয় ত তথা-কথিত মৌখিক অর্থহীন কুশল-প্রশ্ন অথবা উভয় পক্ষ হইতে একটু কাষ্ঠ হাসির বিনিময় অতীতকে বিদ্রূপ করিতে থাকে।

মানব-জীবনের এই সাধারণ পরিণতি সম্বন্ধে বন্ধুত্রয়ের জীবনে এখনও পর্য্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। এখনও বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের মাদকতাভরা তাহাদের জীবনের সমুদয় রঙ্গীন অংশে বাস্তবের নিকষকৃষ্ণ যবনিকা দুলিয়া উঠে নাই। এখনও অনাবিল বন্ধুত্বের প্রবল প্রবাহধারা তর তর বেগে অন্তরকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান ও ছেলেদের প্রেয় আহার্য্যগুলি প্রস্তুতের অবকাশে বিকাশের জননী, তাহাদের অগোচরে মাঝে মাঝে মিলন আনন্দে অভিভূত আলোচনা-মগ্ন যুবক তিনটিকে দেখিয়া যাইতেছিলেন। বহু—বহু দিন তিনি এমন দৃশ্য দেখেন নাই। ভগবান! ইহাদিগকে সুখী কর, তৃপ্তি ও আনন্দ দান কর!

বিকাশ বলিয়া উঠিল, "আজ কিন্তু আমরা তিনজন এই ঘরেই ঘুমুবো!"

অনিল বলিল, "আমি মাকে বলে এসেছি, আজ আর ভবানীপুরে আস্‌তে পারবো না।"

মনীশ বলিল, "মা জানেন এখানেই আমার রাত্রিবাস।"

পল্লী সহরের অতীত জীবন যাত্রার দৃশ্যগুলি তাহাদের বোধ হয় মনে পড়িতেছিল। অনিল মনীশের দক্ষিণ করপুট চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কিন্তু ভাই, তোমার প্রতিশ্রুতি ভুলো না। আমাদের স্বদেশী মেলায় তোমার একখানা নূতন ভাল ছবি দেওয়া চাই-ই।"

মনীশ বলিল, "তা নিশ্চয় দেব। এখনো ত একমাসের উপর সময় আছে। একখানা ছবি এর মধ্যে হয়ে যাবে।"

বিকাশ বলিল, "আচ্ছা, অনি, তুই সারা দিন সেখানে কি করে কাটাস বল্‌ত, ভাই? সঙ্গী তোর বড় কেউ আছে বলে ত মনে হয়না।"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "কেন, কেতাব-কীটের সঙ্গীর অভাব কি? কাউপার যেমন বলেছিলেন গ্রন্থাগার তাঁর সহধর্ম্মিণী। ও যে রকম কেতাব-কীট তাতে সঙ্গীর অভাব ওকে দুঃখ দিতে পারে না।"

বিকাশ বলিল, "সে কথা ঠিক। তা ছাড়া চরকাও ত আছে।"

অনিলচন্দ্র সরল প্রাণে উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল। বন্ধুরা তাহার সম্বন্ধে অভ্রান্ত।

মনীশকে সে বলিল, "তোর সে ব্যায়ামচর্চ্চা এখনও চল্‌ছে ত?"

বিকাশ বলিল, "ওর চেহারা দেখে বুঝতে পাচ্ছিস না, ভাই? বঙ্কিমবাবুর সে বর্ণনাটা মনে আছে ত? ভাষাটা ঠিক মনে পড়ছে না, কোমলতায় এমন বলময়। ও তাই। রোজ ঘণ্টাখানেক স্যাণ্ডোর প্রক্রিয়া ও চালাবেই।"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "বিকাশ এ বিষয়ে যে সাধুপুরুষ নয় তা ত তুমি জানই। ও আবার আমায় জুজুৎসু আর লাটি খেলাও শিখিয়েছে।"

অনিল বলিল, "ওসব একটু আধটু জেনে রাখা ভাল। বাঙ্গালীকে যদি জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করতে হয়, তবে বলিষ্ঠ, ব্যায়ামপটু দেহ ও সুস্থ সবল মনের অধিকারী হতে হবে। কলেজে এ বিষয়টা আমি ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

চিন্তিতভাবে বিকাশ বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তমাত্র চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর গম্ভীর ভাবে বলিল, "ভাই, একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ কি না জানি না। কলকাতায় ত দেখ্‌তে পাচ্ছি, ছেলেরা যেন নারীসুলভ কমনীয়তার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে। খেলাধূলার উৎসাহ অনেকের মধ্যে আছে বটে; কিন্তু যাদের মধ্যে সাহিত্যিক মনোবৃত্তি একটু আছে, ললিত-কলার যারা পক্ষপাতী, তারা যেন পৌরুষের চর্চ্চা করাটাকে অপরাধ বলে মনে করে।"

মনীশ বলিল, "এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মত-বিরোধ নেই। বাঙ্গালী তার পূর্ব্ব পুরুষগণের পৌরুষ হারাতে বসেছে। এটা দুর্লক্ষণ।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "কিন্তু মফঃস্বলের ছেলেদের মধ্যে এ দোষটা কম দেখ্‌তে পাচ্ছি। সহর ও মফঃস্বলে এ পার্থক্য কেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমরাও ত এখনো তরুণদলের

বাইরে গিয়ে পড়ি নি। আমাদের শিক্ষার সঙ্গে এ মনোবৃত্তির যোগ নেই।"

মনীশ বলিয়া উঠিল, "আমাদের প্রথম শিক্ষা মেসো-মশায়ের কাছে, সে কথাটা ভুলে যেও না।"

অনিল বুঝিল, বিকাশের পিতার কথাই মনীশ বলিতেছে। শ্রদ্ধায় তাহার চিত্ত অবনত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "সে সৌভাগ্য সত্যি সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁর আদর্শ আমার জীবনে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।"

বিকাশ কথাটার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া বলিল, "মনীশ, তোর দেশভ্রমণের একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা কি বল্‌বি বলছিলি যে। সেটা ত শোনা হয় নি।"

অনিল বলিল, "হ্যাঁ ভাই, সেটা শোনা যাক্।"

মুহূর্ত্তে মনীশ যেন গম্ভীর হইয়া পড়িল। ডিবা হইতে একটা পাণ তুলিয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে সে বলিল, "মহারাজার সঙ্গে কাশী হয়ে সোজা আমরা আগ্রায় যাই। মহারাজা লোকটা সৌখীন, সে কথা বলা বাহুল্য। সঙ্গে একখানা মোটর। ওটা চালাবার কৌশল অনেক দিন আগেই শিখে নিয়েছিলুম। কোথাও যখন একলা বেড়াতে যেতাম, তখন নিজেই হাঁকাতাম। তোরা ত জানিস নির্জ্জনতার আমি ভারী ভক্ত। ও রোগটা তোদের দু'জনেরও আছে। আগ্রায় যাবার উদ্দেশ্য অনেকগুলো ছিল। মানুষের শিল্প-প্রতিভার অনেকগুলো অতুলনীয় নিদর্শন সেখানে মূর্ত্ত হয়ে আছে। সেদিন পূর্ণিমা। ভারী ইচ্ছে হল, সাজাহানের প্রেমস্বপ্নের মূর্ত্ত-বিগ্রহের সাম্‌নে বসে বাঁশী বাজাব।" মনীশ সহসা নিমীলিত নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল।

বন্ধুযুগল মনীশের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার প্রতিভা-প্রদীপ্ত সুন্দর মুখমণ্ডলে একটা আনন্দদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

নয়ন উন্মীলিত করিয়া সহাস্যমুখে সে বলিল, "সে সুন্দর, পবিত্র, মনোরম দৃশ্যের কথা জন্মে কখনও ভুলব না। কোন লোক যে পারে বিশ্বাস করি নে। আকাশে মেঘের বিন্দুমাত্র রেখাও নেই। যমুনার দিকে তাজের পেছনে একটা নির্জ্জন স্থান খুঁজে নিয়ে বসে পড়লাম। লোকজন সেদিন ছিল না বল্‌লেই হয়। অনেকক্ষণ ধরে জ্যোৎস্না-ধারায় অভিষিক্ত তাজের মহিমা দেখে—সৌন্দর্য্যের জোয়ারে প্রাণটা কাণায় কাণায় ভরে উঠলো। বাঁশীটা বাজাতে আরম্ভ করে দিলুম।"

মনীশ আবার নীরব হইল। বিকাশ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া ছিল। অনিলচন্দ্রও মুগ্ধ-ভাবে শুনিতেছিল। সহসা সে যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন কথা বলিয়া সে মনীশের একাগ্রতাকে ভঙ্গ করিতে চাহিল না।

"তারপর, কতক্ষণ বাঁশী বাজিয়েছিলুম মনে নেই। বার বার সুরটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজিয়ে শেষে ঘড়ী বার করে চেয়ে দেখ্‌লাম, দশটা বাজে। আর রাত করা ঠিক নয়। মহারাজা আমায় সঙ্গে না নিয়ে কোন দিন খান না। মোটরখানা চাবি দিয়ে অচল করে বাইরে রেখে এসেছিলুম। বাঁশীটা পকেটে রেখে তাজকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। খানিক দূর গিয়ে ফটক পার হবার সময়—" মনীশ থামিল। সোজা হইয়া সে উঠিয়া বসিল।

বন্ধুরা দেখিল, বন্ধুর আয়ত নয়ন-যুগল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখে রোষবহ্নি অকস্মাৎ এমন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল কেন?

"দেখ্‌লাম, দুটো জোয়ান লোক একজন পুরুষকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। তাঁর দুইজন সঙ্গিনী স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে উঠেছেন। পাষণ্ডরা সঙ্গের তরুণীকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছে।"

অনিল সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বাধা দিয়া মনীশ বলিল, "না বন্ধু, পারেনি তারা। একজন পদাঘাতে লুটিয়ে পড়ল। আর একজনকে গলা টিপে শুইয়ে দিলাম। এতদিনের শক্তি সাধনা ব্যর্থ হয় নি, ভাই। শুধু ছবি আঁকার তুলি টেনে জীবনটা নারীর মত কোমল করে পৌরুষহীন করে তুলি নি।"

রুদ্ধ নিশ্বাসে বিকাশ বলিল, "এ যে উপন্যাসের মত চমকপ্রদ! তার পর?"

"বদমাস্‌রা বেগ দেবার চেষ্টা একটু করেছিল, কিন্তু বন্ধু, তোমার জুজুৎসু শিক্ষা আর অব্যর্থ মুষ্টির আঘাত কাজে লেগে গেল। মোটরে করে তার পর তাঁদের তুলে নিয়ে যথাস্থানে পৌছে দিলুম।"

অনিলচন্দ্রের নয়ন যুগল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বিকাশ বলিল, "রোমান্স ঐখানেই শেষ। আর কিছু এগোল না?"

মনীশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "তার মানে ?"

"না, ভাই, আমায় ক্ষমা কর। তুমি যে ও-সবের অতীত তা জানি।"

অনিলচন্দ্র চমৎকৃত হইয়াছিল। ভ্রমণ-প্রত্যাগত বীরেশ বাবুর মুখে সেদিন এই ঘটনার কথা সে শুনিয়াছিল ; কিন্তু তাহার নায়ক যে তাহারই অন্তরঙ্গ বন্ধু মনীশ, ইহা সে ভ্রমেও কল্পনা করিতে পারে নাই।

সে কি বলিতে যাইবে, এমন সময় বিকাশের মা আসিয়া বলিলেন, "তোরা ওঠ। ঠাঁই হয়েছে, আর দেরী নয়—দশটা বাজে।"

অনিলচন্দ্র কি ভাবিয়া প্রসঙ্গের আলোচনাটা স্থগিত করিল। তার পর তিন বন্ধু আহারের জন্য বিকাশের মাতার অনুসরণ করিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণের আলোক জানালার মধ্য দিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। পরীক্ষকগণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কন্যার অবয়ব—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমালোচকের ন্যায় পরীক্ষা করিতেছিলেন। বীরেশবাবু উৎকণ্ঠিত চিত্তকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ ও নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতুলচন্দ্রের সহিত অনিলচন্দ্রও পরীক্ষা-সভার এক পাশে আসিয়া বসিয়া ছিল।

অনিলের সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া বীরেশবাবু চারিদিকে কন্যার জন্য পাত্র সন্ধান করিতেছিলেন। বিক্রমপুরের কোনও শিক্ষিত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত একটি পাত্রের পক্ষ হইতে, পাত্রের পিতা, মাতুল ও খুল্লতাত গৌরীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ছয় জোড়া তীক্ষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টির আঘাতে গৌরী অগ্রহায়ণ মাসেও ঘামিয়া উঠিতেছিল।

কেতাবতী বিদ্যার পরীক্ষার পর শিল্প-নৈপুণ্যের পরীক্ষা গৃহীত হইল। গৌরী সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী তাহা তাঁহারা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। সুতরাং এই পরীক্ষার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া গৌরী বোধ হয় স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পাত্র-পক্ষের তরফ হইতে পাত্রীর রূপ-গুণের পরীক্ষার কার্য্য সমাপ্ত হইলে কন্যাপক্ষীয়রা অনুমান করিলেন, পাত্র-পক্ষ এ বিষয়ে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

গৌরী তখন ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইল। বীরেশবাবু স্বয়ং তাহাকে অন্দরে প্রবেশ করিবার দ্বার পার করিয়া দিয়া আসিলেন।

পরামর্শান্তে পাত্রের মাতুল বলিয়া ফেলিলেন, কন্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের পক্ষ হইতে বিশেষ কিছু আপত্তি হইবে না। অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা যদি সঙ্গতভাবে হয়, তাহা হইলে এখনই তাঁহারা কথা পাকা করিয়া যাইতে পারেন। অগ্রহায়ণের শেষ দিকে তাঁহারা বিবাহ দিতে চাহেন। কারণ, পাত্র বিবাহের পরই বিলাত যাত্রা করিবে। সুতরাং বীরেশবাবু যদি তাঁহাদের দাবী মিটাইতে পারেন, তাহা হইলে এইখানেই বিবাহ দেওয়াতে তাঁহাদের আপত্তি হইবে না। পাত্র বিলাতে যাইবে বলিয়া অগ্রহায়ণের মধ্যে যে কোনও স্থানে বিবাহ দিবেন, অবশ্য যদি দরে বনে।

অনিলচন্দ্র এতক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে চাহিয়া ছিল। 'দর' কথাটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে একবার বক্তার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

বীরেশবাবু বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনাদের অভিপ্রায় জান্‌তে পারলে আমি অগ্রসর হতে পারি। তবে অনুগ্রহ করে মনে রাখ্‌বেন, আমি ধনী নই।"

পাত্রের মাতুল আদালতে পেস্‌কারী করেন। এখানকার জজ আদালতেই তিনি কাজ করিতেছেন। সেই সূত্রেই পাত্রপক্ষ কন্যা দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞভাবে হাসিয়া বলিলেন, "বীরেশবাবু, আপনি পণ্ডিত লোক, সুতরাং আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, পণ্ডিত জামাই পেতে গেলে টাকার মায়া করলে চলে না।"

অনিল চেয়ারের উপর চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রতুলচন্দ্রও আসনে সোজা হইয়া বসিলেন।

বীরেশবাবু বলিলেন, "তা জানি, নগেনবাবু। কিন্তু অবস্থার অতিরিক্ত ত মানুষের কোন কাজ করবার সামর্থ্য নেই।"

এবার প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তা আপনাদের দরটা কি তাই বলুন না, নগেনবাবু।"

মুন্‌সেফদের মধ্যে প্রতুলচন্দ্র বিচারকালে কড়া হাকিম, সে কথা নগেনবাবু জানিতেন। বিশেষতঃ জজ সাহেবের সঙ্গেও তাঁহার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ন্যায় বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে সে খবরও তাঁহার অগোচর ছিল না। সুতরাং নগেনবাবু কণ্ঠস্বর বেশ মোলায়েম করিয়াই বলিলেন,

"ওঁদের আঁচ, মেয়েকে বীরেশবাবু যা ইচ্ছে হয় দেবেন, তবে হাজার তিনেক টাকার কমে যেন অলঙ্কারগুলো না হয়। বরাভরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন বক্তব্য ওঁদের নেই। ঘর সাজান আস্‌বাবপত্র, সোনার রিষ্টওয়াচ্, অর্গান এ সব ত উনি নিজেই দেবেন। সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য। তবে ছেলের বিলেতে পাঁচ বছর থাকতে হবে, সেজন্য হাজার দশেক টাকা ওঁদের দরকার আছে। এ আর পাত্র হিসাবে এমন বেশী কিছু নয়, কি বলেন বীরেশবাবু?"

বীরেশচন্দ্র এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। পাত্রপক্ষের ক্ষুদ্র তালিকার ভারে তিনি ধীরে ধীরে সম্মুখের আসনে বিবর্ণ মুখে বসিয়া পড়িলেন।

প্রতুলচন্দ্র রসলেশহীন কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "পাত্রটির যাতায়াতের জাহাজ ভাড়া কি ঐ দশ হাজারের মধ্যে?"

এবার পাত্রের খুল্লতাত বলিলেন, "নগেনবাবু সে কথাটা বল্‌তে ভুলে গেছেন। হিসাব করে যা পড়ে সেটা অবশ্য বীরেশবাবুই পরে দেবেন। তার জন্য কোন চুক্তি অবশ্য আমরা কর্‌তে চাই নে।"

অনিলচন্দ্রের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এতক্ষণ চুপ করিয়াই বসিয়া ছিল। এইবার সে তাহার স্বভাব-সুলভ ধীর কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা নগেনবাবু, আপনার ভাগিনেয় এম্-এ-তে কোন্ ক্লাশ, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

নগেনবাবু এই নূতন জনপ্রিয় তরুণ অধ্যাপকটিকে বিশেষ ভাবেই চিনিতেন। তিনি বলিলেন, "এম্-এ পাশ সে এখনও করে নি। বি-এ পাশ করেই বিলেত যাচ্ছে।"

"ওঃ!" বলিয়াই অনিল চুপ করিয়া গেল।

বীরেশবাবু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "নগেনবাবু, আপনি ত আমার অবস্থা জানেন। এত টাকা দেবার সঙ্গতি আমার নেই।"

পাত্রের পিতা এবার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি কত খরচ করতে পারেন, বীরেশবাবু?"

"মোট পাঁচ হাজার টাকার বেশী মেয়ের বিয়েতে খরচ করবার সামর্থ্য আমার নেই।"

পাত্রের খুল্লতাত উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিক্ত কণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, "বিক্রমপুরের কুলীনশ্রেষ্ঠ বসুবংশের সঙ্গে তা হলে আপনার কুটুম্বিতা করা শোভা পায় না।"

অনিলচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমরা কিন্তু গাভার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের এম্-এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট ছেলেকে মাত্র দু হাজার টাকা খরচ করে ঘরে এনেছিলুম। প্রতুলবাবু এখানকারই মুন্‌সেফ্, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

বীরেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের দাবী মেটাবার সাধ্য আমার নেই। কি আর করব—মেয়ের অদৃষ্ট!"

পাত্রপক্ষ গম্ গম্ শব্দে ঘর কাঁপাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রতুলচন্দ্র অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার শ্যালকের পানে চাহিলেন। অনিলচন্দ্র তখন নতনেত্রে ভূমিতলে কি দেখিতেছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শয্যার উপর দেহভার এলাইয়া দিয়া অনিলচন্দ্র অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভৃত্য অনেকক্ষণ ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। অনিলচন্দ্রের সে দিকে খেয়ালই ছিল না। সে নীরবে উপরের দিকে চাহিয়া চিন্তারাজ্যে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল।

কনিষ্ঠা সহোদরার নিকট হইতে সে মৃদু তিরস্কার পাইয়াছিল। প্রতুলচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ম্মম। কিন্তু অনিলচন্দ্র প্রতিবাদ করিতে ত পারে নাই। এ সকল কথার বিরুদ্ধে বলিবার কিই বা আছে!

বীরেশ বাবুর কন্যা প্রিয়দর্শনা, সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক বরং তাহাকে বিশেষ অনুকূল মতই প্রকাশ করিতে হইয়াছে। গুণের দিক দিয়া এমন কন্যা হাজারে একটা পাওয়াও কঠিন, সে কথা অনিলচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেই প্রকাশ করিয়াছে। বংশমর্য্যাদা এবং পিতৃ-মাতৃ পরিচয়? সে বিষয়ে অভিযোগ করিবার কিছুই নাই, বরং এমন সর্ব্ববিষয়ে গুণবান পিতা এবং মাতা কয়টি বাঙ্গালী পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায়?

তবে?—তবে অনিলচন্দ্রের সমক্ষে এই কন্যাকে গ্রহণ না করিবার কি সঙ্গত কারণ উপস্থিত থাকিতে পারে? চির-কৌমার্য্যকে সে নীতি বা বিশ্বাস হিসাবে বরণ করিয়া লয় নাই, এটুকু সে সহোদরা ও ভগিনীপতির নিকট প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সংসারী

মানবের পক্ষে, যাহারা উপার্জ্জনক্ষম, সুস্থ-সবল-দেহ, তাহারা কোন কারণেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার গুরু দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে না, করা কর্ত্তব্য নহে, এ কথা তাহাকে মানিয়া লইতেই হইয়াছে। ব্যর্থ প্রেমের জন্য সে চিরকুমার-ব্রত পালন করিয়া চলিতেছে না, ইহাও অনিলচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদের সহিত, সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে।

তবে কন্যাদায়গ্রস্ত এই সমধর্ম্মী প্রবীণ অধ্যাপকের কন্যাকে বিবাহ করিতে তাহার বাধা কোথায়? তাহার পিতা ও মাতা এ প্রস্তাব শুনিবামাত্র সাগ্রহে মত করিবেন। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের কাছে তাহার কোন অজুহাতই বিচারসহ হইবে না, তাহা অনিলচন্দ্র উত্তমরূপে জানে। এতকাল বিবাহ না করিবার যে সকল আপত্তি সে পর পর প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি এখন অন্তর্হিত। অর্থোপার্জ্জন সে স্বয়ং করিতেছে, পিতার সঞ্চিত সম্পত্তিও স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে নিতান্ত সামান্যও নহে। দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ যাহারা করে, তাহারা যে বিবাহ করিলেই দেশ-সেবা ব্যর্থ হইয়া যায়, এমন যুক্তি গায়ের জোরে ছাড়া প্রতিপন্ন করাও ত চলে না।

সবই সত্য। কিন্তু কোথায় তাহার বাধা সে কথা ত প্রকাশ করিয়া বলা চলে না, সঙ্গতও নহে। তাহার জননীর অন্তরের ব্যথা দূর করিবার জন্য বিবাহ করিবার কথা মনে পড়িবামাত্র আর এক জনের জননীর কথা তাহার অন্তরের দ্বারে তীব্রভাবে আঘাত করিল।

যদি সে কোনও দিন তাঁহার মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তবেই সে নিজেও তাহার জননীর হৃদয়-ব্যথা দূরীভূত করিয়া দিবে। নহিলে তাহার জীবনে শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে যদি প্রথম হইতেই বন্ধু-জননীর দুঃখের হেতু না হইত, সে যদি বন্ধুকে উৎসাহ না দিত, তাহা হইলে আজ তাহার বন্ধু-জননীকে এমন নৈরাশ্যপূর্ণ দুঃখময় জীবন যাপন করিতে হইত না।

সেদিনও তিনি তাহার হাত ধরিয়া কত অনুনয় বিনয় করিয়া বন্ধুর মতপরিবর্ত্তনের আবেদন জানাইলেন। তিনি ত জানেন না, তাঁহার পুত্র কতখানি ব্যর্থতা অন্তরে বহন করিয়া চির-কৌমার্য্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে। সে কথা প্রকাশ করা অসম্ভব। শুধু তিনজন ব্যতীত চতুর্থ কোন নরনারী তরুণ জীবনের এই বিয়োগান্ত অবস্থার হেতু ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। জীবন থাকিতে সে কথা তাহারা প্রকাশ করিতেও পারিবে না।

বন্ধুর কল্পনাকে, কামনাকে সার্থক করিয়া তোলার পক্ষে এমন বাধা ঘটিবে ইহা যদি সে ঘুণাক্ষরেও পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিত, তাহা হইলে এমন অবস্থা যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থার জন্য অন্ততঃ চেষ্টা করিতে পারিত; কিন্তু তরুণ, উদার, কল্পনাপ্রবণ মন কোন দিক হইতেই বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতার আভাস পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারে নাই। যাহা শোভন, সঙ্গত এবং অনিবার্য্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, যে পথ সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুমোদিত বলিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল, সেই পথে সেই শোভন ব্যাপারটিকে তাহারা সার্থক করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছিল।

চিন্তার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া অনিলচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, আহার্য্য প্রস্তুত। অনিলচন্দ্র ভৃত্যকে বলিয়া দিল, সে ও পাচক আহারাদি শেষ করিয়া ফেলুক। আজ তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষুধা নাই।

ভৃত্য বহুদিনের পুরাতন। মাতা তাহাকে পুত্রের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। সে সঙ্গে থাকিলে তাঁহার পুত্রের কোন অসুবিধা হইবে না।

নিমাই দাদাবাবুর এমন ক্ষুধামান্দ্য কোন দিন লক্ষ্য করে নাই। সে বিস্মিত ভাবে বলিল, "কিছু খাবেন না? দিদিমণি অনেক রকম খাবার তৈরী করে আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন যে। না খেলে তিনি দুঃখিত হবেন।"

অনিলচন্দ্র বলিল, "তবে ঠাকুরকে এখানে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে যেতে বল। যদি খানিক পরে ক্ষিদে পায়, খাব।" নিমাই দেখিল, তাহার দাদাবাবুর মুখ শুধু বিষণ্ণ নহে, বিবর্ণ। কোন কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া সে বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে রন্ধনাগারের দিকে চলিয়া গেল। অনিলচন্দ্র টেবলের সম্মুখে চেয়ারে আসিয়া বসিল। টেবলের এক ধারে পিতা মাতা, অপর ধারে তাহার, মনীশ ও বিকাশের আলোকচিত্র। তিন বন্ধুতে একসঙ্গে এই চিত্র তুলিয়াছিল।

নির্নিমেষ নেত্রে সে মনীশের প্রতিভাপ্রদীপ্ত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে জানিত, মনীশ,

বিকাশ ও তাহার মধ্যে যে অনাবিল বন্ধুত্ব বিদ্যমান, সহসা মানুষের মধ্যে তাহা দুর্লভ। তাহার বিশ্বাস, তাহাদের তিনজনের মধ্যে মনীশের প্রতিভার দীপ্তি সমধিক উজ্জ্বল। মনীশের কল্পনায় প্রচুর সৃষ্টি-ক্ষমতা সঞ্চিত হইয়া আছে। প্রথম জীবনে ব্যর্থতার যে আঘাত-বেদনা সে পাইয়াছে, যদি তাহা না ঘটিত, তবে সহস্রধারায় মনীশের প্রতিভা চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িত। নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অনিলচন্দ্রের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস পর্য্যাপ্ত থাকিলেও, মনীশের চিত্ত কিরূপ দৃঢ় তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। দুর্ব্বলতা তাহার মনের কোনও প্রান্তে উদিত হইতে সাহস পায় না। সেই গভীর, উদার, মহৎ হৃদয়ে নীচতার স্থান নাই। তাহা চপল, চটুল নহে। একবার যাহা তাহার মনে স্থান পায়, গভীর ভাবে তাহা রেখা কাটিয়া অচল অটল হইয়া থাকে।

সুতরাং এই দৃঢ়চেতা বন্ধুর মত পরিবর্ত্তনের আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা না ঘটে, ততদিন তাহার পক্ষেও কৌমার্য্যকে পরিহার করা অসম্ভব। না এ বিষয়ে অন্য কোন পথ নাই। সে সম্পূর্ণ ভাবেই নিয়তির হস্তে এ বিষয়ে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সংসারী মানুষ তাহার এই মনোভাব ও দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনিয়া হাসিবে। বিদ্রূপ করিবে, ইহা সে জানে। তাই সে তাহার মনের কথা বন্ধুদিগের নিকট হইতেও গোপন করিয়া রাখিয়াছে। অনিলচন্দ্র নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যাহা চিত্তক্ষেত্রের-নিভৃততম স্থানে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ধ্যানের সাহায্যে অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করা যায়, কিন্তু লেখনী বা তুলিকার সাহায্যে তাহাকে কি সম্পূর্ণভাবে রূপ দেওয়া চলে?

গৌরী তাহার অঙ্কিত চিত্রপটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কথাই ভাবিতেছিল। আসন্ন মেলার প্রদর্শনীতে সে একখানি চিত্র দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছে। নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীরা তাঁহাদের বিচিত্র প্রতিভার দ্যোতক নানা প্রকার চিত্রশিল্প পাঠাইতেছেন। এ প্রতি-যোগিতায় তাহার এই অক্ষম প্রয়াসসঞ্জাত অতি সাধারণ চিত্রের কোন মর্য্যাদাই থাকিবে না, তাহা সে ভালরূপেই জানে; কিন্তু তথাপি পিতার নির্দ্দেশানুসারে তাহাকে একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিতেই হইবে। অভিজ্ঞ বিচারকের দৃষ্টিতে তাহার চিত্র প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত হইবে না, জানিয়া শুনিয়াই সে এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে।

তবে এ কথা সে জানে যে, যত্নের ত্রুটি সে করে নাই। সমগ্র অন্তর দিয়া সে বর্ণ ও তুলিকার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। এজন্য দীর্ঘ দিবা ও দীর্ঘ রাত্রি সে পরিশ্রম করিতে ত ত্রুটি করে নাই!

চিত্রের অঙ্কন কার্য্য এতদিনে সমাপ্ত হইয়াছে। তুলিকার শেষ রেখাপাত, শেষ বর্ণবিন্যাস করিয়া আজ সে মুক্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পাইয়াছে। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আগামী কল্য সে পিতার দ্বারা চিত্রখানি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবে।

পিতা স্বয়ং চিত্রবিদ্যার গভীর অনুরাগী। তিনি যথা-সম্ভব তাহাকে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে সে যে চিত্র দিতে চলিয়াছে, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় পিতাকে সে এতদিন জানায় নাই, তিনিও জানিতে চাহেন নাই।

পাছে তাঁহার সমালোচনা বা মন্তব্যে তাহার কল্পনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এজন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনায় নিরস্ত ছিলেন। সে বরাবর দেখিয়া আসিতেছে, শিক্ষাদান কালে তাহার পিতা সকল রকমে তাহার কাছে আলোচ্য বিষয় বিশদ করিয়া তুলিয়া ধরেন। কিন্তু যখন গৌরী তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য সাধনা করিতে থাকে, তখন তিনি আর কোনও প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করেন না।

সন্ধ্যাকালে গৃহস্থালীর সকল কার্য্য শেষ করিয়া গৌরী নিজের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সপ্তমীর চাঁদ শীতের আকাশে ঈষৎ কুহেলিমাখা।

শীতের রাত্রিতেও সে বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হয় নাই। খোলা জানালা দিয়া মৃদু জ্যোৎস্নাধারা-ধৌত সন্ধ্যার আকাশ পানে কিয়ৎকাল সে চাহিয়া রহিল। সম্মুখে নদীর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

ধীরে ধীরে সে অঙ্কিত চিত্রখানির আবরণ উন্মুক্ত করিয়া প্রদীপ্ত আলোকে তাহা সমালোচকের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিল। যে সময়ের চিত্র স্মরণ করিয়া সে অঙ্কিত করিয়াছে তখন ফুল্ল-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর

বিচিত্র মাধুর্য্যলীলায়িত অবস্থা। আজিকার এই ক্ষীণদীপ্তি চন্দ্রমার আলোকে তাহা কতকটা অনুভব করা যায় মাত্র।

সহসা তাহার সেই রজনীর ভয়াবহ অবস্থার কথা মনে পড়িল। সে রাত্রির ঘটনা তাহার মানসপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায় নাই কি? সেই স্মরণীয় বিপৎসঙ্কুল অবস্থায় তাহার মানসিক উদ্বেগ এখনও তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে। দুরন্ত রিপু-তাড়িত, মনুষ্য-পশুর ক্ষুধিত, লুব্ধ দৃষ্টির চিত্র সে কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না। দেবদূতের মত যে প্রচণ্ড শক্তিশালী যুবক আসন্ন অপমান ও লাঞ্ছনা হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, বহুবার সে তাঁহার উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে।

পিতা ও মাতা কতবার এই অপরিচিত যুবকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। অনেক সময় তাহার মনে হয়, এই অপরিচিত, পথের ক্ষণিক দেখা মানুষটির হৃদয় কি মহৎ! নিজের পরিচয় দিয়া কৃতজ্ঞতা আদায়ের স্পৃহা মাত্রও তাঁহার ছিল না। বিংশ শতাব্দীর এই ঘোর স্বার্থপরতাপূর্ণ যুগে এমন বাঙ্গালীও কি সত্যই আছে? না, সেই পূর্ণিমা রজনীর সে ঘটনা স্বপ্নদৃষ্ট অবস্থার ন্যায় বাস্তবতাশূন্য?

গৌরী কতবার মনে করিয়াছে, সে বোধ হয় দুঃস্বপ্নই দেখিয়াছিল। নহিলে উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে যিনি ঔপন্যাসিক নায়কের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডের স্পর্শে অন্তর্হিত দৃশ্যের ন্যায় কোন পরিচয়ের আভাসমাত্র না দিয়া বিরাট পৃথিবীর জনকোলাহলের মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেলেন?

গৌরীর মন চিন্তার রাজ্যে এমনই ভাবে চলিতে চলিতে সহসা বাস্তব পৃথিবীর রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। সে মনে মনে যেন একটু সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। সত্য বটে, নারীচিত্ত সাহসী বীরের পক্ষপাতিনী হইয়া পড়ে—ইহা নারীর স্বভাবধর্ম্ম। কিন্তু এমন ভাবে নামগোত্রহীন ক্ষণিক-দেখা অপরিচিত পুরুষের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া লাভ কি?

না, লাভ কিছুমাত্র নাই। তবে তাহার চিত্ত এমন ভাবে প্রায়ই কেন, ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই অজ্ঞাতকুলশীল মানুষটির সংবাদ জানিবার জন্য অবস্থা? গৌরী চিত্রপটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতে লাগিল।

চিন্তার বিচ্ছিন্ন সূত্রজাল অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজেদের অবস্থার কথা তাহার মনে পড়িল। পিতার সদাপ্রসন্ন মুখ সে আজকাল সকল সময়েই বিষণ্ণ দেখে, মাতার আননে চিন্তা ও নৈরাশ্যের কালিমা। তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁহারা যেন বিমূঢ়, অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন।

কেন? এত দুশ্চিন্তা কিসের? তাহার বিবাহ হইতেছে না, কেহ তাহার নারীজন্ম অনুগ্রহপূর্ব্বক সার্থক করিয়া তুলিতেছে না বলিয়াই ত? নারী এমনই হেয়, এমনই বিক্রেয় পণ্য? তাহার কোন সত্তা নাই, কোন মর্য্যাদা নাই? যাহারা বিবাহ করিতে আসে, তাহারাই এক-তরফা মতামত প্রকাশ করিবে, পছন্দ করিবে, অথবা প্রত্যাখ্যান করিবে? এ অধিকার কে তাহাদিগকে দিয়াছে? নারীর তরফ হইতে অনুরূপ ব্যবস্থা কেন হইবে না?

পিতা মাতার কাছে এ সকল কথা উত্থাপন করিতে তাহার সঙ্কোচ হয় বলিয়াই এতদিন সে কোন কথা বলে নাই। এখন সে মার কাছে বলিবে, আজীবন সে কুমারীই থাকিবে। সে যে বিদ্যার আলোচনা করিতেছে, তাহাতে কি নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা একান্তই অসম্ভব? তাহা ছাড়া পিতা যে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার অবিদ্যমানে সে অর্থ কি তাহাদের সামান্য প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে? তবে?

গৌরী ধীরে ধীরে চিত্রপটের উপর আবরণ অন্যমনস্ক ভাবে টানিয়া দিতে দিতে মনে মনে ভাবিল, পৃথিবীর দুরন্ত মানুষ এবং মনের দুর্দ্দম প্রকৃতির আঘাতের শঙ্কা আছে বটে; কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিলে, সাধনা করিলে, এ সকল নিদারুণ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে কেন পারিবে না?

এমন চরিত্রবান্ পিতা, এমন সাধ্বী জননীর রক্তধারা তাহার ধমনীতে প্রবাহিত। পবিত্র বংশের চিরাচরিত নিষ্ঠা ও সংযম কেন তাহাকে শক্তি প্রদান করিবে না?

না, সে আজীবন কুমারীই থাকিবে। পুরুষ যখন লাভ-লোকসান খতাইয়া—বাহিরের রূপ ও ঐশ্বর্য্যের ভিত্তির উপরই পত্নী-নির্ব্বাচন করিয়া স্বার্থপরতার চরম নিদর্শন দেখাইতে পারে, তখন নারীরও কর্ত্তব্য, তাহার এই

গৌরী সংকল্প স্থির করিয়া ঘরের বাহির হইতেই মাতার আহ্বান তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া অনিল বলিল, "তুই এসেছিস্ ভাই! আঃ! সত্যি আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে!"

মনীশ সহাস্য মুখে বলিল, "অঙ্গীকার পালন করতে কোন দিন ভুলে গেছি কি, অনি?"

গাঢ় স্বরে অনিল বলিল, "না,—সে দোষ তোর প্রধান শত্রুও তোকে দিতে পারবে না। কিন্তু এতটা দৃঢ়তা যদি তোর না থাকৃত!"

বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া মনীশ বলিল, "তার মানে?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল বলিল, "ব্যাখ্যা আমি কর্‌তে পারব না। থাক্ ও প্রসঙ্গ।"

মনীশ কি বুঝিল, সেই জানে। কিন্তু সে আর এ বিষয়ে কথা বাড়াইল না।

ভৃত্য নিমাই দাদাবাবুর বন্ধুর জিনিসগুলি গুছাইয়া রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মনীশ জামা জুতা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "এখানে এসে দেখ্‌ছি ভালই করেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম ছবিখানা ইনসিওর করে পাঠিয়ে দেব; কিন্তু শেষে ভাবলাম অনিকে কথা দিয়েছি, বেড়িয়েই আসি। এখানে এসেই দেখ্‌লাম, চমৎকার জায়গা। প্রকৃতি-লক্ষ্মী দু'হাতে তাঁর ঐশ্বর্য্য-সম্ভার ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ভারী ভাল লেগেছে আমার।"

অনিশ বলিল, "বিকাশ আসবে না ভাই?"

"সে নিশ্চয় আসবে। তার ছুটি আর পাঁচ দিন পরে আরম্ভ হবে। কলেজ বন্ধ হইলেই সে রওনা হবে।"

প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া স্নান শেষে মনীশ আরাম করিয়া অনিলের পাঠ-কক্ষে বসিল। নিমাই উভয়ের জন্য জলখাবার লইয়া আসিল।

মনীশ বলিল, "এবার ত স্থিত-ভিত হয়েছিস, এখন বিয়ে করে ফেল্। তা হ'লে অভাগা বন্ধুদের আতিথ্য সৎকারের জন্য তোকে এমন ব্যস্ত হতে হবে না।"

অনিল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল, "এ যে ভূতের মুখে রাম নাম! তা বন্ধু, দৃষ্টান্তটা তুমিই আগে দেখাও! সে অভিযোগ ত তোমার সম্বন্ধেও সমানভাবে চলে।"

মনীশ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। পরিহাসচ্ছলে সে যে প্রসঙ্গের আলোচনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই যেন তাহার অন্তরকে বিদ্ধ করিল। প্রসঙ্গের মোড় ফিরাইয়া দিয়া মনীশ বলিল, "ঐ বাংলোটা কার রে? বেশ সুন্দর দেখ্‌তে ত!"

অনিল বলিল, "তা জানিস নে বুঝি? না, তুই কেমন করেই বা জান্‌বি। ওখানে মুন্‌সেফ প্রতুলবাবু থাকেন, আমার ভগিনীপতি রে—তুই তাঁকে আগে কখনও দেখিস নি। ঠিক্ ঠিক!"

নিবিষ্ট দৃষ্টিতে সেই বাংলোর প্রতি চাহিয়া মনীশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "ওঁরা এখানে কত দিন আছেন?"

"তা অনেক দিন—আমার এখানে আসবার অনেক আগে প্রতুলবাবু এখানে বদলী হয়েছেন।"

এ আলোচনা এইখানেই শেষ হইল। আহারাদির পর উভয় বন্ধু খানিক বিশ্রাম করিল। তার পর অনিল বলিল, "তা হ'লে ছবিখানা এবার মেলা কমিটীর আপিসে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্,—কেমন?"

মনীশ বলিল, "তা দিলেই হয়। তবে কমিটীর সেক্রেটারী ত অনিলচন্দ্র বসু?"

অনিল হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু আপিস ঘর ত এখানে নয়, তা ছাড়া চিত্র-শিল্পগুলি মিসেস টম্‌সনের কাছেই পাঠাতে হয়। চিত্রের আবরণ পর্য্যন্ত তিনি নিজে প্রথমে খুলবেন। তার আগে ছবি দেখবার নিয়ম নেই। এ ছবি বেশ করে প্যাক্ করা আছে ত?"

মনীশ আসবারপত্রের মধ্য হইতে ছবিখানি সন্তর্পণে বাহির করিয়া বলিল, "কমিটীর নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে।"

অনিল সেই অবস্থায় মনীশের ছবি ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীর কাছে ভৃত্য নিমাইয়ের হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিল।

অপরাহ্ণকালে বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া অনিল বলিল, "চল, প্রতুলবাবুর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ পরিচয় করে দিয়ে আসি। কোন আপত্তি আছে?"

মনীশ চলিতে চলিতে বলিল, "আপত্তি আবার কিসের?"

প্রতুলবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া তখন একখানি বই মনোযোগ সহকারে পড়িতেছিলেন। একজন অপরিচিত

যুবকের সহিত শ্যালককে আসিতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অনিল বলিল, "ইনি প্রতুলবাবু, আমার ভগিনীপতি। আর ইনি আমার বন্ধু প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী মনীশ গুহ।"

অভিবাদনানন্তর প্রতুলবাবু সানন্দে মনীশকে বসাইলেন। প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "চিত্র-শিল্পের মারফতে আপনার পরিচয় আমার কাছে নূতন নয়। আমি আপনার চিত্রের অনুরাগী। আগে জান্‌তাম না,—আপনি অনিলবাবুর বন্ধু। অল্প দিন হ'ল সে সংবাদ অনিলবাবুর প্রমুখাৎ জেনেছি।"

আলাপ অল্পক্ষণেই বেশ জমিয়া উঠিল। মনীশ এই মার্জ্জিতরুচি পণ্ডিত ব্যক্তিটির সহিত আলাপ আলোচনায় আনন্দলাভ করিল।

জলযোগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া উভয়ে বলিয়া উঠিল, তাহারা অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই সে কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়াছে। এখন একটু সহর ঘুরিয়া দেখিবার ইচ্ছায় বাহির হইয়াছে।

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমি আপনাদের সঙ্গী হ'তে পারলে সুখী হতাম; কিন্তু নূতন ডেপুটীবাবু একটু পরেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। সুতরাং আমার অপরাধ নেবেন না, মনীশবাবু।"

মনীশ হাসিয়া বলিল, "না, না, সে কি কথা। আপনি বসুন, আমরা ঘুরে আসি।"

বাংলোর চারিদিকে ফুলের বাগান—গোলাপের স্নিগ্ধ মধুর দীপ্তিতে বাগানটি যেন হাসিতেছিল। তাহার সৌন্দর্য্য-লুব্ধ দৃষ্টি চারিদিকে একবার নিক্ষিপ্ত হইল। তার পর বন্ধু-যুগল রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরিচ্ছন্ন সহরের বিভিন্ন অংশ দর্শন করাইয়া অনিলচন্দ্র বন্ধুকে লইয়া নদীর দিকে চলিল। নদী তীরের মধুর সৌন্দর্য্য শীতের সন্ধ্যাতেও মনোরম।

সেদিন পূর্ণিমা। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণিমার বৃহৎ চন্দ্র দেখা যাইতেছিল। শীতের কুহেলিকা আজ তেমন গাঢ় নহে। অল্পক্ষণেই চারি দিকে রজতধারার দীপ্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মনীশের কবি-চিত্ত এ দৃশ্যে উল্লসিত হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, "চমৎকার!"

বসিল। তাহারা যেখানে আসিয়াছিল, তাহার অনতি-দূরে নৌকা ভিড়িবার স্থান। সখের জল-ভ্রমণ করিয়া কেহ কেহ এখানে নৌকা বাঁধিয়া তীরে উঠিয়া থাকে। নির্জ্জন নদীতীরে বসিয়া বসিয়া দুই বন্ধুতে কত সুখ দুঃখের আলোচনা চলিতে লাগিল।

শীতের নদী—তরঙ্গশূন্য। জ্যোৎস্না-স্নাত নদী-জলের উপর দিয়া একখানি জেলে-ডিঙ্গি বন্ধু-যুগলের অদূরে তীর-লগ্ন হইল। একটি পুরুষ ও দুইটি নারী ধীরে ধীরে তীরে উঠিলেন। বন্ধু-যুগল সেখান হইতে উঠিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বেই চন্দ্রালোকিত রাজপথ।

পুরুষটি অগ্রে, তাঁহার পশ্চাতে দুইটি নারী ধীরে ধীরে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজপথে উঠিলেন। বন্ধু-যুগলকে তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন না। সহসা অস্ফুট কণ্ঠে মনীশ বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য!"

অনিল বন্ধুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ব্যাপার কি?"

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মনীশ তন্দ্রা-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এই তিনজনকে যেন কোথায় আমি আগে দেখেছি। ঠিক মনে হচ্ছে না; কিন্তু এটা ঠিক, এঁরা আমার চোখে নতুন নন্‌। হাঁ নিশ্চয়! মনীশ একবার যা দেখে, জীবনে তা কোন দিনই ভুল্‌বে না। তাই ত কোথায় এঁদের দেখেছি!"

অনিলের চক্ষুযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বন্ধুর প্রতি নিবিষ্ট ভাবে চাহিয়া বলিল, "তোমার ভুল হয় নি ত?"

"পাগল, এত ভুল হলে কি ছবি আঁক্‌তে পারতাম? কিন্তু কোথায় দেখলাম এঁদের!"

তিনটি নরনারী তখন রাজপথের অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। বন্ধুর হাত ধরিয়া অনিল বলিল, "চল রাত হয়েছে। কোথায় এঁদের দেখেছ সে কথা বাসায় গিয়ে ভাল করে ভেবে দেখো।" "চল" বলিয়া মনীশ নীরবে বন্ধুর সহিত বাসার দিকে ফিরিল। অনিলচন্দ্রও আর কোন কথা পথের মধ্যে বলিল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মেলা আরম্ভ হইয়াছিল। জেলার হাকিম উদ্বোধন-কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সহরের গণ্যমান্য এবং কর্ম্মীসম্প্রদায় এই স্বদেশী মেলাকে সার্থক করিয়া তুলিবার

বহুলাংশে সার্থক হইয়াছিল। দূর পল্লী হইতে বহু লোক মেলা দেখিতে সহরে আসিতেছিল; কৃষিবিভাগ, উটজ-পণ্য-শিল্প-বিভাগ, চিত্র-শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রদর্শনের আয়োজন হইয়াছিল।

আজ চিত্র-শিল্পাগারের উদ্বোধন হইবে। মিসেস টম্‌সন উহার উদ্বোধন-কার্য্য উপলক্ষে একটি বক্তৃতা করিবেন। সে জন্য সহরের সকলেই মেলা-প্রাঙ্গণের পটমণ্ডপে সমবেত হইয়াছিলেন। বিকাশ আজ সকালেই বন্ধুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে। আহারাদির পর বন্ধুত্রয় সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পল্লীসহরে এমন একটা মেলার আয়োজন দেখিয়া বিকাশ অত্যন্ত বিস্ময়ানুভব করিল।

মনীশ বলিল, "এ প্রচেষ্টার মূলে আমাদের সন্ন্যাসীকল্প বাল্যবন্ধু অনিলের প্রাণপণ আগ্রহ ও চেষ্টা আছে, এ কথা অনেকের মুখেই শুন্‌ছি।"

অনিল লজ্জিত ভাবে বলিল, "কি যে বলিস্ তোরা। কায অবশ্য মানুষ করে, কিন্তু মূলে যে তাঁরই কল্যাণ চেষ্টার আশীর্ব্বাদ রয়েছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে কেন, ভাই!"

বিকাশ বলিল, "সে কথা ঠিক, কিন্তু যন্ত্রীর গুণগানের সঙ্গে যন্ত্রের গুণপনার প্রশংসা মানুষ যদি না করে, তাহ'লে সেটা অশোভন হয় না কি?"

মেলার প্রবেশ-দ্বারে তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। মণ্ডপতলে দর্শকগণ সমবেত হইয়াছিলেন। অনিল বন্ধু-যুগলকে লইয়া সভানেত্রীর আসনের নিকটেই উপবেশন করিল।

মিসেস্ টম্‌সন্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রসন্ন আনন চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। অদূরে উপবিষ্ট অনিলচন্দ্রকে দেখিয়া, তাহার অভিবাদনের বিনিময়ে অভিবাদন ফিরাইয়া দিয়া তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

সভার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইলে সভানেত্রী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট বচনে বলিলেন, "আপনাদের সযত্ন-সংগৃহীত চিত্রপূর্ণ চিত্রাগারের দ্বার উন্মোচন উপলক্ষে আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। মেলা-কমিটী আমাকে চিত্র-সম্বন্ধে গুণাবলীর বিবেচনা করে, যে চিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে তা নির্ব্বাচন করবার ভার দিয়েছেন। অবশ্য এ কাযে সাহায্য করবার জন্য কয়েকজন গুণী ব্যক্তি দ্বারা তাঁরা একটা কমিটীও গঠন করে দিয়েছেন।

"সংগৃহীত চিত্রগুলি আমরা সকলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখেছি। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি মতে বিচারে যা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত সার আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। তার পর চিত্রাগারে প্রবেশ করে আমাদের নির্ব্বাচন ঠিক হয়েছে কি না, তা ত আপনারা পরীক্ষা করে দেখবার অবকাশ পাবেন।

"চিত্র-শিল্পে বাঙ্গালাদেশের উন্নতি দেখে আমি সত্যই বিস্মিত হয়েছি। অবশ্য অনেক চিত্র-শিল্পী মৌলিক পরিকল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নি, এ কথাটাও এই সঙ্গে বলে রাখা সঙ্গত মনে করি। বিদেশী প্রতিভাবান চিত্র-করের অনুকরণে, শুধু অনুসরণে নহে, তাঁরা ছবি এঁকেছেন। কিন্তু মৌলিক পরিকল্পনা এবং খাঁটি ভারতীয় পরিকল্পনার পরিচয়ও কেহ কেহ দিয়েছেন—অবশ্য তাঁদের সংখ্যা অল্প।

"সংগৃহীত চিত্রগুলির মধ্যে দু'খানি ছবি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, এই দুই চিত্র-শিল্পীর বিষয়-বস্তু একই। কমিটী এই বিচিত্র সাদৃশ্য দেখে সন্ধান নিয়ে জেনেছেন, এই দু'জন প্রতিভা-বান চিত্র-শিল্পী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করেন, পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু চিন্তারাজ্যে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে। জানি না, কোন্ বিস্ময়কর মুহূর্ত্তে এঁরা দু'জনেই একই বিষয়কে চিত্র-রচনার উপযোগী বলে মনে করেছেন—"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী টেবিলের উপর হইতে একতাড়া কাগজ তুলিয়া লইয়া খুলিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ বিস্ময়ে বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। মনীশ চমৎকৃতভাবে অনিলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এ বড় অদ্ভুত কাহিনী ত!" অনিল নীরবে মৃদু হাসিল। বিকাশ বলিল, "সাহিত্যে এমন বিচিত্র সাদৃশ্যের কথা পড়া গেছে বটে।"

সভানেত্রী পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, এই দুই চিত্র-শিল্পীর একজন পুরুষ, তিনি ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বলে শুনেছি। অপরা নারী, হিন্দুগৃহের কুমারী কন্যা!—" শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল।

মিসেস্ টম্‌সন্, কণ্ঠস্বর আরও উন্নত করিয়া বলিলেন, "মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অগোচরে, বস্তু-তান্ত্রিক জগতের

অতীত মনোরাজ্যে কি অদ্ভুত লীলা চলে, মানুষ এখনও তার সম্পূর্ণ সন্ধান পায় নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোন নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক অবস্থার মধ্যে পড়ে পরস্পরের অপরিচিত এই তরুণ চিত্র-শিল্পী এবং এই তরুণী অন্তঃপুর-চারিণী একই বস্তুকে উপলক্ষ করে চিত্র অঙ্কিত করেছেন। নিপুণতার দিক দিয়ে পুরুষ চিত্র-শিল্পী যে অভিনব সৌন্দর্য্য তাঁর অঙ্কিত চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে সংগৃহীত চিত্রগুলির মধ্যে তাঁর চিত্রখানি শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নেই। কিন্তু তরুণী চিত্র-শিল্পীও ভাবের দিক দিয়ে যে ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর ছবিখানিও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তাই আমরা স্থির করেছি, এই দু'খানাই একই বন্ধনীর মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেছে।"

সভানেত্রী এই পর্য্যন্ত বলিয়া একবার দর্শকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর কোন্ কোন্ চিত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়া তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করিলেন।

মনীশ চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া এই অভিভাষণ শ্রবণ করিতেছিল। তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "মিসেস্ টম্‌সনের বর্ণনাভঙ্গী ত চমৎকার!"

সভানেত্রী তার পর বলিলেন, "এখন হয় ত আপনারা প্রথম দু'জন চিত্রশিল্পীর নাম জান্‌বার জন্য কৌতূহলী হয়েছেন। পুরুষ-শিল্পীর নাম মিঃ মনীশ গুহ—"

মনীশ সহসা চমকিত হইয়া উঠিল। বিকাশ বলিল, "এ আমি জান্‌তাম। রসজ্ঞ সমালোচকরা মনীশের প্রতিভাকে অস্বীকার কর্‌তে পারেন না।"

শ্রোতৃবৃন্দের করতালি-ধ্বনি থামিলে কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া মিসেস্ টম্‌সন্ বলিলেন, "আর এই তরুণী চিত্র-রচয়িত্রী আমাদের এই সহরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বীরেশ বাবুর কন্যা কুমারী গৌরী ঘোষ"—উচ্চ করতালি-ধ্বনিতে প্রায় দুই মিনিট কাল সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল।

মনীশ বিস্মিতভাবে বলিল, "এ মেয়েটিকে তুমি চেন অনিল?"

বিকাশ বলিল, "আশ্চর্য্য! বীরেশবাবুর নাম শুনেছি, দূর সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী মার বোন্ হন। মেয়েটির পাত্র জুটছে না বলে সেদিন মাকে তিনি পাত্রের খোঁজের জন্য পত্র লিখেছেন। আমাকেও তাঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে

অনিল এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এবার বলিল, "বীরেশ বাবু তোর আত্মীয় হন, সে খবর ত আমার জানা ছিল না!" মনীশ আপন মনে বার দুই অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!"

মিসেস্ টম্‌সনের কথা আবার শুনা গেল। তিনি বলিতেছিলেন, "এবার আমি গিয়ে চিত্রাগারের দ্বারোন্মোচন করব। তার পর আপনারা যথারীতি চিত্রগুলি দর্শন করে ধন্য হবেন। কেবল একটা কথা আমি এখানে না বলে পারছি না। এই মেয়েটি বাইরের কোন সাহায্য না পেয়ে, তাঁর বাপের কাছে উপদেশ ও প্রথম শিক্ষা পেয়ে নিজের প্রতিভা-বলে যে সুন্দর ছবিখানি এঁকেছেন, এ জন্য আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করছি। আর কমিটীর নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার ছাড়াও আমি তাঁকে একটি মেডেল দিতে চাই।"

আবার সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি সভা-প্রাঙ্গণকে মুখরিত করিয়া তুলিল। বীরেশবাবু সভাক্ষেত্রের এক প্রান্তে বসিয়া ছিলেন। তিনি উদ্গত-প্রায় আনন্দ-অশ্রুধারাকে অতি কষ্টে সংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বারোন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যক্তি চিত্রাগারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে ভিড় একটু কমিলে অনিলচন্দ্র বন্ধুযুগলের সহিত চিত্রাগারে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই মনীশ তাহার চিত্র দেখিতে পাইল। "জ্যোৎস্নালোকে তাজ" চিত্রের পার্শ্বেই দেখিল আর একখানি চিত্র। তাহার শিরোনামা শুধু "জ্যোৎস্নালোকে।" অনিল বলিয়া উঠিল, "চমৎকার!" বিকাশ বলিল, "আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, কিন্তু—"

তিনজনেই গৌরী-রচিত চিত্রখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, এই চিত্রখানিতে তাজ জ্যোৎস্নার ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দাঁড়াইয়া। তাহার কিছু দূরে একটি ভয়ার্ত্তা নারী। তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য একজন দুর্ব্বৃত্ত হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। তাহার নয়নে লালসার কি উগ্র দীপ্তি! আর একজন বলিষ্ঠ তরুণ আক্রমণকারীর গলদেশ চাপিয়া ধরিয়াছে!

মনীশ আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "চমৎকার! চমৎকার! কিন্তু এ দৃশ্য—" বিকাশ বলিয়া উঠিল,

হচ্ছে!" অনিলচন্দ্র সহসা আপনাকে দৃঢ় বলে সংবরণ করিল।

মনীশ ঈষৎ বিচলিত ভাবে বলিল, "তাই ত দেখছি। তবে—ওঃ! অনিল, সেদিন জ্যোৎস্না রাতে যাঁদের দেখেছিলুম!—মনে পড়েছে, তাঁরাই, তাঁরাই!"

মনীশের মনের কোনও প্রান্তে আর সন্দেহের অবকাশ মাত্র রহিল না। সে তখন বলিল, "নিশ্চয় এঁদের সঙ্গে তোমার জানা শোনা আছে, অনি?"

মৃদু হাসিয়া অনিল বলিল, "তা আছে বৈ কি। তবে শুধু বীরেশবাবুর সঙ্গে। বহু বচন হিসাবে নয়!"

বিকাশ হাসিয়া বলিল, "অনিলের স্বভাবটা এক রকমই রয়ে গেল। রহস্য করবার অবকাশ পেলে, কখনই ছাড়বে না।"

অন্যান্য চিত্র দর্শনের পর মনীশ মাঝে মাঝে আত্মগত ভাবে বলিয়া উঠিতে লাগিল, "আশ্চর্য্য কিন্তু! ভারী আশ্চর্য্য!"

বিকাশ বন্ধুকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অনিলচন্দ্র তাহার গা টিপিয়া নিষেধ করিল। বিকাশ অনিলের ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য না বুঝিলেও সে বন্ধুর সতর্কতার সম্মান রক্ষা করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

শীতের প্রভাত। তখনও কুহেলিকার যবনিকা চারি দিক আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে।

হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই নিম্নোল্লিখিত বন্ধুত্রয়ের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। অনিলচন্দ্র তাহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়া চলিয়াছিল, সমাজের লোক যতই শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হইতেছে, মনুষ্যত্বের উচ্চাদর্শ হইতে ততই তাহারা নীচে নামিয়া চলিয়াছে। প্রতীচ্য সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিক প্রভাব, প্রাচ্য সভ্যতার অনাড়ম্বর উদারতাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ, এই ভাবে চলিলে, কখনই আশাপ্রদ হইবে না। এ কথা সে জোর করিয়া বলিতে পারে।

বিকাশ বলিল, "কিন্তু আমরাই ত সে সমাজের লোক। আমরা ইচ্ছা করলে অনেক অনাচারের প্রতিবিধান করিতে পারি। খাঁটী বাঙ্গালী জীবনকে অবলম্বন করতে বাধা কোথায়?"

মনীশ বলিল, "তাই করাই ত দরকার। তরুণ দলের পর্য্যায়ে আমাদের নাম নিশ্চয়ই আছে। সংস্কারের দিকে শক্তি প্রয়োগ করাই ত দরকার।"

অনিল বলিল, "কিন্তু আমাদের মন যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েই রয়েছে। এই ধর না কেন বিবাহে পণপ্রথা। এটার সংস্কার কি সাধ্যের অতীত?"

মনীশ বলিল, "এটা ত সহজেই হতে পারে। হচ্ছেও অনেক।"

অনিল হাসিয়া বলিল, "অনেক নয়, কদাচিৎ দু' একটা। এই ধর না কেন, বীরেশবাবুর মেয়ে। দেখতেও চমৎকার—অবশ্য গৌরবর্ণ নয়, কিন্তু চেহারা খুব সুন্দর। গুণের কথা কি আর বলব! লেখাপড়া, সূচিশিল্প, গান বাজনা চমৎকার শিখেছেন। আর চিত্রশিল্পের পরিচয় ত নিজের চোখেই পেয়েছ। অথচ মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে না। যে আসে, সেই দশ পনের হাজার চেয়ে বসে।" এই বলিয়া সম্প্রতি যে ঘটনা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। বিকাশ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "এরা কি মানুষ!" মনীশ চেয়ারের উপর একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

বিকাশ র‍্যাপারখানা গায় জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "আমরাও ত এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারি। অবশ্য আমার মাসতুতো বোন। তোমরা দুজন ত বিয়ে কর নি! একজন কেন এমন চমৎকার মেয়েটিকে বিয়ে কর না। তোমাদের কারুরই ত অন্নবস্ত্রের অভাব নেই।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বন্ধু-যুগলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মনীশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে মনুষ্য-পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল।

"অনিলবাবু উঠেছেন না কি?"

"কে প্রতুলবাবু? আসুন, আসুন!"

বাহিরে যাইবার সজ্জায় ভূষিত হইয়া প্রতুলচন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনিল বলিল, "এত সকালে কোথায় চলেছেন?"

"আর ভাই, আমার বোন্ মেলা দেখ্‌বে বলে ভারী উৎসুক হয়েছে। কিন্তু লোকের অভাবে আস্‌তে পারছে না। বোনাই মফঃস্বলে আদায়ের চেষ্টায় গেছেন। তাই তাকে আনবার জন্য যাচ্ছি। ষ্টীমার ৮টায় ছাড়বে।

সেখানে পৌঁছুতে ১২টা বাজ্‌বে। আজই তাকে নিয়ে ফিরব। তবে আস্‌তে রাত্রি হবে। আপনার বোন্ রইল। কথাটা বল্‌বার জন্য এসেছিলাম!" প্রতুলচন্দ্র বিদায় লইলেন। আলোচনায় বাধা পড়ায় প্রসঙ্গটা আর উঠিল না।

মধ্যাহ্ন আহারের পর বিকাশ বলিল, "বীরেশ বাবুর বাড়ীটা—মাসীমার বাড়ীটা নদীর ধারে, সহরের দক্ষিণে বলছিলে না? সেখানে আমি একবার যাব। তোমরা গল্প কর, আমি সেখান থেকে ঘুরে আসি।"

বিকাশ চলিয়া গেলে দুই বন্ধু শয্যার উপর শয়ন করিয়া পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিল। দিবা নিদ্রার স্বভাব কাহারও ছিল না। চিত্রাগার হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে মনীশ একটু স্বল্পভাষী হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা অনিল লক্ষ্য করিয়াছিল। এরূপ অবস্থা তাহার যে নূতন তাহা নহে। যখনই কোন একটা কল্পনা তাহার চিত্তে জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই সময় মনীশ কম কথা কহে, ইহা অনিল ও বিকাশের অগোচর ছিল না। তার পর যখন তাহার কল্পনা বর্ণ ও তুলিকার সহযোগে রূপ গ্রহণ করে, তখন মনীশের এই গাম্ভীর্য্য বা অন্যমনস্ক ভাব অন্তর্হিত হয়।

দূরে কোতোয়ালীর ঘটিকা-যন্ত্রে ৪টা বাজিয়া যাইবার শব্দ শ্রুত হইল। নিমাই আসিয়া দুইজনের জলখাবার দিয়া গেল। দুই বন্ধু জলযোগ সারিবার পর অনিল বলিল, "একবার ও-বাসা ঘুরে আসি। মনীশ চল্ না আমার সঙ্গে।" মনীশ বলিল, "যাবো?"

"একা বসে কি করবি? ওখানে খানিক বসে তার পর বেড়াতে গেলে হবে। বিকাশ সন্ধ্যার আগে ফিরবে বলে মনে হয় না। তার পর না হয় একবার তিন জনে মেলার দিকে যাওয়া যাবে। কি বলিস?" "তাই চল্।" মনীশ জুতা জোড়া পায় গলাইয়া দিল।

প্রতুলবাবুর বাংলোয় উপস্থিত হইয়া মনীশ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বোনের শরীর এখন ভাল আছে?" তরলিকার বিবাহের পর আজ সর্ব্ব প্রথম মনীশ অনিলচন্দ্রকে তাহার সহোদরা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল।

অনিলচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে বলিল, "সে ভালই আছে। তার শরীর আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করবি?" "মন্দ কি!" অনিলচন্দ্র বন্ধুর দৃষ্টিতে একটা উজ্জ্বলতা এবং কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্যের ব্যঞ্জনা অনুভব করিল কি? বাহিরের ঘরে মনীশকে বসাইয়া অনিল ভিতরে চলিয়া গেল।

মনীশ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদ্‌পিণ্ড যেন দ্রুত তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটা অনুভূতির দহন জ্বালা যেন ক্রমেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পৌষের শীতল বাতাস তাহার ললাটের স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিল। সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া সে উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিল। অদূরে গোলাপ-বীথির ডালে ডালে কতকগুলি বড় বড় গোলাপ ফুটিয়া উদ্যানের শোভা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। গাছগুলি একটি বাতায়নের নিম্নেই অবস্থিত।

অন্যমনস্কভাবে মনীশ সেই দিকে চলিল। তাহার উদ্দেশ্যের কোনও স্থিরতা তখন ছিল না। গোলাপ-কুঞ্জের কাছে পৌঁছিয়া সে হাত বাড়াইয়া একটি প্রকাণ্ড গোলাপ তুলিতে যাইবে, এমন সময় তাহার প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। জানালার অপর পারে ঘরের মধ্যে দুইটি কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শ্রুত হইল। একটি তাহার বন্ধু অনিলের, অপরটি—সে কাণ পাতিয়া শুনিল, হ্যাঁ সেই সুপরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু যৌবন-ধর্ম্মের প্রভাবে এখন তাহা আরও গুঞ্জন-মাধুর্য্য অর্জ্জন করিয়াছে! সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। তাহার মূর্ত্তিও কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না।

তরলিকার কণ্ঠ উচ্চ সপ্তকে উঠিয়াছিল। সে বলিল "তুমি কি বল্‌ছ, দাদা!—আমি এখন শুধু তোমার বোন্ নই। আমি একজনের স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী। তিনি বাড়ী নেই, তাঁর অগোচরে আমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব?"

অনিল মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "সে ত তোমার অজানা নয়, আগে তাকে দাদা বলেই ডাকতে। এতে দোষ হতে পারে—বিশেষতঃ এ যুগে?"

ঝঙ্কার দিয়া তরলিকা বলিয়া উঠিল, "তার মানে? লেখাপড়া শিখে তোমাদের কি বুদ্ধি শুদ্ধি হয়েছে, বুঝতে পারি নে। হিঁন্দুর মেয়ে স্বামীর মত না নিয়ে বাইরের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাবে কেন? তোমার বন্ধুই বা একজন পরস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য এত লালায়িত কেন?"

অনিল বলিল, "তুই অত রাগ্‌ছিস কেন, বোন্?"

"রাগ হবে না? এসব লোকের মতিগতি দেখ্লে হিন্দুর মেয়ে সহ্য করতে পারে? আমার স্বামী যখন বাড়ী নেই, তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসা হল। কেন, তোমার বন্ধু ত অনেক দিন হল এখানে এসেছেন। এ বাড়ীতেও এসেছেন। আমার স্বামীকে বল্তে পারেন নি, তরলিকা আমার বোন্ হয়, তার সঙ্গে দেখা করব? ছিঃ! ছিঃ!—তুমি আবার তার হয়ে ওকালতি করছ? না, তাকে বলগে দেখা হবে না। তার সঙ্গে সম্পর্ক কি? তার পর আমার স্বামীর অসাক্ষাতে আমি তার সঙ্গে দেখা করব না। হিঁদুর ছেলে হয়ে, হিঁদুর মেয়ের সঙ্গে পরস্ত্রীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়, এসব কি জানা নেই?"

মনীশচন্দ্রের দেহ টলিতে লাগিল। তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নাক কাণ দিয়া অগ্নি-তরঙ্গ তীব্র উচ্ছ্বাসে নির্গত হইতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইল না। সোজা ফটক পার হইয়া বন্ধুর বাসভবনে আসিল। স্পন্দিত দেহ-ভার বহন করা অসাধ্য দেখিয়া সে শয্যার উপর এলাইয়া পড়িল।

বুকের উপর হাত রাখিয়া সে কেবল বারকয়েক অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল, "উঃ। উঃ!"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

অনিলচন্দ্র বাহিরে আসিয়া মনীশকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হইল। তবে কি মনীশ তাহাদের আলোচনা শুনিতে পাইয়াছে? মনীশ ত তরলিকার সহিত দেখা করিবার প্রস্তাব করে নাই, বরং সেই উপযাচক হইয়া দেখা-সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়াছিল। তরলিকা যে এই সহজ ব্যাপারটিকে এমন দুষ্টভাবে গ্রহণ করিবে, ইহা তাহার কল্পনাতেও আসে নাই। এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে, এ প্রস্তাব উত্থাপিত করা সঙ্গত হয় নাই। সে এখন পরের স্ত্রী, হিন্দু ঘরের কুললক্ষ্মী। বিশেষতঃ—না, সত্যই তাহার সাংসারিক বুদ্ধি অল্প।

অনিলচন্দ্র দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মনীশ নিমীলিত নয়নে, নিস্পন্দ ভাবে শয্যায় শুইয়া আছে।

অনিলের পদশব্দে মনীশ উঠিয়া বসিল। অনিল দেখিল, বন্ধুর আননে একটা বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। তাহার নয়নযুগলে অস্বাভাবিক দৃঢ়তার দীপ্তি।

মনীশ স্থির দৃষ্টিতে অনিলের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া অকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "অনিল!"

বিস্মিতভাবে অনিল বলিল, "কি?"

"বীরেশবাবু আমাদের স্বজাতি?"

"নিশ্চয়।"

"তিনি আমার মত পাত্রে তাঁর মেয়েকে দান করতে রাজি আছেন? অবশ্য বিনাপণে?"

অনিলচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিল। পরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "তোমার মত পাত্র পেলে তিনি চরিতার্থ হবেন, আমি জানি।"

"তবে তুমি আজই প্রস্তাব কর, আমি তাঁর মেয়ে গৌরীকে আমার গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত। এই মাঘ মাসের প্রথমেই যে শুভদিন থাকে, আমি রাজি।"

অনিলচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত বন্ধুর মুখের দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া চাহিয়া রহিল।

সত্য? ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তবে বিংশ শতাব্দীতে ভঙ্গ হওয়া সম্ভবপর? কিন্তু কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল?

অনিলচন্দ্র মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক। মানব-মনের গোপনতম মনোবৃত্তির প্রকাশ-ভঙ্গীর সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলি সে বহুবার বহুরূপে আলোচিত হইতে দেখিয়াছে। সে কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল। তার পর সহসা তাহার নয়নে একটা আলোক-দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উটিল। সে কি তবে মনের গতির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের মূলসূত্রটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে?

মনীশ এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। সহসা সে মুখ ফিরাইয়া বন্ধুর দিকে চাহিল। দেখিল, অনিলচন্দ্র তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার সমগ্র আননে একটা রক্তোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। তার পর হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বিশ্বাস হচ্ছে না বন্ধু? আমি সত্য কথাই বলেছি। মনের উপরে এত দিন কল্পনার যে মায়াজালখানা পড়েছিল, সত্যের তীব্র আলোকে তার মিথ্যা রূপ ধরা পড়ে গেছে। মরীচিকা কখনো প্রকৃত শীতল জলে ভরা দীঘি হতে পারে না। এতদিন শুধু শুধু আমার মাকে, আমার পার্থিব দেবতাকে কষ্ট দিয়েছি। এখন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাক। বন্ধু, আমায় ভুল বুঝো না।"



তরুণের স্বপ্ন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ চট্টোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

অনিলচন্দ্র বোধ হয় এতক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিল। সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "মেয়েটিকে একবার চোখে দেখ্‌বে না? শেষে যদি অনুতাপ আসে?"

গাঢ় স্বরে মনীশ বলিল, "কোন প্রয়োজন হবে না। আমার জীবনের প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে একজন যখন তাকে দেখেছে, তুমি বিশ্বাস করতে পার, তখন আমি নিজের চোখে তাকে আর দেখ্‌ব না। নারী জাতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ সম্ভ্রমবোধ আছে, সে কথা বোধ হয় তুমি ভালই জান। বারবার পুরুষ তার গৃহলক্ষ্মীকে বরণ করবার জন্য বেগুন, পটল, শাক, মাছের মত তাকে পরীক্ষা করে দেখ্‌বে, এটা আমার কাছে অসহ্য। অনিলচন্দ্র যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাকে দেখ্‌বার আর দরকার হবে না। বিশেষতঃ আগরার তাজমহলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে আমি সে মূর্ত্তি দেখেছি। নতুন করে আর দেখ্‌তে যাবার দরকার নেই।"

ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনিল বলিল, "তবে তাই হোক্। তুমি বস। এ শুভ মুহূর্ত্ত আমি বৃথা যেতে দিতে পারি নে। আমি বেরুচ্ছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আস্‌ব।"

নিমাই এমন সময়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, এ বেলা কি রান্না হবে?"

অনিল প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "তোর যা খুসী, নিমাই। আজ ভালরকম ভোজের ব্যবস্থা করতে পারবি?"

বিস্মিত ভাবে নিমাই বলিল, "কেন পারব না? কিন্তু আজ কি হয়েছে, দাদাবাবু?"

অনিল বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ খুব ভাল খবর এসেছে। তাই এখানে উৎসব করা যাবে।"

সে আর দাঁড়াইল না। ছড়িগাছা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

তুলসীতলে প্রদীপ দিয়া, লক্ষ্মীর পূজা সারিয়া গৌরী নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল। আজ তাহার বাবা এখনও তাহাকে নিয়মিত পাঠে সাহায্য করিবার জন্য আসেন নাই। সে পাঠ্য-পুস্তকগুলি লইয়া আলোকের সম্মুখে বসিল।

কিন্তু পড়ার দিকে আজ তাহার চিত্ত যেন অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। গত্য কল্য মেলার চিত্র-শিল্পাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে মিসেস্ টম্‌সন তাহার শিল্পপ্রতিভা সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, পিতার মুখে সে তাহা শুনিয়াছিল। সহরের সাপ্তাহিক পত্র একটা অতিরিক্ত সংস্করণ আজ ছাপিয়াছে, তাহাতেও সে তাহার প্রশংসার কথাগুলি পাঠ করিয়াছে। আজ পুনঃ পুনঃ সেই কথাগুলিই তাহার মনে পড়িতেছিল।

নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাহার কোন বিশ্বাসই ছিল না। তাহার অঙ্কিত চিত্র যে বিশেষজ্ঞগণের কাছে প্রশংসিত হইবে, এমন দুরাশা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনের কোন প্রান্তে স্থান পায় নাই। শুধু প্রশংসা পাওয়া নহে। বাঙ্গালার উদীয়মান, সর্ব্বজন-প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর সমপর্য্যায়ে তাহার আসন নির্দ্ধারিত হইয়াছে!

গৌরী ভাবিতে লাগিল। বাস্তবিক, এ কি বিস্ময়! উভয়ে একই বিষয়-বস্তু লইয়া ছবি আঁকিয়াছে! কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল?

গৌরী চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তন্ময় হইয়া গেল। নানারূপ সম্ভব অসম্ভব কল্পনা তাহার মনের মধ্যে জটলা পাকাইয়া তুলিল।

সহসা পার্শ্বের কক্ষে পিতা ও মাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাহার সম্বন্ধে বাবা মাকে কি বলিতেছেন? গৌরী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

মাতা বলিলেন, "সত্যি না কি?"

পিতা বলিলেন, "অনিলবাবু এইমাত্র সেই প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। বিকাশও তাই বল্‌ছে।"

গৌরী শুনিল মাতা বলিতেছেন, "বিকাশ একটু আগে এসেছিল, তা কোন কথা বলে নি ত?"

"না, তখন বলে নি, এখন বল্‌ছে। পাত্র এক পয়সাও চায় না। তোমার কি মত?"

মাতা বলিলেন, "ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র কেমন খোঁজ নেবে ত?"

বীরেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, "অনিলবাবু ও বিকাশের পরম বন্ধু, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর! তা ছাড়া আগরার তাজ দেখতে গিয়ে রাত্রি বেলা কি বিপদে পড়েছিলুম্ মনে আছে ত? এই মনীশ গুহই গুণ্ডাদের হাত থেকে গৌরীকে রক্ষা করেছিল। আরও শুন্‌তে চাও?"

গৌরী চমকিয়া উঠিল। তাহার বুকের স্পন্দন দ্রুত-তালে নাচিয়া উঠিল। মনীশ গুহ! নব-যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীই তাহার মান-মর্য্যাদার রক্ষাকর্ত্তা! তিনিই আজ তাহার পাণিপ্রার্থী!

বীরেশবাবু বলিতেছিলেন, "ছেলে গৌরীকে দেখতেও চায় না। বন্ধুদের কাছে তার গুণের পরিচয় পেয়েছে, তাই যথেষ্ট বলে মনে করে। বিকাশ, অনিলের শৈশবের বন্ধু। মা আছেন, বিষয়-সম্পত্তি আছে; ব্যাঙ্কে নগদ টাকাও যথেষ্ট; চরিত্রটি গঙ্গার জলের মত পবিত্র। এমন পাত্র—মহাদেবের ন্যায় সুন্দর জামাই—তোমার মেয়ের তপস্যা এতদিনে বুঝি সার্থক হয়!"

গৌরী তখন তপস্যারতা গৌরীর ন্যায়ই নিমীলিত নেত্রে বসিয়া ছিল। পরীক্ষা দিবার জন্য সে আর কখনও পরীক্ষার্থিগণের সম্মুখে আসিবে না। তাহাতে যদি আজীবন কুমারীও থাকিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; আজ কি সর্ব্বান্তর্যামী, অনাথ-শরণ তাহার সে মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন! তিনি নিরুপায়ের উপায়, দরিদ্রের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় স্বরূপ এ কথা মিথ্যা নহে, মিথ্যা নহে!

* * * *

মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের শুভ্র রজনীতে মনীশ ও গৌরীর মিলন-মন্ত্র উচ্চারিত হইল। বাসর-ঘরে দম্পতি নীত হইল। অনিল ও বিকাশ সেখানে আসিয়া মহিলাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনারা এখানে আমাদের দু'জনকে খানিকক্ষণ বসবার অনুমতি দিন। আমাদের শৈশব বন্ধু আজ আমাদের একটা গান শুনিয়ে দেবেন। এ গানটা এই ঘরে বসে শুন্‌বার পর আমরা চলে যাব।"

মনীশ অনিলকে জনান্তিকে ডাকিয়া বলিল, "তোমার মতলব কি, অনি?"

হাসিয়া অনিল বলিল, "কিছু না। শুধু তোমাকে একটা গান গাইতে হবে।"

"কি গান?"

অনিল তেমনই প্রশান্তভাবে হাসিয়া বলিল, "চিরন্তনীর জয়!—যে গানটা আমরা তিন জনে অনেকবার গেয়েছি। সেইটি।"

মনীশের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, অনিল এই গানটি রচনা করিয়াছিল। গানের মর্ম্ম প্রেম চিরন্তন। সে কখন কোন্ আধারে তাহার অভিব্যক্তি ফুটাইয়া তুলে মানুষ তাহা জানে না, বলিতে পারে না। বিদ্রোহ করিয়া উহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিলেও চিরন্তন সত্য একদিন তাহার জয় ঘোষণা করিবেই।

মনীশ বলিল, "বন্ধু, তোমাদের আদেশ শিরোধার্য্য।"

গান শেষ হইয়া গেলে অনিল বিকাশের হাত ধরিয়া সে ঘর ত্যাগ করিল।

তাহার মুখের উপর তখন শুধু তৃপ্তির একটা অনাবিল দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল কি?

শেষ

মাধবী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

শুধু ভালোবাসিয়াছি; সেই প্রেম মোর
কুসুমের মতো শুভ্র; কৌমুদী-বিভোর
আকাশের মতো দীপ্ত; জাহ্নবীর সম
অন্তরের সুধামন্ত্রে সুপবিত্রতম।

যে যুগল নামে তব আত্মীয় স্বজন
তোমারে আসিছে ডাকি, কোরেছি বর্জ্জন
আমি তাহা ওগো সখি! বলিয়া 'মাধবী'
জানায়েছি মাধুরীর তুমি মূর্ত্ত ছবি।

যোগ্য নাম 'মাধবী' তোমার; মধু তব
দৃষ্টিতে, বাণীতে, হাস্যে; নিশিদিন দ্রব
পরাণ-পরাগ তব মৃদু মধুধারে,
মধু তব সারা অঙ্গে, মধু অঙ্গহারে।

নিমেষে সোহাগভরে মরুভূরে চুমি
ঢাকো তারে পত্রে পুষ্পে হে মাধবী তুমি
তোমার পুলক রসে প্রজাপতি দুলে
মেলিয়া চিকণ পাখা কৃষ্ণচূড়া-ফুলে।

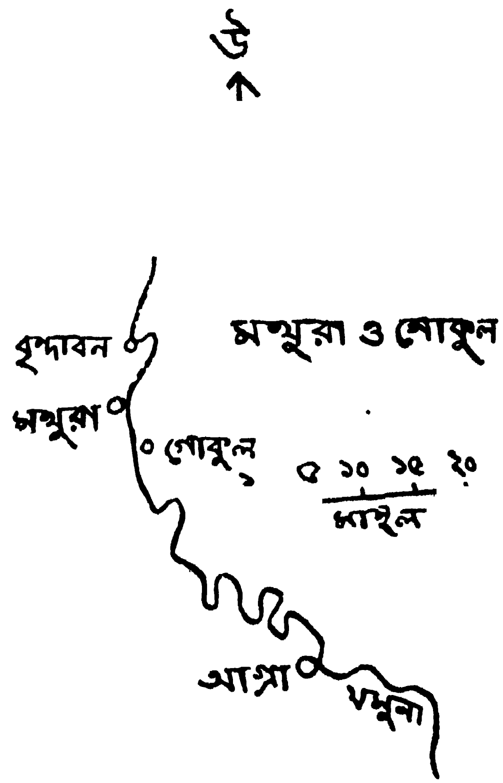
মরমের রাঙারাখী অনুরাগে দিয়া
তোমারে নিয়াছি আমি আপন করিয়া
সবুজ আঁচল তব ভরেছি কৌতুকে
চাঁপা, নাগকেশরেতে, অশোকে, কিংশুকে।

হৃদয়ের অর্ঘ্য লহ, মাধুরীর রাণী
তুমি যে বেসেছ ভালো, বহু ভাগ্য মানি
মন চুরি করা জেনো অপরাধ নয়,
যেথা তাহা মৃত্যুহীন শুধু বিনিময়।

ভারতে যাদব-বংশ

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

আজ মহাপুরুষ কৃষ্ণের একটি অদ্ভুত ঐতিহাসিক কীর্ত্তি,—যাদব-বংশকে জরাসন্ধের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা সমগ্র বংশের বহু সহস্র লোককে মথুরা হইতে ছয় শত মাইল দূরবর্ত্তী সুরাষ্ট্রে লইয়া যাওয়া আমাদের আলোচ্য। কৃষ্ণ যাদববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে যাদবগণের সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতে আগমন করিবার কথা আছে। এই জন্য আদৌ তাহারা আর্য্য জাতীয় ছিল কি না সেই বিষয়ে কোন কোন পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আচার-ব্যবহারে যে তাহারা সাধারণ আর্য্যগণ হইতে অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল, মহাভারত, হরিবংশ ইত্যাদিতে তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা স্বভাবতঃই কিছু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল, এবং ইহাও দেখা যায় যে, সুরা ও রমণীতে তাহাদের আসক্তি কিছু অতিরিক্ত ছিল। যাহা হউক, পরবর্ত্তী কালে তাহারা ভারতীয় আর্য্যসমাজে সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছিল, এবং সুরাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দুই ধারে, ভারতের সমগ্র পশ্চিম-উপকূল ব্যাপিয়া দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বে মথুরা পর্য্যন্ত তাহারা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। হরিবংশে যাদবগণের বংশ-বিস্তার সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, অযোধ্যার সূর্য্যবংশে হর্য্যশ্ব নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি মধুপুরীর (মথুরা) রাজা মধুদৈত্যের (দ্রাবিড়বংশীয় ?) কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া তিনি শ্বশুরবাড়ী আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্বশুর মধুদৈত্য তাঁহাকে সুরাষ্ট্র প্রদেশে স্থাপিত করিলেন এবং গিরিদুর্গ-সমন্বিত তাঁহার রাজ্য যে আনর্ত্ত নামে বিখ্যাত হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। হর্য্যশ্বের পুত্র যদু। যদু সমুদ্রোদরবাসী (সম্ভবতঃ আরব্য সাগরের সোম দ্বীপের রাজা) সোম রাজার পঞ্চ কন্যা বিবাহ করেন। যদুর পাঁচ পুত্র,—মুচুকুন্দ, পদ্মবর্ণ, মাধব, সারস ও হরিত। ইহাদের মধ্যে মাধব পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন। অন্য চারিজন দেশবিজয়ে বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। মুচুকুন্দ বিন্ধ্য ও ঋক্ষবাণ পর্ব্বতের মধ্যে রাজ্য স্থাপন করিয়া নর্ম্মদাতীরে মাহিষ্মতীপুরীতে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। পদ্মবর্ণ পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার মধ্যে বেণা নদীর তীরে করবীর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন

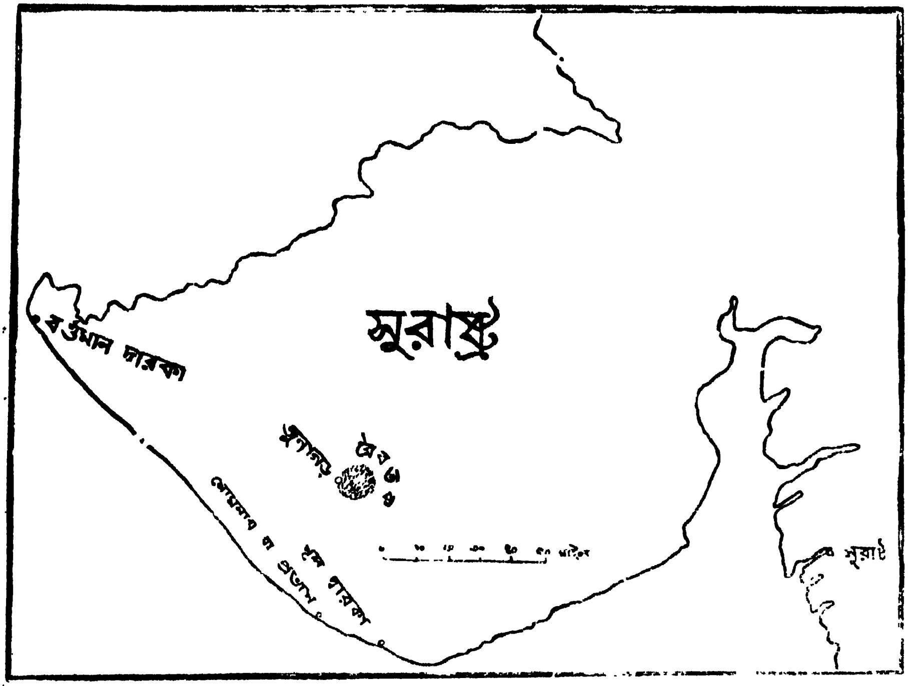


গোকুলের মানচিত্র

করিলেন। [এই স্থান বর্ত্তমান পর্ত্তুগীজ অধিকার গোয়া প্রদেশের সীমার অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত এবং বর্ত্তমানে কারোয়ার নামে পরিচিত, প্রায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিখ্যাত স্থান।] সারস বনবাসী নামক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রৌঞ্চপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। "হরিত···বহুরত্নপূর্ণ সমুদ্রদ্বীপ পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যের

মুদ্গর নামক বিখ্যাত ধীবরগণ সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করতঃ শঙ্খসকল আহরণ করিত। অপর সাবধান ধীবরগণ রাশি রাশি জলসম্ভূত প্রবাল ও উজ্জ্বল মুক্তাসমূহ সংগ্রহ করিত। নিষাদগণ ক্ষুদ্র নৌকাযোগে অন্বেষণ করতঃ জলজাত রত্নরাশি আহরণ করিয়া মহানৌকায় সংগ্রহ করিত। সেই রাজ্যের লোক সকল মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সেই রত্নদ্বীপ নিবাসী মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকার রত্ন গ্রহণ করতঃ মহানৌকাযোগে দূরদেশে গমন করিয়া বাণিজ্যলব্ধ দ্রব্য দ্বারা ধনদসদৃশ একমাত্র হরিতেরই তৃপ্তিসাধন করিত।"

হরিবংশ। বঙ্গবাসী সংস্করণ, বঙ্গানুবাদ, ১৫৪ পৃঃ।



সুরাষ্ট্রের মানচিত্র

বনবাসীর কদম্ব-রাজগণ পরবর্ত্তী কালে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন—উহা বর্ত্তমান কালের উত্তর কানাড়া প্রদেশ মাঙ্গালোর নামক বিখ্যাত সহর ইহার অন্তর্গত। রত্নদ্বীপ সিংহলেরই অপর নাম। হরিবংশের এই বিবরণ প্রাত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করা কঠিন। যাদবগণের পশ্চিম ভারতে এই বিস্তৃতির অনুমানিক কাল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দ। আর্য্য সভ্যতা অশোকের (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দ) পূর্ব্বেই সিংহল পর্য্যন্ত প্রসৃত হইয়াছিল, এইমাত্র জোর করিয়া বলা যায়।



জুনাগড়ে উপর কোট দুর্গ

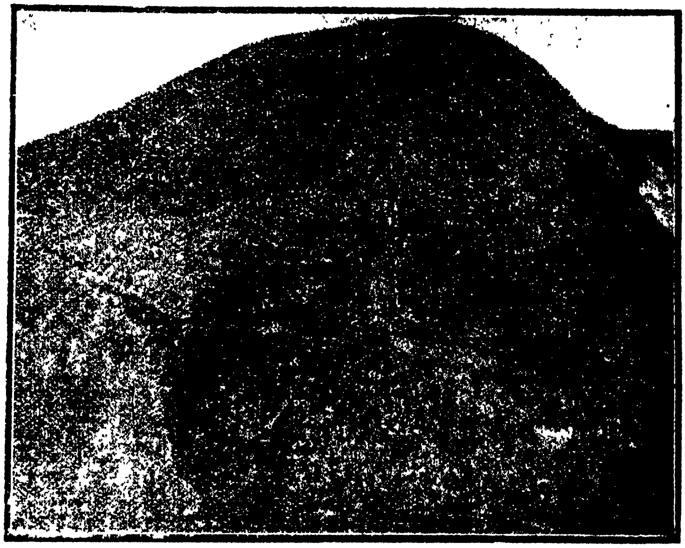
যদুর শ্বশুর সমুদ্রোদরবাসী নাগ যদুকে বর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্ততিগণ জলে-স্থলে সমান বিচরণশীল হইবে। যাদবগণের মহানৌকায় সমুদ্র যাত্রা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার সেই আশীর্ব্বাদ সার্থক হইয়াছিল। ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে এবং শ্যাম কাম্বোজ ইত্যাদি রাজ্যে খৃষ্টের জন্মের

পূর্ব্ব হইতেই কি করিয়া ভারতীয় সভ্যতা প্রসৃত হইয়াছিল, যাদবগণের এই মহানৌকায় সমুদ্রে বিচরণ হইতে তাহা বুঝা যায়।

সুরাষ্ট্রে মাধব রাজা হইলেন। মাধবের ছেলে সাত্বত। সাত্বতের পুত্র ভীম। "রাজা ভীমের রাজত্বকালেই অযোধ্যায় রাম রাজ্যশাসন করিতেছিলেন।" সেই সময়েই সুমিত্রানন্দন শত্রুঘ্ন মধুপুরীতে মধুর পুত্র লবণকে যুদ্ধে নিহত করেন। লব ও কুশের সময় ভীম মধুপুরী বা মথুরা অধিকার করেন। ভীমের পরে অন্ধক রাজা হন। অন্ধকের পুত্র রেবত। তাঁহার নামানুসারে সুরাষ্ট্রের স্বনামখ্যাত পর্ব্বত রৈবতক নাম ধারণ করে। রেবতের দুই পুত্র ঋক্ষ ও বিশ্বগর্ভ। ঋক্ষ সম্ভবতঃ সুরাষ্ট্রে রাজা হ'ন, বিশ্বগর্ভ মথুরায় প্রস্থান করেন। বিশ্বগর্ভের পুত্র বসু। বসুর পুত্র বসুদেব।

বসুদেবের ঘরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম—কংস-বধ

মথুরায় তখন যাদবগণের আর এক শাখা ভোজ-বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেছিল। ঐ বংশের শূরসেন বা উগ্রসেন যখন মথুরার রাজা, তখন উগ্রসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবকের কন্যা দৈবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হয়। বসুদেবের আর এক স্ত্রীর নাম রোহিণী। কিছু দিন পরে উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া উগ্রসেন পুত্র কংস মথুরার সিংহাসন অধিকার করিলেন। কংস বসুদেবের গোষ্ঠীকে সুনজরে দেখিতেন না। নানা প্রকার গালগল্পের মধ্য হইতে সত্য বাহির করা বড় কঠিন। কংসের এই বাসুদেববংশ-ভীতির প্রকৃত কারণ কি, হরিবংশ পড়িয়া তাহা স্থির করা যায় না। 'যে আদিম মনোবৃত্তি হইতে মার্জ্জার বা ব্যাঘ্র তাহার নবজাত শাবক ভক্ষণ করিয়া ফেলে, যে মনোবৃত্তিবশে মিশরাধিপ অধীন ইহুদী-গণের নবজাত বালক মাত্রকেই নদীতে ফেলিয়া দিতে হইবে বলিয়া আদেশ দিয়াছিলেন, কংসের বসুদেববংশ-ভীতিও সেই মনোবৃত্তিরই বিকাশ বলিয়া মনে হয়।



শিলালিপির টীলা

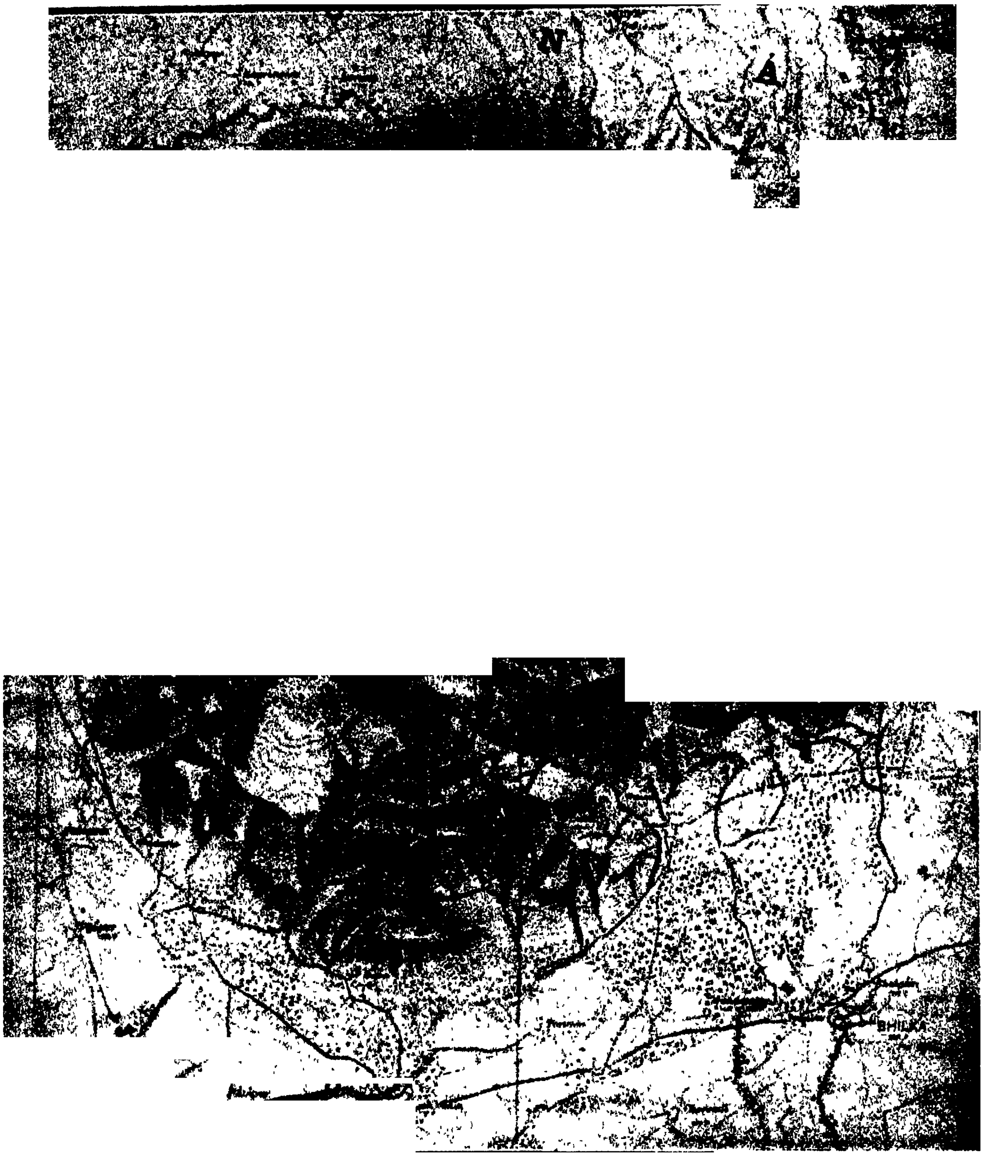
যাহা হউক, কংসের ভয়ে বসুদেব জ্যেষ্ঠপুত্র বলরাম সহ তাহার গর্ভধারিণী রোহিণীকে যমুনার পূর্ব্বপারে গোকুলে গোপ-পল্লীতে লুকাইয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।



উপর কোট হইতে রৈবতকের দৃশ্য

কিছু কাল পরে দৈবকী-গর্ভে কৃষ্ণ জন্মিলে পর তাহাকেও আভীরগণের সর্দ্দার নন্দগোপের ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

গোকুলে কৃষ্ণ ও বলরাম বাড়িয়া উঠিল, ক্রমেই তাহারা অসাধারণ বলবীর্য্যের পরিচয় দিতে লাগিল। তাহাদের বলবীর্য্যের খ্যাতি যাইয়া মথুরা পর্য্যন্ত পৌছিলে, দুই পুত্রকে গোকুলে লুকাইয়া রাখার অপরাধে একদিন কংস বসুদেবকে রাজসভামধ্যে খুব গালাগালি দিলেন,— যাদববৃদ্ধগণও কংসকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন। ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ ও বলরামকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া কংস তাহাদিগকে মথুরায় আনিতে গোকুলে অক্রুর নামক যাদবকে পাঠাইয়া দিলেন। মহাবলশালী কিশোর কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় যাইয়া মল্লগণকে পরাজিত ও নিহত করিলেন, অন্যায় যুদ্ধে কিশোরদ্বয়কে বধ করিতে আদেশ দিলে পর কংসও কৃষ্ণের হাতে নিহত হইলেন। কিশোর কৃষ্ণের পরামর্শে যাদবগণ কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজা করিলেন। উগ্রসেন কৃষ্ণ ও বলরামকে



রৈবতকের মানচিত্র

অবস্তিতে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দুই ভাই মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই প্রসঙ্গের পরে হরিবংশে বলরাম ও কৃষ্ণের বহু-রাষ্ট্র-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ আছে। কংস প্রবল পরাক্রান্ত মগধ সম্রাট জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কংসের মৃত্যুর পরে সেই দুই বিধবা কন্যা অনবরত জরাসন্ধকে মথুরা আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। জরাসন্ধও অনেকবার মথুরা আক্রমণ করিয়া যাদবগণের পরাক্রমে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। রাম ও কৃষ্ণ দেখিলেন, তাহাদেরই জন্য বারবার মথুরা আক্রান্ত হইতেছে ও যাদবগণ বিপন্ন হইতেছে। দুই ভাই তখন মথুরা ছাড়িয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং দক্ষিণ দিকে চলিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হইয়া তথাকার এবং সহ্যাদ্রির নিকট ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত যাদবরাজ্যসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হরিবংশে আছে—মগধ সম্রাট জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে ধরিতে সসৈন্য পিছনে পিছনে ধাইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান গোয়ার নিকটস্থ গোমন্ত নামক পর্ব্বতে কৃষ্ণ ও বলরাম আশ্রয় গ্রহণ করিলে চারি দিক হইতে ঐ পর্ব্বত ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানে রাম ও কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং জরাসন্ধ আবার বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হ'ন। রাম এবং কৃষ্ণও কিছু দিন পরে মথুরায় ফিরিয়া যান। রাম ও কৃষ্ণের বহুরাষ্ট্রভ্রমণ এবং জরাসন্ধের সসৈন্য তাহাদের অনুসরণ ও গোমন্ত পর্ব্বতে তাহাদের সহিত যুদ্ধের উপাখ্যান হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নহে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে (পরে দ্রষ্টব্য) সুরাষ্ট্রস্থিত রৈবতক পর্ব্বতেরই অপর নাম 'গোমন্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

যাদবগণের মথুরা হইতে অপযান

রাম ও কৃষ্ণ মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, জরাসন্ধ এবার কালযবন নামক এক দুর্দ্ধর্ষ যবন রাজার সহিত মিলিয়া দুই দিক হইতে মথুরা আক্রমণ করিয়া মথুরাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবার জোগাড় করিতেছেন। যাদবগণের এই বিপদ দেখিয়া দূরদর্শী রাজনৈতিক কৃষ্ণ যাদবগণকে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া সুদূর যাদবরাজ্য সুরাষ্ট্রে প্রয়াণ করিবার পরামর্শ দিলেন। এই অপযানের কার্য্য ও কারণ সম্বন্ধে মহাভারত হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারি। বলা বাহুল্য মহাভারতের সাক্ষ্য এই বিষয়ে হরিবংশ হইতে গণ্যতর।

মহাভারত অনুসারে, কংসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জরাসন্ধ একবার মথুরা আক্রমণ করেন। হংস ও ডিম্বক



জৈন-মন্দির

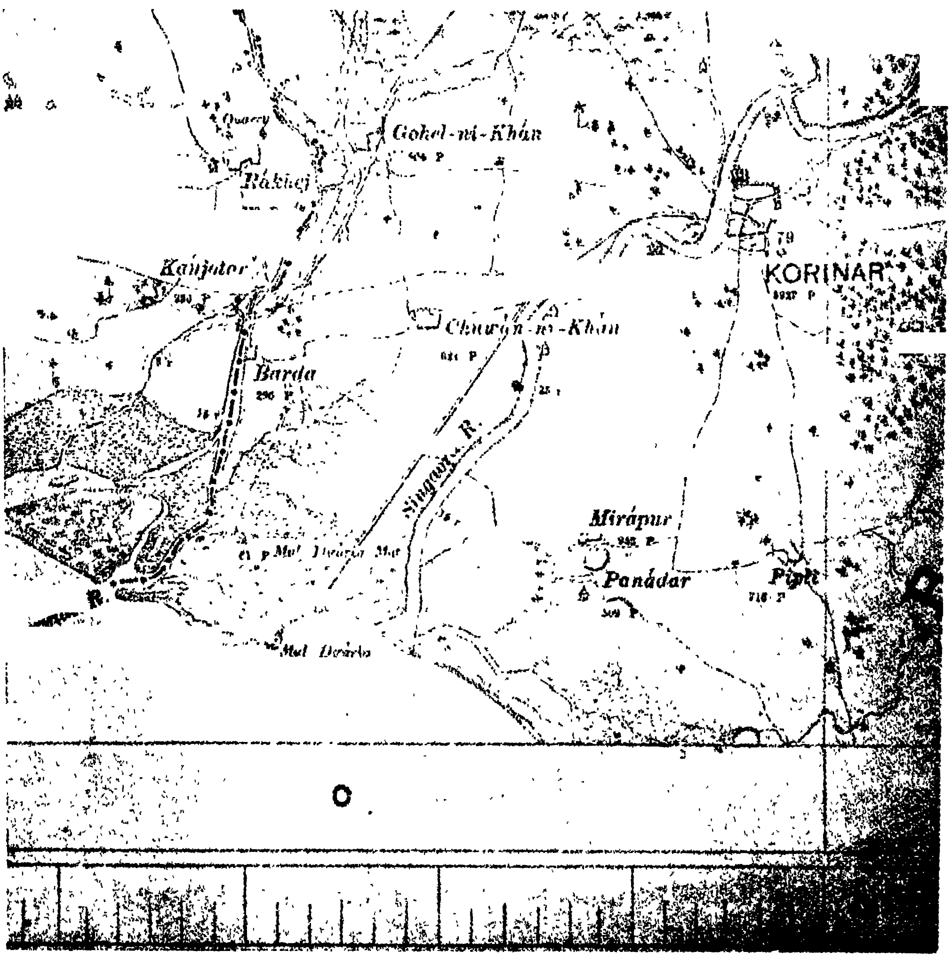
নামক তাঁহার দুই সেনাপতির মৃত্যু হওয়ায় জরাসন্ধ সেইবারের মত ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পরে কংসপত্নী নিজের বিধবা কন্যাগণের প্ররোচনায় জরাসন্ধ আবার মথুরা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেই যাদবগণ "বিমনা ও পলায়মান" হইল। ঐ জরাসন্ধের ভয়ে আমরা বিপুল ঐশ্বর্য্য পৃথক্ পৃথক বিভাগ দ্বারা সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত পলায়ন করি।......তৎকালে আমরাও উহার ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারবতী পুরীতে পলায়ন করিয়াছিলাম।" (বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারত সভাপর্ব্ব, চতুর্দ্দশ অধ্যায়। বঙ্গবাসী সংস্করণ, বঙ্গানুবাদ,

২২২ পৃষ্ঠা।) হরিবংশের জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ প্রসঙ্গ মহাভারতে নাই। জরাসন্ধ ও কালযবনের একযোগে মথুরা আক্রমণ প্রসঙ্গও মহাভারতে নাই।

যাদবগণের রাজধানী দ্বারবতীর অবস্থান নির্ণয়

সুরাষ্ট্রের মানচিত্রের সহিত সকলেই পরিচিত আছেন। মানচিত্রে দেখিবেন, বর্ত্তমান দ্বারবতী নগরী বা দ্বারকাপুরী অবস্থান দৃষ্ট হইবে। কিন্তু মহাভারত ও হরিবংশ মিলাইয়া পড়িয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে আদি দ্বারবতী মূল দ্বারকায়ও অবস্থিত ছিল না। মূল দ্বারকা দ্বারবতী নগরীর দ্বিতীয় সংস্থান। আদি দ্বারকা কোথায় ছিল সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করা যা'ক্।

মহাভারতের সভাপর্ব্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের



মূল দ্বারকার মানচিত্র

অতসী-কোরকাকৃতি সুরাষ্ট্রের একেবারে সূক্ষ্মাগ্র চঞ্চুপ্রদেশে অবস্থিত। এই স্থানেই দ্বারকাধীশ বা রণছোড়জির বিখ্যাত মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। কিন্তু সুরাষ্ট্রের সকলেই জানে, কৃষ্ণের দ্বারবতী বা মূল দ্বারকা এই স্থানে ছিল না। মানচিত্রে আজিও মূল দ্বারকার অবস্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সঙ্গীয় মানচিত্র হইতেই বর্ত্তমান দ্বারকা ও মূল দ্বারকার নিকট কৃষ্ণের আত্মবিবরণ বর্ণনায় আছে—"সকলেই পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিলাম। ঐ পশ্চিমাঞ্চলে রৈবতশৈল দ্বারা পরিশোভিতা কুশস্থলী নামে এক পরম রমণীয়া পুরীতে বাস করিলাম এবং তথাকার দুর্গ উত্তমরূপে সংস্কৃত করিলাম। ঐ দুর্গ দেবতাদিগেরও অগম্য, তথায় স্ত্রীগণও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে, বৃষ্ণি-কুলোদ্ভব মহারথীদিগের ত

কথাই নাই। হে শত্রুঘাতিন্, এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ পুরীতে বাস করিতেছি। মাধবেরা ঐ গিরিবরের সংস্থানাদি পর্য্যালোচনা করিয়া এবং মগধেশ্বরের হস্ত হইতে উত্তীর্ণই হইয়াছি বিবেচনা করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে জরাসন্ধের অনিষ্টাচরণে সর্ব্বতোভাবে উত্যক্ত হওয়ায় আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও প্রয়োজনবশতঃ আমরা গোমন্ত পর্ব্বতে সমাশ্রিত হইয়াছি। ঐ পর্ব্বত তিন যোজন বিস্তীর্ণ। প্রতি যোজনের মধ্যে উহাতে একুশটি সৈন্যব্যূহরচিত এবং যোজনান্তে এক শত দ্বার নির্ম্মিত আছে। বীরদের বিক্রমই উহাতে তোরণ স্বরূপ হইয়াছে, এবং অষ্টাদশ বংশসম্ভূত যুদ্ধ দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। হে রাজন্, আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা বর্ত্তমান আছে।”

মহাভারতের এই প্রসঙ্গটি হইতে বিবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাই এই অংশটুকু সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছি।

প্রথম দেখা যাউক মথুরা হইতে সুরাষ্ট্রে প্রয়াণকারী যাদবগণের মোট সংখ্যা কত ছিল।

মাঝারি আকারের একটা সহরের লোক-সংখ্যা সেই কালে ৬০।৭০ হাজারের উপরে ছিল বলিয়া সম্ভব মনে হয় না। তাহাদের মধ্যে ১০।২০ হাজার রহিয়া গিয়াছিল ধরিলে হাজার পঞ্চাশেক যাদব মথুরা পরিত্যাগ করিয়াছিল ধরিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এইটা নিতান্তই একটা মোটা রকমের আন্দাজ।

মহাভারতে কৃষ্ণ বলিতেছেন, যাদবগণ অষ্টাদশকুলে বিভক্ত এবং তাহাতে ১৮০০০ 'ভ্রাতা' বর্ত্তমান আছে। ভ্রাতা অর্থে যদি যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি ধরা যায়, তবে হিসাবের একটা ভিত্তি পাওয়া যায়। সেই কালে যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞানই ক্ষত্রিয়ের প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ১৪ বছর হইতে ৫০ বছর পর্য্যন্ত যোদ্ধারা সমরে লিপ্ত হইত বলিয়া ধরা যায়। বর্ত্তমান কালের লোক-গণনার অঙ্ক পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুসমাজে পুরুষের সংখ্যা ১৪ বছর পর্য্যন্ত মোট সংখ্যার তৃতীয়াংশ, ১৪ হইতে ৫০ বছর পর্য্যন্ত মোট সংখ্যার অর্দ্ধাংশ এবং বৃদ্ধ ষষ্ঠাংশ। কাজেই যাদবগণের মধ্যে পুরুষ প্রায় ১৮×২=৩৬০০০ ছিল এবং স্ত্রীগণও প্রায় সমান সংখ্যক ছিলেন ধরিলে উহাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৭০০০০ ছিল ধরিতে হইবে। এই সত্তর হাজার লোকের মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম পথের উপর দিয়া চলিয়া প্রায় সাড়ে ছয় শত মাইল দুরবর্ত্তী রৈবতক পর্ব্বত পর্য্যন্ত যাইয়া বসতি স্থাপন করা ভারতের ইতিহাসে এক পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার এবং যাদব-নায়ক মহাপুরুষ কৃষ্ণের এক অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, যাদবগণ যে পুরীতে বাস স্থাপন করিয়াছিল, তাহার নাম কুশস্থলী অথবা দ্বারবতী। তথায় পূর্ব্ব হইতেই এক দুর্গ ছিল; যাদবগণ যাইয়া তাহা উত্তমরূপে সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিল মাত্র। ঐ দুর্গ এত দুর্ভেদ্য ছিল যে স্ত্রীগণও তাহাতে অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। ঐ দুর্গ ও পুরী রৈবত শৈল দ্বারা পরিশোভিত। এই রৈবত শৈল তিন যোজন বিস্তীর্ণ এবং উহার নানা স্থানে সৈন্য সমাবেশ দ্বারা উহা শত্রুর অধৃষ্য করা হইয়াছিল।

রৈবতক পর্ব্বতে যে সুরাষ্ট্র স্থিত, বর্ত্তমানে জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত গির্ণার পাহাড়, তাহা সকলেই জানেন। এই পাহাড়ে অনেকগুলি শিখর আছে। ইহা আকারে প্রায় গোল এবং উত্তর দক্ষিণে অথবা পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় বার মাইল দীর্ঘ। কাজেই এ স্থানে চারি মাইলে এক যোজন ধরিতে হইবে। মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌এর সংস্কৃত অভিধানে যোজনের অন্যতম পরিমাণ চারি অথবা পাঁচ মাইল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে দ্বারকা সমুদ্রতীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লক্ষ্য করা আবশ্যক যে দ্বারবতীর প্রথম উল্লেখে সমুদ্রের প্রসঙ্গ মাত্র নাই। অথচ মৌষল পর্ব্বে দেখা যায়, দ্বারবতী সমুদ্রতীরে প্রতিষ্ঠিত।

আদি দ্বারবতী যে রৈবতক পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী, এমন কি ঐ পর্ব্বতের উপরেই ছিল, হরিবংশে তাহারও প্রমাণ আছে। যাদবগণ মথুরা হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে চলিতে চলিতে “সাগরানূপ শোভিত বিপুল দেশ দেখিতে পাইলেন।...তাহার অনতিদূরেই মন্দরের ন্যায় রমণীয় শিখরসমন্বিত রৈবতক পর্ব্বত সার্ব্বাঙ্গীন শোভা বিস্তার করিতেছে। সেই পর্ব্বতে...একলব্য বাস করিতেন... এবং তদুপরি তাহার যে স্বায়ত অষ্টাপদ সদৃশী বিহার ভূমি নির্ম্মিতা হইয়াছিল তাহাই দ্বারবতী নামে প্রসিদ্ধ। কেশব সেই স্থানেই নগর স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং যাদবগণও তথায় সেনা নিবাস করিতে চাহিলেন।...

এইরূপে সবান্ধব যাদবগণ দ্বারবতী পুরী প্রাপ্ত হইয়া দেবগণ যেরূপ সুরপুরে বাস করেন তদ্রূপ সুখে বাস করিতে লাগিলেন।"

হরিবংশ, ১১৩ অধ্যায়।

হরিবংশের ১১৫ অধ্যায়ে দ্বারবতীর একটি বর্ণনা আছে। উহাতে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দ্বারকা এবং রৈবতকের পশ্চিমস্থ দ্বারকার বর্ণনা মিশিয়া খিচুড়ী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই বর্ণনায়ও আছে যে দ্বারকার পূর্ব্ব দিকে—"মণি ও কঙ্কনময় তোরণ সমন্বিত এবং রমনীয় সানু গুহা চত্বর শোভিত লক্ষীবান্ রৈবতক শৈল শোভা পাইতেছে।" এই বর্ণনা সমুদ্রতীরস্থ মূল দ্বারকায় কথনও প্রযুক্ত হইতে পারে না।

আদি দ্বারবতী রৈবতক পর্ব্বতের খুব কাছে অথবা ঐ পর্ব্বতের উপরে থাকিবার আর একটি প্রমাণ মহাভারত হইতে উপস্থিত করিতেছি। এই স্থানে মনে রাখা আবশ্যক যে, দ্বারবতীর দ্বিতীয় সংস্থান-স্থল, যাহা বর্ত্তমানে মূল দ্বারকা বলিয়া পরিচিত, তাহা রৈবতক পর্ব্বত হইতে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া পৈত্রিক রাজ্যার্দ্ধ লাভ করিয়া পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলে দ্রৌপদী সম্বন্ধে নিয়মভঙ্গ করার জন্য অর্জ্জুন বার বছরের জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। গোটা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া তিনি অবশেষে সুরাষ্ট্রের প্রভাস তীর্থে আগমন করিলেন। অর্জ্জুন প্রভাস তীর্থে আসিয়াছেন শুনিয়া কৃষ্ণ আসিয়া আদর করিয়া তাঁহাকে যাদব-রাজধানীতে লইয়া গেলেন।

"অনন্তর তাঁহারা দুইজনে প্রভাসে যথাভিলাষ বিহার করিয়া বাসের নিমিত্ত রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কৃষ্ণের অনুজ্ঞানুসারে পরিচারকগণ সেই মহীধর মণ্ডিত করিয়া তথায় বিবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। অর্জ্জুন বাসুদেবের সহিত তথায় ভোজনাদি করিয়া…শয্যায় নিদ্রাভিভূত হইলেন…বিভাবরী অবসানে …উত্থিত হইলেন এবং যাদবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কাঞ্চনময় রথে দ্বারকা গমন করিলেন।…(তথায়) কৃষ্ণের সহিত…রমণীয় ভবনে বহুদিবস বাস করিলেন।"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১৯ অধ্যায়।

প্রভাস হইতে মূল দ্বারকা ২২ মাইল সোজা পূর্ব্বদিকে। প্রভাস অর্থাৎ সুলতান মামুদ লুণ্ঠিত সোমনাথও সমুদ্রতীরে, মূল দ্বারকাও সমুদ্রতীরে। আদি দ্বারবতী তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে তথায় যাইতে ৫০ মাইল উত্তরস্থিত রৈবতক হইয়া যাওয়ার কোন দরকার ছিল না। তর্কের স্থলে বলা যায়, রৈবতকের মত চমৎকার জায়গাটি দেখাইবার জন্য কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রথম রৈবতকে লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজধানীতে লইয়া যান। কিন্তু দ্বারবতী যে এই সময় সত্যই রৈবতকের নিকটবর্ত্তী ছিল, সুভদ্রাহরণের বিবরণে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

বর্ত্তমান কালে ফাল্গুন মাসে রৈবতক-যাত্রা-উৎসব উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। রৈবতক পর্ব্বত সম্বন্ধীয় উৎসবেই অর্জ্জুন প্রথম সুভদ্রার দর্শন লাভ করেন। শত শত যাদব কেহ বা যানে কেহ বা পদব্রজে রৈবতকে যাইতেছিল, কৃষ্ণার্জ্জুনও যাইতেছিলেন। রৈবতকে সখী-পরিবৃতা সুভদ্রাকে দেখিয়া অর্জ্জুন মোহিত হ'ন এবং কৃষ্ণের পরামর্শ এবং ক্ষত্রিয় আচার অনুসারে তাহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট অনুমতি চাহিয়া দূত পাঠান হইল। দূত যুধিষ্ঠিরের সম্মতি লইয়া ফিরিয়া আসিলে একদা যখন সুভদ্রা রৈবতককে অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকায় ফিরিয়া চলিয়াছেন, তখন অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিলেন এবং "স্বীয় নগরাভিমুখে" গমন করিতে লাগিলেন—অর্থাৎ খাণ্ডবপ্রস্থে রওনা হইলেন। সুভদ্রার রক্ষী সৈন্যেরা অমনি দ্বারকায় দৌড়িয়া গিয়া সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত যাদবগণের গোচর করিল। তৎক্ষণাৎ রণভেরী (Alarm signal) নিনাদিত হইল। যাদবগণ সমবেত হইয়া অর্জ্জুনকে শাস্তি দিবার পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। অবশেষে কৃষ্ণের যুক্তি-যুক্ত বাক্য শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে সাদরে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহারা সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ দিলেন। দ্বারকা রৈবতকের নিকটবর্ত্তী না হইয়া ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত হইলে রক্ষীগণ এত শীঘ্র সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত যাদবগণের নিকট পৌঁছাইতে পারিত না। বর্ণনা পড়িয়া এমনও বোধ হয় না যে, 'উৎসব শেষ করিয়া যাদবগণ সমুদ্র-তীরবর্ত্তী মূল দ্বারকায় ফিরিয়া গিয়াছিল; কেবল সুভদ্রাই পিছনে পড়িয়াছিল, এবং মূল দ্বারকায় পৌঁছিবার অল্প

বাকী থাকিতে রাস্তা হইতে সুভদ্রাকে হরণ করিয়া অর্জ্জুন সরিয়া পড়িতেছিলেন।

কৃষ্ণের আদি দ্বারকার অবস্থান নির্ণয়ের জন্য রৈবতক পর্ব্বত ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলির ভৌগোলিক সংস্থান পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। রৈবতক পর্ব্বত বর্ত্তমানে সুরাষ্ট্রের করদরাজ্য জুনাগড়ের অন্তর্গত। রাজধানীর নাম জুনাগড়; তাহা হইতেই রাজ্যেরও নাম হইয়াছে। জুনাগড়ের চারি দিকে পাথরের দেওয়াল আছে, সঙ্গীয় মানচিত্রের মধ্যে তাহার নক্সা দৃষ্ট হইবে। এই দেওয়ালের অভ্যন্তরে সহরটি উত্তর-দক্ষিণে দেড় মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে এক মাইল বিস্তৃত। সহরের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ বর্ত্তমানে একরকম খালিই পড়িয়া আছে—লোক-বসতি নাই। সহরের পূর্ব্বভাগ সহরের অন্যান্য ভাগ হইতে অনেক উচ্চ,—এইখানেই একটি পাহাড়ের মাথা সমতল করিয়া জুনাগড়ের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত পক্ষে এই দুর্গেরই নাম জুনাগড়, উহার চারিদিকের সহর পরবর্ত্তী কালে গড়িয়া উঠিয়াছে। সহরের প্রকৃত নাম মুস্তাফাবাদ, কিন্তু ঐ নাম পরিচিত নহে, সমস্তটা জড়াইয়া জুনাগড়ই বলা হয়—এবং দুর্গকে উপরকোট নামে অভিহিত করা হয়।

উপর কোটের দ্বার মাত্র একটি, গড়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই উপর কোট দুর্গের দুর্ভেদ্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সবিস্ময় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে লেফটেন্যাণ্ট পোষ্টান্স জুনাগড় দেখিয়া নিম্ন লিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"The old citadel is built upon an elevation of the limestone, which appears to cap over the granite at the base of the hills; and on which the city of Junagarh is situated ··The Uparkot is a noble specimen of eastern fortification, its walls being unusually high, with immense bastions. The materials for these have been taken from a wide and deep ditch, which has been scarped all round it. There is only one gate-way and narrow entrance from the westward······ J. A. S. B. 1838. P. 874.

কাপ্তেনউইলবারফোরস-বেল্ প্রণীত History of Kathiawad হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"······The fort at Janagadh, now known as the "Uparkot." This fort lies on a most commanding position in the town of Junagadh, and about one and a half miles west of the holy Girnar Hill. Its massive walls and strong defences must have made it a very formidable stronghold to attack before the days of artillery······From its walls, the whole country round could be seen and in course of time, the town of Junagadh came to be built round it, which in its turn was surrounded by a strongly fortified wall, thus making the citadel doubly secure:" P. 55:

জুনাগড়ের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কাপ্তেন সাহেব নিম্নলিখিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"Ra Mulraj···died in A. D. 915. and was followed by his son Vishwarah···The next Raj of Wamansthali Grahripu built the fort at Junagadh, now known as the Uparkot.······ The word Junagadh means "the Old Fort" and the story of how it got the name is somewhat quaint It relates that between the Girnar Hill and Wamansthali, * there was formerly thick jungle, through which no one could penetrate. After several Raj of Wamansthali had ruled, a wood-cutter one day managed to cut his way through the forest and came to a place, where stone-walls and a gate existed. Near by sat a holy man in contemplation, and on being asked by the wood-cutter the name of the place and its history replied that its name was "Juna"—old. The wood-cutter returned by the way he had come, to Wamansthali and reported his discovery to the Raj who ordered the forest to be cleared away. This being done, the fort came into sight. But there was none who knew its history or who could tell more than the holy man had told the wood-cutter. So the fort became known as Junagadh···

History of Kathiawad—by Captain
Wilberforce-bell, P. 55—56.

* Modern Wanthale eight miles S. W. W. of Junagadh.

এই বিবরণ হইতে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, রায় গ্রহরিপু গহন বন মধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গের অবস্থান অবগত হইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া তাহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। ভীমকান্তি রৈবতক পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অনতি-উচ্চ দুইটি পাহাড় প্রায় সমান্তরাল ভাবে পশ্চিম দিকে প্রসৃত হইয়া আছে—এই দুই পাহাড়ের ব্যবধান স্থানে স্থানে ৪০ গজ মাত্র। এই ব্যবধানের নিম্নতম স্থান দিয়া একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী প্রবাহিত—রৈবতক হইতে নামিয়া রৈবতক হইতে প্রসৃত সমস্ত ঝরণার জলে পুষ্ট হইয়া তাহা জুনাগড়ের দেওয়ালের নিম্ন দিয়া পশ্চিম দিকে বহিয়া গিয়াছে। রৈবতকে যাইবার একমাত্র চল্‌তি পথ ঐ দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া এই পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর পার দিয়া নির্ম্মিত। জুনাগড় দুর্গ এই পথেরই মুখে দুই পাহাড়ের ব্যবধান রুদ্ধ করিয়া নির্ম্মিত। দুর্গের পূর্ব্ব দেওয়াল হইতে অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে রৈবতকে যাইবার রাস্তার পারে সেই বিখ্যাত টীলা, যাহার উপরে সম্রাট অশোকের (খ্রীঃ পূঃ ২৫০) চতুর্দ্দশটি অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে। এই টীলারই অপর পার্শ্বে রৈবতক পর্ব্বত হইতে প্রসৃত নদীগুলিকে বাঁধ দিয়া আট্‌কাইয়া রৈবতকের পাদদেশে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য কর্ত্তৃক সুদর্শন হ্রদ নির্ম্মাণের কাহিনী (৩০০ খ্রীঃ পূঃ) এবং শকক্ষত্রপ রুদ্রদাসের সুদর্শন হ্রদ পুনর্নির্ম্মাণ-কাহিনী খোদিত (১৫০ খ্রীঃ) এবং আর একটি পার্শ্বে সম্রাট স্কন্দগুপ্ত কর্ত্তৃক (৪৫৬ খ্রীঃ) ঝটিকা বিধ্বস্ত সুদর্শনের পুনর্নির্ম্মাণ-কাহিনী খোদিত রহিয়াছে। এই প্রাচীন লিপি সমূহের সান্নিধ্য হইতেই জুনাগড় দুর্গের বয়স অনুমান করা যায়। জুনাগড় সহর ও দুর্গ যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বর্ত্তমান আছে, তাহার কতকগুলি ভাল প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

১। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্ সঙ্ ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে এই অঞ্চলে আগমন করেন। সুরাষ্ট্র বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

"রাজধানীর অনতিদূরে উজ্জয়ন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে। উহার শিখরে একটি সঙ্ঘারাম অবস্থিত। গোঁফা এবং মঞ্চগুলি বহুশঃ পাহাড়ের গা খুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে। গভীর জঙ্গল ও বড় বড় গাছে পাহাড়টি ঢাকা; পাহাড়ের চারিদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে। সাধু সন্ন্যাসীগণ এই পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায় ও বিশ্রাম করে এবং তপোবল সম্পন্ন ঋষিগণও এই স্থানে একত্রিত হয় ও বাস করে।"

Beal. Vol II. P 269.

উজ্জয়ন্ত বা উর্জয়ৎ রৈবতক পর্ব্বতেরই আর একটি নাম। কাজেই ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে জুনাগড়ে যে সুরাষ্ট্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহই উঠিতে পারে না।

২। জুনাগড়ের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বস্থিত পূর্ব্বোক্ত স্কন্দগুপ্তের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, স্কন্দগুপ্ত পর্ণদত্তকে সুরাষ্ট্র শাসনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং পর্ণদত্ত নিজের পুত্র চক্রপালিতকে এই নগর রক্ষণ ও শাসনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় ভয়ঙ্কর ঝড়ে সুদর্শন হ্রদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হ্রদটি জলশূন্য হইয়া পড়িলে চক্রপালিত বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে আবার বাঁধটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কাজেই ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দেও এই সহর ছিল।

৩। ঐ স্থানেরই শকক্ষত্রপ রুদ্রদাসের শিলালিপিতে এই নগরস্থ গিরিনগর বলিয়া উল্লিখিত আছে বলিয়া বোধ হয়, যদিও লিপিটির কতক স্থান নষ্ট হইয়া যাওয়াতে পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কাজেই সার্থকনামা গিরিনগরের কথাই হইতেছে না উজ্জয়ন্ত (রৈবতক) পাহাড়ের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত কোন নগরের কথা হইতেছে, তাহা ভাল বুঝা যায় না। পাহাড়ের বর্ত্তমান নাম গির্ণার (গিরিনগর) দেখিয়া মনে হয়, পাহাড়ের এক মাথায়, যেখানে বর্ত্তমানে জৈন মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত, ঐ স্থানে যে নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহারই নাম সম্ভবতঃ ছিল গিরিনগর। জুনাগড়ের প্রাচীন নাম কি ছিল তাহা হইলে তাহা আমরা আজিও জানিতে পারি নাই।* যে স্থানে জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার বর্ণনা পরে প্রদত্ত হইবে। উহাও চারিদিকে পাথরের দেওয়াল দ্বারা দুর্গের মত সুরক্ষিত; তবে আয়তনে উহা সঙ্কীর্ণ, নগর নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। উহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধমাইল এবং প্রস্থে সিকি মাইল মাত্র। এই আয়তনের উপর ছোট একটি সহর যে প্রতিষ্ঠিত

* কোন পণ্ডিত বলেন যবনগড়, কেহ বা বলেন জীর্ণগড়, কিন্তু কেহই প্রমাণ দেন নাই

া হইতে পারে তাহা নহে এবং সঙ্কটকালে তাহাতে আশ্রয় াওয়াও অসম্ভব নয়।

উপরকোটে রুদ্রদাসের পিতা জয়দাসের একটি শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে।

৪। রুদ্রদাসের এই লিপিতেই উল্লেখ আছে যে, যে সুদর্শন হ্রদের বাঁধ রুদ্রদাসের আমলে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে মেরামত হইয়াছিল (এবং ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের আমলে ফিরিয়া াহার মেরামত হইয়াছিল,) তাহা প্রায় ৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আমলে, বাঁধ দিয়া নদী আট্‌কাইয়া, প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং অশোক মৌর্য্যের আমলে (২৫০ খ্রীঃ পূঃ, প্রায়) প্রণালী ইত্যাদি খুলিয়া বাঁধটির দৃঢ়তা সাধিত হইয়াছিল। অশোক এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজস্থানীয়গণ নিকটবর্ত্তী অধিষ্ঠান অর্থাৎ সহরে বাস করিতেন, লিপির ভাবে তাহাই বুঝা যায়। কাজেই জুনাগড়ের বয়স খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০০ পর্য্যন্ত পাইতেছি।

এখন যদি আমরা মহাভারত ও হরিবংশে দ্বারবতীর বর্ণনা স্মরণ করি এবং ঐ বর্ণনায় দ্বারবতী ও রৈবতক পর্ব্বতের পরস্পরের নৈকট্য স্মরণ করি, তবে সন্দেহ মাত্র থাকে না যে, বর্ত্তমান জুনাগড়ই কৃষ্ণের আদি দ্বারবতী। হরিবংশের একটি বর্ণনায় এমনও বোধ হয় যে পাহাড়ের উপর ½×⅓ মাইল স্থান ব্যাপিয়া যে পাথরের-দেওয়াল-ঘেরা সহর প্রতিষ্ঠার স্থান আছে—তাহাই আদিতম দ্বারবতী। এক-দ্বার-বিশিষ্ট উপরকোট দুর্গে তৎপর দ্বারবতী স্থাপিত হয় এবং এই দুর্গও যাদবগণ তৈয়ার করে নাই,—তৈয়ারী অবস্থায়ই পাইয়াছিল, মেরামত করিয়া লইয়াছিল মাত্র। রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে ভীম, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক জরাসন্ধ নিহত হইলে জরাসন্ধের ভয় যখন আর রহিল না, তখনই সমুদ্রতীরবর্ত্তী দ্বারবতী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই জন্যই হরিবংশে দুই দুইবার করিয়া দ্বারবতী নির্ম্মাণ প্রসঙ্গ আছে—যদিও দুই বারই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দ্বারবতী নির্ম্মাণের প্রসঙ্গই দেখা যায়। পণ্ডিত-গণের নিকট যদি আমাদের যুক্তি গ্রাহ্য হয়, তবে খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দ ৩০০ হইতে জুনাগড়ের বয়স প্রায় খ্রীঃ পূঃ ১২০০তে এমন কি তাহারও আগে চলিয়া গেল। চারি শতাব্দী কাল মুসলমান শাসনে আসিয়া উহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ অধিকাংশই প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে,—উপরিউক্ত জয়দাসের লিপি এবং নিকটবর্ত্তী অশোক, রুদ্রদাস ও স্কন্দগুপ্তের লিপি ভিন্ন আর কোন প্রাচীনত্ব প্রমাণই আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

উপরকোট ও রৈবতকের সংস্থান পর্য্যালোচনা করিলে কৃষ্ণের সদম্ভোক্তির অর্থ বুঝা যায়, যে, কেমন করিয়া দ্বারবতী দুর্গ দেবতাদেরও অগম্য এবং তথায় কিরূপে স্ত্রীগণও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। উপরকোটের দুর্ভেদ্যতার বিষয়ে আধুনিক যোদ্ধাগণের মন্তব্য পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। ইতিহাসে দেখা যায় পরবর্ত্তী কালের রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ উপরকোটও রক্ষা অসম্ভব দেখিলে গির্ণার পাহাড়ের উপর, যে দুর্গমধ্যে অধুনা জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেই দুর্গে পলাইয়া যাইতেন। এই দ্বিতীয় দুর্গ যে 'দেবতাগণেরও অগম্য' সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। * খাড়া পাহাড়ের মাথায় এই দুর্গ প্রতিষ্ঠিত এবং সমুদ্রতল হইতে এই দুর্গ স্থান ২৮৩৮ ফিট উচ্চ। মাত্র পাঁচফুট প্রশস্ত অতি দুর্গম রাস্তা দিয়া এই স্থানে পৌঁছিতে হয়। ঐ রাস্তায় দুখানা পাথর গড়াইয়া দিলে শত-শত লোককে ঠেকাইয়া রাখা যায়। কিছু উপরে অতি চমৎকার জলের অফুরন্ত উৎস আছে, এবং আরও উপরেও আরও আশ্রয়-স্থান আছে। সর্ব্বোচ্চ শিখরেও একটি মন্দির আছে। এই স্থানের উচ্চতা ৩৬৬৬ ফুট।

পুণ্যতীর্থ রৈবতক

ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন তীর্থগুলি প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অজস্রতায় নিরীশ্বরবাদীর নিকটও অথবা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের নিকটও এই সকল স্থান তীর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের অতি অল্প তীর্থ-স্থানই এ পর্য্যন্ত দেখিতে সমর্থ হইয়াছি; কিন্তু ব্রহ্মপুত্রদ্বার বিধৌতপাদ, চারি দিকে অনন্ত গিরিমালার মধ্যে অবস্থিত, কামাখ্যা শৈলে যে দেবতা বিরাজ করেন, স্বচক্ষে দেখিয়া আমি তাহার সাক্ষ্য দিতেছি। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের শিখরে উঠিয়া পাদমূলে

* "The Uparkot has been many times besieged and often taken, on which occasions, the Raja was wont to flee to the fort on Girnar, which from its inaccessibility was almost impregnable.

Imperial Gazetteer. Ed. 1886 "Junagarh."

বিস্তীর্ণ স্তব্ধ বঙ্গোপসাগরের অপার বারিধি বক্ষে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া সত্যই মনে হয়, কলিযুগে দেবতা চন্দ্রশেখরেই বাস করেন। আর সকল কক্সবাজারের অনতিদূরে সমুদ্রগর্ভে আদিনাথ পাহাড়ে অনাদিকাল হইতে জগতের নাথ বাস করিতেছেন, একবার দেখিলেই সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। রৈবতক যে কেমন সুন্দর স্থান, ইহার অবস্থিতি-স্থান যে কেমন মনোহর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে হয় কৃষ্ণ যেন উহারই শিখরে বসিয়া, অবিশ্রাম বাঁশী বাজাইয়া বিশ্ববাসীকে অহরহ আকর্ষণ করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রৈবতকের সানুদেশ হইতে দুইটি পাহাড় নামিয়া আসিয়া প্রায় জুনাগড়ের দেওয়ালে ঠেকিয়াছে, ঐ দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়াই রৈবতক যাত্রার পথ। উপরকোট হইতে এই দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া রৈবতকের যে ভীমকান্ত মূর্ত্তি নয়নগোচর হয় তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না।

জুনাগড়ের পূর্ব্ব তোরণ হইতে বহির্গত হইয়া অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইলেই হাতের দক্ষিণে রাস্তা হইতে কয়েক গজ মাত্র দূরে বিখ্যাত শিলালিপির ক্ষুদ্র টীলাটি নয়নগোচর হয়। টীলাটি আকৃতিতে একটি বৃহদাকার পাশার গুটির মত। উঁচু মাত্র ৮ হাত, গোড়ার বেড় ৫০ হাত। অশোকের শিলালিপি ইহার সমস্ত পূর্ব্ব ধারটা অধিকার করিয়া আছে। পশ্চিম ধারে রুদ্রদাসের লিপি এবং উত্তর ধারে স্কন্দগুপ্তের লিপি। এই শিলালিপি টীলার নিকট হইতেই রৈবতকে যাইবার একটি বাঁধা রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে। এই বাঁধা রাস্তা দুই পাহাড়ের মধ্যের নালার পার দিয়া অগ্রসর হইয়া একটি চমৎকার পাথরের পুলের উপর দিয়া নালা পার হইয়াছে। নালার পাশ সাধারণতঃ ৫০ গজ; কিন্তু যেখানে পুল সেখানে নালা ৪০ গজের বেশী প্রশস্ত হইবে না। শিলালিপি হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল অগ্রসর হইয়া কয়েকটি মন্দির এবং দামোদরকুণ্ড নামে খ্যাত এক সরোবর পাওয়া যায়। এই স্থানে বাঁধা রাস্তা শেষ হইয়াছে। অতঃপর বন জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে। আরও অর্দ্ধ মাইল গেলে রৈবতক পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থান হইতে পদব্রজে অথবা ডুলিতে চড়িয়া রৈবতকে আরোহণ করিতে হয়। শিখর পর্য্যন্ত দূরত্ব ৪৬৯১ ফিট। মাইলখানিক আরোহণ করিলে একটি বিশ্রাম-স্থান পাওয়া যায়। এই স্থানে ধর্ম্মশালা আছে। এই পর্য্যন্ত পাহাড় জঙ্গলময় এবং চারি দিকের পাহাড়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহার পরেই খাড়া শিখর উঠিয়াছে—এবং উহার গায়ে বৃক্ষলতা কিছু নাই বলিলেই হয়। উত্তরে প্রকাণ্ড একটি প্রস্তরখণ্ড স্তম্ভের মত আলগা হইয়া খাড়া দাঁড়াইয়াছে—মনে হয় যেন একটু ধাক্কা দিলেই ভীমনাদে ধরাশায়ী হইবে। এই স্তম্ভকে ভৈরবঝম্প বলে, অনেকে ইহার মাথা হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে। ধর্ম্মশালা হইতে মাত্র পাঁচফুট প্রশস্ত রাস্তা খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া নানা কৌশলে ঘুরিয়া ফিরিয়া জৈন মন্দিরগুলিতে যাইয়া পৌঁছিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমুদ্র হইতে ২৮৩৯ ফিট উচ্চে পাহাড়ের ক্রোড়ে প্রায় $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ মাইল পরিমাণ সমতল ভূমির উপর এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত। স্থানটি দুর্গের মত চারি দিকে পাথরের দেওয়ালে ঘেরা। এই ঘেরের মধ্যে জৈনদের আটটি চত্বর-সমন্বিত মন্দির আছে। জৈনগণ বলেন তাঁহাদের দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমি কৃষ্ণের জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। অরিষ্টনেমি স্থানীয় রাজবংশের যুবক ছিলেন। তাঁহার বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে খাদ্যার্থে হননের জন্য সংগৃহীত পশু পাখীর কাতর চীৎকারে তিনি এত বিচলিত হইলেন যে, বিবাহ না করিয়াই তিনি পলাইয়া রৈবতক পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন এবং তথায়ই তপস্যা করিয়া তীর্থঙ্করত্ব লাভ করিয়া দেহরক্ষা করিলেন। তদবধি ইহা জৈনতীর্থ। জৈন মন্দিরগুলি কিন্তু কোনটিই ৭।৮০০ বৎসরের বেশী পুরাতন নহে। ইহাদের মধ্যে নেমিনাথের মন্দিরই বৃহত্তম। মন্দিরচত্বর আয়তনে ১৯৫ × ১৩০ ফিট। হিউএন্ সঙ্-এর বর্ণনা মত দেখা যায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই পর্ব্বতশিখরে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল।

জৈন মন্দিরগুলি হইতে রৈবতক-শিখর পর্য্যন্ত আরোহণ বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে—আগাগোড়াই সিঁড়ি আছে। রাস্তার দুই ধারে ছোট বড় অনেকগুলি মন্দির আছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তু গোমুখী নামক চমৎকার ঝরণাটি,—উহা হইতে অবিশ্রাম অতি নির্ম্মল জল উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। গোমুখীর নিকটেও ছোট ছোট কয়েকটি মন্দির [illegible]।

আরও কিছু উঠিলেই রৈবতকের শিখরদেশে উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানে অম্বা মা নাম্নী দেবীর মন্দির আছে। রৈবতক পর্ব্বতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ইহাই একমাত্র মন্দির। এই স্থানে সমতলভূমির পরিমাণ ১৫ গজ × ১৫ গজের বেশী নহে। অম্বা মার মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিয়া চারি দিকের যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহা আজীবন মনে থাকে; এবং পরবর্ত্তী কালে যখনি মানস নয়নে ভাসিয়া উঠে, তখনই অনাবিল আনন্দের কারণ হয়। ডাঃ উইলসন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গির্ণার পাহাড়ে (রৈবতকের বর্ত্তমান নাম) উঠিয়াছিলেন এবং জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরগুলি দেখিতে গিয়া তথায় সমবেত জনসঙ্ঘের নিকট পুতুল পূজার নিরর্থকতা ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সেবায় অনন্ত জীবন লাভের বিষয় বক্তৃতা না দিয়া পারেন নাই। গির্ণার পাহাড়ের শিখরে উঠিয়া সেই পাদ্রি উইল্‌সন্‌ই লিখিয়াছেন—

"গির্ণার শিখর হইতে চার দিকের যে দৃশ্য দেখা যায়, উঠিবার দারুণ পরিশ্রম তাহার যথেষ্ট মূল্য নহে। চারি দিকে সারি সারি পাহাড়, নিকটবর্ত্তী ধাতর নামক শিখর যাহা প্রায় গির্ণারেরই সমান উচ্চ, চারি দিকে বিপুলা পৃথ্বার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ, পশ্চিমে মহাসমুদ্রের অনন্ত বিস্তার!" J. A. S B, 1838, P. 335.

অম্বা মার মন্দির হইতে দক্ষিণে চাহিলে দুইটি অদ্ভুত পর্ব্বতশিখর দৃষ্টিগোচর হয়। সম্পূর্ণ পৃথক তলদেশ হইতে দীর্ঘাকৃতি পিরামিডের মত উহারা উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে। উহাদের সূক্ষ্মাগ্র শিখরগুলি গ্রেনাইট পাথরের এবং তাহাদের গায়ে বৃক্ষলতাদি মাত্রই নাই। গির্ণার ও উহাদের মধ্যে একটি গভীর খাত; গির্ণার হইতে যেটি অপেক্ষাকৃত দূরে, সেটিই উচ্চতর এবং তাহার মাথায় গুরু দত্তাত্রেয়ের একটি মন্দির আছে। অম্বা মার মন্দির হইতে দক্ষিণে চাহিলে কিছুতেই মনে হয় না যে গুরু দত্তাত্রেয়ের মন্দির মানুষের অধিগম্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অম্বা মার মন্দির হইতে গুরু দত্তাত্রেয়ের মন্দিরে যাইবার সত্যই সিঁড়ি আছে এবং প্রত্যেক বৎসর সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এই দুর্গম পথ দিয়াই দত্তাত্রেয়ের মন্দিরে যাতায়াত করে, পা পিছলিয়া পড়িয়া অনেকে প্রাণও হারায়।

এই গির্ণার পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদেরও তীর্থস্থান আছে। দক্ষিণে দাতারপীর নামক শিখরে জামাল শাহ (দাতার পীর) নামক ফকিরের দরগা আছে। সুরাষ্ট্রের মুসলমানগণ এই দরগাকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। দাতারপীর পাহাড়ের তলদেশে শত শত কুষ্ঠা ও খঞ্জ এবং নানা প্রকার ঘৃণ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ রাতদিন বসিয়া পীরের নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করে। সুরাষ্ট্রের পশ্চিম তীর দিয়া যাইবার সময় নাবিকগণ দাতার-পীর লক্ষ্য করিয়া সিন্নি মানত করে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আমলে গির্ণার পাদমূলে যে সুদর্শন হ্রদের সৃষ্টি, যাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাসের আমলে এবং ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজাধি-রাজ স্কন্দগুপ্তের আমলে এতটা ব্যয়বাহুল্য হইয়াছিল, আজ আর তাহার কোন চিহ্নও নাই। মানচিত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, গির্ণার-পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে যে উপত্যকা আছে, তাহাই হ্রদে পরিণত করা হইয়াছিল। এই উপত্যকার দক্ষিণ হইতে একটি এবং উত্তর হইতে একটি নদী নামিয়াছে। রুদ্র-দাসের লিপিতেও দুইটি নদীরই উল্লেখ পাওয়া যায়। একটির নাম ছিল সুবর্ণসিকতা, আর একটির নাম ছিল পলাশিনী। পলাশিনীর নাম লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু উভয়ের মিলিত জলপ্রবাহ আজিও সোনারেখা বলিয়া পরিচিত। এই মিলিত জলপ্রবাহকে বাঁধ দিয়া রুদ্ধ করিয়াই হ্রদের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ পোষ্টাম্‌স্‌ অনেক খুঁজিয়াও এই বাঁধের কোন চিহ্ন পান নাই। রুদ্রদাসের লিপিতে বাঁধের যে অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহার মাপ দেওয়া আছে। ঐ ভগ্ন অংশ লম্বায় ছিল ২১০ গজ, পাশেও তাহাই এবং উচ্চতায় ছিল ৭৫ হাত। কাজেই বাঁধাটি ইহারও অপেক্ষা বড় ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। অথচ বর্ত্তমানে যেখানে সেতু নির্ম্মিত সেই স্থানে দুই পাহাড়ের মধ্যে ব্যবধান ৪০ গজের বেশী নহে। কাজেই যেই বাঁধের ২১০গজ পরিমিত স্থান ভাঙ্গিয়াই গিয়াছিল সেই প্রকাণ্ড বাঁধ ঐ স্থানে কি করিয়া ধরিতে পারে, পোষ্টাম্‌স্‌ সাহেব তাহা বুঝিয়া উঠিতেই পারেন নাই।

পোষ্টাম্‌স্‌ সাহেবের লেখা হইতেই কিন্তু এই রহস্যের মীমাংসার একটা সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—The remains of an old causeway

are to be seen near the present one, crossing the bed of the ravine in a diagonal direction. It is only traceable for a few yards, but appears to have been connected with some former extensive work of the kind, as it is again to be seen for a short extent beyond the modern causeway towards Junagarh.

J. A. S. B 1839. P. 879

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান পুলটি যে ভাবে নির্ম্মিত, সেই রকম আড়াআড়িভাবে যদি সুদর্শন হ্রদের বাঁধ নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে বর্ষাকালে জল বাঁধে ঠেকিয়া কূল প্লাবিত করিয়া রৈবতকে যাইবার পথ ডুবাইয়া ফেলিত। কাজেই বাঁধ কোণাকোণী করিয়া এমন ভাবে রৈবতকে যাইবার রাস্তা তাহার উপর দিয়া লেওয়া হইয়াছিল যে বাঁধের উপর দিয়াই রাস্তা উচ্চ স্থানে যাইয়া পৌছিয়াছিল, বর্ষায়ও প্লাবিত হইবার আশঙ্কা আর ছিল না। প্রয়োজন না হইলে একটা পার্ব্বত্য নালার উপরে অনর্থক ব্যয়বাহুল্য করিয়া কোণাকোণী ভাবে কেহ রাস্তা নির্ম্মাণ করে না। কাজেই পোষ্টান্‌স্ সাহেব বর্ত্তমান রাস্তার নিকটবর্ত্তী কোণাকোণী নির্ম্মিত যে প্রাচীন প্রশস্ত রাস্তার চিহ্ন পাইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহাই সুদর্শন হ্রদের প্রাচীন বাঁধের ভগ্নাবশেষ বলিয়া আমার মনে হয়।

মূল দ্বারকা ও বর্ত্তমান দ্বারকা

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের উপক্রমে কৃষ্ণের পরামর্শমত জরাসন্ধ নিহত হইলে যাদবগণ তাহাদের পরম শত্রুর ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। এইবার রৈবতক শিখরে অথবা দ্বারকার সুদৃঢ় কিন্তু স্বল্পায়তন দুর্গের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হইয়া শত্রু প্রতীক্ষায় সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকার প্রয়োজন আর রহিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হরিবংশে দ্বারবতী নির্ম্মাণ প্রসঙ্গ দুইবার আছে। রাজসূয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণ সমুদ্রতীরে দ্বারবতী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। হরিবংশে আছে, কৃষ্ণের অনুরোধ স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা দ্বারবতী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণের আদেশে সমুদ্র অনেক দূর সরিয়া গিয়া দ্বারবতীর জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিল। সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝা যায় যে সমুদ্রতীরবর্ত্তী অনেকখানি ঢালু যায়গা ঘিরিয়া লইয়া দ্বারবতী নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ উহার কতক স্থান, বর্ত্তমান কালের নেথারল্যাণ্ড দেশের মত, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নিম্ন এবং সুদৃঢ় বাঁধ দ্বারা সমুদ্র জল হইতে রক্ষিত ছিল। বর্ত্তমান মূল দ্বারকার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই অনুমান অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। * সার্ভে অব ইণ্ডিয়া প্রচারিত ১ ইঞ্চি = ১ মাইল মানচিত্রে দেখা যায়, মূল দ্বারকার পূর্ব্বে সিঙ্গাওরা নদী, প্রায় ১৩২ গজ প্রশস্ত। পশ্চিমে এক বিস্তীর্ণ নিম্ন ভূমি, তাহার মধ্য দিয়া দেড় শত হাত প্রশস্ত সুরমৎ নামক নদী আসিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। এই দুই নদীর অভ্যন্তরে দেড় মাইল বিস্তৃত নিম্ন ভূমির উপরে মূল দ্বারকা অবস্থিত ছিল। এই ভূভাগের উত্তরাংশ অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান, পশ্চিমেও প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত জলাভূমি। সঙ্গীয় মানচিত্রে দেখা যাইবে যে এরূপে মূল দ্বারকা দেড় মাইল বিস্তৃত এবং তিন পোয়া মাইল দীর্ঘ এক দ্বীপাকার ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যাদবগণ নিতান্ত কোপন-স্বভাব ও কলহপ্রিয় ছিল, মহাভারতে এবং হরিবংশে অনেক স্থানেই তাহার পরিচয় আছে। সুরায় ও রমণীতে আসক্তি ছিল তাহাদের অসাধারণ। শত্রু কর্ত্তৃক দ্বারকা অবরোধ প্রসঙ্গে অথবা অন্যবিধ বিপৎকালে একাধিক বার এ কথা মহাভারতে আছে যে সুরাপান নিবারণ করিয়া এবং সুরাপায়ীর শূলদণ্ড বিধান করিয়া দ্বারকায় রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং নট ও নর্ত্তকদিগকে রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। যথা—মহাভারত বনপর্ব্বে শল্য কর্ত্তৃক দ্বারবতী অবরোধ প্রসঙ্গ এবং মৌষল পর্ব্ব। স্যমন্তক হরণ প্রসঙ্গেও দেখা যায় যাদবপ্রধানগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা, রেষারেষি ও অবিশ্বাস বেশ প্রবল ভাবেই ছিল এবং যাদবগণের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলকামী কৃষ্ণও এই সকল হীন আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেন না। প্রভাসে যাদবকুলের পরস্পর কলহে ধ্বংস এই উচ্ছৃঙ্খলতার শেষ ফল। মৌষল যুদ্ধের বিবরণে দেখা যায়, কৃষ্ণ নিজ হস্তে অনেক যাদবের প্রাণ বধ করিয়া ভূভার লাঘব করিয়াছিলেন। মৌষল যুদ্ধের পর অর্জ্জুন আসিয়া হতাবশিষ্ট যাদবগণকে ও যাদব-রমণীগণকে নিজের দেশে লইয়া গেলেন—সমুদ্র দ্বারকাপুরী গ্রাস করিল। সম্ভবতঃ যে বাঁধ ও প্রাকার সাহায্যে সমুদ্রজল আটকাইয়া দ্বারকাপুরীর বিস্তৃতি-সাধন হইয়াছিল, যাদবগণ দ্বারকা ছাড়িয়া যাইবার কালে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল এবং এইরূপেই সমুদ্র দ্বারকাপুরী গ্রাস করিয়া থাকিবে। সুরাষ্ট্রের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে বর্ত্তমান দ্বারকা যে নিতান্ত আধুনিক প্রতিষ্ঠান, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

---

* হরিবংশের ১৪৫ অধ্যায়ে দেখা যায়, যাদবগণের পিণ্ডারকতীর্থে সমুদ্রস্নান-যাত্রাকালে সহস্র সহস্র গণিকা তাহাদের সঙ্গে যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে হরিবংশকার মন্তব্য করিয়াছেন—"দৃঢ়বিক্রম যাদবগণ সমুদ্রকে স্বস্থান হইতে অপসারিত করতঃ এই অসংখ্য বেশ্যাগণকে দ্বারবতীতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

পুনরাগমন

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

আঃ, বাঁচা গেলো। এই তিন ঘণ্টা সময় তার দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে। দুঃস্বপ্নের মত, চার ডিগ্রী জ্বরের তীব্র সম্মোহনের মত—চারপাশে যা-কিছু হচ্ছে, তা তা'র মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারছে না,—চেতনায় প্রবেশ করতে পারছে না; অথচ, যা কিছু হচ্ছে, সব তা'কে নিয়েই, তা'রি উপলক্ষ্যে। তা'কেই উপলক্ষ্য করে' এই ব্যাপার—তা'রি জন্যে সিঁড়িতে আল্পনা, ফুলের মালা, ধূপের ধোঁয়া, চন্দনের প্রলেপ—মিষ্টি গন্ধ, মিষ্টি গান, শাড়ির এত রঙ-বেরঙ, কথার এত ঘটা। সবি শুধু তা'রি জন্যে—এটা সে তা'র অবচেতন মনে আগাগোড়া উপলব্ধি করছিলো—আর ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠ্‌ছিলো। সত্যি—শারীরিক অর্থে ঘামছিলো; বার-বার তা'র দু' হাতের চেটো ঘেমে উঠ্‌ছিলো, বার-বার রুমাল বা'র করে' তা'কে হাত মুছতে হচ্ছিলো। একবার হঠাৎ তা'র মনে হয়েছিলো, সবাই তা'র এই হাত-মোছা ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে না তো? এবং, ও-কথা মনে হওয়ামাত্র সে তাড়াতাড়ি রুমাল পকেটে ঢুকিয়ে তা'র গলার প্রকাণ্ড ফুলের মালাটা নিয়ে প্রাণপণে টানাটানি করতে আরম্ভ করলো। মালাটা ছিঁড়েই যেতো, যদি না এক ফাঁকে আভা তা'র কানের কাছে মুখ এনে তা'কে সাবধান করে' দিতো—

যাক্, সব চুকেছে। এইবার সে বাঁচ্‌লো। সভা ভেঙে যাওয়ার পরও ভক্ত-মণ্ডলী তা'কে ছাড়্‌তে চায় না; তা'র মুখের কথা শোন্‌বার জন্য সবাই উৎসুক; অধ্যাপকরা আসেন কাব্যের তত্ত্ব নিয়ে, সুন্দর চেহারার মেয়েরা অটোগ্রাফ নিয়ে; হালে যে-সব যুবক লিখে' নাম করেছেন, তাঁরা আসেন তা'র সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায় শুন্‌তে। কথা শুন্‌তে হয়, কথা বল্‌তে হয়, নাম-সই করতে হয়। আভাকে গিয়ে কয়েকজন খবরের কাগজের প্রতিনিধি—'কবি'র ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য-সম্বন্ধে তাঁদের অশ্রান্ত কৌতূহল। রাস্তায় বেরোতেই আধ ঘণ্টা কেটে গেলো। অনেক চেষ্টায় গাড়িতে যদি বা উঠে বসা গেলো, দরজার কাছে বিদায়ের ঘটা—গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা এক-এক করে' বিদায় নিচ্ছেন—ভদ্রতার কথা বল্‌তে হয়, হাসি হাস্‌তে হয়; কল্‌কাতার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তা'কে শ্রদ্ধার নমস্কার জানাতে আসে; বিনয়ের অবতার হ'য়ে তা'কেও আনন্দে গলে' যেতে হয়। গাড়ি যখন স্টার্ট দিয়েছে, তখনো এক ভদ্রলোক ছুটে' এসে কী যেন একটা কথা বলে' গেলেন। সে শুন্‌তে পেলো না—তবু অমায়িক ভাবে ঘাড় নেড়ে হাস্‌লো। অসহ্য, অসহ্য!

এতক্ষণে গাড়ি নির্জ্জন পার্ক স্ট্রীট দিয়ে ছুটে' চলেছে—বেশ জোরেই ছুটেছে। নেই; কেউ নেই; কিছু নেই। আর চার মিনিটের ভেতর বাড়ি পৌঁছে যাবে। এমন একটা শুভ-ঘটনা তা'র বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিলো না। রাস্তা খালি, গাড়িতে তা'র পাশে শুধু আভা। অনেক দূরে টাউন হল্, অনেক দূরে তা'র ভক্তরা; অনেক পুরোনো কথা তা'র সম্বর্দ্ধনা—আলো আর মালা, গানের সুর আর শাড়ির রঙ্, বক্তৃতা আর তর্ক। অতীত, সেটা অতীত। সেটা হ'য়ে গেছে। আঃ—কী মুক্তি। গদিতে হেলান দিয়ে আরামে সে চোখ বুঁজ্‌লো।

এ-ও তার কপালে ছিলো! চিরকাল একটা জিনিষকে সে ভয় করে' এসেছে—বক্তৃতা-শোনা। তা'র চেয়েও ভয় করেছে বক্তৃতা-দেয়াকে। যা জন-সভা—দু'চারজন বাছা-বাছা লোকের আড্ডা নয়—সেখানে গেলেই তা'র হাঁফ ধরেছে; সভা-সমিতি ইত্যাদিকে যদ্দিন পেরেছে, এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু বেশি দিন পারে নি। ছেলেবেলা থেকেই সে লিখ্‌তো। লিখ্‌তে তা'র ভালোই লাগ্‌তো। প্রথম যৌবনের অনভিজ্ঞতায় সে ভেবেছিলো, সাহিত্যিক জীবনের চাইতে সুখের কিছুই নয়। প্রথম যৌবনের কয়েকটা বছর কেটেওছিলো সুখে। তার পর খ্যাতি এলো। খ্যাতি যতই বাড়্‌তে থাক্‌লো, ততই দেখ্‌লো, তা'র নিজকে দশজনে লুটে' খাচ্ছে; সে আর তা'র নিজের নয়। বাড়ীতে খবরের কাগজের লোক

আসে ইণ্টারভিয়ু কর্‌তে, বহু দূর থেকে ছেলেরা আসে তা'কে 'দেখ্‌তে'; সভার সভাপতিত্ব কর্‌তে হয়, দিতে হয় বক্তৃতা, মিশ্‌তে হয় বহু লোকের সঙ্গে। প্রথম-প্রথম এড়াতে চেষ্টা করেছে, ঠেকাতে চেয়েছে—শেষটায় বাধ্য হয়েছে ভেঙে পড়্‌তে, ধরা দিতে, বেসুরো, বিশ্রী বাইরেকে আমল দিতে। এলো অর্থ, এলেন সুযোগ্যা স্ত্রী, উঠ্‌লো বালিগঞ্জে বাড়ী, হঠাৎ একদিন নিজের একখানা গাড়িও হ'ল। সপ্তাহে তিন দিন তা'র নিমন্ত্রণে যেতে হয়, সপ্তাহে চার দিন নিমন্ত্রণ কর্‌তে হয়। শহরের সব অনুষ্ঠানে জোর করে' তা'কে ধরে' নিয়ে যায়; বছরে অন্তত দু'খানা বই প্রকাশকরা তা'কে দিয়ে জোর করে' লিখিয়ে নেয়। সময় নেই; এক মুহূর্ত্ত সময় নেই। নিজ হাতে একখানা চিঠিও সে লিখ্‌তে পারে না; তা'র প্রিয়, পুরোনো বইগুলোর বছরে একবারো পাতা ওল্টানো হয় না। জনতার কাছে নিজকে সে বেচে দিয়েছে; জনতার হুকুম প্রতি মুহূর্ত্তে তা'কে তামিল কর্‌তে হয়; সে আর তা'র নিজের নয়। প্রতি মুহূর্ত্ত তা'র অসহ্য লাগে, প্রতি মুহূর্ত্তে সে পালাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে; প্রতি মুহূর্ত্তে সে আরো বেশি করে' জড়িয়ে পড়ে। আরো যশ, আরো অর্থ। সে যদি না-ও চায়, কৃতিত্ব তা'র পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে। সে যদি নিজকে লুকিয়ে রাখ্‌তে চায়, গৌরব এসে ঘর জুড়ে' বসে। একটু ফাঁকা নেই, একটু সময় নেই।

শেষটায়, আজ্‌কে তার এই সম্বর্দ্ধনা। বাঙলাদেশকে এ-দোষ কখনো দে'য়া যাবে না যে সে তা'র সাহিত্যিককে যোগ্য সম্মান দেয় নি। দিয়েছে; তা'কে, শিবপ্রসাদ দত্তকে খুব বেশি করে'ই দিয়েছে। এখনো তা'র বয়েস চল্লিশ হয় নি। আজ্‌কে সমস্ত দেশ প্রকাশ্যে তা'কে বরণ করেছে, তা'র কপালে দিয়েছে চন্দন, গলায় পরিয়েছে মালা; সোনার পাত্রে করে' সমস্ত জাতি তা'কে আজ অভিনন্দন দিয়েছে। এত দিন পর্য্যন্ত যদি বা তা'র কোনো ছিটেফোঁটা তা'র নিজের ছিলো, আজ থেকে তা-ও গেলো, তা-ও গেলো।

উঃ—শেষ আর হয় না। তা'র চেয়ে অন্তত তিরিশ বছরের বড়, বৃদ্ধ, গত শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ এক সভাপতি—তাঁর অভিভাষণ, উঃ, কী স্তুতি, কী চাটুকারিতা, মিথ্যা কথা, নির্ব্বোধ কথা, অর্থহীন কথা! মেয়েদের গান, একটা গান এই উপলক্ষ্যে বিশেষ করে' রচিত, তা'র কবিতার আবৃত্তি, তা'র সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ—শেষ আর হয় না। অভিনন্দন পাঠ ও উপহার—তার পর তা'র উত্তর। কী উত্তর দেবে—একটা কথা তা'র মনে আস্‌ছে না। তবু, কলের মত কতগুলো কথা বলে' গেলো—করতালি শুনে' বুঝ্‌তে পার্‌ছলো, খারাপ কিছু বল্‌ছে না। একবার, শুধু একবার আট্‌কে গিয়েছিলো—আভা তৎক্ষণাৎ পাশ থেকে তা'কে ঠিক শব্দটি জুটিয়ে দিয়েছিলো। আভা—আভাকে না হ'লে তা'র কী করে' চল্‌তো? গেলো দশ বছর ধরে'—বিয়ের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত—আভা তা'র দক্ষিণহস্ত, তা'রো বেশি। এত কাজের বোঝা আভা না হ'লে সে কিছুতেই বইতে পার্‌তে না। আভা তা'র বোঝা অর্দ্ধেক করে' দিয়েছে; এ-সব কাজে-কর্ম্মে তা'র যেমন উৎসাহ, তেম্‌নি নিপুণতা। বাইরের বহুমুখী উদ্ভ্রান্ত জীবন আভা বেশ কাটাতে পারে, লোকের চোখের সুমুখেই তা'র ভালো লাগে; এই যশ, এই গৌরব, তা'রি কাছে আসা উচিত ছিলো, তা'কেই ও-সব মানাতো; সে, শিবপ্রসাদ দত্ত, এর যোগ্য নয়। আভার রূপ কল্‌কাতা শহরে নাম-করা; তা'র ওপর, অসাধারণ তা'র কথা-বলার ক্ষমতা, তা'র উপস্থিত বুদ্ধি, তা'র চরিত্রের দৃঢ়তা। মনকে সে চব্বিশ ঘণ্টা চাবুকের ওপর রাখ্‌তে পারে; তা'র মধ্যে কোনো হেলাফেলা, আলস্য, ঔদাস্য নেই—কাজ, কাজ তা'র কাছে সব। কাজ কর্‌তে তা'র ভালো লাগে। আশ্চর্য্য! আজ্‌কের এই সম্বর্দ্ধনা—এই আলো আর মালা আর রঙ-বেরঙের শাড়ি, এই তর্ক বিতর্ক, কথার উত্তরে কথা—এ-সব তা'রি জন্যে হওয়া উচিত ছিলো, আভার জন্য, আভাই এ-সব সহ্য কর্‌তে পার্‌তো; শুধু তা ই নয়, উপভোগও কর্‌তো।

একবার চোখ মেলে সে আভার দিকে তাকালো; আভা স্থির দৃষ্টিতে সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে আছে—তা'র উজ্জ্বল চোখ আরো উজ্জ্বল, তা'র গোলাপী গাল লাল হ'য়ে ফেটে পড়্‌ছে। নেশা—নেশা—গৌরবের নেশায় তা'কে ধরেছে, তা'র স্বামীর গৌরবে। সমস্ত বাঙ্‌লা দেশ যে-লেখককে আজ অভিনন্দন দিলে, সে তা'রি স্বামী। তা'রি। আভা কথা কইতে পার্‌ছে না উত্তেজনায়, আর সে নিজে—শিবপ্রসাদ দত্ত—সে চুপ করে' আছে ক্লান্তিতে।

ক্লান্তি, ক্লান্তি। তিন ঘণ্টা ধরে' প্রকাশ্য সভায় যে সম্বর্দ্ধিত হয় নি, সে কী করে' বুঝ্‌বে, ক্লান্তি কা'কে বলে।···যাক্‌, বাড়ী এসে গেছে।

তা'র ইচ্ছে হ'ল, একেবারে শোবার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়; কিন্তু একবার ওপরে উঠ্‌লে আর নীচে নাবা অসম্ভব হ'বে। তাই, খাবার হাঙামটা চুকিয়ে যাওয়াই ভালো। না-খেতে পার্‌লেই সে খুসি হ'ত; কিন্তু আজ্‌কের রাতে না খেলে আভা দুঃখিত হ'বে; এবং আজ্‌কের রাতে আভাকে দুঃখ দেয়া যায় না, তা'র ভেতর থেকে একটা স্বর এ-কথা বল্‌ছিলো। অন্যের হুকুমে চল্‌তে সে অভ্যস্ত; তাই নিজের ওপর এটুকু জবরদস্তি তা'র গায়েই লাগ্‌লো না। বস্‌বার ঘরে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলে—অভ্যেস-মত সন্ধ্যের কাগজগুলো থেকে একটা তুলে' নিয়ে চোখের সাম্‌নে খুলে' ধর্‌লো। মহেশ এসে পাখাটা খুলে' দিয়ে চলে' গেলো। আভা এরি মধ্যে কাপড় বদ্‌লে এসেছে। তা'র পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে—'তারি ক্লান্ত বোধ কর্‌ছো—না? একটু বোসো, খাবার ব্যবস্থা দেখি গে।' সে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

তা'র দিকে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করে' আভা বেরিয়ে গেলো। সে-দৃষ্টি সে লক্ষ্য কর্‌লে। নেশা, নেশা! আভা আজ সার্থক মনে কর্‌ছে নিজকে। সে—শিবপ্রসাদ—সে-ও সার্থক মান্‌ছে সব। আভা যদি সুখী হ'য়ে থাকে, সে কেন অভিযোগ কর্‌তে যাবে? যে-মেয়ে তা'র সমস্ত জীবন তা'কে দিয়েছে, তা'র জন্য ব্যয় করেছে, সে না-হয় প্রতিদানে নিলো খানিকটা গৌরব; তা'র জন্য, তা'র তৃপ্তির জন্য, বে-আব্রু বাইরের কাছ থেকে দু' হাতে গৌরব কুড়োতে শিবপ্রসাদ কেন কুণ্ঠিত হ'বে?

'টেলিফোনে আপনাকে ডাক্‌ছে।'

'বলে' দাও, মহেশ, এখন হ'বে না।'

'বলেছিলাম।'

'আবার গিয়ে বলো।'

মহেশ ভয়ে-ভয়ে বল্‌লে, 'ও-কথা মানে না। ভয়ানক নাকি দরকার।'

ভুরু কুঁচ্‌কে শিবপ্রসাদ জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লে, 'কী নাম?'

'বলে নি।—মেয়েলি গলা।'

অসম্ভব! এখন যদি আবার কোনো আধ-চেনা 'সাহিত্যিক' মেয়ের সঙ্গে মধুরভাবে আলাপ করতে হয়—না, অসম্ভব।

'যাও, মহেশ; দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

মহেশ ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌লো।

'বলে' দাও, কাল সকাল ন'টায় রিং-আপ্‌ কর্‌তে।'

'তা-ও বলেছিলাম। আজ্‌কে রাত্তিরেই নাকি অনেকদিনের জন্য কল্‌কাতা ছেড়ে যাবে—পনেরো মিনিটের মধ্যেই গাড়ি ছাড়্‌বে। সময় নেই।'

মহেশ এক নিংশ্বাসে কথাগুলো বলে' ফেল্‌লো।

জীবনে বহুবার শিবপ্রসাদকে বহু ভক্ত খামকা টেলিফোনে বিরক্ত করেছে। আর-একবার না-হয় হ'ল। এ-ই তো তার জীবন; সে অন্য-সকলের, সে তার নিজের নয়।

লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে সে টেলিফোন তুলে' নিলে।—'হ্যালো।'

'চিন্‌তে পার্‌ছো?'

সে (একটু ভেবে)। না।

স্বর। অথচ তুমিই তো বলেছিলে, মানুষের সবি বদ্‌লায়, শুধু বদ্‌লায় না তার গলার স্বর।

সে (চুপ)।

স্বর। এখনো চিন্‌তে পার্‌ছো না?

সে। বলো। একটু—এ-ঘর থেকে যাও, মহেশ।

স্বর। বেশিক্ষণ রাখ্‌বো না। জানি, তুমি খুব ক্লান্ত।—তবু ভাগ্যিস তুমি টেলিফোন ধর্‌লে। অনেক ধন্যবাদ।

সে। ও-সব বোলো না।

স্বর। আজ্‌কে তোমার সম্বর্দ্ধনা কেমন লাগ্‌লো?

সে। ও-কথা থাক্‌।

স্বর। ভেবেছিলাম, যাবো। হ'য়ে উঠ্‌লো না। গেলে তোমাকে দেখ্‌তে পেতাম। তুমি কি বদ্‌লেছো—চেহারায়?

সে। কী করে' বলি। পনেরো বছর আগে যা'রা আমাকে দেখেছে, তা'দের কারো সঙ্গে আর দেখা হয় না।

স্বর। অনেক বই লিখেছো—না?

সে। অনেক।

স্বর। সবগুলো আমার পড়াও হয় নি। সময়ই পাই নে।

সে। কী করে' কাটাও সময়?

স্বর। সে কথা থাক্।—এখনো কবিতা লেখো?

সে। (একটু পরে) না। এখন শুধু গল্প।

স্বর। কবিতা একেবারেই লেখো না?

সে। যা লিখেছিলাম, লিখেছিলাম। তার পর—

স্বর। থামলে কেন? বলো।

সে। তোমার কথা বলো।

স্বর। আমার কথা? এ-পর্য্যন্ত ছ'টি হয়েছে।

সে (চুপ)।

স্বর। হাস্‌লে না?

সে। তার পর?

স্বর। বেঁচে তো আছি।

সে। কল্‌কাতায় কবে থেকে আছো?

স্বর। বছর খানেক।

সে। বছর খানেক!

স্বর। অনেক দিন—না? দৈবাৎ যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, তার কোনোই সম্ভাবনা ছিলো না। এক বছরে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছি তিন বার। তা-ও বেশি দূর নয়।

সে (চুপ)।

স্বর। তা ছাড়া, আমাকে দেখ্‌লেও তুমি চিন্‌তে পার্‌তে না।

সে। তোমার চেহারা ঠিক মনে কর্‌তে পার্‌ছি না।

[একটু চুপচাপ]

সে। কল্‌কাতায় কোথায় ছিলে?

স্বর। কালীঘাটে।

সে। স—সপরিবারে?

স্বর। তা-ই।—ও-সব তুমি শুন্‌তে চাও কেন?

সে। না—না, শুন্‌তে চাই নে।

স্বর। খানিকটা শোনো। এক বছর কল্‌কাতায় কাটিয়ে গেলাম—আগাগোড়া জান্‌তাম, তুমিও এখানেই আছো।

সে। এখন কোথায় যাচ্ছো?

স্বর। তা আর না-ই শুন্‌লে।

সে। কোত্থেকে কথা বল্‌ছো?

স্বর। হাওড়া স্‌টেশ্‌ন্। আমাদের গাড়ি ছাড়্‌বার আর দেরি নেই।

সে। কোথায় যাচ্ছো বল্‌বে না?

স্বর (চুপ)।

সে। এখন গাড়ি নিয়ে বেরুলে তোমাদের ট্রেইন ছাড়বার আগে—ও কী?

স্বর (চুপ)।

সে। একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে পারি?

স্বর। বলো।

সে। আজ এই সময়ে হঠাৎ—

স্বর। কেন, বল্‌ছি। তোমার সম্বর্দ্ধনার খবর আমার কানেও পৌঁচেছিলো। মনে কর্‌লাম, আজ সময় থাক্‌তে আমিও তোমাকে আমার অভি—কী হ'ল?

সে। বলে' যাও, বলে' যাও।

স্বর।—আমার অভিনন্দন জানিয়ে যাই। দেশের লোকের সঙ্গে আমিও তোমাকে—

সে (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) না—না—না।

স্বর। কেনই বা নয়? আর হয়-তো সুযোগ হ'ত না।—তা হ'লে রেখে দিই?

সে। একটু—আর একটু।

স্বর। আচ্ছা, একটা কথা বলো। তোমার কি তখন ভয় করেছিলো?

সে। তখন?

স্বর। তখন।

সে। না—তা'কে ভয় বলে না।

স্বর। তা-ই। ভয় তুমি পাও নি; সেইজন্য আজকে তুমি জয়ী হ'লে। আর-একটা কথা।

সে। বলো।

স্বর। এখন তো আর তোমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই?

সে। কী করে' বলি!

স্বর। বলো, সবি সার্থক হয়েছে?

এক্‌সচেঞ্জ। Hurry up, please.

সে। One minute.

সে। বল্‌লে না?

স্বর। বল্‌লে না?

সে। তোমার গাড়ির ঘণ্টা শুন্‌তে পাচ্ছি। তুমি আর ফিরবে না?

স্বর। কোথায়?

সে। ফির্‌বে না?

স্বর। আজকে যে-রকম ফিরলাম ?

সে। কেন নয় ?

স্বর। তা হ'লে এখন—

সে। এই—আর-একটা কথা। শোনো—শোনো।… হ্যালো!…হ্যালো! 'খাবার দিয়েছে।'

'চলো, যাই।' শিবপ্রসাদ টেলিফোন রেখে দিলে।

আভা বললে, 'খেয়ে-দেয়ে আজ আর কাগজ-পত্র নিয়ে বসতে পারবে না। অমনি ঘুম। চোখ দুটো একেবারে লাল হ'য়ে উঠেছে, দেখছি।'

বেদুইন

শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

হাতে পায়ে গায়ে ধূলা মেখে আজ ক্রন্দন ভুলে যাই,
হাসি দিয়ে আমি সসাগরা ধরা জিনিয়া লইতে চাই।

ধরায় ধূলার ছেলে—
স্বর্গের শচী চাহিবে না কভু ছোট দুটি বাহু মেলে।

বেশী কিছু লোভ নহে—
বজ্রের সুর বীণার মতন বুকে যেন মোর সহে।

রাত্রি-শেষের শরতের চাঁদ উপভোগ যেন ক'রি,
জ্যৈষ্ঠের রোদে রোদন ভুলিয়া আমি যেন পথে ম'রি।

মত্ত সাগর পাড়ি দিয়ে এনু বেদুইন বেপরোয়া,
ধরাখানা মোর সরাইখানা যে,—বিশ্বপতির দেওয়া।

ফলে ফুলে ভরা ধরা—
ইহারে যদি না উপভোগ ক'রি, বৃথা এসে ঘুরে মরা।

মন মোর এই চায়—
পথের কুকুরো মোর সাথে মিশে আনন্দ যেন পায়।

কাহারো চাইতে বড় নহি আমি, কারু চেয়ে নই নীচু,
ভাগ্য সে মোর হাতের খেলনা—ছোটে মোর পিছু পিছু।

দিনের আলোতে চন্দ্রেরে ভুলি, ভুলি রাত্রের তারা,
চাঁদের আলোতে ভুলি আবেশেতে সুখ দুঃখ দিল কারা

ঝঞ্ঝায় ঝোঁকে চ'লি—
সসীমের মাঝে অসীমে নেহারি ধরণী দুপায়ে দ'লি।

কত কি যে মনে আসে—
মধুকর আমি মাধুকরী ক'রে বেড়াই সবার পাশে।

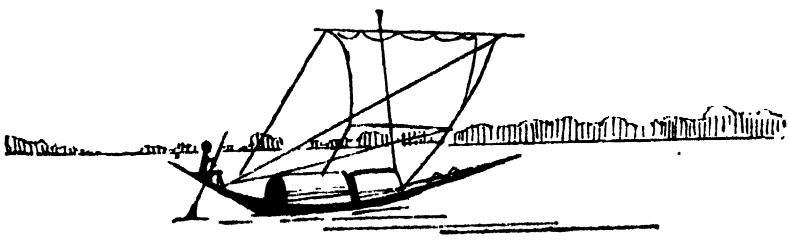
জীবন দোলায় দোল খেয়ে খেয়ে দুলে দুলে উঠে প্রাণ,
বেদের বেপথু প্রাণে লাগে ভাই—বপু নহে বেপমান।

আমার লাগিয়া কাঁদিতেছে হেরি সীমাহীন ওই পথ—
কোটি জনমেও পারি যদি ও'র মিটাইব মনোরথ।

হেসে নেচে গান গেয়ে—
একদিন আমি নিশ্চয় যাব ও'রি বুক বেয়ে ধেয়ে।

ভাবনা কিছুই নাই—
যাহা চাই তাহা অনায়াসে আমি মুঠির ভিতরে পাই।

জ্ঞানী অজ্ঞানী বুঝি না কিছুই,—শত মণি জ্বলে বুকে,
বন্ধুর পথে বন্ধুর মত মেনে নিই ভুল চু'কে।



বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বপ্ন-রহস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সৃষ্টির আদি হইতে মানুষ ও অন্য অন্য জীবজন্তু স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে। সেই অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া স্বপ্ন মানবের কাছে চির রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন কি রকম করিয়া হয়, এবং কেনই বা হয়? এই 'কেন'র উত্তর পাইবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই, এবং এখনও সে চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু আজিও এ রহস্যের সমাধান হইল না—রহস্য চিরদিনই রহস্যই রহিয়া গেল।

স্বপ্ন-রহস্য ভেদ করিবার জন্য সভ্য অসভ্য সকল দেশের সকল জাতির লোকদের কৌতূহল অসামান্য। যাঁহার যেরূপ মনে হইয়াছে, তিনিই সেইরূপে স্বপ্ন-রহস্যের এক একটা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ স্থির করিয়াছেন, স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র। মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণও বলেন, স্বপ্ন চিন্তার ফল মাত্র। কিন্তু তাঁহারা স্বপ্নঘটিত চিন্তাকে অমূলক বলেন না। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, স্বপ্ন-চিন্তার একটা না একটা মূল আছেই। শারীরতত্ত্ববিদরা স্বপ্নকে কতকগুলি (প্রধানতঃ বিকৃত) শারীর-ক্রিয়ার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রকাররা স্বপ্ন সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমাদের স্বপ্নফলগুলির আলোচনা করিলেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। স্বপ্নফল সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থে কয়েকজন পৌরাণিক ব্যক্তির স্বপ্ন-দর্শন-বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ সুস্বপ্ন কেহ-বা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন; কিন্তু সকলেই শাস্ত্রানুযায়ী স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন—কেহই অশাস্ত্রীয়ভাবে স্বপ্ন দেখেন নাই।

সম্প্রতি অধ্যাপক ফ্রয়ড নামক একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত নূতন ধরণে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার স্বপ্ন-বিশ্লেষণ পদ্ধতি চিন্তামূলক, এবং অতি অভিনব ও সুন্দর। এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে অনেক স্বপ্নের সুন্দর ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র-শেখর বসু ডি-এসসি, এম-বি মহাশয় অধ্যাপক ফ্রয়ডের স্বপ্ন-বিশ্লেষণ প্রণালীর অনুসরণ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে স্বপ্ন-বিশ্লেষণ প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা অতি চমৎকার। যাঁহারা এই প্রণালী অবগত হইতে এবং নিজে নিজে তাঁহাদের নিজেদের এবং তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন, তাঁহারা গিরীন্দ্রবাবুর "স্বপ্ন" পুস্তকখানি পাঠ করিলে সমূহ উপকৃত হইবেন।

আমার মনে হয়, স্বপ্নকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। তন্মধ্যে তিনটি প্রধান যথা,—(১) চিন্তাতান্ত্রিক, (২) বস্তুতান্ত্রিক এবং (৩) (চিন্তা ও বস্তুর) মিশ্রতান্ত্রিক। এতদ্ব্যতীত, প্রয়োজন হইলে আরও দুই একটি শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। কারণ, আমার ধারণা, স্বপ্নমাত্রেই কেবল অমূলক বা সমূলক চিন্তার ফল নহে। অনেক স্বপ্নের মূলে বাস্তব ঘটনা, বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব রহিয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৩২৮ সালের চৈত্র মাসের শেষে ও ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে গুড্‌ফ্রাইডের ছুটি উপলক্ষে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। "নায়কে"র প্রতিনিধি রূপে আমি এই সম্মিলনে গিয়াছিলাম।

মেদিনীপুরে আমার একজন আত্মীয়—দূর সম্পর্কের ভায়রা-ভাই বাস করেন। মেদিনীপুরে যখন যাওয়া গেল, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল। আমি সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া দুইজন স্বেচ্ছাসেবকের সহিত আমাকে আমার আত্মীয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন।

এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমার এই আত্মীয়ের সহিত আমার বিবাহের রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য মাত্র আলাপ হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহার সহিত কালে-ভদ্রে এক আধ দিন সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলেও তাহা কলিকাতাতেই হইয়াছিল। কারণ, ভায়রা-ভাই মহাশয় স্বয়ং কলিকাতায় খুব কমই আসিতেন, এবং সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্ব্বে আমিও কখনও মেদিনীপুরে যাই নাই। তবে তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্র কন্যারা প্রায় কলিকাতায় আসিতেন এবং আসিয়া থাকেন—দেখা সাক্ষাৎও প্রায়ই হয়।

আত্মীয়-গৃহে গমন করিয়া দুই চারিটি কথাবার্ত্তার পর তিনি তাঁহার স্ত্রীর (আমার শ্যালিকার) সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবমাত্র আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমার মনে হইল, আমি এ বাড়ীতে পূর্ব্বে যেন একবার আসিয়াছিলাম! বাড়ীর প্রত্যেক অংশই আমার পরিচিত বলিয়া মনে হইল। আমি পূর্ব্বে কখনও মেদিনীপুরে যাই নাই, অথচ, এ বাড়ী আমার এত চেনা কেমন করিয়া হইল তাহা আমি আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। বাড়ীর বাহিরের অংশ দেখিয়া কিন্তু তাহা পরিচিত বলিয়া বোধ হয় নাই। চিন্তা করিতে করিতে মনে পড়িল, বাল্যকালে—বিবাহের বহু দিন পূর্ব্বে স্বপ্নে আমি সেই বাড়ীতে গিয়াছিলাম। এমনও মনে হইল যে, ঐ বাড়ীতে আমি একটি গৃহ-বিগ্রহও দেখিয়াছিলাম। তখন আমি শ্যালিকা মহোদয়াকে আমার স্বপ্নে সেই বাড়ীতে বহুকাল পূর্ব্বে যাওয়ার কথা এবং ঠাকুর দেখার কথা বলিলাম। শুনিয়া তাঁহারও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এখানে আমার বক্তব্য এই যে আমার স্বপ্নদৃষ্ট বাড়ীটি চিন্তামাত্র নহে

—তাহার একটা বাস্তব অস্তিত্ব রহিয়াছে। বাল্য-স্বপ্নের সকল কথা আমি স্মরণ করিতে না পারিলেও, বাড়ীখানি যে স্বপ্ন-দৃষ্ট এবং পূর্ব্ব পরিচিত তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই, অথচ, আমি যে তৎপূর্ব্বে আর কখনও—সে বাড়ীতে যাওয়া দূরের কথা—মেদিনীপুরেই যাই নাই, তাহাও ধ্রুব সত্য। এই জন্য আমার মনে হয়, স্বপ্ন যদি চিন্তামাত্র হয়, তাহা হইলে এরূপ ঘটনা কিরূপে সম্ভব হয়? এবং এই জন্যই আমি স্বপ্নের শ্রেণীবিভাগ করিয়া একটি বিভাগকে বস্তুতান্ত্রিক বলিতে চাহি।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহা আমার কথা নহে—স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কথা। শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থান্তর্গত "পিতা-পুত্র" নামক প্রবন্ধ হইতে অক্ষয়বাবুর নিজের কথাগুলিই আমি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"১৮৭০ সালের ২৯শে মার্চ্চ, পিতা পাকা সবজজ হন। পাকা পদ পাইয়া প্রথমে চট্টগ্রামে গমন করেন। সেই সময়ে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও সেটির উল্লেখ করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি। সাহিত্য কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া, অর্থাৎ রস লইয়া, নাড়া চাড়া করে। সাহিত্যের এলেকা ছাড়া আরও অনেক গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয় আছে। সেইরূপ একটি আধ্যাত্মিক ঘটনার কথা বলিতেছি। ১২৯৩ সালের শ্রাবণের "নবজীবনে" যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ভবিষ্যতের ছোটখাট ঘটনা আমি কতবার স্বপ্নে দেখিয়াছি, তাহা বলিতেই পারি না। সাঙ্গোপাঙ্গ একটি গুরুতর ঘটনা আমি একবার এ-স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। আমি একরাত্রি বহরমপুরে থাকিতে হঠাৎ (এইখানে আচার্য্য মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন—হঠাৎ বলিবার ভাব এই যে, যে বিষয় স্বপ্ন দেখি, সে বিষয়ে জাগ্রত অবস্থায়, কোনই তোলা-পাড়া করি নাই।) স্বপ্নে দেখি যে, পূজ্যপাদ পিতৃদেব যেন চট্টগ্রামে কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন, আর আমি তাঁহাকে কলিকাতায় রাত্রিকালে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিতে গিয়াছি। আলোয় জাহাজ ঝক্ ঝক্ করিতেছে, খালাসীরা কল্ কল্ করিতেছে, নীচে গঙ্গা কুল কুল করিতেছে, আর উপরে বায়ু ঝরঝর করিয়া বহিতেছে। স্বপ্নের কথা দুই এক জনকে বলিয়াছিলাম। ইহার কয়মাস পরে, ঠিক সেইরূপ ঘটনা হইল। তেমনই আলো, তেমনই গঙ্গা; আমার বোধ হইল, সেই রেঙ্গুন নামা জাহাজই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। স্বপ্ন মিথ্যা আমি কখনই বলিতে পারি না।"

ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং বলিতেছেন, তিনি এ বিষয়ে (পিতার বদলী হওয়ার বিষয়ে) জাগ্রত অবস্থায় কোন তোলাপাড়া অর্থাৎ চিন্তা বা আলোচনা করেন নাই। সুতরাং ইহা চিন্তা-তান্ত্রিক স্বপ্ন নহে, বলিতে হইবে। আমার বোধ হয় এই ধরণের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা ফ্রয়েডের বিশ্লেষণ-পদ্ধতির দ্বারা সম্ভবপর নহে। সেইজন্য আমি এই শ্রেণীর স্বপ্নকে বস্তু-তান্ত্রিক বলিতে চাহিতেছি। কারণ, এই স্বপ্ন একটি ভাবী বাস্তব ঘটনার পূর্ব্বাভাষ—ইহার মূলে বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা—তিনটি ব্যাপারই রহিয়াছে, কিন্তু চিন্তামাত্র নাই।

আর এই স্বপ্ন বৃত্তান্তের অন্তর্গত 'আধ্যাত্মিক' কথাটির প্রতি আমি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি। কারণ, পরে এই কথাটির আলোচনার প্রয়োজন হইতে পারে।

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম শিষ্যোত্তম বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ) যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস দেবকে দর্শন করিতে গমন করেন, তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বালক বাবুরামকে তাঁহার সাধন-ক্ষেত্র পঞ্চবটী দর্শন করিয়া আসিতে আদেশ করেন। পঞ্চবটীর চারিদিক ঘুরিয়া বাবুরামের বাল্যকালের অনেক স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। পঞ্চবটীতে পদার্পণ করিয়াই স্থানটি ঠিক ঠিক তাঁহার বাল্যকালীন স্বপ্নের চিত্রানুযায়ী দেখিয়া মনে মনে চমৎকৃত ও পরিতুষ্ট হইলেন।—(উদ্বোধন)

আমার মনে হয়, যাঁহারা বাস্তব-জগতে পূর্ব্ব-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু, ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনার পুনরায় সাক্ষাৎ পান, তাঁহারা যদি সেই সকল স্বপ্ন ও ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে স্বপ্ন-লোকের বস্তু-তান্ত্রিক দিকটাতে আলোক-সম্পাত হইতে পারে। এবং এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজনও রহিয়াছে।

প্রাচীনপন্থী মত

প্রাচীনপন্থী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ যে ভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তদনুসারে সমগ্র মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের (Metaphysics) আলোচনা আসিয়া পড়ে। Metaphysics বলিতে তত্ত্ববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র—এই ত্রিবিধ বস্তুই বুঝাইতে পারে। সুতরাং স্বপ্ন-রহস্যও এই তিন দিক দিয়াই আলোচিত হইতে পারে, এবং প্রাচীন-পন্থীদিগের দ্বারা আলোচিত হইয়াছেও। আমি এখানে মোটামুটি তাহার সামান্য আভাষ মাত্র দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমে এই শাস্ত্রটির ভিত্তি ছিল অনুমান মাত্র। পরবর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রটিকে প্রত্যক্ষানুভূতি এবং বস্তুতান্ত্রিক ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ-রূপ ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া তাহার সংস্কার সাধন করেন। তাঁহারা প্রথমে ধরিয়া লয়েন যে, সমগ্র বিশ্ব-জগতের কার্য্যাবলী একটা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে—কোথাও এই নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। মানুষের মন যে ভাবে কার্য্য করে তাহাও এই নিয়মের অধীন। পদার্থ-বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে-ভাবে ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক পদার্থ-বিজ্ঞান-ঘটিত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে, মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রেও ঠিক সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া মানসিক ক্রিয়া সমূহের একটা সাধারণ নিয়ম নির্ণয় করা হইয়াছে। তবে অবশ্য এ বিষয়ে মনো-বৈজ্ঞানিকগণকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছে। কারণ, পদার্থ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ করা যতটা সহজ, মানসিক ক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা তত সহজ নহে। কারণ, মন বলিয়া জিনিসটি বস্তুতান্ত্রিক নহে,

এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলীর সংখ্যাও সুপ্রচুর নহে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিককে প্রধানতঃ তাঁহার নিজের মনের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে—নিজের মনের গতিবিধির অনুসরণ করিয়া চলিতে হইয়াছে। অপরের মনের খবর তিনি খুব কমই পাইয়াছেন। বাহ্য ফলাফলের বিচার করিয়া লোকের মনের গতি অনেকটা অনুমানে বুঝিয়া লইতে হইয়াছে। এই জন্য পদার্থ-বিজ্ঞান অপেক্ষা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে নানা মুনির নানা মতের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত অধিক। তথাপি, ইহারই মধ্যে, যতটা সম্ভব, একটা সাধারণ নিয়ম খাড়া করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার ফলে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কার্য্যই সমধিক উল্লেখযোগ্য। মানুষের মনের গতিবিধির সন্ধান রাখিবার সুযোগ তাঁহারা যতটা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এতটা অপর কেহ নহে। মনের সুস্থ ও অসুস্থ উভয় অবস্থাই পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ তাঁহারাই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই রূপে মানসিক ক্রিয়ার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া প্রথমেই যে নিয়মটি আবিষ্কৃত হইল, সেটি—কার্য্য কারণের সম্বন্ধ। মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষানুভূতি জন্মিল, তাহাতে দেখা গেল যে, প্রথমে একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল; তাহার পর কার্য্যটি ঘটিল। ঠিক অনুরূপ অবস্থায় অন্যত্র কোন কারণ উপস্থিত হইতে দেখিলে বুঝিতে হইবে, কার্য্যটিও ঠিক ঘটিবে; এবং যদি কার্য্যটিকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তবে বুঝিতে হইবে—কারণটি পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছিল, তবে কার্য্যটি ঘটিয়াছে। এটি একটি সাধারণ নিয়ম। অবস্থার সমতা থাকিলে সর্ব্বত্রই কারণের পর কার্য্য, কিম্বা কার্য্যের পূর্ব্বে কারণ ঘটিবেই ঘটিবে। একটি শিশুর দৈবাৎ যদি কোন অঙ্গ পুড়িয়া যায় তবে সে আগুনকে ভয় করিতে শিখিবে। যখনই সে আগুনের সংস্পর্শে আসিবে, তখনই তাহার মনে অগ্নিভীতির উদয় হইবে—কখনই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। অবশ্য স্থলবিশেষে এইরূপ অভিজ্ঞতা মাত্রা অতিক্রম করিতে পারে; কিন্তু সে সকল জটিল তত্ত্বের আলোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

মনের কার্য্য চারিটি—চিন্তা করা, ইচ্ছা করা, স্মরণ করা ও বিচার করা। মনের এই চারিটি ক্রিয়ার আমরা পরিচয় পাই—উহাদের ফলাফলের দ্বারা। অতএব বস্তুতান্ত্রিক কার্য্যের দ্বারা মনের পরিচয় লইতে হয়। অন্য কোন উপায়ে লইতে গেলে তাহা প্রথমতঃ হইবে—অবৈজ্ঞানিক; দ্বিতীয়তঃ, তাহাতে ভ্রান্তি ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। প্রাচীনপন্থীদের মতে ইহাই মোটামুটি মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্র।

কিন্তু সেকালের দার্শনিকরা ছিলেন অদ্ভুত শ্রেণীর জীব, এবং তাঁহাদের মতও ছিল অতি বিচিত্র। নানা মুনির নানা মত কথাটি চিরন্তন সত্য। সেইরূপ, নানা শ্রেণীর দার্শনিক মন এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা রকম মতের প্রচার করিতেন। Egoists (এগোয়িষ্টস) নামক এক শ্রেণীর দার্শনিক নিজের নিজের মন ব্যতীত অপরের মনের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না। কারণ,নিজের দেহের ভিতর নিজের মনকে তাঁহারা বুঝিতেন, সে জন্য কোন প্রমাণের দরকার হইত না। কিন্তু অপরের দেহেও যে একটি করিয়া মন থাকিতে পারে এবং থাকে, তাহার প্রমাণ কৈ (!!!!)?

সুখের বিষয়, এইরূপ এগোয়িষ্টদের সংখ্যা সেই সেকালেও অধিক ছিল না। সেকালেও এমন অনেক দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, যাঁহারা কেবল নিজেদের নহে, অপরের মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন; এমন কি, পশুদের দেহেও মনের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতেন না।

এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধানই এই শ্রেণীর দার্শনিক-পণ্ডিতদিগের চরম উদ্দেশ্য। এবং এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা সকল দিক দিয়া মানব মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথমে তাঁহারা জড়-বস্তুর সহিত মানুষের মনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা মনের কার্য্যপদ্ধতির এইরূপ বিশ্লেষণমূলক শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন; যথা,—

১। অনুভূতি ও ধারণা (Sensation and Perception)।

২। সম্বিৎ ও অনুধ্যান (Consciousness and Reflection)।

৩। প্রমাণ (Testimony)।

অনুভূতি বলিতে এই বুঝায় যে, আমাদের দেহে অনুভূতির যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, তাহাদের দ্বারা যে সকল ধারণা জন্মায়, সেই ধারণা মনের ভিতর সঞ্চালিত হইয়া বাহ্য বস্তুর গুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। অনুভূতি ও ধারণা পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট—অনুভূতির উৎপত্তি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারণাও জন্মিয়া যাইবে। তবে একটা কথা—বস্তু সম্বন্ধে ধারণা যে সব সময়ে প্রকৃত হয়, তাহা নহে—কখনও কখনও ভ্রান্ত ধারণাও জন্মিয়া থাকে। কোন্ কোন্ অবস্থায় প্রকৃত ধারণা জন্মে, এবং অপ্রকৃত ধারণাই বা কোন্ কোন্ অবস্থায় জন্মিতে পারে, দার্শনিকরা তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া সে সকল আলোচনা পরিত্যাগ করা গেল।

মনের ভিতর যখন কোন চিন্তা বর্ত্তমান থাকে, তখন সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার নাম সম্বিৎ বা Consciousness। আর এই অবধানের ব্যাপারটা বিস্তৃতি লাভ করিলে অর্থাৎ অবধানতার সহিত চিন্তা করিতে থাকিলে, তাহাকে অনুধ্যান বা refl-ction বলা যায়। সম্বিতের অপর এক নাম চৈতন্য। চৈতন্য দুই প্রকার—জাগ্রত চৈতন্য বা Conscious-ncss; আর সুপ্ত চৈতন্য বা Subconsciousness। চৈতন্যের কাজ আমাদের জ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয়—তাহাকে আমরা বুঝি। আর সুপ্ত-চৈতন্যের কাজ আমাদের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয়; তাহা আমরা ভাল রূপ বুঝি না। তাহা অতি বিশৃঙ্খল ভাবেই হয়। (অথবা তাহার মধ্যে শৃঙ্খলা থাকিলেও, তাহা আমরা বুঝি না বলিয়া বিশৃঙ্খল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।) অনুধ্যানের সহিত অতীত চিন্তাধারার সংযোগ থাকে; আমরা বর্ত্তমান চিন্তাধারার সহিত অতীত চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার তুলনা করি, বিচার-বিতর্ক করি। এই ভাবে আমরা উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করি; এবং কোন্ পদ্ধতিতে মানসিক কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার একটা সাধারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা করি।

বহির্জ্জগতের সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহার সমস্তটাই

আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান নহে। আমাদের অর্জ্জিত জ্ঞানের অতি সামান্য অংশই আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা-লব্ধ; অধিকাংশ জ্ঞানই অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত। পরের নিকট হইতে আমরা যে জ্ঞান সঞ্চয় করি, তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। অপরের অভিজ্ঞতার দ্বারা আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধন করিতে হইলে, প্রথমে, সেই অপরের সত্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমাদের মনে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। তৎপরে, যেরূপ অবস্থায় ও যে সকল সুযোগের ফলে তিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ঐ অবস্থা ও সুযোগের যে জ্ঞানবিধায়িনী শক্তি আছে, তাহা আমাদের জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। তাহার পর, তিনি পুর্ব্বে তাঁহার যে সকল অভিজ্ঞতার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন, সেইগুলি যে সত্য তাহা পুর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকা আবশ্যক। এই এত কাণ্ডের পর তবে আমরা তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। অতএব এইগুলি তাঁহার কথার সত্যতার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা testimony। কোন অপূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তির কথায় আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। সতর্ক ভাবে তাঁহার কথা বিচার করিয়া দেখিতে হয়—অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা testimonyর দাবী করিতে হয়। যদি কাহারও পুর্ব্ববর্ত্তী কোন কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাঁহার কথার আমরা সহসা বিশ্বাস করি না; কারণ তাঁহার কথার সত্যতার বিশ্বাস ও নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ বা testimony নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান না থাকিলেও, আমাদের পুর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অনুযায়ী, বক্তার কথাগুলি সত্য হওয়া সম্ভব এরূপ একটা অনুভূতি বা ধারণা থাকিলেও আমরা অনেক সময়ে লোকের কথায় বিশ্বাস করিতে পারি। তথাপি, এ ক্ষেত্রে আমাদিগকে সতর্ক হইতে হয়, এবং তাহার উক্তির সমর্থনসূচক প্রমাণের প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়।

মনের কার্য্য-পদ্ধতি এবং বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলাম। এইবার মনের কার্য্য কি কি তাহার আলোচনা করিয়া দেখিব। মনের কার্য্য প্রথমতঃ স্মরণ রাখা, স্মরণ করা। প্রথমটি হইতেছে স্মৃতিশক্তি (memory) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে মনে মনে অতীত বিষয়ের আলোচনা (recollection)। এই দ্বিতীয় কার্য্যটি কিছু ব্যাপক; কারণ, আমরা কেবল মানস-গোচর অতীত ঘটনাবলীরই আলোচনা করি না, ঐ সকল ঘটনার যে চিত্র আমাদের মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া আছে, মনে মনে তাহা স্মরণ করিতে পারি, পুর্ব্বদৃষ্ট ব্যক্তিগণের চেহারা ও আচার ব্যবহার, কাজ-কর্ম্ম স্মরণ করি; কোন স্থানে গিয়া থাকিলে তাহার দৃশ্যও আমাদের মনে থাকে, এবং তাহাও আমরা স্মরণ করিতে পারি। ইহাকে অনেক সময় মনের স্বতন্ত্র শক্তি ও স্বতন্ত্র কার্য্য বলা হয়; কিন্তু স্মৃতিশক্তির সাহায্য না পাইলে এই কার্য্যটির স্ফুরণ হইতে পারে না; সেইজন্য স্মৃতিশক্তি ও স্মরণ করাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করাই উচিত।

মনের দ্বিতীয় কার্য্য এই—যেরূপ অবস্থায় কোন বস্তু সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করি, সেই অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে আমরা বস্তুটির সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক করিতে পারি। এমন কি, বস্তুটির বিভিন্ন গুণের বিশ্লেষণ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি; বিভিন্ন বস্তুর তুলনা করিয়া কোন্ কোন্ গুণ তাহাদের মধ্যে সাধারণ তাহাও নির্ণয় করিতে পারি। এইরূপে আমরা বস্তু ও ঘটনা-সমূহের শ্রেণীর পর শ্রেণী বিভাগ করিতে পারি। মনের এই কার্য্যটির নাম তন্ময়তা বা একাগ্রতা (Abstraction)।

তৃতীয়তঃ, মনের কার্য্য ঘটনাসমূহের দৃশ্য বা শ্রেণীর মূল সূত্র আবিষ্কার করা ও বিশ্লেষণ করা। এবং সেই মূল সূত্রের অনুসরণ করিয়া মনে মনে নব নব—কিন্তু ভিত্তিহীন—ঘটনাবলীর সৃষ্টি করা। ইহার নাম কল্পনা (Imagination)।

চতুর্থতঃ, আমরা ঘটনাবলীর তুলনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ ও সংশ্রব নির্ণয় করিতে পারি। অপিচ, এইরূপে আমরা বস্তুসমূহের সাধারণ প্রকৃতি অবধারণ করিতে পারি। মনের এই কার্য্যটির নাম যুক্তি বা বিচার (Reason or Judgment)।

স্মৃতিশক্তি নির্ভর করে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের উপর—(১) অবধান (Attention), ও সাহচর্য্য (Association)। অবধানতার সহিত কোন কথা শুনিলে বা কোন কিছু দর্শন করিলে তাহা যে স্মরণ করিয়া রাখা যায় ইহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। আর সাহচর্য্যের ফল এই দাঁড়ায় যে, দুই বা ততোধিক ঘটনা একসঙ্গে বা ঠিক পরে পরে ঘটিলে তাহা মনে এমনভাবে মুদ্রিত হইয়া যায় যে, একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিতে গেলে অপরটি বা অপরগুলি মনে না আসিয়া পারে না। কিম্বা সাহচর্য্যের ফলে চিন্তাধারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মনে ঠিক সেইভাবে উদিত হয় যেমন ভাবে যে শৃঙ্খলাক্রমে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল। এমন কি, একটি ঘটনার কথা মনে হইতে তাহার সদৃশ অন্য ঘটনার কথাও মনে হয়। ইহাও সাহচর্য্যের ফল। আমরা ইচ্ছা না করিলেও বা মনোযোগ না দিলেও এরূপ চিন্তাধারার আবির্ভাবে বাধা ঘটে না। যখন লোকে চিন্তামগ্ন হয়, তখন প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কত কথাই যে মনে আসে তাহার মাথামুণ্ড কিছুই স্থিরতা থাকে না।

সাহচর্য্য তিন প্রকার—

১। স্বাভাবিক বা দার্শনিক সাহচর্য্য (Natural or Philosophical Association)।

২। স্থানীয় বা প্রাসঙ্গিক সাহচর্য্য (Local or Incidental Association)।

৩। যথেচ্ছ বা কাল্পনিক সাহচর্য্য (Arbitrary or fictitious Association)।

এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে মনের অনেক অভিনব অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই সকল অবস্থা দুই বা ততোধিক ঘটনা, চিন্তা বা বস্তুর উপর নির্ভর করে, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা অনিবার্য্যও নয়, থাকেও না; তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয় হইলেও ক্ষতি নাই, এবং প্রায় তাহাই হইয়া থাকে। কেবল মনের

ভিতর তাহারা একসঙ্গে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সংশ্রব স্থাপন করিয়া গোলমাল বাধায়।

সকলের স্মৃতিশক্তি সমান নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন ও শিশুদিগের স্মৃতিশক্তি কিছু দুর্ব্বল। কিরূপে স্মরণশক্তি বর্দ্ধন করা যায়, মনোবৈজ্ঞানিকরা তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যে উপায়ে প্রাচীন ব্যক্তিগণের স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে,—শিশুগণের স্মরণশক্তি বর্দ্ধনের উপায় তাহা হইতে বিভিন্ন। মনোবৈজ্ঞানিকরা বিস্তৃতভাবে এই দুই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া তদালোচনায় বিরত রহিলাম।

শিশু ও প্রাচীনগণের স্মরণশক্তি স্বাভাবিক কারণে দুর্ব্বল হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত, আর এক প্রকারে, শিশু, বৃদ্ধ এবং পূর্ণ-বয়স্ক সকল শ্রেণীর লোকের স্মরণশক্তির দৌর্ব্বল্য ঘটিতে পারে। সেটি শারীরিক অসুস্থতা। মস্তকে আঘাত লাগিলে, মস্তিষ্ক পীড়িত হইলে, জ্বরে, কিম্বা শারীরিক অতিরিক্ত দুর্ব্বলতার দরুণ স্মৃতিক্ষীণতা ঘটে। অতিমাত্রায় মাদক বা ইন্দ্রিয়-সেবা স্মরণশক্তিক্ষীণতার অপর এক কারণ। ইহাদেরও বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

অবধানের ঠিক বিপরীত অবস্থা অন্যমনস্কতা বা অনাবিষ্টতা (abstraction)। আবার Abstraction অর্থে, বস্তু সকলের গুণাবলীর বিশ্লিষ্টভাবে আলোচনাও বুঝাইতে পারে। পূর্ব্বে ইহাকে তন্ময়তা বা একাগ্রতা বলা হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য পূর্ব্বের সংজ্ঞার সহিত বর্ত্তমান সংজ্ঞার কোন বিরোধ ঘটিতেছে না। কারণ কেহ যখন নিবিষ্টচিত্তে কোন বিষয় চিন্তা করে বা কোন কার্য্য করে, তখন স্বভাবতই সে অপর সকল চিন্তা বা কার্য্যে অনাবিষ্ট হইয়া পড়ে। Abstraction মনের একটা স্বতন্ত্র কার্য্য কি না, সে বিষয়ে মনোবৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে।

মনের আর একটি কার্য্য—কল্পনা-কুশলতা বা কল্পনা-প্রবণতা (Imagination)। ইহার সাহচর্য্যে মন অনেক অবাস্তব, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ বস্তু বা বিষয়ের সৃষ্টি করিতে পারে। কল্পনাপ্রবণতা চিত্রশিল্পী, কথা-সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী বা কবির প্রাণ।

মনের শেষ ক্রিয়া—যুক্তি বা বিচার (Reason or Judgment)। মনের যে ক্রিয়ার দ্বারা আমরা বস্তু বা বিষয় সকলের পরস্পরের সহিত তুলনা করিতে পারি এবং বাহ্যবস্তুসমূহের সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা সুসঙ্গত ধারণা জন্মাইতে পারি—তাহাই যুক্তি বা বিচার। যুক্তির প্রয়োগ এইভাবে করিতে হয়—

আমরা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিষয়সমূহের পরস্পরের সহিত তুলনা করি ও তদ্দ্বারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ, সংযোগ এবং প্রবণতার অনুসন্ধান করি। তৎপরে যে সকল সম্বন্ধ স্থায়ী ও সমান ভাবের, সেইগুলি হইতে আপেক্ষিক (incidental) সম্বন্ধ গুলি পৃথক করিয়া ফেলি।

বস্তু সকলের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে? প্রথমতঃ তাহাদের লক্ষণ বা প্রকৃতিগত সম্বন্ধ। যে সকল লক্ষণ দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা যায়, তাহাই তাহার প্রকৃতি। একাধিক বস্তুর মধ্যে এই প্রকৃতিগত সাম্য বা বৈষম্য ঘটিতে পারে। এবং ইহারাই মনের বিচার্য্য বিষয়। প্রকৃতি, লক্ষণ ব্যতীত, চিহ্ন, গুণ প্রভৃতিও বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন বৃক্ষের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান-ঘটিত গুণনিচয়, কোন খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম্ম, রোগ বিশেষের লক্ষণ, কোন বস্তুর অনুভূতিযোগ্য বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি; ব্যক্তিবিশেষের মানসিক সম্পদ, নৈতিক চরিত্র ইত্যাদি।

তাহার পর আকৃতিগত সম্বন্ধ, বস্তু সকলের মধ্যে সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম, উহাদের গঠনমূলক সম্বন্ধ; কারণগত সম্বন্ধ, পরিমাণ ও অনুপাতমূলক সম্বন্ধ প্রভৃতি যুক্তি-সঙ্গত তুলনার দ্বারা নির্ণয় করা মনের কার্য্য। এইরূপ আরও নানা ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ করা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতারা মনের এই বিচার-শক্তিকে আরও দুই ভাবে প্রয়োগ করেন; যথা, (১) সত্যানুসন্ধান, এবং (২) নিজ আচরণকে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করা। এখানে সত্যানুসন্ধান বলিতে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং সংযম বলিতে ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধানের সুবিধা হইবে এমন ভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধান কালে যে সকল বিষয় লইয়া যুক্তি-তর্কের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিতে পারে (Fallacies in facts); এবং সিদ্ধান্তগুলিও নির্ভুল না হইতে পারে (Fallacies in Induction)। এমন কি যুক্তি-তর্কের প্রণালীও ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে (False Reasoning)। কিরূপে এই সকল ভ্রান্তির নিরশন করিয়া সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়, সেইজন্য লজিক বা তর্কশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্র নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রই রচিত হইয়াছে।

বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে মনে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে অনেক সময়ে এই ভ্রান্তি ধরা পড়ে, এবং ভ্রান্ত ধারণা সংশোধিত হয়। মনের এমন শক্তি আছে যে, সুদূর অতীত কালে সংঘটিত কোন ঘটনার বিবরণ কিম্বা দৃশ্যের চিত্র মন স্মরণ করিতে পারে; এবং চিন্তাশক্তির পরিচালনা করিয়া মনে মনে ঐ বিবরণের পুনরাবৃত্তি করিতে পারে, মানস-পটে ঐ দৃশ্যের চিত্র প্রতিফলিত করিতে পারে। মনের এই শক্তিটির নাম দেওয়া হইয়াছে—ধারণাশক্তি (conception)। আবার মনের এমন ক্ষমতাও আছে যে, এই সকল ঘটনার মিশ্রণ ও অদল-বদলের দ্বারা মনে মনে নূতন ঘটনা বা দৃশ্যের সৃষ্টি করাও যায়; অথচ, এই ঘটনা বা দৃশ্য বাস্তব নহে—সম্পূর্ণরূপে কল্পিত। পূর্ব্বে আরও দেখা গিয়াছে যে, সাহচর্য্যের দ্বারা বহুকাল পূর্ব্বে বিস্মৃত ব্যক্তি, ঘটনা বা দৃশ্য স্মরণ-পথে আসিয়া পুনরুদিত হয়। সে সময়ে নানা চিন্তাধারা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই সকল চিন্তা কেমন করিয়া যে মনে আসিয়া উদিত হয় তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে এমন অনেক কথা মনে পড়ে, যে সকল বিষয়ে বহু কাল ধরিয়া কোনরূপ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। মনে যখন এইরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনকার মনের অবস্থাকে ঠিক সক্রিয় অবস্থা বলা চলে না; বরং তাহাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থাই বলিতে হইবে। মনের অলস অবস্থাতেই এইরূপ উদ্দেশ্যহীন

চিন্তার উদয় হয়। মন যখন কোন বিশেষ বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে তখন এইরূপ চিন্তার উদয় খুব কমই হয়।

কোনরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণা অথবা সাহচর্য্য কিম্বা কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট হইয়া এইরূপ চিন্তাধারা যখন মনের ভিতর সঞ্চালন করে তখন মনে হয়, চিন্তার বিষয়ীভূত বস্তু বা ঘটনাগুলি যেন সত্য সত্যই মনশ্চক্ষের সমক্ষে ঘটিয়া যাইতেছে অথবা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু জীবনের বাস্তব নিত্য-স্রোতে মন আকৃষ্ট হইলেই ঐ কাল্পনিক দৃশ্যাবলী তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়। এই কার্য্যটি হয় মনের যুক্তি-শক্তির দ্বারা—বহির্জ্জগতের বাস্তব অবস্থার সহিত কাল্পনিক দৃশ্যাবলীর তুলনার দ্বারা। কবি যখন কাব্য রচনা করেন, ঔপন্যাসিক যখন তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্র-সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত থাকেন, অভিনেতা যখন একাগ্রচিত্তে কোন নাটকীয় চরিত্রের ভূমিকার অভিনয় করিতে থাকেন, তখন যিনি যে বিষয়ের চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন, সম্ভবতঃ সে সময়ে তিনি তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়ের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যান, যেন সেই সকল বিষয়, ব্যক্তি বা বস্তু মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আর সেই অবস্থায় তিনি তাঁহার রচিত চিত্রের অনুযায়ী বিচার করেন, কথা কহেন বা কার্য্য করেন। ইহাকেই আমরা বলি—কল্পনা। কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরও যদি ঐ কাল্পনিক দৃশ্য অন্তর্হিত না হয়, তিনি যদি তাঁহার কাল্পনিক মূর্ত্তির অনুযায়ী কাজ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত বলিতে হয়।

এখানে মনের যেরূপ অবস্থার বর্ণনা করা যাইতেছে, সেরূপ অবস্থা বাস্তবিকই ঘটে—কাল্পনিক দৃশ্য বা ধারণা বাস্তব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াও মন তাহার কাল্পনিক দৃশ্য দূর করিতে সমর্থ হয় না—যুক্তি তখন মনের এই অবস্থার সংশোধন করিতে অপারগ হয়। মনের দুইটি অবস্থায় এই ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে ঘটে—(১) উন্মত্ত অবস্থায় ও (২) স্বপ্নে। মানসিক ক্রিয়া হিসাবে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত অধিক। পার্থক্যের মধ্যে কেবল এইটুকু যে, উন্মত্ত অবস্থায় মনে যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া থাকে তাহা স্থায়ী এবং তাহা রোগীর আচরণের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করে। আর স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাপার কিয়ৎক্ষণের জন্য সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও চরিত্রের উপর কোন প্রভাব পড়ে না; কারণ, জাগ্রত হইবার পর স্বপ্ন মিলাইয়া যায়—তাহার কোন বাস্তব চিহ্ন থাকে না। পক্ষান্তরে, মন যখন কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তখনকার মানসিক অবস্থা এবং উন্মাদ রোগগ্রস্ত অবস্থা বা স্বপ্নাবস্থার মধ্যেও রীতিমত পার্থক্য ঘটে। কল্পনাপ্রবণ অবস্থায় মনে যে সকল চিত্র উপস্থিত হয়, তাহা আমাদের ইচ্ছাকৃত, চেষ্টাকৃত; ইচ্ছা করিলেই তাহার পরিবর্ত্তন করা যায় কিম্বা একেবারে মন হইতে দূরীভূত করা যায়। কিন্তু শেষোক্ত দুই অবস্থায় (উন্মাদ ও স্বপ্ন) মানসিক চিত্র পরিবর্ত্তিত করিবার বা দূরীভূত করিবার শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে। সে সময়ে যে চিন্তাস্রোত মনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, মন তাহার অধীন হইয়া পড়ে। ইচ্ছা করিলেই তাহাদের পরিবর্ত্তন বা দূরীকরণ সম্ভবপর নহে। এমন কি, এরূপ ইচ্ছা করাও সম্ভব হয় না। এই চিন্তাধারা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহচর্য্য হইতে উদ্ভূত। সাহচর্য্যজাত বিবিধ বিষয় নানা ভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া বহু নূতন ও অদৃষ্টপূর্ব্ব, অপ্রত্যাশিত চিত্রের সৃষ্টি করে। চিত্রগুলি এমন ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় যে আমরা তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া পাই না, কিম্বা তাহার কোন সঙ্গত ও সম্ভবপর কারণও নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

স্বপ্ন যখন দেখা যায় তখন অনুভূতিমূলক ইন্দ্রিয়গুলি এমন নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে যে, বহির্জ্জগতের কোন ভাবের ছাপ তাহাতে পড়ে না। মনের প্রভাবে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। স্বপ্নাবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর মনের প্রভাব স্থগিত থাকে,—কোন কার্য্য করে না। তবে অবশ্য স্থলবিশেষে ইহার একটু আধটু ব্যতিক্রমও যে ঘটে না তাহাও নহে। কারণ, স্বপ্নাবস্থায় লোককে ক্রন্দন করিতে, ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতে, কিম্বা হাত-পা ছুঁড়িতেও দেখা যায়। কিন্তু এই সকল কার্য্য মনের ইচ্ছানুসারে কিম্বা জ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয় না।

উন্মাদ অবস্থায় কিন্তু দৈহিক অনুভূতিগুলি সজাগ থাকে, বহির্জ্জগতের ভাবের ছাপ তাহাদের উপর পড়িতে কোন বাধা ঘটে না। তখন তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনও মনের প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। তবে সে সকলই ভ্রান্তিপূর্ণ। ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ উন্মাদ রোগী তখন এমন কাজ করে কিম্বা এমন ব্যবহার করে, যাহা সে স্বাভাবিক অবস্থায় কখনই করিতে পারিত না—কোন মানুষই স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা করিতে পারে না—এবং যাহাতে সে ব্যক্তি জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠে।

উন্মাদ ও স্বপ্নাবস্থার মাঝামাঝি অবস্থা স্বপ্ন-সঞ্চরণ (Somnambulism)। এই বিষয়টি এখানে অপ্রাসঙ্গিক এবং আমাদের আলোচ্য নহে। কেবল এইটুকু বলা যায় যে, এই অবস্থায় দেহের অনুভূতিগুলি আংশিক ভাবে জাগ্রত থাকে, এবং বহির্জ্জগতের সঙ্গে অল্প কিছু সম্পর্ক থাকে। (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব কাব্যের রসধারা

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধের ভিতর আমি বৈষ্ণব কাব্যের বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করি নাই। বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে যে রসানুভূতি আমি উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই সুধিজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

বৈষ্ণব কাব্য বাংলা ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। যখন বাংলা সাহিত্যের তরুণ অবস্থা, তখনই বৈষ্ণব কাব্য বাংলা সাহিত্যে এমন এক স্থানে আসন গ্রহণ করিয়া বসিল, যাহার বিচার সেদিনও কেহ করিতে পারে নাই, আজও কেহ পারিল না এবং কোন দিনও পারিবে কি না সন্দেহ;—এতই উচ্চে ইহা স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ভাব-মাধুর্য্য তাৎকালিক সুধিজনকে তো মোহিত করিয়াই ছিল, এখনও ইহার রস-সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখিলে মুগ্ধ হয় না এমন ব্যক্তি বোধ হয় নাই বলিলেও চলে।

বাংলা দেশে এক সময়ে ধর্ম্মে ও সাহিত্যে এমন এক যুগ আসিয়াছিল, যখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব কাব্যের মত সাহিত্যের প্রয়োজন

হইয়া পড়িয়াছিল। এই ধর্ম ও সাহিত্য লোকের মনকে এতদূর বশীভূত করিয়াছিল যে, ইহা এখনও অমর হইয়া রহিয়াছে।

সকল ধর্মই এবং সকল সাহিত্যই নীরস তত্ত্ব ও নীরস বস্তু বিচার লইয়া আলোচনা করিয়াছে বলিয়া এমন করিয়া লোকের মনের মধ্যে দাগ দিতে পারে নাই, যেমন করিয়া দাগ দিয়াছে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য।

ধর্মের জন্য বৈষ্ণব সাহিত্য কতখানি কি করিয়াছে তাহা দেখান আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার তো মনে হয় ধর্মের দিক ছাড়িয়া দিয়াও বৈষ্ণব কাব্যকে এত ভাল লাগে এইজন্য যে, ইহা একেবারে জীবনের চিরন্তন মূল ব্যাপার লইয়া রচিত। প্রেম, বিচ্ছেদ, মিলন,—যাহা মানুষের জীবনে নিত্য ঘটমান তাহার মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব কবিরা সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য এত মধুর ও প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে।

অন্য সব ধর্মতত্ত্ব শুধু ঐশ্বর্য্যজনিত ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে বড় করিয়া লইয়া ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ধর্মও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে এবং ধর্মগ্রন্থও সাহিত্য হিসাবে গণ্য ও চিরস্থায়ী হইয়াছে। আর সেইজন্যই বৈষ্ণব গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন ধর্মগ্রন্থই সাহিত্যে স্থান পায় নাই,—তাহারা দূরে থাকিয়া ভক্তির জিনিষ হইয়াছে কিন্তু প্রাণের জিনিষ হইতে পারে নাই।

বৈষ্ণব কাব্যের বিষয়-নির্ব্বাচনও অনির্ব্বচনীয়। সত্যকারের যে কাব্য তাহার ভিতর আমরা বস্তুর অন্বেষণ করি না,—অন্বেষণ করি বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্য, অরূপতা এবং কল্পনার প্রসারতা। সাহিত্য-দর্পণকার কাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং" অর্থাৎ রসই কাব্যের একমাত্র উপজীব্য। বৈষ্ণব কাব্যের ভিতর এই রস-সৃষ্টি অনবদ্য রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুন্দরের অঙ্গনে জীবাত্মার লীলাভিসারই তাহার আনন্দরূপকে প্রকাশিত করে। বৈষ্ণবের লীলাবলিও এই উক্তির সমর্থন করে। বৈষ্ণবের ধর্ম রসের ধর্ম—নীরস তত্ত্বের ধর্ম নয়, বৈষ্ণব কাব্য-দর্শনে লীলার স্থান তাই এত উচ্চে।

যেখানে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নাই সেখানে আবেগের তীব্রতা কোথায়? কাজেই আনন্দের অংশও তাহার মধ্যে অত্যন্ত কম। এই কারণেই বৈষ্ণব কবিরা ভগবানের সহিত নানা রূপ সম্বন্ধ পাতাইয়া মানবীয় প্রেমের ভিতর দিয়াই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন ও তাঁহাকে পাইতে চাহিয়াছেন।

ইহার ভিতর আবার সকল সম্বন্ধ হইতে কান্তা-প্রেমের সম্বন্ধকেই তাঁহারা সব হইতে উচ্চে স্থান দিয়াছেন। তাহার কারণ এই অনুমান হয় যে, অন্য সম্বন্ধে পরস্পরের নৈকট্যকে তত বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে আকর্ষণ করে না, একটুখানি সংযমের ব্যবধান রাখিয়া দেয়; কিন্তু কান্তা-প্রেমের সম্বন্ধ বর্ষার দুকুল-প্লাবনী জলধারার মত কোথাও কোন বাধা রাখে না,—না মনে, না ব্যবহারে,—একেবারে প্রাণের ভিতরকার জিনিষ করিয়া তোলে। সেইজন্যই বৈষ্ণব কবিরা কান্তা-প্রেমকে বড় করিয়া দেখিয়া তাহার মধ্যেই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছেন। ইহাও গভীর রসানুভূতির প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই ভাব হইতেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

আবার এই কান্তা-প্রেমের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেও বৈষ্ণব কবিরা কতখানি অনুভব-শক্তির প্রকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অনুরাগ মানবের কাছে বড়ই মধুর। সামাজিক প্রেমও মধুর, কিন্তু সামাজিক প্রেম সহজ-লভ্য বলিয়া তাহার ভিতর গাঢ় রসমাধুর্য্য নাই, বা রস-সৃষ্টির বৈচিত্র্য নাই। স্বকীয়া প্রেমের ভিতর প্রেমের মর্য্যাদাই আছে শুধু; কিন্তু প্রেমের সদাই-হারাই-হারাই-ভাবের মাধুর্য্য নাই বলিয়া বৈষ্ণব কবিরা পরকীয়া প্রেমানুরাগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

চৌরি-পিরিতি হোয় লাখ গুণ রঙ্গ।

কারণ এর তুল্য ত্যাগ, আত্মদান বা আত্মনিবেদন অন্য কোন অনুরাগেই হয় না। কিন্তু বৈষ্ণবের যে পরকীয়া ভালবাসা তাহা পার্থিব-ভাব-বর্জ্জিত। ইহার ভিতর লালসার গন্ধ নাই। নিজের সুখের জন্য যাহা কিছু কামনা তাহাই কাম, কিন্তু বৈষ্ণবের যে আত্মদান বা আত্মনিবেদন তাহার ভিতর আত্মসুখেচ্ছা নাই; তাই ইহা কামশূন্য। এই যে আত্মদান বা আত্মনিবেদন ইহা পরম প্রেমাস্পদের জন্য, দয়িতের সুখের জন্য। নিজেকে সর্ব্বতোভাবে প্রেমাস্পদের সুখের জন্য দান করিবার এই যে আকাঙ্ক্ষা ইহা কামলেশশূন্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণব কবিতা পাঠের পর মনের ভিতর কোন কলুষতার চিহ্ন থাকে না। এই যে অনুরাগের প্রেরণা, ইহা বুদ্ধিগত নয় ভাবগত—কাজেই ইহকাল পরকাল কুলশীল ধর্মাধর্ম কোন দিকেই লক্ষ্য থাকে না। অনুরাগের মধ্যেই পরম প্রেমাস্পদের সহিত মিলন হয়।

শ্যাম ও রাধার অনুরাগের যে ছবি তাঁহারা আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবসম্পদে অমূল্য। এই শ্যাম ও রাধাকে দেবতার বা শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতীক রূপে কল্পনা করিলে, আমার মনে হয়, বৈষ্ণব কাব্যের রস সৌন্দর্য্যকে খর্ব্ব করা হয়। এই যে শ্যাম ও রাধা ইহা তো প্রেমের প্রতীক মাত্র, কোন বস্তুর বা ধর্মের প্রতীক তো নয়। ইহার মধ্যে যদি সেই বৃন্দাবন নামক বিশেষ কোন স্থানের রাধাকৃষ্ণকে খুঁজিতে যাই, তাহা হইলে ইহার রসমাধুর্য্যের হানি হইবে। ইহা মনোবৃন্দাবনের শাশ্বত প্রেমের লীলা মাত্র।

এই শ্যামসুন্দরের চিরন্তন প্রেমের বাঁশী চিরদিন বাজিয়াছে। এক একজন এক এক ভাবে তাহা শুনিয়াছে এবং তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের ভিতর শ্রীরাধাও আছেন, আবার জটিলা কুটিলাও আছে। শ্রীরাধা সেই বাঁশীর সুরের অনুরাগী, আর জটিলা কুটিলা বিরাগী। শ্যামসুন্দরের এই যে বাঁশীর সুর ইহাই তো শাশ্বত প্রেম! প্রেমের পরশ শ্রীরাধাই অনুভব করেন, জটিলা কুটিলা তাহার ছায়াও মাড়ায় না। তাহাদের সে ক্ষমতা নাই। শ্রীরাধা সেই প্রেমের অন্তর;

আর শ্যাম তাহার বাহির। দুয়ের মিলনেই প্রেমের পরিণতি। ইহাই বৈষ্ণব কবির কাব্যের মূল রসানুভূতি।

এই জন্যই বৈষ্ণব কবিরা পরকীয়া প্রেমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া, তাহার ভিতর দিয়াই মিলন, বিচ্ছেদ, বিরহের নানা রসের অবতারণা করিয়াছেন। বৈষ্ণব কাব্যের মূল সূত্রই হইতেছে ভালবাসা। যাহাকে আমি ভালবাসি, ইচ্ছা হয় যুগে যুগে জীবনে মরণে তাহার সঙ্গে প্রেম-ডোরে বাঁধা থাকি। থাকা সম্ভব কি না সে বিচার কাব্যের নয় ;—মানব-হৃদয়ের চিরন্তন আবেগের অভিব্যক্তিই কাব্য। তাই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এই যে ভোগ করিবার, একান্ত করিয়া গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা, ইহাই তো নিত্য সত্য। তাঁহারা যেমন অরূপের ভিতর রূপের খোঁজ করিয়া বেড়াইয়াছেন, তেমনি রূপের ভিতরও অরূপের সন্ধান পাইয়াছেন।

সকল রসের সার পিরিতি, এ কথা বৈষ্ণব কবিরা যেমন করিয়া বুঝিয়াছিলেন তেমন করিয়া বোধ করি আর কেহই বোঝেন নাই। সেইজন্যই বোধ হয় চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

সই পিরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা॥

কিন্তু প্রেম করিতে যাইলেই যে বিরহ বিচ্ছেদ বাধা রূপে আসিবে, এ কথাও তাঁহারা ভোলেন নাই। আর তা ছাড়া বিরহ বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই তো প্রেম এত মধুর হইয়া উঠে।

যত্ন করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সিঁচি আঁখি-জলে।

প্রেমের বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে যে আঁখি-জলের প্রয়োজন, এ কথাও কোথাও তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই। তাই আবার কবি বলিয়াছেন—

কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টল মল॥
* * * *
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঞি॥

প্রেমের ভিতর যে সুখানুভূতি তাহা দুঃখের ভিতর দিয়াই লাভ করিতে হয়। দুঃখের আগুনের ভিতর দিয়া যাইয়াই তো সুখের মাধুর্য্য অনুভব করিতে হয়। তেমনি প্রেমের পরিপূর্ণতা হয় তখনই, যখনই বিরহ-বিচ্ছেদের ভিতর দিয়া প্রেমাস্পদকে লাভ করা যায়, অথবা বাহ্যিক জীবনে লাভ করা যায় না, কেবলমাত্র ভাবসম্মিলনে তাঁহাকে অন্তরে অনুভব করা যায়।

পিরিতি করিতে হইলে জাতি-কুলশীল অভিমান সব ত্যাগ করিতে হয়। স্বার্থশূন্য নিষ্কাম যে প্রেম তাহাই তো শ্রেষ্ঠ।

নয়ন-পুতলী করি লইনু মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরিতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥

সেই মোহন রূপের উপলব্ধি করিতে, পিরিতি-রূপ আগুনে সকল কামনা বাসনাকে পোড়াইয়া খাঁটি করিয়া তবে তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এত বড় ত্যাগের কথা বিশ্বসাহিত্যে অল্পই আছে।

এইবার বৈষ্ণব পদাবলী হইতে কয়েকটি পদের নমুনা দেখাইয়া বৈষ্ণব কাব্যের অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীরাধা বিরহে ঘরের ভিতর থাকিতে পারিতেছেন না। কখন প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইবেন তাহারই জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছেন। এই দৃশ্যটি কত সহজভাবে সাধারণ কথায় কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥

এই ঘটনা ও বর্ণনা কত সহজ সরল ; কিন্তু পড়িলেই সেই বিরহিণীর মিলন-চঞ্চল মূর্ত্তিখানি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। আবার এই বিরহ হইতে শ্যামসুন্দরও বাদ পড়েন নাই—

মাধবী-লতা-তলে বসি।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশী।
তোহারি করিত অনুমানে॥

এটি পড়িলেও বিরহ-বিধুর শ্যামসুন্দরের মিলনাকুল মূর্ত্তিটি সহজে চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। কত সহজে অবস্থার বর্ণনা।

এখন তখন করি দিবস গোঙায়লু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়লু
ছোড়লু জীবনক আশা॥

দীর্ঘ বিরহে দিন গুণিয়া গুণিয়া শ্রীরাধা সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষীণাঙ্গীর বিরহ-কাতর তনুদেহখানি শ্যামবিরহে যে কত কাতর তাহা এই পদের কয়েকটি কথাতেই কবি ব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীরাধা চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার চলিবার রূপবর্ণনায় কবি কি সুন্দর উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন,—

যাঁহা যাঁহা নিকসয় তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই ॥

* * * *

যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ্ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নিল-উৎপল ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥

চলিষ্ণু সৌন্দর্য্যের আর একখানি অপরূপ চিত্র পাঠক চিত্তে চিরমুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন কবি চণ্ডীদাস তাঁহার লোক-প্রসিদ্ধ কবিতার একটি অনবদ্য চরণে,—"চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।" নীলবসনা রূপসীর প্রত্যেক পদ-পাতে বাসনার কমল ফুটিয়া ফুটিয়া চলিয়াছে।

শ্রীরাধা ও শ্যামের রূপবর্ণনাতেও কবি মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীরাধা পূজার জন্য ফুল চয়ন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরী
কুসুমহিঁ নিরমিত সব তনু তোরী।

* * * *

গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমান
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান ॥

শ্রীরাধার কুসুমপেলব সুন্দর দেহখানিই ফুলের মত। দেবপূজার জন্য পুষ্প-চয়নের আবশ্যকতা কি? সুন্দর জিনিষই দেবভোগ্য। অতএব গোবিন্দ-দাস বলিতেছেন, হে গৌরাঙ্গী, তোমার নিজের সুন্দর তনু দান করিয়াই দেবপূজা করো। পূজার উপচার তো বাহ্যিক ধর্মাচরণ, অন্তরের পূজাই তো আসল পূজা। অতএব নিজের দেহ মন দিয়া পূজা সার্থক কর, এই বোধ করি কবির বলিবার উদ্দেশ্য।

যব,—গোধুলি সময় বেলি
ধনি—মন্দির বাহির গেলি।
নব জলধর বিজুরি—রেহা
দন্দ পসারি গেলি ॥

শ্রীরাধা প্রেমাস্পদের উদ্দেশে অভিসার-যাত্রায় বাহির হইয়াছেন। তখন সন্ধ্যা। গৌরাঙ্গী রাধা যখন মন্দির হইতে অভিসারোদ্দেশে বাহির হইলেন তখন মনে হইলে নবীন জলধরের উপর বিদ্যুতের রেখা বিবাদ বিস্তার করিয়া গেল। গোধূলির অন্ধকারাবৃত জলধর তুল্য শ্যামল অঙ্গে উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী রাধার দেহকান্তি ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় দীপ্তি বিস্তার করিয়া যাওয়ায় এবং তদ্দ্বারা গোধূলির অন্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হওয়ায় জলধরেরও বিদ্যুতের বিবাদ বলা হইয়াছে।

নাহি উঠল দুহুঁ মোছলে অঙ্গ।
দুহুঁ রূপ নিরখিতে মুরুছে অনঙ্গ ॥

রাধাশ্যামের স্নাত রূপ এত সুন্দর যে, যিনি সুন্দরতম অনঙ্গ তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের পরস্পরের রূপ দর্শনে মনে কেবল বিমল আনন্দ রসানুভব হয়, কিন্তু তাহা কামলেশ-বিবর্জ্জিত, ইহাই এই কবিতার ধ্বনি বলিয়া মনে হয়। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের,—'নিরস্ত্র মদন পানে চাহিলা সুন্দরী।"

এমনি করিয়াই বৈষ্ণব কবিরা তাঁহাদের প্রতি পদাবলীতে নব নব বিস্ময়, নব নব অনুভূতির ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সূক্ষ্মানুভূতির আরো পরিচয় পাই নিম্নলিখিত পদগুলিতে।

শ্রীরাধা বলিতেছেন—

সজনী কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশ—মনি পরশক বাধন
আভরণ সৌতিনি মান ॥

হে সখি, বেশ রচনায় প্রয়োজন কি? কৃষ্ণরূপ পরশমণির স্পর্শের বাধাদায়ক বেশভূষাকে সপত্নী বলিয়া মনে করি। শ্যামের ওতপ্রোত স্পর্শে অঙ্গাভরণ বাধা দান করিবে। ইহার চেয়ে বিনা অলঙ্কারে শ্যামালিঙ্গন ঢের বেশী শ্রেয়। কিন্তু শুধু অলঙ্কার ত্যাগ করিলেই তো বাধা দূর হইল না। অলঙ্কার তো ত্যাগ করিলেনই, উপরন্তু,—

হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই ফিয়রে সঙ্গে ॥

চন্দনে কতটুকুই বা বাধা দেয়, কিন্তু সেটুকু বাধাও সহ্য করিবার মত ধৈর্য্য নাই। এমন কি—

সো তনু পরশে পুলক জনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ ॥

পার্থিব বস্তুর বাধা সহ্য তো হয়ই না, সেগুলিকে দূর করাও চলে, কিন্তু শ্যামতনু স্পর্শ করিলে শরীরে যে পুলক রোমাঞ্চ হইবে তাহাও তো সম্যক মিলনে বাধা দান করিবে। একান্ত মিলনের এই যে আগ্রহ এমন আগ্রহের অনুভব বোধ করি আর কোন কবিই করিতে পারেন নাই। আর একটি সূক্ষ্মানুভূতির উদাহরণ দিতেছি—

শ্রীরাধা আকুল আগ্রহে শ্যামসুন্দরকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না, দেহ বাধা হইল। তখন দৃষ্টির ভিতর দিয়া শ্যামকে অন্তরে গ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, এখানে বাধা হইল অন্তর। তখন শ্রীরাধা আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, শ্যামকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন না বলিয়া। এই যে রূপাতীত অরূপকে, শাশ্বত সৌন্দর্য্যকে একান্ত করিয়া উপভোগ করিবার অসীম আগ্রহ, ইহা এক বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যেই সম্ভব হইয়াছিল।

বৈষ্ণব কবিরা রূপাতীতের সন্ধান করিতে যাইয়া বিশ্ব-প্রকৃতিকে

ভুলিয়া যান নাই একেবারে। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতরও শ্যামরূপের মোহন ছবি দেখিয়াছেন।—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
* * * *
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥

শ্রীরাধা শ্যামচাঁদের শ্যামলরূপ স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহাও মেঘমেদুর শ্রাবণের ঘন বর্ষণের শ্যামল শ্রীর মধ্য দিয়াই। বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য এমন সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

বৈষ্ণব কবিরা বর্ষার রূপের মধ্যেই শ্যাম-রূপ উপভোগ করিয়াছেন বিশেষ করিয়া। বর্ষাই তো প্রকৃতিকে নবীন শ্যামলশ্রীতে শোভিত করে। এই যে প্রকৃতির নবীন রূপ ধারণ ইহাও তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া যায় নাই। বর্ষা আসিয়াছে—

ঘন ঘন মেঘ গরজে দিন যামিনি
আওল মাহ আষাঢ়।
নব জলধর পর দামিনি ঝলকায়
দাহ দ্বিগুণ তহিঁ বাঢ়॥

বর্ষার ভিতর দিয়াই কবি চিরন্তন বিরহের ক্রন্দনও অনুভব করিয়াছেন। বর্ষার যে শুধু শ্যামল সৌন্দর্য্যই আছে, তাহা নয়, ইহার ভিতর চিরন্তন বিরহ ক্রন্দনী হইয়াও আছে। এই তথ্যটিও তাঁহাদের সূক্ষ্মানুভূতিতে বাদ যায় নাই। তাই কবি বর্ষার সহিত তুলনা করিয়া শ্রীরাধার বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন—

অন্তর গর গর পাঁজর জর জর
ঝর ঝর লোচন বারি॥
দুখ-কুল-জলধি-মগন অছু অন্তর
তাকর দুখ কি নিবারি॥

বর্ষার সহিত এমন সৌসাদৃশ্য রাখিয়া বিরহ বর্ণনা বোধ করি এক মাত্র বৈষ্ণব কবিতেই সম্ভব হইয়াছিল।

বৈষ্ণব কবিদের কাব্যের মূল সূত্রই হইতেছে রূপের অনুভূতি, প্রেমের অনুভূতি। আর সেইজন্য তাঁহাদের কবিতা অনবদ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কবিতা ব্যক্তিগত ভাবের হইলে তাহা কাব্য পদবাচ্য হয় না। বৈষ্ণব কবিদের কবিতা কাব্য পদবাচ্য হইয়াছে এইজন্য যে, তাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের বা ব্যক্তিগত ভাবের কবিতা নয় বলিয়া। চিরন্তন প্রেমের লীলাকে নানা রূপে, নানা আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া নিজেরা নানা রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নিজেদের উপলব্ধি ছন্দে গাঁথিয়া জগতের সামনে মেলিয়া ধরিয়াছেন। এই যে রাধাশ্যামের রূপক কল্পনা করিয়া এত বড় একটা তাহা হইলে এত বড় কাব্য কখনই সৃষ্টি হইতে পারিত না। আর হইলেও তাহা চিরস্থায়ী কখনই হইত না। রাধা-শ্যাম কোন ব্যক্তি মাত্র নয়, ইহাঁরা শাশ্বত প্রেমের প্রতীক মাত্র। ইহাঁদের ব্যক্তির প্রতীক ভাবিলে কবিকে ও কাব্যকে খর্ব্ব করা হয়। এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অরূপ রূপের নিত্য লীলা চলিতেছে তাহাই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন মাত্র। প্রকৃতির কাছে মানবের যে প্রেম-নিবেদন তাহারই বিচিত্র ধারা বৈষ্ণব কবির কাব্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের কাব্যের ভিতর আছে নূতনকে নবনব রূপে, নবনব ভাবে, নবনব লীলায় উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা—পুরাতনের স্থান সেখানে নাই। সেইজন্য নূতনের নবনব লীলার গানই তাঁহারা গাহিয়াছেন। ধর্ম্মের দিক দিয়া যাহাই হোক, কাব্য হিসাবে যে পদাবলী সাহিত্য অতুলনীয়, এ সম্বন্ধে দুই মত বোধ করি হইতে পারে না এই আমার বিশ্বাস।

নর ও নারীর মেধা কি সমান?

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে

"নর ও নারীর বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতায় প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। তফাৎ যা কিছু দেখা যায় সেটার কারণ শুধু এই যে, পুরুষ অনেক যুগ ধরে নারীকে শিক্ষার ও মানসিক ক্ষমতা খাটাবার সুযোগ দেয় নি। এই সুযোগ পেলেই নারী সব বিষয়ে পুরুষের সমান হতে পারে। এই দেখ না খনা, লীলাবতী, গার্গী, এ্যানি বেসাণ্ট, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি।"

এই রকম কথা সম্প্রতি এত লোকে এতবার বলেছেন যে, শুনে শুনে অনেকের কাছে কথাটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মনে হয়েছে ও তাঁরাও এই কথা প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন। তবে যাঁরা সত্য নির্ণয় করতে চান তাঁদের দুদিককারই যুক্তি প্রমাণ শোনা উচিত। তাই, এই বিষয়ে নানা পাশ্চাত্য চিকিৎসক, মনোবিদ্, নৃতত্ত্ববিদ্, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মত সঙ্কলন করে দিলাম। নিজের যুক্তি প্রমাণ ও মতামতও সেই সঙ্গে দিয়েছি। পাছে কেউ উক্ত পণ্ডিতদের মত 'সেকেলে' বলেন, এইজন্য বলা দরকার যে জার্ম্মাণ পণ্ডিত আডলফ্ হাইলবোরনের (Adolf Heilbornএর) লিখিত ও J. E. Pryde-Huges অনুবাদিত 'The Opposite Sexes' আমি প্রধানতঃ অনুসরণ করেছি। এখানি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ছাপা। যেখানেই মনে হয়েছে যে ইংরাজির অনুবাদে মূলের ভাব ঠিক প্রকাশ করতে পারিনি সেখানেই বন্ধনীর মধ্যে মূল উদ্ধৃত করেছি।

নারীর মস্তিষ্কের দৈন্য

R. Martimএর মতে ইয়োরোপীয় পুরুষের মস্তিষ্কের পরিসর (cranial capacity) প্রায় ১৪৫০ ঘন সেন্টিমিটার (centimeter), পক্ষান্তরে ইয়োরোপীয় নারীর প্রায় ১৩০০ মাত্র। নিম্নশ্রেণীর জাতিদের

নরের চেয়ে ছোট। ইয়োরোপীয় নারীর মস্তিষ্কের ওজন নরের মস্তিষ্কের ওজনের চেয়ে গড়ে ১২০ গ্র্যাম (gram) কম। নবজাত শিশুর মধ্যেও এই পার্থক্য ৫০ গ্র্যাম। মস্তিষ্কের ওজনের বেশী-কমের সঙ্গে বুদ্ধির বেশী-কমের সম্বন্ধ জর্জ বুশেন (George Buschan) প্রভৃতি অনেক গবেষক স্বীকার করেন। Max Bartelsএর মতে সূক্ষ্ম গঠন (fine construction) ও ভাঁজের (convolutionsএর) দিক দিয়েও নরের মস্তিষ্ক নারীর মস্তিষ্ক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। হ্যাভেলক্ এলিস্ (Havellock Ellis) তাঁর Man and Woman গ্রন্থে ছোট মস্তিষ্কের পক্ষে ও বড় মস্তিষ্কের বিপক্ষে যা লিখেছেন, আধুনিক চিকিৎসক ও গবেষকদের সিদ্ধান্ত তার বিপরীত।) সভ্য জাতদের চেয়ে অসভ্য জাতদের, ও একই জাতদের মধ্যে মস্তিষ্ক পরিচালনকারী, বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেয়ে সাধারণ মানুষের, মাথার বিস্তৃতি (cranial capacity) ও মস্তিষ্কের ওজন কম। বুশেনের Brain and Culture' দেখুন।

নারীর স্বভাব

নারীর মন সম্বন্ধে জার্ম্মাণ দার্শনিক ভাইনিঙ্গারের (Weiningerএর) মত এই যে নারীর নিজস্ব আত্মা বা সত্ত্বা বলে কিছু নেই। নারী বাহ্য রূপ নিয়েই থাকে (Woman has no soul and no ego. It is the external appearances that make up the ego of the woman.)। নারীরা সব বিষয় উপর উপর ভাসা ভাসা রকম দেখে ও ভাবে, পক্ষান্তরে নর কোন বিষয়ের শুধু মোটা দিকটার প্রতি মনোযোগ দেয় না, কারণ সে সমস্ত ব্যাপারের ভিতর গভীর ভাবে যায়। নারী মুখ্য বিষয় ভাল করে না বুঝে, অঘল চাখে ও হাতড়ে বেড়ায়। সব বিষয়ে চেখে বেড়ানই নারীর বিশেষত্ব ; এই বিষয়েই তারা পারদর্শিতা লাভ করতে পারে। ডাক্তার হাইলবোরন্ বলেন যে, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে শোপেনহাউয়ার্ (Schopenhauer), এডুয়ার্ট ফন হার্টমান্ (Eduard Von Hartmann) ও নিশ্‌ট্‌কারও (Nietzscheএরও) মোটামুটি এই মত। Ferrero, Lombroso, Von Krafft Ebing, Mobius প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসক ও মনস্তত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্তও এই মত সমর্থন করে।

নারী অন্ধ-সংস্কারের অধীন

মনস্তত্ত্ববিদ মোয়েবিউস (Mobius) "On the physiological weak-mindedness of the female" প্রবন্ধে বলেন যে পুরুষের চেয়ে নারীর কার্য্যকলাপে অন্ধ সংস্কারের (instinctএর) প্রভাব বেশী দেখা যায়। মানসিক ক্রমপরিণতির ধারাই এই যে, অন্ধ সংস্কারের প্রভুত্ব ক্রমশঃ কমে আসে, আর চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধি তার স্থান অধিকার করে। অন্ধ সংস্কার বলতে বোঝায় যে, কোন কাজ করা, কিন্তু কেন যে করা হল, তা নিজেই না জানা, বা বুঝতে না পারা। বিচার-বুদ্ধির সাহায্য না নিয়ে হঠাৎ কোন মীমাংসা করা বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকেও অন্ধ সংস্কার বলে। আসলে অন্ধ সংস্কার কিম্বা কোন কাজ বা অনুভূতি (unconscious fieldএ) থাকে। কিন্তু কতটা মগ্নচৈতন্যে থাকে তার মাত্রার তফাৎ হয়। যে পরিমাণে কোন লোকের কাজ বা অনুভূতি জাগ্রত চৈতন্যে হয়, সেই পরিমাণে তাকে মানসিক উন্নতিশালী ও স্বাধীন বলা যায়। ভাবও (feeling ও) কতকটা অন্ধ সংস্কারের মত। তবে অন্ধ সংস্কারের সুবিধা এই যে, চিন্তা করার কষ্ট পেতে হয় না, আর তার উপর নির্ভর করা চলে। অন্ধ সংস্কারের সমধিক অধীন হওয়াতেই নারী জন্তুর মত, পরাধীন, অথচ দ্বিধাহীন ও নিরুদ্বেগ (sure and serene)। এখানেই নারীর প্রকৃত শক্তি, এরই জন্য তারা বিস্ময়জনক ও মনোমুগ্ধকর। নারীর অনেকগুলি বিশেষত্বই তাদের জন্তুর সঙ্গে এই সাদৃশ্যমূলক। মোয়েবিউসের মতে কোন বিষয়ে প্রাজ্ঞতার অভাব ও সৃষ্টিক্ষম কল্পনার ন্যূনতা (want of judgment and lack of creative imagination) এই সব বিশেষত্বের ফল। তিনি বলেন যে স্ত্রীলোকের দুর্ব্বলচিত্ততা শুধু যে আছে তা নয়, এটা থাকা একান্ত দরকার। বুদ্ধিজীবিতা (intellectualism) থেকে তাদের রক্ষা করা উচিত।

নরনারীর বুদ্ধির ও মনের পার্থক্য প্রাকৃতিক ও পাকা

Madame de Stael বলেন যে নরনারীর মনের গতি ও শক্তিতে কোন তফাৎ নেই ; বুদ্ধিতে যা তফাৎ দেখা যায় সেটা শিক্ষার ফল। নৃতত্ত্ববিদ্ (anthropologist) Allan বলেন উক্ত মাদামের এই কথা দৃশ্যতঃ অসঙ্গত (is paradoxical)। পুরুষের মত মনীষাসম্পন্না স্ত্রীলোক তেমনই অস্বাভাবিক (is as great an abnormality) যেমন পুরুষের মত দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক। নর ও নারীর শরীরে যেমন বিশেষ তফাৎ, তাদের মন ও বুদ্ধির মধ্যে তেমনই মূলগত, স্বাভাবিক ও কায়েমী বৈসাদৃশ্য (radical, natural and permanent differences) বিদ্যমান। বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ Max Runge বলেন যে, স্ত্রীলোক কোন বিষয়েই পুরুষের সমান নয়। তাদের গুণগুলি একেবারেই বিভিন্ন।

তফাৎ কোথায় ?

আমাদের চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক প্রভৃতিকে জ্ঞানের দ্বার বলা হয় ; আর মস্তিষ্ককে জ্ঞানের হেড আফিস্ বলা চলে। সুতরাং নর ও নারীর বুদ্ধি ও মেধার পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে তাদের ঐ সব ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা ও মস্তিষ্কের গড়ন, পরিমাণ ও কার্য্যের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে।

হেড আফিসে তফাৎ।

পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক যে ওজন ও সূক্ষ্ম গড়নে (fine modellingএ) হীনতর এ বিষয় আগে দেখিয়েছি। জার্ম্মাণীর অন্তর্গত ম্যুনসেনের (Munichএর) শরীরতত্ত্ববিদ্ রুইডিঙ্গার্ (Rudinger) বলেন যে নবজাত বালকের মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও ঘনতা নবজাত বালিকার চেয়ে বেশী। বয়স্ক বালক ও যুবকও এ বিষয়ে এবং মস্তিষ্কের

parietal lobeএ) বালিকা ও যুবতীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বার্লিনের শরীরতত্ত্ববিদ্ (anatomist) ভালডিয়ার (Waldeyer) (যিনি যমজ সন্তানদের সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করেছেন) দেখেছেন যে একই মা বাপের যমজ ছেলে মেয়ের মধ্যে ছেলের মস্তিষ্কের রন্ধ্র গুলি (fissures) মেয়ের চেয়ে অনেক বেশী পরিণত। ডাঃ হাইলবোরন্ বলেন যে সমস্ত উন্নত জীবের মধ্যে, বিশেষতঃ বনমানুষের (anthropoid apesএর) মধ্যে, পুরুষের মস্তিষ্কের আকার বড় দেখা যায়। সুতরাং নরের মস্তিষ্কের বেশী পরিমাণ, ভাল গড়ন ও উন্নত বিকাশ (fissure modelling) শুধু শিক্ষা ও কৃষ্টির (culture) দরুণ না হতেও পারে।

নারী প্রতিভার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ নরের সর্ব্বোচ্চ প্রতিভার অনেক নীচে

দেখা যায় যে, নানা বিষয়ে পুরুষ যতদূর বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে উন্নতি লাভ করতে পারে কোন স্ত্রীলোক ততদূর কখনই পারে না। অবশ্য প্রত্যেক যুগে কোথাও কোথাও এমন কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখা যায় যারা সাধারণ পুরুষের চেয়ে (the average of man) যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ। যেমন গণিত জ্যোতিষে হর্শেল গ্রহের আবিষ্কর্ত্তা হর্শেল সাহেবের ভগ্নী ক্যারেলিন হর্শেল (জন্ম ১৭৫০ খৃঃ—মৃত্যু ১৮৪৮ খৃঃ) ও এলিজাবেথ ব্রাউন গণিতে সোফি জার্ম্মেণ (১৭৭৬—১৮৩১) ও Sonia Kowalewska। পদার্থ বিজ্ঞানে মাদাম কুরী। কবিতায় সাফো (প্রায় খৃঃ পূঃ ৬১০ সালের) Annette von Droste (১৭৯৭-১৮৪৮) ও সেলমা লাগরলফ্। চিত্রকলায় রোজা বনহয়ার্ (১৮২২-১৮৯৯) ও কেটা কলভিট্জ্ (জন্ম ১৮৬৭ খৃঃ)। কিন্তু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও প্রতিভার সব চেয়ে বড় নমুনাও সেই সেই বিষয়ে পুরুষের উচ্চতম প্রতিভার অনেক নীচের স্তরের জিনিস। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সঙ্গীতে স্ত্রীলোকের সৃজনী-প্রতিভা দেখা যায় না। উল্লেখ-যোগ্য নারী সঙ্গীত-রচয়িত্রী ইয়োরোপে কেউ নেই। রুবিনষ্টাইন একবার বিস্ময়ভরে বলেছিলেন যে "সঙ্গীতে, কোন স্ত্রীলোক দ্বারা, নারীর দুই স্বাভাবিক সংস্কারের—অর্থাৎ পুরুষের প্রতি প্রণয় ও শিশুর প্রতি স্নেহের—প্রকাশ হয় নি। নারী-রচিত এমন কোন প্রণয়-সঙ্গীত বা ছেলে-ভুলান ছড়া আমার জানা নেই যেটা অমরত্ব লাভ করেছে (has attained to Classical importance)। মহা মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তরূপে নারিকেলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন "তারপর মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখনও আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অষ্টেন বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন,—মন্দ হয় না, কিন্তু দুই-ই মালার মাপে।"

ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার তফাৎ

চোখ সম্বন্ধে ইংরাজ বিশেষজ্ঞ কার্টার, বৈজ্ঞানিক গ্যালটন, জার্ম্মাণ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক ট্সোয়াডেমাকার (Zwaademaker), বিলরোট্ (Billroth), আইজেলবার্গ (Eiselsberg), যৌন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও প্রামাণিক লেখক অষ্ট্রেলিয়ান হ্যাভেলক এলিস্ (Man and Woman গ্রন্থে) প্রভৃতির মতে প্রধান ইন্দ্রিয়গুলির (অর্থাৎ চোখ, কান নাকের) এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতায় নারী নিঃসন্দেহ ভাবে পুরুষ অপেক্ষা হীন। নারী শুধু আস্বাদ (নোন্তা জিনিসের ছাড়া) স্পর্শ ও বেদনাসহন ক্ষমতায় পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ভূয়ো সাম্যবাদের নিদান

(১) যাঁরা নরনারীর শরীর, মন ও বুদ্ধির তুলনা-মূলক আলোচনা ও গবেষণার খোঁজ রাখেন না, (২) ইয়োরোপের কতক লোকের অন্ধ অনুকরণে মিথ্যা সাম্যবাদের মোহে আচ্ছন্ন, অথবা (৩) কোন কারণে যে পুরুষেরা নারীর খোসামোদ করতে চান, তাঁরা প্রায়ই বলেন যে নারী বুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক ক্ষমতায় পুরুষের সমান, তবে উপস্থিত যা তফাৎ দেখা যায়, তার কারণ নারী বহু যুগ ধরে পুরুষের মত শিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত।

নারী, শিক্ষার সুযোগ, চিরকাল কম পায় নি।

এই আপাত-মনোরম যুক্তির উত্তরে ডাক্তার হাইলবোরন্ বলেন যে কোন কোন সমাজে ও কোন কোন যুগে (যথা শিভাল্‌রীর ও ইটালীর নবজাগরণের যুগে) পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের অনেক বেশী যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর সব যুগেই তাদের কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা বিশেষভাবে শেখান হয়েছে। সুতরাং নর ও নারীর সাধারণ ক্ষমতা ও উচ্চতম সাফল্যের পার্থক্যের কারণ শুধু শিক্ষার ও সুযোগের তফাৎ, এ কথা বলা চলে না।

স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার সমান সুযোগ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় অন্ততঃ তিন পুরুষ ধরে চলে আসছে। পুরুষেরা প্রায়ই চাকরি, ব্যবসা ও অন্যান্য জীবিকার জন্য অল্প বয়সেই সাধারণ শিক্ষার স্কুল কলেজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা (বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তো বটেই, অনেকে বিবাহের পরও) অনেক বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করে। অথচ কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতিতে নারীর দান এখনও সামান্য ও নগণ্য।

গবেষণার ফল—নারীর মেধার দৈন্য প্রাকৃতিক

আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও হল্যাণ্ডের অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে এ কথা অভ্রান্তভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর মেধার দৈন্যের কারণ শুধু শিক্ষারই অভাব নয় (জার্ম্মাণ মনস্তত্ত্ববিদ্ G. Heymansএর The Psychology of Woman দেখুন)। এই সব পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, নারী সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে উৎসাহ, পরিশ্রম, ও ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রজ্ঞা ও বিষয়-বুদ্ধিতে (sagacityতে) নিকৃষ্ট। স্থূল সত্যগুলিই (concrete realities) নারীর ভাল লাগে, বিবিক্ত ভাব (abstract), আদর্শ (ideal) ও কাল্পনিক ভাব তাদের ততটা আকর্ষণ করে না। গবেষকবৃন্দ এ বিষয়ে একমত যে, পুরুষ হতে তাদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, অধিক ভাবপ্রবণতা ও সহজে বেশী উত্তেজিত হওয়া (stronger emotionalism, greater excitability, and so to say, the

inconsiderate response to every 'stimulus.')। ডাঃ হাইলবোরণ বলেন যে, ভাবপ্রবণতা আদিম ও অবচেতন মনের লক্ষণ (Emotionalism is a quality associated with primitive subconscious mental activity)। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে নারীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমার কিন্তু বিশেষ সন্দেহ আছে।

ভাবপ্রবণ লোকের প্রকৃতি

ইতঃপূর্ব্বে বলা হয়েছে যে ভাবপ্রবণতা (emotion lism) নারী জাতির অন্যতম বিশেষত্ব। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে নিম্নলিখিত গুণগুলি ভাবপ্রবণতার সহিত সংযুক্ত থাকে। ক্ষণে ক্ষণে মেজাজ বদলান, ভীরু-স্বভাব (timidity) মনস্থির করতে না পারা, সাহসের অভাব (lack of courage) লোকের প্রভাব বেশী দিন থাকা, শীঘ্র রাগ পড়ে যাওয়া, চলচিত্ততা (variability), সহানুভূতির পাত্র প্রায়ই বদলান (frequent changes of sympathies), মুহুর্মুহু হাসা, অনুভূতির সীমাবদ্ধতা (limitation of consciousness) নিজেরই ভাবনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া (susceptibility to auto-suggestion), কল্পনা রাজ্যে বিচরণ, সহজ জ্ঞান অথচ বুঝবার ক্ষমতার অভাব (intuitive power but lack of comprehension), সূক্ষ্ম ও বিবিক্ত বিষয় পরিহার করার প্রবৃত্তি (inclination to avoid the abstract) আর সর্ব্বোপরি সহজ বোধ (intuitive thought), আবেগশীলতা বা ঝোঁকের মাথায় কাজ করা, গোঁড়ামীর বশবর্ত্তিতা, হাতের কাজে দক্ষতা, দেমাক, প্রভুত্বের ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, অত্যধিক অনুকম্পা অথচ উৎকট নিষ্ঠুরতা, অতিরঞ্জনপরায়ণতা অথচ সাধুতা ও নির্ভরযোগ্যতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও প্রায়ই মানসিক বিক্ষোভ হওয়া (frequency of psychic disturbances)। Heymans আরও বলেছেন যে, যতদিন নারী বিশেষভাবে ভাবপ্রবণ থাকবে ততদিন এইগুলি তার বিশেষত্ব থাকবে। আমার মতে এই তালিকা থেকে 'ক্রন্দনশীলতা' বাদ যাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়, কারণ অল্পে কাঁদা ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের বিশেষত্ব, এ কথা সকলেই জানেন।

আদিম যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত পুরুষ, রূপ ও পূর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে এমন সব গুণ যেগুলি তার কাছে দামী (যথা, হাতের কাজে নৈপুণ্য, সাধুতা ও নির্ভরযোগ্যতা) সেইগুলি দেখে নিজের সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করে আসছে। সুতরাং ভাবপ্রবণতা প্রকৃতিদত্ত নারীর একটি বিশেষ গুণ। ভাবপ্রবণতার কতকগুলি দোষ অনেক দিনের শিক্ষা ও চেষ্টার ফলে দূর হতে পারে।

শিল্পে দক্ষতায় তফাৎ

যদিও মনস্তত্ত্ববিদদের মতে নারী নর অপেক্ষা বেশী ভাবপ্রবণ; এবং ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে হাতের কাজে দক্ষতা; কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, যে সব কাজ বা শিল্পে নারীর বিশেষ অধিকার বলে ধরা হয়, তার মধ্যে যেগুলিতে পুরুষ হাত দিয়েছে তাতেই নারীর চেয়ে বেশী উৎকর্ষ দেখিয়েছে, যেমন রান্না ও দরজীর কাজ।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষতায় তফাৎ

দুঃখী, পাপী, তাপী, ও ধর্ম্মপিপাসু নরনারী যাকে ভক্ত, যোগী বা জ্ঞানী দেখে তারই কাছে শান্তি, আনন্দ ও পরমার্থ লাভের জন্য ছুটে যায়। এ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ বাছে না। নারীর ভিতর পুরুষের চেয়ে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠা ও রক্ষণশীলতা বেশী দেখা যায়; কিন্তু জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, ধর্ম্ম-সংস্কারক, মহা ভক্ত, মহা জ্ঞানী, মহা যোগী—এক কথায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চস্তরে—ক'জন নারী দেখা যায়? ভারতের ইতিহাসে এক মীরাবাইএর নাম মনে আসে। চেষ্টা করলে হয়ত আরও ২।১টি নাম বার করা যায়; কিন্তু পুরুষ ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগীদের তুলনায় তাঁদের সংখ্যা যেমন নগণ্য তাঁদের উৎকর্ষের মাত্রাও তেমনি সামান্য।

নারীর অধীনতা শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য নয়

দেখা যায় যে, যে সকল জন্তু বহু যুগ ধরে গৃহপালিত হয়ে আসছে, তারা নিজের জাতের বনের জন্তুর চেয়ে মস্তিষ্কের ওজন ও মানসিক ক্ষমতায় নিকৃষ্ট। সুতরাং মনে হতে পারে যে, নারীর বিনীত, নম্র ও আজ্ঞাবহ ভাব, ভীত স্বভাব, কপটতা (insincerity) ছল (dissimulation) প্রভৃতি কতকটা পুরুষের অধীনে বাস করার ফল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বিনীত, নম্র আজ্ঞাবহ ও সহিষ্ণু ভাব (submissiveness) শুধু যে মানব সমাজের স্ত্রীজাতির মধ্যে বেশী দেখা যায় তা নয়, অপর উচ্চ শ্রেণীর জীবদের মধ্যে, বিশেষতঃ বন-মানুষের মধ্যে, সেই পরিমাণে দেখা যায়। এই ব্যাপার সম্বন্ধে ষ্টাইন্-মেট্স্ (Steinmetz) ঠিকই বলেছেন যে, স্ত্রীজাতির গায়ের জোর কম বলে যে এ রকম হয়েছে তা নয়। বড় বড় বুনো জন্তুর চেয়ে মানুষের গায়ের জোর কম, কিন্তু মানুষ কখনও তাদের পদানত হয় নি। যদি নারীর বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও দর্প নরের সমান হত, তাহলে সে কখনও নরের অধীন হত না।

সাহিত্য বিচারে পুরুষ নারী ভেদের কারণ

আমরা কোন বালকের কোন কাজ বিশেষ ভাল হলে, সেটিকে স্নেহের চোখে দেখে, সাধারণতঃ বালকের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত বলে, বয়স্ক লোকের সেই রকমই কাজের চেয়ে তার বেশী প্রশংসা করি। সেইরকম যখন কোন সমালোচক নারীর রচিত সাহিত্য-বিচারে ভিন্ন মাপকাটি ব্যবহার করেন, অর্থাৎ পুরুষের সেই রকম রচনার চেয়ে তার বেশী প্রশংসা করেন, তখন তাঁর মনে এই ভাবই থাকে যে পুরুষের শ্রেষ্ঠতম রচনা বা বুদ্ধির পরিচয় তিনি নারীর কাছে প্রত্যাশা করেন না, কারণ তাঁর ধারণা নারীর মেধা ও মনীষা পুরুষের চেয়ে কম। এ ধারণা যে ভুল নয়, এ কথা, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা ও গবেষণার ফল উপরে সঙ্কলন করে দিয়ে, আমি দেখিয়েছি। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁদের উপর রাগ করা চলে না।

নর ও নারী পরস্পরের সমান হতে পারেন না

এ কথা স্বীকার করায় নারীর পক্ষে দুঃখ, লজ্জা বা ক্ষোভের বিষয়ও

কিছু নেই। কারণ সব বিষয়ে পুরুষের সমান হতে হবে, না হলে ভারি অগৌরবের কথা, এ কথা যে পাগলের পাগলামি, সেটা বর্ত্তমান ইয়োরোপ আমেরিকার একদল চুল-ছাঁটা, সিগারেট-খাওয়া, জিম্‌নাষ্টিক্ করা ক্ষ্যাপা মেয়ের অন্ধ অনুকরণ না করলে বেশ বোঝা যায়। পুরুষেরা তো সব বিষয়ে নারীর সমান হতে চেষ্টা করেন না, হওয়া সম্ভব বলেও মনে করেন না। নরনারীর শরীর-গঠনে যেমন স্বাভাবিক তফাৎ আছে, তাদের বুদ্ধির ও মনের ধরণ-ধারণে তেমনই অনেক রকম স্বাভাবিক প্রভেদ আছে। সেগুলি কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায় না।

বুদ্ধিতে হীন হলেও নারী মনুষ্যত্বে শ্রেষ্ঠ

নর যেমন বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতায় বড়, নারী তেমনি স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, সেবা, যত্ন, ধর্ম্মপিপাসা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় এবং দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, অনাহার, অনিদ্রা, প্রভৃতি সহ্য করার ক্ষমতায় বড়। কে না স্বীকার করবেন যে, বুদ্ধি ও জ্ঞান রাজ্যে প্রতিভার চেয়ে মানুষের জীবনে ঐ সব গুণের দাম বেশী? তাই আমরা মেধা, প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অধিকারীর চেয়ে ঐ সব সুকুমার ও মধুর গুণের অধিকারীকে স্বভাবতঃই বড় করে দেখি। তবে স্নেহ প্রেম প্রভৃতির অধিকারীর পক্ষে মেধা প্রভৃতির নূন্যতার জন্য লজ্জিত হওয়ার বা আক্ষেপ করার কি আছে? শারীরিক শক্তির চেয়ে আমরা শারীরিক কৌশলকে, আবার তার চেয়ে মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে, বড় বলে মনে করি। তাই পালোয়ানের চেয়ে ভাল দরজী বা শিল্পী, তার চেয়ে গাইয়ে বাজিয়ে ও তার চেয়ে ক্রমান্বয়ে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পরার্থপরায়ণ, প্রেমিক ও সাধু মহাত্মা শ্রেষ্ঠতর বলে গণ্য। অতএব মেধা, মনীষা ও প্রজ্ঞাতে হীন হলেও, নারী যখন এদের চেয়ে উঁচুদরের গুণাবলীর অধিকারিণী, তখন ত তাঁরাই বড়। তাই পুরুষ চিরকাল নারীর গুণে মুগ্ধ ও তার পদানত। অতএব নারীরই জিত।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(২)

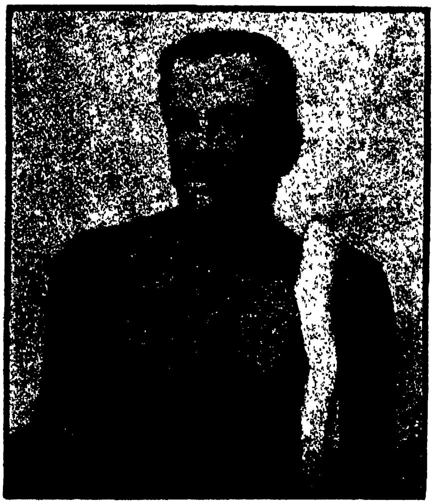
রাজা দেবী সিংহ—রায় দেওয়ালি সিংহের পুত্র দেবী সিংহ পলাশি যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা ঠিক পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি তৎকালে ক্লাইবের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময় ইংরাজ কোম্পানী সামান্ত ব্যবসায়ী হইতে দেশশাসকের আসন গ্রহণ করিতেছিলেন। তখন তাঁহাদের খাজনা আদায়ের উপযুক্ত লোকজন ছিল না। এই সময় দেবী সিংহ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অতি বিশ্বাসের সহিত কোম্পানীর এই কার্য্য করেন। কোম্পানীর কলিকাতার অধ্যক্ষগণের বিবেচনায় এ বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক তখন আর কেহ ছিল না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই সকল কার্য্যে তিনি অতুল যশের সহিত বহু অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোম্পানী একটী অভিযোগ আনয়ন করায় বহু দিন তাঁহাকে বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। যাহা হউক পরে তিনি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হন এবং রাজা হইতে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হন। দেওয়ালি সিংহ নশীপুরে প্রথম বাস স্থাপন করিলেও রাজা দেবী সিংহ হইতেই নশীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়।

* * *

আনন্দকৃষ্ণ বসু—ইনি রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র; ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর ন্যায় ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার সময়ে খুব কমই ছিলেন। ইহাঁর বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ ইহাঁর নিকট ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি ইহাঁর দ্বারা বক্তৃতাদি লিখাইয়া লইতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত ইনি নিরভিমান ও অহঙ্কারশূন্য ছিলেন।

* * *

রাধানাথ শিক্‌দার—১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে যোড়াসাঁকোর শিক্‌দারপাড়ায় ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম তিতুরাম শিক্‌দার। ইঁহারা ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত কলিকাতার অতি প্রাচীন অধিবাসী, বংশ-পরম্পরা ক্রমে মুসলমান নবাবদিগের সময় শিক্‌দার বা পুলিস কমিশনরের কাজ করার জন্য এই উপাধি। রাধানাথ প্রথমে ফিরিঙ্গী কমল বসুর স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনিও ডিরোজিওর শিষ্যদলের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সার্ভে অফিসে একটী সামান্য চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া পরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বহু বৎসর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। সে সময় তিনি ৬০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। তাঁহার



আনন্দকৃষ্ণ বসু

তেজস্বিতা, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি ইংরাজদিগের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষার একজন সুহৃদ ছিলেন। তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রকে সরল সহজ বাঙ্গালা লিখিবার জন্য প্ররোচনা দান করেন। উভয়ের সম্পাদকতায় "মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। জীবনের শেষ দশায় চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। ১৮৭০ সালে সেই স্থানেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

* * *

তারকনাথ প্রামাণিক—ইঁহার পিতার নাম গুরুচরণ প্রামাণিক। গুরুচরণ দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তিমান এবং দীন-দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। তিনি নিত্য বহু লোককে অন্ন দিতেন। তারকনাথ পিতার সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার ধাতবদ্রব্যের বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। তিনি উপার্জ্জিত অর্থের বহুল অংশ দানধ্যানে ব্যয় করিতেন। প্রতি একাদশীর দিন তিনি বহু দরিদ্রজনকে ভিক্ষা, আহারীয় ও বস্ত্র দান করিতেন। ১৮৭৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্ঞী উপাধি প্রাপ্তিতে কলিকাতার দরবারে সরকার কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন।

* * *

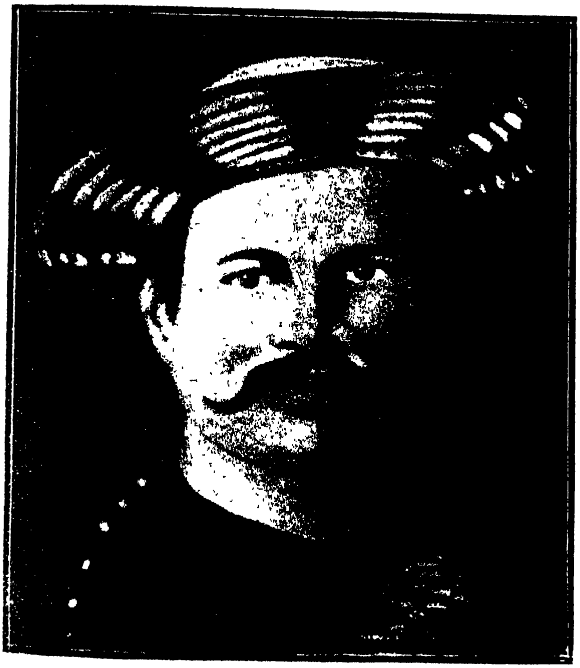


ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবরাম সান্যাল—নূতনবাজারের সান্যাল বংশ পূর্ব্বে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিল। এই বংশের শিবরাম যশোর হইতে আসিয়া কলিকাতায় প্রথম বাস স্থাপন করেন। হাটখোলার দত্তদের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে চতুর্ব্বিংশতিটি নীলের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি প্রায় বাইট লক্ষ টাকার সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি দাতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মধুসূদন ও কালিদাস নামে দুই পুত্র রাখিয়া তিনি মারা যান। এই দুই সহোদর মামলা মকদ্দমায় সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট করেন।

* * *

রসিকলাল ঘোষ—ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ কালীচরণ ঘোষ চন্দননগরের ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামদুলাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগে চন্দননগর হইতে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি পোর্ত্তুগীজ সওদাগরদের কলিকাতার এজেণ্ট হইয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের "বেলগেছিয়া ভিলা" নামক বাগানটি তাঁহারই সম্পত্তি ছিল। রামধন ঘোষ নামক তাঁহার একমাত্র পুত্রকে রাখিয়া তিনি ১০৮ বৎসর বয়সে গতায়ু হন। দেশীয়



রাজা দিগম্বর মিত্র

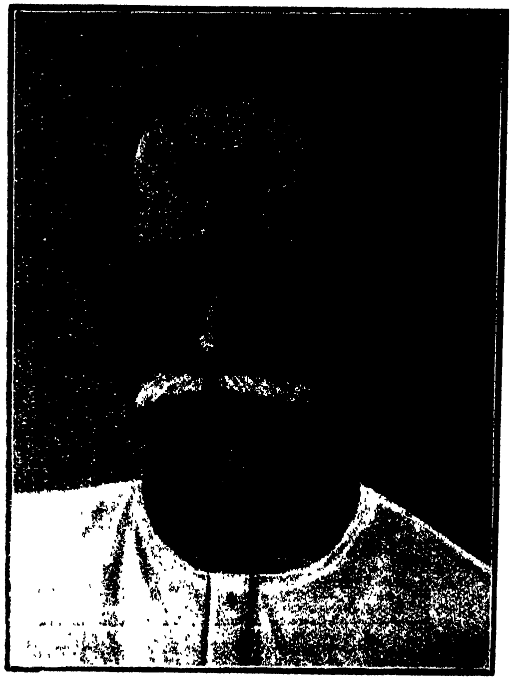
ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিহারপ্রদেশে নীল কুঠি স্থাপন করেন। রসিকলাল ইহাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। শিক্ষক রূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়া কাউণ্টেণ্টএর প্রধান সহকারী পদে উন্নীত হন। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ও খাঁটি হিন্দু ছিলেন। বাটীতে ধূমধামের সহিত সকল প্রকার পূজা করিতেন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন।

* * *

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা মহেশচন্দ্র তাঁহাদের সময়ে শিক্ষিত সমাজে খ্যাতনামা অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ঈশানচন্দ্র ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি জেনারেল্ এসেম্ব্লি্স্ ইনষ্টিটিউশন্, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

* * *

নিধুরাম বসু—ইনি দেওয়ান নিধুরাম বলিয়া পরিচিত



অক্ষয়কুমার দত্ত

ছিলেন। বাগবাজারের দেওয়ান নিধুরামের বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ছিল। ইংরাজ আগমনের বহু পূর্ব্বে ইনি মাইনগর হইতে বাগবাজারে আসিয়া বসতি করেন। ইঁহার ছয় পুত্র রাধাচরণ, রামচরণ, শ্যামচরণ, ভবানীচরণ কালীচরণ ও দেবীচরণ দাতব্য কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন।

* * *

রাধাকৃষ্ণ মিত্র—পিতার নাম কালীপ্রসাদ মিত্র। ইনি দর্জ্জিপাড়ায় বাস করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রামদুলাল দের

জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইনি ধার্ম্মিক এবং একজন খাঁটি হিন্দু ছিলেন। কাশীতে ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি শিব-মন্দির আছে। ইহাঁর পুত্রদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ আমেরিকান্ সওদাগরদের সহিত মিলিত হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

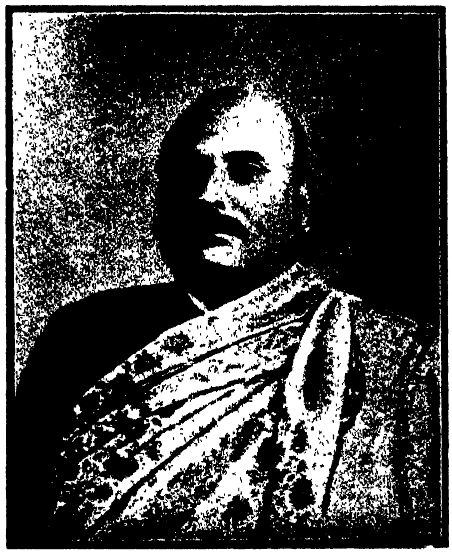
* * *

দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়—ব্যারাকপুরের সন্নিকটবর্ত্তী মণিরামপুরে ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোলকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। বাল্য-কালেই তিনি কলিকাতায় আনীত হন এবং হিন্দু কলেজে



রাজেন্দ্র দত্ত

তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ১৫ কি ১৬ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পিতার অবস্থার অসচ্ছলতা বশতঃ তিনি পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন একবিংশতি বৎসর তখন ডেভিড্ হেয়ারের বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য প্রাপ্ত হন এবং ছাত্রবন্ধু ডেভিডের কৃপায় তিনি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। জানা যায় তাঁহার স্ত্রীর হঠাৎ কঠিন পীড়া হওয়ায় চিকিৎসক আসিতে বিলম্ব হয় এবং সেই সময় তাঁহার মৃত্যু ঘটায় তাহার চিকিৎসা-বিদ্যায় অনুরাগ জন্মে। মিঃ জোন্স (Mr. Jones) যখন হেয়ার স্কুলের অধ্যক্ষ হন তখন দুর্গাচরণের মেডিক্যাল্ কলেজে পাঠের সুযোগ রহিত করিয়া দেন। ইহাতে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ ত্যাগ করেন এবং পরে পাঁচ বৎসর মেডিক্যাল্ কলেজে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু এখানেও পাঠ শেষ করার পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিতে হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সময় ফোর্ট্ উইলিয়মে ৮০৲ টাকা বেতনের একটি কাজ যোগাড় করিয়া দেন। এই সময় তিনি প্রাতে ও বৈকালে চিকিৎসা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে এই কাজও ছাড়িয়া দেন এবং স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ



রায় পশুপতিনাথ বসু

করেন। অতি শীঘ্র সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে, এবং তিনি দশ বৎসরের মধ্যে এক লক্ষ টাকারও অধিক উপার্জ্জন করেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় রোগ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা কোন চিকিৎসকের ছিল না। ১৮৭০ সালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাঁরই পুত্র।

* * *

রূপচাঁদ রায়—তিনি বেনিয়ানের কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বড়বাজারে তাঁহার বাস ছিল। তাঁহার নামে একটা রাস্তা আছে।

* * *

রাজা দিগম্বর মিত্র—রাজা দিগম্বর মিত্র হইতেই ঠনঠনিয়ার মিত্র-বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কোন্নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হইয়া তিনি ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম আমিনরূপে ইনি মুর্শিদাবাদে কার্য্য করেন এবং তথায় ক্রমে রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষক ও পরে তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার স্বরূপ দান করেন। ইহা অবলম্বন করিয়াই প্রথমে নীল ও পরে রেশমের কাজ এবং তৎপরে জমিদারী দ্বারা প্রভূত সৌভাগ্যের অধিকারী হন। যৌবনকাল হইতেই তিনি ঠাকুর পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং খ্যাতনামা দ্বারকানাথ ঠাকুর



রায় পশুপতিনাথ বসুর বাটী

মহাশয়ের নিকট হইতেই তিনি রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের তিনি প্রথম সহকারী সম্পাদক হইয়া পরে তাহার সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্, লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটির সম্পাদক ও কলিকাতার প্রথম দেশীয় সেরিফ্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সরকার কর্ত্তৃক রাজা ও সি-আই-ই উপাধি ভূষিত হন। তিনি তাঁহার জীবনকালে বহু ছাত্রকে ভরণ-পোষণ করিতেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র গিরীশচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাতে প্রেরিত হন, এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তাঁহার দুই শিশু পৌত্র—কুমার মন্মথনাথ ও কুমার নরেন্দ্রনাথকে রাখিয়া মারা যান।

* * * *

মদনমোহন দত্ত—ইনি হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশ-সম্ভূত। ইঁহারা বালির দত্ত বলিয়া খ্যাত। মদনমোহনের পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দশরণ দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া প্রথম আন্দুল হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার বাস হইতেই গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি এইরূপ প্রবাদ। কথিত আছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহাদের সম্পত্তি অদলবদল করিয়া তাঁহারা হাটখোলায় উঠিয়া আইসেন। গোবিন্দশরণের পৌত্র রামচন্দ্র ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমদানী রপ্তানি গুদামের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। মদনমোহন অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ



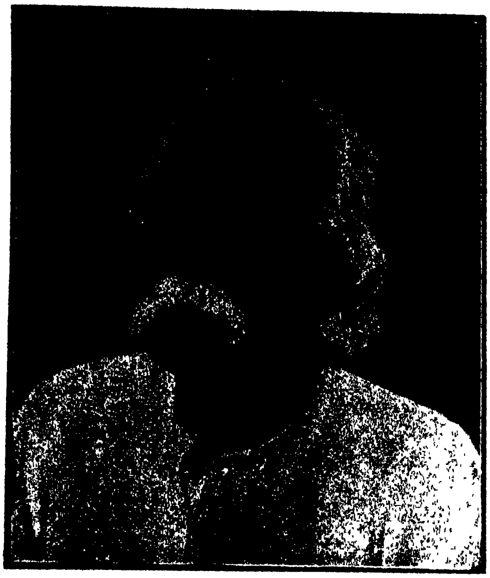
প্রাণনাথ দত্ত

ও দানশীল ছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় রামদুলাল দে বিদ্যায় ও ধনে এতাদৃশ সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আমতা, মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যে সকল কীর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে গয়ার প্রেতশীল পাহাড়ের সোপান শ্রেণী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। পাটনায় পাটনেশ্বরীর মন্দির এই বংশসম্ভূত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাটনার দেওয়ান জগৎরামের কীর্ত্তি। পানিহাটি কোন্নগরের গঙ্গাপার্শ্বস্থ ঘাট ও দ্বাদশ মন্দিরও এই বংশের কীর্ত্তির পরিচায়ক।

* * *

অক্ষয়কুমার দত্ত—১৮২০ সালে নবদ্বীপের সন্নিহিত

পিতা পীতাম্বর দত্ত বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে খিদিরপুরে আসিয়া বাস করেন। প্রথম গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করিয়া ইনি গৌরমোহন আঢ্যের "ওরিএণ্টাল্ সেমিনারী"তে ইংরাজি শিক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটায় তাঁহাকে লেখাপড়া ছাড়িতে হয়। অভাবের তাড়নায় অল্প বয়স হইতেই তাঁহাকে ধনোপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত হইতে হইলেও জ্ঞানার্জ্জনের প্রবল স্পৃহা বশতঃ বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা করিতে তাঁহাকে বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথম তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক রূপে মাসিক আট

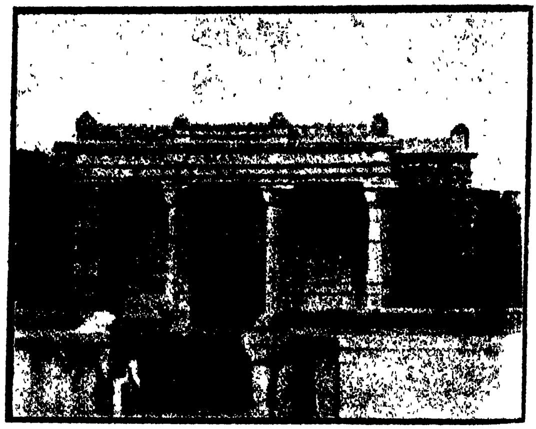


ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার সম্পাদক হন। এই সময় তিনি কিছুদিন মেডিক্যাল্ কলেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিয়া উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতিতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর সাহায্যে তিনি দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাঁহার দেহ মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ সাল হইতে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হন। জীবনের শেষবয়সে তিনি বালি গ্রামের গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক উদ্যান-বাটীতে বাস করিতে থাকেন। ১৮৮৬ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়।

* * *

রাজেন্দ্র দত্ত—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ অক্রূর দত্তের বংশে তিনি জন্মগ্রহণ কারন। তিনি প্রথমে ড্রামণ্ড সাহেবের বিদ্যালয়ে এবং পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। এখানকার শিক্ষা শেষ করিয়া কিছুকাল মেডিক্যাল কলেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে উপদেশাদি শ্রবণ করেন। চিকিৎসার দ্বারা লোকের দুঃখহরণরূপ পরোপকার-ব্রতে আত্মনিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার প্রয়াস। বিষয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুদিন সওদাগর অফিসে বেনিয়ানের কাজ



ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অব্ সায়ান্স

করিলেও তিনি সুপ্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া নিজ বাটীতে একটী এলোপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করিয়া দরিদ্রদের চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ আরম্ভ করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচারের জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইয়োরোপ হইতে আগত ডাক্তার টন্নার (Dr. Tonnere) ডাক্তার বেরিনি (Dr. Beriegny)কেও এ বিষয় তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য—তৎকালীন প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা হীরা বুলবুলের পুত্রকে হিন্দু-কলেজে ভর্ত্তি করায় সহর মধ্যে যখন মহা আন্দোলনের

সৃষ্টি হয়, তখন ১৮৫৩ বা ৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মেট্রপলিট্যান্ কলেজ নামে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়, রাজেন্দ্রবাবুই তাহার অগ্রণী ছিলেন। তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষতা করিবার জন্য ক্যাপ্টেন ডি, এল্, রিচার্ডশন্‌কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

*　　*　　*

রায় পশুপতিনাথ বসু—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগবাজারের প্রসিদ্ধ বসুবংশসম্ভূত। পাটনা, গয়া, লোহারডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার জমিদারীর তত্ত্বাবধানে তাঁহার জীবনের অনেকটা অংশ অতিবাহিত হইলেও তিনি কলিকাতার অনেক জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। বাগবাজারের "পল্লী সমিতি" তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের তিনি একজন আজীবন সভ্য ছিলেন। তিনি বাগবাজারে একটি দাতব্য



যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু



কুমার কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু)



দেওয়ান রামকমল সেন

চিকিৎসালয় খুলিয়া বহু লোকের উপকার করিয়াছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে বাটীতে রাখিয়া ভরণপোষণ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন কমিশনর ছিলেন এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি মারা যান।

*　　*　　*

প্রাণনাথ দত্ত—হাটখোলার দত্তবংশের লোকনাথ দত্তের পুত্র প্রাণনাথ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনারি ও হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ইংরাজি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। "বিবিধার্থ সংগ্রহ", "রহস্য সন্দর্ভ" ও অন্যান্য যে সব সাময়িক পত্রিকা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইত, পরে প্রাণনাথ সে সকলের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি ইয়োরোপে দেশীয় উৎপন্ন-বস্ত্র রপ্তানির জন্য প্রাণনাথ দত্ত চৌধুরী নামে এক ব্যবসা খোলেন। তৎপরে একটী ছাপাখানা, লোহা ঢালাই প্রভৃতির কাজও করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচিত সদস্যের পদের

সৃষ্টি হইলে তিনি প্রথম দলেই নির্ব্বাচিত হন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের এবং ইণ্ডিয়ান্ ইউনিয়নেরও সভ্য ছিলেন। এই সকলের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও তিনি সাহিত্যের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই। তিনি এই সময় "বসন্তক" নামে একখানি হাস্যরসপূর্ণ বিদ্রূপাত্মক সচিত্র মাসিক প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর পত্রিকা ইহাই প্রথম। ইহার বহুল প্রচার হইয়াছিল এবং তৎকালীন বিদ্বজ্জন সমাজে বিশেষ সমাদৃত



মতিলাল শীল

হইয়াছিল। সংস্কৃতের সহিত ইংরাজি ভূমিকা সম্বলিত গ্রন্থ তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। ব্যবসায়ে লোকশান ও তাঁহার পুত্র কৃপানাথের স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়া হেতু হাটখোলা হইতে কাশীপুরের দিকে যাইয়া বাস করেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি বিশেষ চেষ্টার দ্বারা কাশীপুর ও চিৎপুর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত হইতে না দিয়া স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটী সৃজনে সমর্থ হন। ১৮৮৮ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—হাওড়ার অন্তর্গত পাইকপাড়ায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামতারক সরকার। মহেন্দ্রলাল শৈশবেই মাতৃহীন হওয়ায় কলিকাতায় নেবুতলায় তাঁহার মাতুলালয়ে প্রতিপালন হন। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করিয়া তিনি মেডিক্যাল্ কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এম-ডি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি এলোপ্যাথিতে শিক্ষালাভ করিলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি নিজ মত প্রচারের জন্য



রামগোপাল ঘোষ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে Calcutta Journal of Medicine নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি Indian Association for the Cultivation of Science নামক বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা। ১৮৭৬ সালে তদানীন্তন ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের সহায়তায় ইহার উদ্বোধন হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, সেরিফ্, লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য, মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনর, এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও যাদুঘরের ট্রাষ্টী ছিলেন। সরকার

তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি ভূষিত করিয়াছিলেন। কলেরা ও প্লেগ সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বৈদ্যনাথে তাঁহার স্ত্রীর নামে রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১৯০৪ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার ইল্‌সবা গ্রামে মাতামহের আলয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি হুগলী কলিজিয়েট্ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে চুঁচুড়ার অক্ষয়কুমার সরকারের সাধারণী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে শিক্ষানবিশ রূপে প্রবেশ করেন। এই স্থান হইতেই তাঁহার সংবাদপত্র পরিচালনায় শিক্ষা লাভ হয়। তৎপরে কলিকাতায় গমন করেন এবং তথা হইতে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী" প্রকাশ করেন। তিনি একখানি বাঙ্গালা দৈনিকও প্রকাশ



রমেশচন্দ্র দত্ত

করিয়াছিলেন। কিন্তু দশ বৎসর কোনরূপে রাখিয়া উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে তিনি টেলিগ্রাফ্ নামে ইংরাজিতে একখানি সান্ধ্য সুলভ দৈনিক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে হিন্দুধর্ম্মের বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের রচিত



শিবচন্দ্র দেব

রাজলক্ষ্মী, মডেল ভগিনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও বিশেষ আদৃত ছিল। ১৯০৫ সালে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।



রসময় দত্ত

দ্বারকানাথ গুপ্ত—ইনি সাধারণতঃ ডি, গুপ্ত বলিয়া খ্যাত। ইনি মেডিক্যাল্ কলেজের একজন পুরাতন ছাত্র।

ইঁহার পেটেণ্ট জ্বরঘ্ন ঔষধ, যাহাকে সচরাচর লোকে ডি-গুপ্ত বলিয়া থাকে, তাহাই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই ঔষধ বিক্রয় দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

* * * *

লালাবাবু—ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। ইনি পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান্ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, ফার্সি ও আরবি ভাষায় বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নানাকারণে অতি-সম্ভ্রান্ত ছিল, দানে ইহা বিখ্যাত ছিল। কথিত আছে গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার



গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

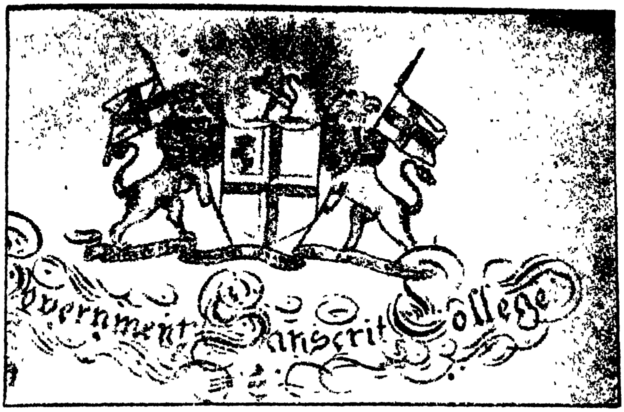
মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং লালাবাবুর অন্ন-প্রাশনের সময় সোনার পাতে লিখিয়া পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রপুরে চারিটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গাগোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্য অপুত্রক রাধাকান্তেরও সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। কৃষ্ণচন্দ্র এতাদৃশ ধনবানের পুত্র হইয়াও পিতার সহিত মনোমালিন্য ঘটায় স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন মনস্থ করিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে গভর্ণমেণ্টের সেরিস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন উড়িষ্যা অধিকার করেন, তখন তিনি দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রধানতঃ কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল হইতে থাকে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ও পণ্ডিতগণের সহিত আলাপনে রত হন। তৎপরে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয় এবং সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের মানসে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণের শিক্ষা ও সংসারের ব্যবস্থাদি করিয়া বৃন্দাবনধামে গমন করেন। তথায় তিনি পঁচিশ লক্ষ টাকা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীউর মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য লইয়া যান। তাঁহার এই অর্থের কথা প্রচারিত



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হওয়ায় তাঁহার বাটীতে লুণ্ঠন দ্বারা ডাকাইতেরা তিন লক্ষ টাকা লইয়া যায়। তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে এক মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। মন্দিরের জন্য নিজ পছন্দ-মত প্রস্তর ক্রয় করিবার জন্য তিনি স্বয়ং রাজপুতানায় গিয়াছিলেন। একজন স্থানীয় রাজাকে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা-দায়ক সন্দেহ করিয়া তথাকার পলিটিক্যাল্ এজেণ্ট লর্ড মেট্‌কাফ্ তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া যান। তথায় অনুসন্ধানে নির্দ্দোষ প্রমাণ হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাটের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সম্রাট তাঁহাকে মহারাজা উপাধি দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি নিজেকে সর্ব্বত্যাগী ভিখারী জানাইয়া তাহা

গ্রহণের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তখন তিনি সত্যই "মাধুকরী" ব্রত গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা উদর পোষণ



সংস্কৃত কলেজের প্রাবরণ চিত্র

করিতেন। ৪০ বৎসর বয়সে অপঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির বৃন্দাবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বর-পূর্ণ ও উচ্চ। কথিত আছে, লালাবাবু একদিন হঠাৎ একজনের মুখে কথা প্রসঙ্গে 'বেলা গেল' এই কথাটি শুনিবামাত্র তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী রাণী কাত্যায়ণীও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন।

* * * *

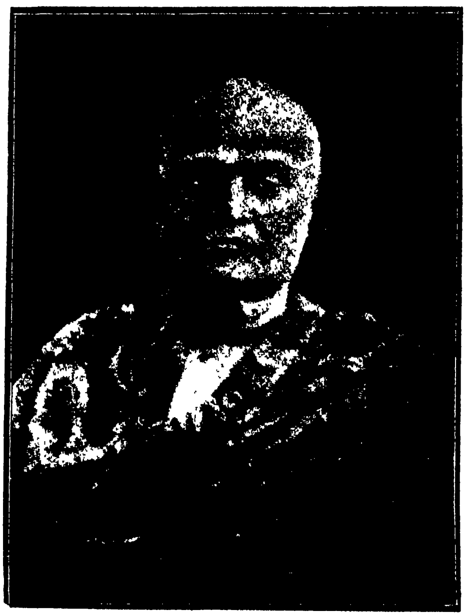
শোভারাম বসাক—পলাশী যুদ্ধের সময়ের তিনি একজন বিখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী ছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া তাঁহারা সুতানুটীতে বাস স্থাপন করেন। কথিত আছে হলওয়েল সাহেব শ্যামবাজার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'চার্লস্ বাজার নাম রাখেন, কিন্তু শোভারাম চেষ্টা করিয়া তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্যাম বসাকের নামে পুনরায় ইহা শ্যামবাজারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। শোভারামের নামে কলুটোলায় একটি ষ্ট্রীট, ও বড়বাজারে একটা লেন্ আছে।

রামকমল সেন—ইনি সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ; ১৭৯৫ অথবা ৯৬ খৃষ্টাব্দে গৌরীভা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০১ সালে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আইসেন। প্রথম কতিপয় বৎসর তিনি কয়েকটী সাহেবদের ছাপাখানায় কার্য্য করেন। তৎপরে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে একটি কর্ম্ম পান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কেরাণীরূপে এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে ঢুকিয়া পরে তথাকার দেশীয় সম্পাদক ও কমিটির সভ্য মনোনীত হন। অবশেষে টাঁকশালের



রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর

দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তিনি হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইলে তাহার কমিটিতে ছিলেন



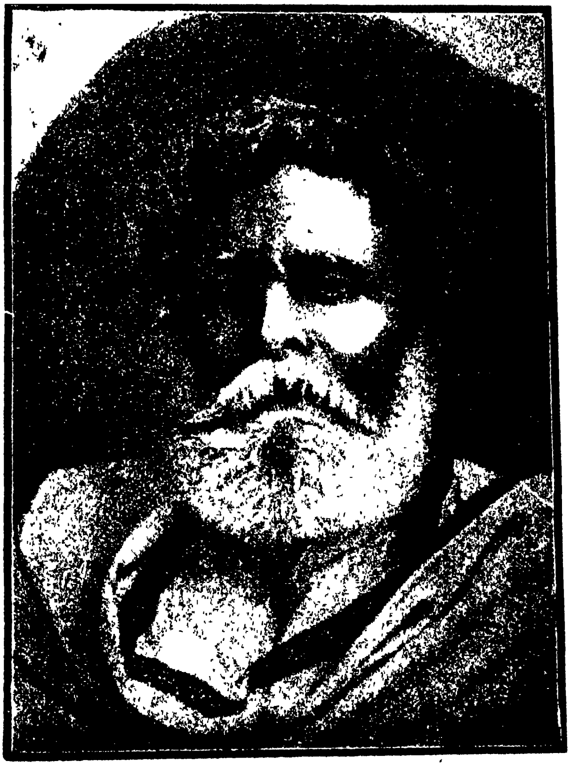
কুঞ্জবিহারী মল্লিক

কিছুদিন নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া-ছিলেন। মেডিক্যাল্ কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে মেডিক্যাল্ কমিশন্ নিযুক্ত হয় তিনি তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি

একখানি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

মতিলাল শীল—১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চৈতন্যচরণ শীল কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। মতিলাল কিছু বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। ১৮১৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে সামান্য একটী কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই স্থানে থাকিতেই ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বোতল্ ও কর্কের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং পরে তিনি জাহাজের মুচ্ছুদ্দির



রাজনারায়ণ বসু

কার্য্য করেন। এই উভয় ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি কলিকাতায় কোম্পানীর কাগজের বাজারের হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া উঠেন। তিনি শিষ্ট, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা মহাশয়ের উন্নতির আদি কালে তাঁহার সহিত যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল। শীলস্ ফ্রী-কলেজ নামক যে অবৈতনিক বিদ্যালয়টি আছে, উহা তিনিই ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়।

* * * *

রামগোপাল ঘোষ—ডিরোজিওর শিষ্যগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তাঁহার অপেক্ষা কৃতি ও যশস্বী আর কেহ ছিলেন না। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটের বাটীতে রামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দেওয়ান রমাপ্রসাদ সিংহের পৌত্র ও গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের পৈত্রিক বাস ছিল হুগলী জেলার বাগাটী গ্রামে। তাঁহার পিতার অবস্থা মন্দ থাকায় পরের অর্থসাহায্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। একাডেমিক্ এসোসিএশন্ নামক একটি সভা তাঁহার সময়ে স্থাপিত হয়,



দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ

তাহার সভ্যগণের মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। এই সভাতেই তাঁহার বক্তৃতাশক্তির প্রথম বিকাশ হয়। তিনি কলেজে অধ্যয়ন কালেই ইংরাজি ভাষায় সুন্দর কথা কহিতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন। এবং পাঠ শেষ করিবার পূর্ব্বেই ১৮৩২ সালে সোসেফ নামক একজন ধনবান ইহুদীর ব্যবসায় কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং পরে কেলসল্ ঘোষ এণ্ড কোং এবং অবশেষে নিজ নামে (R. G. Ghose & Co.) সওদাগরী কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে সুবক্তারূপেই তাঁহার প্রধান খ্যাতি। তাঁহার অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ মুগ্ধ

হইতেন। তিনি তাঁহার সময়ের সকল সভাসমিতি, রাজনীতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যদল মিলিত হইয়া "লিপি-লিখন সভা" (Epistolary Association) ও "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জন সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে যে সভা স্থাপন করেন, রামগোপাল তাহার প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এই শেষোক্ত সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক "জ্ঞানান্বেষণ" নামক একখানি মাসিক প্রকাশিত হইত। রামগোপাল তাহার লেখকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক ইংলণ্ড হইতে আনীত জর্জ টম্‌সন্ (George Thomson) সাহেবের উৎসাহে স্থাপিত ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটী, যাহা পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিএশনে পরিণত হয়, ইনি তাহার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন বিষয়ে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি অতিশয় বন্ধুবৎসল ছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার নিকট তাঁহার বন্ধুগণের গৃহীত ৪০০০০৲ টাকা ঋণ তিনি ছাড়িয়া দেন।



প্রমথনাথ দেব (লাটু বাবু)

* * * *

শিবচন্দ্র দেব—ইঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর দেব। শিবচন্দ্র ১৮১১ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ডিরোজিওর শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সাধু পুরুষ খুব কমই ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইয়া হিন্দুকালেজে তাহার শেষ হয়। তথায় তিনি ১৬৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া ছিলেন। তিনি প্রথম সার্ভে অফিসে বেতনে কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে দীর্ঘকাল ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করেন। তিনি তাঁহার বাসগ্রামের উন্নতি কল্পে বহু কার্য্য করিয়াছিলেন। কোন্নগর হিতৈষিণী সভা, ইংরাজি স্কুল, বাঙ্গালা স্কুল, পোষ্ট অফিস, রেল-ষ্টেশন, ডিস্পেন্সরি, ব্রাহ্মসমাজ, পুস্তকাগার প্রভৃতি তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার



নন্দলাল সিংহ



আশুতোষ দেব (সাতু বাবু)

বিষয়েও তিনি উদ্যোগী ছিলেন। বহু চেষ্টায় তিনি তাঁহার নিজ বাসভবনে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃব্য হরিমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া তিনি আরব্য উপন্যাস বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন এবং শিশুপালন ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

*   *   *   *

রমেশচন্দ্র দত্ত—রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে ১৮৪৮ খৃঃঅব্দে রমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি এই পরিবারের উজ্জ্বলতম রত্ন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ রসময় দত্তের ভ্রাতা পীতাম্বর



কালীপ্রসন্ন সিংহ

দত্তের পৌত্র ও ঈশানচন্দ্র দত্তের পুত্র। উক্ত রসময় বাবু সেকালের কোর্ট অব্ রিকোয়েষ্ট নামক বিচারালয়ের একজন বিচারক ছিলেন। এই দত্ত বংশেই সুপ্রসিদ্ধা তরুদত্ত ও অরুদত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই তাঁহাদের পিতা গোবিন্দদত্তের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। ইনি রসময় দত্তের পুত্র ছিলেন। ইঁহারা ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইঁহারা ইংরাজীতে বহু কবিতা লিখিয়াছিলেন। তরু ফরাসী ভাষায় একখানি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান এবং ৬৯ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ান্ হইয়া এ দেশে আইসেন। তিনি একে একে বহু স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কাজ করিয়া, শেষে ১৮৯৪ অব্দে ডিভিসন্যাল কমিশনর পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী এই পদ প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C. I. E. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। সরকারী কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিলেও তিনি পুনরায় লণ্ডন্ ইউনিভার্সিটির ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তথা হইতে ফিরিয়া বরোদা রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন।



রামদুলাল দেব (সরকার)

এ কার্য্যে তিনি যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তিনি প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। এ সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণা পূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, সমাজ প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। বাঙ্গলা ১৩১৬ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়।

*   *   *

নীলমণি মিত্র—ইনি পলাশী আমলের লোক, কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর সহরবাসীদের ক্ষতিপূরণের জন্য যে কমিশন বসে নীলমণিবাবু তাহার একজন সদস্য ছিলেন। দরজীপাড়ায় তাঁহার বাটী এখনও বর্ত্তমান আছে। যে রাস্তায় তাঁহার বাটী, তাহার নাম নীলমণি মিত্রের গলি।

* * *

রাজা গুরুদাস—ইনি মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র, নবাব মীরজাফরের আমলে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার ফাঁসির পর তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া যান। কথিত আছে বর্ত্তমান বিডন গার্ডেন যে স্থানে আছে, তথায় তাঁহার আবাস ভবন ছিল।

* * *

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—১২২৭ সালে বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা ভাল ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র নয় বৎসর বয়সে বীরসিংহ হইতে পিতার সহিত পদব্রজে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতিতে দক্ষতা লাভ করিয়া কলেজ হইতে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। ১৮৪১ অব্দে ৫০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট্-উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ইংরাজী জানা না থাকায় এখানে সাহেবদের পড়াইবার অসুবিধা হওয়ায়, তিনি এই সময় ইংরাজী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই উভয় ভাষায় সুদক্ষ হন। ৪৬ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হন এবং ৪৯ সালে পুনরায় ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজের অধ্যাপক হন। ১৮৫০ সালে তিনি আবার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং পর বৎসর অধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হইলে ১৫০৲ টাকা বেতনে ঐ পদে বরিত হন। পরে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৩০০৲ হয়। এই সময় Special Inspector of Schoolsএর কাজও তাঁহাকে করিতে হইত, এ জন্য মোট ৫০০৲ টাকা পাইতেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকার কালে ছোট লাট হ্যালিডের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েই হিন্দু বালবিধবাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি নির্ভীক হৃদয়ে গভর্ণমেন্টের সাহায্যে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সহিত মনোবাদ ঘটায় তিনি এক কথায় পাঁচ শত টাকার চাকরীতে ইস্তফা দেন।

বিদ্যাসাগরের সকল পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। তাঁহার মত পরদুঃখকাতর দাতা অধুনা খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মত বঙ্গভাষার সুহৃদও দেখা যায় না। তিনি বর্ণ-পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষা তাঁহার দ্বারা নূতন শ্রী লাভ করিয়াছে এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। নিজ রচিত পুস্তক বিক্রয় দ্বারা তিনি বহু অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই তিনি দানকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ছয় মাস কাল অন্ন বস্ত্র দিয়া শত সহস্র লোককে রক্ষা করিয়াছিলেন। মেট্রপলিটান্ কালেজ তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। তিনি বীরসিংহ গ্রামেও একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সকল কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দান করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি হুগলী জেলার ভাঙ্গা-মোড়া গোপীনাথপুরের দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। ইনিই কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ১৮২৯ সালে অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া সিনিয়র স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথম হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ আদালতে নাজির রূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ১৮৭০ সালে সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লিডার হন এবং অতি অল্পকাল পরেই অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্রের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তিনি হাইকোর্টের বিচারাসনে স্থান প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুদিনের জন্য বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের সভ্য, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো এবং ফ্যাকাল্টি অব্ ল-এর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মাত্র

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * *

মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল—সুপ্রসিদ্ধ ভূকৈলাসের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জয়নারায়ণ কন্দর্প ঘোষালের পৌত্র। ইহাঁদের পূর্ব্ব বাস ছিল গোবিন্দপুরে, যেখানে বর্ত্তমান ফোর্ট্ উইলিয়ম দুর্গ অবস্থিত। কোম্পানী গোবিন্দপুর অধিকার করিলে তাঁহারা খিদিরপুরে উঠিয়া যান। কন্দর্প প্রচুর ধনশালী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্রের মধ্যে গোকুলচন্দ্র বাঙ্গলার গভর্ণর ভেয়ারলেষ্টের দেওয়ান হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণের দখলে আইসে। জয়নারায়ণ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনে কিছুকাল সন্দ্বীপের কানুন্-গো ছিলেন। তিনিই ভূকৈলাসের রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া পরিখা দ্বারা বেষ্টন করেন। তিনিই স্বর্ণময়ী পতিতপাবনী দেবীর জন্য সুন্দর মর্ম্মর-খচিত দেবায়তন নির্ম্মাণ, এবং শিবগঙ্গা ও সত্যগঙ্গা নামক দুইটী দীর্ঘিকা খনন করান। তিনি ভূকৈলাসে দুইটী অতি বৃহদায়তনের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। জয়নারায়ণ ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দিবার জন্য বারাণসীতে একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহা জয়নারায়ণস্ কলেজ নামে খ্যাত। তথায় গুরুধাম নামে একটী ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া করুণানিধান মহাদেবের নামে উৎসর্গ করেন। তিনি বহু সৎকার্য্য করার জন্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে মহারাজা বাহাদুর উপাধি এবং ৩৫০০ ঘোড়সওয়ার রাখিবার সনন্দ প্রাপ্ত হন।

জয়নারায়ণের পুত্র কালীশঙ্কর কাবুল যুদ্ধের সময় সরকারের সাহায্য করায় ও অন্যান্য দানশীলতার জন্য রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কাশীতে একটী অন্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালীশঙ্করের পুত্রগণের মধ্যে রাজকুমার সত্যচরণ ও সত্যশরণ রাজা বাহাদুর উপাধি এবং সত্যশরণ C. S .I. উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। তৎপরে সত্যশরণের পুত্র সত্যানন্দ ঘোষাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি ব্রিটিশ্-ইণ্ডিয়ান্-অ্যাসোসিয়েসনের এবং কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইনিও লোকহিতকর বহু সৎকার্য্য করিয়াছিলেন।

* * *

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মধুসূদন ১৮২৪ অব্দে যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। তিনি কলিকাতায় প্রথম গ্রামার স্কুলে এবং পরে হিন্দু স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তিনি গ্রীক্ ও লাটিন ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তদবধি তাঁহার নামের সহিত মাইকেল যুক্ত হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজে যান এবং তথায় তাঁহার প্রথম গ্রন্থ Captive Lady প্রণয়ন করেন। এই সময় তিনি মাদ্রাজ কলেজের অধ্যক্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং পরে তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলে হেনরিয়েটা নাম্নী অন্য এক ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার পুলিসকোর্টে চাকরী গ্রহণ করেন। তৎপরে কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি কৃষ্ণকুমারী, শর্ম্মিষ্ঠা, মেঘনাদ-বধ, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্য সকল রচনা করেন। ১৮৬২ অব্দে তিনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে যাইয়া অর্থকৃচ্ছ্রতায় তিনি বড়ই কষ্ট পান। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। প্রবাসে অবস্থানকালে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন এবং এখানে ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এ কার্য্যে কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর বিয়োগ ঘটে এবং ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। অর্থাভাবে তিনি হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অবশেষে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সেই স্থানেই তাঁহার জীবনান্ত হয়।

* * *

গোবিন্দরাম মিত্র—কুমারটুলির মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম রত্নেশ্বর মিত্রের পুত্র ও হংসেশ্বর মিত্রের পৌত্র ছিলেন। ১৬৮৬।৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যারাকপুরের নিকট

একটী পল্লী হইতে গোবিন্দপুরে আইসেন এবং তথা হইতে কুমারটুলিতে উঠিয়া আইসেন। পলাশী যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে ডেপুটী ফৌজদার নিযুক্ত করেন। হলওয়েল সাহেব তাঁহাকে "ব্ল্যাক্ ডেপুটী" বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও দুর্দ্দান্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং সুবৃহৎ ও উচ্চ নবরত্নের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মহাদেব স্থাপনা করিয়াছিলেন। তিনি ১৭৬৬ সালে একমাত্র পুত্র রঘুনাথ মিত্রকে রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* * *

দেওয়ান রামসুন্দর মিত্র—ইনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ব্যারাকপুরে কমিসারিয়েট্ বিভাগে কার্য্য করিতেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানিত ছিলেন। বাঙ্গলার নবাব নাজিমের নিকট হইতে তিনি বংশপরম্পরায় রায় উপাধি পাইয়াছিলেন।

* * *

কুঞ্জবিহারী মল্লিক—ইনি সুপ্রসিদ্ধ বীর নরসিং ওরফে বীরু মল্লিকের বংশসম্ভূত। তিনি ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনারীতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন খুব সম্মানিত জমিদার ছিলেন এবং দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার দানশীলতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি কখন নামের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। দর্ম্মাহাট্টা ষ্ট্রীটের উপর তাঁহার প্রাসাদসম অট্টালিকা গরীব দুঃস্থদের আশ্রয়স্থল ছিল। ১৮৯৯ সালে তিনি গতায়ু হন।

* * *

রাজনারায়ণ বসু—১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বোড়াল গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ছিল নন্দকিশোর বসু। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি মেদিনীপুরের গভর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম ও ধর্ম্ম-সংস্কারক ছিলেন। ইনি বঙ্গভাষার একজন সেবক ছিলেন। তাঁহার "সেকাল আর একাল", "আত্মচরিত" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাঙ্গলা ভাষার মূল্যবান সম্পদ। ইঁহার বক্তৃতা দিবার শক্তিও বেশ ছিল। ইনি শেষ জীবন দেওঘরে অতিবাহিত করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * *

দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ—ইনি কোম্পানীর আমলে কলেক্টর্ মিঃ মিড্‌লটন্ ও সার টমাস্ রমবোল্টের অধীনে দেওয়ান ছিলেন। তিনি একজন বিশেষ স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু ছিলেন। নানাবিধ পুণ্য কার্য্যের দ্বারা তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। বারাণসীতে তিনি একটী শিবস্থাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল—প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। এই জয়কৃষ্ণের পুত্র নন্দলালই মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতা। তিনি সাতু সিংহ নামে পরিচিত ছিলেন।

* * *

কালীপ্রসন্ন সিংহ—সুবিখ্যাত মহাভারত-অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতি-কল্পে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ তাঁহার অতুল কীর্ত্তি হইলেও, তাঁহার রচিত "হুতোম পেঁচার নক্সা"ও সেকালের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল। মহাভারতের অনুবাদ ও প্রকাশে তিনি এত অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল এবং সেজন্য পরিশেষে তাঁহার উড়িষ্যার মূল্যবান জমিদারী ও কলিকাতার বেঙ্গল ক্লাব প্রভৃতি বাটী তাঁহাকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। সংস্কৃত নাটক বেণীসংহার ও বিক্রমোর্ব্বশীর প্রথম অভিনয় তাঁহার চেষ্টাতেই তাঁহার নিজ বাটীতে হইয়াছিল। কবি মধুসূদনের সম্মানের জন্য কালীপ্রসন্ন বাবু নিজ বাটীতে এক সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র ও এক রৌপ্য পাত্র দান করিয়াছিলেন। লং সাহেব নীল-

টাকা দিয়া তাঁহাকে কারাদণ্ড হইতে মুক্ত করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট্ পত্রিকার তিনি একজন প্রথম ট্রাষ্টী ছিলেন। তিনি নানা গুণের আধার ছিলেন।

* * *

রামদুলাল দেব—রামদুলাল দেব ওরফে রামদুলাল সরকার অতি সামান্য অবস্থা হইতে কোটিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি নামক গ্রামে বাস করিতেন। রামগোপালের জন্মের অল্পকাল পরে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তিনি মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি হাটখোলার মদনমোহন দত্তের বাটীতে প্রথম ৫৲ টাকা বেতনে বিল সরকাররূপে নিযুক্ত হন ও পরে ১০৲ টাকা বেতনে জাহাজ সরকারের কার্য্য প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি একদিন নিলামওয়ালা টুল্লো কোম্পানীর অফিসে তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে ১৪০০০৲ টাকায় একখানি জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় করেন এবং উহার মূল্য জমা দিবার পূর্ব্বেই এক সাহেবকে প্রায় এক লক্ষ টাকায় উহা বিক্রয় করেন। তিনি এই লাভের টাকা মদনমোহন বাবুকে দিতে চাহিলে, তিনি রামদুলালের সততা দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত টাকা তাঁহাকে দান করেন। ইহাই তাঁহার সৌভাগ্যের ভিত্তি। তৎপরে তিনি আমেরিকার সওদাগরদিগের এজেন্ট হইয়া এবং অনেক আফিসের বেনিয়ান হইয়া বিপুল ধন উপার্জ্জন করেন। তিনি অশেষ গুণসম্পন্ন, ধার্ম্মিক এবং অসাধারণ দানশীল ছিলেন। মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ টাকা, হিন্দু কলেজ নির্ম্মাণে ৩০০০০৲ এবং কাশীতে ত্রয়োদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠায় ২২২০০০৲ টাকা ব্যয় করেন। তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে, আশুতোষ ও প্রমথনাথ—যাঁহারা সাতুবাবু ও লাটুবাবু নামে খ্যাত—তাঁহাদের রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। এই পুত্রদ্বয় পিতৃশ্রাদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে রামদুলাল মৃত্যুকালে ১ কোটী ২২ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। সুপ্রসিদ্ধ অনাথনাথ দেব তাঁহারই পৌত্র।

বন্ধুর দেশ

জসীমউদ্‌দীন

বন্ধুর দেশ—বড় ভাল দেশ, লতাপাতা আর ফুল
কেউ ফুটিয়াছে, কেউ আধ-ফোটা, কোথা এর সমতুল।
প্রকাণ্ড মাঠ, কচি ধান শিশু লইয়া মাটীর মাতা
সারাটি বুকের স্নেহ নিঙাড়িয়া মেলিছে নবীন পাতা।
সবুজে সবুজ, ধানের সবুজে ঘাসের সবুজ মিশে
বনের সবুজে ধরিতে যাইয়া পথের হারাল দিশে।

গাছে গাছে পাখী খালি গান গায়—নানান রঙের পাখী
বন্ধুর দেশ উড়ায়ে লইল আড়াআড়ি করি ডাকি।
বনের বুকের, মাঠের বুকের গোপন ছিল যে কথা
চঞ্চুতে ধরি আজি তা উহারা ছড়াইছে যথা-তথা।

বন্ধুর দেশ—বড় ভাল দেশ, চিকন চিকন ধান,
চিকণ চিকণ ঘাসের আঁচলে দুলিতেছে দিনমান।
চিকণ চিকণ বাঁশের গায়েতে চিকণ চিকণ পাতা
বাতাসের সাথে যত দোলে, তত দোলে না চোখের পাতা।
তারি ধার দিয়ে পথখানি গেছে, চাষী-বউদের পার
খাড়ুর গানেতে আলতার দাগে ধূলি পবিত্র তার।
পথের দুপাশে ছোট ছোট ঝোপ আছে শাখা বাড়াইয়া
চাষী-বউদের বাড়ায় বিপদ অঞ্চল জড়াইয়া।

বন্ধুর দেশ—বড় ভাল দেশ, গগনে গগনে ঘুরি
পরদেশী মেঘ যেখানে সেখানে রচিছে রঙের পুরী।
অঙ্গণে তার হেলিয়া দুলিয়া নাচিছে বিজলী মেয়ে;
চরণের তালে গুরু গুরু গুরু চ'লে উদাসীয়া গেয়ে।
বন্ধুর দেশে কদম কেয়ায় বাতাসেরে করে ভারি;
যে পথে বন্ধু চলে সেই পথে সুবাস আঁচল নাড়ি।

কাব্যের ভূমিকা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সন্ধ্যার পরেই লগ্ন। বর আসিয়াছে বিবাহ করিতে; প্রচলিত নিয়মে বিবাহ যেমন করিয়া হয়। আসর বসিয়াছে। দামী গালিচা পাতা, আশপাশে লাল মখমলের গোটা চারেক তাকিয়া, দু'দিকে বড় বড় রূপার ফুলদানিতে দুইটি ফুলের তোড়া, মাথার উপরে ও দেয়ালের চারিদিকে ঝাড়ের আলো জ্বলিতেছে। বরযাত্রীতে বড় ঘরখানা ঠাসাঠাসি। ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র গোলমাল, লুচিভাজার গন্ধ, চুরুটের ধোঁয়া, ফুলের খোসবায়, গানের আওয়াজ, সুলভ রসিকতার ইঙ্গিত, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়ন। ঠিক সাধারণ বিবাহ যেমন করিয়া হয়, অতি সাধারণ প্রথায়।

বরের মাথায় টেরি, কপালে চন্দন, চোখে উৎসাহ, মুখে সংযত হাসি, সর্ব্বাঙ্গে পরিপাটি প্রসাধন। সভায় প্রকাশ, ছেলেটি শিক্ষিত, বিনয়ী, রূপবান এবং ধনী—কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ, অন্যের চোখের পছন্দে সে বিবাহ করিতে আসিয়াছে। তাহাতে তাহার বিরক্তিও নাই; এই প্রচলিত প্রথা। মনের খুসিতে ও চাপা হাসিতে বর এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। তাহার পাশেই দু'তিনটি আধুনিক যুবক গান গাহিতেছে।

দরজার কপাটে হেলান্ দিয়া তাহার যে বন্ধুটি চুপ করিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, বর তাহাকে ইঙ্গিতে হাত বাড়াইয়া ডাকিল। বন্ধুটি কাছে আসিয়া বসিতেই বর হাসি-হাসি মুখে কহিল, বেশ লাগ্‌চে, না রে অমিয়?

অমিয় তাহার কথাটাকে তাচ্ছিল্য করিয়া কহিল, অত্যন্ত বিরক্তিকর কিনা, তাই তোর ভালো লাগ্‌চে।

তাই বটে, ঠিক বলেচিস্ তুই, বিরক্তিকর! সেই থেকে একটানা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে' চলেছে।

একটু হাসিয়া অমিয় কহিল, তাহলে' নিশ্চয় বাজে কথা বলেচি। আমি যখন বাজে কথা বলি তখন সবাই আমার প্রশংসা করে।

বর তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। কহিল, ওখানে এতক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলি কেন?

দাঁড়িয়েছিলাম, হ্যাঁ—এম্‌নি।

চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলি? দেখছিলি বুঝি কারো দিকে?

চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলাম।

বর কহিল, গান শুন্‌ছিলি নাকি?

না, গান শুন্‌ব কেন? হ্যাঁ, গানই শুন্‌ছিলাম। বেশ গান।

কি করছিলি তোর মনে নেই!

অমিয় কহিল, হ্যাঁ মনে নেই, গান শুন্‌ছিলাম।

বর বলিল, চুরুট ধরাস্ ত নে, ঐটাতে রয়েছে। যাক্, তোর ঘট্‌কালির বাহাদুরি আছে কিন্তু, যাই বলিস্।

হ্যাঁ, চেনা মেয়ে, নিজেদের জানাশোনার মধ্যে। শ্বশুরবাড়ী কাছাকাছিই হল'। রোজ একবার করে' যাতায়াত চল্‌বে। বিদেশ বিভুঁয়ে না হয়ে এ বরং—

তোরই জানা মেয়ে, নিতান্ত একেবারে অচেনা নয়। আচ্ছা ঠিক বয়েসটা কত বল্ ত?

অমিয় কহিল, মেয়েদের বয়েস দেখতে নেই, দেখতে হয় বাঁধুনি,—যৌবন। তবে এর বয়েস বছর আঠারো!

আঠারো? ওরা যে বলেছে ষোল?

ওরা যে মেয়ের পক্ষ!—হ্যাঁ, এই বছর আঠারো, কিম্বা, এই ধরো দু'মাস কম। আঠারোর মতই তাকে দেখতে, ষোলও নয়, কুড়িও নয়—সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ আঠারো! আঠারোটি বছরকে সর্ব্বাঙ্গে সে থাকে-থাকে সাজিয়ে রেখেছে।

বর মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ফুটিয়া তাহার মাথার ভিতর ভিড় করিতে লাগিল। এক সময় কহিল, আচ্ছা, মেয়ে ত সুন্দরী তুই বলেচিস্!

নানা গোলমাল, নানা কণ্ঠের কোলাহল, সকলেই

এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। পান তামাক সরবৎ সিগারেট ও অসংলগ্ন হাসি-মস্করা চারিদিকে ছড়াছড়ি হইতেছিল। কন্যাপক্ষীয়রা অতি সন্তর্পণে অতি-ভদ্রতার মুখোস পরিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত তদ্বির করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

অমিয় চুরুটটা ধরাইয়া লইল। মুখের মধ্যে ধোঁয়া টানিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়া বলিল, সুন্দরী!

বর বলিল, বলতে গিয়ে চুপ করেছিলি কেন? খুব সুন্দুরী নয় বুঝি?

আবার চুরুটে টান্ দিল এবং আবার ধোঁয়া ছাড়িয়া অমিয় কহিল, হ্যাঁ, খুবই সুন্দরী।

খুব নয় বোধ হয়, শুধু সুন্দুরী।

হ্যাঁ শুধু সুন্দরী; সুন্দরীই শুধু। খুব বল্‌লে বোঝানো যায় না, কত।

তবু কি রকম সুন্দুরী? কা'র মতন?

কারো মত নয়। তার মত হবার যোগ্যতা কারো নেই। যে শুধু সুন্দরী, তার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

তুলনাই হয় না? এত রূপ?

এত রূপ নয়, এত সৌন্দর্য্য! বিয়ে করা উচিত রূপ দেখে নয়, সৌন্দর্য্য দেখে। সত্যিকারের সৌন্দর্য্যের কোনো সত্য বর্ণনা নেই।

চোখ উজ্জ্বল করিয়া বর বলিল, মাথায় চুল আছে খুব?

দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলির দিকে অমিয় তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর দেখিল ঝাড়ের সব আলোগুলি ঠিকমত জ্বলিতেছে কিনা। ওপাশে বন্ধুরা তাস খেলিবার আড্ডা বসাইয়াছে। মনে হইতেছে বিবাহের লগ্নের আরও একটু দেরি আছে।

সাজা পানের কপাল হইতে একটি লবঙ্গ খুলিয়া লইয়া মুখে পুরিয়া অমিয় কহিল, হ্যাঁ, অনেক চুল। চুলের অন্ধকার। সুমুখের দিকে কোঁকড়ানো, একরাশ আংটির মত, আর পেছন দিকে অসংখ্য সাপের মত, আঁকাবাঁকা—হিল্‌হিলে। অরণ্যের মত গভীর; চুল নয়, চালচিত্র। ঘরে এসে দাঁড়ালে চুলের গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়। সে যদি পথ হারায় তুমি তার চুলের গন্ধ অনুসরণ করে' তাকে খুঁজে পাবে। সে যদি উলঙ্গ হয়ে বসে' চুলের রাশি খুলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকে, তবে তার কাপড় না পরলেও চলে।

গভীর মনোযোগের সহিত বর তাহার কথা শুনিতেছিল। শেষের কথায় বিস্ময় অনুভব করিয়া কহিল, মুখখানি ভাল, কি বলিস্? তুই ত কতবারই দেখেচিস্!

হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছি, বহুবার। সে কেমন দেখতে এ কথা বহুবার তাকে দেখে ভেবেছি।

কেমন দেখতে রে?

বলা কঠিন। দেখতে সে ভাল। দেখতে সে ভাল এইজন্যে যে, পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। পৃথিবীর একটিমাত্র মেয়ে সে। চন্দ্রের চারিদিকে যেমন কোটি কোটি তারা, তেমনি তার পাশে পৃথিবীর আর সব মেয়ে। সে মেয়ে নয়, মেয়েদের রাণী।

বর কহিল, আমি বলছি তার মুখখানি কেমন দেখতে!

অমিয় কহিল, শ্যাওলা-পড়া দিঘীতে অনেক পদ্ম ফুটে রয়েছে। তুলতে তুলতে হঠাৎ দেখা গেল, একটি তার মধ্যে পদ্ম নয়, সেটি একটি মেয়ের মুখ, মুখখানির ওপর শরতের শিশির-বিন্দু। সেই মুখখানি এই মেয়ের, এই, তুমি যাকে বিয়ে করবে।

আচ্ছা, তা ত' হল'! মেয়ে লেখাপড়া জানে?

যথেষ্টই জানে! বিদ্বান নয়, সুশিক্ষিত!

বর কি ভাবিয়া কহিল, কিন্তু লেখাপড়া জানা মেয়ে শুনেছি তেমন—

হ্যাঁ, লেখাপড়া জানা মেয়েরা ভালবাসতে পারে না, আর নিরক্ষর মেয়েরা ভালবাসতে জানে না,—এই ওদের মধ্যে তফাৎ।

তাহলে এ মেয়ের সঙ্গে—

এ মেয়ে বিধাতার সর্ব্বপ্রথম সু-সৃষ্টি! এর মধ্যে নিরক্ষর মেয়ের সারল্য এবং শিক্ষিতা নারীর সৌজন্য, দুই আছে। এ মেয়ের মধ্যে ভালবাসা ছাড়াও আর একটি বস্তু আছে, যা আর কোনো মেয়ের মধ্যে নেই। সে হচ্ছে প্রেম!

আচ্ছা, ভালবাসা আর প্রেমের মধ্যে কি তফাৎ?

অমিয় কহিল, ভালবাসা হচ্ছে বোঁটা, প্রেম হচ্ছে ফুল! সব বোঁটায় ভাল ফুল ফোটে না।

বর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, মেয়েটির আচার-ব্যবহার কি রকম অমিয়?

অমিয় কহিল, হয় 'অত্যন্ত সরল, নয় অত্যন্ত

রহস্যজনক ?

না, সরল। মেয়েদের সবই পুরুষের চোখে রহস্যজনক লাগে। অত রহস্য আছে বলেই অত সরল।

পাশাপাশি বসিয়া দুইজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছিল, কথার আর তাহাদের বিরাম নাই। বর আনন্দে বসিয়া বসিয়া পান চিবাইতেছিল। পান যে তাহার খাইতে নাই এ কথা সে তখন ভুলিয়া গেছে।

একটি কন্যাপক্ষীয়ের লোক গামছা কাঁধে ফেলিয়া কি একটা কাজে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, একজন বরযাত্রী বলিয়া উঠিল, আচ্ছা মশাই, বিয়ের লগ্নটা ঠিক ক'টার সময় বলুন ত ?

লোকটি বলিয়া গেল, এই, সময় প্রায় হয়ে এল আর কি, ঘণ্টাখানেক দেরি, ন'টার পর।

ন'টার পর, অথচ বর এল সাতটার সময়। এতক্ষণ তাহলে' বসে' বসে'—অমিয়বাবু, চুপি চুপি কি গল্প করছেন বরের সঙ্গে ? পাত হয়েছে কিনা দেখুন না একবার! আপনি ত কন্যেপক্ষের—

অমিয় কহিল, হ্যাঁ এদিকে আমি মাসি, ওদিকে পিসি।

সবাই হাসিয়া উঠিল। যে লোকটি বসিয়া গান গাহিতেছিল, সে আরও উঁচুতে গলা চড়াইয়া দিল। ও পাশে বাঁয়া-তব্‌লায় চাঁটি পড়িতে লাগিল।

বালিশে হাত চাপিয়া বর কাৎ হইয়া বসিল। তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মেয়ের চোখ দুটি কেমন অমিয় ?

অমিয় হাসিল, হাসিয়া বলিল, মেয়ে দেখে যে বিয়ে করে না তার এই দুর্দ্দশাই হয়! চোখদুটি তার অত্যন্ত সাধারণ, এত সাধারণ যে মনে হয় সে চোখ বহুবারই দেখেছি। বহু মেয়ের মধ্যে বহুবার সে চোখ দেখেছি, দেখে চিনে রেখেছি। সে চোখ এত সাধারণ এবং এত স্বাভাবিক।

বর চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল সে যেন ভগবৎ গীতা শুনিতেছে। অমিয় বলিতে লাগিল, কোথায় তুমি সে চোখ দেখেছ তোমার মনে নেই! মনে হবে বহু জন্ম আগে থেকে তুমি ওই চোখদুটি খুঁজে এসেছ। সে চোখের কাছে দাঁড়ালে তোমার মুখের ছায়া পড়বে তার মধ্যে। সে চোখ যেন দুই বিন্দু আকাশ।

বর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইল। অমিয় নিজের মনে বলিয়া চলিল, অতিরঞ্জিত নয়,—সে চোখে ইসারা-ইঙ্গিত নেই, সুন্দরী মেয়ের স্বভাব-সুলভ ছলাকলা নেই, তা'তে আছে প্রাণের গভীরতা। সে চোখে পিপাসা নেই, আছে নিবিড় তপস্যা।

বর কহিল, তপস্যা ? তাহলে' ঘর করবে কেমন করে' ?

অমিয় মৃদু হাসিল,—ঘর করবারই তপস্যা! তুমি যখন তাকে ভাল করে' চিন্‌বে, তোমার মনে হবে সে সন্ন্যাসিনী নয়, নিতান্তই গৃহবাসিনী।

খুব শান্ত বুঝি ?

খুব। শান্ত এবং ধীর। ঝড় যখন ছোটে না, তখন সে বসে' ধ্যান করে। এত শান্ত যে মানুষের বিস্ময় আনে। তাকে দেখলে মনেই হয় না যে এই দক্ষিণ হাওয়ার পিছনে রয়েছে প্রলয়ের ঝড়। হ্যাঁ, তুমি যখন তা'র কাছে বসবে, মনে হবে, তোমার পাশেই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি। এ মেয়ের সর্ব্বাঙ্গে তরুলতা, ফুল-ফল, বন-প্রান্তর, গিরি-গহ্বর, অরণ্যের শ্যামশোভা, অপরিমাণ আকাশ,—সূর্য্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র। তোমার শরীর হবে রোমাঞ্চ, আবেগে আন্দোলিত হবে তোমার সর্ব্বদেহ, তোমার স্তব করতে ইচ্ছে হবে।

স্তব করতে ? ভালবাসতে নয় ?

ভালবাসতে এবং স্তব করতে। ভালবেসেই তুমি তৃপ্ত হবে, ভালবাসা পেয়ে নয়।

বর কহিল, সে কি রে ? সে ভালবাসবে না ? ভালই যদি না বাসবে তাহলে এত কাণ্ড করে'—?

অমিয় বলিল, এক একটি মেয়ে থাকে, তারা ভাল-বাসতে আসে না, ভালবাসা পেতে আসে। তুমি তাকে স্ত্রী বলে' পরিচয় দেবে এই তোমার পরম ঐশ্বর্য্য! মেয়েরা ত ভালবাসে না, তোমাদের ভালবাসায় তারা মুগ্ধ হয়, এই মাত্র। মেয়েদের আসক্তিকে প্রেম না বল্‌লে সব পুরুষই সন্ন্যাসী হয়ে যেত'। মেয়েরা পূজায় তুষ্ট হয়, তাই তাদের নাম—দেবী। তুমি দেবে পূজা, সে দেবে প্রসাদ।

এ মেয়েটি কেমন ?

কেমন—এই কথাটাই ত তোমাকে আবিষ্কার করতে

হবে! এ মেয়েটি তোমার মুখের দিকে যখন মুখ তুলে তাকাবে, তোমার মনে হবে তুমি জীবনে অনেক অন্যায় ও অনেক পাপ করেছ। মনে হবে তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল, ভীরু, অসহায়। এমন একটা চোখের দৃষ্টি, যাতে তোমার মনে হবে তুমি অতিশয় ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, তুমি তার পায়ের কাছে বসবারও যোগ্য নও। এর কাছে এলেই তুমি বারে বারে নিজের দৈন্য অনুভব করবে।

চুপি চুপি বর কহিল, এ কথা তোমার বুঝতে পারলাম না অমিয়।

বুঝতে পারবে, প্রথম যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বুঝবে তুমি কী। তোমার প্রতি রোমকূপ থেকে তোমার সব লজ্জা ফুটে বেরোবে, তোমার যত পঙ্গুতা, যত গ্লানি,—তা'র চোখের দৃষ্টিতে হবে তোমার শুদ্ধি, তোমার নবজন্ম। তুমি যদি সারাজীবন ধরে' দুঃখ পেয়ে থাকো, এর কাছে বসে' তুমি সকল দুঃখের কৈফিয়ৎ পাবে, সকল বেদনার। এ মেয়ে তোমার কাছে হবে বিস্ময়!

বিস্ময়?

হ্যাঁ, বিস্ময়! বিস্ময় আর বিচিত্র! নারীজাতি বহুদিন ধরে' তপস্যা করেছে একটি নারীর জন্য; সে এই মেয়েটি। শ্রাবণের আকাশ আপন অন্তর্বেদনায় কালো হয়ে উঠেছিল, সেই প্রসব-বেদনায় ফুটল একটি কেয়াফুল!

বর যেন তাহার কথাগুলির মধ্যে একটি সুস্বাদ গ্রহণ করিতেছিল। বলিল, যাক্ তোকে বহু ধন্যবাদ, তোর জন্যেই এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া সম্ভব হল'। তোর সঙ্গে পরিচয় ছিল বলেই ত—আচ্ছা, আমাকেও ত চিনিস্, বেশ বনিবনা হবে ত আমার সঙ্গে?

অমিয় প্রথমে কথার উত্তর দিল না। সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে বসিয়া একা তাহার মন কোথায় যেন উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল। যেদিকে তাকাইয়া ছিল সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। মৃদুস্বরে বলিল, বনিবনা তোমার সঙ্গে নাও হতে পারে!

বিস্মিত হইয়া বর কহিল, সে কি রে?

হ্যাঁ, এর অহঙ্কার একটু বেশী।

অহঙ্কার? সর্ব্বনাশ—

অহঙ্কার সুন্দরী বলে' নয়, সুন্দর বলে'। অহঙ্কার এর কলঙ্ক নয়, অলঙ্কার। কোথাও মাথা হেঁট করে না, তার কারণ এর আছে গভীর আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসই এর অহঙ্কার। তোমার স্ত্রী হবে, কিন্তু তোমার কাছে ছোট হবে না। তুমি যদি তা'র সমান না হতে পারো, অনায়াসে সে তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে। জীবনে সে কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করেনি। প্রেমের জন্য নয়, ঐশ্বর্য্যের জন্য নয়, সংসারের জন্যও নয়।

স্বাধীন মেয়ে নাকি?

স্বাধীন নয়, সহজ। সহজ হতে পারাই তার মন্ত্র!—চুরুটে আর একটা টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া অমিয় কহিল, তোমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হবে, বুঝবে, সে নিতান্ত নারী নয়।

নারী নয়, মানে?

মানে তার মেয়েলিপনা কম। নারীর স্বার্থপরতা তার মধ্যে নেই; ছোট লোভ, তুচ্ছ ঈর্ষা, ক্ষুদ্র হিংসা, ছলনা ও লালসার ছোট ছোট ইঙ্গিত—এগুলো তার কাছে স্বপ্ন। এগুলো সে জয় করেছে তা নয়, এগুলোকে সে আনতে ভুলে গেছে। আনতে ভুলে গেছে বলেই তার এত অহঙ্কার।

বর বলিল, এই যদি সত্যি হয় তবে সে ত কাদার পুতুল। প্রাণহীন মাটির মূর্ত্তি। তার গায়ে মানুষের রক্ত কোথায়?

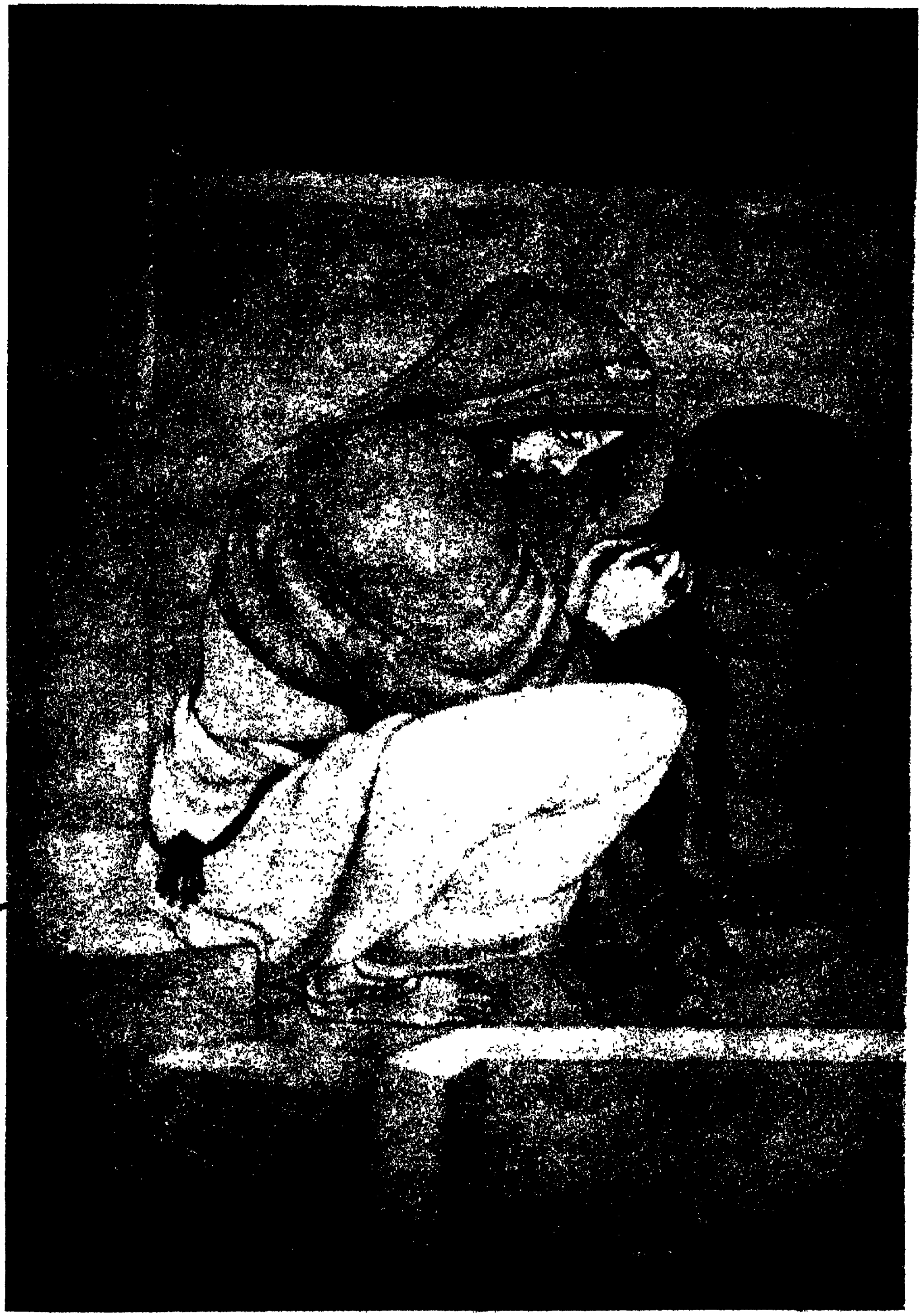
অমিয় হাসিল। হাসিয়া কহিল, সাধারণ নরনারীর দেহে আছে দুই রক্ত, মানুষের আর জানোয়ারের। এর শিরায় আছে শুধুই মানুষের রক্ত। এ মেয়ে হচ্ছে দেবতার আসন।

খুব তেজ আছে নাকি?

তেজ নয়, জ্যোতিঃ। দিনের আলোতেও তুমি দেখবে তা'র চারিদিক ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডল। সেই জ্যোতির্মণ্ডলের কাছে বসলে মাথার মধ্যে তোমার প্রলাপ জমে' উঠ্‌বে। আনন্দে তুমি হবে অস্থির, তোমার হাসি পাবে, কিন্তু কান্নায় গলা বুজে আসবে; আরামের অসহ্য ব্যথায় তোমার সর্ব্বশরীর থর থর করে' কাঁপবে। তোমায় মাতাল করবে না, কিন্তু বিভ্রান্ত করবে। তৃপ্তিতে অচেতন হবে, ঘুম পাবে।

বর কহিল, সে ত মোহ!

মোহ নয়, মোহমুক্তি।



বেণী বিনোদিনী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বর বলিল, এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে অমিয়। তা'র আসল পরিচয়টা চেপে রেখে তুমি অনর্থক ধোঁয়ার সৃষ্টি করছ! আচ্ছা, সে কি ভালবাসে বল দেখি?

অমিয় বলিল, সে ভালবাসে অশোক আর শিমুল ফুল, রক্ত, সিঁদুর, আল্‌তা, সূর্য্যাস্তের আকাশ, আগুনের আভা, রেলপথের বিপদসূচক আলো।

দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। বর এক সময় তাহার হাতঘড়িটা ফিরাইয়া সময় দেখিয়া লইল। অমিয় আপন মনে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, সব চেয়ে কঠিন... সব চেয়ে কঠিন তুমি যখন তাকে ভালবাসার কথা বলতে যাবে। মনে হবে তাকে ভালবাসা জানাবার ভাষা তোমার হাতে নেই, তুমি একেবারে দেউলে হয়ে গেছ। তুমি অনেক কথা ভেবে তার কাছে বসবে, কিন্তু কিছুই বলা হবে না। তুমি যত বড় ঐশ্বর্য্যশালীই হও, তার কাছে মনে হবে তুমি ভিখারী। সব চেয়ে কঠিন তাকে ভালবাসা জানানো, সত্যি, সব চেয়ে কঠিন।

অমিয় চাপিয়া চাপিয়া অলক্ষ্যে একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল, যত দিন যাবে ততই তুমি তার কাছে ছোট হতে থাকবে। একদিন তুমি তার নাগাল পাবে না... তুমি তার পায়ের তলায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তুমি চীৎকার করতে পাবে না, কাঁদতে পাবে না, তোমার পালাবার শক্তি নেই, তোমার টুঁটি টিপে ধরেছে, তুমি ক্লিষ্ট, ক্লান্ত · নিজের কাঙালপনায় তোমার চোখে জল আসবে। মনে হবে জন্ম জন্ম ধ'রে ছায়ার মত ওর পেছনে পেছনে তুমি ঘুরছ, অনাগত বহু জীবন ধরেও তোমাকে ওর অনুসরণ করতে হবে।

তাকে ভালবাসতে গিয়ে এই হবে আমার শাস্তি?

একটা অতি উগ্র আনন্দ অনুভব করিয়া অমিয় বলিল, হ্যাঁ, এই শাস্তি। এই শাস্তিই পুরুষের প্রেম!

বর কথা কহিল না। অমিয় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, প্রতিদিন তুমি আয়োজন করবে একটি কথা বলবার জন্য, 'তোমায় ভালবাসি'—প্রতিদিন চূর্ণ হবে তোমার সে স্বপ্ন। ভালবাসার কথা শোনবার আগ্রহ যার আছে কিনা তুমি বুঝতে পারবে না, তাকে ভালবাসা জানাবার মত সাহস তোমার হবে কেমন করে'? সে যে-ঘরে থাকবে, আপন অস্থিরতায় তুমি সে-ঘরে টেঁক্‌তে পারবে না, তোমার দম্ আটকে আসবে। তোমার কেবলই মনে হবে এ মেয়ে সঙ্গীহীন, নিরন্তর কি একটা অনির্দ্দিষ্ট বস্তুর জন্য ধ্যান করছে! তোমার কাছে কেবলই সে জটিল হতে জটিলতর হতে থাকবে।

বর কহিল, এমন মেয়েকে তা হলে বিয়ে করা উচিত নয়, তাই না?

অমিয় হাসিল। তারপর গভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তোমার মনে হবে বিয়ে করে' তার কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। পরিবর্ত্তন হয় তার ভেতর থেকে, বাইরের অবস্থা থেকে নয়। হৃদয়টা তার পুরুষের, মাথার ভেতরটা তার তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, পুরুষের মত তার প্রতিভা, বীরের মত তার সাহস ও শক্তি, কিন্তু তবু সে মেয়ে! সেই গোপন মেয়েটি তার ভেতরে যে কোন্ গহনে বাস করছে, তাই আবিষ্কার করাই হবে তোমার সাধনা, তোমার প্রেম! নৈলে তাকে ভালবাসি—এ কথা বল্‌তে গেলেই সে হেসে উঠ্‌বে, তার কারণ সে নারী নয়। সে নারী নয়, এই কাঁটাই বার বার ফুটে ফুটে তোমায় ক্ষতবিক্ষত করবে, যাতনায় তোমাকে জর্জ্জরিত করবে, বেদনায় তোমার জীবন হবে দুর্ব্বিসহ, দেহে আর মনে এমন জ্বালা ধরবে যে মনে হবে, তোমার শরীরের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে বা'র করে' দিলে তুমি শান্তি পাও। তোমার মনে হবে—

বর বলিল, যথেষ্ট হয়েছে, আর আমি শুন্‌তে চাইনে।—বলিয়া পরম আগ্রহভরে সে বক্তার মুখের কাছে মুখ সরাইয়া আনিল।

ভিতরের অনুপ্রেরণায় ও আবেগে অমিয়র চোখ দুইটা জ্বালা করিতেছিল। তাহার চোখের ভিতর তাকাইলে মনে হইত, চোখের ধারগুলি তাহার সজল হইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, কেবলই তোমার মনে হবে সে নিষ্ঠুর, তার হৃদয় নেই, ভেতরটা তার মরুভূমি, তোমার প্রতি সে উদাসীন; তোমার মধ্যে যখন ঝড় বইছে, তা'র তখন সময় হল' ছবি দেখবার। এবং সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা তোমার, সে যখন তোমাকে ভুলে থাকবে।

ভুলে থাকবে? স্বামীকে?

হ্যাঁ, ভুলে থাকবে এবং ভুলেও তোমার খোঁজ নেবে না। চোখের আড়ালে তুমি গেলেই মনের মঞ্চে সে

যবনিকা ফেলে দিল। তোমার প্রতি তা'র অবজ্ঞা নয়, বিতৃষ্ণা নয়—এই তার রূপ।

স্বামীর প্রতি এই ব্যবহার করবে?

স্বামীর প্রতি নয়, তোমার প্রতি। স্বামী তার কেউ নয়। হ্যাঁ, রাত্রে তোমার হবে কণ্টকশয্যা। ঘুমের ঘোরে তুমি শিউরে উঠ্‌বে, দুঃস্বপ্নের ভয়ে তুমি অস্থির হয়ে পায়চারি করে' বেড়াবে। শত শত কঠিন বাহু দিয়ে কে যেন তোমাকে বাঁধবে, তুমি চীৎকার করতে যাবে, পারবে না, তুমি শক্তিহীন, নিশ্বাস নেবার হাওয়া তোমার ফুরিয়ে যাবে, সমস্ত শরীর তোমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত!

বন্ধু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কহিল, আর আমি শুনতে চাইনে ভাই, তুই চুপ কর্ অমিয়।—বলিয়া সে একবার ঘড়িটা দেখিয়া লইল।

অমিয় চুপ করিল না, মুখখানা আরও সরাইয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, ভাঙা খেল্‌নার মত যদি কেউ তা'র কাছে গড়াগড়ি যায়, সে ফিরেও তাকায় না। নিজের মাথা তোমার চূর্ণ বিচূর্ণ করে' ফেল্‌তে ইচ্ছে হবে, মনে হবে, এ প্রবঞ্চনা, এ অন্যায়,—বিধাতার বিরুদ্ধে তোমার যুদ্ধ ঘোষণা করতে ইচ্ছে হবে, আকাশ তোমার চোখে হবে বিষাক্ত, জীবন তোমার কাছে হবে ভয়াবহ বিদ্রূপের মত···একটিমাত্র নারীর জন্য তোমার চোখে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। অথচ এই দুঃখের মধ্যেও তোমার ভেতরে জ্বল্‌বে আনন্দের অগ্নিশিখা। দুঃখের পাত্র থেকে আনন্দ পান করবে অঞ্জলী ভরে'। তা'র জন্য দুঃখ পেতেও তোমার ভাল লাগবে। একদিন সেই তোমাকে—বলিতে বলিতে গলা ধরিয়া আসিতেই সে হঠাৎ সচেতন হইয়া মুখ সরাইয়া লইল। বর তাহাকে এতক্ষণ ধরিয়া সন্দেহ করিতেছে নাকি?

ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেই সে আর বসিল না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

এমন সময় আসরে একটা সোরগোল উঠিল। অন্য পক্ষের একটি লোক আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, দয়া করে' উঠুন আপনারা, লগ্ন হয়ে এসেছে।

একসঙ্গে সবাই উঠিয়া হুড়োহুড়ি করিয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বরকে লইয়া গেল সর্ব্বাগ্রে।

বাহিরের নির্জ্জনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অমিয় একবার রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইল। দুই দিকে বড় বড় বাড়ীর মাঝখান দিয়া সে-আকাশ সামান্যই দেখা গেল। তারপর মুখ ফিরাইয়া কাছে একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া সে পা ঝুলাইয়া বসিল। পকেট হইতে চুরুট ও দেশালাই বাহির করিয়া সে অন্ধকারে ধরাইতে গেল, কিন্তু পারিল না, দুইটা হাত তখনও তাহার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। বর কি তাহাকে সত্যই সন্দেহ করিয়াছে? এমন কী সে বলিয়া ফেলিয়াছে যাহাতে তাহার প্রতি সন্দেহ আসিতে পারে?

বার বার অমিয় শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিল।

জীর্ণ মন্দিরের কথা

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, বি-এ

বারেক তরীটি ভিড়াও ওখানে,
শুনে যাও দুটি প্রাণের কথা,
কণ্ঠের স্বর যায় না অতটা
ক্ষমা কর তার অক্ষমতা।
কাছে ডাকি বাছা,—দিনেরি বেলা-ত
ভাঙা ঘাট পাবে একটু আগে,
ফাটা সিঁড়ি, দেখো—সাবধানে উঠ'
ফাটলে ও-পায় ব্যথা না লাগে।

ভয় পেলে না কি? ও কিছুই নয়,—
পাখা ঝট্‌পটে বনের পাখী,
অতিথি বরণে ঝিল্লীরা বুঝি
একতানে ঐ উঠেছে ডাকি'।
ভূত মান' না কি? ভূত কি আছে রে?
ভূত থাকিলে ত ভালোই হ'তো,
তাদের নিয়েই নব সংসার
গড়ে' তুলিতাম মনের মত।

ডাকাতের ভয় ? ডাকাতো মানুষ,
থাকিলে তাদের সাথেই বেশ
হইতে পারিত মরমের কথা,
দিতাম না বাছা তোমারে ক্লেশ।

অনেক কথাই জানাতে পরাণ
আকুলি বিকুলি করিছে কত,
মাথায় আমার জটাজূট দেখে
ভেবোনা মৌন আমার ব্রত।
ধ্যানী মুনি নই, শীর্ষে আমার
নয়ক' কঠোর তপের ঘটা,
তৈলবিহনে ধূলায় বালিতে
রুখু চুলে মোর বেঁধেছে জটা।
যাক্, বাজে কথা! কেন ডাকিলাম ?
দাঁড়ায়ে রয়েছ কৌতূহলী!
ওখানে একদা হাজার ভক্ত
দাঁড়াত নিত্য কৃতাঞ্জলি।
একটি মানুষে কাছে আনিবারে
কত সাধাসাধি করছি আজি,
ভেবে দেখ দেখি নৌকা বাঁধিতে
কত গররাজী তোমার মাঝি।
শত শত বাকী অর্ঘ্য বয়েছে
উঠেছে নিত্য জয়ধ্বনি,
গঙ্গার ঘাটে যাত্রী বহিয়া
নাচিত দুলিত কত তরণী।
বাদ্য-ঘটায় উদ্বেল বায়ু
ছিল তার গতি ধূপমোদিত,
হিরণ মূল্যে বিক্রীত হতো
মোর দেবতার চরণামৃত।

চারিপাশ ঘিরি ছিল জনপদ
ধনসম্পদে আঢ্য সুখী,
তাহার চিহ্ন—ভয় নেই বাছা
একটা শিয়াল দিতেছে উঁকি—

ঐ জনপদে আছিল যাহারা
তারা ছিল মোর সেবকদল,
ভাবিত তাহারা তাদের ভাগ্য
মোর মহিমা বা কৃপার ফল।
ভাবিত তাহারা,—আহা ব্যথা পেলে ?
বেলকাঁটা বুঝি বিঁধিল পায় ?
আহা মিছামিছি এখানে ডাকিয়া
কত বেদনাই দিনু তোমায়।—

হায় মূঢ় নর,—কোথা তোরা আজ
আমি ত তেমনি রয়েছি খাড়া,
আমার বুকের শিবলিঙ্গটি
আজিকে সেবক পূজারীহারা।
হায় মূঢ় নর,—দেবতা, দেউল
তোদেরি সৃষ্টি সুখের দিনে,
তোদেরি ভাগ্যে আমার ভোগ্য,
মহিমা যা কিছু তোদেরি ঋণে।
মিছা কথা,—মোরা তোদেরে বাঁচাই,
তোদেরি কৃপায় আমরা বাঁচি,
মানুষেরি কৃপালাভের আশায়
মরণ দশায়ও বাঁচিয়া আছি।

জরা অনশনে এ কণ্ঠ ক্ষীণ
একটুতে অবসন্ন হই,
ভাবিয়াছিলাম অনেক কথাই
বলিব, বলার শকতি কই ?
আর না, তোমায় রাখিব না ধ'রে,
অনেক কথা ত বলাই হ'লো,
যাচ্ছ নগরে ? আমার কাহিনী
পুরা-পরিষদে বারেক ব'লো।
দরদী পাইলে বলিও তাহারে
ভিক্ষা আমার এই কেবল,—
শিবরাত্রিতে একটি সলিতা,
বোশেখে দু'কোশা ঝারার জল।

ম্যাডাগাস্কার

শ্রীভারতকুমার বসু

আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সাগর-তীর থেকে ২১৫ মাইল দূরে ম্যাডাগাস্কার অবস্থিত। সুদূর অতীতে এই দেশটাকে গ্রীক এবং আরবেরা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু দেশটির 'ম্যাডাগাস্কার' এই নামকরণ করেন মিঃ মার্কো পোলো ১৩শ শতাব্দীতে। মার্কো পোলো ঐ দেশটাকে জীবনে কিন্তু কোনো দিনই দেখেন নি।

১৬শ শতাব্দীতে পোর্ত্তুগীজরা ম্যাডাগাস্কারে এসে সেখানে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ফরাসীরা সেখানে হাজির হ'য়ে, পোর্ত্তুগীজদের ধর্ম্মযাজকদের দেশ থেকে তাড়ালেন। এইতেই হ'লো যত অনিষ্টের সূত্রপাত। ফ্রান্স ক্ষেপে গেল। এবং তার পরই যুদ্ধ বাধলো ফরাসী ও ম্যাডাগাস্কারবাসীদের মধ্যে। এই যুদ্ধ অনেক বছর ধ'রে চ'লেছিল। শেষে, ১৮৯৫ সালে জেনারেল্ গ্যালিনির দ্বারা ম্যাডাগাস্কার পরাজিত হয়।

ম্যাডাগাস্কার দ্বীপটী আজকাল একজন ফরাসী বড় লাটের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় রাজকীয় নিম্নতর কাজে নেটিভদের নিযুক্ত করা হ'য়েছে। তবে সেখানকার উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী মাত্রেই ইয়োরোপীয়।



হাসিমুখ

উপনিবেশ নষ্ট ক'রে দিলে। এইভাবে সেখানে ইয়োরোপীয়রা এসে বাসা বাঁধতে লাগলো। ম্যাডাগাস্কারের নেটিভ রাজা প্রথম রাদামাও কোনো আপত্তি করেন নি। বরং তিনি ইয়োরোপীয়দের পছন্দ ক'রতেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি উৎসাহ দেখাতেন। কিন্তু ১৮২৮ সালে তাঁর মৃত্যু হ'তেই, তাঁর রাণী রাণাভালোনা সিংহাসনে উঠে প্রথমেই খৃষ্টান

ঐ দ্বীপটীর মধ্য-প্রদেশগুলিতে আছে—অনেক পর্ব্বত শ্রেণী। কোনো কোনো পর্ব্বতের উচ্চতা ৮০০০ ফিটেরও বেশী। সাগর তট থেকে উক্ত প্রদেশের ভূমির উচ্চতা প্রায় তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফিটের মধ্যে। সেখানকার সাধারণ দৃশ্য কিন্তু নিতান্তই একঘেয়ে। তার একমাত্র কারণ, প্রকৃতি সেখানে সৌন্দর্য্যের আশীর্ব্বাদ

বর্ষণ করেন না। সেখানে বছরে মাত্র দুটী ঋতুর আত্মপ্রকাশ হয়—গ্রীষ্ম ও শীত। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম এবং মে থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত শীত। গ্রীষ্মের সময়ে সেখানকার জল-হাওয়া সমস্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর থাকে। পশ্চিম-প্রদেশগুলি ত দারুণ গ্রীষ্ম-প্রধান এবং জ্বরের ডিপো। পূর্ব্ব-প্রদেশ-



ধানের ক্ষেতে মাটী কাটছে



নৃত্য—(১)



ছড়ির তারে ছড় টেনে সুর বাজাচ্ছে

গুলিও যার-পর-নাই 'ড্যাম্প'; সারা বছর ধ'রে প্রচুর বৃষ্টিপাত-ই এর কারণ।

পশ্চিম-প্রদেশগুলির জমি মাঝারি-রকমের উর্ব্বরা। কিন্তু ...ও কিছু পরিমাণে দেখা দেয়। শীতের সময়টী সেখানে ধান ও ফল-আবাদের উপযোগী। শীতকালটীকেই সেখানকার ইয়োরোপীয়রা পছন্দ করে বেশী। এই সময়েই

সেখানে বৃষ্টিপাত হয় বছরের মধ্যে অল্পদিনই। এইজন্য, সন্তোষজনক চাষ-আবাদ যা-কিছু সেখানে হয়, তা হয় সাগর-তীরস্থ স্থানে।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তেও বৃষ্টির চিহ্ন দেখা যায় কদাচ। কাজেই, সেখানে প'ড়ে আছে কেবল ধূ-ধূ বালুর মরুভূমি। সূর্য্যের প্রখর তাপে এবং গরম হাওয়ায় দিনের বেলা সে স্থান যেন ঝ'ল্‌সে যায়। আবার, রাত্রে ঠিক উল্টো ভাবে হঠাৎ একেবারে ঠাণ্ডা হয়।

ম্যাডাগাস্কারের প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে—তার বন বন্ধনী (forest-belt)। বাস্তবিকই সমুদ্রতীরের কাছ পর্য্যন্ত



টুপী তৈরী ক'রছে

অজস্র বনরাজি যেন ম্যাডাগাস্কার-দেশটাকে বেঁধে রেখেছে। উত্তর-পূর্ব্ব দিকের বনগুলিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় সেখানকার গাছ-পালা বাড়তে থাকে দ্রুতগতিতে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ওই সব বনে মাটীর গভীরতা খুব বেশী নয়। তা হ'লেও, ওই মাটীতেই জন্মায় নানারকমের বর্ণ-বিচিত্র ফুল ও ফলের তরু-লতা। আবলুস-কাঠও পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। ব্যবসায়ীরা এই কাঠের প্রতি লোভ রাখেন যার-পর-নাই বেশী, কারণ, হিন্দু ক্রেতারা অন্যান্য কাঠের চেয়ে এই কাঠ বেশী মূল্যেও কিনতে অত্যন্ত উৎসুক হ'য়ে থাকেন।

ম্যাডাগাস্কারে বড়-বড় জন্তু একেবারে নেই। সিংহ, জেবরা, জিরাফ, হাতী ইত্যাদির সেখানে একান্ত অভাব। সেখানে বড় জন্তুর আসন কায়েমী ক'রে আছে—একমাত্র বন্য-শূকর। কিন্তু সেখানকার বুনো জন্তুদের মধ্যে সকলের চেয়ে বিশেষ জন্তু হচ্ছে—"লেমার্" (lemur)। এরা যখন মুখে এক রকম অদ্ভুত শব্দ ক'রে এক গাছ থেকে আর-এক গাছে লাফিয়ে যায়, তখন তা দেখলে যে-কোনো সাধারণ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ধারণা ক'রবেন যে, তারা বানর এবং কাঠ-বিড়ালের জগা-খিচুড়ী-পাকানো নতুন এক জীব বিশেষ।

সেখানকার আরও একটী অদ্ভুত জন্তুর



নৃত্য—(২)

নাম "আই-আই" (aye-aye)। পৃথিবীর আর-কোথাও এ-রকম জন্তু দেখা যায় না। এরা নিশাচর। কিন্তু এদের শিকার করা হয় কদাচ; কারণ, সেখানকার লোকদের এই রকম একটী সংস্কার আছে যে, যে-ব্যক্তি ঐ জন্তুকে হত্যা ক'রবে, এক বছরের মধ্যে সেও ম'রবে।

সেখানকার নদীগুলিতে কুমীরের দল রাজত্ব করে। কুমীরগুলো দস্তুরমত দীর্ঘ। নদীতে নামতে হ'লে, নেটিভরা ত ভয়েই সারা হয়।

ম্যাডাগাস্কার-বাসীরা মালায়ো-পলিনেশিয়ান্‌দের বংশধর। এই বংশধরদের মধ্যে সম্প্রদায়-বিভাগ আছে

অনেকগুলি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আকারে এবং প্রকারে ভিন্ন। কিন্তু তবুও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এদের কাহারও ভাষার কোনো প্রভেদ নেই।

প্রধান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে হোভা, শাকালাভা, বেট্‌সিলিয়ো এবং মাহাফালি—এই কয়টীর নাম উল্লেখ-যোগ্য। হোভা-সম্প্রদায় বাকীগুলির তুলনায় সুশ্রী-তনু।



ধীবর-রমণী

তারা শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমানও বেশী। চাষের কাজে তারাই অধিকতর সিদ্ধহস্ত।

শাকালাভা সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ। তারা অহঙ্কারী এবং স্বাধীনচেতা লোক। যুদ্ধ তাদের প্রিয় বস্তু। শিল্পোন্নতির পথে বাধা জানাই তাদের কাজ। তাদের মধ্যে একদল লোক আছে, যারা ধীবর এবং নাবিকের কাজ ক'রে দিন কাটায়। সাঁতারে তারা ওস্তাদ। জমি কিম্বা জল—যে-কোনো স্থান-ই তাদের কাছে বাড়ীর সমান।

মাহাফালি-সম্প্রদায়ের লোকেরা দক্ষিণ-প্রদেশে বাস করে। তারা অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় জাতি। যুদ্ধই তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা। প্রতিবেশীদের ঘরে লুঠ-তরাজ ক'রে তারা আমোদ পায়।

বেট্‌সিলিয়ো-সম্প্রদায়ের লোকেরা হচ্ছে ম্যাডাগাস্কারের কর্ম্মকার। লোহার কাজে,



জননী

এবং ছুরী-কাটারী ইত্যাদি তৈরীর ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট দক্ষতা আছে। এই দক্ষতার বিনিময়েই তারা তাদের জীবিকা অর্জ্জন করে।

ম্যাডাগাস্কারের লোকদের যথেষ্ট বুদ্ধিচাতুর্য্যের জন্য তারা অনেকেরই অনেক প্রশংসা পায়। তারা নকল

নৌকা ব'লতে তিরিশটা কিম্বা চল্লিশটা বাঁশকে বোঝায়। এই বাঁশগুলিকে লতার সাহায্যে তারা কোনো প্রকারে



কেশ-বিন্যাস



ডুলি-বাহক

বাঁধে। এইটাই তাদের নৌকা। এ-হেন নৌকা এম্‌নি মজবুত যে, মালপত্তর সমেত দুটী কিম্বা তিনটী লোক তার উপর উঠলেই, তিনি আধা-ডুবন্ত হ'য়ে পড়েন। ঐ নৌকায় একটী বিভক্ত বাঁশ, দাঁড়ের কাজ করে। মাত্র একশ' গজ দীর্ঘ একটী নদীতে এক ঘণ্টায় চারবারের বেশী ঐ নৌকায় 'ফেরী' করা চলে না। দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলের লোকেরা কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান। তারা গাছের গুঁড়ি বেঁধে নৌকা তৈরী ক'রতে জানে। এই নৌকা দৈর্ঘ্যে হয় ৩০ ফিট, এবং প্রস্থে হয় ৮ ফিট। এই রকম নৌকা এক সময়ে ৫০ জন যাত্রীকে নিয়ে যেতে পারে।

সেখানে ডোঙ্গা তৈরী হয়—গাছের গুঁড়ি ফাঁপা ক'রে। এগুলি সাধারণতঃ লম্বায় হয় প্রায় তিরিশ কিম্বা চল্লিশ ফিট। এদের গতি বেশ দ্রুতই।

উত্তর-পশ্চিম উপকূলে মৎস্য শিকারের সুবিধা আছে। শাকালাভা জাতীয় লোকেরা নৌকায় পাল তুলে ঐ স্থানে মাছের সন্ধানে যায়।

ম্যাডাগাস্কারের লোকেরা খুবই সংস্কার-প্রবণ জাতি। কথায়-কথায় তারা গণৎকারের শরণাপন্ন হয়। কোনো প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ হবার আগেই গণৎকারকে ডেকে আনা চাই-ই। গণৎকারের ভাগ্য-গণনার ব্যাপারটী বেশ-একটু নতুন ধরণের। প্রথমেই তিনি একটা মাদুর পাততে ব'লবেন। তার পর সেই মাদুরের উপর কতকগুলি ঘর কাটবেন। সেই সব ঘরে বিভিন্ন সংখ্যার মটর রাখবেন। তার পর তিনি সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কি-সব মন্ত্র প'ড়বেন। এই কাজ শেষ হ'লেই তিনি প্রকাশ ক'রে বলবেন যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জ্ঞাতব্য শুভ, কি, অশুভ।

সেখানকার ডাক্তারদের কাছে লোকের ভীড়ও একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ডাক্তাররা রোগ সারাতে পারে খুব অল্পই। কিন্তু তবুও লোকেরা পঙ্গপালের মতো ছোটে তাঁদের কাছে প্রত্যহই। ডাক্তারদের অর্জ্জিত পুণ্য আছে, নিঃসন্দেহ!

সেখানকার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের বিভিন্ন প্রথা

বর্ত্তমান আছে। কোনো-কোনো জাতি অতি দূর-আত্মীয়কেও বিবাহ করে না। যদি করে, তা হ'লে একটা সামাজিক গণ্ডগোল হবেই। আবার কখনো-কখনো এমনও হয় যে, যথারীতি দেখা-শুনোর পর বিবাহ হ'য়ে গেছে। কিন্তু বিবাহের পরই যদি আগে থেকেই কোনো আত্মীয়তার সম্বন্ধ বেরিয়ে পড়ে, তা হ'লে ওই বিবাহ তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে যাবে। এই বিবাহ-বিধির একবার কিন্তু পরিবর্ত্তন হ'য়েছিল। সেবার এ্যান্টিমেরিনা জাতীয় এক রাজা তাঁর এক বোন্‌কে বিবাহ ক'রেছিলেন। এর কারণ শোনা যায় যে, রাজ-পরিবারের মধ্যে শুচিতা রক্ষা করাই ছিল রাজার উদ্দেশ্য।

হোভা-জাতীয় লোকেরা তাদের ছেলেদের জন্য নিজেরাই পাত্রী পছন্দ করে। কিন্তু শাকালাভা-জাতীয় যুবকেরা ঐ ব্যাপারে পিতার রুচির ধার ধারে না। তারা নিজেরাই নিজেদের ক'নে পছন্দ করে। কাজেই, তাদের বিবাহ-প্রথাটী অনেকটা যেন ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন, এ কথা ব'ললে ভুল বলা হবে না। অধিকাংশ লোকের মধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদ চল্‌তি আছে। সেখানকার বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে একটা খুবই সোজা ব্যাপার। স্বামী স্পষ্ট ক'রেই স্ত্রীকে বলে যে, এবার থেকে আর পরস্পরের দাম্পত্য-সম্বন্ধের দরকার নেই; সুতরাং—



মৃৎ-শিল্প ও শিল্পী

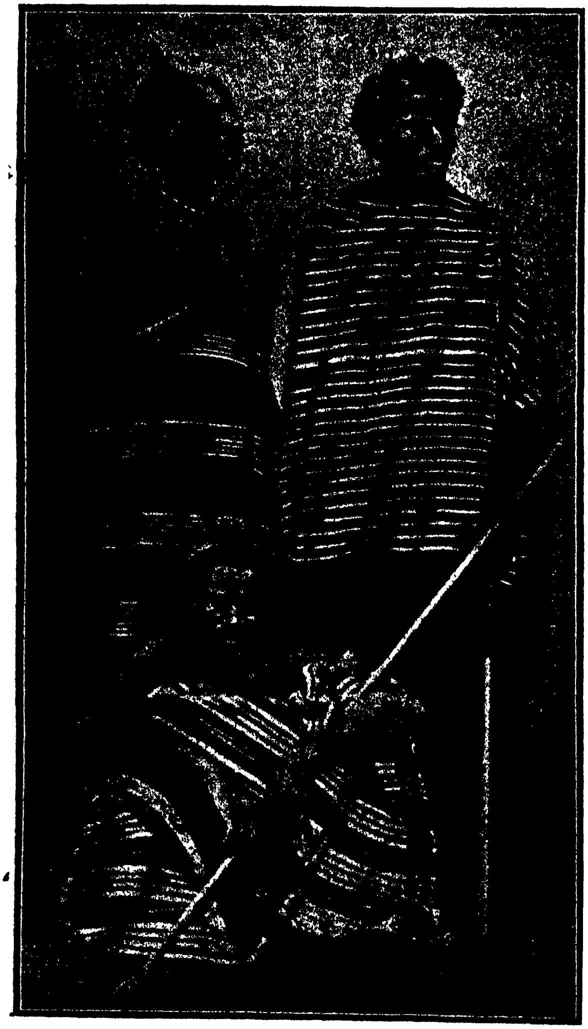
সুতরাং দুজনেই দুজনকে সেলাম ঠুকে তফাৎ হয়।

বিবাহের মতো সেখানে মৃতদেহ কবরস্থ করার প্রথাও বিভিন্ন। কেউ কেউ মৃতদেহকে নির্জ্জন স্থানে কবরস্থ করে, আবার, কেউ-কেউ তা করে—নিজেদের গ্রামের ভিতরেই। কেউ-কেউ মৃত্যুর ঠিক পরেই মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করে; আবার, কেউ-কেউ অপেক্ষা করে ঠিক ততদিন পর্য্যন্ত, যতদিন পর্য্যন্ত না মৃতদেহ রীতি-মত প'চে যায়। সাধারণতঃ সেখানকার অধিকাংশ লোকই মৃতদেহকে কবরস্থ করে—



ম্যাডাগাসি-মেয়ে

নিজেদের বাড়ী থেকে বেশ কিছু দূরেই। মৃতদেহকে লম্বা-লম্বা কতকগুলি বাঁশে বাঁধা হয়। তার পর সেটাকে নিয়ে সমাধি-ক্ষেত্রের দিকে যাওয়া হয়। শব-যাত্রীদের যাবার পথে যদি রাত্তির হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে কোনো রাত্রি-নিবাসের দেয়ালে বাঁশে-বাঁধা শবদেহকে হেলিয়ে রেখে, সকলে ঐ নিবাসে রাত কাটায়।



যুদ্ধ-প্রিয় পাহাড়ী লোক

কবর-ক্ষেত্রগুলিকে সেখানকার লোকেরা দস্তর মত ভয় করে, যেহেতু, তাদের এই রকম ধারণা যে, ঐ সব স্থানে মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়। কাজেই, তারা সেখান-দিয়ে-যাওয়া পথিকদের ঘাড় না ম'টকে আর যায় কোথা! মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খুব ধূম-ধাম ক'রেই সম্পন্ন হয়। দীয়তাং-ভূজ্যতাং-এর ব্যবস্থা হয় প্রচুর। যথা:—অনেকগুলি বলদ বলিদান করা হয় এবং পেয়েরও সুবন্দোবস্ত হয়।

প্রায়ই, পাথর কিম্বা কাঠ দিয়ে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন তৈরী করা হয়। শাকালাভাদের কবর-ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যেই প্রচুর বলদের শিং পুঁতে রাখা হয় এবং চারিদিক পাথরে ঘিরে রাখা হয়। মৃত দেহের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির অর্থরাশিও কবরস্থ করা হয়।

হোভা-জাতীয় লোকেরা কিন্তু খোলা জায়গায় মৃতদেহ কবরস্থ করে না; তারা তা করে—গুহার মধ্যে। বেট্‌সিমিসারাকা জাতীয় লোকেরা ফাঁপা করা কফিনের মধ্যে মৃতদেহ রাখে। সে কফিন্‌কে ফিন্‌ই বলা উচিত নয়, এম্‌নি তা বিশ্রী। তাকে ঢেকে রাখে একটা সীসের চাদর। এ-হেন কফিনের ধারণা ক'রতে পারবেন—একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা স্বচক্ষে ডোঙ্গা দেখেছেন। ডোঙ্গার চেয়ে তা কোনো অংশেই শ্রেষ্ঠ নয়। যাই হোক, শবদেহ কিন্তু কবরস্থ করা হয় না। রীতি অনুযায়ী, গরীবলোকেরা অনাবৃত মাটীর ওপর, এবং ধনীলোকেরা মঞ্চের উপর মৃতদেহ রেখে দেয়।

বেট্‌সিলিয়ো জাতীয় লোকেরা এক প্রকার সাপ্‌কে বাড়ীর লোকের মতোই ব্যবহার করে। তারা মনে করে যে, ওই সব সাপ হচ্ছে—মৃত ব্যক্তিদের আত্মার-ই রূপান্তর। এইজন্য সাপদের প্রতি তারা শ্রদ্ধাও দেখায় কম নয়! কিন্তু এই সব সাপ বা সরীসৃপ কোথা থেকে আসে? এর একটু ইতিহাস আছে:—

কোনো লোক মারা গেলে, তার মৃতদেহকে বাড়ীতে রাখা হয়, যতক্ষণ না তা প'চে গ'লতে আরম্ভ করে। ওই গলিত তরল পদার্থের খানিকটা অংশ একটা পাত্রে নেওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ পাত্রে বড় বড় পোকা জন্মায়। তখন ঐ পাত্রের মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়; কেবল একটা ছিদ্র-পথে একটা লম্বা কাঠি এমন ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে পোকাগুলো ওই কাঠি বেয়ে' বেরিয়ে আসতে পারে। পরে, ঐ পাত্রটাকে পারিবারিক সমাধি-ক্ষেত্রে

রেখে আসা হয়। কিছুদিনের মধ্যে কতকগুলি সরীসৃপ ঐ পাত্র থেকে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের মধ্যে এই রকম সরীসৃপ দেখলেই, তাকে রেশমের কাপড় ও খাবারের অঞ্জলি দেওয়া হয়। এই দেওয়াতেই প্রকাশ পায় যে, অঞ্জলি দাতা হচ্ছে সরীসৃপের আত্মীয়।

প্রধানতঃ সেখানকার ধর্ম্ম হচ্ছে পিতৃ-পুরুষের পূজা। অবশ্য সেখানকার দেবাদি-দেবও আছেন। তিনি হচ্ছেন জানাহারি। কিন্তু তিনি কারুর অনিষ্ট ক'রতে পারেন না এবং মানুষের ব্যাপারে তাঁর কোনো হাতও নেই। কাজেই, তিনি আমল-ও পান না। যে-দেবতার দ্বারা কাজ হয় না, সে-দেবতার পূজা ক'রে লাভ কি?—এই রকমই সেখানকার মনোবৃত্তি।

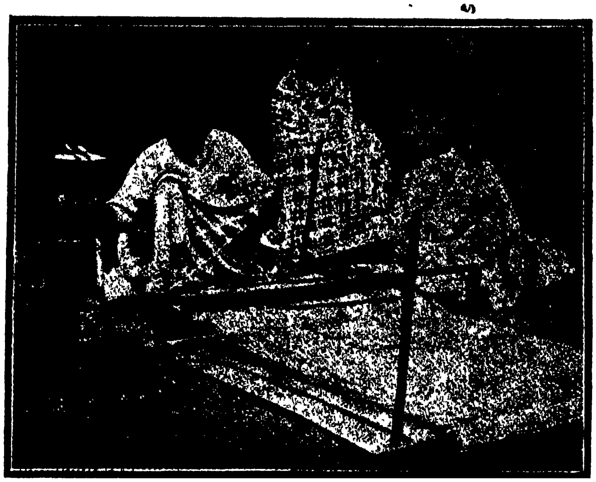
সেখানকার এক প্রকার কু সংস্কারের কথা বলা বিশেষ দরকার। সংস্কারটীকে কতকগুলি "বাধা"র সমষ্টি ব'ললে ভুল বলা হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জল তুলতে যাবার সময় কোনো লোককে তার নাম ধ'রে ডাকায় বাধা আছে, কারণ, লোকটা তাতে নিশ্চয়ই ম'রবে। কাজেই, তাকে বাঁচাতে হ'লে, তার উদ্দেশ্যে অভিসম্পাত উচ্চারণ ক'রে, তার দুরদৃষ্টকে খণ্ডন ক'রতে হবে।

দাঁড়িয়ে, শুয়ে, কিম্বা মাথায় টুপী প'রে যাওয়া, একাধিক বড় চাম্‌চে পরস্পরের উপর আড়াআড়ি রাখা, চাম্‌চে দিয়ে মারা, এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় ফল ছুঁড়ে দেওয়া, খাবার সময়ে হাত ঢেকে হাড়ের ভিতর থেকে মজ্জা চুষে বের করা,—ইত্যাদি ব্যাপারেও 'বাধা' আছে। এমন কি, জোরে হাসা, টুপী পরা, আর্শীতে মুখ দেখা, দাঁত মাজা, ছাতা-ব্যবহার এবং সাঙ্কেতিক বাঁশী-বাজানোর মধ্যে 'বাধা' আছে অগুন্তি।

চাল সেখানকার প্রধান খাদ্য। শাঁকআলুও লোকেরা খুব ভালবাসে। দুধের চেয়ে মাছের ঝোলের আদর সেখানে

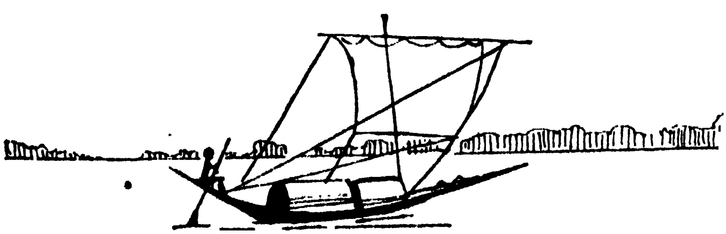


কেশ-বিন্যাসের ফ্যাসান



তাঁত

সেখানে মোট ২৫০,০০০ বর্গমাইল জায়গা আছে। ম্যাডাগাস্কারের দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার মাইল, এবং প্রস্থে তিনশ' মাইল।



ব্রতচারী

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

(এক)

সহরের সীমান্তে একটি পল্লী। পল্লী প্রান্তে একটি নদী। নদী তীরে খোলা মাঠ। এক শত বিঘা জমির বেড়ের মাঝখানটায় খানকয়েক ঘর। ঘরগুলির সুমুখে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ-খানি দূর্ব্বাদলের আচ্ছাদনে শ্যামল-শ্রী। প্রাঙ্গণের দুধারে পুষ্পোদ্যান—সুরচিত, সুসজ্জিত। উদ্যান ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে গোয়াল-ঘর। গোয়ালে পাঁচ সাতটা গাভী—বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, দুগ্ধবতী। গোয়ালের আশে-পাশে শাক সব্জী, তরি-তরকারীর বাগান। বাড়ীর বেড়ের ধারে-ধারে নানান্ রকমের ফলের গাছ।

গোয়াল-ঘর ও রান্না ঘর ভিন্ন আর সব কয়খানি ঘরই খড়ের ছাউনীর। কিন্তু নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে বেশ সুদৃশ্য। একখানি ঘরে বাড়ীর মালিক থাকেন। সে ঘরের ভিটি পাকা। পাক ভিটির মেঝের উপর ফরাসের বিছানা পাতা। ভিতরে কোথাও বিলাস-বিভবের চিহ্নই নাই। কিন্তু সব এম্‌নিভাবে সাজানো-গোছানো, দেখেই মনে হয়—ঘরে যিনি থাকেন তিনি সুরুচি-সম্পন্ন। আর একখানি ঘর—এখানা আয়তনে বড়। দুটি কামরা—বেশ প্রশস্ত। একটি অতিথি অভ্যাগতের জন্য, আর একটি বাড়ীর লোকজনের থাক্‌বার। লোকজনের মধ্যে মালিকের তিনটি চাকর, আর জন দশেক অনাথ ছেলে। চাকর তিনটি সেই সম্প্রদায়েরই লোক যাদের বুকের উপর অস্পৃশ্যতার জগদ্দল পাষাণ চাপিয়ে দিয়ে সমাজ-প্রধানেরা অচল করে' রেখেছে। অনাথ ছেলেদের মধ্যে একটি মুচি, একটি মেথর, আর কয়টি কোন্ জাতের কেউ জানে না। আর দুখানি ঘরও বড়। একখানি রোগীদের বস্‌বার, আর একখানি নৈশ-বিদ্যালয়ের ছেলেদের পড়্‌বার।

(দুই)

বাড়ীর মালিক ডাক্তার সুবিমল বসু। যুবাপুরুষ, বেশ বলিষ্ঠ গঠন, সুস্থ, সুশ্রী! চোখে-মুখে সংযম-নিষ্ঠার জ্যোতিঃ সুস্পষ্ট। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। বছর কয়েকের মধ্যেই সহরের একজন বড় চিকিৎসক বলে' সুনাম হয়েছে।

বৈশাখের বেলা শেষে। গোধূলির লালিমায় আকাশ রাঙা। রঞ্জিত গগনের সে রক্তিম ছবিটি নদী-জলে প্রতিফলিত। তীরে বসে' দুই বন্ধু। সুবিমল কোনো দিনই সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরবার অবসর পায় না। বন্ধু আজ তার গৃহে অতিথি। তাই বেলা-শেষেই বাড়ী ফিরে' এসেছে।

"তোমার সুখ্যাতি সহরের বাইরে গাঁয়ে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। সহরে তোমার ব্যবসা ত একচেটে। প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ আছে বলে' ত শুনলুম না।" বন্ধুর এই প্রশংসায় সুবিমল নিরুত্তর। বন্ধু জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"টাকা-পয়সা সব কি কর?"

"কি আর কর্‌ব, খরচ করি।"—হাসিমুখে সুবিমল এই উত্তর দিলে। বন্ধু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"সব টাকা?"

"প্রায় সবই।"

"হাজার টাকার উপরে ত তোমার আয়।"

"ঐ রকমেরই একটা কিছু হবে। হিসেব-টিসেব বড় একটা কিছু রাখি না। সময়ও হয়ে ওঠে না।"

বন্ধু আবার বললেন—"এত টাকা কিসে তাহ'লে খরচ কর? বাড়ীতে ত তোমার টাকা-পয়সার অভাব নেই। কিছু দিতেও হয় না।"

"গরীব রোগীদের ঔষধ বিতরণে অনেক টাকা যায়। অনেকের পথ্য-খরচও চালা'তে হয়। তার পর চাষী-মজুর আর অস্পৃশ্য জাতের ছেলেদের জন্যে নৈশ-বিদ্যালয় খুলেছি, তাতেও খর্‌চা কম হয় না। মাসে শ'তিনেক টাকা করে জমাচ্ছি। একটা সেবা-সদন প্রতিষ্ঠা কর্‌ব। পঞ্চাশজন রোগীর স্থান সঙ্কুলান হতে পারে, এমন একটা পাকা বাড়ী তৈরী হবে। সকল জাতের গরীব রোগীদের বিনি-খর্‌চায়

চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত থাক্‌বে। জমানো টাকাটা ঐ কাজেই লাগাব।"

"শুধু তোমার ঐ জমানো টাকায় কি আর ঐ রকমের একটা বড় প্রতিষ্ঠান গড়্‌তে পার্‌বে?"—বন্ধুর প্রশ্নটির জবাবে সুবিমল বল্‌লে—"তা'ত হবেই না। সহরের কয়েকজন সহৃদয় ধনী এ কাজে সাহায্য কর্‌বেন বলে' কথা দিয়েছেন। প্ল্যান্ হয়ে গেছে। পাশেই আরো জমি নিয়েছি। তোমায় সব দেখাব। আস্‌ছে শীতেই কাজ আরম্ভ হবে।"

"বিয়ে থা কর্‌বে না?"

"সে কাজের আর অবসর কই?"

"ওতে আবার অবসরের দরকার হয় না কি?"

"হয় না! বল কি?" এর উত্তরে বন্ধু বল্‌লে—"না ভাই, তাম্‌সা নয়। তোমার বাবা-মা আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁদের অনুরোধে তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি শুধু এরই জন্যে।"

"কেন, বাংলাদেশে কি ঘটকের অভাব হয়েছে, যে, পশ্চিমাঞ্চল থেকে তোমায় ডেকে' আন্‌তে হবে। আচ্ছা, তুমি এখন কত মাইনে পাচ্ছ?"

"সাড়ে চার শ'।"

"প্রফেসারের কাজে বেশ আরাম। আমাদের ডাক্তারী ব্যবসার মতন এত দায়িত্ব আর এত ভাবনা-চিন্তাও নেই।"

বন্ধু বলে' উঠ্‌লেন—"ওসব কথা রেখে' দাও। কাজের কথায় এস। সত্যি বল, কি স্থির করেছ। আমি ত চিঠিতেও তোমায় সব কথা লিখেছি।"

"হ্যাঁ, তা' ত লিখেছই। আমি ত অনেক দিন থেকেই স্থির করেছি, বিয়ে কর্‌ব না।"

"কেন?"

"একটা বন্ধনের মাঝে জড়িয়ে পড়্‌লে জীবনের আদর্শটিকে সার্থক করে' তুল্‌তে পার্‌ব না।"

"নারীকে তা'হ'লে তুমি শ্রদ্ধা কর না! নারীর শক্তিতেও তোমার বিশ্বাস নেই!" বন্ধু কঠোর স্বরেই ঐ কথা কয়টি বল্‌ল।

তখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ধরার বুকে নেমে আস্‌ছিল। কথার কোনো জবাব না দিয়েই সুবিমল 'চল, যাই' বলে' উঠে' দাঁড়াল। বল্‌লে—"ছেলেরা সব এতক্ষণ পাঠশালে এসে গেছে। পড়াতে হবে তাদের।" এই বলে' বাড়ী চল্‌ল; বন্ধুও সাথে। পথ চল্‌তে চল্‌তে সুবিমল বল্‌তে লাগ্‌ল—"নারীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা—নারী শক্তিতে আমার বিশ্বাস গভীর। সে শ্রদ্ধা বিশ্বাস তোমাদের মত বিবাহিত লোকের—যাদের বেশীর ভাগই নারীকে বিলাসের বস্তু বলে' মনে করে—তাদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের চেয়ে সত্যিকার। তাদের শ্রদ্ধা মুখের, আমার শ্রদ্ধা অন্তরের।" সুবিমলকে ভাবোদ্বেল দেখে' বন্ধু এবার কোমল কণ্ঠে বল্‌লে—"আমার কাছে, ভাই, নারী কিন্তু রহস্যময়ী। বিশ্ব কবির ই কথা—'রমণীরে কেবা জানে, মন তার কোন্‌খানে।"

"হতে পারে তোমার কাছে নারী একটা হেঁয়ালী। তা আর আশ্চর্য্য কি।"

বন্ধু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—"আচ্ছা, আমি যদি নারীকে কবির ভাষায় বলি—'অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা।"

"বল্‌তে পার।"—সুবিমল শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে।

(তিন)

বাড়ী পৌঁছে' সুবিমল দেখ্‌তে পেল নৈশ-বিদ্যালয়ের ছেলেরা সব পাঠ-গৃহের আঙিনায় ছুটোছুটি কর্‌ছে। তাকে দেখে' ছোট ছোট ছেলেগুলি লাফিয়ে তার পাশে জড় হল। কেউ তার হাত ধরে' নাচ্‌তে নাচ্‌তে বল্‌ল—"গুরুজি! চল, আমাদের পড়াবে চল।"

বৈশাখী-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চাঁদের আলো ম্লান, নিষ্প্রভ। মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ার ঝাপ্‌টা জমাট-বাঁধা মেঘগুলোকে যখন উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন চাঁদের ম্লানিমা দূর হয়ে আলোক-রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে ধরার গায়। আবার বাতাসের নাচন যখনই বন্ধ হয়, আকাশের চাঁদিমা, মেঘান্তরালে তার সলাজ মুখটি লুকায়। চন্দ্র ও মেঘের এই কোলাকুলি, আলো-বাতাসের গলাগলি—প্রকৃতির লীলায়িত গতি-ভঙ্গী সুবিমল মুগ্ধ-নেত্রে নিরীক্ষণ কর্‌ছিল। আর প্রাণের মাঝে তার জাগ্‌ছিল বন্ধুর কণ্ঠোচ্চারিত কবি-বাণী—"অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা।" আকাশের পানে চেয়ে এম্‌নি তন্ময় সে, কি যে বল্‌ছিল পড়ুয়া ছেলেরা তা তার কানে পৌঁছয় নি। ছোট ছোট ছেলেরা অভিমানে মুখ ভারি করে' বল্‌লে—"আম্‌রা চলে' যাই। গুরুজী রাগ করেছে।" এই বলে' ছেলেগুলো সুবিমলের হাত ছেড়ে দিয়ে যখন তার কাছ

থেকে সরে' গেল, তখন তার দৃষ্টি সেদিকে পড়ল। সুবিমল ছেলেদের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত বুলিয়ে কত আদর করে' বল্লে—"কি রে, হলো কি তোদের?" "তুমি কথা কও না যে। রাগ করেছ। আমরা বাড়ী চলে' চাই।"—ছেলেগুলো আরও কত কি বল্তে লাগ্ল। সুবিমল তাদের সেধে-সুধে বল্লে—"নারে রাগ ত করিনি। চল্, পড়্‌বি চল।" এই বলে' ছেলেদের নিয়ে পাঠ-গৃহে চাটাই পেতে' বসে' গেল। কিছুক্ষণ পড়া হল। কিন্তু সেদিন পড়া জমেনি ভালো। সুবিমল ছিল উন্মনা। আর এদিকে বাইরে দুর্য্যোগের লক্ষণ প্রকট। আকাশের গায় বিজ্‌লী-চমক, ঘন ঘন দেয়া গরজন, ঝড়ো হাওয়ার বেতাল ছন্দের নাচন—যেন কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব লীলার পূর্ব্ব-আয়োজন। সুবিমল ছেলেদের বল্লে—"ঝড় আস্‌ছে, চল্, তোদের এগিয়ে দি।" বলে' ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।

(চার)

ফিরে' এসে সুবিমল বন্ধুকে বল্‌ল—"চল, খেতে যাই। তোমায় বল্‌তে ভুলে' গেছি, আমার এখানে জাত্‌-বিচার নেই। সবারই সাথে এক পংক্তিতে বসে' খেতে হবে কিন্তু। আমার এখানে তুমি বামুন-পণ্ডিতের বংশধরও যা, আর মুচি-মেথরের ছেলেও তা'। বুঝ্‌লে ত ভাই?" বন্ধু হাসিমুখে জবাব দিল—"তোমার এখানে কি হয়-না-হয় সব খবর রাখি আমি। জাত্‌-বিচার আমি যে কতটা মেনে চলি, তা' ত তোমার অজানা নেই।" বলে' দুই বন্ধু আহারে গেল।

পরদিন সকালবেলা বন্ধু বিদায় নিয়ে চলেছে। বিদায়-কালে বন্ধু হাসিমুখে বল্‌ল—"প্রার্থনা করি, নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা একদিন যেন লীলা-কমল হয়ে তোমার অন্তর-মাঝে ফুটে' ওঠে।"

"ওঠেই যদি, তবে আমি নির্ম্মমের মতন তার পাপড়ি-গুলো ছিঁড়ে ফেলে' চরণ-তলে দল্‌তে পার্‌ব না।" স্মিতমুখে এই কথাটি বলে' সুবিমল বন্ধুকে বিদায় দিল।

(পাঁচ)

চার বছর পরের কথা। সুবিমলের সংকল্পিত সেবা-সদনের দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। নানা-বিভাগের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সুবিমলের পরিপূর্ণ সাধনাকে আশ্রয় করে' যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে' উঠ্‌ছে, তার সুখ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে।

লোকনাথবাবু সহরের একজন বড় উকীল। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে দশ হাজার টাকা দান করেছেন। তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে সে বাড়ীতে সুবিমলের যাতায়াত আছে। এই দানের মধ্য দিয়ে সুবিমলের সঙ্গে লোকনাথবাবুর একটা অন্তরের যোগ স্থাপিত হল।

কুমারী মালতী লোকনাথবাবুর একমাত্র কন্যা। কলেজের ছাত্রী। বয়স আঠারো। মালতী তার পিতার সাথে মাঝে মাঝে সুবিমলের প্রতিষ্ঠানটি দেখ্‌তে যেত। প্রতিষ্ঠানটিতে একজন ব্রতচারী তরুণের বিপুল সাধনা ও মহান্ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মালতী কতদিন তাঁর উদ্দেশে মৌন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

মালতীর জ্বর। দিনের পর দিন যায়, জ্বরের বিরাম নাই। সুবিমলের আপ্রাণ চেষ্টায় ও সুচিকিৎসার ফলেও কোনো পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। মালতীর পরিপুষ্ট দেহখানি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগ্‌ল। তার সুন্দর মুখখানি ভোর-গগনের তারাটির মতন ম্লান, নিষ্প্রভ। সুবিমল যখনই মালতীর শয্যায় এসে বসে, তখন তার রোগ-মলিন মুখখানি ক্ষণেকের তরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সুবিমলের স্পর্শে তার জীর্ণ বুকের মাঝে এক অজানা পুলকের অনুভূতি জাগে। সকালে যাওয়ার বেলা রোগিণী নিজেই বলে' দেয়—দুপুর বেলা আর একবার দেখে যাবেন; আর দুপুরে সে বলে—বিকেলে আস্‌তে ভুলবেন না। এভাবে সুবিমলকে রোজ তিনবার করে' আস্‌তে হয়। মালতী ভাব্‌ত, তার রোগ যেন আর না সারে। রোগ সেরে' গেলে ত সুবিমলের বাঞ্ছিত সান্নিধ্য থেকে সে কত দূরে পড়ে' থাকবে—তার সুখ-স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত হবে। তার মনের মধ্যে ঐ এক চিন্তা—তিনি যে ব্রতচারী। আমার দেহ নিরাময় হলে তিনি আর স্পর্শ করবেন কেন!

জ্বর টাইফয়েডে পরিণত হল। মালতী প্রলাপ বক্‌তে লাগ্‌ল। অবস্থা খারাপের দিকেই। সুবিমলকে এখন এ-বাড়ীতেই রাত্রি-যাপন কর্‌তে হয়। সারা দিন-রাতের মধ্যে কতবার যে রোগিণীর কাছে আস্‌তে হয়, তার আর সীমা নেই। চিকিৎসা করে'ই সুবিমলের এখন আর

তৃপ্তি হয় না, নিজহাতে রোগিণীর সেবা-শুশ্রূষাও সে করে। সুবিমলের মনের মধ্যে একটা বিপ্লব যে আসন্ন, মাঝে মাঝে সে তা' অনুভব কর্‌ত।

সময় সময় জ্বরের বিরাম হতে লাগ্‌ল। জ্বরের বিরামের অবস্থায় প্রলাপ বন্ধ হত,—কোনো কোনো সময় রোগিণীর পূর্ণ চেতনা ফিরে' আস্‌ত। বাড়ীর লোক কিছু আশ্বস্ত হল; কিন্তু ডাক্তার রোগিণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে নাই।

(ছয়)

রোগের এম্‌নি অবস্থায় একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় সুবিমল রোগিণীর শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট। তখনও সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলেনি। মালতীর চোখ তন্দ্রা-নিমীলিত। মালতীর রোগ-শীর্ণ বিশুষ্ক মুখখানি—মুদিত দুটি আঁখি। সুবিমলের মুগ্ধ দৃষ্টি তারই পানে নিবদ্ধ। মনে হল—এ যেন কোন্‌ দেবতার সোনার দেউলের হিরণ্ময় প্রদীপটি নিভে গেছে। ভাব্‌তে সুবিমলের সমবেদনা-ভরা প্রাণটি ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। সে নাড়ী পরীক্ষা কর্‌তেই রোগিণীর তন্দ্রা টুট্‌ল। সুবিমল তা' বুঝ্‌তে পারে নি। রোগিণীর চোখ দুটি তেম্‌নি নিমীলিত। নাড়ীর গতি মন্দ নয়। সুবিমলের হাতের মধ্যে মালতীর হাতখানি। মালতী চোখ মেলে' দুর্ব্বল কণ্ঠে বল্‌ল—"কখন আস্‌লেন?" সে ক্ষীণ কণ্ঠ-স্বর সুবিমলের কানে পৌঁছয় নি। কিন্তু সে বুঝেছিল, মালতী যেন কি বল্‌ছিল। মালতীর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে' সুবিমল জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কি বল্‌ছিলে?" "বল্‌ছিলুম, কখন আস্‌লেন।"—বল্‌তেই মালতীর চোখ দুটি দৈহিক দুর্ব্বলতায় আপনি বুজে আস্‌ল। "হল কতক্ষণ"—সুবিমলের কণ্ঠস্বর বেদনা-করুণ।

মালতী পাশ ফিরবার চেষ্টা কর্‌তেই সুবিমল তাকে ধরে' আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়ে দিল। সুবিমলের হাতখানি মালতী তার বুকের দিকে টেনে' নিয়ে বল্‌ল—"দেখুন ত আমার জ্বর আসছে না কি!" "না, তেমন কিছু ত মনে হচ্ছে না।" সুবিমলের হাতখানি মালতী গভীর আবেশে বুকের 'পরে চেপে' রেখে বল্‌ল—"আমাকে বাঁচাবার জন্যে আপনার এই আপ্রাণ চেষ্টা, আর আপনার ঐ প্রাণ-ভরা সেবা-যত্ন—বলুন ত, এর ঋণ কি করে' শুধ্‌ব?"

"এ কাজটিকে এত বড় করে' দেখ্‌বার কি আছে? কর্ত্তব্য করে' যাচ্ছি মাত্র।"

"তার বেশী কিছু করেন নি বুঝি?" মালতীর এই প্রশ্নে সুবিমল নীরব। দুর্ব্বল কণ্ঠে মালতী আবার বল্‌ল—"যাই করুন না কেন, আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। আপনি যতই গোপন করুন, আমি বেশ অনুভব কর্‌তে পারছি দিনের পর দিন আমার শরীর ক্ষয়ে' যাচ্ছে। আপনার দুঃখ থাকবে, এত করে'ও আমাকে রাখ্‌তে পারলেন না। কিন্তু আপনার ঐ কত-আপন-করা সেবা-যত্নটির স্নিগ্ধ স্মৃতি বুকে নিয়ে আমি সত্যি সুখে মরব। বিশ্বাস করেন না বুঝি?"—এই বলে' মালতী চোখ মেলে' সুবিমলের পানে চাইল। দেখ্‌তে পেল—সুবিমলের অশ্রুভারাক্রান্ত সুন্দর চোখ দুটির স্থির, নিশ্চল দৃষ্টি তারই মুখ-পানে। দু'জনায় কিছুকাল এম্‌নি নীরব। ভৃত্য কখন যে সন্ধ্যা-প্রদীপ জেলে' দিয়ে গেল, কেউ টের পায় নি। দেওয়ালের কোণে টেবিলের নীচে মিটি মিটি আলোটি জ্বলছে।

(সাত)

সে-দিন ছিল আশ্বিনের স্নিগ্ধ সন্ধ্যা। সাম্‌নের আঙিনার পুষ্পোদ্যান থেকে মৃদু-মন্দ বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আস্‌ছিল। মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়ে শুক্লপক্ষের শারদ-চন্দ্রমার নির্ম্মল জ্যোৎস্নারাশি গৃহ-মধ্যে বিকীর্ণ। মালতী বল্‌ল—"আমার মরণ যে নিশ্চিত, সে কাল রাত্রিরে আমি ভালো করে'ই বুঝেছি।" "কি করে?"—বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে সুবিমল জিজ্ঞেস কর্‌ল। "রাত তখন অনেক—স্বপ্নে দেখ্‌তে পেলাম—মা আমার শিয়রে বসে' মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মা বলে' ডাকতেই ঘুম ভাঙল। বাবাকে বলি নি। তিনি অস্থির হয়ে পড়বেন। মনটা তাঁর কত নরম—মেয়েমানুষের মতন। দাদা আর আমার দিকে চেয়ে মায়ের স্মৃতিটুকু বুকে করে' দিনগুলো কেমন করে' কাটিয়ে দিলেন। পুরুষের মধ্যে বাবার মতন চরিত্রের লোক খুব কম মিলে। না, কি বলেন?" "তিনি ত দেব-চরিত্র। তাঁর—।" সুবিমলের কথা শেষ না হতেই মালতী আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—"আপনি ত মাকে দেখেন নি। তিনি ছিলেন দেবী। মা বেঁচে থাকলে আপনাকে আজ কত স্নেহ—।" বল্‌তেই ভাবাবেগে

মালতীর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল। সুবিমল তা অনুভব কর্‌তে পেরে বল্‌ল—"মায়ের কথা আমি শুনেছি। তিনি সত্যি দেবী ছিলেন।" মালতী আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—"সাত বছর আগে আশ্বিনের এম্‌নি এক সন্ধ্যায় মা আমার—।" উদ্বেলিত শোকাবেগে মালতীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। মাতৃ-শোকাতুরা মালতীর শীর্ণ কপোল দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মালতী ডাক্‌তে লাগ্‌ল—মা! মা! মা! সুবিমল ব্যথিত, ব্যাকুল। মালতীর মাথা কখন যে বালিশের ওপর থেকে সরে' পড়েছে তা' সে দেখ্‌তে পায় নি। সেদিকে চোখ পড়তেই সুবিমল দুই হাতে খুব আস্তে মালতীর মাথাটি বালিশের ওপর তুলে' দিল; আর, নিজের গায়ের চাদরের কোণে অশ্রু-প্লাবিত চোখ-মুখ মুছিয়ে' দিতে দিতে বল্‌ল—"এ দুর্ব্বল শরীরে শোকের কথা ভাব্‌তে নেই।"

এতক্ষণে সুবিমল ধর্‌তে পার্‌ল যে, মালতীর শরীরের উত্তাপ বাড়্‌ছে। পরীক্ষা করে' দেখ্‌ল জ্বর এক শ' তিন ডিগ্রিতে। সুবিমলের মুখ বিষণ্ণ। নিরাশার কালো ছায়াটি তার চোখে-মুখে সুস্পষ্ট দেখে' মালতী মৃদু-স্বরে বল্‌ল—"আমি ত বলে দিয়েছি, আমায় বাঁচাতে পারবেন না।" মালতীর হতাশ কণ্ঠের ঐ কাতর উক্তিতে সুবিমলের হৃদয় ব্যথিত। উচ্ছ্বসিত দীর্ঘ-নিশ্বাসটি অতি কষ্টে চেপে রেখে' সুবিমল শান্ত কণ্ঠে বল্‌ল—"এখন চুপ করে' না থাক্‌লে অসুখ বাড়্‌বে।"

"এতদিন রোগে ভুগে' আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি, এবার চেতনা হারালে আর তা ফিরে আস্‌বে না। আরো কয়টি কথা—।" মালতীর মুখের কথা শেষ না হতেই সুবিমল ব্যস্ত হয়ে পায়ের তলা থেকে লেপ টেনে নিয়ে মালতীর গা ঢেকে দিল। শিয়রের ধারে এগিয়ে বসে' মালতীর মাথায় পাখা দিয়ে বাতাস কর্‌তে লাগ্‌ল। মালতী আবার বল্‌তে সুরু কর্‌ল—"আমার কথা কয়টি শুন্‌তে হবে আপনাকে। পাখা রেখে দিন ত। মাথায় বাতাস লাগ্‌বে না। কষ্ট ত অনেক করলেন। আর কেন?" একটু থেমে' শ্রান্ত কণ্ঠে বল্‌ল—"উঠুন ত। টেবিলের ডান-দিকের দেরাজে একছড়া চাবি রয়েছে। নিয়ে আসুন দেখি।" সুবিমল উঠে' গিয়ে চাবি নিয়ে এলে মালতী দেওয়ালের পাশে একটা সেগুন কাঠের আলমারী দেখিয়ে বল্‌ল—"ওটা খুলে' ওপরের থাকে একটা চন্দন কাঠের ছোট বাক্স পাবেন। নিয়ে আসুন ত।" এই বল্‌তে বল্‌তে মালতীর চোখ দুটি জ্বরের দুঃসহ উত্তাপে ও শারীরিক অবসাদে আপনা-আপনি বুজে এল। সুবিমল বাক্সটি এনে বিছানার ধারে রেখে' দিয়ে শিয়রের পাশে বসে' আবার মাথায় বাতাস কর্‌তে লাগ্‌ল। একটু পরে মালতী চোখ মেলে' জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কই, বাক্স কোথা?" সুবিমলের কাছ থেকে জবাব না পেতেই বাক্সটি মালতীর চোখে পড়্‌ল। "খুলুন দেখি বাক্সটা। ওর মধ্যে দুটা শ্বেত-পাথরের বড় কৌটা আছে।" কৌটা দুটি বের কর্‌বার আগেই মালতী প্রশ্ন কর্‌ল—"পান্ নি এখনো?" মালতীর কণ্ঠস্বরে প্রবল উৎকণ্ঠা। "পেয়েছি, এই যে"—বলে' সুবিমল কৌটা দুটি মালতীর কাছে নিলে মালতী তার গায়ের লেপটা সরিয়ে ফেল্‌তে বল্‌ল। লেপখানা সরিয়ে দিলে মালতী কৌটা দুটি নিয়ে দু'হাতে বুকে চেপে ধরে' চক্ষু দুটি মুদ্রিত কর্‌ল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ এমনি কেটে গেল। সুবিমল তার বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখ দুটি মালতীর মুখপানে নিবদ্ধ করে আছে। মনে হল তার—এ যেন কোন্ তপস্বিনীর তপোদ্দীপ্ত মূরতি! চোখ মেলে' মালতী বল্‌ল—"আমার গেল বছরের জন্ম-দিনের উৎসবের কথা মনে আছে ত আপনার?"

"না থাক্‌বে কেন? আমি যে উপস্থিত ছিলাম তা বোধ হয় মনে নেই?" কথা শুনে' মালতী স্মিতমুখে বল্‌ল—"আপনি হয়ত মনে করেছেন রোগে আমার স্মৃতি-বিভ্রম হয়েছে। তা হয় নি এখনো। আপনি আমায় একটা উপহার-ও দিয়েছিলেন। কেমন, ঠিক বল্‌ছি না?" বলে' মালতী শ্বেতপাথরের কৌটা দুটি সুবিমলের হাতে দিয়ে বল্‌লে—"আমার গত জন্মদিনের উৎসব-রাতে যে দুটি প্রিয় বস্তু আপনার উদ্দেশে সঞ্চিত করে' রেখেছিলাম এতে তা রয়েছে। উৎসবান্তে নিশীথ-রাতে এই ঘরেই আমার এই বিছানাটাতে শুয়ে' চোখের জলে বুক ভাসিয়েছি। অশ্রুজলের উৎসে সেদিনকার উৎসব-রাত ভোর করেছি। সেদিন মনে করি নি আপনাকে ঠিক এখানটাতেই এমন-ভাবে পাব।" এই বল্‌তে বল্‌তে মালতীর ভাবোদ্বেলিত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হল। একটু পরে শ্রান্ত কণ্ঠে বল্‌ল—"একটা অনুরোধ, আমার মরণের আগে কৌটা খুল্‌বেন না। আমায় কথা

দিন—অনুরোধ রাখবেন।" বলে' মালতী উত্তরের প্রতীক্ষায় সুবিমলের পানে চাইলে সুবিমল বল্ল—"কথা দিলুম—অনুরোধ রাখব।" সুবিমলের অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠ-স্বরে কি এক অব্যক্ত বেদনার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

(আট)

এর-ই দিন সাতেক পরে আশ্বিনের এক সন্ধ্যায় মালতীর জীবন-প্রদীপটী নিভে গেল। লোকনাথ বাবু শোকে অধীর। মালতীর পুষ্পাচ্ছাদিত শবদেহ শ্মশানে। লোকনাথ বাবু সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর এই শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবার জন্যে সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী, উপকৃত—ছোট বড় বহুলোক শ্মশানে সম্মিলিত হয়েছে।

মালতীর মৃত্যুকালে সুবিমল তার পাশেই বসে' ছিল। দেহ-মন তার অবসন্ন, মুখ মলিন। বাড়ী ফিরে' এসে নিজের হাতের সাজানো বাগান থেকে ফুল তুলে অতি যত্নে একছড়া মালা গাঁথ্ল। নিজহাতে-গাঁথা সে মালাটি তার শোকাশ্রুজলে অভিষিক্ত। সে যত্ন-রচিত, অশ্রু-পূত, মালাটি নিয়ে সুবিমল পাগলের মতন শ্মশানে ছুটে গেল। চিতা সজ্জিত। মালতীর পুষ্পাচ্ছাদিত শবদেহের পার্শ্বে মালা হাতে সুবিমল শোক-ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে। সে নিঃশব্দে যুক্তকরে কিছুক্ষণ ঊর্দ্ধে তাকিয়ে রইল। তার পর প্রাণহীনা মালতীর নিশ্চল মুখের পানে সুবিমল তার শেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' গলায় মালাখানি পরিয়ে দিয়ে বিপুল জনতার মধ্য দিয়ে চলে গেল।

(নয়)

সুবিমল শোকে অভিভূত। সে-রাত্রে বাড়ী ফিরে' তার আর নিদ্রা হল না। শোকে তার সান্ত্বনা—মালতীর শেষ দান। নিশীথ-রাতে সুবিমল তার নির্জ্জন কুটীরে বসে' কৌটা খুলে দেখ্তে পেল—একটিতে তারই দেওয়া জন্মদিনের সামান্য উপহারটি ফুল দিয়ে সাজানো। ফুল-গুলি শুক্নো, পাপ্ড়ি-ঝরা। আর একটিতে ছোট্ট একছড়া শুষ্ক পুষ্পমাল্য দিয়ে সাজানো একখানা চিঠি। মুগ্ধ-বিস্ময়ে সুবিমল দেখ্তে পেল—মালতীর সে লিপিখানি রক্তে লেখা। রক্তাক্ষরে লিখিত ছিল এই কয়টি কথা—

দেবতা আমার! জন্মদিনের উৎসবে এই দেহ-মন তোমার উদ্দেশে নিবেদিত হল।

দেবতার পূজার ফুল—
মালতী

অশ্রু সজল চোখে সুবিমল লিপিখানি পাঠ করল। একবার, দুইবার, তিনবার। আর পড়া হল না। স্বতঃ-উৎসারিত অশ্রুধারার অবিরাম প্রবাহে লিপিকা সিক্ত। সে নৈশ নিস্তব্ধতার মাঝে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে মিশে' গেল—মালতীর নিষ্কলঙ্ক বুকের অনবদ্য রক্তবিন্দু সুবিমলের অনাবিল অশ্রুনীরে।

জীবন-সঙ্গিনী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

জীবনের সাথী দিবা আর রাতি
কতই ছলনা জানে!
একই পথে যায় তবু দুজনায়
দুই হাত ধরে' টানে;—
আলোয় আঁধারে রৌদ্রছায়ায়
রূপে ও অরূপে কায়ায় মায়ায়

ঘরে ও বাহিরে জানা-অজানায়
দুদিকের সন্ধানে।
একজন এসে বাঁধে যে বাঁধন
আরজন দেয় খুলি',
দিবস আসিয়া যে বুলি শিখায়
রজনীতে তাই ভুলি!

নিত্য উষায় নির্ম্মল বায়
নির্জ্জন মন্দিরে
আলোক-পরশে যত বাতায়ন
খুলে' যায় ধীরে ধীরে ;
জেগে উঠে ধরা কর্ম্মের যাগে,
কলকোলাহল কানে এসে লাগে ;
বন্দী এ হিয়া সেই সন্ধিতে
বন্ধন তার ছিঁড়ে।
নূতন নেশায় মেতে উঠে মন
দিগ্বিজয়ের টানে,
বাহিরের বানে ঘরের ঠিকানা
ভেসে যায় কোন্‌খানে !

হাটে-মাঠে-ঘাটে ছুটে' ছুটে' যবে
ক্লান্তিতে ভরে কায়,
বাসনার সোণা গলে' ঝরে' পড়ে
সন্ধ্যার সোহাগায়,
গৃহমন্দিরে বেজে ওঠে শাঁক—
শ্রান্তি-ভুলানো শান্তির ডাক,
মর্ম্মপুরীর গোপন কক্ষে
কর্ম্মের কিনারায়।
অনেকের সাথে হট্টগোলের
পুঞ্জিত অবসাদ
একের মাঝারে বিরাম মাগিয়া
লভে চিত্তের স্বাদ।

একবার করে' চোখ বোঁজা আর
একবার চোখ মেলা—
আঁখিপাতা সাথে আঁখির চুক্তি
আলো আঁধারের খেলা !
একজন বলে—বাহিরিয়া আয়,
জল-ভরা চোখে আরজন চায়—

এমনি করিয়া দোমনার মাঝে
কাটে জীবনের বেলা !
দিনের আলোকে বাহিরের চোখে
একবার ফুটে গতি,
রাতের আঁধারে অন্তর-পারে
আরবার তারি যতি !

দিনে আর রাতে, রাতে আর দিনে
এমনি দোটানা টানে
জীবনের গতি শেষ হয় যবে
পথেরি মধ্যখানে—
চমকিয়া থামে সেথায় যাত্রী,
ঘনাইয়া আসে গহন রাত্রি—
কাজল-তিমিরে হারায় যে দিশা
প্রভাতের পথপানে !
ফিরে ছুই সখী উদাসচক্ষে
বিধাতার বাঁধা পথে,
নূতন পথিকে টানিয়া আবার
নবজীবনের রথে !

ইহজীবনের কৌতুকময়ী
হে যুগল সঙ্গিনী,
যেমন সঙ্গ তেমনি রঙ্গ—
চিনি তোমাদের চিনি !
জানা-অজানার মোহন মেলায়
হিয়াহীন এই লীলার খেলায়
তোমরা কেবলই দাও করতালি
বাজাইয়া কিঙ্কিনী !
মহাকাল-নাটে যে নাচ চলিছে,
তারি সাথে তাল রাখি'
মানবেরে লয়ে চালাও মর্ত্তে
জীবন-লীলার ফাঁকি !

রুদ্ধ স্রোত

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

বড়দিনের ছুটি। শীতের দুপুরবেলায় যে যাহার ঘরে লেপ-মুড়ি দিয়া শুইয়া দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছিল, বিপিনবাবুর কণ্ঠ শোনা গেল,—চল, আজ সব সার্কাস যেতে হবে!

বিদ্যুৎবেগে কথাটা বাড়ীময় প্রচার হইয়া গেল—জ্যেঠামশাই বলেছেন সার্কাস যেতে হবে। একপাল ছেলে উঠিয়া মোজা পরিতে আরম্ভ করিল, মেয়েরা চুল খুলিয়া দিয়া চিরুণী খুঁজিতে বসিল—আজ সার্কাস!

মাঝে মাঝে জ্যেঠামশায়ের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল, শীগ্‌গির নাও, শীগ্‌গির নাও।

তাঁর নিজের মোটর ও আর একখানা ট্যাক্সী আসিয়া হাজির হইল,—দুইখানা গাড়ী বোঝাই করিয়া ভাইপো ভাইঝিদের লইয়া বিপিনবাবু চলিলেন সার্কাসে।

এমনি নিত্য। বড় অপিসে তিনি বড় চাকরী করিতেন। আপন ও খুড়তুতো ভাইবোনদের মধ্যে তিনিই সকলের বড়; তাই মা-ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টিপূর্ণ বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া ভাইপো-ভাইঝির ছোটখাট একটি দল লইয়া বিপিনবাবুকে প্রায়ই ব্যস্ত দেখা যাইত।

আজ মেমোরিয়াল, কাল চিড়িয়াখানা, পরশু বোটানিক্‌স্, তরশু বায়স্কোপ—এ লাগিয়াই আছে।

তা ছাড়া তাহাদের চোর-ধরায়, তাহাদের কলহে, তাহাদের ঘুড়ী ওড়ানোয়, তাহাদের পুতুল খেলায় তিনি নিত্য উপস্থিত থাকিতেন।

উমার মেয়ের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর মেয়ে রাণীর ছেলের বিবাহ যখন স্থির, তখন মুস্কিল হইল—জ্যেঠামশাই কলিকাতায় থাকিবেন না, অপিসের কাজে আসানসোল যাইবেন। উমা ত মাথায় হাত দিয়া বসিল,—সুবিধা প্রেসের পকেট-পঞ্জিকা হইতে পুত্তলিকা-পরিণয়ের বিশেষ শুভদিন স্থির হইয়াছে,—এমন দিনে জ্যেঠামশাই না থাকিলে ত সব মাটি।

জ্যেঠামশাই বলিলেন, ভয় কি রে বেটি, আমি ১০০৲ টাকা দিয়ে যাচ্ছি—এইতেই কোনোরকম করে সেরে নিস্। আমি এসে আরো কিছু দোব, কাজ আট্‌কাবে কেন?

টাকার দিক দিয়া যে কাজ আট্‌কাবে না, এ বিশ্বাস উমারও ছিল। কিন্তু জ্যেঠামশাই না উপস্থিত থাকিলে দেখাশোনা করে কে,—পুতুলের বিয়ে হইলেও ঝক্কি ত কম নয়?

জ্যেঠামশাই বলিয়া গেলেন, তিনি বিবাহের তিথিতে সকালবেলা কলিকাতা পৌঁছিবেন,—করিলেনও তাহাই। অপিসে দরখাস্ত দিয়াছিলেন—তাঁহার ভাইঝির কন্যার বিবাহ। কন্যাটি সজীব কি নির্জ্জীব অবশ্য তার কোনো উল্লেখ ছিল না!

রীতিমত প্রোসেশন করিয়া বিবাহ ত হইয়া গেল। সারা বছরের তত্ত্বতাবাস—সেই কি কম হাঙ্গাম। ফরমাস দিয়া ছোট্ট ছোট্ট দই ও ক্ষীরের হাঁড়ী ও তার অনুরূপ বাঁক; ছোট ছোট থালায় ঠিক সত্যকারের মত সন্দেশ ক্ষীরমোহন লেডিগেনী চন্দ্রপুলি তৈয়ারী প্রভৃতি; ছোট পুঁটি মাছকে ইলিস মাছ বলিয়া চালানো ও কপির সময় ছোট কপির ফুল ও আমের সময় কচি আমের বোল ছোট ঝুড়ি করিয়া ভরিয়া দেওয়া শুধু পয়সা ফেলিলেই হয় না, রীতিমত পরিশ্রম করিয়া যোগাড় করিতে হয়, ইহা কাহার না জানা আছে? জ্যেঠামশাই সব করিতেন।

পূজার সময় সব ভাইপো-ভাইঝিকে ডাকিয়া গায়ের মাপ নেওয়াইয়া এক দামের এক ধরণের কাপড় জামা সকলের জন্য আনিতেন; কিন্তু পূজার উপহারে নিজের দুটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাড়ীর অন্য ছেলেদের একটু তফাৎ করিতেন। ভানু হয় ত বলিল, আমার ক্যামেরা চাই জ্যেঠামশাই। তাকে বলিলেন, আচ্ছা, তোমাকে এক ১০৲ টাকা দামের ক্যামেরা কিনে দোব, তাতে হবে ত? মাণিক হয় ত বলিল, আমার টেরাই সাইকেল চাই। তাকে বলিলেন, যদি পুরোন একটা কিনে নতুনের মতন্ করে দিই তাতে আপত্তি আছে? মীনা হয় ত বলিল, আমার হার্ম্মোনি

চাই। বলিলেন—বেশ, ছোট একটা হার্ম্মোনি তোমার আসবে! কিন্তু নিজের ছেলে সতু অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে যখন বলিয়া বসিল, আমার একটা দোয়াতদানী দরকার বাবা, তখন তাহাতেও ব্যয়সঙ্কোচ করিলেন, বলিলেন, দোয়াতদানীতে দুটো দোয়াত থাকে—তোমার দুটো কি দরকার? তুমি ত লাল কালীতে লেখো না, তোমায় একটা দোয়াত দোব, কি বল? আর নিজের মেয়ে হাসি যখন বলিল, আমার একটা রংএর বাক্স চাই, তখন বলিলেন তুমি ত আঁকতে শেখো নি এখনো,—তোমার রংএর বাক্স কি হবে? তোমায় একটা লাল-নীল পেন্সিল কিনে দোব।

মোট কথা স্কুলের বেতন, মাষ্টারের মাহিনা, জুতা জামা কাপড় হইতে খাই-খরচের প্রায় সমস্ত ভার বিপিনবাবু নিজের স্কন্ধে লইয়াছিলেন। ভাইয়েরা অল্প-স্বল্প যা মাহিনা পাইত, দাদার হাতে ফেলিয়া দিত, তাহা হইতে তিনি ইলেক্‌ট্রিকের খরচ, বাড়ীর ট্যাক্স টেলিফোন ইত্যাদি মিটাইতেন।

রাজার হালে তিনি সকলকে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু কাহাকেও বুঝিতে দিতেন না—বাড়ীর বড় হইয়া তিনি কতটা করিতেছেন। নিজে ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়া, নিজে অভুক্ত থাকিয়া তিনি কোলাহলমুখর বাড়ীখানিকে নিত্য আনন্দময় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু এ চেষ্টায় বাধা পাইল। তাঁর স্ত্রী শরৎশশী সাতে-পাঁচে থাকিতেন না, কিন্তু তিনি আশা করিতেন অন্য জায়েরা তাঁকে মান্য করিয়া চলুক; যেহেতু তাঁহার স্বামী সকলকে এতটা করিতেছেন। প্রথম প্রথম মান্য পাইয়াও ছিলেন; কিন্তু এ কথা যখন সকলের কাছে পরিষ্কার হইয়া আসিল—শরৎশশীকে খুসি রাখার উপর বিপিনবাবুর দেওয়া নির্ভর করে না, তা ছাড়া যতই কম হোক্ অন্য বাবুরাও সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছেন এই পরিবারের সংসার-যাত্রায়, কেহ অমনি খাইতেছেন না,—তখন তটস্থ ভাবটা ক্রমশঃই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল এবং অবশেষে প্রায় রহিলই না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরৎশশীর মনেও ক্রমে এ ধারণা ঢুকিতে লাগিল যে, ন দেবায় ন ধর্ম্মায় তাঁর স্বামী যে খরচ করিতেছেন, তা সঞ্চিত হইলে তাঁহারই ছেলেমেয়ের থাকিবে। রাত্রের কলগুঞ্জন সুরু হইল ও দিনে দিনে দীর্ঘরাত্রিব্যাপী হইতে লাগিল।

বিপিনবাবু থামাইবার অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিলেন। রাত ভোর হইয়া আসে গুন্ গুন্ গুজ্ গুজ্ শব্দে রহিয়া রহিয়া চলে—ন-বৌ কি বলিয়াছে, মেজ-বৌ কি করিয়াছে, বিনে কি মনে করে, ক্যাবলার আস্পর্দ্ধা কতদূর অসহ্য হইয়াছে!

দিনের পর দিন বিনা প্রতিবাদে শুনিতে শুনিতে বিপিনবাবুর আর বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট রহিল না যে, ভাইগুলা তাঁর স্বার্থপর—তাঁর মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া নিজেদের কাজ গুছাইয়া লইতেছে; ভ্রাতৃবধূরা অকৃতজ্ঞ, ভাইপো-ভাইঝিরা গোঁয়ারগোবিন্দ;—সব কটাই তাঁর ছেলে এবং মেয়ের হিংসা করে।

পত্নীর কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ হইল, তাঁর সঙ্গে বিনা পরামর্শে তিনি অতঃপর কোন কাজ করিতেন না এবং হঠাৎ একদিন তাঁরই প্ররোচনায় বাড়ী ভাগের কথা তুলিয়া বসিলেন।

জমি তৈয়ারীই ছিল, অন্য ভায়েরাও তাহাদের গৃহিণীর মুখে শুনিয়াছিল তাহাদের বড়-ঠাকুর বড়-দি আসলে কত বড় শয়তান। সকলেরই মুখে অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল—আর ত পারা যায় না; কিন্তু কেন যে পারা যায় না, সে সম্বন্ধে খোঁজ করিলে হয় ত কয়েকজনের চক্রান্তই শুধু বাহির হইয়া পড়িত!

যাই হোক পার্টিশন হইতে এতটুকু দেরী হইল না। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো, এই নীতি মানিয়া লইয়া ভায়েরা নিজেদের দুঃখের দুমুঠার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাদার অংশ বুঝাইয়া দিল। দাদা আলাদা হইয়া গেলেন এবং উঠানের মাঝামাঝি একটা পাঁচীল তুলিয়া সু-উচ্চ অট্টালিকা বানাইয়া ফেলিলেন।

ওধারে প্রাসাদ গড়িয়া উঠিল, এধারের বিদ্যুৎ আলো নিভিয়া গিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, বালির চাপড়া খসিয়া পড়িল, টেলিফোন সরিয়া গেল,—পাড়ার মধ্যে যে বাড়ীখানি সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল, তারই ভিতরের কঙ্কাল বাহির হইয়া গিয়া খোলার বাড়ীর অধম হইয়া পড়িল।

কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তি হইতে লাগিল বিপিনবাবুর, —ভাইপোগুলা কেউ একবার উঁকি মারে না। হতভাগারা! কেন আলাদা কেউ সংসারে কি হয় না? বরঞ্চ একান্নবর্ত্তী পরিবার কমই আছে—সকলেই ত পৃথক!

এমন কি ঘটিয়াছে, যার জন্য ভাইপো ব্যাটারা এ বাড়ী মাড়াইবে না ?

একদিন থাকিতে না পারিয়া তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—তোরা আস্‌বি! তখন সকলেই একে একে আসিয়া জ্যেঠার ঘরের অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা ও গৃহসজ্জার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিল। আসিল না শুধু ক্যাবলা যাকে বিপিনবাবু সকলের চেয়ে ভালবাসিতেন। সে না কি বলিয়াছে, জ্যেঠামশায়ের বাড়ী যা, গভর্ণরের বাড়ীও তা, আমার ত কোনো অধিকার নেই!

হাসির বিবাহ আসিয়া পড়িল। তিনি সকলকে সাধারণ ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন—জনে জনে বিশেষ করিয়া বলেন নাই। ক্যাবলা আসিল না,—বলিয়া পাঠাইল, জ্যেঠা কি আমাকে বলেছে? বিপিনবাবু ভাবিলেন, থাক্, নাই আসিল! ক্যাবলা আসিল না বলিয়া তার মাও আসিল না, বাপও আসিল না। শরৎশশী বলিলেন, ওদের হিংসেটা সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু বিপিনবাবুর মনে হইল—হিংসা নয়, অভিমানটাই হয় ত সকলের চেয়ে বেশী। গৃহিণীর ভয়ে তাহাদের ডাকিতে যাইতে পারিলেন না।

নীল আকাশে সাদা মেঘের রাশ দেখিয়া বিপিনবাবুর মনে পড়িল পূজা আসিতেছে। এমন দিনে তিনি কি ভাইপো ভাইঝিদের কিছুই করিতে পারিবেন না! করিবার সাধ্য কি?

সপ্তমীর দিন দেখিলেন পুরানো বাড়ীর সামনে একখানা থার্ডক্লাশ গাড়ী অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন বৌ-মারা নাকি সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব দেখিতে যাইবেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর গাড়োয়ান চেঁচামেচি সুরু করিল। ভানু বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, না যাস্ চলে যা—আমাদের মোটর গাড়ী ঐ দেখ দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়োয়ান সংসারানভিজ্ঞ নয়। সে বলিল, ও-বাড়ীতে মোটর গাড়ী আছে তা তোমাদের কি? মোটর থাক্‌লে কি আর আমাকে বোলাতে?

উপরের বারান্দা হইতে এ কথা শুনিয়া বিপিনবাবুর আর ধৈর্য্য রহিল না। তিনি থাকিতে থার্ডক্লাস গাড়ী কখনো বাড়ীর সামনে দাঁড়াইতে দেন নাই,—আজ তাঁহারই সামনে তাঁহারই ভাইপো একটা ছোটলোকের কথা সহিয়া চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইবে, আর তিনি দাঁড়াইয়া দেখিবেন? তখনই হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, রামসিং, গাড়ীটা ভাগায় দেও। হামারা মোটর হুঁয়া পর রাক্কো, মায়ী লোক যাঁহা যায় লে যাও!

'বড়াবাবু'র চেঁচামেচির চোটে গাড়ী পলাইল এবং ভানু বীরদর্পে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

কালীপূজার দিন নিজের বাড়ী তিনি সাজাইতে দিলেন না; কারণ পাশের বাড়ীতে আলো নাই! প্রদীপ আসিয়াও পড়িয়া রহিল। ছাতে উঠিয়া দেখিলেন শীতের কন্‌কনে সন্ধ্যায় ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝিরা আকাশের দিকে লোলুপনেত্রে চাহিয়া বাজীর খেলা দেখিতেছে। একটিমাত্র ফুলঝুরি জ্বালিয়া তিনজনে পালা করিয়া হাতে লইয়া ঘুরাইয়া বাজী পোড়ানর সখ মিটাইতেছে।

তখনি দোকান হইতে প্রকাণ্ড একঝুড়ি ভর্ত্তি বাজী কিনিয়া একটা মুটের হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন—ঐ বাড়ীতে দিয়ে আয়; বলবি বাদুড়বাগানের হরিশবাবু দিয়েছে। মুটে দিয়া আসিয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। বিপিনবাবু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—এখনি পট্‌কার চট্‌পটি, আর রংমশাল, লাল নীল দেশলাইয়ের আলো পাশের বাড়ীতে ফুটিয়া উঠিবে; তার পরে তাঁর ছেলেমেয়েরা বাজী পুড়াইবে; কিন্তু কই, কোনই সাড়াশব্দ নাই। তিনি ত জানিতেন না যে, অদৃশ্য হরিশবাবুর হঠাৎ এই বদান্যতা দেখিয়া বধূরা বাবুরা না আসা পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছে না এবং বাবুরা যখন ফিরিল তখনও কাহার ভুল হইয়া থাকিবে মনে করা ছাড়া কিছু স্থির হইল না। সুতরাং লোভকাতর ছেলে-মেয়েদের দুর্লভ বস্তুগুলিতে হাত দেওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না।

ফুলকপি ত গলা দিয়া নামিতে চাহে না। দু-একটা পাশের বাড়ী পাঠাইয়া দিলে হয়; কিন্তু দু'একটায় অতবড় বাড়ীর কি হইবে? বেশী দিলে লইবে কি? যে তেজ! গৃহিণীরও খরদৃষ্টি সবদিকে! অবশেষে একদিন যা থাকে কপালে বলিয়া বাজার হইতে প্রকাণ্ড একঝোড়া কপি কিনিয়া বন্ধু জগদীশের বাড়ী হাজির হইলেন। তার চাকরকে বলিয়া দিলেন—এটা আমার ভাইয়েদের বাড়ী দিয়ে আয়; বলবি, নিবারণ বাবু শ্যামবাবুকে হোমিওপ্যাথি দিয়ে আরাম করেছিলেন, তাই তিনি দিলেন। সে বড়বাবুর এই অকারণ মিথ্যা কথার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যেমন বলা হইল তেমনি করিল।

নিবারণ কথাটা কিন্তু বুঝিল না। শ্যামবাবু বলিয়া কেহ ত তার ঔষধ লন নাই; বরঞ্চ যদুবাবু একজন আছেন। যাই হোক সাত পাঁচ ভাবিয়া তারা গ্রহণ করিল। বিদায় দিবার সময় দেখা গেল লোক পলাইয়াছে।

দিনকতক বাদে আবার যখন একটি লোক কমলালেবুর ঝাঁকা লইয়া হাজির হইল এবং বলিল শ্যামবাবু দিয়াছেন, তখন নিবারণেরও বিশ্বাস করা শক্ত হইল। সে বলিল বোধ হয় দাদার কাজ! তার স্ত্রী বলিল, দাদার ওপর যা বিশ্বাস তোমার,—বয়ে গেছে তাঁর দিতে। একবার ডেকে খোঁজ করেন? লোকটিকে যাইতে বলিয়া নিবারণ তার পিছু লইল। দেখিল বড় রাস্তায় গিয়া একটা গ্যাসের নীচে তার বড়দাকে লোকটা কি বলিল এবং তিনি একটি টাকা তার হাতে দিলেন।

নিবারণ রুক্ষকণ্ঠে গিয়া বলিল—এ তোমার কি কাণ্ড বড়দা, আমরা কি খেতে পাইনে?

বড়দা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—তোদের ত দিই নি, আমার ভাইপোদের দিয়েছি। চোখের জল ঝরিয়া পড়িবার আগে তিনি সরিয়া পড়িলেন।

খবর পাওয়া গেল—ক্যাবলা ফেল করিয়াছে। বুকটা তাঁর ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। মাষ্টার রাখবে না তার কি হবে! মাস্তুর অমন ভাল সম্বন্ধ টাকার জন্য ভাঙিয়া গেল—তার জন্যও আপশোষ হয়! কিন্তু কিই বা করিবেন তিনি, কেউ কি তাঁর পরামর্শ লয়?

গভীর রাত্রে ছাতে উঠিয়া পুরোনো ভাঙা বাড়ীটার দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতে থাকেন—তাঁরই বংশধরেরা দুঃখে, দারিদ্র্যে, কুশিক্ষায়, অস্বাস্থ্যে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে! একি তাঁর গৌরবের? তাঁর পরিচয়েই না সমাজে তারা চলাফেরা করে?

উঠানের সামনে ঐ দালানটায় বসিয়া কত দীর্ঘকাল ধরিয়া দিনের অন্ন তিনি মুখে তুলিয়াছেন; একই জানালার সামনে শয্যায় শুইয়া কত দীর্ঘরাত্রি তাঁর কাটিয়াছে; সেই বহু পরিচিত গৃহতল ছাড়িয়া পিতৃপিতামহের স্মৃতি-পূত সংসার পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন প্রাসাদে সম্পূর্ণ নূতন জীবন যে তিনি যাপন করিতে আসিয়াছেন, সকল মায়া সকল মমতা বিসর্জ্জন দিয়া—এ কি খুব পরিতৃপ্তির? মোটেই নয়। তিনি ঐ সংসারে ফিরিয়া যাইতে চাহেন, ঐ পরিবারে হাসি ফুটাইতে চাহেন।

সকালে উঠিয়া ভায়েদের ডাকিয়া তিনি প্রস্তাব করেন—যা হইবার হইয়া গেছে,—এসো, আবার এক হওয়া যাক্। ভায়েরা প্রতিবাদ করে, বলে—সে হয় না। একবার ভাঙ্‌লে আর কি যোড়া লাগে?

সকলের চেয়ে তেজ বেশী যার, সেই ক্যাবলার কয়দিন হইল অসুখ করিয়াছে।

বিপিনবাবু একবার ভাবিলেন দেখিয়া আসি। গৃহিণী বলিলেন, কি অসুখ জানা নেই—টাইফয়েড হতে পারে। তোমার ছেলেপুলের ঘর—তুমি বাইরে থেকে খোঁজ নাও না।

চোখ দুটা একবার রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া আবার ম্লান হইয়া আসিল। গৃহিণীই তাঁহাকে নষ্ট করিয়াছেন।

সকলের চেয়ে কুৎসিত এবং সকলের চেয়ে নির্ব্বোধ বলিয়া ক্যাবলার প্রতি তাঁর বিশেষ মমতা ছেলেবেলা হইতেই। অথচ সেই তাঁকে সকলের চেয়ে বেশী আঘাত দিয়াছে।

চিররুগ্ন ঐ ছেলেটা অভিমান করিয়াই সারা জন্ম কাটাইল। করিবেই বা না কেন, এই যে এ বাড়ীতে সে একেবারে আসে না,—তিনি কয়বার ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? অথচ একদিন ক্যাবলাকে সঙ্গে না লইলে তাঁর কোথাও নিমন্ত্রণ অবধি যাওয়া চলিত না,—কে জানে সামাজিক উৎসব, কে জানে অপিসের টি-পার্টি!

তবু এমনি তাঁর পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কাজে-কর্ম্মে অসুখের কথাটা ভুলিতে পারিলেন। অনেক দিন কোন খবর না লইয়া এবং না পাইয়া তিনি মনে করিলেন ক্যাবলার অসুখ ভালো হইয়া গেছে।

হঠাৎ একদিন শুনিলেন খুব বাড়াবাড়ি। সেদিন তাড়াতাড়ি কিছু আঙুর নাসপাতি আপেল কিনিয়া একেবারে ওপরে গিয়া উঠিলেন, ক্যাবলা দরজার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল, জ্যেঠাকে দেখিয়া দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইল।

বিপিনবাবু সস্নেহে ডাকিলেন, ক্যাবলাবাবুর রাগ হয়েছে! ফেরো, দেখো কি এনেছি।

ক্যাবলা কাৎ হইয়া ফিরিয়া তাঁর হাত হইতে আঙুরের

খোকাটা লইয়া মাথার দিকের জানালা গলাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, এক মাস পরে দেখতে এলেন !

পিসি-মা ধমকাইলেন—ও কি, জ্যেঠার সঙ্গে ও-রকম করে?

রুক্ষকণ্ঠে ক্যাবলা জবাব দিল—জ্যেঠা ! জ্যেঠা এতদিন খোঁজ নিয়েছিলেন কেমন আছি? নিজের ছেলে হলে পারতেন?

কথাগুলি তীরের মতন গিয়া বুকে বিঁধিল। অপরাধীর মতন বিপিনবাবু উঠিলেন,—শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিয়া গেলেন, পাগলা রেগে গেছে ! কিন্তু তাঁর মন বার বার বলিতে লাগিল সে অন্যায় কিছু বলে নাই।

তার পরদিনই অবস্থা খুব বাড়াবাড়ি হইল, লোকজনে বাড়ী ছাইয়া গেল। বিপিনবাবুর জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না অবস্থা কি রকম।

সমস্ত দিন ধরিয়া কোথায় যেন একটা অস্ফুট ক্রন্দন, যেন একটা চাপা আর্ত্তনাদ, যেন একটা আচম্‌কা হাহাকার তাঁর কাণে আসিতে লাগিল।

বিষণ্ণ মলিন মুখে পাশের বাড়ীর লোকেরা বাহিরে যাওয়া-আসা করিতেছে—তাহাদের দুপ্‌ দুপ্‌ চরণ-ধ্বনি বিপিনবাবুর অসহ্য বোধ হইতেছে।

সন্ধ্যার সময় তিনতলার সিঁড়ির জানলার কাছে গিয়া তিনি চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—সেখান হইতে পুরানো বাড়ীটার অন্দরের অনেকটা দেখা যায় এবং সামনেই ছাদ পড়ে। দেখিলেন স্তিমিত অন্ধকারে পাঁচিলের কাছে বসিয়া ছিন্ন মলিন কাপড় মুখে গুঁজিয়া রেণি কাঁদিতেছে ফুলিয়া ফুলিয়া ;—তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন রে !

রেণি চীৎকার করিয়া বলিল, ও জ্যেঠামশাই গো, দাদা আর বাঁচবে না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে আর বলছে, জেঠামশাই আমাকে দেখলে মম্‌তুম না !

জ্যেঠামশাই হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—আমি জ্যেঠা, আমি জ্যেঠা, আমি জ্যেঠা,—আমার ভাইপো, আমারি ভাইপো যায়, আর আমি জ্যেঠা এখানে বসে—

কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি নীচে নামিয়া টেলিফোনের হাতল তুলিয়া ধরিলেন ; তাঁর ডাক্তার বন্ধু রজতবাবুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—৬৪-র ৩২-র যে কয়জন চিকিৎসক কলিকাতায় আছেন তাঁর বাড়ী হাজির করিতে।

চিকিৎসার গুণেই হোক, পরমায়ু ছিল বলিয়াই হোক সে 'টাল'টা কাটিয়া গেল।

প্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্র বারান্দার কোলে আসিয়া পড়িয়াছে ; প্রাতঃসূর্য্যকে প্রণাম করিয়া ভায়েদের উদ্দেশে বিপিনবাবু বলিলেন—ওরে আজ মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছি—সে মজুর নিয়ে এসে এখনি উঠনের মাঝখানের এই পাঁচিলটা ভেঙে ফেলবে—এ আমার বুকে পাষাণের মতন চেপে বসে আছে—

নিবারণ আপত্তি করিল, কিন্তু দাদা, আমরা না হয় এক হলুম, আমাদের ছেলেরা কি পারবে ?

করুণভাবে মিষ্ট হাসি হাসিয়া দাদা জবাব দিলেন—তাদের ভাবনা তারা ভাববে রে,—এখন আমি যে কদিন আছি একটু শান্তিতে থাক্‌তে দে ! ভাইপোদের সঙ্গে নিয়ে না থাকলে কি জ্যেঠা হয়েছি অমনি ?

প্রভাতে

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

[illegible]ের প্রভাত-বেলা, কলিকাতা হতেছে মুখর,
একে একে ফেরীওলা সুপ্ত পথে করিছে জাগর।
আমি ব'সে আছি আজ স্তব্ধ ধীর,—কি চিন্তা কে জানে ?
[illegible] অতন্দ্র চিন্তা চিত্তে যেন মোহাবেশ আনে।
এ মোহ নেশার মতো,—সকল চেতনা যেন ঢুলে !
[illegible] রুদ্ধ কর্ম্মগতি, বাঁচা মরা যাই যেন ভুলে !
[illegible] যাই—গৃহ আছে, আছে মোর আত্মীয় স্বজন ;
[illegible] যাই—দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, ধর্ষণ পেষণ।
[illegible] হয়—চিত্তে যেন শান্ত ধীর সমুদ্র বিরাজে,—
[illegible] তল, নাহি সীমা, ডুবে গেছি আমি তারি মাঝে !

সৌম্য শান্ত হিমালয় ধ্যানমগ্ন বিরাট গম্ভীর
সহসা হৃদয়ে যেন দাঁড়ায়েছে অটল সুস্থির।
তারি তলে তারি পাশে ম'রে গেছে উচ্ছ্বাস ও ভাষা,
আশা-বাসনার লীলা, তৃপ্তিহীন দুর্দ্দম পিপাসা
আজিকে প্রশান্ত স্থির অবনত যেন বেগহীন।
ধরাতীত শান্তি মাঝে আজি যেন হয়েছি বিলীন।

* * * *

ডাকে কাক, ছোটে গাড়ী, চলে লোক, বলে কত কথা,
শুনি তবু চিত্তে মোর চাঞ্চল্যবিজয়ী নীরবতা।

নিবারণ কথাটা কিন্তু বুঝিল না। শ্যামবাবু বলিয়া কেহ ত তার ঔষধ লন নাই; বরঞ্চ যদুবাবু একজন আছেন। যাই হোক সাত পাঁচ ভাবিয়া তারা গ্রহণ করিল। বিদায় দিবার সময় দেখা গেল লোক পলাইয়াছে।

দিনকতক বাদে আবার যখন একটি লোক কমলালেবুর ঝাঁকা লইয়া হাজির হইল এবং বলিল শ্যামবাবু দিয়াছেন, তখন নিবারণেরও বিশ্বাস করা শক্ত হইল। সে বলিল বোধ হয় দাদার কাজ! তার স্ত্রী বলিল, দাদার ওপর যা বিশ্বাস তোমার,—বয়ে গেছে তাঁর দিতে। একবার ডেকে খোঁজ করেন? লোকটিকে যাইতে বলিয়া নিবারণ তার পিছু লইল। দেখিল বড় রাস্তায় গিয়া একটা গ্যাসের নীচে তার বড়দাকে লোকটা কি বলিল এবং তিনি একটি টাকা তার হাতে দিলেন।

নিবারণ রুক্ষকণ্ঠে গিয়া বলিল—এ তোমার কি কাণ্ড বড়দা, আমরা কি খেতে পাইনে?

বড়দা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—তোদের ত দিই নি, আমার ভাইপোদের দিয়েছি। চোখের জল ঝরিয়া পড়িবার আগে তিনি সরিয়া পড়িলেন।

খবর পাওয়া গেল—ক্যাবলা ফেল করিয়াছে। বুকটা তাঁর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মাষ্টার রাখবে না তার কি হবে! মাস্তর অমন ভাল সম্বন্ধ টাকার জন্য ভাঙিয়া গেল—তার জন্যও আপশোষ হয়! কিন্তু কিই বা করিবেন তিনি, কেউ কি তাঁর পরামর্শ লয়?

গভীর রাত্রে ছাতে উঠিয়া পুরোনো ভাঙা বাড়ীটার দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতে থাকেন—তাঁরই বংশধরেরা দুঃখে, দারিদ্র্যে, কুশিক্ষায়, অস্বাস্থ্যে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে! একি তাঁর গৌরবের? তাঁর পরিচয়েই না সমাজে তারা চলাফেরা করে?

উঠানের সামনে ঐ দালানটায় বসিয়া কত দীর্ঘকাল ধরিয়া দিনের অন্ন তিনি মুখে তুলিয়াছেন; একই জানালার সামনে শয্যায় শুইয়া কত দীর্ঘরাত্রি তাঁর কাটিয়াছে; সেই বহু পরিচিত গৃহতল ছাড়িয়া পিতৃপিতামহের স্মৃতি-পূত সংসার পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন প্রাসাদে সম্পূর্ণ নূতন জীবন যে তিনি যাপন করিতে আসিয়াছেন, সকল মায়া সকল মমতা বিসর্জ্জন দিয়া—এ কি খুব পরিতৃপ্তির?

মোটেই নয়। তিনি ঐ সংসারে ফিরিয়া যাইতে চাহেন, ঐ পরিবারে হাসি ফুটাইতে চাহেন।

সকালে উঠিয়া ভায়েদের ডাকিয়া তিনি প্রস্তাব করেন—যা হইবার হইয়া গেছে,—এসো, আবার এক হওয়া যাক্। ভায়েরা প্রতিবাদ করে, বলে—সে হয় না। একবার ভাঙ্‌লে আর কি যোড়া লাগে?

সকলের চেয়ে তেজ বেশী যার, সেই ক্যাবলার কয়দিন হইল অসুখ করিয়াছে।

বিপিনবাবু একবার ভাবিলেন দেখিয়া আসি। গৃহিণী বলিলেন, কি অসুখ জানা নেই—টাইফয়েড হতে পারে। তোমার ছেলেপুলের ঘর—তুমি বাইরে থেকে খোঁজ নাও না।

চোখ দুটা একবার রাগে জলিয়া উঠিয়া আবার ম্লান হইয়া আসিল। গৃহিণীই তাঁহাকে নষ্ট করিয়াছেন।

সকলের চেয়ে কুৎসিত এবং সকলের চেয়ে নির্ব্বোধ বলিয়া ক্যাবলার প্রতি তাঁর বিশেষ মমতা ছেলেবেলা হইতেই। অথচ সেই তাঁকে সকলের চেয়ে বেশী আঘাত দিয়াছে।

চিররুগ্ন ঐ ছেলেটা অভিমান করিয়াই সারা জন্ম কাটাইল। করিবেই বা না কেন, এই যে এ বাড়ীতে সে একেবারে আসে না,—তিনি কয়বার ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? অথচ একদিন ক্যাবলাকে সঙ্গে না লইলে তাঁর কোথাও নিমন্ত্রণ অবধি যাওয়া চলিত না,—কে জানে সামাজিক উৎসব, কে জানে অপিসের টি-পার্টি!

তবু এমনি তাঁর পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কাজে-কর্ম্মে অসুখের কথাটা ভুলিতে পারিলেন। অনেক দিন কোন খবর না লইয়া এবং না পাইয়া তিনি মনে করিলেন ক্যাবলার অসুখ ভালো হইয়া গেছে।

হঠাৎ একদিন শুনিলেন খুব বাড়াবাড়ি। সেদিন তাড়াতাড়ি কিছু আঙুর নাসপাতি আপেল কিনিয়া একেবারে ওপরে গিয়া উঠিলেন, ক্যাবলা দরজার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল, জ্যেঠাকে দেখিয়া দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইল।

বিপিনবাবু সস্নেহে ডাকিলেন, ক্যাবলাবাবুর রাগ হয়েছে! ফেরো, দেখো কি এনেছি।

ক্যাবলা কাৎ হইয়া ফিরিয়া তাঁর হাত হইতে আঙুরের

খোকাটা লইয়া মাথার দিকের জানালা গলাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, এক মাস পরে দেখতে এলেন!

পিসি-মা ধমকাইলেন—ও কি, জ্যেঠার সঙ্গে ও-রকম করে?

রুক্ষকণ্ঠে ক্যাবলা জবাব দিল—জ্যেঠা! জ্যেঠা এতদিন খোঁজ নিয়েছিলেন কেমন আছি? নিজের ছেলে হলে পারতেন?

কথাগুলি তীরের মতন গিয়া বুকে বিঁধিল। অপরাধীর মতন বিপিনবাবু উঠিলেন,—শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিয়া গেলেন, পাগলা রেগে গেছে! কিন্তু তাঁর মন বার বার বলিতে লাগিল সে অন্যায় কিছু বলে নাই।

তার পরদিনই অবস্থা খুব বাড়াবাড়ি হইল, লোকজনে বাড়ী ছাইয়া গেল। বিপিনবাবুর জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না অবস্থা কি রকম।

সমস্ত দিন ধরিয়া কোথায় যেন একটা অস্ফুট ক্রন্দন, যেন একটা চাপা আর্ত্তনাদ, যেন একটা আচম্কা হাহাকার তাঁর কাণে আসিতে লাগিল।

বিষণ্ণ মলিন মুখে পাশের বাড়ীর লোকেরা বাহিরে যাওয়া-আসা করিতেছে—তাহাদের দুপ্ দুপ্ চরণ-ধ্বনি বিপিনবাবুর অসহ্য বোধ হইতেছে।

সন্ধ্যার সময় তিনতলার সিঁড়ির জানলার কাছে গিয়া তিনি চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—সেখান হইতে পুরানো বাড়ীটার অন্দরের অনেকটা দেখা যায় এবং সামনেই ছাদ পড়ে। দেখিলেন স্তিমিত অন্ধকারে পাঁচিলের কাছে বসিয়া ছিন্ন মলিন কাপড় মুখে গুঁজিয়া রেণি কাঁদিতেছে ফুলিয়া ফুলিয়া;—তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন রে!

রেণি চীৎকার করিয়া বলিল, ও জ্যেঠামশাই গো, দাদা আর বাঁচবে না। যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে আর বলছে, জেঠামশাই আমাকে দেখলে মর্‌তুম না!

জ্যেঠামশাই হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—আমি জ্যেঠা, আমি জ্যেঠা, আমি জ্যেঠা,—আমার ভাইপো, আমারি ভাইপো যায়, আর আমি জ্যেঠা এখানে বসে—

কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি নীচে নামিয়া টেলিফোনের হাতল তুলিয়া ধরিলেন; তাঁর ডাক্তার বন্ধু রজতবাবুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—৬৪-র ৩২-র যে কয়জন চিকিৎসক কলিকাতায় আছেন তাঁর বাড়ী হাজির করিতে।

চিকিৎসার গুণেই হোক, পরমায়ু ছিল বলিয়াই হোক সে 'টাল'টা কাটিয়া গেল।

প্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্র বারান্দার কোলে আসিয়া পড়িয়াছে; প্রাতঃসূর্য্যকে প্রণাম করিয়া ভায়েদের উদ্দেশে বিপিনবাবু বলিলেন—ওরে আজ মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছি—সে মজুর নিয়ে এসে এখনি উঠনের মাঝখানের এই পাঁচিলটা ভেঙে ফেলবে—এ আমার বুকে পাষাণের মতন চেপে বসে আছে—

নিবারণ আপত্তি করিল, কিন্তু দাদা, আমরা না হয় এক হলুম, আমাদের ছেলেরা কি পারবে?

করুণভাবে মিষ্ট হাসি হাসিয়া দাদা জবাব দিলেন—তাদের ভাবনা তারা ভাববে রে,—এখন আমি যে কদিন আছি একটু শান্তিতে থাকতে দে! ভাইপোদের সঙ্গে নিয়ে না থাকলে কি জ্যেঠা হয়েছি অমনি?

প্রভাতে

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শীতের প্রভাত-বেলা, কলিকাতা হতেছে মুখর,
একে একে ফেরীওলা সুপ্ত পথে করিছে জাগর।
আমি ব'সে আছি আজ স্তব্ধ ধীর,—কি চিন্তা কে জানে?
গভীর অতন্দ্র চিন্তা চিত্তে যেন মোহাবেশ আনে।
এ মোহ নেশার মতো,—সকল চেতনা যেন ঢুলে!
যেন রুদ্ধ কর্ম্মগতি, বাঁচা মরা যাই যেন ভুলে!
ভুলে যাই—গৃহ আছে, আছে মোর আত্মীয় স্বজন;
ভুলে যাই—দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, ধর্ষণ পেষণ।
মনে হয়—চিত্তে যেন শান্ত ধীর সমুদ্র বিরাজে,—
নাহি তল, নাহি সীমা, ডুবে গেছি আমি তারি মাঝে!

সৌম্য শান্ত হিমালয় ধ্যানমগ্ন বিরাট গম্ভীর
সহসা হৃদয়ে যেন দাঁড়ায়েছে অটল সুস্থির।
তারি তলে তারি পাশে ম'রে গেছে উচ্ছ্বাস ও ভাষা,
আশা-বাসনার লীলা, তৃপ্তিহীন দুর্দ্দম পিপাসা
আজিকে প্রশান্ত স্থির অবনত যেন বেগহীন।
ধরাতীত শান্তি মাঝে আজি যেন হয়েছি বিলীন।

* * * *

ডাকে কাক, ছোটে গাড়ী, চলে লোক, বলে কত কথা,
শুনি তবু চিত্তে মোর চাঞ্চল্যবিজয়ী নীরবতা।

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রের আলোক রহস্য)

চিত্র সম্বন্ধে যাঁদের সামান্য কিছু জ্ঞান আছে, তাঁরাই এ কথাটা জানেন যে ছবির প্রধান সম্পদ হ'চ্ছে 'আলো-ছায়ার' লীলা-চাতুর্য্য! এই 'আলো-ছায়ার' বিশেষ তারতম্যের গুণেই ছবির অন্তর্নিহিত রূপ ও প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে! চলচ্চিত্রও ছবি; তাই এরও প্রকাশমাধুর্য্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে আলো-ছায়ার সুবিন্যাসের উপর। আলোক-সম্পাতের কৌশলে মানুষের দৃষ্টিকে



আলো-ছায়ার তারতম্য

(আলোক সম্পাতের গুণে এই ছবিখানি দেখলেই মনে হয় যেন খিলানের নীচে দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত ভিতরে দৃষ্টি যাচ্ছে! খিলান ও আস্‌বাবগুলির উপর জোর আলোর কৌশলে depth & roundness চমৎকার ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ শুধু আকার নয়, ওদের সম্পূর্ণ অবয়বও দেখা যাচ্ছে।)

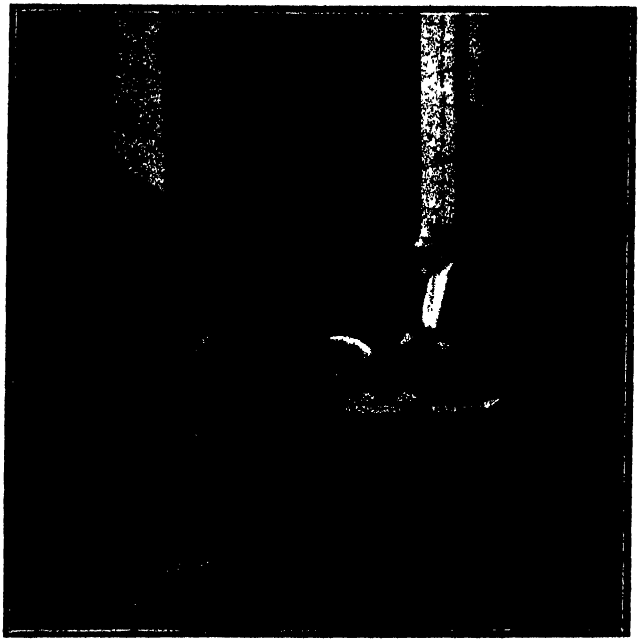
এমনিই বিভ্রান্ত ক'রে তোলা যায় যে, পাতলা একখানি পর্দ্দার উপর ঘর-বাড়ী, গাছপালা, নরনারী, জীবজন্তু, এবং আস্‌বাব ও তৈজসপত্রের যে ছায়া পড়ে, তার কোনোটিকেই ছায়া ব'লে মনে হয় না। সবই যেন চোখের সামনে সত্য ও প্রত্যক্ষ দেখ্‌চি বোধ হয়! ছবিতে গোটা-জিনিসটার শুধু আকার নয়—সম্পূর্ণ অবয়বটিও অর্থাৎ তার depth এবং roundnes টুকুও দেখানোর একমাত্র উপায়ই হচ্ছে এই আলো-ছায়ার সু-সন্নিবেশ। কাজেই, চলচ্চিত্রের প্রধান একটা অঙ্গ হ'চ্ছে আলোক-সম্পাত।

দিনের আলোর উপর নির্ভর ক'রে ছবি তোলার একটা মস্ত অসুবিধা হ'চ্ছে, সে আলো নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; তা'ছাড়া সূর্য্যালোক তেমন সহজে আমরা যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করতে পারিনি। প্রয়োজন মত অতিসূক্ষ্ম ওজনে কমানো বা বাড়ানোরও কোনো সহজ উপায় থাকেনা আমাদের হাতে। সুতরাং সূর্য্যালোকের চেয়ে 'ষ্টুডিও' বা চলচ্চিত্রাগারের মধ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে ছবি তোলাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ, আলোক এখানে সম্পূর্ণরূপে পরিচালকের আয়ত্তাধীন। চিত্রগড়ে বৈদ্যুতিক আলোক ছাড়াও 'ইন্‌ক্যাণ্ডিসেণ্ট্‌ লাইট্‌' এবং 'আর্ক-ল্যাম্প্‌' প্রভৃতি নানা রকম আলোক ব্যবহারের সুব্যবস্থা করা থাকে। এই সব আলো পরিচালক তাঁর ইচ্ছামত ও প্রয়োজন অনুসারে যেখানে খুশী ফেলতে পারেন এবং যেরকম দরকার সেইরকম ভাবেই অনায়াসে কমাতে বা বাড়াতে পারেন।

চিত্রগড়ের 'আলোক-রহস্য' যদিও কতকগুলি মাপ-জোক্‌, হিসাব ও যন্ত্রপাতির অধীন, তবু চিত্রের প্রয়োজন মতো তাকে অদলবদল ক'রে নিয়ে ব্যবহার করা চলে। প্রথমেই ত' $\frac{1}{16}$ সেকেণ্ডের মধ্যে ছবি তোলা যেতে পারে এমনভাবে চিত্রগড়টি ক্যামেরার সামনে দিক থেকে আলোকিত ক'রে রাখতে হবেই। এর উপর আবার diffused light (অনাবৃত-আলো) সমস্ত দৃশ্যটির উপর

ওজোন বুঝে ছড়িয়ে ফেল্‌লে ছবির যে সব জায়গা একেবারে গাঢ় আঁধার অর্থাৎ গভীর ছায়াযুক্ত, সে সব অংশও বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এর ফলে, ছবিখানির মধ্যে আলো-ছায়ার লীলা এমন সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে, সে ছবির তারিফ না ক'রে পারা যায় না। ক্যামেরার দিক থেকে দৃশ্যপটের উপর আবৃত-আলোও (spot-light) ফেলতেই হয়, তাছাড়া উপরদিক থেকে আবার এই diffused light বা অনাবৃত আলো ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত দৃশ্যটি সমানভাবে আলোকিত ক'রে রাখতে পারলে ছবির আলো-ছায়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা নিজেদের আয়ত্তের ভিতর থাকে। কোন্ ছবিতে কোন্‌দিকে এবং কোন্‌খানটায় কতখানি আলো বা কতটা ছায়া (shado) রাখা দরকার, কোথায় আলো খুব জোর হ'লে ভাল হয়, কোথায় কমজোর হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; এই সব দিক দিয়ে ছায়ার মায়াকে মূর্ত্ত ক'রে তোলার পক্ষে এই diffused light বিশেষ কাজে আসে। তা'ছাড়া, আজকাল সবাক্ ছবি তোলবার জন্য প্রত্যেক দৃশ্যে এতবেশী সংখ্যক ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় যে, অনাবৃত আলোক-সম্পাত এখন ছবি তোলার একটা প্রধান আবশ্যকীয় অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে !

নির্ব্বাক্ ছবিতে কোনো চিত্রগড়েই আগে একসঙ্গে তিনটির বেশী ক্যামেরা ব্যবহার করা হ'ত না। কিন্তু এখন 'কথাকওয়া ছ'বি তুলতে গিয়ে অনেক চিত্রগড়ে একসঙ্গে পনেরোটি পর্য্যন্ত ক্যামেরাও চালানো হ'চ্ছে। যাদের অবস্থা খুব বেশী সচ্ছল নয়, তারা সবচেয়ে কম ক'রেও একসঙ্গে অন্ততঃ চারটি ক্যামরা না হ'লে কাজ করতে পারেনা ! একই ছবির একই দৃশ্য পনেরোটি ক্যামেরায় কেন তুলে নেওয়া হয়—এ প্রশ্ন যদি কারুর মনে জাগে, তার অবগতির জন্য বলছি যে—ছবি এক হ'লেও নানা বিভিন্ন কোন (angle) থেকে দেখলে সেই একই ছবি বিভিন্ন রকম দেখতে হয়। তাছাড়া নিকট ও দূর থেকে দেখার ও শোনার দুইয়েরই পার্থক্য ত' আছেই এবং আরও আছে—বিভিন্ন ক্যামেরার চক্ষের দৃষ্টি-শক্তি (power of Lens) ভিন্ন ভিন্ন রকম। অর্থাৎ, কোনো ক্যামেরার লেন্‌সের power খুব বেশী, কোনোটার কম। কাজেই পনেরোটি বিভিন্ন শক্তির ক্যামেরায় ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ও ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব থেকে এবং বিভিন্ন আলোক-সম্পাতের সাহায্যে যে দৃশ্যটির ১৫খানি ছবি তোলা হয়, তার কোনো-না-কোনো একখানি ছবি শব্দ ও চিত্রের দিক দিয়ে নিখুঁত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা থাকেই, আর তা' যদি না'ও হয়, তাহ'লেও, যে ক্যামেরায় ছবির যে অংশটুকু ভালো উঠেছে তা' থেকে সেই অংশটুকু কেটে নিয়ে জোড়া লাগিয়ে একখানি যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নির্দ্দোষ ছবি তৈরী হবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই আরও বিশেষ ক'রে অনাবৃত-আলোর সাহায্যে সমস্ত দৃশ্যগুলি সমানভাবে আলোকিত ক'রে রাখা প্রয়োজন।



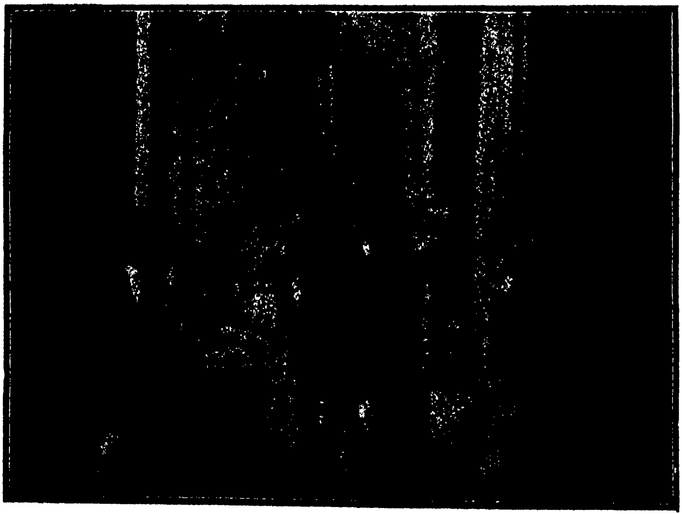
যথাস্থানে আলো

(এই ছবিখানিতে বামদিকের খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো আসছে। জানালা আলোক আসবারই পথ। সুতরাং, এই জানালার ভিতর দিয়ে এই দৃশ্যে যে কৃত্রিম আলোক-সম্পাত করা হ'য়েছে—একে বলে 'Source lighting' বা যথাস্থানে আলো।)

উপরদিক থেকে আলো ছড়িয়ে ফেলার একটা মস্ত সুবিধা হ'চ্ছে প্রত্যেক জিনিষটার এবং প্রত্যেক নরনারীর উপরাংশ ক্যামেরার সামনে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে! ছবির লোকগুলোর চোখ মুখ যদি আমরা ভালো ক'রে দেখতে পাই, তাহ'লে সে ছবির উপর সহজে আমাদের বিরাগ উৎপন্ন হয়না। উপর থেকে আলো ফেলার ব্যবস্থা ক'রলে আর একটা সুবিধা হয় এই যে, ছবি তোলবার সময় ক্যামেরা-কুটুরী (comera-booths) আলোকাধার (light--stands) প্রভৃতির পরিবেষ্টনে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে ওঠায় অভিনয়ের স্থানটুকু আর অধিকতর সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়েনা।

এই উপর থেকে ছড়িয়ে ফেলা আলোর ব্যবস্থাটা বেশ সন্তোষজনক ভাবে ক'রে উঠতে পারলেই তার পরের কাজ হ'চ্ছে কী-ভাবে প্রত্যেক দৃশ্যে আলোক নিক্ষেপ করা হবে সেইটে স্থির করা। অর্থাৎ সেই দৃশ্যের ছবির আখ্যান ভাগ অনুযায়ী কোন্ সময়ে ঘটছে সেইটে জেনে তদনুরূপ আলোক নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা। যদি সেই দৃশ্যে খোলা-জানালা দেখবার সুযোগ থাকে তা'হলে সেই খোলা-জানালার ভিতর দিয়ে দিনের তখন কতদণ্ড হিসাব করে এবং সে সময় কোন্দিক্ থেকে ঘরের মধ্যে আলো আসা সম্ভব সেটা বিবেচনা ক'রে ঘরের সেইদিকের জানালা দিয়ে আলোক নিক্ষেপের আয়োজন করা উচিত। কিম্বা, যদি সেটা রাত্রিকালের কোনো দৃশ্য হয়, তাহ'লে ছবির গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী সে ঘরে তখন কী আলো বা দীপ জ্বলছিল, ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, না টেবিলল্যাম্প, সেইটে জেনে তারই সাহায্যে দৃশ্যটি আলোচিত ক'রে তোলবার ব্যবস্থা করাই হ'চ্ছে শিল্প-রুচি-সম্মত উপায়।

আলোর ব্যবস্থা করায় যদি কোনো ভুল বা ত্রুটী হ'য়ে পড়ে তাহ'লে কিন্তু ছবিগুলি মাটি হ'য়ে যায়। কারণ ভুল দিক থেকে আলো ফেলার দোষে এবং সেখানে যতটুকু আলোর দরকার তার কমবেশী হ'য়ে গেলে সে দৃশ্যে অভিনয় ত' ক্ষতিগ্রস্ত হয়ই, তা' ছাড়া সে ছবিও ভালো খেলেনা! অর্থাৎ ক্যামেরা খুব ভাল হ'লেও আলোর দোষে ঠিক আশানুরূপ সাফল্যলাভ হয় না। সুতরাং চলচ্চিত্র-শিল্পীদের প্রথম কর্ত্তব্য হ'চ্ছে গল্পটি বেশ ভালো ক'রে পড়ে নিয়ে—'আলোকর' (Light-expart) দৃশ্য-সজ্জাকর (Art-Director) এবং ছায়াধর-যন্ত্রী (camera-man) তিনজনে মিলে পরামর্শ ক'রে প্রত্যেক দৃশ্যের ছবি তোলবার আগেই সে দৃশ্যটিতে কী ভাবে কোন্দিক দিয়ে কতটা আলো ব্যবহার করা হবে, তার একটা ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করা। এইভাবে কাজ সুরু ক'রতে পারলে অনেক ভুলচুক্ কম হবে। ছবি তুলতে অযথা অর্থের অপব্যয় এবং অকারণ বিলম্ব ঘটবে না।



নিরপেক্ষ আলো

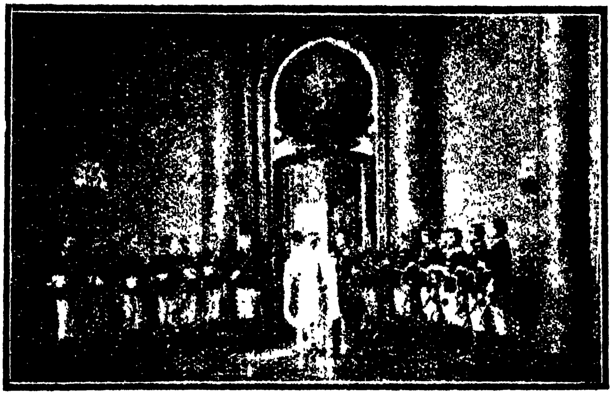
(লভ্ প্যারেডের এই দৃশ্যটিতে এমনভাবে আলো ফেলা হয়েছে যে প্রধান নট-নটীর সঙ্গে দ্বারপালেরাও ক্যামেরার চোখে সমান আদর পেয়েছে। একে বলে 'Impersonal lighting'।)

কোন্ দৃশ্যে কোন্দিক থেকে কি ভাবে আলো ফেলা হবে, এটা স্থির হবার পরই চলচ্চিত্র-শিল্পীর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আলোর সাহায্যে দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন করা। অর্থাৎ চিত্রেয় বস্তু বা ব্যক্তির শুধু রেখায় আঁকা আকৃতি দেখানো নয় তার সম্পূর্ণ অবয়বের রূপ (depth & roundness) ফুটিয়ে তোলা! এটা সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র আলো-ছায়ার কৌশলে দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি

ক'রতে পারলে। চিত্রের বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতির depth দেখাতে হ'লে আলোর তারতম্য বিধানই একমাত্র সহজ উপায়।

কোনো ছবির পুরো-ভূমিকা (Fore-ground) যদি ছায়া-কায়া (Silhouett) মাত্র ক'রে রেখে, মধ্যভূমিকা (middle-ground) খুব দীপ্ত আলোকোজ্জ্বল করে তোলা হয় এবং পট-ভূমিকা (Back-ground) একেবারে অন্ধকার রাখা হয়, তাহ'লে যে কোনো দৃশ্যের depth ছবিতে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে আলো-ছায়ার এই তারতম্য (Contrast of light & shade) তা' ব'লে কোনো ছবিতেই যেন স্পষ্ট হ'য়ে না ওঠে। কারণ, আলো-ছায়ার তারতম্যটুকু যদি দর্শকদের চোখে ধরা প'ড়ে, যায় তাহ'লে তাদের দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি করা কঠিন। সুতরাং ছবির যে অংশটুকু মাত্র সিলুহোট্ করা হবে তার মধ্যেও প্রত্যেক খুটি-নাটিটি (details) পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া চাই ; আবার, যে অংশটুকু আলোকোজ্জ্বল করা হবে সেটুকু যেন বড্ড বেশী জোর আলোয় একেবারে সাদা না হ'য়ে পড়ে। এবং একেবারে অন্ধকার অংশেরও অন্ততঃ আকৃতি-রেখাগুলো (Outlines) যেন অদৃশ্য না হয়ে যায়।

Depth দেখাবার আর একটা উপায় হ'চ্ছে দৃশ্যের দেওয়াল বা প্রাচীরগাত্র খুব আলোকোজ্জ্বল ক'রে তুলে ঘরের ভিতরের ও দেওয়ালের সম্মুখের আসবাবপত্রগুলি একটু 'সিলুহোট্' ক'রে রাখা! Depth দেখাবার এ উপায় যেখানে অবলম্বন করা হবে, সেখানে দৃশ্যপটের দেওয়ালগুলি যাতে চ্যাপ্টা ও প্লেন না হ'য়ে উঁচু উঁচু 'বীট' বা 'পল' তোলা, থাম বসানো এবং ষট্‌কোণ বা অষ্ট-কোণ হয়, আগে থেকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। দেওয়ালের অভ্যন্তরে ঝরোকা, বাতায়ন, বা ঘুলঘুলি থাকলে আরও ভালো হয়। আসবাবপত্র-গুলো একটু আকারে বড়ো হ'লে এ রকম ছবির পক্ষে খুব সুবিধা। তা'ছাড়া ঘরের ভিতরকার প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তির যদি সেই ঘরের মেঝেয় আলোর বিপরীত দিক থেকে ছায়া পড়ছে দেখানো হয়, তাহ'লে অতি সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন ক'রতে পারা যায়।



'লাভ্ প্যারেডের' একটি দৃশ্য

(এই দৃশ্যের পটভূমিকায় যে আলো ফেলা হ'য়েছে অন্যান্য অভিনেতৃবর্গের উপর তার চেয়ে হালকা আলো দেওয়া হ'য়েছে, আবার প্রধানা অভিনেত্রীর উপর অপেক্ষাকৃত জোর-আলো ব্যবহার করা হ'য়েছে। এর ফলে এই লঘু ছবিখানির মধুর ভাবটুকু বেশ খুলেছে।)



'ডাঃ ফ্যু মাঞ্চুর' একটি দৃশ্য

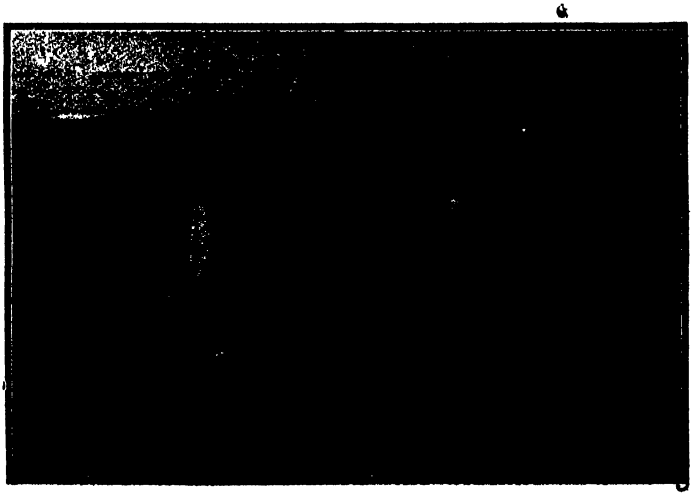
(এই দৃশ্যে আলোছায়ার যে বৈচিত্র্য দেখানো হ'য়েছে তার ফলে এই গুরু ছবিখানির একটা গম্ভীর সংযত ভাব চমৎকার ফুটেছে।)

Roundness অর্থাৎ চিত্রের বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতি ও অবয়বের সম্পূর্ণ গঠন, যদি দেখাতে হয় তাহ'লে বিশেষ যত্ন ক'রে জোর-আলো ব্যবহারের কৌশল শিক্ষা করা চাই। দৃশ্যের মধ্যে যেখানে সামান্য একটুও বৃত্তরেখার (Carve) সম্পর্ক আছে, সেই সেই স্থানগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ক'রে ছোট ছোট আবৃত-আলোক (Spot-light) ব্যবহার ক'রে সেগুলি সু-স্পষ্ট ক'রে তোলা চাই। বৃত্তরেখা বেশী করে দেখাতে পারলেই ছবির roundness ফুটিয়ে তোলা সহজ হ'য়ে উঠবে। কারণ এই বৃত্তরেখার (Curve) সাহায্যেই আমাদের দৃষ্টির 'গোলাকার বোধ' জন্মায়। কাজেই ছবিতে কোনোও কিছুর 'ঘের' বোঝাতে হ'লে বৃত্তরেখার সাহায্য নেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নেই। যেমন ধরুন কোনো ছবিতে যদি গোটাকতক গোল খিলান সারি সারি গোল থামের উপর থাকে, তাহ'লে যে কোনো একদিক থেকে সেই থামের উপর জোর আলো ফেললে থামের বৃত্তরেখা আমাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে এক পাশ থেকে খিলানেরও ভিতর দিকটায় জোর আলো দিতে পারলে শুধু যে তার roundness টুকুই আমরা বুঝতে পারবো তাই নয়, তার ভিতরের depthও আমাদের দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হবে। এমনি ভাবে আস্‌বাব্‌-পত্রের উপরও আলো ফেলতে পারলে সমান ফল পাওয়া যায়। ঘরের ভিতরের টেবিল চেয়ারগুলির পায়া যদি এমনভাবে আলো ফেলে স্পষ্ট ক'রে তোলা যায় যে, মেঝের আলো এবং দেওয়ালের গায়ের আলোর সঙ্গে বেশ একটা তার পার্থক্য থাকবে অথচ সেটা খুব বেশী তফাৎ না হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে সে আস্‌বাব্‌গুলো আমাদের চোখে একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য হ'য়ে উঠবে।



পক্ষপাতি আলো

('ভ্যাগাবণ্ড কিং'য়ের এই দৃশ্যে প্রধানা অভিনেতৃকেই আলোকিত ক'রে দেখানো হ'য়েছে—তাঁর সখী বা পরিচারিকাদের সম্পূর্ণ অবহেলা করে! একে বলে Personal lighting)



'এ্যানা ক্রিষ্টী'র একটি দৃশ্য

(আলোক-সম্পাতের গুণে এই দৃশ্যে রজনী হ'য়ে উঠেছে যেন হেমন্তের ঘন কুজ্ঝটিকায় ঢাকা। ঘর বাড়ী আলো ও মানুষের ভিতর দিয়েও স্পষ্ট তার রূপ দেখা যাচ্ছে।)

অবশ্য দৃশ্যপট ও আস্‌বাব-পত্রের চেয়ে নট-নটীদের উপরই লক্ষ্য রাখতে হবে বেশী, কারণ ছবির প্রধান আকর্ষণ তারাই, দৃশ্যপট বা আস্‌বাব-পত্র নয়। ওগুলো তাদেরই সুবিধার জন্য রাখবার প্রয়োজন। চলচ্চিত্রের অভিনেতৃদের মধ্যে আবার ছবির রকম হিসাবে দু'টো শ্রেণী আছে। একরকম হ'চ্ছে 'ষ্টার' ছবি! অর্থাৎ প্রধান অভিনেতা বা অভিনেত্রীই এ ছবির প্রধান আকর্ষণ! সুতরাং এ ছবির মধ্যে যা কিছু থাকবে সমস্তই সেই 'ষ্টার্' বা প্রধানের আকর্ষণের অনুকূল। আর এক-রকম ছবি হ'চ্ছে "All-Star" চিত্র অর্থাৎ সে ছবিতে প্রধান ব'লে বিশেষ কোনও এক জনের আকর্ষণ নেই, সে ছবির গল্পের সাফল্য নির্ভর করে সবারই উপর সমান ভাবে! কেউ তাতে কম বেশী নয়।

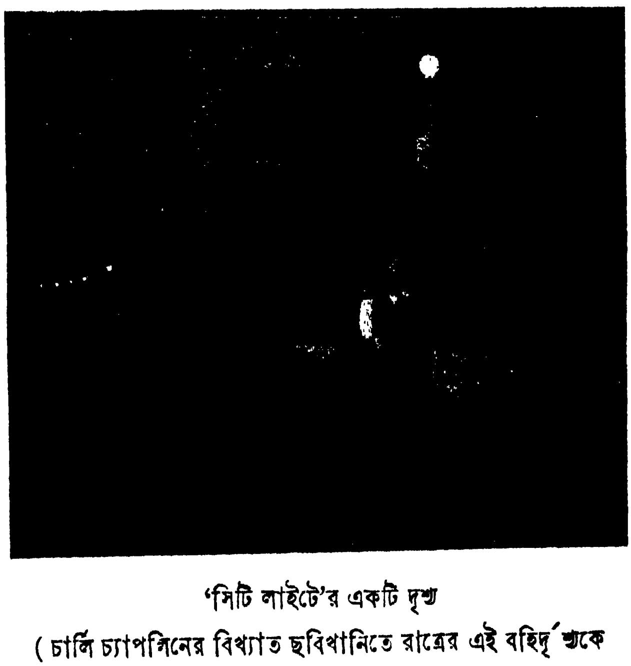
এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ছবিতে আলোর ব্যবহারও একেবারে দু রকমের। প্রথম শ্রেণীর ছবিতে সেই প্রধান ব্যক্তির প্রয়োজন হিসাবেই আলোর ব্যবস্থা ক'রতে হয়। 'ষ্টার' যিনি তাঁকে যাতে সকল দৃশ্যেই সুন্দর ও মনোহর ক'রে তোলা যায় সেই দিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। কারণ, তিনিই হচ্ছেন সেই ছবির প্রধান আকর্ষণ! দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবিতে ব্যক্তির প্রয়োজন গৌণ হ'য়ে পড়ে। সেখানে গল্পের আকর্ষণটাই মুখ্য; কাজেই সেইদিকে লক্ষ্য রেখে ছবি-খানিকে শিল্প-চিত্রে-র দিক দিয়ে দ্রষ্টব্য ক'রে তুলতে হয়।

'ষ্টার্' ছবি তোলা আজকাল অনেক ক'মে এসেছে, কারণ যে ছবিতে 'ষ্টার্' অর্থাৎ প্রধান একজন নায়ক বা নায়িকাকেই বড়ো ক'রে তোলা হয়, সে ছবির অনেক দোষ থেকে যায়! যেহেতু—তার গল্প, তার চিত্রনাট্য, তার ভূমিকা-নির্ব্বাচন—তার অভিনয় পরিচালন—তার ছায়াচিত্র, তার আলোক-সম্পাত, তার বিবৃতি-লিপি (Titles) সব কিছুই এমন ধরা-বাঁধার মধ্যে থেকে ক'রতে হয় যাতে সেই 'ষ্টারে'র নাগালের বাইরে না গিয়ে পড়ে কিছু!

একাধিক নিম্নশ্রেণীর 'ষ্টার্' ছবিতে বাজার ছেয়ে যাওয়ায় 'ষ্টার' ছবির উপর সাধারণেরও একটা অভক্তি



রাত্রে তোলা বহির্দৃশ্য
('জার্ণিজ এণ্ড' ছবিখানির এই দৃশ্যে মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের আলোয় ভয়াবহ রাত্রির নিবিড় রূপ ও রণক্ষেত্রের ভীষণতা বেশ ফুটে উঠেছে।)



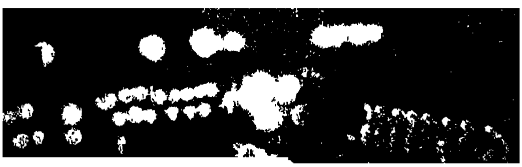
'সিটি লাইটে'র একটি দৃশ্য
(চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত ছবিখানিতে রাত্রের এই বহির্দৃশ্যকে সুন্দরভাবে আলোকিত ক'রেছে—'Sou:e lighting'! রাজপথের ঐ আলোটি অবলম্বন ক'রেই চলচ্চিত্র-শিল্পী এ দৃশ্যটিতে আলোক-সম্পাতের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।)

জন্মেছে। গল্পের মধ্যে যে দৃশ্যে 'ষ্টার্' আছেন—তার ঘটনা যেমনই হোক্ না কেন, 'ষ্টার'কে তার ভিতর প্রধান আকর্ষণ ক'রে ছবি তুলতেই হবে। প্রযোজকদের এই



'সানরাইজে'র একটি দৃশ্য

(পটভূমিকায় রাত্রিকালের অন্ধকার আকাশ। মধ্যে আলোকোজ্জ্বল 'কাফে' বা হোটেল এবং পুরোভূমিকায় রাজপথ। রাজপথের পথিকগুলিকে 'সিল্‌হৌটে দেখানো হ'য়েছে।)



'কিং অফ্ জাজের' একটি দৃশ্য (তোলবার আগে)

(দৃশ্যপটের স্বাভাবিক রংটি পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রে দেখাতে হ'লে কত বেশী আলো একটি দৃশ্যে ব্যবহার করতে হয় তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এই ছবিখানিতে।)

খেয়াল অনেক সময় পরিচালক ও চিত্র-শিল্পীর কাজের পক্ষে পীড়াদায়ক হ'য়ে ওঠে! কারণ, 'ষ্টারের' খাতিরে তাঁদের প্রায়ই 'আর্ট'কে গলাটিপে হত্যা ক'রতে হয়। ছবি তুলতে তুলতে এমন অনেক দৃশ্যে দেখা যায় যে সেই তথাকথিত ষ্টারের সুন্দর মুখের চেয়ে একটা কোনো ছোট্ট অপ্রধান ভূমিকার চোখ মুখের ভাব ক্যামেরার সামনে অভিনয়ে এত চমৎকার ফুটে উঠেছে যে নাটকীয় ঘটনার দিক দিয়ে তার সার্থকতা যতখানি শিল্প কলার দিকদিয়েও তার সৌন্দর্য্য তেমনই লোভনীয়! কিন্তু, পাছে 'ষ্টার' কোথাও এতটুকু মলিন হ'য়ে পড়ে এই আশঙ্কায় সে অপ্রধান ভূমিকার অভিনেতাকে অলক্ষ্যেই রেখে যেতে হয়। তাছাড়া, 'ষ্টার্' কোনো উৎসব-মণ্ডপে, আনন্দ-সভায়, প্রমোদ-গৃহে বা কারাগারের অন্ধকূপে, পর্ব্বত-গহ্বরে কিম্বা পাতালের সুড়ঙ্গপথেই থাক্—সব সময়েই—সর্ব্বত্র—তাকে সুন্দর ক'রে ছবিতে তোলা চাই, অর্থাৎ, স্থান-কাল যেমনই হোক না কেন, সেদিকে চোখ বুজে 'ষ্টারের' চাঁদমুখের চারপাশে ছবিখানির গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আলোর একটা চালচিত্তির ধ'রে বেড়াতেই হবে। এটা যে কোনোরকম যুক্তিতর্ক দিয়েই সমর্থন করা যায়না, এবং এতে যে আর্টের চরম অপমান করা হয়—ছবির কারবারী মহাজন তা' কিছুতে বোঝে না; সে ভাবে—যাকে এত টাকা দিয়ে কণ্ট্র্যাক্ট্ ক'রে—অথাৎ চুক্তি-পত্র সহি করে এনেছি, তাকে ছবির মধ্যে আগাগোড়া যত বেশী ক'রে দেখাতে পারি, সেইটেই আমার পক্ষে লাভ! কিন্তু, এই অতি-লোভের ফলে যে ছবির মর্য্যাদা অনেক খেলো হ'য়ে যায় সে হিসাব তারা রাখে না। কাপড়ের পাড়ের জরিদার কাজ দেখিয়েই তারা লোক ভোলাতে চায়, —মিহি বা খাপি খোলের জন্যে মাথা ঘামায় না!

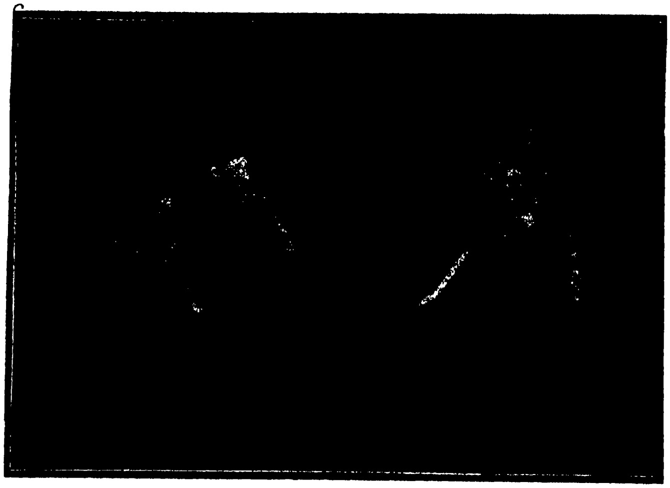
দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ 'all-star' ছবি যেগুলি, সৌভাগ্যক্রমে আজকাল সেই ছবিই ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌ছে। এতে চলচ্চিত্র-শিল্পীর স্বাধীন ভাবে কাজ করবার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। একজনের প্রতি সমস্ত

মনোযোগ না দিয়ে সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দেবার অবকাশ পায় সে। এর ফলে শিল্পের দিক দিয়ে চলচ্চিত্রের চরম সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা ঘটে।

ছবির আলোক-সম্পাত, সর্ব্বত্র ঠিক গল্পের ভাবানুকূল ক'রে তোলা উচিত। উৎকৃষ্ট ছবির প্রধান গুণই হ'চ্ছে তাই। ছবির ঘটনা ও কাহিনীর মর্ম্মনিহিত যে সুর, আলোর ভিতর দিয়ে সেই সঙ্গীতকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারলেই সেই ছবি হয়ে উঠ্‌বে সকল ছবির শ্রেষ্ঠতম।

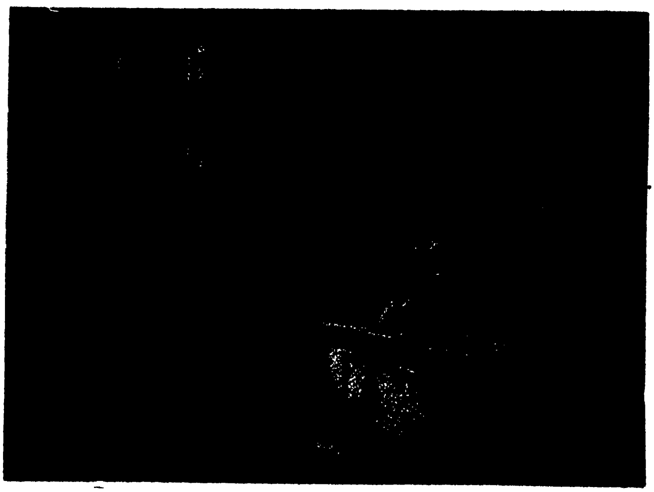
ছবির গল্প যদি 'The way of All Flesh'; বা 'Lummox' কিম্বা 'The case of Sgt. Grischa'র মতো গুরুগম্ভীর ভাবের হয়—তাহ'লে আলোক-সম্পাত সে ছবিতে খুব সংযতভাবে করা উচিত। কিন্তু ছবিখানি যদি 'মেলো-ড্রামা' বা মধুর নাটক হয় যেমন 'Dr. Fu Manchu' বা 'Alibi' ছবি তাহ'লে আলোক সম্পাত হওয়া উচিত একটু নরম রকমের, অথচ তারই মধ্যে আগা-গোড়া আলো-ছায়ার বৈচিত্র্যও রাখা উচিত। আবার 'Love Parade' কিম্বা 'Vagabond King'এর মতো মধুর মিলনান্তক হাল্‌কা ছবি যদি হয়, তাহ'লে আগাগোড়া খুব জোর-আলো ব্যবহার করাই সমীচীন। এর দু'টি কারণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথম, ঘটনার সঙ্গে তা'তে আলোর সামঞ্জস্য থাকে, দ্বিতীয় কারণ, ছবির কোনো মধুর অংশই এতে দর্শকের অলক্ষ্যে থেকে যাবে না! নিপুণ চলচ্চিত্র-শিল্পীর তত্ত্বাবধানে ছবির আলোক-সম্পাত শুধু যে গল্প ও অভিনয়ের স্থানকালোপযোগী একটা নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তাই নয়, দর্শকের মনকেও চিত্রের অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য রস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

কেবলমাত্র যে 'চিত্রগড়ের' অভ্যন্তরে কৃত্রিম আলোর সাহায্যেই এইভাবের ছবি তোলা সম্ভব, এমন যেন কেউ মনে করবেন না। বাইরে মুক্ত প্রকৃতির কোলে দিনের আলোতে তোলা ছবিও এমনিই সুন্দর ও সু-আলোকিত ক'রে তোলা যায় যদি সে চলচ্চিত্র শিল্পীর জানা থাকে—স্বভাবের আলোকেও কি উপায়ে নিজের আয়ত্তাধীন করে'



'লামাক্সের' একটি দৃশ্য

('Lummox' একখানি গুরু গম্ভীর নাটক। তার আলোক-সজ্জাও অনুরূপ ভারি ও সংযত করা হয়েছে।)



'এ্যালিবি'র একটি দৃশ্য

(পটভূমিকায় হত্যার উপযোগী অন্ধকার! দূরের জানালা-পথে আলো এসে প'ড়ে হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে! আলো-ছায়ার চমৎকার সন্নিবেশ হয়েছে এখানে।)

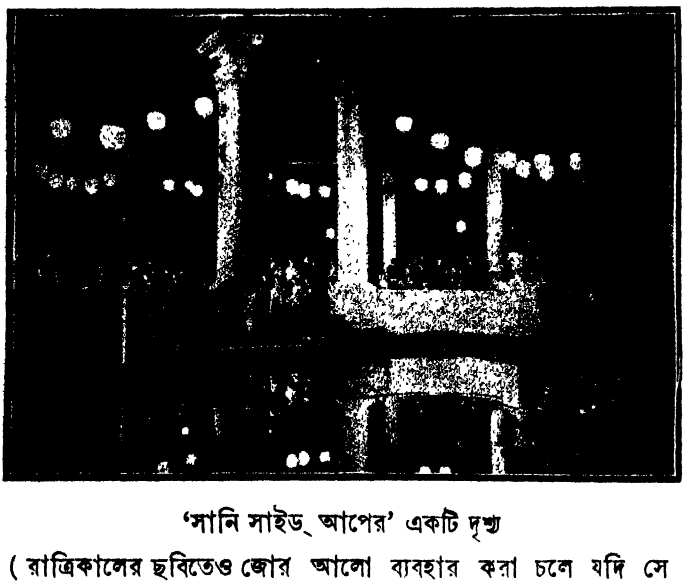
নেওয়া যেতে পারে! এ কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ; এবং দীর্ঘকালের সাধনা-সাপেক্ষ!

সূর্য্যের আলোক নিয়ন্ত্রিত করবার প্রধান উপায় হ'চ্ছে ক্যামেরার মুখটি খোলা ও বন্ধ করার কৌশল আয়ত্ত



অনেকের মাঝখানে দু'জন

('লামাস্কের' এই দৃশ্যে বহু লোকের মধ্যেও দুটি নারী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে। সবাইকেই বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যেও ওরা দুজন স্পষ্টতর হ'য়েছে।)



'সানি সাইড্ আপের' একটি দৃশ্য

(রাত্রিকালের ছবিতেও জোর আলো ব্যবহার করা চলে যদি সে দৃশ্যের ঘটনা এই ছবিখানির মতো অধিক আলোর অনুকূল হয়।)

করা। অর্থাৎ, কোন্ দৃশ্যটি কতক্ষণ কী পরিমাণ আলোর ভিতর তোলা দরকার, সেইটি জানা এবং লেন্সের সামনে সূতোর জাল ব্যবহার ক'রতে শেখা। অর্থাৎ কী রকম আলোর কী পরিমাণ তারতম্য ঘটাবার জন্য কোন্ ধরণের জালিপর্দ্দা লাগানো দরকার, সেটা ভাল ক'রে শেখা। এই উপায়ে সমস্ত ছবিখানি আগাগোড়া, কিম্বা তার অংশবিশেষের উপর দিনের আলোয় তোলবার সময়ও প্রয়োজন মত আলোর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো চলে। প্রত্যেক দৃশ্যের অনেক কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার ওই Gauze Matte এর সাহায্যে ইচ্ছামত সুস্পষ্ট ক'রে তোলা বা অস্পষ্ট ক'রে ফেলা যায়। তবে এ করবার উপায়টুকু একান্ত সীমাবদ্ধ! বহির্দৃশ্যের ছবি তোলবার সময় চলচ্চিত্র-শিল্পীর প্রয়োজন হ'লে এই ভাবেই তিনি দিনের আলো কতকটা কমিয়ে-বাড়িয়ে নিতে পারেন। এখানে একটা কথা ব'লে দেওয়া উচিত মনে করি; ক্যামেরার ভিতরের Matte বাক্সে এক আধ ইঞ্চি Gauze ব্যবহার করার চেয়ে অভিনেয় দৃশ্যপটের সামনে ও মাথার উপর খুব বড় জালিপর্দ্দা (Matte Screen) ঝুলিয়ে দেওয়াই অধিকতর সুবিধাজনক। সেই পর্দ্দার বাইরে যদি অভিনেতৃরা থাকে, তা'হলে তাদের উপর বেশ জোর আলোই পড়বে এবং পর্দ্দাবৃত থাকার দরুণ পটভূমিকা ও দৃশ্যস্থল অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলো পাবে। আবার কোনো দৃশ্যে যদি পটভূমিকা ও দৃশ্যস্থল উজ্জ্বল রেখে নটনটীদের স্বল্পালোকের মধ্যে অভিনয় করানো প্রয়োজন মনে হয়, তাহ'লে এমন কোনো একটি স্থান নির্ব্বাচন ক'রতে হবে যেখানে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী বেশ রৌদ্রকরোজ্জ্বল কিন্তু অভিনয় স্থলে গাছপালা, ঘরবাড়ী বা পাহাড়েরই হোক—খানিকটা ছায়া এসে প'ড়েছে; যদি সে রকম ছায়াযুক্ত স্থান খুঁজে না পাওয়া যায় তাহ'লে কোনো রকম কৃত্রিম উপায়ে প্রাচীর খাড়া ক'রে সেখানে আলোকটুকু আড়াল ক'রে নিতে হবে। অনেক সময় সেই জায়গাটুকুতে খুব ঘন কালো রং মাখিয়ে দিলে

ক্যামেরার ভিতর দিয়ে ছায়ার মধ্যে অভিনয় করার ফল পাওয়া যায়। তারপর reflector অর্থাৎ যার উপর সূর্য্যালোক প'ড়ে আবার প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন দর্পণ বা সোনা ও রূপোর মতো চক্‌চকে কোনো জিনিস ইত্যাদি—এগুলো বহির্দৃশ্যের ছবি তুলবার সময় ব্যবহার করা একেবারে অত্যাবশ্যকীয় হ'য়ে ওঠে। কারণ, চিত্রের দৃশ্যের প্রত্যেক অন্ধকার কোন্‌টি এবং অভিনেতৃদের অবয়বের যে অংশ আলোর বিপরীত দিকে থাকে সে সব সমান ভাবে আলোকিত ক'রে তোলবার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে প্রয়োজনমত প্রচুর পরিমাণে এই 'refl c-tor' ব্যবহার করা। চিত্রগড়ের অভ্যন্তরে যেমন বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে বিভিন্নপ্রকার আলোর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা চলে, ভিন্ন ভিন্ন ঔজ্জ্বল্যবর্দ্ধক reflectorএর সাহায্যে বহির্দৃশ্যেও ঠিক সেইরকমই আলোর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। তবে, ঠিক তত সহজে এবং তেমন সূক্ষ্মভাবে করা যায় না!—কড়া আলো, নরম আলো, সামনের আলো, পিছনের আলো, মাঝের আলো, কোণা-কোণি আলো, পাশের বা ধারের আলো, সব রকম আলোই এই reflector থেকে স্থূল ভাবে পাওয়া যেতে পারে বটে, যদি তার কৌশল জানা থাকে।

আমাদের এখানে প্রচুর সূর্য্যালোক! কিন্তু মুস্কিল এই যে সূর্য্যকে ঠিক এক জায়গায় অচল ভাবে অনেকক্ষণ পাওয়া যায় না। উদয়-অস্তের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে তার গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের নীচেয় পৃথিবীর উপরও আলো-ছায়ার অবস্থান বদলে যায়। তা ছাড়া এখানে মেঘেরও অভাব নেই, হুস্ ক'রে উড়ে এসে প'ড়লেই হ'লো! কুয়াসা, ধোঁয়া ও ধুলোর উৎপাত ত' আছেই। সুতরাং এ স্থলে সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হ'চ্ছে দিনের বেলাতেও বহির্দৃশ্যের ছবি কৃত্রিম আলোর সাহায্যে তোলার ব্যবস্থা করা। তাহ'লে আর আলোর অভাবে ছবি খারাপ হ'য়ে গেলো ব'লে দৈবের দোষ দেবার দরকার হবে না! কিম্বা, কাজ ক'রতে ক'রতে আলো চলে গেলো দেখে ছবি তোলা বন্ধ ক'রতে হ'বে ভেবে আক্ষেপ করতে হবে না! কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা থাকলে সমস্ত দিনই বাইরে কাজ করা চলবে।



কৃত্রিম আলোয় দিনে ছবি তোলা



রাত্রে আকাশে আলো ফেলবার যন্ত্র

(উড়ো জাহাজের আক্রমণ প্রভৃতি দেখাবার জন্য রাত্রে আকাশে আলো ফেলবার প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্রে সে কাজ সুসম্পন্ন করা চলে।)

রাতের দৃশ্যও আগে দিনের বেলাতেই তোলা হ'তো। তখন শুধু, ক্যামেরায় রাতের ছবি নেওয়া হ'তো একটু কম

সময়ের মধ্যে Under exposo করে, এবং সে ছবি ছাপা হ'ত নীল রংয়ের ফিল্‌মের উপর। তা'তেই কাজ চলে যেত!—কিন্তু আজকাল অনেক রকম আলোর সুবিধা হওয়াতে রাতের দৃশ্য রাত্রেই তোলা হয়। তাতে কাজেরও অনেক সুবিধা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে ছবিখানি শেষ হ'য়ে যায়, রাত্রির অংশ আর পৃথক ক'রে ছাপতে হয় না। এবং রৌদ্রের তাত ও দিনের আলোয় কাজ করার শ্রান্তি ক্লান্তি থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীগণ, তথা চিত্রকর ও পরিচালকও অনেকখানি অব্যাহতি পান।

বর্ত্তমানে চলচ্চিত্রে আলোক-সম্পাতের ব্যবস্থা করা বিশেষ রকম জটিল হ'য়ে উঠেছে। কারণ আজকাল প্রত্যেক ছবি তোলবার সময় একাধিক ক্যামেরা ব্যবহার করার রীতি প্রচলন হয়েছে, ক্যামেরাও হালে সব বদ্‌লে গেছে। এখন Teiltng বা 'ঘূর্ণী-ক্যামেরাগুলো ছবি তোলবার সময় যেন 'ভানুমতীর খেল্' দেখাবার মতো নড়ে' চড়ে' উল্টে-পাল্টে ডিগ্‌বাজী খেয়ে ছবি নেয়! কাজেই, তাদের সঙ্গে সমান ভাবে তাল রেখে আলোর চালটি দিতে পারলে তবেই ছবির 'কিস্তি' মাত করে দেবার আশা থাকে, নইলে সব মাটি! আলো নিয়ে এমনিতর ছিনিমিনি খেল্‌তে পারা কেবল তাদেরই পক্ষে সম্ভব যারা আলোক-বিজ্ঞানে ধুরন্ধর! সঙ্গীতজ্ঞের কাছে যেমন কোনো গানের পদ প'ড়তে প'ড়তেই তার সুরের আভাসটিও মনের মধ্যে জেগে ওঠে, চলচ্চিত্রে সুদক্ষ আলোক-শিল্পীর কাছেও তেমনি গল্পটি প'ড়তে প'ড়তেই তার কোথায় কী আলো ব্যবহার ক'রতে হবে—সে রহস্য আপনিই উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে পড়ে—অবশ্য, যদি তাঁর সে সাধনা থাকে।

শোক-সংবাদ

পরলোকে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়

বিগত ২২শে জানুয়ারী ১৯৩২, তারিখে ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় হাজারীবাগে পরলোকগত হইয়াছেন। দীর্ঘ দিন শিক্ষা বিভাগে কাজ করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। অবসর গ্রহণের পর হইতে পরলোক গমনের সময় পর্য্যন্ত তিনি হাজারীবাগেই ছিলেন। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সমস্ত যুবক বিদেশে গিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া দেশের উন্নতিকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ডাঃ পি, কে, রায় তাঁহাদের অন্যতম। ইনি প্রধানতঃ শিক্ষাদান এবং জ্ঞানচর্চ্চায়ই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী লর্ড হলডেন ডাঃ পি, কে, রায়ের সহপাঠী ছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণ করিয়া ইঁহারা উভয়েই সমান নম্বর পাইয়া "ব্রাকেটেড" হইয়াছিলেন। লর্ড হলডেনের সহিত তাঁহার আজীবন বন্ধুত্ব ছিল। ভারতবর্ষে ফিরিয়া ডাঃ পি, কে, রায় পাটনা কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। ভারত বাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় এডুকেশন্যাল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হইয়াছিল। স্যার আশুতোষ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন, তখন ডাঃ পি, কে, রায় কিছু দিনের জন্য রেজিষ্ট্রার এবং কলেজ ইন্সপেক্টর হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সরলা রায়ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় বিখ্যাত গোখলে মেমোরিয়াল গার্ল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরলোকে যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে সব বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। নদীয়া জেলায় রাণাঘাট সাব্‌ডিভিজনে গোঁড়পাড়া গ্রামে

সম্ভ্রান্ত মিত্র বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রামপ্রসন্ন মিত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় আখেরিগঞ্জে নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন। এই আখেরিগঞ্জেই প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যোগেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়। সাত বৎসর বয়সে ইনি বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন, এবং সেখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে হুগলী কলেজে পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ-এ পড়িতে আসেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় নানা দৈব দুর্ব্বিপাকে সাংসারিক অভাব-অনটনের মধ্যে পড়ায় তিনি কলেজ ছাড়িতে বাধ্য হন; এবং এই অল্প বয়সেই কলিকাতার কোন একটী স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষকতার কার্য্য তাঁহাকে বড় বেশী দিন করিতে হয় নাই। ঘটনাক্রমে একদিন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে তদানীন্তন সিবিলিয়ান লায়ান্‌স সাহেবের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। লায়ান্‌স সাহেব এই সময়ে কটকের সেটল্‌মেণ্ট অফিসার ছিলেন। প্রিয়দর্শন যোগেন্দ্রনারায়ণের কথাবার্ত্তা এবং আলাপ-কুশলতায় প্রীত হইয়া তিনি যোগেন্দ্রনারায়ণকে স্কুল মাষ্টারি ছাড়িয়া দিতে বলেন এবং পরে তাঁহারই অধীনে কটকের সেটল্‌মেণ্ট অফিসে হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত করেন। এই কেরাণীগিরিও তাঁহাকে বেশী দিন করিতে হয় নাই। অক্লান্ত পরিশ্রমী যোগেন্দ্রনারায়ণ নিজের বুদ্ধিবলে ও কার্য্যকুশলতায় অল্প দিনের মধ্যেই এই কেরাণীগিরি হইতে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেটল্‌মেণ্ট অফিসার, ডিপুটি কালেক্‌টার, রেভিনিউ সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট এবং পরে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী হন। এই পদ ইতিপূর্ব্বে I. C. S ভিন্ন আর কোন ভারতবাসী পান নাই।

চাকুরী করিলেও যোগেন্দ্রনারায়ণ বরাবর স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী ও সদালাপী লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। একবার যে তাঁহার সংস্রবে আসিত, তাঁহার অমায়িক ও মিষ্ট ব্যবহারে সেই তাঁহার আপনার হইয়া যাইত। পরের উপকার করা তাঁহার যেন সহজাত প্রবৃত্তি ছিল। কাহারও কিছু উপকার করিবার সুযোগ পাইলে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তিনি নিজে সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন অনেক। তিনি প্রথম যৌবনে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গান ও কবিতা "রবিচ্ছায়া" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তখনকার দ্বিজেন্দ্রলালের মজলিসে যে সব সাহিত্য-রসিক সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলাল যে ইভিনিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই



৺যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র

ক্লাবের সভ্যগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমবয়সী কেবল ইনিই এতদিন জীবিত ছিলেন।

যোগেন্দ্রনারায়ণ বিপত্নীক ছিলেন। পরিণত বয়সে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যে সদাজাগ্রত, কর্ম্মবীর, সামাজিক, সদালাপী—যোগেন্দ্রনারায়ণ পাঁচটি পুত্র, দুইটী কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি সাজান সংসার রাখিয়া গত ২৮শে পৌষ, বুধবার, মধ্যরাত্রে হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে ইহলোক ত্যাগ করেন। যোগেন্দ্রনারায়ণের ন্যায় বন্ধু

হারাইয়া আমরা আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করিতেছি।

যোগেন্দ্রনারায়ণ বাবুর পরলোক গমন উপলক্ষে প্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে কবিতাটী লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

আমার শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় যোগেন্দ্র-নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের উদ্দেশে—

তোমার শ্রদ্ধা পেয়েছি আমি—
তোমার নয়ন-মাঝে,—
যখনি হ'য়েছে দেখা—
সকালে কি সাঁঝে!
কাল্ মোরে খুঁজেছিলে,—
পাও নি ক' দেখা,
আজ আমি খুঁজি তোমা,—
রয়ে যাই একা!
দু'দিনের ভালবাসা—
রেখে গেলে জমা,
ঋণী হ'য়ে রহিলাম,
যাচি তাই ক্ষমা!

পৌষ সংক্রান্তি
১৩৩৮

অনুতপ্ত
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপালের পথে

শ্রীশ্রীপতি ঘোষ বি-এ, বি-ই

নবেম্বর ১৯২৩—নেপালের Engineer in charge of Buildings (সেখানের ভাষায় ঘরকাজ Engineer) এর পদ পাইয়া আমি প্রথম নেপালে আসি। নিয়োগপত্রে কোন্ পথে কি ভাবে আসিতে হইবে তাহার কতকটা আভাস পাই। কাশী হইতে Raxalo রক্সৌল পর্য্যন্ত রেলে। রক্সৌল ষ্টেসন হইতে অল্প দূরে নেপালের সীমানা। নেপালের সীমানায় (Birgang) বীরগঞ্জ নামক স্থানে একজন নেপাল-রাজ্যের কর্ম্মচারী থাকেন। তাঁহাকে আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইবে। তিনি যান-বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। নিয়োগপত্রে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিন বীরগঞ্জ হইতে ভিচ্ছ্যাখোরে ১৮ মাইল। দ্বিতীয় দিন সেখান হইতে সুগারিটায়, তৃতীয় দিন সুগারিটায় হইতে কুসিখানি—মাঝপথে যান-পরিবর্ত্তন। চতুর্থ দিন কুসিখানি হইতে কাঠমাঁডু। নিয়োগপত্রে ইহাও জ্ঞাত করা হয় যে, পথে খাইবার মত রসদ পাওয়া নাও যাইতে পারে। পথের ব্যবস্থার এই উপদেশ পাইয়া ৬ই ডিসেম্বর বাড়ী হইতে রওয়ানা হইলাম। Time table দেখিয়া জানিতে পারিলাম যে, বেনারস হইতে রক্সৌল প্রায় ২৫০ মাইল, যাইতে B. N. W. R.-এ ২৪ ঘণ্টা লাগিবে। ভটনি, গোরখপুর, নরকটিয়াগঞ্জ তিন জায়গায় গাড়ী বদল করিতে হইবে। পথে আহারাদির জন্য লুচি মিঠাই ও চাল ডাল তরকারি লইয়া রওয়ানা হইলাম। এ দেশের চাকর বামুন নেপালে যাইবে না; যাইলেও অত্যধিক বেতন দিতে হইবে ও তাহাতেও সুবিধা মত কায পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া একাই যাত্রা করিলাম। কিন্তু বীরগঞ্জের হাকিম সাহেবকে পত্র লিখিলাম, যদি তিনি লোক স্থির করিয়া দেন বিশেষ উপকৃত হইব।

৭ই প্রাতে রক্সৌল ষ্টেসনে পহুঁছিলাম। নরকটিয়াগঞ্জে গাড়ী বদল করিতে হইল না। যে গাড়ীতে আমি আসি সেটী সোজা দ্বারবঙ্গ হইয়া গঙ্গার ধার মোকামা ঘাটের উত্তর পর্য্যন্ত যায়। আসার সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও কোনও লোক ষ্টেসনে আসে নাই। যান—গরুর গাড়ী ও পুরাতন ধরণের পাটনাই একা—সেগুলিরও অবস্থা শোচনীয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বীরগঞ্জ ষ্টেসন হইতে ২ মাইল। একটি গরুর গাড়ী ১ টাকায় ভাড়া করিয়া তাহাতে মালপত্র রাখিয়া নিজে পদব্রজে বীরগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

অল্প দূর যাইয়া বীরগঞ্জের হাকিমের প্রেরিত একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল সে আমায় লইয়া যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু বিশেষ আবশ্যকীয় কাযে থাকায় যথাসময়ে পৌঁছিতে পারে নাই। ষ্টেসনে লোক থাকিবে না সেটা কতকটা আশা করিয়াই ছিলাম। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ মান্যগণ্য লোক না হইলে কোনও রূপ সাহায্য পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র।

প্রায় আধ মাইলের পর নেপালের সীমা। সেখানে পহুঁছান মাত্র নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া রাহাদালি অর্থাৎ pass-port তলব হইল। আমার নিয়োগপত্র ভিন্ন অন্য pass-port ছিল না,—সেটী সঙ্গে পকেটেই লইয়াছিলাম। যে সিপাহী লইতে আসিয়াছিল সেও আমার পরিচয় দিয়া দিল। আরও প্রায় এক মাইল পরে গেষ্ট হাউস। সেখানে যাইবার পর সংবাদ পাইলাম যে, রাজগুরু আসিতেছেন; সুতরাং সেখানে স্থান হইবে না, ধর্ম্মশালায় থাকিতে হইবে। আরও প্রায় আধ মাইল পরে ধর্ম্মশালা। ইহা অল্প দিন হইল একজন মাড়ওয়ারি তৈয়ার করাইয়াছেন। নূতন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম চাকর পাচকের কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। ধর্ম্মশালার একটি লোককে বলায় সে একটি কুলি ঠিক করিয়া দিল। কিন্তু যেখানে পাক করিবার ব্যবস্থা, সেখানে আমার মত অব্যবসায়ীর পাক করা চলে না। সুতরাং সঙ্গে যে লুচি ছিল তাহাতেই আহার শেষ করিয়া হাকিম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার আবাস ধর্ম্মশালা হইতে প্রায় আধ মাইল। সেইখানেই অফিস—পাহারার শান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায় দেখাইয়া দিল, তিনি একটি তাঁবুতে বসিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হইল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁহার military পদ colonel,—শাসন হিসাবে জেলার Magistratseএর সমান পদ—বড় হাকিম পদের নাম। তাঁহাকে নিয়োগপত্র দেখাইলাম। তিনি বলিলেন যে যান-বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। চাকর পাচকেরও ব্যবস্থা করিবেন বলিলেন বটে,—কথার ভাবেই বোধ হইল তাহা সম্ভব নহে। বাসায় ফিরিয়া আসার কিছুক্ষণ পরে একজন লোক কয়েকটি কুলি সঙ্গে করিয়া কি কি জিনিষ দেখিতে আসিল ও স্থির করিল ৪ জন কুলির আবশ্যক। বৈকালে সংবাদ পাইলাম যে পাঁচজন কুলি লাগিবে ও ২ জনের মজুরি ৬৲ টাকা হিসাবে আমায় দিতে হইবে। পরদিন সকালে ৫ জন কুলি ও ৪ জন কাহার ডুলি লইয়া উপস্থিত হইল। ডুলি চড়া এই প্রথম ও নিতান্ত হীন মনে হইল। ঘোড়া পাইব আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু উপায়ান্তর নাই দেখিয়া অগত্যা তাহাতেই রওয়ানা হইলাম। কুলি বাস্তবিক কিন্তু ৪ জনই লাগিল। যদিও আমার নিকট ৪ জনের ব্যবস্থা করিয়া ২ জনের পেয়াগী লইয়া গেল। কুলিকে এ দেশে ভারিয়া বলে,—জাতে ভোটদেশীয়। কাহার বেহারী। রওয়ানা হইতে প্রায় ৮টা বাজিল। তাহার পর বড় হাকিমের অফিসের নিকট—এ দেশে অফিসকে আড্ডা বলে,—আরও প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল। কাহার ঘণ্টায় ২ মাইল কষ্টে চলে। পথে ক্রমাগত বক্‌সিস ও জল-খাবার পয়সার প্রার্থনা। ভারিয়াদের সঙ্গে একটি সিপাহীও আসিয়াছিল, বলিল—সে সঙ্গে যাইবার আদেশ পাইয়াছে। তাহারও এক কথা—জল-খাবারের পয়সা। এই ভাবে অতি মৃদুগতিতে নানা রকম ওজর আপত্তি সত্ত্বেও ঠিক সন্ধ্যার সময় ভিচ্ছাখোরে আসিয়া পহুঁছিলাম। শেষ ৮ মাইল নিবিড় বন। পহুঁছিয়া দেখিলাম বাঙ্গলাটীতে দুইটী ঘর। একটি অধিকার করিয়া আছেন একজন Colonel, অপরটিতে নানা রকমের ১৫।২০ জন লোক। Colonel সাহেবের চাকরকে বলায় সে মোটে আমলই দিল না। বাঙ্গলার চৌকিদারও কোনও রূপ সুবিধা করিয়া দিতে পারিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বয়ং জোর করিয়া Colonel সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। লোকটি আশাতীত ভদ্রব্যবহার করিলেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—রাজার আত্মীয়। পদ প্রায় Chief Engineerএর—রাস্তার চার্জ্জে,—পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি পাশের কামরাতেই থাকিবার অনুমতি দিলেন ও নিজের লোক দ্বারা পাক করাইয়া ভাতও খাইতে দিলেন। আমার লোকজন রাত্রি ১০টায় আসিয়া পহুঁছিলে তাহাদিগকে চটিতে থাকিতে বলিয়া দিলাম।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই হাত-মুখ না ধুইয়াই রওয়ানা হইলাম। পথ ছয় মাইল—একটি নদী অবলম্বন করিয়া নদীর গর্ভে গর্ভেই চলিয়াছে। চারিদিকে নিবিড়

বন। নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। নদীর এক স্থানে ডুলি রাখিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার কাহারদের সহিত বকাবকি করিতে করিতে চলিলাম। প্রায় দুইটার সময় দ্বিতীয় বাঙ্গলা সুপারিটায় পহুঁছিলাম। ভাগ্যক্রমে বাঙ্গলা খালি ছিল ও স্থানটীও বেশ মনোরম। কিন্তু বাঙ্গলার চারি দিক বড়ই অপরিষ্কার। ভারিয়ারা সন্ধ্যার সময় আসিয়া পহুঁছিল। তাহার পর পাক করিয়া আহার করিলাম। একজন ভারিয়া জল আনিয়া দিল ও বাসন মাজিয়া দিল। ভিচ্ছাখোর হইতে এই স্থানটী ১৪ মাইল।

তৃতীয় দিন প্রত্যুষেই রওয়ানা হইলাম। এবারও পথ নদী অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে; কিন্তু এবার নদীর গর্ভে নহে, অনেক উপরে। মধ্যে মধ্যে লোহার Girder Bridge ও suspension bridge আছে। পথের উন্নতির চেষ্টা অনেক দিন হইতেই হইতেছে। এখনও অনেক পথ বাকি। ১০ মাইল যাইয়া ভীমফেরি (Bheemphedi)। এইখানে যান পরিবর্ত্তনের কথা। ১১টার সময় পহুঁছিলাম। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা দেখিলাম না। থাকিবারও স্থানাভাব। একটি বাঙ্গলা আছে—সেটী বাজার হইতে কিছু দূরে। নূতন যান-বাহনের আশায় সেটী ছাড়াইয়া আসিয়াছিলাম। সাধারণ লোকের থাকিবার স্থান ধর্ম্মশালা—এ দেশে শতল বা গোসল বলে—অতিশয় অপরিষ্কার ও বাসের অনুপযোগী। সাধারণ দোকানে থাকিবার নিয়ম আছে ও তাহার জন্য কোনও বিশেষ গোলমালও নাই। দোকানীর নিকট হইতে রসদ লইলেই বিনা ভাড়ায় থাকিতে দেয়। কিন্তু ভদ্রলোকের বাসের উপযোগী নহে। সেগুলিতে থাকা যুক্তিসঙ্গতও মনে হইল না। খুঁজিতে খুঁজিতে সংবাদ পাইলাম যে সরকারি একটি গুদাম আছে। সরকারী যাবতীয় মাল গো-গাড়ীতে এই পর্য্যন্ত আসে; এখান হইতে মানুষে বহিয়া লইয়া যায়। সেখানে সংবাদ লইয়া যান-বাহনের কোনও খোঁজ পাইলাম না। ঐ অফিসের একটি কর্ম্মচারী সংবাদ দিল যে আবশ্যক হইলে টেলিফোনে কাঠমাঁডুতে সংবাদ দেওয়া যায়। কিন্তু টেলিফোনের ফী দিতে হইবে। অগত্যা তাহাই করিলাম এবং ঐ লোকটির নির্দ্দেশ-অনুসারে গুদামের ধারাণ্ডায় রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলাম। সন্ধ্যার সময় ডাণ্ডি ও দুইজন কুলি আসিয়া পহুঁছিল। তাহাদিগকে পথে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম আমায় লইতেই আসিয়াছে। বাজার হইতে লুচি আনাইয়া ও বাড়ী হইতে যে খাবার আনিয়াছিলাম তাহা খাইয়াই রাত্রি যাপন করিলাম। স্থির করিলাম কোনও মতে পরদিন কাঠমাঁডু পহুঁছিতে হইবে। পথে রাত্রি যাপন অতি কষ্টকর। কুলিদিগকে বক্‌শিস্ দিব বলায় তাহারাও স্বীকার করিল। পরদিন প্রত্যূষে রওনা হইলাম।

এইখান হইতে রাস্তা অত্যন্ত খাড়া ও দুরারোহ। গো-গাড়ীর পথ এইখানেই শেষ। যাবতীয় সামগ্রী এই ভীমফেদি পর্য্যন্ত গো গাড়ীতে আসে ও এখান হইতে কুলি দ্বারা কাঠমাঁডু যায়। পথ অধিকাংশ স্থলে ২ফিট বা ৩ফিট যাইলে প্রায় ১ফিট উচ্চে উঠা হয়। আন্দাজ বোধ হয় প্রায় ২০০০ ফিট উঠিতে হয়। পথে একটি সেনা-নিবাস। মধ্যে মধ্যে দুর্গের প্রাকারের মত আছে, কিন্তু তাহা নাম মাত্র। স্থানটীর নাম চীসাগঢ়ী Cheesa Garhi অর্থাৎ শীতল গড়—এইখানে সমস্ত যাত্রীকে রাহাদালি অর্থাৎ pass-po t বা যাইবার অনুমতিপত্র দেখাইতে হয়। এবং বাক্স সিন্দুক বিছানা সমস্ত খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে হয়। নূতন জিনিষ থাকিলে তাহার মাশুলও দিতে হয়। যদিও আমায় বিশেষ কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই, কিন্তু জিনিষপত্র সমস্ত খুলিয়া দেখান বড়ই অসুবিধাজনক। কাগজে ও পুস্তকে এক দেশ হইতে অন্য দেশ যাইতে যে Customs Barrierএর কথা পড়িয়াছিলাম এই তাহার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। এখান হইতে প্রায় ৭০০।৮০০ ফিট উঠিয়া আবার নীচে নামিতে হয়। সে নামার পথও প্রায় উঠার মত খাড়া। প্রায় ১॥০ মাইল পরে অপেক্ষাকৃত সরল পথ। পথে যাইতে Wire Rope-way লাগাইবার চেষ্টার নিদর্শন দেখিলাম। ইহার দ্বারা মালপত্র লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইবে। স্থানে স্থানে তাহার লোহার ফ্রেম খাটান হইয়াছে। কিন্তু কায এখনও শেষ হয় নাই। দুই মাইল পরে একটি Suspension Bridge পার হইয়া পথ উচ্চ পাহাড়ের গায়ে গায়ে চলিল। পথ কোথাও মেরামত হইতেছে, কোথাও নূতন করিয়া তৈয়ার হইতেছে। স্থানে স্থানে মনে হয় বাহকের পা পিছলাইলে একেবারে ৫।৭ শত ফিট নীচে পড়িতে হইবে। কিন্তু এ সমস্ত জায়গায় চাষ-আবাদ হয়। জঙ্গল নাই বলিলেই হয়। স্থানে স্থানে



ইদের চাঁদ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতিশচন্দ্র সাহা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

চাষের সুবিধাও যথেষ্ট। পার্ব্বত্য ঝোরা অর্থাৎ প্রস্রবণ হইতে অনায়াসে সেচনের জন্য জল পাওয়া যায়। খাল কাটা হইয়া গিয়াছে—আবার দ্বিতীয় ফসলের চেষ্টা হইতেছে। মূলা অত্যন্ত সস্তা ও খুব ব্যবহৃত হয়। কুলিদের পথের খাদ্য মূলা ও চিড়া। পথের ধারে যাহাদের বাড়ী, তাহাদের প্রায় সকলেরই একটি করিয়া দোকান আছে। এই সকল দোকানে ভুট্টার ময়দার রুটি বড়, মটর ভাজা, চিড়া ও মূলা বিক্রয় হয়। কোথাও কোথাও এক প্রকার মাদক-জাড়ও বিক্রয় হয়। প্রায় ১০ মাইল পথ এইরূপ। সমস্তই আবাদী জমী—নূতনত্বের মধ্যে ভারতবর্ষের মত এক জায়গায় অনেকগুলি ঘর লইয়া গ্রাম হয় না। প্রায় সকলেই নিজের জমিতেই বাড়ী তুলিয়া বাস করে; সুতরাং গ্রামের মত ঘেঁস বসতি নহে। বাড়ীগুলি প্রায়ই দ্বিতল বা ত্রিতল। নীচে গরু, শূয়ার, মুরগি, ছাগল ইত্যাদি থাকে; উপরে চাষী নিজে থাকে। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; কিন্তু আসপাশ অত্যন্ত নোংরা। ইহার পর প্রায় আধ মাইল আবার জঙ্গল ও পাহাড় উঠিতে হয়। এই পাহাড়ের (Chandragir) নাম চন্দ্রগিরি। যখন সর্ব্বোচ্চ স্থানে পহুঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় ৪টা। এখান হইতে দূরে কাঠমাঁড়ু দেখা যায়। বেশ বড় সহর। এ স্থানটী প্রায় ৭৫০০ ফিট উচ্চ হইবে। অধিক হওয়াও অসম্ভব নহে। নীচে উপত্যকার নাম নেপাল—তাহার মধ্যে প্রধান সহর কাঠমাঁড়ু! উপত্যকাভূমির পরপারে আর এক শ্রেণী পাহাড়। তাহার উপর দিয়া হিমালয় দেখা যায়। সম্মুখে উত্তর দিকে যতদূর দেখা যায়—পর্ব্বতের উপরিভাগ বরফে ঢাকা। কোথাও একেবারে সাদা, কোথাও মধ্যে মধ্যে কালো পাহাড় দেখা যাইতেছে। চন্দ্রগিরি শিখর হইতে পথ নিম্নগামী—প্রায় সিঁড়ির মত নামিতে হয়। নামাল প্রায় ২০০০ ফিট হওয়া সম্ভব। স্থানটি খুব ঠাণ্ডা ও জঙ্গলপূর্ণ। পাহাড়ের নীচে একটি পল্লী—নাম (Thankot) থানকোট। কতকগুলি দোকান আছে। যখন নীচে পহুঁছিলাম, প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে ও কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে। এখানে দোকানে বেশ ভাল দুধ দধিও বিক্রয় হইতেছে। দুধ প্রায় ভারতীয় মুদ্রায় ৵০-৵১০ সের। এখানে নামিবার পর কুলিরা বিশ্রাম করিয়া অল্প খাওয়া দাওয়া করিল। যখন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম তখন প্রায় অন্ধকার হইয়াছে। এখান হইতে কাঠমাঁড়ু ৬ মাইল। পথ বেশ প্রশস্ত ও ভাল অবস্থায়ই আছে। এখন ভাবনা—কোথায় গিয়া এই শীতের রাত্রে থাকিব। সমস্ত দিন আহারাদি ত হয় নাই। কুলিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাতে কোথায় থাকিতে হইবে সে সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না।—স্রোতের মুখে গা ঢালিয়া যাওয়ার মত চলিলাম। রাত্রি নয়টার পর কাঠমাঁড়ু পহুঁছিলাম। সহর তখন নিস্তব্ধ—কোথাও ২।১টা দোকান খোলা আছে। পথে বিদ্যুতের আলো। একটি নির্জ্জন জায়গায় একখানি বাড়ীর ধারে ডাণ্ডি নামাইয়া কুলিরা বলিল, এই বাড়ীতে আমাকে আনার আদেশ তাহারা পাইয়াছে। বাড়ীতে কোথাও সাড়াশব্দ নাই—আলো পর্য্যন্ত দেখা যায় না। একজন ভারি ডাকাডাকি করার পর সাড়া পাওয়া গেল। একটি লোক আসিয়া বলিল যে, বাড়ীর মধ্যের অংশে আমার থাকার জায়গা। সেই লোকটিকে জল আনিতে বলিলাম। আলো, জলখাবার ও বিছানা সঙ্গেই ছিল। সুতরাং তাহাকে ও কুলিদের বিদায় দিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

মহারাজের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ

যে বাড়ীতে নামিলাম, সেটীর তিন অংশ। এক ধারে একজন ডাক্তার ও অপর ধারে একজন মাষ্টার থাকেন। মধ্য-অংশ আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ও নিতান্ত পুরাতন নহে। প্রতিবেশীরা দুইজনই বাঙ্গালী। পূর্ব্বরাত্রে যে লোকটি জল দিয়া গিয়াছিল, প্রাতে সেই আসিয়া জল দিয়া গেল ও বলিয়া গেল যে সে মাষ্টার-বাবুর চাকর। তিনি ২।৪ দিন পরেই যাইবেন। তাহার পর সে আমার কায করিতে পারিবে। আপাততঃ ২।৪ দিন দুই যায়গায়ই কায করিবে। রান্নাবাড়ার যোগাড়ও সে করিয়া দিবে; আবশ্যক হইলে রাঁধিয়াও দিতে পারে। মুখ হাত ধুইয়া প্রতিবেশীদের সহিত দেখা করিতে গেলাম। মাষ্টার মহাশয় তখনও উঠেন নাই।

দেখা করিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার বাবুর সহিত দেখা হইলে তিনি যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিলেন ও আহারাদির নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিয়া গেলেন যে পর্য্যন্ত বামন চাকরের যোগাড় না হয় তাঁহার বাড়ীতেই আহারাদি হইবে। দুপুর বেলায় রাজবাটী হইতে সংবাদ আসিল যে, বৈকালে রাজদর্শনে যাইতে হইবে। কাশীর একটী লোক যাহাদের বাড়ী বামন চাকর প্রভৃতির জন্য লিখিয়াছিলাম, তিনি উচ্চপদস্থ; তাঁহার প্রতিপত্তিও আছে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার কোনও সাড়াই পাইলাম না। সুতরাং বৈকালে একাই রাজবাটী উপস্থিত হইলাম ও নিয়োগপত্র লইয়া অফিসের সন্ধান করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া মহারাজকে জানাইলাম। কিছুক্ষণ পরে দর্শনের জন্য ডাক আসিল।

বিদেশীয় মাল আনাইবার জন্য এখানে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। তাহার নাম জিন্সী আড্ডা—বিদেশীয় লোকজন আনাইতে হইলেও এই অফিস বা আড্ডা মার্ফৎ ব্যবস্থা হয়। এই অফিসের একটী কর্ম্মচারী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। প্রকাণ্ড রাজবাটী, সম্পূর্ণ আধুনিক ছাঁদে তৈয়ার হইয়াছে। তাহার একটি ঘরে সপারিষদ মহারাজ আসীন। ঘরে কেবল একখানি চেয়ার, তাহাতে মহারাজ বসিয়া আছেন, কর্ম্মচারী বা পারিষদ কেহ বা মাটীতে কেহ বা একটি বনাতের উপর বসিয়া আছেন, অনেকে দাঁড়াইয়াও আছেন। ঘরের দ্বারের কাছে জুতা খুলিবার আদেশ হইল। গিয়া সেলাম করিলাম। মহারাজের বয়স ৬০।৬১। পরিচ্ছদের বিশেষ কোনও আড়ম্বর নাই। কথাবার্ত্তায় বেশ Genial মনে হইল। বৈকালে নিয়মিত বাহিরে আসেন এবং সেই সময় অনেক রাজকার্য্যের আলোচনা ও অনেক মোকদ্দমারও শুনানী হয়। আমায় কি কাজ করিতে হইবে তাহার আভাস দিবার ও অন্য দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার অল্পক্ষণ পরেই যাওয়ার আদেশ পাইলাম।

কাঠমাঁড়ু

এই সহরের নাম একটী কাঠের বাড়ী, যাহা ধর্ম্মশালা রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতেই হইয়াছে। এখন রাজা গোরখা জাতীয়। প্রায় যে সময় ইংরাজ বাঙ্গলায় প্রবেশের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোরখালি দেশের রাজা এই উপত্যকাভূমি জয় করেন। তাঁহার পূর্ব্বে এ দেশ নেওয়ার জাতির রাজ্য ছিল। তাহাদের রাজধানী কাঠমাঁড়ুর অল্প দূরেই বাগমতী নদীর অপর পারে। এখনও পূর্ব্ব নাম পাটন চলিত; কিন্তু এখন কাঠামাঁড়ুর উপনগর মাত্র।

কাঠমাঁড়ু বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত। আরও দুই তিনটী নদী কাঠমাঁড়ুর নিকটেই বাগমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সকল নদীগুলিই বালুকাময়; বর্ষার সময় ২।৩ ফিট জল হয়; অপর সময় ১ ফুট জলও থাকে না। কোন কোনটী জ্যৈষ্ঠ মাসে একেবারে জলশূন্য হয়। বাগমতী নদীর ধারেই অধিকাংশ ঘন বসতি। কিন্তু আসিবার পথে যেমন, এখানেও সেই মত চারি দিকেই চাষ আবাদ ও লোকের বসতি। সমস্ত উপত্যকা বোধ হয় ১৫।২০ মাইল লম্বা ও ৫।৬ মাইল প্রস্থে। কাঠমাঁড়ু সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্থানে বাগমতীর ধারে;—বরাবর যতদূর দেখা যায় পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত চাষ আবাদ ও বাড়ী ছড়াইয়া রহিয়াছে। অনেক দূরে পাহাড়ের চূড়ার নিকট কতক জঙ্গল। উত্তর দিকে যতদূর দেখা যায় হিমালয়ের শুভ্র মূর্ত্তি। স্থানটী সমুদ্র হইতে প্রায় ৪৮০০ ফীট উচ্চ। Thacker's Directory র হিসাবে ১৩৪৪৪২ জনের বসতি। গ্রীষ্মকালে Temp, ৮৪।৮৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হয়। শীতকালে তুষারপাতও যথেষ্ট হয়। বৈশাখ মাস হইতেই জল ঝড় আরম্ভ হয়; বর্ষা প্রায় আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ হয়। অধিকাংশ বৃষ্টি রাত্রেই হয়। বেলা ৭টা-৮টা হইতে ২টা-৩টা পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টি হয়।

এখানকার অবস্থাপন্ন লোকেরা ভাত খায়; গরীবেরা ভুট্টার আটার রুটী ছাতুর ন্যায় জলে গুলিয়া অল্প তাতাইয়া খায়। ভারতবর্ষের তরকারি প্রায় সকল রকমেরই পাওয়া যায়; কিন্তু আলুর চাষও অনেক, ব্যবহারও বেশী গরীবদের। জলখাবারের দোকানগুলিতে আলুর তরকারি, ফুটকড়াইয়ের মত এ দেশীয় এক রকম মটর ভাজা ও তেলে ভাজা ভুট্টার (এদেশে মকই বলে) আটার লুচি বা পিঠা ও সুপারির টুক্রা। সরু সরু কুচাইয়া সুপারি খাওয়ার প্রথা এ দেশে নাই। সিগারেট খাওয়া আছে বটে, কিন্তু খুব বেশী নহে।

তামাক ইতর ভদ্র স্ত্রীপুরুষ এমন কি সম্ভ্রান্ত মহিলারা পর্য্যন্ত সেবন করেন। হুঁকাগুলি প্রায়ই কদর্য্য, কিন্তু গরীবের কলিকাও কারুকার্য্যপূর্ণ ও হুঁকার হিসাবে অনেক বড়। এখানকার সকল শ্রেণীর লোকই অত্যন্ত মাংসপ্রিয়।

সচরাচর বেশভূষার পারিপাট্য মধ্যবিত্ত ও বড়লোকদের মধ্যে যথেষ্ট। বিলাতি সৌখীন রংবেরংএর কাপড় এখানে খুব চলিত। মূল্যও কলিকাতায় ঠিক দ্বিগুণ বা ততোধিক। ভারবাহী কুলিদের পরিধেয় একটী কৌপীন, তাহার উপর নেপালী হিসাবের Double Breast খাকী জামা—প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত থাকায় লজ্জা নিবারণ হয়।—কোমরে প্রায়ই একটী কাপড় জড়ান থাকে, তাঁহাকে পটুকা বলে। ইহাতেই খুকরি হইতে যাবতীয় জিনিষ গুঁজিয়া রাখা চলে। মাথায় এক রকম টুপি, যাহা ভারতবর্ষে অন্য কোথাও দেখা যায় না।

চাষীরা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। তাহারা কৌপিনের বদলে পা-জামা পরে ও কোমরে আট দশ হাত লম্বা দেড় হাত চওড়া উলের একটী কাপড় জড়ায়। জামা পা-জামা অধিকাংশই মোটা সুতার—প্রায় খদ্দরের ন্যায়, দোহারা। শীতকালে ভুটে কুলিরা কম্বলের কোট গায়ে দেয়।

ভদ্রলোকেরা প্রায় এক একবার গেরুয়া রংএর বিলাতি কাপড়ের ন্যায় নয়নসুখ বা লংক্লথের সরু পাজামা ও জামা—সুরুয়াল ময়লপোষ পরে। কোমরে সাদা মখমলের পটুকা, তাহার উপর জনকাল রংএর ইংরাজি ফ্যাসানের waist-coat, তাহার উপর কোট। ছুতার কামার ইত্যাদিরও সাজসজ্জা আর্থিক অবস্থার চেয়ে উন্নত—অন্ততঃ ভারতবর্ষীয় হিসাবে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকের কাপড়ের ত কথাই নাই। ইংরাজি waist-coat, বুট, coat মোজা খুব চলিত। কিন্তু জামা পা-জামা নেপালি হিসাবের। সৈন্যবিভাগে motor chauffeurs cap এর ন্যায় এক রকম টুপি অথবা নেপালি টুপি বা গোল felt মখমল বা রেশমের কারুকার্য্য-করা টুপি। Hat'ও চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদের পরিধেয়ে এখানকার এক বিশেষত্ব আছে—গরীবের মেয়েরাও ১৫।২০ হাতের কম কাপড় পরে না। কিন্তু সমস্তই কোঁচায় যায়। গায়ে একটি জামা ও বাহিরে যাইতে হইলে একটি চাদর—শীতকালে বালাপোষ। অবস্থাপন্ন হইলে কাপড় এক থানেও একখানা কুলায় না। তাহার নীচে আবার আধখান বা ততোধিক মাপের কাপড়ের পাজামা underwear। কিন্তু এ দেড়খান কাপড় সমস্তই কোমরের নীচে। যথাস্থানে ইহাকে রাখিবার জন্য স্ত্রীলোকদেরও পটুকা ব্যবহার চলিত। কাপড় অধিকাংশই উজ্জ্বল রংএর ছিট। গায়ে নেপালি জ্যাকেট বা আধুনিক Blous বা জ্যাকেট।—মাথায় কাপড় দেওয়ার প্রথা নাই। খোঁপা প্রায় অধিকাংশ স্থলে চূড়ার আকারে মাথার উপর; সঁীতা পিছনে। গহনা অধিক প্রচলিত নহে। কিন্তু পায়ে রূপার একগাছা করিয়া প্রকাণ্ড মল পরা আছে। কানে ছোট ছোট অনেকগুলি মাকড়ি—প্রায় সোনার। হাতে অধিকাংশ স্থলে কাঁচের চুড়ি,—রাজরাণীরও তাহাই। ক্বচিৎ ২।১ গাছি সোণার চুড়ি। স্ত্রীলোকদের Tolet ব্যাপারের ইয়োরোপীয়দের ন্যায় Powder, cosmetic ত আছেই—কাজল দিয়া ভ্রূ অঙ্কিত করা ও চোখ টানিয়া বাড়ান বৃদ্ধার পক্ষেও দূষণীয় নহে। মোজা ও রঙ্গিন বনাতের জুতা—সুতার sole—অবস্থাপন্ন স্ত্রীলোকমাত্রেই ব্যবহার করে। পারিলে সোনা রূপার কায করাও থাকে।

এখানে পর্দ্দা নাই। সুতরাং স্ত্রীলোকেরা—অবস্থাপন্ন ঘরেরও—বেড়াইতে যান। রাজ অন্তঃপুরের কাপড়ের পরিসর কিন্তু কিছু কম ও অপেক্ষাকৃত মানানসই।

এ দেশের স্ত্রীপুরুষ সকলেই মাথায় ফুল গুঁজিতে বড় ভালবাসে। ৬০।৭০ বছরের কুলি স্ত্রী বা পুরুষ উজ্জ্বল রংএর ফুল দেখিলেই মাথায় গুঁজিবে। মাথায় ফুল না গুঁজিলে স্ত্রীলোকদের সাজ-সজ্জা যেন অসম্পূর্ণ থাকে।

গহনার প্রচলন খুব কম। শুনা যায় পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ন্যায় এখানেও স্ত্রীলোকরা গহনার চাপে ক্লিষ্ট হইত। কিন্তু এখন পায়ে রূপার 'মোটা মল' পরে। কানে সোনার সরু সরু মাকড়ি। উপর কানে ৮।১০টী করিয়া থাকে। অধিক অবস্থাপন্ন হইলে সেকেলে লোকেরা মোটা সোনার হার ও মাথায় প্রকাণ্ড ঢাকের ন্যায় এক প্রকার গহনা ব্যবহার করে। একেলেরা ইংরাজি ফ্যাশানের গহনা পরে। কাঁচের চুড়ি ও পুঁতির মালার

গোছা রাজ-গৃহ হইতে গরীব কাঙ্গাল সকলেরই অবশ্য আছে।

৩০।৪০ বৎসরের ভিতরে বাড়ী প্রায় সব কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের ধাঁজের হইয়াছে। পুরাতন বাড়ী অধিকাংশ কাঠ-প্রধান। গরীবের দরজা জানালাতেও খুব উচ্চ দরের কাঠের কারুকার্য্য দেখা যায়। প্রায় সকল বাড়ীই খোলার চালের; কিন্তু খোলাগুলি নূতন রকমের। চালের উপর কাদা প্রায় ২″।৩″ পুরু করিয়া লেপিয়া দিয়া তাহার উপর খোলা ঢাকা থাকে। বরগার উপর তক্তা, তাহার উপর কাদা, তাহার উপর খোলা। আজকাল Burn Co. ধরণের টাইলএর প্রচলন হইয়াছে। বাড়ীগুলির প্রায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে বড় জানালা বা অল্প একটু খোলা ছাদ থাকে— শীতপ্রধান দেশ হওয়ায় ইহা নিতান্ত আবশ্যক। ঘরগুলি প্রায়ই দোতালা তিন তালা—তালা অবশ্য ৭ ফুট হইতে ৯ ফুটের মধ্যে···এবং ভারতবর্ষের হিসাবে প্রশস্ত; কিন্তু অসম্ভব ময়লা ও নোংরা—মল মূত্রের বিচার নাই বলিলেই চলে। সুতরাং রোগের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট। ৮।১০টী সন্তান প্রায়ই হইয়া থাকে; ১৬।১৮টী ছেলে মেয়ের মা বাপও বিরল নহে। কিন্তু বসন্ত ওলাউঠা ও যক্ষ্মা নাই এমন ঘর নাই বলিলেও হয়।

এখানে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে লেপ গায়ে দেওয়া আবশ্যক হয়। অগ্রহায়ণের শেষ ভাগ হইতে তুষারপাত আরম্ভ হয়, কিন্তু বরফ কখনও পড়ে না। ফাল্গুন হইতে শীত কমিতে আরম্ভ করে; বৈশাখ মাসের শেষে লেপ ছাড়া চলে। বৃষ্টি প্রায় আষাঢ় হইতে আরম্ভ হয় ও আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত থাকে।

রাজ্যশাসন

যে সময় ইংরাজ প্রথম বাঙ্গলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন, প্রায় সেই সময় আজকালকার রাজবংশ কাঠমাঁড়ু উপত্যকা অধিকার করেন। তাহার পূর্ব্বে এই দেশ নেওয়ার জাতীয়দের ছিল। এখনকার রাজারা নিজেকে ক্ষত্রিয় ঠাকুর বলিয়া পরিচয় দেন। মন্ত্রীবংশ চিতোরের রাণা বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করেন।—তাঁহাদের উপাধি রাণা। প্রধান মন্ত্রীর উপাধি মহারাজ। রাজাদের যাবতীয় উপাধি সাহা। রাজকীয় উপাধি মহারাজাধিরাজ ও চলিত কথায় শ্রী ৫ মহারাজ ও মন্ত্রী শ্রী ৩ মহারাজ। রাজকার্য্যে রাজাধিরাজের কোনও ক্ষমতা নাই। সমস্তই মন্ত্রী ও মন্ত্রীবংশের হস্তগত। কেবল চলিত মুদ্রায় তাঁহার নামাঙ্কিত; ও কোনও উৎসব ইত্যাদিতে তিনি দেখা দেন —ও রাজবেশে মন্ত্রী অপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পূর্ণ মন্ত্রীর ইচ্ছাধীন। কাঠমাঁড়ু পরিত্যাগ করিবারও অধিকার তাঁহার নাই। মন্ত্রীপদ মন্ত্রীবংশে থাকে বটে, কিন্তু মন্ত্রীপুত্র মন্ত্রী হয়েন না। সচরাচর নিয়ম—মন্ত্রীর পর তাঁহার চেয়ে বয়সে ছোট যে ভাই থাকিবেন তিনিই সেনাপতি ও Civil বা নিজামতি কাজ প্রধান মন্ত্রীর আদেশানুযায়ী করেন। প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যুর পর ইঁহারই মন্ত্রী হওয়ার কথা। তাঁহার চেয়ে যে ছোট ভাই থাকিবেন তিনি তখন সেনাপতি ও উপমন্ত্রী হইবেন ও তাঁহার চেয়ে ছোট যদি ভাই থাকেন তিনি সেনা-বিভাগের অধিনায়ক হইবেন। যদি ছোট ভাই না থাকেন, তাহা হইলে সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ যে ভ্রাতুষ্পুত্র থাকিবেন তিনিই সেনানায়ক হইবেন।—অর্থাৎ উচ্চ পর্য্যায়ে কেহ জীবিত থাকিতে নিম্ন পর্য্যায়ে মন্ত্রীপদ আসিবে না এবং বয়স ও মন্ত্রীর নৈকট্য হিসাবে পর পর পদ পাইবেন।

১—মন্ত্রী

২—মন্ত্রীর ছোট ভাই

৩—তাঁহার ছোট ভাই—তাহা না থাকিলে ভাইপো ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজ্যশাসন militaristic বা সেনাপ্রধান। উপরিতম কর্ম্মচারী সকলেই বড় বড় সৈনিক পদবীযুক্ত। মন্ত্রীর নীচে তাঁহার ভাই—ভাই না থাকিলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাইপো সেনাপতি। তাহার নিম্নে ভাই বা ভাইপো প্রধান সেনানায়ক। তাহার নিম্নে ৪টী সৈনিক command—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম। ইঁহারা আপনা-আপন অধিকার মধ্যে সেনানায়ক ও শাসনকর্ত্তা। আপাততঃ এই নিয়ম বটে, কিন্তু নিয়মটী এখনও সুপ্রতিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। মন্ত্রীপদের জন্য অধিকাংশেরই হস্ত কলঙ্কিত। জোর যার মুলুক তার।

বড় বড় কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই প্রধান মন্ত্রীর আত্মীয় —সকলেরই সৈনিক পদ আছে। ইঁহাদের অধীনে স্বয়ং

প্রধান মন্ত্রীর পরিচালনে রাজকার্য্য চলে। কর্ম্মচারী যত বড়ই হউন না কেন, বিশেষ ক্ষমতা কাহারও নাই। তাহার উপর গুপ্তচর সর্ব্বত্রই আছে; রাজকার্য্য প্রায় গুপ্তচরের সাহায্যে প্রধান মন্ত্রীর চালনায় চলিয়া থাকে। আর সকলে প্রায় figure-heads। সৈনিক পদেই লাভ ও সম্মান; সকলেরই চেষ্টা সেই দিকে—অন্ততঃ ক্ষত্রিয় বংশের। সেরেস্তার কায সমস্তই কিন্তু নেওয়ারদেরই হাতে। নামে তাহারা উচ্চপদস্থ না হইলেও কার্য্যতঃ তাহাদের ক্ষমতা যথেষ্ট ও লোকগুলিও বুদ্ধিজীবী; কিন্তু ক্ষত্রিয় মাত্রেই তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সৈনিক-বিভাগে কেরাণীর কায ছাড়া অন্য কোথাও নেওয়ার নাই। মিস্ত্রী কারিগর ব্যবসাদারও প্রায় সবই নেওয়ার। তাহাদের মধ্যে অনেকে বেশ অবস্থাপন্নও বটে।

ক্ষত্রিয়েরা সরকারে গোর্খা বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদের পূর্ব্বের দেশ গোর্খা নামেই পরিচিত। সেখান হইতে আসিয়া তাহারা নেপাল অধিকার করে। তাহার পর আরও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া ভোট দেশের কতক জয় করে। এই সমস্ত মিলিয়া যে দেশ, তাহাই নেপাল রাজ্য।

পূর্ব্বে ইঁহারা চীনের অধীশ্বরতা কতক অংশে স্বীকার করিতেন। চীনে একজন কর্ম্মচারী থাকিত ও বার্ষিক ১০,০০০৲ বেতন হিসাবে পাইতেন। চীন প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর নেপাল তাহার অধিনায়কত্ব অস্বীকার করে।

বড় বড় কর্ম্মচারীদের সকলেরই বেতন নগদ টাকার পরিবর্ত্তে জমি। অনেক ছোট ছোট কর্ম্মচারী, কেরাণী ও সৈনিক পর্য্যন্ত টাকার পরিবর্ত্তে জমি পায়। সকলেই উহা নগদ বেতনের চেয়ে সম্মানের মনে করে।

মন্ত্রী মহাশয় যখন বেড়াইতে যান, তাঁহার গাড়ীর কোচ-বক্সে একজন colonel পদের সেনানী Rifle হাতে বসেন। পশ্চাতে সহিসের দাঁড়াইবার স্থানে একজন Captain Rifle লইয়া থাকে। সঙ্গে ২০ জন সশস্ত্র সিপাহী। গাড়ী যখন দৌড়ায় সিপাহীর দলও দৌড়িতে থাকে। রাজাবাসের নিকটেই রাজবাড়ীর প্রাচীর মধ্যে তাঁহার Body Guard সেনা, মায় machine gun থাকে। রাজবাড়ীর সমস্ত দরজার চাবি মন্ত্রীর নিজের কামরায় নিজের কাছে থাকে। যাতায়াতের দরজায় একজন শান্ত্রি পাহারা, কিন্তু তাহার হাতে বন্দুক নাই—একটি লাঠি মাত্র। সেই লাঠিটি আড় করিয়া আগোড়ের ন্যায় ফেলিয়া রাখে। কাহাকেও ভিতরে যাইতে হইলে শান্ত্রিকে বলিতে হয়। সে লাঠি তুলিয়া লইলে তবে ভিতরে যাওয়া চলে। সশস্ত্র শান্ত্রির পাহারা বাহিরের ফটকে।

রাজকার্য্যের সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত মন্ত্রীর হাতে। অন্য কর্ম্মচারীর কাজ প্রায় কেবল হুকুম পালন। হুকুম বলিলেই মহারাজের 'হুকুম' বুঝিতে হয়। অন্য কাহারও আদেশের পক্ষে হুকুম কথা বলার অধিকার নাই।

অধিকাংশ ছোটখাট রাজকার্য্য বৈকালে বাগানে বসিয়া মহারাজ করেন। পারিষদবর্গ বেষ্টিত হইয়া মহারাজ বসেন। পেশকার একটি একটি কাগজ শুনান ও মহারাজ হুকুম দেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথাবার্ত্তাও চলে। মহারাজের অর্থাৎ চন্দ্র সমশেরজঙ্গের একটি অসাধারণ ক্ষমতা—যে কয়েক বিষয়ের কথা একসঙ্গে চলে, সকলগুলির দিকেই তাঁহার মনোযোগ থাকে এবং প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই প্রশ্ন বা আদেশ করিতে পারেন।

জটিল রাজকার্য্যগুলি নিজের অন্দরে বসিয়া সমাপিত হয়। যে কর্ম্মচারীর উপস্থিত আবশ্যক হয়, তাঁহাকে সেখানে হাজির হইতে হয়।

মহারাজ চন্দ্রসমশের পরিশ্রমী অমায়িক দয়ালু ও বিচক্ষণ। সাজগোজ অহঙ্কার ইত্যাদি মোটেই নাই। খুব সূক্ষ্মদর্শী ও বিচক্ষণ। ইঁহার চেষ্টায় দেশের অনেক কুপ্রথা ও কদভ্যাস অপসারিত হইতেছে। এখানে এক দিকে দাসদাসী প্রথা, অন্য দিকে চরিত্রদোষ ঘটিলে প্রাণদণ্ড। তাহা আবার ইচ্ছা করিলে যাহার স্ত্রী সে নিজেই অপরাধীর মাথা কাটিবার আদেশ পায়। কিন্তু ইহাতেও চরিত্রদোষ যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে মহারাজ আদর্শ-চরিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফাঁসি প্রথা এখানে চলিত নাই। অপরাধীর মাথা কাটা হয়।

এখানে সেন্সস (census) ও বজেট Confidential সুতরাং আয়-ব্যয়ের হিসাব পাওয়া কঠিন। কিন্তু মোটের উপর প্রজার অবস্থা মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। কাঠ-মাঁডুতে একটি কলেজ আছে। ইঞ্জিনিয়ারি ডাক্তারি ইত্যাদি পড়িবার জন্য দেশীয় ছাত্রদের ভারতবর্ষে পাঠান

হয়। ইংরাজি হিসাবে দুইটি বড় হাঁসপাতাল—একটি সিবিল ও একটি মিলিটারি—আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ও আছে। সহরে Electric Light ও Elect ric কল-কব্জা আছে। কাঠমাঁড়ু হইতে ৭৷৮ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের ঝরণার সাহায্যে Electricity তৈয়ার হয়। এই Electricityর সাহায্যে একটি Wire-ropeway চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার দ্বারায় কাঠমাঁড়ুতে মালপত্র আনিবার সুবিধা হইবে। সহরে কলের জলও আছে। পথঘাট যাহা কাঠমাঁড়ুতে আছে তাহা ভাল অবস্থাতেই। কিন্তু মফস্বলে যাতায়াত দুর্গম।

পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাণীর সহিত কমলার, পাণ্ডিত্যের সহিত বদান্যতার সম্মিলন হইলে যে কি মধুর ফলোৎপত্তি হয়, পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের জীবন তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

যে বনগ্রাম মহকুমা এখন যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত, পূর্ব্বে তাহা নদীয়া জেলার অংশ ছিল। সেই বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত কায়বা গ্রামে সন ১২৫১ সালের ৭ই বৈশাখ (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল) বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় পাঁড়ে মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। বীরেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কেদারেশ্বর ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীকৃষ্ণ।

বীরেশ্বরের পিতামহ কনকচন্দ্র সাধারণ্যে "কনক রাজা" নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার আমলে একবার কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে লক্ষ ব্রাহ্মণের সমাবেশ হয়। সেই লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি অদ্যাপি তাঁহাদের বাটীতে রক্ষিত আছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি লাভ বড় অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। প্রচুর অর্থবল এবং প্রভূত সম্ভ্রম, সম্মান, প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্য্যাদা না থাকিলে যে সে লোকের পক্ষে এরূপ সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভবপর নহে। কনকচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তদীয় সহধর্ম্মিণী বিমলাসুন্দরী পতির সহমৃতা হন।

শৈশবকাল হইতেই বীরেশ্বরের ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া সকলেই বালকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে বীরেশ্বর আত্মীয়-স্বজনের আশা সফল করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিক্ষানুরাগ প্রকাশ পায়। তাঁহার বয়স্যগণ যখন ক্রীড়া-কৌতুকে নিমগ্ন থাকিত, বীরেশ্বর তখন শিক্ষকের সাহচর্য্য করিয়া নূতন কিছু শিক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেন। বীরেশ্বরের স্বাস্থ্য তেমন ভাল না থাকায় তিনি কলেজে বেশী শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ শিক্ষানুরাগ প্রবল থাকায় তিনি গৃহে নিজ চেষ্টায় প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। যখন তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িতেন, তখন অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য তাঁহাকে কলেজ ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়। আরোগ্য-লাভান্তে তিনি পুনরায় কলেজে যোগ দিতে উৎসুক হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া গৃহেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে বীরেশ্বর এক দিকে কুলপুরোহিত মোহনচন্দ্র চূড়ামণির নিকট সংস্কৃত, এবং নিজ চেষ্টায় ইংরেজী অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

সতের বৎসর বয়সে বীরেশ্বর সংস্কৃত লীলাবতী নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। বাইশ বৎসর বয়সে তাঁহার "আর্য্যচরিত" নামক ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচিত হয়। তাহার তিন বৎসর পরে তিনি ছাত্রদিগের জন্য "বিজ্ঞানসার" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বরের হৃদয়ের প্রসারতা যেমন বাড়িতে লাগিল, জ্ঞান বিতরণেও তদ্রূপ তাঁহার মনে আগ্রহ জন্মিল। গ্রাম্য বালকগণের শিক্ষা লাভের অসুবিধা দেখিয়া বীরেশ্বর নিজ ব্যয়ে স্বগ্রামে একটি মধ্য ইংরেজী

বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার নিজ গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী অপর কয়েকখানি গ্রামের বালকদিগের শিক্ষা লাভের সুযোগ উপস্থিত হইল। গ্রামবাসীদের বিশেষ সুবিধার কথা এই ছিল যে, এই বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্রগণকে বেতন দিতে হইত না।

বীরেশ্বর আজন্ম সাহিত্যসেবী ছিলেন। কেবল স্কুল-পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াই তাঁহার সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত না। সেইজন্য তিনি তৎকালীন সাময়িক পত্রাদিতে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। সেই সময়কার সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র "আর্য্যদর্শনের" তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে "মানবতত্ত্ব" নামে তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে যখন কলিকাতার ইউনিভারসিটীতে বাঙ্গালা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তখন এই মানবতত্ত্ব বি এ ও এম-এ ক্লাসে পাঠ্য পুস্তকের তালিকাভুক্ত ছিল। মানবতত্ত্ব বাহির হইবার পরেই তাহার যশঃসৌরভ সমস্ত বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পরে। মানবতত্ত্ব একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধও প্রায় দর্শন সম্বন্ধীয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এটি সামাজিক নক্সা। বীরেশ্বর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা, শাস্ত্রানুগত সামাজিক প্রথায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ; প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে স্নান-আহ্নিক, পূজা-পাঠ না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। এদিকে প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে তখন হইতেই সমাজ-বিপ্লবের সূত্রপাত হইতেছিল। প্রতীচ্য আদর্শে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবর্ত্তনের সূচনাও তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। বীরেশ্বর এই সমাজ-বিপ্লব ও স্ত্রীস্বাধীনতার পরিণাম কল্পনা করিয়া ব্যথা পাইয়াছিলেন, দিব্য নেত্রে উহার ভাবী উৎকট বীভৎস দৃশ্য দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। "অদ্ভুত স্বপ্ন" গ্রন্থে তিনি এই অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ দৃশ্যের চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বীরেশ্বর একই সময়ে "সহচরী" "জাহ্নবী" ও "বিজ্ঞান-দর্পণ" এই তিনখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই তিনখানি সাময়িক পত্রের একখানি ছিল কথাসাহিত্য-মূলক একখানি ধর্ম্মসাহিত্যমূলক এবং একখানি বিজ্ঞান-সাহিত্যমূলক। তিন ধরণের তিনখানি মাসিকপত্র একই সময়ে সম্পাদন করা বড় অল্প ক্ষমতার কাজ নহে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বীরেশ্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে অধিকতর মনোনিবেশ করেন; এবং ভারতীয় বরেণ্য লোকনায়কগণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমান্বয়ে "আর্য্যশিক্ষা", "আর্য্যপাঠ", "চারুশিক্ষা" ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ; এবং বালকদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী সংস্কৃতমূলক "নীতি কথামালা" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শিশু ও বয়স্ক বালকদিগের উপযোগী দুইখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার "কবিতাপাঠ" ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ রচিত হয়।

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" এই গ্রন্থত্রয়কে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই কাব্যত্রয়ে কবি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ও ঋষিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বীরেশ্বর "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নামে উহাদের এক বিস্তৃত সমালোচনা পুস্তক প্রকাশ করেন।

পাঁড়ে মহাশয়ের স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে কয়েক-খানি উচ্চ প্রাথমিক, মধ্য বাঙ্গলা ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে অনেকবার পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষা দিবার সময় আমরাও যেন তাঁহার কোন কোন পুস্তক পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। পাঁড়ে মহাশয়ের শেষ বাঙ্গলা গ্রন্থ ধর্ম্ম-দর্শন-বিষয়ক—"ধর্ম্ম-বিজ্ঞান" ও "ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব"। এই দুইখানি গ্রন্থে তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানুষেরই নিজ নিজ পৈত্রিক ধর্ম্ম পালন করা উচিত। মৃত্যুর অল্প কাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার "মানবতত্ত্বে"র ইংরেজী অনুবাদ "Man" নামে প্রকাশ করেন।

১২৮৫ সালে বীরেশ্বর পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছিলেন। কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ী-দিগের মধ্যে অনাচার দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেন। তিনি দেখিতেন বস্ত্রের ব্যবসায়ীরা বস্ত্রের ন্যায্য মূল্যের অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্য ক্রেতাদিগকে ঠকাইয়া লইয়া থাকে। ইহা যেমন দুর্নীতি-

মূলক, তদ্রূপ, ক্রেতাদের পক্ষে ক্ষতিকর এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ের পক্ষেও অনিষ্টকর বটে। এই কারণে, এবং প্রধানতঃ স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ বশতঃ, বীরেশ্বর কলিকাতায় ৬১নং কলেজষ্ট্রীটে "নববাস" নামে একখানি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান খুলেন। এই দোকানে তিনি ন্যায্য মূল্যে এবং একদরে বস্ত্র বিক্রয় করিতেন। সেই হইতে কলিকাতায় "একদরে" বস্ত্রাদি ও অন্যান্য বস্তু বিক্রয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এদিকে, তিনি স্বয়ং সাহিত্যিক বলিয়া দোকানখানি সাহিত্যিকগণের বিশেষ আকর্ষণের স্থল হইয়া উঠে, এবং ক্রমে কলিকাতার প্রধান প্রধান বিদ্বজ্জনগুলীর মিলন স্থানে পরিণত হয়। স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী"তে যেমন পণ্ডিতগণের সমাগম হইত, বীরেশ্বর বাবুর "নববাস"ও তদ্রূপ পণ্ডিত-সমাগমে মুখর থাকিত। এখানে প্রত্যহ অপরাহ্ণে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভূদেববাবু, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এবং আরও অনেকে নিত্যই আগমন করিতেন, এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁড়ে মহাশয়ের তর্কশক্তি দর্শনে তাঁহাকে "নৈয়ায়িক" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

কায়বা গ্রামের পাঁড়ে বংশ চিরদিন অতিথিবৎসল, এবং বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বীরেশ্বর বাবুর কলিকাতার বাটীতেও সদাব্রত ছিল—অতিথি আসিয়া কখনও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় পিতার সদগুণ-রাশির উত্তরাধিকারী হইয়া পিতৃ-অনুষ্ঠিত সদাব্রত তাঁহার গোয়াবাগানষ্ট্রীটের বাটীতে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন।

বীরেশ্বর বাবুর গ্রামের বাটীতে বার্ষিক দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা পার্ব্বণ হইত। নানা গোলযোগে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। পৈত্রিক পূজা বন্ধ হওয়ায় বীরেশ্বরবাবু মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিতেন। অবশেষে মহামায়ার কৃপায় তাঁহার সে ক্ষোভ দূর হয়—বিডন ষ্ট্রীটের বাটীতে পুনরায় দুর্গোৎসব আরম্ভ হয়।

৺কাশীধামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সাধ তাঁহার বহু দিন হইতেই ছিল—মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যও শেষ হইয়াছিল, কিন্তু বীরেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। সন ১৩১৮ সালের ২৬শে ফাল্গুন বীরেশ্বর ৺কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

অগাধ পাণ্ডিত্যে, দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় এক দিকে যেমন তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে, ভূস্বামীজনোচিত উদার প্রকৃতি এবং অপরাপর সদ্‌গুণ-রাশিতে তাঁহার চিত্ত ভূষিত ছিল। জনহিতকর বহু সদনুষ্ঠানের অভিপ্রায় তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহাদের জমিদারী বহুধা বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় এই সকল মহৎ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় থিয়েটার ও অন্যান্য ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকিলে বীরেশ্বরবাবু তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় পুত্রের নিকট প্রকাশ করেন। পিতৃগতপ্রাণ মনোমোহন অবিলম্বে পিতার সদভিপ্রায় পরিপূরণে যত্নবান হইলেন। তিনি প্রথমে ৺কাশীধামে একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পিতার জীবদ্দশায় মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

শিবমন্দির নির্ম্মাণ ব্যতীত, মনোমোহন বাবু পিতার অভিপ্রায়ানুযায়ী নিম্নলিখিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন—

১। যশোহর জেলায় বীরেশ্বর বিদ্যাপীঠ নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই টোলে ২০টি ছাত্রকে মাসিক ৮৲ হিসাবে বৃত্তি প্রদত্ত হয়। এতদ্ভিন্ন সমস্ত ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া ও বাসস্থান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ৮।১০ বৎসর হইতে এই অনুষ্ঠানটি ভালভাবে চলিতেছে।

২। বীরেশ্বরের স্বগ্রাম (কায়বা গ্রাম যশোহর) পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার নাম বীরেশ্বর দাতব্য চিকিৎসালয়। চিকিৎসকের পারিশ্রমিক, দরিদ্র রোগী-দিগকে বিনামূল্যে ঔষধাদি প্রদান প্রভৃতি ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি ইহার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

৩। কলিকাতার যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ

বিদ্যালয় সংলগ্ন আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতালে বীরেশ্বর ওয়ার্ড নামে একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া ২০টি শয্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার খরচ নির্ব্বাহের জন্য বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন হাসপাতালের গৃহ-নির্ম্মাণ ও আসবাবপত্রাদিতে বহু টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

৪। ৺কাশীধামে বীরেশ্বর-ভবনে নিত্য চণ্ডীপাঠ শিবপূজা, পাঠ, হোম, ব্রাহ্মণ-সেবা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

৫। ৺কাশীধামে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীদের বাসের জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে "বীরেশ্বর ধর্ম্মশালা" নামে একটি আশ্রয় স্থান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৬। জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণার্থ যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলায় বহু পুষ্করিণী ও টিউবওয়েল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু গৃহস্থের উপযোগী সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ত আছেই।

৭। মনোমোহন বাবুর কলিকাতাস্থ গোয়াবাগান বাটীতে ১৫।১৬টি ছাত্রের আহার ও বাসস্থান দিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং এই সমস্ত কার্য্য তাহার পিতার জীবনকাল হইতেই চলিতেছে।

উত্তরকালে এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের ৫৯।১, ৫৯।২, ৫৯।৩, ৬০, ৬০।১, ৬০।২ ও ২০।৩ এই সাতখানি বাটী রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের দ্বারা উপযুক্ত ট্রাষ্টীগণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই সমুদয় ভূসম্পত্তির আনুমানিক মূল্য—৪ লক্ষ টাকা।

ভারতবর্ষ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় বি-এ

তব পুণ্য-পীযূষ-সরিতে মগ্ন হর্ষ-পুলক চিত্ত
তব জ্ঞান-গরিমা শিল্পকলাদি লভেছি কতই বিত্ত।

তব গঙ্গাপুলিন স্বর্ণরেণুকা স্পর্শন পূত বক্ষে
কত রঞ্জিত নব সুন্দর ছবি নিত্য নেহারি চক্ষে!

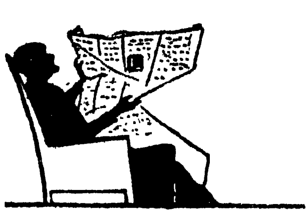
কভু না জানি বা কোন ধ্যানে
রহি চাহিয়া আকাশ পানে;
হ'য়ে জাগ্রত চিত শঙ্কিত কেন হিয়া দুরু-দুরু রিক্ত!

কত লক্ষ তরণী ছুটিছে সঘনে জাহ্নবীজল চুমিয়া
সৈকতে কত নর্ত্তনরত শোভিছে ময়ুর ভ্রমিয়া

তব শ্যামল গোষ্ঠভূমে—
তব চরণ-প্রান্ত চুমে—
আমি ধেয়ান-নিরত তাপসের মত আনন্দে রহি বসিয়া।

কত রম্য হর্ম্ম্য-শোভিত নগর কটিতে মেখলা লগ্ন—
তাহে রত্নখচিত মন্দির শত দীপ্ত আলোক-মগ্ন।
কত অভ্রপ্রসারি ভীম গিরিচূড়া গৌরব ভরে উচ্চ
প্লাবিত চন্দ্র সূর্য্য কিরণে মণ্ডিত হিম পুচ্ছ।

তব সাম-নিনাদিত স্তোত্র পঠন ঘন মুখরিত বনমাঝে
কত অজিনাম্বর সৌম্য মূরতি যোগীজন রত রাজে!
সেই পুণ্য হোমানল-শিখা নিঃসৃত ধূম বিভূষিত অঙ্গ—
যুক্ত কর-যুগ কল্যাণ যাচে কল্যাণ নটরঙ্গ।



সাময়িকী

বাঙ্গালা-সরকারের ইস্তাহার—

আইন লঙ্ঘন আন্দোলনে যে কোন প্রকারেই হউক সাহায্য করিলে আইনের চক্ষে কি অবস্থা দাঁড়ায় তৎসম্বন্ধে জনসাধারণের অবগত্যর্থ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নরূপ ইস্তাহার জারী করিয়াছেন—

সাধারণ আইন বা বিশেষ অর্ডিন্যান্স বলে যাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, তা ছাড়া এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা সর্ব্বসাধারণের জানা দরকার।

(ক) ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারায় লিখিত আছে যে, যদি কেহ বে-আইনী সমিতিকে বা উহার কার্য্যকে কোনরূপে আর্থিক সাহায্য করে বা ঐ জন্য আর্থিক বা অন্য কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করে তবে সে আইনানুসারে দণ্ডিত হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এবং স্থানীয় বহু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যদি ১৭ (১) ধারার আইনের সর্ত্ত পড়ে, তবে আইন লঙ্ঘন আন্দোলন সম্পর্কে যে কোন প্রকার সাহায্য তাহা তাহার কার্য্যপদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করার কল্পেই হউক বা পরোক্ষভাবে উহার প্রচারে সাহায্য করে বা আর্থিক সাহায্য বা উহার কোনরূপ অনুষ্ঠানাদির সাহায্য করে তাহা হইলে সরাসরি ভাবেই উহা অভিযোগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) জরুরী ক্ষমতাবিষয়ক আইনের ৪ ধারায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ঐ সমস্ত ক্ষমতা বাঙ্গলার সমস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনারদের হাতে দেওয়া হইয়াছে। উহার বলে তাঁহারা আন্দোলন দমন করিতে পারিবেন, বা যদি কাহারও আচরণ এরূপ বলিয়া বিবেচিত হয় যে, সে জনসাধারণের শান্তি বা নিরাপত্তার ব্যাঘাতজনক কোন আন্দোলনের সম্প্রসারণ কল্পে কোন কাজ করিয়াছে বা করিতেছে বা করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাকেও শাসন করিতে পারিবেন এবং ইহার বলে কাহারও নিকট বা অধীনে যদি কোন সম্পত্তি থাকে তবে তাহার সম্বন্ধেও আদেশ দেওয়া চলিবে।

(গ) জরুরী ক্ষমতাবিষয়ক অর্ডিন্যান্সের ১৩ ধারা অনুসারে যে কোনও সরকারী কর্ম্মচারী আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা কল্পে দরকার বোধ করিলে বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। ঐ আদেশ অমান্য করিলে উক্ত অর্ডিন্যান্সের ২২ ধারা মতে দণ্ডার্হ হইতে হইবে।

এরূপ জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান আইন লঙ্ঘন আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে কোন কোন ফার্ম্ম এরূপ এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যাহাতে লেখা আছে যে, ফার্ম্মের পরিচালনা সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি জাতীয় আন্দোলনের পরিপন্থী কোনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবে না বা ভারত সরকারের পক্ষে বা নির্দ্দেশানুসারে বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কোনরূপ কার্য্য যাহা আন্দোলনের পরিপন্থী তাহা করিতে পারিবে না। এই প্রকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবিক পক্ষে আইন লঙ্ঘন আন্দোলনের ন্যায় অবৈধ ও বে-আইনী। আন্দোলনের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করাতে কাহারও সাধারণ কর্ত্তব্যের বিঘ্নজনক হইবে না; বা আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জরুরী ক্ষমতাবিষয়ক অর্ডিন্যান্সের ১৩ ধারায় উল্লিখিত শ্রেণীর কাহাকেও বিশেষ বাধ্যবাধকতার জন্য সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে ঐ প্রতিশ্রুতি কোনরূপে অন্তরায় হইবে না।

(ঘ) জরুরী ক্ষমতাবিষয়ক অর্ডিন্যান্সের ১৬ ধারার বলে যে কোন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রেলওয়ে ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন। বিশেষ ভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট মাল কোন রেল কোম্পানীকে না লওয়ার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থ এ কথা পরিষ্কার ভাবে জানাইতেছেন যে, যাহারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিবে বা সাহায্য করিবে কেবলমাত্র তাহাদের পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাগুলি ব্যবহৃত হইতে পারিবে, পক্ষান্তরে যাহারা আইন মানিয়া চলে তাহাদের

পক্ষে ঐ সমস্ত আইনের জন্য কোন আশঙ্কার কারণ নাই। অরাজকতার হাত হইতে রক্ষাকল্পে এবং ব্যবসা বাণিজ্য স্বাধীন ভাবে চলার সৌকর্য্যার্থ জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য ঐগুলি ব্যবহৃত হইবে।

সংবাদপত্রের প্রতি নির্দ্দেশ—

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন বাঙ্গলা দেশের যাবতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগকে নিম্নলিখিত সরকারী ইস্তাহার সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলিয়াছেন।

ইস্তাহারে প্রকাশ, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী ও অন্যান্য বেআইনী বলিয়া ঘোষিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশিত করিলে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

যে সকল বিষয় সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ করিলে আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইতে হইবে, নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১। কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কিত যে কোন সংবাদ ও ধৃত ব্যক্তিগণের বাণী।

২। জেলে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমাচার।

৩। গবর্ণমেণ্ট বা সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে উগ্র সমালোচনা।

৪। কোনও রাজনীতিক ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবৃতি। কোনও রাজনীতিক সংবাদের শীর্ষস্থিত লিখনাদির বাগাড়ম্বর। কোনও সংবাদ পাশাপাশি এরূপভাবে সাজান যাহা হইতে আইন লঙ্ঘন আন্দোলনের সহায়তা হইতে পারে বা দেশবাসীর মনে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়।

৫। আইন লঙ্ঘন আন্দোলনের সহায়ক যে কোনও বিজ্ঞাপন বা সংবাদ প্রকাশ।

৬। কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদানকারী যে কোনও ব্যক্তির ফটো বাহির করা।

১লা বৈশাখ—

প্রতি বৎসরের পয়লা বৈশাখ সরকারী ছুটীর দিন বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে বিভিন্ন জিলার মত লইয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে প্রস্তাবটী প্রত্যাহার করা হয়। সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে পয়লা বৈশাখ অতিরিক্ত ছুটীর দিন বলিয়া ঘোষিত হইল। কিন্তু ইহাতে বৎসরের সাধারণ সাত দিন অতিরিক্ত ছুটীর যে ব্যবস্থা আছে, তাহার সংখ্যা বাড়ানো যাইবে না; অর্থাৎ প্রত্যেক জিলায় যে সাত দিন ছুটী দেওয়া হইত তাহারই একটি ছুটী বন্ধ করিয়া পয়লা বৈশাখের ছুটীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। জিলাগুলি তাঁহাদের সুবিধা মত কোন ছুটী বন্ধ করিবেন, তাহা নিজেরা স্থির করিবেন। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া এই ব্যবস্থাটী কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

রবীন্দ্রনাথ ও ছাত্রগণ-

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রদের উদ্দেশে নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করিয়াছেন,—

"আমাদের ইতিহাসের এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে ছাত্রগণ আমার নিকটে একটি বাণী দাবী করিতে আসিয়াছে। আমি ঐ বাণী পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি; এক্ষণে কেবল উহার পুনরুক্তি করিতে পারি। বর্ত্তমান অবস্থায় সরকার যে নীতি অবলম্বন সমীচীন বলিয়া মনে করেন, উহা পরিণামে অনিষ্টকর। গঠনমূলক স্থায়ী ও মৌলিক পন্থা অনুযায়ী দেশের সেবা করিবার জন্য আমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কাজ করিতে হইবে। আমাদিগকে ঐ সেবা ও আত্মশুদ্ধি হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার কোনও শক্তির নাই। যে শান্ত শক্তি আপনার সম্পদ বালকোচিত আবেগ ও আত্মা অবনতিকর বিষয়ে ব্যয় না করিয়া নীরবে আপন কার্য্য সম্পন্ন করে, আমরা নৈরাশ্য হইতেই ঐ শক্তি লাভ করিব।"

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বড়লাট—

বিগত ২৫শে জানুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের উদ্বোধনী বক্তৃতায় মাননীয় বড়লাট বাহাদুর যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েকটী বিষয় ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া হইল।

(১) কৃষির অবস্থা—

কৃষি বিষয়ক অবস্থার উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলেন, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কিছু বাড়িয়াছে ; ইহা বড়ই সুখের কথা। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ কৃষকদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া কাজ করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট মোট চারি কোটি টাকারও অধিক খাজনা কমাইয়া দিয়াছেন। পঞ্জাবে গত খারিফ শস্যের মরসুমে ৪৬ লক্ষ টাকা খাজনা রেহাই করিয়াছেন। কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ভারতের সর্ব্বত্র কৃষি বিষয়ে মঙ্গলকর বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

(২) আর্থিক অবস্থা—

গত সেপ্টেম্বর মাসে আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বড়লাট যে পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন—"আমাদের অসুবিধা এখনও অনেক রহিয়াছে বটে, কিন্তু কৃতিত্বের সহিত অনেক অসুবিধা উত্তীর্ণ হইয়াছে, যে আশা আমরা তখন করিতে সাহসী হই নাই।" বাজেট সম্বন্ধে ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলেন,—"পৃথিবীতে কোন গবর্ণমেণ্ট ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কে বিবেচনার ভার ব্যবস্থা পরিষদের হস্তে এতটা ছাড়িয়া দেন নাই বা জনপ্রতিনিধিগণের প্রস্তাব সমূহ এতটা অধিক কার্য্যে পরিণতি করেন নাই।"

(৩) রাজস্ব বিল—

অতঃপর বড়লাট বলেন, "গত সেপ্টেম্বর মাসে যে আনুমানিক আয়ব্যয় ধরা হইয়াছে, তাহার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় কোন পরিবর্ত্তন বা নূতন কর ধার্য্য করা সম্বন্ধে ভোট দিবার জন্য পরিষদকে অনুরোধ করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে কোন নূতন রাজস্ব বিল সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা হইবে না।"

সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে বড়লাট বলেন,—"আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে,—ভারতে আমাদের আর্থিক অবস্থা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের তুলনায় ভাল। ভারতীয় পণ্য বিদেশের বাজারে এখনও স্থান পাইতেছে। ভারতীয় শিল্প এখনও প্রসারিত হইতেছে। কাপড়ের কলসমূহ বাড়িতেছে এবং সঙ্গত পরিমাণ লাভ রাখিয়া কাজ চালাইতেছে। ভারতে চিনি শিল্প সম্প্রসারণের আমি চিহ্ন দেখিতেছি। গত দুইটি রাজস্ব বিলের বিধিব্যবস্থা এই সকল ফললাভে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া আমরা দাবী করি।"

(৪) বিনিময়—

বিনিময় হার সম্বন্ধে বড়লাট বলেন,—"অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, আমরা ষ্টার্লিংয়ের সহিত টাকার হার বাঁধিয়া দিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে। প্রথমতঃ বিদেশে ভারতের ঋণভার ৮৪ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৬১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং ১৫০ লক্ষ ষ্ট্যার্লিং ঋণ পরিশোধের জন্য আমাদিগকে নূতন করিয়া ধার করিতে হয় নাই। ব্যাঙ্কের সুদের হার কতকটা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। বিনিময় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ জন্য খুব সামান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ভারতের অর্থনৈতিক মর্য্যাদা বিশেষ করিয়া লণ্ডনে বর্দ্ধিত হইয়াছে। লণ্ডনে শতকরা সাড়ে তিন ষ্টার্লিং সুদের কাগজের দর ৪৩৷৷০ হইয়াছিল ; উহা এক্ষণে ৫১৷৷০ হইয়াছে এবং ভারতের প্রধান প্রধান পণ্য বিশেষ করিয়া তূলার দর টাকায় বাড়িয়াছে।"

(৫) স্বর্ণ রপ্তানী—

অতঃপর বড়লাট বলেন,—"এইরূপ নূতন আশার সময়ে এক শ্রেণীর লোক ও সংবাদপত্র ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এমন সব বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন যাহাতে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। তাহারা বলিতেছেন যে, স্বর্ণ রপ্তানী ভারতের পক্ষে ধ্বংসকর।"

বড়লাট বলেন,—"এই সময়ে স্বর্ণ রপ্তানী ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশ যখন বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন ভারতবর্ষ তাহার অগাধ স্বর্ণ সম্পদের অংশমাত্র ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দেশ হইতে সন্তোষজনক টাকা পাইতেছে। ৪০ কোটি টাকার যে স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে তাহা ভারতের সমগ্র স্বর্ণের তুলনায়

অকিঞ্চিৎকর মাত্র। গত ত্রিশ বৎসরে ভারতের সমগ্র স্বর্ণের মূল্য ৭০০ কোটী টাকা। সম্প্রতি ১৯১৫, ১৯১৮ ও ১৯২১, এই তিন সালে স্বর্ণের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইয়াছে। বস্তুতঃ নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অর্থ নৈতিক বিবর্ত্তনে এমন ক্ষেত্র উপস্থিত হইবার সুযোগ আসিতে পারে, যখন স্বর্ণ ব্যবসায় সম্বন্ধে ভারতের অতীত গৌরব দেশের আর্থিক সুবিধা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।"

(৬) আপোষ হইতে পারে না -

অতঃপর বড়লাট রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,—"কংগ্রেস ইচ্ছাপূর্ব্বক আপোষ-পথ রুদ্ধ না করা পর্য্যন্ত আমি বা আমার গবর্ণমেণ্ট ঐ পথ হইতে বিচ্যুত হই নাই বলিয়াই আমি মনে করি। কোন গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আহ্বান গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারেন না। জনসাধারণ বা যাহারা আইন অমান্য করিবার পক্ষপাতী তাহাদের পক্ষে ভ্রান্ত ধারণার কোন স্থান নাই। এই বিষয়ে কোন আপোষ হইতে পারে না। বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার যাহাতে না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যেমন আবশ্যকীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, তেমনই আইন লঙ্ঘন দমন জন্য এক্ষণে যে সকল ব্যবস্থা রহিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যবস্থার অনুরূপ ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহা শিথিল করা যাইতে পারে না।"

(৭) গোলটেবিল কার্য্যকরী সমিতি—

অতঃপর বড়লাট রাষ্ট্রতন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন,—"প্রধান মন্ত্রী মহাশয় গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্য চালাইয়া যাওয়া সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন। অনেক সমালোচকের বিশ্বাস, পরামর্শ পরিষদ (গোলটেবিলের ওয়ার্কিং কমিটী) একটি অলঙ্কারস্বরূপ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ভারতে রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে যে সকল আলোচনা হইবে, উক্ত পরামর্শ পরিষদের দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা তাহার সহিত যোগসূত্র রাখিবেন। ভারতের নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের বিস্তৃত আলোচনা ইংলণ্ডে হইবে না, কারণ গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনাই এই যে, ভারতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইবে এবং এখানকার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমি প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কে সর্ব্বদা জানাইব।

"সুতরাং গোলটেবিল বৈঠকে রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে যতদূর পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহার বাকী অংশটুকু পূর্ণ করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করাই পরামর্শ-পরিষদের কার্য্য হইবে। এই পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত ও প্রয়োজনীয় যে, উহার কার্য্য আরম্ভে সময় নষ্ট করা উচিত নহে। সেই হেতু আমি বর্ত্তমান সপ্তাহেই উহার অধিবেশন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রাথমিক আলোচনাতেই আমরা এমন একটি কার্য্যকরী কার্য্যতালিকা প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইব, যাহার দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রতন্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ সত্বর সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হইবে। এই পরিষদের কার্য্যে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত থাকা আমার অভিপ্রায়।"

উপসংহারে বড়লাট বলেন,—"গত কয়েক মাসের মধ্যে আমাদিগকে বহু বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে হইলেও এবং এখনও বহু গুরুতর সমস্যা আমাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকিলেও, আমার সরকারী কার্য্য-জীবনের শেষ ভাগে ভারতকে সম্রাটের অন্যান্য উপনিবেশের সহিত সম্পূর্ণ সমান অংশীদার রূপে তাহার প্রতিশ্রুত স্থানে লইয়া যাইবার জন্য পরিচালিত করিতে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।"

প্রধান মন্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ—

কিছুদিন পূর্ব্বে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারী-নীতির প্রতিবাদে লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক তার করিয়াছিলেন; সম্প্রতি উহা প্রকাশার্থ দেওয়া হইয়াছে। তারখানা এইরূপ :—

প্রধান মন্ত্রী,
হোয়াইট হল; লণ্ডন।

মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের পর হইতে ভারত সরকার যেরূপ চাঞ্চল্যকর ও বেপরোয়া দমন-নীতি চালাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের ও আপনাদের দেশবাসীর মধ্যে এক

স্থায়ী দুঃখজনক বিচ্ছেদ ঘটাইয়া তুলিতেছে এবং আপনাদের প্রতিনিধিগণের সহিত শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক আপোস নিষ্পত্তি বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা অতিশয় কষ্টকর করিয়া তুলিতেছে।

স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অংশ—

বিগত ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা মহাশয়, স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অংশলাভের সম্বন্ধে একটী বিল যে ইতঃপূর্ব্বে পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই বিলটীকে সিলেক্ট কমিটিতে দিবার প্রস্তাব করেন। এই উপলক্ষে সেদিনের পরিষদে যে আলোচনা হয়, বিলটীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, আমরা এই আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দিলাম। শ্রীযুক্ত সর্দ্দা মহাশয় এই উপলক্ষে হিন্দু বিধবাদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া বিলের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি খণ্ডন করেন। তিনি প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র হইতে দেখান যে, প্রাচীন কালে হিন্দু বিবাহিত হইবামাত্র তাহার স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ-ভাগিনী হইতেন। এবং সেই হেতু পৃথক হইবার সময় তাহারা পুত্রদের সহিত সম্পত্তির সমান অংশ পাইতেন।

শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত সিলেক্ট কমিটীতে দিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিশ্বাসী রূপে তিনি এই বিল সমর্থন করিতে পারেন না এবং প্রাচীন ঋষিদের পবিত্র অনুশাসনে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই। বাঙ্গালায় হিন্দু বিধবাদের অবস্থা যে শোচনীয় তিনি তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, উক্ত বিল গৃহীত হইলে হিন্দুর সমাজ গঠনের মূল নীতিতে কুঠারাঘাত করা হইবে।

মিঃ ইয়ামান খান হিন্দু বিধবাদের দুরদৃষ্টের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, অনেক হিন্দু বিধবার পক্ষে তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। প্রত্যেক পুরুষের ন্যায় নারীদেরও বাঁচিবার অধিকার আছে। পুরুষের তৈয়ারী আইনে স্ত্রীলোকদিগকে তাহার উত্তরাধিকারের বৈধ অংশ হইতে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত করিয়া আসা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণম আচারিয়ার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, দেশের অধিকাংশ লোক যখন সমাজ বিষয়ে কোন আইন চাহিবে, তখনই সেইরূপ আইন উপস্থাপিত হওয়া উচিত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই বিল সম্বন্ধে সেরূপ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। তিনি বলেন, এই বিল পাশ, হইলে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

মিঃ আজার আলি বিলে বিধবার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, উহা খুব অস্পষ্ট হইয়াছে।

মিঃ লালচাঁদ নাভালরায় বিলের খসড়ার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বিলের আকার আমূল পরিবর্ত্তিত না করিয়া সিলেক্ট কমিটিতে তাহা সংশোধিত হইতে পারে না। বিলের মধ্যে আইনসঙ্গত এই ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে যে, উহাতে সাংসারিক সম্পত্তি হইতে পুত্রদের অধিকার কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টা হইয়াছে।

সার ল্যান্সলট গ্রেহাম গবর্ণমেণ্টের মনোভাব সম্বন্ধে বলেন যে, এই বিলের পক্ষে প্রবল জনমত না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট ইহার সমর্থন করিবেন না। পরিষদে আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, যে তিনজন হিন্দু আলোচনায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জগঃ—অনেকে উহার পক্ষেও আছেন; তাঁহারা এখনও কিছু বলেন নাই।

সার ল্যান্সলট গ্রেহাম :—আমি তাহা জানি। তবে শূন্য গ্যালারীসমূহ হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, এই বিলে জনসাধারণ তেমন আগ্রহান্বিত নহে। পক্ষান্তরে দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দ্দার পূর্ব্ববর্ত্তী বিলের আলোচনার সময় গ্যালারীসমূহে লোকের ভিড় যথেষ্ট হইয়াছিল।

উপসংহারে সার ল্যান্সলট্ গ্রেহাম বলেন যে, বিলের পক্ষে প্রবল জনমত না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত এ, দাস বিলের সমর্থন করিয়া বলেন, আলোচনাকালে বিলের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহা অস্পষ্ট এবং তাহাতে বিলের নীতি ক্ষুণ্ণ হয় না।

সার হরিসিং গৌর গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের তীব্র

সমালোচনা করিয়া বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট শুধু দমন ব্যাপারে শৌর্য্য দেখাইতেছেন—সমাজ-সংস্কার বিষয়ে নহে। এই বিষয়টি এত প্রয়োজনীয় যে, গণনা দ্বারা এই বিষয় নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত নহে—সত্য ও ন্যায়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। বাধা প্রদানকারী গোঁড়া সদস্যগণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, মানুষের তৈয়ারী আইন সমাজের প্রয়োজন অনুসারে যখন সংস্কার করা হইতেছে, তখন পবিত্র ও দৈব আইনের কথা তাঁহারা তুলেন কেন? বিলে যদি কোন ত্রুটী থাকে, সিলেক্ট কমিটি তাহার সংশোধন করিবেন।

অতঃপর অন্য একটী বিষয়ের আলোচনার সময় উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত সর্দ্দা মহাশয়ের প্রস্তাব মুলতবী হয়। বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পুনরায় এই বিলের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কিছুক্ষণ আলোচনার পর এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হইবে কি না, সেই সম্বন্ধে উপস্থিত সদস্যগণের ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ২৬ ও বিপক্ষে ৫৬ ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হইয়াছে।

চীন-জাপান সংঘর্ষ—

চীন ও জাপানে রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। বিশেষজ্ঞ যুদ্ধনীতিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিছু দিন ধরিয়া এইরূপই একটা কিছুর প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন—পৃথিবীর ভাবী কুরুক্ষেত্র হইবে প্রাচ্যভূমি, এবং সে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেও যে বেশী বিলম্ব নাই, তাহাও তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের অনুমান ব্যর্থ হয় নাই।

চীন-জাপানে সংঘর্ষ অপ্রত্যাশিত, অতর্কিত ব্যাপার নহে। গত ইয়োরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া সকল ইয়োরোপীয় জাতি আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উভয়পক্ষে বারুদ স্তূপীকৃত হইতেছিল। একজন সার্ব্বিয়ান কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়ার একজন রাজকুমারের হত্যাকাণ্ড ঐ বারুদের স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করিয়াছিল মাত্র।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় অনুরূপ। একজন জাপানী চীনাদের হস্তে নিহত হয়—বাহ্যতঃ ইহাই জাপানের চীন আক্রমণের মুখ্য কারণ। কিন্তু ইহা উপলক্ষ মাত্র। কেন না, ইহাই প্রকৃত কারণ হইলে কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আদান প্রদান করিলেই ব্যাপারটা চুকিয়া যাইত। কিন্তু অনেক দিন হইতেই জাপানকেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছিল। বর্ত্তমানে তাহার চীন আক্রমণের গৌণ কারণ তাহার অদম্য রাজ্যলিপ্সা। জাপান দ্বীপপুঞ্জ ক্ষুদ্র রাজ্য, তাহার আয়তন বড় বেশী নহে। জাপানীরা জীবিত উন্নতিশীল জাতি—জাপানী জাতির সংখ্যা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে—ক্ষুদ্র জাপান রাজ্যে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাজেই বৃহত্তর জাপান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে তাহার আর চলিতেছে না। এই জন্যই জাপানকে ফরমোজায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইয়াছে, কোরিয়া অধিকার করিতে হইয়াছে। বহু জাপানী আমেরিকায় গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু সেখানে প্রাচ্য জাতির বিরুদ্ধে বড় কঠোর ব্যবস্থা—সেখানে মাথা তুলিবার সুযোগ নাই। অন্য কোন দিকেই জাপান সাম্রাজ্যের প্রসারের সম্ভাবনা নাই। অতএব, নিকটতম প্রতিবেশী আত্মকলহে দুর্ব্বল চীনের উপর জাপানের যে লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি?

জাপান এতদিন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। চীনের উপর জাপানের যেমন লোভ, ইয়োরোপের শক্তিশালী জাতি সমূহের লোভও তদপেক্ষা একটুও অল্প নহে। এত দিন তাই চীনের উপর সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ইয়োরোপ আর্থিক সঙ্কটে বিষম বিব্রত। সেই জন্য তাঁহারা এখন আর এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের উপর তেমন তীব্র দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছেন না। ইহাই জাপানের সুবর্ণ সুযোগ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জাপান এই সুযোগ উপেক্ষা করিবার পাত্র নহে। তাই ঐ একজন নগণ্য জাপানী হত্যার উপলক্ষ করিয়া জাপান আজ চীনে অভিযান করিতে সাহসী হইয়াছে, এবং অতি সামান্য আয়াসে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া অধিকার করিয়াছে।

চীনও নিদ্রিত নহে। চীন এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় দল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মহাচীনের দক্ষিণাংশে জাতীয় দলের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতীয় দলের নেতা চিয়াং কাই সেক মহা যোদ্ধা ও রাজনীতিকুশল ব্যক্তি। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সঙ্কটকাল উপস্থিত দেখিয়া

তিনি আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে হয় ত চীন জাপানকে বাধা দিতে পারিবে; কিম্বা ঠিক কি ঘটিবে তাহা হয় ত এখনও নিশ্চিত করিয়া বলিবার সময় উপস্থিত হয় নাই।

জাপান ও ইয়োরোপ -

চীন-জাপান যুদ্ধে আর একটি বিবেচ্য বিষয়—ইয়োরোপ এই যুদ্ধে যোগ দিবে কি না? রাজনীতির গতি কখন কোন্ পথ অনুসরণ করে, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা না গেলেও, কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া একটা অনুমান করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। চীন-জাপানের যুদ্ধটা আসিয়া পৌছিয়াছে সাংহাইএর খুব কাছে—এমন কি, সাংহাইএর উপরও গোলা-গুলি পড়িতেছে। এখন এই সাংহাইটি একটি আন্তর্জাতিক বন্দর। ইহার উপর গোলা-গুলি বর্ষণ আন্তর্জাতিক বিধি-বিরোধী। এই হেতু বৃটেন ও আমেরিকা উভয়েই চীন ও জাপান উভয়কেই সাংহাইএ যাহাতে গোলা-গুলি না বর্ষিত হয় সে পক্ষে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এবং ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের—ইংরেজ, ফরাসীয়, এবং আমেরিকার সৈন্য, নৌসৈন্য, রণতরী প্রভৃতি সাংহাইএর নিরপেক্ষতা রক্ষার্থ এখানে আসিয়া জমা হইতেছে। সাংহাইএ এইভাবে শক্তি সমন্বয় সংঘটনের ফলে সাংহাইএর শান্তি ও নিরপেক্ষতা রক্ষিত হইতেও পারে; কিম্বা—ইহারা উপস্থিত না থাকিলে হয় ত বিশেষ কোন গণ্ডগোল না ঘটিতেও পারিত, কিন্তু ইহাঁর উপস্থিত থাকার দরুণই—ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে জাপান চীন যুদ্ধে লিপ্ত হইতেও হইতে পারে—কিছুই বলা যায় না; কারণ, যুদ্ধ-বিগ্রহের স্থলে এরূপ অঘটন প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য চীন-জাপান যুদ্ধ পৃথিবীর সকলের পক্ষেই সমান উদ্বেগের কারণ হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ চীনে ইয়োরোপের মহা স্বার্থ রহিয়াছে—বিগত বক্সার যুদ্ধের দরুণ চীন শক্তিপুঞ্জের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য আছে—চীনের সে ঋণ সম্ভবতঃ এখনও পরিশোধিত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধের গতি অনুসারে ইয়োরোপ, ইচ্ছা না করিলেও হয় ত, বাধ্য হইয়া এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারে। তখন কি অবস্থা ঘটিবে, এখন তাহা অনুমানাতীত বিষয়। একটা সংবাদ পাওয়া গেল যে, ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের আপোষ-প্রস্তাব জাপান অগ্রাহ্য করিয়াছে; সুতরাং ব্যাপার গুরুতর হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত—পুস্তকাবলী

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'ভারতীয় নারী'—৸৹
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত বেদান্ত-দর্শন—৪৲
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস 'পথের সাথী'—২৲
শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত নাটিকা 'একাঙ্কিকা'—১৷৹
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গাথাকাব্য 'চিত্র ও চিত্ত'—১৲
শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত 'রূপসী'—১৲
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত 'ইতি'—১৷৹
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত 'পুতুল ও প্রতিমা'—১৷৹
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস 'দূরের আশায়'—২৲
শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত নাটক 'বাসুকী'—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস 'গুপ্ত ঘাতকের ছুঁচ' ও 'ডাকলুঠ'—প্রত্যেকের—৸৹

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJAE.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.



সতীর দেহত্যাগ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু পাঠাগারের সৌজন্যে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works



চৈত্র—১৩৩৮

তীয় খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ { চতুর্থ সংখ্যা

ত্মা

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্

(১)

জীবাত্মা কি তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব ; বুঝাইতে পারিব এমন সাহস করি না। নিম্নে দেখা যাইবে যে, এই বিষয়ের আলোচনা কত জটিল।

আমরা এখন সকলেই দেহাতিরিক্ত একটি জীবাত্মা স্বীকার করিয়া থাকি। তিনি দেহ নহেন, কিন্তু দেহের অধিপতি ও পরিচালক। এইরূপ ধারণা সভ্য সমাজে সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। কোন সমাজে ইহাকে soul বলে, কোন সমাজে روح ('রু') বলে। কিন্তু সর্ব্ব সমাজেই দেহ হইতে ইহাকে পৃথক করা হয়।

যদি তিনি দেহেই বাস করেন অথচ দেহ হইতে পৃথক, তবে দেহের সর্ব্বত্রই বাস করেন, কিম্বা দেহের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করেন—ইহাই সর্ব্বপ্রথমে আলোচ্য।

প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত জীবাত্মা সম্বন্ধে কি ধারণা চলিয়া আসিতেছে? প্রথমে কোষ-গ্রন্থের উল্লেখ করিব। নিঘণ্টুকে বেদমন্ত্রের কোষ-বলা যাইতে পারে। নিরুক্ত তাহারই ভাষ্য। নিঘণ্টুতে জীবাত্মা বা আত্মা শব্দের কোন পদ-নাম (প্রতিশব্দ) নাই। সুতরাং অনুমিত হইতে পারে যে বেদের মন্ত্রাংশে জীবাত্মা অথবা আত্মা

শব্দের উল্লেখ নাই। আমিও বেদে এই দুই শব্দ পাই নাই।

অমরকোষে দেখা যায় যে আত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও পুরুষ—এই তিন শব্দের একই অর্থ।

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতি স্ত্রিয়াং।

স্বর্গবর্গ ৪।১০

অর্থাৎ আত্মার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ ও পুরুষ এবং প্রকৃতির নাম প্রধান।

কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমে জীব শব্দের যত্ন, ধৃতি বুদ্ধি, স্বভাব, ব্রহ্ম, দেহ এই ছয়টি প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে "অমরকোষ প্রমাণং"। কিন্তু আমি অমরকোষে এই ছয়টি অর্থ পাই নাই। আমি যাহা প্রাপ্ত হইতেছি তাহাতে জীবাত্মা দেহ হইতে পৃথক পদার্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

জীবাত্মা যদ্যপি ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে জানেন, স্বয়ং দেহ নহেন। গীতার ১৩।২ শ্লোকে পাওয়া যায়—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥

শ্রীধর স্বামী এ স্থলে বুঝাইতেছেন যে "ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রং * * * * এতদ্ যো বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে তং ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাহুঃ কৃষিবলবৎং ফল ভোক্তৃত্বাৎ তদ্বিদঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিবেকজ্ঞাঃ।" স্বামীজী বলিয়াছেন যে দেহকে প্ররোহ ভূমি বলিয়া যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে ইনিই জীবাত্মা।

কিন্তু অমরকোষে ইহাকে পুরুষও বলিয়াছে। সাংখ্য-দর্শনে দেখিতেছি—

সঙ্ঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।

পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ ১৭

ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য্য প্রণীত কারিকা।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত সংঘাত পদার্থ "পরের" অর্থাৎ অসংঘাত পদার্থের প্রয়োজনীয়। যাহা সংযোগ বিয়োগের দ্বারা জাত হয় তাহা (ঐ প্রকারে যিনি জাত নহেন তাঁহার অর্থাৎ) অজাতের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সে অজাত ত্রিগুণাত্মক বস্তু নহে, অর্থাৎ ত্রিগুণ জাত সমস্তের অতিরিক্ত। ইনি অধিষ্ঠাতা ভোক্তা এবং মুক্তির জন্য প্রবৃত্ত। এতদ্দ্বারাও জীবাত্মা দেহ হইতে পৃথক বলিয়া বুঝা যাইতেছে; এবং বোধ হয় পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যাইতেছে।

মেদিনী কোষে জীবাত্মাকে "মন" বলিয়াছে। কিন্তু মন কি? মন সংকল্প বিকল্পাত্মক অন্তরেন্দ্রিয় মাত্র। অমরকোষে মনের এই কয়েকটী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে—

চিত্তন্তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসংমনঃ।

স্বর্গবর্গ ৪।১৮

তাহা হইলে জীবাত্মা চিত্ত অথবা হৃদয় হইতেছেন। কারণ তিনি ও মন একই।

হেমচন্দ্র জীবকে অর্ক হুতাশন ও বায়ুর সহিত এক করিয়াছেন।

জীবঃ অর্কঃ হুতাশনঃ বায়ুঃ।

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত।

এ কি হইল? জীবাত্মা বায়ু এবং হুতাশন এবং অর্ক হইয়া গেল। এ তিনটি কি ক্ষেত্রজ্ঞ অথবা পুরুষ?

ত্রিকাণ্ড-শেষে জীব পর্য্যায়ে আত্মা, পুরুষ, অন্তর্যামী এবং ঈশ্বরকে একই বলা হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মমায়োপহত হইয়া ঈশ্বর উপাধি লাভ করেন, এবং ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টি। সুতরাং জীবাত্মা সৃষ্টিকর্ত্তাই হইতেছেন। ইহা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। পাতঞ্জল দর্শনের যোগপাদের ২৪ সূত্রে দেখা যাইতেছে যে—

ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।

জীবাত্মা কি তবে ক্লেশ কর্ম্মাদির অধিক হইল না? এ কি?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখিতে পাই—

জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এব চ।

আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীবঃ স এব চ॥

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নির্লিপ্ত আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিবিম্বই জীবাত্মা অথবা দেহী। পরমাত্মার প্রতিবিম্ব কথাটি বুঝা কঠিন। অবস্তুর প্রতিবিম্ব কি? প্রতিবিম্ব পড়েই বা কোথায়? স্থানান্তরে বলা হইয়াছে,

"দর্পণ মুখ প্রতিবিম্ববৎ বুদ্ধিস্থ চৈতন্যং প্রতিবিম্বং।"

বুদ্ধিস্থ চৈতন্য নিশ্চয়ই দেহে অবস্থিত; সুতরাং দেহী অথবা জীবাত্মা। মুখ এবং দর্পণ দুইটি বস্তু থাকিলে দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে। পরমাত্মা যদি বস্তু হন এবং আর একটি স্বচ্ছ বস্তুও থাকে তবেই তাহাতে পরমাত্মার

প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে। নচেৎ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব জীবাত্মা, এ কথাটি বন্ধ্যা পুত্রের ন্যায় অসম্ভব হইয়া উঠে। এই কথাটি উপমা মাত্র তাহা বুঝিতেছি ; কিন্তু বস্তুতঃ অর্থ বোধ করা কঠিন। তাহা হইলেও জীবাত্মা দেহ হইতে পৃথক কিন্তু দেহস্থ, ইহা বুঝা যাইতেছে।

"দেহস্থ"—কিন্তু দেহের কোথায় স্থিত? এ কথা বুঝিতেই হইবে, যদিও বুঝা সহজ নহে। বেদান্ত মতে—

"ঘটাবচ্ছিন্নাকাশবৎ শরীর ত্রিতয়াবচ্ছিন্নং চৈতন্যং"

অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ত্রিবিধ শরীরাবচ্ছিন্ন হইয়াই চৈতন্য রহিয়াছে। তাহাতেই আমরা চেতন। যে বস্তুতে এই পদার্থ নাই তাহা অচেতন। কিন্তু ত্রিবিধ দেহে অবচ্ছিন্ন হইলে ঐ সকল দেহের কোন্ স্থানে অবচ্ছিন্ন তাহা বুঝা গেল না।

শ্রীমদ্ভাগবদগীতার (২।২২) বিখ্যাত "বাসাংসি-জীর্ণানী" শ্লোকে দেখিতেছি যে জীবাত্মা দেহ হইতে পৃথক পদার্থ। কারণ তিনি এক দেহ ত্যাগ করিয়া আর এক দেহ গ্রহণ করেন, আমরা যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করি। গীতারই ২।২৫ শ্লোকে মনকে আত্মাতে স্থির করিবার উপদেশ আছে। অথচ মেদিনী কোষ মন ও আত্মা এক করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক মনকে আত্মাতে স্থির করিবার অর্থ কি? গীতার ১৩।৩২ শ্লোকে লিখিত আছে যে—

"সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মানো পলিপ্যতে"।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে গীতাকার জীবাত্মাকে দেহের সর্ব্বত্র স্থিত বিবেচনা করিয়াছেন। তাহা হইলে মনকে দেহের সর্ব্বত্র স্থির করিতে হয়। এ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য কথা। আত্মা দেহ হইতে পৃথক পদার্থ হইলেও তাহার অবস্থান অপরিজ্ঞাত থাকায় মনকে তাহাতে স্থির করিবার কথা আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে।

আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি যে জীবাত্মা ও মন একই। (অমরকোষ স্বর্গ বর্গ, ৪।১৮)। এ স্থলে মনকে আত্মায় স্থির করা বলিলে কি বুঝিব?

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (৯।৩।২৫-২৬) দেখিতে পাই—অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদন্যত্রাস্মন্মন্যাসৈ যদ্ধ্যেতদন্যত্রাস্মৎ স্যাচ্ছানো বৈতদদ্যুর্ব্বয়াংসি বৈনদ্বিম থীয় ন্নিতি।২৫।

কস্মিন্নু তঞ্চাত্মাচ প্রতিষ্ঠিতৌস্থ ইতি প্রাণ ইতি, কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি, * * * সমান ইতি ॥২৬॥ *

এই দুই মন্ত্রের ভাষ্যে স্বামী শঙ্করাচার্য্য বুঝাইতেছেন যে, যস্মিন্‌কালে এতদ্ধৃদয়মাত্মা অস্য শরীরস্যান্যত্র ক্বচি-দেশান্তরেঽস্মতো বর্ত্তত ইতি মন্যসে * * * তদাশ্বানো বা এনচ্ছরীরং তদাদ্যুঃ, বয়াংসি বা (পক্ষিণো বা) এনদ্ধি * * * বিলোড়য়েয়ুঃ। তস্মাস্ময়ি শরীরে হৃদয়ং (আত্মা) প্রতিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ। শরীর স্যাপি নামরূপ কর্ম্মাত্মকত্বাদ্ধৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৫ ॥

হৃদয় শরীরয়োরেব মন্যোঽন্য প্রতিষ্ঠোক্তাকার্য্য করণয়ো-রতস্থাং পৃচ্ছামি কস্মিন্নু ত্বং চ শরীর চাত্মাচ তব হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতৌস্থ ইতি। প্রাণ ইতি। দেহাত্মানৌ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতৌ কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি * * * সমান ইতি। ২৬। পূর্ব্বে উদ্ধৃত ২৫।২৬। মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্যের অর্থ এইরূপ—"হে অহল্লিক যে সময়ে এই শরীরের পরিচালক হৃদয় (আত্মা) আমাদের দেহ হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে কর সে সময়ে এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করে, পক্ষী সকল স্ব স্ব চঞ্চু দ্বারা বিমোহিত (ছিন্ন ভিন্ন) করে। যেহেতু হৃদয়ের অভাবে দেহ এইরূপ বিধ্বস্ত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই দেহই হৃদয়ের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। যেমন হৃদয় দেহেতে প্রতিষ্ঠিত তেমনই নামরূপ কর্ম্মময় শরীরও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।" ।২৫। "তুমি (শরীর) এবং তোমার আত্মা (হৃদয়) এই উভয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—প্রাণে অর্থাৎ দেহ ও আত্মা উভয়েই প্রাণবৃত্তিতে অবস্থিত। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রাণবৃত্তি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—অপানে। অপান বৃত্তি কোথায় অবস্থিত? উত্তর—ব্যানে। * * * সমানে প্রতিষ্ঠিত।" ।২৬।

এ সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হৃদয়ের নামই দেহস্থ আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। জীবাত্মা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমান এই পঞ্চবায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। এই পঞ্চবায়ু শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কর্ম্ম করে। প্রাণবায়ু নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস করায় ; এইরূপ আর চারিটি বায়ুও

---

* মন্ত্রে এবং শঙ্কর ভাষ্যে * * * এইরূপ ষ্টার চিহ্নিত স্থানে ব্যান, উদান, সমান, বায়ুত্রয় সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্তবৎ প্রশ্নোত্তর বুঝিতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করায়। অতএব জীবাত্মা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করান। তাহা হইলে জীবাত্মা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হইতেছেন; এবং হৃদয় ইঁহার নামান্তর মাত্র হইতেছে। জীবাত্মা তবে সর্ব্বশরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কর্ম্মপ্রবর্ত্তক পঞ্চবায়ুর সমষ্টি-নাম হইয়া গেল। যেমন বহু বৃক্ষলতাদির সমষ্টি-নাম জঙ্গল অথবা অরণ্য। যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে আছে তাহা ঐ সকল বৃক্ষলতা। জঙ্গল অথবা অরণ্য বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই। উহা কেবল সমষ্টি-নাম মাত্র। তদ্রূপ যখন প্রাণ অপানাদি পঞ্চবায়ুর সমষ্টি-নাম আত্মা, তখন যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে আছে তাহা ঐ পঞ্চবায়ু অথবা তাহাদিগের (শারীর) কর্ম্ম; আত্মা নহে। এ দিক হইতে দেখিলে জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। তাহা হইলে জীবাত্মা সর্ব্বদেহের বিভিন্ন কোষের কর্ম্ম-সমষ্টি অথবা কর্ম্ম-সমষ্টি-প্রবর্ত্তক এবং সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত পদার্থ হইতেছে; ইহার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকিতেছে না। ন্যায়দর্শনে ১।১।১০

ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনোলিঙ্গমিতি। এবং বৈশেষিক দর্শনে ৩।৪।২

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তর বিকারাঃ সুখ দুঃখেচ্ছাদ্বেষ প্রযত্নাশ্চাত্মনোলিঙ্গানি।

এতদুভয় দর্শন হইতে দেখা যাইতেছে যে, ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটি সামান্য লিঙ্গ আছে এবং বৈশেষিকে কয়েকটি বিশেষ লিঙ্গ আছে। বৈশেষিক দর্শনে বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই প্রাণবায়ু অপান বায়ু প্রভৃতি জীবাত্মার লক্ষণ বলিতেছে। তৎসহ সমস্ত জীবন ব্যাপারেরও উল্লেখ করিয়াছে, যদিও মনেন্দ্রিয়াদি পৃথক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উভয় দর্শনেই ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ ইত্যাদিকে জীবাত্মার লক্ষণ বলা হইয়াছে। যাহা হউক মহর্ষি গৌতম ও কণাদ উভয়েই দেহের সমস্ত প্রযত্ন ও মনের সমস্ত বৃত্তি এবং সুখ দুঃখাদি অনুভূতিকেই জীবাত্মার লিঙ্গ বলিতেছেন। ইহাতেও জীবাত্মার লক্ষণ দেহের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আরোপ করা হইতেছে না; বরং আমাদিগের জীবনব্যাপী দেহ মনের সমস্ত কর্ম্মের সমষ্টিকেই জীবাত্মার লক্ষণ বলা হইতেছে। লক্ষণ হইতে লক্ষ্যকে যখন পৃথক করা যাইতে পারে না তখন ঐ সমস্তকেই জীবাত্মা বলা হইল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৯।৩।৯ মন্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

"কতম একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্মত্যদিত্যাচক্ষতে।" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তেত্রিশ দেবগণকে ক্রমে একে পরিণত করিবার পর বলিতেছেন যে, সেই এক দেব কে? উত্তর—সেই এক দেব প্রাণ; তাহাকে ব্রহ্ম বলে। এ স্থলে প্রাণকে পঞ্চবায়ুর অন্যতম বলা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। লক্ষ্য করিবেন, ঈশ্বর বলা হয় নাই, ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অমরকোষে এবং গীতায় জীবাত্মাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থ, ব্রহ্ম তাহা নহেন। সুতরাং এই দুই অর্থে অত্যন্ত প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৩।১ এবং ১।৪।৩ মন্ত্র দুইটি পূর্ব্বোদ্ধৃত ৯।৩।৯ মন্ত্রের সহিত একত্র পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, আত্মা প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান এই পঞ্চবায়ুই; এবং ব্রহ্মও। ৪।৩।১ মন্ত্রে আত্মাকে পঞ্চবায়ুর সহিত একীকরণের পর "সর্ব্বান্তরঃ" বলায় ব্রহ্মই বলা হইল। ১।৪।৩ মন্ত্রে "প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি * * * * প্রাণ এবায়তনং" বলায় স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা * * * * *" মন্ত্রের (মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।১) ভাষ্য করিতে স্বামী শঙ্করাচার্য্য জীবাত্মাকে অবিবেকী এবং "কাম-কর্ম্ম-বাসনাশ্রয় ফল-ভোগী" বলিয়াছেন। সুতরাং এ স্থলে জীবাত্মাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করা হইতেছে। কারণ ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব এবং কাম কর্ম্ম বাসনার ফল কখনই ভোগ করেন না। "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মে এ প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঈশোপনিষদেরও প্রথম মন্ত্রেই ব্রহ্মের ব্যাপিত্ব উল্লেখ আছে। সে ব্যাপিত্ব জীবাত্মার নাই। তবে জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলা হইবে কেমন করিয়া? তিনি কি সর্ব্বদেশী অথবা ঘটাবদ্ধ সুতরাং একদেশী?

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঞ্চ কোশের বিবৃতি আছে। প্রত্যেক কোশের মস্তক বাহু পদ ইত্যাদি অঙ্গ আছে। অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ; অতএব "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ"। এই অন্ন রসময় কোশ হইতে পৃথক আর একটি প্রাণময় কোশ আছে। ঐ কোশ "অন্তরঃ আত্মা" অর্থাৎ আত্মারূপে পরিকল্পিত। অন্নময়

কোশের যিনি আত্মা প্রাণময় কোশেরও তিনিই আত্মা। এ আত্মা "শারীর আত্মা"। শারীর অর্থে এ স্থলে শরীরস্থ। মনোময় কোশের এবং জ্ঞানময় কোশের একই রূপ। জ্ঞানময় কোশেরও শারীর আত্মা অর্থাৎ জ্ঞানময় কোশের যেরূপ শরীর বর্ণিত আছে তদাশ্রিত আত্মা। শ্রদ্ধা এ কোশের মস্তক, ঋত দক্ষিণ হস্ত, সত্য বাম হস্ত, যোগ তাহার আত্মা, বুদ্ধি তাহার পুচ্ছ। এ রূপকের অর্থ সুস্পষ্ট। অনন্তর আনন্দময় কোশ। এ কোশেরও দেহ আছে। "স বা এষ পুরুষ বিধ এব;" অর্থাৎ আনন্দময় কোশ পুরুষরূপ। কিন্তু পুরুষের তো রূপ নাই। এ নিমিত্ত পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী সংশোধিত তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ভাষ্যে "মনুষ্যাকার" বলা হইয়াছে। এ অর্থ গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। যাহা হউক আনন্দময় কোশেরও রূপ আছে। সে রূপ এই প্রকার—

তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।

মৎকৃত উপনিষদ্ গ্রন্থাবলীতে এ মন্ত্রের আমি এইরূপ অনুবাদ করিয়াছি :—

প্রীতি তার শির উত্তম অঙ্গ,
সূক্ষ্ম দেহের সূক্ষ্ম সঙ্গ।
মোদ হয় তার দক্ষিণ হস্ত
প্রমোদ তাহার বাম হস্ত।
নিত্য আনন্দ আত্মা তাহার
ব্রহ্ম বস্তু পুচ্ছ তাহার।

এ রূপকের অর্থও সুস্পষ্ট।

এ সকল হইতে আমরা জীবাত্মার কি পরিচয় পাইলাম? পঞ্চকোশের প্রত্যেকেরই দেহ আছে, মস্তক বাহু পদ ইত্যাদি সমস্তই আছে। অন্নময় কোশের যেরূপ পঞ্চ-কোশেরও সেইরূপ। কিন্তু প্রত্যেকের শির বাহু পদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে গঠিত। আনন্দময় কোশের শির প্রীতি (প্রিয়) বিজ্ঞানময় কোশের শির শ্রদ্ধা; মনোময় কোশের শির যজু। এ কোশের আত্মা ব্রাহ্মণ অংশ। ইহার পুচ্ছ অথর্ব্ব মন্ত্র।

তস্য যজুরেব শির। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ।
সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা।
অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।

প্রাণময় কোশের মস্তক প্রাণ; ব্যান ও অপান দুই বাহু; আকাশ আত্মা; পৃথিবী পুচ্ছ। অন্নময় কোশের দেহ আমরা সকলেই দেখিতেছি। পঞ্চ কোশেরই দেহ একই প্রকার এবং প্রত্যেক কোশ দেহের পুরুষ একই প্রকার অর্থাৎ "শারীর আত্মা"। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশের যেমন শারীর আত্মা পর পর কোশেরও তেমনই। "যঃ পূর্ব্বস্য"। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১—৫। এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে যে, অন্নময় কোশের পুরুষ যখন অন্নরসময় হইল তখন অপর চারিটি কোশের পুরুষও সেইরূপ হইলে অর্থ কি হইবে? আত্মা কি আমাদিগের আহার্য্য পদার্থের মধ্যগত শক্তি মাত্র? যদি তাহা হয় তবে আত্মা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্তই হইতেছে। পূর্ব্বে অন্যান্য প্রমাণ হইতেও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। কিন্তু সে সকল স্থলে আত্মা অন্ন-রস-ময় শক্তি হইতে পৃথক বিবেচিত হইয়াছিল; এ স্থলে অন্ন রস-গত শক্তিই বিবেচনা করিতে হইল। এ প্রকাণ্ড প্রভেদ।

কঠোপনিষদে পাই—

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। কঠ ৬।১৭

তাহা হইলে আত্মা তো দেহের সর্ব্বত্রব্যাপী হইল না। কেবল হৃদি-সন্নিবিষ্ট হইল। হৃদয় কোথায়? আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত শঙ্কর-ভাষ্য হইতে বুঝিয়াছি যে, হৃদয় ও আত্মা একই পদার্থ। বৃহদারণ্যকের মন্ত্রও তাহাই প্রতিপন্ন করে। যদ্যপি হৃদয় ও আত্মা এক হইয়া গেল তবে আত্মা হৃদি-সন্নিবিষ্ট এ কথার অর্থ কি? আত্মা আত্মাতেই সন্নিবিষ্ট। সুতরাং তাহার কোন আধার নাই। তিনিই সমস্তের আধার। অতএব ব্রহ্ম।

এক্ষণে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে দেখা যাইতেছে যে, এক শ্রেণীর প্রমাণে জীব শব্দের অর্থ "দেহ" পাইতেছি। অপরাপর প্রমাণে জীবাত্মা দেহের সর্ব্বত্রব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক হইতেছেন। সর্ব্বশেষে উদ্ধৃত প্রমাণ মূলে জীবাত্মা ঈশ্বরও হইতেছেন, ব্রহ্মও হইতেছেন। আমরা এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম?

প্রশ্ন উপনিষদে পাইতেছি—

তস্মৈ স হোবাচ প্রজা কামোবৈ প্রজাপতিঃ

সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা স মিথুন মুৎপাদয়তে।
রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যে তৌমে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যতে ইতি॥ ৪॥
আদিত্যো বৈ প্রাণোরয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্ব্বা
এতৎ সর্ব্বং যন্ মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ। ৫।

প্রশ্নোপনিষদ্ ১।৪-৫।

ইহার অর্থ এই যে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া তপস্যা (সংকল্প) করিলেন। চিন্তা মাত্রেই রয়ি এবং প্রাণ এই দুইটি উৎপন্ন হইল। রয়ি অর্থাৎ ভূত; প্রাণ অর্থাৎ আত্মা। এরূপ বুঝিলে বিশেষ দ্বৈধ হয় না। কিন্তু পঞ্চম মন্ত্রের জন্য এরূপ বুঝিবার উপায় নাই। কারণ ঐ মন্ত্রে বলিতেছে যে রয়ি অর্থ চন্দ্রমা এবং প্রাণ অর্থ আদিত্য। সে' আদিত্যও পূর্ব্বদিকে উদয় হন, সুতরাং তিনি সূর্য্য (৬ষ্ঠ মন্ত্র)। এখন কি হইল? প্রথম সৃষ্টি কি চন্দ্র এবং সূর্য্য? চতুর্থ মন্ত্রের "প্রাণ" তো পঞ্চবায়ুর অন্যতম হইতেছে না। তবে বৃহদারণ্যকের প্রাণ অপানাদির সহিত আত্মার একীকরণ কেমন করিয়া বুঝিব? যদি এই প্রাণ অথবা আত্মা দেহের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক হন, তবে তাঁহাকে সূর্য্য বলিলেই বা কি বুঝিব?

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এবং যে সকল প্রমাণ উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা হইতে, জীবাত্মা দেহ কি দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু; দেহের সর্ব্বত্রব্যাপী অথবা দেহের একদেশবাসী ইহা বুঝা সহজ নহে। জীবাত্মা ব্রহ্ম কি ঈশ্বর কিম্বা খাদ্য পানীয় গত শক্তি তাহাও বুঝা সহজ নহে। তথাপি বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিলে এবং বিভিন্ন প্রমাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে মীমাংসা করিতে হয় যে, জীবাত্মা ব্রহ্মই।

জীবাত্মা না বুঝিতে পারিলে পরমাত্মা বুঝাও অসাধ্য। এ সকল না বুঝিলে মানব-জন্মই নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং বুঝিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। এতক্ষণ আমরা এক দিক দিয়া এ চেষ্টা করিতেছিলাম; এক্ষণে অন্য দিক দিয়া চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করি।

প্রশ্ন হইতেছে, আত্মা কি এবং দেহের কোথায় অবস্থিতি করে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দেহ কিরূপে গঠিত হয়। জীবদেহ দ্বিবিধ;—এককোষ (Unicellular) এবং বহুকোষ (Multicellular)। এককোষ জীবের দৃষ্টান্ত শুক্রকীট, ম্যালেরিয়া, বসন্ত আদি রোগের কীট; এবং বহুকোষ জীবের দৃষ্টান্ত আমরা। এককোষ জীবের দেহ একটি মাত্র কোষে গঠিত; তাহাতেই তাহার সমস্ত জীবন-ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। বহুকোষ জীবের দেহ বহু কোষে গঠিত; ইহাদিগের দেহস্থ ভিন্ন ভিন্ন কোষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে। অস্থিকোষ, পেশীকোষ, স্নায়ুকোষ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত। অস্থিহীন বহুকোষ জীবেরও দেহে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কোষ আছে এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে। এককোষ জীবের বংশবৃদ্ধি একটি কোষ হইতেই হয়; বহুকোষ জীবদিগের বংশবৃদ্ধিও এককোষ জীব দ্বারাই সাধিত হয়। যে পুংকোষ (Spermatozoon) এবং স্ত্রীডিম্ব (ovum) মিলিত হইয়া পরবংশ গঠন করে তাহারা উভয়েই এককোষ জীব। সুতরাং জীবদেহ এককোষই হউক অথবা বহুকোষই হউক, পরবর্ত্তী বংশের দেহ গঠন এককোষ জীবই করে।

পুংকোষ ও স্ত্রীডিম্ব জড় পদার্থ নহে, উহারা জীব। সুতরাং উহাদিগের আত্মা আছে। উহাদিগের মিলনে যখন অপত্যদেহ গঠিত হয়, তখন কি সে দেহে দুইটি আত্মা অবস্থিতি করে? না, তাহা নহে। বলিতেই হইবে, একটি আত্মা অবস্থিতি করে। উহাদিগের মিলনজাত ক্ষুদ্র দেহের নাম কলল। কলল দ্বিধা, ত্রিধা, চতুর্ধা ইত্যাদি বহুভাগে বিভক্ত * হইতে হইতে শত শত কোষ গঠিত করিবার পর উহারা ঊর্দ্ধাধঃ সজ্জিত হইয়া তিনটি স্তর গঠন করে এবং সেই সকল কোষপিণ্ড নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত হয়। তাহা হইতেই সমস্ত বহুকোষ জীবের দেহ জাত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, যে আত্মা অতি ক্ষুদ্র কলল-দেহাধিষ্ঠিত ছিলেন তিনিই পূর্ণগঠিত দেহের প্রত্যেক কোষে অবস্থিতি করেন। এ স্থলে কি বহু কোষে বহু আত্মা স্বীকার করিব? না, একই আত্মা। যে অণোরণীয়ান্ (অতি ক্ষুদ্র) আত্মা কলল-কোষে বসতি করিতেন তিনিই আবার মহতোমহীয়ান; সুতরাং পূর্ণাবয়ব দেহের প্রত্যেক কোষেই অতএব সমস্ত দেহেই ব্যাপ্ত। নচেৎ দেহস্থ বহু কোষের বহু ক্রিয়া মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। আমাদিগের দেহে সহস্র সহস্র কোষ আছে।

* বিভক্ত অথচ বিচ্ছিন্ন নহে, পরস্পর সংযুক্ত।

ইহারা কেহ কাহারও কর্ম্ম করে না ; যেন স্বতন্ত্র। তথাপি সকলেই সমষ্টি-জীবনের অনুকূল। বহুত্বের মধ্যে এই একত্ব রক্ষা করে কে ? ইহাদিগের বিভিন্ন কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা না হইলে জীবন-ব্যাপার অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই সামঞ্জস্য অতি বিস্ময়কর ভাবেই রক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি এই সামঞ্জস্য রক্ষা করেন তিনিই দেহের সর্ব্বকোষগত আত্মা। তিনিই অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্। এই উভয়বিধ ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্ব জীবাত্মার স্বধর্ম্ম। পরমাত্মারও স্বধর্ম্ম। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মাই। পরমাত্মা দেহবদ্ধ হইলে নাম দেওয়া হয় জীবাত্মা। ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভেদ নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়েও রেতঃ (শুক্র)কে আত্মা বলা হইয়াছে।

যদেতদ্রেতস্তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ
সম্ভূত মাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি। ২।১

ইহার অর্থ এইরূপ :—রেতঃ সমুদয় অঙ্গ হইতে সংগৃহীত তেজ। রেতঃ স্বরূপ আত্মাকে পুরুষ নিজমধ্যে ধারণ করে।

দেহের যোগে না হইলে আত্মা কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। দেহ শব্দে এ স্থলে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, ত্রিবিধ দেহই বুঝিতে হইবে। মানবের দেহ-কোষ সকলের মধ্যে একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানের অর্থাৎ অণ্ডের অথবা ডিম্বাধারের (ovary) বিশিষ্ট কোষকে পুংকোষ অথবা স্ত্রীডিম্ব বলে। ইহারাই মিলিত হইয়া পরবংশের দেহ গঠন করে। মানব দেহের অন্যান্য কোষ দেহ গঠন করিতে পারে না।

দেহ মরে কিন্তু পুংকোষ ও স্ত্রীডিম্ব পরবংশ গঠন করে বলিয়া মরে না। পিতার পুংকোষ পুত্রের অণ্ডে যায় এবং সেখানে তাহার পুংকোষ গঠন করে। মাতার স্ত্রীডিম্ব (স্ত্রীকোষ) কন্যার ডিম্বাধারে (ovary) গিয়া তাহার স্ত্রীডিম্ব গঠন করে। ইহারা বংশানুক্রমে দেহ গঠন করিতে থাকে এবং প্রত্যেক পর-পর বংশীয় দেহে অণ্ডে অথবা ডিম্বাধারে আশ্রয় লয় ও সেখানে স্বানুরূপ কোষ গঠিত করে। ইহাতে দেহকে আবাসভূমি এবং কললকে দেহ নির্ম্মাতা বলা যাইতে পারে *। ইহারা বংশধারা ক্রমে অমর। রেতঃ অমর সুতরাং অজও। ঐতরেয় উপনিষদে এই নিমিত্ত রেতঃকে আত্মা বলা হইয়াছে।

আমরা আবার সেই ব্রহ্ম ভাবে অথবা ঈশ্বর ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা অমর তাহা অজ তাহা নিত্য। সুতরাং একদেশী নহে। ফলে জীবাত্মা সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত হইতেছে।

যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে জীবাত্মা প্রকৃত পক্ষে দেহ নহে, কিন্তু দেহ গড়িয়া লইয়া তাহার সর্ব্বত্র অবস্থিতি করে। জীবাত্মা বস্তুধর্ম্মী নহে, বস্তুও নহে।

এতক্ষণে আমাদিগের উত্থাপিত প্রশ্ন দুইটির উত্তর হইল। কিন্তু পরমাত্মা এবং জীবাত্মা যদি একই পদার্থ হন তবে জীবাত্মা দেহাবদ্ধ হওয়াতে উভয়ে এত পার্থক্য কেন উপস্থিত হয় এবং এ পার্থক্যের অবসান হইবে কেমন করিয়া ? এ অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রশ্নের উত্তরে পরমাত্মার ও জীবাত্মার ব্যবহারিক প্রভেদ বুঝিতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতি এ বিষয়ে কিছুই সাহায্য করিতে পারে না। সুতরাং উপমা দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে হয়। বেদান্তে অনেক স্থলে সূর্য্য-কিরণের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। সূর্য্য-কিরণ অনন্ত আকাশ-বিস্তৃত, বৃহৎ। উহা বহুবিধ ঘটে পতিত হইয়া ঘট-ধর্ম্মানুসারে আমাদিগের নিকট বহু প্রকার প্রতীয়মান হয়। এক পদার্থে লাল, অন্য পদার্থে কাল ; এক পদার্থে স্বচ্ছ, অন্য পদার্থে অস্বচ্ছ ইত্যাদি বহু ভাবে প্রতিভাত হয়। আমরা সমুদ্রের জল এবং ঐ জল পূর্ণ একটি ঘট, এই দুইয়ের উপমা দ্বারা পরমাত্মার ও জীবাত্মার প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করি। ঘটপূর্ণ জল সমুদ্রের জলই, কিন্তু ক্ষুদ্র ঘটাবদ্ধ হওয়ায় তাহার কতিপয় ধর্ম্ম পৃথক হইয়া যায়। সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে, তরঙ্গের চূড়া ফেণাবৃত হয়, সমুদ্রের জলরাশি নীলবর্ণ দেখা যায়। কিন্তু ঘটাবদ্ধ জল নীলবর্ণ দেখা যায় না, উহাতে তরঙ্গ উঠা অসম্ভব ; ফেণাও উহাতে কখনই হইতে পারে না। ঘটাবদ্ধ জল অল্প কালেই সমল হইয়া উঠে, সমুদ্রের জল তদ্রূপ হয় না। ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, বৃহৎ যদি ক্ষুদ্রে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে ক্ষুদ্রত্ব বশতঃই সে বৃহতের ধর্ম্ম হইতে অনেক অংশে পৃথক হইয়া যায়।

* The bodies of the higher animals which die may from this point of view be regarded as something temporary and nonessential destined merely to carry for a time the unicellular eggs.

Ray Lankester.

সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা স মিথুন মুৎপাদয়তে।
রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যে তৌমে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যতে ইতি॥ ৪॥
আদিত্যো বৈ প্রাণোরয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্ব্বা
এতৎ সর্ব্বং যন্ মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ। ৫।
প্রশ্নোপনিষদ্ ১।৪-৫।

ইহার অর্থ এই যে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া তপস্যা (সংকল্প) করিলেন। চিন্তা মাত্রেই রয়ি এবং প্রাণ এই দুইটি উৎপন্ন হইল। রয়ি অর্থাৎ ভূত; প্রাণ অর্থাৎ আত্মা। এরূপ বুঝিলে বিশেষ দ্বৈধ হয় না। কিন্তু পঞ্চম মন্ত্রের জন্য এরূপ বুঝিবার উপায় নাই। কারণ ঐ মন্ত্রে বলিতেছে যে রয়ি অর্থ চন্দ্রমা এবং প্রাণ অর্থ আদিত্য। সে' আদিত্যও পূর্ব্বদিকে উদয় হন, সুতরাং তিনি সূর্য্য (৬ষ্ঠ মন্ত্র)। এখন কি হইল? প্রথম সৃষ্টি কি চন্দ্র এবং সূর্য্য? চতুর্থ মন্ত্রের "প্রাণ" তো পঞ্চবায়ুর অন্যতম হইতেছে না। তবে বৃহদারণ্যকের প্রাণ অপানাদির সহিত আত্মার একীকরণ কেমন করিয়া বুঝিব? যদি এই প্রাণ অথবা আত্মা দেহের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক হন, তবে তাঁহাকে সূর্য্য বলিলেই বা কি বুঝিব?

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এবং যে সকল প্রমাণ উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা হইতে, জীবাত্মা দেহ কি দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু; দেহের সর্ব্বত্রব্যাপী অথবা দেহের একদেশবাসী ইহা বুঝা সহজ নহে। জীবাত্মা ব্রহ্ম কি ঈশ্বর কিম্বা খাদ্য পানীয় গত শক্তি তাহাও বুঝা সহজ নহে। তথাপি বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিলে এবং বিভিন্ন প্রমাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে মীমাংসা করিতে হয় যে, জীবাত্মা ব্রহ্মই।

জীবাত্মা না বুঝিতে পারিলে পরমাত্মা বুঝাও অসাধ্য। এ সকল না বুঝিলে মানব-জন্মই নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং বুঝিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। এতক্ষণ আমরা এক দিক দিয়া এ চেষ্টা করিতেছিলাম; এক্ষণে অন্য দিক দিয়া চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করি।

প্রশ্ন হইতেছে, আত্মা কি এবং দেহের কোথায় অবস্থিতি করে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দেহ কিরূপে গঠিত হয়। জীবদেহ দ্বিবিধ;—এককোষ (Unicellular) এবং বহুকোষ (Multicellular)। এককোষ জীবের দৃষ্টান্ত শুক্রকীট, ম্যালেরিয়া, বসন্ত আদি রোগের কীট; এবং বহুকোষ জীবের দৃষ্টান্ত আমরা। এককোষ জীবের দেহ একটি মাত্র কোষে গঠিত; তাহাতেই তাহার সমস্ত জীবন-ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। বহুকোষ জীবের দেহ বহু কোষে গঠিত; ইহাদিগের দেহস্থ ভিন্ন ভিন্ন কোষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে। অস্থিকোষ, পেশীকোষ, স্নায়ুকোষ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত। অস্থিহীন বহুকোষ জীবেরও দেহে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কোষ আছে এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে। এককোষ জীবের বংশবৃদ্ধি একটি কোষ হইতেই হয়; বহুকোষ জীবদিগের বংশবৃদ্ধিও এককোষ জীব দ্বারাই সাধিত হয়। যে পুংকোষ (Spermatozoon) এবং স্ত্রীডিম্ব (ovum) মিলিত হইয়া পরবংশ গঠন করে তাহারা উভয়েই এককোষ জীব। সুতরাং জীবদেহ এককোষই হউক অথবা বহুকোষই হউক, পরবর্ত্তী বংশের দেহ গঠন এককোষ জীবই করে।

পুংকোষ ও স্ত্রীডিম্ব জড় পদার্থ নহে, উহারা জীব। সুতরাং উহাদিগের আত্মা আছে। উহাদিগের মিলনে যখন অপত্যদেহ গঠিত হয়, তখন কি সে দেহে দুইটি আত্মা অবস্থিতি করে? না, তাহা নহে। বলিতেই হইবে, একটি আত্মা অবস্থিতি করে। উহাদিগের মিলনজাত ক্ষুদ্র দেহের নাম কলল। কলল দ্বিধা, ত্রিধা, চতুর্ধা ইত্যাদি বহুভাগে বিভক্ত * হইতে হইতে শত শত কোষ গঠিত করিবার পর উহারা ঊর্দ্ধাধঃ সজ্জিত হইয়া তিনটি স্তর গঠন করে এবং সেই সকল কোষপিণ্ড নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত হয়। তাহা হইতেই সমস্ত বহুকোষ জীবের দেহ জাত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, যে আত্মা অতি ক্ষুদ্র কলল-দেহাধিষ্ঠিত ছিলেন তিনিই পূর্ণগঠিত দেহের প্রত্যেক কোষে অবস্থিতি করেন। এ স্থলে কি বহু কোষে বহু আত্মা স্বীকার করিব? না, একই আত্মা। যে অণোরণীয়ান্ (অতি ক্ষুদ্র) আত্মা কলল-কোষে বসতি করিতেন তিনিই আবার মহতোমহীয়ান; সুতরাং পূর্ণাবয়ব দেহের প্রত্যেক কোষেই অতএব সমস্ত দেহেই ব্যাপ্ত। নচেৎ দেহস্থ বহু কোষের বহু ক্রিয়া মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। আমাদিগের দেহে সহস্র সহস্র কোষ আছে।

* বিভক্ত অথচ বিচ্ছিন্ন নহে, পরস্পর সংযুক্ত।

ইহারা কেহ কাহারও কর্ম্ম করে না ; যেন স্বতন্ত্র। তথাপি সকলেই সমষ্টি-জীবনের অনুকূল। বহুত্বের মধ্যে এই একত্ব রক্ষা করে কে ? ইহাদিগের বিভিন্ন কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা না হইলে জীবন-ব্যাপার অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই সামঞ্জস্য অতি বিস্ময়কর ভাবেই রক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি এই সামঞ্জস্য রক্ষা করেন তিনিই দেহের সর্ব্বকোষগত আত্মা। তিনিই অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্। এই উভয়বিধ ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহতত্ব জীবাত্মার স্বধর্ম্ম। পরমাত্মারও স্বধর্ম্ম। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মাই। পরমাত্মা দেহবদ্ধ হইলে নাম দেওয়া হয় জীবাত্মা। ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভেদ নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়েও রেতঃ (শুক্র)কে আত্মা বলা হইয়াছে।

যদেতদ্রেতস্তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ
সম্ভূত মাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি। ২।১

ইহার অর্থ এইরূপ :—রেতঃ সমুদয় অঙ্গ হইতে সংগৃহীত তেজ। রেতঃ স্বরূপ আত্মাকে পুরুষ নিজমধ্যে ধারণ করে।

দেহের যোগে না হইলে আত্মা কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। দেহ শব্দে এ স্থলে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, ত্রিবিধ দেহই বুঝিতে হইবে। মানবের দেহ-কোষ সকলের মধ্যে একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানের অর্থাৎ অণ্ডের অথবা ডিম্বাধারের (ovary) বিশিষ্ট কোষকে পুংকোষ অথবা স্ত্রীডিম্ব বলে। ইহারাই মিলিত হইয়া পরবংশের দেহ গঠন করে। মানব দেহের অন্যান্য কোষ দেহ-গঠন করিতে পারে না।

দেহ মরে কিন্তু পুংকোষ ও স্ত্রীডিম্ব পরবংশ গঠন করে বলিয়া মরে না। পিতার পুংকোষ পুত্রের অণ্ডে যায় এবং সেখানে তাহার পুংকোষ গঠন করে। মাতার স্ত্রীডিম্ব (স্ত্রীকোষ) কন্যার ডিম্বাধারে (ovary) গিয়া তাহার স্ত্রীডিম্ব গঠন করে। ইহারা বংশানুক্রমে দেহ গঠন করিতে থাকে এবং প্রত্যেক পর-পর বংশীয় দেহে অণ্ডে অথবা ডিম্বাধারে আশ্রয় লয় ও সেখানে স্বানুরূপ কোষ গঠিত করে। ইহাতে দেহকে আবাসভূমি এবং কললকে দেহ নির্ম্মাতা বলা যাইতে পারে *। ইহারা বংশধারা ক্রমে অমর। রেতঃ অমর সুতরাং অজও। ঐতরেয় উপনিষদে এই নিমিত্ত রেতঃকে আত্মা বলা হইয়াছে।

আমরা আবার সেই ব্রহ্ম ভাবে অথবা ঈশ্বর ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা অমর তাহা অজ তাহা নিত্য। সুতরাং একদেশী নহে। ফলে জীবাত্মা সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত হইতেছে।

যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে জীবাত্মা প্রকৃত পক্ষে দেহ নহে, কিন্তু দেহ গড়িয়া লইয়া তাহার সর্ব্বত্র অবস্থিতি করে। জীবাত্মা বস্তুধর্ম্মী নহে, বস্তুও নহে।

এতক্ষণে আমাদিগের উত্থাপিত প্রশ্ন দুইটির উত্তর হইল। কিন্তু পরমাত্মা এবং জীবাত্মা যদি একই পদার্থ হন তবে জীবাত্মা দেহাবদ্ধ হওয়াতে উভয়ে এত পার্থক্য কেন উপস্থিত হয় এবং এ পার্থক্যের অবসান হইবে কেমন করিয়া ? এ অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রশ্নের উত্তরে পরমাত্মার ও জীবাত্মার ব্যবহারিক প্রভেদ বুঝিতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতি এ বিষয়ে কিছুই সাহায্য করিতে পারে না। সুতরাং উপমা দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে হয়। বেদান্তে অনেক স্থলে সূর্য্য-কিরণের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। সূর্য্য-কিরণ অনন্ত আকাশ-বিস্তৃত, বৃহৎ। উহা বহুবিধ ঘটে পতিত হইয়া ঘট-ধর্ম্মানুসারে আমাদিগের নিকট বহু প্রকার প্রতীয়মান হয়। এক পদার্থে লাল, অন্য পদার্থে কাল ; এক পদার্থে স্বচ্ছ, অন্য পদার্থে অস্বচ্ছ ইত্যাদি বহু ভাবে প্রতিভাত হয়। আমরা সমুদ্রের জল এবং ঐ জল পূর্ণ একটি ঘট, এই দুইয়ের উপমা দ্বারা পরমাত্মার ও জীবাত্মার প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করি। ঘটপূর্ণ জল সমুদ্রের জলই, কিন্তু ক্ষুদ্র ঘটাবদ্ধ হওয়ায় তাহার কতিপয় ধর্ম্ম পৃথক হইয়া যায়। সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে, তরঙ্গের চূড়া ফেণাবৃত হয়, সমুদ্রের জলরাশি নীলবর্ণ দেখা যায়। কিন্তু ঘটাবদ্ধ জল নীলবর্ণ দেখা যায় না, উহাতে তরঙ্গ উঠা অসম্ভব ; ফেণাও উহাতে কখনই হইতে পারে না। ঘটাবদ্ধ জল অল্প কালেই সমল হইয়া উঠে, সমুদ্রের জল তদ্রূপ হয় না। ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, বৃহৎ যদি ক্ষুদ্রে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে ক্ষুদ্রত্ব বশতঃই সে বৃহতের ধর্ম্ম হইতে অনেক অংশে পৃথক হইয়া যায়।

* The bodies of the higher animals which die may from this point of view be regarded as something temporary and nonessential destined merely to carry for a time the unicellular eggs.

Ray Lankester.

পরিমাণের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এ তাহাই। পরমাত্মা বৃহৎ, ঘট অর্থাৎ দেহ ক্ষুদ্র। পরমাত্মা ক্ষুদ্র ঘটাবদ্ধ হইলে সেই হেতুই উভয়ের মধ্যে কতিপয় ব্যবহারিক পার্থক্য উপস্থিত হইবে, যদিও উভয়ে একই। ক্ষুদ্রত্ব হেতু জীবাত্মা যে সমলতা প্রাপ্ত হইল তাহা শুদ্ধ করিবার উপায় উপাসনা। যেমন সমল জল পরিষ্কার করিলে নির্ম্মল হয় তেমনই জীবাত্মা দেহাবস্থিতি বশতঃ সমলতা প্রাপ্ত হইলে উপাসনা দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং শুদ্ধ হইলেই পরমাত্মার সহিত একধর্ম্মী হইয়া তাহাতে লীন হইয়া যায়। যেন জলে জল মিশিয়া গেল।

সাঁঝের পল্লী

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

নিবু নিবু-প্রায় দিবসের আলো
নদীর পাড়ে,
পাতায় পাতায় আবির ছড়ায়
বাঁশের ঝাড়ে।

সুর-শিল্পীর চিত্রশালার
রংএর ভাণ্ড করি চুরমার
কোন্ দেবশিশু খেলে বসি নভে
সংগোপনে।

হাসিভরা তা'র মুখটী উজল
সাঁঝের তারায় করে জ্বল জ্বল,
ঝুমঝুমী তার বাজে ঝুম্ ঝুম্
ঝিল্লীগনে।

হোথা পল্লীর প্রতি ঘরে ঘরে
আলোর কমল ফোটে থরে থরে,
মধুভরা মনে বধূ পাতে শেজ
বঁধুয়া তরে।

পাখী যেতে যেতে আপন কুলায়,
পূরবীর সুরে মৃদু গান গায়,
তরল আঁধারে আবছায়া রূপ
ধরণী ধরে।

গ্রাম পথ পরে রাখালেরা সব
গরু নিয়ে ফেরে করি কলরব,
হাটুরেরা সব হাট সেরে এল
দিনের পরে।

মাঠ হতে এসে দাওয়ার উপরে
কৃষক বসেছে হুঁকা হাতে করে,
বৌ তারে কয় নৌ-মাখা কথা
সোহাগ ভরে।

নিবিড় তিমির যবনিকা খানি
ধীরে ধীরে টানি সন্ধ্যার রাণী
ঢাকিল এবার নিখিল দৃশ্য
নিখুঁত করে।

লাখ জোনাকীর চুম্‌কী কেবল
যবনিকা পরে করে ঝলমল,
তারারা বিলায় স্নিগ্ধ আলোক
গগন পরে।



অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ, বি-এ

(৯)

মেজর ও অনি যখন বাসায় ফিরিলেন তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। পথে একসঙ্গে একই গাড়ীতে আসিলেও মেজরের সঙ্গে অনির বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইল না। অনি ভাবিয়া পাইতেছিল না—মেজরের সহসা এতখানি পরিবর্ত্তনের কারণ কি? এই কয়েক দিন হইতে সে লক্ষ্য করিয়াছে, যেন সর্ব্বদা একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান মেজরের বুকে জমিয়া উঠিতেছিল। সে অভিমান অমূলক ও তাহার প্রতিকার-চেষ্টা অশোভন ভাবিয়া অনি তাহা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহার গোপন অন্তরে মেজরের এমন একটা দাবী গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অনি নিজেই হাঁপাইয়া পড়িতেছিল।

মেজরের শয়নগৃহে আসিয়া অনি তাঁহার টীপয়ের উপর জল, সিগার ও স্মেলিং সল্টের শিশি গুছাইয়া রাখিতেছিল। মেজর কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু অনির পরাজয়ের ভাবটা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় অল্প একটু হাসিলেন। সে হাসিতে গর্ব্বের একটু আভাস থাকিলেও তাহা যেন বেদনার ভারে ম্লান ও নিষ্প্রভ। মেজরের সেই হাসিটুকু চোখে পড়িতেই অনির মুখখানি যেন মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল ও লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজের সে দুর্ব্বলতা পাছে মেজরের কাছে ধরা পড়িয়া যায় এই ভয়ে অনি নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া লইয়া বলিল—"মেজর! আপনার বোধ হয় একটু অভিমান হ'য়েছে? কিন্তু সেটা কি আমারই দোষ? আমি তো—"

অনির কথা শেষ হইতে না হইতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেজর পূর্ব্ববৎ উদাস ভাবেই উত্তর করিলেন—"দোষ কারো নয়। যেখানে অভিমান শুধু অপর পক্ষের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা নিয়েই ফিরে আসে, সেখানে অভিমান ক'র্‌বার মত প্রবৃত্তি কোন ভদ্রলোকের না থাকাই উচিত। অত বড় ট্র্যাজেডী জীবনে ব'য়ে বেড়া'বার দুঃসাহস যেন কারো না থাকে।"

নিজের তরফ্ হইতে মেজর অত্যন্ত হাল্‌কাভাবে এ সাফাই দিবার চেষ্টা করিলেও অনির বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহার ভিতর কতখানি গুরু ভার লুকানো আছে। ইহা মুহূর্ত্তে অনিকে একটু বিচলিত করিল; কিন্তু অনি সে ভাব সামলাইয়া লইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই কহিল—"চিকিৎসা-বিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞান যখন ঠিক্ এক জিনিষ নয়, তখন প্রথমটার সাহায্যে দ্বিতীয়টার সিদ্ধান্ত নির্ভুল না হ'তেও পারে। সমস্ত বিষয় ভাল ক'রে জান্‌বার আগে, অত বড় ভুলটা ক'রে ব'স্‌বেন না, ডাক্তার বাবু! নিজের দৈন্য আর অযোগ্যতার চাপে যার মাথা সর্ব্বদাই হেঁট হ'য়ে আছে, মহৎকে উপেক্ষা ক'র্‌বার স্পর্দ্ধা তার কোনো দিনই হ'তে পারে না। প্রতিদানের যোগ্যতা নেই ব'লে, সে যে নিজের আগুনে পলে পলে কেমন ক'রে পুড়্‌ছে, তা শুধু সেই জানে আর অন্তর্যামী জানেন। তারও হয় তো জীবনের প্রত্যেকটী কোণে উত্তাপের বাষ্প জমে' ওঠে। প্রতিদানের শক্তি যার প্রকৃতই নেই, তাকে সংকীর্ণ মনে ক'রবেন না মেজর!"

এই কয়েকটী কথার ভিতর দিয়া অনির গোপন অন্তরের ভাব এতই পরিস্ফুট হইয়া তাহার সমস্ত মুখ

চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল, যে, মেজর তাহা লক্ষ্য করিয়া সহসা যেন বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। মেজর যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা যে এত অধিক ভাবে তাঁহাকে জয়ের গৌরবে ভরিয়া দিবে তাহা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন নাই। এতখানি প্রত্যাশা করিবার সাহস তো তাঁহার ছিল না। বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মেজর করমর্দ্দনের জন্য অনির দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। অনি তাহা লক্ষ্য করিয়াও হস্ত প্রসারিত করিল না। মজ্জাগত সাহেবী কায়দার আদব লইয়াই মেজর অনির হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—"মেনি থ্যাঙ্কস্ মিস্!"

অনির মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না; নিশ্চল পাথর মূর্ত্তির ন্যায় অনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাত পা যেন তখন অসাড় হইয়া গিয়াছিল।

মেজর শুইয়া পড়িলে, অনি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। আশঙ্কা ও নিরাশার প্রবল জোয়ার ভাটায় তাহার সমস্ত অন্তর যেন তোলপাড় করিয়া উঠিতেছিল।

লাইব্রেরী ঘরের ভিতরে গিয়া অনি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একখানা চেয়ারের উপর অবশ ভাবে বসিয়া পড়িল। একটা চাপা কান্নায় তাহার বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল; অনি প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা দমন করিবার জন্য দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া টেবিলটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আজ যে ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া তাহার প্রাণটা পাক খাইতেছিল, চিরসংযতা সেই দৃঢ়চিত্ত নারী কোন মতেই তাহা হইতে নিজেকে টানিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। অনি আঘাত করিয়াও আজ আর তাহার প্রাণকে সবল করিয়া তুলিতে পারিল না। আজ তাহার সারা অন্তর শুধু কাঁদিতে চাহে; চোখের জল যেন আজ বাহির হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। চিরাভ্যস্ত সংযমের বাঁধ ছাপাইয়া অবিরল ধারে অনির চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

বিছানায় পড়িয়া অনি অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিল, কিন্তু তাহার চক্ষে ঘুম আসিল না; আলোটা একটু বাড়াইয়া দিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে মাসিক পত্রিকাখানি টানিয়া লইয়া একটু পড়িবার উদ্দেশ্যে পাতা উল্টাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও সে মনোযোগ দিতে পারিল না। একটা চিন্তা তাহার সমস্ত হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া ফিরিতেছিল; একটা অব্যক্ত গুরু ভার তাহার সারা মনটার উপর চাপিয়া বসিয়াছিল। তাহার প্রতিকার নাই—সমাধান নাই। শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া অনি হলঘরের বড় জানালাটার পাশে আসিয়া নিতান্ত অবসন্ন ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশের এ'পার হইতে ও-পার পর্য্যন্ত যেন একখানা কালো মেঘের চাদরে ঢাকিয়া গিয়াছে—একটী তারাও দেখা যায় না। অনি আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল তাহার জীবনের কথা; কিন্তু তাহার নিষ্পিষ্ট হৃদয় কোন সমস্যাই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহারও এপার ওপার যেন এমনি একটা নিকষ-কালো পাথরের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন দাদুর যে কয়েকটী কথা তাহার মনে একটা অবলম্বন আনিয়া দিয়াছিল, আজ আর অনি যেন তাহার মধ্যে কোন সোয়াস্তি খুঁজিয়া পাইল না। কেবল ফিরিয়া ফিরিয়া অনির মনে হইতে লাগিল—'এ তো দাদুর আদেশ হইতে পারে না; যুদ্ধ শ্রান্ত দাদু নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দাদু তো দুর্ব্বল ছিলেন না; জীবনের স্থির সিদ্ধান্ত তো দাদু কখনই পরিবর্ত্তন করেন নাই। দাদুর আশা ও আকাঙ্ক্ষা যে মর-জগতের সীমা বদ্ধ গণ্ডীর বাঁধ ছাপাইয়া চলিত।'

আলোটি নিভাইয়া দিয়া অনি কৌচের উপর শিথিল ভাবে বসিয়া পড়িল। বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ তখন যেন প্রলয়ের ভীষণ মূর্ত্তিতে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর নিস্তব্ধ বুকে মুষল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। ঝড়ের সাঁ সাঁ শব্দে প্রকৃতির সমস্ত বুকখানা যেন দুলিয়া উঠিতেছিল। অনি স্থির দৃষ্টিতে সেই গাঢ় অন্ধকারের পানে চাহিয়া তাহার শূন্য জীবনের পথ খুঁজিতেছিল। কিন্তু সেখানে তাহার কোন সঙ্কেত নাই—কোন ইঙ্গিত নাই। ঝড় যেন শুধু তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া তাহার অতীত জীবনের জীর্ণ স্মৃতির পাতাগুলিকে টুক্‌রা টুকরা করিয়া তাহারই চক্ষের সম্মুখ দিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল।

বিহ্বল চিত্তে অনি বইখানিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ঠাকুর, আমায় পথ বলে' দাও—শক্তি দাও প্রভু!"

*　　*　　*

উন্মত্ত বাদলের পথ-ভ্রান্ত ধারা আসিয়া অনির অনাবৃত মুখ চোখকে সিক্ত করিয়া দিতেছিল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার মত মানসিক অবস্থা তখন তাহার ছিল না।

(১০)

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া মেজর যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখনও তাঁহার ঘুমের নেশা সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই। মেজরের শয়ন-গৃহ ও লাইব্রেরীর মাঝখানে যে প্রকাণ্ড হল্‌টা ছিল, সেইটাই ছিল উপরের কয়েকখানি ঘরের সাধারণ পথ। শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া হল্‌ঘরের মধ্যে আসিয়াই মেজর যেন থমকিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার পাশে বড় কৌচটার উপর শুইয়া অনি তখনও ঘুমাইতেছিল। অনির এরূপ ভাবে এখানে ঘুমাইয়া পড়িবার কোন কারণ তিনি ভাবিতে পারিলেন না। অনিকে এরূপ শ্লথভাবে শুইয়া থাকিতে মেজর কোন দিনই দেখেন নাই। শিথিল বইখানি তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বর্ষণ-ধৌত আকাশের নির্ম্মল স্নিগ্ধতা মাখিয়া প্রভাত-সূর্য্যের সদ্যোজাত রাগরাশি আসিয়া অনির সর্ব্বাঙ্গকে যেন প্লাবিত করিয়া দিতেছিল। যে অনিকে নিবিড় ভাবে ঘিরিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি পুঞ্জীভূত ব্যগ্রতায় উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল, তাহার ভিতর এত অপরূপ সৌন্দর্য্যের সন্ধান যেন মেজর কখনই পান নাই। তাঁহার তন্দ্রা-বিমূঢ় হৃদয় একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে উদ্বেলিত হইয়া নিমেষে তাঁহার সমস্ত অগ্রপশ্চাৎকে যেন ডুবাইয়া ফেলিল। নিজের অজ্ঞাত-সারেই মেজর ধীরে ধীরে গিয়া অনির শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সমস্ত বুকখানা যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

*　　*　　*

সহসা নাসাগ্র ও ওষ্ঠে একটা উষ্ণ-স্পর্শ অনুভব করিতেই অনি ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিল। চকিতে, মেজরকে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার বুকের ভিতরটা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ক্রোধে, ঘৃণায়, দুঃখে আত্মহারা হইয়া অনি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মেজর! আপনাকে বিপন্নের আশ্রয়দাতা ব'লে শ্রদ্ধা ক'রেছিলুম্; তাই নিঃসঙ্কোচে আপনার মহত্বের উপর বিশ্বাস ক'রে এই অনাথা বিধবা আপনার আশ্রয় নিয়েছিল; স্বপ্নেও ভাবিনি—আপনি—"

অনির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দুই হাতে মুখখানাকে ঢাকিয়া, অনি উচ্ছ্বসিত রোদনের ভারে লুটাইয়া পড়িল।

"অনি বিধবা!" একখানা চাবুক মেজরের বুকে দারুণ আঘাত করিয়া, তড়িৎ-প্রহারের ন্যায় তাঁহাকে অসাড় করিয়া দিল। তাঁহার হাত পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। একটা কি বলিতে গিয়া তাঁহার ঠোঁট দুখানি শুধু বিকৃত ভাবে একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। কোন কথা বলিবার শক্তি তখন তার ছিল না। মরার মত অসাড় ও বীভৎস দৃষ্টিতে বারেক শুধু অনির দিকে চাহিয়াই, মেজর টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আলমারির কোণে সজোরে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির হইল, কিন্তু তাহা অনুভব করিবার মত অবস্থা তখন তাঁর ছিল না।

*　　*　　*　　*

মেজর চলিয়া যাইবার পরেও অনি কতক্ষণ ধরিয়া যে সেই কৌচের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়াছিল, তাহার ঠিক্ নাই। ভাগ্যহীন জীবনের কোথাও সে কোন কূল কিনারা খুঁজিয়া পাইল না। আজকার হারানোর ব্যথা যেন তাহার অতীতের সমস্ত হারানোকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। আজ সে যাহা হারাইয়াছে তাহার জন্য নিজেকে সান্ত্বনা দিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ইহার ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণের আশা নাই, অতীত-স্মৃতির কোন গৌরব থাকিবে না; সব কিছু সম্বল যেন একটা কালিমায় ডুবিয়া গিয়াছে। অনির ইচ্ছা হইতেছিল—আত্মহত্যা করিয়া তাহার নিজের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন ভাবে মুছিয়া ফেলিতে।

অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া অনি ধীরে ধীরে তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে উঠিয়া আসিল। তাহার হাত পা তখনও এত শ্লথ ও অসাড় হইয়া ছিল যে, তাহার মনে হইতেছিল—সে বুঝি পড়িয়া যাইবে। একটা তীব্র বিষ

যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গকে জর্জ্জরিত করিয়া শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

অনি কি করিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না। পৃথিবীতে তাহার এমন কোনো আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, যাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া সে একটু শান্তি পায়। সহসা বনবিহারী বাবুর কথা মনে হইতে অনি যেন একটু ভরসা পাইল। বনবিহারী ব্যতীত আর কোন পরিচিতের কথা সে ভাবিয়া পাইল না। আজ অনির মনে হইতেছিল বটে, তাহার সেই হরিৎদা, কালিদাস দা প্রভৃতির কথা; কিন্তু অনি তো আজ আর তাঁহাদের কোন সন্ধানই জানে না। সে আজ সুদীর্ঘ বারো বৎসর পূর্ব্বের কথা। নিরঞ্জনদা তাহাদিগকে কাশীতে দাদুর কাছে রাখিয়া বলিয়াছিলেন—"মা, বিপদে সম্পদে ছেলেদের কথা ভুলে যাবেন না"। নিরঞ্জনদার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল। মা বাঁচিয়া থাকিতে নিরঞ্জনদা কয়েকবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর হইতে অনি তো এ দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাদের কোন খোঁজ-খবরই পায় নাই। তখনকার সেই ছাত্র-নিরঞ্জনদা আজকার কর্ম্মজীবনে কোথায় সরিয়া গিয়াছেন—সে সন্ধান তাহাকে কে দিবে! কর্ত্তব্য আর নিষ্ঠা দিয়া গড়া কি সে সুন্দর নির্ভীক্ প্রকৃতি ছিল—নিরঞ্জনদার! তিনিও মানুষ—মেজরও মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের কি আকাশ পাতাল প্রভেদ!

মেজরের আশ্রয়ে থাকিতে অনির আর এক মুহূর্ত্তও ইচ্ছা হইল না; অনির সমস্ত অন্তর ঘৃণায় মেজরের উপর বিরূপ হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি বনবিহারী বাবুর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত তাহার আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, অনি তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য বসিল! ।কন্তু হঠাৎ কি ভাবিয়া সে আর একটা বর্ণও লিখিতে পারিল না। বনবিহারী বাবুকেও আর তখন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। জীবনে ভোগের মাত্রাকে বাড়াইয়া চলিবার জন্য যাহারা পিতা পিতামহের চিরাচরিত প্রথাগুলিকেও ঘৃণা করিয়া পায়ে দলিয়া যায়, তাহাদের কাহাকেও হয় তো বিশ্বাস করা যায় না; অন্ততঃ অনি সে শক্তি ও সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বিশেষতঃ এই সকল সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ধ্বজাধারীদের উপর অনির সারা অন্তর যেন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই সব সম্ভ্রান্ত ও সুসভ্য সমাজের আদর্শ যাঁহারা, তাঁহাদের অধঃপতন অসভ্য ও অনার্য্যদের অধঃ-পতনের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। অনার্য্যের অধঃপতিত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিকে বলে না পারিলেও কৌশলে আয়ত্ত করা যায়; বুদ্ধি ও মানসী বৃত্তির দুর্ব্বলতা তাহাকে অনেকটা শক্তিহীন করিয়া রাখে; সে ছলনার জাল পাতিতে পারে না। কিন্তু এই সুসভ্য সমাজের প্রশস্ত ছায়ার তলে থাকিয়া যাহাদের পাপবৃত্তি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহাদের বিষাক্ত অন্তর বাহিরের ছদ্ম রূপে আত্মগোপন করিয়া থাকে। সুযোগ-মত সর্ব্ববিধ দুরভিসন্ধির অব্যর্থ বাণপ্রয়োগে তাহারা 'সিদ্ধহস্ত। অনার্য্য দস্যু অন্তর-বাহিরে দস্যু, আর সুসভ্য পিশাচ 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ'।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া অনি নিশ্চলভাবে বসিয়া ভাবিতে-ছিল—সে কি করিবে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিবার মত মনের অবস্থা তখন তাহার ছিল না। বনবিহারী বাবুর কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা অনি যখন তাঁহার পিছনে সুলতার শান্ত ও পবিত্র ছবিখানি দেখিতে পাইল, তখন আর তাহার সন্দেহের তিল মাত্র অবসর রহিল না। সুলতার কথা মনে হইতেই অনি যেন একটু আশার সন্ধান পাইল।

মনের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া অনি বনবিহারী বাবুকে পত্র লিখিল। বেশী কথা লিখিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। সে কেবলমাত্র লিখিল—

"বন-দা, দয়া করিয়া একবার আসিবেন; ঠিক্ যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই। আশা করি ভগিনীর এ অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না।"

ইতি—

ভাগ্যহীনা অনি।

বেয়ারার হাতে পত্রখানি দিয়া অনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ মোগলসরাইএর ডাক্তার বাবুর নিকট পৌছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু পূর্ব্বের মত ঠিক্ যেন আর আদেশ করিতে পারিল না। মোগলসরাইএ যাইবার রেল ভাড়াও অনি তাহার হাতে দিল।

তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বেয়ারা শিট

কিষণ্ একবার মাত্র অনির মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাহার হইল না।

(১১)

সন্ধ্যার গাড়ীতে সুলতা ও বনবিহারী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনির পত্রে সকল বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে না পারিয়া, এবং বেয়ারার নিকট হইতেও সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে না পারিয়া বনবিহারী একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ অনির সহসা ঐরূপ 'বনদা' সম্বোধন যেন হঠাৎ তাঁহার বোধ ও চিন্তাশক্তিকে ঘোলা করিয়া তুলিয়াছিল।

মেজরের ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া বনবিহারী সুলতাকে সঙ্গে করিয়া বরাবর অনির ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। অনি তখনো নিশ্চলভাবে চৌকীর এক পাশে বসিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার মুখ চোখ দেখিয়া বনবিহারী সহসা চম্‌কাইয়া উঠিলেন; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হঠাৎ তাঁহার সাহস হইল না। মনে হইল একটা প্রবল ঝড় যেন অনির সব কিছুকে ওলটপালট করিয়া দিয়া গিয়াছে।

অনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বনবিহারীর পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। বনবিহারী ইহাতে অনেকখানি আশ্চর্য্য হইলেন। অনিকে এরূপ ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে তিনি পূর্ব্বে কখনো দেখেন নাই। সুলতাকে কাছে টানিয়া লইয়া অনি তাহার হাতখানি কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখ হইতেই কোনো কথা বাহির হইল না।

হয় তো মেজরের কোনরূপ বিপদ হইয়াছে,—এই আশঙ্কা হইতেই বনবিহারী বাবু বলিলেন—"মেজরকে দেখ্‌ছি না যে অনি! তিনি কি বেরিয়ে গেছেন? এখন বেশ ভাল আছেন তো?"

অনি সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিল—"আমার নিজের একটা কাজের জন্যে আপনাকে ডেকেছি দাদা। আপনি দয়া ক'রে আমার জন্যে একটু কষ্ট স্বীকার ক'রবেন কি?"

"নিশ্চয় অনি, তোমার কোনো কাজে লাগ্‌বার সুযোগ পেলে' বরং সুখীই হব। সে বিষয়ে এত ফর্ম্যাল ভাবে তোমার বল্‌'বার কোন দরকার নেই। কি ক'রতে হবে বলো—"

অনি বলিল—"আমায় কোলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে হবে আপনাকে, আজই রাত্রের ট্রেনে।"

বনবিহারী বাবু ভিতরের অবস্থা তখনো ঠিক উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না; অথচ অনির মুখ চোখের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"তোমায় পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো নিশ্চয়ই; তবে চাকরী-জীবী যারা, তারা তো হঠাৎ ইচ্ছা ক'রলে কোথাও যেতে পারে না—দিদি। আমাকে ছুটি মঞ্জুর করানোর জন্যে অন্ততঃ একটা দিন সময় দিতে হ'বে। কা'ল রাত্রের ট্রেণে রওনা হ'লে তেমন ক্ষতি হবে কি কিছু?"

"না ক্ষতি কিছু নেই; তবে—" বলিয়াই অনি দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া একটু ভাবিয়া লইয়াই যেন বেগে বলিয়া উঠিল—"কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয় দাদা!"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই অনি মুখ নীচু করিয়া সুলতার হাতের চুড়ি কয়গাছি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল।

ব্যাপারটা বনবিহারী বাবুর কাছে একটা হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইলেও, তিনি ভদ্রতার অনুরোধে অনিকে বলিলেন—"তবে, এই একদিনের জন্যও অন্ততঃ, তোমাকে আমার পর্ণকুটীরে থাকতে হবে; তার মধ্যেই আমি ছুটির ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌বো। কেমন! তাতে রাজী আছ তো?"

সুলতার সকল বিষয় বুঝিয়া উঠিবার যোগ্যতা ছিল না; কিন্তু অনির আতিথ্য গ্রহণের কথা শুনিয়াই সানন্দে তাহার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল—"তাই ভালো, দিদি, আমাদের ওখানেই চলুন; এক্ষুনি।"

অনি উদাসভাবে উত্তর করিল—"হাঁ; তাই যাবো বোন্।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুলতা আবেদনের দৃষ্টিতে একবার স্বামীর মুখপানে চাহিল। পত্নীর সরল দৃষ্টিটুকুর অর্থ বুঝিলেও, স্বামী তাহাতে কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না।

বনবিহারী বাবু অনুমান করিলেন—বোধ হয় মেজরের

সহিত অনির কোনরূপ মনোমালিন্য হইয়াছে, যাহার জন্য অনি আর এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছুক নহে।

মেজর তখনো ফিরিয়া আসেন নাই। অনি সাড়ে সাতটার গাড়ীতে এখান হইতে রওনা হইবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু একটু বিশ্রাম করিয়া লইবার অছিলায় বনবিহারী বাবু পরের ট্রেণ ধরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে না পারিলেও বনবিহারী মেজরের গৃহ হইতে তাঁহার অনুপস্থিতিতে অনিকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কি না তাহা ঠিক ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অথচ অনির যেটা একমাত্র প্রার্থনা জানিয়াই তিনি নিজে হইতেই তাহার পূরণের ভার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহা এড়াইয়া চলিবার কোন পথও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

রাত্রি নয়টার মধ্যেও মেজর ফিরিলেন না দেখিয়া বনবিহারী অনিকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সুলতা এতক্ষণ জিনিষপত্র গুছাইবার ধুমধামের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সে, কি কি গুছাইতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য, অনির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; কিন্তু অনি সে বিষয়ে পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্ট থাকিয়াই উত্তর করিল—"কিচ্ছু না।"

বনবিহারী ও সুলতা উভয়েই যেন অনির ভাবগতিক দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গূঢ় রহস্য আছে! সে কথা অনুমান করিলেও কেহই সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিলেন না।

নিজের কয়েকখানি কাপড় ও খানকয়েক বই এবং খাতাপত্র—যাহা লইয়া অনি তিন মাস পূর্ব্বের এক মধ্যাহ্নে আসিয়া এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল—সেই কয়টীকে মাত্র আবার তাহার পুরানো বেতের ছোট্ট বাক্সটির মধ্যে গুছাইয়া লইয়া অনি বাহির হইল।

ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ ও প্রতি স্থানটি এই অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অনির এত আপনার হইয়া উঠিয়াছিল যে আজ এক নিশ্বাসে ছাড়িয়া যাইবার ভিতরেও সে সবের আকর্ষণে যেন অনির চোখ দুইটি ছলছল্ করিয়া উঠিল। হল্ ঘরের ভিতরে যেখানে দেওয়ালের উপর মেজরের বড় ফটোগ্রাফখানা ঝুলিতেছিল, সেখানে আসিয়াই অনির পা দুইটি যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই বারেকের জন্য থামিয়া গেল। প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার চোখ দুইটিকে মাটির দিকে নামাইয়া রাখিয়া অনি দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বনবিহারী ও সুলতা তখন গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়াছেন। অনি নীচে আসিয়া বয় ও বেয়ারার হাতে একটী করিয়া টাকা দিয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইল। অশিক্ষিত ও সরল চাকর দুইটির মুখে কোন কথাই বাহির হইল না; তাহারা শুধু অনির মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

* * *

মোটর ছাড়িয়া দিতেই সুলতা অনির হাতখানাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল: "দিদি, তুমি যে এক নিমিষে ঝড়ের মত সব কিছু ছেড়ে কোলকাতায় পালাতে চাচ্ছ কেন, তা ভেবে পাচ্ছি নে।"

অনি সস্নেহে তাহার মাথাটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ঘূর্ণীর স্রোতে ও ঝড়ের ঝাপ্টায় যে সব আল্গা ঘাস পাতা বা আলাদা আলাদা জিনিষ এক জায়গায় এসে মেশে, তাদের ছাড়াছাড়িও হ'য়ে যায় আবার অমনি একটা ঝড় কিম্বা ঘূর্ণীর ভিতর দিয়ে। যারা গোড়াগুড়িই পৃথক ও আলাদা, তাদের একতা তো কখনই স্থায়ী হ'তে পারে না দিদি। মানুষের জীবনেও ঠিক্ তাই ঘটে, এতে ভাব্বার বা জান্বার কিছুই নেই বোন্।"

বনবিহারী অবাক্ বিস্ময়ে অনির মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। যাহার সব কিছু জানিবার জন্য মনে অদম্য একটা আগ্রহ হয়, তাহাকে সম্মুখে পাইয়া তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলিতেও যেন একটা সঙ্কোচ আসে। সেটা লজ্জা না দুর্ব্বলতা তাহা ঠিক্ বলা যায় না।

ট্যাক্সি যখন ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন ট্রেণ ইন্ হইয়াছে। যে বেনারস ছাড়িয়া যাইবার জন্য অনি এতক্ষণ উতলা হইয়া পড়িয়াছিল, সেই বেনারস ছাড়িয়া যাইতেও অনির মনটা এইবার কাঁদিয়া উঠিল।

(১২)

দুই দিন পরে মেজর যখন বাংলোয় ফিরিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। একটা ভীষণ আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেন তাঁহার যাবতীয় সমৃদ্ধি এই

দুই দিনের মধ্যেই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। ঝড়-পোহানো একটা পঙ্গু ও অবসন্ন কাকের মত অবস্থায় মেজর বাহিরের ফটকটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভিতরে আসিতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না। তাঁহার সমস্ত শরীর স্তখন মৃতের ন্যায় বিকৃত ও অসাড় হইয়া গিয়াছে। কোটর-গত চক্ষু দুইটীকে দেখিলে হয় তো মনে হয় ক্ষীণ নিষ্প্রভ জীবনীশক্তি এখনো বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সে দৃষ্টি এমনই ঝলসিয়া গিয়াছে, যে, তাহাকে আর দৃশ্য জগতের আলোকের সম্মুখে তুলিয়া ধরা যায় না।

একটা অতর্কিত ভূমিকম্প অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলভাবে সব ওল্‌ট পাল্‌ট করিয়া দিয়াছিল, যে অল্প-বুদ্ধি বেয়ারা ও বয় বেচারীরা তাহার কোন সূত্রই খুঁজিয়া পায় নাই। অনি চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব হইতে মেজরকে অনুপস্থিত দেখিয়া ও অনির ওরূপভাবে চলিয়া যাইবার কোন কারণ ভাবিতে না পারিয়া তাহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ শিউ কিষণ; সে চাকর হইলেও তাহার সেবার ভিতর দিয়া অনি ও মেজরকে সে বিশেষ স্নেহ করিত। মায়িজী কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন, ডাক্তার সাহেবও দুই দিনের মধ্যে কুঠীতে ফিরিলেন না: শিউকিষণ সত্য সত্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল।

মেজরকে গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভগ্‌লু ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে সেলাম দিল ও এক নিশ্বাসে অনেক অভিযোগ ও অনুযোগ শুনাইয়া ফেলিল। মেজর নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন কি না বলা যায় না।

সহসা মেজরের মুখ-চোখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বয় আতঙ্কে থামিয়া গেল। মেজরের তখনকার চেহারা দেখিয়া তাহার অনুমান করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না যে তাঁহার পুনরায় সেইরূপ একটা কঠিন অসুখ হইয়াছে। সরল-চিত্ত হিন্দুস্থানী কিশোর ব্যথিত হৃদয়ে প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মেজর পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বাক ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন; কোনো কথা বলিতে বা কোনো আদেশ করিতে পারিলেন না।

অনির চলিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়াও ডাক্তার নিঃসঙ্কোচে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার নিজস্ব অধিকার এই ঘর-বাড়ী, তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত আজ্ঞাবহ ভৃত্য ভগ্‌লু ও শিউকিষণ—সব কিছুই যেন আজ বিধ্বস্ত জীবনের তটভূমি হইতে সুউচ্চ পর্ব্বতশিখরের মত মনে হইতেছিল। যে পদ-সেবী ভগলু ও কিষণের অস্তিত্ব তাঁহার নিকট কখনো কোন বিশিষ্টতা লইয়াই দাঁড়াইতে পারে নাই, এমন কি যাহাদিগকে কখনো সমতলবর্ত্তী ভাবিতেও তাঁহার ঘৃণা হইত, সেই বয় ও বেয়ারার পানে চোখ তুলিয়া চাহিবার সাহস পর্য্যন্ত আজ আর মেজরের নাই। তাঁহার সর্ব্বদাই আশঙ্কা হইতেছিল হয় তো তাহারাও আজ অন্তরের সেই দুর্গন্ধময় ক্ষত দেখিয়া ফেলিবে। অপ্রকাশিত গোপন পাপও পাপীর শিরকে নত করিয়া রাখে।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত নিজের বশ পদদ্বয়কে কোন রূপে টানিয়া লইয়া মেজর উপরের ঘরে উঠিলেন। অনি না থাকিলেও, তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির সম্মুখ হইতেও নিজেকে গোপন রাখিবার জন্য আজ যেন মেজর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চোরের মত নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অতি বড় শত্রুও যাঁহাকে কোন দিন ধর্ম্মভীরু বলিয়া অপবাদ দিতে পারিত কি না সন্দেহ, খেয়ালের ঘূর্ণাবর্ত্তে যাঁহার আত্মপ্রবৃত্তি বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেও কখনো দ্বিধাবোধ করে নাই, আজ গোপন-বৃত্তির সংঘর্ষে তাঁহার সমস্ত অন্তরে যেন দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কোচের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজর বলিয়া উঠিলেন—"ভগবান, জানি না তুমি আছ কি না; যদি থাকো, আমায় শান্তি দাও।" নাস্তিকতার ঝুলিতে তখন পরাজয়ের গ্লানি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

পেখমের সৌন্দর্য্যে উৎফুল্ল ময়ূর যেমন সহসা তাহার কুৎসিত চরণ দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠে, নিমেষে তাহার সকল নৃত্য থামিয়া যায়, মেজরও সেইরূপ আজ তাঁহার দৃপ্ত জীবনের পঙ্কিলতাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এতদিন তিনি নিজেকে চিনিতে পারেন নাই। ছদ্ম মহত্ত্বের ভিতর যে পাপ লুকাইয়াছিল, মেজর আজ তাহার স্বরূপ দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। এতকাল, শুধু এ বিশ্বকে ভোগের বাসর মনে করিয়া, তাহার অগ্রপশ্চাৎ চাহিয়া দেখিতে তিনি কখনই চেষ্টা করেন নাই। মহত্ত্বের আদর্শে

যাহাকে বিপন্ন বলিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, ভোগের দুয়ারে তাহাকে বলিদান করিয়া সে আদর্শের পূর্ণাহুতি হইয়াছে। জীবনপথে যাহারা একে একে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেক জীবনটাকে কিরূপে ব্যর্থ করিয়া পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন, আজ আর সে কথা ভাবিয়া দেখিবার মত একবিন্দু শক্তিও মেজরের বুকে নাই। অন্তরের সেই সব অনাদৃত অনুভূতি আজ তাঁহার অচঞ্চল শান্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাণের সে শান্তি, হৃদয়ের সেই অসমসাহসিকতার তেজ বিপ্লবের আগুনে ছাই হইয়া গিয়াছে। এ আগুন বুঝি আর নিবিবে না।

আজ আর মেজর নিজেকে সান্ত্বনা দিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। যে সব মহত্বের গৌরব লইয়া নিজেকে অনেকবার সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মেজর নিজেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। নিজের দারুণ ক্ষুধাই যে এতকাল মহত্বের রূপ লইয়া প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে, সে কথা মেজর কোনো দিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অনিকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন; তাহার বিপন্ন অবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া, না—তাহার দেহসম্ভারের পরিপূর্ণতায় প্রলুব্ধ হইয়া, সে কথা আজ যেন তিনি অন্তরে অন্তরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিন্তু কে তাহার মীমাংসা করিয়া দিবে! জীবনের পথে কত অসহায় বিপন্ন পথিক আর্ত্তনাদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—কৈ? তিনি তো কাহারো সন্ধান রাখেন নাই! জীবনের ইতিহাসে আজ কোনো পাতায় এমন একটা উদাহরণ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, যাহার গৌরব অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

যে অনিকে কেবল মাত্র আশ্রয় দিয়া তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার রোগশয্যায় সেই অনির সেবা যে তাঁহার সে অনুগ্রহের ঋণকে ছাপাইয়া তাঁহাকেই ঋণী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"তাহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।" তাই অনি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে তো কোন দিনের জন্যও তাঁহার আশ্রয়ের ভিখারিণী হইয়া আসে নাই।

ইদানীং বনবিহারীর উপর মেজরের একটা অযথা আক্রোশ গড়িয়া উঠিয়াছিল; হয় তো বনবিহারীর জীবনে তাহার ছায়াপাতও হয় নাই। অনি বনবিহারীর সহিত যে-রূপ অবাধে তর্ক ও আলোচনা করিত, তাহা মেজরের আদৌ ভাল লাগিত না। বনবিহারীর সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা রাখাটা তিনি মনে মনে সমর্থন করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়াই, বনবিহারীর আসা যাওয়া ও আহ্বান-অভ্যর্থনা-গ্রহণ তাঁহার পছন্দ হইত না। যতবার তাঁহার মনে হইয়াছে অনি বনবিহারীর সহিত অধিক আগ্রহে মেলামেশা করিতেছে, ততবারই তিনি মনে মনে যাচাই করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—'অনি কাহার নিকট অধিক উপকৃতা ও ঋণী? বনবিহারীর দাবী তাঁহার অধিকারকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।' কিন্তু কিসের এই দাবী? আজ নিজের কাছে এ প্রশ্নের জবাবদিহি করিতেও মেজরের মাথা হেঁট হইয়া যাইতেছিল।……কিন্তু অনি তো কোন দিনের জন্যও বলে নাই যে সে বিধবা। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—অনি অযথা কোন বিষয় উত্থাপন করা পছন্দ করিত না; অকারণ কৌতূহলকেও অনি কখনো পরিতৃপ্ত করে না। অনি বিধবা কি সধবা—সে প্রশ্ন তো তিনিও কখনো করেন নাই। করিলেও হয় তো কোন ফল হইত না। অনির বিপন্নতাকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন,—সে বিধবা, না কুমারী তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন তো তাঁহার ছিল না। বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া মানে কি তার যৌবনকে হাতে পাবার প্রচ্ছন্ন লালসা!

সারাদিন মেজর শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। শান্তির কোন সন্ধান তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। বয় ও বেয়ারা অনেকবার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাহাদের হয় নাই। সমস্ত বাড়ীটাই যেন একটা বেদনার নিস্তব্ধতায় থম্‌ থম্‌ করিতেছিল। বেলা শেষ হইয়া আসিল, মেজর তবুও ঘর হইতে বাহির হইলেন না; নিঝুম হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। রাজপথ হইতে কর্ম্ম-প্রত্যাগত কুলীদের কোলাহল ভেদ করিয়া একটা অসংলগ্ন গজলের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। কোন শ্রান্ত কুলী তখন মাতাল হইয়া গাহিতেছিল—

হরবকৎ ইএ পিয়ালা মে
দিল্‌ করে মস্‌গুল।

ইমারৎ ইএ জান্ বাগিচায়
তান্ ধরে বুল্ বুল্।

ভাঙা ভাঙা গানের শব্দগুলি মেজরের কাণে যাইতেই, তিনি বিছানার উপর একবার উঠিয়া বসিলেন। ঐ নিরন্ন দিন-মজুরদের প্রাণের আনন্দটুকুও আজ যেন তাঁহার নিকট বড় লোভনীয় বস্তু। চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া তিনি জানালার ধারে আসিয়া বসিলেন। আর একদল কুলী তখন খুব হল্লা করিতে করিতে গাহিয়া চলিয়াছিল—

"তাজা চুয়া মিঠা দারু
পিয়ো পিয়ো রে মেরি জান্।
দিল্‌তি আচ্ছা হোগা সাচ্চা
টুট্ যাওয়ে চায়রাণ্॥"

মেজর কাণ পাতিয়া শুনিতেছিলেন; ঐ নিরন্ন কুলীদের আনন্দ-গান যেন তাঁহার বুকের ব্যথাকে গোপনে কিসের ইসারা করিয়া গেল।

(১৩)

অনি ও সুলতাকে সঙ্গে করিয়া বনবিহারী কলিকাতায় আসিলেন। ভবানীপুর—চন্দ্রমাধব ষ্ট্রীটে—তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া উঠিবেন বলিয়া বনবিহারী পূর্ব্বেই তাঁহাকে তার করিয়া দিয়াছিলেন।

*   *   *

অনির পিসিমা, মোক্ষদাসুন্দরী, বাগবাজারে—বোসপাড়া লেনে থাকিতেন; তাঁহার স্বামী গোপীমোহন ছোট আদালতের উকিল। মোক্ষদাসুন্দরী রাধাকিশোরের সহোদরা ভগিনী না হইলেও, রাধাকিশোর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তিনি মোক্ষদার খোঁজ খবর ও তত্ত্বতল্লাস করিতে কখনো ত্রুটি করেন নাই। গোপীমোহন যখন প্রথমে হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। রাধাকিশোর মফঃস্বল হইতে মক্কেল সংগ্রহ ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতে কখনো কোনরূপ কৃপণতা করেন নাই। ভগিনীপতি গোপীমোহন তাঁহার সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। অনির পিতা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন মোক্ষদা ও গোপীমোহন অনেকবার অনিকে কলিকাতায় আনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া রাধাকিশোরের একমাত্র কন্যা অনিই যে তাঁহাদের সর্ব্বস্নেহের একমাত্র আধার সে কথা মোক্ষদাসুন্দরী বহুবার ঘোষণা করিতে বাকী রাখেন নাই।

*   *   *

বনবিহারীকে সঙ্গে করিয়া অনি পরদিন বিকালে পিসিমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাগবাজারের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনির ইচ্ছা ছিল যে পর্য্যন্ত সে কলিকাতায় কোনরূপ উপার্জ্জনের সংস্থান না করিতে পারে, পিসিমার আশ্রয়েই থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইবে; যদিও মাতার ও দাদুর মৃত্যুর পর অনি নিজের বিপন্ন অবস্থার কথা জানাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ সহানুভূতির সাড়া না পাইয়া সে আশা অতি ক্ষীণভাবেই পোষণ করিয়াছিল।

গোপীমোহন তখন আদালত হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানায় তামাক ও গল্পের আড্ডা জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। ছোট আদালতে তাঁহার যে বেশ প্রসার-প্রতিপত্তি জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা গোপীমোহনের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াই অনুমান করা যায়। অনি তাহার কৈশোরে যে অবস্থায় গোপীমোহনকে দেখিয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাহা মিলাইয়া লইয়া তাঁহাকে সহসা সে চিনিয়া উঠিতে পারিল না।

অনির বিস্তৃত পরিচয় শুনিয়া গোপীমোহন বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাধাকিশোরের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বিপন্ন জীবনের কাহিনী শুনিয়া গোপীমোহনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল পত্র দিয়াছিল, তিনি তাহার একখানির কথাও জানিতেন না। গোপীমোহন আদালতে থাকিবার কালে যে সব পত্র আসিত, মোক্ষদাসুন্দরী তাহা খুলিয়া দেখিতেন। অতি সরল ও উদার-প্রকৃতি স্বামীর উপর মোক্ষদাসুন্দরী এরূপ নিপুণভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিতেন যে স্বামীর মার্জ্জিত ওকালতি বুদ্ধিও সব সময় তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। গোপীমোহন সমস্ত বুঝিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। মোক্ষদাসুন্দরী পরিপূর্ণ রূপে অসুন্দরী হইলেও, তাঁহার বিষয়ে স্বামীর বেশ একটু দুর্ব্বলতা ছিল।

অনির হাত ধরিয়া গোপীমোহন অন্দরে আসিয়া হাজির হইলেন। মোক্ষদা তখন পাচকের নিকট মধ্যাহ্নের লবণ তৈলের হিসাব বুঝিয়া লইয়া, সায়াহ্নের সরঞ্জাম মঞ্জুর করিতেছিলেন। সহসা স্বামীর পশ্চাতে নবাগতা একটী মহিলাকে দেখিয়া তিনি যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। মোক্ষদার অন্দরে কালে-কস্মিনেও কোন অতিথির শুভাগমন হইত কি না সন্দেহ। প্রতিবেশিনী মহিলারাও নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কখনো মোক্ষদার নিকট আসিতেন না। মোক্ষদা বিরক্তি-পূর্ণ মুখে ভ্রূ দুইটীকে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বক্রদৃষ্টিতে অনির আপাদ-মস্তক একবার দেখিয়া লইলেন।

গোপীমোহন বাড়ী ঢুকিয়াই আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"ওগো—দেখছো, কে এসেছে! এই যে অনু, আমাদের রাধুর মেয়ে।"

অনি মোক্ষদাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

মোক্ষদা যেন অবাক্ হইয়া বলিলেন—"কোন্ রাধু! কোথাকার!!"

কথাটা অনির বুকে খচ্ করিয়া বিঁধিল। মোক্ষদা তাহারই পিসিমা!

স্বামীর মুখে সকল কথা শুনিয়া মোক্ষদা যেন অতি কষ্টে একটা ক্ষীণ স্মৃতিকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"ওঃ; আহা! বেশ! বেশ! এখানে কোথায় থাকো মা?"

স্ত্রীর কথায় একটু লজ্জিত হইয়া গোপীমোহন তাড়াতাড়ি পত্নী-পক্ষের অভ্যর্থনার ত্রুটিটুকু ঢাকিয়া লইবার জন্য বলিয়া উঠিলেন—"দেখ দেখি, আমরা থাক্‌তে মা আবার থাক্‌বে কোথায়! ও তো মাত্র কা'ল এসেছে। রাত্রে এসে কোথায় বাসা খুঁজে বেড়াবে, সেই জন্যে কা'লই এসে এখানে উঠতে পারে নি। ঐ যে ভদ্রলোকটী এসেছেন, ওঁর বাসাতেই বুঝি উঠেছ মা? উনি বোধ হয় তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোক?"

অনি সংক্ষেপে উত্তর করিল—"হাঁ; ওঁর বাসাতেই আমি আছি।"

মোক্ষদার মুখ চোখের ভাব ও অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে অনির পিত্ত প্রায় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি তাহার অত বড় বিপদের সংবাদ পাইয়াও কোন খোঁজ-খবর করেন নাই, উপরন্তু স্বামীকে সে সকল সংবাদ পর্য্যন্ত জানিতে দেন নাই, সেই পিসিমার নিকট হইতে অনি ইহার বেশী বিশেষ কিছু আশা করিতে পারে নাই। তবুও সে আসিয়াছিল, তাহার আশ্রয়ের নিতান্ত অভাব বলিয়া। প্রয়োজন হইলে, অনি নিজের খোরাকী দিয়াও সেখানে থাকিতে পারে; কিন্তু এখন আর সে প্রবৃত্তি রহিল না।

"তবে আসি পিসি মা!" বলিয়া অনি মোক্ষদাকে আর একবার প্রণাম করিল; অন্তরে ঠিক ভক্তি ছিল কি না বলা যায় না। গোপীমোহন দাঁড়াইয়া পত্নীর রায় শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মোক্ষদার অভ্যর্থনা দেখিয়া তিনি সত্যই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু কোন কথা বলিবার ইচ্ছা বা সাহস তাঁহার হইল না।

মোক্ষদা চক্ষু দুইটিকে ঈষৎ মুদ্রিত করিয়া, গাল-ভরা দোক্তা-পানের কিঞ্চিৎ রস গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—

"আচ্ছা—এসো মা। এবার যখন ক'লকেতায় আস্‌বে, আমার এখানেই উঠো। আজ রাতে এখানে থেকে গেলেও হ'তো।"

অনি মনে মনে না হাসিয়া পারিল না। ঠিক্ এই রকমের একটা উত্তর সেও কল্পনা করিয়াছিল।

নির্ব্বাক গোপীমোহন অনির সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্য্যন্ত আসিলেন। কি বলিবেন তাহা ভাবিতে পারিলেন না। বনবিহারী ও অনি তাঁহার পদধূলি লইয়া বিদায় হইল।

(১৪)

অনি যে বিধবা তাহা বনবিহারী এতাবৎ কাল জানিতেন না। তিন চারি মাসের মধ্যে আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা যথেষ্টই হইয়াছিল; কিন্তু নাম-ধাম ও কুল-পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা আধুনিক সভ্যতায় বাধে বলিয়া সে বিষয়ে কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। আজ গোপীমোহনবাবুর সহিত অনির কথোপকথন কালে যে সকল বিষয় বনবিহারী জানিতে পারিলেন, তাহাতে তিনি হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। অনির সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তখন বনবিহারী ভাবিয়াছিলেন—অনি বোধ হয় মেজরের কোন আত্মীয়া হইবেন। তবে সে আত্মীয়তার বিষয় তিনিও বিশেষ কিছু অনুসন্ধান

করিবার চেষ্টা করেন নাই ; মেজর এবং অনিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনো দিন সে কথা উত্থাপন করেন নাই। অনি যেদিন হঠাৎ মেজরের আশ্রয় ছাড়িয়া আসে, সে দিন তিনি কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে অনি ও মেজরের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সূত্র থাকিলেও তাহা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ; হয় তো সেটা মাত্র বন্ধুত্বের দাবী। তাহার পর অনি যেদিন সেই দুই ছত্রের একখানা পত্র লিখিয়া তাঁহাকে 'বনদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ফেলিল, সেইদিন হইতে বনবিহারীর থাকা-না-থাকা অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষাই ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রতিষ্ঠিত দাবীকে আবার নূতন করিয়া নাড়া-চাড়া করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই ; পাছে সে সম্বন্ধের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে।

অনি ও বনবিহারী যখন পিসিমার বাড়ী হইতে বিদায় হইয়া রাস্তায় আসিয়া নামিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য আলোকের শ্রেণী তখন সারা পথকে যেন হাসির মালায় বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অনির হাসির শেষ কণাটি পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তার অশ্রুতে ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

বনবিহারী একখানা গাড়ী ডাকিয়া অনিকে উঠাইয়া নিজে উঠিয়া বসিলেন। অনি ভারাক্রান্ত মনে গাড়ীর এক কোণ ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া বসিল। নিজের অদৃষ্টের চিন্তায় তাহার মনটা তখন এত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কথা বলিবার শক্তিটুকুকে পর্য্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এতদিন অনি তবুও মনে একটা আশা পোষণ করিয়াছিল যে—তাহার পিসিমা আছেন। দূর হইতে পিসিমার সাড়া না পাইলেও সম্মুখে আসিয়া এতটুকু স্নেহের পরশ পাইবার আশা অনি ছাড়িতে পারে নাই ; স্নেহের পিপাসায় তাহার বুকখানা যে মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ অনি যখন সেখান হইতেও হতাশ হইয়া ফিরিল, তখন আর সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছিল না। আজ তাহার সত্য সত্যই মনে হইতেছিল—এ পৃথিবীর সকল আশ্রয়, সকল করুণার দ্বার তাহার পক্ষে চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; আজ সে অনাথা, নিরাশ্রয়া—পথের ভিখারিণী।

অনিকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বনবিহারী অনেকক্ষণ হইতেই অবসর খুঁজিতেছিলেন ; কিন্তু অনির ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি কোনো কথা উত্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না।

বনবিহারীর পক্ষে অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত অসহ্য বলিয়া মনে হইল ; মানুষের ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি আর কিছু থাকিতে পারে কি না, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত বনবিহারী জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন—"অনি, তুমি তো কৈ এতদিন আমাদের ওসব কথা কিছুই জানাও নি।"

'ওসব'টা যে কি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে তাঁহার কোথায় যেন একটু ব্যথার বাধা লাগিতেছিল।

অনি মুখ তুলিয়া একবার বনবিহারীর দিকে চাহিল ; চোখ দুইটিতে কোনো প্রশ্নও ছিল না, উত্তরও ছিল না। তখনও বোধ হয় সে ভালরূপে বনবিহারীর জিজ্ঞাস্য বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। পরক্ষণেই আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বেশ প্রকৃতিস্থ ভাবে বলিল—"কি কথা দাদা ?"

"ওই যে—" বলিয়া বনবিহারী একটা ঢোঁক গিলিলেন। একটা দুর্ব্বলতার সঙ্কোচ আসিতেছিল—হয় তো অনির প্রাণে ব্যথা লাগিবে।

"ওঃ—আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বুঝি ?" বলিয়াই অনি একটু হাসিল। সে হাসিতে প্রসন্নতা বা ব্যথা কিছুই ছিল না ; তবু নীরস ও রুক্ষ নয়।

বনবিহারী জানিতেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখের বা হাসি-কান্নার উপর অনির অদ্ভুত একটা আধিপত্য আছে। দুঃখ অনিকে বিচলিত করিতে পারে না। নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই পুনরায় বলিলেন—"হাঁ। তুমি যে বিধবা সে কথা কোনো দিন ভাবতেও পারিনি ; তুমি নিজেও তো সে সম্বন্ধে কোনো দিন কোনো কথা আমাদের ব'লো নি।"

অনি অবিচলিত ভাবেই উত্তর দিল—"আপনারাও তো সে সম্বন্ধে কোনো দিন জিজ্ঞেস্ করেন নি, দাদা ! বিনা কারণে অযাচিত ভাবে নিজের দুঃখের কাহিনী তো মানুষ বল্‌তে পারে না। পারলেও আমি অন্ততঃ সেই 'পারা'টাকে ঘৃণা করি ; ওতে হৃদয় ভিক্ষুক ও কাঙ্গাল হ'য়ে পড়ে। লোকেও হয় তো তার দুঃখে ব্যথা পেয়ে তাকে দয়া ক'রতে পারে ; কিন্তু শ্রদ্ধা ক'রতে পারে না।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই অনির মনে হইল—নিজের দৈন্যের কথা জানাইয়া মেজরের কাছে সে তো সত্যই

দয়ার ভিখারী হইয়াছিল; তবে তাঁহার কাছে নিজের এই সত্য পরিচয়টুকু সে গোপন করিয়াছিল কেন? অনি মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

অনিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বনবিহারী একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"তবে থাক্। আমি অবশ্য সে জন্যে বিশেষ—"

"না দাদা, আপনার কাছে তো আমার সে সমীহের কোন কারণ নেই। যেখানে স্নেহের প্রতিষ্ঠা শিকড় গেড়েছে, সেখানে কি মানুষের আত্মাভিমানের বালাই থাক্তে পারে? তবে আমার কথা হয় তো আমিও ভাল ক'রে জানি না।—

"সে আজ বারো বৎসর আগেকার কথা। তখন সুখ দুঃখ বুঝবার ক্ষমতা আমার হ'য়েছিল কি না বল্তে পারি না; তবে ভালো মন্দ বোধ হয় কতকটা বুঝতুম্। বাবা ছিলেন স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর; তিনি তখন সিউড়িতে থাক্তেন। বাবার শরীর অত্যন্ত ভেঙে পড়ে'ছিল। হয় তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বেশী দিন আর বাঁচবেন না; তাই আমার বিয়ের জন্যে খুব তাড়াতাড়ি লেগে গেল তাঁর। আমার যিনি শ্বশুর হ'লেন, তাঁর সঙ্গে বাবার আগে থেকেই খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমি পূর্ব্বে তাঁকে অনেকবার আমাদের বাড়ী আস্তে দেখেছিলুম্। তাঁর অবস্থা খুব ভাল ছিল; তাই ব'লে আমার গরীব বাপকে তিনি অশ্রদ্ধা করেন নি কখনো।

"আমার যখন বিয়ে হ'ল তখন ফাল্গুন মাস। বিয়ের কিছুদিন পরেই বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'য়ে পড়'লেন। তখন থেকেই আমাদের দুর্ভাগ্যের সূচনা হ'ল। বাবা চাকরী ছেড়ে দিয়ে ইন্‌ভ্যালিড পেন্‌শন্ নিতে বাধ্য হ'লেন। পুরো বেতনের তিন ভাগের এক ভাগ বাবার পেন্‌শন্ মঞ্জুর হ'ল। অত কম আয়ে তখন যে আমাদের চল্‌বে কেমন ক'রে তাই ভেবে মা অস্থির হ'য়ে পড়ে'ছিলেন। জেলা-সহরের মধ্যে বহরমপুরে খরচ খুব কম পড়'তো তখন। আমরাও বহরমপুরে গিয়ে বাসা ক'রলুম্। বাবারও তাই ইচ্ছা ছিল; কারণ তাতে দেশের জমিজমা-গুলো দেখার সুবিধে ছিল, এবং গঙ্গাতীর।"

"তোমরা বহরমপুরে থাক্‌তে বুঝি? আমার দেশও যে ওরই কাছাকাছি; নেহালিয়া—জিয়াগঞ্জের লাগাই। বহরমপুর কলেজে পুরো চার বৎসর পড়ে'ছিলুম্, অবশ্য শুধু আই-এসসিই। তোমাদের বাড়ীও কি বহরমপুরেই।"

"না। বাবা যতদিন অসুস্থ ছিলেন, ততদিন বহরম-পুরেই ছিলুম্ আমরা। আমাদের বাড়ী ছিল—বহরম-পুরের কয়েক মাইল পূর্ব্বে ভাণ্ডারদহ বিলের পাশে চাঁদপুর বলে' একটা গ্রামে। কিন্তু দেশের বাড়ীতে আমরা থাক্তুম্ না। থাক্‌বার কোন সম্বলও ছিল না। বাবার অসুখ যখন খুব বেশী, সেই সময়ই আমার শ্বশুর মশায়ও মারা যান্। সকলের কথা খুব ভাল ভাবে আমার মনে পড়ে না। তবে শ্বশুর মশায়ের কথা কতকটা মনে পড়ে। খুব লম্বা চওড়া পুরুষ ছিলেন তিনি; হঠাৎ দেখলে কাছে যেতে ভয় ক'র্‌তো। আমার শাশুড়ী ছিলেন না বলে' মা দুঃখ ক'রেছিলেন,—ভেবেছিলেন বোধ হয় আমার কষ্ট হবে। কিন্তু আমার সেই তেজস্বী শ্বশুর আমায় এত স্নেহ ক'রতেন যে আমায় সে অভাব তিনি একেবারেই জান্‌তে দেন্ নি। শেষ সময়ে তিনি আমায় দেখবার জন্যে খুব ব্যস্ত হ'য়েছিলেন; কিন্তু বাবাও তখন মৃত্যু-শয্যায়; তাঁকে ফেলে যাওয়া হয় নি। কে জান্‌তো যে আমার শ্বশুর মশায়েরও সেই শেষ ডাক্।"

অনির গলাটা একটু ভারি হইয়া আসিল। হয় তো তাহার চক্ষে তখন জল আসিয়াছিল। কিন্তু গাড়ীর ভিতরের অস্পষ্ট আলোকে বনবিহারী তাহা দেখিতে পাইলেন না।

"থাক্ অনু, যা হ'য়ে গেছে তা' তো আর ফির্‌বার নয়। ও সব কথা ভেবে আর মিছে দুঃখকে ডেকে এনে লাভ কি বল?"

"দুঃখ যেখানে বাসা পেতেছে, সেখানে আর দুঃখকে ডেকে আন্‌তে হয় না দাদা। তারা আপনা আপনি সার বেঁধে' এসে বুকের ভিতর বাসা করে; তাদের অবাধ গতিকে আট্‌কানো যায় না। বুকের মাটিকে ঝাঁঝরা ক'রে তারা মনের উপর এমন বড় বড় বল্মীক-পিণ্ড খাড়া ক'রে তোলে, যাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বভাব-গতি পর্য্যন্ত বাধা পেয়ে বন্ধ হ'য়ে যেতে চায়।"

"কিন্তু তাদের সেই বল্মীক্ বাসাকে ভেঙে দেবার তো চেষ্টা ক'রতে হবে অনু! ব্যথাকে চাপা দিয়ে রাখতেই হবে। নইলে প্রাণ যে ক্রমেই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অসাড় হ'য়ে পড়'বে।"

"তাকে সরানোর তো কোন উপায় নেই দাদা। সে উই ঢিপি ভেঙে দিলে, তার ভিতরের পিঁপড়েগুলো সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ে' তাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলবে। আবার নূতন জায়গায় নূতন ক'রে বাসা বাঁধবে, কিন্তু, পালাবে না। দুঃখ এসে জমে হুড়োহুড়ি ভিড় ক'রে, কিন্তু যাবার বেলায় তারা তত সহজে যেতে চায় না। দুর্ভাগ্যের ক্রমই তাই দাদা। বাবা পক্ষাঘাতে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গেলেন; তার ছ'মাস পরেই শ্বশুর মারা গেলেন। শ্বশুরমশায়ের মৃত্যুর মাস চারেক পরেই বোধ হয় আমি বিধবা হ'য়েছিলুম্। বাবা আমার সে শোক সহ্য ক'রতে না পেরে দু' মাসের মধ্যেই তাঁর সুখ দুঃখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে, আমাদের অনাথা ক'রে গেলেন। তার পর মা, দাদু সবই একে একে গেলেন; একটুও যেন তর্ সইলো না কারো। আমার মনে হয়, এ বিপ্লবটা বোধ হয় ঘট্‌লো শুধু আমার জন্যেই; নইলে—বাবা—"

অনির কথায় বনবিহারীর চোখে জল আসিতেছিল। আর্দ্রকণ্ঠে, অনির হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া, তিনি বলিলেন "ছিঃ অনু! ও কথা মনে ক'রো না, যা হ'বার তা' কেও রোধ ক'রতে পারে না। ভাগ্যে যা আছে তা' ঘট্‌বেই; তার জন্যে দায়ী কেও নয় বোন্।"

"তা' বুঝি; কিন্তু তবুও মনকে ঠিক্ সান্ত্বনা দেওয়া যায় না দাদা। আমার স্বামী আমাকে বিয়ে ক'রে হয় তো একটী দিনের জন্যও মনে শান্তি পান নি। এ বিয়েতে তাঁর সম্পূর্ণ অমত ছিল; শ্বশুর মশায় জোর ক'রেই বিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁকে ত্যাজ্য-পুত্র ক'রবার ভয় দেখিয়ে। তখন আমি এ সব কথা ভাববার যোগ্যতা পাই নি; আমার বয়স তখন মাত্র এগারো বারো বৎসর। কিন্তু এখন ভাবতে গেলে কেবল মনে হয়—মনের অত বড় অশান্তিটা সহ্য ক'রতে না পেরেই বোধ হয় তিনি মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন; নইলে যুদ্ধে যাবেন কেন? আর তাই থেকেই আমার বাবা, মা সকলের জীবন আল্‌গা হ'য়ে পড়ে'ছিল। উঃ, বাবা যেদিন তাঁর বন্ধু ব্রাউন সাহেবের কাছ থেকে জামাইএর মৃত্যু-সংবাদ পেলেন, সেদিন হঠাৎ বাবার কি অবস্থা যে হ'য়ে পড়'লো! তার পর দেখতে দেখতে সবই যেন—"

অনির কথা শেষ হইতে না হইতেই গাড়ী বাসার সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। বনবিহারীও এতক্ষণ নিবিষ্ট-চিত্তে অনির কথাই শুনিতেছিলেন। শব্দ পাইয়া সুলতা তাড়াতাড়ি দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; অভিমানে মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া রাখিলেও, চাপা হাসির আভাটুকু লুকাইতে পারে নাই।

(১৫)

গোপীমোহনের বিশেষ আগ্রহ ও সহৃদয়তা থাকিলেও মোক্ষদার ব্যবহার তেজস্বিনী অনিকে বিশেষ ব্যথিত করিয়াছিল। মনে মনে যথেষ্ট বোঝাপড়া করিয়াও সে পিসিমার বাসায় আশ্রয় লইবার আকাঙ্ক্ষাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না; কোনো মেস্ কিম্বা মহিলা-নিবাসে থাকাই স্থির করিল। বনবিহারীবাবু পূর্ব্ব হইতেই সে কথা বলিয়াছিলেন। বিপন্ন অবস্থায় আত্মীয়ের আশ্রয়ে না থাকাই ভালো।

বনবিহারী নিজেই চেষ্টা করিয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটী মহিলা-নিবাসে অনির থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। ব্যয় বাহুল্যের ভয়ে অনি প্রথমে সেখানে থাকিতে আপত্তি করিলেও বনবিহারী তাহা মানিলেন না। অন্ততঃ যতদিন সে কোন কাজকর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া উঠিতে না পারে, ততদিন ঋণ বলিয়াও তাঁহার নিকট হইতে মাসিক খরচটা লইবার জন্য তিনি নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া অনিকে রাজী করিলেন।

কাহারো নিকট সাহায্য গ্রহণ করা অনির স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল; বিশেষতঃ মেজরের সাহায্য গ্রহণের তীব্র বিষ তাহার প্রাণের শিরা উপশিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিয়া সে সাহস ও প্রবৃত্তিকে যেন আরো অসাড় করিয়া তুলিয়াছিল। তথাপি বনবিহারীর আন্তরিকতা ও নিজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনি তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার শেষ মাসের পেন্‌শনের যে কয়েকটী টাকা মাত্র অনি তাহার নিঃসঙ্গ জীবন যাত্রার পাথেয় স্বরূপ পাইয়াছিল, তাহাও তখন প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল।

* * * *

মাত্র সাত দিনের অবকাশ লইয়া বনবিহারী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা-সাক্ষাতের হিড়িকে ও কায

কর্ম্মের ভিড়ে এই ক্ষুদ্র অবসরটুকু এরূপ অলক্ষ্যে কাটিয়া গেল যে বনবিহারী ও সুলতা কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অনিকে মেসে উঠাইয়া দিয়া ও তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি গুছাইয়া দিয়া, তাঁহারা যখন অদ্যই ডেরাডুন্ এক্সপ্রেসে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার কথা জানাইয়া অনির নিকট বিদায় চাহিলেন, তখন সুলতার চোখের জল ও অনির বিহ্বল দৃষ্টি যেন সেই ছুটি-শেষের বিচ্ছেদ-বেদনাকে ভালভাবে জানাইয়া দিল।

বনবিহারীর পায়ে মাথা ঠেকাইয়া অনি গড় হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই বনবিহারীর সহিত যেদিন তাহার প্রথম পরিচয় হয়, সেই দিন হইতেই সে তাঁহার সরল প্রকৃতিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার বাচাল ও কৌতুকপ্রিয় প্রকৃতির অন্তরের এই বিরাট মনুষ্যত্বকে তখন অনি এরূপ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মেজরের তুলনায় বনবিহারীর যে সকল চপলতা ও দুরন্তপনাকে অনি একদিন অবহেলার চক্ষে দেখিয়াছিল, আজ সেগুলিকে তাঁহার সরল হৃদয়ের সমৃদ্ধি বলিয়া শ্রদ্ধা না করিয়া পারিল না। আজ অনির সারা অন্তর বনবিহারীর চরণে ভক্তিনত হইয়া পড়িল।

সুলতার মুখখানির পানে চাহিয়া অনির ব্যথিত হৃদয় যেন ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুলতা তাহার পদধূলি লইতেই অনি তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। এই নিতান্ত সরলা বালিকার স্নেহময় বন্ধুত্ব সম্পদ সেই সুদূর প্রবাসে তাহার জীবন-মরুভূমিকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়া দিয়াছিল। অনি তাহার উত্তপ্ত শূন্য জীবনে সুলতাকে যেন হঠাৎ একটা সুশীতল ছায়াবীথির মত পাইয়াছিল। কিন্তু আজ সেই সুলতাকেও আবার ছাড়িয়া দিতে হইবে—কে জানে, সেই ছাড়া চিরদিনের মত কি না, এ কথা ভাবিতেই অনির চোখ্ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। আরো নিবিড়ভাবে সুলতার মুখখানিকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে অনি বলিল—"লতি! আমায় ভুলে' যাবি না তো বোন্!"

সুলতার ঠোঁট দুখানি তখন কাঁপিতেছিল। অনির বুকের মধ্য মুখখানাকে তেমনি ভাবেই গুঁজিয়া রাখিয়া উদ্গত কান্নাকে চাপিয়া লতি বলিল—"দিদি, তুমি আর যাবে না—আমাদের ওখানে?"

"নিশ্চয়ই যাবো" বলিয়া অনি তাহার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া বলিল—"তোর ছেলের অন্ন-প্রাশনে।"

লজ্জিতা সুলতা অনিকে একটু ধাক্কা দিয়া চাপা ভর্ৎসনার ইঙ্গিতে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল—"যাও! ভারি দুষ্টু মেয়ে! আমার ছেলে হ'তে হবে না; আমি চাই নে।"

দুঃখের মধ্যেও অনি একটু না হাসিয়া পারিল না, এই বোকা মেয়েটীর সরল ভাব দেখিয়া। সুলতার গাল দুইটীকে ঈষৎ টিপিয়া দিয়া বলিল—"তা না হ'লে যে বাঁধন আল্‌গা হ'য়ে যাবার ভয় আছে! চা'স্—নিশ্চয়ই চা'স্।"

"সে ভয় আমার এক ফোঁটাও নেই। তুমিই তো ব'লেছিলে যে—ভক্তির ঘরে ভয়কে বাসা বাঁধ্‌তে দিতে নেই।"

"ব'ল্‌লে কি হয় লতি! ঐ দুটো জিনিষ গোড়াগুড়ি এমন তাল পাকিয়ে জড়িয়ে থাকে যে, ভয়কে ভক্তি থেকে আলাদা ক'রে বেছে' ফেলা ভারি কঠিন।"

"তা হো'ক্ গিয়ে! তার ভয়ে আমি 'মা' হ'তে চাচ্ছি কি না! আমার ছেলেয় দরকার নেই; তুমি যাবে কি না বল?"

"যাবো; নিশ্চয়ই যাবো লতি!" বলিয়া অনি সুলতার মুখখানিকে গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাণে কাণে বলিল—"পাগলি! মেয়েরা কি শুধু 'মা' হ'তে চায় 'ছেলের মা' হ'বার লোভে? স্বামীর আত্মার একটা টুক্‌রোকে নিজের রক্ত মাংস দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে, একবারে নিজস্ব ক'রে বুকে পাবার লোভই তা'দের পাগল ক'রে তোলে, জানিস্।"

অনির কথা খুব পরিষ্কার ভাবে না বুঝিলেও, সুলতা যতখানি বুঝিল—তাহারই অনুভূতি তাহার সুন্দর মুখখানিকে নিমেষে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

রাত্রি দশটায় ডেরাডুন্ এক্সপ্রেস্ ছাড়িয়া যায়। তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে দেখিয়া বনবিহারী সুলতাকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে বলিলেন। জিনিষপত্র সবই ভবানীপুরে পড়িয়া আছে, তখনো কিছুই গুছাইয়া লওয়া হয় নাই।

অনি ও সুলতা আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখের মধ্যেও কথা-বার্ত্তায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সহসা

নাড়া পাইয়া যেন পরস্পরের হৃদয় আবার ব্যথিত হইয়া উঠিল।

দারোয়ান জানাইল যে ট্যাক্সি ডাকা হইয়াছে। অনি সুলতা ও বনবিহারী নীচে নামিয়া আসিলেন। অনির মনটা তখন বেদনার ভারে আরো নিস্তেজ ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। সুলতাকে আর একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অনি তাহার সীমন্ত চুম্বন করিল; মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না। উভয়েরই চক্ষু তখন নীরব বেদনার অশ্রুতে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

লতিকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া অনি মুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিল। অশ্রু যে তাহারই জীবনের সাথী; অপরকে সে তাহার অংশ পাইতে দিবে কেন!

বনবিহারী জোর করিয়া অনির হাতে কয়েকখানি নোট গুঁজিয়া দিলেন। ইচ্ছা হইলেও অনি তাহাতে আপত্তি করিতে পারিল না। এই স্নেহের দাবীকে উপেক্ষা করিবার সাহস তাহার ছিল না।

ট্যাক্সি ছাড়িয়া গেলেও অনি নিশ্চল ভাবে তাঁহাদের পথ পানে চাহিয়া রহিল। আজ অনির মনে হইতে লাগিল যে পশ্চিমের সঙ্গে তাহার সুদীর্ঘ বারো বৎসরের সম্বন্ধ বোধ হয় এই বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়িয়া গেল—শুধু কতকগুলা কান্নাহাসির জীর্ণ স্মৃতির একটা স্তূপ তাহার মনের উপর বসাইয়া দিয়া। আজ মেজরের কথা মনে পড়িয়াও তাহার চোখে জল আসিল। সেই বাংলো, সেই শিউকিষণ ও ভগলু;—একজনের ক্ষণিক দুর্ব্বলতার ঝাপ্‌টায়, সব কিছু হইতেই চিরদিনের মত সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

বনবিহারীর উদাস মনটাও বোধ হয় তখন একটু কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাই অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া—হাতের রুমালখানি নাড়িতে নাড়িতে তিনি গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিলেন—

নিত্য তোমার ভাঙা-গড়া,
স্মৃষ্টি-খেলার আগা-গোড়া।
হে নটরাজ, নৃত্য তোমার
বুঝেও বুঝি না।
কান্না-হাসির ছন্দে-ভরা
তোমার আঙিনা॥

বনবিহারী ও সুলতা চলিয়া যাওয়ার পর অনি অনেকক্ষণ নিঝুম ভাবে ফটকের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। এতদিন গোপনে তাহার বুকের ভিতর যে ভালবাসা নীরবে আপনার অস্তিত্বটুকুকে ছড়াইয়া রাখিয়াছিল, আজ পশ্চিমের সঙ্গে সম্বন্ধের সকল বাঁধন নিঃশেষে কাটিয়া যাইতেই যেন সেই প্রচ্ছন্ন ভালবাসা মূর্ত্ত হইয়া তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বিশেষতঃ, মেজরের স্মৃতিতেই যেন তাহার সারা অন্তর জুড়িয়া আজ হাহাকার উঠিতেছিল; আর অনি শুধু চোখ রাঙাইয়া তাহার মনকে সংযত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল।

উপরে আসিয়া, অনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর একটা ব্যথিত ক্রন্দন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

(১৬)

সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই যেন মেজরের কর্ম্মঠ ও উৎসাহী প্রাণটা সম্পূর্ণ অসাড় ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা তাঁহার এই চৌত্রিশ বৎসর বয়সের উদ্দাম জীবনকে এরূপ জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল যে, মেজরকে দেখিয়া এখন আর সহসা তাঁহার বয়স অনুমান করা যায় না। এই কয়দিন তিনি বাহিরের ডাক ও হাসপাতালের কার্য্যে পর্য্যন্ত বাহির হন্ নাই। বয় ও শিউকিষণ্ নিয়মিত ভাবে তাঁহার সমস্ত কার্য্যই করিয়া যাইতেছিল; কিন্তু তিনি সে সব দৈনন্দিন কার্য্যের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া এমন একটা নিভৃত কোণে নিজেকে টানিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বেচারী চাকর ও বেহারাদের সমস্ত শক্তির নাগালকে তাহা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এখন আর পূর্ব্বের মত তাহারা যখন তখন মেজরের সম্মুখে আসিতে সাহস করিত না। মেজরও হয় তো সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন—পাছে তাঁহার দুর্ব্বলতা ও গোপন পাপ বিশ্বের চক্ষে ধরা পড়িয়া যায়।

যে গ্রহ একদিন তাহার খেয়ালের পথে অবাধ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল—জগতের সকল অমঙ্গল ও বাধাবিঘ্নকে নিজের শক্তির প্রাবল্যে উপেক্ষা করিয়া, সহসা একটা প্রলয়ের ঝঞ্ঝায় সে যখন কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই দুর্জ্জয় আত্মাভিমান ও খেয়ালের শক্তির নেশা এক মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যায়। সেই ভীষণ পতনের হাত হইতে সে

তখন নিজেকেও ফিরাইতে পারে না; তাহারই উপেক্ষিত নিতান্ত ক্ষুদ্র উপগ্রহদের আকর্ষণকেও হাত বাড়াইয়া নাগাল পায় না। খেয়ালের নেশা যখন দুকূল ছাপাইয়া বহিতেছিল, তখন তীরের বন উপবন সব কিছুকে ভাঙ্গিয়া লইয়া মেজর চাহিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের মাতলামিকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে। সেদিন তিনি ভাবিতেও পারেন নাই যে সেই সকল গাছপালা একদিন সেই স্রোতের মোহনায় জমা হইয়া তাহার গতি রোধ করিয়া দিবে—সমস্ত প্রবাহ বদ্ধ-বেগ হইয়া তাহার অন্তর পর্য্যন্ত পচিয়া উঠিবে। বাসনার আগুনকে জ্বালাইয়া তুলিয়া যে উপভোগের যজ্ঞে তিনি কর্ত্তব্যের বিধি-নিষেধকে পর্য্যন্ত শাখাসহ ছিঁড়িয়া লইয়া আহুতি দিয়াছিলেন, সেই আগুনে যে পতঙ্গের মত শেষে নিজেকেই পূর্ণাহুতি দিতে হইবে, তাহা মেজর কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

এখন আর মেজর বড় একটা বাহির হইতেন না। অধিকাংশ সময়ই নিজের শয়ন-কক্ষখানিকে আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। লাইব্রেরি, অনির নির্দ্দিষ্ট ঘরখানি, এমন কি, হল্ ঘরেরও সেই অংশটুকু পর্য্যন্ত তিনি এড়াইয়া চলিবার জন্য সদা সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সেই অচেতন জড় পদার্থগুলিকে দেখিয়াও যেন তাঁহার একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইত। স্থবিরের মত বদ্ধ ঘরে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে যখন তাঁহার প্রাণ নিতান্ত শ্বাসরুদ্ধ হইয়া উঠিত, মেজর কোনরূপে নিজেকে টানিয়া আনিতেন বারান্দা কিম্বা পশ্চাতের বাগানের একটি কোণে। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। নিজের যে দুর্ব্বলতা তিনি এতকাল জানিতে পারেন নাই, সেই দুর্ব্বলতা যেদিন হইতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে তাহার স্বরূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিন হইতেই বহির্জগতের একটা ক্রুর বিদ্রূপ-হাসি যেন মেজরের সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া বাজিত।

* *

তখন সন্ধ্যা। পৃথিবীর যে বুক এতক্ষণ আলোকে ভরিয়া ছিল, গোধূলির ম্লান হাসি যেন সহসা কোন গোপন দুর্ব্বলতাকে তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে লজ্জায় রাঙা করিয়া তুলিয়াছিল; পরক্ষণেই সেই লজ্জার আভাটুকুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আনন্দময় জীবনের উজ্জ্বল আলোকরাশি যেন ভয়ে আত্মগোপন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন শুধু একটা বিষাদের কালিমা ভরিয়া উঠিয়াছে। সেখানে হাসি নাই, আলো নাই; দিনের সব পথ, সব সৌন্দর্য্য যেন মুহূর্ত্তে ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে। মেজর জানালার পাশে কৌচটার উপর পড়িয়া বাগানের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। কামিনী গাছটার কোলে কাঁঠালি চাঁপার প্রকাণ্ড ঝোপটা—যাহার পাতাগুলা এতক্ষণ আলোকে ঝল্‌মল্ করিয়া দুলিতেছিল, সেটা যেন তখন একটা নির্জ্জীব অন্ধকার স্তূপের মত দাঁড়াইয়া আছে। দিনের আলোয় খুঁজিলে যাহার কচি পাতার বুকে গন্ধের মদেভরা হাজার ফুলের কলি মিলিত, এখনকার বীভৎস রূপ দেখিয়া তাহাকে হয় তো ভালভাবে আর চেনাই যায় না। কিন্তু এই অন্ধকারে তাহার রূপের সমাধি হইয়া গেলেও কি তাহার বুকের মধ্যে লুকানো সেই সুরভি সৌন্দর্য্যের উৎস মরিয়া গিয়াছে? না—বাতাসে এখনো তাহার ভাষা হয় তো শোনা যায়। সে মরে নাই, মরিবে না। অন্ধকার তাহার চোখ বাঁধিয়া পথরোধ করিয়াছে; কিন্তু বাতাস তাহার নিশ্বাসের গতিরোধ করে নাই তো। মেজরও বাঁচিয়া আছে—সে বাঁচিবে, যে অন্ধকার সহসা তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে শ্বাসরোধ করিতে দিবে না।

মৌন মেজর বসিয়া বসিয়া নিজের জীবনের কথা ভাবিতেছিলেন। "জন্মের আগেকার কোনো ইতিহাস যার নেই, মৃত্যুর পরে যা' নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাবে, তার পিছনে মানুষ এত সামাজিকতা, এত বিধি নিষেধ গড়ে' তা'কে দম-বন্ধ ক'রে তুলেছে কেন? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পথে আপনা আপনি যা বেয়ে চলে' আসে, তার গতিরোধ ক'রে নতুন ধারা সৃষ্টি ক'রে নিজেদের হাত পা এমন শিকল্ দিয়ে বাঁধবার কি দরকার পড়ে'ছিল মানুষের! চোখ, কাণ নাক মুখ প্রত্যেক অঙ্গ মানুষের জন্মের সাথেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে তাকে ভোগ ক'র্‌বার জন্যে। কল্পনার সৃষ্টিতে 'মরালিটী'র বাঁধন দিয়ে যারা সেই জীবনের হাত-পা'কে বেঁধে ভোগের পেয়ালাকে লোহার আবরণে ঢেকে ফেলেছে, তারা শুধু নিজেরা অক্ষম ব'লেই নিজেদের সেই তৃষ্ণার্ত্ত জীবনের পিপাসা মিটাবার অক্ষমতায় তার গলায় ছুরি মেরে, তার হাহাকারকে বন্ধ ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'রেছে মাত্র। কিন্তু যার সে পথ

বেয়ে চল্‌বার ক্ষমতা আছে সে কেন নিজে সেই সব অকর্ম্মণ্য মস্তিকের খেয়ালগুলোকে হাতে-পায়ে জড়িয়ে নিয়ে নিজেকে বিশ্বের সব কিছু থেকে বঞ্চিত ক'রবে? মানুষ জন্মেছে, সে মর'বেও। কিন্তু সেই জন্মানো আর মরার মাঝখানে তার যে পরিমিত বেঁচে থাকা, সেটাকেও সে মরবার আগেই মেরে ফেল্‌বে কেন? যে মুমূর্ষু সেও জল চায়, তারও পিপাসার আর্ত্তনাদ আছে, অন্ততঃ যতক্ষণ বাঁচ্‌বার—জগতের শেষ নিশ্বাস বাতাসটুকু পর্য্যন্ত তার বুকের পথকে মুক্ত ক'রে রেখেছে। মানুষ নিজে যে কল্পনার দড়ি তৈরী ক'রে মানুষকে বেঁধে রাখ্‌তে চায়, তা'র পাশের ভিতর আমরা আপনা-আপনি হাত বাড়িয়ে দেবো, কেন? প্রকৃতির বুকে যে অধিকার নিয়ে যে জন্মেছে, সে অধিকার তার নিজস্ব—সে তা' ভোগ দখল কর্‌বেই। কিন্তু—

ঐ 'কিন্তুর' গণ্ডীটা মেজর কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যেখানে নিজের স্বচ্ছন্দ অধিকার-টুকুকে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া আমরা পাইতে চাই, সেখানে পরেরও তো আছে—তাহাদের প্রত্যেকের স্বচ্ছন্দ নিজস্ব অধিকার। জগতের তরফ্ হইতে প্রত্যেকের সেই স্বচ্ছন্দ অধিকারকে বাঁচাইয়া চলিতে হইলেই, নিজের অধিকারের গণ্ডীকে মাপিয়া লইতে হইবে—সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া। সমাজ—বিধি-নিষেধ, এ সকলই সেই অধিকারের মাপকাঠি। যে মাপকাঠি সমস্ত দুনিয়ার বাজারকে দখল করিয়া বসিয়াছে, আজ সহসা তাহাকে ভাঙিতে গেলে সেখানে বিপ্লব ঘটিবেই। সংহত শক্তির আঘাতে নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফিরিতে হইবে—শুধু পরাজয়ের গ্লানিতে নিজের অন্তরকে বোঝাই করিয়া। সেই গ্লানির কালিমায় নিজস্ব অধিকারের শেষ আলোক-কণাটুকু পর্য্যন্ত কালো হইয়া উঠিবে। আলোর সম্মুখ হইতে যে দুর্ব্বল জীবাণু কোন্ নিভৃত কোণে আত্মগোপন করিয়া ছিল, আজ সেই দুর্ব্বলতার অবসর লইয়াই, নিমেষে একটা বিষাক্ত ঘায়ের মত সমস্ত অন্তরকে সে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহাকে একদিন অধিকারের দাবী বলিয়া পতাকার মত তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, আজ তাহা গ্লানির পাথর হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। সেখানে আলো নাই, তৃপ্তি নাই, পথ নাই—; শুধু গ্লানির হাহাকার, ক্ষতের ব্যথা!

দাঁতে দাঁত চাপিয়া মেজর হাতের উপর মাথা রাখিয়া কপালের উপরকার সম্মুখের চুলগুলিকে আস্তে আস্তে টানিতেছিলেন।

বয় ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিতেই মেজরের খেয়াল হইল। তিনি সেই অবস্থাতেই গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ হ্যায়।"

সন্ত্রস্ত বালক কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। অতি নিম্নস্বরে সভয়ে কহিল—"হাম্মে—হুজর! ভগ্‌লু।"

মেজর কটাক্ষে ভগ্‌লুর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরেই বলিলেন—"পেগ্ লেয়াও—পেগ্—সরাব।"

ইদানীং মেজর সুরাপাত্রের মধ্যে শান্তির সন্ধান খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। দুশ্চিন্তা, অনুশোচনা ও অশান্তিতে যখন তাঁহার মনটা উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, মদ্যপানে তাহার বোধশক্তিকে উন্মত্ত করিয়া দিয়া তিনি অশান্তির গুরুভার ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। জীবনের পাত্র যখন কাণায় কাণায় বিষাক্ত হইয়া উঠে, মানুষ মরিয়া শান্তি পাইতে চায়, অথচ নিজেকে ঘিরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার লোভও সে ছাড়িতে পারে না, তখন এইরূপ একটা আশ্রয়ের মধ্যেই নিজেকে দাঁড় করাইয়া সে ঐ মরিবার চিন্তাটুকুকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে চায়। মেজর তাঁহার কাজকর্ম্ম ও সব কিছুকে ঐ সুরার পাত্রে ডুবাইয়া দিয়া হাল্‌কা হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবসাদের সুযোগ লইয়া যখনই দুশ্চিন্তা ও অশান্তি মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত, তখনই নীতি ও শান্তির বিরুদ্ধে মেজর নিজেও এই দারুণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেন।

বেচারা ভগ্‌লু বোতল ও পেয়ালা আনিয়া মেজরের সম্মুখে টিপয়ের উপর সাজাইয়া দিল। এই মদ্যপানের অধ্যায়টা তাহার নিকট বিশেষ ভীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইত। যাহা অস্বাভাবিক, তাহা শিশুর প্রাণকে ভীতি-চঞ্চল করিয়া তোলে। বিশেষতঃ তাহার সুদীর্ঘ দুই বৎসরের কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায় কখনো মেজরকে এইরূপ অবস্থায় সে দেখে নাই।

তখন মেজরের চা ও বিস্কুট খাইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া বয় ভয়ে ভয়ে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া

পুনরায় অতি নিম্নস্বরে বলিল—"হুজুর, চা রোটি লেয়াযে—"

মেজর একটা পেগ মুখে লাগাইয়া টানা অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"নেই—"।

সন্ত্রস্ত বালক-ভৃত্য ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মেজরের শাসনকে যথেষ্ট ভয় করিয়া চলিলেও মাঝে মাঝে প্রভুর নিকট ভগ্‌লু যে আদর পাইত, তাহার আনন্দ সে শাসন-ভীতিকে ছাপাইয়া উঠিয়া তাহার তরুণ বুকখানাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। কিন্তু এখন শাসনের ভয় হাল্‌কা হইয়া আসিলেও, বঞ্চিত হওয়ার অভিমান ও ব্যথা তাহার কচি ঠোঁট দুখানিকে যেন কান্নার চাপে ফুলাইয়া তোলে। সে কাঁদিতে পারে না, হয় তো তাহার ভৃত্য-জীবন আপনার পাওনার সীমা বুঝিতে শিখিয়াছে। ইহা অপেক্ষা সেই শাসনের ভয়ই যে তাহার ভাল ছিল। সে ভয়ের মধ্য দিয়া ভৃত্য তাহার প্রভুকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এই শাসনের শিথিলতার ভিতর দিয়া যে প্রভু বিকৃত রূপ লইয়া ভৃত্যের সম্মুখে দাঁড়ান, তাঁহাকে দেখিয়া যে ভৃত্যের মনও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

হাতের পেয়ালাটিকে এক চুমুকে নিঃশেষিত করিয়া মেজর কি বলিবার ইচ্ছায় একবার বয়ের উদ্দেশে ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু ভগ্‌লু তখন বাহির হইয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত্তে কি ভাবিয়া লইয়াই মেজর উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মনের অবস্থাটা বোধ হয় হঠাৎ একটু বদলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া মেজর শান্তকণ্ঠে ডাকিলেন —"ভগ্‌লু!"

ভগ্‌লু ছুটিয়া উপরে আসিল। অনেক দিন পরে যেন, বালক তাহার প্রভুর আহ্বানের মধ্যে সেই পূর্ব্ব স্নেহের রেশটুকু খুঁজিয়া পাইল।

ভগ্‌লু নিকটে আসিলে, মেজর তাহার মাথার উপর সস্নেহে নিজের বাম হাতখানি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"ভগ্‌লু, তোর মায়িজী, তোকে কোন চিট্টি উট্টি লেখে নি?"

ঈষৎ ম্লান হইয়া মেজরের মুখপানে চাহিয়া বয় বলিল— "নেই হুজুর। মায়িজী তো হাম্‌কো ছোড়কে গিয়া। এক-দম্ মুল্লুক্ চলা গিয়া……।" বালকের কচি বুকখানি একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসে দুলিয়া উঠিল।

"মায়িজীর জন্যে তোর মনে খুব কষ্ট হয়, না—রে ভগ্‌লু? তুই তার সঙ্গে গেলি না কেন?" বলিয়া মেজর ভগ্‌লুর মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বালকের স্বচ্ছ চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

ভগ্‌লু, মুখখানি মাটির দিকে নামাইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"মায়িজী গরীব হ্যায় হুজুর; ওহি বাস্তে সাথমে নেই লে গিয়া।"

দুই হাতে রেলিংটাকে ধরিয়া মেজর আকাশের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার আকস্মিক অন্যমনস্কটুকু ভগ্‌লুর চোখেও ধরা পড়িল।

অনির দেশ সম্বন্ধে, মেজর কোনো দিনই তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। মুল্লুক বলিতে— সেই বিস্তীর্ণ বাংলা দেশ। কে তাহাকে চেনে সেখানে; কে কাহার খোঁজ রাখে!

ভগ্‌লুকে বিদায় দিয়া মেজর আবার ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার মনটা তখন অবশ হইয়া যেন পুরাতন কোনো একটা স্মৃতিকে বারবার আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছিল। আর তাহারি ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল হইয়া অনির মুখখানি তাঁহার বুকের মধ্যে উঁকি মারিতেছিল। অনির সন্ধানের জন্য মেজর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

(ক্রমশঃ)



মণিপুর রাজ্যে

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

পূজোর ছুটী,—কি করা যায়। এতবড় ছুটিটা শুধু বারোয়ারী-তলার আমোদে কাটাবার ইচ্ছে হল না। দলের সকলেরই মন সহরের বাহিরে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল। অতএব ঠিক হল ট্রেনে চাপ-তেই হবে, তা সে যে দিকেই হোক।

এমনি একটা দিনে আমাদের নৃতত্ত্বের কয়েকটী ছাত্র মিলে স্থির করা হল এবার মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। অনেক দিনের বাসনা মণিপুর-ভ্রমণ আমার ভাগ্যে আছে দেখে খুব আনন্দ হল।

১২ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দুপুর-বেলা আসাম মেলে চাপা গেল। কল্‌কাতার লোক,—বাহিরের গাছপালা আর ক্ষেতের দর্শনলোভে বাহিরের দিকে তাকিয়ে রহিলাম। কিন্তু রোদে বেশীক্ষণ ভাল লাগ্‌ল না, অতএব সময় কাটাবার জন্যে আমরা তাস্ পাড়লাম। চমক ভাঙ্গল, গাড়ী যখন পদ্মার বুকে এসে পড়েছে। পশ্চিমে-হেলে পড়া সূর্য্যের নিস্তেজ রোদ আমাদের গায়ে এসে



"ব্রহ্মপুত্র"



মণিপুরী নাগা

পড়েছে—আমরা তাস বন্ধ করলাম। রাত্রি ৮টার সময় পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল করে খাবার নিয়ে বসা গেল। তারপর শয়ন। ছোট গাড়ী আমাদের ঘুমের মাঝে বাংলা ছেড়ে আসামে এসে পড়ল। পরদিন সকালে আমিনগাঁওএ ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে (ষ্টীমারে অবিশ্যি) কামাখ্যা পাহাড়ের তলায় আশ্রয় নিতে হল। একটু বেলায় আসামের গাড়ী ছাড়ে দেখে আমরা স্নানাহার সেরে নিলাম।

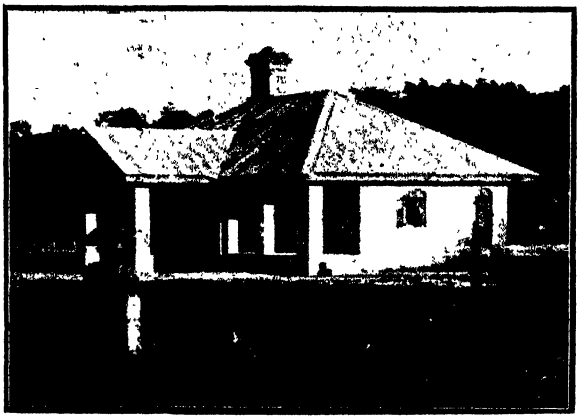
বেলা ১২টায় আসাম বেঙ্গল রেলের ছোট গাড়ীতে চাপা গেল। গৌহাটীর ভেতর দিয়ে গাড়ী চলেছে—এক দিকে ব্রহ্মপুত্র আর এক দিকে খাসিয়া, জয়ন্তীয়া হিল্‌স্। শিলং রোড দেখে মনে পড়ল, শিলং

পিক্‌, লেক্‌ ও চেরাপুঞ্জীর গুহার কথা। ভাবলাম মণিপুর কি এরও চেয়ে সুন্দর?

রেলপথটী প্রায় আগাগোড়া পাহাড় আর বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে,—মাঝে মাঝে পাহাড়ের কোলে ধান-জমি। রাতে যখন দ্বিতীয়ার চাঁদ ঝাউয়ের আড়ালে উঁকি মারছিল, আর পাহাড়ের ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের শরীরে বেশ আমেজের ভাব আনছিল, তখন



'ইম্ফালের বাজার'



বিষ্ণুপুর ডাকবাংলো

এই আসামের পথে রেলে ভ্রমণ বাস্তবিকই রমণীয় করে তুলেছিল।

রাত্রি ১২৷৷০টায় যখন পৃথিবী বেশ শীতল হয়ে এসেছে—গাড়ী আমাদের 'মণিপুর রোড ষ্টেশনে নামিয়ে দিল। ষ্টেশনে বিশ্রাম-ঘর (waiting room) নেই। নিকটে এক ডাকবাংলো আছে, তাতে শুনলাম লোক আছেন। অতএব হিমের রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে ভোরবেলা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার জন্য সব প্রস্তুত হওয়া গেল। একখানা বাস ঠিক করা হল, বাস ছাড়া সাধারণ মোটর এখানে মোটেই থাকে না, শুনলাম। যাহা হউক, শনিবার সকালে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হল মোটরবাসে।

চারি দিক কুয়াসায় ঢাকা, শীতও বেশ বোধ হল। ষ্টেশনে চা পান করে বেশ গরম হওয়া গেল এবং সারাদিনের পথ শুনে পেটটাও ভরে নিতে হল। গেট খোলার সময় বরাবর তাড়া দিয়ে বাস আমাদের ৬-৩০টার সময় রওনা করে দিলে। নিকটে ডিমাপুর থানায় বাস দাঁড়াল পাস্‌পোর্টের জন্য। দরবারের চিঠি দেখিয়ে প্রত্যেকের ৮ আনা দিয়ে পাশ করা হল।

স্থানটীর নাম ডিমাপুর—একেবারে আসামের জঙ্গল। অতএব ম্যালেরিয়ার উপদ্রব এখানকার বিখ্যাত। লোকজন এখানে মন্দ থাকেন না। বাঙ্গালীও কয়েক ঘর আছেন। এখানে দেখবার

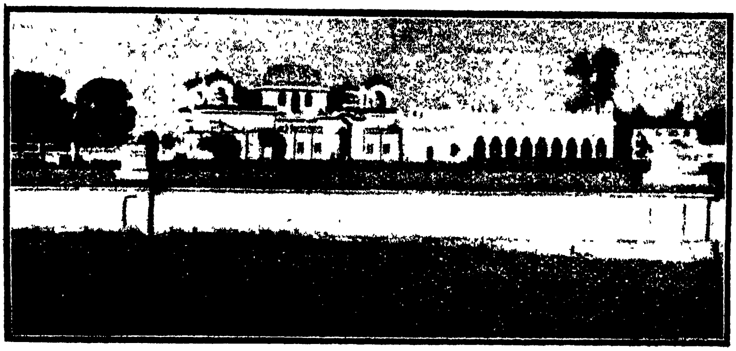


ক্ষেতের কাজে মণিপুরী

একটী জিনিষ আছে, সেটী হচ্ছে বনের ভেতর, রাস্তার ধারেই প্রায়, কয়েকগুলি প্রাচীন মনোলিথ্ (monolith) —এক-প্রস্তর করব। এর নিকটে যেতে একটী বহু-পুরাকালের ফটক পড়ে। স্তম্ভগুলোর গায়ে বেশ খোদাই করা আছে। কিন্তু এগুলি যে কোন্ জাতের, কোন্ সময়ে তৈরী, কে ঠিক করে বলে দেবে? হয় ত বা মহাভারতের অর্জ্জুনও মণিপুর প্রবেশ করবার সময় এই বনানীর ছায়াতলে চিরসুপ্ত মানবগণের সমাধি দেখে থাকবেন। তারই বা ঠিক কি?



'ঢাকা ব্রিজ'



রাজপ্রাসাদ

সরু পিচ্ বাঁধানো, উঁচু-নীচু পথের ওপর দিয়ে আমরা এগোতে লাগ্‌লাম। পথে ধনেশ্বরী নদী পড়ল। তার সাঁকো পার হয়ে আমরা নাগা হিলের দিকে অগ্রসর হলাম। অল্পবিস্তর কুয়াসার ভেতর দিয়ে গাড়ী চলেছে, সামনে আকাশের গা ঘেঁসে পর্ব্বতশ্রেণী, আশে পাশে ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে ধান-জমি। কখনও বাঁশ বন, কলা বন পথের ধারে ঝুঁকে পড়েছে; কোথাও ছোট্ট পাহাড়ের ওপর বন্য লম্বা গাছ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সারা অঙ্গে তার জড়ানো লতানে গাছের পাতা।

৯ মাইল দূরে মণিপুরের পথের প্রথম গেট 'নীচুকার্ড গেট' (Nichucard Gate)এ এসে গাড়ী দাঁড়াল। ৭টায় গেট খুল্‌লে গাড়ী ছাড়ল। খানিকটা যাবার পর গাড়ী পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগল। বিশাল নাগা হিলের অঙ্গ বেয়ে ছোট্ট বাসখানি চল্‌তে লাগ্‌ল। পাহাড়ের পাদদেশে উপত্যকার ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে সরু 'দয়াং' নদী।

খানিক রাস্তা-ভোর নদীটিকে প্রায় আশে পাশে দেখা যায় এবং বার পাঁচেক বোধ হয় পার হতে হয়। নদী না থাকলে বোধ হয় মণিপুরের পথ এত



লোক্‌টাক্‌লেকের অন্তস্থিত পার্ব্বত্য-দ্বীপাংশ

সুন্দর লাগত না। কখনও পথটী একেবারে নদীর গায়ে এসে মিশেছে, তখন নদীর পাথরের টুকরোগুলির ভিতর

দিয়ে জলের স্রোত ও শব্দ দুই বেড়ে গেছে, কখনও পারের পাহাড়ের অঙ্গ নদীর ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তখন পাথরের শিরগুলি তার বেরিয়ে পড়েছে।



'কোহিমা'

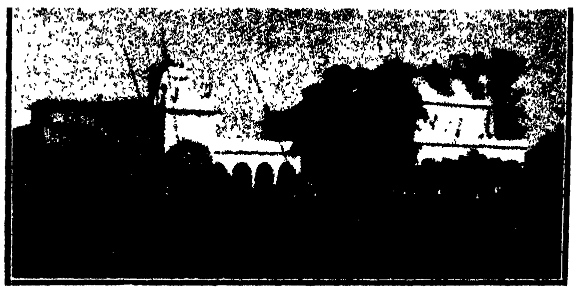
১৩৩ মাইলের বর্ণনায় হয়ত পাঠকপাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি হতে পারে, কিন্তু মণিপুর অপেক্ষা মণিপুরের পথটাই বেশী উপ.ভাগ্য—তাই তার বর্ণনা না দিলে আমার কাহিনীই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১০ঘণ্টা ব্যাপী এই সারাদিনের পথ-ভ্রমণ একটুও কষ্টকর লাগেনি এই পার্ব্বত্য পথের দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে; এবং হেমন্তের বাতাস আর রোদ এই পার্ব্বত্য পথে আমাদের শরীরে এতটুকুও কষ্ট দেয় নি।



'পাহাড়ের কোলে মণিপুর'

প্রায় পঞ্চাশ মাইল এসে ৯-৩০টার সময় আমরা কোহিমাতে পৌছিলাম। কোহিমা 'নাগা হিল' জেলার হেড্‌কোয়াটার—ইংরেজদের অধীন। কিছু দুর থেকে স্বাধীন মণিপুর আরম্ভ। স্থানীয় নাগাদের দেখতে পাওয়া গেল—তাদের গালে গোলাপী রং, অঙ্গে পাহাড়ী শক্তি। কয়েকজনের হাতে বন্দুক দেখতে পাওয়া গেল। এদের যোদ্ধার বেশে, মাথার টুপি থেকে পায়ের পোষাক পর্য্যন্ত বিশেষত্ব পূর্ণ। নাগাদের জন্তু শিকারের বহর দেখে বিশ্বাস হয় যে এরা আগে মানুষের মাথা নিয়ে বেড়াত,—head-hunting করত।

কোহিমা প্রায় ৫ হাজার ফিট উঁচু,



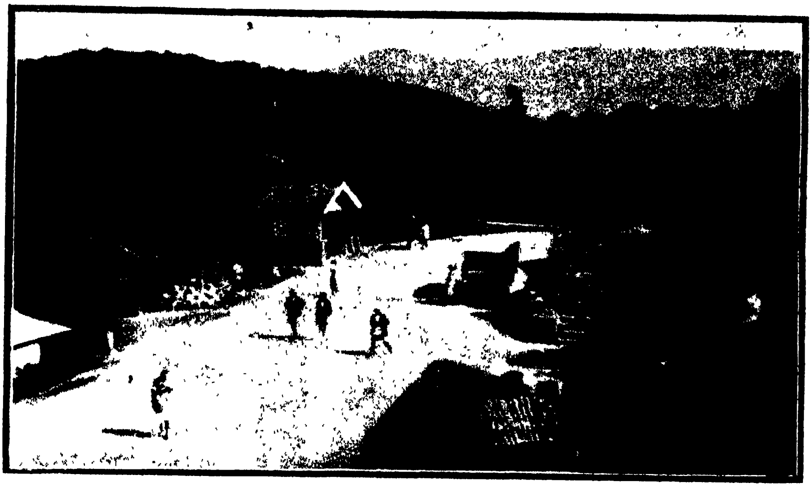
"শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির"

তাই বেশ ঠাণ্ডা বোধ হল। সহরটী বেশ বড়ই লাগল। বাড়ী ঘরদোরের সংখ্যাও বেশী,—থানা, ক্লাব-হাউস্, কাছারী, ক্যান্টনমেণ্ট সবই আছে। কাছাকাছি নাগাদের বস্তিও অনেক দেখা গেল।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে বাস আমাদের কিছুক্ষণ ছুটী দিলে, মাঝপথের মোটর ষ্টেশন 'মাও'তে এসে। পাহাড়ের গায়ে এমন সুন্দর স্থানে মাও জায়গাটা কোহিমার চেয়েও ভাল লাগল। মাও নাগাদের একটা মস্ত গ্রাম, মোটরেরও বড় ষ্টেশন। দুতিনজন বাঙ্গালী

এখানেও দেখা গেল। পাহাড়ের ওপর ডাকবাংলো, আর একটা মাড়োয়ারীর পুরীর দোকান। আমরা চা ও পুরী এখানে খেয়ে নিয়ে সে দিনের মত মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপ্ত করলাম।

১২-১৫তে গেট খুল্‌ল, দুদিক্‌কার সমস্ত আটকান গাড়ী ছেড়ে দিতে। ঘণ্টা পড়লে আগে বেরোল ডাক-গাড়ী; তার পর সব। অতএব আবার বাসে এসে মাও থেকে রওনা হওয়া গেল। এবার গাড়ী পাহাড় থেকে ক্রমশঃ নামতে লাগল। ইম্ফাল নদীর পাশ দিয়ে আমরা চলেছি—বেলা তখন পড়ে এসেছে। উৎসুক মন কেবলই ভাবছে 'আর কতদুর', 'সেই মণিপুর'। মাইল-ষ্টোনে পথ্ গুণতে গুণতে চলেছি—



'মাও'—গেটের আগে R. M. S দাঁড়িয়ে আছে

তবু মণিপুর কই? মণিপুর এল, বেলা তখন চারটে।

মণিপুর উপত্যকায় রাজধানী ইম্ফালে পৌছিলাম বিকেল ৫টায়, কল্‌কাতা থেকে বাহান্ন ঘণ্টা পথ ভেঙ্গে। বন্ধুবর সর্ব্বজিৎ সিংএর বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম, বাজারের নিকটেই। কাপড় চোপড় ছেড়ে, চা, খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা বাজারের দিকে। বাজারের অর্থে শুধু স্থায়ী দোকান নয়, নিত্যকার হাটও তখন বেশ জমে এসেছে। শুনলাম প্রত্যহ এই হাট বিকেল থেকে বসে, আর রাত্তিরে ভাঙ্গে। মস্ত হাট, রাত্তিরে সেদিন এর হদিস পাই নি, এত বড়। গম্ গম্ করছে ক্রেতা-বিক্রেতার গোলমালে। গন্ধকে ভেজান কাঠি জ্বালিয়ে জিনিষ বেচতে বসে গ্যাছে মণিপুরী মেয়েরা, খালি গায়ে। খ্যাঁদা আর তেলক-কাটা এই মেয়েদের কথা এক বর্ণও বোঝা যায় না। যা হোক, বন্ধুবরের সাহায্যে কিছু জিনিষপত্র কেনা হল—এ দেশের তুলনায় ওখানে অনেক কিছু সস্তা বলেই মনে হল। আসামের অন্য অন্য স্থানের মত এখানেও কলা, কমলালেবুর আমদানী বেশ। শুঁটকী কইমাছ থেকে, ভাল ভাল ও-দেশীয় তাঁতে-বোনা বেড কভার, পর্দ্দা, চাদর সব রয়েছে দেখা গেল। বাজার ঘুরে বাড়ী ফিরে



মণিপুরী স্ত্রীলোক

খাওয়া-দাওয়া সারা হল। তার পর সারাদিনের ক্লান্তি ঘুচাবার জন্যে বিছানায় শুয়ে লেপ মুড়ি দেওয়া গেল।

রবিবার সকালে সহর দেখ্‌তে বেরোন হল। চতুর্দ্দিকে পাহাড়—মাঝখানে এই নাতিদীর্ঘ ইম্ফাল। নদীটি একে বেঁকে সহরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। স্থানে স্থানে তার ওপর সেতু তৈরী করা—সেকেলে ধরণের খড়ের চালে ঢাকা। কলের জল, বিজলী আলো, পো: এণ্ড্ টেলিগ্রাফ আপিস, ক্যান্টনমেণ্ট, রাজবাটী, পোলো গ্রাউণ্ড সবই আছে দেখলাম। পথগুলিও মন্দ নয়—দুপাশে সারি সারি বিলাতী ঝাউ আর বাগানওয়ালা বাড়ী। এখান থেকে কতকগুলি পথ আছে শীলেট, শিলচর ও বর্ম্মাসীমান্ত প্রভৃতি স্থানে যাবার।

মণিপুরের মহারাজার প্রাসাদ পড়ল সহরের এক প্রান্তে। রাজপ্রাসাদের কম্পাউণ্ডের ভেতর ৺গোবিন্দজীর মন্দির—মাথায় দুটী সোণালী গম্বুজ। প্রাসাদের পেছন দিকে মহারাজার নিজস্ব পোলো-গ্রাউণ্ড। এখানকার পোলো খেলা যে বিখ্যাত তা এই মাঠ দেখলেই বোঝা যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় মহারাজ-ভবনে আমরা প্রবেশ করি নি; কারণ, সেই সময়ে মহারাজার মেয়ে মারা যান।



হ্রদের কিনারায় "মইরাং" হাট

বিকেলে আমরা গেলাম বাবুপাড়ার দিকে, যেখানে বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা থাকেন। ষ্টেটের রেজিষ্ট্রার, স্কুলের শিক্ষক, ওভার-সিয়ার ও পুলিশ-কর্ম্মচারী কয়েকজন



"কুকি বালিকাদ্বয়"

বাঙ্গালী। তাঁরা সব এই পাড়ায় থাকেন। কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। তাঁরা তাঁদের স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, থিয়েটার-হল সব দেখালেন। সুদূর মণিপুরে এসেও যে তাঁরা এমন সুন্দর আছেন, দেখে বাস্তবিকই আনন্দ অনুভব করতে হল। বাবুপাড়ার রাজপথ ছাড়িয়ে আমরা পিচের রাস্তায় পড়লাম—তার পাশে-পাশে, আদালত, ট্রেজারী, পলিটিকেল এজেণ্ট ও দেওয়ান সাহেবের বাড়ী। আরও খানিকটা এগিয়ে বাজারের নিকটে সেনা-নিবাস।

পরদিন সোমবার সকালে আমরা চলে গেলাম এগিয়ে আরও ১৮ মাইল, সহর থেকে বিষ্ণুপুর বলে একটী গ্রামে। বিষ্ণুপুরের

নিকটেই মণিপুরের বিখ্যাত লোগ্‌টাক্ লেক্। জায়গাটার নির্জ্জনতা বড় ভাল লাগ্‌ল। গাড়ী একেবারে ডাকবাংলোর দোরগোড়ায় এনে ফেল্‌লে। একেবারে পাহাড়ের কোলে আমরা আশ্রয় পেলাম। পাহাড়টা হচ্ছে 'লুসাই হিল'; নিকটেই এর গা বেয়ে একটা ছোট্ট নদী লোগ্‌টাকে গিয়ে মিশেছে। নদীর ওপর ঝোলা পোল দিয়ে, ডাকবাংলোর সামনের হাঁটা পথটা চলে গেছে শিলচর—শ'খানেক মাইলের ওপর।

এবার লেকের আর মণিপুরীদের বিষয়ে কিছু বলে আমার কাহিনী শেষ করব। একদিন, কবে মনে নেই, খুব প্রত্যূষে আমরা ভীষণ কুয়াসার ভেতর লোগ্‌টাকের কিনারায় এসে দাঁড়ালাম। ছোট ছোট বোটই বেশী। তাতেই চেপে আমরা হ্রদের ওপর বেড়াতে বেরোলাম—উদ্দেশ্য কিছু শিকার করা; কারণ বন্ধুবর সর্ব্বজিৎ বন্দুক এনেছিলেন। সারা হ্রদটা কচুরিপানায় ভরা—এতবড় হ্রদ, যার হদিস্ আমরা ৬ ঘণ্টা ঘুরেও পেলাম না, তাকে কচুরীপানায় এত হতশ্রী করে রাখবে আশা করি নি। যাই হোক, কুয়াসা ভেদ করে আমরা এগোতে লাগ্‌লাম। খানিক দূরে কয়েকখানি ভাসমান জেলেদের কুটীর, আর মাঝে-মাঝে ছোট দ্বীপ। মাঝামাঝি এসে অসংখ্য পাখীর ঝাঁক মিল্‌ল—রাজহাঁস থেকে বন্যকুক্কুট পর্য্যন্ত। হ্রদের মাঝখানে কয়েকটা পর্ব্বতশ্রেণী মাথা উঁচু করে আছে, তার একটাতে আমরা গেলাম। এই পাহাড়ে দ্বীপগুলিতে কয়েকটা পল্লী আছে—সমস্ত পল্লীতে মণিপুরীর বাস। পাহাড়ের কোলে জল ভারী সুন্দর লাগ্‌ল। কুয়াসার জন্যে ভাল ছবি তোলা হল না।

লোগটাকের আর এক কিনারায় মইরাং, বিষ্ণুপুর থেকে আট মাইল দূরে। অনেক লোক থাকে এখানে এবং এক কালে এই মইরাংই না কি মণিপুরের রাজধানী ছিল। বিষ্ণুপুর পল্লী এই মইরাং থানা ও পোঃ অফিসের এলাকায় পড়ে, তাই বাড়ীতে চিঠি পাঠাতে বেশ মুস্কিল হত। কখনও কখনও বাসের ড্রাইভারকে দিয়ে সহরে পোষ্ট করানো হত।

মণিপুরে আমরা তিন রকম লোক দেখতে পাই—'নাগা', 'কুকী' ও মীথি, যাদের আমরা বলি মণিপুরী। সবার বিষয়ে বলতে গেলে হয় ত পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে; তাই শুধু মণিপুরীদের কথাই বলি। এদের হাব ভাব পার্ব্বত্য আসামীদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এদের ধর্ম্ম হল বৈষ্ণব, রাজা হতে প্রজা পর্য্যন্ত। কুসংস্কার ও অনেক রকম দেবতারও মানত করা এদের ভেতর অনেক আছে। 'সেনামিহি', 'লামলাই' প্রভৃতি শক্তি ও স্থানীয় দেবতার ভয় এদের খুব। এ ছাড়া শ্রীগোবিন্দজীর পূজা সকলেরই করে থাকে, মন্দিরে।

মণিপুরের অধিবাসীরা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে নাগা, কুকীর তুলনায় সভ্য এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন। পুরুষেরা প্রায়ই বাঙলা ধাঁচে কাপড় পরেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা বুকে আঁটা, ডোরা লুঙ্গী, হাঁটু পর্য্যন্ত ও রঙ্গীন বা সাদা ওড়না ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব বেশী, সকলেই পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জ্জন করে; পর্দ্দা ও সতীত্বের শাসন কম। বিবাহবিচ্ছেদ (divorce) চলে; আবার পুরুষে একাধিক বিবাহও করতে পারে। বেশীর ভাগই মণিপুরী পুরুষের ২।৩টা করে স্ত্রী থাকে এবং সেই স্ত্রীরা তাদের স্বামীকে খাওয়ায়। বর্ম্মার নিকট বলেই বোধ হয় পুরুষেরা একটু কুঁড়ে, কিন্তু নারীরা কর্ম্মপ্রবণ।

অঙ্গশ্রীর মধ্যে এদের ছোট টানা চোখের সৌন্দর্য্য আছে—রং ময়লা নয়, হল্‌দেটে ফরসা। কুমারী মেয়েদের চুল বব্ করে ছাঁটা; বিবাহ হবার পর আর কাটতে দেয় না। সৌষ্ঠবের মধ্যে পুরুষের দেহ বেশ শক্ত; কিন্তু মেয়েদের দেহ অত খাটলেও মোটেই আঁটসাট নয়। পায়ে জুতো মেয়েপুরুষ বেশী ব্যবহার করে না। বৈষ্ণবী বলে সকলেরই গলায় মালা;—মাছ মাংস খায় না। মাংস্ ত মোটেই নয়; তবে শুট্‌কি, কই মাছ কেউ কেউ খায়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদেরই বৈচিত্র্য বেশী বলে, তাদের চেহারার নিদর্শন একটা ছবিতে দিলাম। কুকী মেয়েরাও ধরেছিল তসবীরের জন্য, তাও সঙ্গে রহিল। এদের পোষাকে মৌলিকত্ব নেই—মণিপুরীদের ছাঁটেই করা।

মণিপুরের নৃত্যের খ্যাতি শুনেছিলাম, কিন্তু দেখবার সে রকম সুবিধে হয় নি। তাদের বিশেষ পরিচ্ছদ পরে নাচই নাকি খুব সুন্দর, এবং সে নাকি রাস ও বিশেষ কোন উপলক্ষ না হলে হয় না। তাই আমাদের খুবই হতাশ হতে হল। শুনলাম রাজবাড়ীতে খুব জাঁকজমক করে

রাসলীলা হয়, কিন্তু রাস পর্য্যন্ত থাকা আমাদের সম্ভব হয়ে উঠল না। শুধু একদিন নয় পূর্ণিমার ছ দিন আগে হতে উৎসব আরম্ভ হয় এবং রাসপূর্ণিমার দিন উৎসব শেষ হয়। মহারাজার সামনে মণিপুরী মেয়েদের নৃত্য দেখবার খুব লোভ হয়েছিল; কিন্তু অত দিন থাকা কি করে চলে,—ইউনিভার্সিটির ক্লাস খুলে যাবে তার আগে।

অতএব ১লা অগ্রাণ মঙ্গলবার ফেরবার দিন ঠিক হল। আগের দিন রাত্তিরে ওখানকার রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত মনোমোহন কুণ্ডু মহাশয়ের বাড়ীতে একটা নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল। পরদিন সকালবেলা আমাদের host শ্রীমান সর্ব্বজিৎ সিংকে অনেকগুলো ধন্যবাদ জানিয়ে বাসে চাপা গেল। কুয়াসার ভেতর ইম্ফাল ছেড়ে গাড়ী পাহাড়ের দিকে চলল—আমাদেরও আমোদে গলা দিয়ে গানের স্রোত বহিতে লাগল।

বুধবার পথে ব্রহ্মপুত্রর ধারে আমিনগাঁওতে এক পিক্‌নিক করে রাত্তিরে শিলং মেল চড়ে পরদিন সকালে কল্‌কাতা—সেই জনাকীর্ণ কল্‌কাতায় ফেরা গেল।

পত্র

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল, ডি-লিট (পেরিস)

হাফিয হইতে। মূলের ছন্দের অনুকরণে)

আয্ খুনে। দিল্ নভিশ্‌তম্। নয্ দীকে। য়ার নামাঃ

লিখিনু দিলের খুনে বঁধুরে পত্রখানি,—
"পলকে বিয়োগ তব প্রলয়- মতন মানি।
কত না করি পরখ, হ'ল না লভ্য কিছু
পরখে পরখ-করার কেবলি পাইনু হানি।
তোমারি বিচ্ছেদে গো নয়নে চিহ্ন শত,
নিশানি নয় কি চোখে অঝোর এ চোখের পানি?
হকীমে জিজ্ঞাসিনু, 'জান কি বঁধুর ধারা?'
'দূরেতে নরক জ্বালা, নিকটে চোখ রাঙানি।'
বলিনু, 'খাই গালি তার পিছনে বেড়াই যদি;'
বলিল, 'খোদার কসম! গালি যে প্রেমের বাণী।'
ভিতরে দগ্‌দগি ঘা, মুখেতে কাজ কি ব'লে?
দেখ না কলম-চোখে ঝরিছে কতই পানি।
মলয়া ঘোম্‌টা খুলে দেখা'ল আমার চাঁদে
যেন গো মেঘ সরায়ে বেরুল সুরুজ খানি
পরাণী বদল দিয়ে পেয়ালা হাফিয মাগে,—
পিয়াসী পাত্রে তব পিয়িতে মেহেরবাণি।"

দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দামোদরের সমস্যা

নদীয়া জেলার পালঘাটি গ্রামের থার্ড মাষ্টার দামোদর দত্ত মাত্র ত্রিশ টাকা বেতন পাইত। দামোদরের বিদ্যা-বুদ্ধির মূল্য অবশ্য ৩০৲ টাকার অনেক বেশী; অন্ততঃ তাহার সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ও অপর পাঁচ-জনের কাছেও তাহা অনেক সময়ে প্রতিপন্ন করিত। কিন্তু বাজার-দর খারাপ। তা' ছাড়া কতকগুলি বিশিষ্ট কারণের ফেরে পড়িয়াই দামোদরকে এই সামান্য স্কুল-মাষ্টারিতে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। কারণগুলি এই:—দামোদরের পিতা বাঞ্ছারামের অবস্থা কোনকালেই ভাল ছিল না; পৈতৃক বিঘা সতের জমীই ভরসামাত্র ছিল। কিন্তু সংসারের এই আর্থিক অভাব মিটাইতেই বোধ হয় বাঞ্ছারাম দুই'টি দার-পরিগ্রহ করেন। দামোদর প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র পুত্র; কিন্তু বাঞ্ছারামের দ্বিতীয় সংসারটি ক্রমে সংখ্যাবহুলই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটি একটি করিয়া দ্বিতীয় পক্ষে তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছিল। দুইটি ছেলে হইবার পর—তখন দামোদর কলিকাতায় কলেজে বি-এ পড়িতেছিল—বাঞ্ছারাম তাহাকে লিখিয়া জানান যে, দামোদরের বিবাহে প্রাপ্ত টাকা শেষ হইয়াছে, কাজেই তাহাকে পড়ার খরচ দেওয়া অসম্ভব। বলা বাহুল্য ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বেই দামোদরের বিবাহ হইয়াছিল। ইহাতে অবশ্য দামোদর আর পড়াশুনায় অগ্রসর হইতে পারিল না। কেমন করিয়া আর পড়িবে? একেই বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত পাঠ্য-পুস্তক হইতে তাহার মন একটু একটু করিয়া অপসৃত হইতেছিল; তাহার উপর এই অলঙ্ঘনীয় বাধা। দামোদর কলেজ ত্যাগ করিয়া দেশের বাড়ীতে আসিয়া বসিল। কিন্তু বাড়ীতেও আহারের অপেক্ষা লোকসংখ্যা অধিক হওয়াতে তাহার সুস্থির হইয়া বসিবার উপায়ও ছিল না। বাঞ্ছারাম ও দামোদরের বিমাতা, ইঁহারা তাহাকে বসিয়া থাকার বিরুদ্ধে অনেক প্রবল যুক্তি দেখাইলেন। শেষে বাঞ্ছারামই গ্রামের স্কুলের সেক্রেটারি অতুল চাটুয্যেকে ধরিয়া, অনেক উপরোধ অনুরোধ করিয়া, দামোদরের জন্য থার্ড মাষ্টারির কাজটি আদায় করিয়া দেওয়ায়, দামোদরকে বাধ্য হইয়া তাহা বজায় রাখিতে কষ্ট করিতে হইতেছে।

তবে বাড়ীতে শান্তি নাই। বাঞ্ছারামের দ্বিতীয় পক্ষ প্রবল; প্রথম পক্ষ আবার সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। দামোদরের মাতাঠাকুরাণী—জননী তারাসুন্দরী—অত্যন্ত শিথিল প্রকৃতির লোক ছিল। তাহার নিজের স্বার্থ সুবিধা অধিকার সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার ধারণা তাহার থাকিলেও, সে-সমস্ত রক্ষা করার বা দাবী করার মত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি তা'র কখনো ছিল না। সপত্নীরূপ প্রত্যক্ষ ও সাবয়ব উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও, বাক্য ব্যতীত কার্য্যে তা'র উৎসাহ বড় দেখা যাইত না। দ্বিতীয় পক্ষ—দুর্গারাণীর প্রকৃতি ঠিক ছিল বিপরীত; বাক্য ও কার্য্য দুইই সে সমান নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতে পারিত। কাজেই বাঞ্ছারাম যে স্বাভাবিক কারণেও দ্বিতীয় পক্ষের উৎসাহে সেইদিকেই ঝুঁকিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এই অবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র-কন্যাদেরও যে দাবী ও জোর একটু সরব ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও স্বাভাবিক। দামোদরের বৈমাত্র ভাইগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি—সীতারাম, হরিপদ বড় হইয়া উঠিয়াছিল। সীতারামের বয়স প্রায় ১৬; সে দামোদরের চেয়ে ৫।৭ বৎসরের ছোট; গ্রামের স্কুলেই পড়ে বা পড়িবার নাম করিয়া যায়। দ্বিতীয়টির বয়স মোটে ১৩; সে কিছুই করিতে চাহে না। আগে পাঠশালায় যাইত—কিন্তু গুরুমহাশয়ের সহিত দ্বিতীয় ভাগ না শিশুপাঠ কি একখানা পুস্তকের পাঠ্য-বস্তু লইয়া মতান্তর হওয়ায় আর যায় না। দুর্গারাণী বলে, দোষটা গুরুমহাশয়েরই। মতান্তর যাহা

ঘটিয়াছিল তাহা বিশেষ কিছু নহে; তবু গুরুমহাশয় না কি বেত্রচালনা করিয়াছিলেন। অথচ বিষয়টি সামান্য; গুরুমহাশয় যাহাকে পাঠ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, হরিপদ তাহাকে অপাঠ্য বিবেচনা করিয়াছিল, কেবল এইটুকু মতান্তরে অমন ক্ষমতার ব্যভিচার করা গুরুমহাশয়ের উচিত হয় নাই। কাজেই হরিপদ এখন ছিপ্ হাতে করিয়া পুকুর পাড়ে মৎস্য শিকারে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার পরে কন্যা শ্যামা। শ্যামার বয়স প্রায় ১১ বৎসর। সে মার কাছে তিরস্কার খায় ও পাড়ার ও গ্রামের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লোকনির্বিশেষে ও বিনা পুরস্কারে তাহা প্রচার করিয়া বেড়ায়। ছোট বৈমাত্র ভাইটি এখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই; কিন্তু বাড়ী শুদ্ধ সকলের মতে তাহার বুদ্ধির কাছে না কি অনেক বৃদ্ধও পরাজয় না মানিয়া পারে না। এতগুলি অসামান্য প্রাণীর চেষ্টা ও ব্যবহার যে একটু অশান্তির কারণ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ যখন আবার বাঞ্ছারামের মতে দামোদরের মাহিনার ৩০৲ টাকার উপর বাঞ্ছারামেরই পূর্ণ দাবী আছে, তখন দামোদরকে অন্তত ২৫৲ টাকাও পিতৃকরে সমর্পণ করিয়া অশান্তি ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু দামোদরের অশান্তির আরও গূঢ় কারণ ছিল। তাহার স্ত্রী রাধারাণী—বিবাহের পর একবার মাত্র স্বামীর বা শ্বশুরের ঘর করিতে আসিয়াছিল; প্রায় মাস ছয় সাত ছিলও। কিন্তু তার পর সেই যে পিত্রালয়ে গিয়াছে আর প্রত্যাবর্ত্তনের নামও করে না। দামোদর লোক মারফত ২।৩ খানা চিঠিও দিয়াছিল, কিন্তু কোনও জবাব পায় নাই। নিতান্ত পার্শ্বের গ্রামেই শ্বশুরালয় হইলেও, দামোদরের যাইবার উপায় ছিল না। কেমন লজ্জা করিত। শ্বশুরবাড়ীতে যাওয়ার সংবাদটা সর্ব্বদাই সীতারাম ও শ্যামার কল্যাণে গ্রামময় এত বর্ণ-বিচিত্র হইয়া ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল যে, সে কথা মনে হইলেই দামোদরের সপ্রতিভ প্রকৃতি কুণ্ঠিত হইত। তাহার বিবাহের পর প্রথম যেবার সে শ্বশুরবাড়ী যায়, সেবারে আর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তাহার দুই দিনও তিষ্ঠান দায় হইয়াছিল। ভাগ্যে তখন সে কলিকাতায় পড়িত; তাই কলিকাতার মেসে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এখন ত' ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়াছে যে, দামোদরের শ্বশুর নিতাই ঘোষ না কি আর বাঞ্ছারামের সংসারে কন্যাকে পাঠাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ইহার উত্তরে বাঞ্ছারামও না কি প্রচার করিয়াছে, যে নিতাই ঘোষ কন্যাকে তাহার স্বামীর ঘরে যতক্ষণ না পৌঁছাইয়া দিয়া এই ব্যবহারের জন্য জবাবদিহি করিবে, ততক্ষণ পুত্রবধূকে আনা হইবে না। দামোদর সমস্তই শুনিতে পাইত। রাধারাণীও যে তাহার পত্রের উত্তর না দিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিত। অথচ স্ত্রীকে না লইয়া চলে কি করিয়া? সংসারে তাহার মন বসে না; সেখানে তাহার আপনার বলিতে কিছু নাই। এক জননী;—তা' জননীরও ত' আচার ব্যবহার তাহার পক্ষে খুব প্রীতিপ্রদ নহে। তা' ছাড়া, স্ত্রী এক বস্তু! বিশেষতঃ যখন কিছুদিন তাহার সহিত একত্র সংসার করিয়াছে, মিশিয়াছে ও দু'জনের ভিতর প্রণয় ঘটিয়াছে! দামোদরের নিকট সমস্ত জগৎটা সেই স্ত্রীর অভাবে বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছে; কোন কাজেই আর স্পৃহা নাই। তার উপর স্কুলে ও গ্রামে সকলেই তাহাকে এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিয়া তাহার মনকে আরও অশান্ত করিয়া তুলে। দামোদর সমস্যায় পড়িল, কি করিয়া স্ত্রীকে আনা যায়?

অনেক কিছু চিন্তা করিয়া শেষে প্রথমে সে কথাটা পাড়িল মা'র কাছে। তারাসুন্দরী তিন রকম বিভিন্ন মত প্রকাশ করিল। প্রথমে বলিল, "মেয়ে না পাঠায়, তা'দের মেয়ে তা'দের কাছে থাক্। তোর আবার বিয়ে দিচ্ছি, দেখ্।" পরক্ষণেই মনে পড়িল নিজের কথা; সপত্নী লইয়া ঘর করা কি সহজ ব্যাপার? কহিল, "পাঠাবে না কি রকম? বিয়ে দিতে পেরেছে, মেয়ে পাঠাবে না ত কি? আদালত কোর্ব্ব না?" কিন্তু আরও ভাবিয়া, আদালত করার উৎসাহ তার হ্রাস পাইল। শেষে রায় দিল, "তা' এখানে আর কি দেখে পাঠাবে? আমার কি চাল আছে না চুলা আছে? আমারই দুর্ভাগ্যে তোর এই লাঞ্ছনা। তা' একবার না হয় সেখানে যা'; অন্ততঃ কেন পাঠাচ্ছে না তা'ও ত জান্তে পার্‌বি!" দামোদরের মনের ভিতর এই ইচ্ছাটাই কয়দিন হইতে প্রবল হইতেছিল। সে বলিল, "আমিও তাই ভাব্‌ছি, মা। কিন্তু বাবা নাকি বলে বেড়িয়েছে যে

নিতাই ঘোষ মেয়ে পৌঁছে না দিলে, আর কৈফিয়ৎ না দিলে, তা'কে আন্‌বে না। যদি রাগ করে?"

তারাসুন্দরী রাগিয়া উঠিল, "রাগ করে, কর্ব্বে। এমন কথাও ত শুনি নি। নিজের বেলায় বুঝি মনে থাকে না?" তা'র পর তা'র প্রকৃতির নির্ভরশীলতা প্রকট হইল। বলিল, "একবার না হয় বলে যাস্ যাবার সময়।"

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় দামোদর বাঞ্ছারামের কাছে কথাটা পাড়িতেই, বাঞ্ছারাম একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "না, খবরদার না। কিছুতেই তোমার যাওয়া হবে না। এত তা'দের কিসের স্পর্দ্ধা? আমার ছেলেকে, আমাকে, অপমান করা? তুমি আবার যেতে চাইছ কোন্ লজ্জায়?"

দুর্গারাণীও যোগ দিল, "আজকালকার ছেলেদের লজ্জা-সরম কি কিছু আর আছে? কেন তুমি ওকে বাজে কথা বল্‌ছো? ওদের নিজেদের সম্ভ্রমও নেই; বাপ পিতা'ম'র সম্ভ্রমও রাখ্‌তে জানে না।" দামোদর বিব্রত হইয়া পড়িল। অনুযোগ করিল, "কিন্তু ব্যাপারটা কি একবার সন্ধান করা ত উচিত।" আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই দুইজনের সম্মুখে কেমন তাহার বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল এবং অদূরে শ্যামার মুখে হাসি দেখিয়া স্তব্ধ হইল।

দুর্গারাণী বলিল, "ব্যাপার আবার দেখতে যাবে কি? ব্যাপার ত দেখাই যাচ্ছে। তা'রা মেয়ে পাঠাবে না। এখানে নাকি মেয়ের অনাদর হয়! বাপ রে! দেখে আর বাঁচি না।"

বাঞ্ছারাম বলিল, "অনাদর হয় হবে। আমার সংসারে এলে যেমন ইচ্ছে সেই রকম আমি রাখবো। জমিদার দেখে বিয়ে দিতে পারে নি? মেয়ে হাতী ঘোড়া হাওয়াগাড়ি চড়ে বেড়াত!"

শ্যামা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "তা' দাদার ইচ্ছে হয়েছে বৌদিকে দেখতে, যাক্ না বাপু!" দুর্গারাণী সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

দামোদর আর সেখানে দাঁড়াইল না। একেবারে বাড়ীর বাহিরে গিয়া হাঁফ ছাড়িল, 'উঃ! ঐটুক মেয়ে কি রকমই না কথা শিখিয়াছে। আচ্ছা করিয়া উহার কাণ মলিয়া দু' গালে দু' চড় দেওয়া হয়, তবে ঠিক হয়!' তাহার ক্রমশঃ রাগটা পড়িল বাঞ্ছারামের উপর। "এ কি জিদ্! তাহার স্ত্রী আসে না আসে সে বুঝিবে; পরের ইহা লইয়া ভাবনা কিসের? শুধু ভাবনা? সে স্ত্রী আনিবে, কি না আনিবে—এ বিষয়ে হুকুম করিবে অপরে, আর সে তাহা স্বীকার করিয়া তাহা পালন করিবে? কেন? যদি এখন নিতাই ঘোষ ২।৪ বৎসরই মেয়ে না পাঠায়? যদি একেবারেই না পাঠায়? দামোদর কি করিবে? পুনরায় সে বিবাহ করিবে? তাহার পর? বাঞ্ছারামের পুত্রও বাঞ্ছারামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে, আর সমান ফলভোগ করিবে? দুইবার বিবাহ? প্রথম প্রণয়ের পর আবার কি প্রণয় হয়? ও-সব অনাচার হইবে না; দামোদর প্রথম প্রণয়ের অবমাননা করিতে পারিবে না। কিছুতেই নয়। কিন্তু কর্ত্তব্য কি এখন?" দামোদর উভয় সঙ্কটে পড়িল। তাহার সমস্যা জটিল, কি করিয়া সমাধান করিবে? দিক্ নির্ব্বিশেষে দামোদর চিন্তাকুল হইয়াই পথে চলিতেছিল; ইচ্ছা নির্জ্জনে বসিয়া এই প্রশ্নের একটা মীমাংসা করিবে। কিছুদূর যাইবার পর দেখিল হরিপদ ছিপ হাতে ফিরিতেছে। দামোদরকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া, কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "ভূতো দিয়ে গেছে।"

'ভূতো' দামোদরের শ্বশুরবাড়ীর ভৃত্য। ভুতোর নাম শুনিয়া দামোদরের বুকের ভিতর রক্ত নাচিয়া উঠিল। দামোদর চিঠিখানি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কখন, কোথায়, দিয়ে গেল?"

হরিপদ তখন প্রায় দশ হাত দূরে গিয়াছে; সেইখান হইতেই উত্তর দিল, "দুপুরে; আমি খেয়ে যখন বেরুচ্ছিলুম। তুমি ইস্কুলে গিছলে, তাই আমি রেখেছিলুম।"

দামোদর চিঠিখানি নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিল। ইহা তাহার স্ত্রীর নহে। খোলা কাগজের টুক্‌রাতে নিতান্ত অস্পষ্ট জড়ান হাতে লেখা। ইহা নিতাই ঘোষের চিঠি। ভাঁজ খুলিয়া দামোদর পড়িল, "কল্যাণবরেষু, বাবাজীবন, বহুদিন তোমার কুশল খবর পাই নাই। পত্রপাঠ পার ত সোণাপুরে একবার আসিবার চেষ্টা করিবেক।—ইতি, নিতাই ঘোষ।"

চিঠি পড়িয়া দামোদর পিছন ফিরিয়া দেখিল যে হরিপদ

বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। তাহার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল, যে এই চিঠি অন্য কেহ দেখিয়াছে কি না। কিন্তু সে বিষয়ে উপস্থিত কোনও সংবাদ পাইবার উপায় নাই। হরিপদ'র সময়ের অভাব। তাহাকে পাওয়াও মুস্কিল। তবু প্রশ্নটা সময়ান্তরে একবার করিবে, সে স্থির করিল।

নিতাই ঘোষের চিঠি তাহার মনে অত্যন্ত লোভ জন্মাইয়া দিল। যাহাই হউক, সে একবার যাইবেই। রাধারাণীকে না পাইলে, না দেখিলে তাহার কিছুতেই চলিবে না। মনে মনে সে একটি মতলব স্থির করিয়া লইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"কন্যা পাঠাইব না"

উপরি-উক্ত ঘটনা যে সপ্তাহে ঘটে, তাহার পরের সপ্তাহের শনিবার স্কুলের ছুটি হইতেই, দামোদর তাড়াতাড়ি বাড়ী, আসিয়া বাঞ্ছারামকে বলিল যে, সে বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতা যাইতেছে, সোমবার কি মঙ্গলবার ফিরিবে। বাঞ্ছারাম সেইমাত্র দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া নিজের হাতে সাজা তামাক লইয়া বসিয়াছিল। এই সময়ই বাঞ্ছারাম একলা থাকিত; কেন না অপর সকলে হয় দিবানিদ্রায় তখন মগ্ন থাকিত; না হয় বাড়ীর বাহিরেই আলাপ পরিচয়ে যাইত। এই সময়ই বাঞ্ছারামের তর্ক, জেরা, প্রশ্ন করার মত কোনও উত্তেজনা থাকিত না, তাহা দামোদর জানিত। বাঞ্ছারাম কোনও আপত্তি করিল না। কিন্তু দামোদর কলিকাতায় গেল না। গেল পার্শ্বের গ্রামে সোণাপুরে নিতাই ঘোষের বাড়ীতে। পৌঁছিতে তা'র প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনের পথে প্রায় ৩।৪ মাইল হাঁটিয়া, তার পর আবার অন্য পথে ঘুরিয়া আরও ৫।৭ মাইল চক্রাকারে তাহাকে হাঁটিতে হইল। তাহা না হইলে তাহার গ্রাম হইতে নিতাই ঘোষের বাড়ী যাইতে ১½ ঘণ্টার বেশী লাগে না। কিন্তু কলিকাতার পথ নিতাই ঘোষের বাড়ীর দিক দিয়া না যাওয়াতে তাহাকে লোকের চক্ষু এড়াইতে অনর্থক বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইল।

নিতাই ঘোষ তখন বাড়ী ছিল না। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র রমাই বাড়ীতে ছিল; তা' ছাড়া অন্য পুত্রেরা, বলাই, কানাই, ও যাদব সকলেই ছিল। রাধারাণী রমাই-এর নীচেই; রমাই-এর বয়স প্রায় দামোদরেরই বয়সের সমান। রাধারাণীর বয়স ষোল বৎসর হইবে, কি হইয়া গিয়াছে। দামোদর ঠিক জানিবার অবসর পায় নাই কখনো। দামোদরকে দেখিয়া রমাই, কানাই, ও যাদব সকলেই আনন্দিত হইল। রমাই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। যাদব ছুটিয়া গিয়া বাড়ীর ভিতরে খবর দিল। নিতাই ঘোষের স্ত্রী ও রাধারাণী তখন রন্ধনশালায় ব্যস্ত ছিল। ব্যস্ততা আরও বাড়িয়া গেল। রাধারাণী এখন কি ভাবিয়া হঠাৎ মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল। যাদব হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "দিদি, সুখবর দিলুম কি দিবি?" রাধারাণীর মা হাসিলেন। রাধারাণী যাদবকে কিল দেখাইল।

পা হাত মুখ ধুইয়া দামোদর বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া রমাইকে কুশল প্রশ্ন করিল। তার পর একে একে রাধারাণী ব্যতীত সকলের সংবাদ লইল। কেমন ধান হইয়াছে, গরুগুলি সব দুধালো কি না, পুষ্করিণীতে মাছ আছে কি না, পালঘাটিতে কেন বলাই ও রমাই মাঝে মাঝে যায় না, রমাইদের গ্রামের সখের থিয়েটার কেমন চল্‌ছে, ইত্যাদি সমস্ত খবর লইল। রমাই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া উল্টা প্রশ্ন করিল, "এত খবর 'ত নিচ্ছ; এতদিন আস্‌তে কি হয়েছিল? এই দু' ঘণ্টার রাস্তা ত। মাঝে মাঝে এলেই পার।"

দামোদর উত্তর দিল, "স্কুলে বড় কাজ। খেটে আর শেষ হয় না। একটা রবিবার; তা'ও সেক্রেটারী মশা'য়ের সমস্ত জরুরী চিঠিপত্র ইংরাজিতে লিখে দিতে হয়। সময় ক'রে উঠ্‌তে পারি না। অনেক বলে কহে তবে এবার এসেছি।"

রমাই মাইনর স্কুলে ২।৪ বৎসর পড়িয়াছিল মাত্র। এখন সে পিতার সহিত ক্ষেতবাড়ি দেখে। নিতাই ঘোষের অবস্থা খুব ভাল। প্রায় ১০০।১৫০ বিঘা চাষের জমি; ৩।৪টা বড় বড় পুষ্করিণী; গোশালে গরু; বাড়ীর উঠানে বড় বড় ধানের মরাই। বাড়ীটি একতলা হইলেও পাকা। ৫খানি বেশ বড় বড় ঘর; ভিতরে প্রকাণ্ড আঙিনা; এক পাশে প্রকাণ্ড দালান-দেওয়া রন্ধনশালা। বাহিরে একদিকে গোশালা, আর একদিকে চণ্ডীমণ্ডপ। সমস্তই শ্রীসম্পন্ন; পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। নিতাই ঘোষ নিজে

উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। রমাইও পিতার সহিতই সমানে কাজকর্ম্ম দেখিতে করিতে শিখিতেছে।

দামোদরের না আসার কারণ শুনিয়া রমাই সন্তুষ্ট হইল। দৈহিক পরিশ্রম সে করিতে পারে; কিন্তু লেখাপড়াতে যে মানসিক পরিশ্রম হয় তাহার প্রতি রমাই-এর সসম্মান ভয় ছিল। সে সায় দিল, "তা বটে। তবু একবার আস্‌তে হয়, দামোদর! কতদিন আস নি।"

এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে জলযোগের জন্য দামোদরের আহ্বান আসিল। যাদব আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়া একটি ঘর দেখাইয়া দিল। দামোদর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী একখানি থালায় নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়া, আসন পাতিতেছেন। আসন পাতা হইলে তিনি বলিলেন, "এসো বাবা।"

দামোদর প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই, তিনি আবার বলিলেন, "বোস। একটু জল খেয়ে নাও। এতটা পথ এসেছ। বাড়ীর সব ভাল ত? মা, বাবা, সীতারাম, হরিপদ, শ্যামা, সবাই বেশ ভাল আছে?"

দামোদর আসনে উপবেশন করিয়া উত্তর দিল, "হাঁ, সবাই ভাল আছে।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী যাদবকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই এখানে বসে জামাইবাবুকে খাওয়া। আমি আস্‌ছি।"

যাদব বসিয়া বলিল, "জামাইবাবু, খান।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। খাইতে বসিয়া দামোদর যাদবকে কত প্রশ্ন করিল; কিন্তু আসলে রাধারাণী সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিতে পারিল না। তাহার একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, রাধারাণী কোথায় ও কি করিতেছে। কিন্তু তাহা পারিল না। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, যাদব বলিল, "বাবা ফিরে এসেছেন যেন মনে হ'চ্ছে।"

দামোদর অকারণে চমকিয়া উঠিল। বলিল, "এসেছেন? তাই না কি?"

যাদব উত্তর করিল, "হাঁ। গলার আওয়াজ পাচ্ছি। দেখে আসবো? কিন্তু আপনি সন্দেশ ফেলে রাখ্‌ছেন কেন? ও আপনাদের সহরের দোকানের সন্দেশ নয়। বাড়ীর দুধের ছানা থেকে দিদি তৈরি করেছে।"

দামোদর সন্দেশ দুইটি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিল, "বেশ হয়েছে, না? তোমার দিদি সন্দেশ কর্ত্তে শিখেছে?"

যাদব মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ। সন্দেশ, রসগোল্লা, নিম্‌কি, বোঁদে সব তৈরি কর্ত্তে পারে। আচ্ছা, জামাইবাবু, কল্‌কাতায় কি এ সব কিন্‌তে পাওয়া যায়?"

দামোদর হাসিয়া উত্তর দিতে যাইতেছে, এমন সময় নিতাই ঘোষ গাম্‌ছা হাতে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'এসেছ, দামোদর? বেশ করেছ! খাও, খাও। হাত গুটালে কেন? আমি এই বোস্‌ছি, এইখানে। মেঝেতে বসাই ভাল; এই গ্রীষ্মকালে ভারী আরাম লাগে। আমরা হ'চ্ছি চাষাভুষা মানুষ; মাটি ঘেঁটেই বেড়াই। এ বিলিতি মাটির মেঝে বড় লোকের বাড়ীতেই মানায়, বাবাজী।"

যাদব হাসিয়া বলিল, "তুমি তবে বড়লোক, না বাবা? তোমার বাড়ীতে বিলিতি মাটির মেঝে রয়েছে।"

নিতাই ঘোষ তাহাকে ধমক দিলেন, "তুই কি করছিস্? পালা। বড়লোক না ত কি গরীব? হাত পা' যা'র আছে, খাট্‌তে যে পারে সেই বড়লোক। বুঝ্‌লি? এখন পালা।"

যাদব উঠিয়া গেল। দামোদর অন্যমনা হইয়া তখনও সন্দেশ দুইটি লইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল; নিতাই ঘোষ তাহা দেখিয়া বলিল, "ও ঘরে তৈরী সন্দেশ, বাবাজী। খেয়ে ফেল। ভাব্‌বার কিছু নেই।"

দামোদর একটু ভাঙিয়া মুখে দিয়া বলিল, "আপনি চিঠি দিয়েছিলেন, পেয়ে আমি আস্‌ছি।"

নিতাই ঘোষ জামাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওঃ।"

তা'র পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি পেয়েছিলে? ওঃ। তাই এসেছ?" শ্বশুরের ভাব দেখিয়া অস্বস্তিতে দামোদর ক্রমশই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছিল। সভয়ে উত্তর করিল, "হাঁ। চিঠি পেয়েছিলুম। তবে আস্‌তে একটু দেরী হ'য়ে গেল!"

নিতাই ঘোষ হাতের ভিজা গাম্‌ছা দিয়া বেশ করিয়া মুখ, হাত, বুক ও পিঠ মুছিয়া যেন আপন মনে বলিল, "ওঃ! তাই এসেছ?"

দামোদর আর এক টুক্‌রা সন্দেশ মুখে দিয়া বাকীটা

নিরীক্ষণ করিয়া যেন তাহা লইয়া গভীর গবেষণায় মনঃসংযোগ করিল।

নিতাই ঘোষ ঘরের চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর ঘরের ভিতরকার ছাদ মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিল; শেষে সেখান হইতে দৃষ্টি নামাইয়া ঘরের দরজা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা ছিল, বাবাজী। তা' চিঠি পেয়েছিলে, তুমি? ওঃ।" সে গামছা লইয়া আবার মুখ ও বুক মুছিয়া লইল।

দামোদর গবেষণা হইতে মন আকর্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

নিতাই ঘোষ বলিল, "তাড়া কি? সব হবে, সব হবে। এসেছ যখন তখন কথা কি আর বাদ যাবে? এমন কথা কইব, তখন দেখ্‌বে। চাষাভুষো মানুষ বলে কি কথা কইতে পারি না? বিশেষ জামাই-এর সঙ্গে। তা' মনেও করো না, বাবাজী। এখন সন্দেশটুকু খেয়ে জল খেয়ে জিরিয়ে নাও। দু'দিন আছ ত? কথা হবে বৈ কি।"

দামোদর জবাব দিল, "পরশুই আবার ফির্‌তে হবে। স্কুলে ছুটি ত' পাই নি। পরশু গিয়ে স্কুল কোর্ব্ব।"

নিতাই ঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল আছ 'ত? কাল? কাল?"

দামোদর উত্তর করিল, "কাল থাক্‌তে পারি। কিন্তু কথাটা বলুন না কি? আমারও মনটা বড় অশান্ত হয়েছে।"

নিতাই ঘোষ কি ভাবিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল "তাই বটে! তাই বটে! ওঃ! মন কি হয়েছে? কি বল্লে?"

দামোদর নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মনের সমস্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগ তাহাকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। এইমাত্র আসিয়াছে; এখনও রাধারাণীর সহিত দেখা হয় নাই। রাত্রে—কে জানে কত রাত্রে তাহার সহিত দেখা হইবে, এখন আর কোনও গোলযোগ তুলিয়া কাজ নাই। শ্বশুর মহাশয়ের আকৃতি ও প্রকৃতি সুবিধার নহে। নিতাই ঘোষ গামছা লইয়া হাত, মুখ ও বুক মুছিয়া গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে খাইতে দামোদরের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া অপ্রয়োজনে আবার হাত, মুখ ও বুক মুছিয়া, বলিল, "কথাটা কি জান বাবাজী? কথাটা এই যে, রাধারাণীকে পাঠাবো না। বুঝ্‌তে পার্লে? রাধারাণীকে তোমাদের ঐ বাড়ীতে আর পাঠাবো না। বুঝ্‌তে পার্লে না? তোমার স্ত্রীকে—রাধারাণীকে তোমার বিমাতার ঘর কর্ত্তে পাঠাবো না। নিতাই ঘোষ পাঠাবে না; বুঝেছ? এ আর বুঝ্‌তে পার না?"

কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া নিতাই ঘোষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, যেন একটা মস্ত কাজ শেষ হইল। যেন আর কিছু বলিবার বা করিবার নাই। দামোদর ইহারই আশা ও ভয় করিয়াছিল। তবু কথাটা শুনিয়া তাহার মনে যেন একটা গুরু আঘাত লাগিল। হাত সন্দেশ হইতে আপনিই গুটাইয়া আসিল। কিন্তু 'কেন?' এ প্রশ্ন করিবার সাহস তাহার হইল না। সে নতমুখে ভীতভাবে বসিয়া রহিল।

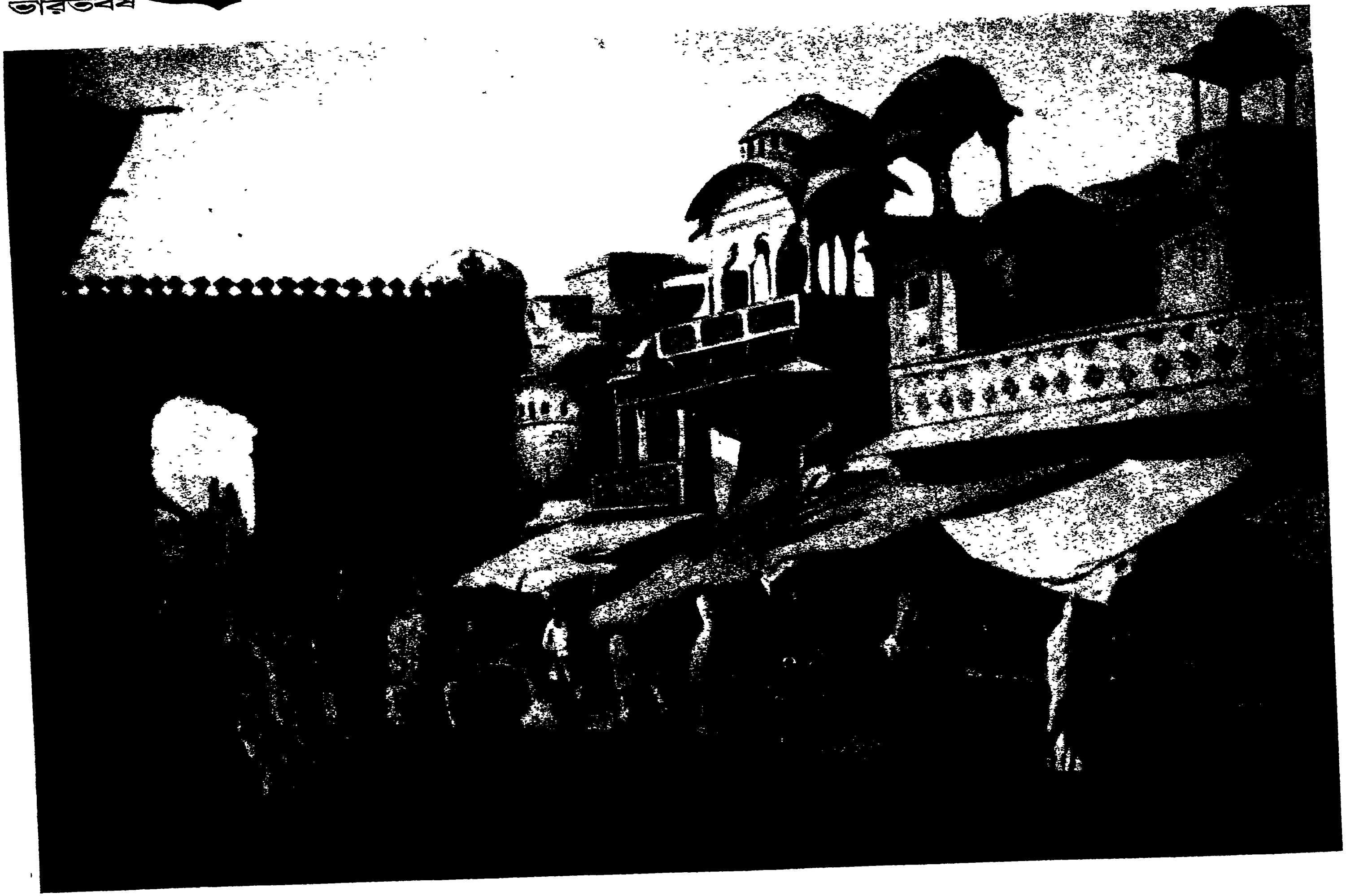
নিতাই ঘোষ উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় বলিল, "খাও, খাও, সন্দেশটুকু খাও, বাবাজী! কিছু ভাব্‌বার নেই; কোনও অসুখ কোর্‌বে না। কিন্তু কথাটা ঐ বুঝেছ? রাধারাণীকে পাঠাবো না।"

দামোদর শির আন্দোলনে জানাইল সে বুঝিয়াছে। কিন্তু সন্দেশের উপকারিতায় সন্দেহ না করিলেও, তাহাতে আর তাহার আগ্রহ রহিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম প্রণয়

রাত্রে আহারাদির আয়োজন প্রথামত হইলেও, দামোদরের মন বিকল হওয়ায় তাহাতে আর সে আনন্দ পাইল না। লুচি, আলুর দম, বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, মাছের কালিয়া, কিস্‌মিসের চাটনি, ক্ষীর, সন্দেশ, রসগোল্লা—চর্ব্ব্যচোষ্যের সমস্ত সমারোহ তাহার কাছে পরিহাস হইয়া না গেলেও, তাহাতে কোনও প্রকার রস সে পাইল না। তাহার মনের মধ্যে কেবল প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল, "রাধারাণীকে পাঠাবো না।" সে খাইবে কি করিয়া? শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ও রমাই-এর বহু অনুরোধে সে মাত্র মাছের কালিয়া দিয়া ৪।৫ খানা লুচি খাইল। কেন না রমাই খবর দিল যে তাহার জন্যই সন্ধ্যার পর



যোধপুরের বাজার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল

নিতাই ঘোষ জাল দেওয়াইয়া তাজা রোহিত মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অতি সুস্বাদু মৎস্য। যে পুষ্করিণী হইতে মৎস্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা না কি নিতাই ঘোষের অত্যন্ত যত্নের ও পরিশ্রমের জিনিস। তাই সে পুষ্করিণীর মাছ না খাইয়া নূতন অপরাধ করার ভয়ে দামোদর মাত্র কালিয়াই খাইল। আর কিছু খাইতে পারিল না। তাহার রুচিল না। আহারাদির পর সে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে একলা শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কি করিবে? রাধারাণী আসিলে তাহাকে কি বলিবে? নিতাই ঘোষ কি প্রকৃতির লোক তাহা সে জানে না। রাধারাণী ত' নিশ্চয়ই জানে। তাহার নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ সে লইতে পারিবে—পরে যা' হয় কর্ত্তব্য স্থির করিবে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল; সারা অপরাহ্নের পথ হাঁটার পরিশ্রম যেন এখন নিদ্রার উপহার লইয়া আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। অথচ নিদ্রা যাওয়াও ঠিক নয়। রাধারাণী কি মনে করিবে? এত দিনের বিরহ আজ মিলনে অবসান হবে, আর আজই কি না ঘুম? দামোদর উঠিয়া বসিল। ঘরের কোণে একটি পাত্রে জল ছিল; চোখে মুখে জল দিল। পাছে বিছানায় বসিলে শুইতে ইচ্ছা করে, তাই জান্‌লার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আর মনে মনে কি ভাবে রাধারাণীকে সম্ভাষণ করিবে, কি কি কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল। নিশ্চয়ই প্রথমে সে কথা বলিবে না; তাহার চিঠির কোনও জবাব সে দেয় নাই কেন? যদি সাধা-সাধির পর কথাই বলে, তা' হলে কি প্রথমে বলিবে? বলিবে "এ অভিনয় আর কেন? প্রেমের প্রণয়ের ত' শেষ হয়েছে! তবে আর কেন?" নাঃ। প্রথমেই এ'রকম বিদায়ের রাগিণী ভাল নয়। বরং জিজ্ঞাসা করিবে, "এত প্রেম যদি, তবে এতদিন ছিলে কেমন ক'রে!" কিন্তু নাঃ! তা'ও ঠিক হয় না। দূর ছাই! নভেল উপন্যাস মাথা খেয়েছে। রাধারাণী শুনিয়া যদি হাসে! এ-রকম অবস্থার অভিজ্ঞতা তাহার নাই; কি ভাবে আলাপ সুরু করা যায় তাহা ত' সে বুঝিতে পারে না।

দামোদরের আলাপের উপায় স্থির হইবার পূর্ব্বেই রাধারাণী ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। দামোদর ফিরিয়া দেখিল না বটে; কিন্তু সে বুকের স্পন্দনে বুঝিতে পারিল যে রাধারাণী আসিয়াছে ও তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া তাহার কাছে আসিতেছে। সে জোর করিয়া দৃষ্টি দিয়া বাহিরের অন্ধকার ভেদ করিতে চেষ্টা করিল। ক্রমশঃ তাহার পৃষ্ঠদেশে ঘাড়ে পিছনের দিকে কাহার উষ্ণ নিশ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করিল। সে অচল হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

রাধারাণী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "এসো, আর রাগ কর্ত্তে হবে না। শুন্‌ছো? এসো, বস্‌বে এসো। অনেক কথা আছে বল্‌বার। আমি কি কোর্‌বো? আমার উপর কেন তুমি রাগ কোরছ?"

দামোদর ঘুরিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমার রাগে আর কা'র কি এসে যায়?"

রাধারাণী তাহার উত্তর না দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া, তক্তপোষের বিছানার উপর বসাইয়া, নিজে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বলিল, "রাগ করেছ? আমার মুখের দিকে চাও না! মুখ তোল! দেখ চেয়ে; সত্যি, বল না। রাগ করেছ?" সে হাত দিয়া দামোদরের মুখ তুলিয়া ধরিয়া চোখে চোখ রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বল!"

দামোদরের সমস্ত চিন্তা, দুর্ভাবনা, প্রশ্ন, সমস্যা মুহূর্ত্তের জন্য যাদুকরের মোহন স্পর্শে শূন্যে মিলাইয়া গেল। সে রাধারাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল। তাই 'ত! রাধারাণী ত' আর সে রাধারাণী নাই। এই কয়েক মাসের ভিতর মাধুরী বাড়িয়া গিয়াছে; মুখের কমনীয়তা, চোখের দৃষ্টির আকর্ষণ, সে বেশ স্পষ্ট অনুভব করিতেছে। তাহার শ্যামবর্ণ রূপের ছটাকে যেন কোমল, স্নিগ্ধ আবরণে রমণীয়, বরণীয় করিয়া ফেলিয়াছে। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। এই রাধারাণীকে ছাড়িয়া সে কেমন করিয়া জীবন কাটাইবে?

রাধারাণী স্নিগ্ধকণ্ঠে অনুযোগ করিল, "রাগ পড়্‌ছে না বুঝি? তুমি কথা বল। তা'হলে রাগ পড়ে যাবে। বুঝেছ? বল। খুব বকো আমাকে, আর রাগ থাক্‌বে না।"

দামোদর তাহার হাত দুইটি ধরিয়া নামাইয়া তাহাকে কাছে আনিয়া বলিল, "রাগ নয়, রাণী; ভাব্‌ছি এ সব কি গোলযোগেই পড়্‌লুম। তোমার বাবা তোমাকে পাঠাতে চান না। কি করা যায়? ওখানেও যাওয়ার

কথা উঠ্‌লেই হাঙ্গামা পড়ে যায়। কার দোষ, কিসের জন্তে এত হো'ল, বুঝ্‌তে পারি না।"

রাধারাণী একটু চুপ করিয়া বলিল, "বাবা কিন্তু কিছুতেই পাঠাবে না। কেন, জান? ওখানে সত্যি আমার কষ্ট হয়। তুমি'ত থাক্‌তে না বড়; মাঝে মাঝে আস্‌তে; ২।৪ দিন থাক্‌তে, বড় জোর না হয় ১০।১৫ দিন। আর সব কথাও কিছু তোমাকে বলা যায় না, কিন্তু ওখানে আমি থাক্‌তে পারবো না।"

দামোদর বলিল, "তা' বুঝি। কিন্তু উপায় কি?"

"উপায়?" রাধারাণী দামোদরের চোখে চোখ রাখিয়া বলিল, "উপায়? তুমি এইখানে এসে থাকো।"

দামোদর প্রশ্ন করিল, "কিন্তু স্কুল? চাক্‌রি!"

"এইখান থেকে কোর্‌বে। পার্‌বে না? দেড় দু' ঘণ্টার রাস্তা বৈ 'ত নয়। আমার জন্তেও পার্‌বে না!"

দামোদর বলিল—"তা' দেড় দু' ঘণ্টার রাস্তাও না হয় হাঁটলুম, তোমার জন্তে। কিন্তু জান 'ত আমার বাবাকে। এই নিয়ে এমন গোলযোগ কেলেঙ্কারি করে তুল্‌বে যে চাক্‌রিও শেষে না যায়। তখন যদি চাক্‌রি যায় কি হ'বে?"

রাধারাণী উত্তর দিল, "সে যখন হবে দেখা যাবে। তেমন যদি হয়ই, তা'হলে কি আর বাবা এখানে তোমাকে দু'টি খেতে দিতে পার্‌বে না? সে খুব পার্‌বে।"

দামোদর ইহার জবাব দিয়া উঠিতে পারিল না। সে রাধারাণীকেই দেখিতেছিল, তাই ত' রাধারাণীকে ছাড়িয়া কি করিয়া সে ছিল এতদিন?

রাধারাণী বলিতে লাগিল, "আর আমাদের এখানেও ত' স্কুল আছে; সেইখানেই না হয় কাজ নেবে। বাবাকে বলে তোমার ব্যবস্থা করে দেওয়াব। পালঘাটিতে চাকরি করাও যা' না করা'ও তাই। একটা পয়সা 'ত নিজের কাছে রাখ্‌তে পাও না। উল্‌টে আমার বিয়ের সময় বাবা যা' কিছু যৌতুক দিয়েছিলেন, তা'ও গেছে। এখানে থেকে চাক্‌রি কর্‌লে, তোমার সবই জম্‌বে। না কি না, বল না?"

দামোদর উত্তর দিল, "তা' বটে।"

"তবে? তোমার কোনও আপত্তি আমি আর শুন্‌বো না। সেখানে থেকে আর ভূতের বেগার খেটে দেহপাত কর্ত্তে হবে না তোমাকে। কেন কোর্‌বে? সীতারাম, হরিপদ 'ত বড় হয়েছে, কাজকর্ম্ম কর্ত্তে পারে না? কেন শুধু শুধু তা'দের ঘরে বসিয়ে খাওয়ান আর উল্টে জুতোর তলায় থাকা?"

দামোদর ভক্তের মত শুনিতে লাগিল। কিম্বা হয় ত' তাহার কাণে কোন কথাই প্রবেশ করিতেছিল না।

রাধারাণী বলিল, "জবাব দিচ্ছ না কেন? বল না 'হাঁ।' আমি কি মন্দ কিছু বল্‌ছি?" সে দামোদরকে নাড়া দিল।

দামোদর তাহাকে আকর্ষণ করিয়া উত্তর দিল, "ঠিক কথা তুমি বল্‌ছো, রাণী। এ খুব ঠিক কথা।"

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, "দেখ, কি কষ্টই না এতদিন শুধু শুধু দিলে? একবার এলে কি তোমার খুব অপমান হোত? আমার কি যাবার উপায় আছে যে যাবো? তোমার মত পুরুষ মানুষ হ'লে যেতুম। কিন্তু তুমি কি বলে এতদিন খোঁজ-খবর না নিয়ে চুপ ক'রে ছিলে? একবারও মনে হো'ত না? একবারও না? বল না।"

দামোদর কহিল, "আমারও কি সুখে দিন কেটেছে, রাণী? তোমায় ২।৩ খানা চিঠি দিয়েছিলুম পাঠিয়ে—পাও নি?"

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, "চিঠিতে কি মন উঠে? চিঠিতে কি হয়? না দেখ্‌লে—"

রাধারাণী পুরাদস্তর প্রণয়িনীর মতই কথা সমাপ্ত করিল। দামোদর বলিল, "তা' ঠিক, রাণী। তবু খোঁজটি দিতে পারতে ত? কেমন আছ না আছ, তা' জান্‌তেও ত' আমার মন চাইতে পারে?"

"যে আমার হস্তাক্ষর, লিখ্‌তে লজ্জা ক'রে। আর এতই যদি আমার জন্তে দুর্ভাবনা হয়েছিল, ত' একবার এলে কৈ? তোমার কোন কথায় বিশ্বাস হয় না। এইখান থেকে এইখানে—আমার ভাব্‌লেই এমন রাগ ধরে যে কি বল্‌বো। আর যে তুমি আমাকে এমন ক'রে কষ্ট দেবে, তা' আর হবে না। তোমাকে আর আমি ছেড়ে দেব না, কিছুতেই দেব না। কি বল, যাবে? ছেড়ে যাবে?"

দামোদর প্রথম প্রণয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উত্তর দিল, "না, রাণী, আর যাবো না।"

"ঠিক? আমার মাথা ছুঁয়ে বল।"

দামোদর মাথা ছুঁইয়া বলিল, সে আর রাধারাণীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না।

রাধারাণী বিছানার উপর উঠিয়া শয়নের উদ্যোগ করিয়া বলিল, "বাঁচ্‌লুম। এতদিনে তুমি যে মুখ তুলে চাইলে তাইতে আমার মাথা থেকে বোঝা নেমে গেল। এখানে থাক্‌লে তোমার আরও অনেক সুবিধা হবে। বাবা বলেছে, যে আমার বিয়ের সময় তোমার বাবা নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর অর্দ্ধেক জমি আর বাড়ীর অর্দ্ধেক এক বৎসরের মধ্যেই তোমাকে লেখাপড়া করে দেবেন। তা' দেন নি। তোমাকে সহায় পেলে সেটার একটা কিনারা বাবা করে দেবেন বলেছেন। কেন তুমি বঞ্চিত হবে? তোমার হক্‌ যা' তা' ত' নেবে। কথা দিয়ে কথা রাখেন না এই বা কেমন? ওখানে থাক্‌লে তোমায় শেষে পথে দাঁড়াতে হবে। তুমি না হয় দাঁড়ালে, আমি তখন কোথায় যাবো? বল্‌তে পার?"

দামোদরের সে অবস্থায় অত বড় গূঢ় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল। সে সেই প্রশ্নই দিয়া রাধারাণীর ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা দূর করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিষয় না বিষ?

দামোদর সোমবারে আসিয়া পালঘাটি হাইস্কুলে পৌঁছিতে পারিল না। অবশ্য ইহার ব্যবস্থা সে হেড্‌-মাষ্টারকে বলিয়া কহিয়া গিয়াছিল। মঙ্গলবার আসিয়া বাড়ীতে না গিয়া সে যথারীতি স্কুলের কাজ করিল; কিন্তু পড়ান তাহার হইল না—সে সমস্ত স্কুলের সময়টি ভাবিয়া কাটাইল, যে নূতন ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবে কি করিয়া। একবার ভাবিল যে, হেড্‌মাষ্টারকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলে ও একটা পরামর্শ করে। কিন্তু কে জানে যদি কার্য্যারম্ভের আগে মন্ত্রণাভেদ করিলে কার্য্য ব্যাহত হয়? সে নিজেই একটা পথ উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিল।

স্কুলের ছুটির পর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সে বিস্মিত হইল। বাড়ীর হাওয়া যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে; যেন তাহার মন্ত্রণা ইতিমধ্যেই কে ভেদ করিয়াছে। সে গম্ভীর ভাবে নিজের ঘরে গিয়া জামা জুতা খুলিতেছে, এমন সময় তারাসুন্দরী আসিয়াই প্রশ্ন করিল, "কোথায় গিছ্‌লি? শ্বশুরবাড়ী?"

দামোদর এরূপ সোজা প্রশ্নের আশা করে নাই। সে উত্তর দিল না। জুতা জামা খুলিতেই ব্যস্ত রহিল।

তারাসুন্দরী কটু কণ্ঠে বলিলেন, "তা' স্পষ্ট বলে গেলেই ত' হো'ত। কল্‌কাতা যাচ্ছি বলে যাওয়া কেন? এ নিয়ে আমায় কেন কথা শুন্‌তে হয়? যা'র যা' খুসী বলে।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কে কি বলেছে?"

"কে কি বলে নি? আমি তো'কে পরামর্শ দিয়েছি; আমি তো'কে ভাঙিয়ে নিচ্ছি; সংসার ভাঙ্‌বার জোগাড় কোর্‌ছি; সকলে যা'তে উপোসী থেকে মরে তারই ব্যবস্থা কোর্‌ছি; এই সব কথা কেন শুন্‌তে হয় আমাকে? আমি তো'কে কি পরামর্শ দিয়েছি?"

দামোদর মনে মনে সকলের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু কোনও কথা বলিল না।

তারাসুন্দরীর নিজের অধিকারের কথা স্মরণ হওয়ায় কহিল, "তাই যদি দিয়েই থাকি, অন্যায়টা কি? আমার ছেলের ভালমন্দ আমি দেখ্‌বো না ত' কে দেখ্‌বে? আমার ছেলে আমায় দেখ্‌বে না ত কে দেখ্‌বে? বলুক্‌ ত' দেখি কি অন্যায় হয়েছে।"

শ্যামা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিল, "দাদা, বৌদি কি বল্লে?"

বলিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। তারাসুন্দরী তাহাকে ধমক দিল, "তো'র এসব কথায় কি দরকার রে? ছোট আছিস্‌ ছোট থাক্‌—বড়দে'র কথায় দিনরাত থাকিস্‌ কেন? কি শিক্ষাই হ'চ্ছে?"

শ্যামা রাগিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, "তা', বাবু, ঘুরিয়ে নাক দেখান কেন? হাস্‌বার কাজ কর্লেই লোকে হাসে। কে না হাস্‌বে? দেখ না কাল গাঁ শুদ্ধ লোক হাসে কি না।" বলিয়াই শ্যামা ক্রোধভরে প্রস্থান করিল।

দামোদর বিরক্তি ও রোষ দমন করিয়া ঘরের বাহিরে দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দুর্গারাণী তাহার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। সে দালান হইতে নামিয়া বাড়ীর সদর দরজায় পা' দিয়াছে, পিছন হইতে বাঞ্ছারাম ডাকিল, "দামোদর! ও দামোদর!"

দরজায় দাঁড়াইয়াই দামোদর উত্তর দিল, "কি?"

"একবার এ দিকে এসো 'ত।"

দামোদর আস্তে আস্তে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইল! বাঞ্ছারাম তখন বসিয়াই ছিল। বসিয়াই তাহার সমস্ত দিন কাটিত। দামোদরকে বসিতে বলিল।

দামোদর বসিলে বাঞ্ছারাম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কল্‌কাতা গিছ্‌লে?" দামোদর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, উত্তর করিল, "না। নিতাই ঘোষের বাড়ী গিছ্‌লুম।"

বাঞ্ছারাম উত্তপ্ত স্বরে বলিল, "কেন? কি জন্যে সেখানে তুমি গিছ্‌লে শুনি? তোমায় না পঞ্চাশ বার বারণ করেছিলুম যেতে। তবু কেন গিছ্‌লে?"

দামোদর উত্তর না দেওয়ায় দুর্গারাণী তাহার হইয়া উত্তর দিলেন, "তা' যাবে না কেন? তুমি বড়, না স্ত্রী বড়?"

বাঞ্ছারাম কহিল, "আমার চেয়ে স্ত্রীই তোমার বড় হো'ল? এতদিন মানুষ কর্‌লুম, চাক্‌রি করে দিলুম,—কি এই জন্যে? স্ত্রী পেলে কোথা থেকে শুনি? কে তোমার বিয়ে দিয়ে স্ত্রী এনে দিয়েছিল? সে এই শর্ম্মা থাক্‌তে তবে না হয়েছিল! আমি না দাঁড়ালে, নানা রকম ভাঁওতা না দিলে, নিতাই ঘোষ তোমায় মেয়ে দিত? তোমার কি যোগ্যতা, বাবু? এখন তোমার স্ত্রীই বড় হো'ল? আমার মাথা হেঁট কর্ত্তে তাই গিয়েছিলে?"

দামোদরের বিরক্তি শেষ সীমায় উপস্থিত হইল। সে বলিল, "মাথা হেঁট নিজের দোষেই হয়। কেউ তা'র জন্যে দায়ী নয়। আপনি কেন ভাঁওতা দিয়ে প্রতারণা করেছিলেন তা'দের? কথা দিয়ে কথার খেলাফ কেন করেছেন? তা'দের সঙ্গে কি সদ্‌ব্যবহার করেছেন? কেবলই ত' নানা ছলে ফন্দিতে যা' পেয়েছেন আদায়ই ক'রে এসেছেন। তা'তে মাথা হেঁট হয় না?"

দুর্গারাণী যেন নির্ব্বাক বিস্ময়ে দামোদরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাঞ্ছারাম তিরস্কারের ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। দামোদর সাধারণতঃ নিরীহ প্রকৃতির লোক; কিন্তু রাগিলে তাহার রাগ অনেক দূর যাইত। তাই সে দুর্গারাণী, বাঞ্ছারাম সকলকেই অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "আমার অর্দ্ধেক জমি ও বাড়ীর অর্দ্ধেক দিন—যেমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পাঁচজনের সামনে—আমি আলাদা হয়ে থাক্‌বো। আমার কোন সংস্রবে আর দরকার নেই।"

দুর্গারাণী বাঞ্ছারামকে বলিলেন, "কেমন, যা' বলেছি তাই না? ডুবে ডুবে অনেক দূর যায় বড়গিন্নী।"

বাঞ্ছারাম সায় দিয়া বলিল, "দেখছি তাই।" তার'পর দামোদরকে কহিল, "এক সিকি কড়ার বিষয়ও তোমায় দেব না। দূর করে দেব। দেখবো কে তোমায় খেতে দেয়, থাক্‌তে দেয়। বিষয়ের ভাগ চাও—আমি বেঁচে থাক্‌তেই, বটে? এই পরামর্শ করে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয়েছিল? একটা আধ্‌লাও দেব না। দেখি তুমিই বা কি কর আর তোমার নিতাই ঘোষই বা কি কর্ত্তে পারে।"

দামোদরের রাগ কতকটা পড়িয়া গিয়াছিল; তবু সে বলিল, "বেশ দেখা যাবে।"

সেইদিনই আবার দামোদর রাগের মাথায় শ্বশুরবাড়ী ফিরিল। সেখানে পৌঁছিতেই নিতাই ঘোষ বলিয়া উঠিল, "বেশ; ঠিক্, আচ্ছা করেছ, বাবাজী! এইবার নিজের ভাল দেখ। কেন থাক্‌বে সেখানে, কেন? কেন শুনি। আমার মেয়েকে কি আমি জলে দিয়েছি? তা'কে ত' তোমার হাতে দিয়েছি—তোমার হাতে, বুঝেছ? তবে? তুমি তাকে জলে ফেল্‌বে কেন? কিসের জন্যে? বুঝেছ? জলে ফেল্‌তে পাবে না। এইখানে থাক—এইখানে থাক। আমি তোমার সব বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। ঐ বাড়ীর অর্দ্ধেক আর জমির অর্দ্ধেক আদায় করে তবে কথা। তোমায় ঐ বিমাতার গ্রাস থেকে উদ্ধার করেছি দেখ না।" দামোদর তখন আর ইহা লইয়া আলোচনা করিল না। রাত্রে রাধারাণী তাহাকে খুব আদর, যত্ন করিল। দামোদর তাহার কথামত চলিতে পুনরায় প্রতিশ্রুত হইল।

রাধারাণী বলিল, "দেখ, যেই বল, স্ত্রীর চেয়ে ত' তোমার আপনার কেউ হ'তে পারে না!"

দামোদর তখন সে কথার অনুমোদন না করিয়া পারিল না। তাহার সমস্ত বিরক্তি ও দুঃখে এমন স্নেহ-প্রলেপ কেহ-ই আর দিতে পারে নাই। বিশ্ব-সংসারে রাধারাণীই কেবল তাহার আপনার।

পরদিন দামোদর স্কুলের কাজে যাইবে কি না যাইবে তাহা লইয়া নানা বিতর্ক আপনার সহিত করিয়া, শেষে নিতাই ঘোষের পরামর্শে গেল। কিন্তু ৪।৫ মাইল পথ হাঁটিয়া যাওয়া ক্লান্তিজনক। তার উপর স্কুলে পৌঁছিয়াই

সে শুনিতে পাইল যে, তাহার প্রসঙ্গটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। হেডমাষ্টার, সেকেণ্ড মাষ্টার আসিয়া কেহ তামাসা করিলেন, কেহ উৎসাহ দিয়া গেলেন। সমস্ত ছাত্রেরা দূর হইতে ইসারা ইঙ্গিতে তাহাকে লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। পড়ান কাজে তাহার মন আর বসিল না। সে ভাবিল যে কাজ ছাড়িয়া দিবে। নিতাই ঘোষের মত জমি লইয়া চাষবাস করিবে। সে যদি চাষবাস করে—কি রকমে করিবে, তাহার কিছু কল্পনা করিল। কিন্তু তাহার লেখাপড়ার কি হইবে? এত যে শিক্ষা করিয়াছে, সাহিত্যে এত যে দখল জন্মিয়াছে তার—সাহিত্যকে এত ভালবাসে—সব বিসর্জ্জন দিবে? না; তা' হয় না। সে কি করিয়া নিরক্ষর চাষা হইবে? ছুটির পর দামোদর আবার শ্বশুরালয়ে ফিরিতে উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় হেডমাষ্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন, "দামোদরবাবু, চাটুয্যে মশায় ডেকে পাঠিয়েছেন। একবার হ'য়ে যাবেন।" দামোদরের মনটা আশঙ্কিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" হেডমাষ্টার উত্তর দিলেন "ঠিক বল্‌তে পার্‌লুম না। তবে সম্ভব এই ব্যাপার নিয়েই কোনও একটা প্রাইভেট আলোচনা কর্ত্তে চান। আপনার বাবাকে আজ সকালে ওদিকে যেতে দেখেছিলুম।"

দামোদর আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই সে চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে দেখিল। চাটুয্যে মহাশয় সামাজিক সভায় বসিয়াছেন; বাঞ্ছারামও উপস্থিত ছিল।

চাটুয্যে মহাশয় দামোদরকে বসিতে বলিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "দামোদর, তোমার নামে এসব কি শুন্‌ছি? আমরা গ্রামের সমস্ত প্রবীণ লোক এখানে আছি। বাঞ্ছারাম যাই করুক্, বলুক, সে তোমার বাপ্। তা'কে এমন করে অবজ্ঞা করে, উপেক্ষা ক'রে যাওয়া তোমার উচিত হয় নি। তুমি তার কাছে মাফ চাও—সকলের সামনে; আর নিজের বাড়িতে গিয়ে থাক। শ্বশুরবাড়ি থাকা অত্যন্ত গর্হিত। পথে ভিক্ষা করা ভাল, তবু শ্বশুরের অন্নে থাকা উচিত নয়। আর তোমার স্ত্রীর আনা সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করে একটা ব্যবস্থা কোর্ব্ব।"

দামোদর একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিল, "এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখে আপনাদের জানাবো।"

চাটুয্যেমশা'য় কহিলেন, "তোমার ভাব্‌না-চিন্তার দরকার নেই'ত বাবু। এতে তোমার বলাবলিরও কিছু নেই। যা' আমরা পাঁচজনে তোমার গুরুজনেরা মীমাংসা করেছি—তাই তোমাকে মান্‌তে হবে। না মান আমরা তা'র ব্যবস্থাও কর্ত্তে পারবো।"

দামোদরের মনে পড়িল যে রাধারাণীর নিকট সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে; এখানে পালঘাটিতে থাকার অর্থ রাধারাণীকে ত্যাগ করা, একেবারে চির-বিচ্ছেদ। আর নিতাই ঘোষ চাটুয্যেমশা'য়ের স্কুলের মাষ্টার নহে যে ধ'মকে ভয় খাইবে। বিশেষতঃ এতগুলি প্রাচীন লোকের সমবেত বিরোধ তাহার পছন্দ হইল না, সে একে গোলযোগ ভালবাসে না।

দামোদর বলিল, "উনি যদি বাড়ির অর্দ্ধেক ও জমিজমার অর্দ্ধেক আমাকে লিখিয়া আলাদা করিয়া দেন, তবেই আমি আপনাদের কথামত কাজ কর্ত্তে পারি।"

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই একসঙ্গে একটা প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিয়া একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিলেন। চাটুয্যেমশা'য় বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! আঃ! থাম না তোমরা। আমি সব বল্‌ছি যখন, তোমরা আবার 'হাঁ' 'হাঁ' কর কেন?" তা'র পর দামোদরকে কহিলেন, "দামোদর, এ তোমার অতি অন্যায় কথা। তোমরা লেখাপড়া জানা ছোক্‌রা, তোমাদের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আক্কেল বিবেচনা ত থাকা চাই। তোমার পিতার অবস্থায় কি ক'রে তোমাকে অর্দ্ধেক জমিজমা ও অর্দ্ধেক বাড়ি সে তোমাকে দেবে শুনি। তোমাকে আলাদা করে দিয়ে ওরা কি বাকী সবাই শুকিয়ে মরবে? সেটা কি বিবেচনার কাজ? তোমার মা, বাপ, ভাই, বোন সব না খেয়ে মরবে—আর তুমি আলাদা হয়ে স্ত্রী নিয়ে সংসার কোরবে, এ কি আক্কেলের কথা? ছিঃ! ছিঃ! একেবারে বয়ে গেছে! স্ত্রীলোকের কথা অনর্থকর; তাই শুনে তুমি হিতাহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব বিস্মরণ হ'তে বসেছ।"

চাটুয্যেমশা'য়ের কথায় উপস্থিত সকলে শির আন্দোলনে সায় দিলেন। মিত্তিরমশা'য়, মুখুয্যেমশা'য় ও রায়মশা'য় বলিয়া উঠিলেন "ঠিক! ঠিক!" আর সকলে একসঙ্গে বিস্ময় বিরক্ত দৃষ্টিতে দামোদরের দিকে চাহিলেন, যেন

সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে চান, "এইবার? একেবারে বয়ে গেছ? স্ত্রীলোকের কথায় মজেছ?"

সমবেত দৃষ্টিতে কুণ্ঠিত হইয়া দামোদর বলিল, "তা না হ'লে, শ্বশুরমহাশয় যে পাঠাবে না। সুতরাং সেটা দরকার। আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি।"

বাঞ্ছারাম মন্তব্য করিল, "শুন্‌লেন ত' চাটুয্যে মশা'য়, শুনুন।"

মিত্রমশা'য় প্রশ্ন করিলেন, "কলিকাল আর কিসে? পাঁজির কথা মিথ্যে হয়?"

চাটুয্যে মশা'য় বলিয়া উঠিলেন, "ঐ তোমরা আবার গোল কর্ত্তে সুরু কর্লে? বলি, আমায় যখন কথা কইতে তোমরা বলেছ, তখন আমি কি কথা কইতে জানি না যে তোমরা মাঝখানে পড়ে হট্টগোল করছো?" তার পর দামোদরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এটা কি তোমার স্থির, পাকা কথা? সেইটাই আমাদের জানিয়ে দাও। তুমি ত' উৎসন্ন গেছই; তবু পরিষ্কার করে সব বলে দাও। আমাদের ত' সেইরকম ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। যখন বাঞ্ছারাম আমাদের কাছে মীমাংসার জন্যে এসেছে, তখন মীমাংসা কর্ত্তে হবেই ত।"

দামোদর চুপ করিয়া রহিল। মিত্র মশা'য়, মুখুয্যে মশা'য়, প্রভৃতি সকলে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে বিব্রত ও বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিল। সে ঘামিয়া উঠিল। দরজার দিকে তাকাইয়া দেখিল, পলায়নের পথ আছে কি না। দেখিল তাহারও উপায় নাই। ও-পাড়ার শ্যাম কর আর মন্মথ সরকার দু'জনে সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। দামোদর হতাশ হইল।

চাটুয্যে মশা'য় বলিলেন, "উত্তর দাও না হে, দামোদর!"

বাঞ্ছারাম আপনাকে সংযত করিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল, "ওর গোষ্টীর মাথা উত্তর দেবে! ও কি আর মানুষ আছে? ভেড়া, ভেড়া হয়েছে। এর বিহিত একটা কর্ত্তেই হবে, চাটুয্যে মশা'য়। নিতাই ঘোষকে একবার দেখে নিতে হবে! এটা আপনাদের গাঁয়েরই অপমান!"

চাটুয্যে মশা'য় এবার রাগিলেন; বলিলেন, "বাঞ্ছারাম, তোমাদের ঐ বড় দোষ! মাঝে পড়ে কথা বলা তোমাদের স্বভাব! কি কর্ত্তে হবে না হবে আমি কি জানি না? আমি কি খোকা?" তা'র পর শ্যাম কর ও মন্মথ সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা ওখানে কি কর্‌ছো? এখানে এসে বস্‌তে পার না? এত বড় একটা ব্যাপারের মীমাংসা হচ্ছে, তোমরা বাইরে কি কোচ্ছ, শ্যাম?"

চাটুয্যে মশা'য়ের প্রশ্ন শুনিয়া শ্যাম কর ও মন্মথ সরকার বৈঠকখানার ভিতরে আসিয়া বসিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, চাটুয্যে মশা'য়, এই 'ত আমরা আছিই। আপনি যখন মীমাংসার ভার নিয়েছেন, তখন আমাদের জন্যে কি আট্‌কায়?"

চাটুয্যে ম'শায় উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দামোদর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। সে দরজা ফাঁকা দেখিয়া, উঠিয়া এক লম্ফে বাহিরে পড়িল, তা'রপর জুতা হাতে করিয়া ছুটিল। চাটুয্যে মশা'য় কথা আরম্ভ করিতেই পারিলেন না। বাঞ্ছারাম চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওকে ধর না কেউ!"

দামোদর একেবারে একছুটে প্রায় এক মাইল পথ উত্তীর্ণ হইল। তা'রপর দাঁড়াইয়া, একটু জিরাইয়া লইল। ধীরে ধীরে জুতা পরিয়া, কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছিয়া, সে শ্বশুর বাড়ির অভিমুখে চলিল। তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "বিষয় না বিষ! এর জন্যে এত কাণ্ড!" সে গ্রামের সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তিদের উপর রাগিয়া উঠিল। তাহাদের কি? তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে, তবু এখনও পরের কথা লইয়াই সব ব্যস্ত! তাহারা কি কেহই স্ত্রী লইয়া সংসার করে না? একটার জায়গায় কাহার কাহারও ত দুই জন স্ত্রী। আর তাহার বেলাতেই যত দোষ! কেন? তাহার স্ত্রী কি স্ত্রী নহে? রাধারাণীর মত স্ত্রী কাহার আছে? সে মনে মনে গ্রামের সমস্ত পরিচিত রমণীর আলোচনা করিয়া বলিল, "না! রাধারাণীর মত আর দ্বিতীয় কেহ নাই।"

(ক্রমশঃ)

জৈন সাধক চিদানন্দ

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহু সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া লোকশিক্ষায় নিরত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম লোকসমাজে প্রচলিত আছে; কিন্তু যাঁহারা একান্তে নিজ সাধনায় মগ্ন থাকিয়া লোকলোচনের বাহিরে অবস্থান করেন, তাঁহাদের পরিচয় জনসাধারণে বড় পায় না।

জৈনসমাজেও এরূপ সাধকের অভাব হয় নাই। গত ১৩৩৮ কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় জৈন-সাধক 'আনন্দঘনের' পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আর একজন জৈন-সাধক 'চিদানন্দের' পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

'চিদানন্দ' কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ও কবে কোথায় দীক্ষাগ্রহণ করেন জানা যায় না। মাত্র এইমাত্র জানা যায় যে, ইনি একজন জৈন সাধু ছিলেন ও ইঁহার আসল নাম 'কর্পূরচন্দ্র' ছিল—'চিদানন্দ' উপনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের অধিকাংশ কথাই অজানা থাকিয়া গিয়াছে। ইঁহার পদগুলির মধ্যে একটীতে উল্লিখিত আছে যে "যুগ[৪]-পূরণ[০] নিধান[৯]-শশী[১] সংবত, ভাবনগর ভেটে গুণধামী" অর্থাৎ ১৯০৪ সংবতে ভাবনগরে পার্শ্বনাথের প্রতিমার দর্শন করেন। সেই সময় যে ভজন রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সংবত দেওয়া আছে। ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইঁহার আবির্ভাব হয়। কথিত আছে যে ভাবনগর হইতে একজন জৈন গৃহস্থের সহিত তীর্থপর্য্যটনে ইনি গিরণার পাহাড়ে গিয়াছিলেন ও সেইখান হইতে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া যান। এই ঘটনার পর চিদানন্দ প্রায়ই লোকালয়ে আসিতেন না; যদি হঠাৎ কোন স্থানে উপস্থিত হইতেন, আবার সেইরূপ হঠাৎই অন্তর্হিত হইতেন। পার্শ্বনাথ পাহাড়ে ইঁহার দেহান্ত হয়, এরূপ প্রবাদ আছে। কয়েক বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এরূপ লোক ছিলেন যাঁহারা চিদানন্দকে দেখিয়াছেন, কিন্তু ইঁহার জীবন সম্বন্ধে কোন সংবাদ কেহ দিতে পারেন নাই। এরূপ কথিত হয় যে, ইঁহার বহু অলৌকিক শক্তি ছিল ও ইনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ ইঁহার রচিত পদগুলির মধ্যেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। জৈনদর্শনে গভীর জ্ঞানের পরিচয় ইঁহার বহুপদে পাওয়া যায় ও অন্যান্য দর্শনও ইঁহার অধিগত ছিল, তাহাও কোন কোন পদে জানা যায়। ইঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে "পুদ্গল গীতা," "প্রশ্নোত্তর-মালা," "স্বরোদয় জ্ঞান", "বহোত্তরী" প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, জৈনধর্ম্মে কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা মুক্তি পাইবার সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া হয় নাই। জ্ঞান, ভক্তি ও চারিত্রের সমন্বয়ে মোক্ষ পাওয়া যায়, কথিত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের জৈন সাধকগণের রচনায় যে ভক্তিভাব ও প্রেমের উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়, তাহা সেই যুগের বিশেষত্বের ছাপ মাত্র। বৈষ্ণব ও সহজিয়া ভাবের প্রবল প্লাবনের ছাপ জৈনদের মধ্যেও পড়িয়াছিল ও জৈন সাধকগণ উপাস্যদেবকে ভক্তি ও প্রেম দ্বারা সাধনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু জৈনসম্প্রদায়ের সংস্কারগত বিশেষত্ব-জ্ঞানের প্রভাব সাধকগণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনাতেও জ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। এই যুগে রচিত জৈন স্তব ও ভজনগুলির অনেকটীতে ভক্তিভাবের উক্তির প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

এই যুগের জৈনসাধকগণের রচনায় আত্মাকে 'প্রিয়', 'প্রাণনাথ', 'বল্লভ' প্রভৃতি শব্দদ্বারা যেরূপ সম্বোধন করা হইয়াছে, 'শ্যামসুন্দর', 'বংশীধারী', প্রভৃতি শব্দদ্বারাও সেইরূপ সম্বোধন করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে 'শ্যামসুন্দর',

'বংশীধারী' প্রভৃতি শব্দ প্রেম-প্রকাশক সম্বোধন রূপে মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সময় এই সমস্ত শব্দ এত অধিক প্রচলিত হইয়াছিল যে, তাহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে কোনও দেব বা ব্যক্তির প্রতি প্রেমপ্রকাশ করিতে হইলে এই শব্দগুলি সম্বোধন রূপে ব্যবহৃত হইত। জৈন ভক্তগণের রচনাতেও এই শব্দগুলির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অনেক জৈন-স্তবনে তাঁহারা নিজেদের উপাস্যদেবকে 'শ্যাম', 'শ্যামসুন্দর', 'কনহিয়া' প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। আত্মাকে সম্বোধন করিয়াও এইরূপ শব্দের বহুপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 'আনন্দঘন' ও 'চিদানন্দ'ও এরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। চিদানন্দের এরূপ ধরণের উক্তি বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া এস্থলে এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা হইল।

চিদানন্দ যোগাভ্যাসী ছিলেন। কোন কোন পদে ইঁহার যোগাভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

"সোহং সোহং সোহং সোহং,
সোহং সোহং রটনা লগিরী।
ইঙ্গলা, পিঙ্গলা, সুখমনা সাধকে,
অরুণ প্রতিথী প্রেম পগীরী;
বঙ্কনাল, ষট্‌চক্র ভেদকে,
দশমদ্বার শুভ জ্যোতি জগিরী।" ইত্যাদি।
২৩ (বহোত্তরী)

"সোহং সোহং এর রটনা লাগিয়াছে। ইঙ্গলা, পিঙ্গলা, সুষুম্না সাধন করিয়া অরুণের ন্যায় জ্যোতিঃ সম্পন্ন আত্মার সহিত প্রেম দৃঢ় করে! বঙ্কনাল ও ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া দশমদ্বারে শুভজ্যোতি জাগ্রত হয়।" ইত্যাদি। ৫০ সংখ্যক পদেও পিণ্ডস্থাদিক ধ্যান, রেচক, পূরক, কুম্ভক, শান্তিকের কথা এবং প্রাণ, সমান, উদান, ব্যানকে অধীন করিয়া অনাহত নাদ শ্রবণ করার কথা আছে। অন্যান্য সাধকের ন্যায় ইঁহার রচনাতেও প্রেমের উচ্ছ্বাসপূর্ণ অনেক পদ দৃষ্ট হয়। যথা:—

অবলাগী, অবলাগী, অবলাগী, অবলাগী,
অবলাগী, অবলাগী, অব প্রীত সহিরী।
অন্তর্গতকী বাত অলী শুন,
মুখথী মোপে ন জাত কহিরী;
চন্দ্র চকোরকী উপমা ইন সমে,
সাঁচ কহুঁ তোঁহে জাত বহিরী।
জলধর বুন্দ সমুদ্র সমানী,
ভিন্ন করত কোউ তাস মহিরী;
দ্বৈত ভাবকী টেব অনাদি,
ছিনমে তাকুঁ আজ দহিরী।
বিরহ ব্যথা ব্যাপত নহি আলী,
প্রেমধরী পিয়ু অঙ্ক গহিরী;
চিদানন্দ চুকে কেম চাতুর
ঐসো অবসর সার লহিরী।" ২৪

"এইবার আমার প্রীতি দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছে। হে সখি, আমার অন্তরের কথা শুন—মুখে ইহা আমি বলিতে অপারগ। আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি যে চন্দ্র চকোরের যে প্রীতি তাহা আমার প্রীতির সহিত কোনরূপে উপমিত হইতে পারে না—অর্থাৎ তাহা আমার প্রীতির সহিত তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। জলধরের জলবিন্দু সমুদ্রে মিশিয়া গেলে তাহাকে কি কেহ পৃথক করিতে পারে? আজ আমি অনাদিকালের দ্বৈতভাবকে ক্ষণমাত্রে ধ্বংস করিয়াছি। হে সখি, আমি প্রেমপূর্ব্বক প্রিয়তমের ক্রোড় গ্রহণ করিয়াছি, আর আমার বিরহ ব্যথা নাই। চিদানন্দ কহিতেছেন হে চতুর, তুমি এরূপ প্রশস্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া তাহা কেন বৃথা নষ্ট করিবে।"

আবার ৪৬ পদে বলিতেছেন:—

"অনুভব মিত্ত মিলায় দে মোকুঁ,
শ্যামসুন্দর বর মেরা রে।
শিয়ল ফাগ পিয়া সঙ্গ রমুঁগী,
গুণ মানুগী মেঁ তেরা রে॥" ইত্যাদি

"হে অনুভব মিত্র, আমার স্বামী শ্যামসুন্দরকে (আত্মা) মিলাইয়া দাও। আমার প্রিয়তমের সঙ্গে শীলরূপ (সচ্চারিত্র রূপ) হোলী খেলিব ও তোমার গুণ স্মরণ করিব।" ইত্যাদি। এস্থলে 'শ্যামসুন্দর'এর অর্থ 'প্রিয়তম'—ইহা কোন দেব বা ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে। আনন্দঘনের পদেও 'শ্যামসুন্দর' 'ব্রজনাথ' প্রভৃতি শব্দ ঠিক এই ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

আত্মার প্রতি অগাধ প্রেম ইঁহার পদে পরিলক্ষিত হয়। ৩২ সংখ্যক পদে তিনি বলিতেছেন :—

"অবধু পিয়ো অনুভব রস প্যালা,
কহত প্রেম মতবালা ;
অন্তর সপ্তধাত রসভেদী পরম প্রেম উপজাবে,
পূরব ভাব অবস্থা পালটী, অজবরূপ
দরসাবে।" ইত্যাদি।

"হে অবধু, অনুভবরসের পেয়ালা পান কর এরূপ প্রেমমত্ত বলিতেছে। অন্তরের সপ্তধাতুর রসভেদ করিয়া পরমপ্রেম উৎপন্ন হইবে ও পূর্ব্বের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া অপূর্ব্বরূপ দর্শন করাইবে।" ইত্যাদি।

এইরূপ প্রেমে মতওয়ারা হইয়া তিনি অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিবার জন্য গাহিয়াছেন :—

"অলখ লখ্যা কিম জাবে হো, অয়সী কোউ জুগতি বতাবে,
অলখ লখ্যা কিম জাবে।
তনমন বচনাতীত ধ্যানধর, অজপা জাপ জপাবে ;
হোয় অডোল লোলতা ত্যাগী,
জ্ঞান সরোবরে হ্বাবে হো !
শুদ্ধ স্বরূপমে শক্তি সম্ভারত,
মমতা দূর বহাবে ;
কনক উপল মল ভিন্নতা কাজে,
যোগানল সলগাবে হো।
এক সময় সমশ্রেণী রোপী,
চিদানন্দ ইম গাবে ;
অলখরূপ হোই অলখ সমাবে
অলখ ভেদ ইম পাবে হো॥" ৪৫

অলক্ষ্যকে কি করিয়া লক্ষ্য করা যায়—এরূপ কোন উপায় কেহ বলিয়া দিবে কি? তনু, মন, বচন—এই তিন যোগের অতীত হইয়া যে যোগাতীত ধ্যান ধারণ করিয়া অজপা জপ জপে এবং আসক্তি ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ স্থির হইয়া জ্ঞানসরোবরে স্নান করে। শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিজ শক্তির সন্ধান লয় ও মমতাকে দূরে ত্যাগ করে এবং আত্মারূপ স্বর্ণ হইতে প্রস্তরমল পৃথক করিবার জন্য যোগানল জ্বালাইয়া দেয়। চিদানন্দ এরূপ গাহিতেছেন যে একসময়ে সমশ্রেণী করিয়া স্বয়ং অলক্ষ্য হইয়া অলক্ষ্যে প্রবেশ করে এবং এইরূপে অলক্ষ্যের সন্ধান পায়।" ('এক সময়ে সমশ্রেণী' করা নির্ব্বাণ লাভ করিয়া সিদ্ধ-শিলায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বাবস্থা—ইহা জৈন শাস্ত্রের একটী বিশেষ কথা, বাহুল্যভয়ে বিস্তারিত অর্থ করা হইল না।)

চিদানন্দের সংসারের প্রতি বিরক্তিও তীব্র ছিল। ৭১ পদে তিনি গাহিয়াছেন :—

"ক্যা তেরা ক্যা মেরা,
প্যারে সহু পড়াই রহেগা।
পংছি আপ ফিরত চহুঁদিশথী, তরুবর রৈন বসেরা,
সহু অপনে অপনে মারগতে,
হোত ভোরকী বেরা।
ইন্দ্রজাল গন্ধর্ব্বনগর সম, ডেঢ়দিনকা ঘেরা ;
স্বপন পদারথ নয়ন খুল্যা জিম,
জড়ত ন বহুবিধ হের্যা।
রবিসুত করত শীশপর তেরে, নিশদিন ছানা ফেরা ;
চেত শকে তো চেত চিদানন্দ,
সমঝ শব্দ এ মেরা।" ৭১

"হে প্রিয়, তোমার ও আমার সমস্ত এখানে পড়িয়া থাকিবে। পক্ষীসকল চারিদিক হইতে আসিয়া বৃক্ষতে রাত্রিবাস করে ও সকাল হইলে সকলে আপন আপন মার্গে চলিয়া যায়। ইন্দ্রজাল ও গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় এ সমস্ত দেড় দিনের জন্য থাকে, স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থ চক্ষু খুলিবার পর অনুসন্ধান করিয়াও আর পাওয়া যায় না। তোমাদের মস্তকের উপর রবিসুত যম দিবারাত্রি লুকাইয়া ভ্রমণ করে। হে চিদানন্দ, আমার এই কথা বুঝ ও সাবধান হও।"

গুঢ়ার্থক সমস্যাপূর্ণ পদও ইঁহার আছে :—

"সন্তো অচিরজা রূপ তমাসা,
কিড়ীকে পগ কুঞ্জর বাঁধ্যো
জলমে মকর পিয়াসা।
করত হলাহল পান রুচিধর,
তজ অমৃতরস খাসা,
চিন্তামণি তজ ধরত চিত্তমে,
কাচ শকল কী আশা।
বিন বাদর বরসা অতি বরষত,
বিনদিগ বহত বতাসা ;

বজ্রগলত হম দেখ্যো জলমে,
কোরা রহত পতাসা।
বৈর অনাদি পন উপরথী,
দেখত লগত বগাসা ;
চিদানন্দ সোহী জন উত্তম
কাপত যাকা পাসা॥" ২০।

"হে সাধো, আশ্চর্য্য তামাসা। পিপীলিকার পায়ে হস্তীকে বাঁধা হইয়াছে, জলে থাকিয়াও মকর পিপাসিত। উত্তম অমৃতরস ত্যাগ করিয়া রুচি পূর্ব্বক হলাহল পান করিতেছে। চিন্তামণি রত্ন ত্যাগ করিয়া কাচের টুকরার আশা রাখে। বাদল নাই অথচ অত্যন্ত বর্ষা হইতেছে, দিক্ নাই অথচ বাতাস প্রবাহিত হইতেছে, আমি বজ্রকে জলে গলিয়া যাইতে দেখিলাম, অথচ বাতাস যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। অনাদিকালের বৈরভাব আছে, অথচ বাহির হইতে দেখিতে বকের ন্যায় স্নেহময় দেখায়। চিদানন্দ কহিতেছেন সেই জনই উত্তম যাহার পাশ-বন্ধন—কর্ত্তিত হইয়াছে।" আবার :—

"অয়সা জ্ঞান বিচারো প্রীতম
গুরুগম শৈলী ধারো রে।
স্বামী কি শোভা করে সারী
তে তো বালকুমারী রে ;
যে স্বামী তে তাত তেহনো
কহো জগত হিতকারী রে।
অষ্টদিকরী জারী বালা
ব্রহ্মচারিণী ভোবে রে,
পরনারী পূরণ চন্দা থী,
এক সেজ নহি শোবে রে।"
ইত্যাদি ৪০।

"হে প্রিয়, গুরুর নিকট শিক্ষা লইয়া জ্ঞানের বিচার কর। স্বামীর শোভা বর্দ্ধন করে এরূপ স্ত্রী অথচ সে বালকুমারী, আর তাহার যে স্বামী সেই তাহার পিতা এবং সে জগতের হিতকারী। বালা আটটী কন্যার জন্ম দিয়াছে অথচ তাহাকে ব্রহ্মচারিণী বলা হয়, পূর্ণচন্দ্রের সহিত তাহার বিবাদ হইয়াছে—অথচ স্বামীর সহিত এক শয্যায় সে শয়ন করে না" ইত্যাদি। এই পদটী আনন্দঘনের ৯৯ সংখ্যক পদের সহিত তুলনীয়। আনন্দঘন বলিয়াছেন—

* * * *

"নহি হুঁ পরণী নহি হুঁ কুঁবারী,
পুত্র জনাবন হারী।
কালি দাঢ়িকো মেঁ কোই নহি ছোড়্যা,
তো হজুয়ে হুঁ বালকুমারী।" ইত্যাদি

"আমি বিবাহিতা নহি, আমি কুমারী নহি, অথচ পুত্রের জননী। কালো দাড়ি বিশিষ্ট কোন লোককে আমি ছাড়ি নাই অথচ এ পর্য্যন্ত আমি বালকুমারী।"

নানক ও দাদুপন্থী সাধকগণের গূঢ়ার্থক সমস্যাপূর্ণ রচনা ভারতে অনেক প্রচার লাভ করিয়াছিল। জৈন সাধকগণও তাহার অনুকরণ করিয়া এইরূপ পদ রচনা করিয়াছেন। আমি বাল্যকালে "ভরথরী" ও "সুথরা" গানে এইরূপ সমস্যাপূর্ণ অনেক গান শুনিয়াছি।

আনন্দঘনের অন্যান্য পদের সহিতও চিদানন্দের পদের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

চিদানন্দের রচনায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমরা উপরে যে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার এই সকল শক্তির পরিচয় ব্যক্ত হইতেছে, তবুও আরও ২।১টী পদ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"জাগ অবলোক নিজ শুদ্ধতা স্বরূপকী।
জামেঁ রূপরেখ নাহিঁ, রঞ্চ পরপঞ্চ নাহি,
ধারে নহিঁ মমতা—সুগুণ ভবকূপকী।
জাকে হৈ অনন্ত জ্যোত, কবহু ন মন্দ হোত,
চার জ্ঞান তাকে সোত, উপমা অনুপকী।
উলট পুলট ধুব জ্ঞান, সত্তামে বিরাজমান,
শোভা নাহি কহি জাত, চিদানন্দ ভূপকী॥" ৩৯।

"হে আত্মা, জাগো, নিজ স্বরূপের শুদ্ধতা অবলোকন কর। যাহাতে রূপের রেখামাত্র নাই, সামান্যও প্রপঞ্চ নাই, সেই সুগুণ, ভবকূপের প্রতি মমতা রাখে না। যাহার অনন্তজ্যোতিঃ আছে যাহা কখন ও ম্লান হয় না, প্রথম চারি জ্ঞান (মতি, শ্রুতি, অবধি, মন ও পর্য্যায়) সুপ্ত অবস্থায় থাকে (পঞ্চম জ্ঞান—কেবল জ্ঞান—প্রকাশ পাইলে অন্যান্য জ্ঞানের পৃথক সত্তা থাকে না) এবং এই জ্ঞানের কোন উপমা নাই, তাই ইহাকে অনুপম কহে। যাহার পর্য্যায়ের

পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও সভায় যাহা ধ্রুব থাকে এরূপ চিদানন্দ ভূপের শোভা বর্ণনা করা যায় না।"

৩৫ পদে :—

* * * *

"নলিনী ভ্রমর মর্কটমুঠি জিম,
ভ্রমবশ অতি দুখ পাবে রে,
চিদানন্দ চেতন গুরুগম বিন,
মৃগতৃষ্ণা ধরি ধ্যাবে রে।"

"নলিনীর মধ্যে বদ্ধ ভ্রমর ও কলসের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া মুষ্টিবদ্ধ-হস্ত-মর্কট ভ্রমবশে যেরূপ কষ্ট পায় সেইরূপ হে চিদানন্দ, লোকে গুরুর নিকট শিক্ষা না পাইয়া মৃগতৃষ্ণা ধরিয়া দৌড়িয়া বেড়ায়।"

৩৭ পদে :—

"জাগরে বটাউ, অব ভয়া ভোর বেরা,
ভয়া রবিকা প্রকাশ, কুমুদহু খয়ে বিকাশ,
গয়া নাশ প্যারে, মিথ্যা রৈন কা অঁধেরা।" ইত্যাদি

"হে পথিক, জাগো, সকাল হইয়াছে। রবির প্রকাশ হইয়াছে, কুমুদ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, মিথ্যা জ্ঞানরূপ রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়াছে।"

৫৯ পদে :—

"ধ্যানঘটা ঘনছায়ে,
সুদেখো মাঈ, ধ্যানঘটা ঘনছায়ে,
দম দামিনী দমকতি দহুঁদিশ অতি,
অনহদ গরজ সুনায়ে।
মোটী মোটী কুন্দ গিরত বসুধা সুচি,
প্রেম পরম জড় লায়ে।
চিদানন্দ চাতক অতি তল্পত,
শুদ্ধ সুধা জল পায়ে।"

"হে মাতঃ, দেখ ধ্যানরূপ ঘনঘটা চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্রিয় দমনরূপ দামিনী দশদিকে চম্‌কাইতেছে ও অনাহত নাদের গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। মোটা মোটা পবিত্র জলবিন্দু পৃথিবীতে পড়িতেছে ও পরমপ্রেমরূপ বৃক্ষের শিকড় গজাইতেছে। অত্যন্ত তৃষাতুর চিদানদচাতক শুদ্ধ সুধাজল পান করিল।"

এইরূপ বহুসংখ্যক পদে ইঁহার সুললিত বর্ণনাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইঁহার রচিত ৫২টী দোহা বা সবৈয়াও পাওয়া যায়। এগুলিও পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে পদগুলির অনুরূপ। আমরা এস্থলে মাত্র একটী উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ওঁকার অগম অপার প্রবচন সার,
মহাবীজ পঞ্চপদ গর্ভিত জানিয়ে;
জ্ঞান ধ্যান পরম নিধান সুখ থান রূপ,
সিদ্ধি বুদ্ধি দায়ক অনুপ এ বখানীয়ে।
গুণ দরিয়াব ভব জলনিধি মাহে নাঁব,
তত্ত্বকে লিখাব হিয়ে জ্যোতিরূপ ঠানিয়ে;
কীনো হৈ উচ্চার আদ আদিনাথ তাতে থাকো,
চিদানন্দ প্যারে চিত্ত অনুভব আনিয়ে। ১।

সায়াহ্নের অভিসার

শ্রীরাধারাণী দেবী

সায়াহ্নের অভিসারে এনু তব দ্বারে
অঞ্চল আড়ালে ধরি সন্ধ্যাদীপ খানি!
জীবনের মহোৎসবে ডেকেছিলে যারে,
অসময়ে এসেছে সে, পরাজয় মানি।
গিয়াছে প্রভাত, গেছে দীপ্ত দ্বিপ্রহর,—
তখন আসিনি আমি তোমার মন্দিরে!
সহসা গোধূলি লগ্নে হে চিরসুন্দর!
উত্তরিল তরী মোর তব নদী তীরে।
সারানিশি এখনো তো রহিয়াছে বাকী,—
মধ্যাহ্ন গিয়াছে তাহে কিবা ক্ষতি প্রিয়!
পুষ্পগন্ধী শুক্লারাতে চন্দ্রালোক ছাকি'
সর্ব্বাঙ্গে জড়াবো তব নব-উত্তরীয়।
নিশা-শেষে হ'ব দোঁহে সর্ব্ব বাধাহীন,
অনন্ত ঘুমের ঘোরে র'ব স্বপ্নলীন।

ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)



"বগলুপ"।

এই প্যাঁচটী অনেক অবস্থা হইতেই করিতে পারা যায়। কখনও একটী হাত লেঙ্গটে ও অপর হাতটী ঘাড়ে রাখিয়া, কখনও দুইটী হাতই লেঙ্গটে রাখিয়া বা কখনও হাতে হাত দিয়া, যে কোন অবস্থাতেই নিজের শরীরটী অপরের বগলের মধ্য দিয়া গলাইয়া লইয়া গিয়া পিছনে যাওয়াকেই "বগলুপ" বলে। তাহার যে পা পিছনে থাকিবে সেই-দিকেই প্যাঁচটী করিতে হইবে। যদি তাহার ডান পা পিছনে থাকে তবে নিজের বাঁ পা-টী তাহার ডান দিকে আগাইয়া দিয়া উপরিউক্ত ভাবে শরীরটী একটু নীচু করিয়া তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া গলাইয়া লইয়া পিছনে যাইতে হয়। পিছনে যাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ডান পা টী পিছাইয়া লইতে হইবে।

"বগলুপ নিকাল"।

ঠিক "বগলুপ" প্যাঁচের ন্যায়, অপরের পাঁয়তারা দেখিয়া, যদি তাহার বাঁ পাঁয়তারা থাকে, নিজের বাঁ



পা টী তাহার ডান দিকে আগাইয়া দিয়া, শরীরটী একটু নীচু করিয়া তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া পিছনে যাইবার পূর্ব্বেই যদি বাধা পায় তবে বাঁ হাতটী তাহার পিছন দিক দিয়া পাছার মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া ঐখানেই আটকাইয়া রাখিয়া হাতের জোরে তাহার

শরীরটা ঊর্দ্ধে তুলিয়া নীচে ফেলাকে "বগল্লুপ নিকাল" বলে।



বগল্লুপ নিকাল

"কালা জাং"।

যদি অপরের ডান পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটী তাহার ডান গুলির উপর দিয়া লইয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে একটু নীচু হইয়া নিজের বাঁ দিকে ঘুরিয়া ডান হাতটী তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান পা-টী জড়াইয়া ধরিয়া, মাথাটী তাহার বগলের নীচে রাখিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সাম্‌নে ঝোঁক্ দিয়া চিৎ করাকে "কালা জাং" বলে।

"মুচ্ছীফোটা"

অপরের পিছনে যাইয়া বাঁ হাত দিয়া তাহার কোমরের পিছনের (মাঝখানের) লেঙ্গটটী জোরে ধরিয়া পরে বাঁ দিকে ঘুরিয়া, বাঁ হাঁটু নীচে ও ডান্ হাঁটু



কালা জাং—১ম

তুলিয়া পাঁয়তারা করিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথাটী তাহার পাছায় লাগাইয়া ডান হাতটী দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া দিয়া তাহার বাঁ পায়ের মোজাটী ধরিয়া টানিবার



কালা জাং—২য়

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া কোমরটী পিছন দিকে টানিয়া চিৎ করাকে "মুচ্ছীফোটা" বলে।



"মুচ্ছীফোটা—১ম"

"গিরা"।

অপরের পিছনে যাইয়া যদি তাহার ডান পাঁয়তারা থাকে, বাঁ হাত দিয়া তাহার কোমরটী জড়াইয়া ধরিয়া কিম্বা লেঙ্গটটী ধরিয়া তাহার ডান ধারে ঘুরিয়া আসিয়া ডান হাত দিয়া তাহার ডান হাঁটুর পিছনে ও সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা দিয়া তাহার বাঁ গোড়ালীর কাছে মারিবার সময় বসিয়া তাহার শরীরটী পিছনে উল্টাইয়া দিয়া চিৎ করাকে "গিরা" বলে।



"গিরা—১ম"



২য়"

"ধাপা"।

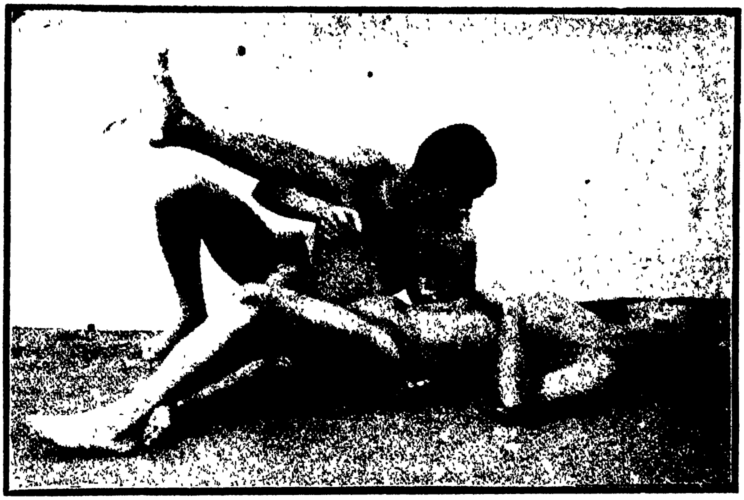
যে কোন অবস্থা হইতেই অপরের মাথাটী নিজের বগলের নীচে পাইলে বাহু দ্বারা তাহার গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া চাড় দেওয়াকে "ধাপা" বলে।

"ছিপ্পি"।

অপরে যদি পিছনে যাইয়া কোমরটী জড়াইয়া ধরে তখন তাহার পাঁয়তারা দেখিয়া তাহার যে পা আগে আছে নিজের সেই পা-টী বাহির দিয়া লইয়া গিয়া তাহার বাহিরের গাঁটের কাছে লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ধারের হাতটী দুই হাত দিয়া ধরিয়া বিপরীত ধারে জোরে ঘুরিয়া চিৎ করাকে "ছিপ্পি" বলে।

"ঘিস্সা"

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে, তবে ডান হাঁটুটী তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার উরতে রাখিয়া জোরের সহিত বসিয়া, বাঁ



"গিরা—২য়"

হাতটী তাহার বাঁ দিক দিয়া লইয়া গিয়া পেটের কাছে লেঙ্গটটী চাপিয়া ধরিয়া, ডান হাত দিয়া কিম্বা ডান পায়ের



"থাপা"



"ছিপ্পি—১ম"

চেটো দিয়া তাহার ডান কনুইয়ে জোরে ধাক্কা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া তাহার শরীরটী উল্টাইয়া দিয়া চিৎ করাকে "ঘিস্সা" বলে। অপরের শরীরটী উল্টাইয়া দিয়া নিজের বাঁ পা টী ঘুরাইয়া তাহার পেটের উপর চাপাইয়া রাখিতে হয়।



"ছিপ্নি—২য়"

"গাঁড়ুসা" বা "গাঁড় হাতী"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে, তবে ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু



"ঘিস্সা—১ম"

তাহার উরতে রাখিয়া, বাঁ হাত দিয়া তাহার পাছার কাছে লেঙ্গটটী চাপিয়া ধরিয়া, জোরের সহিত বসিয়া, ডান হাতটী তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান মুটো বা কব্জীটী ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতটী তাহার পাছার মধ্য দিয়া ভিতরে চালাইয়া



"ঘিস্সা—২য়"

দিয়া পেটের কাছে লেঙ্গটটী চাপিয়া ধরিয়া, সেই হাতে তাহার শরীরটা উল্টাইয়া দিয়া চিৎ করাকে "গাঁড়সা বা"



"গাঁড়সা" বা "গাঁড়হাতী"—১ম,

"গাঁড় হাতী" বলে। উল্টাইয়া দিবার সময়, নিজের পাঁয়তারা ঠিক রাখিবার জন্য ডান পাটী উঠাইয়া রাখিতে হইবে। শরীরটা উল্টাইয়া দিয়া নিজের বাঁ পা-টী ঘুরাইয়া তাহার পেটের উপর চাপাইয়া রাখিতে হয়।

"দচ্চা"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডানদিকে থাকে তবে ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান হাঁটুর সামনে মাটীতে রাখিয়া, জোরের সহিত বসিয়া, পরে বাঁ হাতটী তাহার বাঁ দিক দিয়া লইয়া গিয়া পেটের কাছে রাখিয়া, তাহার পিঠের উপর একটু



"গাঁড়সা" বা "গাঁড়হাতী—২য়



"দচ্চা"

উপুড় হইয়া, ডান কনুই দিয়া তাহার ডান কনুইয়ের কাছে জোরে ধাক্কা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাঁটু দিয়া তাহার ডান



"ইন্দিরা"



"চরকা—১ম,"

পা-টী ও বাঁ হাত দিয়া বাঁ পা-টী লম্বা করিয়া, তাহার শরীরটিকে লম্বা করাকে "দচ্চা" বলে।



"চরকা—২য়"

"ইন্দিরা"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি ডানদিকে থাকে তবে ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার উরুতে রাখিয়া, জোরের সহিত বসিয়া, বাঁ হাত দিয়া তাহার পাছার কাছে লেঙ্গটটা চাপিয়া ধরিয়া, পরে ডান হাতটী তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ডান মুঠো বা কব্জীটী ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া ঘুরাইয়া তাহার পিঠে তোলা বা আটকাইয়া রাখাকে "ইন্দিরা" বলে।



"শোয়া ১ম

"চরকা"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডানদিকে

থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার পাছার কাছে লেঙ্গটটা চাপিয়া ধরিয়া, পরে নিজের বাঁ পা দিয়া বাহির কিম্বা ভিতর দিক হইতে তাহার ডান পা টী জড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা দিয়া তাহার গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া, নিজে সাম্‌নে ঝোঁক দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া চিৎ করাকে "চরকা" বলে।



"শোয়ারী—২য়"

"শোয়ারী"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটিতে বসে, তখন তাহার শরীরের উপর চাপিয়া বসিয়া, ভিতর দিক হইতে তাহার দুই পায়ের মধ্যে নিজের দুইপা চালাইয়া দিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত তাহার দুই বগলের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া, মুঠো কিম্বা কব্জী দুইটী চাপিয়া ধরিয়া ভিতর দিকে টানিতে টানিতে, পায়ের জোরে তাহার শরীরটী লম্বা করিয়া আট্‌কাইয়া রাখাকে "শোয়ারী" বলে।

"পেটী"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে তখন তাহার শরীরের উপর চাপিয়া বসিয়া, "শোয়ারী" প্যাচের ন্যায় হাতের ও পায়ের কাজ করিয়া তাহাকে লম্বা করিয়া পরে একটী পা তাহার পেটের নিচু দিয়া চালাইয়া দিয়া অপর পায়ের সহিত আট্‌কাইয়া রাখিয়া তাহার পেটে চাপ দেওয়াকে "পেটী" বলে।



"পেটী"

"হপ্তা"

অপরকে নিচে লইয়া আসিয়া "শোয়ারী" দিয়া নিচে আট্‌কাইয়া রাখিয়া পরে তাহার ডান বগলের মধ্যে দিয়া বাঁ হাত চালাইয়া দিয়া হাতটী তাহার ঘাড়ের উপর আট্‌কাইয়া রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মোড়াটী মোচড় দিয়া তুলিয়া লইয়া চিৎ করিতে পারা যায়। এইরূপে হাতটী তুলিয়া লওয়াকে "হপ্তা" বলে।



"হপ্তা"

যে জীবন দীন

শ্রীআশীষ গুপ্ত

লিমিটেড কোম্পানী,—অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষের,—ঘুঁটের। চার জন অংশীদার,—মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা, জংলীর মাসী। বড় স্কেলে ব্যবসা,—ঘুঁটে বিক্রি করে, বর্ষাকালের জন্য ষ্টক করে;—বৃষ্টি যখন নামে, তখন অংশীদারেরা গম্ভীরমুখ করিয়া বলে, "এত বিষ্টি,—ঘুঁটে শুকোই কোতা, মা'ঠান্—?" একখানা ঘুঁটে চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া বলে, "এতবড় ঘুঁটে এ তল্লাটে নেই,—এই ভরা বাদল, কিন্তু শুকিয়ে খট্‌খট কর্‌ছে যেন ঝুনো নার্‌কোল,—পয়সায় আটখানা,—এ তুমি বলেই দিচ্ছি, মা'ঠান্, লোক্‌সান করে'—"

গোয়ালাবাড়ীতে গোবর বন্দোবস্ত,—মাসে দেড়টাকা করিয়া প্রত্যেককে দিতে হইত,—পরিবর্ত্তে গোবর পাইত প্রতিজনে রোজ দুই ঝুড়ি। লোকের বাড়ীর দেয়াল বন্দোবস্ত,—মাসে চার আনা করিয়া ভাড়া,—চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া জায়গা।—মানদা বলিত, "সরযূ, তোর হাত দু'খানা ঢ্যাঙ্গা আছে, তুই-ই মাপ্ না হয় দ্যাল্‌টা,—আমার হাতে বড্ড কম হয়—"

দেয়াল মাপিতে মাপিতে, সরযূ মুখ টিপিয়া হাসিত, বলিত, "তোর ত হাত নয়, যেন দাঁতন-কাঠি—"

মানদা বলিত, "বেশ্ লো বেশ, তোর হাত যেন আঁক্‌ষী—"

জংলীর মাসী বলিত, "মা'ঠান্, লাভ হ'ত যদি না দ্যালের ভাড়া দিতে হ'ত,—মাঠে শুকোতে দিতে পারি,—পয়সাও দিতে হয় না,—কিন্তু ছোঁড়ারা সব বল খেলে, লাপালাপি করে,—দেয় সব ঘুঁটে ভেঙ্গে; তাই—"

পয়সা ভাগ-বাটোয়ারা হইত মাসকাবারে,—সমস্ত মাসটা ঝগড়া বিবাদের মধ্যে দিয়াও একপ্রকার নির্ব্বঞ্ঝাটে কাটিত,—কিন্তু পয়সা ভাগ করিবার সময়েই মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইত। সরযূ কহিত, এ মাসে বেশী পয়সা না আনিলে, স্বামী তাহাকে অতিরিক্ত প্রহার দিবে বলিয়াছে। মানদা বলিত, তাহার অভাব, তাহাকে কিছু বেশী না দিলে চলিবে না। হাব্‌লার মা বলিত, কম কম বিড়ী খাইয়া হাব্‌লার পেট ফুলিয়াছে, এ মাসে স্বচ্ছন্দ পরিমাণে বিড়ী না খাইতে পাইলে হাব্‌লা আর বাঁচিবে না। জংলীর মাসী কহিত, জংলী একদিন ফিলিম না কি দেখিতে যাইতে চায়,—ছবিতে নাকি হাঁটে, ছবিতে নাকি কথা কয়,—জংলীর মাসীও জংলীর সহিত যাইবে; বুড়া বলিয়া কি তাহার প্রাণে সখ নাই?

সরযূ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, "আবার সখ? এ মাসের পয়সা ত সব তোর কাছেই ছিল, তুই তার থেকে কত চুরি করেছিস, আগে তার হিসেব দে, তারপরে ফিলুম দেখ্‌তে যাস্—" বলিয়া সরযূ জংলীর মাসীর নাকের কাছে হাত দুইটা আনিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে নাড়িয়া দিল।

জংলীর মাসী কোমর হইতে পয়সার থলিটা খুলিয়া লইয়া সরযূর দিকে ছুড়িয়া দিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "মানি বলে ঠিক, হাত নয়, আঁক্‌ষী,—নে না তোর হিসেব,—ধ্যাংরা মারি অমন হিসেবের মুখে—"

মানদা আন্নার "বকুলফুল"। ও-পাড়ায় কোথায় একখানা নূতন বাড়ী তৈরী হইবে,—তাহারই ভিত খোঁড়া হইতেছিল। ভালো মাটি দেখিয়া, নিজের দাওয়া সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে মানদা সেখান হইতে ঝুড়ি মাথায় করিয়া মাটি লইয়া আসিতেছিল! পথে আন্নার সহিত দেখা।

আন্না কহিল, "কি ভাই বকুলফুল, মাটি নিয়ে যাচ্ছিস্?"

প্রশ্নটা অনাবশ্যক,—কিন্তু ওটা আলাপ জমাইবার পূর্ব্বাভাস, এবং বৃহত্তর পরিচয়ের পক্ষে অপরিহার্য্য।

মানদা কহিল, "হ্যাঁ, তুই কোথায় যাচ্ছিস্, ভাই আন্না?"

আন্না বলিল, "বেশ মাটি ত, বকুলফুল,—খোলামকুচি-টুচি নেই,—দে না আদ্দেকটা, উনুন গড়্‌ব—"

মানদা কহিল, "না বাপু, তা পার্‌ব না,—আমি কত কষ্ট করে' আন্‌ছি বলে'—"

আন্না আসিয়া হাত বাড়াইয়া মানদার মাথার উপরকার ঝুড়িটা ধরিয়া মিনতির সুরে বলিল, "নামা না ভাই বকুলফুল, ঝুড়িটা একবার, একটুখানি মাটি নিই, —এট্টু—"

এক ঝট্‌কা টানে আন্নার হাত হইতে ঝুড়িটা ছাড়াইয়া লইয়া, মানদা কহিল, "বারণ কর্‌লেও শুনিস্ না ক্যান্ লা? —এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছিস্ নাকি?"

অভিমানে কাঁদ-কাঁদ মুখ করিয়া আন্না বলিল, "একটুখানি মাটি চাইলে তেড়ে আসিস্, তুই এম্‌নিতর বকুলফুল?"

অত্যন্ত বিষয়ী লোকের মত মানদা বলিল, "মাটি দিয়ে আমি 'বকুলফুল' পাতাতে পার্‌ব না, এ আমি তোমাকে সিধেসিধি বলে' দিচ্ছি,—'বকুলফুল' থাক্, আর যাক্, মাটি আমি দিতে পার্‌ব না।—আর আজ তুই মাটি চাইতে এসেছিস্, কাল যখন একটু নাউশাক চাইতে গেসনু তোর কাছে, তুই দিয়েছিলি?—নিজের বেলা আঁটিসুঁটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি—?"

আন্না কহিল, 'সে হ'ল নাউশাক, আর এ মাটি—"

মানদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "তোর নাউশাকের বেলা 'বকুলফুল' নয়, আর মাটি চাইবার সময় 'বকুলফুল',—বাঃ রে আব্‌দার!—"

আন্না কহিল, "আচ্ছা যাস্ আজ্‌কে, লাউশাক দেব'খন,—এখন মাটি দে -"

অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে মানদা বলিল, "ঠিক দিবি? ভাঁড়াচ্ছিস্ না ত?"

"ঠিক না ত কি মিথ্যে?—আচ্ছা যাস্ তুই চাইতে, যদি না দিই তখন বলিস্—"

অত্যন্ত উদারভাবে মানদা কহিল, "তবে না হয় খানিকটা মাটি নে—"

মাটি ভরিবার মত একটা উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া, পথের ধারের আঁস্তাকুড়ের নিকট হইতে একটা ভাঙ্গা কড়া টানিয়া লইয়া, মানদার ঝুড়ি হইতে আন্না মাটি তুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

মানদা কহিল, "কিন্তু খবরদার আন্না, লাউশাক যদি না দিস্--তাবলে' অতটা নিস্‌নে যেন,—তাহ'লে তেরাত্তিরের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মর্‌বি, সে কথা বলে' দিচ্ছি—"

কড়াটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে আন্না কহিল, "শাপমন্যি কর্‌ছিস্ ক্যান্ লা মানি?"—কিছুদূরে যাইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "যেয়ো'খন নাউশাক আন্‌তে, দেব'খন ভালো করে', নাউশাক দেবে, না কচুপোড়া দেবে—?"

আন্নার রকম-সকম দেখিয়া মানদা স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল।—

* * * *

মানদাকে সবাই ঠকায়;—সে যদি কোন কিছু বিক্রি করিতে যায়, তাহা হইলে সে লোককে দশ আনার জিনিষ দিতে গিয়া, বারো আনার দিয়া, আট আনা পয়সা লইয়া আসিবে, ইহা একরকম জানা কথা; এবং এ কথা মানদার অংশীদার তিনজনের অপেক্ষা ভালো করিয়া কেহই জানিত না। তাহারা বহুবার ঠকিয়া এবং ঠেকিয়া শিখিয়াছিল যে, মানদাকে অর্থ সংক্রান্ত কাজের ভার দিলে, তাহাদের লিমিটেড কোম্পানীর লোকসান অনিবার্য্য।

সেদিনকার ব্যাপার;—বড়বাবুদের বাড়ী ঘুঁটে বিক্রী করিয়া মানদার তিন টাকা পাঁচ আনা আনিবার কথা। সে ফিরিয়া আসিয়া সরযূর কাছে বসিয়া হিসাব করিতে লাগিল; কহিল, "পয়সায় চার গণ্ডা করে' হ'লে, তোমার এক আনায় হ'ল গে,—হ্যাঁ লা সরি, কত হয় লা?"

সরযূ কহিল, "গিন্নীমা তোকে যা পয়সা দিয়েছে, তুই আগে বার কর্, তার পর দেখ্ আমি হিসেব করে' দিচ্ছি—"

মানদা সন্তর্পণে কাপড়ের আঁচলের গিরা খুলিল; মস্তবড় গ্রন্থি, অনেকবার করিয়া কাপড়টা জড়াইয়া বড় করিয়া বাঁধা হইয়াছে! অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেটা খুলিয়া সে দেখিল, আঁচলের মধ্যে কিছুই নাই! সরযূ কহিল, "টাকা কি হ'ল লা, মানি—"

স্তম্ভিত মানদা বলিল, "ভেল্কী লাগিয়ে দিলে বাছা—পয়সা নিয়ে এনু আঁচলে বেঁধে; গেরো ঠিক রয়েছে, পয়সা নেই!"

অসংখ্য রকমে মানদার মুণ্ডপাত করিবার বন্দোবস্ত করিতে করিতে সরযূ ছুটিল। বড়বাবুদের বাড়ী গিয়া দেখে, মানদা যেখানে বসিয়া ঘুঁটে গণিয়াছিল, তাহারই পাশে তিন টাকা পাঁচ আনা পয়সা পড়িয়া রহিয়াছে! —মানদা শূন্য আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়া বাড়ী গিয়া হিসাব করিতেছিল, এক পয়সায় চার গণ্ডা ঘুঁটে হইলে, চার পয়সায় কত হয়!

আর একবারের ঘটনা,—গোয়ালা-বাড়ীতে গোয়ালার সহিত মানদার একদিন বচসা হইল'—মানদা এক জায়গা হইতে গোয়ালাকে কয়েক আঁটি খড় কিনিয়া আনিয়া দিয়াছিল, গোয়ালা বলিল, তাহার হিসাব-মত তিন আঁটি খড় কম হইতেছে।

মানদা কহিল, তাহার অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু চুরি-বিদ্যা তাহার আছে এ কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলে নাই।—কথাটা সত্য; সেই জন্যই গোয়ালা আর কিছু বলিল না।

—ইহার কিছুদিন পরে, মাস-প্রথমে গোয়ালা বলিল, "মাসকাবার ত হ'ল মানদা, তোমার টাকা দেড়টা কবে দিচ্ছ?"

মানদা একেবারে ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল,—গোয়ালা যেদিন তাহাকে আকার-ইঙ্গিতে চোর বলিয়াছিল, সেদিনও সে এতটা রাগ করে নাই! সে কহিল, "আমায় চোর বলে' আবার দেড়টা টাকা চাইতে এসেছ? হারামজাদা বিট্‌লে কোথাকার—! এবার তিন্‌টে টাকা দেব,—দেখি তুই আর কেমন আমায় চোর বলিস্—দেড় টাকা চেয়ে আমায় অগেরাহ্যি করা!"

গোয়ালা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিল না,—কিন্তু টাকা দিবার সময়ে, মানদা তিন টাকাই দিল,—দিয়া এতটা অহঙ্কারের সহিত একটি কথাও না কহিয়া চলিয়া গেল যে, গোয়ালা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল, এবং ততোধিক বিস্মিত হইল মানদার অংশীদারেরা তিনজন। নিজের সতত্ব প্রমাণ করার এই অদ্ভুত প্রণালী দেখিয়া সরযূ কহিল, "তোর বুদ্ধিসুদ্ধি নেই মানি,—ওকে তিন টাকা দিলি কি বলে?"

মানদা কহিল, "আমায় বলে চোর, হারামজাদার আস্পর্দাটা একবা'র দেখ, সরযূ,—ঘুঁটে বিক্রি করে' খাই,—কিন্তু তাই বলে' কেউ যে আমায় শুধু-মুধু চোর বলে' যাবে, আর আমি মুখ বুজে সহ্যি কর্‌ব, তেমন মেয়ে আমি নই!—ওর নাকের ওপর দিনু ছুড়ে টাকা,—কি রকম টিট্ হ'য়ে গেল, দেখ্‌লি সরি?—আর কথাটি কইতে পার্‌লে না—"

* * * *

জংলীর মাসীর প্রাণে সখ খুব,—যাত্রা দেখিতে চায়, ফিলুম দেখিতে চায়, থেটার দেখিতে চায়! পূজাবাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া যে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে, জংলীর মাসী যেন সেই। ভাগ্যবানদের জুতার ঠোক্কর, লাঠির তাড়া, সশব্দ হুঙ্কার এ সকল অগ্রাহ্য করিয়া যে কুকুরটা নিমন্ত্রণ-গৃহের আশপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় কলাপাতার লোভে, জংলীর মাসী যেন তাই!—থেটার, ফিলুম, যাত্রা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বড় বেশী;—জংলী ছিল উৎসাহিত করিবার জন্য। সরযূ হাসিত, মানদা মুখ বিকৃত করিত, হাব্‌লার মা নিন্দা করিত; কিন্তু জংলীর মাসীর সখ মরিত না।

সরযূর স্বামী ছিল,—স্বামী ত নয়, ইষ্টদেব,—কাজের মধ্যে ছিল দুটি, খাওয়া আর ঘুমান। ঘুম থেকে উঠিয়া খাইত, খাইয়া আবার ঘুমাইত, জাগিয়া উঠিয়া আবার খাইত, ভোজনশেষে পুনরায় নিদ্রা যাইত।

সরযূ বলিত, "খাক্ যত খুসী, কিছু বল্‌ছি না,—ঘুমোক্ যত ইচ্ছে, মানা কর্‌ছি না,—কিন্তু গালমন্দ করে কেন?—বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি, আবার চোখ রাঙ্গানি,—সরি কারও কথার ধার ধারে না—"

কিন্তু নিদ্রাতে বোধ হয় পরিপাক ভালো হয়,—সরযূর স্বামী সাধন খাইতে পারিত হাতীর মতন;—হাতী যে কতটা খায়, তাহা সরযূ জানিত না,—কিন্তু সাধনের আহার দেখিলে হাতীর কথা ছাড়া সরযূর অন্য কিছু মনে হইত না।

শুধু ঘুঁটের রোজগারে সাধনের খোরাক সংগ্রহ করা অসম্ভব। সরযূ বড়-বাড়ীর বাসন মাজার কাজে নিযুক্ত হইল; কহিল, তাহার নিজের ভাত সে বাড়ীতে লইয়া গিয়া আহার করিবে।—কিন্তু সেদিন যখন প্রায় পৌনে দু'সের চালের ভাত একটা কাঁসিতে স্তূপাকারে সাজাইয়া, সরযূ দুপুরবেলা বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন সিঁড়ির মাথায় বড় গিন্নীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল অকৃত্রিম

বিস্ময়ের সহিত বড় গিন্নী কহিলেন, "এই এতগুলো চালের ভাত তুমি একা খাবে নাকি সরযূ?".

অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে সরযূ কহিল, "আমি একটু বেশী খাই, মা'ঠান্,—খাটুনীর শরীল, ভাত একটু বেশী না খেলে—"

বড়গিন্নী অতিশয় বুদ্ধিমতী,—তিনি কহিলেন, "কাল তোমাকে নিজের কাছে বসিয়ে খাওয়াব সরযূ,—তুমি কি খেতে ভালবাস, বল,—ঠাকুরকে বলে' দেব'খন। আহা গরীব মানুষ,—তোমাদের পেট ভরিয়ে খাওয়াতে পার্‌লে বড় তৃপ্তি পাই—"

সরযূ বুঝিল, তাহাকে খাওয়ার পরীক্ষা দিতে হইবে। তাহার পর, পরশু হইতে তাহার ভাতের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইবে। বাড়ী ফিরিয়া সরযূ নির্জলা উপবাস করিল;—কাল বেশী করিয়া না খাইতে পারিলে, অধিক পরিমাণে ভাত পাওয়া যাইবে না,—সাধনের আহারের জোগাড় করা শক্ত হইবে। কিন্তু উপবাস করিয়াও সে একা যে অতগুলা ভাতের সিকি অংশও আহার করিতে পারিবে না, সেটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি সরযূর ছিল।—কিন্তু তবুও যতটা পারা যায়! পরদিন বড়গিন্নী সরযূর কাছে বসিয়া, তাহার খাওয়া দেখিতে লাগিলেন।—সে যেন জীবন-মরণ পণ করিয়া ভাত গিলিতে আরম্ভ করিল। বড়গিন্নী তাহার আহারের পরিমাণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন;—কিন্তু এত করিয়াও কূলে আসিয়া তরী ভিড়িল না। ভোজনের ব্যাপারে শ্রীমান সাধন একেবারে যাহাকে বলে একমেবা-দ্বিতীয়ম্, তাই। সরযূ যখন খাওয়া শেষ করিল, তখন আর তাহার নড়িয়া বসিবার মত সামর্থ্যটুকুন্‌ও অবশিষ্ট নাই; কিন্তু সাধনের প্রয়োজনের তুলনায় তাহার নিজের খাদ্যের পরিমাণ যে কত অল্প, কত তুচ্ছ হইয়াছে, সে ব্যাপারটা অত্যন্ত ভালো করিয়া উপলব্ধি করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে অস্পষ্ট স্বরে সরযূ বলিল, "আজকে আমার শরীরটা ভালো নেই, মা'ঠান্, নইলে আমি আরও বেশী খেতে পারি,—ঢের বেশী এর চাইতে, মা'ঠান্,—অনেক বেশী—"

দেখিয়া বড়গিন্নীর দয়া হইল;—তিনি কহিলেন, "এখানেই এখন থাক্, সরযূ, রোদ পড়্‌লে বিকেলবেলা বাড়ী যাস্'খন—"

সরযূর স্বামীপ্রীতি তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে সন্তুষ্ট করিয়াছিল,—তাহার প্রতি বড়গিন্নীর মনটা পূর্ব্বাপেক্ষা কোমল হইয়া উঠিল। পরদিন হইতে সরযূ আবার আগে-কার মতই নিজের এবং সাধনের ভাত একত্র করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল; বড়গিন্নী আর তাহা লইয়া বাক্যব্যয় করিলেন না।

* * * *

যে জীবন দীন, যে জীবন হেয়,—যাহাদিগকে কেহ কোনদিন একটা কথা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, এ কাহিনী তাহাদের।—তাহাদিগের ক্ষুদ্র পরিসরের বাহিরে যে মানুষ থাকে, বুকে আনন্দ লইয়া, দেহে স্বাস্থ্য লইয়া, হাসিতে মুখ ভরিয়া, মাথায় দুর্ব্বুদ্ধি পূরিয়া,—মানুষে মানুষে যে কাটাকাটি, খাওয়াখায়ি করিয়া মরে, এ কথা তাহারা জানে না। ঝগড়া তাহারাও করে,—দিবারাত্র, চব্বিশপ্রহর,—কিন্তু মুখের উপরে মুখোস আঁটিয়া মনের মধ্যে বিষের ছুরী তাহারা শানায় না। কলহ বিবাদ তাহারাও করে বটে, কিন্তু তাহার ভিতরকার হুলটির অভাব, শিক্ষা ও সভ্যতা নাই, বোধ হয় সেইজন্যই।—

* * * *

মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা, জংলীর মাসীর সভা বসিয়াছিল,—মাঠের মাঝখানে। বড়গিন্নীর বড় ছেলেটা সাইকেল চড়া শিখিতেছে। মাঠটা বেশ নিরাপদ,—অবশ্য সাইকেল চড়ার পক্ষে। সাইকেল জিনিষটা মানুষের অদ্ভুত প্রতিবেশী-প্রীতির কথা অনেক সময়ই স্মরণ করাইয়া দেয়,—ঘণ্টা হয় ত একটা লাগান থাকে, চেষ্টা করিলে হয় ত কখনও ক্রিং করিয়া বাজেও।—কিন্তু যে গাড়ীর তলায় অন্য লোক পড়িলে, যে চাপা পড়ে তাহার অপেক্ষা, চালকেরই চিৎপাত হইয়া পড়ার সম্ভাবনা ঢের বেশী, সে গাড়ীর ঘণ্টা বাজাইয়া সাইকেল-আরোহী যে কাহাকে সাবধান করে, সে কথা মনে করিলে হাসি পায়। মনে হয় যেন, সাইকেলের ঘণ্টাটা মিনতি করিয়া বলে, "দোহাই তোমাদের, একটু রাস্তা ছাড়িয়া দাও, নহিলে মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িব—"

রাস্তার লোকেরা কিন্তু সতর্ক হয় না,—হাসে, "ভারী ত গাড়ী,—পড়ুক্ বেটা উল্‌টে—"

সেদিন বড়গিন্নীর বড়ছেলে উল্টাইয়া পড়িল, একেবারে

জংলীর মাসীর ঘাড়ে। জংলীর মাসীর হাতের কনুইটা গেল ছড়িয়া,—সামান্য একটু আঁচড়, একরকম কিছু-না বলিলেই হয়।

ও-ধারের আম্‌ড়াগাছের গুঁড়ির উপরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া বড়গিন্নীর বড়ছেলে মাথা কাটিয়া ফেলিল;—কিন্তু চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ডাহিনে বাঁয়ে না তাকাইয়াই ছেলেটা নিজের মাথার যন্ত্রণা ভুলিয়া এমন প্রচণ্ড দৌড় দিল যে, চোখের পলক ফেলিতেও তর সহিল না। সাইকেলটা রহিল মাঠের মাঝখানে পড়িয়া।

জংলীর মাসী উঠিয়া বড়গিন্নীর কাছে গেল; কহিল, "তোমার ছেলের কীর্ত্তি দেখ, মা'ঠান্,—হাতটা ভেঙ্গে দিলে। ওপরে শুধু একটুকুন্ ছড়ে' গেছে বটে, মা'ঠান্,—কিন্তু ভেতরের হাড় আমার একেবারে ছাতু হ'য়ে গেছে—" বলিয়া জংলীর মাসী চোখের জল মুছিল।—"আমরা ছোটলোক মা'ঠান্, গরীব মানুষ,—হাতখানা গেল! এ কি বাইসিকিল চড়া বাপু তোমার ছেলের—" বলিয়া জংলীর মাসী আবার চোখ মুছিল, "তোমার ছেলে বলেই কিছু বলিনে, মা'ঠান্,—অপর কেউ হ'লে, এতক্ষণে মুখখিস্তিতে—"

বড়গিন্নী কহিলেন, "কিছু মনে করিস্‌নে বাছা, ছেলেটাও হ'য়েছে একটা বাঁদর।—এই পাঁচটাকার নোটখানা ধর্ জংলীর মাসী,—ওষুধ-টষুধ কিনে হাতে মালিশ করিস্, কেমন থাকিস্ আমায় একবার বলে' যাস্ কাল—"

জংলীর মাসী ভারী খুসী;—কহিল, "সোনার চাঁদ ছেলে তোমার, মা' ঠান্,—একটু অশান্ত, তা' হ'ক্; ও-বয়সে ছেলেরা একটু দুষ্টুমি করেই থাকে। তুমি যেন ওকে মার-ধোর কোরোনি,; নেগেছে, নেগেছে. আমার হাতে নেগেছে, ও আমি গেরাহ্যি করিনে।"

সেদিন রাত্রিতে জংলীর মাসীর বাড়ীতে দস্তরমত মহোৎসব। ঘুঁটে বিক্রীর পয়সায় আর অমনতর উৎসব করিতে হয় না। জংলীর মাসীর দাঁত আর ঠোঁটচাপা থাকিতে চায় না,—সে কহিল, "দাঁতের মিশি ফুরিয়ে গেছে, জংলী, দোক্তাপাতা কাল কিনব—"

জংলী কহিল, "আর ফিলিম দেখ্‌তে যাবিনে?"

জংলীর মাসী বলিল, "হ্যাঁ, তাও যাব,—আর একটা হারিকেন কিনব, আর নেপের জন্যে তুলো, আর একটা কাঁথার জন্যে পুরোন কাপড়,—তোর জন্যে গেঞ্জী—"

জংলী কহিল, "তোর জন্যেও একটা কিনিস্, মাসী—"

*　　*　　*

বড়গিন্নীর শরীরে মায়াদয়া আছে,—অত যে বড় ঘরের বউ, কিন্তু লেশমাত্র অহঙ্কার নাই। সমস্ত সংসারটা কড়ে আঙ্গুলের ইঙ্গিতে চলে,—প্রকাণ্ড একটা কলের মত, নিয়ম-মাফিক। সংসার-যন্ত্রের কোথাও একটি স্ক্রু অবধি ঢিলা নাই। তাঁহারই স্নেহচ্ছায়ায় যেন আত্মীয়-স্বজন, ছেলেপুলেগুলা বাস করে,—দাসী চাকর, গরীব দুঃখীগুলাও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হয় না। অতএব বড়গিন্নী লোক ভালো!—

*　　*　　*

হাব্‌লার মা'র যা গলা, শুনিলে ভয় হয়। মোটা নয়, সরু,—কিন্তু এক কথায়, শঙ্কাজনক। সে যখন কথা কয়, তখন মনে হয় যেন সমস্ত শব্দগুলা তাহার গলার ভিতরে একপাশে কাৎ হইয়া পড়িয়াছে;—তাহার কথা শুনিলেই বোধ হয় যেন, তাহার জিভ্‌টা নৌকার খোলের মত করিয়া লইয়া, গলার একপাশের চড়ায় আট্‌কাইয়া সে কথা কহিতেছে,—অত্যন্ত পাত্‌লা একটা কাঁসার থালায় লোহা দিয়া আঘাত করিয়া যেন তাহার কাৎ-হইয়া-পড়া শব্দগুলা বাহির হয়।

হাব্‌লার মা জানে না, পৃথিবীতে এমন সংবাদ নাই! লাটসাহেবের দরবারের সর্ব্বাপেক্ষা টাট্‌কা খবর হাব্‌লার মা জানে,—দুনিয়ার কোথায় কি ঘটিতেছে, এবং কেন ঘটিতেছে, তাহা জানিতে হইলে বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না, হাব্‌লার মা'কে কেবলমাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে! বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের পাটের আমদানী-রপ্তানী হইতে আরম্ভ করিয়া, দেশলাইয়ের কল, বিড়ীর ফ্যাক্টরীর কোন ইতিবৃত্ত তাহার অজ্ঞাত নাই। হাব্‌লার মা এতবড় কালোয়াৎ!—

বিড়ীর ফ্যাক্টরীর কথা হাব্‌লার মা জানিবে না ত কি জানিবে ও-পাড়ার গদাইয়ের পিসি?—হাব্‌লার বিড়ী খাওয়া একটা দেখিবার জিনিষ;—সে যখন চোখ বুজিয়া বিড়ী টানে, তখন তাহার চতুষ্পার্শ্বে ভিড় জমিয়া যায়। সম্মুখে বসিয়া হাব্‌লার মা গর্ব্বিতমুখে সকলের দিকে

চাহিয়া বলে, "লোকে মনে করে মুখ দিয়ে ধোঁয়া নিয়ে নাক দিয়ে বার করে' দেওয়াটা আর অমন কি শক্ত? —কিন্তুন্ করুক দিগিনি তারা এম্‌নিতর,—সাত হাত জিভ্ বেরিয়ে যাবে বাবা,—অম্‌নি নয়! চার্‌টে বিড়ী একসঙ্গে খেলেই মাথা ধরে', পেট ফুলে' ঢোল হ'য়ে যাবে, —আর এ কি খেলা কথা! হাব্‌লার আমার কোনদিন কপালটি পর্য্যন্ত টিপ্‌টিপ্ করেনি—"

হাব্‌লার দিকে চাহিয়া পুনরায় বলে, "একবার জ্বলন্ত দিকটা দিয়ে টান্‌না বাবা, এরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ্‌বে বলে'—"

সেদিন গোটা সাতেক বিড়ী একসঙ্গে সূতা দিয়া বাঁধিয়া লইয়া, হাব্‌লা তাহাই টানিতে টানিতে লোকগুলার কাছে কেরামতী দেখাইতেছিল,—মায়ের কথায় বিড়ীগুলা ঘুরাইয়া লইয়া, আগুনের দিকটা মুখের ভিতর পুরিয়া দিয়া উল্টা টানিয়া, নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।—

হাব্‌লার মা কহিল, "আমার ষষ্ঠীর বাছা হাব্‌লা, ওর দৌলতে কতগুলো বিড়ীর দোকান চল্‌ছে! কত লোকের ভাত কাপড় জোগায় ও—"

অর্থনীতির বড় কথা,—চাহিদা ও জোগান দেওয়ার সরল ব্যাখ্যা! সাধে কি আর সরযূ বলে, হাব্‌লার মা সব জানে!—

হাব্‌লা যেন বিড়ী মুখে লইয়া, দেশালাই হাতে করিয়াই পৃথিবীতে জন্মিয়াছে!—

* * * *

ইহাদের বৈঠক বসিত, ঝগড়া হইত, পয়সা ভাগ হইত, হিসাব-নিকাশ হইত। দূরে বড়গিন্নীদের প্রকাণ্ড বাড়ীটা মাথা উঁচু করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিত,—সেই বাড়ীটা ছিল ইহাদের মস্ত ভরসা,—বাড়ীটা নয়, বড়গিন্নী! —মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা, জংলীর মাসীর মধ্যে যখন ঝগড়া বাধিত, তখন বড়গিন্নী জানালায় আসিয়া দাঁড়াইতেন। মাঠের ভিতরকার গোরুগুলা তখন লেজ তুলিয়া দৌড় মারিত; গাছের উপরকার কাকগুলা কলরব করিতে করিতে উড়িয়া পলাইত। চারিজনের গলা যখন সাম্মিলিত-ভাবে উপরের দিকে উঠিত, তখন এক বিচিত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি হইত। বড়গিন্নী জানালায় দাঁড়াইয়া বিরক্তি-কুটিল মুখে, ইসারা করিয়া ডাকিতেন,—মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা, জংলীর মাসী নিঃশব্দে বড়বাড়ীতে প্রবেশ করিত, যেন তাহারা উঁচু গলায় পরস্পরের সহিত কোনদিন আলাপটি পর্য্যন্ত করে নাই, ঝগড়া ত পরের কথা। বড়গিন্নী বলিতেন "ফের আবার তোরা কোঁদল করছিস্?"

প্রত্যেকেই তাহার নালিশ জানাইত; বড়গিন্নী মীমাংসা করিয়া দিতেন।—বড়বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় মানদা বলিত, তাহার স্বামীকে হাঁপানিতে ধরিয়াছে; সরযূর কাছে সে পরামর্শ চাহিত, এখন সে কি করিবে।

সরযূ বলিত, "আর বলিস্‌নে মাসি; আমিও ত খেটে খেটে হন্যে হ'নু,—এখন মরণ হ'লেই বাঁচি—"

জংলীর মাসী কহিত, "হাঁপানির ভালো ওষুদ জানে শেতলাতলার পুরুত,—একদিন চ'না সেখানে যাই—"

সরযূ বলিত, "আমিও না হয় যাব'খন—"

হাব্‌লার মা কহিত, "শুধোব'খন বুনোর খুড়োকে হাঁপানির ওষুদ,—সেদিন বল্‌ছিল বটে একটা অব্যর্থ শেকড়ের কথা—"

ভারী বন্ধুত্ব কয়জনে,—বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্ব্বেকার কণ্ঠস্বর আর নাই!—

* * * *

জংলীর মাসীর আজকাল কেবলই সাইকেল চাপা পড়িতে ইচ্ছা করে। জংলীর তখন ধুম জ্বর;—মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা আসিয়া তাহারকাছে বসে,—নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া ওষুধ আনে, পথ্য আনে। জংলীর মাসীর পয়সার বড় টানাটানি;—সে ভাবে, একবার সাইকেল চাপা পড়িয়া বড়গিন্নীর কাছে যাইতে পারিলেই ত পাঁচ টাকা—! সে বহুবার তাঁহার কাছে গিয়াছিল, টাকা চাহিতে, সাহায্য চাহিতে। বড়গিন্নী লোক ভালো, কিন্তু তাই বলিয়া যখন তখন, যাহাকে তাহাকে, যা তা করিয়া যে টাকাগুলা খয়রাৎ করিবেন, এতবড় আহম্মক তিনি নন্! গরীবের ছেলের অসুখ বলিয়া যে তিনি ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইয়া বেড়াইবেন, বড়গিন্নী সে মেয়ে নয়। কিন্তু নিজের ছেলে অপরাধ করিলে, তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে তিনি প্রস্তুত,—সে উদারতাও কিন্তু কম নয়, কয়জনেরই বা সেটুকু থাকে?—অতএব বড়গিন্নী যে লোক ভালো, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই!

জংলীর মাসী গিয়া বলিল, "দাও না মা'ঠান্ পাঁচটা

টাকা,—দেব শোধ করে' শীগ্‌গিরই,—আমরা একটা গোরু কিন্‌ব মা'ঠান্ আস্‌ছে হপ্তায়,—রোজ দুধ দেব তোমাদের বাড়ী, তার দাম থেকেই কেটে নিয়ো না হয়—"

বড়গিন্নী কহিলেন, "গোরু ত আর তোর একার হ'বে না, যে, দুধের দাম থেকে টাকা শোধ দিবি ভাব্‌ছিস? দুধের দাম যদি না দিই, তুই ওদের পয়সা কোত্থেকে দিবি শুনি—"

জংলীর মাসী বলিল, "সে হ'বে'খন মা'ঠান্, তুমি দাও না আমায় ক'টা টাকা,—জংলী আমার ওষুদ পাচ্ছে না, পথ্যি পাচ্ছে না এমন কর্‌লে আর বাঁচ্‌বে না ও—" বলিয়া জংলীর-মাসী হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বড়গিন্নী খুব মিষ্ট কথা কহিতে পারেন,—কহিলেন, "কাঁদিস্‌নে জংলীর মাসী,—অসুখ হ'য়েছে, সেরে যাবে, তার জন্যে এত ভাবনা কিসের? একটু সাবধানে থাকিস্, ভালো করে' সেবাশুশ্রূষা করিস্, অনিয়ম হ'তে দিস্‌নে যেন,—ভয় কি?"

জংলীর মাসী বলিল, "টাকা কি দেবে মা'ঠান্?"

বড়গিন্নী কহিলেন, "আমার হাতে ত এখন কিছু নেই, তা দেখ্‌ব কর্ত্তাকে একবার জিজ্ঞেস্ করে,'—রাজী হ'বেন বলে' ত মনে হয় না। তুই আসিস্ একবার দিন পাঁচ সাত পরে,—আমার প্রত্যাশায় থাকিস্‌নে যেন, অন্য কোথাও চেষ্টা দেখিস্, বাছা—" বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "গরীব দুঃখী মানুষ তোরা, এত খরচ চালিয়ে চিকিৎসা করা কি তোদের কাজ? আহা, জংলী তোর শীগ্‌গির ভালো হ'য়ে উঠুক—"

* * * *

জীবনের প্রতি ইহাদের আকর্ষণ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়,—মনে হয়, কিসের লোভে ইহারা এমন করিয়া বাঁচিতে চায়। এ পৃথিবীর কোন্ জিনিষের টান ইহাদিগকে এমনভাবে অহরহ ধুলার পানে টানিতেছে। ইহাদের জীবনীশক্তিরও যেন শেষ নাই,—নুইয়া পড়ে বটে, কিন্তু ভাঙে না, যেন কচিগাছের ছোট চারা। জীবন ইহাদের কঠিন হইয়া ওঠে নাই,—নমনীয়তা আছে, সেইজন্যই বোধ হয় ঝড়ের ঝাপ্‌টায় কাহিল হয়, কিন্তু সহজে উপ্‌ড়াইয়া পড়ে না।

ওষুধ জুটিল না, পথ্য জুটিল না,—বড়গিন্নী দুঃখ করিয়া বলিলেন, "কর্ত্তা টাকা দিতে রাজী হ'লেন না, জংলীর মাসী—" কিন্তু তবুও জংলী দিব্য সুস্থ হইয়া উঠিল। আবার সে "ফিলুম" দেখিতে চায়, রাঙা গেঞ্জী পরিতে চায়, জংলীর মাসী পুলকিত হইয়া ওঠে।

বিপদের দিনে মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা একেবারে জংলীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—দূরে বসিয়া মিষ্ট কথা শুনায় নাই। জংলীর মাসী অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলিল, "তোরা আমার জংলীর জন্যে কত করলি, ভগবান তোদের ভালো কর্‌বেন—"

সমস্বরে তাহার অংশীদারেরা জবাব দিল, "তোর যেন ঢং, জংলী কি আমাদের পর?"

* * * *

মানুষের ভাগ্য যেন পুকুরপাড়ের সূর্য্য—ডুবিতে ভোলে না, কিন্তু উঠিতেও দেরী করে না,—হিসাব ঠিক আছে। জংলী ভালো হইয়া উঠিল, এইবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ধরিল সরযূর স্বামী সাধনকে। মানদা, হাব্‌লার মা, জংলীর মাসী আসিয়া দাঁড়াইল। বড়গিন্নীর নিকট টাকা ধার চাহিতে গিয়া সরযূ শুনিল,—"অসুখ হ'য়েছে, ভালো হ'য়ে যাবে, তা'র জন্যে অত ভাবনা করিস্‌নে সরযূ,—কর্ত্তাকে টাকার কথা বল্‌ব'খন, কিন্তু রাজী হ'বেন বলে' ত মনে হয় না।—" এবং শেষ অবধি কর্ত্তা রাজীও হইলেন না।

জংলীর মাসীর মনে সাইকেলচাপা পড়িবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল।

সেদিন সাধন জ্বরের ঘোরে ধুকিতেছিল,—সমস্ত দিন বার্লির পয়সাটুকু পর্য্যন্ত জোটে নাই। সাধনের সম্বন্ধে ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা কল্পনা করা যায় না। তাহার আহার ছিল একটু বেশী, এবং সেইজন্যই সাধনের রোগের কষ্টের অপেক্ষা তাহার অনাহারের কষ্ট সরযূকে ঢের বেশী পীড়িত করিতেছিল। স্বামীর মাথার ধারে বসিয়া সরযূ ভাবলেশহীন চোখে চাহিয়া ছিল। ওর মনটা যেন এখন মস্ত বড়,—ও যেন আর এখন বাসন-মাজা ঝি নয়, ও যেন আর ঘুঁটেকুড়ুনীও নয়,—ওর হৃদয়ের ভাষা লইয়া এখন কাব্য রচনা করা চলে;—অলস, কর্ম্মবিমুখ, ভোজনবিলাসী, স্বামীর প্রতিও তাহার ভালবাসা সরযূকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। তাহার চিন্তার ধারা এখন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল

জয় করে; কোন কল্পনা করিতেই সে আর আজ ভয় পায় না। সাবিত্রী যেদিন সত্যবানকে কাড়িয়া লইয়া আসিয়াছিল মরণদেবতার গ্রাস হইতে, সেদিনের কথাও সরযূ ভাবে।—

সাধন চিরকালের অবুঝ,—কেবলই খাইতে চায়। সরযূ তাহার দিকে চাহিয়া মনে করে, ইহার প্রাণটা এমনই করিয়া "ভাত দে, ডাল দে, মুড়ি দে, রুটি দে, জল দে" করিতে করিতেই হয় ত এক সময় বাহির হইয়া যাইবে!—

মানদা আসিল, হাব্‌লার মা আসিল, জংলীর মাসী আসিল,—নিজেদের সকল সঞ্চয় উজাড় করিয়া সরযূর হাতে ঢালিয়া দিল। কিন্তু পয়সা আসিল সুঁচের ডগায়, বাহির হইয়া গেল হাঙ্গরের মুখে।—এ যেন অতলস্পর্শ গহ্বর, ঢিল ফেলিয়া আন্দাজ করিতে হয়, কয়টা টুক্‌রায় গহ্বরটা ভরিবে!—

দেখিয়া দেখিয়া জংলীর মাসী মাঠে গেল।—

* * * *

বড়গিন্নীর বড়ছেলেটার উৎসাহ আছে,—সাইকেলচড়া শেষ করিয়া মোটর চালাইতে শিখিতেছে; এবার আর মাঠে নয়, মাঠের পাশের বড় রাস্তায়। জংলীর মাসী গিয়া ফুটপাথের উপরে দাঁড়াইল,—সাইকেলচাপা পড়িয়া যদি পাঁচ টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে মোটরচাপা পড়িলে নিশ্চয়ই বেশী টাকা পাওয়া যাইবে! বেচারী সরযূ, স্বামীর জন্য তাহার কত কষ্ট! বেচারা সাধন,—পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই, মহারাজ!

—বড়গিন্নীর বড়ছেলে সাহসী হইয়া উঠিয়াছে।—সাইকেল ছাড়িয়া মোটরে চড়িলে পদমর্য্যাদাও বাড়ে, ভরসাও বাড়ে! তাহার কাকার বেবি প্যাজো গাড়ীখানা সে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে গারাঝ্‌ হইতে লুকাইয়া বাহির করিয়া আনে;—কিন্তু গাড়ীটা যেন তাহার হাতে পড়িয়া স্বরাজ লাভ করে,—থামাইতে গেলে চলিতে চায়, চালাইতে গেলে নড়ে না,—ডানদিকে ঘুরাইতে গেলে যায় বাঁ-দিকে এবং বাঁ-দিকে ঘুরাইতে গেলে সোজা সম্মুখে অগ্রসর হয়!

বড়গিন্নীর বড়ছেলে চারিদিকে চাহিয়া দেখে চেনা অচেনা কয়জন লোক তাহাকে দেখিল।—রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ন, রাস্তার আশপাশে জনমানবের চিহ্ন নাই,—গোরুগুলা ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে। বড়গিন্নীর বড়ছেলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। এমন সময় জংলীর মাসীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে উৎসাহিত হইয়া উঠিল; অপ্রয়োজনে হর্ণটা একবার বাজাইয়া বলিল, "এত কম বয়সে বাঙ্গালীর ছেলেকে আর কখনও মোটর ড্রাইভ কর্‌তে দেখেছিস্‌ জংলীর মাসী?—আমিই প্রথম,—একে বলে পাইয়োনীয়ার—" কথাটা নূতন শিখিয়াছে, সেইজন্যই ব্যবহার সম্বন্ধে স্থান-অস্থানভেদের বিচার-বোধ এখনও সুস্পষ্ট নয়।

জংলীর মাসী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে শুধু চাহিয়া রহিল। বড়গিন্নীর বড়ছেলে মোটর লইয়া রাস্তার মাঝখানে তাহার কসরৎ দেখাইতে লাগিল। জংলীর মাসী অত্যন্ত ভীতপদে ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিল, ভাবিল, একটু কায়দা করিয়া গাড়ীচাপা পড়িতে হইবে, চাকাটা একেবারে গলার উপর দিয়া না যায়, একটু পাশে দাঁড়াইতে হইবে,—নহিলে—

বেবি প্যাজো গাড়ী হঠাৎ জংলীর মাসীর ঠিক সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল,—ফুটব্রেক চাপিতে গিয়া ছেলেটা চাপিল এ্যাক্‌সেলারেটার। ষ্টিয়ারীং ডানদিকে ঘুরাইতে গিয়া ঘুরাইল বাঁদিকে।

জংলীর মাসী শুধু একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া রাস্তার উপর পড়িয়া গেল,—তাহার চোখ দুইটা স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল, বড়গিন্নীর বড়ছেলের দিকে নয়, আকাশের পানে। বড়গিন্নীর কাছ হইতে টাকা লইয়া আর সরযূকে দেওয়া হইল না! বেচারী সরযূ, অসুস্থ স্বামী লইয়া কি যে করিবে! বেচারা সাধন,—কোনদিন একটা পয়সা রোজগার করিল না, চিরকাল মেয়েটাকে জ্বালাইয়া খাইল! জংলীর মাসী বোধ হয় এই সব চিন্তাই করে, অত্যন্ত গভীরভাবে, ভারী দরদীর মতন, চোখের পলকে ফেলিবারও অবসর পায়না, নিশ্চয় সেই জন্যই।—



বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বপ্ন-রহস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

এইবার আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়—স্বপ্নের আলোচনার অবসর পাওয়া গেল।

স্বপ্ন দর্শন করিবার সময় মনের যে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) মনে যে সকল ভাব বা দৃশ্যের উদয় হয়, তাহা তখনকার মত বাস্তব এবং বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জাগ্রত অবস্থায় চিন্তাকালে বাহ্য বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের সুযোগ থাকে, নিদ্রাবস্থায় তাহা থাকে না—ভ্রান্ত বিশ্বাস সংশোধিত হয় না।

(২) সাহচর্য্যের ক্রম অনুসারে কাল্পনিক দৃশ্য বা বিষয় সকল ক্রমান্বয়ে পর পর মনশ্চক্ষে উদিত হইতে থাকে; অথচ, ঐ সাহচর্য্যের উপর আমাদের কোনই হাত থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় আমরা ইচ্ছা করিলে চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন করিয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারি; কিম্বা চিন্তা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারি; স্বপ্নাবস্থায় এ সকল কিছুই পারি না। স্বপ্নের দৃশ্য সকল অবাধে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আসা-যাওয়া করে।

স্বপ্নাবস্থায় কোন একটা বিশেষ বিষয় কিম্বা কতকগুলি দৃশ্য কি ভাবে দেখা দেয়, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অনন্ত কাল ধরিয়া মানুষের মনে একটা অদম্য কৌতূহল সদা জাগ্রত রহিয়াছে এবং অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, স্বপ্নের ভিতর অনেক বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অনুসন্ধানের ফলে এ বিষয়ে এ যাবৎ, সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, অনুমিত হইয়াছে বা সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটা পাঠক-পাঠিকাগণের অবধানের জন্য এখানে উপস্থিত করা গেল।

১। সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে কিম্বা যে সকল ভাব মনের ভিতর ক্রিয়া করিয়াছে, সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া জড়াইয়া এক হইয়া যায়। কিম্বা সম্প্রতিকার ঘটনাবলীর সঙ্গে কিছু দিন বা বহু দিন পূর্ব্বে সংঘটিত ঘটনা সমূহও মিশিয়া যাইতে পারে। এই মিশ্রিত ঘটনা ও ভাবগুলি এক অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন ঘটনায় পরিণত হয়। মনের অবস্থা তখন এইরূপ দাঁড়ায় যে, এই সকল ঘটনা যেন একই এবং পরস্পরের সহিত অল্প-বিস্তর সম্বন্ধযুক্ত। অথচ বাস্তব পক্ষে তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে, এবং প্রায়ই থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা হয় ত কোন শোকাবহ দুর্ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করিলাম; হয় ত বিদেশগত কোন আত্মীয়ের সম্বন্ধে কোন দুঃসংবাদ পাইয়াছি। কিম্বা আমাদের কোন ব্যবসায়ের অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে মন বেশ রীতিমত চঞ্চল রহিয়াছে। রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রা প্রগাঢ় হইল না। স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলির পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বপ্নে একটি অখণ্ড ঘটনায় পরিণত হইল। যে দুর্ঘটনা পরের উপর দিয়া ঘটিয়াছে, স্বপ্নে তাহা আমাদের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা গেল। যে আত্মীয়ের সম্বন্ধে দুঃসংবাদ পাইয়াছি, স্বপ্নে তিনি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভাবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আর, যে ব্যক্তিকে লইয়া ব্যবসায় সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে, তিনিও স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যের অন্যতম ব্যক্তি। এই তিনটি নিঃসম্পর্কীয় ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র বিষয় সাধারণ—তিনটির দ্বারাই মনে একই প্রকার ভাব বা চাঞ্চল্যের উদয় হইয়াছে। স্বপ্ন যখন দেখা গেল, তখনকার শারীরিক অবস্থাও হয় ত এই ঘটনাত্রয়কে সংযুক্ত ও মিলিত করিতে সাহায্য করিয়াছে—হয় ত সে সময় পেটের ভিতর কোনরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া মনকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। দৈহিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে এইরূপ একটা সাম্য ভাব বা সামঞ্জস্য না ঘটিলে এই ধরণের স্বপ্ন দৃষ্ট হয় না। এইরূপ সামঞ্জস্যের অসদ্ভাব স্থলে বিশেষ ভাবে এই স্বপ্নটি না দেখিয়া হয় ত অন্য কোন রকম স্বপ্ন দেখা যাইত; কিম্বা ইহার কোন কোন অংশ বিভিন্ন প্রকার সাহচর্য্যের সহিত সংযুক্ত ভাবে আবির্ভূত হইত। যেমন, দূরদেশগত যে আত্মীয়ের সম্বন্ধে দিবাভাগে দুঃসংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তিনি হয় ত কোন পুরাতন প্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়া সেই ঘটনা-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি বা ঘটনার সহিত আবির্ভূত হইতেন—বর্ত্তমান যে দুঃসংবাদের সংশ্রবে তাঁহার স্মৃতি মনে জাগ্রত হইয়াছে, স্বপ্নের ভিতর হয় ত তাহার আভাষ মাত্র থাকিত না। আর একটা দৃষ্টান্ত—বহু বৎসর ধরিয়া যাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই, এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। তাঁহার সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে উভয়েরই পরিচিত ও বন্ধু এমন অন্য অনেক লোকের সম্বন্ধেও খোঁজ-খবর লওয়া হইতে লাগিল। সুদূর অতীতের অনেক ঘটনার কথাও উঠিয়া পড়িল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম। সেই স্বপ্নে এই সকল লোক এবং তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য অনেক লোক ও অন্যান্য ঘটনার আবির্ভাব হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে এই সকল ব্যক্তি ও ঘটনার কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, স্বপ্নের

ত্রিসীমানায়ও তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিল না। ইহার কারণ হয় ত এই যে, মনে যে সকল ঘটনা ও ব্যক্তির পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল, সেই সকল ঘটনা ও ব্যক্তির সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল না।

একটি স্ত্রীলোক পীড়িত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছিল। সে যখন নিদ্রা যাইত, তখন ঘুমের ঘোরে অনেক কথা বলিত, অনেক লোকের নাম করিত, এবং বলিত, সেই সকল লোক এই হাসপাতালের অন্যান্য শয্যার রোগী বা রোগিণী। শুশ্রূষাকারিণীরা এই সমস্ত রোগীর নাম ও তাহাদের রোগের বিবরণ, এমন কি শয্যার সংখ্যা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকটির মুখে স্পষ্টাক্ষরে শ্রবণ করিত; কিন্তু তৎকালীন রোগীদিগের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিদের কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। স্ত্রীলোকটি যে সংখ্যার শয্যায় যে রোগীর নাম করিত, সেই সংখ্যার শয্যায় সেই রোগী ত নহেই, হাসপাতালের কুত্রাপি সেই সেই নামের কোন রোগী তৎকালে ছিল না। অবশেষে হাসপাতালের কাগজ-পত্র অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল সে দুই বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকটি আর একবার পীড়িত হইয়া সেই হাসপাতালে আসিয়াছিল, এবং তৎকালে অন্যান্য শয্যায় উল্লিখিত নামের রোগীরাও ছিল। স্ত্রীলোকটি তাহাদের নাম ও শয্যার সংখ্যার নির্ভুল ভাবেই উল্লেখ করিত বটে। বলা বাহুল্য, স্বপ্নে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইত।

২। প্রবল দৈহিক অনুভূতির সাহচর্য্যে স্বপ্নে নানা কাল্পনিক দৃশ্য সারিবন্দী ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার অনেক দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে শীত ঋতুতে অত্যধিক শৈত্য হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য রাত্রিকালে গরম জলের বোতল পায়ের তলায় ঠেকাইয়া রাখিয়া শয়ন করিবার প্রথা আছে। বোতলের পরিবর্ত্তে আইসব্যাগের ন্যায় গরম জল পূর্ণ রবারের ব্যাগ পায়ের তলায় রাখিয়াও অনেকে নিদ্রা গিয়া থাকে। এই রকম একটি গরম জলের পাত্র লইয়া শয়ন করিয়া এক ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল যে, সে এটনা নামক আগ্নেয়গিরির শিখরদেশে ভ্রমণ করিতেছে, এবং পদতলের নিম্নস্থ মৃত্তিকা উত্তপ্ত বোধ করিতেছে। প্রথম জীবনে সে একবার ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। আগ্নেয়গিরির গহ্বরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিবার সময় সে যথার্থই পদতলের নিম্নের মৃত্তিকার উত্তাপ অনুভব করিয়াছিল। এখানে দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে স্বপ্নে সে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়-গিরির পরিবর্ত্তে এটনা আগ্নেয় গিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এটনা সম্বন্ধে তাহার নিজের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। অপর একজন লোকের এটনা ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সে এই আগ্নেয়গিরির বিবরণ পাঠ করিয়াছিল। স্বপ্নে এটনাশিখরে আরোহণ করিবার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, এটনা-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থখানি সে অল্প দিন মাত্র পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিল। আর একবার এই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে, একটা শীতঋতু সে হাডসন উপসাগরে কাটাইতেছে। এবং তুষারপাতের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। জাগ্রত হইয়া সে দেখিতে পায় যে, রাত্রিকালে যে বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সে শয়ন করিয়াছিল, ঘুমের ঘোরে তাহা সরিয়া যাওয়ায় তাহার গাত্রে ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল; এবং এই শৈত্যানুভূতিই তাহার ঐরূপ স্বপ্ন দেখিবার কারণ। আর ইহার অল্পদিন পূর্ব্বেই সে হাডসন উপসাগর প্রদেশে শীতঋতুর অবস্থার বর্ণনা একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছিল। আর একবার সে দন্তরোগে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। এই সময়ে একদিন রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখে যে, সে একজন দন্ত-চিকিৎসকের কাছে রুগ্ন দন্ত তোলাইতে গিয়াছে, এবং দন্ত-চিকিৎসক ভুল ক্রমে একটা সুস্থ দন্ত উপড়াইয়া ফেলিয়াছে; আর রুগ্ন দন্তটি স্বস্থানে রহিয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও রুগ্ন দন্তের যন্ত্রণানুভূতি তাহাকে ঐরূপ স্বপ্ন দর্শনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। আর একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্তে জানিতে পারা যায় যে, এক ভদ্রলোক ও তাহার পত্নী একই সময়ে একই কারণে একই রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এক সময়ে ফরাসীদের দ্বারা স্কটল্যাণ্ড দেশ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। ফরাসী সৈন্য জাহাজে করিয়া আসিয়া স্কটল্যাণ্ডের ভূমিতে অবতরণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এডিনবরা নগরের পুরুষ মাত্রেই সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিল। শত্রুর অবতরণের সংবাদ দেশময় প্রচার করিবার জন্য প্রথমে দুর্গ হইতে একটি কামান দাগিবার ব্যবস্থা হয়। সেই তোপধ্বনি শুনিবামাত্র সমগ্র দেশে এই সংবাদ প্রচারের জন্য নানা স্থানে সাঙ্কেতিক ধ্বনি (তোপ, ঢক্কা প্রভৃতির বাদ্যধ্বনি) করিবার ব্যবস্থা হয়—যেন সমস্ত দেশের লোক শত্রুর আগমনের সংবাদ জানিতে পারে। এতদ্ব্যতীত, শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনার উপলক্ষে এডিনবরার দুর্গের সম্মুখে প্রিন্সেস ষ্ট্রীটে অল্প দিন মাত্র পূর্ব্বে পাঁচ হাজার সৈন্যের কুচ-কাওয়াজ হইয়াছিল। যে ভদ্র লোক স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলেন, বলা বাহুল্য, তিনিও একজন স্বেচ্ছাসৈনিক ছিলেন, এবং যুদ্ধ করিবার জন্য ভয়ানক উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাত্রি দুইটা কি তিনটা—ভদ্রলোকটি নিজ শয্যায় নিদ্রিত। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কেল্লা হইতে প্রথম সাঙ্কেতিক তোপধ্বনি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সৈনিকের বেশে সজ্জিত হইয়া দুর্গে চলিয়া গেলেন। সেখানে আরও যে তোপধ্বনি ও অন্যান্য সাঙ্কেতিক ধ্বনির আয়োজন চলিতেছিল, তাহা তিনি দর্শন করিতে লাগিলেন। তার পর তিনি দুর্গ হইতে বাহির হইয়া নগরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। নগরের সর্ব্বত্র তিনি লোকদের মধ্যে মহা ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিলেন এবং উত্তেজনামূলক ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। সৈন্যগণ ও গোলন্দাজরা আসিয়া জমা হইতেছে দেখিলেন। বিশেষ করিয়া প্রিন্সেস ষ্ট্রীটে সামরিক আড়ম্বরের সীমা ছিল না। এই সময়ে তাঁহার পত্নী তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন—তাঁহার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। জাগ্রত হইয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী ভয়ঙ্কর ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। স্ত্রীর মুখে তিনি শুনিলেন যে, স্ত্রীও তাঁহারই ন্যায় স্বপ্নে সাঙ্কেতিক তোপধ্বনি, নগরে মহা কোলাহল, শত্রুর অবতরণ প্রভৃতি দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন; অতিরিক্ত ইহাও স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, বিগত যুদ্ধে তাঁহার স্বামীর যে বন্ধু তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তিনি নিহত হইয়াছেন। স্ত্রী ও স্বামীর একই ভাবের স্বপ্ন দেখিবার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা যায় যে, একটা চিমটা কোন উচ্চ স্থান হইতে

কোন রকমে মেঝেয় পড়িয়া গিয়া শব্দ হইয়াছিল, সেই শব্দ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং আসন্ন যুদ্ধের উত্তেজনায় উভয়ের মনের ভাব একই রূপ থাকায় দুইজনেই প্রায় একই রকম স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ইহাও শারীরিক অনুভূতিমূলক স্বপ্ন। ডাক্তার রীড' নামক এক ব্যক্তি আর একটি অনুভূতিমূলক স্বপ্নের কথা বলিয়াছেন। কোনও একটা অসুখের দরুণ তাঁহার মাথায় বেলেস্তারা বসাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিদ্রাবস্থায় ঘুমের ঘোরে ব্যাণ্ডেজ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সরিয়া যাওয়ায় তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি অসভ্য নরখাদক বন্য জাতির হাতে পড়িয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার মস্তকের চর্ম্ম ছাড়াইয়া লইতেছে।

অনুভূতিমূলক স্বপ্নের উৎপত্তি স্বাভাবিক ভাবেও হইতে পারে, কৃত্রিম উপায়েও হইতে পারে। কোন কোন লোক যখন নিদ্রা যায়, তখন তাহাদের কাণে কাণে ফুসফুস করিয়া কথা কহিলে তাহারা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সেনাদলের একজন সেনানীর এই বিশেষত্বটুকু একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। তাহার অপরাপর সেনানী বন্ধুরা এই তত্ত্বটুকু অবগত ছিল। এই সুযোগে তাহারা বিলক্ষণ রঙ্গ-রসের সৃষ্টি করিতে পারিত—লোকটি যখন নিদ্রা যাইত, তখন তাহার কর্ণে ফুসফুস করিয়া কথা কহিয়া তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত যে-কোন রকম স্বপ্ন উৎপাদন করিতে পারিত। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাহার কর্ণে কথা কহিত, সে যদি তাহার বিশেষ বন্ধু হইত, যাহার গলার আওয়াজ তাহার খুব সুপরিচিত, তাহা হইলে ত কথাই থাকিত না। একদা তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার কর্ণে এমন সকল কথা বলিল যে, সে স্বপ্ন দেখিল, একজনের সঙ্গে তাহার ভয়ানক বিবাদ বাধিয়াছে; উভয়ে কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। ঝগড়ায় আগাগোড়া এই ভাবে আবৃত্তির পর তাহার পরিণামে ঘটিল—দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য যখন উভয়ে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল, তখন বন্ধুরা তাহার হাতে একটা পিস্তল গুঁজিয়া দিল। সেনানী নিদ্রাঘোরেই পিস্তলের আওয়াজ করিল। সেই আওয়াজে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আর একবার সে একটা জাহাজের একটা কামরায় দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো শয্যায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার কয়েকজন বন্ধু তাহা দেখিয়া তাহার কাণে ফুসফুস করিয়া বলিল যে, সে জাহাজ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছে। অমনি সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যে সে সমুদ্রে পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ সাঁতার কাটিতেছে। শয্যার উপরই সে সত্যসত্যই সাঁতার কাটার ভঙ্গীতে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। তার পর বন্ধুরা বলিল, একটা হাঙ্গর তোমার পিছু লইয়াছে। তুমি ডুব সাঁতার কাটিয়া প্রাণ বাঁচাও। সে এত জোরে ডুব দিল যে শয্যা হইতে কামরার মেঝেয় ছিটকাইয়া পড়িল। ইহাতে তাহার শরীরের নানা স্থান ছড়িয়া গিয়াছিল। জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে সৈন্যদল তীরে অবতরণ করিল। এক দিন তাহার বন্ধুরা দেখিল, সে তাহার নিজের তাঁবুতে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে সময় শত্রুপক্ষ কামান দাগিতেছিল। সেই শব্দে তাহার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। তাহাতে সে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মেজাজ খারাপ দেখিয়া বন্ধুরা আমোদ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। তাহারা তাহার কাণে মন্ত্র জপিয়া দিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে—সে যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। ইহাতে, স্বপ্নে সে অত্যন্ত আতঙ্ক প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি সে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার ভাব দেখাইতে লাগিল। ইহাতে তাহার বন্ধুরা তাহার কাণে কাণে ফুসফুস করিয়া তাহাকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। এ দিকে তাহাকে আরও বেশী ভয় দেখাইবার জন্য আহত ও মরণোন্মুখ ব্যক্তিগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আর্ত্তনাদ শুনিয়া সে বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কে আহত হইল, কে মারা পড়িল। তাহার বন্ধুরাও বাছিয়া বাছিয়া তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নাম করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা বলিল, তোমার ঠিক পাশের লোকটি মারা পড়িল। তখন সে পলাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্তভাবে নিদ্রাঘোরে খাট হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িতে লাগিল। অবশেষে তাঁবু বাঁধিবার দড়িতে পা বাধিয়া পড়িয়া গিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং স্বপ্নগত আসন্ন বিপদ হইতেও সে রক্ষা পাইল। এই ব্যক্তির সংন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, এই সমুদয় পরীক্ষার পর সে স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারগুলি স্পষ্টভাবে স্মরণ করিতে পারিত না, কেবল ভাসাভাসা ভাবে ও বিশৃঙ্খল ভাবে একটা অস্পষ্ট ক্লেশ ও ক্লান্তির আভাস তাহার মনে আসিত। সে তাহার বন্ধুদের প্রায়ই বলিত,—তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা তাহার সহিত চালাকী খেলিতেছে। আরও অনেক লোকের এইরূপ দুর্ব্বলতার কথা শুনা যায়—তাহাদের কাণেও ফুসফুস করিয়া কথা কহিয়া ইচ্ছামত স্বপ্ন উৎপাদন করা যায়।

শব্দ হইতে যে সকল স্বপ্ন উৎপন্ন হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যে শব্দে লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেই শব্দ হইতে তাহারা স্বপ্নও দেখে। নিদ্রাভঙ্গ ও স্বপ্নদর্শন এতদুভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অতি অল্প, অথচ, এই অল্প সময়ের মধ্যে যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা দীর্ঘ কালব্যাপী বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এক ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, সৈন্যদলে যোগদান করিলেন, তৎপরে দল ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার সন্ধানে লোক ছুটিল, তিনি ধরা পড়িলেন, তাঁহাকে আবার ব্যারাকে আনা হইল, তাঁহার বিচার হইল; তাঁহার প্রতি এই দণ্ডাদেশ হইল যে গুলি করিয়া তাঁহাকে বধ করা হইবে; অবশেষে তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল; গুলি করিয়া মারিবার সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন হইল, এমন কি একটা বন্দুকের আওয়াজ পর্য্যন্ত করা হইল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন যে পাশের ঘরে একটা শব্দ হওয়ায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল এবং উহারই দরুণ তাঁহার স্বপ্ন-দর্শনও হইয়াছিল।

শব্দ ব্যতীত অন্য কারণেও ক্ষণকালস্থায়ী অথচ, দীর্ঘকালব্যাপী স্বপ্ন-দর্শন হইতে পারে। এক ভদ্রলোককে একবার একটা স্যাঁৎসেঁতে ভূমিতে নিদ্রা যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বহু কাল ধরিয়া শয়ন

করিয়া নিদ্রা যাইতে হইলেই মনে হইত তাঁহার দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আর সেই সঙ্গে তিনি এই স্বপ্ন দেখিতেন যে, একটা নরকঙ্কাল যেন সজোরে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, তাই তাঁহার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে। তিনি যখন বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাইতেন, তখন কোন প্রকার অস্বস্তির ভাব মনে আসিত না, তিনি কোন দুঃস্বপ্নও দেখিতেন না। কিন্তু বসিয়া বসিয়া নিদ্রাবেশ হইলেও সমস্তক্ষণ ত বসিয়া নিদ্রা যাওয়া যায় না—শুইয়া পড়িতেই হয়, কিন্তু শয়ন করিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুঃস্বপ্নটিও আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য তিনি অনেক উপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু কোনটিই ফলপ্রদ হইল না। অবশেষে তিনি একজন প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। তাহার প্রতি আদেশ রহিল যে, তিনি বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাইবেন, প্রহরী তাঁহাকে চৌকি দিবে। যখনই তিনি নিদ্রাবেশে ঢুলিয়া পড়িবেন, তখনই সে তাঁহাকে জাগাইয়া দিবে। এক দিন তিনি স্বপ্নে একটা নরকঙ্কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে প্রবল ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিল। অবশেষে তিনি জাগ্রত হইলেন। জাগিয়া উঠিয়া তিনি ভৃত্যকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—সে কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিয়াছে; কেন সে তাঁহাকে অতক্ষণ ধরিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিল; তিনি ঢুলিয়া পড়িবামাত্র কেন সে তাঁহাকে জাগাইয়া দেয় নাই। ভৃত্য অনেক শপথ করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল যে, সে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও শয়ন করিয়া থাকিতে দেয় নাই। যে মুহূর্ত্তে তিনি ঢুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে সে তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়াছে। ইহার পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে ভদ্রলোকটির এই দুঃস্বপ্ন দর্শনের অভ্যাস দূরীভূত হয়।

আর একটি ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখেন যে তিনি জাহাজে চড়িয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় গিয়াছেন। সেখানে এক পক্ষ কাল যাপনের পর দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য তিনি পুনরায় জাহাজে উঠিয়াছেন। মধ্যপথে এক দিন তিনি সমুদ্রে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত আতঙ্কিত হইলেন। অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া তিনি দেখিলেন যে তিনি দশ মিনিটের অধিক নিদ্রা যান নাই।

৩। পুরাতন ব্যাপার; তাহার কথা এখন কিছুই মনে নাই। এইরূপ সম্পূর্ণ বিস্মৃত বিষয়ের স্বপ্নে পুনরাবির্ভাব। বিস্মৃত বিষয় স্বপ্নে কি প্রণালীতে পুনরায় স্মরণ-পথে আসিয়া উদিত হয় তাহা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব বলিলেও চলে। এইরূপ স্বপ্ন সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ব্যাপার কোনরূপ নিয়ম-পদ্ধতির অধীন বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নে এই শ্রেণীর স্বপ্নের দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

এক ভদ্রলোক ব্যাঙ্কে চাকুরী করিতেন। কেহ ব্যাঙ্কে টাকা লইতে আসিলে তাহাকে টাকা দেওয়া ইঁহার কাজ ছিল। ব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মানুসারে যে সর্ব্বাগ্রে আসিবে, সে সর্ব্বাগ্রে টাকা পাইবে। এইরূপে পরে পরে আগত ব্যক্তিরা তাহাদের আগমন-কালের ক্রম অনুসারে যথাক্রমে টাকা পাইবে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কয়েক ব্যক্তি টাকার জন্য তাহাদের পালার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া ছয় পাউণ্ড চাহিয়া বসিল। সে বলিল, টাকা তাহাকে অবিলম্বে দিতে হইবে, এক মিনট দেরী করিলে চলিবে না। তাহাকে বলা হইল, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা যখন তাহার আগে আসিয়াছে, তখন তাহারাই আগে টাকা পাইবে, পরে তাহাকে টাকা দেওয়া হইবে। কিন্তু লোকটা সে কথা বুঝিতে চাহে না। লোকটী অত্যন্ত অধীর ভাবে সর্ব্বাগ্রে টাকা পাইবার জন্য অত্যন্ত গোলমাল করিতে লাগিল। বিশেষতঃ লোকটি আবার অত্যন্ত তোতলা এবং ক্রুদ্ধ হইলে তোতলাদিগের তোতলামি সাধারণতঃ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তাহাদের কথা একেবারে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে—এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করিলেন যে, লোকটিকে আগে টাকা দিয়া বিদায় করা হউক—এরূপ অপ্রিয়ভাষী লোকের উপস্থিতি ও সঙ্গ হইতে রক্ষা পাওয়া যাউক। প্রস্তাবটি সঙ্গত বিবেচনা করিয়া—কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হইল বলিয়া নিতান্ত বিরক্ত চিত্তে—উক্ত কর্ম্মচারী লোকটিকে আগেই টাকা দিয়া বিদায় করিলেন; পরে অপর লোকদিগকে তাহাদের ক্রম অনুযায়ী টাকা দিতে লাগিলেন।

বৎসরের শেষে, অর্থাৎ এই ঘটনার প্রায় আট-নয় মাস পরে ব্যাঙ্কের বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের সময় দেখা গেল হিসাব কিছুতেই মিলিতেছে না—ছয় পাউণ্ডের পার্থক্য ঘটিতেছে। কয়েক দিন ধরিয়া দিবারাত্রি খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়াও ভুল বাহির করিতে পারা গেল না।

কয়েক দিনের অতিরিক্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারী একদিন সন্ধ্যার সময় কর্ম্মস্থল হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া তিনি শয়ন করিতে গেলেন। নিদ্রাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, ব্যাঙ্কে যথাস্থানে তিনি বসিয়া আছেন। অর্থী প্রত্যর্থী প্রাপ্য টাকার জন্য আসিয়া ক্রমানুযায়ী অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময় ঐ তোতলা দুর্দ্দান্ত লোকটি টাকা চাহিতে আসিল। এইরূপে তাহার সহিত যেভাবে কারবার হইয়াছিল, সেই সমগ্র দৃশ্যটি বায়োস্কোপের ছবির ন্যায় তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অভিনীত হইয়া গেল। তিনি যখন জাগ্রত হইলেন, তখন তাঁহার মনে ধারণা জন্মিল যে, গত কয়েক দিন ধরিয়া তিনি যে ভুল বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই স্বপ্ন বুঝি তাহারই সুযোগ করিয়া দেয়। পরদিন আপিসে গিয়া সেইদিনকার দৈনিক হিসাবের পৃষ্ঠা বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতে তিনি দেখিলেন, ঐ তোতলা লোকটিকে যে ছয় পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, তাহা খাতায় তোলা হয় নাই; সেইজন্য এই ভুলটি হইতেছে এবং হিসাব মিলিতেছে না। অন্য অনেক স্থলেও স্বপ্নযোগে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্রে এইরূপ হিসাবের ভুল ধরা পড়িয়াছে, এরূপ ঘটনার কথা শোনা যায়। এমন কি কঠিন গণিত বিষয়ক অঙ্কের সুসমাধান স্বপ্নযোগে হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বর্ত্তমান দৃষ্টান্তটিতে স্বপ্নরহস্যের একটি বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আট-নয় মাস পূর্ব্বে সংঘটিত ঐ হিসাবের ভুলের কথা, এমন কি ঐ ঘটনার কথা উক্ত কর্ম্মচারীর কিম্বা ব্যাঙ্কের অপর কোন কর্ম্মচারীর আদৌ স্মরণ ছিল

না। অথচ স্বপ্নে সেইদিনকার সমস্ত ঘটনাগুলিই কর্ম্মচারীর স্মরণ-পথে উদিত হইল। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, সাহচর্য্যের (association এর) কোন অবকাশই ঘটে নাই। ঘটনাটি মনে পড়িতে পারে এমন কোন সূত্রই উপস্থিত ছিল না। কারণ যে ঘটনার উপর এই ব্যাপারটি নির্ভর করিতেছিল, সেই ঘটনাটি এই যে, টাকা দিতে কোন ভুল হয় নাই—কেবল টাকাটা খরচের খাতে লিখিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল,। টাকা দিবার সময় কিম্বা দেওয়া হইয়া যাইবার পর, খরচটা যে খাতায় লেখা হইল না, এরূপ কোন সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও উক্ত কর্ম্মচারীর মনে উদয় হয় নাই। তা যদি হইত তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে কতকটা সাহচর্য্যের দরুণ তাহার এই স্বপ্ন দর্শন ঘটিয়াছে। সুতরাং আট নয় মাস পূর্ব্বে সংঘটিত এবং অধুনা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত এই ঘটনার আগাগোড়া দৃশ্য স্বপ্নে তাহার দৃষ্টিগোচর হইল কেন, তাহার কোনই সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কেবল এইটুকু মাত্র অনুমান করা যায় যে, ছয় পাউণ্ড যখন কম পড়িতেছে, তখন ঐ ভদ্রলোক হয় ত স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, এই টাকাটা কাহাকেও অনিয়মিত ভাবে প্রদান করা হইয়াছে কি না, যাহাতে টাকাটা খাতায় খরচ লেখা হয় নাই। অথবা অন্য কোনরূপ ভুল হইল কি না। কিন্তু একটা বড় ব্যাঙ্কে যেখানে প্রত্যহ হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের দেনা-পাওনার কারবার হইতেছে, সেখানে আট-নয় মাস পূর্ব্বে মাত্র ছয় পাউণ্ড কাহাকেও প্রদান করিয়া ভুল ক্রমে খরচ লিখিয়া না রাখার কথা স্মরণ করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। মোটের উপর এই বিচিত্র ব্যাপারটার সম্বন্ধে মনের এই ক্রিয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যজনক।

ইহার সমশ্রেণীর আরও একটি ঘটনার কথা বলা যাইতেছে। এটি কিন্তু পূর্ব্বোক্তটির মত অতটা আশ্চর্য্যজনক নহে; কারণ, এইটির ঘটনার সময় ও স্বপ্ন দর্শনের সময়ের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প। স্বপ্ন দর্শন না করিয়াও, স্মরণশক্তি বলেই হয় ত এ ক্ষেত্রে প্রতিকার হইতে পারিত। সে যাহা হউক, ঘটনাটি এইরূপ—এক ব্যক্তির একটি বড় ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইবার দিবসে তাঁহার হাত দিয়া যে সকল টাকার লেন-দেন হয়, দিবাবসানে তাহার হিসাব মিলাইবার সময় দশ পাউণ্ডের ঘাটতি হয়। লোকটি হিসাব মিলাইবার অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু ঘাটতির কারণ কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারেন না। তাঁহার প্রথম দিনের কাজেই এইরূপ গলদ হওয়ায় তিনি কতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। হিসাব গরমিল অবস্থাতে রাখিয়াই তিনি বাড়ী চলিয়া যান। রাত্রে নিদ্রাযোগে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, ব্যাঙ্কে নিজ স্থানে বসিয়া তিনি কাজকর্ম্ম করিতেছেন, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক আসিয়া দশ পাউণ্ডের একখানি হুণ্ডি তাহার কাছে ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেলেন। এই লোকটি উক্ত কর্ম্মচারীর সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন। সকালে উঠিয়া স্বপ্নের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। আরও মনে পড়িল, পূর্ব্ব দিবস স্বপ্নদৃষ্ট পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকটি তাঁহার নিকট হইতে যথার্থই একখানি দশ পাউণ্ডের হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কে গিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, হুণ্ডিখানি ছেঁড়া কাগজের সহিত মিশিয়া গিয়া মেঝেয় পড়িয়া রহিয়াছে, এবং ঝাড়ুদারর ঘর ঝাঁট দিয়া পরিত্যক্ত ছিন্ন কাগজপত্রের সহিত হুণ্ডিখানিও ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার পর অবশ্য হিসাব মিলিতে বিলম্ব হইল না। এ ক্ষেত্রেও পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার ন্যায় বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করিবার উপযোগী কোন সাহচর্য্যের সাহায্য পাওয়া যায় না।

অনেক সময়ে অন্য প্রকারেও বিস্মৃত বিষয় স্মৃতিপথে ফিরিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। এক ব্যক্তি একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু নিয়মিত চর্চ্চার অভাবে সে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায়। পরে একবার তাহার কঠিন পীড়া হয়। পীড়িত অবস্থায় সে প্রলাপ বকিতে থাকে। সেই প্রলাপের মুখে বিস্মৃত ভাষা আবার তাহার মনে পড়িয়া যায়, সেই ভাষায় সে আবৃত্তি করিতে থাকে। স্বপ্নেও কখনও কখনও বিস্মৃত ভাষা স্মরণ-পথে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। এক ব্যক্তির গ্রীক ভাষা শিখিবার খুব ঝোঁক ছিল, এবং যৌবনে কিছু কিছু সে শিখিয়াও ছিল। পরে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করায় চর্চ্চার অভাবে সে গ্রীক ভাষা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায়। এমন কি সে এই ভাষা আদৌ পড়িতে পারিত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে বহুবার সে গ্রীক ভাষার গ্রন্থ হইতে সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিত।

স্যার ওয়ালটার স্কট তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ওয়েভারলী উপন্যাসাবলীর এক স্থলে একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, ঘটনাটি সত্য। স্বপ্নটির মর্ম্ম এইরূপ—মিঃ আর নামক একজন জমিদারের বিরুদ্ধে একটা জমির বহু বৎসরের খাজনার বাবদ অনেক টাকার দাবীতে একটি নালিশ রুজু হয়। মিঃ আরের ধারণা ছিল, ঐ জমি তাঁহার পিতা স্কট-ল্যাণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত একটি বিশেষ আইন অনুযায়ী ক্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং উহার স্বত্ব ও স্বামিত্ব তাহারই। যাঁহারা খাজনার দাবীতে নালিশ করিয়াছেন, তাহারা ঐ জমির এক সময়ে মালিক থাকিলেও এখন উহা আর তাহাদের নহে। মিঃ আর কিন্তু তাহার পিতৃপরিত্যক্ত কাগজপত্রের মধ্যে ঐ জমি ক্রয়ের দলিল বহু অনুসন্ধানেও খুঁজিয়া পাইলেন না। সরকারী ভূমি সংক্রান্ত দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিয়াও ভূমি ক্রয়ের কোন নিদর্শন মিলিল না। যে সকল আইনজীবী মিঃ আরের পিতার বিষয়-সম্পত্তির সম্পর্কে আইনের কাজকর্ম্ম করিয়া দিতেন, সেই সকল ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়াও মিঃ আর তাহার ধারণার সমর্থনসূচক কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হইলেন না। এদিকে অভিযোগের বিচারের দিন ক্রমশঃ সন্নিহিত হইয়া আসিতে লাগিল। জমির ভূতপূর্ব্ব অধিকারীরা একটা ভিত্তিহীন দাবী উপস্থিত করিয়া অন্যায় করিয়া অনেক টাকা আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে; অথচ, জমির যথার্থ অধিকারী যে মিঃ আর, তাহা সপ্রমাণ করিবার মত কোন দলিলই পাওয়া যাইতেছে না। মোকদ্দমায় পরাজয় অনিবার্য্য, দাবী অনেক টাকার—এই অর্থ ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে; পক্ষান্তরে, জমির মালিকানস্বত্ব যে তাহার নহে—অপর পক্ষের, সে কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব মিঃ আরের মানসিক অবস্থা

সহজেই অনুমেয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি বাদীপক্ষের সহিত একটা মিটমাটের চেষ্টায় এডিনবরা নগরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। যেদিন যাত্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে মিঃ আর যথাসময়ে শয়ন করিতে গেলেন। নিদ্রাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার বহু বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গগত পিতা যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার মন এত চঞ্চল কেন? তুমি এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ কেন? কোন ভদ্রলোক বহু কাল পূর্ব্বে লোকান্তরিত হইলেও স্বপ্নে তাঁহার আবির্ভাব হইলে কেহ বিস্মিত হয় না—স্বর্গত পিতাকে দর্শন করিয়া মিঃ আরও বিস্ময় অনুভব করেন নাই। মিঃ আরের মনে হয়, পিতার ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁহার দুঃখের কারণ পিতাকে জানাইয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখের বিশেষ কারণ এই যে, একটা মিথ্যা দাবীতে অনেক টাকা তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইতেছে। অথচ, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—এ টাকা বাদীর যথার্থ প্রাপ্য নহে। এ দিকে তিনি কোন প্রমাণই বাহির করিতে পারিতেছেন না। মিঃ আরের পিতার প্রেতমূর্ত্তি পুত্রের দুঃখের কারণ শুনিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি ঠিকই বলিয়াছ বৎস। আমি ঐ জমি যথার্থই ক্রয় করিয়াছিলাম। ইহার জন্য তোমার নিকট হইতে খাজনার দাবী করিয়া অভিযোগ রুজু করা অপর পক্ষের সঙ্গত হয় নাই। জমি যখন কেনা হইয়াছে তখন উহার দলিলও নিশ্চয়ই আছে। এই দলিলগুলি মিঃ অমুকের কাছে আছে। তিনি এটর্ণী। এখন তিনি ব্যবসায়-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এডিনবরা নগরের নিকটবর্ত্তী ইনভারেস্ক নামক স্থানে এখন বাস করিতেছেন। বিশেষ একটা কারণে এই জমি ক্রয় সংক্রান্ত আইনঘটিত কার্য্যের ভার আমি এই ব্যক্তিকে দিয়াছিলাম। ইনি কিন্তু অন্য কোন ক্ষেত্রে আমার কোন কাজ করেন নাই। এই জমি কেনার ব্যাপার অনেক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হওয়ায় ঘটনাটা সম্ভবতঃ এখন তাঁহার স্মরণ নাই। তবে তুমি বিষয়টা তাঁহাকে এক উপায়ে স্মরণ করাইয়া দিতে পারিবে। যদি তিনি আমার কাজ করার কথা ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তবে তুমি তাঁহাকে বলিবে যে, আমি যখন তাঁহাকে তাঁহার পারিশ্রমিকের টাকা দিতে গিয়াছিলাম, তখন একটা পোর্ত্তুগীজ স্বর্ণমুদ্রা কোন মতে ভাঙ্গাইতে পারা যায় নাই। সেই জন্য দেনা-পাওনা চুকাইয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আমরা একটা শুঁড়িখানায় গিয়া উভয়ে মদ্যপান করিয়া খরচ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

পর দিন সকালে মিঃ আরের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখনও স্বপ্নের প্রত্যেক দৃশ্য ও কথা তাঁহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, অশ্বারোহণে ইনভারেস্কে গিয়া ব্যাপারটা যাচাই করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। অতএব পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুসারে সোজাসুজি এডিনবরায় না গিয়া মিঃ আর ইনভারেস্কে গমন করিলেন। সেখানে স্বপ্নোক্ত এটর্ণীর খোঁজ করায় তাঁহার সন্ধানও মিলিল। জায়গাটি ছোট বলিয়া বেশী খোঁজও করিতে হইল না। ভদ্রলোকের বাড়ী পৌঁছিয়া মিঃ আর দেখিলেন, লোকটি অত্যন্ত স্থবির। স্বপ্নের উল্লেখ মাত্র না করিয়া মিঃ আর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পিতার (নামোল্লেখ করিয়া) জন্য এইরূপ কোন আইনঘটিত কার্য্য করিয়াছিলেন কি না। বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রথমে এরূপ কোন কাজ করার কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তখন মিঃ আর পিতৃ-নির্দ্দেশ মত পোর্ত্তুগীজ স্বর্ণমুদ্রার কথার উল্লেখ করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঘটনা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তখন তিনি তাঁহার কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া তন্মধ্য হইতে মিঃ আরের প্রয়োজনীয় দলিলখানি বাহির করিয়া দিলেন। সেই দলিল লইয়া মিঃ আর এডিনবরায় চলিয়া গেলেন, এবং উহা আদালতে দাখিল করিলেন। বলা বাহুল্য, যে মামলায় নিশ্চয়ই তাঁহার পরাজয় ঘটিত, ঐ দলিলের বলে তাহাতে তাঁহার জিত হইল।

পূর্ব্বে যে পদ্ধতির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অনুযায়ী এই স্বপ্নটির এই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় যে, মিঃ আর কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার পিতার নিকট হইতে উক্ত জমি ক্রয়ের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অবশেষে এক্ষণে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায়, এই বিষয়টি লইয়া তিনি মনে মনে বিলক্ষণ তোলপাড় করিতে থাকেন। ইহার ফলে সাহচর্য্যের শ্রেণী ক্রমান্বয়ে তাঁহার মনে উদিত হইতে থাকে, এবং স্বপ্নে তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া সমগ্র বিষয়টি তাঁহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠে।

য়্যাসোসিয়েসন বা সাহচর্য্যের প্রভাবে স্বপ্নে বিস্মৃত বিষয় পুনরায় স্মৃতিপথে উদিত হওয়ার আরও দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। এডিনবরার একজন আইনজীবী একটি সম্পত্তি হস্তান্তর করা সংক্রান্ত দলিলপত্র সংশ্লিষ্ট একখানি প্রয়োজনীয় কাগজ কোথায় রাখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল না। সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার জন্য একটি দিনও ধার্য্য হইয়াছিল। কয়েক দিন ধরিয়া ঐ কাগজখানির অনেক অনুসন্ধান করা হয়; কিন্তু কিছুতেই তাহা পাওয়া যায় না। অবশেষে নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্ব দিনের সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল; তখনও দলিলখানির সন্ধান মিলিল না। ইহাতে উক্ত আইনজীবী এবং এই ব্যাপার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির উদ্বেগের সীমা রহিল না। উকিল মহাশয়ের পুত্র হতাশ হইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে রাত্রে শয়ন করিতে গেলেন। নিদ্রাযোগে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি যখন তাঁহার পিতাকে কাগজখানি প্রদান করেন, তখন টেবিলের উপর অন্য একজন মক্কেলের বিষয়-সম্পত্তি-ঘটিত বহু সংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল। তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট হইতে কাগজখানি লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার ধারণা জন্মিল, ঐ মক্কেলের কাগজপত্রের মধ্যে হারানো কাগজখানিও হয় ত থাকিতে পারে। মক্কেলের দলিলাদি একটা স্বতন্ত্র বাক্সে রক্ষিত হইত। পুত্র ঐ বাক্স খুলিয়া সেই সমস্ত কাগজপত্র বাহির করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মক্কেলের কাগজের একটা বাণ্ডিলের সঙ্গে দরকারী কাগজখানিও বাঁধা রহিয়াছে। সহজেই বুঝা গেল, অন্যমনস্কতা বশতঃ ভুলক্রমে এই কাগজ

মক্কেলের কাগজের বাণ্ডিলের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছিল, এবং বাক্স বন্ধ করা হইয়াছিল। আর একবার একটা সরকারী আপিসের একজন কর্ম্মচারী এই ভাবে একখানি দরকারী কাগজ এমন জায়গায় রাখিয়াছিলেন যে, প্রয়োজনের সময় তাহা পাওয়া যাইতেছিল না; এবং না পাওয়া গেলে তাঁহার চাকুরী যাইবার সম্ভাবনাও ছিল। অনেক অনুসন্ধানে কাগজখানি পাওয়া গেল না, কিন্তু স্বপ্নে একটা বিশেষ স্থানে উহা আবিষ্কৃত হইল, এবং পরদিন ঠিক সেই স্থান হইতে উহা বাহির হইল।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিস্মৃত বিষয় বা ঘটনা য়্যাসোসিয়েসনের সাহায্যে স্বপ্নে স্মরণে আসিতে পারে। যে সকল ঘটনা বা বিষয় বহুকাল পূর্ব্বে মন হইতে সম্পূর্ণ বিদূরীত হইয়াছে, যাহার লেশমাত্র কখনও মনে পড়ে না, এমন সকল বিষয়ও স্বপ্নযোগে স্মৃতি-পথে জাগরিত হইতে পারে। কেবল ইহাই নহে—এমন অনেক বিষয় আছে যাহা সাময়িক ব্যাপার মাত্র, যাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার কোনই প্রয়োজনই হয় না। তাহা যে সময়ে ঘটে, মাত্র সেই সময়টুকুর জন্যই মনের সংস্পর্শে আসে, ঘটনার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মন হইতে তাহার স্মৃতিও সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায়। এইরূপ বিষয়ও মনে যে অস্পষ্ট আবছায়া ছাপ রাখিয়া যায়, সাহচর্য্যের কল্যাণে এমন ঘটনাও যে সময়ে সময়ে স্বপ্নযোগে মনের মধ্যে স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া ফুটিয়া উঠে, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। এই উপায়ে আরও অনেক স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার অর্থ নিরাকরণ করা যাইতে পারে। এক জায়গায় একজন ফেরিওয়ালা নিহত হইয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের যখন তদন্ত চলিতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আসিয়া তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারীদের কাছে প্রকাশ করিল যে, সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, তাহাকে একটা বাড়ী দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং একটা অশরীরী বাণী ঐ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া জানাইয়াছে যে, ঐ জায়গায় নিহত ব্যক্তির বিক্রের পণ্য-পূর্ণ একটা বাক্স মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। অনুসন্ধানে মাটীর ভিতর হইতে বাক্সটি বাহির হইল বটে, কিন্তু ঠিক তাহার নির্দ্দেশানুযায়ী স্থান হইতে নহে, তবে উহার কাছাকাছি জায়গা হইতে। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের প্রথমেই মনে হইল, লোকটি নিজেই হয় হত্যাকারী, না হয় ত হত্যাকারীর সহচর ও সহায়তাকারী। কিন্তু ইহার পর প্রকৃত হত্যাকারী ধরা পড়িল। তাহার বিচার হইল ও সে দণ্ডিত হইল। ফাঁসী যাইবার পূর্ব্বে সে তাহার অপরাধের সম্পূর্ণ বিবরণ স্বীকার করিল। সে দৃঢ় ভাবে প্রকাশ করিল যে, স্বপ্নদর্শনকারীর এই হত্যাকাণ্ডের সহিত কোন সংস্রব ছিল না, সে ইহার কথা জানিতও না। অনুসন্ধানে কেবল এইটুকু জানা গেল যে, হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে হত্যাকারীর সহিত স্বপ্নদর্শনকারীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং কয়েক দিন ধরিয়া উভয়ে একত্র থাকিয়া অনবরত মদ্য পান করিয়া মাতাল অবস্থায় ছিল। ঘটনার সহিত স্বপ্নদর্শনকারীর এইটুকু মাত্র সংস্রব দেখা যায়। অনুমান হয়, মত্তাবস্থায় হত্যাকারী হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোন কোন কথা প্রকাশ করিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিবার মত মানসিক অবস্থা স্বপ্নদর্শনকারীরও ছিল না। সেই জন্য, তাহার নেশা কাটিয়া গেলেও এই কথা তাহার মনে ছিল না। কিন্তু স্বপ্নে একটু ভিন্ন আকারে তাহা তাহার মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল।

৪। আর এক শ্রেণীর স্বপ্ন আছে; তাহাও পরিদর্শন করিবার উপযোগী বিষয়। ইহাতে স্বপ্নে লোকের চরিত্রের প্রবণতা অথবা প্রবল মানসিক ভাবপ্রবণতা জড়িত থাকে। কতকগুলি স্বাভাবিক যোগাযোগের ফলে এই ধরণের স্বপ্ন বাস্তব জীবনে ফলিয়া যায়। একজন হত্যাকারী প্রকৃত নরহত্যা করিবার বহু বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে, সে খুন করিতেছে। আর একবার একজন বিখ্যাত সেনানী একটা অসম্ভব রকম স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং দশ বৎসর পরে সেটা ফলিয়া গিয়াছিল। ঘটনার সময় সেনানীর দশ বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্নের কথা একটুও মনে ছিল না। ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এইরূপ—উক্ত সেনানীর বয়স যখন চৌদ্দ হইতে পনেরো বৎসরের মধ্যে, তখন তিনি ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি এটনা আগ্নেয়গিরি গহ্বরের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন। বাহির হইতে যতদূর দেখিতে পাওয়া গেল তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অগ্রসর হইলেন। গহ্বরের চূড়ায় তখন প্রচুর ধূম ও অগ্নিশিখা উদ্গত হইতেছিল। কিন্তু নীচের দিকে কিয়দংশ বেশ শান্তই ছিল। গহ্বরের গাত্রে পায়রার খোপের ন্যায় গর্ত্ত ছিল। সেই গর্ত্তে পা আটকাইয়া দিয়া দিয়া তিনি নামিতে লাগিলেন। কিছু দূর নামিবার পর একটা গর্ত্তে পা রাখিবামাত্র তাহা ধ্বসিয়া গেল, তাঁহার পা ফস্কাইয়া গেল, তিনি গড়াইয়া গড়াইয়া গহ্বরের গর্ত্তে নিম্নতলের দিকে পড়িতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখনও তাঁহার বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। জাগ্রত হইয়া তিনি দেখিলেন, ব্যাপারটা স্বপ্ন মাত্র। তথাপি, যেন আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন ভাবিয়া তিনি স্বস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃটিশ সেনাদলের একজন ক্যাপ্টেন। একবার এই সেনাদল মেসিনা প্রদেশে প্রেরিত হয়। সেখানে অবস্থিতিকালে কয়েকজন বৃটিশ সেনাপতি একটা দল বাঁধিয়া এটনা গিরিশিখর দর্শনে যাত্রা করেন। এই ক্যাপ্টেনও ঐ দলে ছিলেন। দলটি যখন পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইল, তখন দলের অনেক লোক এমন পীড়িত হইয়া পড়িলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু এই ক্যাপ্টেন এবং অপর দুইজন সেনানী দুইজন পথ-প্রদর্শকের সহিত পর্ব্বত-পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে লাগিলেন। হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহারা যে সময়ে পর্ব্বত-শিখরে পৌঁছিলেন, তখন সূর্য্যোদয় হইতেছিল। তাঁহারা এক ঘণ্টা সেখানে বিশ্রাম করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা কিছু খাইয়াও লইলেন। ক্যাপ্টেন প্রস্তাব করিলেন যে, বিখ্যাত এটনা আগ্নেয়গিরির শিখরে ত উঠা গেল; কিন্তু গহ্বরের তলদেশটা একবার দেখা উচিত নয় কি? অন্যান্য লোকরা তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পথ-প্রদর্শকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা তাঁহার সঙ্গে যাইবে কি না। তাহারা বলিল, তুমি পাগল, তাই এইরূপ দুঃসাহসিক কথা বলিতেছ। ক্যাপ্টেন তখন কাহারও

অপেক্ষা না করিয়া একাকীই গহ্বরে নামিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া অপর একজন সেনানী তাঁহার সঙ্গী হইতে সম্মত হইলেন। পথপ্রদর্শকরা কোনরূপ সাহায্য করিতে স্বীকার করিল না। গহ্বরের বহির্দিকের মুখের পরিধি তিন মাইল। আর তলদেশটা গোলাকার; তাহার পরিমাণ আন্দাজ তিন বিঘা। গহ্বরের মুখের এক অংশ দিয়া ধূম বাহির হইতেছিল বটে, কিন্তু তলা হইতে বহু বৎসর ধরিয়া কোন অগ্ন্যুদগম হয় নাই। গহ্বরের একদিককার কিয়দংশ ধ্বসিয়া গিয়া তলা পর্য্যন্ত ঢালু ও গড়ানে হইয়া গিয়াছিল। যাত্রীদ্বয় সেই দিকে গিয়া দেখিলেন বেশ সহজে নামিতে পারা যাইবে। এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা অনায়াসে তলায় গিয়া পৌঁছিলেন। পথপ্রদর্শকদ্বয় উপর হইতে উঁকি মারিয়া তাঁহাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছিল। তাঁহাদিগকে তলদেশস্থ সর্ব্বনিম্ন প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা যে কতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সেনানীরা দেখিলেন, গহ্বরের তলাটা প্রস্তরখণ্ড ও ভস্মে পূর্ণ। তাঁহারা সহজে নামিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উঠিবার সময় তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। নরম ভস্মের উপর দিয়া উঠিতে হওয়ায় পায়ের নীচের মাটী সরিয়া গিয়া পদে পদে তাঁহাদের পদস্খলন হইতেছিল। যখন পুনরায় শিখরে উঠিলেন, তখন ক্লান্তিতে তাঁহারা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে এরূপ অসমসাহসিক কার্য্য নিরাপদে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়ায় তাঁহারা বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে যখন তাঁহারা বাসায় সুখশয্যায় শয়ন করিতে গেলেন, তখন দশ বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্নবৃত্তান্ত ক্যাপ্টেনের মনে পড়িয়া গেল।

অনেক সময়ে সমসাময়িক ঘটনার দৃশ্য স্বপ্নে দেখা যায়। একবার এক পাদরী এডিনবরার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতে সহরে আসিয়া এক পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাত্রিতে নিদ্রাযোগে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার ঘরে আগুন লাগিয়াছে এবং তাঁহার একটি সন্তান সেই জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের কথা মনে পড়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ সহর ত্যাগ করিয়া নিজের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যেখান হইতে তাঁহার বাড়ী প্রথম দেখা যায়, সেইখানে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন বাড়ীটি সত্য সত্যই পুড়িতেছে। তিনি দৌড়িয়া বাড়ীর নিকটে গিয়া পৌঁছিলেন, এবং দেখিলেন, ছেলেমেয়েদের সকলকেই বাহির করা হইয়াছে; কেবল অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্কে ও ব্যস্ততায় একটি সন্তান তখনও ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। যাহারা তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল, পাদরী সাহেব তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া নিরাপদে ছেলেটিকে বাহির করিয়া আনিলেন। এরূপ ঘটনার স্থলে অনেক সময়ে ছায়ামূর্ত্তি বা প্রেতমূর্ত্তিরা আবির্ভূত হইয়া আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া যায়—সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস আছে। এই ধারণা সত্য কিম্বা ভ্রান্ত তাহার বিচার না করিয়াও বলা যায় যে, এই ধরণের স্বপ্নের অতি সরল ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মনে করুন, পাদরী সাহেবের একজন ভৃত্য ছিল। লোকটা বড় অসাবধানী। বিশেষ করিয়া অগ্নি সম্পর্কে তাহার অসাবধানতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহার ভাব-গতি দেখিয়া পাদরী সাহেবের মনে ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, সে কোন্ দিন বা তাঁহার ঘরে আগুন লাগাইয়া বসে! বাড়ীতে থাকিতেই চাকরটার অসাবধানতার জন্য পাদরী সাহেব সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। এখন বাড়ী হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার উদ্বেগ স্বভাবতই যে বেশী হইবে, তাহাও সহজে বুঝা যায়। কারণ, তিনি বাড়ীতে থাকিলে তাঁহার নিকট বকুনী খাইবার ভয়ে চাকরটা যতটুকুও সাবধান হইত, এখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে সে ত আরও অসাবধান হইবেই। আবার ধরুন, ভদ্রলোকটি উদ্বিগ্ন চিত্তে যখন শয়ন করিতে গেলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, সেই দিন তাঁহার বাড়ীর কাছে একটা মেলা বসিয়াছে। চাকরটা নিশ্চয়ই মেলা দেখিতে গিয়াছে, এবং সেখান হইতে প্রচুর তাড়ি খাইয়া নেশায় বুঁদ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে এই সকল ধারণা ও চিন্তার ফলে তাঁহার মনে স্বপ্নের সৃষ্টি হইল যে, তাঁহার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে; এবং ঐ সকল ধারণা এতই সম্ভবপর ছিল যে, সত্য সত্যই তাঁহার বাড়ীতে আগুন লাগিল—তাঁহার স্বপ্ন সত্য হইয়া দাঁড়াইল।

এক ব্যক্তির একটি আব (tumour) হইয়াছিল। সেই আবটি কাটাইবার দরকার হইয়াছিল। অস্ত্র-প্রয়োগের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছিল। দুইজন বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসককে রোগীর তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। নির্দ্ধারিত দিবসের দুই দিন পূর্ব্বে রোগীর পত্নী স্বপ্ন দেখিলেন যে, রোগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সেই জন্য অস্ত্র-প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। পর দিন সকালে উঠিয়া রোগী ভদ্রলোকটি আবটি পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, উহার স্পন্দন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়াছে। এক কথায়, রোগ আপনা আপনি আরাম হইয়া গিয়াছে। যাহারা চিকিৎসক নহে, অর্থাৎ সাধারণ লোককে জানাইয়া রাখা দরকার যে, বিনা অস্ত্র-প্রয়োগে এই শ্রেণীর আব আরোগ্য হওয়া অতীব অসাধারণ ব্যাপার। এরূপ ঘটনা বড় একটা দেখা যায় না; এমন কি, একেবারে অসম্ভব বলিলেও চলে। তবে যিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি হয় ত কাহারও মুখে এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইবার কথা শুনিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, স্বামীর রোগ এবং অস্ত্র-চিকিৎসার কথা ভাবিয়া তিনি যে বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। এই সকল যোগাযোগের ফলেই হয় ত তিনি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তবে তাঁহার স্বপ্ন ঠিক সেই সময়েই সফল হওয়া—সেটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বীকার করিতেই হইবে।

স্বপ্নে সতর্কতার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। একটি ভদ্রমহিলা স্বপ্ন দেখিলেন যে, একজন কৃষ্ণকায় ভৃত্য তাঁহার এক বর্ষিয়সী আত্মীয়াকে হত্যা করিয়াছে। এই স্বপ্নটি তিনি একাধিকবার দেখিলেন। পুনঃ পুনঃ একই ধরণের স্বপ্ন দেখিয়া তিনি এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি স্বয়ং ঐ বৃদ্ধা আত্মীয়ার গৃহে গমন করিলেন এবং পরবর্ত্তী রজনীতে ঐ বৃদ্ধার উপর নজর রাখিবার জন্য এক ভদ্রলোককে রাজী করিলেন। রাত্রি তিনটার সময় উক্ত ভদ্রলোকটি সিঁড়িতে পদশব্দ

শুনিয়া, তিনি যেখানে লুকাইয়া বসিয়া ছিলেন, তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সিঁড়িতে ভৃত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সে তখন কিছু কয়লা লইয়া উপরে যাইতেছিল। সে কোথায় যাইতেছে এই প্রশ্ন করা হইলে সে উত্তর করিল যে, প্রভুপত্নীর ঘরের আগুন নিবিয়া আসিতেছে বলিয়া সে তাহাতে কয়লা দিতে যাইতেছে। তাহার ইতস্ততঃ ভাব ও জড়াইয়া কথা বলার ধরণ দেখিয়া ভদ্রলোকটির মনে সন্দেহ হইল। বিশেষতঃ তখন গ্রীষ্মকাল, বেশ গরম চলিতেছে। এমন গরমের সময়ে, রাত্রি তিনটায় শয়নকক্ষে কয়লা জ্বালিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করার একান্তই প্রয়োজনাভাব। এইরূপ অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ও অসম্ভব কার্য্যে তাহাকে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া ভদ্রলোকটির সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। খানাতল্লাসীতে কয়লার নীচে হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরাও বাহির হইল। আত্মীয়াটি স্বপ্ন দর্শন করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করায় বৃদ্ধা এ যাত্রা অপঘাত-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া গেলেন।

আর একবার আর একটি মহিলা স্বপ্ন দেখেন যে, একটি বালক—তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র—অপর কয়েকটি বয়স্যসহ নৌকারোহণে সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া গিয়াছে। পর দিন সকালে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে সেদিন তাঁহার কাছে আটকাইয়া রাখিলেন। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে তাহার বয়স্যরা নৌকাযাত্রা করিল। অপরাহ্নে সংবাদ আসিল, তাহারা সকলেই সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। কেবল এই বালকটি তাহাদের সঙ্গে না থাকায় বাঁচিয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্‌লা বানান

আলোচনা

শ্রীহীরেন্দ্রনারাণ মুখোপাধ্যায় কাব্য-বিনোদ বি-এ

গত পৌষ ও মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" ভাষাপ্রবীণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের ও শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'বাংলা বানান' পড়িলাম। বিদ্যানিধি মহাশয় যে বলিয়াছেন "সমালোচনাই চাই", ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে আমিও স্বীকার করি, কারণ ভাষা সার্ব্বজনীন সম্পত্তি। যে কয়েকটী শব্দের লিখন-প্রণালী ও বানান সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমারও কিছু বক্তব্য আছে।

"আমরা সর্ব্বত্র অনুস্বারকে 'ঙ'রূপে উচ্চারণ করি" তাহা মনে হয় না। "বাংলা" ও "বাঙ্‌লা" বাঙ্‌লার সর্ব্বত্র যখন ব্যবহৃত হয় না, বিশেষতঃ রাঢ়ে, তখন পূর্ব্বোক্ত দুইটির কোনটিই সার্ব্বজনীন হিসাবে স্বীকার করা চলে না। তবে 'বাঙ্‌লা'র মধ্যস্থ যুক্ত ও স্থূল ধ্বনিকে এড়াইয়া ভাষা সহজ করিবার উদ্দেশ্যেই যদি ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে আপত্তি নাই; কারণ, উভয়েই শ্রুত এবং সামঞ্জস্যবিশিষ্ট। তবে "বাংলা"কে সমর্থন করিলে, "বাংালী" লিখিবার বেলায় গোলযোগ ঘটে যথেষ্ট। "বাঙলা"র বেলায় সে বিপদ থাকে না। 'বাঙ্‌লা' ও "বাঙ্গালী" পৃথক পৃথক অক্ষরগত বানানের হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

যাহা হউক, আসল প্রশ্ন, 'ঙ' অক্ষরের উচ্চারণ কিরূপ? সংস্কৃতের বানান ও উচ্চারণ লইয়া টানাটানি করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ "বাঙ্‌লা" সংস্কৃত নয়। এখন সমস্যা দাঁড়াইয়াছে কয়েকটী অক্ষরের ধ্বনি লইয়া। বিশেষতঃ "ঙ", "ং", "ঞ"। "ঙ" "ং" এবং "ঞ" ইহাদের কোনটীরই স্বাধীন ধ্বনি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না। ইহারা যে কতকটা "অনুধ্বনি" তাহা উচ্চারণে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। এই জন্যই মৌলিক কয়েকটী "স্বরের" মৃদু ধ্বনির সাহায্য না লইয়া ইহাদিগকে উচ্চারণ করা যায় না। উচ্চারণ অনুসারে "ঙ" "ঞ" এবং "ং" এই তিনটাকে "অর্দ্ধধ্বনি"ও বলা চলে।

"ঙ" "ং" ও "ঞ" এই তিনের ধ্বনির মধ্যে একটা মিল আছে বটে, কিন্তু তিনটীর মধ্যে কোনটাই কাহারো সহিত সম্পূর্ণ সমধ্বনি নহে। তিনটী ধ্বনির গতি বিভিন্নমুখী। "ঙ"র ধ্বনি আত্মমুখী, "ং"র বহির্মুখী, এবং "ঞ"র ধ্বনি অধোমুখী। প্রাচীন কাব্য ও সাহিত্যে ক্রিয়ার সহিত "ঙ" ও "ঞ" এই উভয়েরই বহুল ব্যবহার পাওয়া যায়। তাহাতে একটী জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। "ঙ" আত্মমুখী ধ্বনি বলিয়াই উত্তমপুরুষে "ঙ" ব্যবহার একটু বেশী দেখা যায়, এবং মধ্যম ও প্রথমপুরুষে "ঞ" ব্যবহার বেশী দেখা যায়। "পাখীজাতি যদি হঙ; পিয়া পাশে উড়ি যাঙ"—(কর্ত্তা মুঁ)। "রাধাক দেখিঞা কাহ্নে, উতরল ভৈলা মনে।" "বড়ায়িক সম্বোধিঞা বুলিল বচনে।" (কর্ত্তা প্রঃ পুঃ)। যাহা হউক, "ঙ"র ধ্বনি ঠিক "উঁ"কি? ("উ"ও "ঁ"র মিশ্র ধ্বনি শুনিতে কুন্থনধ্বনিবৎ) "উঁ" স্থলে "উ৺" চিহ্ন দ্বারা "ঙ"র ধ্বনি নির্দ্দেশ বোধ হয় আরও স্পষ্ট হয়। ঐরূপ ক্ষেত্র বিশেষে "ঙ"র ধ্বনি "ও৺" হইয়া থাকে। কোনো শব্দের সহিত যোগ না করিয়া, "ঙ"কে পৃথকভাবে উচ্চারণ করিতে হইলে, আমরা সাধারণতঃ মৃদু "উ" কিম্বা "ও" (কখনো বা "অ") প্রাক্‌ধ্বনিরূপে ব্যবহার করি। উহার নামকরণও তদনুসারেই হইয়াছে। কিন্তু "ঙ" কোনো অক্ষরের অনুগমন করিলে, তখন তাহাকে পূর্ব্ববর্ণের "স্বর"টার সাহায্যেই উচ্চারণ করি। "পাখী জাতি যদি হঙ; পিয়া পাশে উড়ি যাঙ।" "হঙ"এর "ঙ"—"অ৺", "উ৺" এবং "ও৺" তিন প্রকারেই উচ্চারণ করা চলে, তবে "অ৺" যেন অধিক প্রযোজ্য। "যাঙ" উচ্চারণে "আ৺" অধিক স্পষ্ট, তবে "উ৺" এবং "ও৺" করা চলে; কিন্তু বেশী স্পষ্ট হয় না। "শাঙন মেঘ", এখানে "ঙ" স্পষ্ট "৺অ"।

অনুস্বার যে অনুধ্বনি, তাহা নামকরণ হইতেই বুঝা যায়। "ং"এর পৃথক উচ্চারণ দেখি না। ইহা সর্ব্বদাই পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর লইয়া আসে; সুতরাং পূর্ব্ববর্ণের স্বরের সহিত—ং যোগ করিয়া ইহাকে উচ্চারণ করা হয় এবং ইহার পক্ষে সে নিয়ম সর্ব্বদাই খাটে।

"ব'লে", "ক'রে", "হ'লে" ইত্যাদি লিখিতে—যে ঊর্দ্ধ 'কমা' ব্যবহার করা হয়, তাহা কতকগুলি লুপ্তবর্ণের চিহ্ন। সাধারণ কথা

ভাষার মৌখিক রূপ লিখিতে যে উর্দ্ধ কমা ব্যবহার করা হয়, তাহাকে লুপ্তবর্ণের সাধারণ চিহ্ন হিসাবে ধরিয়া রাখিলে বোধ হয় বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। ভাষা শিক্ষার অসাধারণ শব্দ আয়ত্ত করিতে যত কষ্ট হয়, নিত্যকথ্য শব্দে তাহা হয় না। কেন না, নিত্যকথ্যগুলির মৌলিকরূপ প্রায় সকলেরই পরিচিত, এবং লেখ্য ভাষায় বহুলভাবে সেই-গুলিই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ব'লে', ক'য়ে, চ'লে' প্রভৃতিতে বো—, কো,—, চো— কিম্বা—ল্যে,—য়্যে—ল্যে ইহাদের কোনটাই সন্তোষজনক প্রণালী বলিয়া মনে হয় না। লেখ্য ভাষায় যখন বলিয়া কহিয়া, চলিয়া নিত্য ব্যবহার করা হয়, তখন "কথোপকথনের" ব'লে, ক'য়ে, চ'লে' ব্যবহার :বিশেষ রূপ-বিভ্রাট ঘটায় না। সেদিকে ততখানি ধরিলে, "বাংলা"ও আভিজাত্য নির্ণয়ে কম গোলমাল ঘটাইবে না। চল্‌তি কথায় সাধারণ 'লুপ্ত-চিহ্ন' হিসাবে উর্দ্ধ কমা ব্যবহার করিলে, চাকর্যে, পুব্যে, তিল্যে, গুড়্যে ইত্যাদি লিখিবারও প্রয়োজন নাই। চাক্‌রে', পুবে', গুড়ে' ইত্যাদি লিখিলে বিশেষণত্ব লুপ্ত হয় না। উহাদিগকে যখন ছাঁটকাট করিয়া কথ্য ভাষাই করা হয়, সাধুভাষা রূপে ব্যবহার করা হয় না, তখন উহাদের আভিজাত্য জানাইবার পক্ষে 'লুপ্ত-চিহ্ন'ই যথেষ্ট। ইয়া প্রত্যয়ের চিহ্ন বজায় রাখিতে যদি য-ফলা "্য" দিতে হয়, তাহা হইলে লৈখিক 'বলিয়া'কে মৌখিক বা কথাতে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, কেবল 'বলো' 'গুড়ো' ইত্যাদি বলিলে চলে না; "বল্যা", "গুড়্যা" ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয়। গঠন খাস্ পূর্ব্ববঙ্গের স্বরূপ ধারণ করে। শব্দের আভিজাত্য নির্ণয়ে ইহাও পরিণামে পশ্চিমবঙ্গে গোলযোগের সৃষ্টি করিবে। 'গুড়্যা'তে "ইয়া" প্রত্যয় অটুট আছে, তাহা লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বে, তাহাতে ঠিক্ 'গুড়' শব্দটা আছে কি না তাহা ভাবিয়া উঠাই অনেকের পক্ষে কঠিন হইবে। সুতরাং লুপ্তটুকুকে শুধু "লুপ্ত-চিহ্ন" দ্বারা প্রকাশ করাই সুবিধাজনক এবং সার্ব্বজনীন।

ঠাকুর মা—মৌখিকে ঠাকুমা শোভন এবং যথেষ্ট ব্যবহার পাওয়া যায়। তবে ঠাকুরঝি—মৌখিকে 'ঠাকুঝি' উচ্চারণ বিশেষ শুনি না। ঠাকুরঝি —কথ্য—'ঠাকুরঝি' অধিক চলিত। কোথাও কোথাও শেষের 'ঝ'টা এত মৃদু যে, উচ্চারণ ঠিক "ঠাকুজ্জি" বলিয়াই মনে হয়।

"তোমাদের ভিতরে কে সাহসী" ইহাতে "মধ্যে" অর্থে "ভিতরে" ব্যবহার করিতে দোষ কি?

'আজে বাজে' ছাড়া 'আঁকা বাঁকা' 'হের ফের' প্রভৃতি আরো শব্দ আমরা বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণে ব্যবহার পাই। বিশেষণে ছায়া পূর্ব্ব-গামী না-হইবার কোনো বিশেষ কারণ আছে কি? আমার মনে হয়, যাহাতে উচ্চারণ সহজ ও শুনিতে ভাল হয় সেইরূপেই উক্ত যুগলগুলি (ছায়া+শব্দ) সাজাইয়া লওয়া লইয়াছে। 'বিজি বিজি' (বীজ বীজ) হইতে 'ইজি বিজি' ও 'হিজিবিজি' হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'বিজিবিজি' অর্থে আমরা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সমন্বয় বুঝি, কিন্তু 'হিজি-বিজি'তে বুঝি সম্পূর্ণ অন্যরূপ।' 'হিজিবিজি' অর্থে কুণ্ডলীকৃত, বক্র ও জটিল দীর্ঘ বস্তু সমূহের সমন্বয় বুঝা যায়। কেবল পূর্ব্বগামী 'বিজি' শব্দটার স্থলে 'হিজি' ব্যবহারে এতদূর পার্থক্য ঘটিতেছে। 'হিজি'টা 'বিজি' শব্দের ভ্রংশরূপ হইলে, এত পার্থক্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। 'হিজি'কে 'বিজি'র ছায়া বলিয়াই বোধ হয়। এই সকল যুগল শব্দ (ছায়া+শব্দ) গঠিতই হইয়াছে কেবল ধ্বনির গুণ বাড়াইয়া শব্দার্থকে বিশেষ রূপ দিবার উদ্দেশ্যে। 'জড়' পদার্থ ব্যতীত 'চেতন' পদার্থের ক্ষেত্রেও আমরা সময় সময় ছায়া পশ্চাদ্‌গামী দেখি; "মোটা-সোটা" মানুষ, "ঢিলে-ঢালা" লোক।

বাংলা বানান

(আলোচনা)

শ্রীবীরেশ্বর সেন

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় আমার বাংলা ভাষা প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছেন আমি তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

'বাংলা' বানানটা আমি এই জন্য ভুল বলিয়াছিলাম যে সংস্কৃতে ঙ এবং অনুস্বারের উচ্চারণ অভিন্ন নহে। বাংলায় আমরা অভিন্নরূপে উচ্চারণ করি। ইহাই ভুল। 'বাংলা' বানান ভুল হইলেও আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছিলাম। বিদ্যানিধি মহাশয়ের তাহাতে আপত্তি হইল কেন বুঝিলাম না। ইংরেজীতে can এবং ভূতকালে could ভুল বানান coud হওয়া উচিত। কিন্তু সকলেই could লেখেন। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু পণ্ডিত "বাঙলা"ই লেখেন। অর্থাৎ ঙকারের সংস্কৃত উচ্চারণই লেখেন।

অনুস্বারের উচ্চারণ যে অঁ আমি এমন কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছিলাম অনুস্বার যে স্বরের পরে থাকে সেই স্বর দ্বিরুক্ত হইয়া চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে প্রায় অনুস্বারের উচ্চারণ হয়।

'তিঙন্ত' শব্দে ঙকারের উচ্চারণ সকলেই যেরূপ করেন তাহাই ঙ বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ। শিঙ্, রঙ্‌পুর, রাঙা, রঙীন, আঙুল প্রভৃতি শব্দেও ঙ বর্ণের প্রকৃত ধ্বনি আছে। কোন প্রদেশে বা সমস্ত দেশে 'হয়' কে 'হঙ' লেখার ব্যবহার লক্ষ বৎসরের পুরাতন হইলেও তাহা অশুদ্ধ। ইহা যদি শুদ্ধ হয় তাহা হইলে 'আমি' স্থলে 'স্বামী' এবং 'মহেশ' স্থলে 'মহেষ'ও শুদ্ধ—তাহা হইলে অশুদ্ধ বানান বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না। একজন স্কচ্‌ম্যান এক হেডমাষ্টারকে লিখিয়াছিলেন I wish to inter my boy in your skull. এটাও তাহা হইলে শুদ্ধ বানান।

আমি প্রকৃত শুদ্ধাশুদ্ধ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি, স্থানবিশেষের উচ্চারণের পক্ষপাতী হইয়াছি. বিদ্যানিধি মহাশয় ইহা কেন ভাবিলেন তাহা বুঝিতে পারি না।

গেলে কোরে চোলে লিখিলে ধাতু চিনিতে পারা যায় না এই উক্তি আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। যদি সংস্কৃত ভূ ধাতু হইতে বভূব,

অস্ ধাতু হইতে ভবিষ্যতি, অভূৎ। ইংরেজী bring হইতে brought' fight হইতে fougut, বাংলা বলা ধাতু হইতে বোল, বুলি, খা হইতে খেয়ে, যা হইতে গিয়ে হইতে পারে তাহা হইলে উচ্চারণানুরূপ বানান চোলে, কোরে বোলে র ওকারে আপত্তি করিয়া একটা নূতন সৃষ্টি কমা দিবার প্রয়োজন কি তাহা বুঝিতে পারি না। সেই কমার যদি একটা বাংলা নাম থাকিত তাহা হইলেও হইত। বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন যে বোলে কোরে চলে বানানের সময় এখনও হয় নাই। আমি কিন্তু ষাট বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দু বিকাশ হইতেই উদ্ধৃত করিয়াছিলাম "প্রাণ জ্বোলতে হোলেই বোলতে হয়" ইত্যাদি।

আমি নিজেই যখন বলিয়াছি যে ঠাকুর্দা অথবা ঠাকদ্দা লেখাই ভাল ছিল, তখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করার বোধ হয় তেমন প্রয়োজন ছিল না। বিদ্যানিধি মহাশয় শুনিয়াছিলেন রেফের নিচে দ্বিরুক্ত দ অশুদ্ধ। আমি কেবল ইহার সূত্র জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি তাহার স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। এখন তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে রেফের নিচে দ্বিত্ব বর্ণ লেখা তাঁহার মতবিরুদ্ধ। আমার কিন্তু মত এই যে যখন আমরা দ্বিত্বরূপে উচ্চারণ করি তখন বানানও তদনুরূপ হওয়া উচিত। আমরা বলি কর্ত্তা, হিন্দুস্থানীরা বলেন কর্তা। এই শেষ কর্তার উচ্চারণ কেয়া কর্তা হ্যায় জী? এই প্রশ্ন মধ্যস্থ কর্তার মত। আমরা বলি ভর্ত্তা। হিন্দুস্থানীরা আহারের জন্য ভর্তা প্রস্তুত করেন। ভর্তা—ডাল, বেগুন, আলু প্রভৃতি যাহা প্রথমে ভাতে দিয়া বা পোড়াইয়া পরে তেল লবণ লঙ্কা মাখিয়া খাওয়া হয় তাহাকে ভর্তা বলে। পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোকজন কত্তা, দক্ষিণ বঙ্গের অশিক্ষিতেরাও কর্তা বলে। মধ্য বঙ্গে বলে কত্তা—অর্থাৎ রেফ হীন। বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে রেফের নিম্নস্থ ব্যঞ্জন মাত্রে দ্বিরুক্ত হয়। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন "কালক্রমে দ্বিত্ব উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে" এ কথাটা বোধ হয় ঠিক্ নহে। তবে ইহা ঠিক যে যে সকল বর্ণ দ্বিত্বরূপে লিখিতে আয়াস হয় সেগুলি এখন আর দ্বিত্বরূপে লেখা হয় না; যেমন তর্ক, মূর্খ, গর্গ ইত্যাদি। শর্ম্মা শব্দের ম দ্বিত্ব হয় কিন্তু বর্মার ম দ্বিত্ব হয় না। তেমনি ঠাকুর্মা শব্দের ম দ্বিত্ব হয় না। কিন্তু ঠাকুর্দ্দা সেরূপ নহে। ইহার দ দ্বিত্ব হয় যাহা আমরা চলিত ঠাকুদ্দা হইতে বুঝিতে পারি। সুতরাং ঠাকুর্দ্দা লেখায় এমন কি দোষ হইয়াছে।

একটা অবান্তর প্রশ্ন। আমরা বলি মাত্তে, ধত্তে, কত্তে। অথচ লিখি মারতে, ধরতে, করতে। কেন?

শতকে ৫০জন শিক্ষিত বাঙালী 30 এবং 40কে থার্টি এবং ফর্টি বলেন। কেন?

আজে বাজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা নিতান্তই আজে বাজে ছিল।

ভারতের পঞ্চকন্যা

রায় সাহেব শ্রীশ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়োঽপি হ শতং
বিজ্ঞানবতামেকো বলবানা কম্পয়তে।
বলেন দেব মনুষ্যা বলেন পশবশ্চ
বয়াংসি চ তৃণ বনস্পতয়ঃ। বলেন
লোকস্তিষ্ঠতি। ছাঃ উঃ ৮।১

তত্ত্বপিপাসুগণ প্রাপ্ত পদার্থের যথাদৃষ্ট অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সেই পদার্থের সত্য স্বরূপ কি তাহা জানিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানবিৎগণের আচরণ একটু পৃথক। ইঁহারা পদার্থের যথাদৃষ্ট ভাবটিকে লইয়া কার্য্যান্তরে প্রয়োগ জন্য, তাহার সাধ্যসাধন প্রক্রিয়া লইয়াই ব্যস্ত থাকেন ও তাহাতেই তাঁহারা কৃতকৃতার্থ মনে করেন। তত্ত্বপিপাসু ও বিজ্ঞান-পিপাসুগণের মধ্যে সংক্ষেপতঃ এই প্রভেদ। প্রথমটিকে প্রায় পাগল বলিয়া ধরা হয় এবং তিনি চলিত সংসারে নানারূপে লাঞ্ছিত ও দরিদ্রতার পীড়নে নিষ্পেষিত হয়েন; আর দ্বিতীয়টি সাংসারিক জীবনে অশেষ উপকারিতা দেখাইয়া চলিত সংসারে পরম আদরের সহিত গৃহীত ও পূজিত হয়েন। তাঁহার দরিদ্রতাও দূর হয়। তবে ফলতঃ দেখা যায় প্রথমোক্তের জ্ঞানটি আয়তনে সঙ্কীর্ণ হইলেও সেটি খাঁটি এবং তদ্দ্বারা তিনি সামঞ্জস্য করিতে সক্ষম। আর বৈজ্ঞানিক একের বাহুল্য প্রচারের ফলে, সমাজে মহা বিপ্লব বাধাইয়া তুলেন। তাঁহার ভূয়ো দর্শনের ফলে শত সহস্র অভাবের সৃষ্টি হয় এবং অভাব বাড়িলেই তাহার পূরণ জন্য ন্যায় বা অন্যায় যেরূপ হয় চেষ্টা করিতেই হয়।

আবার চিন্তা যতই বড় হউক, যদি তাহা অনুষ্ঠানের সহিত অন্বিত না হয়, তবে তথায় প্রকার-বহুলতা আসিতে বাধ্য। প্রকার-বহুলতা আসিলেই সমাজে নানা প্রকার উৎপাত আসিয়া পড়ে। ভারতের অবস্থা এক্ষণে ঠিক এইরূপই হইয়া পড়িয়াছে। কি ধর্ম্মে, কি সমাজে বা কি নৈতিক জীবনে সর্ব্বত্রই এই চিত্র পরিস্ফুট। একমাত্র ভগবানই জানেন, এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অভূতপূর্ব্ব সম্মিলনে কত দিনে ভারতের গভীর-তত্ত্বজ্ঞানের সহিত আবার অনুষ্ঠানের অন্বয় আনয়ন করিবেন।

উদ্ভিদ্ ও কৃষিবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে বীজ ভাল না হইলে অঙ্কুর ও তজ্জাত বৃক্ষ সতেজ হয় না। আবার বীজ বলবান হইলেও, শক্তিহীন ক্ষেত্রে তাহা সতেজে অঙ্কুরিত হয় না। সুতরাং একটি বলশালী বৃক্ষ লাভ করিতে হইলে, বীজ ও ক্ষেত্র উভয়ই শক্তিশালী হওয়া দরকার। যাঁহারা পশুপক্ষীর উৎপাদন ও ব্যবসা করেন তাঁহারাও জানেন যে পুংজাতি পশুটি বল ও স্বাস্থ্যবান হওয়া আগে দরকার; আবার স্ত্রীজাতি পশুটিও রুগ্ন হইলে চলে না। অধুনাতন কালের কৃষিবিদ্যা আফিসে ভাল বীজন, ভাল ষণ্ড প্রভৃতির সংগ্রহ

তাহার দৃষ্টান্ত। এখন মানুষও বঙ্গ-নারীর সহিত অপেক্ষাকৃত বলবান পাঞ্জাবী বা সিন্ধুদেশীয় পুরুষের সহিত সঙ্গত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। সর্ব্ব স্থলেই বীজনের বীর্য্যবত্তার দিকে প্রধান লক্ষ্য। এই বীর্য্যবত্তাকে ইংরেজী ভাষায় প্রি-পোটেন্সি (Pre-potency) বলা হয়। এই প্রি-পোটেন্সি তত্ত্বটি প্রাচীন হিন্দুগণ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই তত্ত্বজ্ঞানের অভিব্যক্তিই হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থে সারদাণ্ডায়ণীর স্বামীর আজ্ঞায় ব্রাহ্মণের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি; কল্মাষপাদের পত্নীর স্বামীর অনুজ্ঞায় বসিষ্ঠের দ্বারা অশ্মক নামক পুত্র লাভ; সত্যবতী ও ভীষ্মের নিয়োগে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পরাশর-পুত্র ব্যাসদেব দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর উৎপত্তি। এরূপ পুত্রোৎপাদন প্রাচীন গ্রন্থে বহুল দৃষ্ট হয়। বংশের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে শ্রেষ্ঠতর বীজ গ্রহণে সন্তানোৎপাদনের প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল। প্রি-পোটেন্সীর লোপ হওয়াতে কলিকালে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার একটি ভাল বীজন বাঁড় সংগ্রহ করিতে যত যত্ন ও চেষ্টা করিতে হয়, তৎকালেও একটি উত্তম বীর্য্য-সম্পন্ন পুরুষ লাভ করিতে বহু সাধ্যসাধনা করিতে হইত। ব্রাহ্মণের বীর্য্যই তখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন ব্রাহ্মণ পাওয়াও কঠিন ছিল। পাওয়া গেলেও তাঁহাকে অর্থ দিয়া ক্রয় করা যাইত না। ব্রাহ্মণ সহজে হয় না—অতি কঠিন তপস্যাদির ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইত। বিশ্বামিত্র তাহার দৃষ্টান্ত। ঋষ্যশৃঙ্গের ইতিহাসও এ বিষয়ে দেখা যাইতে পারে।

হিন্দুগণ প্রাতঃকালে কয়টি শ্লোক পাঠান্তে শয্যা ত্যাগ করেন। তাহার মধ্যে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা ও মন্দোদরীর নাম স্মরণ করিতে হয়। এই পাঁচজনকে পঞ্চকন্যা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকটি খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ না হইলেও কোন্ সময় যে ইহা প্রচলিত হইয়াছিল তাহার সময় নিরূপণ করা এখন অসম্ভব। তবে ইহা নিশ্চিত যে উহা কোন বালকের খেয়ালের ফল নহে। এই পাঁচজনেরই পুত্র হইয়াছিল; অথচ ইঁহারা কন্যা। কন্ ধাতু দীপ্ত্যর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই পঞ্চকন্যা স্ত্রীধর্ম্মে দীপ্তিশালিনী ছিলেন। অথচ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, অহল্যা ইন্দ্রগমনে পতিতা ও শাপগ্রস্তা; দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, কুন্তির ছয়টি স্বামী, তারা একবার সুগ্রীবের আবার বালীর মহিষী; মন্দোদরী রাবণ বধের পর বিভীষণের মহিষী। কাজেই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে যে ছোট একটি মাপকাটি আনিয়া এই পঞ্চকন্যাকে মাপিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের মুখ ছোট হইয়া যায়। বিধর্ম্মীগণ যখন এই সকল উপাখ্যান বলিয়া হিন্দু-সন্তানদের ঠাট্টা করেন—তখন বিজ্ঞানবিদ্গণ "তাই তো" "তাই তো" বলিয়া গালি-গালাজগুলি স্বচ্ছন্দে পকেটস্থ করেন ও স্থানত্যাগে সুখী হয়েন। কেহ কেহ বা তত্ত্বজ্ঞানের ভানে কাল্পনিক অর্থবাদে কৃত-কৃতার্থ বোধ করেন।

প্রোক্ত পঞ্চকন্যার মধ্যে অহল্যা তারা ও মন্দোদরী রামায়ণ যুগের এবং দ্রৌপদী ও কুন্তি মহাভারত যুগের কথা। কাজেই এই পঞ্চকন্যার তত্ত্ব-বোধ করিতে হইলে আমাদের ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের বিষয় আগে ভাবিতে হইবে। এ কালের মাপকাটি লইয়া এ তত্ত্ব মাপিতে গেলে ভুল হইয়া যাইবে এবং এইরূপ ভুল সচরাচর সর্ব্বত্রই হইতেছে ও হইতে থাকিবে। প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি দেখিতে পান যে আদি গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত বেদতত্ত্ব-পরিপূর্ণ। এবম্ভূত অমূল্য গ্রন্থদ্বয়, প্রক্ষেপের অত্যাচারে, আমরা এক্ষণে অতিশয় মলিনভাবে পাইতেছি। যে পদার্থ যত শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট, তাহার বিকারও ঠিক সেই পরিমাণে অধিক বা অল্প মন্দ, হইয়া পড়ে। এই দুই মহাগ্রন্থে যে কত কুচিত্র ও কুকথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে যাহা বেদ-তত্ত্ব বিরোধী তাহা কখনই হিন্দুধর্ম্মের কথা নহে। বেদতত্ত্ব জ্ঞানের অবতরণ প্রথার ফলে ঐরূপ প্রক্ষেপ সম্ভবপর হইয়াছে ও বোধ হয় এখনও সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচারে হইতেছে। ইহা কলি-কালের প্রভাব—শাস্ত্রকার তাহার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। নানা মতের পণ্ডিত নিজ সাম্প্রদায়িক ভাব পোষণের জন্য যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রক্ষেপ করিয়াছেন এবং টীকা টিপ্পনিতে বেদ-তত্ত্বকে ঘোর সঙ্কীর্ণতায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং প্রক্ষিপ্তাংশের পরিমাণ এত বেশি যে কোন্ অংশ আসল ও কোন্ অংশ নকল তাহার উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুগ্ধে এত জল পড়িয়াছে যে দুধের সন্ধান পাওয়া দুরূহ। তত্ত্বজ্ঞ সাধকরূপ হংস বিনা, জল ত্যাগে ক্ষীরোদ্ধার অপরের পক্ষে অসম্ভব। শাস্ত্রজ্ঞান কর্ম্মের সহিত অন্বিত না হওয়ায় যত গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে।

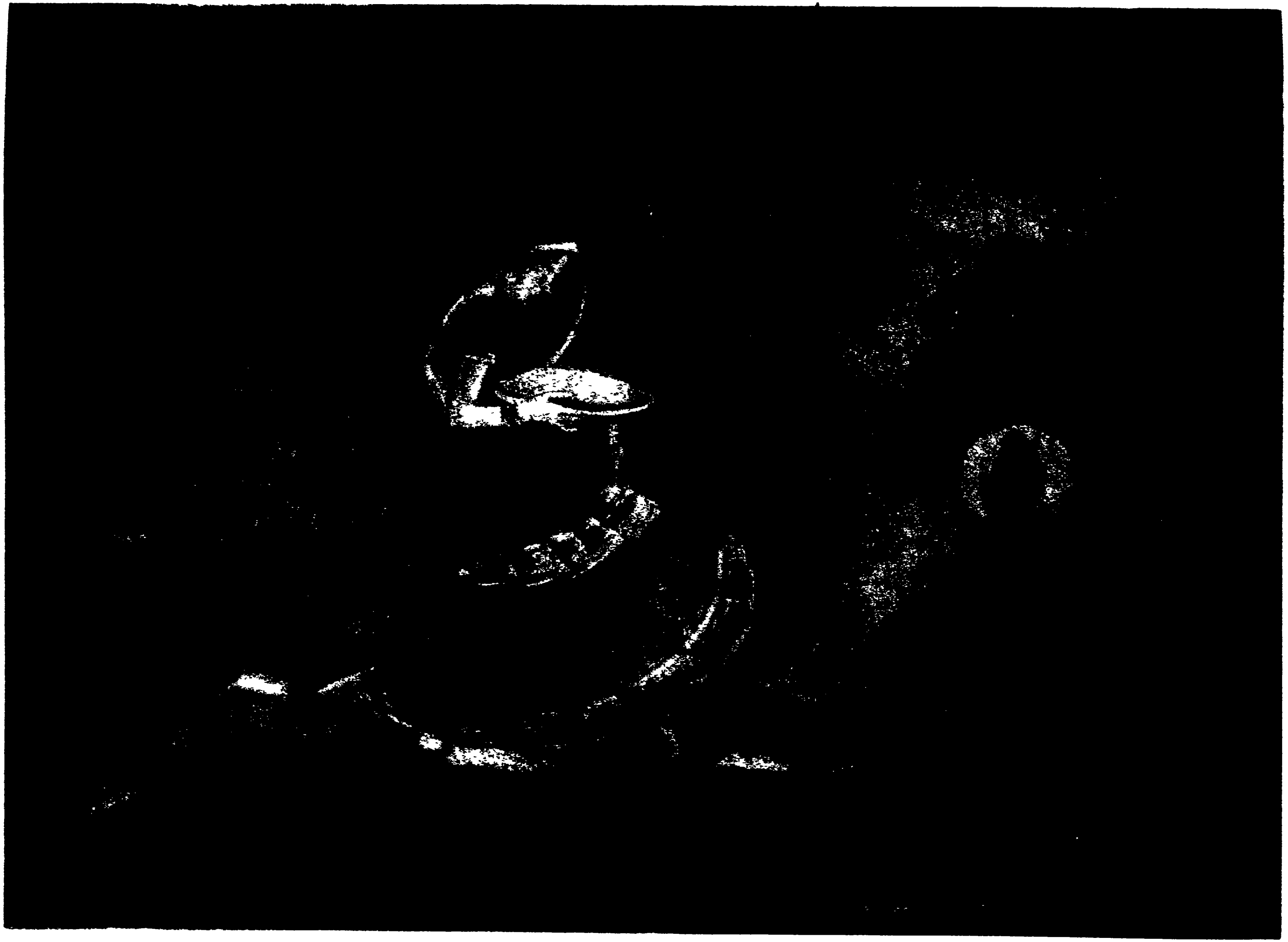
ত্রেতাযুগের প্রথমাবস্থায় ক্ষত্রিয় জাতি অত্যাচারী হওয়ায় পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল একবিংশতিবার নির্ম্মূল করেন। সেই নির্ম্মূলিত ক্ষত্রিয়কুল পুনঃস্থাপন উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় নারী ব্রাহ্মণের দ্বারা সন্তানোৎপাদনে উপদিষ্টা হয়েন। ফলে ক্ষত্রিয় জাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। ক্ষত্রিয় বিনা ব্রাহ্মণ রক্ষিত হয় না। ক্ষাত্র-শক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। এখনও মনুষ্যসমাজ যখন ধ্বংস হয় তখন অন্যের ক্ষেত্রে যে পুত্রোৎপাদন প্রথা প্রচলিত নাই তাহা নহে। বিগত জর্ম্মাণ যুদ্ধের ফলে ইয়োরোপে যে সামাজিক রীতি আইন করিয়া প্রচলিত করিতে হয় তাহা ইহার দৃষ্টান্ত। তবে সে সন্তানোৎপাদন ও পরশুরামের সময়কার সন্তানোৎপাদনে একটু তফাৎ আছে। সেখানে প্রি-পোটেন্সী দেখে ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানে যথেচ্ছাচার। ছেলে হইলেই হইল।

পর-দারাপহারী রাবণ ও তদনুচর রাক্ষসগণকে দণ্ড দিবার জন্য দেবতা ও ব্রাহ্মণগণ যখন অত্যন্ত ব্যাকুল—তখন দেবকার্য্য সাধন জন্য রামের অবতার। রামায়ণে এই রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস রৌদ্র, হাস্য ভয়ানক, করুণ, অদ্ভুত ও শান্ত এই নববিধ রসোদ্দীপক ঘটনাবলীর উল্লেখ থাকিলেও, এই গ্রন্থ প্রধানতঃ শৃঙ্গার ও করুণ রসাশ্রিত। শৃঙ্গারই আদি রস এবং ইহা সংযোগ ও বিপ্রলম্ভ এই দুই ভাগে বিভক্ত। সমগ্র রামায়ণে এই সংযোগ ও বিপ্রলম্ভের প্রাধান্য চিত্রিত। ক্রৌঞ্চ মিথুনের মিলন ও বিচ্ছেদই রামায়ণ গ্রন্থের মূল সূত্র। বেদোক্ত অর্দ্ধ পতিপত্নী রূপ প্রজাপতির দ্বিভাগের মূর্ত্ত রূপই এই "মা নিষাদ" শ্লোকটি ইহা বলিলেই হয়। অগ্নিসোমাত্মক যাবতীয় সৃষ্টিই ভোক্তা ও ভোক্তব্যের সম্বন্ধে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রকাশতা ম্যাটার ও

এনার্জি (matter and energy) লইয়াই জগৎ। অহল্যার উপাখ্যান সম্বন্ধে প্রচলিত রামায়ণে কি পাওয়া যাইতেছে তাহা এখন দেখা যাক্। গৌতম আশ্রম সম্বন্ধে পৃষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্র রামকে বলিতেছেন :—হে রামচন্দ্র! যে মহাত্মার কোপ প্রযুক্ত আশ্রমের এই অবস্থা ঘটিয়াছে' আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই স্থানে দেব-বাঞ্ছিত মহাত্মা গৌতমের আশ্রম ছিল, তখন ইহার সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না। তিনি এখানে অনেক দিন অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন সুযোগ পাইয়া সুর-রাজ ইন্দ্র গৌতম-বেশ ধারণ পূর্ব্বক অহল্যাকে এই কথা বলিলেন—"হে সুন্দরি! রতি-প্রার্থী জন ঋতুকালের প্রতীক্ষা করে না; অতএব তুমি আমার মনঃসাধ পূর্ণ কর।" দুর্বুদ্ধি অহল্যা স্বামী-বেশধারী শক্রকে জানিতে পারিয়াও তাহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রহৃষ্টমনে শচীপতিকে কহিলেন "আমি কৃতার্থ হইয়াছি। অতএব তুমি অবিলম্বে এথান হইতে চলিয়া যাও। হে দেবরাজ! তুমি আপনাকে ও আমাকে গুরুর শাপ হইতে রক্ষা কর।" তখন সহাস্য বদনে সুরেন্দ্র কহিলেন "হে নিতম্বিনি! আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আমি দেব-লোকে প্রস্থান করিলাম।" * * * সদাচারপরায়ণ মুনি, অসদাচারী ইন্দ্রকে নিজবেশ ধারণ করিয়া আশ্রম হইতে নিক্রান্ত হইতেছেন দেখিয়া সক্রোধে কহিলেন—

"রে দুর্ম্মতে! তুই যখন আমার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অকর্ত্তব্য কার্য্য আমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছিস্ তখন আমার শাপে তোর বৃষণ স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। * * * তদনন্তর অহল্যাকে কহিলেন—রে দুরাচারিণি! তোকে এই আশ্রমে অনেক কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে হইবে। রে দুঃশীলে! অন্য কথা কি কহিব তোকে অন্যের অদৃশ্যভাবে অনাহারে অবস্থিতি ও ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। যখন এই নিবিড় বনে দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের শুভাগমন ঘটিবে, তাঁহার পাদস্পর্শে তুই মুক্ত হইবি।" মহাতপা মহর্ষি গৌতম দুষ্টাচারিণী অহল্যাকে এই কথা বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ সংসেবিত রমণীয় হিমালয় শিখরে গমন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।" (বসুমতী অনূদিত রামায়ণ আদিকাণ্ড)। রামচন্দ্র তার পর বিশ্বামিত্রের সহিত অহল্যার উদ্দেশে গমন করিয়া দেখিলেন "তপস্যার তেজে গৌতমীর প্রভা অধিকতর প্রতিফলিত হইতেছে—মানুষের কথা দূরে থাকুক দেবদানবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় বিধাতা প্রযত্নাতিশয়ে এই মায়াময়ী মোহিনী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দীপ্তি ধূমপূর্ণ বহ্নিশিখা সদৃশ। * * গৌতমী শাপান্তে যেই রামচন্দ্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন—অমনি তিনি ত্রিলোকেরও দর্শনীয় হইলেন। তখন রাম লক্ষ্মণ হৃষ্টমনে অহল্যার চরণ বন্দনা করিলেন। গৌতমীও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া উঁহাদিগের সমুচিত সৎকার করিলেন। তখন দেবী অহল্যা বিধিকৃত কর্ম্মানুসারে রাম লক্ষ্মণকে পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। * * * তখন দেবগণ তপোবল-সম্পন্না পতিপরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাতপা গৌতমও গৌতমীর সহিত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিহিত বিধানে রামচন্দ্রের সংবর্দ্ধনা করতঃ পুনর্ব্বার তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন।" (বসু-রামা)। আবার উত্তর কাণ্ডে উক্ত রামায়ণেই দেখা যায় যে যখন ইন্দ্রজিৎ প্রজাপতির অনুরোধে ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দেন, তখন ইন্দ্রের অনুশোচনার উত্তরে প্রজাপতি বলিলেন যে তিনি প্রজা সৃষ্টির পর অনবদ্য এক স্ত্রী সৃজন করেন। সে স্ত্রীতে কোন নিন্দার বস্তু ছিল না। হল্য শব্দে নিন্দনীয় রূপ বুঝায়—সেই সৃষ্ট রমণী মূর্ত্তিতে কোন নিন্দা বা বিরূপতা ছিল না বলিয়া তাহার নাম অহল্যা রাখেন। ইন্দ্র সেই পরম সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া স্ব-পত্নী ভাবে চিন্তা করেন। প্রজাপতি সেই অহল্যাকে প্রথমে গৌতমের নিকট গচ্ছিত রাখেন। গৌতম বহু বৎসরান্তে সেই নারীকে আবার প্রজাপতির নিকট প্রত্যর্পণ করেন। তাহার পর গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃসিদ্ধি দেখিয়া সেই প্রজাপতিই আবার অহল্যাকে গৌতমের পত্নী করিয়া দেন। কিন্তু কামুক ইন্দ্র গৌতম আশ্রম গমন করেন। তথায় তিনি অহল্যাকে অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতে দেখেন। তবুও তাঁহার সতীধর্ম্ম হরণ করেন। গৌতম আসিয়া বলিলেন "লুপ্তবুদ্ধে! তুমি যে এই পাপের সৃষ্টি করিলে, তোমার দোষে নিঃসন্দেহ অদ্যাবধি নরলোকে এই পাপ প্রচলিত হইবে ইত্যাদি।" গৌতম অহল্যাকেও শাপ দিয়া বলিতেছেন—"দুর্বিনীতে! তোমার রূপ আশ্রমের নিকটেই নষ্ট হউক; তুমি রূপ-যৌবন সম্পন্না—কিন্তু তোমার মন অস্থির। সুতরাং জগতে তুমিই আর রূপবতী থাকিবে না। সকল সৃষ্ট পদার্থই তোমার রূপের অংশভাগী হইবে।" * * * অহল্যা উত্তর দিলেন "ব্রহ্মণ! দেবরাজ আপনার আকৃতি ধারণ করিয়া আমার সতীধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং আমি অজ্ঞানকৃত পাপ করিয়াছি। ইচ্ছা বশতঃ নহে। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।" তদুত্তরে গৌতম রামাবতারের কথা বলিয়া রামের দর্শনে অহল্যার উদ্ধার, এ কথা বলিলেন। আরও বলিলেন সেই উদ্ধারের পর অহল্যা তাঁহার সহবাস করিতে পারিবে। ব্রহ্মবাদী পত্নী অহল্যাও সুমহৎ তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। ইহার পর যে সকল কথা আছে তাহাতে বৈষ্ণব যজ্ঞে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ বৈষ্ণব পণ্ডিতের সাম্প্রদায়িকতার প্রচার মাত্র। রামায়ণের অন্য পুস্তকে অহল্যার কথা সংক্ষেপে বালকাণ্ডে এইরূপ বর্ণিত আছে :—গৌতম অহল্যার সহিত সেই বনে বহু বৎসর বাস করেন ও তপস্যা করেন। পঞ্চশরে অভিভূত দেবরাজ গৌতম বেশে একদা সুযোগ পাইয়া অহল্যাকে বলিলেন, "যদিও ঋতুকাল অপেক্ষা করা আমাদের উচিত, কিন্তু আমি অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।" তার পর যাহা ঘটিল তাহা প্রায় বসুমতীর অনূদিত ভাবই ব্যক্ত করে—কেবল রামের পাদস্পর্শে অহল্যার উদ্ধারের কথা নাই। রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র সেই বনে প্রবেশ করিয়াই মূর্ত্ত অহল্যাকে দেখিতে পান ও তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। এই রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অহল্যার কথা নাই। তথায় তৎপরিবর্ত্তে ভৃগুকন্যা অজার কথা আছে। দণ্ডরাজ ও অজার আখ্যান প্রায় অহল্যা ও ইন্দ্র আখ্যানের ভাবে নিহিত। অগস্ত্য দণ্ডকারণ্য নামের উৎপত্তি বলিতে গিয়া এই অজার উপাখ্যান রামকে শুনান্।

রামায়ণের মূল নারদ ও বাল্মীকি সংবাদে অহল্যার কথা একেবারে নাই।



গোপন চারিণী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল ভৌমিক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বাল্মীকির শ্লোক-জাত অধ্যায়েও অহল্যার কথা নাই। তবে বিশ্বামিত্রের সহিত রামের বিচিত্র কথার উল্লেখ আছে। এই বিচিত্র কথার মধ্যেই অন্যতম অহল্যার উপাখ্যান। কাজেই এই অহল্যার উপাখ্যান আদিম রামায়ণে ছিল কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ এই "বিচিত্র কথা বাদ" ও উত্তরকাণ্ড প্রক্ষেপের যথেষ্ট অবসর দিয়াছে। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই এই দুইস্থলে অবাধে জুড়িয়া দিতে পারিয়াছেন। রামায়ণের প্রত্যেক অনুবাদক নানাপ্রকার রামায়ণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে আদিম রামায়ণ যে কি ছিল তাহা বলা যায় না। স্বর্গগত ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রচারে কৃতকর্ম্মা ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তল্লিখিত ভূমিকায় এক স্থানে বলিয়াছেন—"এতদ্দেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভাষাকারে ছন্দোবন্ধে বিরচিত এবং তাহাই দেশবাসী সাধারণ লোকের রামায়ণ-পাঠপিপাসা চরিতার্থ করিতেছে। সত্য বটে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহুল প্রচারে আমাদের সমাজ অনেক পরিমাণে কৃতজ্ঞ ও ঋণী; কিন্তু তাহা বাল্মীকির মূল দর্শনে অনুবাদিত না হওয়ায় অনেক স্থানে সর্ব্বনাশ দাঁড়াইয়াছে। আমরা যে কৃত্তিবাসের শক্তি বা কবিত্বের পক্ষপাতী নহি, এ কথা নহে; কিন্তু "সাত নকলে আসল খণ্ড" এই যে এক কথা আছে—ইহার অবস্থাও তাহাই দাঁড়াইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের নাম করিয়া অনেকস্থলে অধ্যাত্ম রামায়ণের মত এবং স্থল বিশেষে তাহাকেও পরাস্ত করিয়া নূতন কথা ও নূতন কাণ্ড সংযোজিত করা হইয়াছে। * * * বোধ করি কথক ব্যবসায়ী মহাপ্রভুরা উৎকট কল্পনাকে আরাধনা করিয়া লোকের মনোরঞ্জনানুরোধে মূলকে নির্ম্মূল করতঃ ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবেন। * * * যেরূপ যোজনান্তে ভাষার ভিন্নতা, সেইরূপ "একোঽহং বহুস্যাম্" এই শ্রুতির সম্মাননার জন্য নানা-দেশে নানা বাল্মীকির আবির্ভাব।" আমরা এই প্রবন্ধে যে অংশগুলি উদ্ধার করিয়াছি পাঠকগণ তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিবেন। পাদস্পর্শে অহল্যার উদ্ধারের কথা আদিকাণ্ডের প্রথমাংশে আছে; অর্থাৎ শাপের কথায় আছে। কিন্তু রামচন্দ্র সেই বনে গমন করিলে যে তাঁহার পাদস্পর্শে অহল্যার উদ্ধার হইল সে কথা নাই। পরন্তু রাম-লক্ষ্মণ অহল্যার চরণ বন্দনা করিলেন, এ কথা আছে। আবার শাপাংশে অহল্যা অদৃশ্য হইয়া থাকিবে এই আছে। পাষাণ হইয়া থাকিলে অদৃশ্য কেমন করে হয় তাহা বুঝিতে আসে না। ঋষি-পত্নীকে রাম কখনই পদাঘাত করিতে পারেন না। রামের এরূপ চরিত্র রামায়ণের কুত্রাপি নাই। রামায়ণকার রামকে কোন স্থানে অলৌকিক দৈবশক্তি দেন নাই। কাজেই পাদস্পর্শে অহল্যার উদ্ধার রামভক্ত ব্রাহ্মণেতর কোন পণ্ডিত মহাশয়ের কীর্ত্তি। আবার উত্তর কাণ্ডের অংশে পাদস্পর্শের কথাই নাই। বৈষ্ণব যজ্ঞে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি আছে। অন্য রামায়ণে পাদস্পর্শের কথা একেবারেই নাই। অহল্যার রূপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইল এই কথাই আছে। রূপ নষ্ট হইলেই পাষাণ হয় না। এবং সূক্ষ্ম শরীরে পাদস্পর্শ সম্ভবে না।

অহল্যা সুন্দরী ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। গৌতমের বেশে ঋতুকালের অপেক্ষা না করিয়া অহল্যা গমন করেন। এক স্থলে বলা হইয়াছে যে অহল্যা গৌতমবেশী ইন্দ্র ইহা জানিয়াও রতিদান করেন এবং শুধু তাহা নয় তিনিই আগে বলেন তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন এবং ইন্দ্রকে বলিলেন "চলে যাও, চলে যাও, গৌতম এসে শাপ দিবে।" অন্যত্র আছে, যে ইন্দ্রই দোষী; কেন না, অহল্যার সতীধর্ম্ম তিনি হরণ করেন। এখানে অহল্যার জ্ঞানকৃত পাপের কথা নাই। অহল্যা তাই বলিয়া গৌতমের নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন। এইরূপ সমস্ত বিবদমান আখ্যানের ভিতর ঋতুকাল ভিন্ন যে স্ত্রী সহবাস করা ঘোর পাপ, এই কথাটি সর্ব্বত্র একভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এইটি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একটি প্রধান ধর্ম্মতত্ত্ব। তার পর ইন্দ্র অহল্যাকে অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তিশীলা দর্শন করেন। অহল্যা গৌতমের ব্রহ্মবাদিনী পত্নী; অহল্যার প্রতি দেব-দানবগণ দৃষ্টিপাত করিতে পারে না—তাঁর এত তেজ; তাঁহার দীপ্তি ধূমপূর্ণ বহ্নিশিখা; তিনি পতি-পরায়ণা, এবং দেবগণ তাঁহার পূজা করেন। এযস্তুতা অহল্যার ইন্দ্রজার বৃত্তান্তটি একেবারে খাপছাড়া হইয়া পড়ে। কিন্তু কথক ঠাকুরদের কারিগরি বাদ দিয়া, মাপকাটিটি ত্রেতার মতে আরোপ করিলে কি তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহাই একবার দেখা যাক।

ঋগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্রকে ব্রহ্মের স্থানে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রই সর্ব্বপদার্থের মূল এইভাবে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তাঁহার স্তবনা করিয়া-ছেন। বেদের সহিত মিলাইয়া পড়িলেই রামায়ণের ইতিহাস ও পুরাণ অংশের উদ্ভব-স্থল বেশ সুন্দর ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার রামায়ণ ও মহাভারত মিলাইয়া পড়িলে মহাভারত যে সমূহ পরিমাণে রামায়ণের নিকট ঋণী তাহা বেশ দেখা যায়। এমন কি স্থানে স্থানে রামায়ণের অবিকল শ্লোকগুলি মহাভারতে উদ্ধৃত। সে বিষয় এখানে আলোচ্য নহে। ইহা এত বড় জিনিষ যে বিজাতীয় সত্যপ্রিয় পণ্ডিতগণও তাহা অনুভব করিয়াছেন। (ক) কিন্তু আমরা শাস্ত্রের নূতন টীকা লিখিতেই ব্যস্ত! নূতন কিছু নাই, সব ফুরাইয়া গিয়াছে। পুরাণ সন্দেশে পচা ক্ষীর মিশাতে গেলেই সেটা অখাদ্য হইয়া উঠে।

(ক) বিদেশী লেখক বলিয়াছেন:—That Brahmins unknown to fame have re-modelled some of the Hindoo Scriptures and especially *Puranas* cannot reasonably be contested after dispassionately weighing the strong internal evidence, which all of them afford, of the intermixture of un-authorised and comparatively modern ingredients. But the same internal evidence furnishes proof equally decisive of the anterior existence of ancient materials. * * * The publications available now re worse than useless except in the han s of those who can distinguish the pure metal from the alloy.

A sound and comprehensive survey of the Hindoo system is wanting—A comparative analysis of the religion can only elucidate an important chapter in the history of the human race. * (Wilson) অর্থাৎ অ-প্রতিষ্ঠাবান কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থের বিশেষতঃ পুরাণগুলির নূতন রূপে গঠন করিয়াছেন। গ্রন্থগুলির অভ্যন্তরীণ প্রমাণ

ঋগ্বেদ-সংহিতা বলিতেছেন :—

সোমা পূষণা জননারয়ীণাং জননাদিকে জননা পৃথিব্যাঃ
জাতৌ বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ দেবী অকৃণ্বমৃতস্য নাভিম্॥
ইমৌ দেবৌ জায়মানৌ জুষন্তেমৌ তমাংসি গূহতামজুষ্টা
আভ্যামিন্দ্রঃ পক্ক মালাস্বন্তঃ সোমাপূষভ্যাং জনদুগ্রিয়াসু॥ ২।৪০

প্রাণের এক অংশ অগ্নি, তেজ, সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি রূপে ও অপরাংশ সোম জল, পৃথিবী, অন্ন প্রভৃতি রূপে কার্য্য করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে। এই এনার্জি ও ম্যাটারের মিথুনত্ব সম্পাদিত না হইলে কোন সৃষ্টি হয় না। এই তেজ বা অগ্নিই ইন্দ্র। আর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ এই অগ্নির মিথুন বা ভোক্তব্য জিনিষ। রসায়ন কার্য্য বিনা সৃষ্টি নাই; কাজেই ভোক্তা ও ভোগ্যকে পৃথক করিলে সৃষ্টি হয় না। ইন্দ্র তাই সর্ব্বদা পারদারিক। এই ভোক্তা ও ভোগ্য তত্ত্ব লইয়াই বেদে প্রবেশহীন জনগণের ধর্ম্মজ্ঞানের বিষম ব্যাঘাত ঘটে। কত প্রকার কুৎসিত ধর্ম্মবাদ যে এই বেদে জ্ঞান নব্য ভারতে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। (খ)

স ঘানো-যোগ আভুবৎ স রায়ে স পুরংধ্যাম্।
গমদ্বাজে-ভিরা সনঃ। ১।২।৩

পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব আমাদের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি বিষয়ে একমাত্র কারণ হউন। সেই তেজোরূপ চিত্রভানো ইন্দ্র আমাদের ধর্ম্মার্থদ হউন। সেই ইন্দ্র আমাদের স্ত্রীতে বর্ত্তুন। সেই ইন্দ্র আমাদের ধন পুত্রাদিকে প্রাপ্ত করুন। এই ইন্দ্র আবার কেমন না, "অক্ষিতোতিঃ" (ক্ষয়হীন রক্ষণশীল), সূর্য্যরূপে স্বর্গে—অহিংসক অগ্নিরূপে পৃথিবীতে এবং সর্ব্বত্র বায়ুরূপে অবস্থিত। ইনি পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত। (যুঞ্জন্তি ব্রধ্নং অরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ ১।২।১) আবার ঋষি অগ্নিরূপী ইন্দ্রকে বলিতেছেন "তান্ যজত্রান্ ঋতাবৃধঃ অগ্নে পত্নীবতঃ কৃধি।" হে অগ্নে! তুমি সকল দেবগণকে স্ব স্ব পত্নীর সহিত একত্রিত কর। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন—এই প্রাণই ইন্দ্রিয়াদির সহিত ঋষিপদবাচ্য। প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ। বাক্য ও প্রাণের সম্মিলন বা মিথুনত্ব প্রণব বা বেদ দ্বারা উৎপন্ন হয়। কর্ণদ্বয়ই গৌতম ও ভরদ্বাজ ঋষি। কর্ণই বাক্যের একমাত্র মূর্ত্ত ইন্দ্রিয়। গৌতম দক্ষিণ কর্ণ। মূর্ত্তরূপে অমূর্ত্ত এই নিগূঢ়-বেদতত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য বেদতত্ত্বজ্ঞ বাল্মীকি রামায়ণ গ্রন্থে গ্রথিত করিয়া থাকিবেন। কেন না, ত্রেতায় বা দ্বাপরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল; তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজ জাতি ভিন্ন অন্যের বেদে প্রবেশ অধিকার ছিল না। অথচ বিশ্বপ্রেমে স্বার্থহারা ঋষিদের স্ত্রী-শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। "স্ত্রী-শূদ্রয়োস্তু সত্যামপি জ্ঞানেপেক্ষায়াং উপনয়নাভাবে নাধ্যয়নরাহিত্যাৎ বেদেঽধিকারঃ প্রতিষিদ্ধঃ। ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানং তু পুরাণাদি মুখেন উৎপদ্যতে। (সায়ণ) আবার ব্রহ্মজ্ঞানটিও সকলের নিত্য বিচারমধ্যে ছিল না। পরমহংসাবস্থায় উপনীত দ্বিজগণেরই এই ব্রহ্মজ্ঞান বিচার নিত্য ধর্ম্ম ছিল। ব্রহ্মজ্ঞানই জীবের চরম লক্ষ্য। ব্রহ্ম ভোক্তা সৃষ্টি ভোগ্য। কাজেই বেদে মুক্তরূপ অদ্ভুত জীবগুলির কথা থাকিতে পারে না।

রামায়ণের পাঠভেদে আমরা পাইয়াছি যে প্রজাপতি অনবদ্যা অহল্যার সৃজন করিয়া কন্যাবস্থায় বহুকাল তাহাকে গৌতমের নিকট গচ্ছিত রাখেন। গৌতমের ধৈর্য্য ও তপস্যার পরীক্ষা শেষ হইলে অহল্যার সহিত গৌতমের বিবাহ দেন। ত্রেতাযুগে বা দ্বাপরে যে সময় বেদ-প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ছিল, তখন ব্রাহ্মণ হইতে হইলেই অগ্নিহোত্রী হইতে হইত। পত্নী বিনা অগ্নিহোত্রী হওয়া যায় না। ইন্দ্র বা ব্রহ্মই পরম ঐশ্বর্য্যবান। গৌতম ও অহল্যা ইন্দ্ররূপী অগ্নির সেবা করিতেন। অগ্নিহোত্রীর ঋতুকাল ব্যতীত দারোপগমন নিষিদ্ধ। বোধ হয় গৌতম সেই বিধি লঙ্ঘন করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়েন। এই প্রায়শ্চিত্ত জন্যই পতি ও পত্নীতে পৃথক হইতে বাধ্য হয়েন। তাই আমরা পাই যে গৌতম ও অহল্যা উভয়েই তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই উপাখ্যান হইতে আমরা সমাজতত্ত্বের কি কি পাই তাহা দেখা যাইতেছে।

১। ধৈর্য্যশীল বা ইন্দ্রিয়জয়ী গৌতমের নিকট অনবদ্যা কামিনীরও স্বধর্ম্মচ্যুতির ভয় ছিল না।

২। বিবাহ-বন্ধন না হওয়া পর্য্যন্ত গৌতম অহল্যাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করেন নাই।

৩। বিবাহের পর পতিপত্নীতে অগ্নির সেবা করিয়া অগ্নিসদৃশ দীপ্তিমান হয়েন।

দ্বারাই ইহা অনিবার্য্য ভাবে বুঝা যায়। তাহাতে কত যে প্রক্ষেপ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। তেমনি অভ্যন্তরীণ প্রমাণে ইহাও দেখা যায় যে শাস্ত্রের প্রাচীন তত্ত্বগুলিও ছিল। তবে আমরা প্রচলিত যে সকল পাঠ পাই তাহা একবারে পরিত্যজ্য। যাঁহারা মূল আদিম তত্ত্ব হইতে প্রক্ষেপ অংশকে বাছিয়া ফেলিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট ভিন্ন প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের কোন মূল্য নাই। সমস্ত ধর্ম্মের আমূল তত্ত্বানুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলে মনুষ্যজাতির একটা নূতন অধ্যায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) It has heen observed with reference to heat (অগ্নি, তেজ,) thus viewed, that it would be as correct to say, that heat is absorbed, or cold produced by motion, as that heat is produced by it. * This difficulty ceases when the mind has been accustomed to regard heat and cold as themselves motion, i. e., as correlative expansions and contractions, each being evidenced by relation and being inconceivable as abstraction ' Corr-datm of Physical forces)

অর্থাৎ উত্তাপ চলিয়া গেলে শৈত্য আইসে, সেইরূপ শৈত্যের অপসরণে উত্তাপ দেখা যায়। দুইই গতিশীলতার তারতম্যে উৎপন্ন হয়। কাজেই সব গণ্ডগোল চুকে যায় যদি আমরা বুঝিতে পারি যে অগ্নি ও সোম—তেজ ও শৈত্য এই উভয়ই গতিশীলতা মাত্র। তেজ ও শৈত্য অচ্ছেদ্য।

অগ্নী ষোমৌ মিথঃ কার্য্য কারণে চ ব্যবস্থিতে। পর্য্যায়েণ সমং চেতৌ প্রক্ষীয়তে পরস্পরং॥) যাগবাশিষ্ঠ) বায়ুরূপ আত্মশক্তি হইতে সোম, সোম হইতে তেজ ও তেজ হইতে সোম এইরূপ পরস্পরের উৎপাদন কষ্টে সম্পাদিত হয়।

৪। অগ্নিরূপী ইন্দ্র অহল্যার অভ্যন্তরে শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে ধূমপূর্ণ অগ্নিশিখাসদৃশ করিয়া তুলেন।

৫। তপস্যার ক্রমোন্নতির ব্যাঘাতক অসময়ে পত্নীগমনে দম্পতি-যুগ্মের উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটে।

৬। পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত হইবার জন্য উভয়ে পৃথক্ থাকিয়া তপস্যায় নিরত হয়েন। এবং সুপ্ত ধৈর্য্য ফিরিলে আবার একত্রিত হয়েন ও অগ্নির সেবা করিয়াছিলেন।

৭। যথাসময়ে দম্পতির বংশরক্ষা হইয়াছিল।

৮। রমণীজাতি সর্ব্বদাই চঞ্চলচিত্ত। এবং পতিব্রতা নারী পতির আদেশে অসময়েও নিজ শরীর দান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। পতির ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা—পত্নীর কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই।

৯। চঞ্চল-চিত্তা ব্রাহ্মণ-পত্নীর যদি পদ-স্খলন হইবার সম্ভাবনা ঘটে তবে যেন তাহা বিশুদ্ধ-বীর্য্য-সম্পন্ন উত্তম পুরুষের সঙ্গেই হয়।

১০। ব্রাহ্মণের উপর উত্তম-পুরুষ অন্য কেহ নাই। কাজেই দেবতাই যেন লক্ষ্য হয়। গৌণভাবে পরপুরুষ সঙ্গবন্ধও হইল কেন না দেবতার শরীর মোটা নহে।

এতগুলি গুরুতর সমাজতত্ত্বের পরিবর্ত্তে প্রচলিত অহল্যার উপাখ্যানে আমরা পাইয়াছি কি না, অহল্যা কুলটা এবং দেবেন্দ্র পারদারিক। কাজেই পরদার গ্রহণে ত্রেতায় অনুমোদন ছিল। কি মানসিক অধঃপতন!! অহল্যার উপাখ্যানের যে প্রধানতম শাসনবিধি ঋতুকাল ভিন্ন অগ্নিহোত্র সাধকের পত্নীগমন নিষিদ্ধ তাহা একবারে ডুবিয়া গেল। যাবেই—কেন না, সেটা এখন হিন্দুর স্বপ্নের মধ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয়-জিতের নিকট অনবদ্যা পরনারীও যে নির্ভয়া, তাহা ডুবাইয়া না দিলে পারদারিকদের সুবিধা হয় না। বিবাহ-বন্ধন যে বিশুদ্ধ সমাজের মূল তাহা উড়াইয়া না দিলে যে উচ্ছৃঙ্খলতার জয় হয় না। পত্নী গ্রহণ বিনা যে হিন্দুর কোন ধর্ম্মাচরণ ঘটে না এ তত্ত্ব মুছিয়া না দিলে যে মুণ্ড সন্ন্যাসীদলের প্রভাব বিস্তারে সুবিধা হয় না। নিজ পত্নীতে পুত্রোৎপাদন যে হিন্দুধর্ম্মের প্রথম সূত্র তাহা না ভুলিলে যে বিভূ, প্রভু, স্বামী প্রভৃতি হওয়া যায় না। পত্নী যে চিরদিন পতির অঙ্কশায়িনী ও অপৃথক সত্তা এ কথা প্রচার থাকিলে যে অবশীকৃতাস্ত্রিয়ের যথেচ্ছাচার প্রচলনের সুবিধা হয় না। প্রবন্ধের শিরোদেশোক্ত শ্রুতিবাক্যের লক্ষ্য যে বংশবিস্তারে বলের উন্নতি—তাহা, পতিপত্নী বিনা পুরুষাংশ যে নীরস ও শুষ্ক এই বেদবাক্য এবং অগ্নিহোত্র ছাড়া যে ব্রাহ্মণত্বলাভ হয় না প্রধানতঃ এই কয়টি কথা মনে রাখিয়া আদিরস যে শৃঙ্গার তাহার পরিশুদ্ধ ব্যবহার করতঃ পাঠক মহোদয়গণ একটি উপাখ্যান রচনা করিয়া এই অধমকে উপহার দিলে কৃতকৃতার্থ হইবে। আমি করযোড়ে নিবেদন করি তাঁহারা চেষ্টা করুন। তার পরে অহল্যার ইন্দ্রজারের কথার গভীরতত্ত্ব আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইবে আশা করা যাইতে পারে। বাল্মীকির কথা ছাড়িয়া দিউন। যদিই বা অহল্যা উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হয় তবুও ইহাতে সত্য কিছু আছে কি না তাহা দেখিবার বোধ হয় ইহাই সমীচীন পথ।

আদিকবি বা অন্য যে কেহ ইন্দ্রকে অহল্যাজার না করিলেও ত পারিতেন। কিন্তু তাহা তখন মাথায় ঢুকে নাই। কেন না ইন্দ্রই পরম-তত্ত্ব। ব্রাহ্মণপত্নীর ইতর জার হইতে পারে এ কথা তৎকালিক সমাজের ধারণার বাহিরে ছিল। ভীষ্ম সত্যবতীকে ঠিক এই ভাবের উপদেশ দিয়াই ব্রাহ্মণের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। ভূদেব ব্রাহ্মণের পত্নীতে শৃঙ্গার রসের কথা যুড়িতে গেলে—সুরপুরেশ্বর ইন্দ্রকেই আনিতে হয়। ইন্দ্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভের জন্যই যজ্ঞ। অবশ্য এটা এখন কেহ বিশ্বাস করেন না যে ইন্দ্রটি শরীর নিয়ে অহল্যাগমন করিতে পৃথিবীতে নামিয়া আসেন নাই। ইন্দ্রের তেজোময় তনু অনুপ্রবিষ্ট করিয়া অধিকতর প্রোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যদি পাঠকগণের মধ্যে কেহ অগ্নিহোত্রী থাকেন—বা কোন নিষ্ঠাবান অগ্নিহোত্রীর সাহচর্য্যে আসিয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয় জানেন—ইন্দ্র এখনও জার ভাবে অগ্নিহোত্রীদম্পতিকে উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। অগ্নিহোত্রীর পত্নী উপনীতা হয়েন—তিনি নারায়ণশিলা স্পর্শ করিতে অধিকারিণী।

কন্যা মানেই অল্প সন্তানা ও অল্প পুংসঙ্গা। উত্তম অগ্নিহোত্রী একটি মাত্র পুত্র হইলেই পত্নী-সহবাস পরিত্যাগ করেন। অহল্যার সাতগণ্ডা সন্তান হয় নাই। পরপুরুষ গমন তাঁহাতে সম্ভাব ছিল না। মলিন বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্ববোধ চেষ্টা করিলে মলিন-জ্ঞানই উদ্ভূত হয়। পরদারাপহারীর দণ্ড ও বিনাশ জন্যই রামাবতার—পরন্তু কুলটা অহল্যার উদ্ধার জন্য নহে। কাজেই কৃত্তিবাস ও কথকগণ-কথিত অহল্যা উপাখ্যান সমস্ত রামায়ণ-তত্ত্বের বিরোধী—সুতরাং একান্ত অগ্রাহ্য। কুলটা অহল্যা কখনই রামের চক্ষে প্রদীপ্ততেজা বলিয়া প্রতীয়মানা হইতে পারিতেন না। রামচন্দ্রও সেরূপ নারীর পাদবন্দনা করিতেন না এবং দেবগণও প্রফুল্লিত হইতেন না। বেদার্থবিদ্‌গণের নিকট অহল্যা নারীরত্ন ও কন্যা। আর ত্রেতার সমাজে আদিকবির এই সামাজিক শাসন অতি আদরেই গৃহীত হইয়া থাকে।

অহল্যার মূল তত্ত্বই তারা ও মন্দোদরীতে আরোপিত। তারা সুগ্রীবের পত্নী। কিন্তু সুগ্রীবের ঔরসে তারার গর্ভে কোন সন্তান হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। কিন্তু সেই তারার গর্ভে বালীর ঔরসে একটিমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। বানরের মধ্যেও কবি বেদ-তত্ত্বের প্রচার করিতে প্রচেষ্ট। শৃঙ্গার রসের ছড়াছড়ি থাকিলেও তারার গর্ভে পাল পাল বানর হয় নাই। সুগ্রীব বানরের মধ্যে পরম ধার্ম্মিক। তারা পরে সুগ্রীবের মহিষী হয়েন কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্তান হয় নাই। এসব গূঢ় বেদ-তত্ত্ব প্রচারে পাশবিক বৃত্তির মাপকাটি চলে না। ইহা মিলন ও বিপ্রলম্ভের কথা মাত্র। মন্দোদরীর বিষয়ও তারার মত। ইন্দ্রজিৎই একটি পুত্র, অথচ রাবণ কাম-পরবশ। বিভীষণের ঔরসে মন্দোদরীর সন্তান হয় নাই। তারা ও মন্দোদরী তাই কন্যা। সুগ্রীব সূর্য্যতনয় সূর্য্য সদৃশ; বালী ইন্দ্রতনয় ইন্দ্র-সদৃশ। তারা বরুণ-পুত্র সুষেণের কন্যা। রাবণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-পুত্র ও প্রজাপতি পুলস্ত্যের পৌত্র। মন্দোদরী ময়দেবতার কন্যা। সবই দেবতা সদৃশ। দেবতা প্রত্যেকটিকা শক্তিসম্পন্ন। তাহাদের দ্বারা কুৎসিত সমাজচিত্র অঙ্কিত হয় না। রাবণ রাক্ষসাধম হইলেও তাহার দেবত্ব ছিল। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবাসুর বর্ত্তমান ও উভয়ে বিরোধ চলিতেছে। আবার দেবতাগণ নিজ পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিতে অক্ষম ইহা রামায়ণেই উমা-বাক্যে লিপিবদ্ধ আছে। -ত্রিপোটেন্‌সী তত্ত্বের কি সামঞ্জস্য পূর্ণ ইতিবৃত্ত—দেখিলেও মুগ্ধ হইতে হয়।

দ্রৌপদী অগ্নিসম্ভূতা। ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার ইঁহার পঞ্চ স্বামী। পঞ্চ দেবতার অমূর্ত্ত রূপই মূর্ত্তরূপে পঞ্চ পাণ্ডব। আবার পঞ্চ তত্ত্বই—একতত্ত্ব হিরণ্য গর্ভ প্রজাপতি। সেই প্রজাপতির প্রথম শক্তিই অর্ক বা অগ্নি। কাজেই ধার করে আনা ছোট মাপকাটিটা ফেলিয়া দিলেই মহাভারতের মহান সমাজ-তত্ত্ব বুঝা যাইবে। পাঁচ স্বামীর পাঁচটি মাত্র পুত্র। পাঁচ পাঁচে পঁচিশটি নয়। দ্রৌপদী অল্প সন্তানা অল্প পুংসঙ্গাও বটেন। তিনি কন্যা। কুন্তি মহাধার্ম্মিক ভোজের কন্যা। বংশ রক্ষার জন্য দেবতাদের দ্বারা পুত্রোৎপাদন করেন। নিগূঢ় বেদ-তত্ত্ব মূর্ত্তভাবে প্রচারিত করাই প্রাচীন গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বেদানুগ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে গার্হস্থ্য জীবন ও সন্তানোৎপাদন একটি অপরিত্যাজ্য অঙ্গ। তাই অহল্যা প্রভৃতিকে ব্রহ্মচারিণী অপ্রসূতি কুমারী রূপে অঙ্কিত করা হয় নাই। সেটা অতি সহজেই করা যাইত—কিন্তু বেদানুগ হইত না বলিয়া তাহা গ্রহণীয় হয় নাই। বাল্মীকি ও ব্যাসের ভুল হইয়া থাকিবে।

বীজের আদর থাকিলে ভাল বীজ যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা আপনিই সমাজে আসিয়া পড়ে। পরিশুদ্ধ বীজে বিশুদ্ধ বংশের বিস্তার হয়। ভাল বীজে ভাল বাগান হয়। বাগানের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই রামায়ণ ও মহাভারত।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

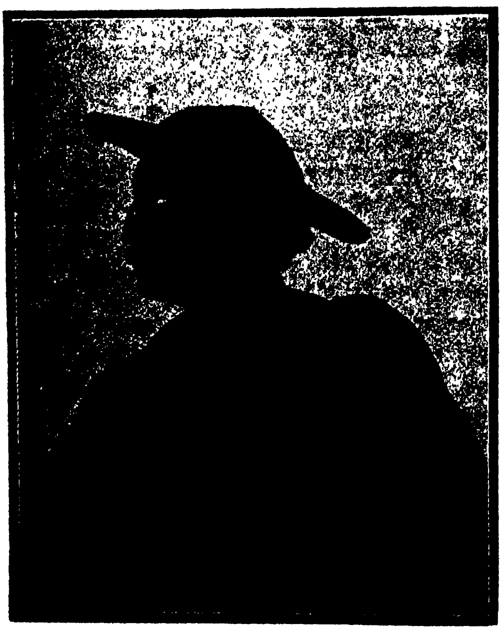
শ্রীহরিহর শেঠ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খ্যাতনামা দেশীয় অধিবাসিগণ

(৩)

রাজা রামমোহন রায়—রাজা রামমোহন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি পনর ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাটনায় থাকিয়া পারসী ও আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত হন। কথিত আছে তিনি তথায় বাসকালে কোরাণ পাঠ করিয়া হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার

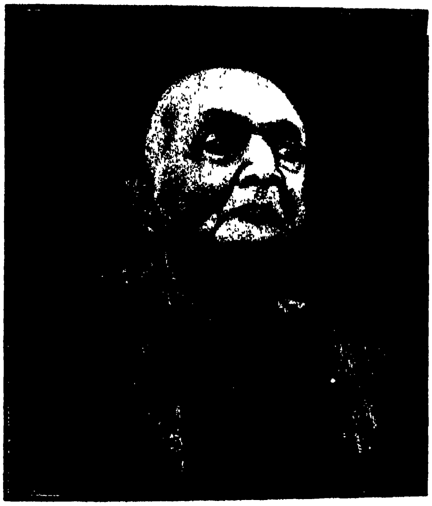


রাজা রামমোহন রায়

প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। এই বিষয় লইয়া পিতার সহিত মনান্তর ঘটায় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তিব্বতদেশে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করায় তাঁহার জীবন বিপন্ন হয় এবং তিনি অচিরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীধামে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময়ে পিতার সহিত মনোমালিন্য দূর হয় এবং পিতা তাঁহাকে বাটীতে ফিরাইয়া আনেন এবং বিষয়-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। এই সময় তিনি পিতৃ আদেশে স্বীয় চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী লইয়া রামগড় ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন কাজ করার পর রঙ্গপুরের কলেক্টর ডিগ্বী সাহেবের সেরেস্তায় দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসর নিজ বিষয়-কর্ম্ম দেখিয়া ১৮১৪ সালে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন।

রামমোহন রঙ্গপুরে থাকিতেই ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে প্রথম আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই স্থানে অবস্থান কালেই তিনি পারস্য ভাষায় একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তথায় গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন। ইনি রামমোহনের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে "জ্ঞানাঞ্জন" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতায় আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলন-তরঙ্গ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮১৫ সালে তিনি "আত্মীয় সভা" নামে এক সভা স্থাপন করেন। সেখানে শাস্ত্রীয় বিচারে সহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইতেন। এই সভাতেই তিনি মান্দ্রাজ প্রদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাস্ত করেন। ইহার পর হইতে তিনি সমাজ-সংস্কার কার্য্যে বিশেষরূপে আত্মনিয়োগ করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদাদি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রামমোহনের কার্য্যাবলীতে স্বদেশবাসীদের বিদ্বেষ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইলে তাঁহার সহিত কমিটিতে একত্র কার্য্য করিতে সকলে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাকে তথায় স্থান দেওয়া হয় নাই। ইহার পর তিনি যীশুর উপদেশাবলী নামে একখানি পুস্তক ও একেশ্বরবাদ প্রতিবাদক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করায় হিন্দু সাধারণ তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরূপ হন। ১৮২৩ সালে পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশন্ কমিটি স্থাপিত হইলে যখন উহা একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার বিষয় স্থির করেন, তখন রামমোহন এই কার্য্যের প্রতিবাদ করেন এবং তদবধি ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। হন। বাদশাহ সেই সময় তাঁহাকে অর্থ ও রাজা উপাধি দান করেন। রাজারাম নামক তাঁহার প্রতিপালিত একজন অনাথ, এবং রামরতন মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী দাস নামক দুই ব্যক্তি তাঁহার সহযাত্রী হন। তিনি বিলাতে গিয়া ভারতের জন্য অনেক কার্য্য করেন এবং সকলের নিকট সম্ভ্রম প্রাপ্ত হন। তথায় তিনি বৃষ্টলের নিকট একটী পল্লীতে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হইয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁহার প্রাণান্ত হয় এবং ৮ই অক্টোবর ষ্টেবাড়ি নামক স্থানে তাঁহার সমাধি হয়। তিনি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে রমানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজের



ভোলনাথ চন্দ্র



রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

ইহার পর তিনি এ দেশ হইতে সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টিত হন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ডফ্ সাহেব (A. Duff) যখন তাঁহার ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন রামমোহন তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন বিষয়েও তিনি কম সহায়তা করেন নাই। তাঁহার দ্বারা বঙ্গভাষায় গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তিনি "কৌমুদী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

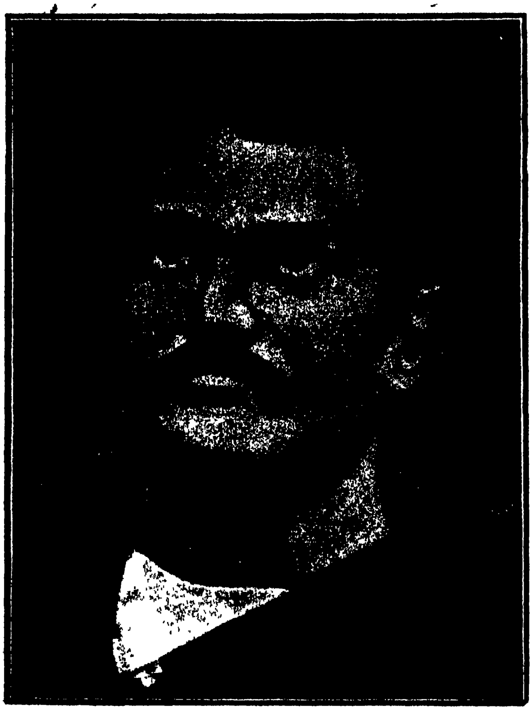
১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর রামমোহন দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট কর্ত্তৃক তাঁহার নিজ আবশ্যকের জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত

ট্রাষ্টী এবং বিশ্বম্ভর দাসকে সম্পাদক মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। রামমোহন একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ ছিলেন।

* * * *

ভোলানাথ চন্দ্র—বাঙ্গালা ১২২৯ সালে নিমতলা ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে ভোলানাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামমোহন চন্দ্র। খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ রাধাচরণ চন্দ্রই প্রথম কলিকাতায় আইসেন। ভোলানাথ প্রথম ম্যাকে (Mr. Mackay) সাহেবের স্কুল, জয়নারায়ণ মাষ্টারের স্কুল, ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনারী প্রভৃতিতে পড়িয়া শেষে হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত

হন। তিনি প্রথম কিছুদিনের জন্য ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে জ্ঞাতিভ্রাতা মহেশচন্দ্রের সহিত ভোলানাথ ও মহেশচন্দ্র এই নামে একটি ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কাশীপুরস্থ চিনির কলের এজেন্ট হন। এই শেষোক্ত কার্য্যের জন্য তিনি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ইহা হইতেই তাঁহার বিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তকের সূত্রপাত হয়। ভোলানাথ ইংরাজী ভাষায় খুব ভালরূপ লিখিতে পারিতেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভিন্ন আরও বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতিপয় মহাপুরুষের জীবন-চরিত উল্লেখযোগ্য। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।



কেশবচন্দ্র সেন

* * * *

দীনবন্ধু মিত্র—কলিকাতার অদূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া নামক গ্রামে ১২৩৬ সালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। পিতা দরিদ্রতা নিবন্ধন পুত্রকে ভালরূপ শিক্ষা দিতে পারেন নাই, তাঁহাকে কিছুদিন গ্রাম্য পাঠশালায় রাখিয়া একটি বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। দীনবন্ধুর ইহা ভাল লাগিল না। তিনি গোপনে কলিকাতায় আসিয়া এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে ডাক-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মসূত্রে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ১৮৭১ সালে লুশাই-যুদ্ধের সময় তাঁহার উপর ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার অর্পিত হয়। তিনি এ কার্য্য সুনির্ব্বাহ করায় রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। দীনবন্ধু কবি ও নাট্যকার রূপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রথম ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকরে" লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি "মানব-চরিত্র" নামে একখানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। নীলকরদের অত্যাচারে প্রজাদের দুঃখে বিচলিত হইয়া ১৮৬০ সালের শেষভাগে তিনি ঢাকা হইতে "নীলদর্পণ" প্রকাশ করেন। এই নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া রেভারেণ্ড জেমস্ লং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। তৎপরে দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী" "সধবার একাদশী" "লীলাবতী" প্রভৃতি নাটকগুলি রচনা করেন। "সুরধুনী কাব্য" "দ্বাদশ কবিতা" ও "কমলে কামিনী" তাঁহার শেষ দশায় লিখিত। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—"যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য্য, এমন কার্য্য দীনবন্ধু কখন করেন নাই।" ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গতায়ু হন।

* * * *

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—১৮২০ সালে কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, তিনি হাতিবাগানের সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র ছিলেন। দ্বারকানাথ প্রথম গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পরে গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ১৮৩২ সালে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম তথাকার গ্রন্থরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন, তৎপরে তথাকার অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে পদোন্নতি হইয়া এই স্থান হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। তিনি রোম ও গ্রীসের ইতিহাস, নীতিসার প্রভৃতি পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু "সোমপ্রকাশ"ই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদকতায় ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং যতদিন তাঁহার দেহে সামর্থ্য ছিল

তিনি উহা পরিচালন করিয়াছিলেন। "কল্পদ্রুম" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা তিনি কিছুদিন বাহির করিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। শেষে পীড়াবৃদ্ধি পাইলে রেওয়া রাজ্যের সাতনা নামক স্থানে গিয়া বাস করেন এবং সেই স্থানেই ১৮৮৬ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

* * * *

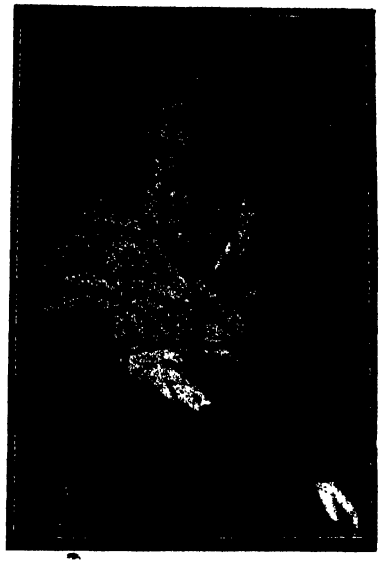
কেশবচন্দ্র সেন—কেশবচন্দ্র গৌরীভানিবাসী ও কলিকাতার কলুটোলাপ্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন



রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর

মহাশয়ের পৌত্র ও প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৮ সালে কলুটোলার ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারীমোহন পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার পত্নীও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। কেশবচন্দ্র অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন এবং জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের তত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। হিন্দু কলেজ ও মেট্রপলিটান্ কলেজে তিনি বিদ্যালাভ করেন। কোন বিশেষ কারণে একবার তিনি বিদ্যালয়ে শাস্তিভোগ করেন। এবং ইহাতে তাঁহার মনে গুরুতর আঘাত লাগে। কথিত আছে এজন্য তাঁহার যে অনুতাপ আইসে তাহাই তাঁহার জীবন-ধারার পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ হয়।

১৮৫৬ সালে তিনি ড্যাল্ সাহেব ও পাদরী লং সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে এক সভা স্থাপন করেন। পর বৎসর তাঁহার ধর্ম্মভাব ও কর্ম্মোৎসাহ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। এই সময় Good-will Fraternity নামে আপন ভবনে এক সভা স্থাপন করেন। এই সভাতে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতেন ও বক্তৃতা দিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার ভাবী বাগ্মিতার সূত্রপাত এই সভাতেই হয় এবং এই সভার সম্বন্ধসূত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনাথ যখন



দ্বারকানাথ ঠাকুর

ধ্যান-ধারণার জন্য কিছুদিন সিমলা পাহাড়ে অবস্থান করেন, তখন কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। ইহার পর তিনি এই নবধর্ম্মের প্রতি ক্রমশই অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। ১৮৫৯ সালে "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নামে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র তথায় ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা বহু ছাত্র ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন। অনুমান ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে "সঙ্গত-সভা" নামে এক ধর্ম্মালোচনা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেশবচন্দ্র এই সভায় যোগ দিয়া ধর্ম্মজীবনের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

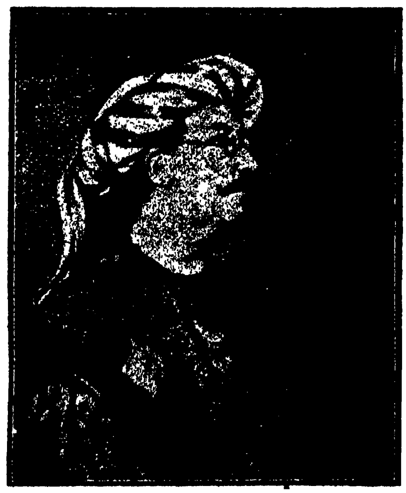
১৮৫৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তিনি সিংহল ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণোদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ইহার ফলে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তিনি সুদৃঢ় প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হন। বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটী ত্রিশ টাকা বেতনের চাকুরী লইতে বাধ্য হন, কিন্তু শীঘ্রই এ কার্য্য ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৬২ সালে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক কলিকাতা সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হন এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হন। পর



গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৎসর তিনি "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ১৮৬৪ সালে তিনি মাদ্রাজ ও বোম্বাইপ্রদেশে প্রচারার্থ গমন করেন এবং তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নিক্ষেপ করিয়া আইসেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইলে সমাজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং "ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা" নামক তৎপ্রতিষ্ঠিত সভাকে আশ্রয় করিয়া একটী ব্রাহ্মমণ্ডলী গঠন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়েই নারীদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে "ব্রাহ্মিকা-সমাজ" নামে একটী নারী সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের দ্বারা "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ রাখা হইল। ১৮৬৮ সালের প্রারম্ভে এই নব সমাজের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করা হয় এবং কেশবচন্দ্র সদলে নগরকীর্ত্তন করিয়া তাহার ভিত্তিস্থাপন করেন। ইহাই ব্রাহ্মদিগের প্রথম নগরসঙ্কীর্ত্তন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ছয় সাত মাস তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে বহু বক্তৃতা করেন। তথায় তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের নিকট সম্মান লাভ করিয়া ফিরিয়া



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (যৌবনে)

আইসেন। ফিরিয়া আসিয়াই কলিকাতায় "ভারত সংস্কার সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া সর্ব্ববিধ সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ব্রাহ্মপরিবারের আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে "ভারতাশ্রম" নামে তিনি একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার কন্যার কুচবিহারে বিবাহ ব্যাপার লইয়া এক বিষম দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলে, তিনি নিজের বিভাগীয় সমাজের "নববিধান" নাম দিয়া তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন,

নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। এই কার্য্যে তিনি পাঁচ বৎসর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার শরীর ভগ্ন হয় ও ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। তাঁহার ন্যায় বাগ্মী ও সমাজ-সংস্কারক বাঙ্গালায় খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

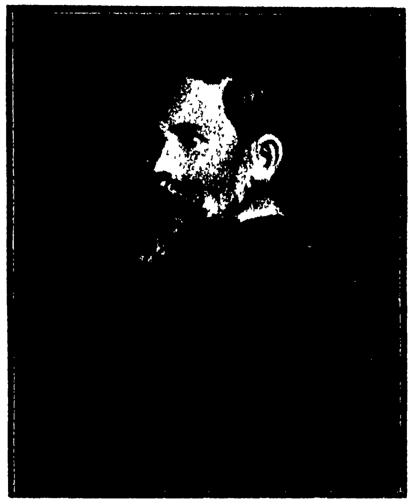
* * * *

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর—১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। প্রথম ওরিয়েণ্ট্যাল্ সেমিনারীতে শিক্ষালাভ করিয়া



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (বার্দ্ধক্যে)

পরে নূতন মেট্রোপলিট্যান্ কলেজে ক্যাপ্টেন্ রিচার্ডসনের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি ২৪ পরগণার জজ্ আদালতে অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং সেই সময়েই বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিতে থাকেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট হইতে হিন্দুপেট্রিয়ট্ যখন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হস্তে আইসে, তখন ১৮৬১ সালে কৃষ্ণদাস তাহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি তেজস্বিতার সহিত উহার পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সহকারী সম্পাদক রূপে প্রবেশ করিয়া ১৮৭৯ সালে উহার সম্পাদক হন। ১৮৬৩ সালে তিনি কলিকাতা সহরের জাষ্টিশ্ অব্ দি. পিস্ হন। তিনি একজন ক্ষমতাশালী মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনর ছিলেন এবং ১৮৮৩ সালে বড়লাটের সভায় অতিরিক্ত সদস্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় সুবক্তা বিশেষ কেহ ছিলেন না। ১৮৭৭ সালে তিনি রায় বাহাদুর এবং পর বৎসর C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। জনসাধারণের নিকট তিনি বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। হ্যারিসন রোড ও কলেজ



দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

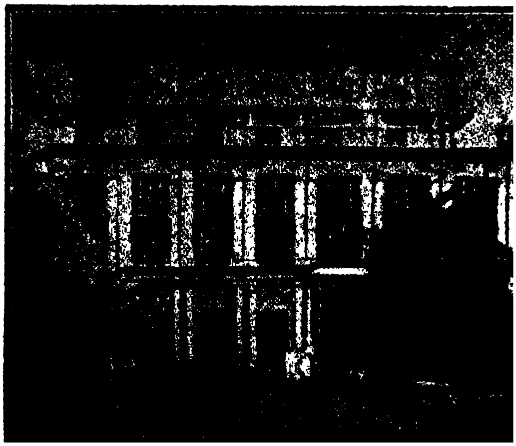
ষ্ট্রীটের চৌমাথার মোড়ে তাঁহার একটী মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * * *

মহারাণী স্বর্ণময়ী—১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার ভট্টকোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একাদশ বৎসর বয়সে কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৪১ সালে কৃষ্ণনাথ রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ সালে তিনি তাঁহার কলিকাতার চিৎপুরের বাটীতে আত্মহত্যা করেন। রাজার উইল অনুসারে স্বর্ণময়ীর স্ত্রীধন ব্যতিরেকে সমস্ত সম্পত্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিকার করেন। স্বর্ণময়ী যে কিছু

বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজ সম্পত্তি ও জমিদারীর কাজ বেশ বুঝিতে পারিতেন। কাশিমবাজার ষ্টেটের সুযোগ্য অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর রাজীবলোচন রায়ের সহায়তায় তিনি তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সুপ্রীম্ কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং তিন বৎসর পরে আদালত উইল্ নামঞ্জুর করেন।

স্বর্ণময়ী সর্ব্বাংশে হিন্দু বিধবার ধর্ম্ম পালন করিতেন। তাঁহার দান অসাধারণ ছিল। তিনি বহরমপুরে জলের কলে ১৫০০০০৲, উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষে ১২৫০০০৲ মেডিক্যাল্ কলেজ্ ও ক্যাম্বেল্ মেডিক্যাল্ স্কুলের ফিমেল্ হোষ্টেলে



জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী

১১০০০০৲ দান করিয়াছিলেন। বহরমপুর কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বৎসরে ১৬০০০৲ হইতে ২০০০০৲ টাকা ব্যয় করিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অসংখ্য ছোট ছোট দান ছিল। জলকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি বহুসংখ্যক জলাশয় এবং দুস্থদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহু বিদ্যালয় ও টোল কেবল তাঁহার দানের উপর নির্ভর করিয়াই চলিত। পৌষ ও চৈত্র সংক্রান্তিতে তিনি সহস্র সহস্র কাঙ্গালী দুঃখীকে ভোজন করাইতেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রথম রাণী তৎপরে ১৮৭১ সালে মহারাণী এবং ১৮৭৮ সালে C. I. 3. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার ষ্টেটের [illegible]। তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হন।

* * * *

কাশীনাথ ঘোষ—নদীয়ার রাজাদের দেওয়ান রামদেব ঘোষের পুত্র কাশী ঘোষ ফেয়ারলি ফার্গুসন কোম্পানীর সহকারী বেনিয়ান্ ছিলেন। তিনি এই মুচ্ছুদ্দিগিরি কাজ করিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নামে একটী গলি আছে।

* * * *



রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষ—আদিশূরের দ্বারা কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আনীত কায়স্থ মকরন্দ ঘোষ হইতে এই ঘোষ বংশের উদ্ভব। এই বংশের মনোহর ঘোষ প্রথম কলিকাতার চিত্রপুর অধুনা চিৎপুরে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন এবং প্রথম রাজা টোডরমলের অধীনে একজন গোমস্তার কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে তিনি রাজস্ব তালিকা প্রস্তুতের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সর্ব্বমঙ্গলা ও চিত্রেশ্বরী দেবীর একটী ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

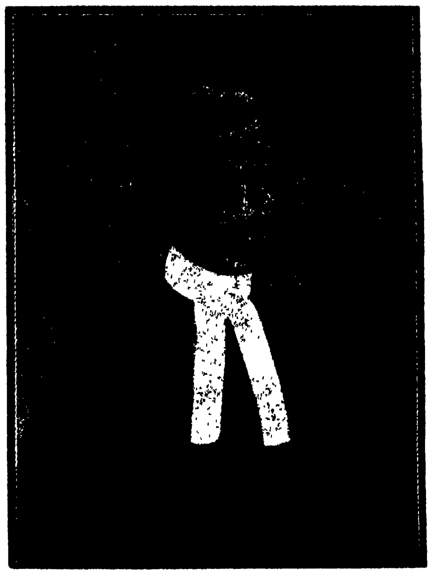
কথিত আছে বৃটিশ্ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বাঙ্গালার মধ্যে এই স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নরবলি হইত। ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মনোহরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ নরবলির অমানুষিক দৃশ্য দেখিতে না পারায় এই স্থান ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে গিয়া বাস স্থাপন করেন। তথায় রহিম সিংয়ের দ্বারা তাঁহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়, পরে তিনি নিহত হন। তাঁহার পুত্র বলরাম নিজ মাতাকে লইয়া কিছুদিন এখানে ওখানে থাকিয়া পরিশেষে চন্দননগরে বাস করেন এবং এই স্থানে ব্যবসায় কার্য্যে নিযুক্ত হন। কেহ কেহ বলেন তিনি ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ১৭৫৬



কালীকৃষ্ণ ঠাকুর

সালে রামহরি, শ্রীহরি, নরহরি এবং শিবহরি নামক চারি পুত্রের প্রথম দুইটীকে রাখিয়া মারা যান। তাঁহারা চন্দননগর হইতে কলিকাতার বাগবাজারস্থিত কাঁটাপুকুর পল্লীতে উঠিয়া যান এবং প্রায় কুড়ি বিঘা জমি লইয়া এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন।

শ্রীহরি ঘোষ বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ইংরাজিতেও সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি দেওয়ানী হইতে অবসর লইবার পর কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এই সময় তিনি তাঁহার বহু স্বজাতীয়গণকে ও আত্মীয়স্বজনকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অনাহুত রবাহুত বহু লোকেও তাঁহার বাটী সদা কোলাহল-মুখরিত করিয়া রাখিত। এই সকল কারণে লোকে তাঁহার বাটীকে বলিত "হরিঘোষের গোয়াল।" তিনি দান ধ্যান ও ক্রিয়াকলাপেও বহু অর্থব্যয় করিতেন। তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার এই স্বভাবের সুযোগ লইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার জীবন শেষাবস্থায় অত্যন্ত কষ্টে কাটিয়াছিল। তিনি শেষে মনের দুঃখে তাঁহার বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া কাশীবাসী



জষ্টিশ্ চন্দ্রমাধব ঘোষ

হন। তথায় ১৮০৬ সালে কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, হরলাল ও রসিকলাল নামক চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * * *

বারাণসী ঘোষ—ইনি বলরাম ঘোষের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ছিলেন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের জামাতা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল রাধাকান্ত ঘোষ। বারাণসী ২৪ পরগণার কলেক্টর মিঃ গ্ল্যাডউইনের (Mr. Gladwin) দেওয়ান ছিলেন। তিনি একটী স্নানের ঘাট ও ব্যারাকপুরে ছয়টী শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন।

* * * *

তুলসীরাম ঘোষ—ইঁহার পিতার নাম রামনিধি ঘোষ। হাওড়ার সন্নিকট পৈতাল গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ঢাকায় খাজাঞ্চির কাজ করিয়া তিনি বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে একটী শিব মন্দির এবং ঢাকায় কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি শিবপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ নামক দুই পুত্র রাখিয়া গতায়ু হন।

* * * *

দ্বারকানাথ ঠাকুর—কলিকাতার ঠাকুরবংশ অতি প্রাচীন। আদিশূরের অনুরোধে কান্যকুব্জাধিপতি প্রেরিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ হইতে এই বংশের



শিশিরকুমার ঘোষ

উৎপত্তি। ভট্টনারায়ণের ষষ্ঠবিংশতি বংশধর পঞ্চানন যিনি যশোহর হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তিনিই প্রথম "ঠাকুর" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইঁহার পুত্রের নাম ছিল জয়রাম। তাঁহার চারি পুত্র—আনন্দিরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। এই নীলমণি হইতেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের উৎপত্তি। তৎপূর্ব্বে দরমাহাট্টা ষ্ট্রীট তাঁহাদের বাসভবন ছিল। নীলমণির তিন পুত্র রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভের মধ্যে রামমণির তিন পুত্র ছিলেন, দ্বারকানাথ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৭৯৪ বা ৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার

[illegible]

ছিলেন। তিনি প্রথম সেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কুমারখালির জমিদারী এবং বহু ভূসম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তিনি অল্প বয়স হইতেই জমিদারীর কার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আইনও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল চব্বিশপরগণার লবণ বিভাগের এজেণ্টের সেরেস্তাদার পদে কার্য্য করিয়া পরে এই বিভাগের দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮২৯ সালে তাঁহার চেষ্টায় ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৪ সালে "কার ঠাকুর" নামে একটী



গণেশচন্দ্র চন্দ্র

কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। শিলাইদহ ও অন্যান্য স্থানে তিনি কতিপয় নীলের কারখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার বিষয়ক কার্য্যে তিনি একজন সহায়ক ছিলেন। হিন্দু কালেজ্ ও মেডিক্যাল্ কালেজ্ প্রতিষ্ঠা বিষয়েও তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ সালে তিনি জমিদার সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ তাঁহারই পরামর্শে সৃষ্ট হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার তিনি একজন উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৪২ ও ৪৫ সালে তিনি দুইবার বিলাত যান এবং তথায় তিনি বিপুল সংবর্দ্ধনা লাভ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ,

ইটালীর রাজা, ইজিপ্টের রাজ-প্রতিনিধি প্রভৃতিও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি District Charitable Societyতে দশ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ নামক তিন পুত্র রাখিয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* * * *

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ-পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে তত্ত্ববোধিনী সভা



নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ইহা ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং সমাজকে ভগ্নদশা হইতে রক্ষা করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার পিতা কার ঠাকুর কোম্পানীর নামে প্রায় এক ক্রোর টাকা ঋণ করিয়া মারা যান, কিন্তু এই ঋণ করিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জমিদারীর কতকাংশ ট্রাষ্টিদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। কোম্পানীর দেনার জন্য ট্রাষ্ট্ সম্পত্তি দায়ী নহে—বহু লোকের নিকট এরূপ পরামর্শ পাইয়াও তিনি সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এবং বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণ সকল বিক্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে দেনা পরিশোধ করিয়াছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি সংসারে থাকিলেও নিষ্কাম ও নিস্পৃহভাবে জীবন যাপন করিতেন। তিনি অনেক সময় হিমালয়ের নিভৃত স্থানে ভগবদারাধনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণে "মহর্ষি" উপাধি দিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের দানও কম ছিল না। তাঁহার আত্মজীবনী, আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। কুচবিহারের মহারাজার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়ায় সকলে কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিলেও তিনি তাঁহার মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাঁহার পার্শ্বেই



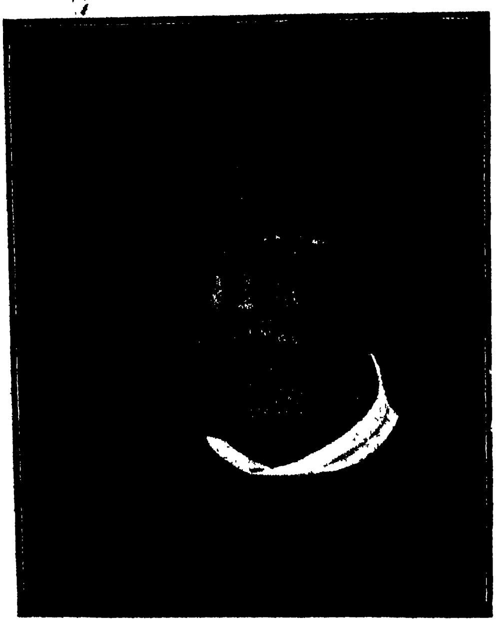
মহারাজা নন্দকুমারের কাশীমবাজারের বাটী

ছিলেন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮৯ বৎসর বয়সে বাঙ্গলার গৌরবস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্র-নাথ প্রভৃতি পুত্রকন্যাগণকে রাখিয়া মহাপ্রয়াণ করেন। ভারতগৌরব বিশ্ববিশ্রুত রবীন্দ্রনাথই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র।

* * * *

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—ইনি হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া অতি অল্প বয়সেই সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বৎসর বয়সে "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত" এবং "মুক্তাবলী" নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন

পরবর্ত্তীকালে তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রের বঙ্গানুবাদ, "মণিমালা" "ধাতুমালা" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহনের প্রসিদ্ধি এ সবের জন্য নহে। তিনি একজন সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। ষোড়শবর্ষ বয়ক্রম কালে তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন আরম্ভ করেন। তিনি শুধু এ দেশে নয়, বহু দেশ-বিদেশ এমন কি সুদূর আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে যেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে কোন ভারতীয় কোন বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা তাহা পান নাই। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফিলাডেল্‌ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Doctor



সারদাচরণ মিত্র

of Music উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্গ ও ভারত সরকারও তাঁহার এই উপাধি অনুমোদন করেন। ১৮৯৬ সালে অক্সফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও তিনি এই উপাধি পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে Companion of the Order of the Indian Empire এবং রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। নেপাল হইতে সঙ্গীত শিল্প বিদ্যাসাগর ও ভারতীয় সঙ্গীত নায়ক উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, ও জাষ্টিশ্ অব্ দি পিস্ হইয়াছিলেন। লণ্ডনে রয়েল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটী ও রয়েস্ সোসাইটী অব লিটারেচার; ফ্রান্সে প্যারিশ একাডেমী ও মন্টি্ল্ একাডেমীর সভ্য ছিলেন। ইহা ছাড়া স্পেন্, পর্ত্তুগাল্, ইটালী, সুইডেন্, রাশিয়া, ডেন্মার্ক্, হলাণ্ড, জার্ম্মানী, তুরস্ক, ইজিপ্ট, আফ্রিকা, চীন্, জাপান্ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত সুসভ্য দেশেও তিনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কলুটোলা ও চিৎপুর রোডে বেঙ্গল্ মিউজিক্ স্কুল্ নামে দুইটী সঙ্গীত শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। লাট প্রাসাদে কোন সঙ্গীতাদি হইলে তাঁহার নিমন্ত্রণ অগ্রে হইত। তিনি লণ্ডনে Royal College of Music এ সুগায়ক ও সুগায়িকাকে সুবর্ণ-পদক দিবার জন্য এককালীন অর্থ দিয়াছিলেন। সংস্কৃত



নীলকমল মুখোপাধ্যায়

কলেজে জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী আনন্দময়ী দেবীর নামে ও তাঁহার পিতার নামে বৃত্তি ও মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর দ্বীপে পিতার নামে একটী পুষ্করিণী খনন ও বরাহনগরে একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বরিশালে বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য ভূমিদান এবং লেডি ডফরিন্ হাঁসপাতাল গৃহ ও আলবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

* * * *

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—আনুমানিক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোপাল লাল ঠাকুর। হিন্দু

কলেজে, ওরিয়েণ্টাল্ সেসিনারী ও ডভটন্ কালেজে তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি একজন প্রজাহিতৈষী জমিদার বলিয়া বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তিনি দানশীল ছিলেন, অভাবগ্রস্ত লোকদের তিনি কখন বিমুখ করিতেন না। তাঁহার পুত্রের বিবাহে তিনি বহু দান ধ্যান করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠায় তিনি অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার দুই পুত্র শরদিন্দ্রমোহন ও শৌতীন্দ্রমোহন উভয়েই



ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র

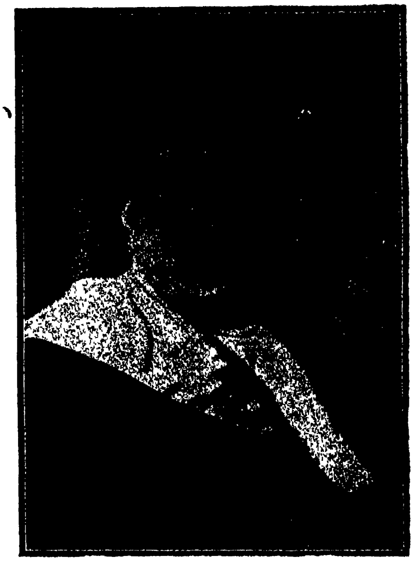
পরলোক গমন করেন। শৌতীন্দ্রমোহন নিঃসন্তান ছিলেন। স্বনামধন্য প্রফুল্লকুমার ঠাকুর শরদিন্দ্রমোহনের বংশধর।

* * * *

রামশঙ্কর ঘোষ—ইনি আরপুলির সুবিখ্যাত ঘোষ বংশজাত। সাধারণতঃ শঙ্কর ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দৈবকিনন্দন ঘোষের পুত্র মনোহর ঘোষের পুত্র ছিলেন। ইনি কাপ্তেনের মুচ্ছুদ্দির কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহার অধিকাংশ ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন। চোরবাগানের কালীর মন্দির তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

* * * *

শিবচন্দ্র গুহ—ইঁহারা হোগলকুড়িয়ার গুহবংশসম্ভূত। ইঁহারা মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতার বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ১৭৯৩ সালে শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম ছিল ব্রজনাথ গুহ। পিতার আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃ তাঁহার ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ হয় নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে



প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ল্যাকারাষ্টিন্ কোম্পানীর (Messrs Lackersteen and Co.) আপিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে তিনি অফিসের মুচ্ছুদ্দি হন এবং সেই সঙ্গে নিজে একটী স্বতন্ত্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি জীবনে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সৎকার্য্যের দ্বারা তাহা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ করিতেন। তিনি ভীম ঘোষের ষ্ট্রীটে শিবমন্দির ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এবং ২৪ পরগণায় জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি কতিপয় জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অভয়চরণ ও তারাচাঁদ নামক দুই পুত্রকে রাখিয়া তাঁহার বরাহনগরস্থ বাগানবাটীতে তিনি মারা যান।

* * * *

চন্দ্রমাধব ঘোষ—ইঁহার জন্মস্থান বিক্রমপুর। পিতার নাম রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ওকালতী পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম বর্দ্ধমানে উকীল-সরকারের কাজ করেন। পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া ডেপুটী-কলেক্টর হন। পরে পুনরায় এই পদ ত্যাগ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করেন।



প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন অস্থায়ী চিফজষ্টিসের কাজও করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "নাইট্" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

* * * *

শিশিরকুমার ঘোষ—ইনি যশোহর জেলার মাগুরার সুবিখ্যাত ঘোষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নীলকরদিগের অত্যাচার দর্শনে তাহার প্রতিবিধানার্থ সমস্ত ঘটনা গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি তাঁহার [illegible] "অমৃতবাজার পত্রিকা" নামে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ সালে গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া আইন প্রণয়ন করিলে তিনি অমৃতবাজার ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহা প্রথম সাপ্তাহিক ছিল, পরে দৈনিকে পরিণত হয়। ১৮৮১ সালে অমৃতবাজার কার্য্যালয় কলিকাতায় আইসে। শিশিরকুমারের ন্যায় নির্ভীক, তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী সম্পাদক বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। Hindu Spiritual Mag.zine নামে একখানি মাসিকপত্রও তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিতেন। তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার "অমিয় নিমাই চরিত" এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত "Lord Gauranga" নামক



নলিনবিহারী সরকার

গ্রন্থদ্বয় সর্ব্বত্র সমাদৃত। বিডন্ গার্ডেনে শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনে যে বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে তাহা ইঁহারই চেষ্টায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। জীবনের শেষাবস্থায় শিশির কুমার তাঁহার যোগ্য সহোদর মতিলাল ঘোষের হস্তে পত্রিকার ভারার্পণ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় জীবনযাপন করেন।

* * * *

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ইনি কাঁচড়াপাড়ার হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র ১২১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটিলে কলিকাতা যোড়াসাঁকোতে

মাতামহ রামমোহন গুপ্তের আলয়ে অধিকাংশ সময় থাকিতেন। লেখাপড়া শিক্ষায় তাঁহার মনোযোগ ছিল না; সুতরাং সামান্য বাঙ্গালা ভিন্ন তাঁহার শিক্ষা কিছুই হয় নাই; কিন্তু এই শিক্ষা লইয়াই তিনি তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতির গুরুস্থানীয় ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মে। তাঁহারই প্ররোচনাতে ১২৩৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদকতায় "সংবাদ-প্রভাকর" সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। দুই বৎসর পরে যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সহিত "প্রভাকর" কিছুদিনের জন্য উঠিয়া যায়। এই সময় আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের উদ্যোগে "রত্নাবলী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মহেশচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তি নামতঃ সম্পাদক থাকিলেও ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সম্পাদকতা কার্য্যে সম্পূর্ণ সহায়ক ছিলেন। ১২৪৩ সালে তিনি প্রভাকরকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তখন উহা সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হইত; পরে দৈনিকে পরিণত হয়। ১৮৫৩ সালে "পাষণ্ডপীড়ন" নামক আর একখানি পত্র তিনি বাহির করেন। পর বৎসর উহা উঠিয়া গেলে "সাধুরঞ্জন" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ১২৬০ সালে "প্রভাকর" নামে একখানি স্থূলকায় মাসিক প্রকাশ করেন। ১২৬২ সালে তিনি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনচরিত সম্বলিত গ্রন্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ১২৬৪ সালে প্রবোধ প্রভাকর নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১২৬৫ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * * *

গণেশচন্দ্র চন্দ্র—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাশীনাথ চন্দ্র। তিনি বেঙ্গল একাডেমি, হিন্দু মেট্রোপলিট্যান্ কলেজ ও ডভটন্ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৩ সালে সুইনহো এণ্ড লাহার (Messrs Swinhoe & Law) অফিসের রমানাথ লাহার আর্টিক্যাল্ ক্লার্ক হন। ১৮৬৮ সালে এটর্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের এটর্নীর তালিকাভুক্ত হন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য, অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য, ডেপুটী সেরিফ, এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য ছিলেন। তিনি প্রথম কতিপয় বৎসর অপরের সহিত যুক্ত হইয়া এটর্ণীর কার্য্য করিয়া পরে ১৮৭২ হইতে ৯৪ পর্য্যন্ত নিজ নামে ফার্ম্ম খোলেন এবং পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্র চন্দ্র এটর্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার ফার্মের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া জি, সি, চন্দ্র এণ্ড কোম্পানী রাখা হয়। এটর্ণী হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট নাম ছিল। খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র পরলোকগত রাজচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের পুত্র।

* * * *

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—যশোরের কুলিয়ারাণঘাট গ্রামে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পণ্ডিত দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। তিনি এম্-এ, বি-এল, পাশ করিয়া প্রথম কলিকাতা হাইকোর্টে পরে পাঞ্জাব চীফ কোর্টে ওকালতি করেন। লাহোরে অবস্থান কালে তাহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া কাশ্মীরের মহারাজা ১৮৬৮ সালে তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন। পরে তিনি তথায় রেশমের কারখানা স্থাপন করিয়া তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। মহারাজা তাঁহার বিবিধ সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সনদ ও উপহারাদি এবং অর্থ সচিবের পদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি কার্য্যত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন। ১৮৯৬ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ হন এবং বহুদিন এই পদে থাকিয়া সম্মানের সহিত কার্য্য করেন।

* * * *

মহারাজা নন্দকুমার—সম্ভবতঃ ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ রায়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মুরশিদাবাদ জেলার জরুলগ্রামে বাস করিতেন। পরে ভদ্রপুর গ্রামে, তাঁহার প্রপিতামহ রামগোপাল রায় তত্রত্য মথুরানাথ মজুমদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ-পুত্র চণ্ডীচরণের প্রথমা পত্নীর গর্ভে পদ্মনাভ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মুরশীদ কুলীখাঁর অধীনে আমীনের পদে

নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমার পিতার শিক্ষাধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাঁহার সহকারী বা নায়েব আমীনপদে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৪০ অব্দের পর তিনি নবাব কর্ত্তৃক হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমীন নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি দুইবার বিপদগ্রস্ত হন এবং শেষবার প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিতে সঙ্কল্প করিলে কলিকাতায় পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। পরে মুস্তাফার মৃত্যু হইলে পুনরায় মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া বহু চেষ্টায় সাতাইশকা পরগণার আমীনের পদলাভ করেন। কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহার আর্থিক সুবিধা না থাকায় উহা ত্যাগ করিয়া হুগলীতে আইসেন। এই সময় তাঁহার দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। কিছুদিন কষ্টভোগের পর মহম্মদ ইয়ারবেগ খাঁ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হইলে তাঁহার অধীনে তিনি দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি "দেওয়ান-নন্দকুমার" নামে অভিহিত হইতে থাকেন।

আলিবর্দ্দিখাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসন লাভ করিলে প্রথম মির্জ্জা মহম্মদ আলী ও পরে ওমরউল্লাকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন; কিন্তু উভয়েরই কার্য্য সন্তোষজনক না হওয়ায় পরে নন্দকুমারকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। পরে ইংরাজদিগের চন্দননগর আক্রমণের সময় নবাবের আদেশের বিপরীত কাজ করায় অর্থাৎ ফরাসীদের সাহায্যের পরিবর্ত্তে ইংরাজদের প্ররোচনায় উমিচাঁদের পরামর্শে ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করায় নবাব তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর নন্দকুমার ক্লাইভের দেওয়ান নিযুক্ত হন। পরে মীরজাফরকে তিনি অনুরোধ করিয়া নন্দকুমারকে হুগলী হিজলী প্রভৃতি স্থানের দেওয়ানী দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর অধীনে একটী দায়িত্ব-পূর্ণ কর্ম্মের ভার দিলেন। ১৭৫৮ সালে নদীয়া ও বর্দ্ধমানের রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরাজ পক্ষ হইতে এই দুই স্থানের তহশীলদারী পদ প্রাপ্ত হন। অল্পদিন পরে নন্দকুমার নবাব সরকারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহা হেষ্টিংসের মনঃপুত না হওয়ায় তিনি নানা উপায়ে নন্দকুমারের প্রভাব খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করেন। এই সময় ক্লাইভ সর্ব্ববিষয়েই নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ক্লাইবের পর ভান্সিটার্ট গভর্ণর হইলে প্রথম তিনি নন্দকুমারকে যথেষ্ট স্নেহ করিলেও হেষ্টিংসের প্ররোচনায় ক্রমে বিদ্বেষভাবাপন্ন হন। এই সময় ক্রমে বৃটিশ প্রাধান্য বৃদ্ধির সহিত নন্দকুমারের ক্ষমতা লোপ হইতেছিল। পরে তিনি অমিয়ট্ ও এলিসের পরামর্শে কর্ণেল্ কুটের সহিত প্রধান কর্ম্মচারীরূপে পাটনায় প্রেরিত হন। মীরকাসিমের পতন হইলে মীরজাফরের পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রাপ্তির পর নন্দকুমার তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই সময় মীরজাফরের চেষ্টায় বাদশাহ কর্ত্তৃক তিনি "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহার ইংরাজদের গোপনে অনিষ্ট চেষ্টা অভিযোগে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তিনি পদচ্যুত হন এবং তাঁহার স্থানে মহম্মদ রেজা খাঁ বঙ্গের নায়েব সুবাদার হন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।

সম্ভ্রম, গৌরব, প্রতিপত্তি ও প্রতিভায় নন্দকুমার তাঁহার সময়ে বাঙ্গালীর মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার ভাগ্য বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। তিনি হেষ্টিংস প্রভৃতি কতিপয় পদস্থ ইংরাজের বিরাগ-ভাজন হইয়া শেষে তাঁহাদের ষড়যন্ত্রে জাল করা অপরাধে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিতে বাধ্য হন। ১৭৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট খিদিরপুরের নিকট কুলীবাজারে তাঁহার ফাঁসী হয়।

* * * *

দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এবং রাজা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ছিলেন। ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত কেটিয়ারি নামক গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। গভর্ণমেণ্টের অধীনে পাটনার আফিমের কুঠীর দেওয়ান হইয়া তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। ইংরাজী ও পারস্য ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দির ও একটী স্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, শম্ভুকৃষ্ণ, শিবকৃষ্ণ ও তারাকৃষ্ণ নামে পাঁচ পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * * *

সারদাচরণ মিত্র—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সারদাচরণের জন্ম হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। এম-এ পরীক্ষায় ইনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়া-

ছিলেন। বি-এল, পাশ করিয়া ইনি হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯০২ সালে অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্ত হন এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবসর গ্রহণের পর তিনি স্থায়ীভাবে এই পদে নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। ইনি কায়স্থ সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

* * * *

নীলকমল মুখোপাধ্যায়—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নীলমাধব মুখোপাধ্যায়। পিতামহ রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম ও নীল সরবরাহ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার একচেটিয়া ব্যবসা ছিল এবং নয় দশটী রেশমের কারখানা ও প্রায় অতগুলি নীলের কারখানা ছিল। নীলকমল কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তথায় তিনি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কুড়ি বৎসর বয়সে একটি ব্যাঙ্কের কার্য্য গ্রহণ করেন। তৎপরে হাইকোর্টে এটর্ণীর আর্টিকেল্ ক্লার্ক্ হন; কিন্তু পিতৃবিয়োগ ঘটায় উহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং ব্যাঙ্ক অব্ হিন্দুস্থান, চায়না এবং জাপান্ লিমিটেড্-এ পুনরায় কার্য্য গ্রহণ করেন ও পরে তথাকার দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার জন্য পাবনা যান, কিন্তু তিনি তাঁহার দাদাশ্বশুর দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারীর ভার লইতে অনুরুদ্ধ হইয়া সেই কাজ গ্রহণ করেন। পরে তিনি গ্রেহাম্ কোম্পানীর অফিসে প্রবিষ্ট হন।

* * * *

ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র—১২৫১ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জয়গোপাল মিত্র। তিনি শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়ায় প্রথম কিছুদিন পড়িয়া পরে কলিকাতায় থাকিয়া এম-এ ও বি-এল পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অতি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর অব্-ল উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজে তৎপরে হুগলী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এই পদ ত্যাগ করিয়া হুগলী আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন এবং তথায় প্রায় আট বৎসর থাকিয়া ১৮৭৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের অধ্যাপক হন ও হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি ঠাকুর আইন অধ্যাপক হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সিণ্ডিকেটের সদস্য, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, ও বিলাতের রয়েল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটির সভ্য ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভবানীপুরে গতায়ু হন।

* * * *

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথম কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করেন। তৎপরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জুডিশিয়াল সার্ভিস্ গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে এলাহাবাদের ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ সালে লক্ষ্ণৌএর অতিরিক্ত জজের পদ প্রাপ্ত হন এবং সেই বৎসরই তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। তিনবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকল্টি অব্ ল'র সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

* * * *

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৮৪৮ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এম-এ, বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন এবং শীঘ্রই লাহোর আদালতে ওকালতি করিতে যান। তথায় তিনি ক্রমে প্রধান আদালতের বিচারপতি মনোনীত হন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই পদে পাকা হন। তিনি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন এবং পরে ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। তিনি পাঞ্জাব সাধারণ পুস্তকাগারের এবং ডায়মণ্ড জুবিলী হিন্দু টেকনিক্যাল স্কুলের সভাপতি ছিলেন। তিনি সরকার কর্ত্তৃক প্রথম রায়বাহাদুর পরে দিল্লী দরবারের সময় C. I. E উপাধিতে ভূষিত হন।

* * * *

নলিনবিহারী সরকার—তারকচন্দ্র সরকারের দ্বিতীয় পুত্র নলিনবিহারী সরকার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নৈহাটীতে

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া পিতার সুবিখ্যাত কার-তারক কোম্পানী নামক কার্য্যে প্রবেশ করেন এবং পরে উহার অংশীদার হন। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং ১৮৮১ সালে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে যেরূপ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, অন্যান্য সকল বিষয়েও তেমনই সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের, পোর্ট্ ট্রাষ্টের, ও বেঙ্গল্ লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য এবং কলিকাতার সেরিফ হইয়াছিলেন। তিনি অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং বেঙ্গল্ চেম্বার্শের Calcutta Import Trade Associationএর চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কৈশর-ই-হিন্দ পদক ও C. I. E. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন।

গলায় গলায়

[আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্]

প্রদীপ মলিন তোর ; তবে ভোর হয়ে এল বলে।
পাথরের বেড়া ভেঙ্গে আসে রেঙ্গে আলো পলে পলে।
স্বপ্নের তরল দাগে জ্যোতি লাগে উষার স্পন্দনে ;
নিশা-অবসান-গাথা গাও হোতা, আলোক-বন্দনে।

হে আকাশ, হে প্রকাশ, একি দেখি আজ অকস্মাৎ—
আলোকের ধারে ঝরে অবিরাম প্রাণের প্রপাত !
অসংখ্যের সঙ্গে গাঁথা সবে হেথা প্রপাত তলায় ;
আকাশ-গঙ্গার জল টলমল গলায় গলায়।

দীপ্তির বিদ্যুৎ মৃত্যু ঝলসি' দহিছে দেশ কাল ;
আলোকে গলিছে দৃশ্য, সারা বিশ্ব হয় লালে লাল।
খেদ নাই, ভেদ নাই, পায় না আপনা খুঁজে কেউ ;
সীমার আঙ্গিনা পরে ঢলে' পড়ে অনন্তের ঢেউ।

অনন্ত কি ? কি পর'খি অন্তরের অন্ত খুঁজে খুঁজে ?
রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রে ধরে' অপারের তরে চলি যুঝে।
অতি ঊর্দ্ধে এই ক্ষুদ্রে প্রসারিতে বহে চিরগতি ;
এই অল্প কোটি কল্পে পরাজিতে চায় নিরবধি।

ছড়ায়ে প্রাণের সূতা জড়াইতে যাই বিশ্ব-জনে ;
বিশ্বসহ আপনায় অজানায় বাঁধিতে বন্ধনে
সঞ্চরে গতির ছন্দ ; একি অন্ধ প্রয়াস জীবনে ?
নহে, নহে ; বহে সত্য অফুরন্ত আলোক-দীপনে।

ছিঁড়ে এই সত্য সূত্র, ত্যজি ক্ষুদ্র, কোথা দিবে ঝাঁপ ?
চাও মুক্তি, মোক্ষে সুপ্তি ? হে উদ্‌ভ্রান্ত, সে যে মহাপাপ !
হে আদিত্য, ভ্রান্তচিত্তে মোক্ষচিন্তা দাও পোড়াইয়া ;
বিশ্বসহ অদৃশ্যকে বুকে বুকে দাও জড়াইয়া।

হে জাগ্রত, হে প্রবুদ্ধ, এ জীবন বোঝা নয় ঘাড়ে ;
ক্ষুদ্র তোর, অল্প তোর মহিমায় ভূমা হয়ে বাড়ে।
নয়, নয় কর্ম্মক্ষয় ; জীবনে সে সোপান সতত ;
কর্ম্মে নাই অবসান, কর প্রাণ অনন্তে উদ্যত।

জাগুক, লাগুক প্রাণে অপরের প্রাণের স্পন্দন ;
সুপ্তি নয়, মুক্তি নয়, চিত্ত চায় জীবন্ত বন্ধন।
এস স্পর্শি' ওগো রশ্মি, দীপ্তি তব প্রাণের তলায়
অনাদির সাথে বাঁধি' বিশ্বপ্রাণ গলায় গলায়।

আশ্রয়

শ্রীঅশোকা ঘোষ

বাড়ীর আগের আমগাছটার তলায় একগাদা খড়। রমেশ তারি পাশে আসিয়া বসে। হাতে খড়-কাটা দা। সুরু হয়—খট্, খটাখট্, খট্। মন তার ছোটে গত ও আগত জীবনের ছোট-বড় হাজারোটা ঘটনার পিছনে। বেলা বাড়ে। গাছের ছায়া সরিয়া যায়। রমেশের চোখে মুখে বৈশাখী সূর্য্যের দৃপ্ত ঝলক আসিয়া লাগে। রমেশ তা হয় ত টেরও পায় না।

স্ত্রী সরলা আসিয়া ডাকে, বলে, কি হচ্ছে?

রমেশ ফিরিয়া তাকায়। কিছু বলে না।

ওগো শুনছ?

রমেশ হয় ত বলে, শুনেছি। কিন্তু কি যে হচ্ছে, সে ত নিজেই দেখ্‌তে পাচ্ছ। পাচ্ছ না?

সরলা বলিতে যায়,—তা ত পাচ্ছি। ওদিকে ঘরে যে—

কথা শেষ হইতে পায় না; রমেশ বলিয়া উঠে, ঘরে যে চাল নেই, ডাল নেই, নুন নেই—

এই ত? তা কি করব?

হাঁড়ী চড়বে কি দিয়ে?

রমেশ উত্তর দেয় না। সরলা বকিতে বকিতে চলিয়া যায়। রমেশ কাটে আবর—গত ও আগতের। কপালে যে যায়গায় রোদ লাগিয়া ঘাম হয়, রমেশ একবার ধূলো হাত সেখানে বুলাইয়া আনে। এমনি করিয়া বেলা বাড়ে।

সামনেই একটা এক-ফসলী ক্ষেত। ধান কাটার পর চাষী একবার চাষ দিয়া রাখিয়াছে,—এখনো কিছু বুনে নাই। বৈশাখীর 'রোদ্দুরে' ক্ষেতটা যেন জ্বলিতেছে—জ্বল—জ্বল—। মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ায় সেই রোদে-পোড়া বালু উড়াইয়া আনে। রমেশ থাকিয়া থাকিয়া সেই ধূ-ধূ-মাঠের দিকে তাকায়—কি যেন ভাবে।

ক্ষেতের ও-পারে একটা বাড়ী। বেশ বড় বাড়ী। সামনের পুকুরের একটা পাড় দেখা যায়। ঐ ধারটায় অনেক কালের একটা বকুল গাছ। একটা মোটা ডাল তার মাটীতে পড়িয়া আছে। তার ওপরে বসিয়া বিশ বাইশ বছরের এক যুবক। একটু দূরে দুইটি গরু চরিতেছে। তার পাশ দিয়া একটা নতুন বাছুর আপনার শক্তির প্রাচুর্য্যে যেন আত্মহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। বৈশাখী আভায় তার মসৃণ দেহ চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

রমেশ চাহিয়া থাকে।

কখনো যুবকটীর সাথে চাহনি মিলে; রমেশ চম্‌কিয়া উঠে। তার মনে হয় সে যেন তার দিকেই চাহিয়া আছে, আর সে চাহনি ঠিক যেন সেই ধরণের চাহনি; সেই……

রমেশের মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে, ঐ বাড়ীর ঐ থানটাতেই সে দাঁড়াইয়া ছিল। এই ক্ষেতে এক চাষা হাল বাহিতেছিল। একটা গরু হঠাৎ শুইয়া পড়িল। তখন বেলা বোধ হয় একটা। সেই দুপুরের রোদের ঝলক মাথায় করিয়া চাষার পো কম-সে-কম আধঘণ্টা সেই গরুর সাধ্য-সাধনা করিল। পিঠে হাত বুলাইল, লাঠি বুলাইল—গালাগাল দিল—তার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই বালুতে গা হেলাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন যে দৃষ্টিতে রমেশ তার দিকে চাহিয়াছিল, এ যেন হুবহু সেই দৃষ্টি। একটা দয়া-মিশ্রিত ঘৃণার ভাব; যে ভাব লইয়া মানুষ বলে—বেচারা, আহা! কষ্ট পাচ্ছে!

দয়া?

দয়া সে সহিবে না।

রমেশের ইচ্ছা হয়—সেই খড়-কাটা দা দিয়া সেই যুবকের গলায় এক কোপ বসাইয়া দেয়। ইচ্ছা হয়—।

যাদৃশী ভাবনা—সিদ্ধিও তাদৃশী হইল।

কোপ বসাইল-ও—।

কিন্তু—কিন্তু সে কোপ পড়িল তার বাঁ-হাতের বুড়া আঙুলে।

উঃ, নাক মুখ বিকৃত করিয়া সে দা-টা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর ডান মুঠিতে কাটা আঙুলটা চাপিয়া ধরিয়াই ছাড়িয়া দিল। হাতটা ধরিল উঁচু করিয়া। সেই

কেবল-কাটা হাতের রক্ত তাহার বাঁ হাটুর উপর দিয়া গড়াইয়া পায়ের তলায় আসিয়া জমিতে লাগিল। আর সেই ধারা-পাতের দিকে সেই মর্ম্মর মূর্ত্তির নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। কপালে দুই একটী বিরক্তি-ক্রোধের রেখা ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

ওদিকে সরলা বকিতেছে, ব'সে ব'সে কেবল ঐ করলেই চল্‌বে? না আরো কাজকম্ম কিছু করতে হবে! জামাই এলে খড় শেদ্ধ খেতে দেবে; না? জামাই—

জামাই? হাঁ জামাই—

রমেশ উঠিল। বাড়ীর ভিতর হইতে একটা চাদর লইয়া কাটা হাতের উপর জড়াইয়া দিল। সরলা কহিল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে, এই ভর দুপুরে? ও কি? হাতে রক্ত কেন অত? কাট্‌ল—

রমেশ ততক্ষণে পথে—।

'সা'জির বাড়ী মাইল দুইয়ের পথ।

'সা' জি অর্থাৎ মধুস্থদন সাহা রমেশের ও আরো অনেকের একরূপ হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা—অর্থাৎ মহাজন।

মেঠো পথ। রমেশ চলিতেছে। মাথার উপরে সারা আকাশ জ্বলিয়া জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল। কোথাও একটু ছায়া নাই—না আকাশে—না মাটীতে। একটু আড়াল নাই। দুই ধারে ক্ষেতের পর ক্ষেত, তার পর ক্ষেত। ধূ—ধূ—ধূ—। মাঝে মাঝে আমন ধান কাটিবার পর যে আগুন দিয়াছিল, তার কালো দাগ এখনো আছে। পোড়া-ফাটা মাটী,—যেন হাড়। তারি মাঝে দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ। রমেশ চলিতেছে।

হাতের রক্ত ঝরা থামিয়াছে, ব্যথায় কাটাটা টন্‌টন্ করিতেছিল। চাদরের এক ধারে হাতটা জড়াইয়া আরেকটা ধার মাথায় তুলিয়া দিল। সূর্য্যদেব এই কাণ্ড দেখিয়া আরো হাসিয়া উঠিলেন।

প্রথমে থানা, তার পরে পোষ্টাফিস, তার পর কাছারী —জমীদারের, তারও পোয়া-মাইলটাক পরে 'সা'জির বাড়ী। রমেশ পৌছিল। সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলিয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপের ছায়ায় একটা জলচৌকী পাতা; 'সা'জি গুড়গুড়ীর নলটা হাতে করিয়া বসিয়া। খাইবার স্পৃহা যেন আর নাই।

সাহজী?

কেহ সাড়া দিল না। রমেশ আবার ডাকিল। তার পর সাহস করিয়া বলিল, আমি এসেছি···। তার দিকে না তাকাইয়াই সাহজী বলিলেন, 'আমি'টা কে?

রমেশের চোখ যেন জ্বলিয়া উঠিল। তার বাবার সামনে যে 'মধু সা' মুখ তুলিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারিত না, সেই 'মধু সা' আজ টাকার জোরে মধুস্থদন সাহজী হইয়া রমেশকে না-চেনার ভান পর্য্যন্ত করিতে পারে। সে একবার কি কথা যেন বলিতে গেল, হঠাৎ মনে পড়িল, জামাই, জামাই আস্‌ছে। কোনও মতে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে কহিল, রায়পুরের দত্তবাড়ীর—

রায়পুরের দত্ত বাড়ী? হরি দত্তের ছেলে না? হাঁ, হয়েছে। তা তোমার কাছে ত অনেক বাকী। কত এনেছ? কি হে? চুপচাপ যে? আনোনি? তা'লে কি বাবাজীর দর্শন দিতে আসা হয়েছে? সাহজীর উচ্চ-হাস্যে অদূরের একটা পাখী উড়িয়া গেল।

রমেশ বলিতে গেল, আরো যদি কিছু—

হা—হা—হা—

'সাজি' বলিলেন, বেশ বাবা বেশ। দেব না, সে তুমিও জানো, আমিও জানি। তা থাম্‌লে কেন? বল, ব'লে যাও। লেখাপড়া জানো তোমরা, তোমাদের কথা শুন্‌তে আমার বেশ লাগে।

রমেশের ইচ্ছা হইল গুড়গুড়ীটা সাজীর টেকো মাথায় বসাইয়া দেয়। কিন্তু, কিন্তু জামাই আস্‌ছে। তাকে খড় সেদ্ধ দিলে ত চলিবে না। মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল, চিঠি এসেছে, জামাই আস্‌বে। এই প্রথম বার। কাপড় চোপড় দিতে হয় জানেনই ত। তা সে ত দূরের কথা, দুমুঠো ভাত যে দেব তারও জো নেই···

সাহজী বলিলেন, তা ত বুঝ্‌লাম। ব্যবস্থা একটা করা দরকার।

রমেশের বুক আশায় নাচিয়া উঠিল।

সাহজী বলিলেন, হ্যাঁ হয়েছে। জামাইকে জমিদার-বাড়ীর অতিথিশালায় পাঠিও, বেশ থাক্‌বে, খাবে। কোন ঝঞ্ঝাট নেই। সেই ভাল হবে, কি বলো?

এও রমেশ হজম করিল, বলিল, অন্ততঃ দশটা টাকা —নইলে 'ইজ্জত' বাঁচে না।

মুখটা যতদূর সম্ভব গম্ভীর করিয়া সাহজী উত্তর দিলেন,

তা, মশায়ের ইজ্জতটা না বাঁচলে কি একেবারেই চল্‌বে না?···যাও। গোমস্তার কাছ থেকে হিসেবটা জেনে যেয়ো।

গোমস্তাকে যদি গলানো যায়।

গোমস্তা ঘরে ছিল না। গদীর উপর একটা ক্যাস-বাক্‌স ডালা ফেলা,—হয় ত খোলা। যেন আপনার অজ্ঞাতসারেই রমেশ ডালাটা তুলিয়া ধরিল, এবং তেমনি করিয়া একটা দশটাকার নোট হাতের মুঠিতে চাপিয়া ধরিল।

পেয়েছি—।

হঠাৎ কে যেন পিছনে চীৎকার করিয়া উঠিল, চোর! চোর!

রমেশ চমকিয়া চাহিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অথচ কে যেন তখনো বলিতেছে—চোর, চোর। সে সভয়ে চারিদিকে চাহিল। কেহ কোথাও নাই। তার মনে হইল, ঘরের কড়ি বরগা, থাম যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—চোর, চোর—

সে কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বাক্‌সের ডালা তুলিয়া নোট রাখিতে গেল। কিন্তু কে যেন বলিল, রমেশ যে। কি মনে করে?

গোমস্তা ঘরে ঢুকিল। নোট রাখা হইল না।

রমেশ কহিল, হিসেবটা দেখ্‌ব ভেবেছিলাম। তা বেলা হয়ে গেছে। সে বাহির হইল।

সেই দগ্ধ পৃথিবীর পথে সে হাঁটিয়া চলিয়াছে। ছুটিয়া চলিয়াছে। উপরে আকাশ চীৎকার করিয়া উঠে, চোর! চোর! পায়ের নীচে মা বসুমতী কাঁদিয়া বলে, চোর! চোর! হাতে নোটটা যেন আগুনের হল্‌কা। জ্বলিতেছে।

কাছারী বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বলুক সবে চোর, জানুক পৃথিবী। কিন্তু সে চোর হইতে পারিবে না। ওদিকে আকাশ বাতাস চীৎকার করিয়া বলিবে—চোর, চোর, দত্তবাড়ীর ছেলে চোর। হরিদত্তের ছেলে চোর—চোর—এ সে সহিতে পারিবে না। সে টাকা ফিরাইয়া দিবে।

সে ফিরিল।

কে রমেশ নাকি?

ডাকিতেছিল, কাছারীর এক আমলা। সে হল, আজ্ঞে।

এস ত।

সে আসিল। কাছারীর দাওয়ায় উঠিতেই বাবু কহিলেন, কি হে, এসেও যে আসো না। ব্যাপার কি। জমীদার কি তোমাকে জমীগুলো ব্রহ্মোত্তর দিয়েছেন নাকি।—এমনি কথা।

রমেশ কহিল, খেতে পাইনে—

রামলাল তেওয়ারী পাশেই ছিল। পেটে খোঁচা দিয়া কহিল, ভুঁড়িটা ত বেশ বাঁধিয়েছ। কেবল খাজনার—রমেশ আর সহিল না, তেওয়ারীকে। কিন্তু তার আগেই তেওয়ারীর বজ্রমুষ্টিতে ক্ষুধা-জীর্ণ দেহ তার নুইয়া পড়িল। কাটা হাতে চাপ লাগিতেই ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। আর পড়িল,—দশ টাকার সেই নোটটা।

তার পর কি যে হইল। নানা ধরণের, নানা রকমের গালাগালির মধ্যে সেই দশ টাকা খাজনার বকেয়া হিসাবে জমা হইয়া গেল। সে অবসন্নের মত বাহির হইয়া আসিল! সে চোর, চোর! চোর নাম ঘুচাইবার উপায় আর রহিল না। চোর!

কে ডাকিল, রমেশবাবু!

তার মনে হইল বলিতেছে, চোর! সে ফিরিল। রাগে নয়, দুঃখে নয়, কিসে তা সে বলিতে পারে না। কিন্তু সে ফিরিল। দেখিল পোষ্ট মাষ্টার বাবু।

রমেশ ফিরিয়া চাহিতেই পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন, চিঠি আছে।

চিঠি?

রমেশ ফিরিল। আস্তে আস্তে ডাকঘরের সরকারী বেঞ্চে আসিয়া বসিল। চোখে পড়িল, অদূরের টেবিলে টাকার স্তূপ। স্তূপ? স্তূপ বৈ কি। সাহজীর কাছে না হইতে পারে, কিন্তু রমেশের কাছে টাকার স্তূপ। এক কেতা—খান আষ্টেক দশটাকার নোট ফিতা বাঁধা; কাঁচা টাকা—খুচরাও প্রায় পঞ্চাশ টাকা হইবে। মাষ্টার বাবু দিনের হিসাব মিল করিতে ব্যস্ত।

রমেশের চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল।

এ দিকে মাষ্টার বাবু একখানা পোষ্টকার্ড তার হাতে দিয়া বলিতেছেন, এসেছে আজ তিন দিন। পিওন নেই কি না। কবে যে—

এ সব রমেশের কানে আসিতেছিল না। পোষ্টকার্ডের

উপর চোখ বুলাইতেই তার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় চেতনা-রহিত হইয়া গিয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের চোখ এড়াইল না। তিনি বলিলেন, কি খবর রমেশ বাবু? ভাল ত?

অস্বাভাবিক স্বরে রমেশ বলিয়া উঠিল, ভাল বৈ কি! জামাই, জামাই। কাল রওনা হ'য়েছে, আজ এতক্ষণ বাড়ী এসে পৌঁছেচে। জামাই—আর—আর ঘরে আমার একটু নূন পর্য্যন্ত নেই—ভাল খবর—বড় ভাল খবর—না মাষ্টার বাবু?

কতক্ষণ সে নিশ্চল নির্জ্জীবের মত চুপ করিয়া রহিল। তার পর তেমনি বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, আর আমার বাড়ীর সামনে মতি সরকারের গোলায় হাজারো মণ ধান পচ্ছে—আমার যদি শক্তি থাকৃত, যদি—সে চুপ করিল।

এ ভাবের কথার জবাব নাই। মাষ্টার বাবু বলিলেন, বাড়ী যান। এক রকম ক'রে হ'য়ে যাবে। এ রোদে বেরিয়েছেন কেন? উচিত হয়নি।

বাড়ী? হা—হা—গিয়ে দেখ্‌ব, জামাই ক্ষুধায় অস্থির, জামাই,—আর এক মুঠো চাল নেই ঘরে। হা-হা-হা—বাড়ী!

রমেশের মনে হইল, সে বাড়ী যাইতে পারিবে না। এ দৃশ্য সে পারিবে না,—পারিবে না দেখিতে। না, পারিবে না। সে যাইবে না। কিন্তু, কিন্তু থাকিবেই বা কি করিয়া? বাড়ীতে উপোসী জামাই, আর সে পারিবে থাকিতে এখানে? তার মনে হইল এক যদি কেউ দাবী দিয়া জোর—হাঁ, জোর করিয়া রাখে, তবে হয়। কিন্তু কে আছে? যদি, যদি কেহ থাকিত! জানালার পথে মুক্ত আকাশে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর খুঁজিয়া সে দেখিল, কেহ নাই—নাই—

না—নাই—নাই—

ঝন্ ঝন্ ঝন্—

মাষ্টার বাবু টাকা বাজাইয়া দেখিতেছিলেন। ঝন্ ঝন্—মনে হইল, এই ত মিলিয়াছে, উপায় মিলিয়াছে, আশ্রয় মিলিয়াছে। দাবী দিয়া জোর করিয়া রাখিবার লোক মিলিয়াছে। কেহ না দেয় আশ্রয় রাজা দিবে। রাজা তাকে ফিরাইবে না, না। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, কেউ না থাকে রাজা আছে। সব শেষে রাজা রক্ষক, রাজা পালক। রাজা আশ্রয়দাতা!

বাঘের মত থাবা মেলিয়া সে টাকার টেবিলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাষ্টার বাবুকে এক ঘুসিতে ফেলিয়া দিয়া, সেই নোটের তাড়া লইয়া সে ছুটিল। ছুটিল থানার পথে। থানার পথে।

*   *   *   *

সে নিশ্চিন্ত হইল। আশ্রয় মিলিল। রাজা দিলেন।

"শীতের শেষে—"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

(১)

শীতের শেষে ভীরুর মত
কে এলি তুই, বল্?
শিশির ফোঁটায় ঐ যে টোপায়
তোরি চোখের জল!
তুই এলি মোর কুঞ্জবনে
ফাল্গুনে আজ সঙ্গোপনে,
অম্‌নি ফুটে উঠ্‌লো আমার
ফুল-কলিদের দল!

(২)

ঘুমিয়ে ছিল আমার নিখিল
আঁধার কুয়াশায়
স্বপন মাঝে তোমায় পাবার
বিপুল দুরাশায়,
আজ ভোরে তার ঘুম ভাঙা'লে;
দখিন হাওয়া গন্ধ ঢালে,——
তোমায় হেরি কানন ঘেরি'
ফুলেরো চঞ্চল!

রুস্তমজী কাওয়াসজী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(১)

পূর্ব্বাভাষ

পারস্যের উত্তরাংশে নেহাবন্দের উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্রে পারসিক (আধুনিক পার্শী) সাসানীয় বংশের (২১৬ – ৬৫১ খৃঃ অঃ) শেষ রাজা ইয়াজদেগার্ডের সঙ্গে আরবীয় মুসলমানদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল (৬৪১ খৃঃ অঃ) তাহার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে পারস্য পারসিকগণের হস্তচ্যুত হইয়া যায়।* অত্যাচার এড়াইবার জন্য বহু পারসিক বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে রাজি হইল না তাহারা পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া পারস্যের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে খোরাসান অঞ্চলে আশ্রয় লইল। কিছুকাল পরে সেখানেও মুসলমানদের উপদ্রব আরম্ভ হইলে পারসিকগণ দক্ষিণগামী হইয়া পারস্যোপসাগরে অর্মাজ দ্বীপে, এবং তথা হইতে অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে জাহাজযোগে গুজরাটের দক্ষিণবর্ত্তী ক্যাম্বে উপসাগরস্থ দিউ বন্দরে পরিবার-পরিজনসহ আসিয়া উপনীত হয়। এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া প্রায় ৭১৬ খৃঃ অব্দে দমনের পচিঁশ মাইল দক্ষিণে সঞ্জন বন্দরে তাহারা সদলবলে গমন করে। তথাকার হিন্দু রাজা ইয়াদি রাণা পারসিকগণের মুখে তাহাদের বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে স্বরাজ্যে বাসস্থাপন করিতে অনুমতি দিলেন। এদিকে নূতন নূতন পারসিক দলও পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া স্বধর্ম্মীদের সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিন শত বৎসরের মধ্যে গুজরাট ও ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সুরাট, আহ্‌মাদাবাদ, নাভসারি প্রভৃতি অঞ্চলে তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। স্ব-ভাষা পহ্লবীর পরিবর্ত্তে পারসিকগণ গুজরাটী ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহারা ধর্ম্মে পারসিক রহিল বটে, কিন্তু একত্র বসবাস হেতু গুর্জ্জরবাসী হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল। ব্যবসা ও কৃষিকর্ম্মই জীবিকার প্রধান অবলম্বন হইল। পারসিকগণ বোম্বাই শহরে কখন বসতি বিস্তার করে তাহা সঠিক জানিতে পারি নাই। ইউরোপীয় পর্য্যটক ডাঃ ফ্রায়ার ইং ১৬৭১ সনে বোম্বাই নগরীতে মৃত্যু-মন্দির (Tower of Silence) দেখিতে পান। সুতরাং ঐ সনের পূর্ব্বেই পারসিকদের অনেকেই তথায় বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল।*

রুস্তমজী কাওয়াসজীর পূর্ব্বপুরুষ বানাজী লিমজী সুরাটের সন্নিকট জন্মভূমি ভগবাদণ্ডি হইতে ১৬৯০ সনে বোম্বাই গমন করেন। তিনি সেখানে কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি করিয়া স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করেন। বানাজী লিমজীর উদ্যোগেই ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বোম্বাই অঞ্চলের ব্যবসার সূত্রপাত হয়। তিনি ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। লোকহিতেও তিনি প্রচুর দান করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের দুর্গের সন্নিকট 'আরাদান' বা অগ্নি-মন্দির তাঁহারই কীর্ত্তি। লিমজীর পৌত্র দাদাভাই বেরামজী পারসিকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন। বাংলার তৎকালীন গবর্ণর জন কার্টিয়ারের (১৭৬৯-১৭৭২) সঙ্গে তাঁহার খুব হৃদ্যতা হইয়াছিল। তিনি কার্টিয়ারের নামে একখানা জাহাজেরও নামকরণ করিয়াছিলেন।†

* *Encyclopædia Britanica.* "Persia" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* *History of the Parsis.* By Dosabhai Framji Karaka. 1884. Vol. I Chapter I.

† Ibid. Vol. II. PP. 54-55.

রুস্তমজী কাওয়াসজীর পিতা কাওয়াসজী বানাজী বোম্বাই শহরের একজন বিশিষ্ট অধিবাসী এবং নামজাদা ব্যবসায়ী ছিলেন। ‡ তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। স্যর হেনরি ইভান্ এ কটন লিখিয়াছেন,—কাওয়াসজী বানাজী কলিকাতাস্থ রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানীর অধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু এই উক্তির সপক্ষে আদৌ প্রমাণ নাই। কারণ, সমসাময়িক 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' মাসিকে (ডিসেম্বর, ১৮৩৯) প্রকাশিত "রুস্তমজী কাওয়াসজী" শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—"The Firm [Rustomjee Cowasjee & Co.] consists of himself [Rustomjee Cowasjee] and his second son;" অর্থাৎ রুস্তমজী ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রই এই কোম্পানীর মালিক। ১৮৩৫ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের 'কলিকাতা কুরিয়র' নামক ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত 'কাওয়াসজী ফেমিলি' নামে একখানা জাহাজের ভাসান-উৎসবের বিবরণে রুস্তমজী কাওয়াসজীকেই ইহার প্রধান মালিক বলা হইয়াছে; পিতা কাওয়াসজী বানাজীর এস্থলে নামোল্লেখ মাত্র নাই।

রুস্তমজী ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা তিন ভ্রাতা—ফ্রেমজী কাওয়াসজী বানাজী, রুস্তমজী কাওয়াসজী ও খার্সেদজী কাওয়াসজী। * ফ্রেমজী কাওয়াসজী ১৭৯০ সালে বোম্বাই শহরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এবং পাঁচ বৎসর পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট নিযুক্ত হন। বোম্বাই শহরে ব্যবসায় চলিলেও তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কৃষিকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী বনাকীর্ণ পভাই তাঁহার চেষ্টা-যত্নে ফলপ্রসূ ও মনুষ্যবাসের যোগ্য হইয়াছিল। রাস্তা নির্ম্মাণ, দীর্ঘিকা খনন প্রভৃতি ছাড়া এমন কতকগুলি বিষয়ের সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন যাহা দ্বারা দেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ফ্রেমজী পশ্চিম ভারত শিক্ষা-সংসদের সভ্য থাকিয়া এবং বোম্বাইয়ের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজে বহু অর্থ দান করিয়া শিক্ষা-প্রসারে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। সে-যুগের ইংরেজি দৈনিক বম্বে টাইম্‌স (ইদানীং টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া) যাঁহাদের অর্থে ও উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ফ্রেমজী কাওয়াসজীও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

ফ্রেমজীর কীর্ত্তিগাথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার দৈনিক সম্বাদ ভাস্কর (২৭এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫১) লিখিয়াছিলেন,—

"বোম্বাই দেশীয় সমাচারে বেদ্য হয় কলিকাতা নগরীর সুবিখ্যাত পারসী বণিক রোস্তমজী কাউসজী মহাশয়ের অগ্রজ ফ্রেমজী কাউসজী মহাশয় ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোকগত হইয়াছেন মৃত মহাশয় যদিচ এইক্ষণে অধিক ধনসম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই তথাপি বিমল যশঃ রাখিয়া গিয়াছেন এবং তৎবিয়োগ জন্য বোম্বাইস্থ বহুল লোক বিশেষ পরিতাপিত হইয়াছেন তদ্ধেতু এই যে তিনি পারসী জাতীয় লোকেরদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বিস্তারিত রূপে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া তজ্জাতির উন্নতির পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন এবং এতদ্ভিন্ন তাঁহার সৌভাগ্য সময়ে তিনি দেশহিতজনক নানা ব্যাপারে সহায়তা করিয়া কীর্ত্তি পতাকা জগন্মণ্ডলে সুবিস্তার করিয়া গিয়াছেন। এই মৃত ব্যক্তির চারি সহোদরের মধ্যে এইক্ষণে কেবল রোস্তমজী মহাশয় জীবিত রহিলেন তিনিও পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যোন্নত দশায় সময় সম্বরণ করিতেছেন কিন্তু তন্মধ্যম ভ্রাতা লিমজীর সন্তানেরা অদ্যাবধি বোম্বাই নগরীর প্রধান ধনি বলিয়া বিখ্যাত আছেন।"

‡ *Calcutta Old and New*. 1907. P. 766.

* এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়—

(১) 'ফ্রেমজীর দুই ভাই ছিল, রুস্তমজী কাওয়াসজী ও খার্সেদজী কাওয়াসজী'।—*History of the Parsis.* By Dosabhai Framji Karaka. 1884. Vol. II. p. 122.

(২) ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের মতে রুস্তমজীরা ছিলেন সাত ভাই—The *National Magazine* for April, 1908. P. 151

(৩) সম্বাদ ভাস্কর (২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৫১) বলেন, 'ফ্রেমজী কাওয়াসজীর চারি সহোদর ছিলেন'।

শিক্ষানবীশ রুস্তমজী কাওয়াসজী

ইণ্ডিয়ান রিভিউ (ডিসেম্বর, ১৮৩৯) মাসিকে প্রকাশিত বিবরণ হইতে রুস্তমজীর ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী সম্বন্ধে মোটামুটি কতকটা জানিতে পারি। শৈশবেই ব্যবসা-কর্ম্ম শিখিয়া ১৮০৬ সনে জ্যেষ্ঠ মাসে ফ্রেমজী কাওয়াসজীর সঙ্গে তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮১২ সনে জাহাজযোগে কলিকাতায় আগমন করেন এবং সেখান

হইতে মাদ্রাজ, সিংহল হইয়া আবার বোম্বাই ফিরিয়া যান। তিনি ১৮১৩ সনে দ্বিতীয় বার কলিকাতায় আসেন, এবং এই বৎসর চীনদেশেও গমন করেন। সেখানে ক্যান্টন সহরে তিন বৎসর থাকিয়া ১৮১৭ সনে পুনরায় বোম্বাই যান। রুস্তমজী দ্বিতীয় বার চীন যাইয়া ১৮২০ সন্ পর্য্যন্ত তথায় বাস করেন। ঐ সনেই কলিকাতায় আসিয়া তিনি ব্যবসায় কার্য্য আরম্ভ করেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ, সিংহল, চীন প্রভৃতি স্থানে বার-বার যাতায়াতের ফলে রুস্তমজী এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের রুচি, ধরণ ধারণ, রীতি-নীতি সম্যক অবগত হইয়া ব্যবসায়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অধিগত করিয়া লইয়াছিলেন। ৺প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন, "তিনি [রুস্তমজী কাওয়াসজী] পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে বিষয় সম্পত্তি কিছুই লাভ করেন নাই।" * রুস্তমজী শৈশবাবধিই যে তৎপরতার সহিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন ইহা তাহার একটি কারণ সন্দেহ নাই।

কর্ম্মক্ষেত্রে রুস্তমজী কাওয়াসজী

রুস্তমজী কাওয়াসজী কলিকাতায় স্থায়িভাবে ব্যবসায় সুরু করিয়া দেশী-বিদেশী সকলের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ক্রুটেণ্ডন ম্যাকিনন কোম্পানীর বেনিয়ান নিযুক্ত হন। এই সময় স্বনামধন্য রসময় দত্ত তাঁহার অধীনে ঐ কোম্পানীতে গুদাম সরকারের কর্ম্ম করিতেন। * অল্পকাল মধ্যেই ব্যবসায়-ক্ষেত্রে রুস্তমজীর এরূপ প্রতিপত্তি হইল যে, সে-যুগের বীমা কোম্পানীগুলি তাঁহার সহায়তা লাভে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ১৮২৮ সনের ২৪ এ জুন ইউনিয়ন বীমা কোম্পানীর এক সভায় পাঁচ জন সভ্য লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়। কোম্পানী হইতে নদী বীমায় যে-সব পলিসি বাহির হইত, তাহাতে কমিটির পাঁচ জন সভ্যের অন্ততঃ তিন জনের স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন হইত। রুস্তমজী এই কমিটির অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। † আমরা তৎকালীন কলিকাতায় বীমা কোম্পানীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই নামের উল্লেখ পাই। রুস্তমজী নিউ অরিয়েণ্টাল জীবন-বীমা কোম্পানীর ‡ এবং ইউনিভার্সাল বীমা কোম্পানীর ভারতীয় শাখার § স্বত্বাধিকারী ও ১৮৩৪ সনের ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত সান লাইফ আপিস নামক আর একটা বীমা কোম্পানীর অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার আমলে কয়েক বৎসর ধরিয়া শেষোক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণকে অংশ-প্রতি পাঁচশত টাকা লাভ দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৩৮ সনের ৩১এ জানুয়ারি কোম্পানীর বার্ষিক অধিবেশনে রুস্তমজী যাহাতে আরও ছয় মাস ইহাকে সাহায্য করেন এইজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়। ‡

রুস্তমজী কাওয়াসজী ইংরেজের সহযোগে 'রুস্তমজী টার্ণার এণ্ড কো' নাম দিয়া এক যৌথ কারবার খুলিয়াছিলেন। ১৮৩৪ সনের ৪ঠা অক্টোবর দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজ অংশীদার লইয়া 'কার ঠাকুর এণ্ড কো' নামে এক কোম্পানী খুলিলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এক পত্রে তাঁহাকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করেন যে, ইংরেজ ও ভারতবাসী মিলিয়া যৌথ কারবারে তিনিই অগ্রণী হইয়াছেন। ১৮৩৫ সনের ৮ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা কুরিয়ারে প্রকাশিত 'পি-জি-এইচ' স্বাক্ষরযুক্ত এক পত্রে ইহার প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল। পত্র লেখক বলেন,—'কার ঠাকুর এণ্ড কো' প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বনামধন্য রুস্তমজী কাওয়াসজী 'রুস্তমজী টার্ণার এণ্ড কো' নামে এইরূপ একটি যৌথ কারবার খুলেন, এবং তিনি স্বয়ং ইহার অধ্যক্ষ হন। কুরিয়র-সম্পাদকও এই প্রতিবাদের সমর্থন করিয়া বলেন,—"দেশী-বিদেশী মিলিয়া যৌথ কারবার পরিচালনায় পথপ্রদর্শক আমাদের পার্শী বন্ধু রুস্তমজী কাওয়াসজীই। তবে হিন্দুদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম এই কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখান।" *

১৮৩৫ সনের ২৬এ মে কলিকাতা কুরিয়র পত্রে বঙ্গীয় বাণিজ্য সংসদের (Bengal Chamber of Commerce) পরিচালনা সমিতি গঠনের যে সংবাদ বাহির হয় তাহাতেও

* The *National Magazine* for April 1908-p. 151.

* *Ibid.* p. 152.

† The *India Gazette*, July 7, 1828. Advertisement.

‡ The *Calcutta Courier*, May 21, 1835.

§ *Ibid.* May 27, 1835.

¶ *Ibid.* February 1 1838.

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট অংশে ইহার সম্পাদক মহাশয় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ভ্রমের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। (পৃঃ ৩৩২)

ইহার একমাত্র ভারতীয় সদস্য হিসাবে রুস্তমজী কাওয়াসজীর উল্লেখ পাই। পরিচালনা সমিতি দুইটি অন্তঃকমিটিতে বিভক্ত ছিল,—(১) কর্ম্ম পরিচালনা কমিটি (Committee of Management and correspondence) এবং (২) সালিশী কমিটি (Committee of Arbitration)। রুস্তমজী ছিলেন কর্ম্ম পরিচালনা কমিটির অন্যতম সভ্য।

১৮৩৪ সন পর্য্যন্ত আমেরিকার বোষ্টন হইতে বরফ আমদানী করিয়া কলিকাতাবাসীদের বরফের অভাব দূর করা হইত। বরফ তখন দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল ছিল। লঙ্গেভিল ক্লার্ক নামক জনৈক ইংরেজের চেষ্টায় ১৮৩৪ সনে কলিকাতা টাউন হলে এক সভার অধিবেশনে বরফের কারখানা স্থাপন স্থির হয়। সভার অধিবেশনের তিন দিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট অনুষ্ঠাতাদের ব্যাঙ্কশাল উদ্যানের এক অংশ ইজারা দেন, এবং কলিকাতার অধিবাসীরা পঁচিশ হাজার টাকার অংশ ক্রয় করেন। রুস্তমজী কাওয়াসজীও একজন অংশীদার ছিলেন। *

রুস্তমজী কলিকাতা ডকিং কোম্পানীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি প্রায় ছয় লক্ষ টাকা মূলধনে খিদিরপুর ও সালকিয়া ডক ক্রয় করেন। † এই কোম্পানী খুব সম্ভব ১৮৩৭ সনে স্থাপিত হয়। কারণ, ১৮৩৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি সেক্রেটারিরূপে রুস্তমজী ডকিং কোম্পানীর প্রথম বার্ষিক সভা আহ্বান করেন। ‡ রুস্তমজীর দ্বিতীয় পুত্র মানকজী রুস্তমজী ইহার একজন অংশীদার ছিলেন। রুস্তমজী কোম্পানীর নিকট হইতে মাসিক দু' হাজার টাকা বেতন লইতেন। তাঁহার আমলে কোম্পানীর কার্য্য দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহিত হইত। ১৮৪৩ সনের ২৬এ অক্টোবরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত ডকিং কোম্পানীর ত্রয়োদশ অর্দ্ধ বার্ষিক সভার বিবরণে রুস্তমজীর কৃতিত্বের নিদর্শন পাই। বিবরণের তাৎপর্য্য নিম্নে দিলাম,—

সেক্রেটারি রুস্তমজী কাওয়াসজীর আপিসে ডকিং কোম্পানীর ত্রয়োদশ অর্দ্ধ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতাস্থ এই কোম্পানীর খুবই উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহার মূলধন প্রায় ছয় লক্ষ। শুনা যায়, সেক্রেটারিগণকে মাসে দু' হাজার টাকা হারে বেতন দিয়াও কোম্পানী অংশীদারগণকে শতকরা ষোল টাকা লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। সভায় আট জন উপস্থিত ছিলেন। হিসাবপত্র খুব সন্তোষজনক—এই মর্ম্মে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রুস্তমজী কাওয়াসজী কলিকাতা, কাশীপুর ঘুসুরি প্রভৃতি স্থানে জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। * ১৮৩৮ সনের ২৭এ মার্চ্চ কলিকাতায় ভূম্যধিকারী সভার প্রথম অধিবেশন হয়। সভার উদ্দেশ্য—সরকারকে 'যেমন সৌদাগরী সভায় বাণিজ্যবিষয়ক পত্রাদি প্রেরিত হইয়া থাকে সেইরূপ এ সভায় সেক্রেটারি দ্বারা ভূম্যধিকারিগণের সাধারণ উপকারার্থ পত্রাদি প্রেরণ হয়।'—১৮৩৮ সনের ২৮এ মে রুস্তমজী এবং ২৩এ জুন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মানকজী রুস্তমজী ভূম্যধিকারী সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এবং কোথাও কোথাও পরেও ‡ ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলে ব্যক্তিগতভাবে ঘরে ঘরে এবং সংঘবদ্ধ হইয়া প্রচুর লবণ উৎপন্ন করা হইত। এই সময়েই আবার বিলাতী লিভরপুলি লবণও ক্রমশঃ দেশের বাজার ছাইয়া ফেলিতে থাকে। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি

* *Calcutta Old and New.* By (Sir) Henry Evan A. Catton. 1907.

১৮৭—১৯০ পৃষ্ঠায় বরফ গৃহ (Ice House) সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। কলিকাতা কুরিয়রে (২রা নবেম্বর, ১৮৩৫) বরফ গৃহের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বঙ্গের লাট এই সর্ত্তে ব্যাঙ্কশাল উদ্যানের এক অংশ ইজারা দেন যে, চারি মাসের নোটিশে বরফ গৃহ তুলিয়া লইতে হইবে। তবে পাঁচ বৎসরের মধ্যে উঠাইয়া দিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও বরফ গৃহ—উভয়ের মনোনীত লোকের নির্দ্ধারণ অনুসারে গবর্ণমেণ্টকে গৃহের মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

† *Famous Parsis.* pp. 22-23

‡ The *Calcutta Courier,* January 20, 1834. Advertisement.

* *The Indian Review* for December 1839. p. 750. Calcutta.

† সমাচার দর্পণ, ২জুন, ১৮৩৮।

‡ "মান্দ্রাজের অন্তর্গত করমেণ্ডল কোষ্ট নামক স্থানে ৭১৩৩২৬ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছে ঝড়ে যদি হানি না করিত তবে আরও ১০০০০ হাজার মণ অধিক হইত।"—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়। ১০ বৈশাখ, ১২৯২ (২১ এপ্রিল, ১৮৩৫)।

নামে লবণ তৈরি করিবার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে সাহেবদের পরিচালনায় এক কারখানা খোলা হইলে রুস্তমজী কাওয়াসজী তাঁহার একজন প্রধান অংশীদার হন। সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে কর্ম্মচারীরা টিকিতে না পারায় এবং প্রচুর বারিপাতে লক্ষাধিক টাকা নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৪১ সনের ২৬এ জুন কলিকাতা টাউনহলে অংশীদারদের সভায় কারবার গুটাইবার প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়। * কোম্পানীর হিসাব ও লেনদেন পরীক্ষা এবং সম্পত্তি বাটয়ার রিপোর্ট করিবার ভার যে দুই জন অংশীদারের উপর পড়ে রুস্তমজী কাওয়াসজী তাঁহাদের একজন। †

রুস্তমজী ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ‡

১৮৪২ সনের ১৬ই জুলাই রুস্তমজী কাওয়াসজী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ২১এ জুলাই তারিখের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশ,—

"গত শনিবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এক সভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন—মেসার্স জন এ্যালান, লঙ্গেভিল ক্লার্ক, জন বেকউইথ, রুস্তমজী কাওয়াসজী ও বিশ্বনাথ মতিলাল।"

১৮৪৮ সনে ব্যাঙ্কের পতন পর্য্যন্ত রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ইহা রক্ষার্থ তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সফলকাম না হওয়ায় তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

জাহাজের মালিক রুস্তমজী কাওয়াসজী

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে ভারতবাসী পরিচালিত বহুসংখ্যক জাহাজ কোম্পানী ছিল। কলিকাতায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী এবং রুস্তমজী কাওয়াসজীর রুস্তমজী কাওয়াসজী এণ্ড কোম্পানী নামক দুইটি জাহাজ কোম্পানী সে-যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী এণ্ড কোম্পানী কত সনে স্থাপিত হয় তাহা জানিতে পারি নাই। তবে ১৮৩৫ সনের ৭ই ডিসেম্বরের কলিকাতা কুরিয়রে প্রকাশিত কাওয়াসজী ফেমিলি নামক জাহাজের ভাসান-উৎসবের বিবরণে ইহার প্রধান মালিকরূপে রুস্তমজীর উল্লেখ পাইতেছি। সুতরাং রুস্তমজী যে এই সময় হইতেই জাহাজের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কাহারও মতে রুস্তমজী চল্লিশখানা * কাহারও মতে ত্রিশখানা † জাহাজের মালিক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে একুশখানা জাহাজের নাম ৺প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার "রুস্তমজী কাওয়াসজীর জীবনী" শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানীর জাহাজগুলি কলিকাতা, মান্দ্রাজ, সিংহল, বোম্বাই এবং সিঙ্গাপুর, চীন, মেলবোর্ণ প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যখণ্ডে ব্যবসায় কার্য্যে খাটান হইত। §

সে-সময়ে আধা খৃষ্টিয়ানী আধা পৌত্তলিকভাবে জাহাজ ভাসান উৎসব খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইত। * সমকালিক সংবাদপত্র পাঠে রুস্তমজীর একাধিক জাহাজ ভাসানের বিবরণ জানিতে পারি। এই সকল বিবরণ হইতে সেকালের জাহাজ, জাহাজের নির্ম্মাতা, এবং দেশী বিদেশীর সামাজিক মেলামেশা, আমোদ-প্রমোদ ও উৎসবাদির একটা চিত্র পাওয়া যায়।

* বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর সেক্রেটারি কিন্তু বলেন যে, এইরূপ বিপৎপাত সত্ত্বেও তিনি এ বৎসর ৫০।৬০ হাজার মণ লবণ তৈরি করিতে পারিবেন। *The Friend of India.* October 14, 1841.

† *The Friend of India.* July 1, 1841. Proceedings of the Salt Meeting.

‡ *The Calcutta Courier,* January 17, 1838. Advertisement.

* "Baboo Rustomji...actually built a dock and sailed 40 ships at a time under his own ownership." *Famous Parsis.* Messrs. G. A. Natesan & Co. P. 23.

† *Calcutta Old and New.* By H. E. A. Cotton. P. 766. "The firm [Rustomjee Cowasjee & Co]...owned a fleet of not less than Thirty opium clippers."

‡ *The National Magazine* for April. 1908. P. 152. জাহাজগুলির নাম :—স্কুনার কাপা, জোস্‌ফিনা ফর্ম্ম, ব্রিগ ব্ল্যাক জোক, বার্ক সিল্ক, রুস্তমজী কাওয়াসজী, কাওয়াসজী ফেমিলি, এরুয়াদ, স্কুনার পার্ল, ব্রিগ ফরসেয়ার, ফ্রেমজী কাওয়াসজী, মারমেড, খার্সেদজী কাওয়াসজী, রয়্যাল এক্‌স্‌চেঞ্জ, ব্রিগ প্রেমাভেরা, ব্রিগ লিনেট, বার্ক এ্যাগনেস, ব্রিগ পিস্‌ল, বার্ক টার্গেট, স্কুনার ডেভিল, ব্রেমার, ফোর্থ।

§ *The Indian Review* for December, 1839. p. 750.

* *Chow-Chow.* By Lady Falkland, (who came to India in 1848). Chapter 1. p. 15.

'রুস্তমজী কাওয়াসজী' নামে রুস্তমজীর আর একখানা জাহাজ প্রথম যাত্রাতেই সেকালের সব চেয়ে দ্রুতগামী ক্লিপার স্যর এড্‌ওয়ার্ড রায়ানকে হারাইয়া দিয়া বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল,—

'রুস্তমজী কাওয়াসজী, যাহা গত জুলাই মাসে (১৮৩৯) ভাসান হইয়াছে, ক্ষিপ্রতার জন্য বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।...ইহা সিঙ্গাপুর হইতে রওনা হইয়া ষষ্ঠ দিনেই এ-যুগের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জাহাজ স্যর এডওয়ার্ড রায়ানকে অতিক্রম করিয়া এগার দিনে মাকাও † পৌঁছিয়াছে। ‡

রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানীর জাহাজগুলি যে শুধু ব্যবসাতেই খাটান হইত তাহা নহে, দ্রুতগামী বলিয়া সুনাম থাকায় ১৮৩৯ সন হইতে চীন-অভিযানে ব্রিটিশ সরকার ইহাদের অনূ্যন পনরখানা ভাড়া করিয়াছিলেন।* সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহার কয়েকখানির উল্লেখ আছে। † রুস্তমজীর 'গোলকোণ্ডা' নামে একখানা জাহাজ চীন যুদ্ধে নষ্ট হয়।

রুস্তমজীর কোন কোন জাহাজে ডাক চলাচল করিত,—

"কাওয়াসজী ফেমিলি চীন হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ৬ই জানুয়ারি (১৮৩৮) পর্য্যন্ত ক্যাণ্টনের সব চিঠিপত্র আনয়ন করিয়াছে। ‡"

রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানীর 'ফ্রেমজী কাওয়াসজী', 'রুস্তমজী কাওয়াসজী' প্রভৃতি কোন কোন জাহাজ ভারতবর্ষের বাহিরে মরিসস দ্বীপে শ্রমিক প্রেরণেও নিয়োজিত হইত। §

বাষ্পীয় পোত প্রবর্ত্তনে রুস্তমজী কাওয়াসজী

ভারতবর্ষের মধ্যে ও বাহিরে বাষ্পীয় পোতে ডাক-চলাচল ও লোক-যাতায়াত প্রচেষ্টায় রুস্তমজীর কৃতিত্ব কম নহে। সে-যুগে ইংলণ্ড হইতে আলেকজাণ্ড্রিয়া এবং সুয়েজ হইতে কলিকাতা ও প্রাচ্য খণ্ডের নানা বন্দরে বাষ্পীয় পোতে ডাক-চলাচল প্রবর্ত্তনের জোর আন্দোলন চলিয়াছিল। বিলাতে কম্‌প্রিহেন্‌সিভ স্কীম কমিটি নাম দিয়া এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি স্থাপিত হয়। সুয়েজ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ডাক-চালাইবার জন্য রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল ও রামকমল সেন এবং টার্টন প্রমুখ নয়জন ইংরেজ লইয়া 'প্রিকার্স'র স্কীম কমিটি' নামে একটি কোম্পানী গঠিত হয়। * ১৮৪২ সনের মার্চ্চ মাসে এই কোম্পানীর আট শত অংশের মধ্যে মাত্র দুই শত চৌত্রিশটি বিক্রী হইতে বাকি ছিল। এমন সময়, এক আকস্মিক কারণে প্রথম কোম্পানীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায় এবং দ্বিতীয়টির কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। কি কারণে ইহা সম্ভব হইল তাহা নিম্নের উক্তি হইতে সম্যক বুঝা যাইবে,—

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সহজে ডাক-চলাচল ও যাতায়াতের জন্য কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও সিংহলের লোকেরা জাহাজ কোম্পানী খুলিবার উদ্দেশ্যে বিস্তর টাকা চাঁদা দিয়াছিল। লণ্ডনে স্থাপিত একটি কোম্পানী [Comprehensive Scheme Committee] সুয়েজ যোজকের উভয় পার্শ্বে এবং কলিকাতার একটি কোম্পানী [Precursor Scheme Committee] শুধু ভারতবর্ষের দিকের সমুদ্রগুলিতে জাহাজ চালাইবার সর্ব্ব প্রকার উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন বিলাতের গভর্ণমেণ্ট হইতে আলেকজাণ্ড্রিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ডাক চালাইবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়া বিলাতের লোকেরা পেনিনসুলার এণ্ড অরিয়েণ্টাল নামে এক কোম্পানী খুলেন। এই কোম্পানী অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষের দিকের সমুদ্রগুলিতেও ডাকসমেত জাহাজ চালাইবার চমৎকার সনন্দ লাভ করেন। অতঃপর, সর্ব্বত্র জাহাজে ডাক লইয়া যাইবার পূর্ব্বে এই বিলাতী ডাক মান্দ্রাজ ও সিংহল হইয়া সরাসরি কলিকাতায় লইয়া যাইবে, ইহার ডিরেক্টরগণ স্পষ্ট ভাষায় এই অভিপ্রায় প্রকাশ

† পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ, ক্যাণ্টন নদীর মুখে অবস্থিত। সেকালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল।

‡ *The Friend of India,* December 19, 1839.

* *Calcutta Old and New.* 1907. P. 766.

† *The Friend of India.* July, 1840.

‡ *The Calcutta Courier,* February 15, 1838.

§ *The Friend of India.* March 9, 1843 & *The Eastern Star,* February, 20.

* *The Calcutta Courier.* November 25, 1839. The precursor Association.

করায় লণ্ডন ও কলিকাতার কোম্পানী দুইটি তাঁহাদের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন এবং লণ্ডন কোম্পানীর অংশীদারগণ অনেকেই পেনিন্‌সুলার এণ্ড অরিয়েণ্টাল কোম্পানীতে অংশগুলি স্থানান্তরিত করেন। *

গঙ্গার এপার-ওপার যাতায়াতের জন্য ষ্টীম ফেরি ব্রিজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিরূপে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য নয় জন সভ্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। †

নদীমাতৃক বাংলায় ও বাংলার বাহিরে সর্ব্বত্র ষ্টীমারযোগে গমনাগমনের সুবন্দোবস্তের জন্য ১৮৪৪ সনের ২৩এ ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) কলিকাতা টাউনহলে ত্রিশজন দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য লোক লইয়া এক সভার অধিবেশন হয়। কোম্পানীর উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপায় অবলম্বনের এবং অনুষ্ঠান-পত্র গঠনের ভার এই সভা দ্বারা মনোনীত এক অস্থায়ী পরিচালক কমিটির (Board of Directors) উপর পড়ে। দশ জন সভ্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হয় এবং বাবু রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। ‡ ১৮৪৪ সনের ৮ই মে (বুধবার) কলিকাতা টাউনহলের সভায় অস্থায়ী কমিটি কর্ত্তৃক গঠিত অনুষ্ঠানপত্র পাশ করা হয়। কোম্পানীর নাম হইল ইণ্ডিয়ান জেনরল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী। সভায় প্রকাশ পায় যে, কোম্পানীর অংশসমূহের মধ্যে ১,১৪৬টা অর্থাৎ ⅗ ভাগ ক্রয়ের জন্য আবেদন ইতিমধ্যেই লব্ধ হইয়াছে। এই সভায় কোম্পানীর স্থায়ী পরিচালক কমিটি নিযুক্ত হয়। যাঁহাদের লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছিল, রুস্তমজী কাওয়াসজী তাঁহাদের অন্যতম ও একমাত্র ভারতীয়। §

বদ্যোৎসাহী রুস্তমজী কাওয়াসজী

উইলিয়ম উইলবারফোর্স বার্ড ভারতবর্ষের অস্থায়ী বড়লাটরূপে দাসপ্রথা নিবারণ (১৮৪৪), এবং শিক্ষা প্রচার কল্পে নানা প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতবাসী আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-বিদায় স্মরণীয় করিবার জন্য ১৮৪৪ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) কলিকাতা টাউনহলের জনসভায় তাঁহার প্রিয় কার্য্য শিক্ষায় উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এগার জন দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া 'বার্ড স্কলারশিপ টেষ্টিমনিয়াল কমিটি' গঠিত হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী কমিটির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। * তিনি কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশনে যোগদান করিয়া ইহার কার্য্যের সহায়তা করেন। এই অধিবেশনে চাঁদার খাতা বিলি করিবার এবং আদায়ী টাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জমা দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। †

দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের জন্য হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে সি. এইচ. ক্যামেরন ও জে. ই. লায়াল বিশেষ পদক প্রদানের ব্যবস্থা করেন। কলেজ-মণ্ডপে এক সভায় (৯ই অক্টোবর, ১৮৪৪) অরুণচন্দ্র বসু, রাজনারায়ণ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বড়লাট স্যর হেনরি হার্ডিঞ্জের হস্ত হইতে এই পদক গ্রহণ করেন। যে-সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজী একজন। ‡

১৮৪৫ সনের ২৭এ মার্চ্চ মেডিকেল কলেজের বাৎসরিক সভায় স্যর হেনরি হার্ডিং ছাত্রগণকে উপাধি, বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান করেন। রুস্তমজী কাওয়াসজী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। §

পরবর্ত্তী বৎসর বাৎসরিক সভায় রুস্তমজী কাওয়াসজী কলেজের সফলকাম ছাত্রদের স্বর্ণ-পদক দিয়াছিলেন। সম্বাদ ভাস্কর (৭ই এপ্রিল, ১৮৪৬) লেখেন,—

> "রুস্তমজী কাওয়াসজির গুণের কথা লেখা অধিক, তাঁহার গুণ কলিকাতার বাহির রাস্তায় জলপ্রণালীতেই নগরের মালাস্বরূপ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ঐ বাবু আরও অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, বিশেষতঃ সাধারণের বিদ্যাবৃদ্ধির জন্য মেডিকেল কলেজে স্বর্ণ মেডেল দিলেন।

---

* The *Friend of India*. December 14, 1843. Proceedings of the Steam Memorial Meeting.

† *Ibid*. August 4, 1842, & Bengal Hurkaru, August 3.

‡ *Ibid*. February 29, 1844.

§ *Ibid*. May 6, 1844.

* *The Friend of India*. September 19, 1844.

† *Ibid*. September 26, 1844.

‡ *Ibid*. October 17, 1844.

§ *Ibid*. April 3 1845.

অতএব এমৎ সৎস্বভাব মনুষ্য অবশ্যই ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন।"

দ্বারকনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ১৮৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসে স্যর জন পিটর গ্রাণ্টের নেতৃত্বে কলিকাতা টাউনহলে এক জনসভা হয়। সভার ধার্য্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রধানটি এই,—লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে সাধারণ শিক্ষা বা কারু শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র পাঠাইবার উদ্দেশ্যে 'দ্বারকানাথ ঠাকুর এন্‌ডাউমেণ্ট ফণ্ড' নামে এক ভাণ্ডার খোলা হইবে। সরকারী বেসরকারী কয়েকজন ইহার ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য, রুস্তমজী কাওয়াসজীও অন্যতম ট্রাষ্টী নির্ব্বাচিত হন। *

সাধারণ বিদ্যা ছাড়া অর্থকরী বিদ্যার প্রচারেও রুস্তমজী কাওয়াসজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। উইলিয়ম কেরি প্রতিষ্ঠিত কৃষি ও উদ্যান-রচনা সমিতি (Agricultural and Horticultural Society) দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কৃষি শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষে অনেক স্থলে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ সালে এই সমিতির সঙ্গে রুস্তমজীর যোগসাধন হয়। তিনি ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। † সমিতিতে রুস্তমজীর দানও ছিল যথেষ্ট। ১৮৪৫ সনের ২০এ নবেম্বর ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশ,—

"কৃষি সমিতির গত অধিবেশনে জানান হয় যে, মেটকাফ হল নির্ম্মাণে যে ঋণ হইয়াছে অংশমত তাহা পরিশোধ করিবার জন্য সমিতির সভ্য রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ও বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রত্যেকে এক শত টাকা এবং ডাঃ হফ্‌নেগ্‌ল'ও রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রত্যেকে দুই বৎসরের জন্য বিনা সুদে পাঁচ শত টাকা আগাম দিতে সম্মত হইয়াছেন।"

৺প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন,—'রুস্তমজী সমিতিকে হাজার টাকা ধার দেন এবং পরে ইহা সমিতিকে দান করেন।' ‡

৺প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,—'রুস্তমজী কাওয়াসজী ১৮৪৮ সনে বঙ্গের এশিয়াটিক সোসৈটিতে যোগদান করেন।' * বস্তুতঃ রুস্তমজী ১৮৪৪ সন হইতেই যে সোসাইটির সভ্য ছিলেন তাহা ইহার বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যাইতেছে। ১৮৪৮ সন পর্য্যন্ত রুস্তমজী ইহার বিশিষ্ট চাঁদাদাতা সভ্য ছিলেন। রুস্তমজীর পুত্র মানকজী রুস্তমজী ১৮৪৬ সনে সোসাইটির সভ্য হন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুস্তমজী একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলে পিতা-পুত্র উভয়েই সোসাইটির সভ্য পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। †

ভারতবর্ষের অস্থায়ী গবর্ণর জেনরল স্যর চার্ল্‌স মেটকাফ'(১৮৩৫—১৮৩৬) মুদ্রাযন্ত্রকে শৃঙ্খলমুক্ত করিলে কলিকাতবাসী দেশী-বিদেশী প্রধানগণ তাঁহার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য 'মেটকাফ লাইব্রেরী' নামে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের সংকল্প করেন। যাঁহারা গ্রন্থাগার স্থাপনে সর্ব্বপ্রথম অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজী একজন। রুস্তমজী মেটকাফ লাইব্রেরিতে ২০০৲ দুই শত টাকা দান করেন। ‡

সভা-সমিতিতে রুস্তমজী কাওয়াসজী

সাধারণের হিতার্থ অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে রুস্তমজী কাওয়াসজী সাগ্রহে যোগদান করিতেন। তিনি স্বদেশের স্বার্থকেই আমরণ বড় করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত উপস্থিত হইলে তিনি শাসিতের পক্ষই অবলম্বন করিয়াছেন। তাই বলিয়া রুস্তমজী বিদেশীর সকল উদ্যোগ-আয়োজন বা প্রচেষ্টাকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন না। এমন অনেক ত্যাগী ভারত-বন্ধু বিদেশী ছিলেন যাঁহাদের গুণের আদর করিতে অথবা যাঁহাদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তিনি যে-সকল সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া গুণগ্রাহিতা, নির্ভীকতা ও স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, পুরাতন সংবাদ-

* *Vide* Memoir of Dwarkanath Tagore. By Kissory Chand Mitra. 1870. Appendix C. (Quoted from the *Hurkaru,* December 4, 1846.)

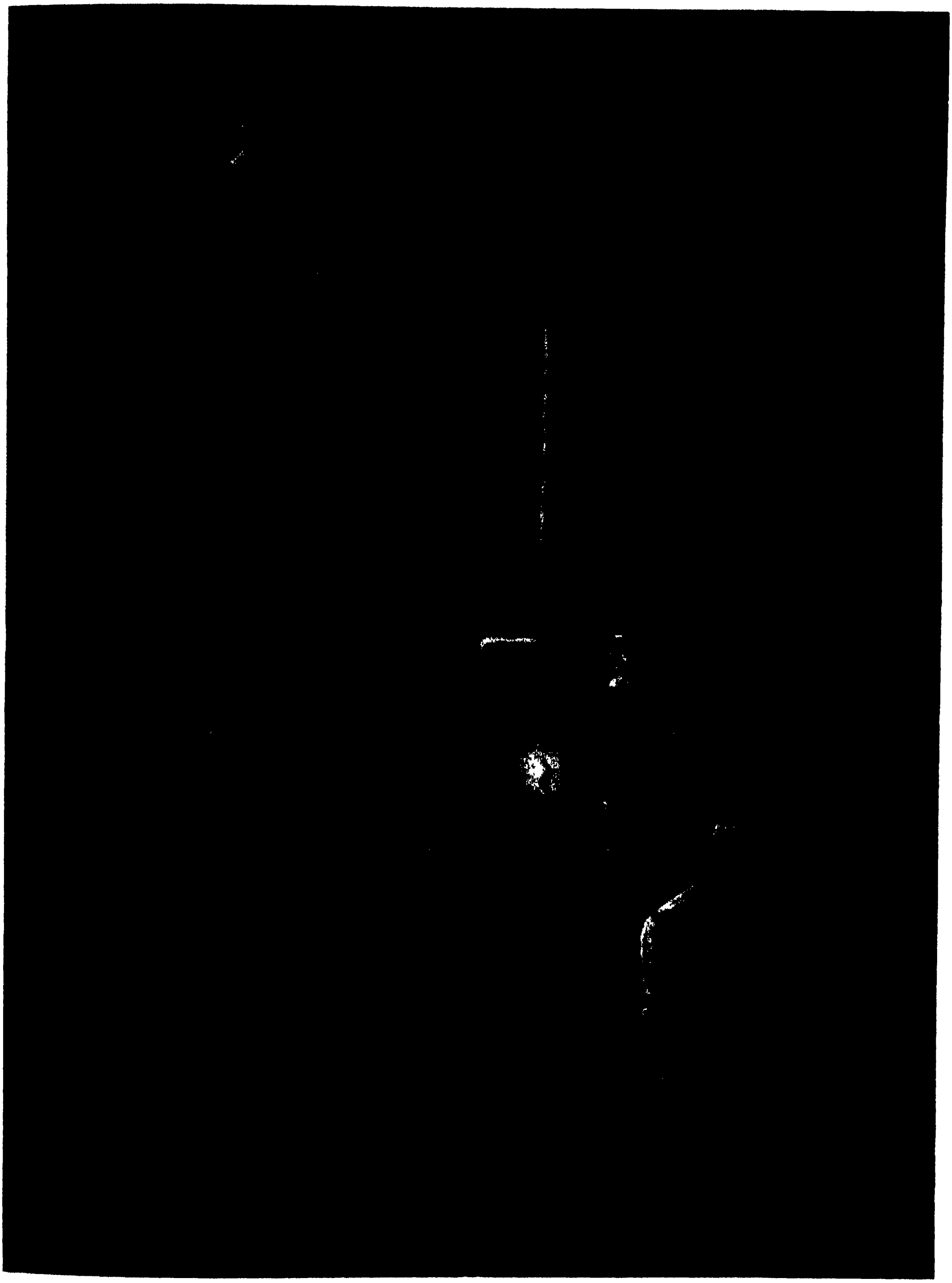
† *The National Magazine* for May 1908. Rustomjee Cowasjee (2). P. 173.

‡ *Ibid.*

* *The National Magazine* for May 1908. P. 173.

† Royal Asiatic Society of Bengal's Journal. Vols. (1844—1849)-Annual reports.

‡ *The Calcutta Courier*. September 3, 1835.



জুম্মা রাতে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু দে ঘটক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

পত্রের জীর্ণ ফাইল হইতে তাহার কয়েকটি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিব।

১। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে তাঁহার গুণাবলী স্মরণীয় করিবার উপায় নির্দ্ধারণার্থ যাঁহারা ১৮৩৪ সনের ৫ই এপ্রিল (শনিবার) কলিকাতা টাউনহলে জনসভা আহ্বান করেন, রুস্তমজী কাওয়াসজী তাঁহাদের মধ্যে একজন। এই তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যর জেম্‌স পিটর গ্রাণ্ট সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় একটি নির্দ্দেশে অর্থ সংগ্রহের জন্য দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য লোক মিলিয়া এক কমিটি গঠিত হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী কমিটির একজন সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি স্বয়ং রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডারে আড়াই শত টাকা দান করেন। *

২। ১৮৩৫ সনের জানুয়ারি মাসে সরকার নিজস্ব বীমা কোম্পানী স্থাপনের মানস করিয়া নিয়মাবলী গঠনের জন্য এক কমিটি স্থাপন করেন। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে কলিকাতায় বেসরকারী বীমা কোম্পানী-গুলি, এবং ইহাতে স্বার্থসংবদ্ধ ইংরেজ ও ভারতবাসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একযোগে সরকারের প্রস্তাবের দোষ ত্রুটি দর্শাইয়া এক আবেদন পেশ করেন। তাঁহাদের মতে নিম্নলিখিত কারণে লোকে বেসরকারী বীমা কোম্পানীগুলি ছাড়িয়া সরকারী বীমা কোম্পানীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের হানি হইবে—(১) সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে লোকের অটল বিশ্বাস, (২) সরকারী বীমা কোম্পানীর অল্পতর হার (Premium)। রুস্তমজী কাওয়াসজী এই ব্যাপারে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। † বলা বাহুল্য, সরকার-ও এ ব্যাপারে আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই।

৩। ১৮২৩ সনের মার্চ্চ মাসে সরকার আইন করিয়া ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে ভারতবর্ষের অস্থায়ী বড়লাট স্যর চার্ল্‌স মেটকাফ এই আইন রহিত করিয়া দেন। কলিকাতার গণ্যমান্য পচাঁশীজন লোক এই সুকৃতির জন্য মেটকাফ মহোদয়কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে কলিকাতা টাউনহলে জনসভা আহ্বান করিতে ১৮৩৫ সনের ১৮ই মে সেরিফকে অনুরোধ জানান। * ৮ই জুন সকাল ৯-৩০ মিনিটের সময় সেরিফ ডব্‌লিউ হিকির নেতৃত্বে কলিকাতা টাউনহলে দেশবাসীর পক্ষ হইতে মহামতি মেটকাফকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা সমীচীন বলিয়া ধার্য্য হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী এ বিষয়েও বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। ‡

ভারতবর্ষ-ত্যাগের প্রাক্কালে ১৮৩৮ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউন হলে ভারত-বন্ধু মেটকাফ মহোদয়কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে এক ভোজ দেওয়া হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী এই কার্য্যেও খুব সহায়তা করিয়াছিলেন। §

৪। ১৮৩৫ সালের ১৮ই জুন ৪-৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা নেটিভ হাসপাতালের উদ্যোগে সি. ডব্‌লিউ. স্মিথের সভাপতিত্বে টাউনহলে মধ্য-কলিকাতায় একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপন মানসে জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় গৃহীত এক নির্দ্দেশে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রমুখ বার জন * দেশীয় প্রতিনিধি লইয়া সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায়ের জন্য এক কমিটি গঠিত হয়। আর এক নির্দ্দেশে প্রকাশ থাকে যে, হাসপাতালের কার্য্য পরিদর্শনার্থ হিন্দু ও মুসলমান চাঁদা-দাতৃগণের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি ফিভার হাসপাতাল কমিটিতে নিযুক্ত হইবেন। রুস্তমজী কাওয়াসজী ফিভার হাসপাতালে তিন হাজার টাকা দান করেন। সভাক্ষেত্রেই ষোল হাজার টাকা চাঁদা আদায় হয়। †

* সমাচার দর্পণ। ২৬ মার্চ্চ ও ৯ এপ্রিল, ১৮৩৪। প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৮ সংখ্যায় (পৃঃ ৪৭৯,৪৮০) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সমসাময়িক সংবাদপত্রে রামমোহন রায়" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† The *Calcutta Courier*. May 26, 1835.

* *Ibid.* June 6, 1835.

‡ *Ibid.* June 8, 1835.

§ *Ibid.* February 1838.

* রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, রসময় দত্ত, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাজচন্দ্র দাস, আগা কুরবোলি মাহোম, মথুরানাথ মল্লিক, রাজা রাজনারায়ণ রায়, মহম্মদ মাহাদি মাস্‌কি, মতিলাল শীল, বিশ্বনাথ মতিলাল, দ্বারকানাথ ঠাকুর।

† *The Calcutta Courier*. June 1, 1835.

৫। ভারতহিতৈষী কর্ণেল জেম্‌স ইয়ং ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে, ভারতবাসীদের নাগরিক এবং রাষ্ট্রীক অধিকার লাভের আন্দোলনে, জুরি দ্বারা বিচারকার্য্য হওয়ার ব্যাপারে, সর্ব্বোপরি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৪০ সনের জুন মাসে তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। এই ব্যাপারেও রুস্তমজী কাওয়াসজী অগ্রণী ছিলেন। ‡

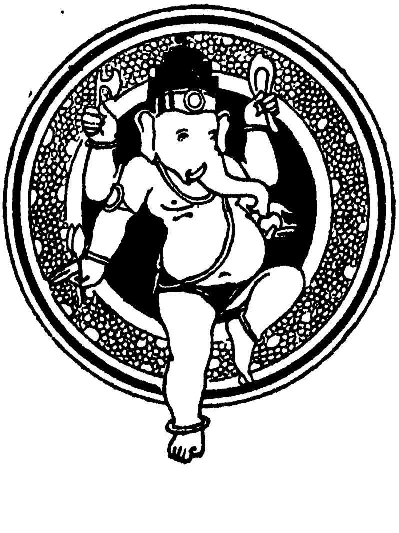
৬। পেনিন্‌সুলার এণ্ড অরিয়েণ্টাল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজ সুয়েজ হইতে মান্দ্রাজ ও সিংহল হইয়া ডাকসহ সরাসরি কলিকাতায় পৌছিবে—এইরূপ একটা মৌখিক বুঝাপড়া হওয়ায় রুস্তমজী প্রমুখ লোকেদের পরিচালিত প্রিকাস'র কমিটি কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। তখন বহু কলিকাতাবাসী পেনিন্‌সুলার কোম্পানীর অংশ ক্রয় করেন। ১৮৪৩ সনের শেষভাগে পেনিন্‌সুলার কোম্পানি প্রস্তাব করেন যে, জাহাজ ডাক লইয়া সুয়েজ হইতে বোম্বাই হইয়া তবে কলিকাতায় যাইবে, এবং এই জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ইহার অনুমতি চাহিয়া পাঠান। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য হইলে কলিকাতায় ডাক পৌছিতে বিলম্ব হইবে, ফলে প্রাচ্য-খণ্ডের ব্যবসায় অচল হইয়া পড়িবে। কলিকাতায় পূর্ব্বে বোম্বাই ডাক পৌছিলে উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবসায়গত পার্থক্য অর্থাৎ এক স্থানের সুবিধা ও অন্য স্থানের অসুবিধা হওয়াও অনিবার্য্য। কাজেই, উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ কল্পে ১৮৪৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। ডব্‌লিউ-পি-গ্রাণ্ট সভার তথা কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে পেনিন্‌সুলার কোম্পানীর প্রস্তাবের প্রতিবাদপূর্ণ এক স্মারক লিপি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের সভাপতি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা প্রভৃতি উপরওয়ালাদের নিকট প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রস্তাবটি সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। *

সভাক্ষেত্রে যে-সব দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি টাকা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা,—

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	২,০০০ টাকা
রাজচন্দ্র দাস	২,০০০ „
দ্বারকানাথ ঠাকুর	৫,০০০ „
মথুরানাথ মল্লিক	২,০০০ „
রুস্তমজী কাওয়াসজী	৩,০০০ „
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	১,০০০ „
মাধব দত্ত	১,০০০ „
মোট	১৬,০০০ টাকা

The Friend of India January 23, 1840.

* *The Friend of India* December 14, 1843 : Proceedings of the Steam Memorial Meeting.



"মণির মোহে জীবন দহে…"

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

সুদখোর পঞ্চানন মুখুয্যের নাম গ্রামের বা তাহার চারিদিককার লোকগুলি ভাল রকমেই জানিত। সকাল বেলায় কেহ পঞ্চাননের নাম লইত না; প্রবাদ ছিল—সকালে তাঁহার নাম লইলে সেদিন অদৃষ্টে অন্ন জুটিবে না।

গ্রামের অনেকেই, এমন কি প্রতাপশালী জমিদার পর্য্যন্ত, পঞ্চাননের নিকট ঋণী। সুদের আশায় পঞ্চানন সকলকেই টাকা ধার দিতেন,—মাস মাস বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সুদ আদায় করিতেন। অনেক সময় সুদের সুদও আদায় হইত।

পঞ্চাননকে লোকে বলিত ছিনে জোঁক; যাহার গায়ে তিনি একবার দাঁত বসাইবেন তাহার খানিকটা রক্ত টানিয়া লইবেনই।

বাড়ীতে তাঁহার কেহ ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ একা। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া তিনি তাগাদায় বাহির হইতেন; কোন কোন দিন ফিরিতে বারটা-একটা হইত। কোন কোন দিন সকাল সকাল ফিরিতেন। যেদিন বিলম্ব হইত সেদিন আর অনর্থক কাঠ কয়লা পোড়াইয়া অপব্যয় করিতেন না, যা হয় দুইটা খাইয়া দিন কাটাইয়া দিতেন।

পয়সা যে কিরূপে সঞ্চয় করিতে হয় তাহা পঞ্চানন জানিতেন। যদি কোনদিন চিঁড়া মুড়কি দুই পয়সার কিনিয়া খাইয়া দিন কাটাইতে পারা যায়, ভাত তরকারী তাঁহার রাঁধিবার দরকার হয় না। সূক্ষ্মরূপে হিসাব করিয়া দেখিতেন ইহাতে খরচ অনেক বাঁচিয়া যায়। ভাত রাঁধিতে কেবল চালেরই খরচ নাই। কাঠ কয়লা প্রথমেই দরকার। তাহার পর তরকারী আছে,—লবণ আছে, তৈল মসলা কোনটাই বা না লাগে।

একদিন একটা হাঁড়ি দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি তিন দিন আর ভাত রাঁধেন নাই—চিঁড়া গুড় খাইয়া দিন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। লোকে বলিল তিনি হাঁড়ির মূল্য উসুল করিয়া লইতেছেন। একটা পয়সা, একটা অতি তুচ্ছ জিনিসও ছিল তাঁহার গায়ের রক্ত। এতটুকু জিনিস তাঁহার অপব্যয় হইবার যো ছিল না। যেখানে যাহা পড়িত তিনি তাহা খুঁটিয়া ঘরে তুলিতেন।

লোকে জিজ্ঞাসা করিত—"কার জন্য সঞ্চয় করছেন মুখুয্যে মশাই? আপনি কি চিরকাল বেঁচে থেকে এ সব ভোগ করবেন?" পঞ্চানন এ প্রশ্নে যে বিশেষ খুসি হইতেন না, তাহা বলাই বাহুল্য; মনের রাগ মনেই চাপিয়া তিনি মুখে হাসি ফুটাইয়া উত্তর দিতেন—"না হয় তোমাদের বিলিয়ে দিয়ে যাব।" পরক্ষণেই শক্ত হইয়া গম্ভীর মুখে বলিতেন, "তা বলে ভেব না আমি এখনই মরব, আর তোমরা আমার টাকাগুলো ফাঁকি দিয়ে খাবে। যা ধার দিয়েছি সুদশুদ্ধ সব আদায় করব, তবে আমার নাম পঞ্চানন মুখুয্যে। তার পর মরব, তার আগে যমদূত আমায় ছুঁতে পারবে না, তা জেনো।"

যেদিন ছিদাম মণ্ডলের যথাসর্ব্বস্ব দেনার দায়ে নিলাম করাইয়া তিনি নিজের টাকা আদায় করিয়া লইলেন—সেদিন প্রবীণ বিহারী ভট্টাচার্য্য একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "কি করতেই বা এত কাণ্ড করছ পঞ্চানন, সত্যিই তোমার টাকা ভোগ করবে কে? যে নাতির আশায় তুমি সব রাখছ সে সত্যি আছে কি না তাই বা কে জানে?"

পঞ্চাননের বুকে ধক্ করিয়া এই কথাটাই লাগে।

কিন্তু কে তাঁহার পুত্র, কে তাঁহার নাতি? কোথায় তাহারা গিয়াছে, আছে কি না আছে, তাই বা কে জানে?

সে কি আজিকার কথা? স্ত্রী এতটুকু ছেলে যোগেশকে রাখিয়া মারা যান। পঞ্চানন পুত্রকে বুকে করিয়া মানুষ করেন। সেই পুত্র বড় হইল, তাহার বিবাহ দিলেন। তখন তো তাঁহার বয়স বড় কম নয়—বোধ হয় ছত্রিশ

সাঁইত্রিশ হইবে। যোগেশ তখন সতের বৎসরের; এবং পুত্রবধূ দুর্গা তখন বার বৎসরের।

কি কুমতিই তখন হইয়াছিল, এতকাল সংযমের মধ্যে কাটাইয়া এই সময়েই তাঁহার অধঃপতন হইল। তিনি কৃপণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অত আদরের পুত্রকে যে তিনি কখনও কোন জিনিস দেন নাই, সেই তিনি একটী অস্পৃশ্যা নারীকে লইয়া উন্মত্ত হইয়া গেলেন, এবং তাহারই জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন।

যোগেশ কিছুদিন চুপ করিয়া সহিয়া গেল। তাহার পর একদিন পিতার সহিত বিবাদ করিয়া সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। স্নেহপ্রবণ পিতার বুকটা ফাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু কেবল পুত্রের কার্য্যের উপযুক্ত দণ্ড দিবার জন্যই তিনি তাহাকে ডাকিলেন না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল। যে মেয়েটীকে লইয়া এত কাণ্ড বাধিয়াছিল, সে একদিন কলেরায় আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল।

পঞ্চানন পুত্র ও পুত্রবধূকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। যোগেশ আসিল না। লোক আসিয়া সংবাদ দিল—সে আসিবে না। শুনা গেল যোগেশের একটী পুত্র হইয়াছে। ইহার পর শুনা গেল, যোগেশ পশ্চিমে কোথায় কাজ পাইয়া স্ত্রী-পুত্রসহ সেখানে চলিয়া গেছে। পিতাকে সে ক্ষমা করিতে পারে নাই; তাই পিতার কাছে আর আসে নাই।

তাহার পর এই উনিশটা বৎসর কাটিয়া গেছে, পঞ্চাননের বয়স তেষট্টি বৎসর পার হইয়া গেছে, মাথার সব চুলগুলা সাদা হইয়াছে, দেহটা সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তবু পঞ্চাননের মনে আশা আছে—পুত্র তাঁহার কাছে না ফিরিয়া আসুক, পৌত্র একদিন আসিবেই। তাহারই জন্য তিনি অর্থ সঞ্চয় করিতেছিলেন। পুত্রকে কিছুই দিতে পারেন নাই, পৌত্রকে তিনি ধনবান করিয়া রাখিয়া যাইবেন।

দিন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। অনেক রকমে পুত্র ও পৌত্রের খোঁজ লইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

(২)

গ্রামের লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল—পঞ্চাননের বাড়ীতে কোথা হইতে একটা ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে।

বয়স বোধ হয় ষোল সতের হইবে, লম্বা পাতলা ধরণের ছেলেটী! মুখ দেখিলে মনে হয় খুব চালাক, আর সত্যই তাই। তাহা না হইলে পঞ্চাননের মত লোক তাহাকে আশ্রয় দিত না।

প্রথমে তাহাকে আবিষ্কার করিল ছেলেরা। ঘাটে স্নান করিতে গিয়া অপরিচিত এই ছেলেটীকে দেখিয়া তাহারা নিজেরাই আসিয়া আলাপ করিয়া জানিতে পারিল সে কাল বৈকাল হইতে একটী বৃদ্ধের বাড়ীতে আছে, সে বৃদ্ধের আর কেহ নাই!

দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্রামময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল। কাল পঞ্চানন পাঁচ ক্রোশ দূরস্থিত চাতরা গ্রামে তাগাদায় গিয়াছিলেন, সম্ভব সেইখানেই ইহাকে পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত লোক যে অনায়াসে একটী এত বড় ছেলের ভার লইল, ইহাই হইল সকলের নিকট আশ্চর্য্যের বিষয়।

পঞ্চানন সত্যই চাতরার পথে এই ছেলেটীকে কুড়াইয়া পাইয়াছেন। মলিন-মুখ ছেলেটী যখন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাতরমুখে জানাইল সে আজ দুই দিন কিছু খায় নাই, তখন তিনি তাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়া আসার সময় হঠাৎ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠিক তাঁহার হারান ছেলের মুখ। হাঁ, এমনই মুখ চোখ তাহার ছিল,—এই বয়সে এমনই রোগা, লম্বা, এমনই গৌরবর্ণ ছিল সে।

পঞ্চানন কি ভাবিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিলেন। নিজে ওবেলা চিঁড়া গুড় খাইয়া কাটাইয়া দিয়া এবেলার জন্য মুগের ডাল সিদ্ধ ভাত রাঁধিয়াছিলেন; তাহাই ছেলেটীকে খাইতে দিয়া নিজে এবেলাও চিঁড়া গুড় খাইয়া কাটাইয়া দিলেন।

রাত্রে শুইয়া আপন মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন—আর একটী লোক পুষিতে তাঁহার খরচ বড় কম লাগিবে না। সকালে উঠিয়াই তিনি ছেলেটীকে বলিয়া দিলেন—

"আজই বিকেলের দিকে তুমি তোমার পথ দেখো বাপু, আমি অনর্থক তোমায় পুষতে পারব না।"

ছেলেটা কোনও উত্তর দিল না। আহারাদি করিয়া, পরম নিশ্চিন্তভাবে বারাণ্ডায় মাদুরটা পাতিয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িয়া দিব্য এক ঘুম দিয়া সন্ধ্যাবেলা জাগিল। তাহার পর গম্ভীর মুখে উঠিয়া মাদুর তুলিয়া এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল।

পঞ্চানন ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিলেন। যাদব যে সহজে নড়িবে সে আশা করাও ভুল। একদিন একটা রাত্রির জন্য আসিয়া সে যেন এখানে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়া বসিল। গ্রামের লোক তামাসা করিয়া বলিল, "কি মুখুয্যে মশাই, ওটি কি আপনার নাতি নাকি?"

গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়া মুখুয্যে মশাই উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, নাতিই বটে। হতভাগাটা কোথা হতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, দেখ না,—আর উঠবার নাম নেই। এত করে অপমান করছি—এখান হতে চলে যেতে বলছি—তবু যদি নড়ে। আরামে আছে, দিব্যি দুবেলা রান্না ভাত পাচ্ছে—কাপড় ছিল না—নিজের একখানা কাপড় দিয়েছি—ও কি আর সহজে নড়ে?"

দিন দশ বার পরে একদিন আবার তিনি যাদবকে ডাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "তা বাপু, অনেক দিনই তো রইলে, এইবারে আস্তে আস্তে সরে পড়বার যোগাড় দেখ।"

যাদব মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাব?"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া পঞ্চানন বলিলেন, "কোথায় যাবে, তা আমি কি জানি? তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ তো আছে, সেখানেই যাও।"

যাদব সরল ভাবে উত্তর দিল, "কেউ নেই মশাই। থাকলে কি আপনার কাছে সেদিন ভাত খেতে চাইতুম, না পরবার কাপড় নিতুম? এসেছি যখন, আর দুদিন থাকি, তার পর না হয় চলে যাব তার জন্যে আর কি।"

পঞ্চাননের অন্তরটা হঠাৎ যেন কোমল হইয়া গেল,—আহা অভাগা, কেহই নাই। গলার স্বর খাদে নামাইয়া বলিলেন, "বেশ, আর দুদিন থাক, তার পরই না হয় যেয়ো।"

(৩)

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে টিঁকিয়াই গেল। সকলেই দেখিল, যে পঞ্চাননের হাত দিয়া এতটুকু জল বাহির হইত না, এই পথে-কুড়াইয়া-পাওয়া ছেলেটার জন্য সেই তিনিই পয়সা খরচ করিতেছেন। আজকাল তাঁহার দুবেলা ভাত তৈয়ারী হয়। ছেঁড়া বালিসগুলা বিদায় লইয়াছে; তাহার স্থানে নূতন বালিস আসিয়াছে। অনেক বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে।

দুধ তিনি কখনও খান না, কিন্তু তাঁহার পোষ্যটার দুধ না হইলে চলে না; কেন না, তাহার দুইবেলা চা খাওয়া চাই। কেবল একটু দুধ হইলেই না হয় চলুক, তা নয়, আবার চা চাই, চিনি চাই। মাঝে মাঝে আবার দু একজন বন্ধুবান্ধব আসিয়া জুটে, তাহাদের সুদ্ধ চা খাওয়ায়। পঞ্চানন আর খরচ বহিতে পারেন না। লোকের কাছে বলেন—"ছোঁড়াটা আমার শনিগ্রহ, ও এবার আমায় ফতুর করতে এসেছে। আমার সব খাবে দেখছি, সব সব উড়াবে।"

লোকে বলে—"এ আপনার অন্যায় কথা মুখুয্যে মশাই,—ওকে যেতে বলুন না কেন?"

পঞ্চানন বলেন, "গেলে তবে তো বলব। ওর যে যাওয়ার গা ই দেখছি নে। হুঁ, এমন নবাবের মত খাওয়া-পরা ফেলে ও না কি আবার যাবে?"

যাদব হুকুমও চালায় বড় কম নয়,—সত্যই সে নবাবের মত চলে। লোকে বলিতে লাগিল, "বুড়ো এই ছেলেটাকে পোষ্যপুত্র নেবে। হায় রে, নিজের ছেলে নাতি ভেসে গেল, এখন—'উড়ে এল চিল, জুড়ে নিল বিল'—তাই হয়েছে।"

পঞ্চানন যাদবকে নিষেধ করেন—সে যেন গ্রামের লোকের সহিত না মেশে। গ্রামের লোকেরা তাহাকে এ গ্রাম হইতে তাড়াইবার চেষ্টায় আছে; কারণ, উহারা কখনই লোকের ভাল দেখিতে পারে না।

যাদব সে কথা কাণে তুলে না, সে গ্রামের লোকের সহিত মিশে। পঞ্চানন তাহাকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার উপদেশ দিয়া তাগাদায় বাহির হন। ঠিক দুপুর রৌদ্রে একটা ছাতা মাথায় দিয়া পথে

পথে ঘুরিতে ঘুরিতে হাঁপাইয়া উঠেন, মনে মনে হাজার বার যাদবকে গালাগালি দেন।

সত্যই তো, এ আপদ যদি না আসিয়া জুটিত, তাঁহাকে তো এ জ্বালা সহ্য করিতে হইত না। সকালে তিনি বাহির হইতেন, দুপুরে বাড়ী ফিরিয়া কোন দিন ভাত রাঁধিতেন, কোনদিন চিঁড়া মুড়কি খাইয়া কাটাইয়া দিতেন। এখন ভোরে উঠিয়া নবাবপুত্রের চায়ের জলের জন্য উনানে আগুন দিতে হয়। সেদিন নিতান্ত রাগ করিয়াই বলিয়াছিলেন—"উনান নিজে জ্বালাইয়া জল বসাও।" ইহাতেই নবাবপুত্র রাগ করিয়া সেদিন চা খায় নাই।

নিতান্ত পঞ্চানন বলিয়াই উহার এত আবদার সহ্য করিতেছেন। অন্য কেহ হইলে একদিনও যে যাদবকে বাড়ীতে স্থান দিত না, এ জানা কথা।

তাগাদা হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ী ফিরিয়া দেখিতে পান, যাদব ঘরে চাবী তালা দিয়া বাহির হইয়া গেছে। দরকার পড়িতে পারে বলিয়া তিনিই তাহাকে একটা চাবি তালা দিয়াছিলেন,—কিন্তু সে যে প্রত্যহই দরজা দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বেড়াইতে যাইবে তাহা তিনি জানিতেন না।

সেই চাবির জন্য তাঁহাকে আবার কষ্ট করিতে হইত বড় কম নয়। বাহিরে বসিয়া থাকা অসহ্য বলিয়া তিনি আবার যাদবের খোঁজে বাহির হইতেন। কোন দিন তাহাকে মৈত্রদের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের দাবাখেলার নিকট গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত; কোন দিন পাড়ার সব বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া কোথাও তাস খেলিত, অথবা চক্রবর্ত্তীদের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে বসিয়া যাইত।

পঞ্চানন বেশী তিরস্কার করিতে পারেন না, ভয়—পাছে সে চলিয়া যায়।

সেদিন রামা আসিয়া তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিল—যাদব তাহার গাছের তিন চারটা শশা লইয়া গেছে। আজ যদিও সেগুলি আঙ্গুলের মত ছোট, তবু একদিন সেইগুলাই দেড়-হাত না হোক সওয়া হাত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতগুলা শশা বিক্রয় করিয়া সে পয়সাটা পাওয়া যাইত, তাহারই কথা মনে করিয়া রামা চোখের জলে ভাসিয়া গেল। তাহার সহিত বীরত্বও বড় কম ছিল না। পঞ্চাননের যেমন খাইয়া দাইয়া কাজ নাই, তাই একটা হতভাগা ছেলেকে জায়গা দিয়াছেন, ওটাকে এখনই ঘরের কড়ি দিয়া বিদায় করা উচিত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পঞ্চানন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাহার দাবীর এক টাকার স্থলে আট আনা দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

যাদব বাড়ী আসিলে তিনি খুব রাগের ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই রামার গাছের শশা নষ্ট করে দিয়েছিস্?"

যাদব দমিল না, গর্ব্বিতভাবে বলিল, "হ্যাঁ, দিয়েছি-ই তো। উঃ, বেটা কি পাজি, আবার এখানে নালিশ করতে এসেছিল বুঝি? একটা শশা দুটো পয়সা দিয়ে নিতে চাইলুম, তা যেমন দেয় নি, তেমনি তার চারটে শশা নষ্ট করে দিয়েছি। খেয়েছি এ কথা কেউ বলতে পারবে না। যে ছোটলোক একটা শশা পয়সা নিয়ে দিলে না, তার জিনিস আবার ভদ্রলোকে খায়? চারটে শশা ওরই সামনে পা দিয়ে পেঁতলে দিয়ে এসেছি।"

এই ভদ্রলোকের ভদ্রত্ব যে কোন্‌খানে তাহাই দেখিবার জন্য পঞ্চানন বিস্ফারিত চোখে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

(৪)

পূজার প্রারম্ভে শুনা গেল যোগেশ সপরিবারে বাড়ী আসিতেছে। গ্রামের সকলেই এ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া গেল; সকলেই বলিল—"আহা, বাপের ছেলে বাপের কাছে ফিরে আসুক, শূন্য ঘর আবার পূর্ণ হোক।"

নবীন চক্রবর্ত্তী তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "মুখুয্যে, ও আবাগের বেটা ভূতের বিষদাঁত এবার ভাঙ্গবে, তাই আমার আনন্দ হচ্ছে। কি নন্দদুলালই পেয়েছ তুমি,—যত আদর করছ, তত যেন আরও মাথায় উঠছে। কাউকে এতটুকু খাতির করে না, এইটেই না বড় ভয়ানক কথা। তুমি যে তুমি, ওকে পথ হতে কুড়িয়ে এনে রাজার হালে রেখেছ, তোমাকেই কি না বলে, তোমার সঙ্গেই বা কি ব্যবহার করে। হয়েছে,—ও মনে করেছিল, নিয়ে যখন এসেছ, তখন সবই ও পাবে। সেই জন্যেই ওর এত বাড় হয়েছে। বেঁচে থাক তোমার ছেলে নাতি, তাদের সব তারাই নেবে। তারা থাকতে এই কুড়িয়ে-পাওয়া মাণিকটী

যে তোমার সব বিষয় দখল করবে, তা আমরা সহ্য করতে পারব না বলেই তো যোগেশকে খবর দিয়ে আনছি।"

ঘটনাটা জলের মতই পরিষ্কার হইয়া গেল। পঞ্চানন বুঝিতে পারিলেন দীর্ঘকাল পরে পুত্রের বাড়ী ফিরিবার কারণ কি? সে তাঁহার জন্য আসিতেছে না, সে আসিতেছে—পাছে তাহার প্রাপ্য বিষয় অপরে গ্রহণ করে সেই জন্য। নিমেষে বিগলিত মনটা কঠিন হইয়া পড়িল।

যাদবের দৌরাত্ম্য কমিল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। সঙ্গী শ্রীদাম একটা হার্ম্মোনিয়াম কিনিয়াছিল। তাহাই দেখিয়া যাদব আসিয়া পঞ্চাননকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে একটা হার্ম্মোনিয়াম কিনিয়া দিতে হইবে। একটা হার্ম্মোনিয়াম পাইলে সে আর বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না, দিনরাত বাড়ীতেই থাকিবে।

পঞ্চানন শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাম কত?"

যাদব উৎসাহিত হইয়া বলিল, "দাম বেশী নয়, মাত্র তিরিশ টাকায় পাওয়া যাবে। আমি দর দাম সব ঠিক করে এসেছি, টাকা পেলেই দিয়ে আনব। মাত্র তিরিশটা টাকা বই তো নয়—"

মাত্র তিরিশ টাকা! পঞ্চানন যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন—"তিরিশ পয়সা এখানে আসবার আগে চোখে দেখেছিস কখনও, যে আজ তিরিশ টাকা নিতে এসেছিস? তিরিশ টাকা আমি ওই বাজনা কিনতে দেব,—আমার রক্ত জল করা টাকা!"—ক্রোধে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল।

যাদব খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল,—"উঃ, আমার রক্ত জল করা টাকা, মরবার সময় যথ দেবে ওই টাকায়। সিন্ধুক বোঝাই টাকা, তিরিশটা বার করতে গেলে মরে যাবে।" পঞ্চানন নীরবে তাহার অস্ফুট উক্তি শুনিয়া গেলেন।

বৈকালে যাদব যখন ফিরিল, তখন তাহার মুখখানা বড় গম্ভীর। পঞ্চানন তখন বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, যাদবকে দেখিয়া নিকটে ডাকিলেন। গম্ভীর মুখে সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন শান্তভাবে বলিলেন, "শোন্ যাদব, তুই যে হার্ম্মোনিয়াম কিনবি বলে ঝোঁক করছিস, ও:তে তোর কি লাভ হবে? বাড়ীতে এখন ছেলে পুলে সব আসবে, বাজনা তুই রাখবি কোথায়, ওদের হাতে যে ভেঙ্গে যাবে।" যাদব শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কারা আসবে?" পঞ্চানন উত্তর দিলেন, "আমার ছেলে বউ নাতি নাতনীরা।" "তবে থাক—" আস্তে আস্তে যাদব সরিয়া গেল।

তাহার মলিন শুষ্ক মুখখানা পঞ্চাননের মনে বড় বেশী রকমই আঘাত দিল। খানিক গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার সময় একটা লোকের মাথায় হার্ম্মোনিয়ামের বাক্সটা চাপাইয়া যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাদবকে ডাকিয়া বলিলেন, "নে, সেই হার্ম্মোনিয়াম নিয়ে আসতেই হল। আমি বেশ জানি তুই আমার শনিগ্রহ, সব রকমে আমায় জ্বালাতে এসেছিস। সিন্ধুকের দিকে যখন তোর নজর পড়েছে, তখনই জেনেছি ও সিন্ধুক খালি হল বলে।" যাদব অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কেই বা তোমায় আস্তে বলেছিল, আমি তো বলি নি।" সেদিন সন্ধ্যার পরে পঞ্চাননের নীরব ঘর হঠাৎ হার্ম্মোনিয়ামের মিষ্ট সুরে ভরিয়া উঠিল। যাদব মহানন্দে প্রদীপের কাছে বসিয়া উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে পর্দা চিনিয়া সা-রে-গা সাধিতে লাগিল। আর বারাণ্ডায় মাদুরে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে পঞ্চানন চমৎকৃত হইয়া ভাবিতেছিলেন ছেলেটা হার্ম্মোনিয়াম বাজাইতে শিখিল কোথায়?

(৫)

একদিন সপরিবারে যোগেশ আসিয়া পৌছিল। বাড়ীতে পৌছিয়াই ছেলেটার দিকে দৃষ্টি পড়িল। পিতাকে বলিল, "এ ছেলেটাকে কোথা হতে জুটালে বাবা?" পিতা মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "গরীবের ছেলে, দুদিন খেতে পায় নি, সেইজন্যে—"

পুত্র খুসির ভাব দেখাইয়া বলিল, "ও, ওটাকে চাকর রেখেছ? তা বেশ করেছ, আমার ছেলেমেয়েগুলোকে দেখা শোনা করতে পারবে।" ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পঞ্চানন বলিলেন, "না না, চাকর কেন? বামুনের ছেলে, গলায় পৈতে রয়েছে দেখতে পাস নি?"

যোগেশ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "তাই ওকে ঠাকুর

করে রেখেছ? কিন্তু আমি আগেই বলে রাখছি বাবা, তোমার ওই পুষ্যি পুত্তুরের আদর আবদার আমার কাছে খাটবে না, কুকুরকে নাই দেওয়া আমি আদতে পছন্দ করি নে।” পঞ্চানন নিতান্ত অসহায় ভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

যোগেশ বাস্তবিকই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কোথা হইতে এই ছেলেটা আসিয়া সব যেন জুড়িয়া বসিয়াছে। তবু অদৃষ্ট ভাল যে সে আগেই আসিয়া পড়িয়াছে, পিতা ইহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া যাইতে পারিবেন না।

পঞ্চানন যাদবকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে তাঁহার নিজস্ব জিনিস, ইহাদের নিকট হইতে তাই তাহাকে দূরে, একেবারে নিজের কাছে রাখিতে চান। যোগেশ বা তাহার স্ত্রী যে যাদবকে মোটেই সহ্য করিতে পারিতেছে না, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেছিলেন। তাই তিনি সর্ব্বদা তাহাকে বুকের আড়ালে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

যাদবের বড় সাধের হার্ম্মোনিয়ামটা যেদিন যোগেশের পুত্র বাজাইতে সুরু করিল, সেদিন তিনি আর কোনক্রমে সহ্য করিতে পারিলেন না; পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন, “আচ্ছা বউ মা, উড়ে এসে তো জুড়ে বসেছ, সবই তো একে একে দখল করেছ, আবার ওই বাজনাটা কেন দখল করছ বল দেখি? ঘরের মধ্যে তো বাপু পা বাড়াবার জায়গা রাখ নি, ছোঁড়াটা সারা দিনই তো বাইরে বাইরে ঘোরে। ওর বড় সাধের বাজনাটাও তোমরা দখল করলে, তবে ও যায় কোথায় বল দেখি।”

তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কথাটা যখন যোগেশের কানে গিয়া পৌঁছিল, তখন সে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

“আমি বুঝেছি বাবা, আমরা যে এখানে থাকি তা তোমার ইচ্ছে নয়,—তুমি ওই ছোঁড়াটাকে নিয়েই সুখে থাকতে চাও। বেশ, তাই বললেই তো হোত, অপমান করার কোনও দরকার ছিল না। আমি না হয় ওদের সকলকে নিয়ে আজই চলে যাব, জানব আমার বাবা নেই।”

পঞ্চানন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, “কই, অপমান কি করেছি বল দেখি?”

যোগেশ রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, “অপমান নয়? ওর বাজনাটায় নরেন একটু হাত দিয়েছে বলে তুমি তোমার বউমাকে যা না তাই শুনিয়ে দিলে। কোথাকার একটা পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া ছোঁড়া,—ও হয়েছে তোমার সাত-রাজার ধন এক মাণিক; বেশ, ওকে নিয়েই থাক, আমরাই না হয় চলে যাচ্ছি।”

পঞ্চানন নীরবে কেবল মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, পুত্রকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলেন না—তাঁহার প্রাণটা যখন একটী কোন স্নেহের পাত্রের জন্য অন্তরের মধ্যে কাঁদিয়া মরিতেছিল, সেই সময়ই তিনি এই ছেলেটীকে পাইয়াছেন,—সেইজন্যই ইহার উপর তাঁহার বড় স্নেহ পড়িয়া গেছে।

মানুষ একটা কোনও উপলক্ষ্য লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। পঞ্চাননের জীবনে কোনও উপলক্ষ্য ছিল না তাই তিনি বড় কঠিন, নির্দ্দয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্তরের অন্তরালে কেহ যে নিরন্তর কাহারও জন্য কাঁদিয়া মরিত, তাহা অপরে জানা দূরে থাক, তিনি নিজেই জানিতেন না।

এই ছেলেটী আসিয়া পর্য্যন্ত এই নির্দ্দয় বৃদ্ধটীর ভিতরকার সত্য রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি নিজেই এক এক সময় আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন,—তিনি এত কোমল হইয়া পড়িলেন কি করিয়া?

এই তো সেদিন উদ্ধব দাসের বাড়ী তাগাদায় যাইতে যখন সদ্যবিধবা মেয়েটী একটী ছেলে লইয়া তাঁহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল, তখন পঞ্চানন খানিকটা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ নিজেই উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! পঞ্চানন নিজেই সে দিন বড় কম আশ্চর্য্য হইয়া যান নাই। এ রকম ব্যাপার তো তাঁহার জীবনে কখনও ঘটে নাই! এ রকম হইলেও তো চলিবে না। তিনি সুদখোর মহাজন, সেই অপবাদই তাঁহার শিরোভূষণ হইয়া থাক,—দয়ার্দ্র আখ্যায় বিভূষিত হইতে তিনি চান না।

কিন্তু এই ব্যাপারটাই তাঁহার কোমলতার প্রথম পরিচয় দেয় নাই। মনটা যেন কি রকম হইয়া গিয়াছিল,—কাহারও দুঃখ কষ্ট শুনিলে চোখে যেন জল আসিয়া পড়ে।

লোকে তাঁহার চরিত্রের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যাহার হাত হইতে একটী

পাই সুদ এড়াইবার যো ছিল না, তিনি এখন অনেক জায়গায় সুদ ছাড়িয়া দেন।

লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিত, "মুখুয্যে মশাই, ব্যাপারখানা কি, এ কি রকম হল?"

মুখুয্যে মহাশয় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া যাদবকে দেখাইয়া বলিতেন, "ওই শনিগ্রহটা এসেই আমায় একেবারে মাটি করে দিলে, ওর জন্যেই তো আর কড়াকড়ি করতে পারি নে। ছোঁড়া সুদখোরকে দারুণ ঘেন্না করে। বলব কি—আমার মুখের ওপর পষ্ট বলে দেয়—'সকাল বেলায় যেন মুখ দেখিয়ো না, সুদখোরের মুখ সকালে দেখলে সেদিনটা ভারি খারাপ যায়।' ওই ছোঁড়াই আমায় সব রকমে মারলে। কি কাল শত্রুই যে এনেছিলুম বলতে পারি নে।"

যোগেশ পিতার সুদ ছাড়িয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিয়াছিল। সে স্পষ্টই পিতাকে জানাইল, "দেখ বাবা, সুদ তুমি আজ থেকে ছেড়ে দিচ্ছ শুনতে পাচ্ছি। আমি তা করতে দেব না। তোমার কাগজপত্র সব আমায় বুঝিয়ে দাও, আমি সব আদায়পত্র করব। ও রকম করে সুদ ছাড়তে গেলে সংসার করা চলে না। তুমি এখন বুড়ো হয়েছ, ঘরে বসে হরিনাম কর, এখন বিষয়কর্ম্মের মধ্যে তোমায় আর যেতে হবে না। বুড়ো হয়ে তোমার মন ভারি নরম হয়ে গেছে, তাই সব দেনদার চোখের জল ফেলে তোমার মন ভিজিয়ে দিচ্ছে। ও রকম করে কাজ করা চলে না—তা জান তো।"

বৃদ্ধ পঞ্চানন নির্ব্বাকে পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। দপ করিয়া তাঁহার মনে বহু বৎসর পূর্ব্বেকার একটা চিত্র জাগিয়া উঠিল। তখন যোগেশ ছিল কিশোর মাত্র, পিতার এই সুদ নেওয়ার বিপক্ষে সে সেদিন দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মূলে ছিল—সে সেদিন সংসারী ছিল না, সে সেদিন অর্থ কি তাহা চিনে নাই। তাই সে সেদিন ছিল সুদখোর অধার্ম্মিক পিতার ধার্ম্মিক পুত্র,—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। আজ সে ঘোর সংসারী। আজ তাই তাহার কাছে একটী পাইয়েরও অনেক মূল্য। আজ সে হিসাব করিতে শিখিয়াছে, তিনটী পাইয়ে একটী পয়সা হয়। সেদিন যাহার মূল্য তাহার কাছে কিছুই ছিল না, আজ তাহারই মূল্য তাহার কাছে খুব বেশী।

(৬)

যাদব হঠাৎ যখন ঝড়ের বেগে আসিয়া পড়িয়া বলিল, "দাদু, এ রকম অত্যাচার করলে তো চলবে না,—এর একটা ব্যবস্থা কর"—তখন পঞ্চানন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে, ব্যাপার কি?"

যাদবের এমন মুখ তিনি কোন দিনই দেখিতে পান নাই,—সে যেন আজ যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

যাদব যাহা বলিল তাহার সার মর্ম্ম এই—বহুদিন পূর্ব্বে পঞ্চানন যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের উদ্ধব দাসকে এক শত টাকা ধার দিয়াছেন, তাহা আজ সুদের সুদ ধরিয়া আসলের সহিত যোগ করিয়া অনেক হইয়াছে। পঞ্চানন কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আদায় করিতে যান, তাহারই দুদিন আগে মাত্র উদ্ধব মারা গিয়াছে। সদ্য-বিধবা ও তাহার বালক পুত্রটীর রোদনে বিচলিত পঞ্চানন চলিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি ইচ্ছা করিয়াই সে কথা আর মনে করেন নাই।

যোগেশ পিতার কাগজপত্র হাতে পাইয়া সকলের নিকট হইতে জোর করিয়া, নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতেছে। বিধবার উপর অত্যাচার বড় কম হয় নাই, অবশেষে নালিশ। শেষটায় আজ আদালতের লোক গিয়া সেই বিধবা ও তাহার শিশু পুত্রটীকে টানিয়া বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরে তালা দিয়াছে।

পঞ্চানন দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিলেন। যোগেশ যে এরূপ করিতে পারে ইহা যেন তাঁহার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। হায় রে সংসার, তোমার ফাঁদে পা দিয়া দেবপ্রকৃতি মানুষও একদিন দানবে পরিণত হয়।

তিনি কি বলেন জানিবার জন্য যাদব দাঁড়াইয়া ছিল; তিনি একটী কথাও বলিলেন না।

সন্ধ্যার সময় যোগেশ ফিরিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনলুম নাকি উদ্ধবের স্ত্রীপুত্রকে ঘর হতে বার করে দিয়ে ঘরে তালা দিয়েছ, কথাটা সত্যি কি?"

যোগেশ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "এ খবর কে দিলে, তোমার পুষ্যিপুত্তুর বুঝি?"

পঞ্চানন বলিলেন, "যেখানেই হোক আমি শুনেছি। কিন্তু এ রকম কাজ করা কি উচিত যোগেশ?"

যোগেশ বলিল, "উচিত অনুচিত সে আমি বুঝব এখন বাবা, তুমি হরিনাম কর গিয়ে, এ সব দিকে দেখবার তোমার কোনও দরকার নেই।"

পঞ্চানন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কোনমতে রোধ করিতে পারিলেন না; তখনই মনে পড়িয়া গেল—এ তাঁহারই কৃতকার্য্যের ফল,—তিনি যে গাছ রোপণ করিয়াছেন আজ তাহাতে ফল ধরিয়াছে।

রাত্রে তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া যাদব জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে ওদের কোনও উপায় করবে না দাদু?" কঠিন সুরে পঞ্চানন উত্তর দিলেন, "না"—হঠাৎ যাদব একেবারে নীরব হইয়া গিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পঞ্চানন ঝাঁজের সঙ্গে বলিলেন, "তোর যদি অত মাথাব্যথাই হয়ে থাকে যেদো, তুই গিয়ে তাদের দেনা শোধ করগে না কেন? যখন ধার করেছিল তখন মনে ছিল না যে শোধ করতে হবে?"

যাদব একটু কঠিন সুরেই বলিল, "তখন তো উদ্ধব জানত না সে এত শীগ্‌গীরই মরে যাবে?"

বিকৃতমুখে পঞ্চানন বলিলেন, "ওরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, আর কথা বলিসনে, চুপ করে থাক। অসহ্য বোধ হয় চলে যা, আমি তো তোকে ধরে রাখি নি। সুদখোর মহাজনের বাড়ীতে রয়েছিস, কেবল দেখে যাবি—কথা বলা পাপ তা জানিস?" যাদব রোখের সঙ্গে বলিল, "বেশ তাই হবে।" সে রাত্রিটা বেশ ঘুমাইয়াই কাটিয়া গেল।

পরদিন সকালে যাদব যখন আসিয়া পঞ্চাননের পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, "কোথায় যাচ্ছিস রে যেদো?"

যাদব একটু হাসিয়া বলিল, "একটা কাজ পেয়েছি, তাই চলে যাচ্ছি।"

"কাজ করতে যাবি—তুই—?" বিস্ময়ে পঞ্চানন তাহার মুখের পানে তাকাইলেন।

যাদব বলিল, "কি করব? সেই বিধবাটী আর তার ছেলের ভার যখন নিয়েছি, তখন একটা উপায় তো করতে হবে, ওদের বাঁচানো তো চাই। তোমার কাছে বললুম, তুমি সোজা জবাব চাইলে ওরা ধার করেছিল কেন? সে জবাব যে দিত সে আজ চলে গেছে, কাজেই জবাব দেওয়া হল না দাদু। আচ্ছা চললুম দাদু—"

সে চলিয়া গেল, পঞ্চানন কেবল তাকাইয়া রহিলেন।

(৭)

পুত্রবধূ বলে—"বুড়ো পাগল হয়েছে।" যোগেশ মহা ব্যস্ততা দেখাইয়া কবিরাজ দেখাইয়া ঠাণ্ডা তৈলের ব্যবস্থা করে। পঞ্চানন কাহারও কথায় কান দেন না, চুপচাপ নিজের ঘরেই বসিয়া থাকেন। দিনের মধ্যে একশবার যাদবের কাপড় জামাগুলা পাড়িয়া আবার গুছাইয়া তুলেন, জুতাজোড়াটা ঝাড়িয়া মুছিয়া আলমারীতে সাজাইয়া রাখেন। হার্ম্মোনিয়ামটার ডালা খুলিয়া তাহাতে সুর দিয়া দেখেন ঠিক আছে কি না। নাতি নাতনীরা হাসে—।

একদিন যাদবেরই সমবয়স্ক নাতি প্রভাস আসিয়া বলিল, "হার্ম্মোনিয়ামটা আমায় দাও না ঠাকুরদা, তুমি আর ওটা নিয়ে কি করবে?"

পঞ্চানন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পরের জিনিস দিই কি করে বল দেখি? আমার নিজের যদি হতো তোকে এতদিন ক—বে দিয়ে দিতুম।"

প্রভাস বলিল, "পরের জিনিস কি করে? তুমিই তো যেদোকে নিজের পয়সা দিয়ে কিনে দিয়েছিলে।"

মুখখানা বিকৃত করিয়া পঞ্চানন বলিলেন, "হ্যাঁ, তা দিয়েছি, তাকে দান করেছি। এখন সেই দান ফিরিয়ে নিতে পারব না। তোর অত ঝোঁক হয়ে থাকে তোর বাবাকে বল গে যা, কিনে দেবে এখন।"

বৃদ্ধ যে কেন এমন করিয়া যাদবের জিনিস আগলাইয়া থাকেন তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। যোগেশ বলে, "ওগুলো প্রভাসকে দিয়ে দাও না বাবা, যখের মত ও সব আগলে আছ কেন?" পঞ্চানন নীরবে তামাক খা'ন, উত্তর দেন না।

লোকে বলে—সে আর আসিবে না, কিন্তু তাঁহার মন এ কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। মন বলে—সে আসিবে, নিশ্চয়ই আসিবে। দীর্ঘ দুইটা বৎসর সে এখানে কাটাইয়া গেছে, দুই বৎসরের মায়া এত সহজে—একটা দিনেই সে পরের জন্য ত্যাগ করিতে পারে? এই গ্রাম, এই ঘর, ইহার প্রতি স্থান—এমন কি প্রতি কোন্ পর্য্যন্ত তাহার বড় পরিচিত। কোন দিন কি তাহার

মনের এক কোণে এখানকার স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে না, কোন দিন কি সে এখানে আসিবে না? লোকে বলুক সে আসিবে না, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মন বলে—সে আসিবেই, এখানে তাহার সবই যে পড়িয়া আছে—সে যাইবে কোথায়? দেয়ালে তাহার ঘুড়ি লাটাই, আলমারীর মাথায় তাহার লাটিম সূতা প্রভৃতি আজও রহিয়াছে, নাতিরা চাহিয়া চাহিয়াও এগুলি পায় নাই।

আজ জীবনে কোন উদ্দেশ্য নাই, কোনও বন্ধন নাই। নিজের পুত্রও যেন তাঁহার নিজের নয়, সে একেবারেই পর হইয়া গেছে। তাঁহার যাহা কিছু সব উহারা লইয়াছে, তাঁহার হাতে হরিনামের মালা দিয়া দূর পরলোকের চিন্তা করিতে বসাইয়া দিয়াছে। ছন্নছাড়ার জীবনে একটী মাত্র মায়ার বাঁধন পড়িয়াছিল, সে বাঁধন আজ ছিঁড়িয়া গেলেও দাগ তো মিলায় নাই। তাহারই স্মৃতিতে তিনি তন্ময় হইয়া থাকেন। রুদ্ধ দ্বারে আর কয়টী ছেলেমেয়ে কোলাহল করিয়া আসিয়া আঘাত করে, তাঁহার সাড়া পায় না।

দিন এ-দিকে ক্রমে কাছে আসিতেছিল, বিজয়ার বাদ্য বাজিয়াছিল। একদিন পঞ্চানন বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না।

কর্ম্মিষ্ঠ যোগেশ সারাদিন পিতার খোঁজ লইতে পারে নাই, রাত্রে খোঁজ লইয়া জানিল—তিনি আজ উঠেন নাই, জলস্পর্শও করেন নাই। পিতার ঘরের দরজা বন্ধ, রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া যোগেশ ফিরিয়া আসিল। পরদিন অনেক বেলায় ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া যোগেশ ঘরে প্রবেশ করিল।

দরজার কাছেই মেঝের উপর পড়িয়া পঞ্চানন—হয় তো দরজা খুলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া গেছেন, আর উঠিতে পারেন নাই। ঘরের মেঝেয় চারিদিকে ছড়ানো পড়িয়া আছে যাদবের জিনিসগুলি, এমন কি তাহার লাটিম সূতা পর্য্যন্ত।

বিকারের ঝোঁকেই হয় তো এগুলো তিনি পাড়িয়াছিলেন; তাহার পর আর তুলিতে পারেন নাই।

কবিরাজ আসিলেন, ডাক্তারও আসিলেন; বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া সকলেই জবাব দিয়া গেলেন। পঞ্চানন তখন প্রলাপ বকিতেছিলেন—দুই একটা অসংলগ্ন কথা মাত্র—"কে, যাদব, এসেছিস?"

রুদ্ধ কণ্ঠে যোগেশ বলিল, "না বাবা, আমি তোমার পাশে বসে আছি।" পঞ্চানন চক্ষু মুদিলেন।

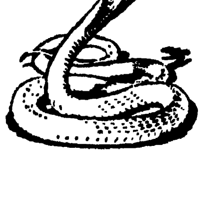
"ওর জিনিসগুলো রইল, কে ওর কাছে পৌঁছে দেবে? ছেলেমেয়েগুলো যেন কি,—ওর এই জিনিসগুলো নেবার জন্যেই চারিদিকে ঘুরছে, আমি একবার ঘর হতে বার হলে হয়—ওরা একটা কিছু এ ঘরে রাখবে না। আমিও বার হব না, এই বসে রইলুম। বউমা, এই ঘরেই আমার ভাত দিয়ো মা, ও ঘরে গিয়ে আমার খাওয়া হবে না।"

সমস্ত দেহ ক্রমেই শীতল হইয়া আসিতেছিল।

শেষ সময়ে একবার তিনি জোর করিয়া উঠিয়া বসিলেন; বিছানা হাতড়াইতে হাতড়াইতে জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "কই, উদ্ধবের টাকা নেওয়ার রসিদখানা গেল কোথায়? ওখানা পুড়িয়ে ফেলতে হবে—যাদবকে মুক্তি দিতে হবে যে।" প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই দেহটা ধপ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া গেল।—

মুক্তি কে পাইল—তিনি না যাদব, সে কথা জানেন একমাত্র ভগবান।

যাদবের জিনিস সবই পড়িয়া রহিল,—যিনি সব দিয়া সেই ক্ষুদ্র জিনিস কয়টী বুক দিয়া রক্ষা করিতেছিলেন, তিনিই চলিয়া গেলেন।



রেঙ্গুন

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরাণী বি-এ

ছবির মত উপকূলটি। এতদিন পরেও স্মৃতির নেগেটিভ থেকে সে ছবিখানি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সেদিন মানুষে ও দেবতায় মিলে দৃশ্যখানি এঁকে তুলেছিলেন। সেদিনও অন্যান্য দিনের মত ধরণীর পায়ের তলায় জলদেবী ইরাবতী তনুখানি এলিয়ে রয়েছেন বঙ্কিম ভঙ্গীতে, তাঁর দেহের বাঁকে বাঁকে তটের উপরেই মানুষের হাতের কারিগরিও তেমনি রয়েছে, সেগুলি বিদেশী সওদাগরদের আপিস মাত্র হলেও আকারে প্রকারে পড়ে না। আমরা সূর্য্যোদয় দেখি যখন সূর্য্য আকাশে খানিকটা চড়েছেন, একখানা সোনার থালার মত। কিন্তু সেদিন যে সূর্য্য আঁকা দেখলুম, সে যথার্থই বাল-সূর্য্য, গালখানি টকটকে, শিশুর মত কোমল স্থির নির্ব্বাক দৃষ্টিতে ধরণীর প্রতি চেয়ে রয়েছে। আর নদীর দর্পণে নিজের মুখখানি দেখে বিস্ময়-বিস্ফারিত হচ্ছে।

তারপরে, ডাঙ্গায় নেমে আর এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। সহরের যেখানেই যাও, যেদিকেই ঘোরো ফেরো, এক একটি



পাগোডা ও উদ্যান—রেঙ্গুন

সেখানকার প্রকৃতির সঙ্গে যেন বেমানান হয়নি। কলকাতার উপকূলবর্ত্তী সৌধের মত নয় তারা, আর এক ছাঁদের হয়ে নূতন দেশের নূতনত্বের অংশ যেন তারাও বহন করছে।

মানুষের হাত পেরিয়ে আকাশ যেখানে দেবতার হাতে পৌঁছেচে, সেই অন্তরীক্ষেই সেদিন কিন্তু আসল কারিগরি দেখলুম। কে এক চিত্রকর এমন তুলি হাতে সেখানটায় এঁকেছেন, দেখলে অবাক্ হতে হয়। বোধ হয় তিনি রোজই 'আঁকেন—সমতল বাঙ্গলায় আমাদের চোখে অভ্রভেদী সোনালী টোপর নগরকোতোয়ালের মত নগরের প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে। নবাগতের দৃষ্টি যেমন ক্রমাগতই তাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, তাদেরও দৃষ্টি নবাগতের প্রতি প্রতিমুহূর্ত্তে আপতিত রয়েছে। কলকাতার মত ট্রাম, মোটর ও বাস্‌বহুল আধুনিক সহরের বুকের ভিতরই তাদের প্রতিষ্ঠা। টোপরযুক্ত রক্ষীগুলির শরীর নীচের দিকে ক্রমশঃ স্ফীত ও বিস্তারিত হয়ে এক একটি গম্বুজের আকার ধারণ করেছে। চূড়ায় সমৃদ্ধি ও গর্ভে শান্তির বার্ত্তাবহী

এই সৌধগুলি এক একটি বৌদ্ধ মন্দির বা পাগোডা ; এদের মধ্যে একটি সুপ্রসিদ্ধ শোয়ে-ডাগন, আর একটি সুলে-পাগোডা। এই মন্দির ও তাদের সংশ্লিষ্ট সাধু আবাসগুলি ভারতবিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ-জীবনপদ্ধতি বর্ম্মায়িত হয়ে এখানে যে বিশেষতা লাভ করেছে তা প্রতিপদে ব্যক্ত করছে। রেঙ্গুনের রাজপথে নানাজাতির বিচরণ, তার বাণিজ্য ব্যাপারে সর্ব্বজাতির সমানাধিকার, কিন্তু সে যে বর্ম্মীর দেশ, তার সেই বর্ম্মীত্ব, বর্ম্মীপ্রাণ ও প্রকৃতির বিশেষত্ব সমস্ত কলকোলাহলের মধ্যে একটা নিজস্ব সুরের মত এই মন্দিরগুলিতে পরিস্ফুট হয়ে আছে।



বার ষ্ট্রীটের অপর দৃশ্য—রেঙ্গুন

কলকাতা যে বাঙ্গালীর দেশ, কলকাতার সার্ব্বজনীনতার মধ্যে সেই বাঙ্গালীত্বের কোন বাহ্য পরিচয় পাওয়া যায় কি ?

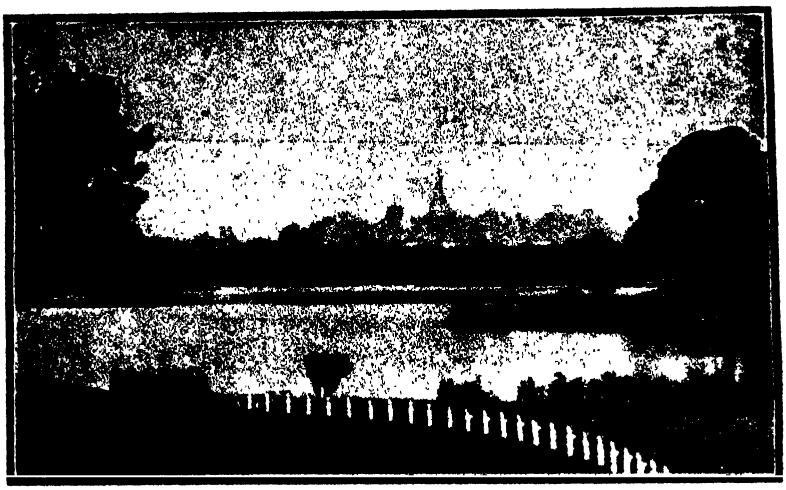


বার ষ্ট্রীট—রেঙ্গুন

বর্ম্মাদেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই এই প্রশ্ন মনে উদয় হতে লাগল—সারাটা বঙ্গদেশের গায়ে বাঙ্গালীর বিশেষত্ব কোথায় ফুটে আছে ? কোন্ স্থাপত্যে বা কোন্ কারু-কার্য্যে ? নদীতীরে সারি সারি দ্বাদশ শিবমন্দিরে ছাড়া বাঙ্গালী আর কোন রকমে নিজেকে বাইরে প্রকাশ করেনি। বর্ম্মীদের মন্দিরের মত সেগুলি অভ্রভেদী হয়ে দিনে সোনায় ও জহরতে এবং রাত্রে বিজলির দীপমালায় ঝকঝকিয়ে দূরদূরান্তর থেকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের মন্দিরগুলির মত ভাস্কর্য্যের

কোন গরিমাও তাদের নেই। আর ভিতরের দৃশ্যেও কত প্রভেদ। থাক, সে কথা পরে বলব।

রেঙ্গুনে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ বন্দরখানা ছোট। এক একজন মানুষের নিরীহ চেহারার পিছনে যেমন কখন কখন একটা প্রচণ্ড জীবন-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে, এই বন্দরের পিছনে সহরখানাও তেমনি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বাইরে থেকে তার কোন আভাষ পাওয়া যায় না। ডক পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লেই প্রথমত দেখা যায় দক্ষিণভারতের কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের মত কেবলই অর্দ্ধ-উলঙ্গ মাথার সামনেটা কামান, পিছনে বেনে খোঁপা বাঁধা বা ঘাড়-পর্য্যন্ত-লম্বমান-চুল মাদ্রাজী কুলি ও রিক্‌শ-ওয়ালার দল। এক বৎসর পূর্ব্বে এদেরই সঙ্গে বর্ম্মী কুলিদের ভীষণ দাঙ্গা



সরকারী হ্রদ—রেঙ্গুন

হয়ে গেছে, যেমন সে বছর ঢাকায় পুলিসের চোখের উপর হিন্দু ও মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছিল। এদের নিরস্ত্র আত্মীয় স্বজনদের ছোট ছোট গলির মধ্যে অবরুদ্ধ করে মারপিট ও হত্যার তাণ্ডবলীলা চলেছিল। সেই অবধি নাকি হাজার হাজার বিদেশী কুলি বর্ম্মা থেকে দেশে ফিরে গেছে।

কলকাতা যেমন সার্ব্বজনীন সহর, তার কোন কোন পাড়ায় বাঙ্গালীর মুখ প্রায় দেখাই যায় না, রেঙ্গুনও তাই; এরও রাস্তাবিশেষে বর্ম্মীমুখদর্শন দুর্লভ। ছোটলোক মাদ্রাজীর পর ভদ্রলোক গুজরাটীর সংখ্যা এখানে খুব বেশী, তাছাড়া ভারতীয় মুসলমান ভদ্র ও অভদ্র সব রকমের। তাদের মধ্যে যারা এখানে বিয়ে থাওয়া করে ঘরবসত করছে, তাদের একটা স্বতন্ত্র নামই হয়ে গেছে—'জেরবাদি'। পথে ঘাটে বাঙ্গালী খুব বেশী দেখা যায় না, পাঞ্জাবীও না, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা লাভ হল বর্ম্মার বন্দরে কন্দরে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীর অধিষ্ঠান।

প্রাচীনকাল থেকেই চট্টগ্রামী, মণিপুরী ও আরাকান বাঙ্গালীর গতিবিধি ত এখানে আছেই, তাদের রক্তে বর্ম্মী রক্তও অনেকটা মিশ্রিত হয়েছে, তাদের ভাষা আচার-ব্যবহারও বর্ম্মী হয়ে গেছে—তথাপি ধর্ম্ম ও সঙ্গীতগত একটা স্বাতন্ত্র্য তারা আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করে এসেছে—সে বিষয়ে পরে বল্‌ব। কিন্তু আধুনিক ব্রিটিশ শাসনের অঙ্গীভূত বাঙ্গালীর সমাবেশ এখানে অত্যধিক। তাঁরা প্রায়ই উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা চাকুরে; ব্যবসায়ী খুব অল্প। পাঞ্জাবীরা একেবারেই আধুনিক। তাঁদের মধ্যে চাকুরে ছাড়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোকও অনেক আছেন।

রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙ্গালীদের গৃহিণী ও কন্যারা একদিন সভা করে আমার সঙ্গে মিলনোৎসুক—এ সম্বাদ স্বামী শ্যামানন্দ তীরে পদার্পণের পূর্ব্বেই আমাকে জানিয়েছিলেন, এবং উত্তর-বর্ম্মার মেমিও নামক পার্ব্বত্য-সহরে আর্য্যসমাজের উৎসব উপলক্ষ্যে প্রবাসী পাঞ্জাবী এবং তাঁদের গৃহিণীরাও আমার আমন্ত্রণ-অভিলাষী—একজন পাঞ্জাবী ডাক্তারের প্রমুখ এ সম্বাদও জাহাজ থেকে উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বেই পেয়েছিলুম।

দেশের মেয়ে দেশের লোকের সঙ্গে দেখাশুনার আনন্দলাভের জন্য আগ্রহান্বিত ত ছিলুমই;—কিন্তু যে নূতন দেশে এসেছি সেই দেশের নরনারীর সঙ্গে, তাঁদের আচার-বিচার, রীতিনীতি, কাব্য-ইতিহাস, কলা ও কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের জন্যেও বিশেষ লোলুপ ছিলুম। সে লোভ চরিতার্থতার সুযোগ যে গৃহে আতিথ্যলাভ করলুম সেই গৃহে প্রশস্ততম—এ কথা প্রত্যেক ভারতবর্ষী

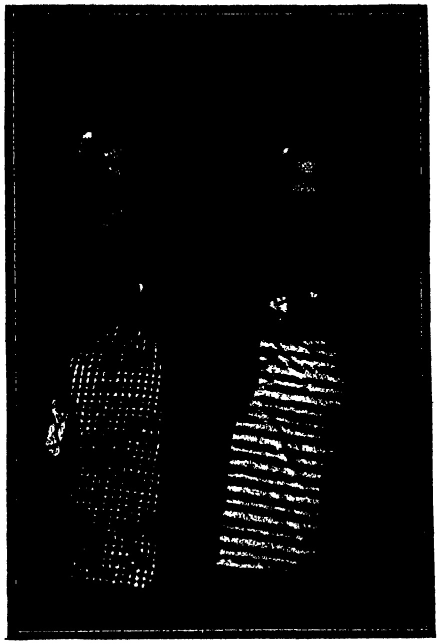
আমায় জানালেন। জষ্টিস সেন ও তাঁর গৃহিণীর বন্ধুমণ্ডলটি সুবিস্তৃত, এবং তাঁদের বন্ধুবাৎসল্য সুপ্রসিদ্ধ। কি স্বদেশী কি বিদেশী, কি ভারতীয় কি বর্ম্মীয়, কি আর্ম্মানী কি পারসী, কি বাঙালী কি গুজরাটী—সকলের সঙ্গেই তাঁদের মেলামেশা ও হৃদ্যতার আদান-প্রদান সমভাবে প্রবর্ত্তিত। তাই তাঁরা রেঙ্গুনে সর্ব্বলোকপ্রিয়। প্রতিদিনই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেতে থাকলুম।

অতিথিসৎকার-পটীয়সী সখা আমার জানতেন যে কেবল ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে, আরামে আদরে যত্নে



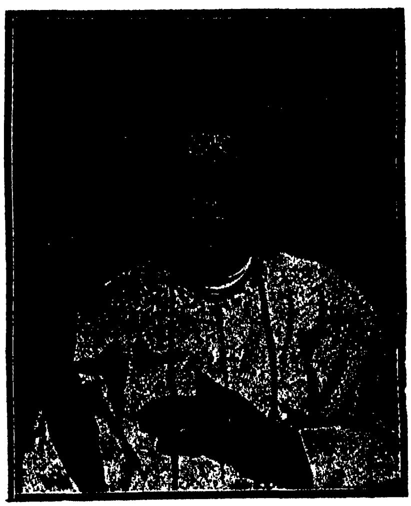
বৌদ্ধ-পুরোহিত

রেখেই তাঁর অতিথিসেবা সম্পূর্ণ হবে না ;—যতক্ষণ না বর্ম্মার কিছু দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য তা আমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর কর্ত্তব্যের অবসান নেই। এই আদর্শ-আতিথ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি জানবার আগে, ভাববার আগে, বলবার আগে তিনি আমায় বর্ম্মার সর্ব্বতোরস উপভোগ করাবার জন্যে চিন্তিত থাকতেন, এবং ভিতরে ভিতরে তার আয়োজন করতেন। যার নিজের রসবোধ নেই, সে অপরকে রসাস্বাদনের জন্যে ভাবিত হয় না। তাঁর নিজের রসগ্রাহিতা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, —কেশবচন্দ্রের কন্যা ত তিনি,—তাঁর অতিথিকেও রসদানে তাই এত আগ্রহান্বিত থাকতেন।



ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা

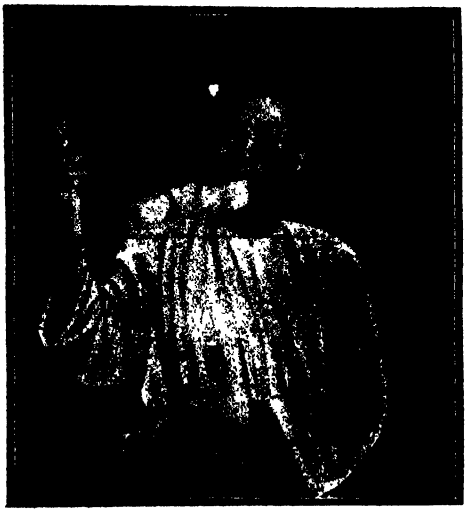
আমি রেঙ্গুনে এসেছি একটা গুরুতর দায়িত্ব নিয়ে,—বর্ম্মা প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে সভানেতৃত্ব করতে।



কবরীর ফুলসাজ

সমস্ত দিনটা তাতে ব্যাপৃত থাকি। তার ঠাট সব রাজনৈতিক সভার মত। প্রেসিডেন্টের 'ব্যাজ' ধারণ করে "বন্দে

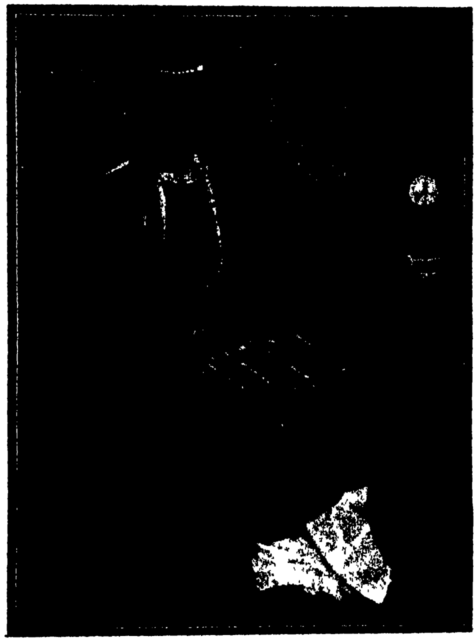
মাতরম্" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লাইন করা ভলান্টিয়ারদের 'স্যালুট' গ্রহণ করে, লাল কাপড় পাতা নির্দ্দিষ্ট পথে সভাস্থলে প্রবেশ করে, সহস্র সহস্র ভারতবাসীদের সঙ্গে সম্মিলিত হই। বৌদ্ধ ও মস্‌লিম ভাইদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র্য রক্ষা করে বর্ম্মাপ্রবাসী হিন্দুদের হিতকল্পে যত কিছু প্রস্তাব ও পন্থা ভাবা যেতে পারে, তার পর্য্যালোচনায় সাহায্য করি। তর্ক-বিতর্ক, বাক্‌বিতণ্ডা, রাগারাগি ও দলাদলির সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে সভার কার্য্যতরীখানি বেয়ে চলি। সারাদিনের পর শ্রান্তক্লান্ত দেহে বন্ধু-গৃহে ফিরি। সেখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশ্রামান্তে সতেজ হয়ে উঠে তাঁর আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করি।



ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা ধূমপান করিতেছে

তাঁর প্রথম রাত্রির আয়োজন হল দুটি উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট বর্ম্মী বন্ধুকে তাঁর গৃহে ডিনারে আমন্ত্রণ করা। ইতিপূর্ব্বে সকালেই একজন 'লীডার' আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন 'মাউঙ নাম—'। তারপরে আসেন 'চমিন'। দুজনেই যুবা ও দুজনেই স্যাসনলিষ্ট। মাউঙ বাল্যকাল হতেই ভারতবর্ষে হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষিত, থিয়সফিষ্টদের হাতে মানুষ; তাই ভারতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহযুক্ত, ভারতবর্ষ থেকে বর্ম্মা-ব্যবচ্ছেদের অত্যন্ত বিরোধী ও সেই দলের অন্যতম নেতা; চমিনও তাই। চমিন ভারত কৌন্সিলের একজন সদস্য। ইনি গর্ব্ব করলেন, গত বৎসর দিল্লী থেকে মহাত্মা গান্ধী যখন বম্বে ফিরে যান ইনি ষ্টেসনে ছিলেন। যে বিপুল জনতা মহাত্মাজীকে বিদায় দিতে গিয়েছিল, সেই হাজার হাজার লোকের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন তিনজন মাত্র খদ্দরপরিহিত নয়—সেই তিনজনের মধ্যে একজন তিনি—বাকী সকলের পরিধানে শুভ্র খদ্দর। সেই শুভ্র স্বদেশীয়তার প্রচণ্ড প্রভাব তাঁর হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হল, তিনি সেই মুহূর্ত্তে অনুভব করলেন—ভারতীয় নাসনালিজমের শক্তি কোথায়, এবং শিক্ষালাভ করলেন বর্ম্মায় তাঁদের মত নেতাদের কি কর্ত্তব্য।

মাউঙ ভারতবিচ্ছেদ নিবারণের জন্য তীব্রভাবে



ব্রহ্ম সুন্দরী

প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁর এ বিষয়ে ছাপান কাগজপত্র ও পুস্তিকা সকল আমায় দিয়ে গেলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সবরমতি আশ্রম পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছেন, ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আবার শীঘ্রই ভারতে ফিরে যাবেন, এবং সেখান থেকে বিলেত যাবেন। মাউঙ ও চমিন দুজনেরই পোষাক ভদ্রশ্রেণীর বর্ম্মীয়োচিত,—রেসমি লুঙ্গি, রেসমি চীনে-কাটের কুর্ত্তা, ও রেসমি রুমালের ছোট পাগড়ি—এমন সুশ্রী, এমন ফিটফাট, এমন ফ্যান্সি ড্রেসের উপযুক্ত—চোখ জুড়িয়ে যায়। আমি চমিনকে বল্লুম "তোমরা যে একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ভিতর রয়েছ

া তোমাদের পোষাক দেখলে মনে হয় না। যুদ্ধে মেও ভারতবাসীর মত সব শোভা সৌন্দর্য্য তোমাদের ্যাগ করতে হয়নি সে ভাল।"

তিনি বল্লেন—"আমাদের দেশেও খদ্দর হয়, তাকে ামরা বলি 'পিনি', গরীবগুরবারা পরে। আমরা ক্রমে মে সেটা ন্যাশনালিষ্টদের পরিধান করে আনব।"

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় জাহাজে ফার্ষ্ট ক্লাসে এক- ন ন্যাশনালিষ্ট বর্ম্মীকে পিনির কুর্ত্তা পরিহিত দেখলুম,— াদা নয়, আমাদের দেশের ফিকে খাকি খদ্দর। কিন্তু ংচঙে রেসমি লুঙ্গি ও পাগড়ি থাকায় তাতে ঠাটের কছুমাত্র ন্যূনতা হয়নি।



সুকেশা ব্রহ্ম-মহিলা—(কেশবতী কন্যা)

মি স সেন তাঁর গৃহে সান্ধ্যভোজে যে দুজন বর্ম্মী দ্ধুকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, তার মধ্যে একজন সস্ত্রীক িষ্টার বাদ্‌র্ন এবং আর একজন পর্ত্তুন্‌। বাদ্‌র্ন উচ্চপদস্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, পলিটিক্সের ধার ধারেন না; পর্ত্তুন ্যারিষ্টার ও একটি পোলিটিকাল দলের নেতা।

বাদ্‌র্ন একজন বিদ্বান ব্যক্তি। বর্ম্মার ইতিহাস, াহিত্যকলা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান তাঁর অগাধ। তাঁর স্ত্রী সুন্দরী ও ভারি একটি সৌকুমার্য্যসম্পন্না। তাঁর বেশভূষায় কথাবার্ত্তায় এমন একটি মোহিনী আছে যা বর্ম্মী মেয়েদের বিশেষত্ব।

পর্ত্তুনের পত্নী আমেরিকান, আজ অসুস্থ বলে আসতে পারেন নি। পর্ত্তুন ইংরেজী ডিনার স্যুটে বিভূষিত হয়ে এসেছেন, বর্ম্মার আত্মা যেন তাঁর দেহত্যাগ করে চলে গেছে মনে হল। এর পরে আর একদিন তিনি সস্ত্রীক চায়ের নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, সেদিন কিন্তু বর্ম্মীজ পোষাকে শোভিত ছিলেন। সেদিন তাঁর দেহের ভিতর স্বাভাবিক মানুষটাকেও যেন চেনা যাচ্ছিল।

বাদ্‌র্নের কথায় জানতে পারলুম, আদৎ যে বর্ম্মা জাতি, তারা নিজেদের মূলতঃ তিব্বতী আর্য্য জাতি বলে বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষের প্রতি তাদের বিশেষ টান নেই। বৌদ্ধধর্ম্মগত যে টান সেটা সিংহলের উপরেই বেশী পড়েছে।



বীণ-বাদক

কেননা প্রথম প্রথম উত্তরপূর্ব্ববঙ্গ থেকে বৌদ্ধ প্রচারকের দল বর্ম্মাদেশে অভিযান করলেও শেষাশেষি সিংহলের মহাযান-পন্থার বৌদ্ধধর্ম্মই তাদের মধ্যে বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করেছে; সিংহল থেকে বুদ্ধের দন্ত প্রভৃতি অনেক স্মৃতি-চিহ্নও তারা লাভ করেছে; তাই প্রায় দুতিন শতাব্দী থেকে সিংহলের সঙ্গেই বর্ম্মার বৌদ্ধদের বেশী ঘনিষ্ঠতা, এবং সিংহলে যাতায়াতও বেশী।

এদিকে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সংঘর্ষে বর্ম্মাস্থ ভারতবর্ষীয়দের প্রতি অনেক বর্ম্মীরা সম্প্রতি বিশেষভাবে

বিমুখ হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রতি তাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার ঋণ একেবারে ভুলে যাবার যোগাড় হয়েছে। হিন্দু মহাসভার সভানেত্রী যে বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন ও সন্দেশ নিয়ে এখানে উপনীত হয়েছে, তার কর্ণকুহরে বর্ম্মীমুখপ্রসূত এ-সব তথ্যগুলি বড় শ্রুতিমধুর হল না। কিন্তু বার্দ্‌ন এ-সব ঝগড়াঝাঁটির ধার ধারেন না। সকলের সঙ্গে মেলা-মেশাতেই তাঁর আনন্দ। ভারতবর্ষ থেকে যে কোন খ্যাতনামা লোক আসেন তাঁদেরই তিনি সম্বর্দ্ধনা করেন। লাহোরের তথা-কথিত বৌদ্ধ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর স্বজাতি, পণ্ডিত শিবনারায়ণ একবার বর্ম্মা



রেঙ্গুনের হস্তী (২)

পরিভ্রমণে আসার পর বার্দ্‌নের পরম বন্ধু হয়েছেন। পূজনীয় মাতুল রবীন্দ্রনাথকেও নাকি তিনি বর্ম্মী কলাগহনের মধ্যে পরিচালিত করেছেন। ভারতবর্ষে কিন্তু কখন যান নি; সিংহলে ও শ্যামে যেতেই তাঁর সমস্ত অবসর কেটে যায়। আমায় তার পরদিন প্রভাতে শোয়ে-ডাগন পাগোডা দেখানর ভার তাঁরা নিলেন। তার বর্ণনা পরে দেব।

দুদিন পরে আমার জন্যে বার্দ্‌ন একটা মস্ত বড় বার্ম্মীজ ভোজের আয়োজন করলেন। সে রাত্রি বাকী সকল নিমন্ত্রিতদের জন্যে কিছু কিছু আমিষ খাদ্য থাকলেও আমার হিতকল্পে মিসেস বার্দ্‌নের স্বহস্তে রাঁধা বর্ম্মীজ নিরামিষ ব্যঞ্জনে টেবিল ভরে গিয়েছিল। তিনি নিজে সে-দিন আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে পারেন নি। বর্ম্মীজ-চটিপরা-পায়ে দুখানা টেবিলে দ্রুতগতিতে পরিবেশন করতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, আমাদের সঙ্গে বসে খাবার তাঁর তিলমাত্র অবসর ছিল না। আমি আনাড়ির মত খাচ্ছি লক্ষ্য করে, আমার প্রতি বিশেষ স্নেহে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলেকে মা যেমন সব মেখেচুকে খাইয়ে দেয়, তেমনি আমার প্লেটে একরাশ বার্ম্মিচেলি সিদ্ধ ভাতের মত তুলে দিয়ে, তাতে সব রকম ব্যঞ্জন একত্রে মিশিয়ে অনেকটা তেঁতুলগুলা ঢেলে সুমিষ্টভাবে বল্লেন—"এইবার ঠিক হয়েছে, ভাল করে খান।" তরকারিগুলি অধিকাংশ সামুদ্রিক ঘাসের। আমি প্রত্যেকটা একটু একটু করে খেলে হয়ত বেশী স্বাদ গ্রহণ করতে পারতুম—কিন্তু সেটা বর্ম্মীজ রীতি হত না। গৃহকর্ত্রী যে ভাবে মিশিয়ে দিলেন সেটা ঠিক বর্ম্মীজ কায়দা, কিন্তু তাতে সে রাত্রে আমি প্রায় অভুক্তই থেকে গেলুম। দু একটি গ্রাস কষ্টে-সৃষ্টে গলাধঃকরণ করে, শেষে দু একটা আম খেয়ে ক্ষুধার তৃপ্তি করলুম। আমার পাশে মাউঙ ছিলেন। তিনি স্বদেশী নিরামিশ খাদ্যের দিব্যি মান রক্ষা করলেন। স্বাদ জিনিষটা অভ্যাসের বশবর্ত্তী। যে জিনিষটা যে রকম ভাবে আমরা খেতে অভ্যস্ত সেই রকমেই সুস্বাদু লাগে, অন্যথা রুচিকর হতে কিছু সময় চাই। সেই একই জিনিষ মিসেস সেন একদিন নিজের বাড়ীতে বাঙালী রকমে রেঁধে আমায় খাওয়ালেন, পরম উপাদেয় লাগল।

সে-দিন টেবিলে আর একটা জিনিষ ছিল। 'ডোরিয়ান্' নামে কাঁঠাল জাতীয় এক ফল আমার জন্যে

বিশেষ করে আনা হয়েছিল। এই ফল সম্বন্ধে আমার সখীর কাছে ইতিপূর্ব্বেই আমি বর্ণনা শুনেছিলুম যে, এ ফল ভাঙবার সময় এক মাইল দূর থেকে এর উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ হতে হয়—খাওয়াও সকলের সাধ্য নয়। কিন্তু সামনা-সামনি ভাঙ্গা হয়নি বলে, শুধু কতকগুলি কোয়া টেবিলে রাখা ছিল বলে বোধ হয় গন্ধের কোন তীব্রতা কেউ অনুভব করেনি। কোয়াগুলো খেয়ে যা দেখলুম, তাতে কিছু সুস্বাদ না পেলেও বিশেষ কিছু বিস্বাদও পেলুম না, নিকৃষ্ট জাতের নেও কাঁঠালের মত মনে হল। বাড়ী ফিরে এসে আমার বান্ধবী, এবং তাঁর স্বামী ও কন্যারা আমায় খুব বাহাদুরী দিলেন, বল্লেন—"বীরাঙ্গনা বটে! নয় ত প্রথমবারেই ডোরিয়ান এমন নিঃশব্দে গলাধঃকরণ কর্‌লে।"

আমার সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যে বার্দ্‌ন সাহেব সেদিন তাঁদের দেশের চারপাঁচ নব্য যুবতীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটি খ্রীষ্টান, আবাল্য মিশনরিদের হাতে মানুষ, কলেজে পাশ করা—নাকে মুখে চোখে কথা কন। মাউঙও সে ডিনারে উপস্থিত ছিলেন বলেছি। তিনি থিয়সফিষ্ট, সুতরাং নিরামিষাশী, তাছাড়া কোন কোন ইঙ্গবঙ্গ বা ইঙ্গবর্ম্ম যুবকের মত ডিনার টেবিলে কথার তুবড়ি চালাতে পারেন না। তাঁর ভিতর একটি প্রাচ্য সৌম্য সংযম আছে। এই সবগুলি কারণে পূর্ব্বোক্ত নব্য বর্ম্মীজ মেয়েটির তিনি বিশেষভাবে উপহাসের পাত্র দেখলুম। ভদ্রলোকক্কে প্রতি পদে পদে সে মেয়েটি বাক্যবাণে দিগ্ধ করতে লাগল। মাঙচ তাঁর শোভন ধৈর্য্যের বলে নিজেকে অক্ষত রাখলেন। বরঞ্চ শ্রোতারা শুনে শুনে হাসির আড়ালে অধীর হতে থাকল।



রেঙ্গুনের হস্তী (১)

মাউঙ আমাকে একবার নেপথ্যেঃ বললেন—"এ মেয়েটিকে বর্ম্মিজ শিক্ষিত মেয়েদের আদর্শ ভাবলে একটা ভুল ধারণা নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া হবে। সাধারণতঃ আমাদের মেয়েরা এ রকম নয়, তারা শিষ্ট ও সংযত, এ মেয়েটি মিশনরি শিক্ষার ফল।"



কার্য্যনিরত হস্তী

তা সত্য। দোষে গুণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শের নমুনা এ মেয়েটি। দোষগুলি উপেক্ষা করলে দেখা যায় সে অনেক গুণে গুণান্বিতা। সে গুণগুলি ফুটবার অবসর পেয়েছে মি শ ন রি দে র কল্যাণে। সে গান গায় অতি সুন্দর। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্গীতে সিদ্ধ গায়িকা, আবার ইংরেজী হাল গানে, মজার গানে, নাচুনে গানে, প্রেমের গানেও পরিপক্ক। তার মুখে সুমিষ্ট, বর্ম্মীজ গানও শুনলুম; আমি তখনি তখনি তার স্বরলিপি করে নিলুম। সামাজিক সম্মিলনীতে যে কোন সমাজে তার পাসপোর্ট সহজলভ্য। এমন হাসিমুখা, জীবন্ত, প্রাণবন্ত মেয়ে

উপস্থিত সবাইকেই প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রাচ্য সমাজের আদর্শ তা হয় ত নয়; কিন্তু মনুষ্য সমাজে সেটা সর্ব্বত্র আদরণীয়। মেয়েটি শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাবে—বিলেতের সমাজে সে নিজের মার্কা মারতে পারবে সন্দেহ নেই।

এ দিকে যতই ইংরেজী প্রভাবন্বিতা হোক্, সে সাজ-সজ্জায় সম্পূর্ণ বার্মিজ। ইংরেজী পোষাক ও প্রসাধনের চেয়ে বর্ম্মীজ বেশে ও কেশবিন্যাসে যে তাদের আকর্ষণী শক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হবে, সে বিষয়ে নব্য বর্ম্মীজ মেয়েদের মেয়েলি-বুদ্ধি টন্‌টনে আছে। নিজের চুলটা পিছন থেকে আঁচড়িয়ে মাথার মধ্যিখানে তুলে নিয়ে পরিপাটি করে একটা ছোট বিঁড়ে মত করে তারা খেপে দেয়। তারপরে



হস্তী কাষ্ঠ টানিতেছে

পরচুলা নিয়ে সেই গোল ভিত্তির চারপাশে জড়িয়ে জড়িয়ে সেটাকে বড় ও উঁচু করে তোলে। যে যত উঁচু করতে চায় সে ততগুলো পরচুলা ব্যবহার করে। মধ্যে মধ্যে সুচারু কাঁটা ও চিরুণি বসায়। খোঁপার উচ্চতার পরিমাপ ফ্যাসনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। এই মেয়েটি একবার সগর্ব্বে বললে—তার খোঁপায় তার দিদিমার চুলের পরচুলা জড়ান।

নব্য বর্ম্মিণীদের কাপড়ের ফ্যাসানে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। রঙিন ঘাঘরা বা লুঙ্গির সঙ্গে উপরের জামাটা এখন শুভ্র শ্বেতরঙের পরা ফ্যাসন হয়েছে। তাও খুব পাৎলা হওয়া চাই, যেন ভিতরের লেসওয়ালা বডিস সকলের চক্ষুগোচর হয়। এ তথ্যটা একজন বিবিয়ানার বিরোধী বর্ম্মীজ্ পুরুষের সকাশাৎ লাভ করি। নব্য সহরে মেয়েদের পরিধানে আর একটী বিশেষত্ব দেখা যায়। তাদের গলায় একটি সাদা শিফনের ছোট স্কার্ফ বা উড়নী থাকে, তাতে সাদা জামার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়।

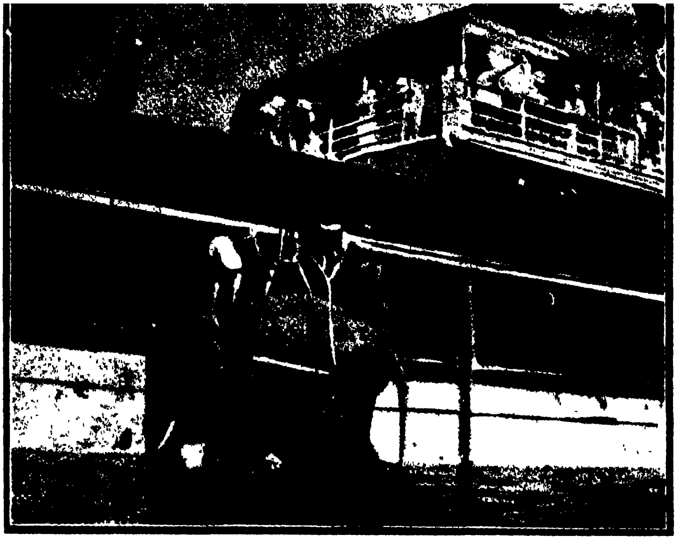
খ্রীষ্টান মেয়েটি ছাড়া আরও দুটি কুমারী মেয়ে ছিল—তারা দুই বোন। তারাও নব্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, কিন্তু পুরাকালের মেয়েদেরই মত স্বল্পভাষিণী। তাদের মধ্যে একজন চি কর ও একজন সঙ্গীতানুশীলনপর। চিত্রকর মেয়েটি একমাস পরে নিজের চিত্রের একটি প্রদর্শনী খুলবে তার আয়োজন করছে। সঙ্গীতপরায়ণা মেয়েটি বর্ম্মীজ সঙ্গীতে ইংরেজী হার্ম্মনি কি করে ঢোকান যায় তাঁর অনুসন্ধানে রত। মিসেস সেনের অনুরোধে আমার রচিত হার্ম্মনিযুক্ত দুই একটি বাঙ্গলা গান তাদের শোনান হল।

একটি বিবাহিত বর্ম্মীজ মেয়ে স্বামীসহ সে ডিনারে উপস্থিত ছিল, সে একেবারে চুপচাপ। শুনলুম বিবাহের পূর্ব্বে সে খুব চটকদার ও কইয়ে বলিয়ে ছিল। ভদ্র বর্ম্মীজ পরিবারের রীতি অনুসারে বিবাহের পর তাকে এই রকম মৌন স্থবিরভাব ধারণ করতে হয়েছে। অনেকের ধারণা বর্ম্মার স্ত্রীরা পুরুষপরতন্ত্র নয়, অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। আমার বন্ধুরা বল্লেন সেটা ভ্রান্তধারণা। তাদের পর্দ্দা নেই বটে, তারা ইচ্ছে করলে নিজের জীবিকা নিজে অর্জ্জন করতে পারে বটে, কিন্তু ভদ্র ঘরের বর্ম্মীজ পত্নী কখন পরপুরুষের সঙ্গে বেশী মেশামিশি, কথা-কওয়াকয়ি করে না। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় আদর্শ ও বর্ম্মী আদর্শ একই। একটি বর্ম্ম ফরাসী দম্পতি ছিলেন। ফরাসী পত্নীর ভারতবর্ষের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ, কোনদিন হয়ত ভারতবর্ষে আসবেন এই আশা হৃদয়ে পোষণ করছেন। কিন্তু স্বামীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যা শুনলুম তার থেকে মনে হল না, সে আশা অচিরে পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা আছে। তাঁর স্বামী বর্ম্মীজ 'বীণা' বাজান, আমাদের বাজিয়ে শুনালেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বর্ম্মীজ ভদ্রলোক বর্ম্মীজ তবলায় সঙ্গত রাখলেন। সে বীণাকে বর্ম্মার

ভারতবর্ষীয়েরা বলেন কাঠতরঙ্গ। একখানা নৌকাকৃতি কাঠের উপর সাতখানা চওড়া লোহার পাতের পরদা, দুধারে দুটি ছিদ্রে সুতো দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। সাতখানা পরদা—সা, রে, মা, পা, নি, র্সা, র্রে, 'কোমল' এই সাতটা সুরে বাঁধা। যতই গান বা বাজনা হোক্ না, ঐ কটা সুর অতিক্রম করে সরগমের আর কোন সুর স্পর্শ করার যো নেই। তাই প্রত্যেক বর্ম্মা সঙ্গীত গান্ধার ও ধৈবৎ বর্জ্জিত কতকটা আমাদের সারঙ্গের মত।

মিসেস সেন আমায় বর্ম্মার 'পোয়ে' নাচ দেখাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছিলেন, তার সুযোগ যখন তখন হয় না। বার্দ্দন শুনে বল্লেন "আমার এক ভাইঝির বিয়ে পরশু, তদুপলক্ষ্যে পোয়ে হবে। যদি অনুমতি দেন আপনার অতিথিকে সকালে বিয়েতে ও বিকেলে পোয়েতে নিয়ে যাব।" মিসেস সেন যেন আমার হয়ে চাঁদ হাতে পেলেন, আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে ব'ল্লেন - "আশাতীত সুযোগ। বর্ম্মীজ বিয়ে ও 'পোয়ে' দুই দেখতে পাবে। কি শুভক্ষণে এসেছ।"

বর্ম্মার শ্বেত হস্তীর কথা উঠল। তাঁরা বল্লেন শ্বেত হস্তী আর দেখা যায় না, তবে বর্ম্মা শেল কোম্পানীতে ও অন্যত্র হাতী দিয়ে ভারতোলা দেখা একটা দর্শনীয়



জাহাজে হাতী-তোলা

বস্তু বটে; কিন্তু সে কারখানাগুলিও এখন বন্ধ। তার ছবি সংগৃহীত হতে পারে। অনেক রাত্রে ডিনার পার্টি ভঙ্গ হল। পরদিন বিয়ে ও নাচ দেখার আশা মনে রেখে আমরা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করলুম।

পুরানো দপ্তর

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল্

ছুটীর দিন।···

অত্যন্ত অলস ভাবে ছোট্ট বাগানখানিতে বসে' আছি—শীতের রোদটুকু পিঠে বেশ মিষ্ট আমেজ দিচ্ছে। মনে কোনো চিন্তার বালাই নেই; খালি চায়ের পেয়ালাটি নিশ্চিন্ত আরামের স্মৃতিটুকু নিয়ে সাম্‌নে পড়ে' আছে।

আটবছরের কন্যা এসে বল্লে, ও বাবা! এই দেখ, কী কাণ্ড হ'য়েচে। কি কর্‌বে কর এগুলো নিয়ে।

হাতে তার একটা অতি জীর্ণ ন্যাকড়ায় বাঁধা ছোট দপ্তর। বিরক্ত হ'য়ে বললুম, কি হবে ওটা নিয়ে? কোত্থেকে নিয়ে এলি?

—মা দিলে গো! দেখচ' না, সব রুই ধরেচে!···

ভিতর থেকে গৃহিণী গম্ভীরস্বরে মেয়েকে সমর্থন করে' যা বললেন, তা হ'তে এইটুকু বুঝলুম, তিনি আজ ছুটীর অবসরে ঘরের জিনিষপত্র ঝাড়ামোছা কর্‌তে উঠে পড়ে' লেগেচেন। এই উই-ধরা দপ্তরটিতে কি-সব কাগজপত্র আছে, দেখেশুনে রাখবার আমার ওপর হুকুম হ'য়েচে।

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই দপ্তরটি নিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে তার বাঁধন খুলে ফেল্‌লুম।

খুলেই বুঝ্‌লুম, এই মহামূল্য সম্পত্তিটি আমার নয়, আমার স্বর্গগতা পিসিমাতার। মরবার সময় তিনি তাঁর এই সম্পত্তিটি আর একটা ভাঙ্গা টিনের ট্রাঙ্ক আমারই কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন।

দপ্তরটির ভিতর থেকে এক একটি জিনিষ বার করে' নিয়ে তার ধুলো ঝেড়ে রাখ্‌তে লাগলুম। অতি জীর্ণ তেলে-ভেজা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আবাঁধা তারকনাথের ছবি, স্কুলপাঠ্য গ্রামার ইত্যাদি। তাদের সঙ্গে আছে আর তিনটি জিনিষ, দু'খানি পোষ্টকার্ডে লেখা চিঠি, আর একখানি প্রীতি-উপহার।···

এই পোষ্টকার্ড ও প্রীতি-উপহারগুলি আমি একে একে পড়্‌তে বসলুম;—অলস মনের একটা খোরাক জুটে গেল।······

প্রথম চিঠিখানি লিখেচেন, পিসিমার বড় ছেলে নারাণ। প্রবাস থেকে সে লিখ্‌চে, মা, আমি যে পরীক্ষায় সফল হ'য়েছি, সেটা কেবলই তোমার ঐকান্তিক চেষ্টা ও শুভেচ্ছার ফলে। আর, এই সফলতা সার্থক হবে শুধু সেইদিনই, যেদিন আমি তোমার দুঃখ-অভাব ঘোচাতে পারবো।······

দ্বিতীয় চিঠিখানি পিসিমার ছোট ছেলে রেণুর লেখা। সে লিখেচে, মা, আমি দাদার মত লেখাপড়া শিখ্‌তে পারলুম না বলে' সবাই দুঃখ করে, আমারও সত্যই দুঃখ হয়। কিন্তু আবার এটুকু না-ভেবেও আমি পারিনে যে, যে-লেখাপড়ার ফলে ছেলে বৌকে নিয়ে বিদেশে চাকরী করতে চলে' যায়, আর মা থাকেন গ্রামে পড়ে' ভিটেয় প্রদীপ জ্বালতে, সে রকম লেখাপড়া আমার কপালে সহ্য হবে না ব'লেই বোধ হয় আমি আজ মূর্খ!···

শেষে রেণু লিখেচে, মা, মূর্খ ছেলে ব'লেই তুমি হতাশ হ'য়ো না।···এমন দিন আমারও আসবে, যেদিন তোমার এই মূর্খ ছেলেই তোমার মুখে হাসি আন্‌তে পারবে।···

······ঐ দুটী ছেলেকে নিয়ে পিসিমা অল্প বয়সে বিধবা হন। আমাদেরই বাড়ীতে তিনি তাঁর ছেলে দুটীকে মানুষ করেছিলেন। নারাণ বি-এ পাশ করে' বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে' বিদেশে চাকরী করতে চলে' গেল বউকে সঙ্গে নিয়ে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে মাকে কিছু সাহায্য করতো, কিন্তু সে কু-অভ্যাস সে শীঘ্রই ত্যাগ করেছিল।······

আর রেণু,—মায়ের কোলের ছেলে বলে' অত্যধিক আদরে সরস্বতীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হ'লো, কিন্তু সমস্ত দোষকে ছাপিয়েও ঐ একটা অতিবড় গুণ তার জেগে রইল, তার অসীম মাতৃভক্তি!···

সেই রেণু যখন সে-বছর হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে তার মায়ের কোলে মাথা রেখে পরপারের দিকে চলে' গেল, সে-দিনটা এখনো আমার চোখে স্পষ্ট জেগে রয়েছে।··· তখন তার বয়স আঠারো বছর।···তার ঐ চিঠিতে যে ভবিষ্যতের দিনটি সম্বন্ধে সে তার মায়ের কাছে আশার বাণী শুনিয়েছে, সে-দিনটি আস্‌বার পূর্ব্বেই ভগবান্ তাকে তাঁর চিরন্তনের ডাক শুনিয়ে দিয়েছিলেন।···

আর নারাণ? সে এখনও দিল্লীতে সরকারী কর্ম্মচারী, চার পাঁচটী ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার এখন পরিপূর্ণ সংসার।·· সেই নারাণেরই হাত থেকে কোনো দিন যে তার দুঃখিনী মায়ের দুঃখকষ্ট ঘোচাবার এতবড় অলীক ইচ্ছা লিপিবদ্ধ হয়েছিল, সে কথা বোধ হয় সে আজ নিজেই বিশ্বাস করতে পারবে না।······

আমার অলস মস্তিষ্ক ক্রমশঃ জটিল চিন্তায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। পূর্ণাহুতি দিলে ঐ ১৩২২ সালের ৬ই ফাল্গুন তারিখের লেখা প্রীতি-উপহারখানি।···

ষোল বৎসর পূর্ব্বে তরুণ মনের রাশি-রাশি কল্পনা নিয়ে ঐ প্রীতি-উপহারখানি আমিই লিখেছিলুম, আমার ছোট বোন্ অরুণার বিয়েতে।······

···মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা!···কিন্তু, এই ষোল বৎসরের মধ্যে কী না ঘটে গিয়েছে!······

কত ধুমধামের মধ্যে—কত আশা-আকাঙ্ক্ষায় জড়িয়ে অরুণার সে বিয়ে! বাড়ীর ছোট মেয়ে, রং ছিল তার কালো, কিন্তু বড় আদুরে, বড় অভিমানী ছিল অরুণা!··· পাছে শ্বশুরবাড়ীতে তার কোনো কষ্ট, কোনো কথা সহ্য করতে হয়, বাবা-মা তাই সাধ্যের অতিরিক্ত দান-সামগ্রী তত্ত্বতাবাস পাঠাতেন। কিন্তু তাতেও বড়লোকের আদুরে মেয়ে' বলে' শ্বশুরবাড়ীতে তার উপর টিকা-টিপ্পনী চল্‌তে লাগ্‌লো।

…মা দুঃখ কর্‌তেন, বাবা বোঝাতেন ; অমন একটুতে চঞ্চল হ'লে কি চলে ! বাঙ্গালীর মেয়ের বৌ-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তেই হবে !

বিশেষ কিছু জান্‌বার আমাদের উপায় ছিল না। বুদ্ধিমতী মেয়ে শ্বশুরবাড়ীর কোনরূপ নিন্দা আমাদের কাছে কর্‌তো না। কিন্তু তবু এটুকু বুঝ্‌তুম, অরুণা সুখে ছিল না।……

এমনি ক'রেই কেটে গেল তিন বৎসর। হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল, অরুণার সাংঘাতিক অসুখ, বাঁচে কি না !

…বাবা ছুটে গেলেন ডাক্তার নিয়ে।…গেলেন সকালে, ফিরে এলেন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই !

অসুখের খবর মিথ্যা,—আসল ব্যাপার, অরুণা কেরোসিনে পুড়ে' ম'রেছিল। বাবা যাবার পূর্ব্বেই লাস নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল শ্মশানে।

…অরু মরে' গেল, আত্মহত্যা কর্‌লে ; কিন্তু কেন, কি তার হ'য়েছিল, কী অব্যক্ত দারুণ যন্ত্রণা তার বুকে বাজ্‌লো, যেটা সে জ্বলন্ত আগুনের চেয়েও অসহ্য মনে কর্‌লে, তার কোনো খবরই আমরা পেলুম না।…শ্বশুর-বাড়ীতে তার শোনা গেল, কিছুই তো হয়নি, কেন যে অমন কর্‌লে, তা তাঁরাও বুঝ্‌তে পারেন না !

…ব্যস্‌, এই পর্য্যন্ত ! আর কিছু না।……

……সে আজ তের বৎসরের কথা !

তার পর মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ঐ অরুর স্মৃতি তিলে-তিলে তাঁকেও দগ্ধ করেচে !…কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে তিনি বল্‌তেন, ওরে, যে অরুর মরা দেহ আগুনে পুড়্‌তে দেখ্‌লেও আমি পাগল হ'য়ে যেতুম, সেই অরু আমার টাট্‌কা আগুনে পুড়েচে !…কতবড় আগুন তার বুকে জ্বলেছিল, যার জ্বালা সে আগুন নইলে ঠাণ্ডা কর্‌তে পার্‌লে না ?…

……সেই অরুর বিয়েতে আমারই লেখা ঐ প্রীতি-উপহার ! চক্‌চকে মোটা কাগজে টক্‌টকে লাল অক্ষরে ছাপা ঐ কবিতা !…কিন্তু, কতবড় মিথ্যা সে !……

লিখেছিলুম,—

* * *

ঐ অচেনার ঘরে ব'সো গিয়ে বোন
চির-আপনার বেশে,—
যেথা স্নেহ-ভালবাসা প্রীতির নিঝর
অমিয়-সাগরে মেশে ;—

* * *

এতবড় মিথ্যাবাদ—এতবড় অলীক স্বপ্ন আর যে কিছু সংসারে হ'তে পারে, তা আমি আজ ভাব্‌তে পারি না। কিন্তু, ষোল বৎসর আগে যখন ঐ কথাগুলি আমার প্রাণ থেকে বেরিয়েছিল, তখন কতখানি রঙীন কল্পনা আমার চোখে ও মনে সোণার কাঠি বুলিয়ে দিয়েছিল !……

'মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গেন !'…কথাটা শুনে আস্‌চি জ্ঞানের উন্মেষ থেকেই, কিন্তু এই পরম সত্যকে কোনো গুরুই এ পর্য্যন্ত আমাকে এমন করে' বোঝাতে পারেন নি, যেমন বুঝিয়ে দিলে এই উইয়ে-খাওয়া পুরানো দপ্তরটি !… প্রকাণ্ড এক মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে' কেমন আমরা মশ্‌গুল হ'য়ে জীবনের দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছি !…যখন সেই মিথ্যা ধরা পড়্‌বে, তখনো আমাদের চৈতন্য হয় কৈ ? সেই ঘা-খাওয়া মনই তো আবার নিত্য-নূতন কত রং-বেরংএর তাসের-বাড়ী গড়ে তুল্‌চে !……

…ঐ নারাণ-রেণুর চিঠি, আর অরুর বিয়ের এই প্রীতি-উপহার, কত আবেগ, কত সহৃদয়তা জমা হ'য়ে আছে ওদের প্রতি ছত্রে-ছত্রে। কিন্তু সত্যিকারের সবই যে ভুয়ো, সবই যে মিথ্যা, সবই যে আত্মপ্রবঞ্চনা, এ কথা আজ কেমন সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি !……

ছুটীর দিনের অলস মুহূর্ত্তগুলি হঠাৎ এক উত্তাল চিন্তার তরঙ্গে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। এম্‌নি করে' তন্ময় হ'য়ে যখন বসে' আছি, তখন গৃহিণী খোকাকে কোলে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে কাছে এসে বল্‌লেন, শুন্‌লে গো, ছেলের কথা ! ওর পকেটে ঐ যে চারটে পয়সা জমেচে, তাই থেকে ও দু'পয়সার বাড়ী, আর দু'পয়সার মোটর গাড়ী কিন্‌বে।

—বলে' খোকার পানে-মুখে চুমু দিয়ে-দিয়ে বলে' উঠ্‌লেন, ছেলের কি সবই আজগুবি !…

মনের কোন্‌ কুয়াসা-ঘেরা প্রান্ত থেকে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।……

হা রে সংসার ! কোন্‌টা তোমার আজগুবি নয় ? শিশুর মনের ঐ সরল আকাঙ্ক্ষা আজ যে-ভাবে অলীক মনে হচ্চে, ঠিক তেমনিই তো কত সুচিন্তিত আশার বাণী মাত্র ক'টা বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করে' অলীক এবং অসম্ভব হ'য়ে আমাদের চোখে ধরা পড়চে, আর ব'লে দিচ্চে, কত নগণ্য এই মানুষ, আর কত নগণ্য তার আশা-আকাঙ্ক্ষা !……

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীগোপাল বাবুর পিতা রাধানাথ বসু মল্লিক মহাশয়ের নামে পটলডাঙ্গার একটি রাস্তার নাম আছে। রাধানাথ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। শ্রীগোপাল অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলেও পিতৃপরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির সহিত তাঁহার সদ্‌গুণাবলীরও অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি যেমন অসাধারণ ছিল, তিনিও তদ্রূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পরম স্নেহভাজন ছিলেন।

শৈশবকাল হইতেই জ্ঞানার্জ্জনে শ্রীগোপালের অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মে। সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন, এবং অচিরে 'কন্টিনেণ্টাল' অর্থাৎ ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা, এবং এই শাস্ত্রে নব-নব জ্ঞানার্জ্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রত্যহ তিন চারিজন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বেদান্ত-দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা চলিত। বেদান্তের প্রতি তাঁহার এমন প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, মৃত্যুকালে উইল করিয়া বেদান্ত-বৃত্তি স্থাপনের জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার উইলের সর্ত্তানুযায়ী ন্যস্ত সম্পত্তি হইতে বেদান্ত অধ্যাপনার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হয় যে, এক একজন বেদান্ত-অধ্যাপক তিন তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। তিনি বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবেন এবং মৌলিক গবেষণা করিবেন। অধ্যাপকের মাসিক বৃত্তির পরিমাণ হইবে ১২৫ টাকা। তিন বৎসর অন্তে তিনি আরও থোক ১৪০০ টাকা পাইবেন। তাঁহার অধ্যাপনা ও গবেষণার ফল, সংস্কৃত ভাষা, বিশেষতঃ বেদান্তচর্চ্চার সহায়তাকল্পে ঐ থোক টাকা হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে। মুদ্রিত পুস্তকের ৪০০ খণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

ঢাক-ঢোল বাজাইয়া যাঁহারা দান করিয়া থাকেন, নামের প্রয়াসী হইয়া যাঁহারা দান করেন, তাঁহাদের দান দান বটে, সাধারণের তাহাতে মঙ্গলও হয় বটে, কিন্তু উহাতে যে স্বার্থের গন্ধ থাকে, সেই কারণে উহার মাহাত্ম্যের কতকটা অপচয় ঘটে। কিন্তু যাঁহারা নাম হইবে বলিয়া দান করেন না, যাঁহারা বিনা আড়ম্বরে দান করেন, তাঁহাদের দানই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান; এইরূপ দানেই ধনের যথার্থ সদ্ব্যয় হয়। ইহার সহিত যদি দাতার বিদ্যানুরাগ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ স্বীকার করিতেই হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তের অধ্যাপনার সুব্যবস্থা আছে। এই অধ্যাপনার জন্য উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থাও আছে। এই বৃত্তির নাম শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বৃত্তি। যে শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় এই বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেদান্তশিক্ষার্থী ছাত্রমণ্ডলী এবং বাঙ্গলাদেশের অধিবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় জনসাধারণ সবিশেষ অবগত নহেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, দাতা নামের প্রয়াসী ছিলেন না। বেদান্তের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ-বশতঃ বেদান্তচর্চ্চার সাহায্যার্থ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তিনি আত্মতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন মাত্র। আজ আমরা বহু চেষ্টায় দাতার জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহপূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিতেছি।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পটলডাঙ্গার বিখ্যাত মল্লিকবংশে শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। বসু মল্লিকবংশের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত কাঁটাগড় গ্রামে ছিল। জ্ঞানালোচনা ও জনহিতকর কার্য্যের জন্য এই বসু মল্লিকবংশ চিরদিনই প্রসিদ্ধ। শ্রীগোপাল বসু মল্লিক এই বংশের উপযুক্ত বংশধর।

এবং ১০০ খণ্ড দাতার বংশধরগণ তাঁহাদিগের বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণার্থ প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ট পুস্তক ও টাকা অধ্যাপক স্বয়ং প্রাপ্ত হইবেন। এই বৃত্তির টাকা হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "শ্রীগোপাল ফেলোসিপ লেকচারারের" চেয়ার স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীগোপালের বিদ্যানুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল, নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভে তাঁহার কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহা তাঁহার পারিবারিক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকের তালিকা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। এই সমুদয় পুস্তক তিনি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে গ্রন্থাগারটি সুসজ্জিত। এতদ্ব্যতীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য বিষয়ক বহু দুরূহ ও দুর্লভ গ্রন্থও অধ্যয়ন করিয়া এই দুই শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

যিনি স্বয়ং সুশিক্ষিত—শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শ্রীগোপাল বৃত্তি। দরিদ্র সন্তানরা অর্থাভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারে না দেখিয়া, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিতে তিনি সদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দুস্থ হিন্দু বিধবাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি তাঁহার জননী ৺ বিন্দুবাসিনীর নামে একটি তহবিল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই তহবিল হইতে অসহায়া বিধবাদিগের অভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী দুই-চারি টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত, ইহার অনুরূপ আরও বহু সাধারণ হিতকর কার্য্যে তিনি অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

প্লেগ নামক মহামারী যখন সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা আক্রমণ করে, তৎকালে শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয়ের পরদুঃখকাতর চিত্ত দুস্থ প্লেগ রোগীদিগের দুঃখে বিগলিত হইয়া উঠে। সেই জন্য তিনি হ্যারিসন রোডস্থ তিনখানি সুবৃহৎ অট্টালিকা প্লেগরোগীদিগের হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ছাড়িয়া দেন।

হিন্দু-সুলভ ধর্ম্মপ্রবণতা ও ভগবদ্ভক্তি তাঁহাতে অতিরিক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। সেই জন্য তিনি তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ শ্রীধরজীর সেবার্থ উইল করিয়া দিয়া যান।

স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেন তখন, শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় সদনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন জানিয়া, এই অনুষ্ঠানের পক্ষ হইতে এক ভদ্রলোক বসু মল্লিক মহাশয়ের নিকট আসিয়া চাঁদার জন্য আবেদন করেন। শ্রীগোপাল বাবু এই অনুষ্ঠানে এককালীন বহু অর্থ প্রদান করেন। চাঁদার খাতায় টাকার অঙ্ক লিখিয়া দিয়া স্বাক্ষর করিবার সময় তিনি চাঁদা-সংগ্রাহক ভদ্রলোককে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন যে এই দানের কথা যেন প্রকাশ করা না হয়। নাম জাহির করা সম্বন্ধে এরূপ ঔদাসীন্য এ দেশ কেন, কোন দেশেই বিশেষ সুলভ নহে।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজাইয়া নাম জাহির করিয়া সদনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন না—তিনি ছিলেন নীরব কর্ম্মী। তাই তিনি নীরবে নিঃস্বার্থ ভাবে বহু সদনুষ্ঠান করিলেও এবং বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া সাহায্য করিলেও, আজও তাঁহার বহু অবদানের কথা বাঙ্গালী জনসাধারণের অজ্ঞাত। বঙ্গীয় সমাজে এমন আদর্শ চরিত্র সুদুর্লভ।

সন ১৩০৬ সালের ১০ই চৈত্র (১৯০০খৃঃ, ২৩এ মার্চ্চ) দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ নরনারায়ণের একনিষ্ঠ সেবক এই মহাত্মা অমরধামে মহাপ্রয়াণ করেন। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সদনুষ্ঠানগুলির কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। তাঁহার নশ্বর দেহ ধ্বংস হইলেও তাঁহার কীর্ত্তিগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীগোপাল বাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয় পিতৃ অনুষ্ঠিত সকল কীর্ত্তি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। তবে তিনি এখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ায় তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মল্লিক ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বসু মল্লিক এখন বিষয়-কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

বে-মানান

শ্রীহাসিরাশি দেবী

(১)

ভাদ্র মাস।

তিন দিন আগে হইতে সেই যে বৃষ্টি পড়া সুরু করিয়াছে, তাহার যেন আর বিরাম বিশ্রাম ছিল না। তবে শেষের দিনে বৃষ্টির বেগটা কমিয়া গিয়াছিল বটে!

সহরের প্রান্ত;—খোলার বাড়ী ও কতকগুলি পাকা বাড়ী যেন গা-ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইয়া পরস্পরের দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া আছে। সকলের অবস্থাই প্রায় সমান, অর্থাৎ চূণ-বালির নামগন্ধও নাই; জীর্ণ যক্ষ্মারোগীর মত শুধু দেহের ঠাট বজায় রাখিয়া যে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সহরের যে পথটা দুই পাশে বাড়ীগুলি ভাগ করিয়া দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া আবার দূরের দিকে মিলাইয়া গিয়াছিল, সেই পথে একখানা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি ঘড় ঘড় শব্দে পথিপার্শ্বস্থ ঘরবাড়ীর গাঁথুনীর মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলিয়া একখানা বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল। খোলা জানালা দিয়া বাহিরের বাড়ীগুলির দৃশ্য দেখিয়া লইয়া বিনোদিনী মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভিতর হইতে বন্ধ দরজা টপকাইয়া যে পুরুষটি নামিয়া আসিয়া কড়া নাড়িল, তাহার বয়স বোধ হয় চল্লিশের মধ্যে। একহারা লম্বা চেহারা, বর্ণ বোধ হয় আগে গৌরই ছিল, উপস্থিত তাম্রবর্ণ।

বেশের পারিপাট্যে—প্রথমেই নজরে পড়ে তাহার হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুল আদ্দির চুড়ীদার, হাতে ছড়ি;—মাথার চুল ছ'আনা, দু'আনা, বার আনায় গন্ধতৈল সিক্ত, ফিরানো, এবং পায়ে পাম্পসু—···।

কড়া নাড়িতে নাড়িতে সে ব্যস্তস্বরে ডাকিল—

"মাসি,—বলি অ মাসি, দরজা কি খুলবে না? না দরজা থেকেই ফিরতে হবে?"

ভিতর হইতে অস্পষ্টস্বরে—নারী-কণ্ঠের উত্তর আসিল—

"যাই"—তাহার পরই যে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল, সে একটি রমণী—বয়স কুড়ি বাইশের মধ্যে, কাল, লম্বা, একহারা।

কালাপাড় শাড়ীর আঁচলখানা ঘুরাইয়া স্কন্ধে ফেলিতে ফেলিতে হাসিয়া—অথচ অভিমানাহত স্বরে কহিল—"বৌ—নিয়ে এলে বুঝি?"

পরেশ এই দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; তাই সে সেই হাসিটুকুর জবাবে হাসিল কি না ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু কণ্ঠস্বর গাড়ির মধ্যে উপবিষ্টা বিনোদিনীর কানে আসিয়া বাজিল—

"হু—ম্···।"

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের খিল্ খিল্ হাসির শব্দ কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেই, বিনোদিনী শিহরিয়া আরও একটু জড়সড় হইয়া বসিতেই, গাড়ির নিকটে আসিয়া মেয়েটি পাদানে পা দিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরে হঠাৎ দুই হাতে বিনোদিনীর নত মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—"বাঃ—বেশ নোলক নাকে ঘোমটাবতী ক'নে বউটি তো!"···আবার সেই হাসি।

বিনোদিনী শিহরিল,—মুখ তুলিতে পারিল না। মুখ ছাড়িয়া দিয়া সে কহিল—"পরেশবাবু তোমায় নামিয়ে নিয়ে যেতে আমায় ভার দিয়েছেন; চল গো ওঠ, - বৌ বরণ ক'রবার পাট তো আর এখানে নেই যে তোমায় বরণ করে, খই ছড়াতে ছড়াতে উলু দিয়ে,—কোলে ক'রে নিয়ে যাব। শুধুই এখানে উঠতে হয়; আর উঠবার ইচ্ছে না থাকলে জোর করে উঠাতেও আমাদের বাধে না;—বিশেষ এই বিন্দী,—সব পারে গো বৌ ঠাক্রুণ,—সব পারে।"···

বিন্দু তাহার হাত ধরিবার পূর্ব্বেই বিনোদিনী নামিয়া বিন্দুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ছোট্ট অঙ্গন;—চারি দিকে পায়রার খোপরের মত

ছোট ছোট মানুষ বাস করিবার খোপর;—আলো বাতাসের সংস্পর্শ তাহাদের সহিত নাই;—তাহারই পাশ দিয়া উপরে উঠিবার সরু সিঁড়ী দিয়া উপরে উঠিয়াই মাসির—অর্থাৎ বাড়ীউলি···মাসির ঘর।

বিন্দুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাসির কক্ষে প্রবেশ করিয়া, পরেশকে দেখিয়াই বিনোদিনী আবার এক হাত ঘোমটা টানিয়া দিল। অনুমানে বুঝিল, খাটের উপরে শায়িতা প্রৌঢ়া নারীই পরেশের সালঙ্কারে বর্ণিত মাসি।

পায়ের ধূলা লইতে যাইতেই মাসি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল; খাটের একধার দেখাইয়া দিয়া কহিল—"বোস বাছা, বোস।"

বিন্দু হাসিয়া পূর্ব্ববৎ স্বরে কহিল—"বউয়ের যে অতি-ভক্তি দেখছি গো পরেশবাবু,—একেবারে এসেই মাসিকে পেন্নাম!—একটু সামলে থেক' গো মাসি বোনপো,—কথায় আছে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ!" হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া পরেশ কহিল—"নীচে চললুম গো মাসি, দরকার হ'লে ডেকে পাঠিও।"

হাতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে বাহির হইয়া গেল; একটু পরেই নিচে হইতে বিন্দুর হাসির সহিত তাহারই কণ্ঠের গান শোনা গেল—

মনে কি পড়িল বঁধু এতদিন পরে,—
বল,— কোন অপরাধে, পাশরিয়ে রাধে
ছিলে হে মানের ভরে!

পরেশের চাপা কণ্ঠস্বরও শোনা গেল—"চুপ্—চুপ্··"

(২)

বিনোদিনী দেখিল এ বাড়ীর বাসিন্দারা সকলেই স্ত্রীলোক, এবং অবস্থাও কাহার' কাহার' ভাল নহে,—অর্থাৎ এক একদিন প্রায় উপবাসেই কাটাইতে হয়;—কিন্তু সেই অনাহারে থাকিয়াও দৈন্যের মধ্যে দিন কাটাইয়াও বেলাশেষে তাহাদের সাজসজ্জার সে কি উৎসাহ! সে যেন মনের মধ্যে বিস্ময় জাগাইয়া দেয়।

সন্ধ্যার পরে ঐ আলো-বাতাসহীন কুঠুরীগুলিই যেন এক একটি সুরসভা হইয়া উঠিয়া, গানে, গন্ধে,—আলোয় আপনাদের দিনের দৈন্য ঢাকিয়া ফেলে; তাহার পরে—রাত্রি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক একবার শুধু ভাসিয়া আসে পানোন্মত্তদের বিকৃত কণ্ঠের অশ্লীল গান,—চীৎকারধ্বনি।—

বিনোদিনী শিহরিয়া উঠে। যেদিন রাত্রে পরেশ ঘরে থাকে সেদিন সে "ওগো,—শুনছো···"

পরেশ প্রায় বেহুঁস অবস্থাতেই ঘরে ফিরিয়া আসে, তাহার পরে নিদ্রার গভীর অঙ্কে বিনা দ্বিধায় গা' ঢালিয়া দেয়। তাই তাহার ঘুম ভাঙ্গে না, অস্পষ্ট স্বরে হাত নাড়িয়া শুধু আশ্বাস দেয়—"হুম্···" তাহার পরে আবার চুপ। বিনোদিনী দিন দিন যেন শুকাইয়া উঠিতেছিল।

যে ঘরখানি তাহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা উপর তলার এক প্রান্তে,—প্রায় কাহারও এদিকে আসিবার সম্ভাবনা নাই। দিনের বেলা ছাড়া সেও ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় না।

মাসির ঘর আর এক প্রান্তে,—কিন্তু তাহার ঘরে বড় গোলমাল হয় না, মাসি বোধ হয় নির্জ্জনতাপ্রিয়! কিন্তু সবই যেন কেমন!

বিনোদিনী ভাবে, কই, ইহাদের সঙ্গে তাহার গ্রামবাসীদের তো কোনও দিক মেলে না! সমস্ত যেন কেমন ওলট-পালট হইয়া যায়; নিঃশব্দে শুধু ভাবে—কেন এমন হইল?···এতখানি অমিল সে মনের মধ্যে কেমন করিয়া মানাইয়া লইবে! অশ্রুবন্যা নামিয়া আসিতে চাহে আপনার অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে খোলা জানালার উপরে বসিয়া বিনোদিনী শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের রৌদ্রদগ্ধ আকাশের পানে চাহিয়া ছিল; হঠাৎ ডাক আসিল "ও-, বৌ—··!'

বিনোদিনী চমকিয়া মুখ ফিরাইল, দেখিল, মাসি তাহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

বিনোদিনী উঠিয়া আসিতেই মাসি' তাহাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল; বসিয়া কহিল—"সময় যেন আর একা একা কাটতে চায় না বাছা, তাই একবার তোমায় ডাকলাম! বলি,—দুটো পাকাচুল তোলাও হবে, কথা কয়ে হাঁপ্ ছাড়াও হবে; দাও তো বাছা দু'টো পাকাচুল তুলে, একটু স্বস্তি পাই···!

বিনোদিনী মাসির আদেশ মত নির্ব্বাকে পাকাচুল

তুলিয়া দিতেছিল, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাসি প্রশ্ন করিল—"তোমার বাপের বাড়ী কোথায় গা বাছা? কে কে আছে সেখানে?" পিত্রালয়ের বিষয়ে বিনোদিনীর বিবাহিত জীবনে এই প্রথম প্রশ্ন—! সে ধরা গলায় উত্তর দিল—"সে অনেক দূরে,—যেতে আসতে দু'দিন লাগে; বুড়ো বাপ্—আর একটি ছে'ট্ট ভাই আছে,—বেহারীগুরুর পাঠশালায় পড়ে; আর কেউ নেই।"

মাসি' তাহার হাত ধরিয়া সম্মুখেব সাইল; মুখখানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া আজই যেন প্রথম ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পরে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"পরেশ তোমায় বিয়ে ক'রে এনেছে, কেমন?"

মাথা নাড়িয়া বিনোদিনী জানাইল "হ্যাঁ,—"

মাসি ক্ষণকাল নতমুখে কি যেন ভাবিয়া লইল, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিল—

"তুমি নীচের কোন' মেয়ের সঙ্গে মিশো না, বুঝলে বৌ? যা দরকার হবে, তা তুমি আমায় ব'লবে। পরেশ যদি না এনে দেয়, আমি এনে দেব!"

বিনোদিনী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে মাসি উঠিয়া গেল; কুলুঙ্গী হইতে আয়না চিরুণী ও গন্ধতৈল আনিয়া রুক্ষ, অসংযত চুলগুলিকে আঁচড়াইয়া সযত্নে খোঁপা বাঁধিয়া দিল; তাহার পরে কহিল—"বেলা পড়'লে গা ধুয়ে ফেল,' আমি ওপোরে জল দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

সেদিনকার এই পরিচয় যেন বিনোদিনীকে মাসির দিকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিল, কিন্তু তবু সে 'আপনার' বলিয়া ভাবিতে পারিল না, কোথায় যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য রহিল।

রাত্রে পরেশ ফিরিলে প্রশ্ন করিল—"তুমি না ব'লেছিলে মাসি' আর তোমার ঐ বোনেরা ছাড়া আর কেউ নেই, তবে মাসিই বা তোমার বোনেদের সঙ্গে আমায় মিশতে বারণ করলো কেন?'

নেশার ঘোরে অস্পষ্টস্বরে কি একটা জবাব দিয়া পরেশ পাশ ফিরিয়া শুইল, সাহস করিয়া বিনোদিনী তাহাকে আর কোনও প্রশ্ন করিল না।

(৩)

বেলা প্রায় দশটা।

মাসি' বাড়ী ছিল না,—বাহিরে কোন দরকারে গিয়াছিল; পরেশের তো দিনের বেলায় দেখা মেলাই ভার,—সুতরাং উপরতল সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। শুধু নীচে হইতে মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল বাসন মাজার শব্দ, আর ক্বচিৎ কাহারও কণ্ঠস্বর; সমস্ত বাড়ীখানা যেন উৎসবের পরে অবসাদের ঘোরে তন্দ্রামগ্ন;—প্রতিদিনকার ঘটনা ইহাই,—তাই আর বিস্ময় জাগায় না।

ঠিক এমনি সময়ে নীচের বারান্দা হইতে বিন্দু তাহার 'বাজ খাঁই' গলায় হাঁকিল—"ওগো, ও বৌ-ঠাকরুণ, চিঠি নিয়ে যাও, তোমার চিঠি এসেছে।"

রান্না চড়াইয়া বিনোদিনী নিশ্চলভাবে বসিয়া উনুনের আঁচের দিকে চাহিয়া ছিল। নামিয়া আসিতে আসিতে হর্ষোজ্জ্বল মুখে কহিল—"আমার নামের চিঠি এসেছে, বিন্দুঠাকুরঝি?—"

নীচের বারান্দায় যে কয়জন মেয়ে উপস্থিত ছিল, সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একসঙ্গে হাসিয়া উঠিতেই বিনোদিনী যেন এক মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল।

পত্রখানা বিন্দু বিনোদিনীর হাতে দিতেই এক দিক হইতে মলিনা বলিয়া উঠিল—"ঠাকুরঝি' ব'লতে তোকে কে শিখিয়েছে সত্যি করে বল্‌তো ভাই বৌ, মাথার দিব্যি,—সত্যি কথা বলবি।"

বিনোদিনী কথা কহিল না, পত্রখানা হাতে লইয়া নির্ব্বাকে নতমুখে ঘামিয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটি কহিল—

"পরেশবাবু বুঝি?" হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে বিন্দু বলিয়া উঠিল—"সে না হ'লে আর অমন চৌকস্ বুদ্ধি কার হবে? যেমন চেহারা, তেমনি তো বিদ্যে বুদ্ধিরও দৌড় হবে!" নিজের রসিকতায় সে নিজেই হাসিয়া উঠিল, তাহার পরে বিনোদিনীর কানের কাছে মুখ আনিয়া স্পষ্টস্বরে কহিল—"ঠাকুরঝি নই লো, ঠাকুরঝি নই; পারিস্ তো সতীন ব'লে ডাকিস্।"

আবার একটা হাসির স্রোত চলিয়া গেল। দয়ার্দ্র চিত্তে পটলী কহিল—"আহাঃ,—কেন ওকে তোরা ওম্‌নি করে নাকালের একশেষ করিস বিনি! তোদেরও যেমন সং···"

নিষ্কৃতি পাইয়া বিনোদিনী উপরে চলিয়া আসিল, কিন্তু পিতার চিঠিখানা পড়িতে গিয়া অশ্রুজলের ধারায় একটা অক্ষরও স্পষ্ট দেখিতে পাইল না; দুই হাতে মুখখানা ঢাকিয়া কাঁদিয়া ডাকিল "বাবা···গো···।"

সেদিন রাত্রে একটু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া পরেশ কহিল—"চিঠি এসেছে? ভালই। কিন্তু···এই গিয়ে···দেখ্ বৌ! এখন, কি বলে, হ্যাঁ,···এখন আমার বড় হাত টান, —সংসারের ব্যাপার তুইও তো বুঝিস, বুঝিয়ে আর কি ব'লতে হবে। তাই ব'লছি, তোর বাপের কাছু থেকে কিছু টাকা ধারই চেয়ে নে' না হয়; দেখ,—···পরে নয় আমিই সুদ্ শুদ্ধ আসল সব শুধে দেব।"

মুখে একটা কঠিন জবাব আসিয়াছিল, সামলাইয়া গিয়া বিনোদিনী কহিল,—"নিজের সংসারই যে ধার করে চালায়, মাসে মাসে দোকানদারের মুখ খিঁচুনী, গালাগাল সহ্য করেও ধার খেতে হয়,—কারণ পেটে না দিলে চলে না,—সে আবার তোমার জন্যে ধার করবে কোথা থেকে? কেউ কি বিশ্বাস ক'রে দেবে?"

পরেশ সোজা হইয়া বসিয়া বিরক্তি দমন করিতে গিয়াও পারিল না, উষ্ণতা কণ্ঠস্বরে প্রকাশ হইয়া পড়িল; হাত নাড়িয়া কহিল—"আরে·· চেষ্টা করে দেখতেই বা দোষ কি?"

"দোষাদোষ তুমি বুঝবে না, কারণ বুঝবার ক্ষমতা তুমি মদ্ খেয়ে হারিয়ে ফেলেছো। সে ক্ষমতা যদি তোমার থাকতো—"

উঠিয়া আসিয়া একটা ঠেলায় তাহাকে ফেলিয়া দিয়া পরেশ বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গেল—"কী,··· আমাকে মাতাল,—দুশ্চরিত্র বলা? মেয়ে মানুষের এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমাকে আবার উপদেশ দিতে আসা? আমি দোষাদোষ বুঝি না! আমি মাতাল? আর উনি খুব সতী—না? আরে আমার শা···রে! রোস্ আজ, মজাখানা টের পাইয়ে দিচ্ছি, আজ বিন্দি পটলাদের সামনে—বাবুদের সামনে তোকে সোজা করছি, দাঁড়া!"

কিছুক্ষণ পরে সকলকে সঙ্গে লইয়া সত্যই সে যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল ঘোমটাবৃতা একটি নারীমূর্ত্তি দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রাখিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে আর তাহার মাথার কাপড় ভিজাইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে তাজা রক্তের ধারা। আর বড় কিছু জুলুম সেদিন হইল না, মাসির ইঙ্গিতে সকলেই ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, রহিল শুধু মাসি ও বিনোদিনী। মাথার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে মাসি সকরুণ স্বরে কহিল "ওটা গোঁয়ার! অমন মানুষের সঙ্গে কি ঘর করা পোষায় রে বাছা! আর মানুষের সব সময়েই কি মনের ঠিক থাকে? হ'লেই বা মেয়েমানুষ! তার কি প্রাণে কোনও সাধ আহ্লাদই নেই? অঙ্গে তো একদিন একখানা ভালো কাপড় ছোঁয়াতে দেখ্লাম না, সোনার আঁচড় তো নয়ই। আমার বাড়ীতে র'য়েছে বলে ওকে এই বেশে দেখে লজ্জায় আমারই যেন গা কেমন করে; তার চেয়ে এবার থেকে তুই আমার মতে চল্ দিকি বৌ, দেখবি কখনও' কোনও দুঃখ তুই পাবি'নে! আর তখন ঐ পোড়ারমুখোর মুখে সাত ঝেঁটা মেরে···········"

বিনোদিনী একবার যেন সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

(৪

তাহার পরে আজ প্রায় সপ্তাহ কাল অতীত হইয়া গিয়াছে; পরেশ আর এ' বাসামুখো হয় নাই, বিনোদিনীর সহিত দেখাও করে নাই। সে কোথায় আছে তাহাও বিনোদিনী জানে না। তবে মাসির ব্যবহারে সদয়তা যে দিন দিন বাড়িতেছিল তাহা অনুভব করিয়া একটা অজানা আশঙ্কায় দিবারাত্রি হৃদয় যেন কাঁপিতেছিল; কিন্তু এ আশঙ্কার সে কোনও হেতুই আবিষ্কার করিতে পারিতেছিল না।

রাত্রে দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়া সে একাই শয়ন করে, কিন্তু গরমের জন্য খোলা থাকে পার্শ্বের জানালাটা। সেদিনও খোলাই ছিল,—হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই বিনোদিনীর মনে হইল খোলা জানালা হইতে টর্চ্চের আলো ফেলিয়া কে তাহাকে দেখিতেছিল, হঠাৎ সাড়া পাইয়াই টর্চ্চ নিভাইয়া সরিয়া গেল।

প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া সে উঠিয়া বসিল,—চীৎকার স্বরে প্রশ্ন করিল "কে? কে ওখানে?"

কোনও উত্তর আসিল না, শুধু মনে হইল যেন কাহার পদশব্দ জানালার পার্শ্ব হইতে দূরে সরিয়া গেল।

কক্ষের অপর পার্শ্বস্থ দ্বার খুলিয়া বিনোদিনী দ্রুতপদে মাসির ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—"মাসি, ও মাসি!—"

ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া গেল, দুই হাতে চোখ ডলিতে

ভলিতে বাহিরে আসিয়া মাসি যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল; প্রশ্ন করিল—"এত রাত্রে বৌ যে? কি মনে ক'রে গো?—"

তাহার প্রশ্নে—গোপনতা সত্ত্বেও কোথায় যেন বিদ্রূপের একটু রেশ ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিবার সময় তখন বিনোদিনীর ছিল না, বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করিয়া যেন ঢেঁকির ঘা পড়িতেছিল; শুষ্কস্বরে সে বলিয়া উঠিল—"বড় ভয় করছে মাসি!—" আলো ও পদশব্দের কথা সে ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া গেল।

মাসি কয়েকবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিল,—যেন বিনোদিনীর মুখখানা হইতে অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত এক নিশ্বাসে দেখিয়া লইতে চায়! তাহার পরে কহিল—"তাই না কি? তা—বাছা, পরেশবাবু কি আজ রাতেও ঘরে ফেরেনি?" কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন কেমন!

মাথা নাড়িয়া বিনোদিনী জানাইল—"না।"

মাসি হঠাৎ হাসিয়া উঠিল; কহিল—"আর বোধ হয় সে আসবেও না বৌ, তোর ভয় নেই!"

ভয় নেই! মাসি কি বলিতে চাহে! বিনোদিনী শিহরিয়া মুখ তুলিতেই মাসি যেন ইচ্ছা করিয়াই মুখের ভাব বদল করিয়া ফেলিল; কহিল—"না—আমি সে সম্বন্ধে কিছু ব'লছিনে, বলছি যে, তুমি কিছু ভেব না বৌ—"

একটু থামিয়া যেন কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—"তুমি শোও গে, ভয় নেই—আমি জেগেই আছি, ফের যদি ভয় পায়, মাসি ব'লে একটা ডাক দিও।"

উত্তর পাইয়া বিনোদিনী আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিল, ও চতুর্দ্দিক বন্ধ করিয়া শুইল, কিন্তু আর ঘুম আসিল না। এক একবার কানে ভাসিয়া আসিতেছিল নীচেকার কলরব, উল্লসিত হাসির ধ্বনি।

পরদিন সন্ধ্যায় মাসি যখন বিনোদিনীর চুল বাঁধিয়া, আগ্রহাতিশয্যে একখানা পরিষ্কার শাড়ী পরাইয়া ও নিজের খরচে জলখাবার খাওয়াইয়া কোন কাজে বাহির হইয়া গেল, তখন মাসির যত্নের চুল বাঁধা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে কেন যে সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহা বিনোদিনী নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

ঠিক এমনি সময়ে নিঃশব্দ পদে যে আসিয়া দ্বারের উপরে দাঁড়াইল, সে মাসি নহে, পরেশও নহে; বিন্দু! বিন্দু ডাকিল—"বৌ—ওগো ঠাকরুণ!"

জ্বলিয়া উঠিয়া বিনোদিনী চীৎকার করিয়া উঠিল—

"বেরোও আমার ঘর থেকে, তোমাদের মুখ দেখতে পর্য্যন্ত আজ আমার ঘেন্না করছে। শীগ্‌গির আমার সামনে থেকে সরে যাও,—নইলে—"

অন্য কোনও দিন হইলে ইহার উত্তরে বিন্দু কি বলিত, করিত, তাহা অনুমান করা শক্ত, কিন্তু সে আজ চীৎকার করিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিল না, বাহির হইয়াও গেল না, যেন আহত স্বরেই বলিয়া উঠিল—"একটা কথাও কি আজ আমার মুখ থেকে শুনতে চাও না বৌ? সত্যিই কি তুমি আমায় এত ঘেন্না কর?"

বিনোদিনী মুখ তুলিয়া চাহিল,—দেখিল সে বিন্দুর সহিত এ বিন্দুর শুধু সাজসজ্জায় নয়, মুখের ভাবেও সম্পূর্ণ ভিন্নতা আছে। ক্ষণকাল কি ভাবিয়া লইয়া কহিল—"না, কি ব'লবে শীগ্‌গির বল।"

বিন্দু বার কয়েক পশ্চাতে চাহিয়া পায়ে পায়ে সরিয়া আসিল, কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—

"নিজেকে বাঁচাতে চাও? যদি চাও, তবে তাড়াতাড়ি কথার উত্তর দাও, দেরী কোর' না। কারণ, হয় তো এখনই মাসি এসে পড়বে।"

বিনোদিনী ক্ষণকাল বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অধীর স্বরে বিন্দু বলিয়া উঠিল—"শীগ্‌গির বল, আমার সময় নেই…"

রুদ্ধ নিশ্বাসে বিনোদিনী বলিয়া উঠিল—"চাই।"

বিন্দু কহিল—"তাহ'লে সব গুছিয়ে রেখ, দিন দু'একের মধ্যে একটা সুবিধে ক'রে তোমায় তোমার বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব। যার সঙ্গে তোমায় পাঠাব, জেন, সে বিশ্বাসী। আর যদি না যেতে চাও,—তাও জেন,—যে আমাদের দশা ছাড়া আর কোনও পথ—"

হঠাৎ তাহার হাত দুইখানা জড়াইয়া ধরিয়া রোদন জড়িত স্বরে বিনোদিনী বলিয়া উঠিল—"আমায় তুমি বাঁচাও,—ওগো—আমায় তুমি বাঁচাও।"

হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বিন্দু বলিয়া গেল,—

"চেষ্টা করব এই পর্য্যন্ত বলতে পারি,—ব্যস্ত হ'য়ো না, আর আজ রাত্তে ঘরের দরজা খুলো না—সাবধান।"

সে চলিয়া গেল, বিনোদিনাও উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

… … … …

দিন দুই পরে মাসির সহিত বাসায় প্রবেশ করিয়াই পরেশ চীৎকার করিয়া ডাকিল—"বিন্দি!—"

বিন্দু এই ডাকটির জন্যই সম্ভব প্রস্তুত ছিল, অগ্রসর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত পরেশ তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িল—"বল্ হারামজাদি, আমার বৌকে কোথায় পাঠিয়েছিস্, বল শীগ্‌গির!" বিন্দুর তুলনায় পরেশ কৃশকায়, জোরও প্রায় সমানই; তাই এক ঝট্‌কায় তাহার আক্রমণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বিন্দু সরিয়া দাঁড়াইল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জোর গলায় উত্তর দিল—"চুলোয়,—যেখানে তোর মত স্বামী নেই,—তোর মন্ত্রী ঐ মাসি নেই, আর এই জাত-ধর্ম্মখাগী বিন্দিও নেই—সেইখানে পাঠিয়েছি; পারিস্ তো নালিশ পুলিশ করে নিগে যা।"

"তোকে আমি খুন্ ক'রবো, তাতে ফাঁসি যেতে হয় সেও বি আচ্ছা, তবু আমি তোর রক্ত দেখব আজ; আমার নাম পরশা, জানিস! তোর মত কত শত বিন্দিকে মেরে টিট্ ক'রে দিয়েছি; আজ তোর পালা…"

পরেশ অগ্রসর হইয়া যাইতেই মাসি বাধা দিল…"আহা কি কর পরেশবাবু…?

বিন্দু দরজার পার্শ্ব হইতে নোংরা ঝাঁট দিবার ঝাঁটাটা ডান হাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আগাইয়া আসিল,—"তবে আমারই এক ঘা হজম্ কর্—…

সপাৎ করিয়া তাহার এক ঘা পরেশের মুখের উপরে পড়িতেই সে "বাপ্" বলিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মাসী চীৎকার করিয়া উঠিল—"মেরে ফেললে রে,—খুন করলে রে…।

বিন্দু ততখন বাসার বাহির হইয়া গিয়াছে।

মালবীয়-জয়ন্তী

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

গত ২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ ভগবান দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসব হয়। তাঁহার গুণানুরক্ত বহু মনীষী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার্ জগদীশচন্দ্র বসু, সার্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন সভাসমিতি অভিনন্দন-পত্র প্রেরণ করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর সার সৈয়দ মামুদ, শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক সর্দ্দার গুরুমুখ সিং তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। সার সি, ভি, রামণ্ জয়ন্তী-উৎসবে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রবাসী বাঙ্গালী সমিতির পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিনন্দন পাঠ করেন।

অন্তে মালবীয়জী এই সব অভিনন্দনের উত্তরে কয়েকটি মাত্র কথা বলেন যে "সারা জীবন আমি ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মনে করিয়াছি। আমার দেশ সেবা আমার ধর্ম্ম। লোভের বশে বা ভয়ে আমি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই। জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া আমি আমার দেশবাসীকে মাত্র এইটুকু জানাতে চাই, যেন কোন দিন আমার দেশ-সেবা ক্ষুণ্ণ না হয়, এবং যেন আমার এই জীর্ণ দেহের অবসানে আবার এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।" শেষ কয়টি কথা বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পাকুল হয়, উপস্থিত জনসংঘের অনেকেরই চক্ষু সজল হইয়াছিল।

এলাহাবাদে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন; এবং জপ, তপ, আরাধনা ও পুরাণ কথায় দিন যাপন করিতেন। মালবীয়জী এখনও সগর্ব্বে বলেন যে, তিনি কথকের পুত্র; এবং দুঃখ করেন যে, তাঁহার পিতৃদেবের ন্যায় যদি তিনি ভগবানের নাম-গানে দিন যাপন করিতে পারিতেন—তাঁহার জীবন সার্থক

হইত। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য গর্ব্ব তাঁহার পিতৃদত্ত উত্তরাধিকার। 'দ্বিজাঃ উজ্জ্বল বেশাঃ' —ব্রাহ্মণ শুচি শুভ্র পরিচ্ছদ ধারণ করিবে ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। তিনি কখনও এই বিধি অমান্য করেন নাই। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'একাদশী কথা' উপলক্ষে যিনি তাঁহার পুরাণ ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, অতীতের কাহিনীকে এমন সজীব ও সরল করিয়া বর্ণনা করিবার ক্ষমতা সংসারে দুর্ল্লভ। মালবীয়জীর মুখে 'হিন্দী' শুনিয়া মনে হয়, 'হিন্দী'ই ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া উচিত।

তাঁহার বাণী এত মিষ্ট, কারণ তাহার মূলে আছে ভাবুকতা। Gladstone সম্বন্ধে বলা হয়—তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহাতে তিনি বড় কবি, লেখক ও ধর্ম্মসাধক হইতে পারিতেন; মালবীয়াজী সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। তিনি যদি রাজনীতি ক্ষেত্রে না নামিতেন—তিনি বড় লেখক, অধ্যাপক ও ধর্ম্মগুরু হইতে পারিতেন। তাঁহার মধ্যে যে ঐশী শক্তি নিহিত তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে রাজনীতিক্ষেত্রে, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় ও গঠনে।

এ সংসারে ছোট-বড় সকলেই নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, জীবিকার জন্য কোন কায করিতে বাধ্য। তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন এবং ওকালতিতে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ওকালতি করিলে তিনি আজ লক্ষপতি হইতে পারিতেন। কিন্তু স্বার্থের মোহ তিনি যৌবনেই কেমন করিয়া কাটাইলেন ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহার ন্যায় অনন্যকর্ম্মা সর্ব্বত্যাগী দেশসেবক ভারতে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি? এমন কি রাজনৈতিক জীবনেও ইচ্ছা করিলেই তিনি বড়লাটের দরবারে আশী হাজারী কর্ম্মসচীব হইয়া, Knight খেতাবে ভূষিত হইতে পারিতেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে ভাল ভাল চাকরী দিতে পারিতেন। কিন্তু অর্থলিপ্সা বা যশোলিপ্সা কোন দিন তাঁহাকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। এমন কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যখন তাঁহাকে D. L. উপাধিতে সম্মানিত করিবার প্রস্তাব করা হইল, তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বিশেষ অনুনয় ও বিনয় সহ এই উপাধির হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিলেন। তিনি জীবনে এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, মানুষের প্রধান সম্পদ তাহার কীর্ত্তি, যাহা কালের নিকষেই ধরা পড়ে।

তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় ২০ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনায় এই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। হিন্দুর কৃষ্টি (culture) সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধনই ইহার মূল প্রেরণা। উত্তর যুগই ইহার পরিচয় দিবে এবং হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এইখানেই পাওয়া যাইবে।

মালবীয়জী বর্ত্তমান যুগের মহা-ভিক্ষু। দীন ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া 'অনাথ পিণ্ডদ সুতা'র ন্যায় ভিক্ষার দ্বারা এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন—এক ক্রোড় ত্রিশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিলেন—তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তাঁহার পূত চরিত্র, অসাধারণ বাগ্মিতা এবং একনিষ্ঠ দেশ-ভক্তির জন্যই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

ভারতে এমন অক্লান্তকর্ম্মী সুলভ নহে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, ব্যায়াম (এখনও তিনি নিয়মিত ডন্ বৈঠক করেন) স্নান ও পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া তিনি কর্ম্মে মনোনিবেশ করেন, এবং রাত্রি দশটার পর তবে বিশ্রাম। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু মহাসভা ও দেশের সেবাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের পরিচয় দেয়। এমন সদা-চলমান (Constantly mobile) কর্ম্মী কল্পনা করাও কঠিন হইয়া পড়ে। আজ তিনি কাশী, দুদিন পরে বোম্বাই, তিন দিন পরে লাহোরে, চার দিন পরে মান্দ্রাজ—এইভাবে তাঁহার জীবন গৃহ অপেক্ষা রেলওয়ে ট্রেণেই বোধ হয় বেশীর ভাগ কাটিয়াছে। মিতাহারী (এ বিষয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর ন্যায়,) মিতাচারী, নিষ্ঠাবান ও সংযমী বলিয়াই আজ ৭০ বৎসর বয়সেও তিনি এত পরিশ্রম করিতে পারেন।

তাঁহার বাগ্মিতা সম্বন্ধে অনেকেই জানেন। তাঁহার বাক্য-বিন্যাস এমন সহজ এবং দ্রুততালে চলে যে কোথাও রসভঙ্গ হয় না এবং পারম্পর্য্য নষ্ট হয় না। কোন চীৎকার বা হস্তপদ সঞ্চালন বা মুখভঙ্গী দ্বারা ভাবপ্রকাশ, যাহা Demagogueদের প্রধান সম্পদ, তাহা কখনও তাঁহার বাগ্মিতায় প্রকাশ পায় না। তাঁহাকে আদর্শ Speaker বলা যায়। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সময় স্বর্গীয় গোখলেকে মনে পড়ে। শ্রদ্ধেয় গোখলে মহোদয়ের বক্তৃতায় Statistic

খুব বেশী থাকিত। মালবীয়জীর বক্তৃতা সরস; কারণ, তিনি ভাবুক ও রসিক। কাযেই, তাঁহার বক্তৃতার ছন্দ আছে, দোলা আছে, কল্পনায় তাহা রঙ্গীন। তাঁহার ইংরাজীর উচ্চারণ বিশুদ্ধ, ভাষা মার্জ্জিত, কোথাও শব্দাড়ম্বর নাই, শ্রোতার নিকট তাঁহার আবেদনটি অতি সহজেই পৌঁছায়। শোনা যায় জালিয়ানওয়ালাবাগ ব্যাপারে Councilএ তিনি পুরা পাঁচ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের নিরন্তর বিরক্তিকর বাধা প্রদান সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার বক্তব্য,—নিরস্ত্র ও নিরীহ নরনারী হত্যার করুণ কাহিনী ও পাঞ্জাবে Martial Lawর অত্যাচারের জ্বলন্ত ছবি তিনি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরে হিন্দীতেও তিনি পুরা পাঁচ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দেন। শ্রোতাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই—ইহা তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতার পরিচয় দেয়। স্যার তেজবাহাদুর লিখিয়াছেন মালবীয়জীর Orthodoxy invulnerable নয়, কারণ তিনি সম্প্রতি 'কালাপানি' পার হইয়াছেন। তাঁহার মন যে গতিশীল (Dynamic) তাহার পরিচয় তিনি বহু কাল পূর্ব্বে দিয়াছেন। অব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ হইলে অধ্যাপনার অধিকারী, এই সত্য তিনি সহজেই মানিয়া লন—যদিও ইহাতে 'অচলায়তনে'র পাণ্ডারা তারস্বরে চীৎকার ও আন্দোলন করেন। এই অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে গঙ্গাতীরে তিনি আপামর চণ্ডালকে স্বয়ং 'নারায়ণ' মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পরম নিষ্ঠাবান, আচারবান, শাস্ত্র-বিশ্বাসী আদর্শ ব্রাহ্মণ, হিন্দু মহাসভার নিয়ন্তা ও সভাপতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা সাহসের পরিচয় আর কি হইতে পারে। তাঁহার চিত্ত যে সংস্কার মুক্ত, সত্যান্বেষী ও গতিশীল, বিশেষতঃ জীবনের এই অপরাহ্নে—এই কয়টি ঘটনাই তাহার সম্যক পরিচয় দেয়।

ভারতের অতীত গৌরব তাঁহার জীবনের পথ প্রদর্শক। 'হামারা দেশ' এই কথা যখন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়, মনে হয় তাঁহার অন্তরাত্মা যেন এই বাণীতে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক চিন্তায়, বাক্যে ও কর্ম্মে সেই এক কথা—'আমার দেশ'। কি করিয়া দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়, দেশের নরনারী দেশ-ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়, জগতের সম্বন্ধে ভারতের আত্ম-সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়, এই তাঁহার সারা জীবনব্যাপী সাধনা। তিনি স্বদেশ, স্বধর্ম্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; কিন্তু কখনও বিদেশ বা পরধর্ম্মের নিন্দা করেন না।

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি কখনও উগ্র নীতির পক্ষপাতী নহেন। Palmerston was a living compromise—মালবীয়জীও জীবনে তাহাই করিয়াছেন—তিনি চিরদিনই



পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়

মধ্যপন্থী। তিনি শুধু মুখে বলেন নাই, জীবনে পালন করিয়াছেন সেই অমূল্য নীতি—Truth lies in the golden mean. নানা মতের সংঘর্ষের মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে তিনি সত্যের সহিত, Principleএর সহিত কোন দিন compromise করেন নাই। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা যখন খুবই শোচনীয়, তখন শোনা যায় 1s. 6d. এ ভোটের জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রলোভন দেওয়া

হয়, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। Assemblyতে cotton duty লইয়া যে বিবাদ তাহাতে তিনি বলেন শত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট হয় হউক, কিন্তু দেশের কল্যাণ যেন ব্যাহত না হয় এবং এই উপলক্ষে Assemblyর সভ্যপদ ত্যাগ করেন। বোম্বাইয়ে যখন তাঁহাকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়, তিনি প্রকাশ্য বিচারালয়ে ব্রিটীশ রাজত্বের বিচার প্রণালী সম্বন্ধে এমন ভাবে হাকিম মহাপ্রভুকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাহা ভারতবাসী কোন দিন ভুলিবে না। তাঁহার ন্যায় সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পক্ষে কারাবাস যে কি কঠোর, তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয়; কিন্তু তিনি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সানন্দে কারাবরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি কোন দিন তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি-চর্চ্চা করেন নাই, রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন নাই। শিক্ষা-কেন্দ্রকে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিলে তাহার অকল্যাণ হয়, ইহা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। আমাদের দেশে boy politician-এর সংখ্যা বড় বেশী, তিনি তাহার প্রশ্রয় দিতে চান না। শিক্ষক ছাত্রের জীবন মনন-রাজ্যে। ইহা সঞ্চয়ের ক্ষেত্র যাহার পরিচয় পাওয়া যায় কর্ম্মজীবনে।

'তন মন ধনসে' তিনি দেশের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত 'হামারা দেশ' তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইবে। দেশমাতৃকার এমন বরেণ্য সন্তান লাভ কত যুগের তপস্যার ফল।

পর দুঃখে কাতরতা, সহৃদয়তা ও মাধুর্য্য তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। তাঁহার কথায় ও কাযে অহঙ্কার কোথাও প্রকাশ পায় নাই। তিনি পরম বৈষ্ণব, ভগবৎ-কৃপাই তাঁহার জীবনের পরম আশ্রয়।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিৎ ধনম্"

এই মন্ত্রই তিনি জীবনে পালন করিয়াছেন—এবং এই মন্ত্রই তাঁহাকে আজ ভারতের স্বদেশী যজ্ঞে প্রধান পুরোহিতের আসন দিয়াছে। Greatness, goodness and kindness এই তিন অসাধারণ গুণের সমন্বয়ই মালবীয়-চরিত্রের বিশেষত্ব।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই মহতী বাণী মুখে মুখে উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জী সারা জীবন জন্মভূমিকে সত্যই স্বর্গাদপি গরীয়সী জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছেন।

জন্মভূমি তাঁহার নিকট মৃন্ময়ী নন, তিনি চিন্ময়ী; এবং মালবীয়জী তাঁহার একনিষ্ঠ সাধক। তাঁহার সাধনা সার্থক হউক এই আমাদের প্রার্থনা।

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রে রূপসজ্জা)

প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীর পক্ষে যে কোনো চরিত্র অভিনয়েই রূপসজ্জা বা 'Make-up' একটা অপরিহার্য্য ব্যাপার। 'রূপসজ্জা'কে যিনি অবহেলা করেন, তিনি যতবড় অভিনেতাই হোন না কেন, তাঁর অভিনয়ের অনেকখানি অঙ্গহানি ঘটে। অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতা যদি তাঁর আকৃতি ও বেশভূষার সামঞ্জস্য না রাখেন তা'হ'লে সে অভিনয় কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। আবার কেবলমাত্র এই রূপসজ্জার গুণেই অনেক সাধারণ অভিনেতাও দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে সক্ষম হন। অভিনেয় চরিত্রকে সকলদিক দিয়ে পরিস্ফুট ক'রে তু'লতে শিল্পীকে প্রধানতঃ সাহায্য করে তার নিখুঁত রূপসজ্জা।

এই রূপসজ্জার প্রয়োজন রঙ্গমঞ্চেও যেমন অস্বীকার করা চলে না, চলচ্চিত্র-জগতেও যে তার আবশ্যকতা তেমনিই স্বীকার্য্য, এ কথা বলাই বাহুল্য। বরং রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের চেয়ে চলচ্চিত্রের অভিনেতাদের রূপসজ্জা

সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত হওয়া দরকার। রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের রূপসজ্জার জন্য খুব বেশী পরিশ্রম ক'রতে হয় না, অল্প আয়াসেই তাঁরা রূপান্তর গ্রহণ ক'রতে পারেন, কিন্তু চিত্র-লোকের শিল্পীদের রূপসজ্জার জন্য প্রভূত পরিশ্রম ক'রতে হয়, কারণ, মানুষের চোখকে অতি সহজেই ঠকানো চলে, কিন্তু ক্যামেরার লেন্সের তীব্র দৃষ্টি যেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি সূক্ষ্ম! তাকে ঠকানো ভারি কঠিন! শিল্পীর রূপসজ্জায় যদি কোথাও খুব সামান্য ফাঁকিও থাকে, ক্যামেরার চোখে তৎক্ষণাৎ তা' ধরা পড়ে যাবে।

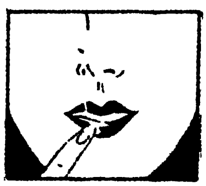


মুখে রং মাখা

এই সোজা কথাটা মনে না রেখে—আমাদের দেশী ছবিগুলিতে অনেক অভিনেতাই রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জা নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে ক্যামেরার সামনে



চোখের পাতায় রং মাখা

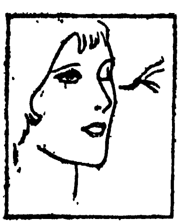


ঠোঁটে রং মাখা

অতি হাস্যাস্পদ রূপ ধারণ ক'রেছেন দেখতে পাই! যাত্রার দলের 'পরচুলো' আর ভাড়া ক'রে আনা পোষাকে বড়জোর একরাত্রি ইস্কুলের ছেলেদের সখের 'থিয়েটার' করা চ'লতে পারে, কিন্তু রূপ-দক্ষদের 'অভিনয়' করা চলে না। 'রূপসজ্জা' ছেলেখেলা নয়। এটা শিখতে হ'লে—সাধনা করা দরকার



আঁখি-পল্লব আঁকা



নকল আঁখি-পল্লব

কারণ, শিল্প ও বিজ্ঞান এই উভয় বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকলে 'রূপ-দক্ষ' হওয়া অসম্ভব। 'হাঞ্চ্ব্যাক্ অফ্ নোত্তার-ডেম্' ছবিতে স্বর্গীয় রূপ-দক্ষ লোন্‌চ্যানী এমন জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জ্জন ক'রতে কখনই পারতেন না,' যদি না রূপান্তর গ্রহণ করবার শিল্প-বিজ্ঞান-সম্মত সূক্ষ্ম তত্ত্বটি তাঁর জানা থাকতো! "A man of Thousand Faces" উপাধি পাবার



হাই লাইট্ মেক-আপ্
(গাল, নাক ও থুৎনি)



লো-লাইট্
মেক আপ্

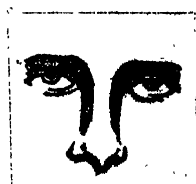
যোগ্যতা তাঁর ছিল ব'লেই 'হাঞ্চ্ব্যাকে'র ভূমিকায় তার রূপসজ্জা ও অভিনয় চরিত্রানুযায়ী অমন নিখুঁত হ'য়ে উঠতে পেরেছিল। সু-অভিনেতা শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংস্ শুধু অভিনয়ে নয়, রূপসজ্জাতেও অসাধারণ নিপুণ! শ্রীযুক্ত জন ব্যারিমূরের রূপসজ্জাও প্রথম শ্রেণীর রূপদক্ষের উপযোগী! ফলে এই সকল অভিনেতা চলচ্চিত্র জগতে



নাক (লো-লাইট্ মেক্ আপ্)



নাক (হাই লাইট্ মেক্ আপ্)
বিশেষ চরিত্রাভিনয়ের রূপসজ্জা



মোটা নাক
সরু করা

সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন ক'রে অপরিমেয় যশের অধিকারী হ'য়েছেন।

চিত্রলোকে প্যানক্রোমেটিক্ ফিলম্ (Panchromatic Film) উদ্ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'রূপসজ্জা'রও রকম ব'দলে গেছে অনেক। আগে 'অর্থোক্রোমেটিক ফিল্মরে (Orthocromatic Film) আমলে চিত্রলোকে যে

রূপসজ্জা চ'লতো, এখন আর তা' একেবারেই চলে না। প্যানক্রোমেটিক্ ফিলমের বিশেষত্ব হচ্ছে এতে সব রকম রংয়েরই ছায়া ওঠে, অতএব এই ফিলম বা 'ছায়াবাহনে'র নাম দেওয়া যেতে পারে 'সবর্ণ ছায়াবাহন' এবং 'অর্থো-ক্রোমেটিক্ ফিল্‌মের' নাম দেওয়া যেতে পারে 'অসবর্ণ ছায়াবাহন'। কারণ, এই ফিল্‌ম বা ছায়াবাহনে সব রংই শুধু কালো হ'য়ে ওঠে! তারা আর 'সবর্ণ' থাকে না!

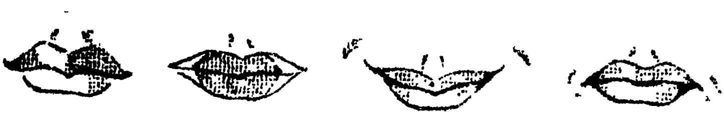
সুতরাং 'সবর্ণ-ছায়াবাহন' প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রলোকে 'সবর্ণ-রূপসজ্জার'ও (Panchromatic Make-



১ম-স্বাভাবিক চোখের রূপসজ্জা ২য়—ছোট চোখ বড়ো করা ৩য়—বুড়ো রসিকের চোখ

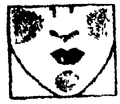
up) আমদানী হ'য়েছে। এই রকম রূপসজ্জার পদ্ধতি অনুসরণ করলে চিত্র-নাট্যের অভিনেতারা এমন কতকগুলি বাঁধা-ধরা রংয়ের হিসাব ও ওজন পেতে পারেন, যা শুধুই বর্ণের সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে না, আধুনিক বিবিধ আলোকসম্পাতের বর্ণ-বিলোপক শক্তিকেও প্রতিহত ক'রতে পারে। এই ধরণের রূপসজ্জা আলোকচিত্রকরকেও নানা দিক দিয়ে সাহায্য করে।

রূপসজ্জার প্রধান গুণ হ'চ্ছে অভিনেতার মুখের



১ম—স্বাভাবিক ঠোঁট ২য়—বড়ো ঠোঁট ছোট করা ৩য়—স্ফুর্ত্তিবাজের ঠোঁট ৪র্থ—দুঃখীর ঠোঁট

আপত্তিজনক ক্ষত চিহ্ন, কাটা-পোড়া দাগ, কিম্বা মুখের উপরের কোনো বেমানান তিল, আঁচিল, জরুল বা আব এমন ভাবে ঢেকে ফেলা অথবা দাবিয়ে রাখা যায়—যাতে ক্যামেরার লেন্‌সের সামনে সে সব দোষ না ধরা পড়ে! তা'ছাড়া, মানুষের গায়ের যে স্বাভাবিক বর্ণ ক্যামেরার তোলা ছবিতে ঠিক সেটা বোঝা যায় না, কিন্তু, রূপসজ্জায় নিপুণ নট অনুকুল অঙ্গরাগ ব্যবহার ক'রে—অতি সহজেই এ বাধা অতিক্রম ক'রতে পারেন। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে রোদে জলে তেতে পুড়ে যাঁর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে তিনি ইচ্ছা করলে ছবিতেও তাঁর মুখের সেই বর্ণবিকারের ছাপ হুবহু বজায় রাখতে পারেন যদি রূপসজ্জার কৌশল তাঁর জানা থাকে। রূপসজ্জার গুণে অভিনেতা তাঁর রূপের সকল ত্রুটীই সংশোধন ক'রে নিতে পারেন। আবার নিজের নির্দ্দোষ

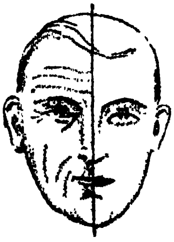


থুৎনি এবং নাক (হাই লাইট্ মেক্-আপ্)



থুৎনি এবং গাল (লো-লাইট্ মেক্-আপ্)

আকৃতিকে ইচ্ছামত বিকৃত ক'রেও তুলতে পারেন। অনেক্ষণ ক্যামেরার সামনে অভিনয় ক'রতে ক'রতে, বিশেষ আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অভিনেতৃরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন। তাঁদের চোখেমুখে একটা অবসন্নতার ছাপ ফুটে ওঠে, বিরক্তি বা নিরানন্দের আভাস এসে পড়ে, একটা অবসাদ ও শ্রান্তির মালিন্যও দেখা দেয়। রূপসজ্জার প্রাথমিক ঔজ্জ্বল্যটুকুও ক্রমেই ক্ষীণ-প্রভ হ'য়ে আসে। সুতরাং, অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্য অনুযায়ী প্রত্যেক অভিনেতারই নিজ নিজ রূপসজ্জা মাঝে মাঝে চানকে নেওয়া দরকার।



যৌবনের জরায় রূপান্তর

রূপসজ্জার কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট বিধি নিয়ম থাকলেও প্রতিভাবান শিল্পী অনেক সময় নিজের মাথা খেলিয়ে নব নব রূপান্তর গ্রহণ করবার একাধিক সহজ ও নূতন উপায় উদ্ভাবন করে নিতে পারেন। যাঁরা এ ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ তাঁদের অবগতির জন্য গোটাকয়েক প্রচলিত প্রাথমিক সঙ্কেত এখানে দেওয়া যেতে পারে, যেমন—

১। প্রত্যেক অভিনেতার উচিত মুখমণ্ডল মুণ্ডিত রাখা।

২। রূপসজ্জা সুরু করার আগে মুখখানি বেশ ভাল করে সাফ্ ক'রে নেওয়া চাই। সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেললেই হবে।

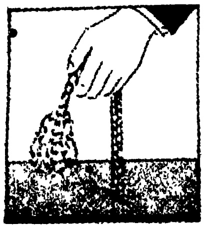
৩। রং-মাখবার আগে মুখে কোনো 'কোল্ড-ক্রীম' মেখে

নিতে পারলে ভাল হয়। যেমন 'হেজলীন' বা 'ভেন্‌যুশা' ক্রীম।

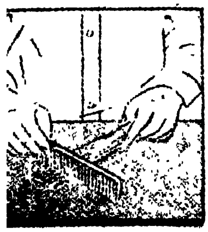
তেলা-রংই (Grease paint) সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। রংয়ের টিউব থেকে সিকি ইঞ্চি পরিমাণ রং বামহাতের তালুতে নিয়ে ডানহাতের আঙুলের ডগা দিয়ে সেই রং মুখের চারদিকে তিলক ফোঁটার মতো লাগিয়ে নেবে। তেলা রং খুব কৃপণতার সঙ্গেই ব্যবহার করা উচিত, কারণ ও রং বেশী হ'য়ে গেলেই—সব 'মেক্-আপ্' মাটি! তারপর হাতের তালু ও আঙুলের ডগা থেকে রং মুছে তুলে ফেলে, হাত দুটি' জলে ভিজিয়ে নিয়ে সেই ভিজে হাতের আঙুল দিয়ে মুখের উপরের সেই তেলা রংয়ের তিলক ফোঁটা টেনে টেনে মুখময় সমানভাবে লেপ্‌টে লাগাতে হয়। লাগাবার সময় মুখের মাঝখান থেকে পাশের দিকে টেনে যাওয়াই নিরাপদ, কারণ রং কোথাও বেশী হ'য়ে গেলে ধারের দিকে টেনে এনে মুছে ফেলা চলে, কিন্তু মুখের মাঝখান থেকে মুছে ফেলা চলে না। আঙুল প্রতিবারই জলের বাটিতে ডুবিয়ে নেওয়া উচিত, তাহ'লে রং বেশ পাত্‌লা ও সমান হ'য়ে মুখে লাগবে। কী রকম রং মাখতে হবে সেটা নাট্যোক্ত চরিত্রের রূপ বর্ণনা অনুযায়ী ঠিক ক'রে নিতে হবে।

। চোখের পাতার উপরও পাতলা ক'রে একপোঁচ রং টেনে দিতে হবে, যাতে চোখের উপর কোনো রেখা না দেখতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র চরিত্রোপযোগী চেহারা করবার সময় প্রয়োজনমত চোখের উপর কালো রেখা টেনে নিতে হয়। নইলে, সাধারণত চোখের পাতার উপর রং লাগাবার পর ভ্রূ আঁকবার অঞ্জনা পেন্সিল (Dermatograph Pencil) দিয়ে শুধু চোখের পল্লবের কোল দিয়ে আঁখির প্রান্ত রেখাটুকু একটুখানি ঈষৎ টেনে স্পষ্ট ক'রে দিলেই যথেষ্ট।

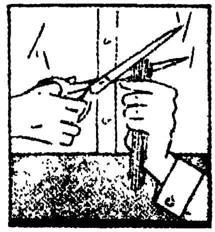
৬। ঠোঁটে রং দেবার সময় ঠোঁটের ভিতর পিঠেও রং লাগানো উচিত, নইলে, হাঁচলে কাশ্‌লে, হাসলে, হাঁ করলে রং মাখা ঠোঁট ধরা পড়ে যাবে। ঠোঁট সাধারণতঃ 'রুজ' (Rouge) লিপ্‌-ষ্টিক্ দিয়েই রং করে। মুখে পাউডার দেবার পর জিব দিয়ে যদি সন্তর্পণে ঠোঁটটি মুছে নেওয়া হয় তাহ'লে ভারি চমৎকার দেখায়।



১ম—ক্রেপ্ চুলের পাটখোলা



২য়—ক্রেপ্ চুল আঁচড়ে নেওয়া

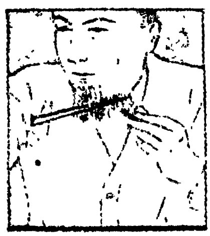


৩য়—ক্রেপ্ চুল ছাঁটা

৭। তেলা-রং লাগাবার পর চোখের কোল এবং ঠোঁটের কাজ শেষ হ'লে মুখময় থুপে থুপে পাউডার দিতে হয়। যতক্ষণ না পাউডার মুখের তেলা-রংয়ের উপর সমানভাবে ধরে যায় ততক্ষণ লাগানো দরকার। কোথাও যদি বেশী লেগে যায় কিছু ক্ষতি নেই, কারণ তারপরই পাউডার-ঝাড়া নরম ব্রাশ্ দিয়ে সমস্ত মুখখানি আস্তে আস্তে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। এতটুকু পাউডারের শুক্‌নো গুঁড়ো কোথাও না লেগে থাকে।



১ম—স্পিরিট গাম্ দিয়ে দাড়িতে ক্রেপ্ চুল আঁটা



২য়—দাড়ি ছাঁটা



৩য়—সুসম্পূর্ণ দাড়ি

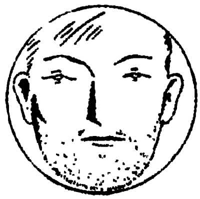
৮। এইবার ভ্রূ আঁকার পালা! ভ্রূ আঁকার আলাদা পেন্সিল পাওয়া যায়। সেই পেন্সিল দিয়ে খুব সুন্দর ভ্রূ আঁকা হয়। পেন্সিলের সরু শিস্ ঠিক ভ্রূর চুলের মতো দাগ কাটতে পারে। রং দিয়েও তুলির সাহায্যে ভ্রূ আঁকা যেতে পারে, কিন্তু সে ঠিক স্বাভাবিক

হয় না। ভ্রূ আঁকবার একরকম ছাঁচ পাওয়া যায়, তাতে বেশ ভালো কাজ হয় এবং শীঘ্রও হ'য়ে যায়। ছাঁচের উপর তুলি দিয়ে রং মাখিয়ে সেই ছাঁচ ভ্রূর উপর চেপে ধরলেই চমৎকার ভ্রূ হয়ে যায়।

। তারপর, আঁখি-পল্লব নিয়ে পড়তে হবে। পুরুষ



স্পিরিট্ গাম দিয়ে গোঁফ আঁটা



দু'চার দিন ক্ষৌর কার্য্যের অভাবে দাড়ির অবস্থা

অভিনেতারা এটাতে কেউ বড়ো একটা মনোযোগ দেন না, দেবার তেমন দরকারও হয় না, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে রূপসজ্জায় এটা একেবারেই অপরিহার্য্য! 'কস্‌মেটিক্' (Cosmetic) কিম্বা মোম-জমা রং দিয়ে

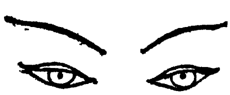


নাকের রূপান্তর



থুঁৎনির রূপান্তর

আঁখিপল্লবকে দীর্ঘ অথবা ঘন যেমন ইচ্ছা করা যেতে পারে। কস্‌মেটিক্ একটা টিনের বাটিতে রেখে স্পিরিট ল্যাম্পে গরম ক'রে গুলে নিতে হবে। তার-পর একটা কাগজের ফুঁপি কিম্বা দেশলাইয়ের কাঠি

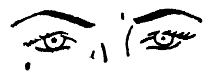


১ম—সুন্দরের ভ্রূ

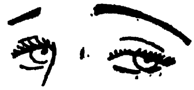


২য়—শয়তানের ভ্রূ

দিয়ে সেই পাতলা কস্‌মেটিক্ তুলে চোখের পল্লবে লাগাতে হবে। প্রতি পল্লবটির মুখ যদি শিশির কণাযুক্ত বা ক্ষুদে পুঁথি পরাণোর মতো দেখতে হবে—এরকম করবার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে প্রতি পল্লবের মুখে সেই গলিত কস্‌মেটিক্ ফুঁপি ক'রে তুলে বার বার লাগাতে হবে, যতক্ষণ না তার মুখে ছোট ছোট কস্‌মেটিকের দানা বাঁধে। দুটি তিনটি পল্লব কেশ একত্র ক'রে নিয়েও তার মুখে একটি ক'রে শিশির

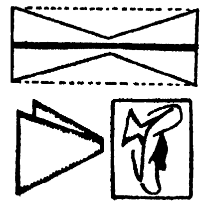


১ম—রাগী লোকের ভ্রূ



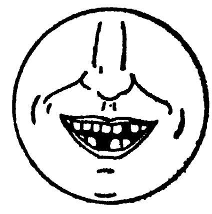
২য়—উদ্ধত অহঙ্কারীর ভ্রূ

কণা বা মুক্তাবিন্দু লাগানোর মত কস্‌মেটিক্ দেওয়া চলে। প্রসাধনের দোকানে কৃত্রিম আঁখিপল্লবও অনেক রকমের কিনতে পাওয়া যায়। এইগুলি ব্যবহার করাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। নীচের পাতা এবং ওপর পাতার প্রয়োজন মত কৃত্রিম আঁখিপল্লব কিনে এনে তাকে চোখের মাপে কেটে নিয়ে পল্লবের মুখে তুলি ক'রে গঁদ লাগিয়ে তার উপর এই কৃত্রিম আঁখিপল্লব এঁটে দিলে মানুষের চোখ ত' কোন্ ছার, ক্যামেরার লেন্‌সেও সে ছদ্ম-রূপ ধরা পড়ে না!

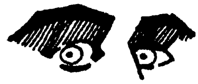


তোব্‌ড়ানো কাণের সরঞ্জাম

১০। মুখের সঙ্গে হাতপায়ের মিল রাখবার জন্য ঘাড় ও গলা এবং আঙুলের ডগা থেকে আরম্ভ ক'রে কাঁধ পর্য্যন্ত হাতে এবং হাঁটু পর্য্যন্ত পায়ে ঠিক মুখের অনুরূপ রং জলে পাতলা ক'রে গুলে নিয়ে মাখা উচিত। সে রং সাবান জল দিয়ে ধুলেই উঠে যায়। মুখের তেলা রংও ভেসেলিন লাগালেই উঠে যায়। বেশ করে মুখে ভেস্‌লিন্ বা ক্রীম ঘসে ঘসে লাগিয়ে তেলা-রংটা আল্‌গা ক'রে তোয়ালে বা ঝাড়ন দিয়ে মুখটা মুছে ফেললেই পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তারপর একটু গরম জলে সাবান গুলে মুখটি আগে ধুয়ে নিয়ে তারপর ঠাণ্ডা জলে মুখটি ডোবালেই বেশ স্বস্থ ও আরাম বোধ হবে। রূপসজ্জা করবার সময় যেমন ধৈর্য্যের



ফোগ্‌লা দাঁত



৩য়—ডাকাতের ভ্রূ

সঙ্গে যত্ন নেওয়া উচিত, তোলবার সময়ও সেই রকম ধৈর্য্য ও যত্ন থাকা চাই।

যত্নবান হ'তে হবে। ইংরাজীতে যাকে বলে 'character' part, এবং 'Type' part,—অর্থাৎ বিশেষ একটি মানুষের



লনচ্যানী
(স্বাভাবিক মূর্ত্তি ও
বিভিন্ন রূপান্তর)

বিশেষ কোনো নির্দ্দিষ্ট চরিত্র অভিনয় করবার সময় রূপসজ্জার দিকে খুব সতর্ক মনোযোগ দিতে ও বিধিমত

ভূমিকা—যার চরিত্রের এমন কতকগুলি গুণ ও দোষ আছে যা ঠিক সামান্ত ও সাধারণ নয়,—যেমন 'ঔরঙ্গজেব'

বা নাদিরশা' কিম্বা 'বুদ্ধদেব' কি 'শ্রীগৌরাঙ্গ' অথবা 'কৃষ্ণকান্ত' কি 'যোগেশ';—এদের 'character' part বলা চলে। Type বলে তাদের যাদের প্রকৃতি ও স্বভাব অথবা জীবনযাত্রা প্রণালী তাদের একটা কোনো দাগী বা ছাপমারা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে! যেমন গ্যাঁড়াতলার গুণ্ডা, বা বাগদী ডাকাতের সর্দ্দার, গ্রাম্য চাষা, অথবা কয়লাখনির মজুর—বখাটে ছেলে, উচ্ছৃঙ্খল ও





শ্রীমতী ফাজেন্দা
(দেখতে সুন্দরী কিন্তু ছবিতে নামেন কুরূপা সেজে)

অত্যাচারী জমীদার, পুলিশের দারোগা, জিপ্সি, বেদে, সাপুড়ে ইত্যাদি। এই সব ভূমিকা অভিনয় করতে হ'লে কি 'রূপসজ্জায়'—কি অভিনয়ে কোথাও এতটুকু ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

'Character part' অর্থাৎ কোনো 'বিশেষ চরিত্রের' ভূমিকা অভিনয় ক'রতে হ'লে অভিনেতার পক্ষে সেই চরিত্রটির সকল দিকের প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান ধারণা করা প্রথম

করা, চিত্রাদি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখা, এক কথায় উক্ত চরিত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। Type অর্থাৎ কোনো বিশেষ প্রকৃতির লোকের ভূমিকা অভিনয় ক'রতে হ'লেও অভিনেতাকে তাদের সম্বন্ধে সব কিছু জানতে হবে। তাদের জীবনের রীতি-নীতি, তাদের সমাজের আচার ব্যবহার, তাদের কিরূপ মনস্তত্ব এ সম্বন্ধে অভিনেতাকে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ হ'তে হবে। পুলিশের দারোগার সঙ্গে যদি তার পরিচয় না থাকে, খনির মজুরদের যদি সে কখনো না দেখে থাকে তা'হ'লে তার সর্ব্বাগ্রে উচিত থানায় গিয়ে বা খনিতে নেমে এদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা, এদের 'প্রকৃতি' সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা। এদের চেহারা ও ধরণ-ধারণ বিশেষ ভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য ক'রে হৃদয়ঙ্গম করা। এদের সঙ্গে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে অভিনেতার একটা একাত্মবোধ জন্মায় ততদিন পর্য্যন্ত সে এ ধরণের ভূমিকা অভিনয়ে কৃতকার্য্য হ'তে পারে না। কারণ, এই Type part অভিনয়ে নিখুঁত 'রূপসজ্জা'ও যেমন প্রয়োজন, নিখুঁত অভিনয়ও ততোধিক প্রয়োজন। এখানে সাজের সঙ্গে অভিনয়ের সামঞ্জস্য না থাকলে অভিনেতাকে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়।

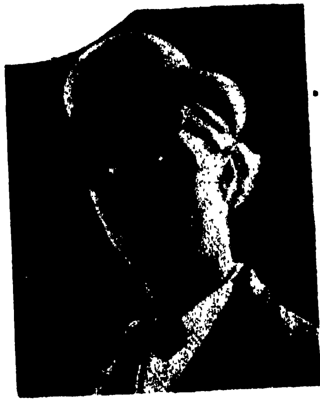
রঙ্গমঞ্চে দেখা যায়—সৈনিক, প্রহরী, দূত, পরিচারিকা, ভৃত্য প্রভৃতি ছোটখাটো অপ্রধান ভূমিকার অভিনেতারা 'রূপসজ্জা' সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নন। চলচ্চিত্রে কিন্তু তাঁদের এ অবহেলা বা আলস্য করা একেবারেই চলবেনা। ভূমিকা যতই ক্ষুদ্র হোক এবং ক্যামেরার সামনে থেকে যত দূরেই অভিনয় ক'রতে হোক 'রূপসজ্জা' সম্বন্ধে প্রত্যেক চলচ্চিত্রের অভিনেতাকে অবহিত হ'তে হবে। 'রূপসজ্জা'র খুঁটি নাটি অনেক বটে, কিন্তু ছবিতে সেই সব খুঁটি-নাটি বা তুচ্ছ detailএরও অনেক দাম। সুতরাং ওগুলো বাদ দিতে গেলেই ছবির ক্ষতি করা হবে।

রূপসজ্জায় রংয়ের বর্ণ-গাঢ়তার তারতম্য ঘটিয়ে মুখের উপর আলো ছায়ার বৈষম্য সৃষ্টির দ্বারা ইচ্ছানুরূপ রূপান্তর গ্রহণ করা যায়। রং-মাখা মুখের যে যে অংশ উজ্জ্বল রাখা দরকার সেই সেই অংশ বাদ রেখে মুখের অবশিষ্ট

অংশে মুখেরই রংয়ের অনুকূল অথচ অপেক্ষাকৃত গাঢ় রংয়ের পোঁচ সুকৌশলে টেনে দিলেই মুখের উপর আলোছায়ার সৃষ্টি করা যায়। একে বলে high-light make-up. যদি সাদা বা হলুদে রংয়ের পোঁচ দিয়ে মুখের রংয়ের সঙ্গে শেষটা সব মিলিয়ে দেওয়া হয়, তা'লে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। একে বলে low-light make-up। কালচে রং

অনেক সময় মুখের অনেক ত্রুটী—যেমন খাঁদা নাক বা বড্ড বেশী বড়ো নাক, লম্বাটে থুঁত্‌নি, প্রকাণ্ড মুখের কাঁদ, ছোট্ট চোখ, এ সমস্তই শুধরে নেওয়া যায় যদি কেউ রূপসজ্জায় মুখের উপর নিপুণভাবে আলো-ছায়ার কৌশল প্রয়োগ ক'রতে পারে।

গাল তুব্‌ড়ে বসে গেছে, চোখের কোল ঢুকে গেছে, দুই চোয়ালের গোড়া রগের কাছে খাল হ'য়ে গেছে, এই ধরণের রূপ-সজ্জায় একটু কালো বা পাট্‌কিলে রং তোব্‌ড়ানো জায়গায় লাগিয়ে, আশেপাশে বলিছি বলে কেউ যেন তাব'লে ভুষো বা খাঁটি কালো রং ব্যবহার না করেন। গ্রে, মেরুণ, বা গাঢ় ব্রাউন এই রকমের রং ব্যবহার করাই বিধেয়।





বেন্ টার্পিন
(স্বাভাবিক মূর্ত্তিতেই এর চোখ টেরা কেবল একটি গোঁফ পরলেই রূপান্তর!)



জ্যাক্ ডাকী
শুধু দাড়ি ও চোখের 'মেক্-আপ্' এই যুবকের কি রূপান্তর ঘটায় আধখানা মুখে হাত চাপা দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে

'নোজ্-পেষ্ট্' বলে এক রকম নরম প্ল্যাষ্টারের মতো পদার্থ পাওয়া যায়; এই জিনিসটির সাহায্যে নাকের চেহারা বদ্‌লে ফেলা যায়। খাঁদা নাককে উঁচু করা, ছোট নাককে বড়ো করা, সরু নাককে মোটা করা এই 'নোজ-পেষ্ট্' লাগিয়ে অনায়াসে ক'রে নেওয়া চলে। মোটা নাক যদি সরু করতে হয় তাহলে নাকের মোটা অংশটুকু সুকৌশলে কালচে রংয়ের পোঁচ দিয়ে চাপা দিলেই নাক সরু দেখাবে। অবশ্য, তার আগে মুখের রংয়ের চেয়ে নাকের উপরের

রং একটু হাল্‌কা করে মাখা চাই। অর্থাৎ high-light make-up দরকার। নাক যদি একটু উপর দিকে ঠেলে উঁচু ক'রে তুলতে হয়, তাহ'লে নাকের নীচে দিকে নাসারন্ধ্রের মাঝখানে তেকোনা ক'রে কালচে রং টেনে দিলেই হবে।

চোখ হ'লো মানুষের মনের মুকুর! ভাবপ্রকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন। চোখ যার ভালো, চলচ্চিত্র অভিনয়ে





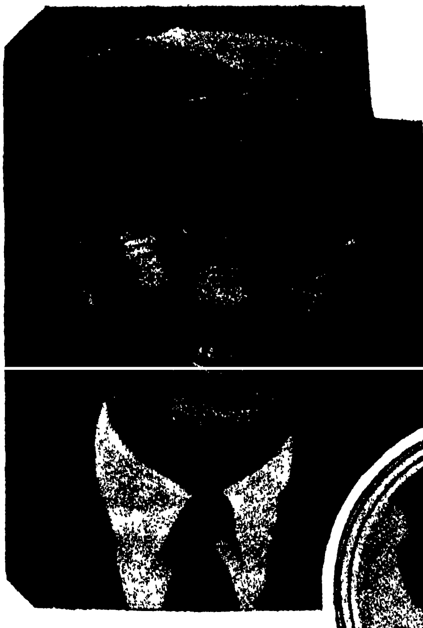
চেষ্টার্ কন্ক্‌লীন্ (স্বাভাবিক মূর্ত্তি ও রূপান্তর)

তার সাফল্য-লাভের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। চোখের দিকে চেয়ে আমরা বুঝতে পারি সে বিষণ্ণ কি উৎফুল্ল? ক্রুদ্ধ না ভয়ভীত,? ঘৃণা, লজ্জা, লালসা, লোভ, আশা, আগ্রহ, উৎসাহ, উত্তেজনা, আনন্দ, বিস্ময়—সব কিছুই পরিস্ফুট হ'য়ে দেখা দেয় মানুষের চোখের ভিতর! সুতরাং চিত্রাভিনেতাদের রূপসজ্জায় চোখের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। চোখের রং, চোখের গড়ন, চোখের অবস্থান, চোখের পল্লব ও ভ্রূ'যুগল এবং চোখের কোল হিসাব মতো চান্‌কে নিতে পারলে—চেহারা একেবারে ব'দ্‌লে যায়। Type part বা বিশেষ প্রকৃতির কোনো লোকের ভূমিকা অভিনয় ক'রবার সময় রূপকে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে চোখই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। চোখ দু'টি যদি নাকের বড্ড কাছাকাছি হয়, তাহ'লে সে চোখ সন্দেহজনক চরিত্রের লোককে চট্ করে চিনিয়ে দেয়। চোখ দুটি যদি নাকের কাছ থেকে আবার বড্ড দূরে অবস্থিত হয় তাহ'লে সে চোখ আমার বন্ধু নয় এমন লোককে ধরিয়ে দেয় একেবারে চকিতের মধ্যে! চোখ যার খোলের ভিতর ঢুকে গেছে বা চোখের কোল যার বড্ড ব'সে গেছে, সে মানুষ যে সৎ ও বিশ্বাসী নয় এটা বুঝতে কারুর বিলম্ব হয় না। হিংস্র, ক্রুদ্ধ, রুগ্ন, ভয়ঙ্কর প্রকৃতি, কামুক, উচ্ছৃঙ্খল, শয়তান প্রভৃতি Type part-এর রূপসজ্জায় এই রকম খোলের ভিতর ঢোকা বা বসে যাওয়া চোখ খুব কাজে আসে। চোখ যার ছোট সে তা' অনায়াসে বড়ো করে নিতে পারে, কেবলমাত্র তার ছোট চোখের কিনারা ঘেঁসে যদি সে নিপুণভাবে একজোড়া বড়ো চোখের আদ্‌রা এঁকে নেয়!

কেবলমাত্র ঠোঁটের সাহায্যে মানুষ অনেক কিছু ভাব প্রকাশ ক'রতে পারে। দুঃখ, বেদনা, আঘাত, অভিমান, আনন্দ, ঘৃণা, প্রসন্নতা, প্রীতি, চিন্তা, ক্রোধ এ সবই দু'টি পাতলা ঠোঁটের রকমারি ভঙ্গীতে প্রকাশ করা যায়। ঠোঁটের সঙ্গে যদি চোখ যোগ দেয়—ব্যস্! তাহ'লে কোনো অভিনেতাকেই মুখে আর কিছু ব'লে বোঝাতে হয় না! সে যা ব'লতে চায় তা' বলবার অনেক আগেই তার চোখমুখের ভঙ্গী সে কথা আমাদের জানিয়ে দেয়। মেয়েরা অতি সহজেই তাঁদের অধরোষ্ঠকে মদনের ফুলধনু করে তোলেন কেবলমাত্র রুজ্ ও লিপ্-ষ্টিক্ (ঠোঁটে মাখবার বাতি) ব্যবহার করে। যাঁদের ঠোঁট পুরু ও মোটা তাঁরা রংয়ের সাহায্যে সে ত্রুটি সংশোধন করে নেন। ঠোঁটের খানিকটা অংশও তাঁরা মুখের রং দিয়ে ঢেকে বাকীটুকুতে পরিপাটি করে রুজ দিয়ে সুন্দর ঠোঁট এঁকে

নেন। আকর্ণ-বিস্রান্ত অধরকে তাঁরা সুকৌশলে ঢেকে ছোট করে নেন, আবার ছোট্ট ঠোঁট দু'খানিকে তুলি ও রংয়ের টানে টেনে ইচ্ছামত বাড়িয়ে নিতে পারেন। পুরুষদের বড়ো একটা রুজ ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয় না। যদি কেউ ব্যবহার করেন তা'হলে তাঁদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন মেয়েদের ঠোঁটের মত তাঁদের অধরোষ্ঠ মদনের ফুলধনু না হ'য়ে ওঠে। যাঁদের উপরের ঠোঁট নীচের চেয়ে বড়ো বা নীচের ঠোঁট সামনের দিকে বেশী ঝুলে পড়া হয়, তাঁদের মুখে রং মাখবার সময় বড় ঠোঁটের উপর একটু ঘন বা ঘোর রং মাখা উচিত এবং ছোট ঠোঁটে হাল্কা বা পাতলা রং লাগানো দরকার তাহলে আর এই ছোট বড়োর অসামঞ্জস্যটুকু থাকেনা। যদি বেশ স্ফুর্ত্তিবাজ বা সদা-প্রফুল্ল ও সুরসিক লোকের ভূমিকা অভিনয় ক'রতে হয়, তাহ'লে অধর দেশের উভয় প্রান্তরেখা একটু বেঁকিয়ে ঈষৎ উপর দিকে তুলে দিলেই উক্ত চরিত্রের অনুকুল অতি চমৎকার একটা আকৃতিগত রূপান্তর ঘটে, আবার ওই অধরপ্রান্তই যদি নীচের দিকে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে মুখ দেখলেই মনে হবে এ লোকটি জীবনযুদ্ধে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত বেদনাজর্জ্জর বা নিতান্ত দুর্গত এক অভাগা!

থুঁৎনী দু'তিন রকমের বেশী বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। হয় উপরদিকে ঠেলে ওঠা, নয়ত' ভিতরদিকে চেপে বসা, কিম্বা মধ্যে একটি রেখা প'ড়ে দ্বিধাবিভক্ত। কিম্বা নীচের দিকে ঝুলে পড়া লম্বাটে থুঁৎনি। উপর দিকে ঠেলে ওঠা থুঁৎনি হয় ছুঁচ্লো, নয় চৌকো বা গোল-গাল গড়নের দেখা যায়। প্রয়োজনমত 'নোজ পেষ্টের' সাহায্যে ছুঁচ্লো থুঁৎনিকে চৌকো বা গোল-গাল করে নেওয়া চলে, আবার চৌকো বা গোলগাল থুঁৎনিকেও ছুঁচ্লো ক'রে তোলা যায়। রং মাখবার সময় রং লাগাবার একটু মারপ্যাচ করতে পারলেও অভিনেতা তাঁর অভীষ্ট ফল লাভ ক'রতে পারবেন।





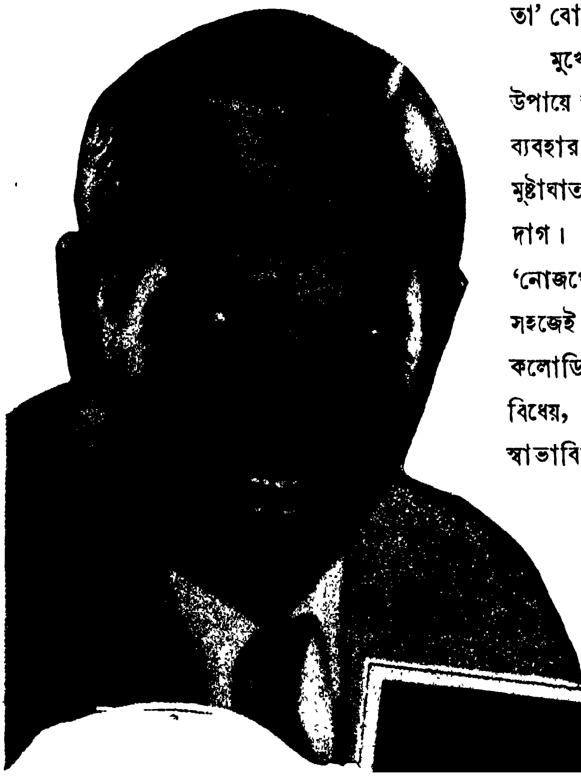
স্নাব্ পোলার্ড
(স্বাভাবিক মূর্ত্তি
ও রূপান্তর)

কাগচে রংয়ে ঢেকে থুঁৎনিকে ইচ্ছামত রূপ দেওয়া যেতে পারে। আবার যাদের থুঁৎনি নেহাৎ ছোট, তারা যদি মুখের চেয়ে থুঁৎনির উপর রংটা আরও বেশী হাল্কা ক'রে লাগান তাহ'লেই সুফল পাবেন।

সাধারণতঃ বয়স বেশী দেখাবার জন্য অভিনেতাদের চোখেমুখে 'বলি-রেখা' আঁকতে দেখা যায়। 'বলি-রেখা' আঁকবার সহজ উপায় হ'চ্ছে মুখে রং মাখা হবার পরই মুখখানি বিকৃত ও সঙ্কুচিত করলেই বলিরেখার অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। সেই সেই অংশে পেন্সিলের দাগ দিয়ে নিয়ে পরে যদি গাঢ় রক্তবর্ণের কিম্বা পাট্‌কিলে রংয়ের আঁচড় টেনে দেওয়া হয়, তাহ'লেই মুখমণ্ডলে 'বলিরেখা' বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

গোঁফ অনেক সময় অনেক মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্রের আভাস দেয়। যেমন:- সৌখীনবাবুর গোঁফ প্রায় কার্ত্তিক ঠাকুরের মতো! অর্থাৎ দু'ধার বেশ তা' দিয়ে ঘুরিয়ে পাক দিয়ে রাখা। পরচুলের তৈরি গোঁফ টিপকল সংযোগে নাকের ডগায় না এঁটে বাজারে একরকম 'ক্রেপ' চুল পাওয়া যায় তাই এনে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে কেটে 'স্পিরিট-গাম্' দিয়ে ঠোঁটের উপর এঁটে দিলেই সে গোঁফ আর কৃত্রিম ব'লে মনে হবেনা। দাড়ির সম্বন্ধেও ঠিক এই ব্যবস্থাই করা উচিত। 'নুর', 'ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, চাঁপ দাড়ি,

খোঁচা দাড়ি (কামা নার অভাবে) মোগলাই দাড়ি, কাবুলি দাড়ি, তপস্বী দাড়ী প্রভৃতি যতরকম দাড়ি দেখতে পাওয়া যায়, সব রকমই ঐ 'ক্রেপ' চুলের সাহায্যে 'স্পিরিট্ গাম্' দিয়ে এঁটে তৈরি করে নেওয়া যায়। দু'চারদিন না কামালে যেরকম অল্প অল্প দাড়ি হয় সেটা অনেক সময় দাড়িতে গ্রে-ব্লু বা রেড ব্রাউন্ রংয়ের পোঁচ দিয়ে নিলেই





এ্যাল জন্সন্
স্বাভাবিক মূর্ত্তি
ও রূপান্তর)

হ'য়ে যায়। চুল ব্যবহার করবার দরকার হয়না। ফুটো ফুটো রবারের স্পঞ্জে পূর্ব্বোক্ত যে কোনোরকম একটা রং মাখিয়ে নিয়ে দাড়িতে ছাপ দিলেই দু'চারদিন দাড়ী কামানো হয়নি এই রকম দেখতে হয়। গোঁফ তৈরি ক'রে নেবার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত অভিনেয় চরিত্রটির দিকে। কারণ, পূর্ব্বেই ব'লেছি যে গোঁফ অনেক সময় মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতির পরিচয় দেয়। গুণ্ডা পালোয়ানের গোঁফ, লোচ্চা-বদমায়েসের গোঁফ, সাধু সচ্চরিত্রের গোঁফ, ইত্যাদির এমন একটা বিশেষ রূপ আছে যা দেখবামাত্রই মানুষটির ভিতরকার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভ্রূ যেমন মুখের সৌন্দর্য্যকে বাড়ায়, তেমনি ভ্রূর গঠন মানুষের প্রকৃতিরও পরিচয় দেয়। রাগী মানুষের ভ্রূ অহঙ্কারী মানুষের ভ্রূ, দস্যুর ভ্রূ, সয়তানের ভ্রূ, সুন্দরের ভ্রূ, সবেরই একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। ছবিগুলি দেখলেই তা' বোঝা যাবে।

মুখে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখাতে হ'লে দুরকম উপায়ে তা' করা যায়, 'নোজপেষ্ট' লাগিয়ে বা 'কলোডিয়ন্' ব্যবহার করে। আঘাতও দুরকমের হয়, অস্ত্রক্ষত, কিম্বা মুষ্টাঘাত! অর্থাৎ কালশিরা-পড়া ফুলে ওঠা কিম্বা কাটা দাগ। ফুলেওঠা ও কালশিরার চিহ্ন ক'রতে হ'লে 'নোজপেষ্ট' লাগিয়ে তার উপর গ্রে-ব্লু রংয়ের পোঁচ দিলে সহজেই তা' করা যায়। কাটাদাগ করতে হ'লে কঠিন কলোডিয়ন (Non Flexible collodion) ব্যবহার করাই বিধেয়, কারণ, তাতে উক্ত ক্ষতচিহ্ন একবারে অবিকল স্বাভাবিক দেখায়। ক্ষতচিহ্ন গভীর দেখাবার প্রয়োজন হ'লে তিনচারবার কলোডিয়ন লাগাতে হবে। একবার লাগাবার পর সেটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তবে তার উপব আর একবার লাগাতে হয়। এমনি ক'রে তিন চারবার বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রয়োজনমত গভীর দেখতে না হয়, ততবার তুলি দিয়ে মোটা কলোডিয়নের পোঁচ লাগালেই ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে!

কাণ কারুর কারুর কাটা তোবড়ানো বা জোড়া দেখতে পাওয়া যায়। জোড়াকাণ কাটা দেখাত হ'লে জোড়ের মুখে কাল্চে রংয়ের পোঁচ দিতে হয়। কাটা কাণ জোড়া ক'রতে হ'লে 'নোজ পেষ্ট' দিয়ে কাটা অংশ জুড়ে নিলেই চলে। কিন্তু তোবড়ানো কাণ দেখাতে হ'লে একটু খাটতে হবে। এক ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি লম্বা এবং আধ ইঞ্চি চওড়া একখানি পিসবোর্ড ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে কেটে নিতে হবে। মাঝখানে একটি মাথার

কাঁটা লম্বা দিকে বসিয়ে আটা লাগানো ফিতে (adhesive tape) দিয়ে আট্‌কাতে হবে। ফিতের দুমুখ একটু একটু বেরিয়ে থাকা দরকার। এইবার পিসবোর্ডখানি ছবিতে যেমন দেখানো হ'য়েছে সেইভাবে মাঝামাঝি ভাঁজ করে মুড়ে নিতে হবে। তার পর সেই পিস্‌বোর্ডের অর্দ্ধেক মাথার সঙ্গে অর্দ্ধেক কাণের সঙ্গে এমনভাবে এঁটে নিতে হবে যাতে কানটি কোণাকোণি তুবড়ে যায়। তার পর তার উপর 'নোজ-পেষ্ট' দিয়ে তোবড়ানো কানটির চেহারা সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।

খারাপ দাঁত অনেক সময় মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। দাঁত যদি অসমান হয়, ফাঁক্ ফাঁক্ হয়, তা'হলে 'গাটাপার্চ্চা' দিয়ে সে দোষত্রুটী সেরে নেওয়া চলে। দাঁত যদি দাগী ও কালো হয় তাহ'লে সাদা 'টুথ-এনামেলের' সাহায্যে তাকে মুক্তোর মত চক্‌চকে করে নেওয়া যায়। যদি ফোগ্‌লা দাঁত ক'রতে হয়, তাহ'লে কালো টুথ-এনামেলের সাহায্যে যে কোনো দাঁত ঢেকে ফেললেই দাঁত পড়ে গেছে বলে মনে হবে।

রূপসজ্জার জন্য নিম্নলিখিত উপকরণগুলি প্রত্যেক নট নটীরই হাতের কাছে রাখা দরকার। গ্রীজপেণ্ট বা তেলারং, লাইনিংয়ের রং বা মুখের জমীর রং, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক্, ফিঁকে রুজ, কোল্ড-ক্রীম্, সাদারং, ভূষো, নোজ-পেষ্ট, পাতলা রং, কালো মুখোসের ও সাদা মুখোসের রং, টুথ এনামেল, সাদা ও কালো, স্পিরিটগাম্। ক্রেপচুল, কলোডিয়ন, কাঁচি, ছুরি, তুলি, পাফ, প্যাড, চিরুণী, ব্রাস্, তোয়ালে, সাবান, তেল, গরমজল, তিলকমাটি, চন্দন, সিঁদুর, আলতা, কালি, সুরমা, ডারমেটোগ্রাফ পেন্সিল, কাগজের ফুপি, চকখড়ি, কাঁটা, সুতো, উল, ইত্যাদি।

শনি-কবচ

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস এম-এ

এক

প্রিয়দর্শন চট্টোপাধ্যায় একজন নব্য যুবক ; ইতিহাসে এম্‌.এ পাশ করিয়া কলিকাতার কোনও একটী কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। কলুটোলা অঞ্চলে একটী ছোট গলির মধ্যে একখানি ছোট দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়া প্রিয়দর্শন বাবু কয়েক বৎসর হইল কলিকাতায় বাস করিতেছেন। সংসারে একমাত্র বিধবা মাতা ভিন্ন তাঁহার আর কেহই নাই। এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। বিবাহে অনিচ্ছা না থাকিলেও মনোমত পাত্রীর অভাবে বিবাহ ঘটিয়া উঠে নাই। সকালে অধ্যয়ন, দ্বিপ্রহরে অধ্যাপনা এবং সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে তাস ও দাবার মজলিস বসাইয়া প্রিয়দর্শন বাবুর দিনগুলি একরকম কাটিয়া যাইতেছিল। তাঁহারই একতলার একটী কক্ষে পল্লীর যুবকদিগের তাস ও দাবার মজলিস বসিত,—খেলার আনন্দে অনেক সময়ে রজনীর দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ হইয়া যাইত ; এবং উষার বাতাস গায়ে লাগিলে তবে খেলার বৈঠকের শেষ হইত।

সেদিন প্রিয়দর্শন বাবুর বৈঠকখানায় খেলার মজলিস বেশ জমিয়া আসিয়াছে এমন সময়ে উকীল শচীনবাবু জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পথে কাহাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "আসুন জ্যোতিষী মশায়, আসুন, আসুন।" শচীনবাবুর আহ্বানে যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনি একজন সাদাসিধা পোষাক-পরা যুবক ; লাল রঙ্গের খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং মাথার চুল খুব ছোট করিয়া ছাটা। শচীনবাবু তাঁহাকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে গিয়া বলিলেন, "এই ফেলারাম ভট্টাচার্য্য মশায় মস্ত বড় জ্যোতিষী, ছদ্মবেশে শনি এসে এঁর কাছে ধরা দিয়েছিলেন, এঁর শনি-কবচ অব্যর্থ।

ওপাড়ার শৈলেন গত বৎসর আই-এস্‌সি দেবার সময়ে এঁর শনি-কবচ ধারণ করেছিল। আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না, শৈলেন ফিসিক্সের একটা পেপার না দিয়ে সেই পেপারেও পাশের নম্বর পেয়ে গেল। একেবারে অব্যর্থ কবচ। কি বলেন ফেলারাম বাবু ?”

“তা শনির কৃপায় কতকটা তাই বটে।” এই বলিয়া ফেলারাম বাবু গম্ভীর ভাবে বসিয়া নস্য টানিতে লাগিলেন।

অতঃপর শচীনবাবু ফেলারাম ভট্টাচার্য্যকে নিকটে টানিয়া আনিয়া নিজের হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, “ফেলারাম বাবু, আমাদের হাতগুলো দেখে দিন না। এই আমারটা থেকে আরম্ভ করুন।” এই হাত দেখার প্রসঙ্গে সেদিনকার মত তাসের মজলিস বন্ধ হইল। সকলেই নিজের নিজের হাত দেখাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িল, ভবিষ্যতের গর্ভে কাহার কত বড় ভাগ্যের ইতিহাস নিহিত আছে, ইহা জানিবার এমন সুযোগ কেহই ছাড়িতে চাহিল না। ক্রমে ক্রমে সকলের হাত দেখিয়া ভালমন্দ বিচার করিয়া ফেলারাম বাবু প্রিয়দর্শন বাবুর হাতটী নিয়া বসিলেন। তাঁহার হাতটী দেখিতে আরম্ভ করিয়াই জ্যোতিষী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, “মহাশয়, আপনার একখানি হাত বটে! উঃ, ভাগ্যরেখা কি দেখুন, একেবারে মণিবন্ধ থেকে মধ্যমার শেষ পর্ব্ব পর্য্যন্ত ঠেলে উঠেছে। আপনার ভাগ্য মারে কে মশায়। তবে, ইদানীং আপনার শনির অন্তর্দশা চলছে, এতেই যা কিছু মুস্কিল। আপনার কি রাশি বলুন ত? মেষ রাশি? হ্যাঁ, তা হলেই ত আপনার উপর শনির প্রকোপ রয়েছে। দেখি, আপনার হাতটা ভাল করে। এই মাটী করেছে, এটা আবার কি? আপনার শুক্রস্থানে যে একটা চতুষ্কোণ চিহ্ন রয়েছে। এর মানে কি জানেন? কারাবাস। আমাদের জ্যোতিষের বচনেই আছে,—

চতুষ্কোণ চিহ্ন এক শুক্রস্থান ’পরে,
পিতৃরেখা সনে মিশে দেখ যার করে,
ভাবিতে তাহার কথা মনে দুঃখ হয়,
কারাবাস হবে তার, ভুল কভু নয়।”

কথাটা শুনিয়া প্রিয়দর্শন বাবুর প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল। স্বভাবতঃ তিনি একটু ভীরু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কিন্তু এতগুলি সঙ্গীর সম্মুখে মনের দৌর্ব্বল্য পাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় মুখে সাহস দেখাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “কি বলছেন ফেলারাম বাবু, আমি ওসব বিশ্বাসই করি না, সব বাজে কথা!”

ফেলারাম বাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, “তা, আপনি মন খারাপ করবেন না, আমি কবচ দিয়ে আপনার গ্রহের প্রকোপ কাটিয়ে দেবো। দেখি হাতখানা আর একবার।” এই বলিয়া প্রিয়দর্শন বাবুর হাতটা টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ মনোযোগের সহিত দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, “দেখুন, আর একটা কথা আপনাকে বলব খুব গোপনে। এই যে আপনার কনিষ্ঠা অঙ্গুলির শেষ পর্ব্বে একটা ক্রুশচিহ্ন রয়েছে। এর মানে কি জানেন? খুব গোপনে বলছি, এর মানে ‘অবিবাহ’। আমাদের জ্যোতিষ বচনে আছে—

কনিষ্ঠার শেষ পর্ব্বে ক্রুশ যার রয়,
বড়ই দুঃখের কথা, বিবাহ না হয়।”

ফেলারাম বাবুর এই কথায় মজলিসের সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রিয়দর্শন বাবু সেই হাসিতে মন খুলিয়া যোগ দিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল, তবে কি তাঁহার এতদিনের রঙ্গীন কল্পনা শূন্যেই মিলাইয়া যাইবে? তিনি জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “যান, কি যে বলেন আপনি জ্যোতিষী মশায়। একেবারে পাগল!” যতীন ডাক্তার হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, “এর কোনও কবচ নেই ফেলাবাবু?” “নিশ্চয়ই। আমাদের জ্যোতিষে নেই কি।” এই বলিয়া ফেলারাম বাবু সদর্পে গুম্ফমর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়দর্শন বাবুর দিকে তাকাইয়া যতীন ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “তবে ত আর ভাবনা নেই, একটা শনি-কবচ নিয়ে ফেলো, প্রিয়দর্শনদা’।” তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়দর্শন বাবু বলিলেন, “বাজে কথা রাখ যতীন, কি পাগলের পাল্লায় যে পড়া গিয়েছে। যাক্, অনেক রাত হয়েছে, আজকের মত সভা ভঙ্গ হ’ক।” সকলেই উঠিয়া পড়িলেন, সেদিনকার মত বৈঠক শেষ হইল।

দুই

কয়েক দিন পরে শারদীয়া পূজার সময় আসিল। প্রিয়দর্শন বাবুর পল্লীর যুবকেরা বারোয়ারী দুর্গাপূজার

উদ্যোগ করিল এবং সেই উপলক্ষ্যে তিনি কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ভালোয় ভালোয় দুর্গা-পূজা শেষ হইল। প্রতিমা নিরঞ্জনের দিনে বিশেষ কার্য্যবশতঃ প্রিয়দর্শন বাবু প্রতিমার সঙ্গে যাইতে পারিলেন না,—কয়েকটী যুবককে প্রতিমার ভার দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিতেই আপনার নামের আহ্বান শুনিয়া প্রিয়দর্শন বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একজন দীর্ঘগুম্ফধারী বিশালাবয়ব পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। প্রিয়দর্শন বাবুর প্রাণটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিয়াই পুলিশ কর্ম্মচারী প্রশ্ন করিল, "আপনিই কি প্রিয়দর্শনবাবু, এ অঞ্চলের বারোয়ারী পূজার সেক্রেটারী?" প্রিয়দর্শন বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিই সেক্রেটারী। তা হয়েছে কি?" পুলিশকর্ম্মচারী উত্তর করিল, "সেটাই জানতে এসেছিলাম। আপনার বারোয়ারী দল প্রতিমা নিয়ে যাবার সময়ে জেকেরিয়া ষ্ট্রীটের উপর মস্‌জিদের কাছে পুলিশের নিষেধ সত্বেও বাজনা বাজিয়েছিল, তাই রিপোর্ট হয়েছে। ডেপুটী কমিশনার হয় ত আপনাকে তলব্ করবেন।" উত্তরে প্রিয়দর্শন বাবু একটী ছোট "আচ্ছা" বলিয়া নীরব হইলেন। পুলিশ কর্ম্মচারীটী সদর্পে চলিয়া গেল।

প্রিয়দর্শন বাবুর প্রাণে আতঙ্কের ছায়া পড়িল। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী মনে জাগিতে তিনি আরও শিহরিয়া উঠিলেন। মনে হইল তিনি জ্যোতিষীর কথায় অবিশ্বাস করিয়া ভাল করেন নাই। পরদিন সকালে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া জোড়াবাগান কোর্টে হাজির হইবার জন্য ডেপুটি কমিশনারের নোটিশ দিয়া গেল।

সপ্তমীর উৎসর্গীকৃত জন্তুবিশেষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে প্রিয়দর্শন বাবু ডেপুটি কমিশনারের কোর্টে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন পুলিশকর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেল। যাইতেই ডেপুটি কমিশনার বলিলেন, "আপনাদের বারোয়ারীর দল প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন গোলমাল করিয়াছিল জানেন।" প্রিয়দর্শন বাবু ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমি জানি না, হুজুর। আমি প্রতিমার সঙ্গে থাকিতে পারি নাই।" "তাহার জন্য আপনার সেক্রেটারীর দায়িত্ব যাইতে পারে না।" "হুজুর, উহাদের অপরাধ হইলে আমি ক্ষমা চাহিতেছি। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর আমি কখনও বারোয়ারীর সম্পাদক হইব না।" ডেপুটি কমিশনার প্রিয়দর্শন বাবুর কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "লিখিয়া দিন।" প্রিয়দর্শন বাবু একখানি কাগজে উক্ত প্রতিজ্ঞা লিখিয়া দিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন। ডেপুটি কমিশনার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এখন আপনি যাইতে পারেন।"

ধীর-মন্থর গতিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া প্রিয়দর্শন বাবু শয্যা গ্রহণ করিলেন। শয্যায় শুইয়া শুইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন এ-যাত্রা রক্ষা পাওয়া যাইবে ত, না জ্যোতিষীর বাক্য ফলিয়া যাইবে? পল্লীর উকীল শচীন বাবু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে ইহাতে বিশেষ কিছু ভয় নাই, ইহার শাস্তি বড় জোর অর্থদণ্ড, কারাবাসের কথা আসিতেই পারে না। তথাপি অধ্যাপক প্রিয়দর্শন বাবু সেই কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল যে তিনি জ্যোতিষীর কথা অবহেলা করিয়া ভাল করেন নাই।

তিন

সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনাকে লুক্কায়িত করিয়া প্রিয়দর্শন বাবু জ্যোতিষী ফেলারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে ডাকিয়া প্রিয়দর্শন বাবু বলিলেন, "দেখুন ফেলারাম বাবু, আপনার শনি-কবচ ধারণ করব বলেই স্থির করলাম।" ফেলারাম বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিলেন, "তা ভালই ত, আমার শনিকবচে আপনার শনির প্রকোপ দূর হবে।" অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া জ্যোতিষী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "দেখুন প্রিয়দর্শন বাবু, আপনি বিদ্বান্, তাই আপনাকে বলছি, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সবই গ্রহগণের প্রভাবে। ঈশ্বর নিজের হাতে কিছু করেন না, তিনি গ্রহদিগকে এমনিভাবে নিয়মিত করে রেখেছেন যে তাদের ক্রিয়াবশেই জগতের সমস্ত ঘটনা ঘটছে। শুধু মানুষ বলে নয়, পৃথিবীর সকল পদার্থ ঈশ্বরের নিয়মে উৎপন্ন হচ্ছে, আর গ্রহের প্রভাবে পরিচালিত হয়ে হ্রাসবৃদ্ধি পাচ্ছে।" তার পর তিনি অনেকটা উত্তেজনার সহিত এই বলিয়া শেষ করিলেন "আসিতেছে—আবার তাগা-মাদুলী-কবচ মানিবার দিন

আসিতেছে। য়ুরোপের জ্যোতিষীরাও এই গ্রহৌষধি মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন দিন আসিবে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্রদিগকেও চসমা চোখে দিয়া গ্রহৌষধি শিক্ষার জন্য কলেজ এটেণ্ড করিতে দেখা যাইবে।" অবশেষে ফেলারাম বাবু প্রিয়দর্শন বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আগামী কালীপূজার রাত্রে আপনাকে কবচ ধারণ করতে হবে। অমাবস্যার অন্ধকারে আপনি আমার বাড়ী আসবেন, বুঝলেন।" প্রিয়দর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব অমঙ্গল দূর হবার জন্যেই ত কবচ দেবেন? ঐ যে শেষে যেটা বলেছিলেন। মনে আছে?" এই বলিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে প্রিয়দর্শন বাবু জ্যোতিষী মহাশয়ের দিকে তাকাইলেন। ফেলারাম বাবু সহাস্যে বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে। ঐ 'অবিবাহে'র কথা বলছেন ত? তার জন্যও যে শনি-কবচ।"

কালীপূজার দিন অমাবস্যার রাত্রিতে প্রিয়দর্শন বাবু ফেলারাম বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া নগ্নপদে নগ্নদেহে চলিলেন জ্যোতিষীর হাত ধরিয়া পল্লীর নিকটস্থ শ্মশানের মধ্য দিয়া বনচাঁড়াল গাছের অন্বেষণে। এই গাছের পাতা দিয়া কবচ প্রস্তুত করিয়া সেই রাত্রেই ধারণ করিতে হইবে। প্রিয়দর্শনের নগ্ন পদে কাঁটা বিঁধিতে লাগিল, নগ্ন গাত্রে বনের পোকা কামড়াইতে লাগিল এবং অন্ধকারের ভয়াবহ মূর্ত্তিতে গাটা ছমছম করিতে লাগিল। এক এক সময়ে তাঁহার ভয় হইতে লাগিল হয়ত জ্যোতিষীর কোনও দুষ্ট মতলব আছে, হয় ত বা তাঁহাকে কোনওরূপ তুকতাক করিয়া শ্মশানঘাটে রাখিয়া যাইবে। এই প্রকারের দুই একটা গল্প তিনি শৈশবে শুনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল। ক্রমে সেই ঈপ্সিত গাছের পাতা মিলিল, উভয়ে জ্যোতিষীর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর জ্যোতিষী মহাশয় "হুং হুং হ্রীং হ্রীং ঐং ঐং ক্লীং লং হুং ফট" এইরূপ কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রিয়দর্শন বাবুর বাম বাহুর ঊর্দ্ধভাগে শনি-কবচ পরাইয়া দিয়া উপদেশচ্ছলে বলিলেন, "দেখুন, এতে সব রকম অমঙ্গল আপনার দূর হবে। ঐ যে অবিবাহ সম্বন্ধে বলেছিলাম, সে ফাঁড়াও কাটবে, তবে ও-বিষয়ে একটু চটপটে হবেন, অর্থাৎ মনের মত পাত্রী হ'লে একটু pushing হবেন, লজ্জা করলে ফল হবে না।" অধিক রাত্রে প্রিয়দর্শন বাবু গৃহে ফিরিয়া সে রাত্রি উপবাস করিয়া কাটাইয়া দিলেন।

চার

প্রিয়দর্শন বাবু বাঁচিলেন। পুলিসের নিকট হইতে আর কোনও ডাক আসে নাই। এখন দ্বিতীয় ফাঁড়াটী কাটিলেই পূর্ণমাত্রায় নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সে সুযোগও শীঘ্রই দেখা দিল।

প্রিয়দর্শনবাবুর মামাত ভাই সুদর্শন বাবু নাগপুরের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। অনেক বৎসর পরে ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতায় বেড়াইতে আসিলেন। কয়েক মাস কলিকাতায় থাকিবেন বলিয়া শ্যামবাজার অঞ্চলে একখানি বাটী ভাড়া করিলেন। দাদার নিকট হইতে চিঠি পাইয়া একদিন কলেজের পরে প্রিয়দর্শন বাবু দাদা ও বৌদিদির সহিত সাক্ষাৎ করিতে শ্যামবাজারে উপস্থিত হইলেন।

সুদর্শন বাবু বাটী ছিলেন না, তাঁহার পত্নী সুমতি দেবী প্রিয়দর্শন বাবুকে সযত্নে বসাইয়া সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনেক বৎসরের পরে সাক্ষাৎ, সুতরাং ইহাতে যথেষ্ট নূতনত্ব ছিল। সুমতি দেবী দেবরকে শয়নকক্ষে বসাইয়া রাখিয়া তাঁহার জলযোগের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। প্রিয়দর্শন বাবু কিয়ৎক্ষণ নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিয়া ঘরের আসবাবপত্র দেখিতে লাগিলেন। যে চেয়ারখানিতে তিনি বসিয়া ছিলেন, তাহারই পার্শ্বে একটা টেবিল, টেবিলের উপর একখানি মণিপুরী চাদর পাতা। সেই টেবিলের উপর মাথার কাঁটা, ফিতা, রিবন হ তে আরম্ভ করিয়া খাতা পেন্সিল বই স্তূপীকৃত রহিয়াছে। একখানি পুস্তক হস্তে লইয়া প্রিয়দর্শন বাবু দেখিলেন সেখানি Gardinerএর History of England; নিজে ইতিহাসের অধ্যাপক, সুতরাং পরিচিত পুস্তকখানি দেখিয়া তিনি দুই একখানি পাতা খুলিতেই মেয়েলি হাতের লেখা যে নামটী দেখিলেন, তাহার পরিচয় তিনি পূর্ব্বে পান নাই। এ বাড়ীতে সুরুচি দেবী নামে কে যে থাকিতে পারে, তাহা তিনি কল্পনায় আনিতে পারিলেন না, কারণ তিনি যতদূর জানেন তাহাতে সুদর্শন বাবুর স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র ভিন্ন সংসারে আর

কেহ নাই। তিনি পুস্তকখানি হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সুমতি দেবী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি টেবিলের এক পার্শ্বে দেবরের আহার্য্য রাখিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ও সব বই আমার ছোট বোন সুরুচির, তাকে আপনি কখনও দেখেন নি ঠাকুরপো। আমরা নাগপুরে যাবার কিছুকাল পরেই আমার মা মারা গেলেন, সেই থেকে ও আমার কাছে থেকে লেখাপড়া করছে। নাগপুর কলেজে আই-এ পড়ছে, পড়াশুনায় মন্দ নয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করে দিচ্ছি, দেখুন না কেমন লেখাপড়া শিখেছে।"

দিদির আহ্বানে সুরুচি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নত-মস্তকে দাঁড়াইলেন। প্রিয়দর্শন বাবুও কখনও অনাত্মীয়া কোনও অপরিচিতা রমণীর সহিত আলাপ করেন নাই, সুতরাং তিনিও কি বলিয়া আলাপ আরম্ভ করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সুমতি দেবী ভগিনীকে দেখিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, এই আমার ছোট বোন সুরুচি, নাগপুর কলেজে আই-এ পড়ছে।" পরে সুরুচিকে বলিলেন, "ইনি আমার দেবর প্রিয়দর্শনবাবু, কলিকাতার একটী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। পড়াশুনা সম্বন্ধে একটু আলোচনা কর না।"

ততক্ষণে সুরুচির লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কারণ এতকাল নাগপুরে থাকিতে থাকিতে লজ্জা বা পর্দ্দার আবরু তাহাকে তত স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রিয়দর্শন-বাবু দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী; সহজে তাঁহার বাক্য স্ফুরণ হইল না। সুরুচিই প্রথমে কথা আরম্ভ করিল, "আপনাদের এখানেও কি এই সব ইতিহাসের বই পড়ান হয়?" প্রিয়দর্শনবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "হ্যাঁ, একই বই।"

"আপনারা কি সব বইটা পড়ান? না, notes দেন, আর মাঝে মাঝে summary বুঝিয়ে দেন?"

"না, বইটা সবই পড়ান হয়, তবে notes না দিলে সাধারণ ছেলের অসুবিধা হয়।"

"আমাদের ওখানে ইতিহাসটা ভাল পড়ান হয় না।" এই কথা শুনিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "তা'হ'লে ইতিহাসটা ক'দিন ঠাকুরপোর কাছে পড়ে নে না। কি বলেন ঠাকুরপো?"

প্রিয়দর্শনবাবু বলিলেন, "খুব সন্তোষের সঙ্গেই আপনার আদেশ পালন করব।"

সুরুচি ও প্রিয়দর্শনবাবুর মধ্যে ইতিহাসের আলোচনা চলিল। এমন সময়ে সুমতি দেবী সুদর্শনবাবুর গৃহে প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া সুরুচিকে সেখানে থাকিতে বলিয়া স্বামীকে ডাকিয়া আনিতে গেলেন। সুদর্শনবাবু প্রবেশ করিলে দাদাকে প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া প্রিয়দর্শনবাবু বৌদিদির নিকট প্রত্যহ একবার আসিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সেদিনের মত বিদায় লইলেন।

প্রিয়দর্শনবাবুর জীবনে ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা। এইরূপ শিক্ষিতা সুন্দরী মহিলার সহিত আলাপ পরিচয়ে যে আনন্দ তাহা তাঁহাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে দাদা ও বৌদিদিকে দেখিতে যাওয়া প্রিয়দর্শনবাবুর একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া গেল। তাঁহার বৈঠকখানার মজলিসে আর তাঁহার দর্শন মিলে না। সঙ্গীরা রাগ করিয়া বৈঠক ছাড়িল এবং প্রিয়দর্শনবাবুর মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিল। কিন্তু তাহারা জানিত না যে বৈঠকের মজলিস তাঁহাকে যে আনন্দ দিত তাহার সহস্রগুণ আনন্দ প্রিয়দর্শনবাবু পাইতেছেন আজকাল শ্যামবাজারের একটী গৃহে একজন সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলার সহিত আলাপনে।

সুরুচির সহজ নিঃসঙ্কোচ ভাব তাঁহাকে আরও মুগ্ধ করিত। তিনি দেখিতেন সুরুচি বাড়িয়া উঠিয়াছে যেন প্রকৃতির উদ্যানজাতা বল্লরীর মত, সেখানে সামাজিক আচার-পদ্ধতির কৃত্রিম বন্ধন নাই। সুরুচির সরস সদাহাস্যময় আলাপে প্রিয়দর্শনবাবু অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তথাপি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত জ্যোতিষীর দ্বিতীয় গণনা স্মরণ করিয়া। তিনি তখন মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন, ভয় কি, শনি-কবচ তাঁহাকে উদ্ধার করিবে।

কিছুকাল পরে একদিন কথায় কথায় সুরুচি বলিল, "দেখুন, আপনার পড়ান'র ধরণ আমার বড় ভাল লাগে, এমন চমৎকার আপনার বলবার ভঙ্গী।" সেদিন বাস্তবিকই প্রিয়দর্শনবাবুর মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তিনি স্থান কালের জ্ঞান হারাইয়া সুরুচির হস্ত ধরিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে

বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বলছ তুমি ?" এতকাল যে সুরুচিকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাও ভুলিয়া গেলেন। সেদিন আর পড়াশুনা জমিল না। সুরুচি কাজ আছে বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। প্রিয়দর্শন-বাবুও বৌদিদির নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

গৃহে ফিরিয়া প্রিয়দর্শনবাবু ভাবনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। কেন তাঁহার এই উদ্দাম বাসনা। সুরুচির মত পত্নীলাভ কি তাঁহার ভাগ্যে সম্ভব হইতে পারে! হ্যাঁ, চিরাকাঙ্ক্ষিত রত্ন বটে! তবে জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে মনোমত পাত্রী দেখিলে উদ্যোগী হইতে হইবে। বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না, এইরূপ হইলে তাঁহার জীবনে জ্যোতিষীর শেষ গণনাই ফলিয়া যাইবে। প্রিয়দর্শনবাবু স্থির করিলেন যে তিনি আজই প্রস্তাব করিবেন। কাহার কাছে করিবেন প্রথমে সেইটাই সমস্যার বিষয় দাঁড়াইল। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুরুচিকেই চিঠি লেখা বাঞ্ছনীয় স্থির করিয়া তখনি একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। তিনি লিখিলেন—

সুরুচি দেবী,

তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া 'তুমি' সম্বোধন করিতেছি বলিয়া মনে কিছু করিয়ো না। কারণ তোমার সঙ্গে আমার অল্পদিনের পরিচয় হইলেও, আমায় কে যেন অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বলিয়া দিতেছে তুমি আমার চির-পরিচিতা পরমাত্মীয়া। যেন কোন্ এক অচ্ছেদ্য সূত্রে তুমি আমার সহিত বাঁধা আছ বর্ত্তমানে, বাঁধা ছিলে অতীতে এবং সেই সূত্রে বাঁধা থাকিবে ভবিষ্যতেও। তোমার মত রত্ন লাভ করিতে কামনা করা আমার বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার প্রয়াস বুঝি, কিন্তু তথাপি কি আকর্ষণে আমাকে তোমার দিকে টানিতেছে বলিতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি—বড়ই ভালবাসিয়াছি। যদি ইহাতে অপরাধ করিয়া থাকি, মার্জ্জনা করিয়ো। আর, আর—যদি অপরাধ মনে না কর, তবে দয়া করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবে কি? জানি না আমার ভাগ্যে ভগবান্ কি লিখিয়াছেন। আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

ইতি—তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষী

প্রিয়দর্শন চট্টোপাধ্যায়

চিঠিখানি লিখিয়া তখনি খামে পুরিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করিতে করিতে প্রিয়দর্শনবাবু নিদ্রামগ্ন হইলেন।

পাঁচ

দুই দিন পরে শ্যামবাজারের বাড়ীতে যাইতেই প্রিয়দর্শন-বাবুর প্রথম সাক্ষাৎ হইল তাঁহার বৌদিদি সুমতি দেবীর সহিত। তাঁহাকে দেখিয়াই সুমতি দেবী খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখুন ঠাকুরপো, আপনাদের পুরুষ জাতকে বিশ্বাস নেই। আমি সরল মনে আপনার সঙ্গে আমার বোনের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, আর আপনি তাকে রসগোল্লার মত টপ্ করে গিলে ফেলতে চাইলেন। আশ্চর্য্য! আর আমি তাকে আপনার সামনে আনছি না। কি জানি যদি গিলেই ফেলেন। আপনার চিঠি আমি সমস্তটাই পড়েছি, আপনার মাথা খারাপ হয়েছে ঠাকুরপো। কিছু মধ্যমনারায়ণ তেলের ব্যবস্থা করুন, প্রেম রোগ সেরে যাবে।" প্রিয়দর্শনবাবুর মনটা একেবারে দমিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার পদতলস্থ ভূমিখণ্ড ক্রমেই ধসিয়া যাইতেছে। কোনও প্রকারে দুই চারিটি প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। মাকে ক্ষুধা নাই বলিয়া একেবারে শয্যাগ্রহণ করিলেন।

পরদিন তিনি দেখিলেন তাঁহার দাদা আসিয়া মাতার সহিত অনেকক্ষণ কি কথাবার্ত্তা বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনটা আরও ভারাক্রান্ত হইল। একদিন তাঁহার মাতা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ্, এইবার একটা বউ ঘরে আনি, আর ত একা থাকতে ভাল লাগে না।" প্রিয়দর্শনবাবু অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "না মা, বিয়েতে আমার মন নেই।" তাঁহার মাতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাহলে আর কি করি বল্, সুন্দরী পাত্রী হাতে ছিল, তোর দাদার ছোট শালী সুরুচি। মেয়েটাকে আমার বড্ড ভাল লেগেছে, তুই মত দিলে আমি সুখী হব।" প্রিয়দর্শন-বাবুর মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তিনি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "তোমার কবে অবাধ্য হয়েছি মা,

তোমার মতেই ত আমার মত।" হাসিমুখে মা নীচে নামিয়া গেলেন।

এক মাস পরে মহাসমারোহে প্রিয়দর্শনবাবুর সুরুচি-রত্ন লাভ হইল। পাকস্পর্শ উপলক্ষ্যে পল্লীর অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৈঠকখানার মজলিসের সকলেই ছিল। এমন কি জ্যোতিষী ফেলারামবাবুও ছিলেন। সমবেত সভার মধ্যে উকীল শচীনবাবু জ্যোতিষী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ফেলাবাবু, আপনার শনিকবচ অব্যর্থ, দেখুন, আর যে সব অবিবাহিত ছোকরা এখানে জুটেছে, তাদের বিয়েতে ফাঁড়া থাকলে ধরে ধরে একটা করে শনিকবচ পরিয়ে দিন না। একেবারে রত্নলাভ হবে। কি বল প্রিয়দর্শনদা।" চারিদিকে একটা হাসির ফোয়ারা ছুটিল, এবার কিন্তু সেই সঙ্গে প্রিয়দর্শনবাবুও যোগ দিয়াছিলেন।

নৃত্য

(স্বাস্থ্যের দিক হইতে)

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌-এম্‌-এস্‌

"অন্ধের হস্তী পরিচয়" ন্যায়

স্বদেশ প্রাণ, মহানুভব গুরুসদয় দত্ত I. C. S. মহাশয়, বর্ত্তমানে বীরভূম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি তথায় স্বকীয় কর্ম্ম করিয়া, দুইটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ পাইয়া, নিজে যত আনন্দিত হইয়াছেন, দেশের, তথা বাঙ্গালী জাতির, তত উপকার সাধন করিতে পারিয়াছেন। মহাপ্রাণ দত্ত মহাশয়ের স্বর্গগতা পত্নীর নামে যে "সরোজ-নলিনী শিল্পাশ্রম" কলিকাতার ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আশ্রমের পত্রিকা "বঙ্গ-লক্ষ্মীতে", "রায়-বেঁশে" বা "রাই-বেঁশে" সম্বন্ধে বিস্তর চিত্র সম্বলিত প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তৎসম্পর্কে গুরুসদয় বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাও দেখিয়াছি; এবং রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "অমৃত-বাজার পত্রিকায়" (১লা আশ্বিন, ১৩৩৮ তারিখে) তৎসম্পর্কে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহাও দেখিলাম।

বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর্‌ বটম্‌লী সাহেব, ঐ নৃত্যের মধ্যে, ছাত্রদের কল্পনা-প্রসারের পথ দেখিলেন; এবং বাঙ্গালার ছাত্র-স্বাস্থ্য-বিষয়ক-পরিচালক বুকানন্‌ সাহেব, উহার মধ্যে ড্রিলের চেয়ে ভাল জিনিষ দেখিতে পাইলেন; দত্তজ মহাশয় ইহার মধ্যে একটি কলা আবিষ্কার করিলেন এবং দেশের বহু শত বৎসরের একটি প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাইলেন। বটম্‌লী সাহেব, ভাব প্রবণ বাঙ্গালী-ছাত্রদের ভাব প্রকাশের একটা ক্ষেত্র আবিষ্কার করিলেন; বুকানন্‌ সাহেব ইহাকে উৎকৃষ্টতরও দেশী ড্রিল মনে করিলেন। ইহার মধ্যে আরো কি আছে, তাহাই সন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে, কাঠ-বিড়ালের সাগর-বন্ধনের ন্যায়, আমি নিম্নে কয়েক পংক্তি লিখিলাম;—আশা করি, অন্ততঃ বাঙ্গালী পাঠকরা তাহা একটু মনোযোগ সহকারে পড়িবেন।

আমাদের পাশ্চা -সুলভ মনোবৃত্তি

আমি এ প্রসঙ্গে, "ব্যায়ামের" দিকটা দেখিয়া লইব। সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে ব্যায়ামের মস্ত সুফল এই যে, খেলোয়াড়গণ খেলাকে দেবতার স্থানে বসাইয়া, মনপ্রাণ ঢালিয়া, তাহার সেবায় মাতিয়া যায়; হারিলে, সাংখ্যের পুরুষ সাজে; জিতিলে, মুনির মত স্থৈর্য্য দেখায়; কখনো কাপুরুষোচিত বা হীনচেতার ভাব দেখায় না;—এক কথায়, নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগিতা, সাহস, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য

শিখিয়া, মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হয়। এ কারণে ব্যক্তির বা জাতির চরিত্র গঠনে, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে খেলাধূলা অতীব আবশ্যক। এই জন্য, কি অসভ্য কি সভ্য,—সকল অবস্থার মানুষই অল্প-বিস্তর সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে (in a team spirit) ব্যায়াম করিতে ভালবাসে। অসভ্যদের মধ্যে, নাচ ও কৃত্রিম-রণক্রীড়া সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রচলিত; সভ্য সমাজে, নানারূপ "কসরৎ" ও খেলা-ধূলা প্রচলিত। আমাদের মধ্যে অনেকেই, আদিম-অবস্থাপন্ন-মানবের নৃত্য বা রণকৌশল দেখেন নাই; কিন্তু, পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সম্মত খেলা-ধূলার কথা সকলেই অল্প-বিস্তর জানেন বলিয়া, প্রথমে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রণালীর কথাই উল্লেখ করিব।

আমরা—অর্থাৎ, যাঁহারা এরূপ মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠের মত "সভ্য" ও "শিক্ষিত"—প্রতীচ্য জাতি হইলেও, শিক্ষায়, ক্রীড়ায় ও চিন্তাধারায়, এক রকম পাশ্চাত্য হইয়াই গিয়াছি—যেহেতু, পাশ্চাত্য সব কিছুই আমাদের "হাঁড়ির ভিতরে" ঢুকিয়াছে। এই জন্য, "ব্যায়াম" বুঝাইতে, কপাটি, ডাণ্ডা-গুলি, ডন-বৈঠকের কথা না বলিয়া, ডাম্বেল ভাঁজা, হকি, ফুটবল, টেনিস্, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলা, ও জিম্ন্যাষ্টিক করার কথা ছাড়া, আর কিছুর কথা বলা চলে না।

এ দেশে ব্যায়াম-চর্চ্চার দুর্দ্দশা

যদিও আমাদের স্কুলের ছেলেরা আপনা-আপনিই দৌড়াদৌড়ি করে—তবুও, এ কথা বলা চলে না যে, এ দেশে, এখনো, কোনও বালক বা বালিকাদের বিদ্যালয়ের নিম্ন-শ্রেণীতে, কোনও রূপ বাঁধা-ধরা, ক্রমিক-উন্নতির হারে, ব্যায়াম বা খেলার প্রবর্ত্তন হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে, যত বা অভিভাবকরা, তত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও সমান-ভাবে উদাসীন। সত্য বটে, ছেলেরা ও অভিভাবকরা প্রতি-বৎসরে, বিনা ওজরে, "স্পোর্টস্ ফি" নামক টেক্স আদায় দেন; এবং বিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তারাও বেমালুম তাহা আদায় করিয়াই, কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখান; এবং আরো সত্য বটে যে, এই গৌরী-সেনের দেশে, খুব মোটা বেতনে, একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ "স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইবার নির্দ্দেশক" রূপে (Director of Physical Education) এখানে আসিয়া, রাইটার্স বিল্ডিংএর ত্রিতলে, খাসা পাখার হাওয়া খাইয়া, আমাদিগকে পরম অনুগৃহীত ও আপ্যায়িত করিতেছেন; তবু, এটা সত্য কথা যে, এ যাবৎ কোনও বিদ্যালয়ে, কি উপরের শ্রেণীতে, কি নিম্ন-শ্রেণীতে, সকল ছাত্রের জন্য, কোথাও রীতিমত, ব্যায়াম-চর্চ্চার এতটুকু চেষ্টা হয় নাই।

কাযেই, দেখা যায় যে, সহরে ও পল্লীগ্রামে, সুধু বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কেন, অপর যুবকরাও খেলা-ধূলা বা ব্যায়াম কিছু কিছু করে। কিন্তু, তাহারা কয় জন? তাহারা মুষ্টিমেয়। কারণ, এই কার্য্যে কিছু ব্যয় আছে—সে ব্যয় সঙ্কুলান করিবার সামর্থ্য সকলের থাকে না; এবং এই কার্য্যে, অভিভাবকের ও সমাজের সহানুভূতি থাকে না;—যাহারা খেলাধূলা বা জিম্ন্যাষ্টিক্‌স্ করে, তাহারা "বয়াটে" নামে অভিহিত হয়। এখন, অভিভাবকরা নিজেরাও "সভ্য" সাজেন, এবং শৈশব হইতে, ছেলেদিগকে "সভ্য ও শিষ্ট" সাজাইয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত হন। এই জন্য, ছেলে একটু দৌড়াইলে, ভয়ে শিহরিয়া, নিষেধ করেন —"দৌড়াইও না, পড়িয়া যাইবে!"

কাযেই, যদি দেশের শতকরা মাত্র দুই কি পাঁচটি ছেলে ব্যায়াম করে—তাও বিজাতীয় আওতায়,—তাহা হইলে কি হইল? কিন্তু যে কয়টিই করে, তাহারাই বা কতদিন ধরিয়া তাহা করিতে পায়? চমৎকারা অন্নচিন্তার ঠেলায় পড়িয়া, অচিরেই তাহারা তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

এই কয়েকটি কথা হইতে আমরা বুঝিলাম,—প্রথমতঃ, এ দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শারীরিক চর্চ্চার ধাপ্পাবাজী থাকিলেও, ব্যাপকভাবে, কিছুই আসল কায হয় না। অথচ, দেহ সুস্থ না হইলে, মন সুস্থ হইবে কি করিয়া?

দ্বিতীয়তঃ, কি বিদ্যালয়ে, কি পল্লীগ্রামে,—মুষ্টিমেয় উৎসাহী যুবক কয়েক বৎসর মাত্র আপনারাই চাড়ে ব্যায়াম করে এবং উপকৃতও হয়। সে দিকে কাহারো দৃষ্টি আছে কি?

তৃতীয়তঃ, কেহই পাশ্চাত্য মতে বেশী দিন ব্যায়াম করিতে চাহে না। তাহার কারণ এই মনে হয় যে, উহা নিতান্ত প্রাণহীন, এক-দেশী এবং একঘেয়ে। এই মতে, দেহের কতকগুলি পেশী যেন বাঁধা-রাস্তায় চলিয়া চলিয়া, ক্রমে আড়ষ্ট হইয়া আসে। নিয়ন্ত্রিতভাবে যেমন-তেমন অঙ্গচালনা

করিলেও, সারা দেহের কিছু-না কিছু উপকার হয়ই,—এ বিষয়ে মতভেদ নাই; কিন্তু, পাশ্চাত্য সকল প্রকারের ব্যায়াম-চর্চ্চাই একঘেয়ে ও সুধু কতকগুলি মাংসপেশীকে বাড়ায়। এই জন্য, আজকাল জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌স্‌, ও এমন কি স্যাণ্ডো প্রভৃতির পথে কসরৎ কেহ কেহ প্রথমাবস্থায় করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত তাহা রাখিতে চাহেন না, ও পারেন না। এখন ঐ পথ বর্জ্জন করিয়া খেলার দিকে সকলেরই বেশী ঝোঁক বাড়িয়াছে। যেহেতু, সঙ্ঘবদ্ধ খেলায় জয়-পরাজয়ের উত্তেজনা আছে—খেলাটা কৃত্রিম হইলেও প্রাণবন্ত যুদ্ধ।

চতুর্থতঃ, কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ে, বালিকাদিগের দেহ-চর্চ্চার কোনও চেষ্টা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চমতঃ, এ দেশে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, সাধারণদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এমন কি ধনীদের মধ্যেও, ঘরে ঘরে, কুস্তি, লাঠি খেলা প্রভৃতি ব্যায়াম চর্চ্চার খুবই প্রসার ছিল; এবং দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে, এই বাঙ্গালী জাতিই যুদ্ধের সৈন্যদলভুক্ত হইয়া, কত রণকৌশল ও বীরত্ব দেখাইয়াছিল। আর আজ?—ছেলেরা দৌড়াইলে, আমরা শিহরিয়া উঠি;—আর, যদি কেহ শরীর চর্চ্চায় একটু মনোযোগী হয়, তবেই তাহাকে বয়াটের দলে ফেলি! এই সর্ব্বনেশে মনোবৃত্তিই আমাদিগকে আরো উৎসন্নের পথে লইয়া যাইতেছে।

চাই জাতীয়-শিক্ষা

এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? আমাদিগের কর্ত্তব্য অনেক।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক অভিভাবককে—বিশেষ করিয়া জননীদিগকে—ছেলে-মানুষ করার কথা বেশ করিয়া শুনিতে ও শিখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, "ছেলে" বলিলে, তৎসঙ্গে ও বিশেষ এবং বেশী করিয়া, "মেয়েদিগের" কথাও ধরিয়া লইতে হইবে। যথার্থরূপে ছেলে-মানুষ করা বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা পর্ব্বত-প্রমাণ!

দ্বিতীয়তঃ, খেলার ভিতর দিয়াই, মানব শিশুর ভাবী-জীবনের গতি ও প্রকৃতি এবং চরিত্র গড়িয়া উঠে—এ কথাটা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে; এবং সেই সঙ্গে, মনে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমাদের ভাষায়, "ছেলে খেলা" কথাটিকে আমরা কত মারাত্মক ধারণাসূচক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছি!

তৃতীয়তঃ, দেহ ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিলে, তবে তাহার চূড়ার (মস্তিষ্কের) উৎকর্ষ সার্থক হয়; অতএব, যে শিক্ষায়, বা যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, ছেলেদের মানসিক-উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে, দৈহিক-স্বাস্থ্যের বিকাশ একতালে না হয়, সে শিক্ষা ও সে প্রতিষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ না করিলে, ভাবী বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করাই হইবে ও হইতেছে। এতদ্বিষয়ে সকল অভিভাবককে জাগরূক হইতে হইবে। কোথায়, কোন্ ডাইরেক্টর খোসখেয়ালের বশে, যা'-তা' হুকুম নামা বাহির করিবেন; বা টেক্সট্-বুক্-কমিটি যা'-তা' বই আমাদের ঘাড়ে চাপাইবেন; অথবা ইউনিভার্সিটি যত-ইচ্ছা পরীক্ষার বাঁধন-কষণ করিবেন;—এ সকলের যুগ বহুকাল পূর্ব্বেই যাওয়া উচিত ছিল;—এখনো যায় নাই, কারণ, আমরা এ সব বিষয়ে ভাবিও না—চেষ্টা করা ত দূরের কথা।

চতুর্থতঃ, অন্ধ-পরানুকরণে কোনও জাতি কখনো "মানুষ" হইয়া উঠিতে পারে না;—বিশেষতঃ, খেলা-ধূলা বিষয়ে। ধার করিয়া হাসিলে, সে হাসি ভ্যাংচানতে দাঁড়ায়! খেলা-ধূলার ভিতর দিয়াই যখন আমাদের ভাবী চরিত্র ও মানসিক গতি নির্ণীত হয়, তখন সেই খেলাটা সম্পূর্ণভাবে "জাতীয়" আদর্শে না হইলে, আমরা কখনোই এ দেশের মানুষ হইব না। এই জন্য, যাহাতে শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত, খেলা, ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয়ভাবে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য দেশের লোকরা একযোটে তাহা না চাহিলে, কখনই আমরা তাহা পাইব না। আমি পাশ্চাত্য কোনও খেলার বিরোধী নই। তবে, আগে দেশী, পরে পাশ্চাত্যের খেলা—এইটাই আমি চাহি। যে উদার হিন্দু অনার্য্য, শক, হুন্, তাতার প্রভৃতিকে আপনার জন করিয়া লইতে জানে, আবশ্যক হইলে, কেমন করিয়া পাশ্চাত্য খেলা'কে প্রতীচ্য খেলার অঙ্গীভূত করিতে হয়, তাহা আর তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ কর

আমি চিরকালই বলিয়াছি এবং এ স্থলেও বলি যে, এ দেশে, শিশুপালন করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়; যেহেতু, তাঁহার

আদর্শ-জীবনে, এ দেশের ভাব ও রীতি অনুস্যূত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এক-রকম রাজার "ছেলে" হইলেও, সর্ব্বদাই নগ্নগাত্রে, উন্মুক্ত মাঠে ও ঘাটে, বাঁশী বাজাইয়া, নৃত্য করিতেন। ইহার মধ্যে, খুব বেশী ছন্দানুবর্ত্তিতা ছিল; এবং শিশু জীবন গঠনে ছন্দানুবর্ত্তিতা, যে কত বড় সহায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কোন বিশিষ্ট প্রথায় ব্যায়াম-চর্চ্চা না করিলেও, নৃত্য করিয়া, ও উন্মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যকিরণ সেবনের ফলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ বলরামাপেক্ষা কম বলশালী ছিলেন না; অথচ, তাঁহার দেহ কত কমনীয় ছিল! শ্রীকৃষ্ণ পরম যোগীপুরুষও ছিলেন। হঠযোগ-প্রক্রিয়ায় সমগ্র দেহ অতীব বলশালী হয়। যোগ বুঝি না;—কাযেই, যেটা বুঝি না, সেইটার উপরে ভর করিয়া কোনও কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু শরীর গঠনে নৃত্য যে কতটা সহায়তা করে, তাহা জনসাধারণ জানেনও না, এবং হয় ত বিশ্বাসও করিবেন না। এর জন্য, নৃত্য সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিতেছি।

পাশ্চাত্য ব্যায়াম ত্যাগের কুফল

এ দেশের যে যে যুবকরা ১৪।১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়ার সঙ্গে কিছু কিছু ব্যায়াম চর্চ্চা করেন, তাঁহারা ২৫ বৎসর বয়সে লেখা-পড়া সাঙ্গ করিয়া, কাযকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কাযে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি কদভ্যাস জুটিয়া থাকে; যথা—

(১) নিয়মিতভাবে, প্রত্যহ মুক্ত বায়ু সেবন করা আর ঘটিয়া উঠে না।

(২) প্রত্যহ, নিয়ম করিয়া, খেলাধুলা ক্রমশঃই থাকে না বলিয়া, নিত্য যে প্রচুর ঘর্ম্মত্যাগ ঘটিত, তাহার অবকাশ কমিয়া আসে; বরং তৎস্থানে অনেকক্ষণ নানারকম জামা-জোড়ায় আবদ্ধ থাকায়, দেহে রক্ত চলাচলের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাতও সৃষ্ট হয়।

(৩) বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, আমাদের দম কমে;—অর্থাৎ, ফুস্‌ফুসের ও হৃৎপিণ্ডের জোর কমে।

(৪) প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে পায় না বলিয়া, কিড্‌নী নামক মূত্র সৃষ্টিকারী যন্ত্রের উপরে অযথা চাপ পড়ে; কাযেই, ক্রমশঃ ব্লাড-প্রেশার বা রক্তচাপ বাড়ে।

(৫) ক্রমশঃ এইগুলির দরুণ, "ভুঁড়ি" জন্মায়; অর্থাৎ, একদিকে যেমন উদরের প্রাচীর শিথিল হয়, অন্য দিকে, সেই সঙ্গে, মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক বক্রতা নষ্ট হয়। তাহার ফলে, উদর ও বক্ষো-গহ্বরের যাবতীয় যন্ত্র বিকল হইতে থাকে। যে ব্যক্তির দেহ সুস্থ, তাঁহার পেটের মাংসপেশী দৃঢ় থাকে বলিয়া, সমস্ত দেহ-যন্ত্র যথা-স্থানে থাকিয়া, সুস্থ-ভাবে কায করিতে পারে। মাংসপেশী দৃঢ় থাকিলে, "ভুঁড়ি" জন্মায় না। এজন্য, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু আসিয়া উপস্থিত হয়;—অর্থাৎ, যেখানে দৈনিক ও ঠিক সময়ে, নিয়ম করিয়া, দেহ মল অন্ততঃ দুইবার নিষ্কাশিত হইত, তথায় দৈনিক একবারও তাহা হয় কি না সন্দেহ; এবং দেহ-মল যথাযথ ভাবে নিষ্কাশিত না হওয়ায়, অকাল-জরা উপস্থিত হয়।

(৬) এই সঙ্গে, আহারের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা অধিকাংশই বেশী খাই,—কেহ লোভ বশতঃ, কেহ ভ্রমাত্মক ধারণা বশতঃ। সে ভ্রমাত্মক ধারণাটি এই যে, খুব তৃপ্তি করিয়া "ভুরি"-ভোজন করাটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। দেহের আবশ্যকের অতিরিক্ত ভোজন করিলেই—তা' সে যত "তৃপ্তি" করিয়াই হউক—দেহকে সেই অতিরিক্ত আবর্জ্জনা বাহির করিবার জন্য অতিরিক্ত শ্রম করিতে হয়। অর্থাৎ, পরিপাক যন্ত্রগুলিতে অধিকক্ষণ ধরিয়া রক্তাধিক্য ঘটে,—যাহার ফলে, দেহের অপর অংশে রক্তের ন্যায্য পরিমাণের ন্যূনতা ঘটে, দেহের অযথা ক্ষয় হয়, এবং বাড়্‌তি খাদ্য হইতে যে বাড়্‌তি-আবর্জ্জনার সৃষ্টি হয়, তাহা নিষ্কাশিত করিতে সকল সময়ে দেহ সমর্থ নাও হইতে পারে;—কাযেই, আপনার অবিবেকিতার জন্য, দেহে ক্রমশঃ ময়লা জমে, তাহার ফলে, অকাল-জরা বা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই জরা আসিবার পূর্ব্বে, দেহে মেদ-সঞ্চার হইয়া, আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া দেয়। আমরা কি সে সতর্কতার বাণী শুনি? পালিত কুকুর-বিড়াল বা অশ্ব স্থূলকায় (stout বা obese) হইলে, সে অবস্থাটাকে দোষাবহ মনে করি; কিন্তু, স্বয়ং স্থূলকায় হইলে, মনে মনে খুসী হই, এবং সেটা বংশানুক্রমিক অবশ্যম্ভাবী অবস্থা, এই মনে করিয়া, তৃপ্ত থাকি! কিন্তু এটা খুব ধ্রুব সত্য যে, দেহে মেদ-বাহুল্য হওয়া, স্বাস্থ্যের চিহ্ন নহে—ব্যারামের লক্ষণ। আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবন-বীমা কোম্পানীরাও, বাধ্য হইয়া, ধরিয়া লয়েন

যে, ২৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে, সাত-আট সের দৈহিক ওজন বৃদ্ধি কার্য্যতঃ অন্যায় হইলেও লোক চক্ষুতে অন্যায় নহে! অথচ, ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার পৃষ্ঠে এই "সামান্য" ৭।৮ সের ভার চাপানর ফলে, অনেক সময়ে, সে ঘোড়া বাজি জিতিতে পারে না! এই প্রসঙ্গে আরো স্মরণ করাইয়া দিই যে, বিবৃদ্ধ মেদ সুধু চর্ম্মের নিম্নেই আপনার স্থান করিয়া লয় না—হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র প্রভৃতির ভিতরে বা আশে-পাশে জমিয়া, উক্ত যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক কার্য্যের যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করিয়া নিত্যই ক্রমে আয়ুঃক্ষয় করে। কাযেই উদরের আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা না করিলে, ভুড়িবৃদ্ধি, মাংসপেশীর শৈথিল্য, কাযেই হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ, বাত, ব্লাড্ প্রেশার বৃদ্ধি, সন্ন্যাস রোগ, যকৃতের দোষ, বহুমূত্র—প্রভৃতি দেখা দেয়।

জীবনটাকে সত্যিকার ভোগ করিবার পন্থা

কাযেই, সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দমনে জীবনটাকে সত্যকার "ভোগ" করিতে হইলে, দুইটি প্রধান কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে:—(১) খুব বুঝিয়া, আবশ্যক মত ভোজন করা; এবং যাহা করিলে দৈনিক তিনবার মলত্যাগ হয়, তাহা করা চাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রবাদ বচন আছে,—"নিজ অবস্থা "অতিক্রম" করিয়া, ঘর-বাড়ী করিবে; অবস্থা "অনুযায়ী", বেশ ভূষা করিবে; কিন্তু খাইবে, অবস্থার চেয়ে "ঢের কম" করিয়া।" এটি অতীব জ্ঞান-গর্ভ কথা। (২) নিয়মিত ভাবে, এক সঙ্গে সমগ্র দেহের ব্যায়াম করা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাত্র মুষ্টিমেয় লোক স্বল্প কালের জন্য, ব্যায়াম বা খেলা করে,—এবং তাহারাও, বেশীর ভাগ হাতের ও পায়ের কতকগুলি মাংসপেশী লইয়াই ব্যস্ত থাকে;—কাযেই, সে ব্যায়ামের ফল যেমন একদেশীয়, তেমনি একঘেয়ে, কাযেই অল্পদিন স্থায়ী হয়। এই জন্য, মধ্যবয়সে, ব্যায়াম বা খেলা ছাড়িতে-না-ছাড়িতেই, দেহ ভাঙিতে আরম্ভ করে। সুধু মাংসপেশী লইয়াই দেহ নহে। দেহে "মস্তিষ্ক" ও "স্নায়ু" আছে; শিরা-ধমনী আছে; যন্ত্রপাতি আছে; গ্ল্যাণ্ড (বিশেষ করিয়া, endocrine glands) ও আছে। তাহা ছাড়া, শৈশবে আমরা বুকে হাঁটি; তাহার পরে, পর-পর হামাগুড়ি দিই, দাঁড়াইতে শিখি ও দৌড়াই—from serpentine to quadruped, to biped posture to running;—কাযেই, পিঠ, পেট, কোমর ও উরুদেশ—প্রধানতঃ এই চারটি স্থানের উপরেই আমাদিগকে বেশী করিয়া মনোযোগ দেওয়া চাই। যাঁহারা নিয়মিত পাশ্চাত্য মতে ব্যায়াম বা খেলা করেন, তাঁহারা যদি নিজ নিজ উদর ও নিতম্বদেশ লক্ষ্য করেন, ত দেখিবেন যে, ঐ দুইটি স্থান তেমন দৃঢ় ও সুপুষ্ট হয় না। এবং জুতার দোষে পা আড়ষ্ট হইয়া আসে—গুল্ফ ও তৎসন্ধি বিশ্রী হয়।

নৃত্যের বিশেষ গুণাবলী

অথচ কোনও বর্ব্বর বা অসভ্য জাতির মধ্যে—মেদবাহুল্য, উদর প্রাচীরের শৈথিল্য বা ভুঁড়ি ঋজু পৃষ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড), অপুষ্ট নিতম্ব দেখা যায় না। তাহারা দুই দিন বসিয়া থাকিলেও, তাহাদের দেহ ভাঙিয়া পড়ে না। তাহারা ত ঐরূপ কর্ম্মঠ, সুপুষ্ট, সুগঠিত ও লঘু দেহ লইয়া "জন্মায়" নাই—তাহারা আপনাদিগকে ঐরূপ "করিয়া" লইয়াছে। তাহাদের সহজ নৃত্য-ভঙ্গীর সাহায্যে, তাহারা একসঙ্গে সমগ্র দেহের উন্নতি সাধন করে। তাহারা দেহের ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া উন্নতি সাধন করে না—যেহেতু, তাহারা biceps ও জানে না, trapezius ও মানে না।

যাহারা নৃত্য করে, তাহারা তালে তালে, এবং বারম্বার স্বচ্ছন্দে, ঘুরিয়া-ফিরিয়া, নানারূপ কৌশল দেখায়। এ দিকে, পাশ্চাত্য মতে ব্যায়ামে, আকস্মিক ভাবে, কতকগুলি মাংস পেশীর উপরে জোর প্রয়োগই প্রথম এবং শেষ কথা। যাঁহারা কলকব্জা বুঝেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, নৃত্যটা turbine or rotary engine; এবং বিলাতি ব্যায়ামটা, reciprocating or opposing engine. নৃত্যে শক্তির অপচয় নাই, পাশ্চাত্য-ব্যায়ামে শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় আছে।

দ্বিতীয়তঃ, নৃত্য করিতে গেলে, প্রধানতঃ উদর ও কোমরেরই বেশী কায হয়। ভগবান এই উদরের প্রাচীরকে নমনীয় করিয়াছেন, এবং উদরের ভিতরেই, আমাদের পুষ্টির এবং দেহশুদ্ধির যন্ত্রপাতি রাখিয়াছেন। এই উদরেই, হিন্দুমতে মণিপুরচক্র ও পাশ্চাত্যমতে Solar plexus বা abdominaal brain নামক sympathetic স্নায়ুর অতীব

প্রয়োজনীয় অংশ রাখিয়াছেন। এবং মানবজীবনের তিনটি প্রধান স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ—gonads ও adrenals নামক endocrine glands—এই উদরেই স্থিত। কাযেই, এটা বেশ বুঝা যায় যে, যদি মস্তিষ্কের ও বক্ষের পরে কোনও দেহাংশের স্থান থাকে, তবে তাহা উদর ও বস্তি। নৃত্য করিতে গেলে, প্রধানতঃ উদর ও বস্তির সকল যন্ত্রই অল্পবিস্তর নাড়া চাড়া পায়। যদি বস্তিকে চক্রের মধ্যমণ্ডল বা নাভি (centre) কল্পনা করা যায় (এবং সেরূপ কল্পনা কিছু অযৌক্তিকও নহে), তবে, স্বচ্ছন্দে এ কথা বলা চলে যে, এই নাভির ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হস্ত-পদাদি-রূপ চক্রের পরিধিগুলি (radii) স্বতঃই নাড়া চাড়া পায় ও পুষ্ট হইয়া উঠে।

তৃতীয়তঃ, নৃত্যকালে, একটা গোড়ালির উপরে ভর দিয়া পাক খাওয়া, নানাদিকে কোমর বাঁকাইয়া অঙ্গভঙ্গী করা, উল্লম্ফন, নীচু হইয়া অর্দ্ধ বসিয়া পড়া, সারা দেহকে লীলায়িত ভাবে আন্দোলন করা—ইত্যাদি কারণে, উদর ও বস্তির মধ্যস্থ দৈহিক যন্ত্রগুলিও ঐ ঐ ভাবে নাড়া চাড়া পায় এবং সেই সঙ্গে, সমস্ত দেহের সমতা (balance), ভারসামঞ্জস্য (poise) ও গতিমাধুরী (grace) সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠে। তাহা ছাড়া, নৃত্যকারীদের চরণের গঠন ও সৌষ্ঠব একটা দেখিবার জিনিষ।

চতুর্থতঃ, নৃত্যকালীন, কখনো এমন ভাবে আঁতমারার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করা হয় যে, মনে হয়, যেন তদ্দ্বারা সমস্ত আঁতটিকে টিপিয়া, চাঁছিয়া দেওয়া হইল—যাহার ফলে, আমাদের অন্ত্রমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহা স্বচ্ছন্দে ক্রমশঃ অগ্রগতি হইতে পায়—কোষ্ঠশুদ্ধির পথ খোলসা করা হয়। পাশ্চাত্য মতে পেটের কসরৎগুলির ফল, পেটের যন্ত্রপাতিকে নীচের ও সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া—ভুঁড়ি তৈয়ারী করা। নৃত্যে তাহা আদপে হইতে পায় না, বরং উদর-প্রাচীরকে বেশ দৃঢ় করে। তদ্ব্যতীত, নৃত্যের ফলে সকল বোধক-স্নায়ু সজাগ হইয়া উঠে, মনে সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি বিরাজ করে।

তাহা হইলে বেশ বুঝা গেল যে, শরীরকে সুস্থ রাখিবার ও গড়িয়া তুলিবার জন্য, এই এই বিষয়ে আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে :—

(১) ব্যায়ামকারীকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যায়াম করার প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য,—শরীরকে সুগঠিত ও দৃঢ় করা, নিত্য নিয়মিত ২।৩ বার যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় তাহা করা, এবং মন ও সমগ্র শরীরকে স্ব-চ্ছন্দে রাখা। এই সবগুলিই পাওয়া যায়, যদি উদর ও বস্তিদেশকে প্রধান লক্ষ্যস্থল করিয়া ব্যায়াম করা যায়—অর্থাৎ নৃত্যের সাহায্যে। হাতের বা পায়ের মাংসপেশীর দিকে প্রধান লক্ষ রাখিলে, এ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

(২) ব্যায়ামকালীন যত ছন্দানুবর্ত্তিতা থাকে, এবং সেই সঙ্গে গতি ও ভঙ্গী যত সহজ হয়, ততই সমস্ত দেহের মাংসপেশীগুলি সমানে গড়িবার অবকাশ পায়।

(৩) উদর ও বস্তিদেশকে প্রধান লক্ষ্যস্থল করিলে, হাত-পায়ের মাংস-পেশী (trapezius) ও deltoid সবাই আপনা-আপনিই গড়িয়া উঠে, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র-ভাবে খেলাইতে হয় না।

এই কারণেই মনে হয় যে, আদিম বা অসভ্যাবস্থায় যে নৃত্য নিয়মিত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিত্যই আচরিত হয়, তাহা যেমন শরীর গড়ে ও ভাল রাখে, বোধ হয়, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কসরৎ করিয়া, তাহা হয় না। এই জন্যই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের দেহ লীলায়িত, তিনি নৃত্যশীল এবং বংশী তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তিতার প্রতীক।

বর্ত্তমানকালের পাশ্চাত্য ball dancing কখনো দেখি নাই ; তবে তদ্বিষয়ে শুনিয়া, ছবি দেখিয়া, ও পড়িয়া মনে হয় যে, ঐ নৃত্যে আমার পূর্ব্ববর্ণিত সবগুলি নাই ; এই জন্য সে নৃত্যের ততটা সাধুবাদ দিতে পারিলাম না।

"রায় বেঁশে" নৃত্য দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক নৃত্যশীল ব্যক্তির দৈহিক গঠন দেখিয়া মনে হয় যে, ঐ নৃত্যে আদিম-যুগের নৃত্যকারীদের যথেষ্টই মাল মসলা ও ভঙ্গী আছে। একারণে, drill ও gymnastics ত্যাগ করিয়া, প্রাণবন্ত নৃত্যের প্রসার হইলে, দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। এ বিষয়ে মাননীয়া শ্রীযুক্তা পি, কে, রায় ও কবিসম্রাট ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও মাননীয় মিঃ গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের চেষ্টার জন্য, তাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

লোভী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ওপারে ত্রিতল বাড়ীখানার ছাদের উপর নীল আকাশ যেন অলসভাবে শুইয়া আছে। ত্রিতল-বাসিনীদের দেবকন্যা বলিয়াই আমাদের মনে হইত। কিন্তু স্বর্গরাজ্যে কলহ কোলাহল আছে এ কথা কোন' বইয়ে না পড়িলেও উহাদের বিচিত্র জীবন-যাত্রা হইতে এই সত্য কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি।

আমরা খোলার ঘরের অধিবাসী হইলেও—সংবাদ-সংগ্রহে অলস নহি; এবং এ বিষয়ে সুরমার তৎপরতাকে অভিনন্দন না দিয়াও পারা যায় না। ও-বাড়ীর সকাল-দুপুর-রাত্রির খবর তার মুখে মুখে। সুতরাং সে খবর আমারও কাণের মধ্যে পশিয়া মনে একটু নাড়া দেয় বৈকি!

বিশেষ করিয়া ও-বাড়ীর বৌটি।

প্রায়ই দেখি ছাদের খাটো আলিসার উপর ভর দিয়া নীল আকাশকে ছুঁইয়া কেমন যেন উদাসিনীর মত একদিক পানে চাহিয়া থাকে। মাথায় কখনো স্বল্প-আবরণ থাকে, কখনো বা গুণ্ঠনহীনা। সমগ্র কালো মুখখানি ভীরু আলস্যের ভারে তন্দ্রাতুর। চোখ দুটিতে ক্ষুধার দৃষ্টি;—লোভের, ক্ষোভের—এবং কলহেরও বটে। শীর্ণপ্রায় দেহ। গতি কখনো উগ্র, কখনো ধীর। কাপড় মেলিতে দেওয়ার সময় ক্ষিপ্র-কর-সঞ্চালনে পুঞ্জীভূত নিষ্ফল ক্রোধকে সে চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। মেয়েটিকে দেখিলেই আমার মনে হয়, অবরুদ্ধ আগ্নেয়-গিরি গলিত ধাতু উত্তাপে বিদারণের অপেক্ষায় ভিতর হইতে বিশীর্ণ দেহকে বারম্বার প্রবল পীড়ন করিতেছে। ভালবাসিবার বিন্দুমাত্র কোমলতা ও মুখের কোথাও নাই।

নব-জীবন কুঞ্জে কোথায় ওর মুকুলিত শাখায় কোকিল-কূজন, কোথায় বা নীল চোখে সাগরের স্বপ্নমায়া। বসন্তের উন্মাদ শ্রী, বর্ষার সজল কান্তি, শরতের প্রসন্নতা, —হেমন্তের শস্য-সম্পদ ও শীতের আরাম কল্পনা সমস্তই বুঝি বৈশাখী মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের তেজে আত্মগোপন করিয়াছে। ছাদে পদচারণা করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া আপন মনে কত কি বকে। হাসিও দেখিয়াছি, নির্মেঘ আকাশে যেমন করিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে। শুষ্ক—শঙ্কাকুল ভীরু নয়ন দুটি তুলিয়া আকাশের গায়ে ও কি লেখা পাঠ করিতে চায় যেন। সেকি বিদলিত যৌবনের স্মরণ-সমারোহ মাঝে নিষ্ঠুর বর্ত্তমানের মরু-লিপি?

সুরমা বলে—বৌটি মুখরা এবং লোভী।

নেপথ্যের কোলাহলে একথা না বিশ্বাস করিয়া পারি না, কিন্তু লোভকে উহার স্পষ্টই দেখিয়াছি।

ছাদের কোণে চিলেকোঠার গায়ে ঠেস দিয়া এদিক ওদিক ভীরু চোখে চাহিয়া কাপড়ের তলা হইতে লুকানো জিনিষ বাহির করিয়া প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে ও রসনার তৃপ্তি-সাধন করে। ক্ষয়া চুড়ি কগাছিতে রিনি ঝিনি বাজে।

তারপর ট্যাঙ্কের জলে হাত মুখ ধুইয়া রৌদ্রে মেলা কাপড়ে মুখ মুছিয়া ধীরে ধীরে বৌটি নামিয়া যায়।

সুরমা হাসিয়া বলে, "দেখেছ কাণ্ড! এমন নোলা-দাগা মেয়েও ত কখনো দেখিনি!"

কোন' কোন' দিন ধরাও পড়ে। বিধবা শাশুড়ী হয়ত চেলা কাঠ দিয়া বৌটির সর্ব্বাঙ্গে কালশিটা পাড়াইয়া দেন। কাঠে কাঠে ঠকাঠক শব্দ হয়; ও কাঁদে না। তিরস্কার করিলে মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাসে। বেহায়ার একশেষ! যে কার্য্য বারণ করা যায়—সেই কার্য্যেই ওর উৎসাহ বেশী। আলিসায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া শাশুড়ী পাড়ার লোককে ডাকিয়া বৌয়ের গুণগ্রামের কাহিনী বলেন। বকিয়া বকিয়া শ্রান্ত হইয়া অবশেষে নামিয়া যান। কাহিনী হইতে বুঝা যায়, অমনুষ্যত্বের যে বিষবাষ্প কুটীরের চারিধারে ঘন কুয়াসা রচনা করিয়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে অসুন্দর, অসরল ও কদর্য্যতার আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে,—সে বাষ্পের ছায়া আকাশস্পর্শী ত্রিতলের ছাদেও ঘুরিয়া বেড়ায়। দৈন্য অভাবের মধ্যে যে লোভ—যে উৎপীড়ন মানুষকে শান্তিহারা করে, স্বচ্ছলতার মাঝেও তার প্রকাশ।

বৌটির কথাই বলি।

এই ত সেদিন এবাড়ীতে আসিয়াছে। সেদিন মানে—বছর দুই। শানাইয়ের বসন্ত-রাগিণী এখনও কাণে বাজিতেছে।

একমাত্র ছেলের বিবাহ—সঞ্চয়ী কর্ত্তার আনন্দের সীমা ছিল না। সমারোহ করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। বাদ্য, হুলুধ্বনি ও আনন্দ-অভ্যর্থনার মধ্য দিয়া রূপসী—সালঙ্কারা বধূ আসিল। লোকে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অলঙ্কারের সুখ্যাতি করিল।

বিবাহ-শেষে অতিথিরা চলিয়া গেলে—কোলাহল-শূন্য-গৃহে বসন্ত দেখা দিল, কোকিলও ডাকিল। আমাদেরই এদিককার দ্বিতলের সুসজ্জিত-কক্ষে নব-দম্পতিরা আশ্রয় লইল। দক্ষিণ বসিয়া জানালা রহিল খোলা এবং সেই মুক্ত পথ দিয়া মিষ্ট হাসির ঢেউ আসিয়া চারিদিকের আবেষ্টনীকে বসন্তের মঞ্জুশ্রীতে ভরিয়া তুলিল। সারারাত্রি সে কলতানের বিরাম থাকিত না, সারারাত্রি

রঙীন আলোটাও জ্বলিয়া জ্বলিয়া সে রঙ্গ উপভোগ করিত। কখনো বাতায়নের নিকটে বৈষ্ণব পদাবলীর অতীত গানকে তারা রূপান্তরিত করিয়া তুলিত।

কিন্তু সে স্বপ্ন। অষ্টাহান্তে দম্পতি এ বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে—সেই যে ও-ঘরে আলো নিবিল, বাতায়ন বন্ধ হইল—এই দুটি বৎসরের অসংখ্য চন্দ্রালোকিত রাত্রিরেও তাহা আর খুলে নাই। গৃহিণী বাসনপত্র ঠাসিয়া ঘরখানির কণ্ঠরোধ করিয়াছেন। উত্তর খোলা ঘরে নব-দম্পতির শয্যা পড়িয়াছে। তারপর, কর্ত্তা পৃথিবীর ওপারে গিয়াছেন, যার নামে বিষয় সে গম্ভীর হইয়াছে।

গৃহিণী উহাদের অসহ্য আনন্দ-হাসিকে দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সর্ব্বদা শাসনের কথা লইয়া বৌটির পাছু পাছু ফিরেন। খাওয়া পরার বিধি নিষেধই কি কম!

বৌটির সে দামী বেনারসী ঢাকাই শান্তিপুরী নানা রঙ বে-রঙের কাপড়গুলি কোথায় গিয়াছে! হয়ত—ছিঁড়িয়াছে, হয়ত ট্রাঙ্কে পচিতেছে। গহনাও অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্তির ভয়ে তোলা আছে। নিমন্ত্রণে যাইবার পূর্ব্বে সেগুলি বাহির হয়। কিন্তু বিশীর্ণ দেহে সেগুলি যেন বিদ্রূপের মত বিঁধিতে থাকে। এখন নারিকেল তেলে জবজবে চুল হইতে কোন প্রকার সুগন্ধ বাহির হয় না। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড় ভেদ করিয়া বর্ণ-সুষমাও দেখা যায় না। খদ্দরের মোটা ছেঁড়া সেমিজ, সারাক্ষণই অঙ্গে থাকে।

খাইতেই কি ভাল করিয়া পায়? তা যদি পাইত ত ছাদের উপর দাঁড়াইয়া—অমন কাঙাল-পনা করিবে কেন? শান্ত-বৌ মুখরা হইয়াছে, লক্ষ্মী-বৌ দুষ্ট হইয়াছে, সুন্দরী-বৌ রূপ-শ্রী হারাইয়া কুৎসিত হইয়াছে।

মাঝে মাঝে দ্বিতলের জানালাটা খুলিয়া যায়, বৌ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আকাশ দেখে। বর্ত্তমানের আকাশে অতীতের বর্ণ-বৈচিত্র্য খুঁজিয়া বৃথাই সে প্রলোভিতা হয়। সেদিন মধ্যাহ্নেও সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সুরমা ঘরে আসিয়া বলিল, "ওগো, দেখ—দেখ, বৌটি কাঁদছে। বোধ হয় শাশুড়ী মেরেছে।" শাশুড়ী ত প্রত্যহই প্রহার করেন, কাঠ দিয়া কিংবা কাষ্ঠাপেক্ষা রূঢ়তর বাক্য দিয়া। তাহাতে ত কোনদিন ও কাঁদে না।

বলিলাম, "শাশুড়ী নয়, বোধ হয় ওর স্বামী।" সুরমা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এমন একগুঁয়ে বৌ ত কখনো দেখি নি! এত জিজ্ঞাসা ক'রলুম—মুখের রা-টি খসালে না! সাধ ক'রে কি আর মারে?" অশ্রুমতীর দু-চোখের বিগলিত ধারা নিঃশব্দে গাল বহিয়া গড়াইতেছে, দৃষ্টি তার দূর নীলাকাশের প্রান্তে। সুরমার সমবেদনামাখা প্রশ্নের একটি উত্তরও সে দেয় নাই। রাগ হইবারই কথা।

সুরমা অনেক কথাই বলিল। মানুষের অত লোভ মোটেই ভাল নহে। সকলকে খাওয়াইয়া পরাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে—তাহাই পরম তৃপ্তিতে গ্রহণ করা নাকি বধূধর্ম্ম। বধূ যে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী,—বিশেষত হিন্দুর ঘরে।

বলিলাম, "এ তো গেল বধূর কথা, কিন্তু মাতৃস্থানীয়া শাশুড়ীর কি কোন কর্ত্তব্য নেই, সু? বালিকা হঠাৎ বাপের বাড়ীর আদরের আবেষ্টনী থেকে এসে এমন অনাদরের ঢেউ যদি সহ্য না-ই ক'রতে পারে"—সুরমা গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, তবে আর হিঁদুর মেয়ে শিখলে কি? এত ব্রত-উপবাস, এত পাঁচালী কথা শুনেও শিখবে না?" কথা সত্য। সংযম শিক্ষার ভিত্তি পৌরাণিক কাহিনী ও আচার অনুষ্ঠানে বাল্যকাল হইতেই বালিকাদের অন্তরে আরম্ভ হইয়া থাকে! আমায় চিন্তান্বিত দেখিয়া সুরমা বাহিরে গিয়াছিল। খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "ওগো, দেখ সে—দেখ সে, কোথায় গেছে তার কান্না! দিব্যি ট্রাঙ্ক খুলে কাপড় জামা বার ক'রে সেজে গুজে হাসচে। পাগল নাকি!"

পাগল না হইলে এই পরস্পর বিরোধী আচরণের কোন সামঞ্জস্যই ত খুঁজিয়া পাইনা! যে লাঞ্ছিতা নারী নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় ক্ষণপূর্ব্বে নিঃশব্দে অজস্রধারা বর্ষণ করিতেছিল, ক্ষণপরে তার এই উৎকট লোভ···পাগল ছাড়া আর কি?

ওর হাসি দেখিতে বড় সাধ হইল। দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সুরমা মিথ্যা বলে নাই, সত্যই পাগলিনী হাসিতেছে। মাধুরী নাই, প্রাণ নাই, শুষ্ক ম্লান হাসি। দামী বেণারসী সাড়ী, একদিন যাহা প্রতি অঙ্গবেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব সুষমাকে প্রকাশ করিত, আজ শীর্ণদেহে তাহা পরিপাটীরূপে ধরিয়া রাখাও দুষ্কর। গায়ের গহনা গুলিও ঢলঢল করিতেছে। হাড় ওঠা গলায় ব্লাউজটা এমন বে-মানান হইয়াছে যে, টান মারিয়া সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেও ক্ষতি নাই! একে একে সমস্ত গহনা পরিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া বৌটি দাঁড়াইল। মুখে মৃদুহাসি। লম্বা দেওয়াল-আয়নাটায় সর্ব্বাঙ্গ হয় ত দেখা যাইতেছিল না। বৌ-টি কিসের উপর উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক ফিরিয়া ভাল করিয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে লাগিল। সে দেখা যেন তার শেষ আর হয় না। হাত ঘুরাইয়া ঘাড় কাত করিয়া, চুল এলাইয়া, পিছন ফিরিয়া, ঠোঁটে মৃদুহাসি টানিয়া, ভ্রূ-কুঁচকাইয়া কত রকমের দেখিবার সে ভঙ্গী! কে জানে, হয়ত সে ব্যাকুল আগ্রহে এ বাড়ীতে প্রথম পদার্পণের দিনটির লাবণ্য লালিত্যকে ওই শুষ্কশীর্ণ কুৎসিত প্রায় দেহের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছিল। কিন্তু গতদিন ফিরিয়া আসেনা এ নিষ্ঠুর সত্যকে জানিয়াও—ও যেন ভুলিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। কপোলে সে আরক্তিম আভা কই? কোথায় বঙ্কিম ভ্রূ-বিলাস, অধরের সুষ্ঠু ভঙ্গী! বহুক্ষণ পরে সে আয়নার সম্মুখ হইতে নামিয়া আসিল। মুখের হাসি মিলাইয়াছে, চক্ষের দীপ্তি নিবিয়াছে,

ব্যর্থচেষ্টার অবসাদে সারাদেহ মাতালের মত টলিতেছে। দেখিয়া মনে হইল, অশ্রুবন্যায় ও যেন এখনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে!

সারা দুপুর ধরিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৌটি বিগত সৌন্দর্য্য সাধনায় মন-প্রাণ ঢালিয়া ছিল। কিন্তু অনাদরে অভিমানে যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহাকে ফিরাইবে কে? রাত্রিতে সুরমা বলিল, "ওগো, তুমি ঠিকই ব'লেছিলে। শাশুড়ীর মারে ও কোনদিন কাঁদেনা। আজ ওর বর ওকে বকেছিল—লাথিও মেরেছিল। বিকেল বেলায় ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ওর শাশুড়ী হাসতে হাসতে পাড়ার লোককে শোনালেন। ওর বর নাকি ব'লেছিল, 'দূর হ'য়ে যা জলার পেত্নী—অলক্ষী কোথাকার!' আহা!"

বছর দুই পূর্ব্বে ওই দখিনদুয়ারী ঘরটায় বসন্ত সমারোহের আর অন্ত ছিলনা। রূপসী নববধূ—পিপাসী নববর। ভালবাসা তখন ছিলনা, সত্যই ছিলনা। তবুও নির্ঝরিণী কলরোলের মত সেই ক্লান্তিহীন সুমিষ্ট শব্দঝঙ্কার আজও আমার কাণে আসিয়া বাজিতেছে। ভালবাসাকে লইয়া সেই সুকোমল মুহূর্ত্তগুলির চঞ্চলতা। করে কর, অধরে অধর, নয়নে নয়ন, হাসিতে হাসি সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সৌন্দর্য্য পান; তরুণ মনের প্রচণ্ড পিপাসা তৃপ্তির কি যে সুন্দর আয়োজন! ভালবাসা হয়ত সেই রূপের মধ্যে, শব্দের আশ্রয়ে, গন্ধের বিকাশে প্রাণের সূক্ষ্ম তন্ত্রী দিয়া কোন এক সময়ে শিরায় শিরায় রক্ত কণিকার সঙ্গে মিশিয়া যায়! তারপর, স্বপ্ন টুটিয়া—উদ্দামতা কাটাইয়া যে ভালবাসা যেদিন স্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যেদিন বাহিরের রূপধারায় আর সে বাঁধা থাকে না। যেদিন অন্তরে অন্তরে তার মায়াজাল সম্প্রসারিত হয়। সেদিন, সুন্দর অসুন্দরের প্রশ্ন মনকে পীড়া দেয় না,ক্রটি বিচ্যুতি ও কর্কশ হইয়া দৃষ্টিপথে বাধা জন্মায় না। সেদিন,—জীর্ণ ম্লান কুয়াশা মণ্ডিত প্রকৃতির মাঝে—প্রকৃতির পরাজয়।

বৌ টির দুঃখ এখন বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি ওর সারা দুপুরের সামঞ্জস্য হীন আচরণের ক্ষুধা। স্বামীর অবহেলাও সহিতে পারে নাই। হয়ত বা সেই অতীত ভালবাসার অবমাননায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ভালবাসা ওর বাসনার মধ্য দিয়া শীর্ণ দেহের নীল শিরায় সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। ভালবাসাকে ফিরাইবার জন্য সারা দুপুরের ব্যর্থ প্রয়াসে ও তাই মগ্ন হইয়াছিল।

সেইদিন হইতে বৌ-টি উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।—পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও ফিরাইবেই;—দেহের লাবণ্য, মুখের হাসি, অঙ্গের মনোরম ভঙ্গী। সকাল, বিকাল, দুপুর—এমন কি রাত্রিতেও চুরি করিয়া সে দুধ, সর, ফল, মিষ্ট যাহা কিছু সংগ্রহ করে —ছাদে আসিয়া খায়। দুপুরে ঘরে খিল আঁটিয়া গহনা, কাপড়, ক্রীম, পাউডার লইয়া শীর্ণ অঙ্গ সাজায়; আর্শীর সামে দাঁড়াইয়া কত রকমে আপনাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে,—শেষে মুখ ম্লান করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। ওর ক্ষুধাতুর জল্‌জ্বলে চোখ দুটোর পানে চাহিয়া ভয়ে আমরা কাঁপিয়া উঠি। ঘৃণা অবহেলার রুক্ষতায়—দিন দিন সে মুখে এমন কদর্য্যতা ফুটিয়া উঠিতেছে যে, দেখিলেই শিহরিয়া উঠিতে হয়। অথচ সে মুখ···অষ্টাদশ বর্ষীয়া সৌন্দর্য্যময়ী তরুণীর।

সেদিন, বোধ হয় দুয়ারের খিল বন্ধ করে নাই। ছোট টুলটির উপর দাঁড়াইয়া—এক গা গহনা পরিয়া—আর্শীর পানে চাহিয়াছিল। চাহিতে চাহিতে হঠাৎ দুর্ব্বল শরীর টলিয়া উঠিল; মাথা ঘুরিয়া বৌটি পড়িয়া গেল।বৌ টি ভয়ে কাঁদিয়া তাড়াতাড়ি টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডুর কপাল কাটিয়া লাল রক্ত গড়াইতেছে। দামী বেনারসী শাড়ীখানার অনেকখানি সেই রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের কোণেও অশ্রু, না, শোণিত? এত রক্তও ওই শীর্ণ দেহে ছিল। সৌন্দর্য্য সাধনার জন্য কত দীর্ঘ দিন ধরিয়া উঞ্ছবৃত্তি করিয়া ওই লাল বিন্দুগুলিকে সঞ্চয় করিয়াছিল, আজ নিমেষের অসাবধানতায় ধারাকারে তা বাহির হইয়া গেল।

বৌ-টি ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।—যন্ত্রণায় নহে, পীড়নের ভয়েও নহে—আশা-ভঙ্গের হতাশ্বাসে।

সাড়া পাইয়া শাশুড়ী ছুটিয়া আসিলেন—আরও অনেকে আসিল। কিন্তু জীবন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া নিজের চরম-লাঞ্ছনায় যে মাটীতে মিশাইয়া গেল, তাহাকে শাস্তি দিতে নিষ্ঠুরতম নির্য্যাতন আর কি আছে?

আর বৌ টিকে ছাদে দেখি না, জানালাতেও আসিয়া দাঁড়ায় না। দ্বিপ্রহরের অলস আকাশ পরম আলস্যভরে প্রিয় সঙ্গিনীকে খুঁজিতে ছাদের কোণ ঘেঁষিয়া পড়িয়া থাকে। রৌদ্রে কাজল শুকায়, ট্যাঙ্কের জলধারাও ছড়্ ছড়্ করিয়া পড়ে; কিন্তু চিলে-কোঠার ছায়ায়—ভীরু লুব্ধা মেয়েটি আঁচলে খাবার ঢাকিয়া নিঃশব্দ পদে আর আসিয়া দাঁড়ায় না।

দ্বিতলের জানালাটা খোলা থাকে,—দক্ষিণের হাওয়া ঘরে বয়। যাঁরা সে ঘরে আসেন—অতি সন্তর্পণে, আবার তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া যান। বৌ-টির সৌন্দর্য্য-সাধনা শেষ হইয়াছে। স্বাস্থ্যলাভের তপস্যায় ও আর অবসন্ন দেহ মনকে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে না। ছাদের উপর যে আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্থির হইয়া থাকে—তারই কোলে এতটুকু ঠাঁই পাইবার জন্য ওই লোভাতুরা ফুলশয্যার খাট-খানিতে শুইয়া আজ তপস্যা করিতেছে। ওর ওই দুর্দ্দমনীয় লোভকে ঠেকাইতে—মাটী মার সমস্ত বন্ধন—সমস্ত মায়াই আজ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বুঝি!



সাময়িকী

বাঙ্গলার আয় ব্যয়—

কয়েক দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজস্ব-সচিব অনারেবল মিঃ এ, মার ১৯৩২-৩৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। বাজেট উপস্থিত করিয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার উপক্রমণিকায় মিঃ মার নৈরাশ্যের গীতি গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আমার পক্ষে বাজেট উপস্থিত করা চিরদিনই একটা দুঃখজনক কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এবারকার দুঃখই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। কাজেই কি কি কারণে এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমি এবার এই পরিষদের সদস্যদের মনে ভীতি সঞ্চার করিতে ইচ্ছা করি না।"

অতঃপর মিঃ মার ১৯৩০-৩১, ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৩২-৩৩ সালের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেন। তাহাতে দেখা যায় ১৯৩২ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় ২,১০,৯৪,০০০৲ বেশী হইবে।

গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণ

এই ঘাট্‌তি পূরণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মোট ২,১০,৯৪,০০০৲ টাকা ধার লওয়া হইবে। এই ধার বার্ষিক ১৪,৩৩,০০০৲ টাকা করিয়া আগামী ৫০ বৎসরে পরিশোধ করা হইবে।

১৯৩২-৩৩ সালের আনুমানিক আয় ধরা হইয়াছে, ৯,৪৯,৮৬,০০০৲ টাকা এবং আনুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছে ১১,১২,৯৮,০০০৲ টাকা।

১৯৩১-৩২ সালে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হইবে মোট ১১,১৩,৮৯,০০০৲ টাকা। ১৯৩২-৩৩ সালের ব্যয় ইহা অপেক্ষা মাত্র ৯১,০০০৲ টাকা কম হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

রাজস্ব সচিব ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বেতন হ্রাস করা হইয়াছে এবং শাসন কার্য্যের ব্যয়ও সঙ্কোচের চেষ্টা করা হইতেছে। তথাপি ব্যয় সঙ্কোচের পরিমাণ এত কম হইল কেন, এ কথা সদস্যগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।—ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই, ১৯৩১-৩২ সালে বেতন হ্রাসের দ্বারা ৯,১০,০০০৲ টাকা বাঁচিবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৩২-৩৩ সালে এই বাবদ ৩৬,৯৮,০০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

মোটের উপর ১৯৩২-৩৩ সালে বেতন হ্রাসের দ্বারা ২৭,৮৮,০০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। ভ্রমণ ব্যয় ও ভাতা ইত্যাদি হ্রাস করা হইয়াছে। ইহার ফলে আরও ১,৫৪,০০০৲ টাকা বাঁচিবে বলিয়া আশা করা যায়। মোট ২৯,৪২,০০০৲ টাকা বাঁচিবে।

কিন্তু জেল, পুলিশ, আদালত ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত ৩৩,১৭,০০০৲ টাকা বরাদ্দ করিতে হইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে এই বিষয়ে ২১,৫৪,০০০৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার প্রায় সমস্তই এই বিষয়ে ব্যয় হইয়া যাইবে। তথাপি রাজস্ব-সচিব আশা করেন যে, ব্যয়সঙ্কোচের টাকা হইতে অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধলক্ষ টাকা থাকিবে।

১৯৩২-৩৩ সালের ঘাট্‌তি

১৯৩২-৩৩ সালের শেষে গবর্ণমেণ্টের ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,৬৩,২৯,০০০৲ টাকা। মিঃ এ, মার বলিয়াছেন, যদি অস্বাভাবিক ব্যয় বন্ধ হয় এবং দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতি হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার আয় বাড়িবে এবং ব্যয় কমিবে। এই অবস্থায় ১৯৩২-৩৩ সালের শেষে ঘাটতির পরিমাণ হয় ত এত বেশী থাকিবে না। যদি ১,৬৩,২৯,০০০৲ টাকাই ঘাটতি পড়ে তাহা হইলে আবার ভারত সরকারের নিকট হইতে ঋণ করিয়া আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে হইবে এবং এই ঋণ পরিশোধের জন্য বার্ষিক ১১,০৯,০০০৲ টাকা করিয়া ভারত সরকারকে ৫০ বৎসর দিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে বার্ষিক ১৪,৩৩০০০৲ টাকা + ১১,০৯,০০০৲ টাকা—মোট ২৫,৪২,০০০৲ টাকা করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

রাজস্ব-সচিব এবার নূতন কোন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করেন নাই; ঋণ করিয়া ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেসন—

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেসন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে :—

যে যে সর্ত্তের অধীনে রেজেষ্ট্রীকৃত সংবাদপত্র সমূহ অল্পমূল্যের ডাক টিকিটে ভারতের ডাকঘর সমূহে প্রেরিত হইয়া থাকে, ঐ সকল সর্ত্তের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ১৯৩২ অব্দের আগামী ১লা এপ্রিল হইতে সংস্কৃত সর্ত্তগুলি প্রযুক্ত হইবে।

নূতন বিভাগের কয়েকটি প্রধান সর্ত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। প্রচলিত সংবাদপত্র সমূহের রেজিষ্ট্রেশন ১৯৩২ অব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে। তৎপরে পুনরায় রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে।

২। যে সকল সংবাদপত্র ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল বা তৎপূর্ব্বে প্রথম রেজেষ্ট্রী হইবে, ঐ সকল সংবাদপত্র যে অব্দে রেজেষ্ট্রী হইবে, ঐ অব্দের শেষকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিবে। তৎপরে নূতন অব্দে পুনরায় রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে।

৩। রেজেষ্ট্রীকালের মিয়াদ অতীত হইবার এক মাস কাল পূর্ব্বে সংবাদপত্র সমূহের ম্যানেজার বা প্রকাশককে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বা কেন্দ্র বিশেষের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট পুনরায় রেজেষ্ট্রী করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া নোটীশ দিতে হইবে। রেজিষ্ট্রেশন পুনরায় লইতে হইলে কোন ফি দিতে হইবে না।

৪। রেজিষ্ট্রেশন প্রার্থনার নোটীশের সহিত অন্ততঃ ৫০জন গ্রাহকের নাম সম্বলিত এক তালিকা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) যদি এমন দেখা যায় যে কোন রেজেষ্ট্রীকৃত সংবাদপত্র ন্যূন মূল্যের টিকেট লাগাইয়া ডাকে দিয়াছে অথবা যদি রেজিষ্ট্রেশনের কোন বিধান ভঙ্গ হয় তাহা হইলে ঐ সংবাদপত্র ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি এইপ্রকার কোন বিধানের লঙ্ঘন পথিমধ্যে বা ডেলিভারী আফিসে ধরা পড়ে তাহা হইলে উহা বুক প্যাকেটরূপে গণ্য করা হইবে এবং বুক-প্যাকেটের হার অনুসারে ন্যূন টিকেটের মূল্য দ্বিগুণ করিয়া আদায় করা হইবে। কোন সংবাদ-পত্রের ভিতরে যদি নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্বলিত কোন ক্রোড়পত্র ভরিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ সংবাদপত্র বুক-প্যাকেট-রূপে পরিগণিত হইবে—

(১) কোন বিজ্ঞাপনদাতার জন্য মুদ্রিত বিজ্ঞাপনপত্র যাহা সংবাদপত্রের সহিত পাঠাইবার জন্য সংবাদপত্রে প্রেরিত হইবে।

(২) কোন বিজ্ঞাপনপত্র যাহাতে দরখাস্তের, প্রোপোসালের বা জিজ্ঞাসাবোধক ফরম থাকিবে।

(৩) কোন মুদ্রিত পত্র যাহাতে গ্রাহকের নিকট প্রেরকের ব্যক্তিগত পত্র বুঝাইবে, যেমন মুদ্রিত সার্কিউলার বা পত্র।

রেজেষ্ট্রীকৃত সংবাদপত্র প্রেরণ সম্বন্ধে প্রচলিত সর্ত্তগুলিরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

ডাক বিভাগ ১৯৩০-৩১—

ভারতীয় ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের—১৯৩০-৩১ সালের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। ডাক বিভাগে ক্ষতির পরিমাণ এ বছর ৬২ লক্ষ ৯ হাজার ২১২ টাকা। আগের বছর ক্ষতি হয়েছিল ২১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৩৩ টাকা। টেলিগ্রাফ বিভাগে এ বছর ক্ষতি হয়েছে ৬১ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৩৪ টাকা। টেলিফোন ও রেডিও বিভাগের ক্ষতি এবার ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩০৮ টাকা। গত বছর এই বিভাগে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৩১ টাকা। সমস্ত বছরে ১২৯ কোটি ৪৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩৫১টি চিঠিপত্র ডাক বিভাগ ডেলিভারী করেছে, আগের বছর ৯ কোটি ২০ লক্ষ চিঠিপত্র ডেলিভারী বেশী হয়েছিল। সংবাদপত্রের প্যাকেট আলোচ্য বছর কমেছে ৮৫ লক্ষ। প্রেস অর্ডিন্যান্সের ফলে গত বছর অনেক কাগজ বন্ধ হয়েছিল, এই কারণে বোধ হয় অনেক পত্রিকা প্যাকেটে কমেছে। আলোচ্য বছর পোষ্টকার্ডের ব্যবহার কমেছে প্রায় ৬০ লক্ষের উপর—অ-রেজেষ্ট্রী চিঠি কমেছে প্রায় কোটি ২০ লক্ষের উপর। মণিঅর্ডার সংখ্যায় শতকরা প্রায় ৪ ভাগ ও টাকার পরিমাণে শতকরা ৮৷৷০ ভাগ কমেছে।

স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মিত্র—(১৮৯৮—১৯৩২)

সুপ্রসিদ্ধ ভবানীপুর ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কোষাধ্যক্ষ এবং ইণ্ডিয়ান ম্যাচ্ ফ্যাক্টরির স্বত্বাধিকারী রবীন্দ্রনাথ মিত্র বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। খেলার মহলে বিলি মিত্রকে চিনিত না এমন খুব কম লোকই আছে। ভবানীপুর ক্লাব তাঁহারই যত্নে ও উৎসাহে ভারতবর্ষীয় ক্রীড়া সমিতিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

কোন্নগরের বিখ্যাত মিত্র বংশের জমিদার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের তিনি দ্বিতীয় সন্তান। বিশেষ কৃতিত্বের



স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মিত্র

সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম-এ পাস করিয়া তিনি তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ম্যাচ্ ফ্যাক্টরিতে তাঁহার সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করেন। তিনি কোন চাকরি গ্রহণ করেন নাই, কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য নিরাকরণ কেবল জাতীয় শিল্পের জাগরণ দ্বারাই হইতে পারে।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি বাগবাজারের খ্যাতনামা ৺নন্দলাল বসুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বটবিহারী বসুর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার কোন পুত্র-কন্যা নাই।

সমগ্র বাংলাদেশ শোক-নিবেদন করেছে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর প্রতিকৃতি ও জীবনী বাহির করে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী স্যার্ এন্, এন্, সরকারের সভাপতিত্বে এক সভায় তাঁহার জীবনী, আদর্শ, এবং কার্য্যাবলি বিশেষরূপে সমালোচিত হয়। আমরা শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প বিভাগ—

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প বিভাগ (Department of Industries) হইতে মধ্যে মধ্যে এক একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া থাকে। এই সকল পুস্তিকায় এই বিভাগের কর্ম্মীদের গবেষণা ও পরীক্ষার ফল এবং আরও নানা প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ হয়। এইগুলি Bulletin নামে অভিহিত। আমরা শেষ যে বুলেটিনখানি পাইয়াছি, তাহার সংখ্যা ৫১ ; অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে আরও পঞ্চাশখানি বাহির হইয়াছে। তাহার কতকগুলিও আমরা পাইয়াছি। ৫১ সংখ্যার পর যদি কোনখানি বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা এখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

৫১ সংখ্যক বুলেটিনের নাম The Refining of Cocoanut Oil বা নারিকেল তৈল শোধন করিবার পদ্ধতি। নারিকেল তৈল বঙ্গীয় মহিলারা মাথায় মাখিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে উহা রন্ধনার্থ এবং ভোজ্য রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাজারে নারিকেল তৈল যাহা পাওয়া যায়, এমন কি বিখ্যাত কোচিনের তৈল বলিয়া যাহা বিক্রীত হয় তাহাও বিশুদ্ধ নহে ; এবং তাহাতে একটা অপ্রিয় গন্ধ থাকে। সৌখিন পুরুষ ও মহিলারা নারিকেল তৈল রঞ্জিত করিয়া তাহাতে মাথাঘষা মশলা ও গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া কেশ তৈলরূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু উহার দুর্গন্ধ ও অবিশুদ্ধ অবস্থার দরুণ কেশতৈল হিসাবে এই তৈল তেমন সুবিধাজনক নহে। সেইজন্য মূল্যবান কেশতৈল প্রস্তুত করিতে জলপাইয়ের তৈল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য পুস্তিকার প্রণেতা ডাক্তার আর, এল, দত্ত ডি-এসসি এবং তাঁহার সহকারীরা এই পুস্তিকায় নারিকেল তৈল শোধনের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া নারিকেল

তৈলকে গন্ধ ও বর্ণহীন করিতে পারিলে কেশতৈল প্রস্তুত কার্য্যে নারিকেল তৈলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। তৈল ব্যবসায়ীদিগকে আমরা জিনিষটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পরামর্শ দিতেছি।

নদীর কথা—

সংবাদপত্রের সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সেটি—(১) এই নদীমাতৃক দেশে জলকষ্ট, এবং (২) অনাবৃষ্টি ও (৩) অতিবৃষ্টির ফলে শস্যহানি। আজ যদি সংবাদপত্রে পড়া গেল যে অনাবৃষ্টির ফলে অমুক স্থানে শস্য জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, তাহা হইলে, আগামী কল্য হয় ত পড়া যাইবে—অতিবৃষ্টির ফলে অমুক স্থানে শস্য হাজিয়া মজিয়া পচিয়া কৃষকের সর্ব্বনাশ ঘটাইল। তাহার উপর বৎসরের কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট মাস ধরিয়া জলাভাবে সাধারণের আর্ত্তনাদ শুনিতে সংবাদপত্রের পাঠক সাধারণ এমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে তাঁহারা আর উহাতে বিচলিত হন না। নিত্য ও নৈমিত্তিক এই সকল ব্যাপারের উপর কয়েক বৎসর অন্তর বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাওয়ার সংবাদও প্রায় অভ্যস্ত হইয়া আসিল। ১৩১৮-১৯ সালে দামোদরের বন্যায় বর্দ্ধমান ভাসিয়া গিয়া দেশময় হাহাকার উঠিল। মাত্র নয় বৎসর পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবনে কিছু কাল ধরিয়া জলমগ্ন হইয়া রহিল। তাহার পর গত বৎসরও আবার বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থল বন্যাপ্লাবিত হইয়া রহিল। বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে, অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে এরূপ দেশব্যাপী সর্ব্বনাশ কিরূপ সম্ভবপর হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

সুখের বিষয় সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের কৃপাদৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা এফ আর-এস মহাশয় এই বিষয়ে তাঁহার চিন্তা ও গবেষণার ফল একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার মহলানবিশ মহাশয়ের সঙ্কলিত (১৮৭০-১৯২২) প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী বাঙ্গলার বৃষ্টির পরিমাণ ও প্লাবনের হিসাব পর্য্যালোচনা করিয়া অধ্যাপক সাহা মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বঙ্গদেশের নদ-নদীগুলির গতি অতি পরিবর্ত্তনশীল। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে মেজর রেনেলের মানচিত্রে বাঙ্গলার নদ নদীগুলির অবস্থান যেরূপ ছিল, মাত্র সার্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে তাহার সমূহ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর, নদীর গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, সাধারণ স্বাস্থ্য, লোক সংখ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গলার নদনদীর অবস্থান যেরূপ ছিল, তাহাতে বৃষ্টির ও বন্যার জল বাঙ্গলা প্রদেশের সর্ব্বত্র যথোপযুক্ত অনুপাতে বিস্তৃত হইয়া পড়িত—দেশের কোন একটা অংশ জলপ্লাবনে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না। এবং সম্ভবতঃ এই কারণে তখন বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া এমন ব্যাপক ভাবে ছিল না।

এইরূপ অতিপ্লাবন এবং দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া নিবারণের পন্থা নির্দ্দেশেও অধ্যাপক সাহা মহাশয় বিরত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ১৭৮৭ সালের পূর্ব্বে নদনদীর অবস্থান যেরূপ ছিল, সেগুলিকে সেই পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিম্বা বাঙ্গলার দুইটী প্রধান নদীর জল এবং উত্তরবঙ্গের জলপ্রণালী যাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এটি অবশ্য বহুব্যয়সাধ্য এঞ্জিনীয়ারিং ব্যাপার; সুতরাং ইহা যে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায় না। তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, অর্থ সংস্থান করিতে পারিলে ব্যাপারটি যে অসম্ভব নহে, স্যার উইলিয়ম উইলকক্সের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা পাঠ করিলে এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা দেশের নদনদীর অবস্থা ও অবস্থান স্বয়ং পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া স্যার উইলিয়ম উইলকক্স এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভাগীরথী প্রভৃতি বড় বড় নদীগুলি স্বভাবজাত নহে উহারা মনুষ্য কর্ত্তৃক খাত এবং সেকালের ভারতীয় স্থপতির অসাধারণ এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধির পরিচায়ক। স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, স্থানান্তরে যাতায়াতের সুবিধা প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজন সাধনের জন্যই ঐ সকল প্রকাণ্ড নদী সেই সুদূর অতীত কালে

খাত হইয়াছিল। সেকালে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, একালে তাহা সম্ভব না হইবার কারণ দেখা যায় না।

অবশেষে অধ্যাপক সাহা মহাশয় বলিয়াছেন—"আমার মনে হয় যে, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত প্রাথমিক তদন্ত করিয়া উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে বাঙ্গলার জনসাধারণের পক্ষে কোন ব্যয়বহুল পরিকল্পনাতে রাজী হওয়া উচিত নহে। নিম্নলিখিত ভাবে তদন্ত করিতে হইবে :—

(১) বাঙ্গলা দেশের নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য গবেষণার্থ একটী হাইড্রলিক রিসার্স লেবরেটারি স্থাপন।

(২) অধ্যাপক মহলানবিশের গবেষণা আরও চালাইবার জন্য একটী সংখ্যাসংগ্রহ বিভাগ (Statistical department) গঠন।

(৩) বাঙ্গালার জলপথ সম্বন্ধে আধুনিক উপায়ে জরীপ (hydrographic survey)।"

সাহিত্য-সংবাদ

—নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী—

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "তারপর" মূল্য—২৲

শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "বেদুইন" ; মূল্য—১৲

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত নাটক "জগন্নাথ"—১৲

শ্রীদিলীপকুমার রায়, বীরবল ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সঙ্কলিত "পত্রাবলী ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান"—১৲

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত "ভারতলক্ষ্মী"—১।•

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সাহিত্য-ভারতী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "প্রভাতী"—১৲

ডাক্তার শ্রীচণ্ডীচরণ পাল বিরচিত "মেয়েদের সাংখ্য"—৸•

শ্রীনীহারবালা দেবী প্রণীত উপন্যাস "দেশের ডাক"—১৲

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত গল্প পুস্তক "সনাতনী"—১৷•

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "চেনা ও জানা" মূল্য—২৲

অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ প্রণীত "আমি ও আমার দেহ"—১।•

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাস মালার ত্রৈমাসিক সংস্করণ যণ্ডামার্কের দপ্তরের চতুর্থ গ্রন্থ "সঙ্কট দ্বীপ"—১৷৶

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত "কামরূপ সাধনাবলী" মূল্য—৬৲

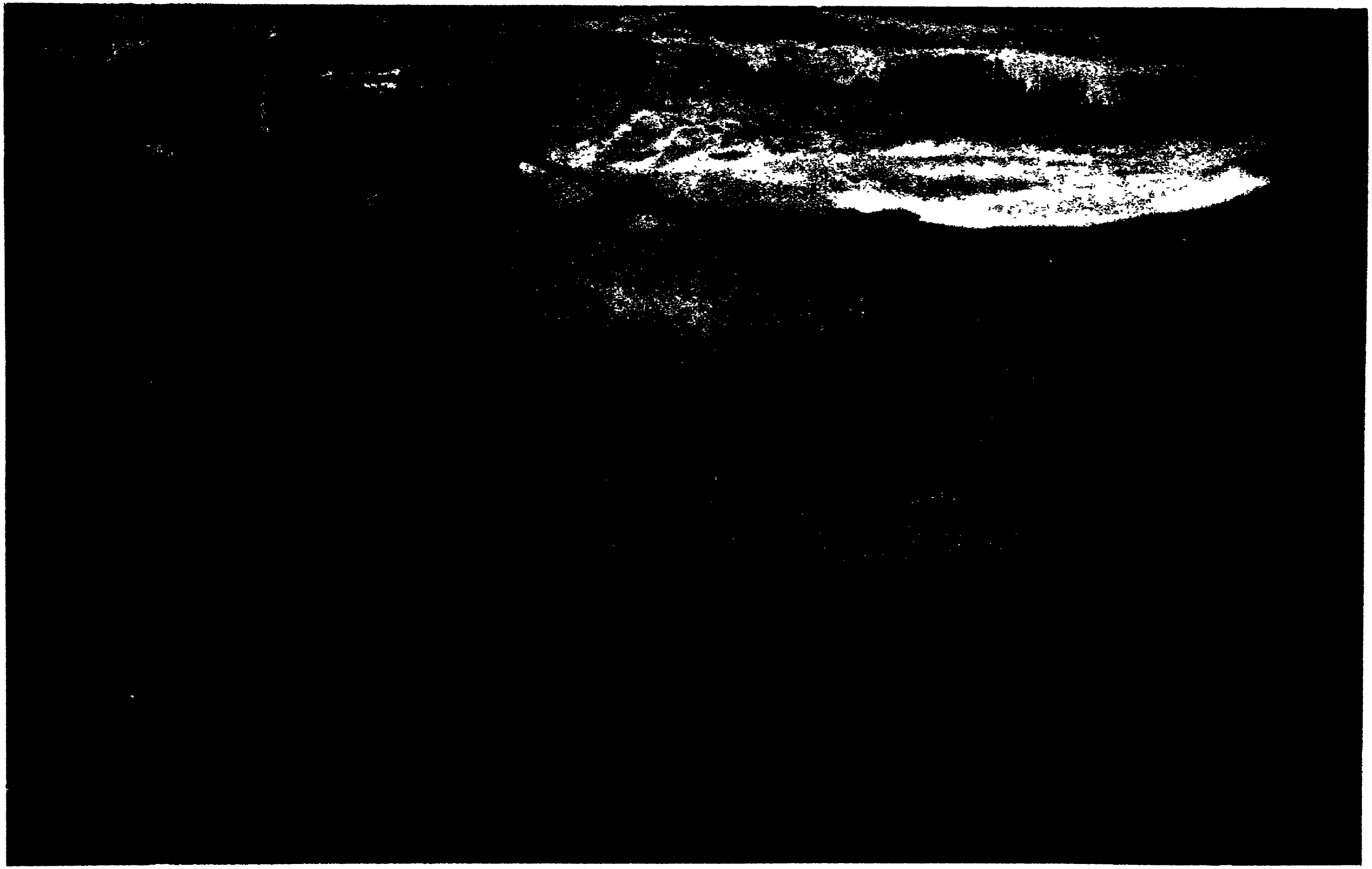
ফাল্গুনের ভারতবর্ষে "ভারতে যাদব বংশ" প্রবন্ধের ভ্রম-সংশোধন

পৃ:	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৩৭১	২৭	আমর্ত্ত	আনর্ত্ত
"	২৮	সোম দ্বীপের	কোন দ্বীপের
"	২৯	সোম রাজার	কোন রাজার
৩৭২	দ্বিতীয় ব্লকের নাম	জুনা গড়ে উপরকোট দুর্গ	জুনাগড়ে উপরকোট দুর্গ হইতে রৈবতকের দৃশ্য

পৃ:	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭৩	"	উপরকোট হইতে রৈবতকের দৃশ্য	জুনাগড়ে উপরকোট দুর্গ
"	৩৫	রাখিগ্না	রাখিয়া
৩৭৬	৯	কুলস্থলী	কুশস্থলী
৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩		রুদ্রদাস ও জয়দাস সর্ব্বত্র রুদ্রদাম ও জয়দাম হইবে।	

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJAE.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.



দিনের শেষ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works



বৈশাখ—১৩৩৯

দ্বিতীয় খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ { পঞ্চম সংখ্যা

গীতার পরিচয়

শ্রীবীরেশ্বর সেন

প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে গীতা অধ্যয়ন করিলে যেরূপ আধ্যাত্মিক উপকার হয়, গীতার পরিচয় পাইবার জন্য, অর্থাৎ কোন্ দেশের কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে গীতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য, পরিশ্রম করিলে সেরূপ উপকার কখনই পাওয়া যায় না। কিন্তু তথাপি এরূপ পরিচয় জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। ম্যাক্‌বেথ, হ্যাম্‌লেট প্রভৃতি নাটক বেকন প্রণীত, না সেক্‌স্‌পীয়ার প্রণীত, ইহা লইয়া এখনও বাদানুবাদ চলিতেছে। এই সকল নাটক এবং গীতা প্রত্যেকেই পৃথিবীর এক-একটী মহামূল্য সম্পত্তি। এই সম্পত্তি যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নির্ম্মাণের যশ কেবল তাঁহারই প্রাপ্য—অন্যের প্রাপ্য নহে। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দিবার ইচ্ছাই এই সকল বাদানুবাদের মূলে অবস্থিত। আমি এই ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই গীতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গীতা যে ব্যাসেতর কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, প্রথমেই প্রদর্শন করিতে হইবে যে, ইহা মহাভারতের একটা প্রক্ষিপ্ত অংশ মাত্র।

এই জন্য এই প্রবন্ধে আমার প্রথম উপপাদ্য হইবে যে গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; এবং ইহা মহাভারতের

প্রকৃত অংশ নহে, এবং হইতে পারে না। আমার দ্বিতীয় উপপাদ্য এই হইবে যে, গীতার রচয়িতা ছিলেন একজন বাঙ্গালী। আমার তৃতীয় উপপাদ্য এই হইবে যে, গীতাকারের নাম ছিল পদ্মনাভ দত্ত। এই প্রবন্ধে কোন অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করা যাইবে না।

প্রথম উপপাদ্য—গীতার প্রক্ষিপ্ততা

আমাদের দেশে সাধারণ বিশ্বাস এই যে, গীতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের অংশ। এই বিশ্বাসের প্রকার-ভেদ আছে। এক শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসের পরিধি বড়ই ব্যাপক। তাঁহাদের মত এই যে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সত্য-সত্যই উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া গীতায় বর্ণিত কথোপকথন করিয়া তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইহাও বিশ্বাস যে, গীতায় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উক্তি বলিয়া যে সকল শ্লোক আছে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ঠিক্ ঠিক্ সেই শ্লোকেই কথোপকথন করিয়াছিলেন। এবং যদিও পরে অনুগীতার আরম্ভে উক্ত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই সেই কথোপকথন বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এবং ব্যাসই সেই কথোপকথন যোগবলে বা ধ্যানে অবগত হইয়া ভীষ্মপর্ব্বে লিখিয়াছেন। এই মতবাদীদের মত পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আমি কোন চেষ্টা করা উচিত মনে করি না। কেন না এরূপ মতবাদ অলৌকিক ঘটনার প্রতি আস্থা স্থাপনের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

আর একটী মতবাদে আপাত দৃষ্টিতে কোন অসম্ভব কথা নাই। তাহা এই যে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গীতোক্ত কথা বলুন বা নাই বলুন, মহাভারতকার নিজের ফিলসফি (Philosophy) কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথনচ্ছলে মহাভারতের মধ্যে লিখিয়াছেন। বাল গঙ্গাধর তিলক বলেন যে, মহাভারতের ঠিক যে অংশের পরে গীতার আরম্ভ হইয়াছে, সেই অংশের সহিত গীতার আরম্ভের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। তিলকের এই কথা সত্য হইলে কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিত না যে গীতা প্রক্ষিপ্ত। অতএব তিলকের উক্তিটা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে গীতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মটা পাঠকের জানা উচিত। তাহা এই যে—

গীতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মৎপক্ষীয় এবং পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা সমবেত হইয়া কি করিলেন? (গীতার প্রথম শ্লোকের অবিকল অনুবাদ)

সঞ্জয় বলিলেন, দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সৈন্য ব্যূহিত দেখিয়া দ্রোণকে নিজ পক্ষের এবং পাণ্ডব পক্ষের প্রধান প্রধান সেনানীর পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, আমরা যেন ভীষ্মকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হই। ইহা শুনিয়া ভীষ্ম আহ্লাদিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। সেই ধ্বনি শুনিয়া কুরু পাণ্ডব উভয় পক্ষের সেনানীগণও নিজ নিজ শঙ্খ বাজাইলেন। তাহার পর অর্জ্জুন উভয় সেনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্বীয় রথ লইয়া যাইতে কৃষ্ণকে বলিলেন। কৃষ্ণ সেই আদেশ পালন করিলেন। অর্জ্জুন উভয় পক্ষেই আত্মীয়, বন্ধু, গুরুজন দেখিয়া বলিলেন যে, আমি যুদ্ধ করিব না। কৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। কথায় কথায় মানুষের শারীরিক মানসিক, আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যের কথা উঠিল। কৃষ্ণ সকল বিষয়েই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন এবং অবশেষে অর্জ্জুনের ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। এই সমস্ত কথা ভীষ্মপর্ব্বের ২৫ হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত ১৮ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে, ২৫ তম অধ্যায়ের প্রথম কথার সহিত ২৪ তম অধ্যায়ের শেষভাগের বা অন্য কোন ভাগের ধারাবাহিকতা আছে কি না। ইহা দেখাইতে হইলে ভীষ্মপর্ব্বের প্রথম হইতে ২৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত মহাভারতকার কিরূপ ধারা বা ক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে প্রথমে এই ২৪ অধ্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১। প্রথম অধ্যায়ে জনমেজয় প্রশ্ন করিলেন, কৌরব-পাণ্ডব, সোমক প্রভৃতি কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? উত্তরে বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডবেরা পশ্চিমভাগে এবং কৌরবেরা পূর্ব্বভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়া প্রথমে যুদ্ধের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন।

২। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাস সঞ্জয়কে যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্যক্

রূপে ধৃতরাষ্ট্রের গোচর করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। এই অধ্যায়ের সমস্তটাই বৈশম্পায়নের উক্তি।

৩। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাস যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সকল নিমিত্ত দর্শন করিয়াছিলেন, বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে তাহা শুনাইলেন।

৪। চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন পৃথিবীর যত দেশ হইতে পাণ্ডবেরা সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন সঞ্জয়কে সেই সকল দেশের বর্ণনা করিতে বলিলেন। সঞ্জয় পৃথিবীর জীবজন্তু মোটামুটি কি কি রূপে বিভক্ত তাহা বলিলেন।

৫।৬।৭। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র পৃথিবীর নদী পর্ব্বত জনপদ প্রভৃতির নাম ও প্রমাণ জানিতে চাহিলেন। সঞ্জয় জম্বুদ্বীপের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন।

৮। অষ্টম অধ্যায়ে সুমেরু ও হিমালয়ের কথা বলিতে বলিতে সঞ্জয় এমন একটী দেশের কথা বলিলেন যেখানে মানুষ মরিলে ভারুণ্ড নামক এক পক্ষী সেই ব্যক্তির শব ভক্ষণ করে। (এই বিবরণে পারসীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধ্বনি আছে।)

৯। নবম অধ্যায়ে যে ভারতবর্ষের প্রতি লুব্ধ হইয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ধৃতরাষ্ট্র সেই ভারতবর্ষের কথা জানিতে চাহিলেন।

১০,১১। দশম ও একাদশ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে ভারতবর্ষ, জম্বুদ্বীপ, শকদ্বীপ প্রভৃতি আরও কয়েকটী দেশের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেগুলির কথাও সঞ্জয় বলিলেন।

১২। দ্বাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয় বলিতে বলিতে এমন একটা জনপদের উল্লেখ করিলেন, যেখানে সর্ব্বলোকেশ্বর ভগবান দণ্ড ধারণ করিয়া দেশ রক্ষা করেন। (ইহা য়িহুদিদিগের দেবতন্ত্র Jewish Theocracy হইতে পারে।)

১৩। ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে ভীষ্মপর্ব্ব প্রকৃত আরম্ভ হইয়াছে। ইহা যেন আরিষ্টটল (Aristotle) নামক গ্রীক পণ্ডিতের বিধান অনুসারে ঘটনার মধ্য স্থান হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। কেন না তিনি বলিয়াছেন যে মহাকাব্য রচনা করিতে হইলে ঘটনার মধ্য স্থান হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এই অধ্যায়ে প্রথমেই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—মহারাজ পঞ্চালপুত্রের হাতে অস্ত্র ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন। (এই অধ্যায়ে এবং পরবর্ত্তী কয়েক স্থানে পাঠক দেখিবেন যে সঞ্জয় বলিতেছেন যে তিনি স্বচক্ষে এই যুদ্ধ দর্শন করিয়াছিলেন। দিব্য-চক্ষুর কোন কথা নাই।)

১৪,১৫। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের মর্ম্ম এই যে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এত বড় বীর ভীষ্মকে পাণ্ডবেরা কিরূপে নিহত করিল। সঞ্জয় বলিলেন—আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে রণে শিখণ্ডী ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়াছে।

১৬,১৭,১৮। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে কিরূপে যুদ্ধারম্ভ হইল সঞ্জয় তাহা বর্ণনা করিলেন। ভীষ্ম প্রথমে রাজাদিগকে এই বলিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে বলিলেন যে, যুদ্ধই স্বর্গগমনের দ্বার। তাহার পর ভীষ্মের মৃত্যুর পূর্ব্বে কিরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বর্ণনা।

১৯। উনবিংশ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা উত্তমরূপে ব্যূহিত দেখিয়াও এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যূহবেত্তা হইয়াও যুধিষ্ঠির কি সাহসে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ব্যূহ রচনা করিলেন? সঞ্জয় বলিলেন, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিলেন, বৃহস্পতি বলিয়াছেন শত্রুসৈন্য অপেক্ষা নিজ সৈন্য অল্প হইলে তাহাদিগকে বিস্তারিত করিয়া ও অধিক হইলে সংহত করিয়া সংগ্রাম করিবে, অতএব বৃহস্পতির বাক্য অনুসারে ব্যূহ রচনা কর। তাহার পর প্রভাতের পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

২০। বিংশ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রভাত হইলে কোন্ পক্ষের সেনা অধিকতর হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? সঞ্জয় কহিলেন, উভয় পক্ষের সেনাই সমভাবে হৃষ্টচিত্ত ছিল।

২১,২২। একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায়ে সঞ্জয় বলিলেন যুধিষ্ঠির ভীষ্ম-রচিত ব্যূহ দেখিয়া বড় দুর্ম্মনায়মান হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিব কি? অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে সাহস দিলেন। তখন যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্য ব্যূহিত করিলেন।

২৩। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে সঞ্জয় বলিলেন কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন দুর্গার স্তব করিলেন। (এই অধ্যায় যদিও প্রক্ষিপ্ত তথাপি পূর্ব্ব অধ্যায়ের সহিত ইহার অসঙ্গতি নাই।)

২৪। চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় জিজ্ঞাসা

করিলেন, কোন্ পক্ষের সেনা যুদ্ধের প্রাক্‌কালে অধিকতর হৃষ্টচিত্ত ছিল? সঞ্জয় পূর্ব্বের মতই বলিলেন, উভয়পক্ষীয় সেনাই সমান হৃষ্টচিত্ত হইয়া শঙ্খ ও ভেরী বাজাইয়া তুমুল নিনাদ করিতেছিল।

পাঠক দেখিবেন যে, কৌরবপক্ষ এবং পাণ্ডবপক্ষ যেরূপ যুদ্ধ করিতেছিলেন তাহার প্রত্যেক ছোট বড় বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে শুনিতেছেন। ১৩ হইতে ২৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত ১২ অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমন কি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কূটপ্রশ্ন অথবা জেরা করিয়া সম্পূর্ণ আনুপূর্ব্বিক ঘটনার আখ্যাপন জানিতেছিলেন। ইহার পরেও যে তিনি সঞ্জয়কে আবার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবেন যে, আমার পক্ষীয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় যুদ্ধার্থীরা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল? ইহা হইতেই পারে না। এই প্রশ্নের সহিত পূর্ব্বাধ্যায় অর্থাৎ ২৪ অধ্যায়ের শেষ অংশের বা অন্য কোন অংশের অথবা ভীষ্মপর্ব্বের অন্য কোন অংশের কোনপ্রকার সম্বন্ধ বা ধারাবাহিকতা নাই। এই অধ্যায়ে অর্থাৎ গীতার অব্যবহিত পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, কৌরবপক্ষীয়েরা শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ করিয়া ভীষণ কোলাহল করিতেছিলেন। এবং গীতার অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অর্থাৎ ভীষ্মপর্ব্বের ৪৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে সেই সময়ে যুদ্ধের স্থানে অর্জ্জুনকে দেখিয়া তাঁহারা আরও অধিক কোলাহল আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ২৪তম অধ্যায়টাই দুইভাগে ভাগ করিয়া মধ্য স্থানে এই নাতিক্ষুদ্র কাব্য গীতা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভীষ্মপর্ব্বের ৪র্থ হইতে ২৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রত্যেক অধ্যায়ই খুব দীর্ঘ। তাহার পর ২৪তম অধ্যায় হ্রস্ব। এই অধ্যায়ের সহিত গীতার অব্যবহিত পরবর্ত্তী হ্রস্ব অধ্যায়ের সঙ্গতি আছে। ইহা হইতেও বোধ হয় যে ২৪তম অধ্যায়ও পূর্ব্বে দীর্ঘ ছিল। তাহা দুই ভাগ করিয়া মধ্যস্থলে গীতার স্থান করা হইয়াছে।

গীতা যে মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ, তাহা মহাভারতের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে প্রদর্শিত হইল। সুতরাং গীতা যে authentic নহে অর্থাৎ গীতাকার এবং মহাভারতকার যে একই ব্যক্তি নহেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গীতা genuine বা ঐতিহাসিকও নহে।

তিলকের আরও দুইটী যুক্তির কথা মনে হইতেছে। একটী এই যে, গীতার ভাষা এবং মহাভারতের ভাষা একই রূপ; অতএব উভয় গ্রন্থের কর্ত্তা এক। এই কথার সত্যতা এই পর্য্যন্ত যে উভয়েরই ভাষা সংস্কৃত। কেহ যদি মহাভারতের যে কোন স্থল হইতে আঠার অধ্যায় লইয়া গীতার আঠার অধ্যায়ের সহিত মিলাইয়া ভাষার তুলনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, গীতাতে আঠার অধ্যায়ে যেমন নানাপ্রকার ছন্দের শ্লোক আছে মহাভারতে তাহা নাই। গীতায় যেরূপ অনেক অপাণিনীয় প্রয়োগ আছে মহাভারতে তাহাও নাই। সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভাষার সাদৃশ্য নাই।

তিলকের আর একটা কথা এই যে গীতায় মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ আছে, যাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে যুদ্ধের বর্ণনা করিতে করিতেই গীতা রচিত হইয়াছিল; সুতরাং গীতাও ঐতিহাসিক। এই যুক্তিটাও আমার নিতান্ত হেত্বাভাস বলিয়া বোধ হয়। এই যুক্তি অনুসারে বত্রিশ সিংহাসন ও মেঘদূতকেও ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে; কেন না, বত্রিশ সিংহাসনে পুনঃপুন বিক্রমাদিত্যের এবং মেঘদূতে পুনঃপুন যক্ষের প্রতি কুবেরের অভিশাপের উল্লেখ আছে।

এখন আমরা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব যে গীতাকার ছিলেন একজন বাঙ্গালী; সুতরাং ইহা সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হইবে যে মহাভারতকার যে পৃথকভাবে গীতা লিখিয়াছিলেন এরূপও হইতে পারে না।

দ্বিতীয় উপপাদ্য—গীতাকার বাঙ্গালী ছিলেন

গীতা অবশ্যই কোন না কোন ব্যক্তি কোন সময়ে লিখিয়াছিলেন। তিনি যে কোন্ সময়ে ছিলেন, তাহা যখন জানা যায় নাই, তখন কেহ যদি বলেন যে অমুক দেশের একজনই তৎপ্রণেতা ছিলেন, তাহা হইলে সেই উক্তিতে a-priory অসম্ভাবনা কিছুই থাকিতে পারে না। দেখিতে হইবে যে, যে দেশ গীতাকারের দেশ বলিয়া দাবী বা বিবেচনা করা হয়, সেই দেশের পক্ষে গীতাকারের মত লোকের উৎপাদন করিবার মত ক্ষমতা ছিল কি না। যে সকল গুণ থাকায় কোন দেশকে গীতাকারের জন্মস্থান বলিয়া মনে হইতে পারে সেই সকল গুণ যদি অন্য দেশেরও থাকে তাহা হইলে প্রমাণ হইল না যে অমুক দেশেই

গীতাকার জন্মিয়াছিলেন। যেমন হটেণ্টট্‌দিগের দেশে নেপোলিয়ানের মত যুদ্ধ-বীর এবং মহাবিদ্বান জন্মিতে পারে না, তেমনি ধাঙ্গড় বা সাঁওতালদিগের মধ্যেও গীতাকারের উদ্ভব হইতে পারে না।

যে দেশে সংস্কৃত বিদ্যার বহুল প্রচার এবং যে দেশে বিশেষরূপে কবিত্বের স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দেশেই গীতারূপ মহাকাব্যের উৎপত্তি সম্ভব। বঙ্গদেশে গুপ্তসম্রাটদিগের পূর্ব্ব হইতে অদ্যাপি সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন প্রভৃতরূপে হইয়া আসিতেছে, এবং কবিত্বে বাঙ্গালীদের কৃতিত্ব চিরদিনই আছে। বাঙ্গালী রঘুনন্দন সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। অন্ততঃ দুইখানি মহাপুরাণের প্রণেতা ছিলেন বাঙ্গালী ইহা "পুরাণ প্রসঙ্গ" লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রদর্শন করিয়াছেন। রামচরিত প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী বাঙ্গালী ছিলেন। মুগ্ধবোধকার বোপদেব বাঙ্গালী ছিলেন। ভাগবত পুরাণকারও একজন বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধি আছে। এ বিষয়ে প্রাচীন একটা শ্লোক আছে।

ভূয়ঃ কর্কশ শব্দাঢ্যা নৈষা রীতির্মহাত্মনাম্।
কৃতং বঙ্গদেশীয়েন ব্যাসতুল্যেন কেন চিৎ॥

অর্থাৎ ভাগবতে যেমন বড় বড় কঠিন শব্দ আছে সেরূপ শব্দ ব্যবহার করা ঋষিদিগের রীতি নহে—ব্যাসতুল্য কোন বাঙ্গালীই ইহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

জয়দেব বাঙ্গালী ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস বাঙ্গালী ছিলেন। সাহিত্যদর্পনকার বিশ্বনাথ, এবং শকুন্তলাকার কালিদাসও বাঙ্গালী বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

যে সকল কাব্যলেখক বাঙ্গালী বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, এবং যাঁহারা বাঙ্গালী বলিয়া সুপ্রমাণিত, তাঁহারা যে দেশে জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশে গীতাকার জন্মিতে পারেন, এ কথা শুনিয়া চমকিত হইবার কিছুই নাই।

একটু অবান্তরভাবে এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাঙ্গলায় কবির সংখ্যা যত অধিক, তেমন অন্য কোন প্রদেশে নহে। বাউল কবিগণের সংখ্যা বোধ হয় নির্ণীত হয় নাই। তাঁহাদের এবং চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, দাশরথি, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বহু বহু কবির অন্য কোন প্রদেশে তুলনা নাই। আমাদের দেশের অতি অশিক্ষিত লোকের রচিত সাধারণ গানেও কিছু না কিছু কবিত্ব আছে। অন্য প্রদেশের গানে ঝঙ্কার আছে কিন্তু কবিত্ব নাই বলিলেই হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও ইঙ্গিত করিয়াছেন। এমন কবিত্বময় দেশে গীতা রচিত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ধর্ম্মবিষয়ে নূতনত্ব। যে দেশে চৈতন্যদেব এবং তাঁহার শিষ্যগণ জন্মিয়াছিলেন; যে দেশে রামপ্রসাদ, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণমোহন, বাউল সম্প্রদায় জন্মিয়াছিলেন; সে দেশেই ত গীতাকারের মত নূতন মত প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হওয়া অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক সম্ভব।

গীতার নূতনত্বের কথা এইজন্য বলিলাম যে, গীতা একখানি গতানুগতিক গ্রন্থ নহে। ইহার বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহাতে অনেক নূতন মত সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণত ভারতবর্ষবাসীর এই মত যে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা দুইটী পৃথক বস্তু; কিন্তু ৺মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, গীতায় জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রভেদ স্বীকৃত হয় নাই। আবার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যদিও উপনিষদ্ গীতার মূল, এবং উপনিষদ্ হইতে গীতার উপাদান ভূরি পরিমাণে আহৃত হইয়াছে, তথাপি গীতাকার সর্ব্বস্থলে উপনিষদের মত অবিকল গ্রহণ করেন নাই। উপনিষদে আছে, যাহারা পুণ্যশীল তাহাদেরই আত্মা অমর; কিন্তু গীতাকার কৃষ্ণোক্তির ব্যপদেশে বলিয়াছেন যে, সকলের আত্মাই অমর। ভারতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা সকলেই কত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, কত কৃচ্ছ্রসাধন, কত ব্রত উপবাস করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু গীতাকার বলিয়াছেন যে, কেবল ভাল করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম। উপবাসাদি দ্বারা ধর্ম্মসাধন করা সম্বন্ধে গীতাকার বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মার্থী অতিভোজনও করিবে না, ভোজন ত্যাগও করিবে না। ভারতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা খাদ্যাখাদ্য বিচার কত করিয়াছেন। গীতাকার কিন্তু সে সকল বিধান কর্ত্তব্যের মধ্যেও আনেন নাই। তাঁহার মতে যাহা শরীর মনের পক্ষে ভাল তাহাই সাত্ত্বিক আহার। গীতা ১৭ অঃ ৮-১০। ভারতীয় শাস্ত্রকার মাত্রই আত্মা এবং মনকে পৃথক পৃথক

বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতাকার কিন্তু অনেক স্থলে মনকেই আত্মা বলিয়াছেন। সকল শাস্ত্রেই বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাক্য বলিয়াছেন; কিন্তু গীতায় কেবল যে বেদের অর্থবাদেরই নিন্দা আছে তাহা নহে—বেদ-ত্রিগুণ বিষয় বলিয়া বর্জ্জনীয়, ইহাও বলা হইয়াছে। এই সকল নূতনত্ব গীতার বিশেষত্ব। বাঙ্গালীদিগের ব্যবহারিক জীবনেও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারাও সংসারে গতানুগতিক হইয়া চলেন নাই। সকল বিষয়েই তাঁহারা ভাল বা মন্দ একটা নূতন কিছু করিয়াছেন। বস্ত্র পরিধান সকলেই করে, কিন্তু বাঙ্গালীরা উষ্ণীষ পরিত্যাগ করিয়াছেন। খড়ের ঘরের মধ্যেও তাঁহাদের গৃহনির্ম্মাণ প্রণালী বিভিন্ন রূপ। তণ্ডুলই ভারতীয়দিগের প্রধান খাদ্য; কিন্তু মুড়ি বঙ্গদেশ হইতেই অন্যত্র গিয়াছে। রসগোল্লা সন্দেশ ও পিষ্টক বাঙ্গালীরই সৃষ্টি। সকল প্রদেশেই লেপ বালিশ আছে; কিন্তু তাহার ওয়াড় সৃষ্টি বাঙ্গালীর। রন্ধন করিবার প্রণালীও বাঙ্গালীদের ভিন্ন রূপ। বাঙ্গালীদের গীতবাদ্য, বেশ-বিন্যাস, উত্তরাধিকার, সকড়ি-বিচার প্রভৃতিও ভিন্ন প্রকার। অন্য কোন প্রদেশেই বাঙ্গালীদের দুর্গোৎসবের তুলনা নাই। যাহাদের এত বৈশিষ্ট্য, তাহাদের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গীতকাব্য প্রণয়ন অসম্ভব নহে। কিন্তু এই সকল কথায় প্রমাণ কিছুই হয় না। কেবল এই মাত্র প্রদর্শিত হইল যে, গীতাকারের বাঙ্গালী হওয়া অসম্ভব নহে। এখন প্রমাণ অন্বেষণ করা যাউক। অন্য প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক, ভাষার প্রমাণ সর্ব্বদাই বলবৎ। প্রথমেই ইহার দুইটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মাতালেরা একটা র উচ্চারণ করিতে পারে না—দুইটা কি তিনটা র্ একত্র করিয়া বলে। যেমন তাহারা রাম না বলিয়া র্রাম বা র্র্র্ রাম বলে। ইংলণ্ডের পুলিস জানে যে মাতালেরা rain বলিতে পারে না rr, rain বলে। আবার তাহারা ইহাও জানে যে মাতালেরা hippopotamus বলিতে পারে না। হিপ্ পট্ পট্ পটেমাস বলে। ইংলণ্ডে কোন মাতাল যদি রাস্তায় পড়িয়া থাকে তাহাকে পুলিশ ধরে। মাতাল তখন ভাণ করে যে সে মাতাল নহে—হঠাৎ পেটে বেদনা হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। পুলিশ তাহাকে rain এবং hippopotamus উচ্চারণ করিতে বলে। মাতাল বলে rr rain এবং হিপ পট্ পট্ পটেমাস। অমনি পুলিস তাহাকে ধরিয়া ফেলে। আর একটী দৃষ্টান্ত—একটী মুসলমান যুবক ব্রাহ্মণ সাজিয়া দূর-দেশের এক টোলে গিয়া সংস্কৃত পড়িত। একদিন একটী অদ্ভূত গল্প শুনিয়া অসাবধানে সে সুভানল্লা বলিয়া উঠিল। তখন সকলেই তাহাকে মুসলমান বলিয়া জানিতে পারিয়া তাড়াইয়া দিল। এই দুই দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, কেবল ভাষার সাক্ষ্যে একজন মাতাল ও একজন মুসলমান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সেইরূপে আমরা দেখাইব যে, গীতার এমন দুই একটী শব্দ আছে যাহাতে নিঃসন্দেহে গীতাকারকে একজন বাঙ্গালী বলিয়া ধরাইয়া দেয়।

বঙ্গদেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক ভাবে প্রচার হইলেও সংস্কৃত কখনই বাঙ্গালীদের মাতৃভাষা হয় নাই। ইহার বলে কত অ-সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালীরা সংস্কৃত রচনার মধ্যে চালাইয়া দিয়াছেন, যেমন গাড়ী, প্রতুল, কাণ্ডারী, কঠিনী (বাঁশের কলম)। কত সংস্কৃত শব্দ ভুল করিয়া কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াও প্রয়োগ করেন। যেমন মুখরিত, একত্রিত, বর্জ্জিত, সৃজন। আবার এরূপ কতকগুলি শব্দ তাঁহারা ব্যবহার করেন, যাহার অর্থ সংস্কৃতে একরূপ, বাঙ্গলায় অন্যরূপ। যেমন এবং, সুতরাং, সহজ, প্রশস্ত, যথেষ্ট, অপর্য্যাপ্ত, উঞ্ছবৃত্তি, স্ত্রৈণ, আমোদ, শাক। এই তিন শ্রেণীর শব্দের কোন একটা শব্দও যদি কোন সংস্কৃত পুস্তকে থাকে, তাহা হইলে সেই পুস্তকের প্রণেতা যে বাঙ্গালী, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

প্রথমে যে শব্দটী দ্বারা গীতাকারকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারা যায়, তাহা 'অপর্য্যাপ্ত'। ইহা প্রথম অধ্যায়ের দশম শ্লোক আছে।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।

পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥

বাঙ্গালী টীকাকারেরা অনেকেই "অপর্য্যাপ্ত" শব্দের প্রকৃত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দুর্য্যোধন বলিতেছেন যে তাঁহার সৈন্যবল কম হইয়াছে। কিন্তু তিলক অতি উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে এখানে "অপর্য্যাপ্ত" শব্দের অর্থ প্রয়োজন অপেক্ষা বহুপরিমাণে অধিক অর্থাৎ বাঙ্গালীরা যে অর্থে অদ্যাপি এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাণ্ডবদের সৈন্যবল সাত অক্ষৌহিণী কিন্তু দুর্য্যোধনের সৈন্যবল একাদশ অক্ষৌহিণী। সুতরাং দুর্য্যোধন

কথনই এমন কথা বলিতে পারেন না যে পাণ্ডবদের অপেক্ষা তাঁহার সৈন্যবল অল্প। তিনি যে যুদ্ধের প্রাক্‌কালে কিছু ভয় পাইয়া ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার বল কিছু অল্প এরূপও হইতে পারে না। তিনি চিরদিনই অতি দাম্ভিক এবং সাহসী ছিলেন। দীনভাব তাঁহাকে কথনই স্পর্শ করে নাই। উদ্যোগ পর্ব্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি এই বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন যে তাঁহার সৈন্য অজেয়। তিনি পাণ্ডবদের ষোলজন প্রধান বীরের নাম করিয়া নিজের সাতজন বীরের নাম করিয়া বলিলেন, ইহা ভিন্ন আরও অনেক বীর আছেন যাঁহারা সর্ব্বাস্ত্রবিৎ এবং তাঁহার জন্য প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন (অন্যেচ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে বিশারদাঃ)। সুতরাং তাঁহার বল অল্প হইয়াছে এ কথা তাঁহার পক্ষে বলা অসম্ভব ছিল। অতএব এখানে 'অপর্য্যাপ্ত' বাঙ্গালীরা যে অর্থে ব্যবহার করেন তাহাই বুঝিতে হইবে। এই একটা শব্দেই প্রমাণ হয় যে গীতাকার বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও ভাষাগত প্রমাণ আছে। পশ্চিম প্রদেশে সম্বোধনে ভোঃ, আয় অয়ি শব্দই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাঙ্গালীরা কি সংস্কৃত কি বাঙ্গলায় "হে" শব্দ প্রয়োগ করেন। গীতায়ও দেখিতে পাই 'হে' শব্দ সম্বোধনে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা হে কৃষ্ণ, হে যাদব হে সখেতি। গীতা ১১।৪১

বহুশাস্ত্র পারদর্শী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ও পুরাণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'হে' সম্বোধন বাঙ্গালীদের।

সুতরাং প্রমাণিত হইল যে গীতাকার বাঙ্গালী ছিলেন। এখন সেই ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী বাঙ্গালীর যৎকিঞ্চিৎ যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাই দিতেছি।

অনেক বাঙ্গালী স্ব স্ব টীকা সম্বলিত গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার একাধিক পুস্তকের প্রথমে এবং কথন কথন শেষে গীতাধ্যান নামে কয়েকটী শ্লোক আছে। সেই সকল শ্লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিঃসৃতা॥

এই শ্লোকোক্ত পদ্মনাভ নামক ব্যক্তিই ছিলেন গীতাকার। এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ নিম্নে বিবৃত হইল। এই শ্লোকটা পদ্মনাভের রচিত হইতেও পারে, না হইতেও পারে। কেন না পদ্মনাভ নিজে নিজের মুখকে মুখপদ্ম বলিবেন, ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে। ইহা তাঁহার পুত্র বা তৎস্থানীয় কেহ লিখিয়া থাকিবেন। যেমন করিয়াই হউক পদ্মনাভের নাম যখন আছে তখন পদ্মনাভ নামক কেহ গীতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা বলা যাইতে পারে। এখন এই পদ্মনাভের আর কি পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই দেখিতে হইবে।

পদ্মনাভ নামক তিন ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছি। একজন বিদ্যমান ছিলেন পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু গীতা তাহার বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, কেন না অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য তাহার টীকা লিখিয়াছিলেন। সুতরাং সেই পদ্মনাভ গীতাকার হইতে পারেন না। বিশেষতঃ তাঁহার বিদ্যাবত্তারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। আর এক পদ্মনাভ ছিলেন মহারাষ্ট্রে। তিনি বিশেষ বিদ্বান ছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্যমান ছিলেন দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে। অতএব তিনিও গীতাকর্ত্তা হইতে পারেন না। অবশিষ্ট পদ্মনাভ ছিলেন মহাবিদ্বান। তিনি সুপদ্ম নামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহার পঠন পাঠন অদ্যাপি বঙ্গদেশের অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। তাঁহার সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে তিনি সম্পূর্ণরূপে পাণিনিকে মানিয়া চলিতেন না। আমরা দেখিতে পাই যে গীতায় অনেক শব্দ অপাণিনীয়রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। সেনানীনামহংস্কন্দঃ (গী ১০।২৪) বাক্যে সেনানী শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে সেনানী নাম লিখিত হইয়াছে। গীতাকারের ন্যায় মহাসংস্কৃতজ্ঞ অবশ্যই জানিতেন যে সেনানী শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে সেনান্যাম্ পদ হয়। তথাপি তিনি সেনানী নাম লিখিয়াছেন। ছন্দের জন্য যে এরূপ করিয়াছেন তাহাও বোধ হয় না। যেহেতু তিনি 'স্কন্দোঽহমস্মি সেনান্যাম্' অনায়াসেই লিখিতে পারিতেন। তথাপি তিনি যে অশুদ্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা কেবল তিনি পাণিনীর সকল নিষেধ বিধি মানিতেন না। যুক্তিযুক্ত লিখনের প্রতি বাঙ্গালীসুলভ বিদ্রোহ ভাব জন্য হউক অথবা ভুল করিয়াই হউক সেনানী শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে সেনানীনাম্ লিখিয়াছেন, যেমন করিয়াই হউক ইহা পাণিনি বিরুদ্ধ প্রয়োগ। "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি"

এই বাক্যে সখেতি পাঠ অশুদ্ধ। কেন না পাণিনির সন্ধির সূত্রানুসারে সখে+ইতি=সখেতি হয় না, সখইতি হয়। আবার দেখিতে পাই "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্" বাক্যে প্রিয়ায়াঃ এবং অর্হসি সন্ধি করিয়া প্রিয়ায়ার্হসি করা হইয়াছে। ইহাও অশুদ্ধ ও পাণিনি বিরুদ্ধ। কেহ কেহ বলেন শব্দটা প্রিয়ায়াঃ নহে প্রিয়ায়। এরূপ হইলে অশুদ্ধ হয় না বটে কিন্তু ক্রমভঙ্গ দোষ হয়। যেহেতু পূর্ব্বে আছে 'পিতেব পুত্রস্য সখো সখ্যুঃ' অর্থাৎ দুইটাই ষষ্ঠীর প্রয়োগ। অতএব প্রিয়ায় না হইয়া প্রিয়ায়াঃ হওয়াই রচয়িতার অভিপ্রেত ছিল।

পদ্মনাভের সম্পূর্ণ নাম পদ্মনাভ দত্ত। তিনি বৈদ্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ। যে বংশে চক্রপাণি দত্ত অসাধারণ বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই বংশে পদ্মনাভ দত্তের জন্মগ্রহণ অসম্ভব নহে।

পদ্মনাভ দত্তের বা গীতাপ্রণয়নের কাল সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে কিছু লিখিত আছে কিনা আমি অবগত নহি। সংস্কৃত কোন্ গ্রন্থেরই বা নিশ্চিতরূপে কাল নির্ণয় হইতে পারে? সিলভান্ লেভিও এ বিষয়ে হতাশ হইয়াছেন। তবে অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। যবদ্বীপে (Javaতে) যে মহাভারত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে গীতা নাই। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে তখনও গীতা প্রণীত হয় নাই। যবদ্বীপে হিন্দুউপনিবেশ পঞ্চম শতাব্দীতে হইয়াছিল। উপনিবেশ আরম্ভ হইতে হইতেই যে সেখানে মহাভারত গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। মহাভারত সেখানে নীত হইয়াছিল তাহারও পরে। এই সময়েই বা তাহার কিছু পরে গীতারচনার সময়। অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীতে গীতা প্রণীত হইয়াছিল। কালিদাসের প্রায় সমসাময়িক।

গীতাকার এবং সুপদ্ম-ব্যাকরণ-কর্ত্তা পদ্মনাভ দত্ত যে অভিন্ন ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তের পর অনেকের মতে বোধ হয় Q. E. D. বসাইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু ইহার প্রবল সম্ভাবনা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমি কিন্তু আশা করি আমার প্রথম দুইটী সিদ্ধান্ত—গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এবং গীতার রচয়িতা ছিলেন বাঙ্গালী—দেশে গৃহীত হইবে।

আরও একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের অধিক স্থানে এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী বিচিত্রা পত্রিকায় বলিয়াছেন যে গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু তাঁহারা অথবা অন্য কেহ এ বিষয়ে কোন স্থলে বিচার করিয়াছেন কি না তাহা আমি অবগত নহি।

পদ্মনাভ যে গীতাকার ইহা ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বহু স্থলে লিখিয়াছেন। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন যে পৃথক পুস্তক বা প্রবন্ধে প্রমাণ করিবেন যে পদ্মনাভ ছিলেন গীতাকার এবং কালিদাস ছিলেন বাঙ্গালী বৈদ্য। কিন্তু তিনি এই দুই বিষয়ে কিছু লিখিয়া যাইবার সময় পান নাই।

পদ্মনাভ শব্দে বিষ্ণুকেও বুঝায়। শ্লোকে পদ্মনাভকে গীতাকার বলা হইয়াছে—ইহা হইতেই লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বিষ্ণু বা কৃষ্ণই গীতা রচনা করিয়াছিলেন। গীতার মধ্যে কৃষ্ণের উক্তি ভিন্ন আরও কয়েকজনের উক্তি আছে। সুতরাং সমস্ত গীতাকে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর উক্তি বলা যায় না। আরও গীতার মতবাদ বহুল পরিমাণে উপনিষদের উপরে স্থাপিত। বিষ্ণু স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া অন্য লোকের মতবাদকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা তাঁহার মানের খর্ব্বতা করিয়া তাঁহাকে অসম্মান করেন। আরও একটা কথা সকলের মনে রাখা উচিত যে কি গীতায় কি মহাভারতে এমন কথা নাই যে গীতা কৃষ্ণের রচিত। গীতা সমস্তটাই সঞ্জয়ের উক্তি। গীতা যদি মহাভারতের অংশও হয় তাহা হইলেও তাহা সঞ্জয়ের উক্তি। এই উক্তি বৈশম্পায়নের উক্তির অন্তর্গত। বৈশম্পায়নের উক্তি আবার সৌতির কথার অন্তর্গত। কোন মতেই ইহা পাওয়া যায় না যে গীতাকার ছিলেন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। শাহারজাদা যেমন আরব্য উপন্যাস রচনা করেন নাই, কৃষ্ণ বা অর্জ্জুন অথবা সঞ্জয়ও তেমনি গীতা প্রণয়ন করেন নাই।

'ভারতবর্ষ' সম্পাদকের মন্তব্য—

পরলোকগত শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম গীতাকার বাঙ্গালী ছিলেন এই মত প্রচার করেন। তিনি প্রমাণস্বরূপ কি যুক্তি পাইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বীরেশ্বরবাবু নিজ যুক্তির দ্বারা এই মতই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বীরেশ্বর

বাবুর মতে গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিলক এ মত স্বীকার করেন না। তিলক বলেন গীতায় যে আর্ষ-প্রয়োগের বাহুল্য ও ছন্দবৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে "ঋগ্বেদ ও উপনিষদের ত্রিষ্টুপ্‌বৃত্তের ঢং অনুসারেই এই সকল শ্লোক রচিত হইয়াছে। মহাভারতের অন্যত্রও এইরূপ আর্ষশব্দ ও বৈদিকবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়।" মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে গীতার উল্লেখ আছে। শ্লোক-সঙ্গতি দেখিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত মনে হয় না। বীরেশ্বরবাবু তিলকের এই সকল যুক্তির উত্তর দেন নাই। তিনি যদি দেখাইতে পারিতেন যে, গীতার আর্ষপ্রয়োগগুলি পদ্মনাভের ব্যাকরণসম্মত তবে তাঁহার প্রমাণ দৃঢ়তর হইত। গীতাকারকে বাঙ্গালী বলিলেও মহাভারতকারকে বাঙ্গালী বলিবার উপায় নাই। মহাভারতের মধ্যে বঙ্গদেশীয় গীতা কি করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিল, তাহা বুঝা যায় না। ভারতবর্ষে প্রচলিত কোনও মহাভারতের কোনও সংস্করণেই গীতা বাদ যায় নাই। বীরেশ্বরবাবু বলেন যবদ্বীপে প্রাপ্ত মহাভারতে গীতা নাই। যবদ্বীপে মহাভারতের সহিত এখানকার মহাভারতের অনেক বিষয়েই মিল নাই। বিশেষজ্ঞই এই মিল বা অমিলের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

ধনী ও দীন

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী

বার দাপে রোষে নির্ম্মম শীত নামিয়াছে রণরঙ্গে,
কাঙাল কৃষাণ মজুরের প্রাণ কেঁপে ওঠে সারা বঙ্গে।
পথে পথে ওই ভিক্ষুক চলে হইয়া অর্দ্ধ-নগ্ন,
রাস্তার ধারে কাঁদিছে বৃদ্ধ পা দুটি হয়েছে ভগ্ন।
ভিক্ষায় চলে দুঃখিনী জননী শিশুরে করিয়া বক্ষে
অন্ধ কাঁদিছে ভিক্ষার লাগি' বারি বহে দীন-চক্ষে।
সবারে কাঁদায়ে নির্ম্মম শীত পরিহাসে করে নৃত্য,
ধনীর দুয়ারে ছেঁড়া জামা গায়ে কাঁপিতেছে দীন ভৃত্য!
সব ক্রন্দন সব দুঃখে করি মগ্ন,
ভুলি' লজ্জায় ভোগসজ্জায় ধনী হয়ে আছে লগ্ন।

প্রতিদিন দ্বারে উমেদার আসে করিতে চাকুরী-চেষ্টা,
ধনীর সঙ্গে দেখা নাহি হয় ফিরে যেতে হয় শেষ্‌টা।
কন্যাদায় ও শিক্ষার দায় বহি' হায় নিতি পিঠেগো,
আসিছে কত না পিতা ও ছাত্র তৃষ্ণা নাহি যে মিটেগো।
ধনীর সঙ্গে মিলেনা রে দেখা তবু আসে তারা বারবার,
কৃপার লাগিয়া ঘুষ্‌ দিয়া করে আমলার সাথে কারবার।
এক টাকা ভিখে দুই আনা হায় দর্শনী দিয়া দ্বারীরে,
শতেক বেদনা লাঞ্ছনা বহি' ফিরে যেতে হয় বাড়ী রে।
দীনেরা যখন ফিরে যায় কেঁদে দ্বারে গো,
ধনীর লাগিয়া কামরায় বাজে গ্রামোফোন্‌ বারেবারে গো।

যুগ যুগ ধরি, তিলে তিলে হায় আপনারে করি' হত্যা,
অভাগা কাঙাল গড়িয়া তুলিল ধনীর বিলাস রথ্যা।
জীবনের রস নিঙাড়িয়া দীন গড়িল সাধের ঘর গো,
ধনী আসি' হায় ভোগের লাগিয়া হরিল সে সুখ স্বর্গ।
দীনের লাগিয়া কাঁদিল না ধনী, ধনী লাগি' কাঁদে দীন গো,
ধনী নিশিদিন বাজাইছে বাঁশী ভেঙ্গে কাঙালের বীণ্‌ গো!
দীন গড়ে নিতি বেদনার তাজ আগুনের দাহ মাখি'রে,
ধনী আসি তায়' ভেঙে দিয়ে যায় করে হায় রাঙা আঁখিরে!
ধনীর পুরীতে গড়ে ওঠে রাজতক্ত,
চুষিয়া চুষিয়া অভাগা দীনের জীবনের রস-রক্ত।



অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ

(১৭)

যে ব্যথা লইয়া অনি মেজরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, বনবিহারী ও সুলতার সাহচর্য্যে সে যেন তাহার অনেকখানি সহিয়া লইয়াছিল। সুলতার সরল স্বভাব ও সস্নেহ বন্ধুত্ব তাহার শূন্য জীবনকে বহন করিবার মত একটা অবলম্বন দিয়াছিল। কিন্তু সেই মহিলা-নিবাসের অপরিচিত গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে রাখিয়া যেদিন সুলতা ও বনবিহারী তাঁহার নিকট বিদায় লইল, সেইদিন হইতে অনির রিক্ত জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত যেন তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যে-কোনো দুঃখকে বুক পাতিয়া সহ্য করিবার মত যে একটা দৃঢ়তা অনির চরিত্রে ছিল, তাহা যেন সেই সর্ব্বস্ব-হারানোর ব্যথার আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। যে অনির স্বাভাবিক প্রকৃতি অতি স্নিগ্ধ, মিশুক ও সঙ্গীপ্রিয় ছিল, এখন তাহা এত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে আর সহসা কাহারো সহিত আলাপ করিতে পারিত না। মেসের যে সকল মহিলা তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছেন, সে যেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। অনির সর্ব্বদাই মনে হইত, হয় তো সেই পাপ-স্পর্শ যাহা তাহাকে নিঃস্ব করিয়াছে—এখনো তাহার সারা মুখে কুৎসিত পোড়া দাগের মত লাগিয়া আছে। হয় তো যে-কেহ তাহার মুখের পানে চাহিলেই তাহার সেই নিতান্ত হীন দারিদ্র্য ধরিয়া ফেলিবে। একটা অকারণ আতঙ্ক যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। মহিলাদের মধ্যে অনেকেই ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি ছিলেন। অনি তাহার জীবিকার অন্বেষণে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবার কথা অনেকবার ভাবিয়াছে, কিন্তু ঐ দুর্ব্বলতা এরূপ ভাবে তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিয়াছিল, যে, সে কোন রূপেই তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া আপনার কথা কাহারো নিকট বলিতে পারিত না। নিজের সমস্ত বিবেকবুদ্ধি দিয়া অনি সহস্রবার আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে—'এ শুধু তাহার অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস; সে তো কায়মনোবাক্যে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে; তবে কেন এই আগন্তুক পাপের বোঝা তাহারই বুকে চাপিয়া বসিবে! সে যাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না, তাহারই অজ্ঞাতে যে পাপ তাহার জীবনের উপর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে,—সে পাপ কি তাহার?' কিন্তু পরক্ষণেই একটা দীর্ঘনিশ্বাসের স্রোতে অনির সে আত্মপ্রবোধ ভাসিয়া যায়। তাহার শূন্য জীবন আবার হাহাকার করিয়া উঠে; আবার সেই বুকভাঙা আর্ত্তনাদ তাহার সারা প্রাণকে জুড়িয়া বসে।

মেজরের উপর অনির সারা অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার চিন্তাটুকুর বিরুদ্ধেও অনির মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিত। অথচ অনি যেন মেজরকে অভিসম্পাত করিতে গিয়াও ব্যথিত হইয়া পড়িত। নিজের সেই ব্যথার মধ্যেও একটা যে কিসের তৃপ্তি ছিল, তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারিত না। অনি যখনই নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই লজ্জায় তাহার সারা মনটা রাঙিয়া উঠিয়াছে।

মহিলা-নিবাসে যে কয়েকজন কর্ম্মী ও দেশসেবিকা ছিলেন, মঞ্জিষ্ঠাদেবী তাঁহাদের অন্যতমা ও প্রধান-তমা। সভা-সমিতি, খদ্দর-প্রচার প্রভৃতি কার্য্যে ইনি

প্রায় আঠারো ঘণ্টাই বাহিরে থাকিতেন। মাত্র দুইবেলা আহারের সময় ও রাত্রে বিশ্রামের সময় ভিন্ন মঞ্জিষ্ঠাদেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া প্রায় একপ্রকার অসম্ভব ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যে ছয় সাত ঘণ্টা মাত্র তিনি মহিলা-নিবাসে থাকিতেন, তাঁহার স্বভাব-মুখরতা সারা বাড়ীখানিকে এমন সজীব করিয়া রাখিত যে, তাঁহার অনুপস্থিতি কালেও সে অস্তিত্বের ঝাঁক যেন মেসের প্রত্যেক ঘরে ঘরে ফিরিয়া বেড়াইত। কর্ম্মী হিসাবেও মঞ্জিষ্ঠাদেবীর যেমন নাম ছিল, অবিশ্রান্ত কথা বলিবার যোগ্যতাও তাঁহার তদপেক্ষা ন্যূন ছিল না। ঐ আহার ও বিশ্রাম সময়টুকুর মধ্যেও অনর্গল বকিয়া বকিয়া নিজের সারা দিনের কাজের হিসাব, কৈফিয়ৎ ও জবাবদিহি না করিতে পারিলে তিনি শান্তি পাইতেন না; তাহাতে অপরের আগ্রহ থাক্ আর নাই থাক্। দৈনন্দিন কার্য্য সারিয়া তাঁহার মেসে ফিরিতে প্রায়ই রাত্রি নয়টা, দশটা বাজিয়া যাইত। কিন্তু যখন ফিরিতেন, তখন এক দিকে যেমন সারা দিনের প্রাণপাত পরিশ্রমে শক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়া আসিত, অপর দিকে তেমনি দেশ বিদেশ-সভা-সমিতি প্রভৃতির নানা খবরে তাঁহার ফ্রী প্রেস্ বোঝাই হইয়া উঠিত। মেসের প্রত্যেক ঘরে ঘরে সংবাদপত্রের মত ফিরিয়া তাঁহার ঐ খবরের বোঝাগুলাকে যতক্ষণ তিনি খালি করিয়া ফেলিতে না পারিতেন, ততক্ষণ যেন মঞ্জিষ্ঠাদেবী একেবারে হাঁপাইয়া উঠিতেন।

অনির সাধারণ অভ্যর্থনার ত্রুটিটুকু লক্ষ্য করিয়া অধিকাংশ মহিলাই তাহার নিকট যাওয়া-আসা একপ্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মঞ্জিষ্ঠার কার্য্যতালিকায় তাহার ঘরখানি একদিনের জন্যও বাদ পড়ে নাই। প্রত্যহই নিয়মিত ভাবে তিনি, অন্ততঃ একবারও, দিনান্তের হিসাব লইয়া তাহার নিকট আসিতে ভুলিতেন না। অভ্যর্থনার ওজন যাচাই করিবার মত সময় ও প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। নিজের কাজের নেশা যাঁহাদিগকে মাতাল করিয়া রাখে, পরের ত্রুটি লইয়া চিন্তা করিবার অবসর তাঁহাদের হয় না।

নিজের অবিশ্রান্ত কাজ ও অনর্গল বক্তৃতার ভিড়ের ভিতর দিয়াও মঞ্জিষ্ঠাদেবী অনির মৌন ও স্বল্পভাষী প্রকৃতিটিকে কয়েক দিনের আলাপেই চিনিয়া ফেলিলেন। অনির উন্নত হৃদয় ও মার্জ্জিত প্রকৃতি যে একটা কিসের গুরুভারে এমন মৌন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মঞ্জিষ্ঠার দৃষ্টি এড়াইল না। অনিও কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝিয়া লইয়াছিল যে এই ছিপ্‌ছিপে ও লম্বা মেয়েটি সার্ব্বজনীন 'মঞ্জিষ্ঠাদি' প্রতিষ্ঠার কতখানি যোগ্য। মঞ্জিষ্ঠাদির স্বভাবের মধ্যে এতো স্নেহ ও পরদুঃখকাতরতা ছিল, যাহাতে ঝি-চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া মেসের প্রত্যেক মহিলাটি পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে তাঁহার প্রাধান্য ও শাসন মানিয়া চলিত। হৃদয় জয় করিয়া মানুষ যে প্রতিষ্ঠা পায়, তাহা ভয় দেখানো শাসন অপেক্ষা এতো উচ্চে যে, সেখানে মানুষ শুধু আত্ম-নিবেদন করিয়াই শান্তি পায়; বিদ্রোহ করিবার স্পৃহা তাহাদের থাকে না।

অন্ন ও বস্ত্র সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে আগে গৃহশিল্পকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—দেশের ঘরে ঘরে চর্‌কা চালাইতে হইবে। মঞ্জিষ্ঠা—ডাইনিং হল্ হইতে আরম্ভ করিয়া মেসের উপরে নীচে, বাহিরে—পথে ঘাটে লোকের বাড়ী বাড়ী—সেই মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। মেসের সকলকেও তিনি চর্‌কা কাটিতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন। অনি তাহার কর্ম্মহীন অবসরের মধ্যে হঠাৎ নূতন একটা কাজ পাইয়া যেন সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। কলিকাতা সম্বন্ধে অনির বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া সে কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় বড় একটা বাহির হইতে পারিত না; শুধু সংবাদ-পত্র ও অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাহার আর উপায় ছিল না। কাজে কাজেই অধিকাংশ সময় তাহাকে ঘরের মধ্যেই থাকিতে হইত এবং সেই নির্জ্জন বাসে একমাত্র অবলম্বন চর্‌কা তাহার অনেকখানি সহায় হইয়া উঠিয়াছিল। সারা দিনে অনি যে সূতা কাটিত, তাহা মেসের সাধারণ মহিলাদের সূতার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইত। ইহা যেন মঞ্জিষ্ঠার দৃষ্টিকে তাহার প্রতি আরো অধিকতর আকর্ষণ করিল। মঞ্জিষ্ঠা অনির সূতা কাটার নিপুণতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া, প্রত্যহই সেই সূতার বাণ্ডিল লইয়া ছুটিতেন খাদি-প্রতিষ্ঠানে—তাহা দেখাইবার জন্য।

সেদিন রাত্রে মেসে ফিরিয়াই মঞ্জিষ্ঠা দেবী অনির ঘরের দিকে ছুটিলেন—তাহার সূতা সম্বন্ধে খাদি প্রতিষ্ঠান ও সমিতির কর্ম্মীদের অভিমতটা তাহাকে শুনাইবার জন্য।

সে অভিমত হয় তো অনি অপেক্ষা তাঁহারই অধিক প্রীতিকর হইয়াছিল। কিন্তু সহসা ঘরে ঢুকিতেই অনির দুশ্চিন্তা-ম্লান মুখখানা তাঁহার উৎফুল্ল মনটাকে এমন একটা অতর্কিত ঝাঁকানি দিল, যে, মঞ্জিষ্ঠাদির মনটা যেন হঠাৎ সেই ঝাঁকুনিতে একেবারে ঘোলা হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি অনির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"তুই কি ভাবিস্ ভাই! যখন তখন মুখখানিকে অমন কালো ক'রে?"

ইহা যেন অনির জীবনের একটা অনাস্বাদিত প্রীতি। বন্ধুত্বের এত নিবিড় বেষ্টন সে কোন দিনই পায় নাই। শৈশবের স্মৃতিতে যে দুই একটী ক্ষীণ রেখা লাগিয়া ছিল, তাহা তো তাহার ব্যথিত জীবনে কোন শান্তিই দিতে পারে নাই। সুলতাও তাহাকে এমনি ভালবাসে, কিন্তু সেই নিতান্ত সরলা তাহারই উপর এতখানি নির্ভর করিয়া চলে যে অনি নিজে কোন দিনই নিজের দুশ্চিন্তার মধ্যে তাহার উপর নির্ভর করিতে পারে না। অনির চক্ষে জল আসিতেছিল।

অনিকে নীরব দেখিয়া মঞ্জিষ্ঠা তাহার পার্শ্বে বসিয়া সস্নেহে তাহার চিবুকটি নাড়িয়া দিয়া বলিলেন—"লুকোস্ নি। তোর মুখ দেখে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে তুই একটা ব্যথার বোঝা নিয়ে শুধুই সেটাকে লুকোবার জন্যে মনের কোণ খুঁজে বেড়াচ্ছিস্। তার ভারে মুখ-চোখ তোর এমনি হয়ে গেছে, যে, দেখ্‌লে কান্না পায়। মানুষ নিজে যা বইতে পারে না, বন্ধু-বান্ধবকে তার অংশ দিয়ে অনেকটা হাল্‌কা হ'তে পারে। আর বন্ধুরাও তার অংশ নিয়ে তাকে হাল্‌কা ক'র্‌তে পারে ব'লেই তারা বন্ধু। মনের কবাট যত বন্ধ ক'রে রাখ্‌বি, অন্তরের ঠাকুর শ্বাস-রুদ্ধ হ'য়ে ততই ছট্‌ফট্ ক'রবে; অন্ধকার বাড়্‌'বে ছাড়া কম্'বে না। তোর যে কিসের অত দুশ্চিন্তা তা তোকে বল্‌'তেই হ'বে। সকলেই বলে—তুই সর্ব্বদাই এই ঘরের কোণে বসে' থাকিস্। তবে যে তুই কেন এই মেসে এসে পড়ে' রয়েছিস্ তা' তো বুঝ্‌লুম্ না। যে-কোনো একটা কাজ হাতে নে; কাজের চাপে সব দুর্ভাবনাই মিলিয়ে যাবে। নিজের জীবনের খুঁটিনাটি নিয়েই যদি মানুষ অত ভাবে, তা' হ'লে এত বড় দুনিয়ার কথা ভাব্‌বার অবসরই যে তারা পাবে না ভাই। নয় কি? তুই বল্!"

অনি ঠিক এমনি একটা কিছু চাহিতেছিল। নিজের দুর্ব্বলতায় সে হাত বাড়াইয়া কোন আশ্রয়কে ধরিতে পারিতেছিল না বলিয়াই তাহার অন্তর এমনি একখানা প্রসারিত বাহুর জন্য কাঁদিয়া মরিতেছিল। অনির ইচ্ছা করিতেছিল সে মঞ্জিষ্ঠার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে—'ওগো দিদি, আমার বুকের দুয়ার জোর ক'রে ভেঙে তুমি তার সব কিছু নিয়ে আমায় হাল্‌কা কর। আমি যে আর পারি না।' পরক্ষণেই তাহার মনে হইল—মেজরের কথা, মেজরের সেই পাপ-আশ্রয়! তাহা তো সে প্রাণ থাকিতে কাহারো কাছে ব্যক্ত করিতে পারিবে না। জীবনে সব কিছু হারানোর ব্যথা তাহার সহ্য হইয়াছে, এ ব্যথাও তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে। সে যে নিঃস্ব, সে ভিক্ষুক! বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সে তাহার অভাবের ঝুলি সাহায্যে ভরিবে—কিন্তু তাহার দৈন্যের ঝুলিতে বিশ্ব-জনের ঘৃণার মুষ্টি-ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া সে তো আর বহিতে পারিবে না।

নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া মঞ্জিষ্ঠার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া অনি বলিল—"মঞ্জিষ্ঠাদি, আমি একটা কাজের খোঁজেই আজ এক মাস ধরে' মেসে বসে' আছি। কিন্তু জোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারি নি—আজও কিছুই। কোল্‌কাতার কোনো কিছুই ভালভাবে চিনি না, জানি না, তাই বাধ্য হ'য়ে সারা দিন ঘরের কোণেই বসে' আছি, আর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দুচার'টে দরখাস্ত কর্‌'ছি মাত্র। তাতে বিশেষ কিছু হবে বলে' আর আশা হয় না। কাজ-কর্ম্ম কিছু একটা পেলে যে নিজেকে অনেকটা ভুলে' থাক্‌তে পার্‌তুম তাতে সন্দেহ নেই। কর্ম্মহীন দিনগুলো কাট্‌তে চায় না বলে'ই দুশ্চিন্তার কাঁড়ি এসে মনের ভিতর জমে। তাও আপনার চরকাটা পেয়ে যেন আজ কয়েক দিন একটু অবলম্বন পেয়েছি। অন্ততঃ কিছুক্ষণ সময়ও বেশ নিশ্চিন্তে কেটে যায় ঐ নিয়ে। নইলে, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সারা দিনই মনটাকে এতো অসাড় ক'রে রাখ্‌তো যে এক এক সময় প্রায় পাগল হ'য়ে উঠ্‌তুম। আচ্ছা দিদি, আমাকে আপনাদের সমিতির মধ্যে নিতে পারেন না?"

"নিশ্চয়ই পারি—খুব পারি; একশো বার।" বলিয়াই মঞ্জিষ্ঠা তাঁহার দীর্ঘ বাহু দুইটীতে অনিকে বেষ্টন করিয়া বিশেষ আনন্দের সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—"তা' হ'লে কা'লই

তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে 'স্বেচ্ছা-সেবিকা' খাতায় নাম লিখিয়ে দেবো, কি বল ?"

"তাই ভালো মঞ্জিষ্ঠাদি, আমায় আপনাদের কাজের মধ্যে টেনে নিন্। আমি জানি, হয় তো আপনাদের মত দেশের ও দশের সেবায় অমন ক'রে নিজেকে উৎসর্গ ক'র্‌বার ক্ষমতা বা যোগ্যতা আমার নেই। যে জীবন পঙ্গু হ'য়ে গেছে, তার পক্ষে অত বড় একটা মহাব্রত নেবার আকাঙ্ক্ষা হয় তো গিরি-লঙ্ঘনের বাসনার মত একটা বাতুলতা হবে মাত্র। কিন্তু তবুও যে আমায় বাঁচ্‌তে হবে; দশ'কে টেনে রাখবার ক্ষমতা যার নেই, দশের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া ভিন্ন তার আর বাঁচ্‌বার পথও নেই।" মুহূর্ত্তে কি চিন্তা করিয়াই অনি পুনরায় বলিল—"কিন্তু দিদি, কেবল স্বেচ্ছা-সেবিকা ব্রত নিলেই তো আমার চল'বে না; ঐ সঙ্গে আমায় আরো কিছু ক'র্‌তে হবে নিজের উদরান্নের সংস্থানের জন্যে। নইলে তো আমার চল্'বার কোন উপায়ই নেই। সংসারে এমন কেউ নেই আমার যে—"

অনির কথা শেষ না হইতেই মঞ্জিষ্ঠা দেবী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিলেন—"থাম্, তোর আর সংসারের কথা পেড়ে কাজ নেই। কেবল—কেউ নেই, আর কিছু নেই—এই কথাগুলো আমি একবারেই শুন্'তে পারি নে। যার কেউ নেই, তার সবাই আছে। 'কেউ' থাক্'লে হয় তো সেই পাঁচ সাতজন 'কেউ' মিলে তার জীবনটাকে একেবারে নিজস্ব ক'রে খাস্‌দখলে রাখ্‌তো; আর 'কেউ' নেই যার, সে দেশ দুনিয়ার লোককে আপনার ক'রে নিয়ে নিজের স্বাধীন সত্বাকে অবাধ ভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে। জীবনের পথে অমন সব 'কেউ' না থাকাই ভালো। তুই নিজের খরচ চালাবার মত একটা কাজকর্ম্ম কিছু পেতে চা'স্? বেশ, সে কথা তো আমায় আগে ব'ল্‌লেই পারতিস্। চেষ্টা ক'রলে একটা না একটা কিছু জোগাড় হোত'ই—কোন্ দিন্।"

"চেষ্টা তো আজ এক মাস ধরে' করছি দিদি, কিন্তু হ'য়ে উঠছে কৈ!" বলিয়া অনি মঞ্জিষ্ঠার মুখের দিকে চাহিল।

মঞ্জিষ্ঠা তখন অনেকটা নিজের প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার কথা বলার স্বাভাবিক বেগে এক নিশ্বাসে বলিলেন—"যা! যা! খুব হ'য়েছে। খবরের কাগজ আর বিজ্ঞাপন দেখলেই যদি কাজ হ'তো, তা হ'লে লোকে দশ বিশ টাকা খরচ ক'রে দেশ বিদেশে না গিয়ে, বাড়ী বসে' দু পয়সার 'দৈনিক' কিনেই সব জোগাড় ক'রে ফেল্‌তো। থাক্, আমি কা'লই যাচ্ছি, তোর কাজের চেষ্টায় সুরথদা'র বাড়ী। সেদিন তিনি ব'লেছিলেন বটে একজন ভাল শিক্ষয়িত্রীর কথা—'কণা'র জন্যে। আমার খুব নিকট আত্মীয় তাঁরা; লোকও অতি ভদ্র; তোর সঙ্গে ঠিক্ পোষাবে।"

অনিকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই মঞ্জিষ্ঠাদেবী ঠিক স্বাভাবিক নিজস্ব গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন—একটা ঝড়ের ঝাপটার মত।

(১৮)

মোক্ষদাসুন্দরীর পিতা মনোহর ও রাধাকিশোরের পিতা চন্দ্রশেখর ছিলেন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। কিন্তু মনোহর ও চন্দ্রশেখর যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন উভয় ভ্রাতার মধ্যে যে প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন ছিল, তাহা কোন দিনের জন্যও শিথিল হয় নাই। উভয়েই চন্দ্রশেখর-জননী বিমলা দেবীর ক্রোড়ে সমান স্নেহে ও যত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। পিতা ও পিতৃব্যের মৃত্যুর পর রাধাকিশোর সেই পূর্ব্ব-প্রীতির ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠতাতের একমাত্র কন্যা মোক্ষদাসুন্দরীকে সহোদরার সকল আসন পরিপূর্ণ রূপে ছাড়িয়া দিয়া। মোক্ষদাকে সুখী করিবার জন্য তিনি আমরণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সহপাঠী গোপীমোহনের প্রতি তাঁহার যে বন্ধুত্বের আকর্ষণ ছিল, ভগিনীপতি গোপীমোহনের প্রতি তাহা একাধারে স্নেহ-ভালবাসা ও প্রীতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রাধাকিশোরের উদার ও সহৃদয় ব্যবহার গোপীমোহনকে এতই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল, যে, তিনি রাধাকিশোরকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা না করিয়া পারিতেন না। গোপীমোহন জানিতেন যে রাধাকিশোর তাঁহাদের জন্য কতখানি চেষ্টা ও যত্ন করিতেন,—তাঁহাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে। সেই রাধাকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারবর্গের শোচনীয় অবস্থার কথা সেদিন

যখন অনির নিকট তিনি বিস্তৃতভাবে শুনিলেন—তখন গোপীমোহনের হৃদয়খানা যেন বেদনায় ভাঙিয়া পড়িল। রাধাকিশোরের একমাত্র স্নেহের দুলালী অনিকে তাঁহার পক্ষপুটের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য গোপীমোহনের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু মোক্ষদাসুন্দরীর সেই কল্পনাতীত ঔদাসীন্য ও শুষ্ক ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার সে আগ্রহ যেন নিমেষে উপিয়া গেল। মোক্ষদা অনির পিসিমা, রাধাকিশোরের ভগিনী। সেই মোক্ষদাই যখন তাহার ভগিনীগতপ্রাণ অগ্রজের কন্যা অনিকে ভালরূপে চিনিতে পর্য্যন্ত পারিল না, তখন গোপীমোহনের মস্তিষ্ক যেন সহসা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। তিনি যে কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। প্রখরা মোক্ষদাকে একটু ভয় করিয়া চলিলেও, তাহাকে উপেক্ষা করিবার মত সাহসও হয় তো তখন তাঁহার ছিল; কিন্তু সেই উপেক্ষার পরিণামের ভিতর পড়িয়া মন্দভাগিনী অনির জীবন যে মোক্ষদার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে, সেই কথা ভাবিয়াই গোপীমোহন নীরবে সকল বেদনা সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। অনাথা হইলেও অনির শ্বশুরালয়ের যাহা কিছু সংস্থান আছে, তাহার মধ্যে থাকিয়া হয় তো বাকী দিনগুলি তাহার ইহা অপেক্ষা শান্তির সঙ্গেই কাটিবে। গোপীমোহন তজ্জন্যই মোক্ষদার ভাব লক্ষ্য করিয়া অনিকে আর বাধা দিবার চেষ্টা করিতে পারিলেন না।

অনি চলিয়া যাইবার পর তাঁহার মনে হইল—সে বোধ হয় তাহার উত্তপ্ত জীবনে একটু শান্তি পাইবার আশায় ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাঁহাদের স্নেহের আশ্রয়ের সন্ধানে। স্বভাব-অভিমানিনী অনির চিত্তে তাহার পিসিমার ব্যবহার শেলের মত বিঁধিয়াছিল, হয় তো সেই জন্যই অনি কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। আহা! বালিকা সে—সেই তো সেদিনের। কিন্তু অভাগীর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখের সব অধ্যায়গুলিই যেন আচম্বিতে একটা কালো যবনিকায় ঢাকিয়া গিয়াছে। স্বামীকে স্বামীরূপে সে জীবনে একটী দিনের জন্যও দেখিবার সুযোগ পায় নাই। সেই বিবাহের রাত্রে একটা জনতার মধ্যে শুধু একটি মুহূর্ত্তের সুযোগ ভগবান তাহাকে দিয়াছিলেন—তাহার নারী-জীবনের একমাত্র সম্বল ইহকাল পরকালের আশ্রয় স্বামীকে দেখিবার জন্য। রাধাকিশোর ও বৌদির সেদিন সে কী আনন্দ! অনিকে লইয়া আনন্দ ভোগ করিবার পূর্ণাহুতিই সেদিন হইল বলিয়া বোধ হয় রাধাকিশোরের স্থির চিত্তও আনন্দে অত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আনন্দে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন—"গোপী, মাকে আমার যেন আজ সাক্ষাৎ গৌরীর মত দেখাচ্ছে। এই সাধ আমার অনেকদিন হ'তে ছিল।" রাধাকিশোরের চোখ দিয়া তখন ঝর্ ঝর্ করিয়া আনন্দের অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল! সেই গৌরীর সাজ—আহা! দেখিতে দেখিতে কয়েক মাসের মধ্যেই অনুর অঙ্গ হইতে খুলিয়া গেল,—কোন্ ভাগ্য দেবতার অভিশাপে! দ্বিরাগমনের সুযোগটুকু পর্য্যন্ত জীবনে ঘটিয়া উঠিল না। য়ুরোপের সেই কাল মহাসমর যেন ভারতের ভাগ্যেই একটা অমঙ্গলের ধূমকেতু হইয়া উঠিয়াছিল।

অনির কথা ভাবিতে ভাবিতে গোপীমোহনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। পরক্ষণে যখনই তাঁহার মনে হইল—অনির শ্বশুরালয়ের যথেষ্ট সংস্থান থাকিলেও তাহার ন্যায় নিতান্ত অল্পবয়স্কা বিধবার পক্ষে সেই শ্বশ্রূ-স্বামীহীন গৃহে প্রতিষ্ঠা পাওয়া হয় তো একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে, তখন যেন গোপীমোহনের মনটা সহসা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। অনিকে কেন তিনি আটকাইয়া রাখিলেন না? মোক্ষদার উপর তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল; নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার উপরেও তাঁহার বিরক্তি আসিল:—অনিকে তিনি যেমন করিয়া হউক্ ফিরাইয়া আনিতেন। তাঁহার অবস্থাটা বুঝিয়াও অনি তাহাতে আপত্তি করিতে পারিত না।

* * *

সেদিন রবিবার। মধ্যাহ্নে আহারাদি শেষ করিয়া গোপীমোহন তাঁহার শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন। ঈষৎ তন্দ্রায় চক্ষু দুইটি মুদ্রিত হইয়া আসিলেও গড়গড়ার নলটী তখনও সে বিশ্রামের সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই।

মোক্ষদাসুন্দরী গজেন্দ্র ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে, গোপীমোহনের নিকট কোন অভিযোগ, অনুযোগ বা উদ্দেশ্য লইয়া আসিতে হইলেই মোক্ষদার স্বাভাবিক স্থূলগতি এমন একটা রূপান্তর গ্রহণ করিত, যাহাতে—অন্ততঃ মোক্ষদা নিজে যে

তাহার সেই গতিকে স্বয়ং মোক্ষদাত্রীর গতি অপেক্ষাও অধিকতর মহিম-ময় করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না, এ কথা বুঝিয়া লইতে কাহারও তিলমাত্র সময় লাগিত না। কিন্তু মোক্ষদার চক্ষে নিজের সেই অস্বাভাবিকত্বটুকু ধরা পড়িবার কোনো আশাই ছিল না; কেন না, সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব জগতের অনুভূতিটুকু তাহার মধ্যে জন্মাবধিই মূক ও বধির হইয়াই ছিল।

স্বামীকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া মোক্ষদা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কপাল ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল; এবং গোপীমোহন যে তাহার জন্য অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, ছুটির দিনে দুই একটি কথা বলিবার ফুরসৎ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দিলেন না—ইহাতে মোক্ষদার ওষ্ঠে কিঞ্চিৎ অভিমান ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সোজাসুজিভাবে গোপীমোহনের নিদ্রাভঙ্গের কোন চেষ্টা না করিয়া সে খাটের পাশেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া গভীর একাগ্রতার সহিত সুপারি কাটিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

উৎকলী যাঁতির অবিশ্রান্ত খট্ খট্ শব্দ ও দোক্তাকুষ্টা মোক্ষদার সজোর হিক্কাধ্বনিতে বেচারা গোপীমোহনের তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া যাইতে বিলম্ব হইল না। 'মোক্ষদা আসীনা' দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সপ্রতিভ ভাবে গড়্গড়ায় গোটা দুই টান দিয়া একটু গলা ঝাড়িয়া বলিলেন—"কি গো! আজ যে খাওয়া দাওয়া খুব সকাল সকাল সেরে নিয়েছ! ব্যাপার কি?"

মোক্ষদা সেই রূপ কার্য্যরত ভাবেই উত্তর দিল—"আহা! ঘুমোও না বাপু! আমি কি তোমায় ডেকেছি ঘুম্ ভাঙাবার জন্য?"

গোপীমোহন বলিলেন "না—ঘুমোই নি তো। এই তোমার খেতে নিতে একটু দেরী আছে ভেবে কেবল কি না একটু—"মোক্ষদার বিরক্তির কথা ভাবিতেই স্বামীর কৈফিয়ৎ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও তামাকু সেবন সব এক সঙ্গে তাল পাকাইয়া গেল। মোক্ষদার বিরুদ্ধে, পশ্চাতে নানারূপ দৃঢ়তা চিত্তে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও, সম্মুখে আসিলেই তাঁহার সব কিছুই যেন পাক খাইয়া যাইত। মোক্ষদাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এক গাল হাসিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন—"তুমি যে ব'ল্‌ছিলে কি কথা আছে তোমার—খাওয়া দাওয়ার পর।"

মোক্ষদা মনে মনে একটু হাসিল। মাছ যতই সরিবার নড়িবার চেষ্টা করুক, তাহার জালের ঘাই ছিঁড়িয়া পলাইবার শক্তি তাহার নাই।

"থাক্ না সে কথা এখন; তুমি একটু ঘুমোও। আমার কথা আর এমন কি বিশেষ জরুরী!" বলিয়াই মোক্ষদা একবার, তাহার জীবনের কোন সুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া আসা, বিগত যৌবনের মাধুর্য্যটুকুকে স্মরণ করিয়া যথাশক্তি চোখ-মুখে তাহা টানিয়া আনিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

"তবুও।"

"বল্'ছিলুম—এবার পূজোয় কোথায় যাচ্ছ? ভবঘুরের মত চিরদিনই কি বিদেশে ঘুরে বেড়াবে? দেশের বাড়ী-ঘরগুলো তো বজায় রাখার দরকার! পুরোনো ঘরটরগুলো ভেঙে ফেলে আমাদের থাক্‌বার মত একটা নতুন বাড়ী উঠিয়ে নিলে, তোমার ছুটি ছাটার সময় দেশে গিয়ে থাকা হয়। তাতে বাপের ভিটেটাও বজায় থাকে, সম্পত্তি অল্প স্বল্প যা আছে, তাও দেখা-শুনা হয়। চিরদিন কি বিদেশেই কা'টবে?" বলিয়াই মোক্ষদা বেশ গম্ভীর ভাবে স্বামীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ মোক্ষদার এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া গোপীমোহন একটু আশ্চর্য্য হইয়াই বলিলেন—"আমার আবার দেশ কোথায় মোক্ষি! বাপের ভিটে তো পড়াশুনো ক'র্‌বার সময়ই বিক্রী হ'য়ে গেছে। নূতন ক'রে আবার সে সব কেন্‌বার হাঙ্গামা ক'রে লাভ কি বল? আর ক'র্‌লেই বা সে সব কার জন্যে! ছেলে পুলেও নেই; দুটি প্রাণী; আমার এই অল্প আয়ের যা অবশিষ্ট থাক্‌বে, তাতেই কোনরকমে বাকী জীবনটা এইখানেই কেটে যাবে।"

"তোমার বাবার ভিটে না থাক্‌লেও, আমার বাপের ভিটে তো এখনো যায় নি। আর ভোগ-দখল ক'র্‌বার লোকই বা নেই কেন? বালাই! তোমরা আপন-জনকে গোছাও না, তাই বলো। নইলে এই তো মণ্টু—আমার মামাতো ভাই, চিঠির পরে চিঠি লিখ্‌ছে। একটু আদর আহ্বান পেলেই সে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ছুটে আস্‌বে।"

গোপীমোহন যেন অবাক্ হইলেন। মোক্ষদার পৈত্রিক

বাসভূমি ও সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহা সবই তো তাঁহার পরলোকগত শ্বশুর মহাশয় রাধাকিশোরের নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি সেইরূপ বিস্মিতভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাবা সে সবই তোমার দাদাকে দিয়ে গিয়েছিলেন না—মোক্ষদা ?"

"তুমিও যেমন দেখেছ! বাবা লিখে দিয়েছিলেন না হয়; কিন্তু দাদার বংশে যখন বাতি দিতেও রইলো না কেউ, তখন ওসব তো এখন আমাদেরই ন্যায্য পাওনা। এই সব ভাব-গতিক বুঝেই তো সেদিন ঐ ঝানু মেয়েটি এসেছিলো, মিষ্টি কথায় এ সব হাত ক'র্‌বার মত্‌লবে। কিন্তু আমার কাছে উড়ে যাওয়া বড় সোজা নয় যাদু। তুমি যাবে ডালে ডালে, আমি যাবো পাতায় পাতায়।"

"সে কি কথা মোক্ষি! অন্নকে তুমি ভুল বুঝেছ; রাধাকিশোরের মেয়ে সে। মা-বাপের জীবনের সব কিছু তেজ ও সব কিছু গুণ তার ভিতর আছে। সম্পত্তির মায়া কোনো দিনই তার অন্তরকে নীচ ক'রতে পারে না। সম্পত্তির অভাব তো তার নেই। তোড়নগাঁয়ে তার স্বামীর যে সম্পত্তির সে মালিক, তার কাছে চাঁদপুরের সামান্য জমি জমা কত তুচ্ছ তা' তুমি জানো না। রাধু দা যেদিন জামাইএর মৃত্যুর খবর পেয়ে আমার কাছে বৌদিকে দিয়ে সেই কয়েকটা লাইনের চিঠিখানা লিখিয়া ছিলেন,—সেইদিনই বুঝেছিলুম, সম্পত্তি তাদের কাছে কত সামান্য জিনিষ। মেয়ের সব সুখই যদি অকালে শেষ হ'য়ে গেল, তা'হ'লে আর সম্পত্তি নিয়ে কি হ'বে বল ?"

"ওগো, সে আমি সব বুঝি। সম্পত্তির মায়া ছেড়ে দেওয়া অত সহজ নয়। তোমার ওকালতি বুদ্ধির কাছে টিঁকে উঠ্‌তে পা'র্‌বে না বলে'ই কায়দা ক'রে কাজ সিদ্ধির জন্যে এসেছিল সে। মানুষকে আমি ঠিক্ চিন্‌তে পারি, তা জেনে রেখো।"

"ভুল বুঝেছ, মোক্ষদা। তাকে তুমি চেন না। সে বোধ হয় নিতান্ত অসহায় হ'য়েই আমাদের কাছে এসেছিল। সম্পত্তির অভাব তার নেই; তোড়ন গাঁয়ের অত বড় সম্পত্তির মালিক সে। আমার মনে হয়, অনাথা বিধবা সে—তোড়ন গাঁয়ের সে সম্পত্তিতে হয় তো সে দখল নিতে পারে নি; শরীকরা সব বেদখল ক'রে ফেলেছে। অনি চলে' যেতেই আমার সে কথা মনে হ'ল। নইলে, কাশীতে গিয়ে তারা ছিল কেন? নিতান্ত সহায়হীনা বিধবার পক্ষে হয় তো সে নির্জ্জন পুরীতে প্রবেশ করার অধিকার পাওয়া খুবই অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে। তার জন্যেই আমার সাহায্য পেতে এসেছিল—বোধ হয় তার শ্বশুর তো সবই—"

গোপীমোহনের কথা শেষ না হইতেই মোক্ষদা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"ভালো দেখেছ তুমি! অমন যার বয়েস আর রূপের চটক্ তার আবার সহায় সম্বলের অভাব।"

"মোক্ষদা!" গোপীমোহনের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তাঁহার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। মোক্ষদার উপর ঘৃণায় তাঁহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। এই মোক্ষদা রাধাকিশোরের ভগিনী! যে রাধাকিশোর মোক্ষদাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন! সামান্য স্বার্থের চিন্তাও যে মানুষের অন্তরকে এতো নীচ করিয়া দিতে পারে, তাহা গোপীমোহন কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

মোক্ষদা তখন দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটা সুপারিকে দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য সজোরে যাঁতির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

গোপীমোহন কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মোক্ষদার পানে ফিরিয়া চাহিতেও যেন তাঁহার ঘৃণা হইতেছিল।

(১৯)

মঞ্জিষ্ঠার চেষ্টায়, আহার বাসস্থান ও মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে, অনি শ্যামবাজারে সুরথবাবুর বাড়ীর গৃহশিক্ষয়িত্রী-রূপে নিযুক্তা হইল।

কণা সবেমাত্র সাত বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে; ঠিক সৌন্দর্য্য-চন্দ্রমার শুক্লা সপ্তমীর চাঁদখানির মত। জীবন-উষার সবটুকু স্নিগ্ধতা যেন প্রকৃতি আপন-হাতে কণার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়াছেন। ভোরবেলাকার টগরের মত তার ফুটফুটে রঙ, আর তাহারি বুকের নির্ম্মল শিশিরের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল চোখ দুটী; সারা মুখখানি যেন প্রভাত-সূর্য্যের সোণালী কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া আছে।

মঞ্জিষ্ঠার ডাক শুনিয়াই কণা যখন ছুটিয়া আসিল, তাহার ঘাড় পর্য্যন্ত লম্বা মখ্‌মলের মত থোকা থোকা চুলের গোছাগুলি দোলাইতে দোলাইতে, অনির অন্তরের কারারুদ্ধ 'মা' যেন সহসা তাহার লৌহ নিগড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। এই কণা! এই কণাকে ছাত্রীরূপে পাইবে সে তাহার কোলের পাশে! এ যে ভগবানের অসীম দয়ার দান। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, নিজের অদৃষ্টের ক্রুর পরিহাসের কথা স্মরণ করিয়া; এই কণাকে কোলে পাইবার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই যে তাহার হীন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে—শুধু তাহার অর্থের লালসায়। কণাকে বুকে করিয়া লইবার বিনিময়ে তাহাকে বেতন গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর পরিহাস তাহার অদৃষ্টে আর কি থাকিতে পারে!

"পিছিমা" বলিয়া মঞ্জিষ্ঠার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, কণাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, মঞ্জিষ্ঠা তাহার চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে বলিল—"কণি-মা, এই দেখ তোমার গুরু-মা এসেছেন।"

মঞ্জিষ্ঠার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কণা একবার অনির পানে চাহিল। তাহার পর মঞ্জিষ্ঠার কাণের কাছে মুখখানিকে সংলগ্ন করিয়া বলিল—"গুরু-মা?"

"হাঁ, গুরু-মাকে নমো কর মাণিক!" বলিয়া মঞ্জিষ্ঠা তাহাকে অনির দিকে একটু ঠেলিয়া দিতেই, কণা তাঁহার কোল হইতে নামিয়া অনির পায়ের কাছে মাটির উপর মাথাটি ঠেকাইল।

অনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল—অন্তরের সমস্ত স্নেহ ও আগ্রহ দিয়া। এ যে তাহার জীবনে ভগবানের দেওয়া পূত নির্ম্মাল্য; তাহার মরুভূমিতে শান্তিধারা!

কণা অনির ঠোঁটের উপর নিজের কচি হাতখানি দিয়া তাহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি গুরু-মা?"

অনি তাহাকে বুকের উপর আরো একটু নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"হাঁ, মাণিক!"

কণার রকম দেখিয়া তখন তাহার মামীমা নীলিমা দেবী মঞ্জিষ্ঠার মুখপানে চাহিয়া হাসিতেছিলেন।

অনির মনে কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিতেছিল—

"ওরে ও হাস্য-সরল নৃত্য-চপল কুরঙ্গ!
এ যে মোর উন্মনা মন-বিহঙ্গ॥"

কণা মঞ্জিষ্ঠার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও সুরথবাবুর ভাগিনেয়ী। সুরথবাবু এবং নীলিমার সমস্ত স্নেহ ও যত্নের একমাত্র ধন হইয়া কণা পলে পলে বাড়িতে থাকিলেও, অনি মঞ্জিষ্ঠার নিকট কণার এই এক-কণা জীবনের যে ছোট্ট ইতিহাসটুকু শুনিয়াছিল, তাহাতে তাহার মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-উৎস যেন সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল—কণাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য। এই কচি শিশু কণা জন্মের সাথে সাথেই কোন পূর্ব্বজন্মের নিষ্ঠুর অভিশাপ মাথায় করিয়া আনিয়াছিল, কে জানে! কণা যখন সবেমাত্র দুই বৎসরের, এই আধো আধো ভাষা তখনো তাহার কণ্ঠের মধ্যে জড়াইয়া ছিল, সেই অবিকসিত উষার কণা বঞ্চিত হইয়াছে—জীবজগতের অতুলনীয় সম্পদ মাতাপিতার স্নেহ-সিংহাসন হইতে। উর্ম্মিলা মরিয়া শান্তি পাইয়াছে। কিন্তু তাহার বুকের রক্ত দিয়া তৈরী স্মৃতির একটী কণা—এই কণার জীবনের শুভ্র ও স্বচ্ছ ছবিখানির উপর ভগবান যে কালো তুলির দাগ টানিয়া দিলেন তাহা তো সে মুছিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

মঞ্জিষ্ঠার নিকট কণার ও উর্ম্মিলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিলেও, আজ কণাকে দেখিয়া অনির মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নই ঠেলিয়া উঠিতেছিল। এই ফুলের মত সুন্দর মেয়েটীর জীবনেও যে ভগবান এত বড় বিপ্লব বাধাইয়া তুলিলেন কেন, তাহা অনি ভাবিয়া পাইতেছিল না।

পথে বাহির হইয়া অনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া মঞ্জিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা দিদি, কণার বাপ্‌ যে কোনো বিষয় না ভেবে চিন্তে এতবড় একটা কাণ্ড ক'রে ব'স্‌লেন, উর্ম্মিলা তাতে কি নিজের মান রক্ষার জন্যে কোনো কথাই বলেন নি? আমার মনে হয়, যদি তাঁর স্বামীকে তিনি সে বিষয়ের সত্যমিথ্যে সব স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিতেন, তা হ'লে হয় তো পরিণামটা অতদূরে গিয়ে দাঁড়াতো না।"

ঈষৎ ভাবিয়া লইয়া মঞ্জিষ্ঠা বেশ স্থির ভাবেই উত্তর দিলেন—"উর্ম্মিলা কি ব'লেছিল তা জানি না। তবে সত্য সতীত্বের যে একটা তেজ তার ছিল, তা সে স্বামীর কাছে

নিশ্চয়ই খাটো করে নি। তাঁকে আর কেউ না চিনুক, আমি তো খুব ভালো ভাবেই চিন্‌তুম্ অনি। স্বামীর প্রতি তার যে ভক্তি ও ভালবাসা ছিল, তার মর্য্যাদা বোধ হয় দাদা কোনো দিনই বুঝ্‌তে পারেন নি। কি জানি! ঐ দাদাই আবার একদিন উর্ম্মিলার ভালবাসায় আত্মহারা হ'য়ে তাকে বিয়ে ক'র্‌বার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজেই উর্ম্মিলার বাপ সমাধীশ বাবুর কাছে ঐ বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। তাতে সমাধীশ বাবুই বরং উপদেশ দিয়ে দাদাকে কত ক'রে বুঝিয়েছিলেন যে আগে লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, পরে ও-সব হবে। আর দাদাও—" মঞ্জিষ্ঠা থামিয়া গেলেন।

মঞ্জিষ্ঠাকে নীরব হইতে দেখিয়া অনি বলিল—"থাম্‌লে যে দিদি?"

"কি আর বল্‌বো বল্? জ্যেঠতুতো ভাই হ'লেও দাদাকে ঠিক সহোদরের মতই শ্রদ্ধা ক'র্‌তুম। বিশেষতঃ উর্ম্মিলা মাঝখানে এসেই যেন সেটাকে আরও ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল।" মঞ্জিষ্ঠার বুকখানা কাঁপাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

মঞ্জিষ্ঠা সাধারণতঃ বাক্‌পটিয়সী হইলেও, উর্ম্মিলা ও দাদার কথায় যেন তাহার ভাষা বাধিয়া যাইতেছিল। তাহার ভ্রাতৃ-স্নেহ দাদাকে বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও, বন্ধুপ্রীতি উর্ম্মিলাকে রক্ষা করিবার জন্য যে তাহার ভিতর একটা ঝড় তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা মঞ্জিষ্ঠার ঐ সংক্ষিপ্ত কয়েকটা কথার ভিতর দিয়াও অনির বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় নাই। উর্ম্মিলার জীবন ও মঞ্জিষ্ঠার দাদার অবিচার—এই দুইটী জিনিষকেই যখন অনি পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দেখিল, তখন যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই সমস্ত পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে অনির সারা অন্তর বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া উঠিল। একজন ছুটিবে তাহার জীবনের সব-কিছুকে নিঃশেষে নিবেদন করিবার আকাজ্ক্ষায় তাহার প্রার্থিত শরীরী দেবতার চরণপ্রান্তে, আর অপর, সেই নিবেদিত-আত্মার উপায়ান্তর-হীনতার অবসর লইয়া—শুধু নিজের খেয়ালের নেশায়—ছিনি-মিনি খেলিবেন তাহার জীবন-মৃত্যুর সমস্যা লইয়া। উর্ম্মিলা ছিল মঞ্জিষ্ঠার আবাল্য বান্ধবী। উর্ম্মিলার প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে মঞ্জিষ্ঠা অন্তর দিয়া চিনিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় এই জায়গায় তাহার দাদাকে সেও ক্ষমা করিতে পারে নাই। দাদা—তাহার সহোদর না হইলেও—সহোদর অপেক্ষাও উচ্চ আসন পাতিয়াছিলেন মঞ্জিষ্ঠার হৃদয়ে, শুধু তাহার প্রিয়তমা বান্ধবী উর্ম্মিলার স্বামী বলিয়াই। আর সেই দাদার ভিতর দিয়া সমস্ত পুরুষজাতির স্বরূপ দেখিয়াই বোধ হয় আজ মঞ্জিষ্ঠা আমরণ কৌমার্য্যের সঙ্কল্প লইয়া নিজেকে শুধু দেশের কাজে নিবেদন করিয়া দিয়াছে।

দাদার কথা-প্রসঙ্গে সেদিন মঞ্জিষ্ঠা বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলিয়াছিল—"অনি, মানুষকে চেনা বড়ই কঠিন। বন্ধু হোক্, আত্মীয় হোক্, স্বজন হোক্—দুনিয়ায় যে সব চেয়ে প্রিয় ও আপনার, তাকেও চেনা যায় না। মানুষ মানুষকে চিন্‌তে পারে না ব'লেই এমন পদে পদে ঠেক্‌ছে, বিশ্বাসের মূল আল্‌গা হ'য়ে পড়্‌ছে। বিশেষতঃ এই শিক্ষিত সমাজের লোকগুলোর বাইরের আবরণ যেন আরো বেশী পুরু; সহজে ভেদ করা যায় না।"

মঞ্জিষ্ঠা কথাগুলি একটু দুঃখের সঙ্গেই বলিয়াছিল, অনিও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল তাহা কত সত্য।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া মঞ্জিষ্ঠা একখানি গাড়ী ডাকিয়া অনিকে লইয়া উঠিয়া বসিল। অনি তখনো বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল।

কোচ্‌ম্যানকে গন্তব্য স্থানের ঠিকানা দিয়া, মঞ্জিষ্ঠা পুনরায় বলিতে সুরু করিল—"আর একটা কথা কি জানিস্ অনু, মানুষ যতদিন না ঠেকে, ততদিন নিজের ভুল সে ধ'রতে পারে না। জ্যেঠা মশায়ের বিরুদ্ধে কি হীন ধারণাটাই না মনে মনে পুষে রেখেছিলুম্! তাঁকে দেখ্‌বার সৌভাগ্য অবিশ্যি জীবনে কোনো দিন হয় নি; কিন্তু ব্রাহ্ম হওয়ার জন্যে তিনি বাবাকে এমন শাসনই ক'রেছিলেন যে, দেশের বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ্‌বার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত তিনি জন্মের মত ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সব কারণে গোড়া থেকেই আমার মনটা জ্যেঠা মশায়ের উপর বিগ্‌ড়ে ছিল। তার পর যখন দাদা কোলকাতায় পড়্‌তে এলেন, তখন সেটা একবারে চরম হয়ে দাঁড়ালো।"

কথাটা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে না পারিয়া অনি প্রশ্ন করিল—"কেন? তোমার দাদাও বুঝি তোমাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখ্‌তে পার্‌তেন না তাঁর বাপের ভয়ে?"

মঞ্জিষ্ঠা বলিল—"না; সে রকম নিষেধ অবিশ্যি জ্যেঠা-

মশায়ের ছিল না। তবে দাদার উপরও তাঁর যে রকমের কড়া শাসন দেখ্‌তুম, তাতে মনে হ'ত যেন সবই জ্যেঠা মশায়ের বাড়াবাড়ি। বাবার কাছেও সে কথা দুই একদিন তুলেছিলুম; কিন্তু বাবা সেগুলো মোটেই কাণে নেন্ নি। অদ্ভুত! বড় ভাই তাঁকে দেশছাড়া ক'রেছিলেন, অথচ বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি কখনো ব'লতে দিতেন না কাকেও।

"আমি যেদিন বাবাকে গিয়ে ব'ললুম—'বাবা, আমার মনে হয় জ্যেঠা মশায় বোধ হয় খুব বেশী লেখাপড়া শেখেন্ নি ব'লেই তিনি আধুনিক সভ্যতা ও চাল্-চলনের ওপর অত চটা: এর প্রকৃত আলোকটুকু বোধ হয় তাঁর অনুভব ক'রবার ক্ষমতা নেই।' তখন বাবা কি বললেন জানিস? তিনি রেগে আগুন হ'য়ে বলে' উঠ্‌লেন—'মঞ্জু, তোমরা মস্ত ভুল ক'রচো। দাদাকে তুমি চেন না ব'লেই এ কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। তাঁর মত জ্ঞানী ও সীধে লোক দুটি নেই। স্নেহ-ভালবাসাও তাঁর অফুরন্ত আছে; কিন্তু কর্ত্তব্যকে তিনি সকলের উপরে স্থান দিয়ে রেখেচেন'।

"আমার সঙ্গে তখন দাদার ঘনিষ্ঠতাটা খুবই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সবের ভিতর দাদারও অনেকখানি যোগ ছিল। তার জন্যেই বোধ হয় আমি অতবড় ভুলটা ক'রে ব'সেছিলুম।" আরও কি একটা কথা বলিতে গিয়া মঞ্জিষ্ঠা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

মঞ্জিষ্ঠার পিতা সরোজচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ লইয়া অগ্রজের সহিত মনোমালিন্য হইলেও, সরোজবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রতি কখনো শ্রদ্ধাহীন হইতে পারেন নাই। তিনি সারা জীবন কলিকাতাতেই কাটাইয়াছিলেন। দেশের সম্পত্তি ও বাড়ীঘর সমস্তই ত্যাগ করিয়া, তিনি দাদার শাসন মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন। সরোজবাবু যে সঞ্চিত অর্থ ও কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন, একমাত্র কন্যা মঞ্জিষ্ঠার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ছিল।

পিতার জ্ঞান, উদারতা ও বিবেচনা সম্বন্ধে মঞ্জিষ্ঠার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও সে তখন জ্যেষ্ঠতাত সম্বন্ধে পিতার অভিমতগুলিকে মানিয়া লইতে পারে নাই। সে ভাবিত—দাদার ব্যবহার কত সুন্দর! কত মোলায়েম! দাদাও তো সেই জ্যেঠা মশায়ের ছেলে! কিন্তু নিশ্চয়ই দাদার অন্তর এতো প্রশস্ত হ'য়েছে শুধু শিক্ষার গুণে। এমন শিক্ষিত ও সুসভ্য ছেলেকেও যে জ্যেঠামশায় জবরদস্তি ক'রে চালাতে চান্ সেটা কেবল তাঁর গোঁ।"

দাদার মার্জ্জিত রুচি ও মোলায়েম ব্যবহার মঞ্জিষ্ঠা-দিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। দাদার পক্ষ সমর্থনের জন্য জ্যেঠা মহাশয় কেন, যে কোন অভিভাবকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেও বোধ হয় মঞ্জিষ্ঠা পশ্চাৎপদ হইত না।

কিন্তু আজ আর মঞ্জিষ্ঠা সে দাদাকে সমর্থন করিতে পারে না, তাঁহার বিরুদ্ধে মঞ্জিষ্ঠার সমস্ত অন্তঃকরণ আজ ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দাদার বাহিরের সে আবরণটা যে ভিতরের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ্‌ছাড়া, তাহা মঞ্জিষ্ঠা পূর্ব্বে কখনো কল্পনাও করিতে পারিত না। সামান্য কারণে, এমন কি অকারণে, যে মানুষ এত বড়ো একটা বিপ্লব বাধাইয়া তুলিতে পারে, নিজের খেয়ালে পরের জীবনকে পর্য্যন্ত পথের ধূলার মত উড়াইয়া দিতে পারে, তাহা মঞ্জিষ্ঠা ভাবিতেও পারে নাই।

উর্ম্মিলার সম্বন্ধে কথাটা আরও পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অনি অনেকক্ষণ হইতেই ইতস্ততঃ করিতে-ছিল। মঞ্জিষ্ঠা নিজ হইতে কথাটা সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাবে বলিল না দেখিয়া এবার অনি দুই একটা ঢোঁক গিলিয়াই প্রশ্ন করিয়া বসিল—"আচ্ছা দিদি, উর্ম্মিলার চরিত্রের ওপর অতবড় একটা কুৎসিত সন্দেহ ক'রবার কারণ কি? তিনি কি কারো সঙ্গে তেমন মেলামেশা ক'রতে দেখেছিলেন তাকে?"

"দাদা সেই হীন সন্দেহটা প্রকাশ ক'রেছিলেন প্রোফেসর এন, চৌধুরীর সম্বন্ধে; অথচ প্রোফেসর চৌধুরীকে দাদা কোনো দিন চোখেও দেখেন নি। সুতরাং সে-রকম সন্দেহ হবার কারণ কি, তা দাদাই জানতেন। উর্ম্মিলা মেলামেশা তেমন কারো সঙ্গেই কখনো করে নি। একমাত্র প্রোফেসর এন্, চৌধুরীর সঙ্গেই সে মিশতো বটে, তা তার মাঝখানে তো আমরাই ছিলুম—আমি আর নীলিমা। আর সেই মেলামেশারই বা এমন কি গুরুত্ব ছিল! উর্ম্মিলা তো বরং আস্‌তে রাজী হ'ত না; কেবল আমি আর নীলিমা তাকে ক'দিন জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছলুম আলিপুর গার্ডেনে, আর বায়স্কোপে। তাতে যে

অপরাধের কি হ'য়েছিল তা বুঝতে পারি নি বোন্। মাঝখান্ থেকে আমরাও নিমিত্তের ভাগী হ'য়ে রইলুম্।" মঞ্জিষ্ঠার চোখ দুইটি জলে চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

মঞ্জিষ্ঠার হাঁটুর উপর ডান্ হাতখানি রাখিয়া অনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"প্রোফেসর এন্, চৌধুরীটি কে দিদি?"

দুঃখের ভিতরেও মঞ্জিষ্ঠার গাল দুইটী নিমেষে একবার লাল হইয়া উঠিল; একটা সলজ্জ বক্র-দৃষ্টিতে অনির মুখের দিকে চাহিয়া সে ছোট্ট করিয়া বলিল—"আমার বন্ধু"। তাহাদের সম্বন্ধটুকু বুঝিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। অনিরও বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

গাড়ী মহিলা-নিবাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জিষ্ঠা ভাড়া মিটাইয়া দিয়া অনির হাত ধরিয়া ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল।

উপরে উঠিতে উঠিতে অনি মঞ্জিষ্ঠার হাতে একটু চাপ্ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, জীবনটা কি এমনি কাটবে; বিয়ে থা' ক'রবে না?"

মঞ্জিষ্ঠা বেশ সহাস্য অথচ দৃঢ়ভাবেই উত্তর দিল—"মনের বিয়ে কি দেহের বিয়ের চেয়ে ছোট অনি? স্ত্রী হওয়ার চেয়ে সহধর্ম্মিণী হ'য়ে জীবন কাটানো কি কম তৃপ্তির? যাঁকে ভালবাসি—তাঁর জীবনের ব্রত ও উদ্দেশ্যকে মনে-প্রাণে বরণ ক'রে নিতে পা'রলেই নিজেকে সার্থক মনে ক'রবো।" কথাটা অনির শিরায় শিরায় যেন একটা ঝঙ্কার তুলিয়া বাজিয়া উঠিল।

(২০)

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া প্রথমে সুলতার অসুখ, পরে কাজের চাপ ইত্যাদি নানা কারণে বনবিহারী মেজরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার উপর একে একে দিনগুলি যতই কাটিয়া যাইতেছিল, বনবিহারীর মনে ততই একটা অকারণ-দুর্ব্বলতা গড়িয়া উঠিতেছিল। মেজরের অনুপস্থিতিতে অনিকে তাঁহার আশ্রয় হইতে লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি না, বনবিহারী তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। বনবিহারী যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দিক হইতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও অকলঙ্ক হইলেও, মেজর ব্যাপারটাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহা বলা যায় না। মেজরের মনে যদি এ সম্বন্ধে কোন কুৎসিত ধারণা হইয়া থাকে, সে ধারণা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, বনবিহারীকে হয় তো তিনি এত হীন ও ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন যে, বনবিহারী সে লাঞ্ছনা কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। দেখিতে দেখিতে অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তথাপি বনবিহারী ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি মেজরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কি না!

কয়েক দিন পরে বনবিহারী অনির একখানি পত্র ও প্রেরিত মণিঅর্ডার পাইলেন। মণিঅর্ডারের টাকা লইতে বনবিহারীর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহা ফেরৎ দিতে পারিলেন না; কারণ, তিনি ইহা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার নিকট অনি ঋণী হইয়া থাকিবে না। তিনি প্রত্যাখ্যান করিলে সে হয় তো আরও ব্যথিতা হইবে। অনিকে তিনি ভাল ভাবেই জানিয়াছিলেন। বনবিহারী টাকা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণে বিশেষ অতৃপ্তি বোধ করিলেও, অনি যে তাহার জীবিকা অর্জ্জনের একটা উপায় করিয়া লইতে পারিয়াছে, এইটুকু জানিয়া বনবিহারীর মনে কতকটা সোয়াস্তি হইল।

অনি তাহার পত্রে মেজরের সংবাদ লইতেও ভুলে নাই। পূর্ব্বে মেজরের প্রতি অনির যে দারুণ বিতৃষ্ণার ভাব বনবিহারী লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই, যে, অনি মেজরের খোঁজ-খবর লওয়ার বিষয়ে এরূপ সতর্ক থাকিবে। অনির পত্রখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া, বনবিহারীর সহসা যেন নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি খেয়াল হইল। সব বিপদ আপদ ও দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও কর্ত্তব্যকে কিরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তাহা অনির পত্রের এই কয়েকটী ছত্র হইতেই তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

সেই দিন বিকালের ট্রেনেই বনবিহারী মেজরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন।

বনবিহারী যখন মেজরের কোয়ার্টারে আসিয়া পৌছিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; বাহিরের ঘরে আলো জ্বালা হইয়াছে। দরজার সম্মুখে আসিতেই বেয়ারা শিউকিষণ সসম্মানে কুর্ণিশ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। শিউকিষণ বনবিহারী বাবুকে ভাল ভাবেই

চিনিত। বনবিহারী তাহার কুশল প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাহেব হ্যায় ?"

শিউকিষণ একটা ঢোঁক গিলিয়া একটু বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দিল—"সাহেব তো হিঁয়াসে বদ্‌লি হো গিয়া হুজুর! আজমগড়।"

"কব্!" বনবিহারী বাবু যেন হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মেজর এত শীঘ্র সহসা বদ্‌লি হইয়া গেলেন কেন, তিনি তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া লইবার জন্য আর একবার বেশ স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সাহেব—মেজর এ, রায় ?"

"হাঁ হুজুর!" শিউকিষণের কণ্ঠ যেন একটু ভারি হইয়া উঠিতেছিল। ব্যথিত বেয়ারা জানাইল সে তাহার বার্দ্ধক্যের জন্য সাহেবের সঙ্গে আর নূতন জায়গায় যাইতে পারে নাই। শেষ বয়সে আর ঘর সংসার ছাড়িয়া কোথাও যাইবার ইচ্ছাও তাহার নাই। চাকুরি করিবার সখ্ তাহার মিটিয়া আসিয়াছে।

মেজর রায়কে শিউকিষণ অত্যন্ত স্নেহ করিত। চাকর হইলেও, তাহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় প্রভুকে সন্তানের ন্যায় ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পুর্ব্বেই মেজরের ট্রান্সফার্ হইবার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া বনবিহারীর মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। শিউকিষণকে সকল কথা প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলেও তিনি ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। চাকরের নিকট প্রভুর ব্যক্তিগত জীবনের খোঁজ লওয়া সঙ্গত হইবে কি না, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

শিউকিষণ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"আঃ দেওতাকে মাফিক্ আদ্‌মি—একদম্ ঐসা বন্ গিয়া!"

শিউকিষণের কথা কয়টা কাণে যাইতেই বনবিহারীর সঙ্কোচ ও দ্বিধার বাঁধ নিমেষে ভাঙিয়া গেল। বেয়ারার পিঠের উপর হাত দিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"শিউকিষণ, মেজরকা খবর সব্ আচ্ছা তো ?"

"নেই হুজুর!" বৃদ্ধের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিতেছিল।

বনবিহারী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। মেজরের খবর ভাল নয় শুনিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শিউকিষণকে আরও নিকটে টানিয়া লইয়া তিনি মেজরের সম্বন্ধে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ব্যথিত হৃদয়ে বেয়ারা বলিয়া চলিল—তাহার প্রভুর সেই কল্পনাতীত পরিবর্ত্তনের কথা। বৃদ্ধের শীর্ণ গণ্ডস্থল চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছিল।

বৃদ্ধের নিকট মেজরের সম্বন্ধে যাহা শুনিলেন, তাহাতে বনবিহারীর অন্তর শুকাইয়া উঠিল। সেই মেজর,—অত স্থির, দৃঢ় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ,—হঠাৎ যে তাঁহার এত দুর অধঃপতন হইতে পারে, তাহা বনবিহারী কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে সরকারী কার্য্যে অবহেলা করার জন্যই মেজরকে ট্রান্সফার্ করা হইয়াছে।

শিউকিষণ্ সকল কথা পরিষ্কার ভাবে গুছাইয়া বলিতে না পারিলেও, যতটুকু বলিল, তাহাতেই বনবিহারী বুঝিলেন—মেজর কত নীচে নামিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকেন; সরকারী কার্য্যে একবারও বাহির হন্ না। বাহিরের ডাক তো দূরের কথা, হাঁস্‌পাতালের জরুরী কাজে পর্য্যন্ত আজ দুই মাসের মধ্যে একটি দিনও বাহির হন্ নাই। মিয়মিত খাওয়া শোওয়া প্রভৃতি কাজ সম্বন্ধে যিনি অত তৎপর ছিলেন, সেই মেজর যে এখন নিজের শরীরের প্রতিও ওরূপ ভাবে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বনবিহারীর হৃদয় একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। অনি চলিয়া যাওয়ার পর হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ও পরিবর্ত্তন মেজরের জীবনে ঘটিয়া আসিতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু বেয়ারার মুখ হইতে নিতান্ত অসংলগ্নভাবে শুনিলেও, বনবিহারীর চক্ষে যেন ইহার অন্তরের রহস্য আপনা-আপনি অনেকখানি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মেজরের এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের সহিত যে অনির সেই বেনারস্ ত্যাগের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা বনবিহারীর বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু হঠাৎ কি বিষয় লইয়া এই বিপ্লব এতদূর গড়াইয়াছে তাহা তিনি ভাবিতে পারিলেন না।

শিউকিষণের নিকট বিদায় লইয়া বনবিহারী সেখান

হইতে ফিরিলেন। সারা পথ কেবল মেজরের কথাই তাঁহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল। বিশেষতঃ মেজরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার ভয় হইতেছিল। এই কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি নিউমোনিয়া হইতে কোনরূপে সারিয়া উঠিয়াছেন; তাহার উপর ঐরূপ অপরিমিত অত্যাচার ও অনাচারের পরিণাম-ফল যে অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বেনারসে থাকিতে বন্ধুবান্ধবগণের সাময়িক জবরদস্তিরও যে ভয়টুকু ছিল, আজমগড়ে গিয়া তাহারো বালাই থাকিবে না। সেখানে মদ খাওয়া হয়তো আরো পুরা দমেই চলিবে। তাঁহাকে জোর করিয়া ফিরাইবার কেহই নাই। চাকরেরা হয় তো তাঁহার মতের বিরুদ্ধে—খাওয়া দাওয়ার বিষয় পর্য্যন্ত লইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতে সাহস করিবে না।

বনবিহারীর ইচ্ছা হইতেছিল সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে জানাইয়া অনিকে আসিবার জন্য লিখিয়া দিতে। মেজরের রোগ-শয্যায় তিনি বহুবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে, তাঁহার উপর অনির বেশ একটা জোর আছে; মেজরও অন্তরের সহিত অনির অসন্তুষ্টিকে ভয় করিয়া চলেন। সুরার স্বাভাবিক ধর্ম্মের ভিতর এমন একটা আকর্ষণ আছে, যাহা সুরাপায়ীকে নিঃশেষে আপনার মধ্যে টানিয়া লয়। এই আসক্তির হাত হইতে মানুষকে টানিয়া তুলিতে হইলে, এমন একটা শক্তির দরকার হয় যাহার নিকট সুরার আকর্ষণ আপনা-আপনি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। মেজরকে ফিরাইতে হইলে ঠিক্ সেই শক্তিরই প্রয়োজন। অনির শাসনকে মেজর কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না; তাঁহাকে ফিরাইবার লোকও বোধ হয় এক অনি ব্যতীত আর কেহই নাই। দেশেও যে মেজরের কোন নিকট আত্মীয় স্বজন নাই, তাহা তিনি মেজরের অসুখের সময়েই জানিয়াছিলেন।

বনবিহারী কোন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অনিকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিশেষ কিছু ফল হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। কারণ, যেভাবে অনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, এবং তাহার ভাবভঙ্গীর মধ্যে মেজরের প্রতি যে বিতৃষ্ণার ভাব তিনি পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার ন্যায় তেজস্বিনীর গতিকে পুনরায় আকর্ষণ করা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। আত্মসম্মান-জ্ঞান অনির অত্যন্ত প্রবল। বনবিহারী তাহাকে যতখানি চিনিয়াছিলেন, তাহাতেই স্থির জানিয়াছিলেন যে, তিনি কেন, সমস্ত বিশ্বের অনুরোধও অনিকে ফিরাইতে পারে কি না সন্দেহ। নিজের কর্ত্তব্যের বিষয়ে যেরূপ সতর্ক, আত্ম-সম্মান বাঁচাইয়া চলিতেও সে তদ্রূপ। পরের জন্য সে যেমন নিজেকে বিলাইয়া দিতে জানে, প্রয়োজন হইলে ঠিক্ সেইরূপে নিজেকে গুটাইয়া লইবার ক্ষমতাও তাহার আছে। অকারণে অনি কখনই বিচলিতা হয় না। কিন্তু বেনারস হইতে চলিয়া যাইবার সময় তাহার যে বিচলিত ভাব বনবিহারী লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সে কথা মনে হইতে আজ তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে, তাহার মধ্যে নিশ্চয় কোন একটা গুরুতর কারণ আছে। সে ক্ষেত্রে তাহাকে আবার ফিরাইবার জন্য অনুরোধ করা হয় তো তাঁহার উচিত হইবে না। তাহাতে অনি আরও ব্যথিতা হইয়া পড়িবে।

বনবিহারী যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। সুলতা তখনো তাঁহারই অপেক্ষায় জাগিয়া বসিয়া ছিল। বনবিহারী কোন সাড়া না দিয়া চুপি চুপি ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। বান্ধবী-বিরহ-বিধুরা লতি নিবিষ্ট চিত্তে অনির পত্রখানি লইয়াই নাড়া-চাড়া করিতেছিল; তাহার চোখ দুইটি যেন তখন বেদনায় ম্লান হইয়া গিয়াছে।

বনবিহারীকে দেখিয়াই, সুলতা তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"এত দেরী যে? ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে খুই একচোট্ ঝগড়া ক'রে এলে বুঝি?"

"না, মেজরের সঙ্গে দেখাই হ'ল না। তিনি আজমগড়ে বদ্‌লি হ'য়ে গেছেন।" বলিয়া বনবিহারী চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন।

সুলতা বেয়ারাকে চায়ের জল গরম করিতে বলিয়া, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল। বনবিহারী বলিলেন, "শুনলুম, মেজরের আশ্চর্য্য রকম অধঃপতন হ'য়েছে। তিনি আজকাল চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেতে সুরু ক'রেছেন, কাজকর্ম্ম কিছুই দেখেন না। আমার কাছে ব্যাপারটা যেন একটা হেঁয়ালি ব'লে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, অনি যাবার আগে তোমায় মেজরের সম্বন্ধে বা তার যাওয়া নিয়ে কিছু বলে'ছিল কি?"

"কৈ, না তো। তবে আমার মনে হ'চ্ছিল—তিনি বোধ হয় ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে রাগারাগি ক'রে চলে' যাচ্ছিলেন।"

"সে তো বোকারাও বুঝ্‌তে পেরেছিল। যাক্, মনে ক'র্‌ছি অনিকে একবার আস্‌তে লিখ্‌বো।" বলিয়া বনবিহারী জামা কাপড় ছাড়িবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন।

(২১)

সর্ব্বহারার জীবনে অতুল সম্পদের মত কণা অনির নিঃস্ব বুকখানিকে অল্প দিনের মধ্যেই ভরিয়া তুলিল। মাতৃহীনা কণাকে সর্ব্বস্নেহে বুকে জড়াইয়া অনিও তাহার সকল বেদনাই ভুলিয়াছিল। সমাজ তাহার শাসন শৃঙ্খলে অনির সব কিছু সম্পদকে বাঁধিয়া তাহার জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিলেও, তাহার নারী-হৃদয়ের সেই জন্মগত সম্পদ—মাতৃত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার অটুট হইয়া বাঁচিয়া ছিল। আজ কণাকে বুকে পাইয়া যেন অনির সেই অতুল সম্পদ আপন তরঙ্গে জীবনের কূল ছাপাইয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেখানে বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, সঙ্কোচ নাই; আছে শুধু এক জীবন-ভরা তৃপ্তি। সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তৃপ্তিতে অনির জীবন যেন আবার সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

কণা অনিকে 'গুরুমা' বলিয়া ডাকিত। কিন্তু সেই বৃন্তচ্যুত ছোট ফুলটির মত—মাতৃহীনা কণাকে কোলের কাছে পাইয়া অনির অন্তরের চিরবঞ্চিতা জননী 'মা' হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অনি সবলে সকল সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙিয়া কণাকে শুধু "মা" বলিয়াই ডাকিতে শিখাইয়াছিল। জীবনের মরুপথে যে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক ক্লান্ত চরণে উদ্দেশ্যহারার মত চলিয়াছিল, আজ সহসা এক সুশীতল শান্তি-উৎসের সন্ধান পাইয়া সে তো আর নিজের সেই পিপাসিত অন্তরকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। আপনার সব-কিছুকে সে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবেই।

এই নূতন পরিবারের মধ্যে আসিয়া অনির দিনগুলি বেশ ভালই কাটিতেছিল। নীলিমার সাহচর্য্য, মঞ্জিষ্ঠার বন্ধুপ্রীতি ও কণার মাতৃত্বের অধিকারটুকু পাইয়া তাহার জীবন যেন আবার সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। অনির সকাল সন্ধ্যা কাটিত নীলিমা ও কণাকে লইয়া; দুপুরে সে মঞ্জিষ্ঠার সহিত বাহির হইয়া পড়িত—সমিতির কাজে; সপ্তাহে দুই দিন করিয়া সরোজনলিনী বিদ্যালয়ে যাইত শিক্ষকতা করিতে। শূন্য জীবনের ফাঁকগুলি এই সব নানা কাজের ভিড়ে ভরিয়া উঠিয়া তাহার অন্তরের বেদনাকে যেন অনেকখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। দুশ্চিন্তা আর সারাক্ষণ তাহার বুকের উপর গুরুভারের মত চাপিয়া থাকিবার অবসর পাইত না। কিন্তু তাহার নিয়মিত কার্য্যের অবসর-সময়ে অনেকের কথাই মনে পড়িত। পশ্চিমের স্মৃতিকে অনি সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। সুলতা, বনবিহারী, মেজর, বয়, শিউকিষণ প্রভৃতি সকলের কথাই তাহার মনে হইত। মেজরের স্মৃতিকে অনি চেষ্টা করিয়াও মন হইতে সরাইতে পারে নাই। যাঁহার নিকট সে সহস্ররূপে ঋণী, যাঁহার উদার মহত্ব হইতে সে জীবনে অনেক কিছু পাইয়াছে, ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় একটী মাত্র ভুলের বোঝা কি সেই মেজরের সব কিছুকেই ডুবাইয়া দিবে! যখনই মেজরের কথা মনে হইত, অনি শুধু এই কথা লইয়াই বহুবার আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মেজরের কথা ভাবিতে গেলে, সেই পরিচয়ের প্রথম দিনটী হইতে—দাদুর অসুখের কথা, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি, নিজের আশ্রয়হীনতা—মেজরের সহৃদয়তা ও দৈনন্দিন ব্যবহার প্রভৃতি প্রত্যেকটী ঘটনা যেন অনির চক্ষে চলচ্চিত্রের মত ভাসিয়া উঠিত। যখনই সে অন্তরের সহিত সব কিছুকে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে—তখনই সে মেজরকে আর অশ্রদ্ধা করিতে পারে নাই। আবার পর মুহূর্ত্তেই হয় তো একটা দীর্ঘনিশ্বাস সব কিছুকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

অনি যতক্ষণ বাসায় থাকিত, নীলিমা প্রায় সকল সময়ের জন্যই তাহার কাছে কাছে থাকিত। নীলিমা ঠিক্ সুলতার মতই তাহার একটী স্নেহপরায়ণা বান্ধবী হইয়া উঠিয়াছিল। তবে সুলতার স্বভাবের সঙ্গে নীলিমার স্বভাবের একটা মস্ত পার্থক্য আছে। সুলতা সংসারের

পক্ষে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, ছোট্ট বালিকাটীর মত সরলা। সে যেন অনিকে কাছে পাইলেই নিজের সব কিছুকে অনির ঘাড়ে চাপাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিত। অনির উপর নির্ভর করিতে পাইলেই যেন সুলতা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। আর নীলিমা ছিল ঠিক্ তার বিপরীত। সে অনির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হইলেও, অনির খাওয়া শোওয়া প্রভৃতি সকল বিষয়েই রীতিমত অভিভাবকত্ব করিতে ছাড়িত না। অনিও তাহার এই স্নেহের শাসনকে খুব আনন্দের সঙ্গেই মানিয়া চলিত। নীলিমার স্বভাবের মধ্যে বিন্দুমাত্র কঠোরতা ছিল না। বিধাতা তাহার দেহখানিকে যেরূপ অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-সম্ভারে সাজাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার অন্তরখানিকেও সেইরূপ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিশেষ লেখাপড়া না জানিলেও নীলিমা বুদ্ধিমতী ও নিপুণা ছিল। সুরথবাবুর ক্ষুদ্র সংসার-খানিকে সে যেন এক আনন্দময় শান্তিনিকেতন করিয়া রাখিয়াছিল।

গৃহশিক্ষয়িত্রী রূপে অনি যেদিন প্রথম আসিয়া এই পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিল, সেদিন সে মনে মনে অনেক আশঙ্কা লইয়াই আসিয়াছিল। অন্ন-সমস্যা বিষয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেও, নিজের সম্মান-সমস্যা লইয়া অনি আর এখন অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া পারিত না। বিশেষতঃ সুরথবাবু যে সর্ব্বদাই বাড়ীর মধ্যে থাকেন, ইহা অনির নিকট ভাল লাগে নাই। সাধারণ পুরুষকে সে যেন এখন মনে মনে একটু ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু অনির সে সঙ্কোচটুকু কাটিয়া যাইতে বেশী সময় লাগিল না। সুরথবাবুকে সে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই চিনিয়া ফেলিল। সর্ব্বদা বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও সুরথবাবুর সহিত তাহার দিনান্তে কচিৎ সাক্ষাৎ হইত। তিনি সর্ব্বক্ষণ লেখাপড়া লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সীমানা ছিল শুধু লাইব্রেরী আর নিজের শয়নকক্ষটিকে লইয়া। বিশেষ কোনো প্রয়োজনে হঠাৎ সেই গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাঁহার ছিল না; পড়াশুনার নেশা সুরথবাবুকে সর্ব্বদার জন্য এতই মাতাল করিয়া রাখিয়াছিল যে, নিজের প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার লোপ পাইয়াছিল। এতো সমৃদ্ধি ও এরূপ পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে পাশে রাখিয়াও যে মানুষ এমন নির্ব্বিকার ভাবে পড়ার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে, তাহা এই সুরথবাবুকে দেখিবার পূর্ব্বে অনি কল্পনাও করিতে পারিত না।

সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন স্বামীকে লইয়া নীলিমা যখন অত্যন্ত বিরক্ত হইত, তখন সে মাঝে মাঝে আসিয়া অনির নিকট নানা অভিযোগ করিত। নীলিমার অধিক রাগ ছিল, ঐ রাশিরাশি বইএর উপর। ঐ সব কাগজ আর কালির দাগগুলার মধ্যে এমন কি আছে, যাহাতে তাহার স্বামীকে এরূপভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখে—তাহা নীলিমা ভাবিয়া পাইত না। স্বামীর খাওয়া-পরা হইতে আরম্ভ করিয়া সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ের ভার পড়িয়াছিল তাহারই হাতে; এমন কি সুরথবাবুর সহিত কোনো বিষয়ের পরামর্শ টুকু পর্য্যন্ত করিবার অবসর সে পাইত না। নিতান্ত প্রয়োজনে পড়িয়া স্বামীর নিকট কোন জরুরী পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেও, তিনি হয় তো পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতেই বলিতেন—"আচ্ছা"।

এই "আচ্ছা"র সঙ্গে হয় তো পত্নীর প্রস্তাবিত বিষয়ের কোন সামঞ্জস্যই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। নীলিমা সেদিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অনির নিকট আসিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিল—"দিদি, ওই মুখপোড়া বইগুলোর উপরে আমার রাগে গা জ্বলে যায়; আমার মনে হয় ওরা আর-জন্মে আমার সতীন্ ছিল। ইচ্ছে করে সবগুলোকে টুক্‌রো টুক্‌রো করি, পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলি।"

নীলিমার কথা শুনিয়া অনির হাসিও পাইতেছিল, দুঃখও হইতেছিল। আহা, বেচারা! স্বামীকে এত কাছে পাইয়াও তাহার পাওয়ার পরিপূর্ণতা হইতেছে না। সুরথ-বাবুর উপর অনিরও সময় সময় রাগ হইত; পার্শ্বস্থা নারী পুরুষের অধিক মনোযোগ পাইলেও যেরূপ সঙ্কুচিতা হইয়া পড়ে, সম্পূর্ণ অমনোযোগেও তাহা অপেক্ষা কম আহতা হয় না। ধ্যানমগ্ন পুরুষ যখন আপন সাধনায় তন্ময় থাকিয়া নারীর পানে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসরও পান না, তখন নারীর অন্তরের সেই উপেক্ষিতা উর্ব্বশীদলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠে। পুরুষকে ভয় করিয়া চলিলেও তাহাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষাও নারী আমরণ ছাড়িতে পারে না। অনির মনে হইত সুরথবাবুর সকলই বাড়াবাড়ি।

নীলিমা ও অনি—কেহই সুরথবাবুর উপর বিরক্ত হইয়া থাকিতে পারিত না। যিনি নিজের সম্বন্ধেই অত উদাসীন, তিনি যে পরের দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর পাইবেন না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! মাঝে মাঝে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেও, নীলিমা যে স্বামীকে লইয়া খুব সুখী হইয়াছিল, তাহা অনি তাহার প্রত্যেকটী বিষয়েই বুঝিতে পারিত। সুরথবাবু ছিলেন নীলিমার আদরের খেলার পুতুল। ধ্যানমগ্ন স্বামীর উপর সে একাধিপত্য পাইয়াছিল। তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণার অনুভূতিটুকু পর্য্যন্ত নীলিমাকেই অনুমান করিয়া লইতে হইত। সুরথবাবুর জামাকাপড়ের প্রয়োজন বুঝিয়া নীলিমাকেই তাহার অর্ডার দিতে হইত। সাংসারিক কোনো কিছুতে স্বামীর মতামত লইবার সুযোগও তাহার ঘটিত না। কিন্তু সেই সাধক স্বামীর 'দর্শন-বেদান্তের' গণ্ডীর বাহিরে পরিমিত বিশ্রাম-অবসরে নীলিমা যে অপরিমেয় ভালবাসা পাইত, তাহাতেই তাহার নারীহৃদয় সার্থকতার গৌরবে ভরিয়া উঠিত। স্বামীর সেই অনাবিল প্রেম তাহার জীবন-পাত্রের কাণায় কাণায় ছাপাইয়া উঠিত।

অনি আসার পর হইতে নীলিমার অনেকখানি অভাব ও অসুবিধা দূর হইয়াছিল। এখন সে আর স্বামীকে অকারণে বিরক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া অনির সঙ্গেই সকল বিষয়ের পরামর্শ করিত। অভিভাবিকা নীলিমা স্বামী ও অনির উপর সমভাবে কর্ত্রীত্ব করিয়া চলিলেও, বস্তুতঃ সেই বালিকা নীলিমাকে সংসার-জীবনে পরিচালিত করিবার সকল ভার সম্পূর্ণরূপে অনির হাতেই পড়িয়াছিল।

অনির তুলনায় নীলিমা অন্যান্য বিষয়ে অল্পশিক্ষিতা হইলেও, সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। অনি আদৌ গান গাহিতে পারিত না। নীলিমা এই সুযোগ লইয়া অনিকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়াও অনি নিষ্কৃতি পাইল না। মেজর তাহাকে গান শিখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াও রাজী করিতে পারেন নাই; কিন্তু নীলিমা তাহাকে জোর করিয়া প্রত্যহই হারমোনিয়মের পাশে টানিয়া আনিতে ছাড়িত না। অনির অত্যন্ত লজ্জা করিত; নীলিমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কণাও যে সকল গানে পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, ধাড়ী ছাত্রী হইয়া সেই সকল প্রাথমিক স্বরলিপি তাহাকে নূতন করিয়া সাধিতে হইবে। কিন্তু নীলিমা ছাড়িবার পাত্রী নহে। অনির নানারূপ আপত্তিতে, শেষে নীলিমা তাহাকে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটী গানের 'স্বরলিপি' শিখাইতে আরম্ভ করিল, যেগুলি কণা জানে না। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কাজ হইল না। অনি কোনমতেই নিঃসঙ্কোচে গলা ছাড়িয়া দিয়া সুর সাধিতে পারিত না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে গাহিতে বসিয়া, অন্যমনস্কভাবে হারমোনিয়মের চাবি টিপিতে টিপিতে যেই সে ভুল করিয়া বসিত, অমনি কণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিত—"মা-মণি, 'নি—সা—ধা নি পা—' করো।" সঙ্গে সঙ্গে অনির গান থামিয়া যাইত। সে কণাকে টানিয়া লইয়া হারমোনিয়মের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিত—"তুমি গাও তো মাণিক্।" অনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত।

সেদিন কণাকে তাহার মামাবাবুর সহিত বেড়াইতে পাঠাইয়া, নীলিমা পুনরায় অনিকে লইয়া সুর সাধাইতে বসিয়াছিল। নীলিমার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে জানিয়াই অনি বাধ্য হইয়া তাহার নির্দ্দেশ মত স্বরলিপি সাধিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সে মনোযোগ দিতে পারিতেছিল না; গানের প্রথম চরণের শেষ ছত্রটির নিকটে আসিয়াই অনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল।

'আমি আপনার হাতে মূরতি তোমার
ভাঙিয়া ফেলেছি দেবতা গো।'

নীলিমা সযত্নে বহুবার ধীরে ধীরে দেখাইয়া দিলেও, অনি কোন রূপেই এই স্বরলিপিটুকুকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না। নীলিমা এই কথা কয়টীর গতিভঙ্গী ও সুরের লীলাকে বার বার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে শিখাইবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, অনি যেন ততই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। অনির উদাস ভাবটা বেশ স্পষ্ট হইয়া নীলিমার চোখে পড়িলেও, সে ইহার কোনো তাৎপর্য্যই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অনি তাহার শিক্ষকতাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য হয় তো এরূপ অবহেলা করিতেছে—এই ভাবিয়া নীলিমা ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল।

ঝি সদর হইতে একখানি পত্র আনিয়া অনির হাতে দিল। অনি খামের উপরের লেখা দেখিয়াই বুঝিল—

পত্র বনবিহারীর নিকট হইতে আসিতেছে। সে অনেকক্ষণ হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কেবল নীলিমার ভয়ে উঠিতে পারিতেছিল না। পত্রখানি হাতে পাইয়াই অনি নাড়াচাড়া করিতে করিতে সেই অছিলায় উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নীলিমা একবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র, কিন্তু কোন কথা বলিল না।' সে তখনো আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতেছিল।

অনি ঘরে আসিয়া বনবিহারীর পত্রখানি আগোপান্ত পাঠ করিল। বনবিহারী পত্রে মেজরের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া অনির দেহমন দুঃখে ও আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। এ কি! সেই মেজরের এ কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! মেজর আজমগড়ে বদ্‌লি হইয়া গিয়াছেন। অনিয়ম, অত্যাচার ও অতিরিক্ত সুরাপানে তাঁহার স্বাস্থ্য একবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বনবিহারী শিউকিষণের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন ও নিজে আজমগড়ে গিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা সমস্তই বিস্তৃতভাবে অনির নিকট লিখিয়া জানাইয়াছেন। অনি পত্রখানি আর একবার আগাগোড়া পড়িয়া দেখিল। একটা বেদনার দোলায় তাহার সমস্ত অন্তর তখন যেন তালবৃন্তের মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে চলিয়া আসার পর হইতে এই যে মেজর প্রতি পলে পলে তাঁহার মূল্যবান জীবনটাকে একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় টানিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য দায়ী কে? সেই মেজর! দাদা মহাশয়ের মৃত্যুশয্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অন্তিমের সৎকার, বিপন্ন অবস্থায় অনিকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করা প্রভৃতি সব কিছুই যিনি মুক্তহস্তে করিয়া ছিলেন। যাঁহার অনুগ্রহ ও সাহায্য না পাইলে অনি তাহার দাদুর মৃত্যুশয্যায় পর্য্যন্ত একটু ঔষধ পথ্য দিতে পারিত না। সেই দাদু! সেই দাদুকে চিরদিনের মত বিদায় দিতে হইত—তাঁহার অনাহার ও অনশনক্লিষ্ট মুখখানির পানে চাহিয়া! মেজরের নিকট অনি যে সাহায্য পাইয়াছে, তাহা যে সে কোনো আত্মীয় বন্ধুর নিকট হইতেও পায় নাই। অর্থ, সামর্থ্য, সমবেদনা—সব কিছু দিয়াই যে মেজর তাহাকে সাহায্য করিতে কখনো বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই। অত মহৎ, অত কর্ত্তব্যপরায়ণ, অত ধীর সেই মেজরের জীবনকে আজ সে কোথায় ঠেলিয়া ফেলিয়াছে! অত সুন্দর একটা জীবনের সব কিছু মহত্ত্ব ও সম্পদ কি শুধু মাত্র বারেকের ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় চিরদিনের মত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে! মানুষ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার কর্ত্তব্য ও মনুষ্যত্বকে বাঁচাইয়া চলিলেও —সে তো মানুষ! রক্তমাংসের ক্ষুধাকে মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় বাধা দিয়া চলিলেও, তাহার শক্তি তো নিমেষের জন্যও সেই দুর্ব্বার ক্ষুধার লেলিহান্ বহ্নিশিখায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে। যাহাকে সজ্ঞানে মানুষ এড়াইয়া চলে, অজ্ঞানতার অবসর লইয়া যদি মুহূর্ত্তের জন্য সেই দুর্ব্বার পিপাসা মানুষকে জয় করিয়া চলিয়া যায়, তবে সেই মুহূর্ত্তের পরাজয়ের গ্লানি দিয়াই কি মানুষের সমস্ত জীবনটাকে ওজন করিয়া লইতে হইবে!

অনি আত্মহারা হইয়া পড়িল। মেজর আহার নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহার আর খেয়াল নাই। দিবারাত্রি সুরাপান করিয়া প্রতিদিন আত্মহত্যাকে যেন বরণ করিয়া লইতেছেন। বনবিহারী বাবু লিখিয়াছেন—এখন আর মেজরের চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনের সব কিছু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। বেতনের টাকায় তাঁহার সঙ্কুলান হয় না। প্রতি সপ্তাহে অজস্র টাকা ঋণ করিয়া চলিয়াছেন। শিউকিষণ সঙ্গে যায় নাই। নূতন চাকর যাহারা আসিয়াছে তাহারা প্রভুর এই দুর্গতির অবসর লইয়া দুই হাতে লুট করিয়া চলিয়াছে। এখনো হয় তো ফিরাইবার সময় আছে; আর কিছু দিন এইভাবে চলিলে, মেজরের জীবন যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার ঠিকানা নাই। এখনো অনি চেষ্টা করিলে হয় তো তাঁহাকে ফিরাইতে পারে; একমাত্র অনি ব্যতীত আর কাহারো সে শক্তি আছে কি না সন্দেহ।

মুহূর্ত্তে অনির সমস্ত অভিমান ও আত্মসম্মান ভাসিয়া গেল। অনি সঙ্কল্প করিল সে যেমন করিয়া পারে যাইবেই; মেজরের ন্যায় একটা মহৎ প্রাণকে সে কিছুতেই ডুবিয়া যাইতে দিবে না। আজই সে রওনা হইয়া পড়িবে মোগলসরাইএ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে এখনই বনবিহারীদাকে তার করিয়া দিবে। মেজরের জীবনকে যে সে-ই আপন হস্তে অধঃপতনের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে, আপনার তৃষিত অন্তরকে সমাজের যূপকাঠে

বলিদান করিয়া। অনি চিঠিখানাকে দুই হাতে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওগো সমাজের নিষ্ঠুর দেবতা, তোমার পুজো ক'রতে গিয়ে, তোমারই সংস্কারের নাগপাশে আপনাকে বেঁধে রেখে—অন্তরের যে আরাধ্য ঠাকুরকে আজ আপন হাতে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি, তার জন্য দায়ী কে? ওগো নিষ্ঠুর, ওগো কঠিন্! এ লাভলোকসানের হিসাব কি তুমি দিতে পার?" বেদনায় অনির বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল—তাহার চোখের জল তখন আর বাধা মানিতেছিল না। সেও যে মেজরকে ভালবাসিয়াছিল; এখনো হয় তো বাসে; তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতে পারে না—সে ঋণী।

ড্রয়িংরুমে বসিয়া নীলিমা তখনো গাহিতেছিল। 'তাহার সেই সুললিত স্বরের হিল্লোলে হিল্লোলে সারা বাড়ীখানিকে কাঁপাইয়া বাজিয়া উঠিতেছিল—

আমি আপনার হাতে মূরতি তোমার
ভাঙিয়া ফেলেছি দেবতা গো!'

সেই পাগল-করা দুইটি লাইনের কঠোর ইঙ্গিত যেন অনির বুকের তলায় আবার শূলের মত বিঁধিল। বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া অনি বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যে সাহারা পথের বেদুইন্! উষ্ণ পথের পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিয়া চলিলেও সে দস্যু। সে পুড়িয়া মরিতেছে, কিন্তু তাহারই আগুনে বিশ্বকেও সে জ্বালাইতেছে কেন? তাহারই হিতৈষী বন্ধুকে—বিপন্ন জীবনের একমাত্র আশ্রয়দাতাকে······!

(২২)

আজমগড়ে আসিয়া মেজর নূতন করিয়া আবার কাজকর্ম্মের চার্জ্জ বুঝিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোনো পরিবর্ত্তনই তাঁহার হয় নাই। জীবনের গতি বেনারসেও যেরূপ চলিতেছিল, আজমগড়ে আসিয়াও ঠিক্ সেইরূপ চলিতে লাগিল। পুরানো চাকর ও বাবুর্চ্চি কেহই আর মেজরের সঙ্গে আসে নাই। জিনিষপত্র লইয়া কেবলমাত্র বালক-ভৃত্য ভগ্‌লু তাঁহার সহিত আসিয়াছিল। আজমগড়ে আসিয়া মেজর নূতন কোনো বন্দোবস্তই করিলেন না। পূর্ব্বতন সিভিল সার্জ্জনের চাকর, বাবুর্চ্চি যাহারা ছিল, তাহারাই আপন ইচ্ছামত মেজরের কার্য্যে লাগিয়া পড়িল; মেজরের সে সব বিষয়ে কোনো লক্ষ্যই ছিল না। নিজের খাওয়া পরা বিষয়েও এতো উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, বয় ও চাকরদের পুনঃপুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও মেজর সে সম্বন্ধে আদৌ মনোযোগ দিলেন না। চাকরেরা নিজেদের জন্য ডালরুটি বানাইয়া লইত, কিন্তু মেজরের নির্দ্দিষ্ট কোনোরূপ আদেশ না পাওয়ায় তাঁহার জন্য কোনো ব্যবস্থা করিতেই সাহস করিত না। বেনারসে থাকিতে অনি নিজে কর্ত্রীত্ব করিয়া মেজরের খাওয়া পরা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল, সে চলিয়া যাওয়ার পরও বৃদ্ধ শিউকিষণ্ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পালন করিয়া চলিত। মেজর কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও, বেয়ারা তাঁহার সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না।

শিউকিষণের বয়স হইয়া আসিয়াছিল। প্রভুকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিলেও, শেষ বয়সে বাবা বিশ্বনাথের চরণ ছাড়িয়া সে আর নূতন জায়গায় বদ্‌লি হইয়া যাইতে চাহে নাই। মেজরের পদে ডাঃ আয়ার বেনারসে বদ্‌লি হইয়া আসিলেন; শিউকিষণ্ তাঁহার কাজে নিযুক্ত হইয়া রহিল। সঙ্গে না যাইতে পারিলেও, প্রভুভক্ত ভৃত্যের স্নেহার্দ্র অন্তর মেজরকে ছাড়িয়া দিবার সময় যেন বুকের মধ্যে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। মেজরের সেই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া শিউকিষণ্ আরও ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভগ্‌লুকে কাছে ডাকিয়া নিয়মিত ভাবে মেজরের সেবাযত্ন করিবার জন্য বৃদ্ধ বার বার বলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু বালক ভগ্‌লু আজমগড়ে আসিয়া প্রাণপণ চেষ্টাতেও কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। শিউকিষণের উপদেশ মত প্রভুর সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে—পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত গাজু ও বাবুর্চ্চির আসন ঠেলিয়া—সে কোনমতেই নিজের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না। বিশেষতঃ প্রভু যখন তাহার শত অভিযোগ ও অনুযোগেও কর্ণপাত করিলেন না, তখন বেচারা ভগ্‌লুকে বাধ্য হইয়া বাবুর্চ্চি ও গাজুর হাতেই আত্মসমর্পণ করিতে হইল। গাজুর ব্যবস্থামতই মেজরের সাংসারিক গতিবিধি পরিচালিত হইতেছিল।

স্বেচ্ছায় মেজর কখনো কিছু খাইতে চাহিলে, গাজু

পত্র বনবিহারীর নিকট হইতে আসিতেছে। সে অনেকক্ষণ হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কেবল নীলিমার ভয়ে উঠিতে পারিতেছিল না। পত্রখানি হাতে পাইয়াই অনি নাড়াচাড়া করিতে করিতে সেই অছিলায় উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নীলিমা একবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র, কিন্তু কোন কথা বলিল না।' সে তখনো আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতেছিল।

অনি ঘরে আসিয়া বনবিহারীর পত্রখানি আগ্যোপান্ত পাঠ করিল। বনবিহারী পত্রে মেজরের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া অনির দেহমন দুঃখে ও আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। এ কি! সেই মেজরের এ কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! মেজর আজমগড়ে বদ্‌লি হইয়া গিয়াছেন। অনিয়ম, অত্যাচার ও অতিরিক্ত সুরাপানে তাঁহার স্বাস্থ্য একবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বনবিহারী শিউকিষণের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন ও নিজে আজমগড়ে গিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা সমস্তই বিস্তৃতভাবে অনির নিকট লিখিয়া জানাইয়াছেন। অনি পত্রখানি আর একবার আগাগোড়া পড়িয়া দেখিল। একটা বেদনার দোলায় তাহার সমস্ত অন্তর তখন যেন তালবৃন্তের মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে চলিয়া আসার পর হইতে এই যে মেজর প্রতি পলে পলে তাঁহার মূল্যবান জীবনটাকে একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় টানিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য দায়ী কে? সেই মেজর! দাদা মহাশয়ের মৃত্যুশয্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অন্তিমের সৎকার, বিপন্ন অবস্থায় অনিকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করা প্রভৃতি সব কিছুই যিনি মুক্তহস্তে করিয়া ছিলেন। যাঁহার অনুগ্রহ ও সাহায্য না পাইলে অনি তাহার দাদুর মৃত্যুশয্যায় পর্য্যন্ত একটু ঔষধ পথ্য দিতে পারিত না। সেই দাদু! সেই দাদুকে চিরদিনের মত বিদায় দিতে হইত—তাঁহার অনাহার ও অনশনক্লিষ্ট মুখখানির পানে চাহিয়া! মেজরের নিকট অনি যে সাহায্য পাইয়াছে, তাহা যে সে কোনো আত্মীয় বন্ধুর নিকট হইতেও পায় নাই। অর্থ, সামর্থ্য, সমবেদনা—সব কিছু দিয়াই যে মেজর তাহাকে সাহায্য করিতে কখনো বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই। অত মহৎ, অত কর্ত্তব্যপরায়ণ, অত ধীর সেই মেজরের জীবনকে আজ সে কোথায় ঠেলিয়া ফেলিয়াছে! অত সুন্দর একটা জীবনের সব কিছু মহত্ব ও সম্পদ কি শুধু মাত্র বারেকের ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় চিরদিনের মত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে! মানুষ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার কর্ত্তব্য ও মনুষ্যত্বকে বাঁচাইয়া চলিলেও —সে তো মানুষ! রক্তমাংসের ক্ষুধাকে মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় বাধা দিয়া চলিলেও, তাহার শক্তি তো নিমেষের জন্যও সেই দুর্ব্বার ক্ষুধার লেলিহান্ বহ্নিশিখায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে। যাহাকে সজ্ঞানে মানুষ এড়াইয়া চলে, অজ্ঞানতার অবসর লইয়া যদি মুহূর্ত্তের জন্য সেই দুর্ব্বার পিপাসা মানুষকে জয় করিয়া চলিয়া যায়, তবে সেই মুহূর্ত্তের পরাজয়ের গ্লানি দিয়াই কি মানুষের সমস্ত জীবনটাকে ওজন করিয়া লইতে হইবে!

অনি আত্মহারা হইয়া পড়িল। মেজর আহার নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁহার আর খেয়াল নাই। দিবারাত্রি সুরাপান করিয়া প্রতিদিন আত্মহত্যাকে যেন বরণ করিয়া লইতেছেন। বনবিহারী বাবু লিখিয়াছেন—এখন আর মেজরের চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনের সব কিছু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। বেতনের টাকায় তাঁহার সঙ্কুলান হয় না। প্রতি সপ্তাহে অজস্র টাকা ঋণ করিয়া চলিয়াছেন। শিউকিষণ সঙ্গে যায় নাই। নূতন চাকর যাহারা আসিয়াছে তাহারা প্রভুর এই দুর্গতির অবসর লইয়া দুই হাতে লুট করিয়া চলিয়াছে। এখনো হয় তো ফিরাইবার সময় আছে; আর কিছু দিন এইভাবে চলিলে, মেজরের জীবন যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহার ঠিকানা নাই। এখনো অনি চেষ্টা করিলে হয় তো তাঁহাকে ফিরাইতে পারে; একমাত্র অনি ব্যতীত আর কাহারো সে শক্তি আছে কি না সন্দেহ।

মুহূর্ত্তে অনির সমস্ত অভিমান ও আত্মসম্মান ভাসিয়া গেল। অনি সঙ্কল্প করিল সে যেমন করিয়া পারে যাইবেই; মেজরের ন্যায় একটা মহৎ প্রাণকে সে কিছুতেই ডুবিয়া যাইতে দিবে না। আজই সে রওনা হইয়া পড়িবে; মোগলসরাইএ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সে এখনই বনবিহারীদাকে তার করিয়া দিবে। মেজরের জীবনকে যে সে-ই আপন হস্তে অধঃপতনের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে, আপনার তুষিত অন্তরকে সমাজের যূপকাষ্ঠে

বলিদান করিয়া। অনি চিঠিখানাকে দুই হাতে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওগো সমাজের নিষ্ঠুর দেবতা, তোমার পূজো ক'রতে গিয়ে, তোমারই সংস্কারের নাগপাশে আপনাকে বেঁধে রেখে—অন্তরের যে আরাধ্য ঠাকুরকে আজ আপন হাতে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি, তার জন্য দায়ী কে? ওগো নিষ্ঠুর, ওগো কঠিন্! এ লাভলোকসানের হিসাব কি তুমি দিতে পার?" বেদনায় অনির বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল—তাহার চোখের জল তখন আর বাধা মানিতেছিল না। সেও যে মেজরকে ভালবাসিয়াছিল; এখনো হয় তো বাসে; তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতে পারে না—সে ঋণী।

ড্রয়িংরুমে বসিয়া নীলিমা তখনো গাহিতেছিল। তাহার সেই সুললিত স্বরের হিল্লোলে হিল্লোলে সারা বাড়ীখানিকে কাঁপাইয়া বাজিয়া উঠিতেছিল—

আমি আপনার হাতে মূরতি তোমার
ভাঙিয়া ফেলেছি দেবতা গো!'

সেই পাগল-করা দুইটি লাইনের কঠোর ইঙ্গিত যেন অনির বুকের তলায় আবার শূলের মত বিঁধিল। বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া অনি বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে যে সাহারা পথের বেদুইন্! উষ্ণ পথের পিপাসায় ছট্‌ফট্ করিয়া চলিলেও সে দস্যু। সে পুড়িয়া মরিতেছে, কিন্তু তাহারই আগুনে বিশ্বকেও সে জ্বালাইতেছে কেন? তাহারই হিতৈষী বন্ধুকে—বিপন্ন জীবনের একমাত্র আশ্রয়দাতাকে·····!

(২২)

আজমগড়ে আসিয়া মেজর নূতন করিয়া আবার কাজকর্ম্মের চার্জ্জ বুঝিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোনো পরিবর্ত্তনই তাঁহার হয় নাই। জীবনের গতি বেনারসেও যেরূপ চলিতেছিল, আজমগড়ে আসিয়াও ঠিক্ সেইরূপ চলিতে লাগিল। পুরানো চাকর ও বাবুর্চ্চি কেহই আর মেজরের সঙ্গে আসে নাই। জিনিষপত্র লইয়া কেবলমাত্র বালক-ভৃত্য ভগ্‌লু তাঁহার সহিত আসিয়াছিল। আজমগড়ে আসিয়া মেজর নূতন কোনো বন্দোবস্তই করিলেন না। পূর্ব্বতন সিভিল সার্জ্জনের চাকর, বাবুর্চ্চি যাহারা ছিল, তাহারাই আপন ইচ্ছামত মেজরের কার্য্যে লাগিয়া পড়িল; মেজরের সে সব বিষয়ে কোনো লক্ষ্যই ছিল না। নিজের খাওয়া পরা বিষয়েও এতো উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, বয় ও চাকরদের পুনঃপুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও মেজর সে সম্বন্ধে আদৌ মনোযোগ দিলেন না। চাকরেরা নিজেদের জন্য ডালরুটি বানাইয়া লইত, কিন্তু মেজরের নির্দ্দিষ্ট কোনোরূপ আদেশ না পাওয়ায় তাঁহার জন্য কোনো ব্যবস্থা করিতেই সাহস করিত না। বেনারসে থাকিতে অনি নিজে কর্ত্রীত্ব করিয়া মেজরের খাওয়া পরা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল, সে চলিয়া যাওয়ার পরও বৃদ্ধ শিউকিষণ্ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পালন করিয়া চলিত। মেজর কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও, বেয়ারা তাঁহার সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না।

শিউকিষণের বয়স হইয়া আসিয়াছিল। প্রভুকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিলেও, শেষ বয়সে বাবা বিশ্বনাথের চরণ ছাড়িয়া সে আর নূতন জায়গায় বদ্‌লি হইয়া যাইতে চাহে নাই। মেজরের পদে ডাঃ আয়ার বেনারসে বদ্‌লি হইয়া আসিলেন; শিউকিষণ্ তাঁহার কাজে নিযুক্ত হইয়া রহিল। সঙ্গে না যাইতে পারিলেও, প্রভুভক্ত ভৃত্যের স্নেহার্দ্র অন্তর মেজরকে ছাড়িয়া দিবার সময় যেন বুকের মধ্যে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। মেজরের সেই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া শিউকিষণ্ আরও ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভগ্‌লুকে কাছে ডাকিয়া নিয়মিত ভাবে মেজরের সেবাযত্ন করিবার জন্য বৃদ্ধ বার বার বলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু বালক ভগ্‌লু আজমগড়ে আসিয়া প্রাণপণ চেষ্টাতেও কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। শিউকিষণের উপদেশ মত প্রভুর সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে—পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত গাজু ও বাবুর্চ্চির আসন ঠেলিয়া—সে কোনমতেই নিজের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না। বিশেষতঃ প্রভু যখন তাহার শত অভিযোগ ও অনুযোগেও কর্ণপাত করিলেন না, তখন বেচারা ভগ্‌লুকে বাধ্য হইয়া বাবুর্চ্চি ও গাজুর হাতেই আত্মসমর্পণ করিতে হইল। গাজুর ব্যবস্থামতই মেজরের সাংসারিক গতিবিধি পরিচালিত হইতেছিল।

স্বেচ্ছায় মেজর কখনো কিছু খাইতে চাহিলে, গাজু

প্রায় বাজার হইতেই কিনিয়া আনিয়া দিত। মেজরের ব্যাপার লইয়া বেয়ারা ও বাবুর্চ্চি কেহই ব্যস্ত হইত না; তাহারা প্রভুর বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণরূপেই বুঝিয়া লইয়াছিল। মেজর কোন বিষয়েই কোনো আপত্তি করিতেন না। ক্রমে ক্রমে মেজরের ক্যাশের চাবিও গাজুর হাতেই আসিয়া পড়িল। গাজুও এই অবসরের সুযোগটুকুকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইদানীং মেজরের সুরাপানের মাত্রাও যেরূপ ক্রমে গ্লাস হইতে বোতলের সংখ্যা বাড়াইয়া চলিতেছিল, ব্যয়ের মাত্রাও ঠিক্ তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেনারসে থাকিতে—শেষের দিকে—আর মেজরের বেতনের টাকায় মাস চলিত না, তবুও শিউকিষণ বহু চেষ্টায় তাহাতে প্রায় তিন সপ্তাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। মেজর তখন হইতেই তাঁহার পিতার আমলের এটর্ণি ননীলাল মল্লিকের নিকট পত্র লিখিয়া মাসে মাসে ঋণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজমগড়ে আসিয়া তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শিউকিষণের হাতে যে অর্থে তিন সপ্তাহ চলিত, গাজুর হাতে পড়িয়া তাহা প্রায় প্রথম সপ্তাহেই শেষ হইয়া যাইত। অবশ্য মেজরের মদের খরচও বেনারসের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়া পড়িয়াছিল। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত—যতক্ষণ মেজর জাগিয়া থাকিতেন, ততক্ষণ আর তাঁহার মদ্যপানের বিরাম ছিল না।

সেদিন হুইস্কি আনিতে গিয়া গাজু প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যেও বাজার হইতে ফিরিল না দেখিয়া মেজর যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রমে মেজরের বিরক্তি রাগে পরিণত হইতে লাগিল। এই কয়েক মাসের অবিশ্রান্ত সুরাপান মেজরকে এতই আসক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল যে দুই ঘণ্টাকাল বিরত থাকাও যেন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। মেজর আর স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া বয়কে তখনই গাজুর উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মেজাজ তখন এতই রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে বালক-ভৃত্য ভগ্‌লুও তাঁহার কয়েকটী কথার মধ্যে তাহা ভালভাবেই উপলব্ধি করিল।

ভগ্‌লুকে পাঠাইয়া দিয়া মেজর ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন। অবসরের এক একটী মুহূর্ত্ত যেন তাঁহার নিকট এক একটী যুগ বলিয়া মনে হইতেছিল। কপাল কুঞ্চিত করিয়া দুই হাতে জোরে জোরে মাথার চুল টানিতে টানিতে মেজর হল্‌ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিলেন। গাজুর বিলম্ব করিবার কথা ভাবিতে গিয়া তাঁহার মনে হইল—বোধ হয় চাকরেরাও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে সুরু করিয়াছে। নহিলে তাঁহারি বেয়ারার এতদূর স্পর্দ্ধা যে… …; হঠাৎ কি ভাবিয়া মেজর জানালার পাশে আসিয়া কৌচটার উপর বসিয়া পড়িলেন; সহসা যেন অনির উপর একটা বিজাতীয় ক্রোধে তাঁহার বুকের ভিতর জ্বালা করিয়া উঠিল। উঃ, সেই অনি যাহার জন্য তিনি সব কিছু করিয়াছেন, সে কি না তাঁহাকে পথের ধূলার মত পদদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে! তাঁহার সব কিছু শক্তি, শান্তি ও তেজকে চাকর বাবুর্চ্চির নিকটেও আজ এত হেয় করিয়া তুলিয়াছে! এমন কি কারণ ঘটিয়াছিল, যাহা লইয়া অনি তাঁহার উপর এত বড় একটা প্রতিশোধ লইয়া গিয়াছে?

কৌচের উপর হইতে উঠিয়া মেজর পুনরায় হল্‌ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করিতে লাগিলেন। আজমগড় কোয়ার্টারের হল্‌ঘরখানি খুব প্রশস্ত ছিল বলিয়া, মেজরের লাইব্রেরীর আল্‌মারিগুলিও হলের এক পাশে দেয়ালের কোলে কোলে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। আপন্ মনে পায়চারি করিতে করিতে একটা আল্‌মারির সম্মুখে আসিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মেজর সেটাকে টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন। থাকে থাকে রাশীকৃত বই অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। ইংরাজী, বাংলা, ডাক্তারি—জাতি-নির্ব্বিশেষে কে কাহার পার্শ্বে স্থান পাইয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। 'প্রবাসী'র থাকের ভিতর 'ভারতবর্ষ'গুলা ঢুকিয়া রহিয়াছে। মডার্ণ রিভিউ আর মেডিক্যাল জর্ণাল ওলট্ পালট্ হইয়া এমন তাল পাকাইয়া গিয়াছে যে কোনো-কোনোখানির পাতা ও ফর্ম্মা পর্য্যন্ত বদল হইয়া গিয়াছে। সব বিশ্রী ও বিশৃঙ্খল। এ কাজ ভগ্‌লুর। বেনারস হইতে জিনিষপত্র আজমগড়ে লইয়া আসার পর ভগ্‌লুই প্রাণপাত চেষ্টায় সেগুলি যথাসাধ্য গুছাইয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছে। অশিক্ষিত বালক বইগুলিকে সাজাইয়াছে—শুধু তাহাদের রং ও আকার

মিলাইয়া। বিষয় ও ভাষা মিলাইয়া সাজাইবার শক্তি সে কোথায় পাইবে!

মেজর ক্ষিপ্রহস্তে বইগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে একখানা মোটা বই উপরের থাক্ হইতে টানিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন। সেখানি কোন বিশিষ্ট লেখকের আধুনিক 'মনোবিজ্ঞান'। বইখানি মেজরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পূর্ব্বে অবসর সময়ে প্রায় সেইখানিকে লইয়াই তিনি তন্ময় থাকিতেন। নভেল ও অন্যান্য বই পড়িবার সখ্ তাঁহার খুব কমই ছিল।

সহসা পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মেজরের চোখে পড়িল—একখানি লম্বা কাগজ—ভাঁজ করিয়া বইএর মধ্যে গোঁজা। মেজর সেখানাকে খুলিয়া ফেলিলেন। অনির হাতের লেখা তাঁহারই আয়-ব্যয়ের একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব। আরও কয়েকটি কথা—। হঠাৎ মেজরের মাথার মধ্যে আবার চন্‌চন্ করিয়া রাগ উঠিয়া পড়িল, ঠিক্ চিতি সাপের বিষের মত। ওষ্ঠ দংশন করিয়া মেজর সেই কাগজসহ বইখানিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন; শক্ত বাঁধানো বইখানি সজোরে আল্‌মারির কাঁচে গিয়া লাগিতেই সেখানা ঝন্‌ঝন্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। তৈল-হীন কলকব্জার ভিতর যেমন পরস্পরের ঘর্ষণে একটা বিশ্রী বিকৃত শব্দ হয়, মেজরের ভিতর হইতেও যেন ঠিক্ সেইরূপ একটা বিকৃত শব্দ বাহির হইয়া আসিল—"কোনও দরকার ছিল না। নিছক ভণ্ডামী।"

* * * *

বাজারে যাইতে যাইতে গাজু দেখিল স্কুলের পাশের ময়দানটায় ভীষণ ভিড় জমিয়াছে। স্থানীয় বহু ভদ্রলোক ও ছাত্রগণ সেখানে সমবেত হইয়াছেন। ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া গাজুও একবার ব্যাপারটা জানিয়া লইবার জন্য সেখানে ভিড়িয়া পড়িল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া গাজু দেখিল সেখানে মস্ত একটা সভা বসিয়াছে। খদ্দর-পরিহিত একজন দীর্ঘকায় বাঙ্গালী যুবক ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে অনর্গল কি বলিয়া চলিয়াছেন। অতি সাধারণ পোষাক পরিয়া থাকিলেও তাঁহার চেহারা ও বক্তৃতার মধ্যে এমন একটা দীপ্ত গৌরব ও তেজস্বিতা ফুটিয়া উঠিতেছিল, যাহাতে গাজুর মত লোকের মনটাও ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। বিশেষ মনোযোগ সহকারে গাজু তাঁহার বক্তৃতা একটু শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; সে বুঝিল—তিনি তাহাদেরই কথা বলিতেছেন।

তিনি বলিতেছিলেন—"ভাই সব, আমরা যা'দিকে ছোটলোক ব'লে ঘৃণা করি, তারাও কি মানুষ নয়? দেশকে উন্নত ক'র্‌তে হ'লে তাদের হাত ধ'রেও কি আমাদের তুলে নেওয়া উচিত নয়? তাদের পানেও আমাদের চাইতে হবে। তারা যেমন চাকর খানসামা হ'য়ে আমাদের সেবা ও তাঁবেদারি ক'র্‌ছে, মুনিব হ'য়ে আমাদিগকেও তেমনি তাদের মন ও সংসার-জীবনকে উন্নত ক'রে দেবার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। দেশে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের চেয়ে দিন-মজুর ও চাকর খান্‌সামার দলই বেশী। সেই সব চাকর খান্‌সামা ও চাষাদের বাদ দিলে, আমাদের কোনো শক্তিই থাকে না। য়ুরোপ যে আজ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, আমেরিকা যে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রেছে, তার একমাত্র কারণ—তারা এই সব ভাইবোনদিগকেও কোলের পাশে পাশে টেনে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা ধাপে ধাপে এমন নেমে যাচ্ছি—শুধু ভাইবোনদের ঘৃণা ক'রে ও এড়িয়ে চলে'। দেশের শক্তির অভাব পূরণ ক'র্‌তে হ'লে এদের শিক্ষা দিতে হ'বে; এদের নৈতিক ও সামাজিক জীবনকে উন্নত ক'রে দিতে হবে; তবেই আমরা প্রকৃত সবল হ'তে পার্‌বো। আর যে সব অনাথ অসহায়েরা একটু সহানুভূতি ও আশ্রয়ের অভাবে চির-ব্যর্থ হ'য়ে ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে, তাদিগকে আশ্রয় দিতে হবে, মানুষ ক'র্‌তে হবে।

আমাদের অভাব ও অন্ন সমস্যার মীমাংসা ক'র্‌তে হ'লে আগে আমাদিকে আলস্য ত্যাগ ক'র্‌তে হবে। আজ এই যে সোনার ভারতে অন্নের জন্যে হাহাকার উঠেছে তার জন্যে দায়ী আমরা নিজে। আমরাই আলস্য ক'রে আমাদের গৃহশিল্পকে নষ্ট ক'রেছি। আমাদের দেশের যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল, তা সব ভেঙে চুরমার ক'রে ফেলেছি। তাই আজ সামান্য অভাবের জন্যেও আমরা পরমুখাপেক্ষী; তাই আজ ব্যবসা বাণিজ্য আমরা ভুলে' গেছি। তাই আজ দেশের অনাথা বিধবারা ও স্বাস্থ্যহীন দুঃখীরা স্বাধীনভাবে এক মুঠো খেতে পাচ্ছে না। আমরা যদি আবার আগেকার মত ঘরে ঘরে চরকা চালিয়ে সুতো কাটি, দেশী তাঁতে কাপড় বুনিয়ে নিয়ে পর্‌তে আরম্ভ

করি, বা চরকার স্থতো কিনে নিয়ে তারি কাপড় তৈরী করি, তা হ'লে ঐ সব দুখী, অনাথা ও নিরন্নেরা এক মুঠো ভাত পায়।

অবশ্য আপনারা ব'ল্‌তে পারেন যে—মিলের কাপড় ব্যবহার ক'রতে দোষ কি? আমি বলি তাতেও দোষ আছে। তাতে বিশেষ লাভ হ'বে না। দেশের কতকগুলো কুলী মজুরের খুচরো রোজকার তাতে কিছু বাড়বে বটে, কিন্তু সে বাড়া বিশেষ কাজে লাগ্‌বে না। তারা যে তিমিরে—সেই তিমিরেই থেকে যাবে। তাতে তাদের সাম্প্রদায়িক উন্নতি কিছুমাত্র হবে না। দীনসম্প্রদায় চিরদিন দরিদ্র ও নিরন্নই থেকে যাবে; দেশের অনাথা ও বিধবারাও তাতে কোনো অবলম্বন পাবে না। চরকা চালানো মানে কেবল বস্ত্র সমস্যার মীমাংসা করা নয়, লক্ষ লক্ষ অনাথা ও বিধবাদের জীবিকা অর্জ্জনের একটা পথও ক'রে দেওয়া হয়; সেই সঙ্গে আমাদের কুটীর-শিল্পও আবার বেঁচে ওঠে।"

তাহার পর তিনি পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াই তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। উচ্চ জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ হইল। বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে।

গাজুর এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। সভা ভঙ্গ হইতেই তাহার মনে হইল, সে মুনিবের জরুরী কাজে আসিয়া কত দেরী করিয়া ফেলিয়াছে। সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভিড় ঠেলিয়া গাজু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া মদের দোকানের দিকে চলিল। মনে মনে সে স্থির বুঝিতেছিল—আজ তাহার উপর দিয়া একটা মস্ত ঝড় বহিবে।

* * * *

সভা ভঙ্গ হওয়ার পর বক্তা তাঁহার সহকর্ম্মী দুইজন বাঙ্গালী যুবক ও স্থানীয় কয়েকটী শিক্ষিত যুবককে ডাকিয়া লইয়া 'অনাথ-আশ্রম' ও 'নৈশ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু কিছু চাঁদা আদায়ের একটা খস্‌ড়া প্রস্তত করিয়া ফেলিলেন এবং এখন হইতেই কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য বিশেষভাবে সকলকে অনুরোধ করিলেন; চুন্নি-লাল সিং ও সীতারাম দুবেকে তিনি আজমগড় 'অনাথ-আশ্রম' ও 'নৈশ-বিদ্যালয়ের' তত্ত্বাবধানকারীরূপে নির্ব্বাচন করিলেন।

স্থানীয় ভদ্রলোক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিবার জন্য তাঁহারা তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন।

* * *

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়া, মেজর তখনো শোফার উপর অর্দ্ধশায়িতভাবে পড়িয়া ছিলেন। গাজু অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকিল। আশঙ্কায় তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা পর্য্যন্ত তখন কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মেজর তখন এতো অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে গাজুর আগমন তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। গাজু ধীরে ধীরে টিপয়টা টানিয়া আনিয়া ছিপি খুলিয়া মদের বোতল ও গ্লাস মেজরের সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া, ভয়ে ভয়ে বলিল—"হুজুর, সরাব।"

মেজর কোনো কথা বলিলেন না। একবারমাত্র বেয়ারার দিকে চাহিয়া, হাত বাড়াইয়া এক গ্লাস মদ ঢালিয়া লইলেন। তাঁহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া যেন তখন আগুন্ ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল।

তবুও গাজু একটু হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। চাকুরী আজিকার মত রক্ষা পাইল। গাজু ভয়ে ভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। দরজার সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিয়াই সহসা চমকিয়া উঠিয়া দেখিল—সেই সভার ভদ্রলোক কয়েকটী। সে সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা মেজরের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

সকলের মাথায় গান্ধী-টুপি দেখিয়াই, মেজর বুঝিলেন তাঁহারা কে। প্রতিনমস্কার করিয়া, তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি চান্?"

চুন্নিলাল মুখপাত্র হইয়া বলিলেন—"অনাথ-আশ্রম ও নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য।"

শুনিয়া মেজর একটা বিকৃত হাসি হাসিলেন মাত্র; উত্তর না দিয়া পুনরায় এক গ্লাস মদ ঢালিলেন।

প্রধান কর্ম্মী ঈষৎ অগ্রসর হইয়া অনুনয়ের সহিত বলিলেন—"আপনাকে আর একটি অনুরোধ রাখ্‌তে হবে। আমাদের অনুরোধ ব'লেই শুধু নয়, অন্ততঃ দেশের ও দশের অনুরোধে, আপনার অনাহারক্লিষ্ট ভাইবোন্‌দের মুখ পানে চেয়ে, আপনাকে সুরাপান ত্যাগ ক'রতে হবে। আপনি

বাঙ্গালী—ভারতবাসী ও উচ্চ শিক্ষিত—আপনার কাছ থেকে আমরা দেশের উদ্দেশ্যে এই ত্যাগটুকু খুবই আশা করি। সাহায্য করুন, না-করুন এ ভিক্ষাটি দিতেই হবে।"

মেজর পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবেই উত্তর করিলেন—"হবে না। কা'ল সকালে আস্‌বেন।"

"আপনি একটু চেষ্টা ক'র্‌লেই হবে। আপনার মত লোকের কাছ থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে এ ত্যাগটুকু আমরা খুবই আশা করি। এই মদ্যপান আমাদের অধঃপতিত জাতিটাকে আরও কত নীচে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে কথা তো আপনার মত লোককে বুঝাতে যাওয়া আমাদের ধৃষ্টতা। যার ভিতর দিয়ে আমাদের অজস্র অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে, তার ভিতর দিয়ে আমাদের সামর্থ্যও যে পলে পলে লোপ পেতে বসেছে। আমরা এতো নীচে নেমে গেছি যে অর্থ ব্যয় ক'রেও নিজেদের সামর্থ্যকে আমরা বিকিয়ে দিতে বসে'ছি। এই এই—"

মেজরের যেন এতক্ষণে খেয়াল হইল। তিনি কর্ম্মিদের এই বক্তৃতায় অকারণে তাতিয়া উঠিয়া বলিলেন—"নন্-কো-অপারেশন্! গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন! হিঁয়াপর নেই হোগা। আভি নিকালো।" মেজরের বিস্ফারিত চক্ষু দুইটি তখন ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সকলেই মেজরের এই অস্বাভাবিক রূঢ়তায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। একজন বাঙালী ভদ্রলোকের নিকট বাঙলার বাহিরে আসিয়াও যে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহার পাইতে পারেন, তাহা কেহই কল্পনা করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহারাও যখন বাঙালী। আর সহসা ডাক্তারের এরূপ রাগিয়া উঠিবারই বা কারণ কি?

কর্ম্মিদিগকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া মেজর পুনরায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"চলে যান্, চলে যান্ শীগ্‌গির; নইলে, এখনি পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবো। যান্ বল্‌ছি——"

হঠাৎ একটা বিকট প্রেতমূর্ত্তি দেখিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, মেজরও সেইরূপ আচম্বিতে ভগ্‌লুর পশ্চাতে অনি ও বনবিহারীকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার কথা মুখের মধ্যেই থামিয়া গেল।

ধীর ও দৃঢ়পদে অনি মেজরের টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মূর্ত্তিটার ভিতর তখন এমন একটা দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, মেজরও বোধ হয় তাহা দেখিয়া ভয় পাইলেন। অনি কোনো কথা না বলিয়া টেবিলের উপর হইতে মদের বোতলটা লইয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল। মেজর একবার মাত্র অনির মুখপানে চাহিয়াই হাতে মুখ ঢাকিয়া কৌচের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। অর্দ্ধ সমাপ্ত পেগ্‌টা তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া সশব্দে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

ভদ্রলোকেরা নির্ব্বাক-ভাবে দাঁড়াইয়া এই মহিয়সী নারীটির পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাদের মনে হইল যেন আজ দেশমাতৃকার প্রতিরূপা তাঁহাদিগের জীবন-ব্রতের সহায়তা করিতে আসিয়াছেন।

সহসা পশ্চাৎ ফিরিয়া অনি তাঁহাদিগকে তখনো তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইয়া গেল। মেজরের সেই রূঢ় ভাষা অনির কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। ভদ্রসন্তানগণের প্রতিও যে মেজর ঐরূপ অমানুষিক ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

ঈষৎ অগ্রসর হইয়াই অনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। এ কি। এ যে তাহারি চেনা মুখ! কিন্তু অনি ঠিক্ চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যেন বহুদিন পূর্ব্বের একটা স্বপ্নের ছবির ন্যায় অনির স্মৃতিতে অতি ক্ষীণভাবে তাহা জাগিয়া উঠিতেছিল। দৃষ্টিকে প্রাণপণ শক্তিতে তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়াই অনি বিহ্বলভাবে বলিয়া উঠিল—""নিরঞ্জন দা! আপনি —নিরঞ্জন-দা! এখানে?"

যুবকটী যেন আরও অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, তুমি—তুমি—অনু!"

অনির বুক ঠেলিয়া যেন সহসা কান্না আসিবার উপক্রম হইল। জীবনের কত স্মৃতি—কত কথা! নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া সে বলিল—"আশা ক'র্‌তে পারি নি দাদা, যে জীবনে কখনো আর দেখা হবে। মনে মনে আপনার কথা অনেক চিন্তা ক'রেছি; কিন্তু কোন খোঁজই জানতুম না—আপনার।"

"আগে কোলকাতাতেই ছিলুম্। শরীর ও মন ভাল না

থাকায় মাঝে প্রায় বৎসর দুই শিলিং পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলুম; তার পর কাজে অকাজে কিছুদিন ভবঘুরের মত দেশে দেশে বেড়িয়ে, শেষে এই মাস দুই হ'ল বেনারস্ হিন্দু য়ুনিভার্সিটির প্রোফেসারি নিয়ে এসেছি। কিন্তু দিদি, তুই এতো বদ্'লে গেছিস্ যে তোকে আর ঠিক্ চেনা যায় না। বেনারসে এসেই তোদের বাসায় খোঁজ নিতে গেছলুম, কিন্তু সেখানে দেখি এখন এক্ হিন্দুস্থানী বাস ক'র্‌ছে।"

নিরঞ্জনের কথায় ঈষৎ হাসিয়া অনি বলিল—"জীবনের সে অধ্যায়েও যবনিকা পড়ে' গেছে দাদা।" তাহার সে হাসি যেন মৃতের বিকৃত ওষ্ঠের একটা আকারান্তর মাত্র।

"আর বদ্'লে যাওয়ার কথা বল্'তে গেলে, কেবল আমি একাই বদ্‌লাই নি দাদা; আপনিও বদ্‌লে' গেছেন ঢের। আপনাকে দেখেছিলুম্—'অসাধারণ তেজস্বী'; কিন্তু আজ যে রকম ভাবে নির্ব্বিবাদে ডাক্তার বাবুর অপমানটাকে আপনি হজম্ ক'র্‌ছিলেন, তাই দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছিল আরো বেশী, যে আপনি সেই 'নিরঞ্জনদা' কি না!"

"আমাদের জীবনের যে এই ব্রত দিদি। এ যে বৈষ্ণব অবতারের দেশভাই। এরা ক্রোধকে জয় ক'রেছে ক্ষমা দিয়ে, হিংসাকে জয় করেছে প্রেম দিয়ে। সহিষ্ণুতা দিয়েই চিরদিন এরা 'অসহ্য'কে জয় করে' এসেছে। চৈতন্যদেবের সেই কলসী-কাণার আঘাত খাওয়ার কথা তোর মনে নেই? যাক্, কিন্তু তুমি যে হঠাৎ এখানে দিদি? ডাক্তারবাবু কি তোমার আত্মীয়?"

অনি মাটির দিকে চোখ নামাইয়া, একটা ঢোঁক গিলিয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল—"হাঁ"।

প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করিয়া লইবার জন্য মেজর দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া রাখিলেও, তাঁহার বুক ঠেলিয়া একটা চাপা-কান্নার অস্পষ্ট শব্দ বাহির হইয়া আসিতেছিল। (আগামীবারে সমাপ্য)

চির-যাত্রী

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত বি-এ

পথের সমাপ্তি নাই, চলিয়াছি রাত্রি দিনমান—
বিবশ বিশীর্ণ দেহ, শ্রান্তিতে নয়ন মুদে আসে;

দুস্তর বন্ধুর পথ, ঝিলিমিলি শুধু চোখে ভাসে—
কানে বাজে, রহি রহি, অনন্তের অজানা আহ্বান!

উল্কার মত্ততা ল'য়ে শুধু ধাই উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ—
দুর্নিবার অগ্রগতি, আশাহীন চলারই উল্লাসে;—

ব্যর্থতা গুমরি কাঁদে, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে;
জীবনে ঘনায় ধীরে দিনান্তের ক্লান্ত অবসান!

কাহার উদ্দেশে চলি? দূর হ'তে কে বাজায় বাঁশী?
ঘর-ছাড়া তারি বাঁশী পথে মোরে ক'রেছে বাহির;—

চ'লেছি জীবন ভোর, আজো শেষ হয়নি গতির—
অজানা হ'ল না জানা, ধরা ত সে দিল নাক' আসি!

অসমাপ্ত পথমাঝে মরণ হাসিছে ক্রুর হাসি,
অস্ফুট সুরের মোহে তবু প্রাণ উন্মুখ অধীর!

আধুনিক কাব্য-লোক

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী, এম্-এ

সেদিন একখানি দৈনিকে দেখ্‌ছিলাম, জাপানীরা কি ক'রে তা'দের দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে বেছে নেয়। এক নম্বর। দু'নম্বর ক'রে অনেকগুলি সুন্দরী মেয়ের ছবি ছাপা হ'য়েছে দেখলাম। সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথমা হ'য়েছেন, তাঁ'র ছবি আমাদের চোখে তত ভালো লাগ্‌ল না। বরং দ্বিতীয়া, তৃতীয়া এবং চতুর্থীর মুখ-শ্রী আমাদের অতি পরিচিত ব'লে মনে হ'ল—অর্থাৎ ভালো লাগ্‌ল। রুচি এবং সৌন্দর্য্য-বোধের দিক্ দিয়ে এই অতি গোপন পরিচয়ের সূত্রটি খুব বেশী কাজ করে। এটি আবার দেশভেদে, জাতিভেদে, এমন কি ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্র এবং বিচিত্র রূপ নিয়ে দেখা দেয়। জাপানীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে বেছে নেওয়ার মূলে এর বিশিষ্ট প্রভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। বিচারক বল্‌ছেন—আমরা শ্রেষ্ঠ ব'লে বেছে নেব সেই সুন্দরীকে, যিনি স্বদেশে লালিত এবং বর্দ্ধিত হ'য়েও বিদেশী শিক্ষা এবং কাল্‌চারের মধ্যে আত্মহারা হ'য়ে যান্ নি—বর্ত্তমান কালের নানা বিরোধী ভাব এবং চিন্তাধারার মধ্যেও যিনি স্বদেশের শ্রী ও শোভার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখ্‌তে পেরেছেন। এক কথায়, বিদেশী শিক্ষা বলুন, বিদেশী রুচি এবং আদর্শ বলুন,—এ সবকে যিনি তাঁ'র অন্তরে বাহিরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে বরণ না ক'রে, দেশীয় মনোবৃত্তি, দেশীয় রুচি এবং আচার-শোভনতার সঙ্গে সেগুলিকে তুলনা করেছেন, বর্জ্জন ক'রেছেন এবং কতক বা প্রয়োজনবোধে ভূষণস্বরূপ গ্রহণ করেছেন, তিনিই জাপানীদের মতে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী।

কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে গিয়ে এ-কথা আমাকে বল্‌তে হ'ল,—কেন না শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর মধ্যে একটা জাতিগত সাদৃশ্য আছে। তা ছাড়া, জাপানী সৌন্দর্য্য-বিচারকের কথাটার মধ্যে এমন একটা সত্য আছে, যাকে আমরা সহজে অস্বীকার কর্‌তে পারি নে।

ব্রহ্মস্বাদ, সহোদর রসের কথা ছেড়েই দি—কারণ, যেখানে সত্যকার রসসৃষ্টি, সেখানে ভাষা স্তব্ধ। কিন্তু সেই রসলোকে পৌঁছুবার পথটিই কণ্টকাকীর্ণ—দুর্গমং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। যত বিচার, যত আলোচনা, যত তর্ক—সে সব এই দুর্গম পথকেই কেন্দ্র ক'রে। এই পথে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত রুচির বাধা আছে, অধিকার-ভেদের বাধা আছে, নানাবিধ জটিল আত্মকেন্দ্রীয় দৃষ্টির বাধা আছে—এ ছাড়া আরও বাধা থাকার সম্ভাবনা। এই সমস্ত বাধাকে অতিক্রম ক'রে সেই ক্ষণকালের স্বর্গলোকে পৌঁছুবার দুর্লভ পথের সন্ধান দেবার চেষ্টা ক'রেছেন আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা। তাঁদের মতবাদের মধ্যে একটা চিরকালের সত্য প্রচ্ছন্ন আছে—এ-কথাও কেউ কেউ বল্‌ছেন। আবার কেউ কেউ বল্‌ছেন—আধুনিক যুগে তাঁদের সে মতবাদ অচল; কেন না, সাহিত্যসৃষ্টি 'সাহিত্যদর্পণে'র অপেক্ষা রাখে না, যতটা রাখে স্রষ্টার দৃষ্টির এবং বিশিষ্ট অনুভূতির। সাহিত্যের জহুরী যাঁ'রা, তাঁ'দের বোধ হয় এতটা স্বাধীনতা পছন্দ হয় না—তাই তাঁ'রা অঙ্ক ক'ষে ক'ষে সৃষ্টির মধ্যে এক-একটা গণ্ডী টেনে দেন,—বলেন, এটা গোলাপ, এটা গাঁদা, এটা গন্ধরাজ ইত্যাদি। জাপানীরা না হয় তাঁ'দের দেশের শ্রেষ্ঠ গোলাপসুন্দরী নির্ব্বাচন ক'রে নিলেন। কিন্তু আমাদের এই আধুনিক যুগে আমরা শ্রেষ্ঠ কাব্য-সুন্দরীকে নির্ব্বাচন কর্‌ব কি ক'রে?

সর্ব্বপ্রথমে আমার মনে এই প্রশ্নটিই আনাগোনা সুরু করেছে। আমাদের দেশে আধুনিক যুগের কাব্যকলালক্ষ্মীর যে রূপসজ্জা, সে কি তা'র দেশগত সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কর্‌তে পেরেছে? উত্তর হ'বে—অসম্ভব, তা' পারে না। প্রাচীন ভারত আধুনিক যুগের মানুষের কাছে স্বপ্ন মাত্র। আর, তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে যে বঙ্গভূমি শতপল্লীসন্তানের দল বুকে ক'রে রেখেছিলেন, সেই দু'শ' বছর আগেকার বাংলার রূপ আর এখনকার বাংলার রূপে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তাই, আধুনিক কাব্যলক্ষ্মী অন্য সব বিষয়ের মতই সাগর-পারের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই

সাগরপারের দিকে তাকিয়ে থাকাটা সত্য, তবে এই তাকিয়ে থাকার পরিমাণ কতখানি—এই নিয়ে তর্ক উঠ্‌তে পারে। সেকালের যে কবি তপসী মাছ আর পাঁটার মাংস নিয়ে কাব্য লিখেছেন, তাঁ'র সময়ে নিশ্চয়ই এই সাগরপারের দিকে তাকিয়ে থেকে সাগরের সুদূর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের গর্জ্জনধ্বনি, আর সমুদ্রপক্ষীর পক্ষঝাপটের শব্দ শুন্‌বার প্রয়োজন কা'রও হয় নি। আমরা দেখ্‌তে পাই, এই প্রয়োজন যখন এল, তখন সঙ্গে সঙ্গে সে প্রয়োজনকে অতিক্রম কর্‌বার সে কী প্রাণান্তকর প্রয়াস! ভাঙন সুরু হ'ল, এবং সরল সহজ ললিতগতি পয়ারের লাইনগুলি পংক্তিমিতালির বন্ধন কাটিয়ে নূতন প্রাণের স্পন্দনে আন্দোলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে আন্দোলনের মধ্যে আমরা যে প্রচ্ছন্ন গম্ভীর কণ্ঠধ্বনির আভাস পেলাম, সে কণ্ঠ মিল্টনের স্বগোত্র, কিন্তু তা' একান্ত বাংলার-ই। বিদেশী প্রতিভার উজ্জ্বল জ্যোতিতে সে কণ্ঠ বিস্ময়ে আত্মহারা হয় নি—তা' আত্মস্থ হ'য়েছিল। আত্মপরায়ণ স্বল্পপরিমিত বাংলাসাহিত্যের অতি ক্ষুদ্র সংস্থানের মধ্যে সেই থেকে যে হাওয়া বইতে সুরু করেছে—সেই হাওয়া ই আধুনিক যুগের হাওয়া।

তার পর অনেক আক্ষেপ, অনেক আলোচনা, অনেক তর্ক-বিতর্কের কুয়াসা ছিন্ন ক'রে যে রবিজ্যোতির স্বয়ম্প্রকাশ আমরা দেখতে পেয়েছি, বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক যুগের অগ্রগতি তা'র পরে আর হ'তে পারে কি না, হ'লে কোন্ দিক দিয়ে হ'তে পারে, তা'র আভাস কিছু দেখা যায় কি না—এ-সব আধুনিক মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন। যুগধর্ম্ম ব'লে একটা কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়—ঋতুপরিবর্ত্তনে প্রকৃতির রূপবিবর্ত্তনের মত এই যুগধর্ম্মে অলক্ষ্যে গোপনে রুচির এবং মনোভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়; উজ্জ্বল আলোয় নতুন বর্ণে নতুন রূপে সে পরিবর্ত্তন যখন সম্পূর্ণ বিকশিত হ'য়ে ওঠে, তখন নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিও পোষাক বদ্‌লে ফেলে—প্রাত্যহিক অভ্যাসের-ও একটু-আধটু বদল হয়। নতুন পাতাগুলি যখন দীপ্ত রৌদ্রে ঝলমল্ ক'রে ওঠে—এলোমেলো হাওয়া বইতে সুরু হয়, অসংখ্য মুকুলের মৃদু সৌরভে সচকিত হ'য়ে মানুষ আর স্থির থাক্‌তে পারে না—বসন্তকে স্বীকার না ক'রে তার নিস্তার নেই। সমস্ত অভ্যস্ত পথের গণ্ডীরেখা অতিক্রম ক'রে সেই স্থবিরের শাসন-নাশন এসে দেখা দেয়। কিন্তু মনে রাখ্‌তে হ'বে এই দেখা-দেওয়াটার মধ্যে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা নেই—সহজ সরল স্পষ্ট তা'র আবির্ভাব—তা'কে স্বীকার কর্‌তে মানুষ একটুও ইতস্ততঃ কর্‌বে না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে,—এই যে নূতনের আবির্ভাব,—আধুনিক রুচি, আধুনিক মনোভঙ্গী যা'কে প্রণাম করে, যাকে স্বীকার করে - এই আবির্ভাবের সঙ্গে প্রাচীনের কি কোনো যোগ নেই? এর উত্তর হ'বে এই যে, যোগসূত্র আছে, যোগ-সূত্র থাক্‌বেই। প্রাচীন বৃক্ষের কাণ্ডের সঙ্গে নূতন পাতার যেমন যোগ, শুক্তির সঙ্গে মুক্তার যেমন যোগ—প্রাচীনের সঙ্গে নবীনেরও তেমনি অলক্ষ্য যোগসূত্র আছে। কাব্যের দিক্ দিয়ে' এ কথা প্রমাণিত করা দরকার। যে মহাকবির কণ্ঠে নূতন ভাষা উজ্জীবিত হ'ল—সে নূতন কণ্ঠস্বর-ভঙ্গী তাঁর বহুদিনের সাধনালব্ধ ধন। প্রথমে তাঁকে প্রচলিত রীতির পথেই চল্‌তে হ'য়েছিল। তার পরে যেদিন নূতন সুরের সন্ধান তিনি পেলেন, সেদিন তাঁ'র বাণী অকস্মাৎ উচ্চ দিব্যতানে উদ্‌গীত হ'ল। কিন্তু প্রথম যে সাধনা সে সাধনা বাঁধাপথের। তা'রপরে আসে আবিষ্কারের আনন্দ।

প্রত্যেক কবি-ই দিকচিহ্নহীন বিশাল সমুদ্রের মধ্যে কলম্বাস্। একদিন হয় ত দ্বীপবাসী বিহঙ্গেরা তাঁ'র জাহাজের সম্মুখ দিয়ে উড়ে যা'বে—তার পর হয় ত বনরাজিনীল দিক্‌চক্রের ঈষৎ আভাস মিল্‌বে—কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁ'র জাহাজ কূলের দিকে ভিড়্‌ছে, ততদিন তিনি আশ্বস্ত হ'বেন না। আধুনিক এই বিশিষ্টতাকে কাব্যবিচারে খুব বড় স্থান দেওয়া হ'য়েছে। কোন' বিশিষ্ট কাব্যই হয় ত শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়—তবু বর্ত্তমান বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে আজ্‌কের দিনে এই বিশিষ্টতাই খুব বড় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কবিদের ভুল হয় সেখানেই—যেখানে বিশিষ্ট বাণী বা ভঙ্গী দেবার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও বিশিষ্ট হ'বার চেষ্টা আছে। শেষে, কাব্যের মধ্যে এই দুঃসাধ্য চেষ্টার ঘর্ম্মবিন্দু তা'র সৌন্দর্য্যকে হয় ত ম্লান ক'রে দেয়। কেউ কেউ বলেন, না, কাব্যসুন্দরীর ললাটের ঐ স্বেদবিন্দুই ভাল,—এই কঠোর প্রয়াসের পর একদিন বিশ্রাম মিল্‌বে,—ভবিষ্যৎ যুগের কোন নূতন কবি হয় ত এই পথে তাঁ'র প্রেরণা পা'বেন।

কিন্তু সত্যই, আধুনিক যুগে এই নূতন পথের প্রেরণা দেখা দিয়েছে। তা'র কথাই বলি। শুধু বর্ণনার পর বর্ণনা, শুধু চিত্রের পর চিত্র, শুধু শব্দের কারুকার্য্য আর কথার কলঝঙ্কার এ প্রেরণাকে উদ্‌বুদ্ধ করে নি—জীবনের একটা গভীরতম উপলব্ধির সঙ্গীতময় প্রকাশকে এ আশা করছে; তা'র কারণ রসবোধের আভিজাত্য যে আধুনিক মানুষের আছে, সে আধুনিক মানুষের দৃষ্টি আজ পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের সাহিত্য-রসের পরিধির মধ্যে প্রবেশ করেছে। আরিষ্টটল্, ক্রোচে, টলষ্টয়, অথবা সম্মটভট্ট, অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ, রাজশেখরের রসমীমাংসাতে-ই তা'র সন্দেহ মিট্‌ছে না। এই প্রখ্যাত-নামাদের টিকিয়ে রাখ্‌বার জন্যে তা'র যেমন পরিশ্রমের অন্ত নেই, অপর দিকে নূতন ভাষ্য, নূতন ব্যাখ্যা এবং নূতন টীকা সংযুক্ত ক'রেও তা'র আশা মিট্‌ছে না। এর কারণ আর কিছুই নয়—এর কারণ aesthetics বলুন, অলঙ্কার শাস্ত্র বলুন, রস-প্রমার সন্ধান বলুন— সবই সৃষ্ট সাহিত্যের ব্যাকরণ মাত্র। সূক্ষ্মতম অন্তর্দ্দৃষ্টির ফলে এঁরা যে প্রমাণে গিয়ে পৌঁছন, সে প্রমাণের মধ্যে যুগ-পরিবর্ত্তন-নিরপেক্ষ সামান্য-ধর্ম্ম হয় ত থাকতে পারে, এমন কি থাকেও, কিন্তু তা'কেই একমাত্র কেন্দ্র ক'রে সাহিত্য সৃষ্টি চলতে পারে না। স্রষ্টারা যদি এই দিকে বেশী ঝোঁক দিয়ে বসেন, তাহ'লে তাঁদের রস-উৎস শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। নরদেহের অবয়ব-সংস্থানের মধ্যে মূল অস্থিময় কঙ্কালটি থাকে দর্শকের দৃষ্টির অগোচরে—শুধু সুন্দর প্রাণময় শোভাময় মূর্ত্তিটি চোখের সম্মুখে থাকে। যুগধর্ম্মের হাজার পরিবর্ত্তন হ'লেও কঙ্কাল চিরস্থায়ী হ'য়ে থাকবে। কঙ্কালহীন নরদেহ হয় ত হ'বে না—কিন্তু তা'র শোভা, তা'র বেশ, তা'র মূর্ত্তির একটা পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক। কাব্যদেহের পক্ষেও এই এক কথা—কঙ্কাল বা কাঠামো তা'র আছেই—তবে তা'র মূর্ত্তি-লাবণ্যের ব্যতিক্রম ঘটেছে আধুনিক যুগে। শুধু এই কঙ্কালকে কেন্দ্র ক'রে, যত বড় অন্তর্দ্দৃষ্টি-ই হোক্, একটা সাধারণ কবি-ধর্ম্ম গঠন ক'রে, তা'র বিধি নিষেধ প্রবর্ত্তন করার ক্ষমতা তা'র নেই :—"Even when we have invented a formula, that seems to explain those things the poets have in common, we shall find that each of them escapes out of the formula and has to be reformulated—or, as I should prefer to say, portrayed—in terms of his own personality". বিভিন্ন কবির এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে পাঠকের সম্মুখে ধ'রে দেবার কাজই হচ্ছে প্রকৃত সমালোচকের কাজ। একটা সাধারণ ধর্ম্ম হয় ত নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু সেটা যুক্তি-সহ না-ও হ'তে পারে। তবে তা'র আনুমানিক একটা গতি বা প্রকৃতি নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া যেতে পারে।

পূর্ব্বেই বলেছি, প্রত্যেক কবিই তাঁর দৃষ্টিসীমার মধ্যে স্ব-তন্ত্র,—অন্ততঃ এ না হ'লে তাঁর কাব্য-সাধনা সম্পূর্ণাঙ্গ হ'বে না। এই স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে বিভিন্ন আধুনিক কবির কাব্য থেকে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টি বা মনোভঙ্গীর যে আভাস পাওয়া যায়, সেইগুলির পরিচয়-ই আজ দিতে বসেছি। প্রত্যেকের কাব্যলোক বিশিষ্ট হ'লেও সেই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও আমরা একটি যে সুর শুনতে পাই—সেটি হচ্ছে, সুন্দরতম, সম্পূর্ণতম জগতের বাসনা—the desire for a more perfect world. এই বাসনালোক থেকেই কবির কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে—কোনটি বিদ্রোহের উচ্চকণ্ঠ, কোনটি পূরবীর ম্লানমন্দ স্বর, আর কোনটি বা তিক্ত ব্যঙ্গের অট্টহাস্য! এ জগৎ আর ভালো লাগছে না—আধুনিক কাব্যের মধ্যে এই টুক্‌রা কথাটি-ই অজস্র হাহাকারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। মহত্তর পরিণামের দিকে তাকিয়ে আধুনিকেরা উৎফুল্ল হ'য়ে কাব্যরচনা করতে চা'ন্ না। হয় তাঁ'রা কল্পনাকে অতীতের ঘনান্ধকার স্তব্ধ প্রস্তর-মূর্ত্তি সমাচ্ছন্ন যুগে পাঠিয়ে দেন, আর নয়, বর্ত্তমান যন্ত্রজগতের নিপীড়িত মানবাত্মার ছবি আঁকতে বসেন। এ সকলেরই মূল ভাবভিত্তি কিন্তু এক—ভালো লাগছে না আমার, আমি পীড়িত, আমি ক্ষুধার্ত্ত, নারীর ভালোবাসা আমি পাই নি, আমি বঞ্চিত! এই বাসনার তীব্র বেগে কবির কল্পনাদৃষ্টি যেখানে ঘুরে বেড়ায়, সেখানকার দৃশ্য আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটে উঠে—সে দৃষ্টি যে চিরকাল চিরসুন্দরের মূর্ত্তিই নিয়ে আসবে এমন কোন' কথা নেই;—সে বীভৎসকেও আনে, কুৎসিতকেও আনে, অসুন্দরকেও নিয়ে আসে; আসলে তা'র কণ্ঠস্বরের সে প্রবলতা থাকা চাই, সে যেন বলতে পারে—

"Theirs be the music, the colour, the glory,
the gold;
Mine be a handful of ashes, a mouthful
of mould.
Of the maimed, of the halt and the blind
in the rain and the cold—
Of these shall my songs be fashioned,
my tale be told."

তা'র কাব্যলোকের মধ্যে অনাদৃতরাও স্থান পায়। অবহেলিত অনভিজাত, বঞ্চিতের বেদনার কাহিনী আধুনিক কবির কাব্য-খেয়ালের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রেছে। আমাদের দেশেও আধুনিক সাহিত্যে এদের দেখা পেয়েছি,—এমন কি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যসম্রাট্‌দের মধ্যে একটা মহাকলহও এই নিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্র থেকে এদের উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি—তা'র কারণ, যাঁরা সন্দেহ করেছিলেন যে, আমাদের দেশের তরুণদের মাথায় বিদেশী Post-war Literature-এর ভুত এসে চেপেছে—তাঁ'দের সে সন্দেহ ব্যর্থ হ'য়েছে। সত্যকার অনুভূতির উপরেও আমাদের দেশের সুখ-দুঃখের কাহিনী সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে। আমার মনে হয়, সেইখানেই তা'র প্রতিষ্ঠা।

আমি বলি, এ অনুভূতি সত্য না হ'য়ে যায় না। বর্ত্তমান জগতের কথা একবার ভেবে দেখুন, দেখি! সমস্ত জগৎটা একটা দানবীয় বৈশ্যশক্তির অধীনে—কল-কারখানা, লোহালক্কড়, অগণ্য মারণাস্ত্রের জাল, বিজ্ঞানের রাক্ষস-তৃষ্ণা—এই সব নাগরিক সভ্যতার ধূলিধূম্র জটিল কুজ্ঝটিকাময় রূপের মাঝখানে এক-একবার বিদ্যুৎচমকের মত রৌপ্যচক্রের ঝনৎকার এবং চাকচিক্য আধুনিক মানুষকে প্রলুব্ধ করেছে—টেনে নিয়ে গেছে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তা'কে অবসন্ন ক'রেছে—বিলাসী ক'রেছে—মৃতপ্রায় করেছে। যন্ত্রই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক মানুষের দক্ষিণ হস্ত;—যন্ত্রের সাহায্যে সে সময়কে জয় করতে চায়—কেন না সময় তা'র হাত থেকে কেবলি স'রে স'রে যাচ্ছে। আজ এবং আগামী কালে এর হাত থেকে সত্যই কি মানুষের পরিত্রাণ আছে? আধুনিক কাব্যে এর হাত থেকে সেই পরিত্রাণ সেই মুক্তির বাণী নানা সুরে, নানা ভাবে এবং রূপে উদ্‌ঘোষিত হচ্ছে। তাই, আধুনিক কাব্য অলঙ্কার-বাহুল্য পরিত্যাগ করেছে। তা'র রূপ হ'য়ে উঠেছে সংক্ষিপ্ত, শাণিত এবং তীক্ষ্ন। ছোট ছোট Epigram, ছোট ছোট sonnet আধুনিকতম কাব্যের বাহন। যে কথা তা'কে বল্‌তে হ'বে—যে রূপ তা'কে ফোটা'তে হবে—সে কথা, সে রূপ নূতন, তাই তা'র ভাষাও নূতন, তা'র সরল সংক্ষিপ্ত উপমাগুলিও নূতন—তা'র বল্‌বার ভঙ্গীও নূতন। চিরাচরিত সমস্ত সংস্কার, সমস্ত conventionকে সে অস্বীকার কর্‌তে চায়;—সাহিত্যিক রীতিতে এত বড় ব্যতিক্রম বোধ হয় এর পূর্ব্বে আর কখনো ঘটে' উঠে নি। যে সব মৌলিক পুরাতন সুরের পুনরাবৃত্তি হ'য়েছে, যে সব image এবং imagery বারে বারে ভেঙে ভেঙে নূতন ব'লে চালা'বার চেষ্টা করা হ'য়েছে—আধুনিকের তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সে সব সুর, সে সব image-এর সত্য পরিচয় পেয়েছে। তাই সে পুরাতনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন কর্‌তে চায়। নইলে তা'র আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের আর মুক্তি নেই। এমন একটি রসলোকের সন্ধানে সে যাত্রা করেছে, যে রসলোক অনাবিষ্কৃত; এমন একটি কণ্ঠস্বরভঙ্গী সে আয়ত্ত কর্‌তে চায় যা' অনুচ্চারিত।

এ দুঃসাহস তা'র আছে, তাই যখন শুনি—

Sleep not my country: though night is here, afar
Your children of the morning are clamorous
for war:
Fire in the night, O dreams!
Though she send you as she sent you, long ago
South to desert, east to ocean, west to snow,
West of these out to seas colder than the
Hebrides I must go
Where the fleet of stars to anchored, and the
young Star captains glow.

তখন এর ছন্দে, এর বল্‌বার ভঙ্গীতে এর বাণীর উদ্দীপন-ধ্বনিতে আমরা নূতনত্বের আস্বাদ পাই, অথবা,

Twilight. Red in the West.
Dimness. A glow on the wood.
The teams plod home to rest.
The wild duck come to glean.
O souls not understood,
What a wild cry in the pool!

এর মধ্যে পূর্ব্বতন কবিদের কণ্ঠস্বরের কোন সাদৃশ্য পাই নে। অথচ কাব্যের সাধারণ ধর্ম্মের মধ্যে একে স্থান দিতে হয়—কেন না এ কাব্যে music আছে। ছোট ছোট শব্দের মধ্য দিয়ে যে চিত্রটি ফুটে উঠ্‌ছে—তা'র পরিবেশের মধ্যে একটি অজ্ঞাত রহস্যময় কারুণ্যের ধ্বনি আছে। এর রূপসজ্জা নূতন—তাই এ নবযুগের কাব্য-মণ্ডলে একটি অতি গভীর বিস্ময় বহন ক'রে নিয়ে এসেছে।

(২)

আধুনিক যুগের এই যে সদা ব্যস্ততা, এই যে অনবসর —এ আজ বিশ্বব্যাপী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কাব্যের তৃষ্ণা কোনো কালেই মানুষের যা'বে না, তাই আধুনিক কাব্য এই অনবসরের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। জাপানী কবি নোগুচির লেখা যাঁ'রা পড়েছেন, তাঁ'রা নিশ্চয়ই দেখেছেন কি সংক্ষিপ্ত, নিখুঁৎ, তীক্ষ্ণ এবং দ্রুত রসসঞ্চারী তাঁর কাব্যের লাইনগুলি! নোগুচির কাব্যের সম্পূর্ণ প্রভাব কি না জানি না, বিদেশী অর্থাৎ ইয়োরোপীয় অতি-আধুনিক কাব্যের সাধারণ ধর্ম্মই ঐগুলি। Epic যুগ যে গত হ'য়েছে, এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই থাকে না। কিন্তু এখনো একখানি বিশালকায় এপিকের ক্ষুধা মানুষের মেটে নি। সে ক্ষুধা মেটাবার ভার নিয়েছে আধুনিক যুগের প্রকাণ্ড উপন্যাসগুলি। Muse of utility তা'র music ও rhyme, গদ্যের সুদীর্ঘ পংক্তিগুলির মধ্যে নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে বিচিত্র মানুষের হাজারো রকম মনোবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পন্ন কর্‌ছে। এতখানি কাজ কাব্য তা'র ক্ষেত্র থেকে ছেড়ে দিয়েছে। তা'র পরিধি সংকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে; কিন্তু চতুরা কাব্যলক্ষ্মী সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেও আধুনিক মানুষের পিপাসা মেটা'বার সামর্থ্য অর্জ্জন ক'রেছেন—সে তাঁ'র কল্পনা-দৃষ্টির ক্ষিপ্রতম ব্যঞ্জনায়! দশখানি Realistic এবং tragic উপন্যাস পাঠান্তে পাঠকের যে মনোভাব হ'বে—অসংখ্য চরিত্র-জনতায় নিয়তির নিষ্ঠুরতম পরিণাম ইঙ্গিতে মাথার মধ্যে যে জটিলতম চিত্রের ভাবনা হ'বে—নীচের এই কয়েক পংক্তি কবিতায় সে ভাব-ব্যঞ্জনা অনেকটা পাই না কি?—

In a narrow high passage, half hogs came
tumbling outward
To the top of an inclined plane of wood,
slid down
And stuck at the base a second to be
smitten in two.
A dark youngman with an axe was
standing there,
Lean-waisted, strong-armed ; one fancied a
mask like a headsman's.
He waited, axe downwards, his eyes looking
at us and through us,
His mouth was firm, chin square, he'd a
slight dark moustache :
Slavouic perhaps. There was pride and
contempt in his eyes,
And nothing else lived in his face to show
what he thought.
A carcass rushed down ; his hands went
steadily upwards,
Then down flew the axe and severed it
clean between bones,
To tumble down funnels…I answered
ashamed his gaze
As he stood, imperious, erect, his eyes
looking forward,
Axe at rest, straight down from his forearm,
a waiting headsman.
A figure fyom allegory, a symbal of Doom.

এই Headsman যেন classic কবিদের মহাকাব্য থেকে সরাসরি আধুনিক যুগের কাব্যের মধ্যে নেমে এসেছে—আধুনিক কল্পনায় এই ভয়ানক রসের চিত্র অনেকবার দেখা গেছে।

কল্পনার দৃষ্টি-কেন্দ্রে অদ্ভুত নূতনত্ব, বিস্ময় ও ভয়ানক রসের প্রাধান্য, কাব্যের সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যে জীবনের জটিলতম সমস্যার সংহরণ এবং জটিলতম রূপকে ধর্‌বার ক্ষমতা—রূপসজ্জার বৈচিত্র্য—এইগুলিই আধুনিক কাব্য-লোকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

এইবার কতকগুলি দৃষ্টান্তের মধ্যে আমার বক্তব্যকে আরো স্বচ্ছ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব। দীর্ঘদিন হাঁসপাতালে কঠিন রোগশয্যার পর রোগী মুক্তি পেয়েছে—সে সহরের

রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, গাড়ীতে চলেছে; তা'র সন্তসুপ্ত মনোলোকে বাহিরের জগতের স্থূল রূপটি কেমন সূক্ষ্ম হ'য়ে প্রবেশ ক'রেছে এবং কত বিচিত্রভাবে সে তা'র অনুভূতিটিকে প্রকাশ কর্‌ছে—

O, the wonder, the spell of the streets !
The stature and strength of the horses,
The rustle and echo of footfalls,
The flat roar and rattle of wheels !
A swift tram floats huge on us···
It's a dream ?
The smell of the mud in my nostrils
Blows brave—like a breath of the sea !
···O, yonder—
Is it ?—the gleam of a stocking !
Sudden, a spire
Wedged in the mist ! O the houses,
The long line of lofty, grey houses
Cross-hatched with shadow and light !
These are the streets···
······Free······!
Dizzy, hysterical, faint,
I sit, and the carriage rolls on with me
Into the wonderful world !

প্রেমিক তা'র প্রথম প্রেমকে ভুল্‌তে পার্‌ছে না; দেহ-ভোগের কারাগারের মধ্যে তা'র প্রথমা প্রিয়ার মূর্ত্তি বার বার তা'র চিত্তকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে—তা'র প্রথম প্রেম যে মলিন হয় নি, এই কথা কয়টিকে সে কত বিশিষ্ট বেদনার সঙ্গে প্রকাশ কর্‌ছে—

Last night, ah, yesternight, betwixt her
lips and mine
There fell thy shadow, Cynara, thy breath
was shed
Upon my soul between the kisses
and the wine ;
And I was desolate and sick of an old passion,
Yea, I was desolate and bowed my head,
I have been faithful to thee, Cynara,
in my fashion.

'কিশোরকালের প্রেমের স্মৃতি লুপ্ত হ'য়েও লুপ্ত নয়'—কবির এই একটি লাইনের মর্ম্মকথাটি বিদেশী কবির গভীর অনুরাগের মধ্যে কি বিচিত্র রূপ নিয়েছে—

I have forgot much, Cynara, gone
with the wind,
Flung roses, roses, riotously with the throng,
Dancing, to put thy pale, lost lilies
out of mind,
But I was desolate and sick of an old passion
Yea, all the time, because the dance
was long,
I have been faithful to thee, Cynara !
in my fashion.

পরিশেষে রাত্রির ঘনান্ধকারের মধ্যে এই স্মৃতির ক্ষুধা কি ভাবে সুরের সমাপ্তির অপেক্ষা কর্‌ছে—

I cried for madder music, and for
stronger wine,
But when the feast is finished and the
lamps expire,
Then falls thy shadow, Cynara, the
night is thine ;
And I am desolate and sick of an old passion
Yea, hungry for the lips of my desire,
I have been faithful, to thee Cynara,
in my fashion.

এই মুক্ত নিরুদ্ধ অন্তঃস্রোত, এই আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর, এর তুলনা আমাদের দেশের কাব্যে বিরল না হ'লেও, খুব কমই আছে। এ দেশের পক্ষে যতটা হওয়া সম্ভব, আধুনিক কাব্য তা'র চেয়ে অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি, সাগর-পারের পাখীর ডানার ঝাপটের শব্দ এবং সাগর-তরঙ্গের গর্জ্জনোচ্ছ্বাস-ধ্বনি শোনা আমাদের দেশের কবিদের পক্ষে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে;—তা'র ফলে যা হ'য়েছে, সেটা প্রত্যক্ষ। যেখানে সেটা স্বাভাবিক—যে কবির আত্মসাৎ কর্‌বার শক্তি বেশী, তিনি জাপানীদের দেশানুকূল সৌন্দর্য্যচর্চ্চার মত বিভিন্ন বিরোধী চিন্তাধারাকে স্বকীয় ক'রে নিয়ে তাঁ'র শক্তির উৎকর্ষ সাধন ক'রেছেন;—আর, যেখানে সেটা স্বাভাবিক নয়, আত্মসাৎ কর্‌বার শক্তি যেখানে নেই, সেখানে ইংরাজী আধুনিক কবিতার রসাস্বাদ কর্‌তে যাওয়াও যা'—অক্ষম কবির অপরের অনুকৃতি পাঠ করাও তাই। তবে, এটা অতি সত্য কথা যে, অতি-আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে কয়েকটি হাওয়া বইতে

সুরু করেছে, তা'র মধ্যে ইংরাজি অতি-আধুনিক কাব্যের হাওয়াই বেশী জোরালো। অতি-আধুনিক বাংলা কাব্য-লোকে সংস্কৃত-কাব্যের ছায়া বা ভাবের কথা মাঝে মাঝে ওঠে, শুনতে পাই। কিন্তু আমার মনে হয়, সে কথার কোন ভিত্তি নেই। 'শিপ্রা' 'উজ্জয়িনী' আর মেঘদূতের প্রচলিত কয়েকটি শ্রুতিমধুর শব্দ কবিতাতে থাকলেই সে কবিতায় সংস্কৃত-কাব্যের ছায়া থাকে—এমন ধারণা ভুল। এতক্ষণ ধ'রে যে আধুনিক-কাব্য-পরিমণ্ডলীর বা কাব্যলোকের কথা ব'লে এলাম, সংস্কৃত-কাব্যলোক তার থেকে সহস্র যোজন দূরে। সংস্কৃতের টেক্‌নিক্, তা'র গাম্ভীর্য্য, তা'র ছন্দোবৈচিত্র্য; সর্ব্বোপরি তার Logic সংস্কৃতের বহুদূর অপভ্রংশ বাংলাভাষায় কোথায়? রবীন্দ্রনাথ শুধু সংস্কৃত-কাব্যলোকে স্বপ্নে বিচরণ ক'রেছেন মাত্র; এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারা যায় যে, রবীন্দ্রকাব্যে সংস্কৃত শ্রেষ্ঠকাব্যের মোহ আছে। মোহ এবং আদর্শ—দু'টিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সংস্কৃতকাব্যের আদর্শে এখনকার দিনের কোন' কবি কবিতা রচনা ক'রেছে কি না জানিনা—যদিও চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা তাঁ'র ভুল হ'বে। ও জিনিষ শ্রদ্ধার সঙ্গে মাঝে মাঝে পড়্‌তেই ভালো লাগে—মাঝে মাঝে কল্পনাকে পাঠিয়ে মালবিকা-মঞ্জুলিকার সংবাদ-স্বপ্নে আধুনিক ভাষায় কাব্য রচনা করাও যায়—কিন্তু তা'তে তৃপ্তি নেই। এখনকার দিনে একমাত্র 'ঋতু মঙ্গলে'র কবি সংস্কৃতকাব্যের আদর্শে কবিতা রচনা কর্‌তে পেরেছেন—কিন্তু 'ঋতু-মঙ্গল' ক'জন পড়েন? সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপ দেবার চেষ্টা ক'রেছেন কিন্তু সে শুধু চেষ্টা-ই। Synthetic ভাষার ছন্দ-ধ্বনিকে analytic ভাষার বহমান্ স্রোতের মাঝখানে বেঁধে রাখ্‌বার চেষ্টা। তা'র চেয়ে দ্রুতগতিতে মৌলিক সৃষ্টির চেষ্টা দেখ্‌লে কাজ দিত। এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন, যে, আমি classic মহাকবিদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব মনে পোষণ কর্‌ছি। Classic মহাকবিদের কাব্য দু'শ'বার পঠনীয়—তা'র বিশেষ মর্ম্ম গ্রহণীয়—তা' থেকে কল্পনার খাদ্যও সংগ্রহণীয়; কিন্তু তা'র প্রাচীন টেক্‌নিক্—যা' আমাদের বর্ত্তমান কাব্য-লোকের বাইরে—সে টেক্‌নিক্ মোটেই অনুকরণীয় নয়—তা' হ'তেই পারে না।

আধুনিক বাংলা কাব্যলোকে দেশমুক্তি-সাধনার বাণী নির্গত হচ্ছে না ব'লে অনেকে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। কাব্যের মধ্যে Politics-এর অনুপ্রবেশ—এটাও Muse of utility। এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি যে, ও জিনিষটি আধুনিক কাব্যলোকের বাইরে চলে গেছে; তা'র কারণ বহু—সে কথা বিস্তৃত ক'রে বল্‌বার অবকাশ আর নেই। কিন্তু এই কি যথেষ্ট নয় যে, যে দুঃখ, যে জীবনের নাগপাশের বেদনা আধুনিক কবির কাব্যে বহুধা বিভক্ত হ'য়ে রূপ পরিগ্রহ কর্‌ছে—যে কণ্ঠস্বর ক্ষণে ক্ষণে রুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে—তা'দের উৎপত্তি দেশের এই মহা দুর্দ্দিনের মধ্যেই! Muse of Inspiration, রাজনীতির মধ্যে তা'র প্রাণের খোরাক পায় না—কাব্যে যতটুকু বেদনা রূপ পরিগ্রহ করে, তা' সাধারণ, তা' অনেক সময় বিশ্বজনীন! কাব্যের এই বিস্তৃত সফলতার অর্থ আধুনিক কবি বুঝেছেন; তাই সাগর-পারের আধুনিক কবির কাব্যের নিগূঢ় ধ্বনি-তাৎপর্য্য আমরা গ্রহণ ক'রে আনন্দ পাই। যদি ভাষার ব্যবধান না থাকত, তা'হলে ওখানকার কবিরাও আমাদের দেশের আধুনিক কাব্য প'ড়ে আনন্দ পেতেন। এখানকার একটি দুঃখী পরিবারের মেয়ে ঘনঘোর বর্ষার দিনে তা'র ধনী বান্ধবীকে চিঠি লিখ্‌ছে—গিরিডির শুষ্ক মাঠের উপর বর্ষা নেমে সবই শ্যামলতর ক'রে তুল্‌ল! বন্ধু, তুমি তোমার সেতারের ঝঙ্কারে বর্ষার আনন্দ উপভোগ কর্‌ছ; আর, এখানে নগরীর রাজপথের কর্দ্দম মোটরের চাকা থেকে ছিট্‌কে ছিট্‌কে এসে আমার বিভ্রান্ত স্বামীর পাঞ্জাবীতে লেগে যায়—কলতলায় বহু যুগের শ্যাওলা এসে জমেছে। বাসন মাজ্‌তে মাজ্‌তে আমি সেগুলি ঝামা দিয়ে পরিষ্কার করি—

'শ্যাওলা-পিছল কলতলা দিদি, ঘ'সে ঘ'সে মরি ঝামা!'

ধনীদের সেতার-ঝঙ্কৃত বর্ষার আনন্দের মধ্যে চিরদুঃখিনী বাঙালী মেয়ের এই contrast বাস্তব চিত্রটি আধুনিক কাব্যের দান! যন্ত্রজগতের এবং যন্ত্রজীবনের পশ্চাদ্ধাবনে আধুনিক মানুষের ক্ষীণ, ক্লান্ত ম্রিয়মাণ কণ্ঠস্বর একটি গভীর দুরাশা মনে মনে পোষণ কর্‌ছে—

'যন্ত্রজগতের গান থেমে যা'বে সন্ধ্যার সময়,
তখন আসিও তুমি!'

ছোট ছোট শব্দের মধ্য দিয়ে নিতান্ত নিরাভরণ ক'রে

এই যে গভীর অনুভূতির প্রকাশ, এর মধ্যে আলস্য নেই—সত্য আছে। আধুনিক কবির দূরদৃষ্টি আরও ব্যাপ্ত হ'য়ে একটি রুদ্ধ সংযত করুণ ক্রন্দনে মূর্ত্তি নিয়েছে—

…'হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড় !'

জনতাময়ী নগরীর স্তব্ধ, অন্তর্গূঢ় মূর্ত্তি আধুনিক কবির দৃষ্টিতে কি গভীর ঔদাস্যের সঙ্গে ফুটে উঠ্‌ছে—

'আলো আসে ভয়ে ভয়ে গলিপথে সুড়ঙ্গের দ্বারে
ছায়া যেথা অধীশ্বর যেথা ঘুরে টাকার চাকারা
সীমাহীন, বর্ণহীন পথে !'

এই জ্বালাময় জগতের যন্ত্রণা থেকে আধুনিক কবি তাঁ'র কল্পনাকে বহুদূরে পাঠিয়ে উদার মুক্তি প্রার্থনা কর্‌ছেন—

'অথবা সেথায় চলো, মোর সাথে—যেথায় 'অরোরা'
বর্ণের আলিম্প আঁকে বিজন, ভীষণ মেরু শিরে,
অথবা বাদাম ফলে যেথা বক্ত-সাগরের তীরে,
ছায়ায় ঘুমায়ে থাকে চিক্কণ-চিত্রিতা বিষধরা
আর বিচিত্রতা চিতা ; ব্যর্থপ্রেমে যেথা তীক্ষ্ণ ছোরা
প্রিয়ের বুকের রক্তে লাল হয়, সেথা চলো ফিরে !'

বর্ত্তমান জগতের রূঢ় ক্লান্তির মধ্যে কবি কি নিদারুণ ভীষণতার স্বপ্নে আপনার কবি-কল্পনার সার্থকতা অন্বেষণ করেছেন! ঘৃণাহত, মুহ্যমান, ক্লান্ত নাগরিক পুরাতন জীর্ণ পুঁথির মধ্যে তা'র অনাদৃত, হরিদ্রাভ পাতাগুলি উল্‌টে, উল্‌টে কি অদ্ভুত মনোভঙ্গীতে চ'লে গেছেন—

'এ জীর্ণ পাতার স্পর্শ নারীমাংস চেয়ে সুখকর,
মলাটে ধূলির গন্ধ,——মুখমদ্য তা'র তুল্য নয়,
গ্রন্থের অক্ষয় গ্রন্থি—পরিপূর্ণ, প্রবল প্রণয়,
এই প্রেমে সমাসীন স্বপ্নলব্ধ পরম সুন্দর !'

'Escape from real life-এর উদাহরণ হয় ত, আলঙ্কারিকদের মতে 'রসাভাসে'র প্রবল উদাহরণ হয় ত, কিন্তু তবু এ আধুনিক জীবনের জটিলতম মনোভঙ্গীর কাব্য—সে হিসাবে এর মূল্য আছে—আর, এর সরল বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীর যে মূল্য—সে মূল্য সত্যকার কবি-হৃদয়ের কাছে চিরকাল আদৃত হ'বার যোগ্যতা রাখে।

হতাশ প্রেমিক রোগ-শয্যায় তা'র নিষ্ঠুরা প্রেয়সীর ছবিকে স্বপ্ন-কল্পনার মাধুর্য্য দিয়ে উপভোগ কর্‌ছে—

'সন্ধ্যা কোমল কায়া—
ছোট বোন্‌টির মতো পাশে ব'সে নয়নে করুণ মায়া
তুমি কি এখন চঞ্চলপদে গৃহ-আচরণে রত,
তোমার চোখে কি সন্ধ্যা নেমেছে আমার স্নেহের মত ?
শুয়ে আছি চুপচাপ—
কাণ পেতে শুনি রাতের পাথায় বাজে আজি কি বিলাপ !'

এতদিন যত স্বপ্ন দেখা হ'য়েছে, যত ভাবে, যত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে, আধুনিকেরা তাঁদের কল্পনাদৃষ্টিকে সেই পুরাতন স্বপ্ন-জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন—এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি। আধুনিক বিদেশী কবিতার উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত থেকে এই কথাই প্রমাণিত হ'বে। এইবার আমি আমার আরম্ভের কথায় ফিরে যা'ব। বাংলাদেশের সত্যকার আধুনিক কাব্য তা'র দেশগত বিশিষ্টতা হারায় নি—এই কথাই আমি বল্‌তে চাই। এখনো তা'র রেখাগুলি হয় ত অস্পষ্ট, এখনো তা'র কল্পনা হয় ত শান্ত স্থৈর্য্য পায় নি—কোনটিই হয় ত classic হ'বার যোগ্যতা পায় নি, স্মরণ রাখ্‌বার যোগ্য লাইন হয় ত খুব কমই লেখা হ'য়েছে, তবু এইটুকু পর্য্যন্ত বলা যায় যে, কাব্যগগনে এ একটা নূতন জ্যোতিষ্কের আলো—বহুদূর থেকে তা'র ক্ষীণ জ্যোতি আস্‌ছে ; পৃথিবীর উপরে এখনো তা'র পূর্ণ অধিকার জন্মায় নি। কাব্যের পক্ষে দেশগত বিশিষ্টতা বল্‌তে অনেকখানি বোঝায়। ছন্দ, ভাষা, ভাব, এবং রীতির উপরেই তা'র অবলম্বন-সূত্র। এ কথার যথার্থ প্রমাণ দিতে গেলে অনেক উদাহরণ তুলে দেখান' দরকার। এ প্রবন্ধে শুধু আধুনিক কাব্যলোকের গতি ও প্রকৃতি নির্দ্দেশ কর্‌লাম মাত্র।

প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্য ধ'রে বিচার করাই আধুনিক সমালোচকের কাজ—এ কথাও পূর্ব্বেই বলেছি। তবু, সমস্ত উজ্জ্বল বিশিষ্টতার মধ্যেও একটু আধটু সাধারণ-ধর্ম্ম উঁকি দেয়—সমালোচকের বিশেষ দৃষ্টির পক্ষে সেটা একটা আবিষ্কারের আনন্দ। এখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, আধুনিক কাব্যের রূপ কি ? তা'হলে এ প্রশ্নটিও একটি বিশেষ সাধারণ-রূপের অপেক্ষা রাখে। আমি বলি, আধুনিক কাব্যের রূপ পুরাণ-কথার দময়ন্তীর রূপ—যে দময়ন্তীকে অর্দ্ধবসনে উদ্‌ভ্রান্ত নল নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পরিত্যাগ ক'রে গেছেন। পত্রচ্ছেদের অবকাশে যতটুকু আলো এসে বনতলে পড়েছে, অরণ্যভূমির শুষ্কপত্রের যতটুকু মর্ম্মরধ্বনি আস্‌ছে—সেই আলো এবং সেই শব্দ ধ'রে দময়ন্তী তাঁ'র প্রিয়ের সন্ধানে চ'লেছেন। সন্ধানের যতদিন শেষ না হয়, ততদিন তিনি—

উন্মত্তরূপা শোকার্ত্তা তথা বস্ত্রার্ধসংবৃতা।
কৃশা বিবর্ণা মলিনা পাংশুধ্বস্তশিরোরুহা॥

এইরূপে তিনি কত দেশ অতিক্রম ক'রে যা'বেন, কত মহা দারুণ বন, কত পদ্মসৌগন্ধিক তড়াগ, কত সুশীতলা নির্ম্মলস্বাদুসলিলা নদী—কোনো দিন হয় ত কোনো করুণ-হৃদয় তাঁ'কে দেখে বল্‌বেন,—

তাদৃক্ রূপং চ পশ্যামি বিদ্যোতয়তি মে গৃহং।
উন্মত্তবেশপ্রচ্ছন্না শ্রীরিব আয়তলোচনা॥

তাঁর সেই উন্মত্তবেশের অন্তরালে হয়ত কল্যাণী লক্ষ্মীরূপ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে !



সূচী-শিল্প

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

মাঞ্চুরিয়া

শ্রীভারতকুমার বসু

বিপুল চীন-সাম্রাজ্যের একটী ক্ষুদ্র অংশ—মাঞ্চুরিয়া। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাঞ্চুরিয়ায় তাতার এবং মাঞ্চু-জাতীয় লোকেরা বসবাস ক'রতো। নুরহাচু নামে একজন মাঞ্চু-রাজা ছিলেন তাদের শাসক। এঁরই বংশধরেরা দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে অভিযান ক'রে, বিখ্যাত মিং-রাজবংশের উচ্ছেদ করেন। এর পরই তাঁরা পিকিং-সহরে চীনের রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন।

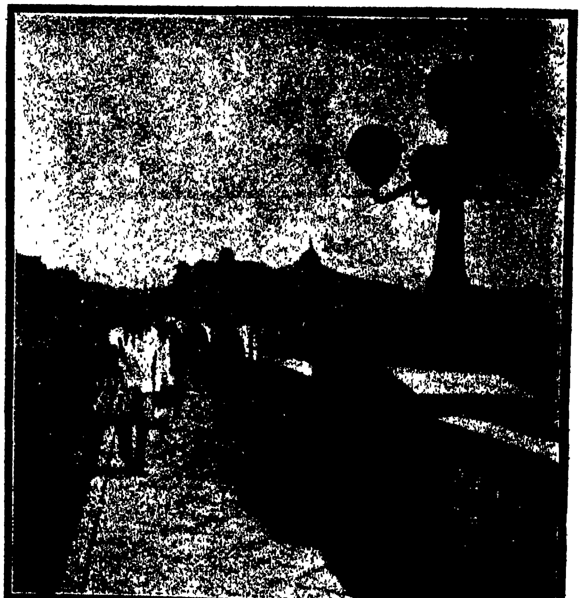
নুরহাচু ছিলেন অসাধারণ প্রতাপশালী রাজা।



মাঞ্চুরিয়ান শ্রমিক

শত্রুকে তিনি শক্তির দ্বারা করায়ত্ত ক'রতেন। সকলের জন্য তিনিই প্রথমে মাথার সামনেকার চুল কামিয়ে ফেলবার এবং সুদীর্ঘ শিখায় বেণী-বন্ধন রাখবার রীতি প্রচলিত করেন। এই রীতি সমস্ত চীনেই ছড়িয়ে পড়ে। মাঞ্চুদের জন্য নুরহাচু একটী লেখ্য ভাষারও প্রচলন করেন। এই ভাষা মোঙ্গল-ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। নুরহাচুর সমাধি-চিহ্ন আজও মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুকডেন-সহরের কাছেই দেখতে পাওয়া যায়। স্থাপত্য এবং দৃশ্যের দিক দিয়ে, মুকডেনের সঙ্গে প্রাচীন তাতারদের রাজধানী পিকিংয়ের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তবে, পিকিংয়ের তুলনায় মুকডেন-সহরটী ছোট।

মাঞ্চুরিয়ার আসল নাম—টুং সান্ সেং, অর্থাৎ, "চীনের পূর্ব্বদিকের তিনটী প্রদেশ"। এই তিনটী প্রদেশের নাম :—দক্ষিণে, ফেংটিন্ বা শেং-কিং; রাজধানী মুকডেন।



সেতু

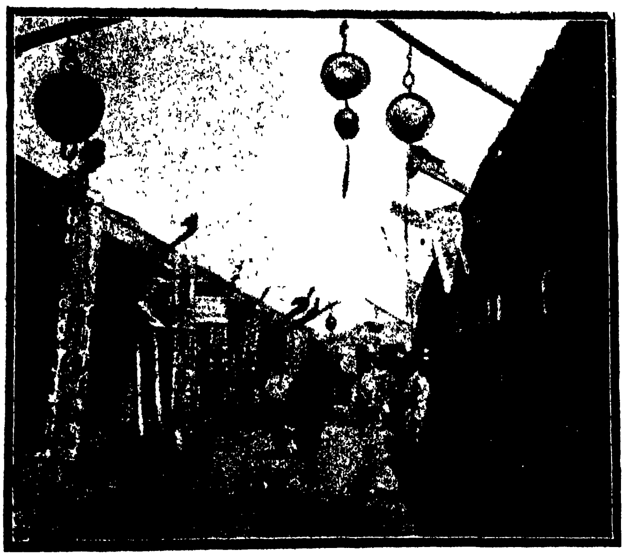
মধ্যে, কিরিণ্; রাজধানী কিরিণ্। উত্তরে, হিলুংকিয়াং; রাজধানী সিট্সিহার।

১৬৪৪ সাল থেকে ১৯১১ সালের চৈনিক বিদ্রোহ পর্য্যন্ত যে মাঞ্চু-রাজ-বংশের দ্বারা সারা চীন শাসিত হ'তো, সেই রাজ-বংশের নাম—"টা চিং চাও" অর্থাৎ "পরম পবিত্র রাজ-বংশ"। কিন্তু সান্-ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবে ওই 'পবিত্র রাজবংশের' ধ্বংস হয়। প্রজা যেখানে উৎপীড়িত, রাজ-

বংশের পবিত্রতা সেখানে কতখানি অপরাধী, বর্ত্তমান প্রজাতান্ত্রিক চীন তার উপযুক্ত উত্তর দিয়েছে। আজকাল মাঞ্চুরিয়ার মালিক—সেই মাঞ্চু-রাজারা নন,—প্রজাতান্ত্রিক



পথ



বাজারের পথ

চীন;—যদিও জাপান সেখানে সম্প্রতি থাবা উদ্যত ক'রে ব'সেছে।

ফেংটিন্-প্রদেশটী মাঞ্চুরিয়ার অপর দুটী প্রদেশ—কিরিণ্ ও হিলুং কিয়াংয়ের চেয়ে অনেক উন্নতিশীল। তার একটু কারণও আছে:—

মাঞ্চু রাজবংশের উদ্ভবের আগে, মিং-রাজাদের সময়ে



বাজার

ফেংটিন্-প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চল ছিল চৈনিক অধিকারভুক্ত। সেই সময়েই ওই প্রদেশটী উন্নতির সুযোগ পায়। এ ছাড়া, ফেংটিনের ভিতর দিয়ে গেছে—লিয়াও-নদী। এই নদীর উপর দিয়ে দুশ' মাইল পর্য্যন্ত হাজার-হাজার নৌকা চলাচল ক'রতে পারে। ফেংটিনের সমস্ত পশ্চিম-ভাগই হচ্ছে সু-উর্ব্বর উপত্যকা-ভূমি। ফেংটিনের পূর্ব্বাঞ্চল হচ্ছে পাহাড়ী জায়গা। তবে তার ভিতরে চাষোপযোগী উপত্যকা আছে প্রচুর। ওই সব পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 'ওক্'-গাছ পোঁতা হয়। এই সব গাছের ডালের উপরে গুটি-পোকাকে রাখা হয়—খাওয়াবার

ফেংটিনের প্রায় সমস্ত উত্তরাঞ্চলই রাজ-কর্ম্মচারীদের শিকারক্ষেত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হ'তো। আজকাল সেটীকে চীনা-অধিবাসীদের কাজে লাগাবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে। আজ সেখানে একটী কর্ম্ম-ব্যস্ত বিরাট কৃষিজীবনের সাড়া পাওয়া যায়।

ফেংটিন্ এবং কিরিণ্-প্রদেশের জঙ্গলে যে-সব কাঠ জন্মায়, সেই কাঠ সমস্ত উত্তর চীনের কাজে লাগে।

ফেংটিনের মতো কিরিণ্-প্রদেশের পশ্চিমদিকেও আছে

প্রচুর পর্ব্বত-শ্রেণী। এগুলো সমস্তই আগ্নেয়গিরি। পাই টাউ সান—পর্ব্বতের মুখ-বিবরে ৬।৭ মাইল দীর্ঘ একটী সরোবর আছে। এর গভীরতা ৩০০ ফিট। কিরিণ্ এবং নিংগুটা-



দৃশ্য দেখাবার যন্ত্র

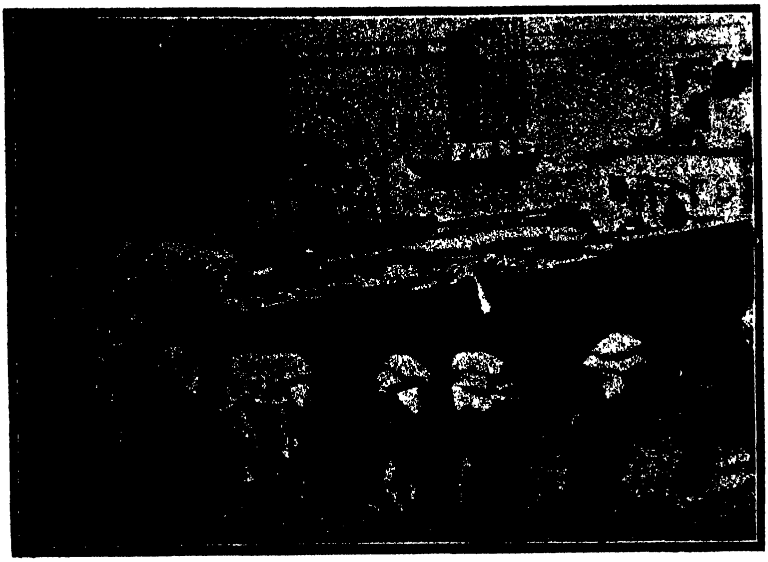
সহরের মধ্যে জলাভূমি ও উচ্চ পথের উপর দিয়ে যাওয়া আর একটী গলিত ধাতুর সরোবর আছে। সরোবরটী খুবই দীর্ঘ।

কিরিণ্-প্রদেশের চাং পাই সান্-নামক একটী পর্ব্বত খুব বিখ্যাত। শোনা যায়, এর পাদমূলেই নাকি অতীত যুগের মাঞ্চু-রাজ নুরহাচুর জন্ম হ'য়েছিল। কিরিণের কাছে আর একটী গিরি আছে। তার নাম, চিয়াও চ্যাং পাই সান্, অর্থাৎ "চির-শুভ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত"। আগে



ভাল্লুক-খেলা

প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর দুবার ক'রে ঐ পর্ব্বতের কাছে আসতেন এবং রাজ-বংশের পিতৃপুরুষদের প্রতি রাজকীয়ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতেন।



বন্দরে মাল-বহন

মাঞ্চুরিয়া যে অত উন্নতিশীল দেশ, তার অন্যতম প্রধান কারণ,—সেখানে নদীর অভাব নেই। উদাহরণ স্বরূপ



চীনা-তরুণী

বলা যেতে পারে, চ্যাং পাই সান্-পাহাড় থেকে বেরিয়েছে—তিনটী নদী,—সুঙ্গারি, হয়্কা এবং টুমেন্। সুঙ্গারি-নদী বরাবর উত্তর-পশ্চিম দিকে মোঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত চ'লে গেছে এবং পেটুনা নামক স্থানে পৌঁছেই, নোন্নি নামে আর একটী নদীর সঙ্গে মিলিত হ'য়েছে। কিরিণ্-প্রদেশের উত্তর দিক ধৌত ক'রে রেখেছে—সুঙ্গারি এবং আমুর-নদী।

কিরিণ্ সহরের চৈনিক নাম—চুয়ান্-চ্যাং। 'চু য়া ন্ চ্যাং' অর্থে 'ডক্'-ক্ষেত্রকে বোঝায়। সুঙ্গারি-নদীর উপর দিয়ে যে-সব কাঠ কিরিণে নিয়ে আসা হয়, তা থেকে তৈরী হয় প্রচুর নৌকা। এই জন্যই ঐ সহরকে 'ডক্-ক্ষেত্র' বলা হয়। ওই সব কাঠের দ্বারা বাড়ী তৈরী এবং বেড়া নির্ম্মাণের কাজও হ'য়ে থাকে। সুঙ্গারি-নদীর পশ্চিম-তীরস্থ স্থান হচ্ছে খুব সমতল এবং উর্ব্বরা। কিন্তু সুঙ্গারি ও হয়্কা-নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান এখনও পাহাড়ে ভর্ত্তি হ'য়ে



ভিক্ষুক

আছে; কেবল উপত্যকা-ভূমিতে চাষারা চাষের কা[জ] করে। দক্ষিণাঞ্চলটী শিকার, কাষ্ঠ-সঞ্চয় এবং স্ব

অনুসন্ধানের জায়গা। ইউসুরি এবং হুমকা-নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান একেবারে অনুন্নত এবং অনুর্ব্বর। সেখানে যারা বাস করে, তারা হচ্ছে "ইউ-পি-টা-জি"—জাতীয় লোক।



কৃষাণী জননী



সাড়ম্বর-পোষাক পরিহিত চীনা



রসায়নাগারে ছাত্রদের শিক্ষা

"ইউ-পি-টা-জি"র অর্থ—"মৎস্য-চর্ম্মাবৃত তাতার"। এরা স্যাল্‌মন্‌-মাছের চামড়া থেকে নিজেদের বসন তৈরী ক'রে পরে ব'লে, এদের ওই রকম চীনা-নাম দেওয়া হ'য়েছে। এরা জাতিতে ধীবর। স্যাল্‌মন্‌ মাছের ব্যবসা ই এদের প্রধান পেশা।

মাঞ্চুরিয়ার উত্তর-প্রদেশ হিলুংকিয়াং ভিতর দিয়ে ব'হে গেছে আমুর্‌ নদী। আমুরের চৈনিক নাম—"হি-লুং-কিয়াং", অর্থাৎ "কৃষ্ণ-সর্প নদী"। এর একটু কারণ আছে। মে ও জুন্‌ মাসে পর্ব্বতের উপর থেকে তুষার-গলা জল ঐ নদীতে

এসে পড়ায়, তার রং কাল হ'য়ে যায়। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা প্রধান কারণ আছে। বছরের মধ্যে ৬।৭ মাস ঐ



পাশ্চাত্য-প্রথায় চীনা ছাত্রীদের শিক্ষা। ক্লাসে সূচের কাজ ক'রছে

নদীতে জল বরফ হ'য়ে ভাসতে থাকে। গ্রীষ্মকালে ঐ সব বরফ গ'লতে থাকে এবং দশ ফিট পুরু এক-একটা চাপ্‌ড়ায়



কয়লা-খনির রেলপথ

খণ্ড হ'য়ে যায়। এই সময়েই নদীর জল কৃষ্ণ-সর্পের গায়ের রঙের মতোই কালো হ'য়ে যায়।

মাঞ্চুরিয়ার শতকরা ১০ ভাগ লোক হচ্ছে মাঞ্চু-জাতীয়। একদিন এই মাঞ্চুরাই অস্ত্রবলে সারা চীন-সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব ক'রতো। এখন চীনারা তার প্রতিশোধ নিয়েছে। কৃষিজীবী, নিরীহ চীনারা আসুরিক শক্তি-মদ-মত্ত স্বাধিকার-প্রচেষ্টায় শোণিত-স্পৃহ মাঞ্চুদের রাজ-সিংহাসন-চ্যুত ক'রেছে। হিলুংফিয়াং-প্রদেশে, আগে যেখানে মাঞ্চুদেরই ভোগ-দখল ছিল পুরো মাত্রায়, এখন সেখানে অগণ্য চীনা গিয়ে বাসা বেঁধেছে। আগে, অর্থাৎ ১৯১১ সালের আগে মাঞ্চু-রাজারা পিকিং-সহরের মস্‌নদে ব'সে অপরাধীদের নির্ব্বাসিত ক'রতেন হিলুংফিয়াং-প্রদেশে। সেই অপরাধীদের মধ্যে অনেকে কিন্তু পালিয়ে যায়। পলাতক-অবস্থায় তারা কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উপর লুট-তরাজ সুরু করে। আজও পর্য্যন্ত ওই রকম লুটপাট মাঞ্চুরিয়ার একটা অনপনেয় কলঙ্ক, কারণ, চৈনিক কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁদের ঠাণ্ডা ক'রতে পারেন না।

জাতিগতভাবে মাঞ্চু এবং চীনাদের মধ্যে বিশেষ-কোনো পার্থক্য নেই। ইউরোপীয়েরা বলেন, মাঞ্চু ও চীনা ভদ্রলোকেরা যে গাউন্ পরেন, তা প্রায় একই রকমের। মাঞ্চু-কৃষকেরা সাধারণতঃ ঠিক চীনাদেরই মতো গায়ে পরে নীল রঙের তুলোর জ্যাকেট্ এবং আল্‌গা পা-জামা; কেবল, শীতকালে বাড়্‌তির ভাগ তারা পরে অন্য কোনো তুলোর পোষাক। তবে, সাধারণতঃ শীতকালে তাদের বাড়্‌তী-পোষাক হচ্ছে—ভিতর দিকে পশম-যুক্ত ভেড়ার চামড়ার জামা। মাঞ্চু-মহিলাদের ঋজু দেহ এবং পোষাকের বিশেষত্ব চীনা-মহিলা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।



চীনা বালক

মাঞ্চুরিয়ার প্রধান শিল্প হচ্ছে—কৃষি-শিল্প। সেখানকার প্রধান ফসল হচ্ছে—এক জাতীয় তৃণ-শস্য। এই শস্যের নাম 'কাওলিয়াং'। এই শস্য যে কেবল সেখানকার লোকদেরই প্রধান খাদ্য, তা নয়,—সেখানকার মালবাহী পশুরাও ওই শস্য খেয়ে প্রাণধারণ করে। এ ছাড়াও, ওই শস্যের সাহায্যে 'সামশু'—নামে এক প্রকার সুরা শোধন করা হয়। ঐ সুরার তলানি-অংশ শুকর-শাবকদের খেতে দেওয়া হয়। চীনা শুকর-শাবকদের গায়ে চমৎকার শক্ত লোম থাকে। চীনারা এই রকম শুকরের মাংসের প্রতি খুবই লোভী।

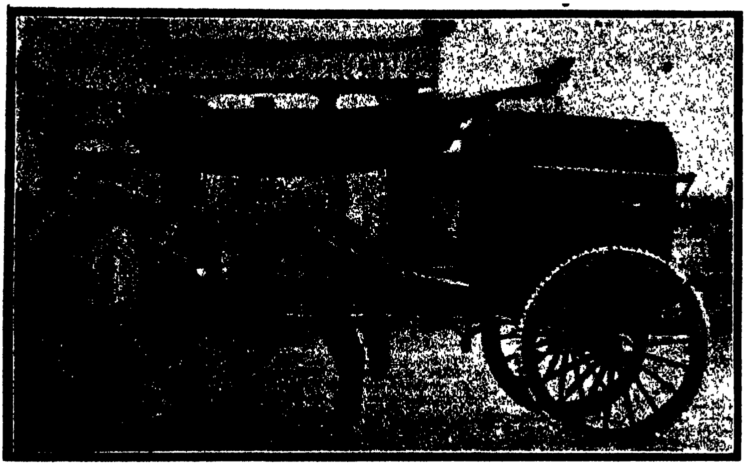


লক্ষ্য বেধ শিক্ষা



মাথার শিখার সাহায্যে বৃত্ত আঁকছে। বিগত মাঞ্চু-রাজ নুরহাচু চীনাদের মাথায় শিখা রাখবার রীতি প্রচলন করেন

'কাওলিয়াং'—শস্য থেকে মাঞ্চুরিয়ানদের যে কেবল খাদ্যেরই সংস্থান হয়, তা নয়; এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি পর্য্যন্ত ওই শস্য-তৃণ-ক্ষেতের উপর প্রায় ১২ ফিট



যান

উঁচু হ'য়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। জাঁতার সাহায্যে তা থেকে শস্য বের ক'রে নেওয়া হয়। তার পর তার শীষ্ থেকে ঝাঁটা



বালক-ছাত্র

তৈরী হয়। ঐ তৃণের ডাঁটা বুনে মাদুরও তৈরী হয়; আবার তা থেকে বাড়ী-তৈরী কিম্বা সেতু-নির্ম্মাণের কাজও হয়।

উত্তর-মাঞ্চুরিয়া প্রদেশটা ঠিক কানাডার মতো। রুশো-জাপানী যুদ্ধের পর থেকে সেখানে গমের চাষ ক্রমশঃই বেড়ে উঠেছে। আধুনিক ময়দার কলেরও প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে সেখানে প্রচুর।

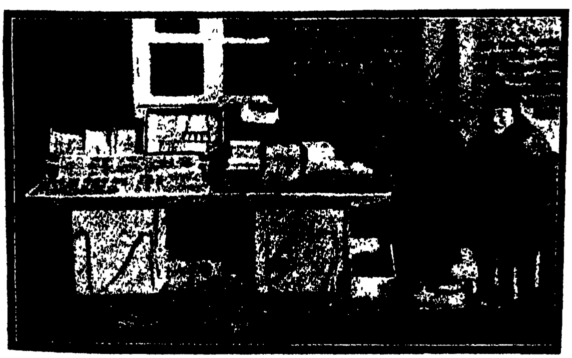
সাধারণ ধানের চাষ ক'রতে হ'লে চাই অবিরাম জল-সেচন। কিন্তু এই জল-সেচনের অভাবে ধান সেখানে চাষ করা হয় খুবই কম। আর একপ্রকার শস্য সেখানে জন্মায়। লোকে ভুল ক'রে তাকে "পার্‌ল্ বার্লি" ব'লে থাকেন। তার দ্বারা ওষুধ এবং খাদ্য দুয়েরই কাজ হয়। সেখানে একপ্রকার কলাই জাতীয় শস্য জন্মায়। এই শস্যই মাঞ্চুরিয়ার সকলের চেয়ে মূল্যবান শস্য।

কাপড় রং করবার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় একপ্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। তার নাম—"Dyer's Knotweed"। এই উদ্ভিদের পাতা থেকে নীলের কাজ হয়। সেখানে তুলা এবং সাধারণ শণ জন্মায়। তা থেকে সূতা তৈরী

হয়। প্রায়ই ভুল ক'রে ওই শণ্‌কে পাট বলা হ'য়ে থাকে।

প্রথম শ্রেণীর তামাকের পাতা-ও সেখানে পাওয়া যায়। ওই সব পাতা থেকে আজকাল আধুনিক ধরণের সিগারেট তৈরী করবার জন্য অনেক কল্ বসানো হ'য়েছে। মুক্‌ডেন ও হারবিন-সহরের চীনারাই ওই সিগারেটের পক্ষপাতী বেশী। সেখানে বিট-পালং থেকে চিনি তৈরী করা হয়। হারবিন ও উত্তর-পশ্চিম কিরিণ-প্রদেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিট-পালং জন্মায়। চিনি তৈরীর জন্যে সেখানে রাশিয়ান্ ও চীনা ফ্যাক্টরী আছে। মুকডেনের কাছে আর-একটা জাপানী কারখানাও আছে।

১৯০৬ সালে আফিং-নিবারণী-আন্দোলন আরম্ভ হবার আগে মাঞ্চুরিয়ায় প্রচুর পরিমাণে আফিং জন্মাতো। কিন্তু ১৯১১ সালের চৈনিক বিপ্লবের দ্বারা আফিংয়ের চাষ একেবারে যে উন্মূলিত হ'তে পারে নি, এর একমাত্র কারণ, চীনের অন্তর্বিপ্লবের জন্য গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতা।



দোক্‌নদার

মাঞ্চুরিয়ার চীনা-অধিবাসীরা একতালা-বাড়ীতে বাস করে। চাষারা-চাষের কাজ ছাড়াও, গুটি পোকা পালন ক'রে অর্থ সঞ্চয় করে। ওই সব গুটিপোকা থেকে শরৎ ও বসন্তকালে রেশমের গুটি পাওয়া যায়। ওই রেশম রপ্তানি করা হয় প্রচুর পরিমাণে।



ক্রীড়া

নানাপ্রকার ধাতু, বিশেষতঃ সোনা, রূপো, তাঁবা এবং কয়লার দ্বারা মাঞ্চুরিয়া সমৃদ্ধ।

মাঞ্চুরিয়ার আধুনিক ইতিহাসটা—উপনিবেশ-স্থাপন, রেলপথ-নির্ম্মাণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদেশী সৈন্যের ভোগ-দখল এবং অনবরত স্বার্থের দ্বন্দ্বে ভরা। ১১৯৪-৫ সালে চীন-জাপানের যুদ্ধের ফলে চীনের কাছে জাপান সমস্ত মাঞ্চুরিয়া অধিকারের দাবী করে। ১৮৯৫ সালে চীন এই দাবী সমর্থন ক'রতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী জাপানের কাছে এই ব'লে প্রতিবাদ করে যে, জাপানের দ্বারা সমস্ত মাঞ্চুরিয়ার অধিকারে প্রাচ্যের শান্তি নষ্ট হ'তে পারে। জাপান এই উপদেশ-টাকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ ক'রলে। ১৮৯৬ সালে কেবল চীন ও রাশিয়ার অর্থে "চাইনেজ্ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে কোম্পানীর" সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর তিন বছর পরেই মাঞ্চুরিয়াকে রুশিয়ান্-প্রদেশে পরিণত করবার ইচ্ছায়, রাশিয়া বিদেশী শক্তিকে ওই রেলপথের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত ক'রলে। এর

কয়েক বছর পরেই ১৯০৪-৫ সালে বিখ্যাত রুশো-জাপানী যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ান্ রেলপথ জাপানের হস্তগত হয়। এই রেলপথের ব্যাপার নিয়েই ১৯৩১ সালে চীনের রাষ্ট্র-



ঠাকু'মা ও নাতি

গগনে চীন-জাপান যুদ্ধের মেঘ ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে। এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই!—



ধীবর-রমণী

জাপানী অধিকার-ভুক্ত দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ান্ রেলপথের সঙ্গে চীনের মূল রেলপথের যোগাযোগ আছে। 'নন্নী' নদীর সেতু এই যোগাযোগের সহায়ক। কাজেই, সেতুটাকে ধ্বংস করাই মঙ্গল। এই সেতু ধ্বংস ক'রলে জাপানের আর উত্তর-মাঞ্চুরিয়ায় হার্বিণ সহরের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে না। উপরন্তু হার্বিণ ও উত্তর-মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার যে-প্রভাব আছে, তার দিকে দৃষ্টি রাখবারও কোন উপায় থাকে না। তার ওপর, ভলাডিভষ্টক-বন্দরের পাশে সমুদ্রে যাবার পথও জাপানের একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়। কাজেই, জাপানী সীমানা পার হবার পর ১৮।৯।৩১-তারিখে চীন, পিটেইং-নামক স্থানে বোমা ফেলে জাপানের দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ান্ রেলপথ ভেঙ্গে দেয়। ঐ স্থানটী মুকডেন-সহরের তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এর ২০ মিনিটের মধ্যেই জাপ-সেনা কামান দেগে সমস্ত জেলাটাই অধিকার ক'রে নেয়। রাত ১১টার সময় চীনা সৈন্য বোমা ফেলে, এবং ভোর ৪টের সময় জাপ-সৈন্য মুকডেন-সহর অধিকার করে। ক্রমে, চাংচুং, নানলিং, কোয়ান্‌চেংজি ইত্যাদি অনেকগুলি দেশ জাপানীরা যুদ্ধের দ্বারা জয় করে। মাঞ্চুরিয়ায় তখন জাপানের মোট সৈন্য ছিল ১২ হাজার, এবং চীনের ছিল ৩ লক্ষ ৩১ হাজার। মুকডেনের কাছে জাপানের সৈন্য ছিল ২ হাজার, এবং চীনের ছিল ১৫ হাজার। কিন্তু সংঘর্ষ বাধবার পর জাপান মাঞ্চুরিয়ায় প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্র শস্ত্র পাঠায়।

মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে জাপানী সংবাদ পত্রসেবী মিঃ হিল্‌কয়িচি মোটোইয়ামা বলেন,—

"মাঞ্চুরিয়ায় রাজ্য-বিস্তার করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। আমরা রাশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ক'রে, মাঞ্চুরিয়া জয় ক'রে, চীন-সরকারকে তা ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমরা বাহুবলে যা জয় ক'রে চীনকে দিয়েছি, তাতে আমাদের কিছু কিছু সুবিধা রক্ষার জন্য সন্ধিবদ্ধ হ'য়েছিলুম। সেই সব সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ হচ্ছিল ব'লেই, আমরা মাঞ্চুরিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের অধিকার বজায় রাখতে বাধ্য হ'য়েছিলুম। কিন্তু আমরা চীনের বিপক্ষে

যুদ্ধ ঘোষণা করিনি। মাঞ্চুরিয়ায় জাপ-প্রজাদের ধন প্রাণ সশস্ত্র আক্রমণকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হ'চ্ছিল। চীনের কাছে বারবার অভিযোগ ক'রেও আমরা কোনো প্রতীকার পাইনি। আমরা তাই স্বহস্তে আত্মরক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছি।···চীন-সরকার জাপানের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অযৌক্তিক আইন গ'ড়ছেন। জাপান সুবিচার চাইলে, চীন জনসাধারণকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রছেন, জাপানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার ক'রছেন, তাঁদের স্কুল কলেজে জাপান-বিদ্বেষ ছাত্রদের শেখাচ্ছেন। দোষ কার?"

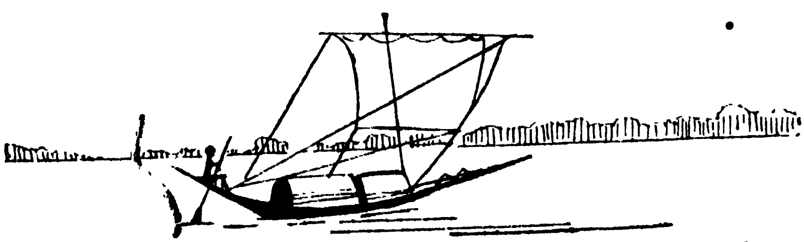
কূট রাজনীতিকরা বলেন, রাশিয়ার প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসই যেমন জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়াকে সারাজেভো-র ছল ধ'রতে প্ররোচিত ক'রেছিল, এক্ষেত্রেও তেমনি, রাশিয়ার প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসই জাপানকে চীনের ছল ধ'রতে প্ররোচিত ক'রেছে। জাপানের সদাই ভয়, যদি রাশিয়া এসে আবার প্রাচ্যে প্রবল হয় ও চীনকে শিখণ্ডী-রূপে সামনে রাখে! ১৮৯৫ সালে চীন জাপানের যুদ্ধ এইজন্যই হ'য়েছিল, কারণ, ১৮৯০ সাল থেকে রাশিয়া একটু-একটু ক'রে চীনের উত্তরাংশ গ্রাস ক'রতে আরম্ভ ক'রেছিল। তারপর ১৯০০ সালে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় অভিযান করে। তার পরিণাম—১৯০৫ সালের রুষো-জাপান-যুদ্ধ এবং জাপানের কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার কতকাংশ অধিকার ও রাশিয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব! আসল কথা, জাপান চায়, কোনো পাশ্চাত্য শক্তি যাতে না চীনের সহায় হ'তে পারে। কারণ, প্রাচ্যের মধ্যে জাপান একমাত্র প্রবল শক্তি হ'য়ে আছে। প্রতীচ্য এখানে আসন গ্রহণ ক'রলে, জাপানের তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে। চীন, মাঞ্চুরিয়ায় সুশাসন ক'রতে পারছে না, এটা জাপানের অজুহাৎ। ব্রহ্মের থিবো মদ খাচ্ছিল,—এটা যেমন অজুহাৎ, চীনের সুশাসনের অভাবও তেমনি জাপানের নিছক্ অজুহাৎ!

চীন-জাপানের যুদ্ধের দামামা আরও কতদিন বাজবে, তা বলা কঠিন। তবে, ১৪।২।৩২ তারিখের "রয়টার" এইরকম খবর দেন, "চীন-জাপান বিবাদের পরিণতি স্বরূপ শীগ্‌গিরই মাঞ্চুরিয়া একটা স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে ব'লে সংবাদ পাওয়া গেছে।"



গ্রাম্য তরুণী

মাঞ্চুরিয়ার মোট লোক-সংখ্যা প্রায় তিন কোটী।



দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জীবন বিষময়

নিতাই ঘোষ সব কথা শুনিয়া আনন্দে দামোদরকে বলিলেন, "কিছু ভাব্না নেই, বাবাজী। ও চাটুর্য্যে মাটুর্য্যে সব ঠাণ্ডা ক'রে দেব। নিতাই ঘোষ চাষাভূষা মানুষ। ও সব বোঝে না। বুঝেছ? লাঠ্যৌষধি দেব। ভূত দেখেছ, বাবাজী? ভূত পালায় সে ওষুধে। দেখ না, তুমি।" নিতাই ঘোষ অদূর ভবিষ্যতে ভূতের দলের বিশৃঙ্খল পলায়ন যেন স্বচক্ষে দেখিয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "ও চাটুর্য্যেটি কে?"

দামোদর উত্তর দিল, "চাটুর্য্যে আগে ষ্টেশনমাষ্টার না কি ছিল। অনেক টাকা চুরি করেছে। আবার সরকারের কাছে খেতাবও পেয়েছে। এখন গ্রামের মাতব্বর, স্কুলের সেক্রেটারি, য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, অনেক কিছু।" একটু হাসিয়া ও চোখ একটু ছোট করিয়া নিতাই ঘোষ জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা করেছে? দশ হাজার? বিশ হাজার? পঁচিশ হাজার? কত করেছে? পুকুর চুরি করেছে, না খাল চুরিয়েছে? খবর দিতে পার, একবার দেখি।"

দামোদর জানাইল সে জানে না। তবে শুনিয়াছে 'পয়সা বিস্তর' করিয়াছে, তারই জোরে গ্রামে 'চাঁই' হইয়া দাঁড়িয়েছে। 'পয়সা'য় কি না হয়?

নিতাই ঘোষ সায় দিল, "ঠিক কথা, বাবাজী! ভেবে দেখি কি করা যায়। আমিই ভাব্ছি। তুমি আপাততঃ এইখানেই থাক। ও-স্কুলে আর মাষ্টারি কর্ত্তে যেও না। না হয় এইখানেই একটা মাইনর স্কুল আছে—দেখ চেষ্টা ক'রে। আমি তোমার বিষয়ের ন্যায্য দাবীটা আদায় করতে চেষ্টা করি। চাটুর্য্যেকে দেখছি!" দামোদর বলিল, "তার আর দরকার কি? মিছে আর কেন এই নিয়ে নানা উৎপাত করা ও আপদ সহ্য করা? বিষয় বিষ। ও দরকার নেই।"

নিতাই ঘোষ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "বল কি! তা'ও কি হয়? বিষয় বিষ? অবাক্ কর্লে। তবে আমি কি এতদিন বিষ খেয়েই আছি? অবাক্ কর্লে, বাবাজী। বিষয় বিষ? নাঃ! তুমি অবাক্ কর্লে।"

দামোদর ইহার পর আর কথা কহিল না। নিতাই ঘোষকে তাহার ভয় করিত। তাহার সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় দেহ, তাহার কথা বলার ভঙ্গিমা দেখিয়া তাহার কেবলই সরিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইত। আপাততঃ তাহার পালঘাটি যাওয়া বন্ধ হইল, ইহাতেই তাহার অত্যন্ত আরাম বোধ হইল। রাধারাণীর সহিত দিনরাত এক বাড়িতেই থাকিবে; তা ছাড়া প্রত্যহ ৮৷১০ মাইল রাস্তা হাঁটাও বাঁচিয়া যাইবে। সে কথাটা ভাবিয়াই অত্যন্ত আরাম অনুভব করিল, রাধারাণীও আনন্দিত হইল। দামোদরের শ্বশ্রূঠাকুরাণী বলিলেন, "বেশ হয়েছে। এইখানেই থাক, বাবা। তুমিও যা' আমার রমাই বলাইও তাই। সেখানে কি মানুষে থাক্তে পারে? একে অভাবের সংসার, তা'র উপর আবার ঐ সমস্ত উৎপেতে লোক।"

দামোদরের কাণে কথাগুলি মধু বর্ষণ করিল। তাহার মনে হইল, এত আরাম সে জীবনে পায় নাই। এ বাড়ির সব কেমন তৃপ্তিকর! শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ত' কথাই নাই; রমাই, বলাই, কানাই, যাদব—সকলে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে। কানাই তাহার জন্য কত খুঁজিয়া চা-এর বন্দোবস্ত করিয়াছে। রমাই তাহার আহারের সুবিধার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে; সকলে তাহাকে কত স্নেহ করে। শুধু এক নিতাই ঘোষকে একটু কেমন ভয় ভয় করে। তা' আর কি হইবে? দামোদর নিতাই ঘোষকে এড়াইয়া চলিবে। নিতাই ঘোষ ত' উদয়াস্ত বাহিরেই থাকে। বাড়ির সহিত তাহার সম্বন্ধ কতটুকুই বা? যখন নিতাই

ঘোষ বাড়িতে আসিবে বা থাকিবে, সে তখন না হয় নিজের নির্দিষ্ট ঘরেই শুইয়া থাকিবে।

দামোদর শ্বশুরালয়ে আরামে দিন কাটাইতে লাগিল। বাড়ির কথা বড় ভাবিত না। ভাবিতে সময় পাইত না। রাধারাণীর কথাই ভাবিত। সারাদিন তাহার সহিত মনে মনে একলাই প্রীতির আলাপ করিত; কখনোও বা ইংরাজি বাঙলায় কবিতা লিখিত। রাত্রে সেই রকম পদ্ধতিতে রাধারাণীকে সম্ভাষণ করিত, প্রীতির আলাপ করিত; কবিতা শুনাইত ও আলোচনা করিত।

কিন্তু নিতাই ঘোষ নিশ্চেষ্ট ছিল না। একদিন দামোদর সন্ধ্যাবেলায় চণ্ডীমণ্ডপে খুব একটু উত্তেজনা দেখিল। ১০।১৫ জন লোক আসিয়া আলাপ করিতেছে দেখিল। খুব হাসি ও মন্ত্রণার ধুম দেখিল। সে একটু বিস্মিত হইল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিতাই ঘোষ বলিয়া উঠিল, "এই যে বাবাজীবন! এসো। কাজ ফতে। সব ঠিক হয়েছে। বুঝেছ? বুঝতে পারলে না? তোমার জমীর ফসল কেটে এনেছি, বেবাক্ কেটে এনেছি—ঠিক আধাআধি। জমি তোমার কি না। এইবার বাড়িখানা—তা'রও বন্দোবস্ত হ'বে। তুমি ভেবো না।"

দামোদর ভীত হইল; বলিল, "বেশ করেছেন; কিন্তু বাড়ির আর দরকার কি? আমি ত' এইখানেই থাকি, এইখানেই থাকবো। বাড়ির ভাগ নিয়ে কি কোর্‌ব?"

নিতাই ঘোষ উত্তর দিল, "অবাক্ কর্লে, বাবাজী। এখানে থাক্‌বে তা' কি? তা' বলে হক্ ছেড়ে দেবে? হুঁঃ! পুরুষ বাচ্ছা, না? নিজের হক্ এমনি ছেড়ে দেবে? কেন? কেন শুনি। তা' নিতাই ঘোষ বেঁচে থাক্‌তে হবে না। তুমি কিছু ভেব না। ও চাটুয্যে মাটুয্যে সব ঠাণ্ডা করে দেব।"

সমবেত লোকেরা হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, "ও সব বড় বড় বাক্যবীর। ওদের আবার ভয় কর্ত্তে হবে? পালঘাটিতে মানুষ আছে? সব কলের গান। কেবল চেঁচাতে পারে।"

নিতাই ঘোষ উচ্চরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সব গান ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, মধু, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! লাঠ্যৌষধি—বুঝেছ?"

দামোদরের ভয় বাড়িল। ইহারা কি পরামর্শ করিয়াছে কে জানে? একটা দাঙ্গা লাঠালাঠি বাধাইবে না কি? রক্তারক্তি ব্যাপার কর্ত্তে চায় না কি? শেষে পুলিশের হাতে পড়াবে দেখ্‌ছি। একবার পুলিশের হাতে পড়লে আর রক্ষে আছে। জেল, দ্বীপান্তর, ফাঁসী। দামোদর আর ভাবিতে পারিল না। এই নিতাই ঘোষ ত' বড় দুর্দ্দান্ত, অসমসাহসী লোক। লেখাপড়া না শেখার এই ফল। ফাঁসীই যাবে, না দ্বীপান্তর যাবে তার ঠিক কি? কিন্তু দামোদর কি করিয়া জেলে, কি দ্বীপান্তরে, কি ফাঁসী যায়? সে কি করিয়া রাধারাণীকে ছাড়িয়া যাইবে? শেষে কি এরই জন্যে সে শ্বশুরবাড়ি আসিল।

রাত্রে রাধারাণীকে সে কথাটা বলিল; "দেখ, রাণী, এই নিয়ে শেষে লাঠালাঠি, রক্তারক্তি করা ভাল নয়। তোমার বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলো। শেষে কি জেলে, দ্বীপান্তরে সব যাবো?"

রাধারাণী উত্তর দিল, "ও বাবা! আমি কিছু বল্‌তে পার্‌বো না। তুমিই বল না কেন?"

দামোদর বলিল, "আমার কেমন তোমার বাবাকে দেখ্‌লে ভয় করে। কোন কথা ঠিক-মত বল্‌তে পারি না।"

রাধারাণী হাসিয়া উঠিল; বলিল, "কেন?"

দামোদর যেন 'কেন' এই কথা নিজেকেই প্রশ্ন করিয়া নিজেকেই উত্তর দিল, "কেন, তা' বুঝ্‌তে পারি না, রাণী। তোমার বাপ কি খুব লাঠালাঠি কর্ত্তে পারে না কি? দেখ্‌লে ভয় হয়।"

রাধারাণী উত্তর দিল "তা' পারে। শুধু, বাবা কেন, দাদা, বলাই, কানাই সবাই পারে। জমি নিয়ে গোল 'ত প্রায়ই হয়!"

দামোদর উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রক্তারক্তি? খুন জখম? এ সব হয়েছে কখনো?"

রাধারাণী উত্তর দিল, "তা' একটু আধ্‌টু হয় বৈ'কি। বাবা'রই ত মাথা একবার প্রায় দু' ফাঁক হয়ে গিছ্‌লো। দাদা একবার প্রায় তিন চার মাস পা' ভেঙ্গে পড়ে ছিল।"

দামোদর শিহরিয়া উঠিল; বলিল, "রাধারাণী, এ-সব কথা 'ত তুমি আমায় কোনদিনই বল নি?"

রাধারাণী উত্তরে কহিল, "এ সব আর কি বল্‌বো?

এত প্রায়ই নিত্যি হয়। আমাদের ও-সব কিছু বলে মনে হয় না। তা' ছাড়া তুমি যে ভীতু লোক! ভয়ে তুমি এ মুখোই হ'তে না।"

দামোদর কহিল, "তোমরা বুঝ্‌তে পার না, রাণী। বড় বিপদের কথা এ সমস্ত। পুলিসে যে সন্ধান পায় না, এই আশ্চর্য্য। পেলে রক্ষা থাক্‌তো না।"

রাধারাণী উত্তর দিল, "কেন? পুলিসে কি কোর্ত্তে পারে? কতবার 'ত আমাদের বাড়িতে পুলিস এসে, সমস্ত তল্লাস করে গেছে। কিছুই হয় নি। এই যে এবার তোমার জমির ফসল কেটে আনা হয়েছে, কেউ কি জানে কোথায় আছে, কে এনেছে। কোনও খোঁজ কর্ব্বার শিবের বাবারও শক্তি নেই। পুলিস 'ত এল বলে। কিন্তু কি কর্ব্বে? এসে একবার দেখে শুনে চলে যাবে।"

দামোদর রাধারাণীর মুখের দি'কে নির্ব্বাক্ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রাধারাণী বলিল, "অমন ক'রে দেখ্‌ছো কি? কি ভীতু মানুষ তুমি!"

দামোদর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "রাণি, তোমারও খুব সাহস! আমি সত্যি ভীতু।"

রাধারাণী হাসিয়া উত্তর দিল, "তোমার ভয় নেই। আমি এইখানেই 'ত আছি। তোমাকে আগ্‌লাবো'খন। তুমি শুয়ে ঘুমোও এখন।"

দামোদর শুইল। কিন্তু ঘুম তাহার কিছুতেই আসিতে চাহিল না। তাহার মনে কেবলই ভয় হইতে লাগিল যে, শেষে না তাহাকেই ধরিয়া লইয়া যায়। নিশ্চয়ই বাঞ্ছারাম ও চাটুয্যে মশা'য় থানায় খবর দিয়েছে। দারোগা নিশ্চয়ই তদন্ত কর্ত্তে আস্‌বে। আর তা'কেই ধর্ব্বে। কেন না সেই 'ত জমিজমার অর্দ্ধেক নেবার জন্যে অমন করে সকলের সাক্ষাতে চাটুয্যে মশা'য়কে বলেছিল। সাক্ষীর 'ত অভাব হবে না। তখন তাহাকে ছাড়া আর কা'কে দোষী কর্ত্তে পারে? সে একবার চোখ চাহিয়া দেখিল, রাধারাণী ঘুমাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সে আবার চক্ষু মুদিত করিল। কিন্তু চোখ মুদিলেই তাহার অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। কি ভাবিয়া সে শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল, কি ঘটিতে চলিল! যদি তাহাকে পুলিসে চালানই দেয়, তবে সেই বা কোথায় থাকিবে, রাধারাণীই বা কোথায় থাকিবে। রাধারাণী 'ত ঘুমাইতেছে। উহার কোনও দুর্ভাবনা নাই। ও সাহসী হইতে পারে, কিন্তু সত্য যথার্থ প্রণয়িনী এইরূপ বিপদের আশঙ্কায় কি কখনোও নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারে? দামোদর আবার চক্ষু খুলিয়া দেখিল, রাধারাণী নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে কি না। ঘুমাইতেছে বৈ কি। যখন ঘুমাইতেছে, তখন নিশ্চিন্ত হইয়াছে। চিন্তা থাকিলে কি ঘুম আসে? তাহার আসিতেছে না কেন? দামোদর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ভাবিল, যেমন ছিল, থাকিলেই হইত, তাহাতে আর যাই হোক্ এমন বিপদ ত কিছু ছিল না। রাধারাণীর ভালবাসায় পড়িয়া এ কি বন্ধন তাহার? হায় প্রেম, তুমি এমন বিপদে দামোদরকে কেন ফেলিলে? প্রেম কি এই প্রকার দুঃসাহস না হইলে হয় না? তাহার মনে পড়িল যে, কত কবিতায় ও নভেলে এই কথা পড়িয়াছে; কিন্তু সেটা তাহার ঠিক ন্যায়সঙ্গত ব্যাপার বলিয়া মনে হইল না। প্রেমে কণ্টক আছে; থাকুক্! কিন্তু প্রেম প্রাণ লইয়া টানাটানি করে? প্রাণ গেলে তখন প্রেম লইয়া দামোদর কি করিবে? কে'ই বা কি করিতে পারে? তা' ছাড়া রাধারাণীর প্রেম নাই! উহার ঘুম হইতেই স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাধারাণীর হৃদয় কঠিন! প্রেম নিশ্চিন্ত নহে।

বিনিদ্র রজনীর প্রভাত হইতেই দামোদর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া, বাহির-বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপে গেল। দেখিল অত প্রত্যূষেই নিতাই ঘোষ উঠিয়াছে ও দিব্য আরামে তামাকু সেবন করিতেছে। তাহার মনে হইল আবার সে গিয়া ঘরে প্রবেশ করে! কিন্তু নিতাই ঘোষ তাহাকে ডাকিয়া বাধা দিয়া বলিল, "বাবাজী, একটু কথা আছে। বুঝেছ?"

নিতাই ঘোষ ও তাহার কথাকে দামোদর ভয় করিত। সে উত্তর করিল, "কি?"

নিতাই ঘোষ তিনবার হুঁকাতে টান্ দিয়া একমুখ ধূম উদ্গীরণ করিয়া বলিল, "আজ তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে একটু, বুঝেছ? তোমাদের পালঘাটিতে যেতে হ'বে। আজ বাড়ির ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে।"

দামোদর উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যবস্থা ?"

নিতাই ঘোষ আবার তিন চার টান্ তামাকের ধূম মুখে লইয়া, "হুম্ হুম্" শব্দ করিয়া তাহা আকাশের দিকে ছাড়িয়া বলিল, "ব্যবস্থা ? ব্যবস্থা ? এই আধাআধি বখ্‌রা করা আর কি। বুঝেছ ? বখ্‌রা ক'রে পাঁচীল তুলে দেওয়া। বস্, আর কি ? এই বেলাই যাওয়া ভাল—দারোগা নেই। খবর নিয়েছি—বুঝেছ ?"

দামোদর অস্ফুট স্বরে বলিল, "কিন্তু তা'রা কি তা' কর্ত্তে দেবে ? এই নিয়ে লাঠালাঠি না বেধে যায় !"

নিতাই ঘোষ হুঁকা নামাইয়া রাখিল। দামোদরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া আবার হুঁকাটি তুলিয়া লইয়া মিনিট দুই তিন খুব জোরে টান দিল। তারপর আবার হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া, মুখের ধূম নিঃসারিত করিয়া বলিল "লাঠালাঠি ? লাঠালাঠি ? হবে কি ? হতে কি বাকী আছে ? সে ত হ'চ্ছেই। তোমার চাটুয্যে আর ভয়ে বেরুবে না বাড়ি থেকে। তোমার ঐ মিত্তির, বোস্, মুখুয্যে সব দেখবে দরজা বন্ধ করে বাড়িতে বসে আছে। কেউ বেরুবে না। পয়সা করেছে না ঐ চাটুয্যে ? পয়সা নিয়ে থাক্ ! কিছু ভেব না, সব ঠিক করে দিয়েছি। শুধু তুমি না উপস্থিত থাক্‌লে এই ভাগ্‌বাট্‌রা হবে না, তাই তোমাকে যেতে হবে।"

দামোদর বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া শুনিল। নিতাই ঘোষ বলে কি ? কি ক'রে এসেছে ? নিশ্চয়ই কা'র না কা'র মাথা ফাটিয়েছে ; নিতান্ত পক্ষে হাত পা'খানিও ভেঙ্গে দিয়ে এসেছে। এ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে !

কিন্তু নিতাই ঘোষ ছাড়িবার পাত্র নহে। একটু রৌদ্র উঠিতেই নিতাই ঘোষ দলবল লইয়া দামোদরকে সঙ্গে করিয়া পালঘাটি যাত্রা করিল। দামোদরের দুই তিনবার পলাইয়া যাইবার প্রবৃত্তি হইল। কিন্তু কোথায় পলাইবে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া, আর পলায়নও অত লোকের মধ্য হইতে অসম্ভব বুঝিয়া, নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া চলিল। পালবাটিতে পৌঁছিতে তাহাদের যাহারা দেখিল তাহারাই পাশ কাটাইল। দামোদর দেখিল, চাটুয্যে ম'শায় বাড়ির বৈঠকখানার জানলা দিয়া মাত্র একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন। পথে মিত্তির, বোসজা, মুখুয্যে, মন্মথ সরকার, শ্যাম কর কা'হারও সঙ্গে দেখা হইল না। দামোদর বিস্মিত হইয়া নিতাই ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, নিতাই ঘোষ মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সে ভীত হইল ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল।

বাঞ্ছারামের বাড়ি পৌঁছিতেই, বাঞ্ছারাম বাহির হইয়া আসিল। সে হরিপদর মুখে আগেই এই অভিযানের সংবাদ পাইয়াছিল। বাহিরে সে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "কি চাও সব ?"

নিতাই ঘোষ অগ্রসর হইয়া জবাব দিল, "বেহাই মশা'য় না কি ? ওঃ ! বেশ্ বেশ্ ! বেহাই মশা'য় ! ওঃ।"

বাঞ্ছারাম উত্তর দিল, "হাঁ। কি চাও, নিতাই ঘোষ ?"

নিতাই ঘোষ হাসিয়া দামোদরকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া বলিল, "এই বাবাজী—দামোদর বাবাজী এসেছে।" নিতাই ঘোষ দামোদরের হাত ধরিয়া তাহাকে ঠেলিয়া বাঞ্ছারামের চোখের উপর দাঁড় করাইল। দামোদর নিতান্ত বিষণ্ণ, বিরস ও অসহায় ভাবে দাঁড়াইল।

বাঞ্ছারাম চীৎকার করিল, "ও আমার ত্যাজ্য পুত্র। ওর সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই। ওকে আমি এক কাণাকড়িও দেব না। তোমার জামাই তুমি রাখ গে, পোষ গে। আমার কাছে এনেছ কেন ?"

নিতাই ঘোষ হাসিয়া বলিল, "বাড়ির অর্দ্ধেক ?"

বাঞ্ছারাম উত্তর দিল, "বাড়ি ? বাড়ির অর্দ্ধেক ? সে এ বাঞ্ছারাম বেঁচে থাক্‌তে নয়। তুমি কি এই মতলবে এসেছ না কি ? এ বাড়ির অর্দ্ধেক ? সে কেউ পাবে না।"

ভিতর হইতে দুর্গারাণীর গলা পাওয়া গেল, "তুমি চলে এসো।" শ্যামা, হরিপদ, সীতারাম সবাই আসিয়া পিতার পশ্চাতে ও পার্শ্বে জড় হইল। ভিতরে তারাসুন্দরী তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিতাই ঘোষ বলিল, "কথা দিয়েছিলে, বেহাই ! কথা দিয়েছিলে !"

বাঞ্ছারাম উত্তর করিল, "দিয়েছিলুম তোমার জিদে। আর রাখ্‌বো আমার সুবিধে মত। মরি, তখন তোমার জামাইএর জন্য ভাগ নিয়ো।"

দামোদরের মনে হইতেছিল ছুটিয়া পালায়। তাহার এ সমস্ত একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে নিতাই ঘোষকে বলিল, "আমার বাড়ি চাই না।"

বাঞ্ছারাম বলিয়া উঠিল, "তবে? নিতাই ঘোষ! তবে তুমি কেন এমন ডাকাতি কর্ত্তে এসেছো। আমার জমির ধান নিয়ে গেছ তুমিই তা'হলে?"

নিতাই ঘোষ বাঞ্ছারামের কথার জবাব দিল না। জামাইএর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। হরিপদ বোঁ করিয়া পাশ কাটাইয়া কোথায় ছুটিয়া গেল। বোধ হয় থানায় খবর দিতে।

চীৎকার করিয়া দামোদর বলিল, "দরকার নেই। বাড়ি ফিরে চলুন। আমার বাড়ির ভাগ চাই না। আমি নেব না। কি হবে নিয়ে? কিছুতেই নেব না।" নিতাই ঘোষ আর বাক্য ব্যয় করিল না। নিজের দলবল লইয়া ফিরিল; বাঞ্ছারামের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। বাঞ্ছারাম চীৎকার করিয়া পশ্চাৎ হইতে জানাইল যে দারোগা ফিরিয়া আসিলেই তাহার ধানের কিনারা সে কর্ব্বে।

দামোদরের মনের ভিতর আর সুখ ছিল না। বিশেষতঃ নিতাই ঘোষের সঙ্গে চলিতে তাহার আর মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না। নিতাই ঘোষ অস্বাভাবিক রকমে গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল—যেন দামোদর কি এক অদ্ভুত প্রাণী। যত বারই নিতাই ঘোষ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখে, ততবারই দামোদরের মনের ভিতর কেমন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল।

নিতাই ঘোষ নিজের বাড়ি পৌঁছিতেই, তাহার দলবল সব চলিয়া গেল। দামোদর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পড়িল। নিতাই ঘোষ বাড়ির ভিতর না গিয়া একবার বাড়ির চারিদিক ঘুরিয়া আসিল। তাহার পর চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়িতে বসিয়া ভৃত্য ভুতোকে তামাকু দিতে বলিল। তামাকু আসিলে, হুঁকাতে তাহা চড়াইয়া, দামোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "চাই না বাবাজী? তোমার চাই না? হুঁ!"

দামোদর চুপ করিয়া রহিল। নিতাই ঘোষ হুঁকায় টান্ দিয়া ধুম বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ি চাও না? ভাগ চাও না? হুঁ।" আবার দু' এক টান দিয়া কহিল, "থাক্‌বে কোথা? থাক্‌বে কোথা? স্ত্রী নিয়ে থাক্‌বে কোথা?"

দামোদর তাহারও উত্তর দিল না। নিতাই ঘোষ মিনিট পাঁচ সাত খুব জোরে টান দিয়া বলিল, "আশ্চর্য্য করেছ? লেখাপড়া শিখে আশ্চর্য্য করেছ? আঁত জল হয়ে গেছে; রক্ত জল হয়ে গেছে; মাছিমারা কেরাণী হয়েছ; নিজের হক্ রাখতে পার না। থাক্‌বে কোথা?"

দামোদর কোন প্রশ্নের জবাব দিল না। আস্তে আস্তে উঠিয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সে যত সরে, নিতাই ঘোষও তত তাহার দিকে চাহিয়া দেখে। শেষে দামোদর তাহার চোখের আড়াল হইবার জন্য নিরুপায় হইয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া বাড়ির ভিতরের দিকে গেল, নিতাই ঘোষ তামাকু সেবন করিতে লাগিল।

আর দামোদরের শ্বশুরবাড়িতে আনন্দ নাই। সেখানে তাহার আর থাকা যেন প্রকৃতই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছিল। নিতাই ঘোষই তাহার শনি। তাহার মনে হইল নিতাই ঘোষ তাহার এখন সুখের হন্তারক। তাহার জীবনকে বিষময় করিয়াছে। তাহার আর কোনও রকম স্পৃহা নাই। যদি সত্য দারোগা আসে; আজ না হয়, কাল, না হয় পরশু আসে; ধান কাটা নিয়া গোল করে; তাহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া যায়? না! দামোদর আর থাকিবে না। নিতাই ঘোষের বাড়িতে থাকা অসম্ভব। সে যেখানে হয় যাইবে। তবু নিতাই ঘোষের বাড়ি থাকিবে না। শুধু রাধারাণী? তা' রাধারাণীও সঙ্গে যাইবে। যদি সত্য প্রণয় থাকে কেন যাইবে না? দু'জনে কোনও দেশে গিয়া—পশ্চিমে, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, কাশী, যেখানে হয় যাইবে। নির্ব্বিবাদে থাকিবে। কোনও সংস্রব কাহারও সহিত রাখিবে না। সারাদিন দামোদর এই কথাই ভাবিয়া ঠিক করিল যে পশ্চিমেই যাইবে। নিতাই ঘোষ সেদিন আর বাহিরে না যাওয়াতে, তাহার এই সঙ্কল্প ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে লাগিল। যতই সে বাড়ির ভিতর নিতাই ঘোষের কথার আওয়াজ পাইতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি কাশী না হয়, কাশীতে লোকে প্রায় যায়—কি জানি নিতাই ঘোষও যদি যায়,—আরও পশ্চিমে যাইবে। শুধু রাত্রে রাধারাণীকে আজ সমস্ত সঙ্কল্প শুনাইয়া রাজী করিবে। ভোরে বাহির হইয়া পড়িবে। কাহাকেও জানাইবে না। এ খবর

সন্ধান পাইলে কে জানে নিতাই ঘোষ আবার কি করিয়া বসে !

সে রাত্রে রাধারাণী যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন দামোদর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রথমটা কথা কহিতে সাহস করিল না। রাধারাণী অন্য রাত্রে যেমন আসিয়াই তাহার সহিত কথা বলে, সেরূপ কিছু সে রাত্রে করিল না। দরজা বন্ধ করিয়া নীরবে নিজের বিছানাতে শুইল। দামোদর বিশ পঁচিশ মিনিট কথার সূত্রপাতের জন্য অপেক্ষা করিল। কেন না অত বড় সঙ্কল্পটা ত' হঠাৎ বলা যায় না। কিন্তু রাধারাণীর তরফ হইতে কোনও রকম সাড়াশব্দ আসিল না। শেষে দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমুলে, রাণী !"

রাধারাণী কোনও উত্তর দিল না। দামোদর আবার প্রশ্ন করিল। রাধারাণী বলিল, "না, কেন ?"

"কথা কইছ না যে ? কি হয়েছে ?"

রাধারাণী বলিল, "কি আবার হবে ?"

দামোদর ব্যথিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কথা কইছ না কেন ?"

রাধারাণী তাহার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "ইচ্ছে হয় নি, তাই কথা বলিনি, কার সঙ্গে কথা বল্‌বো ? তোমার সঙ্গে ?" রাধারাণী জিভ্ উল্টাইল।

দামোদর ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না। শুধু বুঝিল রাধারাণী যে কারণে হোক্ তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে। মান অভিমান প্রেমের লক্ষণ, মানাভিমান না থাকিলে প্রেম বুঝা যায় না। কিন্তু আজ রাত্রে সে সব না হইলেই ভাল হইত। দামোদর কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

রাধারাণী কিছুকাল চুপ করিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বাবাকে আজ থামকা অপমানটা করালে কেন ? তোমার জন্যেই ত' বাবা পালঘাটি গিয়েছিলো ; আর তুমিই শেষে বাবার মাথা হেঁট করালে। ছিঃ ! তুমি না পুরুষ মানুষ ?"

দামোদর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ও কথা ছেড়ে দাও, রাণী। ও ভাল হয়েছে ; অপমান কিছু হয় নি। কাজটা ঠিক হোত না ; শেষে সত্যি খুনোখুনি হো'ত ; সেটা কি ভাল হো'ত ?"

রাধারাণী উত্তেজিত স্বরে জবাব দিল, "অপমান হয় নি ? পাঁচজন লোক যা'রা সঙ্গে গেছ্‌লো, তা'রা কি ভাবলে ? কাজটা ভাল হো'ত কি না তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে কি ক'রে ? তোমার বিষয়-বুদ্ধি আছে ? বিষয় নেই, তা'র বিষয়-বুদ্ধি ! এখন কোর্বে কি ? চাকরি নেই, মাথা গোঁজবার চাল্ নেই, এখন রাস্তায় বোস গে, আর কি ? ভাল হয় নি। বেটাছেলে হয়ে জন্মেছিলে কেন ? ছিঃ !"

দামোদর নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছিল, আর রাধারাণীর মুখের উপর নানা বিভিন্ন ভাবের ছায়া যেন অন্ধকারেই দেখিতেছিল। সে একটু ভাবিয়া বলিল, "রাণী, তুমি রাগ করো না, আমি যা' মতলব করেছি, শোন।" সে রাধারাণীকে তাহার মত্‌লবের কথা আদ্যন্ত শুনাইয়া বলিল, "দু জনে থাক্‌বো, আর কেউ নয় রাধারাণী। দেখ্‌বে কি আনন্দ ! জীবনে সুখ এর চেয়ে আর কি হ'তে পারে ? কোনও দুর্ভাবনা উৎপাত থাক্‌বে না। একেবারে যাকে ইংরেজিতে বলে "idyll" তাই হবে। কেমন রাজী আছ ?" রাধারাণী শুনিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। অন্ধকার ছিল বলিয়া তাহার মুখের ভাব কি তাহা দামোদর দেখিতে পাইল না ; তাই সে এই অদৃষ্ট ভাবকে প্রণয়ের ভাবই মনে করিয়া কহিল, "এতদিন জীবনটা বিষম হয়ে ছিল। এইবার চল। আর কোনও রকম অসুখ অশান্তি থাক্‌বে না। যা' চাও, প্রণয়ী লোকে যা' কামনা ক'রে, ঠিক তাই। তোমার আমার অবাধ মিলন। কত কবিতা লিখে তোমায় শোনাবো। বই লিখ্‌বো। সাহিত্যিক হবো। আমার নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়্‌বে। শরৎ চাটুয্যে কি নরেশ সেনের মত। বুঝেছ ?"

রাধারাণী সশব্দে হাসিয়া উঠিল। তার'পর হাসি একটু থামিলে, বলিল, "ওঃ ! শুধু ভীরু নও, তুমি একেবারে নীরেট। যাবে ত' লঙ্কা, লাফ দিয়ে যাবে না কি ? তোমার কি আছে ? নিজে খেতে পাও না, নিজের আহারই আগে জুটাও, তবে পরের, আমার ভাব্‌না করো। বসে বসে আর স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে হবে না, শুয়ে পড়, আর জ্বালিও না।" দামোদরকে যেন উচ্চ পর্ব্বত হইতে কে নীচে ফেলিয়া দিল। তা'র আঘাতটা ঠিক ততটা গুরু রকম মনে হইল। এই

রাধারাণী! তা'হলে রাধারাণীর প্রেম কি ছলনা? নারী কি কখনও প্রকৃত প্রেম বুঝে না? বুঝে শুধু টাকা!

দামোদর চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। রাধারাণী একবার বলিল, "বসে বসে আর আকাশ-কুসুম তৈরীর দরকার নেই। নেশা করেছ না কি? যত বাজে কথার আবাদ কোর্‌ছ? শুয়ে পড়—ঘুমোও। খুব বাহাদুরি দেখিয়েছ আজ, আর দরকার নেই।" সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

দামোদর স্তব্ধ, ব্যথিত হইয়া কিছুকাল বসিয়া রহিল। তাহার মনে যে যাতনা হইতেছিল তাহা সে কাহাকে বলিবে? ইহার নাম সংসার? ইহার জন্য সে এত করিয়াছে? হায়, হায়! জীবনে কি সুখ নাই? সংসার কি স্বপ্ন, মায়া? শঙ্করাচার্য্য পণ্ডিত ঋষি ছিলেন; হবে না কেন? কত বড় যোগী মহাপুরুষ ছিলেন; তিনি কি আর না জেনেই লিখেছেন, "কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ"। কেহই কাহারও নহে। রাধারাণীও তাহার নহে। তবে সে সংসারে কি করিতে থাকিবে? দামোদর ঘুমাইল না। শুইয়া শুইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইল। শেষে উঠিল। দেখিল, রাধারাণী অকাতরে ঘুমাইতেছে। সে সন্তর্পণে নামিল। তা'রপর ঘরের যেখানে তাহার জামা একটি পেরেকে ঝুলান ছিল, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইয়া পকেটে হাত দিল, রুমাল জড়ান একখানি দশ টাকার নোট ছিল, আছে কি না দেখিয়া লইল। কিছু খুচরা পয়সাও ছিল। সে জামাটি আস্তে-আস্তে পরিয়া লইয়া জুতার খোঁজ করিল। জুতা জোড়া হাতে করিয়া সেই রকম সাবধানতার সহিত দরজার অর্গল খুলিয়া ফেলিল। নিঃশব্দ পদে বাহির হইতে যাইতেছে, কিন্তু দরজার শিকল নড়িয়া উঠিল। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া শুনিল, রাধারাণী জাগিয়াছে কি না। দেখিল, না জাগে নাই। বাহিরে আসিয়া ধীরে ধীরে দরজা ভেজাইয়া দিল। ভিতরের দরদালান পার হইয়া, সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইল। চণ্ডীমণ্ডপের দিকে গেল না, যদি কেউ থাকে। নিতাই ঘোষকে বিশ্বাস নাই; হয় ত' এই রাতেই সে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছে। সে গোশালার পাশ দিয়া গিয়া বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া গ্রামের রাস্তায় পড়িল। তা'র পর জুতা পরিয়া লইয়া চলিল। তাহার অন্ধকারে ভয় যে করিতেছিল না তাহা নহে; তবে তাহার এই সংসারে যে বিরাগ ঘটিয়াছিল আর নিতাই ঘোষের যে ভয় হইয়াছিল তাহার কাছে কোনও ভয়ই ভয় নহে। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে নিশ্চয়ই নিতাই ঘোষ তাহার পিছনে আসিতেছে!

পালঘাটির ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তাহার মনে হইল একবার বাড়িতে যাইবে কি না। কিন্তু প্রভাতের ঘটনা মনে পড়াতে আর সে ইচ্ছা হইল না। তা' ছাড়া কি করিতে সে নিজের বাড়ি যাইবে? সেখানে তাহার কেহ নাই। কেহই তাহাকে চাহে না। সে শঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্য স্তোত্র আওড়াইতে লাগিল। "কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ।" কি গভীর জ্ঞানের কথা! সে গোড়াতেই সন্ন্যাসী হইলেই পারিত। তাহা হইলে এই উৎপাত সহ্য করিতে হইত না। সংসার সত্যই বিচিত্র। কে ভাবিয়াছিল রাধারাণীর হৃদয় অমন কঠিন? অমন কোমল শরীরে অমন কঠিন মন কি করিয়া আসিল? যেন নারিকেলের বিকল্প! দামোদর উদাস মনে চলিল। পালঘাটিতে দাঁড়াইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"পয়সা রাস্তায় ছড়ান আছে।"

সারা পথ হাঁটিয়া রেল ষ্টেশনে পৌঁছিতে দামোদর প্রায় সকাল করিয়া ফেলিল। ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। ষ্টেশ মাষ্টারের ঘর বন্ধ; টিকিটবাবুও দরজায় তালা দিয়া বাসায় গিয়াছেন; দু'এক জন খালাসী যা'রা ছিল, তাহারা যে যেখানে সম্ভব পড়িয়া ঘুমাইতেছে। দামোদরের ক্লান্তি আসিয়াছিল; ভোরের শীতল স্পর্শে তাহারও শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু শুইল না। এখনি আধ ঘণ্টার ভিতরই একখানা ট্রেণ আসিবে। সে আপাততঃ কলিকাতায় যাইবে। ঘুমাইয়া পড়িলে যদি নিতাই ঘোষ সন্ধান করিয়া আসিয়া পড়ে তবে বিপদ ঘটিবে। সে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, রেল-ষ্টেশনের লোকেদের নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রায় বিস্মিত হইল। আর মাত্র আধ ঘণ্টা হয় ত ট্রেণ আসিতে আছে; কিন্তু উহাদের সে জন্য কোন চিন্তা নাই।

ক্রমে পাঁচ সাত করিয়া আধ ঘণ্টার আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী রহিল। আরও দু' এক জন যাত্রী বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দামোদর ভাল করিয়া দেখিল, তাহার পালঘাটি কি নিতাইঘোষের গ্রামের কেহ নয়। সে সুস্থির হইল। পাঁচ মিনিট দু' মিনিটে দাঁড়াইল; ক্রমে ট্রেণের শব্দ সে শুনিতে পাইল। দু' মিনিট পরে ট্রেণ আসিয়া দেখা দিল। দামোদর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল, খালাসীরা তখনও ঘুমাইতেছে; ষ্টেশনের লোকজনও আর কেহই আসে নাই। অথচ ট্রেণ এখানে দু' তিন মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ট্রেণ যখন প্লাটফর্মের অর্দ্ধেক আসিয়াছে খালাসী দুইটা উঠিল। প্লাটফর্মের এক কোণ দিয়া মাঠ ভাঙিয়া টিকিট-বাবু আসিলেন; অন্য কোণ দিয়া "ছোটবাবু" বা সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় উপস্থিত হইলেন। ট্রেণ থামিতেই, সব ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলা হইল। টিকিট বাবু ঝপাঝপ্ করিয়া চার পাঁচ খানা টিকিট কাটিয়া দিলেন। দামোদর তাহার কলিকাতার জন্য একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ১৵১৫ পয়সা দিয়া কিনিয়া, আস্ত ১০ টাকার নোট আনার জন্য টিকিটবাবুর কাছে ধমক্ খাইয়া, দৌড়াইয়া গিয়া গাড়িতে উঠিল। সে বসিতে না বসিতে ট্রেণ বাঁশী বাজাইয়া ছাড়িয়া দিল। দামোদর বসিয়া হাঁফাইতে লাগিল। উঃ! আর একটু হোলেই ট্রেণ ফেল্ হয়েছিল!

শ্বাস প্রশ্বাসের ধরণ স্বাভাবিক হইলে, সে একবার গাড়ির ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। গাড়িতে লম্বা লম্বা বেঞ্চ। দু'পাশে দু' খানি, মাঝে একখানি। আর দু'টি পাশে দু'দিকে গাড়ির প্রস্থ জুড়িয়া দুইখানি বেঞ্চ। সবই প্রায় ভর্ত্তি হইয়াছে। বেশীর ভাগ লোকই এখনও শুইয়া আছে। দু' এক জন বসিয়া "বিঁড়ি" টানিতেছে। সে যেখানে বসিয়া ছিল তাহার পাশে একজন মাড়োয়ারি ও একজন বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া ছিল। আর এক পাশে একজন শুইয়া ছিল, কিন্তু ঘুমায় নাই, চোখ চাহিয়াই ছিল। মাড়োয়ারিটি দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথা যাবে, বাবু?" দামোদর উত্তর দিল, "কল্‌কাতা।" "এটা কি ষ্টেশন আছে?" দামোদর বলিল, "পালঘাটি।" মাড়োয়ারি বিজ্ঞের মত কহিল, "ওঃ!" তাহার সঙ্গের বাঙ্গালী বাবুটি জিজ্ঞাসা করিল, "কল্‌কাতায় কি করা হয়? চাকুরি?" একটু ভাবিয়া দামোদর উত্তর দিল, "না। তবে চাকুরির চেষ্টাতেই যাচ্ছি।" মাড়োয়ারিটি বলিয়া উঠিল, "চাকুরি কেনো কোর্‌বে বাবু। বাঙ্গালী লোক চাকুরি কোর্‌তে বড্ড ভালবাসে। ব্যবসা কোর না; লছমী আপ্‌নি খুদ বাঁধা দেবে। সম্‌ঝোলে, বাবু?"

সঙ্গের বাঙালী বাবুটি কহিল, "তা' আর বল্‌তে। চাকুরি? হুঁ! চাকুরি ক'রে কেউ বড় লোক হয়, না হয়েছে? ব্যবসা কর। ব্যবসার চেয়ে জিনিস আছে?"

তা'রপর মাড়োয়ারিটিকে দেখাইয়া বলিল, "এই ভকত-রামবাবু যখন আসেন,—কি, ভকত্‌রাম বাবু! কি নিয়ে এসেছিলেন?"

ভকত্‌রামবাবু একমুখ হাসিয়া জবাব দিল, "এক লোটা ঔর এক কম্‌লি!"

বাবুটি সোৎসাহে বলিল, "শুন্‌ছেন? এক লোটা আর এক কম্বল। এখন ভকতরামবাবুর কি হয়েছে? কি, ভকতরামবাবু, কি হয়েছে, কত টাকা করেছেন? বলুন না।"

ভকত্‌রামবাবু সেইরূপ হাসিয়া উত্তর দিল, "এই দো' চার লাখ হোবে, নারান বাবু, ওর কেত্‌না? বেশী কিছু হোয় নি।"

বাবুটি বলিল, "শুন্‌ছেন? শুনুন, তিন-চার বছরে দু'-চার লাখ! কি চাকুরিতে হয় বলুন ত দু'চার লাখ? চাকুরি মানুষে ক'রে!"

যে লোকটি শুইয়া শুইয়া তাকাইতেছিল, সে উঠিয়া বসিল। মাড়োয়ারি ভকত্‌রামবাবুকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে হো'ল? ম্যাজিক না কি, বাবা? কিসের ব্যবসা?"

মাড়োয়ারির সঙ্গী বাবুটি—নারাণবাবু উত্তর দিল, "ম্যাজিক বৈ কি, ব্যবসার ম্যাজিক্।"

ভকত্‌রামবাবু বলিল, "কল্‌কত্তায় রাস্তাতে টাকা ছড়ান আছে; কেবল উঠিয়ে নেওয়া বৈ' ত নয়। হাঁ, সহর বটে, রূপেয়া রোজকার ক'রে সুখ আছে।"

দামোদরের কাছে সংবাদটি একেবারে অভিনব ও রূপক মনে হইল। প্রায় তিন-চার বছর সে কলিকাতায়

ছিল, রাস্তায় 'ত টাকা ছড়ান দেখে নাই। সে আগ্রহান্বিত হইয়া শুনিতে লাগিল।

শুয়ে উঠা লোকটি একটি হাই তুলিয়া তুড়ি দিল। তার পর বলিল, "ভুতুড়ে কাণ্ড বাবা! লালবাতি ক'বার জ্বেলেছিলে, ভকত্‌রামবাবু? আমি মহিমচাঁদ বচ্ছুর—পাঞ্জাবে বাড়ি—কাপড়ের ব্যবসা করি বাঙাল্‌ দেশে—; আমি ত' বুঝ্‌তে পারি না কিছু, কি ক'রে তিন-চার বছরে দু'-চার লাখ জমে। আর কল্‌কাতাতেও টাকা ছড়ান দেখিনি, তবে পকেটকাটা অনেক আছে বটে, গাঁটকাটা আছে।"

ভকত্‌রামবাবু মাথা নাড়িয়া কহিল, "পথ আছে, মহিমচাঁদবাবু। পথ আছে কলকত্তায়। আঁখ্‌ দিয়া দেখা চাহিয়ে।"

ভকতরামবাবুর সঙ্গীটি যোগ দিল, "নিশ্চয়ই। দেখা চাই। ব্যবসা মানে কি দোকানদারি? মনিহারীর দোকান? কাপড়ের দোকান? পাণের দোকান? হুঁ! ব্যবসা কর্ত্তে হ'লে দোকান টোকান কিছুর দরকার হয় না। কেবলী কথা; জবান্‌ চাই। না, ভকত্‌রামবাবু; বলুন না কি ক'রে ব্যবসা করেন।"

ভকতরামবাবু হাসিয়া জবাব দিল, "সে কথা বোল্‌তে নেই, নারাণবাবু। কারবারের কথা কি ফাঁশ কোর্‌তে আছে?"

মহিমচাঁদ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ফাঁকের কারবারে আবার ফাঁক ঢাকা কি, বাবা? জবান দিয়ে কার্‌বার; ও 'ত বিলকুল ফাঁক্‌।"

ভকত্‌রামবাবু হাসিতেই লাগিল। নারাণবাবু তাহার হাসি দেখিয়া বাধ্য হইয়া জোর করিয়া আরও সশব্দে হাসিয়া উঠিল। গাড়ির লোকে সবাই তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কিসের এত হাসি!

হাসি থামিলে মহিমচাঁদ কপুর বলিল, "কথা ঠিক? না?"

ভকত্‌বাবু কহিল, "হাঁ, মহিমচাঁদবাবু, কথা ঠিক আছে। কিন্তু রূপেয়া ত' পয়দা হোয়। ফাঁক্‌ সেই হোয়।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে হয়?"

ভকতরামবাবু আবার হাসিল। নারাণবাবুও হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে ভকতরামবাবুর চোখে জল আসিল, পাগ্‌ড়ী আল্‌গা হইয়া গেল। নারাণবাবু হাসিতে হাসিতে কাসিয়া ফেলিল। মহিমচাঁদ বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইয়া আপনমনে বলিল, "শিকারী লোক্‌! মতলব্‌ ভাল নয়!" তা'র পর দামোদরকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া লইয়া মহিমচাঁদ বলিল, "কিসে? হাওয়াতে হয়, বাবু। আর কিসে হবে? কি আর আছে? কল্‌কাতায় কি হয় কে বল্‌তে পারে।"

নারাণবাবু হাসির দমক বন্ধ করিয়া বসিল। ভকত্‌রামবাবু একটু সুস্থির হইল। গাড়ি আর একটি ষ্টেশনে থামিল। সকলে বাহিরে প্লাটফর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কেহ নূতন যাত্রী উঠিল না। গাড়ি আবার চলিল।

ভকতরামবাবু দামোদরকে প্রশ্ন করিল, "তুমি চাক্‌রি কোর না, বাবু। ব্যবসা কর। এই নারাণবাবু বড় চালাক্‌ লোক আছে। তুমি নারাণবাবুর কাছে ব্যবসা শিখে নিয়ো। কেমন, নারাণবাবু, এ বাবুকে তুমি ব্যবসা শিখালাবে?"

নারাণবাবু উত্তর দিল, "আপনার কাছে আমি, ভকতরামবাবু?" তার পর দামোদরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি, ব্যবসা কর্ত্তে চান না কি? না, চাক্‌রি কোর্‌বেন?"

দামোদর উত্তর দিল, "ব্যবসা কি ক'রে কোর্‌ব? কিছু কি জানি? তা' ছাড়া ব্যবসা কর্ত্তে টাকা চাই; আমার টাকা নাই।"

ভকতরামবাবু কহিল, "ব্যবসা কর্ত্তে ঘরের টাকা লাগিয়ো না, বাবু। তা' হলেই লোকসান্‌ হবে।"

নারাণবাবু কোনও রায় দিল না। পকেট হইতে বিঁড়ি ও দেশলাই বাহির করিয়া ধরাইল।

দামোদর বলিল, "আমি কিছুই ত জানি না। কল্‌কাতায় ছিলুম বটে তিন-চার বছর; কিন্তু লেখাপড়াই করেছি। ব্যবসার কথা জানি না।"

নারাণবাবু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি পড়েছো?"

দামোদর উত্তরে জানাইল সে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে—"ফোর্থ ইয়ারে পর্য্যন্ত পড়েছি।"

নারাণবাবু তাচ্ছল্যের স্বরে বলিল, "ওঃ! সে ত ছড়াছড়ি! বি-এ, এম-এ পড়া কি আর .এমন? বড় জোর ৪০৲ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরি। আর কি হয়?"

ভকতরামবাবু রায় দিল, "আরে, ও লিখাপড়াতেই ত সব মিট্টি হ'য়ে গেলো। আমি ত' নাম সহি কোরতে পারি না, আমি তাই না রূপেয়া রোজকার করিয়েছি।"

নারাণবাবু সায় দিল "নিশ্চয়। লেখাপড়া ঐ জন্যে আমিও শিখিনি। পাঠশালায় ভকতরামবাবু, গিয়েছিলুম্ দু'চার রোজ। তার পর আর যাই নি। তবু সাহেবদের সঙ্গে কথা বল্‌তে আমার আট্‌কায় না। গড় গড় করে কথা বলি, শুনেছেন ত' আপনি, ভকতরামবাবু। সেবার গার্ড কোম্পানীর বড় সাহেবকে কেমন শুনিয়ে দিলুম। কেমন, শুনাই নি? বেটা থ' মেরে গিয়েছিল। যায় নি?"

ভকতরামবাবু জবাবে কহিল, "হাঁ, নারাণবাবু, আপনি ইংরাজীতে বড় লায়েক আছে।"

তার পর নারাণবাবু ও ভকতরামবাবুতে কত কোম্পানীর কথা হইল, কতবার কত সাহেবকে কি রকমে চালাকি করিয়া ফাঁদে ফেলা হইয়াছিল; কত টাকার খেসারত্ আদায় হইয়াছিল; কত আরও ভবিষ্যতের ফন্দী আছে; তাহা লইয়া কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা হইবে, ইত্যাদি; ইত্যাদি। দামোদর মন দিয়া শুনিতে লাগিল। কতক সে বুঝিল, কতক বুঝিল না। মহিমচাঁদ ওদিকে আর কর্ণপাত করিল না। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন এইরূপে পার হইয়া গাড়ি চলিল। তাহার ইতিমধ্যে ক্ষুধা পাইয়াছিল। সকলের দেখাদেখি সেও মাঝের একটি ষ্টেশনে কিছু খাবার কিনিয়া খাইয়া লইল।

শিয়ালদহে পৌঁছিবার আর বেশী দেরী নাই। নারাণবাবু দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কল্‌কাতায় কোথায় থাক?"

দামোদর জবাব দিল, "ঠিক নেই কোথায় থাক্‌বো। কলেজে পড়্‌বার সময় মেসে থাক্‌তুম। সেইখানেই উঠ্‌বো।"

নারাণবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিল, "তোমার নাম কি? কি জাত?"

দামোদর নাম বলিল। জানাইল সে কুলীন কায়স্থ।

নারাণবাবু শুনিয়া কহিল, "চাকরির বাজার বড় খারাপ। তোমার মত ছোক্‌রা কত ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাত ক্ষুইয়ে ফেল্‌লে দরখাস্ত করে করে। চাকরি কি মেলে আর? যে লড়াই গেল; সব উল্টে দিয়ে গেল।"

দামোদর সাহস করিয়া বলিল, "আপনার ত অনেক আফিসের সাহেবদের সঙ্গে জানাশুনা আছে। একটু দয়া করে যদি বলে কহে দেন।"

ভকতরামবাবু মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই বলে দেবেন। নারাণবাবু অতি আচ্ছা লোক আছে। নিশ্চয়ই বলে দেবেন।"

নারাণবাবু হাসিয়া কহিল, "আপনার কাছে কিছু নই, ভকতরামবাবু।"

তার পর দামোদরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো। ১৩নং রতনচাঁদ গার্ডেন লেন, আমার বাড়ির ঠিকানা। চাকুরি যদি নাও পাওয়া যায়, তোমাকে কোনও একটা ব্যবসার মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। রোজগার কর্ত্তে পার্লেই হো'ল; তা' যাতেই হোক্। মেহনত কর্ত্তে পার ত'? তোমার লেখাপড়া বি-এ, এম-এ কোন কাজে লাগ্‌বে না। ও সব ভুলে যাও! তবেই দেখ্‌তে পাবে টাকা রোজকার হচ্ছে। কি বলেন, ভকতরামবাবু?"

ভকতরামবাবু সায় দিল, "নিশ্চয়ই। বেসক্। টাকা ত রাস্তায় ছড়ান নারাণবাবু। উঠিয়ে নিলেই হয়। ধূলোর মত ছড়ান। আজব সহর কল্‌কাতা, নারাণবাবু আগে দেশে মাড়োয়ারে লোকে যখন বল্‌তো এত্‌বার হোত না। এখন দেখ্‌ছি তারা ঝুট্ বলে নি। শুধু উঠিয়ে নিতে জান্‌তে হয়।"

ভকতরামবাবু মহিমচাঁদের দিকে চাহিয়া কথাগুলি বলিল। দামোদর প্রশ্ন করিল, "আপনার দেশ কোথায়?"

ভকতরামবাবু হাসিতে লাগিল, কোনও উত্তর দিল না। নারাণবাবু উত্তর দিল, "রাজপুতানা।"

গাড়ি শিয়ালদহে আসিল। সকলেই নামিতে প্রস্তত হইল। মহিমচাঁদ দাঁড়াইয়া নিজের বিছানা উঠাইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে দামোদরকে নিচু স্বরে বলিল, "বাবু কল্‌কাতা সহর বড় আজব। যার তার কথায় যেন কিছু

করে বস্‌বেন না। জানা লোকের কাছেই যাবেন ও পরামর্শ নেবেন।”

দামোদর এতক্ষণ নারাণবাবু ও মাড়োয়ারীকে মনে মনে প্রশংসা করিতেছিল। কলিকাতায় তাহার নারাণবাবুর মত একজন সহায় হইবে বলিয়া একটু সাহসও হইয়াছিল। কিন্তু মহিমচাঁদের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল। কলিকাতায় সে কিছু জানিত না বটে, কিন্তু কলিকাতায় কত রকম বেরকমের লোক আছে, কত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে তাহা সে শুনিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল যে তাহার আর কি ক্ষতি কেহ করিবে? তবু সাবধানেই চলিবে।

ট্রেণ হইতে নামিয়া নারাণবাবু একবার তাহাকে পুনরায় বলিলেন,—“১৩নং রতনচাঁদ গার্ডেন লেন, মনে রেখো। ষ্ট্রীট নয়, রোডও নয়, লেন। বুঝেছ? সকালে ৯টার আগে, আর না হয় সন্ধ্যা ছ’টার পর যাবে। অ না হলে দেখা হবে না।”

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তাহার পর ধীরে ধীরে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া কলেজে পড়ার সময় যে মেসে থাকিত সেই মেসের দিকে চলিল। সেখানে ম্যানেজার চারুবাবু নিশ্চয়ই এখনও আছেন; তাহাকে একটু আশ্রয় দিতে পারিবেন। চারুবাবু তাহাকে চিনিতে পারিবেন, সে বিষয়ে দামোদর কোন সন্দেহ করিল না। দু’চার দিন দেখিবে, যদি চাক্‌রি না হয়, তবে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। কাহার জন্য কিসের জন্য চাক্‌রিই বা সে করিবে? সে সংসার করিতে চাহে না। তবু ভকতরামের কথাটা একবার যাচাই করিবে। (ক্রমশঃ)

গোধূলি

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

সম্মুখে ঘনায় সন্ধ্যা, গোধূলির ম্লান স্বর্ণ-ছায়া
সঞ্চার করিছে প্রাণে কোন এক অপরূপ মায়া—

জাতিস্মর যাহে আমি, এ আমার অন্তর ভরিয়া
বহু জন্ম জন্মান্তের পূর্ব্বাপর বিস্মৃতি হরিয়া
জন্ম যার সৃজনের রহস্যের স্তব্ধ ছায়াপথে
উদয়-অচলে-যাত্রা অরুণের অভিনব রথে।

জাগরূপ একে একে সাঁঝাকাশের নক্ষত্র সমান,
দুজনার দূরস্মৃত ভালোবাসা, শত অভিজ্ঞান,
তাই এ গোধূলি লগ্নে, মিলনের অন্তিম শয়নে
একে একে ওঠে জেগে, মন্ত্রমুগ্ধ আমার নয়নে

সেদিনের সেই দেখা, কাণে আসে, চিরন্তনী সেই
প্রেমবাণী, “ভালোবাসি ওগো প্রিয়া” প্রতি নিমেষেই।



বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বপ্ন-রহস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

খৃষ্টানদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের শত্রু শয়তান মানুষকে নানা প্রলোভনে বা ভয়প্রদর্শনে বশীভূত করিয়া তাহাদের দ্বারা পাপানুষ্ঠান করাইয়া লয়। এক ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখিলেন যে, শয়তান তাঁহাকে একটা কলের পাদির তলায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহাকে এই বলিয়া ভয় দেখাইতেছে যে, তিনি যদি তাহার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার আদেশ পালন ও তাহার কার্য্য সম্পাদন না করেন, তাহা হইলে সে তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবে। শয়তানের কথা অনুসারে কার্য্য করিতে তিনি অসম্মত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে রফা উপস্থিত হইল। অবশেষে শয়তান তাঁহাকে এই সর্ত্তে নিষ্কৃতি দিল যে, সে যে ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতেছে, ভদ্রলোকটি সেই ব্যক্তিকে শয়তানের নিকটে প্রেরণ করিবেন। শয়তানের উল্লিখিত ব্যক্তি ভদ্রলোকটিরই এক পাড়ার লোক, এবং আত্মীয় ভাবেরে বলিয়া পরিচিত। কয়েক দিন পরে জানা গেল, এই পাড়ার লোকটি জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। যেরূপ অবস্থায় সে মরিয়াছে তাহাতে বুঝা গেল, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

একটি ভদ্র মহিলা তাঁহার একটি ওয়াচ ঘড়ি মেরামত করাইবার জন্য ঘড়ি মেরামতকারীর দোকানে পাঠাইয়াছিলেন। অনেক দিন হইয়া গেল, অথচ, ঘড়ি ফেরত পাওয়া গেল না। ঘড়িওয়ালা নানা ওজোর আপত্তি করিয়া দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল। তখন মহিলাটির মনে সন্দেহ জন্মিল যে, নিশ্চয়ই কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, ঘড়িওয়ালার যে ছেলেটির হাত দিয়া তিনি ঘড়িটি দোকানে পাঠাইয়াছিলেন, পথে যাইতে যাইতে ঘড়িটি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গিয়া এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া যায় যে, তাহা আর মেরামত করিবার যো ছিল না। তখন তিনি দোকানে গিয়া, স্বপ্ন দেখার কথার উল্লেখ না করিয়া, সোজাসুজি তাহাকে বলিলেন, ঘড়িটি তুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ। তখন লোকটি স্বীকার করিল যে, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক—ঘড়িটি ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে বটে।

অসংখ্য লোক প্রত্যহ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখে, এবং নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্য্যও শেষ হইয়া যায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এই যে কতকগুলি সফল স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, এইগুলি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সুতরাং এগুলি বিশেষ একটা পর্য্যায়ভুক্ত স্বপ্ন। সফল স্বপ্নের সমশ্রেণীর অথচ তাহা হইতে কিছু বিভিন্ন আর এক প্রকার স্বপ্ন আছে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত এইরূপ—একটি যুবক তাহার বাড়ী হইতে এক শত মাইল দূরবর্ত্তী এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত এবং বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকিত। একদিন সে স্বপ্ন দেখিল যে, রাত্রিতে সে তাহার বাড়ী গিয়াছে। সে প্রথমে সদর দরজায় গমন করিল। রাত্রি অধিক হওয়ায় দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, বাড়ীর লোকেরা শয্যাশ্রয় করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল। যুবক দরজার কড়া নাড়িল, দরজায় আঘাত করিল, ধাক্কা দিল, ডাকাডাকি করিল—কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না, দরজা কেহ খুলিয়া দিল না। তখন সে খিড়কীর দরজায় গেল। সে দরজাও বন্ধ ছিল; কিন্তু সে কোন রকমে দরজা খুলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল, বাড়ীর সকলেই নিদ্রামগ্ন। তখন সে সোজা তাহার পিতামাতার শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। সে ঘরের দরজা খোলা ছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল তাহার মাতা জাগিয়া আছেন। সে জননীকে বলিল, "মা, আমি অনেক দূরদেশে যাত্রা করিতেছি, সেইজন্য তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিলাম।" এই কথা শুনিয়া মাতা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "আহা বাছা, তুই মরিয়া গিয়াছিস!" এই পর্য্যন্ত স্বপ্ন দেখিবার পর যুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অনন্তর সে স্বপ্নের কথা আর চিন্তা করিল না, এবং বিষয়ান্তরে মন নিবিষ্ট হওয়ায় স্বপ্ন দর্শন ব্যাপার ভুলিয়া গেল। ইহার কয়েক দিন পরে সে তাহার পিতার একখানি পত্র পাইল। তাহাতে তাহার পিতা তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সে কেমন আছে তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার উদ্বেগের কারণ তিনি এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে যে রাত্রে যুবক স্বপ্ন দেখিয়াছিল, ঠিক সেই রাত্রে তাহার মাতা একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। মাতা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, কে যেন সদর দরজার কড়া নাড়িল, ধাক্কা দিল, ডাকাডাকি করিল। তার পর সে খিড়কী দরজায় গমন করিল। এবং অবশেষে তাঁহাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তিনি তখন আগন্তুককে চিনিতে পারিলেন যে, সে তাঁহারই পুত্র। ছেলে তাঁহার বিছানার কাছে আসিয়া বলিল, "মা, আমি দূরদেশে যাত্রা করিতেছি; তাই তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।" ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আহা বাছা, তুই মরিয়া গিয়াছিস!" পিতার পত্র পাঠ করিয়া যুবকের মনে পড়িল, কয়েক দিন পূর্ব্বে সে ঐরূপ স্বপ্নই দেখিয়াছিল বটে। কিন্তু পুত্র কিম্বা মাতা কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই, কিম্বা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপারও ঘটে নাই। এরূপ স্বপ্ন দেখিবার একমাত্র কারণ এই মনে করা যাইতে পারে যে, উভয়েরই মনে একই সময়ে

একই রকমের একটা প্রবল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাই দুইজনেই একই রজনীতে একই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছিল। * ইহার মূল সূত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার যোগ্য বিষয়।

এই যে চারি শ্রেণীর স্বপ্নের কথা বিবৃত হইল, অন্যান্য শ্রেণীর স্বপ্নও ইহাদের কোন না কোনটির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; আবার কতকগুলি স্বপ্ন বিভিন্ন শ্রেণীর হওয়াও অসম্ভব নহে। এই সকল স্বপ্ন কিরূপ সাহচর্য্যের বা য়্যাসোসিয়েসনের ফলে উৎপন্ন হয়, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা বেশ কৌতুকাবহ ব্যাপার। উক্ত চারি শ্রেণীর বহির্ভূত স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত স্বপ্নের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আর পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে যে ভাবে স্বপ্নের কৈফিয়ৎ আদায়ের চেষ্টা হইয়াছে, এই শেষোক্ত শ্রেণীর স্বপ্নের কৈফিয়ৎ সে ভাবে আদায় করা নাও যাইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। দুইটি ভগিনী ও একটি ভাই। ভাইটির গলার ভিতর ঘা (sore throat) হইয়াছিল। রোগ কঠিন, রোগী অনেক দিন ধরিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল; কিন্তু রোগ সাংঘাতিক বিবেচিত হয় নাই—আরোগ্য লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। দুইটি ভগিনীই পীড়িত ভ্রাতার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। ভগিনীদ্বয়ের মধ্যে একজনের একটি ওয়াচ ঘড়ি ছিল। সেটি খারাপ হইয়া যাওয়ায় তাহা মেরামত করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এদিকে রোগীর সেবার জন্য ঘড়ির প্রয়োজন থাকায় সে তাহার এক বন্ধুর নিকট হইতে একটি ওয়াচ ঘড়ি ধার করিয়া আনিয়াছিল। এই ঘড়িটির আর্থিক মূল্য তেমন বেশী না হইলেও, ইহার অধিকারিণী পারিবারিক কারণে ঘড়িটিকে অতি মূল্যবান বিবেচনা করিত। বন্ধুকে ঘড়িটি ধার দিবার সময় সে বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিল যে, ঘড়িটির যেন কোন রকম ক্ষতি না হয়। বন্ধুও ঘড়িটি খুব যত্ন করিয়া রাখিবার ও ব্যবহার করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিল। রোগীর কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে দুই ভগিনী একত্র শয়ন করিত, এবং উভয় কক্ষের মধ্যে একটি দ্বার ছিল, সেই দ্বার দিয়া এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাতায়াত করা যাইত। একদিন রাত্রিতে উভয় ভগিনীই নিদ্রাগত, এমন সময়ে জ্যেষ্ঠা ভগিনী হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে জাগ্রত হইয়া কনিষ্ঠা ভগিনীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বলিল, সে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। সে বলিল, "আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, মেরীর ঘড়িটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে এই কথা বলাতে তুমি বলিলে, ওর চেয়েও বেশী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে '—' (তাহাদের ভ্রাতার) শ্বাসও রুদ্ধ হইয়াছে।" জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিয়া তাহাকে শান্ত করিবার জন্য কনিষ্ঠা ভগিনী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে গমন করিল; দেখিল, ভ্রাতার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবেই বহিতেছে, সে শান্তভাবে ঘুমাইতেছে। ঘড়িটি একটি টানার ভিতর যত্ন করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কনিষ্ঠা ভগিনী টানা খুলিয়া দেখিল, ঘড়ি ঠিক চলিতেছে—বন্ধ হয় নাই। ও ঘর হইতে এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কনিষ্ঠা ভগিনী জ্যেষ্ঠাকে আশ্বস্ত করাতে সে শান্ত হইল, এবং উভয়েই পুনরায় নিদ্রিত হইল। সেই রাত্রে আর তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই। পর দিন রাত্রিতেও জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঠিক পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় স্বপ্ন দেখিয়া উত্তেজিত ভাবে জাগিয়া উঠিল। সে রাত্রিতেও তাহাকে পূর্ব্বরাত্রির ন্যায় শান্ত করা হইল। দেখা গেল, ভ্রাতা পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় শান্তভাবে ঘুমাইতেছে, এবং ঘড়িটিও ঠিক চলিতেছে। পরদিন সকালে পরিবারের সকলের প্রাতরাশ শেষ হইবার পর একজন ভগিনী ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে এবং অপরা ভগিনী পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতেছে। চিঠি লেখা শেষ করিয়া খামে ভরিবার সময় সে তাহার লিখিবার ডেস্ক খুলিয়া সময় দেখিবার জন্য ঘড়িটি বাহির করিতে গিয়া দেখে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঠিক সেই সময়ে সে শুনিল, পার্শ্ববর্ত্তী রোগীর কক্ষে তাহার ভগিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদের ভ্রাতার অবস্থা সকলেই মনে করিতে-ছিল ভালই,—সে আরোগ্যের দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এখন দেখা গেল, হঠাৎ তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।

চলতি ঘটনা বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনার সম্বন্ধে সতর্কতাসূচক স্বপ্নের দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায়। স্কটল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোক ইটালীদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এক দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি স্কটল্যাণ্ডস্থিত তাঁহার জমিদারীর নিকটবর্ত্তী একটি সেতুর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং দেখিতেছেন একটা সমাধির আয়োজন চলিয়াছে। একজন ভৃত্য অশ্বারোহণে তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তাহার পরিহিত উর্দ্দি দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন, সে তাঁহার প্রতিবেশী অপর এক জমিদারের ভৃত্য। পরদিন সকালে উঠিয়া ভদ্র-লোকটি তাঁহার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তাঁহার সহচর বন্ধুর নিকট বিবৃত করিয়া এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন যে, প্রতিবেশী জমিদার পরিবারে হয় ত কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। বন্ধু এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিছু দিন পরে ভদ্রলোকটি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার স্বপ্ন দর্শনের সমসময়ে তাঁহার প্রতিবেশীয় পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি যুবতী, তাঁহার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। প্রথম সন্তান প্রসব কালেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

বহু বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রসমূহে একটা স্বপ্নদৃষ্ট হত্যাকাণ্ড লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। হত্যাকাণ্ডের আট দিন পূর্ব্বে কর্ণওয়ালনিবাসী এক ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি কমন্স সভার 'লবী' (সভাগৃহের পার্শ্বস্থ বারান্দা বা কক্ষ)তে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন একজন খর্ব্বকায় ব্যক্তি 'লবী'তে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে একটি নীলরঙের কোট ও সাদা ওয়েষ্টকোট। তাঁহার অব্যবহিত পরে আর এক ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে জরদা-রঙের একটি কোট, তাহাতে পিতলের বোতাম লাগানো। এই লোকটি তাহার কোটের নীচে হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া প্রথম ব্যক্তিকে গুলি করিল। প্রথম ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলেন। গুলি তাঁহার বাম বক্ষের নিম্নভাগ ভেদ করিয়াছিল, আর ক্ষত হইতে ফিন্‌কী দিয়া রক্ত

* Occult Scienceএ এইরূপ ঘটনার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়।

বাহির হইতেছিল। তথায় উপস্থিত কয়েকটি ভদ্রলোক হত্যাকারীকে ধৃত করিলেন। স্বপ্নদ্রষ্টা হত্যাকারীর মুখ দেখিতে পাইলেন। তিনি এক ব্যক্তিতে নিহত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, ইনি চ্যান্সেলার। তাঁহার নাম মিঃ পার্সিভ্যাল। তিনি তৎকালে ইংলণ্ডের চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার ছিলেন। এই পর্য্যন্ত দেখিবার পর ভদ্রলোকটির নিদ্রাভঙ্গ হয়। তিনি তাঁহার স্ত্রীর কাছে স্বপ্ন বৃত্তান্তের বর্ণনা করেন। স্ত্রী তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দি.লন। সেই রাত্রিতে ভদ্রলোকটি আরও তিনবার ঐ একই স্বপ্ন দেখিলেন। কোনবারই ঘটনার একটুও ইতর-বিশেষ হইল না। এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি এত বিচলিত হইলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা হইল, স্বপ্নের কথা তিনি মিঃ পার্সিভ্যালকে জানান। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার বন্ধুগণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন যে, ইহা লইয়া উচ্চবাচ্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলিলেন, এরূপ স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলে লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে। ইহার পরবর্ত্তী অষ্টম দিবসের সন্ধ্যাকালে তিনি এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইলেন। তাহার অল্প কাল পরে তাঁহাকে একবার লণ্ডনে যাইতে হয়। সেই সময়ে তিনি দোকানে দোকানে এই হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যের চিত্র দর্শন করিয়াছিলেন। এই চিত্রে তিনি হত্যাকারীর মুখ, নিহত ব্যক্তির কোট, হত্যাকারীর পোষাক, মিঃ পার্সিভ্যালের ওয়েষ্টকোট ভেদ করিয়া রক্তস্রোত, হত্যাকারী বেলিংহামের কোটের অদ্ভুত রকমের বোতাম—দেখিয়া চিনিতে পারেন যে স্বপ্নে তিনি এই সমস্তই পরিষ্কার ভাবে দেখিয়াছিলেন।

এক ভদ্রলোক মান্দ্রাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষালাভার্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। তাঁহার পিতামাতা মান্দ্রাজেই রহিয়া যান। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মান্দ্রাজ ও পিতামাতার কথা ভুলিয়া যাইতে থাকেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে এ সকল কিছুই তাঁহার মনে ছিল না। এই সময়ে একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার জননী একটি ঘরে বসিয়া আছেন—তাঁহার বিধবার বেশ এবং বদন বিষণ্ণ, শোকাকুল। যে ঘরে তিনি জননীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, সেই ঘরের নিখুঁত বর্ণনা তিনি করেন—ঘরের আসবাবপত্র যেখানে যেভাবে সজ্জিত তাহা তিনি বলিয়া দেন। পরে জানিতে পারা যায় যে, স্বপ্নদর্শনের সম-সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। আর, যে ঘরের বর্ণনা করিয়াছিলেন—তাঁহার পিতামাতা মান্দ্রাজের যে বাড়ীতে বাস করিতেন, উহা সেই বাড়ীর বৈঠকখানা, এবং এই ঘরেই তাঁহার জননী প্রায়ই বসিয়া থাকিতে অভ্যস্তা ছিলেন। ঘরখানি স্বপ্নে চিনিতে পারার একটা কৈফিয়ৎ এই হইতে পারে যে, তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি যখন মান্দ্রাজে ছিলেন, তখন মায়ের সঙ্গে তাঁহার কাছে তিনিও সর্ব্বদা এই ঘরে থাকিতেন ; ইংলণ্ডে আসিবার পর ক্রমে বাহ্যতঃ এই ঘরের স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও স্বপ্নে পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল। স্বপ্নের অন্য অংশটার কোন সঙ্গত কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ।

স্বপ্নঘটিত দার্শনিক তত্ত্বের অন্যান্য অংশের বর্ণনা সংক্ষেপে করিলেও চলিতে পারে। স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে, লোকে যে সকল বিষয় বা বস্তু স্বচক্ষে দর্শন না করে, এমন বস্তু বা বিষয়ের স্বপ্নও দেখে না। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কেবল এইটুকু নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, স্বপ্নে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা বিষয় এমন জড়িতভাবে প্রকাশ পায়, দৃশ্যমান জগতে যাহা কল্পনাতীত ব্যাপার। আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান অনেক ব্যাপার স্বপ্ন-জগতে সম্ভব হয় ও সঙ্গতভাবে দেখা দেয়। বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মানসিক ধারণা যত গভীর, সেই গভীরতার দ্বারা স্বপ্ন প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ধারণার গভীরতা সমান হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে ধারণার গভীরতার ইতর বিশেষ ঘটিবেই। যে বস্তু আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গভীর হইবারই কথা। আর, সেই অনুপাতে স্বাদ, গন্ধ, এমন কি শব্দ, সম্বন্ধে ধারণা অপেক্ষাকৃত কম ও অস্পষ্ট। এই জন্যই বোধ হয় দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকলই স্বপ্নে বেশীর ভাগ দেখা দেয়। স্বাদ, গন্ধ বা শব্দানুভূতি স্বপ্নে একেবারে দুর্লভ না হইলেও এত কম যে নগণ্য বলিলেও চলে। অথবা, এমন কি, স্বপ্নে আমরা যে বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করি বা গন্ধ অনুভব করি, এ কথা নিশ্চিত করিয়া বলাই যায় না। তবে যদি নিদ্রাবস্থায় কোন শব্দ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বপ্ন দেখি, তাহা হইলে ঐ শব্দ নিজের স্বরূপে নহে—বিকৃতভাবে স্বপ্নে আবির্ভূত হইতে পারে। এরূপ শব্দ-ঘটিত স্বপ্নের দুই চারিটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুত শব্দ প্রকৃত প্রস্তাবে যেমনই হউক না কেন, স্বপ্নে তাহা তৎকালীন মানসিক অবস্থার অনুকূল রূপ ধারণ করিয়া দেখা দেয়। এখানে এ কথাও বলিয়া রাখা ভাল, যে, স্বপ্নে যে শব্দ শোনা যায়, সহজ, সরল, সুপরিচিত শব্দ সম্বন্ধেই কেবল সে কথা খাটে। কারণ, স্বপ্নে আমরা লোকের সঙ্গে কথা কহি, তাহারা যাহা বলে তাহা আমরা বুঝিতে পারি ; অথচ প্রকৃত পক্ষে এ ক্ষেত্রে শব্দের অনুভূতি না জন্মিতেও পারে। একজন শীকারী কেবলই শিকার-যাত্রার স্বপ্ন দেখিতেন। কিন্তু এই শিকার প্রায় সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা এক স্থলে আসিয়া স্থগিত হইত। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া শিকার লক্ষ্য করিয়া তিনি ছুটিতেন। শিকার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তিনি তাহার প্রতি বন্দুক লক্ষ্য করিতেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। স্বপ্নে তিনি কখনও বন্দুকের আওয়াজ করিতে পারিতেন না। মধ্যে মধ্যে এক আধবার তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেন ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ঘোড়া টিপিলেও তাহা পড়িত না—যেন কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। এক ভদ্রলোক ৩০ বৎসর ধরিয়া বধির ছিলেন। তাঁহার সহিত লিখিয়া কথা কহিতে হইত। তিনি যখন স্বপ্ন দেখিতেন, তখনও সেই স্বপ্নেও লোকে তাঁহার সহিত লিখিয়া কথা কহিত। স্বপ্নেও তিনি কখনও কাহারও কথা শুনিতে পাইতেন না বা শুনিতেন না। দুইজন অন্ধ ব্যক্তি তাহাদের স্বপ্ন বিবরণ প্রকাশ করিবার সময় বলিত, তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারাইবার পর হইতে কখনও দৃশ্যমান বস্তুর স্বপ্ন দেখিত না। কেবল একজন অন্ধ লোকের স্বপ্ন দর্শন প্রসঙ্গে জানিতে পারা যায় যে সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইত বটে কিন্তু আবছায়া রকম—মূর্ত্তির মানুষকে সে চিনিতে পারিত না,

এক মূর্ত্তি হইতে অপর মূর্ত্তির ভেদ নির্ণয় করিতে পারিত না। এক ব্যক্তি জন্মের কয়েক মাস পর হইতে অন্ধ হইয়া যায়। সে বলিত, স্বপ্নে সে এমন একটা নূতন ব্যাপার অনুভব করিত, জাগ্রতে যাহা সে করিতে পারিত না। খুব সম্ভব ইহা বস্তু সকলের দৃশ্য। কিন্তু জাগ্রতে দৃশ্যের সহিত পরিচয় না থাকায়, স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যকে সে কেবলমাত্র অনুভূতি নামেই অভিহিত করিয়াছে। তাহার স্বপ্নগত অনুভূতি যে জাগ্রত অনুভূতি হইতে বিভিন্ন এবং নূতন তাহার ব্যাখ্যা সে এইরূপে করিত যে, জাগ্রত অবস্থায় তিন প্রকারে সে মানুষ চিনিতে পারিত ; যথা, (১) লোকদের গলার স্বর শুনিয়া ; (২) লোকের মস্তক ও স্কন্ধে হাত বুলাইয়া অনুভব করিয়া ; এবং (৩) তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্বনি ও ভঙ্গীর অনুসরণ করিয়া। কিন্তু তাহার স্বপ্নগত অনুভূতি এই তিনটির কোনটাই নহে—ইহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং নূতন ও স্পষ্টতর। সে আরও অনুমান করিত যে, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিদের সহিত তাহার এক প্রকার সংযোগ স্থাপিত হইত। স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তিরা তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিত ; অথচ, তাহাদের দেহ হইতে সূত্র বা সূত্রবৎ রেখা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার দেহে প্রবেশ করিত।

ঠিক এই পদ্ধতিতেই—যাঁহারা বলেন, স্বপ্নে কেবল পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুই দেখা যায়—তাঁহাদের এই ধারণারও ব্যখ্যা করা যায়। স্বপ্নে পূর্ব্ব-পরিচিত বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তিরা আবির্ভূত হয়, কিন্তু তাহাদের যোগাযোগ বিভিন্ন রূপ হয়—উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ে। আবার, ধারণাগত বিষয় বা বস্তুর সহিত সুদৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট না হইলে কেবল মাত্র সাধারণ স্মৃতিগত বিষয় সকল স্বপ্নে খুব কমই আবির্ভূত হয়। এই কারণে আমরা প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠ করিলেও, এবং ইতিহাসের অনেক কথা কণ্ঠস্থ করিলেও, ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্র সকলকে স্বপ্নে প্রায় দেখিতে পাই না। তবে দুই একটা স্থলে মাত্র ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যাইতে পারে। এ রকম দুর্লভ বস্তু স্বপ্নে দেখা গেলে, কোন্ কোন্ কারণ-পরম্পরায় এরূপ অঘটন ঘটনা সম্ভবপর হয়, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে, মনস্তত্ব-ঘটিত অনেক বৈজ্ঞানিক রহস্যের সমাধান হইতে পারে।

এই সকল আলোচনার দ্বারা এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝা গেল যে স্বপ্নে আমাদের মানসিক ক্রিয়ার দুইটি অবস্থা বা রূপ দৃষ্ট হয়—(১) পুরাতন ধারণা, এবং (২) পুরাতন সাহচর্য্য বা এ্যাসোসিয়েসন বা ঘটনাচক্র। এই দুইটি অবস্থা একটা নির্দ্ধারিত পদ্ধতিক্রমে পরস্পরের অনুসরণ করিয়া চলে ; অর্থাৎ কখনও বা প্রথমটা আগে, দ্বিতীয়টা পরে, কখনও বা দ্বিতীয়টা আগে, প্রথমটা পরে আসে ; কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া প্রায় একটা অখণ্ড বস্তুরূপে আসিয়া থাকে। যেরূপ ভাবেই আসুক না কেন, তাহাদের গতিবিধির একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ও ক্রম আছে ; কিন্তু এই পদ্ধতির উপর আমাদের কোন হাত নাই। জাগ্রত অবস্থায় আমরা ইচ্ছা করিলে যেমন আমাদের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, স্বপ্নে তাহা পারি না—উহা আপনার খেয়াল অনুসারে চলে। তবে এমন অনেক স্বপ্ন-বিবরণ পাঠ করা যায়, যেখানে মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর মানসিক গুণ-গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহারা কাব্যরসের ধার ধারে না, এমন লোক স্বপ্নে সঙ্গীত রচনা করিবার মনোভাব লাভ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। অনেকে ইহাকে প্রত্যাদেশ (inspiration) আখ্যা দিয়া থাকেন। একজন পণ্ডিত লোক নিজ স্বপ্ন-অভিজ্ঞতার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্বপ্নে তাঁহার মনে যে সকল চিন্তার উদয় হইয়াছে, এমন কি, চিন্তার ভাষাটি পর্য্যন্ত জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার স্মৃতিপটে পুনরুদিত হইয়াছে, সেই সকল চিন্তা এমন সুসঙ্গত, এবং তৎসহ উপযুক্ত দৃষ্টান্তযুক্ত যে, কলেজে অধ্যাপনার সময়ে তিনি সেই ভাষায় সেই সকল দৃষ্টান্ত সহ যুক্তিপূর্ণ সুসঙ্গত বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর সেই সকল চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও রচনা করিয়াছেন। আর একজন গণিতজ্ঞ পণ্ডিত বলেন, অনেক সময়ে তাঁহাকে অনেক কঠিন অঙ্ক গণনা করিতে হইয়াছে ; সেই সকল অঙ্ক সময়ে সময়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। অবশেষে নিদ্রাবেশে স্বপ্নযোগে তিনি ঐ সকল অঙ্ক সম্পূর্ণ করিতে এবং সমস্যা সকলের সুসমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, জাগ্রত অবস্থায় যে সকল রাজনীতিক সমস্যা অত্যন্ত জটিল ও সমাধানের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এমন অনেক বিষয় স্বপ্নে জলবৎ সরলভাবে তাঁহার মনে প্রতিভাত হইয়াছে। একজন প্রসিদ্ধ স্কচ সাহিত্যিক একজন ফরাসী কবি কর্ত্তৃক ফ্রেঞ্চ একাডেমির উপর রচিত একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা পাঠ করিয়া এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তী রাত্রিতে স্বপ্নে তিনি উহার অনুকরণে স্কচ ভাষায় একটি কবিতা (parody) রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে এডিনবরার একটি প্রসিদ্ধ বিদ্বৎসভা ও জনকয়েক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতি তীব্র বিদ্রূপ-বাণ বর্ষিত হইয়াছিল। এক ব্যক্তি একখানি বই পড়িতেছিলেন। তাহাতে তুরস্কে খৃষ্টানদের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনা ছিল। তুর্করা বিচারাভিনয় করিয়া খৃষ্টানদিগের নাসা-কর্ণ-চ্ছেদন করিয়া দিত। পরবর্ত্তী রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তুরস্কে খৃষ্টানদের এইরূপ একটি বিচার হইতেছে। একজন তুর্ক খৃষ্টান আসামীদের উদ্দেশে অনিয়মিত ছন্দে রচিত একটি হাস্যোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করিতেছে। ভদ্রলোকটি তুর্ক ভাষা জানিতেন না ; কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে তিনি স্বপ্নবৃত্তান্ত স্পষ্টভাবে স্মরণ করিতে পারিলেন এবং ঐ তুর্ক কবিতা (doggerel rhymes—ছড়ার মত কবিতা) অক্ষরে অক্ষরে আবৃত্তি করিলেন। আর একজন ইংরেজ ভদ্রলোক স্বপ্নে একটি ফরাসী ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অথচ সেরূপ কোন ক্রিয়াপদ ফরাসী ভাষায় ছিল না।

একদিন স্কটল্যাণ্ডের একজন আইন-ব্যবসায়ীর নিকট একটি মোকদ্দমা পরামর্শের জন্য আইসে। বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। ভদ্রলোকটি কয়েক দিন ধরিয়া এই বিষয় লইয়া অনেক চিন্তা করিলেন। একদিন রাত্রিতে তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন, স্বামী হঠাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া, শয়নকক্ষস্থ একটি লিখিবার ডেস্কের নিকট গিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া একখানি বড় কাগজ টানিয়া বাহির করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাহাতে অনেক কথা লিখিলেন। কাগজখানির এপিট ওপিট সম্পূর্ণরূপে লেখা হইয়া গেলে

তিনি উহা ডেস্কের ভিতর রাখিয়া দিয়া পুনরায় শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন, এবং অচিরে নিদ্রাগত হইলেন। পরদিন সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, রাত্রিতে তিনি একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। যে মোকদ্দমা লইয়া তিনি কয়েকদিন ধরিয়া বিলক্ষণ বিব্রত রহিয়াছিলেন, সেই বিষয় সম্বন্ধে স্বপ্নে তিনি একটি অতি সুযুক্তিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট মন্তব্য রচনা করিয়াছেন। এখন তাঁহার কোন কথাই মনে পড়িতেছে না। স্বপ্নে যে চিন্তাধারা তাঁহার মনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরায় স্মরণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার স্ত্রী তখন তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা, ঐ লিখিবার ডেস্কটা একবার খুঁজিয়া দেখ দেখি! ডেস্ক খুলিতেই তিনি কাগজখানি দেখিতে পাইলেন। তাহাতে মন্তব্যটি স্পষ্ট ভাষায় সম্পূর্ণরূপে লিখিত ছিল। সেই মন্তব্য পরে অতি সুসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

এ কথা নিঃসন্দেহ সত্য যে, এমন অনেক স্বপ্ন দেখা যায়, জাগ্রত হইবার পর যাহার এক বর্ণও মনে থাকে না। রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নাবস্থায় অনেকে অনেক কথা কয়। অপর লোকে তাহা শুনিতে পায় এবং মনে করিয়া রাখে। কেবল যে সেই সব কথা বলিয়াছিল, তাহার নিজের কিছুই মনে থাকে না। আর ইহাও খুব সম্ভব যে, নিদ্রাভঙ্গের পর যে সকল স্বপ্নের কথা মনে থাকে, সেই সকল স্বপ্ন এমন সময় দেখা যায় যখন নিদ্রা খুব গাঢ় থাকে না, কিম্বা নিদ্রাভঙ্গ হইবার উপক্রম হইতেছে।

অনেক সময় লোকে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকে। ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শনে অনেকে আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়ে। পার্শ্বে যদি কেহ জাগিয়া থাকে এবং ঘরে আলো থাকে, তবে এই ভাবান্তর স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দুঃস্বপ্ন দর্শনে কেহ গোঁ গোঁ শব্দ করে, কেহ চীৎকার করিয়া উঠে। কেহ কেহ স্বপ্নে বিপন্ন হইয়া, হিংস্র পশু বা দুর্দ্দান্ত, বিক্রমশালী আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, পলায়নের চেষ্টা করে। অনেক সময়ে স্বপ্নে লোকে এমন ভয়ঙ্কর ভীত হইয়া গোঁ গোঁ চীৎকার করিতে থাকে যে তাহাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করাইবার প্রয়োজন হয়, নচেৎ তাহার চীৎকার থামে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে দুঃস্বপ্ন দর্শনকারী নিদ্রিত অবস্থাতেই বুঝিতে পারে যে সে স্বপ্ন দেখিতেছে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে ভয়ের কারণ নাই। নিদ্রার অত্যন্ত তরল অবস্থাতেই কেবল এইরূপ অনুভূতি জন্মিতে পারে। ঘুম প্রায় ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে স্বপ্ন দেখিলে তাহা যতই ভয়াবহ হউক না কেন, স্বপ্নদ্রষ্টার একটা অনুভূতি থাকে যে, ইহা স্বপ্ন মাত্র। কারণ, নিদ্রার এইরূপ তরল অবস্থায় তাহার যুক্তিশক্তি কিয়ৎ পরিমাণে জাগ্রত হইয়া থাকে। এইরূপ ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখিতে কেহই প্রায় ইচ্ছা করেন না। সেইজন্য, এইরূপ স্বপ্ন যাহাতে দেখিতে না হয় এই উদ্দেশ্যে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি জাগরণোন্মুখ যুক্তিশক্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ যে যুক্তির সাহায্যে দুঃস্বপ্ন দর্শনের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেন যে তিনি একটা সেতুর পার্শ্বে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, একটু অসাবধান হইলেই তাঁহার জলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। তিনি যুক্তির আশ্রয় লইয়া ভাবিলেন, এইরূপ ডানপিঠে-বৃত্তি তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যাপার; অতএব ইহা সত্য হইতে পারে না—নিশ্চয়ই তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। এইরূপ ধারণা বশতঃ তিনি জলে ঝম্ফ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, উদ্দেশ্য—তাহা হইলে স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া যাইবে। বস্তুতঃ তিনি স্বপ্নে ঝম্ফ প্রদান করিলেন; অমনি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, স্বপ্নও বিলীন হইল।

আর এক ব্যক্তি অতি তরুণ বয়স হইতে দুঃস্বপ্ন দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে দুঃস্বপ্ন দর্শন তাঁহার এমন অসহ্য হইয়া উঠিল যে, তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি যুক্তি দিয়া বিচার করিলেন যে, স্বপ্নে তিনি যে সকল বিপদের সম্মুখীন হন, সে সমস্তই কাল্পনিক। অতএব তিনি কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিপদকে আলিঙ্গন করিবেন। কাল্পনিক বিপদ হইতে তাঁহার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। এইরূপ সঙ্কল্প করিবার পর একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি ছাদের আলিসার ধারে আসিয়া পড়িয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি নীচে লম্ফ প্রদান করিলেন। অমনি স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। ইহার পর চল্লিশ বৎসরের মধ্যে তিনি আর এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখেন নাই।

স্বপ্ন দর্শন ও উন্মাদ রোগের মধ্যে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। একজন ডাক্তার একজন উন্মাদ রোগীর চিকিৎসা করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিয়া ছাড়িয়া দেন। আরোগ্য লাভ করিবার পর, এক সপ্তাহ ধরিয়া সে উন্মাদ অবস্থায় যে রকম আচরণ করিত, যে ধরণের কথাবার্ত্তা বলিত, রাত্রিকালে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নযোগে ঠিক সেই সেইরূপ আচরণ করিত, সেই রকম অসংলগ্ন ভাবে কথাবার্ত্তা বলিত। উন্মাদ অবস্থায় সে যে রকম অতিরিক্ত মাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত, স্বপ্নেও দেখিত, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এক সপ্তাহ পরে তাহার এই অবস্থা সারিয়া যায়। বস্তুতঃ স্বপ্নে যে রকম অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং তদনুযায়ী স্বপ্নদ্রষ্টা যেরূপ আচরণ করে, জাগ্রত অবস্থায় লোক-সমাজে সেই রকম আচরণ কেহ করিলে তাহাকে উন্মাদ ব্যতীত আর কি-ই বা বলা যায়! স্বপ্নে সে সকল ব্যবহার অবশ্য উপেক্ষনীয়; কারণ, তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত হয় না, এবং কার্য্যতঃ (practically) তাহা আচরিত হয় না।

স্বপ্ন সম্বন্ধে এই যে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে নিশ্চয়ই প্রতীতি হইবে যে, স্বপ্নরহস্য বিষয়টি কেবল যে কৌতুকাবহ ব্যাপার, তাহা নহে; ইহা মানব-জীবনের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ও বটে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে সকল বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, যে সকল বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়, সেই সকল বিষয় অপেক্ষা স্বপ্ন একটুও কম প্রয়োজনীয় নহে, কিছুমাত্র উপেক্ষনীয় নহে। স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। এই বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিবার যথেষ্ট অবসর

রহিয়াছে। বিশ্বাসযোগ্য স্বপ্ন বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাহা যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্ব নিষ্কাশনের চেষ্টা করিলে মনস্তত্ত্বঘটিত অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে পারে। বস্তুতঃ স্বপ্নরহস্যের ভিতর মানসিক শক্তি ঘটিত বহু দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। স্বপ্নের সম্বন্ধে প্রতীচ্য জগতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনেক অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিতেছে। প্রতীচ্যবাসীরা স্বপ্নের অনেক নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিতেছেন। আমাদের দেশে প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্যক্তি স্বপ্ন দর্শন করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গের পর যদি স্বপ্ন দর্শনের কথা মনে পড়ে, তবে তাহা হয় ত আত্মীয়-স্বজন কিম্বা বন্ধুবান্ধবের নিকট বিবৃত করিতেছেন, এবং বড় জোর স্বপ্ন দর্শনের ফলাফল জানিবার কৌতূহল প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু প্রতীচ্যবাসীর মত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই বিষয়ে কাহাকেও আলোচনা করিতে দেখা যায় না। একটা স্বপ্ন দেখা গেল। কোন্ পদ্ধতিতে সেই স্বপ্নের সৃষ্টি হইল, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কাহারও কৌতূহল দেখা যায় না। সেই কৌতূহল যাহাতে জাগ্রত হয়, সেই জন্যই লেখকের এই প্রয়াস।

স্বপ্ন সঞ্চরণ (Somnambulism)

বা নিশিতে পাওয়া।

স্বপ্নের দুইটি বিভাগ আছে—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। এতক্ষণ আমরা স্বপ্ন সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা করিলাম, তাহা স্বপ্নের নিষ্ক্রিয় দিক। উহার সক্রিয় দিকটির ইংরেজী নাম—Somnambulism। বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে—স্বপ্ন-সঞ্চরণ। কারণ, ইহাতে লোকে স্বপ্নাবস্থায় হাঁটিয়া বেড়ায়। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহাকে রোগের পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে, এবং ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—স্বপ্নাটন রোগ। বাঙ্গালা দেশে চলিত কথায় ইহাকে বলা হয়—নিশিতে পাওয়া।

স্বপ্নের সহিত স্বপ্ন-সঞ্চরণের মূল পার্থক্য শারীরিক ক্রিয়া লইয়া। স্বপ্নের ন্যায় ইহাতেও মন নিজ ধারণার উপর অচঞ্চল, স্থির থাকে। স্বপ্ন-সঞ্চরণে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অনেকটা মনের অধীন থাকে, এবং লোকটি মনের ভ্রান্ত ধারণার প্রভাবে পরিচালিত হয়। আর ভ্রান্ত ধারণানুযায়ী সে কথাবার্ত্তাও কহিয়া থাকে। অবশ্য অনুভূতিমূলক ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে সে বাহির হইতেও কিছু কিছু ধারণা অর্জ্জন করে, কিন্তু এই ধারণা তাহার স্বপ্ন কালীন ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন করিতে পারে না ; বরং তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়।

স্বপ্ন-সঞ্চরণের প্রথম সূচনা হয় স্বপ্নে কথা কওয়া হইতে। প্রথমে লোকটি স্বপ্নে যাহা কিছু দেখিতেছে ও শুনিতেছে, স্পষ্ট ভাষায় তাহার বর্ণনা করে। এই বর্ণনা যেমন সম্পূর্ণ তেমনই সুসমঞ্জস। সময়ে সময়ে সে তাহার নিজের এবং বন্ধু বান্ধবের অনেক গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা—নিদ্রাবস্থায় হাঁটিয়া বেড়ানো। ইহা হইতেই স্বপ্ন-সঞ্চরণ নামটির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাকেই বলে নিশিতে পাওয়া। নিশিতে পাওয়া লোক যখন ঘুমের ঘোরে চলাফেরা করে—অনেকেই তাহা দেখিয়া থাকিবেন। লোকটি প্রথমে শয্যা হইতে অবতরণ করে। বস্ত্রাদি অসংবৃত হইয়া থাকিলে তাহা ঠিক করিয়া লয়। কেহ যদি বাধা না দেয় তবে, শয়ন কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া বাহির হইয়া যায়। তার পর এঘর-ওঘর করিয়া বেড়ায়। সময় সময় বিপজ্জনক স্থানের উপর দিয়া নিরাপদে যাতায়াত করে। কখনও কখনও বিপদেও পড়ে। কোন কোন সময় জানালা গলিয়া বাহির হইয়া যায়। সময়ে সময়ে ছাদে উঠে ; এমন কি এক বাড়ীর ছাদ হইতে অপর বাড়ীর ছাদেও চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ এই ভাবে ঘোরাঘুরির পর আবার শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসে, এবং নিজের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বাভাবিক ভাবে নিদ্রা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়—এই সমস্ত ঘোরাফেরার কার্য্যই নিদ্রিত অবস্থায় সম্পাদিত হয়। প্রতীচ্য দেশে স্বপ্নসঞ্চরণ সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। নানান লোকের আচরণ নানান রকম।

অভিজাত-বংশীয় এক যুবক তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত এক কক্ষে শয়ন করিত। একদিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেখিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শয্যা ত্যাগ করিল। তাহার পর একটা ভারী কোট গায়ে দিয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। কনিষ্ঠও অন্তরালে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিল। দেখিল, জ্যেষ্ঠ ছাদে গিয়া একটা পাখীর বাসা ভাঙ্গিয়া বাচ্ছাগুলিকে তাহার কোটের তলায় আচ্ছাদিত করিয়া লইয়া শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় শয়ন করিল। পরদিন সকালে উঠিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বলিল, রাত্রিতে সে এইরূপ একটি স্বপ্ন দেখিয়াছে। স্বপ্নের অধিক যে কিছু ঘটিয়াছিল, এ কথা কিছুতেই তাহাকে বিশ্বাস করাইতে পারা গেল না। কনিষ্ঠ যখন জ্যেষ্ঠকে বলিল, তুমি জানালা দিয়া বাহির হইয়া ছাদে গিয়া পাখীর বাসা ভাঙ্গিয়া বাচ্ছাগুলিকে লইয়া আসিয়াছ, তখন জ্যেষ্ঠ দৃঢ়তার সহিত বলিল, সে ঐ রকম স্বপ্ন দেখিয়াছে বটে, কিন্তু ঘর ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। অবশেষে যখন তাহার জামার পকেট হইতে পাখীর ছানাগুলি বাহির হইল, তখন আর অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না।

আর একজন লোক নিদ্রাঘোরে শয্যা ত্যাগ করিয়া সাজসজ্জা করিয়া অশ্বারোহণে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া স্থানীয় বাজারে গমন করিত। আর একজন লোকের ঘোড়ার সাজের কারখানা ছিল। সে দিবসের নিত্য নিয়মিত কর্ম্মের পর প্রত্যহ রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করিয়া কারখানায় গিয়া কাজ করিয়া আসিত। একজন মার্কিন কৃষক রাত্রির অন্ধকারে শয্যা ত্যাগ করিয়া গোলাবাড়ীতে গিয়া অন্ধকারেই প্রত্যহ পাঁচ বুসেল 'রাই' শস্য আছড়াইয়া সুন্দরভাবে পৃথক করিয়া রাখিত। স্বপ্নাবস্থায় সঙ্গীত রচনার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনেক বালক নিদ্রাঘোরে তাহাদের অসমাপ্ত পাঠ উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

স্বপ্ন-সঞ্চরণের কাহিনীগুলির মধ্যে কোন কোনটি বেশ রীতিমত কৌতুকাবহ। নিম্নে একটা নমুনা দিলাম।

একটি যুবক একজন ডাক্তারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরু-গৃহে থাকিয়া উদ্ভিদ-বিদ্যা শিক্ষা করিত। এই বিদ্যাটি শিক্ষা করিবার জন্য তাহার অতিমাত্র আগ্রহ ছিল, এবং এ বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সে একটি

সাধারণ প্রতিষ্ঠান হইতে একটা পুরস্কার লাভও করিয়াছিল। উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষালাভার্থ তাহাকে মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদের সন্ধানে যাইতে হইত। একদিন এইরূপে সমস্ত দিন ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় সে গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিল। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া সে শ্রান্ত দেহে শয়ন করিতে গেল। ইহার এক ঘণ্টা পরে—তাহার গুরু তখন নীচেকার একটা ঘরে কোন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন—সিঁড়িতে পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, শিষ্য নামিয়া আসিতেছে। তাহার পরিধানে মাথায় হ্যাট ও গায়ে সার্ট ছিল—পা-জামা ছিল না। এইরূপ প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় সে নামিয়া আসিতেছিল। উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার যে একটি টিনের বাক্স ছিল, সেটি তাহার কাঁধ বেড়িয়া একটি ফিতার দ্বারা তাহার পার্শ্বে বিলম্বিত ছিল। আর হাতে ছিল একগাছি লম্বা ছড়ি। স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার চক্ষু যতটা খোলা থাকে, এখন তদপেক্ষা আরও বেশী খোলা ছিল। কিন্তু উন্মীলিত চক্ষু সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন। তাহার গুরু সম্মুখে উপস্থিত, সে দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। গুরু তাঁহার হস্তস্থিত বাতিটি তাহার চক্ষুর সম্মুখে ধরিলেন, তথাপি সে তাহা লক্ষ্য করিল না। গুরু তখন বুঝিলেন, ছাত্র নিদ্রিত অবস্থায় উঠিয়া আসিয়াছে। কিরূপে তাহাকে পুনরায় বিছানায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইবেন, ইহা ভাবিয়া গুরু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে ঘুমন্ত ছাত্র নিজেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। বলিল, "আপনি কি গ্রীনউইচে যাইতেছেন, মহাশয়?" "হাঁ, মহাশয়।" "জলপথেই (নৌকায়) কি যাইবেন, মহাশয়?" "হাঁ, মহাশয়।" "আমি কি আপনার সঙ্গে যাইতে পারি, মহাশয়?" "হাঁ, মহাশয়, নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু আমি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। অতএব আপনি আমার পিছনে পিছনে আসুন।" এই বলিয়া গুরু ছাত্রের শয়ন-কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, ছাত্রও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় একবারও তাহার পদস্খলন হইল না। শয্যার পার্শ্বে গিয়া গুরু বলিলেন, "এইবার নৌকায় উঠুন। কারণ, নৌকা এখনই ছাড়িবে, আমাকেও এখনই যাত্রা করিতে হইবে।" এই বলিয়া গুরু তাহার স্কন্ধ হইতে বিলম্বিত টিনের বাক্সটি নামাইয়া লইলেন। ছাত্রের মাথা হইতে টুপিটা পড়িয়া গেল, সে তাহা জানিতেও পারিল না। অতঃপর সে যেন নৌকায় উঠিতেছে, এই বিশ্বাসে বিনা বাক্যব্যয়ে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। এবং গুরুকে বলিল, "আমি আপনার মুখ চিনি, আমি নদীর ধারে আপনাকে প্রায় দেখি।" ছাত্র এ ক্ষেত্রে গুরুকে নৌকার মাঝি মনে করিয়াছিল। এই কল্পিত মাঝির সহিত ছাত্রটির প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া নানা অবান্তর বিষয়ে আলাপ চলিল। কথা-প্রসঙ্গে নৌকার মাঝি-রূপে গুরু তাহাকে যাহা কিছু বলিলেন, সেই সমস্ত কথাই সে বুঝিল, এবং তাহার সঠিক উত্তরও দিল। গুরু যে তাঁহার ছাত্রগণকে লইয়া মধ্যে মধ্যে উদ্ভিদের সন্ধানে গ্রীনউইচে গমন করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধেও কথা উঠিল, এবং ছাত্র তাহারও ঠিক ঠিক উত্তর দিল। গুরু অবশ্য মাঝি-রূপেই এই সকল কথা তুলিতেছিলেন, এবং শিষ্যও তাঁহাকে মাঝি মনে করিয়াই সেইভাবে অনুপস্থিত গুরু-শিষ্য সংক্রান্ত উত্তর দিতেছিল। ছাত্র সম্প্রতি যে একটি দুষ্প্রাপ্য গাছের সন্ধান পাইয়াছিল, সে কথাও বলিল। এই গাছের মাত্র একটি নমুনা বোটানিক গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং অধ্যাপক মহাশয় মাত্র দুইটি গাছ দেখিয়া-ছিলেন, সে কথাও ছাত্রটি মাঝির কাছে প্রকাশ করিল। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মাঝিরূপী গুরু প্রশ্ন করিলেন, এবার উদ্ভিদবিদ্যার সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার কে পাইয়াছে, তাহা সে জানে কি না। ইহাতে ছাত্র (সে নিজে এই পুরস্কার পাইলেও) নিজের নাম না করিয়া অপর একজনের নাম উল্লেখ করিল। গুরু বলিলেন, "সত্যি? ঐ লোকটিই কি প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে?" ইহাতে ছাত্র কোন উত্তর করিল না। তখন গুরু (ছাত্রের নামোল্লেখ করিয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইঁহাকে চিনেন কি?" অনেক ইতস্ততের পর ছাত্র বলিল, "সত্য কথা বলিতে কি—আমারই নাম…।" এইরূপে পৌনে এক ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল। এই সময়ের মধ্যে ছাত্র একটাও অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নাই; এবং তাহার নিজের নাম বলিবার ও প্রথম পুরস্কার লাভ করিবার কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলিবার সময় একটুও ইতস্ততঃ করে নাই। অতঃপর সে বলিল, "উঃ! বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, প্রোফেসর যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ এই ঘাসের উপর একটু শয়ন করিয়া বিশ্রাম করি।" এই বলিয়া সে তাহার শয্যার উপর শয়ন করিল। ইহার অনতিকাল পরে অপর এক ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যুবক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল, এবং নবাগতের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল। এই ব্যক্তিও তাহাকে যাহা কিছু বলিলেন, সে সব কথাই সে ঠিক বুঝিতে পারিল, এবং জবাবও ঠিক ঠিক দিল। অনেক সময়ে একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া অনেক দীর্ঘ বাক্যও উচ্চারণ করিল। এই ব্যক্তির সঙ্গে এক ঘণ্টা আন্দাজ কথাবার্ত্তার পর যুবক বলিল, "ঘাসের উপর বড় ঠাণ্ডা। কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি—এই ঘাসের উপরই শুইয়া পড়ি।" বলিয়া পুনরায় শয়ন করিল, এবং অবশিষ্ট রাত্রিটুকু শান্তভাবে শুইয়া রহিল। পরদিন সকালে উঠিয়া পূর্ব্বরাত্রির কথা তাহার একটুও মনে পড়িল না; সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, এমন সন্দেহমাত্র তাহার মনে স্থান পাইল না।

আর একপ্রকার মানসিক অবস্থা লোকের মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় নহে, দিবাভাগে জাগ্রত অবস্থাতেই ইহা ঘটে। আমাদের দেশে কাহারও এরূপ অবস্থা ঘটিলে বলা হয়, লোকটিকে ভূতে পাইয়াছে, কিম্বা তাহার উপর অপদেবতার ভর হইয়াছে। বিলাতী মনস্তাত্ত্বিকরা ইহাকে রোগের আক্রমণ (paroxysm) বলিয়া থাকেন। তবে ইহার লক্ষণ অনেকটা স্বপ্ন সঞ্চরণের ন্যায়। এই সময়ে রোগীর বহির্জগৎ সম্বন্ধে হয় কোন ধারণাই থাকে না; আর যদি থাকে তবে তাহা ভ্রান্ত ধারণা। অনেক সময় ইহা অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করে; আবার সময় বিশেষে প্রথমে মস্তিষ্কের বিকার ঘটে, রোগী অনেক হাঙ্গামা করে। তাহার পর রীতিমত আবিষ্ট হয়। এই অবস্থা আমাদের দেশে অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হয়। স্ত্রীলোকরা প্রায় এই রোগে আক্রান্ত হয়। পুরুষ রোগীর সংখ্যা স্ত্রীলোকদিগের অনুপাতে অনেক অল্প। এই ধরণের লোকদিগের বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে মনে হয়,

এক দেহে দুইজন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ বাস করিতেছে। এই দুইজন লোকের মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। ইহাদের কেহ কাহাকেও চিনে না। যখন একজনের প্রভাব বর্ত্তমান থাকে, তখন অপরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহাদের একজন থাকে সহজ অবস্থায়, অপর জন আবির্ভূত হয় রুগ্ন অবস্থায়। একই দেহে এই দ্বৈত প্রকৃতি বড় আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। বিলাতে এরূপ অনেক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের দেশেও এরূপ ঘটনার অভাব নাই; কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয় না এই যা দুঃখ। এরূপ ঘটনার অনেক বিলাতী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে অবান্তর বলিয়া তাহাদের আলোচনায় বিরত থাকা গেল।

প্রাচীনপন্থী মনোবৈজ্ঞানিক স্বপ্নরাজ্যের এই পর্য্যন্ত আসিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেই হাল তুলিয়া লইয়াছেন, হাল ফ্যাসানের মনস্তাত্বিক। অতঃপর নবীনপন্থীদের মতামতের আলোচনা করিব।

মনো-বিশ্লেষণ (Psycho-Analysis)

প্রাচীনপন্থীরা যে পন্থায় মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিলেন, নব্য মনোবৈজ্ঞানিক সে পন্থা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া নূতন পন্থায় চলিতেছেন। প্রাচীনগণের মনোবিজ্ঞানের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বর তত্বানুসন্ধান। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রটাকে তাঁহারা কতকটা দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখিতেন; সেইজন্য তাঁহারা এই শাস্ত্রটির নাম দিয়াছিলেন Metaphysics বা তত্ত্ববিদ্যা। তত্ত্ববিদ্যানুশীলনের সুবিধার জন্যই তাঁহারা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের (Mental Philosophy) আলোচনা করিতেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ বিজ্ঞান হিসাবে (mental science বা psychology) ইহার আলোচনা করিতেছেন। সেইজন্য আলোচনার পদ্ধতিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ঘটিয়াছে।

নব্য বৈজ্ঞানিক ভাবে মনস্তত্ত্বের অনুশীলন যে শাস্ত্রে করা হয় তাহার নাম সাইকলজি (psychology) বা মনোবিজ্ঞান। প্রাচীন কালের চিকিৎসকগণের সাধারণতঃ এইরূপ ধারণা ছিল যে, দেহ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী যদি সবল থাকে, তবে মানুষকে সাধারণতঃ সুস্থ বলিতে হইবে; কারণ, এই তিনটি বস্তুই মানুষের ক্রিয়াশীলতার ভিত্তি। এই ধারণা অনুযায়ী, তাহা হইলে বলিতে হয়, এই তিনটি বস্তুর বিকলতার ফল স্বাস্থ্যহীনতা। সেই জন্য প্রাচীন কালের চিকিৎসকরা বিবেচনা করিতেন যে, শরীরকে এবং মস্তিষ্ককে অতিরিক্ত মাত্রায় খাটাইলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটে। এই সকল স্থলে তাঁহারা রোগীকে বিশ্রাম করিবার উপদেশ দিতেন, এবং মনে করিতেন, যথোচিত বিশ্রাম করিলেই তাহারা সুস্থ হইবে। আরোগ্য লাভে সহায়তা করিবার জন্য হয় ত তাঁহারা একটা উত্তেজক ও বলকারক ঔষধের ব্যবস্থাও করিতেন, কিম্বা রোগীর উপজীবিকার পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিতেন।

কিন্তু বৎসর কতকের মধ্যে বিশ্বের চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে যুগ-প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। নব্য চিন্তা-নায়কগণ মানুষের মন বস্তুটিকে নবীন আলোকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনোবীক্ষণের এই নূতন পদ্ধতি এবং তাহার ক্রিয়া মনোবিশ্লেষণ নামে অভিহিত হইতেছে।

সাধারণ রোগীর এবং বিশেষ করিয়া মানসিক ও স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির আরোগ্য লাভে সহায়তা করা এই নব্য মনো-বিশ্লেষণ শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। মনো-বিজ্ঞান, তথা, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান শাস্ত্র অনুসারে মনের দুইটি অবস্থা আছে—(১) জাগ্রত চৈতন্য (consciousness) ও সুপ্ত চৈতন্য বা মগ্ন চৈতন্য (sub-consciousness)। জাগ্রত চৈতন্যের অন্তরালে অবস্থিত মগ্ন চৈতন্যের বিশ্লেষণ করিয়া, বিস্মৃত বিষয়সমূহকে উদ্বোধিত করিয়া, সংস্কার-মূলক শক্তি সকলকে প্রভাবিত করিয়া এতদ্দ্বারা রোগীকে নিরাময় করিবার চেষ্টা করা হয়। সিজমণ্ড ফ্রয়ড এই শাস্ত্রের প্রধান মন্ত্রদ্রষ্টা। মনো-বিশ্লেষণ শাস্ত্রের সংক্ষেপে ইনি এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ব্যক্তির মানসিক জীবনের সুপ্ত অংশের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের নাম মনো-বিশ্লেষণ। পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকগণ মনে করিতেন, দেহের কোন অংশবিশেষের বিকারের ফলে স্নায়ুঘটিত পীড়া উৎপন্ন হয়। আধুনিক মনো-বিশ্লেষণ শাস্ত্রের অনুরাগী চিকিৎসকরা ইহার ঠিক বিপরীত পন্থার অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা রোগীর মানসিক সুপ্ত অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া ইহাই বাহির করিবার চেষ্টা করেন যে, কোন আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকার জন্য কিম্বা কোন মানসিক ভাব আহত হওয়ার জন্য, কেবল স্নায়বিক রোগ নহে, অন্যান্য যান্ত্রিক রোগও উৎপন্ন হইতে পারে।

মনো-বিশ্লেষণ শাস্ত্রের বয়স বেশী দিন নয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কোন কথা শুনা যাইত না। ঐ বৎসরই সর্ব্বপ্রথম ফ্রয়ড একখানি পুস্তিকায় এই বিষয়ের আলোচনা করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে তিনি অনেকগুলি পুস্তিকা ও পুস্তকের প্রচার করিয়াছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শাস্ত্রটি রীতিমত গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার পর হইতে বহু প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ইহার অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। এমন কি, এই এক বিষয় লইয়া তিনটি বিভিন্ন মতের সৃষ্টিও হইয়াছে। মতত্রয়ের প্রতিষ্ঠাতৃত্রয়ের নাম যথাক্রমে ফ্রয়ড, জাং এবং এ্যালফ্রেড এ্যাডলার। জাং প্রথমে ফ্রয়ডের মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন, পরে নিজের স্বতন্ত্র মত প্রতিষ্ঠিত করেন।

ফ্রয়ডের মতে, সকল প্রকার স্নায়বিক বিকারের মূলে আছে যৌন ব্যাপার। ইহাই মতভেদের কারণ। প্রথমে যাঁহারা ফ্রয়ডের সমর্থন করিয়াছিলেন, ফ্রয়ডের এই মত প্রচারিত হইবার পর আর তাঁহারা তাঁহার মতের অনুমোদন করিতে পারিলেন না—তাঁহার শিষ্যগণও নয়। এমন কি, অনেকে শেষে মনো-বিশ্লেষণ শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠিলেন। ফ্রয়ড বলেন, তাঁহার মনো-বিজ্ঞানঘটিত গ্রন্থগুলিতে যে যে স্থলে তিনি "যৌন" শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে উহার অর্থ "প্রেম" (love) বুঝিতে হইবে। এই প্রেম কথাটিও তিনি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আদিম অবস্থার মানবের যৌন অনুভূতি হইতে যাহা কিছু ভাবের উৎপত্তি হইতে পারিত, সেই সমস্ত ভাবকেই ফ্রয়ড "প্রেম" কথাটির মধ্যে ধরিয়া লইয়াছেন—সেই সমুদয় ভাবেরই তিনি এক সাধারণ নাম দিয়াছেন—প্রেম।

সহানুভূতি, সমবেদনা, বন্ধুত্ব, অনুরাগ, বিশ্বাস,—এইরূপ সকল ভাবই তাঁহার প্রেমের অন্তর্ভুক্ত। ফ্রয়ডের মতে এই সমস্ত ভাবেরই মূল হইতেছে যৌন-বোধ অর্থাৎ "কাম"। যাহা এক সময়ে বিশুদ্ধ যৌন অনুভূতি ছিল, সময়ান্তরে, অবস্থান্তরে, সভ্যতার প্রসারে এবং আধুনিক সংস্কারে তাহাই ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিয়াছে। ফ্রয়ডের মতে, এই কামকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে গিয়াই যত স্নায়বিক বিকার উপস্থিত হয়। এই কামভাবের ফ্রয়ড নামকরণ করিয়াছেন—Libido। সর্ব্বপ্রকার কামতৃষ্ণা ও তদানুষঙ্গিক সকল প্রকার ভাবাবেগ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এ্যালফ্রেড এ্যাডলার এক সময়ে ফ্রয়ডের শিষ্য ছিলেন। পরে তিনি মত পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার মতে, মানুষের আত্মানুরাগ (egoism) সর্ব্বরকম স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মূল কারণ। মানুষ সাধারণতঃ আত্মসর্ব্বস্ব। এই আত্মপরতা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইলেই মানুষ প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। এ্যাডলার বলেন, মানুষ যখন কোন কারণে বা কোন ক্ষেত্রে নিজেকে অপরের অপেক্ষা হীন মনে করে, তখনই সে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। এ্যাডলারের এই মতবাদের নাম Inferiority-complex। মানুষের মনে এই ভাব প্রবল হইলে অহঙ্কার, গর্ব্ব, ক্ষমতাপ্রিয়তা প্রভৃতি ভাবনিচয় উত্তেজিত হয়। এইরূপ কোন ভাব ক্ষুণ্ণ হইবামাত্র তাহার স্নায়বিক বিকার ঘটে। যদি কেহ দৈহিক শক্তিতে, অর্থে কিম্বা সামর্থ্যে তাহার প্রতিবেশীর অপেক্ষা নিজেকে হীন মনে করে, তাহা হইলে প্রতিবেশীর উপর প্রাধান্য লাভের জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা জন্মে। সেই চেষ্টার ফলে তাহার মস্তিষ্কের প্রশান্ত সাম্যভাব বিচলিত হয়। তাহার পরিণামই স্নায়বিক বিকার।

মানব-চিত্ত অতি ব্যাপক বস্তু এবং মানবের মনস্তত্ত্ব অতি জটিল ব্যাপার। মানুষের মনের ধারণাশক্তি অত্যন্ত অধিক—অসীম বলিলেও হয়। মানুষের মন কত যে বিভিন্ন ভাব আয়ত্ত করিতে সমর্থ তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মতের আলোচনা করিলে মনে হয়, তাঁহারা বিবেচনা করেন—এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভাবের মূল উৎস এক। তবে বিভিন্ন পণ্ডিত ইহার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। সোপেনহর ইহার নাম দিয়াছেন—"বাঁচিবার ইচ্ছা", নিট্‌শে ইহাকে বলিয়াছেন—"ক্ষমতাপ্রিয়তা," বার্গশ বলেন ইহা "Elan Vital," শ ইহার নাম "জীবনী-শক্তি" দিয়াছেন, জাং বলেন ইহা "Horme"; এ্যাডলার বলিতেছেন ইহার নাম "প্রাধান্য-লাভের ইচ্ছা"। আর ফ্রয়ড ইহারই নামকরণ করিয়াছেন "Libido" বা কাম। নাম যাহাই হউক, মূল বিষয় কিন্তু এক—প্রবল ইচ্ছা। ইহাকে ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া বিশ্লিষ্ট করিলে মনের ইচ্ছার বা মনোভাবের অনেক রকম রূপ দেখা যাইতে পারে; যেমন ধন-লাভের কামনা, রাজ্যলাভের কামনা, উপাধিলাভের কামনা, বিলাসভোগের কামনা, নারী-সঙ্গের কামনা, ঈশ্বরলাভের কামনা, ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার কামনা, মান, যশ লাভের কামনা, ইত্যাদি।—মানুষের আকাঙ্ক্ষার কি আর শেষ আছে?—এইরূপ অসংখ্য প্রকার কামনার নাম করা যাইতে পারে।

কামনা শব্দের মূল যে কাম শব্দ তাহার এক অর্থ—ইচ্ছা; এবং তাহার অপর একটি বিশেষ অর্থ—অনুরাগ, স্ত্রী ও পুরুষের সম্ভোগ-লালসা। ফ্রয়ড এই শেষোক্ত অর্থে 'লিবিডো' বা অনুরাগ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সকল প্রকার কামনার মূল—অনুরাগ। ইহা প্রধানতঃ অথবা সম্পূর্ণতঃ ইন্দ্রিয়ঘটিত ব্যাপার। এই অনুরাগ পরিতৃপ্ত না হইলে, ইহার স্বাভাবিক স্ফুরণে ব্যাঘাত ঘটিলে, ইহাকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে গেলে মানসিক বা স্নায়বিক বিকার ঘটিবেই।

অন্যান্য পণ্ডিতরা ফ্রয়ডের মতের প্রতিবাদ করেন। ফ্রয়ড কিন্তু নিজের মতের দৃঢ়তায় স্থির-নিশ্চয় আছেন। তিনি বলেন, যৌবনাগমের পর হইতেই যে কামপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয় তাহা নহে—উহা চিরজীবন-ব্যাপী—আঁতুড়-ঘরে উহার আরম্ভ, এবং চিতাশয্যায় উহার সমাপ্তি। জন্মাবধি এই প্রবৃত্তি মানব-চিত্তে সুপ্ত ভাবে থাকে। পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইতে ইহার প্রথম স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই শিশুরা এমন আচরণ করিতে অভ্যস্ত হয়, যাহা হইতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাহাদের চিত্তে এই প্রবৃত্তির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লোকে শৈশবের সকল আচরণ বা অভ্যাসের কথা স্মরণ করিতে পারে না, কিম্বা চেষ্টা করিলে, অতি কষ্টে অল্প অল্প কথা মাত্র স্মরণ করিতে পারে। বিশেষতঃ শৈশব-স্মৃতির মধ্যে যে সকল কথা অথবা ঘটনা অপ্রীতিকর, তাহা লোকে ভুলিবার চেষ্টাই করিয়া থাকে। আত্ম-সম্মানের পক্ষে হানিকর কথা ভুলিয়া যাওয়াই মানুষের স্বভাব। অনুরাগমূলক আচরণ যে কেবল কামেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়, তাহা নহে। শরীরের অন্যান্য কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াও অনুরাগের স্ফুরণ হইতে পারে। যেমন, গুহ্যদ্বার, মেরুদণ্ড, গলা, বক্ষ এবং বিশেষ ভাবে ওষ্ঠাধর। ফ্রয়ড সাহেব বলিতেছেন, দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের মাতৃস্তন চুষিয়া দুগ্ধ পানের অভ্যাস ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির একটা ছদ্ম প্রকরণ মাত্র। ইহাও যাহা, পরিণত জীবনে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর অনুরাগ-চুম্বনও তাহাই—উভয়েই একই জিনিস!

(ক্রমশঃ)

বাংলা ভাষায় সংকেত-লিপি

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় রেখা-সংকেত বা সংকেত-লিপি নিয়ে আজ পর্য্যন্ত কোনো পত্রিকায় আলোচনা বেশী কিছু হয় নি। রেখা-সংকেত সম্পর্কে দু'চারটী কথার অবতারণা আজ করব।

অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল বাংলা সর্টহ্যাণ্ড জিনিসটা কি—দেখি, শিখি; কিন্তু সুযোগ-সুবিধা অনেক দিনই কিছু পাই নি। তার পর

ইংরেজী সর্টহ্যাণ্ড শিখ্‌তে গিয়ে যেদিন দেখলুম ইংরেজীর homeএ বাংলার হোম, gun, can, fanএ বাংলার গান, ক্যাণ, ফেন, him, seem, deemএ বাংলার হিম, সীম, ডিম প্রভৃতির হুবহু সৃষ্টি হ'তে পারে, সেদিন খেয়ালটা আরো মাথায় চেপে বস্‌লো—দেখ্‌তে হবে ব্যাপারটা কতদূর কি দাঁড়ায়। যেমন সেই ঘুমপুরীর রাজপুত্রী বাঁচন-কাটির হঠাৎ স্পর্শ পেয়ে আচম্‌কা একদিন জেগে উঠেছিল, আমার খেয়ালও হঠাৎ তেমনি নেশার স্পর্শ পেয়ে সেদিন থেকে নানা ভঙ্গীতে কখনো ধীরে, কখনো উন্মাদের গতিতে ছুটোছুটি সুরু করলে! তার পর যেদিন "ছাই'র গাদা উড়াইয়া রতনের সন্ধানের' মত কল্‌কাতার এক ফুটপাতের উপর ছেঁড়া বই'র গাদা থেকে দ্বিজেন ঠাকুরের "রেখাক্ষর বর্ণমালা'র সন্ধান পেলুম, সেদিন হ'ল পাগ্‌লা নেশার পিছু আর একপণ্ড ইন্ধন যোগাড়!

ক্রমে বাজারে চলিত আরো দু'একটী প্রণালীর রেখা-সংকেতের বিষয়ে খবর পেলুম। শুনলুম গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে একরকম লিপি শিখানো হয়; এই প্রণালীর লেখনিক অনেক হয়েছেন। তাঁরা বলেন—সবার মধ্যে এইটাই শ্রেষ্ঠ প্রণালী। এইরূপ একজন লেখনিক "প্রবাসী"তে একবার "অনুসন্ধিৎসুকে সরকার-প্রবর্ত্তিত সংকেত-লিপি সম্পর্কে সকল তথ্য জানাইতে ইচ্ছুক" প্রকাশ করায় আমি তাঁর ঠিকানায় ঐ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জানতে চেয়ে একখানি চিঠি দিই; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার কোন্ উত্তর না পাওয়ায় এই প্রণালীটির বিষয়ে অজ্ঞই রয়ে গেছি।

দ্বিজেন ঠাকুরের "রেখাক্ষর-বর্ণমালা" খানি আগাগোড়া দেখে শুনে বুঝেছি প্রণালীটি বড় কঠিন। যে রেখা-চিহ্নগুলি বইখানিতে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি কিছু জটিল মনে হ'ল। শুনেছি সুদক্ষ সংকেত লেখনিক শ্রীযুত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী, দ্বিজেন ঠাকুরের এই প্রণালীটির অনেক এদিক ওদিক পরিবর্তন করে নিয়ে খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে অদ্যাবধি বহু বক্তৃতার অনুলিপি লিখে আসছেন। কিন্তু দরিদ্র দেশ আমাদের—উৎসাহ আর অর্থ দুয়েতেই হতভাগ্য! সেই অভাবে কত কিছু আবিষ্কার ঘরের কোণের অন্ধ আওতায় পচে পচে মরে—বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসার অদৃষ্ট আর তাদের হয় না! সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কোন ছাপাখানা নেই যেখানে রেখা-সংকেতের হরপ-তৈরীর ব্যবস্থা হয়! ওদেশে Pitman Systemএর পর Sloan Script Oxford, Gregg, Dutton প্রভৃতির আবিষ্কার সগর্বে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল,—আর আমাদের দেশে গৃহকোণই সার! অবশ্য এ কথা সত্য—ব্যাপকভাবে ভাষার ব্যবহার না হ'লে, সে ভাষার রেখা-সংকেত উপযুক্তভাবে কাজে লাগ্‌তে পারে না,—কার্য্যক্ষেত্রে বিস্তৃত প্রসারও তার দরকার হয় না। কিন্তু আজ সমস্ত দেশে স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় বক্তৃতাদি যখন সুরু হয়েছে, তখন সেই সেই ভাষার রেখা-সংকেত অনিবার্য্য প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেশন বা ঐরূপ কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এই রেখা-সংকেতের শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের ভার-গ্রহণ-বিষয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত কি না, তাঁরা ভেবে দেখুন। এদিকে দেশহিতকামী দানশীল ধনী-দলেরও দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করি।

উপরিউক্ত গভর্ণমেণ্ট, দ্বিজেন্দ্র ঠাকুর, আর পরিবর্ত্তিত দ্বিজেন্দ্র ঠাকুর, এই তিনটী প্রণালী ছাড়া আর একটী কি প্রণালী প্রচলিত আছে শুনেছিলুম; কিন্তু তার পরিচয়ের কোন সংস্পর্শে আজ পর্য্যন্ত আস্‌তে পারি নি।

একদিনকার হঠাৎ খেয়াল ক্রমে দ্রুত-মন্থর নানা গতিতে ছুটে আজ মূর্ত্তির পরিণতি নিয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলা 'রেখা-সংকেতে'র আর এক নূতন রূপ-রেখার সৃষ্টি আজ শেষ হ'ল। এই প্রণালীর 'রেখা-সংকেতে'র দুচারটী রহস্যের কথা এখন বল্‌ব।

জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রতিটী বক্ররেখার ভিতর যেমন সরল রেখা লুকিয়ে আছে, তেম্‌নি দুনিয়ার যত আঁকা-বাঁকার ভিতর রেখা-সংকেতের ভাষা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রেখা, বক্ররেখা দিয়ে মুখের কথাকে যুগের বুকে বন্দী করে রাখা যায়,—কালি-কলমের জগতে মানুষের এ বড় কম আবিষ্কার নয়!

এখন দেখ্‌তে হবে রেখা-সংকেতে লেখা কেন অল্পে শেষ হয়। প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, দীর্ঘলিপির প্রতি বর্ণের মধ্যে সংক্ষেপ-লিপির অন্ততঃ চার পাঁচটী বর্ণের সৃষ্টি হয়। যেমন 'ক' এই একাক্ষরের মধ্যে, মাথার মাত্রাতে ন, বামপাশের তির্য্যক্‌ রেখায় চ, তলার দিকের তির্য্যকটী ং, উপর থেকে নীচের দাঁড়ি দ, পাগড়িযুক্ত পাশের আঁকড়িটি সি; মোট যোগ করে আমরা পাই—'নচংদসি'। বালক প্রহ্লাদ এই 'ক' দেখে কেঁদে আকুল হয়েছিল—কৃষ্ণের কথা ভেবে; বর্ত্তমানের 'ক'র মধ্যে পঞ্চাক্ষরী এই 'নচংদসি' দেখে আমাদেরও কাঁদতে হবে কি না বল্‌তে পারি না,—তবে সংক্ষেপ-লিপির রহস্যটুকু ঐ। পিসিমাকে যদি ডাকি—'পিসি এদিকে এসো'—তাহলে রেখা-সংকেত নিজের ভাষায় চতুর্গুণ স্বরে চীৎকার সুরু করে বল্‌বে—"দকসকটদদক নসরংদ ইতদকর-দকনদটপপি নচংদসি ইতদকরপিসরংদংদ"। অর্থাৎ ইত্যবসরে পিসিমা একবার এসে ফিরে গিয়েছেন—আবার এসেছেন, আবার গিয়েছেন। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে চতুর্গুণ কাজ রেখা-সংকেত এই সময়ের মধ্যে সেরে ফেল্‌বে।

'ক' এই একটা বর্ণ লিখ্‌তে কলম পাঁচটী রেখা ও একটী ছোট বৃত্তের সৃষ্টি করবে; কিন্তু রেখা-সংকেতে একটীমাত্র রেখা-সাহায্যেই 'ক' প্রকাশ পায়। কাজেই প্রতি বর্ণ পিছু রেখা-সংকেতের গড়ে চার পাঁচগুণ কম খাটুনি পড়ে।

'শব্দতত্ত্বে' বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখিয়াছেন—ইংরেজীর Psalm নির্বোধের মত p আর l-এর গাধার ভার বইছে, সেইরকম acknowledge, স্বচ্ছন্দে যিনি aknolej হতে পারেন, বহুবিধ কাউ নিয়ে ধাঁধার সৃষ্টি করে রেখেছেন, commission, Committeeর যুগ্ম যুগ্ম মূর্ত্তিগুলি খুঁটিনাটির সমস্তা বাড়াতেই যেন আবির্ভূত! বাংলা-ভাষায় এসবের গোলমাল ততটা নেই বটে, তবে আছে অল্প। তাই ঊর্দ্ধকে ঊর্ধ, দ্বন্দ্বকে দন্দ, উজ্জ্বলকে উজ্বল, পূর্ব্বকে পূর্ব এইভাবে লিখে

কতকটা ভার আমরা কমাই। তার পর স্বরবর্ণের মধ্যে ঈ, ঊ, ঋ, ৯ এই স্বর-চতুষ্টয়কে পুরোপুরি ত্যাগের ব্যবস্থা করে মুক্তির পথে আমরা আরো খানিকটা এগিয়েছি। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্য থেকে ঙ, ঞ, য়, ৎ, ঃ, ঁ কণ্টক কটাকে উৎপাটন করায় লেখনীর বিচরণভূমি আরো কিছু মসৃণ হয়েছে। জ-য, ড-ড়, ঢ-ঢ়, ণ-ন, পঞ্চম বর্ণ ব—অন্তস্থ ব পরস্পর দ্বন্দ্ব ভুলে অভেদজ্ঞানে একে লীন হওয়ায়—'আপদো শান্তি' আরো দুটো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। তালব্য, মূর্দ্ধণ্য, দন্ত্য—এই ত্রি-স মাত্র একটীতে বাহাল হয়ে বাকী সমস্তার ক্লেশটুকু ঘুচিয়েছে। কাজেই আমরা দেখ্‌ছি রেখা-সংকেত বর্ণমালাতেই সতরটাকে বাতিল করে সংক্ষেপ-নীতির পথ পরিষ্কার করছে। রেখা-সংকেতে অল্পে কেন লেখা শেষ হয় —সে রহস্যের এই গেল দ্বিতীয় অধ্যায়।

শেষ কথা—রেখা-সংকেতে 'পদ-চিহ্ন' নীতি রাখা লিপি-সত্বরতার আর এক কারণ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো রেখা-সাহায্যে এক একটী পদ প্রকাশের ব্যবস্থা থাকায় রেখা-সংকেতের সত্বর গতিকে আরো সাহায্য করে। 'পদাংশ ত্যাগ' নীতি অর্থাৎ কোনো কোনো পদের কিছু অংশ ত্যাগ করে লেখার নীতিতে আরো একটু সত্বর লেখা হয়। যেমন 'গুরুভা', 'গুরুপা', লিখেই 'গুরুভার', 'গুরুপাকে'র কাজ সারা যায়।

আইনের বলে 'অব' 'অধি' 'অভি' 'দুর' 'প্রতি' 'সম' প্রভৃতি যথাক্রমে ব, ধ, ভ, প, স-এ প্রকাশ পাওয়ায় উপসর্গগুলির হাত থেকে কিছু উপশম লেখনী পায়।

স্বচ্ছ, কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি সছ, কুঝটিকায় পরিণত হয়ে বেশ ফরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধনশালী, বলশালী প্রভৃতির শালী শুধু শা-যোগেই সন্তুষ্ট। বর্ণে বর্ণে, সঙ্গে সঙ্গে, পদে পদে প্রভৃতি বর্ণে-ব, সঙ্গে-স, পদে-প এইভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে লিপি-গতিকে সাহায্য করছে।

পদশেষের 'পূর্ণ' শুধু প-যোগে, 'বান্', 'মান্'—ব-ম দিয়ে, কথা, গণ, ক গ দ্বারা, সিক্ত, ধর, দাতা, স-ধ-দ দ্বারা—এইভাবে লিখিত হয়ে রেখা-সংকেতকে প্রাণপণে সাহায্য করছে। কেন অল্পে লেখা শেষ হয়—সে রহস্যের এই হ'ল শেষ অধ্যায়।

বাংলা ভাষায় রেখা-সঙ্কেত-সম্পর্কে অন্তবিধ কিছু কিছু আলোচনা প্রসিদ্ধ লেখনিকগণ মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে যদি প্রকাশ করেন, তাহলে অনেক নূতন জিনিস সাধারণের জানার পক্ষে সুবিধা হয়।

কবিবর আলমের বিবাহ হয়েছিল শেখের সঙ্গে। এ বিবাহ যেমনি বিচিত্র, তেমনি কবিত্বপূর্ণ। একবার আলম তাঁর মাথার পাগ্‌ড়ীটি রং করার জন্য এক টুক্‌রা কাগজে মুড়ে শেখ্ বলে এক রংওয়ালীর (হিন্দীতে বলে রং রেজিন) দোকানে পাঠিয়ে দেন। সেই পাগ্‌ড়ি বাঁধা কাগজে কবি আলমের রচিত কবিতার একটি লাইন লেখা ছিল—অনেক চেষ্টা করেও তিনি পরের লাইনটি লিখে কবিতার মিল কর্‌তে পারেন নি। শেখ পাগড়ী খোলবার সময় ঐ কাগজ দেখলেন এবং পরের লাইনটি তৎক্ষণাৎ রচনা করে আলমের লিখিত লাইনের নীচে লিখে দিলেন। তার পর রংকরা পাগড়ী আবার ঐ কাগজে মুড়ে কবি আলমের নিকটে পাঠিয়ে দিলেন। কবি আলম পাগ্‌ড়ী খোলবার সময় কাগজে দেখলেন যে তাঁর সেই রচিত কবিতাটির এক লাইনের নীচে কে আর এক লাইন লিখে দিয়েছে।—তিনি শেখের দোকানে গিয়ে ব্যাপারটি জান্‌তে পারলেন এবং ভারী খুসী হয়ে পাগ্‌ড়ী রং করার জন্য এক আনা আর কবিতা-পূর্ত্তির জন্য এক হাজার টাকা শেখকে দিলেন। ক্রমে উভয়ের সখ্য ঘনিষ্ঠ হয়ে শুভ-বিবাহে পরিণত হোলো!

—আলম ও সেখ মিলিত হয়ে হিন্দীতে অনেক কবিতা রচনা করে গেছেন। সে ভাষার ছটা যেমনি অপূর্ব্ব তেমনি মনোহারী। একটি কবিতার এক কলি রচনা করেছেন আলম আর বাকীটা শেখ রচনা ক'রে যাদু ঢেলে দিয়েছেন! এমনি করে কবিতার ধারা বয়ে চলেছে উদ্দাম গতিতে—কোথায়ও বেমালাম হয়নি।

আলম ও শেখের একটি ছেলে হয়েছিলো। তার নাম-করণ করা হয় "জহান্"। (জহান্ মানে জগৎ) অপূর্ব্ব প্রতিভাশালিনী কবি শেখের যেমনি অতুল কবিত্ব শক্তি ছিল তেমনি আশ্চর্য্য বাক্‌চাতুর্য্যও ছিল।—একবার শাহ্‌জাদা মুয়জ্জম শেখের নিকট জিজ্ঞাসা করেন,—"আলম কি আওরৎ শাপহি হাঁয়?" উত্তরে শেখ বল্লেন,—"জাঁহাপানা, জহান কি মা মায় হি হুঁ।" শাহ্‌জাদা ব্যঙ্গ করে এ কথাটি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিন্তু শেখের সুস্পষ্ট উত্তরে শাহজাদার রসিকতা সেখানেই থেমে গিয়েছিলো।

—হিন্দী কবিতা রচনার মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর অপার আনন্দের ধারা বহুমুখী হয়ে রয়েছে আর সবাই তা আকণ্ঠ পান করেছে—এ কথা ভাব্‌তে গেলে মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরে ওঠে।

* *

হিন্দীভাষা ও কবি-সমাদর

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

—চার—

আওরঙ্গ্‌জেব্ বাদশার পুত্র শাহ্‌জাদা মুয়জ্জমের প্রিয় কবি ছিলেন আলম। ইনি নানা প্রকারের সমস্যাপূর্ত্তির কবিতা রচনা কর্‌তেন। তাঁর সমস্যাপূরণের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে শাহ্‌জাদা তাঁকে অনেকবার পুরস্কৃত করেছিলেন।

কবি এবং কাব্য যে হিন্দীভাষা-ভাষিগণের কি মহা সমাদরের সামগ্রী, তা হিন্দীভাষার ইতিহাস একটু আলোচনা করলেই চোখে ধরা দেয়।—কবিরা নিত্য নব-নব আনন্দদাতা, দেশের মহাগৌরবস্থল,—তা যেন প্রত্যেক লোকই বিশেষ করে জান্‌তো।

কবিবর বিহারীলাল জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহের সভা-কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা যেমনি সুললিত তেমনি উচ্চ ধরণের।

মহারাজা জয়সিংহ যৌবনে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। নবাগতা

তরুণী রাণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করে, তিনি সর্ব্বদা রাণীকে নিয়ে প্রাসাদের অন্দর-মহলে থাকতেন। অন্দর-মহলের বাইরে আর বের হতেন না। রাজকার্য্য সতর্কতার সহিত সুপরিচালিত না হওয়ার দরুণ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটলো। নানা প্রকারের অত্যাচার ও গোলমাল আরম্ভ হোলো। মহারাজার এ দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না। তিনি মন্ত্রীকে পর্য্যন্ত দর্শন দিতেন না। অবশেষে কবিবর বিহারীলাল একটি কবিতা রচনা করে জনৈকা রাজপরিচারিকার মারফতে মহারাজার নিকটে পাঠিয়ে দেন। কবিতা পড়ে মহারাজার হারানো জ্ঞান ফিরে এলো এমনি উপদেশপূর্ণ এই কবিতাটি। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের বাইরে এসে পুনরায় রাজকার্য্য পরিচালনায় মনঃসংযোগ করলেন। ক্রমে রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হোলো। জনসাধারণ ও আমীর-ওমরাহ সকলেই খুশী হয়ে কবিকে নানাপ্রকারের পুরস্কার প্রদান করলেন।

মহারাজা কবি বিহারীলালের কবিতাটি পড়ে এতদূর আনন্দিত হয়েছিলেন যে, কবিকে প্রতিদিন একটি করে "আসরফী" (মোহর) দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রাজকার্য্য পরিচালনে আর কখনও মহারাজার অমনোযোগ দেখা যায় নি।

…… জয়পুর অবস্থান কালেই বিহারীলাল "সত্‌সই" নামক বিখ্যাত কবিতাবলী রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের কবিতাবলী এক নুতন ছন্দে রচিত। "সতসই" গ্রন্থের অনেকগুলি টীকা বেরিয়েছে। …. অল্প দিন হোলো হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন "সৎসই" গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্ম্মাকে বারো শত টাকা "মঙ্গলাপ্রসাদ" পারিতোষিক পুরস্কার দিয়াছেন।

* *

…… মহাকবি চন্দ বরদাই ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট অতুল প্রতাপশালী পৃথ্বীরাজ চৌহানের অতি প্রিয় সভা-কবি ছিলেন। বাঙালীর নিকট "চন্দবরদাই" "চাঁদকবি" নামে অভিহিত। তাই ৺সত্যেন্দ্র দত্ত "দিল্লীনামা" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতায় লিখেছেন,—

"ইন্দ্রের তুমি মর্ত্ত্য-বিলাস
ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি যে নিজে ..
* * * * *   * * * * *
চাঁদকবি গান শুনায়েছে তোরে
পদ নখে তোর চাঁদের কণা।"

…… চন্দবরদাইকে পৃথ্বীরাজের সভাকবি বলিলে তাঁহার ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। চাঁদকবি ছিলেন পৃথ্বীরাজের অভিন্ন-হৃদয়, অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তিনি সর্ব্বক্ষণই সম্রাটের নিকটেই থাকতেন। একত্র উপবেশন ও ভোজন পর্য্যন্ত করতেন। এমন কি হিন্দীভাষার ইতিহাসে ইহাও দেখা যায় যে, উভয়ের জন্ম ও মৃত্যু এক দিনে, এক সময়েই হয়েছিল।

পৃথ্বীরাজের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনার বিবরণ, অসংখ্য অভিযানের বর্ণনা চন্দবরদাই রচিত বিখ্যাত "রাসৌ" নামক গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা যেমনি লালিত্যময়ী, তেমনি মনোহারী। কথিত আছে, চাঁদের মৃত্যুর পরের লেখাগুলি চাঁদের পুত্র জল্হন রচনা করেছিলেন।

চাঁদ কবি ইচ্ছে করলেই বহু অর্থ ও মান পেতে পারতেন ; কিন্তু তাঁর নজর সেদিকে মোটেই ছিল না—এমনি মহাপ্রাণ কবি তিনি ছিলেন।

*
* *

পূর্ব্বে উল্লিখিত চিন্তামণি (মহাকবি ভূষণের ভ্রাতা) রাজপুতানার প্রায় সকল রাজন্যবর্গের নিকট থেকে বহু অর্থ, জায়গীর, রথ, অশ্ব ও গজ পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি একজন হিন্দীভাষার বিখ্যাত কবি।

নাগপুরের সূর্য্যবংশীয় ভোঁসলা মকরন্দ সাহ্ চিন্তামণির কবিতার খ্যাতি শুনে তাঁকে তাঁর সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন।

*
* *

…… কবিবর বৃন্দ আওরঙ্গজেব বাদশার সভাকবি ছিলেন।

*
* *

আওরঙ্গজেব বাদশার পৌত্র আজিম ওস্মান বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন এবং তাঁর রাজধানী ঢাকা সহরে অবস্থিত ছিল। শাহ্জাদা আজিম বৃন্দ কবির কবিতা শুনে এত মুগ্ধ হন্ যে, তাঁকে আওরঙ্গজেব বাদশার নিকট থেকে চেয়ে ঢাকায় নিয়ে এসে তাঁর নিজের সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন।

শাহ্জাদা নিজে হিন্দী ব্রজভাষায় বিখ্যাত কবি ছিলেন।

*
* *

হিন্দীভাষায় একটি প্রসিদ্ধ দুই লাইনের কবিতা আছে,—

"সুর সুরজ, তুলসী শশী, উরগণ কেশোদাস,
অবকে কবি খদ্যোৎসম যহাঁ তহাঁ হোত্ প্রকাশ,"

অর্থাৎ সুরদাস হিন্দী সাহিত্য-গগনের সূর্য্য, তুলসীদাস, চন্দ্র ও কেশোদাস (কেশবদাস) তারার ন্যায় বিরাজমান। আর আজকালকার কবিরা খদ্যোৎ-সদৃশ,—যথা তথা একটু আলোক বিকীরণ করে চিরতরে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

হিন্দীভাষায় দুইজন দেবতার প্রভাব নিয়েই অনেক কাব্য, ভজন, দোহাবলী ও বারমাস্যা রচিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের কথা আর ফুরায় না। …মহাত্মা সুরদাস কৃষ্ণযশ ও গোস্বামী তুলসীদাস রামচন্দ্রের যশ নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। লীলাময় ভগবানকে নিয়ে কোনো ভাষায় বোধ হয় এত কবিতা রচিত হয় নি। সুরদাস ও তুলসীদাস উভয়েই আজন্ম ভক্ত ও সাধক। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁদের সাধনার বিরাম হয় নি।

সাহিত্য-রসিক বাঙালী মাত্রেই উক্ত দুই কবির বিস্তৃত জীবন-কথা অবগত আছেন।

……দেশের ধনী ব্যক্তিগণ, রাজা-মহারাজা, মায় "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" বাদশা পর্য্যন্ত বহুবার অগাধ অর্থ, প্রচুর মান ও জায়গীর উক্ত কবিদের দেওয়ার চেষ্টা করেও বিফল মনোরথ হয়েছিলেন। তাঁদের সাধনা চলেছিলো কাব্যের ভিতর দিয়ে এবং সেই সাধনা জয়যুক্ত হয়েছিল। অর্থ, যশ, মান হেলায় উপেক্ষা করে দারিদ্র্যব্রতী সন্ন্যাসী সেজে তাঁহারা কাব্য রচনা করেছেন।

……সুরদাসকে কেউ বলেন জন্মান্ধ, আবার কেউ বলেন তিনি নিজে ইচ্ছা করেই দৃষ্টিহীন হয়েছিলেন।

এরূপ কথিত আছে যে, একবার পথে বেড়াবার সময় সুরদাসের দৃষ্টি এক পরমাসুন্দরী যুবতীর উপর পড়ে। তিনি অনেকক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তার দিকে চেয়ে ছিলেন। সুন্দরী মেয়েটি তাই দেখে ভাবলে যে, বোধ হয় সুরদাস তাকে ডাকছেন। সে নিকটে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, "কেন আমায় ডেকেছেন?" এতে সুরদাস অত্যন্ত লজ্জিত হোলেন এবং বল্লেন, "না, তুমি আমার চোখে দুটি সূঁচ দিয়ে ফুঁড়ে দৃষ্টিহীন করে দাও।"

মেয়েটি প্রথমে তাতে স্বীকৃত হোলো না। সুরদাস তাকে অনেক বুঝিয়ে অবশেষে রাজি করলেন;—মেয়েটি সূঁচ দিয়ে ফুঁড়ে মহাকবি সুরদাসের চোখ দুটি চিরদিনের মত দৃষ্টিহীন করে দিলে।

আর এক দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, এতে সুরদাসের বাইরের চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে গেলেও, ভিতরের জ্ঞান-চোখের দৃষ্টি শত-শত গুণে বেড়ে গিয়েছিলো। তারি ফলে দেশ পেয়েছে তাঁর অতুল্য-অমূল্য অবদান তাঁর গ্রন্থরাজি।

……ভক্তমালে সুরদাসকে জন্মান্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তুলসীদাস ও সুরদাসের বিচিত্র জীবন-কথা নানা লোকের নিকটে নানা রকমে শুনতে পাওয়া যায়।

……কেশোদাসের কিছু পরিচয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে।

* *

*

হিন্দী কবিগণের মধ্যে সুরদাস ও তুলসীদাসের আসন অতি উঁচুতে। এঁরা এত লোকপ্রিয় যে, এঁদের কীর্ত্তি-কাহিনী ও সঙ্গীতাবলী সকল হিন্দীভাষা-ভাষীর মুখে শোনা যায়। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের হাটে, মাঠে, ঘাটে, ধনীর প্রাসাদে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, সর্ব্বত্র এঁদের রচিত সুধামাখা গানগুলি শুনে মন মুগ্ধ হয়ে যায়।

সুরদাসের "ভজন" অনেক বাঙালী গায়কও গেয়ে থাকেন। তুলসীদাসী রামায়ণ অনেক বঙ্গমহিলাকে ভক্তিভরে পড়তে দেখেছি।

অযোধ্যার লোকে সুরদাস ও তুলসীদাসকে ভগবানের অবতারের ন্যায় ভক্তি করে।…. তুলসীদাসের লেখা পড়তে গেলেই মনে হয় যেন দ্বিতীয় বাল্মীকি জন্মগ্রহণ করেছেন।

*

……কবীন্দ্র উদয়নাথ সমেঠীর রাজার নিকটে থাকতেন এবং রাজপুত্রের প্রিয় সখা ছিলেন। যুবরাজকে প্রত্যহ নূতন কবিতা শুনিয়ে প্রচুর পুরস্কার পেতেন।

*

রেওয়ার মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহও বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর সভায় কবিদের খুব প্রতিষ্ঠা ছিল। কবিদের তিনি লাখ লাখ টাকা পুরস্কার বিতরণ করতেন।

বহু দরিদ্র পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থাদি হিন্দীসাহিত্যের গৌরব।

শুকদেব মিশ্র আর একজন বড় কবি। ইনি আওরঙ্গজেব বাদশার মন্ত্রী ফাজিল আলী ও সমেঠীর মহারাজা হিম্মত্ সিংহের কাছ থেকে বহুবার কবিতা শুনিয়ে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছেন।

* * * *

রাজপুতানার অন্তর্গত কৃষ্ণগড়ের রাজা নাগরীদাস হিন্দীভাষায় একজন বড় কবি ছিলেন। তিনি কবিদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। ইনি যেমনি অসাধারণ কবি ছিলেন, তেমনি মহা বলবান, ভীমকায় পুরুষ ছিলেন। বারো বৎসর বয়সের সময় এক মত্ত মাতঙ্গকে বিচলিত করে দিয়েছিলেন। পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় রাজা নাগরীদাস একটি প্রকাণ্ড সিংহকে তরবারি দিয়ে নিহত করেছিলেন।… বুঁদীর রাজা জৈৎ সিংহকে বাইশ বৎসর বয়সের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করে, বিজয়মাল্যে বিভূষিত হয়ে বাড়ী ফিরে এসেছিলেন।

রাজকার্য্য ও মৃগয়া তাঁহার প্রিয় ছিল কিন্তু সবচেয়ে প্রিয় ছিল কাব্যচর্চ্চা ও সাহিত্যালোচনা।….. বড় কবি ছিলেন তিনি। তাঁর রচিত কবিতা অতি মধুর ও কবিত্বপূর্ণ।

রাজা নাগরীদাসের প্রধানতমা পরিচারিকা বনীঠনীজীও একজন উঁচুদরের প্রতিভাশালিনী কবি ছিলেন। উভয় মিলিত হয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন।

নানা প্রকারের সাংসারিক বিপৎপাতে অধীর হয়ে রাজা নাগরীদাস স্বীয় পরিচারিকা বনীঠনীজীকে সঙ্গে নিয়ে নিজ রাজ্য ছেড়ে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং সেখানে বল্লভাচার্য্যের নিকটে দীক্ষিত হন্।

* * * *

পদ্মাকর হিন্দীভাষার একজন মহাকবি। শৃঙ্গার রসের কবিতা তাঁর মত কেউ নাকি রচনা করতে পারেন নি। জয়পুরাধিপ মহারাজা জগৎ সিংহ তাঁর কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে, তাঁকে তাঁর সভা-কবি নিযুক্ত করেন। মহাকবি পদ্মাকর দেশের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

তিনি চলতেন ঠিক রাজা মহারাজার মত; হাতী, ঘোড়া, পাল্কী-নালকী, রথ ও বহু লোক সঙ্গে নিয়ে দেশে বিদেশে যেতেন।

* * * *

কবীর সাহেব, মীরাবাঈ, দাদুদয়াল, মলুকদাস, সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাকবিগণ অগাধ অর্থ, অপরিসীম সম্মান ও সর্ব্বপ্রকারের সাংসারিক সুখ তৃণবৎ তুচ্ছ মনে করে, নিস্পৃহ হয়ে, দারিদ্র্যব্রতী

জ্ঞানভিক্ষু সেজে সাহিত্যের সেবা করে গেছেন ; নব-নব কাব্য, মহাকাব্য, কবিতা রচনা করে হিন্দীভাষার শ্রীবৃদ্ধি করে গেছেন। আর সমগ্র দেশবাসী মুগ্ধ হয়ে তাঁদের রচিত গ্রন্থরাজি মাথায় করে নিয়েছে—নিজেরা ধন্য হয়েছে।

* * * *

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বহু মুসলমানও হিন্দীভাষার মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে হিন্দীকে নিজেদের মাতৃভাষা রূপে গণ্য করে নিয়েছিলেন এবং তাঁহাদের কবি-প্রতিভা হিন্দীভাষার ভেতর দিয়েই প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মালিক মুহম্মদ জায়সী হিন্দীভাষার একজন বড় কবি। "মালিক" হোলো এঁদের উপাধি আর "জায়স" নামক স্থানে অবস্থান করতেন বলে জায়সী বলে উল্লেখ করতেন। মুহম্মদ হিন্দীভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা অবাধে রচনা করতে পারতেন। তাঁর রচিত একটি "বারোমাস্তা" কবিতা সমেঠীর রাজার এতো ভালো লেগেছিলো যে তিনি কবি মুহম্মদকে জায়স থেকে নিয়ে এসে নিজের সভাকবি নিযুক্ত করেন ও কবিকে বহুবার পুরস্কৃত করেন। কবি মুহম্মদের মৃত্যুর পর রাজার আদেশানুযায়ী রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে একটি কবরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

"পদ্মাবত" ও "অখরাওট" তাঁর রচিত গ্রন্থ দুটিই খুব প্রসিদ্ধ।

হরিদাস আর একজন বিখ্যাত কবি। নিজের অগাধ অর্থ ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসী সেজেছিলেন। তাঁর মত সুগায়ক তখন কেউ ছিল না। এমন ভারতবর্ষে তাঁর মত সুগায়ক আর জন্মায় নি। গানের রাজা তানসেন ও তাঁর গুরু বৈজুবাওরাকে হরিদাসই সঙ্গীতের হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। এর থেকে বুঝে নিতে হবে হরিদাস কত উঁচুদরের গায়ক ও সঙ্গীতবেত্তা ছিলেন। আকবর বাদশা তাঁকে বহু জায়গীর ও অগাধ অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও দিল্লীতে যেতে বাধ্য করতে পারেন নি। বহুবার বাদশা তাঁকে ছদ্মবেশে এসে দেখে গিয়েছিলেন।

······আকবর বাদশার নবরত্নের অন্যতম রত্নদ্বয় বীরবল ও টোডরমলও উঁচুদরের হিন্দী কবি ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই কবিগণকে পরম সম্মান ও সমাদর করতেন। বহুবার বহু কবিকে রথ, অশ্ব, গজ ও ধন দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন।

কবি উসমান আর একজন মুসলমান হিন্দী কবি। রহীমের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হয়েছে। তাঁর রচিত কবিতা হিন্দীভাষাভাষিদের মধ্যে খুব সমাদৃত।

ওড়ছাড় মহারাজা ইন্দ্রজীৎ সিংহের সভায় "প্রবীণ রায়" নামিকা একজন সুগায়িকা নর্ত্তকী ছিল। সে যেমনি সুকণ্ঠী ছিলো তেমনি অসাধারণ কবিপ্রতিভাশালিনী পরমাসুন্দরী নটী ছিলো।····তার রূপলাবণ্যের খ্যাতি তখন সারা ভারতে রাষ্ট্র হয়েছিলো।·····এরূপ কথিত আছে যে আকবর বাদশা নাকি মহারাজা ইন্দ্রজীৎকে বলে পাঠান যে প্রবীণ রায়কে যেন তাঁর দরবারে অগোণে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ইন্দ্রজীৎ তাকে আকবর বাদশার দরবারে পাঠালেন না।

·····ফলে বাদশা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে মহারাজাকে এক কোটী টাকা জরিমানা করে ফেলেন।·····মহারাজা ভারি বিপদে পড়লেন কিন্তু প্রবীণ রায় তাঁকে আশ্বাস ও নানাপ্রকারের প্রবোধ দিয়ে বল্লে যে সে বাদশার দরবারে গিয়ে সসম্মানে মহারাজার জরিমানা মাফ করিয়ে আনতে পারবে।

তৎপর প্রবীণ রায় একদিন আকবার বাদশার দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বরচিত একটি ছোট কবিতা আবৃত্তি করে তার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে শোনালে। আকবর বাদশা কবিতাটি শুনে বড়ই মুগ্ধ হন এবং মহারাজার জরিমানা একদম্ মাফ করে দেন ও প্রবীণ রায়ও প্রচুর পুরস্কার লাভ করেছিলো।·····পরিশেষে প্রবীণ রায়কে সমাদরে মহারাজা ইন্দ্রজীতের সভায় পাঠিয়ে দেওয়া হোলো।

* * * *

সৈয়দ মুবারক সালী বিল্‌গরামী একজন শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দীভাষা তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল। হিন্দীভাষাতেই মুবারকের কবিপ্রতিভা প্রসিদ্ধি লাভ করে।

······কবি রসখান মুসলমান ছিলেন এবং তিনি বাদশাহী পাঠান বংশসম্ভূত। তিনি গোস্বামী বিঠ্‌ঠলনাথজী কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন্। তাঁর রচিত হিন্দী কবিতা যেমনি উচ্চাঙ্গের তেমনি গম্ভীর ধর্ম্মভাবপূর্ণ।

কবিবর মতিরাম শৃঙ্গার রসের বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি বহু রাজা মহারাজা কর্ত্তৃক বহুবার পুরস্কৃত হয়েছিলেন। অবশেষে বুঁদীর মহারাজা রাও ভাউসিংহ তাঁর কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে তাঁর সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন।

কবি সেনাপতি ও সুন্দরদাস বহুজনসমাদৃত হিন্দী কবি ছিলেন। কবিবর সুন্দরদাস অপরূপ সুন্দর পুরুষও ছিলেন এবং শৈশবকাল থেকেই তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

······কুলপতি মিশ্র আর একজন কবি। তিনি জয়পুরের যুবরাজ রামসিংহের সভাকবি ছিলেন।

যোধপুরের মহারাজার দ্বিতীয় পুত্র ও মহারাজা অমরসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যশোবন্তসিংহ নিজে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। তিনি নিজে যেমন একজন মহাকবি ছিলেন তেমনি কবিদের মহাপ্রাণ পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যশোবন্তসিংহের অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপের কথা চির-উজ্জ্বল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ······আওরঙ্গজেব বাদশার চক্রান্তে তাঁকে বিষ খেয়ে জীবনলীলা শেষ করতে হয়েছিলো।

হিন্দীর আর একজন কবি হচ্চেন গোপালচন্দ্র মিশ্র। ছত্রিশগড়ের রতনপুরের রাজা এঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে কবিবরকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। উভয়েই কাব্যচর্চ্চায় দিন অতিবাহিত করতেন।

* * * *

ধর্ম্মসংস্কারকগণের প্রধানতম গুরুগোবিন্দ সিংহ, মলুকদাস, দাদুদয়াল, নানক, কবীর প্রভৃতি অনেকেই হিন্দীভাষাকে পরম স্নেহের চোখে দেখতেন এবং তাঁহাদের বাণী এই ভাষাতেই প্রচার করে গেছেন।

* * * *

ভারতের মুসলমান সম্রাটদের হিন্দীভাষার প্রতি অপরিসীম সমাদর চোখে না পড়েই যায় না। তাঁরা এই ভাষায় সাহিত্যিকগণকে উৎসাহিত না করলে বোধ হয় এ ভাষার এত উন্নতি হোতো না। জহুরী যেমন জহরৎ চেনে, যাচাই করে সাচ্চা-ঝুঁটার দর নির্ণয় করে, মুসলমান বাদশারা তেমনি প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি বা সাহিত্যিককে পেলেই যথোচিত পুরস্কৃত করতেন।

····· মুসলমানরা যেদিন এদেশে এসেছিলো সেদিন থেকেই হিন্দীর সহিত তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হোলো।

অভিশাপ

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শীল, বি-কম্

অহীন্দ্র যেদিন, রেবারে আনিল, শুভ-উদ্বাহ করি
ভেবেছিল মনে অহীন তখন, সুখী সে অবনী'পরি।
তুলি দিয়ে আঁকা রেবার গঠন, কমনীয় তার মুখ
টানা টানা নীল চোখ দুটী দেখে, ভরিত তাহার বুক।
কিবা সুন্দর অলক-গুচ্ছ, নবনী-কোমল দেহ;
লক্ষ্মীর রূপে এসেছে সে ভবে, পূরিতে তাহার গেহ।
অনিমেষ-চোখে হেরিত রেবারে মিটিত না তবু আশা;
মনোহর কিবা চটুল চাহনি, চাহে যেন ভালবাসা!

রূপের পসরা রেবা ছিল বটে, বড় নীচ ছিল মন,
দহিত অহীন ভালবাসা দিয়ে, নাহি সুখ কোন্'ক্ষণ।
খুঁজে সে পেত না, কিবা চায় রেবা, কিবা তার লাগে ভালো;
আকাশ-পাতাল ভেবে করে ঠিক, 'আমি যে বড্ড কালো,
সুন্দরী সে যে—নিশ্চয়-ই মাগে, সুন্দর তার স্বামী—
হেন দুর্ম্মতি দিলে কেন বিধি—রেবারে বরিনু আমি!
সুখ কভু তারে দিতে না পারিনু, নিজে-ও না পেনু সুখ
শুধিব রেবারে কি তার লালসা, কি-আশায় ভরা বুক।'
কথা শুনি তার, হাসি কহে রেবা, 'ক্ষমো মোরে ওগো স্বামী—
শত অপরাধ করে থাকি যদি, তবু তোমা চাই আমি।'
পুলক-আবেশে পাগল অহীন, বুঝিল নিজের ভুল,
কত নীচ মন! বিদূষিত ভাবে দেবতা-পূজার ফুল!

তিন দিন পরে পুনরায় তার, বড় বিস্ময় লাগে—
নাহি চাহে রেবা কহিবারে কথা, আর যেন কিছু মাগে।

এইভাবে ভেসে দিনগুলি শেষে, চলিল অসীম পথে;
সকলে শুনিল, কিছুদিন পরে অতিথি আসিছে রথে।
আহ্লাদে ভাসে অহীন তখন, আসে ঠেলে আঁখিজল—
কি দিয়ে বরিব, নবীন অতিথি, কিবা আছে মোর বল?
আগেকার মতো, সেদিন নিশীথে, রেবা নাহি কহে কথা
অভিমান ভরে শুধান অহীন, 'কিবা লাভ দিয়ে ব্যথা?
কত শতবার বলেছি তোমায়, চাহ যদি হৃদি মোর
সারাটী জীবনে দিব না হইতে শিথিল প্রেমের ডোর।'
উত্তরে রেবা কহে আঁখিজলে, 'বলিবার কিছু নাই
জানো মনে ভাল, হৃদি-মাঝে তোমা চাহি কিবা নাহি চাই।
নাহিক আমার এতটুকু আর বাসনা থাকিতে ভবে;
কত কি দেখিব, শুনিব আর-ও যখন তনয় হবে।
চাইনা হেরিতে পুত্রের মুখ, দেবতারে দেব তুলে—'
চমকি তখনি, ষাট্ ষাট্ বলি কাঁদিয়া উঠিল ফুলে!

স্থির স্বরে তবে অহীন কহিল, 'ভেবেচ দেবতা' কাণে
পশেনি আশীষ-অভিশাপ যাহা, ঢালিলে তনয় পানে।
জেন' মনে ঠিক, শুধু এরি তরে, হবে যবে অনুতাপ
তনয়ে সেদিন ডালি দিয়ে তবু মিটিবে না (ঐ) অভিশাপ।'

এলো যথাকালে রূপবান্ ছেলে, যেন ঘর আলো-করা
স্মরি শাপ-কথা ত্রাসে কাঁপি রেবা, হেরিতে নারিল ত্বরা।
ভয়ে ভয়ে শেষে হেরিয়া তনয়ে বিমোহিত হোল আঁখি
আকুল কণ্ঠে দেবতারে কয়—'দিয়ো না আমারে ফাঁকি!
ক্ষম মোরে প্রভু, এই মাগি শুধু নিয়ো না শিশুরে তুলে;
করেছি যে দোষ শ্রীচরণে তব, দয়া করে যাও ভুলে!'

দিনে দিনে বাড়ে শিশু সুকুমার, বলিবারে শেখে ভাষা;
মধু মা-মা স্বরে ডাকে যত তারে, তবু যে মিটে না আশা!
কি ভাবে ধরিবে পুত্রেরে বুকে কত দেবে তারে চুম্;
নিদ্রা-অলস আঁখি পাতে তার আসিবে না কভু ঘুম।

দু'টী মাস পরে একদা নিশীথে, কালব্যাধি আসি ধীরে
বিঁধিল অহীনে আষ্টে পৃষ্ঠে চোখা চোখা তার তীরে।
ভাল নাহি হয়, রোগ নিজ পথে চলে বেড়ে অনিবার;
জড়সড় রেবা ডাকে ভগবানে, তবু কি ছলনা তাঁর!
এইরূপে যবে অহীন-প্রদীপ নিভু নিভু হতে চায়
কে যেন রেবারে স্মরণ করালো, 'দে'রে ছেলে দেবতায়।'
ছুটিয়া আসিয়া সুপ্ত তনয়ে তুলে নিল রেবা কোলে
বুকের মাঝারে ধরে তারে বলে, ওরে খুকু চল চলে।
ঠিক সেইক্ষণে ব্যথিত নয়নে হেরিল বিহ্বলা রেবা,
থেমে গেল স্বামী তার নাম ডাকি, আর না লইবে সেবা।

পাগলিনী-প্রায় ঘুরে চারিধার তনয়েরে ধরি বুকে
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে শুধু আঁখি, নাহি কথা তার মুখে।
আরো কিছুকাল গেল এইভাবে—সহসা ছাড়িয়া ঘর
ছুটে গেল রেবা খিড়কি দুয়ারে, ভুলিয়া আপন পর।
ত্রয়োদশী-নিশি, চাঁদ যেন হাসি রচিতেছে জলে মালা;
তুষার-শীতল কালো দীঘি-জল, নারিল জুড়াতে জ্বালা।
বিকট হাসিয়া রেবা আনমনে তনয়ে ধরিল তুলে
আধ'-আধ'-ভাসে কাঁদি মা-মা বলি ধরিল বালক চুলে।
পাগল নয়নে হেরিয়া বারেক, ছুঁড়ে তারে জলে ফেলে,
ফুকারিল রেবা, 'ওগো নিষ্ঠুর, ওই নাও মোর ছেলে।'
তখনি লুটাল জ্ঞানহারা মাতা, চাঁদিমা ঢাকিল মুখ;
কালো জল শুধু রহিল তথায়, হেরিতে তাহার দুখ।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ন্যাকড়ার ফালি ছিঁড়ে পায়ের উপর রেখে, তারপর দু' পাশ দিয়ে হাতের তালু দুটো চালিয়ে পিসিমা সল্তে পাকাচ্ছিলেন। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, মাথার চুলগুলি ছোট-ছোট করে' ছাঁটা, ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার দাঁত সব অটুট, নিটোল নিরেট বাঁশের মতো আঁটসাট বাঁধুনি। সারা গা বেয়ে খুসি তাঁর এখনো উপ্‌চে পড়ছে। কোথাও এতটুকু অবসাদের চিহ্ন নেই।

সিতাংশু তাঁকে বল্‌ত: আচ্ছা পিসিমা, তুমি যখন বিধবা হয়েছিলে, তখন তোমার বয়েস কতো?

পিসিমা হেসে বল্‌তেন: আজকালকার মেয়েরা যে-বয়সে স্কিপ্ করে। এগারোয় সবে পা দিয়েছি হয় ত'। মনে আছে সে-বার মালুইচণ্ডীর মাঠে মেলা দেখতে যেতে ঘোড়ার গাড়ির জান্‌লার খড়্‌খড়ি তুলে রাস্তায় উঁকি দিয়েছিলাম বলে' বাবার জাত ছেড়ে মাথা যাবার কথা উঠেছিলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিন-কাল কি-রকম বদলে গেছে। আজকালকার মেয়েরা একা-একা হ্যাণ্ডেল্ ধরে' ট্র্যামের ওপর লাফিয়ে ওঠে!

সিতাংশু জিগ্‌গেস করত: পিসেমশাইকে তোমার মনে পড়ে?

নিচের ঠোঁট উল্‌টিয়ে পিসিমা বল্‌তেন: ছাই।

তার পরে কি ভেবে হেসে গড়িয়ে পড়তেন: তখন কী বোকাই যে ছিলাম। বিয়ের আগে পুরুষমানুষের সঙ্গে একটু-আধটু ন্যাকামো না করলে মেয়েছেলের বিদ্যে-বুদ্ধি খুলবে কেন? ছিলাম একেবারে আস্ত একটি কাঠ।

—কি রকম?

—বিয়ের রাতে—বাসর তখন উঠে গেছে—দু'জনে মুখোমুখি শুয়েছি। তোর পিসেমশাই আমার থুংনিটা ধরে' জিগ্‌গেস করলেন: হ্যাঁ খুকি, তোমার নাম কি? ঘেন্নায় ঘাড় ফিরিয়ে মুখঝাম্‌টা দিয়ে বল্‌লাম: আ মর্। বিয়ের রাতে বউর সঙ্গে সোয়ামি আবার কথা কয় নাকি?

বলে'ই হাসতে-হাসতে তিনি ভেঙে পড়্‌তেন। তার পর হাসি থাম্‌লে চোখের জল মুছে: বেচারাকে সারা রাত একটি কথাও বলতে দিলাম না।

সিতাংশু বল্‌ত: পিসেমশায়ের জন্যে তোমার কষ্ট হয় না?

—কষ্ট? কষ্ট হ'বে কোন্ দুঃখে? খাওয়ালো না, পরালো না,—গরিব বাপ-মা দু' হাতে দু' গাছ শাঁখা দিয়েছিলো, তা-ও কেড়ে রাখ্‌লো। ওঁর জন্যে আবার কষ্ট হ'বে! এই দিব্যি আছি।

পূজো-আচ্চা, ব্রত-সন্ত্যয়ন, গয়া-কাশী—এই খালি লেগে আছে। বলেন: এ-সংসারেই বা মন আমার টিকবে কেন? দু' দু' বছর বিয়ে হ'ল, এখনো বৌর কোল জুড়ে একটি চাঁদ উঠ্‌লো না। এ যে তোদের কী ফ্যাশান্ হয়েছে—একটি ছেলে হ'লেই যেন ঘর-সংসার সব রসাতলে গেলো।

ঘরের ভিতর থেকে শুভা বলে: তোমার পূজোর ঘরেই ত' অনেক পুতুল আছে।

—সে-সব পুতুল যে সাড়া দেয় না পোড়ারমুখি।

—সাড়া যেমন দেয় না, উৎপাতও করে না। বোবার মতন চুপ করে' বসে' থেকে নেহাৎই তোমাকে পূজো করতে দেয়।

বলে' হাসতে-হাসতে শুভা বারান্দায় বেরিয়ে আসে।

শুভাকে এবার আমরা দেখতে পেলাম।

দীর্ঘাঙ্গী পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে মেয়েটি। গায়ের রঙ কালো, কিন্তু পাথরের মতো ঠাণ্ডা ও বর্ষার মেঘের মতো নরম সেই কালো রঙ। চিবুকটি ছোট ও দৃঢ়, নাকটি টিকল ও তীক্ষ্ণ, আর চোখ দুটি যেমন গভীর তেমনি বিহ্বল। গাঢ় তার দৃষ্টি। হাতের যেমনি ডৌল, পায়ের তেমনি লীলা। দেহের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে উচ্ছল একটি ক্ষিপ্রতা ভারি সুন্দর খাপ খেয়েছে। ওর গায়ের রঙ কালো না হ'লে সত্যি ওকে মানাতো না।

রূঢ় প্রখরতার চেয়ে সুশীতল একটি গাম্ভীর্য্যেই ওর রূপ!

আর হাসি ওর কথায়-কথায় কারণে-অকারণে। সে-হাসি সশব্দ, প্রাণবন্ত। যখন ও ঘুমোয় তখনো ওর ঠোঁটের উপর—ফুর্‌ফুরে তুল্‌তুলে টস্‌টসে দু'টি ঠোঁটের উপর—একটি ছোট্ট হাসি জেগে থাকে।

আর ও যখন জেগে থাকে তখন খালি দেখি ওর চঞ্চল ও সুদূর-সন্ধিৎসু আয়ত দু'টি চক্ষু—চক্ষুতে মদিরা ও শান্তি, আঘাত ও অভয়, কাঠিন্য ও করুণা।

ওর আগে নাম ছিলো শুভা।

কিন্তু সিতাংশু বলে: আমি কল্যাণের চেয়ে দীপ্তি পছন্দ করি।

সুভা হেসে উত্তর দেয়: আমিও শৈত্যের চেয়ে পছন্দ করি শুভ্রতা।

অতএব শীতাংশুও সিতাংশু হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু যে-কথা বল্‌ছিলাম—

তার আগেও কিছু বলা দরকার:

মানে, বাড়িটা যে দোতলা, ওপরে তিনখানা ঘর—এক লাইনে; একখানা শোবার, একখানা বসে' গল্প করবার, সব চেয়ে ছোট বাকি আরেকখানা কাপড় ছাড়বার বা শুদ্ধ করে' ড্রেস্ করবার—তিনখানা ঘর ছুঁয়ে বন্ধ একটি বারান্দা—খোলা দক্ষিণের দিকে প্রকাণ্ড তিনটে জান্‌লা; নিচেও তেমনি তিনখানা ঘর—রাস্তার দিকে নামমাত্র একটি বৈঠকখানা, সিতাংশু সকালে সেখানে খবরের কাগজ পড়ে, বিকেলে খেলে তাস, মাঝেরটা সরোজের পড়ার ঘর বা কলেজের বন্ধুদের নিয়ে ক্যারম্ খেল্‌বার ও আড্ডা দেবার, এ-পাশেরটা পিসিমার—শোবার, পূজো করবার, তরকারি কুট্‌বার।

এ আর বিশেষ আশ্চর্য্য কি! মামুলি ছোট একটি সংসার।

কিন্তু আশ্চর্য্যের হচ্ছে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট একটুখানি মাটির উঠোন। এ-ধারের কল-চৌবাচ্চাটা বে-আব্রু, তারই কাছে বাঁকানো ডাল-পাল-মেলা একটা পেয়ারা গাছ—কত দিন থেকে রঙ-ওঠা একটা ঘুড়ি আট্‌কে আছে। উঠোন থেকে ঘরে উঠ্‌বার রোয়াকটুকুর গায়ে দু'টি পাতাবাহারের গাছ—হলদে স্বর্ণলতায় আচ্ছন্ন। পিসিমা বলেন: মাটিতে পা রেখে গা জুড়োল। শুধু ইট-কাঠ-পাথর দেখে-দেখে চোখ দুটো ক্ষয়ে' যায়।

মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে উঠোনের একধারে তিনি বেগুন লাগান—ধনে-শাক আর পালং-শাক; মাচা বেঁধে পুঁইর ডগা লতিয়ে দেন; শীতের দিনে রাজগন্ধার চারা পোঁতেন। দূর গ্রাম্য জীবনের আব্‌ছা একটু আমেজ পাওয়া যায়।

এই উঠোনটুকুতেই চেয়ার পেড়ে এনে সিতাংশু আর সুভা বিকেল বেলা চা খায়—গ্রীষ্মের রাতে ছাতে না গিয়ে এইখেনেই পাটি বিছিয়ে তারা গল্প করে।

সে-সব গল্প নিতান্তই আমাকে-তোমাকে নিয়ে।

তার পর ও-ধারে যে পাল্লা-খাটানো বন্ধ একটা কলতলা আছে ও আমিষ-নিরামিষ দুটো রান্নাঘর—পিসিমার ঘরেই অবশ্যি ভাঁড়ার, মায় বাসন-কোসন হাঁড়ি কুঁড়ি—দরকার হ'লে সিঁড়ির তলায় যে চাকর-বাকরের জায়গা করা যেতে পারে, আপাতত সেখানে ঘুঁটের পাহাড়,—বাইরের কল খুল্‌লে যে ভেতরের কলে জল আসে না ও তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে যে মাঝে মাঝে ঝগড়া বাধে—এ-সব না বল্‌লেও বিশেষ ক্ষতি নেই।

আর সিতাংশু যে বঙ্গবাসী কলেজে প্রোফেসারি করে সে-খবর ত' আমরা যথাস্থানেই শুন্‌তে পেতাম। বয়েস যে তার আঠাশ-উনত্রিশের বেশি নয় তা-ও আমরা আঁচ করেছি। মাইনে কতো পায় দয়া করে' তা বল্‌তে হবে না। বেনামিতে নোট ছাপবার খবর আমরা পেয়েছি; আই-এ-র ছাত্র-ছাত্রীদের সে ইংরিজি-র কাগজ দেখে ও পারতপক্ষে মেয়েদেরই একটু বেশি নম্বর দেয়। তাতে কী বা এমন যায় আসে।

কিন্তু ব্যাপার তা নয়।

হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম।

দোতলার বন্ধ বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে' পিসিমা সল্‌তে পাকাচ্ছেন। আর নিজের মনেই বলছেন: জিনিসগুলো আর এলো না।

সুভা খানিকক্ষণ আগে জেগেছে। মানে, খেয়ে-দেয়ে দুপুরে ও একটু ঘুমোয়। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো

আজ অনেক আগেই জেগে পড়েছে। এখন সবে আড়াইটে। দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে দেখলো তারিখ বদ্‌লানো হয় নি। আজ শুক্রবার—সিতাংশুর চারটে পঁয়তাল্লিশ পর্য্যন্ত ক্লাশ। অনায়াসে আরো খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যেতো।

কিন্তু কিছুতেই টানা ঘুম এলো না।

যতো রাজ্যের ভাবনা জুটেছে।

সুভা ছাতে উঠে, শুকোতে-দেওয়া কাপড়গুলি পেড়ে প্রথমে শোবার ঘরের খাটের উপর জড়ো করলে। পরে বাঁ-হাতের আঙুল ক'টি লতিয়ে-লতিয়ে কাপড় কুঁচোতে লাগ্‌লো।

সামান্য আতপ-চিড়ে ও কুল-চুরের জন্যে দু'দিন থেকে পিসিমা কেন যে এমনি অস্বস্তি প্রকাশ করছেন বোঝা কঠিন।

পিসিমা বল্‌লেন,—দেখতে সামান্য বলে'ই সামান্য নয়, বৌমা। গরিব দিদি—এর চেয়ে বেশি আর কিছু দিতে পারেন নি। সঙ্গতি পেলেই ছোট বোনের জন্যে কিছু-না-কিছু তাঁর পাঠানো চাই।

সুভা দরজার সামনে এসে বল্‌লে,—কিন্তু যার সঙ্গে পাঠিয়েছেন, সে নিশ্চয়ই তা দিয়ে দিব্যি জলযোগ করেছে। চিঠি এসেছে পশু', অথচ জিনিস নিয়ে লোক এখানো পৌছুলো না। কা'র সঙ্গে পাঠিয়েছে?

অমনি বাইরের দরজায় কড়া নড়ে' উঠ্‌লো।

পিসিমা চট্‌ করে' দাঁড়িয়ে পড়লেন: বল্‌তে-বল্‌তেই এসে পড়লো বুঝি। বাঁচবে বহুদিন।

কিন্তু জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখা গেলো মাথায় একটা ডালা ও তার উপর এক বস্তা পুরোনো কাপড় চাপিয়ে বাসনউলি প্রশ্ন করছে: বাসন নেবে গো? তোমার সেই পেতলের গামলা এনেছিলাম।

পিসিমা বল্‌লেন,—না বাছা, আজ নয়।

পিসিমা জলের বাটি ও ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো নিয়ে ফের বসলেন বটে, অমনি আবার কড়া নড়লো।

এবার সরোজ। কলেজ থেকে ফিরছে।

—না, দু'দণ্ড নিরিবিলিতে বসবার জো নেই।

মাল-মশলা নিয়ে পিসিমা নিচে নেমে গেলেন।

দরকার হ'লে দরজা এবার সরোজই খুলতে পারবে। নিচেই তার ঘর। বি-সার্প পেতলের বাঁশি নিয়ে সে কসরৎ সুরু করেছে।

পিসিমার কাজের আর বিরাম নেই। কুলোয় করে' খইয়ের ধান বাছতে লেগেছেন।

সুভা ঘুরে-ঘুরে ঘর ঝাঁট দিলে, আল্‌না গুছোলো, টেবিল পরিষ্কার করলো। এবার পরিপাটি করে' বিছানা পাতছে।

পিসিমা বাইরের উঠোনে কার সঙ্গে কথা কইছেন।

জিনিস নিয়ে সেই লোক এতক্ষণে এলো বুঝি। নিশ্চয়।

উঁকি মেরে দেখবার জন্যে সুভা বারান্দার জান্‌লায় এসে দাঁড়ালো। পিসিমারা ততক্ষণে ভেতরে চলে' এসেছে।

আগে কি কথা হয়েছে সুভা শুন্‌তে পায় নি। কিন্তু এখন সিঁড়ি দিয়ে দু'ধাপ নিচে নেমে না আসা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো।

পিসিমা বলছেন: তোমাকে সেই কতোটুকু দেখেছি। এখন চেনে কার সাধ্য? কী কর আজকাল?

—আর কেন বলেন? ওকালতি।

—কোথায়?

—আলিপুরে নাম একটা লিখিয়ে রেখেছি মাত্র।

—কেমন হচ্ছে?

সুকুমার হেসে বল্‌লো,—চেহারা দেখে চট্‌ করে' কিছু বুঝতে পারবেন না। কিন্তু গেল মাসের ট্র্যাম-ভাড়াও উঠে আসে নি।

সুভা আরো এক ধাপ নাম্‌লো।

পিসিমা বললেন,—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এস ওপরে।

সুকুমার বল্‌লে,—না, আমি এখন যাই।

সুকুমার চ'লেই হয় ত' যেতো।

তাহ'লে এ গল্পও আর লিখ্‌তে হ'ত না।

কিন্তু পিসিমা বল্‌লেন,—সে কি কথা! চা খেয়ে যাও।

—এই মাত্র খেয়ে আসছি।

আরো এক ধাপ। কিন্তু নামতে হ'লে এত কুণ্ঠিত হ'য়ে নামবার কী হয়েছে? শাড়িটা বদ্‌লানো উচিত



অন্তরীপ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন
শ্রীযুক্ত সুকুমার বসুর সৌজন্যে

ছিলো না? গৃহস্থের বউ,—ঘরের মধ্যে কে কবে সেজে-গুজে বিবি হ'য়ে বসে' থাকে? কিসের ভয়?

—না না, তুমি বোস। রোদ্দুরে মুখ তোমার শুকিয়ে গেছে একেবারে। বাড়ি চিনতে খুব ঘুরতে হয়েছিলো নিশ্চয়ই? বলে' পিসিমা ডাকলেন: বৌমা।

বৌমাকে ডাকবার কোনো দরকার ছিলো না।

গল্প আমাদের আগেই সুরু হ'য়ে গেছে।

সুভা তর্ তর্ করে' নেমে এলো। এবং কিছুই যেন হয় নি, হ'তে পারে না, এমনি সহজ হ'বার চেষ্টায়—সুকুমারকে, না পাশের দেয়ালকে ঠিক কিছু বোঝা গেলো না—জিগ্গেস করলে: তুমি নাকি? ওপর থেকে আমি ঠিক আওয়াজ পেয়েছি।

পিসিমা বল্লেন,—সুকুমারকে তুমি আগেই চিনতে বুঝি?

—চিন্তাম না? রাজবল্লভ-ষ্ট্রীটএ আমার বাপের বাড়ির পাশেই যে ওঁরা থাকতেন, ছেলেবেলা থেকে চেনা-শুনো। তোমরা কি এখনো সেই সতেরো নম্বরেই আছ নাকি?

এক নিমেষের জন্যে। সুকুমার প্রায় সাম্লে উঠেছে। কিন্তু সুভার মুখের দিখে সহজে সে তাকাতে পারছে না। মেঝের ওপর চোখ রেখে নির্লিপ্তের মতো বল্লে,—না। সে-বাড়ি কবে বদলেছি।

—এখন কোথায় আছ?

একটু হেসে সুকুমার বল্লে,—এই এখানে-সেখানে—

পিসিমা বল্লেন,—চা না খেয়েই পালাচ্ছিলো। ওকে ওপরে নিয়ে যাও, বৌমা। ঝি এসে কখন উনুনে আগুন দেবে ঠিক নেই।

সুভা বল্লে,—ওপরেই ত' ষ্টোভ আছে। চা আমি দু' মিনিটে করে' দিচ্ছি।

তারপর যন্ত্রচালিতের মতো সুকুমারকে বল্লে,—এস।

সুকুমার পিসিমার ঘরে তক্তপোষের ওপর সেই যে চেপে বসেছে, আর তার ওঠ্বার নাম নেই। এখান থেকে ছুটে পালাতে পারলেই সে বাঁচে। কিন্তু এ-বাড়ির বাইরে কোথায় যে তার যাবার জায়গা থাকতে পারে সহসা সে ভেবে পেলো না।

সুভা হেসে বল্লে,—এস ওপরে। ওপরে কেউ নেই।

সুকুমার মুখ তুলে চাইতেই সুভা অজান্তে একটু লজ্জিত হ'য়ে বল্লে,—মানে, মেয়েছেলে বলতে বাড়িতে একমাত্র আমিই। অপরিচিত তোমাকে দেখে কারুর সন্ত্রস্ত হ'বার কারণ নেই। এস।

সুকুমার রুমাল দিয়ে সমানে ঘাড়ের ঘাম মুছ্ছে।

সুভা বল্লে,—ভারি গরম পড়েছে ক' দিন থেকে।

—হ্যাঁ, এ-ঘরটা ত' আরো গুমোট্। পিসিমা বল্লেন: —ওপরেই যাও।

অগত্যা ওপরেই যেতে হ'বে। সাঁমনেই সিঁড়ি। অনেকগুলি ধাপ উঁচুতে উঠে গিয়ে সুভা স্মিতমুখে বল্ছে: এই যে এই দিকে।

সুকুমারকে সুভা একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে এলো। চেয়ার একটা এগিয়ে দিয়ে বল্লে,—বোস। জান্লাটা খুলে দি। একটা পাখা দেব? বলে' সে মশারির চাল হাতড়াতে লাগলো।

শুকনো গলায় সুকুমার বল্লে,—না, দরকার নেই।

সুকুমারের চোখে সুভাদের এই শোবার ঘরটি আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ঘরটি বেশ্ বড়োই। দু'ধারে দু'খানি খাট পাতা—নিচু ছোট খাট—একজনের মতো করে' বিছানা—নরম তক্তকে বিছানা। শিয়রের বালিশ-গুলো যেন সাবানের ফেনার মতো ফুলে' আছে। মাঝে একটি টিপয়,—সিল্কের ঢাক্নি; তার ওপরে পিতলের একটা ফুলদানি, সম্প্রতি তাতে ফুল নেই। টিপয়ের উপরেই ষ্ট্যাণ্ডে কা'র একটি ফটো—কিন্তু সুকুমার তা দেখতে পাচ্ছে না বলে' আমরাও পাচ্ছি না।

দেয়ালের দিকে যে একটা আল্না, তার গা ঘেঁষে পর-পর তিনটে সুটকেস্ ও উত্তরের জান্লা বাঁচিয়ে প্রকাণ্ড একটা আল্মারি—দরজার একটা পাল্লায় পুরু কাঁচ—এ-সব চোখে পড়ে বটে, কিন্তু এ-সবে চোখ বসে না।

আর, সুভার চোখে সুকুমারকেও আমরা দেখতে পেলাম।

আগের চেয়ে একটু শুকিয়েছে মনে হয়। কিন্তু দিব্যি সুপুরুষ বলতে হ'বে। চেহারায় ও জামা-কাপড়ে আভিজাত্য ও সুরুচি আছে। কপালটা অনেকখানি, ঠোঁট দু'টো চাপা, চোখের দৃষ্টি যেমনি ধারালো তেমনি গভীর। তবু কোথায় কি-একটা পরিবর্তন সুভা লক্ষ্য করছে। গোঁফ? গোঁফ ত' সে বরাবরই কামাতো। গাম্ভীর্য্য? এত দিন

পরে এমন অবস্থায় দেখা হ'লে কে কবে না একটু গম্ভীর হয়!

একটু হেসে সুভা বল্‌লে,—কেমন আছ?

সুকুমারের মুখেও সেই মরা হাসি : মন্দ কি।

আবার চুপচাপ।

হ্যাঁ, টিপয়ের ওপর ছোট একটি টাইম্‌-পিস্‌ ধুক্‌ধুক্‌ করছে।

এবার সুকুমার বল্‌লে,—তুমি কেমন আছ?

সুভা হেসে বল্‌লে,—দেখতেই পাচ্ছ।

হ্যাঁ, আমরাও দেখতে পাচ্ছি। সুভার কোথাও একটুকু দুঃখ নেই। ঘরের চারদিকে তার চিত্তের পূর্ণতা উৎসারিত হ'য়ে পড়েছে! মুখে গভীর প্রসন্নতা।

সুকুমার হঠাৎ অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্‌লো : আমার অনেক কাজ ছিলো। উঠি।

—এত কাজের মানুষ হ'লে কবে থেকে? প্র্যাক্‌টিস্‌ ত' কর্‌ছ না শুনলাম। কবিতাও ছেড়ে দিয়েছ?

সুকুমার ঠিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লো কি না বোঝা গেল না : আর কবিতা!

—তার চেয়ে স্থূলতর কিছু উপাদেয়, না? বিয়ে করো নি?

—না।

—করবে না?

—তোমার মতো প্রতিজ্ঞা করে' ত' লাভ নেই।

—তার মানে যে-কোনোদিন যে-কাউকে বিয়ে করে' ফেলতে পারো। আমাদের নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন। আমার বিয়েতে—এত করে' লিখলাম—তবু এলে না। তোমার বিয়েতে কিন্তু আমরা ঠিক যাবো। অনেক দিন একটা নেমন্তন্ন খাইনি।

অসহ্য। এই ঘর-দোর বিছানা-বালিশ—সব চেয়ে এই অত্যুগ্র পরিচ্ছন্নতা, সুভার রুক্ষ সিঁথিতে সুস্পষ্ট সিঁদূর, মাথায় কাপড়—সব চেয়ে তার এই সহজ ও নিতান্ত নির্ভয় ভঙ্গি—সুকুমারকে কশাঘাত করতে লাগলো। কান দুটো জ্বালা করে' উঠেছে, চোখ মেলে আর তাকানো যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে' সে বল্‌লে,—আর বসতে পাচ্ছি না। এখুনি যেতে হ'বে।

—খাওয়ানোর নাম শুনে ভয় পাচ্ছ নাকি? বেশ, বোস; খেতে ত' আর ভয় নেই। আমি ছাড়লেও পিসিমা তোমাকে ছাড়বেন না। ক্লান্ত বোধ করলে শুয়েও পড়তে পারো স্বচ্ছন্দে। বিছানা পাতা-ই আছে। আমি ততক্ষণে ষ্টোভটা ধরাই।

অসম্ভব। সুকুমারকে আবার বসতে হ'ল।

দরজার বাইরে বারান্দায় বসে' সুভা ষ্টোভ ধরাচ্ছে, ক্রমে-ক্রমে আর-সব জিনিস-পত্রও জড়ো হ'তে লাগলো।

হ্যাঁ, এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে কী হয়েছে!

সুভা চোখ নামিয়ে বল্‌লে,—আমার ওপর এখনো তোমার রাগ আছে নাকি?

সুকুমার বল্‌লে,—কোন্‌ অর্থে?

এবার সুভা চোখ তুলতে পেরেছে—সে-চোখে হাসি টল্‌টল্‌ করছে : চলতি-অর্থে।

—কোনো অর্থেই কিছু নেই।

—তবে এসেই অমনি পালাতে চাও কেন?

—তবে কিসের জন্য আর আসবো?

আবার চুপচাপ।

কিছুতেই সুভা দমে না : তোমার এখন ঠিকানা কি?

—দরকার?

—বা, দরকার হ'তে পারে না?

—না।

—যদি কোনোদিন চিঠি লিখ্‌তে হয়? বলে' সুভা ঘাড় বেঁকিয়ে কেমন করে' একটু হাসলো।

সঙ্কেতটি তেমনি নির্ভুল। তবু সুকুমার অবিচল কঠিন : জবাব যখন পাবে না তখন চিঠি লিখে লাভ নেই।

—জবাব পাবো না, কি করে' তুমি বুঝলে? আর জবাব না পেলে বুঝি চিঠি লিখতে নেই? কী বুদ্ধি!

সুকুমারের সমস্ত গা জ্বলে' উঠলো। প্রায় ধমকে বললে,—চা দিতে হয় ত' শিগ্‌গির দাও।

আঁচলটা জড়ো করে' প্যান্‌এর হাতলটা ধরে' নামিয়ে স্মিতমুখে সুভা বললে,—এই হ'ল। বসে' একটু করে' যেতে তোমার কি এমন রাজ্যপতন হ'বে। কত দিন পরে দেখা বল ত'।

—আমাদের কখনো এর আগে দেখা হয়েছিল নাকি?

—হয় নি? তাই ত' অপরিচিতা ভদ্রমহিলার :

অমনি মুখ গোমরা করে' কথা কইছ? বোস চুপ করে'। উঠ্তে চাইবে ত' চামচ করে' গরম জল ছিটিয়ে দেব কিন্তু। বলে' সুভা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

আরো কিছুক্ষণ।

সুভা চামচ দিয়ে লালচে জলটা নাড়তে-নাড়তে বল্লে,—চুপ করে' বসা অর্থ চুপ করে' বসা নয়, বুদ্ধিমান। গল্প করো। মাঝে মাঝে আসতে পারো না দেখা করতে? টেবি এখন কোথায়? ছেলেপিলে হ'ল কিছু? কতো দিন ছুঁড়িকে দেখি নি। কলকাতায় আসে না? শিগ্গির এলে এবার খবর দিয়ো, লক্ষীটি। কানে গেলো কথাটা?

এখান থেকে পালাতে পারলে সুকুমার বাঁচে। কোন্ একটি ম্লান দিনের হারানো সুর তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করতে সুরু করেছে। তপ্ত না হ'য়ে গায়ের রক্ত তার হিম হ'য়ে আসতে লাগলো। ঐ সেই বসবার ভঙ্গি, কথা কয়টি শেষ করে' সেই অসংলগ্ন হাসি, সেই কাছে আসবো বলে' দূরে থাকবার ইসারা।

আজো তার মনে হ'ল অনায়াসেই সে সুভার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে আনতে পারে, তেমনি গা ঘেঁসে বসে'—তার চেয়েও বেশি—একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে গল্প করতে পারে, আগের মতন অভিমান করে' অভিমান কাটিয়ে ওঠবার জন্তে প্রতীক্ষা করতে পারে। একেবারে অনায়াসে, এতটুকু দ্বিধা না করে'।

কিন্তু মাত্র এতটুকুই।

সুকুমার অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠলো: নাও, সারো শিগগির করে'। লাইট্ চা-ই আমি খাই।

চা-টা পেয়ালায় ঢালতে-ঢালতে সুভা বল্লে,—রোসো গো রোসো, দিচ্ছি।

হাত বাড়াবে ভেবেছিলো, তার আগেই সুভা টিপয়টা সুকুমারের সামনে টেনে এনে তার ওপর চা রাখলে। বল্লে,—কিছুক্ষণ আরো বসিয়ে রাখতে পারলাম যা-হোক। ততক্ষণে দুটো অমলেট্ ভেজে ফেলি।

পেয়ালাটা মুখ থেকে নামিয়ে সুকুমার বল্লে,—সর্ব্বনাশ। তা হ'লে সত্যিই চলে' যাবো, সুভা।

সুভার দুই চোখ কৌতুকে প্রখর হ'য়ে উঠলো: আমার নাম ধরে' ডাকলে যে। দাঁড়াও, খেয়েই যেতে হ'বে তোমাকে। এর আগে আমাদের আর কোনোদিন দেখা হয় নি, না?

ব'লেই আবার তার ঝিক্‌মিক্ হাসি।

অলক্ষিতে কখন সুভার নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সুভার কথা শুনে তবে খেয়াল হ'ল।

তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দাবিয়ে রেখে সুকুমার বল্লে,—আমি যদি চলে' যাই, তুমি আমাকে ধরে' রাখতে পারো নাকি?

সুভার মুখের দীপ্তি আর কিছুতেই অস্ত যায় না: অনায়াসে পারি।

চায়ের কাপ্টা না-ফুরোতেই টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে সুকুমার পিঠ টান্ করে' বসলো: কিসের জোরে পারো শুনি?

—নিতান্তই গায়ের জোরে। তুমি পারবে নাকি আমার সঙ্গে? কী রকম চোয়াড়ে হাত দেখেছ। বলে' সুভা তার অনাবৃত ডান হাতখানি মুঠি চেপে শক্ত করে' মেলে ধরলো: পাঞ্জা লড়বে?

হোপ্‌লেস্। সুকুমার পিঠটাকে নরম করে' আনলে।

সুভা হাসিমুখে ডিম ঘাঁটতে বসলো।

গলা খাঁখরে সুকুমার বললে,—আমাকে যে একা-একা ওপরে নিয়ে এলে—তোমার ভয় করে না?

—ভয়? ভয় করবে কেন?

ঢোঁক গিলে সুকুমার বললে,—যদি সিতা—তোমার স্বামী—

—কে, আমার স্বামী? সিতাংশু বাবু? হ্যাঁ, তাঁর কি হয়েছে?

এক মুহূর্ত্ত সুকুমারের মুখে কোনো কথা এলো না। ফের ঢোঁক গিলে সে বল্লে,—যদি তিনি এখন এসে পড়েন?

তবুও সুভা গম্ভীর হ'তে জানে না। হেসে বল্লে,—ভালোই হয়। দু'বার করে' আমার চা করতে হয় না।

সুকুমার তাড়াতাড়ি চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এখানে আর কতো ক্ষণ থাকলে তার দম বন্ধ হ'য়ে আসবে। বল্লে,—আমাকে মাপ কোরো, আর বসতে পারবো না।

তারপর সিঁড়ির কাছে চলে' এসে ঘাড় ফিরিয়ে

পরে এমন অবস্থায় দেখা হ'লে কে করে না একটু গম্ভীর হয়!

একটু হেসে সুভা বল্লে,—কেমন আছ?

সুকুমারের মুখেও সেই মরা হাসি: মন্দ কি।

আবার চুপচাপ।

হ্যাঁ, টিপয়ের ওপর ছোট একটি টাইম্‌-পিস্ ধুক্‌ধুক্ করছে।

এবার সুকুমার বল্লে,—তুমি কেমন আছ?

সুভা হেসে বল্লে,—দেখতেই পাচ্ছ।

হ্যাঁ, আমরাও দেখতে পাচ্ছি। সুভার কোথাও এতটুকু দুঃখ নেই। ঘরের চারদিকে তার চিত্তের পূর্ণতা উৎসারিত হ'য়ে পড়েছে! মুখে গভীর প্রসন্নতা।

সুকুমার হঠাৎ অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্‌লো: আমার অনেক কাজ ছিলো। উঠি।

—এত কাজের মানুষ হ'লে কবে থেকে? প্র্যাক্‌টিস্ ত' করই না শুন্‌লাম। কবিতাও ছেড়ে দিয়েছ?

সুকুমার ঠিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লো কি না বোঝা গেল না: আর কবিতা!

—তার চেয়ে স্থূলতর কিছু উপাদেয়, না? বিয়ে করো নি?

—না।

—করবে না?

—তোমার মতো প্রতিজ্ঞা করে' ত' লাভ নেই।

—তার মানে যে-কোনোদিন যে-কাউকে বিয়ে করে' ফেলতে পারো। আমাদের নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন। আমার বিয়েতে—এত করে' লিখলাম—তবু এলে না। তোমার বিয়েতে কিন্তু আমরা ঠিক যাবো। অনেক দিন একটা নেমন্তন্ন খাইনি।

অসহ্য। এই ঘর-দোর বিছানা-বালিশ—সব চেয়ে এই অত্যুগ্র পরিচ্ছন্নতা, সুভার রুক্ষ সিঁথিতে সুস্পষ্ট সিঁদুর, মাথায় কাপড়—সব চেয়ে তার এই সহজ ও নিতান্ত নির্ভয় ভঙ্গি—সুকুমারকে কশাঘাত করতে লাগলো। কান দুটো জ্বালা করে' উঠেছে, চোখ মেলে আর তাকানো যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে' সে বল্লে,—আর বসতে পাচ্ছি না। এখুনি যেতে হ'বে।

—খাওয়ানোর নাম শুনে ভয় পাচ্ছ নাকি? বেশ, বোস; খেতে ত' আর ভয় নেই। আমি ছাড়লেও পিসিমা তোমাকে ছাড়বেন না। ক্লান্ত বোধ করলে শুয়েও পড়তে পারো স্বচ্ছন্দে। বিছানা পাতা-ই আছে। আমি ততক্ষণে ষ্টোভটা ধরাই।

অসম্ভব। সুকুমারকে আবার বসতে হ'ল।

দরজার বাইরে বারান্দায় বসে' সুভা ষ্টোভ ধরাচ্ছে। ক্রমে-ক্রমে আর-সব জিনিস-পত্রও জড়ো হ'তে লাগলো।

হ্যাঁ, এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে কী হয়েছে!

সুভা চোখ নামিয়ে বল্লে,—আমার ওপর এখনো তোমার রাগ আছে নাকি?

সুকুমার বল্লে,—কোন্ অর্থে?

এবার সুভা চোখ তুলতে পেরেছে—সে-চোখে হাসি টল্‌টল্ করছে: চলতি-অর্থে।

—কোনো অর্থেই কিছু নেই।

—তবে এসেই অমনি পালাতে চাও কেন?

—তবে কিসের জন্য আর আসবো?

আবার চুপচাপ।

কিছুতেই সুভা দমে না: তোমার এখন ঠিকানা কি?

—দরকার?

—বা, দরকার হ'তে পারে না?

—না।

—যদি কোনোদিন চিঠি লিখ্‌তে হয়? বলে' সুভা ঘাড় বেঁকিয়ে কেমন করে' একটু হাসলো।

সঙ্কেতটি তেমনি নির্ভুল। তবু সুকুমার অবিচল, কঠিন: জবাব যখন পাবে না তখন চিঠি লিখে লাভ নেই।

—জবাব পাবো না, কি করে' তুমি বুঝলে? আর, জবাব না পেলে বুঝি চিঠি লিখতে নেই? কী বুদ্ধি!

সুকুমারের সমস্ত গা জ্বলে' উঠলো। প্রায় ধমকে বললে,—চা দিতে হয় ত' শিগ্‌গির দাও।

আঁচলটা জড়ো করে' প্যান্‌এর হাতলটা ধরে' নামিয়ে স্মিতমুখে সুভা বল্লে,—এই হ'ল। বসে' একটু গল্প করে' যেতে তোমার কি এমন রাজ্যপতন হ'বে। কতো দিন পরে দেখা বল ত'।

—আমাদের কখনো এর আগে দেখা হয়েছিলো নাকি?

—হয় নি? তাই ত' অপরিচিতা ভদ্রমহিলার সঙ্গে

অমনি মুখ গোমরা করে' কথা কইছ? বোস চুপ করে'। উঠ্‌তে চাইবে ত' চামচ করে' গরম জল ছিটিয়ে দেব কিন্তু। বলে' সুভা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

আরো কিছুক্ষণ।

সুভা চামচ দিয়ে লালচে জলটা নাড়তে-নাড়তে বল্‌লে,—চুপ করে' বসা অর্থ চুপ করে' বসা নয়, বুদ্ধিমান। গল্প করো। মাঝে মাঝে আসতে পারো না দেখা করতে? টেবি এখন কোথায়? ছেলেপিলে হ'ল কিছু? কতো দিন ছুঁড়িকে দেখি নি। কলকাতায় আসে না? শিগ্‌গির এলে এবার খবর দিয়ো, লক্ষ্মীটি। কানে গেলো কথাটা?

এখান থেকে পালাতে পারলে সুকুমার বাঁচে। কোন্ একটি ম্লান দিনের হারানো সুর তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করতে সুরু করেছে। তপ্ত না হ'য়ে গায়ের রক্ত তার হিম হ'য়ে আসতে লাগলো। ঐ সেই বসবার ভঙ্গি, কথা কয়টি শেষ করে' সেই অসংলগ্ন হাসি, সেই কাছে আসবো বলে' দূরে থাকবার ইসারা।

আজো তার মনে হ'ল অনায়াসেই সে সুভার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে আনতে পারে, তেমনি গা ঘেঁসে বসে'—তার চেয়েও বেশি—একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে গল্প করতে পারে, আগের মতন অভিমান করে' অভিমান কাটিয়ে ওঠবার জন্যে প্রতীক্ষা করতে পারে। একেবারে অনায়াসে, এতটুকু দ্বিধা না করে'।

কিন্তু মাত্র এতটুকুই।

সুকুমার অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে বলে' উঠলো: নাও, সারো শিগগির করে'। লাইট্ চা-ই আমি খাই।

চা-টা পেয়ালায় ঢালতে-ঢালতে সুভা বল্‌লে,—রোসো গো রোসো, দিচ্ছি।

হাত বাড়াবে ভেবেছিলো, তার আগেই সুভা টিপয়টা সুকুমারের সামনে টেনে এনে তার ওপর চা রাখলে। বল্‌লে,—কিছুক্ষণ আরো বসিয়ে রাখতে পারলাম যা-হোক। ততক্ষণে দুটো অমলেট্ ভেজে ফেলি।

পেয়ালাটা মুখ থেকে নামিয়ে সুকুমার বল্‌লে,—সর্ব্বনাশ। তা হ'লে সত্যিই চলে' যাবো, সুভা।

সুভার দুই চোখ কৌতুকে প্রখর হ'য়ে উঠলো: আমার নাম ধরে' ডাকলে যে। দাঁড়াও, খেয়েই যেতে হ'বে তোমাকে। এর আগে আমাদের আর কোনোদিন দেখা হয় নি, না?

ব'লেই আবার তার ঝিক্‌মিক্ হাসি।

অলক্ষিতে কখন সুভার নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সুভার কথা শুনে তবে খেয়াল হ'ল।

তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দাবিয়ে রেখে সুকুমার বল্‌লে,—আমি যদি চলে' যাই, তুমি আমাকে ধরে' রাখতে পারো নাকি?

সুভার মুখের দীপ্তি আর কিছুতেই অস্ত যায় না: অনায়াসে পারি।

চায়ের কাপ্‌টা না-ফুরোতেই টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে সুকুমার পিঠ টান্ করে' বসলো: কিসের জোরে পারো শুনি?

—নিতান্তই গায়ের জোরে। তুমি পারবে নাকি আমার সঙ্গে? কী রকম চোয়াড়ে হাত দেখেছ। বলে' সুভা তার অনাবৃত ডান হাতখানি মুঠি চেপে শক্ত করে' মেলে ধরলো: পাঞ্জা লড়বে?

হোপ্‌লেস্। সুকুমার পিঠটাকে নরম করে' আনলে।

সুভা হাসিমুখে ডিম ঘাঁটতে বসলো।

গলা খাঁখরে সুকুমার বললে,—আমাকে যে একা-একা ওপরে নিয়ে এলে—তোমার ভয় করে না?

—ভয়? ভয় করবে কেন?

ঢেঁাক গিলে সুকুমার বললে,—যদি সিতা—তোমার স্বামী—

—কে, আমার স্বামী? সিতাংশু বাবু? হ্যাঁ, তাঁর কি হয়েছে?

এক মুহূর্ত্ত সুকুমারের মুখে কোনো কথা এলো না। ফের ঢেঁাক গিলে সে বল্‌লে,—যদি তিনি এখন এসে পড়েন?

তবুও সুভা গম্ভীর হ'তে জানে না। হেসে বল্‌লে,—ভালোই হয়। দু'বার করে' আমার চা করতে হয় না।

সুকুমার তাড়াতাড়ি চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এখানে আর কতো ক্ষণ থাকলে তার দম বন্ধ হ'য়ে আসবে। বল্‌লে,—আমাকে মাপ কোরো, আর বসতে পারবো না।

তারপর সিঁড়ির কাছে চলে' এসে ঘাড় ফিরিয়ে

সুকুমার ফের বল্লে,—কৈ, ধরে' রাখতে ত' পারলে না দেখছি।

সুভা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' তেমনি অমলেট ভাজ্‌ছে। মুখ না তুলে চামচটা নাড়তে-নাড়তে বললে,—আমার চেয়ে তোমার যে দেখছি বেশি ভয়।

সুকুমার থমকে দাঁড়ালো: ভয়? কাকে?

ঘাড়টা প্রায় বুকের কাছে নামিয়ে এনে সুভা বল্লে,—আর কাকে! সিতাংশু বাবুকে।

তারপর বড়ো বড়ো চোখ দু'টি সুকুমারের মুখের উপর তুলে ধরলো: ভয় নেই, ফিরতে তাঁর এখনো ঢের দেরি। ঘণ্টাখানেক তুমি স্বচ্ছন্দে গল্প করে' যেতে পারো। কতো দিন পরে দেখা হ'ল বলো ত'?

সুকুমার পা বাড়াতে যাচ্ছিলো। কঠিন হ'য়ে বললো,—পাঁচ বছর ধরে' ত' অনেক গল্পই করেছিলাম। আবার গল্প কি!

চোখ নামিয়ে সুভা বললে,—তা হ'লে যাও।

যাও বললেই কি যাওয়া যায়?

সুকুমার তাড়াতাড়ি মেঝের উপর সুভার মুখোমুখি বসে' পড়লো। সুভা দিলো হেসে। বললে,—কি, তোমায় ধরে' রাখতে পারি না?

সুকুমার বল্লো,—পারো বলে'ই ত' মনে হ'ত। দাও, যথেষ্ট ভাজা হয়েছে। বলে' অমলেট্ এর উদ্দেশে হাত বাড়ালো।

অলক্ষিতে সে-হাত এসে লাগলো সুভার বাহুর উপর। কালো পাথরের মতো স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা বাহুর উপর।

সুভা বললে,—দাঁড়াও গো, দিচ্ছি।

অমলেট্এর খানিকটা ছিঁড়ে চিবুতে-চিবুতে ভরা-মুখে সুকুমার বললে,—তুমি কিছু খেলে না? সে হ'বে না। বাকিটা তোমায় খেতে হ'বে। হাঁ করো। আমি খাইয়ে দিচ্ছি। কেউ দেখবে না।

সুকুমার তাকে খাওয়াবেই। মুখ সরিয়ে নিয়ে সুভা বললে,—দেখলে ত' ভারি বয়ে' যেতো। সে-কথা হচ্ছে না। আমি এখন কিছু খাবো না। উনি কলেজ থেকে ফিরলে তবে আমরা একসঙ্গে চা খাই।

সুকুমার হাত গুটিয়ে আনলো। ক্ষণকালের জন্য সে বুঝি অতীত পাঁচটা বছর এক নিশ্বাসে পার হ'য়ে গিয়েছিলো। রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের ষোলো নম্বর বাড়ির দোতলার বারান্দায় যেন সেই পরিচিত দুপুরের রোদটি এসে পড়েছে! দু'জনকে বেষ্টন করে' সেই চেনা স্তব্ধতাটি বিরাজ করছে!

ঝট করে' সুকুমার উঠে পড়লো। বল্লো,—তোমার সব কথাই রাখলাম যা হোক্। ডিম পর্য্যন্ত খেয়ে গেলাম।

সুভা হেসে বল্লে,—ঘোড়ার ডিম! কিন্তু গল্প ত' করে' গেলে না।

—সে ত' শুধু গল্পই। গল্প করতে-করতে—শেষকালে সিতাংশু বাবু যদি এসে পড়েন!

—আসবেন।

—এসে আমাদের একসঙ্গে যদি দেখে ফেলেন!

—আমরা একসঙ্গে ভস্ম হ'য়ে যাবো!

—তোমাকে ত' একটা জবাবদিহি দিতে হ'বে। তোমাকে বিপদে ফেলে লাভ কী!

সুভাও ততক্ষণে উঠেছে। হাত তুলে চুলটা ঠিক করে' নিয়ে বল্লে,—খুব উদার দেখছি যে। ধন্যবাদ।

—নিশ্চয়ই উদার। সুকুমার দু' ধাপ নেমে আবার ফিরে দাঁড়ালো: আমি ইচ্ছে করলে তোমার কী সর্ব্বনাশ না করতে পারতাম। তোমার কলঙ্ক ত' আমিই চাপা দিয়ে রেখেছি। আমি বিদ্রোহ করলে তোমাকে আর এই সিংহাসনে বসে' রাজত্ব করতে হ'ত না।

তরল হাসির জলে সুভার কালো কুচ্‌কুচে দু'টি চোখের তারা সাঁতার দিচ্ছে। এবার সে খিল খিল করে' হেসে উঠলো: তাই নাকি? কিন্তু একটা কথা যে তুমি জানো না। শুনে যাও।

সুকুমার দাঁড়ালো। সুভার কথা শুনবার জন্যে নয়। এক-থালা খাবার ও জলের গ্লাশ হাতে করে' পিসিমা সিঁড়ির মাঝপথে তাকে আটকে ফেলেছেন:

—না, না, এ আবার এমন-কি জিনিস!

সুকুমার বলছে: বা, এইমাত্র আমি চা-টা একগাদা কি-সব খেয়ে এলাম যে।

রেলিঙে দু'হাতের ভর রেখে—আঁকাবাঁকা দু' চার গাছি চুল ঘোমটার ফাঁক দিয়ে নেমে এসেছে—সুভা ঝুঁকে পড়ে' বল্লে,—কিছু না পিসিমা। একটি অমলেট, তারো মাত্র আধখানা। ধরে' নিয়ে এস ওপরে।

সুকুমারকে আবার উপরে আসতে হ'ল।

সুভা হেসে উঠলো। বল্‌লো: কী মজা! ভালো ছেলের মতো চুপটি করে' বসে' গেল' এবার।

সুকুমার বললো,—অসুখ করলে কে দায়ী হবে?

পিসিমা টিপয়ের উপর ডিস্‌টা রেখে চেয়ারটা টেনে দিয়ে বললেন,—ভারি ত' দুটো মিষ্টি, তায় অসুখ করবে না হাতি! অসুখ করলে বউ সেবা করবে। বউ আছে কি করতে?

সুভা চোখ নাচিয়ে বললে,—বিয়ে করেছে নাকি?

পিসিমা চোখ বড়ো করে' বললেন,—বিয়ে করো নি এখনো? বলে কি! তা হ'লে—

পিসিমা মনে-মনে বোধ করি পাত্রী নির্ব্বাচন করতে লাগলেন।

সুভা বল্‌লে,—কলেজে পড়বার সময় পাড়ার এক মেয়েকে নাকি ভীষণ মনে ধরে' গিয়েছিলো। সে-মেয়ের অন্য জায়গায় বিয়ে হ'য়ে যেতেই উনি প্রতিজ্ঞা করেছেন বিয়ে করবেন না।

পিসিমাও হেসে উঠলেন: দূর পাগল!

কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও সুভা নেই। বলে'ই সে পালিয়েছে।

অগত্যা খাবারগুলো একে-একে উদরস্থ করা ছাড়া উপায় কি!

পিসিমা নানা-প্রকার জরুরি সংবাদ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। এখন আর সুভার উপস্থিত থাকবার দরকার নেই। অতিথি-সৎকারে ত্রুটি না হ'লেই হ'ল। ঘরের কাজ-কর্ম্ম এখনো তার কিছু বাকি আছে।

অশুচি গ্লানির মতো যার স্মৃতি পর্য্যন্ত সে মন থেকে মুছে দিয়েছে, ভাগ্যের এমনি চমৎকার পরিহাস—তারই ছায়ায় এসে কি না তাকে বিশ্রাম নিতে হ'ল। শুধু তাই নয়, হাত পেতে খাবার খেতে হ'ল, মৌখিক আলাপে সৌজন্যেরো এতটুকু অভাব হ'ল না, উল্‌টে' তাকেই কি না শ্লেষ! অথচ কিছুই তার করবার নেই। একটা কঠিন কথাও মুখ দিয়ে বেরুল না। দু'বার নামবার চেষ্টা করে' দু'বারেই সে ফিরে এলো, এবং দু'বারই কি না খেতে!

জলের গ্লাশে তক্ষুনি চুমুক দিয়ে রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে সুকুমার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। আর সে বসছে না।

পিসিমা বললেন,—দাঁড়াও। বৌমা, সুকুমারকে পান দিয়ে যাও।

সুভা তা হ'লে এতক্ষণ তার জন্যে পান সাজছিলো!

ডাক শুনে পাশের ঘর থেকে সুভা বেরিয়ে এলো—বাঁ হাতের মুঠিতে চুলের গোছা ধরা, ডান-হাতের চিরুনিটা চুলেরই মধ্যে আটকানো। সিতাংশুর বাড়ি ফিরবার সময় হ'ল। ঘর-দোরের সঙ্গে গৃহিণীটিও ফিটফাট হ'য়ে না থাকলে তার রোচে না। তা ছাড়া কোন্‌দিন তার বেড়াতে বেরুবার খেয়াল হ'বে বলা কঠিন। তাই আগে থেকেই একটু এগিয়ে থাকা ভালো।

চুলের গোছা ছেড়ে দিয়ে ঘোমটাটা মাথার উপর গুছোতে-গুছোতে সুভা বল্‌লে,—তুমি আজকাল পান খাও নাকি?

—না।

সুকুমার আর দাঁড়াচ্ছে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই বাঁ দিকে একটা জান্‌লা। সেই জান্‌লা দিয়ে ঘরের দিকে আরেকবার—শেষবার, হ্যাঁ, শেষবারই ত'—না-তাকিয়ে সে পারলে না। দেয়ালের দুই প্রান্ত ঘেঁসে দু'খানি খাট, তাতে পরিপাটি করে' আলাদা বিছানা পাতা। মাঝখানে একটা টিপয় সেই ব্যবধান আরো সঙ্কীর্ণ করে' এনেছে। টিপয়ের উপর পেতলের একটা ফুলদানি, ষ্ট্যাণ্ডএ কা'র একখানি ফটো—তার যে নয় সে তা জানে।

একখানি নয়—পাশাপাশি দু'খানি ফটো। একখানি ত' সুভার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অন্যটা যে তার নয় তাকে তা আমাদের বলে' দিতে হ'বে না।

কথার পিঠে পিসিমা বললেন,—কিন্তু কিছু মশ্‌লা—

—হ্যাঁ, যাই। বলে' সুভা পিঠময় চুল ছড়িয়ে দিয়ে ছুটে নিচে নেমে গেল। বল্‌ল:

—দাঁড়াও, মশলা নিয়ে যাও। ছুটে পালাচ্ছ কি অমনি? তোমাকে যে ধরে' রাখতে পারা যাবে না তা জানি গো জানি। কিন্তু দু'দণ্ড বসে' গল্প করে' গেলে তোমার জাত যেত না।

সুকুমার ফিরে দাঁড়ালো।

সুভা এবার আর ঘোমটাটা মাথায় তুলে দিতে ব্যস্ত হ'ল না। বরং, সাহস করে' এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যে সুকুমার সহসা কী করে' বসতে পারে ভাবতে সুকুমারেরই বুক কেঁপে উঠলো।

সুকুমার শুধু বললে,—মশ্‌লা লাগবে না।

—সে আমাকে বলে' দিতে হ'বে না, বুদ্ধিমান। অতিথি বিদায় নেবার সময় তাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে হয়। কোনো ভদ্রতারই ধার ধার না আজকাল।—তারপর হেসে:

—কিন্তু কী মজাই আজ হ'ল বলো ত'। আমার মুখ দেখবে না বলে' সেই যে ঢাক পিটিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা গেলো চুরমার হ'য়ে। তবে আর কি! মাঝে-মাঝে এসো এবার।

সুকুমার বললে,—অতিথি বিদায় নেবার সময় তাকে মাঝে-মাঝে আসতেও বলতে হয় নাকি?

—হয় বৈ কি।

—কিন্তু এত সদাব্রত হ'লে দেউলে হ'য়ে যেতে কতোক্ষণ!

সুকুমার বসবার ঘর পেরিয়ে রোয়াকে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুভা হেসে বললে,—আমাকে তুমি এতই কাঁচা ব্যবসাদার ঠাওরালে নাকি? সে-ভয় তোমার না করলেও চলবে।

সুকুমার উঠোনে নেমেছে। বললে,—ভয়-ই কি ঠিক, না করুণা!

—তবে করুণা করে' মাঝে-মাঝে এলেই ত' পারো।

—দরকার নেই।

—পৃথিবীতে সব জিনিসই কি দরকার মেপে করতে হয় নাকি?

রাস্তায় পা ফেলবার আগে সুকুমার বললে,—তোমার কাছ থেকে অন্তত এইটুকু ত' আমি শিখেছি।

সেই যে গেলো আর একবারো পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো না। রোয়াকের ধারে দেয়াল ধরে' সুভা তাকে দেখছে কি না সেটুকু দেখতে পর্য্যন্ত না।

কে জানে সুভা হয় ত' সামনের দোকানের বেচা-কেনা দেখছে।

"তোমারে বাসিয়া ভালো—"

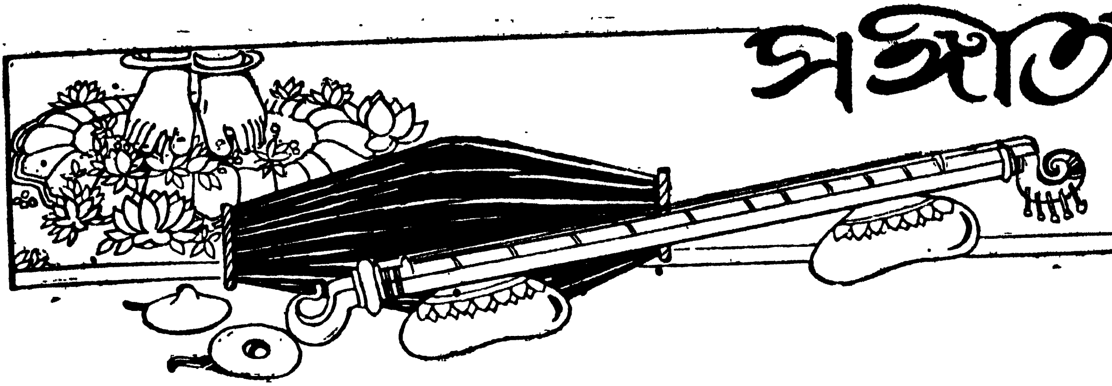
শ্রীরাধারাণী দেবী

তোমারে বাসিয়া ভালো, অপমান যত
লভিতেছি ওগো প্রিয়! সে-ই শ্রেষ্ঠদান
দিতেছেন বিধি মোরে। পরম-সম্মান
গণি' তাই, যত পাই লাঞ্ছনা নিয়ত।

তোমারে বাসিয়া ভালো সুখী আমি কত
কেমনে জানাব বন্ধু?—তাহার সন্ধান
জানে শুধু অন্তর্যামী। ক্ষুদ্র মোর প্রাণ
উথলি' পড়িছে প্রেমে উচ্ছ্বসি' সতত।

শুধায়োনা কোনো প্রশ্ন,—শুধু তব হিয়া
রাখি মোর হিয়াপাতে লহ তা' পড়িয়া।

দুঃখ ব্যথা ক্ষয় ক্ষতি ঘৃণা অপমান
সোণা হয়ে উঠিয়াছে আজি তব প্রেমে,—
সার্থক আনন্দ প্রাণে লভি' অফুরাণ
স্বর্গ আসিয়াছে সখা মর্ত্ত্যে যেন নেমে।



গান

কথা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় বি-এ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

আমার গানের মালা খানি
সকল স্মৃতির ব্যথায় ভ'রে—
দিগন্তে আজ ছড়িয়ে পড়ুক্
কমল চরণ তোমার ঘিরে।

তোমার আমার প্রেম-বারতা
আমাদের সব গোপন ব্যথা—
উঠুক্ ফুটে হে প্রিয়তম—
নিবিড় করে থরে থরে।

এ তো শুধু নয়কো মালা
এ যে প্রিয় হৃদয়-গলা
বিরহেরি তপ্ত জ্বালা
গেঁথেছি গো তোমার তরে।

II { মধা ধা ণধা | পধা মপা পা | রমা মা জ্ঞা | রা া- -া |
আ- মা --র্ গা- নে র্ মা লা খা নি - -

সা রা রা | পমা -া পা | ধা -া -া | -া ণা ধপা |
স ক ল স্ম- - - তি - - - - -র্

পধা পা -া | মা গা পা | মা -া -া | -া -া -া | II
ব্য- থা - - য় ভ রে - - - - - -

(রা রা -জ্ঞা | রজ্ঞরা সা সা | রা রমা মা | গা মা মা |
দি গ -ন্ তে-- আ জ্ ছ ড়ি- য়ে প ড়ু ক্

মা ধা ধা | র্ণসা র্ণসা র্সা | র্সর্রা ধা র্সা | না ধা নমা) } |
ক ম ল্ চ- র ন্ তো- মা • র্ ঘি রে --

{ ধা ধা ধণধা | পধা মপা মপা | ধা ধা পধর্সা | র্ণসণা ধা -া |
তো মা --র্ আ- মা -র্ প্রে ম্ বা--, র-- তা -

মা ধা ণা | ণা ধণর্সা র্সা | র্সর্রা ধা র্সা | ণা ধণর্সা ণা } |
আ মা - দে --র্ সব্ গো- প ন ব্য থা-- -

ধণা পধা র্সা | ণা ধা -া | -া -া -া | -া -া -া |
উ- ঠু ক্ ফু টে - - - - - - -

মপা পা ণা | ণা ণা -া | পণা র্সর্রা র্সা | ণা ধণর্সা ণা |
উ- ঠু ক্ ফু টে - হে- -- প্রি য় ত-- ম্

ধা ধা -াণা | ধণধা পা -া | পধা পা মগপা | মা -া -া |
নি বি -ড়্ ক-- রে - থ- রে থ-- রে - -

{ ধা ধা -া | পধপা মরা মা | মপা মা পধা | পা ধা -া |
এ ত প্রি- য়- - ন য় ক মা লা -

মা ধা -া | ণা পণা র্সর্রা | সা পধা র্সা | ণা ধা -া } |
এ যে - প্রি য়- -- হৃ দ য়্ গ লা -

র্সা র্সা র্রা | র্রা র্সর্রর্গর্মা র্গা | র্রা র্গর্রা র্সা | ন র্সা -া |
বি র - হে রি--- - ত -প্ ত জ্বা লা -

মা মা মা | পা -া ধণা | পধা পর্সা র্ণসণা | ধা -া পমা |
গেঁ থে ছি গো - তো মা র ত রে - - -

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ

(৪)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব—হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১২৪১ সালে পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি গদাধর নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার পিতার নাম খুদীরাম চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুর শৈশবে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। শৈশবেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। তৎপরে ১৭।১৮ বৎসর বয়সে অগ্রজ রামকুমারের সহিত কলিকাতায় আগমন করেন এবং ক্রমে রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীর পূজারী নিযুক্ত হন। কথিত আছে, একাদশ বর্ষ বয়সে স্বগ্রামের নিকট এক জনহীন প্রান্তরে নীল আকাশে নীরদ-বরণী মায়ের অদ্ভুত জ্যোতিঃ দেখিয়া রামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম ভাব-সমাধি। দক্ষিণেশ্বরে কালীর পূজারি রূপে নিযুক্ত হইয়া এই স্থানেই তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হয়। এই স্থানেই তাঁহার ধর্ম্মভাবের অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সকল ধর্ম্মের মূল অবগত হইবার মানসে ইনি প্রথম প্রথম মুসলমানের দেবতা আল্লা ও ইংরাজের দেবতা খৃষ্টের উপাসনা করিয়াছিলেন। ইনি ঠিকমত শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক ইহার কিছুই ছিলেন না, অথচ সবই ছিলেন। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব ইঁহার মধ্যেই প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। শুনা যায় কেশবচন্দ্র ইঁহার নিকট হইতেই এই ভাব গ্রহণ করিয়া নববিধান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ রামকৃষ্ণের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। অল্প বয়সেই তিনি ভার্য্যা সারদা দেবীর সম্মতি লইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথম এক সন্ন্যাসিনীর নিকট,



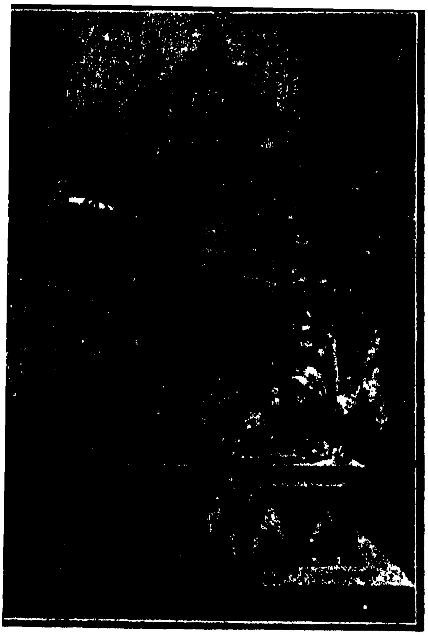
রামকৃষ্ণ পরমহংস

তাহার পরে তোতাপুরী নামক এক যোগীর নিকট যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন।

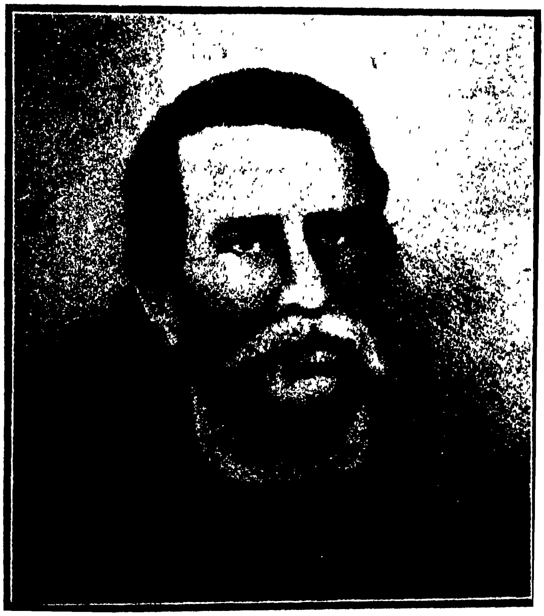
রামকৃষ্ণ কখন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন নাই। তিনি সংসারেই নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া অতি সহজ ভাষায় উপমা দিয়া ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সকল সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশ-প্রণালীর ইহাই বিশেষত্ব। তাঁহার ভক্তের সংখ্যা অনেক এবং শুধু তাহা বাঙ্গালার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে,—ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এমন কি আমেরিকাতেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন লোক অনেক আছেন। প্রতাপ মজুমদার, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ স্বামী, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে অবতার স্বরূপে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণের নাম সংযুক্ত ভারতের নানা স্থানে যত অধিক সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জগতের অন্যত্র এমন অন্য একজনের নামে হয় নাই। একজন অশিক্ষিত পূজারী ব্রাহ্মণের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর এই প্রভাব দেখিয়া তাঁহার অসাধারণত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নশ্বর-দেহের অবসান হয়। যে সকল মহামানবের উদ্ভবে বাঙ্গালা ধন্য হইয়াছে রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

* * *

রাণী রাসমণি—হালিসহরের নিকট কোনা নামক গ্রামে ১২০০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। তিনি একজন সামান্য লোক ছিলেন,—জাতিতে মাহিষ্য। রাসমণি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন একাদশ বৎসর বয়সে কলিকাতার তদানীন্তন একজন বিশিষ্ট ধনী প্রীতিরাম মাড়ের দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছিলেন শ্বশুরালয়ে আসিয়া স্বামীর নিকট কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটায় বিষয় সম্পত্তির ভার রাজচন্দ্রের হস্তেই পতিত হয়। তিনি পত্নী পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করিতেন না। ইহা রাসমণির বিষয়বুদ্ধি স্ফুরিত হইয়াছিল। ১২৪৩ সালে রাজচন্দ্র পরলোক গমন করিলে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য রাসমণীর হস্তে আইসে। তখন নগদ ও শেয়ার প্রভৃতি প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ছিল। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন দরিদ্রের দুঃখ কত ভীষণ তাহা তিনি জানিতেন। ইহার ফলে তিনি আজীবন দরিদ্রের দুঃখমোচনে অতি যত্নশীলা ছিলেন। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন,



রাণী রাসমণির রৌপ্য-রথ



ভূদেব মুখোপাধ্যায় (যৌবনে)

সৎকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, বংশ-গৌরব বৃদ্ধির জন্য যথা কর্ত্তব্য করিয়াছেন ; কিন্তু এই বিপুল সম্পত্তির কিছুমাত্র অপব্যয় করেন নাই ; বরং ইহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। রাজচন্দ্রবাবু আহিরীটোলার স্নানের ঘাট, নিমতলার ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের গৃহ, জানবাজার হইতে ইডেন্‌গার্ডেন্ পর্য্যন্ত রাস্তার দুইধারে নহর, বাবুর ঘাট, চানকের তালপুকুর প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যাদির দ্বারা যে যশোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, রাসমণি তাহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার দান অসাধারণ ছিল। পুরীধামে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার হীরকমুকুট তিনিই দিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় শত শত লোককে অন্ন দিয়া প্রাণরক্ষা

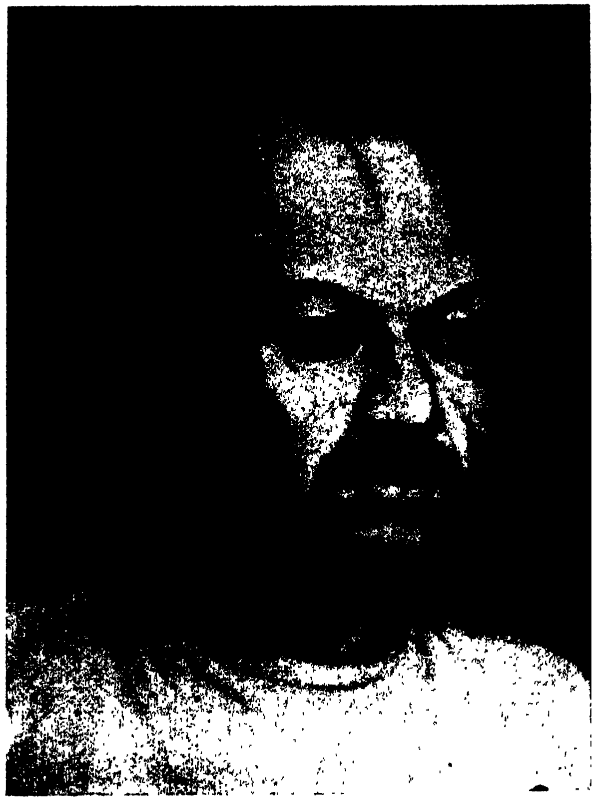


নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

করিয়াছেন। ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষ্যে তিনি বহু ব্যয় করিতেন। তাঁহার রৌপ্যরথ কলিকাতার একটী দর্শনীয় বস্তু। আর দক্ষিণেশ্বরের কীর্ত্তি—ইহা জগতের অমর কীর্ত্তি। তাঁহার ধর্ম্মে যেমন অটল বিশ্বাস, দেব দেবীতে অচলা ভক্তি, তেমনি তাঁহার তেজস্বিতা, সৎসাহস ও সত্য রক্ষার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। গঙ্গায় জেলেদের মাছ ধরিবার কর সম্পর্কে ও নবপত্রিকা স্নান উপলক্ষ্যে বাদ্যধ্বনি সম্পর্কে তাঁহার সরকারের সহিত ব্যবহারের ও দস্যুদের দ্বারা তাঁহার নৌকা আক্রমণ বিষয়ে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহা একজন বঙ্গমহিলার পক্ষে গৌরবের কথা। রাণীর পুত্রসন্তান ছিল না, তিনটী কন্যাকে রাখিয়া ১২৬৭ সালে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * * *

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার হরিতকীবাগান নামক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ইনি একজন বিখ্যাত শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহাদের আদি বাস খানাকুল কৃষ্ণনগর। বিশ্বনাথের পিতা হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম প্রথম



রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক

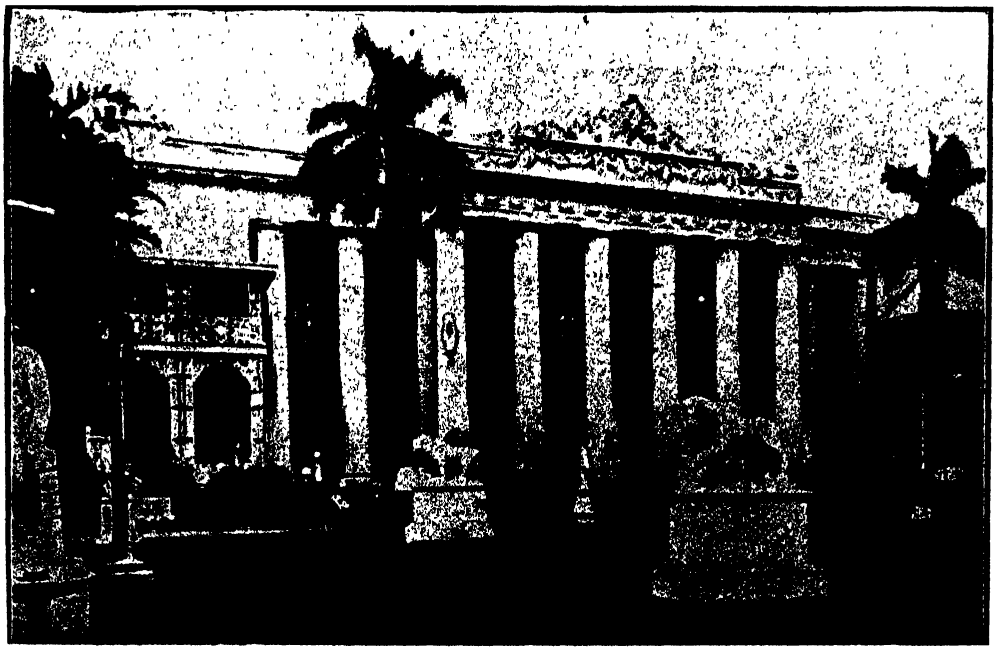
কলিকাতায় আইসেন। ভূদেববাবু চুঁচুড়ায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তিনি প্রথম সংস্কৃত কলেজে পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সম্মানের সহিত তথাকার পাঠ শেষ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তিনি স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে বাঙ্গালীর ছেলেদের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে চন্দননগরে তিনি প্রথম এইরূপ স্কুল স্থাপন করিয়া তাহাতে

শিক্ষকতা করেন। লোকের উৎসাহ ও যত্নের অভাবের সহিত নিজের অর্থাভাব বশতঃ তাঁহাকে এই মহদুদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে তিনি গভর্ণমেণ্টের স্কুলে ৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং উন্নতি লাভ করিয়া ক্রমে ১৮৬৬ সালে অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্‌টর অব্‌ স্কুল পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইন্‌স্পেক্‌টার ও পরিশেষে কিছু দিনের জন্য বাঙ্গালার অস্থায়ী Director of Public Instruction পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক ও "পারিবারিক প্রবন্ধ", "সামাজিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি কতিপয় গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ সরকার এডুকেশন গেজেটের সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলে তিনি দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ সালে তিনি সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন।

ভূদেববাবু একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই মনীষা, চরিত্রবত্তা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একজন প্রকৃত মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ দানশীলতা দুর্ল্লভ। সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চাকল্পে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া "বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ড" নামে একটি ফণ্ড গঠন করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন নিজ বাসস্থলে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" নামে সংস্কৃত বিদ্যালয় এবং "ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়" নামে দাতব্য বৈদ্যক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই দুইটী কার্য্য হইতেই তাঁহার দেশপ্রাণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৪ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

* * * *

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (N. N. Ghose)—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ভগবতীপ্রসন্ন ঘোষ। বি-এ পাঠকালে সিভিল্‌ সার্ভিস্‌ পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ড যান এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ফিরিয়া আইসেন। প্রথম কিছুদিন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিয়া মেট্রপলিটন্‌ কলেজে সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং পরে অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। "Indian Echo" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রথম সম্পাদন করেন। পরে ১৮৮৩ সালে "Indian Nation" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া মৃত্যুকাল



রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রাসাদ—মার্বেল-হাউস

পর্য্যন্ত যোগ্যতার সহিত ইহার সম্পাদকতা করেন। ইঁহার বক্তৃতার ক্ষমতা, ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি অসাধারণ ছিল। কৃষ্ণদাস পাল ও মহারাজা নবকৃষ্ণের জীবনী লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

* * *

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক—ইনি খ্যাতনামা নীলমণি মল্লিক মহাশয়ের দত্তক পুত্র ছিলেন, ১৮১৯ সালে জন্ম



শিবনাথ শাস্ত্রী (যৌবনে)

গ্রহণ করেন। ইঁহাদের প্রকৃত উপাধি শীল ; পূর্ব্বপুরুষ যাদবচন্দ্র শীল মহাশয় মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার পর হইতে ইঁহারা মল্লিক বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। কথিত আছে, যাদবের পৌত্র জয়রাম বর্গীর ভয়ে বৃটিশ আগমনের পূর্ব্বে প্রথম কলিকাতায় আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন। যতদূর জানা যায় ইঁহাদের আদি বাস ছিল সুবর্ণরেখা নদীতীরে কোন স্থানে। তৎপরে সপ্তগ্রামে এবং শেষ হুগলী চুঁচুড়া হইতে কলিকাতায় আইসেন। গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ কালে ইঁহাদের পাথুরিয়াঘাটায় উঠিয়া আসিতে হয় এবং পরে ইঁহারা চোরবাগানে বাস স্থাপন করেন। ব্যবসাই ইঁহাদের উন্নতির মূল। এখন পর্য্যন্ত চোরবাগানে মল্লিকদের যে অতিথিশালা আছে উহা নীলমণি মল্লিক দ্বারাই স্থাপিত হয়। তিনিই চোরবাগানে জগন্নাথজীর জন্ম ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং দয়াবান ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সমাজের দলপতি ছিলেন।

রাজেন্দ্রের বয়স যখন তিন বৎসর তখন নীলমণির মৃত্যু হয়। তাঁহার বিধবা পত্নীর সহিত বৈষ্ণব দাস



নবাব সিরাজদ্দৌলা

মল্লিকের বিষয় ঘটিত একটি মোকদ্দমা হয় এবং সেই সময় পাথুরিয়াঘাটার পুরাতন বাটী হইতে চোরবাগানে ঠাকুর বাটীতে রাজেন্দ্রলালকে লইয়া উঠিয়া আইসেন। যতদিন তিনি নাবালক ছিলেন Sir James Weir Hogg ততদিন সুপ্রিম্ কোর্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। "মারবেল হাউস্" নামক তাঁহার অতুলনীয়

সুন্দর প্রাসাদ তিনি ষোল বৎসর বয়সে আরম্ভ করেন এবং পাঁচ বৎসরে শেষ করেন। ইহা বহু সংখ্যক মূল্যবান



ওয়াট্সের সহিত সন্ধিকার্য্যে ব্যাপৃত মীরজাফর ও মীরণ

প্রস্তর মূর্ত্তি ও তৈল চিত্রাদির দ্বারা সজ্জিত আছে। সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে এরূপ আর একটি সুরম্য অট্টালিকা আছে



নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর

কি না সন্দেহ। ইহার সংলগ্ন চিড়িয়াখানাও কলিকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য। তিনি বদান্যতার জন্য যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, সঙ্গীত, চিত্র, উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যায় তেমনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীর সুবৃহৎ চিড়িয়াখানা হইতে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় অনেক দুর্ল্লভ পশুপক্ষী দান করিয়াছিলেন, তাহা "মল্লিক হাউস্" নামক গৃহে রাখা হইয়াছে। ইয়োরোপের অনেক পশুশালায় ইনি জীবজন্তু প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কলিকাতায় আগত দুর্ভিক্ষ পীড়িত বুভুক্ষদের জন্য বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া তাঁহাদের রক্ষা করেন। এই সময় প্রত্যহ পাঁচ ছয় সহস্র লোককে তিনি অন্নদান করিতেন। এই দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" এবং পরে "রাজা বাহাদুর" উপাধি ভূষিত করেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র, গিরীন্দ্র, সুরেন্দ্র যোগেন্দ্র ও মণীন্দ্র এই ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত পুত্রদ্বয়কে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

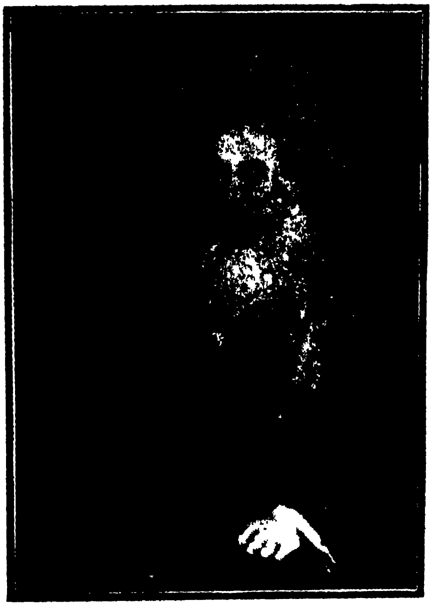
* * *

মোহনচাঁদ বসু—ইনি হাফ্ আখড়াই গানের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি বাগবাজারে বাস করিতেন। নিধুবাবুর মৃত্যুর পর আখড়াই গান ভাঙ্গিয়া হাফ্ আখড়াই সৃষ্ট হয়।

* * *

শিবনাথ শাস্ত্রী—১২৫৩ সালে চাঙ্গড়িপোতায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাসাগর)। শিবনাথ সম্মানের সহিত সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ ও শাস্ত্রী উপাধি লইয়া বাহির হন। তিনি ভবানীপুরে মহেশচন্দ্র চৌধুরীর আলয়ে থাকিয়া যখন খেলাপড়া শিখিতেছিলেন, তাঁহার বাসার নিকটেই ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষিগণের প্রচারকার্য্য দেখিয়া ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হয় এবং ১৮৬৯ সালে বি-এ পাঠকালে উপবীত ত্যাগ করিয়া

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাতে তিনি বাটী হইতে বিতাড়িত হন এবং ভারতাশ্রমে সপরিবারে বাস করিতে



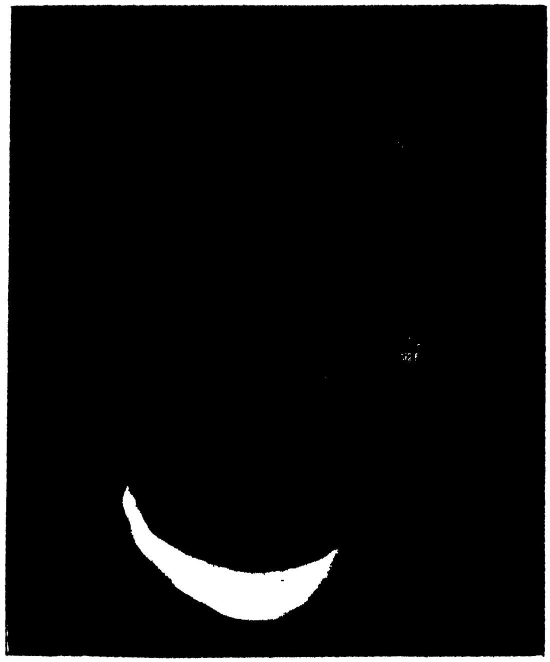
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

থাকেন। সেই সময় তত্রত্য স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অসুস্থ হইলে



কৈলাসচন্দ্র বসু

সোমপ্রকাশ সম্পাদনভার ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পরে সাউথ্ সুবারবণ্ স্কুলে ও হেয়ার স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। "সমদর্শী" নামক একখানি মাসিকপত্রও তিনি বাহির করিয়াছিলেন। এই-



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কেশবচন্দ্র কুচবিহারের রাজকুমারের সহিত তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়ায় অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাদের সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার দল ছাড়িয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনিই আচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং ছয় মাস তথায় থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। ইনি নানা বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে

* * *

দ্বারকানাথ সেন—১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ফরিদপুর জেলার খাঁদারপাড়া গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ অভিরাম রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও রাজবৈদ্য ছিলেন। প্রপিতামহ গোপালকর "রসেন্দ্র-সার-সংগ্রহ" নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের

নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় চিকিৎসা-কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি সুচিকিৎসক এবং সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। মেওয়ারের যুবরাজের পীড়া হইলে রাজসরকার গভর্ণমেণ্টের কাছে একজন সুবৈদ্য চাহিলে তিনিই নির্ব্বাচিত হইয়া প্রেরিত হন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * *

নবাব সিরাজদ্দৌলা—বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অপুত্রক আলিবর্দ্দির পর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে অধিষ্ঠিত



বটকৃষ্ণ পাল

হন। রাজদুর্ল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস অর্থাদি সহ কলিকাতায় আসিয়া যখন ইংরাজদের আশ্রয় লন তখন ইংরাজদের সহিত ফরাসীদের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইতেছিল। তাঁহারা নবাবের অনুমতি না লইয়াই কলিকাতার দুর্গের সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। সিরাজ ইংরাজদের তদানীন্তন কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেককে, অবিলম্বে দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ করিয়া পত্র প্রেরণ করেন। এই উভয় প্রস্তাবই বিফল হওয়ায় নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজদের কাশিমবাজারের কুঠি অধিকার করিয়া ৫০০০০ সৈন্য সহ কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ড্রেক্ সাহেব ভয়ে প্রধান প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং যাবতীয় বালক বালিকা ও মহিলাগণ সহ জাহাজে আশ্রয় লইলেন। কলিকাতা নবাবের হস্তগত হইল। পরে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ্ দুর্গ সহ কলিকাতা পুনরধিকার করিলে নবাবের সহিত ইংরাজদের সন্ধি হইল এবং সিরাজদ্দৌলাকে ইংরাজদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু টাকা দিতে হইল। সন্ধি হইলেও সিরাজ ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত করিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে নবাবের ঔদ্ধত্যে ও অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহার সেনাপতি ও বক্‌সী মীরজাফর, কোষাধ্যক্ষ মহতাব জগৎশেঠ, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, হালসিবাগান নিবাসী উমিচাঁদ প্রভৃতি চক্রান্ত করিয়া ক্লাইভকে সাহায্য করায় তিনি পলাশীর যুদ্ধে সিরাজকে পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধে কেবলমাত্র সেনাপতি মোহনলাল ও মীরমদন নবাবের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ও তৎপরে মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন এবং পরিশেষে ধরা পড়িয়া মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারান। তাঁহার সহিত ভারতের স্বাধীনতাও বিলুপ্ত হয়।



রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর

* * *

মীরজাফর—ইনি নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি ও বক্‌সী ছিলেন। ইঁহার ও আর কয়েকজনের ষড়যন্ত্রেই পলাশী যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ইঁহার ঔদাসীন্য ও চাতুরীর ফলেই নবাব ক্লাইভের নিকট পরাস্ত হন। ইহার পর পূর্ব্বের গোপন ব্যবস্থামত ইংরাজ কর্ত্তৃক তিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। তিনি নবাব হইলেও কার্য্যতঃ ক্লাইভই দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। কোম্পানীর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে টাকা দিতে কোষাগার শূন্যপ্রায় হইল। এই সময় তাঁহার পুত্র মীরণ

বজ্রাঘাতে হত হন। বয়োবৃদ্ধি, পুত্রশোক, অর্থাভাব প্রভৃতি হেতু ক্লাইভের উত্তরাধিকারী ভান্সিটার্ট্ কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত হন এবং তদীয় জামাতা মীরকাসিমকে নবাবি পদ প্রদত্ত হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজদের সহিত বিরোধ ও যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি কলিকাতায় খিদির-পুরের নিকটে বাস করিতেন।



শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

* * *

আবদুল লতিফ—১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেবল মধ্যে কিছু দিনের জন্য কলিকাতা পুলিস আদালতের অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি বহু দিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারই বিশেষ চেষ্টায় Mohamedan Literary Society প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে "নবাব", ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে C. I. E. এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "নবাব বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার ন্যায় পরোপকারী, অমায়িক, জনপ্রিয় ব্যক্তি কমই দেখা যায়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

* * * * *

সৈয়দ আমীর আলি—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সম্মানের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, আইন পরীক্ষায়



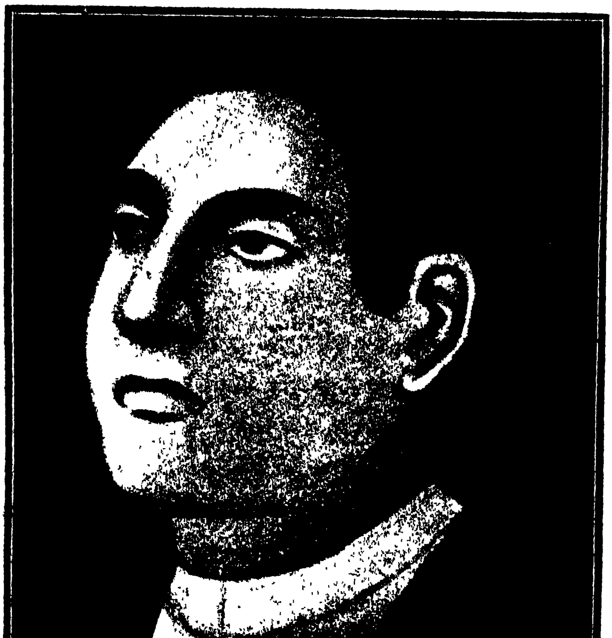
শম্ভুনাথ পণ্ডিত

র্ণ হন এবং হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। অল্প দিন পরেই সরকারি বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে যান এবং ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আইসেন ও পুনরায় পূর্ব্বব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। পর বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে মহম্মদীয় আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৭৬ সালে Central National Mahommeden Association নামে একটি সভা স্থাপিত করিয়া ২৫ বৎসর কাল তাহার সম্পাদকের কাজ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন এবং অস্থায়ীভাবে কিছুদিন প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ছোটলাট

ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল হুগলীর ইমামবাড়ার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া চৌদ্দ বৎসর সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ইংলণ্ডের Moslem Leagueএর শাখার সভাপতি ছিলেন। ইনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বিলাতের প্রিভী কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। মুসলমানদের আইন ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি অনেকগুলি ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৮৭ সালে ইনি সি-আই-ই, উপাধিতে ভূষিত হন।

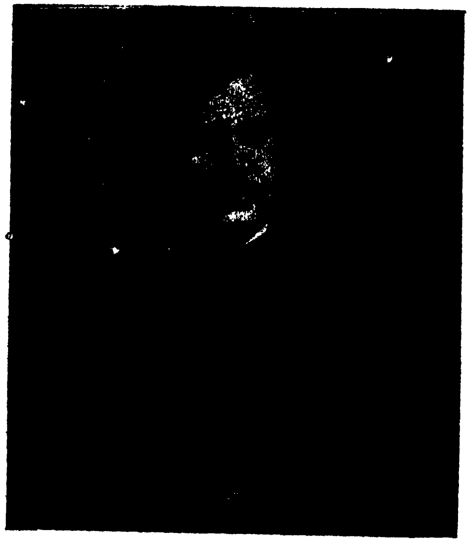
* * * *

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১২৪৫ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুলিটা নামক গ্রামে মাতামহের বাটীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র মাতামহের খিদিরপুরস্থ ভবনে থাকিয়া লেখাপড়া



রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা করেন। এই সময় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জুনিয়ার সিনিয়ার, তৎপরে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের



ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ

সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি বরাবর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথম একটী সামান্য কেরাণীগিরি তৎপরে ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। কাজ করিতে করিতে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আইন পরীক্ষা দিয়া এল্-এল্ উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি শ্রীরামপুর ও হাবড়ায় মুন্সেফের কার্য্য করিয়া ১৮৬১ সালে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে Norton's Law of Evidence নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন এবং এজন্য প্রায় দুই সহস্র টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুসারে ত্রিশ টাকা জমা দিয়া তিনি বি-এল্ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র বাল্যাবধি দরিদ্রতাহেতু বিশেষ কষ্ট পাইলেও কমলার কৃপায় ওকালতিতে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি হাইকোর্টের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং মাসিক দুই

সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ-সবের জন্ম হেমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা নহে, কবি বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি ছিল। ছাত্রাবস্থা হইতেই তাঁহার কবিতা-রচনার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল এবং সেই সময়েই "চিন্তাতরঙ্গিণী" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহা পরে এল-এ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত হয়। পরে তিনি একে একে "বীরবাহু কাব্য", "ভারত-বিলাপ", "ভারত সঙ্গীত", "আশাকানন", "বৃত্রসংহার" ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। "ভারত-সঙ্গীত" প্রকাশিত হইলে বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার যেমন প্রতিষ্ঠা, কার্য্যক্ষেত্রেও তদ্রূপ। সরকারী উকীল অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে তিনিই সরকারী সিনিয়র প্লীডার পদে মনোনীত হন।

শেষাবস্থায় হেমচন্দ্র অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হন, এমন কি উদরান্নের জন্ম লালায়িত হইতে হয়। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তিনি অন্ধ হন। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও অতিরিক্ত দান হেতু কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিলেন। শেষাবস্থায় সরকারের বৃত্তি ও অপরের দানের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ১৩১০ সালে তাঁহার দেহাবসান ঘটে। তিনি একজন যথার্থ জাতীয় কবি ছিলেন।

* * * *

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী কলেজে ও হিন্দু কলেজে ইনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ছাত্রজীবনের অবসান ঘটিলে তিনি ব্যাঙ্কে সামান্য একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ঘটে—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হন এবং ভারতের বহু স্থান ও ইয়োরোপ আমেরিকায় পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতার দ্বারা প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেন। তাঁহার ইংরাজীতে বক্তৃতা দিবার ও লিখিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি "Heart-beats" "Oriental Christ" "The Life and teachings of Keshub Chandra Sen" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং "Interpreter" নামক একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

* * * *



কাশীপ্রসাদ ঘোষ

কৈলাসচন্দ্র বসু—১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বসু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া বহু অর্থ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পিতার নাম হরলাল বসু। ইনি হিন্দু কলেজে পাঠকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অল্প বয়সেই একটী সামান্য কেরাণীর পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে মিলিটারী একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে একটি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ সালে

ইনি Literary Chronicle" নামে একখানি ইংরাজি মাসিক বাহির করেন। যুক্তিতর্ক সহ তিনি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইংরাজীতে তিনি বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি-কল্পে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। তিনি অষ্টাদশ বর্ষকাল বেথুন্ সভার সম্পাদক ছিলেন। Civil Finance Commissionএর সভাপতি স্যার রিচার্ড-টেম্পল্ তাঁহাকে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট্, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রে তিনি নানা বিষয়ের বিস্তর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৮৭৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।



স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * *

বটকৃষ্ণ পাল—১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হাবড়ার নিকট শিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালে মাতাপিতৃহীন হওয়ায় কলিকাতায় বেনিয়াটোলায় মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মাতুলের মসলার দোকানে কাজ শিখিতে প্রবিষ্ট হন। তৎপরে কিছু দিন পাটের ব্যবসা করিয়া ১৮৫৬ সালে খোঙ্গরাপটীতে সামান্য একখানি মসলার দোকান ক্রয় করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। অর্থাভাব ঘটায় মাধবচন্দ্র দাঁকে অংশীদার গ্রহণ করেন। পরে এই দোকানেই সামান্য সামান্য বিলাতি ঔষধ বিক্রয় আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ ইহার উন্নতি করিয়া ঔষধব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। কপর্দ্দকশূন্য অবস্থা হইতে পরিশ্রম ও উদ্যমের বলে এতাদৃশ উন্নতিলাভের ইনি একটি দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি শিবপুরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বেনেটোলায় দুইটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভূতনাথ হরিশঙ্কর ও হরিনারায়ণ নামক তিন পুত্র রাখিয়া তিনি কাশী প্রাপ্ত হন।

* * * *

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী। খিদিরপুরে থাকিয়া হিন্দু কলেজে



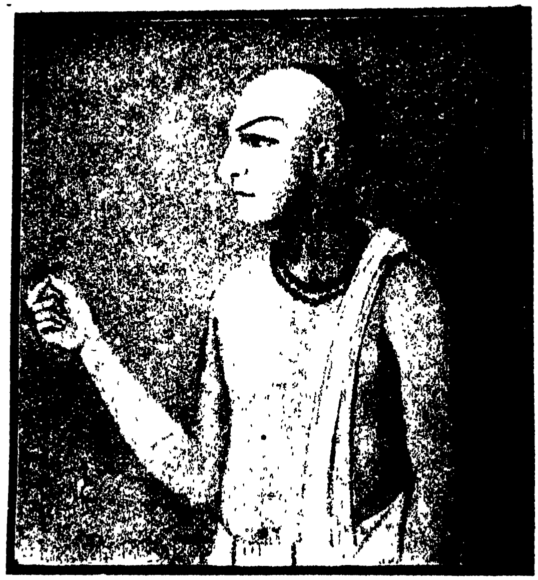
গঙ্গাধর কবিরাজ

ইঁহার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার উপকারিতা শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া Senior Scholarship পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। পাঠ শেষ করিয়া তিনি প্রথম ঢাকা কলেজে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন এবং অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজ, প্রেসিডেন্সী, বহরমপুর কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যাপকের কার্য্য করেন। সংস্কৃত কলেজের তিনি অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। গণিত, জ্যোতিষ ও ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। বাঙ্গলায় গণিত গ্রন্থ ও গণিত সংক্রান্ত বাঙ্গালা পরিভাষার তিনিই পথপ্রদর্শক ছিলেন। ১৮৮৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী—ইনি প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর সহোদর ; রাধানগর গ্রামে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজ ও ঢাকা কলেজে সম্মানের সহিত শিক্ষা শেষ করিয়া মেডিক্যাল কলেজের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জি-এম-সি-বি উপাধি লাভ করেন। তিনি সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া শেষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সৈনিক বিভাগে চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত হইলে, তিনি পূর্ব্বাহ্লেই সংবাদ পাওয়ায় তথাকার ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার সুযোগ হয়। ইহাতে তাঁহার উত্তরোত্তর পদবৃদ্ধি হইয়া ক্রমে তিনি বিগ্রেড্ সার্জ্জন্ পদে উন্নীত হন। জেনারেল্ নীল তাঁহার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং সর্ব্ব বিষয়ে ইঁহার সমর্থন করিতেন। লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্য হেভেলকের সৈন্যদলে এবং বেহারে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে যে অভিযান হয় তাহাতে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী চিকিৎসাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ইহার পর উপরিতন কর্ম্মচারীদের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথম শ্রীরামপুরে পরে কলিকাতায় অত্যন্ত যশের সহিত এই কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আর্ত্তবন্ধু মহাপ্রাণ চিকিৎসক খুব অল্পই দেখা যায়। উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময় ইনি ও ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বহু অর্থব্যয় করিয়া লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য, ফ্যাকাল্টী অব্ মেডিসিনের ও মেডিক্যাল্ সোসাইটী এবং College of Surgeons and Physicinsএর সভাপতি হইয়াছিলেন। শেষোক্ত উভয় স্থানেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ফেরার, পামার, বেলি, সাণ্ডার্স প্রভৃতি খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ সর্ব্বদা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। তিনি রায় বাহাদুর উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি শেষাবস্থায় মধুপুরে বাস করিয়া পরিশেষে দেবপ্রসাদ, সুরেশপ্রসাদ প্রভৃতি স্বনামপ্রসিদ্ধ দেশগৌরব পুত্রগণকে রাখিয়া তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। তথায় তাঁহার চিতাভস্মের উপর স্মৃতিস্তম্ভ ও শ্মশানে সুন্দর বিশ্রামাগার তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।



তারানাথ তর্কবাচস্পতি



মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব

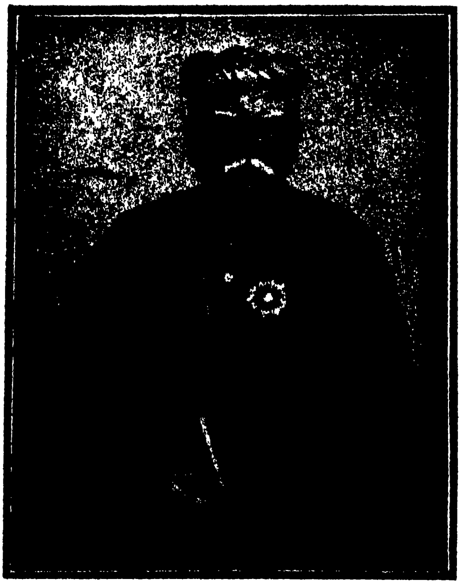
* * * *

নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮২৪ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার ঘোষপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার দত্তের পর ছয় বৎসর কাল ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন হিন্দু পেট্রিয়টের পরে, এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা করেন। ১৮৯৬ সালে তাঁহার

মৃত্যু হয়। তিনি দুইখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

* * * *

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি সাধারণতঃ ডবলু, সি, ব্যানার্জ্জী নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গিরীশচন্দ্র এটর্ণী ছিলেন। বাল্যকালে উমেশচন্দ্রের লেখাপড়ায় ঝোঁক ছিল না, থিয়েটার করিয়াই বেড়াইতেন। প্রথম ইনি এটর্ণীর অফিসে কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করেন। তথায় আইন শিক্ষায় অনুরাগ জন্মে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন এবং চারি বৎসর পরে তথা হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া



মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

আইসেন এবং কলিকাতায় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারের সময় ইনিই তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল্ হন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য এবং উহার প্রতিনিধি হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশলাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বার জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হন এবং পরে ১৮৯২ সালে পুনরায় এই পদ লাভ করেন। ইনি দুইবার হাইকোর্টের জজের পদ গ্রহণের নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯০২ সালে ইংলণ্ডে গিয়া প্রিভি কাউন্সিলে ব্যবসায় করিতে থাকেন। তথায় ১৯০৬ সালে ক্রয়ডনে তাঁহার "খিদিরপুর হাউসে" তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

শম্ভুনাথ পণ্ডিত—১২.৬ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শিবনাথ অথবা সদাশিব পণ্ডিত। ইঁহাদের আদি নিবাস কাশ্মীর দেশ। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া প্রথম সদর দেওয়ানী আদালতে কুড়ি টাকা বেতনে একটী সামান্য চাকুরীতে নিযুক্ত হন। পরে বিচারপতি স্যার রবার্ট বার্লোর কৃপায় ডিক্রীজারির মোহরারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি ডিক্রীজারির আইন সম্বন্ধে দোষের সুন্দররূপে আলোচনা করিয়া এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট পরিচিত হন এবং পরে ইঁহার নির্দ্দেশমত আইন সংক্রান্ত দোষগুলি সংশোধিত হয়। চাকরীতে নানা গোলযোগ হওয়ায় তাহা ত্যাগ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন এবং ক্রমে গভর্ণমেণ্টের সিনিয়র উকিল নিযুক্ত হন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১২৬৯ সালে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৩ হইতে ৬৭ পর্য্যন্ত সুখ্যাতির সহিত এই কার্য্য করেন। তিনিই এ দেশীয় প্রথম বিচারপতি। ইনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। ইনি সরল ও উদার ছিলেন। ১২৭৪ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। ভবানীপুরে তাঁহার নামে একটি হাঁসপাতাল তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

* * * *

রাসবিহারী ঘোষ—বর্দ্ধমান জেলার তোরকোণা গ্রামে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম জগবন্ধু ঘোষ। প্রথম বাঁকুড়ায় পরে কলিকাতায় তাঁহার বিদ্যালাভ হয়। তিনি এম-এ, বি-এল পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়া অল্প দিন পরেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সহিত যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৭১ সালে ইনি Honours in Law নামক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি ঠাকুর আইন অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক

সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ইনি ডি-এল, সি-আই-ই, সি-এস-আই এবং নাইট্ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভূতপূর্ব্ব আইনজ্ঞান, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতাশক্তি প্রভৃতি গুণে তিনি বাঙ্গালীর ভূষণস্বরূপ ছিলেন। তিনি বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় হইতে রাষ্ট্রনীতিতে যোগদান করেন এবং ১৯০৮ সালে মাদ্রাজে জাতীয় মহাসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আইন সংক্রান্ত কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি একবার ইয়োরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার নিকট যে দিয়াশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি শিল্প-

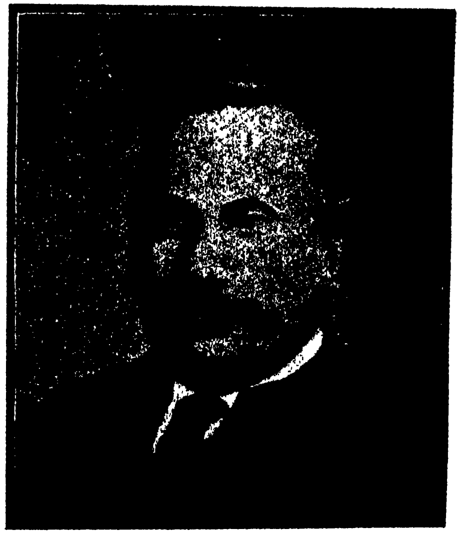


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য দান ও ছিল। ১৯২১ সালে তাঁহার প্রাণান্ত হয়।

* * * *

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মথুরামোহন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দু মেট্রোপলিটান্ কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়ট্ পত্রের প্রথম সহকারী সম্পাদক এবং পরে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পীড়ার সময় সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে "সমাচার হিন্দুস্থান" পত্রের সম্পাদক হন এবং লক্ষ্ণৌএ "তালুকদার এসোসিয়েসনের" সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। তিনি পর পর মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ান, কাশীপুরের রাজা শিওরাজ সিংহের সেক্রেটারী, রামপুরের নবাবের সেক্রেটারী ও ত্রিপুরার মহারাজের মন্ত্রীর কার্য্য করেন। ১৮৭২ হইতে ৭৬ পর্য্যন্ত স্বপ্রতিষ্ঠিত "Mookerjee's Magazine" এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে "Reis and Rayyet" নামক সাপ্তাহিক পত্র আমরণ পরিচালন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ছোটলাট টেম্পল্ সাহেব ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শম্ভুচন্দ্র বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া "ইণ্ডিয়ান লীগ্" নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি



মনোমোহন ঘোষ

আমেরিকার একটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডাক্তার" উপাধি লাভ করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও সুলেখক বাঙ্গালীর মধ্যে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি ইংরাজী ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়।

* * * *

তারকনাথ ঘোষ—১৮১৫ খৃষ্টাব্দে চোরবাগানে জন্মগ্রহ করেন। তিনি হেয়ার সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন প্রথম হেয়ার সাহেবের আড়পুলি পাঠশালায় পরে হি

কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। সাধারণের সাহায্যে হেয়ার সাহেবের যে তৈলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার সহিত তারকনাথও স্থান পাইয়াছেন। তিনি ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন। প্রথম বাঙ্গালী ডেপুটী কলেক্টরদিগের মধ্যে তিনি অন্যতম।

* * *

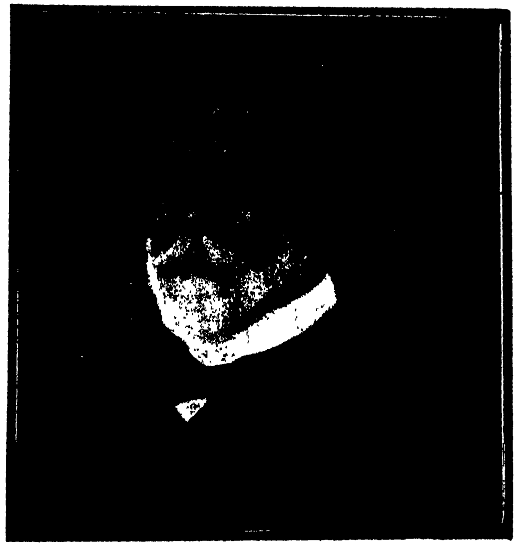
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮২৬ সালে কালনার নিকটবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম হয়। পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল প্রথম মিশনরি স্কুলে পরে হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করেন। কবিতা রচনায় অনুরাগ বাল্যকাল হইতেই ছিল। পরে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা ইঁহার আদর্শ হয়। "পদ্মিনী," "কর্ম্মদেবী," "শূরসুন্দরী" ও "কাঞ্চীকাবেরী" নামে চারিখানি কাব্য রচনা করেন। ইংরাজী রচনাতেও ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি অনেক দিন এডুকেশন্ গেজেটের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং কিছু দিন রসসাগর নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইনি ইনকম্ ট্যাক্সের এসেসর্ হইয়া পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়েও তাঁহার খ্যাতি ছিল। কটকে অবস্থানকালে কতিপয় তাম্রশাসনের আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি সরকারের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভূকৈলাসের রাজপরিবারের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।



নরেন্দ্রনাথ সেন

* * *

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—খিদিরপুরে মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শিবপ্রসাদ। শ্যামবাজারে তাঁহাদের প্রকাণ্ড বাসভবন ছিল। ইনি বাল্যকালে অত্যন্ত আদুরে ছেলে ছিলেন এবং বার বৎসর বয়সে অক্ষর পরিচয় হয়। কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দু কলেজে তিনি তাঁহার সময়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইংরাজী ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় "On Bengali Works and Writers," "Shair and other Poems" ইত্যাদি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি Hindu Intelligencer নামে একখানি বৃহৎ সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরাজীনবীশগণের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে ছিল। ডেভিড্ হেয়ার, কাপ্তেন্ রিচার্ডসন্ প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহার রচনার উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অনেকে বলেন দেশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরাজীতে কবিতা লেখেন। বাঙ্গালা ভাষাতেও তিনি বহু রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার



তারকনাথ পালিত (যৌবনে)

রচিত প্রায় তিনশত বাঙ্গালা গান আছে। ১৮৭৩ সালে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

*　　*　　*

রামনিধি গুপ্ত—ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী চাঁপতাগ্রামে ১১৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিধুবাবু নামে ইনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইনি কুমারটুলিতে আসিয়া বাস করেন। তিনি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া প্রথম ছাপরার কলেক্টরী অফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। পরে টপ্পা গায়করূপে ইনি অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত সরল ভাষায় সুভাবপূর্ণ টপ্পা দেশ বিখ্যাত। ১২৩৫ সালে ইঁহার দেহান্ত হয়।

*　　*　　*

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা শেষ করেন এবং তথাকার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এডুকেশন্ কমিটী ইহাঁকে তর্কবাগীশ উপাধি প্রদান করেন। "উত্তররাম রচিত," "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের ইনি টীকা রচনা করেন। ভারতের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনে ইনি জেমস্ প্রিন্সেপ্‌কে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ অব্দে কাশীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

*　　*　　*

প্রতাপচন্দ্র রায়—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার সাঁকো গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামজয় রায়। তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল। এক ব্রাহ্মণের কৃপায় তিনি শিক্ষালাভ করিয়া ১৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট মাসিক সাত টাকা বেতনে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে তিনি একটী পুস্তকের দোকান করেন। তৎপরে তিনি সাত বৎসরব্যাপী পরিশ্রমে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। প্রতি খণ্ড ৪২৲ টাকা মূল্যে দুই হাজার মহাভারত বিক্রয় করিবার পর প্রায় এক সহস্র খণ্ড তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি একটী ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের বঙ্গানুবাদ করিয়া বহু সহস্র খণ্ড নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ। ইহাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হইলেও ইহার দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট যশোলাভ হইয়াছিল। ১৮৮৯ সালে তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন।

*　　*　　*

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হয়। তিনি বি-এ পাশ করিয়া সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য ১৮৬৮ সালে বিলাত যান। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিলে সিলেটের আসিষ্টাণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য পান, কিন্তু আদালতের নথি কাটাকুটি করা হেতু ৫০৲ টাকা মাসিক অনুকম্পা বৃত্তি দিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপসারিত করেন। তৎপরে তিনি মেট্রপলিটান, সিটি কলেজ ও ফ্রিচার্চ্চ ইনষ্টিটিউশনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বৌবাজারে নিজে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে শিক্ষকতা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই বিদ্যালয়টিই পরে রিপন্ কলেজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় Indian Association নামক সভা স্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল তাহার সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলী পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন এবং পরে ইহাকে দৈনিকে পরিণত করেন। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশন সভার সদস্য ছিলেন এবং এই সভার প্রতিনিধি স্বরূপে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন।

হাইকোর্টের জজ নরিস্ সাহেবের আচরণ সম্বন্ধে বেঙ্গলীতে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করায় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দুই মাস সিভিল জেলে থাকিতে হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভারত বিষয়ক আন্দোলনের জন্য বিলাত যাইলে নরিস সাহেব অযাচিতভাবে তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। জাতীয় মহাসমিতি সংস্থাপন বিষয়ে তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি ইঁহার ১১শ ও ১৮শ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁহার ন্যায় গভীর জ্ঞান-

সম্পন্ন ব্যক্তি বাঙ্গালায় অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ সুরেন্দ্রনাথ অশ্রান্তভাবে সাধারণ হিতকর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তৎকালে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক এমন কোন উল্লেখযোগ্য সভাসমিতি ছিল না যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ইনি যেমন তেজস্বী তেমনই নির্ভীক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ বাগ্মী এপর্য্যন্ত বাঙ্গলা তথা ভারতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। জুরি নোটিফিকেশন্ প্রধানতঃ ইঁহারই আন্দোলনের ফলে প্রত্যাহৃত হয়। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে এ দেশে যে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয় সুরেন্দ্রনাথ তাহার মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মতের অনৈক্যবশতঃ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কংগ্রেসের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া Moderate Conference নামক সমিতির সৃষ্টি করেন এবং পরে তাহার National Liberal League নাম রাখেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে স্যার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং বার্ষিক ৬৪০০০্ টাকা বেতনে স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময় কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল আইন সংস্কার ইঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ১৯২৫ সালে ইঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

* * *

গঙ্গাধর কবিরাজ—যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম ভবানীপ্রসাদ রায়। তিনি দেশে আয়ুর্ব্বেদের পাঠ শেষ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। কিছু দিন এখানে থাকিবার পর মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদ নামক স্থানে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে, এবং কতিপয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করেন। একমাত্র চরকের টীকাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

* * * *

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কাশীধামে এবং কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতভাষায় যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে বহুপ্রকার ব্যবসায়-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ৮০০০০্ টাকা ব্যয় করিয়া "বাচস্পত্য বৃহৎ অভিধান" নামক সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ন করেন। তদ্ব্যতীত "শব্দস্তোম-মহানিধি", "বিধবা বিবাহ খণ্ডন" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে পরলোক প্রাপ্তি হয়।

* * * *

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব—শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণের পিতার নাম রামচরণ। ইঁহার পিতামহ কামিনীকান্ত মোগল সরকারে কর্ম্ম করিয়া "ব্যবহর্ত্তা" উপাধি পাইয়াছিলেন। রামচরণ মুড়াগাছা হইতে বাস উঠাইয়া গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানেই অনুমান ১৭৩২ খৃঃ অব্দে নবকৃষ্ণের জন্ম হয়। দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য কোম্পানী যখন গোবিন্দপুর লইলেন সেই সময় রামচরণ সুতানুটিতে আসিয়া একখানি বাড়ী ক্রয় করেন। ইহাই বর্ত্তমান রাজবাড়ীর সূত্রপাত।

নবকৃষ্ণ পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসকে পারসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রথম লর্ড ক্লাইবের মুৎসুদ্দি লক্ষ্মীকান্ত ধরের অধীনে একটী কর্ম্ম পান। পরে তাঁহারই চেষ্টায় ক্লাইভ্ কোম্পানীর মুন্সী পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। তিনি ক্লাইবের উপঢৌকন লইয়া সিরাজদ্দৌলার শিবিরে গমনপূর্ব্বক তাঁহার গতিবিধির গুপ্ত সংবাদ আনিয়া দেন। ক্লাইবের সহিত মীরজাফরের সম্মিলন, উভয়ের মধ্যে সুবেদারী সম্বন্ধে অঙ্গীকারপত্র লিখন, সম্রাট শাহ আলম্ ও অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন, বেনারস সম্বন্ধে বলবন্ত সিংহের সহিত এবং বেহার সম্বন্ধে সেতাব রায়ের সহিত চুক্তি এ সকলের মধ্যেই নবকৃষ্ণ ছিলেন। মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধের সময় ইনি মেজর এডাম্‌সের সঙ্গে ছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ্ সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে নবকৃষ্ণকে রাজা বাহাদুর ও মনসব্ দশহাজারী উপাধি ও সেই সঙ্গে ৩০০০ অশ্বারোহী, পালকি প্রভৃতি রাখিবার অধিকার আনাইয়া দেন। পর বৎসর মহারাজ বাহাদুর ও ষষ্ঠহাজারি উপাধি এবং ৪০০০ অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার এবং সেই সহিত পারস্য ভাষায় খোদিত একটি স্বর্ণপদক সম্রাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভের নিকট হইতে সুতানুটির জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তিনি

মুন্সী দপ্তর, জাতিমালা কাছারি, খাজনাখানা, মাল আদালত প্রভৃতির অধ্যক্ষ ছিলেন। হেষ্টিংসের সময়েও ইনি এই সকল কার্য্য দেখিতেন; অধিকন্তু ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের অভিভাবক এবং বর্দ্ধমান ষ্টেটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

ইঁহার বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ইঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। যেখানে সেণ্টজন্ গির্জ্জা অবস্থিত সেই স্থান ও তৎসংলগ্ন জমি তিনি কোম্পানীকে দান করিয়াছিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। তৎপূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামসুন্দরের পুত্র গোপীমোহনকে দত্তক রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * * *

রাজা রাধাকান্ত দেব—ইনি সুপ্রিম্ কাউন্সিলের সদস্য জন্ ষ্টেবল্ (John Stables) সাহেবের দেওয়ান রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র এবং মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত হইয়াও তিনি বিদ্যানুশীলনে তাঁহার জীবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশ তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। তিনি এইজন্য ৪৩ বৎসর পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ইহা প্রকাশিত হইলে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশে তিনি ইয়োরোপের নানা সভাসমিতি হইতে সম্মান প্রাপ্ত হন। ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডরিক্ ইঁহাকে সুন্দর কারুকার্য্য-সমন্বিত হারযুক্ত স্বর্ণপদক এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া একটী স্বর্ণপদক দান করিয়াছিলেন। স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সম্পাদক-পদে আসীন থাকিয়া তিনি কয়েকখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি একজন যথার্থ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপন বিষয়ে ইনি একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এই বিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজের সহিত ইনি বরাবর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে রাধাকান্তের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ইহার সভাপতি ছিলেন।

রাধাকান্ত তাঁহার পিতা পিতামহের ন্যায় বিশেষ রাজভক্ত ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতশাসনভার গ্রহণ করিলে ইনি শোভাবাজার রাজবাটীতে বড়লাট প্রমুখ ইংরাজ কর্ম্মচারী ও দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী সম্মিলনী আহূত করেন। কথিত আছে, এরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান এ দেশে পূর্ব্বে কখন হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর শান্তি-স্থাপন স্মরণার্থ ইনি আর একটী সম্মিলনী আহূত করিয়াছিলেন। ১৮৩৭ সালে ইনি রাজা বাহাদুর এবং ১৮৬৬ সালে কে সি-এস-আই উপাধিতে ভূষিত হন। এই শেষোক্ত সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম লাভ করেন। রাজার নিকট তিনি যেরূপ সম্মানিত ছিলেন, দেশে তাহার অপেক্ষা কম ছিলেন না। তিনি তৎকালীন হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাকে সকলেই বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বজন-সমাদৃত মনীষী বাঙ্গালায় অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শেষাবস্থায় বৃন্দাবন ধামে বাস করিয়া তথায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

* * * *

মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ইনি শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের সপ্তমপুত্র ও মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করিয়া কিছুদিনের জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনর ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহিত ইনি দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি ১৮৭৫ সালে রাজা, ৭৭ সালে মহারাজা, ৮৮ সালে কে-সি-আই-ই, এবং ৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৯০৩ সালে হঠাৎ ইঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

রামনারায়ণ তর্করত্ন—১৭৪৫ শকে ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামধন শিরোমণি। ইনি প্রথম চতুষ্পাঠীতে পরে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং সংস্কৃত কলেজেই শিক্ষকে

পদে নিযুক্ত হন। প্রধানতঃ নাট্যকার হিসাবেই ইঁহার প্রসিদ্ধি। ইঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এতগুলি নাটক আর কেহ রচনা করেন নাই। এই কারণে ইনি নাটুকে রাম-নারায়ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব" "পতিব্রতোপাখ্যান," "বেণীসংহার", "রত্নমালা", "মালতী মাধব", "শকুন্তলা" "নবনাটক"ও "রুক্মিণীহরণ" নামক পুস্তকগুলি তাঁহার রচিত। প্রথম দুইখানি নাটক রচনা করিয়া রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরীর নিকট হইতে ৫০ টাকা হিসাবে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব" নাটক দ্বারা তৎকালীন সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কাঁটালপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ডেপুটি কলেক্টরের কার্য্য করিতেন। তিনি হুগলী কলেজ ও হিন্দু কুলেজে অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষালাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর বি-এল্ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। তিনি নানা স্থানে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া শেষে আলিপুর হইতে ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

যে সাহিত্য-সাধনায় তিনি অমর হইয়া আছেন, তাহার আরম্ভ পাঠ্যাবস্থাতেই হয়। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে "ললিতা ও মানস" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকাশেই তিনি তৎকালের বাঙ্গালাভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং আজিও তিনি সেই সম্মানের অধিকারী হইয়া আছেন। তিনি সাহিত্য-সম্রাট বলিয়া পরিচিত। ইংরাজি রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের Mukerjee's magazine পত্রিকায় তিনি অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার "দেবী-চৌধুরাণী", "আনন্দমঠ", "সীতারাম", "বিষবৃক্ষ" প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন অসামান্য প্রতিভা ও স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ "কৃষ্ণচরিত্র" ও "ধর্ম্মতত্ত্বে" অসাধারণ গবেষণা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে "বঙ্গদর্শন" তাঁহার সম্পাদকতায় প্রথম প্রকাশিত হয়। উহা সে সময়ের সর্ব্ববিষয়েই উৎকৃষ্ট মাসিক ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের কতিপয় উপন্যাস ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে "রায় বাহাদুর" এবং ৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৪ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তিনি কলিকাতার প্রতাপ চ্যাটার্জ্জির লেনস্থ ভবনে বাস করিতেন। সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক হিসাবে বাঙ্গালায় তাঁহার ন্যায় লেখকের উদ্ভব আর হয় নাই ইহাই অনেকের মত।

* * * *

মনোমোহন ঘোষ—ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রামলোচন সদর-আলা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া ১৮৬১ সালে ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য পর বৎসর ইংলণ্ড গমন করেন, কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হন না; এবং ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইনি বাগ্মী ছিলেন এবং ইহাঁর দেশানুরাগ প্রবল ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের প্রতিনিধি রূপে ইংলণ্ডে গিয়া ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ তথায় বিবৃত করেন। এই একই উদ্দেশ্য লইয়া পরে আর তিনবার ইংলণ্ডে যান। ইনি কংগ্রেসের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ৬ষ্ঠ অধিবেশনে উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

* * * *

নরেন্দ্রনাথ সেন—ইনি কলুটোলার হরিমোহন সেনের চতুর্থ পুত্র ও রামকমল সেনের পৌত্র। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে পাঠান্তে ক্যাপ্টেন্ পামারের নিকট কিছুদিন ইংরাজী শিক্ষা করেন। তৎপরে আন্‌লি (Anley) নামক এটর্ণীর অফিসে কার্য্য শিক্ষার জন্য প্রবেশ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন ঘোষের সম্পাদকতায় "ইণ্ডিয়ান মিরর" প্রকাশিত হইলে ইনি তাহাতে নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। ঘোষ মহাশয় বিলাত যাইলে সম্পাদকতার নরেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়।

তৎপরে ১৮৬৬ সালে এটর্ণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলে কিছু দিনের জন্য মিররের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া মিররকে দৈনিক পত্রে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলে নরেন্দ্রনাথ ইহার সহিত পুনরায় সংশ্লিষ্ট হন এবং অল্প দিন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদকতা করার পর তিনি পুনরায় সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন এবং স্বত্বাধিকারী হইয়া জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত বিশেষ যোগ্যতা ও নির্ভীকতার সহিত উহার সম্পাদন করেন। ইঁহারই চেষ্টায় "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিকখানির নবপর্য্যায় প্রকাশিত হয়। গভর্ণমেণ্ট ইহার ২৫০০০ খণ্ড গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের বিদ্যালয় ও অফিস সমূহে বিতরণ করিতেন। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন, গীতা সভার সভাপতি ছিলেন এবং থিয়জফিকেল সোসাইটির ইনি একজন প্রধান ছিলেন। ১৯০৮ সালে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৯১১ সালে পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * *

উমিচাঁদ—ইনি জনৈক শিখ বণিক। ইঁহার প্রকৃত নাম আমিন চাঁদ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন এবং বৈষ্ণব দাস ও মাণিকচাঁদ শেঠেদের বাণিজ্য বিষয়ক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যথেষ্ট ধনসম্পত্তি ও নবাব সরকারে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইংরাজদিগের সহিতও তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক সময় নবাব ও ইংরাজদের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইলে তিনি মধ্যস্থতা করিতেন। নবাব-সৈন্য কলিকাতা আক্রমণ কালে লুণ্ঠনে আশানুরূপ ধনরত্ন না পাইয়া উমিচাঁদের বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া চারি লক্ষ টাকার হীরামুক্তাদি জহরৎ সংগ্রহ করিয়া লয়। মীরজাফর প্রভৃতি যখন সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া ইনি ৩০ লক্ষ টাকা দাবী করেন। ক্লাইব্ ইহা দিতে স্বীকৃত হইয়া পরে না দেওয়ায় নিরাশায় ক্ষিপ্তপ্রায় হন এবং ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি একজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

* * *

হুজরী মল—ইনি উমিচাঁদের একজন নিকট আত্মীয় ও খুব বিত্তশালী লোক ছিলেন। তেজারতি ইঁহার ব্যবসায় ছিল। বৈঠকখানা বাজারের নিকট তাঁহার বাগান-বাড়ীতে তিনি একটী একাণ্ড পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। সেই স্থানের পথটি এখনও হুজরী মল ট্যাঙ্ক লেন নামে খ্যাত। বড়বাজারে তাঁহার বাসভবন ছিল। তিনি কোম্পানীর নিকট হইতে কালীঘাটে বহু জমি কোন কার্য্যের জন্য পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে তিনি একটী ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন।

* * *

আনন্দমোহন বসু—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় কেমব্রীজে অধ্যয়ন করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম Wrangler উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ইনি কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতার সিটি স্কুল্ ১৮৮০ সালে ইহার দ্বারাই স্থাপিত হয়। ইনি জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ১৮৮৯ সালে ১৪শ অধিবেশনে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

* * *

তারকনাথ পালিত—ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, - এই কার্য্যের দ্বারা প্রভূত ধন ও যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। অসুস্থা নিবন্ধন শেষ দশায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় ইনি ছাত্রদের বিজ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পনের লক্ষ টাকা দান করেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে নাইট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৪ সালে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। *

* গত কয়েক সংখ্যা "ভারতবর্ষে" যে সকল ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত কথা লিপিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সবই কোন না কোন গ্রন্থ হইতে

লইয়াছি। দুই তিনটী ভদ্রলোক কাহারও কাহারও সম্বন্ধে কিছু ভুল লেখা হইয়াছে জানাইয়াছেন, ইহাতে আমি উপকৃত হইয়াছি। এরূপ ভুল আরও থাকা অসম্ভব নহে ; কারণ একই ব্যক্তির সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবরণ অনেক স্থলে দেখিয়াছি। শুধু জীবনী নহে অন্যান্য বিষয়েও এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে।

যাঁহাদের সংক্ষিপ্ত কথা লিখিত হইয়াছে অথচ প্রতিকৃতি দেওয়া হয় নাই, যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের ছবি সত্বর কেহ আমার চন্দননগরের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইতে পারে।

লেখক

ভ্রম সংশোধন

গত ফাল্গুনের ভারতবর্ষের ৪০৯ পৃষ্ঠায় কুমার কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু) বলিয়া যে ছবিখানি প্রকাশিত হইয়াছে, উহা লালা বাবুর অধস্তন চতুর্থ বংশধর রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ বাহাদুরের প্রতিকৃতি, ভুল ক্রমে ছাপা হইয়াছে।

চৈত্রের সংখ্যায় ৫৬৪ ও ৫৬৭ পৃষ্ঠায় রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের চিত্রে নামের উল্টা পাল্টা হইয়াছে। পাঠিকা ও পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

বোশেখ-বরণ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বোশেখ এল যখন বনে—
বকুল গেছে ঝরে' ;
কামিনী-ফুল—শূন্য যে মূল !
কুটজ—কোথায় ওরে !

দীপ্ত অশোক, দৃপ্ত পলাশ,
নেইকো তাদের বর্ণ-বিলাস ;

সরমে হায় শিমূল সাদা—
ফুল যে গেছে মরে' !
বোশেখ এল—কি দিয়ে তুই
নিবি বরণ করে' ?

দেব্‌তা এল যখন মনে—
নেই আয়োজন কিছু ;
পূজারী প্রাণ,—তাই কি নীরব ?
তাই কি নয়ন নীচু ?

শূন্য বুকের দুয়ার মেলে',
ঝরা-আশার শ্মশান ঠেলে'

ঐ যে ধীরে বেরিয়ে আসে
তপঃকৃশা ঋজু
জ্যোতির্ম্ময়ী মানসী তোর—
দেখ্‌ না চেয়ে পিছু।

রুদ্রনাথের নেত্রানলে
সৃষ্টি জ্বলে' যায়,—
চিত্ত-উমার শুদ্ধপ্রীতি
চাঁপার মত ভায় !



অতীত—বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ভবিতব্য অনেক অঘটন ঘটায়। এক্ষেত্রেও একটা অঘটন ঘটাইয়াছিল। ভবিতব্যের দেখা পাওয়া যায় না, নহিলে অনেকে তাহাকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিত।

এক

অঘটন ছাড়া আর কি বলিব? সদ্যঃ বি. এ পাশ করা মেয়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে 'রেড আপ্ টু এণ্ট্রান্স-ক্লাস'-কালীময়ের বিবাহ, অঘটন নয় ত কি! ইন্দ্রাণীর পিতা ১৯৩০ সালের মন্বন্তরে ভরাডুবী হইয়া, মেয়ের আরও পড়া বন্ধ রাখিয়া বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন। ৺রামময় মিত্রের একমাত্র পুত্র কালীময় পিতৃপরিত্যক্ত ভূষি তিষি তিসি তেঁতুলের ব্যবসা আরও ফলাও করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জ্জন করিতেছে, ইন্দ্রাণীর মাতুল সম্বন্ধ আনিলেন, পিতা সম্মত হইলেন, পিতার উদ্বেগ আশঙ্কা দূর করিয়া, তাঁহাকেই সুখী করা হইবে ভাবিয়া শিক্ষাভিমান ও ভবিষ্যতের স্বাধীনতা-প্রোজ্জ্বল চিত্রখানিকে জলাঞ্জলি দিয়া, লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী মেয়ের মত ইন্দ্রাণীও বারাণসী-চেলিতে সাজিয়া কাজললতা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে শুভদৃষ্টি করিয়া ফেলিল।

কালীময় নাম হইলেও অঙ্গময় কালী ছিল না, বরং আজকালকার কালে যাহাকে সুরূপ বলা হয়, কালীময় তাহাই। সাধারণ দশজন বাঙ্গালীর মত উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, মুখ চোখ নাক বেশ মানানসহি, লম্বা, বাহুল্য-বর্জ্জিত মাংসল চেহারাটি।

ইন্দ্রাণীর পিতার ভরাডুবিটা এমনই ভরাট ও সম্পূর্ণ হইয়াছিল যে, একমাত্র কন্যার বিবাহে দু'দশজন আত্মীয় আত্মীয়াকে আনাইবার ইচ্ছাও তাঁহার হয় নাই; কেবলমাত্র শ্যালক-ঘটক বিপিন, তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি পুত্র বিবাহ-বাড়ীতে উৎসবের সম্মান রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। বরও নাকি বাহুল্য ও আড়ম্বর পছন্দ করে না, তাই বর, বরযাত্রী ও মিতবরে মিলিয়া তিনজনের বেশী আসে নাই—বাহুল্যের মধ্যে নরসুন্দর একটি ছিল।

বিবাহের পর বাসর। কেহ জাগুক আর নাই জাগুক, বাসর 'বসে' এবং বাসরে বর-কন্যাও বসে। ইন্দ্রাণীর মাতুলানী বাসরের যথাসাধ্য মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে চেষ্টান্বিতা হইয়াছিলেন—তাঁহার ইচ্ছা ছিল ইন্দুই গোটাকতক গাহিয়া বাজিয়া জীবনের এই বিশিষ্ট দিনটা পালন করিবে। ইন্দু রাজী হইল না। নেহাৎ মিয়াইয়া যায় দেখিয়া ইন্দুর মাতুল কোন্ হৌস্ কত ভুষি কেনে, কোটী কোটী টাকার তেঁতুলই বা কোথায় চালান যায়, ইত্যাকার কতকগুলি বাসর-ঘরের বিধি-বহির্ভূত প্রশ্নে সজীবতা আনয়নের চেষ্টা করিয়া, অবশেষে "আচ্ছা তোমরা তাহ'লে শুয়ে পড়" বলিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়া গেলেন।

ঘরে বর ও কন্যা! আর কেহ নাই।

বর সোনার সিগারেট-কেস্ বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইতেই, কন্যা কহিল—আপনি আজও সিগারেট খান্?

আমরা যে-সময়কার কথা লিখিতেছি, তখন সমগ্র ভারতবর্ষ অর্থ দগ্ধ না করার একটা বাতিক জোর হইয়া দেখা দিয়াছিল।

বর অম্লানভাবে কহিল—খাই ত!

মাতুলানী আড়ালে আড়ি পাতিতেছিলেন, কথা আরম্ভ হইল দেখিয়া খুসী হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু আরম্ভেই শেষ! সিগারেট পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, ছাইগুলা বোধ করি বিদ্যুৎ পাখার হাওয়ায় উড়িয়া ঘরময় ছড়াইয়া অদৃশ্য হইয়াও গেল, কিন্তু আর কথা হইল না। বৃথা কালক্ষেপ জ্ঞানে মাতুলানী, প্রকাশ হইয়া ক্ষুব্ধ অথচ স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কল্যাণীয়দ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ওমা ইন্দু, দরোজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড় বাছা, রাত্তির অনেক হয়েছে।

মামী সেই বয়সে (সেটা নেহাৎ কম নয়, পঞ্চাশ

হইলেও হইতে পারে) অনেক বাসর জাগিয়াছেন সত্য, কিন্তু বি এ পাস-করা কন্যার বাসর জাগিবার সুযোগ কদাপি না-হওয়ায় নানা কৌতুক-কৌতূহল-উজ্জল চিত্র সন্দর্শনের আশায় অতিমাত্র উৎফুল্ল ছিলেন; কিন্তু এমন হতাশ তাঁহাকে আর কখনও হইতে হয় নাই। মামী বাহির হইয়াও বাহির হইলেন না, দেখিয়া ইন্দু কহিল—মামি, তুমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।

তাই দিই—বলিয়া দ্বারটা বন্ধ করিয়া আরও কয়েক মিনিট রুদ্ধদ্বারে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া অবস্থান করিলেন; তথাপি কোন সাড়াশব্দ হইল না।

অনেকক্ষণ পরে, বর কথা কহিল, বলিল—ঘুম পাচ্ছে, আমার আবার চোখে আলো লাগলে ঘুম হয় না।

ইন্দু নিঃশব্দে হাত বাড়াইয়া সুইচ্ টিপিয়া আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

এমনটা হওয়া সম্ভব কি-না সে তর্কে প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি লেখকের নাই। যাহা হইয়াছিল, আমি শুধু তাহাই বলিতে বসিয়াছি; কার্য্য-কারণের কৈফিয়ৎ দিবার ক্ষমতা মানুষের নাই—সর্ব্বজ্ঞ লেখকেরাও তাহা সকল সময়ে পারেন, এমন বিশ্বাসও আমার নাই।

রাত্রি প্রভাত হইল। কলিকাতা-শহরে চিরদিন যেমন নিঃশব্দে প্রভাত হয়, আজও তেমনই নিঃশব্দে প্রভাত হইল।

দুই

এ বাড়ীতেও কোন সমারোহ না দেখিয়া ইন্দুর বিরুদ্ধ-মন অনেকখানি স্বস্তি অনুভব করিল। এখানে আসিয়া সে একটি মনের মত সঙ্গী লাভ করিয়া, গত দুই দিবসের দুর্ভাগ্যের কথা প্রায় ভুলিয়া গেল। তাহার ননদ বয়সে তাহার চেয়ে কিছু ছোট কিন্তু সংসারের বিজ্ঞতায় অনেকখানি বড় হইলেও মনটা তাহার বুড়াইয়া যায় নাই। অল্প বয়সে তাহার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার মনটা এমন অবস্থায় ছিল যে, যে কোন বয়সের ও যে কোন মেয়ের সহিত অবাধে মিশিয়া মিলিয়া একেবারে এক হইয়া যাইতে বাধিত না। সাধারণতঃ অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত ও অকালে মাতৃত্বপ্রাপ্ত মেয়েদের কথায় বার্ত্তায় চাল চলনে যে গ্রাম্যতা দোষ থাকে, কালীতারার মধ্যে তাহা একেবারে না থাকায়, ইন্দ্রাণী একটা পরম আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্যজ্ঞান করিল।

নূতন গৃহে, প্রথম রাত্রিটা পরমানন্দে তাহার সহিত গল্প করিয়াই কাটিয়া গেল। ইন্দু কলেজের গল্প করিল না, পাশ করার গল্পও বলিল না, সেক্সপীয়র, মিল্টন, হোমারের নামোচ্চারণ করিল না, কালিদাস, ভবভূতিদের সে আমলেই আনিল না, কালীতারা সেজন্য অনেক অনুযোগও করিল; কিন্তু ইন্দ্রাণী তাহাকে নানা কথায়, নানা আদরে ভুলাইয়া কালীতারার সংসারের গল্প, তাহার ছেলেমেয়ের গল্প, তাহাদের খেলার, অসুখ-বিসুখের, তাহাদের খাওয়া দাওয়ার কত গল্পই বলাইয়া লইল। মাঝে মাঝে তাহার দাদার গল্পও আসিয়া পড়ে, দাদা কোন্ বছর কত হাজার টাকা রোজগার করিয়াছে, বিলাত বেড়াইবার তাহার খুব সখ, কেবল মা'র ইচ্ছা নয় বলিয়াই যায় নাই, এমনই বড় বড় আরো তিনখানা বাড়ী করিয়াছে, সেগুলাতে সাহেব ভাড়াটে আছে, দাদা তেমন পাশটাস করে নাই বটে, কিন্তু ধুলো মুঠি দাদার হাতে সোনা মুঠি হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি!

এক সময়ে কালীতারার বড় লজ্জা হইল, বলিল—কি ভাই বক্ বক্ করে মরছি! যত সব আবোল তাবোল বাজে কথা! তার চেয়ে তুমি ভাই তোমার পাস করার কথা বলো। আচ্ছা ভাই বৌদি, তুমি নাকি বরাবর সংস্কৃতয় জলপানি পেয়েছ?

ইন্দ্রাণী হাসিয়া বলিল—কালও পেয়েছি ভাই, তবে আজ থেকে আর বোধ হয় পাব না।

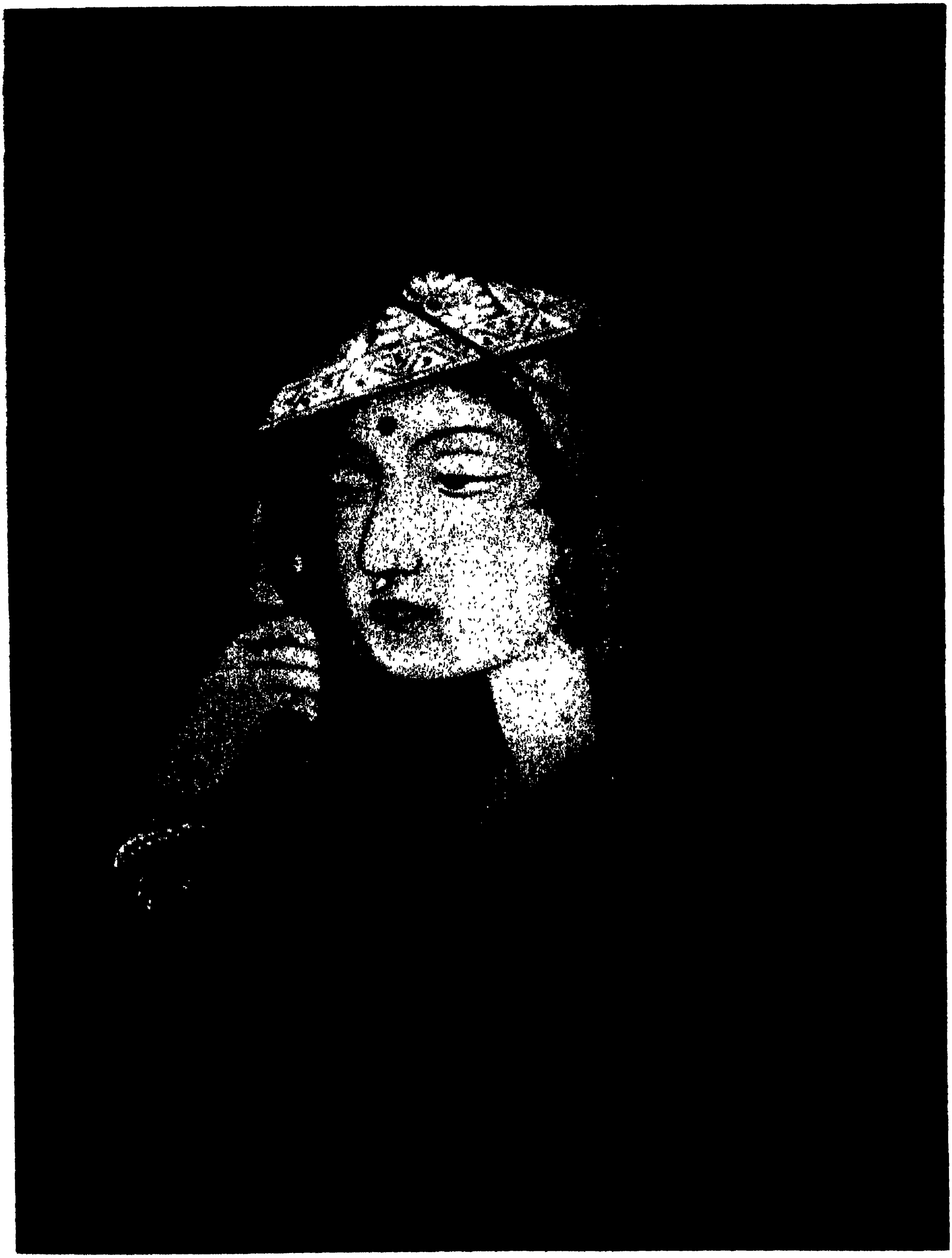
কেন পাবে না?

পড়া বন্ধ করলে আর দেবে কেন ভাই!

কালীতারা উদাসীনের মত বলিল—কে জানে ভাই কি ক'রে অং বঙে তুমি অত পাস কর্‌লে! উনি ত দু'বার এফ্ এ না আই-এ কি-বলে তাই দিয়েছিলেন, দু'বারই অং বঙে ফেল্ করেছিলেন, তাই আর পড়লেনই না।

ইন্দ্রাণী হাসিমুখে বলিল—আমার কিন্তু ভাই অং বঙ খুব ভাল লাগে।

কালীতারা বলিল—তখন যদি তুমি বৌদি হতে ভাই, তাহ'লে আর উনি ফেল্ করতেন না—তোমার কাছে একটু পড়ে-টড়ে নিতেন।



ক'নে-বিদায়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ইন্দ্রাণী কহিল—বেশ ভাই বেশ, খুব জুতো মেরে নিচ্ছ!

লেখাপড়া কথামালা অথবা বোধোদয়ের গণ্ডী পার হইতেও পারে নাই, এমন একটা অপবাদ আরোপিত হওয়ায়, ত্রস্ত হইয়া, কালীতারা তখনই জিভ্ কাটিয়া দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া ভ্রাতৃজায়ার পদস্পর্শ করিয়া বলিল—কি ভাই বল, তার ঠিক নেই! একটু থামিয়া আবার কহিল, দাদাকে জিজ্ঞেস্ করলুম, 'দাদা বৌদির সঙ্গে ভাব হোলো?' দাদা ঘাড় নাড়লেন, তারপর শুনলুম, তোমাদের নাকি ভাই কথাই হয়নি। হ্যাঁ ভাই সত্যি?

ইন্দ্রাণী ঘাড় নাড়িল।

কালীতারা কহিল—দাদা কি বল্লেন, জান বৌ-দি?

ইন্দ্রাণী শিরশ্চালনা করিয়া জানাইল, না।

কালীতারা কহিল—বল্লেন, বি-এ পাস-করা, কথা কইতে ভয় হয়।

ইন্দ্রাণী হাসিয়া বলিল—কিন্তু আমার গায়ে বি-এ পাস লেখা আছে না-কি ভাই!

কালীতারা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া যেন কি ভাবিল, তারপর বলিল, না ভাই, কাল ত ফুলশয্যে, খুব ভাব ক'রে নিও কিন্তু।

ইন্দ্রাণী এ-কথার কোন উত্তর দিল না।

ফুলশয্যার রাত্রি। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হইলে, কালীতারা একান্ত-অনাবশ্যক জানিয়াও যখন শয্যাটা আর-একবার সাজাইয়া গুছাইয়া দিতে আসিল, তখন বৌ-দিদির কাণে কাণে সেই কথাটাই বারম্বার জোর দিয়া বলিয়া গেল, যেন খুব ভাব করিয়া লইতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা না করে!

কালীময় একটা সেটিতে বসিয়াছিল; ইন্দ্রাণী কালীতারার সঙ্গে বাহিরে গিয়া, ফিরিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া সেই সেটিটার পিঠে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া রমণীসুলভ মিষ্টমধুর স্বরে জিজ্ঞাসিল—আমার সঙ্গে কথা কইতে তোমার নাকি ভয় হয়?

'আপনি' যে বলিবে না, তাহা অনেক আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সেইখানে, কালীময়ের পার্শ্বের স্থানটিতে বসিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল, কিন্তু বিনা-আহ্বানে ততখানি অগ্রসর হইতে পারিল না।

কালীময় বসিতে বলিল না, শুধু বলিল—না, ভয় আর কি!

কালীতারা ইন্দ্রাণীর মেডেল, লকেট, সার্টিফিকেটগুলি বাহির করিয়া আজ এই ঘরের টেবিলের উপরই সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, ইন্দ্রাণীর কথার সঙ্গে সঙ্গে কালীময়ের দৃষ্টি সেইদিকেই পড়িল।

ইন্দ্রাণী হাসিয়া বলিল—ও-গুলো ভাঙ্গিয়ে একটা গয়না গড়িয়ে এনে দিও।

কালীময় পূর্ব্বের মতই না-সহজ না-গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—ও-গুলো না ভেঙ্গেও গয়না হতে পারে না না-কি!

ইন্দ্রাণী রমণীর মতই বলিল—তা পারে, কিন্তু এখন ও-গুলোই বা আর কি হ'বে—ধুয়ে জল ত আর খাবনা।

কালীময় বলিল—এতদিন যা হয়েছিল তাই হ'বে।

রেখে দিতে বল্‌ছো? কিন্তু আমার ইচ্ছে, তুমি নিজে পছন্দ ক'রে ও-গুলো থেকে একটা কিছু গড়িয়ে এনে দাও, আমি পরি। যদি হার হয়, তার নাম হ'বে মেডেলহার, কি ঐ রকম কিছু!

কালীময় আর কোন কথা কহিল না। সে-যেন একটু ব্যস্ত, একটু অন্যমনস্ক। ইন্দ্রাণী তাহা ঠিক বুঝিল না, বলিল—দেখবে না ও-গুলো একবার?

কালীময় সামনের ঘড়িটার দিকে চাহিয়াছিল, বলিল—তা দেখ্‌লেই হবে'খন।—বলিয়া থামিল, আবার বলিল, রাত প্রায় ১২টা, তুমি শোও।

নারীর ইচ্ছা হইতেছিল, তাহার হাতটা ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া সেগুলা দেখায়; প্রবচন বলে, কথায় কথা বাড়ায়, কিন্তু ইন্দ্রাণী তাহাও পারিল না; নতমুখে বলিল—চলো।

কালীময় কহিল—তুমি শোও, আমি আসছি।

নারীর পা অচল! নারী চাহিতেছিল, হাতটি সাদরে, সাগ্রহে ধরিয়া যুগলে শয্যা প্রবেশ করে; কিন্তু ইন্দ্রাণী তাহা পারে কৈ? সে ধীরে ধীরে অতি ধীরে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল।

কালীময় সিগারেট ধরাইল এবং কখনও কড়িকাঠের, কখনও দ্বারের দিকে চাহিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল—ভুলিয়াও একবার এদিকে চাহিল না।

নারী যেমন ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। মনকে যত

প্রস্তুত করিয়াই রাখুক, পুরুষের চোখের সম্মুখে শয়ন করিতে কিছুতেই তাহার মন সায় দিল না।

একটি সিগারেট নিঃশেষ করিয়া, আর একটিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া, কালীময় এদিকে ফিরিয়া বলিল—আলো নিবিয়ে দোব ?

সে প্রশ্ন করিল বটে, কিন্তু উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। ইন্দ্রাণী এইবার আস্তে আস্তে বেশবাস, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযত করিয়া শুইয়া পড়িল।

বোধ হয় সে সিগারেটটাও পুড়িয়া শেষ হইল, আর একবার দেশলাই জ্বলিল, মুদিত চক্ষুর পাতা ভেদ করিয়া সে-আলোকটুকু ইন্দ্রাণীর চক্ষে লাগিল। আরও কিছুক্ষণ কাটিল; একবার আলো জ্বলিয়া তখনই নিবিয়া গেল, তারপর পদশব্দ শ্রুত হইল। এইবার সত্য, সত্য, সত্য, ইন্দ্রাণীর সকল অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। অনাস্বাদিত নারী-হৃদয়ের যতেক মধু যাহাকে নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিবার জন্য সকল অঙ্গ উন্মুখ, উৎসুক, তাহারই আগমন-শব্দে একি হৃদিকম্প !

কিন্তু পদশব্দ শয্যার দিকে আসিল না, অত্যন্ত সন্তর্পণে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। অতি ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া আবার বন্ধ হইল—ঘর সম্পূর্ণ নিঃশব্দ ! নারীর অতিক্রুত হৃদয়-স্পন্দন বন্ধ হইল; কিন্তু শান্ত হইল না, শান্তি মিলিল না। এবং তাহার পূর্ব্বেই আকস্মিক ঝড়ের মত, শাশুড়ী ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিলেন—বৌমা, কালী যে বড় চলে গেল !—আলো জ্বলিয়া উঠিল।

ইন্দ্রাণী শয্যায় বসিতে বসিতে বলিল—আমি ত কিছুই জানিনে।

আ আমার পোড়া কপাল ! এর আবার জানবেই বা কি ! তুমি শুয়ে রইলে আর সে চলে গেল, তুমি কিছুই জান্‌লে না ?

ইন্দ্রাণী সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

শাশুড়ী হতাশভাবে বলিলেন—তারাকে ডেকে দিচ্ছি বাছা, তোমার কাছে থাকুক।—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কালীময়ের প্রস্থানের পর হইতে শাশুড়ীর আগমন ও নির্গমন-পর্য্যন্ত বহু সমস্যা মস্তিষ্কে জমা হইতেছিল, শাশুড়ীর শেষ কথাগুলিতে তাহা আরও বাড়িল; কিন্তু হদিশ একটা কিছু পাইবার পূর্ব্বেই শুষ্কমুখে কালীতারা ঘরে আসিয়া কহিল—যেতে দিলে কেন ভাই বৌদি ?

এ কি প্রশ্ন ! ইহার উত্তরই বা কি ! ইন্দ্রাণী স্তব্ধ, বিস্ময়ে অভিভূত।

কালীতারা তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল—যেতে দিলে কেন ভাই ? ফুলশয্যের রাতটাও…

ছোট্ট একটা সূচের খোঁচা হঠাৎ যেন ইন্দ্রাণীর বক্ষে বিঁধিল।

কালীতারা কথাটা শেষ করিল এইরূপে, ফুলশয্যের রাতটাও দাদার ঘরে মন উঠ্‌ল না।

সূচের মুখে বোধ হয় বিষ ছিল, হঠাৎ জ্বালা করিতে লাগিল।

কালীতারা এ সব বুঝে না; মনস্তত্ত্ব বলিয়া কোন 'বস্তু' যে ধরাতলে আছে, তাহার সন্ধানও সে রাখে না। নিজেই ডিগ্রী ডিস্‌মিস করিতে লাগিল, দাদার ত দোষ আছেই কিন্তু তুমিও ভাই বড্ড বোকা ! ফুলশয্যের বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে দিতে আছে ?

ইন্দ্রাণী বলিল—তিনি ত বিছানায় ছিলেন না।

তবে যে মা বল্লেন, তুমি শুয়ে ছিলে।

আমাকে যে বার বার শুতে বল্লেন ভাই।

কালীতারা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মত প্রকাশ করিল, পালাবার মতলব গোড়া থেকেই ছিল কি-না, তাই তোমায় শুতে বলেছিলেন। হারামজাদা মাগী কি-যে অষুধ করেছে ভাই—

দোষযুক্ত বৈদ্যুতিক সুইচে হাত দিবামাত্র লোকে যেভাবে 'শক্' পাইয়া লাফাইয়া উঠে, ঠিক সেইভাবে লাফাইয়া উঠিয়া, ইন্দ্রাণী বলিল—সে আবার কে ঠা—ঠাকুরঝি সম্বোধন করিতে গিয়া সে আত্মসম্বরণ করিয়া লইল। যতটুকু শুনিয়াছে, তাহার পর আর কোন সম্বন্ধ রক্ষার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না।

ইহাও কালীতারার বোধগম্য হইল না; সে কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল—যম জানে, কে ! হ'বে কোন্ শতেকখোয়ারী।

ইন্দ্রাণী স্থির নিষ্কম্পকণ্ঠে কহিল—তোমরা এ সব জান্তে ?

কোন্ সব? ও মা, এ আবার না জানে কে!

ইন্দ্রাণী কঠোরস্বরে বলিল—জেনে শুনে—তোমরা জেনে শুনে—" তাহার বলিবার ইচ্ছা ছিল, "জেনে শুনে আমায় হত্যা করেছ"—কিন্তু কথা বাহির হইল না।

কালীতারা এ-কথাটা কিন্তু ঠিক অনুমান করিয়া লইল, বলিল—বরাতের দোষ ভাই, বরাতের দোষ। দাদা বিয়ে করতে কখনই রাজী ছিলেন না; মা, এবার আত্ম-হত্যে হ'বো, কাশীবাসী হ'বো, ব'লে ভয়টয় দেখাতে দাদা রাজী হলেন। মা ভাবলেন, খুব লেখাপড়া-শেখা গানটান-জানা বৌ এলে ছেলের দোষটি ঘুচে যাবে। তাই ভেবেই ত—

ইন্দ্রাণী পুড়িতেছিল, পোড়ার জ্বালা অসহ্য জ্বালা; জ্বলিতে জ্বলিতে বলিল—একটা নিরপরাধের সর্ব্বনাশ করলেন।

কালীতারা ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ আবার কিসের ভাই? পুরুষ মানুষ অশুদ্ধ হয় না; আর, একবার ঘরে মন বস্‌লে ভাবনার কিছুই নেই! এস ভাই, আলো নিবিয়ে দিয়ে দু'জনে শুয়ে শুয়ে গল্প করি।

এইখানে! এই বাড়ীতে! না।

সে কি ভাই?

ইন্দ্রাণী দুইটি করতল যুক্ত করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল—দয়া ক'রে একখানা গাড়ী আনিয়ে দাও, আমি এখুনি বাবার কাছে যাব।

এই রাত্রে! পাগল না কি বৌদি!

পাগল নই, পাগল হ'লে যেতে চাইতুম না, এইখেনেই পড়ে থাকতুম। দেবে একখানা গাড়ী আনিয়ে? না দাও—

আমি ত বাড়ীর মালিক নই ভাই। মা'কে বলি গে, তিনি যা ভাল বোঝেন, করুন।

সে বাহির হইয়া গেল।

ইন্দ্রাণী শয্যায় বসিল; অশুচিবোধে তখনই দাঁড়াইয়া উঠিল; দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা, বর্ণবহুলপেলব পুষ্পদল সকলই অস্পৃশ্য মনে হইতে লাগিল; উঠিয়া 'সেটির' দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু সেটিতে যেন আগুন জ্বলিতে-ছিল, সেখানেও বসা হইল না, অথচ দাঁড়াইবার শক্তিও পা দু'টির ছিল না। টেবিলের সামনের চেয়ারটিতে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল।

শাশুড়ী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—হ্যাঁ গা বৌমা, এই রাত্রে তুমি নাকি বাপের বাড়ী যেতে চাও?

মাথা না তুলিয়াই ইন্দ্রাণী কহিল—হ্যাঁ।

শাশুড়ী বলিলেন—যেতে হয়, সকালে যেও, বাপের বাড়ী ত' আর পালিয়ে যাচ্ছে না বাছা!

ইন্দ্রাণী দৃঢ় অথচ বিনীতকণ্ঠে কহিল—আমি এখুনি যাব।

শাশুড়ী বধূর এই দৃঢ়তায় অতিমাত্র কঠিন হইয়া কহিলেন—পুরুষের ওপর রাগ করা মেয়েমানুষের সাজে না বাছা। তবে তোমরা নাকি এল-এ বি-এ পাস্ করেছো, তোমাদের কথাই আলাদা। কিন্তু তা'ও বলি বাছা, আজ এই রাত্রে ঢলাঢলি ক'রে তুমি যদি চলে যাও, কালীর-আমার মন চিরকালের জন্য একেবারে বেঁকে যাবে।

ইন্দ্রাণী দৃঢ়স্বরে বলিল—কিন্তু আমি এখুনি যাব, আপনি দয়া ক'রে একটা গাড়ী আনিয়ে দিতে বলুন।

যা ভাল বোঝ কর বাছা। গাড়ীর ভাবনা কি! দে রে তারা, দরোয়ানকে বলে দে, একখানা গাড়ী বের করে আনুক।—বলিয়া শাশুড়ী কোন দিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কালীতারা দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়াছিল, জিজ্ঞাসিল—বৌদি গাড়ী আস্তে বলি?

হ্যাঁ।

সে চলিয়া গেল এবং একমিনিট পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—দাদার গাড়ী ফিরে এসেছে, তুলতে বারণ করেছি।

ইন্দ্রাণী কহিল—ভাড়া গাড়ী একখানা পাওয়া যায় না? কাউকে বলে দাও-না, একটা ট্যাক্সী ডাকুক।

কালীতারা খুব নরম প্রকৃতির মেয়ে; কিন্তু এ কথায় সে'ও গরম হইয়া উঠিল, বলিল—দাদার গাড়ী চড়তেও দোষ।

কোন্‌টা দোষ, কোন্‌টা নয়, ইহার মত অশিক্ষিত মেয়েকে সে কথা বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যথেষ্ট শিক্ষিত বলিয়াই, ইহা লইয়া কথা-কাটাকাটি করিতেও ইন্দ্রাণীর প্রবৃত্তি হইল না; বলিল—আচ্ছা, ঐ গাড়ীতেই যাচ্ছি। তুমি কি ড্রাইভারকে বলে দেবে?

চল।

যখন তাহারা দুইজনে সিঁড়ির মুখে আসিয়াছে, কোন্ অদৃশ্য স্থান হইতে শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁরে তারা, পেঁটরা বাক্স সব দিইছিস সঙ্গে?

কালীতারা বধূর পানে চাহিল; বধূ অনুচ্চস্বরে বলিল —থাক্ সে সব।

তিন

পিতা কোন সান্ত্বনাই দিতে পারিলেন না। রোরুদ্যমানা কন্যার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া মূঢ়ের মত বসিয়া রহিলেন। মেয়ের চোখের জলে বুড়ার বুক ভাসিতে লাগিল, আর বুড়ার চোখের বিন্দু বিন্দু বারি কুসুম-সজ্জিত শিথিল কবরী সিক্ত করিয়া তুলিতেছিল। এমনই নিঃশব্দে, নীরবে স্তব্ধ নিশীথে দুইটি বদ্ধ হৃদয়ের বেদনার আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। ভোরবেলা ইন্দ্রাণী বলিল—বাবা, আর কারও এমন হয়েছে শুনেছ?

পিতা ধীরে শান্ত ও সম্বৃত কণ্ঠে বলিলেন—মা, পোড়া বাঙ্গলাদেশে আজকালই ওটা একটু কমেছে, বিশ পঁচিশ বছর আগে ঘরে ঘরে ঐ দশাই ছিল।

ইন্দ্রাণী চমকিয়া, বাপের বুকের উপর হইতে মাথাটা তুলিয়া জিজ্ঞাসিল—বল কি বাবা?

শুনেছি মা; শুনেছি কেন, বন্ধু বান্ধবকে দিয়ে দেখেওছি।

তারা কি করতো, বাবা?

কারা মা?

স্ত্রীরা—তাদের স্ত্রীরা। আত্মহত্যা করত?

না মা! কেউ আত্মহত্যা করেছে ব'লে কখনও শুনি নি।

তবে কি করতো?

কি আর করবে! চোখের জলে ভাসতো! আবার সুদিন আসবে ভেবে সংসার করতো।

ইন্দ্রাণী একটু ভাবিয়া কহিল—আমাকে তুমি কি করতে বলো বাবা?

পিতা বলিলেন—আমি কিছু বলি নে মা; বলবার অধিকারও ত রাখি নি মা!—বলিতে গিয়া বৃদ্ধের গলাটা রুদ্ধ হইয়া গেল।

মেয়ে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—তোমার কি দো বাবা?

ও-কথায় কোন সান্ত্বনা পাই নে মা! আর দোষ তাই বা বলি কেমন করে! এতটা তাড়াতাড়ি না কর উচিত ছিল। তোর মামা ত খোঁজখবর করতে কসুর ক নি। যে-আপিসে ছোকরা কাজ করে, সেখানকার সাহেব পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিল তোর মামার কাছে।

ইহার পরে উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব। তারপর পি বলিলেন—তবে একটা কথা আমার মনে হয়—তি থামিলেন! ইন্দ্রাণী ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—কি বাবা?

পিতা আস্তে আস্তে বলিলেন—মা, অতীতটাকে ি মুছে ফেলা যায় না মা?

ইন্দ্রাণী মুখে কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িতেছিল; পি তাহা দেখিলেন কি-না বলিতে পারি না, তিনি পূর্ব্বে মত ধীর, শান্ত, সংযত কণ্ঠে, যেন প্রত্যেকটি অক্ষর বাছি প্রত্যেকটি শব্দ ওজন করিয়া, বলিলেন—তুমি প্রতি গড়বে, তুমি কারিকর, মাটি এঁদো ডোবারই হো আর পূতসলিলা ভাগীরথীরই হোক, তার সঙ্গে তোম সম্পর্ক কি! তুমি যা পেয়েছ, সেই মাটাটার সঙ্গে সম্প তুমি তোমার নিজের ইচ্ছে মত ক'রে তাকে তৈরী কর এই না তোমার কাজ মা! তাই নয় কি ইন্দু?

ইন্দ্রাণী সাড়া দিল না।

পিতা পুনশ্চ বলিলেন—নোংরা জলকে ঘাঁটিয়ে তু নোংরা বাড়ে বৈ কমে না; থিতুতে দিলে অনে সময়…

ইন্দ্রাণী বলিল—ওপরটা যাই হোক, তলায় নোং থেকেই যায়, বাবা।

ঠিক বলতে পারি নে মা! তবে আমার বিশ্বা অসহিষ্ণু ব্যক্তি কি ফল পায় জানি-নে, সহিষ্ণু লো সুফল আশা করতে পারে। এ আমি দেখেছি মা, স্বা বা স্ত্রীর কোন সময়ের একটা ছিদ্রের—তা সে সত্যই হো আর কাল্পনিকই হোক্—ছুতো ধরে যারা অপ্রি আলোচনার জের টেনে চলে, তারা ভেদই বৃদ্ধি ক মিলনের সুখ তারা জান্তেও পারে না। আর এ কথা সত্যি মা, যে স্ত্রী সহিষ্ণুশীলা নন, তাঁর অদৃষ্টে বিধাতা সু লেখেন নি।

কিন্তু সহ্যের কি একটা সীমারেখা থাকা উচিত নয় বাবা?

উচিত, কিন্তু কে বিচার করবে যে, কে সীমার মধ্যে থাকছে, কে সীমাভঙ্গ করছে! সীমাকে একটা ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে বাঁধতে গেলে এ সমস্যার মীমাংসা ত হ'বে না; উদারতা দিয়ে বিচার করতে হবে।

কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া, ইন্দ্রাণী যেন চমকাইয়া উঠিল, বলিল—বাবা, আমায় আশীর্ব্বাদ করো।

পিতা বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিতে কন্যা কহিল—তাড়াতাড়ি চলে আসা আমার ভাল হয় নি বাবা; আমি ফিরে যাবো, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করো যেন আমি সহ্য করতে পারি।

পিতা কথা বলিতে পারিলেন না, তাই বুঝিয়াই জলভরা দুইটি চক্ষুর বিগলিত ধারা বুঝি অজস্র আশীষ বর্ষণ করিয়া দিল।

চার

ইন্দ্রাণী যখন এ-বাড়ীতে ফিরিল, তখন বিশ্বের প্রভাত হইয়া থাকিলেও এখানে রাত্রি নিঃশেষ হয় নাই। শাশুড়ী সামনেই ছিলেন, প্রভাতালোকের মত হাসিমুখে বধূকে বুকে ধরিলেন, চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর জ্ঞাপন করিলেন।

গৃহের ভাবগতিক দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল গৃহস্বামী গৃহে নাই—মনে পড়িল, হয়ত এখনও প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হয় নাই। কিন্তু মনের মধ্যে কোন আলোচনা করিবে না স্থির করিয়াই সে কালীতারার কক্ষে গিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল এবং তাহার গ্রাম্য রসিকতাকেই পরম উপভোগ্য করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কোন সময়ে গৃহস্বামী আসিলেন, ভৃত্যমহলে সাড়া পড়িয়া গেল, শাশুড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই নির্দ্দেশে কালীতারা আসিয়া তাহাকে সংবাদটি দিয়া গেল।

ভৃত্য ট্রে সাজাইয়া চা লইয়া যাইতেছিল, বারান্দায় তাহাকে দেখিয়া ইন্দ্রাণী ডাকিয়া বলিল, ও-সব তুমি এইখেনে রেখে বাবুকে ডেকে দাও।

একটু ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি নিয়েই এসো। বাবু কোথায়?

ভৃত্য অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে বারান্দার অপর প্রান্তস্থিত ড্রয়িং রুম দেখাইয়া বলিল—ঐ ঘরে।

ওখানে আর কেউ আছেন?

না।

কালীময় সোফায় চক্ষু মুদিয়া বসিয়া চা'য়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল, পদশব্দে চক্ষু মেলিয়া লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া চক্ষু নামাইয়া লইল।

ইন্দ্রাণীর কাছে এটুকু ভাল লাগিল। ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে ভৃত্যের হস্ত হইতে সরঞ্জামাদি নামাইয়া লইয়া, তাহাকে নীরবে বিদায় দিয়া, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিল—চা ঢালব?

কালীময় ঘাড় নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিল মাত্র। ইন্দ্রাণী চা ঢালিয়া জিজ্ঞাসিল—চিনি কি আমি দিয়ে দেব?

কালীময় নতমুখে বলিল—দাও।

ক' চামচ দেব?

দাও যা হয়!

ইন্দ্রাণী হাসিয়া বলিল—বা রে! ক'চামচ খাও না-জান্‌লে বেশী-কম হযে যাবে না? তুমি কি বেশী মিষ্টি খাও?

কালীময় মুখ তুলিয়া বলিল—না, বেশী খাই নে।—কিন্তু মুখ তুলিয়া সে বিপদে পড়িল। হাসিমাখা তরুণ মুখখানির দুইদিকে দুইটি টোল্ পড়িয়াছিল, সে দু'টি তাহার চোখে, তাই বা কেন, তাহার বুকে গাঁথিয়া গেল;—অবশ্য এ কথাও ঠিক, সে ক্ষণেকের জন্য।

'পোচে' লবণ ও মরিচগুঁড়া দিতে দিতে বলিল নুন কি-রকম দেব বল?—প্রশ্নটা করিয়াই আবার সে হাসিয়া ফেলিল, কহিল—কাল থেকে আর জিজ্ঞেস্ করব না, প্রথম দিন সব জেনে-শুনে নিতে হ'বে ত!

নুনও বেশী খাই নে। কালীময় আর মুখ নীচু করিয়া থাকিতে পারিল না; লোভ্‌ জন্মিল; আবার মুখ তুলিল, আবার সেই নিটোল গালের টোল দু'টি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। কালীময় আবার কথা কহিল—তুমি চা খেয়েছ?

আমি চা খাই নে।

খাও না? কেন?

কোন কারণ নেই। বাবা খান্ না, আমিও খাই নে।

আমাদের বাড়ীতে চায়ের পাটই ছিল না।—বলিয়া সে হাসিল ; একটু পরে আবার বলিল—কলেজের বোর্ডিঙে একবার মাস দুই ছিলাম, তখন রোজ চা খেতাম, ভালও লাগতো।

কালীময় বলিল—চা খাওয়া খারাপ নয়।

ইন্দ্রাণী বলিল—বলো ত, আবার খাই।

খাও না, বেশ ত!

ইন্দ্রাণী বলিল—ও-বেলা থেকে খাব।

শ্রীমতী কালীতারা খুব ভালমানুষটির মত, দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিয়াছিল ; এ কথার পর আর কিছু শুনিবার ধৈর্য্য তাহার রহিল না, মা'কে 'এই পর্য্যন্ত' শুনাইয়া আসিবার জন্ম সে ছুটিয়া গেল এবং বলিল—মা গো, ছলাকলায় বৌ আমাদের এক হাটে বেচে অন্ম হাটে কিনতে পারে! মা বোধ করি যোড়া মহিষ মানত করিতেছিলেন, কথা বলিলেন না।

ইন্দ্রাণী বলিল ক'টার সময় ফেরো? আফিস থেকে।

পাঁচটার আগেই ফিরি।

এসে চা খাও ত?

হ্যাঁ।—ঘড়ির দিকে চাহিয়া কালীময় সুখনকে 'সেভের জল' আনিতে বলিল।

ইন্দ্রাণী কক্ষ হইতে বাহির হইবার সময় বেশ স্পষ্টকণ্ঠে সুখনকে আদেশ দিয়া গেল—বাবুর আফিসের পোষাক আসাক সমস্ত আমার ঘরে রেখে এস সুখন।—বাহিরে গিয়া, আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল—সেগুলো তুমি আগেই রেখে এস সুখন, আমি সব দেখে টেখে রাখি।

কালীতারা তখনও আসিয়া জমিতে পারে নাই ; শুনিলে অবশ্যই বলিত, আমাদের বৌটি দেখি ছলাকলার রাজরাণী।

ইন্দ্রাণী নীচে নামিয়া দেখিল, মাতা-কন্যায় চুপে চুপে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে! যাইবে-কি যাইবে না ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্রাণী দাঁড়াইয়া পড়িতেই শাশুড়ী ডাকিলেন—এস মা!

তাঁহার মুখে অসামান্য তৃপ্তি ও শান্তির স্নিগ্ধতা বিরাজ করিতেছে ; কণ্ঠে তাহাই ব্যক্ত হইল।

ইন্দ্রাণী কাছে আসিয়া বলিল—আমাকে কাজ দিন-মা!

শাশুড়ী কথা বলিবার পূর্ব্বেই কালীতারা দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—কাজের ভাবনা কি ভাই! দাদার আফিসের বাক্সে একশ' পাণ যা'স, সাজতে ত তোমাকেই হবে ভাই! এস ভাঁড়ার-ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি, সাজবে চলো।

ভাঁড়ার-ঘরে পৌঁছিয়া ইন্দ্রাণী বলিল, কিছু মনে করো না ঠাকুরঝি, পান সাজতে আমি জানি ; কিন্তু ভাই, অভ্যেস ত নেই, আজকের দিনটে তুমি আমার সঙ্গে থেকে দেখিয়ে দাও! কি-জানি চুণ-খয়ের-মসলা বেশী-কম করে ফেলি যদি!

ফেল্লেই বা ভাই! দোষ যে ধরবে, তাকে ত দু'চামচ চিনিতেই আঁচলের রিঙ করে এসেছ!—উচ্ছ্বসিত হাস্তে কালীতারা ঘর ভরাইয়া তুলিল।

ইন্দ্রাণী লজ্জার আতিশয্য না দেখাইয়া বলিল, পানে চুণ বেশী হলে কিন্তু আঁচল, রিঙ, সঙ্গে সঙ্গে গালও পুড়ে যাবে।

আফিস হইতে কালীময় একটু সকাল-সকালই ফিরিয়া আসিল। কাজ খুব বেশী ছিল না, বাড়ীর দিকে মনটাও মাঝে মাঝে টান দিতেছিল। টানটা খুব বেশী নয় বটে, তবে খুব কমও নয়। কলেজের ছাত্র যে-ভাবে টানটা অনুভব করে, নববিবাহিত কেরাণীবাবু যে-রকম আকুলি ব্যাকুলি করেন, সে-রকম নয়। একটা নূতনত্বের প্রলোভন মনটাকে মাঝে মাঝে চুনা মাছের টোপ খাওয়ার মত নাড়া দিয়া যাইতেছিল।

সকালের মত চায়ের আসরে বসিয়া চা খাইতে খাইতে কালীময় বলিল—তুমি খেয়েছ?

ইন্দ্রাণী সলজ্জ মৃদুহাস্তে বলিল—এখন খাব।

কালীময় এখন লক্ষ্য করিল, অতিরিক্ত একটি পেয়ালা ট্রের উপরে রহিয়াছে। কিন্তু ফলমূল ও খাবারের আয়োজন একজনেরই ; কালীময় বলিল—তুমি শুধু চা খাবে?

নতমুখে ছোট্ট একটি 'না' বলিয়া ইন্দ্রাণী নিজের পেয়ালায় চা ভরিল ; চামচ ডুবাইয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিল—ঐ থেকেই কিছু নোব'খন।—বলিয়া উঠিয়া গিয়া পর্দ্দাটা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া আসিল। কালীতারা যে নিকটেই কোথায় অবস্থান করিতেছে, সে বিষয়ে সে কতকটা নিঃসন্দিহান ছিল।

চা শেষ করিয়া কালীময় সিগারেট ধরাইল। ভৃত্য

আসিয়া খবর দিল, গোসল তৈয়ার।—কিন্তু কালীময় উঠিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সন্ধ্যাটা আজ বুঝি বড় তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িতেছে!

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—এ-বেলাও স্নান কর?

কালীময় কহিল—হ্যাঁ।

ইহার পর কেহই কোন কথা বলিল না। ইন্দ্রাণী চায়ের সরঞ্জামাদি পাঠাইয়া দিয়া, ম্যাণ্টলপ্লেসে-সজ্জিত টুকি-টাকী খেলনাগুলি মানাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল। এক সময়ে কালীময় সোফা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া, পলকে তাহাকে দেখিয়া লইয়া স্নান-কামরায় চলিয়া যাইতেছিল, ইন্দ্রাণী বলিল—জয়পুর মোরাদাবাদের কিছু বাসন আনিয়ে দেবে? এমন ড্রয়িংরুমে কাচের খেলনা, বাসন মানায় না; আর এগুলো দেশীও নয়।

কালীময় বলিল—কি কি দরকার একটা ফর্দ্দ করে দিও।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ড্রয়িংরুমের এক কোণে একটা পিয়ানো ছিল, অন্য কোণে একটি ফোল্ডিং অর্গ্যান রাখা ছিল। ইন্দ্রাণী পিয়ানোটা খুলিয়া কিছুক্ষণ বাজাইল; তারপর সেটাকে বন্ধ করিয়া আসিয়া অর্গ্যানটা খুলিল। দুই তিনটা গৎ বাজাইল। তারপর কখন্, তাহার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জানি-না, সুকণ্ঠের মধ্য হইতে সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিল; কালীতারা অট্টালিকার অপরপ্রান্তে থাকিয়াও তাহা শুনিতে পাইল এবং ছুটিয়া মা'র সামনে হাসিয়া লুটোপুটি খাইয়া বলিয়া উঠিল—মাগো মা! কি মেয়ে মা! আজই দাদার সামনে গান ধরে বসেছে মা! আমি এই তোমার কাছে দিব্বি করে বলছি, তা তুমি দেখো, বৌ যদি দাদার মুণ্ডু না ঘোরায় ত কি বলেছি।

মা কিছু বলিলেন না, কিন্তু আমরা জানি, কালীঘাটের কালীমাতার আরও দুইটি নধর মহিষ ছানা পাওনা হইয়া থাকিল।

কালীময় স্নান সারিয়া নিঃশব্দে পশ্চাদ্দিকের সোফায় আসিয়া বসিয়া গান শুনিতে লাগিল। যখন একসময়ে গান বন্ধ করিয়া ইন্দ্রাণী আসন ছাড়িয়া উঠিতেছিল, কালীময় বলিয়া উঠিল—থামলে কেন?

ইন্দ্রাণী সলজ্জভাবে আসনটায় বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কখন্ এলে?

অ-নে-ক-ক্ষ-ণ! আরও দু' একটা গাও।

তোমার ভাল লাগে?

কালীময় ঘাড় নাড়িল। ইন্দ্রাণী লজ্জার অভিনয় করিল না, বারম্বার অনুরোধের অপেক্ষাও করিল না। তখনই গাহিতে আরম্ভ করিল।

কালীতারা পর্দ্দাটা ভেদ করিয়া এ দৃশ্যটা একবার দেখিয়া গেল—বধূর অসামান্য কৃতিত্ব সম্বন্ধে মাতাকে আর একবার সচেতন করিয়া আসিল। এবার আর মহিষ নয়, কালীমাতার নাকের মুক্তা-বসানো সোনার নথ প্রাপ্য হইল। অন্য দিন কালীময় সন্ধ্যা হইতেই বাহির হইয়া যায়, আজ আটটা বাজিয়া গেল, তবুও কালীময় ঘরে বসিয়া গান শুনিতেছে দেখিয়া কালীঘাটের কালীমাতার অঙ্গে আর কোন্ দ্রব্য, কোন্ বস্ত্র, কোন্ অলঙ্কার শোভা পায়, জননী তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রাণী এক সময়ে গান থামাইয়া বলিয়া উঠিল—না, তোমার বোধ হয় একঘেয়ে লাগছে।

কালীময় নতমুখে হাসিয়া বলিল—না, আমার ভালই লাগছে।

ইন্দ্রাণী কালীময়ের সোনার সিগারেট-কেসটি খুলিয়া একটি সিগারেট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল—ইচ্ছা ছিল অধরোষ্ঠে গুঁজিয়া দেয়—দেশলাই জ্বালিতে জ্বালিতে বলিল—এক মিনিট তুমি বসো, আমি একটু জল খেয়ে আসি।

কালীময় বলিল—এইখানেই আস্তে বলি-না।

ইন্দ্রাণী হাসিয়া বলিল—না, না, আমি এখনই খেয়ে আসছি।

ইন্দ্রাণী বাহির হইয়া যাইতেই কালীময় ঘড়ির পানে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। ন'টা বাজে যে! কিন্তু তবু উঠিতে পারিতেছিল না। স্থানান্তরের ব্যাকুলতার চিত্রখানি মনের মধ্যে অস্বস্তি জাগাইতেছিল বটে, কিন্তু এখানকার চিত্রটি অধিকতর আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল।

ইন্দ্রাণী একটি সেতার-হস্তে ঘরে ঢুকিয়া কালীময়ের সোফায় বসিয়া পড়িয়া কহিল—সেতার বাজাব, শুনবে? সেবার অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে সেতারে আমি প্রথম হয়েছিলাম। এই তার মেডেল।

মেডেলখানি নাড়িতে নাড়িতে কালীময় বলিল—বাজাও না একটু শুনি।

ইন্দ্রাণী আঙুলে মেজরাপ্ পরিতে পরিতে কহিল—যদি ভাল না লাগে বলো, বুঝলে?

কালীময় হাসিল।

গৎটা ছিল সুদীর্ঘ ও সুমিষ্ট। প্রায় একঘণ্টা পরে ইন্দ্রাণী যখন থামিল, তখন তাহার রক্তিম কপালে, ওষ্ঠের পরে স্বেদবিন্দুগুলি টল্‌টল্ করিতেছে। ক্ষুদ্র রুমালখানি বাহির করিয়া মুখখানি মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসিল—কেমন লাগলো?

কালীময় তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, বলিল—চমৎকার!

ইন্দ্রাণী বলিল—মিউজিক কনফারেন্সে যেটা বাজিয়েছিলাম, সেটা আরও বড়!

কালীময় বলিল—আজ তোমার বড্ড পরিশ্রম হয়েছে. সেটা আর একদিন শুনবো।

ওতে আবার পরিশ্রম কিসের! তোমার ভাল লাগে ত বল, এখনই বাজাই।—বলিয়াই সে তারের উপর মেরজাপটা বুলাইয়া দিতেই, মধুর ঝঙ্কার যেন লাফাইয়া উঠিয়া লুটাইয়া পড়িল।

যে লোক চিরকাল এঁদোপুকুর, ভ্যানভেনে মশা, প্লীহা-যকৃতের পীঠস্থান বাঙ্গলাদেশের পল্লীগ্রামে বাস করিতেছে, হঠাৎ দার্জ্জিলিঙ বা সিমলাশৈলে আসিলে তাহার যে মনোভাব উপস্থিত হয়, আজ কালীময়েরও মনের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ। এ যদি অমরাবতী নয়, তবে সে আর কোথায়?

রাত্রি প্রায় এগারোটা। মা পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—খাবার এইখেনেই দিতে বলি বাবা?

কালীময় চমকিয়া উঠিল। কতদিন, মনে পড়ে না কতদিন, রাত্রের আহার এ গৃহে সে করে নাই! চমকিয়া উঠিল, কিন্তু 'না' বলিতে পারিল না। ইতস্ততঃ-ভাবে কহিল, তা দাও।

বৌমা তোমার খাবারও এইখেনে দিতে বলছি—বলিয়া শ্বশ্রূ বাহির হইয়া গেলেন।

ইন্দ্রাণী সলজ্জ-হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া কালীময়ের দিকে চাহিতেই, কালীময় বলিল—এখানে খেতে তোমার লজ্জা করবে বুঝি?

ইন্দ্রাণী বলিল—লজ্জা! না! মা কি মনে করবেন?

এ সমস্যা ভঞ্জন করিতে কালীময় অক্ষম। কিন্তু আমরা বলিতে পারি, মা'র মনে কালীমাতার রূপ স্পষ্ট ও তাঁহার ঋণ ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছিল; আর কিছু মনে করিবার তাঁহার অবসর ছিল না।

আহারাদি শেষে, কালীময় ইন্দ্রাণীকে বলিল—চল একটু বেড়িয়ে আসি। যাবে?

যাব। জুতোটা পরে আসি।

জুতা পরিয়া, সিল্কের শালখানি গায়ে জড়াইয়া ইন্দ্রাণী যখন কালীময়ের আগে আগে মোটরে উঠিল, তখন দ্বিতলের জানালা হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া কালীতারা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না; সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, চীৎকার করিয়া মা'কে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—মা গো মা, বৌ একেবারে মেম্‌সাহেব মা।—আনন্দে কিম্বা বিস্ময়ে বলিতে পারি না, খবরটা অন্যত্র আর একজনের কাছে জাহির করিতে যাইবার পথে অন্ধকারে দেওয়ালে মাথাটা ঠুকিয়া গিয়া রক্তপাত হইলেও লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না।

পাঁচ

অধিক রাত্রে গৃহে ফিরিয়া, শয়ন করিবার পূর্ব্বে কালীময় টেবিলে সাজানো মেডেল, পুস্তক, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা প্রভৃতি দেখিতে বসিল; ইন্দ্রাণীও একখানা চেয়ার টানিয়া পার্শ্বে বসিল।

একখানা মেডেল দেখিতে দেখিতে এক সময়ে কালীময় জিজ্ঞাসা করিল—তুমি নাচতে পারো?

ইন্দ্রাণী মাথাটা নীচু করিয়া, ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু কালীময়ের তাহাতে তৃপ্তি হইল না, পুনশ্চ জিজ্ঞাসিল—পারো?

ইন্দ্রাণী স্বামীর পানে চাহিতে গিয়া দেখিল সে চক্ষু দু'টিতে একটা অসামান্য ক্ষুধা ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে; পুরুষের চক্ষুর ক্ষুধা যে নারী বুঝিতে না পারে, বৃথায় তাহার নারীজন্ম সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল—পারি; তুমি বাজাতে পার?

পারি।

আজ আর নয়, রাত তিনটে বাজে। কাল আমার স্বরলিপির খাতাটা দোব, তুমি বাজিয়ো, আমি—

কালীময় হাসিয়া বলিল—বেশ। কিন্তু একটা কথা কি আছে জানো? বলে, আজ যাহা পার, কালকের জন্য তাহা রাখিবে না।

ইন্দ্রাণী হাসিল, বলিল—কিন্তু এত রাত্রে বাজনা হ'লে মা'র ঘুমের অসুবিধে হয় যদি?

কালীময় কহিল—মা ভেতরের বাড়ীর তেতলায় শোন্, বোধ হয় শুন্তে পাবেন না; পেলেও কিছু মনে করবেন না।

বেশ—বলিয়া ইন্দ্রাণী উঠিয়া গেল; একটা সুটকেস খুলিয়া দু'তিনখানা খাতা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল—কিন্তু মূলেই যে ভুল গো।

কালীময় মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসিল—কি আবার ভুল হোল?

অর্গ্যান ত ড্রয়িংরুমে!

এ-ইঃ! সে আমি আনছি।—কালীময় বাহির হইয়া গেল। ইন্দ্রাণী স্বরলিপির খাতা খুলিয়া বাছিতে লাগিল। অভ্যাস নাই, ম্যাট্রিকুলেসান দিবার পর শেষবার পারিতোষিক-বিতরণ সভায় নৃত্য করিয়াছিল; তারপর দীর্ঘ চারি বৎসরের অনভ্যাস, ভুলিয়া হয় ত যায় নাই, তবু মনে একটু দ্বিধা যে উঁকি দিতেছিল না, তাহা বলা যায় না।

কালীময় নিজেই অর্গ্যানটা আনিয়া ফেলিল। তখন দুইজনে ঘরের ছোটখাট আসবাবপত্রগুলা সরাইয়া স্থান করিয়া লইল। মালী ফুলদানীতে অজস্র ফুল রাখিয়া গিয়াছিল; তাহারই গোটাকতক তুলিয়া লইয়া ড্রেসিংরুমে যাইবার সময়, কালীময়কে খাতাটা দেখাইয়া বলিল—আমার হারটা চিহ্ন করে রেখে এসেছি, ঐ সুরটা বাজাতে হবে।

কালীময় সুরটা দেখিতে লাগিল। কথাটা খুলিয়া বলা ভাল, তাহার ভিতরের চাঞ্চল্যটা চাপা দিবার জন্যই সে উন্মাদনার আশ্রয় লাভ করিতে চায়। মাতাল যেমন নেশা ফিঁকে হইবার আশঙ্কায় কেবলই গ্লাসের পর গ্লাস টানিতে থাকে, সে'ও তেমনই ষ্টিমুল্যান্টের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতেছে। কালীময় বাজাইতে সুরু করিল।

ফিকা ফিরোজা রঙের সাড়ী পরিয়া, শিথিল কবরীতে কয়েকটি ফুল গুঁজিয়া ইন্দ্রাণী একেবারে নৃত্যচ্ছন্দে ঘরে ঢুকিয়া কোনদিকে না-চাহিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। শিক্ষা ছিল নিপুণ, দেহ ছিল লীলায়িত, রূপ ছিল অনুপম, আর সর্ব্বোপরি চোখে ছিল ভাষা! কালীময়ের নেশা তখন সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীতে আরোহন করিয়াছে; সে'ও নৃত্যের তালে সমতা রক্ষা করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বাজনার পর্দ্দাগুলায় আঙ্গুল চালাইয়া যাইতেছে। আর নারী? তাহার মনে হইতেছে, দুইটি পা ফাটিয়া দর দর ধারে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে! নৃত্য শেষে সে যখন কালীময়ের পায়ের কাছে সুর, তাল, লয়, উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য কালীময় বিস্মিত হইল যে, এ কোন্ নবীনা, তিন চারিদিনের পূর্ব্বে ইহাকে দেখে নাই, ইহার কথা শুনে নাই! তাহার মনে হইল, এ সেই বহুকাল-পরিচিতা! কালীময় তাহাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া তুলিয়া ধরিতে চাহিতেছিল, আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া ইন্দ্রাণী কহিল—তার পরেরটা বাজাও।

এদিকে অভিনব সংবাদটি মাতার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার গোচরীভূত করিতে গিয়া কালীতারা সবিস্ময়ে দেখিল, মা নবীন সরকারকে কালীঘাটে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

সকালে বাথরুমের দরজায় কালীতারার সহিত সাক্ষাৎ! কালীতারা হঠাৎ গলবস্ত্র হইয়া, পরম ভক্তিভরে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল—ধন্যি, ধন্যি, ধন্যি, ধন্যি মেয়ে বাবা! তোমাকে ধন্যি, তোমার বি-এ পাশের ধন্যি, তোমার গানে ধন্যি, তোমার নাচে ধন্যি, ধন্যি, ধন্যি!—এই সাত ধন্যি!

ইন্দ্রাণী লজ্জিতভাবে হাসিল—কথা কহিল না।

কালীতারা বলিল—তা আমি বলে দিচ্ছি ভাই, একরাত্রেই দাদার ওড়বার পাখা দু'খানার মাথা তুমি খেয়ে বসেছ! যেমন কুকুর, তার তেমনই মুগুর হয়েছে। আমাদের মত মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে হ'লে চায়ের বাটীতেই কিক্!

তবে নাকি ঠাকুরঝি তুমি ইংরিজী জান না?

কিক্, কিস্—এ দু'টো ভালই জানি ভাই! আগে কিস্‌টার চলন ছিল, এখন অন্যটা চল্‌ছে। তা সে যা হোক্, তুমি ভাই ধন্যি মেয়ে! মা'কেও—

ইন্দ্রাণী বলিল—মা সব জেনেছেন নাকি?

কালীতারা বলিল—জেনেছেন বলে জেনেছেন। কালীঘাটে চার যোড়া মোষের ব্যবস্থা হয়েছে। নবীন

মেডেলখানি নাড়িতে নাড়িতে কালীময় বলিল—বাজাও না একটু শুনি।

ইন্দ্রাণী আঙুলে মেজরাপ্ পরিতে পরিতে কহিল—যদি ভাল না লাগে বলো, বুঝলে?

কালীময় হাসিল।

গৎটা ছিল সুদীর্ঘ ও সুমিষ্ট। প্রায় একঘণ্টা পরে ইন্দ্রাণী যখন থামিল, তখন তাহার রক্তিম কপালে, ওষ্ঠের পরে স্বেদবিন্দুগুলি টল্‌টল্ করিতেছে। ক্ষুদ্র রুমালখানি বাহির করিয়া মুখখানি মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসিল—কেমন লাগলো?

কালীময় তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, বলিল—চমৎকার!

ইন্দ্রাণী বলিল—মিউজিক কনফারেন্সে যেটা বাজিয়েছিলাম, সেটা আরও বড়!

কালীময় বলিল—আজ তোমার বড্ড পরিশ্রম হয়েছে, সেটা আর একদিন শুনবো।

ওতে আবার পরিশ্রম কিসের! তোমার ভাল লাগে ত বল, এখ্খনই বাজাই।—বলিয়াই সে তারের উপর মেরজাপটা বুলাইয়া দিতেই, মধুর ঝঙ্কার যেন লাফাইয়া উঠিয়া লুটাইয়া পড়িল।

যে লোক চিরকাল এঁদোপুকুর, ভ্যানভেনে মশা, প্লীহা-যকৃতের পীঠস্থান বাঙ্গলাদেশের পল্লীগ্রামে বাস করিতেছে, হঠাৎ দার্জ্জিলিঙ বা সিমলাশৈলে আসিলে তাহার যে মনোভাব উপস্থিত হয়, আজ কালীময়েরও মনের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ। এ যদি অমরাবতী নয়, তবে সে আর কোথায়?

রাত্রি প্রায় এগারোটা। মা পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—খাবার এইখেনেই দিতে বলি বাবা?

কালীময় চমকিয়া উঠিল। কতদিন, মনে পড়ে না কতদিন, রাত্রের আহার এ গৃহে সে করে নাই! চমকিয়া উঠিল, কিন্তু 'না' বলিতে পারিল না। ইতস্ততঃ-ভাবে কহিল, তা দাও।

বৌমা তোমার খাবারও এইখেনে দিতে বলছি—বলিয়া শ্বশ্রূ বাহির হইয়া গেলেন।

ইন্দ্রাণী সলজ্জ-হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া কালীময়ের দিকে চাহিতেই, কালীময় বলিল—এখানে খেতে তোমার লজ্জা করবে বুঝি?

ইন্দ্রাণী বলিল—লজ্জা! না! মা কি মনে করবেন?

এ সমস্যা ভঞ্জন করিতে কালীময় অক্ষম। কিন্তু আমরা বলিতে পারি, মা'র মনে কালীমাতার রূপ স্পষ্ট ও তাঁহার ঋণ ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছিল; আর কিছু মনে করিবার তাঁহার অবসর ছিল না।

আহারাদি শেষে, কালীময় ইন্দ্রাণীকে বলিল—চল একটু বেড়িয়ে আসি। যাবে?

যাব। জুতোটা পরে আসি।

জুতা পরিয়া, সিল্কের শালখানি গায়ে জড়াইয়া ইন্দ্রাণী যখন কালীময়ের আগে আগে মোটরে উঠিল, তখন দ্বিতলের জানালা হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া কালীতারা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না; সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, চীৎকার করিয়া মা'কে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—মা গো মা, বৌ একেবারে মেম্‌সাহেব মা।—আনন্দে কিম্বা বিস্ময়ে বলিতে পারি না, খবরটা অন্যত্র আর একজনের কাছে জাহির করিতে যাইবার পথে অন্ধকারে দেওয়ালে মাথাটা ঠুকিয়া গিয়া রক্তপাত হইলেও লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না।

পাঁচ

অধিক রাত্রে গৃহে ফিরিয়া, শয়ন করিবার পূর্ব্বে কালীময় টেবিলে সাজানো মেডেল, পুস্তক, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা প্রভৃতি দেখিতে বসিল; ইন্দ্রাণীও একখানা চেয়ার টানিয়া পার্শ্বে বসিল।

একখানা মেডেল দেখিতে দেখিতে এক সময়ে কালীময় জিজ্ঞাসা করিল—তুমি নাচতে পারো?

ইন্দ্রাণী মাথাটা নীচু করিয়া, ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু কালীময়ের তাহাতে তৃপ্তি হইল না, পুনশ্চ জিজ্ঞাসিল—পারো?

ইন্দ্রাণী স্বামীর পানে চাহিতে গিয়া দেখিল সে চক্ষু দু'টিতে একটা অসামান্য ক্ষুধা ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে; পুরুষের চক্ষুর ক্ষুধা যে নারী বুঝিতে না পারে, বৃথায় তাহার নারীজন্ম। সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল—পারি; তুমি বাজাতে পার?

পারি।

আজ আর নয়, রাত তিনটে বাজে। কাল আমার স্বরলিপির খাতাটা দোব, তুমি বাজিয়ো, আমি—

কালীময় হাসিয়া বলিল—বেশ। কিন্তু একটা কথা কি আছে জানো? বলে, আজ যাহা পার, কালকের জন্য তাহা রাখিবে না।

ইন্দ্রাণী হাসিল, বলিল—কিন্তু এত রাত্রে বাজনা হ'লে, মা'র ঘুমের অসুবিধে হয় যদি?

কালীময় কহিল—মা ভেতরের বাড়ীর তেতলায় শোন্, বোধ হয় শুন্তে পাবেন না; পেলেও কিছু মনে করবেন না।

বেশ—বলিয়া ইন্দ্রাণী উঠিয়া গেল; একটা সুটকেস খুলিয়া দু'তিনখানা খাতা আনিয়া টেবিলের উপরি রাখিতে রাখিতে বলিল—কিন্তু মূলেই যে ভুল গো।

কালীময় মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসিল—কি আবার ভুল হোল?

অর্গ্যান ত ড্রয়িংরুমে!

এ-ইঃ! সে আমি আনছি।—কালীময় বাহির হইয়া গেল। ইন্দ্রাণী স্বরলিপির খাতা খুলিয়া বাছিতে লাগিল। অভ্যাস নাই, ম্যাট্রিকুলেসান দিবার পর শেষবার পারিতোষিক-বিতরণ সভায় নৃত্য করিয়াছিল; তারপর দীর্ঘ চারি বৎসরের অনভ্যাস, ভুলিয়া হয় ত যায় নাই, তবু মনে একটু দ্বিধা যে উঁকি দিতেছিল না, তাহা বলা যায় না।

কালীময় নিজেই অর্গ্যানটা আনিয়া ফেলিল। তখন দুইজনে ঘরের ছোটখাট আসবাবপত্রগুলা সরাইয়া স্থান করিয়া লইল। মালী ফুলদানীতে অজস্র ফুল রাখিয়া গিয়াছিল; তাহারই গোটাকতক তুলিয়া লইয়া ড্রেসিংরুমে যাইবার সময়, কালীময়কে খাতাটা দেখাইয়া বলিল—আমার হারটা চিহ্ন করে রেখে এসেছি, ঐ সুরটা বাজাতে হবে।

কালীময় সুরটা দেখিতে লাগিল। কথাটা খুলিয়া বলা ভাল, তাহার ভিতরের চাঞ্চল্যটা চাপা দিবার জন্যই সে উন্মাদনার আশ্রয় লাভ করিতে চায়। মাতাল যেমন নেশা ফিঁকে হইবার আশঙ্কায় কেবলই গ্লাসের পর গ্লাস টানিতে থাকে, সে'ও তেমনই ষ্টিমুল্যাণ্টের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতেছে। কালীময় বাজাইতে সুরু করিল।

ফিকা ফিরোজা রঙের সাড়ী পরিয়া, শিথিল কবরীতে কয়েকটি ফুল গুঁজিয়া ইন্দ্রাণী একেবারে নৃত্যচ্ছন্দে ঘরে ঢুকিয়া কোনদিকে না চাহিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। শিক্ষা ছিল নিপুণ, দেহ ছিল লীলায়িত, রূপ ছিল অনুপম, আর সর্ব্বোপরি চোখে ছিল ভাষা! কালীময়ের নেশা তখন সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীতে আরোহন করিয়াছে; সে'ও নৃত্যের তালে সমতা রক্ষা করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বাজনার পর্দাগুলায় আঙ্গুল চালাইয়া যাইতেছে। আর নারী? তাহার মনে হইতেছে, দুইটি পা ফাটিয়া দর দর ধারে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে! নৃত্য শেষে সে যখন কালীময়ের পায়ের কাছে সুর, তাল, লয়, উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য কালীময় বিস্মৃত হইল যে, এ কোন্ নবীনা, তিন চারিদিনের পূর্ব্বে ইহাকে দেখে নাই, ইহার কথা শুনে নাই! তাহার মনে হইল, এ সেই বহুকাল-পরিচিতা! কালীময় তাহাকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া তুলিয়া ধরিতে চাহিতেছিল, আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া ইন্দ্রাণী কহিল—তার পরেরটা বাজাও।

এদিকে অভিনব সংবাদটি মাতার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার গোচরীভূত করিতে গিয়া কালীতারা সবিস্ময়ে দেখিল, মা নবীন সরকারকে কালীঘাটে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

সকালে বাথরুমের দরজায় কালীতারার সহিত সাক্ষাৎ! কালীতারা হঠাৎ গলবস্ত্র হইয়া, পরম ভক্তিভরে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল—ধন্যি, ধন্যি, ধন্যি, ধন্যি মেয়ে বাবা! তোমাকে ধন্যি, তোমার বি-এ পাশের ধন্যি, তোমার গানে ধন্যি, তোমার নাচে ধন্যি, ধন্যি, ধন্যি!—এই সাত ধন্যি!

ইন্দ্রাণী লজ্জিতভাবে হাসিল—কথা কহিল না।

কালীতারা বলিল—তা আমি বলে দিচ্ছি ভাই, একরাত্রেই দাদার ওড়বার পাখা দু'খানার মাথা তুমি খেয়ে বসেছ! যেমন কুকুর, তার তেমনই মুগুর হয়েছে। আমাদের মত মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে হ'লে চায়ের বাটীতেই কিক্!

তবে নাকি ঠাকুরঝি তুমি ইংরিজী জান না?

কিক্, কিস্—এ দু'টো ভালই জানি ভাই! আগে কিস্‌টার চলন ছিল, এখন অন্যটা চল্‌ছে। তা সে যা হোক্, তুমি ভাই ধন্যি মেয়ে! মা'কেও—

ইন্দ্রাণী বলিল—মা সব জেনেছেন নাকি?

কালীতারা বলিল—জেনেছেন বলে জেনেছেন। কালীঘাটে চার যোড়া মোষের ব্যবস্থা হয়েছে। নবীন

সরকার এতক্ষণ পৌঁছে গেল! তা সে যাই হোক্ ভাই, তোমার ঠাকুর জামাইকে যেন ঐ নাচ-ফাচ গুলো দেখিয়ো না, তাহ'লেই আমি কিক্‌ড!

ভয় নেই, তোমার জানা ইংরিজী দু'টো শব্দের কোনটার লোভই আমার নেই ভাই, দেখাব না—বলিয়া সে বাথরুমে ঢুকিয়া গেল।

সাতদিন কাটিয়া গেল। কালীময় যেন আগের সে কালীময় নয়। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তাহার যে শ্রান্তি বা অবসাদ আছে, তাহাও মনে হয় না। এমনই চলিতে-ছিল, হঠাৎ একদিন কালীময় আফিস হইতে যথাসময়ে ফিরিল না। রাত্রি গভীর হইল, তখনও তাহার দেখা নাই। মা বারবার বধূকে প্রশ্ন করিয়া শুষ্কমুখে ফিরিয়া যান্, কালীতারা হাসিমুখে ঠাট্টা করিতে আসে, বধূর বিরস মুখ দেখিয়া চলিয়া যায়।

তৃতীয় প্রহরে কালীময় গৃহে ফিরিল। ইন্দ্রাণী বসিয়াই ছিল, কণ্ঠে বিশ্বের মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়া বলিল—খাবে ত?

কালীময় মুখ তুলিতে পারিতেছিল না, অস্পষ্টকণ্ঠে কহিল—কিছু খেলে হয়।

ইন্দ্রাণী ঘর হইতে চলিয়া গেল। রাত্রের আহার্য্য আজকাল ইন্দ্রাণীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়, আজও হইয়া-ছিল। আহার্য্য যাহাতে তাজা ও গরম থাকে, সূপকারকে বলিয়া সে ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছিল। এখন আহার্য্য সাজাইতে বলিয়া আসিল।

হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কালীময় ভোজনকক্ষে ঢুকিয়া দেখিল, দুইজনের আহার্য্য সজ্জিত; জিজ্ঞাসিল—তুমিও খাও নি বুঝি?

না।

কালীময় বলিল—অনেক রাত হয়েছে। এত রাত্রি পর্য্যন্ত না খেয়ে থাকা উচিত হয় নি।

ইন্দ্রাণী বলিল—একলা বসে খেতে পারি না যে!—তাহার গলাটা ধরিয়া আসিয়াছিল।

কালীময় আর কিছু বলিল না। কেন বিলম্ব হইল, কোথায় বিলম্ব হইল, ইন্দ্রাণী যে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিল না, ইহাতে সে আনন্দিত হইয়াছিল।

শয্যায় আসিয়া বসিয়া কালীময় ডাকিল—ইন্দু!—এর আগে কালীময় তাহার নাম ধরিয়া ডাকে নাই।

ইন্দ্রাণী পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

কালীময় বলিল—চলো বিদেশে কোথাও বেড়াতে যাবে?

ইন্দ্রাণী সাগ্রহে বলিল—যাবো।

কালীময় কহিল—কালই কিন্তু। যাবে?

ইন্দ্রাণী বলিল—যাবো।

কালীময় বলিল—ওখানে খবর দেবে না?

ইন্দ্রাণী কহিল—কাল সকালে একবার দেখা ক'রে এলেই হ'বে। কিন্তু বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন, কোথা কোথা যাওয়া হ'বে, তাহ'লে কি বল্‌বো?

কালীময় চিন্তাযুক্ত স্বরে কহিল—তা ত এখনও ঠিক করি নি ইন্দু। তবে ভারতবর্ষের বাইরে যেখানে হোক্ কিছুদিন বেড়াব। কি বল?

ইন্দ্রাণী, সহকারজড়িতা লতাটি যে নির্ভরে চাহে, সেই নির্ভরে চাহিয়া বলিল—আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তোমার যেখানে যেতে ইচ্ছা, যেখানে তোমার ভাল লাগবে, আমারও সেইখানে ভাল লাগবে।

কালীময় হাসিয়া বলিল—তোমার নিজের পছন্দ অপছন্দ নেই বুঝি?

না। পছন্দ অপছন্দ কখন হোল বল? এতকাল ত বই খাতাতেই কেটেছিল, পছন্দ অপছন্দ ভাববার দরকার ছিল না। আর এখন—

থাম্‌লে কেন? এখন—

এখন মনে হয়, তোমার যা ভাল লাগে, আমারও তাই ভাল লাগে।—বলিয়া বায়ুভরে আন্দোলিতা লতা আছড়াইয়া সহকার অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অঙ্গস্পর্শ এই প্রথম। বুকের উপরে মুখ রাখিয়া ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসিল, আচ্ছা কেমন করে এমন হয় বল্‌তে পারো?

কালীময় বলিল—কি জানি! আমি ত মূর্খ, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমারই জানা উচিত!

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন মানসে ইন্দ্রাণী বলিল—ছাই লেখা পড়া! আচ্ছা, আমরা প্রথমে কোথায় যাবো?

বোম্বাই। সেখান থেকে যেখানে হোক্ যাওয়া যাবে।—বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিল—এত তাড়াতাড়ি কেন যেতে চাই জান ইন্দু?

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

কালীময় বলিল—আফিস পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে। চিত্ত দুর্ব্বল, দূরে যেতে চাই। তুমি সঙ্গে থাক্‌লে কোন ভয়ই থাক্‌বে না। ইন্দু!

কি?

কি ভাবছো?

কিছু না।

আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি বল্‌বে?

ইন্দ্রাণী বলিল—মিথ্যে বল্‌তে শিখি নি ত!

কালীময় জিজ্ঞাসিল—ঠিক করে বল, একটুও ঘৃণা হয় না?—সব জান ত?

ইন্দ্রাণী কালীময়ের হাতটা চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে ভিতরে ভিতরে কাঁপিতেছিল।

কালীময় বলিল—বলতে সাহস হচ্ছে না, নয়?

ইন্দ্রাণী বলিল—মিথ্যে বলবো না, একদিন হয়েছিল! তারপর,—

তারপর?

তারপর ভাবলুম, অতীতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি! আমার সঙ্গে সম্পর্ক, বর্ত্তমানের—ভবিষ্যতের।—বলিয়া ইন্দ্রাণী আবেশভরে কালীময়ের বুকখানিতে মুখ ঢাকিল।

ছয়

আর একদিন কালীঘাটের কালীমাতার মন্দির-সোপান পশুশোণিতে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কলিকাতা চোরবাগানের মল্লিকবংশ অতি পুরাতন, প্রসিদ্ধ, ঐতিহাসিক বংশ। মোগল বাদশাহের আমল হইতে এই বংশ রাজসম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজের আমলেও তাঁহাদের সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। ইঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বঙ্গের সুবর্ণবণিক সমাজের দলপতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের বংশগত উপাধি "শীল"। কিন্তু বাদশাহী আমলে ইঁহারা মহা সম্মানজনক "মল্লিক" উপাধি বংশগত ভাবে লাভ করিয়া এ যাবৎ ব্যবহার করিতেছেন। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর এই বংশের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন।

এই মল্লিক বংশের আদি নিবাস অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত রামগড় নামক স্থানে ছিল। সেখান হইতে তাঁহারা বঙ্গাধিপ আদিশূরের রাজধানীতে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। এই বংশের এক শাখা পরে সুবর্ণরেখার তীরে গিয়া বাস করেন। সেখান হইতে সপ্তগ্রাম, তথা হইতে হুগলী ও চুঁচুড়ায় আসিয়া বাস করেন। এই বংশের বাবু জয়রাম মল্লিক বর্গীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য হুগলী হইতে ইংরেজদের পূর্ব্বে কলিকাতায় গোবিন্দপুরে বাস স্থাপন করেন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য গোবিন্দপুর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে জয়রাম বাবু পাথুরিয়াঘাটায় বাসের জন্য ভূমি প্রাপ্ত হন। জয়রাম বাবু হইতে পঞ্চম পুরুষ বাবু নীলমণি মল্লিক চোরবাগানে ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণ করিয়া গৃহবিগ্রহ জগন্নাথজীর প্রতিষ্ঠা করেন। তৎসহ একটি অতিথিশালাও নির্ম্মিত হয় ও সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত হয়। বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক বাবু নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র।

বাবু নীলমণি মল্লিকের পিতার একটি মাত্র সহোদর ভ্রাতা ছিলেন—বাবু রামকৃষ্ণ মল্লিক। তাঁহার দুই পুত্র—বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও সনাতন মল্লিক। আইনানুযায়ী পৈত্রিক সম্পত্তি দুই ভাগ হইবার কথা; কিন্তু ভ্রাতৃগণের অনুরোধে নীলমণিবাবু মৃত্যুকালে উইল করিয়া সম্পত্তি তিন সমান অংশে ভাগ করিয়া দুই ভাগ দুই ভ্রাতাকে ও একভাগ তাঁহার দত্তক পুত্র রাজেন্দ্রবাবুকে দিয়া যান। রাজেন্দ্রবাবুর বয়স তখন মাত্র চারি বৎসর। নীলমণিবাবু চোরবাগানে ঠাকুরবাটীর পার্শ্বে একটি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী

নাবালক পুত্র সহ চোরবাগানের বাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এইখানে তিনি সযত্নে নাবালক পুত্রটিকে মানুষ করিয়া তুলেন।

সন ১২২৬ সালের ১১ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার (১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪এ জুন) রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের জন্ম হয়। তাঁহার নাবালক অবস্থায় তৎকালীন সুপ্রীমকোর্ট মিঃ জেমস উয়ার হগকে (পরে স্যার জেমস হগ, ব্যারনেট) রাজার অভিভাবক নিযুক্ত করেন। ইনি একদিন রাজেন্দ্রবাবুকে কতকগুলি পক্ষী উপহার দেন। পরিণত বয়সে রাজেন্দ্রবাবু যে জীবজন্তুর প্রতি প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং নিজ বাটীতে পশুশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, এইখানেই তাহার সূত্রপাত হয়।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক তৎকালীন হিন্দু কালেজে ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি দানশীলতা ও দয়াপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। চোরবাগানের রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের যে প্রাসাদ কলিকাতার অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু, তাঁহার ষোল বৎসর বয়সে উহার নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। বাড়ীখানি প্রাচ্য স্থাপত্য ও এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই বাড়ী সাধারণতঃ মার্ব্বেল প্যালেস বা মর্ম্মর প্রাসাদ নামে বিখ্যাত। এই প্রাসাদের পরিকল্পনা হইতে, এই সকল শিল্পে রাজেন্দ্রবাবুর অসাধারণ শিল্প প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবজন্তুর রীতি-প্রকৃতি অধ্যয়নেও রাজেন্দ্রবাবুর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। চিত্রশিল্পের দোষ-গুণ বিবেচনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সর্ব্বপ্রকার চিত্রের সম্বন্ধে তিনি সুবিচার করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রাসাদে সংগৃহীত অসংখ্য উৎকৃষ্ট চিত্র ও মর্ম্মর মূর্ত্তির ভাণ্ডার দেখিবার বস্তু। এইগুলি দেখিবার জন্য দেশবিদেশ হইতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ প্রায়ই প্রাসাদে আসিয়া থাকেন। সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনাতেও রাজেন্দ্রবাবু বিলক্ষণ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রাগ-রাগিণী সমন্বিত ধর্ম্মসঙ্গীত এখনও তাঁহার ঠাকুরবাটীতে গীত হইয়া থাকে।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর বিষয়ের কর্তৃত্ব লাভ করিয়া তিনি পিতৃপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য সুনিয়মিতভাবে পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে এখনও প্রত্যহ পাঁচ-ছয় শত কাঙ্গালীকে অন্ন দান করা হয়। অন্নকষ্ট, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুঃসময়ে তাঁহার গৃহে যে-কোন বুভুক্ষু যখনই আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, কেহই অন্নে বঞ্চিত হইত না। ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় প্রত্যহ পাঁচ হইতে ছয় হাজার দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে রন্ধন করা অন্ন বিতরণ করা হইয়াছিল। তাঁহার এই সদনুষ্ঠান দর্শনে প্রীত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে তাঁহার বহু প্রশংসাবাদ করিয়া তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার যে সকল সদনুষ্ঠানের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—(১) বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক প্রত্যহ বহুসংখ্যক কাঙ্গালীকে অন্নদান করেন। (২) গত জুন মাসে দুর্ভিক্ষপীড়িত বুবুক্ষু ব্যক্তিগণ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার বাটীর সম্মুখে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করেন। পরে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অপর লোকরাও অন্ন বিতরণে প্রবৃত্ত হন। কয়েক মাস ধরিয়া এই কার্য্য চলিয়াছিল। (৩) ক্রমে সহরে দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকায় সংক্রামক রোগের আশঙ্কায় দুর্ভিক্ষ নিবারণ কমিটি সহরের বাহিরে চিৎপুরে অন্ন বিতরণের প্রস্তাব করেন, এবং ধনী লোকদিগকে সহরের ভিতর অন্ন বিতরণে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। রাজেন্দ্রবাবু তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কমিটির হস্তে প্রত্যহ ১০০ টাকা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। তদ্দ্বারা প্রত্যহ ১০০০ লোকের ভোজনের ব্যবস্থা হয়। (৪) এতদুপলক্ষে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক কলুটোলায় নবনির্ম্মিত অনেকগুলি গুদামঘর (ইহাদের মাসিক ভাড়া ১৬০০ টাকা) হাসপাতালের উদ্দেশ্যে কমিটির ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেন। টিভোলী গার্ডেন্স নামক উদ্যান ও জমিও এই উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সহরের ঘনবসতিপূর্ণ পল্লীতে অবস্থিত বলিয়া গুদামঘরগুলি কমিটি ব্যবহার করেন নাই; সহরের প্রান্তে অবস্থিত বাগানটিতে তাঁহারা দরিদ্রদের বাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। (৫) প্রয়োজন হইলে

একটি স্থায়ী আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি মাসে ১০০ টাকা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটন রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরকে রাজা বাহাদুর উপাধি দান করেন।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক জীবজন্তুর তত্ত্বানুরাগী ছিলেন। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তিনি বহু পশুপক্ষী সংগ্রহ করিয়া চোরবাগানের বাটীতে একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের শৈশবকালে এই চিড়িয়াখানাটি আমাদের অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু ছিল। বিশেষতঃ বাড়ীর সামনের পুকুরে একহস্তাধিক দীর্ঘ ও প্রায় অর্দ্ধহস্ত চওড়া লাল মাছগুলির খেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া দেখিয়াও আমাদের শিশু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিত না। হরিমোহন রায়ের চিড়িয়াখানা দেখিতে গেলে ফটকে একটি করিয়া পয়সা দিয়া ভিতরে ঢুকিতে হইত; রাজেন্দ্র মল্লিকের চিড়িয়াখানা ছিল অবারিতদ্বার। শিশু বালক, যুবক বৃদ্ধ—সর্ব্বশ্রেণীর বহু লোক প্রত্যহ এই চিড়িয়াখানা দেখিতে যাইত। আলিপুরের পশুশালা তখনও স্থাপিত হয় নাই। যাঁহাদের আগ্রহে আলিপুরে চিড়িয়াখানা স্থাপনের প্রস্তাব হয়, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। তিনি এই পশুশালায় অনেক মূল্যবান পশু উপহার প্রদান করেন। এই জন্য উদ্যানমধ্যস্থ প্রথম গৃহটির নাম রাখা হয়—"মল্লিকস হাউস।" রাজা বাহাদুর ইয়োরোপের অনেক পশুশালাতেও অনেক মূল্যবান পশু-পক্ষী উপহার পাঠাইয়াছিলেন। প্রতিদানে তিনিও অনেক পদক, ডিপ্লোমা, পক্ষী ও পশু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহু বৈদেশিক জুলজিক্যাল সোসাইটির সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজাবাহাদুর এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলকে অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে বহু সাহায্য করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যাদুঘরের অন্যতম ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মিউজিয়মের ট্রাষ্টীরা তাঁহাকে ফাইন্যান্স ও লাইব্রেরী কমিটির সদস্য পদে নিযুক্ত করেন।

পশু-বিজ্ঞানের ন্যায় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের চর্চ্চায়ও রাজা বাহাদুর বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার গৃহসংলগ্ন উদ্যানে ও সহরের উপকণ্ঠস্থিত উদ্যানে তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য, দুর্ম্মূল্য ও দুর্ল্লভ বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া রোপণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত ও চিত্রকলাতেও তাঁহার অল্প অনুরাগ ছিল না। বহু হাফ-আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রামে তিনি মধ্যস্থতা করিতেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বেশ দখল ছিল। ইংরেজী ও ফার্শি ভাষাও তিনি উত্তমরূপে জানিতেন।

সাধারণের সুবিধার জন্য স্থানীয় পল্লীর উন্নতি সাধন কল্পে রাস্তা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে রাজা বাহাদুর কয়েকখণ্ড জমি বিনামূল্যে সরকারের হস্তে অর্পণ করেন। কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে তাঁহার মর্ম্মর প্রাসাদের সম্মুখে, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট হইতে বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছেন—"রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট"।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চাও করিতেন। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণার্থ বিজ্ঞ কবিরাজগণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার ব্যয়ে তাঁহার গৃহে কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বদাই মজুত থাকিত। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ডাক্তারী ঔষধও ক্রীত হইত।

সন ১২৯৪ সালের ২রা বৈশাখ (১৮৮৭, ১৪ এপ্রেল) রাজা বাহাদুর পরলোকে প্রস্থান করেন। এক্ষণে তাঁহার তিন প্রপৌত্র বর্ত্তমান—কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক, কুমার দীনেন্দ্র মল্লিক ও কুমার গোপেন্দ্র মল্লিক।

রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর ছয় দিন পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২০এ এপ্রেল তারিখে বঙ্গীয় জমীদার সভার (British Indian Association) বার্ষিক অধিবেশন হয়। সেই সভায় উক্ত সভার ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্ট পঠিত হয়। সভার প্রেসিডেণ্ট রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এলএল-ডি, সি-আই-ই উক্ত রিপোর্ট পাঠ করেন। তাহাতে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মের মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—

"বর্ত্তমান অনুষ্ঠানে আমি আর একটি নাম ভুলিতে পারিতেছি না। ইনি রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর। এই সেদিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অতি দীর্ঘকাল আমাদের এই সভার সদস্য ছিলেন। সাধারণ দাতব্য কার্য্যে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। শিষ্টাচারের জন্য বিশেষভাবে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইঁহার অপেক্ষা অধিক কৃতী ও সদাচারী

ভদ্রলোক আপনারা দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার বদান্যতা রাজোচিত ছিল। তাঁহার অবর্ত্তমানে কলিকাতাবাসীরা একজন পরদুঃখকাতর যোগ্য নাগরিককে হারাইলেন। দুর্ভাগ্য কলিকাতার যেন পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। আপনাদের সকলেরই স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৮৬৫-৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি বহু মাস ধরিয়া প্রত্যহ পাঁচ হাজার দরিদ্র-নারায়ণকে অন্ন দান করিয়াছিলেন। যে সকল অনাথ দুর্ভিক্ষ কমিটির গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের ভরণপোষণের জন্য রাজা বাহাদুর ৪০০০০ টাকা দান করেন। তদ্ব্যতীত, বহু বৎসর ধরিয়া তিনি বৎসরের প্রত্যেক দিন তাঁহার নিজ বাটীতে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে নিয়মিত ভাবে অন্ন ও ভিক্ষা দান করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, কলিকাতাবাসী বেশী লোকের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা চলে না।"

শক্তিশেল

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(১)

অপরাহ্ণের আলোক তখনও সন্ধ্যার অঞ্চলতলে আত্ম-বিসর্জ্জন করে নাই। গৃহে ফিরিয়া আদালতের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের পর প্রশান্ত দ্বিতলে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়াইল।

কমলা তখন প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া সুদীর্ঘ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সীমন্তে সিন্দুর টীপ অতি সূক্ষ্ম রেখায় অঙ্কিত করিতেছিল। পশ্চিমের মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রস্থান-পথবর্ত্তিনী দিবার স্বর্ণরশ্মি কমলার পরিধেয় বসনে পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

পত্নীর সুস্থ, সবল, যৌবনোচ্ছল দেহে রূপতরঙ্গের হিল্লোলিত সৌন্দর্য্য প্রশান্তের কর্ম্মক্লান্ত মনকে স্নিগ্ধ রস-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নিমেষহীন দৃষ্টিতে সে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা স্বামীর মুখের দিকে আয়ত নয়ন-যুগলের দৃষ্টি ফিরাইয়া মৃদুহাস্য সহকারে বলিল, "তোমার জলখাবার ঠাকুরের কাছে গুছিয়ে রেখেছি। হাত মুখ ধুয়ে খাবার চা খেও। আমি অমিতাদের ওখানে চল্লুম। নারী-সমিতির বিশেষ অধিবেশন আছে। ফিরতে বোধ হয় ৯টা হবে।"

তরুণী, সুন্দরী মাথার অবগুণ্ঠনটা সুবিন্যস্ত করিয়া দ্রুতলঘু গতিতে ঘর পার হইয়া নীচে নামিয়া গেল।

নিত্য ঘটনা। বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বৎসর হইতে ইহা প্রায় প্রত্যহই ঘটিয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি প্রশান্তের মুখের উপর অন্তর-রাজ্যের বিক্ষোভের ছায়াপাত আজও বিরল নহে কেন?

কয়েক মুহূর্ত্ত ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মন্থরগতিতে প্রশান্ত আবার নীচে নামিয়া গেল। বৈঠকখানা ঘরে সে প্রবেশ করিবার পর, পাচক চা ও জলখাবার আনিয়া টেবলের উপর রক্ষা করিল।

পাচক চলিয়া গেলে, প্রশান্ত হাতের কাগজখানা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে জলযোগে মনোনিবেশ করিল। চা পান শেষ হইলে সে আবার সংবাদপত্রের দিকে হস্ত প্রসারিত করিল।

দৈনিক কাজগুলি এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কোথাও এতটুকু ভুলচুক নাই!

অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। প্রশান্ত একটা চুরুট ধরাইয়া ঘরের বাহিরে আসিল। ভৃত্য ও পরিচারিকারা গৃহকার্য্যে মগ্ন। সে কাহারও দিকে না চাহিয়া সম্মুখের উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্যান-ক্ষেত্র বিশেষ প্রশস্ত নহে, তবে তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় বড়ই বলিতে হইবে। উদ্যান রচনায় কমলা ও প্রশান্ত উভয়েরই সমান অনুরাগ ছিল। সুতরাং দুই বৎসর পূর্ব্বে রচিত উদ্যানে মালীর সযত্ন দৃষ্টি ও প্রসাধন-পারিপাট্য বশতঃ পুষ্প বৃক্ষের শোভা ও পুষ্পসম্পদ অক্ষুণ্ণ অবস্থাতেই

আছে। সন্ধ্যার বাতাসে গ্রীষ্মের ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

প্রশান্ত ঘনায়মান শ্যাম সন্ধ্যায় উদ্যান মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। ইহাও তাহার নিত্যকর্ম্মের অন্যতম। তবে এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার জীবনসঙ্গিনী প্রতি সন্ধ্যায় তাহার পাশে পাশেই "সঞ্চারিণী পল্লবিনী" লতার ন্যায় সঞ্চালিতা হইত।

প্রশান্ত কি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল?

বহুক্ষণ পাদচারণার পর নিঃশেষ-পীত চুরুটটি এক দিকে নিক্ষেপ করিয়া প্রশান্ত ধীরে ধীরে লতাপুষ্প-সমাকীর্ণ লৌহ-তোরণের পথে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বস্থ দ্বারকক্ষে দ্বারবান মৃদুস্বরে গজল গান ধরিয়াছিল। প্রভুকে দেখিয়া সে গান থামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রশান্ত সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া রাজপথ অতিক্রম করিয়া সম্মুখের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার উদ্যানপথে অগ্রসর হইল। ইহাও তাহার নিত্য কর্ম্মের অন্যতম।

সমস্ত বাড়ীটার অভ্যন্তর-ভাগ বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত। সম্মুখের প্রকাণ্ড হলঘর পার্শ্বে রাখিয়া সে আর একটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিল। সৌম্যদর্শন, প্রৌঢ়, প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিত্তশালী জমীদার রাজনারায়ণবাবু জামাতা প্রশান্তকে দেখিয়া প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "আজও কোথাও বেড়াতে যাও নি, বাবা?"

প্রশান্তের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুহাস্য-রেখা বোধ হয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "আজ্ঞে না। বেড়াতে যেতে আর ভাল লাগে না। সারাজীবন খেলা ও বেড়ানতে কেটেছে বলেই, প্রকৃতি তার শোধ নিচ্ছেন।"

প্রৌঢ় রাজনারায়ণ প্রাণখোলা ভাবে হাসিয়া উঠিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই শ্বশ্রূমাতা আসিয়া প্রশান্তের কাছেই বসিলেন। তারপর বলিলেন, "কমলা কোথায়? বেড়াতে গেছে, না বাড়ী আছে?"

প্রশান্ত কোন দিকে না চাহিয়াই বলিল, "অমিতাদের বাড়ীতে মহিলা-সভার অধিবেশনে গেছেন।"

রাজলক্ষ্মী একটু অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "সভা সমিতি করেই মেয়েটা মেতে উঠেছে। অতটা ভাল নয়। তা তোমরা ত কেউ কিছু বলবে না!"

পতি ও পত্নীর নামের সাদৃশ্যের ন্যায় এই প্রৌঢ় দম্পতির মতেরও যথেষ্ট মিল ছিল। এ জন্য তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের নির্ম্মল আকাশে কোনও দিন বর্ষার মেঘ ঘনাইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সংসার-মরুভূমিতে মরু-উদ্যানের ন্যায় একমাত্র সন্তান কমলাকে রাজনারায়ণ বাবু এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, কোনও দিন তাহার ইচ্ছার প্রতিকূলে কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টির অবকাশ দিতেন না। রাজলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার মতের এইখানেই একটু পার্থক্য ছিল।

রাজনারায়ণ বাবু আলবোলার নল হইতে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে সহাস্য মুখে বলিলেন, "তাতে দোষ কি? কিছু দিন পরেই ও-সব খেয়াল মিটে যাবে।"

রাজলক্ষ্মীর কাছে কথাটা ভাল লাগিল না। তিনি জামাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "উনি চিরদিনই ঐ রকম আস্কারা দিয়ে এসেছেন। তা বাবা, তুমিও ত তাকে বারণ করতে পার।"

প্রশান্ত মাথা নত করিয়া নীরবে শুধু একটু হাসিল।

প্রাপ্তবয়স্কা, সুশিক্ষিতা, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তানকে যে পিতামাতা স্বাধীনতার আবেষ্টনে আশৈশব বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহার স্বাধীন চিন্তায় ও কার্য্যধারায় আপত্তি করা যুগ-প্রগতির নিদর্শন কি?

রাজলক্ষ্মী গৃহান্তরে চলিয়া গেলে শ্বশুর ও জামাতা আদালতের মোকদ্দমার নথিপত্র লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন। উহা নিত্য কর্ম্মের অন্তর্গত। রাজনারায়ণ বাবু জামাতাকে তাঁহার জুনীয়র হিসাবে হাইকোর্টে বসাইয়াছিলেন। তাঁহার মক্কেলের ঘরগুলি যাহাতে প্রশান্ত ভবিষ্যতে অধিকার করিতে পারে, এ জন্য প্রতিভা-শালী জামাতাকে ওয়াকিবহাল করিয়া লইতে তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি ছিল না।

ঘণ্টা দেড়েক পর প্রশান্ত কাজ সারিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

(২)

বৃদ্ধ, বিশ্বস্ত, পুরাতন সোফার তখনও কমলাকে ফিরাইয়া আনে নাই।

ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশ ও মর্ত্ত্যে জ্যোৎস্নাপ্লাবন ঢালিয়া দিয়াছিল। রন্ধনশালায় পাককার্য্য বোধ হয়

তখনও চলিতেছিল। প্রশান্ত দ্বিতলে আসিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া শয়ন-কক্ষের সম্মুখস্থ খোলা ছাদে কৌচের উপর দেহ এলাইয়া দিল।

ছাদের উপরেও বেলা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুলের গাছগুলি টবে সজ্জিত ছিল। বেলফুলগুলি শুভ্র হাস্য করিতেছিল, তাহাদের ঘন সুগন্ধ বাতাসে আত্ম-নিবেদন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছিল।

মানুষের হৃদয় ও ফুলের অন্তররাজ্যের মধ্যে ব্যবধান পরিমাপের জন্য প্রশান্তের দার্শনিক মন কি নিবিষ্টভাবে ফুলের দিকে সংন্যস্ত হইয়াছিল? প্রশান্তের মুখমণ্ডলে মৃদু হাসির দীপ্তি মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মানুষের জীবনের বৈচিত্র্য বিষয়েই বোধ হয় তাহার চিন্তাধারা ওতপ্রোত হইতেছিল।

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন বালক, বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যবৃত্তি পরীক্ষা হইতে ক্রমশঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্.এ পরীক্ষায় সাফল্যলাভে সে কখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নাই। বৃত্তির টাকার সাহায্যে তাহার অধ্যয়নের ব্যয়ের প্রধান অংশ সম্পাদিত হইত।

আত্মীয় স্বজন ও পার্থিব ঐশ্বর্য্য সম্পদ হইতে সে যেমন দীন ছিল, বিধাতার আশীর্ব্বাদে তাহার দেহে স্বাস্থ্য ও শক্তি তেমনই অফুরন্তভাবে সে লাভ করিয়াছিল। অঙ্গসৌষ্ঠব ও দৈহিক কান্তি সে তাহার মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিল বলিয়া বাল্যকালে গ্রাম্য বৃদ্ধ বৃদ্ধার নিকট হইতে সে বহুবার শুনিয়াছিল।

শারীরিক ব্যায়ামের প্রতি আসক্তি, অধ্যয়নানুরাগের মতই প্রবল থাকার ফলে তাহার দেহ লৌহদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। ফুটবল্, ক্রিকেট প্রভৃতি ব্যায়ামে কলিকাতায় প্রশান্ত বহু যুবকের ঈর্ষা আকৃষ্ট করিয়াছিল।

সর্ব্বপ্রকারে এই গুণবান ছেলেটির প্রতি প্রসিদ্ধ-ব্যবহারাজীব, জমীদার ও ধনী রাজনারায়ণের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র সন্তান, আদরিণী কমলার জন্য তিনি একটি সুপাত্র খুঁজিতেছিলেন। এই দরিদ্র, প্রতিভাবান, রূপবান, বলিষ্ঠ এবং ক্রীড়াকুশল পাত্রটির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন, কেন তাহার সহিত আলাপ করিলেন, প্রশান্ত তাহা জানিত। পরম্পরায় সে কি শুনে নাই যে, তাহাকে জামাতৃপদে বরণ করিবার জন্য, তাহার কোন কোন অন্তরঙ্গ সতীর্থের কাছে, তাহার সম্বন্ধে সন্ধান গ্রহণ, তাহার প্রশংসাকীর্ত্তনের অন্তরালে কি আগ্রহ প্রচ্ছন্ন ছিল?

তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এ বিবাহে মত দিয়াছিলেন। কমলা যখন বেথুন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন প্রশান্ত ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ উপাধি অধিকার করিয়া দর্শন শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে—আইন পরীক্ষাতেও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া হাইকোর্টে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। ২৩ বৎসরের প্রতিভাবান যুবক দরিদ্র হইলেও জামাতৃরূপে অত্যন্ত স্পৃহনীয়। রাজনারায়ণ সে সুবিধা ত্যাগ করিলেন না। দরিদ্র জামাতাতেই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। কারণ, তাঁহার সর্ব্বস্ব কন্যা-জামাতাই পাইবে। সুতরাং জামাতাকে পুত্ররূপে কাছে রাখিবার বাসনাই তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল।

প্রশান্তর মনে পড়িল, সে গৃহজামাতার স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে সম্মত নহে, এ কথা বিশেষ ভাবেই বন্ধুর দ্বারা ভাবী শ্বশুরকে জানাইয়াছিল। নিজের উপার্জ্জনেই সে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে চাহে। কাহারও দানের সহায়তায় সে আপনার ভবিষ্যৎকে গড়িয়া লইতে চাহে না। প্রশান্তের এই স্বাবলম্বন-স্পৃহা বিচক্ষণ রাজনারায়ণকে কিরূপ বিমুগ্ধ করিয়াছিল, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রশান্তের সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন।

অনেক আলোচনার পর রাজনারায়ণ তাঁহার বাস-ভবনের সম্মুখস্থ অপর একখানি সুদৃশ্য স্বকীয় ভবন কন্যা-জামাতার জন্য স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন—প্রশান্ত স্বতন্ত্রভাবে সেইখানে স্ত্রী লইয়া থাকিবে, এই ব্যবস্থাতে অবশেষে প্রশান্ত সম্মতি দিয়াছিল।

বিবাহের পর জামাতাকে নিজের জুনীয়র রূপে রাখিয়া তাহার উপার্জ্জনের পথ রাজনারায়ণ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতিভাবান যুবক নিজের কর্ম্মপ্রচেষ্টা বলে জীবনসংগ্রামে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে।

বিবাহিত জীবনের প্রথম বৎসরের অনাবিল আনন্দ দৃশ্যগুলি প্রশান্তের মনে পড়িতে লাগিল। সুশীলা কমলা

অনুক্ষণ তাহার সান্নিধ্য লাভে কিরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিত, কেমন করিয়া তাহার দৈনন্দিন কার্য্যসমূহে উৎসাহ সঞ্চার করিত, আজ জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে সেই সুখময় স্মৃতি তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

তার পর দেশের মধ্যে প্রগতির প্রবাহ নূতন খাতে বহিয়া চলিল। সহাধ্যায়িনী তরুণীদিগের সমিতিতে সে ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। বাহিরের আহ্বান অন্তঃপুরচারিণীর প্রাণে যে বিপুল স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিতা কমলা ক্রমে আত্মসমর্পণ করিতে আরম্ভ করিল।

অন্তঃপুর—গৃহপ্রাঙ্গণের বাহিরেও প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র বিদ্যমান—শিক্ষিত মন তাহাতে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিবে না? প্রশান্ত তাহা বুঝিত, সুতরাং কোনও দিন সে নিজের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি ও আনন্দের অজুহাতে পত্নী কমলার স্বাধীন অন্তরের প্রেরণার পথে ব্যবধান রচনার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করে নাই।

কিন্তু—কিন্তু—

থাক্। প্রশান্ত আপনার ক্ষুব্ধ অন্তরের ব্যথা কখনই ব্যক্ত করিয়া তাহার অন্তরের অনুদারতা প্রকাশ করিবে না। আপনা হইতে যাহার অনুভূতি হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলে না, উপদেশ, অনুরোধ অথবা নিষেধের কথা ও কাজ তাহা জাগাইতে পারে কি? দর্শনশাস্ত্র মানব-মনোবৃত্তির এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব সম্বন্ধে কত আলোচনাই না করিয়াছে!

"তুমি এখানে চুপ করে বসে আছ?"

কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে প্রশান্তের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। মোটরের শৃঙ্গধ্বনি তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে নাই, পত্নীর প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে সে এতক্ষণ কিছুই জানিতে পারে নাই।

শুভ্র চন্দ্রকরলেখা কমলার প্রফুল্ল আননে শ্বেত চন্দন-প্রলেপের মতই দেখাইতেছিল। পত্নীর মুখে আনন্দজনিত উচ্ছ্বাস অনুভব করিয়া সে যে কথাটা বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর উচ্চারণ করিল না।

"৯টা বেজে গেছে, চল তোমাকে খাবার দিই। তাদের বৈঠকে আজ প্রায় ৪০।৫০ জন মেয়ে এসেছিল। কত রকমের আলোচনা। তাই দেরী হয়ে গেল। চল, ওঠ!"

কমলা স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। সে স্পর্শে প্রশান্তের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় সুধাস্রোত যেন বহিয়া চলিল। কমলা, তাহার সমগ্র চিন্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কমলাকে সে যে সমগ্র অন্তর দিয়া শুধু ভালবাসে না, পূজা করে, এ কথাটা ত প্রকাশ করিবার নহে। স্বামীর মুখে সে প্রকাশটা যেন নিতান্ত লঘুচিত্তের প্রলাপের মতই শুনাইবে!

বোধ হয়.বুকের মধ্যে কিছু সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। নানা পথে সঞ্চয়গুলি বহির্গত হইতে গেলে তাহার শব্দে পাছে কমলা আকৃষ্ট হয়, তাই প্রশান্ত অতি সন্তর্পণে শ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার ব্যায়ামপুষ্ট, দীর্ঘ দেহের পার্শ্বে কমলাকে শিশুর মত দেখাইতে লাগিল।

চন্দ্রালোকে স্বামীর সে অপূর্ব্বদর্শন মূর্ত্তির দিকে মুহূর্ত্ত নিষ্পলক দৃষ্টিপাত করিয়া কমলার আয়ত নয়নযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে স্বামীর হস্তাকর্ষণ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

(৩)

হাইকোর্ট বার-লাইব্রেরী কক্ষে তরুণ ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে তুমুল তর্ক চলিতেছিল।

একজন ক্ষৌরিত গুম্ফশ্মশ্রু তরুণ উকিল বলিয়া উঠিলেন, "তা তোমরা যাই বল, প্রগতিযুগের লক্ষণই এই। পশ্চিমের মেয়েরা যা করেন, তা আমাদের দেশে নিন্দনীয় কেন বুঝতে পারি নে।"

বন্দ্যোপাধ্যায় আখ্যাধারী অপর তরুণ ব্যবহারাজীব গুম্ফের উভয় পার্শ্ব হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থেকেই ত আমাদের চোখ্ ঝল্‌সে গেছে, পূবের দিকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে দেখবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। তার ফলে সমাজে, সংসারে যা শান্তির আবহাওয়া ফুটে উঠেছে, তাতে মিঃ পাল ভারী আনন্দ পাচ্ছেন ত?"

মিঃ পাল আখ্যাধারী তরুণ উকীলের কর্ণ-প্রান্ত পর্য্যন্ত অকস্মাৎ লোহিত আভা ধারণ করিল। কারণ, কথাগুলির মধ্যে যে ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা বার লাইব্রেরীর সদস্য-দিগের মধ্যে মাঝে মাঝে সরস আলোচনার খোরাক যোগাইত, তাহা মিঃ পালেরও অগোচর ছিল না।

আলোচনার বিষয় ছিল, বাঙ্গালী মেয়েদের রঙ্গমঞ্চে

নৃত্যগীতাভিনয়। মিঃ পালের বিদুষী তরুণী পত্নী একাধিক বার নৃত্য-গীতাভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন। সে জন্য তরুণদিগের নিকট হইতে নানা প্রকার অভিনন্দন পাইয়া শ্রীমতি পাল এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, দুষ্ট লোক সে অবস্থার প্রতি শুধু নির্ম্মম কটাক্ষপাত করিয়াই নিরস্ত ছিল না, চটুল জিহ্বা নিরঙ্কুশভাবে নানা উপকথা রচনা করিয়া প্রচার করিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রগতি যুগের মধ্যেও তরুণ শিক্ষিতগণ দলাদলির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সুতরাং বার-লাইব্রেরী মধ্যে তুমুল তর্ক যুদ্ধ চলিতে লাগিল। একদল নারীর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-গীতাভিনয়ের সার্থকতা প্রতিপাদনের পক্ষে, অপর পক্ষ তাহার কুফল প্রদর্শনের তরফে। অবশ্য উভয় দলের মধ্যে নারীর গীত শিক্ষার পক্ষে বিরুদ্ধ মতবাদ ছিল না। কিন্তু এক দল তাহা সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে, ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয়ের মধ্যে নিবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী, অপর দল কোনরূপ সীমারেখার বন্ধন মানিতে প্রস্তুত নহেন।

আলোচনা ক্রমশঃ সাধারণ হইতে অসাধারণ বা ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিল। এমন সময় প্রশান্ত লাইব্রেরী-কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিঃ পাল উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রশান্তবাবু, আমি আপনাকে আজ সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" জয়ধ্বনির সহিত কয়েকজনের কণ্ঠ মিলিত হইল।

প্রশান্ত অকস্মাৎ এই ব্যাপারের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি?"

উকীল বন্দ্যোপাধ্যায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝলেন না, প্রশান্তবাবু? ল্যাজকাটা শেয়ালের গল্পটা মনে আছে ত? আপনার লাঙ্গুল কর্ত্তনের সুযোগ এসেছে বলেই, মিঃ পাল আপনাকে দলে টান্‌বার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন।"

উচ্চ হাস্যধ্বনি কক্ষতলকে মুখরিত করিয়া তুলিল।

প্রশান্তের বিস্ময় তখনও অপনোদিত হয় নাই। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে বন্ধুবর্গের দিকে চাহিয়া রহিল।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলভুক্ত অপর একজন তরুণ উকীল বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি শুনুন। আজ কাগজে দেখা গেছে, বিদুষী মহিলারা অর্থাৎ তরুণীরা রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্য অভিনয় করিবেন। তার মধ্যে আপনার স্ত্রীও আসরে নাম্‌ছেন। মিঃ পাল সেই সংবাদ জেনেই আপনাকে অভিনন্দিত করেছেন। ওঁর স্ত্রীও প্রধানা নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন কি না।"

চারি দিকে একটা চাপা হাসির উৎসব পড়িয়া গেল। প্রশান্তের মুখমণ্ডলে অকস্মাৎ রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিল। এ সংবাদ তাহার জ্ঞানের অগোচর, অথচ উকীল বন্ধুগণ উত্তমরূপেই সকল সংবাদ রাখেন।

উত্তেজনাকে সবলে দমন করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে প্রশান্ত বলিল, "ওঃ! এই কথা!" তার পর সে কোনও দিকে না চাহিয়া সোজা নিজের আসনে গিয়া বসিল। তার পর একান্ত মনে একটা আপালের মোকদ্দমার নথিপত্রে গাঢ় মনঃসংযোগ করিবার ভাব দেখাইল।

জলযোগের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে তাহার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত আদালত কক্ষে প্রবেশ করিল। অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত সে মনের নিদারুণ চাঞ্চল্য দমন করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল। তার পর আদালত হইতে বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি গৃহের উদ্দেশে একখানা ট্যাক্সি লইয়া চলিয়া গেল। বাড়ীর মোটরের আগমন প্রতীক্ষা পর্য্যন্ত আজ তাহার কাছে অসম্ভব হইয়া উঠিল। বন্ধুবর্গের বিদ্রূপধ্বনি যেন তাহার চারিপার্শ্বে ভীড় করিয়া নিনাদিত হইতেছিল।

তাহার পত্নী রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্য ভাবে অভিনয় করিতে যাইতেছে! তাহার সারা জীবনের আদর্শকে সে এমনই ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে প্রস্তুত!

নারীর কলা-সাধনার প্রতি সে চিরদিনই অনুকূল মতাবলম্বী। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকাশ্য ভাবে রঙ্গালয়ে শত শত কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে, হিন্দু অন্তঃপুরচারিণী নৃত্য, গীত ও অভিনয় করিবে? প্রশান্ত যে এমন অসম্ভব ব্যাপার কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই! ইহার সার্থকতা কি? কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য ইহাতে সাধিত হইবার সম্ভাবনা? মনুষ্যত্বের—নারীত্বের কোন্ গৌরব ইহার দ্বারা অর্জ্জিত হইবে?

গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া, ট্যাক্সি বিদায় করিয়া, ক্ষুব্ধ, উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয়ে প্রশান্ত ভিতরে প্রবেশ করিল। বস্ত্র পরিবর্ত্তন

না করিয়াই সে সোজা দ্বিতলে উঠিয়া গেল। ভৃত্যের নিকট সে সংবাদ পাইয়াছিল, কমলা তখনও বাড়ীতে আছে। আদালত হইতে সে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কোন দিনই কমলা কোথাও যায় না, ইহা সে জানিত। তথাপি ভৃত্যকে সে প্রশ্ন করিয়াছিল। আজিকার সংবাদ সে কোনমতেই পরিপাক করিতে পারিতেছিল না।

স্বামীর প্রতি চাহিয়া কমলা সহসা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। আজ তাহার বেশ-ভূষায় অসম্ভব পারিপাট্য ছিল। সত্যই সে আজ ভুবনমোহিনী বেশ ধারণ করিয়াছিল—তাহার যৌবনদীপ্ত লাবণ্য, জ্যোৎস্নার প্লাবন যেন সর্ব্বাঙ্গে ওতপ্রোত হইতেছিল।

কমলা বলিয়া উঠিল, "তোমার কি অসুখ করেছে? মুখ এমন কেন?"

অন্য দিন পত্নীর শোভন দেহের প্রতি প্রশান্ত মুগ্ধের মত চাহিয়া থাকিত। আজ যেন তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। সে যথাসাধ্য সংযতস্বরে বলিল, "না, শরীরে কোন অসুখ নেই?"

কমলা বলিল, "তবে?"

প্রশান্ত বলিল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

কমলা বিস্মিত হইল। আজ পর্য্যন্ত স্বামী কোনও দিন তাহার কোন কাজের কৈফিয়ৎ চাহেন নাই—কোন দিনই কোন প্রশ্নই করেন নাই। আজ এ প্রশ্নের অর্থ কি?

অত্যন্ত স্বাভাবিক কৌতূহল জনিত প্রশ্নও ত হইতে পারে। কিন্তু অনভ্যস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তাহার কণ্ঠস্বরে কিছু উষ্মা প্রকাশ পাইয়া থাকিবে।

কমলা স্বামীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমাদের নারী-সঙ্ঘের বিশেষ উৎসব আছে। আমার দেরী করবার সময় নেই। ফিরতে অনেক রাত হতে পারে। মোটর যাবার দরকার নেই। সুশীলদের গাড়ীতেই ফিরে আসব।"

প্রশান্তের মন স্বাভাবিক ভাবে সুস্থ ছিল না। তাহার মনের প্রান্তে যে অগ্নি ধূমায়িত হইতেছিল, তাহার উত্তাপ মস্তিষ্কেও ক্রিয়া করিতেছিল। সে বলিল, "তুমি আজ যেও না।"

কমলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তার মানে?"

প্রশান্ত কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমি ও-সব ভালবাসিনে। আমার ইচ্ছা নয়, তুমি রঙ্গমঞ্চে নাচ গান কর।"

কমলার আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। তার পর বিদ্রূপভরা কণ্ঠস্বরে বলিল, "নাচ গান কি দোষ করলে? তা'ছাড়া, তোমাদের যা ভাল লাগবে না, তাই বিনা বিচারে সত্য বলে মেনে নিতে হবে, এর কোন মানে আছে? আমি ত কারও কেনা বাঁদী নই!"

হয় ত এতখানি রূঢ়ভাবে স্বামীকে বলিবার প্রয়োজন অথবা ইচ্ছা তাহার ছিল না। কিন্তু ধনী ও যশস্বী পিতার সে একমাত্র সন্তান, তাহা ছাড়া সেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিণী। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে আত্মসম্মান সম্বন্ধে তাহার যে ধারণা জন্মিয়াছিল, প্রাচ্য নারীপ্রকৃতি তাহার প্রসারিত যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকিবে।

প্রশান্তর বলিষ্ঠ দেহ একবার কম্পিত হইল। তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তথাপি স্বাভাবিক নম্রতা-মধুর কণ্ঠে সে বলিল, "আমার অনুরোধ—আদেশ নয়, তোমার পালন করা উচিত। হিন্দুনারী হয়ে, তুমি—"

কমলার নয়ন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "বক্তৃতা শুনবার অবকাশ আমার নেই। তোমার ভাল লাগা না লাগার জন্য আমার মত ছেড়ে দেবো, এটা তোমার মত লোকের প্রত্যাশা করা উচিত নয়। আমি জানি পুরুষদের মন বড় ছোট। তুমিও বাদ যাও না।"

প্রশান্ত শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কমলা বলিল, "কাপড় চোপড় ছেড়ে খাবার খেয়ে নিও। আমি চল্লুম।"

সে দ্রুত চলিয়া গেল। প্রশান্ত স্থাণুর মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

তার পর স্বপ্নচালিতবৎ সে নীচের ঘরে গিয়া আদালতের পোষাক খুলিয়া ফেলিল। চারিদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে দুই চারবার ঘুরিয়া বেড়াইয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

ড্রয়ার টানিয়া সে একখানা খাতা বাহির করিয়া, দ্রুত হস্তে কি লিখিতে লাগিল।

পরিচারক চা ও খাবার সহ আসিয়া বলিল, "এখানেই দেব ?"

ইঙ্গিতে টেবলের উপর উহা রাখিতে বলিয়া সে নিজের কাজেই মগ্ন রহিল।

সন্ধ্যা তখনও ঘনাইয়া আসে নাই। সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। চা ও খাবার অভুক্তই রহিয়া গেল। সেদিকে বোধ হয় তাহার খেয়াল ছিল না।

(৪)

"প্রশান্ত এ-বেলা এখনো এল না কেন বল ত ?"

পত্নীর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠার ব্যঞ্জনা শুনিয়া রাজনারায়ণ ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই ত, ৮টা বাজে! ও-বাড়ীতে কাউকে পাঠিয়ে দাও।"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "হরির মাকে পাঠিয়েছিলুম, গোপালকেও তার পর পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। দারোয়ান বল্লে, ৫টার পর বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরে নি। কমলাও বাড়ী নেই। তাদের বুঝি আজ আবার কি একটা উৎসব আছে। প্রশান্ত সেখানে যায় নি ত ?"

রাজনারায়ণ বলিলেন, "তা হতে পারে। আজ ওদের সঙ্ঘের কি একটা অভিনয় এম্পায়ারে হবে। আমাকে কমলা একখানা কার্ড সকালে দিয়েছিল।"

রাজলক্ষ্মী অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ নথিপত্রের মধ্যে আবার নিমগ্ন হইলেন।

পাশের ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতে রাজনারায়ণের চমক ভাঙ্গিল। তিনি উঠিয়া যন্ত্রের কাছে গেলেন

"হ্যালো! কে ?—হেমলাল! কি খবর ? অ্যাকসিডেন্ট ? অ্যাঁ—প্রশান্ত ?"

রাজনারায়ণবাবর হস্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি স্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "না, না, এখানেই নিয়ে এসো। ডাক্তার রায়, ডাক্তার মুখার্জ্জি দুজনকেই এখনি এখানে আন্‌বার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মেডিক্যাল কলেজ ?—না, না, এখানেই নিয়ে এসো, ভাই।"

রিসিভার রাখিয়া দিয়া প্রৌঢ় রাজনারায়ণ কয়েক মুহূর্ত্ত বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বেদ জলে তাঁহার ললাট আপ্লুত হইয়া গেল।

চীৎকার করিয়া তিনি ডাকিলেন, "হরি, গোপাল, রঘুসিং—"

তাঁহার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে চারি দিক হইতে আমলা, গোমস্তা, ভৃত্য, দ্বারবান শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল। রাজলক্ষ্মীও ত্বরিতপদে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

রাজনারায়ণবাবু বলিলেন, "পূবের ঘরটায় সব আলো জ্বেলে দে। বিছানাপত্র ঠিক করে রাখ্। শৈলেশ, তুমি ডাক্তার রায় ও ডাক্তার মুখার্জ্জিকে ফোন করে দাও। এখানে এখনি আস্‌তে হবে। যত টাকা লাগে। যাও।"

রাজলক্ষ্মী স্বামীর দুই হাত ধরিয়া ম্লানমুখে বলিলেন, "ওগো, কি হয়েছে বল না গো!"

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া রাজনারায়ণ তাঁহার বিশ্বস্ত নায়েবকে বলিলেন, "ফোনে বিশ্বাস নেই। তুমি মোটর নিয়ে ডাক্তারদের কাছে যাও। যত টাকা চান, তাই কবুল। যেখানে থাকেন, সেখান থেকে নিয়ে এসো। আর শোন বঙ্কিম, তুমি হরির মাকে নিয়ে এম্পায়ার থিয়েটারে যাও। কমলাকে এখুনি নিয়ে চলে এসো।"

আদেশ পালনে অভ্যস্ত কর্ম্মচারীরা তখনই চলিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী মাটীতে বসিয়া পড়িয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো, আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, বলো, বলো!—"উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল।

রাজনারায়ণ বলিলেন, "কাঁদবার সময় ঢের আছে। এখন ধৈর্য্যহারা হয়ো না। প্রশান্ত মোটর-চাপা পড়েছে। পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল—ধর্ম্মতলার কাছে হঠাৎ দুদিক থেকে দুখানা মোটর এসে পড়ে। হর্ণ শুনেও সে থামে নি, সরে যায় নি। এদিক ওদিক করতে গিয়ে—ডাক্তার হেমলালের গাড়ীও ঠিক সেই সময়ে এসে পড়ে। তার গাড়ীতে প্রশান্তকে তুলে নেবার সময়, পাশের দোকান থেকে ফোন্ করেছে, এখানেই নিয়ে আস্‌তে বলে দিয়েছি। জানি না কি অবস্থা তার হয়েছে। ভগবান! ভগবান!"

রাজনারায়ণ উন্মত্তের ন্যায় ফটকের দিকে ছুটিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই ভীষণ শৃঙ্গধ্বনি করিতে করিতে একখানা মোটর ছুটিয়া আসিল। পারিবারিক চিকিৎসক হেমলালবাবু গাড়ীর মধ্যে চেতনাহীন প্রশান্তের পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন।

ধরাধরি করিয়া অতি সন্তর্পণে প্রশান্তের দেহ শয্যার

উপর শায়িত করা হইল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ নিস্পন্দপ্রায়। শরীরের কোথাও কিন্তু রক্তের চিহ্ন নাই।

ডাক্তার হেমলালবাবু নিভৃতে রাজনারায়ণকে বলিলেন, "অবস্থা বড় কঠিন বলেই মনে হচ্ছে। মস্তিষ্কে প্রবল আঘাত লেগেছে। মোটর-চাপা পড়ে নি। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছে। চৈতন্য আন্‌বার চেষ্টা করাই প্রথম কাজ।"

রাজলক্ষ্মী তখন প্রশান্তের শিরোদেশে বসিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার রায় ও মুখোপাধ্যায় আসিয়া পৌছিলেন। সযত্ন পরীক্ষা চলিল। বহুক্ষণ পরে উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিলেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মৃদুস্বরে বলিলেন, "এমন বলিষ্ঠ দেহে এমন দুর্ব্বল হৃদযন্ত্র, অত্যন্ত বিস্ময়কর।"

ডাক্তার রায় সংক্ষেপে বলিলেন, "হুঁ।"

গৃহ চিকিৎসক হেমলালবাবু বলিলেন, "কিন্তু এতদিন আমার ধারণা ছিল অন্যরকম, ডাক্তার রায়!"

রোগীর চৈতন্য সঞ্চারের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছিল না। নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইল। চিকিৎসকত্রয়ের মুখে গাম্ভীর্য্য অসম্ভবরূপ বর্দ্ধিত হইল। দ্বারপথে কমলাকে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

চিকিৎসক তিনজনই ফিরিয়া দেখিলেন, কমলা লঘুচরণে প্রশান্তের সম্মুখে আসিয়া নির্নিমেষ নেত্রে স্বামীর নিস্পন্দপ্রায় দেহের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের প্রলয় ঝটিকার বেগ কি আননে প্রতিফলিত হইয়াছিল? সে ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিল।

পারিবারিক-চিকিৎসক তখন অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে আর একটা ইনজেকসন দিতে আসিলেন। শূন্য-দৃষ্টিতে কমলা চিকিৎসকের সূচিকাবেধ লক্ষ্য করিল।

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেও যখন কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না, তখন ডাক্তার রায় ও মুখোপাধ্যায় হেমলালবাবুকে নিম্নস্বরে উপদেশ দিয়া বিদায় লইলেন। হেমলালবাবু সারা রাত্রি অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

হেমলালবাবু বলিলেন, "দাদা আপনি বৌদিকে নিয়ে এখন যেতে পারেন। আমি আছি। মা কমলা, তুমিও কাপড়-চোপড় ছেড়ে এস গে।"

রাজলক্ষ্মী স্বামীর নির্দ্দেশে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল, মা!"

কমলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি যাও, মা। আমার এখন নড়বার উপায় নেই।" মৃদু হইলেও সে কণ্ঠস্বরে যে দৃঢ়তা ব্যক্ত হইল, তাহা উপেক্ষনীয় নহে!

সকলে চলিয়া গেলে কমলা বলিল, "ডাক্তার কাকা!"

প্রশান্তর নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে হেমলালবাবু বলিলেন, "কি মা?"

"আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন। ডাক্তার রায়কে বলুন। বাবার সব ঐশ্বর্য্য আমার। সে সব আপনার—ওঁকে বাঁচিয়ে দিন!"

হেমলালবাবু দেখিলেন, তরুণীব আয়ত নয়নযুগল অশ্রুশূন্য, কিন্তু তাঁহার মনে হইল, বর্ষার আকাশ ভাঙ্গিয়া এমন প্লাবনধারা বুঝি পৃথিবীকে ভাসাইয়া দেয় না।

"মানুষের সাধ্যে যা আছে, মানুষ তাই করতে পারে, মা! তার কোন ত্রুটিই হবে না। কিন্তু এমন বলিষ্ঠ শরীরের মধ্যে এত দুর্ব্বল হৃদ্‌পিণ্ড আর কখনও দেখিনি! প্রশান্তকে আগেও দেখেছি, কেমন করে এমন হলো!"

দুই হস্তে বক্ষোদেশ চাপিয়া ধরিয়া কমলা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভগবান! ভগবান!—সারা জীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করবো। বাঁচিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও!—"

টেবলের উপর হইতে ঔষধ আনিবার ছলে ডাক্তার চক্রবর্ত্তী পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনিও মানুষ!

(৫)

আরও তিনটি দিন, দুইটি রাত্রি চলিয়া গিয়াছে। সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় মুহূর্ত্তের জন্যও প্রশান্তর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না। তাহার কণ্ঠ সম্পূর্ণ মূক হইয়া গিয়াছিল। অর্থ ও মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি অমোঘ সত্যের কাছে ব্যর্থ ও মিথ্যা হইয়া গেল।

আজ চতুর্থ রাত্রি। নিদ্রাহীন, ক্লান্তিশূন্য ভাবে কমলা স্বামীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ছিল। নিতান্ত প্রয়োজনে, সকলের অনুরোধে অতি সামান্য ক্ষণের জন্যই অন্যত্র যাইত। কিন্তু বিশ্রামের জন্য কেহই তাহাকে স্থান ত্যাগ করাইতে পারিত না। কোন যুক্তি, কোনও প্রমাণ তাহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই।

ধ্রুব মৃত্যু ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। মানুষের শক্তি তাহার গতিরোধ করিতে অসমর্থ। চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তবে অন্তিম সময়ের পূর্ব্বে হয় ত মুহূর্ত্তের জন্য চেতনা ফিরিয়া আসিতেও পারে; কিন্তু সে সম্বন্ধেও সকলে একমত নহেন।

কয় দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি হেমলালবাবুর নয়নকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শুধু কমলা তখন স্বামীর মুখের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া ছিল। স্তব্ধ রজনীর গাঢ় নীরবতাকে ছন্দের তালে তালে গতিশীল করিবার জন্য গৃহপ্রাচীরে বিলম্বিত ঘটিকাযন্ত্র শুধু টিক্‌টিক করিতেছিল। সহসা কমলা চমকিয়া উঠিল। সে শুনিল, প্রশান্তর কণ্ঠমধ্য হইতে অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইতেছে। সে সমগ্র অন্তর কর্ণে কেন্দ্রীভূত করিল।

"কমলা, যেয়ো না, যেয়ো না—"

কমলার বক্ষে সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। না, না, সে জীবনে আর কখনও যাইবে না। তুমি শুনিয়া রাখ, তোমার অবাধ্য স্ত্রী চিরজীবনের জন্য তোমারই চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিবে। একবার—শুধু একবার চাহিয়া দেখ!—

কমলার মনে যুগপৎ এই প্রকার ভাবের সঙ্গে সতর্কতার চিন্তা জাগিয়া উঠিল। সে ডাকিল, "ডাক্তার কাকা! ডাক্তার কাকা!"

হেমলালবাবু সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি হল, মা?"

"এইমাত্র কথা বলেছেন, দেখুন, দেখুন!"

ডাক্তার উৎকণ্ঠিত ভাবে রোগীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার মুখে ঈষৎ কঠিন ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি প্রশান্তর স্পন্দনহীন হাত ধরিয়া নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সত্যই কি চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছিল, না কমলার উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কের বিকার? চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি তাহার কোনও পরিচয় পাইলেন না। উহা কি মগ্ন-চৈতন্যের ক্ষণিক স্ফুরণ মাত্র?

নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার হেমলালবাবুর মুখমণ্ডলে নৈরাশ্যের অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল।

অভ্রান্ত গতিতে ধ্রুব সত্য নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর ইহাকে বাধা দিবার শক্তি মানুষের নাই। চিকিৎসা-শাস্ত্র—মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞান এখানে ব্যর্থ।

হেমলালবাবু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। নিষ্পলক নেত্রে কমলা ডাক্তারের দিকে চাহিয়া ছিল। তাঁহার ভাবান্তর তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। সে স্বামীর দিকে চাহিয়া সহসা আর্ত্তরব করিয়া উঠিল।

রাজনারায়ণ ও তাঁহার পত্নী পার্শ্বস্থ কক্ষে ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কন্যার সে আর্ত্তস্বর তাঁহাদিগকে টানিয়া আনিল।

অন্তিম মুহূর্ত্ত নির্দ্দয়ভাবে আবির্ভূত হইল। কমলার সংজ্ঞাহীন দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

রাজলক্ষ্মী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া হৃদয়ভেদী স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার একমাত্র সন্তানের সুখের সূর্য্য অকালে চিরদিনের জন্য অমাবস্যার ঘনান্ধকারে অন্তর্হিত হইয়া গেল!

রাজনারায়ণবাবু প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * * *

সপ্তাহ পরে প্রভাতে কমলা—প্রভাত-চন্দ্রের ন্যায় বিগতপ্রভ তরুণী ধীরে ধীরে দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইল। এক সপ্তাহের মধ্যে সে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে নাই। শুধু নিয়ম পালনের জন্য যে কাজগুলি করিতেই হইবে, স্বপ্নচালিতবৎ তাহাই করিয়া গিয়াছিল।

কেহ সান্ত্বনার বাণী শুনাইতে আসিলে, সে আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শুইয়া থাকিত। তাহার সতীর্থ ও সঙ্গিনীরা তাহার মুখ হইতে একটি কথাও শুনিতে পায় নাই। কয় দিনের মধ্যেই সে যেন অন্য জগতের মানুষ হইয়া গিয়াছে।

সীমন্তের সিন্দূর-শোভা, চরণের অলক্তক-রাগ মুছিয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও শিক্ষার কুহকে পড়িয়া সে উল্লিখিত দুইটি বিষয়কে পূর্ব্বে কোনও দিন বর্জ্জন করিতে পারে নাই। আজ প্রকৃতির অমোঘ লীলার খেয়ালে সে বর্ণরাগ তাহার দেহ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পিতা ও মাতার নিতান্ত আগ্রহে সে সাদা থান পরিতে পারে নাই, গলার হার ও করপ্রকোষ্ঠের চুড়ী তখনও সে অঙ্গচ্যুত করিতে পারে নাই।

ধীরে ধীরে কমলা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরে

চলিল। দাসদাসীরা সম্ভ্রমভরে দূরে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পথ পার হইয়া সে নিজের গৃহের দিকে চলিল। দ্বারবান উঠিয়া দাঁড়াইল।

অতি মৃদুকণ্ঠে কমলা বলিল, "ঘরের চাবি, সুন্দর সিং?"

বিশ্বস্ত প্রবীণ দ্বারবান তাড়াতাড়ি চাবির গোছা আনিয়া প্রভুপত্নীর হস্তে অর্পণ করিল।

ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া কমলা উপরে উঠিয়া গেল। শয়ন-কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। রুদ্ধ বাতায়নগুলি খুলিয়া দিয়া সে শয্যায় উপবেশন করিল। এই শয্যায় তাহাদের শত মিলন-রজনী অতিক্রান্ত হয় নাই?

ঘরে দ্রব্যাদি যেখানে যাহা ছিল, ঠিক তেমনই আছে। শুধু কয় দিনের ধূলা সঞ্চিত হইয়া আছে।

স্বামীর ব্যবহৃত সেক্রেটেরিয়েট টেবলের উপর এক পার্শ্বে তাঁহার ব্যবহৃত ফাউণ্টেন কলমটি রক্ষিত। টেবলের উপরের দামী টাইমপিস ঘড়ীটি বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কমলা ধীরে ধীরে টেবলের ধারে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। শূন্য, শূন্য—মহাশূন্যে তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ!

অন্যমনস্কভাবে উপরের টানা আকর্ষণ করিতেই একখানি বাঁধান খাতা তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। স্বামীর ডায়েরী?

আগ্রহভরে সে উহা তুলিয়া লইল। পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে সে এক স্থানে দেখিল, স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা আছে—"অভিশপ্ত জীবন।"

"দরিদ্রের পক্ষে ধনীর বিদুষী, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়া কন্যাকে বিবাহ করা জীবনের অভিশাপ। ধনের গর্ব্ব আভিজাত্যের অহঙ্কার ত্যাগ করা কঠিন। এমন পত্নী স্বামীর সুখ-দুঃখকে বিচার করিবার—স্বামীর অন্তরের কামনাকে মর্য্যাদা দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে না। স্বামীর সমগ্র হৃদয়ের শ্রদ্ধাপূত প্রেমকে উপেক্ষা করাই তাহাদের নারীত্বের দ্যোতক। এমন হতভাগ্য স্বামীর জীবন অভিশপ্ত—তাহার বাঁচিয়া থাকা প্রকাণ্ড অভিশাপ।

কার্য্যের অবকাশে, কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে অবগাহন কালেও কমলার চিন্তা, কমলার প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণকে সে জীবনের একমাত্র কাম্য বলিয়া মনে করিত; এক বৎসর পরে পত্নী কেমন করিয়া তাহাকে এড়াইয়া বাহিরের ভোগময় জীবনে আত্মসমর্পণ করিয়া স্ত্রীর পবিত্র প্রণয়কে শুধু কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে, মর্ম্মান্তিক দুঃখপূর্ণ ভাষার উচ্ছ্বাসে দিনলিপিতে তাহা মুদ্রিত। হিন্দুর কন্যা, হিন্দুর ধর্ম্মপত্নী হইয়াও কমলা স্বামীর একটা অনুরোধ রাখে নাই। ভোগসুখের আকর্ষণ এমনই প্রবল যে, অবশেষে কমলা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্যগীত ও অভিনয়-কলার পরিচয় দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না! কিন্তু কাহার জন্য, কাহাকে তৃপ্তি দিবার জন্য, কাহার মনোরঞ্জনের জন্য এমন উন্মাদ আগ্রহ? ব্যায়াম, ক্রীড়া—ফুটবল, ক্রিকেট—নানাবিধ শারীরিক ব্যায়াম যাহার আজন্মের সহচর, অতিপ্রিয় আকর্ষণ, কমলা তাহার অনুরাগিনী নহে বলিয়াই কি, সর্ব্বপ্রযত্নে সে সকল সংস্রব হইতে আপনাকে দূরে সরাইয়া রাখে নাই? শুধু বাড়ীতে শরীর রক্ষার জন্য একবার মাত্র কিছুক্ষণ মুগুর ভাঁজিয়া সে আর সকল প্রলোভনকে অতিক্রম করে নাই? কিন্তু তাহার জীবনের আরাধ্যা দেবী তাহার একটি মাত্র সঙ্গত আবেদনে কর্ণপাত করিল না?"

কমলা আর পড়িতে পারিল না। তাঁহার সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। তাহার সমগ্র অন্তর যেন আর্ত্ত চীৎকারে বলিতে চাহিল, তুমি ভুল বুঝিয়া গিয়াছ। তোমার স্ত্রী—প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে নৃত্যগীত অভিনয় কিছুই করে নাই; অবশ্য বহু অনুরোধ হইয়াছিল, কিন্তু সে সঙ্কল্পে অটল ছিল। শুধু সে সঙ্ঘের সদস্যা বলিয়া উহা দর্শন করিতে গিয়াছিল। সে জানে সে হিন্দুর কন্যা, হিন্দুর পত্নী। নারীর সকল কলাবিদ্যা তখনই সার্থক, যখন স্বামী তাহা উপভোগ করেন। বাহিরের লোককে তৃপ্তি দিবার জন্য গৃহস্থ-বধূর কলা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সেও স্বীকার করে না। সেজন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর নারী আছে। কিন্তু, কিন্তু সে কথা এখন বলিয়া কি ফল?

গভীর ভাবে কমলা চিন্তা-সমুদ্রে নিমগ্না হইয়া গেল।

* * * * *

কন্যাকে বহুক্ষণ না দেখিয়া রাজলক্ষ্মী চিন্তিতা হইলেন। দাসদাসীর কাছে শুনিলেন, কমলা অনেকক্ষণ তাহার নিজের বাড়ীতে গিয়াছে। জননীর চিত্ত অকস্মাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কাহারও অপেক্ষা না করিয়া তিনি

একা পথ পার হইয়া কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া তিনি কন্যার শয়নকক্ষের দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মৃদুকরস্পর্শে অনর্গল রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল।

তিনি দেখিলেন কন্যা ভূমিতলে নিমীলিত নেত্রে বসিয়া। কিন্তু এ কি? তাহার ঘনকৃষ্ণ চিকুরদাম ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে স্তূপীকৃত, পরিধেয় বসনের পাড় ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত। হাতের চুড়িগুলি কক্ষতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

মাতার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল: কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি শব্দও প্রতিবাদ স্বরূপ নির্গত হইতে পারিল না। তিনি দেখিলেন, কন্যার নিমীলিত নয়নপথে বন্যাপ্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে। কমলা অর্দ্ধস্ফুটকণ্ঠে বলিতেছিল—

"দারুণ ব্যথা, অপমান, অভিমান নিয়ে তুমি চলে গেছ। এখানে থাক্‌বার কোন লোভ আমার নেই। কিন্তু তোমার সন্তানকে দেহে ধারণ করবার সৌভাগ্য হয়েছে বলেই, এ দেহ নষ্ট করবার অধিকার আমার নেই। তবে—তবে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না,—তোমার চরণাশ্রিতা তোমার কাছে শীঘ্রই যাবে।"

রাজলক্ষ্মীর আর সহ্য হইল না। ক্রন্দনোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা, অভাগিনী মা আমার!"

তাঁহার দুই স্পন্দিত বাহু কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

ইতিহাস *

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হায় প্রতি পদে কেন অন্তর মাঝে
নামে মন্থর তন্দ্রা?
কেন গুরু গুরু ছায়া মৃদঙ্গে বাজে
শঙ্কা জীমূত-মন্দ্রা?
কেন প্রতি পদে এত দুর্দ্দম অরি
উচ্ছ্রিত ফণা গর্জ্জে?—
যারা বাঁধিতে যাইলে হাসি' যায় সরি'
হাসিলে ফিরিয়া তর্জ্জে?
রাজে মর্ম্ম-আগুনে বন্ধন-রিপু
পাতায়ে ছন্ম মিতালি
হয় চিত-দীপাধারে শিখা নিবু নিবু
অকারণ—নিভে গীতালি।
আসে লক্ষ ঝাপটে লক্ষ শীকরে
নিতি নব আঁধা নাচিয়া,—
হায়, কত সাধনায় প্রাণকন্দরে
প্রদীপটি রহে বাঁচিয়া!
হেন মনে লয়—এই বিশ্ব প্রবীণ
লভে না শান্তি বিন্দু
যদি কোথা এতটুকু বিভাসে নবীন
স্বল্পায়ু কম ইন্দু।
গণে নিখিলের অমাবস্যা প্রমোদ,
ক্ষুধায় নিরত ফুঁসিয়া;

"কেন তন্দ্রিত হিয়া-মন্থনে চাঁদ
উদিবে নয়ন তুষিয়া?
"শোনো মন্দিরে ওই শঙ্খ ধ্বনিল!
অপ্রেম তারে সহিবে?
"তবে কণ্টক যে গো গুমরি' মরিল!
ফুল তবু তারে দহিবে?"
তবু উলসে ক্ষণদা চন্দ্রমা কায়া
কৃষ্ণার করি' তমোনাশ,
নাহি' বসুধা-বাসর তরে আলোগাথা
শুক্লার রচি' বরবাস;
তবু সুরেলা-কণ্ঠে সুরহারা বাধা
ঝঙ্কারে উঠে বাজিয়া,
হয় ভকতির রাগে মূর্চ্ছনা সাধা
মরু হাসে তৃণে সাজিয়া!
তবু অঙ্কুর-রেণু বিজন পাতালে
লাখো কঙ্কর লুটায়ে
ফুটে সঙ্গীত-মধু-ছন্দে,—আড়ালে
পঙ্কে পরাগ ফুটায়ে।
শুধু মুঞ্জরণের কলগুঞ্জন
উপরে না হয় পরকাশ,
হায় ভুবন ভুঞ্জে কুসুম-গন্ধ
কে পুছে কোটার ইতিহাস?

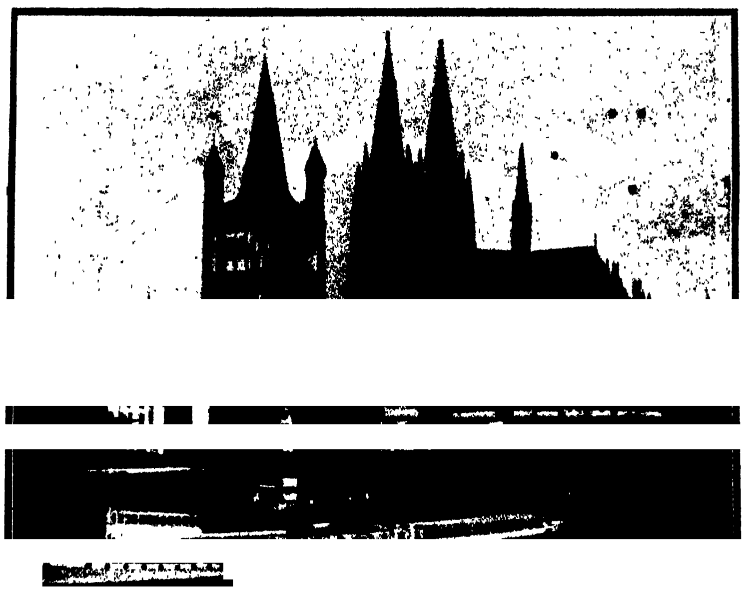
* এই কবিতাটি হিন্দী কবিতা anthology সংগ্রাহক নির্ব্বাচন ক'রেছেন তাঁদের অনুবাদের জন্য।

রাইনল্যাণ্ডের একাংশে

ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ডি-এস্‌সি, এম্‌-বি, এম্‌-আর-সি-পি

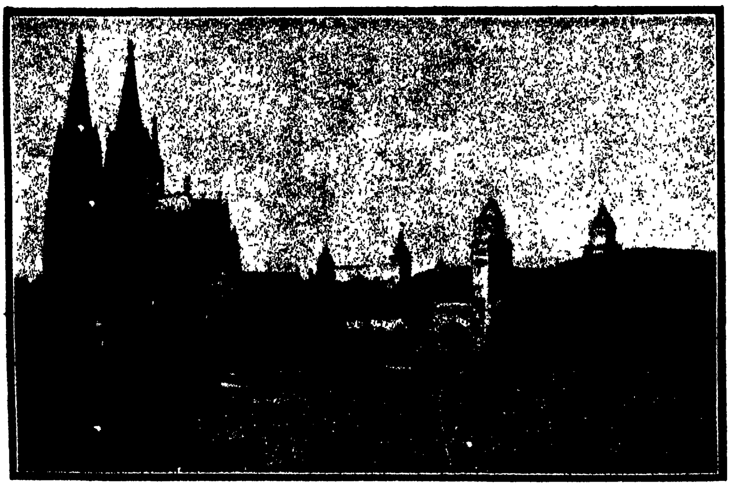
ভ্রাম্যমান্ বন্ধু দুটি, অর্থাৎ ডাক্তার মুখুয্যে ও আমি উভয়ে ছিলাম একে অন্যের সম্পূরক, যাকে ইংরেজীতে বলে complement। ফরাসী ভাষা বলবার সময় অনিচ্ছা সত্বেও এগোতে হতো আমাকে, আর যেই জার্ম্মেণ ভাষায় কথা উঠ্‌লো, অম্নি আমি একবারে স্তব্ধ, মৌন। সুতরাং ইয়োরোপ ভ্রমণে বের হয়ে, বেলজিয়ম পর্য্যন্ত যা' ভরসা ছিল, সেটুকু সম্পূর্ণরূপেই বন্ধুবরের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে, ব্রুসেলস্‌এর মিডি ষ্টেশনে, যখন রাইনল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে গাড়ীতে চাপা গেল, তখন বন্ধুর মুখে "কোন ভাবনা নেই" কথাটা শুনে একটু আশ্বস্ত হওয়া গেল! রাত প্রায় দশটায় গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ কর্লে। ইচ্ছা ছিল, সারা দিনের ভ্রমণ-ক্লান্তি, গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাদেবীর কোলে ভুলতে পারবো; কিন্তু ছোট গাড়ীখানিতে যাত্রীর আধিক্য দেখে সে আশা সুদূর-পরাহত বলেই মনে হলো। অগত্যা বসে বসে ঢুলতে হচ্ছিল! মাঝে মাঝে দু একটা ষ্টেশনে দু একজন নেমে যাচ্ছিল; আর বাকী যারা ছিল, তারাই শরীরখানা আরো একটু বিস্তারিত করে শূন্যতা-টুকুকে পূরণ করে নিচ্ছিল! ঘণ্টা দুই এ রকম দুর্ভোগের পর, একটা বড় ষ্টেশনে, আমার সঙ্গী বেল্‌জিয়ান্‌দের সব কজন যখন নেমে গেল, তখন একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে, নিদ্রাবেশে ধ্যানের অনুকরণ-রত বন্ধুবরকে ধাক্কা দিয়ে বল্লুম, এই সুযোগে দেহটাকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করাই বোধ হয় উচিত! বন্ধুবর কথায় সম্মতি না জানিয়ে, একেবারে 'হাতে কলমে' আমার যুক্তি যে অভ্রান্ত এবং তাঁহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ মতই আছে, তাই প্রমাণ করে দিলেন,—আধ মিনিটের মধ্যে কম্বলখানা বিছিয়ে, সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা দেহকে, একেবারে সাড়ে পাঁচ ফিট পর্য্যন্তই লম্বা করে দিয়ে! মহাজন বন্ধুর হস্তাঙ্ক অনুসরণে আমার বোধ হয় মিনিট দুই দেরী হয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে বন্ধুর রীতিমত নাসিকা-ধ্বনি আরম্ভ হয়ে গেছে!

জানি না, কতক্ষণ একেবারে অচেতনের মতন ঘুমিয়ে ছিলুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল; আর নিদ্রাজড়িত চোখ দুটি খুলে দেখতে পেলুম, গাড়ীতে চার-পাঁচজন সাড়ে ছ' ফিট লম্বা, জাঁদরেল চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে, ও পরস্পর আলাপ কচ্ছে। বন্ধুবর, তাকিয়ে দেখলুম, একেবারে অচেতনের মতন ঘুমুচ্ছেন। আগন্তুকদের দেখে স্পষ্টই মনে হলো যে গাড়ী বেলজিয়াম সীমানা পার হয়ে জার্ম্মেণীতে ঢুকেছে! কিন্তু 'কাষ্টম' অফিসাররা তখনো আসে নি, তাই একটু সন্দেহও হচ্ছিল! গাড়ীতে কটি



রাইন নদীতীরস্থ কলোন—(সেণ্ট মার্টিন গীর্জ্জাসহ)

লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর, আমরা ঘুমুচ্ছি, দেখে নিজেরই মনে লজ্জা হলো; তাই সন্ত্রস্তভাবে বিছানা গুটিয়ে নিতে যাব, এম্নি সময় একজন কি বল্লে আমাকে লক্ষ্য করে! আমি তবু বিছানা সরিয়ে নিচ্ছি দেখে, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলে, আমি ঘুমোতে পারি! সুবোধ বালকেরই মত আমি তাদের নির্দ্দেশ মেনে নিয়ে আবার আপনাকে নিদ্রাদেবীর কোলে সঁপে দিলুম! খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই আবার ঘুম ভেঙ্গে গেল! দেখি তখনো লোক কটি তেম্নি দাঁড়িয়ে আছে! ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রায় দেড় ঘণ্টা চলে গেছে আমার দু'বার ঘুম ভাঙ্গার মাঝামাঝি সময়ে! বন্ধুবর তখনো ঘুমিয়ে! আমার অত্যন্ত লজ্জা হচ্ছিল নিজের স্বার্থপরতায় যে,—আমরা আরাম করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছি, আর লোকগুলি শুধু দাঁড়িয়ে আছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা! অত্যন্ত লজ্জিত চিত্তে, ভাবলুম মুখুয্যেকে ডেকে লোকগুলিকে বসতে বলি, কারণ ভাষা না জানাটা তখন আমার নিজের কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ অপরাধ বলে মনে হচ্ছিল! বন্ধুকে ডাকবো কি না ইতস্ততঃ করে, প্রসারিত শয্যাখানা গুটিয়ে নিচ্ছিলুম, এম্নি সময়, আমাদের একজন বিদেশী সঙ্গী এগিয়ে এসে, তার বলিষ্ঠ ও দৃঢ় দুটি হাত বাড়িয়ে, ছোট্ট শিশুটিরই মত বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, ইঙ্গিতে আমাকে শোবার জন্য অনুরোধ জানালে! তবু আমি আপত্তি কর্ত্তে যাচ্ছিলুম, তখন মুখে কি বলে, অঙ্গুলি দিয়ে একবার নিজের পানে দেখালে, আবার ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে কুড়ি মিনিট দেখিয়ে—আঙুলটা জানালা দিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের পানে বাড়িয়ে দিয়ে, স্পষ্টই বুঝতে পারলুম জানিয়ে দিলে, "পথিক, তুমি অনেক দূর হতে এসেছ, তোমার নিদ্রা আবশ্যক, সুতরাং তুমি ঘুমোও,—আমরা আর কুড়ি মিনিট পরেই নেমে যাবো, সুতরাং তোমার ব্যস্ততার কারণ নেই।" কী অপূর্ব্ব সদাশয়তা, কী অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভাব! এক মুহূর্ত্তে আমার মনে লাগলো, আমাদের দেশের রেলগাড়ীতে, সহযাত্রীর প্রতি সহযাত্রীর ব্যবহার "ও, মশাই, শুনছেন, উঠুন দেখি, জায়গা আপনার কেনা নয়, আমরাও টিকিট কিনেছি, পয়সা দিতে হয়েছে!" যিনি শুয়ে ছিলেন, তিনি হয় ত বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠ্লেন, "যান্—যান্ মশাই, বিরক্ত কর্ব্বেন না, পয়সা দিয়েছেন ত' কি হয়েছে? অন্য গাড়ীতে ঢের জায়গা আছে!" ইত্যাদি ইত্যাদি! শুধু তাই নয়—কয় ঘণ্টা আগেই, বেলজিয়াম সীমান্ত পার হওয়ার আগে, বেলজিয়ানদের বসবার স্থানে, শূন্য হওয়ামাত্র, বিস্তৃতিলাভের প্রয়াসটাও তখন চোখে অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকছিল; একে বিদেশী, তাতে আবার ভাষাজ্ঞানহীন কালা আদমি; তাদের প্রতি, অজ্ঞাত অপরিচিত, কটি জার্ম্মাণের সে রাত্রির সদ্ব্যবহার চিরকালই স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকবে!



রাইন-নদীর উপর হোহেন জোলার্ণ সেতু—(কলোন)

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম! আবার যখন ঘুম ভাঙ্গলো, দেখি বন্ধুবর, সারারাত্রি সুনিদ্রা ভোগের পর, জেগে, বিছানায় শুয়ে মিটমিট করে তাকাচ্ছেন, আর বলছেন "হ্যালো, আই ছে গুডমর্ণিং।" তখন ভোরের আলো জানালা-পথে গাড়ীতে উঁকি দিচ্ছে দেখে "সুপ্রভাত" বলে আমিও উঠে বসলুম! তার পরই বন্ধুকে প্রশ্ন—"আচ্ছা বল দেখি, ধন্যবাদ বলতে হলে জার্ম্মেণ ভাষায় কি বলতে হবে?"

"কেন, এত ভোরে ধন্যবাদের কি হলো?"

"আরে বলই না!"

বন্ধুবর বল্লেন "ডাংসে!"

আপন্ মনে বিড় বিড় করে তিনবার বল্লুম "ডাংসে, ডাংসে, ডাংসে।" অর্থাৎ আমার রাত্রির সহৃদয় বন্ধুরা কখন যে গাড়ী থেকে নেমে গেছে জানিই না। তখন ভাষানভিজ্ঞতার দরুণ তাদের ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি, তাই যেন তাদের উদ্দেশে, আপন মনে তিনবার উচ্চারণ কর্লু্ম, "ডাংসে, ডাংসে, ডাংসে।" জানি না সে ধন্যবাদ তাদের কাণে পৌঁছেছিল কি না!

বন্ধুবর যখন জিজ্ঞেস কর্লে্ন "কি হে, মুখস্থ কচ্ছ না কি?" তখন তাকে রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বল্লুম, জার্ম্মেণ চরিত্রের যে একটা বিশেষত্ব সে রাত্রিতে দেখবার সুযোগ হয়েছে, তা' আজীবন মনে থাকবে! বন্ধুবরও শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন!

টাইম্ টেবল খুলে দেখা গেল আর আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী কলোনে আসবে। সুতরাং প্রশ্ন হলো, রাইন-ল্যাণ্ডের পথে কলোনে নামা হবে, কি সোজা বার্লিন যেতে হবে! আমাদের দুজনের মধ্যে একটু মতদ্বৈধ হওয়াতে,



কলোনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গীর্জ্জা অভ্যন্তর

করা হবে! বন্ধুবর সর্ব্বদাই প্র্যাক্‌টি-ক্যাল্; যেই বলা অম্নি পকেট হতে একটা মার্ক বের করে, এ হলে কলোন, ও হলে বার্লিন বলে কর্লেন "টোস্।" লটারীতে কলোনে নামাই স্থির হলো; তাই তাড়াতাড়ি করে বিছানাপত্র গুটোতে না গুটোতেই গাড়ী এসে প্রকাণ্ড একটা ষ্টেশনে থামলো! দেখলুম বড় বড় করে লেখা আছে "কলোন", আর শুনতে পেলুম জার্ম্মেণ পোর্টার হাঁকছে "কে—ল্।"

গাড়ী হতে নেমে পড়ে সমস্যা হ'ল, যাওয়া যায় কোথায়? সময় সঙ্কীর্ণ; তাই রাত্রিতেই বার্লিনের গাড়ী ধরতে হবে, সুতরাং মালপত্রগুলি 'ক্লোক-রুমের' হেপাজতে ছেড়ে দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল! সারা রাত্রির ভ্রমণজনিত শ্রমে চেহারাখানা প্রায় ঝড়ো কাকের মতই হয়ে উঠেছিল; তাই দুই বন্ধুতে প্রায় এক মার্ক খরচ করে, হাতমুখ ধোওয়া, ক্ষৌরকার্য্য, প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য প্রসাধন ষ্টেশনস্থিত জনসাধারণের স্নানাগারেই সেরে নেওয়া গেল! প্রাতরাশও শেষ করা গেল ষ্টেশনের ভোজনালয়েই;—খেতে বসে বন্ধুবর, এটা ওটার জার্ম্মেণ ভাষায় প্রতিশব্দ কি আমাকে বলছিলেন, এবং চটপট্ সেগুলিকে আয়ত্ত কর্ব্বার জন্য তাড়া দিচ্ছিলেন; ও একমাত্র শ্রোতা বন্ধুটির কাছে খুবই বাহাদুরী নিচ্ছিলেন নিজের জার্ম্মেণ-ভাষাভিজ্ঞতার গৌরবে! কিন্তু পরের দিনই ভোরে বার্লিন ষ্টেশনে ও পুনরায় ষ্টেশনের খোঁজে রাজপথে বন্ধুবরের বিদেশী ভাষা-জ্ঞান কি ভাবে সাহায্য করেছিল, তাহা আমি নিজে ত ভুলতেই পারি নি, বন্ধুবরও যে ভুলতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। আমার ত ফরাসী ভাষার বন্ধু ছিলেন "হিউগো" সাহেব। জানি না বন্ধুবরের জার্ম্মেণ ভাষার বন্ধু কে? তবে তিনি যে হিউগো সাহেবের চেয়ে বেশী কুশল ছিলেন, এটা মোটেই মনে হয় না। যাক্ সে কথা!

প্রাতরাশের মত অত্যাবশ্যক কাযটা সেরে বেরিয়ে পড়া গেল কলোনের রাজপথে! কলোন জার্ম্মেণীর শ্রেষ্ঠ সহরদের অন্যতম, এবং গণনায় বোধ হয় তৃতীয় স্থান অধি-কার করে। এ স্থানটি, রাইন নদীর মত, সুপ্রশস্ত নদীর তীরবর্ত্তী বলিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র! শুধু তাই নয়, সহরের আধুনিক অবয়বের মধ্যে সর্ব্বত্রই পুরাতন ঐতিহাসিক নানা ঘটনা ও কার্য্যাবলীর স্মৃতি অভিন্ন ভাবে বিজড়িত হয়ে আছে। কথিত আছে, ৫০

খৃষ্টাব্দে সম্রাট ক্লোডিয়াস্ তাঁহার রাণী এগ্রিপিনার মনোরঞ্জনার্থ, রোমক নাগরিকদের বসবাসের জন্য এই নগরী স্থাপন করে, তার নামকরণ করেন "কলোনিয়া এগ্রিপেন্‌সিস্"। প্রায় পঞ্চম শতাব্দীতে ঐ নাম, স্বল্পাকারে 'কলোনিয়া'য় পরিবর্ত্তিত হয়, ও তাহাতেই বর্ত্তমান নাম হয়েছে কলোন।

পথে বের হয়েই, দেখা গেল সম্মুখে সুবিশাল রাইন নদী! ইয়োরোপে ইতিপূর্ব্বে টেমস, ক্লাইড, ফর্থ, লিফি, টাইন্, সীন, শেলড্‌ট্ প্রভৃতি যতগুলি নদ ও নদী দেখেছি; কোনটাই আমার চোখে, নদী নামের উপযুক্ত বলে মনে হয় নি, যেন এক-একটা খাল! রাইন দেখেই প্রথম মনে হল যে, ইয়োরোপেও দু'একটি নদী নামের উপযুক্ত নদী আছে! অনেক দিন আগের ভূগোলে পড়া, রাইন নদী, ভল্গার পরেই, ইয়োরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নদী, এ কথাটা স্মরণ হ'ল! খানিকক্ষণ রাইনের তীরে দাঁড়িয়ে, বাস্তবিকই একটা আনন্দের ও স্বস্তির ভাব মনে আস্‌ছিল, আর মনে হচ্ছিল আমার শস্যশ্যামল, গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা-বিধৌত বাংলাদেশের কথা! বোধ হয়, রাইনের এদের সঙ্গে এমন কোন সৌসাদৃশ্য ছিল—যাতে, দৃষ্টিমাত্র রাইন, দেশের নদ নদীগুলিকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল এমন ভাবে, যেমনটি, টেমস্ অথবা সীন কিছুতেই পারে নাই।



রাইন-নদীর তীরে উপবেশনের স্থান ও সেতু

অন্য দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র যেই বন্ধুর চোখে পড়্‌লো উঁচু গীর্জ্জার চূড়া, অমনি লক্ষ্য হ'ল সেই স্থল! কয় মিনিট পরেই আমরা কলোনের সুবিখ্যাত গীর্জ্জার সম্মুখে এসে দাঁড়ালুম! প্রথম দৃষ্টিতেই গীর্জ্জাটি অতি পুরাতন ও অন্যান্য গীর্জ্জা হতে একটু বৈশিষ্ট্যময় বলে মনে হল। সমগ্র জার্ম্মেণীতে, এই গীর্জ্জাটি গথিক কলানৈপুণ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে পরিগণিত! ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত এর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় নাই। ১৩২২ খৃষ্টাব্দে এর উপাসনার বেদী নির্ম্মিত হয়, এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় সওয়া ছয় শো বছর পরে এর কায শেষ হয়! কলোনে আরো কটি গীর্জ্জা আছে। তার মধ্যে সেণ্টজিরিয়োর গীর্জ্জা একাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শেষ হয়। এপোস্‌ল গীর্জ্জা পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত, এবং ইহার মধ্যস্থ সুবিশাল হল'টি ইংলণ্ডের রাজা জনের কন্যা ইসাবেলএর নামে পরিচিত।

সুবিখ্যাত গীর্জ্জাটির সম্মুখেই কেথিড্রেল স্কোয়ার। সেখান হতে রাইনের পারে পারে আমরা হার্‌বারে এসে পৌঁছলুম। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলে' হারবারটি বেশ চমৎকার মনে হ'ল! তবে গ্লাসগো, ডাব্‌লিন কি মার্শেল অথবা টুলোনের মত নোংরা অপরিচ্ছন্ন বন্দর নয়, বেশ ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বন্দরটি! সেখান হতে একটু এগিয়ে, কলোনের উপকণ্ঠস্থ একটি মনোরম, সমৃদ্ধিপূর্ণ স্থান মেরিয়েনবার্গে পৌঁছান গেল। পথেই অদূরে, রোমানদের নির্ম্মিত পুরাতন প্রাকার দেখতে পাওয়া যায়। কলোনের সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ও রাইন হইতে বেশী দূরে নয়। সে স্থান হয়ে কতকগুলি সুদৃশ্য রিংষ্ট্রীট (সুবিশাল রাজপথ) হয়ে, অপেরা হাউস ও আদালতগুলির সম্মুখ দিয়ে, রাইনের তীরে তীরে, অপর

পারে একজিবিশন বিল্ডিংগুলি দেখতে দেখতে পুনরায় এসে কেথিড্রেল স্কোয়ারে উপস্থিত হলুম।

কলোনে যা' কিছু দেখবার, খুবই তাড়াতাড়ি করে সারতে হলো; কারণ, আমাদের প্রোগ্রাম মত সেদিনই রাইনল্যাণ্ডে যাওয়া চাই। বন্ধুবান্ধবদের মুখে শুনেছিলাম, রাইনল্যাণ্ড বাস্তবিকই প্রাকৃতিক দৃশ্যে অতুলনীয়। কিন্তু ভাল করে দেখতে হলে ন্যূনকল্পে এক সপ্তাহ লাগে। আমাদের হাতে সময় অল্প, অথচ প্রোগ্রাম বেশ লম্বা, সুতরাং অল্প সময়ে যতটুকু দেখার সুযোগ হয় ততই লাভ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছাড়া, আরো একটি কারণে রাইনল্যাণ্ড ক'বছর ধরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল,—তা হচ্চে, জার্ম্মাণযুদ্ধের পর, ভার্সেল সন্ধি অনুসারে, যত দিন না জার্ম্মেণী মিত্র-শক্তিপুঞ্জের দাবীর টাকা পরিশোধ কর্ত্তে সক্ষম হয়, তত দিন পর্য্যন্ত, এদের সৈন্যেরা রাইনল্যাণ্ডে ঘাটি বেঁধে বসে থাকবে। হয়েছিলও তাই,—যুদ্ধ বিরতির পর প্রায় দশ বছর পর্য্যন্ত রাইনল্যাণ্ডে মিত্র-শক্তিপুঞ্জের সৈন্যসমাবেশ ছিল, ও শুধু কয়েকটি মাস পূর্ব্বে, তল্পীতল্পা গুটিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের রাইন-প্রদেশ ছেড়ে দেশে ফিরে যেতে দেখেছিলুম, এ কথাটা তখনো স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে ছিল। তাই রাইন-প্রদেশে যেতেই হবে, এটাই ছিল সঙ্কল্প। সুতরাং, পথে কলোন যতটা সম্ভব কম সময়ে যত বেশী দেখতে পারা যায়, তাই শেষ করে,—রেল গাড়ীতে আমরা বোন্ অভিমুখে রওয়ানা হলুম। প্রথমে ইচ্ছা ছিল, ট্রামে যাওয়ার, কিন্তু—শেষ পর্য্যন্ত তা' খুব সুবিধাজনক হয়ে উঠে নি।

কলোনের রাজপথে, বোনের বাড়ীতে, ও রাইনল্যাণ্ড পৌছেও, আমি প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলুম জার্ম্মেণ যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরীদের! কী সুস্থ ও সবল এদের আকৃতি! প্রত্যেকটি মুখে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের ছবি প্রকট হয়ে আছে! চেহারাগুলি, কী ছেলে কী মেয়ে সকলেরই, ভারিক্কি গোছের, কিন্তু স্ফূর্ত্তি ও চাঞ্চল্যে ভরা! সাদাসিধে বেশ,—বিলাস উচ্ছৃঙ্খলতার একটুও আভাষ পাওয়া যায় না; দেখেই মনে হয় যেন, plain-living ও high-thinkingএর নিত্য সাধক এরা! মেয়েরা এখনো শিংল্ করা কাকে বলে, সাধারণতঃ জানে না। মুখে রুজ, অথবা লিপ্‌ষ্টিকের বালাই নেই, তার পরিবর্ত্তে ফুটে উঠেছে—সহজ ও সরল নিটোল স্বাস্থ্যের লালিমা! পোষাক-পরিচ্ছদও অনেকটা পুরাতন সময়োপযোগী, হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত এসে নেমেছে, এবং তার নীচেই সে স্বাস্থ্যসম্পন্ন "আথাপা ঠ্যাং" দেখা যায়, তা বাস্তবিকই তাদের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও শ্রমসহিষ্ণুতার পরিচায়ক! আমার যতদূর মনে হয়, দুর্ব্বল, শ্রান্তিপূর্ণ, অথবা রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখ, জার্ম্মাণীতে খুব কমই চোখে পড়েছে! পথে, মুখুয্যে ও আমাতে বলাবলি কচ্ছিলুম, যতই জার্ম্মেণ লোকগুলিকে দেখ্‌চি, ততই ভাল করে



বোন্ বিশ্ববিদ্যালয়

হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে, কি করে এরা বছরের পর বছর, একা পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে পেরেছিল! অবশ্য অতি দর্পই তাদের পরাজয়ের কারণ হয়েছিল, যেমন চিরকাল হয়ে থাকে। কিন্তু মনে পড়ে, বন্ধুকে বলেছিলুম, আজ এই চোখের উপর, যে সব যুবক-যুবতী অথবা কিশোর-কিশোরীকে দেখছি, কাল তারাই যখন জনক-জননীতে পরিণত হবে, আমার মনে হয়, তারা এমন স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও প্রাণবন্ত কর্ম্মঠ একটা জাতির সৃষ্টি করবে, যে, সমস্ত পৃথিবী যদি তাদের পদানত হয়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই! নানা দেশ ঘুরে জার্ম্মেণীতে এসে, এ ধারণাটা আমার, অন্য সকলের সঙ্গে তুলনায়, একান্তই বদ্ধমূল

হয়েছিল! আর অনেকের সঙ্গে কথায়-বার্ত্তায়ও জানতে পার্ল্লুম, যে, যুদ্ধের পর, বিগত দশ বৎসরে, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিতে, জার্ম্মেণী বাস্তবিকই অনেক এগিয়ে গেছে। ফরাসীদেশ যখন বিলাসে ও সম্ভোগে মত্ত, বেলজিয়ম যখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে, ইংলণ্ডে যখন বাণিজ্যের প্রসার কর্মে' বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে, তখন জার্ম্মেণী, নিষ্ঠাবান সাধকের মত, একান্তে, অতীতকে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে দিয়ে, শিল্প বাণিজ্য ও বিজ্ঞানে, নিজের বর্ত্তমানকে সুফলিত করে তুলেছে!

প্রায় সাড়ে এগারোটায় আমরা এসে বোন্ ষ্টেশনে পৌছলুম। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগ, সুতরাং জার্ম্মেণীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শীতটাও বেশী লাগছিল। সুতরাং ওভারকোট, দস্তানাগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়ে-



গোড্সবার্গ হইতে কোনিগ্স্-উইণ্টার ও সপ্ত-পর্ব্বত

ছিল! বোন্ ষ্টেশনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি গাড়ী হতে নামবার বেলা মুখুয্যে গাড়ীতে বেঞ্চের উপর রাখা দস্তানাগুলির কথা ভুলেই গেলেন। তার পর যখন সেগুলির কথা মনে হলো, ততক্ষণে গাড়ী বোধ হয়, আধ মাইল এগিয়ে গেছে! সুতরাং ষ্টেশন হতে, বেরোবার সময়, বন্ধুর মনে "ঐ যাঃ, গেল", কথাটা শুনে আমি কি গেল বুঝতে না পেরে, থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস্ কর্লুম "কি আবার গেল?"

বন্ধুবর বল্লেন "গাড়ী!"

আমি বল্লুম "তা যাক্, ক্ষতি কি?"

বন্ধু বল্লেন "ক্ষতি যথেষ্টই আছে, কারণ গাড়ীটা শুধু একাই যায় নি, সঙ্গে দস্তানা দুটি নিয়ে গেছে!"

লক্ষ্য করে দেখলুম বন্ধুবরের হাত-দুটি, বে-আব্রু হয়ে পড়েছে।

বোন্ ছোট্ট সহর; রাইনের উপর অবস্থিত! ষ্টেশন হতে বের হয়ে আমরা একের পর এক, অনেকগুলি সুপরিসর ও অল্প-পরিসর পথ পার হয়ে' গেলুম রাইনের অভিমুখে! সকাল বেলা হতে ঘুরে ঘুরে ক্ষিদেও বেশ পেয়েছিল, তাই একটা রেস্তরাঁতে ঢুকে, বসে পড়া গেল দু'খানা চেয়ারে। দোকানের মালিক একজন মহিলা, বেশ হাসিমুখে আমাদের সম্বর্দ্ধনা জানালো! ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতেই, দোকানের কর্ত্রী আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল! তার কাছ হতেই বোনের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া গেল! কিন্তু শুনে ভারি ক্ষুণ্ণ হতে হলো, যে, রাইনল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে যাবার মত কোন বাস, কি অন্য কোন যান পাবার সে সময়ে কোন সম্ভাবনা নেই। অত্যন্ত শীত বলে' পরিদর্শক ঐ সময় খুব কমই আসে, এ জন্য ঐ সমস্ত বন্দোবস্ত একেবারেই নেই! তবে এপ্রিলের প্রথম ভাগেই, রাইনল্যাণ্ডে প্রতি বৎসর অনেক দর্শকের সমাগম হয়, সুতরাং ঐ সময়ে বাস্, মোটর প্রভৃতির চলাচলও বেড়ে যায়! নদীতে বেড়াবার কোন জাহাজ পাওয়া যায় কি না, প্রশ্নের উত্তরে, একটু মৃদু হেসে জার্ম্মেণ মহিলাটি উত্তর কর্লে, তারও সম্ভাবনা খুব কম, তবে চেষ্টা কর্লে বরাত জোরে এক আধখানা মিলেও যেতে পারে।

কথায়-বার্ত্তায় বেশ খানিকক্ষণ কাটানো গেল; কারণ, দোকানীর অন্য কোন খদ্দের ছিল না, তাই দোকানওয়ালী নিশ্চিন্ত মনে আমাদের সঙ্গে গল্প করে চলেছিল। কিন্তু লাঞ্চের অর্ডার দিতে গিয়ে হলো বিপদ! কারণ, দোকানওয়ালী খাবারগুলির জার্ম্মেণ নাম বলছিল, যার কোনটা কি, কিছুতেই বুঝা যাচ্ছিল না। তখন অগত্যা বন্ধুবর উঠে গিয়ে, চেহারা দেখে কতকগুলি খাদ্য, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, প্লেট ভর্ত্তি করে নিয়ে এলেন। বন্ধুবরের জার্ম্মেণ ভাষা, আকার এবং ইঙ্গিতে পর্য্যবসিত হয়েছে দেখে আমার পক্ষে হাসি সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল, তবু কোন রকমে চেপে রাখতে হয়েছিল, পাছে বন্ধু রাগ করেন। অজ্ঞাতনামা

খাবারগুলি, বিশেষতঃ মিষ্টিগুলি সেদিন অতি উপাদেয় বলে মনে হয়েছিল।

অক্সফোর্ড ও কেম্বিজএর মত বোন্‌ও তার অনেক-দিনের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ! তা' ছাড়া 'বোন্'এর প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যই অতুলনীয়! বন্ধু মুখুয্যের কেম্বিজবাসী জনৈক বন্ধুর বাগ্‌দত্তা পত্নী তখন বোন্‌এ ছিলেন। তাঁর বন্ধু, তাঁকে তাঁর ভাবী পত্নীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে বলে দিয়েছিলেন। আমাদের সময় অল্প, আর তার উপর, বন্ধু মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বভাবতঃই লাজুক। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় এ রকম নানা কারণেই আর, তাঁর বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

হবার সেতু আছে; তার উপর দিয়ে লোক-চলাচল করে, ও ট্রামের রাস্তা আছে! সেতুর পাশেই মনোরম বাঁধানো ছোট্ট একটা প্রাচীর। তারই ওপাশে, কাঁকর-বিছানো অনেকটা স্থান লোকের বেড়াবার জন্য ও-ভাবে তৈরী করা হয়েছে। মাথার উপরে সারি সারি ছোট বড় গাছ, আর তার নীচে অনেকগুলি বসবার স্থান! গ্রীষ্মের সময় ও-গুলি না কি লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে। সেদিন শীতের সময় বলে যদিও ততো ভিড় ছিল না, তবুও সেই দুপুর বেলাই অনেক লোক সেখানে বসে প্রকৃতি-রাণীর সৌন্দর্য্য উপভোগ কচ্ছিল। আমরাও প্রায় আধ ঘণ্টা সেখানে বসে, দাঁড়িয়ে ও বেড়িয়ে, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য চোখ দিয়ে যতটুকু পান

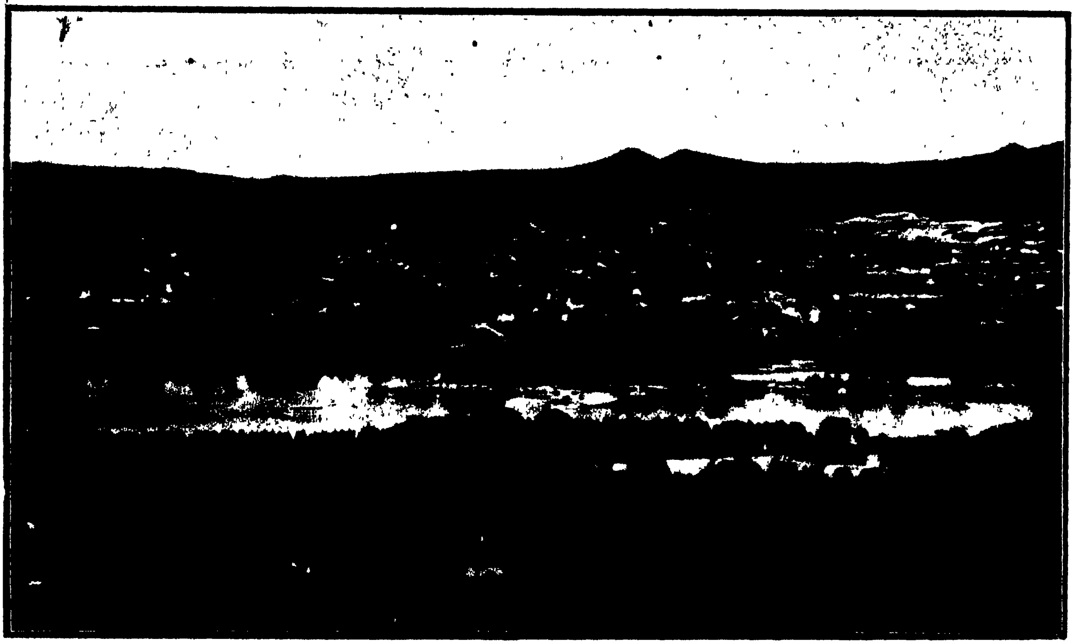


রাইন নদীর উপর একটি খেয়াঘাট

মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে, আমরা সোজাসুজি গিয়ে পৌঁছুলুম রাইন নদীর তীরে! রাইনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কাছে, অন্য যা কিছু দেখবার খুবই অকিঞ্চিৎকর ঠেকে! তার সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত মুনষ্টার গীর্জ্জা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিটোভেনের গৃহ ও প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রভৃতি মনকে বেশীক্ষণ আটকে রাখতে পারে না! তাই আমরা রাইনল্যাণ্ডে পৌছে, রাইনের সান্নিধ্য বড় একটা ত্যাগ করি নি। কলোনের মত, এখানেও রাইন পার

করা সম্ভব, তাই কচ্ছিলুম! সম্মুখে সুপ্রশস্ত রাইন নদী, মন্থর গমনে বয়ে যাচ্ছে; তারই ওপাশে ছবির মত একটা গ্রাম, আর তারই পশ্চাতে, আকাশের গায়ে যেন লেগে আছে, ছোট ছোট কটি পাহাড়! বাস্তবিকই সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ওখানে দু'একটি লোকের সঙ্গে আলাপ করে, নদীতে বেড়াবার কোন সুযোগ ও সুবিধা আছে কি না, জিজ্ঞেস্ করে, যখন জানতে পারলুম যে তেমন কিছুই নেই, সে সময়,—তখন অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হতে হলো।

সৃষ্টিছাড়া লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুদের উৎসাহ কিন্তু অদম্য! যান-বাহন কিছু নেই জেনে, ভগবানদত্ত যান দুটির সদ্ব্যবহারের মনস্থ করা গেল! মনস্থ করা আর কার্য্যে পর্য্যবসিত হওয়ার মধ্যে বোধ হয় মিনিট পাঁচেকের বেশী সময়ের ব্যবধান ছিল না। আমরা রাইনের তীরবর্ত্তী রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ কর্লুম। খানিক দূর এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, দুখানি নৌকায় চড়ে, দুই দল লোক, একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নদী বেয়ে চলেছে! দেখেই মনে হলো নিশ্চয়ই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র! লক্ষ্য করে দেখলুম, প্রত্যেকটি ছেলেই সবল ও বলিষ্ঠ, তাদের মধ্যে রোগা ও শীর্ণ কেউ ছিল বলে মনে পড়ে না। সে সব অঞ্চলে আমাদের মত কালো লোক কদাচিৎ দেখা যায় বলেই বোধ হয় পথের লোকজনদের অনেকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম আমরা! ঘণ্টা খানেক এগিয়ে গিয়ে বোন্‌এর ভাল বাঁধানো রাস্তা এসে শেষ হলো,—গোডস্‌বার্গে! পথেই পড়লো কেসেনিক, প্লিটারস্‌ডর্ফ প্রভৃতি! গোড্‌স্‌বার্গ হতে অপর তীরবর্ত্তী সাতটি পাহাড়ের সমাবেশ ও তাদের গায়ে লেগে থাকার মত কোনিগ্‌স্‌ উইণ্টার, অতি চমৎকার দেখায়! পাহাড়গুলি কোনটিই বোধ হয় হাজার ফিটের বেশী উঁচু নয়! তবু দিগন্তে আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি কচ্ছে পাহাড়, তারি কোলে বসে আছে ছবির মত গ্রাম, আর তারি নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, কুলু কুল করে নদী, এ যে কী দৃশ্য। একবার না দেখলে তা' ধারণা করা যায় না। আমাদের দেশে, হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে, লোকালয়, নদী ও পাহাড়ের যে অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়, বিলাতে অথবা ইয়োরোপে সে দৃশ্য একান্ত বিরল! সেইজন্যই বোধ হয়, রাইনল্যাণ্ড আমাদের কাছে এত ভাল লেগেছিল!



রাইননদী তীরস্থ সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য

গোড্‌স্‌বার্গের পরে, পথ যখন নদীর পারে শেষ হয়ে গেল, তখন ফিরবার প্রস্তাব হলো! আমার কিন্তু তখনো তৃপ্তি হয় নাই, বল্লুম "চল, আর একটু এগিয়ে যাওয়া যাক!" তখন আমাদের পথ হলো, কোথাও বা মাঠের উপর দিয়ে আবার কোথাও বা, জলের ধারেই বালির উপর দিয়ে। এ ভাবে আমরা দুটি বন্ধু এগিয়ে চলেছি। হাতের ডান দিকে পাহাড়ের গায়ে একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া গেল। পরে শুনেছি সেটি পূর্ব্বে গোড্‌স্‌বার্গ প্রাসাদ ছিল! যেতে যেতে, এপাশে ওপাশে যতটুকু দেখা সম্ভব, দেখেও তৃপ্তি হচ্ছিল না,—কি যেন একটা আকর্ষণ আমাদের শুধু সামনেই এগিয়ে নিয়ে চলেছিল;

[ক]দূর এসেছি, ফিরতে হবে কতটুকু, আর সে কি ভাবে—[কি]ছুই মনে ছিল না! যে সময় বেরিয়েছিলাম, তখন [সূর্য্য] ছিল ঠিক মাথার উপরে; হঠাৎ পশ্চিমের দিকে ফিরে দেখা গেল, সূর্য্য অনেকটা সেদিকে হেলে [প]ড়েছে, আর ঘড়ীতে সাড়ে তিনটা বাজ্‌ছে! যখন খেয়াল [হ]লো আমরা আট নয় মাইল পথ এগিয়ে এসেছি, তখনই [হঠা]ৎ মনে ক্লান্তি এল, এবং ভাবতে হ'ল, তাই ত, এখন [ফে]রা যায় কি করে! আবার যদি ভগবান-দত্ত যানেই ফিরতে [হয়], তবে বিপদ! নদীর ধারেই একটা পার্কের মত স্থানে [ব'সে] এ কথাটাই দুই বন্ধুতে চিন্তা কচ্ছিলুম, আর পথে [যারা] চলছিল, তারা চলতে চলতে, পথশ্রান্ত এই দুটি [বি]দেশীর দিকে বার বার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল! হঠাৎ [নদী]র ও-পারে নজর পড়াতে, বল্লেন "ও-পারে নিশ্চয়ই [রেল] আছে, কারণ ঐ ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে!"

আমি বল্লুম "কলের চিমনিও ত হতে পারে!"

বন্ধু খানিকক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে তাকিয়ে দেখে [বল্লে]ন "কথ্‌খনো নয়, কারণ, ঐ দেখ, ধোঁয়া সামনের [দি]কে এগিয়ে চলেছে!"

"হাঁ, তা হতে পারে এবং হলেই ভাল হয়" বলে মনকে [প্র]বোধ দেওয়া গেল। কিন্তু নদী পার হওয়া যায় কি [ক]রে? কিয়ৎক্ষণ পরেই, একজন আগন্তুককে জিজ্ঞেস্ [ক]রে, অর্দ্ধেক কথায় ও অর্দ্ধেক আকারে-ইঙ্গিতে বুঝতে [পা]রা গেল, যে, আর একটু এগিয়ে গেলেই, একটা "ফেরী" [পা]ওয়া যায় এবং তাতে পরপারে যাওয়া যেতে পারে! [ভদ্র]লোকটিকে "ডাংসে" জানিয়ে আমরা শ্রমক্লান্ত পা [দু'টি]কে আবার চালনা কর্লুম ও প্রায় মিনিট পোনেরো [প]রে মাল্‌হেম নামক স্থানে পৌছলুম! সেখানে খেয়াঘাট [আ]ছে দেখে মন অনেকটা আশ্বস্ত হলো। প্রায় কুড়ি [মি]নিট পরে 'খেয়া জাহাজ' ও-পার থেকে ফিরে এলে [আ]মরা ও-পারের যাত্রী হলুম এবং প্রায় আধ ঘণ্টা পরে [নদী]র ও-পারে জাহাজ ভিড়লো!

ও-পারে পৌঁছে, বাস্তবিকই রেল লাইন দেখতে পাওয়া [গে]ল; আমরা ষ্টেশনে পৌঁছবার আশায় সেই রেল [লা]ইন ধরেই সম্মুখে এগিয়ে চল্লুম। মিনিট পনরো এ ভাবে [চলে] আমরা এসে পৌছলুম কনিগ্‌উইণ্টার ডেক্‌মাল্ নামক [স্থা]নে! ষ্টেশনঘরের অভ্যন্তরে একটি ভদ্রলোক, বোধ হয় ষ্টেশন-মাষ্টারই, কাজ কচ্ছিলেন! বন্ধুবরকে বল্লুম, এবার তোমার পালা,—কবে বোনের গাড়ী আসবে, ইত্যাদি জেনে এসো! বন্ধুবর আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন, আমিও বাইরের একখানা বেঞ্চে বসে পড়লুম। বন্ধুর অনেকক্ষণ দেরী হচ্চে দেখে, একটু ওদিকে এগিয়ে গিয়ে, ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখি, বন্ধু ও ষ্টেশন-মাষ্টারের সিনেমা অভিনয় চলছে, হালফ্যাসানের সবাক্ নয়, আগের পুরানো অবাক্ চিত্রই বটে! দু'এক মিনিটের মধ্যেই বন্ধু ফিরে এলেন খবর নিয়ে যে, গাড়ীর এখনো অনেক দেরী। ও গাড়ীতে গেলে, বোন্‌এ ফিরে গিয়ে, কলোনের গাড়ী পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং সেখান হতে প্রায় সিকি মাইল এগিয়ে গিয়ে ট্রাম পাওয়া যাবে, তাতেই যাওয়া সুবিধা হবে! আমরা বিদেশী, পথঘাট চিনি না, তাই ষ্টেশন-মাষ্টার একজন লোককে আমাদের সঙ্গে দিবেন, সেই আমাদের ট্রামে পৌঁছে দিয়ে আসবে! বাস্তবিকই ষ্টেশন-মাষ্টারটি অতীব ভদ্রলোক; তা না হলে সেদিন, অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে বিপদেই পড়তে হতো! কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর্লুম "ডাংসে জানিয়েছ ত?" বন্ধুবর হেসে বল্লেন, যে এ রকম না করার মত মারাত্মক ভুল তার বড়-একটা হয় না।

দুমিনিটের মধ্যেই আমাদের পথ-নির্দ্দেশক, বোধ হয় ষ্টেশনের সিগ্‌নালম্যান কি এম্নি কিছু হবে, মস্ত জোয়ান, সাড়ে ছ ফিট লম্বা, এসে আমাদের অভিবাদন করে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্লো! আমরাও তার নির্দ্দেশ মত এগিয়ে চল্লুম, গ্রামের ভিতর দিয়ে! পথের আশে পাশে, এমন কি দোতালা হ'তে, অসংখ্য আবালবৃদ্ধবনিতা আমাদের যে ভাবে ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য কচ্ছিল ও ডেকে অন্যান্যদের নিয়ে আসছিল, তা দেখে স্পষ্টই ধারণা হলো যে, সে অঞ্চলে আমাদের মত কাউকে কেউ দেখে নাই! সকল মুখেই কৌতূহল ও ঔৎসুক্য দেখতে পেলুম, কিন্তু কোথাও ঘৃণা বা অবজ্ঞার চাউনি (যেমনটি বিলাতে দেখতে পাওয়া যায়) দেখতে পাই নি! ক'মিনিটের মধ্যেই আমরা ট্রাম-ষ্ট্যাণ্ডে এসে পৌছলুম এবং পথপ্রদর্শককে ধন্যবাদ জানিয়ে যেতে বল্লুম। সে একটু হেসে, ঘাড় নাড়িয়ে যেতে অসম্মতি জানিয়ে দাঁড়িয়ে রৈল ততক্ষণ, যতক্ষণ না ট্রাম এসে ষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছলো, ও আমরা তাতে উঠে

বসলুম। সে তখন ট্রাম কণ্ডাক্টারকে আমাদের গন্তব্য-স্থান সম্বন্ধে যথাযোগ্য নির্দ্দেশ দিয়ে, হাসিমুখে অভিবাদন করে ফিরলো! আবার তাকে "ডাংসে" জানাতে আমার মোটেই ভুল হয় নাই।

কনিগ্‌সউইন্টার ডেক্সমালে ট্রাম ধরে' কনিগ্‌সউইন্টার, লঙ্গেনবার্গ, রমলিংহোভেন, ওবেরর‍্যাসেল, লিম্পবুডিংগ, বিউএল, প্রভৃতি রাইনল্যাণ্ডের তীরবর্ত্তী স্থানগুলি অতিক্রম করে' আমরা প্রায় ছটার সময় পুনরায় বোন্‌এ ফিরে এলুম! ট্রামের কণ্ডাক্টার আমাদের একেবারে বোন্ রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছেই নামিয়ে দিলে, কোন্ দিকে ষ্টেশন তাও নির্দ্দেশ করে দিলে! প্রায় সাড়ে সাতটার সময় আবার কলোনে ফিরে আসা গেল!

রাত্রিতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিশেষ কিছুই ঘটে নি। শুধু ষ্টেশন হোটেলে ডিনার খাওয়ার বেলা, বিয়ার না খেয়ে জল পান কর্ত্তে চাই জেনে পরিচারক যা বিস্ময়ের ভাব দেখিয়েছিল, সেটি এখনো ভুলতে পারি নি। তখনো কারণটা বুঝতে পারি নি, পরে পেরেছিলুম, বার্লিন হতে সুইজারল্যাণ্ড পথে যখন এক মার্ক খরচ করে এক পাইন্ট জল কিনতে হয়েছিল; অথচ ঐ দামে দেড়গুণ বিয়ার পাওয়া যেতো!

রাত্রি প্রায় নটায় আমরা বার্লিনের গাড়ীতে উঠে বসলুম! যতক্ষণ জেগে ছিলুম, চোখের উপর দিয়ে বায়োস্কোপের ছবির মত ভাসছিল, একটির পর একটি, রাইনল্যাণ্ডের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর মনের উপর কাজ কচ্ছিল, গত চব্বিশ ঘণ্টায় পাওয়া, একবার নয়, বারবার জার্ম্মেণ সহৃদয়তার নিদর্শন! এখনো সে ঘটনাগুলি স্মৃতিপটে জাগরূক আছে; আর আছে কি ছেলে কি মেয়ে, সকলেরই মুখে কৃত্রিমতাবিহীন পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অভিব্যক্তি ও তাদের কর্ম্মকুশলতার পরিচয়।

আলো-আঁধারি

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একটী দরিদ্র পরিবার;—

জাতির আভিজাত্য দারিদ্র্যকে আরও কঠোর করিয়া তুলিয়াছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ, সমাজের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করিতে হয়,—একান্ত দরিদ্রের মত থাকা চলে না;—দুটী শিশু, তাদেরও নগ্ন, শিক্ষাহীন করিয়া রাখা চলে না। অভ্যাসের বশে নিম্নশ্রেণীর দরিদ্রের চেয়ে অভাব-বোধের তীক্ষ্ণতা তাহাদের স্বাভাবিক। অতৃপ্তি পরিবারের প্রাণী কয়টীর বুকে বুকে ধিকি ধিকি করিয়া অবিরতই জ্বলে। অশান্তির আগুণ ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে; যে সময়টুকু জ্বলে না—সে সময়টুকুতে থাকে উত্তাপ, দগ্ধ বুকের জ্বালা!

এর জন্য দায়ী কে?—অদৃষ্ট?

অদৃষ্ট সে অ-দৃষ্ট, তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া লোকে প্রত্যক্ষ হেতু যাহাকে পায় তাহাকেই ধরে,—তাহারা ধরে সুখময়কে;—সুখময় সংসারটীর কর্ত্তা।

সুখময়ের গোঁয়ার্ত্তুমীই এ দুর্দ্দশার হেতু;—সুখময় গোঁয়ার।

আসল কথাটা হইতেছে বোধ করি এই—মানুষ জন্ম-বিদ্রোহী,—শৈশবেই শাসন-নিষেধ অমান্য করাই একটা প্রধান আনন্দ; জীবনের প্রারম্ভে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা তাহার এই ধর্ম্মের আত্মপ্রকাশ। এ প্রতিষ্ঠা কি? এ প্রতিষ্ঠা হইতেছে প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমানকে ডুবাইয়া দিয়া নতুন আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করা—প্রচার করা;—এই ত বিদ্রোহ! কিন্তু প্রতিষ্ঠাই ত সংসারে শক্তির মাপকাঠী নয়,—কারণ কাল ও ক্ষেত্রের রুক্ষতায়, অনুর্ব্বরতায় প্রাণময় বীজেরও আত্মপ্রকাশের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। কিন্তু দুনিয়া এ দিক দেখে না: দুনিয়ার মজা এই যে, এ সংসারে যে প্রতিষ্ঠাবান তাহারই শক্তি সার্থক—সেই মানুষের মত মানুষ, আর ব্যর্থ যে, সে অক্ষম, অমানুষ, অপদার্থ। আবার সেই অক্ষম যদি মাথাটা খাড়া করিয়া চলিতে চায়, তবে সে গোঁয়ার।

ফুলের কুঁড়ি মাত্রেই বিকাশের শক্তি লইয়া আসে—

...স্ক ক্ষেত্র ও কালের রুক্ষতায় বিকশিত যদি সে না হয়, অকালেই যদি সে ঝরিয়া যায়,—তবু সে বিকশিত ...টীর চেয়ে ছোট নয়—এ সত্য দুনিয়া স্বীকার করে ;—সে বিকশিত ফুলটীকে দেখিয়া আনন্দ-কোলাহল ...রে,—ঝরিয়া-পড়া কুঁড়িটীকে পায়ে দলিয়া যায়।

যাক—আমাদের সুখময় ছিল ঐ গোঁয়ার,—এই জাতীয় ...োয়ারের মতই তাহার বিপরীত বুদ্ধি, বিকৃত দৃষ্টি। ... বুদ্ধিতে, সে দৃষ্টিতে দুনিয়ার মানদণ্ডে ধনের চেয়ে মানুষের ...ক ভারী।

দরিদ্রের ছেলে সুখময়,—বহুকষ্টে বি-এ পাশ করিল ...জের চেষ্টায়,—আর পাশ করিল বেশ কৃতিত্বের ...হিত। এই জন্যই ধনী ব্যবসায়ী হরিশবাবু কন্যা ...রদাকে তাহার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন ;—তাঁহার ...াশা ছিল ছেলেটী আপন কৃতিত্বেই একটা বড় গোছের ...রকারী চাকরী অর্জ্জন করিবে। মহাধনী হরিশবাবুর ...রকারী চাকুরেদের উপর শ্রদ্ধা অসীম। তিনি আজ ...ই—কিন্তু পুত্র পরেশ সে শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়াছে।

সুখময় কিন্তু সকলের কল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিল ;—সে ...করীর উদ্যোগ-পর্ব্বেই এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিল শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া গেলেন। ...৯২১ সালে সে এম-এ পড়া ছাড়িয়া কয়েক মাসের জন্য ...েল ঢুকিয়া বসিল। শুধু তাহার বিধবা মা কহিল—...ছেলে আমার বড় হয়েছে,—যা সে ভাল বুঝেছে, করেছে, তাকে আমি মন্দ বলতে ত পারব না ;—সুখময় ত ...র কাজ কখনও করে না।"

শ্বশুরবাড়ীর সকলের কিন্তু শ্রদ্ধা চলিয়া গেল। দেশের ...শরও গেল ;—উপরন্তু দেশের দশের সঙ্গে বনিলও না ...র ঐ গোঁয়ার্তুমির জন্য ; চাকরী যদি বা পরে একটা ...িলিল—তাও মনিবের সঙ্গে বনিল না। ধনীকে বড় স্বীকার করায়, আর মাথা তুলিয়া চলার অপরাধে ; এমন কি ...ী শ্যালক পরেশের সঙ্গেও শেষ পর্য্যন্ত মুখ-দেখাদেখি ...ন্ধ হইয়া গেল ঐ অপরাধে। নহিলে শ্যালক পরেশের ...রিবারে পঞ্চাশ জন লোক খাটিয়া খায়, মাসে চারি টাকা ...ইতে একশত দেড়শত টাকা বেতনের কর্ম্মচারীও ছিল। ...ন্তু তবু সুখময়ের দারিদ্র্য ঘুচিল না, পরেশও আহ্বান ...রিল না, সুযোগ্যত্ব সত্ত্বেও সুখময় কখনও কিছু বলিল না। শুধু বলিল না নয়, সামাজিক সৌজন্য ও আচার-ব্যবহারে যতটুকু একান্ত প্রয়োজন, তাহার একচুল ওদিকে আগাইয়া গেল না।

সুখময়ের স্ত্রী সারদা পরেশের ছোট বোন,—দুটী ভাই বোনে গভীর ভালবাসা ছিল, আজও আছে।

ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মাঝে বসিয়া পরেশ মাঝে মাঝে ছোট বোনটীর কথা ভাবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সারদারও দারিদ্র্যের যন্ত্রণার মাঝে পাঁচজনের কাছে দাদার গল্প ফুরায় না। কত নিরালা সন্ধ্যার অন্ধকারে চোখের জল ঝরে—দাদার মুখ মনে পড়ে।

এমনি কোন এক স্মৃতি স্মরণের মুহূর্ত্তে বিগলিত হইয়া পরেশ অগ্রহায়ণ মাসে প্রচুর দ্রব্য-সম্ভার দিয়া এক তত্ত্ব পাঠাইল ;—ছেলেদের জামা, গায়ের কাপড়, সারদার জন্য শাল কাপড়, সুখময়ের জন্য শাল, ঝাল, মসলা, ঘি, তেল, একটী গৃহস্থের ছয়মাস চলিবার মত সামগ্রী, দশ দশটা লোক ভারে বহিয়া হিমসিম খাইয়া গেল। সুখময়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে সারদার কাপড়-চোপড়গুলি তুলিয়া লইয়া বাকী সব জিনিষগুলি ফেরৎ দিল।

পরেশের বাড়ীর পুরাতন চাকর গৌর করযোড়ে কহিল—"জামাইবাবু!"

সুখময় তাহার বক্তব্য বুঝিয়াছিল—সে হাসিয়া কহিল, "গৌর, তোমাদের বাড়ীর জামায়ের কি দান গ্রহণ করা উচিত ?"

গৌর জিভ কাটিয়া কহিল—"রাধে রাধে, আমাদের জামাইবাবুকে দান করবার মত দাতা কে ? আর দান করবার মত সামগ্রীই বা দুনিয়ায় কই ? কিন্তু এ ত দান নয় জামাইবাবু!"

সুখময় আলোচনার ধারাটা পাল্টাইয়া দিল—"রমেন্দ্র কেমন আছে গৌর ?"

রমেন্দ্র সুখময়ের ছোট ভায়রা-ভাই, বড়লোকের ছেলে, হাইকোর্টের উকীল।

গৌর কহিল—"ভালই আছেন।"

—"শুভদা ভাল আছে ?"

শুভদা সারদার ছোট বোন।

—"তিনিও বেশ ভাল আছেন।"

—"শুভদার তত্ত্বে কি দিলেন এবার ?"

গৌর হাসিয়া কহিল—"তাঁর তত্ত্ব ত এখন নয়, সেই দোলের সময়।"

সুখময় হাসিয়া কহিল—"তবে গৌর বলছিলে যে এ দান নয়! সে হ'ল বাড়ীর ছোট জামাই, তার তত্ত্ব হ'ল না,—আমার বাড়ী অসময়ে তত্ত্ব এল,—তার মানে আমার অভাব পূরণ করা; নয় কি গৌর?"

গৌরের আর উত্তর জোগাইল না।

অগত্যা তাহাকে দ্রব্যসম্ভার লইয়া ফিরিতে হইল। কিন্তু দশ দশটী লোক লইয়া খাইয়া আসিতেও হইল। আবার বারোটী টাকা বিদায়ও লইতে হইল,—দশজনের দশটাকা—নিজের দুই টাকা;—না বলিতে তাহার সাহসও হইল না; ইচ্ছাও হইল না। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—"জামাইবাবু, সারুদিদির আমার মা দুর্গার মত ভাগ্য, রাজরাণী হ'লেও এর চেয়ে তাঁর মান বাড়ত না।"

সারদা একটীও কথা কহিল না, সে নীরবে ওই দশটী লোককে খাওয়াইল, নীরবেই অঙ্গের শেষ আভরণখানি হাতের রুলী জোড়াটী খুলিয়া দিল ওই বিদায়ের টাকা কয়টীর জন্য, নীরবেই সে গৌরের প্রশংসা-বাণী শুনিল, নীরবেই তাহার কাপড় চোপড়গুলিও ভারে তুলিয়া দিল,—একটী বারের জন্য চোখ ছল ছল করিল না,—একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়িল না।

গৌরের দল চলিয়া গেলে হাত পা ধুইয়া সুখময়ের জন্য খাবায় জায়গা করিয়া সুখময়কে ডাকিল—

"এস, খাবে এস।" কণ্ঠস্বরে উত্তাপ নাই, বাষ্প নাই, আনন্দও নাই, দরদও নাই—নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর!

সুখময় শুইয়া পড়িয়াছিল, সে হাসিয়া কহিল—"ছেলেরা খেয়েছে?"

"খেয়েছে।"

"এখনও আছে?"

"আছে।"

"ছেলেদের ও-বেলা হবে?"

"হবে।"

"তোমার?"

"হবে।"

সুখময় উঠিয়া আসনে বসিয়া হাসিমুখে কহিল—"এই জন্যেই শিব বেছে বেছে অন্নপূর্ণার দোরে হাত পেতেছিলেন। ভাণ্ডার তোমার অক্ষয় হোক,—আমি চিরদিনই হাত পেতে থাকি।"

সুখময় একটু তোষামোদ করিল, প্রিয়জনের এই শীতল অভিমান বড় কঠিন বস্তু; সরোষ অভিমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা চলে, কিন্তু এর কাছে নত না হইয়া উপায় নাই।

স্বামীর এই তোষামোদে কিন্তু সারদার অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বাস ভরেই কহিল—"আমার দাদার অপমানটা না করলেই হ'ত না?"

সুখময়ের দুর্ব্বলতাই হোক আর দোষই হোক সেটা ঠিক এইখানে,—ধনী-কন্যা সারদা আর্থিক, আর তাহার বাপের বাড়ী সম্বন্ধীয় কোন কিছুতে প্রতিবাদ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেই সুখময় আপনাকে হারাইয়া ফেলিত,—তাহার মনে হইত ধনীকন্যা সারদা তাহার ঘরে সুখী নয়—এ অসন্তোষ তাহারই ইঙ্গিত—সারদার প্রতি ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে আচারে ব্যবহারে এ অসন্তোষ পরিস্ফুট মনে হইত। সুখময় আজও উষ্ণ হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের মধুর আত্মসমর্পণের ভারটুকু কোথায় উপিয়া গেল। সে কহিল—"সে আমায় অপমান করে না পাঠালে ত আমি অপমান করতে যেতাম না!—আর অপমান তুমি কাকে বল—অপমান সেই আমাকে করে পাঠিয়েছিল—আমি ফিরিয়ে দিয়েছি মাত্র।"

—"দেখ, সংসারে আত্মীয়-স্বজন—"

সুখময় বাধা দিয়া কহিল—"আত্মীয় তুমি কাকে বল—স্বজনই বা কাকে বল? আত্মার সঙ্গে মিলন না হ'লে আত্মীয় হয় না, ধনীর স্বজন দরিদ্র নয়—দরিদ্রের স্বজন ধনী নয়; সম্বন্ধ-বন্ধন হলেই আত্মীয়ও হয় না—স্বজনও হয় না—হয় কুটুম্ব, কুটুম্ব বল।"

—"ভাল কথা,—তাই হ'ল, কুটুম্বই হ'ল; কিন্তু কুটুম্বই ত সংসারে তত্ত্ব-বার্ত্তা নিয়ে থাকে, দুনিয়ায় কেউ ত তাকে দান বলে অপমান করে না।"

—"আমি করি; দুনিয়ার মানুষে আর আমাতে তফাৎ আছে—সে ভালই হোক আর মন্দই হোক।"

সারদা কহিল—"মন্দ কি হয় না হ'তে পারে! মন্দ হলাম আমি, মন্দ আমায় ভাই, তুমি মহাপুরুষ!"

সারদা রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

একটুখানি নীরব থাকিয়া সুখময় কহিল,—বোধ হয় সে উদ্যত ক্রোধ সংবরণ করিয়া লইয়া কহিল—"তোমার দোষ কি বল, মা-বাপই আমার জীবনের সঙ্গে এক ব্যঙ্গ করে গেছেন সুখময় নাম দিয়ে, তুমি যে আজ মহাপুরুষ বলে আমায় ব্যঙ্গ করলে তার আর দোষ কি! তবে এইটুকু তোমাকে বলি সারদা—যে, আমি মহাপুরুষ নই, কিন্তু আমি পুরুষ মানুষ।"

সারদা ভাতের থালাটা সম্মুখে নামাইয়া দিয়া কহিল—"সে কি একবার, সে একশ বার, সে হাজার বার,—তুমি যে পুরুষ তার পরিচয় তোমার রাগেই পাওয়া যায়—আর তুমি যে মানুষ তার পরিচয় তোমার ব্যবহার।"

সুখময় হেঁট হইয়া চুর দেওয়া ভাতের মাথাটা সবে ভাঙিয়াছিল, সে খাড়া হইয়া হাত গুটাইয়া কহিল "কি বল্লে তুমি?"

সারদার মাথায় বোধ করি রক্ত চড়িয়া গিয়াছিল, সে কহিল "যা বলেছি সে ত শুনেছ তুমি, ফিরিয়ে বলতে গেলে ঠিক সেই কথাগুলিই ত গুছিয়ে আর বলা যায় না।"

সুখময় স্থির দৃষ্টি পত্নীর পানে হানিয়া কহিল, "হ্যাঁ শুনেছি আমি, কিন্তু আমার ব্যবহারটা কি খারাপ দেখলে তুমি শুনি?"

সারদা কহিল "খারাপ কি দেখব? তবে নিজে বুক বাজিয়ে মানুষ বলে অহঙ্কার করছ তাই বলছি,—বলছি, এই কি মানুষের বেঁচে থাকা? কোন মানুষের ছেলে মেয়ে শীতে কষ্ট পায়—গায়ে একখানা কাপড় জোটে না, দেহের পুষ্টি আহার—তা জোটে না? মানুষের ছেলের নয়—এমন হয়, না—না, উঠো না, উঠো না—আমার মাথা খাও।

সুখময় তখন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। সে কহিল "না, আর রুচি হবে না সারদা, তুমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলে তা' আমি বুঝেছি। কথাটা হচ্ছে 'কুকুর বেড়াল'। কুকুর বেড়ালের বাচ্চাই এমন কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি—তুমি যা বল্লে—সে ধারণা তোমার ভুল। বড়লোকের ঘরের মেয়ে তুমি—মানুষের সংজ্ঞা সম্বন্ধে যে ধারণাটা তুমি পোষণ কর, সেটা ভুল। মানুষই সংসারে কষ্ট পায়, তাদেরই ছেলে মেয়ে এমনি ভাবে শীতে কাঁপে, অপূর্ণ সাধ তাদেরই বুকে জ্বালা ধরায়। কিন্তু তবু তারা মাথা নীচু করে না, আপনাকে বিক্রী করে না। আর দুধে-ভাতে পশমের গরমে কারা থাকে জান—তারাও মানুষ, কিন্তু ওদের চেয়ে ঢের ছোট মানুষ,—যারা অভাবের দায়ে আপনাকে বিক্রী করে তাদের সঙ্গেই এক শ্রেণী—কোন তফাৎ নেই। সোণার ঝিনুক মুখে করে আসে—বাপের পয়সায় বড়লোক যারা, এরা তারাই,—নয় তো প্রবঞ্চক লুণ্ঠক, মিথ্যা কথায়, মিথ্যা ব্যবহারে অর্জ্জন করা ধন যাদের, এরা তারাই। ধনীর প্রতি কপর্দ্দকটীতে আছে বঞ্চনা, অক্ষম দীনের অভিশাপ। অধিকাংশই তাই—অন্ততঃ তুমি যাদের অহঙ্কার কর তারা ওই দুটোই। বাপেরও ধন ছিল, প্রবঞ্চনারও অন্ত নাই,—সেটা যেন ধর্ম্ম-কার্য্য, বীরত্ব, পুরুষকারের মন্ত্র।"

সারদা ইহাতেও নিরস্ত হইল না, তাহার বুকের পুঞ্জিত অসন্তোষ আজ অগ্নি-সংযোগে বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছে। সে কহিল "আমার বাপ ভাইকে তুমি চোর বল্লে, কিন্তু তার সাফাই আমি গাইব না—গাওয়া আমার উচিত নয়। তুমি যা বল্লে তারই আমি জবাব দেব। দুঃখ স্বীকার করে বেঁচে থাকা, বুকের জ্বালা বুকে চেপে রাখা কথা গুলো বিনিয়ে বিনিয়ে বলতেও ভাল, শুনতেও ভাল।—জিজ্ঞাসা করি এ সংসারে বঞ্চিত হয় কারা? যারা দুর্ব্বল, যারা অক্ষম, অপদার্থ তারাই।—তুমি যে কথাগুলো বল্লে, সে ঐ অক্ষমদেরই সৃষ্টি করা, আত্ম-প্রবোধের জন্য বিন্যাস করা কথা।—নইলে বঞ্চনা করাও যেমন পাপ, বঞ্চিত হওয়াও ঠিক তেমনি অপরাধ।"

দুর্নিবার ক্রোধে সুখময় যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছিল। যতটুকু জ্ঞান তখনও ছিল, তাই আশ্রয় করিয়া সে ত্বরিতপদে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সারদা স্বামীর গমন-পথের পানে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তার পর স্বামীর অভুক্ত থালাখানা রান্না-ঘরে তুলিয়া দিয়া এ-ঘরে আসিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবু সুখময় ফিরিল না। সারদার বুকের উত্তাপ ততক্ষণে শীতল হইয়া আসিয়াছে; শান্ত সংহত মুহূর্ত্তে সমস্ত স্মরণ করিয়া সারদার বুকের ভিতরটা যেন

ন করিয়া উঠিল। ওই আত্মাভিমানী মানুষটী ত ার অজানা নয়,—সে ত ভাল করিয়াই জানে ষ্যত্বের অভিমানই ওই মানুষটীর সব চেয়ে বড়! র আজ সে কুক্ষণে কুগ্রহবশে যাহা তাহাকে বলিয়াছে, হাতে সে তাহার মনুষ্যত্বের অভিমানকে উন্মাদিনীর ই দুই পায়ে দলিয়া দিয়াছে।

ক্রমশঃ রাত্রি অগ্রসর হইতেছে, তবু সে আসিল না। কি তবে দেশত্যাগী হইল?—আত্মহত্যা-তাও ত স্তেজনার মুখে বিচিত্র নয়!

বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। তাও সে পারিল না।

"মা ঠাকরোণ আছেন গো?"

সারদা চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"কে?"

—"আমি গো মা নোটন খালাসী; বাবু ইষ্টিশানে এই পত্তখানি দিলেন আর এই টাকা কটী—।"

ব্যাকুল আগ্রহে সারদা কহিল—"বাবু কোথায়?"

—"তিনি ডাউন লাইনের টেনে কোথা গেলেন।" বলিয়া নোটন টাকা কয়টী ও পত্রখানি দাওয়ার উপরে নামাইয়া দিল।

কয়টা টাকা বড় নয়—অনেক কটী। কিন্তু সারদা টাকার পানে না চাহিয়া পত্রখানি লইয়া কেরোসিনের ডিবের আলোতে পড়িতে বসিল।

নোটন কহিল—"টাকা ক'টা গুণে লেন মা, পনের টাকা আছে।"

পত্র পড়িতে পড়িতে সারদা কহিল—"আচ্ছা থাক, তুমি যাও।"

নোটন চলিয়া গেল,—সারদা চিঠিখানা পড়িল—

'সারদা,—

'মনের ক্ষোভে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম,—কি করিতাম তা' আমি ঠিক জানি না,—হয়ত সব কিছু পারিতাম; কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ কমিতে ভাবিয়া দেখিলাম তোমার কথাই ঠিক। আমি যাহা বলিয়াছিলাম,—তুমি সত্যই বলিয়াছ,—সেগুলা অক্ষম অপদার্থের আত্ম-সান্ত্বনার জন্য সৃষ্টি-করা বচন-বিন্যাসই বটে। সত্য কথাই ত,—সংসারে যাহার কিছুই নাই তাহার ত্যাগের মূল্য কি? নিঃস্বতা আর ত্যাগ দুইটা সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। দুঃখের গর্ব্ব, ত্যাগের অহঙ্কারের মূল্য কি তাহার? সঙ্গে সঙ্গে সেই শেয়ালের গল্পটা মনে পড়িল,—আঙুর পাড়িতে অক্ষম হইয়া সে বলিয়াছিল আঙুর টক্।

তাই আজ হইতেই আমার জীবনের ভুল সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পনেরটা টাকা পাঠাই, ভুল বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ আমার হাতের মুঠায় আপনি আসিয়া গেল। আজই এখানে রেজেষ্ট্রী আপিসে একটা বড় দলিলে একজন সনাক্তদারের প্রয়োজন ছিল, সেই সনাক্ত দিয়ে কুড়িটা টাকা পাইলাম। দুইটা মিথ্যা কথার দাম কুড়িটা টাকা,—বলিতে হইল আমি ইহাকে চিনি। বোধ হয় দলিলটায় গলদ আছে—হয় তো বা জাল; কিন্তু আমার তাহাতে কি যায় আসে?—

আমি পাঁচটা টাকা লইয়া কাজের চেষ্টায় চলিলাম, বাকী পনের টাকা পাঠাইলাম; ভয় নাই—দেশত্যাগী হইব না,—আত্মহত্যা করিব না,—সময়ে সব সংবাদই দিব। পরিশেষে আরও একটা কথা জানাই—আজ পরেশকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র দিলাম, সে যাহা পাঠাইয়াছিল তাহা পুনরায় পাঠাইতেও লিখিলাম। মূর্খ আমি,—যদি কেহ দেয় লইব না কেন?—

ইতি—সুখময়।—'

সারা অন্তরটা সারদার জ্বলিয়া উঠিল,—কে জানে কেন তাহার মনে হইল সুখময় তাহাকে আজ যে অপমানটা করিল—তার চেয়ে বড় অপমান বুঝি আর হয় না।

সে টাকা কয়টা মুঠায় পুরিয়া একটা ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আপন মনেই কহিল—"তাও ভাল, সুমতি যে হয়েছে সেও আমার ভাগ্যি;—কাল দেবতার পুজো দেব আমি। এই টাকা তোলা রইল।"

কিন্তু অশ্রু তখন চোখের কূল ছাপাইয়া ফেলিয়াছে. দু-ফোঁটা অশ্রুও মাটীতে পড়িয়া শুষিয়া গেল,—কিন্তু দুটী সিক্ত বিন্দুতে তাহার চিহ্ন জাগিয়া রহিল।

* * *

(২)

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে, রাজপথের আলোক এখনও সমান উজ্জ্বল, কিন্তু লোক ক্রমশই বিরল হইয়া আসিতেছে। সুখময় লক্ষ্যহীন গতিতে চলিয়াছে। চাকরী

মেলে নাই, তিন দিনের পর ধরমশালায় আর থাকিতে দেয় নাই। পকেটে আর মাত্র একটাকা কয় আনা অবশিষ্ট। তাই লইয়া আজই সন্ধ্যায় সে পথে বাহির হইয়াছে। অপর একটা ধর্ম্মশালা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

ক্লান্ত দেহ আর চলিতেছে না।—একজনের দাওয়ায় উঠিয়া একবার সে রাত্রি যাপনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামী চোর বলিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সুখময়ের বড় রাগ হইয়াছিল; তাহার মুখে আসিয়াছিল—"আমি চোর! আর তুমি সাধু?—চুরি না করিলে এই পাকা বাড়ী, বিজলী-বাতি, পাখা—তোমার হইল কি রূপে?" কিন্তু চাপিয়া যাইতে হইয়াছে। খানিকটা আসিয়াই তাহার হাসি আসিল—চুরি!—তাই বা পারিলাম কৈ?

সারাটা দিনে খাইয়াছে ত মোট দশ পয়সার। উপার্জ্জন করিতে যে পারে না—সেই খরচের ভয়ে সারা হয়! কাপুরুষের দল সব! চুরি,—সেও ত একটা উপার্জ্জন! সে করিতেও ত একটা সাহসের প্রয়োজন!

সাহস?—হ্যাঁ—সাহস বৈ কি,—নৈতিক না হোক, অবনৈতিক ত বটে,—তাহা হইলে ত এমন অবনৈতিক ভাবে রাস্তার খবরদারী করিয়া ফিরিতে হয় না। আবার সে হাসিল,—হাসিল সে আপন মনের কথার অনুপ্রাসের ছটায়; মনে হইল সাহিত্যিক হইলে মন্দ হইত না,—এ দেশের ব্যবস্থাটা অবস্থার সহিত মিলিত ভাল।

তাহার মুখের হাসি কিন্তু মুখেই মিলাইয়া গেল,—সহসা কাহার করস্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দেখে—একটা পাহারাওয়ালা। পাহারাওয়ালাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহা যায়ে গা?"

সুখময় কহিল—"ই-ধার।"

গম্ভীর কণ্ঠে সিপাহীটা কহিল—"ই-ধার কাঁহা?—ঠিকানা কেয়া?"

একটা বাজে ঠিকানা বলিলেই সব চুকিয়া যায়, কিন্তু মিথ্যা বলিতে কি জানি কেন সুখময়ের প্রবৃত্তি হইল না। সিপাহীটার চোখে দীপ্ত চক্ষু রাখিয়া সে কহিল—"ঠিকানা কিছু নাই আমার,—মাথা গুঁজবার জায়গাই খুঁজছি।"

সুখময়ের এ উদ্ধত ভাব শক্তিমত্ত সিপাহীটার কানে বেশ মধুর ঠেকিল না। সে চড়াৎ করিয়া সুখময়ের গালে এক চড় বসাইয়া দিয়া ব্যঙ্গভরে কহিল—"ঠি-কা-না নেহি হ্যায় হামারা! শালা চোট্টা—আও।"

সুখময়ের মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া গেল,—সে ঐ চড়টার উত্তর দিতে হাত উঠাইতে গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে ইচ্ছা সম্বরণ করিল। ক্ষণ পরে সে হাসিয়া কহিল—"চল, রাতের মত গড়াবার জায়গা মিলবে ত?" জায়গা মিলিল পুলিশ হাজতে।

লম্বা ঘর, দশ পনের জন আসামী তখন আসিয়া গিয়াছে।—কেহ শুইয়া দিব্য আরামে নাক ডাকাইতেছে, একজন কোণে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে, ও-দিকের কোণে একজন বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে।—সে হয় পাগল নয় মাতাল। যে লোকটী বিড়ি টানিতেছিল সে সুখময়কে দেখিয়া কহিল,—"ওয়েল কম্ মাই ফ্রেণ্ড;—পিক্ পকেট না কি?"

বিড়ির ধুঁয়ায়, মদের গন্ধে, অপরিচ্ছন্ন জনের গায়ের গন্ধে সুখময়ের খালি পেট মোচড় দিয়া উঠিতেছিল। তার উপর এই ঘৃণ্য সংশ্রব আর এই হীন কদর্য্য প্রশ্নে আত্মা যেন তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। সে গম্ভীর ভাবে কহিল—'না'।

—"না! তবে কি গুণ্ডাইজম্ না কি?"

সুখময়ের কথা কহিতেও ঘৃণা বোধ হইতেছিল। সে পূর্ণ জবাব দিয়া প্রশ্নোত্তরের হাত হইতে এড়াইতে চাহিল, সে কহিল—"রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো আমার অপরাধ। আশ্রয় ছিল না।"

লোকটা বারকতক ঘন ঘন সজোরে বিড়িতে টান মারিল, কিন্তু বিড়িটা একেবারেই নিভিয়া গিয়াছিল,—আগুন আর জ্বাকিয়া উঠিল না। সে হাত পাতিয়া সুখময়কে কহিল—"ম্যাচিস্‌টা দেখি।"

—"নাই—।"

বিড়িটা সজোরে মেঝের উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সে কহিল—"সেপাই বেটা যখন পেছু নিলে দেখলে—তখন একটা খোলার ঘর দেখে ঢুকে পড়লেই হ'ত। কোন রাস্তায় ত মেয়েমানুষের খোলার ঘরের অভাব নাই।"

সুখময়ের অবরুদ্ধ ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না।—সে বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল—"মশাই, আমি ভদ্রলোক—!"

লোকটা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল,—সুখময় যেন মস্ত একটা রসিকতার কথা বলিয়াছে।

যে লোকটা বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল, ওদিক হইতে সে সহসা সজাগ হইয়া জড়িত কণ্ঠে কহিল,—

"কে বাবা জন্মেজ্জয় ধম্মপুত্তুর নাতির বেটা,—মেয়ে-মানুষের নামে ঘেণ্ণা কর;—ভার-তো—ও—শ্মশান ও—মাঝে এ আমি রে—অবলা-বালা—! সেই অবলা-বালাকে অবহেলা—ক্যা হে—তুমি—?"

সুখময় বিনা বাক্যব্যয়ে সেইখানে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িল,—তাহার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছিল।

ঠিক পাশেই একটা লোক তাহারই মতই আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া আছে, তাহার ছেঁড়া ময়লা চিট্ কাপড়খানার কি দুর্গন্ধ!

সুখময়ের বমি আসিতেছিল,—মুখ ফিরাইয়া শুইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সে লোকটী কহিল—"চেপে যান বাবু, ওদের সঙ্গে কথা কইলেই অপমান, আর ঝগড়া ক'রেও পেরে উঠবেন না। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ুন।"

অতি মৃদুস্বর, তাহাতে একটী সরল মমতার রেশ বাজে, যে মমতা মানুষের কাছে মানুষের প্রাপ্য,—আর আছে একটী সহজ সরল অনাড়ম্বর শীলতা।

সুখময় বিস্মিত হইয়া গেল,—এই এমন ঘৃণ্য কদর্য্যতার মধ্যে অকৃত্রিম শীলতার বাস দেখিয়া; তাহার মুখ ফিরাইয়া শুইতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল,—কিন্তু লোকটী নিজেই কহিল—"আপনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়ুন,—আমার কাপড়ে বড় দুর্গন্ধ,—আমার নিজেরই বড় কষ্ট হচ্ছে,—আপনার ত হবারই কথা। এখনও রাত অনেক বাকী, ওদিক ফিরে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

সুখময় কহিল—"আপনাকে কেন ধরেছে?"

লোকটী যেন হাসিয়া কহিল—"আমি আপনি নই বাবু, আমি ছোট জাত—মুচী;—জুতো সেলাইএর পয়সা নিয়ে এক বাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল,—রাগের মাথায়—পয়সার জন্যে তার ছাতা আটকেছিলাম; তাই বাবু পুলিশে দিলেন।"

সুখময় মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার বড় ইচ্ছা হইল এই লোকটীর সঙ্গে একটী মর্ম্মের আত্মীয়তা স্থাপন করিতে,—ইহার সহিতও যেন আত্মার মিলন তাহার সম্ভব। কিন্তু লোকটীর ওই দুর্গন্ধময় বহিরাবরণ, ওর ওই জাতির পরিচয় তাহাতে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।—সুখময় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, কিন্তু ঘুম আসিল না।—আসিল মস্তিষ্কের মধ্যে রাশি রাশি চিন্তা—একটার পর একটা—একটার পর একটা। আপনার দুর্ব্বলতায় সে আপনিই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

স্বার্থপর মানুষের সৃষ্টিকরা ভেদনীতির ঈর্ষাভরা দুইটা অক্ষর তাহার সকল শক্তি মূক করিয়া দিল—!

ওই একখানা বহিরাবরণ,—আর ওই তার চর্ম্মের মালিন্য যাহা ধুইলে উঠিয়া যায় তাহারই জন্য মনুষ্যত্বকেও সে অবহেলা করিতে পারে! মেকী,—মেকী—সে নিজেও মেকী;—কিম্বা হয় ত মনুষ্যত্ব, মহত্ব, ধর্ম্ম—এই গুলাই ফাঁকি—মানুষের রচা কথা,—এতদিনে মানুষ তার মোহ এড়াইয়া আপন পথ ধরিয়াছে।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে,—মাতালটার বিড় বিড় আর শোনা যায় না। এপাশের বিড়ি-খোরটারও আর সাড়া পাওয়া যায় না। বাহিরে দিবসের কর্ম্মমুখর জনারণ্য রাজপথ হইতেও কোন সাড়া ভাসিয়া আসে না। শুধু শোনা যায়—হাজতের বাহিরের লম্বা বারান্দায়…জাগ্রত প্রহরীর নাল-মারা বুটের অবিশ্রাম শব্দ—খট্—খট্—খট্—খট্!

সহসা সুখময় উত্তেজিত ভাবে সেই লোকটীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"জান—!"

মুচীটীও ঘুমায় নাই, সে কহিল,—"আমাকে বলছেন?"

—"হ্যাঁ,—জান—এরাই হচ্ছে সংসারে উপযুক্ত মানুষ।"

লোকটী কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না, সে চুপ করিয়া থাকে।

সুখময় আপন মনেই বলিয়া যায়—"এই এরা এই মাতাল,—এই বিড়িখোর,—ওরা মিথ্যে-মিথ্যে কখনও কষ্ট পায় না,—ওরা বঞ্চনা করতে জানে—কৌশল জানে,—দুনিয়ার ফাঁকি ওরা ধরে ফেলেছে। উপযুক্ত মানুষের নিম্নতম শ্রেণী—এরা উপযুক্ততম হচ্ছে—দুনিয়াকে যে যত Exploit করতে পারে।" বোধ করি উত্তরের জন্য-ই সে ক্ষণেক নীরব হইল,—কিন্তু কোন উত্তরই পাইল না। আবার সে আপন মনেই বলিয়া গেল—

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনা দোষে লাঞ্ছনা ভোগ করে জানোয়ারের মধ্যে ভেড়া,—গরু আর গাধা;—চাতুরী জানে না,—ছল জানে না, দেহের বল-প্রয়োগ করতে পারে না,। এরাই নিরীহ ভাল মানুষ, অক্ষম অপদার্থ জীব। এরই জন্যে গরু গাধা পশুরাজ হয় না, এরা হয় পশু-রাজের ভক্ষ্য। এ বিধাতার ইঙ্গিত।"

মুচিটা বোধ হয় এত কথা বুঝিতে পারে না, সে নীরব হইয়া রহিল, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

* * * *

যাই হোক, রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গেল; ঐ অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই সুখময়ের কারা-নির্য্যাতনের দুর্ভোগও শেষ হইল। সেটা ভাগ্যগুণে না ভাগ্যবৈগুণ্যে, সুখময় বুঝিল না। থানার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবারের মত সাবধান করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

মুক্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া একবার সে চারিদিক চাহিয়া দেখিল—অগণিত জনস্রোত বিভিন্ন দিকে চলিয়াছে। কেহ ত্রস্ত, কাহারও মুখে কুটিল হাসি, কেহ ঠকিয়াছে, কেহ ঠকাইয়াছে!

পিছন হইতে একটা ধাক্কায় সুখময় মুখ ফিরাইতেই একজন বিরক্তিভরে তাহাকে ধমক দিয়া কহিল "রাস্তায় দাঁড়িয়ে পথ বন্ধ কর কেন? হুঁঃ যত সব ভ্যাগাবণ্ড্স্,—জেল দেয় না এদের!" লোকটা পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

সুখময়ের রাগ হইল না; তাহার মনে হইল ঠিক বলিয়াছে লোকটা—কর্ম্মমুখর সংসারে চিন্তা করিবার অবসর নাই।

সুখময়ও চলিল।

সম্মুখেই দুটী বাবু চলিয়াছে; তাহাদের কথা আপনি কাণে আসিয়া পশে, "কাল যা দাঁও মেরেছি, বুঝেছ,—দশ টাকা দরে কেনা ছিল, চব্বিশ টাকা দরে ঝেড়েছি, পাঁচ হাজার টন্ ।"

—"বল কি হে? হাণ্ড্রেড এণ্ড ফর্টি পারসেণ্ট প্রফিট্! এ যে আলাদ্দিনস্ ল্যাম্প হে ! খাইয়ে দাও।"

—"অল্-রাইট্, একটা পার্টি দেব ভাবছি,—বেশী লোক না—পাঁচ সাতজন বন্ধুজন, বুঝেছ,—কালই। বীণার বাড়ীতে কাল ঠিক সন্ধ্যেয় say সাড়ে সাতটা—গান—পান তথা ভোজনের নেমন্তন্ন রইল;—কি বল—?"

বন্ধুর হাতে ঝাঁকি দিয়া বন্ধু কহে—"থ্যাঙ্কস্। কিন্তু এখন এই সকালে যাচ্ছ কোথায় বল ত?"

—"স্যাকরা বাড়ী,—বীণার জন্যে বউর সঙ্গে বড্ড ঝগড়া চলছে,—কাল সমস্ত রাত্তির ঘুমুতে পারি নি—। শেষ তাই একটা নতুন হারে Compromise হয়েছে। তাই চলেছি—কণ্ঠহার দিয়ে বউর কণ্ঠ রোধ করতে হবে।"

বন্ধু হাসিয়া কহে—"দেখো ভাই—অলঙ্কার আবার না কণ্ঠের ঝঙ্কার বাড়িয়ে দেয়,—কণ্ঠ-হারে না কণ্ঠের মহিমা বেড়ে যায়!"

—"পাগল,—ও ভূষণ পেলেই ভাষণ মধুর হতে বাধ্য। এ পরীক্ষিত সত্য,—নর-নারীর কলহ-পীড়ায় মহৌষধ,—দাম্পত্য-অশান্তির দৈবলব্ধ শান্তি-কবচ। দোষের মধ্যে বিনা মূল্যে পাওয়া যায় না।"

বন্ধু হা-হা করিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসে।

এ বন্ধুটি বলিয়াই যায়—"পয়সাকে তুমি এখনও সম্পূর্ণ চেন নি, নইলে এমন প্রশ্ন নিশ্চয় করতে না!—বন্ধু, পয়সায় দুনিয়া বিক্রী হয়ে গেল,—মানুষ ত ছার!"

শ্রোতা বন্ধু কহে—"*yes that's true.* (ইয়েস ভ্যাট্স্ ট্রু)।"

দুই বন্ধু মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া গেল বিদায় লইতে, সুখময় সম্মুখপানেই তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিল—তাহারও মুখ দিয়া আপনি মৃদুস্বরে বাহির হইল—"yes that's true, (ইয়েস ভ্যাট্স্ ট্রু)।"

* * * *

(৩)

চৌরঙ্গী, লালবাজার, রাধাবাজার, বড়বাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোডের তিনতলা চারতলা বাড়ীগুলার সিঁড়ি ভাঙিয়া শেষ ক্লান্ত হইয়া চারতলা একখানা বাড়ীর লিফ্ট্ম্যানকে দুইটা পয়সা ঘুষ দিয়া সে যখন নামিয়া রাস্তায় আসিল, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা; শীতের দিন—সূর্য্য অস্ত যায় যায়। রাস্তায় বিদ্যুতের আলো জ্বলিয়াছে—গ্যাস জ্বলিতে সুরু করিয়াছে।

সুখময় আপন মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া একটা গানের

কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে কর্জ্জন পার্কে আসিয়া বসিল ;— গান সে কখনও এমন করিয়া গাহে না।

চারিদিকের রাস্তা দিয়া অসংখ্য যান-বাহনের চলাচল, বড় বড় জুড়ি, দীর্ঘদেহ নিঃশব্দ মটরগুলা স্রোতের মুখে নৌকার মত দ্রুতবেগে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে। রাজপথের আলোকে আরোহীদের জলজলে বেশভূষা ঝলমল করিয়া উঠিতেছে,—ধন আর ধনীর সমারোহ!

শ্রান্ত পথচারীর দল রাস্তার এ-পার হইতে ও-পার হইতেছে ত্রস্তপদে শঙ্কাভরে।—

গেল গেল—ওই লোকটা বুঝি গেল—!

যাক,—লোকটা রক্ষা পাইয়াছে!

ল্যাণ্ডোখানার কোচম্যান লোকটার পিঠে একটা চাবুক কষিয়া দিল—'উল্লু—কাঁহাকা!"

ঠিক হইয়াছে,—মূর্খ কোথাকার—পথ—সুমসৃণ রাজপথ পদচারীর জন্য নয়,—ও পথ—রথের জন্য—রথীর জন্য।

সুখময়ের দৃষ্টিটা টাটাইয়া উঠিল,—সে পথ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখে চাহিল,—সারা বাগানটা ব্যাপিয়া কেয়ারীতে কেয়ারীতে মরসুমী ফুলের সমারোহ। ফুলগুলাকে দোলা দিয়া বিচিত্র-বর্ণ পাখা মেলিয়া প্রজাপতির দল উড়িয়া বেড়াইতেছে। সহসা সুখময় হাতের এক ঝাপ্‌টায় একটা প্রজাপতি ধরিয়া নির্ম্মম পেষণে দুই হাতে দলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

চলিল সে মাঠে মাঠে, পথ এড়াইয়া।—ওই আলোকের মালা, রথ-রথী সমারোহাকুল ওই রাজপথ। অসহ—ও'র মাটীতে রথচক্র ঘর্ষণে যে মৃদু উত্তাপ—সে সুখময়ের অসহ!

কালীঘাটের মন্দিরে তখন শঙ্খ ঘণ্টা বাজে;—সুখময় মন্দিরে আসিয়া উঠিল।

ফুলে, মালায়, দীপালোকে, ধূপগন্ধে চারিদিকে একটী স্নিগ্ধ আবেষ্টনী,—সম্মিলিত নর-নারীর স্তব-গুঞ্জনে ভক্তির একটা মোহ চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে।

শান্ত স্নিগ্ধ বর্ণে গন্ধে গানে সুখময় অভিভূত হইয়া পড়িল। সে ব্যাকুল ভাবে দেবতার পানে চাহিয়া প্রণাম করিল—মা—মা! স্তব-গুঞ্জনের তালে তালে সে করতালি দিতে সুরু করিল।

'এই, এই,—এই মাগী,—হটো—হটো—হটো!'

সুখময় সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তের সিঁড়ির মুখে এক পাণ্ডা দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে—'এই মাগী হট্ যাও—হট্ যাও।' মাথারও উচ্চে হাতের উপর তাহার নানা উপচারে সাজান প্রকাণ্ড রূপার পরাত একখানা! পশ্চাতে তাহার একটী সুবেশ বাবু—সঙ্গে প্রজাপতির মত বিচিত্র-বসনা সুন্দরী নারী একটী। সর্ব্বদেহে তাহার স্বর্ণ মণি মুক্তা ঝলমল করিতেছে। প্রতি অঙ্গটী তাহার চটুল চঞ্চল,—ঠোঁটের হাসিটী সরস উচ্ছল।

তাহাদের পুরোভাগে পথ-রোধ করিয়া উঠিতেছে এক শীর্ণা বৃদ্ধা নারী, গায়ে একখানা ছিন্ন নামাবলী। পাণ্ডা তাহাকেই ধমক দিয়া পথ দিতে কহিতেছে। কিন্তু সংকীর্ণ সিঁড়িতে সরিয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই,—বৃদ্ধা প্রাণপণ গতিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

উপরে উঠিতেই পাণ্ডা একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিল—"মাগী যেন রাণী রাসমণি, গুণে গুণে পা ফেলছেন,—ভাগো! আসুন আসুন বাবু, জুতো ওই সিঁড়ির ওপরে খুলুন;—ওরে রামা, বাবুর জুতো জোড়াটা দেখিস তো—। আসুন মা লক্ষ্মী, এই যে এই দিকে, এই —এই পথ দাও হে—পথ দাও, মানুষ চেন না!"

পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমার অঙ্গে বিন্দুমাত্র স্পন্দন নাই। পটুয়ার তুলিতে আঁকা বড় বড় চোখ তেমনি স্থির। অগ্নি-শিখা দূরে থাক,—একবার করুণায় একটা নিমিখও পড়িল না। সুখময়ের চোখটা জ্বলিয়া উঠিল;—সে সেইখানে সজোরে থুৎকার নিক্ষেপ করিয়া মন্দির-চত্বর হইতে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ফাঁকি—সব ফাঁকি,—কিম্বা ধনের লোভে দেবতাই ধনীর পূজা করে;—ওর যে ওই বিস্তৃত রসনা—ও রসনা ভোগ-লালসায় লক্ লক্ করে,—আজও সে লালসা মেটে নাই,—কখনও সে লালসা মিটিবে না—ও লালসার পরিতৃপ্তি নাই।

আসিতে আসিতে একটা খোলা পতিত জায়গায় একটা জনতা জমিয়াছে। সুখময় বুঝিল এখানেও কোন জাল-জুয়াচুরি চলিয়াছে।

সেও মাথা গলাইয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রকাণ্ড একটা কয়লার ধুনি,—চারি পাশে তার নানা আকারের সন্ন্যাসী—দশ হইতে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসরের যোগীর দল,—গায়ে ভস্ম, মাথায় জটা, কারও গলায়

লোহার শিকল, কারও গলায় স্ফটিকের মালা, কারও গলায় বা রুদ্রাক্ষ, কেহ বা হাড়ের গোল গোল চাক্তি গাঁথিয়া পরিয়াছে।

ভক্তের দলও জুটিয়াছে। একজন যোগী হাত দেখিতেছেন, একজন ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কয়জন ভক্ত ভবিষ্যৎ জানিবার প্রত্যাশায় ধূনির আলোকে আপন আপন হাত মেলিয়া রেখাগুলি দেখিয়া রাখিতেছে।

সুখময় সম্মুখে আসিয়া পড়িতেই বছর দশ বয়সের এক যোগী গম্ভীরভাবেকহিল —"কেয়া রে বেটা, হাঁত দেখলায়েগা তুম্?—আরে হাঁত মে কেয়া জরুরৎ—তেরা ললাটকে রেখা সে—হামরা সব মালুম হো গিয়া,—ললাটমে তেরা তিরশূল রেখা হ্যায়,—ভাগ্‌বান পুরুষ হো তুঁ;—লেকিন আব তেরা হালৎ বহুৎ খারাব যাতা হ্যায়। আচ্ছা একঠো পঞ্চমুখ্ রুদ্রাঁখ্ তো তু ধারণ করো—" যোগী সঙ্গে সঙ্গে ঝুলিটা ঝাড়িয়া একটা রুদ্রাক্ষ সুখময়ের দিকে বাড়াইয়া ধরিল।

সুখময়ের হাসি আসিল। কিন্তু মনে মনে ওই শিশুটীর বিষয়বুদ্ধির তারিফ্ না করিয়া পারিল না, একটা পয়সা সে পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া ভিড় হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

পিছন হইতে বাচ্চা-সাধুর কণ্ঠস্বর সে শুনিল—"আরে একঠো পয়সে,—আরে বেটা সাধু ভোজন তো করাও।"

পথ চলিতে চলিতে সুখময়ের মনে হইল তাহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। ও-বেলা মাত্র ছয়টা পয়সার খাবার সে খাইয়াছে। পকেটে হাত দিয়া সে দেখিল এখনও আছে-একটা টাকা, একটা সিকি, একটা আনি,—আর দুটো পয়সা। মুহূর্ত্তের মোহে ওই বাচ্চাটার ভণ্ডামীর পুরস্কার স্বরূপ একটা পয়সা দেওয়ার জন্য সুখময়েরও অনুশোচনা হইল।

একটা খাবারের দোকানে সে ঢুকিয়া পড়িল।

দোকানের চাকরটা কহিল— "ঢাকাই পরোটা দেব বাবু, —ফাউলকারি এই গরম নামল,—চপ—"

সুখময় কহিল—'না।'

—"তবে?"

—"সব চেয়ে কম দামে যাতে পেট্ ভরে তাই দাও।"

তবু বিল হইয়া গেল—চৌদ্দ পয়সা।

সুখময় কহিল—"সাড়ে তিন আনা?"

—"শেষে একটা ডিম নিলেন যে বাবু, একটা চপ—।"

সুখময় সিকিটা ফেলিয়া দিল,—আনিটা পকেটে পুরিয়া সে চলিতে চলিতে অনুশোচনাটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিল,—বেশ করিয়াছে, মানুষ ত সে, লোভ ক্ষুধা ত তাহার জীবধর্ম্ম—জন্মলব্ধ বৃত্তি,—সে বৃত্তির পরিতৃপ্তি তাহার আপনার নিকট জীবনের দাবী।

এমনি একটা অসুস্থ আনন্দে, অস্বাভাবিক প্রফুল্লতায় রাস্তা ধরিয়া সে চলিল,—ঈষৎ কুব্জভঙ্গী, মাটীর উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি, দীর্ঘ দৃঢ় পাদক্ষেপ, হাত দুইটা পিছনের দিকে মুঠীতে মুঠীতে বাঁধা।

পথ জনবিরল হইতে সুরু করিয়াছে, সারাদিনের শ্রম-কাতর দেহে একটা অবসাদ আসিতেছে; শীতের হিম-তীক্ষ্ণ বায়ু বুকের মধ্যে একটা কম্পন বহাইয়া দেয়, সে কম্পনে মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া উঠে, ঠোঁট দুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপে।

একটা আরামের বিশ্রামের স্থান যদি এখন মিলিত!—একটী পরিচ্ছন্ন শয্যার উষ্ণতার মধ্যে—আঃ!

সুখময় সহসা দাঁড়াইল। সম্মুখেই একটা শীর্ণ অন্ধকার গলির মোড়ে একটা জলের কলের পাশেই কয়টা নারী শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তখনও দাঁড়াইয়া আছে।

সুখময় মুহূর্ত্ত দ্বিধা না করিয়া গলির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাজপথের আলোকের আভায় নারী কয়টীর শীর্ণ মুখ অস্পষ্ট দেখা যায়। সুখময় কিন্তু কাহারও মুখের পানে তাকাইল না। সম্মুখেই যে ছিল তাহাকেই সে কহিল—"রাতটা থাকতে দেবে?"

মেয়েটী কহিল—"আসুন।"

সে গলির মধ্যে অগ্রসর হইল, অন্ধকার হিমজর্জ্জর গলিপথ সুখময়ের হিমকাতরতা বাড়াইয়া দিল; চলিতে চলিতে মেয়েটী কহিল—"এক টাকা লাগবে কিন্তু।"

সুখময় থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল, এক-টা কা!

আর ত মোট এক টাকা দুই আনা সম্বল তাহার।

মেয়েটীও দাঁড়াইয়া কহিল—"কি বলছেন আপনি?"

সুখময় ভাবিতেছিল "তাই বা এমন কি বেশী? একটা আচ্ছাদনের তলে শয্যার উষ্ণতার মধ্যে পরম নিশ্চিন্ত মৃত্যুর

মত স্থিরতা—তার মূল্য হিসাবে একটা টাকা এমন কি বেশী! আটটা পয়সা ত থাকিবে!

তবু সে বলিয়া ফেলিল—"কমে হয় না?"

কথাটা বলিল সে বেনেতী বুদ্ধির দর-কষাকষির চাতুরী বশে নয়, বলিল সে দারিদ্র্যের উঞ্ছপ্রবৃত্তিতে।

মেয়েটী কহিল, "কি দেবেন আপনি?"

এতক্ষণে সুখময় আপনার চাতুরীতে খুসী হইয়া উঠিল,—সে কহিল—"আট আনা।"

—"না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুখময় কহিল,—"আচ্ছা—বারো আনা,—আমার কাছে মোট একটা টাকা পুঁজি আছে।"

মেয়েটী কি ভাবিয়া কহিল—"আচ্ছা আসুন।"

শীর্ণ, অপরিসর, অন্ধকার, আঁকা বাঁকা গলি-পথ,—একধারে একটা ড্রেণ, অপর দিকে খোলার ঘরের চালের প্রান্ত;—মেয়েটী কহিল—"একটু সাবধানে আসবেন, দেখবেন মাথাটা নীচু করবেন।"

সচকিত ভাবে সুখময় কহিল—"কেন?"

মেয়েটী কহিল—"মাথায় লাগবে।"

—"ও:, চলুন।"

মেয়েটী বারাণ্ডায় উঠিয়া একটা ঘরের কুলুপ খুলিতে খুলিতে কহিল—"এই আমার ঘর।"

সুখময় ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই টাকাটী মেয়েটীর হাতে দিয়া কহিল—"নেন।"

মেয়েটী টাকাটী লইয়া একটা জাপানী কাঠের বাক্সে রাখিয়া সুখময়কে একটী সিকি দিয়া কহিল—"দেখে নেন।" সে দেওয়ালগিরির শিখাটী বাড়াইয়া দিল।

সুখময় না দেখিয়াই সিকিটা পকেটে পুরিল। উজ্জ্বল আলোক সে দেখিল ঘরখানি ছোট মেটে-ঘর। চারি পাশেই দারিদ্র্যের একটা জর্জ্জরতা নিষ্ঠুরভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া আছে।

একধারের দেওয়ালে কয়খানা পট,—কয়খানা ছবি। এদিকে একখানা তক্তাপোষের উপর একটা বিছানা, আধময়লা চাদরখানা, পাশাপাশি দুইটা মলিন বালিশ। স্থান, কাল, পাত্র, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ পূর্ণ নগ্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল।

এমন ত সুখময় ভাবে নাই।

মেয়েটী অনুরোধ করিয়া কহিল,—"বিছানায় উঠে বসুন,—"

সুখময় কহিল—"আপনি একটু বসুন—আমি একটু ঘুরে আসচি।"

সে পা বাড়াইল,—কিন্তু পিছন হইতে একটা আকর্ষণে ফিরিয়া দেখিল—মেয়েটী তাহার কাপড় টানিয়া আছে। সুখময় ফিরিতেই সে কহিল,—"আপনি যা দিয়েছেন তা' নিয়ে যান।"

সুখময় নীরব হইয়া রহিল। মেয়েটী আবার কহিল—"আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আর আসবেন না।"

সুখময় হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সে এক টানে কাপড়টাকে মুক্ত করিয়া লইয়া দ্রুতপদে গলির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল—মুক্তি যেন তাহার সুকঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

পিছনে তাহার শব্দ উঠিল—"ঝন্ ঝন্"—সুখময় বুঝিল—মেয়েটী পয়সা কয়টা তাহারই উদ্দেশে ছুঁড়িয়া ছড়াইয়া দিল,—একটা কথাও কানে গেল—"আমি ভিখিরী নই।"

কথাটা তীরের মত তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিল,—শরাহত ভীত পক্ষীর মতই সে কাঁপিতে কাঁপিতে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

সে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িল।

গঙ্গার সিক্ত বায়ু বুকের পাঁজরার মধ্যে ব্যথার মত চাপিয়া বসে—সারা পাঁজরাটা যেন কন্ কন্ করিয়া উঠে।

নীচে গঙ্গার মৃদু জল-চল-ধ্বনি ক্রমশঃ যেন অস্পষ্ট ক্ষীণ হইয়া আসে।

* * *

(৪)

পরেশ আবার দ্রব্য-সম্ভার পাঠাইল,—সুখময়ের পত্র সে পাইয়াছে।

সেদিন সুখময়ের জীর্ণ ঘরখানির মধ্যে কিন্তু একটা পরিপূর্ণতার আনন্দ-কলরোল উঠিতেছিল।

ছেলেদের জুতো জামা, সারদার কাপড়, গরম জামা, একখানি সৌখীন শাল, আরও কত কি!

সারদা জিনিষপত্র ঘরে তুলিতেছিল। ছেলে দুটী নতুন জামা গায়ে দিয়া পরম আনন্দে মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বড় ছেলেটী বেশ কথা কহিতে শিখিয়াছে, সংসারের অনেক সে বুঝিতে শিখিয়াছে—সে কহিল—"আজ আর শীত লাগছে না মা!"

সারদা একটী সস্নেহ হাসি হাসিল। ছেলে উৎসাহভরে আবার কহিল—বেশ চুপি চুপি—"বাবা চ'লে গিয়েছে, বেশ হয়েছে, নয় মা;—বাবা থাকলে আবার সব ফিরিয়ে দিত!"

সারদার হাতের জিনিষটা পড়িয়া গেল,—সে নির্ব্বাক হইয়া ছেলের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

তাহার মনে পড়িয়া গেল সুখময়কে,—সেও ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে মানুষ হইয়াছে, কিন্তু সে বোধ হয় এমন কথা কখনও বলে নাই।

গৌর হাসিয়া কহিল—"তোমার অবসর হ'ল দিদিমণি!"

সারদা অন্যমনস্কে কহিল—"এ্যাঁ?"

গৌর আবার কহিল—"বলি—অবসর হ'ল তোমার?"

সচেতন হইয়া সারদা কহিল—"কেন, কিছু বলছিলে?"

—"হ্যাঁ, একটা জবর খবর আছে, চিঠিখানা পড়ে দেখ। আমার কিন্তু বকশিস্ চাই মোটা।"

সারদার হাতে চিঠিখানা দিয়া সে হাসিতে লাগিল। সারদা চিঠিখানা পড়িয়া গেল;—পরেশ লিখিয়াছে—

কল্যাণীয়াসু,—

সারু ভাই, সুখময়ের একখানি পত্র পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলাম,—তা' লিখে কি আর জানাব।—সে আমায় লিখেছে—'এতদিন পরে আমার ভুল ভেঙেছে'—আর ক্ষমা প্রার্থনা করেছে;—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এ যেন সত্যি হয়,—সে যেন লক্ষ্মীকে চিনে লক্ষ্মীমন্ত হয়। অর্থের আদর না করলে অর্থ আসে না,—থাকে না;—তার সম্মান করতে হয়;—এ সংসারে মিথ্যে ভাবাতিশয্যে অনেক লোক আপনার সর্ব্বনাশ করে থাকে। সুখময়কে সে সব ভ্রম থেকে মুক্ত জেনে পরম আনন্দ হ'ল।

আজ একটা সংবাদ তোমায় আমি জানাব,—এ সংবাদটা অবশ্য আমার অনেকদিন পূর্ব্বেই জানান উচিত ছিল;—বাবা তাঁর উইলে তোমাকে পঁচিশ হাজার টাকা আর আমাদের বৈঠকখানার পাশের সেই একতলা বাড়ীখানি দিয়ে গেছেন। তোমার পঁচিশ হাজার টাকা সুদে আসলে আজ বোধ হয় হাজার ত্রিশেক হবে,—টাকা ব্যাঙ্কে মজুত আছে।

এ সংবাদটা আমিই এতদিন চেপে রেখেছিলাম তোমারই মঙ্গলের জন্যে—সুখময়ের ভয়েই জানাই নি। এ টাকাটা হাতে পেলে হয় ত যাতে-তাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যর্থ চেষ্টায় সে খরচ ক'রে ফেলত।

যাক্ আজ তার সুমতি দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

এখন আমার এক পরামর্শ শোন,—তুমি ছেলেদের নিয়ে এখানে এ বাড়ীতে এসে বাস কর। পাকা বাড়ী, তা ছাড়া কাছে স্কুল আছে। আর আমার এখানে তোমার বিষয়-সম্পত্তি করার সুবিধে হবে, আমি সব দেখে শুনে দিতে পারব। আর সুখময় যখন চাকরীই করছে, তখন আমার এখানেই করলেই ত পারে,—আমারও সম্প্রতি একজন লোক দরকার—আশী নব্বুই টাকা মাইনে। ঘুরে ঘুরে সব ব্যবসা দেখে বেড়াতে হবে; কিন্তু কেন্দ্র হবে এখানেই। তুমি তাকে এ কথাটা লিখো। আমাকে তার ঠিকানা জানিয়ো—আমিও তাকে লিখব।

আশা করি যা প্রস্তাব করলাম তাতে অমত হবে না। তোমার অমত যে নাই সে আমি জানি। আমি এখানকার বাড়ীঘর মেরামত করাচ্ছি। আগামী ২৫শে দিন স্থির করলাম। ঐ তারিখে তুমি ছেলেদের নিয়ে এখানে চলে এসো। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

ইতি

আঃ তোমার দাদামণি পরেশ।"

চিঠিখানা পড়িয়া রহিল, বোধ করি ভাগ্যের এতবড় আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সে মূক হইয়া গিয়াছিল।

গৌর কহিল "তাই চল দিদিমণি, আমি তোমাকে নিয়ে তবে যাব।"

সারদা নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতেছিল: সে কোন উত্তর দিল না।

গৌর কহিল "কি ভাবছ বল ত দিদিমণি?"

এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সারদা কহিল—"ভাবছি।"

গৌর হাসিয়া কহিল "জামাইবাবুর ভাবনা ভাবছ ত? কিছু ভেবো না তুমি; বাবুর উইলের খবর শুনলে তাঁর সব রাগ জল হয়ে যাবে। জান দিদি, লটারীতে কে একজন টাকা পেয়ে আনন্দে মরেই গেল।"

গৌর হাসিতে লাগিল।

সারদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কোন্ উদাস ভাবনায় আবার ডুবিয়া গেল।

গৌর বড়-খোকাকে কোলে করিয়া কহিল "বুঝলে মামাবাবু, কেমন বাড়ী দেখবে, শোবার ঘরে মার্ব্বেল দেওয়া হচ্ছে, বাবু বল্লেন সারদা ঠাণ্ডা মাটীতে শুতে ভালবাসে; একটা গাড়ী করে দোব তোমার।"

ছেলেটী কহে—"কোথা?"

গৌর কহে—"নতুন বাড়ীতে, তোমার মামার বাড়ীতে।"

ছেলেটী কহে—"আমাদের ঘর?"

গৌর কহে—"সেও যে তোমার ঘর মামাবাবু।"

ছেলেটী প্রতিবাদ করিয়া কহে—"না, এই ত আমাদের ঘর। হ্যাঁ মা—সেও আমাদের ঘর?"

সারদা তেমনি অন্যমনস্কভাবেই কহিল "হুঁ।"

গৌর মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; সে সারদাকে কহিল "আমার কিন্তু শিরোপা চাই দিদিমণি।"

সারদা নতুন শালখানি গৌরের হাতে তুলিয়া দিল।

গৌর কহিল—"না—না—দিদিমণি—"

সারদা হাসিয়া কহিল—"আমি দিচ্ছি গৌর।"

*

* *

(৫)

দিন পনের পরের কথা।

অর্দ্ধ উন্মত্ততার মধ্যে সুখময় কুলীগিরি সুরু করিয়াছিল, এখনও তাই করে। বস্তির মধ্যে একটা খোলার ঘর—আরও কয়জনের সঙ্গে ভাগে ভাড়া লইয়াছে।

বৃত্তিটা মন্দ নয়,—দিন বারো আনা, এক টাকা, কোন দিন বা দেড় টাকা দুই টাকাও উপার্জ্জন হয়।

সন্ধ্যার পর আসিয়া দুইটা ফুটাইয়া লইয়া শ্রান্ত দেহে অগাধ নিদ্রা। আবার প্রভাতে উঠিয়া ঝুড়িটা হাতে বাজারের ধারে গিয়া বসিয়া থাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় ফিরিতেছে। মোড়ের মাথায় একটা হাঁ হাঁ শব্দে দেখে ঠেঙো বগলে পা কাটা ভিক্ষুক একটা মটরের ধাক্কায় আছাড় খাইয়া পড়িল।

সুখময় কাছে গিয়া লোকটাকে ধরিয়া তুলিয়া দেখিল, আঘাত তেমন পায় নাই; ভয়ের বিহ্বলতায় সে কাঁপিতেছে।

সুখময় ধরিয়া তাহাকে ফুটপাথের উপর আনিয়া কহিল "আস্তানা টাস্তানা আছে তোমার?"

লোকটা তখন হাত মুঠি করিয়া পলাতক মটরখানাকে শাসাইয়া কদর্য্য অশ্লীল গালি দিতেছে।—

সুখময় আবার কহিল—"আস্তানা-টাস্তানা আছে তোমার?"

মুহূর্ত্তে লোকটা কাঁদিয়া কহিল—"নেহি বাবা,—শীতমে মর যাতা হ্যায়, ভুঁখামে মর যাতা বাবা—।"

সঙ্গে সঙ্গে সুখময়কে অজস্র প্রণাম করিয়া ফেলিল।

সুখময় কহিল—"এস আমার সঙ্গে।"

বাসায় লোকটাকে সেঁকিয়া ফুড়িয়া খাওয়াইয়া পাশে শোয়াইল। শ্রান্ত দেহে—নিদ্রা যেন চোখের পাতায় অপেক্ষা করিয়া থাকে,—দুটী পাতা এক করিবার অপেক্ষা, সুখময় ঘুমাইয়া পড়িল।—

সহসা শীতল স্পর্শে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।—

অন্ধকার ঘর, এ-পাশে সঙ্গীরা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে,—সুখময় অনুভব করিল—একখানা হাত তাহার অঙ্গ সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে,—এপাশে সেই পা কাটা ভিখারীটা—তাহার দেহ সন্ধান করিতেছে—সহসা কোমরে একটা টান পড়িল,—সুখময় বুঝিল লোকটা তাহার গেঁজলে কাটিতেছে।

সুখময় যেন পঙ্গু হইয়া গেল;—এই লোকটাকেই সে আজ পরম যত্নে আনিয়া তাহার সেবা করিয়াছে,—খাওয়াইয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে।

লোকটার কাছে হয় ত ছুরীও আছে—বুকে বসাইতেও ত পারে! সে দেখিল—লোকটার পিঙ্গল চোখ দুইটা শ্বাপদের মত অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করিতেছে।

সুখময় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা টুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

সুখময় ঘামিয়া উঠিয়াছিল। সে উঠিয়া বাহিরে আসিল,

সঙ্গে সঙ্গে কোমরের কাটা গেঁজ্‌লেটা টাকার শব্দ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সুখময় সেটা কুড়াইল না। জীবনের একটা শৃঙ্খল যেন তাহার টুটিয়া গেছে।

বাহিরে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিল তাহার ঠিকানা নাই।

আজই খবরের কাগজে সে দেখিয়াছে—"স্বনামধন্য জমিদার ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার দরিদ্র আত্মীয়া সারদা দেবীকে ত্রিশ হাজার টাকা ও স্বগ্রামে একখানি বাড়ী দান করিয়াছেন। এরূপ আত্মীয়-পরায়ণতার নিদর্শন একালে বিরল।"

যাক্—সারদা সুখে আছে, স্ত্রী পুত্রের দায়িত্ব হইতে তাহারা নিজেই তাহাকে মুক্তি দিয়াছে।

একটা কথা তাহার মনে পড়িল—"অর্থে দুনিয়া বিক্রী হয় বন্ধু।"

একটা খস-খস শব্দে সুখময় ফিরিয়া দেখিল, খঞ্জটা আবার উঠিয়া বসিয়াছে—মাটীতে বুক পাড়িয়া অতি ব্যগ্রভাবে দুই হাতে টাকার গেঁজলেটা হাতড়াইয়া ফিরিতেছে। পিঙ্গল চোখে তাহার সেই জ্বল জ্বল দৃষ্টি। তাহার হাতের নখরের ঘর্ষণে মাটীর বুকের চটা বোধ করি চিরিয়া উঠিয়া যাইতেছে।

সুখময় শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ধরণীর বক্ষের উপরের সুশ্যাম চিকণ আবরণখানি নিষ্ঠুর নখরাঘাতে ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার চোখের উপর শুধু ভাসিতেছে—ধরণীর বুকের ভিতরের রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদ, সোনা, রূপা, তামা, লোহা, অগণিত ধাতু-সম্ভার, আর তাহাতে প্রতিফলিত দুনিয়ার কোটী কোটী মানুষের লুব্ধদৃষ্টির রক্তাভ-ছটা!

*   *   *   *

সুখময় অনেক ভাবিল, দুনিয়ার উপর কদর্য্য ঘৃণায় তাহার সারা অন্তর ভরিয়া গেল। এর চেয়ে এ বেনেতীর কারবারের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকাইয়া ফেলাই ভাল; এর সঙ্গে সে খাপ খাইবে না; আপন স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে যে খাপ খাইল না, সে বাহিরের দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাইবে কি রূপে?

যাক্, পথ ত আছে—অনন্ত-বিস্তৃত দুনিয়ার পথ! সেই পথে পথে সে সন্ধান করিয়া দেখিবে—শুধু কি দুনিয়া সোনার তারেই গাঁথা?

সে স্থির করিল, কাল সন্ধ্যার ট্রেনে সে বাহির হইয়া পড়িবে। রাত্রি এগারটায় নামিয়া—জীবনের প্রথম তীর্থ তাহার—যেখানে তাহার সহিত এই ধরণীর প্রথম সম্বন্ধ-সূত্র গ্রথিত হইয়াছে—সেই আপন ভিটাতে প্রণাম করিয়া আনন্দ পাথেয় সম্বল করিয়া অন্ধকারেই আবার সে বাহির হইয়া পড়িবে। জামাটার বুকে সেলাই করা একখানা নোট তাহার আছে!

তার পর দেশ এড়াইয়া পদব্রজে পথে পথে।

এদিকে সুখময়ের জীর্ণ কুটীরে—পথের দিকের জানালাটী খুলিয়া দিয়া, কলিকাতার ট্রেণের অপেক্ষায় সারদা তখনও বসিয়া,—ছেলে দুইটী লেপের ভিতরেও খোলা জানালার হিমপ্রবাহে কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া গিয়াছে।

কে জানে কেন,—সারদা বাপের বাড়ী যায় নাই।

গৌর বলিয়াছিল—"কেন দিদি এমন কষ্ট ক'রে—"

সারদা বাধা দিয়া বলিয়াছিল, "মানুষই দুনিয়ায় এমন কষ্ট করে গৌর! তুমি কি একদিন বল নি গৌর—আমার না কি মা দুর্গার মত ভাগ্য—রাজরাণী হ'লেও আমার মান এর চেয়ে বাড়ত না?"

গৌর প্রণাম করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। ট্রেনের শব্দ আর পাওয়া যায় না—সে কতদূর চলিয়া গেল কে জানে!—

প্রদীপের তেল নিঃশেষে পুড়িয়া শিখাটী নিভিয়া গেল। সম্মুখের পথখানি নিবিড় অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া গেল। সারদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

নিত্যই এমনি,—কালও সে এমনি বসিয়া ছিল,—আজও আছে,—কালও থাকিবে।



ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রে স্বরোদয়)

ছবিও যে একদিন কথা কইবে এ কথা কে জানতো। দশ বছর আগেও এ রকম সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণীকে আমরা কল্পনা-বিলাসীর 'স্বপ্ন' বলে উড়িয়ে দিতে একটুও ইতস্ততঃ করি নি। কিন্তু যা আমাদের ভাবনায় সেদিনও পর্য্যন্ত একান্তই অসম্ভব ছিল, প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষাগারে তা প্রত্যক্ষ সত্য হ'য়ে উঠেছিল তার অনেক আগেই।

যে ছায়া-ছবি ছিল এতদিন একটি বোবা মেয়ে, তার মুখে প্রথম কথা ফোটালে কে?—এর অনুসন্ধান করতে বসলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, একাধিক বৈজ্ঞানিকের দীর্ঘকালের সাধনা ও তপস্যার ফলেই এই মূক মোহিনী আজ এমন মুখরা হ'য়ে উঠেছে! মাত্র একজনের চেষ্টায় এটা সম্ভব হয়নি।

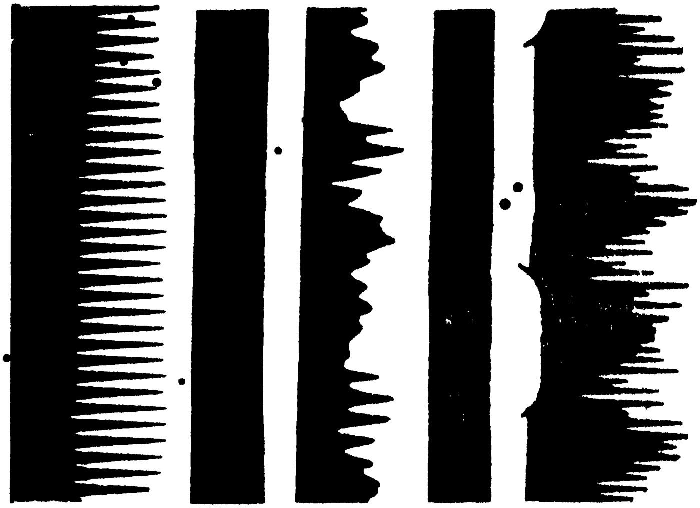
১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেওন স্কট (Leon Scott) সর্ব্বপ্রথম 'স্বর-তরঙ্গ'কে (Sound-waves) তাঁর উদ্ভাবিত 'স্বতঃশব্দ লেখন' যন্ত্রে (Phonautograph) ধরে রাখতে সক্ষম হ'য়েছিলেন; কিন্তু তাঁর সেই যন্ত্র-লগ্ন ভুশো-কাগজের (Smoked-paper) আঁধার বক্ষে শব্দ তরঙ্গ তার যে কম্পন-রেখা (wavy lines) এঁকে রেখে ছিল, স্কট্ তাকে কিছুতেই আর পুর্ণধ্বনিত (reproduce) করে তুলতে পারেননি। তারপর বিশ বৎসর বাদে এলেন বিজ্ঞানাচার্য্য এডিসন। ১৮৭৭ সালে তাঁর উদ্ভাবিত 'স্বর-সঙ্কলন' (Phono-graph) যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখালেন যে, যে কোনো শব্দকে শুধু ধরে বন্ধ করে রাখা নয়, তাকে আবার ইচ্ছামত পুর্ণশব্দায়িত করে তোলাও যায়!

শব্দকে ধরে রাখা এবং তাকে ইচ্ছামত পুনঃপ্রকাশ করতে যে কৌশল মহর্ষি এডিসনের আয়ত্ত হ'য়েছিল, তারই প্রেরণা থেকে তিনি ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে, অর্থাৎ 'স্বর-সঙ্কলন' (Phonograph) যন্ত্র আবিষ্কারের পর প্রায় দশ বৎসর চেষ্টা করে চলচ্চিত্র দেখবার উপযোগী যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল যাতে শব্দকে শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দর্শনেন্দ্রিয়েরও গোচর করা যায়, এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবন করা। তাঁর এ চেষ্টা অনেকখানি সফল হ'য়েছিল;—তিনি স্বর-তরঙ্গকে বন্দী ক'রে—জড় প্রকৃতিকেও সজীব করে তুলতে পেরেছিলেন, কিন্তু, উভয়ের অন্তরঙ্গ মিলন আশানুরূপ সুসম্পূর্ণ ক'রে তুলতে পারেন নি। তাঁর উদ্ভাবিত Kineto-phone ('গতি-স্বরধর' যন্ত্র) এবং Cameraphone (ছায়া-স্বরধর যন্ত্র) কোনোটাই তাঁর Gramophone (স্বর-সঙ্কলন) যন্ত্রের মতো সাফল্য অর্জ্জন করে নি। তাঁর এই 'গ্রামোফোন'ই মূক চলচ্চিত্রকে মুখর হ'য়ে উঠতে সবিশেষ সাহায্য ক'রেছে। তা'ছাড়া, এডিসনের উদ্ভাবিত 'তাপ-দীপ' (Incandescent Lamp) বর্ত্তমান সবাক চলচ্চিত্র-যন্ত্রের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই রকম নানা দিক দিয়ে এডিসন চলচ্চিত্রকে সবাক্ ক'রে তোলায় সাহায্য করেছেন বটে, কিন্তু সবাক্ চলচ্চিত্র সম্ভব হওয়ার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট বলা যেতে পারে না।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল্ ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন যে, শীঘ্রই এমন একদিন আসবে, যখন বৈদ্যুতিক শক্তিকে বিনা-বাহনে প্রবাহিত করা সম্ভব হবে। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে আমেরিকার শ্রীযুক্ত এ্যালেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল 'টেলিফোন' (দূর-স্বরা) যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রলেন। বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে দূরের লোকের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হ'লো। তারপর ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে জার্ম্মাণ বিজ্ঞান-সাধক হায়েনরিক্ হার্টজ্ (Heirtich Hertx) ম্যাক্স্-ওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করলেন। বিনা-বাহনে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে তিনি শূন্যপথে প্রবাহিত ক'রে বেতারের জন্ম সম্ভব ক'রে তুললেন। তখন ইটালীয়ান সাধক মার্কণী প্রভৃতি

বিশিষ্ট বিজ্ঞান-সেবীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় 'Radio' (বেতার-যন্ত্র) গড়ে উঠ্‌লো।

কিন্তু উপরিউক্ত যন্ত্রগুলির কোনটাই তখনও কাজের হিসাবে সুসম্পূর্ণ হ'য়ে উঠবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। 'টেলিফোন্' তখনও পর্য্যন্ত ঠিক দূরকে নিকট করতে পারে নি, নিকটকেই বরং নিকটতম ক'রে তুলছিল। 'ফনোগ্রাফ' তখনও পর্য্যন্ত কাণে কাণে অস্পষ্ট কথা বলছিলো। আর 'রেডিয়ো' তখনও পর্য্যন্ত সদ্যজাত শিশু! সবই ছিল তখন, কেবল ছিল না সেই শক্তিটুকু যার জোরে বলীয়ান হ'য়ে টেলিফোন্ ফনোগ্রাফ বা বেতার সর্ব্বজনের শ্রবণ-সাধ্য হয়ে উঠতে পারে!

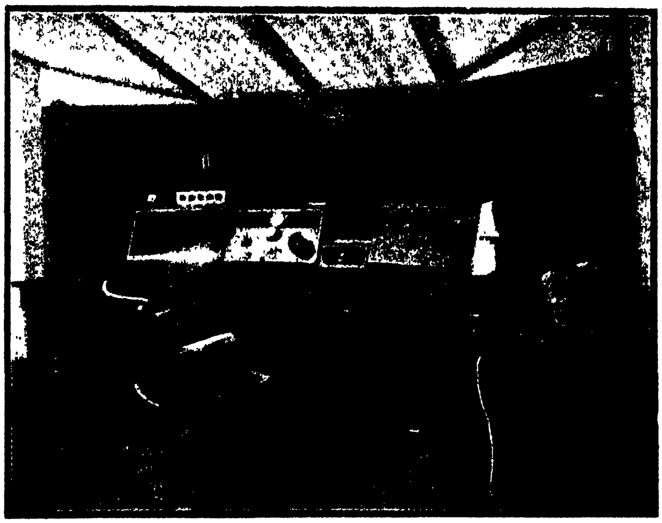


স্বরতরঙ্গের ছায়াছবি (শব্দপট)

১ক দ্বিচক্রযানের ঘণ্টাধ্বনি ১খ ঐক্যতানবাদনের শব্দ ১গ নারীকণ্ঠ স্বর

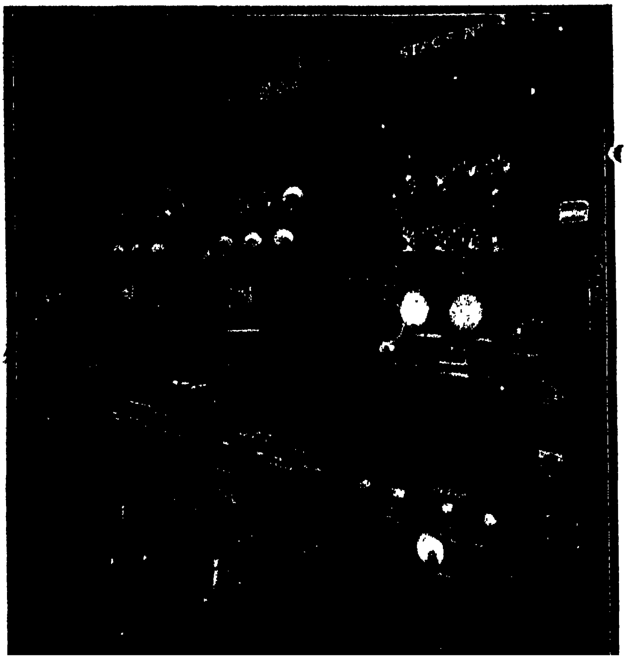
এই সময় জার্ম্মাণীর জড়-বৈজ্ঞানিক এবং রসায়নাচার্য্যরা কেউ কেউ আবিষ্কার করেছিলেন যে 'সি লে নি য় ম্' নামক ধাতুর বিদ্যুৎবাহিকা শক্তি তদুপরি প্রতিফলিত আলোক-শিখার ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য অনুসারে বাড়ে ও কমে! এই রহস্য জানার ফলে 'সিলেনিয়ম-কোষ' (Selenium Cell) তৈরি হয়েছিল, যা এখনও ছবির রাজ্যে প্রভূত প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। তারপর তৈরি হ'লো—Photo-electric Cell, (আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ) একটি 'নির্বায়ু বর্ত্তুলের' (Vacuum globe) খোলের ভিতর দিকে যদি একপুরু করে পটাসিয়ম) Potassium) অথবা ক্যেশিয়ম (Casium) প্রভৃতি ধাতুর পোঁচ লাগিয়ে নেওয়া যায় তাহ'লেই 'আলোক-বৈদ্যুতিক-কোষ' তৈরি হয়। শব্দবিশ্বের বিপুল প্রসার এবং উহার সন্নবিরত ও বিচিত্র ক্রমবিকাশ পুনর্ব্যক্ত করবার সময় 'আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ' নানা ভাবে সাহায্য করে, কাজেই, আজকাল 'সিলেনিয়ম কোষে'র পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে 'আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ'ই ব্যবহার হ'চ্ছে। 'আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ' যখন প্রথম উদ্ভাবিত হ'লো তখন এর ভিতর আলোর দ্বারা উত্তেজিত হ'য়ে যে পরিমাণ তড়িৎশক্তি উদ্ভূত হ'তো তা' এত অল্প যে কোনো কাজেই লাগতো না।

জন্ এম্ব্রোজ ফ্লেমিং নামে একজন ইংরেজ তখন Two-element Vacuum Tube (দ্বৈত-প্রকৃতি-নির্বায়ু নল) উদ্ভাবন করেন এবং ফরাসী ডাক্তার লী-ডি ফরেষ্ট্ তার প্রভূত উন্নতি সাধন ক'রে ঐ নির্বায়ু নলকে ত্রয়োগুণ সম্পন্ন ক'রে তোলেন। ১৯০৬-৭ সালে এই লী ডি



অভিনয় মণ্ডপে (স্বর-সঙ্কলনের যন্ত্রাদি)

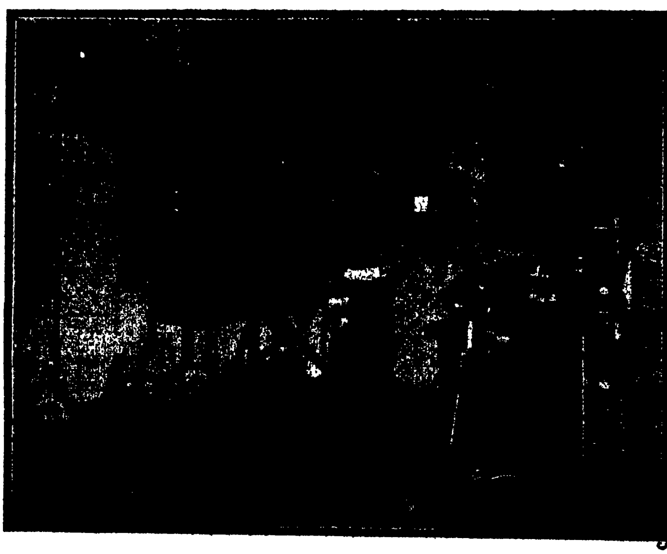
ফরেষ্টের 'শ্রবণী' (Audion) যন্ত্রই Radio-Telephone বা বেতার বার্ত্তার জন্ম ব্যবহার করা হ'ত।



স্বর-বিবর্দ্ধক যন্ত্র

ত্রয়োগুণসম্পন্ন নির্বায়ু-নল উদ্ভাবিত হবার ফলে যখন Amplifier (বিবর্দ্ধক-যন্ত্র) সৃষ্টি হ'লো তখন মানুষ তার নানা কাজে বিদ্যুতের সাহায্য পেয়ে তার কাছে যেন এক অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ হ'লো! এরই জোরে শক্তিশালী হ'য়ে বর্দ্ধমানের লোক আজ বোম্বাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা ব'লতে পারছেন। ১৯১৫ সালে প্রথম মানুষের কণ্ঠস্বর বেতার-বার্ত্তায় (Radio-Telephone) দেশ-দেশান্তরে সাগরপারে পর্য্যন্ত পাঠানো সম্ভব হ'লো। 'বিবর্দ্ধক যন্ত্র' এসে স্বরের চরণ থেকে শিকলের বাঁধন খুলে দিলে। যার শক্তি ছিল সীমাবদ্ধ তার গতি হ'য়ে গেলো অসীম! একজন মানুষ খুব চেঁচালেও বেশী লোক তা' শুনতে পায় না। বিরাট সভা সমিতিতে গেলে মানুষের কণ্ঠস্বরের কতটুকু পর্য্যন্ত পৌঁছাবার শক্তি সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়! বৈজ্ঞানিকেরা মেপে দেখে বলেছেন যে মানুষের কণ্ঠস্বরের শক্তি এক ওয়াটের' (Watt—বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাপ) দশলক্ষ ভাগের দশভাগ মাত্র! আমাদের ঘরে যে বিজলী বাতি জ্বলে, সাধারণতঃ তার এক একটির বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাপ হচ্ছে মাত্র ষাট-ওয়াট্। সুতরাং এর সঙ্গে তুলনা করলে বেশ সহজে বুঝতে পারা যায় যে মানুষের কণ্ঠস্বরের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ, কত তুচ্ছ বা নগণ্য তার শক্তি! কিন্তু এই তুচ্ছ কণ্ঠস্বরকেই Radio Broad-casting Co. (বেতারবার্ত্তা প্রচারক কোম্পানী) আজ বিবর্দ্ধক-যন্ত্রের সাহায্যে সুদূর দেশান্তরেও ধ্বনিত ও শ্রুত হওয়া সম্ভব ক'রে তুলেছেন।

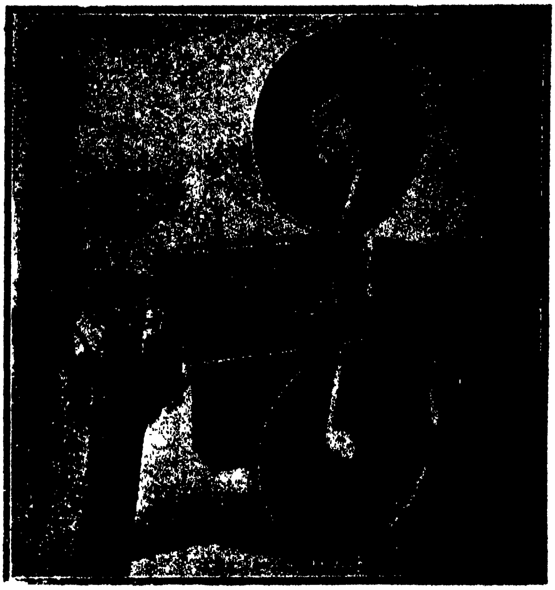
ধ্বনির ন্যায় চিত্র বা প্রতিকৃতিও বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে দূর দেশে পাঠানোর কল্পনা ১৮৪৭ খৃঃঅব্দের বৈজ্ঞানিকদের মাথায় এসেছিল দেখা যায়; কিন্তু ১৯০৮ সালের আগে এ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত হয়নি! নরওয়ের বৈজ্ঞানিক ন্যুড্‌সেন (Knudsen) প্রথম তড়িৎ সঞ্চালনে দূরান্তরে চিত্র প্রেরণে সমর্থ হ'য়েছিলেন। আজ অবশ্য



স্বর-ধর যন্ত্র (Sound camera)

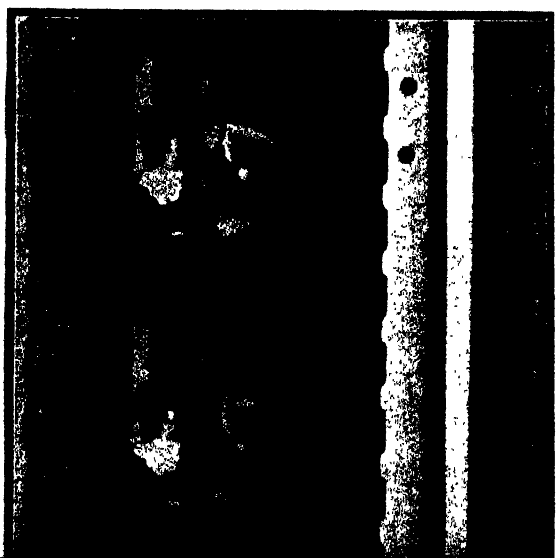
নিউইয়র্ক বা আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অন্য যে কোনো বড়ো শহরের টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে যদি একখানি ফটোগ্রাফ দিয়ে আসা হয় তাহ'লে দু'এক ঘণ্টার মধ্যে সে ছবিতারা প্রেরকের ইচ্ছানুযায়ী হাজার হাজার মাইল দূরের অন্য একটি শহরে পাঠিয়ে দিতে পারবে। এই যে টেলিগ্রাফে ছবি পাঠানো এটা শুনতে যত সহজ লাগে কাজে তত সহজ নয়। এর জন্য অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রতে হয়েছে। সকলেই জানেন বোধহয় যে 'রেখা' হচ্ছে বিন্দুরই সমষ্টি মাত্র! ছবি পাঠাবার সময় চিত্রের প্রত্যেক রেখার প্রতি বিন্দুটি তড়িতবহ তারের সাহায্যে গন্তব্যস্থলে পাঠাতে হবে, সেখানে আবার ঐ বিন্দুগুলি ঠিক ছবির রেখার অবস্থান অনুযায়ী ও সমান ঘন হয়ে পরের পর বসা চাই। 'আলো'কে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে নিতে হবে এবং সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ তারযোগে পাঠাবার পর গন্তব্যস্থানে পৌঁছলে তাকে আবার আলোয় পুনঃ পরিবর্ত্তন করে নেওয়া চাই।

এই যে Telephotography বা 'দূরালোক লেখা' এর সঙ্গে বর্ত্তমান প্রবন্ধের খুব নিকট সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, নীরব চিত্র সরব হ'য়ে ওঠার মূলে এই 'দূরালোক লেখার' প্রেরণা খুব বেশী কাজ ক'রেছে। ১৯২২ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে অবাক্ ছবি 'সবাক্' হয়ে দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তখনও তার সম্পূর্ণ অভ্যুদয় হয়নি। ডিফরেষ্টের phonofilm (শব্দপট) এবং জেনারেল



সম্মিলিত শব্দ ও ছায়াধর যন্ত্র

ইলেকট্রিক কোং'র Pallophotophone (স্বর-চিত্র-চক্র) সে সময় সবাক্ ছবির পক্ষে সবিশেষ উপযোগী যন্ত্র বলে বিবেচিত হয়েছিল। তারপর ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স (Warner Brothers) এবং ভীটাফোন্ কর্পোরেশন (Vitaphone Corporation) মিলে নিউইয়র্কের ওয়ার্ণার থিয়েটারে সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ সবাক্ ছবি 'ডন জুয়ান' (Don Juan) দেখিয়েছিলেন। ছবির সঙ্গে সঙ্গে যে সুমধুর ঐক্যতান বেজেছিল তাও 'স্বরচিত্রে'র (Talkie) গুণে। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রথম সবাক্ চলচ্ছবি যা লোকরঞ্জনে কৃতকার্য্য হ'য়ে ব্যবসা জগতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করলে। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত এর ক্রমেই উন্নতি হ'চ্ছে। ১৯২৭ সালে উইলিয়াম ফক্স উৎকৃষ্টতর সবাক্ চিত্র দেখাতে পেরেছিলেন। এই বছরেই 'ফক্স ম্যুভিটোন্ নাম দিয়ে সরব সংবাদ চিত্র News reel প্রদর্শনও সুরু হয়েছিল।



ছায়া ও শব্দপট

দেখতে দেখতে আমেরিকা ও য়ুরোপের চতুর্দ্দিকে

সবাক্ চলচ্চিত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। আমাদের দেশেও এর ঢেউ এসে লেগেছে এবং বাংলায় হিন্দিতে ও উর্দ্দুতে সবাক্ চলচ্ছবি এখানে তৈরীও হচ্ছে! এখানে মূক ছবি তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করবার আগেই কাঁচা অবস্থায় মুখর হ'য়ে উঠলো। তাই বারো বছরের মেয়ের মা' হওয়ার দুর্ভাগ্যের মতো সে কোনোদিক দিয়েই এখনো সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। সবাক্ ছবি তোলবার জন্য চলচ্চিত্রবিদ্ সুদক্ষ কর্ম্মীর দল ছাড়া কয়েকজন সুপটু শব্দ-বৈজ্ঞানিকের সাহায্যও অত্যাবশ্যক। প্রথমেই দরকার একজন 'স্বর নায়ক' Director of Sound; এঁকে Chief Recording Engineer অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান



ছায়াধর যন্ত্র কুঠি (camera booths) এর ভিতর থেকে ছবি নিলে ক্যামেরার শব্দ বাইরে শোনা যায় না; সঙ্গে শব্দ সম্প্রসারক যন্ত্রদণ্ড (microphone boom)



"আমার মর্ম্ম-গীতি" (song of my heart) চিত্রের জন্য ব্যবহৃত একাধিক ছায়াধর যন্ত্র। (ক্যা.মরার খুট-খাট্ শব্দ নিবারণের জন্য প্রত্যেক ক্যামেরাটিতে খুব মোটা কম্বল চাপা দেওয়া হয়েছে।)

স্বর-ধর যন্ত্রীও বলা হয়। শব্দ বিভাগের ইনিই প্রকৃত কর্ম্মকর্ত্তা। এঁর কাজ অনেক রকম। শব্দ ধরা, যন্ত্রপাতি বসানো, পরীক্ষা এবং সমস্ত সরঞ্জাম ঠিক রাখা। শব্দ সংক্রান্ত একটা Laboratory বা বিজ্ঞানাগার পরিচালনা তাঁর হাতে। কখন কখন ইনিই আবার ক্যামেরার কাজও নির্দ্দেশ করেন। এঁর সঙ্গে থাকেন Recording Supervisor অর্থাৎ —স্বর-তত্ত্বাবধায়ক। এঁর তত্ত্বাবধানেই 'শব্দ' চিত্রে রূপান্তরিত হয়। এঁর আবার তিনজন সহকারী থাকেন। একজন প্রধান স্বর ধর (first Recordist) এবং দুজন সহকারী স্বর-ধর; (Assistant Recordists) সহকারীদের একজনকে থাকতে হয় অভিনয়-মঞ্চের উপর, এবং অন্যজনকে থাকতে হয় স্বরধর-যন্ত্র পরিচালনের কাজে।

স্বরতত্ত্বাবধায়কের কাজ অনেকটা স্বরনায়কেরই অনুরূপ। স্বরধর-যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁকেও সম্পূর্ণ ওয়াকিফ্-হাল হ'তে হয়। তা ছাড়া, অভিনেতা অভিনেত্রীর গলার দৌড় জেনে এবং প্রযোজক ও পরিচালকের মেজাজ ও রুচি বুঝে শব্দ-সঙ্কলনের আয়োজন ও ব্যবস্থা করার দায়িত্বটা সম্পূর্ণ তাঁরই। প্রধান

স্বরধর এবং তাঁর দুই সহকারী নির্ব্বাচন করে নেন তিনিই। সহকারীদের মধ্যে কে থাকবে অভিনয়-মণ্ডপে এবং কে থাকবে স্বরধর-যন্ত্রগৃহে, সে ব্যবস্থাও তিনিই করেন। অভিনয় মণ্ডপে এক অথবা একাধিক Microphone (শব্দ-সম্প্রসারক যন্ত্র) বসানো থাকে। অভিনয় কালীন অভিনেতাদের কণ্ঠস্বরের শব্দপ্রবাহ (Voice current) ঐ শব্দ সম্প্রসারক যন্ত্রের সাহায্যে স্বরধর-যন্ত্রগৃহে (Booth or Sound Truck) অবস্থিত Amplifier বা ধ্বনিবিবর্দ্ধক-যন্ত্র মধ্যে এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎসংলগ্ন স্বরধর যন্ত্রে (Recording Machine) বন্ধ হয়ে যায়।

ধ্বনিবিবর্দ্ধক (Amplifier) যন্ত্রের কর্ণধার হ'য়ে প্রধান স্বরধর ব'সে থাকেন। তাঁর হাতেই তড়িৎাঙ্কের মাপকাঠি। ধ্বনিবিবর্দ্ধক যন্ত্রের মধ্যে যে সব শব্দপ্রবাহ এসে পৌঁছায় তিনি সেগুলিকে সুশৃঙ্খলে সন্নিবেশ করেন। যেখানে একাধিক শব্দ সম্প্রসারক যন্ত্র (Microphones) ব্যবহৃত হয়, সেস্থলে এই প্রধান স্বরধর মিশ্রকের (Mixer) সাহায্যে বিভিন্ন শব্দ সম্প্রসারক যন্ত্রের উৎপাদিত স্বর-প্রবাহ সমূহের একত্র সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর সহকারী দ্বয়ের সঙ্গে টেলিফোনের সাহায্য তাঁর অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে। কারণ স্বর সঞ্চারক যন্ত্রের (Transmitters) সঠিক সন্নিবেশের দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত। তিনি কখনও সহকারীদের সাহায্যে কখনো বা নিজেই অভিনয়-মণ্ডপের পরিচালকদের কাছে শব্দ সম্পর্কীয় নির্দ্দেশ পাঠান।

স্বরধর যন্ত্রীরা যদি গল্পের অন্তর্নিহিত সাহিত্যকলার সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য্য, অভিনয় বিদ্যার সবিশেষ তত্ত্ব ও চিত্রকারু সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞ হন তাহ'লে ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুব বেশী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এরকম লোক এ লাইনে বড় একটা পাওয়া যায় না। যাঁরা আছেন তাঁদের প্রাণপণ লক্ষ্য থাকে শুধু কি ক'রে কণ্ঠস্বর নির্দ্দোষ ও নিখুঁত ভাবে ধরা যায়। তাঁদের এই নিখুঁত স্বরের জন্য অতি আগ্রহের ফলে অনেক সময় অভিনয়ের উৎকর্ষ ও আলোকচিত্রের সৌন্দর্য্য ছবির নানা স্থানে খর্ব্ব হ'তে বাধ্য হয়। অভিনয়-মণ্ডপে যে স্বরধর যন্ত্রী থাকেন তাঁর কাজ হ'চ্ছে স্বরধর যন্ত্রগৃহের সঙ্গে সংযোগ



সামুদ্রিক ক্যামেরা (সমুদ্রের তলদেশের ছবি নেবার জন্য ডুবুরীর পোষাক পরে বারি-বারণ (waterproof) ক্যামেরা নিয়ে আলোক চিত্রকর সাগর-গর্ভে প্রবেশ করেছেন)

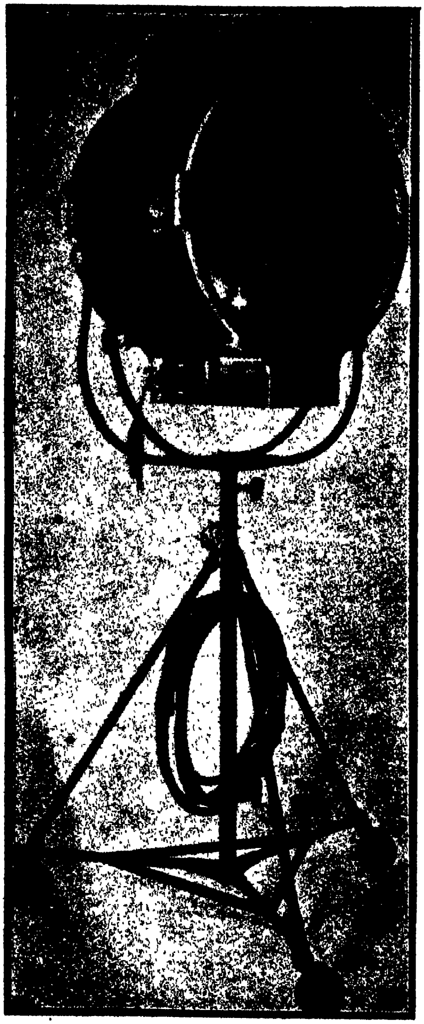


ধাতুপট্টাবৃত কক্ষ (monitor room) এইখানে 'মিশ্রক' (mixer) তাঁর কাজ করেন

রক্ষা করা এবং অভিনয়ের শব্দের সঙ্গে স্বর-সম্প্রসারক যন্ত্রের তাল রক্ষা করা। সুতরাং ধ্বনি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে

সবিশেষ জ্ঞান না থাকলে তাঁকে দিয়ে এ কাজ চলবে না।

স্বরধর যন্ত্রগৃহে যে সহকারী থাকেন তাঁর কাজ হ'চ্ছে স্বরধর যন্ত্রে ধ্বনিপট (Sound Film) সরবরাহ করা এবং স্বরপূর্ণ হলে গুটিয়ে রাখা! সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য



তাপ দীপ (incandescent lamp)

রাখতে হয়—যে, কাজের সময় 'কল না' বেগড়ায়। অনেক সময় মুখর চলচ্চিত্রের শব্দাংশ আশানুরূপ সন্তোষজনক না হ'লে অথবা নূতন কোনো সঙ্গীত বা কথা যোগ করতে হ'লে আবার নূতন করে তা' গ্রহণ করা হয়, একে বলে Re-recording 'পুনঃস্বর নিবেশ'। এ কাজটা বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই করানো উচিত। অবশ্য, শব্দ-তত্ত্বাবধারক ও তাঁর সহকারীরা ধ্বনি-বিশেষজ্ঞকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

আলোকানুরাগ-রঞ্জন, (Sensitometry) ছায়াছবির মূল উপাদান সমূহের সুপরিমিত ব্যবহার, স্বর-বাহনের উপর শব্দ-রেখার (Sound-tracks) রাসায়নিক পরিণতি-সাধন এবং মুদ্রণ (Developing & Printing) ইত্যাদি এ সমস্তই অভিজ্ঞ ধ্বনি তত্ত্ববিদের তত্ত্বাবধানে হওয়া দরকার; কারণ, খুব সযত্নে গৃহীত শব্দ রেখার মূল-ছবিও (Sound-Negatives, কেবলমাত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ত্রুটী এবং



বৈমানিক ক্যামেরা (Aerial camera) (আকাশে উঠে ব্যোম-যান ও বিমানপোতের ছবি নেবার জন্য তৈরী)

মুদ্রণের দোষে একেবারে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক চলচ্চিত্র কোম্পানীর উচিত ধ্বনি-বিজ্ঞান জানা একজন সুদক্ষ আলোক-চিত্রকর (Photographer) নিযুক্ত করা। আনাড়ি লোক নিয়ে অল্প খরচে ফাঁকি দিয়ে সবাকছবি তোলবার চেষ্টা করলে ঠকতে হবে। আমেরিকায় যে সব চিত্র প্রতিষ্ঠানের ছবি আজকাল সবচেয়ে ভালো সেই নামজাদা কোম্পানী গুলিতে ছবি তোলার সম্পর্কে ক'জন ক'রে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন শুনলে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা হয়ত' মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বেন। ওয়ার্ণার

ব্রাদার্সের চিত্রগড়ে ১৯৩ জন লোক শুধু ক্যামেরা, আলো, ও স্বরধর যন্ত্রপাতির কাজে নিযুক্ত আছেন। মেট্রো-গোল্ডোয়াইন মেয়ার কোম্পানীতে আছেন ১৪৭ জন, প্যারামাউণ্টে আছেন ১০৫ জন, য়ুনির্ভাসালে আছেন ১০০ জন, ফক্সের ৭৫ জন ইত্যাদি।

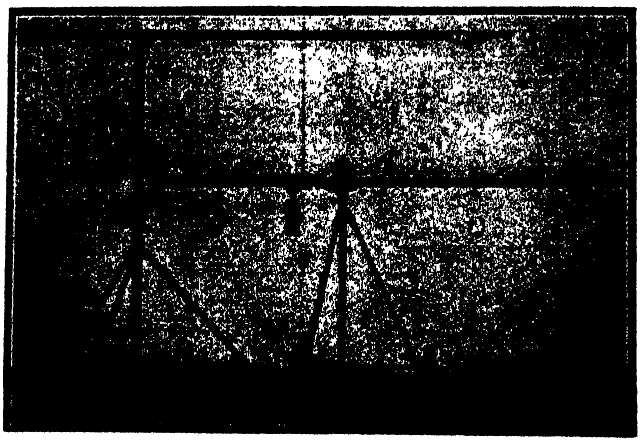
চলচ্চিত্রের সঙ্গে শব্দের সংযোগ পূর্ব্বেই বলেছি, প্রথমটা স্বরসঙ্কলন যন্ত্রের (Gramophone) সাহায্যে ঘটেছিল। শব্দ-চক্র (Disc record) ছিল গোড়ার দিকে স্বর-সঙ্কলনের একমাত্র উপায়। আজকাল ছায়াবাহনের (Photo-Film) ন্যায় শব্দবাহনও (Sound-Film) উদ্ভাবিত হয়েছে। এবং তার আবার দু-রকম পদ্ধতি বেরিয়েছে। একটাকে বলে—Variable density recording অর্থাৎ শব্দের পরিবর্ত্তনীয় ঘনত্বের মাত্রা অনুপাতে সঙ্কলন, এবং অন্যটিকে বলে Variable area recording অর্থাৎ শব্দের পরিবর্ত্তনীয় প্রসারের সীমানুপাতে সঙ্কলন। কলিকাতার অধিকাংশ মুখর ছবিঘরে যে Western Elecrtic কোম্পানীর সবাক্-চিত্রযন্ত্র ব্যবহার হয় সেগুলি প্রথমোক্ত পদ্ধতিই অনুসরণ করে। দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুরাগী হ'চ্ছে R 'C' A Photophone কোম্পানী।

পূর্ব্বেই বলেছি শব্দ-সম্প্রসারক যন্ত্রের (Microphone) সাহায্যে স্বর-তরঙ্গ (Sound waves) তড়িৎ-প্রবাহে (Electric waves) রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেই তড়িৎপ্রবাহে রূপান্তরিত স্বর-তরঙ্গ আবার স্বর-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের সাহায্যে বহুগুণ প্রবলতর হয়ে নির্বায়ু নলে শক্তি সঞ্চার করে এবং তার ফলে স্বর-লেখন যন্ত্রের কার্য্য পরিচালিত হয়। স্বর-লেখন যন্ত্রের কার্য্য হ'চ্ছে ঐ বৈদ্যুতিক প্রবাহে-রূপান্তরিত স্বর-তরঙ্গকে আবার আলোক-ছায়ায় রূপান্তরিত করে ছায়াপটের সঙ্গে সংযুক্ত করা। এই শব্দ ও ছায়ার সম্মিলিত পটই হ'চ্ছে Talkie Film, অর্থাৎ মুখর ছায়াপট!

ছবিঘরের পর্দ্দার উপর যখন এই মুখর ছায়াপটের ছবি গিয়ে পড়ে তখন ছায়াছবির সঙ্গে সঙ্গে আলোছায়ায় রূপান্তরিত স্বর-তরঙ্গ আবার তড়িৎপ্রবাহের রূপ ধরে এবং সেই তড়িৎপ্রবাহ আবার শব্দ-তরঙ্গে পরিণত হ'য়ে দেখা দেয়। এরজন্য দরকার হয় প্রধানতঃ তিনটি যন্ত্র—একটি পুণরভিব্যঞ্জক যন্ত্র (Reproducer) একটি বিবর্দ্ধক যন্ত্র (Amplifier) একটি উচ্চবাক্ যন্ত্র (Loud Speaker)



প্লাবন দীপ (Flood-Lights)

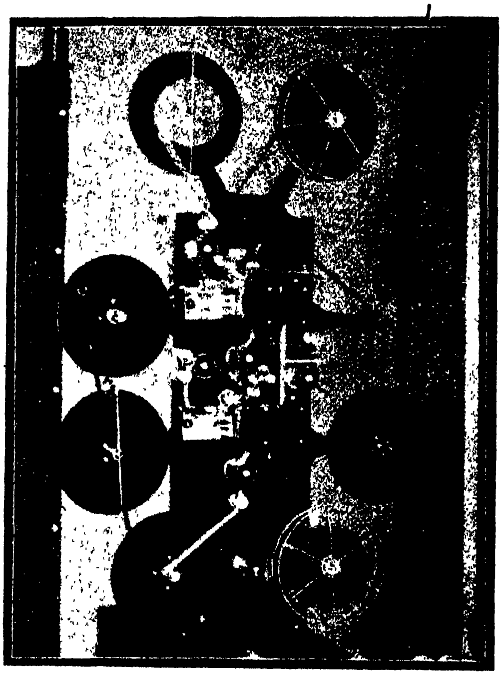


স্বর-সম্প্রসারক যন্ত্রদণ্ড (microphone booms.) (আজকাল হোলিউডে মুখর ছবির মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে! এই দণ্ডের সাহায্যে microphone যেখানে খুশী সরিয়ে নেওয়া চলে)

পুনরভিব্যঞ্জক যন্ত্রের কাজ হ'চ্ছে শব্দপটকে (Sound Record) তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা। বিবর্দ্ধক যন্ত্রের কাজ হচ্ছে ঐ তাড়িত শক্তির বল বৃদ্ধি করা এবং উচ্চবাক্ যন্ত্রের কাজ হচ্ছে সেই তড়িত-শক্তিতে রূপান্তরিত শব্দপটকে ধ্বনিতে পরিণত করা! শব্দপটকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্য দরকার হয় একটি উত্তেজক দীপ (exciting lamp) এক প্রস্থ স্বচ্ছমণি (Lens) এবং আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ (Photo Electric Cell)

ছবির সঙ্গে শব্দের সামঞ্জস্য বিধান করাকে ব'লে Synchronization (স্বরতাল সন্নিবেশ)। অনেক ছবি আছে যা সম্পূর্ণ সবাক্ (Talkie) নয়, কতক অংশমাত্র মুখর। এই শ্রেণীর ছবির শব্দ সঙ্কলন হয় স্বর-চক্রের সাহায্যে (Disc Record) এই স্বর-চক্রকে চিত্রপটের সহযোগী বা সমধর্ম্মী ক'রে তুলতে পারলেই ছবির সঙ্গে শব্দের সামঞ্জস্য বিধান অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে।

সাধারণতঃ দেখা যায় কোনো রঙ্গালয়ে বা ছবিঘরে দর্শকের যে গোলযোগ, অর্থাৎ ওঠা বসার চলা ফেরার গল্প গুজবের আলাপ-আলোচনার বা সাদরসম্ভাষণের যে শব্দ ওঠে সবাক্ চিত্রের শব্দাংশের পরিমাণ তার চেয়ে অন্ততঃ চল্লিশভাগ বেশী না হ'লে প্রেক্ষাগৃহে কিছুই শোনা যায় না! খুব বড় কামানের শব্দের পরিমাণ যদি ১০০ ধরা যায়, তাহ'লে প্রেক্ষাগৃহের গুঞ্জন তার তুলনায় হ'বে ৩০ ভাগ, কাজেই শব্দের পরিমাণ হওয়া চাই অন্ততঃ ৭০ ভাগ।



শব্দ ও চিত্রপট একত্র মুদ্রিত করবার যন্ত্র

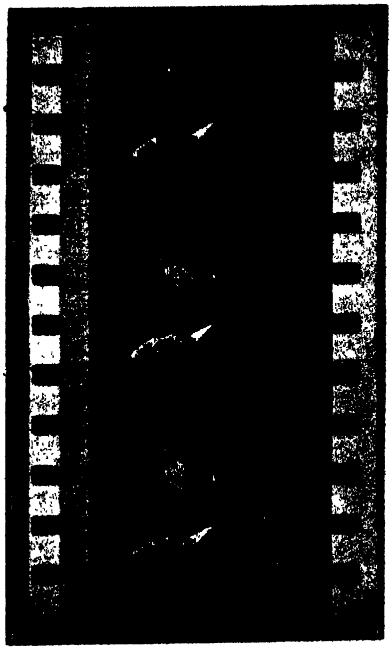


মুখর চিত্রের অভিনয়-মণ্ডপ

আবার ছবির এই সত্তর ভাগের মধ্যে দেখা যায় অভিনয় কালে ফিস্-ফিস্ করে কথা কইলে যে শব্দ হয়—চেঁচিয়ে কথা বললে সে আওয়াজের পরিমাণ দাঁড়ায় তার চেয়ে—ত্রিশ ভাগ বেশী! ছবি তোলবার সময় এই সব হিসেবের দিকে লক্ষ্য রেখে ছবির সঙ্গে শব্দের তাল মান লয় সুসঙ্গত ক'রতে পারলে সে ছবি হ'য়ে ওঠে সুশ্রাব্য ও উপভোগ্য। ছবির পাত্রপাত্রীরা কথা ব'লতে ব'লতে কোনো দৃশ্যে যখন কাছে এসে পড়ে বা দূরে সরে যায় তখন তাদের সেই অবস্থানের বা নড়াচড়ার অনুপাতে তাদের কণ্ঠস্বরের তারতম্যও যাতে সমতালে কম বেশী ও দূর বা নিকট হয়ে ওঠে সেদিকেও সবিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

কণ্ঠস্বর যে পর্য্যন্ত না সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলতে পারা যাবে, সবাক ছবির সাফল্য ততদিন এদেশে সুদূর-পরাহত।

দূরে কোনো ঘটনা ঘটছে দেখাবার সময় ছবিতে সেই দূরের ঘটনাকে দূরে রেখেই দর্শকদের কিন্তু তার খুব কাছে পৌঁছে দিতে হয়, তা না'হ'লে দর্শকদের কৌতূহল চরিতার্থ করা যায় না; এবং তাদের কৌতূহল চরিতার্থ না হ'লে সে ছবি দেখে তারা খুশী হ'তে পারে না। সুতরাং ছবির সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে হ'লে পরিচালককে দর্শকদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকতে হবে। দূরের ঘটনাকে নিকটবর্ত্তী করে দেখাবার জন্য ছায়াধর-যন্ত্রীকে (Camera-man) যেমন দূর-সামীপ্য-মণির (Long Focus Lens) সাহায্য নিতে হয়, তেমনি দূরের শব্দকে দূরে রেখেই তাকে নিকটতর ক'রে শোনাবার জন্য' ছায়াধর-যন্ত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বর-সম্প্রসারক যন্ত্রের (Microphone) অবস্থানও সঙ্গে সঙ্গে বদলে সমান্তর ক'রে নেওয়া দরকার। যেখানে একই দৃশ্যে একই সময়ে close-ups (কাছাকাছি ছবি) Mid-shots, (মাঝা-মাঝি ছবি) Long-shots, (দূরের ছবি) নেওয়ার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে নট-নটীর অবস্থানের অনুপাতে এবং ছায়াধর-যন্ত্রের ব্যবধান অনুযায়ী একাধিক শব্দসম্প্রসারক-যন্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক। তবে প্রতিবারেই একটিমাত্র শব্দসম্প্রসারক-যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত, অন্যগুলি বন্ধ ক'রে রাখা দরকার। অর্থাৎ চিত্রাভিনয়ে পটমণ্ডপের (Set) যে দিকের যে শব্দসম্প্রসারক যন্ত্রটি যখন ব্যবহার করা আবশ্যক ব'লে মনে হবে, তখন কেবলমাত্র সেইটির চাবি খুলে অন্যগুলির চাবি বন্ধ (Switchoff) রাখতে হবে। এরূপ স্থলে একাধিক ছায়াধর-যন্ত্রও ব্যবহার ক'রতে হয়। কারণ একই সময় বিভিন্ন দূরত্বের ও বিভিন্ন দিকের (different positions and different angles) ছবি নিতে হ'লে একটি-মাত্র ছায়াধর-যন্ত্রে কাজের সুবিধা হয় না এবং ছবিও সন্তোষজনক হয় না। একাধিক ক্যামেরার তোলা একই দৃশ্যের নানাদিকের ছবি মিলিয়ে দেখে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়েছে ব'লে মনে হয় সেই অংশটুকু কেটে নিয়ে রাখা হয়, এমনি ক'রে ওরা শ্রেষ্ঠ অংশ (Cuts)



মুখর দ্বিজ-চিত্র (Double exposure on sound film)

গুলি একত্র জুড়ে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবি তৈরী করে।



স্বর-চিত্র সম্পাদন যন্ত্র (sound film editing machine)

সবাকছবি তোলবার পটমণ্ডপ (Set) মূকছবির অনুরূপ হ'লে চলবে না। কারণ স্বর-স্পন্দনের (Sound vibrations) স্থান বিশেষে পার্থক্য (Variation) ঘটে,

যেমন ঘরের ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিলে সে আওয়াজ ঘরের বাইরে এসে কথা ব'ললে সে আওয়াজের সঙ্গে মেলে না। কাপড়ের তাঁবুর মধ্যে কথা কইলে যে স্বরস্পন্দন হয়, ইট বা পাথরের গাঁথা ঘরের মধ্যে কথা বললে সে স্বরস্পন্দন অন্যরকম হয়; আবার কাঠের তৈরী ঘরে বসে কথা ব'ললে সে স্বরস্পন্দন ভিন্ন প্রকার। সুতরাং সবাক্-ছবির পটমণ্ডপ এমন ভাবে তৈরী হওয়া দরকার যাতে এই স্বরস্পন্দনের স্বাভাবিক গতি বা প্রকৃতি বাস্তব দৃশ্যের যথাসম্ভব অনুরূপ হতে পারে।

অনেক স্থলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কণ্ঠস্বরের পরিমাপ বা গ্রাম ঠিক একরকম হয় না। দু'জন



শব্দ সংরোধক (Silencer) (ক্যামেরা পরিচালনে যে শব্দ হয় তাকে রুদ্ধ করবার জন্য কম্বলের পরিবর্তে আজকাল এই রবারের ঢাকনা প্রচলিত হয়েছে। হোলিউডে এর নাম হয়েছে 'বাঙলো' অর্থাৎ ক্যামেরার বাসা। রবারের এই ঢাক্না বেরুবার পর থেকে 'ক্যামেরাকুঠির' রেওয়াজ উঠে যাচ্ছে।)

অভিনেতার স্বরের যখন খুব বেশী রকম পার্থক্য থাকে তখন তাদের দু'জনের জন্য পৃথক পৃথক স্বরধরযন্ত্র ব্যবহার করাই উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি 'চিত্রায়' যে সবাক্ ছবি "দেনাপাওনা" দেখানো হ'ল, তাতে জীবানন্দরূপী দুর্গাদাসবাবুর কণ্ঠের স্বরগ্রাম অন্যান্য অভিনেতার অপেক্ষা অনেক বেশী উচ্চ, কিন্তু একই স্বরধরযন্ত্রে সকলের স্বর-সঙ্কলন করার ফলে দুর্গাদাসবাবুর কথা স্বর-বিবর্দ্ধক-যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ঘুরে উচ্চবাক্ যন্ত্রের (Loud speaker) সাহায্যে যখন দর্শকদের কাণে এসে পৌঁছালো, তখন সে স্বর অন্যান্য অভিনেতাদের তুলনায় কর্কশ চিৎকারের মত মনে হ'তে লাগলো। এখানে দুর্গাদাসবাবুর কণ্ঠস্বরকে নিয়মিত (Regulate) করতে গেলে অপর অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর এত নেমে যাবে যে হয় ত শোনাই যাবে না;—সুতরাং এস্থলে শব্দ-পরিচালকের উচিত ছিল ছবি তোলবার সময় দুর্গাদাসবাবুর জন্য একটি পৃথক স্বরধর-যন্ত্র ব্যবহার করা। যিনি 'মিশ্রক' (Mixer) তিনি তখন অনায়াসে এই বিভিন্ন স্বরগ্রামের সমন্বয় সাধন করতে পারতেন। বলা বাহুল্য যে 'মিশ্রকের' কাজই হচ্ছে সবাক্ছবির স্বর-সমন্বয় করা।

অনেক স্থলে সবাক্ছবিতে স্বর-যোজনা (Scoring) চিত্র নেওয়ার আগে কিম্বা পরে করা হয়। সঙ্গীত এবং বাদ্য সম্পর্কেই বেশীর ভাগ এটা করা হয়; কিন্তু এই প্রাক্স্বরযোজনা (Pre-scoring) বা উত্তর স্বরযোজনার (Post-scoring) একটা প্রধান অসুবিধা হয় এই যে, অভিনেতারা হয় স্বর-ধারক (Sound-record) সম্বন্ধে নয় ছায়া-ধারক (Film record) সম্বন্ধে এত বেশী সচেতন হ'য়ে ওঠেন যে, প্রাক্স্বর-যোজনার ক্ষেত্রে অভিনয়ের প্রতি অমনোযোগী হ'য়ে পড়েন এবং উত্তর স্বরযোজনার ক্ষেত্রে চিত্রের দিকে মনোযোগী হওয়ার ফলে স্বর-সম্বন্ধে অসতর্ক হ'য়ে পড়েন। অতএব চিত্র ও স্বরপট একই সময়ে নেওয়াই নিরাপদ।

মূকছবির ন্যায় মুখর ছবিও কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে সম্পাদন (Edit) ক'রে নিতে হয়। কতটা ছবি বাদ দিলে কতখানি কথা বাদ যায়, সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না হ'লে মুখর ছবি সম্পাদন করা বিপজ্জনক হ'য়ে পড়ে। বিশেষ ক'রে যেখানে চিত্রের শব্দাংশ স্বরধর-চক্রে (Disc record) গৃহীত হয়, সেখানে চিত্র সম্পাদনের সময় স্বরাংশকে পুনঃ সন্নিবেশ (re-recording) না ক'রলে সম্পাদন করা দুরূহ হ'য়ে ওঠে।



সাময়িকী

রাজ-পরিবর্ত্তন—

কবি গাহিয়াছেন—

"এক রাজা যাবে, পুনঃ অন্য রাজা হবে ;
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"

বাঙ্গালার রাজসিংহাসন একদিনের জন্যও শূন্য থাকিবার যো নাই। নির্দ্দিষ্ট পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইতেই বাঙ্গালার রাজা সার ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন মহোদয় বিগত ২৯শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে নবাগত গবর্ণর সার জন এণ্ডারসনের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া এক ঘণ্টা পরেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখী হইয়াছেন ; সার জন এণ্ডারসনও ধূলপায়ে বাঙ্গালার রাজতক্তে আরোহণ করিয়াছেন। সার ষ্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সন স্বদেশে গমন করিয়া সুদীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সার জন্ এণ্ডারসনকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। এক দিকে গোলটেবিল, আর এক দিকে গণ্ডগোল,—এই দুই গোলের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালার শাসনকার্য্য তিনি সুচারুরূপে সম্পাদন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—

বিমান-রথে বিশ্বকবি—

১১ই এপ্রিল সোমবার বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, তাঁহার পুত্রবধূ, প্রাইভেট সেক্রেটারী ও একজন চিকিৎসক সমভিব্যাহারে বিমান-পথে পারস্য দেশে যাত্রা করিয়াছেন ; পারস্যের অধিপতির সাদর নিমন্ত্রণ বিশ্বকবি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ইতঃপূর্ব্বে একদিন বিমান-রথের আড্ডা হইতে আধ ঘণ্টার জন্য ...থে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার বিশেষ আনন্দ বোধ হইয়াছিল ; সেই জন্য তিনি স্থলপথ ও জলপথ দুই-ই বর্জ্জন করিয়া বিমান-পথে পুষ্পরথে এই সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করিতে গিয়াছেন। আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়েরও কবিবরের সঙ্গী হইবার কথা ছিল ; কিন্তু 'স্থান নাই, ছোট এ তরি' হওয়ায় শ্রীমান্ কেদারনাথ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ৪ঠা এপ্রিল বিমান-রথে পারস্য গমন করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে বিশ্বকবির এই বিমান-অভিযান এদেশবাসী সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, কবিবর কবিক্ষেত্র পারস্য দেশ হইতে বিজয়মুকুট-সুশোভিত হইয়া জলপথে স্থলপথে, বা বিমান-পথে, যে পথেই হউক সুস্থ শরীরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।

—

প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য—

বাঙ্গলার হাইস্কুলগুলিতে পাঠ্য বিষয়ের সংস্কার সাধন করার জন্য যে কমিটি নিয়োগ হইয়াছিল, সেই কমিটি সিনেটের বিবেচনার জন্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন।

কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই রিপোর্ট দিয়াছেন যে, ইংরাজী ব্যতীত সমস্ত বিষয় মাতৃভাষায় পড়াইতে ও পরীক্ষা লইতে হইবে।

কমিটি আরও রিপোর্ট দিয়াছেন যে, মাতৃভাষা, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান (জড়-বিজ্ঞান ও রসায়ন) এবং কোন প্রাচীন সাহিত্যে অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হইবে।

কমিটি মনে করেন যে, বর্ত্তমানে ম্যাট্রিক ছাত্রগণ যে অতিরিক্ত বিষয় পাঠ করে, তাহা তাহার আবশ্যকতার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুতরাং কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্য হইতে অনধিক দুইটি বিষয় প্রত্যেক ছাত্রকেই পাঠ করিতে হইবে। এই সমস্ত অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে—হিসাব, জরিপ, প্রাণীতত্ত্ব, ব্যবসায়-পদ্ধতি, ব্যবসায়িক ভূগোল, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি থাকিবে।

কমিটির মতে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা বিভিন্ন ধরণের হওয়া আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। কমিটি পরামর্শ দিয়াছেন যে, ছাত্রীদের জন্য সঙ্গীত ও গার্হস্থ্যবিদ্যা অতিরিক্ত বিষয়ের অন্তর্গত করা হউক।

সিনেট যদি এই রিপোর্ট গ্রহণ করেন, তবে উহা, ১৯৩৩ সাল হইতে তৃতীয় শ্রেণী হইতে উহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে এবং বর্ত্তমানে যে ছাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে, তাহাকে ১৯৩৬ সালে নূতন নিয়মানুসারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হইবে।

আশা করি, কমিটি সিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিলে শিক্ষার বনিয়াদ যে সুদৃঢ় হয় না, মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইলে যে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে, সহজে, অনায়াসে যথার্থ উচ্চ শিক্ষা লাভ করা যায়, ইহা এমন স্বতঃসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য যে, এই বৈজ্ঞানিক যুগে এই সত্যের সমর্থনের জন্য যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বহু দিন ধরিয়া সাহিত্য পরিষদ যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভাইস-চ্যান্সেলারগণ যে প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, স্যার আশুতোষের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাঙ্গালা ভাষার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সিনেট তাঁহাদের স্মৃতির সম্মান রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না, ইহা সকলেই আশা করিতেছেন। আর, কমিটি মেয়েদের জন্য যে স্বতন্ত্র শিক্ষা-পদ্ধতির প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহারও সমর্থন করিতেছি। মেয়েদের শিক্ষা পাওয়া চাই, এ সম্বন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যেহেতু মেয়েরা পুরুষ নয়—মেয়ে, অতএব, তাহাদের শিক্ষাও তদনুরূপ হওয়া আবশ্যক—ইহাও স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সুতরাং কমিটি মেয়েদের স্বতন্ত্র শিক্ষাপদ্ধতির প্রস্তাব করিয়া ভালই করিয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি, কমিটীর সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ্যে প্রকাশিত করিয়া জনসাধারণকেও সেগুলির বিচার ও সে সম্বন্ধে মত প্রকাশের অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য।

কলিকাতার আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য—

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য কলিকাতার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, জানুয়ারী মাসে দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল, ফেব্রুয়ারী মাসে হইয়াছে দুই কোটী ষাট লক্ষ টাকার। গত বৎসর (১৯৩১) ফেব্রুয়ারী মাসে বিদেশ হইতে কলিকাতায় মাল আসিয়াছিল তিন কোটী তেষট্টি লক্ষ টাকার। আর জানুয়ারী মাসে রপ্তানী হইয়াছিল ৪ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকার; ফেব্রুয়ারী মাসে হইয়াছে ৪ কোটী ২৪ লক্ষ টাকার। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারীর রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৬০ লক্ষ টাকার; সুতরাং এবার সামান্য কিছু বাড়িয়াছে। আমদানী মালের মধ্যে সূতী মালের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই; তৈল, খনিজপদার্থ ও ধাতুদ্রব্যের আমদানী বাড়িয়াছে। আর কলকব্জা, লৌহ ও ইস্পাত চিনি, মদ্য, লোহার জিনিস ও তামাকের আমদানী কমিয়াছে। তন্মধ্যে কলকব্জার হ্রাসের পরিমাণ ২৪ লক্ষ ও চিনির হ্রাসের পরিমাণ ২২ লক্ষ টাকার। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে পাট ও খাদ্য শস্য ও ময়দার রপ্তানী কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে; অন্য সকল জিনিসের রপ্তানী কমিয়াছে। তন্মধ্যে কাঁচা পাটের হ্রাসের পরিমাণ ৪০ লক্ষ এবং চায়ের হ্রাসের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা। মোটের উপর বাজারের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ সমান ছিল; অর্থাৎ দুইই তিন কোটী ৬৩ লক্ষ টাকার। এ বৎসর আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ কিছু বেশী আছে।

বাঙ্গালার কৃষি-শিল্প বিভাগ—

বাঙ্গলাদেশের শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য যে কয়েকটি বিভাগ আছে, তন্মধ্যে কৃষি (agriculture), শ্রম-শিল্প (industry), সেচ (irrigation) এই তিনটি বিভাগের সহিত বাঙ্গলার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ

এবং অপর বিভাগগুলির সহিত পরোক্ষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বাঙ্গলার জনসাধারণ বলিতে আমরা সহরবাসী মুষ্টিমেয় জনকতক শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তি মনে করি না। বাঙ্গলার জনসাধারণ বলিতে সেই পল্লীবাসী অশিক্ষিত কৃষক-সম্প্রদায়—সেই দরিদ্র নারায়ণকেই বুঝিতে হয়—যাহারা বাঙ্গলার লোকসংখ্যার শতকরা ৭০।৮০ ভাগ। এই তিন বিভাগের কার্য্যপদ্ধতির উপর বাঙ্গলার জনসাধারণের ভাল-মন্দ নির্ভর করিতেছে। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে কৃষি-বিভাগের সহিত কৃষক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ স্বভাবতই অধিক হইবার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা নহে। তাহার প্রধান কারণ, কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার একান্ত অভাব। এই বিভাগের (এবং অপর তুইটি বিভাগেরও) কার্য্যাদি প্রায় ইংরেজি ভাষাতেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; বাঙ্গলায় যদি কিছু হয়, তাহাও অতি সামান্য। সেই সামান্য কিছুও কৃষক সম্প্রদায়ের গোচর করিবার কিরূপ সুব্যবস্থা আছে তাহাও জানা যায় না। বাঙ্গলার স্থানে স্থানে যে কয়টি সরকারী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র আছে, তথায় অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় উপদেশ ও পরীক্ষার ফল হিসাবে কতখানি সাহায্য পায়, তাহাও বুঝা যায় না। কৃষিবিভাগ হইতে যে সকল সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে অতি উচ্চাঙ্গের কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানের কথা থাকিলেও, তাহা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা উচ্চ শিক্ষিতদের জন্যই লিখিত হইয়া থাকে—ইহা বাঙ্গলার কৃষক সম্প্রদায়ের উদ্দিষ্ট নহে। এই জ্ঞান, অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ যাহাতে কৃষকদের কুটীরে পৌঁছিতে পারে, তাহার কি কোন উপায় করা যায় না? আমরা সরকার এবং দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে ইহার একটা সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করি।

---

* দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, কৃষিবিভাগীয় কয়েকখানি সাময়িক পত্র আমাদের টেবিলে রহিয়াছে, যথা—"Agriculture and Live-stock in India." "Scientific Reports of the Imperial Institute of Agricultural Research, Pusa," প্রভৃতি। ইহাতে যে সকল প্রবন্ধ রহিয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞদের জন্য বিশেষজ্ঞদের লেখা—সাধারণ পাঠকদের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ্য। অথচ ইহাতে এমন অনেক কথা আছে যাহা জানিলে নানা দিক দিয়া কৃষকের অনেক উপকার হইতে পারে। এই সকল তথ্যের সার মর্ম্ম সহজ, সরল, প্রাঞ্জল প্রাদেশিক, স্থানীয়, গ্রাম্যভাষায় লিখিয়া গ্রাম্য কৃষকদিগকে বুঝাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, তাহারা যেমন উপকৃত হয়, সরকারের কৃষি-বিভাগের পরিচালনও তদ্রূপ সার্থক হইতে পারে। প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের কৃষিবিভাগ হইতে এই চেষ্টা হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রভূত অর্থব্যয়ে এত বড় একটা বিভাগ পোষণ করা হইতেছে, অথচ কৃষক সম্প্রদায় ইহা হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশেষ কোন সুবিধা পাইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নয়? শ্রমশিল্প-বিভাগ ও সেচ-বিভাগের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। শ্রমশিল্প-বিভাগ হইতে মধ্যে মধ্যে দুই একখানি পুস্তিকা বাহির হয় দেখিতে পাই—ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা করিলে অর্দ্ধ ও অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরা সেই সকল পুস্তিকা হইতে কিছু কিছু উপকার পাইতেও পারে; কিন্তু অপর দুইটি বিভাগ হইতে সেরূপ কোন বন্দোবস্ত হইতে দেখিতে পাই না।

আচার্য্য রায় জয়ন্তী—

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে আচার্য্য রায় জয়ন্তী উৎসবের যে কল্পনা হইয়াছে, এবং এই উদ্দেশ্যে যে জেনারেল কমিটি গঠিত হইয়াছে, গত ৯ই চৈত্র রামমোহন লাইব্রেরী হলে সেই জেনারেল কমিটির একটি অধিবেশন হয়। উৎসবের কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই সভায় একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি হইয়াছেন স্যার নীলরতন সরকার। শ্রীযুক্তা অবলা বসু, জষ্টিস্ স্যার সি, সি, ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী, স্যার সি, ভি, রমণ, জষ্টিস্ মন্মথনাথ মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী, স্যার এন্, এন্, সরকার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল স্যার হাসান সুরাবর্দ্দী, ডাক্তার বি, সি, রায়, অধ্যক্ষ বি, এম্, সেন, শ্রীযুক্ত জি, ডি, বিরলা ও স্যার

হরিশঙ্কর পাল সহ-সভাপতি হইয়াছেন এবং ডাক্তার সত্যচরণ লাহা কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন।

উৎসব যে আচার্য্য রায়ের মর্য্যাদার উপযোগী সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইবে, কমিটি দেখিয়া এইরূপই প্রতীয়মান হইতেছে।

নূতন অর্ডিন্যান্স—

কিছুকাল ধরিয়া অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স পাশ হওয়ায় "অর্ডিন্যান্স" কথাটি জনসাধারণের কাছে উদ্বেগ ও আতঙ্কের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অর্ডিন্যান্স মাত্রেই যে আতঙ্কের বস্তু নয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ নং অর্ডিন্যান্সে। বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্সটি ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালের বিশেষ ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হইলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বপূর্ব্ব অর্ডিন্যান্স দুইটিতে যে আতঙ্কের ব্যথা ফুটিয়াছে, শেষোক্ত অর্ডিন্যান্সটি তাহাতে প্রলেপের কার্য্য করিবে; অর্থাৎ স্পেশিয়াল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হাইকোর্টে আপীলের অধিকার প্রাপ্ত হইল। ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। কারণ, হাইকোর্টের বিচারে দেশবাসীর যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে, আপীলের মামলায় হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত করিবেন, সে সিদ্ধান্তে দেশবাসী জনসাধারণের অসন্তোষের কোন কারণ থাকিবে না।

আবগারি বিভাগের আয় হ্রাস—

বাঙ্গলার আবগারি বিভাগের ১৯৩০-৩১ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে চলিতে থাকায় মাদকতানিবারণী সমিতিগুলির প্রচার কার্য্যের তেমন অবসর ঘটে নাই। আবগারি বিভাগ হইতে আলোচ্য বর্ষে সরকারের ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯০২ টাকা আয় হইয়াছে, ১৯২৯-৩০ সালে আয় হইয়াছিল ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। দেশী মদে ২৭ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫২৯৲, গাঁজায় ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৪১৲, পচাইতে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৯৮৲, আফিমে ১১ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮৫৲, তাড়ী হইতে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৩৬৲ টাকা আয় হ্রাস পাইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে ১১৫৫ মণ ৯ সের গাঁজা বিক্রয় হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ১৫৫৯ মণ ৭ সের, অর্থাৎ এক বৎসরে ৪০৩ মণ ৩৮ সের হ্রাস পাইয়াছে। মাদক বর্জ্জন আন্দোলনই এই হ্রাসের কারণ।

ভাঙ্গ—পূর্ব্ববঙ্গের লোক ভাঙ্গ খাওয়া প্রায় ত্যাগ করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গেই অধিকাংশ ভাঙ্গ বিক্রয় হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩৩৪ মণ ৫ সের ভাঙ্গ কাটতি হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৩৯৭ মণ ২ সের অর্থাৎ ৬২ মণ ৩৭ সের কমিয়াছে।

চরস—আলোচ্য বর্ষে ৩৮ মণ এবং পূর্ব্ব বৎসর ৫৩ মণ ১৬ সের আমদানী হইয়াছে।

আফিম—১৯৩০-৩১ সালে ৮৮৫ মণ ১১ সের আফিম কাটতি হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৯৯৩ মণ ২১ সের অর্থাৎ ১০৮ মণ ১০ সের হ্রাস পাইয়াছে।

সরকারের আয় হ্রাস হওয়া অবশ্য দুঃখের বিষয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে উপায়ও নাই। জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও নীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে আবগারি আয় হ্রাস তথা মাদক দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাসে আনন্দিতই হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আনন্দ লাভেও আমরা বঞ্চিত। এই আয় হ্রাস ও বিক্রয় হ্রাস যদি স্বাভাবিকভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঘটিত—যদি মাদকদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে মাদকসেবীদের মনোভাবের পরিবর্ত্তনের ফলে—মাদকদ্রব্যের প্রতি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার ফলে এইটি ঘটিত,—তাহা হইলেই আমরা যথার্থ আনন্দিত হইতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ভয়, লজ্জা, দ্বিধা, কুণ্ঠাবশতঃ যাহারা মাদক সেবন বন্ধ রাখিয়াছে, তাহারা আবার মাদক সেবন আরম্ভ করিবে না, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। মাদক দ্রব্যের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শোক-সংবাদ

পরলোকে প্রভাতকুমার

বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাগণ আজ একটি মর্ম্মান্তিক শোকের কাহিনী শুনিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে দুঃখানুভব করিবেন—তাঁহাদের অতি প্রিয় কথা-শিল্পী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহসা পরলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। গত ২২এ চৈত্র (১৩৩৮) সোমবার রাত্রি পৌনে দুই ঘটিকার সময় এই শোকাবহ ঘটনা ঘটে। সোমবার প্রাতে তিনি সুস্থ শরীরে নিত্য নৈমিত্তিক সাহিত্য-চর্চ্চা করেন। তখন কে ভাবিয়াছিল—চব্বিশ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি চির-যাত্রা করিবেন! স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের মৃত্যুও এইরূপ আকস্মিক ভাবে হইয়াছিল। প্রভাতকুমারের এমন ভাবে পরলোকগমনে আমরা যে কি শোক পাইয়াছি, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব?

প্রভাতকুমারের জন্ম হয় ১২৭ সালের মাঘী-সপ্তমীর দিবসে। প্রতিভার উজ্জ্বল স্ফুরণের পক্ষে দিনক্ষণ যে শুভই ছিল—প্রভাতকুমারের সাহিত্যিক জীবন তাহার জীবন্ত সাক্ষী। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর প্রভাতকুমার সরকারী টেলিগ্রাফ আপিসে কিছুদিন কর্ম্ম করেন। তৎপূর্ব্বেই তিনি সাহিত্য-সেবা এবং সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গয়ায় অবস্থানকালে প্রভাতকুমারের সহিত নাটোরের পরলোকগত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের পরিচয় হয়; সেই পরিচয় পরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়া কেমন করিয়া "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র যুগল-সম্পাদকত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা কোন বাঙ্গলা সাহিত্যিকেরই বোধ হয় অজ্ঞাত নহে। টেলিগ্রাফ আপিসে কর্ম্মকালে তিনি "ভারতী", "প্রদীপ" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে কবিতা ও গল্প লিখিতেন। ইহার পর তিনি বিলাত যাত্রা করেন, এবং ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে রঙ্গপুরে, পরে গয়ায় ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় অবলম্বন করেন। বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়; তাহার পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই।

প্রভাতকুমার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, ব্যবসায়ে সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তিনি ছিলেন জন্ম-সাহিত্যিক; সাহিত্য ছিল তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র – সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভই ছিল তাঁহার কর্ম্মফল। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে – ছাত্রাবস্থাতে তিনি যে সাহিত্যচর্চ্চা সুরু করেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যসেবার জন্যই তিনি গয়াধামের ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায়



প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আসিয়া "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র ভার গ্রহণ করেন, এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইন কলেজে আইনের অধ্যাপনা করেন।

টেলিগ্রাফ আপিসে কর্ম্ম করিবার সময় এবং বিলাত প্রবাস কালে ব্যারিষ্টারী পড়িবার সময় তিনি বহু ছোট গল্প রচনা করিয়া ভারতীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ছোট

গল্প রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিশেষতঃ তাঁহার বিলাতী অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যে সব ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের পরে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

উপন্যাসও তিনি অনেকগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাঠক সমাজে তাঁহার উপন্যাসগুলির যে সম্যক আদর হইয়াছে—উহাদের একাধিক সংস্করণই তাহার পরিচয়। প্রভাতকুমার ছিলেন মিতভাষী ও মিষ্টভাষী, সদালাপী ও ধীমান ব্যক্তি।

কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ যাইতেছিল না; তাই বলিয়া তাঁহার যে অকস্মাৎ মৃত্যু হইতে পারে ইহাও কেহই আশা করেন নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। তাহার অশীতি-বর্ষীয়া জননী এখনও বর্ত্তমান। দুইটি পুত্র, চারিটি পৌত্র ও দুইটি পৌত্রী তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমান্ অরুণকুমার ও কনিষ্ঠের নাম শ্রীমান প্রশান্তকুমার। উভয়েই মেডিক্যাল কলেজের এম-বি এবং যশস্বী চিকিৎসক। আমরা তাঁহাদের কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব,—আমরাই যে শোক-বিহ্বল।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "পোষ্যপুত্র" শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিণত; মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "এরা, ওরা এবং আরো অনেকে" মূল্য—২৲

শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "কলরব"; মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "মূর্খ কে?" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই "শাপমুক্তি" মূল্য—১।•

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "শেষের দাবী"; মূল্য—২।•

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সুন্দরী"; মূল্য—২৲

শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন রায় প্রণীত স্বরলিপি পুস্তক "গীতাঙ্কুর"; মূল্য—৸•

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহানাটক "সতী"; মূল্য—।৵•

এম, মাণিক বখ্‌শ সাহেব প্রণীত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক "পাঠান-প্রতিষ্ঠা"; মূল্য—১।•

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড; মূল্য—৪৲

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই "বাঘ-সিংহের মুখে"; মূল্য—॥•

নিবেদন

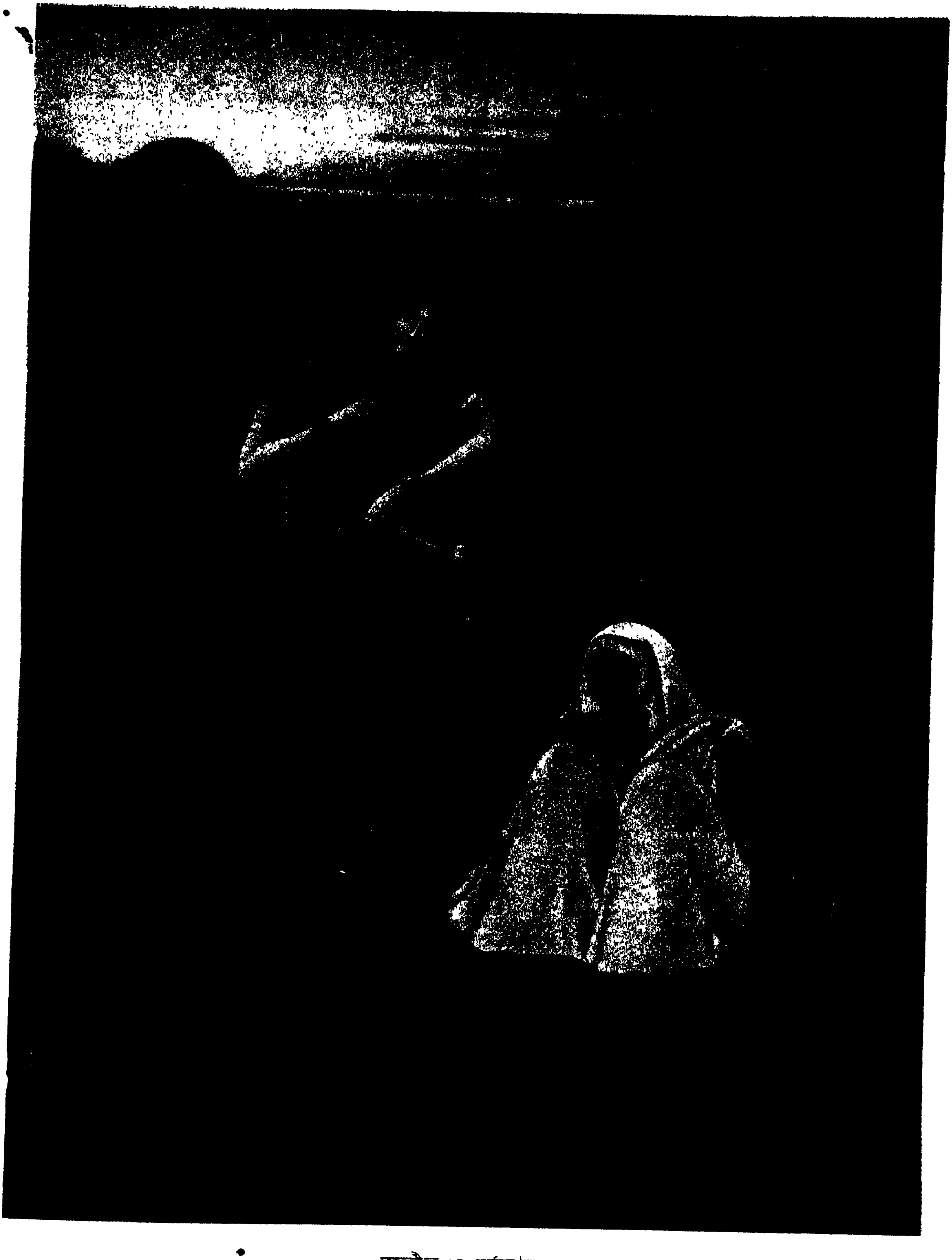
আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬।৵০, ভি, পিতে ৬॥৵০, ষাণ্মাসিক ৩৶• আনা, ভি, পিতে ৩॥•। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নং** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

পুনশ্চ—এই উনবিংশ বর্ষকাল "ভারতবর্ষে" সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের যে সকল শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের অগোচর নাই। কেবল এক বৎসরের কথাই বলি—উনবিংশ বর্ষে কিঞ্চিদধিক ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০ খানি বহুবর্ণ চিত্র ও ন্যূনাধিক ৯০০ একবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটী বিষয় বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য; এই বৎসরে চারিখানি খ্যাতনামা কথা-শিল্পীর উপন্যাস সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে, বিংশ বর্ষেও এই রীতি অনুসৃত হইবে, আমাদের সৌভাগ্য এই যে, প্রথম বর্ষ হইতে "ভারতবর্ষ" যে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা একটুও ম্লান হয় নাই। বিংশ বর্ষের জন্য "ভারতবর্ষ" কিরূপ আয়োজন করিয়াছে, আমরা নিজ মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না—বিগত উনবিংশ বর্ষের "ভারতবর্ষে"র পরিচালনার কথা আলোচনা করিলেই পাঠকগণ স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কর্ম্মকর্তা—"ভারতবর্ষ"

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJAE.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.



অতীত ও বর্ত্তমান

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পরমেশ রায়

শ্রীযুক্ত সুকুমার বসুর সৌজন্যে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works



জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৯

দ্বিতীয় খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ {

নূতন মনোবিদ্যা

ডক্টর শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র এম-এ, পিএইচ-ডি

মানুষের মন স্বতঃই বহির্মুখী। বাহিরের জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ; অন্তরের জিনিষের খবর লওয়া কঠিন, তাই সাধন-সাপেক্ষ। কেবল শিশুরাই শুধু বাহিরের জিনিষ লইয়া ভুলিয়া থাকে। শিশুর বয়স বৃদ্ধি হইলে, কিশোর যৌবনে পদার্পণ করিলে বাহিরের জিনিষ শুধু বাহিরের জিনিষ হিসাবে আর তাহার মনে স্থান পায় না। বাহিরের জিনিষ যখন নিজের মনের প্রতিবিম্বরূপে, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির বিষয়রূপে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই তাহার ডাকে যুবকের মন সাড়া দেয়। মন তখন সুখদুঃখ অনুভব করিতে শিক্ষা করিয়াছে, নিজের দিকে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, অন্তর্দৃষ্টির সূচনা হইয়াছে। জীবনধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক, সাধারণতঃ ততটুকু অন্তর্দৃষ্টিই বিকশিত হয়। ততটুকুই যথেষ্ট।

ব্যষ্টি মন যে পথ ধরিয়া বিকশিত হয় সমষ্টি মনের বিকাশের পথও তদ্রূপ। তাই বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রথম যুগে পদার্থবিদ্যাই একমাত্র আলোচনার বিষয়,—সমষ্টি মন তখন শিশু-মনের মতই বহির্মুখী। Newton, Kepler, Galileo, এই যুগের পুরোহিত। তাহার পর এই সমষ্টি মন যখন নিজের দিকে ফিরিল, মনোবিদ্যার চর্চ্চা

আরম্ভ হইল। Fechner, Wundt প্রভৃতি এই যুগের প্রবর্ত্তক।

মনোবিদ্যার আলোচনায় দেখা গেল, মন সমতল ভূমি নহে। এখানে পর্ব্বত আছে, সমুদ্র আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, স্রোতস্বতী-ধারা আছে, সুগন্ধ পুষ্প-পরিপূর্ণ উদ্যান আছে, আবার জঘন্য কীট পতঙ্গাদি সমাকুল অন্ধকারময় গহ্বরও আছে। কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে আমরা মনের এই পরিচয়ই পাই। সাহিত্যে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রেমের বন্যা বহে, করুণাধারায় জগৎ প্লাবিত হয়, প্রতিজ্ঞা হিমালয়ের মত অটল থাকে, Vesuviusএর অগ্ন্যুদ্গীরণের ন্যায় হঠাৎ ক্রোধের বিকাশ হয়, হিংসার বিষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, আবার প্রশান্ত মহাসাগরের মত স্থির ধীর উদার চরিত্র বিরাজ করে।

কিন্তু যুগের হাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এখন হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কত উচ্চ, কেবলমাত্র তাহা জানিয়া লোকে সন্তুষ্ট হয় না; সেই অত্যুচ্চ শিখরে কি আছে তাহা জানিবার জন্য তথায় অভিযান করে। মহাসাগরের মহা গভীরতার বিষয়ে শুধু জ্ঞান লাভ করিয়া তৃপ্তি হয় না, তাহার সর্ব্বনিম্ন স্তরে কি রত্ন লুক্কায়িত আছে তাহা জানিবার জন্য মানুষ তথায় পৌঁছিতে চেষ্টা করে। বহির্জগতে যেরূপ, অন্তর্জগতেও সেইরূপ। মানব-মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূল কি, মনোরাজ্যের সর্ব্বনিম্ন স্তরে কি আছে তাহা জানিবার কৌতূহলও অদম্য হইয়া উঠিল। তাই মনের মধ্যেও ডুবুরী নামিতে লাগিল। Vienna সহরের এক মহাপণ্ডিত প্রথম এই গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন। তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ আলোকের সাহায্যে সেই প্রদেশে লুক্কায়িত চিন্তা-কণার ও ভাব-সমষ্টির সাক্ষাৎলাভ করিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি সেই বিষয় সকলকে জানাইলেন। কিরূপে, কোন্ পথে তথায় প্রবেশ করিতে পারা যায়, তাহারও ইঙ্গিত করিলেন। কেহ বিশ্বাস করিল, বহু লোক করিল না। ক্রমে অনেকেই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে আরম্ভ করিলেন ও তাঁহার আবিষ্কারের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইলেন। Viennaর সেই পণ্ডিতের, সেই প্রথম পথনির্দ্দেশকের নাম Sigmund Freud। আজ তাঁহার নাম বিশ্ববিখ্যাত; তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথ সর্ব্বজনবিদিত।

সেই সর্ব্বজনবিদিত মনোবিশ্লেষণের পন্থার নাম Psycho-Analysis বা মনসমীক্ষণ। সর্ব্বজনবিদিত হওয়ায় একদিকে যেমন এই বিদ্যার ব্যাপ্তির পরিচয় পাই, অন্যদিকে তেমনি এই সম্বন্ধে ধারণার বৈলক্ষণ্যও যথেষ্ট দেখি। অসম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণারও অভাব নাই। যাহা হউক, সেই সমস্ত প্রচলিত ধারণার যথার্থতা বা অযথার্থতা বিচার না করিয়া এই প্রবন্ধে মনসমীক্ষণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটী কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

কারণ বিনা কার্য্য হয় না, এ কথা প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি হয় না। ইহাই হইল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্‌দের গোড়ার কথা। কিন্তু, মানসিক ব্যাপারে এই রীতি মানিয়া লইতে পূর্ব্বে অনেকেই ইতস্ততঃ করিয়াছেন, এখনও করেন। মনোবিদ্যা বিষয়েও এই রীতি যে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য, শুধু যুক্তিশাস্ত্রের দিক হইতে নয়, দৈনন্দিন মানসিক কার্য্যকলাপের বিশ্লেষণ হইতেও তাহা দেখা যায়। যেমন প্রাকৃতিক ব্যাপারে, তেমনি মানসিক ব্যাপারেও আকস্মিক (chance) বলিয়া কোন জিনিষ নাই। হঠাৎ আমার মনে কোন চিন্তার উদয় হইল, হঠাৎ অস্বাভাবিক ক্রোধের উদ্রেক হইল, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে কি কারণে ঐ চিন্তার, ঐ ভাবের উদয় ঐ সময়ে হইয়াছিল, তাহা ধরা পড়িবে। বস্তুতঃ এই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ মানসিক ব্যাপারেও মানিয়া লইতে না পারিলে মনসমীক্ষণ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা অসম্ভব হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি মানুষের ইচ্ছা, মানুষের চিন্তা স্বাধীন নয়? সমস্ত কার্য্যকলাপই কি তাহার নিয়মের দাস? তাহা হইলে ধর্ম্ম, সমাজনীতি প্রভৃতির অর্থ কি? এই প্রবন্ধে ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিবার অবকাশ হইবে না; শুধু এই কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে, ধর্ম্ম সমাজনীতি সংক্রান্ত ধারণা ও আদর্শসমূহও মনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। মনের আইন মানিয়া তাহারাও চলে। ধর্ম্মভাবেরও পরিণতি হয়, সমাজনীতিরও ক্রমবিকাশ আছে।

মনসমীক্ষণ মনকে বল ও গতিধর্ম্মশালী (dynamic) বলিয়া মানে। প্রাকৃতিক ব্যাপার যেমন এক জড়শক্তির, নানা রকমের বিকার মাত্র, মানসিক ব্যাপারও সেইরূপ এক মানসিক শক্তির নানা ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র।

মনসমীক্ষীদের এই ধারণা মনোবিজ্ঞানক্ষেত্রে নূতন নহে। তবে মনের বিভিন্ন স্তরের কল্পনা ও তাহাদের কার্য্যাবলীর বিচারই মনসমীক্ষণের নূতন ও অমূল্য দান।

আমরা যখন কোন একটী বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকি, তখন সেই বস্তুটিই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাই। তার আশপাশের দ্রব্যাদিও দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ততটা পরিষ্কার ভাবে নয়। আরও দূরের জিনিষ আর দেখিতে পাই না। মনোজগতেও এইরূপ। এখন এই মুহূর্ত্তে যে বিষয়টী চিন্তা করিতেছি, সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট ভাবে মনের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যাহা চিন্তা করিয়াছি, যাহা এখনও আবার মনে করিতে পারি, তাহা অত পরিস্ফুট নহে, তাহা যেন ঠিক এই স্তরের নিম্নে আছে। আবার অনেক চেষ্টা করিয়াও যাহা এখন একেবারেই মনে করিতে পারি না, মনের সর্ব্বনিম্ন স্তরে তাহাদের স্থান কল্পনা করিতে পারি। এই তিনটী স্তরের নাম যথাক্রমে conscious বা সংজ্ঞান, pre-conscious বা আসংজ্ঞান ও un-conscious বা নির্জ্ঞান।

এই যে কোন কোন কথা একেবারেই মনে করিতে পারি না, তাহা সকলেই জানেন। ভুলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক হইলেও, কি ভুলিয়া যাইব, আর কি মনে করিয়া রাখিব, তাহার মধ্যে যে একটী সমস্যা রহিয়া যাইতেছে তাহা অনেকেই উপলব্ধি করেন না। বাল্যকালের একটী কথা কেন ভুলিয়া যাইলাম, সেই সময়ের আর একটী কথা কেনই বা মনে করিয়া রাখিলাম, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার বিষয়। এই অনুসন্ধানের ফলেই নির্জ্ঞান সম্বন্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে Freud অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি মনোবিদ্যার দিক্ হইতে এই চর্চ্চা আরম্ভ করেন নাই। তিনি চিকিৎসক; মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসাকল্পে, বিশেষতঃ একটী হিষ্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসাকালে তিনি এই সমস্ত তত্ত্বের সন্ধান পান। ক্রমশঃ এই তত্ত্বানুসন্ধানই তাঁহার প্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করেন; এবং সেই অবধি, মনো-বিদ্যালোচনার সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতেই, এই কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে তাঁহার মতে কামই আমাদের অনেক কার্য্যের, অনেক চেষ্টার মূল। এ কথায় চমকিত হইবার, কিম্বা ভ্রূ কুঞ্চিত করিবার কিছুই নাই। কাম শব্দ অতি ব্যাপক। ইহাতে শুধু স্ত্রীপুরুষের রমণেচ্ছাই বুঝায় না। চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষে কাম শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় Freudএর Libido বা কাম সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজের আইন মানিয়া তাহাকে চলিতে হয়; অই তাহার সমস্ত প্রকারের অসামাজিক ইচ্ছা পূরণ হইতে পায় না। ইচ্ছা হইলেই আর এক জনকে মারিয়া ফেলা যায় না। কতক ইচ্ছা তাই দমন করিতেই হয়। এরূপ অসামাজিক ইচ্ছা যে মানুষ মাত্রেরই, এমন কি সামাজিক হিসাবে খুব উন্নত ব্যক্তিদেরও মনে মাঝে মাঝে উদয় হয়, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সাহিত্যিকদের মধ্যে সমালোচককে দুই ঘা কসাইয়া দিবার ইচ্ছা বোধ হয় খুব বিরল নহে। সকলের অপেক্ষা অসামাজিক ইচ্ছা এবং সেই জন্য সকলের চেয়ে বেশী অবদমিত হয় কাম-সংক্রান্ত ইচ্ছা। তাই মনসমীক্ষণশাস্ত্রে কামের কথা এত বেশী থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন বল ও গতিধর্ম্মী। যে সমস্ত ইচ্ছা অবদমিত হয় অর্থাৎ নির্জ্জনে চলিয়া যায়, তাহারা তথায় নিশ্চেষ্ট থাকে না। জোর করিয়া ডোবান গোলার মত ক্রমাগতঃ উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে থাকে; কিন্তু সোজা পথে উপরে উঠিতে তাহারা বাধা পায়। কোথা হইতে বাধা আসে, তাহাই এইবার বলিব।

সভ্যতার ও সমাজের কতকগুলি আদর্শের ভিতর দিয়া শিশু-মন গঠিত হইতে থাকে। শিশু সে আদর্শগুলিকে বিচার না করিয়া অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করে। সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্ব-নিম্ন স্তরের সংঘাতে ক্রমশঃ মনের মধ্যেই একটী ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। Freud তাহার নাম দিয়াছেন Censor বা প্রহরী। প্রহরী বা Censor এর কাজ কি, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার কৃপায় তাহা বুঝিতে আর কষ্ট করিতে হইবে না। মনের প্রহরী যাহা কিছু অসামাজিক বলিয়া মনে করে, তাহাই অবদমন করে। যে ইচ্ছা অবদমিত হয়, তাহা যে বাস্তবিক আমাদের নিজের মনেরই ইচ্ছা তাহা জানিতে পারি না। প্রশ্ন হইতে পারে,

এরূপ অবদমিত ইচ্ছা যে আছে তাহা স্বীকার করিব কেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত।

আমরা দেখিতে পাই সমুদ্রের স্রোত একদিকে কিন্তু উহাতে ভাসমান বরফের স্তূপ অন্যদিকে চলিতেছে। উহা হইতে এই তথ্যে উপনীত হওয়া গেল যে, বরফস্তূপের যতটুকু অংশ উপরে দেখিতেছি, ততটুকুই উহার সব নয়। নীচে আরও আছে; এবং নীচের জলের স্রোতের টানে অন্যদিকে চলিতেছে। আগ্নেয়গিরি হইতে হঠাৎ ধূম নির্গত হইতে থাকিলে এই সিদ্ধান্তই করি যে, যদিও অগ্নি দেখিতে পাইতেছি না, গিরি-গুহাভ্যন্তরে উহা বিদ্যমান আছে। এইরূপ সর্ব্বাবস্থাতেই কার্য্য দেখিয়া আমরা কারণ অনুমান করি এবং পরে তাহার সত্যতা পরীক্ষা করি। মানসক্ষেত্রেও ঠিক ঐ ভাবেই বিচার করিতে হইবে। একটী লোকের অপর কোন ব্যক্তির সহিত ব্যবহারে যদি দেখিতে পাই যে, দ্বিতীয়োক্তটী ঘরে আসিলেই প্রথমোক্তটী উঠিয়া যায়, অন্য লোকের সহিত মিষ্ট আলাপন করিলেও ইহারা দুজনে পরস্পরের সহিত মন খুলিয়া কথা কয় না, তাহা হইলে উহারা স্বীকার না করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, উহাদের মধ্যে সদ্ভাবের নিশ্চয়ই প্রাচুর্য্য নাই। সেইরূপ, নিজের ব্যবহার নিজেই বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিলে যদি এইরূপ কোন ঘটনার আভাস পাই, তাহা হইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় যে, আমার মনে কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি শত্রুভাব লুক্কায়িত আছে। সংজ্ঞানে তাহার প্রতি বিরূপতার কোন কারণ খুঁজিয়া না পাওয়া যাইলেও নির্জ্ঞানে তাহার কারণ বিদ্যমান আছে বুঝিতে হইবে। আবার শুধু যুক্তির দিক দিয়া নয়, যখন দেখা যাইতেছে Freud এবং অন্যান্য দেশে আরও অনেক চিকিৎসক যেমন Ferenzci, Jones, Brill,—আমাদের গিরীন্দ্রশেখর বাবুও ঐ তথ্য ভিত্তি করিয়া মানসিক ব্যাধির প্রতিকারে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন;—তখন নির্জ্ঞান মনে অবদমিত ইচ্ছা প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ়তর না হইয়া আর পারে না।

সাধারণতঃ নির্জ্ঞানের ও সংজ্ঞানের মধ্যে একটা আপোষ বন্দোবস্ত থাকে। সেই বন্দোবস্তের ব্যতিক্রম ঘটিলেই দৈনন্দিন ব্যবহারে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। সামান্য বাতিক হইতে আরম্ভ করিয়া দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি পর্য্যন্ত তাহা হইতে ঘটিতে পারে। অধিকাংশ মানসিক রোগের লক্ষণগুলি অবদমিত ইচ্ছার প্রতীক মাত্র; কিম্বা সেই ইচ্ছাকে সংজ্ঞান আক্রমণ করিতে না দিবার ছল মাত্র।

সুস্থ মানুষেরও অবদমিত ইচ্ছার কাল্পনিক পরিতৃপ্তি অনেক প্রকারে হয়। একটী উপায় স্বপ্ন। প্রথমেই বলিয়া রাখি, এই স্বপ্ন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে অসমর্থ। একদিন স্বপ্ন দেখিলাম বহুদিন-বিস্মৃত বহুদূরস্থিত কোন বন্ধু মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছে, শয্যাপার্শ্বে তাহার আত্মীয় স্বজন ক্রন্দন করিতেছে। এক সপ্তাহ পরে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল। এই ধরণের দৃষ্টান্ত হয় ত কেহ কেহ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে উপস্থিত করিতে পারিবেন। প্রশ্ন এখানে, স্বপ্ন ভবিষ্যদ্বাণী কি না। এরূপ দৃষ্টান্ত স্বপ্ন-সাহিত্যে বেশী আছে বলিয়া আমার জানা নাই। স্বপ্নের ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষ কি না তাহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যুক্তিসম্মত সহজ সরল ব্যাখ্যা থাকিতে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয় বলিয়াই মনে হয়।

স্বপ্ন যে ইচ্ছারই পরিস্ফূর্ত্তি, ছোট শিশুদের স্বপ্নে তাহা বেশ প্রতিপন্ন হয়। ছেলেকে লইয়া Botanical gardenএ যাইবার প্রস্তাব হইল। তাহাতে সে বেশ মাতিয়া উঠিয়া অনেক আশা অনেক কল্পনা করিল। কিন্তু কার্য্যগতিকে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না, ছেলে দমিয়া গেল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিল, সে Botanical gardenএ বেড়াইতেছে। এখানে কার্য্যতঃ যে ইচ্ছা পূরণ হইল না, স্বপ্নে তাহা কাল্পনিক ভাবে চরিতার্থ হইল। বয়স্ক ব্যক্তিদের ইচ্ছা সব সময়ে অত সরল কিম্বা অত নির্দ্দোষ হয় না। তাই সেই সব ইচ্ছা অত সহজে সংজ্ঞানে আসিতে পারে না। তখন ইচ্ছার এক একটী অংশ এক একটী প্রতীকের সাহায্যে স্বপ্নে দেখা দেয়। নিজের হিংস্র-প্রকৃতি ব্যাঘ্রের রূপে দেখা দিল; যাহার উপর আক্রোশ সে হয় ত অন্য ক্ষুদ্র জন্তুরূপে আসিল এবং স্বপ্নে দেখিলাম ব্যাঘ্র ভীষণভাবে ক্ষুদ্র জন্তুটীকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপে নিজের বাসনা চরিতার্থতা লাভ করিল। যেরূপ দেখি সেই ভাবেই লইলে স্বপ্ন সম্পূর্ণ নিরর্থক বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়। Freud বলেন, স্বপ্নে যাহা বাস্তবিক দেখি, তাহা উহার manifest content

বা ব্যক্ত অংশ। উহার অনেকটাই প্রতীক দিয়া গঠিত। সেই সমস্ত প্রতীকের অর্থ নির্ণয় করিতে পারিলে যাহা পাই, তাহা উহার latent content বা স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ। এই অব্যক্ত অংশের ভিতর অসামঞ্জস্য কিছুই থাকে না। পরস্পর সঙ্গতিসম্পন্ন পরিষ্কার অর্থ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এবং সেই অর্থ আবার অতৃপ্ত অবদমিত বাসনার পরিতৃপ্তি। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিল যে, সে খালি পায়ে, কেবলমাত্র চাদর গায়ে দিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছে। ঐ বেশ অশৌচের প্রতীক। বিশ্লেষণে জানা গেল, সে তাহার পিতার মৃত্যুকামনা করিতেছে।

সুস্থ ব্যক্তিদের ইচ্ছার নির্জ্ঞান হইতে সংজ্ঞানে আসিবার আর একটী উপায়ের নাম Sublimation অর্থাৎ উদ্গতি। কোন অসামাজিক ইচ্ছার পরিতৃপ্তি না হওয়াতে যদি সেই বৃত্তি কোন সমাজ-অনুমোদিত পথ অবলম্বন করিয়া বাহিরে প্রকাশ পায় তাহাকে বলে উদ্গতি। শিশুকালে অন্যের কোন অঙ্গ দর্শন বাসনা হইতে পরিণত বয়সে চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রগাঢ় অনুরক্তি হওয়া ও তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করার কথা নূতন নহে। ব্যর্থপ্রেমিক হঠাৎ শিকারী হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে বড় বড় জানোয়ার শিকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিম্বা হঠাৎ অসম্ভব রকম ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব কি? সাহিত্যে এরূপ চরিত্র আপনারা নিজেরাই অনেক সৃষ্টি করিয়াছেন।

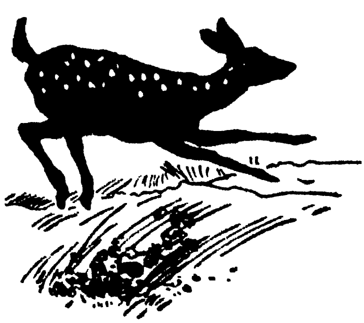
এইরূপ সমস্ত সোজাসুজি পথ যখন উন্মুক্ত না থাকে, তখনই রোগের সূত্রপাত হয়। মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অবদমিত বাসনা যে কত রকমে নিজেদের চরিতার্থতা লাভে প্রয়াস পায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক একটী রোগীর এক একটী পথ। তবে কতকগুলি বড় বড় লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া রোগসমূহের শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত বর্ণনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অসংখ্য রোগীর আত্মকথা শুনিতে শুনিতে Freud আর একটী সারবান তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ও সেইমত কার্য্য করিতে পারিলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। এই তথ্য শিশুমন-সম্বন্ধীয়।

সাধারণতঃ সকলেরই ধারণা, শিশুমন বড় নির্দ্দোষ; শিশুমনে যে কাম-বাসনার কালিমাময় কোন আঁচড় পড়িতে পারে, এ কথা বাতুলের প্রলাপের ন্যায় উড়াইয়া দিবার যোগ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কাম-বাসনা কালিমাময় কি না বা মনে তাহার উদ্রেক হওয়া দোষের কি না সে বিচার মনোবিদ্‌রা করেন না। যাহা হয়, তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। সুতরাং ঐ বিশেষণগুলি বাদ দিয়া তাঁহারা বলেন শিশু-মনে কামের উদ্রেক হয়। কিশোরবয়সে হঠাৎ একদিন কামচেতনা জাগে না। কিশোর-বয়সপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নানা স্তরের ভিতর দিয়া ঐ কামপ্রবৃত্তি আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়। এমন কি Freudএর মতে পাঁচ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মানবচরিত্রের মূলভিত্তি স্থাপিত হইয়া যায়। কাম-প্রবৃত্তির এই ক্রম-জাগরণের একটী বিশেষ ধারা আছে ও অনেকগুলি স্তর আছে। মানসিক রোগীমাত্রেরই রোগের কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ধারার কোন না কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদিগের পিতামাতার কিম্বা অন্য যাঁহাদের উপর তাহাদের ভার ছিল, তাঁহাদের অজ্ঞতা নিবন্ধই উহা ঘটিয়াছে; কতক ক্ষেত্রে সহজাত দোষই ইহার কারণ।

এইবার, আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে অবদমিত ইচ্ছা কিরূপে আপনাকে ব্যক্ত করে তাহার কিছু পরিচয় দিব। একটী পরিচিত নাম প্রয়োজনের সময় বিস্মৃত হওয়া বোধ হয় কোন না কোন সময়ে সকলের অভিজ্ঞতাতেই আসিয়াছে। মনসমীক্ষণের দ্বারা অনেক সময় দেখা যায়, সেই নামের সহিত কোন একটী অপ্রীতিকর ঘটনা জড়িত আছে। সেই অভিজ্ঞতাটী পুনরায় মনে আনিতে চাহি না; তাই তাহার সহিত জড়িত নামটীও ভুলিয়া যাই। হাঁসপাতালে কোন রোগীর একটী নার্সের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু হাঁসপাতাল হইতে ফিরিবার পর নার্সকে পত্র লিখিবার সময় তাহার বড় মুস্কিল হইতে লাগিল। কিছুতেই নার্সের পদবী মনে করিতে পারে না। নার্সের চিঠি দেখিয়া কিছু সুবিধা হইল না, কারণ সমস্ত চিঠিতেই সে গোড়ার নামই সই করিয়াছে। একবার ক্রমান্বয়ে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত পদবী মনে করিতে পারিল না এবং পত্রও পাঠাইতে পারিল না। বিশ্লেষণে জানা গেল, লোকটী পূর্ব্বে আরও দুইটী মেয়েকে ভালবাসিয়াছিল। তিনজনেরই প্রথম নাম একই। সে নাম সে ভুলে নাই। পদবীটি ভুলিয়া যাইয়া তিনজনকে এক করিয়া মনে মনে সে

তাহার প্রেমের পাত্রের নিকট খাঁটীই রহিয়া গেল। আমাদের যাহা দেয় তাহা ভুলিয়া যাই যেমন রবিবাসরের চাঁদা প্রভৃতি কিন্তু যাহা প্রাপ্য তাহা মনে থাকে। পকেটের চিঠি পকেটেই থাকিয়া যায়, ডাকে দিতে ভুলিয়া যাই। কোন জায়গায় যাইবার কথা দিয়া যাইতে ভুলিয়া যাই। অনেক সময় একটা কথার পরিবর্ত্তে অন্য কথা ব্যবহার করিয়া বসি। সাধারণতঃ ঐরূপ ভুলসমূহ আকস্মিক বলিয়া চলিয়া যায়। একটা মহিলা বার্ণার্ড সএর লেখা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন "I think very highly of all my writings." তিনি নিজে ছোট গল্প লিখিতেন। এখানে ভুলের অর্থ সকলেই উপলব্ধি করিবেন। Dr. Jonesএর এক বন্ধু মোটরে আস্তে আস্তে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় একটা লোক সাইকেলে রাস্তার ভুল দিক দিয়া অতি বেগে আসিয়া ধাক্কা লাগাইল, তাহার যান চূরমার হইয়া গেল। সারাইয়া লইয়া Jonsএর বন্ধুর নিকটে ৫০ ডলারের এক বিল পাঠাইল। বন্ধু দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় আদালতে নালিশ করিল। বন্ধুর সহিত দেখা হইতে Jones মামলার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধু বলিলেন "জজসাহেব অসাবধানতার সহিত সাইকেল চালাইবার জন্য কয়েদীকে তিরস্কার করিয়াছেন।" Jones বলিলেন, "কয়েদীকে? ফরিয়াদিকে বল!" বন্ধু বলিলেন "হ্যাঁ, কিন্তু উহার জেলে যাওয়াই উচিত ছিল।" এখানে ইচ্ছা কথার ভুলে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। খামে ভুল ঠিকানা লেখা, জিনিষপত্র, যেমন ছাতা লাঠি ইত্যাদি এখানে ওখানে ফেলিয়া যাওয়া, প্রভৃতি যতই অকারণ ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হউক না কেন, সকল ভুলেরই কারণ আছে, অনুসন্ধান করিলে বাহির করা যায়। মোটামুটি বলিতে গেলে, যে সমস্ত অভিজ্ঞতার সহিত কোন-না কোনরূপ অপ্রীতিকর স্মৃতি জড়িত থাকে, তাহা সহজে পুনরায় মনে আসে না। অনেক সময়ে তাহার বিপরীতও হইতে পারে; যেমন কোন বন্ধু-গৃহে বই ফেলিয়া আসিবার কারণ সেই বন্ধুগৃহে পুনরায় যাইবার ইচ্ছা। সমস্ত ভুলই ঠিক এক নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় না। প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করিতে হইবে। মনসমীক্ষণ করিলে প্রতেকেটীর কারণ আবিষ্কার করিতে পারা যায়।

মনসমীক্ষণ সম্বন্ধে নানা দিক হইতে নানা রকমের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও এবং সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে নানাবিধ মতদ্বৈধ থাকিলেও উহার উপকারিতা সম্বন্ধে মতভেদের আর কোনও কারণই নাই। দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া সুস্থ ও অসুস্থ লোকের মানসিক অবস্থার, সামাজিক, রীতিনীতির, পুরাকালের আচার ব্যবহারের, ধর্ম্ম-কর্ম্মের এমন একটী সুন্দর সহজ সঙ্গত ব্যাখ্যা মনসমীক্ষণ দেয় যে, তাহা অপূর্ব্ব। আবার মানসিক রোগ সারাইবার, শিশুচরিত্র গঠন করিবার, সমাজের দোষগুণ ফুটাইয়া তুলিবার এরূপ মহামূল্য উপায় পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানক্ষেত্রে মনসমীক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ দান। ইহার প্রভাবে ভবিষ্যতে সমাজের সমস্ত কর্ম্মধারার যে আমূল পরিবর্ত্তন হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। যিনি এই অমূল্য দান করিয়াছেন আমরা সম্প্রতি তাঁহার সপ্ততিতম জন্মমহোৎসব করিয়াছি। আশা করি তিনি এখনও বহু বৎসর জীবিত থাকিয়া মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের এবং তাহার ভিতর দিয়া অন্য সমস্ত শাস্ত্রেরই উৎকর্ষ সাধন করিতে থাকিবেন।





অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ

(২৩)

পরদিন সকালে অনি চাকরদিগকে দিয়া সমস্ত ঘর-বাহির পরিষ্কার করাইল। লাইব্রেরীর বিশৃঙ্খল বইগুলি, স্তূপীকৃত সাময়িকপত্র সকল ও অন্যান্য আস্‌বাবপত্রের অবস্থা দেখিয়া তাহার কান্না পাইয়াছিল। এই কয় মাসের মধ্যে মেজরের যত চিঠি-পত্র আসিয়াছে, তাহার অধিকাংশই তদবস্থায় টেবিলের উপর পড়িয়া আছে; মেজর সেগুলিকে খুলিয়া পড়িবার অবসর পর্য্যন্ত পান নাই। অনি বাছিয়া বাছিয়া কয়েকখানি পত্র খুলিয়া ফেলিল; বিশেষ করিয়া রেজিষ্টার্ড পত্রগুলি। মহাজন ননীলাল মল্লিক, প্রাপ্য টাকার দলিল কিম্বা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন, অথচ মেজর সে পত্রগুলি যে অবস্থায় আসিয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়াছেন। এটর্ণির সেই সমস্ত চিঠি একত্র করিয়া অনি ভগ্‌লুকে দিয়া মেজরের নিকট পাঠাইয়া দিল। এখানে আসা অবধি সে মেজরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংস্কারে এতো গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিল যে, তখনো পর্য্যন্ত মেজরের সহিত তাহার কোনো কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ হয় নাই। কিম্বা অনি হয়তো ইচ্ছা করিয়াই তাহা এড়াইয়া চলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। মেজরও পূর্ব্বের ন্যায় কোনো সময়ের জন্যই অনির সম্মুখীন হন্ নাই। অনির সুনিপুণ হস্ত-স্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বিশৃঙ্খল গৃহের শ্রী ফিরিয়া আসিল। মেজরের মদ্যপানের সাজ-সরঞ্জাম-গুলিকে অনি স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। বেয়ারা ও বাবুর্চ্চি কেহই তাহার কার্য্যে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

বিকালে গাজুর নিকট হইতে অনি টাকাকড়ির সমস্ত হিসাব বুঝিয়া লইল। লেখা পড়া না জানার অছিলায় সকল বিষয়ের সঠিক হিসাব ও কৈফিয়ৎ না দিতে পারিলেও, বর্ত্তমান খরচের ভিতরের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে অনির কিছুমাত্র বাকী রহিল না। মাসের চার দিন না যাইতেই বেতনের টাকা প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইয়া গিয়াছে! গাজুর নিকট হইতে চাবি চাহিয়া লইয়া অনি টাকাকড়ি সমস্তই মেজরের দেরাজের মধ্যে রাখিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিল; ও খরচ সম্বন্ধে গাজুকে বার বার সাবধান করিয়া বলিয়া দিল—যেন সে প্রয়োজন মত পয়সা সাহেবের নিকট চাহিয়া লয়।

* * *

অনির অনুরোধ মত, সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই নিরঞ্জন-বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা জীবনের এত বড় একটা কর্ম্মক্ষেত্রে নিরঞ্জন-দাকে পাইয়া অনি যেন মনে মনে অনেকখানি সবল হইয়া উঠিয়াছিল। বিপর্য্যয়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া সে বহুদিন হইতেই এই নিরঞ্জনদার ন্যায় উদার ও সহৃদয় হিতৈষী বন্ধুকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

নিরঞ্জনবাবু আসিতেই, অনি তাঁহাকে দেখাইয়া গাজুকে পুনরায় বলিয়া দিল—"সপ্তাহে সপ্তাহে টাকাকড়ির সব হিসেব এই বাবুর কাছে দেবে; বুঝলে?" নিরঞ্জন-বাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া অনি জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা, আপনি এখন কিছুদিন আজমগড়েই র'য়েছেন বোধ হয়?"

"হাঁ, অন্ততঃ এখানকার কাজ-কর্ম্ম যতদিন শেষ না হচ্ছে। য়ুনিভার্সিটিও এখন বন্ধ।"

* *

নিরঞ্জন-দা'কে সঙ্গে লইয়া অনি বাগানের মধ্যে গিয়া বসিল। জীবনের অনেক স্মৃতি ও অনেক কথা তাহার বুকের তলায় জমা হইয়া উঠিয়াছিল। নিরঞ্জন-দা তাহাদিগকে কাশীতে রাখিয়া যাইবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অনি সংক্ষেপে সমস্তই বলিয়া চলিল। মায়ের মৃত্যু, দাদুর শেষ, মেজরের সাহায্য ও সহানুভূতি—কোনো কথাই অনি তাঁহাকে জানাইতে বাকী রাখিল না। কেবল মাত্র মেজরের সেই দুর্ব্বলতার কথা অনি প্রকাশ করিতে পারিল না; সে নারী, নিজের উপর দিয়াই যে বিপ্লব অত হীনভাবে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে তাহার অন্তর লজ্জা ও ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছিল। নিজেকে সে অত ছোট করিয়া নিরঞ্জন-দার সম্মুখেও ধরিতে পারে না, পৃথিবীর কাহারো সম্মুখেই পারে না।

মেজরের বিষয়ে সকল কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের হৃদয় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিতেছিল। এত মহৎ, এত সহৃদয় ডাক্তার সাহেব! অথচ তিনি পুরা মাতাল! গত সন্ধ্যায় তাহাদের সহিত যে ব্যবহার তিনি করিয়াছেন, তাহাতে মনুষ্যত্বের গন্ধও পাওয়া যায় না। শেষের কথাগুলি ভাবিতে গিয়া যেন নিরঞ্জনের মনে কেমন একটা ধাঁধা লাগিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি কি আগেও মদ খেতেন অনু?"

"না; অন্ততঃ আমি যতদিন বেনারসে ছিলুম, ততদিন তাঁকে ও-রকম কোনো নেশাই ক'রতে দেখিনি। এক চুরুট-সিগারেট ছাড়া তিনি কোনো নেশারই বশীভূত ছিলেন না। আচ্ছা দাদা, অভাগীর বেটারা সন্দেশের বা কাপড়ের দোকান না ক'রে ম'রতে মদের দোকান করে কেন?"

"তুমি কি এখন বেনারস ছেড়ে চলে গেছ? সেই জন্তেই বোধ হয় তোমাদের সেই পুরোনো পল্লীর কেও তোমার খবর দিতে পারলো না। কিন্তু বেনারস্ ছেড়ে গিয়ে তুমি আছ কোথায়? তোমাদের আর কোনো আত্মীয়স্বজন ছিলেন ব'লে তো আমার মনে হয় না। তোমার এক পিসিমা ছিলেন বটে শুনেছিলুম, কোল্কাতায়।"

"পিসিমা এখনো কো'লকাতাতেই আছেন; কিন্তু তাঁর ওখানে উঠিনি, যদিও গোড়ায় সে ইচ্ছা ছিল। মানুষ যখন নিতান্ত বিপন্ন হ'য়ে পড়ে, তখন পিসিমা কেন, কোনো সমৃদ্ধ আত্মীয়ই তাকে চিন্‌তে পারে না। জীবনের উপর দিয়ে যে ঝড়গুলো একে একে ব'য়ে গেছে, তাতে আত্মীয়স্বজন কারোই সাড়া পাই নি। একমাত্র বন্ধু-বান্ধবেরাই সব করে'ছেন। দাদুও যে দিন আমায় একা ফেলে চলে গেলেন, সেদিন অত্যন্ত অসহায় হ'য়ে পড়েছিলুম। দাদু মেজরকে অনুরোধ ক'রেছিলেন, যতদিন আমি নিজেকে চালিয়ে'নেবার মত কোনো একটা ব্যবস্থা ক'রতে না পারি, ততদিন যেন তিনি দয়া ক'রে একটু আশ্রয় দেন্। দাদুর সে অনুরোধ তিনি যথাসাধ্য রক্ষা ক'রেছিলেন। তারপর এই বনবিহারী-দা আর মঞ্জিষ্ঠাদি, এঁরা যথেষ্ট ক'রেছেন। জীবনের সেই ভীষণ ঘূর্ণিতে পড়ে' যদি এঁদের মত উদার ও মহৎ বন্ধুর আশ্রয় না পেতুম্, তা'হলে অবস্থার শেষ পরিণতি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো তা ভাব্‌তেও পারিনে। মঞ্জিষ্ঠা-দি আমার জন্তে যথেষ্ট ক'রেছেন; তাঁর সহানুভূতি পেয়েছিলুম ব'লেই আজ কোনো রকমে দাঁড়াতে পেরেছি। তিনিই শ্যাম-বাজারে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমায় গৃহ শিক্ষয়িত্রী ক'রে দিয়েছেন। ছোট্ট একটী মেয়েকে পড়াতে হয়। সুরথবাবু ও তাঁর স্ত্রী নীলিমাও লোক খুব ভালো—"

বলিতে বলিতেই হঠাৎ নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া অনি দেখিল তিনি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছেন; তাহার কথা একটীও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে কি না সন্দেহ।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া অনি বলিল—"চলুন দাদা, সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে; আটটা দশ মিনিটে ট্রেন,—আজ রাত্রের ট্রেনেই ফির্‌তে হবে; বনবিহারী-দা'রও ছুটি নেই, আমারও থাক্‌বার উপায় নেই—কেন না—"

অনির কথা শেষ না হইতেই নিরঞ্জন পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"তোমার মঞ্জিষ্ঠা দি কি করেন অনি?"

"দেশের কাজ"। অনি বুঝিল—নিরঞ্জন-দা তখনো কি যেন ভাবিতেছিলেন। সে তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ঈষৎ নাড়া দিয়া ডাকিল "দাদা!—"

,, চলো যাই" বলিয়াই নিরঞ্জন উঠিয়া পড়িলেন। অনি তাঁহার এই আকস্মিক অন্যমনস্কতার কোনো কারণই খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে নিরঞ্জন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি নীলিমার মেয়েকে পড়াও, না উর্মিলার মেয়ে কণাকে—? নীলিমার তো কোনো—"

"আপনি কি তাঁদের চেনেন?" অনি একটু আশ্চর্য্য হইয়াই নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিল। অন্ধকারে চোখ মুখের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য করিতে না পারিলেও, তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, নিরঞ্জন-দা তাঁহাদের কথাই ভাবিতেছিলেন।

* * * *

সেইদিন ৮—১০ মিঃ ট্রেনেই অনি ও বনবিহারী আজমগড় ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আজমগড়ে আসিয়া অনি যে চব্বিশ ঘণ্টা ছিল, তাহার মধ্যে মেজরের সহিত কোনো সময়ের জন্যই তাহার কথাবার্ত্তা হইল না। মেজর ও অনি উভয়েই যেন ইচ্ছা করিয়া পরস্পরকে এড়াইয়া চলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। বিদায়-বেলায় অনি একবার মেজরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার মনটা হয়তো তখন অনেক কথা বলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অনি কোনো দিকে না চাহিয়া মেজরের পায়ে মাথা রাখিয়া একটী প্রণাম করিয়া কেবলমাত্র বলিল —"চল্লুম। চোরের ওপর রাগ ক'রে ভুঁয়ে ভাত খাবেন না!"

মেজরের মুখে সহসা কোনো উত্তর যোগাইল না। অনির পানে মুখ তুলিয়া চাহিতেও যেন তাঁহার মাথা লজ্জায় নোয়াইয়া পড়িতেছিল। অনিও কোনো উত্তরের আশা না করিয়াই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উদ্গত অশ্রুকে দমন করিবার জন্য মেজর ওষ্ঠ দংশন করিয়া মাটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

* * * *

নিরঞ্জনবাবু অনি ও বনবিহারীর সঙ্গে ষ্টেশন্ পর্য্যন্ত আসিলেন। অনি অনেকবার লক্ষ্য করিল যে নিরঞ্জন-দা অনেকক্ষণ হইতে যেন কি একটা বলি'-বলি' করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না। অনি গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা, আপনি কি কিছু ব'লবেন?"

নিরঞ্জন একটু বিস্ময়ের সহিত অনির মুখপানে চাহিলেন। তাহার পর কি ভাবিয়া লইয়াই বলিলেন—"তুমি যে এতো শীগ্‌গির ফির্‌চো অনি? বেনারসে নেমে যাবে না?"

"না দাদা; সুরথবাবুরা কিছুদিনের জন্য বাইরে যাবার ঠিক্ ক'রেছেন, আমাকেও তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে। বোধ হয় দুএক দিনের মধ্যেই আমরা পুরী যাবো।"

"তোমরা সকলেই যাবে?" এই "সকলেই" কথাটার উপর এমন একটা অস্বাভাবিক রকমের জোর পড়িল যে নিরঞ্জন-দা নিজেই তাহা লক্ষ্য করিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন; অথচ অনি ও বনবিহারীর তাহাতে মনে করিবার কিছুই ছিল না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই নিরঞ্জন অনি ও বনবিহারীর নিকট বিদায় লইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর নামিয়া দাঁড়াইল। অনি, মেজরের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাঁহাকে বার বার বিশেষভাবে অনুরোধ করিল। তাহার অনুরোধের ভিতর দিয়া যেন আজ সমস্ত আন্তরিকতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল; আজ আর তাহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছিল না।

(২৪)

অনির সেই নীরব শাসনকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া মদ্যপান ত্যাগ করিলেও, পূর্ব্বের সেই অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই মেজরের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িল। কঠিন যকৃৎ-রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন।

অনির অনুরোধ রক্ষা ও নিজের কর্ত্তব্য পরায়ণতা— উভয় দিক্ দিয়াই নিরঞ্জন যথাসাধ্য মেজরের তত্ত্বাবধান করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিপন্নের সাহায্য ও রোগীর সেবায় তিনি চিরদিন মুক্তহস্ত ও দৃঢ় হইলেও, মেজরের অবস্থা যখন ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, তখন যেন নিরঞ্জন-বাবু মনে মনে একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। জীবনে রোগীর সেবা দ্বারা সাধারণ রোগ সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও, এতাদৃশ ব্যাধি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। অনি ও বনবিহারীর পূর্ব্ব পরামর্শ মত, নিরঞ্জন সকল কথা বিস্তৃতভাবে জানাইয়া বনবিহারীকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া দিলেন।

* * * *

বনবিহারী আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারো দুশ্চিন্তা বিশেষ কম হইল না। অতিরিক্ত সুরাপানের সাধারণ পরিণাম যাহা হইয়া থাকে, মেজরের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। বনবিহারী তাঁহার অবস্থাদি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন—মেজরের লিভার ও অন্ত্রের মধ্যে ক্ষত হইয়াছে। লিভার অ্যাব্‌সেসের দুরারোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই অবিদিত ছিল না।

সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া বনবিহারী নিরঞ্জনবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—চিকিৎসার জন্য মেজরকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই বিধেয়। যদি লিভারের উপর অস্ত্রোপচার করিতে হয়, তাহা হইলে কলিকাতা ভিন্ন অন্য কোথাও তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বিশেষ নিরাপদ নহে। তবে সে বিষয়ে মেজরের অভিমত লওয়াও প্রয়োজন।

পরদিন সকালে বনবিহারী প্রকারান্তরে মেজরকে তাঁহার রোগের কথা জানাইয়া, চিকিৎসা বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং এ অবস্থায় কলিকাতায় যাওয়াই যে প্রশস্ত সে কথা তিনি মেজরের নিকট প্রস্তাব করিলেন।

বনবিহারী না বলিলেও, মেজর তাঁহার রোগের বিষয় সম্পূর্ণই বুঝিয়াছিলেন। রোগ ও চিকিৎসাদি সম্বন্ধে তাঁহারও কিছু অবিদিত ছিল না। তথাপি, কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া মেজর বলিলেন—"এখন আর তা হয় না ক্যাপ্টেন্, তাতে টাকা-কড়ির দরকার; তার উপর পাওনাদার বহু টাকার দাবী দিয়ে মালিশ করে'ছে। ঐ দেখুন, টেবিলের উপর তার সমন পড়ে' আছে।"

টেবিলের উপর হইতে সমনখানি তুলিয়া লইয়া বনবিহারী দেখিলেন—এটর্ণি ননীলাল মল্লিক প্রায় বিশ হাজার টাকার দাবী দিয়া মেজরের নামে নালিশ করিয়াছেন। এই অল্পদিনের মধ্যেই এত টাকা ঋণ হইয়াছে দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন।

মেজরের কথার উত্তরে বনবিহারী বলিলেন—"তা হোক্। তাই বলে জীবনকে অবহেলা করা চলে কি? আর কেসের জন্যেও তো কোল্‌কাতায় যাওয়া দরকার। সম্প্রতি যেমন ক'রে হয় চল্‌বেই। টাকার সমস্যা নিয়ে ভাব্‌বার সময় এখন নয়; সে পরে দেখা যাবে। নিরঞ্জনবাবু আর আমি যা হোক্ ক'রে চালিয়ে নেব'খন।"

বনবিহারী ও নিরঞ্জন প্রায় জোর করিয়াই মেজরকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

* * * *

মেডিক্যাল কলেজের একটা কেবিন ভাড়া করিয়া নিরঞ্জন ও বনবিহারী মেজরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া চলিয়াছে দেখিয়া ডাক্তারেরা সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অথচ মেজর নিজের রোগ সম্বন্ধে এতো উদাসীন হইয়া গিয়াছিলেন যে, নিজের যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ বিষয়েও তাঁহার কোনো অনুভূতি ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল না। নিরঞ্জন ও বনবিহারী অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহার সেবা যত্ন করিতেছিলেন। কিন্তু মেজরকে দেখিয়া মনে হইতেছিল—যেন তিনি জানিয়া-শুনিয়াই মৃত্যুকে অত ধীর ও অচঞ্চলভাবে বরণ করিয়া লইতেছিলেন।

মেজরের অসুস্থতার কথা অনিকে জানাইবার জন্য সেদিন বনবিহারী তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু অনি তখনো কলিকাতায় ফিরিয়া আসে নাই। মেজরের এত বড় অসুখের কথা অনিকে না জানাইয়া বনবিহারী কোনরূপেই সোয়াস্তি পাইতেছিলেন না। তিনি অনিদের পুরীর ঠিকানা সংগ্রহ করিবার জন্যও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দারোয়ান কোনো খবরই দিতে পারিল না; উপরন্তু তাঁহারা পুরীতেই আছেন, না সেখান হইতে অন্য কোথাও গিয়াছেন, দারোয়ান সে সংবাদটুকু পর্য্যন্ত রাখে না।

উকিল নিযুক্ত করিয়া বনবিহারী মেজরের কেসের তদন্তও করিতেছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। এটর্ণি ননীলাল মেজরের উপর ডিক্রির পরোয়ানা জারি করিলেন। ননীলাল মেজরের পিতার আমলের এটর্ণি ছিলেন। তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তির অনেক কাগজপত্রই তাঁহার নিকট ছিল। এটর্ণি সেই সকল সম্পত্তিও অ্যাটাচ্ করিয়া নোটিশ জারি করিলেন। মেজর পরোয়ানাগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন মাত্র। ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই

জানিতেন যে, এটর্ণির বরাবরই লোভ ছিল ঐ সকল সম্পত্তির উপর।

মোকদ্দমার রায় বাহির হইবার কয়েকদিন পরেই সংবাদপত্রে বাহির হইল যে '৬৯৪৭ নং কেসের ডিক্রি সম্প্রতি মুলতবী রাখা হইল' এই মর্ম্মে জজসাহেব এক আদেশ জারি করিয়াছেন। তৃতীয় পক্ষ উক্ত আবদ্ধ-সম্পত্তির এক্সিকিউটাররূপে আপত্তি পেষ করিয়াছে। 'স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরীর সম্পত্তি তাঁহার পুত্রের ঋণের জন্য আবদ্ধ করা যাইতে পারে না। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র দান-পত্র দ্বারা তাঁহার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পুত্রবধূর নামে লিখিয়া দিয়াছেন।'

মেজরের কর্ণে এ সংবাদও পৌছিল; কিন্তু মেজর কোনো কথাই বলিলেন না। উকিলের পরামর্শ মত কিস্তিবন্দির জন্য দরখাস্ত দিবার বিষয়ে বনবিহারী মেজরের মত জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিকার ভাবেই উত্তর করিলেন—"যেখানে শেষের ওয়ারেণ্টই জারি হ'য়ে গেছে, ক্যাপ্টেন্, সেখানে আর ও সব ছোটখাটো ওয়ারেণ্ট নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল।"

মেজরের কথায় বনবিহারীর মনটা যেন বারেকের জন্য দুলিয়া উঠিল।

কয়েকদিন পরে চিকিৎসকগণ এক্স-রে ফটো লইয়া স্থির করিলেন—অস্ত্রোপচার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। নিরঞ্জন ও বনবিহারী উভয়েরই বুকের ভিতরটা যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

সম্পত্তি আবদ্ধ করিয়া লইবার চেষ্টা বিফল হওয়ায় এটর্ণি ননীলাল মল্লিক বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধারণা হইল,—ডাক্তার বোধ হয় জানিয়া শুনিয়াই তাঁহাকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে এরূপ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন।

এটর্ণি আইনের সাহায্যে মেজরের উপর ডিষ্ট্রেস্ ওয়ারেণ্ট (Distress Warrant) বাহির করিয়া সেই দিনই তাহা জারি করিলেন! ওয়ারেণ্ট দেখিয়া মেজর একবার একটু ক্ষীণ হাসিলেন মাত্র। কিন্তু তাহা এত ফিকে ও নিষ্প্রভ যে দেখিলে ভয় হয়।

বনবিহারী কয়েকদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন যে মেজর যেন কি একটা কথা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না। মেজরের সঙ্কোচটুকু লক্ষ্য করিয়াই বনবিহারী নিজে হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেজর, আপনি কি কিছু ব'ল্‌তে চান্? বন্ধুর কাছে সঙ্কোচ ক'র্‌বার—"

বনবিহারীর কথা শেষ না হইতেই মেজর বলিলেন—"জানি, বন্ধু, তোমায় জানি। এই বিপন্ন অবস্থায় বন্ধু তুমি; তোমার কাছে আজ আর আমার কোনো সঙ্কোচই নেই—এই জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে।" বনবিহারীর প্রতি তাঁহার সমস্ত হৃদয় যেন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মেজর প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বনবিহারী বাধা দিয়া বলিলেন—"ও কথা বল্‌বেন না মেজর! আপনি নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌বেন। অনিকে একবার সংবাদ দিতে পার্‌লে ভাল হো'ত।"

"আমিও ঐ কথাটাই ব'লতে চাচ্ছিলুম ক্যাপ্টেন! জীবনটার আগাগোড়াই ভুলের বোঝায় ভারি হ'য়ে গেছে। এখনো যদি কিছু কমাতে পারি। সারবার আশা আর নেই; সে ইচ্ছেও নেই।" মেজর আবার একটু হাসিয়া বনবিহারীর মুখপানে চাহিলেন।...

মেজরের কথাবার্ত্তা ও ভাব লক্ষ্য করিয়া বনবিহারীর মনটা যেন আরো দমিয়া গেল। রোগী যদি, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে চাহে, তাহা হইলে চিকিৎসকের সাধ্য কি, সে তাহাকে ফিরাইতে পারে! মেজর যেন মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হইয়া আছেন। জীবনের প্রতি তাঁহার সমস্ত আকর্ষণই শিথিল হইয়া গিয়াছে।

বনবিহারীর হাতখানিকে চাপিয়া ধরিয়া মেজর পুনরায় ব্যথিত স্বরে বলিলেন—"বন্ধু, হতাশ হ'চ্ছ? কিন্তু উপায় নেই। তোমার আর নিরঞ্জন বাবুর ঋণ কখনই শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না।——অনির সঙ্গে একবার দেখা হ'লে কতকটা হাল্‌কা হ'তে পার্‌তুম্। তার কাছে......"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে, মেজরের রোগশীর্ণ বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল।

(২৫)

কণাকে বুকে করিয়া অনির দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিয়া যাইতেছিল। নিরঞ্জনদা ও বনবিহারীদা'র হাতে

মেজরের ভার দিয়া অনি যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়া পুরী আসিয়াছিল। দেব-দর্শন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া অনি যেন আবার ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তরের সেই সজীব প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইতেছিল। তাহার অন্তরের সমস্ত শূন্যতাকে আরো পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল সেই বিশাল সমুদ্র-চিন্তার মত উত্তাল, আশার মত স্নিগ্ধ ও সজীব, জীবনের মত রহস্যময়।

অনি অধিকাংশ সময়ই কণাকে লইয়া সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। সমুদ্র যেন তাহার অন্তরের এতকালের নিদ্রিত আনন্দকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। কখনো বালুবেলায় বসিয়া অনি আপন মনে সেই সীমাহীন নালাম্বুর ভাববৈচিত্র্য দেখিয়া, তাহার সহিত নিজের জীবনকে মিলাইয়া লইত। সেই বিরাট অভিধানের পরতে পরতে জীবনের অর্থ খুঁজিয়া যেন অনি অনেকদিন পরে আপনার মধ্যে আপনাকে দেখিতে পাইয়াছিল। দূরে—বহুদূরে—যতদূর দৃষ্টি যায়, সব যেন মৌন ও গম্ভীর, নির্ব্বিকার ও অচঞ্চল। শুধু বেলাভূমির কূলে কূলে যে বিপর্য্যয়ের ঢেউগুলি উত্তাল হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, ঐ ধ্যানমগ্ন ঋষির সঙ্গে যেন তাহার কোনো যোগসূত্রই নাই। অথচ সেই ভীষণ বিপর্য্যয় যেন জগতের সব বিপর্য্যয়কেই তুচ্ছ করিয়া, ব্যঙ্গভরে শিশুর মত হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছে—ঠিক্ মানুষের হাতের কাছে।

এই কয়েক মাস পুরীতে থাকিয়া অল্পবিস্তর সকলেরই স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে দেখিয়া, সুরথবাবু এখনকার মত পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। বিশেষতঃ লাইব্রেরীর বিরহ তাঁহাকে যেন আরও হাতছানি দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার উপর কয়েকদিন পরেই কণার জন্মতিথি! মাঘের ছাব্বিশে, আর সাতটি দিন মাত্র বাকী।

* * * *

আজ তিন দিন হইল সুরথবাবুরা কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। পথে ভুবনেশ্বরে নামিয়া আসায় আরো দুইদিন দেরী হইয়া গিয়াছে। অনি ও নীলিমা কণার জন্মতিথির আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; আজ কণার জন্মদিন।

অনির মনটা আজ থাকিয়া থাকিয়া উর্ম্মিলার জন্ম কাঁদিয়া উঠিতেছিল। হায় অভাগি! আজ তোমার কণার জন্মদিন। কিন্তু দুঃখের মধ্যেও অনি একটু শান্তি পাইতেছিল—শুধু এই কথা ভাবিয়া যে, সে কণার মায়ের আসনখানিতে নিজের বুভুক্ষু হৃদয়কে বসাইবার সৌভাগ্য পাইয়াছে।

আপনার হাতে কণাকে সাজাইয়া দিয়া, অনি ঠিক্ জন্মক্ষণটীতে তাহাকে পাঠাইল—মামাবাবুকে প্রণাম করিবার জন্য। কণাকে পাঠাইয়া অনি নিজেও জোড়হাতে ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল—"ঠাকুর! কণির জীবনকে সার্থক ক'রে তোল নারায়ণ!"

কণা নাচিতে নাচিতে লাইব্রেরী-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"মা-মণি, মামাবাবু কি দিয়েচেন, ছাখো।" সুরথবাবুর নিকট হইতে একখানি ছবির বই পাইয়া তাহার কচি বুকখানি আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

অনি চাহিয়া দেখিল—মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো একখানা সুন্দর ফটো এ্যালবাম্ সুরথবাবু আজ কণাকে উপহার দিয়াছেন। কণাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অনি এ্যাল্‌বাম্‌খানি দেখিতে লাগিল। কণার আনন্দধ্বনি শুনিয়া নীলিমাও তখন তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ্যাল্‌বামের প্রথম পাতাটি উল্টাইতেই সহসা একটি দম্পতির ফটোগ্রাফ্ দেখিয়া অনি যেন চম্‌কিয়া উঠিল। "এ কি!"

নীলিমা ছবিখানির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"উর্ম্মিলা, আর কণার বাবা।"

কণার বাবা! এ যে মেজর! মেজর উর্ম্মিলার স্বামী! —অনির সর্ব্বাঙ্গ যেন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল; তাহার মুখ দিয়া আর কোনো কথা বাহির হইল না। দুই হাত দিয়া অনি কণাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল—অতি নিবিড় ভাবে। তাহার চোখ হইতে বড় বড় জলের ফোঁটাগুলি গড়াইয়া পড়িতে লাগিল কণার মাথার উপর, উচ্ছ্বসিত স্নেহের মন্দাকিনীর মত।

মেজরের উপর অনির সব অভিমান ও সব অশ্রদ্ধা যেন সেই অশ্রুজলে ধৌত হইয়া গেল। অনি আজ আর মেজরকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা না করিয়া পারিল না। মেজর কণার পিতা। আর কণা! কণা অনির মরুজীবনের

ছায়াসাথি, শূন্য প্রাণের একমাত্র অবলম্বন—তাহারই বুকজোড়া স্নেহের পুতুলি।

ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, যে, বাহিরে একজন ভদ্রলোক গুরু-মার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া অনি কণাকে সঙ্গে করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আজ হঠাৎ বনবিহারীদাকে দেখিয়া অনির মনটা আনন্দে ভরিয়া উঠিল; কণার জন্মদিনে বনবিহারীদাকে সে অতিথি রূপে পাইয়াছে।—তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া অনি হাসিয়া বলিল—"দাদা, আজ আমার খুব সৌভাগ্য যে আপনাকে বিনা-নেমন্তন্নেই পেয়েছি। আজ কণার জন্মদিন। এই দেখুন, কেমন কোল-ভরা ফুটফুটে মেয়ের মা হ'য়েছি।"

বনবিহারীর কাছে এ সংবাদ খুব আনন্দের হইলেও তাহা জ্ঞাপন করিবার মত মনের অবস্থা তখন তাঁহার ছিল না। তিনি নিতান্ত বিমর্ষ ভাবেই বলিলেন—"কিন্তু, আমার তো থাকবার সময় নেই বোন্। মেজরের খুব অসুখ; তাই তোমাকে একবার সংবাদ দিতে এসেছি; তাঁরও খুব ইচ্ছা। এ যাত্রা বোধ হয় আর—" বনবিহারীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতেছিল না।

নিমেষে অনির সমস্ত আনন্দকে ঢাকিয়া একটা বেদনা ও আতঙ্কের কালো মেঘ তাহার হৃদয়কে কাঁপাইয়া তুলিল। অনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি কোথায় আছেন, দাদা?"

"এইখানেই, মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে। তুমি একবার গেলে ভাল হ'ত।"

"একটু অপেক্ষা করুন, আমি নিশ্চয়ই যাবো দাদা, আপনার সঙ্গেই যাবো।" বলিয়াই অনি তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল।

বনবিহারীদার অনুরোধ ও নিজের একান্ত ইচ্ছায়, অনি, তখনই নীলিমাকে জানাইয়া, কণাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মেজরকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ তখন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, মহিলা-নিবাসের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া, অনি মঞ্জিষ্ঠার নিকট একখানি পত্র লিখিয়া, দারওয়ানের হাতে দিয়া, তাহাকে তখনি খাদি-প্রতিষ্ঠানে মঞ্জিষ্ঠার নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বলিয়া দিল। মেজরের অসুস্থতার কথা লিখিয়া মঞ্জিষ্ঠাকে তখনি উল্লিখিত ঠিকানায় যাইবার জন্য অনি বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া লিখিল। কণাকে সঙ্গে করিয়া সেও যে কণার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছে, সে কথাও অনি মঞ্জিষ্ঠাকে জানাইতে ভুলিল না।

* * * *

কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অনি যখন দেখিল—মেজর রোগশীর্ণ হইয়া প্রায় শয্যার সহিত বিলীন হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন কি সজীব কি না তাহাও সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না, তাহার ব্যথিত হৃদয় যেন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই মেজর! তাহার সেই পরম হিতৈষী বন্ধু, যাঁহার জীবনে একদিন সমৃদ্ধি আপন গৌরবে বহিয়া চলিয়াছিল, আজ মৃত্যুশয্যায়, সরকারী চিকিৎসালয়ে আত্মীয়-স্বজনহীন পথিকের মত আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

অনিকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, মেজর একবার চোখ তুলিয়া অনির মুখপানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি বড় করুণ। অনিকে বসিতে বলিয়া মেজর শীর্ণ হাত দুখানি তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

অনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"ও কি! আমার সঙ্গে আবার ফর্ম্যালিটি কেন মেজর?"

মেজর অনির মুখপানে আর একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"জীবনে অনেক ভুল ক'রেছি অনি; এতোদিন যা বুঝতে পারিনি, আজ তা' চোখের সাম্‌নে সব স্পষ্ট হ'য়েই ফুটে উঠেছে। সে সবের ভার আর সহ্য ক'রতে পারছি না, তাই আজ জীবনের এই অস্তাচলে দাঁড়িয়ে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি, শুধু ক্ষমা চেয়ে নিজেকে একটু হাল্‌কা ক'রবো বলে। আমায় ক্ষমা কোরো—"

মেজরের কথা শেষ না হইতেই অনি তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া বলিল—"ছিঃ, ও-কথা মনেও আন্‌বেন না। বহুদিন পূর্ব্বেই ভগবানের কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেছি—তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করেন। আপনি সেরে উঠুন; জীবনে যে ভুল ক'রেছেন, না-ক'রেছেন তা শোধ্‌রাবার সময় অনেক আছে।"

"সেরে আর উঠ্‌বো না অনি! পাপের ভারে যে

জীবন ডুবে গেছে, তার আর উঠ্‌বার আশা কোনো কালেই নেই।" মেজরের কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল।

অনি প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার জন্ত কণাকে কোলের উপর উঠাইয়া লইয়া, মেজরের পানে চাহিয়া বলিল—"মেজর! একে চিন্‌তে পারেন? এই আধফোটা ছোট্ট গোলাপটিকে?"

মেজর যথাসাধ্য নিজের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করিয়া কণার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন। বেশ স্থিরভাবে কি একটু ভাবিয়া লইয়াই বলিলেন—"নাঃ, চিন্‌তে তো পার্‌লুম্ না অনি!"

কথাটা বলিবার ভঙ্গী ও উদাস ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া, অনি বুঝিল—তিনি যেন অন্তমনস্কভাবে তখনো স্মৃতির পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতেছিলেন।

অনিরও মনের মধ্যে একটু ইতস্ততঃ ভাব আসিয়া পড়িল; কিন্তু পরক্ষণে সেটুকু কাটাইয়া লইয়াই, অনি কণার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"চিন্‌তে পার্‌লেন না মেজর? কণা, উর্ম্মিলার স্মৃতিচিহ্ন!"

মেজর যেন সহসা চম্‌কাইয়া উঠিলেন; উর্ম্মিলার স্মৃতিচিহ্ন! মেজরের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার শীর্ণ বাহু দুইটি কণার দিকে প্রসারিত হইয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা শয্যার উপর এলাইয়া পড়িল। মেজর যেন ইচ্ছা করিয়াই সেই প্রসারিত বাহুকে গুটাইয়া লইলেন। তাঁহার চোখ দুইটি তখন জলে ছাপাইয়া উঠিতেছিল।

নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া মেজর অত্যন্ত উদাসভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ উর্ম্মিলা?"

"সুরথ বাবুর ভগিনী উর্ম্মিলা; আপনার—"

আবেগভরে মেজর বলিয়া উঠিলেন—"উঃ, উর্ম্মিলা! উর্ম্মিলার জন্তেই জীবনটা আজ কোথায় নেমে প'ড়েছে! ঐ উর্ম্মিলাকে ঘিরে একদিন বেঁচে থা'কতে চেয়েছিলুম্। উর্ম্মিলার জন্তে জীবনে কী না ক'রেছি! দস্যুর মত, একটা কচি ফুলকে আপনার হাতে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছি! বড় হ'য়ে, উর্ম্মিলাকে পাবার যোগ্য হ'য়ে ফির্‌বো বলে' জীবনকে তুচ্ছ ক'রে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। বাপ্ ঠাকুর্দ্দার কুলগৌরবকে পায়ে দ'লে, যুদ্ধে গিয়ে একটা ব্যভিচারী পশুর মত জীবন কাটিয়েছি। উঃ, অন্নপূর্ণা! পরলোকে গিয়েও তুমি হয়তো আমায় ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌বে না। আর উর্ম্মিলা! জীবনের সব কিছু দিয়েও, তোমার তৃপ্তি হো'ল না! বিশ্বাসের মূল যে অতো আলগা হ'য়ে পড়্‌বে তা স্বপ্নে ভাবি নি।" মেজরের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

মেজরের কথার সবটুকু উপলব্ধি করিতে না পারিলেও অনির বুকখানা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

মেজরের কথা শেষ না হইতেই মঞ্জিষ্ঠা ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, মেজর ও অনি কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। মেজরের শেষের কথাগুলি যেন মঞ্জিষ্ঠার প্রাণে গিয়া শেলের মত বিঁধিল। নিজেকে সংযত করিতে না পারিয়া সে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—"দাদা, জীবনের খেয়া-ঘাটে দাঁড়িয়েও নিজের সেই সঙ্কীর্ণতাকে ভুল্‌তে পার নি। উর্ম্মিলার মত সাধ্বীর পবিত্র জীবনে ঐ ঘৃণিত কালি মাখিয়েছিলে বলে'ই বোধ হয় আজ এই পরিণামে এসে দাঁড়িয়েছো। উর্ম্মিলা সাধ্বী ছিল; সে সাধ্বীর মতই মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে বেঁচেছে। প্রোফেশর চৌধুরীর নাম শুনে যে হীন ধারণা বুকে পুষে রেখেছিলে, সেই নিরঞ্জন চৌধুরী যে কত বড় তা' না দেখ্‌লে, কল্পনা ক'র্‌বার ক্ষমতাও তোমার নেই—।"

অনি অবাক্ হইয়া মঞ্জিষ্ঠার পানে চাহিয়া ছিল। মঞ্জিষ্ঠাকে এত উগ্র অবস্থায় সে কখনো দেখে নাই। আজকার সব কিছুই যেন অনির কাছে একটা হেঁয়ালির মত বোধ হইতেছিল।

মেজর মঞ্জিষ্ঠার মুখ পানে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মঞ্জু, আজ আমার ঠিক্ এই তিরস্কারেরই দরকার ছিল মঞ্জু! নিজের ভুল অনেক সময় মনের কাছে ধরা দিয়েছে, কিন্তু ঠিক্ এমনি ক'রে মুখের উপর কেউ কোনোদিন বল্‌তে পারে নি ব'লেই, পথ খুঁজে পাই নি। আবার বল্ দিদি, যে, উর্ম্মিলা সাধ্বী ছিল। আমিও আজ সর্ব্বান্তঃকরণে বল্‌ছি, উর্ম্মিলা সতী। শুধু নিজের ভুলেই জীবনে এ বিপ্লব ঘটিয়ে তুলেছি, তার শাস্তিও আজ মর্ম্মে মর্ম্মে পাচ্ছি! নইলে, একদিকে যম তাঁর শেষ সমন জারি ক'রেছেন, আর একদিকে মানুষ বডি ওয়ারেণ্ট জারি ক'র্‌বে কেন? এই আমার উপযুক্ত শাস্তি। অস্তাচলের অবসান-প্রায় আলোক-রেখাটুকুতেই আজ প্রায়শ্চিত্ত হোম জলে' উঠেছে। এই ভাখ্—"

বলিয়াই মেজর বালিশের নীচে হইতে ওয়ারেণ্টখানি বাহির করিয়া দিলেন।

পরোয়ানার লেখা কয়টির উপর নজর পড়িতেই অনির পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল সে যেন ভুল দেখিতেছে। নিজের জাগ্রত বাস্তব অস্তিত্বের উপর অনির সন্দেহ হইল। সে যেন কোনমতেই নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সজোরে চক্ষু দুইটিকে মার্জ্জনা করিয়া অনি মঞ্জিষ্ঠার হাত হইতে ওয়ারেণ্টখানি লইয়া প্রত্যেকটি অক্ষর মিলাইয়া পড়িয়া দেখিল। একি! এ যে সত্যই লেখা রহিয়াছে—

শ্রীযুত অরুণময় রায় চৌধুরী
পিতা স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র রায় চৌধুরী
সাকিম—তোড়ণগ্রাম জেলা—বর্দ্ধমান

অনির সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতেছিল—সে বুঝি পড়িয়া যাইতেছে। পৃথিবীর সব কিছুই যেন একটা ভুমিকম্পের দোলায় উল্টাইয়া পড়িতেছে। দুই হাতে খাটের মেহেরাপিটাকে চাপিয়া ধরিয়া, নিজেকে সংযত করিয়া লইবার জন্য, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, অনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

মেজর ও মঞ্জিষ্ঠা—উভয়েই বিহ্বল হইয়া অনির এই আকস্মিক অবস্থান্তরের পানে চাহিয়া রহিলেন। কেহই কিছু ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মঞ্জিষ্ঠা তাড়াতাড়ি অনিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"অনি, কি হো'ল তোর?"

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে অনি আর্ত্তের মত বলিয়া উঠিল—"ওগো দিদি, মিছে আর এ ওয়ারেণ্ট কেন? তিনি যে বহুদিন আগেই সকল ওয়ারেণ্টের বাইরে চলে' গেছেন।"

"বালাই, ও কথা বল্‌ছিস্ কেন অনি? এ ওয়ারেণ্ট যে দাদার।"

মঞ্জিষ্ঠার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া, অনি পাগলের মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"ওগো না—না; এ যে আমার স্বামীর নামের পরোয়ানা। ঐ যে শ্বশুরের নাম লেখা রয়েছে,—সেই তোড়ণগাঁ—" অনির মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার ভিতরটা যেন অচেতন হইয়া আসিতেছিল।

মেজর এতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্যের মত অনির পানে চাহিয়া ছিলেন; সহসা আবেগভরে উঠিয়া বসিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"অনি, অনি, তুমিই অন্নপূর্ণা?" বনবিহারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া মেজরকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অনি জোরে মঞ্জিষ্ঠাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"অ্যাঁ! তবে ব্রাউন সাহেব বাবার কাছে যে তার ক'রেছিলেন যে 'এ-এম্ রায় চৌধুরী' যুদ্ধে মারা গেছেন'; সে কি মিথ্যে?" বুকজোড়া কান্নায় অনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

বনবিহারী ও মঞ্জিষ্ঠা অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। সবই যেন একটা তন্দ্রা-বিজড়িত স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল. কেহই কিছু উপলব্ধি করিতে পারিল না।

মেজর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—"ব্রাউন! ৫৯নং রেজিমেণ্টে আমাদেরই ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন ছিল। যে, মারা গেছ্‌লো সে—আনন্দ মোহন—সিলেটের। অনি—অনি, আগে বলনি কেন যে তুমিই অন্নপূর্ণা?"

"দেবতা, সে কথা তো কখনো জিজ্ঞাসা করো নি।"

"একদিন অনুতপ্ত বুক নিয়ে অনেক খুঁজেছিলুম অন্নু, কোথাও সন্ধান পাইনি, শেষে তোমার পিসিমার কাছে খবর পেয়েছিলুম—তোমরা কেও বেঁচে নেই। অন্নু—অন্নু—বড় দেরীতে এসেছ। জীবনের অস্তাচলে—।" মেজর উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া বনবিহারী আবার ধরিয়া ফেলিলেন। অত্যন্ত উত্তেজনায় মেজরের উর্দ্ধশ্বাস হইতে লাগিল।

—"এ অভাগীর জীবনটা যে আগাগোড়াই অস্তাচল প্রভু!…" অনির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

মঞ্জিষ্ঠা চাহিয়া দেখিল অনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি নার্সকে ডাকিয়া সে তাহাকে ধরিয়া নামাইল।

অনেকক্ষণ পর অনির যখন চেতনা সঞ্চার হইল, তখন ভীতি-বিহ্বলা কণা তাহার বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছিল—"মা, মা-মণি—"

অনি কণাকে নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, বলিল—"মা—মা—মা-মণি আমার!"

অনিকে সুস্থ করিয়া মঞ্জিষ্ঠা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, নিরঞ্জন তখন ফল ও ঔষধের শিশি হাতে করিয়া দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। একটা গিরিবক্ষে বহু-দিনের পথ হারানো দুখানি ক্লিষ্ট মেঘের মত দুজনের দেখা হইল, বিস্ময় ও নিবেদনের চকিত দৃষ্টি বিদ্যুতের ভিতর দিয়া।

(শেষ)

রুস্তমজী কাওয়াসজী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(২)

আশ্রিত-বৎসল রুস্তমজী কাওয়াসজী

রুস্তমজী কাওয়াসজীর আশ্রিত-বাৎসল্য এবং কর্ম্মচারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের কথা সমকালিক সংবাদপত্রে পাওয়া যাইতেছে। ১৮৩৯ সনের ৭ই সেপ্টেম্বরের সমাচার দর্পণ লেখেন,—

"লটারি। গত শুক্রবার লটারি খেলার শেষ দিবস যে লক্ষ টাকার প্রায়িজ্ ছিল তাহা যে টিকিটে উঠিল তাহা শ্রীযুক্ত রুস্তমজী কওয়াসজী কোম্পানী আপনারদের বোম্বাইস্থ একজন মওয়াকেকলের নামে খরিদ করিয়াছিলেন। আরো শুনা গেল যে দশ হাজার টাকার প্রায়িজ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের কপালে উঠিল।"

'ফ্রেমজী কাওয়াসজী' জাহাজে করিয়া মরিসস দ্বীপে যে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণ করা হইত তাহার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জাহাজে স্থানের অনুপাতে শ্রমিক সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় সরকারের এমিগ্রেশন এজেন্ট ১৮৪৩ সনের গোড়ার দিকে জাহাজ ছাড়িতে অনুমতি দেন নাই। উপরন্তু, তিনি, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হইবেন না এই আশঙ্কায় জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ জন মিলারকে কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া লইতে আদেশ দেন। বলা বাহুল্য, রুস্তমজী কোম্পানী এমিগ্রেশন এজেন্টের আদেশের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে এক কড়া চিঠি লেখেন, সরকারের হুজুরেও এক নিবেদন পেশ করেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (৯ই মার্চ্চ, ১৮৪৩) বলেন, এমিগ্রেশন এজেন্টের নিকট তাঁহার আদেশের প্রতিবাদ করিয়া এবং সরকারের নিকট প্রধান কর্ম্মচারীকে প্রয়োজন হইলে কর্ম্মচ্যুত করিতে সম্মতি জানাইয়া রুস্তমজী কাওয়াসজী বিশেষ সততার পরিচয় দেন নাই। এই পত্র দু'খানি আমাদের হস্তগত হয় নাই। তবে ইংলিশম্যানে প্রকাশিত রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানীর প্রশংসা ১৮৪৩ সনের ১৬ই মার্চ্চের ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া কাগজে মন্তব্য সহ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই,—

বেন ব্যাকৃষ্টে নামক সংবাদদাতা 'কাওয়াসজী ফেমিলি'র (?) কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিতে অস্বীকার করিয়া, এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানী যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রশংসা করিয়া ইংলিশম্যান কাগজে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তবে এই কোম্পানী কেন স্বেচ্ছায় উক্ত কর্ম্মচারীকে কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া লইতে সরকারের নিকট রাজি হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে ব্যাকৃষ্টে কিছুই বলেন নাই।

সমাজ সংস্কারে রুস্তমজী কাওয়াসজী

সমুদ্র যাত্রায় বরাবর অভ্যস্ত থাকিলেও পার্শীগণ পূর্ব্বে পুরস্ত্রীগণের জাহাজারোহণে আদৌ পক্ষপাতী ছিল না। রুস্তমজী কাওয়াসজীই সর্ব্বপ্রথম পার্শী তথা ভারতবাসীদের এই অন্ধ সংস্কারের মূলে আঘাত করেন। তিনি ১৮৩৮ সনের আগষ্ট মাসে সহধর্ম্মিণী, পুত্রবধূ ও পরিজনবর্গকে জলপথে কলিকাতায় লইয়া আসেন। পরিবারের স্ত্রীগণের জাহাজযোগে কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাবে বোম্বাই গেজেট (১৮৩৮, ১৬ই জুলাই) রুস্তমজীর সাহস ও উদারচিত্ততার প্রশংসা করিয়া এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—

পারসিকগণ এযাবৎ ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবসা ক্ষেত্রেই অগ্রসর বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এখন তাঁহারা স্ত্রীগণকে সমুদ্র যাত্রা করাইয়া সমাজ সংস্কারেও অগ্রণী হইয়াছেন। ১

কাওয়াসজী-পরিবার কলিকাতায় পৌঁছিলে সমাচার দর্পণ (১৮৩৮, ১৮ই আগষ্ট) লেখেন,—

১ *The National Magazine* for May, 1908. রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে আমারদের সহরবাসী শ্রীযুত রষ্টমজী কাওয়াসজীর শ্রীমতী সহধর্ম্মিণী বোম্বাই হইতে সমুদ্রপথে সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন যেরূপ হিন্দু ও মোসলমানের স্ত্রীলোকেরা সমুদ্রপথে জাহাজে গমনার্থ অনিচ্ছু তদ্রূপ পারসীয় স্ত্রীলোকেরাও বটেন অতএব দেশীয় রীতির বিরুদ্ধে এই প্রথম একজন স্ত্রী তদ্রূপ জাহাজারোহণে আগমন করিয়াছেন। ফলতঃ এমত সাহসী হইয়া দেশীয় কুব্যবহার যে পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে রষ্টমজী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে।"

রুস্তমজী স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং স্ত্রী-পুরুষে মেলামেশার সমর্থন করিতেন। তাঁহার গৃহে যে-সব গণ্যমান্য অতিথি পদার্পণ করিতেন, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের পরিচয় করাইয়া দিতেন এবং আলাপাদি করিতেও উৎসাহ দিতেন।

পার্শী অগ্নি-মন্দির

রুস্তমজী কাওয়াসজী লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ কলিকাতা ২৬নং ডুমতলায় (বর্ত্তমান এজরা ষ্ট্রীট) পার্শীদের জন্য অগ্নি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৮৩৯, ২৩এ মার্চ্চের সমাচার দর্পণে ইহার এইরূপ সংবাদ বাহির হয়,—

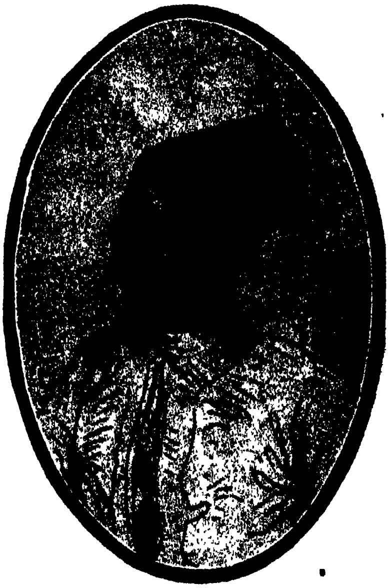
"নূতন মন্দির। সংবাদপত্র দ্বারা অগম হইল যে শ্রীযুত রষ্টমজী কাওয়াসজী ডুমতলায় অতি বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তদুপরি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বজাতীয় কতিপয় পারসিয়েরদিগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা অগ্নির উপাসক।" ৩

ঐ সনের জুন মাসের মধ্যেই যে মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ হইতে জানা যাইবে,—

কলিকাতার পার্শীদের নূতন মন্দিরে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। গতকল্য প্রাতে (১৯এ জুন) মন্দিরের পোর্টিকো ভাঙিয়া পড়ায় একজন মারা গিয়াছে, দুইজনের চোট লাগিয়াছে এবং তিনজন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। ৪

মন্দিরটি ১৮৩৯ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর উৎসর্গ করা হয়। মন্দির-গাত্রে এই উৎসর্গ-পত্র উৎকীর্ণ আছে,—

In the name of Holy Hormuzd
This Fire Temple was built at Calcutta by
Rustomjee Cawasjee Banajee Esqre-
And Consecrated according to the rites of the
Masdiasna Religion



রুস্তমজী কাওয়াসজী

For the Service of God and the observance of
Sacred Rites of Zoroastrian Religion
In the 3rd year of the Reign of
Her Majesty Queen Victoria
On the 17th day of Shurosh of the
1st Month Furrurdeen Kudmee
In the year of yezdzerd 1209 and of
Zoroaster 2229

---

২ *The Indian Review* for December, 1839: Rustomjee Cowasjee, Esq.

৩ ভারতবর্ষ—আশ্বিন, ১৩৩৮। পৃঃ ৬০২। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত সমাচার দর্পণে সেকালের কথা (১) শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪ *The Friend of India*, June 27, 1839: The weekly Epitome of News, June 20.

Corresponding with Monday the 16th September of the Christian year 1839.

রুস্তমজী কাওয়াসজীর চিত্র

১৮৩৯ সনের পূর্ব্বেই রুস্তমজী কাওয়াসজী বদান্যতা ও দেশহিতৈষিতা গুণে যশস্বী হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর সে-যুগের বিখ্যাত শিল্পী কোল্স্ওয়ার্দি গ্রাণ্ট তাঁহার একখানি চিত্র-পুস্তকে রুস্তমজীর চিত্র সন্নিবেশিত করেন। সমাচার দর্পণ (১৮৩৯, ৩০এ মার্চ্চ) ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—

"পূর্ব্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি। পূর্ব্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে অতি বদান্য পরহিতৈষী পারসীয় মহাজন শ্রীযুত রষ্টমজী কাওয়াসজী এবং বঙ্গভাষায় গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুত তাঁরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশালের জমাদার শ্রীযুত রামপ্রসাদ দোবে ও শ্রীমহেশচন্দ্র, তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব অতি প্রশংস্য হইয়াছেন।"

ইণ্ডিয়ান রিভিউ মাসিকে (ডিসেম্বর, ১৮৩৯) 'রুস্তমজী কাওয়াসজী' শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে রুস্তমজীর একখানি রেখা চিত্রও বাহির হয়। কলিকাতার কাগজ-গুলিতে ইহার প্রশংসাসূচক আলোচনা হইয়াছিল।

শিখযুদ্ধে জয়লাভের পর শিখ-কামান কলিকাতায় পৌঁছিলে ১৮৪৭ সনের ৩রা মার্চ্চ বিজয়ব্যঞ্জক শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতার গণ্যমান্য লোকেরা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই শোভাযাত্রার একখানি চিত্র (নং ১৬১৪) কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে টাঙান রহিয়াছে। চিত্রে অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজী (২৬), পৌত্রী (২৭) ও পুত্র মানকজী রুস্তমজী (৩০) দাঁড়াইয়া আছেন। নিম্নের উক্তি হইতে এই চিত্রের কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

We hear that a drawing has gone home of the magnificent structure which later adorned the Midan, and under which the Sikh guns passed before anybody was up, and the fore-ground is a group of distinguished public characters....[৫]

জন-সে য় রুস্তমজী কাওয়াসজী ডিষ্ট্রীক্‌ট চেরিটেব্‌ল্ সোসাইটি

১৮০০ সনে কলিকাতার পাদ্রীরা মিলিত হইয়া দুঃস্থ নিঃসহায় ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশীয় খৃষ্টানগণকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টা ১৮৩০ সনে পাদ্রী টার্ণারের পরিচালনায় ডিষ্ট্রীক্‌ট চেরিটেব্‌ল্ সোসাইটিতে পরিণত হইয়া রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। ডিষ্ট্রীক্‌ট চেরিটেব্‌ল্ সোসাইটির ইতিবৃত্ত ও কর্ম্মধারার সঙ্গে সম্যক পরিচিত হইতে হইলে বার্ষিক রিপোর্টগুলির আশ্রয় লইতে হয়। আমরা সোসাইটি সম্পর্কে রুস্তমজী কাওয়াসজীর কার্য্যকলাপও এই সকল রিপোর্ট হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, এই সকল রিপোর্টের পূর্ব্বাপর আমাদের হস্তগত হয় নাই। তথাপি, যেগুলি পাইয়াছি তাহা হইতেই রুস্তমজীর কৃতিত্ব সংকলন করিতে চেষ্টা করিলাম।

১৯২১ সনে প্রকাশিত নবতিতম রিপোর্টে সোসাইটির ইতিবৃত্ত প্রদান কালে এই মর্ম্মে বলা হইয়াছে,—

দুই বৎসর পরে, ১৮৩২ সনে অখৃষ্টীয় দরিদ্র জনের সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য ৩২ জন হিন্দু, ১ জন পার্শী ও পাঁচ জন ইউরোপীয় লইয়া কমিটি গঠিত হয় এবং লেফ্‌টনেণ্ট বার্ট ইহার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

১৮৩৩ সনে প্রকাশিত সোসাইটির দ্বিতীয় রিপোর্টে (১৮৩২) এই মর্ম্মে লেখা আছে,—এতদ্দেশীয় দরিদ্র জনের সাহায্যের ব্যবস্থা সম্প্রতি করা হইয়াছে, দেশীয় প্রতিনিধি লইয়া সোসাইটির অন্তঃকমিটি নিয়োগের প্রস্তাব স্থগিত রাখা হইল এবং পরবর্ত্তী রিপোর্টে (৩য়) কমিটির বিবরণ প্রকাশ করা হইবে। নবতিতম রিপোর্টে লিখিত ১৮৩২ সনের স্থানে ১৮৩৩ সন হইবে। ৺প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন, ১৮৩৩ সনের ২২এ এপ্রিল সোসাইটির সভায় দেশীয়গণকে সাহায্য দানের নিমিত্ত "Commitee of the Relief of the Native Poor নামে একটি অন্তঃকমিটি

---

৫ *The Eastern Star*, March 27, 1847.

গঠিত হয়।৬ এই অন্তঃকমিটির তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৩৩, ৩০এ এপ্রিল) রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন।৭

সোসাইটির চতুর্থ রিপোর্টে (১৮৩৪) প্রকাশ, এই নেটিভ কমিটি ৭ জন ইংরেজ, ৩২ জন হিন্দু ও ১ জন পার্শী লইয়া গঠিত। কমিটি কার্য্য সুপরিচালনার জন্য কলিকাতাকে বস্তুতঃ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি বিভাগের সীমা নির্দ্দেশ করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের সভ্যদের মধ্য হইতে দুই কি তিন জন করিয়া দর্শক (Visitor) নিযুক্ত হন। রুস্তমজী কাওয়াসজী দ্বিতীয় বিভাগে অন্যতর দর্শক নিযুক্ত হইলেন। এই বিভাগের সীমানা—দক্ষিণে জানবাজার ষ্ট্রীট, উত্তরে বৌবাজার ও বৈঠকখানা ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে সার্কুলার রোড ও পশ্চিমে ষ্ট্রাণ্ড রোড।

১৮৩৭ সনে কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্বাংশের গৃহাদি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইলে নেটিভ কমিটি গৃহহীনদের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা তুলিয়াছিলেন। অর্থ গৃহহীনদের মধ্যে যথারীতি বিতরণ করিয়াও ঐ সনে কমিটির ১৪,০০০ টাকা অবশিষ্ট ছিল।৮

সোসাইটির দশম রিপোর্ট (১৮৪০) পাঠে জানা যায়, কলিকাতা তখন দ্বাদশ ভাগের বদলে দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তর বিভাগ ও দক্ষিণ বিভাগ, এবং রুস্তমজী কাওয়াসজী দক্ষিণ বিভাগের দর্শক।

দুঃস্থ ও নিঃসম্বল ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মের বিনিময়ে যাহাতে অর্থ-দান করা হয়, এই উদ্দেশ্যে সোসাইটির সভ্যগণের, বিশেষতঃ ভারতীয় সভ্যগণের মধ্যে বহুদিন যাবৎ আন্দোলন চলিয়াছিল। অতঃপর ১৮৪০ সনের ৩০এ এপ্রিল টাউনহলের সভায় স্থির হয় যে, নগদ অর্থ না দিয়া দুঃস্থগণকে ভিক্ষা-গৃহে (Alms House) আশ্রয় দিয়া তাহাদের জন্য একটি কর্ম্মশালা (Work House) নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইবে। আর এক প্রস্তাবে প্রকাশ্য স্থানে ভিক্ষা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে 'ভ্যাগ্রান্ট এ্যাক্ট' পাশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান হয়। এই সাধু প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিতে গিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর সভায় এই মর্ম্মে বলেন,—

দরিদ্রজনের সাহায্যার্থ প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বনের কথা ইতিপূর্ব্বে সোসাইটির ভারতীয় সভ্যগণের মনেও উদিত হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত দেশীয়গণের এক জনসভায় ভিক্ষা-গৃহ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মতিলাল শীল ভূমি দান করিতে ও রুস্তমজী কাওয়াসজী টালির ঘর নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। আইন করিয়া প্রকাশ্য স্থানে ভিক্ষা বন্ধ করিবার প্রস্তাবও সভায় বিবেচিত হইয়াছিল। যখন নেটিভ কমিটি এই বিষয় বিবেচনা করিতেছিলেন তখন মূল সোসাইটি এই ব্যয়-ভার স্বহস্তে লওয়ায় কমিটি আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন বিবেচনা করেন নাই।৯

উপরের উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, বহুদিন যাবৎ আন্দোলন চলিলেও ভিক্ষা-গৃহ স্থাপনে সোসাইটির ভারতীয় সদস্যগণই অগ্রণী হইয়াছিলেন।

টাউনহলের সভায় নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্য সোসাইটির এগার জন সভ্য লইয়া তখন এক বিশেষ কমিটি স্থাপিত হয়। বিশেষ কমিটির সভ্যদের মধ্যে ভারতীয় ছিলেন ৩ জন,—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল ও রুস্তমজী কাওয়াসজী। বিশেষ কমিটি টাউনহলের সভায় নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া ভিক্ষুকের উপদ্রব দূরীকরণার্থ এক আইন পাশ করিতে ৩০এ মে পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। ভিক্ষা-গৃহ স্থাপনেও যে সোসাইটি মানস করিয়াছেন তাহাও এই পত্র দ্বারা সরকারের গোচর করান হয়।১০ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপীড়ক ভিক্ষুকদের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইবে সরকার এই মর্ম্মে এক আইনের খসড়া

৬ The *National Magazine* for March, 1908. P. 89.

৭ *The India Gazette* May 6, 1833

৮ Seventh Report (1837). District Charitable Society.

৯ Tenth Report (1840). Also *The Friend of India*, May 7, 1840.

১০ *The Friend of India*, Oct. 8, 1840: District Charitable Society.

প্রকাশ করেন। কমিটি পুনরায় ৩০এ সেপ্টেম্বর ইহার প্রতিবাদ করিয়া সরকারের হুজুরে এক পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের অংশ-বিশেষের মর্ম্ম এই,—

সোসাইটি যে-আইন পাশ করিতে সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন, সরকার তাহা সংশোধিত আকারে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিতে কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তাহা তাঁহাদের জানা নাই। তাঁহারা সবিনয়ে জানাইতেছেন যে, সোসাইটি যে-উদ্দেশ্যে আইন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আইনের মুদ্রিত বর্ত্তমান খসড়ার ধারাগুলি তাহার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। ভিক্ষা-গৃহ নির্ম্মিত হইলে লোকেরা যাহাতে সকল শ্রেণীর ভিক্ষুকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পায় এই উদ্দেশ্য লইয়াই গবর্ণমেণ্টকে আইন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। ১১

বিশেষ কমিটির পত্রে কাজ হইয়াছিল। ১৮৪০ সনের ২০এ নবেম্বর 'ভ্যাগ্রাণ্ট এ্যাক্ট' পাশ হয়। সরকার ভিক্ষা-গৃহ নির্ম্মাণার্থ ১৮৪০ সনের ১৪ই অক্টোবর সোসাইটিকে ৩৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ভূমি, এবং সোসাইটির কুষ্ঠাশ্রমের জন্য ঐ ভূমি সংলগ্ন ২৬ নং দাগের জমি (৪ বিঘা ৬ ছটাক) দান করেন। ভিক্ষা-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য রুস্তমজী এককালীন দু'হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১২

সোসাইটির উনবিংশতিতম রিপোর্টে (১৮৪৯) প্রকাশ, ঐ বৎসর সোসাইটির আইন-কানুন কতকটা অদল-বদল হয়। নেটিভ' কমিটিও তখন আমূল পরিবর্ত্তিত হয়। সম্ভবতঃ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুস্তমজী ইহার সভ্যপদ ত্যাগ করেন।

রুস্তমজী যতদিন সোসাইটির সভ্য ছিলেন, এককালীন দান বাদে, বার্ষিক দুই শত টাকা করিয়া চাঁদা দিতেন। ১৩

১৮৩৯ সালে ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে কলিকাতায় একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনেরও চেষ্টা হইয়াছিল। সমাচার দর্পণ (১৬ই মার্চ্চ, ১৮৩৯) বলেন,—

শুনিলাম যে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল শীল কুষ্ঠী ব্যক্তিদিগের বাস নিমিত্ত মৃজাপুরে একটা স্থান করিয়াছেন এবং রোস্তমজী কওয়াসজী ঐ নিমিত্ত খোলা ঘর নির্ম্মাণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। —জ্ঞানান্বেষণ

কলিকাতার উন্নতি-বিধানে রুস্তমজী কাওয়াসজী

আজিকার এবং এক শত বৎসর পূর্ব্বেকার কলিকাতায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তখন কলিকাতা সর্ব্বরোগের আকর ছিল। সেখানকার রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, পানীয় জল ও গৃহাদির মোটেই সুবন্দোবস্ত ছিল না। বর্ষা-শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এক জ্বররোগেই হাজার হাজার লোকের দেহান্ত ঘটিত। কলিকাতার ধর্ম্মতলাস্থ নেটিভ হাঁসপাতালের পরিচালকগণ ইহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ১৮৩৫ সনের ২০এ মে কমিটির এক বিশেষ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় পরিচালকগণের কয়েক জনকে লইয়া এক অন্তঃকমিটি গঠিত হয়, উদ্দেশ্য—(১) শহরের মধ্যভাগে সর্ব্বপ্রকার, বিশেষতঃ জ্বরাক্রান্ত দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি ফিভার হাঁসপাতাল স্থাপন, এবং (২) শহরের ও শহরতলীর স্বাস্থ্যের উন্নতির উপায়াদি নির্দ্ধারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পেশ করা। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সাধারণের গোচর করিবার জন্য কমিটির পক্ষ হইতে ইহার অন্যতম সভ্য মিঃ ডব্‌লিউ স্মিথের সভাপতিত্বে ১৮ই জুন কলিকাতা টাউনহলে এক জনসভার অধিবেশন হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী সভায় যোগদান করিয়া ফিভার হাঁসপাতাল স্থাপনের নিমিত্ত যে অর্থ-দান করিয়াছিলেন এবং চাঁদা আদায়ের জন্য ভারতীয় কমিটিতে যে অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নেটিভ হাঁস-পাতালের অন্তঃকমিটিতে জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েক জন সভ্য লইবার প্রস্তাবও এই সভায় গৃহীত হয়, এবং পরে দশ জন সভ্য কমিটিতে যুক্ত হন। বলা বাহুল্য, রুস্তমজী কাওয়াসজী এই দশজনের মধ্যে একজন ছিলেন। প্রথমতঃ, কমিটির উদ্দেশ্য লইয়া সরকারের সঙ্গে কিছুকাল পত্র-ব্যবহার চলে। পরে, ১৮৩৬ সনের ৩রা জুন বাংলার লাট

---

১১ *Ibid.*

১২ The Eleventh Report, (1841) and *The National Magazine* for March 1908. P. 74.

১৩ সোসাইটির ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ১০ম ও ১১শ রিপোর্টের বার্ষিক চাঁদা-দাতৃগণের তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে। অন্য রিপোর্টগুলি পাই নাই। তবে যেগুলি পাইয়াছি তাহা হইতে উপরের সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অমূলক নহে।

অকল্যাণ্ড কমিটির উদ্দেশ্য অনুমোদন করিয়া ইহার সঙ্গে কলিকাতার কর-নির্দ্ধারণ ও কর-আদায়ের ব্যবস্থার অনুসন্ধানের ক্ষমতাও কমিটিকে দেন এবং তাঁহার মনোনীত দুইজন বিশেষজ্ঞকে ইহার সভ্য নিয়োগ করেন। ভারতীয় দশজন সভ্যের মধ্যে মাত্র তিনজন (রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত) কমিটির কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর এই কমিটি ১৪ গবর্ণমেণ্ট মনোনীত বলিয়াই গণ্য হইল। ১৪

উদ্দেশ্য ব্যাপক হইয়া পড়ায় কমিটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। কর নিরূপণ, আদায় এবং ব্যয়ের ব্যবস্থা অনুসন্ধান প্রথম কমিটির কার্য্য হইল। দ্বিতীয় কমিটি শহর সংরক্ষণ (Conservancy) বিভাগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার লইলেন। ১৫ ফিভার হাঁসপাতালের জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা ব্যাপারের বিবেচনার ভার পড়িল তৃতীয় কমিটির উপর। রুস্তমজী কাওয়াসজী দ্বিতীয় কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন। ১৬

দ্বিতীয় কমিটির সভ্য হইলেও মূল কমিটির সভ্য ও কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রত্যেক কমিটিকেই নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রত্যেক কমিটির সম্মুখে তিনি যে সাক্ষ্য দেন ও মতামত প্রকাশ করেন তাহা হইতে সেকালের কলিকাতার, বিশেষতঃ বাঙালী অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চলের বাসস্থান, গৃহ-নির্ম্মাণ-রীতি, রাস্তা ঘাট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, জলাভাব, বাঙালীদের অভ্যাস ও আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান প্রকটিত হইয়াছে। তিনি শহরের দুর্দ্দশার প্রতীকার-কল্পে যে-যে উপায় অবলম্বন করিবার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক কমিটি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন, এবং সাধারণ কমিটির রিপোর্টে তাহা সন্নিবেশিত হয়।

সেকালের কলিকাতায় চালাঘরের সংখ্যাধিক্য থাকায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে আগুন লাগিয়া পাড়াকে-পাড়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত। ১৮৩৭ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে ১লা মে পর্য্যন্ত কলিকাতার চালাঘরের শতকরা ১৫খানা, এবং শুধু এপ্রিল মাসেই মোট চালাঘরের অষ্টমাংশ আগুনে পুড়িয়া যায়। ইহার প্রতীকার-পন্থা নির্ণয়ের ভার প্রথম কমিটির উপর পড়িলে কমিটি বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ১৭ রুস্তমজী কাওয়াসজী মে মাসে দুই তারিখে ইহার নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমবারের সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, শহরের উত্তরাংশে অগ্নির প্রকোপ তিনি সম্প্রতি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আগুন নিভাইবার জন্য দমকল আসিয়াছিল, কিন্তু জলাভাবে ইহা কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৮ রুস্তমজী অগ্নির প্রকোপ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় নির্দ্ধারণ করেন,—(১) বহুসংখ্যক সুগভীর পুষ্করিণী খনন, এবং (২) জনগণকে চালাঘরের বদলে খোলার ঘর নির্ম্মাণে বাধ্য করানো। পুষ্করিণী খনন সম্পর্কে তিনি বলেন,—

"আপার সার্কুলার রোড দিয়া বরাবর কিছু ব্যবধানে কতকগুলি গভীর বড় পুষ্করিণী অবিলম্বে খনন করা আবশ্যক। শহরের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এখানেই জলের একান্ত অভাব। অগ্নিদগ্ধ ঘরবাড়ীর স্থানে জমিদারগণ পুনরায় গৃহ নির্ম্মাণ করার পূর্ব্বে অল্প মূল্যেই ভূমি ক্রয় করা যাইতে পারে। ইহার ব্যয়ভার সরকারের বহন করা উচিত। তবে এ কার্য্যে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, সরকার যদি ভূমি ক্রয় করেন, আমিই বৈঠকখানা, মির্জ্জাপুর, এবং মাণিকতলায় নিজ ব্যয়ে চারিটা পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিব। আমি নিশ্চিত

১৪ স্যর ই. রায়ান, স্যর জে. পি. গ্রাণ্ট, সি. ডব্লিউ স্মিথ, রামকমল সেন, এস্. নিকলসন, জে. আর. মার্টিন, এ. আর. জ্যাকসন, রুস্তমজী কাওয়াজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, আর. ককেরেল, এ. রজার্স, ইঁহারা ছিলেন কমিটির সভ্য।

১৫ *The Fever Hospital and Municipal Enquiry Commitee* (1st Report, Jany. 7 1840) & *The Calcutta Courier*. June 19, 1835 হইতে তথ্য গৃহীত।

১৬ *The Fever Hospital & Municipal Enquiry Commitee*, (1st report. January 7, 1840.)

১৭ *Ibid*. Appendix A-C.

১৮ *Ibid*. Appendix C. Minutes on the Late Fires. CxxxIx.

জানি, অনেক ধনী জমিদার শহরের অন্যান্য অংশেও এইরূপ পুষ্করিণী খনন করাইবেন।" ১৯

রুস্তমজী ১৮৩৮ সনের ১০ই জানুয়ারি দ্বিতীয় কমিটির অধিবেশনে পুষ্করিণীর গভীরতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—

"কলিকাতায় আমার অধীনস্থ বিভিন্ন জায়গায় অনেকটি পুষ্করিণী কাটাইয়াছি; কাজেই এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।" ২০

রুস্তমজী উপরোক্ত প্রস্তাব অনুসারে যে নিজ ব্যয়ে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এই উক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সরকার যে তখন তাঁহার প্রস্তাবে রাজি হইয়া পুষ্করিণীর জন্য ভূমি ক্রয় করেন নাই তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

রুস্তমজী কাওয়াজী চালা ঘরের বদলে খোলার ঘর নির্ম্মাণের আবশ্যকতা কমিটিকে বুঝাইয়া দেন, এবং ইহার বিরুদ্ধ মত অকাট্য যুক্তি তর্ক দ্বারা খণ্ডন করেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক খোলার ঘর নির্ম্মাণে চালা ঘরের চেয়ে দেড় টাকা আন্দাজ বেশি লাগিবে বটে, কিন্তু অন্যান্য সুবিধার কথা ধরিতে গেলে এ ব্যয় কিছুই নহে। খোলার ঘর একক্রমে ছয়, আট, এমন কি দশ বৎসরও টিকিয়া যায়, কিন্তু চালা ঘর দু'তিন বৎসরের অধিক কোন মতেই টিকে না। চালা ঘর প্রতি বৎসর মেরামত করা দরকার, খোলার ঘর মেরামতের হাঙ্গামা নাই। খোলার ঘরে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও অমূলক, কারণ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ খোলারঘর-বহুল হইলেও এই কারণে তথায় অসুখ বিসুখ হওয়ার কথা শুনা যায় না। উপরন্তু, প্রত্যেকবার চালা-ঘর আগুনে পুড়িয়া যায় বলিয়া দরিদ্র জনেরা একেবারে সর্ব্বহারা হইয়া যায় এবং তখন তাহাদের দুর্দ্দশার অন্ত-অবধি থাকে না। ইহার একমাত্র প্রতীকার আইন করিয়া জমিদারদের ও লোকেদের চালা ঘরের পরিবর্ত্তে খোলার ঘর নির্ম্মাণে বাধ্য করানো। ২১ দরিদ্রজনের এই দুঃসময়ে এরূপ আইন পাশ হইলে তাহাদের যে ভীষণ বিপদে পড়িতে হইবে তাহা রুস্তমজী বিলক্ষণ জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়াই কমিটির সমক্ষে সাধারণের সাহায্যের জন্য একটি সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব যে একদা পুরাপুরি কার্য্যকরী হইয়াছিল, নিম্নের উক্তি হইতে তাহা বুঝা যাইবে;—

"ইতিপূর্ব্বে পুলিস হইতে এমত ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইয়াছিল, নগর মধ্যে কেহ তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না এবং নগরবাসি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ, বাঙ্গালি, পার্সি প্রভৃতি সাধারণে এক প্রকাশ্য সভা করিয়া চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিল, অর্থাৎ খোলার ঘর করিতে যাহারদিগের নিতান্ত সঙ্গতি না হইবেক তাহারদিগের সেই টাকা হইতে সাহায্য করিবেন, একারণ ঐ সভা হইতে "ফায়ার কমিটি" নামে এক কমিটিও হইয়াছিল, বিখ্যাত পার্সিবণিক রুস্তমজী কোয়াসজী তাহাতে বিস্তর টাকা দিয়াছিলেন, এইক্ষণে সেই কমিটিই বা কোথায় এবং পুলিসের সেই অনুমতিই বা কোথায় প্রতিপালিত হইতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না।" ২২

শহর স্বাস্থ্যময় ও সৌষ্ঠবপূর্ণ করিতে হইলে কতকগুলি কার্য্য ব্যাপকভাবে করা আবশ্যক। গৃহাদির অবস্থান ও নির্ম্মাণের সুব্যবস্থা, অবাধে বায়ু চলাচলের জন্য ও যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ, পানীয় জলের অভাব

---

১৯ I would recommend that a line of deep, large tanks should be immediately dug, at convenient distances, all along the Upper Circular Road. Where water is more scarce, than any other part of the ground might now be perchased at moderate prices before the proprietors have time to erect new huts on the site of those burnt down. I think the Government ought to bear the expense, but as an inducement for them to come forward *I will undertake, if Government will buy the ground, to excavate at my own expense four large tanks between the Boitaconnah, Mirzapore and Manicktollah* and I am sure many rich land-holders will do as much or more in other parts of the town. (*Italics ours.*)

Report of the Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee-Appendix C. Minutes on the Late Fires. C x x x i x, May, 1837.

২০ "I have made a good many tank in different places in my own ground in Calcutta, and consequently have considerable experience in this matter."

২১ *Report of the Fever etc.* Appendix C. Minutes C xxxix & C xvi.

২২ সংবাদ প্রভাকর, ৪ মার্চ্চ ১৮৫৩

দূরীকরনার্থ সুগভীর পুষ্করিণী খনন এবং পয়ঃপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দ্বিতীয় কমিটির পক্ষ হইতে ইহার সভাপতি স্যর জন পিটর গ্রাণ্ট ও সভ্য রুস্তমজী কাওয়াসজী কখনও একযোগে, এবং কখনও বা রুস্তমজী কাওয়াসজী একাকী শহরের দেশীয় অঞ্চল বিশেষের ২৩ অলি-গলিতে পর্য্যন্ত গমন করিয়া তথ্য নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা ঐ স্থান সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই,—

কলেজ ষ্ট্রীটের কাছাকাছি কতকটা জায়গা ছাড়া এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই ঘন বসতি। এ অঞ্চলের বাড়ি ও দোকান-ঘরগুলি পাশাপাশি অবস্থিত। বাড়িগুলি ততটা উঁচু না হইলেও আলো বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। রাস্তাগুলি সরু, আঁকাবাঁকা ও ঘোরালো হওয়ায় এখানে বায়ুর স্বতঃ চলাচল প্রায় বন্ধ। রাস্তাগুলি দৈর্ঘ্যে পোয়া মাইলেরও কম এবং কদাচিৎ বার ফুটের অধিক প্রশস্ত। এই বার ফুটের আবার প্রায় তিন ফুট জুড়িয়া পচা জল ও আবর্জ্জনাপূর্ণ দু'তিন ফুট গভীর নর্দ্দমা। এই নর্দ্দমার উপরিভাগ সেতু দ্বারা একেবারে ঢাকা—অবশ্য মধ্যে মাঝে দু'এক ফুট ফাঁক আছে। সেতুর উপর দিয়া গৃহে প্রবেশের পথ, আবার অনেক স্থলে সেতুর অব্যবহিত পার্শ্বেই এক হইতে তিন ফুট উঁচুতে দোকান-ঘর তৈরি হইয়াছে। নর্দ্দমার উপরিস্থ সেতুই প্রকৃত প্রস্তাবে দোকান-ঘরের নির্ভর হওয়ায় ইহা কখনও পরিষ্কার করা সম্ভবপর হয় না। মাঝে মাঝে যে ফাঁক আছে তাহা হইতে অনবরত দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহাতে কি রাস্তায় কি বাড়িতে কোথাও তিষ্ঠিতে পারা যায় না। ২৪

রিপোর্টের শেষে রুস্তমজী কাওয়াসজী বৎসরের অন্যান্য সময়ে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে, এই অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলেন,—

তিনি [রুস্তমজী] বর্ষাকালে বহুবার এই অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। অল্প বারিপাতেই এই অঞ্চলের নর্দ্দমাগুলি পূর্ণ হইয়া যায়, এবং জল নিষ্কাশনের পথ একরূপ না থাকায় রাস্তায় দু'এক ফুট জল জমিয়া যায়। জল নিঃসরণ হইতে প্রায়ই আট ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ে জলের ভিতর দিয়াই যাতায়াত করিতে হয়। এ অঞ্চলের বাড়িগুলি রাস্তার ইঞ্চিকয়েক নীচুতে অবস্থিত। কাজেই জলে বাড়ির নিম্নভাগ অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকে এবং ইহা অস্বাস্থ্যকর হয়। ২৫

২৩ লালবাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজার এবং কলেজষ্ট্রীটের মধ্যবর্ত্তী স্থান। *The fever Hospital and Municipal Euquiry Gommittee Report*. Appendix D. P. 74.

২৪ The whole of this place, with the exception of some places near College Street, is most thickly inhabited; the houses and shops adjoin; and though not lofty, are sufficiently high to exclude sun and air; the free circulation of the latter of which is effectualy prevented, by the extreme narrowness sharp angles and perpetual tortuosities of the streets; few streets being more than a quarter of a mile in length in the same direction, and may not so much; none of the streets except those to be presently mentioned much exceeding twelve feet between the front walls of the opposite houses, many being much narrower; and often space from one foot, to one and a half foot in width, being occupied by a kennel on each side. These kennels are apparently two or two and a half feet deep' with brick sides the bottoms filled with perfectly stagnant water and filth; and tops covered, at distances of from one foot to two feet and two and a half feet apart with buildings from six to ten feet in length, which in a few places are the entrances to houses; but which in all other instances are the supports of the platform used as shops; which platforms are erected immediately over the Kennel, from one foot to three feet above it, the space between the bridge and the platform being closed to the front, so that no part of the kennel is accessible for the purpose of cleansing' it but the above mentioned intervals of one, two, or two and a half feet in length at various instances of not less than six or more than ten feet from each other; while the whole stench freely escapes into the streets and houses.

The Fever Hospital & Municipal Enquiry Committee Report. Appendix D. P. 74.

২৫ He [Rustomjee] has frequently seen the part of the town above described during the rains, and that after an ordinary fall of rain, the Kennels having no outlet, overflow and cause the water to cover the streets to the depth of one foot or more—and that it sometimes takes a whole day to run off seldom less than eight hours during which there is no passage but through this water; and the houses (of

রুস্তমজী ও গ্রাণ্ট সাহেব দ্বিতীয় বার একযোগে ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া এই রিপোর্ট দেন,—

আমরা পুনরায় শহরের দেশীয় অঞ্চল পরিদর্শন করিলাম। পূর্ব্ব বারের চেয়ে এবার এইমাত্র প্রভেদ যে, এবার আবর্জ্জনা-জঞ্জাল অত্যধিক দেখিলাম। নানা বাধার সৃষ্টি করিয়া রাজপথ আগলানো হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটগণের এদিকে আদৌ দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয় না। ২৬

এই রিপোর্ট পেশ করিবার পর কমিটিতে সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণের প্রশ্ন উঠে। রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে হইলে সরকারকে সাধারণের নিকট হইতে জায়গা ক্রয় করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে লাভালাভের কথা উঠিলে রুস্তমজী বলেন যে, রাস্তা নির্ম্মাণার্থ জায়গা ক্রয় করিতে সরকারের যে ব্যয় পড়িবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার দেড় গুণ লাভ হইবে। কারণ, প্রশস্ত রাস্তার দুই পাশের জমির চাহিদা বেশী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই জায়গার দাম ঢের বাড়িয়া যাইবে। ২৭

অগ্নির প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্তই যে পুষ্করিণী আবশ্যক তাহা নহে, সুপেয় জলের অভাব নিরাকরণের জন্যও ইহার একান্ত প্রয়োজন। সেকালের কলিকাতায় ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের অন্যতম কারণ সুপেয় জলের অভাব। বৈঠকখানা অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখপাত্র এ, ডিসুজা সাহেব সাধারণ ও শহর সংরক্ষণ কমিটির সভ্য হিসাবে রুস্তমজীকে এক পত্রে তাঁহাদের জলের অভাবের কথা জ্ঞাপন করেন। রুস্তমজী এই পত্রের উল্লেখ করিয়া প্রথম কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, আগুন লাগিলেই যে জলের অভাব অনুভূত হয় তাহা নয়, রন্ধনের ও পানের জন্যও লোকেদের অশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পর দ্বিতীয় কমিটিতে পুষ্করিণী খননের কথা উঠিলে রুস্তমজী নিজের অভিজ্ঞতা হইতে ইহার ব্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পুষ্করিণীর গভীরতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বিশ ফুটের পরিবর্ত্তে পুষ্করিণী ত্রিশ ফুট গভীর করিতে হইবে। ইহার কম হইলে সুপেয় জলের সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটিবে। ২৮

দ্বিতীয় কমিটিতে রুস্তমজীর যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ আলোচনা (রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন সম্পর্কে) পাঠ করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর কমিটির সভাপতি মহাশয়কে এই মর্ম্মে লেখেন,—

আমি রুস্তমজীর আলোচনা সযত্নে পাঠ করিয়াছি, এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারিয়া সুখ অনুভব করিতেছি। পৃথক উত্তর দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।······২৯

ফিভার হাসপাতাল স্থাপনার্থ তৃতীয় কমিটি আশানুরূপ টাকা তুলিতে না পারায় সাধারণ কমিটির মত অনুযায়ী আদায়ী টাকা ৬৭,৯২৩৸৴৭ পাই (কাহারও মতে, ৫৫,৪৬২৲ ৩০) দুইটি সর্ত্তে ১৮৪৭ সনের ২৩এ এপ্রিল কলিকাতার শিক্ষা পরিষদে (Council of Education) দান করেন,—(১) টাকা দ্বারা কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে হইবে, এবং (২) যত শীঘ্র সম্ভব একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। ৩১

১৮৪৮ সনের ৩০এ সেপ্টেম্বর তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন বার হাজার টাকা মূল্যের মতিলাল শীল কর্তৃক প্রদত্ত একখণ্ড জমির উপরে হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হাঁসপাতালের নাম হইল মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল। ৩২

প্রথম কমিটির উপর যেমন আগুনের প্রকোপ এড়াইবার

which there are many) which are a few inches lower than the road, or street, have the lower part overflowed, and rendered uninhabitable. *Ibid.*

২৬ *The Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee Report.* Appendix D. P. 75.

২৭ *Ibid.* P-p. 193—195. Rustomjee Cowasjee before Municipal Enquiry 2nd Sub-Committee.

২৮ *Ibid.*

২৯ *The Fever Hospiial and Municipal Enquiry Committee Report.* Appendix D. P. 195.

৩০ *The Friend of India,* Octobtr 5, 18 48.

৩১ *The Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee* (3rd Report) P. 8.

৩২ *The Friend of India* October 5, 1848.

উপায় নিরূপণের ভার পড়িয়াছিল তৃতী কমিটির উপর-ও তেমনই খেয়াঘাট ব্যবস্থার আলোচনার ভার পড়ে। তখন হাজার হাজার লোক গঙ্গা পারাপার হইত। খেয়ার নৌকাই ছিল গঙ্গা পার হইবার একমাত্র সহায়। গঙ্গাতীরে নির্দ্দিষ্ট খেয়াঘাট না থাকায় লোকেরা যেখান-সেখান হইতে নৌকায় উঠিত এবং এ-কারণে তাঁহাদের জিনিষপত্রও চুরি-ডাকাতি হইত। গঙ্গাবক্ষে নৌকাডুবি হইয়া লোকে প্রায়ই ধনে-প্রাণে নাশ পাইত। রুস্তমজী তৃতীয় কমিটির সমক্ষে তৎকালীন খেয়াঘাট ও নৌকার দুরবস্থা ও দুর্ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়া যে প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণ করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য,—

খেয়া নৌকায় নম্বর থাকিবে এবং ইহা রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। নৌকার প্রকাশ্য স্থানে মালিক ও যাত্রীসংখ্যা স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকিবে। যাহারা ইহার অন্যথা করিবে তাহাদের নিকট হইতে মোটা জরিমানা আদায় করিতে হইবে। নৌকার শ্রেণীবিভাগ করিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া দেওয়া দরকার। প্রতি মাসে নৌকা ও নৌকামাঝির যোগ্যতা পরীক্ষা করিতে হইবে। ৩৩

রুস্তমজী কাওয়াসজী কলিকাতার উন্নতিকল্পে ফিভার হাসপাতাল ও মিউনিসিপ্যাল এন্‌কোয়ারি কমিটির সভ্য হিসাবে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার সামান্য মাত্র আভাস দিতে এখানে প্রয়াস পাইলাম। কমিটির রিপোর্ট তিন বার প্রকাশিত হয়। ৩৪ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী অবিলম্বে কার্য্য না হইলেও এই সময় হইতেই বর্ত্তমান কলিকাতার উন্নতির পত্তন হয়। স্যর হেনরি ইভান এ, কটন বলেন,—"It marks the beginning of the modern Municipal Government." ৩৫

কমিটির সভাপতি সুপ্রিমকোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যর জন পিটর গ্রাণ্ট চাকরি ছাড়িয়া বিলাত যাইবার প্রাক্কালে কলিকাতাবাসীরা তাঁহাকে যে অভিনন্দন দিয়াছিলেন তাহার এই অংশ রুস্তমজী কাওয়াসজীর সম্বন্ধেও হুবহু প্রযোজ্য।

We hope to realize permanent results in a sensible improvement of the health and comfort of the inhabitants of Calcutta from the establishment of sanitary regulations and of a Fever Hospital, in the accomplishment of which important objects of the city will ever associate your name, with a grateful recollection of the lively interest evinced by you, and the valuable aid afforded in devising a comprehensive scheme of Municipal Administration of our Metropolis. ৩৬

সংবাদ-পত্রে রুস্তমজী কাওয়াসজীর পরলোকগমনের কথা

১৮৪৮ সনে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় রুস্তমজী কাওয়াসজীর দেহ-মন একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। ১৮৫২ সনের ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার রজনীতে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার দেহত্যাগ হইলে কলিকাতার ইংরেজী বাংলা সংবাদ পত্র তাঁহার নানা কীর্ত্তি-কলাপের উল্লেখ করিয়া শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক ইংলিশম্যান (১৯এ-এপ্রিল) লেখেন,—

Rustomjee has resided about 33 years in Calcutta and for a great part of that time carried on a very extensive business as a merchant and a ship-owner, and for his activity and enterprize was well-known to men of business all over the East. During his prosperity he sought the European society and breaking through the restraints usual among his countrymen, did not hesitate to introduce the ladies of his family to his guests, among whom the Governor General has more than once been present. When what is called a commercial crisis visited Calcutta, Rustomjee shared in the misfortune of his neighbours, and lost nearly all that he had been working for during a long and laborious life. He has

৩৩ *The Fever Hospital & Municipal Enquiry Committee Report*. Appendix K. Pp. 77-78.

৩৪ *Ibid.* 1st Report 7th January 1840; 2nd Report, 7th August, 1846; 3rd Report, 30th October 1847.

৩৫ *Calcutta Old and New.* 1907 P. 171.

৩৬ *The Friend of India*, March 16, 1848.

since that time lived in a very retired manner, and as his health also declined, he utterly withdrew in a great measure from business. The cause of his death is stated to have been disease of heart, which at his advanced age could not be expected to have other than a fatal termination. Rustomjee was extremely liberal while he had the means, and there must be many yet living who have felt his kindness when it was of the utmost value to them. ৩৭

সে-সময়ের আর একখানা দৈনিক 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১১ই বৈশাখ, ১২৫৯) রুস্তমজীর মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হইয়া লিখিয়াছেন,—

আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরীর বিখ্যাত ধনি বণিক্‌বাবু রোস্তমজী কৌয়াসজী গত শুক্রবার রজনীতে লোকান্তর গমন করিয়াছেন; রোস্তমজীবাবু ৩০ বৎসরকাল পর্য্যন্ত এতন্নগরে বর্ত্তমান থাকিয়া বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিয়া উদারস্বভাবে দান ও পুণ্যভাজন কর্ম্মে ব্যয় করিয়া সুখ্যাত হইয়াছেন। কলিকাতার বাণিজ্য-বাজারে অগ্নি লাগাতে রোস্তমজী কৌয়াসজী অন্যান্য বণিক্‌দিগের ন্যায় মন্দাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয়েন, তদবধি বিবেকীর ন্যায় শান্তভাবে কালক্ষেপণ করিতেছিলেন, ফলে মনঃপীড়োপলক্ষেই তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।

পরিশিষ্ট

"রুস্তমজী কাওয়াসজী" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমাংশ ছাপা হইবার পর রুস্তমজী কাওয়াসজীর সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি নূতন তথ্য আমার হস্তগত হইয়াছে। এখানে তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম।

১। ১৮২৮ সনের ৩রা এপ্রিল তারিখের 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে' কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টে দেশী-বিদেশী যে-সকল ব্যক্তি জুরি হইবার যোগ্য তাঁহাদের তালিকা বাহির হয়। এই তালিকায় রুস্তমজী কাওয়াসজীর উল্লেখ আছে। ইহা হইতে রুস্তমজীর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

জুররের নাম	রুস্তমজী কাওয়াসজী
পেশা	ব্যবসায়ী
বাসস্থান	পোলক ষ্ট্রীট
জন্মভূমি	ইষ্ট ইণ্ডিস্ (ভারতবর্ষ)
ধর্ম্ম	পার্শী

রুস্তমজী কাওয়াসজী দুই লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মালিক। যাঁহারা পঞ্চাশ টাকা বাড়ি-ভাড়া দিয়া সাধারণ জুরের শ্রেণীভুক্ত, রুস্তমজী সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

২। কটকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুঃস্থদের সাহায্যার্থ কলিকাতায় চাঁদা তোলা হয়। 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে' (২৪এ নবেম্বর, ১৮৩১) প্রকাশ,—কলিকাতায় তখন বেশ চাঁদা আদায় হইতেছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে একশত টাকা দান করেন।

৩। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মত বিদেশীয়েরাও যাহাতে এদেশে স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে সেই জন্য বিলাতের মহাসভায় আবেদন করিবার জন্য ১৮৩২ সনের ২৪এ মার্চ্চ কলিকাতা টাউনহলে এক সভা হয়। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজীও ছিলেন। ৩৮

৪। দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদী-প্রতিবাদীর প্রার্থনানুসারে জুরি দ্বারা বিচারের জন্য পার্লামেণ্টে আবেদন করিবার যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট লোকেরা সেরিফ মহোদয়কে অনুরোধ জানান যে, তিনি যেন অবিলম্বে এক সভা আহ্বান করেন। ৩৯ সেরিফ মহোদয়ের আহ্বানে ১৮৩২ সনের ১৪ই এপ্রিল বেলা ১১টার সময় কলিকাতার টাউনহলে সভার অধিবেশন হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী সভা আহ্বানকারীদের মধ্যে একজন এবং এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

৫। ১৮৩৫ সনের ৩০এ জানুয়ারি বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন দিবার উদ্দেশ্যে ককরেল সাহেবের সভাপতিত্বে 'এক্সচেঞ্জ' গৃহে অনুষ্ঠিত এক সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়,—

৩৭ *The National Magazine* for May, 1908. Pp. 174-175. রুস্তমজী কাওয়াসজী' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

৩৮ *The India Gazette*, March... 1832.

৩৯ *The Bengal Hurkaru* April 9, 1832

বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন প্রদান করিতে এই ভদ্রমহোদয়গণকে অনুরোধ করা যাইতেছে—মেসার্স ককরেল, হার্ডিং, কোকেন, রুস্তমজী কাওয়াসজী, যাস্‌হিল্‌স, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ভিণ্ট। ৪০

উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে টাকার তোড়া প্রদানেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক সভায় ইহাতে চাঁদা-দাতৃগণের প্রতিনিধি লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে রামকমল সেন ও রুস্তমজী কাওয়াসজী এই কমিটিতে ছিলেন। ৪১

৬। ১৮৩৪ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় একটি বাণিজ্য-সংসদ (Chamber of Commrce) স্থাপনার্থ ব্যবসায়িগণের এক সভার অধিবেশন হয়। ৪২ ১৬ই এপ্রিল এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আর এক সভায় নিয়মাবলী গঠিত হয়। বাণিজ্য-সংসদের পরিচালক-সমিতি প্রধানতঃ যে তিনটি কমিটিতে বিভক্ত হইয়াছিল তাহার দুইটির নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। "General Committee of Twenty one" নামক কমিটিতে দেশী ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ৪৩

৭। ১৮৩৪ সনের ১৪ই জুলাই অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারীদের সভায় রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হন। ৪৪

৮। বাষ্পীয় পোত গমনাগমনে ভাগীরথীর অবস্থা অনুকূল করিবার জন্য ১৮৩৪ সনের ২১এ আগষ্ট ককরেল সাহেবের নেতৃত্বে 'একস্‌চেঞ্জ' গৃহে অনুষ্ঠিত কলিকাতার জাহাজের মালিকদের এক সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, এই ব্যাপার সম্পর্কে সরকারের হুজুরে এক স্মারক-লিপি পেশ করা হইবে। স্মারক-লিপি প্রস্তুতের ভার যে কমিটির উপর অর্পিত হয় তাহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ৪৫

৯। 'সেরবোর্ন' নামক একখানা জাহাজ সমুদ্র-গমনের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় যে-সব কোম্পানীতে বীমা করা হইয়াছিল তাহাদের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য রুস্তমজী কাওয়াসজীর আহ্বানে তাঁহারই আপিসে বীমা কোম্পানীগুলির এক সভা হয়। সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব ধার্য্য হয়,—

"সেরবোর্ন ১৮৩৫ সনের জুলাই মাসে রওনা হইবার সময় সমুদ্র-যাত্রার অযোগ্য ছিল। এই হেতু কলিকাতাস্থ বীমা-কোম্পানীরা জাহাজের বীমার দাবি গ্রাহ্য করিবেন না; তবে আবশ্যক হইলে বীমাকারীদের টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।" ৪৬

১০। বীমা আপিসগুলির কমিটি উইলিয়ম কার এবং রুস্তমজী কাওয়াসজীকে টাকা গ্রহণ করিয়া বণ্টন করিতে আহ্বান করেন। কিন্তু তাঁহারা বিল অফ লেডিং পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে জলগর্ভ হইতে উত্তোলিত জিনিষপত্রের টাকা (salvage) বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন।...৪৭

১১। রুস্তমজী কাওয়াসজী ১৮৩৬ সনে বাণিজ্য-সংসদের (Chamber of Commerce) নিয়মানুসারে কমিটি হইতে অপসৃত হন। ৪৮

১২। ১৮৩৭ সনের ১৬ই জানুয়ারি এক সভায় ডকিং কোম্পানী স্থাপন স্থির হয়। ৪৯ ডকিং কোম্পানীর প্রথম অর্দ্ধবার্ষিক সভা সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছিল,—

"ডকিং কোম্পানী—২৫এ তারিখ [এপ্রিল] ডকিং কোম্পানীর প্রথম অর্দ্ধবার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কোম্পানীর কার্য্য খুবই সন্তোষজনক। ৫০

৪০ *The Calcutta Monthly Journal*, 1835. Asiatic News.

৪১ *Ibid*. P. 80.

৪২ *The Calcutta Monthly Iournal*, 1834 (January—April). P. 563.

৪৩ *The Calcutta Courier*, April 16, 1834.

৪৪ *The Calcutta Monthly Journal*, 1834 (September—December). P. 788.

৪৫ *Ibid*.

৪৬ *The Calcutta Monthly Journal*, 1835. Asiatic News. P. 327.

৪৭ *Ibid*. P. 193.

৪৮ *The Calcutta Monthly Journal*, 1836. Asiatic News. P. 199: "Rustomjee Cowasjee went out by rotation."

৪৯ *Ibid*, 1837.

৫০ *Ibid*. 1837. P. 529.

১৩। ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লর্ড বিশপের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউনহলে ১৮৩৮ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি এক জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় চাঁদা সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য কমিটি গঠিত হয়। সভাক্ষেত্রেই পনর হাজার টাকা আদায় হইয়াছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী চাঁদা সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ তৎপর ছিলেন। তিনি স্বয়ং যে-সকল চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন তাহার তালিকা স্যার এড্‌ওয়ার্ড রায়ানের (সুপ্রিম কোর্টের বিচাপতি) মারফত সভায় পেশ করেন। ঐ তালিকায় গাইকোয়াড়ের বেহুরামের নামে দু'হাজার, রুস্তমজীর এবং তাঁহার পুত্রের নামে যথাক্রমে এক হাজার ও পাঁচ শত টাকা চাঁদা-দানের উল্লেখ আছে। ৫১

১৪। ১৮৪০ সনে 'নিউ লডেব্‌ল্ সোসাইটির' সাত জন ডিরেক্টরের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজীর উল্লেখ আছে। ৫২

১৮৪১ সনে ভারতীয় লডেব্‌ল্ ও মিউচুয়াল বীমা কোম্পানীরও একজন ডিরেক্টররূপে রুস্তমজীকে দেখিতে পাই। ৫৩

১৫। রুস্তমজী কাওয়াসজী কলিকাতাবাসীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য পুষ্করিণী খনন ছাড়া অন্য উপায়ও যে অবলম্বন করিয়াছিলেন, সমকালিক সংবাদপত্রে তাহার উল্লেখ আছে। সম্বাদ ভাস্কর (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৫১) অন্য এক ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহার এই স্পষ্ট উল্লেখ করেন,—

"...বাহির রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া রোস্তমজী বা যাহা করিতেছেন কলিকাতা রাজধানী বর্ত্তমান থাকিতে তাহা নির্ব্বাণ হইবেক না, এই কর্ম্মের জন্য...ব্যয় ভয়ে কেহ অগ্রসর হয়েন নাই কিন্তু রোস্তমজী বাবু উপরুদ্ধ ন হইয়াও সাধারণের উপকারের জন্য এই বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, বাবু রোস্তমজী বহুকাল পর্য্যন্ত দেখিতেছেন বাহির রাস্তার নিকটস্থ লোকেরা জলাভাবে দুঃখ পায় অতএব তিনি বৈঠকখানা হইতে ঐ রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া জল প্রণালী আনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই প্রণালীর জন্যে কত লোকের উপকার হইবে তাহার সংখ্যা নাই অতএব রোস্তমজী বাবু তাঁহার স্মরণীয় এক এক মহৎ চিহ্ন রাখিলেন ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা উপকৃত হইয়া পুরুষানুক্রমে ঐ বাবুর ধন্য ধন্য কহিবেন,..."

৫১ *The Friend of India*, March 8, 1838. Weekly Epetome of News. Thursday, March 1.

৫২ *The Bengal Directory and Annual Register* 1840.

৫৩ *Ibid*, 1841.



দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চারুবাবুর অভ্যর্থনা

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে যাইতে দামোদরের মিনিট ৮।১০ লাগিল। মেসের বাড়িখানি বড়; প্রায় ১৫ খানা বড় বড় ঘর আছে। বেশীর ভাগই কলেজের ছেলেরা থাকে। বঙ্গবাসী, রিপণ, বিদ্যাসাগর, সিটি সব কলেজেরই ছেলে থাকে। চারুবাবুই ইহার পত্তন করেন। চারুবাবু আগে কোন কলেজের কেরাণী ছিলেন; এখন অন্য কলেজে আছেন। কাজেই ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার বেশ বনিবনা আছে। লোকও তিনি খুব আমুদে। একটা না একটা স্ফূর্ত্তির কাণ্ড লইয়াই থাকেন। তাঁহাকে না হইলে মেসের ছেলেদের চলে না।

দামোদর মেস্-বাড়ির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া একবার দেখিয়া লইল, হাঁ, ঠিকই সেই বাড়ি। তার পর ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়িতে উঠিল। নীচের তলায় চাকরবাকর থাকিত; রন্ধন হইত। উপরে দ্বিতলে ও ত্রিতলেই সমস্ত শয়ন-ঘর। দামোদর সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, এমন সময় দু'তিনটি ছেলে দুপ্ দুপ্ করিয়া নামিল। তাহাকে দেখিয়া একটু থামিল। তার' পর তাহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কা'কে চান?"

দামোদর দেখিল ছেলে তিনটির বয়স ১৭ হইতে ২০এর কোটাতেই। একটির বেশ কায়দা-দুরস্ত ১৭।২০ করিয়া চুলছাঁটা; টেরিও খুব কায়দা-দুরস্ত; যে রকম ধরণের টেরি দামোদর নিজেদের সময় দেখিয়াছে ও জানিত, সে রকম নয়। তাহার উপর অতি ছোট গোঁফের দুইটা দিক্ ছাটিয়া মাঝখানে একটুখানি চিহ্ন স্বরূপ যেন রাখিয়াছে। একজনের—সেই সবচেয়ে ছোট—খানিকটা জুল্‌পি! দামোদর তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিল, "চারুবাবু,—তিনি আছেন কি?"

জুল্‌পিওয়ালা ছেলেটি দামোদরকে আপদমস্তক দেখিয়া উত্তর দিল, "না। চারুবাবু সন্ধ্যার সময় আসেন। এখন তিনি কলেজে। আপনার কি দরকার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?"

দামোদর বলিল, "দরকার একটু ছিল। আমি—" সে চুপ করিল।

গোঁফ ছাটা ছেলেটি বলিল, "আপনি কি, বলে ফেলুন। মাঝপথে ব্রেক কস্‌লেন কেন? ওতে lungs খারাপ হয়। জখম হয়ে যায়।"

দামোদর বলিল, "আমি আগে এখানেই থাকতুম। আজ কল্‌কাতা এসেছি। যদি এখানে থাকার আপত্তি না থাকে, তবে থাকবো দু' এক দিন। চারুবাবু আমাকে চেনেন।"

জুল্‌পি-ওয়ালা ছেলেটি কহিল, "এই কথা! স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। আপনার বাড়ি কোথায়? বর্দ্ধমান, হুগ্‌লী, বাঁকুড়া? না নদে, শান্তিপুর? না, পদ্মাপার?"

গোঁফ-ছাটা ছেলেটি বলিল, "আপনি আমাদের roomএ যান্ এখন। বসুন গে। সেখানে ৪টা seat আছে, আমরা তিনজনে থাকি। চাকরকে জিজ্ঞাসা করে নিবেন তেতলায় নগেনবাবুদের ঘর। সেইখানেই বসুন। স্নানাদি কর্ত্তে চান করে নিন্। জল্‌টল্ খেয়ে কিছু নিতে চান, নেবেন। সন্ধ্যের আগেই চারুবাবু ফিরবেন। তখন যা' হয় বন্দোবস্ত হবে। কিন্তু, সাবধান, মশায় কিছু নিয়ে যেন সরে পড়বেন না। আমি দরওয়ান্‌কে বলে যাচ্ছি। আমরা না আসা পর্য্যন্ত আপনাকে যেতে না দেয়।"

দামোদর অত্যন্ত ব্যথিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "সে

কি কথা? আমি বাইরেই অপেক্ষা কোর্‌বো। ঘরে বস্‌বার দরকার নেই।"

যাহার ঝুল্‌পি ছাটা, গোঁফ কিছুই ছিল না, সে বয়সে সব চেয়ে বড়, সে বলিল, "নগেন, তুই বড় অভদ্র।" তার পর দামোদরের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিছু মনে কর্ব্বেন না। ও বড় কট্‌কটে। লোক ভাল; তবে সোজা ও কট্‌কটে কথা বলে ও ভাবে ও ভারী একটা কিছু কর্‌ছে। দু' দিন থাক্‌লেই বুঝ্‌তে পার্ব্বেন। আপনি যান্‌। ঘরেই বসুন গে; শুয়েও থাক্‌তে পারেন। যেমন ইচ্ছা হবে আপনি সেই রকম কর্ব্বেন।"

দামোদর বলিল, "আপনাদের ধন্যবাদ। কিন্তু সত্যিই ত আপনারা আমাকে চেনেন না। কিছু মনে করা অন্যায় নহে। আমি বাইরে বারান্দায় বসে থাক্‌বো। কোন কষ্ট হবে না।" সে উপরে উঠিতে সুরু করিল। ছেলে তিনটি তাহার দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল; তা'রপর আবার দুপ্‌ দুপ্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

উপরে দ্বিতলে উঠিয়া দামোদর ভিতরের বারান্দায় পড়িল। চারিদিকে বারান্দা, তাহার কোলে সব ঘর। কতকগুলি ঘর খোলা, কতক বন্ধ। খোলা ঘরগুলি হইতে হাসির কথার আওয়াজ তাহার কাণে আসিল। সেও এই দ্বিতলে থাকিত, তাহার ঘরে এখন অন্য ছেলে আছে। সে সেই ঘরের পাশ দিয়া একবার গেল, ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিল, তিন-চার জন ছেলে বসিয়া কি লইয়া মহাতর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। সে পার হইয়া গিয়া চারুবাবুর ঘরের সাম্‌নে দাঁড়াইল। পুরাতন, তাহার আমলের, নিধি-উড়িয়া ভৃত্য আসিয়া তাহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবু, আপনি?"

দামোদর এত অপরিচিতের মধ্যে একটি চেনা মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। উত্তর দিল, 'হাঁ, নিধি। ভাল ত? চারুবাবু কোথায়?"

নিধি এক গাল হাসিয়া বলিল, "আপনাদের কৃপায় ভাল আছি, বাবু। চারুবাবু সন্ধ্যেবেলায় আস্‌বেন। আপনি বস্‌বেন?"

দামোদর এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, "হাঁ, নিধি। আমি দু'চার দিন এখানে থাক্‌তে চাই। তাই চারুবাবুকে খুঁজ্‌ছিলুম।"

নিধি বলিল, "তা'র আর কি? আপনি বসুন এই-খানে, আমি চেয়ার এনে দিই।"

দামোদর সম্মত হইল। নিধি চেয়ার আনিয়া দিলে সে বারান্দায় বসিল, বলিল, "নিধি, একটু জল খাওয়াতে পার?"

নিধি জল আনিয়া দিল। দামোদর এক গ্লাস পুরা জল পান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, নিধি, এখন সব বাবুরা কেমন?"

নিধি গ্লাস গ্রহণ করিয়া জবাব দিল, "বাবুরা এখন বেশ ভালই। খুব খর্চে। দু' হাতে সব খরচ করেন। ঘটা লেগেই আছে।"

"খুব খরচ ক'রে? লোক কেমন?"

নিধি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "খুব উঁচু মেজাজের লোক, বাবুরা। আপনপর জ্ঞান নেই। খুব আমুদে।"

দামোদরের মনে নগেনবাবুদের কথা জাগিল। জিজ্ঞাসা করিল "নগেনবাবুরা কেমন লোক?"

নিধি উত্তর দিল, "খুব খরচে হাত। বেশ লোক, বাবু, সবাই। দু'দিন থাক্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন। সবাই বড় লোকের ছেলেই ত মনে হয়। তা' না হলে খরচ ক'র্ত্তে অত টাকা কোথায় পান। এক এক জনের মাসে অন্তত ১০০৲ টাকা খরচ।"

দামোদর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "১০০৲ টাকা! একজনের? বল কি নিধি?"

নিধি জবাব দিল, "তা' হয় বৈকি, বাবু। এখন মেস্ খরচই প্রায় ৩০৲ টাকা। কলেজের মাহিনা আছে। তা' ছাড়া থিয়েটার, বায়স্কোপ, ফুটবল, ক্রিকেট্, হকি; সোডা লিমনেড বরফ; রোজই প্রায় ফিস্‌টি। খরচ কি কম, বাবু? বড় লোকের ছেলে না হলে কি এত পারে? আপনারা কি পার্ত্তেন?"

দামোদর বিষণ্ণ বদনে বলিল, "না, নিধি। আমাদের ৩০।৪০ টাকার ভিতরই সব সাম্‌তে হোত। ৩০৲ টাকাই পেতুম; অনেক বলে কহে হাঙ্গামা আব্দার করে ৪০৲ কখনো কখনো পেয়েছি। তাই থেকে কলেজের মাহিনাও দিতে হোত, খাতাপত্র সব যা' দরকার হো'ত তাই থেকেই কিনতুম।"

নিধি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহার অবিদিত কিছু

নাই। তা'র পর বলিল, বাবু আপনি বসুন। আমি নীচে যাই; ঠাকুরকে তুলে দিই গে। চা, খাবার সব তৈরি করার সময় হো'ল। ৪টা বেজে গেছে।"

দামোদর বলিল, "হাঁ, নিধি, তুমি যাও। আমি অপেক্ষা কোর্‌ছি।"

"চা-টা খাবেন ত?"

দামোদর জানাইল সে খাইবে। নিধি চলিয়া গেল। এই মোটে ৪টা: ৫৷৷০টার এদিকে ত' চারুবাবু আসিবেন না। ততক্ষণ সে কি করিবে? বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় কি? সারাদিনে পরিশ্রম হইয়াছে, তাহা না হইলে বেড়াইয়া আসিত। বসিয়া বসিয়া তাহার মন নিজের দেশের দিকে ছুটিল। এতক্ষণ নানা লোকের সঙ্গে, নানা কথাবার্ত্তায় তাহার নিজের কথা মনেই হয় নাই। এখন তাহার সব কথা একে একে মনে উঠিতে লাগিল। রাধারাণী এতক্ষণ কি করিতেছে? কি ভাবিতেছে? নিতাই ঘোষ নিশ্চয়ই তাহাকে চারি দিকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। নিতাই ঘোষ ছাড়িবার পাত্র নহে। ভয়ানক লোক। কে জানে ডাকাতি করে কি না। ডাকাতের মত ত' চেহারা! পয়সা আছে; চাষ করিয়া কি অত পয়সা হয়? নিশ্চয়ই ডাকাতি করে। রাধারাণী ডাকাতের মেয়ে। তাই উহার এত সাহস। কিন্তু রাধারাণী তাহার কাছে সুন্দর হইলেও, রাধারাণীর হৃদয়ে প্রেম নাই। ডাকাতের মেয়ে, তা'র আবার প্রেম কি? ওঃ! কি বাঁচিয়াই গিয়াছে সে। বাঁচিয়া থাকিতে আর কখনোও ঐমুখো হইবে না। কখনো না।

বসিয়া বসিয়া সে বিরক্ত হইয়া গেল। উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিল। দলে দলে, দু'চার জন করিয়া নানা রকমের ছেলে আসে, যায়, গান করে, তাহার দিকে প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া দেখে; কিন্তু কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। সে দ্বিতল বেড়াইয়া ত্রিতলে উঠিল। সেখানেও বারান্দায় একখানি বড় টেবল্ রাখা। তাহার চারিপাশে চেয়ার লইয়া প্রায় ১৫।১৬ জন ছেলে বসিয়াছে। চা-এর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দামোদরের মনে পড়িল, তা'দের সময়ে চা'-এর বন্দোবস্ত এমন সমারোহ ও অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। নিজে নিজে ঘরে চা' করিত, ষ্টোভ জ্বালিয়া। নিজেরাই খাইত। এ যেন যজ্ঞের ব্যাপার; ভোজ। সে উপরে উঠিয়াই আবার নীচে নামিতে যাইতেছে, টেব্‌লের পাশ হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "পালান কেন, মশা'য়? কাকে চান?"

দামোদর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "চারুবাবুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছি। তিনি নেই। তাই উপরে একবার বেড়িয়ে যাচ্ছি। আমিও এই মেসে তিন-চার বছর ছিলুম কি না।"

সে ছেলেটি উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "বটে? তবে আসুন, সোজা হেঁটে পায়ে পায়ে চলে আসুন, বসুন এইখানে। বসে পড়ুন। এটা হচ্ছে চারুবাবুর চা-এর মজ্‌লিস্। চারুবাবু সোজা এইখানেই আস্‌বেন।"

দামোদর বলিল, "না, না; আপনারা চা' খান। আমি নীচেই গিয়ে বস্‌ছি। নীচেই দেখা কোর্‌ব।"

আর একটি ছেলে বলিয়া উঠিল, "সে কি একটা কথা? কি যে বলেন? এসে সোজা বসে পড়ুন। আপনি ত' আর জেনানা ন'ন, লজ্জা কি? আর এখন জেনানাও নেই। সব স্বাধীন। বুঝেছেন? লজ্জা আর দেশে নেই, আপনার লজ্জা অসভ্যতা।"

দামোদর হাসিয়া বসিল। বলিল, "আপনাদের অনুগ্রহ।"

আর একজন বলিল, "'অনুগ্রহ' কি মশাই? আপনি এসেছেন, এখানকার এই মেসেরই ex-member,—আপনার ত right (অধিকার) আছে। আমাদের চেয়ে বেশী অধিকার। আমাদের তুলনায় আপনি প্রাচীন।"

দামোদর ইহার আর কি উত্তর দিবে? সে চুপ করিয়া বসিল। ছেলেগুলির কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

একজন বলিল, "যাই বল, শরৎবাবুর কাছে আর কেউ নয়। ও বঙ্কিমবাবু বল, আর যেই বল, সব ডুবেছে। কি লেখা, উঃ! পড়ে আর শেষ কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না। কি সব character (চরিত্র)! ভাব দেখি! শ্রীকান্ত'র সঙ্গে, কি চরিত্রহীনের সঙ্গে তুলনা হয় এমন একখানা বই বা'র কর দেখি!"

আর একজন উত্তর দিল, "তুই থাম, নলিন। ও সব ঢের শুনেছি; কাণ পচে গেল। কি গল্প! আর কি বা গল্পের technique! পড়্‌তে পড়্‌তে মাথা ধরে যায়!

একই কথা—আর একই ভাব ফেনিয়ে তোলা। রবিবাবু ত গল্প লিখিয়ে ন'ন। কিন্তু দেখ্‌দেখি এক-একটা গল্প—ছোটই বল, বড়ই বল,—যা' লিখেছেন, একেবারে নূতন ও আলাদা। কোন দুটা গল্পের ভাব বা চরিত্র একরকম নয়। একেই বলে genius প্রতিভা।"

তৃতীয় একটি ছেলে বলিল, "ঠিক কথাই মোহিনী বলেছে। বঙ্কিমবাবুরও কোন গল্প অন্য গল্পের সঙ্গে মিলে না। প্রত্যেকখানি বিশিষ্ট ও বিভিন্ন, অথচ সবগুলিই সমান ভাবে interesting, কিন্তু শরৎবাবুর কথা যদি বল, তবে দেখ্‌বে সব বই'তে একই কথা, একই ঘটনা, একই ভাব।"

চতুর্থ একটি ছেলে বলিল, "তো'রা চুপ কর, বাবু। তো'দের সাহিত্য-চর্চ্চার ঠেলায় দেশান্তরী করবি না কি? ভারি তোদের বাঙ্‌লা সাহিত্য! নাম কর্ত্তে রবিবাবু আর বঙ্কিমবাবু আর শরৎবাবু শিখেছিস্—তা' নিয়ে কাণ ঝালপালা করে দিলি!"

নলিন নামক ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "তোমার আর এ সাহিত্য পছন্দ হয় না, নরেন-দা! তুমি ত পড় না। কাজেই এসব তোমার কাছে নিরর্থক ঠেকে। পড়্‌তে যদি একবার শরৎবাবুর নভেল, শ্রীকান্তখানা, তবে বুঝ্‌তে যে বাঙ্‌লা ভাষাতেও এমন নভেল আছে যা' পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নভেলের সঙ্গে চেষ্টা দিতে পারে। এই ধর না ইন্দ্রনাথের চরিত্র—"

নরেনদা' বলিল, "তুই বাবু, মাথা ধরালি, নলিন। তো'র শরৎবাবু নিয়ে আমাদের পাগলা কোর্‌বি দেখ্‌ছি! এইজন্যে শরৎবাবুও গেল।"

আর একটি ছেলে ডাকিল, "নিধি, ওরে নিধি, তোকে গড়েছিল কোন বিধি; চা' দিবি না?"

নলিন ছেলেটি হঠিবার পাত্র নহে। সে বলিল, "নরেনদা, তুমি গণিত পড়ে মাথা নষ্ট করেছ। নভেলের স্বাদ কি বুঝ্‌বে?"

মোহিনী উত্তর দিল, "তুই-ই বুঝেছিস্, নলিন। আর কেউ বুঝ্‌তে পারে না। তুই আছিস্ জান্‌লে শরৎবাবু নভেলই বই লিখ্‌তো না।"

নলিন বলিল, "শরৎবাবুর সম্বন্ধে কত appreciation বেরিয়েছে খোঁজ রাখ! এই ত সেদিন রাধাকমল মুখুয্যে কি রকম লিখেছিল!"

মোহিনী বলিল, "রাখ্ তো'র রাধাকমল মুখুয্যে, ওসব দেখা আছে। যে যেমন পণ্ডিত তা' বুঝ্‌তে আর বাকী নেই। সাহিত্য আর পলিটিকস্ এতে সবাই পেট থেকে পড়েই মাতব্বর। পড়্‌তে শিখ্‌তে হয় না।"

একটি ছেলে চুপ করিয়া দামোদরের মত শুনিতেছিল; সে গান ধরিল, "বুল্‌বুল্ তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে—দোল্—"

নরেন ধমক দিল, "খবর্দ্দার, যতীন; ঐ গান গাইবি ত' তোকে মেস থেকে তাড়িয়ে দেব।"

যতীন গান থামাইল, কিন্তু হাতের আঙ্গুল দিয়া টেব্‌লের উপর অগীত গানের তাল বাজাইতে বাজাইতে বলিল, "নরেনদা, তোমার এই centuryতে জন্মান উচিত হয় নি। তুমি অক্ষয় দত্তের চারুপাঠ তৃতীয় ভাগের ছদ্মবেশী সংস্করণ। তা' না হ'লে যে কবির গান বাঙ্‌লার তরুণদের এমন কি শিশুদের মুখে মুখে ফিরে, সেই গানের তুমি অপমান কর। কবি ত' নজ্‌রুল্ ইস্‌লাম! এক একটা কবিতা যেন বুলেট্!"

যে ছেলেটি নিধিরামকে ডাকিয়াছিল, সে ডাকিল, "নিধি, দয়ানিধি, তুই বসিয়ে রাখ্‌বি নিরবধি? শুকিয়ে উঠ্‌লো গলা অবধি!"

নিধি আসিয়া দেখা দিল। তাহার হাতে চা'এর সরঞ্জাম, বহুল ও লোভনীয়। টেব্‌লের উপর নিধি চা-এর পেয়ালা সসার প্রায় দু' ডজন, একটা বড় চা-এর চা-দান, ও নানাবিধ খাদ্য, কেক্, সন্দেশ, নিম্‌কি প্রভৃতি—স্তূপাকারে রাখিল। দেখিয়া শুনিয়া দামোদর বিস্মিত হইল। সত্যই ত'! ইহাদের সকলেই নিশ্চয়ই ধনীপুত্র। এরূপ সমারোহ সে দেখে নাই, কখনো। ইহাদের জীবনে আনন্দ আছে।

নরেন নামক ছেলেটি—ছেলেটি দেখিতে শুনিতে বেশ, দামোদরের তাহাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল—তাহাকে বলিল, "আপনি চা খান ত'?"

নলিন উত্তর দিল, "বাঃ! এইবার তুমি ঠকেছ, নরেনদা, এ কথা এই century'তে কেউ কাহাকে জিজ্ঞাসা করে?"

নরেন বলিল, "তুই থাম্; তোর মত সবাই এমন

জ্যাঠা নয়। আমিও ষোল সতের বৎসর চা' খাই নি, তা' জানিস্? তোদের বদ্-সঙ্গে পড়ে এই বদ্ অভ্যাস হ'য়েছে!"

দামোদর জানাইল সে চা' খায়। তবে না হইলেও চলে। চা' পান সুরু হইল। আবার নানা কথার আতস-বাজী হইল। একটি ছেলে বলিল, "চা খাওয়া, নরেনদা, এই শতাব্দীর সভ্যতার ও সামাজিকতার দ্বার। যে বাড়িতে যাও, চা দিয়েই আলাপ সুরু হয়; দু'জনে একসঙ্গে বসে চা' খেতে পার্লে, চির-মিত্রতা স্থাপিত হয়। আর এই চা-এর দৌলতে বাঙ্গলায় নভেলের প্রেমের পর্ব্ব টিকে আছে। এটাকে তাচ্ছীল্য করো না।"

দামোদর হাসিল। সকলেই হাসিল। হাততালি দিল। একজন বলিল, "উমেশ, তুই ডাব্লিউ, সি, বাঁডুয্যেকে হা'র মানিয়েছিস্। তো'কে আমরা এবার এখানকার সহকারী ম্যানেজার কোর্বো।"

উমেশ চটিয়া উঠিল, "কোর্বে না? ক'রে দেখো না, কি হয়। এখন ১০০৲ টাকায় চল্ছে, তখন ১৫০৲তে থৈ পাবে না।"

মোহিনী কহিল, "কুছ্ পরোয়া নেই। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। নরেনদা, আনী পাভ্লোভার নাচ্ দেখ্তে যাবে? চল না আজ রাত্রে যাই। আশ্চর্য্য নাচ। সবাই দেখ্তে যাচ্ছে।"

নরেনদা' বলিল, "না। আনী পাভ্লোভার নাচ বুঝ্বার ক্ষমতা আমার নেই। যা'রা যাচ্ছে তা'রা যাক্।"

নলিন বলিল, "তোমার সৌন্দর্য্যবোধ নেই, নরেনদা। তুমি একেবারে prose—গদ্য, অক্ষয় দত্তের গদ্য। নাচ তোমার ভাল লাগে না?"

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার আওয়াজ হইল; একটু পরেই চারুবাবু ত্রিতলের সিঁড়ির দরজা দিয়া দেখা দিলেন। টেব্লের ছেলেরা একসঙ্গে সোৎসাহে চীৎকার করিল, "ঐ চারুবাবু!"

চারুবাবু একটু বেঁটে ধরণের দোহারা লোক—মাথার ঠিক মাঝখানে একটু টাক্—মুখে যেন কৌতুক ও রহস্য-প্রিয়তা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তিনি ত্রিতলের বারান্দায় পা' দিয়াই বলিলেন, "কিরে বাবু, তো'রা একটু আর অপেক্ষা কর্তে পার্লি না আমার জন্যে! নরেন, ও নরেন, শীঘ্র চা' দে। হাতের কলম চালিয়ে যে গলা কি রকম শুকায় তা' তো'রা কেরাণীগিরি না কর্লে বুঝ্বি না।"

বলিতে বলিতে চারুবাবু টেবলের নিকটবর্ত্তী হইয়া একখানি খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "চা' দেরে, ওরে নরেন। দেরী কর্ছিস্ কেন? কা'র নাচ দেখ্ছিস্?"

নরেন বলিল, "চারুবাবু, চা তৈরি। ভগবান্ কেরাণীদের জন্যে কি চা সৃষ্টি করেছিলেন? না, বেকারদের জন্যে?" সে চা-এর পেয়ালা আগাইয়া দিল।

চারুবাবু চা'-এর পেয়ালা তুলিয়া টেব্লে উপবিষ্ট সকলের মুখ একবার দেখিয়া লইতে লাগিলেন। একদিক হইতে অন্যদিক সমস্ত; তার পর দামোদরকে দেখিতে পাইলেন।

চারুবাবু চা-এর পেয়ালা রাখিয়া উঠিলেন; তা'র পর চেয়ার ঠেলিয়া ফেলিলেন; উচ্চস্বরে বলিলেন, "কে? দামোদর না কি? আরে, ওরে! দামোদর না কি?" তিনি দামোদরের কাছে গিয়া দামোদরের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "ওরে! ও নরেন, ও হরেন, ওরে নলিন, মোহিনী, যতীন, সতীশ, পাঁচু, ওরে এ যে দামোদর! দে—দে, ওকে চা' দে। দামোদরকে খাবার দে। ওরে দামোদর এসেছে আজ! আমাদের দামোদর!" চারুবাবু আবার দামোদরের পৃষ্ঠে এমন আদরে ও সরবে চাপড়াইয়া দিলেন, যে দামোদরের মনে হইল তাহার পৃষ্ঠের চর্ম্ম খানিকটা ফাটিয়া গেল। ছেলের দল দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "হিপ্ হিপ্ হুরে। দামোদর বাবু! হিপ্ হিপ্ হুরে!"

চারুবাবু দামোদরের পার্শ্বে যে ছেলেটি বসিয়া ছিল, তাহাকে উঠাইয়া দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন ও হাঁফাইতে লাগিলেন। নরেন তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখের কাছে তাঁহার চা-এর পেয়ালা ধরিল; চারুবাবু একনিঃশ্বাসে চা টুকু চুমুক দিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আর একটু, নরেন।" নরেন ঘাড় নাড়িয়া, উপরিউপরি চারুবাবুর মুখে একখানা কেকের টুক্রা, দু'তিনটা সন্দেশ দিল। তা'র পর চা-দান হইতে আবার চা' ঢালিয়া প্রস্তুত হইল যে মুখ খালি হইলেই আবার ঐ পেয়ালাটিও চারুবাবুকে পান করাইবে। সে দামোদরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,

"দামোদর বাবু, চারুবাবু বেশী উত্তেজিত হলেই, ওঁর এই সব দরকার হয়।"

দামোদর হাসিয়া কহিল, "তা' জানি। উনি শীঘ্রই উত্তেজিত হয়ে পড়েন।"

দ্বিতীয় কাপ্ চা খাইয়া চারুবাবু একটু সুস্থ হইলেন। তার' পর আবার দামোদরকে ভাল করিয়া আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, "দামোদর! দামোদর! ওরে নরেন, নলিন, যতীন, মোহিনী সতীশ! ওরে তো'রা কি কর্‌ছিস্? দামোদর এসেছে, আর তোরা চুপ ক'রে আছিস্? দামোদর যে তো'দের বড়দাদা, পূর্ব্বপুরুষ; এ মেসের Founderদের একজন। তো'রা কি কোর্‌ছিস্ সব? নিধি, ও নিধে, ও নিধে উড়ে,—তুই কি কোর্‌ছিস্?" চারুবাবু আবার হাঁফাইয়া পড়িলেন; তাড়াতাড়ি মোহিনী এক কাপ্ চা পুনরায় আগাইয়া দিল। চারুবাবু তাহা নিঃশেষ করিলেন। ছেলেরা উঠিয়া হাততালি দিল, "three cheers! চারুবাবু and দামোদরবাবু; three cheers! না, না, two cheers! দু'জনের জন্যে two cheers."

চারুবাবু চা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "নরেন, আজ feast চাই। দামোদরের honor-এ feast চাই। মোহিনী, নলিন, সতীশ, যতীন, সবাই শোন; আজ ফিষ্ট্ চাই। যাও, শীঘ্র নিউ মার্কেটে যাও। না হয় কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে যাও; কাছে হবে। নিয়ে এসো মাংস। বহুবাজার যাও, নিয়ে এসো সন্দেশ; সিমলা যাও, নিয়ে এসো দই; যা' যেখানে পাও নিয়ে এসো, আজ Founder's day! আজ মেসের anniversary! আজ আর চুপ ক'রে থাকা নয়। নরেন, ব্যবস্থা করে ফেল্!"

চারুবাবু আবার দামোদরের পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন। দামোদর আঘাতে মুখবিকৃত করিয়া হাসিল। বলিল, "চারুবাবু, এত ব্যস্ত কিসের? করেন কি? মিছে এঁদের কেন সব কষ্ট দিবেন?"

চারুবাবু বলিলেন, "কষ্ট! আজ কষ্ট বলে কিছু স্বীকার করা হবে? কিছুতেই না। আগে জান্‌লে ব্যাণ্ড বসাতুম্; নহবৎ বাজাতুম; কাগজের ফুল দিয়ে gate সাজাতুম; তোমার জন্যে address ছাপাতুম; এ কি কম কথা! founder's day! এ কি সোজা ব্যাপার! দামোদর! তুমি এ মেসের পক্ষে কি জান? গ্যারিবল্ডি; বিস্মার্ক: রাজা রামমোহন রায়! যা' কোর্‌ছি এ 'ত কিছুই নয়! নরেন, এটা কি কিছু?"

নরেন জবাব দিল, "কিছুই না, চারুবাবু! আমাদের কাছে এ রকম feast 'ত নিত্যকার ব্যাপার; অন্তত সাপ্তাহিক 'ত বটেই। এতে দামোদর বাবুর কিন্তু হ'বার উপায় নেই।"

চারুবাবু বলিলেন, "শোন, দামোদর, শোন। বল্‌ছি 'ত আগে জান্‌লে দেখ্‌তুম। কি বল, নরেন, দেখ্‌তুম কি না? ওরে সেই নগেনটা কোথায় গেল? সে না হ'লে যে আমি একা পেরে উঠ্‌ছি না দামোদরকে সম্বর্দ্ধনা কোর্‌তে। তো'রা কোন কাজের নয়। সম্বর্দ্ধনা কোরতে পারিস না। শীগ্‌গীর কর; আমি আর একটু চা' ততক্ষণ খেয়ে নি। আমার বড্ড গলা শুকিয়ে উঠ্‌ছে।"

ছেলেরা সবাই উঠিয়া চীৎকার করিল, "হিপ্ হুপ্! two cheers। দামোদর ও চারুবাবুর— two cheers."

চারুবাবু চা' পান করিয়া বসিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আরও cheers চাই, চারুবাবু?" চারুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন। ছেলেরা পাঁচ-সাত মিনিট ধরিয়া খুব সাগ্রহে দামোদরের সম্বর্দ্ধনা করিল। দামোদর সহাস্যে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ইহা দেখিতে ও শুনিতে লাগিল। তাহার মনের সমস্ত অশান্তি এই আনন্দের আবর্ত্তে যেন কোথায় তলাইয়া গেল। সে ভাবিল, জীবনে ইহাদের আনন্দই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সে আবার এইরূপ জীবনযাত্রা করিবে। ইহাতে কোনও অশান্তি নাই। সে চারুবাবুর মত থাকিবে। চারুবাবুও সংসারী; অথচ কেমন আনন্দে আছেন। সে কেন থাকিতে পারিবে না?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভালবাসা প্রতারণা

সম্বর্দ্ধনার উত্তেজনার প্রথম ধাক্কা কমিলে, চারুবাবু সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ফর্দ্দ কর। ফর্দ্দ কর। নরেন, কাগজ পেন্সিল নাও।"

একটী ছেলে উঠিয়া গিয়া কাগজ ও একটী ফাউণ্টেন

পেন লইয়া আসিল। নরেন কাগজ পাতিয়া বলিল, "বলুন, চারুবাবু!"

চারুবাবু বলিলেন, "লেখ, ফার্ষ্ট কেলাস মটন—আধ মণ; আধমণ হ'লেই ত হবে? কি বল, নরেন? গেল সপ্তাহে আধমণই ত' লেগেছিল। কেবল দামোদরই ত' বেশী; যেমনি অতীন নেই—আধমণই ধর।"

নরেন লিখিল। চারুবাবু বলিতে লাগিলেন, "একটা একটা item নাও। আধমণ মটনে কত দৈ চাই? /২॥০ সের লেখ; টক্ দৈ। লিখেছ? আচ্ছা, প্যাজ লেখ। কত লিখবে? /৭॥০ সের লেখ। কিছু থাকে থাকবে। চিনি লেখ /১॥০; আচ্ছা, হলুদ প্রভৃতি মস্লা লেখ—/॥০, না হয় ৮০ আনাই লেখ। ঘী সেরেকে পোয়া হিসাবে কত চাই? /৫ সের লেখ। আর কি বাকী রইল, মোহিনী? আদা? আচ্ছা, আদা লেখ—কত? আধপো' হলেই হবে; না হয় একপো'ই লেখ। কিস্মিস্ কিছু চাই বৈ কি; কিস্মিস্ না হলে মটন্ জমে না। এ কোর্ম্মা হবে। বুঝেছ নরেন? কিস্মিস্—তিনপো'ই লেখ। হোল ত'? আর কিছু চাই রে, যতীন? আচ্ছা, এইবার এসো। লেখ, পোলাও-এর চাল—কত চাই /৮॥০ সের লেখ। গেল সপ্তাহে তাই লেগেছিল। ও লুচি চলবে না। লুচির বড় মেহনত্; অত ময়দা মাখ্বে কে? বেলবে কে? ভাজবে কে? ও-সব হয় না। সারা রাত তা'হলে ঐতেই কেটে যাবে; তৈরি হো'তে সব আবার কলেজের টাইম হ'য়ে যাবে। খেতে আর হ'বে না। পোলাওই ভাল; কি বল, দামোদর? আচ্ছা, পোলাও-এর চাল লিখেছ? বেশ—তা'র মশলা লেখ, কত চাই? যা' হয় লেখ, বাবু। যা'তে হয় সেই রকমই চাই। সব কি ছাই আমার মনে থাকে? নলিন, গেল সপ্তাহের সে ফর্দ্দটা কোথায়? হারিয়ে ফেলেছিস্? নাঃ! তো'দের বুদ্ধিশুদ্ধি আর হবে না। শরৎবাবু শরৎবাবু ক'রে তো'র মাথা খারাপ হয়েছে, তো'র আর মাথায় বুদ্ধি থাক্বার জায়গাই নেই। শরৎবাবু কি পোলাও-এর চেয়ে ভাল কিছু লিখতে পারে। পোলাও মাংস দই সন্দেশ-এর চেয়ে ভাল কোন্ নভেলের স্বাদ শুনি! তবে? যাক্। ও মসলা যা' হয় লেখ, নরেন, দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে নিলেই হবে। নিধিটা জানে। ওকেও জিজ্ঞাসা করে নিয়ো। আচ্ছা, আর কি চাই? কতকগুলো হযবরল খেয়ে লাভ নেই। কোনটাই খেয়ে তৃপ্তি হবে না। একটা চাট্নী চাই, বুঝেছ? আলুবোখ্রাই নিয়ো। সের /২॥০ হ'লেই হবে। তা'র জন্যে চিনিও নিয়ো, সের /৪, /৫ বুঝেছ? লিখলে? ভাল কথা, বেশ তাজা ও বড় দেখে কাগজে কি পাতিলেবু নেবে দু'তিন ডজন, যা' পাও। আর কলাপাতা ভুলো না। এই গেল, বাজার! এইবার দৈ—চিনিপাতা দৈ নেবে, যেখান থেকে আমাদের আসে। কত নেবে,—ও ।০ দশ সেরই নিয়ো। আর সন্দেশ—ভাল দেখে নিয়ো, খুব দামী নয়—তবে এই ২॥০ টাকা ৩৲ টাকা সের এই রকম—নিয়ো; কত? ধর জোর /৭॥০ সাড়ে সাত সের। সন্দেশটা দৈ-এর সঙ্গে উঠবে। বস্! আর কিছু নয়। বেশী হাঙ্গামা কর্লে রাত কাবার হ'য়ে যাবে। খাবার সময় পাবো না। আমিই যাচ্ছি দৈ, সন্দেশের ব্যবস্থা কর্ত্তে। তোমরা দেখে আন্তে পার্ব্বে না। তোমরা তিন-চার জন যাও বাজারে। কলেজ ষ্ট্রীটেই যাও। শীঘ্র শীঘ্র কর। যেন রাত্রেই খাওয়া হয়, বুঝেছ? দামোদর! তুমি বোস; না হয় কোথায়ও শুয়ে পড়। যদি বেড়াতে যেতে চাও, চল। যাবে? না হয় থাক্। বড় ক্লান্ত আছ? আচ্ছা, স্নানটান করে নাও, সুস্থির হও তুমি। তুমি আজ guest অতিথি; তুমি স্রেফ্ বসে থাক্বে!"

দামোদর বলিল, "সেই ভাল, চারুবাবু। আমি যেতুম, আপনার সঙ্গে; কিন্তু স্নান কর্ত্তে হবে।"

চারুবাবু বলিলেন, "না, না, দরকার নেই, দামোদর। আমি আসছি বলে। ঘণ্টাখানেকের ভিতরই আস্বো। এই ত' সাড়ে সাতটা বেজেছে; আমি সাড়ে আটটা, ন'টার মধ্যে ফির্বো। তুমি ততক্ষণ জিরিয়ে নাও।"

এমন সময় নগেনের দল ফিরিয়া আসিল। নগেন, ও সেই ঝুল্পিওয়ালা ছেলেটি, তা'র নাম শচীন, আর তৃতীয়টী—তা'র নাম রমেশ। তিনজনে আসিয়া উপস্থিত হইতেই, চারুবাবু বলিলেন, "নগেন? রমেশ? নগেন তুই কোথায় থাকিস্? দামোদর এসেছে জানিস্ না।" বলিয়া দামোদরকে দেখাইয়া দিলেন।

নগেন বলিল, "জানি না, কি রকম? খুব জানি? আপনার আগে জানি।"

চারুবাবু কহিলেন, "ছাই জানিস্! তো'র কেবল

বচন আছে! জানিস্ দামোদর এ মেসের একজন ex; একজন Founder? তা' জানিস্? আজ feast হবে। কেমন নগেন, হবে না? আজ দামোদরের honor-এ feast হবে। বুঝেছিস্! আমরা সব বাজার যাবো। তো'রা ওকে সম্বর্দ্ধনা কর। তোদের ঘরে নিয়ে যা'। আদর অভ্যর্থনা কর। খুব করে অভ্যর্থনা। ও আমাদের দামোদর!" চারুবাবু দামোদরের পিঠ চাপড়াইলেন।

শচীন উত্তর দিল, "বটে! আমাদের দামোদরবাবু? আমাদেরই? চারুবাবু, আজ নিশ্চয়ই feast চাই। শীগ্‌গীর বাজার যান্। আমরা ওঁকে ততক্ষণ engage ক'রে রাখবো। আসুন, আসুন, দামোদরবাবু আসুন, আমাদের ঘরে।" বলিয়া দামোদরকে টানিয়া তাহাদের ঘরে লইয়া গেল।

দামোদর সে ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি তক্তপোষে বসিল। নগেন ও শচীন আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। রমেশ বলিল, "দামোদরবাবু, আগে বল্‌তে হয়। আমরা কি জানি আপনার কথা? ভাগ্যে চারুবাবু ছিলেন; না হলে ত' আপনাকে কেউ চিন্‌তো না; হয় ত' তাড়িয়েই দিত। মেসের কি দুর্নামই হোত।"

দামোদর বলিল, "আপনারা আর কি ক'রে জানবেন?"

শচীন কহিল, "বাঃ! আপনি কোন বলেছিলেন ভাল ক'রে? যাক্, এখন কি কর্বেন? বস্‌বেন, না, শোবেন? বলেন ত' একটা গান গেয়েই আপনাকে শুনিয়ে দিই। নগেন, গাইব রে?"

দামোদর হাসিয়া বলিল, "তাড়া কি? উপস্থিত আমার স্নান কার্য্য ইচ্ছা হচ্ছে বটে; কিন্তু আমার দ্বিতীয় বস্ত্রও নেই, জামাও নেই। আমি এক বস্ত্রেই এসেছি। তাই ভাবছি।"

নগেন জবাব দিল, "বটে? তা'র জন্য আট্‌কাবে না; কিছু আট্‌কাবে না। আমাদের জামাকাপড় দিচ্ছি। দে'ত শচীন আমার ট্রাঙ্ক থেকে একখানা দেশী কাপড়, একটা পাঞ্জাবী বা'র করে। গামছা নিন্; তোয়ালে চাই? আচ্ছা, দে, তোয়ালে দে। আর সাবান দে। তেল চাই? দে' ঐ ক্যাষ্টর ওয়েলের শিশিটা এগিয়ে দে। যান্; চট্ ক'রে নেয়ে আসুন। তা'র পর বসে গল্প করা যাবে। আপনার romantic ব্যাপার। এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়েছেন, এর চেয়ে আর romance কি আছে? কি হয়েছে? কি আপনার দরকার? প্রাণে আপনার কিসের ব্যথার দাগ? নিশ্চয়ই ভয়ানক রোমান্স!"

দামোদর বলিল, "না। তেমন কিছু নয়।"

শচীন বলিল, "তা' হবে না। বল্‌তে হবে। তবে আর আলাপ কি? বন্ধুতা কিসের? নিশ্চয়ই রোমান্স। এক কাপড়ে আসা? ভয়ানক!"

দামোদর একটু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, স্নান ক'রে এসে সব বল্‌বো। আপনাদের দেখে আমারও মন খুব আনন্দিত হয়েছে। আমি আপনাদের মত বন্ধুই চাই।"

দামোদর স্নান করিতে গেল। শচীন আয়নাতে একবার চুলটা দেখিয়া লইল। নগেন একটা সিগারেট্ ধরাইয়া ফেলিল। শচীন্ শুইয়া পড়িয়া গান ধরিল,

"কবে তুমি আস্‌বে বোলে,
আমি থাক্‌বো না বো-সে-এ-এ—"

দামোদর মিনিট ১৫ বাদে স্নান করিয়া নগেনের ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া ফিরিল। নগেন বলিল, "এইবার ঠিক হয়েছে। একটু আরাম পাচ্ছেন? আপনার বাড়ি কোথায়, দামোদরবাবু? বর্দ্ধমান নয়? বর্দ্ধমানের লোকের বুদ্ধির পাক বেশী? বাঁকুড়া। বাঁকুড়াতে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, কেন জানেন? তা'দের আহারের প্রকোপে; সেখানে যা'র পেটে যত বড় পিলে, তা'র তত আহার! পেট ও বুকের গড়নে বাঁকুড়ার লোক বুঝা যায়। হুগ্‌লী? না; হুগ্‌লী জেলার লোক পিলের ভারে বেঁকে পড়ে; দাঁত কাল হয়ে যায়; মুখে মেচেতা পড়ে। গঙ্গার এ-পারে? মুর্শিদাবাদ? না, তাও নয়। নদীয়া? হাঁ; নদীয়ার লোক আপনার মত বেশ গোলগাল হয়। প্রেমের দেশ; গৌরাঙ্গের দেশ; সেখানে মাল্‌পো ও মাল্‌সার প্রাচুর্য্য চেহারায় বুঝা যায়। আপনি নদীয়া, না?"

দামোদর জানাইল যে তাহার অনুমান সত্য। নগেন বলিল, "আমি নগেন। আমার বাড়ি শান্তিপুর। থাকি না বাড়িতে। বাবা, কিছু জমিয়ে গিছ্‌লেন। কি ক'রে জানেন? কে একজন পয়সা-ওয়ালা বিধবা ছিল, তা'র

টাকা মেরে। Glorious ancestor! মহাজন! আমি এইখানে থাকি। টাকাটার ব্যবহার করি। প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। ফোর্থ ইয়ার চল্‌ছে; চার-পাঁচ বছর ধরেই চল্‌ছে; এটা শেষ হ'তে আরও না কোন বছর চার-পাঁচ লাগ্‌বে। ততদিনে পিতৃধনের সুব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌বো। আর এই শচীন; ও'র বাড়ি রাজসাহীতে কোথায়। ওর বাপ উকীল। বেশ বাপ্। হাত পাত্‌লেই কিছু হাতে পড়ে। ওর সেকেণ্ড ইয়ারে দু' বছর হোল। তবে ও বড় সাহিত্যিক; একটু বেশী রকমের প্রেমিক; সেইজন্যে মাঝে মাঝে ও'র উপর বিরক্তি ধরে। বড় বকে। আর এই যে এটিকে দেখ্‌ছেন, ইনি রমেশ। দুনিয়ায় ইনি moving encyclopædia, চলন্ত অভিধান। জানেন না—হেন পদার্থ নেই। অতিবিদ্যায় কাবু হয়েছেন। এঁরও তিন বছর সিক্‌স্‌থ (Sixth) ইয়ার হো'ল। ও'র চলে কিসে জানি না। কোথায় পয়সা পায় বলে না। তবে যেখানেই পা'ক্, ওর উৎস অফুরন্ত। সুতরাং আপনার লজ্জা সঙ্কোচের কিছু নেই। আমরা সবাই veteran. দেখ্‌তে ছোট হ'লে কি হয়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় সব বৃদ্ধ, প্রাচীন। বুদ্ধদেব!"

দামোদর বলিল, "তা' ভাল। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি বড় আনন্দিত হলুম। সত্যি এ আমার সৌভাগ্য!"

শচীন বলিল, "সেটা উভয়ত: দামোদরবাবু। এখন আপনার কথা বলুন। আমাদের ত সব হালচাল শুন্‌লেন। আপনারটা শোনান।"

দামোদর কহিল, "না শোনালে অবশ্য অন্যায় হবে। একান্তই শুন্‌বেন?"

রমেশ বলিল "যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

দামোদর উত্তর দিল, "আমার আপত্তি নাই।" তা'রপর সে নিজের জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নূতন সঙ্গীদের শুনাইল। শচীন, নগেন ও রমেশ উৎসুক হইয়া সমনোযোগে শুনিল। দামোদর সব শেষ করিয়া বলিল, "এই রকমে এসেছি! ভালবাসা প্রতারণা! সংসার বিষময়; জীবনে সুখ নাই! আমি সন্ন্যাসীই হবো। এখানে এসেছি, পথে পড়ে বলেও; আরও দু'এক জন পরিচিত আছে—দেখা করে যাবো বলে। না হলে, সন্ন্যাসী হওয়াই শান্তির পথ।"

নগেন বলিয়া উঠিল, "My god! দামোদরবাবু উ:! ভালবাসা প্রতারণা! ভালবাসা ব'লে দুনিয়াতে কিছু নেই? ওটা নেহাত্ কল্পনা! My God! খাঁটি কথা। বেদের কথা!"

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু নিতাই ঘোষ—আপনার শ্বশুর—খুব রোমাণ্টিক figure ত? আমার যে দেখ্‌তে ইচ্ছে কোর্‌ছে।"

নগেন্ বলিল, "দামোদর বাবু, ও প্রেম জিনিসটা theory, ওটার কার্য্যোপযোগিতা নেই। তাই আজকাল সায়েন্স বলে যা' আছে সেটা sex. বুঝেছেন? sex স্বীকার করুন, বস্; প্রেম টেম সেকালের কথা। সতীত্ব, ভালবাসা, সহমরণ সে সব গিয়েছে; কুসংস্কার মাত্র; সব গেছে, যাচ্ছে। এখন শুধু sex আছে; বুঝেছেন? সায়েন্স পড়ুন, সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন।"

দামোদর ঠিক বুঝিতে পারিল না। বলিল, "আমি অবশ্য আপনাদের মত পড়াশুনা করি নি। কিন্তু যা' নিজের জীবনে বুঝেছি, তাই বল্‌ছি। ভালবাসা মায়া।" সে দীর্ঘনি:শ্বাস ফেলিল।

শচীন বলিল, "আপনার স্ত্রী দেখ্‌তে কি রকম? কিছু মনে কর্বেন না। আপনার কথায় আমার মনে যে রকম ছবি তাঁ'র হয়েছে, সেটা এই রকম; দেখুন 'ত মেলে কি না; সুন্দরী, রূপসী; রূপ কি রকম জানেন, খুব ফর্সা'ও নয়, খুব কালো'ও নয়। ধরুন মাঝামাঝি। লম্বাটে গড়ন, কিন্তু বেশ মজবুত; মুখখানা বেশ কমনীয়, সৌষ্ঠবপূর্ণ; কিন্তু দরকার হ'লে খুব কঠিন হতে পারে। চোখের চাহনি—প্রখর হয় যখন খুব প্রখর; না হোলে কোমল। মাথায় ঘনকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশদাম। এই না?"

রমেশ বলিল, "ও কবি, দামোদর বাবু। আপনি কি আমি কোন ঘটনার কথা ওকে শোনালেই ওর মনে অমনি ছবি ফুটে ওঠে। ওর nervous disorder আছে।"

দামাদর হাসিল। বলিল, 'না, শচীনবাবু, আপনার ছবি ঠিক আঁকা হয় নি। আসল বস্তুর ধার দিয়েও যায় নি। কাল, ছোট গড়ন, একটু রোগা চেহারা, খুব

মজবুত বলেও মনে হয় না ; চাহনি প্রখর হয় না, তবে সুখ খুব ক্ষয় হয় বটে।"

রমেশ কহিল, "শচীন নিজের জানা কা'রও ছবি দেখেছে ; ওর মনটা ঐ রকম নানা রঙ নিয়ে তাল পাকায়। কোনও মেয়ে দেখলেই ও অমনি তাই থেকে এক তিল রূপ খুঁটে নেয় মনে মনে। ওর অদৃষ্টে কি আছে জানি না। তিলোত্তম-বধ কাব্য না বানায়।"

দামোদর মন্তব্য দিল, "ও কিছু নয়। আমিও এক সময় ঐ রকম কত কবিতা করেছি। এখন সব ছুটে গেছে। রূপ থাকতে পারে, প্রাণ নেই।"

শচীন উৎসুক হইয়া বলিল, "কবিতা লিখতেন? শোনান্ না দু' একটা দামোদরবাবু! প্রেমের কবিতা ত? শোনান্ শীগ্‌গির।"

দামোদর সবিনয়ে বলিল, "আমার কি মনে আছে? আর সে শোনাবারও যোগ্য নয়। সে নিতান্তই মামুলি।"

শচীন বলিল, "আমাদের কাছে আর লজ্জা কি? শোনান্ একটা আধটা।"

নগেন ও রমেশও অনুরোধ করিল। দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "ইংরাজি না বাঙলা?"

রমেশ বলিল, "যা হয়। দুই-ই এক, এক-ই দুই। কবিতা জিনিসটার বেশ বদল কর্লেও চরিত্র বদ্‌লায় না নগেনের মতন।"

দামোদর হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, শুনুন। বড় কবিতা মনে নেই ; ছোট দু' একটা মনে আছে। আগে ইংরেজিতেই বলি।

(1)	My Love is dark,	(আমার প্রিয়া কালোবরণ
	She is Dark ;	কালোবরণ তার!
	But does not light	আঁধার ঘরেই আলো জ্বলে,
	Burn in night	আলো যায় আঁধার!
	Love in closet	অন্ধকারে প্রেমের আলো
	Glow'd the best ;	জ্বলে উঠেছিল!
	It was a flame	অন্ধকারে প্রেমের দীপ্
	When it came.	বাড়িয়ে দিয়েছিল!)

সকলে বিস্মিত প্রশংসায় দামোদরকে বলিল, "wonderful! আর একটা! দামোদরবাবু, আপনি wonderful!"

দামোদর আর একটি কবিতার আবৃত্তি করিল,

Love is an omnipotent God,
 In all men or women ;
He is not a myth nor a fraud,
 That science shall question,
Love has a quiver and a bow
 Just a curious trifle ;
But when' he shoots an arrow,
 It's cartridge from a rifle.
Love is dexterous and wily,
 He wounds and he cares not ;
It is the heart. the heart surely,
 That will bleed from his shot.

শচীন বলিয়া উঠিল, "দামোদরবাবু, আপনি genius আপনি Shelly। Wonderful! বিলাত হো'লে আপনার আদর হো'ত!"

রমেশ বলিল, "একটা বাঙলা কবিতা শোনান্। আপনার ইংরেজি কবিতা এত উঁচুদরের, বাঙলা না জানি কি রকম হবে। শোনান্!"

দামোদর বলিল, "বাঙলায় আমার দখল কম। আচ্ছা, শোনাচ্ছি ; এইটা আমার স্ত্রী প্রথম বাপের বাড়ি যাবার পর একদিন লিখেছিলুম।

"মনে পড়ে, সখি, আজ সে গোপন কথা,
সে বাহু বেষ্টন, সেই বুকে রাখা মাথা ;
মৃদু ভাষ,—যেন কোন ঝর্ণার ধারা,
আপন উচ্ছ্বাসে বহে যায় আত্মহারা।
স্মৃতির দংশন এত কে জানিত আগে?
কেন বা আকুল মনে সে কথাই জাগে?
কত দিন দেখি নাই পড়ে যায় মনে,
ধরে না, ধরে না অশ্রু এ দুটি নয়নে।"

দামোদর আরও স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। বলিল, "এটা সনেট—Shakespearean সনেটের ধরণে লিখেছিলুম। শেষের অংশটা মনে নেই।" দামোদর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "দামোদরবাবু, আপনি এখনও Loveএ বিশ্বাস করেন?"

দামোদর বিরসভাবে উত্তর দিল, "না, আর বিশ্বাস নেই। আমার সংসারের কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার। Frailty! Thy name is woman!" এ কথা খুব সত্যি।"

শচীন বলিল, "কিন্তু Love যদি না থাকবে, ত' এত কবি, এত লেখক, সব Love-এর এত ব্যাখ্যান করে কেন?"

নগেন বলিল, "ওটা স্নায়বিক ব্যারাম। মানুষমাত্রেরই ঐ রকম অবস্থা একটা সময়ে হয়। বিশুদ্ধ স্নায়বিক ব্যাপার। সেই সময় উত্তেজনা হয়। Sex-উত্তেজনা। তাই তো লোকে নানারকম কল্পিত জিনিসের ঘটনার ছুবির কথা দেখে ও ভাবে। সাইকলজি পড়্‌লে বুঝ্‌তে পারবি, ওটা একটা অসুস্থ অবস্থা; ব্লড প্রেসার বাড়ে; pulse-এ irregularity হয়; hypochondria হয়; আবল্ তাবল্ বকে। সমস্ত দেহ বিকল হয়। কি বলেন দামোদরবাবু? হয় না? এমন কি ক্ষুধা, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক শরীর-ধর্ম্মও সব গোলমাল হ'য়ে যায়।"

দামোদর বলিল, "কতকটা তাই দাঁড়ায় বটে। ব্যারামও হো'তে পারে।"

নগেন বলিল, "কতকটা কি বল্‌ছেন? পুরা দস্তুর তাই। একজন lover-এর Mood test করে দেখলে দেখবেন যে তাপ কত বেড়ে গেছে। ওটা organic ব্যারাম। sexual ব্যাপার; প্রথম sex-consciousness হওয়াতে সমস্ত দেহ system ঐ রকম বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। যে কোন organism বাড়তে পেলেই ঐ রকম হয়। যেমন দাঁত ওঠা, মেয়েদের যেমন puberty, সেই রকম। এর মধ্যে আর সন্দেহের কিছু নেই। এ পুরা science। ও প্রেমট্রেম্ কুসংস্কার; অজ্ঞানের সময় মানুষ ঐ নাম এই রোগের দিয়েছিল। সায়েন্স এসে সব বদ্‌লে দিয়েছে। এখন প্রেমের কবিতা Whitmann পড়্—দেখ্‌বি কি রকম scientific."

রমেশ বলিল, "তুই সায়েন্স হিসাবেই প্রেমের চর্চ্চা করিস্?"

নগেন উত্তর দিল, "না। সায়েন্স জানি বলে ঐ ব্যারামের প্রতিষেধক আমি রেখেছি নিজের কাছে। Prevention is better than cure."

শচীন কহিল, "আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না যে প্রেম ভালবাসা সব প্রতারণা।"

নগেন বলিল, "Because you are a green lover. তো'র ব্যারাম chronic দাঁড়িয়েছে, তাই। পুরানো ম্যালেরিয়া থেকে কালাজ্বর দাঁড়িয়েছে। দামোদরবাবুকে জিজ্ঞাসা কর!"

দামোদর শচীনের প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টির উত্তরে বলিল, "ভালবাসা প্রতারণা, শচীন বাবু।" দামোদরের আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। শচীন দামোদরের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতে দেখিয়া বলিল, "দামোদর বাবু! মনে আপনার তা' হলে খুব জোর আঘাতই লেগেছে। এ অবস্থায় মানুষ বিষয়ে বিরাগী হয়ে যায়। কিন্তু যাই বলুন, আপনার শ্বশুর কিন্তু খুব জোয়ান! সত্যি কি ডাকাতি করেন না কি?"

দামোদর উত্তর দিল, "ও কথা আর আমায় মনে করিয়ে দেবেন না শচীন্ বাবু!"

রমেশ বলিল, "যাক্! যা' হয়ে গেছে তা' নিয়ে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। ও রকম হয়। দু'দিন বাদে আবার রাগ পড়ে যাবে। তখন বুঝা যাবে। এখন দু'চার দিন এইখানে থাকুন।"

ছেলেরা ও চারু বাবু বাজার করিয়া ফিরিল। চারু বাবু একবার উপরে উঠিয়া দামোদরের কাছে গিয়া বলিলেন, "দামোদর, তুমি বস্‌বে, না শোবে? না হয় ত' নীচে চল। আজ খাও। খুব ধুম কর্ত্তে হবে। নগেন, শচীন, রমেশ, তোরা যাবি নীচে? চল্। রান্না কর্ত্তে হবে। সবাই না গেলে রান্না কোর্ব্বে কে? রাত্রের ভিতরই ত সারতে হবে। কাল্ সকাল না হয়ে যায়। ঘুমুবো কখন তা' হ'লে। উঃ! কাল যদি কলেজের ছুটি থাক্‌তো! তো'দের কি? গেলি না গেলি সব সমান্। চল্, ওঠ্।"

সকলে নীচে চলিল। দামোদর দেখিল মেসের অর্দ্ধেক ছেলে নীচে একতলায় জড় হইয়াছে; বাকী অর্দ্ধেক দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। গোলমালের সীমা নাই। নরেন, নলিন, মোহিনী, সতীশ প্রভৃতি সকলেই জটলা করিতেছে, আর কথা চলিতেছে। একতলা ও দ্বিতলের মধ্যে কথা বলিতেছে। চারু বাবু গিয়া বলিলেন, "আরে, তোরা দেখ্‌ছি সেই সকাল কোর্‌বি তবে ছাড়্‌বি।

লাগা, লাগা। শীগ্‌গির রান্না চড়া। নিধি, ওরে নিধে, কোথায় তুই ? লাগা শীগ্‌গির রান্না চড়িয়ে দে। আগে কোন্‌টা ? ওরে নরেন, আগে কোন্‌টা রাঁধ্‌বি ? দুটো উনানে দুটো কিছু চড়িয়ে দে। ও ঠাকুর ? তোমার ও ভাত দাল ছাই নামাও না। ও, আজ আর কে খাবে, শুনি। তোমাদের উড়ে জাতের আর বুদ্ধি হোল না। কি ক'রে জলের কল মেরামত কর সব ?" চারু বাবু হাঁফাইয়া পড়িলেন। নরেন বলিল, "চারু বাবু, আপনি ঐখানে চেয়ার পেতে বস্থন্। দেখুন্ আমরা সব করে ফেল্‌ছি।" নগেন কহিল, "এ আর কতক্ষণ লাগ্‌বে ? ভোর হবার আগেই সম্ভব সব সারা হবে।" দ্বিতলের বারান্দা হইতে কে বলিয়া উঠিল "শুন্‌ছেন, চারু বাবু? নগেনের কথা শুন্‌ছেন। কাল আর কাউকে কলেজ যেতে হবে না।"

চারু বাবু চেয়ার পাতিয়া বসিয়া বলিলেন, "না, না, রাত্রেই সব করা চাই, নগেন, মোহিনী, তো'রা সব কি গণ্ডগোল কোরছিস্, রাত যে শেষ হো'য়ে গেল। কতক্ষণ বসে থাক্‌বো ? কি কোর্‌বি কর না!"

দামোদর এই গোলমালের ভিতর তাহার নিজের কথা ভুলিয়া গেল। সে বলিল, "চারু বাবু! আমি এতটা আশা করি নি; আপনারা যা আয়োজন করেছেন, এতে রাতই কাটবে; কিন্তু বড় আনন্দ হবে।"

শচীন্ কহিল, "চারু বাবু, গান গাইব ? তা' না হলে কিন্তু আমি কাজ কোরতেই পারি না।"

নগেন্ ধমক্ দিল, "তুই থাম্, শচী, তুই দেখ্‌ছি আমাদের কাজ কর্ত্তে দিবি না।"

চারু বাবু দামোদরকে বলিলেন, "দামোদর! ভাগ্যে তুমি আজ এসেছিলে ? কেমন, ভাগ্যে এসেছিলে ? তা' না হলে কি আজ feast হো'তো! কি রে নগেন, হো'ত ?"

নগেন উত্তর দিল, "কিছুতেই না। আজ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

শচীন্ দামোদরকে বলিল, "দামোদরবাবু, আপনার মনে যদি আপনার স্ত্রী আঘাত না দিত, আর আপনার শ্বশুর মশাই যদি ভয় না দেখাতো, তবে কি আস্‌তেন, না এই রকম feast হো'ত ? উঃ! আমাদের খুব জোর বরাত। তাই না এই রকম ঘটনা ঘটেছিল।"

দামোদর কহিল, "না। আমি আপনাদের মত আবার হোতে যদি পার্ত্তুম! আমার আবার এই রকম ক'রে থাক্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, শচীন্ বাবু। ভালবাসা প্রতারণা; তাহাতে আনন্দ নাই। কিন্তু আপনাদের বন্ধুত্ব বেশ্।"

শচীন্ চুপি চুপি বলিল, "দামোদর বাবু, আমিও যে ভালবেসেছি। এখন তা' হলে উপায় ?"

দামোদর সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "শচীন্ বাবু! কেন ও কাজ কর্‌লেন ? আপনার এই বয়সে ? আমার আসা পর্য্যন্ত যদি অপেক্ষা কর্ত্তেন। আর অগ্রসর হবেন না। আমি বন্ধুর মতই পরামর্শ দিচ্ছি, আর এগুবেন না। বিবাহ করিবেন না। কখনও না।" (ক্রমশঃ)



প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ

(৫)

স্বামী বিবেকানন্দ—১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সিমুলিয়ায় দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ, শৈশবে বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তি, আর্তের প্রতি সহানুভূতি



স্বামী বিবেকানন্দ

এবং আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া প্রথমে তিনি নাস্তিক ভাবাপন্ন হন। পরে ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইলেও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার উপশম না হওয়ায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। তিনি যখন বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়; এবং প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতি অল্প কাল মধ্যে তিনি পরমহংসদেবের শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী হইয়া উঠিলেন।



ভগিনী নিবেদিতা

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসদেবের দেহান্তর ঘটিলে তিনি ছয় বৎসর কাল হিমালয় পর্ব্বতে অতিবাহিত করেন। সেই সময় তিনি তিব্বত গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অনুশীলন করেন। তৎপরে খেতড়ী রাজ্যে আসিয়া তথাকার

রাজাকে স্বমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের রামনাদের রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাদ্রাজবাসীদের অনুরোধে ও অর্থ-সাহায্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো নগরে Parliament of religion নামক সমিতির বৈঠকে প্রেরিত হন। সেখানে হিন্দুর প্রতিনিধি স্বরূপে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া যে সকল বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে তথায় হুলস্থূল পড়িয়া যায়। সেখানে মাদাম্ লুই ও মিষ্টার স্যাণ্ডস্বার্গকে শিষ্যরূপে লাভ করেন। বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়া তথায় তিনি বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন



কাপ্তেন রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার

৮৯৬ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং নানা সভায় বক্তৃতা করিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সহিত আলাপ করিয়া Life and Sayings of Ramkrishna নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করান। এই স্থানে তিনি কুমারী মার্গারেট নোবেল্ নাম্নী মহিলাকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। ইনিই পরে সিষ্টার নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা হন এবং ভারতের ধর্ম্মকে তাঁহার নিজের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া ১৮৯৬ সালে বিবেকানন্দের সহিত ভারতে আইসেন। বিবেকানন্দ ভারতে আসিলে কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সকল স্থানেই আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বামিজী প্রথমে বেলুড় মঠ ও আলমোড়ায় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা-দানার্থ একটি মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ইঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য্য। ১৮৯৭ সালে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যার্থ নানা স্থানে কেন্দ্র স্থাপিত করেন। বহু পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে পুনরায় অল্প দিনের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন। এই সময় স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরে একটি

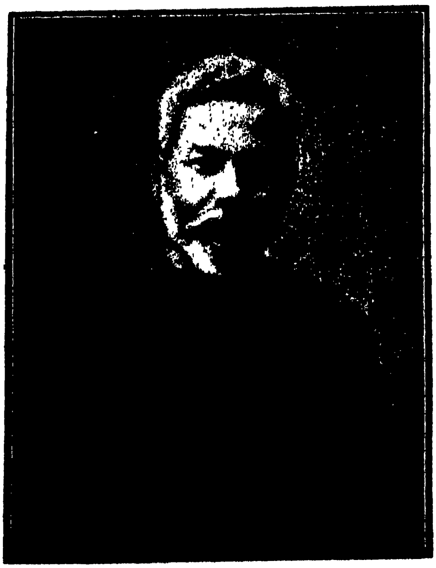


সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

বেদান্ত সোসাইটি ও শান্তি আশ্রম সংস্থাপিত করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস্ নগরে Congress of Religions সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় ফরাসী ভাষায় হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তথা হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, রামকৃষ্ণ হোম্ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাপানের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কংগ্রেসেও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তথায় যাইতে সমর্থ হন নাই। ত্যাগ ও সেবা ইঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-

সংস্থাপন ইঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহার ন্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ধর্ম্ম-প্রাণতা, বহু-ভাষা জ্ঞান ও বক্তৃতাশক্তি-সম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'রাজ-যোগ', 'ভক্তি-যোগ', 'জ্ঞান-যোগ', কর্ম্ম-যোগ', 're-incarnation' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে বৈকালিক ভ্রমণ করিয়া আসিয়া ধ্যানস্থ হন এবং রাত্রি ৯টার সময় মহাসমাধিস্থ হইয়া পরলোক গমন করেন।

রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার—১২৩৫ সালে হাবড়া দরকপুর গ্রামে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার



কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম মাধবচন্দ্র কর্ম্মকার। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ রাজকৃষ্ণের ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে কল-কারখানার কাজ, এঞ্জিন, বয়লার, জাহাজ, ষ্টাম্প কাগজের কল প্রভৃতিতে ইনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। কাশীপুর ও দমদমার গন্ ফাউণ্ডারীতে কামান বন্দুকের কাজ শিক্ষা করিয়া অল্পকাল মধ্যেই এখানকার হেড্ মিস্ত্রী হন। তৎপরে নেপাল-রাজের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় তিনিই প্রথম যন্ত্রযোগে মুদ্রা প্রস্তুত করেন, এবং আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি আনাইয়া কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি কাবুলেও বার জন কারিকরসহ আড়াই বৎসর আমীর আবদার রহমানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তথায় কল বসাইয়া প্রথম কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন। তথা হইতে আমীরের প্রদত্ত বহু পুরস্কার সহ প্রত্যাগমন করিয়া নেপাল-রাজের আহ্বানে ১২৯১ সালে পুনরায় তথায় গমন করেন। তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত কারখানার বহুল উন্নতিসাধন করা ভিন্ন কাঠের কারখানা, বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিষ্ঠা, উন্নত প্রণালীর কামান, কামানের গাড়ী, মেসিন্ গান্ প্রভৃতি



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

নির্ম্মাণের ব্যবস্থাদি করিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তথাকার যাবতীয় কলকারখানা ইঁহারই তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়। মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে কাপ্তেন উপাধি ও বহুমূল্য একটী সুদৃশ্য পাগড়ী উপহার দেন।

* * *

রামমোহন বসু—কলিকাতার পরপারে শালিখা গ্রামে ১১৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রবিলোচন বসু। কলিকাতায় যোড়াসাঁকোয় থাকিয়া ইনি শিক্ষালাভ করেন। এই সময় তিনি অবসর সময়ে কবিতাও লিখিতেন।

কথিত আছে তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভবানী বেণে তাঁহার রচিত কতিপয় গান পথে কুড়াইয়া পান। সেই উচ্চভাবাত্মক শ্রুতিমধুর গানগুলিতে মুগ্ধ হইয়া ভবানী রামমোহনের সহাধ্যায়ীদিগের শরণাপন্ন হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা গান সংগ্রহ করিতে থাকেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে ভবানীর অনুরোধে একদিন রামমোহন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে ভবানীর দলে প্রথম গান করেন। পিতা ইহা জানিতে পারিয়া অসন্তুষ্ট হওয়ায় রামমোহন দলের সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিন কেরাণীগিরি কাজ করিয়া, স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদের দলে গান বাঁধিয়া দুই

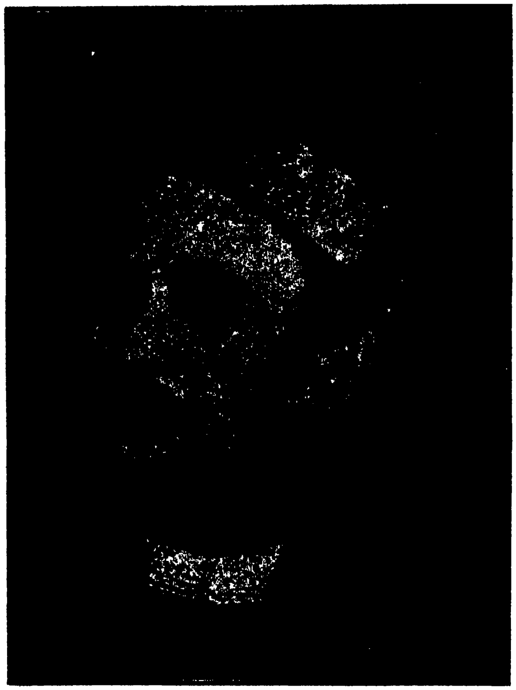


নবকৃষ্ণ ঘোষ

পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। পরে তিনি নিজে সখের দল করিলেন এবং শেষে তাহা পেশাদারীতে পরিণত হইল। তিনি কবিওয়ালাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিরহ, সখীসংবাদ, লহর, সপ্তমী প্রভৃতি গানগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্নস্বরূপ। ১২৩৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * *

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাণাঘাট মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস। কলিকাতার London Missionary Society বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। লেখাপড়ায় মনোযোগী না হওয়ায় এবং খ্রীষ্টানগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করায় পিতার সহিত মনোবিবাদ ঘটে। তৎপরে গৃহত্যাগ করিয়া ষ্ট্যাস্টন্ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৭ বৎসর বয়সে B. S. N. কোম্পানীর একখানি জাহাজে Assistant Steward রূপে ইনি লণ্ডনে যান এবং সেইখানে সংবাদপত্র বিক্রয় ও পরে কুলীর কার্য্য করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করেন। এই সময় ইনি রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ, ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ কিছু কিছু শিক্ষা



রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

করেন। তৎপরে তিনি একটি সার্কাস্ কোম্পানীতে নিযুক্ত হন। হিংস্র পশু দমন শিক্ষা করিয়া ইনি লণ্ডন প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। সার্কাস্ দলের সহিত তিনি জার্ম্মানীতে গমন করেন। তথায় জামবাক্ ও পরে জোগ কার্ল কর্ত্তৃক পশু দমন কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময় তথাকার জনৈক ভদ্রবংশসম্ভূতা যুবতী সার্কাসে সুরেশের সহিত ক্রীড়া করিত। উভয়ের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হওয়ায় যুবতীর আত্মীয়গণ বিরক্ত হইয়া সুরেশের প্রাণ-

সংহার করিবার সঙ্কল্প করিলে তিনি একটী বড় সার্কাস্ কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম লইয়া আমেরিকা পলায়ন করেন। এখানে আসিয়া অনেক ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং সার্কাস্ পরিত্যাগ করিয়া পশুশালার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় একজন চিকিৎসকের কন্যার সহিত ইঁহার প্রণয় জন্মিল। তাঁহারই ইচ্ছায় ইনি ব্রেজিল্ গভর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চিকিৎসক-কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি কর্পোরাল্ হইতে পদাতির প্রথম সার্জেণ্ট পদে উন্নীত হন। ব্রেজিলের নৌসেনাগণ বিদ্রোহী হইয়া যখন নাগেরয় নগর আক্রমণ



লালমোহন ঘোষ

করে, তখন সুরেশ মাত্র পাঁচটী সেনা লইয়া অসীম সাহসের সহিত শত্রুগণকে পরাভূত করেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইনি প্রথম লেপ্টেন্যাণ্ট্ পদে উন্নীত হন। ইহার পর হইতে ইনি রাজ্যের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে অস্ত্রোপচারে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমে লেপ্টেন্যাণ্ট্ কর্ণেল্ ও মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কর্ণেলের পদ লাভ করেন। ১৯০৫ সালে রাইও দে জেনারো নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। যুদ্ধকার্য্যে বাঙ্গালীর এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ ইদানিং আর দেখা যায় নাই।

* * *

রামপ্রসাদ সেন—অনুমান ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারসী ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অভিলাষানুরূপ বিদ্যালাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য এক ধনীর গৃহে মুহুরিগিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয় ভক্তিপ্রবণ ছিল। তিনি অবকাশ পাইলেই শ্যামা-বিষয়ক গীত রচনা করিতেন এবং হিসাবের খাতায় লিখিয়া



রাজকৃষ্ণ রায়

রাখিতেন। একদিন তাঁহার সহৃদয় গুণগ্রাহী ধর্ম্মপরায়ণ প্রভু খাতায়—

"আমায় দাও মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।"

ইত্যাদি গানটী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রামপ্রসাদকে মাসিক ৩০্ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে যাইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও শ্যামা বিষয়ক গীত রচনা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তৎপরে রামপ্রসাদ বাটীতে থাকিয়া একান্ত মনে তাহাই করিতে থাকেন। নদীয়ার গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন এবং তাঁহার

রচিত "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য উপহার পাইয়া তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার রচিত ভাবপূর্ণ মধুর শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীতগুলি দুর্লভ বস্তু। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাধক, ভক্তিমূলক গীতরচক ও গায়ক বাঙ্গালায় আর কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

* * *

গৌরী সেন—অনুমান তিন শত বৎসর পূর্ব্বে হুগলীতে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হরেকৃষ্ণ মুরলীধর সেন। গৌরী প্রথম সামান্য মূলধনে একটী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে কলিকাতায় বড়বাজারে বাস স্থাপন করিয়া তথাকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠের কারবারের অংশীদার হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। তিনি প্রধানতঃ শস্য ও ধাতুদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে চালান দিতেন। কথিত আছে একবার তিনি সাতখানি নৌকা বোঝাই করিয়া রাং চালান দেন। তথাকার কর্ম্মচারী ভৈরবচন্দ্র দত্ত, নৌকা পৌঁছিলে দেখিলেন, নৌকাগুলি রাং নহে, রূপা পূর্ণ। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা ফেরৎ পাঠাইলেন। এদিকে নৌকা ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই গৌরী স্বপ্নে দেখিলেন দেবানুগ্রহে তাঁহার প্রেরিত রাং রূপা হইয়া গিয়াছে। পরে তিনি এই রৌপ্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধন লাভ করেন এবং প্রত্যাদেশ অনুসারে হুগলীতে নিজগৃহে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিবস্থাপনা করেন ও যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করেন। অপরিমিত ধনোপার্জ্জন করিয়াও তিনি কখন গর্ব্বিত হন নাই এবং দান-ধ্যানাদির দ্বারা ধনের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ দানশীলতার সুযোগ লইয়া অনেক অসাধু ব্যক্তিও তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছেন। কেহ অর্থাভাবে আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইলে গৌরী সেনের নিকট প্রার্থী হইলেই তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। ইহা হইতেই "লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন" কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে।

* * *



ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়



সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি একজন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়া শিক্ষা বিষয়ে ইনি বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী রেজিষ্ট্রার। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ সভা স্থাপনে ইনি অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ইনি একজন সদস্য ছিলেন, তথায় তিনি নির্ভীকতার অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৯০৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * *

রসিকলাল দত্ত—ইনি ডাক্তার আর, এল, দত্ত (Lieut Col Dr. R. L. Dutt) নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। মেডিক্যাল্ কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তৎপরে আই এম-এস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান। তখন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই পরীক্ষা স্থগিত থাকায় তিনি এবার্ডিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া এম-বি পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছু দিন পরে তিনি পুনরায় বিলাত যাইয়া আই এম্-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরী লইয়া ফিরিয়া আইসেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এবং প্রচুর অর্থাগম হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে তিনি বহু স্থানে সিভিল্ সার্জ্জনের কার্য্য করিয়া শেষে অবসর লইয়া কলিকাতায় চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও অতিশয় স্বজাতি- ও স্বজনবৎসল ছিলেন। স্বজাতীয় বিধবাদিগের সাহায্যার্থ তিনি একটী সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।



রজনীকান্ত গুপ্ত

* * * *

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—১২৫০ সালে কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। ইনি বিদ্যালয়ে প্রবেশিকার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তৎপরে চারি বৎসর কাল বাটীতে অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করেন। প্রথমে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ইনি বাগবাজারে একটি থিয়েটারের দল গঠন করেন এবং "সধবার একাদশী" অভিনয়ে তিনি নিমচাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইহাই পরে ন্যাসানাল্ থিয়েটার নাম প্রাপ্ত হয়। ইহাতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে গিরিশচন্দ্র ইহার সংস্রব ত্যাগ করেন, কিন্তু পরে গ্রেট্ ন্যাসন্যাল্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ইহাতে অবৈতনিক ভাবে যোগদান করেন। পরে এক শত টাকা বেতনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৎপরে এমারেল্ড, ষ্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক ও কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করেন এবং অভিনয়ও করেন; অনেক সময় অধ্যক্ষতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাট্যশালার সহিত সংযুক্ত হইবার পর হইতেই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সর্ব্বসমেৎ প্রায় ৭০খানি নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। ইঁহার নাটকগুলি বঙ্গীয় নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করে। ইঁহার ন্যায় সুনিপুণ অভিনেতাও কমই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি রামকৃষ্ণ দেবের



রাজা শ্রীনাথ রায়

একজন ভক্ত শিষ্য ছিলেন। ১৩১৮ সালে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজে দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া প্রথম গভর্ণমেণ্টের পাঠশালায় ১৫৲ টাকা বেতনে কার্য্য করেন। পরে বারাসত গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপকের কার্য্য করেন। কলিকাতার জলবায়ু অসহ্য হওয়ায় দেড় শত টাকা বেতনে মুর্শীদাবাদে



এ, আপ্‌কার

জজ্‌পণ্ডিতের কার্য্য করেন এবং ছয় বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শেষে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। অধ্যয়ন কাল হইতেই ইঁহার বাঙ্গালা রচনায় দক্ষতা জন্মে। সেই সময় তিনি 'বাসবদত্তা' ও 'রসতরঙ্গিনী' নামে দুইখানি কাব্য রচনা করেন। ইঁহার রচিত ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা সর্ব্বজনবিদিত। "সর্ব্বশুভঙ্করী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও ইনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে ইনি বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

* * * *

নবকৃষ্ণ ঘোষ—ইনি রামশর্ম্মা নামে খ্যাত ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষ বংশে ১৮৩৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত আগমন কালে ইংরেজী কবিতা রচনায় ইনি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। ইহার কিছু পরে A Reply to Moncrieff's Fidelity of Conscience নামক তাঁহার একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত The ode in welcome to Prince Albert বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। প্রিন্স এলবার্টের কথামত উহার কয়েকখণ্ড মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত বহু সংখ্যক ইংরাজী কবিতার মধ্যে কতকগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় প্রথম জ্যোতিষগ্রন্থ 'জ্যোতিষপ্রকাশ' তিনি প্রকাশ করেন। তিনি একজন



জেনসেট্‌জি ফ্রেমজি ম্যাডান্‌

সামান্য কেরাণী হইতে Assistant of the Accountant General, Bengal পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি দয়া ও দানশীলতা প্রভৃতি বহু গুণের আধার ছিলেন।

* * * *

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সূর্য্যকুমার ঠাকুরের ইনি দৌহিত্র। ডিরোজিও সাহেবের ইনি অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনি প্রথম কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স কলেক্টর ও তৎপরে বাঙ্গালার নবাব নাজিমের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে বর্দ্ধমানের ডেপুটি কলেক্টর হন। বিশেষ কারণে তিনি কিছুদিন লোক-নয়নের অন্তরালে

থাকিয়া ১৮৫১ অথবা ৫২ সালে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করেন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করার জন্য লর্ড ক্যানিং ইঁহাকে রায়বেরেলির অন্তর্গত শঙ্করপুর তালুক জায়গীর স্বরূপে প্রদান করেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা উপাধি দান করেন। ইঁহারই চেষ্টায় 'আউধ তালুকদার এসোসিয়েসন্' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনিই উহার প্রথম সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ টাইমস্ নামক সংবাদ-পত্র ইনি ক্রয় করিয়া উহাকে তালুকদারদিগের মুখ-পত্র রূপে পরিণত করেন। কলিকাতার বেথুন্ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

লালমোহন ঘোষ—ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনিও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে তথায় ভারতের অভাব অভিযোগের কথা ওজস্বিনী ভাষায় বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডে উন্নতিশীল দলের প্রতিনিধিরূপে একবার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে দেশীয় সংবাদ-পত্র বিষয়ক আইন ও ইলবার্ট্ বিল সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইলে ইনি বহু স্থানে নির্ভীকতার সহিত আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

রাজকৃষ্ণ রায়—১২৬২ সালে ইঁহার জন্ম হয়। কবি ও নাট্যকার রূপে তিনি অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতির মধ্যে 'প্রহ্লাদচরিত্র,' 'নরমেধ যজ্ঞ', 'লয়লা মজনু', 'হিরণ্ময়ী' 'কিরণ্ময়ী', সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার পূর্ব্বে সংখ্যায় এত অধিক পুস্তক খুব কম লোকই প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত নাটকগুলির মধ্যে কয়েকখানি আজিও প্রশংসার সহিত কলিকাতার শ্রেষ্ঠ নাট্যালয়ে অভিনীত হইতেছে। ১৩০০ সালে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে।

* * * *

সাতুরায়—১২০৯ সালে নদীয়া জেলার বৈচিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম পীতাম্বর রায়। ইনি একজন অবৈতনিক বাঁধনদার ছিলেন। কবিওয়ালাদের গান বাঁধিয়া দিতেন, কিন্তু কোন পারিশ্রমিক লইতেন না। কবি-ওয়ালা ভোলা ময়রাকে ইনি অনেক গান বাঁধিয়া দিয়া-ছিলেন। গরাণহাটার সখের দলের অধিকারী শিবচন্দ্র সরকার শান্তিপুরে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে গান লইয়া আসিতেন। ইনি শেষ বয়সে পালচৌধুরীদিগের পক্ষে বারাসত মহকুমায় মোক্তারী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ১২৭৩ সালে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।



রুস্তমজী ধানজিভাই মেটা

* * * * *

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—১২৫৪ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পাইলেও তিনি নিজের পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়-বলে ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া, পারসী ও উর্দ্দু শিখিয়াছিলেন। ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। তিনি ১৮৲ টাকা বেতনে একটী সামান্য কার্য্যে প্রবেশ করিয়া শেষে ৬০০৲ টাকা বেতনে

যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়কের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কৃষিবাণিজ্যের অফিসে কেরাণীগিরি কার্য্য করিবার কালে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ রূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে অনেক দেশীয় শিল্প রক্ষা পায়। বড় বড় রেল ষ্টেশনে ভারতীয় কারুকার্য্যের যে সকল দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারই চেষ্টায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে, গাজরের চাষ দ্বারা যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। ঐ সকল দেশে শিল্পোন্নতির জন্য যথেষ্ট



হিরজিভাই মানকৃজী রস্তমজী

চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বিশেষ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রদর্শনী আরম্ভ হইলে তিনি তথায় গমন করেন এবং ইউরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া Visit to Europe নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মিউজিয়মে কার্য্য করিবার কালে গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে 'Art Manufacturers of India' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'জন্মভূমি' 'Wealth of India' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি সোনা, লোহা, কয়লা, প্রভৃতি বিষয় বহু সারবান প্রবন্ধ লেখেন। বিদ্যালয়পাঠ্য ও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালকবালিকাদের জন্যও কতিপয় গল্পের বহি লিখিয়াছিলেন। 'বিশ্বকোষ' নামক সুবৃহৎ অভিধানখানি ইনি এবং ইঁহার অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম আরম্ভ করেন। ১৩২৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * *

তনুবাবু—হাটখোলার দত্তবংশের খ্যাতনামা মদনমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র রামতনু দত্তকে লোকে তনুবাবু বলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নীলমণি হালদার, গোকুল মিত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ দেব, ছাতুবাবু, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রাজা সুখময় প্রভৃতি আটজন বাবু বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের 'আটবাবু' বলিত। ইঁহাদের মধ্যে তনুবাবুই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ঐ বাবুদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে অন্য বাবুদের অপেক্ষা আপনাকে অধিকতর অমিতব্যয়ী প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। বাবুগিরির খাতিরে তাঁহারা অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। তনুবাবুর পরবর্ত্তী কালেও বাবুয়ানার উপমা দিবার জন্য তনুবাবুর সম্বন্ধে কোন একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ঐ সম্বন্ধে মহিমা প্রচার করিত। কথিত আছে ৪০্।৫০্ টাকা দামের ঢাকাই কাপড় তিনি ব্যবহার করিতেন এবং একবার ব্যবহারের পর তাহা ত্যাগ করিতেন এবং কোমরে না আঘাত লাগে এইজন্য সেই স্থানের পাড় কাটিয়া ফেলা হইত। তাঁহার বাটীর উপর হইতে নিচে পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ প্রত্যহ আতর ও গোলাপজল দ্বারা ধৌত করা হইত। তাঁহার বাটীতে স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন পিতল কাঁসার তৈজসাদি ব্যবহার হইত না। শুনা যায় প্রত্যহ শতাবধি স্বর্ণ ও রৌপ্য থালা তাঁহার বাটীতে আহারান্তে ধৌত ও মার্জ্জিত হইবার জন্য উঠানে পড়িত। লোকে তাঁহাকে "বাবু তো বাবু তনুবাবু" বলিয়া সম্বোধন করিত।

* * *

ভোলা ময়রা—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভোলা ময়রার প্রকৃত নাম ভোলানাথ দে, সম্ভবতঃ ১৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৃপারাম। বাগবাজারে বারুদখানার ঠিক দক্ষিণ দিকে তাঁহার খাবারের দোকান ছিল। তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ

বলেন কলিকাতা, আবার কেহ বলেন শ্রীরামপুর, কেহ বলেন গুপ্তিপাড়া। তিনি লেখাপড়া সামান্য জানিলেও পারসী, সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় তাঁহার কিছু অধিকার ছিল। তিনি একজন সুরসিক কবি ছিলেন। সমাজের দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া শ্লেষাত্মক গান বাঁধিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। খুব সম্ভব ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের বংশের গঙ্গাময়রা ভূতের রোজা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

* * *

হরু ঠাকুর—ইহাঁর প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। ১১৫৪ সালে কলিকাতার সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। হরেকৃষ্ণ লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার কবিত্বশক্তির অভাব ছিল না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি কবির দল করিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাস নামক অপর একজন কবিওয়ালার নিকট তাঁহার স্বরচিত গানগুলি সংশোধন করাইয়া লইয়া গাওনা করিতেন। তাঁহার কবির দল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল এবং ইহা দ্বারা তাঁহার অর্থাগমও খুব হইয়াছিল। রাম বসুর যেমন বিরহ গানের প্রসিদ্ধি ছিল, হরুঠাকুরের সখীসংবাদও তদ্রূপ ছিল। সমস্যা পূরণেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় বহুবার পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে বহু সমস্যা পূরণ করিয়া হরেকৃষ্ণ প্রচুর পুরস্কার ও যশঃ লাভ করিয়াছেন। ১২১৯ সালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

* * *

সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী—ইনি ডাক্তার গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত ছিলেন। ১৮২৪ সালে ঢাকা জেলার কনকসার নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম রাধামাধব চক্রবর্ত্তী। ইনি কলিকাতার হেয়ার স্কুলে বৃত্তিলাভ করিয়া জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। কলেজের অন্যতম অধ্যাপক গুডিভ্ সাহেব ইহাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইহাঁরই তত্ত্বাবধানে গভর্ণমেণ্ট হইতে একটি বৃত্তি পাইয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যকুমার চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৫০ সালে প্রশংসার সহিত এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়া আইসেন এবং মেডিক্যাল্ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পাঁচবৎসর পরে বেঙ্গল্ মেডিক্যাল্ সার্ভিসে চাকরী প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী কভ্ন্যাণ্টেড সার্ভিসে প্রবেশ করেন নাই। ইনি একজন সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে ইনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তথায় একটী ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য্যকুমারের পরলোক প্রাপ্তি হন।

* * *

মতিলাল রায়—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতশালা গ্রামে ১২৩৯ সালে ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম মনোহর রায়। ইনি এণ্ট্রেন্স্ স্কুলে কিছু দূর পর্য্যন্ত পড়িয়া প্রথম কলিকাতা যোড়াসাঁকো থানায় কিছুদিন কেরাণীগিরি করিয়া পরে নবদ্বীপের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তৎপরে জেনারেল্ পোষ্ট অফিসেও কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর বাঙ্গালা রচনায় ঝোঁক ছিল। পোষ্ট অফিসে কার্য্য করিবার কালে একখানি নাটক রচনা করেন। তৎপরে দোগাছিয়া নিবাসী হরিনারায়ণ রায় চৌধুরীর অনুরোধে যাত্রার দলের নিমিত্ত একখানি নাটক লেখেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া মতিলাল একটী



রায় বদ্রীদাস বাহাদুর

যাত্রার দল বাঁধেন। এই দল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর স্বয়ং নবদ্বীপে একটী দল প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় পোড়ামাতার সম্মুখে দলের প্রথম গাওনা হয়। এই যাত্রার দল ক্রমে শ্রেষ্ঠ দল হইয়া উঠে। বাস্তবিক গোবিন্দ অধিকারী ও রাধাকৃষ্ণ দাসের পর এরূপ খ্যাতি ও অর্থোপার্জ্জন আর কেহ করিতে পারেন নাই। ইনি 'রাম বনবাস', 'রাবণ বধ' 'নিমাই সন্ন্যাস' প্রভৃতি অনেকগুলি পালা রচনা করিয়াছিলেন। ১৩১৫ সালে কাশীবাসে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

* * * *

রূপচাঁদ পক্ষী—ইঁহারা দক্ষিণদেশবাসী গৌড়েশ্বর বল্লালদেবের বংশসম্ভূত। উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের নিকট ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন। পিতা গৌরহরিদাস মহাপাত্র



কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ১২২১ সালে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীত-বিদ্যায় অনুরাগী ছিলেন। ইনি বহু শান্তরসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনা ও সঙ্গীত দ্বারা যশস্বী হইয়াছিলেন।

* * * *

রজনীকান্ত গুপ্ত—ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে ১২৫৬ সালে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম কমলাকান্ত গুপ্ত। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ইনি শিক্ষালাভ করেন। অভিভাবকদের ইচ্ছা ও অনুরোধ সত্বেও ইনি সাহিত্যসেবা ত্যাগ করিয়া জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। সাহিত্যসেবাই ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি 'জয়দেব চরিত' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পরে 'সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস', 'আর্য্যকীর্ত্তি', 'নবভারত' 'ভারতপ্রসঙ্গ' 'ভীষ্মচরিত' 'বীরমহিলা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কয়েকখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ১৩০৭ সালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

* * * *

রাজা শ্রীনাথ রায়—ঢাকা জেলার ভাগ্যকুল গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কুণ্ডুবংশে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই কুণ্ডুবংশ ইংরাজ আগমনের পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ব-বঙ্গের মধ্যে বিদ্যোৎসাহী, দাতা ও ক্রিয়াবান বলিয়া পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে যখন দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের দয়ায় সহস্র সহস্র লোকের প্রাণরক্ষা হয়। সেইজন্য তদানীন্তন নবাব কর্ত্তৃক বংশের জ্যেষ্ঠ রাসগোবিন্দ কুণ্ডু 'রায়' উপাধি এবং বাৎসরিক ১৪০০৲ টাকা আয়ের নিষ্কর ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হন। অদ্যবধি সংসারের যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি এই 'রায়' উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। শ্রীনাথ বাবু প্রথম ঢাকা ও পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি ঢাকার মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রোড সেস্ ও শিক্ষা সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি একনমিক্ মিউজিয়মের ট্রাষ্টী, জুলজিক্যাল্ গার্ডেনের আজীবন সভ্য, ঢাকার মিড ফোর্ড হাঁসপাতালের আজীবন গভর্ণর এবং ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তাঁহার সহোদর রাজা জানকীনাথ ও রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ব-বঙ্গে চক্ষু-চিকিৎসালয়, সীতাকুণ্ডু ওয়াটার ওয়ার্কস্ ও অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন। তাঁহারা কলিকাতায় দরিদ্রদের জন্য একটা আদর্শ বস্তি বিল্ডিং নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্ব-বঙ্গ ও কলিকাতায় তাঁহাদের বহু ব্যবসায় ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান আছে। কলিকাতা ও ঢাকায় একটী ষ্টীমার সার্ভিস্ও তাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজভক্তি ও বহু জনহিতকর কার্য্যের জন্য ১৮৯১ সালে গভর্ণমেণ্ট শ্রীনাথকে রাজোপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহাদের ন্যায় ধনী বাঙ্গালায় অতি অল্পই আছেন। তাঁহাদের দানের পরিমান ছয় লক্ষ টাকারও অধিক।

* * * *

এ, আপকার—ইনি এলেকজেণ্ডার আরাটুন্ আপকারের পুত্র ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এই আপ্‌কার বংশ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত। আপ্‌কার সাহেব বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আইসেন এবং ১৮৬৯ সালে পৈত্রিক ব্যবসায়ে অংশীদাররূপে যোগদান করেন। তিনি বেঙ্গল্ চেম্বার্সের সভাপতি, ছোটলাটের কাউন্সিলের সদস্য ও কলিকাতা বন্দরের কমিশনর ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালে কলিকাতার সেরিফ্ হন এবং পরবৎসর গভর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক C. S. I. উপাধিতে ভূষিত হন।

* * * *

ফ্রেম্‌সেট্‌জি ফ্রেমজি ম্যাডান্—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পার্শী বেনেভোলেণ্ট্ স্কুলে ইনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি প্রথম একটী সামান্য থিয়েটারে অল্প বেতনে কার্য্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহার কার্য্যদক্ষতা গুণে ক্রমে তিনি এই থিয়েটার কোম্পানীর একজন অংশীদার হন। তৎপরে তিনি করাচি যান এবং তথায় একটী নীলামে কিছু দ্রব্যাদি কিনিয়া দুই সহস্র টাকা লাভ করেন। তৎপরে তিনি বহু স্থানে নীলামে কেনাবেচা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। শেষে মিষ্টার সাক্‌লথের (Mr. Sakloth) সহিত কলিকাতায় একটি কারবার আরম্ভ করেন। দুই বৎসর একত্রে কার্য্য করার পর তিনি পৃথক ভাবে নিজস্ব ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং পর পর বহু স্থানে বহু শাখাপ্রশাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি অন্যান্য কার্য্যে মনোযোগ দিলেও থিয়েটার কখন ছাড়েন নাই। এক্ষণে ভারতের অধিকাংশ বড় বড় সহরে ম্যাডান্ কোম্পানির বায়স্কোপ বা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত আছে।

* * *

রস্তমজী ধান্‌জিভয় মেটা—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ধান্‌জিভয় বাইরামজী মেটা। ১৮৬০ সালে তাঁহারা সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া বাসস্থাপন করেন এবং রস্তমজী কলিকাতাতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ব্যবসায়-কার্য্যে তিনি বিশেষ দক্ষতালাভ করেন এবং তাঁহারই উৎসাহে "এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কলিকাতার সেরিফ্, বেঙ্গল্ ন্যাসন্যাল্ চেম্বার অব্ কমার্শের সহঃসভাপতি, অবৈতনিক্ ম্যাজিষ্ট্রেট্, জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, আলিপুরের লোক্যাল ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি ও কলিকাতা বন্দরের কমিশনর ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের সা কর্ত্তৃক তাঁহার কলিকাতার কঁসুল্ নিযুক্ত হন। তিনি একজন দানশীল বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন।

* * *

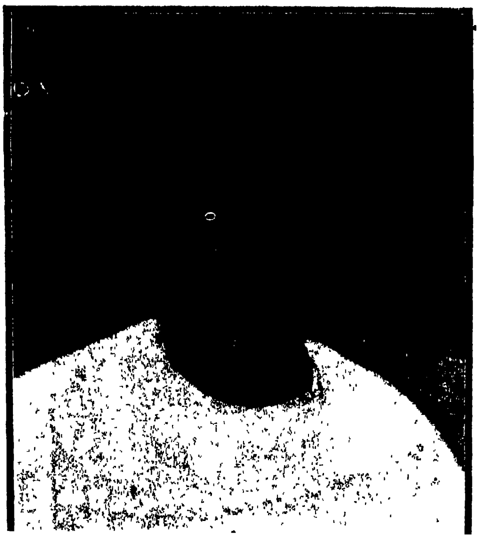
হিরজীভাই মানকজী রস্তমজী—ইঁহার পিতামহ রস্তমজী কাওয়াসজী গত শতাব্দীর প্রথমাংশে কলিকাতায় আসিয়া



বিহারীলাল গুপ্ত

বাস করেন এবং জাহাজের কাজ ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হন। ১৮৭০ সালে তিনি পারস্যের কঁসুল ছিলেন। কলিকাতার টাউন্‌হলে তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে। মানকজী ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতাতেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ন্যাসন্যাল্ ব্যাংকের বোম্বাই শাখায় ডেপুটী একাউণ্টেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পিতার ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বহু জনহিতকর কার্য্যে যোগ

দান করেন। তিনি জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্, মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনর, মেয়ো হাঁসপাতালের গভর্ণর, প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেলের এবং আলিপুর Reformatory Schoolএর পরিদর্শক, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, কলিকাতার সেরিফ্ এবং পিতার মৃত্যুর পর পারস্যের কঁসল্ হইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় পারসী সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। দিল্লির দরবারের সময় তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক C. I. E. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে তাঁহার



শ্রীগোপাল বসু মল্লিক

পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তিনি সকল সম্প্রদায়ের নিকটই সম্মানিত ছিলেন।

* * *

রায় বদ্রীদাস বাহাদুর—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম লালা কালকা দাসজী। ১৮৫৩ সালে ইনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন এবং জহুরির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ মণিকার বলিয়া পরিচিত হন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজ রূপে যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে লাটভবনে হীরা জহরতের সমাবেশ করেন। ১৮৮৩।৮৪ সালে কলিকাতার ইণ্টারন্যাসন্যাল একজিবিশনে তিনি একটী প্রদর্শনী খোলেন। তথায় তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র লাভ করেন। লর্ড মেয়ো তাঁহাকে 'মুকিম্' উপাধি প্রদান করেন এবং লর্ড নর্থব্রুক্ মুকিম্ ও রাজকীয় মণিকার বলিয়া গণ্য করেন। ১৮৭৭ সালে দিল্লির দরবারে লর্ড লিটন্ কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধি এবং এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া পদক প্রাপ্ত হন। মাণিকতলার জৈন মন্দির নামে খ্যাত শ্রীশীতলনাথজীর উদ্যান সম্বলিত মনোহর মন্দির তাঁহারই সম্পত্তি। ইহা কলিকাতার একটী দ্রষ্টব্য বস্তু। বদ্রীদাস করোনেসন দরবারে প্রদর্শনী খুলিয়াও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। কলিকাতায় পিঁজরাপোলের কথা তিনিই প্রথম চিন্তা করেন এবং তিনিই উহা স্থাপন করেন। তিনি বৃটীশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের এবং ন্যাসন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের সদস্য ছিলেন। ভারতের জৈনসম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ১৯০৩ সালে বোম্বাইপ্রদেশে যে দ্বিতীয় জৈনসভা হইয়াছিল তিনি তাহাতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

* * *

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত—১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার ভাটপাড়া গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। তিনি মৈমনসিং ও ঢাকায় শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৬৯ অব্দে সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ড যান এবং উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭১তে সিভিল্ সার্ভিসে যোগদান করেন। ভারতে ফিরিয়া বাখরগঞ্জের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে কতিপয় বৎসর বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং কলেক্টরের কাজ করিয়া ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বোর্ড অব রেভিনিউতে জুনিয়ার সেক্রেটারি পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করেন এবং পরে এই পদে পাকা হন। পরে তিনি বাঙ্গালার এক্সাইস্ কমিশনর হন। তৎপরে উড়িষ্যার কমিশনর এবং ট্রিবিউটারি মহলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সালে তিনি অস্থায়ীভাবে কলিকাতার বোর্ড অব্ রেভিনিউএর সদস্য হন। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতীয় এই পদ প্রাপ্ত হন নাই। এই সময় তিনি বেঙ্গল্ কাউন্সিলের সদস্য হন। ইনি ইণ্ডিয়ান্ ফিসারিস্

কমিশনের নেতৃত্ব করেন। ১৯০৭ সালে ভারত-সচিবের সভার সদস্য মনোনীত হন। ভারতবাসীর উক্ত সভায় এই প্রথম প্রবেশলাভ। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নাইট্ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯:৬ সালে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

* * *

বিহারীলাল গুপ্ত—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ হরিমোহন সেনের দৌহিত্র এবং চন্দ্রশেখর গুপ্তের পুত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি বাটীর সকলের অজ্ঞাতসারে ইংলণ্ড যান এবং তথায় সিভিল্ সার্ভিস্ ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন। মানভূম হুগলী প্রভৃতি কয়েক স্থানে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কলেক্টর পদে কার্য্য করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও করোণার পদে নিযুক্ত হন। দেশীয় সিভিলিয়ানগণ ইউরোপীয় অপরাধিগণের বিচার করিতে আইন অনুসারে অসমর্থ থাকায় তিনি একটী মন্তব্য লিখিয়া তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এ্যাস্‌লে ইডেনের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাই প্রসিদ্ধ ইলবার্ট বিলের মূলভিত্তি। তিনি পরে ডিষ্ট্রিক্ট্ ও শেসন্ জজ, Superintendent and Remembrancer of Legal affairs এবং অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের জজ্ হইয়াছিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি কিছুকাল বরোদা রাজ্যে ব্যবস্থা-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইনি C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৬ অব্দে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * *

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক—১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙ্গার বিখ্যাত মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাধানাথ বসু মল্লিক। শ্রীগোপাল সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন এবং অচিরে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "শ্রীগোপাল ফেলোসিপ্ লেক্চারের" আসন যাহা প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা তাঁহার দর্শন ও বেদান্তের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও উদার হৃদয়ের পরিচায়ক। বেদান্তচর্চ্চার সহায়তা-কল্পে তিনি মৃত্যুকালে বেদান্ত-বৃত্তি স্থাপনের জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি উইল্ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। দুরিদ্রদের সাহায্য-কল্পে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দুঃস্থ হিন্দু বিধবাদের সহায়তা-কল্পে তাঁহার জননী বিন্দুবাসিনীর নামে একটী তহবিল স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যখন প্লেগ্ নামক মহামারী প্রথম দেখা দেয়, তখন রোগীদের হাঁসপাতালের জন্য তিনি তিনখানি বৃহৎ অট্টালিকা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার



জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাটী



রমাপ্রসাদ রায়

হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি অসীম ছিল। তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাঁহার গৃহদেবতা শ্রীধরজীর সেবার্থ উইল্ করিয়া দিয়া যান। ১৩০৬ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

* * *

মহারাজা মহ্‌তাবচাঁদ—১৭৪৮ শব্দে বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ইঁহাকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৭৬৫ শকে ইনি রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি মহাভারতের একখানি বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজসরকারে ইঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ইনি সম্মানসূচক তোপ পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি ভিন্ন বঙ্গদেশীয় জমিদারদিগের মধ্যে এ সম্মান আর কেহ পান নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে ইনি মহারাণীর এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সাধারণকে দান করেন। উহা কলিকাতার যাদুঘরে স্থাপিত আছে। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবাটী, গোলাপবাগ্, কৃষ্ণসায়ার্ ইঁহারই কীর্ত্তি। ১৮৭৯ সালে ইনি পরলোকগত হন।



গৌরীশঙ্কর দে

* * *

কৃষ্ণরাম বসু—১১৪০ সালে হুগলীর অন্তর্গত তাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দয়ারাম। জনৈক সন্ন্যাসী বালক কৃষ্ণরামের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া পিতার অনুমতিক্রমে ইঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণরাম কলিকাতায় আসিয়া পিতার সামান্য মূলধন লইয়া লবণের কারবার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ সৌভাগ্যলাভ করেন। কিছুদিন পরে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে হুগলীতে দেওয়ানি পদ লাভ করেন। তৎপরে এই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতার শ্যামবাজারে আসিয়া বসতি করেন। তৎকালে তিনি একজন বিখ্যাত ধনী এবং দানবীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। একবার দুর্ভিক্ষের সময় ইনি একলক্ষ টাকার চাউল বিতরণ করিয়াছিলেন। মাহেশের সুপ্রসিদ্ধ রথের ইনিই প্রবর্ত্তক। যশোহরে শ্রীশ্রীমদনগোপাল ও বীরভূমে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং কাশীতে ও ভাগলপুরে শিবমন্দির সমূহ স্থাপন এবং গয়ায় রামশিলা সোপানশ্রেণী প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা ইনি অক্ষয় যশঃ লাভ করিয়াছেন।

* * * *

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ত্রিবেণী গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। কথিত আছে দেবতার প্রত্যাদেশে পুত্রের জগন্নাথ নাম রাখা হয়। স্থানীয় টোলে শিক্ষা লাভ করিয়া জগন্নাথ স্বীয় বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভাবলে স্মৃতি ও ন্যায়-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি প্রাপ্ত হন। ক্রমে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজা নন্দকুমার, রাজা নবকৃষ্ণ হইতে ওয়ারেণ্ হেষ্টিং, স্যার্ উইলিয়ম্ জোন্স্, স্যার্ জন্ শোর প্রভৃতি তখনকার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং 'হেদে পোতা' নামক একখানি তালুক প্রদান করেন। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বহু নিষ্কর ভূমি এবং ত্রিবেণীতে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দান করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে উখুড়া পরগণায় সাত শত বিঘা ভূমি প্রদান করেন। আবশ্যক হইলেই গভর্ণমেণ্ট হিন্দু দায়ভাগ সংক্রান্ত পরামর্শাদি তাঁহার নিকট গ্রহণ করিতেন। ১০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া গভর্ণমেণ্ট

তাঁহার নিকট হইতে "অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ" ও "বিবাদ ভঙ্গার্ণব" নামক দায়ভাগ-সংক্রান্ত দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করাইয়া লন। ইহার পরেও তিনি ৩০০৲ মাসিক সরকারি বৃত্তি পাইতেন। ইনি ন্যায়-শাস্ত্রের কয়েকখানি সংগ্রহ পুস্তক ও দুই একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইনি একজন শ্রুতিধর পুরুষ ছিলেন। দুইজন সাহেবের মারামারি বিষয়ক সাক্ষী দিয়া তিনি যে স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা দুর্লভ! তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৮০৭ সালে ১১১ বৎসর বয়সে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে।

* * * *

ধর্ম্মদাস সুর—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম অভিনেতৃরূপে দুই একটী সখের থিয়েটারে যোগদান করেন। ইঁহারই চেষ্টা ও পরিশ্রমে ষ্টেজ্ ও দৃশ্যপট প্রস্তুত হইয়া শ্যামবাজারের রাজেন্দ্র পালের বাটীতে লীলাবতী নাটকের অভিনয় আরম্ভ করা হয়। ইহা হইতেই সাধারণ নাট্যালয় স্থাপনের সংকল্প হয় এবং জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাটীতে নীলদর্পণ নাটক লইয়া ন্যাসন্যাল্ থিয়েটার নামে বাঙ্গালীর প্রথম সাধারণ নাট্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে ধর্ম্মদাসের ঐকান্তিক পরিশ্রমে গ্রেট্ ন্যাসন্যাল্ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার দৃশ্যপটাদি তিনি স্বয়ং চেষ্টা করিয়া অনেকগুলি প্রস্তুত করেন। ইনি কিছুদিন কোহিনুর থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা থিয়েটার প্রাথমিক যুগে তাঁহার ন্যায় নাট্যমঞ্চের শিল্পী আর কেহ ছিলেন না। ১৯১০ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

রমাপ্রসাদ রায়—১২২৪ সালে রাধানগরের নিকট রঘুনাথপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি প্রথম রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে, তৎপরে পেরেণ্ট্যাল্ অ্যাকাডেমিতে ও শেষে হিন্দু কলেজে বিদ্যালাভ করেন। রামমোহনের বিলাত যাত্রার পর দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে অভিভাবকরূপে তত্ত্বাবধান করেন। ডেভিড্ হেয়ারও তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রথম নদীয়া তৎপরে বর্দ্ধমান, হুগলী, ২৪ পরগণার ডেপুটি কলেক্টর হন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এ কার্য্য পান। পরে তিনি এই কার্য্য ত্যাগ করিয়া ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অবসর গ্রহণের পর সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার বাঙ্গালী ও ইংরাজ উভয় সমাজেই প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি যথেষ্ট হয়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি তৎকালীন শিক্ষা-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি একজন সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হইলে একজন দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করিবার কথা স্থির হয়। লর্ড এলগিন্ তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই পদের জন্য মনোনীত করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিচারপতির আসনে বসিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহবাস ত্যাগ করেন। তিনি বহু গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি একজন নীরব কর্ম্মী হইলেও শক্তিমান স্বদেশহিতৈষী ছিলেন।

* * * *

শম্ভুচন্দ্র শেঠ—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে চন্দননগরে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রাধামোহন শেঠ। ইঁহাদের প্রকৃত উপাধি নন্দী, শেঠ নবাব-প্রদত্ত উপাধি। শম্ভুচন্দ্র সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া, শুনা যায় প্রথম কলিকাতায় এক তুলার দোকানে মাসিক ছয় টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি তাঁহার শ্বশুর প্রদত্ত একহাজার টাকা মূলধন লইয়া বড়বাজারে একখানি সামান্য লোহার দোকান করেন। ক্রমে তাঁহার সততা, সত্যবাদিতা ও অধ্যবসায় গুণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শম্ভুচন্দ্র শেঠ এণ্ড সন্স্ কলিকাতার মধ্যে লৌহ ও ষ্টীল্ ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। শুধু ভারতের বহু স্থানেই নয়, বেলজিয়ম, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও এই ফার্ম্মের নাম সুপরিচিত এবং এই সকল স্থানে ব্যবসায় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার সাধুতার জন্য তিনি তাঁহার দেশে ও সমাজেই যে শুধু শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তাহা নহে, কলিকাতায় ও ইউরোপে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তাঁহাকে সকলে এত অধিক বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার সহিত কাজ করিতে সকলেই উৎসুক হইতেন এবং এজন্য কোন এগ্রিমেণ্ট্ সহি করাইবার আবশ্যকতা বোধ করিতেন না। কণ্ট্রাক্ট্ সহি না করিয়া

কাজ করা শুধু দেশীয় ফার্ম্ম কেন বড় বড় বৈদেশিক ফার্ম্মের মধ্যে অদ্যাপিও ব্যবস্থা নাই। তাঁহাদের এ সম্মান বরাবরই অব্যাহত ছিল এবং পরে তাঁহার পুত্র নিত্যগোপাল শেঠও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এতাদৃশ সম্মানিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র লোহাপটি একদিন বন্ধ ছিল। শম্ভুচন্দ্রই প্রধানতঃ পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের সহিত ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বাঙ্গালীকে লৌহ ও ষ্টীল প্রভৃতির আমদানী ব্যবসায়ের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহাকেই বাঙ্গালীর মধ্যে এ কার্য্যের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। এ কার্য্য ভিন্ন বগুড়া, মুঙ্গের, হাটখোলা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার মোকামী কাজও যথেষ্ট ছিল। তিনি একজন যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। পূজা পার্ব্বণ দান-ধ্যান ক্রিয়া কলাপ তিনি ভাল বাসিতেন। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

* * * *

গৌরীশঙ্কর দে—১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মধুসূদন দে। ইনি প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া এম, এ পর্য্যন্ত সম্মানের সহিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা ও এম, এ তে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে বি, এল পাশ করেন এবং রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ৪১ বৎসর ধরিয়া জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক এবং সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি একাধারে যেমন অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই কর্ত্তব্যপরায়ণতা, শ্রমশীলতা, দানশীলতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন।

* * * *

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় (দেওয়ান)—১২২১ সালে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম উমাকান্ত রায়। ইঁহাদের বংশ কৃষ্ণনগর রাজসংসারের দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত। ইনি বাল্যকালে পার্শী ও বাঙ্গালা শিখিয়া ইংরাজী শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আইসেন। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থ মেডিক্যাল্ কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু নানা কারণে উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন, পরে তথাকার দেওয়ানী পদলাভ করেন। ইঁহার দ্বারা রাজষ্টেটের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। "ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত" নামক কৃষ্ণনগর রাজবংশের একখানি বৃহৎ ইতিহাস ইনি রচনা করেন। ইহা ব্যতীত "গীতমঞ্জরী" এবং একখানি আত্মজীবনচরিত প্রণয়ন করেন। সঙ্গীত-বিদ্যাতেও ইঁহার পারদর্শিতা যথেষ্ট ছিল। সুবিখ্যাত নাট্যকার ও হাস্য-রসাত্মক গীত-রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার অন্যতম পুত্র। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দেহান্ত ঘটে। *

* বিগত সপ্ততি বৎসরের মধ্যে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এবং জীবিত ব্যক্তিদের কথা লিখিত হয় নাই। যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কথা বাদ পড়িয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার না জানা থাকা অথবা তাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ করিতে না পারা এবং স্থানাভাব ইহাই কারণ। সংক্ষেপ করিবার জন্যও কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় উল্লেখ করিতে বিরত হইতে হইয়াছে।



সতী

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি-এসসি

পাড়াগাঁয়ের একটা বহু পুরানো বাড়ী—দোতলা। বাড়ীটার দেওয়ালে অনেকগুলি ছোট ছোট আগাছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাড়ীর বাসিন্দে দুজন—প্রবীণ স্বামী, আর তার দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে বয়সের যে পার্থক্য, সেটা বাপ মেয়ের মধ্যেই শোভনীয়। অনীতার বাপের অবস্থা মোটেই ভাল নয়,—কেরাণীগিরি করেই অন্নের সংস্থান কর্ত্তে হয়;—আবার তা'রই থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় কিছু মেয়ের বিয়ের খরচের যোগাড় কর্ত্তে। এর উপর কুলীন সে; কুলীনের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিতে হ'বে—এই না কি সমাজের দাবী। তাই অনীতার বিয়ের সময় অনীতা যখন মুখ তুলে চেয়েছিল শুভদৃষ্টির ক্ষণে, তখন সে দেখেছিল, যে তা'র জীবন-পথের সঙ্গী হ'তে চলেছে, সে বয়সে তার বাপের চেয়ে বড় না হ'লেও ছোট নয়। শুদ্ধভাবে, মন্ত্র পড়ে, এমন কি ধর্ম্মমতে নারায়ণ সাক্ষী করে অনীতাকে সেই বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করা হ'ল! তারপর, যখন বিদায়ের ক্ষণ এগিয়ে এল, তখন মা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বল্লেন—"মা, স্বামীর ঘর কর্ত্তে যাচ্ছ—মনে রেখ, স্বামী দেবতা, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবেস, তাঁর সেবা কোরো—স্ত্রীলোকের এই ধর্ম্ম বুঝলে মা! আশীর্ব্বাদ করি সতী সাবিত্রী হও।"—এর পর দু-তিন বৎসর কেটে গেছে—অনীতা তা'র স্বামীকে সেবা করে, যত্ন করে সত্যিই প্রাণ দিয়ে। সবাই বলে—"আহা, সত্যি বৌটী সতীলক্ষ্মী; স্বামীকে কি রকম ভালবাসে—কত যত্ন করে।"—সকলে সেবা যত্নটাকেই ভালবাসা বলে ভুল করে। বোঝে না যে, স্নেহ সেবা যত্ন নারী অকাতরে বিতরণ কর্ত্তে পারে ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে—কারণ সেইটাই তা'র ধর্ম্ম; কিন্তু ভালবাসা বলতে যা বোঝায়, তা নারী সাধারণতঃ একজনকেই পারে দিতে—আর সেও তা'র ইচ্ছানুযায়ী নয়—হৃদয় যা'কে চায়, তারই পায়ে আপনাকে সে বিলিয়ে দেয়—একেবারে নিজেকে নিঃস্ব করে।

তরী যখন জীর্ণ হয়ে আসে, তখন তা'কে নদীর বুকে চলতে হ'লে অনেক সাবধানে ঢেউএর ধাক্কা বাঁচিয়ে কোনও রকমে চলতে হয়। ঠিক সেই রকম করেই চলতে হচ্ছিল অনীতার স্বামী পরমেশকে; তা'র জীর্ণ দেহখানাকে নিয়ে তা'র জীবন-নদীর বুকে অনীতা ধরে ছিল সে তরীর হাল। কিন্তু অনেক বাঁচিয়ে চল্লেও একদিন পরমেশকে একটু ভাল ভাবেই শয্যা নিতেই হ'ল। নিরালা বাড়ী; অনীতা একাই তা'র রোগী স্বামীকে নিয়ে দিন কাটায়। কিছুদিন গেলে একদিন পরমেশ নিজে থেকেই বল্লেন—"অনীতা, একা আর কত কর্ব্বে তুমি! সংসারের অন্য সমস্ত কাজ থেকে আমার সেবা যত্ন পথ্য সব এক হাতে কি করে হবে রোজ রোজ? কাকেও আসতে লিখলে হ'য় না?"

অনীতা বল্লে—"কাকে লিখবে? আমি ত জানি না তোমার কোথায় কে আত্মীয় আছেন।"

উত্তরে পরমেশ একটু যেন ব্যথিত সুরেই বল্লেন—"আত্মীয়রা আত্মীয়া আমার কেউ যে বিশেষ আছে, তা নয় অনীতা। আর যা দু-একজন আছে তা'রা আমার এ দুঃসময়ে আসবে না—যদিও একদিন তা'দের দুঃসময়ে আমি তা'দের সকলের জন্যই আমার যথাসাধ্য করেছিলাম"—বলে পরমেশ অনেকক্ষণ চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রৈলেন; পরে আস্তে আস্তে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন—"তবে—"

অনীতা তাঁর মুখের কথাটার যেন প্রতিধ্বনি করে বল্ল—"তবে—"

"তবে আমার এক দূর-সম্পর্কের মামাত ভাই নিশীথ কলকাতায় 'ল' পড়ে। এবার তা'র ফাইনাল্ পরীক্ষা হ'য়ে গেল সে-দিন। তা'কে লিখলে সে বোধ হয় আসবে—বড় পরোপকারী, বড় ভাল ছেলে সে। সে এলে মাঝে মাঝে রাতও জাগতে পার্ব্বে, তোমার সেবারও সাহায্য হ'বে। আর তা ছাড়া কয়েকদিন অন্ততঃপক্ষে তোমার কথা বলবারও একটা সঙ্গী হ'বে।"

* * * *

সেদিন সেই পুরানো বাড়ীটার উপর থেকে সূর্য্যের শেষ

বিদায়-রশ্মিটুকু তখন মুছে গেছে ;—চারিদিকে আঁধার জমে উঠেছে; দূরে শৃগালের চীৎকার শোনা যাচ্ছে ; ঝিল্লীরবও উঠেছে চারিধারে। অনীতা তার স্বামীর শিয়রে বসে—অদূরে একটা প্রদীপ জ্বল্‌ছে। আজ দিন দুই-তিন থেকে পরমেশের অসুখটা আরও একটু বেড়েছে। পরমেশের কপালে জলপটী দিয়ে হাওয়া করার এখন যেন একটু সুস্থির হয়ে তিনি 'চোখ বুজেছেন। এমন সময় নীচে দরজার কড়া সজোরে নড়ে উঠ্‌ল। পরমেশের তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেল ;—তিনি চম্‌কে উঠে বল্লেন—"দেখ, দেখ বোধ হয় নিশীথ এল—" অনীতা ধীরে ধীরে উঠে গেল। একজন অপরিচিত পুরুষকে দরজা খুলে দিতে যেতে তার যেন কেমন একটু লজ্জা কর্ত্তে লাগ্‌ল ; অথচ তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না; কাজেই তা'কেই যেতে হ'ল।—দরজা খুলে দিতেই প্রবেশ কর্ল একটী যুবক। তার এক হাতে প্রকাণ্ড একটা সুটকেশ, আর এক হাতে বিছানা। যুবকটীও ঘরে ঢুকেই অপরিচিতা এক যুবতী মহিলাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল।—কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বল্লে—"আপনি নিশ্চয় আমার বৌদি। আমি নিশীথ—আপনার দেওর। পরমেশদা কেমন আছেন? চলুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করিগে।"

অনীতা প্রত্যুত্তরে কোন কথা বল্লে না—মাথার ঘোমটাটী আরও অনেকখানি টেনে দিয়ে নিশীথের আগে আগে চল্‌ল। নিশীথ সিঁড়িতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্ল—"আমার সুটকেশ, বিছানা ঐ নীচেকার ঘরেই থাক্‌ল—আমার আস্তানা কিন্তু ঐ নীচেই হবে বৌদি।"

নিশীথকে ওপরে নিয়ে গিয়ে পরমেশের ঘর দেখিয়ে দিয়েই সে বা'র হয়ে এল। নারীর লজ্জা যেমন একটী আভরণ, অহেতুক ঔৎসুক্যও তেমনি তা'র স্বভাবের একটা অঙ্গ। অনীতা বাইরে এসে ঘোমটাটী তুলে আড়াল থেকে এই নবাগত দেওরটীকে বেশ ভাল্ করে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। দেখ্‌লে যে বেশ বলিষ্ঠ শ্যামবর্ণ সুপুরুষ যুবা—বয়স চব্বিশ পঁচিশ হ'বে। মুখে যেন তা'র হাসি মাখান রয়েছে।

নিশীথ ঘরে ঢুকে পরমেশের পায়ে প্রণাম কর্ত্তেই পরমেশ বল্লেন—"কি রে নিশীথ, আয়। আমার বড় অসুখ, তাই তোকে আস্‌তে লিখেছিলুম। বস্, অনীতা, একটা বস্‌বার জায়গা দাও ত।"

নিশীথ বল্লে—"না, না কিছুর দরকার নেই, আমি আপনার এই বিছানাতেই বস্‌ছি।"—বলে সে পরমেশের বিছানার উপরেই বসে পড়ল। পরমেশ আবার বল্লেন—"অনীতা, তুমি নিশীথের সঙ্গে গল্প কর—নিশীথ, কিছু মনে করিস্ না ভাই, আমি ত বেশী কথা কইতে পারি না—"

বাধা দিয়ে নিশীথ বল্লে—"না, না, আপনি কথা বল্‌বেন না, ঘুমুন। তবে যাঁকে কথা কইতে বল্‌ছেন তিনি এতক্ষণ বোধ হয় নীচের তলায় গিয়ে হাজির। আর কথা বল্‌বেন কি—আমাকে দেখে তিনি যত বড় ঘোমটা দিয়েছিলেন—এ বিংশ শতাব্দীর কথা ছেড়ে দিন—উনবিংশ শতাব্দীরও কোনও বৌ দেওরকে দেখ্‌লে তত বড় ঘোমটা দিত না—এমন কি ভাসুরকে দেখ্‌লেও না।"

পরমেশ মাথাটা একটু উঁচু করে দেখ্‌লেন যে, অনীতা মাথার দিকে নেই। তখন একটু ব্যস্তভাবেই বল্লেন—"সে কি?"—ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলেন—"অনীতা, অনীতা!"

অনীতা ততক্ষণ সত্যই নীচে চলে গেছে। নিশীথ বাধা দিয়ে বল্লে—"আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমিই ভাব করে নেব। ও ঘোমটা যদি কালকের মধ্যে না কপালের কাছে তোলাতে পারি, তাহ'লে আমার নাম নিশীথই নয়।—কিন্তু যাক্, এখন আপনি চোখ বুঁজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন ত—আমি হাওয়া কচ্ছি—বেশী কথা বল্লে আবার কষ্ট হ'বে।"

পরমেশ পাশ ফিরে শুলেন ;—পাশে একটা পাখা ছিল নিশীথ সেইটা তুলে নিয়ে পরমেশকে বাতাস কর্ত্তে লাগল। খানিক পরে যখন নিশীথ দেখলে যে পরমেশ ঘুমিয়ে পড়েছেন, তখন সে অতি সন্তর্পণে উঠে আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল। নীচে গিয়ে আড়াল থেকে দেখ্‌ল যে, উনুনের ধারে বসে অনীতা খাবার তৈরী কর্চ্ছে ;—সুন্দর—গৌরবর্ণ মুখটী আগুনের তা'তে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। সে পা টিপে টিপে পিছন থেকে গিয়ে হঠাৎ ডাক্‌লে—"বৌদি"—

অনীতা চম্‌কে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিশীথকে দেখে একটু লজ্জিত হয়েই ঘোমটা টেনে দিল। নিশীথ হো হো করে হেসে উঠ্‌ল—বল্ল—"আর কি হ'বে ঘোমটা দিয়ে—মুখ দেখে ফেলেছি ত?"

এর পর নিশীথ হাত মুখ ধুয়ে খেতে বস্‌ল। খেতে বসে পাখার উপর পাখা সুরু করে দিল গম্ভীর ভাবে।

অনীতা প্রথমে ঘাড় বাঁ-দিক থেকে ডাইনে, আর ডাইনে থেকে বাঁয়ে নেড়ে কাজ সারতে লাগ্‌ল—পরে "হুঁ" আর "না"—শেষে একটু-আধটু কথা—এমনি করে প্রথম আলাপ সুরু হ'ল।

কয়েক দিন কেটে গেছে। অনীতার সে লজ্জার বাঁধ ভেঙে গেছে—ঘোমটাও উঠেছে গিয়ে কপালে। এমন কি দুই দেওর বৌদির মাঝে "আপনি" সম্বোধনটা উঠে গিয়ে "তুমি" সম্বোধন সুরু হ'য়ে গেছে। সেবা করা ও রাত জাগার পালাও তারা ভাগ করে নিয়েছে। নিশীথ জাগে রাত্রের প্রথম দিকটা, আর অনীতা শেষের দিকটা। নিশীথ আসায় বাড়ীটাতে এত বড় একটা অসুখ থাকা সত্ত্বেও যেন চারিদিকে একটা খুসীর রং লেগেছে—সে যেন কি এক' যাদুমন্ত্রে কান্নাকে হাসির পাতে মুড়্‌তে পারে।—তার সেবা-শুশ্রূষায় পরমেশের মহা তৃপ্তি হয়;—আবার পরমেশ যখন ঘুমান, তখন সে তার বৌদির প্রাণটা খুসীতে ভরিয়ে তোলে রসিকতা, ঠাট্টা চালাকি সখের ঝগড়া করে। দুই দেওর-বৌদির মাঝে দিন দিন একটা মধুর সখ্যতা গড়ে ওঠে।

একদিন নিশীথ বসেছে খেতে—অনীতা সম্মুখে বসে হাওয়া কর্চ্ছে। নিশীথ খেতে খেতে কত গল্প কর্চ্ছে—তার কালেজের, খেলাধূলার, দেশের আরও কত কিসের। অন্য দিন হ'লে অনীতা নিশীথকে এতক্ষণ কত প্রশ্নই না কর্ত্ত। কিন্তু আজ হঠাৎ তা'র কি খেয়াল—কোন কথাই বল্‌ছিল না সে—শুধু নিশীথের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল;—ভারী ভাল লাগছিল আজ তার নিশীথের কথাবার্ত্তা, হাস্যোজ্জ্বল চোখের চাহনি।—অনীতার এই নীরবতা হঠাৎ নিশীথের গল্পের স্রোত বন্ধ করে দিল। সে তা'র গল্প থামিয়ে বল্ল—"বৌদি, তুমি যে কোন কথা বলছ না?"

অনীতা একটু চমকে উঠে বল্‌ল—"তোমার গল্প শুনছি যে—আমি কথা বল্‌ব কি করে?"

নিশীথ খেয়ে উপরে পরমেশের কাছে চলে গেল। অনীতা নিজে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বস্‌ল। খেতে বসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—আচ্ছা, নিশীথ ঠাকুরপোকে বন্ধুর মত মনে হয়।—অন্তর বলে বন্ধুর মতই বেশী;—সংস্কার অন্তরের কণ্ঠরোধ করে বলে—না ভাইএর মতই বেশী—দেওর যে ভাইএরই সমান—

সেই দিন রাত্রে পরমেশ ঘুমুলে পরে অনীতা ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল নিশীথকে খেতে দিতে। নিশীথের ঘরের কাছে এসে দেখ্‌লে যে তা'র ঘরের দরজাটা ভেজান রয়েছে;—মাঝখানে একটু ফাঁক;—তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, নিশীথ টেবিলের সম্মুখে বসে এক মনে একটা বই পড়্‌ছে, আর তার মুখের অনেকখানিই এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে। অনীতা দরজা না খুলেই সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে একদৃষ্টে নিশীথকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। নিশীথকে সামনাসামনি যেন এতটা পূর্ণভাবে সে দেখ্‌তে পার্ত্ত না। খানিক পরে হঠাৎ সে চমকে উঠ্‌ল; মনে হ'ল কি কচ্ছে সে; এ রকম ভাবে দেখা অন্যায়। সে তক্ষণি দরজাটা খুলে ঢুকে পড়ে ডাক্‌ল—"ঠাকুরপো!"

নিশীথ বইটা থেকে মুখ তুলে বল্ল—"কি ভাই বৌদি, খেতে দিয়েছ।"

—"হ্যাঁ, চল তোমাকে ভাত দিয়ে নিইগে। তোমার দাদা একটু চোখ বুঁজেছেন, তাই এক্ষণি তাড়াতাড়ি নেমে এলাম—এই ফাঁকে তোমায় ভাতটা দিয়ে যেতে।—হয় ত এখনি উঠে পড়বেন—এস।"

নিশীথ এসে খেতে বস্‌ল—অনীতা তার সামনে বসে নিজ মনে ভাব্‌ছিল—অন্যায় কিছুই নয়, ও খানিকটা খেয়াল আর খানিকটা অন্যমনস্কতার জন্য।—কিন্তু অন্যায় যদি না হবে, ত মিথ্যা সে বল্‌তে গেল কেন? বল্‌তেই ত পার্ত্ত যে, সে অনেকক্ষণ থেকে লুকিয়ে নিশীথকে দেখ্‌ছিল।

অনীতার মনের কোণে যেন কিসের একটা সন্দেহের ছায়া পড়্‌ল। সে তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে তার স্বামীর পায়ের কাছে বসে তা'র পা দুটি কোলের উপর তুলে নিয়ে হাত বুলাতে লাগ্‌ল।

দু-চারদিন কেটে গেছে এর পর। অনীতার মনের মধ্যের সন্দেহের যে সামান্য দোলা—সেটা থেমে গেছে। সেদিন তখন বেলা দুপুর—চারিদিকে রোদ খাঁ খাঁ কর্চ্ছে—মাঝে মাঝে দুপুরের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে কয়েকটা চিলের চীৎকার আকাশে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। নিশীথ অনীতার ঘরে বসে নভেল পড়ছে। অনীতা পাশের ঘরে পরমেশের কাছে বসে ছিল;—খানিক পরে উঠে এল এ-ঘরে। এসে আস্তে আস্তে পিছন দিক থেকে নিশীথের বইটা কেড়ে নিল।

'নিশীথ জিজ্ঞাসা কল্লে'—"তুমি উঠে এলে যে ?"

অনীতা বল্লে—"উনি ঘুমিয়েছেন—তাই সেই ফাঁকে তোমাকে একটু জ্বালাতন কর্ত্তে এলাম—"

নিশীথ একটু অনুনয়ের সুরেই বল্লে—"বইটা দাও, লক্ষীটি—বড় সুন্দর গল্পটা।"

অনীতা বল্লে—"আমাকে বল কিসের গল্প, তবে বই পাবে।"

—"সে তুমি বুঝ্বে না—"

—"বলই না—বুঝি কি না সে পরের কথা।"

—"একটী মেয়ের হতাশাময় প্রেমের গল্প—"

—"কি রকম ?"

—"মেয়েটীঅতি সচ্চরিত্রা; কনভেণ্টে শিক্ষিতা সে—বিয়েও হয়েছিল তার। কিন্তু স্বামীকে সে ভালবাস্‌তে পারে-নি—ভাল বেসেছিল আর একজনকে—স্বামীরই এক বন্ধু সে। কিন্তু মেয়েটী তার জীবনে কারো কাছে সে ভালবাসা স্বীকার কর্ত্তে পার্ল্লে' না—এমন কি নিজের কাছেও না। নিজের মনের মাঝে অহর্নিশি এই দ্বন্দ্ব তাকে পাগল করে তুলল। শেষে একদিন আত্মহত্যা করে সে সব জ্বালার হাত থেকে ত্রাণ পেল।—"

—কথা শেষ করে নিশীথ অনীতার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই দেখ্‌ল অনীতার মুখে যেন রক্তের লেশ-মাত্র নেই—একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে। সে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"ও কি বৌদি, তোমার মুখ যে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে! কি হয়েছে ভাই ?"

অনীতা চেষ্টা করে মুখে একটু হাসি এনে বল্লে—"না, ও কিছু না"—তারপর হঠাৎ অসংলগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করে ফেল্‌ল—"ঠাকুরপো, তুমি কাউকে ভালবাস ?"—জিজ্ঞাসা করেই তা'র মুখটা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। নিশীথের মুখটাও রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল সঙ্গে সঙ্গে। অনীতা যেন বিশেষ কোন একটা উত্তরের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রৈল। নিশীথ চুপ করে থাকায় অনীতা বল্লে—"বল না, লজ্জা কি ?"

নিশীথ মাথাটা নীচু করে বল্লে—"হ্যাঁ, বাসি।"

অনীতার দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে গেল। হঠাৎ সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে উঠ্‌ল—"কে সে ?—"

নিশীথ বল্লে—"আমার এক বন্ধুর বোন—নাম রাণী।"

—"সে তোমাকে ভালবাসে ?"

—"হ্যাঁ, বাসে। সে এবার ম্যাট্রিক দেবে—তারপর আমাদের বিয়ে হ'বে—এই ঠিক আছে।"

নিশীথের লজ্জা গেল কেটে। সে রাণীর গল্পে শতমুখ হ'য়ে উঠ্‌ল ;—অনীতা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

নিশীথ অনুনয়ের সুরে বল্লে—"কোথায় চল্লে বৌদি ? দাদার কাছে ত সারাদিন ছিলে। এখন ত তিনি ঘুমিয়েছেন—এস না একটু গল্প করা যাক।"

অনীতা একটু গম্ভীর ভাবেই বল্ল—"না যাই, তোমার দাদার জন্য ফলগুলি ছাড়িয়ে রাখিগে।"

—"সে ত বৈকালে খাবেন—তার এত তাড়াতাড়ি কেন ?"

—"না, কাজ সেরে রাখাই ভাল—কাজ ফেলে গল্প কর্ত্তে আমি ভালবাসিনে মোটেই—" বলেই অনীতা আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে লাগ্‌ল। নিশীথ উঠে এসে দরজার কাছ থেকে বল্লে—"ফল কটা ছাড়িয়ে রেখে এস কিন্তু বৌদি—একটু গল্প কর্ব্ব।"

অনীতা নীচে থেকে যেন বেশ একটু বিরক্ত ভাবেই বল্লে—"না ঠাকুরপো, এখন আর গল্প কর্ত্তে ইচ্ছে নেই। তুমি তোমার দাদার কাছে পার ত একটু ব'স। ফল-কটা ছাড়িয়ে রেখে আমি একটু ঘুমুব—আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।"

দিন যায়—

অনীতার মনে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হ'য়েছে। সেদিনের সেই গল্পের মেয়েটীর শেষ অবস্থা মনে করে সে শিউরে ওঠে। স্বামীর সেবায় সে যতদূর সাধ্য আত্মনিয়োগ করেছে; কিন্তু তবুও তা'র মন নিশীথের কথা নিয়েই নাড়াচাড়া করে—সে নিশীথ সামনে থাকলেও, না থাক্‌লেও।—অনীতা ভাবে, তবে কি মনে মনে সে নিশীথকে—তার সংস্কারাচ্ছন্ন মন সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করে ওঠে—না, না, তা হ'তে পারে না, তা হ'তে পারে না কখনও। দেওরের প্রতি স্নেহেরই রূপান্তর—এটা।—কিন্তু তখনি আবার তার অন্তরের কোন গভীর তলদেশ থেকে কে

যেন বলে, তবে সেদিন নিশীথের বন্ধুর বোনের কথা শুনে তা'র বুকটা ব্যথায় রণিয়ে উঠেছিল কেন? আর কেনই বা সেই গল্পের মেয়েটার কথা তাকে প্রতি মুহূর্ত্তে আজও এমন আকুল করে তোলে?—কিন্তু স্বীকার ত সে কর্ত্তে পারে না—মনে মনেও। এ কি হোলো? তার জীবনে ত কোন স্পন্দনই ছিল না; বেশ কেটে যাচ্ছিল একরকম করে। নিশীথ আস্‌তেই তার জীবনে যেন একটা সাড়া পেয়েছে সে। নিশীথকে চলে যেতে বলুক সে। কিন্তু নিশীথ চলে যাবে ভাবতেও যে তার মনটা বিষাদে ভরে উঠে—চারিদিক আঁধার মনে হয়। মনকে ত চিরকাল ফাঁকী দেওয়া চলে না। এত দিনের সুপ্ত যৌবন আজ তা'র দেহের মাঝে জেগে উঠেছে—সে যৌবনের ঢেউ উঠে আজ তার সারা প্রাণটাকে মাতিয়ে তুলেছে। কুড়ি বৎসরের অনীতার বুকের মাঝে আজ কি এক কামনা, কি এক আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সে সেই কামনার, সেই আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠরোধ কর্ত্তে প্রাণপণ চেষ্টা কর্চ্ছে;—কিন্তু সব চেষ্টাকে বিফল করে দিয়ে, ব্যর্থ করে দিয়ে সেই আকাঙ্ক্ষার, সেই কামনার ক্ষীণ ধ্বনি তা'র কাণে এসে বাজছে—সব সময় সব কাজের মাঝে।

অনীতা সেদিন হঠাৎ পরমেশকে বল্লে—"দেখ, নিশীথ-ঠাকুরপো অনেক দিন এসেছে—রাত জাগ্‌ছে সমানে। তবে ও যে রকমের পরোপকারী ছেলে তাতে ও নিজে থেকে কোনও দিন বলবে না যে ওর যাওয়া দরকার! তার উপর ওর বৃদ্ধা মা রয়েছেন;—পরীক্ষা হয়ে গেছে এতদিন। এখন ওর মার কাছে যাওয়া নিতান্ত উচিত।"

পরমেশ বল্লেন—"সবই ত বুঝি অনীতা, কিন্তু আমি ত এখনও ভাল করে সাম্‌লতে পারিনি। ও চলে গেলে তুমি একলা ত পেরে উঠবে না। আরও দিনকতক থাক—তারপর বলব'খনি।" অনীতা হঠাৎ কেঁদে উঠে বল্‌লে—"তোমার পায়ে পড়ি ওকে যেতে বল—আমি খুব পার্ব্ব একা তোমার সেবা কর্ত্তে।"

পরমেশ ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"ও কি, ও কি কাঁদছ কেন অনীতা? ওকে না হয় যেতে বলছি—কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন?"

অনীতার অন্তরের মধ্যে একটা পরম আত্ম-লাঞ্ছনার প্রবাহ বহে গেল। সে ক্রন্দনের সঙ্গে একটু অভিমানের সুর মিশিয়ে ক্রন্দনের কারণটাকে হাল্কা করে দিয়ে বল্লে—"কাঁদব না, তুমি কেবলই বল একলা আমি পার্ব্ব না সেবা কর্ত্তে। কেন, আমি ত কাকেও আস্‌তে বলিনি। তুমিই ত নিশীথ ঠাকুরপোকে আস্‌তে বলেছিলে—তাই আমিও মত দিয়েছিলাম। নিশীথ ঠাকুরপো ত আমার কোনও মহা ক্ষতি কর্চ্ছে না যে, ও গেলেই আমি বাঁচি।"

পরমেশ কৃতজ্ঞতায় ভরা চোখ দুটী তুলে বল্লেন—"না, না অনীতা, তোমার সেবার কি তুলনা হ'তে পারে? এখনও যে বেঁচে আছি, সে তোমারই সেবার জোরে। ভুল বুঝ না, লক্ষ্মীটি! তোমার সুবিধার জন্যই বলেছিলাম। বেশ ত, ওকে এখুনি ডেকে বুঝিয়ে বলছি। সত্যিই, ওর বুড়া মায়ের প্রতি কর্ত্তব্যও আছে বৈ কি—আর ওর মত ছেলে সে কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে পার্চ্ছে না আমারই জন্য;—ঠিকই বলেছ তুমি; ওকে বলব'খনি।"

"আমার যা বক্তব্য তোমাকে বলেছি—তুমি যা ভাল বোঝ তা কর—" বলে অনীতা পরমেশের কাছ থেকে বাইরে চলে এল। বাইরে এসেই তা'র মনে হ'ল যে, এ কি কর্ল্ল সে! তা'র নিরানন্দ জীবনের মাঝে ক'দিনের জন্য যে আনন্দের ক্ষীণ শিখাটুকু জ্বলে উঠেছিল, তা'কে সে নিজে ইচ্ছা করে এক মুহূর্ত্তে একটা ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে এল। হৃদয়ের মাঝে এক মহা অন্তর্দাহ নিয়ে গিয়ে সে তা'র নিজের বিছানায় শরাহত পক্ষিণীর মত লুটিয়ে পড়্‌ল।

কতক্ষণ কেটে গেছে তা' তার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হ'ল তখনই, যখন নিশীথ এসে কাছে দাঁড়িয়ে ডাক্‌ল—"বৌদি" ডাক শুনে মুখ তুলে তাকাতেই নিশীথ জিজ্ঞাসা কর্ল্ল—"অসময়ে ঘুমুচ্ছ কেন বৌদি, অসুখ করেছে?" তার সুর যেন স্নেহ সহানুভূতিতে ভরা। নিশীথের স্নেহভরা ডাক শুনেই অনীতার বুকের ভিতরকার রক্ত উচ্ছল হ'য়ে উঠ্‌ল;—অনীতা প্রাণপণে নিজের প্রবৃত্তির রাশ টেনে ধরল। সে উঠে বসে বল্‌ল—"না ঠাকুরপো—শরীর খারাপ হয়নি; এমনি শুয়ে ছিলাম।"

নিশীথ একটু চুপ করে থেকে বল্লে—"কাল যাচ্ছি বৌদি। দাদা বল্লেন যে, আমার আর থাকার বিশেষ দরকার নেই। মা আছেন, তাঁর কাছে যাওয়া উচিত এখন।

ই বৌদি, মা আমাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ন—আমারও মনটা ভারী ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে দেখবার জন্য। কাল সকালের গাড়ীতেই যাব—" ক চুপ করে থেকে আবার বল্লে—"বৌদি ভাই, াকে ছেড়ে যেতেও মনটা ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে— ার স্নেহের স্মৃতি আমার মনটাকে অনেক দিনই আচ্ছন্ন । রাখবে। আমার কথা তোমার মনে থাক্‌বে ত দি ?"

অনীতার অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত ক্রমশঃই বেড়ে ছিল; ক্রন্দনের একটা রুদ্ধ আবেগ তার বুকের মাঝে রে গুমরে উঠ্‌ছিল। কিন্তু সে সব চাপা দিয়ে শুধু —"মনে থাক্‌বে বৈ কি ঠাকুরপো! তুমি কত উপকার ল্লে আমাদের—কত আমোদে রেখেছিলে—সব মনে ক্‌বে।"—বলে সে উঠে দাঁড়ালে।

নিশীথ আবার বল্লে—"বৌদি, আমার বোন নেই— নি না বোন্‌কে মানুষ কতখানি ভালবাসে;—কিন্তু ই কয় দিনে তোমাকে যতখানি ভালবেসেছি নিজের ান থাকলেও জানি না ততখানি——" অনীতা হঠাৎ থায় বাধা দিয়ে বল্লে—"আমি চল্লাম ঠাকুরপো, তোমার দাকে ওষুধ খাওয়ানর সময় হয়ে গেছে—" বলেই কথার মাঝেই চলে গেল।

রাত্রি তখন প্রায় তিনটে। নিশীথ তার ঘরে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত;—অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। নিশীথের বিছানার উপর নিশীথের মুখে চোখে সে আলোর ছোঁয়াচ লাগছে। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে নিশীথের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে "কে" বলে উঠে বস্‌তেই চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে তার চোখে পড়ল কে একজন মাটীতে বসে। সে তাড়াতাড়ি মাথার কাছ থেকে দেশলাইটা নিয়ে জ্বেলে দেখে—অনীতা। তখন সে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে পাশের আলোটা জ্বেলে ফেল্‌ল। তারপর উঠে অনীতার কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—"এ কি বৌদি, তুমি এ সময়ে এখানে ?"

অনীতা মুখ নীচু করে বসে ছিল,—তার পায়ের কাছেই নিশীথের প্রকাণ্ড সুটকেশটা। নিশীথ এ কথা বলার পরও অনীতা যেমনি মাথা নীচু করে বসে ছিল তেমনিই বসে ... নিশীথ একেবারে কাছে গিয়ে বল্লে—"বৌদি, বসে রইলে কেন ভাই—লেগেছে নাকি ?—"বলে ভাল করে তাকাতেই দেখ্‌লে যে, অনীতার বাঁ হাতের কনুইএর কাছটা খুব কেটে গেছে—রক্ত পড়ছে। নিশীথ তা দেখে অস্ফুট চীৎকার করে উঠ্‌ল। কোমল-হৃদয় নিশীথের মনের ভিতর থেকে তখন সংস্কার, সম্পর্কের বাধা সব লুপ্ত হ'য়ে গেল মুহূর্ত্তের মাঝে;—সে ভুলে গেল যে গভীর রাত্রে একই ঘরে রয়েছে কেবলমাত্র সে, আর তার দূরসম্পর্কীয়া এক যুবতী বৌদি। অনীতার হাতের রক্ত দেখে তার মনটা সহানুভূতিতে কেঁদে উঠ্‌ল। সে গিয়ে তাড়াতাড়ি অনীতাকে দুহাতে তুলে ধরে নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় বসিয়ে দিলে। তার সুটকেশ খুলে একটা ফরসা কাপড় বার করে তাই ছিঁড়ে অনীতার হাতের ক্ষতস্থানটা বাঁধ্‌তে সুরু করে দিল।—বাঁধ্‌তে অসুবিধা হচ্ছিল বলে সে অনীতার হাতটা নিজের কোলের উপর টেনে নিল। অনীতার সারা শরীর এতক্ষণ থর থর করে কাঁপছিল;— এখন নিশীথ তা'র হাতটা কোলের উপর টেনে নিতেই তা'র সারা শরীরের মধ্যে একটা শিহরণ খেলে গেল। নিশীথের স্পর্শটা তার শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎস্পর্শের মত মনে হ'তে লাগল।—বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে নিশীথ জিজ্ঞাসা কল্লে— "কি জন্যে এ সময়ে এত রাত্রে নেমে এসেছিলে ভাই ?"

অনীতার শরীরের সকল রক্ত যেন হঠাৎ জমাট হয়ে গেল। সে প্রথমটা ভেবেই পেল না কি বল্‌বে—কারণ সে ত নিজেই ঠিক এখানে আসবে বলে আসেনি। পরমেশের মাথার কাছে বসে সে ভাব্‌ছিল নিশীথের আসন্ন বিদায়ের কথা। ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার বুকটা এক মহাব্যথায় ভরে উঠ্‌ল— মনের ভিতরকার যে প্রবৃত্তিটাকে সে এত দিন চাপা দিয়ে রেখেছিল—বাইরে প্রকাশ হ'তে দেয়নি, সেই প্রবৃত্তিটা আবার আজ মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াল তা'র মনের মাঝে। হঠাৎ তার অন্তরে এক মহা উন্মাদনার সৃষ্টি হ'ল। তার পর যেন তার মাথার মাঝে এক প্রলয় নাচন সুরু হ'ল। সে ধীরে ধীরে পরমেশের কাছ থেকে উঠে নেমে এল নিশীথের ঘরের দিকে। কিন্তু অনীতার তখন সত্যিকারের জ্ঞান ছিল না;—সত্যিকারের জ্ঞান হ'ল তখনই যখন সুটকেশটা পায়ে বেধে সে পড়ে গেল।—তখন তা'র মনে হ'ল কি করেছে সে—এতদিনের সংযম, সাধনা বিফল করে নিজের সর্ব্বনাশ করেছে সে ?—তাই নিশীথের কথা

প্রথমে কোন উত্তর খুজে পেল না সে।—একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লে—"আমার শরীরটা, বড় খারাপ বোধ হচ্ছিল; আর বস্‌তে পারছিলাম না। তাই তোমাকে ডাক্‌তে এসেছিলাম—তোমার দাদার কাছে একটু বস্‌বে বলে।"

নিশীথ সে কথা পূর্ণ বিশ্বাস করে স্নেহবিগলিত স্বরে বল্লে—"তা বেশ করেছিলে;—কিন্তু একটা আলো হাতে আস্‌তে হয়। দেখ দেখি, পড়ে গিয়ে হাতটা কতখানি কেটে গেছে—" বলে সে অনীতার সেই ক্ষতস্থানটার চারিধারে স্নেহভরে হাত বুলাতে লাগল। নিশীথের স্নেহভরা কথায়, নিশীথের স্পর্শে অনীতার সমস্ত সংযমের বাঁধ আজ এক নিমিষে চুরমার হয়ে গেল। সে সব ভুলে গিয়ে নিশীথের হাত দুটী সবলে চেপে ধরে তা'র রক্তরাঙ্গা চোখদুটী নিশীথের মুখের দিকে তুলে আবেগ-কম্পিত স্বরে ডাক্‌লে—"ঠাকুরপো, ঠাকুরপো—"

নিশীথ তার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখে মহা বিস্মিত হয়ে শুধু বল্লে—"কি বৌদি?"

অনীতার সারা শরীর তখনও থর থর করে কাঁপছিল;—তার বুকের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌ছিল—তা'র ইচ্ছা হচ্ছিল ঐ সম্মুখের মানুষটাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে তার ঐ প্রশস্ত বুকের মাঝে মুখটা রেখে বল্‌তে—"আমি আমার শত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দান করে যে একেবারে নিঃস্ব হয়ে বসে আছি।"—তা'র এ আকাঙ্ক্ষা, এ ইচ্ছাকে আজ আর কোন কিছুই দমিয়ে রাখ্‌তে পাচ্ছিল না—লোকলজ্জা না—তা'র আবাল্যের সতীত্বের সংস্কারও না। অনীতা একেবারে আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলে নিশীথের হাত-দুটী সবলে তা'র বুকের মধ্যে টেনে নিতে গেল—এমন সময় উপর থেকে হঠাৎ তার কাণে এসে পৌছল পরমেশের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—"অনীতা, অনীতা, কোথায় গেলে—" অনীতার কাণে সে স্বর অগ্নিশলাকার মত এসে বিঁধ্‌ল। সে চমকে উঠে নিশীথের হাত ছেড়ে দিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিশীথ খানিকক্ষণ তেমনিই বসে রৈল। অনীতার এর আগেকার দু-একদিনের ব্যবহার নিশীথের মনে মহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু কোনও সন্দেহের দোলা দেয়নি। আজ কিন্তু অনীতার এই আত্মহারা ব্যবহারে নিশীথের সরল মনের মাঝেও একটা সন্দেহের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হ'ল। মনটা তা'র এই নিয়েই নাড়াচাড়া কর্ত্তে লাগল। তার অন্তরের মধ্যে কে যেন বল্‌লে যে, তা যদি হয় ত বড় অন্যায়; কিন্তু তবু বলে ও-কথা ভাবতে তা'র মনে যে খুসীরও একটু ছোঁয়াচ লাগল না তা নয়।—ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল আবার, তা সে জানে না। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখ্‌ল যে রোদ এসে ঘর ভরে গেছে—বেলা হ'য়ে গেছে অনেক। অন্যদিন হলে অনীতা তাকে ডেকে দিত—ঠাট্টা করে হয় ত হেসে বল্‌ত—"নবাব, ওঠা হোক, আপনার চা প্রস্তুত।" কিন্তু আজ আর সে ডাকেনি।

নিশীথ বাইরে এসে দেখ্‌লে যে অনীতা তা'র দৈনিক কাজে ব্যস্ত। সে জিজ্ঞাসা কর্লে—"দাদা কেমন আছেন, বৌদি?"

—"ভাল।"

নিশীথ আবার বল্লে—"তুমি কাল শরীর খারাপ বলে আমাকে ডাক্‌তে গেলে, কিন্তু—"

কথার মাঝে বাধা দিয়েই অনীতা একটী ছোট্ট শুষ্ক উত্তর দিলে—"আর দরকার ছিল না।"

নিশীথ বল্লে—"আজ সকালেই আমি যাব মনে আছে ত বৌদি! সকাল সকাল দুটী ভাত চাই—"

অনীতা শুধু বল্লে—"সে আমার মনে আছে।"

অনীতা পিছন দিয়ে বসেই কাজ কর্চ্ছিল—এতক্ষণেও সে ফিরে একবার নিশীথের দিকে তাকাল না। অগত্যা নিশীথ সেখান থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল;—যাওয়ার সময় বল্লে—"আমি মুখ ধুয়ে আমার ঘরে যাচ্ছি—তুমি সেইখানেই 'চা' নিয়ে এস বৌদি।"

অনীতা একটু চীৎকার করেই বল্লে—"না, তুমি উপরে তোমার দাদার কাছে বসগে—তিনি জেগে আছেন—আমি সেইখানেই তোমার চা নিয়ে যাচ্ছি।"

সেদিন সকাল বেলাটাতে ঘুরতে ফিরতে নিশীথের সঙ্গে অনীতার অনেকবারই দেখা হয়েছে। কিন্তু অন্য দিনের মত আজ একটী বারও হাসি-তামাসায় তা'দের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি—এমন কি বিদায়ের পূর্ব্বে দুই প্রিয়-জনের মধ্যে যে করুণ অথচ স্নেহভরা কথার বিনিময় হয়-

তাও হয়নি। যা দু-একটা কথা না বল্‌লে নয় তাই শুধু বলেছে অনীতা। অনীতার আজকের এ শুষ্ক ব্যবহারে নিশীথের মনটা বেশ একটু বিষণ্ণই হ'য়ে পড়েছে। কালকের রাত্রিকালের সে সন্দেহের ছায়া কখন সরে গিয়ে তার জায়গায় একটা উল্টো ধারণাই আজ তার মনে স্থান অধিকার করেছে। মনুষ্য-চরিত্রে অনভিজ্ঞ নিশীথ আজ শুধুই ভাব্‌ছে কতটা ভুল ধারণাই করেছিল সে। বৌদিকে ছাড়তে আজ তা'র এতটা কষ্ট হ'চ্ছে, আর তার বৌদি একবারটীও একটা মিষ্টি কথা পর্য্যন্ত বলছে না তাকে—বলছে না একটী বারও—"নিশীথ ঠাকুরপো, তুমি চলে গেলে বড় খারাপ লাগ্‌বে," কি "তোমার কথা খুব মনে পড়্‌বে"—কিছু না! এতটুকু স্নেহেরও কি যোগ্য নয় সে!—বুকটা তার অভিমানের-ব্যথায় রণিয়ে উঠল।

নিশীথের যাওয়ার সময় হ'য়ে এল। সে পরমেশকে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতে পরমেশ স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বল্লেন—"নিশীথ, আজ তুই চলে যাচ্ছিস—কতটা কষ্ট যে তাতে আমার হ'চ্ছে, তা' আর কি বলব! আমাকে মরণের পথ থেকে যে জীবনের পথে মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেলি কত চেষ্টা কত যত্ন করে—তা আমি যে কটা দিন বেঁচে থাক্‌ব মনে রাখ্‌ব।"

অনীতার ব্যবহারে অভিমান-ক্ষুব্ধ নিশীথের মনটা অল্প-ভাষী পরমেশের স্নেহমাখা এই কটা কথাতেই গলে গেল। সে শুধু বল্লে—"আমি ত—বিশেষ কিছুই করিনি পরমেশদা, বৌদিই করেছেন সব; আমি তাঁর সাহায্য করেছি মাত্র। আচ্ছা তা' হ'লে আসি পরমেশদা—" বলে সে নীচে নেমে এল। তারপর সুটকেশটা আর বিছানাটা নিয়ে সে রান্না-ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। অনীতা তখন রান্নাঘরে বসে উনুনে নূতন করে কয়লা দিচ্ছিল—ধোঁয়াতেই লাল হয়েছিল। নিশীথ এসে ছোট একটী প্রণাম করে বল্লে—"বৌদি, তাহলে চল্লাম ভাই।"

উত্তরে অনীতা শুধু বল্লে—"এস।"

স্নেহ-পাগল নিশীথ ভেবেছিল যে যাওয়ার সময় অন্ততঃপক্ষে তার বৌদি তাকে বলবে যে, আজ তাকে ছেড়ে দিতে তার বড় কষ্ট হচ্ছে; তা না ব'লে একটা ছোট্ট "এস" বলেই চুপ করে রসে রৈল;—তখন আশাহত নিশীথ আর তার বৌদির মুখের পানে ভাল করে মুখ তুলে তাকাতে পারলনা। শুধু একটী ছোট্ট "আচ্ছা" বলে তার প্রকাণ্ড সুটকেশটা আর বিছানাটা তুলে নিয়ে বার হয়ে এল—চোখ দুটী তার তখন অভিমানের ব্যথায় ছল ছল কচ্ছে।

গ্রামের সেই সরু-পথটা ধরে সে ষ্টেশনের দিকে চলেছিল—মনটা তার কেবলি গুমরে গুমরে উঠছিল এই ভেবে যে, সে কি এতটুকু স্নেহ, এতটুকু মিষ্ট ব্যবহারের যোগ্য নয়।—সামনের দিকে দৃষ্টি রেখেই সে চলেছিল—যদি একবারটীও সে পিছন ফিরে তাকাত সেই বাড়ীটার দিকে, যে বাড়ীটা সে এক্ষণি ছেড়ে এসেছে, তাহ'লে তার চোখে পড়্‌ত—সেই বাড়ীটার দোতলার জানালা থেকে দুটী চোখ ব্যাকুলভাবে এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে তা'র দিকে—আর সেই ধোঁয়ায় লাল চোখ দুটী থেকে অশ্রু-বিন্দু টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছে সেই ভাঙ্গা জানালায় উপর—।

এর পরে আরও কিছুদিন চ'লে গেছে কালের গর্ভে।—পরমেশ একেবারে রোগমুক্ত হয়েছেন।—দিন যেমন চলেছিল পরমেশের অসুখের পূর্ব্বে, এখনও তেমনিই চলছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হয় ত পাড়ার লোকে এসে পরমেশের অসুখের কথা উঠলে তা'রা রোজই প্রায় বলে "পরমেশবাবু সেরে উঠবেন না ত উঠবে কে? ঐ-রকম সতী স্ত্রী যার তার কখন কোনও আশঙ্কা থাকতে পারে জীবনের? কি প্রাণপাত করে সেবা! পুরাণে সতী সাবিত্রীর গল্পই পড়েছি; কলিতে সাক্ষাৎ সতী সাবিত্রী দেখলাম।"

অনীতা তখন হয় ত নিশীথ যে ঘরটীতে থাকত, সেই ঘরটীর কোনও জানালায় বসে দূ'রে সেই ঘন বনানীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কাণে ভেসে আসে বাইরের কথা-বার্ত্তা।—শুনে ম্লান হাসি হাসে সে;—মনে মনে ভাবে—সতী! মস্ত বড় সতী বলেই লোকে তাকে জানল।—সামান্য একটা সুটকেশের ধাক্কা কিংবা সামান্য একটা লোকের ডাকের জন্য আজ তার বাইরের সতীত্বটা বজায় থেকে গেল। লোকে বাইরেটাই দেখে, অন্তরটা কেউ দেখে না!

ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়ায়; চোখ দুটীতে হয় ত তার অজ্ঞাতে দুটী বিন্দু অশ্রু এসে টলমল করে;—সামনের সব কিছুর উপর আঁধারের আঁচল বিছিয়ে হয় ত তখন ধরার বুকে সন্ধ্যা নেমে আসে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বপ্ন-রহস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কাম-মূলক মনোভাব

ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ আত্মসর্ব্বস্ব। সেইজন্য তাহারা প্রথমে নিজেদের ভালবাসে, এবং নিজ দেহের উপর কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। পরিণত বয়সে ইহার পরিণাম কিছু উৎকট হইয়া পড়ে।

কিছুকাল আত্ম-তৃপ্তি সাধনের পর বালক-বালিকারা তাহাদের এই অনুরাগ নিজের উপর হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পিতামাতা, ভাই-ভগিনীর উপর স্থাপন করে। বালকরা তাহাদের জননী-ভগিনীর এবং বালিকারা তাহাদের পিতা অথবা ভ্রাতাদের প্রতি অনুরক্ত হয়। এই অগম্য ও অগম্যা নর-নারীর সম্পর্কে মানসিক অভিসার-নিচয়ের নাম দিয়াছেন ফ্রয়ড—Œdipus Complex। Œdipus একজন গ্রীক রাজা। তাঁহার পারিবারিক কলঙ্কমূলক একটি উপাখ্যান হইতে এই নামটি সঙ্কলিত হইয়াছে। এটি হইল ছেলেদের মনোভাব। আর, মেয়েদের মনোভাবের নাম দেওয়া হইয়াছে Electra-Complex। ইহারও সংশ্রবে ঐরূপ একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ফ্রয়ড প্রথম উপাখ্যানটি সোফোক্লেসের (Sophocles) বর্ণনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, রাজা Œdipus তাঁহার জননীর প্রতি 'অনুরক্ত' হইয়া (falling in 'love') তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য নিজের পিতাকে বধ করেন। Beeton's Classical Dictionaryতে Œdipus সংজ্ঞায় দেখিতেছি গল্পটি অন্য রকম। Œdipus শব্দের অর্থ গোদা-পা। রাজপুত্রের এইরূপ নাম হইবার কারণ কি? কারণ এই—Thebesএর রাজা ছিলেন Laius, আর রাণী ছিলেন Creonএর ভগিনী Jocasta। Œdipus ছিলেন ইঁহাদের পুত্র। Laius দৈববাণী (oracle) শুনেন যে, তাঁহার পুত্র তাঁহার প্রাণবধ করিবে। সেইজন্য রাণীর সদ্যোজাত শিশু-সন্তানের পদদ্বয়ে ছিদ্র করিয়া উভয় পদ একত্র বন্ধন করিয়া Mount Cithæron নামক পর্ব্বত-শিখরে নিক্ষেপ করা হয়। শিশুর দুই পা ফুলিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া রাজকুমারের নাম হয় গোদা-পা (Œdipus)। এক রাখাল বালক শিশুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে স্বীয় প্রভু—করিন্থের রাজা Polybusএর কাছে লইয়া যায়। রাজা পোলিবাস কুড়ানো শিশুকে নিজ পুত্ররূপে লালন-পালন করেন। বড় হইয়া এডিপাস ডেলফির মন্দিরে দৈববাণী শুনিতে গমন করেন। দৈববাণীতে তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন গৃহে প্রত্যাগমন না করেন; করিলে তাঁহাকে পিতৃ-বধের পাপ অর্জ্জন করিতে হইবে। এডিপাস জানিতেন পোলিবাস তাঁহার পিতা, এবং এই পালক পিতাকে তিনি ভালও বাসিতেন। পাছে স্নেহময় পিতাকে বধ করিতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নিজ গৃহ করিন্থে না গিয়া ফোসিস নামক স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এডিপাসের আসল পিতা—থিবসের রাজা লেয়াস এই সময়ে রথারোহণে ডেলফির মন্দিরে যাইতেছিলেন। পথের একটা অপ্রশস্ত অংশে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। ইঁহাদের প্রত্যেকেই অপরকে পথ ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করায় উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ উপস্থিত হইল; এই যুদ্ধে লেয়াস নিজ পুত্রহস্তে নিহত হইলেন, দৈববাণী সফল হইল। লেয়াসের অপর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধী ক্রিয়োন উত্তরাধিকারী হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, যে-কেহ স্ফিঙ্‌সের সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে, তাহাকে থিবসের সিংহাসন অর্পণ করা হইবে এবং রাণী জোকাষ্টার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইবে। এই ঘোষণা-বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া এডিপাস থিবসে গমন করিলেন, এবং সমস্যার সমাধান করিয়া দেওয়ায় রাজ্যলাভ করিলেন, রাণীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহও হইল। এই রাণীর গর্ভে তাঁহার চারিটি সন্তান জন্মিল। কিছু কাল পরে থিব্‌স্ নগরে প্লেগের মড়ক উপস্থিত হইল। তখন দৈববাণী হইল যে, রাজা লেয়াসের হত্যাকারীকে থিব্‌স্ হইতে নির্ব্বাসিত করিলে তবে মড়ক থামিবে। যে রাখাল পর্ব্বত-শিখরে পরিত্যক্ত সদ্যোজাত শিশুকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই রাখালই রাজা লেয়াসের হত্যাকারীকে আবিষ্কার করিল, এবং রাজার আত্মজ বলিয়া সনাক্ত করিল। দৈবদৃষ্টিসম্পন্ন টাইরেসিয়াসও এই আবিষ্ক্রিয়ার সমর্থন করিল। রাণী জোকাষ্টা যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারই পূর্ব্বজাত পুত্র তাঁহার বর্ত্তমান স্বামী, এবং এই পুত্রেরই ঔরসে তিনি চারিটি সন্তানের জননী হইয়াছেন, তখন ঘৃণায়, দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া জোকাষ্টা গলায় ফাঁসী দিয়া আত্মহত্যা করিলেন। এডিপাসও যখন জানিতে পারিলেন যে, তিনি নিজের পিতৃহন্তা, এবং নিজের মাতৃহরণকারী, তখন তাঁহারও ঘৃণা-দুঃখ কম হইল না। আত্ম-গ্লানিতে অধীর হইয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি নিজের চক্ষুর্দ্বয় উপড়াইয়া ফেলিলেন, এবং স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিলেন।

সোফোক্লেসের বিবরণটি কিরূপ তাহা জানি না; কিন্তু এই গল্পে দেখিতেছি, এডিপাস তাঁহার জননীর প্রতি 'অনুরক্ত' হইয়া জোকাষ্টাকে 'মা বলিয়া জানিয়া' তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই, কিম্বা জানিয়া শুনিয়া নিজ জননীকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য লেয়াসকে তাঁহার পিতা বলিয়া জানিয়া বধ করেন নাই। তিনি একটা সমস্যার সমাধান

করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার নিজেরই পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই দেশের রাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বরং শেষে যখন তিনি এবং তাঁহার জননী জোকাষ্টা জানিতে পারিলেন যে, একজন জননী এবং অপর তাঁহার পুত্র, তখন উভয়েই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত অগম্যা-গমন-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন—একজন আত্মহত্যা করিয়া এবং অপর জন নিজ চক্ষুরুৎপাটন করিয়া ও স্বেচ্ছায় আত্ম-নির্বাসন করিয়া। এই ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া Œdipus-Compelx নামক একটা বৈজ্ঞানিক থিওরী গঠন করা ফ্রয়েডের পক্ষে কতটা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এরূপ একটা অবৈধ ব্যাপারের সংস্রবে এমন একটা থিওরী গঠনের পূর্ব্বে ইহার সমর্থনসূচক আরও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করা ফ্রয়েডের পক্ষে উচিত ছিল বলিয়া মনে হয়, যে, পরস্পরের জ্ঞাতসারে মাতা-পুত্রের মধ্যে প্রেম এবং সংসর্গ ঘটিয়াছে। আর সেই প্রমাণ কল্পিত উপন্যাস না হইয়া প্রত্যক্ষ ও সত্য ঘটনা মূলক হওয়া উচিত। আমাদের দেশে এরূপ দুর্ঘটনা বাস্তব জগতে কল্পনাতীত ব্যাপার; এবং যদিই বা পরস্পরের অজ্ঞাতসারে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া যায়, এমন কি বিমাতা ও সপত্নীপুত্রের মধ্যে ঘটিলেও, তাহা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হয়; এবং তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—তুষানল।

Becton's Classical Dictionaryতে Elcctraর ব্যাপারটা এইরূপ—ইলেক্‌ট্রা রাজা আগামেমননের কন্যা। রাজা আগামেমনন ট্রয়-যুদ্ধজেতা বীর। তিনি ছিলেন মাইসিনি ও আর্গোসের রাজা। তাঁহার রাণীর নাম ক্লাইটেমনেষ্ট্রা। আগামেমনন ট্রয় হইতে ফিরিয়া আসিলে রাণী ক্লাইটেমনেষ্ট্রা তাঁহার উপপতি ইজিস্থাসের সাহায্যে আগামেমননকে হত্যা করেন। ইলেকট্রা আগামেমননের পুত্র তাঁহার ভ্রাতা ওরেষ্টেসকে উত্তেজিত করিয়া ভ্রাতার দ্বারা স্বামীঘাতিনী তাঁহাদের জননী ক্লাইটেমনেষ্ট্রার বধসাধন করাইয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রেও দেখিতেছি, ইলেক্‌ট্রা যে তাহার পিতার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ছিল এমন কোন কথা নাই। স্নেহময় পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়াস কন্যার পক্ষে এমন কি অস্বাভাবিক ব্যাপার তাহাও বুঝা যায় না।

ফ্রয়েডের ধারণা, স্নায়ুঘটিত পীড়া মাত্রেরই মূলে এই দুইটি কম্‌প্লেক্সের (মনোভাবের) একটি না একটি আছেই; এবং এই জন্যই অন্যান্য পণ্ডিতরা তাঁহার মতের বিরোধী। ফ্রয়েড প্রথমে বলিতেন, তরুণ বয়সে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে মানসিক বিপর্য্যয় সংঘটনের (অর্থাৎ কোনরূপ ব্যর্থ-প্রেমের) ফলে পরবর্ত্তী জীবনে স্নায়বিক বিকার জন্মে। পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তিনি বলিতে থাকেন যে, বংশানুক্রমিক কামপরতন্ত্রতা, শিশুসুলভ যৌনপ্রচেষ্টা, ইন্দ্রিয় সেবায় অতৃপ্তি, কিম্বা অতিমাত্র ইন্দ্রিয়-চর্চা—এইরূপ কোন না কোন কারণে ঐ রোগ ঘটিয়া থাকে। ফ্রয়েডের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক মত এই যে, যৌন-জীবন অস্বাভাবিক না হইলে প্রকৃত পক্ষে স্নায়বিক বিকার রোগ জন্মিতে পারে না। কিন্তু আধুনিক খাদ্যতত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকরা বলিতেছেন, খাদ্যে "বি" ভাইটামিনের অভাবই স্নায়বিক রোগের কারণ।

এ বিষয়ে ফ্রয়েডের যুক্তির ধারা কতকটা এইরূপ—শিশুর সকল অভাব-অভিযোগ মিটাইবার সর্ব্বপ্রধান পাত্রী—জননী। এই কারণে স্বভাবতই জননী পুত্রের প্রথম ভালবাসার পাত্রী। পুত্র জননীর কাছ হইতে সেবা পাইবার একচেটিয়া অধিকার পাইতে ইচ্ছুক। জননীর নিকট পিতার উপস্থিতি সে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতির ন্যায় দেখে এবং ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করে। সে মায়ের কাছে শুইতে চায়। শয়নের পূর্ব্বে মা যখন বস্ত্র পরিত্যাগ করেন, তখন সে তাহা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করে; মায়ের গোপনীয় আচরণগুলির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল সদা-জাগ্রত। সময়ে সময়ে সে মায়ের সহিত সহবাস করিবার জন্য শিশু-সুলভ চেষ্টা করে। সময়ে সময়ে মাতার পরিবর্ত্তে ভগিনী শিশুর অবৈধ আকর্ষণের পাত্রী হইয়া উঠে। ফ্রয়েড বিবেচনা করেন, বালকের প্রথম প্রণয়-পাত্রী নির্ব্বাচন সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র অবৈধ ভাবে ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রমাণস্বরূপ ফ্রয়েড বন্য অসভ্য সমাজের রীতি-নীতি ও আইন-কানুনের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, মাতা-পুত্রের বা পিতা-পুত্রীর অবৈধ যৌন-সম্মিলন সংরোধের জন্য অসভ্য বন্য সমাজে অসংখ্য আইন ও বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে! স্বভাবতঃ যৌন-সম্মিলনের কামনা পরিবারের বহির্ভূত ব্যক্তিগণের উপর অর্পিত হয়; আর বাহিরের লোকের সঙ্গে "প্রেমে পড়া"র পরিণামে আদর্শ বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে।

কিন্তু ফ্রয়েডের এই যুক্তি কতদূর বিচারসহ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। ফ্রয়েড বিশেষ করিয়া মায়ের প্রতি ছেলের ভাব কিরূপ তাহাই বলিয়াছেন—মেয়ের কথা বলেন নাই। কিন্তু মায়ের প্রতি মেয়ের ভাবও কি ঠিক সেই রকমই নহে? ছেলে যেমন তাহার সকল অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য মায়ের কাছে ছুটিয়া আসে, মেয়েও কি ঠিক সেইভাবেই আসে না? ছেলে যেমন মায়ের উপর একাধিপত্যের দাবী করে, মেয়েও কি ঠিক তাহাই করে না? ফ্রয়েড যুক্তি দিতেছেন, মায়ের নিকট পিতার উপস্থিতি ছেলে প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্ষে দেখিয়া থাকে, মেয়ে তাহা পারে না, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। ফ্রয়েডের যুক্তির অনুমোদন করিতে গেলে বলিতে হয়, পিতা-মাতা যখন একত্র অবস্থিতি করেন, তখন মেয়ের পক্ষে মাতাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসাবে দেখিবার কথা। কিন্তু বস্তুতঃ মেয়ে তাহা করে না। পিতার উপস্থিতির দরুণ মাতার উপর মেয়ের একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম দেখিলে মেয়েও পিতার উপস্থিতিতে রাগ প্রকাশ করে—যদিও সে পিতাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখিতে পারে না, এবং মাতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে দেখে না। ফ্রয়েডের যুক্তি অনুযায়ী মাতার প্রতি ছেলের ভাব যেরূপ, পিতার প্রতি মেয়েরও সেই ভাব হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা হয় না। ভাইএর ন্যায় বোনও মা বলিয়াই কাঁদে, মাকেই ডাকে, অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য মায়েরই কাছে আসে—বাবা বলিয়া কাঁদেও না, বাবাকে ডাকেও না, অভাব-অভিযোগের কথাও বাবাকে জানাইতে যায় না। অতি-শিশু দুই ভাই-বোন মায়ের উপর একাধিপত্য লাভের জন্য, মাকে একলা দখল করিবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া, মারামারিও করে।

মাকে ছেলেও যেমন ভালবাসে, মেয়েও ঠিক তেমনি ভালবাসে। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে মেয়েও ছেলের ন্যায় মাকে অবৈধ প্রণয়পাত্রী বলিয়া মনে করে? এরূপ যুক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করা কঠিন। আমরা ত একেবারেই অসমর্থ। বোধ হয় এই কারণেই ফ্রয়ডের সহযোগী মনোবৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার থিয়োরীর বিরোধী। ফ্রয়ড 'এডিপ্‌সাস কমপ্লেক্সে'র উপর অত্যন্ত বেশী পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন; এমন কি তিনি যে নূতন মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার মূল ভিত্তিই এই। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার যুক্তি অতি দুর্ব্বল; কাজেই তাঁহার বিচার প্রণালীর মধ্যে এডিপাস কমপ্লেক্সই দুর্ব্বলতম অংশ। তাঁহার মনো-বিশ্লেষণ প্রণালীর যাঁহারা অনুমোদন করেন, তাঁহারাও বিবেচনা করেন যে, ফ্রয়ডের 'এডিপাস-কমপ্লেক্সে'র কল্পনা অতিরঞ্জিত, ভিত্তিহীন।

অবৈধ সঙ্গমেচ্ছা নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। উহা কেবল বিকারগ্রস্ত মানসিক অবস্থাতেই সম্ভব। সুস্থ চিত্তে মানুষ ইহার কল্পনা করিতে পারে না। পৃথিবীর সকল সমাজেই এই প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং বিশ্বের সমগ্র জনসাধারণই ইহাকে ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। যেখানেই এই সাধারণ ধারণার বিপরীত ভাব দেখা যায়, সেইখানেই উহা অস্বাভাবিক মনোভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে,— জানিতে হইবে, লোকটিকে সুস্থ দেখাইলেও, সে বাস্তবিক সুস্থ ও স্বস্থ নহে। হয় তাহার মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত, না হয়, তাহার মানসিক অবস্থা বিকৃত, আর, না হয়, তাহার স্নায়ুমণ্ডলী পীড়িত। পিতা-মাতার সহিত সন্তানগণের অবৈধ যৌন সম্বন্ধ বিশেষভাবে মানব-সমাজে ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ।

ফ্রয়ডও স্বীকার করেন যে, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা স্বাভাবিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন নহে—তাহাদের অবস্থাকে অস্বাভাবিক অবস্থা বলিতেই হইবে। তাহারা স্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার সুযোগলাভ করিয়াও তাহাতে সন্তোষলাভ করিতে না পারিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই অস্বাভাবিক মানসিক অভিসারে লিপ্ত হয়—যত উদ্ভট কল্পনা তাহাদের মনে উদিত হয়।

ফ্রয়ড মানুষের মনের দুইটি ক্রিয়ার কল্পনা করিয়াছেন—(১) ভোগেচ্ছা,—Pleasure principle ও (২) বাস্তবতা, সতর্কতা—Reality principle। মানুষ মাত্রেরই মনে এই দুইটি ভাবের একটি না একটি প্রবল। প্রথম শ্রেণীর লোকরা কেবল সুখ ভোগ করিতে চায়। নিজের কামনা পূরণের জন্য তাহারা কোন বাধা-বিঘ্ন মানে না, অপর লোকের সুবিধা অসুবিধা গ্রাহ্য করে না—কেবল নিজেদের সুখটুকু হইলেই হইল। ইহারা পূর্ণমাত্রায়ই স্বার্থ সর্ব্বস্ব। ইহারা কল্পনাপ্রবণ—আকাশ-কুসুম রচনায় সিদ্ধহস্ত। বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে যাহা দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য—যাহা লাভ করা অসম্ভব, সেই সকল অবাস্তব অসম্ভব সুখ ভোগের দিবা-স্বপ্ন ইহারা দেখিয়া থাকে। বাস্তব জীবনে যাহার অভাব, ইহারা কল্পনায় তাহার অভাব পূরণ করিয়া লয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকরা বৃথা কল্পনায় মানসিক শক্তি হ্রাস করিবার বিরোধী। তাহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে যে সকল বাধা-বিঘ্ন থাকে, ইহারা তাহা খতাইয়া দেখে, সেই সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে; এবং যতটুকু পারে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাস্তব কার্য্য-ক্ষেত্রে যাহা লাভ করিতে পারে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। প্রথম মনোভাবটি ফলাফলের অপেক্ষা না রাখিয়া মানুষকে সুখ ভোগের প্রবৃত্তি দান করে। আর দ্বিতীয় প্রকার মনোভাব ফলাফলের কথা চিন্তা করিয়া অসঙ্গত কামনা সংযত করিবার প্রবৃত্তি দেয়।

ফ্রয়ডের এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। বিশ্বের কর্ম্মক্ষেত্রে ইহার দৃষ্টান্ত নিয়তই দেখা যায়। ইহাকে কতকটা আমাদের অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এমন অনেক লোক আছে যাহারা ফলাফলের কথা চিন্তা না করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে—লাগে তুক্ না লাগে তাক্। ইহারা হয় সফলতা লাভ করে, না হয়, সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া মরে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বড় বড় বিশ্বজয়ী বীরের এইরূপ মনোভাব দেখা গিয়াছে। আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যদি এক পদ অগ্রসর হয়, ত, দশ পদ পশ্চাৎগামী হয়। ইহারা খুব বড় কাজ বেশী করিতে পারে না, তবে একেবারে পতনও ইহাদের হয় না। সংসারের অধিকাংশ লোকই এই শ্রেণীর। ইহারা অতি-ভোগ-পরায়ণও নয়, আবার অতি-দুঃখীও নয়।

মধুর অভাবে গুড়ে সন্তুষ্ট থাকিবার ক্রিয়া এই বিশ্ব সংসারে অহরহঃ চলিতেছে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। সঙ্গত হউক অসঙ্গত হউক, মানুষ অনেক আশা করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কয়টা আশা পূর্ণ হয়? প্রথমতঃ, অসঙ্গত আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই। দ্বিতীয়তঃ, আশার শেষ না থাকিলেও, তাহা মিটাইবার ক্ষমতা আমাদের সীমাবদ্ধ। তৃতীয়তঃ, ক্ষমতা থাকিলেও, আশা পূর্ণ হওয়ার পথের সম্মুখে বাধা-বিঘ্নের হিমালয় দণ্ডায়মান। তাহা অতিক্রম করিয়া কয়টা আশা পূর্ণ হইতে পারে? অতএব বাস্তব জগতে নানা কারণে মানুষের অনেক আশা পূর্ণ হইতে পারে না। তাই বলিয়া কি মানুষ আশা করিতে বিরত হয়? কিন্তু যে আশা পূর্ণ হইবার নয় এরূপ বৃথা আশা করিয়া লাভ কি? লাভ কিছুই নাই, তবু মানুষ আশা করিতে ছাড়ে না। এবং বাস্তব জগতে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি না ঘটিলেও, কল্পনায়, স্বপ্নে মানুষ প্রাণ ভরিয়া আশা মিটাইয়া লয়। কায়ার অভাবে ছায়া লইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়—ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া সে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।

উদ্ভট কল্পনার খেয়ালে শৈশব কাল হইতেই মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দিবা-স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করে। বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য লাভের কল্পনা প্রায় জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে মানব-চিত্তে স্থান লাভ করে। সদ্যোজাত শিশু কোন অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলে কাঁদিয়া উঠে। অবলা শিশুর অভাব অভিযোগ জানাইবার একমাত্র উপায়—তাহার কান্না। মা কিম্বা অন্য কেহ শিশুর কান্না শুনিলেই ছুটিয়া আসে। দুই একবার এইরূপ আসিবার পর শিশু তাহার ক্রন্দনের শক্তি, তথা, তাহার নিজের শক্তির কথা জানিতে ও বুঝিতে পারে। তখন হইতেই শিশু এই শিক্ষা লাভ করে যে, তাহার ক্রন্দন উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

সে ক্রন্দন করিলে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য কাহাকেও না কাহাকেও তাহার কাছে আসিতেই হইবে। মা কিম্বা দাস-দাসী কাহাকেও ডাকিতে হইলেই শিশু কাঁদিয়া উঠিবে। কেবল ক্রন্দন নহে; হাত-পা নাড়িয়াও শিশু তাহার অভাব জানায়, মাকে কিম্বা ধাত্রী প্রভৃতিকে আহ্বান করে। একজন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত শিশুর এই অবস্থাকে সর্ব্ব-শক্তিমান অবস্থা বলিয়াছেন—এবং ঠিক কথাই বলিয়াছেন। যে যে বিষয়ে শিশুর স্বার্থ আছে সেই—খাদ্য, আরাম, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে শিশু যে সর্ব্ব-শক্তিমান তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

শিশু যতটুকু অনুভব করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধেই তাহার যাহা কিছু জ্ঞান জন্মায়। সেই জ্ঞানটুকুর সাহায্যে সে অনুমান ও কল্পনা করে যে, সমগ্র বিশ্বটা একমাত্র তাহারই—সে দয়া করিয়া তাহা গ্রহণও করিতে পারে, দয়া করিয়া বর্জ্জনও করিতে পারে। শিশুর যদি অনুগ্রহ হইল তবে হাতের কাছে আসিয়া পড়া জিনিসটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া জানাইয়া দিল যে তাহার অনুগ্রহের সীমা নাই—সে জিনিসটি গ্রাহ্য করিয়াছে। আর নহে ত সে বস্তুটি গ্রহণ করিল না, অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া দিল। এই ঘোর স্বার্থপর শিশুর এই অঙ্গ-চালনা তাহার ভাবী জীবনের পূর্ব্ব-সূচনা। স্বেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় এই শিশু উৎপীড়ক তাহার নিজের আরাম, সুখ, সুবিধা ব্যতীত অপর কাহারও কোনও অধিকারই স্বীকার করে না। শিশুর প্রধান লোভ খাদ্য দ্রব্যের উপর। তাই তাহার নাগালের মধ্যে যাহা কিছু আসিয়া পড়ে তাহাই সে মুখে পুরিয়া দেয়। ধৃত বস্তুটি যদি খাদ্য নাও হয় তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়—সাধ্য হইলে লালারস-সিক্ত করিয়া সে তাহা উদরস্থ করিবার চেষ্টা করে, আর অপরাগ হইলে বর্জ্জন করে কিম্বা কাঁদে। খাট, পালঙ্ক, বাক্স, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি টানিয়া নিজের কাছে আনিতে না পারিলে নিজেকেই উহাদের কাছে টানিয়া লইয়া যায়, এবং লেহন করিয়া উহাদের আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করে। এইরূপে প্রথমে বস্তুতান্ত্রিক ভাবে শিশুর একচ্ছত্র অধিকার পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও অপরের প্রশংসা লাভ করিয়া শিশু মানসিক আনন্দ লাভের খোরাক সংগ্রহ করে। শিশুর প্রত্যেক কাজেই বাড়ীর লোকরা অজস্র বাহবা দিয়া থাকে। শিশুও নিজের ক্ষমতা ও বাহাদুরী দেখিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়া উঠে। অবশেষে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধিকার খর্ব্ব হইয়া আসিতে থাকে। পিতা মাতার বিরক্তি ভাব, জ্যেষ্ঠতর ভাই-বোনের প্রভুত্ব ক্রমে তাহাকে তাহার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধ করাইয়া দেয়। ইহার পর শিশু (তিন বৎসর বয়স হইতে) সখ্য ভাবের ভাবুক হয়—নিজ সমবয়স্ক অন্য শিশুর সহিত সখ্য স্থাপন করে। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থায় (প্রায় দশ বৎসর বয়স হইতে) শিশুর মনে দল বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। আর আন্দাজ বৎসর পনেরো বয়সের সময়—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ হইতে যৌন ক্ষুধা জাগ্রত হয়—হঠাৎ একদিন পৃথিবী তাহার চক্ষে সুন্দর লাগে—সমগ্র বিশ্ব-জগৎ নূতন ও মনোহর রূপ ধারণ করে—পুরুষের পক্ষে স্ত্রী সঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ সঙ্গ স্পৃহনীয় হইয়া উঠে। তখন কবির ভাষায় বলা যায়—

"যে দিন সে প্রথম দেখিনু,—
সে তখন প্রথম যৌবন,—
প্রথম জীবন-পথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন!"

তখন যাহার নয়নের সহিত যাহার নয়ন বাঁধিয়া যায়, তাহাদেরই পরস্পরের প্রতি সকল চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়। এই বৃত্তিকে অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্ জাতির ধারা বজায় রাখা বা বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি বলিয়া মনে করেন। আবার অনেকে এই সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত ধারণা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এই যৌন-স্পৃহার মূলে বংশরক্ষার কোন কামনাই জাগে না—ইহা সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা মাত্র। সাধারণতঃ ইহাকে 'প্রেমে পড়া' বলা হয়। প্রেমে পড়িলে প্রেমাস্পদকে সকল গুণের আধার—আদর্শ সঙ্গী বা সঙ্গিনী বলিয়া মনে হয়। এই সকল গুণের আদর্শ প্রেমাস্পদে থাকুক আর নাই থাকুক, প্রেমিক বা প্রেমিকার চিত্তে থাকেই (যেমন, কথিত আছে, সৌন্দর্য্য থাকে দ্রষ্টার চক্ষে—দৃষ্ট পদার্থে নহে। সেই জন্য একই পদার্থকে কেহ সুন্দর দেখে, কেহ তাহাতে লেশ মাত্র সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পায় না)। প্রেমিকের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্ব-জগতের সকল সৌন্দর্য্য প্রেমাস্পদে কেন্দ্রীভূত হয়।

ইহা হইল সাধারণ মনস্তাত্ত্বিকদিগের মত। ফ্রয়ড এবং তাঁহার শিষ্য-বৃন্দ কিন্তু মনে করেন, যৌবনোন্মেষের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে—অতি শৈশব অবস্থা হইতে যৌন-স্পৃহা জাগ্রত হয়। তাঁহারা এই যৌন ক্ষুধার চারিটি অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন—(১) অবৈধ অবস্থা (পিতা মাতা বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত ভ্রাতা, ভগিনী ইত্যাদি; the Incestuous stage); (২) অহং অবস্থা (নিজে-নিজেই অভিসার; The Narcissistic stage); (৩) সম শ্রেণীর সহচরঘটিত অবস্থা; The Homo-sexual stage); আর বিপরীত শ্রেণীর অর্থাৎ স্ত্রীজাতির পক্ষে পুরুষ এবং পুং জাতির পক্ষে স্ত্রী-ঘটিত অবস্থা; the Hetero-sexual stage)। ফ্রয়ড বলেন, হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ আর কিছু নয়—শৈশবে যাহা ছিল বাস্তব, এবং পরে যাহা চাপা ছিল, প্রকারান্তরে সেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টা মাত্র।

ফ্রয়ডের দেশে, অর্থাৎ, ইয়োরোপে, কামনা দমন করিতে বাধ্য হওয়ায় মেয়েদের স্নায়ুঘটিত রোগ জন্মে। লক্ষ লক্ষ নারী কামনা দমন করিতে বাধ্য হয়; কারণ, তাহাদের যোগ্য, সমর্থ পতি মিলে না। স্বামীর অযোগ্যতার দরুণ অনেক নারী স্বামী সহবাসে অনুরাগ বিহীনা (frigid) হইয়া পড়ে। তাহাদের এই অনাগ্রহ (Frigidity) ক্রমশঃ অভ্যাসে রূপান্তরিত হইয়া প্রকারান্তরে কামনা দমনে সাহায্য করে। এই কারণে ইহারাই কথায় কথায় এত হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। তাহার উপর, সমাজ আছে। আমাদের দেশের ন্যায় এতটা কঠোর না হউক সমাজ-শাসন ইয়োরোপে একেবারে যে নাই তাহা নয়। আর, আমাদের এখানে যেমন, ইয়োরোপেও তেমনি, সমাজ-শাসনের চাপটা মেয়েদের উপর যতটা পড়ে, পুরুষদের উপর ততটা নহে। কাজেই পুরুষরা তাহাদের কামনা তৃপ্তির যতটা সুযোগ পায়, ভদ্রঘরের মেয়েরা তাহা পায় না।

এই জন্য হিষ্টিরিয়া রোগ মেয়েদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। ফ্রয়ডপন্থীরা স্থির করিয়াছেন, কাম দমন করিতে বাধ্য হওয়াই সম্ভবতঃ নারীদের স্নায়বিক বিকারের প্রধান কারণ।

নব্য মনোবৈজ্ঞানিকগণ মনো-বিশ্লেষণ প্রণালীর সাহায্যে কি ভাবে মানব-মনের তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, অতি সংক্ষেপে তাহার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল। এইবার, তাঁহারা কোন্ পদ্ধতিতে স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করা যাউক।

আমাদের এই যে দেহযন্ত্রটি, এটি কোটী কোটী কোষাণুর সমষ্টি। তাই বলিয়া এই জীবকোষাণুগুলি পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া অবস্থিত নহে। এগুলি কতকগুলি করিয়া এক একটী খণ্ডে বিভক্ত, এবং বেশ সুপ্রণালী-বদ্ধ ভাবে অবস্থিত। এক একটি খণ্ডের এক একটি বিশেষ কার্য্য আছে, এবং বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

মস্তিষ্ক এইরূপ একটি খণ্ড। ইহার আবার কয়েকটি অংশ আছে। সেইগুলিও অসংখ্য জীবকোষাণু দ্বারা গঠিত। এই এক একটি অংশের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য আছে। কোনটার দ্বারা অনুভূতি জন্মে, কোনটা স্মরণ-শক্তি, কোনটা চিন্তা, কোনটা ইচ্ছাশক্তির আশ্রয়।

প্রতীচ্য মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতরা মন এবং আত্মাকে (mind or soul) একই বস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ মন ও আত্মা একই বস্তু কি না তাহা বিচার্য্য বিষয় ; কিন্তু সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা তাঁহাদের মতই যখন ব্যক্ত করিতেছি, তখন ধরিয়া লইলাম, মন ও আত্মা একই বস্তু। মন এবং আত্মার কার্য্য মিশ্র। মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য মন বা আত্মার আশ্রয়ে বা মধ্যবর্ত্তিতায় দেহের অবশিষ্ট অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট।

যে সকল মাংসপেশী আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে, আমরা যখন নিদ্রা যাই, তখন ঐ সকল মাংসপেশী বিশ্রাম উপভোগ করে। কিন্তু দেহের অন্যান্য জীবকোষাণুগুলি তখনও কার্য্যে বিরত হয় না। জাগ্রত অবস্থায় কর্ম্ম করিবার সময় যে সকল টিসু (তন্তু) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল জীবকোষাণু তাহাদের ক্ষয় সংশোধন করে। হৃদয়, ফুসফুস, পাকযন্ত্র প্রভৃতি নিদ্রিত অবস্থায়ও কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তবে তখন তাহারা মৃদুভাবে কার্য্য করে। নিদ্রাকালে মস্তিষ্ক বিশ্রাম করে বটে, কিন্তু পূর্ণ বিশ্রাম লাভ তাহার অদৃষ্টে ঘটে না—তাহার কিয়দংশকে নিদ্রাবস্থাতেও নৈশ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের অবস্থা এইরূপ ; কিন্তু কি জাগ্রত, কি নিদ্রিত, অবস্থায়, মন কখনও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। সুস্থদেহ ব্যক্তি যখন জাগ্রত থাকে, তখন দেহের অনেক কার্য্য তাহার অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হয়। মনের কার্য্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে।

মানুষের অজ্ঞাতসারে তাহার দেহের এবং মনের যে কার্য্য চলে, সে অবস্থাটা কি রকম? একটা দৃষ্টান্ত লইয়া কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

মেরু সন্নিহিত সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে গেলে দেখা যায়, নানা আকারের ও বিভিন্ন আয়তনের হিমশিলা (ice berg) সকল রাজহংস, নৌকা কিম্বা জাহাজের ন্যায় সমুদ্র বক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন হিমশিলা পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ এবং আয়তনেও অতি বৃহৎ। জলের উপরি-ভাগে হিমশিলাগুলির যতখানি জাগিয়া থাকে, তাহার আয়তন এত বৃহৎ যে দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। কিন্তু যখন, তাহাদের কতখানি অংশ সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়া আছে, তাহা জানিতে পারা যায়, তখন বিস্ময়ের মাত্রা সীমা অতিক্রম করে। হিমশিলার যতখানি জলের উপর জাগিয়া থাকিয়া মনুষ্যের নয়ন-গোচর হয়, তাহার প্রায় দশ-বারো গুণ অধিক অংশ জলের ভিতর অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করে।

মানুষের মনকে মানসিক সমুদ্র বলা যাইতে পারে। আমাদের জ্ঞাতসারে যে সকল ভাব, ধারণা ও স্মৃতি জাগিয়া থাকে, তাহাদের কথাই কেবল আমরা জানি। কিন্তু আমাদের মানস-চক্ষুর অগোচরে এমন অনেক ভাব, ধারণা ও স্মৃতি লুক্কায়িত থাকে, যাহাদের বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানিতে পারি না।

নূতন যে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনের তিনটি অবস্থা কল্পিত হইয়াছে—(১) জাগ্রত, (২) অর্দ্ধ-জাগ্রত ও (৩) সুপ্ত অবস্থা। জাগ্রত (অর্থাৎ conscious) মনের কার্য্যগুলি আমাদের প্রায়ই জানা থাকে। অর্দ্ধ জাগ্রত মনে অনতিকাল পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত ঘটনা সকলের চিত্র থাকে, যাহাদের কথা আমরা ইচ্ছা করিলেই জানিতে বা স্মরণ করিতে পারি, তবে উপস্থিত সেগুলা আমরা স্মরণ করিতেছি না। আর সুপ্ত অবস্থায় মনের ভিতর এমন সকল গুপ্ত স্মৃতি, বিস্মৃত অভিজ্ঞতা বা চাপিয়া রাখা কামনা সকল বিরাজ করে, যাহাদের সম্বন্ধে উপস্থিত আমাদের কোন জ্ঞান বা ধারণা নাই।

মনের এই অবস্থা ও ব্যবস্থা অনেকটা আমাদের ঘরকন্নার ব্যবস্থার মত। গৃহস্থালীতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জিনিসগুলি হাতের কাছে মজুত থাকে। কতকগুলি জিনিস বাক্স, সিন্দুক, তোরঙ্গইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এগুলি সর্ব্বদা দরকার না হইলেও, মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হইয়া থাকে ; দরকার হইলে তাহা বাহির করিয়া লওয়া হয়। আর একটা ঘরে এমন কতকগুলা জিনিস বিশৃঙ্খল ভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়, যেগুলা প্রায় দরকার হয় না। এবং তাহাদের কথা লোকে ভুলিয়া যায়। তার মধ্যে যদি কোনটা কালে-ভদ্রে আবশ্যক হয়, তবে ঘর খুলিয়া সেই জিনিসটা অনেক অনুসন্ধানের পর বাহির করা হয়। এবং সেই সঙ্গে অন্য অনেক জিনিস বাহির হয় যাহার কথা বাড়ীর লোকরা ভুলিয়াই গিয়াছিল। মনের এই বিস্মৃতি-কক্ষে আমাদের অনেক পুরাতন কথা, অনেক অতীত ঘটনা সঞ্চিত থাকে। কালে ভদ্রে যখন অতীত কোন প্রসঙ্গ আলোচনার বিষয় হয়, তখন বিস্মৃতি কক্ষ হইতে সেই প্রসঙ্গ টানিয়া বাহির করা হয়, এবং সেই সঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট আরও অনেক পুরাতন কথা মনে পড়ে। আমাদের বাল্য-লীলার ব্যাপার, জীবনের অতি আদিম কালের সংস্কার, শৈশবসুলভ ভাব, বালকোচিত বাসনা, লোভ, নিষ্ঠুরতা, অশ্লীল আচরণ—এই সব আমাদের সেই বিস্মৃতি কক্ষের সঞ্চয়। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, আইন-কানুন এবং আমাদের

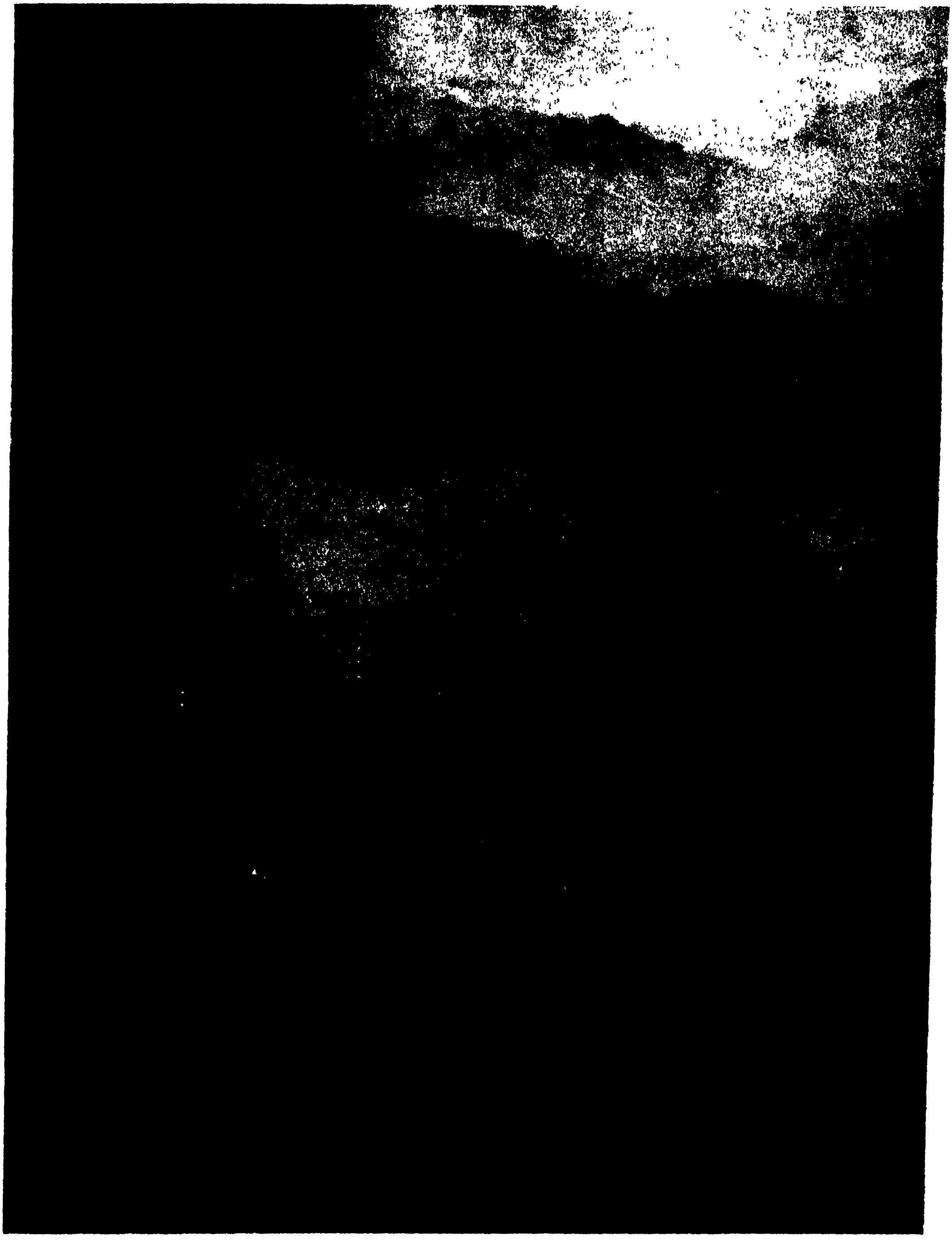
আত্মসম্মান-বোধ, লজ্জা, কুণ্ঠা প্রভৃতির প্রভাবে ঐ সকল ব্যাপার বিস্মৃতি-কক্ষে চাপা থাকে। নব্য মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহাকেই বলা হয় "unconscious" বা অজ্ঞাত অবস্থা। এই বিস্মৃতি ভাণ্ডারের সঞ্চয়ের মধ্যে আছে আমাদের সুখ ভোগের লালসা, আমাদের অনেক অসম্ভব ও অসঙ্গত কামনা, বাস্তব জীবনে নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ অনেক কাজ করিবার ইচ্ছা, এমন কি, যে সকল কাজ করা সম্ভব, নীতিসঙ্গত এবং করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য এরূপ অনেক কাজ করিবার অভিপ্রায়ও। কিন্তু অবস্থার গতিকে এই সমুদায় অভিপ্রায়কে চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে এমন সমস্ত বিষয়ও থাকিতে পারে, যাহার কথা মনে হইলে নিজের কাছেও লজ্জার সীমা থাকে না। সে সব কথা মনে পড়িলেও লজ্জা বোধ হয়। কাজেই সেগুলি যাহাতে মনে না পড়ে, যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থাই করিতে হয়। কিন্তু ভুলিব মনে করিলেই ত ভোলা যায় না। সেগুলি চাপা থাকে মাত্র। আর যদি ভুলিয়াই যাওয়া যায়, তথাপি, তাহা মনের ভিতর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া মনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। কারণ, এই অজ্ঞাত ইচ্ছাগুলি বাহিরে প্রকাশ করা অবাঞ্ছনীয় বলিয়া অস্বাভাবিক ও বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়। কোন একটা বিষয়ে অসঙ্গত জেদ, ভূতাবেশ, ভ্রান্ত ধারণা, অস্তিত্বহীন বস্তুর অনুভূতি প্রভৃতি ইহার বাহ্য লক্ষণ। আবিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেরাও মনে করে যে তাহারা কোন সর্বশক্তিমান দেবযোনি, ভিন্ন জগৎ হইতে তাহারা মর্ত্ত্যে আসিয়াছে, তাহাদের মৃত্যু নাই, তাহারা এই মর জগতের জরা-মরণশীল জীবরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিতেছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ রোজা আনাইয়া মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে ঝাড় ফুক করাইয়া এই শ্রেণীর রোগীদের নিরাময় করিবার চেষ্টা করা হয়। প্রতীচ্য দেশে মনো-বৈজ্ঞানিকগণ রোগীর মনোবিশ্লেষণ করিয়া রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া রোগীকে নিরাময় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। রোগীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার এই রোগ হইল কেন, তাহা হইলে সে তাহার একটা সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিবে; কিন্তু ইহা কাল্পনিক যুক্তি। প্রকৃত কারণ তাহার অজ্ঞাত। তাহার অজ্ঞতা দূর করা মনোবৈজ্ঞানিকের কার্য্য। তাঁহাকেই রোজা হইতে হইবে! মনোবিশ্লেষণের দ্বারা রোগীকে তাহার রোগের প্রকৃত কারণ জানাইতে হইবে; এবং তাহার ঘাড়ে যে "ভূত" (চাপিয়া রাখা কামনা) চাপিয়াছে, তাহাকে ঝাড়াইতে হইবে। রোগীর মনকে দূষনীয় কামনা ত্যাগ করাইয়া সৎপথে চালিত করিতে হইবে।

মনোবৈজ্ঞানিক যখন রোগীর মনের মণিকোঠার দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাহার কুপ্রবৃত্তির কথা প্রকাশ করিবেন, তখন সে অবশ্য অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে তীব্র ভাষায় তাহার আত্ম-মর্য্যাদার পক্ষে অবমাননাকর এই সকল অভিযোগের প্রতিবাদ করিবেই। কিন্তু যতক্ষণ না সে তাহার কুপ্রবৃত্তির কথা স্বীকার করিবে, এবং মনোবিশ্লেষকের উপর আস্থা স্থাপন করিবে, ততক্ষণ তাহার আরোগ্য লাভের আশা নেই। ফ্রয়েডের মতে, মনো-বিশ্লেষণের দ্বারা রোগ নিরাময়ের মূল তত্ত্ব এই—রোগীর সকল অজ্ঞাত মনোভাব তাহার গোচর করিতে হইবে—স্মৃতির ধারায় মাঝে মাঝে যে সকল বিস্মৃতির ব্যবধান ঘটিয়াছে, সেইগুলির পূরণ করিয়া চিন্তাধারা অবিচ্ছিন্ন, অক্ষুণ্ণ করিয়া দিতে হইবে।

মনের যে একটি গুপ্ত কক্ষ আছে, যেখানে অতীত ঘটনার স্মৃতি গুপ্ত ভাবে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, ইহা সকলেরই সহজ-বোধগম্য বিষয়। এই বিস্মৃত ঘটনাবলীর উপর নূতন নূতন ঘটনার স্তরের পর স্তর জমিয়া গিয়াছে। কোন একটা হারানো জিনিসের সন্ধান করিতে করিতে, বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটা কম ব্যবহারে আসে, এবং যে ঘরে বাড়ীর লোকদের যাতায়াত কম, এমন একটা ঘরের কোণের একটা জানালার মাথায় তাকের এক কোণে ছোট একটি পুঁটুলী রহিয়াছে দেখা গেল। তাহার ভিতর কি আছে, তাহা সহসা মনে পড়িল না। কিন্তু পুঁটুলীটি খুলিতে দেখা গেল, তাহার ভিতর একটি কচি শিশুর কয়েকটি তুচ্ছ খেলনা রহিয়াছে। তখন মনে পড়িল, খেলনাগুলি বাড়ীরই একটি শিশুর, যে বাঁচিয়া থাকিলে আজ তাহার বয়স হইত কুড়ি বৎসর। অতি শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। শিশুর শোকাতুরা জননী প্রিয় সন্তানের শেষ স্মৃতিচিহ্নগুলি সযত্নে ন্যাকড়ার পুঁটুলীতে বাঁধিয়া ওখানে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। কালে সেই শিশুকেই বাড়ীর লোকেরা ভুলিয়া গেল—ত তাহার তুচ্ছ খেলনাগুলি! কিন্তু আজ কুড়ি বৎসর পরে সেই খেলনাগুলি সেই কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে উপরত, বাড়ীর কর্ত্তার সেই প্রিয়তম শিশু পুত্রের স্মৃতি পুনরায় জাগাইয়া তুলিল। এইভাবে এক একটা ঘটনার স্মৃতি মনের উপর যে দাগ কাটিয়া রাখিয়া যায়, পরবর্ত্তী ঘটনার পর ঘটনা তাহার উপর দাগের পর দাগ কাটিতে থাকে। এবং ক্রমে পুরাতন ঘটনার স্মৃতি অদৃশ্য হইতে থাকে, কিন্তু একেবারে মুছিয়া যায় না। অবশেষে বহু কাল পরে কোন সূত্রে, কিম্বা সমশ্রেণীর আর একটা ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তাহার সহিত সাদৃশ্য বশতঃ সেই পুরাতন দাগটি আবার নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে।

সেইরূপ, পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল। লোকটিকে চিনি-চিনি করি, তবু চিনিতে পারিতেছি না। মুখখানি যেন চেনা চেনা মনে হইতেছে—যেন অনেক দিন পূর্ব্বেকার পরিচিত কোন লোকের মুখাকৃতির সহিত তাহার মুখের যেন একটু একটু সাদৃশ্য রহিয়াছে—কিন্তু কে সেই লোকটি তাহা কিছুতেই মনে পড়িতেছে না। লোকটি চির-পরিচিতের মত সম্ভাষণ করিল—অথচ তাহাকে চিনিতে না পারিয়া আমাকে অপ্রস্তুত হইতে হইল। অবশেষে সে তাহার পরিচয় দিল; তখন—ও হরি! এ যে আমার সেই ইস্কুলের সহপাঠী হরিশ! কত বৎসর ধরিয়া আমরা উভয়ে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছি। তাহার পর বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে—সেও আজ প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসরের কম নয়। বাল্য বন্ধুর মুখাকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন ত তাহার দাড়ি ছিল না—আজ তাহার এক হাত লম্বা দাড়ী! আজ এই দীর্ঘ শ্মশ্রুর অন্তরালে সেই শৈশব-বন্ধুর মুখখানি সহসা মনে পড়িল না—কিন্তু তাহার স্মৃতি ত বিলুপ্ত হয় নাই—মনের গুপ্ত কক্ষে বিস্মৃতভাবে সঞ্চিত ছিল।

বহু বৎসর পূর্ব্বে একখানি পুস্তক পড়িয়াছিলাম। অনেক কাল বাদে



ভিক্ষু

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রসিকলাল পারিক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

আজ আবার সেই বইখানি হাতে আসিয়া পড়ায় আর একবার পড়িয়া ফেলিলাম। প্রথমবার পড়িবার সময় মনে অনেক ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিছু দিন পরে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজ দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় সেই বিস্মৃত ভাবের অনেকগুলিই পুনরায় মনে পড়িয়া গেল। জাগ্রত অবস্থায় যে সকল সমস্যার কোন সমাধান করা যায় না, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে এরূপ অনেক সমস্যার অতি সহজ সমাধান হইতে দেখা যায়। সহজ অবস্থায় যে মানুষের ভদ্রতা-জ্ঞান সমাজের আদর্শ হইবার যোগ্য, মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে বা অতিক্রোধ অথবা অত্যন্ত উত্তেজনার সময়ে তাহারাই আবার এমন ব্যবহার করে যাহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যেরূপ ব্যবহার দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। সহজ অবস্থায় সমাজ-শাসন-গুণে যে মানুষ স্বভাবতঃ ভদ্র, মদ্যপানে উন্মত্ত অবস্থায় তাহাদের সুপ্ত ক্রূর, হিংস্র, অভদ্র প্রকৃতি জাগ্রত হয়; এবং ঠিক ইহার উল্টা অবস্থাও দেখা যায়—সহজ অবস্থায় যে ব্যক্তি অতি দুর্দ্দান্ত, দুষ্ট প্রকৃতির, মদ্যপান করিলে, তাহাদের প্রকৃতির উদারতা ও অন্যান্য গুণ দেখিয়া চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না। পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীজাতীয়া রোগিনীদের চিকিৎসার্থ ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগ করা আবশ্যক হইলে, ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় ভদ্র ও উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিতা, সভ্যা মহিলারাও এমন অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করে এবং অশ্লীল ভাবভঙ্গী দেখায় যাহা সহজ অবস্থায় নিতান্ত অস্বাভাবিক। হিপনটিজমের দ্বারা আবিষ্ট ব্যক্তিরা তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞানের অতীত অনেক বিষয় প্রকাশ করে; যাহাদের সঙ্গীতের বর্ণপরিচয় হয় নাই, তাহারা উচ্চাঙ্গের গীত বাদ্যের দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করে; অপূর্ব্ব বক্তৃতা-শক্তির পরিচয় প্রদান করে; অথবা, কোন বিদেশীয় ভাষায় অনর্গল কথা কহিয়া যায়, যে ভাষা সে কস্মিন কালেও শিক্ষা করে নাই।

মনের প্রকৃত ভাব কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পায়। মনো-বিশ্লেষকের নিকটে স্বপ্নের অর্থ-নিষ্কাশনই রোগ নির্ণয়ের সর্ব্বপ্রধান উপায়। স্বপ্নই রোগীর মনের মণিকোঠার দ্বার তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

প্রাচীন কালে স্বপ্ন মানব-জীবনে কিরূপ গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপার ছিল, শাস্ত্রাদিতে তাহার বিবরণ পাঠ করা যায়। রাজা-রাজড়া, ধনী, জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের স্বপ্নের অর্থ-নিষ্কাশনের জন্য বেতনভোগী মন্ত্রী, জ্যোতির্ব্বিদ, মোসাহেব ও স্বপ্নবিশারদগণ নিযুক্ত থাকিত। সেকালে যেমন, একালেও তেমনি অনেকে স্বপ্নে ঠাকুরের দৈব ঔষধ প্রাপ্ত হয়, দেবতার বাণী শুনিতে পায়। পাশ্চাত্য দেশে স্বপ্নে অপদেবতারা, শয়তান, ভূতযোনি প্রভৃতি লোকের স্কন্ধে ভর করিত, এখনও কিছু কিছু করিয়া থাকে। অসভ্য, বন্য লোকেরা স্বপ্নকে বাস্তব ঘটনা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বাস্তব জীবনে লোকে তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। স্পিরিচুয়ালিষ্ট বা সম্মোহনবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিরা যে লোককে আবিষ্ট করিয়া থাকে তাহাও কৃত্রিম স্বপ্ন মাত্র।

প্রাচীনপন্থী মনোবৈজ্ঞানিকরা কি ভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। নব্য মনোবিজ্ঞান স্বপ্নের কিরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। নব্য মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে স্বপ্নের অর্থ নিষ্কাশন করিবার সময় ভবিষ্যৎ অপেক্ষা অতীতের উপর এবং দেহের অপেক্ষা মনের উপর বেশী নির্ভর করা হয়। যে সকল বস্তুতান্ত্রিক ঘটনা বা বিষয় উপলক্ষ করিয়া স্বপ্ন উৎপন্ন হয় সেই ঘটনা বা উপলক্ষগুলিকে স্বপ্নের প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। অনেক সময়ে স্বপ্নে মানসিক ব্যাধির মূল সূত্র প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, স্বপ্নদ্রষ্টা ভবিষ্যতে মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে এইরূপ লক্ষণ হইতে কঠিন শারীরিক পীড়া, এমন কি, মৃত্যুর পূর্ব্বাভাষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ একজন পণ্ডিত তাঁহার একখানি গ্রন্থে এক ব্যক্তির স্বপ্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একটি লোক দশ বারো বার একই রূপ স্বপ্ন দেখে যে, একটা বিড়াল তাহার গলায় এত জোরে থাবা মারিতেছে যে প্রত্যেকবার তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। লোকটি মনে করিত, তাহার ভাল হজম হয় না বলিয়া সে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। কিছু দিন পরে তাহার গলায় ঠাণ্ডা লাগায় সে ডাক্তারের নিকট গমন করে। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, তাহার গলায় একটা কিছু জন্মিয়াছে, এবং অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া সেইটা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ঠাণ্ডা লাগিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সেই বস্তুটা তথায় উৎপন্ন হইয়াছিল। সে ঐ বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে নাই। অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া বস্তুটা কাটিয়া বাদ দেওয়ার পর হইতে আর সে ঐ প্রকার দুঃস্বপ্ন দেখে নাই। আর একটি ঘটনায়, একটি লোক স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করে যে, তাহার পায়ের বুড়ো আঙুল পাথর হইয়া গিয়াছে। কয়েক দিন পরে তাহার পদে পক্ষাঘাত রোগ জন্মিল। এই ধরণের স্বপ্নগুলি দৃশ্যতঃ বস্তুতান্ত্রিক হইলেও, নব্য মনো-বৈজ্ঞানিকরা বিবেচনা করেন, দেহমধ্যস্থ কোনরূপ যান্ত্রিক উত্তেজনার ফলে স্বয়ংক্রিয় (autonomous) স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার জন্যই এইরূপ স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সজাগ চিত্ত এই সমুদয় উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার বিষয় জানিতে পারে না। এই কাজগুলা সুপ্ত চিত্তের উপর দিয়াই সম্পন্ন হয়।

সুপ্ত চিত্ত স্বপ্নে অনেক কঠিন কঠিন কার্য্য সুচারু ভাবে সম্পাদন করে, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাহারকতক বিবরণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জাগ্রত চিত্তের পক্ষে দুঃসাধ্য অনেক কার্য্য নিদ্রাবস্থায় সুপ্ত চিত্তের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। স্বপ্নে অনেক হিসাবের ভুল ধরা পড়ে। একজন লোক বাবিলোনিয়ার একটি প্রাচীন মন্দির হইতে দুইখানি ভগ্ন 'এগেট' প্রস্তর কুড়াইয়া পাইয়াছিল। তাহাতে সাঙ্কেতিক ভাষায় কিছু লিখিত ছিল। সেই ব্যক্তি ঐ লিখনের মর্ম্ম জানিবার জন্য উহা অধ্যাপক হিলপ্রেটের (Professor Hilprecht) নিকট আনয়ন করে। তিনি অনেক মাথা খুঁড়িয়াও উহা বুঝিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি বাবিলোনিয়ায় ঐ পুরাকালীন মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে মন্দিরের একজন পুরোহিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পুরোহিত তাঁহাকে মন্দির-সংলগ্ন

কোষাগারে লইয়া গেল। তার পর তাঁহাকে প্রস্তরখণ্ড দুইটি বিশেষ এক প্রকারে যোড়া দিতে বলিল। পূর্ব্বে, জাগ্রত অবস্থায় তিনি ঐ রত্নখণ্ড দুইটিকে একটি অঙ্গুরীয়কের অংশ মনে করিয়া সেই ভাবে যোড়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-প্রযত্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্বপ্নদৃষ্ট পুরোহিতের উপদেশে যোড়া দিয়া দেখিলেন, বেশ যোড় মিলিয়া গেল, এবং অঙ্গুরীয়কের পরিবর্ত্তে হইয়া দাঁড়াইল একযোড়া কর্ণভূষণ (ear-rings)! পরদিন সকালে জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, পুরোহিতের উপদেশ অনুযায়ী যোড়া দিয়া যথার্থ-ই তিনি দেখিলেন, উহা একযোড়া বহুমূল্য ইয়ারিংই বটে। তখন, যে লেখা পূর্ব্বে প্রহেলিকামাত্র ছিল, তাহার অতি সরল অর্থ বাহির হইয়া পড়িল। জাগ্রত অবস্থায়, জাগ্রত চিত্তের জ্ঞাতসারে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহার কিয়দংশ সুপ্ত চিত্ত গ্রাস করিয়া লয় ; সেইজন্য তাহা জাগ্রত চিত্তের অজ্ঞাতেই থাকিয়া যায়। আর স্বপ্নে কিম্বা মোহ-নিদ্রায় (hypnotic trance or mediumistic demonstration) সেই সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়।

স্বপ্নের স্বরূপ কি? নব্য বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, স্বপ্ন আর কিছু নয়—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ মাত্র। মনের জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ইচ্ছার পরিপূরণকে ভিত্তি করিয়া নব্য মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্র (Psychology) গড়িয়া উঠিতেছে। আর এই দিক দিয়াই কেবল স্বপ্নের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

স্বপ্নে মনের জ্ঞাতসারে যে সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ছেলে-মেয়েরা অনেক সময় খেলনা, খাবার জিনিস, সৌখিন জিনিস, এমন কি, আকাশের চাঁদ পর্য্যন্ত চাহিয়া না পাইলেও, স্বপ্নে তাহাদের এই সকল বস্তুই মিলিয়া থাকে। কচি ছেলে-মেয়েরা তাহাদের স্কুলের পড়া মনে রাখিতে না পারিলেও, স্বপ্নের কথা তাহাদের বেশ মনে থাকে, এবং তাহারা স্বপ্নের প্রায় সম্পূর্ণ ও নির্ভুল বিবরণ দিতে পারে।

কেবল শিশুদের কেন, বয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নযোগে পূর্ণ হয়। কোন ভ্রমণকারী লোকালয় হইতে সুদূর দেশে—যেমন আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে, উচ্চ পর্ব্বত শিখরে, মেরুপ্রদেশে, কিম্বা ঐ রকম কোন দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করিতে কিম্বা অনুসন্ধান কার্য্যে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্য, তামাক, বিলাসোপকরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ফুরাইয়া গিয়াছে ; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সংবাদ অনেক দিন হইতে পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায়, অনেক জিনিসের অভাব তাঁহাদিগকে পীড়িত করিতেছে—মনে নানা রকম সাধ উঠিতেছে। এরূপ স্থলে তাঁহারা প্রায় স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জিনিস পাইয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত তাহা উপভোগ করিতেছেন। অনেক ভ্রমণকারী তাঁহাদের স্বপ্ন বিবরণ উজ্জ্বল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, এবং এই সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কারণে, ভ্রমণকারীদের দুর্দ্দশা যখন চরম অবস্থায় উপনীত হয়, তখন নিদ্রা তাঁহাদের প্রধান কামনার বিষয় হইয়া উঠে—শুধু স্বপ্নে তাঁহাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারিবে, এই লোভে।

ফ্রয়েড ও তাঁর শিষ্যেরা বলেন, মানুষের যে সকল দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরাশা, অসঙ্গত ইচ্ছা, দুষ্ট অভিপ্রায় বা উচ্চাভিলাষ স্বাভাবিক অবস্থায় কোনক্রমেই পূর্ণ হইবার নয়, সেই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনের গুপ্ত কোণে সুপ্তভাবে অবস্থিতি করে, এবং স্বপ্নে তাহাদেরই পরিপূরণের চেষ্টা হয়।

প্রচ্ছন্ন কামনার মধ্যে যেগুলা স্বপ্নে আবির্ভূত হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলা অত্যন্ত বিরক্তিকর—ঘৃণা ও লজ্জাজনক। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতকগুলা জাগ্রত অবস্থায় স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত বা বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় ; সে জন্য তাহারা কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করে না। আর, শিশুদের ত কথাই নাই—তাহারা সভ্য-সমাজের শিষ্টাচারের ধার ততটা ধারে না বলিয়া, এই সকল অনুষ্ঠানে লজ্জা বোধ ত করেই না—বরং গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে। যে সকল কাজ করিতে বয়স্ক ব্যক্তিরা লজ্জা বোধ করে, শিশুরা অনেক সময় আগ্রহের সহিত সেই সকল কাজ করে—বিশেষতঃ যৌন ব্যাপার সম্পর্কিত বিষয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত, এই সকল কার্য্য যে লজ্জাজনক, এই শিক্ষা তাহারা লাভ করিয়া থাকে। শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সংযত-চরিত্র হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহাদের মনের কোণে নিষিদ্ধ বিষয় সকল প্রচ্ছন্নভাবে সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিতি করে। হিংসা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি শিশু-সুলভ প্রবৃত্তি বয়োধর্ম্মে জাগ্রত অবস্থায় সংযত থাকিলেও, নিদ্রাবস্থায় তাহারা সংযমের বন্ধন মুক্ত হইয়া স্বপ্নের মধ্যে বা স্বপ্নের আকারে প্রকাশ পায়। কোন সহচর বা পিতা-মাতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুরা তাহাদের মৃত্যু কামনা করে। ইহা আদিম মানব-সুলভ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির প্রকারভেদ মাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণতঃ তাহাদের অতি শৈশব কালের—আট বৎসর বয়সের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা স্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে পারে না। কিন্তু, তথাপি, সে স্মৃতি একেবারে বিলুপ্তও হয় না—মনের গুপ্ত কক্ষে প্রচ্ছন্ন-ভাবে থাকে। স্বপ্নে সেগুলা ছাড়া পাইয়া নানা দৃশ্যে, নানা ভাবে, স্ব-রূপে বা ছদ্মবেশে প্রকাশ পায়। বয়স কালে যাহা দুষ্প্রবৃত্তি বলিয়া নিন্দার্হ এমন অনেক বিষয় শিশুর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং নির্দ্দোষ। শিষ্টাচার শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে শিশুর পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, বয়সকালে প্রকাশ্যে তাহা নিষিদ্ধ হইলেও, স্বপ্নে অনেক বিস্মৃত ঘটনার আকারে তাহার পুনরভিনয় হয়। এইরূপে স্বপ্নজগতে অনেক আশ্চর্য্য, অসাধারণ, অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য নব্য বৈজ্ঞানিক বলেন, প্রাচীনদিগের ধারণা ভ্রান্ত—স্বপ্ন নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় না—বরং ঠিক বিপরীত কাজই করে—নিদ্রায় শ্রান্তি দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতৃপ্ত, বিস্মৃত কামনার তৃপ্তিসাধন করিয়া মনকে শান্ত, সমাহিত এবং ক্লান্ত দেহকে পুনরায় দিবসের কর্ম্মসম্পাদন-ক্ষম করিয়া তুলে। তবে উদ্বেগজনক স্বপ্নগুলা এই ব্যবস্থার বহির্ভূত স্বতন্ত্র ব্যাপার। সেখানে সংযমের বন্ধন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ফলে দুষ্কর্ম্মজনিত অনুশোচনা, আতঙ্ক,

ভীতি, উদ্বেগ প্রভৃতি মানসিক চাঞ্চল্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই জন্যই আমরা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠি।

স্বপ্নের কোন সঙ্গত অর্থ নিষ্কাশন করা সম্ভবপর কি না? ফ্রয়েড বিবেচনা করেন—খুবই সম্ভব। তিনি বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার অন্তরালে স্বপ্নদ্রষ্টার ইচ্ছা কাজ করিয়া থাকে। আর, যে সকল স্বপ্ন স্পষ্ট, তাহাদের অপেক্ষা, অস্পষ্ট স্বপ্নগুলির অন্তরালস্থিত ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া অধিকতর প্রবল। দিবসে সামাজিক শিষ্টাচার মানব মনের অসঙ্গত কামনাগুলাকে সংযত করিয়া রাখে, স্বপ্নে তাহা অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় থাকিয়া অসঙ্গত ইচ্ছাগুলাকে বাহিরে প্রকাশিত হইতে বাধা দেয়। তাহার ফলে সেগুলি প্রকৃত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত না হইয়া ছদ্মবেশে প্রকাশ পায়। এই কারণেই আমরা বিকৃত ঘটনা, অস্বাভাবিক ঘটনা স্বপ্নে দেখি—ইহার পশ্চাতে যে ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে তাহাকে ঠিকমত ধরিতে পারি না—তাহার প্রকৃত পরিচয় পাই না। একটা ঘটনার অনেক অংশ বাদ পড়িয়া ঘটনাটা ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়; অনেক সময়ে বিভিন্ন এবং পরস্পরের সহিত সংশ্রব রহিত ঘটনাগুলা একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ সুসজ্জিত ঘটনার আকারেও দেখা দিয়া থাকে। কখনও কখনও কোন কোন ঘটনার মাত্র একটা অংশ বিশেষ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কখনও বা প্রকৃত ঘটনা যে ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে, স্বপ্নে তাহার ধারাবাহিকতা বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়া বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত হইয়া দেখা দেয়। অনেক সময় আসল ঘটনার প্রতীক স্বরূপ অন্য ঘটনাও দেখা যায়। কখনও কখনও একটা ঘটনা আর একটা ঘটনার প্রতিনিধি রূপে, আবার কখনও একটা ঘটনার স্থলে তাহার ঠিক বিপরীত একটা ঘটনা প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি স্বপ্নে তাহার প্রিয়জনের মৃত্যু সন্দর্শন করে, তবে ইহা হইতে এ কথা বুঝায় না যে, সে তাহার প্রিয়তমের মৃত্যু কামনা করে।—এ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, সে অন্য কোন লোকের মৃত্যু কামনা করে বটে, কিন্তু স্বপ্নে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে—শত্রুর মৃত্যুর পরিবর্ত্তে প্রিয়তমের মৃত্যু ঘটাইয়া দিয়াছে। আবার মৃত্যুর স্বপ্ন দেখিলেও আসল ঘটনা মৃত্যু না হইয়া অন্য কোন ব্যাপারও হইতে পারে—যাহা স্বপ্নে মৃত্যুরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বপ্নে অনুকল্প বেশ চলে। মধু অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা আমাদের শাস্ত্রেই রহিয়াছে—মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। স্বপ্নেও এক বস্তুর স্থলে (প্রায়শঃ স্ত্রী-পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে) অন্য বস্তুর আবির্ভাব হয়। যেমন, পুং চিহ্নের পরিবর্ত্তে অথবা পৌরুষব্যঞ্জক যৌন বোধ জন্মাইবার জন্য উহার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত বস্তু, যথা, লাঠি, পেনশিল, ছুঁচ, কাগজ কাটিবার ছুরি, ছাতি 'টাওয়ার', এবং বিশেষ ভাবে, রিভলভার, ছোরা, বল্লম প্রভৃতির ন্যায় অস্ত্র; কিম্বা পুরুষ জন্তু, যথা ব্যাঘ্র, সিংহ, ষণ্ড, উর্দ্ধশুণ্ড হস্তী, এবং আরও বিশেষ ভাবে সরীসৃপ। আর নারীর চিহ্নের অনুকল্প স্বরূপ বাক্স, সিন্দুক, পকেট, বই, জুতা, গর্ত্ত, গুহা, গির্জ্জা, কূপ প্রভৃতি। যৌন-ক্রিয়ার অনুকল্প; যথা, আঘাত, দংশন, অশ্বারোহণ, ভোজন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, সন্তরণ, উড্ডয়ন প্রভৃতি। হস্তমৈথুনের (onanism) অনুকল্প বৃক্ষ হইতে একটি শাখার পতন। মুষ্কচ্ছেদন (Castration)এর অনুকল্প দন্তের স্খলন। জন্মের অনুকল্প—জল। দিগম্বর অবস্থার অনুকল্প—বস্ত্র। মৃত্যুর অনুকল্প—বিদেশযাত্রা।

বস্তুতান্ত্রিক অনুকল্প ত আছেই; তদ্ব্যতীত গুণবাচক অনুকল্প কিংবা রূপক অনুকল্পেরও অভাব নাই। কোন স্নায়ুবিকারগ্রস্তা রমণীর ধারণা জন্মে যে সে অপবিত্রা হইয়াছে। সেই অপবিত্রতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার মনে একটা প্রবল ইচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছার প্রেরণায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহার বস্ত্র বা দেহ ধৌত করে। ইহা আমাদের দেশের শুচিবায়ুগ্রস্তা মেয়েদের স্বভাবের মতই যেন কতকটা। বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অর্থাৎ অপর নারী বা পুরুষের সহিত অবৈধ সংসর্গ ঘটিলে, স্বপ্নে তাহা ভগ্ন স্তম্ভের আকারে প্রকাশ পায়।

ফ্রয়েড পন্থীদের এই সকল সিদ্ধান্ত, আমাদের মনে হয়, যুক্তি বা বিচারসহ নহে। প্রতীচ্যের বহু মনোবৈজ্ঞানিকেরও এই মত। বৈজ্ঞানিক এবং সম্ভবপর যুক্তির পরিবর্ত্তে যেন গায়ের জোরে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ফ্রয়েডপন্থীরা গোড়া হইতেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, মানুষের সকল চিন্তা, সকল কার্য্য কাম-প্রবৃত্তির ভিত্তির উপর স্থাপিত। সেইজন্য তাঁহারা ঝোপে ঝোপে বাঘই দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যুক্তি ও বিচার দ্বারা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করা কঠিন—স্থল বিশেষে অসম্ভব বলিলেও চলে। উড্ডয়ন, পতন প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর স্বপ্নের অনেক রকম ব্যাখ্যা তাঁহারা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, উড়িবার স্বপ্ন দেখা মানুষের ইচ্ছার পরিপূরণের একটা দৃষ্টান্ত; কেন না, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে মানুষ পাখীদের মত উড়িবার ইচ্ছা করিয়া আসিতেছে। সেই ইচ্ছার পরিপূরণ স্বরূপ তাহারা উড়িবার স্বপ্ন দেখে। আবার কেহ কেহ বলেন, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলে বক্ষস্থলের ছন্দে বা তালে তালে উত্থান পতনের অনুকরণে লোকে উড়িবার স্বপ্ন দেখে। অপর এক দলের মতে, উড্ডয়নের স্বপ্ন দেখার অর্থ এই যে স্বপ্নদ্রষ্টা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করিয়া সকলের শীর্ষ স্থানে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়।

স্বপ্নে পতনেরও অনেক অর্থ করা হয়। এক দল বলেন, এতদ্দ্বারা এই ইচ্ছা প্রকাশ পায় যে, মানুষ সভ্যতার বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া আদিম মানবের অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহে। আর এক দলের মতে, আদিম কালের মানব বৃক্ষশাখায়ব্বাস করিত; এবং সেইরূপ অবস্থায় প্রায় গাছ হইতে পড়িয়া যাইত। সেই অবস্থার স্মৃতির অনুসরণ করিয়া স্বপ্নে মানুষের পতন ঘটে। তৃতীয় এক দল বলেন, স্বপ্নে পতনের দ্বারা শৈশব কালের পুনরভিনয় করা হয়।

মনোবিশ্লেষণ দ্বারা সত্য নির্ণয়ের পদ্ধতিটি অতি সুন্দর। কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যেমন নানা মুনির নানা মত, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মনোবিশ্লেষণ প্রণালীর গোঁড়া অনুরাগীদিগের মধ্যেও মতের

এমন বিভিন্নতা ঘটে যে, বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। একই পদ্ধতিতে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন স্বপ্নবিশ্লেষক বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে—একটি স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে সে একটি শ্বেত কুকুরের গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। ফ্রয়েডের শিষ্যেরা যে পদ্ধতিতে এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত করেন, জাংএর (Jung) শিষ্যেরা সেই পদ্ধতিতে স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া কিন্তু বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? স্বপ্নটি এক, বিশ্লেষণ প্রণালীও এক। সিদ্ধান্তও একই হইবার কথা। অথচ হইল দুই রকম। ইহা কেমন করিয়া হইল? আমাদের মনে হয়, একই বিষয় লইয়া একই প্রণালীতে বিশ্লেষণ করা হইলেও, বিশ্লেষকের নিজের মনের একটা প্রবণতা আছে, যাঁহার যে বিষয়ে প্রবণতা অধিক, তিনি সেই দিক দিয়া বিষয়টির বিচার করিবেন। কাজেই ফলাফলও বিভিন্ন প্রকার হইতে বাধ্য। অর্থাৎ প্রবণতা অনুসারে একটা স্বপ্নের যে কোন রকম মানে করা যায়; এবং তাহার সমর্থনের উপযোগী যুক্তিরও অভাব হয় না। বিশ্লেষকের যদি কোন বিষয়ে বদ্ধমূল সংস্কার থাকে, তবে তিনি হাজার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করুন না কেন, তাঁহার সংস্কারেরও একটা প্রভাব আসিয়া পড়িবেই। এ প্রশ্ন যে ফ্রয়েডের মনেও উঠে নাই, তাহা নয়। তিনি "সন্দেহজনক বিষয়" বলিয়া এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন যে, সন্দেহজনক স্থলেও একটা সঙ্গত অর্থ বাহির করিতে বাধে না।

মোটের উপর এই কথা বলা যায় যে, সকল ক্ষেত্রে ঠিক সত্য সিদ্ধান্তটি বাহির করিতে না পারা গেলেও, স্বপ্ন বিশ্লেষণের ফলে, মনের অজ্ঞাত, গুপ্ত গহ্বর হইতে অনেক চাপা ইচ্ছা এবং মনোভাব টানিয়া আলোকে বাহির করা যায়। আর এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে স্নায়বিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের লক্ষণ আলোচনা করিবার এবং রোগের প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিবার কতকটা সুবিধা হয়।

কিন্তু আর একটি কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবার আছে। স্বপ্ন বিশ্লেষণ দ্বারা সত্য নির্ণয় করা তখনই সম্ভব হইতে পারে, যদি স্বপ্নদ্রষ্টা তাহার মনের সকল চিন্তা হুবহু প্রকাশ করিয়া বলে।—কিছুমাত্র রাখিয়া ঢাকিয়া বলিলে চলিবে না—প্রত্যেক চিন্তাটি প্রকাশ করিয়া বলা চাই; তবে আসল সত্যটি ধরা পড়িবে। নচেৎ অপ-সিদ্ধান্ত হইতে বাধ্য।

কিন্তু মনের সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলা সম্ভবপর কি? কথায় বলে—"মনের অগোচর পাপ নাই।" মন জিনিসটা না কি চক্ষে দেখা যায় না, সেইজন্ত মনে কত কুচিন্তা, কত কুমতলবই না উঠিয়া থাকে। মনের সকল সদসৎ চিন্তা প্রকাশ করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। অথচ তাহা না হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজও হইবে না—কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা হইবে। "সেয়ান ঠকিলে বাপকে বলে না" বলিয়াও একটা কথা আছে। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া সত্য নির্ণয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া লোকে সাধারণতঃ তাহাদের মূর্খতা, বুদ্ধিহীনতা, কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি অপরের কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে সম্মত হইবে, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ফ্রয়েড নিজেও বলেন, তিনি তাঁহার নিজের অনেক স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহার মনে যে সকল চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সেই সকল কথাই তিনি সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহস করেন না।

মানুষের পাপী মনে কত না পাপ চিন্তার উদয় হয়। বর্ত্তমান যুগের মহামনস্বী রোমাঁ রোলাঁ এক স্থলে বলিয়াছেন—"If we are to tell a hundredth part of the dreams that come to an ordinary honest man, or of the desire which come into being in the body of a chaste woman, there would be a scandal and an outcry." অর্থাৎ সাধারণ একজন সৎ ভদ্রলোক যে সকল স্বপ্ন দেখেন, কিম্বা কোন সাধ্বী মহিলার অন্তরে যে সকল অভিলাষ জন্মে, তাহার শতাংশের একাংশও যদি সাধারণ্যে প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে কেলেঙ্কারীর সীমা থাকিবে না, এবং সমাজে মস্ত একটা বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

Thought Reading বা "চিন্তা পাঠ" শাস্ত্রটা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না—কখনও কোনও চিন্তা পাঠকের সংস্রবে আসি নাই। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কুচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিরা চিন্তা-পাঠকের সম্মুখীন হইলে নিজেদের বিপন্ন বোধ করিবে নিশ্চয়ই।

মানব-জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যাহার স্মৃতি মনকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। অনেক লজ্জাজনক দুর্ঘটনার কথা মনে হইলে নিজের কাছেই লজ্জা, ঘৃণার সীমা থাকে না। জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, ইচ্ছায় হউক আর বাধ্য হইয়াই হউক, মানুষ সময়ে সময়ে এমন সকল দুষ্কর্ম্ম করে বা করিতে বাধ্য হয়, যে জন্ত তাহার অনুতাপের অবধি থাকে না, যে জন্ত তাহাকে অশেষ মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মান্তরে লিপ্ত হইলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে হয় ত সময়ে সময়ে লোক এই সকল কথা কিছুক্ষণের জন্ত ভুলিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার স্মৃতি ত বিলুপ্ত হয় না—সুপ্ত চৈতন্তের ভিতর তাহা গুপ্তভাবে সঞ্জীবিত থাকে। স্বপ্নে যখন তাহা প্রকাশ পায়, তখন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন বিশ্লেষণকারীর কাছে, তাহার মনের সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিবে, এরূপ আশা করা যায় কি? সে হয় ত কতক সত্য কথা বলিবে, আবার কতক মিথ্যা কথা, রচা কথা বলিবে—তাহার মনের আসল লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা সে সম্ভবতঃ প্রকাশ করিবে না। তখন, তাহার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা সফল হইবে কি?

আবার, কেবল কুচিন্তার কথাই বা বলি কেন—সৎ চিন্তাই কি লোকে সকল সময়ে প্রকাশ করিতে পারে?

"হৃদয়ে বুদ্বুদ মত
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে—
পাছে লোকে কিছু বলে!"

—কামিনী সেন।

এই "পাছে লোকে কিছু বলে" এই ভয়ে দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তিরা তাহাদের

মনের সৎ চিন্তার কথা প্রকাশ করিতে পারে না—অনেক সৎ কাজ, নির্দ্দোষ কাজ করিতে পারে না। কোন কথা বলিতে বা কাজ করিতে উদ্যত হইয়া ইহারা ইতস্ততঃ করে—পাছে লোকে কিছু বলে। এইরূপ প্রকৃতির লোকই কি স্বপ্ন-বিশ্লেষকের কাছে তাহাদের মনের সকল কথা খুলিয়া বলিতে ভরসা করিবে?

শুনিতে পাই, ঈশ্বর-বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান খৃষ্টানরা তাহাদের Father Confessorএর কাছে তাহাদের মনের মণিকোঠার গুপ্ত দ্বার উন্মোচন করিলে, নিজ মুখে জীবনের সকল পাপ কথা ও পাপ চিন্তা ব্যক্ত করিলে স্বর্গরাজ্য তাহাদের পক্ষে অবারিত-দ্বার হয়। এ কথা কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য, পাঠকরা নিজ নিজ মন দিয়া তাহা বিচার করিয়া দেখুন।

এই সকল কারণে মনে হয়, স্বপ্ন-বিশ্লেষকের কাজ বড় সহজ হইবে না। আদালতে মামলা মোকদ্দমার বিচারের সময়—সাক্ষীরা পাছে মিথ্যা কথা বলিয়া সুবিচারের পথে বাধা জন্মায় এই কারণে—প্রকৃত সত্য নিষ্কাশনের জন্য সাক্ষীদের ধর্ম্মানুমোদিতভাবে শপথ গ্রহণ ও জেরা করিবার বিধান আছে। এই সমস্ত সত্য মিথ্যা কথার বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বিচারককে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তথাপি তিনি সকল সময়েই যে সত্যের সন্ধান পাইয়া সুবিচার করিতে পারেন, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। তাহার উপর তাঁহার নিজের একটা সংস্কার আছে, তাহারও প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন।

স্বপ্ন-বিশ্লেষকের কাজও অনেকটা বিচারকেরই ন্যায়। তাঁহাকেও সত্য মিথ্যার বিচার করিতে হয়। কিন্তু বিচারকের যতটা সুবিধা আছে, স্বপ্ন-বিশ্লেষকের ততটা নাই। তিনি জেরা করিয়া সত্য কথা আদায় করিতে পারিবেন না। স্বপ্নদ্রষ্টা স্বেচ্ছায় যতটুকু তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে, তাহাই মাত্র তাঁহার সম্বল। এরূপ অবস্থায়, তাঁহার পক্ষে পদে পদে বিচার বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই কি?

ফ্রয়ড সাহেবের স্বপ্ন-বিশ্লেষণ-প্রণালী অতি সুন্দর, বিচক্ষণতা পূর্ণ, এবং যথার্থই সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। কিন্তু এই বিজ্ঞানানুমোদিত পদ্ধতিতে যে সকল উপাদান লইয়া স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করিতে হইবে, সেই সমুদয় উপাদানের বিশুদ্ধতার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ বিদ্যমান। ঐ সমুদয় উপাদানের মধ্যে কতকটা সত্য থাকিলেও কতকটা হইবে অসম্পূর্ণ, বিকৃত এবং মিথ্যার ভেজাল। ভেজাল-মিশ্রিত উপাদান লইয়া বিজ্ঞানের কার্য্য কতদূর সফলতা লাভ করিতে পারিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কতকটা এই কারণে,—এবং বিশেষ ভাবে এই জন্য যে নব্য বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রয়ড সাহেবের পদ্ধতিক্রমে স্বপ্নবিশ্লেষণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন—এবং কতকটা আমার আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত বলিয়া—আমি এখানে স্বপ্নবিশ্লেষণ পদ্ধতির বিশেষ ভাবে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি। সেই জন্য সেদিকে আর আমি অগ্রসর হইলাম না।

মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতবর্গ নানা দিক দিয়া মানব মনের সকল স্বাভাবিক ও বিকৃত অবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটির আমি সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করিলাম। স্বপ্নরহস্য (স্বপ্নবিশ্লেষণ নহে) আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাহার সহিত প্রসঙ্গ ক্রমে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের কথা যা যৎকিঞ্চিৎ আসিয়া পড়িয়াছে, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। মানব-মনের অপরাপর অবস্থা আমার আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত বলিয়া সে সকলের উল্লেখ না করিয়া এই খানেই আমার বক্তব্যের ইতি করা গেল।

সমাপ্ত

আহার-বিধি

কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, কবিশেখর, এম্-এস্‌সি

আজকাল খাদ্য এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইতেছে। সাধারণেও এ বিষয়ে জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা খুবই শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের দেশে অতি পুরাকালেই আহার এবং আচার সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের কি দ্রব্য খাওয়া উচিত, কি খাওয়া উচিত নয়, কিরূপভাবে থাকা উচিত, ইত্যাদি স্বাস্থ্য-বিষয়ক নানা বিচার চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ "স্বস্থাতুরপরায়ণ" অর্থাৎ ইহা রোগী ও অরোগী উভয়েরই প্রধান আশ্রয় স্বরূপ। কেবলমাত্র রোগীকে নিরাময় করাই আয়ুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য নহে, সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার উপায় নির্দ্দেশ করাও ইহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদোক্ত আহার বিহারের বিধি সকল ভাল করিয়া পালন করিলে আমরা বহু রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে আহার-বিধি সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই আমি অতি সংক্ষেপে এখানে বলিব।

"মাত্রাশী স্যাৎ"—উপযুক্ত মাত্রায় আহার করিবে, চরকের এই মহাবাক্য অনুসরণ করিলে আজ আমাদিগকে এইরূপ হীনবল হইতে হইত না। বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে লোকের অগ্নির বলও বিভিন্ন হয়। কেহ তীক্ষ্ণাগ্নি-সম্পন্ন, সে গুরু আহারও সহজে জীর্ণ করিতে পারে; কেহ বা মন্দাগ্নি-সম্পন্ন, তাহার লঘু আহারও সহজে জীর্ণ হয় না; আবার কাহারও অগ্নি বিষম, সে কখনও বা ভাল হজম করিতে পারে, কখন পারে না। সেইজন্য সকলের পক্ষে আহার-মাত্রা একরূপ নহে। আহারের মাত্রা মনুষ্যের অগ্নিবলকে অপেক্ষা করে। যে ব্যক্তির যে পরিমিত আহার বিনাক্লেশে, যথাসময়ে পরিপাক হয়, তাহাই তাহার আহার-মাত্রা জানিবেন। আহারই প্রাণিদিগের মূল। আমাদের শরীরে যে অগ্নি রহিয়াছে আহার সেই অগ্নির ইন্ধনস্বরূপ। মানুষ সমাহিত হইয়া মাত্রা ও কাল বিচার পূর্ব্বক হিতকর অন্নপানরূপ সমিধকাষ্ঠ দ্বারা নিত্য অন্তরগ্নিকে আহুতি প্রদান করিবে। অন্তরগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে দেহের নাশ হয়; অতএব অন্নপানরূপ ইন্ধন দ্বারা সেই অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া রাখিবে। দ্রব্য লঘুই হউক, আর গুরুই হউক, উপযুক্ত মাত্রায় ভোজন করিবে। মাত্রাযুক্ত

ভোক্তার প্রকৃতিকে উপহত করে না, সুতরাং ইহা দ্বারা বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুঃ অবশ্য বর্দ্ধিত হয়।

খাদ্যদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পাক না হইলে শরীর পোষণের উপযোগী হয় না। এই পাক দুই প্রকারে সমাধা হয় ; এক বাহিরে রন্ধনশালায় স্থূলপাক, অপর শরীরের ভিতরে সূক্ষ্মপাক। সুশ্রুত আহারবিধির প্রথম বিধি বলিয়াছেন যে, রন্ধনশালা বিস্তৃত ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক, তথায় কেবল বিশ্বস্ত লোক থাকিবে, অর্থাৎ রান্নাঘরকে ঠাকুরঘরের ন্যায় দেখিতে হইবে।

স্নান না করিয়া, বস্ত্র-পরিবর্ত্তন না করিয়া, হস্ত পদ ও মুখ প্রক্ষালন না করিয়া এবং প্রসন্নমনা না হইয়া ভোজন করিতে বসিবে না। ভোজন-পাত্র অপবিত্র, ভোজন স্থান অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার এবং ভোজনকাল অনুপযুক্ত হইলে ভোজন করিবে না। পরিচারকগণ অশিষ্ট ও অশুচি হইলে ভোজন করিবে না। বক্রদেহ হইয়া ভোজন করিবে না।

বাসি অন্ন ভোজন করিবে না। উষ্ণ অথচ স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করিবে। কারণ উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ অন্ন খাইতে ভাল লাগে, জঠরাগ্নিকে উদ্দীপ্ত ও বর্দ্ধিত করে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, বায়ুর অনুলোম (বায়ু সরল) করে এবং বলের বৃদ্ধি করে।

অজীর্ণে কদাচ ভোজন করিবে না, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ হইলে তবে পুনরায় আহার করিবে ; বিরুদ্ধ ভোজন, যে দ্রব্য খাইতে অভ্যাস নাই তাহা ভোজন, অনিয়মিত ভোজন (আজ এক সময়ে খাইলাম, কাল অন্য সময়ে খাইলাম), এইগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। বিষমাশনের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগ জন্মাইতে পারে, এমন কি রাজযক্ষ্মা পর্য্যন্ত হইতে পারে। পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে বাতাদি দোষসকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হয়, অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, ভোজনের ইচ্ছা জন্মে, স্রোতঃ সমূহের মুখ পরিষ্কৃত থাকে, উদ্গার বিশুদ্ধ হয়, বায়ু সরল থাকে এবং বাত-মূত্র ও পুরীষের বেগ থাকে না ; এইরূপ অবস্থায় হিতভোজন করিলে সেই ভুক্ত আহার সমস্ত শরীর-ধাতুকে অদুষ্ট রাখিয়া কেবল আয়ুকেই বর্দ্ধিত করে ; অতএব পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে ভোজন করিবে।

পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে পবিত্র স্থানে বসিয়া অনন্যচিত্তে ভোজন করিবে। ভোজনকালে কথা কহিবে না, হাসিবে না, অতিদ্রুত বা অতিবিলম্বিতভাবে খাইবে না। অতিদ্রুত খাইলে ভুক্তদ্রব্য শরীরের ভিতর পাচকরসের সহিত যথাবৎ মিশ্রিত হইতে পারে না, দ্রব্যের স্বাদও গ্রহণ করা যায় না এবং তাহা কোষ্ঠেও যথাবৎ অবস্থিত হয় না, ভোজ্যদ্রব্যের দোষগুণেরও নিয়ত উপলব্ধি হয় না। অতিবিলম্বিত ভোজন করিলে তৃপ্তি পাওয়া যায় না, অধিক ভোজন করা হয়, আহার দ্রব্য সকল শীতল হইয়া যায় এবং ভুক্তদ্রব্যের পাক সমানভাবে হয় না।

কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিয়া খাইবে, কারণ কুক্ষি তিন অংশে বিভক্ত কল্পনা করিতে হয়,—এক অংশ বায়ু, পিত্ত ও কফের সঞ্চারণের জন্য রাখিয়া দিবে।

আহার্য্যের মধ্যে শালিধান, মুগ, সৈন্ধব, আমলকী, যব, নির্ম্মল জল, দুগ্ধ, ঘৃত, জাঙ্গল পশুর মাংস ও মধু এই সকল দ্রব্য নিত্য সেব্য।

শরীর-স্থিতিকারক দ্রব্যের মধ্যে অন্ন, সান্ত্বনাজনক দ্রব্যের মধ্যে জল, শ্রমহর বস্তুর মধ্যে সুরা, জীবনীয় বস্তুর মধ্যে দুগ্ধ, বৃংহনীয় অর্থাৎ পুষ্টিকারক বস্তুর মধ্যে মাংস, তৃপ্তিকারক বস্তুর মধ্যে মাংসরস, অম্লদ্রব্য, রুচিকারক দ্রব্যের মধ্যে লবণ, হৃদ্য দ্রব্যের মধ্যে অম্ল, বলকারক বস্তুর মধ্যে কুক্কুট মাংস, বৃষ্য পদার্থের মধ্যে কুম্ভীরশুক্র, শরীরস্থিরত্বকারক বিষয়ের মধ্যে ব্যায়াম, শরীরের কৃশতাকারক বিষয়ের মধ্যে মৈথুন, মূত্রজনক দ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু, পুরীষজনক দ্রব্যের মধ্যে যব এবং যৌবন স্থিতিকারক পদার্থের মধ্যে আমলকী শ্রেষ্ঠতম।

চাউলের মধ্যে রক্তশালি, ডাইলের মধ্যে মুগ, লবণের মধ্যে সৈন্ধব-লবণ, মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য, মাংসের মধ্যে মৃগ মাংস, শাকের মধ্যে জীবন্তীশাক, ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃত, দুগ্ধের মধ্যে গব্য দুগ্ধ, কন্দের মধ্যে আদা, ফলের মধ্যে দ্রাক্ষা ও ইক্ষুবিকারের মধ্যে শর্করা পথ্যতমত্বে শ্রেষ্ঠতম।

কতকগুলি দ্রব্য স্বভাবতই গুরু, আবার কতকগুলি স্বভাবতই লঘু। সংস্কার বশতঃ গুরুদ্রব্যেরও লঘুত্ব হয় এবং লঘুদ্রব্যেরও গুরুত্ব হইয়া থাকে। গুরু-ব্রীহি ধান্য সংস্কারদ্বারা লঘু খই হয়। গুরুদ্রব্যও অল্পমাত্রায় খাইলে লঘু হয় এবং লঘুদ্রব্যও অতিমাত্রায় ভক্ষণ করিলে গুরু হইয়া থাকে।

দুগ্ধের সহিত মৎস্য ভোজন করিবে না। মধু, তিল, গুড়, দুগ্ধ, মাষকলাই, মূলা ইহাদের কাহারও সহিত ছাগ বা মেষ প্রভৃতি গ্রাম্য মাংস একত্র ভোজন করিবে না। সর্ষপ তৈল দ্বারা ভর্জ্জিত কপোত মাংস খাইবে না। মূলা, রসুন, শজিনা শাক ও তুলসী খাইয়া দুগ্ধ পান করিবে না ; যেহেতু তাহাতে কুষ্ঠ হইতে পারে। আম্র, আমড়া, কুল, চাল্‌তা, জাম, কয়েতবেল, তেঁতুল, কাঁটাল, নারিকেল, দাড়িম, আমলকী ও কোন-রূপ অম্ল দুগ্ধের সহিত একত্র ভোজন করিবে না। দধি ও মৎস্য একত্র ভোজন বিরুদ্ধ হয়। মধু উষ্ণ করিয়া অথবা উষ্ণার্ত্ত হইয়া মধুপান করিলে মরণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। সমপরিমিত মধু ও ঘৃত অথবা সমপরিমিত ঘৃত ও বৃষ্টির জল বিষতুল্য। রাত্রিকালে দধিভোজন করিবে না ; অন্য সময়েও ঘৃত, চিনি, মধু, মুদ্গযূষ বা আমলকীর রস, ইহাদের কোন একটির সহিত মিশ্রিত না করিয়া কেবলমাত্র দধি খাইবে না।

আমাদের দেশে আম বা কাঁঠালের সহিত একত্র দুগ্ধপান প্রচলিত। ইহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনও ক্ষতি দেখা যায় না। দেশের আচার অনুসারে আমরা অনেক সময়ে বাল্যকাল হইতেই কতকগুলি বিরুদ্ধ ভোজনে অভ্যস্ত হই। এইরূপে সেইগুলি আমাদের সাত্ম্য হইয়া যায় বলিয়া উহা দ্বারা স্বাস্থ্যের কোনও অনিষ্ট হয় না। তবে যতদূর সম্ভব বিরুদ্ধ ভোজন সাত্ম্য করা উচিত নহে। কারণ কি জন্য স্বাস্থ্য খারাপ হয় তাহা সকল সময়ে নির্দ্ধারণ করা যায় না।

গ্রীষ্মকালে চিনি ও ছাতুর সরবৎ খাইবে, এবং ঘৃত, দুগ্ধ ও শালি তণ্ডুলের অন্ন সেবন করিবে। বর্ষাকালে বিশুদ্ধ পানীয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। এই সময়ে নদীর জল পান করিবে না, কূপের বা সরোবরের বা বৃষ্টির জল উত্তপ্ত করিয়া সেই জল শীতল হইলে পান

করিবে। শরৎকালে তিক্ত ও মধুর অন্নপান সকল উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। যে জল সমস্ত দিন সূর্য্যাতপে সন্তপ্ত এবং রাত্রিকালে চন্দ্র কিরণে সুশীতল সেই জলকে হংসোদক বলে। শরৎকালে এইরূপ বিশুদ্ধ হংসোদক স্নানে ও পানে ব্যবহার করিবে; ইহা অমৃততুল্য। হেমন্ত ও শীতকালে গব্যরস, গুড়াদি ইক্ষুবিকার, তৈল ও উষ্ণজল পান করিবে। বসন্তকালে যব ও গোধূম ভোজন করিবে।

ভোজনের পর যাহা পান করা যায় তাহাকে অনুপান বলে। অনুপান ভুক্ত দ্রব্যের সঙ্ঘাত ভাঙ্গিয়া দেয়, ভুক্ত দ্রব্যকে কোমল করে, জীর্ণ করে এবং ভুক্ত দ্রব্যের সুখপরিণাম জন্মাইয়া দেয়। শীতল জল, উষ্ণ জল, মদ্য, কাঁজী ও মাংসরস এই সকল দ্রব্য অনুপানার্থ ব্যবহৃত হয়। অনুপানের মধ্যে জলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জীবাত্মা কি দেহাতিরিক্ত পদার্থ?

শ্রীধনকৃষ্ণ দেব বিশ্বাস বি-এল

ভারতবর্ষের ২য় খণ্ডের ৪র্থ সংখ্যায় দেখিলাম শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম-এ, বি-এল মহাশয় লিখিয়াছেন "আমরা এখন সকলেই দেহাতিরিক্ত একটা জীবাত্মা স্বীকার করিয়া থাকি।" এইটা দেখিয়াই আমার ঐ প্রবন্ধটি পড়িতে বিশেষ আগ্রহ হইল। কারণ দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাই আমাদের প্রকৃত উন্নতির সোপান। এই জগতে আসিয়া আমরা যাহা শিখি বা ভোগ করি, তাহার মধ্যে যাহা নিত্য বা যাহা আমাদের চিরস্থায়ী, তাহাই আদরের বস্তু, ও তাহারই আলোচনা করা উচিত বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, যাহা অনিত্য, বা দুই চার বৎসর বাদে, বা এই দেহের সহিত যাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার জন্য অধিক প্রয়াস ব্যর্থ বলিয়াই মনে করি।

সকলেই নিত্য সুখ, নিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে। এই নিত্য শব্দের অর্থ ব্যক্তি বিশেষে নানা ভাবে গৃহীত হয়। কেহ নিত্য মানে "বহুদিন স্থায়ী", কেহ নিত্য অর্থে "আজীবন স্থায়ী", আবার কেহ নিত্য মানে "জন্ম-জন্মান্তর স্থায়ী" জ্ঞান করেন। এই নিত্য শব্দ মনুষ্যের বিশ্বাস অনুসারে অল্প বা দীর্ঘ কাল বা আজীবন বা জীবনান্তর স্থায়ী বলিয়া গৃহীত হয়।

যাহার যেরূপ জ্ঞান হউক না কেন, সকলেই যে নিজের মতে নিত্য সুখের আকাঙ্ক্ষী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমি দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাকে নিত্য বলিয়াছি, তাহার কারণ, ঐ শাস্ত্রের আলোচনার সুখ যে কেবল ঐ শাস্ত্র আলোচনার সময়েই থাকে তাহা নয়, ঐ আলোচনার পরও উহার স্মৃতি ও উহার সিদ্ধান্তীকৃত সত্য সকল আমাদের জীবনের অনেক সময়, এমন কি জীবনব্যাপী রূপেই আমাদের সুখ ও শান্তির পথ মুক্ত করে। এবং আর্য্য শাস্ত্র মতে উহা ইহজীবনের পর পরজন্মেও আমাদের গতি বা গণ নির্দ্দেশ করে। কারণ আমরা যাহাকে মানুষের গণ বলিয়া জানি, যথা, দেবগণ, নরগণ ও রাক্ষসগণ তাহা আমাদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল জনিত ঊর্দ্ধগতি, স্থিতি বা অধঃগতির সঙ্কেত-চিহ্নমাত্র।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ষষ্ঠাধ্যায়ে ৪০-৪৫ শ্লোকে এই নিত্য সুখময় বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। উহার মধ্যে আমি কেবল দুইটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

> প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
> শুচীনাং শ্রীমতাংগেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৬।৪১

অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত লোক অনেক দিন ভোগ করিয়া পরে শুচী ও শ্রীমান লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

> তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
> যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌকুরুনন্দন ॥৬।৪৩

জীব ঐ শুচী ও শ্রীমানের ঘরে জন্মাইয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন- অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যতটুকু অবধি সাধনা হইয়া তাহার জীবন শেষ হইয়াছিল তাহার পর হইতেই আবার অগ্রসর হন।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে আর্য্য শাস্ত্র মতে মানুষের পূর্ব্বজন্মকৃত চেষ্টা বিফল হয় না—মৃত্যুর পর তাহার পূর্ব্ব বিদ্যা সঞ্চিতভাবে সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে এবং যখন তিনি পুনরায় স্থূল দেহ গ্রহণ করিয়া এই জগতে কার্য্য করিবার জন্য অবতীর্ণ হন তখনই তাহার পূর্ব্ব সঞ্চিত বুদ্ধিবৃত্তি সকল তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কারণ আমাদের প্রবাদ আছে:—

> পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত ধন ও পূর্ব্বজন্ম অর্জ্জিতা বিদ্যা মানুষে পরজন্মে পায়।

পূর্ব্বজন্মের বিদ্যার প্রাপ্তি আমরা মানুষের জন্মের পর বুদ্ধির তারতম্যানুসারেই অনুমান করিয়া লই। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধন কিরূপে আমাদের নিকট আসে, এবং সে ধন কিরূপে বা অর্জ্জিত হইয়া থাকে—এ বিষয়ে অনেকের মনে একটু উৎকণ্ঠা হওয়ায় বলিয়া আমি লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত যে ধন জীবের নিকট আসে তাহা "সিন্দুকে ভরা ধন নয়"—সিন্দুকে ভরা কৃপণের ধন সঞ্চিত ধন নয়—যে ধন সৎ বা উপযুক্ত পাত্রে দত্ত হয় যাহার দ্বারা দরিদ্র ভগবানের সেবা হয় সেই ধনই জীবের সঞ্চিত ধন। উহা পরজন্মে আবার দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য উপযুক্ত পাত্রের নিকট আসে। কিন্তু যে ধন পরজন্মে পাইব আকাঙ্ক্ষা করিয়া কল্পিত দেবদেবীর নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, তাহা কখনও পরজন্মে আসে না; কারণ, কল্পিত দেবদেবীর অস্তিত্ব বা শক্তি উহাদের পূজকের শক্তির উপর নির্ভর করে। পূজক যদি দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার সময় তাহাতে প্রকৃতভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহা হইলেই ঐ দেবদেবী শক্তিশালী হন; নতুবা তাঁহারা কেবল পূজকের ভরণ-পোষণকারী হন—অনেক স্থানে তাহাও হন না। অর্থাৎ দেবদেবী পূজার দ্বারা পেট ভরে না।

অতঃপর যে শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা আমাদের ফল নিত্য হয় এবং জন্মজন্মান্তরেও তাহার ফল ভোগ হয় আমি তাহাকেই প্রকৃত দর্শন বা পথপ্রদর্শক শাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান করি।

এখন দেখা যাক "জীবাত্মা দেহাতিরিক্ত" বস্তু কি না ?

এই বিষয় মীমাংসা করিতে গেলে আমাদের আর্য্য দর্শন শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুশীলন করিতে হয়, নতুবা আমরা "জীবাত্মা"র প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিব না।

আর্য্যগণের সৃষ্টি খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মত ঈশ্বর হইতে কোন পৃথক বস্তু নয়। অর্থাৎ ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট জগৎ ভিন্ন, অন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত নয়। এবং আর্য্যগণের সৃষ্ট পদার্থও ঈশ্বরের দৈহিক পদার্থ হইতে পৃথক নয়।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিতে গেলে ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই।

তবে কি পশু পক্ষী, মলবিষ্ঠাদিও কি ব্রহ্ম ?

হাঁ। তা নয় ত কি ? যখন ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই, তখন অবশ্য মলবিষ্ঠাদিকেও ব্রহ্ম বলিয়া ধরিতে হইবে—বিশ্বাস করিতে পারি বা না পারি উহা করিতে হইবে।

কিন্তু উহার বিশ্বাসসাধন কি প্রকারে হয় ?

শাস্ত্র জ্ঞান ও শাস্ত্র বিচারই প্রকৃত সাত্ত্বিক বিশ্বাসের কারণ। শাস্ত্রে কি বলিতেছেন ? এই বিষয়ের উত্তরে আমি বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিব না—কারণ বেদাদিতে আমার জ্ঞান নাই, বেদ অনেক দুর্ব্বোধ্য এবং আমরা বেদ বুঝি আচার্য্যগণের ব্যাখ্যার দ্বারা—কিন্তু আচার্য্যগণই যে নির্ভুল তাহার প্রমাণ নাই। যথা সায়নাচার্য্য বেদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আর্য্যকে "ত্রৈবর্ণিক" অর্থাৎ কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন দ্বিজ জাতি হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। ইহা কি ঠিক ? অতএব আমি বেদাদির প্রমাণ না দিয়া সাধারণের হস্তগত ও সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য গীতা—যাহা উপনিষদের সার তাহা হইতেই আমার প্রমাণ সকল গ্রহণ করিয়া আমার পাঠকবর্গের তুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করিব।

গীতায় সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান যখন বলিলেন

"জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্মতদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥৭।২৯
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽ পি চ মাং তে বিদুর্যুক্ত চেতসঃ ॥৭।৩০

শ্রীকৃষ্ণ উপরিউক্ত শ্লোক দ্বয় দ্বারা আপনার কয়টী ভাব প্রকাশ করিলেন ; যথা—

১। ব্রহ্ম। ২। অধ্যাত্ম। ৩। কর্ম্ম। ৪। অধিভূত। ৫। অধিদৈব। ৬। অধিযজ্ঞ। এই ছয় ভাব দ্বারা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। এই ছয়টি স্বরূপ বুঝিলেই আমাদের জরা ও মরণের শেষ হয়। অর্থাৎ আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দ্বারা "ব্রহ্মভূত" হই।

এই জন্য অর্জ্জুন ভগবানকে ঐ সকল প্রকাশ করিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। অষ্টম অধ্যায় প্রথম শ্লোক দ্বারা ঐ প্রশ্ন করা হইল।

উহার উত্তর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুই শ্লোক দ্বারা দেওয়া হইয়াছে।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্ম মুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সজ্ঞিতঃ ॥৮।৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতং।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥৮।৪

ব্রহ্মের বিষয় জানিতে গেলে নিজেদের ব্রহ্মের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে দেখিতে হয়। নতুবা ব্রহ্মের বাহিরে আসিয়া ব্রহ্মকে দেখিতে গেলে ব্রহ্ম দেখা হইবে না,—জগৎ দেখা হইবে মাত্র। কারণ জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। যাঁহারা জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক ভাবেন তাঁহারা নিজেদের ব্রহ্ম হইতে আগেই পৃথক করার জন্য তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, জগতেরই জ্ঞান হয়। জগতের কোন জ্ঞানই নিত্য নয়—কারণ "জগৎ" অর্থে যাহা পরিবর্ত্তনশীল অতএব অনিত্য। কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য।

ব্রহ্ম যদি নিত্য হয় তবে তাহার মধ্যে জগৎ থাকে কি প্রকারে ? নিত্য ও অনিত্যের অস্তিত্ব একাধারে কি প্রকারে হয় ?

এখানে সমস্যা অতি কঠিন ; কিন্তু অতি কঠিন হইলেও দুর্ব্বোধ্য নয়। এইখানে ব্রহ্মের ধারণা করিতে গেলে অগ্রে নিত্য ও অনিত্যের ধারণা করিতে হইবে।

নিত্য কি ? যাহা অক্ষর তাহাই নিত্য, তাহাই ব্রহ্ম। অক্ষর কি ? যাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, যাহার মধ্যে সমস্তের অস্তিত্ব সম্ভব, যাহার মধ্যে অবস্থা পরিবর্ত্তনের সুযোগ আছে কিন্তু ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহার স্বভাবের কোন প্রত্যবায় হয় না, তাহাকেই অক্ষর বা নিত্য বা ব্রহ্ম বলা যায়। এই কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল বিষ্ঠা ও চন্দন সকলই ব্রহ্মান্তর্গত হয়।

এই ব্রহ্মের ধারণা করিতে গেলে আমাদের ভাবিতে হইবে—

অখণ্ডং মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।

অর্থাৎ অখণ্ড অর্থাৎ বিভাগশূন্য যে গোলাকার, যাহার দ্বারা চর গতিশীল, অচর—স্থাবর সমস্ত বস্তুই ব্যাপ্ত তাহাই ব্রহ্ম।

এই অক্ষর ব্রহ্ম ভাবিতে গেলে আমাদের সামনে একটা খুব বড় গোলাকার বস্তু আনিতে হইবে—ঐ গোলাকার বস্তু কোন Globeএর প্রতিকৃতি দ্বারা হইবে না। ঐ গোলক আমা হইতে পৃথক, আমি উহা হইতে ভিন্ন। অতএব এমন একটী গোল পদার্থ সামনে আনিতে হইবে যাহার মধ্যে আমিও আছি—তুমিও আছ—সকলেই আছেন।

এ গোল পদার্থ কি ? ইহা কি পৃথিবী ?

তাহাও নয় ; কারণ—আমরা পৃথিবী বলিলে যাহা বুঝি আমরা তাহার উপরে থাকি এবং তাহা হইতে আমাদের পৃথক জ্ঞান করি—অতএব পৃথিবী দ্বারা আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। অতএব এ গোল কি ?—এই গোল পদার্থ ভাবিতে গেলে এই নভোমণ্ডল সমন্বিত ত্রিলোক ভাবিতে হইবে—এই ত্রিলোক ভিন্ন বড় বস্তুর ধারণা করিবার আমাদের এখন ক্ষমতা নাই।

অতএব এই নভোমণ্ডল সমন্বিত এই পৃথিবীকে ও পৃথিবী মধ্যস্থিত সমস্ত জীব জন্তুকে যদি একটী অভিন্ন পদার্থ জ্ঞান করিতে পারি তাহা হইলে আমরা ব্রহ্মের কথঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারি।

এই "অখণ্ড মণ্ডলাকারে"র মধ্যে যাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে তাহাদের অভিন্ন ভাবিতে হইবে। Parallel lines never meet জানিলেও যেমন রেলের দুইটী সমান্তরাল রেলকে দূরে মিশিতে

রথিয়া পূর্ব্বোক্ত সত্যকে যেমন মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ এই খণ্ড গোল আকাশ মধ্যে সমস্ত জীব ও পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও াহাদের অভিন্ন জ্ঞান করিতে হইবে ও আমার ভেদজ্ঞানকে মিথ্যা লিয় বিশ্বাস করিতে হইবে। যদি আমরা এই অসাধ্য সাধন করিতে ারি তবেই এই অক্ষর ব্রহ্মের ধারণা হইবে নতুবা নয়।

উহার জন্য আমায় একটু উপমার আশ্রয় লইতে হইবে। এই অখণ্ড াকাশ মধ্যে বায়ু আছে ও বায়ুর ভিতরে বাষ্পকণা আছে ইহা সকলেই বশ্বাস করিতে পারেন। ঐ আকাশস্থিত বায়ু কখন এক ভাবে থাকে া; অর্থাৎ ঐ বায়ু কখন মৃদুমন্দ বাতাস, কখন প্রবল বাতাস, কখন ঝড়, খন সাইক্লোন, কখন বা টরনেডো ভাবে লক্ষিত হয়। কিন্তু ঐ বায়ুর ভন্ন ভিন্ন আকার ধারণ জন্য বায়ুর মধ্যে কোন নিত্য ব্যবচ্ছেদ াপিত হয় কি? না!

সেইরূপ বায়ুর মধ্যে জলকণা সকল সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র, কিঞ্চিৎ দূর ব্যধি রহিয়াছে। কখনও তাহারা মেঘভাবে দৃষ্টিপথে আসে, আবার কখনও দৃশ্য হয়। কখন তাহারা লাল রং, কখন সাদা রং, কখন বা ভন্ন ভিন্ন রংয়ে প্রতীয়মান হয়। আবার তৎক্ষণাৎ রং পরিবর্ত্তন করে। খন মেঘে বাঘের আকার, কখন হস্তীর আকার, কখন মানুষের াকার আদি দৃশ্য হয়, আবার পরক্ষণেই তাহারা অদৃশ্য হয়।

বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার, এবং জলকণার ভন্ন ভিন্ন রংএ ও ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ দ্বারা যমন বায়ুর ও জলকণার স্থায়ী বা নিত্য বিচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ "অখণ্ড গোলাকার" ব্রহ্মের ভিতর যে সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু আছে, তাঁহাদের াকার বা অবস্থা পরিবর্ত্তনের দ্বারা ব্রহ্মের কোনও ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। হাই ব্রহ্মের অক্ষর ভাব। অতএব ব্রহ্ম বলিতে গেলে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের শ্বর ও ঈশ্বর অতিরিক্ত জগৎ বুঝিলে হইবে না।

আর্য্যগণের ব্রহ্ম ও জগৎ এক। তবে যেমন আকাশের মধ্যে বায়ু র্ব্বব্যাপী, যেমন বায়ুর মধ্যে মেঘ অল্পব্যাপী, সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে জগৎ ল্পব্যাপী হইলেও ব্রহ্মের অঙ্গভুক্ত 'একাংশেন স্থিতো জগৎ' এবং ব্রহ্ম ইতে পৃথক নয়।

এই কারণ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

পূর্ণ মদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব শিষ্যতে॥

ব্রহ্মও পূর্ণ, জগৎও পূর্ণ, পূর্ণ বস্তু হইতে যাহা উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ থকভাবে প্রতীয়মান হয়) তাহাও পূর্ণ—(কারণ ঐ প্রতীয়মান পৃথক ত্য নয় উহা ক্ষণিক) এবং উহাতেও পূর্ণের সমস্ত গুণ বর্ত্তমান আছে দিও তাহা সর্ব্বদা প্রকাশ পায় না) ইহাই জীবভাব। পূর্ণ হইতে পূর্ণ হণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে—(কারণ পূর্ণ হইতে কোন অংশ রিয়া কোথায় রাখিবে ও ঐ পূর্ণের বিভাগ কোন বস্তুর দ্বারা হইবে? লের বিভাগ কি জল দ্বারা সম্ভব, জলে ঊর্ম্মিমালার দ্বারা যেমন জলের চ্ছেদ হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মের ভেদ না। অতএব, ব্রহ্ম, জীব ও জীবের শরীর পরস্পর পৃথক নয়।

উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা আমি ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের সন্নিকটে আসিলাম। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীব পৃথক উপাদানে গঠিত নয়, উভয়েরই উপাদান এক, তবে উভয়ের ভাবের একটু পার্থক্য আছে। ব্রহ্ম সকলকে নিজের অন্তর্ভুক্ত জানেন, এক জীব নিজেকে অন্য জীব হইতে পৃথকভাবে দেখেন। জীবের এই পৃথক দৃষ্টিই ভাগবত জগৎ সৃষ্টির মায়া কৌশলের অবিদ্যা অংশ। যখন জীবের এই অবিদ্যাংশ দূর হইয়া জীব আপনার ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে তখনই উহার জীবভাব নষ্ট হইয়া ব্রহ্মভাব আসিবে। জীবের এই স্বরূপ জ্ঞানই মায়ার অন্তর্গত বিদ্যার বিষয়। এই অবিদ্যা ও বিদ্যা লইয়াই মায়ার দ্বারা জগতের লীলা। এই মায়ার বিষয় আমি পরে বলিব। এখন জীব ও ব্রহ্ম যে এক তাহার প্রমাণ—মেঘ আকাশের মধ্যে যেরূপ, জীবও ব্রহ্ম মধ্যে সেইরূপ পৃথক ও অপৃথক, অনিত্য ও নিত্য, স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থা মাত্র।

ব্রহ্মের এই সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থার প্রভেদ ও তাহার ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পুরুষোত্তম ভাবে স্থিতি এবং তাহার অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ ভাবে অস্তিত্বের ভাব পরে প্রকাশ করিব এবং তখনই জীব সমস্যার সার্থকরূপে সমাধান হইবে।

এখন এইমাত্র বলিতে চাই "জীবাত্মা" "দেহাতিরিক্ত নয়"; কারণ, আত্মা ও দেহে প্রকৃত পার্থক্য নাই। দেহ ছাড়া দেহী থাকিতে পারে না, আধার ও আধেয়ের নিত্য সম্বন্ধ। এইজন্য "প্রকৃতি পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি" অর্থাৎ প্রকৃতি বা দেহ আর পুরুষ বা জীব চৈতন্য উভয়েই অনাদি। উভয়েই যদি অনাদি হয় তবে উভয়েই অনাদি ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত; অতএব "দেহ অতিরিক্ত জীব" হইতে পারে না। কিন্তু এই দেহ স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে পৃথক হইলেও দেহবাচ্য। আবার ঐ দেহ জন্ম ও মরণে পৃথক পৃথক হইলেও দেহবাচ্য। এবং এক জন্মেও ঐ দেহ, শৈশবে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এবং আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ দেহের পরমাণু সকল নূতন নূতন হইলেও ঐ দেহ এক পদবাচ্য। এই জন্য গীতায় ঐ দেহকে "বাসাংসি" বলা হইয়াছে। এই দেহ পরিবর্ত্তন দেহীর ইচ্ছাধীন। অতএব দেহ দেহীর ইচ্ছাধীন, কিন্তু দেহী দেহের অধীন নয়।

তবে ব্রহ্মের অবস্থা অচিন্ত্য "একোঽহং বহুস্যাম" বলিয়া যখন ব্রহ্মের মধ্যে নানা ঊর্ম্মিমালার উদয় হইল তখনই "ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও পুরুষে" বিভক্ত রূপে প্রতীয়মান হইলেন—উহাই পৌরাণিকগণের অর্দ্ধনারীশ্বর "হরগৌরী" মূর্ত্তি, উহাই "লক্ষ্মী নারায়ণ মূর্ত্তি"। ইহাই খৃষ্টানদের আদামের বাম কুক্ষিস্থ এক পঞ্জর হইতে ইভের সৃষ্টির কল্পনা। ইভ আদাম হইতে উৎপন্ন। সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ এক ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন বা প্রকাশিত, উহাতেই স্থিত ও উহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রভেদ অনিত্য। ব্রহ্মই সত্য ও নিত্য। ব্রহ্মই "সদসৎ" উভয়।

অহল্যা ও দ্রৌপদী

শ্রীবীরেশ্বর সেন

চৈত্রের 'ভারতবর্ষে' রায় সাহেব শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য লিখিত ভারতের পঞ্চকন্যা শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুই একটা কথা মনে হইল।

সকল বস্তুরই কারণ জানিবার ইচ্ছা মানুষের প্রকৃতিসিদ্ধ। লোকে যেখানে কোন কিছুর প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিতে পারে না অথবা ভুলিয়া গিয়াছে, সেখানে অনেক সময়ে একটা কারণ কল্পনা করিয়া লইয়াই তৃপ্তি লাভ করে। শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আমরা এই মনোবৃত্তির পরিচয় অনেক সময়েই পাইয়া থাকি। ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। পোর্ত্তুগীজেরা আমেরিকা হইতে আনানস নামক ফল এ দেশে আনিয়াছিল। আমরা ইহাকে আনারস বলি। আনারস যে আনানসের অপভ্রংস তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণ ইহা জানিত না। দাশু রায় বলিলেন, ইহার পোনর আনা ফেলিয়া দিয়া খাওয়ার উপযুক্ত এক আনা মাত্র থাকে বলিয়াই আনারস নাম হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত বলেন যে এই সুরস ফল স্বর্গ হইতে আনা হইয়াছে বলিয়াই আনারস নাম হইয়াছে।

২। ভাষাবিদেরা জানেন যে যবন শব্দ Ionia শব্দেরই রূপান্তর, কিন্তু আমাদের পৌরাণিকেরা যবন শব্দটার এক অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন বশিষ্ঠের গাভীর প্রস্রাব হইতে উৎপন্ন একদল মানুষের নামই যবন।

৩। আমাদের পৌরাণিকেরা বলেন যাহারা সুর বিরোধী তাহারদিগের নামই অসুর। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদেরা উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে অসুর শব্দটা আদিম—উহা অ এবং সুর এই দুই শব্দের মিল নহে। বেদে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাকে অসুর বলা হইয়াছে। অসুর হইতেই সুর হইয়াছে—সুর হইতে অসুর হয় নাই।

এইরূপে পুরাণকারেরা অতি অদ্ভুত এবং জঘন্য ভাবে অহল্যা-জার শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যখন পূর্ব্বকালের হিন্দুদিগকে দুশ্চরিত্র দেবগণের উপাসক বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন, তখন মহা পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট বৈদিক ধর্ম্মের সমর্থন করিয়া ইন্দ্র ও অহল্যাজার শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা এই। ইদ্ ধাতু 'ঐশ্বর্য্যে—যাঁহার পরম ঐশ্বর্য্য বা তেজ আছে তিনি ইন্দ্র। ইন্দ্র, সূর্য্য, আদিত্য প্রজাপতি এক ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। অহল্যা শব্দ অ+হল্যা নহে। ইহা অহন্ পূর্ব্বক লী ধাতু। অহল্যার অর্থ রাত্রি। জৄ ধাতু হইতে জার শব্দ হইয়াছে। ইহার অর্থ যিনি জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করেন তিনি জার। সূর্য্য বা ইন্দ্র রাত্রিকে ক্ষয় করেন বলিয়া তিনি অহল্যাজার সংজ্ঞের অর্থাৎ তিনি তমোনাশক।

কুমারিল ভট্টের নিজের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি—প্রজাপতি স্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। সমস্ত তেজাঃ পরমেশ্বরত্ব নিমিত্তেন্দ্র জরণ হেতুত্বাজ্. জীর্য্যত্যস্মা দনেন বোদিতেন বা হল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রী ব্যভিচারাৎ।

এই বিখ্যাত বচনটীর অবশিষ্ট অংশের মর্ম্ম এই যে সূর্য্য হইতে উষার উৎপত্তি হয় বলিয়া কেহ কেহ উষাকে সূর্য্যের কন্যা বলেন। আবার সূর্য্য ও উষা একত্র অবস্থান করেন বলিয়া কোন কবি তাঁহাদিগকে স্ত্রী পুরুষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই দুইটী কবি ব্যাখ্যার সমন্বয় করিতে গিয়া পৌরাণিকেরা কি কুকাণ্ড করিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন; সুতরাং উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তাহা পৌরাণিক অহল্যাজার কাহিনী অপেক্ষা বড় অল্প কুৎসিত ও ধিক্কারজনক নহে।

দ্রৌপদীর বিবাহ

পাণ্ডবেরা পাঁচ ভ্রাতায় মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহার ঐতিহাসিক কারণ ভুলিয়া গিয়াও পৌরাণিকেরা কম কুকাণ্ড করেন নাই। মহাভারত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে পাণ্ডবদের জন্ম হইয়াছিল হিমালয়প্রস্থে, যে দেশে অদ্যাপি সকল ভ্রাতায় মিলিয়া একটী মাত্র নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত পাণ্ডবেরা সেই দেশেই ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যে সেই দেশের প্রথা অনুসরণ করিয়া সকলে মিলিয়া এক নারীকে বিবাহ করিবেন তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তাহার কত শত বৎসর পরে যখন মহাভারতকার তাঁহাদের ইতিহাস লিখিতে বসিলেন, তাহার পূর্ব্বেই পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশ হইতে সেই অসভ্য প্রথা লুপ্ত হইয়াছিল। রাজকুলের এত বড় একটা সত্য ঘটনা মহাভারতকার উড়াইয়া দিতে পারিলেন না; সুতরাং দ্রৌপদীর বিবাহের কারণ সম্বন্ধে যতগুলি বানরোচিত গল্প প্রচলিত ছিল তাহা স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলেন। অথবা কোন ধর্ম্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি এই সকল গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমি এই গল্পগুলিকে বানরোচিত বলিলাম; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে সেই সকল গল্পের রচয়িতাকে গর্দ্দভ বলিয়াছেন।

বাঙ্গলা বানান *

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি-এ (U. S A.)

এইবার প্রবন্ধ "বাঙ্গলা বানান" সম্বন্ধে আমারও কিছু বক্তব্য জানাব। জান বোধ হয়, আমি Phonetic-ধ্বনি সম্বন্ধে কিছু interested, ও শিখ্তে চাই—সুযোগ পেলে চর্চ্চা করি ও যাঁর কাছে যেটুকু নিতে পারি তা চেয়ে বা কেড়ে নি। তাই তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা করছি।

* চৈত্র মাসের 'ভারতবর্ষে' বাঙ্গলা বানানসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রতিবাদ লিখিয়াছিলেন, হীরেন্দ্র বাবুর নিকট লিখিত এই পত্রাংশে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে; আমরা পত্রখানি যথাযথ

সেন মহাশয় ও রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ না পড়েই শুধু তোমার প্রবন্ধের মধ্যে আমার যা অবোধ্য ও শিক্ষনীয় তাই জানিতে চাই। এর মধ্যে অনেক জায়গায় না বুঝিতে পারা বা একমত না হতে পারার জন্তই এটা তোমাকে লেখা বিশেষভাবে।

ধ্বনি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, সেটা অনুভবনীয়। যে-কোন ধ্বনি শুনে যতটা তার সম্বন্ধে বোঝা যায় সে সম্বন্ধে ভাষায় পড়ে তা হয় ত আরও জটিল হয়ে পড়ে। হয় ত এখানে আমারও ঠিক হয়ে আসবে তাই। যা'হোক, আমার অমিল ও মতামত বিস্তৃত ভাবে জানাচ্ছি—ভাষা, ব্যাকরণ বা সাহিত্যের দিক হতে আমি মোটেই আমার বক্তব্য জানাচ্ছি না, সেটা পূর্ব্বেই বলে রাখলাম।

(১) ঙ্গ ঙ ং—বাঙ্গ্‌লা, বাঙ্‌লা, বাংলা—এই তিনটীতেই আমরা একই ধ্বনিতে 'ঙ্গ্‌' 'ঙ্‌' 'ং' উচ্চারণ করি বলিয়া মনে হয়। যদিও 'ঙ্গ' ধ্বনিতে 'গ' উচ্চারিত হওয়া উচিত। "বাঙ্গলা" "বাঙ্গালী" বানানে তোমার মতই সমর্থন করি। "বঙ্গ" শব্দে 'গ' উচ্চারণ করা হয়।

(২) "আমরা সর্ব্বত্র অনুস্বারকে "ঙ" রূপে উচ্চারণ করি তাহা মনে হয় না।" এইস্থানে আমার মনে হয় "ং" is the contracted form of 'ঙ"—কেন না এক সংস্কৃত ছাড়া—বাংলায় "ং" ও "ঙ" উচ্চারণ একই—কোন পার্থক্য নাই। সংস্কৃতে 'ং" ম হয় বটে। কিন্তু বাংলায় তফাৎ দেখিতে পাই না।—ব্যাং, ব্যাঙ; বাংলা, বাঙলা—ইত্যাদি।"

(৩) রাঢ়ে বোধ হয় 'বাঙ্গ্‌লা" বানান লিখিত ভাবে ব্যবহার হয়—'বাঙলা" ও 'বাংলা" হয় না তোমার লেখায় এইরূপ ভাব মনে হইতেছে। যদি উচ্চারণ অনুরূপ বল—তাহা হইলে কি রাঢে বাংগলা বাঙ্গলা) উচ্চারিত হয় ?

(৪) "বাঙ্গ্‌লার মধ্যস্থ যুক্ত ও স্থূল ধ্বনি"—'স্থূল' ধ্বনি মানে কি? Short & long এর Long—যদি Long হয় তাহা হইলেও বুঝিলাম না; কেন না Vowe এর ধ্বনিই কেবল short ও long হয়; Conso-nant এর soft, hard or aspirated vocalized ও non-vocalised ইত্যাদি হয়। যা'হোক, স্থূল মানে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে লিখো।

(৫) "'ঙ' 'ং' ও 'ঞ' ইহাদের কোনটীর স্বাধীন ধ্বনি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না" কেন? প্রত্যেক element বা শব্দেরই স্বাধীন ধ্বনি আছে—প্রত্যেকেই পরস্পরের (স্বর বা ব্যঞ্জন) সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে যদিও মানে হয় না। যেমন—টক্ (অম্ল), লাট্ (লাটসাহেব)—ক্ ও ট্ যেভাবে এই স্থানে স্বাধীন ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে, বাংলা, ব্যাঙ, পঞ্চ (পঞ্‌চ = পন্‌চ)—এখানেও "ং" "ঙ" ও "ঞ" সেইভাবেই উচ্চারিত হইতেছে। "তোমার "স্বাধীন ভাব" কথার মানে কি? ঙ, ং, ঞ initial ভাবে হয় ত ব্যবহার হয় না। তাছাড়া অন্ত সব elements যেমত প্‌, ত্‌, ট্‌, ন্‌—প্‌, ত্‌, ট, ন ইত্যাদি যে ভাবে উচ্চারিত হয়,—ঙ, ং ও ঞও সেইভাবে হয়। এ ছাড়া ঙ ও ঞ স্বরবর্ণ সংযোগ হইয়াও ব্যবহার হয়—কাঙালী, বাঙালী + মিঞা, ং এর সঙ্গে স্বরবর্ণ সংযোগ হইয়া কোন শব্দ আছে কি না জানি না—থাকে ত জানাইও।

"অন্তধ্বনি" ?

"স্বরের মৃদু সাহায্য না লইয়া ইহাদিগকে উচ্চারণ করা যায় না"—ইংরাজীতে—ম, ল, ন, ঙ, ং, ণ এইরূপ nasal consonantগুলিকে ও 'ল" কে Semi-Vowel বলা হয়। Because the voice is passed unobstructed through the nasal passage though the mouth passage is closed. In case of "ল" both the sides of the tongue is opened to have a passage of the voice and in case of ণ (in মিশ্র) through both mouth & nose. —তুমি হয় ত এইভাবেই "স্বরের মৃদু ধ্বনি" কথাটি উল্লেখ করিয়া থাকিবে। নচেৎ ইহা অন্য কোন সাধারণ স্বর (অ, আ, ই ইত্যাদি) যোগে উচ্চারিত হয় না।

"উচ্চারণ অনুসারে ঙ, ণ, ং এই তিনটাকে 'অৰ্দ্ধধ্বনিও বলা চলে" অৰ্দ্ধধ্বনি মানে কি? পাপ্‌ প্‌ কি অৰ্দ্ধধ্বনি? ব্যাং—'ং' কি অৰ্দ্ধধ্বনি? পাপ্‌ এর "প্‌" যদি অৰ্দ্ধধ্বনি হয় তাহা হইলে ব্যাং এর ংও অৰ্দ্ধধ্বনি বটে। কিন্তু অৰ্দ্ধধ্বনি কেন?

(৬) "'ঙ' 'ং', ও 'ণ' এই তিনের ধ্বনির মধ্যে একটা মিল আছে বটে, কিন্তু তিনটার মধ্যে কোনটাই কাহারো সহিত সম্পূর্ণ সমধ্বনি নহে। তিনটী ধ্বনির গতি বিভিন্নমুখী।"

মিল আছে—তিনটাই অনুনাসিক (nasal)। 'ঙ' ও 'ং' সমধ্বনি। ধ্বনির বিভিন্নমুখী গতি মানে কি?

"'ঙ'র ধ্বনি আত্মমুখী, 'ং'র বহির্মুখী, এবং 'ণ'র ধ্বনি অধোমুখী"



ডায়াগ্রাম নং ১

আত্মমুখী, বহির্মুখী ও অধোমুখী—মানে কি?

ঙ ও ং ধ্বনি একই (সংস্কৃতে ং—ম ভাবেও ব্যবহার হয় নচেৎ বাঙ্গলায় এক) আমি Diagram দিয়া নিজের বক্তব্য বলিব—কেন না তোমার ও তিনটী কথার মানে বুঝিলাম না।

1—নাক, 2—তালু, 3—জিব, 4—ঠোঁট, 5—দাঁত, 6—vocal chord

The formation in this diagram is :—the back of the tongue is raised & shut against the soft palate, while in that position voice is given from the vocal chords being passed through the nose, which gives sound of ঙ and ং as in বাংলা or ব্যাং; অঙ্ক or in বাঙলা or ব্যাঙ। নিজে এইভাবে ধ্বনি দিলে এইরূপ formation ছাড়া অন্য কিছু

হয় না অথবা ঐরূপ formation ঠিক করিয়া লইয়া ধ্বনি দিলে 'ঙ' ও 'ং' ছাড়া কিছু হয় না।

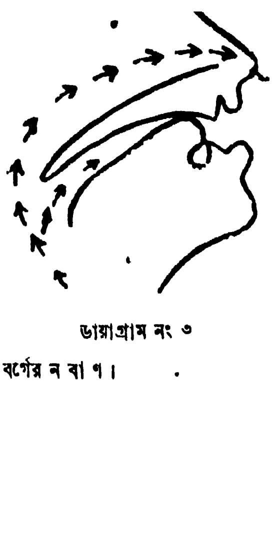
তার পর "ঞ"র ধ্বনি। আমার মতে দুই প্রকার—যেরূপ ভাষাতে পাই। তুমি এর মধ্যে "ঁ"কে আন নি কেন বুঝতে পারলাম না। "ঁ" ঞর contracted form, আমার মতে। 'ঞ'র দুই প্রকার ধ্বনিও diagram দিয়া দেখাইব।



ডায়াগ্রাম নং ২

মিঞা = মিঁা চাঁদ = চঁাদ্
জ্ঞান = গঞ্যান = গঁ্যান

'চাঁদ' এর চ—non-vocal—ঁ—nasal with mouth & nasal passage opened, followed by vowel আ & finally stopped by vocalized দ্ (phonetic) without vowel.



ডায়াগ্রাম নং ৩

পঞ্চ = প ঞ চ = প ন্ চ
চঞ্চল = চঞ্চল্ = চ ন্ চ ল্। এখানে "ঞ"র ধ্বনি "ন" হয়।

"ন" তিন প্রকার ও বিভিন্ন স্থানে উচ্চারিত হয়। দন্ত, কান্ত = দন্ত ও কান্ত —এই ন "দন্ত্য ন" কণ্ঠ = কন্ঠ ; পান = পাণ। এই "ন" ট বর্গের ন বা ণ।

আর "ঞ"র ন (পঞ্চ = পন্চ) হইতেছে "চ" বর্গের 'ন'। এই "ঞ" অথবা চ বর্গের "ন" এবং "ত" বর্গের ন— 'চ' বর্গ ও "ত" বর্গের কোন element এর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া ও "ঞ বা চ বর্গের ন" এবং "ত বর্গের ন" চ ও ত বর্গের কোন elementকে পরে সঙ্গে লইয়া ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় হয়। এ ছাড়া ইহার কোন ব্যবহার ঐরূপ ধ্বনিতে হয় না।—

পঞ্চ = পঞ্চ = পন্চ।

(1) কাঞ্চন = কাঞ্চন্ = কান্চন্।
ঝঞ্ঝা = ঝ ঞ ঝা = ঝন্ঝা—
জঞ্জাল = জ ঞ জাল্ = জন্জাল।

(2) অন্ত = অন্ত
আনন্দ = আনন্দ ইত্যাদি।

(৭) "যাহা হউক 'ঙ' র ধ্বনি উঁ কি!" কেন?
কুণ্ডনধ্বনিবৎ মানে কি?

"অন্য ধ্বনির সহিত যোগ না করিয়া "ঙ" উচ্চারণ করিতে হইলে উ, ও, বা অ প্রাকৃতধ্বনিরূপে ব্যবহার করি—" মোটেই না। "ঙ" ধ্বনির নাম উঁঅ (অ)। কিন্তু ধ্বনি "ঙ্" in ব্যাঙ, যেরূপ "ক" (ক্ + অ) ধ্বনির নাম কিন্তু প্রকৃত ধ্বনি "ক্" in বাক্।

তোমাকে আর বিরক্ত করব না। পড়ে ত হাঁসবেই। যদি চিঠির উত্তর দিতে হয় তবে একটু বিপদ তোমার হবে। উত্তরটা দিও—নইলে মনে করব আমার চেষ্টা বাচালতায় পরিণত। ভবিষ্যতে তোমার এই ভাবের প্রবন্ধ দেখলে বিশেষ আনন্দিত হব জেনো। একটু খাটলে তোমার কাছ হতে বাঙলা দেশ ক্রমশঃ কিছু পাবে জেনো! মাথা ও গতর খাটিয়ে একটু খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন কর না কেন! অনুরোধ।

বেশ দিন কেটে যাচ্ছে। আশা করি ভাল আছ।



ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"রুম"

অপরে যদি পিছনে যাইয়া কোমরটা জড়াইয়া ধরে তখন তাহার পাঁয়তারা দেখিয়া, যদি তাহার ডান পায়তারা থাকে, বাঁ-হাত দিয়া তাহার ডান কব্জীটা ধরিয়া, ডান দিকে ঘুরিয়া তাহার পিছনে যাওয়া বা ঝোঁক দিয়া তাহাকে নীচে লইয়া আসাকে "রুম" বলে। পিছনে যাইয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডান পা টী পিছাইয়া লইতে হইবে।



"রুম" ১ম



"রুম" ২য়

ডান পা টী একটু ডান দিকে ও বাঁ পা-টী সাম্‌নে আগাইয়া, ডান দিকে (একটু) ঘুরিয়া, নিজের ডান হাতটী তাহার সম্মুখ হইতে দুই পায়ের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া, নিজে

"উখাড় বা পুট্টি"

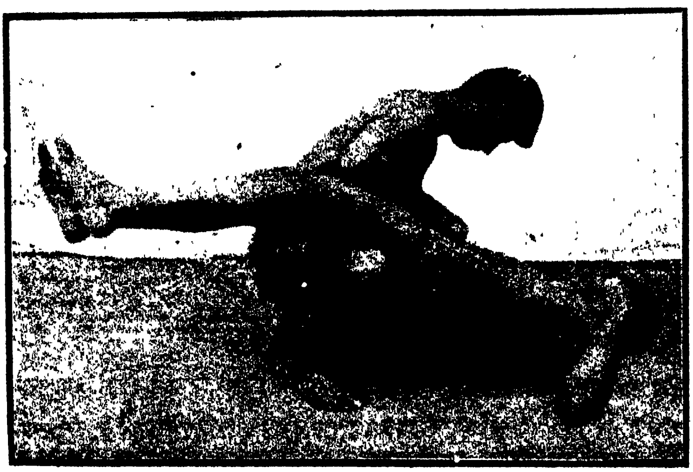
অপরের পিছনে যাইয়া কোমরটা দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া, হাতের জোরে তাহার শরীরটা একটু কাৎ করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া নীচে ফেলাকে "উখাড় বা পুট্টি" বলে।



"উখাড়"

"মতিচুর"

অপরের পিছনে যাইয়া পাঁয়তারা করিয়া দাঁড়াইয়া ("উখাড়" প্যাঁচের ন্যায়) কোমরটী দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া, নিজের হাতের জোরে তাহার শরীরটী একটু কাৎ করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া নীচে ফেলিবার সময় নিজে এক হাঁটু মাটিতে ও অপর হাঁটু তুলিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরটী উপর হইতে উলটাইয়া যে পা তোলা আছে সেই উরতের উপর চিৎ করিয়া ফেলাকে "মতিচুর" বলে।



"মতিচুর"

"ঘোর পালংয়ে টাং"

অপরে যখন পট করিবার জন্য দুই হাত দিয়া পা দুইটী ধরিতে আসে, তখন যদি তাহার মাথা নিজের বাঁ দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার মাথাটী চাপিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে

নিজের ডান পা-টী তাহার বাঁ বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ঘুরাইয়া পিঠের উপর চাপাইয়া দিয়া তাগার



"ঘোর পালংয়ে টাং"—১ম



"ঘোর পালংয়ে টাং"—২য়

শরীরটী বাঁ দিকে ঘুরাইয়া চিৎ করাকে "ঘোরপালংয়ে টাং" বলে।

"ঘুটনা"

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে



"ঘুটনা"—১ম

যদি তাহার ডান দিকে থাকে, তবে ডান হাঁটু তাহার ঘাড়ে রাখিয়া, বাঁ হাত দিয়া তাহার লেঙ্গটটা ধরিয়া জোরের

সহিত ঘাড়টী চাপিয়া রাখাকে "ঘুটনা" দেওয়া বলে। এইরূপে "ঘুটনা" দিবার সময় দুই হাত দিয়া তাহার



"ঘুটনা"—২য়

লেঙ্গটের দুই ধার ধরিয়া শরীরটী উল্‌টাইয়া দিয়া চিৎ করিতেও পারা যায়।

"ছট্‌পট্‌"

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে, ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার পাছার কাছে লেঙ্গটটী চাপিয়া ধরিয়া, ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান উরতের উপর রাখিয়া জোরের সহিত বসিয়া পরে বাঁ হাতটী তাহার পাছার মধ্য দিয়া ভিতরে চালাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে অপর হাতটী তাহার ডান কাঁধের উপর দিয়া ভিতরে



"ছট্‌ পট্‌—১ম"

চালাইয়া দিয়া, নিজের দুই হাত জোরে ধরিয়া কোলের উপর উল্‌টাইয়া চিৎ করাকে "ছট্‌ পট্‌" বলে।



"ধড়"

নিজে নীচে আসিয়া যখন হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসা যায় ও উপরে যে আছে সে যদি ডান দিকে থাকে এবং পাঁয়তারা ঠিক না রাখে, তখন তাহার ডান হাতটী নিজের ডান বগল দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া জোরের সহিত তাহার শরীরটা টানিয়া নিজে বাঁ দিকে কাৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীরটা তাহার শরীরের উপর দিয়া বাঁ দিকে ঘুরাইয়া লইয়া চিৎ করাকে "ধড়" বলে।



"ধড়—১ম"

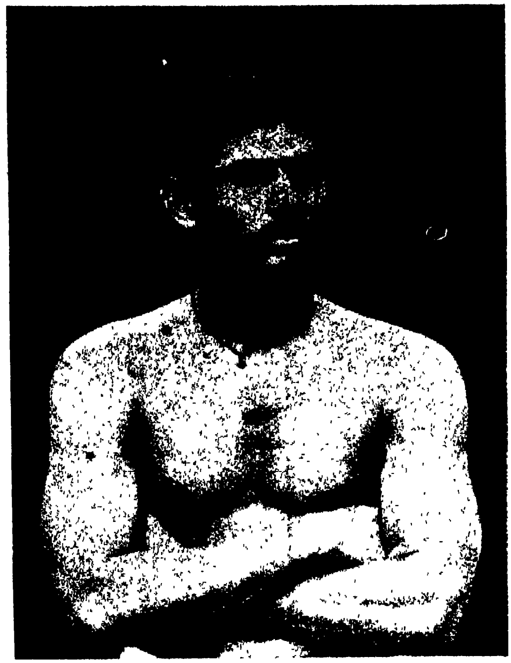


"ধড়—২য়"

"গাধালেট"

নিজে নীচে আসিয়া যখন হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসা যায় ও উপরে যে আছে সে যদি ডান দিকে থাকে এবং পাঁয়তারা ঠিক না রাখে, তখন তাহার বাঁ হাতটী নিজের বাঁ বগল দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া জোরের সহিত তাহার শরীরটী টানিয়া, নিজে ডান দিকে কাৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ("ধড়" প্যাঁচের ন্যায় নিজের শরীরটী তাহার শরীরের উপর দিয়া ডান দিকে ঘুরাইয়া লইয়া চিৎ করাকে "গাধালেট" বলে।

প্যাঁচগুলি এক ধার দিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেক প্যাঁচটী উপরে ও নীচে এবং ডান ধার ও বাঁ ধার দুই ধার দিয়াই করিতে পারা যায়। তবে হাতের ও পায়ের কাজ বদলাইয়া করিতে হইবে। প্যাঁচগুলি অভ্যাস করিবার সময় একাগ্রমনে ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত করিতে হইবে। কাহাকেও প্যাঁচ মারিতে যাইবার সময় নিজের ও অপরের ধরার অবস্থা, পাঁয়তারা ও "মওকা" (timing) অনুযায়ী প্যাঁচ মারিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা



লেখক



"গাধালেট"

গুরুমুখী বিদ্যা। উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্য পাইলে ইহা ঠিকভাবে ও শীঘ্র আয়ত্তে আসিবে। প্রবন্ধের বিষয় যদি কাহারও কিছু বলিবার ও জানিবার থাকে এই ঠিকানায় (৩২।২এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। আর বাকি প্যাঁচগুলি ও প্যাঁচের তোড়গুলি বই ছাপাইতে মনস্থ করিয়া বাকি রাখিলাম। প্যাঁচগুলি অল্প ছবির দ্বারা পরিষ্কাররূপে বোঝান কষ্টকর, সেই জন্য ছবি তুলাইবার কিছু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। বই বাহির করিবার সময় সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব।

উপস্থিত সমাপ্ত

ভ্রম সংশোধন *

বিগত চৈত্র মাসে এই প্রবন্ধের যে অংশ বাহির হইয়াছিল তাহাতে ছাপার কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। আশা করি পাঠকগণ সংশোধন করিয়া পড়িবেন।

"মুচ্ছীকোটা"র স্থানে "মুষ্কীকোটা" হইবে "বিদ্যা"র স্থানে "বিদ্যা" হইবে। ৫৩৯ পৃষ্ঠায় "হপ্তা" প্যাঁচের মধ্যে ৩য় লাইনে "ডান বগলের মধ্য দিয়া ডান হাত কিম্বা বাঁ বগলের মধ্য দিয়া বাঁ হাত চালাইয়া দিয়া" এইরূপ হইবে।

রাজেন্দ্র দত্ত

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

বিদ্যায়,—বুদ্ধিতে, সামাজিক প্রতিপত্তিতে, নীরব জনহিতৈষণায় ও উদার বিশ্বপ্রেমে যিনি অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত হইয়াও যিনি বিলাসের পুষ্পাস্তৃত পন্থা পরিহার পূর্ব্বক দীনের পর্ণকুটীরে মরণাহত রোগীর শয্যাপার্শ্বে দেবদূতের ন্যায় কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়া চিকিৎসা, সেবা ও পথ্য-প্রদান করিয়া অসহায় পরিবারবর্গের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এ দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজেন্দ্র দত্ত বা 'রাজাবাবু'র পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আজ 'ভারতবর্ষ' তাহার শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে।

পলাসীর যুদ্ধের পরে যে সকল ভাগ্যান্বেষী বাঙ্গালী কলিকাতায় আগমন করিয়া স্বাবলম্বন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের প্রভাবে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বহুবাজারের দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা অক্রূর দত্ত অন্যতম। হুগলী জেলায় মগরা ষ্টেসনের সন্নিহিত সোনাটিকুরি নামক গ্রামে অক্রূর দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইনি কৈশোর কাল আলস্যে ও আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন এবং অত্যধিক স্নেহপরায়ণা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার আদরে তিনি বিষয়কর্ম্মে মনোযোগ দিতে আদৌ উৎসুক ছিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একদিন এই ব্যাপার লইয়া স্ত্রীকে অত্যন্ত অনুযোগ করায় তিনি দেবরকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া প্রতিবেশীদিগের গৃহে অলস আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিতে নিষেধ করিলেন এবং স্বভাব পরিবর্ত্তন না করিলে ভাতের পরিবর্ত্তে ছাই খাইতে দিবেন বলিয়া শাসাইলেন। কিন্তু মানুষের স্বভাব একদিনেই পরিবর্ত্তিত হয় না। অক্রূর দত্তের একদিন বাটী ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল। তাঁহার ভ্রাতৃজায়াও তাঁহাকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভাতের থালায় অন্ন-ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটু ছাই রাখিয়া দিলেন। অক্রূর দত্তের ইহাতে মনে বড় কষ্ট হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ বাটী ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করিলেন। রাত্রিতে একটি গ্রামে একজন ধনীর অট্টালিকার বারাণ্ডায় অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেই অট্টালিকাটি একজন সম্পত্তিশালিনী ভূম্যধিকারিণীর সম্পত্তি; বর্গীরা সেই রাত্রে সেই বাটী লুণ্ঠন করিবে সংবাদ দিয়াছিল। বিধবা জমিদার গৃহিণী অক্রূর দত্তের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে স্বীয় ধর্ম্ম ও বহুমূল্য সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন এবং প্রীত হইয়া তাঁহাকে রাজরাজেশ্বর শালগ্রামশিলা, আকবরী মোহর, পঞ্চমুখী শঙ্খ, একমুখী রুদ্রাক্ষ ও কয়েকখানি সোণার ইট প্রদান করেন। অক্রূর দত্ত উহা লইয়া কলিকাতা আসেন এবং বহুবাজারে একজন সদ্গোপের বাটীতে আশ্রয় লন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পুণ্যশীলা রাণী রাসমণির শ্বশুর তাঁহারই ন্যায় একজন ভাগ্যান্বেষী পীরিতরাম দাসের সহিত আলাপ হইল এবং উভয়ে মিলিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অক্রূর দত্ত প্রথমে জাহাজে মাল বিক্রয় করিতেন, পরে সৈন্য-বিভাগে ঠিকাদারের কার্য্য করিতেন এবং অবশেষে জাহাজের কারবার করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আলিপুর জজ কোর্টে একটি মোকদ্দমার সাক্ষ্যে রাজেন্দ্র দত্ত বলেন যে অক্রূর দত্ত বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেন। ডায়মণ্ডহারবার হইতে কলিকাতায় এবং কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবারে পণ্যদ্রব্য প্রেরণের জন্য তাঁহার কতকগুলি জাহাজ ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুকালে ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার বংশধরগণ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন।

অক্রূর দত্তের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামমোহনের পাঁচ পুত্র হয়, যথা, দুর্গাচরণ, পার্ব্বতীচরণ, উমাচরণ, কালিদাস, শিবদাস। রাজেন্দ্র দত্ত পার্ব্বতীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে রাজেন্দ্র জন্মগ্রহণ

করেন। রাজেন্দ্রের জননী রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের ভাগিনেয়ী ছিলেন।

শৈশবেই রাজেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। কিন্তু তাঁহার স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাত দুর্গাচরণ ও তদীয় পত্নী বিমলা দাসী তাঁহাদের নিজের সন্তানদিগের অপেক্ষা রাজেন্দ্র দত্তকে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে পিতার অভাব জানিতে দেন নাই। পিতামহ রামমোহনও তাঁহার পৌত্রের সকল আবদার প্রসন্ন বদনে রক্ষা করিতেন। তখন কারেন্সী নোটের প্রচলন হয় নাই, এবং আদান-প্রদান সচরাচর রৌপ্যমুদ্রার দ্বারাই হইত। পিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাতের দেওয়ানখানায় স্তূপাকার রৌপ্যমুদ্রার উপর শিশু রাজেন্দ্র ক্রীড়া করিতেন, মুঠা মুঠা মুদ্রা লইয়া গিয়া দাস দাসী দীন দরিদ্রকে বিলাইতেন। কেহ কেহ গৃহকর্ত্তাকে ফিরাইয়া দিত, কেহ কেহ দিত না। পিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত শিশুর সহাস্য আনন দেখিয়া ক্ষতির কথা বিস্মৃত হইতেন। এইরূপে শৈশব হইতে রাজেন্দ্র শিখিয়াছিলেন যে, অর্থের মূল্য সঞ্চয়ে নহে, দীন-দরিদ্রের মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলায়। তিনি ভবিষ্যতে যখন ব্যবসায়ের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তখনও যেরূপ অর্থের মায়ায় আকৃষ্ট হন নাই, যখন তাঁহার ঋদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে, তিনি অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যদশায় পতিত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি অর্থের মায়া করেন নাই, মুক্ত হস্তে দীনের সেবা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মতলায় ডেভিড ড্রমণ্ড নামক একজন স্কট্ল্যাণ্ডবাসী 'ড্রমণ্ড একাডেমী' নামে একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ২৮ বৎসর বয়সে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সুকবি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবার বহু বৎসর পরেও তাঁহার স্বদেশে তাঁহার রচিত সুমধুর গীতগুলি গীত হইত। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি বঙ্গগৌরব মহাত্মগণের গুরু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এই ডেভিড ড্রমণ্ডের বিদ্যালয়েই তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং ড্রমণ্ডের যত্নবারি সেচনেই ডিরোজিওর প্রতিভামুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া দিগদিগন্তে অপূর্ব্ব সৌরভ বিস্তার করিয়াছিল। ড্রমণ্ড একাধারে কবি, দার্শনিক ও গণিতবিৎ ছিলেন। তাঁহার শেষজীবন দারিদ্র্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনাবলী স্কট্ল্যাণ্ডে প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহার প্রতিভামুগ্ধ বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের হস্তে দিয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হন। কেহ কেহ বলেন এগুলি প্রকাশিত হইলে তিনি রবার্ট বার্ণিসের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে জাহাজে রচনাগুলি স্কট্ল্যাণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহা জলমগ্ন হওয়ায় মৃত্যুর পরেও ডেভিড ড্রমণ্ড তাঁহার প্রতিভার পুরস্কার পাইলেন না! তিনি যে সকল ইঙ্গবঙ্গীয় সাময়িক-পত্রে সম্পাদক বা লেখকরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা হইতে এখনও তাঁহার কিছু কিছু রচনা উদ্ধার করা অসম্ভব নহে।

রাজেন্দ্র দত্ত বাল্যকালে এই ডেভিড ড্রমণ্ডের বিদ্যালয়েই য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় সহপাঠিগণের সঙ্গে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং ডেভিড ড্রমণ্ডের উপদেশে ডিরোজিওর ন্যায় স্বাধীন চিন্তা করিতে শিক্ষা করেন।

হিন্দু কলেজ এই সময়ে অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং রাজেন্দ্রকে উক্ত কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার সুযোগ না পাইয়া তিনি উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ড্রমণ্ডের স্কুলে ফিরিয়া আসেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ইহার পূর্ব্বেই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত সুগন্ধা গ্রাম নিবাসী রামচাঁদ মিত্রের কন্যা কৈলাসকামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি ক্রোরপতি রামদুলাল সরকারের দৌহিত্রী ও দয়াল মিত্রের ভগিনী ছিলেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর রাজেন্দ্রকে পারিবারিক বিষয়াদি পরিদর্শনের ভার প্রদত্ত হয়। দত্তমহাশয়দিগের তেজারতি কারবার ছিল। রাজেন্দ্র কতকগুলি দলিল পাঠে দেখিলেন যে, অনেকের নিকট বিস্তর সুদ প্রাপ্য হইয়াছে, সুদের হারও অত্যধিক। অধমর্ণগণ দায়ে পড়িয়া ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, কখনও শোধ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। দয়ার্দ্রচিত্ত যুবক এই সকল অধমর্ণদিগের দুর্দ্দশা চিন্তা করিতেন। তাহাদের নিরুপায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া

তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য কয়েকখানি দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরে একজন অধমর্ণ টাকা ফেরত দিতে আসিলে, দলিল কিছুতেই পাওয়া গেল না। উপর্য্যুপরি কয়েক দিন সেই অধমর্ণ ব্যর্থ চেষ্টা পাইয়া অবশেষে কর্ত্তাদের নিকট জানাইল, রাজাবাবু দলিল ফেরত দিতেছেন না, এদিকে সুদ বাড়িয়া যাইতেছে। রাজেন্দ্রের ডাক পড়িল এবং অবশেষে প্রকাশ পাইল যে রাজেন্দ্র যে কয়েকখানি দলিল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন প্রার্থিত দলিলখানি তাহাদেরই অন্যতম। কোমলহৃদয় রাজেন্দ্র দ্বারা এ সকল বিষয়-কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাকে উক্ত কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল এবং রাজেন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

অতঃপর রাজেন্দ্র দত্ত কিছুকাল মেডিকাল কলেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এইখানে স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। দরিদ্রগণের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজেন্দ্র একটি এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করতঃ দুর্গাচরণকে উহার চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্বয়ংও রোগীদিগকে দেখিতেন। এইরূপে ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথির প্রবর্ত্তক রাজেন্দ্র দত্ত প্রথম জীবনে এলোপ্যাথির বিস্তারের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

জ্ঞানচর্চ্চায় রাজেন্দ্রের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ছিল। তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে যে গার্হস্থ্য পুস্তকাগার করিয়াছিলেন তাহার অনুরূপ কলিকাতায় আর ছিল কি না সন্দেহ। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যাইত না, রাজেন্দ্রের পুস্তকাগারে তাহা মিলিত। বহু য়ুরোপীয় ও আমেরিক্যান পণ্ডিত তাঁহার পাঠাগারে আসিয়া গবেষণা করিতেন। একজন আমেরিক্যান পণ্ডিত ডাক্তার ফিট্জ্ এডওয়ার্ড হল ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া রাজেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি সন্দর্শনে এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, ৪৩ বৎসর পরে রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পর 'নিউ ইয়র্ক নেশন' পত্রে তাঁহার উচ্চ সুখ্যাতিপূর্ণ শ্রদ্ধাসূচক একটি প্রস্তাব প্রকাশিত করেন। ডাক্তার হলকে রাজেন্দ্র তদানীন্তন লর্ড বিশপের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেন এবং বারাণসী কলেজের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দেন। ডাক্তার হল ভারতবর্ষ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অক্সফোর্ডে প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক ও সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার পরীক্ষক হন এবং অবশেষে ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার হল রাজেন্দ্রের অপূর্ব্ব পুস্তক-সংগ্রহ ও পাঠানুরাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"রাজেন্দ্র দত্তের সমসাময়িকগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প বাঙ্গালীই শৈশব হইতে তাঁহার ন্যায় যত্নসহকারে আমাদের ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানে প্রবল অনুরাগের ফলে একপ্রকার প্রাচ্যভাববিবর্জ্জিত হইয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করায় ও যথেচ্ছ অবসর থাকায় তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যার্জ্জন এবং সকল প্রকারের গ্রন্থসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার গ্রন্থাগার কলিকাতার গার্হস্থ্য অন্যান্য গ্রন্থাগার অপেক্ষা বৃহৎ ও মূল্যবান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থাগার বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। তিনি কেবল গৃহশোভার জন্য এই পুস্তকরাশি সংগ্রহ করেন নাই; তাঁহার ক্রীত প্রত্যেক গ্রন্থ তিনি অন্ততঃ এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা না দেখিয়া শেলফে তুলিতে দিতেন না, এবং অভিধান বা পঞ্জিকাশ্রেণীর গ্রন্থ না হইলে শীঘ্রই পুনরায় সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করিতেন। এবং তাঁহার সেই পাঠ রীতিমত মনোযোগ ও সমালোচকের দৃষ্টিতে পঠিত হইত।

"উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ল্যাণ্ডরের প্রথম প্রকাশিত সমগ্র গ্রন্থাবলী তিনি প্রতিভামুগ্ধ পাঠকোচিত উৎসাহ ও আনন্দের সহিত প্রাপ্ত হইবার ছয় মাস পরে আমরা উহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব স্থির করি। বলা বাহুল্য ইতোমধ্যে আমরা উভয়েই উহা পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি অত্যুক্তি করিতেছি না, আমার বোধ হইয়াছিল সমুদায় তাঁহার কণ্ঠস্থ। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বহুবার আমরা আলোচনা করিতে বসিয়াছিলাম এবং জীবনচরিত ও ইতিহাসে তাঁহার অধিকার সন্দর্শন করিবার আমি যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছি। তাঁহার জ্ঞানের প্রসার ও অভ্রান্ততা আমার নিকট বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল।"

এই সময়ে তিনি ব্যবসায়েও যথেষ্ট উন্নতি করিয়া-

ছিলেন। বহু ইংরাজী, আমেরিকান ও গ্রীক হৌসের সহিত তিনি বেনিয়ানরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ডাইরেক্টরী দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ও তাঁহার খুল্লতাত কালিদাস দত্ত এই সময়ে নিম্নলিখিত য়ুরোপীয় ও ও আমেরিকান হৌসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—

(১) জর্জ্জ অকল্যাণ্ড (২) এটকিন্সন টিন্টন এণ্ড কোং (৩) রিচার্ড লিউইস (৪) নরম্যান ব্রাদার্স (৫) বি আর হুইলরাইট (৬) শিলিঞ্জি এণ্ড কোং।

বহু ইংরাজ ও আমেরিকান তাঁহার সাধুতা, অমায়িকতা ও শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং আজীবন এই বন্ধুত্বের স্মৃতি হৃদয়পটে উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন। থিওডোর, এ, নীল নামক একজন ধনী আমেরিক্যান বণিকের ২৮শে জুন ১৮৬৭ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্র রাজেন্দ্র দত্তের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি অতীতের বহু স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার আমেরিক্যান বন্ধুগণ রাজেন্দ্র দত্তের স্মৃতি তখনও কিরূপ উজ্জ্বলভাবে হৃদয়ে পোষণ করিতেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। মিষ্টার নীল রাজেন্দ্রের এক কন্যার নামানুসারে স্বীয় কন্যার নাম 'মাতঙ্গিনী' নীল রাখিয়াছিলেন এবং পত্র লিখিবার সময়ও তাঁহার সেই বিংশতিবর্ষীয় কন্যা মাতঙ্গিনী নীল রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত কাশ্মীরী শালখানি কিরূপ যত্নে রাখিয়াছেন ও তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন, তাহা জানাইয়াছেন। পত্রখানি দীর্ঘ বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে হইল।

এই সময়ে রাজেন্দ্র আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন দেশীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছানুরূপভাবে পরিচালিত করিতে লাগিলেন, তখন রাজেন্দ্র দত্ত কতিপয় হিন্দু নেতার সহিত মিলিত হইয়া একটি জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ইংরাজী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত গুরুচরণ দত্ত মহাশয়ের চিৎপুর রোডে একটি স্কুল ছিল। মতিলাল শীলের ফ্রী-স্কুলের সহিত সম্মিলিত করিয়া রাজেন্দ্র দত্ত একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন এবং মতিলাল শীলকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন। কলেজটির নাম হইল 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ'। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২রা মে তারিখে ৭৭ নং চিৎপুর রোডে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মতিলাল শীল এই কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক চারি শত টাকা অর্থসাহায্য করিতেন। অতিরিক্ত ব্যয় রাজেন্দ্র দত্ত স্বয়ং বহন করিতেন।

কলেজ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষাপরিষদের সভাপতি মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন চরিত্রদোষের জন্য হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। রিচার্ডসনের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি এ দেশে অতি অল্পই আসিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, সুলেখক, সুকবি, সদ্বক্তা ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক তখন ভারতবর্ষে আর ছিল কি না সন্দেহ। রাজেন্দ্র দত্ত চারি শত টাকা মাসিক বেতনে তাঁহাকে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন। বিখ্যাত ব্যবসায়ী জন পামারের এক পুত্র কাপ্তেন এফ পামার ৩৫০৲ বেতনে ইংরাজীর অধ্যাপক, উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক নামক একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ৩০০৲ বেতনে দর্শন ও অর্থনীতির অধ্যাপক, উইলিয়ম মাষ্টার্স নামক আর একজন বিচক্ষণ য়ুরোপীয় শিক্ষক ৩৫০৲ বেতনে গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষক, এবং পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রধান পণ্ডিতের নিযুক্ত হন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই কলেজ গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত কলেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট, স্যর লরেন্স পীল, মেজর জেনারেল ল, চার্লস এলেন, গর্ডন ইয়ং, ডাক্তার মৌএট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়া কলেজের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন। এই কলেজের কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্রের নাম হইতে কলেজের গৌরব উপলব্ধ হইবে—

যদুনাথ ঘোষ	ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ও সদ্বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বহুদিন শীলস্ ফ্রী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।
নীলমণি দে	অত্যুৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়া কলেজ হইতে স্যর লরেন্স পীল প্রদত্ত পদক প্রাপ্ত হন। (লেখকের মাতামহ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে সি-আই-ই প্রভৃতির পিতা।)

জয়গোবিন্দ লাহা	কলিকাতার বিখ্যাত লাহা-বংশীয়। শারীরিক বলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।
দ্বারকানাথ সিংহ	রেভারেণ্ড সি এইচ এ ডলের স্কুলের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।
কাশীনাথ মিত্র	স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গণিতে পারদর্শী ছিলেন।
কেশবচন্দ্র সেন	বিখ্যাত বাগ্মী ও ধর্ম্মসংস্কারক।
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	'রেইস এণ্ড রায়তে'র সুপণ্ডিত সম্পাদক
কৃষ্ণদাস পাল	'হিন্দু পেট্রিয়টে'র বিখ্যাত সম্পাদক।
রমেশচন্দ্র মিত্র	হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী প্রধান বিচারপতি।
গণেশচন্দ্র চন্দ্র	এটর্ণীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
নরেন্দ্রনাথ সেন	'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক।

এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য পাঁচ ছয় বৎসর রাজেন্দ্র দত্ত অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। এই সময়ে রাজেন্দ্র এসিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের উৎসাহশীল সভ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বেথুন স্কুল পরিদর্শন সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে "ভারতের ডিমস্থিনীস" রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনার্থ যে সমিতি গঠিত হয়, রাজেন্দ্র দত্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র দত্ত,—দত্ত, লিণ্টজী এণ্ড কোং নামক একটি কোম্পানী স্থাপন করিয়া আমেরিকার সহিত স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন; কিন্তু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রেরিত মাল নষ্ট হওয়ায় ফেরত আসে এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

দত্ত লিণ্টজী এণ্ড কোং ব্যতীত রাজেন্দ্র দত্ত নিম্নলিখিত ব্যবসায়গুলিই স্থাপিত করিয়াছিলেন—

গ্যাঞ্জেস পাইলট কোং, হুগলী টাগ কোং, শ্রীরামপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং, ঘুষড়া ইয়ার্ণ কোং।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাজেন্দ্র এ দেশে এলোপ্যাথি চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচারিত করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, হোমিওপ্যাথিক শ্রেষ্ঠতর। তিনি ডাক্তার সি, এফ্, টনেয়ার নামক একজন য়ুরোপীয় হোমিওপ্যাথকে নিজব্যয়ে কলিকাতায় আনয়ন করেন এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটীগবর্ণর স্যার জন লিট্লারকে পৃষ্ঠপোষক করিয়া এ দেশে প্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগার ও দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ দেশে হোমিওপ্যাথির বিস্তারের জন্য রাজেন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারই চেষ্টায় ডাক্তার টনেয়ার কলিকাতার প্রথম হেল্থ অফিসার নিযুক্ত হইবার পর হোমিওপ্যাথির প্রচার কিছু ক্ষুণ্ণ হয়। দত্ত লিণ্টজী কোং উঠিয়া যাইবার পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র কিছুদিন চন্দননগরে ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার মানসে গমন করেন। এখানে তখন ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। লোকে উহার একমাত্র এলোপ্যাথিক ঔষধ কুইনাইন খাইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আর কুইনাইন খাইতে চাহে না। রাজেন্দ্র কয়েকটি স্থলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ 'আর্সেনিকম' প্রয়োগ করিয়া পুরাতন রোগীদিগকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তাঁহার বাসভবনে শত শত রোগী ঔষধ লইতে আসিতে আরম্ভ করিল। রাজেন্দ্রও বিশেষ মনোযোগের সহিত হোমিওপ্যাথি গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-গণের বহুদিনের পুরাতন রোগ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সারাইয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজেন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হোমিওপ্যাথির ভক্ত হইলেন।

শত শত রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া রাজেন্দ্র ধন্বন্তরী বলিয়া জনসমাজে পূজিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে বৃদ্ধ রাজা রাধাকান্ত দেবের পায়ে ভীষণ গ্যাংগ্রীন হয়। বড় বড় ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গেলেন। অবশেষে রাজেন্দ্র দত্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া দিলেন। চারি দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। রাজা রাধাকান্ত রাজেন্দ্রকে পঁচিশ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিতে চাহিলেন; কিন্তু রাজেন্দ্র উহা লইতে অস্বীকার করিলেন।

তিনি হোমিওপ্যাথি প্রচার করিবার জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু কখনও কাহারও নিকট হইতে এক পয়সা গ্রহণ করেন নাই, অথচ দীন দরিদ্রদিগের পথ্য পর্য্যন্ত নিজ-গৃহে প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতেন। তিনি অনেকগুলি পকেট-বিশিষ্ট একটা আলখাল্লার মত জামা পরিতেন এবং পকেটগুলিতে ডালিম, বেদনা, আঙ্গুর প্রভৃতি রোগীর 'পথ্য ও ঔষধাদি থাকিত। পরোপকার-ব্রত তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ডাক্তার টি, বেরিণি কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তারের উপাধি লাভ করিয়া আমেরিকায় হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন। রাজেন্দ্র দত্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় করিয়া এবং তাহাতে ডাঃ বেরিণিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাণপণে এ দেশে হোমিওপ্যাথি বিস্তারের চেষ্টা করেন। ডাঃ বেরিণির যদি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি বিরাগ এবং আধ্যাত্মিকতা-বাদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত না থাকিত, তাহা হইলে হয় ত তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার ব্যবস্থাসচিব এ দেশে হোমিওপ্যাথির পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেন।

রাজা রাধাকান্ত দেবের আরোগ্যলাভের পর জনসাধারণ সহস্রকণ্ঠে রাজেন্দ্র দত্তের সুখ্যাতি করিলেও, তাঁহার বিপক্ষও বড় মন্দ ছিল না। একজন তরুণ চিকিৎসক—মহেন্দ্রলাল সরকার—তাঁহাকে হাতুড়ে চিকিৎসক বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, রাজার আরোগ্য-লাভের কারণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নহে, অত্যধিক মাত্রায় এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবার ফলেই রাজা সুস্থ হইয়াছেন। রাজেন্দ্র বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মহেন্দ্রলালকে হোমিওপ্যাথির শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতে পারিলেন না। এই সময়ে মহেন্দ্রলাল মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে'র জন্য মর্গানের 'ফিলজফি অব হোমিওপ্যাথি' নামক একখানি গ্রন্থ সমালোচনা করিতে অনুরুদ্ধ হন। মহেন্দ্র-লাল এই উপলক্ষে হোমিওপ্যাথিক প্রণালীর নিন্দা করিয়া রাজেন্দ্র দত্তের উপর এক হাত লইবেন সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া তাঁহার মনে হইল উহাতে যে সকল সত্য নিহিত আছে তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাও যায় না। তখন তিনি রাজেন্দ্রবাবুর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার রোগের চিকিৎসা দেখিতে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজেন্দ্র সানন্দে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখাইলেন। কয়েকটি রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়াও মহেন্দ্রলাল সন্তুষ্ট হইলেন না;—তিনি বলিলেন বোধ হয় পথ্যের ব্যবস্থার জন্য রোগী রোগমুক্ত হইতেছে—হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণে নহে। কিন্তু যখন দেখা গেল যথোচিত পথ্য দিয়াও ঔষধ বন্ধ করিলে রোগ বাড়িতে লাগিল, তখন তাঁহাকে হোমিও-প্যাথির গুণ স্বীকার করিতে হইল। তখন সত্যপ্রিয় মহেন্দ্রলালের সম্মুখে এক নূতন জগৎ দেখা দিল এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখায় বহু য়ুরোপীয় ও দেশীয় ডাক্তারদিগের সমক্ষে মহেন্দ্রলাল "চিকিৎসা শাস্ত্রের অনিশ্চিততা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এলোপ্যাথির কতকগুলি দোষ প্রদর্শন করিলেন। এই নির্ভীক বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে য়ুরোপীয় এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং যে সভায় মহেন্দ্রলাল অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন, তাহা হইতে তিনি বিতাড়িত এবং চিকিৎসক-সমাজ হইতে বর্জ্জিত হইলেন।

কিন্তু রাজেন্দ্র দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় শীঘ্রই মহেন্দ্রলাল অদ্বিতীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে কলিকাতায় অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। মহেন্দ্রলাল আজীবন রাজেন্দ্রকে তাঁহার গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠার সময়েও রাজেন্দ্র দত্ত তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রের আরও অনেক শিষ্য ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে হোমিওপ্যাথির প্রচার করেন। বস্তুতঃ রাজেন্দ্র দত্ত এ দেশে হোমিওপ্যাথির প্রবর্ত্তক।

য়ুরোপ ও আমেরিকার সহিত বাণিজ্য দ্বারা দেশবাসীকে ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট করা, প্রথম শ্রেণীর বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেশব সেন, রমেশ মিত্র, শম্ভু মুখোপাধ্যায় বা কৃষ্ণদাসের ন্যায় মানুষ তৈয়ারী করা, কিম্বা হোমিও-প্যাথির প্রচারের জন্য মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় ব্যক্তির সৃষ্টি করাই রাজেন্দ্রের প্রধান গৌরব নহে। ডাক্তার ফিটজ এডওয়ার্ড জনের ভাষায় বলিতে গেলে "তাঁহার

আত্মা বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত ছিল। কেহ কষ্ট পাইতেছে শুনিলেই তিনি তাঁহার অর্থ ও সেবা দ্বারা তাহার দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হইতেন। বাস্তবিক তিনি পরার্থপরতার অবতার ছিলেন।" আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "দিনে নিশীথে রোগশয্যার পার্শ্বে যাইবার জন্য স্নেহ ডাকিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইতেন; এবং দিনের পর দিন বিনা ভিজিটে, অনেক সময় নিজ ব্যয়ে গিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতেন। আমি অনেকবার তাঁহার গাড়ীতে, তাঁহার সঙ্গে রোগী দেখিতে গিয়াছি ও তিনি কিরূপ একাগ্রতার সহিত চিকিৎসা করিতেন তাহা দেখিয়াছি। রোগীকে বাঁচাইবার জন্য সে ব্যগ্রতা, পরিবার পরিজনের সঙ্গে সেই সমদুঃখসুখতা আর দেখিব না।"

দেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকর কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ বাৎসল্যভাব ছিল এবং তৎসম্পাদিত 'মুখার্জীর ম্যাগেজিন' ও 'রেইস এণ্ড রায়ত' তাঁহার উৎসাহে প্রবর্ত্তিত হয়। 'স্বদেশরক্ষায় ভীম' রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্র তাঁহার স্মৃতিরক্ষিণী সভার অন্যতম সম্পাদকরূপে তাঁহার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেন।

সমাজ-সংস্কারের দিকেও তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার নিকট হইতে বিলাত যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিলে সুরেন্দ্রনাথ, মন্মথ মল্লিক, নগেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সমাজে গৃহীত হন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন ৭৮ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্র সন্ন্যাস রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজেন্দ্রের দীর্ঘ জীবনে তাঁহাকে কয়েকটি গভীর পারিবারিক দুঃখ পাইতে হইয়াছিল। মধ্যবয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁহার দুই পুত্র দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্রের মধ্যে কনিষ্ঠ উপেন্দ্র (৺ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জামাতা) ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর সকালে স্বর্গারোহণ করেন। রাজেন্দ্রের তিন কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠা নবীনমণি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের অগ্রজ উমেশচন্দ্র মিত্রের সহিত পরিণীতা হন। এই উমেশচন্দ্রের বিধবা বিবাহ নাটক ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অভিনীত হইয়াছিল। দ্বিতীয়া কন্যা মাতঙ্গিনী অল্প বয়সে বিধবা হন। তৃতীয়া কন্যা ভিক্টোরিয়া স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতির হেয়ার স্কুলে শিক্ষাগুরু উমাচরণ মিত্রের পুত্র অন্নদাপ্রসাদ মিত্রের সহিত বিবাহিতা হন। এই কন্যাটিও পিতার জীবিতকালেই অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও রাজেন্দ্র দত্ত বিলাসিতা কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি সাদাসিধা পোষাক পরিচ্ছদ ভালবাসিতেন। তাঁহার একমাত্র সখ ছিল—গড়গড়ায় ধূমপান। তাঁহার গাড়ীতে একটি গড়গড়া লইয়া তিনি নানা স্থানে ঘুরিতেন। শুনিয়াছি যখন প্রিন্স অব ওয়েলস্ (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) বেলগাছিয়ার উদ্যানে দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন, তখন রাজেন্দ্র দত্ত প্রিন্সকে গড়গড়ায় ধূমপান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রিন্স স্বহস্তে তাঁহাকে ও রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণকে পান দিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা হয় নাই। তাঁহার বাটীর নিকট একটি অপরিসর গলির নাম রাজেন্দ্র দত্ত লেন রাখিয়া এবং তাঁহার আবাস-ভবনের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর-ফলক রাখিয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ জে, ডোনাল্ডের সভাপতিত্বে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দুই তিনবার তাঁহার সাম্বৎসরিক সভা আহূত হইয়াছিল; কিন্তু এখন আর ঐরূপ সভার কথা শুনিতে পাই না। যিনি আজীবন নীরবে নিঃস্বার্থ-ভাবে পরোপকার করিয়া গিয়াছেন,—কখনও যশের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মুখের কথা

অধ্যাপক শ্রীসত্যরঞ্জন সেন এম-এ, বি-এল

(১)

কুসুমপুরের জমীদার রায় মহাশয়দের একান্নবর্ত্তী সংসার যখন একদিনের একটা অসংযত মুখের কথায় ভাঙ্গিয়া গেল, এবং তিন পুরুষের এজমালি বিষয়-সম্পত্তি বিভাগের জন্য জেলা আদালতে তুমুল মকর্দ্দমা চলিতে লাগিল, তখন সারা গ্রামখানিতে এক নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছিল।

আঘাত লাগিয়াছিল কেবল দুটী ক্ষুদ্র কোমল প্রাণে। দুই তরফের দুই বংশধর সতীশ এবং জ্যোতিষ,—সমবয়সী, মাত্র এক মাসের ছোট বড়,—এবং একসঙ্গে, একই ভাবে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। লোকে বলিত, এক মায়ের পেটেই যমজ-সন্তান হইয়া থাকে, কিন্তু এমনটী কখনও দেখা যায় না। সহসা যখন এই বিবাদের বিরাট প্রাচীর উঠিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের পৃথক করিয়া দিল,—এমন কি, বিদ্যালয়ের একই ক্লাসে রহিয়াও কর্ত্তাদের আদেশে এ উহার পানে চোখ তুলিয়া চাহিবার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইল, তখন তাহাদের ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী রুদ্ধ শোকের আবেগ আর সহ্য করিতে পারিল না। এই যন্ত্রণা হইতে উভয়েই একটু মুক্তিলাভ করিল, যখন সতীশের পিতা বিপক্ষের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাকে স্কুল হইতে সরাইয়া লইলেন।

তাহার পর এই যে ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে ঘটনা-বাহুল্য না থাকিলেও ঘটনা-বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। সাত বৎসর মকর্দ্দমা চলিবার পর যখন তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল, তখন উভয় পক্ষের দুরবস্থারও চূড়ান্ত হইয়াছে। আদালত হইতে আমিন আসিয়া যখন তাঁহাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি দুই সমান অংশে বিভাগ করিয়া গেল, তাহার বহু পূর্ব্বেই ভাগ্য-দেবতার অদৃশ্য মাপকাঠিতে ছোট-বড় দুই শত অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা আদালত-নির্দ্দিষ্ট নিজ-নিজ অংশে দখল বৎসরের হিসাব খতাইয়া এবং দেনা-পাওনা মিটাইয়া দেখিলেন যে, পৈতৃক বাস-ভবনের অংশ ছাড়া যেটুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে সাবেক চাল বজায় রাখা আর চলে না।

কিন্তু নূতন কোন ব্যবস্থা করিবার অবকাশও তাঁহাদের মিলিল না। মকর্দ্দমা শেষ হইতেই বোধ হয় তাঁহাদের জীবনের কার্য্যও ফুরাইয়াছিল, তাই এক বৎসরের মধ্যে উভয়েই ইহ-লীলা সাঙ্গ করিলেন।

জ্যোতিষকে কলিকাতার কলেজের পড়া অসমাপ্ত রাখিয়া পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরি করিতে ছুটিতে হইল।

সতীশের মামা হাইকোর্টের উকীল; মকর্দ্দমার সময় তাঁহার অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে এ-পক্ষের বাজে-খরচ অনেক কমিয়াছিল। তাহার উপর সতীশের পিতা খুব হিসাবী লোক ছিলেন, ছেলেকে স্কুল ছাড়াইয়া আনিয়া বেশী দিন বসাইয়া রাখেন নাই, বিষয়-কর্ম্ম দেখা-শুনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়া, হাতে-কলমে বেশ একটু শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই সতীশের পিতৃ-বিয়োগ হইলে তাহাকে জ্যোতিষের মত অকূলে ভাসিতে হয় নাই, পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতেই সংসার চালাইয়া ক্রমে সে একটু গুছাইয়া লইতে পারিয়াছিল।

(২)

এই ত্রিশ বৎসর কাল সতীশ এবং জ্যোতিষ কেহ কাহারও কোন সংবাদ রাখিতেন না। বাল্য-স্মৃতি অবশ্য একেবারে মুছিয়া যাইবার নয়; কিন্তু সে স্মৃতি একটা অস্পষ্ট বেদনায় পূর্ণ। পায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহার যে যাতনা, তাহা কাঁটা তুলিয়া ফেলিলেই দূর হয়; কিন্তু ক্ষত স্থানে এমন একটু বেদনা থাকিয়া যায়, যাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত কাঁটা-ফোটার তীব্র যাতনাকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইঁহাদেরও তাহাই হইয়াছিল;—বাল্য-জীবনের পরিপূর্ণ সুখের স্মৃতি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল তাঁহাদের আকস্মিক বিচ্ছেদের বেদনায়। তাই যখনই একজনের কথা আর একজনের মনে পড়িত, তখন সেই নিষ্ঠুর

বিচ্ছেদের স্মৃতিই জাগিয়া উঠিত,—বাল্যকালের কথা ভাবিতে কাহারও মনে সুখ ছিল না।

এতদিন পরে আজ জ্যোতিষের একখানা পত্র পাইয়া সতীশের হৃদয় সহসা এক অপূর্ব্ব সুখের আবেশে ভরিয়া গেল। বাল্যের সেই বিস্মৃতপ্রায় ভ্রাতৃস্নেহ আজ আবার এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল। জ্যোতিষ চিঠিতে তাঁহাকে "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি আর এখন কুসুমপুরের বড়-তরফের সতীশ রায় নহেন,—জ্যোতিষের দাদা! জ্যোতিষের সেই বাল্যকালের মধুর ডাক যেন বার-বার তাঁহার কাণের নিকট ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে অতীতের যত সুখময় স্মৃতি একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিল।

এই সময়ে কন্যাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সতীশ বলিয়া উঠিলেন—"বীণা, তোর কাকা আস্‌চে যে! এই দেখ, চিঠি দিয়েচে,—আট-দশ দিনের ভিতরই এসে পড়বে।"

বীণা প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না। সে কাকা বলিয়া কাহাকেও জানিত না। জ্যোতিষের কথা সে লোকমুখে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু শুনিয়াছে বটে, কিন্তু পিতার মুখে কখনও তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই। তাই নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া চিঠিখানা হাতে লইয়া, তাহাতে পত্রলেখকের স্বাক্ষর দেখিয়া তবে কথাটা বুঝিল। বলিল—"ও! ও-বাড়ীর জ্যোতিষ রায়?"

সতীশ বাধা দিয়া বলিলেন,—"জ্যোতিষ রায় কি রে! ও যে কাকা হয়,—দেখ্‌চিস্ না, আমাকে দাদা বলে চিঠি লিখেচে!"

বীণা যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, একটু নরম সুরে বলিলেন—"তা তুই বা জান্‌বি কি করে,—কখনও ত চক্ষে দেখিস্ নি। কিন্তু তা'র কথা কি কখনও কিছু শুনিস্ নি?"

বীণা বলিল—"কিছু কিছু শুনেচি বই কি।"

সতীশ উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। বলিলেন,—"তা'কে আমি বড় ভালবাসতুম, জানিস্? মায়ের পেটের ভাইকেও বোধ হয় লোকে এত ভালবাস্‌তে পারে না।"

তার পর সতীশ তাঁহার বাল্যকালের সুখ ও সৌহার্দ্দ্যের কথা,—যাহা এত দিন নিজের কাছ হইতেও লুকা'য়া রাখিয়াছিলেন,—একে একে শুনাইতে লাগিলেন। এ আলোচনায় তাঁহার এত আনন্দ দেখিয়া বীণা ভুলিয়া গেল যে সে পিতাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়াছে।

সতীশ বিপত্নীক, বীণা তাঁহার একমাত্র সন্তান। সেও তিন বৎসর হইল পর হইয়া গিয়াছে। এখনও যে একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই, তাহার কারণ জামাতার কর্ম্মস্থল অতি দূরে। এম্-এ পাশ করিয়া সে এই এক বৎসর হইল রেঙ্গুন কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছে। কচি-ছেলে লইয়া বীণাকে এতদূরে পাঠাইতে সতীশের সাহস হয় নাই, জামাইও দ্বিরুক্তি করে নাই। বীণাও পিতার নিঃসঙ্গ জীবনকে একটু সরস করিয়া রাখিবার জন্য এই বিচ্ছেদের ক্লেশ হাসিমুখে বহন করিতেছে। তাই আজ পিতার এত আনন্দ দেখিয়া সে বড় সুখী হইল। পিতার কথা শুনিতে শুনিতে সে এত দিনে তাঁহার হৃদয়ের এক সরস কোমল অংশের সন্ধান পাইয়া তৃপ্ত হইল; ভাবিল, বাল্য-সখার সহিত এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলন হইলে হয় ত তাঁহার সুখের অভাব অনেকটা পূর্ণ হইবে।

কিন্তু জ্যোতিষ মাত্র তিন মাসের ছুটী লইয়া আসিতেছেন। তাঁহার বড় মেয়েটী অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে,—যদিও আজকাল এ কথাটা অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে,—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। মিলিটারী বিভাগের চাকুরি,—অধিক ছুটী পাওয়া গেল না।

(৩)

জ্যোতিষ আসিলেন। কয়েক দিন বেশ আনন্দে কাটিল। কিন্তু সতীশের যতটা স্ফুর্ত্তি দেখা গেল জ্যোতিষের ততটা হইল না,—কন্যার বিবাহের চিন্তায় যেন একটু বিমর্ষ, অন্যমনস্ক। সতীশ আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমার কোন চিন্তা নাই, সকল ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমি কথা দিয়ে রাখ্‌চি, যেমন করে হোক তোমার মেয়ের বিয়ে আমি দিয়ে দেবোই।"

দুজনে মিলিয়া পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু কোনটাই অধিক অগ্রসর হইল না। বর মিলে ত ঘর মিলে না, ঘর মিলে ত পাত্র পছন্দ হয় না। যদি দুই মিলিল ত দর শুনিয়া পিছাইতে হইল।

এইরূপে দুই মাস কাটিল। জ্যোতিষ যেন একটু

হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সতীশের উত্তম বাড়িয়া গেল; জ্যোতিষকে বসাইয়া রাখিয়া তিনি নিজেই ঘুরিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আর একটা সুবিধা হইল। সতীশ জামাতার নিকট হইতে পত্র পাইলেন, শীঘ্রই তাহার কলেজে গ্রীষ্মের ছুটী হইবে, তখন সেও আসিয়া পড়িবে। তিনি জ্যোতিষকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"অমল এলে অনেক সুবিধা হ'বে। তা'র বিস্তর আলাপী ছোকরা আছে, একটা যোগাড় করে দেবে এখন। তা'ছাড়া, বাবাজী আমার ছুটাছুটি ঘোরাঘুরি কর্‌তে খুব মজবুৎ!"

(৪)

জ্যোতিষের বড় মেয়ে ঊষা দুদিনের মধ্যে বীণার সহিত খুব ভাব জমাইয়া লইয়াছে। দিবারাত্র সে দিদির কাছেই থাকে। দিনের বেলার আহারটা প্রায় নিজের বাড়ীতেই সারিয়া আসে, কিন্তু রাত্রে বীণার সহিত একত্র ভোজন ও শয়ন করে।

বীণার খোকাটীরও সকল ভার এখন প্রায় ঊষাই লইয়াছে। ছ-মাসের শিশু এই নূতন লোকটীর নিকট মায়ের অপেক্ষা বেশী আদর পাইয়া ক্রমে তাহার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। নিতান্ত প্রয়োজন না বুঝিলে সে মাসীকে ছাড়িয়া মায়ের কোলে যাইতে চাহে না।

বীণা ঊষাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দেয়, যে, বিবাহ হইলেই ত খোকাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, সুতরাং এত মায়া বাড়ানো ঠিক নয়। শুনিয়া ঊষা লজ্জায় কিছু বলিতে পারে না, কিন্তু মনের ভিতর একটা বেদনা অনুভব করে। সে বলে—"দেখ দিদি, তোমার যখন আর একটা খোকা হ'বে, তখন এটা আমাকে দিয়ে দিও,—কি বল?" বীণা বলে—"ততদিনে তোরও ছুটো ছেলে হ'বে রে; তখন দিদির ছেলেকে ভুলে যাবি।" ঊষা বলে,—"বাঃ! তা' হ'বে কেন?" বীণা বলে—"কেন হ'বে তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু হ'বে তা' জানি।" "বড্ড জানো!" বলিয়া ঊষা মুখ চোখ লাল করিয়া দিদিকে ঘুঁসি মারিয়া বা চিম্‌টি কাটিয়া এই তর্কের উপসংহার করিয়া দেয়।

ঊষা যেদিন শুনিল বীণার স্বামী অমল কাল আসিবে, সেদিন রাত্রের আহার সারিয়া সে নিজের বাড়ীতে শয়ন করিতে চলিল। বীণাকে বলিল—"কাল থেকে ত ভাই তোমার কাছে আর শুতে দেবে না; তা'র চাইতে আগে থেকে মানে মানেই যাই। একলা শোয়ার অভ্যাসটা আজ থেকেই করি।" বীণা হাসিয়া উত্তর করিল—"সে আর বেশী দিনের জন্য নয় গো! এই মাসেই—" ঊষা সলজ্জ ভ্রূকুটি করিয়া তাড়া দিয়া আসিল—"দাঁড়াও ত!" বীণা তাহার আস্ফালন দেখিয়া হাসিয়া পলাইল; ঊষাও খিড়্‌কি দ্বার দিয়া নিজের বাটীতে চলিয়া গেল।

শিশুকাল হইতে পশ্চিমে থাকিয়া ঊষার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা একটু স্বতন্ত্র ধরণের হইয়াছিল। অনেক বয়স পর্য্যন্ত সে "দিদি-বাবু" সাজিয়া ভৃত্যের সহিত ভাই-ভগিনীদের লইয়া কোম্পানীবাগানে বেশ হাওয়া খাইয়া বেড়াইয়াছে, বালিকা-সুলভ লজ্জা বা ভয়ের ধার ধারিত না। কিন্তু আজকাল কোথা হইতে একটা দুর্জ্জয় সঙ্কোচের ভাব আসিয়া তাহাকে নিতান্ত সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, অপরিচিত লোকের সম্মুখে বাহির হইতে কুণ্ঠিত হয়। তাই বীণার স্বামী আসিতেছে শুনিয়া প্রথমে তার মনটা একটু দমিয়া গিয়াছিল। তাহার আশঙ্কা হইল, দিদির সহিত তাহার যে মধুর অন্তরঙ্গ ভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল, এই অপরিচিত লোকটী আসিয়া তাহাতে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু মায়ের কাছে যখন শুনিল যে ভগিনীপতির সম্মুখে লজ্জা করিতে নাই, তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতে, এমন কি, ঠাট্টা-তামাসাও করিতে হয়, বরং না করিলেই দোষ, তখন তাহার প্রাণে এক নূতন আনন্দ জাগিয়া উঠিল। জামাই-বাবুর সহিত কি কি কথা হইবে, কিরূপ তামাসা করিবে, তাহারই কল্পনা করিতে করিতে উৎসুক আগ্রহে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৫)

পরদিন ভোরের ট্রেণে অমল আসিল। সামান্য বিশ্রাম করিয়া স্নান করিয়া লইল, বীণা চা আনিয়া দিল। তখন একটু বেলা হইয়াছে, বীণাও স্নান করিয়া এলোচুলে খোকাকে কোলে লইয়া অমলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে খিড়্‌কিতে ঊষার গলার সাড়া পাইয়া বীণা তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

ঊষার অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম হয় নাই, ভোরবেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাই অমল আসিয়াছে তাহা জানিতে

ারে নাই। সে যে সকালে আসিবে তাহাও জানিত া। তাহারা আসিয়াছিল বৈকালে, তাই বোধ হয় াবিয়াছিল সকল ট্রেণ বৈকালেই আসে। উঠিতে বলা হইয়াছে দেখিয়া উষা তাড়াতাড়ি এ-বাটীতে আসিয়া দেখিল বীণা ছাদে দাঁড়াইয়া খোকার মুখে অজস্র চুম্বন ষ্টি করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছে।

তাহার এই স্নেহের আতিশয্য দেখিয়া উষা বলিল—ও! বড্ড আদর হচ্ছে যে! আজ আবার সকাল বলাই ছান্ করা হয়েচে,—বর আস্‌বে কি না, তাই!" এই বলিয়া বীণার পৃষ্ঠে একটা মৃদু কিল মারিয়া তাহার ারা পুলকাবিষ্ট দেহে আনন্দের হিল্লোল বহাইয়া দিল। বীণা কোন কথা কহিল না, একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া উষার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহাকে পরাজিত বুঝিয়া উষা বিজয়-গর্ব্বে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"রোদে চুল শুকোতে এসেছ, ত কচি ছেলেটাকেও টেনে এনেচ কেন? াছার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে, দেখ দেখি! দাও, ছেলে আমাকে দাও।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে বীণার কোল হইতে খোকাকে কাড়িয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল।

অমল তখন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিল; উষাকে ছেলে কোলে করিয়া আসিতে দেখিয়া, তাহাকে বীণা মনে করিয়া বলিয়া উঠিল—"পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? কাছে এস না।" পর মুহূর্ত্তে দুজনে চোখোচোখি হইতেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

কতকটা বীণারই মত এই অপরিচিতা কিশোরীকে দেখিয়া, এবং তাহাকে কি কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া, অমল লজ্জায় বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। আর উষা,—সে ত জানিতই না যে ঘরের ভিতর কেহ আছে। সহসা একজন অপরিচিত লোককে দেখিয়া এবং তাহার এই আহ্বান শুনিয়া, লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল, এবং পর মুহূর্ত্তেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বীণার কাছে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"দিদি, ঘরে ও কে?"

বীণা মুখ টিপিয়া হাসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর করিল—"কে তা কি করে বলি।"

উষা রাগিয়া উঠিল; বলিল—"তোমার ঘরে বসে রয়েছে, তুমি জান না কে! আমায় ধর্‌তে এসেছিল!"

উষা কাঁদিয়া ফেলিল। বীণা তখন সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিল—"এও বুঝ্‌তে পার্‌লি না, পাগ্‌লী মেয়ে! ওই ত তোর জামাই-বাবু। চল্, আলাপ-পরিচয় করিয়ে দি। তা তুই অত ভয় পেয়েচিস্ কেন? সত্যিই ধর্‌তে এসেছিল?"

দিদির কথায় উষার ভয় দূর হইল, বুকটা একটু হাল্কা হইল। কিন্তু শেষ প্রশ্নটায় সে একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল, অপরাধীর ন্যায় মিনতির সুরে কহিল—"না দিদি, মিথ্যে করে বলেছিলুম। আমার বড় ভয় পেয়েছিল কি না। জামাই বাবু এসেচেন তা ত জানি না। তুমিও ত বল নি সকালে আস্‌বেন,—তোমারই ত দোষ!"

বীণা নীরবে এই অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। আজ তাহার প্রাণ এক তীব্র সুখে ভরপুর,—শত অপবাদ, শত লাঞ্ছনাও আজ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না!

উষাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া বীণা অমলের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিল—"এইটী আমার ছোট বোন উষা। এরই বিয়ের জন্যে কাকাবাবু ছুটী নিয়ে এসেচেন।" খোকাকে তাহার মায়ের কোলে দিয়া উষা সলজ্জ চরণে অগ্রসর হইয়া অমলের পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা গড় করিল এবং ফিরিয়া গিয়া দিদির পশ্চাতে দাঁড়াইল।

অমল বলিল—"চোখের দেখাটাই বাকী ছিল, আর সব খবরই জানি। তা কর্ত্তারা দু-মাসেও কিছু পার্‌লেন না ত? যাক্, এখন আমি এসে পড়েছি,—এইবার বিয়ের ফুল ফুট্‌লো। এই মাসের মধ্যে যদি না হয় ত···"

বীণা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"ঢের হয়েচে, নিজের বাহাদুরী আর কর্‌তে হ'বে না। সেই আপনার কথাই ক' কাহন বলে,—তাই; দেখ না! একটা নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, কোথায় তা'র সঙ্গে দুটো কথা কইবে,—তা নয়"

কথাটা আর শেষ হইল না। অমল হঠাৎ যেরূপ ভাল-মানুষটীর মত,—বোধ হয় কি কথা কহিবে তাহাই খুঁজিবার জন্য,—ঘরের চারিদিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল, তাহাতে দুজনেই হাসিয়া ফেলিল।

বীণা উষার গায়ে চিম্‌টি কাটিয়া একটু নিম্নস্বরে কহিল

—"তুই কিছু বল্ না। বল্‌বি বলে কথা মুখস্থ করে রেখেছিলি—দু'একটা এই বেলা বল্!" কিন্তু উষার মুখে কথা ফুটিল না। যাহাকে বলিবে তাহার সহিত যে ভাবে পরিচয় হইল, এবং গোড়াতেই যে প্রসঙ্গ উঠিল, তাহাতে তাহার মুখস্থ বুলি সব গুলাইয়া গেল,—একটাও মনে আসিল না।

(৬)

এইবার অমলের ঘোরাঘুরির পালা আরম্ভ হইল। সে স্থির হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না, বিনা কাজে ঘুরিতেও বেশ আমোদ পায়। তাই বিবাহের পাত্র অন্বেষণের ভার যখন তাহার উপর পড়িল, তখন সে আন্তরিক আগ্রহের সহিতই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

ইতিমধ্যে সে কয়েকবার কলিকাতায় ঘুরিয়া আসিয়াছে। সেখানে যত পুরাতন সমপাঠি বন্ধু, বন্ধুর বন্ধু, তস্য বন্ধু, বিস্তর খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। তাহাদের অনেকেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাহাদের হয় নাই, তাহারা যতবড় উপাধী-ধারীই হউক না কেন, বিবাহ সম্বন্ধে এখনও নাবালক, মাতাপিতার একান্ত আজ্ঞাবর্ত্তী,—নিজেরা কোন কথাতেই নাই। অমল তাহাদের অভিভাবকদেরও ধরিতে ছাড়িল না। কিন্তু সে বড় কঠিন ঠাঁই,—বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। তথাপি সে হাল ছাড়ে নাই, আজ আবার গিয়াছে,—রাত্রে ফিরিবে।

বৈকালে বীণা ও উষা পরস্পরের চুল বাঁধিয়া দিয়া পুকুরে গা ধুইতে গেল। কথায় কথায় অমলের প্রসঙ্গ উঠিল। তাহাকে লইয়া দু-বোনে অনেক আলোচনা করিয়াছে,—তথাপি অনেক কথা এখনও বাকী।

উষা বলিল—"আচ্ছা সত্যি করে বল ত দিদি, জামাই-বাবুকে খুব ভালবাস, নয়?"

বীণা হাসিয়া বলিল—"কেন বল্ দেখি?"

উষা। কেন আবার কি? বল না,—হাঁ কি না।

বীণা। তা' তুইই বল্‌না কেন!

উষা। আমি আবার কি বল্‌বো, বা রে! তুমি নিজের মুখে বল না।

বীণার মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল, গাঢ়স্বরে বলিল—"তীর্থ করে এসে কেউ কাউকে বলে না, জানিস? তেম্‌নি ও কথাও যে নিজের মুখে বল্‌বার নয়, বোন! তোরও যখন হ'বে, তখন বুঝ্‌বি।"

উষার মুখের উপর সন্ধ্যার অন্ধকার যেন বেশী করিয়া ঘনাইয়া আসিল। বীণা তাহা দেখিল। কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"জামাই-বাবুকে তোর কি রকম লেগেচে বল্ দেখি।"

উষার মুখ আবার প্রফুল্ল হইল; সংক্ষেপে বলিল,—"বেশ,—খুব সুন্দর লোক!"

বীণা বলিল—"সুন্দর বল্‌চিস কি চেহারায়, না—?"

উষা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"তা' কেন, সব দিকেই বেশ।—আবার কি রকম আমুদে ভাই!"

অমল কবে কি একটা কৌতুক করিয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া উষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

বীণা হাসিয়া বলিল—"তা' হলে এক কাজ কর্ না কেন?"

কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া উষা বলিল—"কি?"

একটু দূরে সরিয়া গিয়া, বীণা দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—"তোর জামাই-বাবুকেই বিয়ে কর্ না!"

উষার মুখ লাল হইয়া উঠিল; বীণাকে কাছে না পাইয়া জল ছুঁড়িয়া মারিয়া বলিল—"যাঃ! তা বুঝি আবার হয়!"

বীণা বলিল—"খুব হয়,—ভগ্নিপতির সঙ্গে আর বিয়ে হয় না? আচ্ছা, তুই বল্ না,—হয় কি না দেখ্‌বি।"

একটু অভিমানের সুরে উষা বলিল—"হ্যাঁ, আমি বল্‌লেই!—আর তুমি—?"

মুখের হাসি কোথায় মিলাইয়া গেল, বীণা গাঢ় স্বরে উত্তর করিল—"আমি?—আমি তাও পারি। এই জল ছুঁয়ে বল্‌চি বোন্, হিন্দুর ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মেছি, হাসি-মুখে সব সইতে পারি,—কেবল স্বামীর অকল্যাণ ছাড়া।"

বীণার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অপলক নেত্রে শূন্যে কোন অদৃশ্য মূর্ত্তির পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার নয়ন-পল্লব সিক্ত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে কাহাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

চোখে-মুখে জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া যখন সে চাহিয়া দেখিল, তখন সে উষাকে দেখিতে পাইল না,—সে কখন নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া উষাকে খুঁজিতে খুঁজিতে

তাহাদের বাড়ীতে গিয়া বীণা দেখিল, উষা মুখটী ভার করিয়া জানালায় বসিয়া আছে। বীণা কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছে দেখিয়া উষার মা' হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"আজ আবার কি হ'ল উষার?"

বীণা বলিল—"কিছু নয়, কাকী মা; ওর জামাই-বাবুকে ভারি পছন্দ হয়েচে কি না,—তাই বল্‌ছিলাম তা'কেই না হয় বিয়ে কর্।"

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন—"তুইও আচ্ছা পাগ্‌লী হয়ে যা' হোক মা!"

বীণা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"কেন, অন্যায় এমন কি বলেচি, কাকী মা? তা' কি হয় না?—কথায় বলে 'বোন-সতীন',—একবার না হয় পরীক্ষা করেই দেখা যেত, কি-রকমটা দাঁড়ায়।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"তা, এও যে বড় বিদ্‌কুটে খেয়াল মা! না রে উষা, তোর দিদি তামাসা করে বলেচে। শালী-ভগ্নিপতিকে নিয়ে অমন কত ঠাট্টা-তামাসা করে, তা'র জন্যে কি রাগ কর্‌তে আছে, বোকা মেয়ে!"

(৭)

অমল কলিকাতায় একটা সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিয়াছিল। কর্ত্তারা পরদিন দেনা-পাওনার কথা স্থির করিতে গেলেন। বরকর্ত্তার কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ,—দুয় হাজার টাকা নগদ দিতে হইবে, অলঙ্কার তিনি নিজে পছন্দমত একসময়ে গড়াইয়া লইবেন। জ্যোতিষ কন্যার বিবাহের জন্য দুই চারিখানি গহনা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাও গ্রাহ্য হইল না—টাকা সব নগদ চাই। হাজার অনুনয়-বিনয়েও যখন বরকর্ত্তার মন গলিল না, তখন জ্যোতিষ অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে উপরিউক্ত সর্ত্তেই সম্মত হইলেন এবং সতীশকেও রাজী করাইলেন।

জ্যোতিষের কিন্তু এত টাকার যোগাড় ছিল না। এক সপ্তাহ পরে বিবাহের দিন, এই অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে টাকা সংগ্রহ হয়, ইহাই এখন বড় ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইল।

সতীশের হাতে নগদ টাকা বেশী থাকিত না; যাহা কিছু ছিল আনিয়া জ্যোতিষের হাতে দিলেন। এইরূপে এ-দিক ও দিক হইতে যাহা সংগ্রহ হইল তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত দেড় হাজার টাকার অকুলান রহিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও টাকার কোন কিনারা হইল না। তখন জ্যোতিষকে মান সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া গ্রাম্য মহাজন এককড়ি নন্দীর শরণাপন্ন হইতে হইল। এককড়ি সহজে টাকা বাহির করিতে চায় না; বলে গ্রামস্থ জমীদারকে টাকা কর্জ্জ দিবে এতদূর স্পর্দ্ধা তাহার নাই, সে সামান্য তেজারতি করে, এত টাকা কোথায় পাইবে ইত্যাদি। অবশেষে সতীশের বিশেষ অনুরোধে কিছু সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। দলিল লেখাপড়া সেইদিনই হইয়া গেল, স্থির হইল পরদিন রেজিষ্টারী অফিসে যাইয়া টাকার আদান-প্রদান হইবে।

কিন্তু পরদিন এককড়ির আর দেখা নাই। বাড়ীতে খোঁজ লইয়া জানা গেল, কোন এক আত্মীয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া সে ভোরে উঠিয়াই বিষ্ণুপুর চলিয়া গিয়াছে, দুই দিন পরেই ফিরিবে। আশায় আশায় এই দুই দিন কাটিল, কিন্তু এককড়ি ফিরিল না বা তাহার কোন সংবাদ আসিল না।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। আর কোন উপায় না দেখিয়া সেদিন সকালেই অমলকে টাকার জন্য কলিকাতায় ছুটিতে হইল। কতকগুলি অলঙ্কার সঙ্গে লইয়া গেল, সেগুলি বন্ধক রাখিয়া আবশ্যক মত টাকা যোগাড় করিয়া আনিতে হইবে।

সারাদিন কলিকাতার নানা স্থানে ঘুরিয়া অমল দেখিল জিনিস বন্ধক রাখিয়া টাকা দিতে কেহই রাজী নয়,—বিক্রয় করিতে পারিলে হয়। কিন্তু এগুলি সতীশের পরলোকগতা পত্নীর অলঙ্কার। তাঁহার এই স্মৃতিচিহ্নগুলি বিক্রয় করিবার কল্পনা পূর্ব্বে কাহারও হয় নাই, অমলেরও সাহস হইল না। কাজেই টাকার আর যোগাড় হইল না, অমল হতাশ হইয়া সন্ধ্যার সময় ট্রেনে উঠিল।

এদিকে বর যথাসময়ে আসিয়াছে,—লগ্নও উপস্থিত। বরকে সম্প্রদানের জন্য লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিলে, বরকর্ত্তা বিশ্বম্ভর চৌধুরী অমায়িক ভাবে হাসিয়া বলিলেন, —"তা'র আর কথা কি! তবে তাড়াতাড়ির কোন দরকার নেই;—বরং ততক্ষণ ও-দিকটা সেরে ফেল্লে হয় না? কি বলেন চক্কোত্তি মশায়?"

শিয়ালদহ পুলিশ-কোর্টের মোক্তার নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী-মহাশয়ের প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন—"হ্যাঁ, তা বটেই ত! টাকাকড়ির ব্যাপার একটু সময়-সাপেক্ষ; বাকীটা বরং পুরুত ঠাকুর আর মেয়েরা একটু হাত চালিয়ে সেরে নিতে পারেন।"

সতীশ যখন জানাইলেন যে সমস্ত টাকা এখনও সংগ্রহ হইয়া উঠে নাই, জামাই কলিকাতায় টাকার চেষ্টায় গিয়াছেন, ফিরিয়া আসিলেই সব টাকা দেওয়া যাইবে, তখন চক্রবর্ত্তী প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"তা, বেশ ত, বেশ ত,—আসুক না। তাড়াতাড়ির কোন প্রয়োজন নেই,—অনেক রাত পর্য্যন্ত লগ্ন আছে। আর বরও একটু ক্লান্ত আছে, সেই বেলা তিনটের সময় বাড়ী থেকে রওনা হয়েচে, তা'র ওপর উপবাস, আর এই দারুণ গরম। বেচারি একটু বিশ্রাম করুক,—আপনারা বেশী ব্যস্ত হবেন না। আমি বলি ততক্ষণ বরং ইয়ে করলে হয় না? একটা কাজ এগিয়ে থাকে,—বরযাত্রদের কতক কতক বসিয়ে দিলে —?"

"যে আজ্ঞে, তাই বন্দোবস্ত করে দি"—বলিয়া জ্যোতিষ অতি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন।

অমলের ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সকলের যেমন উদ্বেগ হইতেছিল, তেমনি আবার একটু আশাও হইতেছিল যে, যখন এত দেরী হইতেছে, নিশ্চয়ই টাকার একটা যোগাড় করিয়া আসিবে। কিন্তু অমল যখন আসিল তখন সকল আশার অবসান হইল এবং উদ্বেগ শতগুণ বাড়িয়া গেল।

জ্যোতিষ তখন চৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু তিনি টাকা কিছুতেই বাকী রাখিতে প্রস্তুত নহেন। জ্যোতিষ অগত্যা হ্যাণ্ডনোট পর্য্যন্ত লিখিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী জনান্তিকে বুঝাইয়া দিলেন যে হ্যাণ্ডনোট আইনে না টিঁকিতে পারে,—বিপদে ফেলিয়া ভয় দেখাইয়া লিখাইয়া লইয়াছে বলিলে আদালতে অগ্রাহ্য হইতে পারে।

তখন সতীশ একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে আসিলেন। অমল যে অলঙ্কারগুলি লইয়া গিয়াছিল তাহাই জামিন রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য এক সপ্তাহের সময় চাহিলেন। চৌধুরী-মহাশয় এ প্রস্তাবে যেন একটু নরম হইলেন, কিন্তু চক্রবর্ত্তীর পরামর্শ না লইয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। চক্রবর্ত্তীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া এ-কথা বলিতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আরে না না! এমন কাজও করবেন না। কা'র জিনিস তা'র ঠিক নেই, নিয়ে শেষে বিপদে পড়বেন? মনে করুন যদি চোরাই মালই হয়!"

দূর হইতে চক্রবর্ত্তীর কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। শেষের কথাটা শুনিয়া সতীশ রুখিয়া আসিলেন, বরযাত্রীরা হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল,—মুহূর্ত্ত-মধ্যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার বাধিয়া গেল। এই গোলযোগের ভিতর চৌধুরী-মহাশয়, বর তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন। যে গাড়ীতে বর আসিয়াছিল, দূরদর্শী চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ব হইতেই তাহা আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন,—বরকে তুলিয়া লইয়া গাড়ী তৎক্ষণাৎ ছুটিল।

(৯)

ব্যাপার দেখিয়া জ্যোতিষ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সতীশ মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে বাটীর ভিতর গিয়া "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া দালানে একটা তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন। বীণা ছুটিয়া আসিল। পিতার বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে বড় ভয় পাইল, তাড়াতাড়ি একখানা পাখা আনিয়া মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

বাহিরে এইমাত্র যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও জানিতে বাকী ছিল না; সুতরাং বীণা ম্লানমুখে নীরবে পিতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সতীশ বলিলেন—"তুই বল্ মা, এখন কি উপায় করা যায়,—আমার বুদ্ধিতে ত আর কুলায় না। আর এ বিভ্রাট ত আমার বুদ্ধির দোষেই ঘটেচে। জ্যোতিষ আমার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত ছিল, এখন কি করি! এ দায় ত জ্যোতিষের নয়,—আমার!"

বীণা পিতার কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"এ সময়ে এত অধৈর্য্য হ'লে চলবে কেন, বাবা! অন্য কোন পাত্র যোগাড় করে শুভকার্য্য সেরে নিতে হবে,—অন্য উপায় কি আছে?"

সতীশ হতাশভাবে উত্তর করিলেন—"সে উপায়ও ত দেখ্‌ছি না। লগ্ন আর বেশীক্ষণ নেই, আর তেমন পাত্রই বা কই?"

বীণা বলিল—"কেন; এত বড় গ্রামে এমন একটাও পাত্র খুঁজ্‌লে পাওয়া যায় না? ভাল নাই বা হ'ল।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সতীশ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন —"কই, তেমন কাউকেই ত দেখ্‌ছি না।"

পিতার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বীণা কহিল—"ঠিক বল্‌চো বাবা? ভাল করে ভেবে দেখ দেখি কেউ আছে কি না। হয় ত এইখানেই কেউ আছে—"

কন্যার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সতীশ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—"হুঁ, কিন্তু তা' হয় না মা, তা' হয় না।"

বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"কেন হ'বে না বাবা! যে একবার কন্যাদায় থেকে তোমাকে উদ্ধার করেচে, এবারও সেই কর্‌বে,—এ যে তা'র চেয়েও বড় দায়, বাবা! আচ্ছা, তুমি এখন একটু চুপ করে শুয়ে থাক দেখি,—আমি এখনি আস্‌চি।"

এই বলিয়া বীণা বিদ্যুৎ-বেগে বাহির হইয়া গেল, পিতাকে একটী কথা বলিবারও অবকাশ দিল্‌ না।

বাহির-বাটীতে জ্যোতিষ তখনও তেমনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন; অমল কোমরে গামছা জড়াইতে জড়াইতে আস্ফালন করিয়া বলিতেছে—"আপনারা হুকুম দেন ত এখনও গিয়ে বরকে ধরে আন্‌তে পারি। ভোর তিনটার আগে আর ট্রেন নেই,—যা'বে কোথা!"

বীণা দরজার নিকট হইতে অমলকে ডাকিল, এবং চেলীর জোড় তাহার হাতে দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"পরো।"

অমল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল; রুদ্ধস্বরে বলিল—"পর্‌বো!—আমি!—কেন?"

বীণা অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমি বল্‌চি—তাই।"

এইবার অমল বীণার উদ্দেশ্য বুঝিল। অন্য সময়ে হইলে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কিন্তু সে চাহিয়া দেখিল বীণার প্রশান্ত মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত, নয়নে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ! এত দিন যাহাকে সরলা মুগ্ধা বালিকা-রূপে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার এই মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার আদেশ অমান্য করিবার শক্তি রহিল না। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চেলীর জোড় হাতে লইয়া অমল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বীণার অনুবর্ত্তী হইল।

জ্যোতিষের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী বাহিরে হাঁকাহাঁকি শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে, জ্ঞান-সঞ্চার হইলেও, নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিলেন। সহসা শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ছুটিতে ছুটিতে একেবারে বাহির-বাটীতে আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন কন্যা-সম্প্রদান হইতেছে,—বীণা স্বহস্তে অমল এবং উষার সংযুক্ত করে ফুলের মালা জড়াইয়া দিতেছে! উপস্থিত সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, চক্ষু বাষ্পপূর্ণ। কেবল একজনের চোখে-মুখে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—যে অকাতরে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারে,—স্বামীর অকল্যাণ ছাড়া যে আর সব সহিতে পারে!

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বীণা, এ কি কর্‌লি মা?—শেষে এই হ'ল?"

অমলের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বিজয়োৎফুল্ল বদনে মধুর হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিল—"কেন কাকীমা, এ মন্দ কি হ'ল? উনাকে সতীন কর্‌বো বলেছিলুম,—মনে নেই? আজ সেই কথাই ফলে গেল বই ত নয়!"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"তা বলে একটা মুখের কথার জন্যে—"

বীণা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"মানুষের সব কথাই মুখ দিয়ে বা'র হয়, কাকীমা। তা'র মধ্যে কোন্‌টা যে অন্তরের কথা তা' কেবল অন্তর্যামীই জানেন, আর এই রকম করেই বুঝিয়ে দেন।"

আবার মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি হইল। তাহা সেই নিথর নিশ্চল বায়ুস্তরে মিশিয়া নীরব হইলেও একটী অবলা পল্লীবালার এই বিজয়-বার্ত্তা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল!

জৈনশাস্ত্রে জড় ও জীব

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা

(পৃথ্বীকায়)

জৈনশাস্ত্রের বহু তথ্য সাধারণ্যে তেমন প্রচলিত নহে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তার প্রচুর উপাদানে জৈনশাস্ত্র পরিপূর্ণ। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের চিন্তাধারার বর্ত্তমান প্রগতিতে উহার আলোচনা কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে, এ জন্য এ প্রয়াস বঙ্গভাষায় অভিনব হইলেও, বৈজ্ঞানিকগণের স্বাভাবিক দৃষ্টি ইহাতে আকৃষ্ট হইবে ইহা ভরসা করা যায়।

জৈনশাস্ত্রে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু—যাহাকে সাধারণতঃ জড় বলা হয়—এবং উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে বলিয়া উল্লেখ আছে; অর্থাৎ ঐ সমুদায়ের কোনটাই প্রকৃতপক্ষে জড় নয়, উহার প্রত্যেকটী জীব-সংজ্ঞার অন্তর্গত। মৃত্তিকাকে পৃথ্বীকায়, জলকে অপকায়, বায়ুকে বায়ুকায়, অগ্নিকে তেজস্কায় ও উদ্ভিদ্‌কে—বনস্পতিকায এইরূপ সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত পৃথ্বীকায়ের বিশদ্ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। অবশ্য বলা আবশ্যক যে, পৃথ্বীকায় বলিলে কেবলমাত্র মৃত্তিকাই বুঝায় না, প্রস্তর, বালুকা, ধাতু প্রভৃতি যদ্দ্বারা পৃথিবীর, দেহখানি গঠিত—তৎসমস্তই উহার অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

পৃথ্বীকায় প্রধানতঃ দুই প্রকারে বিভক্ত। "সূক্ষ্ম" ও "বাদর"। 'সূক্ষ্ম' তাহাদিগকে বলা যায় যাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচরের বহির্ভূত; আর 'বাদর' তাহারা যাহারা ইন্দ্রিয়গোচরের বিষয়ীভূত। অর্থাৎ 'সূক্ষ্ম' পৃথ্বীকায় আমরা দর্শন বা স্পর্শ করিতে পারি না, আর 'বাদরকে' দেখিয়া বা স্পর্শ করিয়া তাহার সত্তা অনুভব করিতে পারি। সূক্ষ্ম পৃথ্বীকায় সম্পূর্ণ লোকে * সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ সূক্ষ্ম পৃথ্বীকায় জীব কেবলমাত্র এই ধরণীতেই যে আছে তাহা নহে; পরন্তু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে।

বাদর পৃথ্বীকায় সংক্ষেপে দুই প্রকারের—"শ্লক্ষ্ণ" অর্থাৎ মসৃণ ও "খর" অর্থাৎ কঠোর। 'মসৃণ' পৃথ্বীকায় কাল, নীল, লাল, পীত ও শ্বেত এই পঞ্চ মূলবর্ণের †। 'খর' পৃথ্বীকায় অর্থাৎ ক্ষিতি মোটামুটী ছত্রিশ প্রকারের, যথা:—(১) পৃথিবী—মৃত্তিকা; (২) শর্করা—কাঁকর; (৩) বালুকা; (৪) উপল; (৫) শিলা; (৬) লবণ; (৭) উষ—ক্ষারভূমি; (৮) অয়ঃ; (৯) তাম্র (১০) রাং; (১১) সীসক; (১২) রৌপ্য; (১৩) সুবর্ণ; (১৪) বজ্র; (১৫) হরিতাল; (১৬) হিঙ্গুল; (১৭) মনঃশিলা; (১৮) পারদ; (১৯) অঞ্জন; (২০) প্রবাল; (২১) অভ্র; (২২) অভ্রবালুকা; (২৩) গোমেদক; (২৪) রুচক; (২৫) অঙ্ক; (২৬) স্ফটিক; (২৭) লোহিতাক্ষ; (২৮) মরকত; (২৯) মসারগল্ল; (৩০) ভুজমোচক; (৩১) ইন্দ্রনীল; (৩২) হংসক; (৩৩) চন্দ্রপ্রভ; (৩৪)

---

* আকাশের যে অংশে জীবগণের বসতি তাহাকে 'লোক' ও যে অংশে আকাশ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই তাহাকে 'অলোক' বলে।

† এই প্রবন্ধ "আচারাঙ্গ নির্যুক্তি" অবলম্বনে লিখিত। 'প্রজ্ঞাপনা' ও 'জীবাভিগম, সূত্র মতে মসৃণ পৃথ্বীকায় সাত প্রকারের—উপরোক্ত পাঁচ প্রকার ব্যতীত 'পাণ্ডুর' ও 'পণক' আরও এই দুই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে।

বৈদূর্য্য ; (৩৫) জলকান্ত ; (৩৬) সূর্য্যকান্ত। যদিও ৩৬ প্রকারের বিভাগ বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভাগ অসংখ্য—বিচিত্রপ্রকারের মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, রত্ন প্রভৃতির সংমিশ্রণে যাহা যাহা উৎপন্ন হয় তৎসমুদয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। তদ্ভিন্ন বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শভেদেও আবার অনেক বিভাগ হয়; একই বর্ণাদির তারতম্য অনুসারে ও বর্ণাদির পরস্পর মিশ্রণেও অনেক প্রকার ভেদ হইতে পারে।

উভয় প্রকারের পৃথ্বীকায় 'পর্য্যাপ্ত' ও অপর্য্যাপ্ত' ভেদে দ্বিবিধ। এস্থলে 'পর্য্যাপ্ত' ও 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দ দুইটী বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পর্য্যাপ্তি ছয় প্রকারের:—আহার, শরীর, ইন্দ্রিয়, শ্বাসোশ্বাস, বচন ও মন।

কোনও জীব এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীরে উৎপন্ন হইবামাত্র যে বিশেষ শক্তি দ্বারা আহারাদির উপযুক্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে পরিণত করে তাহাকে 'পর্য্যাপ্তি' কহে; অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হইবামাত্র আহারের উপযুক্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া যে শক্তি দ্বারা তাহাকে রসে পরিণত করে তাহাকে আহার-পর্য্যাপ্তি, যে শক্তি দ্বারা জীব ও ঐ রসকে সপ্তধাতুতে পরিণত করে তাহাকে শরীর-পর্য্যাপ্তি কহে, ইত্যাদি। যে সকল জীবের এইরূপে 'পর্য্যাপ্তি' পূর্ণ হয় তাহাদিগকে 'পর্য্যাপ্ত' ও যাহাদের পূর্ণ হয় না—পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়—তাহাদিগকে 'অপর্য্যাপ্ত' কহে। একেন্দ্রিয় জীবের ছয় পর্য্যাপ্তির মধ্যে মাত্র আহার, শরীর, ইন্দ্রিয় ও শ্বাসোশ্বাস এই চারি পর্য্যাপ্তি হয়, বাকী দুইটী—বচন ও মন পর্য্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ ইহাদের বচন ও মন নাই। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে, অন্য ইন্দ্রিয় নাই। সূক্ষ্ম ও বাদর পৃথ্বীকায়ের যত প্রকারের বিভাগ হয়, প্রত্যেক বিভাগে পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত উভয় প্রকারের জীব হয়। বলা আবশ্যক যে, যে পর্য্যায়ের জীবের যে কয়টী পর্য্যাপ্তি হইবে পর্য্যাপ্তি পূর্ণ হইলেও সে কয়টীর বেশী পর্য্যাপ্তি পূর্ণ হয় না, যেমন—পৃথ্বীকায় জীবের আহারাদি প্রথম চারিটি পর্য্যাপ্তি ছাড়া কখনও পাঁচটী হইবে না, এক স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত কখনও দুইটী ইন্দ্রিয় হইবে না।

বাদর পৃথ্বীকায় যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথাপি একটী, দুইটী বা সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় এরূপ সংখ্যেয় পৃথ্বীকায় একত্র হইয়া থাকিলেও উহা সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি-শক্তির মধ্যে আসে না—তাহারা এতই ক্ষুদ্র; ঐরূপ অসংখ্য জীব একত্র হইলে তবেই তাহাদের সমষ্টি আমাদের ইন্দ্রিয়গোচরের বিষয়ীভূত হয় এবং তখনই তাহারা মৃত্তিকা, বালুকা ইত্যাদি রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। ইহাদের আকৃতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহাদের শরীর দেখিতে মসুর বা চন্দ্রের ন্যায় †।

বাদর পৃথ্বীকায়ও কত ক্ষুদ্র তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে—যদি পূর্ণযৌবনা, সুস্থকায়া, বলশালিনী কোন স্ত্রীলোক আমলকী পরিমিত মৃত্তিকা লইয়া শিলায় একুশবার পেষণ করে তবে কতক পৃথ্বীকায় জীব মরণ প্রাপ্ত হইবে, কতক কেবল বেদনা প্রাপ্ত হইবে, আবার কতক কোন আঘাত প্রাপ্ত হইবে না—তাহাদের অঙ্গে শিলার স্পর্শ পর্য্যন্ত লাগিবে না।

আর সূক্ষ্ম পৃথ্বীকায় জীব এত ক্ষুদ্র যে তাহাদের অসংখ্য জীব একত্র হইয়া থাকিলেও কখনও তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পৃথ্বীকায়িক জীবের কেবল মাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। এ বিষয়ে একটু বিশদভাবে বলা যাইতেছে। জৈনশাস্ত্রে সংসারী জীবসমূহকে একেন্দ্রিয়, দ্বিন্দ্রিয়, ত্রিরিন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ের কমবেশী অনুসারে মোটামুটী পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাদের কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে তাহারা একেন্দ্রিয়, যাহাদের স্পর্শ ও রসেন্দ্রিয় আছে তাহারা দ্বিন্দ্রিয়, যাহাদের স্পর্শ, রস ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে তাহারা ত্রিরিন্দ্রিয়, যাহাদের স্পর্শ, রস, ঘ্রাণ ও দর্শনেন্দ্রিয় আছে তাহারা চতুরিন্দ্রিয় এবং যাহাদের স্পর্শ, রস, ঘ্রাণ, দর্শন ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় আছে তাহারা পঞ্চেন্দ্রিয়। পৃথ্বীকায়াদি উপরে যে পাঁচপ্রকারের জীবের কথা বলা হইল ইহারা একেন্দ্রিয় পর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ ইহাদের মাত্র এক ইন্দ্রিয়—স্পর্শেন্দ্রিয় আছে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে পৃথ্বীকায় জীবের শ্বাসোশ্বাস পর্য্যাপ্তি হয়—ইহা দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে এই শ্রেণীর জীব নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ ও গ্রহণ করে। এক স্থলে

† জীবাভিগম সূত্র—১ম প্রতিপত্তি—"মসুরচন্দ সংঠিয়া পন্নত্তা"।

ভগবান মহাবীর তাঁহার শিষ্য প্রথম গণধর ইন্দ্রভূতি গৌতমকে বলিতেছেন যে "হে গৌতম, পৃথ্বীকায় জীব সতত নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ ও গ্রহণ করে"।

যেরূপ অব্যক্ত চৈতন্য, মূর্চ্ছাপন্ন কোন মানুষের উপযোগ, অনুভবাদি শক্তি অব্যক্তরূপে থাকে, তদ্রূপ পৃথ্বীকায় জীবের উপযোগাদিও অব্যক্তরূপে থাকে। ইহাদিগকে কোনও প্রকার আঘাত করিলে ইহারা বেদনা অনুভব করে—যদিও ঐ অনুভূতি অন্যান্য উচ্চতর পর্য্যায়ের জীবগণের তুলনায় অতি অল্পতর। ইহার আহার, ভয়, মৈথুন ও পরিগ্রহ এই চারি প্রকারের সংজ্ঞা বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা আহারাদির বেদনা অনুভব করিয়া থাকে। এই অনুভূতিও অতি সূক্ষ্ম। ইহাদের মন নাই ও ইহারা নিকৃষ্টতম পর্য্যায়ের জীবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাদের অনুভূতিও অতি সামান্য।

ইহাদের মধ্যে স্ত্রী বা পুং যোনি নাই। সমস্তই নপুংসক যোনি। ইহারা গর্ভজ নয় অর্থাৎ ইহাদের উৎপত্তি শরীরাংশ হইতে হয়।

সূক্ষ্ম পৃথ্বীকায় জীবের অল্পতম ও উচ্চতম—যাহা জৈন-সাহিত্যে যথাক্রমে 'জঘন্য' ও 'উৎকৃষ্ট' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হয়—আয়ু অন্তর্মুহূর্ত্তকাল অর্থাৎ এক মুহূর্ত্তের (৪৮ মিনিটের) মধ্যেই তাহাদের আয়ু শেষ হয়।

বাদর পৃথ্বীকায় জীবের অল্পতম (Minimum) আয়ু অন্তর্মুহূর্ত্তকাল অর্থাৎ এক মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট (Maximum) আয়ু এইরূপ :—

শ্লক্ষ্ণ পৃথ্বীকায়ের—এক সহস্র বৎসর।

খর পৃথ্বীকায়ের—বাইশ সহস্র বৎসর।

খর পৃথ্বীকায়ের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'উৎকৃষ্ট' আয়ু কথিত হইয়াছে—যেমন বালুকার ১৪০০০ বৎসর, শর্করার—১৮০০০ বৎসর ইত্যাদি। এই যে 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট' আয়ুর পরিমাণ কথিত হইল ইহা দ্বারা এরূপ অনুমান করা উচিত নহে যে, ঐ বিভাগের সমস্ত পৃথ্বীকায় জীব ঐরূপ সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। যদি কোন পৃথ্বীকায় জীব পৃথ্বীকায় যোনিতে উৎপন্ন হইয়া সেই জন্মে স্বকর্ম্মবশতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আয়ু ভোগ করে তবে উপরে লিখিত উচ্চতম সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে মাত্র ইহাই বুঝায়—যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট আয়ু ভোগ না করে তবে অল্পতম আয়ু অর্থাৎ অন্তর্মুহূর্ত্তকাল হইতে উচ্চতম পরিমাণ আয়ুর সময়ের মধ্যে যে কোন সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। স্থানভেদেও আয়ুর কম বেশী হয়।

প্রাচীন ও পরবর্ত্তী হিন্দুশাস্ত্রে এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আধুনিক যুগে মৃত্তিকা, প্রস্তরাদির প্রাণ আছে এরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক উপরিলিখিত বিষয়ের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের তুলনামূলক কোন সমালোচনা করিলে আরও উত্তম হয়।

চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই,
আমি দুলন-দেওয়া ঢেউ-জাগানো
হাওয়ার দোলায় শুই!
আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই।
আমি চোখ-জুড়ানো চাঁদের সুধায়
আঁখিটি মোর ধুই।
আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই।

আমি ভুবন-ভরা চাঁদের হাসি
এই বুকেতে থুই।
আমি চাঁদনি রাতের জুঁই।

আমি রূপোয় গলা একটি ফোঁটা
শিশির-ভারে নুই।
আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই।

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চিত্র-নাট্য)

চলচ্চিত্রে স্বরোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিত্র-নাট্যের পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। মূক-চিত্রের জন্য যেভাবে চিত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা প্রয়োজন ছিল, মুখর-চিত্রের কাজে তা অনেকখানি বদলে গেছে। তখন যা ছিল শুধু ছবি এখন কথা এসে তাকে ক'রে তুলেছে চিত্র-নাট্য। একেবারে রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য রচিত নাটক না হ'লেও মুখর ছবির জন্য 'নাটক'ই লেখানো হ'চ্ছে। 'Dialogue' অর্থাৎ বাক্‌চাতুর্য্য বেশ চিত্তাকর্ষক না থাকলে মুখর ছবি জনপ্রিয় হওয়া কঠিন। অনেক সময় নৃত্যগীতের প্রাচুর্য্যের দ্বারা বাক্-চাতুর্য্যের অভাব পূরণ করা হয় বটে কিন্তু, সে ছবি তত বেশী জমেনা যতটা জমাট বাঁধে কথার মার-প্যাঁচের কায়দায়।

'চিত্র-নাট্য' সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্ব্বে চলচ্চিত্র কত বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। মোটামুটি দেখা যায় চলচ্চিত্রকে বারোটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে ফেলা যেতে পারে, যেমন—

প্রথম—নিছক্ ছবি! (Abstract or Absolute Film.) অর্থাৎ কোনো গল্প বা ঘটনার সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র গতিছন্দ, বর্ণ বৈচিত্র্য, রূপান্তর, সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তি, নিসর্গদৃশ্য, কাল্পনিক মায়া ইত্যাদি সৃষ্টি ক'রে দর্শকের মনোরঞ্জন করা ও তাদের চিত্তকে নাড়া দেওয়া, যেমন 'Filmstudie' 'Light & Shade' ইত্যাদি চিত্র।

দ্বিতীয়—কাব্য-চিত্র (Cine-Poem or Ballad Film) অর্থাৎ কোনো প্রসিদ্ধ গাথা, কবিতা বা গানকে চিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোলা বা রূপ দেওয়া। যেমন La Marseilloise, Ænoch-Arden ইত্যাদি—

তৃতীয়—নাট্য-চিত্র (Cine-Drama or Play Film) অর্থাৎ চিত্রের পর চিত্র সাজিয়ে নৃত্যগীত ও বাদ্য সহযোগে ছবির ভিতর দিয়ে একটি অখণ্ড নাট্যরসকে জীবন্ত ক'রে তোলা। যেমন Rio-Rita, Love-Parade' 'Piccadily' 'Broadway' ইত্যাদি—

চতুর্থ—কথা-চিত্র (Cine-Fiction or Story Film) অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচিত বা বিশেষভাবে চিত্রের জন্য লেখানো কোনো গল্প বা উপন্যাস অবলম্বনে তার প্রতিপাদ্য বিষয়টি চিত্রের সাহায্য ফুটিয়ে তোলা। যেমন



উপ-চিত্র ('The Black Pirate' ছবিতে চিত্রগড়ে তৈরী মরুদ্বীপের সকল দৃশ্য, তরুলতা পর্ব্বত ও সমুদ্র সমস্তই Studio Set)

'Uncle Tom's Cabin 'Scarlet Letter' 'Romola' ইত্যাদি—

পঞ্চম—রঙ্গচিত্র (Cine- Farce or Comic Film) অর্থাৎ চিত্রের সাহায্যে নানা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ ক'রে হাস্যরস সৃষ্টি করা। যেমন—Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton এর ছবি।

ষষ্ঠ—উপ-চিত্র (Fantasy Film) অর্থাৎ ছবিতে কানো আজগুবি গল্প বা আষাঢ়ে কাহিনী ও ঠাকুমা'র রূপকথাকে রূপ দেওয়া। যেমন—'Trip to the Moon' Thief of Bagdad' ইত্যাদি—

সপ্তম—কৌতুক চিত্র (Cartoon Film) অর্থাৎ শিল্পীর আঁকা কৌতুকাঙ্কনকে সজীব করে তোলা। যেমন 'Felix the Cat' 'Mickey Mouse'—

অষ্টম—ঐতিহাসিক চিত্র (Cine-classic or Epic Film) অর্থার্থ কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিরাট চরিত্রের সুবৃহৎ ছবি। যেমন—'King of Kings' 'Napoleon' ইত্যাদি—



বিরাট-চিত্র ('Wings' ছবিতে চিত্রগড়ে তৈরী রণক্ষেত্রের নকল দৃশ্য ; হতাহত মৃত ব্যক্তিগণ ও দগ্ধ পাদপগুলি নকল)

নবম—শিক্ষা-চিত্র (Scientific, Cultural & Sociological Film) অর্থাৎ কোনো বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, তার শিক্ষার দিক এবং সমাজতত্ত্ব মূলক ছবি। যেমন The Birth of the Hours, The mechanics of the Brain, Arctic Expeditions. The miners ইত্যাদি—

দশম—কারু-চিত্র (Decorative or Art Film) অর্থাৎ ছবিখানি আদ্যোপান্ত উচ্চাঙ্গের কারুকলার আবেষ্টনের মধ্যে তোলা যেমন—'Siegfried' 'Waxworks ইত্যাদি।

একাদশ—ধর্ম্মমূলক চিত্র, (Church Film) অর্থাৎ—কোনো ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারের ছবি। যেমন—'Ten Commandments' 'Joan of Arc' ইত্যাদি।



নাট্য চিত্র (The Broadway Melody' ছবিতে চিত্রগড়ে তৈরী রঙ্গমঞ্চের একটি দৃশ্য। এই দৃশ্যপটের গায়ে সঙ্গীতের স্বরলিপি এঁকে সুরের আবেষ্টন সৃষ্টি করা হ'য়েছে।)

দ্বাদশ—বিরাট চিত্র (Super Film) অর্থাৎ—যে কোনো বিষয়ের একখানি জমকালো, দৃশ্যবহুল (Spectacular) সুদীর্ঘ ছবি। যেমন Metropolis, La Miserables ইত্যাদি।

এই দ্বাদশবিধ চিত্রের পার্থক্য মনে রেখে চিত্র-নাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করা উচিত। চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার আগে মানসচক্ষে সমস্ত ছবিখানি কল্পনা ক'রে দেখা চাই। কারণ চিত্র-নাট্যের মধ্যে এমন কোনো দৃশ্য থাকা উচিত নয় যা ছবির আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে এগিয়ে দেয়না। অবান্তর বা অসঙ্গত কোনো ঘটনার স্থান

নেই ছবির মধ্যে। চলচ্চিত্রে ছবি আঁকা হয়না—তৈরী করা হয়। এই চিত্র নির্ম্মাণ করাকে বলে 'যোজনা' (Montage) অর্থাৎ, অসংখ্য টুক্‌রো টুক্‌রো ছবিকে একসঙ্গে জুড়ে একখানি সম্পূর্ণ ছবি গড়ে তোলা হয়। প্রথমে গল্পাংশের নানা ঘটনার পৃথক পৃথক্ আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়, তারপর সেগুলিকে বেছে বাদ সাদ দিয়ে কেটে কুটে জোড়া লাগানোকেই বলে 'যোজনা' (Montage) সুতরাং 'যোজনা' বলতে কেবলমাত্র জোড়ালাগানো বুঝ্‌লে হবেনা। 'যোজনা' হ'লো—সৃষ্টি, সঙ্কলন এবং গঠন এই ত্রিবিধ ব্যাপারের সমন্বয়ে চলচ্চিত্রের অঙ্গ সম্পাদন (Cine Organisation)

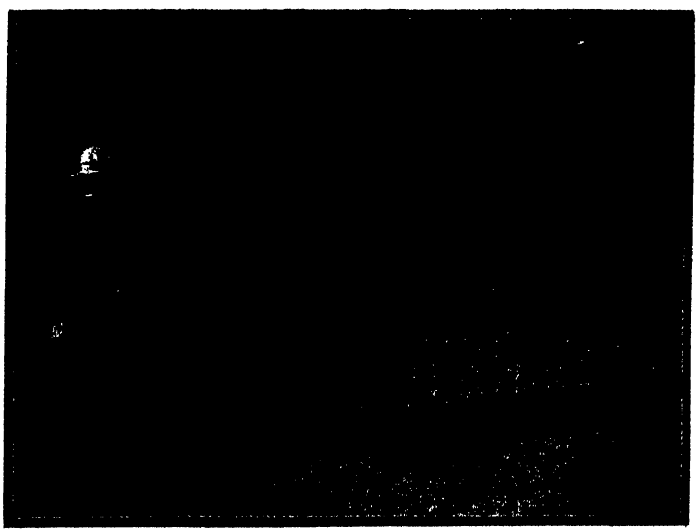
এই চলচ্চিত্রাঙ্গ সম্পাদনের প্রথম কাজ হ'চ্ছে গল্পাংশকে মনের মধ্যে ছবিরূপে কল্পনা ক'রে পরের পর সাজিয়ে নিয়ে পরে চিত্র-নাট্যে লিপিবদ্ধ করা। দ্বিতীয় কাজ হ'চ্ছে ছবির যাবতীয় উপকরণ চিত্র-নাট্যের নির্দ্দেশ অনুসারে সংগ্রহ ক'রে ফেলা। অভিনেতা অভিনেত্রী নির্ব্বাচন এবং ছবির যে যে অংশ চিত্রগড়ে (Studio) তোলা হবে ও যে যে অংশ অনুকূল স্থান (Location) নির্ব্বাচন ক'রে তোলা হবে—তা যাছাই ক'রে ভাগ ক'রে ফেলা। তৃতীয় কাজ হচ্ছে—ছবি নেওয়া (Taking) ও তার রাসায়নিক পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ (Developing & Printing) চতুর্থ কাজ হচ্ছে চিত্রপটের টুক্‌রাগুলিকে (Strips of Film) দেখে শুনে হিসাব ক'রে সাজিয়ে নেওয়া ও সম্পাদন করা। (Editing)

পূর্ব্বেই বলেছি 'পরিচালক' (Director) হ'চ্ছেন চিত্ররাজ্যের প্রধান কর্ণধার। চলচ্চিত্রের সৃষ্টি, সঙ্কলন ও গঠন এই ত্রিবিধ অঙ্গ সম্পাদনের (cine-organisation) সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপর। চিত্র-নাট্যকার, আলোক-চিত্রকর, শিল্পাচার্য্য (Art Director) এবং দৃশ্যকার (Architect) প্রভৃতি কর্ম্মীদের সাহায্যে তিনিই চলচ্চিত্র



চখের ভাষা ('The man with the Camera' ছবিতে নায়কের একটি চোখের Big-Close-up.)

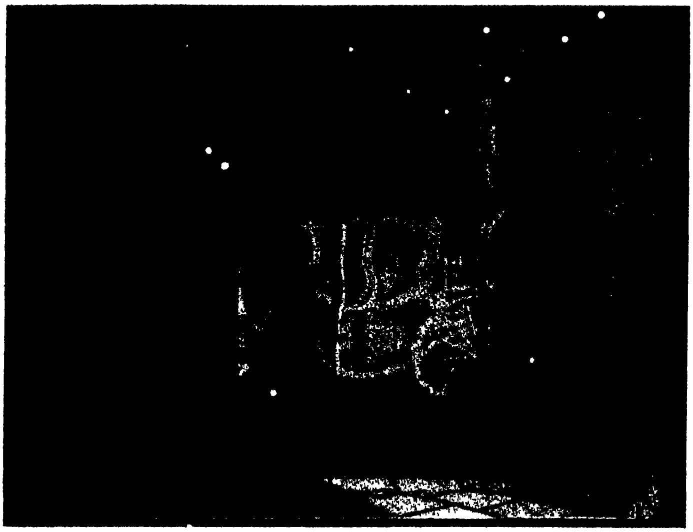
গ'ড়ে তোলেন। এঁরা প্রত্যেকেই পরিচালকের অধীন হ'য়ে তাঁর ইচ্ছা ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন।



কথা-চিত্র' (The Ghost that never returns ছবির একটি mid shot দৃশ্য)

সুতরাং সুপরিচালক যিনি তিনি প্রথমেই খোঁজেন একখানি সুরচিত চিত্রনাট্য। সেই চিত্রনাট্যখানিকে তিনি আবার

নিজের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন করে নেন। এমন কি কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের বহু পরিচিত কোনো রচনাকেও তিনি ছবির উৎকর্ষ ও আকর্ষণের দিক থেকে বিচার ক'রে



উপ-চিত্র (Cindrella রূপকথার ছবির একটি Long-mid-shot দৃশ্য)

অনেক সময় আমূল পরিবর্ত্তন করে নেন। মিলনান্তক বহু গল্পই ছবিতে বিয়োগান্ত হ'য়ে দেখা দেয়, আবার



কারু-চিত্র (Sefried ছবির একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য, দৃশ্যটি নকল। অরণ্য পুষ্প প্রস্রবণ সবই চিত্রগড়ে তৈরী)

বিয়োগান্ত কাহিনীও অনেক সময় হয়ে ওঠে মিলনের মাধুর্য্যে অপরূপ। মোট কথা—চলচ্চিত্রের বীজ নিহিত থাকে—চিত্র-নাট্যের মধ্যেই। কাজেই, চিত্র-নাট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে চলচ্চিত্রের প্রথম ও প্রধান উপকরণ।

ছবির জন্য কোনো মৌলিক গল্প রচনা ক'রে চিত্র নাট্য প্রস্তুত করাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়, কারণ সে ক্ষেত্রে লেখকের কল্পনার একটা অবাধ স্বাধীনতা থাকে। গল্পটি তিনি ছবিরূপেই ভাবতে ও লিখতে পারেন কিন্তু কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের বিখ্যাত রচনাকে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত করা একান্ত কঠিন। কারণ সেক্ষেত্রে গল্পটিকে শুধু ছবি ক'রে তুলতে পারলেই হবেনা; সেই প্রসিদ্ধ লেখকটির সেই বিখ্যাত রচনার যা কিছু বিশেষত্ব অর্থাৎ, যে কারণে সেই রচনা এত বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে, সেটি সম্পূর্ণরূপে ছবির ভিতর ফুটিয়ে তোলা চাই। তবেই সে চিত্র নাট্য ও তার ছবির সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভব হ'তে পারে।

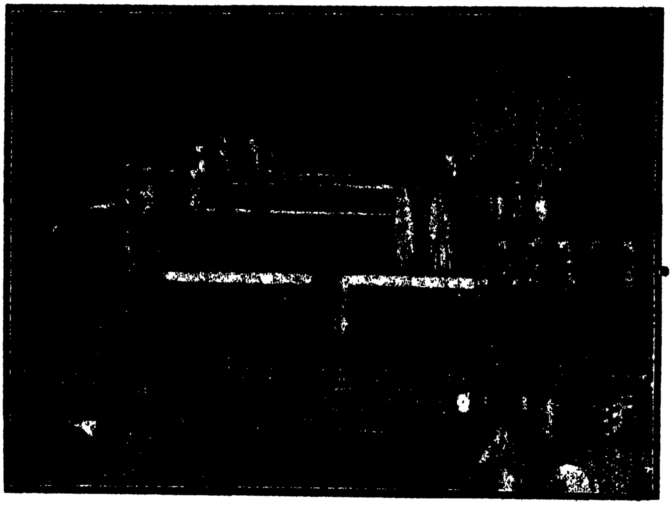
চিত্র-নাট্য থেকে পরিচালক আবার তাঁর কাজের জন্য একটি নক্সা (Scenario Plan) বা চিত্র-লিপি তৈরি ক'রে নেন। তাকে ব'লে 'Shooting Manuscript.' চলচ্চিত্রের ছবি নেওয়াকে বলে Shooting, তাই দূর থেকে নেওয়া ছবির আখ্যা হয়েছে Long Shot, মাঝামাঝি ব্যবধান থেকে নেওয়া ছবিকে বলে—Mid-Shot; ক্যামেরাকে গতির অনুগামী করে যে ছবি তোলা হয়, তাকে বলে—Track Shot ইত্যাদি। 'Closeup Fadein, Fade out, Dissolve প্রভৃতি কথাগুলির তাৎপর্য্য আগেই লিপিবদ্ধ ক'রেছি, তার পর জানা দরকার ছবির—Titles (পরিচয় লিপি) পরিচয় লিপি তিন চার রকম—'Titles, Sub-Titles, Grand Titles ইত্যাদি। এ গুলোর প্রয়োজনীয়তা জানা থাকলে চিত্র-নাট্য রচনা সহজ ও সম্পূর্ণ হ'তে পারে।

অনেক সময় কেবলমাত্র গল্পটুকু পেলেই পরিচালক

তাকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত ক'রে নেন। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পরিচালক যেখানে স্বয়ং গল্প রচনা ও চিত্রনাট্য প্রস্তুত ক'রতে পারেন। সেখানে ছবি প্রায়ই খুব ভালো উৎরে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীযুক্ত দেবকী-বসুর পরিচালিত 'অপরাধীর' উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা ছবির মধ্যে এখানি সকলদিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে ব'লতেই হবে। গল্পটির মধ্যে আগাগোড়া বিলাতী গন্ধ থাকলেও পরিচালক স্বয়ং সেটি রচনা করেছিলেন এবং তার চিত্ররূপ দেবার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন বলেই—ছবিখানিও ভালো হবার সুযোগ পেয়েছিল।

যেখানে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ পরিচালক স্বয়ং সাহিত্য রচনায় তেমন সুপটু নন সেখানে তাঁকে চিত্র-নাট্যের জন্য জনকয়েক সুলেখকের উপর নির্ভর করতেই হয়। এ যিনি না করেন—তিনি ঠকেন। সুসাহিত্যিকের সহযোগীতা ব্যতিত সুচিত্র প্রস্তুত করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এমন কি তিনি যদি প্রসিদ্ধ কোনো গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিকের বিখ্যাত কোনো রচনা নিয়েও ছবি ক'রতে নামেন তা হ'লেও তাঁকে অকৃতকার্য্য হ'তে হয়। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অতুলনীয় রচনা 'শ্রীকান্ত' ছবির পর্দ্দায় যে শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার পর আর এ কথা আশা করি কাউকে ছবার বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। বাংলা ছবির প্রথম যুগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'মান-ভঞ্জনেরও' ঠিক্ এমনিই দুর্দ্দশা হ'তে দেখেছিলুম। এই সাহিত্য রসিকদের সহযোগীতার অভাবেই দেশী ছবির চিত্র পরিচয় (Titles) অপাঠ্য হ'য়ে ওঠে!

ফেলেন। এ ভুলের পরিচয় আমরা সম্প্রতি পেয়েছি 'বিচারক' ও 'নটীর পূজায়'। এই 'বিচারক' এবং 'নটীর পূজাকে'ও ছবির পর্দ্দায় জয়যুক্ত ক'রে তোলা হয়ত সম্ভবপর



কাব্য-চিত্র (Nibelungen Saga'র long shot দৃশ্য)

হ'তে পারতো যদি এই ছবির পরিচালকেরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এগুলির আবশ্যকীয় চিত্ররূপ দিতে বদ্ধপরিকর হ'তেন। অর্থাৎ—ইচ্ছামত অদল-বদল ক'রে নিতেন। যেমন



ঐতিহাসিক চিত্র (ন্যাপোলিয়োঁ বোনাপার্ট)

আবার খ্যাতি ও নামের মোহে ছবির জন্য গল্প নির্ব্বাচন ক'রতে পরিচালকেরা অনেক সময় ভুল ক'রে ওদেশের পরিচালকেরা অনেকেই ক'রে থাকেন। স্পেনের বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত ব্লাস্কো আইবানেজ্ (Blasco

Ibanez) তাঁর একখানি নাটকের চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে ক্ষেপে উঠেছিলেন একেবারে! তাঁর গ্রন্থে ছিল নায়ক-নায়িকার মিলনের আনন্দ-ছবি! কিন্তু চলচ্চিত্রে গিয়ে



ধর্ম্মমূলক চিত্র ('জোয়ান অফ্ আর্ক' ছবির দৃশ্য) (Closeup)
আলোকচিত্রের ঔৎকর্ষে এ ছবিখানি অতুলনীয়

দেখলেন তিনি—তাঁর নায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত! নায়িকা শোকে দুঃখে একান্ত কাতর! অসীম সহানুভূতি ও সমবেদনা নিয়ে বন্ধু এলো বান্ধবীকে সান্ত্বনা দিতে—পঞ্চশরেরর অব্যর্থ শর সন্ধান এবারে আর ব্যর্থ হ'লোনা! আইবানেজ অবাক্! এ বন্ধুটি, তাঁ'র গ্রন্থে ছিলনা! এটি পরিচালকের সৃষ্টি!

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যাঁর সবিশেষ অভিজ্ঞতা নেই তিনি সুসাহিত্যিক হ'লেও যে সুপরিচালক হ'তে পারেন না এ সত্যও বাংলা দেশে একাধিক চিত্রে সপ্রমাণিত হ'য়ে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র একজন পরিচালকের একার চেষ্টায় কোনো ছবিই সুন্দর হ'তে পারে না, যদি না তিনি একাধারে চলচ্চিত্রাভিজ্ঞ, সুসাহিত্যিক, আলোকচিত্রে পটু এবং অভিনয়ে সুদক্ষ হন। এরূপ একাধারে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পরিচালকপাওয়া দুর্লভ ব'লেই প্রয়োজকদের উচিত বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সংগ্রহ করে একটি দল গঠন করা এবং তাদের নিয়ে একত্রে একযোগে কার্য্য করা। এই ভাবে কাজ ক'রতে না পারলে ভালো ছবি হওয়া সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্রের একাধিক শ্রেষ্ঠ রচনাই পরের পর চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হ'তে দেখা গেলো, কিন্তু কোনটিই চলচ্চিত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারলে না। এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তাঁদের কোনো বইখানিরই 'চিত্র-নাট্য' ঠিক্ চলচ্চিত্রের উপযোগী করে লেখানো হয় নি এবং এ সকল ছবির পরিচালকেরা রঙ্গালয়ের অভিনেয় নাটক এবং ছায়াচিত্রে অভিনেয় নাটকের পর্থক্য ও তাহার ভিন্ন অভিব্যক্তি স্বীকার করেন নি অথবা সে সম্বন্ধে তাঁরা অভিজ্ঞ নন!

রঙ্গালয়ের জন্য যেভাবে নাটক রচিত হয়, ছবির পর্দ্দার জন্য ঠিক সেভাবে চিত্র-নাট্য লেখালে চলবে না একথা পূর্ব্বেও বলেছি, আবার বলছি। এবং চিত্রাভিনয়ও যদি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের অনুসরণ করে তাহ'লে চলচ্চিত্র হিসাবে সে যে ব্যর্থ হবেই এ সম্বন্ধেও পুনরুক্তি করা বাহুল্য মাত্র। 'চিত্র-নাট্য' কী-ভাবে রচিত হওয়া উচিত, আমি এখানে শরচ্চন্দ্রের একটি গল্প অবলম্বনে তার বিশেষত্বটুকু পরিস্ফুট ক'রে দেখাবার চেষ্টা ক'রছি। গল্পটি—



(ধর্ম্মমূলক চিত্র। জোয়েন অফ আর্ক আর একটি দৃশ্য)

কাশীনাথ

চুম্বক (Synopsis)

কাশীনাথ শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। মাতুলালয়ে অনাদরে অযত্নে প্রতিপালিত। বয়স আঠারো। টোলে পড়াশুনা করে। সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার।

মাতুল মধুসূদন পূজারী ব্রাহ্মণ। মাতুলানী মুখরা —মমতাহীনা। মাতুলপুত্র হরিচরণ কাশীনাথের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। মাতুলগৃহে সকলেই কাশীনাথকে অশ্রদ্ধা করে, কেবল মাতুল কন্যা বিন্দুবাসিনী তাকে স্নেহচক্ষে দেখে। কাশীনাথ তাই বিন্দুবাসিনীর অনুগত।

জমীদার প্রিয়নাথবাবু অপুত্রক। একমাত্র আদরিণী কন্যা কমলাই তাঁর সব। অত্যাধিক আদরে কমলা স্বেচ্ছাচারিণী। কন্যা বিবাহযোগ্যা। প্রিয়নাথ সুপাত্র সন্ধান ক'রছেন। গুরুদেব কাশীনাথের সন্ধান দিলেন। প্রিয়নাথ তাকে মনোনীত করে কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিলেন এবং 'ঘরজামাই করে রাখ্‌লেন।

কমলা স্বামীর প্রকৃতি ঠিক বুঝতে পারলে না। ফলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হ'লো।

অল্পদিন পরেই প্রিয়নাথবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উইল ক'রে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কন্যা ও জামাতাকে সমানভাগ করে দিলেন। কমলা এতে প্রবল আপত্তি জানিয়ে পিতার সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিলে।

প্রিয়নাথবাবুর মৃত্যুর পর কমলার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করছিল কাশীনাথ। কিন্তু মধ্যে বিন্দুবাসিনীর চিঠিতে তার স্বামীর অসুস্থতা ও তাদের অর্থাভাবের বিষয় জানতে পেরে কাশীনাথ কিছু টাকা নিয়ে বিন্দুবাসিনীকে সাহায্য ক'রতে গেলো। কমলা এ ব্যাপারে কাশীনাথের উপর বিরক্ত হ'য়ে একজন নূতন ম্যানেজার রেখে নিজেই বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে সুরু করে দিলে।

কাশীনাথ ফিরে এসে দেখলে যে সে বাড়ীতে তার আর স্থান নেই। নূতন ম্যানেজার ও পত্নী কমলার কাছে বার বার অপমানিত হ'য়ে কাশীনাথ যেদিন গৃহত্যাগ করলে সেইদিনই রাত্রে পথের মাঝখানে লাঠিয়ালদের হাতে মার খেয়ে কাশীনাথ আহত হ'য়ে পড়ে রইল। বিন্দুবাসিনীর স্বামী সেরে উঠে বিন্দুকে নিয়ে কাশীনাথের সঙ্গে দেখা ক'রতে আসবার সময় পথের মাঝে কাশীনাথকে আহত অবস্থায় পড়ে আছে দেখে তুলে নিয়ে গেলো।

এই ঘটনায় কমলা অত্যন্ত অনুতপ্ত হ'য়ে পড়লো, ফলে স্বামী-স্ত্রী মধ্যে পুনর্মিলন ঘটলো।

(শেষ)



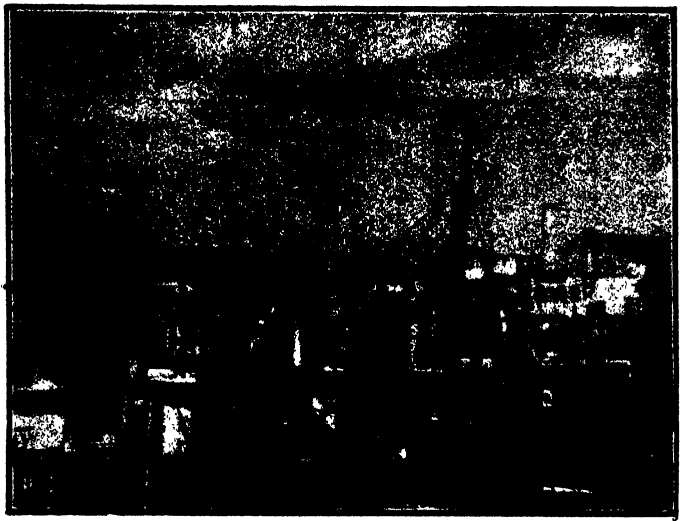
নাট্য-চিত্র (Piccadily ছবির একটি দৃশ্যে নায়িকার ভূমিকায় বিখ্যাতা চীনা অভিনেত্রী Anna May Wong)



শিক্ষা-চিত্র (The Frog ছবির একটি দৃশ্যে ব্যাঙাচির ব্যাপার !)

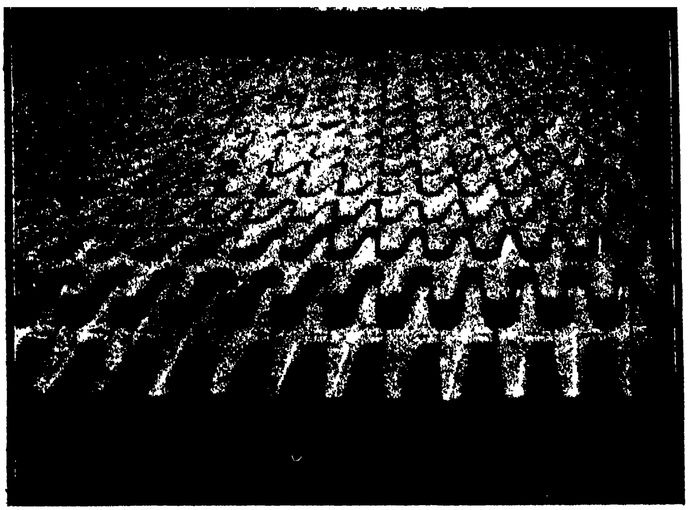
গল্পের এই সংক্ষিপ্তসার থেকেই বোঝা যাচ্ছে চলচ্চিত্রে এ কী রূপ নেবে এবং ছবির দিক দিয়ে এর সম্ভাবনা

কতখানি। এটি যে 'কথা-চিত্র' শ্রেণীর ছবি হবে একথা বলাই বাহুল্য, সুতরাং এই গল্পটির 'চিত্রনাট্য' রচনা ক'রতে হ'লে গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়টুকু যাতে ছবির মধ্যে



শিক্ষা-চিত্র ('Drifters' ছবিতে সমুদ্রের মাছধরা জাহাজ বা ধীবর নৌ বাহিনী

ফুটে ওঠে এবং প্রসিদ্ধ লেখক শরৎচন্দ্রের রচনার বিশেষত্বও যাতে কোথাও ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কলম



নিছক্ চিত্র (La Marche Des Machines নামের ফরাসী ছবিতে কলকব্জার রূপ !)

ধ'রতে হবে। প্রত্যেক চিত্র-নাট্যের গোড়ায় গল্পের সারাংশ দিতে হয় এবং পাত্র-পাত্রীদের একটি কোষ্ঠীপত্র বা পরিচয় লিপি লিখে দিতে হয়। তাতে প্রত্যেক চরিত্রের মোটামুটি একটা বর্ণনা থাকা চাই। যেমন—

কাশীনাথ—সুন্দর যুবা, বয়স আঠারো। বয়সের তুলনায় ধীর গম্ভীর। শান্তপ্রকৃতি। সৎস্বভাব, সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার চিত্ত, দৃঢ়মনা, অশেষ সহ্যগুণ। সহজে বিচলিত হয় না। বিপদে স্থির। সঙ্কল্পে অটুট। আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে সজাগ, রুদ্ধ অভিমানি।

কমলা— চির আদরে লালিতা তরুণী ধনীর দুলালী। রূপ ও আভিজাত্যগর্ব্বিতা, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ মন, উদ্ধতস্বভাবা, স্বাধীন প্রকৃতি, দুর্ব্বিনীতা, কোপন-স্বভাবা। উগ্র, চঞ্চল, অস্থির মতি, দুর্জ্জয় অভিমানিনী।

প্রিয়নাথবাবু—উদার মহৎপ্রাণ সদাশয় জমীদার, স্নেহপ্রবণ পিতা, অনুরক্ত স্বামী। বয়সে প্রৌঢ়। সৌম্যকান্তি। বিচক্ষণ ও বিষয়ী।

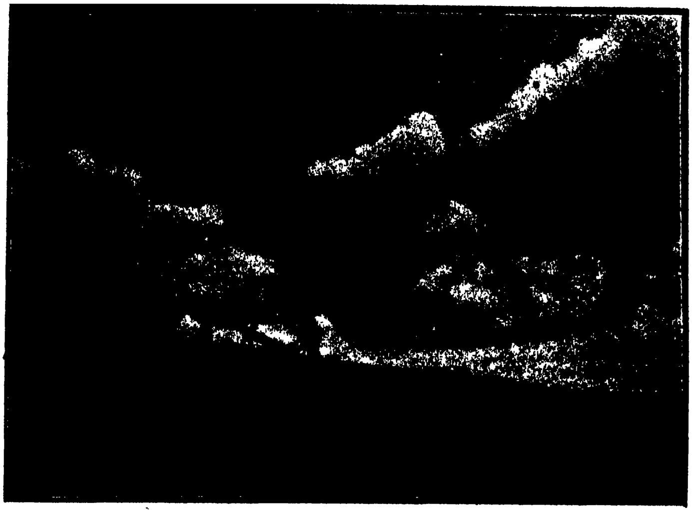
এইভাবে মধুসূদন, মধুসূদনের স্ত্রী, হরিচরণ, বিন্দুবাসিনী, গুরুদেব, নূতন ম্যানেজার প্রভৃতি চিত্র-নাট্যের অন্তর্গত প্রত্যেক চরিত্রের কিছু কিছু বর্ণনা সহ একটি তালিকা দিতে হবে। তারপর চিত্র-নাট্য সুরু করা চাই।

গল্পে আমরা পাচ্ছি কাশীনাথ শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, মাতুলালয়ে অযত্নে অনাদরে প্রতিপালিত। মাতুলানী তার প্রতি মমতাশূন্য। মাতুলপুত্র হরিচরণ বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। একমাত্র মাতুলকন্যা বিন্দুবাসিনী তার প্রতি স্নেহশীলা—সুতরাং এখানে চিত্রনাট্য সুরু করা উচিত প্রধান চরিত্র বা নায়কের শৈশব ঘটনার একটি করুণ দৃশ্য থেকে। কারণ এতে দর্শকদের মনটি গোড়া থেকেই নায়কের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠবে ফলে ছবিখানি সুরু থেকেই তাদের চিত্ত স্পর্শ ক'রে একটা আকর্ষণ জাগিয়ে তুলতে পারবে।

অতএব এ চিত্র-নাট্যখানি সুরু ক'রতে হবে ঐ রকম

একটি প্রস্তাবনা (Prologue)—দিয়ে। প্রস্তাবনায় যে ক'টি দৃশ্য থাকা প্রয়োজন ভেবে নিয়ে তার একটি তালিকা ক'রে ফেলা চাই। তারপর গল্পটির দিকে লক্ষ্য রেখে মূল নাটকের দৃশ্যাবলীরও একটি তালিকা প্রস্তুত ক'রতে হবে। তাহলে চিত্রনাট্য রচনা করা সহজ-সাধ্য হ'য়ে উঠবে এবং পরিচালকেরও কাজের অনেক সুবিধা হ'য়ে যাবে। গল্পটিকে ছবির ভিতর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেই দৃশ্যবিভাগ আপনা হতেই পরের পর মনে আসবে। লেখক তাঁর কল্পনা-শক্তিকে জাগ্রত ক'রতে পারলে ছবিখানির আরও অনেক সৌন্দর্য্য সম্পাদন ক'রতে সক্ষম হবেন।

আমার মনে হয় প্রস্তাবনাটি এইরকম ক'রলে মন্দ হবে না। অবশ্য, যিনি 'পরিচালক' তিনি আলোক চিত্রকরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ইচ্ছামত এর পরিবর্ত্তন ক'রে নিতে পারবেন।



অসীমের রূপ! (Old & New ছবিতে একটি নিসর্গ-দৃশ্য! অনন্ত আকাশ এখানে অসীম প্রান্তরে এসে মিলেছে!

The Prologue

—প্রস্তাবনা—

Grand-Title :—

The Advent of Poojah in the Village

পল্লীতে শারদীয়া পূজা

Time—শারদ-প্রভাত

Properties—প্রতিমা, পূজার সরঞ্জাম, ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা

Costume—সকলের নব বস্ত্রাদি উৎসব বেশ

Sub-Title :—"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে!"

The whole Village is delighted with the joy of the Pujah

Scene 1, —পল্লীদৃশ্য—(Panorama)
Truck shot leads to
(2) জনৈক পল্লীবাসীর চণ্ডীমণ্ডপে

Business :—দশভূজার পূজা

Long shot মহাসমারোহে পূজারতি চলছে, ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, দলে দলে ছেলে মেয়ে
Mid shot স্ত্রী পুরুষ এসে প্রতিমাদর্শণ ও প্রণাম
Close up করছে, অদূরে যূপকাষ্ঠে ছাগ শিশু বাঁধা
Dissolved in to

Scene 11—পূজাবাড়ীর প্রবেশদ্বার

Business নহবৎখানায় নহবৎ বাজছে, পূজাবাড়ী
mid shot প্রবেশের জন্য নরনারী বালক বালিকারা
Long mid ভীড় করে আসছে, পথপার্শ্বে মেলা ব'সেছে,
shot বিবিধ দোকানপাট; খেলনা পুতুল বিক্রী হ'চ্ছে **Fade out—**

Time—same as before

Properties—নহবতের বাদ্য যন্ত্রাদি, আম্র-পল্লব, কদলী বৃক্ষ, সশীর্ষ ডাব, পূর্ণ কুম্ভ, দোকান; খেলনা পুতুল ইত্যাদি

Contume—উৎসব বেশ

Grand Title—A Lonely Orphan

একটি নিঃসঙ্গ অনাথ শিশু!

Subtitle—**Kasinath at his uncles place.**

মাতুলালয়ে কাশীনাথ

Deprived of all affection & care which a child needs most.

আশৈশব সকলের স্নেহ যত্নে বঞ্চিত!

Time—Same.

Properties—ফুটো বালতি, কুয়োর দড়ী,

Costume—ছিন্ন মলিন বস্ত্রে কাশীনাথ—

Sub-Title—"হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!"

Time—Same

Properties—দ্বারপালেদের হাতে লাঠি

Costume—দ্বারপালেদের উর্দ্দিপরা, ভিখারিণী মেয়ের ছিন্ন মলিন বেশ

Time—Same

Properties—বাল্‌তি, বাঁশী, পুতুল, সন্দেশের থালা, ফুল, মালা গাঁথার ছুঁচ সুতা,

Costume—উৎসব বেশে বিন্দু ও হরিচরণ, ছিন্ন মলিন বেশে কাশীনাথ

Fade in—

Scene 111 মধুসূদনের কুটীরপ্রাঙ্গন। প্রাঙ্গণের একপাশে বড় একটি চাঁপা গাছ। চাঁপাগাছের পাশ দিয়ে বাগানের পথ! পথের ধারে সারি সারি ফুলগাছ। চাঁপাতলায় বাঁধানো কূপ

Business mid shot কাশীনাথ অতিকষ্টে বাল্‌তি ক'রে কূপ থেকে জল তুলছে এবং সেই জলের বাল্‌তি দু'হাতে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ফুলগাছে

close up জল দিচ্ছে' কিন্তু হাঁপিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে!

Lap Dissolve in to 1st...Scene.

closeup—যূপকাষ্ঠে ছাগশিশু বাঁধা

Fade out—

Fade in—

Scene II পূজাবাড়ীর প্রবেশ দ্বার—

Business—

দ্বারপালেরা উৎসব বেশধারীদের প্রবেশ ক'রতে দিচ্ছে, কিন্তু, দুঃখী ভিখারীদের যেতে দিচ্ছে না। একটি মেয়ে—কাঙ্গালিনী—করুণ নেত্রে দ্বারে দাঁড়িয়ে!

Fade out—

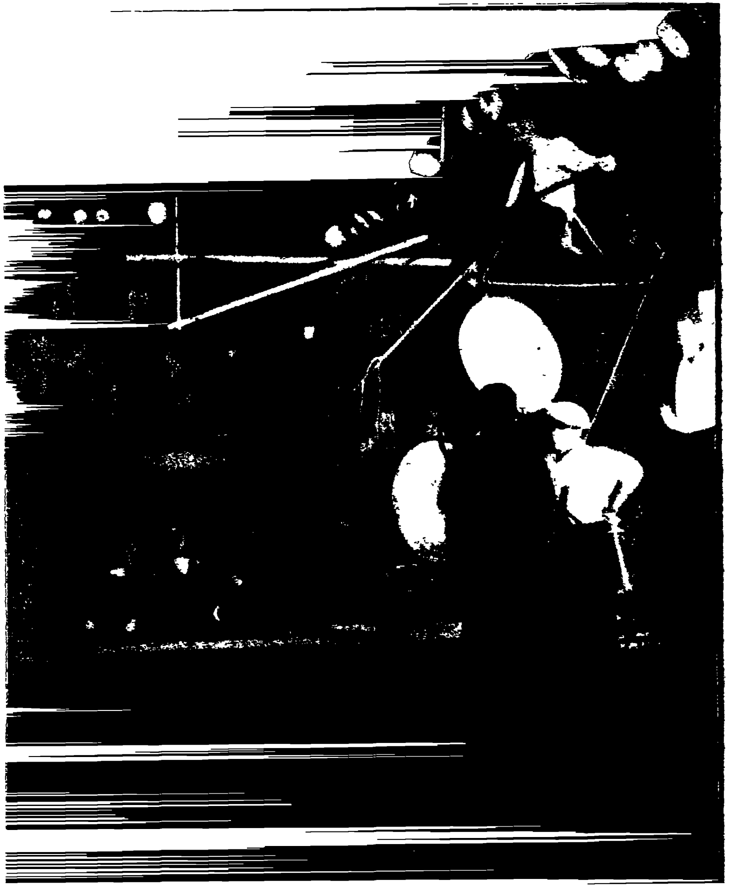
Revive-Scene III.

Business—জল সেচনে ক্লান্ত কাশীনাথ পুজার স্বপ্ন দেখ্‌ছে। বাল্‌তি হাতে কুয়োর পাড়ে

Close up বসেছিল সে; নূতন জামা-কাপড় প'রে বাঁশী ও পুতুল হাতে বালক হরিচরণ এসে তাকে আপনার সাজসজ্জা ও সম্পদ দেখালে, কাশীনাথ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠে

Mid shot প'ড়লো এবং জল তুলে গাছে দিতে গেল। ফুটো বাল্‌তী থেকে জল ফিন্‌কী দিয়ে এসে হরিচরণের নতুন জামা কাপড় ও জুতো ভিজিয়ে দিলে। হরিচরণ রাগে

—do— ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে কাশীনাথকে খুব মারলে। কাশীনাথ জলের বাল্‌তি তুলে হরিচরণকে মারতে যাচ্ছিল; কিন্তু মামী আসছে



পিছ বাড়ী ! ওয়া ! Fifty Million French men ছবিতে প্যারীর
পথ য় পিছ য়ে বাড়ী ফেরার একটি দৃশ্য তোলা হ'চ্ছে—হোলীউডের
গড়ে ! সমস্ত অভিনয় মায় যন্ত্রপাতি ও লোকজন সব একটি
মাচার উপর তুলে ছবি নেওয়া হয়েছে ?)



তুঙ্গশৃঙ্গের চিত্র (The Great-Medow' ছবিতে ক্যামেরা নিয়ে দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় উঠে তুঙ্গ শৃঙ্গের দৃশ্য তোলা হচ্ছে।

—do— দেখে উদ্যত বাহু নামিয়ে নিলে। সন্দেশের থালা হাতে মামী এসে হরিচরণকে সন্দেশ খেতে দিলে—হরিচরণ মা'র কাছে কাশীনাথের নামে লাগালে যে সে তার

—do— নতুন জুতোজামা ভিজিয়ে দিয়েছে। মামা কাশীনাথকে ব'কলে ও সন্দেশ না দিয়ে চলে গেল। হরিচরণ খুসী হ'য়ে কাশী-

close up নাথকে তাঁর সন্দেশ দেখিয়ে ভেঙ্‌চে চলে গেলো, কাশীনাথ জলের বাল্‌তি ছুঁড়ে

mid shot ফেলে দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো। এমন সময় বালিকা বিন্দুবাসিনী এসে তা'কে

Grand Title—**The solitary Sympathiser**

Sub-Title—**The only joy of his Childhood!**

—তার দুখের দুখী ব্যথার ব্যথী শৈশবের একমাত্র সঙ্গিনী।"

mid shot কাঁদতে দেখে আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিলে। নিজের হাতের সন্দেশ তাকে খাইয়ে দিলে। বাবাকে বলে কাশীনাথের জন্য নূতন পূজার কাপড় কিনে দেবে বললে। কাশীনাথ তবুও ম্লান মুখে বসে রইল দেখে তার হাত ধ'রে টেনে তুলে চাঁপাফুল পেড়ে দিতে বললে। কাশীনাথ চোখ মুছে মালকোঁচা বেঁধে গাছে উঠে ফুল পাড়তে লাগলো, বিন্দু-

long shot বাসিনী কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগলো। আঁচল ভরে উঠ্‌তেই কাশীনাথকে গাছ থেকে নেমে আসতে বললে। কাশীনাথ নেমে আসতে তার কাণে একটি ফুল পরিয়ে দিয়ে তার হাত ধরে টেনে কুয়োর ধারে নিয়ে গিয়ে বসালে এবং নিজে তার পায়ের কাছে ব'সে মালা গাঁথতে সুরু

close up করলে। এবং গল্প ক'রতে লাগলো। হরিচরণ এসে একটু দেখলে তারপর কাশীনাথের কাণের ফুল কেড়ে নিলে ও বিন্দুর আঁচলের ফুল সব ছড়িয়ে ফেলে দিলে!

Sub-Title **A constant menace**

চির-শত্রু!

Dissolved into—

Time—Afternoon

Properties—মহাভারত

Costume—আটপৌরে ধুতি সাড়ী

Scene IV. মধুসূদনের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ সিঁড়ির উঁচু

Business ধাপের উপর বসে কাশীনাথ মহাভারত

mid shot পড়ছে; পায়ের কাছে নীচের ধাপে বিন্দু-



[illegible]

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

	বাসিনী বসে শুনছে। হরিচরণ কাছে
close up	দাঁড়িয়ে মুখভঙ্গী করে দেখছে—
Double	(The Boys & girl slowly transfor
Exposure	med into grown-ups) হরিচরণ একটু
mid shot	পরে কাশীনাথের হাত থেকে মহাভারত- খানা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলো। কাশীনাথ বিরক্ত হয়ে
—do—	সেদিকে চেয়ে রইল। বিন্দু উঠে বইখানি কুড়িয়ে নিয়ে এসে কাশীনাথকে দিতে যাচ্ছিল এমন সময় মামী এসে মেয়েকে সেখান থেকে চলে যেতে ব'ললে। বিন্দুর হাত থেকে বইখানি মাটিতে পড়ে গেল।
Close-up	সে ধীরে ধীরে অপ্রসন্ন নতমুখে বাড়ীর ভিতর চলে গেলো। মামী কাশীনাথকে তীব্র ভর্ৎসনা ক'রে চলে গেলেন। কাশীনাথ অপ-
—do—	মানের রুদ্ধ ক্ষোভে ভূলুণ্ঠিত বইখানার দিকে চেয়ে বসে রইল।

Sub-Title— **A grown up young man who never earns a penny, ought to be ashamed of living upon others, and running after girls.**

বুড়ো মদ্দ ছেলে, এক পয়সা রোজগার করবার নাম নেই, কেবল ব'সে ব'সে গিলবে, আর কুণো বেরালের মত মেয়েদের আঁচল ধরে পড়ে থাকবে!—লজ্জা করেনা একটু!

Fade out—

এইখানে প্রস্তাবনা শেষ করে এইবার মূল গল্পের চিত্রনাট্য সুরু করা উচিত। মূল গল্পটি অনুসরণ ক'রলে ছবির হিসাবে দেখা যাবে ৪১ খানি ছবির মধ্যে গল্পটিকে ফুটিয়ে তোলা যায় যেমন :—

ছবির সংখ্যা	Details
১, জমীদার প্রিয়বাবুর বাড়ী	(১) ঘটনাচক্রে কাশীনাথের সঙ্গে কমলার ক্ষণিকের দেখা। প্রিয়বাবু তাঁর গুরুদেবের সহিত পরামর্শ ক'রে কাশীনাথের সঙ্গে কমলার বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন।
২. মধুসূদনের বাড়ী	(২) মধুসূদনের বাড়ী গিয়ে কথা পাকা ক'রে এলেন। মধুসূদন ও তার স্ত্রী হরিচরণের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব ক'রলে। প্রিয়বাবু অসম্মত হলেন।
৩. কাশীনাথের সঙ্গে কমলার বিবাহ	(৩) কাশীনাথের সঙ্গে কমলার বিবাহ হ'লো—
৪. দরিদ্র কাশীনাথের জমীদারের জামাতায় রূপান্তর	(৪) দরিদ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র কাশীনাথের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বাবু সাজতে হ'লো। তার বাথরুমে স্নান, তার জুড়ী চড়ে সান্ধ্যভ্রমণ, তার চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার, তার দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, তার সুবৃহৎ লাইব্রেরী, ক্রমাগত তাকে তার পূর্ব্ব দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলো। কাশীনাথ অসাচ্ছন্দ্য বোধ করে।
৫. নবপরিণীত দম্পতী	(৫) কাশীনাথের মনে সুখ নেই দেখে কমলা তার জন্য চিন্তিত, কাশীনাথ বিরক্ত।

৬. কাশীনাথের মাতুলালয়ে যাত্রা	(৬) কাশীনাথ মাতুলালয়ে চললো, পথে দ্বারবান সঙ্গে যাচ্ছে 'দেখে' কাশীনাথ তাকে ফিরে যেতে ব'ললে, দ্বারবান তার অবাধ্য হ'ল।
৭. মাতুলালয়ে কাশীনাথ	(৭) কাশীনাথ মাতুলালয়ে গিয়ে বিন্দুবাসিনীর কাছে মনের দুঃখ বললে। হরিচরণ এসে জমীদারের ঘরজামাই ব'লে বিদ্রূপ ক'রে গেলো। কমলাকে বিন্দু দেখতে চাইলে। কাশীনাথকে নিতে জমীদার বাড়ী থেকে গাড়ী এলো, সেই গাড়ীতে বিন্দুকে কাশীনাথ নিয়ে যেতে চাইলে, হরিচরণ আপত্তি করলে।
৮. কাশীনাথ ও কমলা	(৮) কাশীনাথ ফিরে কমলাকে মামার বাড়ীর ঘটনা জানালে—
৯. মাতুলালয়ে কাশীনাথ	(৯) পরের দিন আবার বিন্দুকে আনতে গিয়ে শুনলে বিন্দুর স্বামী অত্যন্ত পীড়িত—'তার' পেয়ে বিন্দু চলে গেছে।
১০. প্রিয়বাবু ও কমলা	(১০) প্রিয়বাবু পীড়িত, কমলার সেবা
১১. কাশীনাথ ও কমলা	(১১) কাশীনাথের মনোকষ্ট ও অসুস্থতা, কমলা কারণ জানতে ব্যগ্র, কাশীনাথের স্বীকারোক্তি যে এ বিবাহে সে সুখী হ'তে পারে নি।
১২. প্রিয়বাবু ও কাশীনাথ	(১২) প্রিয় বাবু কাশীনাথের উপর জমীদারীর ভার দিলেন।
১৩. উকীল ও প্রিয়বাবু	(১৩) উকীলকে ডেকে উইল ক'রে সমস্ত সম্পত্তি কন্যাজামাতাকে সমান ভাগ ক'রে দিলেন ; কমলা আপত্তি ক'রে সমস্ত সম্পত্তি নিজ নামে লিখিয়ে নিলে।
১৪. প্রিয়বাবুর মৃত্যু	(১৪) প্রিয়বাবুর মৃত্যু।
১৫. কাশীনাথ ও দেওয়ান	(১৫) দেওয়ানকে নিয়ে কাশীনাথের জমীদারী সম্বন্ধে আলোচনা ও উইলের বিষয় অবগত হওয়া।
১৬. কমলা ও পরিচারিকা	(১৬) কমলা স্বামীর উদাসীনতার জন্য দুঃখিত। পরিচারিকার কাছে অভিযোগ, পরিচারিকার কাশীনাথের পক্ষ সমর্থন।
১৭ কমলার পীড়া	(১৭) কমলার পীড়ায় কাশীনাথের একাগ্র সেবা যত্ন।
১৮, জমীদার কাশীনাথ	(১৮) জমীদার কাশীনাথের লোকপ্রিয়তা।
১৯. কাশীনাথ ও কমলা	(১৯) কাশীনাথকে কমলার অশ্রদ্ধা, পরিচারিকার কর্ম্মচ্যুতি নিয়ে স্বামীর অবাধ্যতা।
২০. কলিকাতায় কাশীনাথ	(২০) বিন্দুর চিঠি পেয়ে কাউকে কিছু না ব'লে কাশীনাথের কলিকাতা যাত্রা।
২১. কমলা ও দেওয়ানজী	(২১) কমলার দেওয়ানজীকে ব'লে নূতন ম্যানেজার নিয়োগ।
২২. দেওঘরে কাশীনাথ	(২২) বিন্দু ও তার স্বামীকে নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শে কাশীনাথের দেওঘর যাত্রা।
২৩. নূতন ম্যানেজার ও কমলা	(২৩) নূতন ম্যানেজারকে কমলার কার্য্যভার প্রদান।
২৪. কাশীনাথ ও নূতন ম্যানেজার	(২৪) তিনমাস পরে ফিরে এসে কাশীনাথ বুঝলে এ বাড়ীতে তার স্থান নেই। নূতন ম্যানেজার তাকে মানে না। (২৫) কমলার কাছে কাশীনাথের অভিযোগ। কমলার ম্যানেজারের পক্ষ অবলম্বন (২৬) ব্রাহ্মণপ্রজার কাশীনাথের কাছে নূতন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ। (২৭) কমলাকে কাশীনাথের সেকথা বিজ্ঞাপন। কমলা এবারও নূতন ম্যানেজারের পক্ষ নিলে। (২৮) কাশীনাথ অন্তঃপুর ত্যাগ

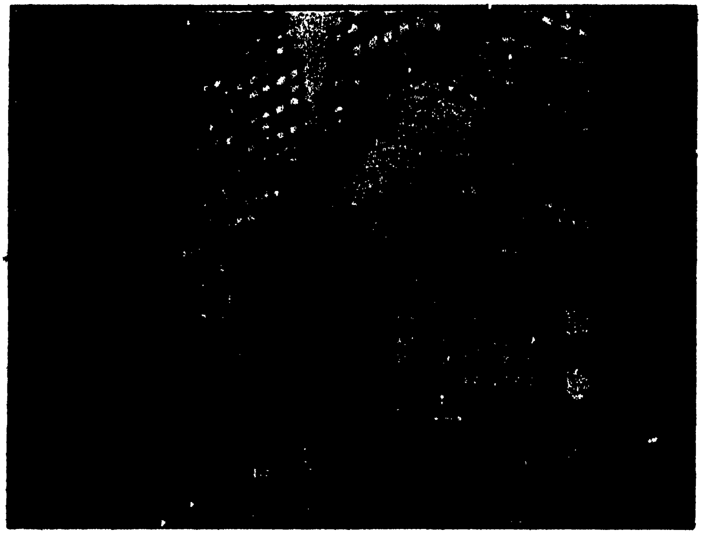
২৫, কমলা ও কাশীনাথ	করে বারবাড়ীতে আশ্রয় নিলে। (২৯) কমলাকে নূতন ম্যানেজার কাশীনাথের বিরুদ্ধে অনেক কথা বললে। (৩০) কাশীনাথ নিজের ঘড়ীচেন বেচে বিন্দুকে ৫০০৲ টাকা পাঠালেন। ব্রহ্মণপ্রজাদের নালিশ করতে বললেন এবং নিজে তাদের পক্ষে সাক্ষী দেবেন জানালেন।
২৬. কাশীনাথ ও ব্রাহ্মণ প্রজা	
২৭. কমলা ও কাশীনাথ	
২৮. বারবাড়ীতে কাশীনাথ	
২৯. কমলা ও নূতন ম্যানেজার	
৩০. কাশীনাথ দুঃস্থ	
৩১. কমলা ও নূতন ম্যানেজার	(৩১) নূতন ম্যানেজার কমলাকে জানালে কাশীনাথের বিরুদ্ধ সাক্ষ্যের জন্য মামলায় হার হয়েছে।
৩২. কাশীনাথ ও কমলা	(৩২) কমলা কাশীনাথকে এইজন্য তীব্র তিরস্কার ও অপমান করেন।
৩৩. কাশীনাথের গৃহত্যাগ	(৩৩) কাশীনাথ গৃহত্যাগ করে চলে গেল।
৩৪. কমলা ও ম্যানেজার	(৩৪) কাশীনাথকে জব্দ করবার জন্য কমলা নূতন ম্যানেজারকে হুকুম দিল।
৩৫. পথের মাঝে কাশীনাথ আহত	(৩৫) ম্যানেজার লোক সঙ্গে নিয়ে পথের মাঝে কাশীনাথকে মেরে রেখে গেল।
৩৬, বিন্দু ও তার স্বামীর কাশীনাথকে পাওয়া	(৩৬) বিন্দু ও তার স্বামী দেশে আসবার পথে তাকে কুড়িয়ে পেলো।
৩৭. কমলা ও পরিচারিকা	(৩৭) পরিচারিকার মুখে কমলা কাশীনাথের অবস্থা শুনে মর্ম্মাহত হ'ল।
৩৮, গ্রামে হুলস্থুল	(৩৮) গ্রামে এই নিয়ে হুলুস্থুল প'ড়ে গেল।
৩৯. ডাক্তার, কাশীনাথ, বিন্দু, কমলা, পুলিশ	(৩৯) ডাক্তার বাঁচবার আশা দিয়ে গেল। কমলা ও বিন্দুর সেবা। পুলিশ এই দুর্ঘটনার অনুসন্ধানে এলো। কাশীনাথের ও ম্যানেজারের জবানবন্দী নিতে। কমলার ভয়। কে মেরেছে জেনেও পুলিশের কাছে এজেহারে কাশীনাথ তা প্রকাশ করলেনা।
৪০. সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কাশীনাথ, বিন্দু, কমলা	(৪০) বিকারের ঘোরে কাশীনাথের মুখে সেকথা প্রকাশ হ'লো, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ডাক্তার এসে ভালো করলে, বিন্দুর ও কমলার সেবা। কাশীনাথের আরোগ্য লাভ।
৪১. কাশীনাথ, কমলা	(৪১) কমলার কাশীনাথের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। কাশীনাথ কমলাকে প্রশান্ত মনে ক্ষমা করলে।
(শেষ)	(শেষ)

এই ছবির তালিকা ধরে পরের পর ঠিক এই গল্পের প্রস্তাবনা'র অনুরূপ ক'রে দৃশ্যগুলি সাজিয়ে লিখতে পারলেই একখানি মূক ছবির জন্য সুসম্পূর্ণ 'চিত্র-নাট্য' রচিত হবে। এর মধ্যে 'পরিচালক' ইচ্ছা ক'রলে একাধিক দৃশ্যে 'প্রতীক' বা Symbol ব্যবহার করতে পারেন। প্রতীক অনেক ছবিকে সুন্দর ক'রে তুলতে পারে। এ ছবিখানির প্রস্তাবনায় 'যূপকাষ্ঠে বাঁধা ছাগ শিশুকে' আমি অসহায় কাশীনাথের অবস্থার 'প্রতীকরূপে' একবার ব্যবহার ক'রেছি। মূল ছবির চতুর্থ দৃশ্যে যেখানে দরিদ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র কাশীনাথ ধনী জমীদারের জামাতা হ'য়ে সুখী হ'তে পারছে না—সেখানে অরণ্যতরুকে তুলে এনে টবের চারায় পরিণত করার প্রতীক ব্যবহার হ'তে পারে। এমনি ক'রে অনেক খুঁটিনাটি বাড়িয়ে ছবিখানিকে বেশ উপভোগ্য ক'রে তোলা যায়। পরিচালক এই ছবি সম্পাদন করবার সময় কোথায় কোথায় এ ছবির উপযোগী বিরাম কাল (cuts) পাওয়া যেতে পারে বিবেচনা ক'রে একে তিন অংশে (Parts) বা চার অংশে ভাগ ক'রে ফেলতে পারেন।

'কাশীনাথ' গল্পটি 'মূক-ছবি' না হয়ে যদি 'মুখর চিত্র' রূপে গৃহীত হয় তাহ'লে এ 'চিত্রনাট্য' থেকে সে ছবি নেওয়া চলবে না। মুখর চিত্রের জন্য নূতন ক'রে 'চিত্র-নাট্য' রচনা করা চাই। তাহ'লে সে যেন ষ্টেজের নাটক না হয়। কথায় অনেক কিছু বোঝানো যায় বলে—পরিচালক ইচ্ছা করলে 'মুখর চিত্র' ছবিখানিকে ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রেও ছবির অংশ অনেক কমিয়ে ফেলতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় সেদিকে ঝোঁক দেওয়া কোনো পরিচালকের উচিত নয়, কারণ, চিত্র মুখর হ'লেও—সে ছবি। সুতরাং,

ছবির সংখ্যা কমানো মানেই ছবিকে হত্যা ক'রে রঙ্গমঞ্চের নাটককে পর্দ্দায় টেনে আনা!

মুখর 'চিত্রনাট্য' করবার সময় 'কাশীনাথ' ছবিতে প্রস্তাবনা অংশ রাখবার প্রয়োজন নেই। কারণ যে দৃশ্যে কাশীনাথ কমলার কাছে বিন্দুবাসিনীর কথা বলবে সেই দৃশ্যে সে তার শৈশবের দুরবস্থার বর্ণনা করবার সুযোগ পাবে সুতরাং মুখর চিত্রনাট্য একেবারে 'প্রিয়বাবুর বাড়ী' থেকে কমলার বিবাহের কথাবার্ত্তা নিয়ে সুরু করলেই হবে। এবং ৩, ৯, ১০, ১৪, ২৪, ২৯, ৩০, ৪০ প্রভৃতি, দৃশ্যগুলি অনায়াসে বাদ দেওয়া চলবে। শরৎ সাহিত্যে 'Conversation' ও dialogue' আলাপ ও বাক্‌চাতুর্য্য অতি অপূর্ব্ব এবং উপভোগ্য, সুতরাং চিত্রনাট্যে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য রচয়িতাকে 'কথা' তৈরী করবার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না, বই থেকেই সব পাওয়া যাবে। মুখের চিত্রনাট্যের আর একটা মস্ত সুবিধা 'Titles' বা চিত্র পরিচয়ের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। কথা শুনে গল্প বোঝা যায়। কেবলমাত্র যেখানে 'সময়' বোঝাবার দরকার অর্থাৎ একটা ঘটনার পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে, ছবিতে যখন তার পরের ব্যাপার দেখানো হবে—তখন ছবির Continuity বা পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য 'Caption' বা ছেদ-পূরণ' ব্যবহার করা আবশ্যক। সুতরাং মুখর ছবির 'চিত্র-নাট্য' ষ্টেজের নাটক না হ'য়ে যাতে ছবিরই 'নক্সা' হয় সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।



বিরাট চিত্র—(বিশ্ববিশ্রুত Metropolis ছবির অপূর্ব্ব আলোক চিত্র !)

(ক্রমশঃ)

সুপ্তিভঙ্গে

শ্রীকালিদাস রায়

বিকালবেলা ঘুম ভেঙেছে
বসে আছি জানলা পাশে,
অকাল ঘুমের অলস আবেশ
তখন' চোখ জড়িয়ে আসে।
এলোমেলো মনটা আমার
তখনো ঠিক হয়নি জড়ো,
চিরপ্রাচীন সৃষ্টিটাকে
লাগ্‌লো হঠাৎ মিষ্টি বড়।

আজ মনে হয় গাছপালা মাঠ
সবই যেন চিত্রে আঁকা,
নিত্য দেখা দৃশ্যগুলি
সবই যেন স্বপ্ন-মাখা।
ঝুরঝুরে ঐ বাতাস যেন
কইছে কানে রসের বুলি।
ছায়া যেন মায়ার রূপে
চোখে বুলায় কাজল তুলী।

অপূর্ব্বতা পেয়েছে আজ
গাছের পাতা রঙ গড়নে,
নাম-না-জানা পতঙ্গেরা
দৃষ্টিতে মোর স্বপন বোনে।
শিউরে ওঠা শিরীষ তরু
অঙ্গে তাহার আলোকলতা,
কাঠবিড়ালী নাড়ছে মাথা,
তার সাথে কয় মনের কথা।
এক পলকো একটি ঠাঁয়ে
পক্ষী দুটি থির না থাকে,
দুইটি পাখীই পক্ষীভরা
করেছে ঐ বৃক্ষটাকে।
দুজন সুখে কূজন করে
পুচ্ছ নাচায় দোলায় গ্রীবা,
আদিম যুগের প্রেমের লীলা
আড়ি পেতে দেখ্‌ছি কিবা।
একটি ছোট ধব্‌ধবে মেঘ
দেখছি ভেসে যাচ্ছে দূরে,
সবুজ রঙের একটি ঘুড়ি
তাহার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে।
চন্দনের ঐ ফোটা ও কি
শ্যামলা দিগ্‌বধূর ভালে?
তাহার নীচেই একটি ছোট
তিল কি জাগে তাহার গালে
তাল নারিকেল কুঞ্জশিরে
আলোর লুকোচুরির ফাঁকি,
আকাশ-বধূর ময়ূরকণ্ঠী
চেলির আঁচল দুল্‌ছে নাকি?
সোনার আলোয় জ্বল্‌ছে দূরে
ঝল্‌ছে বিলের বক্ষখানি,
দিনের ও কি পিছন পানে
চাউনি সজল—বিদায় বাণী?
চরছে ঘোড়া দীঘির পাড়ে,
ঢেউ খেলে যায় তাহার লোমে,
সেই হরষের লহর লাগে
অঙ্গে আমার রোমে রোমে।
ভরা কলস আঁকড়ে কাঁখে
গ্রামের বধূ ফিরছে ঘরে,
মাঝে মাঝে চম্‌কে জাগে—
বাঁশ-বাগানে আড়াল পড়ে
ওরা যেন ব্রজের গোপী
কবির স্বপন দিয়ে গড়া,
চলন ওদের নাচের মতন,
ঘট কি ওদের সুধায় ভরা?
তৃপ্তি যেন মূর্ত্তিমতী
ধেনুগুলি ফিরছে ধীরে,
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে যেন
লক্ষ্মী-শ্রীটিই আস্‌ছে ফিরে।
ঘুমঘোরের আবেশভরা
নয়নে আজ দেখ্‌ছি চেয়ে,
সৃষ্টি হাসে আমায় হেরে
নূতন কলেবরটি পেয়ে।
ঘুম ভেঙে আজ ঘুমের স্বপন
মন হ'তে কি বাইরে এসে
প্রাচীন ধরায় অভ্র দিয়ে
আড়াল করে বেড়ায় ভেসে?
দণ্ড কয়েক অকাল ঘুমের
ব্যবধানের মধ্যখানে,
সৃষ্টি এমন বদলে যাবে
হয় না মনে—হয় না মানে।
দেহ মনের সব পরিজন
এখনো মোর কেউ না জাগে,
শুধু আমার চোখ জেগেছে
হঠাৎ আজি সবার আগে।
তাদের কোলাহলের মাঝে
যারে পাওয়া যায় না খুঁজি,
নেত্র আমার একলা পেয়ে
নিভৃতে তাই ভুঞ্জে বুঝি।

যাযাবর

শ্রীধূর্জ্জটি অধিকারী

৩১

বরিশাল এক্‌স্‌প্রেসের যাত্রী।

বিত্ত অধমের কোঠায়, বিন্দুবিশেষ—has position but no magnitude। কিন্তু যাত্রী মধ্যমশ্রেণীর। মানের কাম্য নয়; স্বাস্থ্যের বালাই নিয়েই হয়রাণ। তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি বেঞ্চবর্জ্জিত হ'লেই Cattle van। তার উপর জর্দ্দার পিচ্‌কারি, চীনে বাদামের খোসা, মাছের ঝুড়ি, বিড়ি-সিগারেটের বাক্স—অর্থাৎ তাল্লাকি অংশগুলির সমাবেশে স্থানটি এমনই মনোরম যে, তৈলঙ্গ স্বামীর কোঠায় না পৌঁছুলে সেখানে আসন পাতে কার সাধ্য। তাই দেড়া ভাড়ার দণ্ড। কিন্তু এও কিছু বৈকুণ্ঠ নয়—হাওড়া সহরের তুলনায় কাশীর ব্যাঙ্গালীটোলা আর কি!

দেখি, আমারও আগে এসে একজন একখানি বেঞ্চে দখল জারি ক'রে গেছেন। দুটি সুটকেশ, শয্যাদ্রব্য, টিফিন-ক্যারিয়ার, গ্রামোফোনের বাক্‌স প্রভৃতির একটি ছোটখাটো স্তূপ—তারই মাঝে একটি বেতের ছড়ি প্রোথিত, আর তার উপর একটি শোলাহাট। যেন Polar Expeditionist বেওয়ারিস ভূমির উপর Union Jackএর প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। আমার লোটা কম্বল সামনের বেঞ্চে রেখে দু'একখানা কেতাবের সন্ধানে নেমে প'ড়লুম।

বুক্‌ষ্টলে এটা ওটা সেটা নাড়াচাড়া করছিলাম। ট্রেনের তখনো পনের মিনিট বিলম্ব ছিল। খর্ব্বাকৃতি, আগাগোড়া প্রায় গোলাকার একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক ঐ একই অজুহাতে সময় কাটাচ্ছিলেন। পরণে হাফ্‌প্যাণ্ট, হোজ, অক্‌স্‌ফোর্ড সু, হাতকাটা আহ্লাদে শার্ট, আগাগোড়া খাকি—মায় গায়ের বর্ণটুকু পর্য্যন্ত।

মনে হ'ল স্বগতোক্তি, কিন্তু ক্রমশঃ কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল যে নিছক আত্মার তৃপ্তির জন্য বায়ুমণ্ডলকে বিক্ষুব্ধ করা নয়—আলাপ সুরুর উদ্দেশ্যে বাগুয়া বিস্তারও ঘটে। বলছিলেন—

His Last Bow—Conan Doyle, হুঃ। 'Trash অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে গাঁজা। দেশী থিয়েটার দেখেছেন?

কেতাবের সমালোচনা থেকে থিয়েটার; নিজেকে বিশেষ অসহায় ব'লেই মনে হ'ল। কিন্তু পরক্ষণেই—

পাশেই জলজ্যান্ত বর্ত্তমান। অথচ অন্য দিকে চেয়ে পরিত্রাহি চীৎকার "সাবিত্রী কই—সনাতন! সাবিত্রী কই।" Conan Doyleও তাই মশায়। অথচ ওর জোরেই বাজীমাৎ ক'রে রেখেছেন—একেবারে স্যর্ (Sir)। Blue of the Twisted Candle—Edgar Wallace, Daughters of the night—Ditto—এঃ একেবারে জগন্নাথঘাটের সিঁড়ি যে রে বাবা। পাশাপাশি ব'সে গেছেন—শিবালয়—ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার।

বুঝলাম—গাঁজারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা চ'লেচে। তার পর সহসা একরকম আমাকে টেনেই নিয়ে চ'ল্‌লেন।

আসুন, আসুন। কেনবার মত কিছুই নেই। আমার কাছে যথেষ্ট বই আছে, দেব'খন। কোন্ ক্লাস? তিন দাঁড়ী না ত্রিশঙ্কু? ত্রিশঙ্কু বুঝলেন না? বাংলা পরিভাষা নিয়ে সাহিত্যিকদের প্রসবব্যথা উপস্থিত হ'য়েছে। কিন্তু Intermediate অর্থে মধ্যমশ্রেণী—দাস-মনোবৃত্তির চরম পরিচয়। মৌলিকতার সংজ্ঞা কি? আসুন আগে বসি গুছিয়ে, পরে বিশ্রম্ভালাপ করা যাবে।

দেখি, আমারই কক্ষের—room-mate। কিন্তু আমার স্থানটি ততক্ষণে বেদখল; অর্থাৎ আমার কম্বলের উপর এক অজানা—চৌদ্দপোয়া। আমার হাতব্যাগটি মাথায় দিয়ে বাংলা দৈনিকে আত্মহারা। অবশ্য কাগজখানিও আমার খরিদা সম্পত্তি। একটু থ্ হয়ে গেলাম। খাকি ভদ্রলোকটি ততক্ষণ কিন্তু চোদ্দপোয়ার উদ্দেশে সুরু ক'রে দিয়েছেন—

মশয় শুনচেন! আপনার নিবাস কুমিল্লায় নয়?

চৌদ্দপোয়া তিনপোয়ায় পরিণত হ'লেন অর্থাৎ উঠে

ব'সলেন। আর্ট-থিয়েটারি চুল-বিন্যাস। নাকটি একটু চ্যাপ্টা, চোখ দু'টি ছোট ছোট। কর্ণযুগলের প্রথমার্দ্ধ পোকাধরা বেগুনপাতার মত কুঁকড়ে গেছে—হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন দু'কাণ-কাটা। ছোট ছোট চোখ দু'টি যথা-সম্ভব বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে রইলেন। খাকি নাছোড়বান্দা—ব'লতে লাগলেন—

বলুন না মশয়—নিবাস আপনার কুমিল্লায় নয়?

আজ্ঞে—কাছাকাছি। নয়নপুর। আপনি—

আমি জানলুম কি ক'রে? হঃ হাঃ হাঃ। এ খাটো খদ্দরের পাঞ্জাবী অভয় আশ্রমের নিশ্চয়। কাপড়খানা বঙ্গচন্দ্র পালের দোকান থেকে নিয়েচেন, কি বলেন? আগাগোড়া খদ্দর কুলিয়ে উঠতে পারেন নি। বুঝেছি, বুঝেছি।

কানকাটা ভদ্রলোক একেবারে থ।

কিন্তু খদ্দরের পাঞ্জাবি আর বঙ্গচন্দ্রের কাপড় আপনাকে ধরিয়ে দেয়নি। আমি পথ চলি চোখ চেয়ে—যখন চ'লতেই হ'বে, তখন তা ছাড়া নান্যপন্থা। আর তা নইলে মজাও নেই বুঝলেন।

শেষের লাইনটি আমাকেই নিবেদন করা হ'ল।

হ্যাঁ, তার পর কতদুর চ'লেচেন? বরিশাল। তা বেশ। বিছানাপত্র কিছুই ত' দেখচি না। এক কাপড়েই বেরিয়ে প'ড়েচেন। সদানন্দ পুরুষ—বসুধৈব কুটুম্বকম্। একেবারে পরমাত্মীয়ের মত পাতা বিছানায় গা ঢেলে দিয়েচেন। খবরের কাগজখানিও বোধ হয় এই ভদ্রলোকের। হুঁ, হ্যাঁ, জানা আছে, জানা আছে। দুটো পয়সাও বিদ্যা-সাগরকে ফাঁকি দেন আপনারা। নামটি কি?

কাণকাটা—আজ্ঞে নাগেশচন্দ্র বল্। কিন্তু বিদ্যা-সাগরকে ফাঁকি দেওয়ার অর্থটা বুঝলাম না।

খাকি—সোজা কথা—তরলং। দু পয়সা খরচ হ'বে ব'লে একখানা প্রথম ভাগও কিনে পড়েন না কস্মিন্‌কালে। আহা বসুন বসুন, চ'টবেন না।

নাগেশচন্দ্র কিন্তু সে গাড়িই পরিত্যাগ ক'রলেন। কিছু পরেই গাড়ির চলা সুরু হ'ল।

২

খাকি পরিচয় দিলেন। শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। মনে হয়েছিল টিকটিকি। তা নয়—আমারি মত বিলাতী ফিরিওয়ালা, কোন ইংরাজ কোম্পানীর Traveller। সারা পূর্ব্ববঙ্গে টহলদারি করেন। যে কোম্পানীর নেমক খান, তারই মহিমা প্রচার ক'রে বেড়ান। নাম—কলিজাপ্রসন্ন সরকার। নামটায় Hindu-Moslem pactএর গন্ধ কেন, নিজেই ব্যাখ্যা ক'রলেন। যথা—দূরদৃষ্টি মশায় দূরদৃষ্টি। সাত টাকা মাইনের জেটি সরকার হ'লে কি হয়, বাবার আমার ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি বাপুদেব শাস্ত্রীকেও হার মানিয়ে দেয়। ব'লতেন, সাত টাকা সাতাশ বৎসরে ছত্রিশ টাকায় উঠেছিল রে বাবা। আর নিবারণ মল্লিকের ব্যাটা য়্যালবিয়ন রয় আমারি য়্যাপ্রেন্টিসি ক'রতে এসে তিন বৎসরের মধ্যে পনের থেকে সাড়ে তিনশোয় ফোরম্যানিতে পাকা হ'য়ে ব'সল। আরও পাঁচ বর্ষার পর একেবারে য়্যাকাউন্ট্যান্ট—সাড়ে বারশোর গ্রেড্। তাই অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই নাম-করণ—নইলে তোর মা ত' রেগেই খুন। ব'লত, কুলদা রাখলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত। যখন সাহেবের ঘরে Slip পাঠাবি, লিখবি "Coolidge Pershing Sircor" একশোর কম First appointment দিতে ভরসাই ক'রবে না। হয়েছিলও তাই। কিন্তু সইল না। তবে জেল খাটতে হয় নি, এই যা। পিতৃপুরুষের পুণ্যের জোর ছিল, আর হয় ত বা—

লাইনটি অসমাপ্তই র'য়ে গেল। পাশের কামরায় বোধ হয় একটা বিপ্লব সুরু হ'য়েছিল। হৈ হৈ চীৎকার। গাড়ি থেমে গেল---চীৎকারের কেরামতি নয়, বারাসাত ষ্টেশনের খাতিরে।

এবার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ হল। পাশের কক্ষে এক ভদ্রলোক স্ত্রীকন্যা নিয়ে যশোহর চ'লেচেন। পুরুষ-কামরা। দু'পাশে দু'খানি বেঞ্চ। ভদ্রলোক একখণ্ড চীনে চাদর মাঝামাঝি টাঙিয়ে দিয়ে কামরাটিতে সদর-মফস্বলের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েচেন। শিয়ালদহে কামরার মুখ ছিল পশ্চিমে, সুতরাং ভদ্রলোক সেই দিকের বেঞ্চেই সদর প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন। কিন্তু শিয়ালদহের পরবর্ত্তী ষ্টেশনগুলির অবস্থান-ভেদে বারেবারে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অসম্ভব বিধায় ভদ্রলোক মফস্বলের দরজা জানালাগুলির উপর martial law জারি ক'রে দিয়েছিলেন—সব

বন্ধ থাক্‌বে। চল্‌তি ট্রেণে চোর-প্রবেশের রেওয়াজ আছে বটে, কিন্তু লম্পট-প্রবেশের কথা ইতিহাসে পড়া যায় না। তখন অপরাহ্ন—সদরে কর্ত্তা সজাগ, অন্দরে গিন্নী। তাই বোধ হয় মেয়েটি মাত্র একটি জানালা খুলে দিয়েছিলেন। অপরাধ এই। ভদ্রলোক রাসভ-চীৎকার জুড়ে দিয়েছিলেন—হুঁস নেই যে সেটা ট্রেন, তাঁর অন্দর-মহল নয়। তখন উত্তরখণ্ড সুরু হয়েছে। ভদ্রলোক ব'লছিলেন—

দশ হাত কাপড়ে স্যাংটার জাত্। ধাতে ময়লা—কার বাপের সাধ্যি তোমাদের সিধে রাখে। শ্যামবাজার থেকে পটলডাঙ্গা, সেখান থেকে তালতলা, পরের মাসেই উল্টোডিঙ্গী—বাড়ী পাল্টাপাল্টি ক'রে হয়রাণ—ছাতে ওঠা রদ্ ক'রতে পারলুম না। কোল্‌কেতা—নিকুচি ক'রেছে কোলকেতার—সদরে চাবি বন্ধ ক'রে বাবুরা অফিস বেরুলেন, যেন লক্ষ্মণের গণ্ডী টেনে দিয়ে গেলেন। আর ছাতের ওপর দিয়ে যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল সেদিকে হুস নেই। লোকে ঘুস দিয়ে কোলকেতায় ষ্ট্যাটিস্টিনি ক'রতে পেলে বর্ত্তে যায়—আর আমি শালা ঘুস দিয়ে যশোরে বদ্‌লি হ'চ্ছি।

রেলের খালাসী, কুলী, যাত্রী, পানি-পাঁড়ে, চা-মিঞা প্রভৃতির একটি ছোটখাটো জনতা মজা দেখ্‌ছিল। স্ত্রী-লোকটি কাপড়কুণ্ডলী হ'য়ে এক কোণে ব'সে ছিলেন এবং পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু কন্যা মা'র কোল ঘেঁসে ভয়চকিত দৃষ্টিতে বাপের পানে চেয়ে ছিল। দৃশ্যটা ক্রমে অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল; নিজের কামরার দিকে ফিরছিলাম—খাকি ইসারায় নিষেধ ক'রলেন। আবরুবাজ কামরা রিজার্ভ করেন নি, বে-পরোয়াই ছিল। বারাসাতে তিন মিনিট গাড়ি থামে। গোলমালে খেয়াল ছিল না—হঠাৎ গাড়ির চলা সুরু হ'তেই কলিজা সেই কাম্‌রাতেই উঠে প'ড়লেন এবং আমাকেও পাছু নিতে হ'ল। গাড়িতে উঠেই কলিজা আরম্ভ ক'রলেন—

Emergency মশয়—মাপ ক'রবেন। পরের ষ্টেশনেই নেমে যাচ্ছি।

অন্দরের আসনেই ব'সে প'ড়লেন। আমি দ্বারের পাশেই দাঁড়িয়ে রইলাম। আসন গ্রহণ ক'রেই সুরু ক'রলেন—

আপনি মশয় যদি এই মাঝখানটিতে বসেন তাহ'লেই আমার দিকটা neutral ground হ'য়ে পড়ে।

ভদ্রলোক কলিজার দিকে একবার ভস্মলোচন ছেড়ে তাই ব'সলেন।

কলিজার বিরাম নেই।—

দেখুন মশয়, দম্পতী-কলহ কালিদাসের আমলেও বেশ কায়েমী ভাবে এ দেশে ছিল। ইতিহাসের পাতায় তো ইতরে জনার স্থান নেই; আর রাজা-রাজড়ার হাঁড়ি হঠাৎ হাটে ভাঙ্গা যায় না। তাই কাব্য বা উপন্যাসের শরণ নেওয়া। মুঘল-বাদশাদের চক্ষু-লজ্জার বালাই ছিল না—ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছেন। কিন্তু আপনি ত' হিন্দু! রামচন্দ্রের নজির আছে বটে—কিন্তু সে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা, তখন বানর জাতিরও সমাজে হুঁকো মিল্‌তো।

কাসির অছিলায় জানালার বাইরে মুখ বা'র ক'রে হাসি গোপন ক'রলাম।

কলিজা—গাম্ভীর্য্য সুরুতে একটা pose মাত্র, তার chronic অবস্থার পরিচয় হ'ল habit। আবার তারই মল্লিনাথ হ'ল—second nature। কিন্তু Diversion ব'লে একটা কথা আছে। ছেলে-ভুলানো একটা গল্পে প'ড়েছিলুম, বিষম রাগ হ'লে এক থেকে এক শো অবধি গুণতে আরম্ভ ক'রবে। এর মূলেও ঐ principle of Diversion ছাড়া আর কিছুই নেই। Diversion ভাল মশয়, ভাল। বদ্ধ পাগলের জন্য এটাই হ'ল পরম ব্যবস্থা।

"Rascal"—Boilerএর safety valve চকিতের জন্য খুলে দিলে যেমন একটা শব্দ হয় তদনুরূপ একটু আওয়াজ।

কিন্তু কলিজার হেল্‌দোল্ নেই। নির্ব্বিকার চিত্তে ব'লে যেতে লাগ্‌লেন—

তামাম কোলকেতা শহর উঠোন ক'রে ফেলেছেন—নিরাপদ স্থান দিক্‌চক্ররেখার মত পিছিয়েই গেছে। শেষে যশোর নগরীকে ভাগ্য-পরীক্ষার ক্ষেত্র ক'রলেন। বড় সুবিধা হ'বে মনে হয় না। Gratis adviceএর গুরুত্ব নেই—হয় ত' এ কাণ দিয়ে প্রবেশ ক'রে অন্য কাণ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তবুও বলি। কোন্ জেলা? হুগলী না বর্দ্ধমান? তা যেখানেই হ'ক—কাঁঠালগাছ দেখেছেন বোধ হয়। পশ্চিম-বঙ্গের কাঁঠালগাছ মশয়—পূর্ব্ববঙ্গের নয়—সেখানে অত বাঁধাবাঁধি নেই। কাঁঠাল পাকবার

প্রাক্কালেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা গোড়া থেকে অন্ততঃ ছ'সাত হাত উপর পর্য্যন্ত বাব্‌লা কাঁটার ব্যবস্থা করেন—শৃগাল প্রভৃতি পরস্বলোভী পশ্বাদির দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ করবার ফিকির আর কি। Chittagong Hill Tracts নাম শুনেছেন বোধ হয়। সেখানে অনায়াসে কিছু বন ইজারা পেতে পারেন। গাছের ওপর কুটীর নির্ম্মাণ—বাব্‌লা কাঁটা—আর একখানি দড়ির সিঁড়ির ব্যবস্থা—ব্যস্‌!

পরের ষ্টেশন এসে পড়ার দরুণ হাতাহাতিটা আর হ'ল না। নিজেদের কামরায় যাবার আগে কলিজার বিদায়-সম্ভাষণটুকু কিন্তু আবরুবাদী লোকটিকে বিস্মিত ক'রল—

আবগারি বিভাগের মগজের মধ্যে একটা কথা দিনরাত জ্বল জ্বল ক'রছে—"Illicit"। কিন্তু মেয়েদের সাতপাকের বাঁধনের বাইরেও দু'একজন থাকে যাদের সঙ্গে মাখামাখির মানে Illicit Love নয়ই নয়—বুঝলেন। এখনই যদি আপনার গিন্নীকে সুশীলা ব'লে ডাকি, সে ঘোমটা ত' খুলবেই—পানের খিলিও একটা দিতে পারে। কি বলিস রে সুশীলা—আহাম্মকটার কাণ্ ম'লে দিয়ে পরিচয়টা দিয়ে দিবি তো।

মিহিসুরের মোলায়েম আওয়াজ এল—সরকার মশাই—খাকি ফিরলেন।

৩

নিজের কামরায় ফিরে এসে দেখি, আসন জোড়া ক'রে দুই ম্যাওয়া। গায়ের গন্ধে থাইসিস সারে। দুই পাগড়ীতেই দু'শো গজের ধাক্কা। অনেক দুঃখেই আমাহুল্লা সাহেবিয়ানা পোষাকের পক্ষপাতী হ'য়ে প'ড়েছিলেন—অন্ততঃ পাগড়ীর আওতায় প'ড়ে কাবুলী মগজটা বিগড়ে যাবার সম্ভাবনা আর থাক্‌তো না। একজন গোঁফে তা দিচ্ছিলেন, আর একজন দাড়ী চোম্‌রাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই দু'জনের চোখে চোখে কি ইসারা হ'য়ে গেল। কলিজা তখনো ফেরেন নি, বোধ হয় পাশের গাড়িতে সদর-মফস্বলের শান্তি-বৈঠকে পান-তামাক দুই-ই মিলেছিল। ইসারার পর কি আকারিত হ'য়ে ওঠে দেখবার জন্যে আগ্রহ ক্রমেই ঘনিয়ে উঠ্‌ছিলো। মিনিট কয়েক পরেই গোঁফবিলাসী ব্যক্তিটি কাবুলী বাংলায় সম্ভাষণ ক'রলেন—

এঃ বাবু! খোল্‌না কঃ বাজ্জে পোঁছা? ক্যতনা? সাড়ে'ছ?

তার পর দেশওয়ালী ভাষায় সঙ্গীকে কি ব'ললেন, আমার মনে হ'ল "কামস্কাট্‌কা"। সঙ্গীর উত্তরটা শোনালো, "খাগ্র খাস্‌তো খা না খাস্‌তো গ্র"।

কথা ক'ওয়া'ত' নয় যেন করাত চালানো। ঐ ভাষায় নবদম্পতীর মধুমিলনের প্রথম আলাপ কেমন জমে কে জানে।

বাথরুম—কথাটা শোনায় ভাল—নইলে ইণ্টার ক্লাসের বাথরুম ব'লতে যা বোঝায় তা'র বাংলা তর্জ্জমাটায় পর্য্যন্ত দুর্গন্ধের দৌরাত্ম্য। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন আর এক মূর্ত্তি। জেগেই ছিলুম—নইলে মনে হ'ত নৃসিংহ অবতারের স্বপ্ন দেখ্‌ছি। ইঁহা দাড়ী-গোঁফের সমারোহ—চুলগুলির সমাবেশ এমনই যে ঝড়-বিধ্বস্ত ধানক্ষেতকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মাথায় লম্বা লম্বা তামাটে জটা—যেন কন্টিকারীর বন। গলায়, দুই বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। গায়ে বস্ত্রের বালাই নেই—লোম প্রাচুর্য্য সে অভাব মিটিয়েছে। তবে কটিদেশ হ'তে হাঁটু পর্য্যন্ত, একখণ্ড গেরুয়া পাঁচ আইনকে ঠেকিয়ে রেখেছে। হাতের আঙ্গুলে লম্বা লম্বা নখ। তেমন মেধাবী আইন-সচিবের পাল্লায় প'ড়লে অস্ত্র-আইনের কবলে আস্‌তেন। দাড়ি-গোঁফের তরঙ্গের মাঝে নাসিকাটি শুশুকের মত যেন ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠেছে—তলিয়ে গেল ব'লে। একটি মাত্র চক্ষু। আর একটি, শুকনো ডোবার মত চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত। ক্রমশঃ এগিয়ে এলেন কাল-বোশেখীর মেঘের মত। চেহারার চটকে কাবুলীযুগল পর্য্যন্ত থ। একচক্ষের দৃষ্টি আমারই ওপর প্রসন্ন। খাড়া অবস্থাতেই কথা সুরু ক'রলেন—

আপ্‌নে বাবুজি বঙ্গালি আছে, আপ্‌নে বোঝ্‌বেন। বিদেশী জাত রাজতকত পাইয়েছেন, সাধু ফকিরকোভি পাশ পয়সা মাঙ্‌ছেন। ইয়ে কলি, পুরা কলি দেওতাকো প্রভাব। অন্যথা আপ্‌নে কভ্‌ভি পোড়েছেন, শোনেছেন সাধু-সন্ন্যাসী কোড়ি দেকর্‌ এক শওহরসে দুসরা শওহরমে যাইছেন। পরণে নোকর আপ্‌নে বঙ্গালি বাবুলোগী ভি ভেড়ুয়া বনে গিয়েছেন। আপ্‌নে বোল্‌বেন ইয়ে রেল্‌কে চোড়্‌কে কেনো যাইছেন—পাঁওদলমে যাইলে কোড়ি

লাগ্‌ছে না। পাঁওদলের সড়ক রাখ্‌ছেন যে যাইবো? ফুটাফাটা সড়ক। একটা গাছভি নেহি যে বিশ্রাম করি। একঠো কুয়াভি নেহি যে তিয়াসকা জল মিলি। নালা খালামে একঠো লাওভি নেহি যে ইস্‌পারসে উস্‌পার যায়ি। সড়কে সে কেমোন কোরেঃযাইবন। বোলেন—একঠো বাত তো বোলেন।

কিন্তু সাধুসঙ্গ বেশীক্ষণ অদৃষ্টে নেই—বাত্‌ বোল্‌বার অপেক্ষা সইল না। ষ্টেশন কাছে এসে পড়ায় গাড়ীর গতি মন্দীভূত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে সাধু মহারাজ বাথরুমে প্রবেশ ক'রলেন। হয় তো কলিকাতা থেকেই এই লুকোচুরির সুরু। মাথার ওপর হঠাৎ ধ্বনি, "ইচ্ছে হয় কাণ ধ'রে এনে দেখিয়ে দিই"। তাজ্জব! Bunkএর ওপর একজন। কখন অধিষ্ঠিত হ'য়েছিলেন এবং কলিঙ্গার Kitsএর মাঝখানে কেমন ক'রে যে আত্মগোপন ক'রেছিলেন ঈশ্বর জানেন। দশ পনের মিনিট কামরাতে ছিলাম না, এরই মধ্যে আমদানি, না কলিঙ্গার মালপত্রের সঙ্গে Smuggled হ'য়ে এসেছিলেন বুঝতে পারলুম না। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যোয়ান ছোক্‌রা। গৌরবর্ণ, নাসিকার ডগে একটুকরো গোঁফ, জোড়া ভ্রূ, দিব্যি আয়ত চক্ষু। অঙ্গের বাকী অংশটুকু আধময়লা শয্যাস্তরণে ঢাকা। বললুম—

ধরা প'ড়লে এর চেয়ে আর বেশী শাস্তি কি হ'বে মশাই। বাথরুমে বন্দী। জরিমানা দেবার সম্বল নেই, দু'দশ দিনের কয়েদ হ'বে। পাঁচ ছ' ঘণ্টা নরকবাসের চাইতেও সে কি বেশী শাস্তি?

আহা তা নয়। তা নয়। Railway দেশের নৈতিক চরিত্র কতখানি অবনত ক'রেছে Railway পাণ্ডাদের সাম্‌নে এই সাধুকে হাজির ক'রে দেখিয়ে দিই। হাঁটা রাস্তা লোপাট, পয়সা ফেল, পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে এ-গাঁ ও-গাঁ যাওয়া-আসা কর। না থাকে, চুরি কর, মোদ্দা রেলে যেতেই হ'বে। হাঁত পা থাকতে জগন্নাথ। এ তো গেল এক দিক। পল্লীগ্রামের ধান দুধ মাছ তো চুরি ক'রছেই—মানুষ পর্য্যন্ত চুরি ক'রছে এই রেল। ক'লকেতায় আজ যারা জলজীয়ন্ত তারা তো চোরাই মাল মশাই। এই রেল তাদের চুরি ক'রে এনে গাফ্‌ ক'রেছে। গাফ্‌—একেবারে বেমালুম। এমন বেমালুম যে আজ দেশ যদি তাদের দাবি করে, সেটা হ'বে দেশের বেয়াদবি; আর যদি জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়, সেটা হ'বে বাটপাড়ি। তার পর দেখুন আর এক দিক।

ব'লতে ব'লতে উঠে ব'সলেন।

যারা চাষ ক'রতো তারা হ'য়েছে চাপ্‌রাশী; ফলে মাঠ হ'য়েছে বন কি ভাগাড়; ম্যাঞ্চেষ্টার হয়েছেন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা; Gillete Blade আর Hair cutting Saloonএ দেশ ছেয়ে গেছে। মাছ নিঃশেষ, Director of Fisheries আছেন—খান্‌, কত খাবেন। গোয়ালিনীর মার্কা দেখিয়ে পুত্রকন্যাকে সন্তুষ্ট করুন। তেল—সারা ক'লকেতা খুঁজুন, সর্ব্বত্রই "এখানে ভেজাল মিশ্রিত তৈল পাওয়া যায়"—খাঁটি সর্ষের তেল কি প্রত্নতত্ত্বের সামিল না কি? আরে মশাই, এইখানেই কি ইতি?

ব'লতে ব'লতে নেমে এলেন। খদ্দরের কাপড়, বেনিয়ান। দিব্যি পেশী-বহুল সটান চেহারা।

তখন বর্গী আস্‌তো—হাঁটা-পথে পালে-পার্ব্বণে। লুঠ করলো—চৌথ আদায় করলো—ব্যস্‌ প্রস্থান। এখন বর্গীর হাঙ্গামা ডাক্তার-উকীল-কাবুলী-গঠিত একটা বিরাট চমূ। শেষ নেই, ফাঁক নেই, দিন নেই, ক্ষণ নেই—বারো মাস, চব্বিশ ঘণ্টা লুঠছে—হাড়মাস চিবিয়ে খাচ্ছে;—এই রেলের কল্যাণে। এই যে দুব্যাটা চলেছে—জিজ্ঞাসা করুন, কাকে পাঁচ টাকার বিনিময়ে পঞ্চাশ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়েছে, এখন হয় ত গরু-বাছুর, জরু পর্য্যন্ত খুইয়ে সে খত তাকে ফিরিয়ে নিতে হ'বে। দুখানা গাড়ির পরেই ফাষ্টক্লাসে চ'লেছেন ডাক্তার বর্ণচোরা রায়—যশোরে; আমাশায় শলা চালাবেন, ৬৪০্‌ টাকা মাথট। রিজার্ভ সেলুনে চ'লেছেন রক্তচঞ্চু সরখেল য়্যাডভোকেট—বরিশাল; গরু চুরির মোকর্দ্দমা—দৈনিক ৩৫০০্‌ চাঁদির জুতি গ'ণে নেবেন। আর ওঁরা—যাঁদের নাম করতে ভয় হয়, তাঁরা তো লাখে লাখে—যেন ময়মনসিংহের মশা—কি মার্টিনের রেলের ছারপোকা—রক্ত নেবেই, আপনি যতই কেন সাবধান হোন্‌ না।—এই যে, যশোর। আসি মশায়, নমস্কার। এক জায়গায় ডাক প'ড়েছে। একবার মা'র পায়ের ধূলো নিতে চ'লেছি। দেখা হয় তো, এই শেষ কিংবা এই সুরু। আসি, নমস্কার।

নেমে প'ড়লেন।

প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আবার একবার বিদায়-সম্ভাষণ—মনে মনে হয় তো ভাবছেন পাঁচ মিনিটে পাঁচশো কথা ক'য়ে গেল, ছোকরা বড় বক্তার; আর কথাগুলোর মধ্যে বস্তু কিছু নেই। কিন্তু কথাগুলোকেই বড় ক'রে নাই দেখ্‌লেন। কবি-সমাজে একটা প্রবচন আছে—দুটো লাইনের মুখোস প'রে যে দ্রব্যটা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সেইটাকে আবিষ্কার করাই কেরামতি। কিন্তু সকলেই কিছু কবি নয়। কবি-সমাজের বাইরেও একটা জগৎ আছে, সেখানকার মত এই যে, সত্য অপ্রকাশ থাকে না—ধরা প'ড়বেই এবং তার জন্ম বিশেষ কিছু কেরামতির দরকার নেই; তবে সময়-সাপেক্ষ হ'তে পারে। কখনো বা হাতে-হাতেই ধরা পড়ে, কখনও বা লগ্ন ব'য়ে গেলে। এ ক্ষেত্রে, আমাকে বক্তারই ভাবুন আর রেলওয়ে-বিরোধী আহাম্মকের কোঠাতেই পৌঁছে দেন, আমার মধ্যে সত্যিকার যে মানুষটি বর্ত্তমান তাকে চিন্‌বেনই চিন্‌বেন। আমি তখন হয় তো আপনার দৃষ্টির পরিধির বাইরে চ'লে গেছি এবং সে চেনায় আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না হ'বারই সম্ভাবনা, তবে আপনার বুদ্ধির পরিমাণ যে বাড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ পর্য্যন্ত নেই—হাঃ হাঃ হাঃ। আসি—নমস্কার।

চ'লে গেলেন। ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় যে গতিটাকে চলার গতি বলা হয় সেই ছন্দেই গেলেন। আমার মতে কিন্তু সেটা চলন নয়—ধাবন। শেষের ক'টি কথা কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেক্‌লো। রেলসম্বন্ধে বেশ বৈরীভাব পোষণ করেন—বেশ বোঝা গেল। কিন্তু এ ছাড়াও ওঁর ভিতর সত্যিকার কি আছে যেটা জান্‌তে পারলে আমার বুদ্ধির পরিমাণ বেড়ে যাবে—এ তো ধারণাতেই এল না। Humbug!

"এঃ বাব্বু!"—পয়লা নম্বরের কাবুলী আলাপচারীর উপক্রম ক'রলেন। "আপ্‌কে বেকুফ্ বনায়া—ভাগ্‌নেবালা আদ্‌মী chhor হ্যায়।"

য়্যা! চ'মকে উঠ্‌লুম। চোর? তাই তো—কলিজার সুটকেশের চাবি খোলাই তো বটে। সর্ব্বনাশ!—"এতনা ঘড়ি কাহে নেই বোলা?"

"ক্যা জরুরৎ?"

তা বই কি—তুমি তো আর—। যাক্, কলিজা এসে প'ড়লেন। নির্ব্বিকার মানুষ। সব শুনে, একটু হাসলেন মাত্র। বললেন—

ওর ভেতর সত্যিকার মানুষটি হচ্ছে 'চোর'—যিনি হাত ফস্কে পালিয়ে গেলেই বুদ্ধি বাড়ে—ইতি প্রবাদবাক্য। হাঃ হাঃ হাঃ।

গুম হ'য়ে রইলুম।

খুলনায় গাড়ি পৌঁছে গেছে, কিন্তু আমাদের গেরো কাটেনি। ট্রেণের কামরা হ'তে বা'র হ'বার উপায় নেই। দ্বারপথের এক প্রান্তে কাবুলীযুগল পশ্চিমাস্যে নমাজ সুরু ক'রে দিয়েছিলেন, অন্য প্রান্তে নৃসিংহাবতার পূর্ব্বমুখে প্রাণায়ামে ব'সেছিলেন। কলিজার ফুর্ত্তি দেখে কে। বলছিলেন,

আফ্‌শোষ। আলো নেই—একটা snap নিতুম। শাস্ত্রে বলে একত্রে সাতপদ মাত্র ভূমি অতিবাহিত ক'রতে পারলে মৈত্রীর দাবী যমেও রদ ক'রতে পারে না। ক'লকেতা হ'তে খুলনা এক সঙ্গে পাড়ি—কিন্তু বরিশালের ষ্টীমার তো ধর্ম্মসম্মেলনের মর্য্যাদা রাখবে না। অথচ, ধর্ম্মেও হাত দিতে পারি না!

আমি শায়েস্তা খাঁর পথ অবলম্বন করার পরামর্শ দিলাম —গবাক্ষ-পথ। কলিজা ব'লেন—অণিমা লঘিমা আদি কায়দা-কানুনগুলো জানা থাক্‌লে এই বপু সত্ত্বেও না হয় আপনার পরামর্শটা risk করতাম। অন্ততঃ আপনি নেমে প'ড়ে কাজটা অর্দ্ধেক এগিয়ে রাখুন, অচল লাগেজ-গুলো চালান ক'রে দিন। সচল লাগেজ পরেই যাবেন। বেশী দেরী হ'বে না;—টিকিট-কলেক্টারদের অধ্যবসায় বেশী নয়, তাঁরা ষ্টেশনের গেট ত্যাগ ক'রলেই ধর্ম্ম-সম্মেলন ভেঙ্গে যাবে। আপনি ষ্টীমারে উঠে খানসামাকে দুটো পুরো ডিনারের কথাই ব'লে দেবেন বুঝলেন;—ও নিরামিষে আমার আস্থা নেই।—হ্যাঁ সেকণ্ড্ ক্লসে বৈ কি। ষ্টীমারে ত্রিশঙ্কুত্বে বালাই অনেক—পয়লা নম্বর হচ্ছে—আচ্ছা সে বর্ণনা পরে হবে'খন।—আপনি অগ্রসর হোন্।

ইরাক

শ্রীভারতকুমার বসু

ইরাক-দেশটা এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। দেশটা আয়তনে ছোট হ'লেও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এর খ্যাতি অন্য যে-কোনো দেশের চেয়ে কম নয়। ইসলাম যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এর বুকের উপর দিয়ে অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের প্রবল স্রোত ব'য়ে গেছে। বিগত মহাসমরের সময়ও সেখানে তুর্কী সরকার ও ইংরাজদের মধ্যে একটা বিশেষ বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে। মেসোপোটেমিয়া নামে এই দেশটি সব যায়গায় পরিচিত। সেখানকার প্রাকৃতিক



আরব অভিজাত

বিশেষত্ব মোটেই উপভোগ্য নয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে আছে —আরব ও সিরিয়ার ধু-ধু মরুভূমি। মরুভূমির মতো হ'লেও, ইরাক কিন্তু আরবের মতো নয়। ইরাকের ভিতর দিয়ে ব'হে গেছে—তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিশ নদী। এর উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে র'য়েছে জিমেন ও জেবেল পর্ব্বত। উভয় নদীই মিলিত হ'য়ে প'ড়েছে পারস্য উপসাগরে। এই জন্যই আরবের তুলনায় ইরাক হচ্ছে বসবাস ও চাষবাসের পক্ষে অনেক বেশী উপযুক্ত স্থান। কিন্তু তা ব'লে সেখানকার উত্তাপের পরিমাণ কম নয়! উত্তাপ ১১২ থেকে ১২৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ওঠে। মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাঁরা ইংরাজের স্বপক্ষে যুদ্ধ ক'রতে গিয়েছিলেন, তাঁরা ওই উত্তাপের প্রতাপ হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলেন। দারুণ গ্রীষ্মে সামনে নদীর জল থাকলেও তার জল ব্যবহার করবার হুকুম ছিল না। এমন কি, এই রকম আদেশ জারী করা হ'য়েছিল যে, যদি কেউ নদীর জল ব্যবহার করে, তা হ'লে তাকে তৎক্ষণাৎ 'গুলি' ক'রে মেরে ফেলা হবে। সরকার থেকে জনপিছু আড়াই পাউণ্ড জল দেওয়া হ'তো। এই জলের দ্বারা স্নান-পান ইত্যাদি সমস্ত কাজই শেষ ক'রতে হবে। সোডাওয়াটার দেওয়া হ'তো বটে, কিন্তু তাতে জলের অভাব কি মেটে?

…নদীর জল ব্যবহার ক'রতে দেওয়া হ'তো না, কারণ শত্রুপক্ষীয়রা যদি তা বিষাক্ত ক'রে দিয়ে থাকে—এই রকমই ছিল ভয়। যুদ্ধের পর ইরাক, তুর্কীদের অধীনতা-পাশ ছিন্ন ক'রে, নিজেকে স্বাধীন দেশ ব'লে ঘোষণা করে। হেজাজের রাজার তৃতীয় পুত্র এমার ফয়জলকে সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে রাজা ব'লে মেনে নেওয়া হ'লো। তবে রাজ-নৈতিক ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ব্যাপারে ইংরাজের পরামর্শ নিয়ে চ'লতে হবে, এই রকম স্থির হয়। ১৯২১ সালে রাজকার্য্য ভাল ক'রে চালাবার জন্য মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়।

ইউফ্রেটিশ নদীর পূর্ব্ব দিক থেকে বরাবর দক্ষিণে বসোরা পর্য্যন্ত কেবল একটানা মাঠের পর বিস্তীর্ণ মাঠ,—বালি ধু ধু ক'রছে। তার মধ্যে মধ্যে খেজুরগাছের সারি। এই একঘেয়ে ভাবে চ'লতে থাকলে, মনে স্বভাবতঃই অস্বস্তি বোধ হ'য়ে থাকে। এই অংশেরই নাম মেসোপোটেমিয়া।

সেখানকার গাছপালা ব'লতে খেজুর গাছকেই বোঝায়। এত খেজুর সেখানে জন্মায় যে, তা বলা যায় না। খেজুরই

সেখানকার প্রধান ও সুলভ কৃষি-জাত ফল। ইরাকবাসীরা এই খেজুর খেতে ভালবাসেও যেমনি, তা বিদেশে চালান্ ক'রে অর্থ অর্জ্জনও করে তেম্‌নি। তারা খেজুরের পাতার থ'লে তৈরী ক'রে, তার ভিতরে খেজুর রেখে, নিজেদের খালি এবং নোংরা শ্রীচরণ দিয়ে বেশ ক'রে চেপে চেপে ভর্ত্তি করে। এই সব থ'লে বিদেশে চালান হয়, এবং পৃথিবীর লোক সেই খেজুর তৃপ্তির সঙ্গে খায়।

সেখানে কাঁটা-জাতীয় এক রকম ঘাস জন্মায়। কাঁটাতে মুখ ক্ষত-



স্বর্ণকারের দোকান



বাগদাদের জু-মহিলা

বিক্ষত হ'য়ে গেলেও, সেখানকার উটেরা তা পরমানন্দে চর্ব্বণ করে,—এমনি প্রিয় খাদ্য ওটা তাদের। সেখানকার মরুভূমিতে চলাচলের ও ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে উট বিশেষ উপযোগী। সেখানে ঘোড়াও আছে, তবে সংখ্যায় খুব কম। লোকেরা উটের দুধ খেয়ে থাকে। মোরগ ও দুম্বা-ও সেখানকার অধিবাসীরা পোষে। দুম্বার মাংস তাদের প্রিয় খাদ্য।

ইরাক-দেশটাকে আজ মরুভূমির মতো দেখালেও, এককালে ওটা একটা জনাকীর্ণ, সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যাবিলনের নাম করা যেতে পারে। আজও তার ভগ্নাবশেষ অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই সব ভগ্নাবশেষের কিছু অংশ নিয়ে হিলা ও বাগ্‌দাদের প্রাচীর তৈরী করা হ'য়েছে।

ইরাকে আজকাল নানা জাতীয় লোক বসবাস করে। আরবের উত্তরাংশের লোকেরা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সেখানে এসে আস্তানা গেড়েছিল। এখন তাদের বংশধরেরা সেখানে স্থায়ী হ'য়ে গেছে। আর্য্য-বংশীয় কেউ' বোধ হয় সেখানে ছিল না। সেমেটিক নামে অর্দ্ধসভ্য এক জাতীয় লোক সেখানে বসবাস ক'রেছিল। এখনও তাদের বংশধরেরা সেখানে বংশ-বৃদ্ধি ক'রছে। এরা-

অনেকটা ছিল দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়দের মতো। বেদুইনরাই সেখানকার আদিম অধিবাসী।

ইরাকের নারীদের ইরাণী সুন্দরী বলা উচিত। বাস্তবিকই এদের গায়ের রং ও গঠন দেখে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। এদের কালিদাস-বর্ণিত তনু-শ্রী দেখলে স্বপ্ন-রাজ্যের পরীদের কথাই যেন মনে প'ড়ে যায়। কিন্তু তা হ'লে কি হবে, তারা বড় নোংরা। এরা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তারা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী সুন্দরী।

ইরাকে পর্দ্দাপ্রথার বাধা নেই। কাজেই, মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে পথে চলা-ফেরা করে। সেখানে মেয়ে চুরীও হয় না, কিম্বা, ব্যভিচারেরও তেমন প্রশ্রয় নেই।

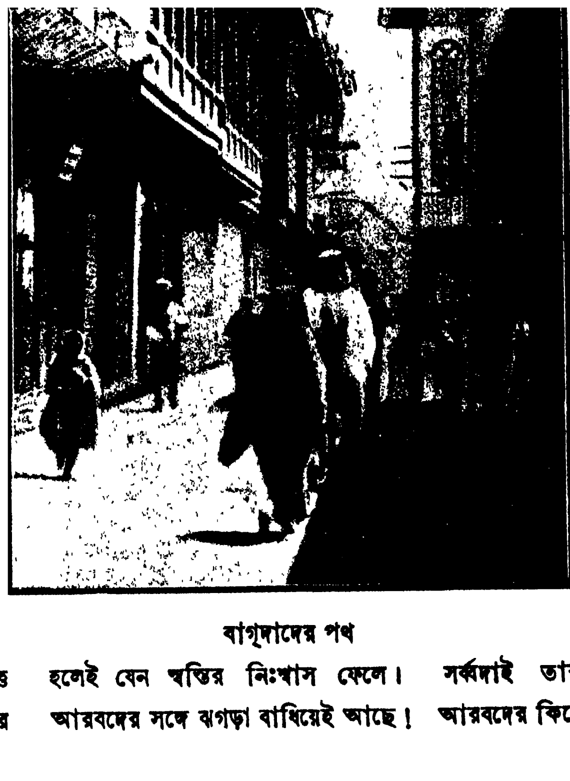


তরুণী

চোখে দেখতে পারে না, এবং অন্তরের সঙ্গে ঘৃণাই করে। বেদুইনরা তাদের সঙ্গে কোনো লেন্-দেন্ না রাখতে



মুচির কাজ

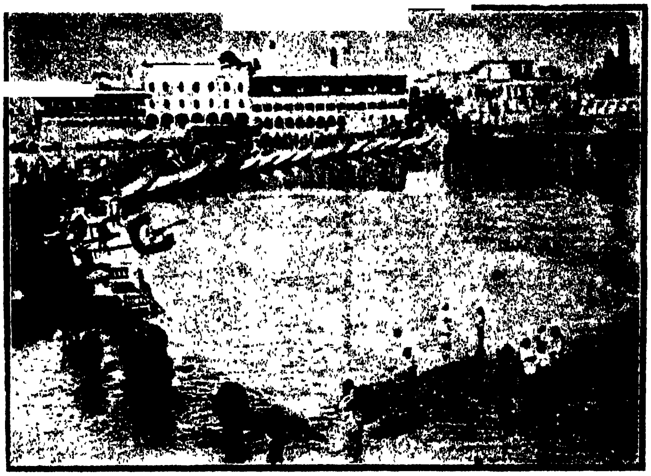


বাগ্দাদের পথ

বেদুইনদের চেয়ে সেখানকার আরবদের শক্তি-প্রতিপত্তি ও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হ'লেও, বেদুইনরা তাদের মোটেই প্রীতির হলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সর্ব্বদাই তারা আরবদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েই আছে। আরবদের কিসে

ক্ষতি হবে, তাই তাদের একমাত্র চিন্তা। বেদুইনরা চুরি-ডাকাতী এবং নানা উপায়ের দ্বারা আরবদের অস্থির ক'রে তুলতে ছাড়ে না। এদের ধ'রে সায়েস্তা করাও একটা বিষম হাঙ্গামা! এরা ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না। একগুঁয়েমি এদের প্রধান গুণ। এরা একবার যা 'গোঁ' ধ'রবে, নানা যুক্তি দিয়েও তা ছাড়ানো যাবে না;—তারা তা মোটেই শুনবে না;—বোঝা ত দূরের কথা। এই সব বেদুইন দেখতে যেমন ভীষণ, তাদের প্রকৃতিও তেম্‌নি ভয়ানক! এরা দলবদ্ধ হ'য়ে থাকে। প্রত্যেক দলে এক-একজন সর্দ্দার থাকে। এই সব সর্দ্দারের ইঙ্গিতেই তারা চলাফেরা করে। কোনো পথিক যদি এদের পাল্লায় প'ড়েছেন, ত গেছেন! এরা সাধারণ লোকালয়ে থাকে না। এদের বাসভূমি হচ্ছে মরুভূমির এমন জায়গায় যেখানে একেবারেই লোক-চলাচল হ'তে পারে না। মাটীর নীচে গর্ত্ত ক'রে তার ভিতরে এরা আস্তানা গড়ে এবং আলো ও হাওয়ার জন্য মাটীর উপর একটা চিমনীর মতো জিনিষ তৈরী ক'রে রাখে।

বিগত মহাসমরের আগে ইরাক ছিল তুর্কীর অধিকারে। তুর্কী-সরকার বহুবার ঐ সব বেদুইনদের হাতে 'নাস্তানাবুদ্' হ'য়েছিলেন। বেদুইনরা ছিল বিপ্লবপন্থী। আরবরাও তুর্কী-সরকারকে বড় একটা মেনে চ'লতো না; নিজেরাই জোর-জবরদস্তি ক'রে খাজনা আদায় ক'রতো এবং সুযোগ পেলেই সরকারী অফিস্ পুড়িয়ে দিত। আবু আহম্মদ এবং বেন্ আলামের দল এ-বিষয়ে ছিল খুব সিদ্ধহস্ত। এরা কথায়-কথায় খুন-জখম ও লুটতরাজ ক'রতো। বেশী বাড়াবাড়ি ক'রলে, পথিককে হত্যা ক'রতেও এরা পশ্চাদ্‌পদ হ'তো না। নির্জ্জনে পথিক হত্যা ক'রে লুট করাই ছিল এদের নিত্য-কর্ম্ম। বিশ্বাসঘাতকও ছিল এরা খুব। কিন্তু তুর্কীদের সঙ্গে মনোমালিন্য থাকলেও, যুদ্ধে এরা তুর্কীদের স্বপক্ষে থেকে' ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রেছিল। এরা ছিল প্রথম শ্রেণীর খামখেয়ালী। কাজেই, কোনো কাজের ভার এদের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় ছিল না। এরা এমন বদ্‌খেয়ালী যে, যুদ্ধের সময় সুযোগ পেলে স্বজাতি ও স্বদেশবাসীদেরও ওপর অত্যাচার ক'রতে দ্বিধা বোধ ক'রতো না। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা ত দূরের কথা, তুর্কী সরকার এদের নিয়ে মহামুস্কিলে প'ড়েছিলেন।



টাইগ্রিস্-নদীর উপরে নৌকার সেতু



নোমাদ্ জাতীয় পরিবার

ঐ উৎপীড়নেচ্ছার মূলে আছে প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িকতা। মেসোপোটেমিয়াবাসীরা হচ্ছে সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, এবং তুর্কীরা

হচ্ছে সুন্নি। তুর্কীরা দেশের হর্তা কর্তা ছিল ব'লে তাদের রীতি-নীতি ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসই প্রচলিত ছিল বেশী। ওদিকে,



কাঠের কাজ

সিয়া-সম্প্রদায়স্থ লোকেরা সংখ্যায় বেশী হ'লেও, তাদের ধর্ম্মমত সুন্নি-শ্রেণীর লোকেরা মেনে চ'লতো না কাজেই—



চুব্‌ড়ী নৌকা। এর সাহায্যে ফল-আনাজ বহন করা যেতে পারে, আবার নদী পার হওয়াও চলে

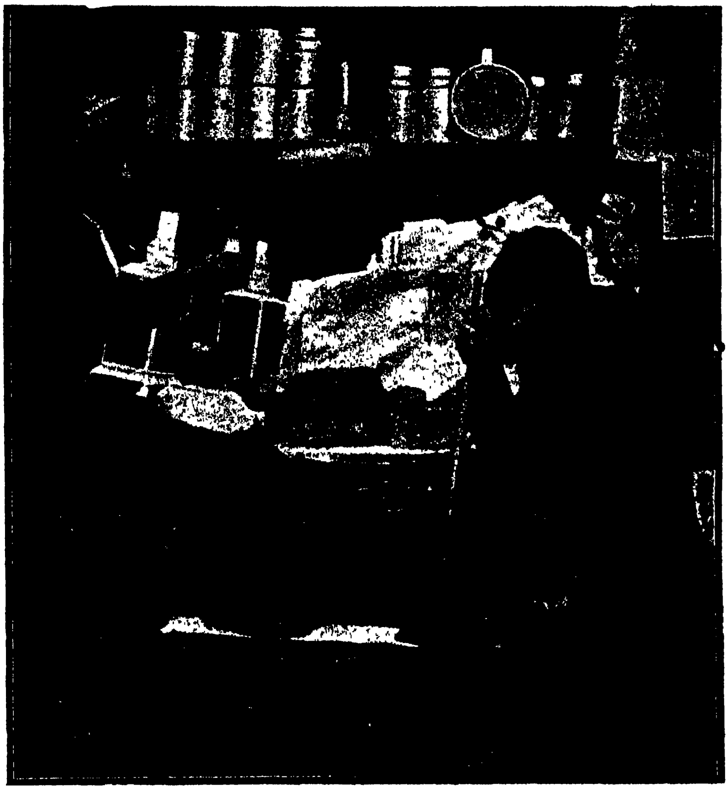
কাজেই, মতান্তর মনান্তরে, এবং মনান্তর ক্রমে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণত হ'লো। কারবালার মাঠে ঐ দুই সম্প্রদায়ের যে তুমুল যুদ্ধ ঐ কারণে হ'য়ে গেছে, তার স্মৃতি-চিহ্ন বুঝি আজও সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায়।

আর এক ধর্ম্মাবলম্বী লোক সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। তারা কোন্ ধর্ম্মের লোক, তা তাদের আচারবিচার দেখে' বোঝা কঠিন। কোনো নদীর তীরে বাস করাই না কি তাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। তাই, তারা নদীর তীরে বাস করে এবং বাস ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করে। আচার ব্যবহারে এরা কতকটা খৃষ্টানদের মতো, এবং কতকটা মুসলমানদের মতো। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হ'তে কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে, এরা তাকে ধর্ম্ম-গ্রন্থ ব'লে আসছে। বাস্তবিক পক্ষে এদের নিজেদের ব'লতে কিছুই নেই। সপ্তাহের প্রথম দিন্‌কে এরা ঠিক খৃষ্টানদের মতো মানে। তবু তারা খৃষ্টান নয়, আবার ইহুদীও নয়! যাই হোক, ধর্ম্মে এরা যা-ই হোক না কেন, এদের এমন একটী গুণ আছে, যার জন্য এদের দেশ-বিদেশে বেশ-একটু সুনাম আছে। তা হচ্ছে এদের স্বর্ণ ও রূপার জিনিষের উপর কারু-কার্য্য। উক্ত কারু-বিন্যাস ও চিত্র এমন সুন্দর হয় যে, অনেক ইংরাজ-ই তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই কাজই তাদের জাতীয় ব্যবসা ও অর্থ অর্জ্জনের একমাত্র পথ। পাছে কেউ তাদের ওই কারু-কুশলতার কৌশল দেখে' শিখে নেয়, এই ভয়ে তারা নির্জ্জনে ব'সে কাজ করে; পরম আত্মীয় বা নিকটতম বন্ধুকেও কাছে আসতে দেয় না। একাধিক সন্তান থাকলে, পিতা তার বড় অথবা আদুরে ছেলেটীকেই

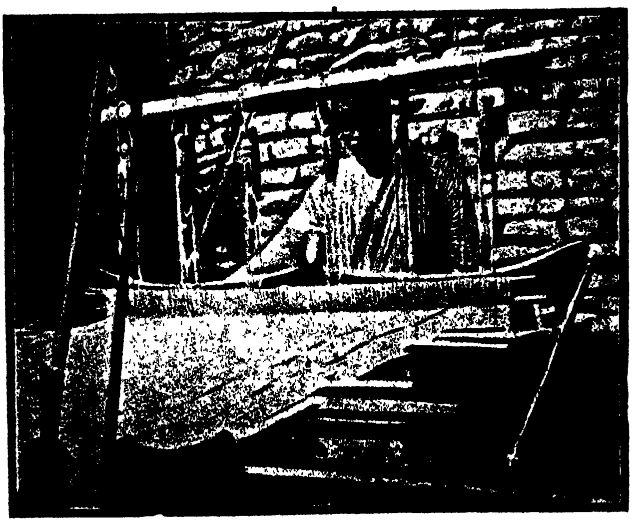
ঐ কাজ শেখান। অবশ্য ছেলে যাতে না অন্যের কাছে ঐ কাজের কৌশল প্রকাশ ক'রে দেয়, এজন্য তাকে দিয়ে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া হয়। ছেলে যদি ঐ কৌশল প্রকাশ ক'রে দেয়, তা হ'লে তার ভবিষ্যৎ ফল কি হবে, তাও ব'লে দেওয়া হয়। কাজেই উত্তরাধিকারসূত্রে বংশ-পরম্পরায় তারা ঐ কৌশল অন্যের কাছে চির-অজ্ঞাত ক'রে রাখে।

ইরাকের উত্তর সীমান্তে আর-এক দল লোক বাস করে। তারা হয় ত কুর্দ্দিস্থানের আদিম অসভ্য জাতি। তারা প্রেত-উপাসক। তাদের বিশ্বাস, সাপই যত অনর্থ ও পাপের মূল! তাই, যাতে সাপের বংশ ধ্বংস হয়, সে জন্য তারা ময়ূর পুষে থাকে এবং অতি পবিত্র জ্ঞানে ময়ূরকে ভক্তি করে। যে কোনো সাপ দেখলেই, তাকে যেন-তেন-প্রকারেণ মারা চাই-ই। এটাকে তারা একটা পবিত্র কাজ ব'লে মনে করে।

ইরাকে ব্যবসা বাণিজ্য আগে তেমন সুবিধাজনক ছিল না। উট, নৌকা কিম্বা মুটের দ্বারা ব্যবসা ভাল ভাবে চ'লতো না। তাতে আমদানী জিনিষের দাম



টিনের তৈরী জিনিষের দোকান



তাঁত

খুবই চড়া হ'তো। রপ্তানী জিনিষেও তেমন লাভ থাকতো না। বছর কয়েক ধ'রে রেল হওয়ায়, স্থলে ও জলে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের সুবর্ণ সুযোগ হ'য়েছে। বাগদাদ থেকে চারি দিকে রেল লাইন চ'লে গেছে। দক্ষিণ দিকে রেল লাইন বসোরা পর্য্যন্ত এসেছে। বসোরা থেকে ষ্টীমারে পারস্যোসাগর দিয়ে বিদেশে অল্প সময়ে ও কম খরচে মাল চালান হ'য়ে থাকে। আবার, আমদানী মাল-ও বসোরা থেকে অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সব যায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ইরাক কৃষি-প্রধান না হলেও, আজকাল সেখানে চাষের খুবই উন্নতি হচ্ছে।

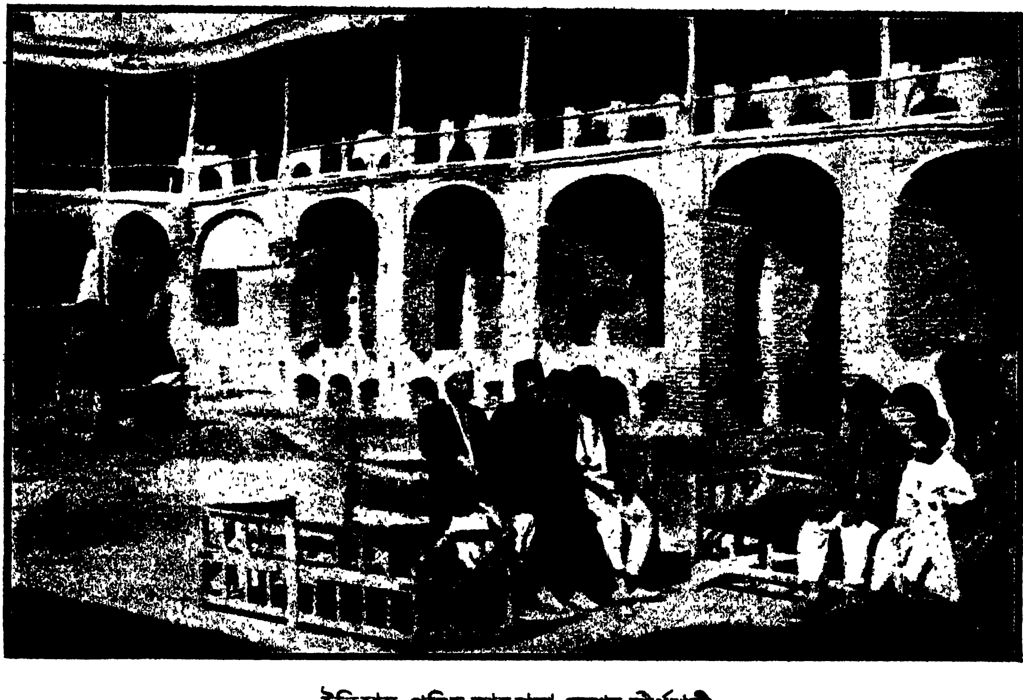
ইরাকের বর্ত্তমান রাজধানী বাগদাদ। এই বাগদাদ্-ই একদিন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হারুণ আল্

রসিদের রাজধানী ছিল। অন্তর্বাণিজ্যের এটা একটা প্রধান কেন্দ্র। বিলাত ও ভারত-লাইনে যে এরোপ্লেন চলে,

বাগদাদে অনেক প্রসিদ্ধ বাড়ী ও মস্‌জিদ আছে। তার মধ্যে আবদুল কাদের মস্‌জিদই নামজাদা।



কাফিখানার বারাণ্ডায় বায়ু-সেবন



ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কার্‌বালা-দেশের তীর্থযাত্রী

বাগদাদ তার একটা প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। এর পরই উল্লেখযোগ্য সহর হচ্ছে বসোরা।

সেখানকার একটী বিশেষত্ব এই যে, সেখানকার বাড়ীগুলো প্রায় এক রংয়ের। নদীতীর থেকে এই সহরের দৃশ্য

অতি সুন্দর। সকালে ও সন্ধ্যায় আরব বালকেরা ছোট ছোট নৌকা নিয়ে খেলা করে। নৌকা চালাবার সময় খাটো ব্যবসায়ে বেশ দু-পয়সা আয় হয়। এতে খুব বেশী হয় ত ৮।৯ মণ মাল ধরে। আনাজ, ফল ও তরকারীর



পথের ধারে নাপিতের কাজ

তারা যে মধুর গজল গান করে, তা কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্ম স্পর্শ করে। কখনো কখনো মেয়েরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যে নৌকায় তারা বেড়ায়, সেই সব নৌকা বড় বড় খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী। নৌকাগুলো ৪।৫ মণ ওজনের মাল বহন ক'রতে পারে। আর এক রকমের নৌকা সেখানে আছে, যা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। তাকে চুবড়ী-নৌকা বলা যেতে পারে। সেগুলো কাঠের তৈরী নয়। তার ফ্রেম্-গুলো কাঠের এবং ছাউনীগুলো খড়ের। তবে, খড়ের হলেও, নৌকার ভিতরে জল ঢুকতে পারে না, কারণ, আল্কাত্‌রা ও পিচ্-জাতীয় একরকম জিনিষ এমন ভাবে তার উপর প্রলেপ দেওয়া হয় যে, তা ঠিক সিমেণ্টের মতো চেপে ব'সে যায়। তাই-গ্রীস্-নদীতে এই নৌকা চালিয়ে ছোট

ব্যবসাই এর দ্বারা সম্ভব। সময়ে আবার এই নৌকায় ফেরির কাজও হ'য়ে থাকে।



খেজুর-গাছের তলায় পড়া খেজুর সংগ্রহ ক'রছে

ইরাকের তুর্কী, আর্মেনিয়ান ও ইহুদী অধিবাসীরা পাজামা, কোর্ত্তা ও ফেজ্ টুপী ব্যবহার করে। তবে যারা সঙ্গতিপন্ন, তারা কেউ কেউ রেশমের টুপী কিম্বা ইয়োরোপীয় পোষাক পরে। গরীবরা দেশীয় কাপড়-জামাই ব্যবহার করে। এরা নিজেদের হাতে কার্পাস থেকে সুতা বের ক'রে সেই সুতায় তাঁতে কাপড় বোনে। আজকাল অনেক বিদেশী সস্তা কাপড় আমদানী হওয়ায়, অনেকে তাঁত বোনা ছেড়ে দিয়ে, বিদেশীদের পেট ভরাচ্ছে। অনেকে আবার বিদেশী জিনিষ কেনাকে অন্তরের সঙ্গে



সন্ত-তৈরী মাটীর গাম্‌লা রোদ্দুরে শুকোতে দিতে যাচ্ছে

ঘৃণা করে। হাতের কাজে তাদের খুব দক্ষতা আছে, অর্থাৎ জুতা-সেলাই থেকে রাজপ্রাসাদ তৈরী ক'রতে তারা সিদ্ধহস্ত। তার একটু কারণ আছে। এরা লেখাপড়ার দিকে মনোযোগী একটুও নয়। লেখাপড়া ব'লতে এরা আগে আরবী, উর্দ্দু ভাষা বোঝে। আগে যে ব্যক্তি কোরাণ প'ড়তে পারতো, সে হ'তো মহা পণ্ডিত। এই জন্যই, মৌলবী ও মোল্লার দল এই দিকেই নজর দিতেন বেশী। সাধারণ লোকেরা তাই কোরাণে চোখ বুলিয়ে গিয়েই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য হাতের কাজ শিখতে মন দেয়। আজকাল তারা কিন্তু লেখাপড়ার যে কিছু মূল্য আছে, তা বুঝতে শিখেছে। তারা বুঝেছে যে, কেবল হাতের কাজ নয়, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জ্জন না ক'রলে উন্নতির আশা নেই। তাই, বর্ত্তমানে সেখানে দু-একটা স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে।

ডাক্তারী-শাস্ত্র ইরাকে অজ্ঞাতই ছিল। এখনো কারও কিছু অস্ত্র ক'রতে হ'লে, তাকে শরণাপন্ন হ'তে হবে নাপিতের। নরসুন্দর মহাশয় তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে



মৃৎ-শিল্প

রাস্তায় ধারে ব'সে থাকেন। তিনি চুলও কাটেন, আবার দরকার হ'লে ক্ষুর অথবা নরুণ নিয়ে এমন সাংঘাতিকভাবে অস্ত্র করেন যে, তার কল্যাণে রোগী হয় বেঁচে যায়, আর নয় ভবলীলা সাঙ্গ করে।

শাস্ত্র-পড়া দু একজন ডাক্তার যে সেখানে নেই, তা নয়। তবে তাদের চাহিদা প্রচুর। কাজেই, সহর এবং ধনীদের বাড়ীতেই তাদের দেখতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামের লোকেরা দুঃস্থ। কাজেই, অল্প পয়সায় হাকিমী মতে তারা চিকিৎসা করায়।

ইরাকের আরবী অধিবাসীদের কেউ কেউ ফেজ টুপী ব্যবহার করে বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই মাথায় মোটা রুমাল পাগড়ীর মতো বাঁধে; খানিকটা আবার পিঠের দিকেও ঝুলিয়ে দেয়। অবস্থানুসারে তারা জুতা ও মোজা ব্যবহার করে। সেখানকার মেয়েরাও পা-জামা পরে এবং মাথায় কাশ্মীরী মেয়েদের মতো রুমাল জড়ায়। তারা পুরুষদের মতো আলখাল্লাও পরে এবং নাগ্‌রা জুতা পছন্দ করে। নাকে ও কাণে রিং প'রতে তারা অত্যন্ত ভালবাসে। এরা খুব পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ। সাংসারিক কাজকর্ম্ম শেষ হ'য়ে গেলে, অবসর সময়ে তারা বিক্রীর জন্য জিনিষ-পত্তর তৈরী ক'রে একটা আয়ের উপায় ক'রতে আন্তরিক উৎসাহ ঢেলে দেয়। পুরুষরা অবসর সময়ে কোনো হোটেলে কিম্বা সরাইখানায় ব'সে কাফি খায়, দাবা খেলে, আর খোস্‌-গল্প ক'রে সময় কাটায়। সময় সময় আবার আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়েরও আলোচনা হ'য়ে থাকে। সেখানকার পুরুষদের মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই যে, তারা দাড়ি রাখে কম।

ইরাকের লোকেরা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে প্রায়ই অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে না। আর, যদিও বা করে, তবে প্রথমা স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয় না। গমের রুটী সেখানকার প্রধান খাদ্য।

মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে সিয়াদের পবিত্র তীর্থ-স্থান হচ্ছে—নাজিফ, কারবালা, কাজি মেইন ও সামারা। সপ্তম ও নবম সামেরা দ্বাদশ ও শেষ ইমামের কবর-স্থল—কাজি মেইন। নেজাফে খালিফা আলির, এবং কারবালায় আলির পুত্র হোসেনের কবর ও মসজিদ বর্ত্তমান। মহরম উপলক্ষে কারবালায় লোক-সমাগম হয় বেশী। হোসেন সেখানে মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে যুদ্ধ ক'রে শত্রুর হাতে নিহত হন। তারই স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ অন্তর-ভরা দুঃখ জানাবার জন্য প্রতি বৎসর ওই পবিত্র তিথিতে সেখানে সিয়ারা বুকে আঘাত ক'রে অশ্রু ফেলে আসে। এদের বিশ্বাস, নাজিফ



হাওয়ায়-ভরা চামড়ার থলির সাহায্যে টাইগ্রিস্‌-নদীতে ভেসে যাচ্ছে

ও কারবালায় যদি তাদের মৃত্যু হয় এবং কবরও হয়, তাহ'লে তাদের আত্মা মুক্তি পাবে।

ইরাক, তুরাণ, আরব ও পারস্যদেশের লোকেরা অর্থাৎ মুসলমানেরা গরু জবাই করে না,—জবাই করে দুম্বা। তারা বলে, দুম্বা-জবাই-ই খাঁটী মুসলমানধর্ম্মের চিহ্ন!

মোট ১৪৩২৫০ বর্গ মাইল জায়গা ইরাকে আছে। সেখানকার মোট লোক-সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ।



যথাস্থানে (?)

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

বাড়ীর পাশে বস্তি। নানা রকম লোক আসে, বাস করে, উঠে যায়।

দিন-পাঁচেক হবে একঘর হিন্দুস্থানী স্বামী-স্ত্রী এসেছে। একটী বছর দুয়েকের মেয়ে—আর তারা দুজন। রেণুদের শোবার ঘরের জানলা দিয়ে তাদের খোলার ঘরের দোতলার বারান্দাটুকু দেখা যায়। বৌটী দেখতে বেশ, খুব ছেলেমানুষ মুখখানা। অবস্থাও নিতান্ত গরীব ব'লে মনে হয় না।

রেণু অবসরের সময় মাঝে মাঝে বস্তির ঘর-গেরস্থালী দেখে। বাঙালী বাসিন্দাদের ঘরকরণা, কাপড়চোপড় পরা, খাওয়া দাওয়া প্রায় একই ধরণের। প্রভেদ তাদের মাঝে শুধু দারিদ্র্যের আর অভাবের ইতর-বিশেষের।

এরা যেন ওদের মতন নয়। কেমন করে সামনে কুঁচিয়ে রঙীন শাড়ীগুলি পরে, সাদা শাড়ী পরেই না। কানে মস্ত ফুল, নাকে ছোট নাকফুল, হাতে রূপার পৈছে, কাচের চুড়ী গোছা করা—গলায় মোটা হাঁসুলী, পায়ে সরু বাঁকমল। চোখ দুটীতে কাজলপরা, কপালে সোনালী রঙীন টীপ।

রেণু অবাক হয়ে দেখে, ওদের যে পারিপাট্য আছে সে পারিপাট্য ঐ অবস্থার ওদের অন্য প্রতিবেশীর নেই।

রেণুর তেতলার ঘরের জানলা থেকে ওদের দেখার শেষ নেই। সব বুঝতে না পারার যেন একটা বিশেষত্ব আছে—যেমন অজানা হিন্দী গানের চেনা সুর। ওদের রান্না সেই বারান্দার এক কোণে। কিসের ডাল করে তাতে রসুন কুঁচিয়ে ফোড়ন দেয়; আরি একটা উৎকট গন্ধে রেণুদের দোতলার ঘর ভরে যায়। আর শুধু বেগুনের, শুধু আলুর, শুধু সীমের তরকারী—আলাদা আলাদা করে রাঁধবে।

খাবে তাও কি অনাসৃষ্টি।—স্বামীকে ভাত দিয়ে তারই ভাতের পাশে সব ভাত ঢেলে দেয়।—মস্ত একটা কানা-উঁচু থালে শলা শলা ভাত আর ডাল সে খেয়ে যা' থাকে, তার তামাক সেজে, মাদুর পেতে, বিছানা করে মেয়েকে শুইয়ে তার পর এসে খায়।

রেণুর মনে হয় ততক্ষণ ভাতগুলো যদি হাঁড়িতে থাকে, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়!

* * * *

রাত কত, কে জানে। একটা গোলমালে রেণুদের ঘুম ভেঙে গেল। শুনলে, বৌটা কাঁদছে—আর তার বর তাকে খুব বকছে।

হয় ত মারলে।—

বকুনির প্রকোপ আর কান্নাও বেশী কোরে শোনা গেল।

রেণু উঠে বসল। শৈলেন বল্লে, 'হতভাগা মাতাল হয়ে আদ্ধেক রাত্তিরে বীরত্ব করছেন।'

রেণু বল্লে, 'আহা, বৌটা যে কি শান্ত, আর কি ছেলে-মানুষ কি বলব। মুখটা দেখলে এমন মায়া হয়! কি করে বা মারতে ইচ্ছে যায়।'

শৈলেন বল্লে, 'ছাড়াছাড়ি তো নেই। থাকৃত যদি, কে জানে এত মারধোর চলত কি না!—'

ততক্ষণে খোলার দোতলায় কান্না থেমে গেছে। ওরাও ঘুমিয়ে পড়ে।

রেণু ভাবে, বৌটা কোন্ দিন আত্মহত্যা করে বা! স্বামীকে বলে। স্বামী হাসে, বলে, 'না, তা' করবে না, পালাবে কোন দিন।—'

রেণুর তা' বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু আত্মহত্যা নয়—ঐ ব্যাপারটাই ক্রমে যেন নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি' হয়ে উঠল।

সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, একটু আধটু শাসনের আভাস তো পাওয়া যায়ই; মাঝে মাঝে নিশুতি রাত্রে খুব সমারোহে শাসন-সংস্কার চলতে থাকে। মূক প্রাণীর মতন এক পক্ষ চুপচাপ থাকে।

শৈলেন চলে যায় কোর্টে ; সব সময় কানে যায় না ; রেণুর তো তিষ্ঠনো দায় মনে হয়। শৈলেন যেদিন বাড়াবাড়ি দেখে, রাগ করে বলে, 'হতভাগাদের উঠিয়ে দিতে পারলে বাঁচা যায়—নিজেদের বাড়ীতে নিজেরা টেঁকা দায় হয়েছে। পুলিশ ডেকে বিদেয় করতে হবে।'

রেণু আবার ভয়ে বলেও না সব সময়,—তাঁর কেমন মায়া হয়—আহা বৌটা চলে যাবে!

নিত্য শুনতে শুনতে রেণুর আর আশ্চর্য্য বোধ হয় না—যেন মারা আর মার-খাওয়া সমান স্বাভাবিক ওদের কাছে।

সন্ধ্যের পরই মেয়েটাকে খাইয়ে মাদুর পেতে বারান্দায় শুইয়ে স্বামীর অপেক্ষায় বৌটা বসে থাকে।—কত রাত্রে সে আসে কে জানে।

কাঠের রেলিংয়ে ঠেস্ দিয়ে বসে থাকে, অস্পষ্ট আলোয় মুখখানি যেন পেতলের প্রতিমার মুখের মতন দেখায়; ম্লানও নয়, দীপ্তও নয়, যেন কেমন বয়স ছাড়া গম্ভীর।

বস্তির অন্য ঘরে যদি বিবাদ-বিতণ্ডা হয়,—যে-কোনো সম্পর্কের মাঝেই হোক না—যে গালাগালি বর্ষিত হয়, তা যেমন অকথ্য তেমনি অশ্রাব্য। এ বেচারা কিন্তু চুপ করে মার খায়, আবার স্বামী চলে গেলে তার সেবার সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ আয়োজন করে; তামাক সাজা থেকে নিয়ে মেয়েটাকে খেলা দেয়, যেন কিছুই হয় নি মনে হয়।

স্বামী ফিরে এলে মৃদু অল্প হেসে কথা কয়।

রেণু ভাবে, রেণু হলে?—আবার হাসি—কথা?—

গলায় দড়ি দিয়ে কবে লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ত।

আবার নিজের অসম্ভব কল্পনায় নিজেরি হাসি পায়।

আর কৌতূহলের ঠেলায় আর সমস্ত অবকাশ সময়টুকু জানলাতেই উঁকি ঝুঁকি দিয়ে কাটায়।

বেচারী উৎপীড়িত হলে ক্রটীটা যে কার রেণু তা বুঝতে পারে না। কারখানার সাহেবের, না, মিলের কর্ত্তার—কি কার কে জানে—এদিকে তো চওড়া চাপরাস বুকে বেঁধে যায়। কিন্তু, সে যাই হোক মার খায় বৌটাই।—

ক্রটী যার হবার তার হবেই—সেদিনও কি হ'ল কে জানে,—রেণুদের ঘুম ভাঙল আবার।

কি একটা জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে দেবার শব্দ হ'ল। রেণু উঠে মুখ বাড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখলে, বৌটার পায়ের কাছে কয়লার আগুনের টুকরো পড়ে আছে।—সে কাপড় ঝাড়ছে আর কাঁদ কাঁদ স্বরে কি বলছে, আর তার বীর স্বামী পরুষ স্বরে তার জবাব দিচ্ছে।

রেণুর গা জ্বালা করতে লাগলো। স্বামীর সঙ্গে খানিকটা পুরুষজাতের অবিচার অত্যাচারের বিষয় আলোচনাতে দুজনে একমত হয়ে—কত রাত্রে বস্তির নিস্তব্ধতার সঙ্গে নিজেরাও ঘুমিয়ে পড়ল।

জ্যৈষ্ঠের রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। গোটা পাঁচ সাত তারা ঘন নীল আকাশে ঝক্ ঝক্ করছে। পূর্বদিকটা প্রায় ফরসা হয়ে আসছে। রেণুর ঘুম ভাঙল। জল খেতে উঠে দেখতে ইচ্ছে হ'ল, বৌটা কি করছে।—

মাদুরের এক পাশে মেয়ে মাঝখানে তার বাপ, আর তার বুকের পাশটীতে মাথাটা নিচু করে—বৌটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

দেখে মনেও হয় না রাত্রে ওই মেরেছিল—এখন যেন একান্ত নির্ভর; আর যে মার খেয়েছিল, সেও তার মতন কিছু ভাবই দেখাচ্ছে না—

যেন পরমাশ্রয় তার।—

রেণুর যেমন হাসি পেল, তেমনি রাগ হ'ল।

বেচারা শৈলেনের শেষ রাত্রির স্নিগ্ধ ঘুমটুকু ভাঙিয়ে বল্লে, 'দেখ, দেখ, একটা মজা দেখবে এসো।'

'আঃ আদ্ধেক রাত্তিরে কিসের মজা!—'

'আদ্ধেক রাত্তির না সন্ধ্যে, সকাল হোলো যে!—ওঠো, ওঠো, দেখ না,'—

'কি?'—বল্লে শৈলেন একবার চোখ খুল্লে।—

'ওরা কেমন ঘুমুচ্ছে দেখ,—যেন কিছু হয়নি রাত্তিরে।'—

'কি জ্বালা, আড়ি পাতছ, ছি! ছি! শোও, শোও, পাগল।'—

'হ্যাঁ, আড়ি হ'ল বুঝি'—

'না দেখে না, ছি! শোবে এসো।'—

নিরুপায় রেণু বিছানায় এসে বসল। বল্লে, 'রাত্তিরে ঐ কীর্ত্তি, আর সকালে কি ভাব। আমরা কত কি বলছিলাম—মোকদ্দমা ছাড়াছাড়ি!"—'

শৈলেন আবার চোখ বুজে ভাঙ্গা ঘুমের রেশটুকু ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় ছিল।—সে বল্লে,—'ঐ রকম হয়,—কি করবে আর,—'

"না গো! ভালবাসে। দেখলে না'তো কেমন ঘুমচ্ছে নিশ্চিন্ত হয়ে;'—রেণু বল্লে।

শৈলেন বল্লে 'যেন নিজের জায়গায়—না?—তা' নয়, বোধ হয় ভীতু মেয়েটা;—'

'আহা!'—

'না, না, একটু ব্যবস্থা থাকা দরকার ছিল বৈ কি—। আজ নয়, কাল পীড়ন ভোগ করবেই, মার খাওয়াই থাকবে। কথা কইবারও তো অধিকার নেই।'—

'ভারি অধিকার!—ওর স্বামীর কাছে ওর অধিকার ও বুঝবে। নইলে শুশ্রূষা কেন?'—

'তা' বটে, তোমাদের দশাই ঐ!'—বলে শৈলেন এবার চোখ খুলে একটু হাসলে,—'সয় যে উপায় নেই বলে;—'

রেণু বল্লে—'আচ্ছা তাই যদি,—তবে মাথা ব্যথাই বা কেন অধিকারের?'

'তোমরা বুঝেও বুঝবে না। দরকার আছে,—হয়ে পড়েছে যে!'—

'অর্থাৎ?'—

শৈলেন বল্লে, 'অর্থাৎ দরকার হলে সম্মান রাখতে পারবে তাই;—ও দেখ না রোজই মার খায়, রোজই সয়,—ঐ যে কাছে ঘুমচ্ছে,—সেবা করছে,—ওর মানে ভালবাসা নয়,—ভয় ভক্তি;—'

রেণু রাগ করলে, 'না, কিছুই নয় ওটা! ভারি তর্ক! তুমি ওর মনের কথা বুঝতে পারছ যেন;—সত্যি আপনার মনে না করলে'—

সিঁড়ি থেকে ঝি ডাকলে, 'বৌমা, উনুন ধরেছে গো,—চায়ের জল বসাও'—

রেণু যেন চেয়ে দেখলে, কখন ভোর কেটে গিয়ে সকাল প্রসন্ন মুখে চেয়ে রয়েছে। বেশ বেলা হয়েছে।

একটু হেসে শৈলেন বল্লে 'যাক্ তুমি ওর স্বামীর পক্ষের উকীল হয়েছ আজ দেখছি—ভালই;—'

রেণু বল্লে,—'আমার কারুর উকীল হবার সময় নেই—আমার সংসারের ঢের কাজ আছে। তুমি ভাব তোমার তর্কের সত্যি লোকের কথা।'—

স্বামী হাসলে,—'আপাততঃ চা খাওয়া অবধি আমিও তোমার দলে,'—

উঠে যাবার সময় দুজনেই জানলা দিয়ে উঁকি মারলে বস্তির ঘরে,—দেখলে, লোকটা মাদুরে বসে মেয়েটাকে আদর করছে, আর বৌটা নতুন একটা কলকেয় তামাক সাজছে।—একটী ভাঙ্গা কল্কের টুকরা ছড়ানো মাদুরের কাছে।—

স্বামীকে রেণু বল্লে, 'দেখলে?'—

মৃদু হেসে স্বামীও বল্লে, 'দেখ্‌লে? আবার রাত্তিরে দেখো—'

রেণু রাগ করে নেবে গেল।—

পারের বাঁশী

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

যেতেই যখন হবে আমার অচিন দেশের পার,
তখন কেন পিছু ডেকে পরাও মায়ার হার?
পথে যেতে যদিই বাধে,
যদিই আমার পরাণ কাঁদে,
তখন না হয় আসব ফিরে, খুলো তোমার দ্বার।

বিদায় বেলায় বলব কিছু? বলব কি গো আর?
বলার পালা শেষ হয়েছে, নাইক বাকি তা'র?
আজকে আমার কথার ছুটী,
কাজ নিল তাই নয়ন দুটী,
অলখ পথে খুঁজে নিতে, যাহা সারাৎসার।

ফিরব কবে শুধাও তুমি? যাচ্ছি কাহার পুরে?
তাও জানি না; জানি শুধু ডাক শুনেছি দূরে,
অজানা ওই ডাকের মাঝে,
গভীর গোপন বাঁশী বাজে,
ঘর ছাড়ালো আমারে তা'র মন হারানো সুরে।

ছাড়ছি কেন জীবন সাথী? কিসের এত ভয়?
প্রিয়ার কাছে হার মানাতেই আনবে যে মোর জয়।
আর যদি না ফিরিই আমি,
রইল তোমার স্বামীর স্বামী,
তারে তুমি দিবস-যামই রেখো পরাণময়।

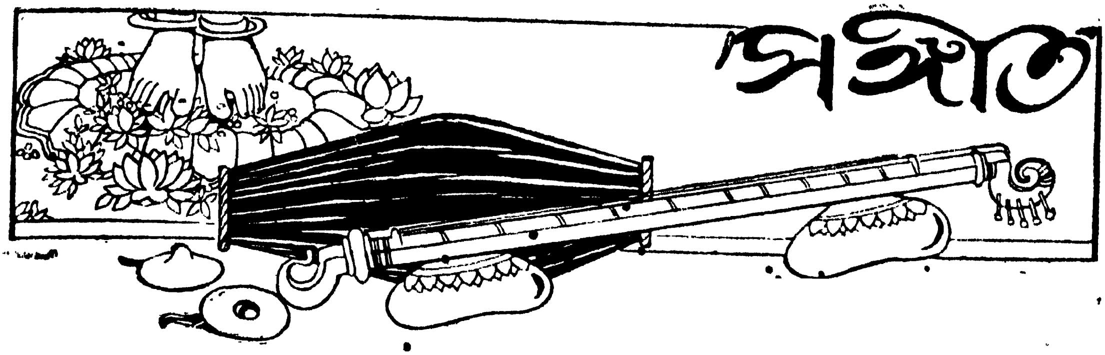
আজকে প্রিয়া খেয়াঘাটে চাইছ উপহার?
নাই যে আজি কিছুই তোমার নর-দেবতার।
শুধু তুমি সঙ্গোপনে,
এস আমার নিমন্ত্রণে,
দুলবে যখন প্রাণে অসীম সুধার পারাবার।



উর্ব্বশী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সমর দে

Bharatvarsha Halftone Printing Works



স্বরলিপি

কথা ও সুর—
কাজী নজরুল ইস্‌লাম

স্বরলিপি—
শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, ও শ্রীজগৎ ঘটক

কত আর এ মন্দিরদ্বার, হে প্রিয়,
রাখিব খুলি।
বয়ে যায় যে লগ্নের ক্ষণ, জীবনে—
ঘনায় গোধূলি॥

নিয়ে যাও বিদায়-আরতি
হল ম্লান আঁখির জ্যোতি—
ঝরে যায় যে শুষ্ক স্মৃতির মালিকার
কুসুমগুলি॥

কত চন্দন ক্ষয় হ'ল হায়—
কত ধূপ পুড়িল বৃথায়—
নিরাশায় যে পুষ্প কত ও-পায়ে—
হইল ধূলি॥

ও বেদীর তলে কত প্রাণ—
হে পাষাণ নিলে বলিদান—
তবু হায় দিলে না দেখা, দেবতা,—
রহিলে ভুলি॥

গা মা II গমা -গমা -পণদা পা | মা -জ্ঞা রা রজ্ঞা | রা -সা ন্‌া রা | -সা -া -া সা I
ক র আ০ ০০ র০০ এ ম ন্‌ দি র০ দ্বা র্‌ হে প্রি য় ০ ০ রা
যা'০ ০০ য়০০ যে ল গ্‌ নে র০ ক্ষ ণ্‌ জী ব নে ০ ০ ঘ

I সরা -সরজ্ঞরা সণ্‌ধ্‌া ধ্‌ণ্‌া | ধ্‌ণ্‌া -সরা -জ্ঞা -া | সরা -রমা -া -া | -সা া গা মা II
খি০ ০০০০ ব০ খু০ লি০ ০০ ০০ ০০০০০০ ০০ ব য়ে
ণা০ য়্‌০০ গো০ ধূ০ লি০ ০০ ০০ ০০০০০০ ০ ক ত

গা মা II পা -া -া পা | পধা -পমা মগা -মা | পা -া -া -া | -া । পা পা I
নি যে যা ০ ও বি দা০ য়০ আ০ র তি ০ ০ ০ ০ ০ হ ল

I মা -া -ধপা মা | মজ্ঞা -া রজ্ঞা রজ্ঞা | রসা -া -া -া | -া । সা সা I
ম্লা ০ ন্০ আঁ খি০ ০ র জ্যো০ তি০ ০ ০ ০ ০ ০ ঝ রে

I সরা -জ্ঞরা -সা ধ্ণ্া | সা -া সা রা | রজ্ঞা -রমা জ্ঞা রজ্ঞা | সা । -া সা I
যা০ ০০ য় যে০ শু ষ্ ক ম্ব তি০ র্০ মা লি০ কী ০ র কু

I মজ্ঞা -র্সা -ণ্া ণা | ধ্ণ্া -সরা -জ্ঞা -া | -সরা মা -া -গমা -সা । গা মা II
সু০ ০০ ম গু লি০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০ ক ও

[র্সা -র্সা -র্র্সা]
গা মা II { পা ণা -ণা -ণা | পণা -ণা ণা -ণা | ধণা -ধণা -া -া | -পা । পা -পা } I
ক ত চ ন্ দ ন ক্ষ য়্ হ ল হা০ য়০ ০ ০ ০ ০ ক ত

I মা -া -মধপা পা | মজ্ঞা -া -রা রজ্ঞা | -সা -া -া -া | -া । সা সা I
ধূ ০ প০০ পু ড়ি০ ০ ল বৃ০ থা য়্ ০ ০ ০ ০ নি রা

I সরা -জ্ঞরা -সা ধ্ণ্া | সা -া সা রা | রজ্ঞা রমা জ্ঞা রজ্ঞা | -সা -া । । I
শা০ ০০ য়্ যে০ পু ষ্ প ক ত০ ০০ ও পা০ য়ে ০ ০ ০

I সা -সজ্ঞরসা -ধ্ণ্া ণ্া | ধ্ণ্া -সরা -জ্ঞা -া | -সরা মা -া -গমা | -সা । গা মা II
হ ই০০০ ল০ ধূ লি০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ক ত

পা পা II পমা -ধপা -া মপা | মজ্ঞা -মা পা পণা | পা -ণা -ণা -র্সা | -ণর্সা । র্সর্রা র্সা I
ও বে দী০ ০০ বৃ ত০ লে০ ০ ক ত০ প্রা ০ ০ ০ ণ০ ০ হে০ পা

I ণা -া -া ণা | ধণণধা- পদ্ধপা ধা ধর্সণধা | পা -া -া -া | -া । পা পধা I
ষা ০ ণ্ নি লে০০০ ০০০ ব লি০০৮ দা ০ ন্ ০ ০ ০ ত বু০

I ধা -মা -া পা | মা -জ্ঞা রা জ্ঞা | রসা -া না রা | -সা -া -া সা I
হা ০ য়্ দি লে ০ না দে খা০ ০ দে ব তা ০ ০ র

I সজ্ঞা -রসা -ণ্া ণ্া | ধ্ণ্া -সরা -জ্ঞা -া | -সরা মা -া -গমা | -সা । গা মা II II
দি০ ০০ লে ভু লি০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ক ত

ভারত-শিল্পে অতি-আধুনিকতার ভয়

শ্রীঅসিতকুমার হাল্দার

অতি-আধুনিকতার ঢেউ উঠেচে আর্টের মধ্যে। অন্য সব ঢেউ যেদিক থেকে আসে, এও সেই পশ্চিমথেকে এসেচে; আর তার তালে তালে আমরা নেচে উঠেচি। অবশ্য পশ্চিমের যা ঢেউ, তাই আমাদের পক্ষে আনন্দকর, এ কথা ধরে নিলে আর কোনো গোলই থাকে না। কিন্তু যাঁরা তা' মেনে নিতে চান না, তাঁরাই দেখি সমস্যা জটিল করে তোলেন। এখন দেখা যাক্, অতি-আধুনিকতায় মূলটা ইউরোপ কোথায় রোপণ করেচেন এবং তার শাখা প্রশাখার প্রসারই বা কি ভাবে কত দূর এগিয়েচে। দেখলে দেখতে পাই যে, তার মূল হ'ল একালের সভ্যতার আওতায় অসভ্যদের অসম্পূর্ণ পটুতার আদর্শে; এবং ডালপালার বহর এখনো সংকীর্ণ। যাঁরা কোমর-বেঁধে-আধুনিক, বা তরুণের দল, তাঁরা বলবেন সংকীর্ণ বটে, কিন্তু প্রবল। আবার অপর পক্ষ হয়ত জোর গলায় বলবেন যে দল টেঁকলে হয়। অতি-আধুনিক দল টিকে আছেন অতি আধুনিক ক্রিটিকের কলমের ও করতালির জোরে। ক্রিটিক যা দেখেন বা না দেখেন, তাও কথার রঙে ফলিয়ে গেলেন। অনেক সময় কুটো অবলম্বনে কাব্য রচনাও হ'তে দেখা যায়। তার ফলে হয় অনেক সময় এই যে, তাঁদের লেখার খোরাক জোগাবার ও বাহাবা পাবার লোভে শিল্পীদের মধ্যে লেগে যায় স্কুর প্যাঁচ, জিলিপির প্যাঁচ বা ছোপছাপ ধাচ প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ও কিম্ভূতের প্রতিযোগিতা। শেষটা পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে ওঠে এর ভার। সার অপেক্ষা ভার হয়ে ওঠে পর্ব্বত-প্রমাণ। এই জন্তে সংখ্যায় কম অতি-আধুনিক শিল্পীরা থাকায় এখনো পর্য্যন্ত যাঁরা জগতে শিল্পকলায় নাম করেচেন, তাঁদের সম্মান এখনো ঘোচেনি। আর্ট গ্যালারী-গুলো অতি-আধুনিকের কবলে কবে পড়বে জানি না; যদি কখনো পড়ে, হয়ত তখন সনাতন আর্ট সংহারের পথ মুক্ত হবে। কিন্তু তার ভয়ের কোনোই কারণ দেখি না। কেন না আর্ট কেবল কতকগুলি রেখা-সমষ্টিকে স্বচ্ছন্দে সাজিয়ে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিলেই যদি হ'ত, ত art composition এর কেতাবের চাটগুলিই আর্ট হয়ে উঠতো। Abstract art বল্লে আমরা বুঝি ছন্দের ধ্বনি। যেমন বাণীকে বাদ দিয়ে ধ্বনি শুধু জোযনা করে ছন্দ রচনা করলে কাব্য হয় না, হয় অব্যক্ত-অবুঝ তবলার বোল, তেম্নি ছবি আঁকার রেখা যদি চেহারা বাদ দিয়ে খালি রেখার কাঠামোর সাজাবার কৌশল দেখানোতেই পর্য্যবসিত হয়, ত সেটা হয়ে ওঠে—সেই নীরস চোরাগণ্ডি, যেখান থেকে সীতা-দেবীকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, সেই রাক্ষুসে গণ্ডি; তার ভিতর প্রাণ নেই আছে গণ্ডীর রেখাটি। অতি-আধুনিক বল্‌বেন, তা' নেই বা চেহারা ফুটল, নেই বা ছবিটা কিছু বল্‌লে? ছবিটা ছবির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে স্থির! অতি সনাতনী পন্থার চেয়ে অতি-আধুনিক পন্থার বিপদ হচ্চে এই যে, আর্টে 'ডেমক্রাসী' চলে না। সস্তা বাজার-চলিত করবার সহজ উপায় অসংখ্য থাকতে পারে, কিন্তু তার মূল্য বাজারেই পর্য্যবসিত। আর্টের কাঠামোটাকে নিয়ে যা কিছু করাই আর্টের চূড়ান্ত নয়। তাহলে অশিক্ষিত পটুয়ার পটে বাজার ছয়লাপ হয়ে যাবে।

একদা ইউরোপ শিখিয়েছিল প্রকৃতির নকল করাই আর্ট; এখন আবার Paul Klee, Pablo Picasso, Jaun Gris, Fernand Leger, Andre, Masson, Joan Miro প্রভৃতি শিল্পীরা দেখাচ্চেন যে, প্রকৃতির প্রতিকৃতির যত প্রকারের বিকৃতিই হ'ল আর্ট। আমাদের দেশের সমস্যা এই যে, ইউরোপকে আর্টের মাষ্টারীতে বাহাল ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। একদিকে ইউরোপের এ্যাকাডামীর ভণ্ডামী, অপরদিকে এই অতি-আধুনিক খ্যাপামীর মাঝ-পথে পড়ে আমরা আমাদের অন্তর্য্যামীকে নির্য্যাতিত করচি। জাপানকে একসময় কাউণ্ট ওকাকুরা এই up-start বা বিধর্ম্মী আর্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন দেশের শিল্পের ঐতিহ্যের সাধনায় শিল্পীদের চিত্তকে

উদ্বুদ্ধ করে। তেম্‌নি আমাদের দেশে শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেচেন। দেখচি যে, এই ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যেই তাঁর প্রেরণায় দেশীয় শিল্পের গৌরব করতে সারা ভারতবর্ষ শিখেচে; কিন্তু এখন আবার বাঙলা দেশের মধ্যে বিদেশী অতি-আধুনিক শিল্পের নকলে দেশের কলা-সরস্বতীর নির্ব্বাসনের আয়োজন হবার সুত্রপাত হয়েচে। তাই ভক্তরা তার ভাসানের জন্যে খালি শোকবস্ত্র না পরে তার সাধনা আরতির দ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করলেই ভাল হয় না কি? বাংলা দেশ এত অল্পকালের মধ্যেই দেশের শিল্পে বীতরাগ হয়ে যে তার সপিণ্ডকরণের ব্যবস্থা করতে সহসা বস্‌বে, তা' আমাদের ধারণার অতীত। অবনীন্দ্রনাথের নব নব উন্মেষশালী প্রতিভার এই মধ্যাহ্ন কাল; এখনই অকালে তাঁর প্রতিষ্ঠানটি ভেঙেচুরে যায়, এর চেষ্টা কোনো দেশহিতৈষীই করতে চাইবেন না। তা ছাড়া দেশের আর্টের বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের দরদ হবারই কথা।

দেশের শিল্পের কাঠামোটা নিয়েই খেলা এতদিন হয়েচে,—অজন্তা ধরণ, মোগল ধরণ, তিব্বতি, রাজপুত প্রভৃতির ধরণের অনুকরণে। সত্যিকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যে পুরোহিত করেচেন, তিনি তাঁর স্বধর্ম্ম কখনো ত্যাগ করেননি। তাঁর শিষ্যদের ভিতর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েচে, Masson, Miro, Klee, Gris প্রভৃতি বিদেশী শিল্পীদের অতি শিশুর ভাবে অতি অদ্ভুত রচনার সুলভতার সুযোগ দেখে। ছবি আঁকার জন্যে কোনো বিষয় (subject) বর্ণনার দরকার যদি না হয়, আঁকতে আঁকতে ছবি আপনি যদি ফুটে ওঠে, তাহলে শিল্পীরা মাভৈঃ বলে কাগজ ভরাতে লেগে যাবেন। তাহ'লে অত ছবির ফ্রেম ও কাচ যোগানোই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠ্‌বে। আর যদি রচনা করতে হ'লে বিষয়-বস্তুর নির্ব্বাচন বা নিরিখের প্রয়োজন থাকে, তাহলে শিল্পকলা সহজ সুলভ হ'তে পা'রবে না। তাহলেই ব্যক্তিগত অঙ্কন-পদ্ধতি কেবল নয়, বিষয়-বস্তুর চিন্তা-শক্তিরও বিষয় ভাববার বিষয় হবে। আমাদের দেশের আর্টের ভিতর এইটেই বেশী ফুটেচে প্রাচীন ভরহুত, সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতির পাথরের চিত্রগুলিতে। Abstract ভাবেও বিদেশী শিল্পীরা যদি এগুলিকে দেখেন ত তার মধ্যে রেখা-ছন্দেরও আনন্দ তাঁরা পাবেন, আবার যাঁরা জাতকের গল্পগুলি যা তাতে ফেলানো হয়েচে তা জানেন, তাঁরাও সেগুলি দেখলে দেখতে পাবেন যে বিষয়-নির্ব্বাচন-ক্ষমতাও সে সব প্রাচীন শিল্পীদের কত অসাধারণ ছিল।

ছবি এক হিসাবে abrstact না হয়ে যায় না—যথা, একই ছবিতে ঘটনা-পরম্পরা দেখানো যায় না (সিনেমা ছাড়া—সিনেমা আর্ট নয়)। তাই ছবিতে juxta-position এবং বিষয়-নির্ব্বাচনের বিশেষ প্রয়োজন। বিষয়-নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে তার আনুসঙ্গিক সজ্জা প্রভৃতিরও প্রয়োজন। অবশ্য সুশ্রী চেহারা আঁকাই আর্ট, এ কথা এখনকার যুগে কেহই বল্‌বেন না; কেন না সুন্দরের প্রকাশ দুনিয়ার সব তাতেই আছে; কেবল সেটিকে আহরণ করার ক্ষমতার উপরই তার অভিব্যক্তি। আর্টের কাঠামোটির বিশেষ ভাবে দরকার হয় কারুকার্য্যের যেখানে দরকার, তার প্রকাশ কাঠামোটির মোলায়েম সুছন্দ সজ্জায়। তাই যে ছবি কেবল রেখা-চাতুরীতে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বলচে না যে কি ভাব তার মধ্যে আছে, সেটাকে ছুঁচের কাজে কার্পেটে ফলিয়ে তোলা দেখচে, সেটি সেখানে কেমন খাপ খেয়ে গেছে। মোগল আমলের ছবিগুলি বৌদ্ধ আমলের ছবিগুলির এই কারণেই অনেক পৈঠা নিচে। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পীদের নামধাম গাঁই গোত্র আমাদের কিছুই জানা নেই, তবুও অজন্তার ছবির প্রাণবান সুবর্ণিত ভাব সহজেই ধরা পড়ে। মোগল রাজপুত শিল্পের রঙে ও রেখায় সূক্ষ্মতার বাহার ছবির প্রাণের দিকে খাটো করেচে। হয়ত আধুনিক রেখাগুলি শিল্পীর চক্ষে রেখাঙ্কনের দোষ অজন্তার ছবিতে বেশী আছে—কিন্তু তাতে যে জীবন-কথা ব্যক্ত করচে প্রাণবেগে, সে প্রাণবেগ মোগল যুগের আর্টে বিরল। অবশ্য এ বিষয়ে নানান মুনির নানান মত থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের নিকট যা' ঠেকে তাই এস্থলে বলা হ'ল।

অতি-উৎসাহী অতি-আধুনিক বিলাত-ফেরতের দল বিলাতের অতি-আধুনিক আর্টের প্রদর্শনীগুলি দেখে দেশে ফিরে আসেন এবং সেইমত একটা ব্যাপার দেশের আর্টে না দেখতে পেলেই মনঃক্ষুণ্ণ হ'ন্‌। বেশীর ভাগ তাঁরাই ইউরোপের অতি-আধুনিকতার ঢেউ দেশে এনেচেন। দেশের ঐতিহ্যের ভিতর দিয়ে অতি-আধুনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অতি-আধুনিক আর্ট যদি কোনো শিল্পী সৃষ্টি করতে পারেন ত তাঁর কথাই আলাদা। কিন্তু এই ইউরোপীয় আমদানী আর্টের ফলে দেশের নিজস্ব আর্টের যে এক সঞ্জীবতার সাড়া পড়চে তাতে না দ' পড়ে, তাই ভাবনা হয়। এক্ষেত্রে শ্রীভগবানের গীতার উক্তি বারবার মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি "স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ।"

নারী

শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তোফী, বি, এ,

প্রায় পাঁচ বছর পরে তা'র চিঠি পেলুম। সে খিদিরপুরে বাপের বাড়ীতে এসেচে; আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমাকে যেতে লিখেচে।

সকালে চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে সব্ কিছুই ভারী ভালো লাগ্‌চে। এমনও হয়, দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পরেও স্মৃতি মরে না, সে ক'ল্‌কাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ব্যাকুল চিঠির ইসারা করে।

ফিট্‌ফাট্ হ'য়ে রাস্তায় বেরিয়েচি। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা দেশবন্ধু-পার্কের দিকে যাচ্চে। সাঁ ক'রে একটা বাইসিকল্ একদিকে হেলে চ'লে গেলো। মোটরে যাচ্চে একটি পুরুষ ও একটি নারী, দুজনেরই মুখে চোখে অত্যন্ত খুশীর ভাব।

হ্যারিসন রোড, ওয়েলিংটন, ধর্ম্মতলা, ভবানীপুর, কালীঘাট, ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে শ্যামবাজারের বাস্ ছাড়্‌লো। চোখের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে কত মোটর, ট্রাম, বাস; ফুট্‌পাতে অগণ্য নরনারী। আমাদের বাস্ একটু আস্তে চল্‌চে।

হঠাৎ দেখলুম, একটি বৃদ্ধ স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে রয়েচেন। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললুম, এই যে, আপনি এইখানে বসুন না।

থাক্, থাক্ বাবা, তুমি ব'সো—

সে কি হয়? আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ যাবেন?

বৃদ্ধকে বসানো গেলো। তুমি বৃদ্ধ, তোমাকে কি কেউ আজ তা'র পাঁচ বছরের অদর্শনের ব্যথা অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় লিখে জানিয়েচে?

ধর্ম্মতলায় বাস্ বদল ক'রে ট্রামে উঠ্‌লাম। ও-দিকে ট্রামে যেতেই ভালো লাগে, তা ছাড়া বেশ জোরেই যায়।

খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে শব্দ ক'রে ট্রাম ছুটে চ'লে যায়। যেন কি এক অভাবনীয় সম্ভাবনার দিকে মহা আনন্দে সমস্ত পৃথিবী সশব্দে ছুটে চ'লেচে। বাইরে দুটি একটি ঘোড়ায় চড়া সাহেব দেখ্‌া যায়; কেউ বা গল্‌ফ্ খেল্‌চে। আমার সাম্‌নের সিটে দুটি তরুণী মেম ব'সেচে, মাথার টুপী খুলে রেখেচে, বব্ করা সোণালী চুল উড়্‌চে।

তখন সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী দেরী নেই। যখন গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখি ঘরের দরজার কাছে ব'সে গা-ধোয়ার পরে মাথার খোঁপা ঠিক্ ক'র্‌চে। সীঁথিতে সিঁদুর।

আমাকে দেখে মাথা তুলে একবার ব'ল্‌লে, কি ভাগ্যি।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে বস্‌লাম। খোঁপা ঠিক্ ক'রে এবং নিজের আরো কি কাজ শেষ ক'রে যখন ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো, তখন আমার ভারী বিশ্রী লাগ্‌চে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে যা'র সঙ্গে দেখা হবে, সে কোথায়?

হঠাৎ লক্ষ্য ক'রলুম, ও অন্তঃসত্ত্বা।

বাইরে সন্ধ্যার আকাশে কি চাঁদ উঠ্‌লো? আজও বোধ হয় একটি একটি ক'রে তারাগুলি ছড়িয়ে পড়্‌বে।

কবি, তোমার বীণায় ছন্দের তাল কাটেনি ত? দেখো তোমার কাব্যের শেষে যেন সত্যের অপমান না হয়।

ওর বিবাহের সময় ভেবেছিলাম, বিধাতা মানুষের চেয়ে নিষ্ঠুর।

—কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা বলো ত, বিজনদা। ওঃ, তা প্রায় চার বছরেরও বেশী হবে। তা' তোমরা তো আর আমাদের খবর নাও না, ম'রে গেলেও না। মা ব'লছিলেন, তুমি নাকি অনেকদিন এখানে আসো নি। মা ব'লছিলেন, আমি চ'লে গেছি ব'লেই আসো না। আচ্ছা, এইবার আস্‌বে ত? এসো, এসো, মাঝে মাঝে এক-একবার তোমার গরীব বোন্‌টির কাছে এলে তোমার পয়সা বাজে খরচ হবে না। এখনো সেই রকম বন্ধুদের আড্ডা আছে ত? আচ্ছা, এটাই বা

তোমার কি রকম হ'লো শুনি? এক্জামিনে যে পাস্ ক'র্‌লে, সন্দেশ কই? দেখো সে আমি আদায় ক'রে নেবোই। তুমি কি আর আমার হাত থেকে এড়ান্ পাবে? হ্যাঁ, আমাকে কিন্তু ভাই খানকতক গল্পের বই এনে দিতে হবে, বুঝ্‌লে?

তা'র কথার উত্তর দেওয়ার অবসর পেয়ে ব'ললাম, হ্যাঁ, তা'র আর কি?

গল্পের বই কিন্তু, বুঝ্‌লে ত, গল্পের বই। তোমার সেই কবিতার বই পোষাবে না কিন্তু। এই সংসারে কি আর কবিতা কর্‌বার সময় আছে আমার?

এম্‌নি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম, সময় নেই তো গল্পের বই পড়্‌বে কখন?

সে আমি পড়্‌বো 'খন, তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। খেয়ে নিয়ে বই হাতে ক'রে শুলে ঘুমটা শীঘ্র আসে। তা'ছাড়া···অনেকগুলো বই দিয়ো কিন্তু, তখন তো আর কোন কাজ থাক্‌বে না।

একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, আমি এখনো কবিতা লিখি কি না।

যাক্, যাক্, সে সব্ পাগলামী—

তা'র মুখের দিকে একবার অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌লাম। হেসে উঠ্‌লো, ব'ল্‌লে, এইবার বল্‌চি, বিজনদা, বিয়ে-থা করো। একটি টুকটুকে বউ আস্‌বে ঘরে, তা'কে কবিতা পড়িয়ে শোনাবে—

সমস্তটা অত্যন্ত কুৎসিত মনে হ'লো, যা'কে বলে vulgar; এত বিশ্রী লাগ্‌লো যে তখনই সেখান থেকে চ'লে আস্‌তে ইচ্ছা হ'লো। হাতে যদি তখন চায়ের বাটি থাক্‌তো এবং সেটা প'ড়ে ভেঙে গিয়ে ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ ক'রে উঠ্‌তো, তবেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল্‌তো। আমি সমস্তই শুনে গেলাম। অত্যন্ত কুৎসিতভাবে 'জলটল' খেয়ে, আবার আসার প্রতিজ্ঞা ক'রে চ'লে এলাম।

তবু আশা ছিলো যে যখন বিদায় দেবে তখন তা'র চোখের মধ্যে এমন একটি অদ্ভুত ইঙ্গিত থাক্‌বে, যা শুধু বুঝ্‌বো আমি; এবং যা আমার সমস্ত ব্যথাকে মধুর ক'রে দেবে। ওর ঠোঁটের একটু হাসি, ওর চোখের একটু চাওয়া!

যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, সেই পথেই ফিরে যাই। ট্রামের শব্দ শুধু কানে শুন্‌চি। আরো জোরে চলুক্। যেন কি একটা ভীষণ কুৎসিতের সাম্‌নে থেকে পালিয়ে যেতে পার্‌লে বাঁচি। পথে আস্‌তে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিনি। নিজের কথাই ভাব্‌ছিলাম। ওর পাঁচ বছর আগেকার কথা ভাব্‌ছিলাম। ওর লেখা চিঠিগুলো এখনো আমার কাছে আছে। ওর দেওয়া মাথার কাঁটা আমার বালিশের তলায় রয়েচে।

একবার মনে হ'লো যে, আমরা একদিন পালিয়ে যাওয়ার কল্পনা ক'রেছিলাম। কোন্ সুদূর দেশে গিয়ে নিজেদের কুটীর তৈরী ক'র্‌বো, সেখানে আমাদের সন্ধান পাবে না কেউ।

গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লেগেচে। যাত্রীর চোখের ওপরে হঠাৎ একসঙ্গে অনেক আলো, হাসি, রঙ্ নেচে ওঠে। তা'র পরেই অন্ধকার।······



পারস্যে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিগত ১১ই এপ্রিল দমদম হইতে বিমান-রথে পারস্য যাত্রা করিয়াছেন, এ সংবাদ পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় গমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমিয়বাবু ভ্রমণ-পথের বিভিন্ন স্থান হইতে বিমান-ডাকে যে সমস্ত বিবরণ ও সংবাদ যতদূর প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আমরা গত ১১ই এপ্রিল প্রাতে ৬টায় দমদম্ ত্যাগ করিয়া বেলা ১০টা ১০ মিনিটের সময় এলাহাবাদ পৌঁছি। আকাশ-ভ্রমণকারীর নিকট বাঙ্গালার দৃশ্য বাস্তবিকই যেন এক অপরূপ ছবি। তাহার সেই শ্যামলাঞ্চল-ঘেরা পল্লী-গ্রাম, নদী, পুকুর, মন্দিরশ্রেণী ও ছায়া-ঢাকা পথঘাট আকাশ হইতে এক বিচিত্র শোভা চোখের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে।

মানভূম ও হাজারীবাগ জেলার পর্ব্বতশ্রেণী ও ঘন-বনের একটা নিজস্ব গাম্ভীর্য্য আছে। যুক্ত-প্রদেশের বিস্তীর্ণ মাঠ, প্রান্তর ও বিক্ষিপ্ত গ্রামসমূহ এবং হরিৎ ক্ষেত্র শস্য-শোভিত হইলেও বাঙ্গালার সেই নয়ন-স্নিগ্ধকর শ্যামলতা যেন সেখানে নাই। মারবারের দৃশ্য অতি উদার। ট্রেনের গবাক্ষ-পথে যেমন দৃশ্য দেখা যায়, বিমান-পোতের গবাক্ষ-পথেও ঠিক তেমনি পাহাড়, প্রস্তর ও সুদূরপ্রসারি অনন্ত বালুকারাশি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এই একঘেয়ে দৃশ্যের মাঝে মাঝে রাজপুত দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও পাহাড়ের চূড়ায় সামরিক ঘাঁটীগুলি আমাদের চমক লাগাইয়া দিতেছিল।

এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আমরা বেশ আরামেই আসিয়াছি। বিমান-পোতের কম্পন কিম্বা এঞ্জিনের গর্জ্জন আমাদিগকে একটুও বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু যতই আমরা যোধপুরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম এবং গরম বাতাসের হাত এড়াইয়া বিমান-পোত যতই উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল, এই শীতোষ্ণ বায়ুর তারতম্য হওয়াতে ততই আমরা অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম,—আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া যেন গোলমেলে হইয়া উঠিতেছে অনুভব করিতে লাগিলাম্। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—আকাশ পথে ভ্রমণের আতঙ্ক-মিশ্রিত আনন্দ আমাদিগকে সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করিবারও অবকাশ দেয় নাই। ওলন্দাজ বিমান-চালকের দক্ষতা ও সৌজন্যের নিমিত্ত আমরা এই নূতন অভিজ্ঞতায় কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করিতে পারি নাই। বাস্তবিক আকাশ-পথে ভ্রমণ যে আজ এতখানি আরামপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।

এলাহাবাদ হইতে যোধপুর পর্য্যন্ত কবির একটু ক্লান্ত ভাব আসিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার চির-তরুণ চিত্ত বিকালের দিকে সকল ক্লান্তির ভাব দূর করিয়া দিয়াছিল। যোধপুরে আমাদিগকে সরকারী ভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। প্রেসিডেণ্ট মহারাজ সিং আমাদিগকে চা'এর নিমন্ত্রণ করেন। রাজ-অতিথি রূপে আমাদিগকে সাদরাহ্বান করা হয় এবং সন্ধ্যার সময় স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর নিজে আসিয়া কবির কক্ষে উপস্থিত হন ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। মহারাজা নিজেও একজন বিমান-চালক। তাই, তিনি কবিকে আকাশ-পথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং বলেন যে, অন্যান্য বহু বিষয়ে কবি যেমন অগ্রগামী, এই আকাশ-ভ্রমণেও দেশবাসীর নিকট তিনি যে পথপ্রদর্শক হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? মহারাজা যোধপুরে একটী ফ্লাইং ক্লাব গঠন করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের দুইটী বিমান-পোত আছে। শুনিলাম যে, ঐ ফ্লাইং-ক্লাব উদ্বোধন করিবার দিন মহারাজা নিজে আকাশে নানা রকম অদ্ভুত বিমান-পরিচালন-চাতুর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে আমরা যোধপুর পরিত্যাগ করি। করাচীর পথে আমাদের এই সকাল-বেলার ভ্রমণ ভারি চমৎকার লাগিয়াছিল। করাচী পৌঁছিতেই দেখা গেল, কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিতে সহরের বিশিষ্ট অধিবাসিগণ সকলেই সমবেত হইয়াছেন। সেখানে বহু

বন্ধুবান্ধব ও করাচীর জনসাধারণ কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। করাচীতে কয়েক মিনিট মাত্র আমরা ছিলাম। আমাদের বিমান-পোত চলিতে আরম্ভ করিলে সমবেত পুরুষ ও মহিলাবৃন্দ মিলিত কণ্ঠে যখন "জন গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে" সঙ্গীত গাইয়া উঠিলেন, তখন প্রাণে প্রচুর আনন্দ অনুভব করিলাম। কবিকে তাঁহার বন্ধুগণ যে ফুল ও ফল উপহার দিয়াছিলেন, সে কথা ভুলিতে পারিব না। করাচী রবীন্দ্রনাথ-নাট্য ও সাহিত্য ক্লাব যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কবি যখন করাচী আসিয়াছিলেন, তখন তিনি মিঃ মেটার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ মেটা ও মিঃ গুরুদয়াল মল্লিকও সেদিন আমাদের অভ্যর্থনায় উপস্থিত ছিলেন।

করাচী হইতে জাস্ক ভ্রমণ অত্যন্ত আরামপ্রদ হইয়াছিল। বেলা ১১টায় আমরা পুনরায় আকাশে উঠি এবং দেখিতে দেখিতে সিন্ধু দেশের মরুভূমি আমাদের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায়। তারপরের দৃশ্য অতি চমৎকার;—এক দিকে বেলুচিস্থানের জলন্ত ধু ধু বালুকারাশি, অপর দিকে পারস্য উপসাগরের নীল জলোচ্ছ্বাস। তখন বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল, বাতাসও বেশ স্নিগ্ধ ছিল। আমরা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া কমলা লেবু খাইতে খাইতে দুরে তটভূমি ও সাগরের দৃশ্য দেখিতেছি ও কত কল্পনার সাগরে বিচরণ করিতেছি, এমন সময় কবিকে পারস্য দেশে 'স্বাগতম্' সম্ভাষণ জানাইয়া বেতারে খবর আসিল—

বুসায়ার হইতে—

জনাব ডক্টর ঠাকুর,

পারস্য-সাম্রাজ্যের সীমানায় আপনার আগমনে আমি আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। আমি নিজে আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতেছি।

তেলখানি,

পারস্য উপসাগর ও পারস্যের দক্ষিণ বন্দর সমূহের গভর্ণর জেনারেল।

অপরাহ্ন ২-২০ মিনিটের সময় আমরা জ্যাস্ক পৌছিলে পারস্যের রাজকর্ম্মচারীগণ আমাদের অভ্যর্থনা করেন। জ্যাস্ক পারস্য-সাম্রাজ্যের মরুভূমির একটী ঘাঁটী-বিশেষ।

এখানে কবি পারস্যের গভর্ণরের অতিথি রূপেই অবস্থান করিবেন। জাস্ক অতি অদ্ভুত জায়গা। এখানে কোন গাছ নাই, শুষ্ক বায়ু কেবল হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দূরে সমুদ্র-বেষ্টিত গ্রামটী দেখা যায়। বেতার-ষ্টেশন ও বিমান-পোতাশ্রয়ের জন্যই এই স্থানটীর একটু কদর বাড়িয়াছে। ইম্পিরিয়াল বিমান-বিভাগ, কে এল এম ও ফরাসী বিমান-বিভাগ প্রত্যেকেই তাঁহাদের পূর্ব্ব-দেশীয় বিমান চলাচলের পথে এখানকার বিমান-পোতাশ্রয়ে আশ্রয় লইয়া থাকেন।

পারস্যে রবীন্দ্রনাথ

কবি সদলবলে দক্ষিণ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বুসায়ারে পৌছিলে বিরাট জনসভার আয়োজন হয় এবং সরকারী ভাবে ও নাগরিকদের পক্ষ হইতে কবিকে মানপত্র দেওয়া হয়। তাহার পর কাজরাণ নগরে সম্বর্দ্ধনায় সমস্ত নগরবাসী উপস্থিত ছিল। ভোজসভারও আয়োজন হইয়াছিল। ১৬ই তারিখে সিরাজে পৌছিলে সরকারী ভাবে কবিকে অভ্যর্থনা করা হয়। সামরিক ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া কবিকে গভর্ণরের প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়। নাগরিক এবং সাহিত্যিকদের পক্ষ হইতেও অভ্যর্থনা করা হয়। কবি গভর্ণরের প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। ১৭ই তারিখ সেখ সাদীর সমাধিপ্রাঙ্গণে কবিকে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা করা হয়। গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাদির সমাধিক্ষেত্র দর্শন

১৮ই এপ্রিল তারিখে পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ সহর হইতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী তারযোগে জানাইতেছেন:—

বুসায়ার নগরে আমাদের আর অবসর ছিল না। কবিকে বহু ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হইয়াছে। সরকার-পক্ষ এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে মানপত্র দিয়া ভারতের মহান সন্তানের প্রতি সম্মান দেখান হইয়াছে।

বুসায়ারের পর আমরা কাজেরূণে পৌঁছি। সেখানকার অভ্যর্থনা সত্যই অভূতপূর্ব্ব হইয়াছিল। কারণ, এই অভ্যর্থনায় উক্ত সহরের সমস্ত অধিবাসী যোগদান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে এক ভোজসভায়ও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

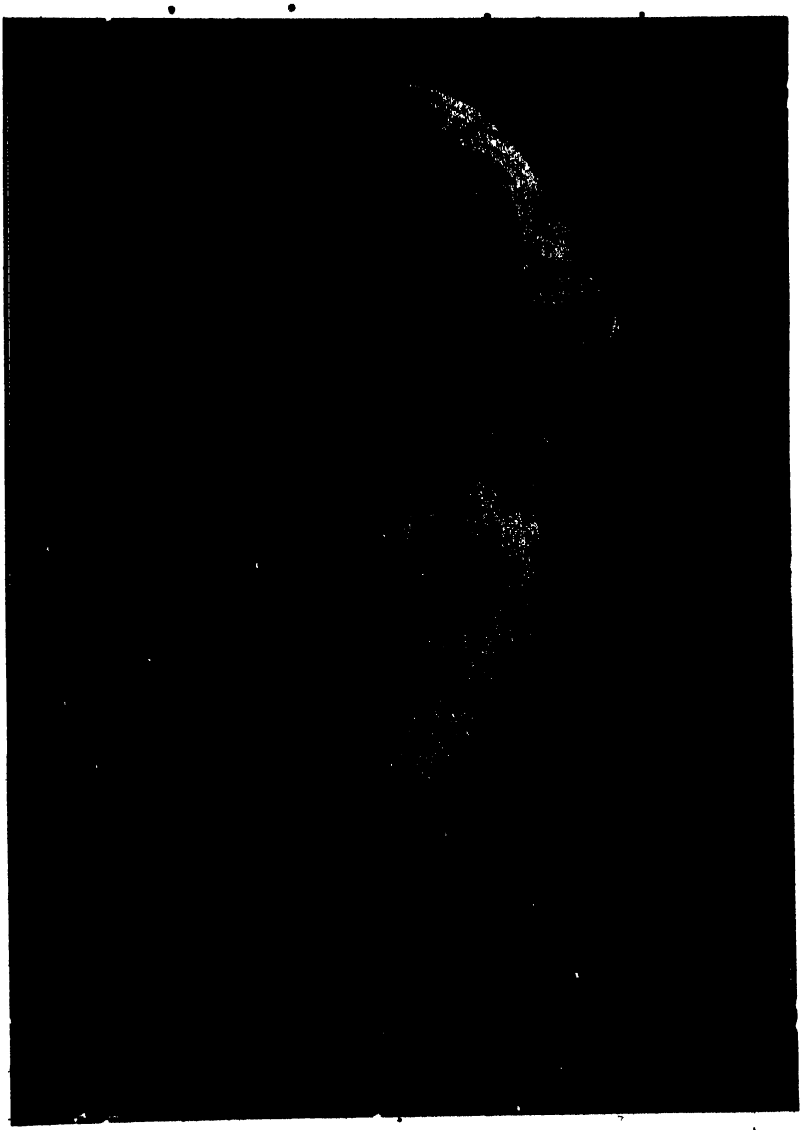
১৬ই তারিখে আমরা স্বপ্নরাজ্য সিরাজ সহরে উপস্থিত হই। কবিকে সরকারী ভাবে অভ্যর্থনা করা হয় এবং সেনাদল সামরিক কায়দায় তাঁহাকে অভিবাদন করে। বহু নাগরিক ও সাহিত্যিক-সভা এশিয়ার মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসিয়াছিলেন।

কবি স্থানীয় গবর্ণরের প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন।

পরদিন ১৭ই এপ্রিল বিশ্ব-বিখ্যাত কবি সাদীর সমাধিক্ষেত্রে অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হয়। জনসাধারণ এক প্রকাণ্ড সভায় মিলিত হইয়া তথায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করেন। এই সভায় গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কবিকে অনেকগুলি মানপত্র দেওয়া হয়।

১৯শে এপ্রিল বুসায়ার হইতে রাত্রি ৩টার সময় নিম্নলিখিত তারটি পাওয়া গিয়াছে :—

কবি হাফেজের সমাধিক্ষেত্র দর্শন করিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভাবাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে সিরাজনগরীর খলিলাবাদ উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন।



বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইস্পাহানে বিশ্বকবি

ইস্পাহান, ২৩শে এপ্রিল—আমরা নির্ব্বিঘ্নে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ইস্পাহান পরিদর্শনে কবি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রফেসার হের্‌স্ ফেল্‌ডের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইয়াছিল।

গত কল্য কবির আগমনে তাঁহাকে রাজকীয় সম্বর্দ্ধনায়

সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। অন্ত সৈন্তবিভাগ, অসামরিক বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ ও বণিক-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইল। বুধবার দিন মিউনিসিপ্যালিটি জনসাধারণের পক্ষ হইতে টাউন-হলে এক মানপত্র দান করিবেন।

কবি এখানে চারি দিন অবস্থান করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করেন। তার পর কোমের পথে তেহারাণ অভিমুখে যাত্রা সুরু হইবে।

তেহারাণ, ৩০শে এপ্রিল—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেহারাণে পৌঁছিয়াছেন। নগরের ফটকের বাহিরে এক উদ্যানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তিনি বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শিক্ষামন্ত্রী তাঁহাকে মিঃ আসাদীর বাসভবনে লইয়া যান। মিঃ আসাদীর বাড়ীতেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কবিবরের উপস্থিতিতে সহরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইতেছে।

তেহারাণ, ৩রা মে—বিগত কল্য অপরাহ্নে পারস্যের মহামান্য শাহের সহিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অনেকক্ষণ আলাপ হইয়াছে।

শোক-সংবাদ



স্বর্গত মহিমানাথ ভট্টাচার্য্য

স্বর্গত মহিমানাথ ভট্টাচার্য্য

ইনি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার জন্ম হয়—১৭ই এপ্রিল, ১৮৭০, মৃত্যু হইয়াছে ২৬শে মার্চ্চ, ১৯৩২ (বাঙ্গালা ১২ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৩৮) প্রাতঃকালে। দেশবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তিন পুত্র, এক কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র মন্মথনাথ (M.A.) বহু দিন পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মুণীন্দ্রনাথ (M A, B.L.) হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনিও অকালে চলিয়া গিয়াছেন। কন্যাও কিছু দিন পূর্ব্বে গত হইয়াছেন। ছিলেন কনিষ্ঠ পুত্র মহিমানাথ (B.A.)। তিনিও গত ১২ই চৈত্র, শুক্রবার প্রাতঃকালে চলিয়া গেলেন। তিনি অতি মিষ্টভাষী, অমায়িক, অহমিকাশূন্য; সকলের সঙ্গে সমানে মিশুক অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর শরীর অনেক দিন হইতেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইতেন। হাঁপানির ব্যারাম ছিল। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। মহিমানাথ প্রথম চাকরি গ্রহণ করেন ওপিয়ম্ ডিপার্টমেণ্টে। তার পর—যশোহর, মৈমনসিং, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, হাবড়া, আলিপুর প্রভৃতি স্থানে ডেপুটিগিরি করেন। কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল; তিনি সুবিচারক ছিলেন। আলিপুরে

ডেপুটিগিরি হইতে ৮ বৎসর হইল পেন্সন লইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট হঠাৎ মারা গেলে, তাঁর পদেও কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। স্বগ্রাম নারিটের প্রতি ইঁহার ভালবাসা ছিল। অনেক সময় তথায় গিয়া থাকিতেন। মহিমানাথ বাবুর পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

স্বর্গীয় বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৪ বৎসর বয়সে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দেহাবসান হইয়াছে। এ যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই বামাপদ বাবুকে চিনিতে পারেন কি না সন্দেহ—কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই চিত্রশিল্পীকে সেকালের দেশীয় রাজা মহারাজা হইতে পদস্থ বাঙ্গালী সকলেই যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতেন। বর্দ্ধমান জেলার সাতগাছিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে বামাপদ বাবুর জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ছবি আঁকার দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। পাঁচ ছয় বৎসর বয়সেই তিনি মাতুলালয়ে বারোয়ারীর সং দেখিয়া তাহার অনুকরণে গঙ্গামাটীর পুতুল গড়িয়া দিতেন। পরে শ্রীধরপুরে স্কুলে পড়িবার সময় মধ্যে মধ্যে সং গড়িয়া তাহাকে হরিতাল মাথাইয়া বাহির করিতেন এবং সঙ্গীদের বিকৃত মূর্ত্তি গড়িয়া নীরব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেন।—জনাইয়ের জমিদার পূর্ণচরণ মুখোপাধ্যায় ও প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে তিনি সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। কিছু দিন এখানে শিক্ষালাভ করিবার পর তিনি তৈল-চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিবার ইচ্ছায় তখনকার প্রথিতনামা চিত্রকর প্রমথনাথ মিত্রের নিকট অয়েল-পেন্টিং শিক্ষা করিতে চেষ্টা করেন এবং পরেও Becker নামে একজন অভিজ্ঞ জার্ম্মাণ চিত্রকরেরও নিকট কিছুদিন চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করেন। ১৮৭৯ হইতে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। এলাহাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, গোয়ালিয়র জয়পুর যোধপুর প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তখনকার রাজা মহারাজগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া যথেষ্ট যশ ও অর্থলাভ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও প্রায় ১২ বৎসর কলিকাতায় বসবাস করিতে থাকেন। এই সময়েই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, মনোমোহন ঘোষ ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির তৈল-চিত্র অঙ্কন করিয়া যশস্বী হয়েন। রবি বর্ম্মার পৌরাণিক চিত্র দেখিয়া তিনি পৌরাণিক চিত্র প্রকাশের ইচ্ছা করেন। তিনি পৌরাণিক চিত্রের শিল্পী হিসাবে বাঙ্গলার বাহিরেও যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহার "দুর্ব্বাসা শকুন্তলা" "শান্তনু-গঙ্গা" "কলঙ্কভঞ্জন"

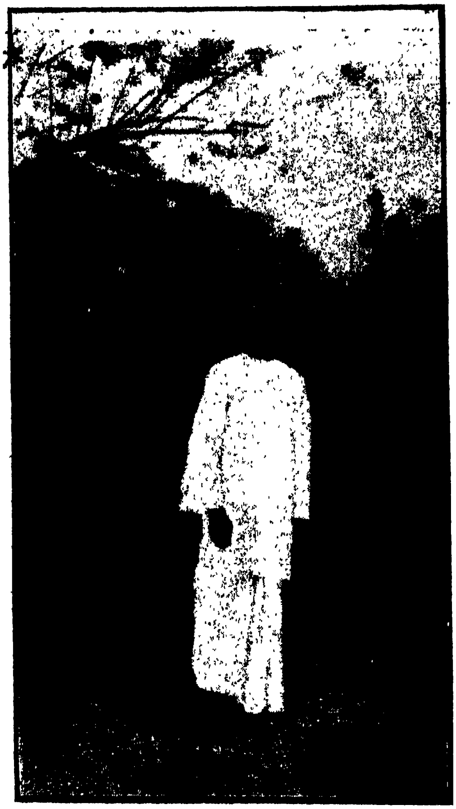


স্বর্গীয় বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

"অর্জ্জুন উর্ব্বশী" তাঁহার নাম এ দেশে চিরকাল অক্ষয় করিয়া রাখিবে। মানুষ হিসাবে তিনি সরল নিরহঙ্কার ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি শালিখায় বসবাস করিতেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনগণের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

স্বর্গীয় অধ্যাপক পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ইলিপুর গ্রামে ১৩০২ সালে পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের মধ্যে তাঁহার প্রপিতামহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম নৈয়ায়িক পণ্ডিত ৺প্রাণকৃষ্ণ ন্যায়ভূষণ মহাশয় ও শিক্ষকতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ৺বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ খ্যাত। তাঁহার পিতা



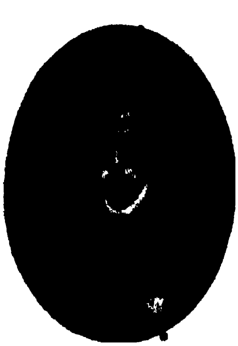
স্বর্গীয় অধ্যাপক পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়

৺কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করিতেন এবং তাঁহার গৃহসংলগ্ন বিস্তৃত চতুষ্পাঠী গৃহে বঙ্গদেশের অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ছাত্র-জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। বহু কাল হইতেই পঞ্চানন বাবুর তীব্র বিদ্যানুরাগ ও অদম্য জ্ঞানপিপাসার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়, এবং শিয়াখালা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৯১২ খৃঃ ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি যখন বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন তখন তিনি ও উক্ত বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত মহাশয় দুইজনে কাশীধামের ধর্ম্ম-রক্ষিণী সমিতির পরীক্ষা দেন ও তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করেন ও ৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় ও তাঁহার মাতা, অবিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগ্নী ও ভ্রাতা জানকীনাথের ভরণ-পোষণের ভার আদর্শচরিত্র বিংশতিবর্ষবয়স্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তুলসীদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর পতিত হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অত্যধিক পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়া পঞ্চাননের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। সেই সময় পঞ্চানন-বাবুর জীবন অতিরিক্ত অর্থকষ্টের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। দারিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নে প্রতিভাশালী পঞ্চাননবাবু কিছুমাত্র বিচলিত বা হতাশ না হইয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় বাণী সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন ও বাগ্দেবীর অপার করুণা লাভ করিয়া ১৯১৬ খৃঃ বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন ও ১৯১৯ খৃঃ এম-এ পরীক্ষায়ও শীর্ষ স্থান লাভ করেন। ১৯১৮ খৃঃ এম-এ পরীক্ষার পূর্ব্বেই বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ খৃঃ তাঁহার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ইউনিভার্সিটী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক পদ প্রদান করেন এবং জীবনের শেষদিনাবধি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত তিনি সেই বরণীয় পদের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। পড়াশুনা করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র নেশা ছিল এবং সাংসারিক কর্ম্মে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে তিনি যেন সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হইয়াও তিনি বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। বালক-সুলভ সরলতা ও নিরহঙ্কার ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

তাঁহার জন্মস্থান ইলিপুর গ্রামে ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভা স্থাপনের তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোগী ও বহু দিন উক্ত সমিতির সম্পাদক রূপে কর্ম্ম করিয়া গ্রামের লুপ্ত শ্রী ফিরাইতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতা আদর্শ বাণীমন্দির নামক বিদ্যালয়ের পাঁচ বৎসর কাল তত্ত্বাবধায়ক থাকিয়া উক্ত অনুষ্ঠানের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বহু সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জননী ভ্রাতা ও বহু আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি অকালে পরলোকের যাত্রী হইলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনগণের এই গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

স্বর্গীয় রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১২ই বৈশাখ সোমবার রাত্রি এগারটার সময় আমাদের পরম বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি মাস দুই হইতে সামান্য জ্বরে ভুগিতেছিলেন; অনেক চিকিৎসাতেও কোন ফল হইল না। ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ২৪-পরগণার অন্তর্গত তারাগুনিয়া গ্রামে রাইমোহন বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন পুলিশের দারোগা। রাইমোহন বাবুর অদৃষ্টে পিতৃদর্শন ঘটে নাই; তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃদেব পরলোকগত হন। অনাথা মাতা ও পিতৃঋণ স্কন্ধে লইয়াই রাইমোহন বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের বলে কলিকাতায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকপ্রবর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য হন। তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি চারি দিকে প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রণীত হোমিওপ্যাথী



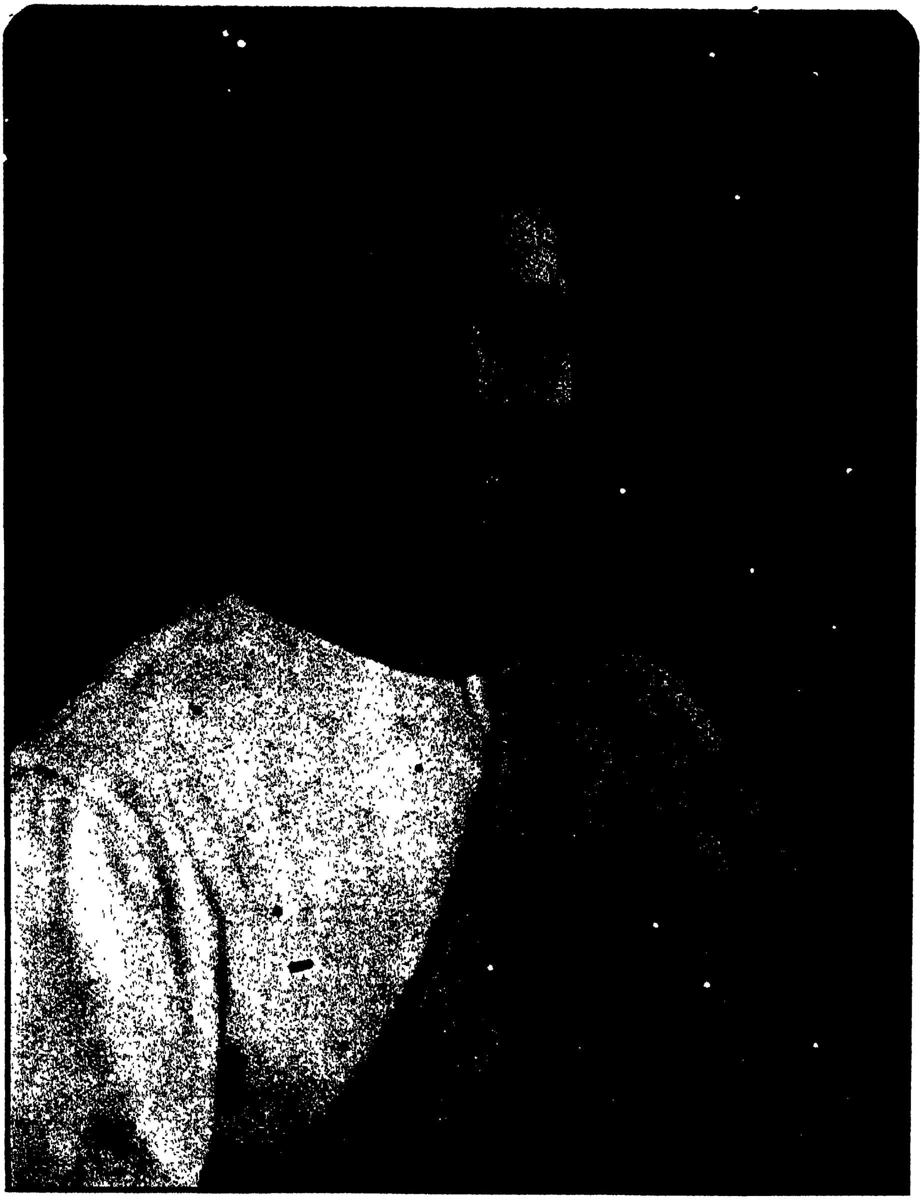
স্বর্গীয় রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চিকিৎসা-গ্রন্থগুলি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তিনি কলিকাতা হোমিওপ্যাথী মেডিকেল কলেজ ও রাজকুমারী মেডিকেল স্কুলে অনেক দিন অধ্যাপনা করিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুইকন্যা বর্ত্তমান আছেন। আমরা তাঁহার বিধবা সহধর্ম্মিণী পুত্রকন্যা ও আত্মীয়স্বজনগণের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

সাময়িকী

সংবর্দ্ধনা—

বর্ত্তমান বর্ষে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর মেয়র পদে পুনরায় নির্ব্বাচিত হওয়ার জন্য আমরা তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিতেছি। বিগত বৎসরেও তিনিই মেয়র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ বৎসর নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে তিনি ব্যতীত আরও দুইজন



শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় (মেয়র)

(কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে)

প্রার্থী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চক্ষু-চিকিৎসক শ্রীযতীন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মহাশয়; দ্বিতীয় জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত এ, কে, ফজলল হক মহাশয়। অধিকাংশ সদস্যের ভোটানুসারে শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; এ জন্য তাঁহাকেও আমরা সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।



শ্রীযুক্ত এস, এম, ইয়াকুব (ডেপুটী মেয়র)—কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্যে

মহাশয়ই পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মেয়র নির্ব্বাচনের পর ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচনে অধিকাংশ সদস্যের ভোটানুসারে খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত এস, এম, ইয়াকুব মহাশয়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসবের আয়োজন দ্রুত চলিতেছে। ইতিমধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক

সমিতির দুইটী সভা হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে পত্রিকাদিতে তেমন প্রচার না হইলেও তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবগণ এই উৎসবে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিবার জন্য স্বেচ্ছায় যোগদান করিতেছেন;—শুনা যায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাদিগকে কর্ম্মকর্ত্তা করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া জানাইয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। বিগত ১৮ই এপ্রিল সোমবার রামমোহন লাইব্রেরী-হলে এক সাধারণ সভা হয়। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করিবার জন্য আরও কতকগুলি নূতন নাম যোগ করা হইয়াছে। কার্য্য-তালিকা যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, জনসাধারণের পক্ষ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন, বেঙ্গল নেশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আচার্য্য-দেবকে এক-একটি অভিনন্দন দেওয়া হইবে। আচার্য্য রায়ের কার্য্যাবলী ও আদর্শ চরিত্র সম্পর্কে যে-সকল বিখ্যাত লোক যাহা লিখিবেন, তাহা স্মৃতিপুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হইবে, সভায় ইহাও স্থির হইয়াছে। ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সভাপতি), শ্রীযুক্ত মেঘনাথ সাহা, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সত্যচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু ভট্টাচার্য্যকে লইয়া একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। বোর্ড ইতিমধ্যেই সভা করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আরও স্থির হইয়াছে যে, সদস্যগণের নিকট হইতে দুই টাকা হিসাবে চাঁদা দ্বারা যে টাকা সংগৃহীত হইবে, এবং স্মৃতি-পুস্তকের বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ লাভ হইবে, তাহার একটী পয়সাও অভ্যর্থনা-উপলক্ষে ব্যয় করা হইবে না; সে সমস্ত টাকাই ছাত্রবন্ধু আচার্য্য রায়ের অভিপ্রায় অনুসারে দরিদ্র ছাত্র-ফণ্ডে জমা হইবে; অভ্যর্থনার জন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহা আচার্য্য রায়ের গুণমুগ্ধ কয়েকজন বন্ধু ও ছাত্র সম্পূর্ণরূপে বহন করিবেন। এ ব্যবস্থা যে অতি সুন্দর হইয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা অবগত হইলাম, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই দলে দলে লোক সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন।

সুনীতি সঙ্ঘ—

যাহাতে তরুণবয়স্কদিগের মন নীতি ও পবিত্রতার আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং যাহাতে সাহিত্য, অভিনয়, নৃত্য অথবা চিত্রের পথ দিয়া তাহাদের মধ্যে নীতির প্রতি অবহেলার ভাব অথবা অন্য কোনও রূপ দূষিত ভাব প্রসার লাভ করিতে না পায়, এই উদ্দেশ্যে "সুনীতি সঙ্ঘ" নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। দেশের কল্যাণের জন্য এইরূপ একটি অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হওয়া যে কিরূপ প্রয়োজন, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আপাততঃ কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী ও অপর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এই কার্য্যের প্রাথমিক উদ্যোগ করা হইতেছে। গ্রীষ্মাবকাশের পরে তাঁহারা জনসাধারণের, এবং বিশেষ ভাবে ছাত্রসাধারণের ও তাঁহাদিগের অভিভাবকগণের সাহায্য লইয়া ক্রমশঃ একটি শক্তিশালী সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা করিবেন। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এই সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকরূপে গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে এক আবেদন-পত্র লইয়া বন্ধুদিগকে ঐরূপ সমিতি গঠনের জন্য উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা এই কার্য্যে যোগদান অথবা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এখনই স্বেচ্ছাসেবকগণের হস্ত হইতে সুনীতি সঙ্ঘের মুদ্রিত ফর্ম্ম লইয়া ইহার জন্য চাঁদা দিতে পারেন; অথবা ইচ্ছা করিলে এখন হইতেই নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র-(pledge) সংবলিত কার্ডে স্বাক্ষর করিয়া সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারেন, "আমি চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে পবিত্র থাকিব। আমি নীতিবিরুদ্ধ সাহিত্য পাঠ হইতে, নীতিবিরুদ্ধ অভিনয়, নৃত্য ও চিত্র দর্শন হইতে বিরত থাকিব, এবং অপরকেও বিরত রাখিতে চেষ্টা করিব।" যাঁহারা সুনীতি সঙ্ঘে যোগদান করিতে অথবা ইহার বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অন্যতম অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত, ৬নং রামকৃষ্ণ দাস লেন, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সঙ্ঘের অস্থায়ী সভাপতি এবং শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, শ্রীজলধর সেন, মুজীবর রহমান, শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ সহকারী সভাপতি হইয়াছেন।

আমদানী-শুল্ক বৃদ্ধি—

আমদানী শুল্কের নূতন আইন অনুসারে বিগত ২৫শে এপ্রিল হইতে কারখানা-উৎপাদিত প্রায় সমস্ত আমদানী পণ্যের উপর শতকরা ২০৲ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সমস্ত জিনিষের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে, সেগুলির উপর বর্ত্তমানে মূল্যের হিসাবে শতকরা ১০৲ টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে এবং অন্যান্য অধিকাংশ দ্রব্যের উপরই আরও অতিরিক্ত কর বসান হইবে। সুতা ব্যতীত বস্ত্র-শিল্পের অন্যান্য জিনিষ, কাগজ, কাচের জিনিষ, রবারের দ্রব্য, চামড়া, বিদ্যুৎ সম্পর্কিত জিনিষপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত পণ্যের উপর শতকরা ২০৲ টাকা হারে কর ধার্য্য হইয়াছে; অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিষ কারখানায় উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় সমস্ত-গুলির উপরই নূতন শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতীয়দের বৃত্তি।—

"ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ডিউটস্ অ্যাকাডেমি" জানাইতেছেন যে, বিভিন্ন জার্ম্মাণ বিশ্ব-বিদ্যালয় ১৯৩২—৩৩ সালের জন্য নিম্নলিখিত বৃত্তিগুলি ভারতীয় ছাত্রদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রগণ উহার জন্য আবেদন করিতে পারেন—

(১) ব্রেস্‌লো—ব্রেস্‌লো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তিতে বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে; এবং ৩০ মার্ক হাত-খরচের বাবদ দেওয়া হইবে। (কেবল দর্শন, ভাষা, গণিত, শিল্পকলা এবং ভারত সম্বন্ধীয় বিষয়ের জন্য)।

(২) ড্রেসডেন—ড্রেসডেনের টেক্‌নোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির বৃত্তিতে কেবল বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে।

(৩) হোহেনহীম—হোহেনহীমের কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তিতে বিনা বেতনে অধ্যয়নের এবং বিনা ব্যয়ে থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

(৪) ন্যুরণবার্গ—এই স্থানের বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তিতে মেনসা একাডেমিতে বিনা বেতনে অধ্যয়নের ও বিনা ব্যয়ে খাইবার ব্যবস্থা আছে।

এই চারিটী বৃত্তি ১৯৩২ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৩৩ সালের জুলাই পর্য্যন্ত চলিবে। যে সকল ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় বিদেশে স্বীকৃত, সেই সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ বৃত্তির জন্য আবেদন করিতে পারেন। যাঁহারা গ্রাজুয়েট নহেন, তাঁহারা যদি কোনরূপ সাহিত্য কিম্বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাফল্য অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহাদের আবেদন বিচার্য্য হইবে। আবেদনের সহিত যে অধ্যাপকের অধীনে আবেদনকারী অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসাপত্র দিতে হইবে।

ল্যাবুনচুষ পুষ্প—

যে বালিকাটীর আলোক-চিত্র এখানে প্রকাশিত হইল, তাহার নাম—পুষ্পরাণী ঘোষ। (ল্যাবুনচুষ পুষ্প—এই নাম



শ্রীমতী পুষ্পরাণী ঘোষ—(ল্যাবুনচুষ পুষ্প)

রেডিও ব্রডকাষ্টিং হইতে প্রদত্ত হয় এবং এই নামেই বালিকাটী সাধারণে পরিচিত; মেয়েটীর বর্ত্তমান বয়স সাড়ে পাঁচ বৎসর। তিন বৎসর বয়স হইতেই মেয়েটী সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে। এক্ষণে ঠুম্‌রী, খেয়াল, রামপ্রসাদী ও আধুনিক কণ্ঠ-সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া গায়ক মহলে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার সঙ্গীত-শিক্ষক—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার ঘোষ। ইনি

পুষ্পর খুল্লতাত এবং ইঁহারই কাছে পুষ্প বরাবর সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে। বালিকাটীর পিতার নাম শ্রীজহরলাল ঘোষ, নিবাস—৪৯ সচ্চাসীপাড়া রোড, কাশীপুর, কলিকাতা। বালিকাটী অনেক উপহার পাইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল ;—ঝামাপুকুরের রাজা—একটী হারমোনিয়ম্‌, আন্দুল মৌরীর জমিদার—একটী বীন্‌, বঙ্গীয় সদ্গোপ-সভা—একটী এস্রাজ, B.N.R. —Bengali Association Kharagpur—একটী স্বর্ণ-পদক ; এতদ্ভিন্ন প্রচুর রৌপ্যপদক, খেলনা প্রভৃতি। বাংলায় এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভার বিকাশ প্রশংসার্হ। বহু প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পুষ্প বেণীর ভাগ প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছে।

এক কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ—

ভারতের জন্য শতকরা ৫ পাউণ্ড হার সুদে এক কোটী পাউণ্ড (প্রায় ১৪ কোটী টাকা) ঋণ গৃহীত হইয়াছে। এক শত পাউণ্ডের ঋণপত্রের দাম ৯৫ পাউণ্ড। ১৯৪২—৪৭ সালে উহা পরিশোধ করা হইবে। নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে ;—

অদ্য ভারত-সচিব এক কোটী পাউণ্ড ঋণের অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করিতেছেন। উহা ১৯৪২-৪৭ সালে পরিশোধ করা হইবে। এক শত পাউণ্ডের ঋণের দাম বর্ত্তমানে ৯৫ পাউণ্ড হইবে। উহার সুদ শতকরা বার্ষিক ৫ পাউণ্ড হিসাবে প্রদত্ত হইবে। যদি পূর্ব্বে পরিশোধ নাও হয়, তাহা হইলেও ১৯৪৭ সালের ১৫ই জুন পরিশোধ করা হইবে। কিন্তু ভারত-সচিব লণ্ডন গেজেটে তিন মাস পূর্ব্বে নোটিশ দিয়া ১৯৪২ সালের ১৫ই জুনের পর যে কোন ষান্মাষিক সুদের তারিখে উহা পরিশোধ করিতে পারিবেন। আগামী ২৭শে এপ্রিল লণ্ডনে ঋণ গ্রহণ আরম্ভ এবং ঐদিনই সমাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন ও করাচীস্থিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিসে ঋণ প্রদত্ত হইতে পারিবে। উল্লিখিত স্থান সমূহে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অফিসে অনুষ্ঠানপত্রের সর্ত্তাবলী সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যাইবে। ভারতবর্ষে রেলওয়ে ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য শতকরা সাড়ে ছয় পাউণ্ড হারে ১৯৩২ সালে পরিশোধের সর্ত্তে গৃহীত ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই ইস্তাহার প্রচারের পর বিগত ২৭শে এপ্রিল তারিখে অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিলাতে এই এক কোটী পাউণ্ড ঋণ পাওয়া গিয়াছে।

সার দোরাব টাটার দান—

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ পার্শী ব্যবসায়ী এবং ক্রোড়পতি সার দোরাব টাটা তাঁহার তিন কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি দাতব্য কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সার দোরাব টাটা সম্পত্তি উদ্মাদিয়া চ্যারিটি ট্রাষ্টের আদর্শে একটি ট্রাষ্ট দলিলের খসড়া করিয়াছেন। কিন্তু এই দলিলের সর্ত্তগুলি সার দোরাবের জীবিতকালে কার্য্যকরী হইবে না। জীবিতকাল পর্য্যন্ত স্বত্বাধিকারী হিসাবে তাঁহার ট্রাষ্টের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান থাকিবে। ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য হইল—পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সমস্ত লোক হঠাৎ দৈব-দুর্ব্বিপাকে পতিত হইবে, তাহাদিগকে এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহকে—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে—সকল প্রকারে সাহায্য করা। এই তিন কোটি টাকা ব্যতিরেকে সার দোরাব "অনারোগ্য ব্যাধিসমূহ" সম্পর্কে গবেষণা কার্য্যের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে ২৫ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীর যে কোন স্থানে এইরূপ গবেষণা-কার্য্যের জন্য উৎসাহ দেওয়া হইবে এবং যাঁহারা তাঁহাদের প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করিবেন, তাঁহাদিগকে মোটা রকম পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ভারতে জাপানী মাল—

১৯৩১ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩২ অব্দের মার্চ্চ মাসের হিসাবে জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যে কতকগুলি অসুবিধা ঘটিয়াছিল। প্রথম ছয় মাস ভারতের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় এবং রাজনৈতিক অবস্থার কোন ঠিক-ঠিকানা না থাকায় ব্যবসায়ীরা দীর্ঘকালের জন্য কোন কন্‌ট্রাক্ট করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। পরে মহাত্মা গান্ধীর সহিত গবর্ণমেণ্টের একটা আপোষ রফা হওয়ায় ব্যবসায়ের অধোগতি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। অতঃপর সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেটব্রিটেন স্বর্ণমান প্রত্যাহার

করায় আবার মুস্কিল হয়। সে সময় জাপান স্বর্ণমান বজায় রাখায়, মুদ্রা-বিনিময় বিভ্রাটে পড়িয়া ভারতের বাজারে জাপানী মালের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া জাপানী ব্যবসায়ের প্রবল বিঘ্ন উৎপাদন করে। তদুপরি ভারত সরকার অর্থাভাবে পড়িয়া রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য আমদানী শুল্ক শতকরা ২১৲ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেন। সর্ব্বোপরি জাপান মাঞ্চুরিয়ার হাঙ্গামায় জড়িত হইয়া পড়ায় জাপানের টাকার বাজারে টান পড়ে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি জাপান স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে; তখন জাপানী ব্যবসায়ীরা ভারতে সস্তাদরে মাল দিতে সক্ষম হওয়ায় তাহাদের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে। জানুয়ারী মাসে বিরামসন্ধি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পুনরায় জটিল হইয়া উঠে। এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে জাপানী ব্যবসায়ের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, গত বৎসরের তুলনায় জাপান হইতে জুতা, কাপড় প্রভৃতির আমদানী হ্রাস পাইয়াছে বটে; কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানের অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, জাপানী মাল সস্তা বলিয়া অন্যান্য দেশের মাল অপেক্ষা জাপানী মালের ভারতে বেশী কাট্‌তি হয়। আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি না পাইলে আরও অনেক জাপানী মাল ভারতে আসিত।

জিনিষের নাম	১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত।		
	১৯২৯ ৩০	১৯৩০-৩১	১৯৩১ ৩২
বুট ও জুতা	১৮১০৩৬৪৲	৫২৯৬৬৬৫৲	৪১৫৬০৬৬৲
কর্পূর	১৮৩৯৪২৫৲	৭৮৬১৭০৲	৬৯৪৭১৮৲
সিমেন্ট	৫৪১১১৪৲	৯৭১৫৯৭৲	৮১৭৮৭৩৲
প্রসেলিন	২৬৪২৬৪৯৲	১৭২৯০৮৯৲	১৩৫৬০৮৭৲
কাচ ও কাচের জিনিষ	৬৪৪৩২৩৯৲	৪১২৫৮৬৭৲	৩৩৮২২৫০৲
লৌহের জিনিষ	২২৩২৮১৮৲	১৭৫৮৮ ৩৲	১২৬৯৭২০৲
বৈদ্যুতিক তার	১৯৮৪০৭৲	১৯১৩৯৪৲	১৭৬৪৭৮৲
কার্পাস সূতা	১৪৯০৬০৫৯৲	৭২৯৭৮২২৲	৬৯২৫৭৯৫৲
মোজা গেঞ্জি	১০০৬৮৪৩১৲	৬৯১১৮৬৩৲	৫৬৮৮৭২২৲
কোরা কাপড়	৭৬৩০০৪২২৲	৩৪৭৯৪৪০০৲	২৪২০০৯২৮৲
ধোয়া কাপড়	২২৭৭৫৮২৲	৪০৬৮৮৯৫৲	৮০৭৮৯৮০৲
রঙ্গীন ও ছাপা	২৮৮০১৩১২৲	১১৮০৫৪৩৬৲	১৩৮৯৩৪৮৫৲
লেস ফিতা ইত্যাদি	১৭৪১০১৬৲	১১৫৩৮০২৲	৮৬৭৪৪০৲
রেশমী সূতা	১১৮৩৭৩৩৲	৭৯৪৯৩৩৲	৪৫১৫৭৬৲
মিশ্রিত রেশমী মাল	১৬৮৮১৫৮৲	১৪৯৭৩০৮৲	১৫৫৩৪৫৯৲
রেশমী কাপড়	১০৮৬৯২০৮৲	৫,০৩২৭৮৲	৫৭৮৩৯০৭৲
পশমী কাপড়	৪৬০০৮৩৲	২৮৫৭৯৬৲	৬২৮২১৲
কৃত্রিম রেশমের কাপড়	—	৪৪৮০৫৩৮৲	১৭৬০৪৩৭৪৲
মিশ্রিত কৃত্রিম ঐ	—	১৯৭৭৮২৲	৩০৫০২৪৲

ম্যালেরিয়া—

ম্যালেরিয়ায় ত দেশ উজাড় হইয়া গেল। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের এবং দেশের প্রতি মমত্বশীল ব্যক্তিগণের উদ্বেগেরও সীমা নাই। দেশের এই শত্রুকে দমন করিবার জন্য নানা জনে নানা রকম পরামর্শ দিতেছেন। ম্যালেরিয়ার বাহন মশককে বধ করিয়া ম্যালেরিয়াকে খোঁড়া করিবার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে মন্দ নয়। কলিকাতায় যদি ম্যালেরিয়া আসিয়া থাকে, কিম্বা অদূর ভবিষ্যতে আসিবার সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন মশককুলকে



টোপাপানা

ধ্বংস করিবার জন্য বার্ষিক অনেক টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ম্যালেরিয়াবাহী মশককুল যে জলে ডিম্ব প্রসব করে, সেই জলে কেরোসিন নিক্ষেপ করিয়া মশকের শাবকগুলিকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিবার জন্য এই টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। কেহ কেহ এই টাকার কিয়দংশ দিয়া কই মাছের চাষ করিবার পরামর্শ দিতেছেন; কারণ, ম্যালেরিয়া-মশার বাচ্ছা কই মাছগুলির প্রিয়তম খাদ্য। কই মাছের ন্যায় চুণাপুঁটি, ট্যাংরা, বাটা এবং বড় মাছের ছোট ছোট পোনারা মশকের বাচ্ছা খায়। সেইজন্য অনেকে আবার বাঙ্গলার পল্লীগুলিতে এই সকল মাছের চাষ করিবার পরামর্শ দিতেছেন। ইহা এক রকম ম্যালেরিয়া দমনের পদ্ধতি। কিছুদিন হইল, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, খাগড়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় মশা মারিবার আর এক প্রকার পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি হাতে না মারিয়া মশার শাবকগুলিকে ভাতে মারিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি খাদ্যে বঞ্চিত করিয়া উহাদের ধ্বংস করিতে চাহেন।

ডাক্তার রায়ের পদ্ধতি অভিনবও বটে এবং বিজ্ঞানানুমোদিতও বটে; এবং দেখা যাইতেছে, বেশ ফলপ্রদও বটে। তিনি বলেন, বঙ্গদেশের পুকুরগুলিতে টোপাপানা নামে এক প্রকার পানা জন্মে। এই পানার শিকড়ের গায়ে এক প্রকার সরু সরু সূত্রবৎ পদার্থ লম্বমান ভাবে ঝুলিয়া থাকে। এই বস্তুটি মশক-শাবকের খাদ্য। উহারা যদি এই খাদ্য না পায় তাহা হইলে বাঁচিতে পারে না। ডাক্তার রায় পুকুরগুলি হইতে টোপাপানা তুলিয়া ধ্বংস করিয়া মশক শাবককে খাদ্যে বঞ্চিত করিতে চাহেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি এই বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, এই উপায়ে তিনি অনেক পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়া-শূন্য করিয়াছেন, অনেক স্থানের ম্যালেরিয়া কমাইয়া দিয়াছেন। এমন কি তিনি ইচ্ছা করিলে ম্যালেরিয়া-শূন্য স্থানে টোপাপানার চাষ করিয়া ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করিতে পারেন। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ডাক্তার পি, সি, রায়ের ম্যালেরিয়া দমনের এই পদ্ধতির অনুমোদন করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায়, অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় মশক ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া দমন করা যখন ডাক্তার রায়েরও উদ্দেশ্য, তখন তাঁহার পদ্ধতিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। টোপাপানা ধ্বংস করিলে আর কিছু না হউক, অন্ততঃ পুকুরগুলিও ত পরিষ্কার হইবে। তাহাও বড় কম লাভ নহে।

ভারতে বিদেশী বস্ত্র—

গত ১৬ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে ভারতের কোন্ বন্দরে কত হাজার গজ কাপড় আসিয়াছে

এবং পূর্ব্ব সপ্তাহে ও ১৯৩১ সালের অনুরূপ সপ্তাহে কত আমদানী হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কোরা কাপড়

বন্দর,	আলোচ্য সপ্তাহ,	পূর্ব্ব সপ্তাহ,	গত বৎসর—
কলিকাতা	১৪৭৯	৩৫৬২	৪৫১৮
বোম্বাই	১৩৫২	১৬৫২	১৪৯৬
করাচী	৪৪	২০১	৩৯
মান্দ্রাজ	৯৯৯	৯৬৯	৫৮৪
রেঙ্গুন	২০৮	১৮৪	৩৬৬

ধোয়া কাপড়

কলিকাতা	২০৪	১৩৮৪	৫৭৪
বোম্বাই	১২৫৯	১৮৫০	৪৯৬
করাচী	৬৪৩৫	১০৫৭	৪৩২৪
মান্দ্রাজ	৭৮৪	২৫২	৪৩৫
রেঙ্গুন	১১১৪	১৪৯৬	৬২১

রঙ্গীন ও ছাপা

কলিকাতা	৩৭০	১৭২২	৩০৩৯
বোম্বাই	৩১৫৪	৩৮৯০	৯৯১
করাচী	৩০৭৯	৭১৫	১৭১০
মাদ্রাজ	২৭৪	১৫৬	২১৫
রেঙ্গুন	১৪৫৬	১৬৭৬	৬১৯

গত তিন মাসে কোন্ দেশ হইতে কত লক্ষ গজ কাপড় আসিয়াছে তাহার হিসাব এবং ১৯৩১ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন্ দেশ হইতে কত লক্ষ গজ কাপড় আসিয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কোরা কাপড় (লক্ষ গজ)

দেশ	ডিসেম্বর,	জানুয়ারী,	ফেব্রুয়ারী	১৯৩১
বিলাত	৪০	৪৩	৫৫	৫৪৮
জাপান	১২১	১৮০	১৯৩	১৯.০
আমেরিকা	×	×	১	২
অন্যান্য দেশ	×	১৫	১৩	১৬

ধোয়া কাপড় (লক্ষ গজ)

বিলাত	৮৯	১৬২	১৪৪	১৯৭৭
অন্যান্য দেশ	৬৪	৮৩	৫৭	৬৫২

রঙ্গীন ও ছাপা

বিলাত	৭৩	১০৪	৯০	৯৮৪
ইয়োরোপ	৭	১৫	৬	১৫২
জাপান	৫৭	১০৭	৭০	৯০৮
অন্যান্য দেশ	২	১	৩	৩২

বিলাতে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ—

ঈদ উৎসব উপলক্ষে বিলাতে নিখিল ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় দলকে ইণ্ডিয়ান সোসিয়েল ক্লাব এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। ঐ ভোজে বহু ভারতীয় এবং বৃটিশ উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ইকলকার ভারতবর্ষের মঙ্গল কামনা করিয়া এক উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন এবং ঈদ পর্ব্বের ত্যাগের কথার উপর জোর দেন। মিঃ শাপুরজী শাকলাৎওয়ালা অতিথি-বর্গের মঙ্গল কামনা করিয়া বলেন যে, নিখিল ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় দলের ইংলণ্ডে উপস্থিতি একটী বৈশিষ্ট্যমূলক ব্যাপার। এই দল বহু প্রকার ব্যক্তি লইয়া গঠিত এবং ইহা দ্বারা বৃটেনের সহিত ভারতের ঐক্যবদ্ধতার সূচনা করিতেছে। মিঃ সি, কে, নাইডু বলেন যে, পোর-বন্দরের মহারাজা খেলোয়াড় দলকে বক্তৃতা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। লণ্ডন মস্‌জিদের ইমাম বলেন যে, এই প্রকার সভাসমিতির দ্বারা ইঙ্গ-ভারতীয় মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে এবং ভারতেও ইহার অনুকরণ হইবে। লর্ড সভা ও কমন্স সভার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ভারতীয় খেলোয়াড়দিগকে বিগত ২৬শে এপ্রিল কমন্স সভায় এক ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন। লর্ড এবিসাম এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

ভারতে আমদানী রপ্তানি —

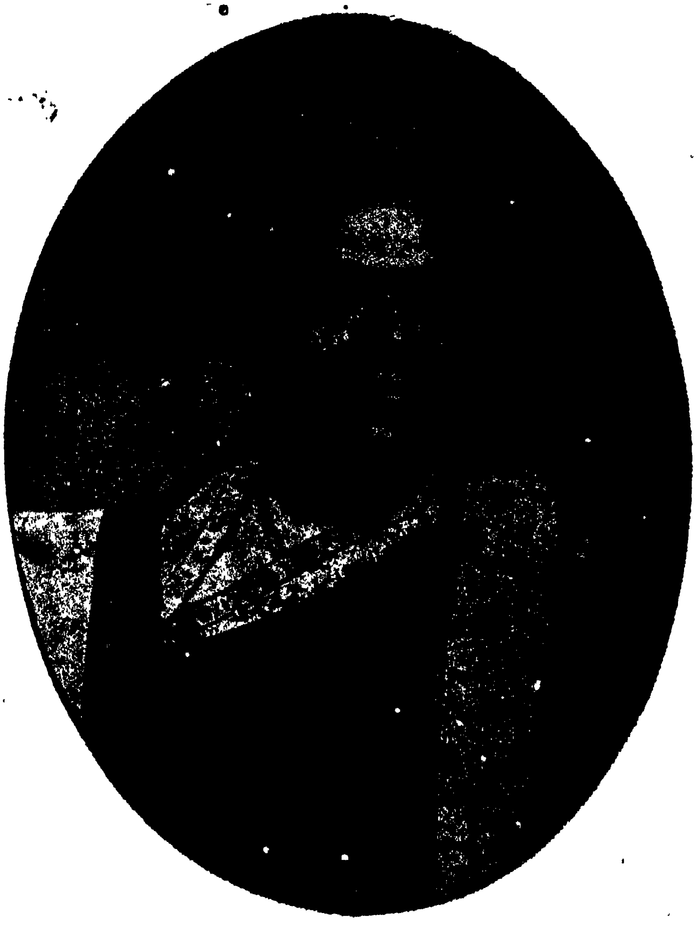
"ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকা বলিতেছেন—ভারতে খাভা চিনির আমদানী একেবারে নাই বলিলেই চলে। মনে হয় যে, ভারতে গুড়ের ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কেন না বিদেশী চিনির আমদানী শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে, অথচ ভারতবর্ষে তদনুরূপ চিনি মাত্রই প্রস্তুত হয় নাই।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য—

মার্চ্চ মাসের হিসাব—

গত মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১০ কোটী ৯১ লক্ষ টাকার মাল আমদানী এবং ১৩ কোটী ২৩ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে।

কলিকাতা বন্দরের শুল্ক-সংগ্রাহক মহাশয়ের প্রচারিত বিবরণে প্রকাশ—



শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সান্যাল

গত মার্চ্চ মাসে কলিকাতা বন্দরে আমদানীর পরিমাণ ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা (ফেব্রুয়ারী) হইতে ২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ছিল ৩ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা। রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য হিসাবে ৪ কোটী ২৪ লক্ষ হইতে ৩ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ছিল ৪ কোটী ৩ লক্ষ টাকা। কোন্ জিনিষ কত লক্ষ টাকার আসিয়াছে এবং গত বৎসরের মার্চ্চ মাসের তুলনায় কত লক্ষ টাকা হ্রাস-বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কাপড়	৪৩	লক্ষ	হ্রাস	৭ লক্ষ
কলকব্জা	৩১	„	„	৮ „
তৈল ও খনিজ	১৭	„	বৃঃ	১ „
লৌহ ও ইস্পাত	১৫	লক্ষ	হ্রাঃ	১০ „
চিনি	১৩	„	„	৪
ধাতু	১২	„	বৃঃ	১
মদ্য	৬	„		×
তামাক	১	„	হ্রাঃ	৫
লৌহের জিনিষ	৬	„	„	৩

প্রধান প্রধান সমস্ত জিনিষেরই আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। কাপড়ের আমদানী ২ কোটী ১০ লক্ষ গজ হইতে ১ কোটী ৯০ লক্ষ বর্গগজে এবং মূল্য হিসাবে ৩৬ লক্ষ টাকা হইতে ৩৫ লক্ষ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। চিনির আমদানী ১৫ হাজার টন হইতে ১০ হাজার টনে নামিয়াছে এবং মূল্য হিসাবে ১৬ লক্ষ টাকা হইতে ১২ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাঙ্গালী

মিঃ সুরেশচন্দ্র সান্যাল কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এতকাল এই পদটী ইয়োরোপীয়দিগেরই অধিকারভুক্ত ছিল। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী মজলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে সামান্য কর্ম্ম গ্রহণ করেন। স্বীয় দক্ষতা ও কার্য্যপটুতার ফলে

আজ তিনি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলিকাতার চীফ ইঞ্জিনীয়ার।

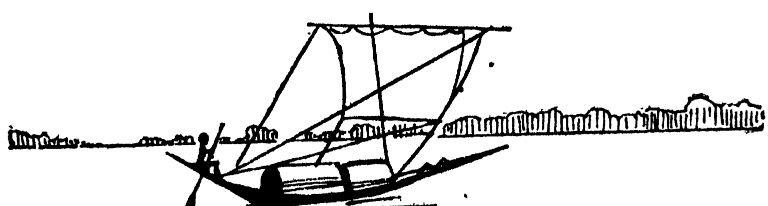
প্রবাসে ভারতীয়গণ—

বর্ত্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতবাসার অধিকার সম্বন্ধে ভারত-সরকারের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের একটা নূতন চুক্তি হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সব ভারতবাসী স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকার রক্ষার এ পর্য্যন্ত তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই। নিম্নে বিদেশে মোট কতজন ভারতবাসী আছেন এবং কোন্ দেশে কতজন আছেন, তাহা দেওয়া হইল।

ভারতের বাহিরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমানে মোট ২৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৫ জন ভারতবাসী আছেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য ছাড়া অন্যান্য দেশে মোট ১ লক্ষ ৫ শত ২৫ জন ভারতবাসী আছে। বিভিন্ন দেশে ভারতবাসীর সংখ্যা এইরূপ—

দেশ	ভারতীয়ের সংখ্যা	আদম-সুমারীর বৎসর
সিংহল	৯৫৯০০০	১৯২৯
বৃটিশ মালয়	৭০০০০০	১৯২৯
হংকং	২৫৫৫	১৯১১
মরিসস	২৮.০২৫	১৯২৮
সিসেইলস	৩৩২	১৯১১
জিব্রালটার	৫০	১৯২০
নাইজিরিয়া	১০০	১৯২০
কেনিয়া	২৬৭৫৯	১৯২৬
উগাণ্ডা	১১৬১৩	১৯২[illegible]
নিয়াসাল্যাণ্ড	৫১৫	১৯২১
জাঞ্জিবর	১২৮৪১	৯২১
তাঙ্গানিকা	১৮৪৮৩	১৯২৭
জ্যামেকা	১৭৬৭১	১৯১৮
ত্রিনিদাদ	১৩০৫৪২	১৯২৯
বৃটিশ গিয়েনা	১২৮২০৯	১৯২৯
ফিজি	৬০৮৩	১৯২১
বাসুতোল্যাণ্ড ও সোয়াজিল্যাণ্ড	১০৬	১৯১১
রোডেশিয়া	১৩০৬ (এশিয়াবাসী)	১৯২১
কানাডা	১২০০	১৯২০
অষ্ট্রেলিয়া	২৬০৬	১৮২২
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৬১৩৩৯	১৯২১
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৩১৭৫ (এশিয়াবাসী)	১০১০
মাদাগাস্কার	৫২৭২	১৯১৭
রিইউনিয়ন	২১৯৪	১৯২৫
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ	৫০০০০ (?)	১৯২০
সুরিনাম	৩৪৯৫৬	১৯২০
মোজাম্বিক	১১০০ (এশিয়াবাসী)	১৯২২
পারস্য	৩৮২৭	১৯২২

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে প্রবাসী ভারতবাসীর সংখ্যা ৩১৭৫ জন ধরা হইয়াছে, কিন্তু এই সংখ্যা ঠিক বলিয়া মনে হয় না; কেননা, আমেরিকার গদর দল নামে যে ভারতীয় বিপ্লবীদল আছে, তাহাদেরই সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার বলিয়া প্রকাশ।



সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন প্রণীত গানের বহি "গীতিগুঞ্জ" ; মূল্য—২৲

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত গল্পের বই "আকাশ প্রদীপ" ; মূল্য—৷৶৹

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সিংহ প্রণীত "ব্যথার গাথা" ; মূল্য—১৷৹

শ্রীবিধুভূষণ জানা প্রণীত "স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম" ; মূল্য—১৷৵৹

শ্রীঅলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "দেবদাসী"—মূল্য ১৲

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "স্বপ্ন-ছবি" মূল্য—১৲

শ্রী[illegible] প্রণীত কৌতুক-নাটিকা "আপন ভোলা" ; মূল্য—৷৹

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত নাটক "প্রহ্লাদ" ও "গয়াসুর" মূল্য—
প্রত্যেক খানি ১৲

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক "ভাস্কর পণ্ডিত"—১৷৹

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'রহস্য-লহরী' উপন্যাস মালায় অন্তর্গত ১৬৪নং উপন্যাস "চীনের চাতুরী" ও ১৬৫নং উপন্যাস "পান্না ও হীরার তারা" ;
প্রত্যেকখানি—৸৹

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "রাজ্যশ্রী" মূল্য—৷৹

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬৷৵৹, ভি, পিতে ৬৷৶৹, ষাণ্মাসিক ৩৶৹ আনা, ভি, পিতে ৩৷৹। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক। ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায় ; সুতরাং পরবর্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে। পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নং দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ নূতন বলিয়া উল্লেখ করিবেন ; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

পুনশ্চ—এই উনবিংশ বর্ষকাল "ভারতবর্ষে" সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের যে সকল শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের অগোচর নাই। কেবল এক বৎসরের কথাই বলি—উনবিংশ বর্ষে কিঞ্চিদধিক ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০ খানি বহুবর্ণ চিত্র ও ন্যূনাধিক ৯০০ একবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আর একটী বিষয় বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য ; এই বৎসরে চারিখানি খ্যাতনামা কথা-শিল্পীর উপন্যাস সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিংশ বর্ষেও এই রীতি অনুসৃত হইবে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, প্রথম বর্ষ হইতে "ভারতবর্ষ" যে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা একটুও ম্লান হয় নাই। বিংশ বর্ষের জন্য "ভারতবর্ষ" কিরূপ আয়োজন করিয়াছে, আমরা নিজ মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না—বিগত উনবিংশ বর্ষের "ভারতবর্ষে"র পরিচালনার কথা আলোচনা করিলেই পাঠকগণ স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কর্ম্মকর্তা—"ভারতবর্ষ"

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJAE
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

উনবিংশ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮—১৩৩৯

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—